দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিক পত্র

বিংশ বর্ষ

প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ—১৩৩৯

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—

ভারতবর্ষ

আষাঢ়—১৩৩৯

প্রথম খণ্ড	বিংশ বর্ষ	প্রথম সংখ্যা

সঙ্ঘ-মন (১)

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ সেন, এম্‌-এ, এফ্‌-আর-ই-এস্‌ (লণ্ডন)

সাধারণতঃ আমরা 'লোক-মত' বলিয়া যাহা বুঝি, সঙ্ঘ-মন তাহারই বৈজ্ঞানিক আখ্যা। মানুষের একটা মন আছে; সেইখানে তাহার ভাব, অনুভূতি, মত, বিশ্বাস ইত্যাদি মনোবৃত্তির উৎপত্তি হয়। সমাজনীতি সম্বন্ধে আধুনিক লেখক ও দার্শনিকগণ বলেন, মানুষ যে সমাজ বা সঙ্ঘ বদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে, সেই সমাজ বা সঙ্ঘও একটা মানুষের মত; তাহারও একটা চিন্তার ধারা আছে, একটা মন আছে; এবং সেই মনে সামাজিক ভাব, সামাজিক অনুভূতি ও সামাজিক মতের উৎপত্তি হয়। মানুষের ব্যক্তিগত মনে যেমন অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া একটা মত বা বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ সমাজ বা সঙ্ঘের মনেও অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবের অহরহ বিচার চলিতেছে, এবং সেই বিচারের ফলেই 'লোকমত' বা 'জনমত'এর উদয় হয়। প্রাত্যহিক জীবন-নির্ব্বাহকালে আমরা অনেক সময়ই বলিয়া থাকি, লোকে কি বলিবে, সমাজ কি বলিবে, 'পাঁচজনে' কি বলিবে! এই লোক বা সমাজ বা 'পাঁচজন' একটা মনগড়া দেবতা নয়। এই দেবতা যে কিরূপ সত্য, কিরূপ নিষ্ঠুর, ইহার আদেশ যে কিরূপ অমোঘ, তাহা আমরা সকলেই জানি। ব্যক্তিগত মানুষের যে সকল দোষগুণ আছে, সঙ্ঘেরও সেই সকল দোষ-গুণ আছে। সুতরাং রক্ত-মাংসে গঠিত না হইলেও সঙ্ঘকেও একটা 'ব্যক্তি'রূপে গণ্য করিতে পারি। প্রত্যেক ব্যক্তিগত মানুষ এই সঙ্ঘ-মানুষটির এক-একটি ভাব-কেন্দ্র। সমষ্টিবদ্ধ মানুষ-মানুষের সহিত আদান-প্রদানের ফলে বহু ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে; সেই সমষ্টিভূত ঘাত-প্রতিঘাতের কেন্দ্রকেই আমরা 'সঙ্ঘ-মন'রূপে অভিহিত করিব। উক্ত ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই সঙ্ঘ ও সমাজসম্পর্কীয় সকল প্রশ্নের বিচার ও মীমাংসা চলিতেছে; অনুভূতি, ধারণা ও বোধশক্তি,—মানুষের মনের এই তিন বৃত্তি, সঙ্ঘ-মনেও

(১) লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় Social Mind বা Group Mindএর পরিভাষারূপে 'সঙ্ঘ-মন' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতিক[illegible] উপযুক্ত পরিভাষা অভাবে আমরাও এই প্রবন্ধে উক্ত শব্দটি গ্রহণ করিলাম।

পাওয়া যায়। এই বিচার বা মীমাংসার ফলেই লোকমতের সৃষ্টি হয়। সমাজ-বিজ্ঞানের (Sociology) পরিভাষায় তাহাই সঙ্ঘ-মন বা Social Mind।

এখন দেখা যাক, এই সঙ্ঘের প্রকৃত স্বরূপ কি ও কিরূপে তাহার সৃষ্টি হয়।

মানুষ প্রথমেই জন্মিল মাতৃক্রোড়ে, এবং পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, আত্মীয়-আত্মীয়ার সমষ্টি হইল ঐ শিশুর সঙ্ঘ বা সমাজ। এই সমাজ শিশুর উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিল। শিশু-চিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভাবনা, স্নেহ-ভালবাসা, সুখ-দুঃখ এই আদিম সঙ্ঘটিকে আশ্রয় করিয়া মঞ্জরিত হইল। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় আত্মীয়াদের ভাব, অনুভূতি, পাপ-পুণ্যের আদর্শ শিশু-চিত্তকে অধিকার করিল। ইহাই হইল সঙ্ঘ-মনের সহিত মানুষের প্রথম পরিচয়।

তাহার পর তাহার কৈশোর,—গৃহকোণ ত্যাগ করিয়া বিশ্বের সহিত প্রথম পরিচয়। শিশু স্বাধীনতা পাইল, পাড়ার সমবয়স্ক বালকবালিকাদের সহিত তাহার পরিচয় হইল। এই সকল বালকবালিকা বিভিন্ন সংসারের অভিব্যক্তি; তাহাদের পিতামাতা ভ্রাতাভগিনী ইত্যাদি বিভিন্ন; সুতরাং তাহাদের চিত্তের স্বরূপও বিভিন্ন। শিশুচিত্ত আর একটা এবং বিভিন্ন প্রকারের সঙ্ঘের মধ্যে আসিয়া পড়িল। কিন্তু সংসারের অভিব্যক্তি যতই বিভিন্ন হউক না কেন, শিশুচিত্তের একটা সার্ব্বভৌম একতা আছে; সুতরাং আমাদের কাল্পনিক মানব-শিশুর অধিকাংশ বালকবালিকার সহিতই সখ্য হইল; কয়েকজনের সহিত হয় ত তাহার শিশু-সুলভ শত্রুতা হইল; ফলে সঙ্ঘের সংখ্যা বাড়িল। ইহাই হইল বালকবালিকার 'দল'। এই দলের উৎপত্তির প্রধান কারণ, দলস্থ সভ্যদিগের মনোবৃত্তির সাময়িক একতা ও সামঞ্জস্য। কিন্তু একবার যখন এই দল গঠিত হইল, তখন এই দলের একটা 'ব্যক্তিত্ব' ফুটিয়া উঠিল, এবং পরস্পরের ভাব ও অনুভূতির আদান-প্রদানের ফলে একটা সম্মিলিত (Collective) বিচারশক্তি হইল, অর্থাৎ সঙ্ঘ মনের উৎপত্তি হইল। এই সম্মিলিত বিচারশক্তি শুধু ব্যক্তিগত ভাবের সমষ্টি-মাত্র নয়, অথচ, ব্যক্তিগত ভাব হইতে নিরপেক্ষও নয়; কারণ, ব্যক্তিগত চিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতেই ইহার উৎপত্তি।

যৌবন হইতেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে 'সমাজে' প্রবেশলাভ করিল। কৈশোরে মানুষের মন যখন তরুণ থাকে, তাহাদের সঙ্ঘের মনও তখন তরুণ; কোনও বিশেষ ভাবই সঙ্ঘ চিত্তের উপর গভীর রেখাপাত করিতে পারে না; এবং এই সঙ্ঘ-মনের প্রভাবও মানুষের জীবনে ক্ষণিক। কিন্তু, মানুষ যখন বৃহত্তর জগতে প্রবেশলাভ করিল, তখন যে সকল সঙ্ঘের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তাহাতে প্রবীণতার বৃত্তিগুলি সম্যক পরিস্ফুট। মানুষ একাকী সঙ্গীহীন হইয়া থাকিতে পারে না; সুতরাং এই সকল সঙ্ঘের কতকগুলিকে আশ্রয় করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে ফুটিতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল সঙ্ঘ কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটা সাময়িক সম্মিলনী নহে, একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই ইহার জন্ম ও মৃত্যু নয়। এমন অনেক সঙ্ঘই আছে, যাহার জীবন বহুযুগব্যাপী; বহু যুগের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও বহু যুগের মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সফলতা-ব্যর্থতার মধ্য দিয়া যাহার একটা সুস্পষ্ট বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে—যাহার জন্য আজিকার মানুষটিকে অমোঘ বলিয়া, সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। অথচ, এই সঙ্ঘের মন কোনও ব্যক্তিবিশেষের মন হইতে যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা মনে করিলে চলিবে না। এ কথা সর্ব্বদা মনে করিয়া রাখিতে হইবে—মানুষের সমষ্টি লইয়াই এই সঙ্ঘ, এবং ইহার যে শক্তি তাহা সংহতির শক্তি। বাস্তবপক্ষে, এই সঙ্ঘ একটা অতিমানুষ নহে, কিন্তু ইহার শক্তি একটা অতিমানুষের মতই। কে একজন বলিয়াছেন, এক এবং এক যোগ করিলে দুই হয় বটে, কিন্তু এক এবং এক সঙ্ঘবদ্ধ হইলে, দুইএর অপেক্ষাও বেশী কিছু হয়। একজন দুর্ব্বৃত্ত পৃথিবীর যাহা অপকার করিতে পারে, দুইজন দুর্ব্বৃত্ত সঙ্ঘবদ্ধ হইলে তাহার দ্বিগুণের অপেক্ষাও বেশী অপকার করিতে পারে। সংহতির মধ্যে একটা বিশেষ শক্তি আছে, যাহার বীজ ব্যক্তিগত মানুষের মধ্যেই লুপ্ত ছিল, কিন্তু সঙ্ঘের সোণার কাঠিতেই যাহার জাগরণ হইল। সুতরাং সঙ্ঘমনের ভিতর দিয়াই মানুষের চিত্তের পরিপূর্ণ প্রকাশ হইল; তাহার হাসিকান্না, উদ্যম আকাঙ্ক্ষা, ভাব অনুভূতির একটা নূতন অর্থ হইল।

মানুষ যখনই সঙ্ঘবদ্ধ হইল, তখনই সঙ্ঘমনের এই অতিমানুষিক শক্তির সহিত পরিচয় হইল। কিরূপে এই

সঙ্ঘমনের অদ্ভুত সৃষ্টি হয় দেখিতে হইলে, সঙ্ঘ-বদ্ধ মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তা কিরূপে সঙ্ঘের চিন্তায় পরিণত হইয়া জনমতের সৃষ্টি করে, দেখিতে হইবে।

মনে করা যা'ক, ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য দেশের হিতার্থ একটা সামাজিক বিধি (আইন) প্রবর্ত্তিত করিতে অভিলাষী হইলেন। কয়েক দিন ধরিয়া তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন; ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে (তাঁহার মতে) সম্ভব যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহার পর হয় ত তাঁহার সান্ধ্য-সমিতি (club) বা নিকট বন্ধুবর্গের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এই সান্ধ্য-সমিতির সভ্যগণ অথবা তাঁহার নিকট বন্ধুবর্গ সামাজিক মতবাদে তাঁহারই অনুকূল মতাবলম্বী, ইহা আশা করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহারা এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি অনুকূল যুক্তি পাওয়া গেল, কয়েকটি প্রতিকূল যুক্তির খণ্ডন হইল। আমাদের কাল্পনিক ব্যক্তিটিরও নিজস্ব কয়েকটি যুক্তি হয় ত ভ্রান্ত বলিয়া দেখা গেল। যাহাই হউক, এই প্রথম পত্তনে, সামাজিক প্রস্তাবটি মোটের উপর সমর্থিত হইল এরূপ আশা করিতে পারি। এইরূপে উৎসাহিত হইয়া উক্ত ব্যক্তি প্রস্তাবটি আইনের আকারে ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত করিলেন। সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার সেই প্রস্তাবের খসড়া প্রকাশিত হইল; ফলে তাঁহার "মত" নিকটস্থ বন্ধুমহল হইতে শিক্ষিত মহলে পৌঁছিল। তাঁহাদেরও আপন আপন সঙ্ঘ আছে, এবং তাহার কতকগুলির সামাজিক মতবাদ হয় ত আমাদের কাল্পনিক সভ্যটির মতবাদের প্রতিকূল। সুতরাং অনুকূল আলোচনা ও প্রতিকূল সমালোচনা পাশাপাশি চলিতে লাগিল; উত্তর-প্রত্যুত্তর হইতে লাগিল। অর্থাৎ, প্রস্তাবটির সমর্থনকারী ও প্রতিকূল মতাবলম্বীদিগের মধ্যে রীতিমত বাগ্‌যুদ্ধ ঘোষিত হইল,—সময় সময় এই যুদ্ধ বাক্যের সীমা ছাড়াইয়া যায় এবং পুলিশের সাহায্য লইতে হয়। যাহাই হউক, উভয় পক্ষই দলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আন্দোলন অর্থাৎ propaganda আরম্ভ হইল—দেশ জুড়িয়া সভা-সমিতির সাড়া পড়িয়া গেল। এই সভা-সমিতির ফলে প্রস্তাবটির বিষয় অশিক্ষিত জনসাধারণও অবগত হইল। সকলেই নিজে নিজে চিন্তা করিতে লাগিল; এবং এই চিন্তার মধ্যে, অপরে, বিশেষতঃ তাহাদের সঙ্ঘ, কিরূপ চিন্তা করিতেছে এবং তাহাদের মত কি, তাহাও স্থান পাইল। এইরূপে চিন্তার ও ভাবের ধারার ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হইল। প্রস্তাবটি যদি অত্যন্ত আধুনিকপন্থী হয়, তাহা হইলে আমাদের রক্ষণশীল-দলের নেতৃবর্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন এবং শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া পুরাতনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবেন। ফলে, সর্ব্বপ্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তিগণই প্রস্তাবটির সম্বন্ধে চিন্তাশীল থাকিবেন। ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণকে, যাহারা তাঁহাদের নির্ব্বাচন করিয়াছে তাহাদেরও (voters) "মত" মনে রাখিতে হইবে। পরিশেষে প্রস্তাবটি সভায় আলোচনার জন্য উপস্থিত হইল, তাহার সামাজিক মূল্য বিচারের জন্য। হয় ত প্রস্তাবটি গৃহীত হইল, হয় ত হইল না—তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোনও সম্পর্ক নাই। মূল কথা এই, একটা "জনমত" বা public opinion সৃষ্ট হইল। জনমত যে প্রত্যেক বিষয়েই একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহা নয়, এবং ব্যবস্থাপক সভায় যে তাহাকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য উপস্থিত হইতেই হইবে তাহাও নহে,—বরঞ্চ, বেশীর ভাগ স্থলেই সমাজসম্পর্কীয় প্রশ্ন এইরূপ একটা বিশিষ্ট সভায় শেষ মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয় না এবং জনমতের সমাধান অস্পষ্ট রহিয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও সমাজ-মন বা সঙ্ঘ-মনের চিন্তা করিবার প্রণালী কি, তাহা উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা কঠিন হইবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, এই যে জনমত বা সমাজ-মন সৃষ্ট হইল, ইহা সমাজের অন্তর্গত সঙ্ঘমনগুলির ঘাতপ্রতিঘাতে। এই সমাজ-মন শুধুমাত্র সঙ্ঘ-মনগুলির যোগফল নহে; ইহার মধ্যে একটা শক্তি আছে যাহা ব্যষ্টিগত সঙ্ঘ-মনের মধ্যেই কেবল পাওয়া যায় না। ব্যষ্টি ও সমষ্টির এইখানেই প্রভেদ। যেমন ভাব, অনুভূতি ইত্যাদি ব্যষ্টিগত মনোবৃত্তিসমূহের সমষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিত্বের উদ্ভব, তেমনি ব্যষ্টিগত ব্যক্তির সমষ্টিতে সঙ্ঘের উৎপত্তি, এবং ব্যষ্টিগত সঙ্ঘের সমষ্টিতে সমাজে প্রকাশ। এই যে মানুষের ব্যক্তিত্ব, সঙ্ঘের ব্যক্তিত্ব, সমাজের ব্যক্তিত্ব, এই প্রত্যেক ব্যক্তিত্বই এক-একটা ঐক্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সমাজে এক এবং এক সম্মিলিত হইলে দুই ত হয়ই,

উপরন্তু একটা উচ্চতর শক্তির উদ্ভব হয় ;—এই উচ্চতর শক্তির একটা নৈতিক ঐক্য আছে—'ব্যক্তিত্ব' বুঝিতে আমরা সেই ঐক্যটাকেই বুঝি। সুতরাং সমাজ-মনের যে ঐক্য, তাহা নিজস্ব একটা ঐক্য হইলেও, সঙ্ঘের ব্যষ্টিগত ব্যক্তিত্বরূপ ঐক্যগুলির পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতেই তাহার সৃষ্টি। তেমনই সঙ্ঘ-মনও মনুষ্যবিশেষের ব্যক্তিত্বের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রকাশ লাভ করে ;—অর্থাৎ, ব্যষ্টিও একটা ঐক্য, সমষ্টিও একটা ঐক্য ; পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া প্রতিনিয়তই চলিতেছে। (২)

সমাজমনকেও এইভাবেই বুঝিতে হইবে। কোনও সমাজ বা সঙ্ঘের ভিতরে যদি ব্যক্তিগত চিন্তার ধারার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, তখন সঙ্ঘ-মনেরও পরিবর্তন ঘটে ; এবং এই সঙ্ঘ-মনের ভিতর দিয়াই সামাজিক চিন্তার ধারার বা আদর্শের পরিবর্তন হইয়া থাকে। কথাবার্তা, আচার ব্যবহারে আমরা অনেকেই সমাজটাকে বাহিরের কিছু বলিয়া ধরিয়া লই,—এমন একটা জীব যাহাকে কখনও দেখা যায় না, অথচ তাহার চক্ষু যে রক্তবর্ণ এবং তাহার আদেশ মাত্রই যে হুঙ্কার, সে বিষয়ে অনেকের মনেই কোনও সন্দেহ নাই। সমাজের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিলে কিন্তু দেখা যাইবে, সমাজ আমাদেরই ঘরের লোক ; ইহার চক্ষুতে আমাদেরই দৃষ্টিশক্তি প্রকাশ পায়, এবং ইহার হুঙ্কারে ইহাই প্রমাণ হয় যে, আমরা হুঙ্কারের দ্বারাই আদেশ করিতে এবং আদেশ লইতে ভালবাসি। যেখানকার মানুষে সাম্য ও স্বাধীনতা ভালবাসে, যেখানে শিক্ষিত লোকের অভাব নাই, জ্ঞানহীন কুসংস্কার যেখানে মানুষের মনকে শাসিত করে না, সেখানকার সমাজ কখনও হুঙ্কার দিয়া কথা বলিতে জানে না, সেখানকার সমাজ নূতন বধূটির মত অনুরোধ করে, এবং নূতন বধূর অনুরোধের মতই তাহার অনুরোধ সানন্দে এবং স্বেচ্ছায় পালিত হয়। একটা কথা বলা এখানে হয় ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আজ আমরা বাংলাদেশের সমাজকে একটা বাহিরের দৈত্য বলিয়া মনে করি ; তাহার একমাত্র কারণ, এখানে প্রকৃত সমাজের অভাব। বহু বৎসরের সামাজিক অরাজকতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতার ফলে বাংলার মানুষ পরস্পরের চিত্ত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে ; ভ্রাতৃভাব দূর হইয়া প্রভু-ভৃত্যের ভাবটাই বাংলার সামাজিক প্রাণটাকে আক্রমণ করিয়াছে। প্রাচীন ভারতে সমাজের এ আদর্শ ছিল না ; তখন আমাদের সমাজ-প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিকাশ হইয়াছিল। কিন্তু এখন সমাজ অর্থে আমরা বুঝি সমাজ-পতি (অর্থাৎ গ্রামের 'মোড়ল'), এবং দেশ অশিক্ষিত বলিয়াই লোকে এই সমাজ-পতির শাসন, কতক ভয় ও কতক শ্রদ্ধার সহিত, পালন করিয়া আসিতেছে। এই শাসক ও শাসিতের ভাব সেই দিন দূর হইবে যেদিন শিক্ষার আলোক বাংলার ঘরের কোণ হইতে আচারের দাসত্ব ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ হইবে।

মানুষের ব্যক্তিগত মন যেমন ব্যক্তিগত জীবনকে পরিচালিত করে, সঙ্ঘমনও তেমনি সঙ্ঘের জীবনকে পরিচালিত করে, সঙ্ঘের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সঙ্ঘের সামঞ্জস্য স্থাপিত করে, সঙ্ঘের সভ্যগণের পারস্পরিক আচার-ব্যবহার নির্ণয় করে, এবং অপরাপর সঙ্ঘের সহিত নিজের সম্বন্ধ স্থির করে। অতএব, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ সামাজিক ক্ষেত্র বলি, সমাজ-মনের প্রভাব যে শুধু সেই ক্ষেত্রেই তাহা নয়, ইহা আমাদের পারস্পরিক ব্যবহারের সবটুকুই পরিচালিত করে,—অর্থাৎ, সমষ্টিবদ্ধ হইয়া মানুষ যাহা কিছু কার্য্য করে, তাহাই সমাজ মনের শাসনাধীন। ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের যত কিছু সংস্কার (traditions) সে সকলই এই সমাজ-মনের সৃষ্টি। যেমন একটা ক্ষণিক চিন্তার ধারা মানুষের মনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তেমনই এক জন মানুষ কিছু ভাবিলে বা করিলে সমাজের উপর তাহা খুব অল্পই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে ; যতক্ষণ না সেই ব্যক্তির চিন্তার ধারা জনসাধারণে সংক্রামিত হইতেছে, ততক্ষণ তাহা সমাজ গ্রহণ করিবে না। সমাজ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এইরূপ ব্যক্তিগত চিন্তার ধারা প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে জনসাধারণে সংক্রামিত হইতে পারে, (ক) সহানুভূতি ও অনুকরণের দ্বারা, এবং (খ) সমালোচনার

(২) ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী Hobhouse বলেন, "By the social mind we mean not necessarily a unity pervading any given society as a whole, but a tissue of operative psychological force which in their higher developments crystallise into unity within unity and into organism acting upon organism.—Social Evolution and Political Theory.

দ্বারা। কেবলমাত্র সহানুভূতি বা অনুকরণের দ্বারা আমরা যে কার্য্য করি তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিতে হয় না, গতানুগতিকতাই তাহার মুখ্য ধর্ম্ম। কিন্তু সমালোচনায় বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা কার্য্যের বিচার করা হয়, অনুকরণ করিলেও তাহা অন্ধ নহে, বিবেচনার ফল।

ক) সহানুভূতি ও অনুকরণ।— মানুষ যতই বুদ্ধিবৃত্তির গৌরব করুক না কেন, সমাজে অন্ধ সহানুভূতি ও অনুকরণের দ্বারাই বেশীর ভাগ মানুষ পরিচালিত হয়। স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা মানুষের ব্যবহার খুব কমই নির্ণীত হয়। পাঁচজনে যাহা ভাবিতেছে বা পাঁচজনে যাহা করিতেছে, তাহাই ভাবা বা করা মানুষের স্বভাব ধর্ম্ম বলিয়া দেখা গিয়াছে। ফরাসী পণ্ডিত লি-বন্ (Le Bon) প্রমুখ মনীষিগণের মানব-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ হইতে জানা গিয়াছে যে দশজনের মধ্যে পড়িয়া মানুষ এমন কার্য্য করিতে পারে যাহা সে শান্তভাবে বিবেচনা করিলে কখনও করিতে পারিত না। দশজনের উদাহরণ সাধারণ মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে। এই গতানুগতিকতাই মানুষের স্বভাব ধর্ম্ম। অসামান্য বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণই স্বাধীনভাবে চিন্তা বা কার্য্য করিতে পারেন; তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব (personality) দেশ-কাল-পাত্র ছাপাইয়া উঠে, এবং তাঁহারাই সত্যানুসন্ধিৎসাকে সৃষ্টিময় করিয়া তুলেন। ইঁহারাই পৃথিবীর যীশুখ্রীষ্ট, মানুষের চৈতন্য, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, মুসোলিনী, রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সাধারণের সংখ্যার তুলনায় ইঁহারা কয়জন! সাধারণ মানুষের অনুভূতি পারিপার্শ্বিক পাঁচজনের অনুভূতির দ্বারা শাসিত হয়। সমাজ-বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাই হইল সহ-অনুভূতি বা সহানুভূতি। তাহার কার্য্যও তাহার সঙ্গ বন্ধুগণের কার্য্য ও ব্যবহারের দ্বারা নির্ণীত হয়, ইহাকেই অনু-করণ বলা হয়। সাধারণতঃ, কোনও সাময়িক উত্তেজনার সময়েই মানুষ কেবলমাত্র সহানুভূতি ও অনুকরণের দ্বারা পরিচালিত হয়। (৩)

(খ) সমালোচনা। সমালোচনার দ্বারা মানুষ বুদ্ধিকে, সহানুভূতি ও অনুকরণের এবং প্রত্যেক স্বাধীন কার্য্যের বিচারক নিযুক্ত করে। প্রত্যেক অনুভূতিই যে সহানুভূতির উদ্রেক করে তাহা নহে, এবং প্রত্যেক কার্য্যই অনুকৃত হয় না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আছে, বিচারশক্তি আছে; এইখানেই মানুষের সহিত পশুর প্রভেদ। এই বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাই মানুষ প্রত্যেক অনুভূতি ও কার্য্যের ন্যূনাধিক বিচার করে। কেবলমাত্র কোনও সাময়িক উত্তেজনার সময়ই এই বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ লোপ হইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক স্বাধীনতার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান দার্শনিকগণ এই আস্থা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এখন দেখা যায়, পূর্ণ নৈতিক স্বাধীনতা একটা আদর্শমাত্র; বাস্তবপক্ষে মানুষ সামাজিক জীব হওয়ায় তাহার অনেকখানিই সামাজিক অনুশাসন ও ভাবপ্রবণতার মধ্যে বাঁধা পড়িয়াছে। কিন্তু অপর পক্ষে, বুদ্ধিবৃত্তি বা বিচারশক্তির যে কোনও প্রভাবই নাই এ কথা মনে করিলে চলিবে না। ফরাসী-বিপ্লবের মূল ধারাটি হয় ত একটা সার্ব্বজনীন উত্তেজনা বা ভাবপ্রবণতার মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার পর যে গঠন-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেকখানি সৃষ্টিকুশল (creative) সমালোচনা ও বিচারশক্তি ছিল। এমন কি, ঐ যে উত্তেজনা বা ভাবপ্রবণতা, যাহা ফরাসী-রাজবিপ্লবের ভিত্তি বলিয়া গণ্য করা হয়, সেই উত্তেজনা বা ভাবপ্রবণতাও একদিনে প্রকাশ পায় নাই; বহুদিন ধরিয়া তাহা সঞ্চিত হইতেছিল, এবং সেই সঞ্চয়ের মূলে ছিল ব্যক্তিবিশেষের (individual) চিন্তার ধারা। মানুষ যে চিন্তা করিতে পারে, কার্য্য-কারণের সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করিয়া ভবিষ্যৎ বিচার করিতে পারে, অন্ধ সংস্কারকে সমালোচনার দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, ইহাই হইল মানুষের প্রতি বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান। এই সমালোচনার শক্তি না থাকিলে জগতে কোনও রূপ উন্নতিই হইতে পারিত না; প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে একটা অতি মন্থর পরিবর্ত্তন হইত বটে, কিন্তু কোনও উন্নতি হইত না। উন্নতি (Progress) বলিতেই আমরা এক বা একাধিক আদর্শ বুঝি—এবং এই আদর্শ-সৃষ্টির মূলে আছে, আত্ম-

(৩) কিন্তু Gabriel Tarde বলেন, অনুকরণই সামাজিক ব্যবহারের মূল ভিত্তি। Prof. Giddings এই মত খণ্ডন করিয়া বলেন, সমাজ-প্রতিষ্ঠান মুখ্য কারণ, 'স্বাজাত্য-জ্ঞান' (consciousness of kind), এবং এই স্বাজাত্য-জ্ঞানকে শুধু অনুকরণের ফল বলা যায় না।

সমালোচনা ও সামাজিক সমালোচনা। এখন, এই যে পারস্পরিক আলোচনা ও সমালোচনার ফলে একটা সামাজিক আদর্শের সৃষ্টি হয়, দেখা যাক তাহার উপাদান কি। সমাজতত্ত্ববিৎ ইহার তিনটি উপাদান নির্ণয় করিয়াছেন,—প্রথম, সামাজিক আত্মজ্ঞান বা Social self-consciousness; দ্বিতীয়, সামাজিক স্মৃতিভাণ্ডার (Social Memory) বা সংস্কার (Tradition); তৃতীয়, মানুষের কার্য্যকলাপের সামাজিক মূল্য বা Social values।

১। সামাজিক আত্মজ্ঞান বা Social Self-consciousness। ইহার স্থূল অর্থ এই যে, সমাজটাকে 'আত্মীয়' অর্থাৎ একান্ত আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। মনে করিলে চলিবে না যে, সমাজটা একটা বাহিরের লোক, একটা গুণ্ডাবিশেষ, যাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাকে আমার চিত্তের সমস্ত দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। সামাজিক আত্মজ্ঞানের বিশেষত্ব এই:—যখন আমি নিজের অনুভূতি ও বিচার সমালোচনা করিতেছি, ঠিক সেই সময় আমার প্রতিবেশী বা আমার সঙ্ঘস্থ বন্ধুগণ যাহা ভাবিতেছে ও বিচার করিতেছে, তাহাও আমার চিন্তার অন্তর্গত করিয়া, এই উভয় চিন্তার ধারাই যে এক—ইহার উপাদান লক্ষ্যস্থল ও আদর্শ যে এক—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি; এবং যখন এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য্য করিব, তখন আমার এই জ্ঞান থাকিবে যে তাঁহারাও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন এবং এই প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন। বুঝিতে হইবে যে, আমার চিন্তার ধারা অপরের চিন্তার ধারার নিরপেক্ষ নহে, কারণ, সেরূপ ভাবিলে কোনওরূপ সামাজিক আত্মজ্ঞানের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব; এবং তাহা হইলে সমাজের মূল ভিত্তিকে অস্বীকার করা হয়। পরস্পরের বুদ্ধিবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে সামাজিক আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কিন্তু এই ঘাত-প্রতিঘাত হয় মানুষের অন্তর্জগতে। আমার প্রতিবেশী বা সঙ্ঘস্থ বন্ধু যাহা ভাবিতেছে এবং আমি যাহা ভাবিতেছি, তাহার ঘাত-প্রতিঘাত যেমন আমার অন্তরে হইতেছে, তেমনি আমার প্রতিবেশীর অন্তরেও হইতেছে, এবং আমরা উভয়েই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া একই ভাবে কার্য্য করিতেছি। বস্তুতঃ, চিত্তের আদান-প্রদান ও পরস্পরের বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয় বা Synthesis এই সামাজিক-আত্মজ্ঞানরূপ অপূর্ব্ব সৃষ্টির উপাদান। এই আদান-প্রদান ও সমন্বয়ের ফলেই সঙ্ঘ-মন একটা রূপহীন অবাস্তব শক্তির ছায়া হইতে একটা বাস্তব সৃষ্টিকুশল অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়। জনমত বা লোকমতও এই সামাজিক আত্মজ্ঞানেরই একটা বিরাট সৃষ্টি। ইহার ধ্বংসের লীলা যেমন প্রচণ্ড, ইহার সৃষ্টির কৌশলও তেমনিই বিচিত্র! রুশিয়ার একছত্র রাজচক্রবর্ত্তী নিমেষে ধূলায় বিলীন হইয়া গেল, পৃথিবীতে অভূতপূর্ব্ব একটা বিরাট প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব হইল, সঙ্ঘ জীবনের বিচিত্র প্রতিষ্ঠা দেখা গেল। রাজনীতিবিশারদ বা ঐতিহাসিক তাহার যে কোনও কারণই নির্দ্ধারিত করুন না কেন, আমরা বলিব, রুশিয়ার মনোজগতে সামাজিক আত্মজ্ঞানের যে আগ্নেয়গিরি অল্পে অল্পে শক্তি আহরণ করিতেছিল, পৃথিবীব্যাপী একটা মহা-আহবকে সহায় করিয়া সেই শক্তির প্রকাশ হইল; রুশিয়ার বর্ত্তমান সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাহারই ফল।

২। দ্বিতীয় উপাদান, সামাজিক স্মৃতি বা সংস্কার। যখন মানুষ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তখনও মানুষের মন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারে না; কেন না, তাহার মত সর্ব্বদাই সমাজের অতীত সুখ দুঃখ ভাব অনুভূতি বিশ্বাস ও আদর্শ-ভার-বিড়ম্বিত। এই সকল ভাব অনুভূতি বিশ্বাস বা আদর্শ, সামাজিক সংস্কারের সৃষ্টি করে। সংস্কাররূপেই মানুষ এই সমস্ত সামাজিক ভাব অনুভূতিগুলিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহাই হইল সামাজিক স্মৃতি, ইহাই সমাজ মনের ঐক্য সাধন করে। মানুষের মনের বিকাশ যতই অগ্রসর হয়, তাহার মনের একতা ততই পরিস্ফুট হয়। শৈশবাবস্থায় মানুষ তাহার এই মানসিক ঐক্যসম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত সে জানিতে পারে, অজ্ঞ হইলেও আজিকার এই মানুষটি কালিকার মানুষটির সহিত জন্ম হইতেই একটা বিশিষ্ট ঐক্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং তাহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত এই ঐক্যের ক্রমবিকাশ হইবে। সমাজ মনেরও যে একটা ঐক্য আছে এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই ঐক্যসম্বন্ধে সমাজ-অন্তর্গত মানুষকে সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হইবে।

তাহার কারণ, সমাজ-মনের যে ঐক্য আছে এই অনুভূতিই এই ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। অপর পক্ষে, এই অনুভূতির অভাব সমাজ-বন্ধনকে আপনা হইতেই শিথিল করিয়া দেয়। সামাজিক সংস্কারগুলি এই ঐক্যের ভিত্তি। এই সংস্কারগুলি আর কিছুই নহে, অতীত যুগের মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতা; সুতরাং অতীত যুগের সহিত বর্ত্তমান যুগের ঐক্য রক্ষা করিবার একমাত্র সেতু। বর্ত্তমান যুগের সহিত এই সংস্কারগুলির সামঞ্জস্য আছে কি না এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। দ্রষ্টব্য এই যে, সামাজিক আচার-ব্যবহারের সমালোচনা করিতে বসিলেই, মুখ্যতঃ হউক, গৌণতঃ হউক, আমরা এই সংস্কারগুলির দ্বারা পরিচালিত হইব। কেহ হয় ত এই সংস্কারের নিকট মাথা নত করিয়া তাহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইবে, কেহ হয় ত সমাজের বর্ত্তমান জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য সংস্কারের পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী হইবে। কিন্তু সংস্কার যে আছে এবং তাহার শক্তি যে প্রভূত, কারণ সঙ্ঘ তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে,—এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। অস্বীকার করিলে হয় বলিব বাতুল, না হয় utopian বলিব।

সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ সামাজিক সংস্কারগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা:—

(১) যে সকল সংস্কার মানুষের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনকে আশ্রয় করিয়া গঠিত হইয়াছে।

(২) যে সকল সংস্কার কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া গঠিত হইয়াছে, ও

(৩) যে সকল সংস্কার তর্ক ও চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই তিন শ্রেণীর সংস্কারকে আমরা যথাক্রমে, প্রাথমিক সংস্কার (Primary traditions), গৌণ সংস্কার (Secondary traditions) ও শাখা সংস্কার (tertiary traditions) বলিব। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও সংস্কারগুলি পরস্পরের নিরপেক্ষ নহে। শাখা সংস্কারের সহিত গৌণ সংস্কারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং কতকগুলি শাখা সংস্কারকে প্রাথমিক সংস্কার হইতে কোনও বিশেষ রীতি মত পৃথক করা যায় না। মানুষের অন্তঃকরণ মাত্র একটি, কিন্তু ভাবের ধারা অসংখ্য। এই একটি মাত্র আধারেই যখন সমস্ত সংস্কারের ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, সমস্ত সংস্কারের জন্মক্ষেত্র যখন মূলতঃ একটি, তখন এই সংস্কারগুলিকে সূক্ষ্মভাবে ভাগ করিতে যাওয়া সমীচীন হইবে না।

বাস্তবিক জীবনে মানুষের যাহা কিছু অভিজ্ঞতা তাহাতেই প্রাথমিক সংস্কারের সৃষ্টি। মানুষের সাধারণ ও দৈনন্দিন জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রণালী সম্পর্কীয় যাহা কিছু সংস্কার (economic traditions) তাহা এই শ্রেণীর। জৈব-জীবনের প্রয়োজনীয়তায় ইহার উৎপত্তি,—শুধু প্রয়োজনীয়তা নহে, মানুষ তাহা কিরূপ উপলব্ধি করিয়াছে তাহাও একটা কারণ। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন, কিন্তু মানুষ খাদ্যেরও বিচার করিয়াছে; তাই ভিন্ন ভিন্ন জাতির খাদ্যও বিভিন্ন। হিন্দুদিগের খাদ্য-সংস্কার একরূপ, মুসলমানদিগের একরূপ, ইংরাজদিগের আর একরূপ। সেইরূপ, গৃহনির্ম্মাণ, স্ত্রীপুরুষের যৌন-সম্বন্ধ, সন্তান পালন ইত্যাদি বিষয়ও বিভিন্ন জাতি বিভিন্নরূপে সমাধান করিয়াছে ও বিভিন্ন সংস্কারের উদ্ভব হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সমাজে মানুষের পারস্পরিক ব্যবহার সম্বন্ধেও সঙ্ঘ-মন অধিকার ও কর্ত্তব্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে। ইহাতেই প্রাথমিক ব্যবহার-বিধি বা Common Law-এর উদ্ভব। এইগুলিকে ব্যবহারিক সংস্কার (jural traditions) বলা যাইতে পারে। অতঃপর, মানুষের বাস্তব জীবনের ধারা ও ব্যবহারিক সংস্কারকে ভিত্তি করিয়া গঠিত হইল মানুষের রাজনৈতিক সংস্কার (Political tradition)। শাসক ও শাসিতের উদ্ভব সমাজ-গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছিল, কিন্তু রাজশক্তির প্রকৃতি কি, এবং প্রজার সহিত রাজার সম্বন্ধ নির্ণয় ও দণ্ডনীতির উদ্ভব—এই সকল সম্পর্কীয় ধারণা প্রাথমিক বলিয়া গণ্য হইলেও অত্যন্ত ধীরে ধীরে সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল; এমন কি এখনও ইহার সমাধান হইয়াছে বলা যায় না; কারণ, বর্ত্তমান যুগেও রাজা ও প্রজার পারস্পরিক সম্বন্ধ লইয়া ধারণার ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে।

কাল্পনিক জগতে মানুষের যাহা কিছু অভিজ্ঞতা, তাহাই হইল মানুষের গৌণ সংস্কার। মানুষ যে পশু হইতে বিভিন্ন, কল্পনা করিবার ক্ষমতা তাহার অন্যতম কারণ। মানুষের আলোচনাশক্তির উপাদান শুধু যে তাহার বাস্তব জীবনের

অভিজ্ঞতাতেই পাওয়া যায় তাহা নহে, অদৃশ্যমান কাল্পনিক জগতের যত কিছু সংস্কার, মিথ্যা হউক, সত্য হউক, মানুষের বিশ্বাসকে হয় ত তাহা আরও দৃঢ়ভাবে শাসিত করে। যখনই মানুষ কল্পনা করিতে শিখিল, তখন হইতেই এই বাস্তব জগৎ হইতে ভিন্ন একটা জগতের সৃষ্টি হইল। মানব-সভ্যতার আদিম যুগে প্রকৃতির লীলা মানুষের মনে বিপ্লব বাধাইয়াছিল। দেহ প্রকাণ্ড হইলেও তখনকার মানুষের মস্তিষ্ক ছিল শিশুর মতই; তাই সে ভাবিল, এই যে পঞ্চভূত, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—ইহারাও এক একটা মানুষ, প্রভেদ শুধু এই যে ইহাদের ক্ষমতা অসাধারণ। তাহাদের প্রাণের পরিচয় তাহাদের গতিশীলতা। প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা,—ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝা, বন্যা, অগ্নি ইত্যাদি—এই সমস্ত প্রাণীরই ক্রোধের প্রকাশমাত্র; এবং এই ক্রোধ উপশম করিবার নিমিত্ত,—অর্থাৎ, প্রাকৃতিক শক্তির নিকট মানুষের অসহায়তার নিদর্শন স্বরূপ—মানুষের পূজার সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপেই দেবতার সৃষ্টি হইল,—অবশ্য, মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা হেতু এই দেবতাগুলিকে এক একটি অতিমানুষ বলিয়াই ধরিয়া লইল। তখনও বিজ্ঞানের জন্ম হয় নাই, মানুষের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার মধ্যে তাহার প্রথম চাঞ্চল্য অনুভব করা গিয়াছে মাত্র। তাই সেই দেবতা-সৃষ্টির যুগে যাহা কিছু অস্বাভাবিক, তাহাকেই একটা ব্যক্তিগত দেবতার পদে উন্নীত করা হইল। এমন কি, একটা অদ্ভুত আকারের প্রস্তরখণ্ডকে কেবল তাহার আকার অদ্ভুত বলিয়াই, হয় কোনও ব্যক্তিগত দেবতার আবাসরূপে, কিম্বা হয় ত ব্যক্তিগত দেবতারূপেই গণ্য করা হইত। প্রাচীন যুগের সভ্যতার যাহা কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যায়, সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনও এই সমস্ত দেবতা সম্বন্ধীয় সংস্কারের দ্বারা কিরূপ গভীরভাবে শাসিত হইত। সমাজতত্ত্বের ভাষায় এই-গুলিকে আমরা দৈব-সংস্কার বলিব (Animistic tradition); প্রকৃতিপূজা ইহার মূল তথ্য। এই দৈব-সংস্কার হইতেই পরে মানুষের আত্মজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। (৪) মানুষ যে স্বপ্ন দেখে—দেহ নিশ্চল, অথচ স্বপ্নে সে কত কার্য্য করিতেছে, কত দেশ ঘুরিতেছে, কত অনুপস্থিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে;—মানুষ যে মরে,—তাহার দেহ পড়িয়া রহিল অথচ 'মানুষ'টা নাই এবং তাহার কোনও শক্তিই নাই; - মানুষ যে অসুস্থ হয়, চিত্ত বিকার হয়, প্রলাপ বলিতে থাকে, পাগল হইয়া যায়, এই সমস্ত ঘটনা, আদিম মানুষের কল্পনাতেও মানুষের একটা অশরীরী আত্মা আছে, এই সন্দেহ উদ্রেক করিয়াছিল; এবং এই সন্দেহের মধ্যেই বর্ত্তমান যুগের আত্মতত্ত্বের প্রথম ধারাটি পাওয়া যায়,— মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ হইল।

দেবতা সৃষ্টি করিয়াই বা আত্মজ্ঞানের উদ্রেক করিয়াই কল্পনা ক্ষান্ত হয় নাই। কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের কলাবিদ্যা প্রকাশ পাইল, শিল্পকলা সম্বন্ধীয় সংস্কারের (æsthetic tradition) সৃষ্টি হইল। সঙ্গীতে, চিত্রে, নৃত্যে, ভাস্কর্য্যে মানুষ আপনাকে প্রকাশ করিল। এইরূপেই মানুষের শিল্পকলার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইল,—সমাজ তাহা গ্রহণ করিয়া মানুষের জীবনকে ধন্য করিল।

ধর্ম্মের (religion) উদ্ভবও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া হইল। একজন সর্ব্বশক্তিমান্ ঐশী শক্তিতে বিশ্বাস এই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কারের (religious tradtion) মূল ভিত্তি। এ বিশ্বাস তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; কল্পনা বলিতে আমরা যাহা বুঝি ঠিক তাহাও হয় ত ইহার ভিত্তি নহে। এ বিশ্বাস ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলেই আমরা এই সর্ব্বব্যাপী শক্তিমহিমাকে ঠিক অনুভব করিতে পারিব। এই শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণসাপেক্ষ নহে, কেবলমাত্র অনুভূতির উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত।

চিন্তাজগতে বা জ্ঞান-(conceptual thought) জগতে মানুষের যাহা কিছু অভিজ্ঞতা তাহাকেই আমরা শাস্ত্র সংস্কার বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। ইহা কল্পনারও ক্ষেত্র নহে, অনুভূতিরও ক্ষেত্র নয়, ইহা গভীর চিন্তার স্থল। ব্যক্তিগত (personal) ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও লীলার স্বরূপ নির্ণয়,—ইহাতেই হইল প্রাথমিক

(৪) অর্থাৎ knowledge of the conscious self। Self-consciousness বলিতে আমরা যাহা বুঝি, 'অহং-জ্ঞান'ই বোধ হয় তাহার উপযুক্ত সংজ্ঞা হইবে। এই 'আত্মজ্ঞান'ই প্রাথমিক দৈবসংস্কারের 'মূল' তথ্য কি প্রকৃতি-পূজাই ইহার মূল তথ্য, সে বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদ্গণের (anthropologists) মধ্যে মতভেদ আছে। এখানে আত্মজ্ঞান—the theory of the soul or 'spiritual substance'।

ভাগবত সংস্কারের (theological tradition) সৃষ্টি। সাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাস, পূজাপদ্ধতি ইত্যাদি ইহার মূল উপাদান। আমাদের বৈষ্ণবধর্ম্ম এইরূপই এক অতুলনীয় ভাগবত সংস্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। এমন কি, একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ানগণের ধর্ম্মমতও "ঈশ্বর-পুত্র" যীশুখ্রীষ্টকে অবলম্বন করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য, ইহার মধ্যে কতখানি তর্ক বা চিন্তাসাপেক্ষ এবং কতখানি ভক্তিসাপেক্ষ, বলা কঠিন; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই বিভিন্ন প্রকারের সংস্কারগুলি পরস্পরের নিরপেক্ষ নহে। সুতরাং, ইহার মধ্যে যতটুকু ভক্তিসাপেক্ষ অর্থাৎ মাত্র অনুভূতির উপরই নির্ভর করে—মানুষ যাহা শুধু প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে পারে মন দিয়া বিচার করিতে পারে না,—আমাদের সংজ্ঞানুসারে সেইটুকুই শুধু ধর্ম্মসংস্কার (religious tradition), পূর্ব্বোক্ত গৌণসংস্কারের অন্তর্গত। কিন্তু যেটুকু আমি মন দিয়া বিচার করিতে পারিলাম এবং সেই বিচারশক্তির ফলে যে ধারণা হইল, তাহা শাখা সংস্কারের অন্তর্গত। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রাথমিক ভাগবত সংস্কার অনুসারে, ধর্ম্ম—অনুষ্ঠান, ঈশ্বর,—'ব্যক্তি'। ইহাকে 'প্রাথমিক ভাগবত সংস্কার' আখ্যা দেওয়া হইল, তাহার কারণ, প্রথমে অনুষ্ঠানের দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং ভগবানকে ব্যক্তিরূপে উপলব্ধি করিয়াছিল। এই চিন্তাশক্তির ফলে মানুষের চিত্তে আর একরূপ সংস্কারের উদ্ভব হইল। পরিভাষা অভাবে ইহাকে আমরা গৌণ ভাগবত সংস্কার বা তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কীয় সংস্কার (metaphysical tradition) বলিতে পারি। (৫) "ততঃ-কিম্" হইল ইহার মূল সূত্র। কার্য্য কারণের বিচার স্থির করিতে করিতে পরিশেষে মানুষ পৌঁছিল এক অজ্ঞাত শক্তিরহস্যে, এবং সেইখানেই সে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বিশ্ব বিধাতাকে পাইল। স্পেন্সার প্রমুখ কয়েকজন মনীষী, অণুর কারণ পরমাণু পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন, কিন্তু স্বীকার করিলেন না 'সোঽহং' বিশ্ব-বিধাতাকে; উপরন্তু বলিলেন, যে শক্তিরহস্যের জন্য পরমাণু সৃষ্ট হইয়াছে বা যে সমস্ত কার্য্যের কারণ অনির্ণীত রহিয়া গিয়াছে, সেই শক্তিরহস্য শুধু অজ্ঞাত নহে, অজ্ঞেয়। এইরূপ চিন্তার ধারার উপর ডারুয়িনের প্রভাব যে কতখানি তাহা বলা বাহুল্য। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সংস্কার (scientific tradition), জ্ঞানজগতে মানুষের শেষ অভিজ্ঞতা। এই সংস্কার কল্পনা-প্রসূত নয়, বাস্তব জগতের ঘটনাবলীর সম্পর্কে মানুষের যাহা সাক্ষাৎ জ্ঞান, তাহাতেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। কালের পরিবর্ত্তনের সহিত জ্ঞানেরও পরিবর্ত্তন বা উন্নতি হইতেছে, বহু যুগের বৈজ্ঞানিক মতও ভ্রান্ত বা মেকী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে নূতন জ্ঞানের কষ্টি-পাথরে। যেখানে বিজ্ঞান কার্য্য-কারণের কোনও সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিতেছে না, সেখানে সে নিজের অসামর্থ্যও স্বীকার করিতেছে না, একটা কাল্পনিক উত্তর দিয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেছে না, নিরুত্তর থাকিয়া অহরহঃ গবেষণার দ্বারা সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এবং তাহার আবিষ্কৃত সত্য, মিথ্যা প্রমাণিত হইলেও, তাহাতে বিজ্ঞানের জয়ই হইতেছে, পরাজয় হইতেছে না।

সুতরাং সংস্কার সম্পর্কীয় আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম :—

প্রাথমিক সংস্কার,—দৈনন্দিন পার্থিব জীবনের সংস্কার :—

(১) আহার বিহার বিবাহ—অর্থাৎ, সাধারণ জীবন-যাত্রা প্রণালীর সংস্কার।

(২) ব্যবহারিক সংস্কার—আইনের সৃষ্টি।

(৩) রাজনৈতিক সংস্কার—শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ নির্ণয় ও 'দণ্ডনীতি'র উদ্ভব।

গৌণ সংস্কার,—অপার্থিব বা কল্পনা-জগতের সংস্কার :—

(১) আদিম দৈব-সংস্কার—প্রকৃতি-পূজা ও দেবতা-সৃষ্টি, আত্মজ্ঞানের উদ্ভব।

(২) শিল্পকলা-সম্পর্কীয় সংস্কার।

(৩) ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কার; ধর্ম্মের রূপ কেবলমাত্র অনুভূতি, বিধাতার রূপ,—ভক্তি।

শাখা সংস্কার—চিন্তা ও জ্ঞানজগতে মানুষের অভিজ্ঞতা :—

(৫) Metaphysical tradition has been derived from the theological. It refines the theological explanation of the universe by interposing "secondary causes," laws and principles between phenomena and their ultimate cause, the fiat of God."—Giddings : *Principles of Sociology, p* 144.

(১) প্রাথমিক ভাগবত-সংস্কার; ধর্ম্ম—অনুষ্ঠান, বিধাতা—'ব্যক্তি'।

(২) গৌণ ভাগবত-সংস্কার;—তত্ত্বজ্ঞানের উত্তর। ধর্ম্ম—তর্ক ও চিন্তা, বিধাতা—শক্তি।

(৩) বৈজ্ঞানিক সংস্কার।

যেমন ধীরে ধীরে এই সকল সংস্কার গঠিত হইতেছে, তেমনিই ধীরে ধীরে এই সকল সংস্কারের পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের ফলেই মানুষ সভ্যতার পথে, নীতির পথে, ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। মানুষের প্রচেষ্টার কোনও মূল্য যদি না থাকিত, যদি তাহার ইচ্ছাশক্তি না থাকিত, তাহা হইলে ত সভ্যতার উদ্ভব কেবলমাত্র অন্ধ প্রাকৃতিক ও যৌন নির্ব্বাচনেই রূপান্তরিত হইত। এইরূপ উদ্দেশ্যহীন প্রাকৃতিক বিবর্ত্তন অনেক সময়ে উন্নতির পরিপন্থী। সর্ব্বপ্রকার বন্ধনের সহিতই মানুষের অহরহঃ সংগ্রাম চলিতেছে; তাহার মধ্যে সংস্কারের বন্ধন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বন্ধন, কারণ সঙ্ঘের যুগ-যুগ সঞ্চিত শক্তি ইহার আধার। এই সংগ্রামের ফলেই প্রতি যুগের আদর্শ সৃষ্টি হইতেছে, এবং এই সংগ্রামের ফলে বিভিন্ন যুগের আদর্শও বিভিন্ন। বর্ত্তমান যুগেও সমাজের যাহা কিছু আদর্শ তাহাও এই সকল সংস্কারের 'সংস্করণে'র ফল। সাধারণ বাস্তব জীবনের সমুদায় সংস্কারের সহিত বর্ত্তমান যুগের ধারণার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, বর্ত্তমান যুগের জীবন-যাত্রার আদর্শ (standard of living) স্থিরীকৃত হইয়াছে। ব্যবহারিক সংস্কারও এইরূপ সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান ব্যবহার-বিধির (penal code) সৃষ্টি করিয়াছে, এবং রাজনৈতিক সংস্কারের পরিবর্ত্তন হইয়া বর্ত্তমান রাজনীতি (policy) তে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে দৈব সংস্কার, শিল্প-সংস্কার ও ধর্ম্ম সংস্কার, যথাক্রমে আদর্শবাদ, রুচি, ও ভক্তিবাদে পরিণত হইল। সেইরূপ প্রাথমিক ভাগবত সংস্কার হইতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের সৃষ্টি হইল এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কীয় সংস্কার হইতে প্রত্যেক যুগের ধর্ম্মতত্ত্বের সৃষ্টি হইল। এইরূপে সংস্কার, পরিবর্ত্তিত, রূপান্তরিত ও সংস্কৃত হইয়া নূতন সংস্কারের সৃষ্টি করে, এবং এই নূতন সংস্কারও আবার কালে পুরাতন হইয়া যায়। বিশেষ, এই যে সকল ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের কথা বলা হইল, কোনও যুগে যে ইহাদের সকলগুলির মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য হইতেই হইবে তাহা নহে, হয় ত যুগবিশেষে ইহাদের মধ্যে কোনওটি না কোনওটি সমাজে প্রাধান্য লাভ করে। হয় ত এক যুগ ধর্ম্মের নামে পাগল হইল, এক যুগ হয় ত নৃত্যকলাশিল্প সম্পদে অতুলনীয় হইয়া উঠিল, আর এক যুগ হয় ত তত্ত্বকথায় বিভোর হইয়া রহিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়। তখন সঙ্ঘের বিচারশক্তি এইরূপ সংস্কার বিশেষের প্রাধান্য দ্বারাই পরিচালিত হয়।

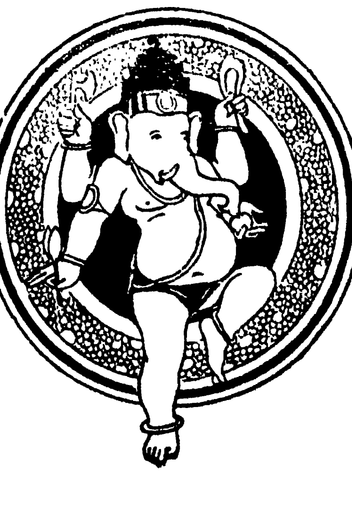
সামাজিক সমালোচনার দুইটি প্রধান উপাদান আমরা লক্ষ্য করিয়াছি—প্রথম, সামাজিক আত্মজ্ঞান; দ্বিতীয়, সামাজিক স্মৃতি বা সংস্কার। সংস্কারের প্রকার ভেদও আমরা করিলাম।

৩। সামাজিক সমালোচনার তৃতীয় উপাদান, মানুষের কার্য্যকলাপের সামাজিক মূল্য। যখনই মানুষের কোনও ব্যষ্টিগত ব্যবহার সঙ্ঘ গ্রহণ করিল, তখনই তাহার একটা সামাজিক মূল্য (Social value) নির্দ্ধারিত হইল। মানুষের আচার-ব্যবহার বিশ্বাস ইত্যাদির নির্দ্ধারিত সামাজিক মূল্য সামাজিক সমালোচনার একটি প্রধান অঙ্গ। যে সকল কার্য্যকলাপ বিশ্বাস অনুভূতির কোনও সামাজিক মূল্য নাই, সঙ্ঘ বা সমাজ যাহাকে সামাজিক জীবনের সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করিল না, সে সকল কার্য্য-কলাপ বিশ্বাস অনুভূতি সমাজে বেশী দিন স্থান পায় না। সঙ্ঘ-মন যখন চিন্তা করিয়া কার্য্য করে, তখন তাহার সেই কার্য্যের মূল কারণটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আচার-ব্যবহার-সংস্কার-সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান (institutions) গুলির সামাজিক মূল্য বিচার ও নির্দ্ধারণ, তাহার একটি প্রধান অঙ্গ। এই সকল নির্দ্ধারিত সামাজিক মূল্যগুলিই সামাজিক সমালোচনার গতি নির্ণয় করে। স্থানাভাবে এখানে একটিমাত্র উদাহরণ দিলাম। খ্রীষ্টিয় ১৯১৯ অব্দে ভারতবর্ষে যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইল তাহার বিরুদ্ধে আমাদের একটা প্রতিবাদ হইল এই যে, উক্ত শাসন-সংস্কার পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিভার পরিপন্থী। আমরা কহিলাম, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় আদর্শ,—রাষ্ট্রীয় শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা এবং এই কেন্দ্রীভূত রাজশক্তিকে, একজন ব্যক্তিবিশেষেই হউক বা একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সম্মিলনীতেই হউক, একটা বিশিষ্ট আধারে ন্যস্ত করা। স্থানীয় প্রাদেশিক

রাষ্ট্রগুলি সর্ব্বভাবেই এই বিশিষ্ট রাজশক্তির অধীন, এবং যেটুকু স্বাধীনতা তাহারা পাইয়াছে, তাহাও এই রাজশক্তির অনুমোদন-সাপেক্ষ। ভারতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল অন্যরূপ। এখানে স্থানীয় রাষ্ট্রগুলিই স্বাধীন ছিল এবং কেন্দ্রগত রাজশক্তি তাহাদের শক্তিকে যেখানে যতটুকু খর্ব্ব করিয়াছিল তাহা তাহাদের স্ব-ইচ্ছায়। ভারতবর্ষে বহুপূর্ব্ব হইতেই সঙ্ঘ-জীবনের বিকাশ হইয়াছিল; সেইজন্য স্থানীয় রাষ্ট্রগুলির এই সঙ্ঘ-জীবনের যোগ্য প্রতিনিধি হওয়ায়, কোনও বিশিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি উদ্ভূত হইয়া ইহাদের স্বাধীনতা অস্বীকার করিতে পারে নাই। বরঞ্চ, এই সঙ্ঘ বা গোষ্ঠীগুলির সহায়তাতেই রাজা তাঁহার রাজশক্তির আধার পাইয়াছিলেন। এইরূপে গোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সামাজিক জীবন গঠিত হইয়াছিল—এখনও ভারতের গ্রামে গ্রামে এই মুমূর্ষু গোষ্ঠী-জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে আমরা ব্রিটিশ-প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম, ইহা ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিভার পরিপন্থী। ভারতের গোষ্ঠী-জীবনকে আমরা যাহা সামাজিক মূল্য দিয়াছি, তাহাই আমাদের সমালোচনার গতি নির্ণয় করিল।

এই সামাজিক মূল্যের মূল নিদর্শন, সঙ্ঘের বা সমাজের আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠান। ইহাদের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহা সামাজিক জীবনের সহায়ক ও হিতকর। এইরূপ, স্বাজাত্য-জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন, সামাজিক বন্ধন (Solidarity),—এবং সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতারূপ কয়েকটি নৈতিক ধারণা—এগুলির সামাজিক মূল্য খুব বেশী—কারণ ইহারা মানুষের সামাজিকতাকে সর্ব্বাঙ্গীন করিয়া তুলে।

প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা একটা কথা বলিব। মানুষ সামাজিক জীব, সেই সমাজ কিরূপে চিন্তা করে ও কার্য্য করে, এই চিন্তা ও কার্য্যের উপকরণ কি, সমাজের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছি,—কিন্তু সামাজিকতার উপর অযথা আস্থা স্থাপন করিলে চলিবে না। উন্নতির মূল তত্ত্ব মনুষ্যত্বের বিকাশ। সমাজ যখন সত্যময়, প্রাণময়, তখন সমাজকে আশ্রয় করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বরূপ সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। মানুষের সহিত সমাজের যখন বিরহ হয়, তখনই সমাজ অত্যাচারী, তখনই সমাজ-দানব আপনার যূপকাষ্ঠে মনুষ্যত্ব-বলি দাবী করে; তখন সমাজ সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পরিপন্থী। মানুষ হয় ত ক্ষণকালের জন্য এই সামাজিক অত্যাচারের ভার সহ্য করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু ক্রমশঃ চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়, এবং সেই বিক্ষোভ হইতে সঙ্ঘ-মন আবার জাগরিত হয়, সমাজের পুনর্গঠন হয়। ততদিন পর্য্যন্ত, সমাজ অর্থে অনুশাসনের দাসত্ব,—যাহার সত্য লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু মিথ্যাটুকু জাগিয়া আছে। মনে রাখিতে হইবে, মনুষ্যত্বের দাবী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ দাবী,—সমাজ এই মনুষ্যত্ব-বিকাশেরই প্রধান ও একমাত্র আশ্রয়। সমাজ সঙ্ঘ-মনের ভিতর দিয়া কার্য্য করে, সুতরাং মনুষ্যত্বকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে সঙ্ঘ মনের পরিপূর্ণতা-সাধন আবশ্যক। "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্"—আমি আছি, অমনি জানি, আমি প্রকাশ করি—ইহাই মনুষ্যত্বের মূলমন্ত্র।





বন্যা

শ্রীসীতা দেবী বি-এ

(১)

ক্ষুদ্র জাম্‌রাল গ্রাম, পরাক্রমশালী বিজয় নদের ধারেই। নদের মেজাজটা বড়ই উগ্র বলিয়া এ অঞ্চলের লোক তাহার নামেই নমস্কার করে। বন্যাস্রোতে আশেপাশের গ্রাম প্রতি বৎসরই ভাসিয়া যায়, অসহায় নরনারীর আর্ত্তনাদে আকাশ ভরিয়া ওঠে।

সন্ধ্যাবেলা, জাম্‌রালের পথ ধরিয়া একটি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত পাল্কী নদীর ঘাটের দিকে চলিয়াছে, তাহার পিছনে একখানি খোলা ফিটন, ও গোটা দুই ঘোড়ার পাল্কী গাড়ী। গ্রামের লোক বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। একজন বৃদ্ধা অগ্রসর হইয়া পাল্কী-বাহকদের জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা, পাল্কী কার জন্যে? এত গাড়ীঘোড়ার ঘটাই বা কেন? বর আন্‌তে যাচ্ছ নাকি? কাদের বাড়ীর?"

বেহারাদের সর্দ্দার ভারি গলায় বলিল, "আনি আগে, তার পর দেখ্‌তেই পাবে।"

গ্রামের ভদ্র গৃহস্থদিগের বাস একটু ভিতরের দিকে। নদীর ধারে নিম্ন শ্রেণীর লোকরা, বিশেষ করিয়া জেলে, মাঝি প্রভৃতিরাই বাস করে। নৌকার সাহায্য ভিন্ন গ্রামে প্রবেশ করা বা গ্রাম ত্যাগ করা কঠিন, কাজেই ঘাটে খেয়া নৌকা সারাক্ষণই বাঁধা আছে। নিতান্তই শাদাশিদা সাধারণ নৌকা এগুলি। তবে সমারোহ করিতে হইলে নিকটবর্ত্তী সমৃদ্ধ গ্রাম হইতে আট দাঁড়ের নৌকা, বড় বজরা প্রভৃতি চাহিয়া বা ভাড়া করিয়া আনা হয়।

পাল্কী ও গাড়ীর পিছনে ক্রমেই লোকের ভীড় জমিয়া উঠিতেছিল। সঙ্গের লোকজনরা কেহ অবশ্য তাহাদের বাধা দিতেছিল না, কিন্তু কাহারও প্রশ্নের কোনো উত্তরও দিতেছিল না। নদীর ঘাটের কাছে আসিয়া সকলে থামিল। তখন একখানা পাল্কী গাড়ীর দরজা খুলিয়া ভিতর হইতে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গের লোকজনদের বলিলেন, "ঐ ত ওদের নৌকোর আলো দেখা যাচ্ছে, তোরা গাড়ীর ভিতর থেকে মশালগুলো বার করে জ্বালিয়ে নে।"

মশাল জ্বলিয়া উঠিয়া, সন্ধ্যার অন্ধকারকে আরো প্রকট করিয়া তুলিল। মাঝি এবং জেলেদের ঘর হইতে দলে দলে স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা বাহির হইয়া, অপেক্ষাকারীদের ঘিরিয়া ফেলিল। নানা কণ্ঠে নানা দিক হইতে প্রশ্ন হইতে লাগিল "কাদের বর গো, কাদের বর? ওমা, গাঁয়ের লোক আমরা, আমরাই জানলাম না?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, "এই যে বর এসে পড়ল। ওহে বাজন্‌দাররা, বেরিয়ে এস বাপু। খুব কষে লাগাও এবার।"

সঙ্গে সঙ্গে অন্য পাল্কী গাড়ীখানির দরজা খুলিয়া গেল। চার পাঁচজন মানুষ বাহির হইয়া মহোৎসাহে বাজাইতে সুরু করিল। ঘোড়াগুলা ক্ষেপিয়া তীব্র হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল; তাহাদের অনেক কষ্টে শান্ত করা হইল।

একটি বজরা ক্রমেই ঘাটের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। উহা আরোহীতে পূর্ণ এবং আলোকমালায় সুশোভিত। বজরা যতই কাছে আসিতে লাগিল, বাজন্‌দারদের উৎসাহ ততই বাড়িয়া চলিল, মশালধারীরাও মহোৎসাহে নানা রকম চীৎকার করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিল।

নৌকা আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করিবার জন্ম তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া গেলেন। গোটা দশ বারো লোক একে একে নামিয়া পড়িল। দলের পাণ্ডা একটি টাকপড়া, স্থূলদেহ ভদ্রলোক; তাঁহার পিছনে একটি ষোলো সতেরো বৎসরের বালক বা যুবক, তাহার পর নানা বয়সের এবং আকৃতির জন দশ মানুষ। বালক যে বর, তাহা তাহার পোষাক দেখিলেই বোঝা যায়। তাহার পরণে গোলাপী রংএর রেশমের পাঞ্জাবী, মিহি ঢাকাই ধুতি, মাথায় টোপর, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দন। তাহার মুখ সলাজ-হাস্যে বিকশিত।

অভ্যর্থনাকারী ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া মহা বিনয় সহকারে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আসুন, যাদববাবু, স্বাগত। বেশী যে দাঁড় করিয়ে রাখেননি তার জন্তে ধন্তবাদ। এইদিকে বাবাজী, এই পাল্কীতে ওঠ।"

যাদববাবু বরের কাকা, এখন বরকর্ত্তা। খুব ভারিক্কি চালে বলিলেন, "না, তা দেরি আর কি কারণে হবে? ঘটা করতে গেলেই না দেরি হয়? এতে আর কি? নিতান্ত না হলে নয়, এমন জনকয়েক লোক নিয়ে বেরিয়ে আসা গেল।"

কন্যাকর্ত্তা সাজিয়া যিনি আসিয়াছিলেন, তিনিও কনের পিতা নয়, মামা। তিন আরো মোলায়েম করিয়া হাসিয়া বৈবাহিকের মন গলাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ এই ক্রটিটুকু থেকে গেল বটে। তা এরপর যত খুসি সমারোহ করা যাবে, আগে বিয়েটা ভালোয় ভালোয় উৎরে যাক্। উঠুন মশাই গাড়ীতে, এই যে এই গাড়ীতে আপনারা। ওরে, তোরা সব হাঁ করে দেখছিস্ কি? মশাল ভাল করে বাগিয়ে ধর্, চল্ এগিয়ে চল্। ওহে বাজাও না ভাল করে, হাতে কি জোর নেই? ক'পো চালের ভাত খাও? ওহে গাড়ী হাঁকাও না, আর দেরি কিসের?"

হাঁকডাকে সবাই অগ্রসর হইল। আসিবার বেলা লোক ছিল অল্পই, বরযাত্রী লইয়া যাইবার বেলা লোকের অভাব হইল না, গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা একেবারে শোভাযাত্রার পিছনে ভাঙিয়া পড়িল। পাড়াগাঁয়ের লোক, অত রাখিয়া-ঢাকিয়া কথা বলিতে জানেনা। কন্যাপক্ষ সম্বন্ধে কত মন্তব্যই যে হইতে লাগিল, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই।

একজন বৃদ্ধা বলিল "ওমা, ওমা, কোথায় যাব, আমাদের সুবির বে, তা জানলাম না গা? মাগী কি অর্থ-পিচেশ, ঐ ত এক মেয়ে, কার জন্তে টাকা রাখছে?"

মধু মাঝি হুঁকো হাতে করিয়াই বরযাত্রীর সঙ্গ লইয়াছিল; সে বলিল "তুমিও যেমন কেষ্টো পিসী, ও-সব বাবুভেইয়ার কথাই আলাদা। তারা কি গরীব মানুষকে পোঁছে?"

তাহার ছোটভাই সাধুচরণ বলিল "আমরাই না হয় ছোটলোক, ভদ্দরদেরও ত কাউকে বলেনি, সব কেমন হাঁ করে তাকাচ্ছে দেখছনা?"

সত্যিই গ্রামের লোক বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল। পুরুষরা বাহির হইয়া আসিতেছিল, মেয়েরা ঘরে দাঁড়াইয়া মুখ ছুটাইতেছিল।

এদিকে প্রতুলচন্দ্র মিত্রের বাড়ী ততক্ষণে রসুন চৌকী বসিয়া গিয়াছে! প্রতুলচন্দ্রের স্ত্রী নারায়ণী অনেক দিন হইতই অসুস্থ; তবু আজ মেয়ের বিয়ে, কাজ না করিলেই নয়, তিনি কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়াছেন। বিশেষ কারণে পাড়াপ্রতিবেশীকে আগে নিমন্ত্রণ করিতে পারেন নাই, এখন তিনি এবং বৃদ্ধা শাশুড়ী মিলিয়া সকলকে মিষ্টি কথায় বুঝাইয়া বাড়ীতে ডাকিয়া আনিতেছেন। একেবারে লোক না থাকিলে বিবাহ হইবে কি করিয়া? একটা সভা ত চাই, স্ত্রী-আচারের জন্য এয়োও অন্ততঃ কয়েকজন চাই? নারায়ণীর বাপের বাড়ী হইতে তাঁহার এক বিধবা দিদি, এবং এক ভাই আসিয়া জুটিয়াছেন। ভাই গিয়াছেন বরযাত্রী আগাইয়া আনিতে, বোন ঘরের কাজের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন।

মেয়ের দল মহা হৈ চৈ বাধাইয়াছে। কনে সুবর্ণ মাত্র আট বৎসরের বালিকা; কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল, তাহাকে ধরিয়া আনা হইয়াছে। বাড়ীতে এত লোকজন, এত কোলাহল, ধুমধাম দেখিয়া সে প্রথমে খুব খুসিই হইয়াছিল, কিন্তু পাশের বাড়ীর মুক্তো পিসী যখন বলিল "কি ধিঙ্গীর মত লাফাচ্ছিস্, তোর না আজ বিয়ে?"

তখন সুবর্ণ রাগিয়া গেল, মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া বলিল "ইঃ বিয়ে? বিয়ে আমি করলে ত? বাবা বলেছে বিয়ে পচা।"

মুক্তো হাসিয়া উঠিল। নারায়ণীকে ডাকিয়া বলিল "ও বৌ, শোনো মেয়ের কথা। বিয়ে নাকি পচা, ওর বাপ

বলেছে, ও বিয়ে করবেনা। হ্যাঁলা, তোর বাপ বিয়ে করেনি ?"

সুবর্ণ বলিল, "ধাঃ, আমার বাবা কেন বিয়ে করতে যাবে ? বাবা কত লেখাপড়া জানে।" বলিয়া সে মল ঝন্‌ঝন্ করিয়া এক দৌড় দিল।

নারায়ণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঐ ত পাগল, ওকে যে কি করে পার করব, তা ভগবানই জানেন, এখন মুখ রক্ষা হয় তবেই। যা না ভাই ঠাকুরঝি, ওকে ভুলিয়ে ফুস্‌লিয়ে নিয়ে আয়। আর ত দেরি নেই, লগ্নের সময় হয়ে এল বলে। বরযাত্রী এখনি এসে পড়বে, মেয়েটাকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দে। নইলে অমনি মূর্ত্তি করে ও সকলের সামনে গিয়ে হাজির হবে। আমি যাই, রান্নার কতদূর কি হল দেখি। দিদি ঘরে আছে, বাক্সের চাবী তার কাছে, সব চেয়ে চিন্তে নিস্।"

নারায়ণী চলিয়া গেলেন, মুক্তো চলিল সুবর্ণর খোঁজে। উঠানের ভিতর যেখানে ছাদ্‌নাতলা বাঁধা হইতেছিল, সে সেখানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে মজুরদের কাজ দেখিতেছে। মুক্তকেশী বলিল "ও সুবু, আজ কত ধুমধাম হবে, তুই এমন ময়লা কাপড় পরে বেড়াচ্ছিস্? চল্ তোকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিই গে।"

সাজগোজ করিতে সুবর্ণর কোনো দিনও আপত্তি ছিলনা, সে তখনি বাগ মানিয়া গেল। মুক্তো পিসীর পিছন পিছন মায়ের শুইবার ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

সুবর্ণর মাসী তাড়াতাড়ি চাবির গোছা, মুক্তকেশীর হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নাও ভাই, ওই বড় তোরঙ্গটার মধ্যে কাপড় গহনা সব আছে। আমার ত কপাল পোড়া, এ সব চোখে দেখতে নেই, আমি যাচ্ছি ভাঁড়ারে, কিছু যদি দরকার লাগে ত চেয়ে নিও।"

কনে সাজানোর নামেই আর একপাল মেয়ে আসিয়া জুটিয়া গেল। মহোৎসাহে চুল বাঁধা, চন্দনঘষা, চেলী পরান, গহনা পরান সুরু হইয়া গেল।

বরযাত্রী আসিয়া পড়িল। ধুমধাম নাই, কিন্তু আদর অভ্যর্থনার ত্রুটী হইলনা। গ্রামের লোকে দেখিতে দেখিতে বাড়ী উঠান সব ভরিয়া গেল। কেহ আহূত, কেহ অনাহূত, কেহ বা রবাহূত। নিমন্ত্রণ হয় নাই বলিয়া আসিতে কেহ ছাড়ে নাই, খাওয়ার বেলায় দেখা যাইবে।

স্ত্রী-আচার সুরু হইল। নারায়ণী কিশোর বরের সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া স্নেহবিগলিত-চিত্তে ভাবিলেন "এর হাতে মেয়ে আমার কখনো অসুখী হবেনা। এত কাণ্ড করে বিয়ে যে দিচ্ছি, সব সার্থক হবে।"

একজন প্রতিবেশিনী বলিল, "আহা একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তা বাপ দাঁড়িয়ে দিতে পারলনা। যাই বল বাছা, কাজটা কি ভাল হল ? সব ঠিক্ করে খবর দিলেই পারতে, তখন চক্ষুলজ্জার খাতিরে বিয়ে দিতেই হত। আর অমন সুন্দর ছেলে, ওকে কি আর অপছন্দ হত ?"

নারায়ণী চোখ মুছিয়া বলিলেন, "তুমি তাকে জানো না দিদি, তার রাক্ষুসে জেদ; মানুষে তার জেদ ভাঙতে পারে না। জান্‌তে পারলে এখনও এসে মেয়েকে ছাদ্‌না-তলা থেকে তুলে নিয়ে যাবে। নইলে এমন কাণ্ড করি ? জাত-ধর্ম্ম ত রাখ্‌তে হবে? শাশুড়ী শুদ্ধু, বল্লেন, তাই ভরসা করে এগোলাম, নইলে আমার সাধ্য কি ? এর পর কত হেনস্তা আমার হবে তা দেখ এখন তোমরা।"

প্রতিবেশিনী বলিল, "তা মেয়ে সুখে থাকে তবেই, আর ত তোমার নেই ? স্বামী বেশী বাড়াবাড়ি করে না হয় মেয়ে জামাইয়ের কাছেই থাকবে।"

নারায়ণী বলিলেন, "ও আশীর্ব্বাদ আর কোরোনা দিদি। সংসারে আমার সুখ নেই। স্বামীর ঘর করাই যখন কপালে জুটলনা, তখন আর কারো ঘরে আর ঢুকবনা। ভাবছি শীতকালটা কেটে গেলে, শাশুড়ীকে নিয়ে কাশী চলে যাব।"

বরণ, সাতপাক, সব হইয়া গেল। শাঁখের শব্দে সন্ধ্যাগগন মুখর হইয়া উঠিল। বর সভায় চলিল। রক্তাম্বরা, সালঙ্কারা, হাস্যমুখী কন্যার দিকে চাহিয়া নারায়ণী গোপনে চক্ষু মুছিয়া অন্তরালে সরিয়া গেলেন।

হঠাৎ একটা গাড়ী ঘড় ঘড় করিয়া আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। আশঙ্কায় নারায়ণীর বুকের রক্ত হিম হইয়া আসিল। কে এ অসময়ের আগন্তুক ? তাঁহার সব কাজ পণ্ড হইতে বসিল নাকি? তাড়াতাড়ি নিজের শুইবার ঘরের জান্‌লার কাছে ছুটিয়া গিয়া তিনি জান্‌লা খুলিয়া ফেলিলেন। গাড়ীর দরজা খুলিয়া যে বাহির হইল সে তাঁহার স্বামী নয়, কিন্তু আগন্তুককে দেখিয়া তিনি বিশেষ প্রীতও হইলেন না। এটি তাঁহার দূর-সম্পর্কের দেবর

শিবচন্দ্র। দাদার অতিশয় গোঁড়া ভক্ত; সুতরাং মেয়ের এই গোপন বিবাহ যে সে অত্যন্তই নিন্দার চক্ষে দেখিবে, সে বিষয়ে নারায়ণীর সন্দেহ ছিল না।

শিবচন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়া, আর কোনো দিকে না তাকাইয়া, সোজা নারায়ণীর ঘরের দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "এ কি কাণ্ড বৌঠান্? আমি আর একটু আগে আস্‌তে পারলে, কখনও এ ব্যাপার ঘটতে দিতামনা। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? যাতে দাদার সব চেয়ে অমত বলে জান, তাই লুকিয়ে লুকিয়ে করছ?"

নারায়ণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তা কি করব ভাই, তোমরা না হয় সহরে গিয়ে সাহেব হয়েছ, আমরা ত তা হইনি? আমাদের সমাজের মুখ দেখতে হয় ত? নইলে মরলে যে ঘরে পচে মর্‌ব?"

শিবচন্দ্র ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তাই আট বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করছ? এরি মধ্যে সমাজের বার হয়ে যাচ্ছিলে নাকি?"

নারায়ণী তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "যাঁর মেয়ে তাঁর কাছে জবাবদিহি করব ঠাকুরপো, তোমায় আর কৈফিয়ৎ দিয়ে কি হবে? তুমি এসেছ যখন, শুভ কাজ যাতে ভালয় ভালয় হয় তাই কর। আমাকে দাঁড়িয়ে গাল দিলে ত বিয়ে ফিরে যাবে না?"

"এ বিয়ে চোখে দেখ্‌লেও পাপ হয়," বলিয়া শিবচন্দ্র যেমন ঝড়ের বেগে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি ভাবেই বাহির হইয়া গেল। নারায়ণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার পর অমঙ্গল অশ্রুজল গোপন করিয়া ভাঁড়ার-ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

বৃদ্ধা খাশুড়ী দইয়ের আর মিষ্টির হাঁড়ি পাহারা দিয়া বসিয়া ছিলেন। নারায়ণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওদিকে কাজ হয়ে গেল না বৌমা?"

নারায়ণী বলিলেন, "হ্যাঁ মা, ছোট ঠাকুরপো এসেছিল, অনেক শক্ত শক্ত কথা বলে গেল।"

বৃদ্ধা মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "কুলাঙ্গারের গুষ্টি। চলে গেল বুঝি?"

নারায়ণী ইঙ্গিতে জানাইলেন, চলিয়াই গিয়াছে। কিন্তু তখন আর দাঁড়াইবার সময় নাই, বিবাহ সমাপ্ত হইয়াছে, এইবার বরযাত্রী খাওয়ানোর পালা। ত্রুটি হইলে রক্ষা থাকিবে না, তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

বড় ঘরখানায় মেয়ের দল বর-কনে লইয়া বাসর জমাইয়া বসিল। হাসির হিল্লোল ক্রমাগত আসিয়া নারায়ণীর কর্ণে আঘাত করিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরটা ক্রমেই আশঙ্কায় কালো হইয়া উঠিতে লাগিল। ঝোঁকের মাথায় কাজ ত করিয়া বসিলেন, এখন শেষ তাল সাম্‌লাইতে পারিবেন ত? খাশুড়ীর উপর ত দোষ পড়িবে না, সমস্তটাই পড়িবে তাঁহার স্কন্ধে! কন্যাকে পতিযুক্তা করিতে গিয়া, তিনি চিরদিনের মত পতিকে হারাইলেন হয় ত। কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কাও তাঁহার অশ্রুরোধ করিতে পারিল না, দুই চোখ বাহিয়া ক্রমাগত জলধারা ঝরিতে লাগিল।

যাহার বিবাহ লইয়া এত কাণ্ড, তাহার মনে কিন্তু চিন্তা বা আশঙ্কার লেশমাত্র ছিল না। মহোৎসাহে সে গল্প করিতেছিল, হাসিতেছিল, মেয়েদের ঠাট্টার পটাপট্ জবাব দিতেছিল। বর বেচারীই বরং কনের রকম-সকম দেখিয়া সলজ্জভাবে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। মেয়ের দল বরকে কনে, এবং কনেকে বর সাজাইবার প্রস্তাব করিয়া তাহার কর্ণমূল আরো আরক্ত করিয়া তুলিতেছিল।

খাওয়া দাওয়া, গোলমাল ক্রমে চুকিয়া আসিল। বাসর-ঘরেও মেয়েদের কোলাহল ক্রমে নিভিয়া আসিল, যে যেখানে পারিল, শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। বর একবার চাহিয়া দেখিল, সবাই নিদ্রামগ্ন, তাহার নববিবাহিতা বধূ আর একটি কিশোরীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পরম নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতেছে। ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট খাটের উপর গিয়া জড়সড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন বর-কন্যা বিদায়ের সময় মহা গোলযোগ লাগিয়া গেল। সুবর্ণ কিছুতেই যাইবে না, সে কাঁদিয়া, চীৎকার করিয়া, হাট বসাইতে লাগিল। বরকর্ত্তার মুখ ক্রমেই গম্ভীর হইতেছে দেখিয়া নারায়ণী মনে মনে প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। সুবর্ণকে কত বোঝান হইল, সে কিছুতেই কথা শোনেনা। জোর করিবার উপক্রম করিতেই গাঁটছড়া খুলিয়া ফেলিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল!

খবর অবশ্য তাহাকে দিতে হইলই। এক রকম জেলের

কয়েদীর মত করিয়াই তাহাকে পাল্কীতে ওঠান হইল, সেখানেও সে "আমি যাব না, আমি যাব না," করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাহার কান্না শুনিবার কেহ সেখানে ছিল না। নারায়ণী ঘরের ভিতর ধুলায় লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন।

নদীর ঘাটের কাছাকাছি আসিয়া বর শ্রীবিলাস সুবর্ণর ক্ষুদ্র একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে তুমি ভালবাস না সুবর্ণ?"

সুবর্ণ এক ঝট্‌কায় হাত সরাইয়া লইল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে আমি কোনো জন্মে ভালবাসব না, তুমি ছাই, পচা, কেন আমাকে মায়ের কাছ থেকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছ?"

(২)

প্রতুলচন্দ্র মিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পল্লীগ্রামে সাধারণ হিন্দু-গৃহস্থ-ঘরে। তাঁহার বংশে ইতিপূর্ব্বে কেহ স্কুলের পড়া সারিয়া কলেজ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। জমি-জমা, চাষ-বাস লইয়াই বেশীর ভাগের দিন কাটিয়াছে। যাহাদের তাহাতে মন ওঠে নাই, তাহারা রেলের বাবু, পোষ্টমাষ্টার প্রভৃতি হইয়াছে, দু-পয়সা নানা উপায়ে ঘরেও আনিয়াছে। মা লক্ষ্মীর প্রতি অনুরাগ সকলেরই ছিল, কিন্তু দেবী সরস্বতীর ভক্ত বিশেষ কেহ ছিলেননা।

এমন বংশে জন্মলাভ করিয়া প্রতুলচন্দ্র কিরূপে যে এত বড় সাহিত্যানুরাগী এবং আধুনিক হইলেন, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার আত্মীয়-স্বজন সবাই চলিত সমাজ, ধর্ম্ম, গুরু, পুরোহিত, থানার দারোগা, সব কিছুকে মানিয়া; প্রতুলচন্দ্র চলিতেন ঠিক তাহার উল্টা পথে। কোনো-কিছুকে মানিয়া লওয়া তাঁহার স্বভাবে ছিল না। তিনি এণ্ট্রান্স্ পাশ করিয়া, রেলের চাকুরী পাইয়াও করিলেন না, সামান্য স্কলারশিপের উপর নির্ভর করিয়া গেলেন কলেজে পড়িতে। পাঠ-চর্চ্চার সময় মা বাপের পীড়াপিড়িতে, এবং বালিকাটির সৌন্দর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়া তিনি বিবাহ করিয়া বসিলেন, ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র পথচ্যুতি। নিজে বাল্য-বিবাহ করিয়া, তাহার দোষগুলি যেন আরো উৎকট ভাবে দেখিতে পাইলেন, এবং অনুতপ্ত চিত্তে তখন যতদূর সম্ভব প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টাও করিলেন। কিন্তু হিন্দু পরিবারে কেবল মাত্র স্বামীর কথায় কিছু হয় না, স্বামীর পিতামাতা বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাদের কথাই মাথা পাতিয়া লইতে হয়। সুতরাং প্রতুলচন্দ্রের চেষ্টায় কিছু হইল না, বিশেষ করিয়া পত্নী নারায়ণীর মনও অনুকূল ছিল না। স্বামীকে ভক্তি করিত ও ভালবাসিত বলিয়া মুখে সে কখনও তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিত না, তাঁহার কথামত কাজ করিতেও চেষ্টা করিত, কিন্তু মনটা তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর মতেই মত দিত। প্রতুলচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল অন্ততঃ ষোলো সতেরো বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ না করিয়া, তাহাকে কলিকাতার কোনো বালিকা-বিদ্যালয়ের বোর্ডিংএ রাখিয়া সুশিক্ষা দিবেন, পরে তাহাকে সংসার করিতে দিবেন। কিন্তু মা বাবার প্রবল আপত্তিতে তাঁহার কথা ভাসিয়া গেল, নারায়ণীও শ্বশুর শাশুড়ীর অমতে স্বামীর সহিত সহরে আসিতে রাজী হইল না। প্রতুলচন্দ্র স্ত্রীকে কিছু-দিনের জন্য অন্ততঃ বাপের বাড়ী রাখিতে বলিলেন, কিন্তু তেরো বৎসরের মেয়ে যথেষ্ট বড় হইয়াছে বলিয়া নারায়ণীকে শ্বশুর-ঘর করিবার জন্য লইয়া আসা হইল। বিরক্ত হইয়া প্রতুলচন্দ্র গ্রামের বাড়ীতে আসাই ছাড়িয়া দিলেন। নিজে এম্ এ পাশ করিয়া প্রফেসারের কাজ পাইবার আগে তিনি আর বাড়ীমুখোই হইলেন না।

নারায়ণীর তখন কুড়ি বৎসর বয়স হইয়া গিয়াছে। নিজেকে স্বামী পরিত্যক্তা মনে করিয়া সে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিত। কিন্তু তবুও আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কার ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইতে তাহার মন উঠিত না। এতদিন পরে স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া সে তাঁহাকে ভালবাসা ও ভক্তির আতিশয্যে প্লাবিত করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু প্রতুলচন্দ্র স্ত্রীর মনের ভাব অনুভবেই বুঝিতে পারিলেন। নারায়ণীকে তিনি ভাল-বাসিলেন, কিন্তু তাহাকে সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণীরূপে পাইবার আশা তাঁহার মন হইতে মুছিয়া গেল। ইহার পর তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসিতেন বটে, কিন্তু নিতান্তই অতিথির মত। সংসারের সহিত মনের যোগ তাঁহার ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল।

সুবর্ণ জন্মগ্রহণ করার পর তিনি আর একবার ফিরিয়া

সংসারী হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নারায়ণী তখনও আসিতে রাজী হইলেন না। বিধবা শাশুড়ীও ঘোরতর আপত্তি করিতে লাগিলেন। শিশু-কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া প্রতুলচন্দ্র আবার ফিরিয়া গেলেন।

কন্যা বড় হইলেই তাহাকে নিজের কাছে লইয়া আসিবেন, এক প্রকার স্থিরই ছিল। নারায়ণী মুখে কখনও আপত্তি প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু মনে মনে জানিতেন প্রাণ থাকিতে মেয়েকে তিনি ছাড়িবেন না। তাঁহার একমাত্র সন্তান, এই কন্যা, এও যদি পিতার দলে ভিড়িয়া যায়, তাহা হইলে কাহাকে লইয়া তিনি সংসারে থাকিবেন? শাশুড়ী এবং বধূতে এই বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা হইত। দুজনেরই ইচ্ছা ছিল, মেয়েকে সকাল সকাল বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া, না হইলে প্রতুলচন্দ্রের উৎপাত এড়াইবার আর কোনোই উপায় ছিলনা।

সুবর্ণ যখন চার পাঁচ বৎসরের তখন তাহাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা আর একবার হইল। কিন্তু মেয়ে, মা এবং ঠাকুরমাকে ছাড়িয়া কোনোদিনও থাকে নাই; সে এমন কান্নাকাটি আরম্ভ করিল যে প্রতুলচন্দ্র তখনকার মত লইয়া যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। তাহার পর প্রতি বৎসরই চেষ্টা হইত, এবং মা, ঠাকুরমা এবং মেয়ে মিলিয়া সব ব্যর্থ করিয়া নিশ্চিন্ত হইত।

নারায়ণীর শরীর ক্রমে খারাপ হইয়া আসিতেছিল, বৃদ্ধা শাশুড়ী ত আজ আছেন কাল নাই। এ অবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র একটা পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য দুজনেই মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। প্রতুলচন্দ্রকে লুকাইয়া সব ব্যবস্থা করিতে হইবে, এইজন্য ব্যবস্থা করাও শক্ত ছিল! গ্রামের ভিতর কোথায়ও সম্বন্ধ করা তাঁহারা সুবিবেচনার কাজ মনে করিতেন না, কারণ খবরটা তাহা হইলে অবিলম্বে প্রতুলচন্দ্রের নিকট পৌঁছিবে। অন্য গ্রামে সম্বন্ধ করিলে চট্ করিয়া ধরা পড়িবার সম্ভাবনা কম, কিন্তু দুইটি হিন্দুঘরের রমণীর পক্ষে গ্রামান্তরে গিয়া কোনো ব্যবস্থা করাও কঠিন।

দৈবক্রমে একটা সুবিধা জুটিয়া গেল। জামরালেরই এক গৃহস্থ কন্যার বিজয় নদের অপর পারে অবস্থিত এক গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল। তিনি নিজে এখন প্রৌঢ়া, সংসার ফেলিয়া খুব যে ঘনঘন বাপের বাড়ী আসিতে পারিতেন, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার পুত্র শ্রীবিলাস প্রায়ই মামার বাড়ী আসিত। ছেলেটি মধ্যে মধ্যে নারায়ণীর চোখে পড়িত। শ্রীবিলাস মোটের উপর দেখিতে ভালই, স্কুলের পড়া শেষ করিয়া পরীক্ষা দিতে চলিয়াছে। ঘরও ভাল, জানাশোনার মধ্যে। শ্রীবিলাসের মা নিস্তারিণী ডাকসাইটে ঝগড়াটে স্বভাবের। এ ভিন্ন ছেলের আর কোনো খুঁৎ নাই। ত একেবারে নিখুঁৎ সম্বন্ধ আর পাওয়া যাইবে কোথায়? শাশুড়ী ননদের গঞ্জনা খাইয়া সব মেয়েকেই ঘর-সংসারে হাতেখড়ি করিতে হয়। তাহার পর আবার আরাম করিবা দিনও আসে। মোটের উপর ছেলেটিকে নারায়ণী পছন্দই হইল। শাশুড়ীকে তিনি নিজের ইচ্ছা খুলি বলিলেন। তিনিও আপত্তি করিবার কোনো কার দেখিলেননা। নাতনীর বিবাহের জন্য বৃদ্ধাও ব্যস্ত হই উঠিতেছিলেন। ছেলে ত ম্লেচ্ছ, তাহার দ্বারা কো উপকার হইবেনা। তিনি যতদিন বাঁচিয়া আছেন, পর্ব্বতের আড়ালে আছে। তিনি যদি সহায় হন, তা হইলে সে ভরসা করিয়া স্বামীর অমতে কন্যার বিবাহ দিতে পারে, কিন্তু তিনি বিদায় হইলে এতখানি সাহসের কা আর তাহার দ্বারা হইবেনা। শ্রীবিলাস কিছু মন্দ পাত্র ন কাছে-ঘরে আর ইহার চেয়ে ভাল পাওয়া যাইতেছে কই?

লুকাইয়া লুকাইয়া কথাবার্ত্তা, চিঠি-লেখালিখি চলি লাগিল। পাত্রপক্ষেরও সুবর্ণকে নানা কারণে বেশ পছ হইল। মেয়ে দেখিতে শুনিতে ভাল, ভাল ঘরের। অ পিতার একমাত্র সন্তান। লুকাইয়া বিবাহ দেওয়ার দ এখন যতই বিরক্ত হোন, কন্যা-জামাতাকে একেবারে ত্যা কিছুতেই করিতে পারিবেন না, কালে সুবর্ণই সব ধ সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। শ্রীবিলাসের পিতা জীবি নাই, ধনসম্পদও বিশেষ কিছু রাখিয়া যান নাই। জমিজ খড়ের চালের ঘর, এই ত তাহাদের সম্বল। সুতরাং এক পদস্থ মুরুব্বী শ্বশুর থাকিলে যথেষ্ট সাহায্য হইতে পা অতএব সম্বন্ধ একরকম পাকা হইয়া গেল।

নারায়ণী গ্রামের কাহাকেও একটা কথাও জানাই না। শত্রুর অভাব নাই,—পরদিনই খবর স্বামীর ক তুলিয়া দিবে। শ্বশুরকুলেরও কাহাকেও কিছু বলিলেন এক শাশুড়ীকে ছাড়া। শুধু নিজের বাপের বাড়ী

লুকাইয়া খবর দিলেন। যত নিরাড়ম্বর ভাবেই বিবাহ দিন, এক হাতে একটা বিবাহের কাজ সারা যায়না, বিশেষ বাড়ীতে পুরুষ মানুষ বলিতে কেহই প্রায় নাই। বিবাহের দিন স্থির হইবামাত্র নারায়ণী তাঁহার দিদি এবং দাদাকে আনাইয়া লইলেন। সব আয়োজন তলে তলে হইতে লাগিল। গহনা কাপড় ইত্যাদি সব সহর হইতে একেবারে কিনিয়া আনা হইল। অন্য সব জোগাড়ও ধীরে ধীরে গোপনে হইতে লাগিল। নগদ টাকা কিছু নিজের কাছে সঞ্চিত ছিল, তাহাতে সব খরচ কুলাইবেন না দেখিয়া স্বামীর কাছে নানা অছিলা করিয়া তিন শত টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। টাকাকড়ির বিষয়ে প্রতুলচন্দ্র সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন, নিজের হাতে পয়সা প্রায় কোনো সময়েই থাকিতনা,—বই কিনিয়া, চাঁদা দিয়া, পরের ধার শোধ করিয়া মাসের মাঝামাঝিই তাহার হাত শূন্য হইয়া পড়িত। তবু পত্নী যখন চাহিয়াছেন, তখন অনেক কষ্টে ধার করিয়াই তিন শত টাকা তিনি তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দিলেন।

যত দিন অগ্রসর হইতে লাগিল, নারায়ণীর ভয়ও ততই বাড়িতে লাগিল। হঠাৎ যদি গোলমাল পাকিয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায় ত সর্ব্বনাশ। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল তাঁহার, অন্ততঃ এই একটা দিকে,—বিবাহের দিন সন্ধ্যার আগে পর্য্যন্ত কেহ কোনো কথা জানিতে পারিলনা। বিবাহ একপ্রকার সুসম্পন্নই হইয়া গেল। মাঝে শিবচন্দ্র আসিয়া গোলমাল বাধাইল বটে, কিন্তু সেও বাধা দিবার চেষ্টা করিলনা। অবশ্য বাধা দিবার সময়ও তখন ছিলনা।

বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন মেয়ে জামাই বিদায়ও হইল,—অবশ্য নিতান্ত ভালয় ভালয় না। সুবর্ণ কাঁদিয়া-কাটিয়া নারায়ণীর ভাঙা মন আরো যেন ভাঙিয়া দিয়া গেল। একদিন, একরাত তিনি আর দরজাই খুলিলেননা। মেয়ের কান্না কেবলি তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল। তাহার কচি হাতের মুঠি জোর করিয়া ছাড়াইয়া, বাছাকে সকলে পাল্‌কীতে তুলিয়া দিয়াছে। না জানি অচেনা, অজানা মানুষের মধ্যে কেমনভাবে তাহার দিন কাটিবে। নিতান্ত অবোধ বালিকা, তাহাকে বিচারের চোখে দেখিলে, তাহার অসংখ্য খুঁৎ বাহির হইবে। একটু স্নেহের চক্ষে তাহারা তাহাকে দেখিবে কি?" কন্যার মঙ্গল কামনায় তিনি নিজের জীবনের সুখ শান্তি ত বলি দিলেনই, কন্যাকেও বলি দিলেন না ত!

বেয়ান ঠাকুরাণীর যা সুনাম, তাহা স্মরণ করিতেই তাঁহার বুক ভয়ে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

তাঁহার মন যদিও মেয়ের চিন্তায় মগ্ন, তবু তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই উৎকর্ণ হইয়া ছিলেন। পদধ্বনির আশায় না আশঙ্কায়? যাহাকে সমগ্র হৃদয় দিয়া তিনি সদাসর্ব্বদা মনে মনে ডাকিতেন, তাহারই আগমনের ভয় তাঁহাকে আজ অভিভূত করিতেছিল। স্বামীর হাতে তাঁহার জন্য কি দণ্ডই না জানি অপেক্ষা করিয়া আছে।

প্রতুলচন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন তাহার পর-দিন সকাল-বেলা। নারায়ণী তখন সবে স্নান করিয়া রান্না চড়াইবার জোগাড় করিতেছিলেন। আগের দিন তাঁহার সম্পূর্ণ অনাহারে গিয়াছে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী তখন পাড়ায় কি কাজে বাহির হইয়াছেন। হঠাৎ দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনিয়া নারায়ণী চাহিয়া দেখিলেন, স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন।

স্বামী স্ত্রী মিনিটখানিক পরস্পরের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই। নারায়ণীর বলিবার কিছু ছিলই না, তিনি কেবল মাথা পাতিয়া দণ্ড লইবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। প্রতুলচন্দ্র ভাবিয়া পাইতেছিলেন না, কি করিয়া কথা আরম্ভ করিবেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন "তুমি চিরদিন জান, ছেলেবেলায় মেয়ের বিয়ে দেওয়াতে আমার অত্যন্ত আপত্তি ছিল, তবু এই কাজ করলে?"

নারায়ণী মৃদুস্বরে বলিলেন "না করে যদি উপায় থাকৃত, তাহলে কি আর করতাম?"

প্রতুলচন্দ্র তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপায় ছিলনা কি কারণে? মেয়ে কি ভেসে যাচ্ছিল, না আমি মরে-ছিলাম?"

নারায়ণী শিহরিয়া জিভ কাটিলেন। তাহার পর বলিলেন, "যা বল্‌বে বল, গাল খাবার জন্যে আমি তৈরিই হয়ে আছি।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "গাল দিয়ে কার কি লাভ হবে? কিন্তু এতটা সাহস যে করলে, সব ঝুঁকি সামলাবার ক্ষমতা

তোমার আছে? মেয়ে যদি অসুখী হয়, তার দায় নেবে তুমি?"

নারায়ণী বলিলেন, "সুখী অসুখী হওয়া ত আর মানুষের হাত নয়? যার যেমন অদৃষ্ট।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "অদৃষ্ট দায়ী হবেনা, হবে তুমি। মানুষে সন্তানের জন্যে যথাসাধ্য করেও যদি তাকে সুখী না করতে পারে, তাহলে অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া তার সাজে। কিন্তু তুমি নিজে জেনে-শুনে মেয়েকে বলি দিয়েছ। ছেলেটা একটা অপরিণত-বুদ্ধি বালক, তার শিক্ষাদীক্ষা কিছু এখনও শেষ হয়নি। মা তার দেশ-বিখ্যাত দজ্জাল এবং কৃপণ। এই ঘরে মেয়ে সুখী হবে বলে যে আশা করে সে হয় পাগল নয় মূর্খ। তাছ'ড়া মেয়ের ভালমন্দ স্থির করবার ভারই বা তোমার উপর কে দিয়েছিল? জগৎ সংসারের কি জান তোমরা? ঘরের চারটে দেওয়ালের মধ্যে যার জন্ম থেকে মরণ অবধি কেটে যায়, সে পৃথিবীকে চেনে কতটুকু? নিজে পা বাড়িয়ে একলা একপা চল্‌বার ভরসা যার নেই, একটা দিন নিজের ভার বইবার সাধ্য যার নেই, সে কোন্ আক্কেলে যায় অন্যের জীবনের ব্যবস্থা করতে?"

নারায়ণী মাথা হেঁট করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কোনো উত্তর দিলেননা। পিছন হইতে প্রতুলচন্দ্রের মাতা বলিলেন, "অত রাগ করিস্ নে বাবা, বৌমা আমার মত নিয়ে তবে এ কাজ করেছে। আজ কালই না হয় তোরা স্বাধীন হয়েছিস্,—আমাদের সময় বুড়োবুড়ী বাপ মা থাকতে তাদের উপর কেউ কথা কইতনা। তারা যা ব্যবস্থা করত সেই অনুসারে কাজ হত।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "তার ফলেই আজ সমাজের এই দশা হয়েছে। বেশ, নিজেরা যা করেছ, নিজেরা তার তাল সাম্‌লিও। সুবর্ণর বাবা থাকতেও সে পিতৃহীনার মত ব্যবহারই পেয়েছে। সে জানুক তার বাপ নেই। ভবিষ্যতেও যেন বাপের উপর কোনো অভিমান না করে। তোমার বউও খুব অহঙ্কার করে নিজের মতে কাজ করেছেন, এই অহঙ্কার বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা করুন। যা একান্ত আমারই করবার কাজ, তা যখন তোমরা করতে দিলেনা, তখন আর কোনো কর্ত্তব্যই আমি করব বলে আশা রেখোনা।"

তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহার মা ছুটিয়া আসিলেন, "ও কিরে চল্লি কোথা? বোস্, স্থির হ। মেয়ে-জামাই জোড় ভাঙ্‌তে আসুক, তাদের দেখে আশীর্ব্বাদ করে যা। বিয়ে ত এখন রাগ করলেই ফিরে যাবেনা?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বস্‌বার জন্যে আমি আসিনি, আর কোনো দিন আসবও না। আশীর্ব্বাদ কোরব কাকে? তোমরা ত তার গলায় ফাঁসি পরিয়ে দিয়েছ, আমি আটকাতে পারলামনা, এ লজ্জা আমার কোনো দিন যাবেনা। আশীর্ব্বাদ করে আর তাকে ঠাট্টা করবনা।"

তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। নারায়ণী মূর্চ্ছিতা হইয়া রান্নাঘরের মেঝেতে গড়াইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

আত্মহারা

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

জানি আমি, জীবনের এ যাত্রা আমার
হবে শেষ একদিন আসিয়া তোমার
শ্রীচরণতলে। সকল বিরহ মোর
জানি, ওগো জানি, একদিন ফুরাইবে
মধুর মিলনে। টুটিবে সকল ঘোর—
সব দুঃখ, সকল বেদনা জুড়াইবে।

তিমির-সরণি শেষে, জানি একদিন
জাগিবে অমল উষা দিব্য মেঘহীন;
সেই দিন প্রত্যুষের পূর্ব্ব-কিরণের
অপূর্ব্ব আচ্ছদ-তলে হৈম বরণের,
জীবন-তটিনী-নাথ এ মম আসিয়া
তব প্রেম-সিন্ধু মাঝে যাইবে মিশিয়া।

তোমার অসীম প্রেমে মিলাইয়া ধারা
সেদিন আমার প্রেম হবে আত্মহারা!

মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ্-আর-ই-এস্

(১)

উপক্রমণিকা

সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় পরিণত বয়সের প্রতিভা-প্রদীপ্ত উপন্যাস গ্রন্থাবলীর শেষ গ্রন্থ "সীতারামের" উৎসর্গ-পত্রে লিখিয়াছেন, "সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, সর্ব্বগুণের আধার, সকলের প্রিয়, আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।"



বঙ্কিমচন্দ্র (প্রথম বয়সে)

উৎসর্গ-পত্রের ভাষা সচরাচর অতিরঞ্জিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ যখন সেই পত্র কোনও পরলোকগত বন্ধুর উদ্দেশে রচিত হয়। কিন্তু উপরিধৃত উৎসর্গ-পত্রের একটি বর্ণও যে অতিরঞ্জিত নহে, তাহা যাঁহারা মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কৃত কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করিবেন। বাস্তবিকই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। গণিত, কাব্য, দর্শন, ভাষা-তত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি,—তিনি সকল বিষয়েই তাঁহার সুবর্ণময়ী লেখনী বিনিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং মনীষার অবতার ডাক্তার জনসন বাগীন্দ্র বরপুত্র গোল্ডস্মিথ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, রাজকৃষ্ণের প্রতিও তাহা প্রয়োগ করিয়া বলিতে পারা যায়,—তিনি যাহাতেই লেখনী স্পর্শ করিয়াছিলেন তাহাই অপরূপ শব্দ ও অলঙ্কারে উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল—"Nothing did he touch that he did not adorn." রাজকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের একটি প্রধান স্তম্ভ ছিলেন এবং "বেঙ্গলী"-সম্পাদক স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছিলেন "He was by far the most brilliant and scholarly contributor to the Bangadarsana, when the Bangadansana was in the height of its fame." (যখন 'বঙ্গদর্শন' যশঃ-শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন, তখন উহার লেখকগণের মধ্যে তিনিই উজ্জ্বল প্রতিভা ও প্রজ্ঞায় সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন।)

'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর লিখিয়াছিলেন :—

"His writings on history, philosophy and general literature were many, varied and valuable, and his able contributions to the *Bangadarsana* long formed a feature of that well-known magazine. He conducted the

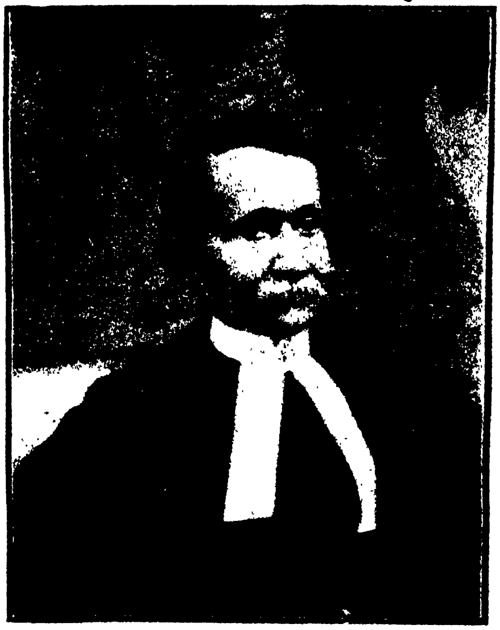
Bengalee newspaper for several years with great ablity, and his contributions occasionally enriched the columns of the *Hindoo Patriot* during the life-time of our illustrious predecessor. He was an antiquarian and a linguist and besides English and Sanskrit he had command oucr Assamese, Uria, Persian, Urdu, Hindi, French, German, Latin and Pali. His knowledge of Pali & Sanskrit enabled him to prosecute original researches



বঙ্কিমচন্দ্র (পরিণত বয়সে)

into the Buddhistic Scriptures which commanded the admiration of his fellow-members of the Asiatic Society. As a member of the committee of the Science Association he took the keenest interest in scientific researches and spread of scientific knowledge in the country. In days when superficial education is so much in vogue, it was refreshing to see this student of forty-one going in for any particular branch of knowledge in a truly scholar-like spirit. To create a noise, to make a name and fame for himself was never in his line. Vast as his erudition was in all departments of philosophy and literature, its extent was never fully known to any who knew him not closely, so quiet, unobtrusive, and unassuring were his manners"

(ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার রচনা প্রচুর, বৈচিত্র্যময় ও মূল্যবান্ এবং 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁহার সুলিখিত সন্দর্ভাবলী বহুকাল ব্যাপিয়া সেই সুপরিচিত মাসিকপত্রের একটী বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি কয়েক বৎসর অসাধারণ দক্ষতা সহকারে 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্র সম্পাদিত করিয়াছিলেন এবং আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ সম্পাদক



স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের * জীবিত কালে মধ্যে মধ্যে "হিন্দু পেট্রিয়টের" স্তম্ভও তাঁহার রচনা দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবং বহুভাষাবিৎ ছিলেন, এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ব্যতীত তাঁহার আসামী, উড়িয়া, পারসী, উর্দ্দু, ফরাসী, জার্ম্মান ও পালী ভাষায় যথেষ্ট অধিকার ছিল। পালী ও সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান তাঁহাকে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিতে সহায়তা করিয়াছিল এবং এই

* রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর সি-আই-ই

সকল গবেষণা দ্বারা তিনি তাঁহার এসিয়াটিক সোসাইটীর অন্যান্য সভ্য-ভ্রাতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য রূপে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। যখন পল্লবগ্রাহিণী শিক্ষারই প্রাদুর্ভাব তখন একচত্বারিংশ বর্ষবয়স্ক এই ছাত্রকে একটি বিশেষ বিষয়ে যথার্থ ছাত্রের ন্যায় অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করিতে দেখিয়া আনন্দ হইত। ঢক্কানিনাদ দ্বারা নিজের নাম ও খ্যাতি বিস্তার করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। সাহিত্য ও দর্শনের সকল বিভাগে তাঁহার যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল,

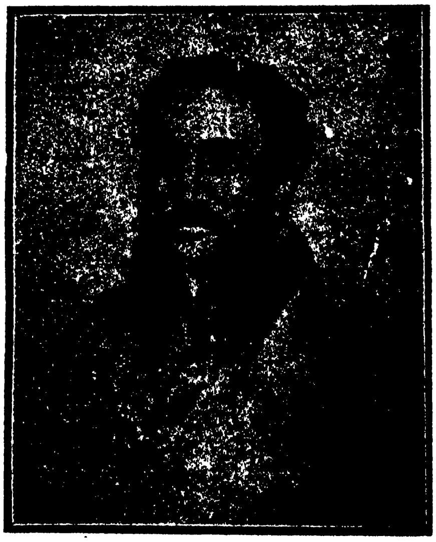


রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

তাহার পরিমাণ যিনি তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে না জানিয়াছেন তাঁহার পক্ষে জানা অসম্ভব ছিল, তাঁহার স্বভাব এত ধীর, শান্ত ও আত্মগোপনকারী ছিল।)

কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য বা বিদ্যার গৌরবই রাজকৃষ্ণের স্মৃতিকে মহিমমণ্ডিত করিয়া রাখে নাই। তিনি চারিত্র্যে গরীয়ান ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "সর্ব্বগুণের আধার, সকলের প্রিয়" ছিলেন। সেই জন্য হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক রাজকৃষ্ণের মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"Those that knew him best will not remember him as the exquisite poet, the deep scholar, the learned professor, the painstaking antiquarian,' the able officer or the profound linguist. He will be best remembered as the amiable gentleman whose suavity of manners and unruffled temper would shrink from giving the least offence to any one. In his habits and his tastes he was simple, literally as a child, and of him it might truly be said that 'his heart was born a full twenty-five years after his body.' In these days of disgusting scepticism and heartless sophistry it was a relief to come across men of Raj Krishna's stamp. All who knew him could have but one feeling for him; it is



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

unique that he was not divided from the love of a single soul that he ever came in contact with."

"যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিতেন তাঁহারা তাঁহাকে কেবল শক্তিশালী কবি, অসাধারণ পণ্ডিত, বিচক্ষণ অধ্যাপক, শ্রমশীল পুরাতত্ত্ববিৎ, কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজকর্ম্মচারী অথবা অপূর্ব্ব ভাষাবিৎ বলিয়া স্মরণ করিয়া রাখিবেন না। তিনি বিনয় ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তিরূপে সর্ব্বদা স্মরণীয় থাকিবেন—যাঁহার ধীর ও অকোপন স্বভাব এবং সৌজন্য কাহাকেও কোনও প্রকার ত্রুটি গ্রহণে সুযোগ দেয় নাই। তাঁহার রুচি ও প্রকৃতি শিশুর ন্যায় সরল ছিল, এবং তাঁহার

বিষয়ে যথার্থই বলা যাইতে পারে যে "তাঁহার দেহের পঁচিশ বৎসর পরে তাঁহার হৃদয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।" আজি কালিকার এই বিরাগজনক অবিশ্বাস ও হৃদয়হীন ছলনার দিনে রাজকৃষ্ণের মত পুরুষের সংশ্রবে থাকিলে আনন্দ হইত। তাঁহাকে যাঁহারা জানিতেন তাঁহাদের মনে শ্রদ্ধা ভিন্ন অন্য কোনও ভাব আসিত না। ইহা আশ্চর্য্য যে যাঁহারা তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছেন তাঁহাদের একজনেরও প্রীতি হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হন নাই।"

অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য, শিশুসুলভ সারল্য, ও অমায়িক ব্যবহার রাজকৃষ্ণকে সকলের হৃদয় অধিকার



ভূদেব মুখোপাধ্যায়

করিতে সমর্থ করিয়াছিল। রেইস এণ্ড রায়তের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাহাই লিখিয়াছিলেন :—

"Babu Raj Krishna's talents and versatile acquirements were embellished by his frank manners, and his modesty and simplicity of character endeared him to all who knew him."

"রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রতিভা এবং বহুবিষয়িনী বিদ্যা তাঁহার অকপট ব্যবহার দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং তাঁহার বিনয় ও চরিত্রের সরলতা তাঁহার পরিচিতগণের নিকট তাঁহাকে পরম প্রীতিভাজন করিয়া তুলিয়াছিল।"

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যসেবার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইব।

জন্ম ও জন্মস্থান

১২৪২ বঙ্গাব্দে ১৬ই কার্ত্তিক দিবসে (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর) নদীয়ার অন্তর্গত গোস্বামী-দুর্গাপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

রাজকৃষ্ণের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ কালীচরণ বিবাহসূত্রে সর্ব্বপ্রথম গোস্বামী-দুর্গাপুরে বসতি করেন। তাঁহার পিতৃনিবাস মুর্শিদাবাদে ছিল। গোস্বামী-দুর্গাপুর গ্রামের পত্তন সম্বন্ধে



রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই কিম্বদন্তী আশ্রয় করিয়া রাজকৃষ্ণ তাঁহার "রাজবালা" নামক "ইতিহাস-মূলক আখ্যায়িকা" প্রণয়ন করেন। প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক হৃত-সর্ব্বস্ব ও নানাপ্রকারে অত্যাচারিত হইয়া এক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর তরুণ বয়স্ক পুত্র স্বপ্নে দেবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া এক গভীর অরণ্যে রাধারমণের পূজায় ও ধ্যানে কালাতিপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে মৃগয়াব্যপদেশে রাজা রায়-মুকুট সপরিবারে তথায় উপস্থিত হন। রাজকুমারী

মাত্রই প্রেমসঞ্চার হয়; কিন্তু দেবাজ্ঞার জন্য গোস্বামী তাঁহার বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে সংসার-ধর্ম্ম পালনে অস্বীকৃত হন। অবশেষে রাজা সেই গভীর অরণ্যই পরিষ্কৃত করিয়া তথায় নূতন নগরের পত্তন করেন। এই নগরের নাম নবদম্পতীর নামানুসারে গোস্বামী-দুর্গাপুর রাখা হয়।

পিতা আনন্দচন্দ্র

রাজকৃষ্ণের পিতা আনন্দচন্দ্র "পাইকপাড়া কন্সারণ" নামক নীলকুটীর দেওয়ানী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া কর্ম্মে অপরিমিত ব্যয় করায় (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর) ৪৬



ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন

বৎসর বয়সে মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পুত্রগণের জন্য বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

আনন্দচন্দ্রের স্বর্গারোহণ কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধিকাপ্রসন্নের বয়স পোনের বৎসর এবং রাজকৃষ্ণের বয়স নয় বৎসর মাত্র।

অগ্রজ রাধিকাপ্রসন্ন

রাজকৃষ্ণের অগ্রজ রাধিকাপ্রসন্ন একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়ের দ্বারা কতদূর আত্মোন্নতি করিতে পারা যায় তিনি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। পিতার মৃত্যুকালে তিনি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া সেই বৃত্তি-লব্ধ অর্থে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা, সংসার প্রতিপালন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা কতদূর ক্লেশজনক ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। পরে সিনিয়র স্কলারশিপ বৃত্তি ভোগ



অক্ষয়চন্দ্র সরকার

করিয়া রাধিকাপ্রসন্ন শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করেন এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য প্রশংসার সহিত সম্পাদন করিয়া প্রভূত যশঃ এবং রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। তিনি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল

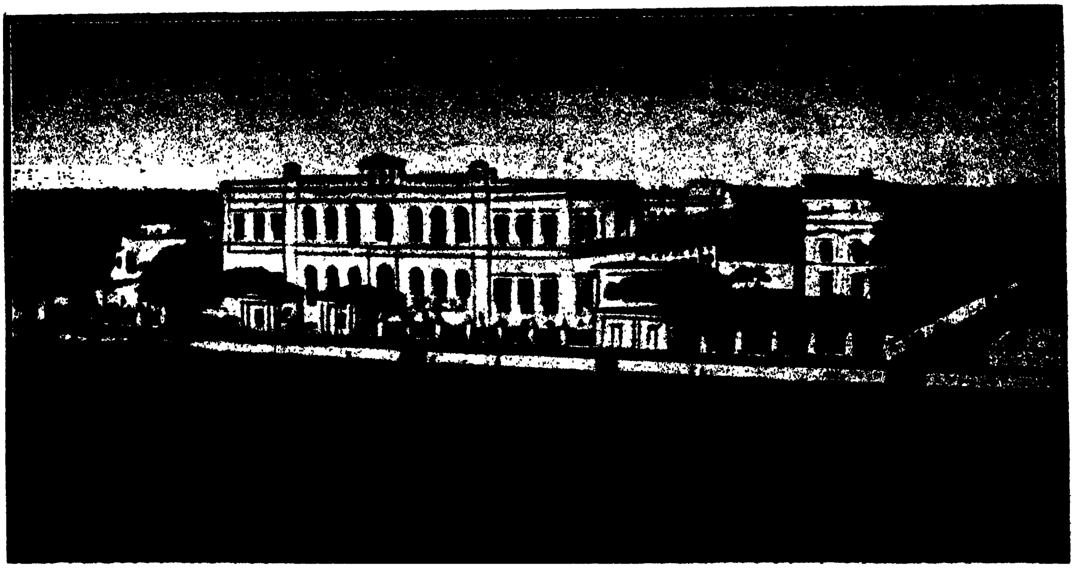
প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বহুদিন বঙ্গদেশের বিদ্যালয় সমূহে অবশ্য-পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নৈতিক চরিত্র ও রুচি গঠন এবং মানসিক উন্নতি বিধান।

শৈশব

পিতার মৃত্যুর সময় রাজকৃষ্ণ নিজ গ্রামে জনৈক গুরু মহাশয়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার জননী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যা—শুনা যায় তাঁহার মাতামহী চিত্রাদেবী স্বামীর মৃত্যুর পর সহমৃতা হইয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ শৈশবেই এই ধর্ম্মপরায়ণা জননীর উপদেশে দেবদ্বিজে

হইলেন। অতঃপর রাজকৃষ্ণ কৃষ্ণনগর কলেজের স্কুল বিভাগে প্রবেশ লাভ করেন। কথিত আছে যে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার সময় প্রধান শিক্ষক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি জ্যামিতি পড়িয়াছেন কি না? রাজকৃষ্ণ উত্তর দিলেন "পড়িয়াছি।" তখন শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "চারি অধ্যায়ে কয়টি সম্পাদ্য, কয়টী উপপাদ্য প্রতিজ্ঞা আছে বলিতে পার?" রাজকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিয়া শিক্ষক মহাশয়কে বিস্মিত করিয়া দেন।

দুই বৎসর কৃষ্ণনগর কলেজের স্কুল বিভাগে পড়িয়া রাজকৃষ্ণ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ১৮৲ মাসিক ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন।



জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজ

ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলেন। মায়ের পূজার জন্য পুষ্প-চয়ন তাঁহার শৈশবের আনন্দদায়ক কর্ত্তব্য ছিল। জননীর ইচ্ছা ছিল তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ন্যায় সংস্কৃত টোলে শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু দূরদর্শী হিতৈষীদিগের পরামর্শে তাঁহাকে প্রতীচ্য সাহিত্যাদিতে শিক্ষা দেওয়া স্থির হইল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রাধিকাপ্রসন্ন রাজকৃষ্ণকে কৃষ্ণনগরের বাসায় লইয়া গেলেন। সেখানে কয়েক মাসের মধ্যেই কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তক পড়াইয়া রাজকৃষ্ণকে তিনি তত্রত্য এক মিশনারী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। ৬ মাসের মধ্যেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ এল্‌-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ত্রিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

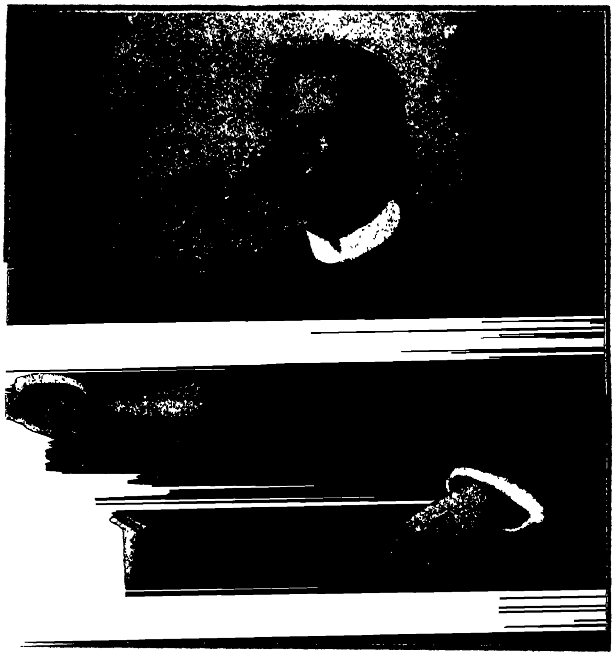
১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ৫০৲ বৃত্তি পান।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দর্শন-শাস্ত্রে এম্‌-এ পরীক্ষা দিয়া রাজকৃষ্ণ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বর্ণ পদক ও পুস্তকরাশি পুরস্কার পান। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় (কন্‌ভোকেশনে) তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর স্যর হেন্‌রি মেন তাঁহার সম্বন্ধে বলেন যে "তিনি যে প্রতিভা ও শাস্ত্রাধিকার প্রদর্শন

করিয়াছেন তাহা অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।"

কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ

এই বৎসরেই রাজকৃষ্ণ জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসন একণে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে দর্শন-াস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। রেভারেণ্ড ডাক্তার জম্‌স্ অগিল্‌ভি তখন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ধ্যাপনায় রাজকৃষ্ণ বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন।



নবীনচন্দ্র সেন

বেথুন সভায় 'হিন্দু-দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে প্রধানতঃ উক্যাল কলেজের তৎকালীন সম্পাদক এফ্ জে এটের চেষ্টায় কলিকাতায় বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের তষ্ঠাতা মহাত্মা জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের রক্ষার্থ বেথুন সোসাইটী নামে এক সাহিত্য-সভা তষ্ঠিত হয়। উহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালী সমাজের উচ্চ কৃত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া সাহিত্য ও বিজ্ঞানের লোচনা করিতেন। গবর্ণর জেনারেল বা লেফ্‌টেন্যাণ্ট র্ণর উহার অধিবেশনে যোগদান করিতেন, এবং হাইকোর্টের ইংরাজ বিচারপতিরাও উহার অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজকৃষ্ণ এই বেথুন সভায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ তারিখে 'হিন্দু-দর্শন' সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রমাণিত করেন যে, হিন্দু-দর্শন গ্রীক্ দর্শনের নিকট কোনও রূপে ঋণী নহে। বেদে সর্ব্বপ্রথমে Ego এবং Non-Ego, Mind এবং Matterএর প্রভেদীকরণ দৃষ্ট হয়। সূত্র যুগে যে ষড়্‌-দর্শনের উৎপত্তি হয়, তাহাও বৌদ্ধ-দর্শনের নিকট ঋণী নহে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার পর জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ইংরাজ ব্যতীত আর কোনও জাতিই বোধ হয় হিন্দুর ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর তাঁহাদের দার্শনিক-তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন নাই; এবং উপসংহারে তিনি এই আশা করেন যে স্বভাবসিদ্ধ পরীক্ষা-প্রিয়তা যথোচিত ভাবে পরিচালিত হইলে হিন্দুরা বিজ্ঞানে চরম উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধটি সভায় সদস্যগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইবার পর উক্ত সভার সভাপতি বিচারপতি স্যার জন বাড্‌ ফিয়ার একটি মনোহর বক্তৃতা করেন এবং উপসংহারে প্রবন্ধ পাঠকের উচ্চ সুখ্যাতি করিয়া যাহা বলেন, সভার কার্য্য-বিবরণীতে তাহা এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"He concluded by thanking the lecturer for his excellent essay, and congratulated him upon having successfully vindicated the character of his country's philosophy. So far from Hindu philosophy being visionary and unreal, it appeared to be entirely realistic in its structure. Whatever might be the value of the results which it had yet reached, its foundation was experience and its constant appeal was to observation. The President then after formally conveying the thanks of the meeting to Babu Raj Krisnna Mukerjyea, declared the Meeting at an end."

উপসংহারে তিনি বক্তাকে তাঁহার উপাদেয় প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং তাঁহার দেশের দর্শন-শাস্ত্রের বিশেষত্ব সাফল্যের সহিত প্রদর্শিত করিয়াছেন বলিয়া

আনন্দ প্রকাশ করেন ও তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। হিন্দু-দর্শন অস্পষ্ট ও অসম্ভব নহে, পরন্তু উহার প্রকৃতি বা গঠন বাস্তবানুযায়ী। যে সিদ্ধান্তে উহা এ পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছে তাহার মূল্য যাহাই হউক না কেন, উহার ভিত্তি ভূয়োদর্শন, এবং প্রতিনিয়ত পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধটি এতাদৃশ মূল্যবান তথ্যের আকর যে, বেথুন সভায় কার্য্যবিবরণীর শেষে সমগ্র প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটী উক্ত বিবরণীর ৩২ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছিল।

ব্যবহারাজীব

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ বি এল্ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগ উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। উক্ত বৎসরে ১৬ই মার্চ তিনি হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন এবং বহরমপুরে ওকালতী করিতে যান।

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন: "তখন বহরমপুরে বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চার বড় সুবিধা ছিল। ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ী সেইখানে। তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল। আর ভারতবর্ষের সংসৃষ্ট ইংরাজি পুস্তকও বিস্তর ছিল। 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' লেখক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পিতৃদেব (সুকবি গঙ্গাচরণ সরকার) ঘুরিয়া-ফিরিয়া বহরমপুরেই আসিয়া থাকিতেন। বাঙ্গালার ইতিহাস লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,—এই সময়ে বহরমপুরেই ওকালতি করিতেন। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর এই সময়ে এই বিভাগের পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন; আর আমি যাবার কিছুকাল পরেই,—পিণ্ডান্ত পিণ্ড শেষ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অন্তত্তর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। সুতরাং এ সময়ে বহরমপুরে বাঙ্গালা চর্চ্চার মাহেন্দ্র যোগ বলিতে হইবে। আমি মাহেন্দ্রক্ষণের সুযোগ অবহেলা করি নাই।"

রাজকৃষ্ণও এ মাহেন্দ্রক্ষণের অবহেলা করেন নাই। যদিও তখনও বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আগমন করেন নাই, উপরি-উল্লিখিত অন্যান্য সাহিত্য-সেবকগণের সাহচর্য্যে যে তাঁহার স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

"যৌবনোদ্যান"

এই সাহিত্যানুরাগ তাঁহার "যৌবনোদ্যান" নামক কাব্যগ্রন্থে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল। "যৌবনোদ্যান"



গিরীশচন্দ্র ঘোষ

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মুখপত্রে, শুধু এই গ্রন্থ বলি কেন তাঁহার প্রায় সকল গ্রন্থেরই মুখপত্রে তাঁহার মূলমন্ত্র নিধুবাবুর সেই অমর পংক্তি কয়টি মুদ্রিত ছিল,

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর, কিবা বল চাতকীর,
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?"

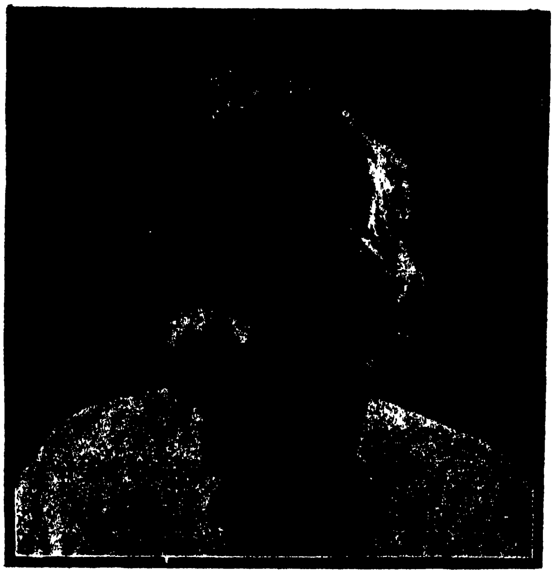
কাব্যগ্রন্থখানি কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের নামে উৎসৃষ্ট হয়। উৎসর্গ-পত্রটি এইরূপ :

বঙ্গকবিকুল-শিরোমণি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়—

সদাশয়েষু।

কবিবর!

আপনার প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বাগ্‌দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হই। যৌবনোদ্যান হইতে কতকগুলি পুষ্পোত্তোলন করিয়া মালা গাঁথিয়া অর্চ্চণারম্ভ করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না। যদি ভাল ভাল ফুল তুলিতে না পারিয়া থাকি, অজ্ঞতাবশতঃই এরূপ



মহেন্দ্রলাল সরকার

হইয়াছে; কারণ অত্যল্প দিন হইল কাব্যকারের যৌবনোদ্যানে প্রবেশ ঘটিয়াছে, এমন কি মধ্যদেশ পর্য্যন্ত যাইতে অনেক বিলম্ব আছে।

আপনার করে এই কবিতা-কুসুম-হার উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম। রচয়িতার গুণে যত না হউক আপনার নাম সংযোগে ইহার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। চন্দ্রকরে তামসী নিশাও শোভা ধারণ করে। নারায়ণ-নাম-লিখিত তুলসী-পত্রও বিশ্ব হইতে ভারী হইয়া থাকে। ইতি

বহরমপুর গ্রন্থকারস্য।

২৯ জুন ১৮৬৮।

'যৌবনোদ্যান' একটি রূপক।" "সংসার সাম্রাজ্য" নামক সঙ্কল্পিত কাব্যগ্রন্থের উহা প্রথম খণ্ড। "সংসার সাম্রাজ্য" কাব্যখানি সম্পূর্ণ হয় নাই। যৌবনোদ্যানের বিষয়টি সংক্ষেপে এই। একদিন প্রত্যূষে, যখন

আলোকের আগমনে হইয়া চকিত,
লজ্জায় শঙ্কায় রক্ত হরিদ্রা আনন,
তমোময় কেশপাশ পাশে বিগলিত,
নিশ্বাসে বিস্তার করি সুগন্ধ পবন,
সূর্য্যাসনে ফুলশয্যা ত্যজিয়া যখন,



রামগোপাল ঘোষ

সুবর্ণ বরণা উষা, কমল চরণে,
পালায় অম্বর পথে বিচলিত মন,
পশ্চিমদিকের পানে ত্বরিত গমনে,
সৌদামিনী জিনি বেগে,
পড়ে কিবা পড়ে না নয়নে,—

তখন যৌবন-উদ্যানে সুখসরোবরের তীরে একজন সুন্দর পুরুষ বসন্তের দেখা পাইল এবং সংসার-রাজ্য ভ্রমণ করিবার কামনা প্রকাশ করিল। বসন্ত বলিলেন যে যৌবন-উদ্যান ভয়শূন্য নহে, চারিদিকে প্রলোভন মায়া বিস্তার করিয়া আছে, ধৈর্য্য, যত্ন, সাহস ও সুমতিকে সঙ্গে লইয়া

ধর্ম্মকে মাথায় রাখিয়া অগ্রসর হইলেই সংসার-যাত্রা সুগম হইবে। এই বলিয়া তিনি ঐ কয়টি সঙ্গীকে আবাহন করিয়া আনিলেন। উহাদের বর্ণনা অতি সুন্দর। একটি উদ্ধৃত করি,

সাহস বিশাল বক্ষ, লৌহময় কায় ;
সম্মুখে সর্ব্বদা দৃষ্টি—পিছে নাহি চায় ;
থর থর ক্ষিতিতল কাঁপে পদভারে ;
কাহারে না কিছু ভয় করে এ সংসারে ;
বহিলে প্রবল বাত্যা নাহি পারে করিতে চঞ্চল।
সিংহনেত্র জিনি নেত্র জ্বলে অন্ধকারে,
শোভা পায় করদ্বয় করী-করাকারে ;
দেবদারু জিনি উরু, দেহে ভীমবল ;
অচল, অটল সদা যথা হিমাচল ;



মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন

এই সঙ্গীগণ

যেমতি সলিল বিম্ব সলিলে মিশায়,
কিম্বা বক্র ইন্দ্রধনু সহসা গগনে,

সেইরূপ যুবকের অঙ্গে মিশাইয়া গেল। এই সঙ্গীদের সহায়তায় যুবক নানা প্রলোভন জয় করিয়া সংসার-রাজ্যে অগ্রসর হইলেন।

কাব্যখানিতে ৮৩টা নয় পংক্তি সমন্বিত শ্লোক আছে। উহার স্থানে স্থানে ইংরাজ কবি স্পেন্সারের ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তরুণ বয়স্ক কবির পক্ষে উহা যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য এবং উহা সুধীগণ কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিল। সুক্ষ্মদর্শী সমালোচক ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'রহস্য সন্দর্ভে' এই কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"ইহাতে অলঙ্কার-বিশেষের আড়ম্বর অনেক আছে এবং রচনা চাতুর্য্যও স্থানে স্থানে প্রদীপ্ত বোধ হয়। অধিকন্তু পদ্যের সারল্য ও সম্মার্জ্জিততাও লক্ষ্য হয় ; উদাহরণ স্বরূপ কএকটি পদ প্রদর্শিত হইতেছে।

হেরিলা দ্বারের মাঝে, রতন আসনে,
চিন্তাকুলা মৌনভাবে বসিয়া রূপসী ;
খরতর রবিকর জ্বলে সে বদনে ;
নয়নের তেজে যায় নয়ন ঝলসি ;
সৌদামিনী রাশি নাকি পড়িয়াছে খসি ?



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কপাল কিঞ্চিৎ উচ্চ, প্রশান্ত, অঙ্কিত,
ভাবনা লাঙ্গলে ভাল গেছে যেন চসি ;
বক্রাগ্র নাসিকা ; ওষ্ঠ কি জন্য কম্পিত ;
দৃঢ় গ্রীবা ; অন্য অঙ্গ অলঙ্কার বাসে আচ্ছাদিত

(২৯ পৃঃ)

কিছুকাল গ্রন্থখানি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

বিবাহ

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর রাজকৃষ্ণ বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী কান্তমণি অতি সাধ্বী ও সুশীলা রমণী

ছিলেন। ইনি যে পুণ্যজ্যোতির্ম্ময় শান্তিময় সংসার সৃজন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতিভাশালী পতির সরস্বতী সেবার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল।

কটকে অধ্যাপনা

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী রাজকৃষ্ণ কটক ল-কলেজে ৩৫০্ মাসিক বেতনে অধ্যাপক পদে বৃত হন।

'হিন্দু-দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা

এই স্থানে অবস্থানকালে কটক ডিবেটিং ক্লাবে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৭শে মার্চ্চ দিবসে তিনি হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল।



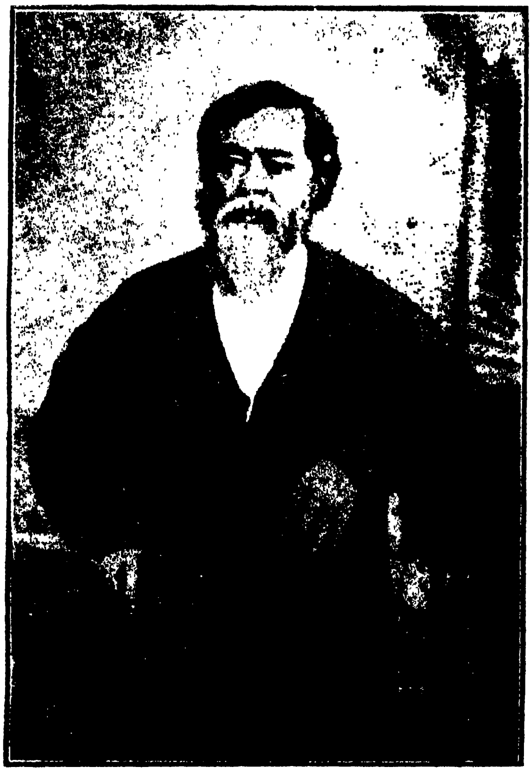
রমেশচন্দ্র দত্ত

বেথুন সভায় তিনি ইতঃপূর্ব্বে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাই কিঞ্চিৎ সংশোধিত করিয়া কটকে প্রদত্ত হইয়াছিল। সেইজন্য উহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

'মিত্র-বিলাপ'

এই বৎসর ১৯শে মে তারিখে রাজকৃষ্ণের দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'মিত্র-বিলাপ' প্রকাশিত হয়। জনৈক বন্ধুর বিয়োগে এই কাব্যের সূত্রপাত হয়। 'মিত্রবিলাপ' ব্যতীত এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত কবিতাগুলিও সন্নিবিষ্ট হয়, যথা, বুদ্ধদেবের সংসার-ত্যাগ, নিশাকালে বিহঙ্গমরব, চিন্তা, নিদ্রা, সংসার, কাল, বসুমতী, বালকের মুখ, নিজদোষে বিপন্নের প্রতি, মনের প্রতি উপদেশ, প্রতিধ্বনি, স্বভাবের শোভা, কাব্যের বাগান, উত্তানপাদের প্রতি সুনীতি, বন্ধুহীন কবিতা। কবি বঙ্গ-ভাষার চরণে কাব্যগ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়া লিখিয়া-ছিলেন,

কবিতা-কুসুম-মালা গাঁথিয়া যতনে
দিলাম মা বঙ্গভাষা তোমার চরণে।
আমি মা অকৃতী অতি, জ্ঞানহীন মূঢ়মতি,
তব যোগ্য উপহার দিব মা কেমনে।



চন্দ্রনাথ বসু

যেমন শকতি ছিল, তনয় মা তাই দিল,
ভুলি নাই তোমায় মা এই ভাব মনে॥
পশিয়া "যৌবনোদ্যানে," ফুল তুলি স্থানে স্থানে,
অর্পিয়াছি তব পদে, আছে কি স্মরণে?
আবার গাঁথিয়া মালা, পুরিয়া পূজার ডালা,
আসিয়াছে নন্দন মা তোমার সদনে।

'মিত্র-বিলাপে'র ন্যায় আন্তরিকতাপূর্ণ করুণরসসমন্বিত সুমধুর কাব্যগ্রন্থ তৎকালীন সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর

সেইজন্য একবার রাজকৃষ্ণের কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মিত্র-বিলাপটি'কে যথার্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"He was the writer of several very clever poetical works, foremost of which is the *Mitrabilap*, throughout which there runs an exquisite and delicate pathos hardly to be met with in works that have succeeded in creating a greater noise."

"তিনি কতকগুলি লিপিচাতুর্য্য-পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'মিত্রবিলাপ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের সর্ব্বত্র একটি সুন্দর কোমল করুণ রস প্রবাহিত হইতেছে যাহা অনেক প্রসিদ্ধতর গ্রন্থেও সচরাচর লক্ষিত হয় না।"



সারদাচরণ মিত্র

প্রতিভার অবতার ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত "রহস্যসন্দর্ভে" এই গ্রন্থের সমালোচন প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধার যোগ্য :—

"যে সময়ে পৃথিবীতে আহার্য্য শোভার প্রতি বিশেষ সমাদর না হইয়া উঠে ততদিন কাব্যরচনায় স্বভাবোক্তিই সুচারুরক্ষিত হইতে পারে। পর্ব্বতাদি স্বাভাবিক বিষয় সকল যেরূপে বর্ণিত হয়, সুচারু কারুনির্ম্মিত প্রাসাদাদির বর্ণনাপ্রণালী কদাপি তাদৃশ শ্লাঘ্য হইতে পারে না। যে সকল কবির সামাজিক আহার্য্য শোভার ভাব পরিজ্ঞাত হইয়াও স্বভাবের কৌশল লিখিয়া কীর্ত্তিলাভ করিতে পারেন তাঁহারাই সহৃদয় শ্লাঘ্য এবং কীর্ত্তনীয়। আমাদিগের সমালোচ্য গ্রন্থ প্রণেতা মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্তরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়া কীর্ত্তনীয় হইবার যোগ্য হইয়াছেন। ইঁহার রচনা-প্রণালী স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। গ্রন্থখানি মিত্রবিলাপ আখ্যায় অভিহিত সুতরাং বন্ধু বিরহ বর্ণনই উদ্দেশ্য। বিরহাবস্থায় মানবের প্রকৃতির চারুতা দর্শন অভিলষণীয় হওয়াতে প্রকৃতির বর্ণনাদিও লক্ষিত হয়। ফলতঃ ইনি যেরূপ ভাবে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে ইঁহাকে বিরহাবস্থার লোক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। ইঁহার বিরহভোগিত্ব ও কবিত্বের প্রামাণ্য-



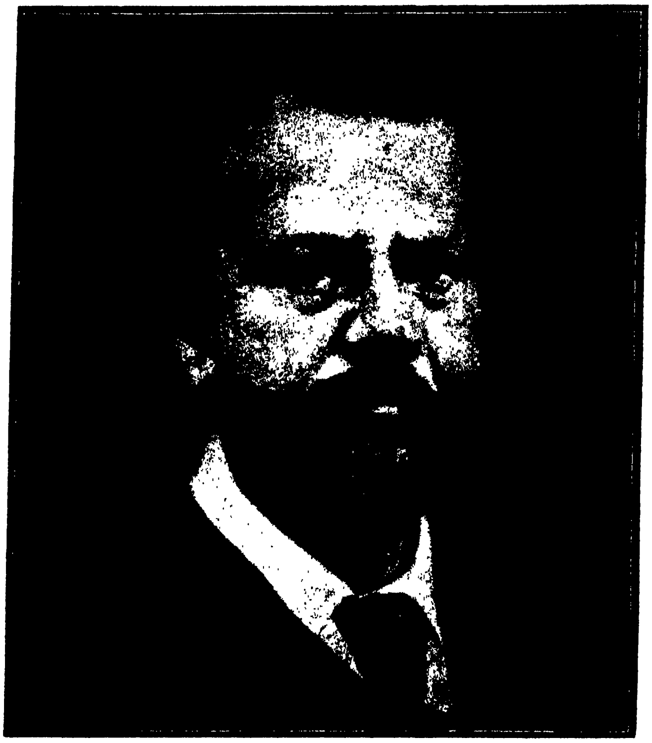
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রক্ষার্থ কতিপয় কবিতা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্যই বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবেন।

'দেখিলাম স্বপনে মুখে মৃদু মৃদু হাঁসি কুমুদে কৌমুদী-
রাশি, হেরি সুখ নাহি ধরে মনে।
প্রণয় বচন তার, ঢালে কর্ণে সুধাধার, শিহরে পুলকে কায়া
সে কর স্পর্শনে
উল্লাসে সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিল আমার। একি উষা দিলে
তুমি আবার আঁধার? ৪র্থ পৃঃ

নিম্নস্থ চারি পংক্তি স্বপ্নাবস্থায় বন্ধু দর্শনে চিত্তের প্রকৃত কার্য্যই প্রকাশ করিতেছে।

'প্রণয়ের পাত্র সহ হইলে মিলন, :
উথলে আহ্লাদ চিতে, সুধা বর্ষে চারি ভিতে, বিজলির
সম হাসি উজলে আনন ;
মানস সরস মাঝে, আশা কমলিনী সাজে, হেরিয়া নয়নে
পুনঃ সুখের তপন ;
রোগ শোক দূরে যায়, ইচ্ছা হয় পুনরায়, সংসার তরঙ্গে
রঙ্গে চালাই জীবন।
প্রণয় বিষয় আজি বুঝি আমি ভালো ;
বন্ধু সনে যে সকল, দেখিতাম নিরমল, আজি সে সকল
আমি দেখি যেন কালো ;



নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

সে কালে শীতল কর, দিতে তুমি সুধাকর, তুমিও এখন
মম মনাগুণ জ্বালো ;
তোমারো মলয়ানিল, শীতলতা গুণ ছিল, এখন কেবল
তুমি শোক শিখা পালো।'

(১৮ ১৯ পৃঃ)

প্রথমোদ্ধৃত কবিতার নিম্নে পংক্তি চতুষ্টয় রূপ অলঙ্কারে লক্ষিত হইয়া মানসি প্রকৃত বৃত্তির বিষয় প্রকাশ করিয়াছে। মিলনাবস্থায় সুরম্যবস্তু দর্শনে মনোমধ্যে যে রূপ আনন্দ লহরী বহিতে থাকে, বন্ধু বিচ্ছেদে ঐ সমস্ত রম্য বস্তু দর্শনেও সেইরূপ মনের ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া থাকে। গ্রন্থকর্ত্তা ইহা শেষোক্ত কবিতায় সুনিশ্চিত করিয়া শব্দ নিবন্ধ করিয়াছেন। ফলে ইনি পুস্তকখানি রচনা করিয়া যে কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে এরূপ স্থল অনেক আছে, যাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে সুখি করিতে পারি, কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইতে হইল।"

'মিত্রবিলাপে' সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলি নানা ছন্দে রচিত হইয়াছে। 'উত্তানপাদের প্রতি সুনীতি' নাম্নী কবিতাটি মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা'র আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

'কাব্যকলাপ'

কটকে অবস্থানকালেই ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মে রাজকৃষ্ণের আর একটি কাব্যগ্রন্থ—"কাব্য-কলাপ" প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের 'মঙ্গলাচরণে' তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত রচনার উল্লেখ আছে :—

"কৃপা করি, শ্বেতভুজে ভকত বৎসলে,
আবার দেহি মা স্থান চরণ-কমলে।
ভ্রমিব মনের রঙ্গে, পুনঃ কবিকুল সঙ্গে,
তব পদচিহ্ন ধ্যান করি কুতূহলে।
প্রবেশি 'যৌবনোদ্যান' প্রথমে আরম্ভি গান,
'মিত্রের' মরণে পরে ভাসি নেত্র-জলে;
কথন বিহঙ্গ গীত, চিত্ত করে বিস্ফারিত,
কভু বা 'চিন্তার' সনে বেড়াই বিরলে ;
কভু খুলি ভূতদ্বার, দেখি 'বুদ্ধ' শয্যাগার,
প্রেমের বন্ধন যবে ছিঁড়ে ধর্ম্মবলে।
দীনে যেন থাকে মায়া, দেহি মা গো পদছায়া,
নূতন সঙ্গীত রসে রসিব সকলে।
শরীরে ত গুণ নাই, তোমার করুণা চাই ;
হিমবিন্দু সূর্য্যালোকে গণ্যে মুক্তাফলে।"

এই কাব্যগ্রন্থে আশার প্রভাব (১ম কাণ্ড), সন্তোষসাধন, হর্ষ, মনোবৃত্তিগণের নৃত্য এবং গঙ্গাবতরণ কাব্য (১ম সর্গ) এই পাঁচটি দীর্ঘ কবিতা আছে। গঙ্গাবতরণ কাব্যটি অতি সুন্দর সনাতন ভাবোদ্দীপক। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ এই

কাব্যটি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম সর্গের অধিক আর লেখেন নাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই গ্রন্থটির সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন "মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাবুক, রসজ্ঞ, এবং সুলেখক; তাঁহার রচনা পাঠে সহৃদয়বর্গের তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে। আমরা 'কাব্যকলাপ' পাঠে আনন্দানুভব করিয়াছি।"

Origin of Language. (ভাষাতত্ত্ব)

এই সময়েই, অর্থাৎ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যে মাসে রাজকৃষ্ণ কটক ডিবেটিং ক্লাবে ইংরাজি ভাষায় আর একটি বক্তৃতা দেন। উহার বিষয় Origin of Languge বা ভাষাতত্ত্ব। কয়েক বৎসর পরে 'বঙ্গদর্শনে' ১২৭৯ চৈত্রে রাজকৃষ্ণ এই বিষয়টিই আরও বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা সেই প্রবন্ধটির বিচার করিবার সময় এই বিষয়ের আলোচনা করিব বলিয়া এক্ষণে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বিরত হইলাম।

Hindu Mythology. (হিন্দু দেবতত্ত্ব)

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জুলাই রাজকৃষ্ণ কটকে আর একটি বক্তৃতা দেন। উহার বিষয় ছিল Hindu Mythology। আমরা এই প্রস্তাবটি দেখিবার সুযোগ পাই নাই। সম্ভবতঃ উহাতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই পরে 'বঙ্গদর্শনে' ১২৮১-২ সালে 'দেবতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন।

রাজবালা

কটকে অবস্থানকালে রাজকৃষ্ণের আরও একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এখানি কাব্যগ্রন্থ নহে—ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকা 'রাজবালা'। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে উহা প্রকাশিত হয়।

রাজকৃষ্ণের জন্মস্থান গোস্বামী-দুর্গাপুর নামক গ্রামের পত্তন সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহাই এই আখ্যায়িকার আখ্যানবস্তু। যখন বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি অভিনব আদর্শে রচিত উপন্যাসাবলী প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল, তখন এরূপ গ্রন্থ প্রকাশের আবশ্যকতা ছিল কি না প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু এ কথা স্মর্তব্য যে যেখানে সঠিক ইতিহাসের উপকরণ দুর্লভ, সেখানে এরূপ কিম্বদন্তী রক্ষা করার মূল্য আছে এবং বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখক এই আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিয়া—একটি নূতন পথ দেখাইয়া—ভালই করিয়াছিলেন।

রাজকৃষ্ণের এই প্রথম গদ্যরচনার কিছু নিদর্শন দিই—

"আশা, তোমার কি মোহিনী শক্তি! তুমি মরীচিকাবৎ বারম্বার ছলনা কর, তাহাতেও তোমার প্রতি লোকের বিশ্বাস যায় না। তুমি দূরস্থ পদার্থপুঞ্জ এমন সুন্দর বর্ণে চিত্রিত কর, যে তাহারা জনমনোহররূপে নিরন্তর নরচিত্ত আকর্ষণ করে। সুখলোভে সকলে তোমার অনুবর্ত্তী হয়, কিন্তু কজনে বাঞ্ছিত ফল পাইয়া থাকে? তুমি আলেয়ার ন্যায় মাঝে মাঝে দীপ্তি দান কর, কিন্তু যে তোমার অনুসরণ করে, তাহাকে কত গর্ত্তে, বিলে বা জলাভূমিতে পড়িতে হয়। সঙ্কটে শরণাপন্ন লোকদিগকে তুমি কত প্রবোধ দেও, কত নূতন পথের কথা কহিয়া থাক, কত নূতন দেশের প্রফুল্ল মুখ দূর হইতে দেখাও; কিন্তু কতবার তাহারা পরিশেষে তোমার প্রতারণা বুঝিতে পারে। হয়ত কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই এমন অন্ধকারে পতিত হয়, যে সে স্থান হইতে আর কোন পথ দেখিতে পায় না। অথবা যে বস্তু লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিল, তাহা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। কিম্বা নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখে, যে কুসুমপুঞ্জের উদ্দেশে আসিয়াছিল তাহা কীটে পরিপূর্ণ, যে সুধার জন্য এত যত্ন করিয়াছিল তাহা হলাহলে জড়িত।

"কিন্তু, আশা, তাই বলিয়া তোমায় নিন্দা করি না। সংসারে এত দুঃখ যে তুমি সাহস দিয়া দূরে সুখের চিত্র না দেখাইলে জীবন অসহ্য হইয়া উঠিত। যেখানে সম্পূর্ণ অন্ধকার, সেখানে আলেয়ার আলোও ভাল। যখন নিশাকালে গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হয়, যখন তারকাকুল ভয়াকুল হইয়া নেত্র নিমীলিত করে, যখন শশাঙ্ক আতঙ্কে অন্তর্হিত হন, যখন দশদিক্ নিবিড় তিমিরে আবৃত হইয়া অকূল, অতল নদী সাগরের ন্যায় দেখায়, তখন যে চপলার ক্ষণহাস্যও পথহারা পথিকের একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহার আর অণুমাত্র সংশয় নাই।"

রাজকৃষ্ণের মনোহর রচনা-পদ্ধতির নিদর্শন অধিক দিবার স্থান নাই, কিন্তু যদি কোনও পাঠক এই 'সেকেলে'

আখ্যায়িকা মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন তাহা হইলে অনেক স্থলেই গ্রন্থকারের রচনাশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন।

বহরমপুরে আইন অধ্যাপক

বঙ্গগৌরব স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরের আইন-অধ্যাপকের কার্য্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জানুয়ারি রাজকৃষ্ণ দুইশত টাকা মাসিক বেতনে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া তিনি ওকালতী করিবারও অনুমতি পাইয়াছিলেন। এখানে এবারে তিনি প্রায় ছয় মাস ছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে স্থানান্তরিত হন এবং সম্ভবতঃ এই স্থানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার আজীবনব্যাপী প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়।

পাটনায় দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই রাজকৃষ্ণ পাটনা কলেজে তিন শত টাকা বেতনে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কটকে অবস্থানকালে উড়িয়া ভাষা, বহরমপুরে সংস্কৃত এবং পাটনায় উর্দ্দু, পারসী ও হিন্দীভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। তিনি আজীবন ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়নশীল ছিলেন।

Theory of Morals (নীতি-তত্ত্ব)

পাটনায় অবস্থানকালে রাজকৃষ্ণ তাঁহার ছাত্রগণের নিকট Theory of Morals বা নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি ইংরাজী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাটি, কটকে প্রদত্ত Origin of Language নামক বক্তৃতার সহিত একত্র মুদ্রিত হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শিক্ষাবিভাগের অলঙ্কার স্বরূপ, সুপণ্ডিত স্যামুয়েল লব্ তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়া লিখিয়াছেন: "I am glad that like your master Hume, you pay as much attention to style as to matter." অর্থাৎ তুমি তোমার গুরু হিউমের ন্যায় রচনাতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ন্যায় মনোযোগ দিয়াছ দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছি।" এই লব সাহেবের নিকট স্যর গুরুদাস প্রভৃতিও দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইনি কোমতের শিষ্য ছিলেন এবং গ্রুবদর্শন এবং অন্যান্য দার্শনিক বিষয়ে ইঁহার কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। ইনি কিছুকাল কৃষ্ণনগর ও হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে ইনি শিক্ষাবিভাগের অনেক সংস্কার সাধিত করিয়া যাইতে পারিতেন।

দামোদরের বিপত্তি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

নবম পরিচ্ছেদ

নারাণবাবুর উপদেশ

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিতে দামোদরের দেরী হইয়া গেল। দু-একজন ছাড়া সবাই দেরীতেই উঠিল। উঠিয়া দেখিল ৯টা বাজে। তাহার সঙ্গীরা—শচীন, নগেন ও রমেশ তখনও ঘুমাইতেছে। সে উঠিয়া বাহিরে গিয়া মুখ ধুইয়া আসিল। তার পর কি করিবে তাহার একটা তালিকা মনে মনে ঠিক করিতে লাগিল। এবেলায় ত' আর নারাণবাবুর দেখা পাইবার উপায় নাই। বিকালেই যাবে; সন্ধ্যার পর। আপাততঃ একবার চারুবাবুকে সমস্ত বলিয়া একটা পরামর্শ করিলে হয় না? না—দরকার নাই। চারুবাবু এখনি সে সমস্ত প্রচার করিয়া দিবেন—দামোদরের লজ্জার আর অবধি থাকিবে না। বরং এক কাজ করিলে হয়। তাঁহাদের কলেজের কাছে যে চা-এর দোকান ছিল, সেই দোকানের মালিকের সঙ্গে তাহার খুব সদ্ভাব ছিল; তাহার কাছে গেলে কলিকাতার হালচাল্

কিছু জানা যাইবে। সে লোকটি খুব পাকা, পোড়-খাওয়া। আর তাহাকে দিয়া কোনও কথা বাহির হইবার নহে।

দামোদর উঠিয়া গিয়া কাপড় জামা—নগেনের কাপড় জামা—ছাড়িল। নিজের কাপড় জামা পরিল। তা'র পর চারুবাবুর সন্ধানে গেল। চারুবাবু তখন উঠিয়া চা-পান শেষ করিয়া তেল মাখিতে যাইতেছিলেন। দামোদরকে দেখিয়া বলিলেন, "Haloo! দামোদর! কা'ল কি রকম হো'ল?"

দামোদর উত্তর দিল, "আপনারই দয়া, চারুবাবু।"

চারুবাবু সোৎসাহে বলিলেন, "দয়া কি দামোদর? ওটা তোমার পাওনা। যাক্, দু' একদিন থাক্‌বে ত? এখন কি করা হো'চ্ছে? দেশেতেই আছ?"

দামোদর জবাব দিল, "দু-তিন দিন থাকতে পারি। দেশেই ছিলুম। কিন্তু ভাল লাগলো না। এইখানে এসেছি তাই। দেশের স্কুলেই মাষ্টারি কর্ত্তুম।"

চারুবাবু তেলের বাটিতে হাত দিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ। ভিলেজ্ লাইফ্ একটু আধটু ভাল, দামোদর,—বরাবর থাক্‌লে হাঁফিয়ে উঠ্‌তে হয়। আমি তাই ন'মাসে ছ'মাসে বাড়ি যাই। ছেলেপিলেরা, সংসার সব বাড়িতেই থাকে বটে; কিন্তু আমার আর যাওয়া ঘটে উঠে না। আর ও-সব সংসার ছেলেপিলে মাঝে-মাঝেই ভাল। সর্ব্বদা কাছে থাক্‌লে কি বাঁচ্‌তুম। উঃ! এ কেমন আছি, নির্ঝঞ্ঝাটে, বল দেখি।"

দামোদর সায় দিল, "তা'তে আর সন্দেহ। বেশ আছেন। এঁরাও সব দিব্য ছেলে, চারুবাবু। আমাদের চেয়ে এঁরা খোলা প্রাণ, আমুদে, সরল।"

চারুবাবু একটু হাসিলেন। তা'র পর আস্তে আস্তে দামোদরকে বলিলেন, "সব গাধা, দামোদর, সব গাধা। সংসারের কিছু জানে না। বাপ মা বেচারারা কি ক'রে টাকা জোগায়, কিছু ভাবে না। বুঝেছ? আমি ত সবারই ভিতরের খবর জানি। এর ভিতর আমীরেরও ছেলে নেই, ওমরাহর ছেলেও নেই,—সবই সাধারণ গৃহস্থের ছেলে, কিন্তু দেখেছ বুদ্ধি আর নবাবি সব। এরা সবাই শনি। আমার এ মেস শনিমণ্ডল, দামোদর। লক্ষীছাড়ার বাসা। তবে ওদের নিয়ে চলে ভাল; যদিও মনটা এক এক সময় বড় খারাপ হয়। ওদের ভবিষ্যৎ যে কি তা' ওরা যদি জান্‌তো, তবে আত্মহত্যা করে বস্‌তো। ভগবান মানুষকে মূর্খ করে কি ভালই করেছেন; ভাগ্যে কেউ ভবিষ্যতের কথা জান্‌তে পারে না, দামোদর!"

দামোদরেরও মনে কথাগুলি বড় দাগ রাখিয়া গেল। সে ত ভাবিয়াছিল ইহারা সবাই ধনীপুত্র; না হলে এত সমারোহ, এত অর্থ-ব্যয় কি করিয়া করে? কিন্তু ইহাদের অবস্থা কাহারও বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালীর মত নহে; অথচ অপরিণামদর্শিতায় ইহারা এইরূপ করে। দামোদর ভাবিল, যাহা হউক, ইহাদের প্রাণ আছে। ইহাদের মন ঢের উদার; ইহারা আত্মসর্ব্বস্ব বা আত্মম্ভরী নহে। ভগবান ইহাদের ভাল নিশ্চয়ই করিবেন। চারুবাবুকে বলিল, "আমি একটু ঘুরে আসি।"

চারু বাবু উত্তরে কহিলেন, "নিশ্চয়ই যাবে। বেড়াতে এসেছ, বেড়াবে না? এ তোমার নিজের ঘর-দোর, দামোদর। এখানে তোমার কোনও সঙ্কোচ নেই, তুমি যত-দিন ইচ্ছা থাক। বুঝেছ? নগেন্‌কে বলে দেব'খন আমি।"

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া নামিয়া গেল। মেস্‌বাড়ি হইতে সুরেন বাবুর চা-এর দোকান বেশী দূর নহে। দামোদর রাস্তা দেখিতে দেখিতে চলিল। অনেক দিন পরে কলিকাতা তাহার কাছে নূতন বোধ হইল। দু'একবার মোটর-গাড়ির হর্ণ তাহার পিছনে এত কাছে বাজিয়া উঠিল, যে সে চমকিত হইয়া ৪।৫ হাত সরিয়া গেল। রাস্তায় লোকের ভিড়, গোলমাল, গাড়ির চলাচল তাহার কাছে নূতন বোধ হইল। সে হাঁটিতে হাঁটিতে ৫ মিনিটের স্থানে ১৫ মিনিটে সুরেন বাবুর দোকানে পৌঁছিল।

সুরেন বাবু লোকটির বয়স হইয়াছে। প্রায় ৫০, ক্ষীণ দেহ, লম্বাটে; মাথার চুলগুলি সবই প্রায় পাকিয়াছে। একটি গেঞ্জি গায়ে, চটিজুতা পায়ে দিয়া দোকানের সামনে একখানি টুলে বসিয়া ছিলেন। তাঁর সাম্‌নেই লোহার একটি বড় উনানে, একটা মস্ত বড় লোহার কেট্‌লী বসান আছে; তাহা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। দোকানটি লম্বে হাত দশেক, প্রস্থে হাত ৮ হইবে। মধ্যে একটা লম্বাটে ধরণের সস্তা কাঠের টেবল্; উপরে অয়েলক্লথ মারা; টেবলের দু'দিকে দু'খানি লম্বা বেঞ্চ। ইহারই ভিতর আবার একটি কোণে একটা ছোট টেবল; তাহার উপরে একটি পুরান দোয়াত, একটা কলম, ও একখানা লম্বাটে

খাতা, হিসাবের ও ধারের। দেওয়ালের গায়ে একটা আল্‌মারি বসান আছে ; তাহাতে চা-এর কপ্, সসার, চা এক্ টিন, চিনির শিশি, চাম্‌চে খান ৫।৭ ; মুর্‌গীর আণ্ডা ; ও মস্ত বড় ২।৩ টা এনামেলের বাটি : ১ খানা কড়া ; এটা ফ্রাই প্যান ; একটা তেলের বোতল ; ও একটি ঘিয়ের শিশি ও ২।৩ টা আরও ছোট ছোট শিশি, মরিচ গুঁড়া, লঙ্কা গুঁড়া, নুন প্রভৃতি রাখা আছে। সুরেন বাবু দামোদরকে দেখিয়া বলিলেন, "এ কি! দামোদর বাবু যে! কি সৌভাগ্য! করে এলেন? আসুন, বসুন। চা দেব না কি?"

দামোদর হাসিয়া বলিল, "কাল এসেছি, সুরেন বাবু। দিন এক কপ্ চা—বহু দিন আপনার দোকানের চা খাওয়া হয় নি। তার পর, কেমন আছেন? কি রকম চল্‌ছে?" দামোদর ভিতরে একখানি বেঞ্চে বসিল। সুরেন বাবু কেট্‌লির ঢাক্‌না তুলিয়া দেখিয়া, কেট্‌লী নামাইলেন। ভিতর হইতে একটি চা-দানী আনিয়া তাহাতে চা দিলেন ও জল দিলেন। উনানে খানকতক কয়লা ফেলিয়া দিলেন। তার পর চা-দানি লইয়া ছোট টেবলের উপর রাখিয়া, আলমারির ভিতর হইতে একটি কপ্ ও একখানি সসার লইয়া দামোদরের সম্মুখে রাখিলেন। পরে কোথা হইতে মরিচা-পড়া একটা ছাক্‌নি ও দুধের একটা গেলাস বাহির করিয়া, দামোদরকে চা' দিলেন। সব ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া বলিলেন, "আর জিজ্ঞাসা করেন কেন? বড়ই মন্দা পড়েছে, দামোদর বাবু। বাজার বড়ই খারাপ যাচ্ছে। আজকাল কি আর চা খাইয়ে আছে? সব ছোক্‌রারা আজকাল দেখে দোকানের আস্‌বাব। বড় বড় আয়না চাই, টেরি বাগবার জন্যে, মুখ দেখবার জন্যে। সৌখীন কাপ চাই ; পাথর বসানো টেবিল চাই ; বেতের চেয়ার চাই, হেলান দিয়ে বস্‌বার জন্যে। ভাল ভাল সুন্দর সুন্দর ছেলে মানুষ দেখে ছোক্‌রা চাই ; তা না হইলে আর চায়ের দোকান চলে না। আর আপনাদের কাল নেই, দামোদর বাবু।"

দামোদর সুরেন বাবুর অবস্থা শুনিয়া, নূতন নূতন সমস্ত কারবারের ব্যবস্থা শুনিয়া দমিয়া গেল। সুরেন বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে কি না বুঝিতে পারিল না। বলিল, "বলেন কি?"

সুরেনবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় একটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "কৈ, বাবু, কেকের দাম দিন!"

সুরেনবাবু উত্তর দিলেন, "কেকের দাম? সেই সন্ধ্যেবেলায়। এখন মাত্র দোকান খুলেছি ; এখন দাম কোথায় পাব?"

লোকটি মুখ ভার করিয়া বলিল, "রোজই এই কর্‌ছেন। সকালে এলে বলেন সন্ধ্যেতে, সন্ধ্যেতে এলে বলেন সকালে। এ কি রকম? এটা কি ভদ্রতা?"

সুরেনবাবু মাথা চাপড়াইয়া বলিলেন, "ভদ্রতা আর বজায় রাখি কিসে, বাবা? রাখ্‌বার উপায় কি রেখেছে কিছু? দিন ত ১২।১৪ কাপ্ চা' বেচি ; তা' থেকে তোমাকে কি দিই, বাড়িওয়ালাকে কি দিই, আর ডিমওয়ালাকে কি দিই, চা, চিনি, দুধই বা কোথা থেকে কিনি, আর নিজেই বা খাই কি? ভদ্রতা রাখার 'ত একটা ব্যবস্থা চাই হে!"

লোকটি হাঁ করিয়া শুনিল। তা'র পর বলিল, "দোকান তুলে দিন না তা'র চেয়ে। জিনিসপত্র বেচে, দেনা শুধে অন্য রাস্তা দেখুন। কেন ক্রমশঃ ডুব্‌ছেন?"

সুরেনবাবু তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, "এ বয়সে আর যমের বাড়ির রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তা নেই, বাবা। তাই পড়ে আছি।"

লোকটি শীঘ্র একটা ব্যবস্থা করিতে বলিয়া চলিয়া গেল। দামোদর ব্যথিত হইয়া সুরেনবাবুর দিকে চাহিয়া দেখিল। সুরেনবাবু বলিলেন, "এই 'ত ব্যবসার অবস্থা, দামোদরবাবু। আর কি বল্‌বো?"

দামোদর কহিল, "তাই 'ত! সুরেনবাবু, বড় সমস্যার কথা। আপনার মত একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ লোক—পাকা লোক—যদি এমন করে দুরবস্থাতে পড়ে, তবে আর কা'রও আশা নেই।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "না! দামোদরবাবু! দিন দিন দেশের অবস্থা যে কি দাঁড়াচ্ছে তা' বলা যায় না। এই দোকানে একদিন আমি রোজ ১০।১৫ টাকা বিক্রি করেছি ; আর আজ ১০/১৫ পয়সা বিক্রি কর্ত্তে পারি না। কি করে সংসার চালাই, আর কি ক'রে দোকান রাখি বলুন 'ত?"

সুরেনবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দামোদর উত্তর দিল, "তাই 'ত!"

সুরেনবাবু বলিলেন, "তাগাদায় অস্থির হয়েছি। এখানে এই ডিমওয়ালা, কেকওয়ালা, বাড়িওয়ালা; বাড়িতে স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবাই কেবলই চাইছে—পয়সা দাও। আরে বাপু, পয়সা কি মন্ত্রে হয়? আকাশ থেকে পড়ে? আমি কি গাছ পেয়েছি পয়সার? না পিশাচসিদ্ধি লাভ করেছি? বলবো কি,মশা'য়, সবাই ভাবে যেন পয়সা আমার হাত ঝাড়্‌লেই পড়ে। এ দুনিয়াতেও মানুষে থাকে!"

দামোদর ব্যাপার সুবিধা নয় দেখিয়া উঠিল। সুরেনবাবুকে পকেট হইতে ৵০ পয়সা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "এখন যাই, সুরেনবাবু, একটু কাজ আছে। বিকালে আবার আস্‌বো,— না হয় কাল সকালে।"

সুরেনবাবু পয়সা চারটি ট্যাঁকে গুঁজিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই আস্‌বেন। ভাগ্যে এসেছিলেন, তাই বউনি হো'ল আজ। সকাল থেকে ৵০ আনার কয়লা পুড়ে গেল; খদ্দের একটাও নেই। সবাই কি চা খাওয়া বয়কট কর্লে না কি, কিছু বুঝ্‌তে পারি না। একটা খদ্দেরও এ পথ মাড়ায় না। হো'ল কি দেশ? ক্রমশঃ ভদ্রলোক কমে যাচ্ছে, লোপ পাচ্ছে। তা' না হ'লে চা খায় না।"

দামোদর দোকান হইতে বাহির হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, ভাবিল—কি কুগ্রহ। সে আবার সুরেনবাবুর কাছে পরামর্শ লইতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার সুরেনবাবুর জন্য সত্যই অত্যন্ত দুঃখ হইল। লোকটা ২।৩ বছরের ভিতরই যেন একেবারে জরাগ্রস্ত হইয়াছে। দু'বছর আগেও তাহার মনে স্ফূর্ত্তি, উৎসাহ ছিল; দেহে চাঞ্চল্য ছিল। আজ যেন তাহার সে সমস্ত একেবারে গিয়াছে।

মেসে ফিরিয়া দামোদর দেখিল তাহার সঙ্গী তিনটি তখনো শুইয়া আছে। ঘুম ভাঙ্গিয়াছে বটে, তবে উঠিতে কাহারও আগ্রহ নাই। তিন জনেরই বিছানার কাছে চাএর কপ্‌ দেখিয়া বুঝিল শুইয়াই সব চা পান করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া শচীন বলিল, "দামোদর বাবু, আপনি ত খুব early-riser, এত সকালে উঠে কি করেন?"

দামোদর বলিল, "সকাল মানে ১১টা।"

নগেন কহিল, "১১টা? বলেন কি? আমার যে ১১টায় (ইতিহাস) History class! যাক্; বাঁচা গেল। আর ২ ঘণ্টা ছুটি; তা'হলে আর একটু আরাম করা যেতে পারে। ২ ঘণ্টা মানে সেই ১॥০টা।"

রমেশ বলিল, "ইতিহাসকে আর বর্ত্তমান করিস্‌ নি, নগেন,—ওটা past tenseই (অতীতকাল) থাকুক্। দামোদর বাবু, এখন বলুন, খবর কি? আপনি কি সত্যই সন্ন্যাস নেবেন? কি স্থির কো'র্‌লেন?"

দামোদর উত্তর দিল, "প্রায় তাই মনস্থ করেছি। আমার সংসারে বিরাগ হয়ে গেছে। তবে এখনও নিশ্চিত কিছু বলতে পারি না।"

নগেন্ উঠিয়া বসিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? স্ত্রীর প্রণয় নেই বলে? কুছ্‌ পরোয়া নেই; স্ত্রী চাই না। সংসারে স্ত্রী ছাড়াও ত স্ত্রীলোক আছে, তবে? সবাই পয়সা পেলে স্ত্রীর মত ব্যবহার কর্ব্বে; কিছু ভাব্‌বেন না। শ্বশুরের জন্য? শ্বশুরকে ত্যাগ করুন। বাপের জন্য? নেভার মাইন্‌ড্! বাপ্ আর কিছু এখানে আসচে না। তবে এখানে আপনার কোনও বিরাগ কর্ব্বার জিনিস নেই। এইখানেই থাকুন। সন্ন্যাসের কাজ হবে।"

শচীন বলিল, "যেমন নগেন। দেখ্ নগেন, তুই সকাল বেলাতেই লেক্‌চার সুরু করিস্‌নি। ঐ ভয়ে কলেজে গেলুম না; আর তুই তাই সুরু কো'র্‌লি এখানে।"

দামোদর উত্তর দিল, "এখানে থাকলে ত অর্থের দরকার। টাকা চাই; কাজ কর্ম্ম করতে হবে। তার কি ব্যবস্থা? তা' ছাড়া, আমার নিজের জন্য দাসত্ব করা, চাকরি করার কোনও দরকার নেই—বাহুল্য মাত্র।"

শচীন বলিল, "সন্ন্যাসে যদি যান্, আমাকে নিয়ে যাবেন, দামোদর বাবু, আমারও সংসারে আর মতি নেই।"

নগেন ধমক্ দিল "শচীন্, তোর বাবাকে পথে বসাবি? সে কার জন্যে ওকালতি করে টাকা জমাচ্ছে? তুই একেবারে বেহেড হয়েছিস্! সন্ন্যাসী হয়ে বাবার টাকাগুলো জলে দিবি না কি?"

রমেশ বলিল, "দামোদর বাবু, টাকা রোজগার করার উপায় আমরা বলতে পারি না; খরচ করার পথ অনেক দেখাতে পারি। তবে শুনেছি টাকা লোকে রোজগার করে। দেখুন চেষ্টা করে। এখানে ত' অনেক স্কুল, আফিস আছে; খোঁজ করুন; যদি নিতান্তই কোনও পথ

না পান, তখন সন্ন্যাস নেবার ব্যবস্থা কর্বেন। সন্ন্যাস ত হাতের পাঁচ। ভারতের ইতিহাসে বিষয় ত্যাগ কর্ত্তে সবাই বলেছে; কেন জানেন? কা'রও বিষয় রাখ্‌বার বুদ্ধি নেই, বিষয় কর্ব্বারও নেই।"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের জানা-শুনা লোক এমন কেউ আছেন, যিনি কাজ-কর্ম্ম কর্ত্তে একটু সাহায্য কর্ত্তে পারেন? কোনো একটা টিউসনি জুট্‌লেও চলবে।"

কেহই কোনও খবর দিতে পারিল না। নগেন বলিল "খোঁজ করে বল্‌বো। তবে কোন ভরসা ত দেখি না। ছেলেরা আর পড়তে চায় না দামোদর বাবু। আর চাক্‌রি? তা'র চেয়ে রামের স্বর্ণমৃগ বেশী real.। ও-সব মতলব ছাড়ুন। সন্ন্যাসই নিয়ে ফেলুন। ও একটা মস্ত বড় ব্যবসা, জমাতে পারেন—ত' মোহান্ত। বলেন ত আমিও সঙ্গে যাই। কিরে রমেশ, যাবি? শচীন যাবে না, ওর বাবার পয়সার মুখ চেয়ে ওকে চিরকাল বি-এ পড়্‌তে হবে ও চারু-বাবুর মেসে থাকৃতে হবে।"

রমেশ উত্তর দিল, "আচ্ছা দামোদর বাবু, আপনি চেষ্টা করুন রোজগার কর্ত্তে, না হয়, শেষে আমরাও আপনার সঙ্গে সন্ন্যাস নেব। ঐ ব্যবসা মন্দ নয়। আমি দেখেছি বটে!"

তিনজনের কেহই সেদিন কলেজে গেল না। ১২টার পর উঠিয়া সব স্নানাহার করিয়া আবার শয়ন করিল। এবার দামোদরও ঘুমাইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল বেলা পড়িয়াছে। তাহার সঙ্গীরা কেহই নাই; সবাই উঠিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। শচীনের টাইম-পিসে ৫৷৷০টা বাজিয়া গিয়াছে। সে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল, চা-এর টেব্‌ল আজ প্রায় খালি হইয়া গিয়াছে। দু'একজন মাত্র বসিয়া আছে। সে চা' পানের বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিল না; তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল;—নারাণ বাবুর সহিত দেখা করিতে হইবে।

মির্জ্জাপুর হইতে রতনচাঁদ গার্ডেন লেন বহু দূর। তাহার উপর কলিকাতার সমস্ত পল্লী দামোদরের জানা ছিল না। কাজেই খোঁজ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতে তাহার অনেক বিলম্ব হইল। যখন সে নারাণবাবুর বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। অনেক করিয়া নম্বর বাহির করিল। ১, ২, করিয়া বাড়ি গুণিয়া গিয়া দেখিল ১০, ১১, তা'র পর ৩১, ১২, বাদ; একেবারে ১৪, ১৫, প্রভৃতি; ১২৷১৩'র কোনও সন্ধান নাই; শুধু ফাঁকের স্থানে একটি অপ্রশস্ত ১½হাত ২ হাত অন্ধকার গলি মাত্র। ১৪ নম্বরের একটি ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করায় সে হাসিয়া গলির ভিতর দেখাইয়া দিল। দামোদরের প্রবেশ করিতে ভয় হইল। ছেলেটি তামাসা করিল না কি? কিন্তু ভাল করিয়া পুনরায় সব দেখায়, তাহার মনে হইল যে সম্ভবতঃ ১২৷১৩ নম্বর গলির ভিতরই হইবে। অন্যত্র যাইবার উপায় নাই। সে সাহস করিয়া গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া নারাণবাবুর নাম করিয়া উচ্চ স্বরে ৪৷৫ বার ডাকিল।

মিনিট ৫৷৭ কোনও সাড়া শব্দে উত্তর আসিল না। দামোদর দাঁড়াইবে কি প্রস্থান করিবে মনে মনে বিতর্ক করিতেছে, এমন সময় উপর হইতে কে বলিল, "যাচ্ছি!" তাহার ২৷৩ মিনিট পরে একটি কেরাসিনের ডিব্‌রি হাতে করিয়া নারাণবাবু খালি গায়ে শুধু পায়ে আসিয়া দেখা দিলেন। প্রথমটা দামোদরকে দেখিতে পান নাই; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

দামোদর উত্তর দিল, "আমি দামোদর!" নারাণবাবু নিকটে আসিয়া দেখিয়া তবে চিনিলেন। বলিলেন, "ওঃ! তুমি! এসো! এসো!"

দামোদর তাঁহার পদানুসরণ করিয়া বাড়ির ভিতরে পা' দিতে গিয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। ভিতরটা বাহিরের গলির রাস্তা হইতে প্রায় দেড় হাত নীচু। প্রবেশ করিয়া একটু গিয়া একটা অন্ধকারময় ছোট উঠানে পড়িল। ডিবরির আলোতে দেখিল বাড়িটির ইট্ বাহির হইয়া পড়িয়াছে নহে, ইটের উপর ইহার আর কোন কালেই কিছুর প্রলেপ পড়ে নাই। সেকেলে ইট, ছোট ছোট। একটা দুর্গন্ধপূর্ণ নর্দ্দমা পার হইয়া একখানি ছোট অন্ধকার ঘরের সাম্‌নে ডিব্‌রিটি রাখিয়া নারাণবাবু বলিলেন, "ভিতরে বসো। আমি চট্ করে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা নিয়ে আসি। তক্তপোষ পাতা আছে, দেখে বসো।" বলিয়াই নারাণবাবু অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন।

দামোদর ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া একখানি তক্তপোষ ক্ষীণালোকে দেখিতে পাইয়া তদুপরি বসিল।

তাহার মন নিরুৎসাহ হইয়া গেল। অতবড় ভকতরামের অন্তরঙ্গ সঙ্গী, অত ক্ষমতা প্রতিপত্তিশালী, নারাণবাবুর বাড়ির ও জীবনযাত্রার যেটুকু পরিচয় পাইল, তাহাতে তাহার আর বিশেষ আশা ভরসা হইল না। সে ভাবিতে লাগিল যে এমন করিয়া বিশেষ জানাশুনা না করিয়া আসা উচিত হয় নাই। এখন আসিয়াও পলাইতে পারে না। অথচ তাহার বসিয়া থাকিতেও প্রবৃত্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইল। এমন সময়ে একটি ১৭।১৮ বৎসরের মেয়ে আসিয়া, ডিব্‌রিটি উঠাইয়া এক হাতে লইল, ও অপর হাতে একটি হ্যারিকেন বাতি লইয়া আসিয়া তাহার সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া, হ্যারিকেনটা তাহার পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া সে ডিব্‌রি লইয়া চলিয়া গেল। দামোদর শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; ভাল করিয়া তাহার দিকে চাহিতেও পারে নাই। কিন্তু তা'র বুকটা খুব জোরে স্পন্দিত হইল। মেয়েটি চলিয়া গেলে সে দাঁড়াইয়াই রহিল, বসিতে পারিল না।

একটু পরেই নারাণবাবু নামিলেন; গায়ে একটা টুইলের সার্ট আর পায়ে একজোড়া তালি দেওয়া চটি জুতা। আসিয়াই চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এঃ! না, এ মেয়েটাকে দিয়ে কোন কাজ হয় না! একটা কথাও যদি বুঝ্‌তে পারে! লণ্ঠনটা এইখানে বসিয়ে দিতে আছে! একটু সরিয়ে দরজার কাছে রাখ্‌লে বাইরেটা সুদ্ধ আলো হয়!"

তার পর দামোদরকে বসিতে বলিয়া নিজে বসিল। দামোদর কি রকম হইয়া গিয়াছিল; কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছিল না। সে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বসিয়া পড়িল। নারাণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর, বল? আমার 'ত সারা দিন ভকতরাম বাবু'র কাজে ঘুরে ঘুরে আর কিছুরই সময় হয় নি। তোমার কথা একেবারে ভুলে গিছ্‌লুম হে। তা' তুমি কোথায়ও গিছ্‌লে? কা'রও সঙ্গে দেখা করেছ?"

দামোদর উত্তর দিল, "আমি 'ত কাহাকেও চিনি না। এমনি গেলে কেউ হয় 'ত কথাই বল্‌বে না। তাই আপনার কাছে আসা।"

নারাণবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "সে কথা ঠিক। কেরাণী হলে কি হয় সব, একেবারে যেন লাটসাহেব। এক কথা পাঁচবার জিজ্ঞাসা কর্লে তবে জবাব পাওয়া যায়। তা' এখন 'ত ২।৪ দিন থাক্‌বে? যখন চেষ্টা কর্ত্তে এসেছ কাজের, চেষ্টা না করে কি যাবে?"

দামোদর জবাব দিল, "না। ২।৪ দিন দেখ্‌বো বৈ কি।"

নারাণবাবু বলিল, "ভকতরামবাবুকে ধরে বলে দেখ্‌বো। তার সঙ্গে বড় বড় মাড়োয়ারির আলাপ আছে যথেষ্ট; এই ধর না ধুধুরিয়া, যা'দের তিনটে কাপড়ের মিল; হালুয়াইয়া, তা'দের একচেটে তিসির আর গালার কার্‌বার, ক্রোরপতি; ঝুনঝুনওয়ালা, তা'দের পয়সা খায় কে, ছাতা পড়ে যাচ্ছে। সবাইকেই ভকতরামবাবু জানে; বেশ খাতির আছে। বলে কহে তোমার একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়া তেমন শক্ত নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, তুমি কি কাজ জান? ব্যবসাপত্র কিছু কোনও দিন দেখ নি। তোমাকে দিয়ে বাজার ঘোরাও হবে না; দোকানেও বেচা বা কথা বলা পার্ব্বে না তুমি; খাতাপত্রও রাখ্‌তে পার্ব্বে না, কেন না মহাজনী জান না। সুতরাং কোর্ব্বে কি? এতটা কাল বৃথাই কাটিয়েছ।"

দামোদর কহিল, "শিখে নিতে হবে। চেষ্টা কর্লে কি পার্‌বো না? খুব কি শক্ত? আপনি একটু দেখিয়ে দেবেন।"

নারাণবাবু জবাব দিল, "শক্ত বৈ কি। তবে এক কাজ 'ত ভেবে দেখ্‌ছি, তুমি পার্ত্তে পার। তোমায় যা' শিখিয়ে দেব বল্‌তে পার্ব্বে? এই মনে কর না, যেন আমাদের কার্‌বারে কিছু টাকার দরকার। কেমন? তোমাকে আফিসে বসিয়ে রাখ্‌বো। আর আমি বাইরে থেকে সব মহাজন নিয়ে আস্‌বো। তা'রা এসে কথাবার্ত্তা কইবে। তোমাকে আমি দেখিয়ে তা'দের বল্‌বো, যে গুদামে, ধর, ৫০০০ মণ তিসি আছে; তা' বিক্রি করা চাই। কি দর দেবেন? তুমি বল্‌বে, অমুক দর। আমি বল্‌বো, না, এই দরে দিতে হ'বে। তুমি নিমরাজী হবে; এইরকমে দরদস্তর শেষ হলে, তুমি বল্‌বে আগাম চাই অর্দ্ধেক আর বাকী মাল দিলে শোধ করা চাই; আগাম কিছু টাকা নেবে।" কর্ত্তে পার্‌বে? দেখ্‌বে টাকা রোজগারের শেষ থাক্‌বে না। ভকতরামকে বড় লোক কর্লে কে? এই শর্ম্মা। এই রকম ক'রেই। বুঝেছ?

চাকরি ক'রে আর কি হবে? আর চাকরি পাবেই বা কোথায়? বরং চল আমার সঙ্গে ২।৪ দিন বাজারে ঘুরে দেখ; তার পর এসো তোমাতে আমাতে লেগে যাই। কিছু পয়সা হাতে এলে বাস্, আর কে পায়? কেমন, রাজী আছ?"

দামোদর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শুনিতেছিল। নারাণবাবুর কথা শুনিয়া বলিল, "ভেবে দেখি। বড় ভয়ের কথা! এ একেবারে পুরা জুয়াচুরি; কি ক'রে কোর্ব্ব?"

নারাণবাবু তক্তপোষ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "জুয়াচুরি? জুয়াচুরি কি এতে আছে? তুমি বাজারের কিছু জান না তাই বল্‌ছো। চল তোমাকে আমি সব কাল দেখাবো। তুমি কাল এস, নিশ্চয়ই এসো, ৯টা-১০টার মধ্যে। তোমাকে দেখিয়ে দেব, যে বাজার কিসের উপর চল্‌ছে। হাওয়া, হাওয়াতে চল্‌ছে, দামোদর! ব্যবসায়ে জুয়োচুরি নেই।"

নারাণবাবু হাঁফাইয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মানদা, একটু তামাক দিয়ে যা।"

একটু চিন্তা করিয়া দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য কোন কিছু কাজ কি পাওয়া যাবে না?"

নারাণবাবু ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, "অন্য কাজ? তা'রও চেষ্টা কর যাবে'খন। তোমাকে সবই দেখাবো। কি জান, তোমার উপরে আমার কেমন স্নেহ পড়ে গেছে। সংসারে আমার থাক্‌বার মধ্যে এক স্ত্রী ও একটিমাত্র মেয়ে। ঐ যে মেটে লণ্ঠন রেখে গেল না, ওটি আমার মেয়ে মানদা। ভাল ছেলে পাইনি বলে ওর বিয়ে দেওয়া হয়নি। আমি যা'র তা'র হাতে ত একমাত্র মেয়েকে দিতে পারি না। যে ওকে বিবাহ কর্ব্বে, তা'কে আমি টাকাকড়ি ত দেবই, এই বাড়ীখানিও সেই পাবে পরে। এটা আমার পৈতৃক বাড়ি; তাই ছেড়ে যেতে পারিনি। কেমন মায়া বসে গেছে হে। প্রাণ ধরে এর উপর চূণবালি দিয়েও একে বদ্‌লাতে ইচ্ছে করে না। তা'হলে পিতৃপুরুষ সব বিরক্ত হবেন। বুঝেছ? তাই এখানেই রয়েছি। না হলে বড় বাড়ি করে আমিও চৌরঙ্গীতে থাক্‌তে পারি। সে ক্ষমতা আমার আছে, বুঝেছ, দামোদর! এ নারাণ মিত্তির কম পয়সা রোজগার করে নি! বিশ্বাস নয় তোমাকে, ব্যাঙ্কের খাতা দেখাবো। তখন বুঝতে পারবে। ব্যবসা না কোর্‌লে কি এ সব হো'ত?"

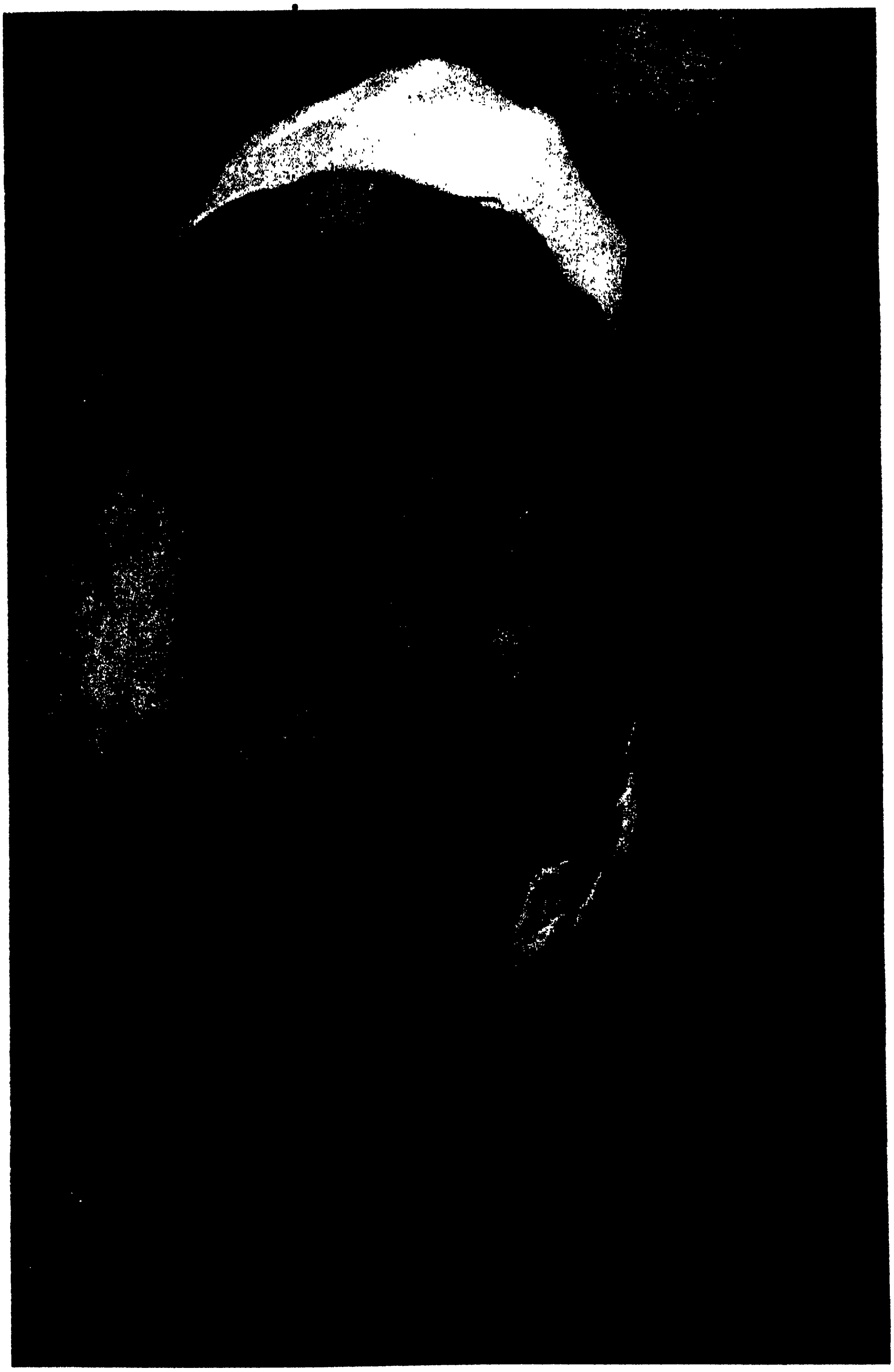
মানদা তামাক সাজিয়া আনিল। তাহার পরিধানে এক মলিন কাপড়। তামাক আনিয়া সে তাহার বাপের হাতে দিল। নারাণ হুঁকা লইতে লইতে বলিল, "এই আমার মেয়ে, দামোদর। দেখ দেখি, এ মেয়েকে কি আমি যা'র তা'র হাতে দিতে পারি? আমি যে রকম ছেলে চাই, ঠিক সেই রকম নাহলে, ওর বিয়ে দেব না প্রতিজ্ঞা করেছি। আর ওর কোষ্টিতে কি আছে জান? ও রাজরাণী হবে। যা'র বাড়ি যাবে, তা'কে রাজা কর্ব্বে। ও জন্মে পর্যান্ত আমার অর্থের বরাত খুলে গেছে। বুঝেছ? এমন সুলক্ষণা মেয়ে আর পাবে না।"

দামোদর ভাল করিয়া মানদার দিকে না তাকাইলেও, চাহিয়া যেটুকু দেখিল তাহাতেই বুঝিল, মানদা সুন্দরী বটে, বেশ সুন্দরী। তবে তাহার ভিতর লজ্জা বা সঙ্কোচের চিহ্নমাত্র নাই। বেশ সহজ ও সতেজ সবটা—মুখশ্রী ও চলন। পিতার হাতে হুঁকা দিয়া সে চলিয়া গেল।

নারাণ জুয়াড়ীর হুঁকায় টান্ দিয়া বলিল, "দেখ, দামোদর, তোমার উপরে আমার স্নেহ হয়ে গেছে। তুমি আমার কথামত কাজকর্ম্ম কর, দেখবে তোমায় আমি বড়লোক ক'রে দেবই। আর কি জান? যখন তোমার জন্যে এতটাই এগিয়েছি, তখন খুলেই বলি মনের কথাটা। আমার ইচ্ছা তোমার হাতেই মানদাকে দেব, বুঝেছ? তুমি ঠিক আমার মনের মতন। একালের চেঁপো ছেলেদের মত ফাজিল নও; বক্কার নও; বেশ শান্ত, ধীর। এই রকম ছেলেই চাই। তুমি ভেবে দেখ। মানদাকে ত' দেখলে। নিতান্ত কুৎসিত নয়; তোমার অযোগ্য নয়? না? বেশ বিয়ে থা' করে এইখানে থাকবে, কাজকর্ম্ম কোর্‌বে, দশজনের একজন হবে। কেমন? আমার সবই তোমার হবে।"

দামোদর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়া উঠিতে পারিল না। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নারাণ বলিল, "এখন যাও, তবে। অনেকদূর যেতে হবে। সেই মির্জ্জাপুরের মেসেই উঠেছ ত? তা' ভাল। কাল ৯।১০টার ভিতরেই এসো। আর যা' বল্লুম ভেবে দেখো।"

দামোদর সম্মতি জানাইল। নারাণবাবু আবার



মানদাকে ডাকিয়া বলিল, "মানদা, দামোদরকে আলো দেখিয়ে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয়।"

মানদা আলো আনিতে যাইতেছিল, নারাণবাবু বলিল, "এই লণ্ঠনটাই নিয়ে যা।"

মানদা লণ্ঠন লইয়া প্রস্তত হইল। দামোদর উঠিয়া তাহার পিছনে পিছনে চলিল। দরজার কাছে মানদা দাঁড়াইল; দামোদর তাহার কাছে আসিতে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মানদা স্থির আয়ত চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল মাত্র। দামোদর তাড়াতাড়ি দরজা পার হইয়া গলিতে পড়িল। গলির শেষে যখন আসিয়াছে, তখন নারাণবাবুর বাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পাইল।

দশম পরিচ্ছেদ

"হাতটা একবার গুণাইতে হইবে"

সদর রাস্তায় পড়িয়া দামোদর দ্রুতপদে চলিল। তাহার বুকের দুরু দুরু তখনও থামে নাই। তাহার মনের ভিতর ভয় ও আশা দুই একত্র দেখা দিল। নারাণবাবুর কথা কিছু বুঝিবার উপায় নাই। যে অবস্থায় থাকেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে চৌরঙ্গীতে বাড়ী করা ও বাস করা সম্ভব বলিয়া দামোদরের মনে হইল না। না হয় পৈতৃক ভিটার মায়াই হইল; কিন্তু তাই বলিয়া কি একটা ঝি, চাকরও রাখিতে নাই? তবে হয় ত লোকটা কৃপণ। বিস্তর উপায় করিয়াছে—করা কিছু বিচিত্র নয়,—বিশেষতঃ লোক ঠকাইয়া—; আর সমস্তই জড় করিতেছে। একটি পয়সার খরচ সম্ভব সহ্য করিতে পারে না। কাহার জন্য জড় করিতেছে? যে উহার মেয়েকে বিবাহ করিবে,—তাহার জন্যই। নিশ্চয়ই তাই। মানদা যে তাহার স্বামীকে রাজা করিবে, তাহা নারাণবাবুরই জমান টাকা দিয়া। দামোদরের ক্রমশই স্থির ধারণা হইল যে—নারাণবাবু কৃপণ, ভয়ানক কৃপণ! শুধু পরের জন্য, জামাই-এর জন্য টাকা জমাইতেছে। কিন্তু হঠাৎ তাহার উপরই বা নারাণবাবুর এত স্নেহ পড়িল কেন? অবশ্য সে দেখিতে কুশ্রী নহে। কিন্তু টাকা থাকিলে ত যথেষ্ট সুপাত্র পাওয়া যায়। হয় ত' ভবিতব্যতা! কিন্তু সে কি করিয়া বিবাহ করিবে! তাহার ত' স্ত্রী বর্ত্তমান; আবার সে কি করিয়া দুইবার বিবাহ করিবে? কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তাহার পিতা বাঞ্ছারাম ত' দুইবার বিবাহ করিয়াছে। সেও করিতে পারে। বিশেষতঃ যখন রাধারাণীকে ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তাহার সংসারে আর আসক্তি নাই। সংসার আর সে করিবে না। চাকরি যদিও করে, শুধু নিজের অভাব মিটাবার জন্যই করিবে। তাহার অধিক কিছুর দরকার নাই। তাই ত'? অথচ এই যে নারাণবাবুর প্রস্তাব—এটা দৈবের দান ত'? একসঙ্গে সুন্দরী স্ত্রী—মানদা সুন্দরীই,—আর ঐশ্বর্য্য, এ তাহার হাতে আসিয়া পড়িতেছে কি করিয়া? ভাগ্য দিতেছে। ভাগ্যের দান অবহেলা করা কি উচিত? না; একবার হাতটা একজন ভাল গণৎকার দিয়া কাল গুণাইতে হইবে। দেখা ভাল, ভাগ্যে কি আছে। তাহা হইলে আর মনে কোনও দ্বিধা থাকিবে না। আনমনে ভাবিতে ভাবিতে দামোদর প্রায় লালবাজারে আসিয়া পড়িল। তখন তাহার চমক্ হইল। তাই ত'! আবার কতটা ঘুরিতে হইবে। একজন চীনা জুতার দোকানে দেখিল ৯টা বাজিয়াছে। সে ভাবিল, ট্রামে যাইবে। লালবাজার হইতে ট্রামে চড়িয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিতে বড় জোর ১২ মিনিট লাগিবে—১০ মিনিটও লাগিতে পারে। সেখান হইতে মেস ৫ মিনিট; আর দেরী করা উচিত নহে। দামোদর ট্রামে করিয়াই ফিরিল। তাহার মনের ভিতর নারাণবাবুর কথাগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে একসঙ্গে দৈবের এতগুলি উপহার কি করিয়া অস্বীকার করিবে? করাটা কি ভাল হয়? জীবনে সুযোগ একবারমাত্র আসে; দুইবার আসে না।

যখন মেসে ফিরিল, মেসে তখন আহারাদি হইতেছিল। একদল খাইয়া উঠিয়া গিয়াছে; আর একদল বসিয়াছে। দামোদর সেই দলে বসিয়া আহারাদি সারিয়া লইয়া একেবারে ত্রিতলে নগেনদের ঘরে গেল। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, নগেন ও রমেশ ৪।৫ খানা বাঙলা ও ইংরাজি খবরের কাগজ জড় করিয়া পড়িতেছে। আর শচীন বিছানায় শুইয়া গান গাহিতেছে:—

"যদি বারণ কর তবে আসিব না—আ—আ—
যদি সরম লাগে, তবে চাহিব না—আ—আ—"

দামোদরকে দেখিয়া নগেন বলিল, "দামোদরবাবু,

এসেছেন ? আপনার জন্যে আমরা কাজ খুঁজছি কি রকম দেখুন !"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "কি ? বিজ্ঞাপন ? কর্ম্মখালি ?"

নগেন বলিল, "হাঁ। অনেক কাজ খালি আছে। একটা লেগে যাবেই; আপনাকে আর সন্ন্যাস নিতে হবে না। আসুন এই দিকে। খাওয়া হয়েছে 'ত ?"

দামোদর তাহার পাশে বসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল খাওয়া হইয়াছে।

নগেন বলিল, "এই দেখুন, একটা। "একজন বীমার কাজে দক্ষ ক্যান্‌ভাসার চাই; বেতন ৭৫৲ হইতে ১৫০৲ যোগত্যা অনুসারে।" কেমন এটা হবে না ? এ'ত আর শক্ত কিছু নয়; লোককে গিয়ে বলা যে তুমি লাইফ্‌ ইনসিওর কর। বস্‌। লোকে করেই থাকে। পার্ব্বেন না ? আমি ও রমেশ না হয় আগেই আপনার খদ্দের হবো।"

দামোদর জবাব দিল, "ঠিকানাটা রেখে দিই। একখানা দরখাস্ত করা যাবে।"

নগেন বলিল, "ঠিক্‌। আর একটা কোথায় দেখলুম ? শচী'কে বললুম একটু দাগ্‌ দিয়ে রাখ্‌তা' ও কুঁড়ের বাদশা; যদি কোনও কাজ ওকে দিয়ে হবে ? এইটে বুঝি ? না। দূর! এ যে ছাই লেডি টাইপিষ্ট চায়। এটা ? না, এ নার্স। এইটে নিশ্চয়; না, এ আবার কা'র আয়া যাই! ভাল জ্বালাতন! ঐ কাগজে বুঝি, রমেশ ?"

রমেশ তাহার কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "না, এতে কিছু নেই। এটা রদ্দি কাগজ। কেবল ইঞ্জিনীয়র তিনটা, ২টা ওভারসিয়র, ৫টা লেডি ক্যান্‌ভাসার ও দু'জন কেরাণী ও ম্যানেজার চায়, ৫০০৲ ও ১০০০৲ টাকা জমা দিতে হবে। কা'রা বোগাস্‌ কোম্পানী খুলে টাকা মারবার ফিকিরে আছে।"

নগেন রাগিয়া গেল। বলিল, "তবে কিসে দেখলুম ছাই ? শচেটার জ্বালায় কি কোন serious কাজ কর্ব্বার যো' আছে। ঐ বাংলা কাগজখানা দেখি ! হাঁ, এইটাই 'ত ? এই যে, একজন সুদক্ষ ও সুসাহিত্যিক সঙ্গী চাই। তাহাকে প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করিতে হইবে। ইংরাজিতে উত্তমরূপ দখল অবশ্যই থাকা যাই। বেতন ১০০৲ হইতে ২০০৲ যোগত্যা অনুসারে।" এইটাই ঠিক হবে, দামোদরবাবু। এর বাড়ির ঠিকানাও আছে, "১০৫ নং পার্ক ষ্ট্রীট্‌।" ও বাবা! এ যে পার্ক ষ্ট্রীট্‌। খুব বড় লোক হবে! রাজারাজড়া না হয়ে যায় না। "সাক্ষাতের সময় সকাল ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত।" এইখানেই যান্‌ কাল, ৯টার পর। বলেন ত আমরা না হয় সঙ্গে গিয়ে আপনাকে এগিয়ে দেব, সেই রাজবাড়ির দরজা পর্য্যন্ত। কেমন ?"

দামোদর বলিল, "আচ্ছা। কাল যাবো।" কিন্তু তাহার মন কেমন সায় দিল না। ৯া১ টার সময় নারাণবাবুর সহিত দেখা করার কথা আছে। কি করিয়া আবার ১০টার ভিতর পার্ক ষ্ট্রীটে যাইবে ? রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র, এই সব আছে 'ত ?"

দামোদর জবাব দিল, "না। ও সব 'ত কিছুই নেই।"

নগেন বলিল, "তবেই হয়েছে। এতদিনে আর খানকতক প্রশংসাপত্রও জোগাড় কর্ত্তে পারেন নি ? তাই 'ত !"

শচীন বলিল, "যোগ্যতা অনুসারে বেতন, ত' প্রশংসাপত্র কি হবে ? কি যোগ্যতা গিয়ে দেখালেই হবে। উনি 'ত কবি ও সাহিত্যিক বটেই।"

নগেন উত্তর দিল, "দেখ্‌ শচী, তুই বাজে বকিস্‌নি। প্রশংসাপত্র না হলে চাকুরি হয় না। কনে না হলে বিয়ে হওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু প্রশংসাপত্র না হলে চাকুরি অসম্ভব। জানিস্‌ কিছু ? চাকুরি করেছিস্‌ ?"

শচীন বিরাগের উদাসসুরে বলিল, "না।"

রমেশ কহিল, 'যখন নেই, তখন আর উপায় কি। একখানা দরখাস্ত লিখে নিন্‌ এই বেলা। আপনার লিখ্‌তে ত বেশী সময় লাগ্‌বে না। কাল সকালে উঠে হয় ত সময় পাওয়া যাবে না। দে'ত, নগেন, কাগজ কলম।"

দামোদর বলিল, "থাক্‌। কালই হবে!"

নগেন উত্তর দিল, "কাল সকালে সময় হবে না। আটটায় সব বেরুতে হবে। এইবেলা লিখে নিন্‌, দামোদর বাবু।" নগেন কাগজ কলম আনিয়া দিল। বাধ্য হইয়া দামোদরকে লিখিতে হইল।

লেখা শেষ হইলে, রমেশ, নগেন ও শচীন একে একে তিনজনে পড়িয়া দেখিল। রমেশ বলিল, "লিখেছেন

ভাল। তবে জোর হয়নি তেমন। অনেকগুলো বেশী "respectfully" "beg" " humbly" "state" হয়ে গেছে। অতটা নীচু হওয়া কি ভাল ?"

শচীন কহিল, "নীচু না ত কি উঁচু হ'য়ে যাবে ? আরও বেশী করে দেওয়া দরকার। বাবার সব আদালতের দরখাস্ত দেখেছি যে প্রত্যেক "sentence" এ (বাক্যে) লেখা আছে, "your humble petitioner" আর respectfully"। এ আবার চাকরি। এতে শুধু humbly, "respectfully obediently, your most obedient servant, এই কথাগুলোই উল্টেপাল্টে লিখে গেলেই দেখ্‌তিস্ ঠিক কাজ লেগে যেতো। তা'র ওপর যদি সত্যিই রাজা মহারাজা হয় তবে your Highness your respectful and most exalted Highness, এই সব লেখা উচিত ছিল। না পেয়ে হয়ত চটে যাবে। তখন শুধু হাতে ফির্‌তে হবে।"

নগেন বলিল, "একটু আধটু বদলে দিতে পারেন না, দামোদর বাবু ? একটু লিখে দিন না যে আপনার ইংরাজি বাংলা কবিতা আছে। আর একটু জোর দিয়ে বলুন, যে চাক্‌রিটা আমার ঠিক উপযুক্ত। আর ঐ যে "I shall spare no pains in giving you satisfaction (আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব) লিখেছেন ওটার বদলে লিখুন "I am sure you will be satisfied with my services" বুঝেছেন ?

রমেশ কহিল, "না; দরকার নেই। ও বাঁধা গৎ-ই ভাল, বাবু। সবাই বুঝে ওর কোনও মানে হয়না। মানে-ওয়ালা কথা দিয়ে শেষে অনর্থ বাধবে। ঐ বেশ হয়েছে। বরং শচী যা' বলেছে, ফাঁক পান ত আর ২।৪টা "humbly" "respectfully" ঢুকিয়ে দিন। একেবারে বিনয়ে ভরাট্ হ'য়ে যা'ক্। পাকা দাসখত্ হওয়াই ভাল।"

দরখাস্ত লেখা হইলে, চার জনেই নিশ্চিন্ত হইল। নগেন বলিল, "এ চাক্‌রি হওয়াই, দামোদরবাবু। তা' হলে কালই আবার feast—প্রকাণ্ড ভোজ!"

রমেশ একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু, দামোদর-বাবু, আপনার ত জামা কাপড় তেমন নেই।"

দামোদর উত্তর করিল, "এই পরেই যাবো। বেশী ভাল জামা কাপড় পরে যাওয়াও ঠিক নয়। চাক্‌রির উমেদারিই ত।"

কথাটা সকলের যুক্তিযুক্ত মনে হইল। সকলে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকমত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া নিরুদ্বেগে বাতি নিভাইয়া শয়ন করিল। দামোদরের ঘুম আসিতে দেরী হইতে লাগিল। সে ভাবিল যে নগেন, রমেশ, শচীন যে রকম তাহাকে লইয়া উৎসাহী হইয়াছে, তাহাতে তাহারা নিশ্চয়ই সকালে তাহার সঙ্গে পার্ক ষ্ট্রীট যাইবে। তাহা হইলে তাহার আর নারাণ বাবুর বাড়ি যাওয়া হইবে না। নারাণবাবু কিছু মনে করবেন না ত ? সে পরে সব কথা খুলিয়া বলিবে না হয়। সে ইচ্ছা করিয়া ত আর কথার খেলাপ করিতেছে না। বরং কাল একবার একজন ভাল জ্যোতিষী দেখিয়া হাতটা গুণাইয়া লইবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে তাহার ভাগ্যে কি আছে,—সন্ন্যাস না রাজত্ব ?

(ক্রমশঃ)



প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নানা কথা

প্রথম নোটের প্রচলন—বেঙ্গল ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারী জ্যাকব রাইডার ও এডওয়ার্ড হের নামে প্রথমে ব্যাঙ্কের নোট চলিত। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল্ ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারীদের স্বাক্ষরযুক্ত পাঁচশত, একশত, পঞ্চাশ টাকা ও এক মোহরের নোট সাধারণে প্রচলিত হয়।

* * * *

সেকালের লাট দর্শনের ব্যবস্থা—তখনকার দিনে যে কোন ভদ্রশ্রেণীর প্রজা লাট-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া



জেনারেল স্যর জন্ এভারেষ্ট

তাহার অভাব অভিযোগ নিজেই জানাইতে পারিত। এজন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত।

* * * *

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কোম্পানীর অধিকৃত সম্পত্তি—সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ইঞ্জিনীয়ার ও সার্ভেয়ার প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা মিলিয়া কোম্পানীর অধিকৃত বাটীগুলির নিম্নলিখিত রূপ মূল্য নির্দ্ধারণ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন—

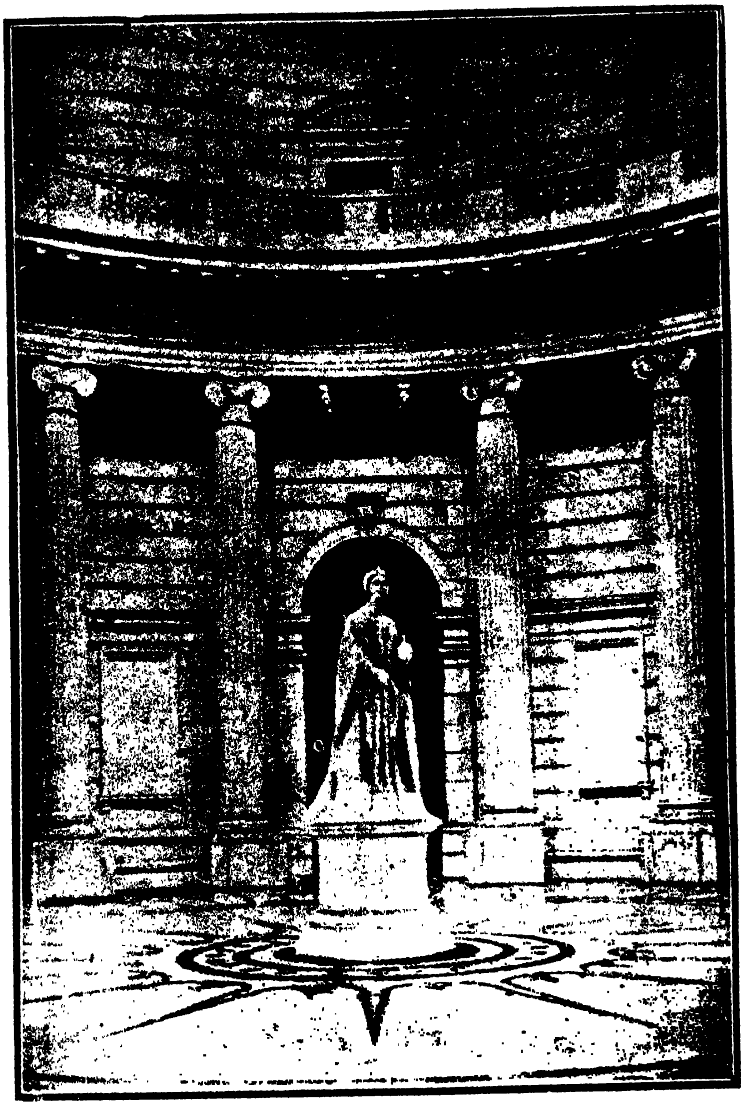
দুর্গ ও তাহার মধ্যবর্ত্তী গৃহগুলির মূল্য	১২০০০০৲



ক্লাইবের মর্ম্মর মূর্ত্তি

হাঁসপাতাল	১২০০০৲
আস্তাবল সমূহ	৪০০০৲

জেলখানা	৭০০০৲
সোরার গুদাম	৭০০০৲
কাছারি বাটী	১৫০০৲
কোতোয়ালি হাজত	১০০০৲
দুইটী পোল	৭০০০৲



ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি

ছিটে প্রস্তুতকারকের বাটী	৬০০০৲
বারুদখানা	৬৯২৫৲
ডক ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি	৭০০০৲
মাল গুদাম	২৫০০০৲
বাগবাজারের রিডাউট্ বা রক্ষামঞ্চ	২১০০০৲

কোম্পানীর দেবতা ব্রাহ্মণে আস্থা—কোম্পানী কর্ত্তৃক সময় সময় কালীঘাটে কালীর পূজা দেওয়ার কথা যেমন জানা যায়, ব্রাহ্মণদের বাৎসরিক দানের কথাও সেইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

* * *

রাত্রে চৌকী দিবার ব্যবস্থা—প্রথম প্রথম বক্সী ও পাইক্ম্যান্ (সড়কীধারী) বলিয়া পাহারাওয়ালারা পাহারা দিত। কোম্পানী ইহা উঠাইয়া দিয়া চৌকী দিবার জন্য গোরা পুলিসের ব্যবস্থা করেন। তাহারা রাত্রি ১০টা হইতে



চোবদার

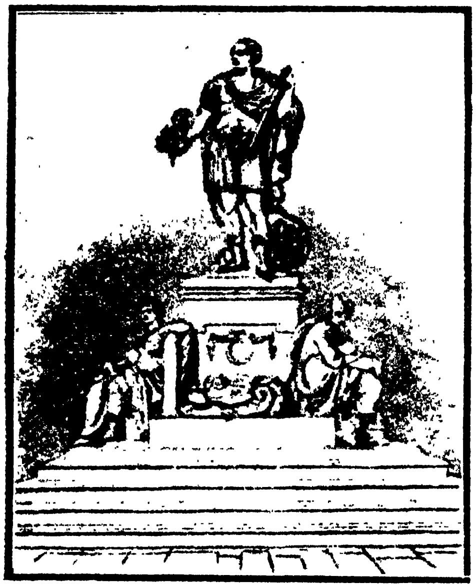
ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত সহরের চারিদিকে পাহারা দিত। যাহাতে গুপ্তচর প্রভৃতি সহরের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে সে জন্য নদীতীর ও সহরের মধ্যে প্রবেশদ্বার গুলিতে কঠোর পাহারার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

* * * *

কোম্পানীর আমলে সম্ভ্রান্ত অতিথিদের সিধা দেওয়ার ব্যবস্থা—সেকালে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোম্পানীর আতিথ্য

গ্রহণ করিলে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীগণের সিধা দিবার ব্যবস্থা ছিল। আবশ্যক মত মূল্যবান উপঢৌকনও দেওয়া হইত। একবার নবাব মীরজাফর ও তাঁহার সঙ্গীগণকে নিম্নের ফর্দ্দমত সিধা দেওয়া হইয়াছিল—

দ্রব্যের নাম	পরিমাণ	মূল্য
চাউল	৪০/ মণ	৭৫৲
দাউল	৮/ „	২০৶০
ঘৃত	৫/ „	৭৭৲
তৈল	৬/ „	৫১৲
লবণ	৩৷৷০ „	৪৶০



লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রতিমূর্ত্তি

ময়দা	৮/ „	২৭৲
চিনি	৫/ „	৩৬৷০
মিষ্টান্ন	৬/ „	৬০৲
মোরব্বা	১/ „	১৯৲
বাদাম কিশমিশ	১/ „	৩১৷০
খাসি	৫০টা	৫০৲
শাকসব্জী		১৬৲
লেবু		৭৲
মসলা		১৪০৷৶০
পান ও তামাকু		১০৸০
হাঁড়ি ও কাঠ		২৬৲
ঝুড়ি থলে ইত্যাদি		২৪৲

* * * *

খুনি আসামিকে ধরিয়া দেওয়ার পুরস্কার—১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে দণ্ডরাম নাপিত নামক এক ব্যক্তিকে খুনি সন্দেহ হওয়ায় যে তাহাকে হাজির করিয়া দিতে পারিবে সকাউন্সিল্ গবর্ণর জেনারেল্ তাহাকে দুই শত সিক্কা টাকা



লর্ড লিটন্

(ব্যঙ্গ চিত্র—The Indian Charivari হইতে)

পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় তখনকার দিনে পুলিশ হইতে না হইয়া গভর্ণর জেনারেল সাহেবের দপ্তর হইতেই এসব কার্য্য হইত। এবং খুনিকে ধরিয়া দিবার পুরস্কার মাত্র দুই শত সিক্কা টাকা।

* * * *

কোম্পানীর রেশম ও সুতার কারবারের অবস্থা—১৭৫৫

খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত আড়ঙ্গগুলির দাদনী হইতে কোম্পানীর তৎকালীন ব্যবসার অবস্থা বুঝা যায়। সেকালের সেরেস্তায় যেরূপ অদ্ভুত বানান লেখা আছে সেই মত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শান্তিপুর	(Santipore)	৯৩৫৯২৶/১৫
হরিপাল	(Harrypaul)	৮৫৪৪৩৷৷১০
ধনেখালি	(Dorneacally)	৩৮৫৩৩ ৶/৫
গলাগোড় (?)	(Gollagore)	৩৮৫১৮৶/১০
কাটোরা (?)	(Cuttorah)	৫১৪০০৷৵/১০
বুরণ (?)	(Burron)	৮২২৬১৻৫
হরিয়াল (?)	(Hurriall)	২২৪১১০৷৵.৫
বুদল (?)	(Budoul)	৭৯৪৮৩৸৵/১০
ক্ষীরপাই	(Keerpye)	১৬২৫৭০৸০



ভারি ভারি মেমলোককা সাথ নাচনে হোগা, কসদ্ করো (বসন্তক হইতে)



স্যর রিচার্ড টেম্পল্
(ব্যঙ্গ চিত্র—The Indian Charivari হইতে)



মেজর জেনারেল্ স্যর এফ্, ডবলু, নরম্যান্
(ব্যাঙ্গ চিত্র—The Indian Charivari হইতে)

মালদহ	(Malda)	২৬৪০০৭৵১০
কলিকাতা	(Calcutta)	৫৯৫০০৲
বরাহনগর	(Barnagore)	৭৮০১৫৶০
সোণামুখী	(Soonamokie)	২২০৯৯৮৵১০

গলাগোড়, কাটোরা, হরিয়াল কোন স্থানগুলি তাহা ঠিক করা যায় না। উহা বলাগড়, কাটোয়া ও হরিপাল হওয়া বিচিত্র নহে। বুরণ ও বুদল এ দুইটী স্থানকে এখন নির্ণয় করা কঠিন।



ডলা Railway শান্তিপুর:
শান্তিপুর ভাবে, এস মম পাশে, দিব মনোমত শাড়ী।
ডলা বলে যত, শস্য নানামত, দিব পুরে গাড়ী॥ (বসন্তক হইতে)



বিধবা মহারাণী যমুনা বাইকে হারক বলয় উপহার দেওয়া হইতেছে

(বসন্তক হইতে)



ভোট ভিক্ষা
আমাদের গৌর মুদী সবে বাটীর দ্বারটি খুলিয়া কি দেখিলেন



দ্বারটি রুদ্ধ করিয়া অগ্নিতে ফুৎকার দিতে পারেন নাই

(বসন্তক হইতে)

প্রথম হিন্দুস্থানী সিপাহী দল—লর্ড ক্লাইভের দলে প্রথম দেশীয়দের মধ্যে মাদ্রাজী ও তেলেঙ্গী সিপাহীই বেশী ছিল; তৎপরে তাঁহারই প্রস্তাবে পশ্চিম দেশীয় ভোজপুরীদের



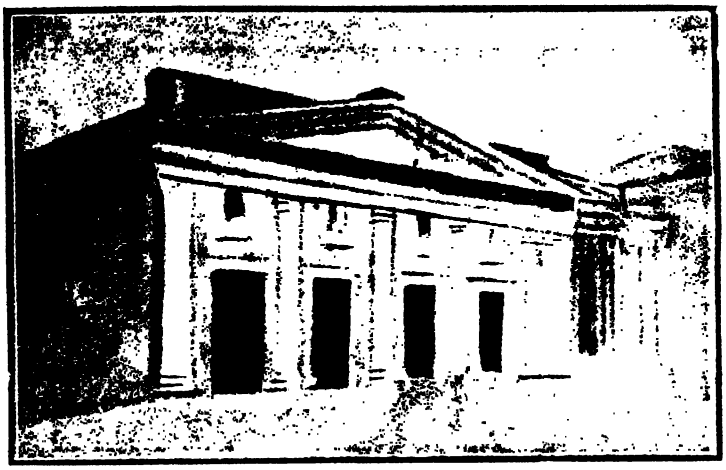
জন ষ্টক্ হাউস—ফোর্ট উইলিয়মের গভর্ণর

সেনাদলে লওয়া হয়। ইহাই সম্ভবতঃ কোম্পানীর প্রথম হিন্দুস্থানী সিপাহীর রেজিমেণ্ট।



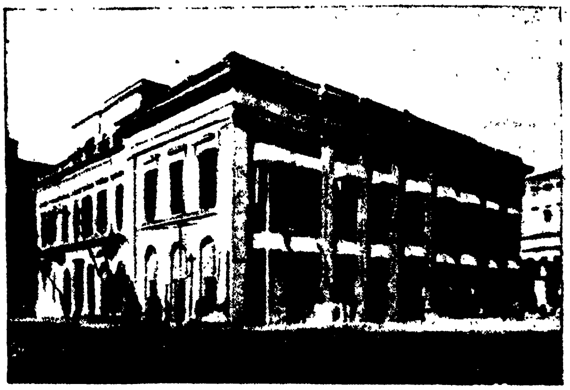
বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ও ইণ্ডিয়ান লিগ।
- ছি ছি ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কি ঝগড়া করিতে হয়
(বসন্তক হইতে)

সেকালে কোম্পানীর উপহার দেওয়ার প্রথা—সেকালে ক্ষমতাসম্পন্ন পদস্থ ব্যক্তিদের প্রীতিসাধনার্থ আবশ্যক মত উপহার উপঢৌকন দিবার ব্যবস্থা বেশ ছিল। বর্দ্ধমানের



কলিকাতার আদি নাট্যশালা

মহারাজা তিলকচাঁদ বাহাদুরের সহিত কোম্পানীর রাজস্ব সম্বন্ধীয় দেনা-পাওনা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটে। ইহার



রয়েল একসচেঞ্জ—কথিত আছে লর্ড ক্লাইবের এবং ফিলিপ ফান্সিসের বাটী

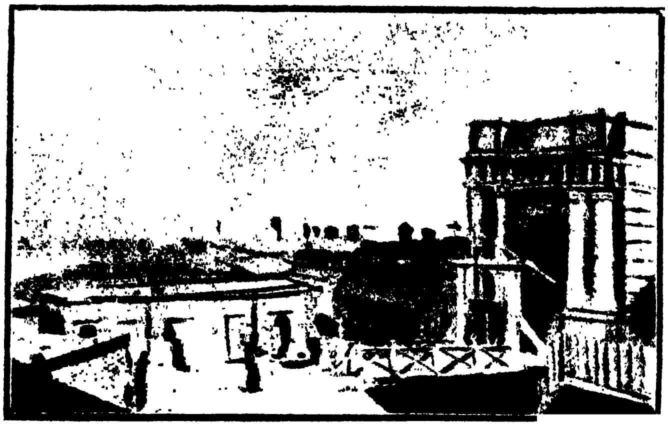
মীমাংসা হইয়া গেলে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে নিম্নলিখিত মত উপহার দেওয়া হয়।

উপহারের বাব	উপহারের দ্রব্য	টাকা
রাজা তিলকচাঁদের জন্য	১টী হস্তী	২০০০৲
	১ প্রস্থ পোষাক	৬০০৲
	হীরক-মণ্ডিত শিরপ্যাচ্	৪০০৲

দেওয়ান অমরচাঁদের জন্য	১ প্রস্থ পোষাক	৫০০৲
	১টী অশ্ব	৫০০৲
	১খানি তলোয়ার	৫০৲
	১টী শিরপ্যাচ্	৩০০৲

নবাব মীরজাফর কলিকাতায় আসিলে তাঁহার অতিথি সৎকারের জন্য খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদের ব্যয় ছাড়া বিবিধ দ্রব্যাদি উপহার দিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

*   *   *

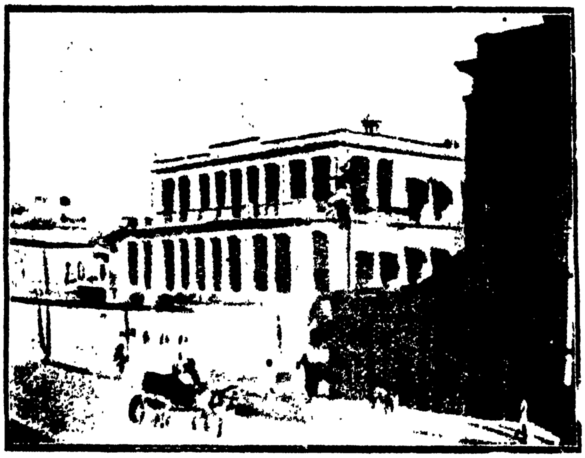


দুর্গের নিকট হইতে কলিকাতার দৃশ্য

তোপে উড়ান প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা—চরম অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের পূর্ব্বে চাবুকের আঘাতে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইত। উহা জেলের মধ্যে করা হইত। তাহাতে বাহিরের দুষ্ট লোকের মনে ভয়ের উদ্রেক হওয়া বিষয়ে কোন সাহায্য হইত না। এই জন্য কোম্পানীর জমীদারীর মধ্যে চরম অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। নয়ান ছুতার নামক এক ব্যক্তি প্রথম এই দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

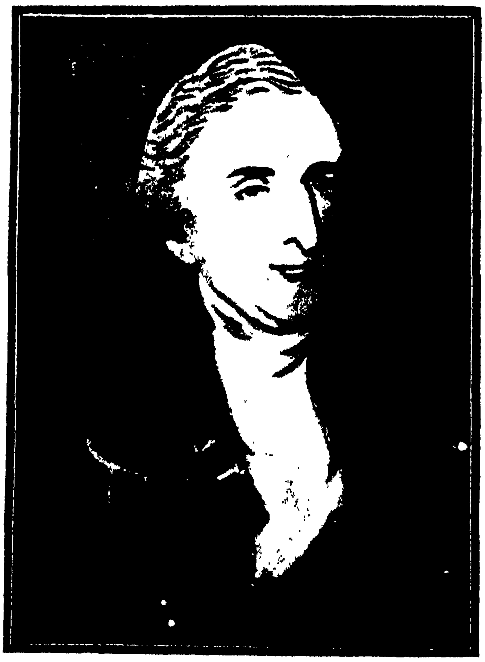
রামদুবে নায়ক	১ প্রস্থ পোষাক	১২৫৲
	১টী অশ্ব	৫০০৲
গোকুল চন্দ্র মজুমদার	১ প্রস্থ পোষাক	১২৫৲
	১টী অশ্ব	৫০০৲
রাজীবেন্দ্র রায়	১ প্রস্থ পোষাক	২২৫৲

কলিকাতার প্রথম ডাক—কলিকাতা হইতে মুরশীদাবাদ এবং মুরশীদাবাদ হইতে কলিকাতায় ৩০ ঘণ্টার মধ্যে



জন পামারের বাড়ী

রাজচন্দ্র রায়, উকীল	১ প্রস্থ পোষাক	২২৫৲
	১টী অশ্ব	৫০০৲
ধনঞ্জয় রায়, উকীল	১ প্রস্থ পোষাক	১৭৫৲
অন্য ছয়জন উকীল	৬ জোড়া শাল	৬০০৲

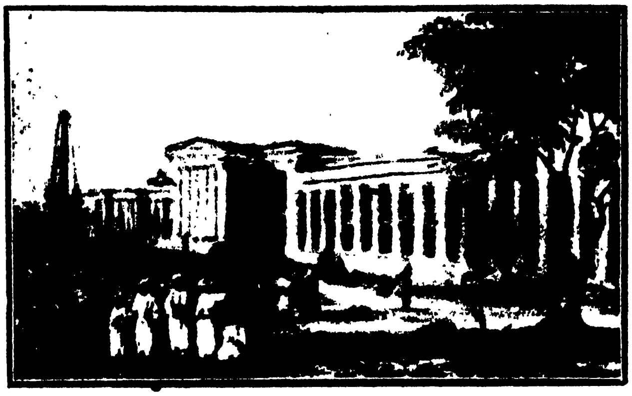


মেজর জেনারেল ক্লড্ মার্টিন

সংবাদাদি আসিবার ও যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহাই কলিকাতার প্রথম ডাক্-ব্যবস্থা বলিতে পারা যায়!

*   *   *

এভারেষ্ট পর্ব্বতশৃঙ্গ—হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্ট পর্ব্বতের কলিকাতার সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার



পুরাতন সংস্কৃত কলেজ

জর্জ্জ এভারেষ্টের (Sir George Everest) নামানুসারে নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী রাধানাথ শিকদার মহাশয়ই গণনা করিয়া উহার উচ্চতা ২৯০০২



পাদরি কিয়ারন্ডান্ডার

ফিট্ স্থির করিয়াছিলেন। রাধানাথবাবু কলিকাতা শিকদারপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তথায় বাস করিতেন।

*   *   *

সেকালের রাজপুরুষ ও অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিদের প্রতিমূর্ত্তি—কলিকাতায় স্থানে স্থানে যে সকল সুন্দর মর্ম্মর ও ধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি শোভিত আছে, তাহাদের মধ্যে কাহার প্রতিমূর্ত্তি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইতেছে—



রেভারেণ্ড হেনরী মার্টিন

মহারাণী ভিক্টোরিয়া	মর্ম্মর মূর্ত্তি	যাদুঘর
ওয়ারেন হেষ্টিংস	মর্ম্মর মূর্ত্তি	টাউন্ হল্



বিশপ্ কুরি

লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক	পিত্তল মূর্ত্তি	টাউন্ হলের সম্মুখস্থ ময়দান
স্যর উইলিয়ম পিল্	মর্ম্মর মূর্ত্তি	ইডেন গার্ডেনের সম্মুখে



কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

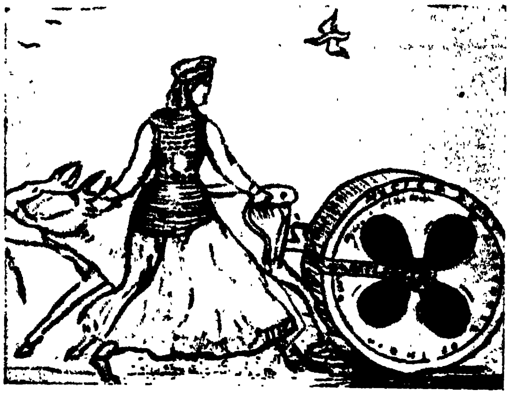
লর্ড নেপিয়ার	পিত্তল মূর্ত্তি	প্রিন্সেপ ঘাটের পূর্ব্বদিকে
লর্ড লরেন্স	ধাতু মূর্ত্তি	গভর্ণমেণ্ট হাউসের দক্ষিণে



অরু ও তরু দত্ত

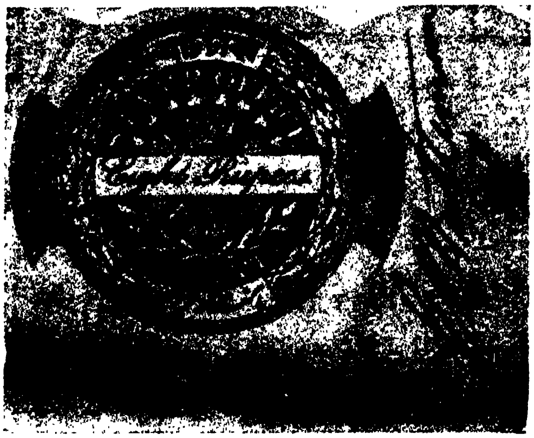
স্যর জেমস্ আউটরাম্	পিত্তল মূর্ত্তি	পার্ক ষ্ট্রীট ও আউট-রাম রোডের সন্ধিস্থলে

লর্ড অক্ল্যাণ্ড	পিত্তল মূর্ত্তি	ইডেন গার্ডেনের বাহিরে
লর্ড ক্যানিং	পিত্তল মূর্ত্তি	গভর্ণমেণ্ট হাউসের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে



ভারতবর্ষ সমভূম করিবার জন্য নূতন মেঞ্চেষ্টর রোলার
(বসন্তক হইতে)

লর্ড মেয়ো	পিত্তল মূর্ত্তি	গড়ের মাঠে
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	প্রস্তর মূর্ত্তি	সেনেট্ হাউস্
ডেভিড্ হেয়ার	প্রস্তর মূর্ত্তি	প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	প্রস্তর মূর্ত্তি	গোলদীঘির ধার



শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের ষ্ট্যাম্প কাগজ

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব	প্রস্তর মূর্ত্তি	বিডন্ উদ্যান
কৃষ্ণদাস পাল	প্রস্তর মূর্ত্তি	হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের সংযোগে

লর্ড হেষ্টিংস্	প্রস্তর মূর্ত্তি	ডালহাউসী ইনস্টিটিউট
লর্ড নর্থব্রুক্	প্রস্তর মূর্ত্তি	হাইকোর্টের প্রবেশ-পথে।
কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন	প্রস্তর মূর্ত্তি	বিডন উদ্যান
স্যার উইলিয়ম জোন্স	প্রস্তর মূর্ত্তি	এসিয়াটিক্ সোসাইটি
হরচন্দ্র ঘোষ	প্রস্তর মূর্ত্তি	ছোট আদালত
লর্ড ক্লাইব	প্রস্তর মূর্ত্তি	ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্

জেনারেল ক্লড্ মার্টিন	ধাতু মূর্ত্তি	ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্
আরল্ অব্ মিণ্টো	মর্ম্মর মূর্ত্তি	সেণ্ট জন্ চার্চ্চ

উক্ত সকল ভিন্ন এসিয়াটিক্ সোসাইটি, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি স্থানে বহু প্রতিমূর্ত্তি আছে। শেষোক্ত স্থানে যে সকল প্রাচীন লোকের প্রতিমূর্ত্তি আছে নিম্নে তাহার একটী তালিকা দিলাম—



মাদ্রাসা



এক্সচেঞ্জ ও এসেম্ব্লি রুম



চাপরাসি

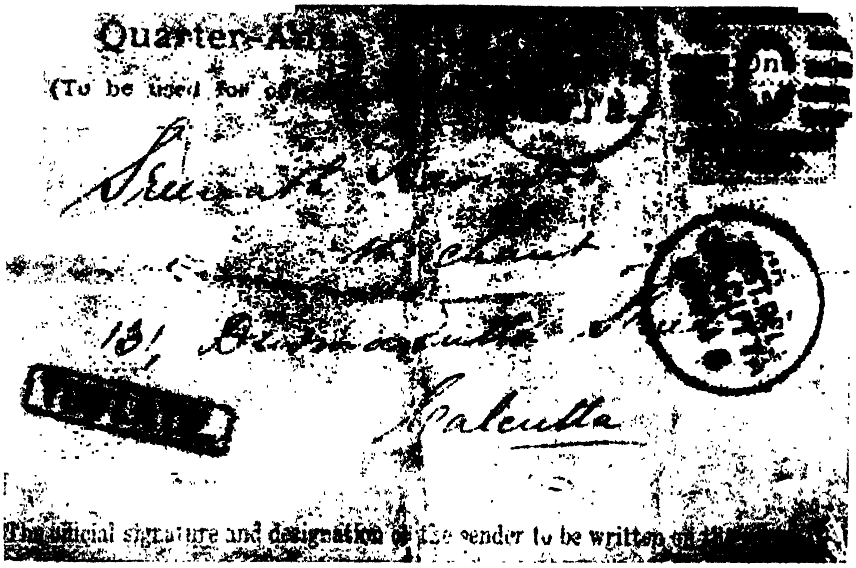


রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর

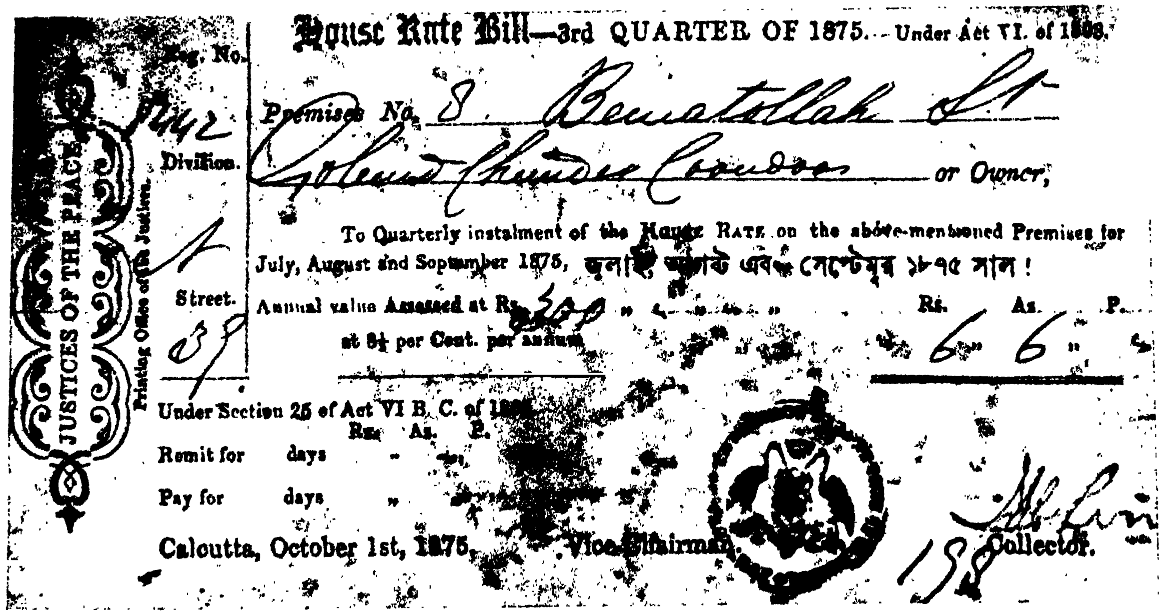
প্রাচীন লোকের প্রতিমূর্ত্তি— সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, চার্লস্ জেমস্ ফক্স মার্কুইশ্ অব্ হেষ্টিংস, মার্কুইশ্ অব্ ডালহাউসি, জেমস্ আউটরাম, আর্ল কানিং

ডিউক অব্ ওয়েলিংটন, লর্ড মেট্‌কাফ, থ্যাকারে, জেনারেল নীল আর্ল অব্ অক্‌ল্যাণ্ড, লর্ড লরেন্স, জন্ নিকল্‌সন, হেন্‌রী কষ্টিভ্, ফ্লোরেন্স নাইটাঙ্গেল, স্যর উইলিয়ম উইলসন্ হাণ্টার, স্যর হেনরি হ্যাভালক, মাকু্‌ইস্ ওয়েলেস্‌লি, মাকু্‌ইস্ কর্ণওয়ালিস্, ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ও এডওয়ার্ড ফ্রেডরিক্ ভেনাব্‌ল্‌স্।

কলিকাতা নামের রহস্য—কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ গল্প প্রচলিত থাকিলেও সুতানুটী গোবিন্দপুর ছাড়িয়া কেবলমাত্র কলিকাতা এই নাম ব্যবহারের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ছিল। জব্ চার্ণকের জামাতা স্যর্ চার্লস্ আয়োরের সময়ে ১৭০০ সালের এপ্রেল মাস হইতে কলিকাতা নাম ব্যবহৃত হয়। তৎপূর্ব্বে সুতানুটী এই নামই কোম্পানির সেরেস্তায় ব্যবহৃত হইত। সুতানুটীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কলিকাতা করার গূঢ় রহস্য এই যে, পর্ত্তুগীজরা কালিকটে ভারতের সহিত প্রথম বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া ঐ স্থানের দ্রব্য ভারতীয় দ্রব্য বলিয়া বহুমূল্যে বিক্রয় করিত। ইহা জানিয়া সুতানুটী আরমাণি বণিকগণ তাহাদের প্রেরিত মালপত্র কলিকাতার নাম



সেকালের সরকারি পত্রাদি লিখিবার পোষ্ট কার্ড

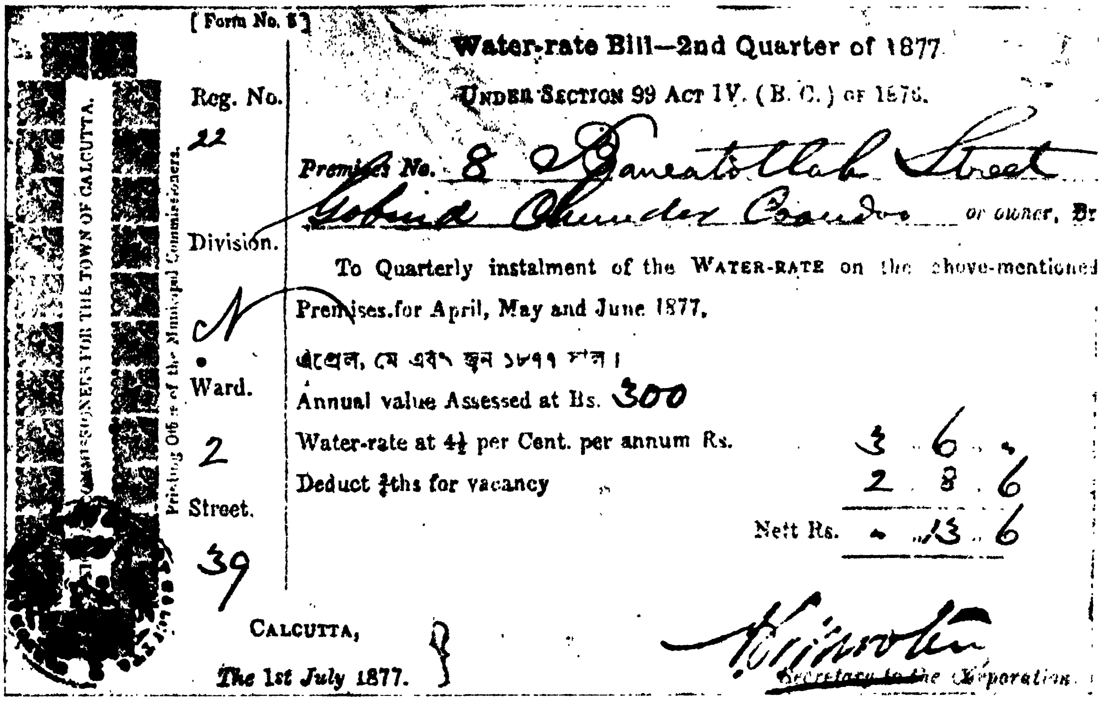


মিউনিসিপ্যালিটির সেকালের হাউস ট্যাক্স বিল

কালিকট্‌রূপে ব্যবহার করিয়া চালান দিয়া বিশেষ লাভ করিত। ইংরাজ কোম্পানি ইহা জানিতে পারিয়া এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের সেরেস্তায় কলিকাতার নামপত্তন করেন।

সম্রাট ফরক্‌শিয়ার প্রদত্ত ৩৮খানি গ্রাম ও উহার রাজস্বের তালিকা—

গ্রামের নাম	রাজস্ব	গ্রামের নাম	রাজস্ব
শালিখা	২৭৭৲	বাহির শুঁড়া	৪০৲



[Form No. 5]

Water-rate Bill—2nd Quarter of 1877

UNDER SECTION 99 ACT IV. (B. C.) OF 1876.

COMMISSIONERS FOR THE TOWN OF CALCUTTA.

Printing Office of the Municipal Commissioners.

Reg. No. 22

Division. N

Ward. 2

Street. 39

Premises No. 8 Daneatollah Street

Gobind Chunder Chunder or owner, Dr.

To Quarterly instalment of the WATER-RATE on the above-mentioned Premises for April, May and June 1877.

এপ্রেল, মে এবং জুন ১৮৭৭ সাল।

Annual value Assessed at Rs. 300

Water-rate at 4½ per Cent. per annum Rs. 3 6 ..

Deduct ¾ths for vacancy 2 8 6

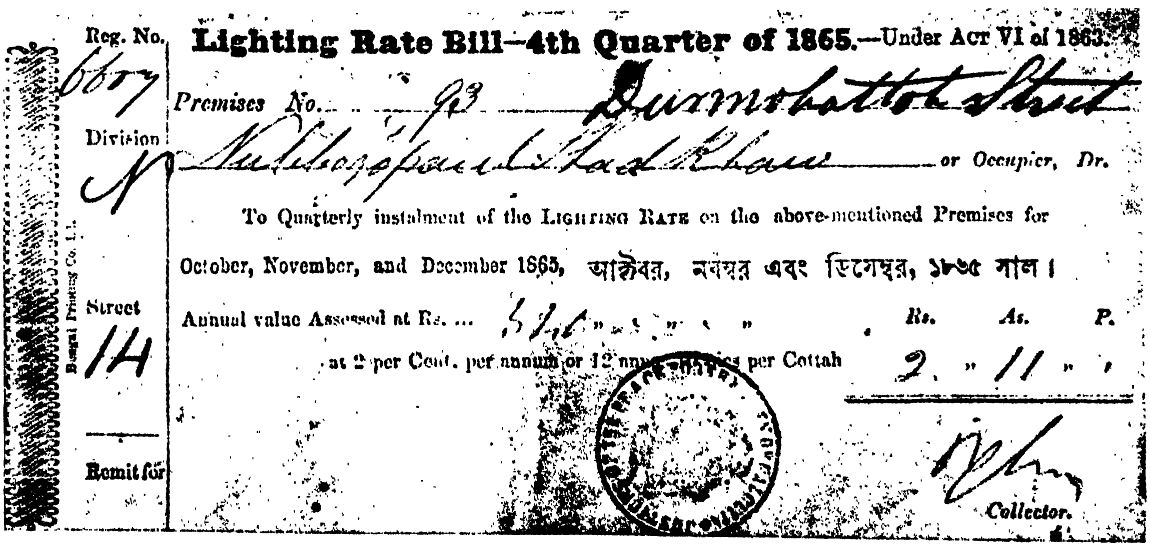
Nett Rs. .. 13 6

CALCUTTA,

The 1st July 1877.

Secretary to the Corporation.

সেকালের মিউনিসিপ্যালিটির জলের টেক্সর বিল



Lighting Rate Bill—4th Quarter of 1865.—Under ACT VI of 1863.

Reg. No. 6807

Division N

Street 14

Remit for

Bengal Printing Co. L.

Premises No. 93 Durmohatta Street

or Occupier, Dr.

To Quarterly instalment of the LIGHTING RATE on the above-mentioned Premises for October, November, and December 1865, অক্টোবর, নবেম্বর এবং ডিসেম্বর, ১৮৬৫ সাল।

Annual value Assessed at Rs. ...

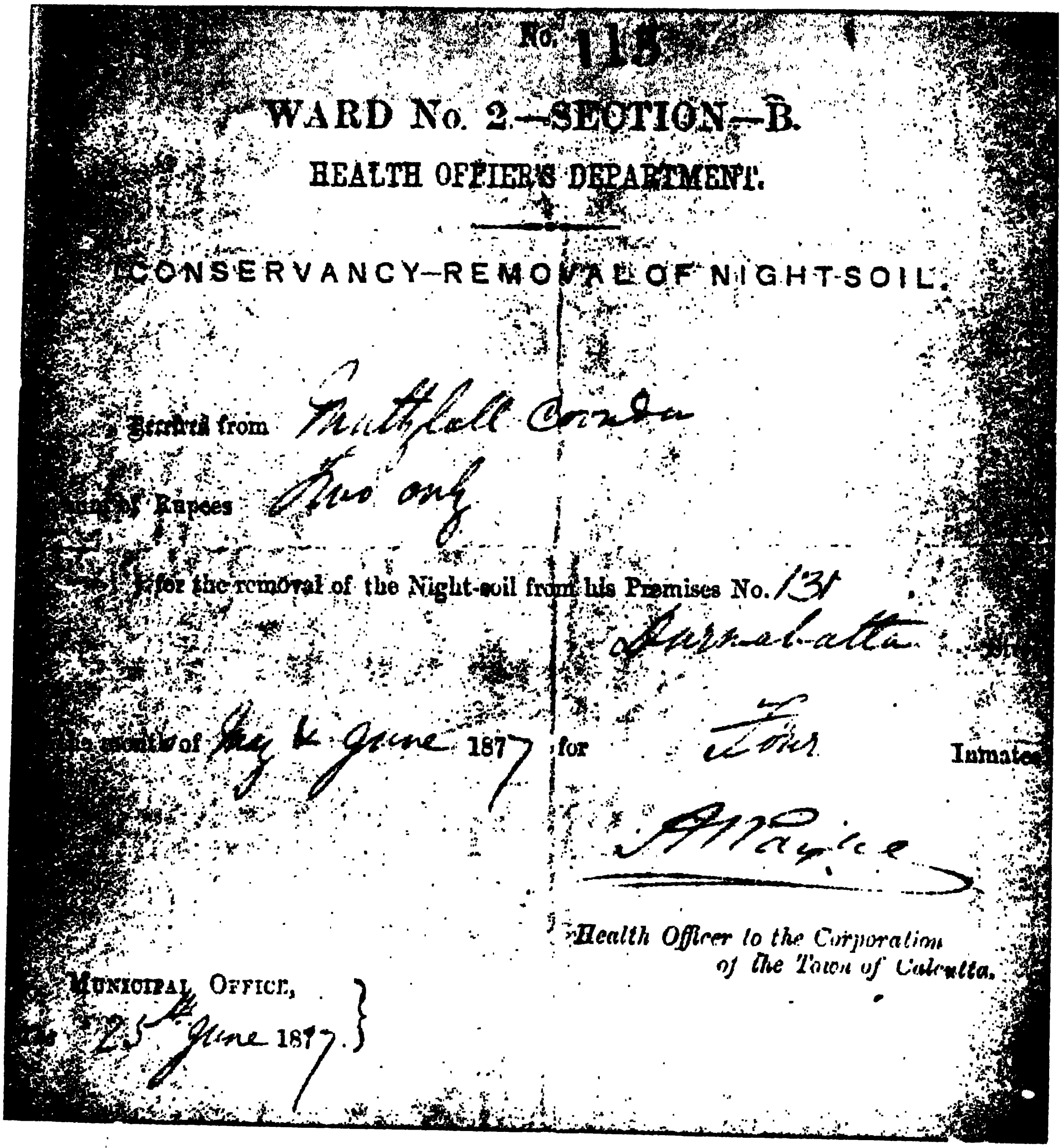
at 2 per Cent. per annum or 12 annas ... per Cottah

Rs. As. P. 2 „ 11 „

Collector.

সেকালের মিউনিসিপ্যালিটির আলোক বিল

হাওড়া	৩৮২৲	শিয়ালদহ	১১৮৲	উল্টাডিঙ্গি	৩১৫৲	কলিঙ্গা	৩৮৩৲
কাশুন্দিয়া	১৩০৲	ধলন্দা	৩০৬৲	দক্ষিণ বাড়ী	৪২৫৲	চৌবাঘা	৩৭৲
রামকৃষ্ণপুর	১৭০৲	বির্জ্জি	২৮৩৲	গোবরা	১০০৲	জলা কলিঙ্গা	১১৪৲
ব্যাটরা	৫৮১৲	তিলজলা	২০৭৲	বাহির দক্ষিণ বাড়ী	১২৫৲	মির্জ্জাপুর	১৭৩৲



No. 115

WARD No. 2—SECTION—B.

HEALTH OFFICER'S DEPARTMENT.

CONSERVANCY—REMOVAL OF NIGHT-SOIL.

Received from Muttylall Coondu

Sum of Rupees Two only

for the removal of the Night-soil from his Premises No. 131 Surnalatta

the month of May & June 1877 for four Inmates

Health Officer to the Corporation of the Town of Calcutta.

MUNICIPAL OFFICE,
25th June 1877.

সেকালের পায়খানার ট্যাক্স বিল

দক্ষিণ-পাইকপাড়া	১৪৫৲	তোপসে	২৯০৲	শ্রীরামপুর ইটালী	১২৭৲	বেলগাছিয়া	৩০৫৲
চিৎপুর	২৫২৲	সাপগাছি	২১১৲	ইটালী	২২৯৲	শেখপাড়া	৪১৲
হোগলকুড়ে	১৩৭৲	চৌরঙ্গী	৮৮৲	গোঁদলপাড়া	১০১৲	সিমলে	৮২৲

কাঁকুড়গাছি	২০৮৲	মাকন্দা	১১৮৲
কুলিয়া	৫৭২৲	আকু'লী	২২৲
শুঁড়া	৬৪৮৲	কামারপাড়া	৬৩৲
ট্যাংরা	২২৮৲	বাঘমারী	৪৯৲

*   *   *   *

কলিকাতায় ছেলে বিক্রী—১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুরে ছোট ছেলে ও বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিবার একটি গুপ্ত আড্ডা ছিল। এই স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উহাদের চালান দেওয়া হইত।

*   *   *

বিক্রেয় পণ্যের উপর ডিউটী—পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বিক্রেয় পণ্যের উপর ও অন্যান্য ব্যাপারে যে ডিউটী আদায় করা হইত তাহার হার নিম্নে দেওয়া হইল।

পণ্য দ্রব্যাদি	মাসুল বা ডিউটির হার
কাপড়-চোপড় ইত্যাদি	শতকরা ২৲
নৌকা বোট প্রভৃতি বিক্রয় বাবত	" ৫৲
ক্রীতদাস বিক্রয় বাবত	প্রত্যেক ক্রীতদাস বা দাসী হিঃ ৪।০
পাট্টা লইবার বাবত	প্রত্যেক পাট্টা ৪।০
সালিসি-নামা	২০ পণ কড়ি।
বন্ধকী খত	শতকরা ৫৲
বিবাহের লাইসেন্স	" ৩৲
রসী সেলামী (বাস্তর জরীপি-খরচা)	" ১৲
নূতন নির্ম্মিত নৌকা, ডিঙ্গী ও বোট প্রভৃতির জন্য	৫০৲ হইতে ১০০৲ আকার অনুসারে।
মদের ডিউটী	২।০ হিসাবে
ঢেঁড়া পিটিবার খরচা	এক কাহন একপণ কড়ি।
চাউলের রপ্তানি	প্রতি মণে দেড় সের চাউল

এতদ্ভিন্ন জরিমানা, ঋণ আদায় প্রভৃতিতেও ডিউটী দিতে হইত।

*   *   *

প্রথম ইংরাজি অভিধান ও গ্রামার—সেকালে বাঙ্গালীর ইংরাজী শিক্ষার কোন সুযোগ না থাকায় ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হয়—

"We humbly beseech any gentleman will be so good to us as to take the trouble of making a Bengali Grammer and Dictionary in which we hope to find all the common Bengal country words made into English. By the means, we shall be enabled to recommend ourselves to the English Government and understand their orders, this favour will be remembered by us and our posterity for ever."

ইহা হইতে তখনকার দেশীয় লোকদের ইংরাজ গভর্ণমেন্টের প্রতি মনোভাবের বেশ একটা পরিচয় পাওয়া যায়। পর বৎসর ডাক্তার মেকিনান্ নামক এক সাহেব একাধারে ব্যাকরণ, শব্দকোষ ও ইংরাজি ভাষা শিক্ষার জন্য একখানি গ্রন্থ ইংরাজি, পারসী ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করেন। উহা তৎকালে কোম্পানীর নব প্রতিষ্ঠিত The Hon'ble East India Company's Pressএ মুদ্রিত হইয়াছিল।

*   *   *

সেকালের সাহেব ডাকাত—কোম্পানীর আমলে সাহেবরা দল বাঁধিয়া ডাকাতি করিত ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একদল সাহেব-ডাকাত কোম্পানীর খাজনা লুঠ করিতে গিয়া ধরা পড়িবার কথা এবং ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন শীলের বাটীতে ডাকাতি করার কথা জানা যায়। এই শেষোক্ত দলে সত্তরজন লোক থাকিত। ইহারা ধরা পড়ে এবং বিচারে ছয়জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। চৈতন শীলের বাড়ীর নিকট এক বাজারে প্রকাশ্য স্থানে তাহাদের ফাঁসির কথা জানা যায়।

*   *   *

সাহেব পল্লী ও দেশীয় পল্লীর নাম—সেকালে সাহেবরা সহরের যে অংশে বাস করিত তাহাকে White town বলিত এবং দেশীয় অধিবাসীরা যে অংশে বাস করিত তাহাকে Black town বলিত।

*   *   *

কড়ির পরিবর্ত্তে আনির প্রচলন - কড়িই পূর্ব্বে সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। ১৭৫৭ সালে বহরমপুরে যখন ইংরাজদের একটী ছোটখাট কেল্লা প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময় কুলি মজুরদিগের মেহনতানা দিবার সুবিধার জন্য

তথাকার ইঞ্জিনিয়ার ব্রোহিয়ার সাহেব কলিকাতা কাউন্সিলের অধ্যক্ষ ড্রেক্ সাহেবকে লিখিয়া কড়ির পরিবর্ত্তে তাম্র কিম্বা রৌপ্য-নির্ম্মিত আনির প্রচলনের জন্য প্রথম প্রস্তাব করেন। তখন ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল কি না তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

* * *

সেকালে গভর্ণর সাহেবের সফরের খরচ—প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ১৭৬০ সালে গভর্ণর ভান্‌সিটার্টের একবার মুরশীদাবাদ নবাব-দরবারে যাওয়ার যে ব্যয় হইয়াছিল তাহার কতকাংশের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। যাতায়াতে সময় লাগিয়াছিল এক মাস ছয় দিন।

গভর্ণর সাহেবের নিজের ব্যবহারের জন্য ৩খানি বজরা ভাড়া—প্রতিদিন ৩৲ হিসাবে—	২১৬৲
২০খানি ৬ দাঁড় নৌকা মাসিক ২৮৲ হি—	৬৭২৲
২২ „ ৮ „ „ ৩৬৲ হি—	৪৯০৲
১২ „ ১০ „ „ ৪০৲ হি—	৫৭৬৲
২ „ ৪ „ „ ২৪৲ হি—	৫৭৲
মোট নৌকা ভাড়া—	২০১১৲
নবাবের ভৃত্যদিগকে বক্‌সীস প্রদান—	১৯২৩৲
নবাবের নজর (সোনার মোহর ৪০খানি ও ৬৯টী সিক্কা টাকা)—	৬৭৪॥০
মুরশীদাবাদের উকীলকে খেলাৎ (পোষাক) প্রদান—	২৫৭৲
চোবদার, পেয়াদা, বরকন্দাজ, বেহারা সরকার, মসাল্‌চী প্রভৃতি ১৬৯জন চাকরদিগের ভাড়া মোট—	৭২৪।০
পাল্কী বেহারাদের ভাড়া (কাশিমবাজার হইতে)	৮৩৩॥০
৩০জন মসালচীর মেহনত-আনা	১২০৲
খানা ও মদ্যাদির খরচ—	৩৫০০৲
বেহারাদের পোষাক ও বন্দুকের আন্দাজনীর জন্য লাল কাপড়	২৪০৸০
তৈল মশাল ইত্যাদি—	২৩৮॥০

* * *

কলিকাতায় প্রথম বাঁধাকপির চাষ—গোল আলু যেমন ইংরাজদের দ্বারা এ দেশে আনীত হয়, কপিও তেমনই তাঁহারাই আনেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কলিকাতায় ইহার চাষ প্রচলন হয়। চাঁদপাল ঘাটের সন্নিকট পুরাতন অর্ফান হাউসের একটু দক্ষিণে কাপ্তেন্ ম্যাকিন্‌টায়ের বাগানে তখন ইহার চাষ হইত।

* * *

প্রথম সাহেবী হোটেল—ঠিক হোটেল প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কলিকাতায় ট্যাভার্ণ্ বা সরাইয়ের মত ছিল। তথায় পান ভোজন ও বিশ্রামাদি চলিত। সে সকলের মধ্যে হার্‌মোনিক্ ট্যাভার্ণ-ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। এই ট্যাভার্ণের প্রধান পাচক ট্রেণ্ হোম সর্ব্বপ্রথম ভদ্রলোকের উপযোগী ডিনার, সপার, ব্রেকফাষ্ট ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবসা করেন। তাঁহার এই হোটেল কসাইটোলার বাজারে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

* * * *

কলিকাতা আক্রমণ জন্য ক্ষতিপূরণ—নবাব সিরাজ-দ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রান্ত হওয়ায় বহু ইংরাজ ও দেশীয় বাসিন্দার সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হয়। নবাব মীরজাফর এজন্য কোম্পানীকে মোট এক কোটী সত্তর লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয়াছিলেন। যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত বাঙ্গালী আক্রমণের সময় কলিকাতা ত্যাগ করেন নাই, এবং কোম্পানীর কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, তাঁহাদিগকে উক্ত টাকার অংশ দেওয়া হয়। ইহা বিতরণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন—

গোবিন্দরাম মিত্র	রঘুনাথ মিত্র
শোভারাম বসাক	আলিজান ভাই
রতু সরকার বা রতন সরকার	শুকদেব মল্লিক
নয়নচাঁদ মল্লিক	দয়ারাম বসু
নীলমণি মিত্র	হরেকৃষ্ণ ঠাকুর
দুর্গারাম দত্ত	রাম সন্তোষ
মহম্মদ সাদেক	আইনুদ্দিন

যে সকল লোক ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়াছিলেন তন্মধ্যে যাঁহারা এক হাজার টাকার অধিক পাইয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের নামের, দাবীর পরিমাণ ও যাহা মঞ্জুর হয় তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

নাম	ক্ষতিপূরণের দাবী	যাহা মঞ্জুর হয়
গোবিন্দরাম মিত্র ও রঘুনাথ মিত্র	৪১২৬৮০।/০	৩৭৬৮০।/০

শোভারাম বসাক	৪৪১২৭৮৷৷/০	৬৬২৭৮৷৷/০
আলিজান ভাই	৩৪৪৫৭৷৷/০	১৭৪৫৭৲
রতু সরকার	১৮০৩২২৶০	৪০৩২২৶০
শুকদেব মল্লিক	৫০৯৪২৷৷০	১০৯৪২৷৷০
নয়নচাঁদ মল্লিক	৪৩৯২২৲	৫৯২২৲
দয়ারাম বসু	৫১৫৩৲	১১৫৩৸৶০
নীলমণি মিত্র	২৮১১৩৲	১০১১৩৸৶০
হরেকৃষ্ণ ঠাকুর	১৩৭৮৮৶০	৩৭৮৮৶০
দুর্লভ লক্ষ্মী কান তরণী চরণ বসাক	৮২৩৪৷৷৶০	১২৩৩৷৷৶০
কুড়রাম বিশ্বাস	৫৯৮৩৷০	১৯৮৩৷০
রামদেব মিত্র	৭৩১৩৷৷০	১৩১৩৷৷০
রাজারাম পালিত	৪২১৫৸০	১০১৫৸০
বৃন্দাবন ও ফুলচাঁদ	১২৩৯৫৷০	২৮৯৫৷০
গোপীচরণ বসাক	৪০৫৬৷৶০	১০৫৬৷৶০

* * * *

সেকালের পদস্থ ইংরাজের আচরণ—সেকালের বড় বড় ইংরাজদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব যুদ্ধ কোন দোষের ছিলনা। এরূপ যুদ্ধে অনেককে প্রাণ দিতে হইয়াছে এ উদাহরণের অভাব নাই। হেষ্টিংস্ গভর্ণর হইবার পূর্ব্বে রিচার্ড কোর্টের বাটীতে ভান্সিটার্টের সভায় একবার যখন সভার কার্য্য চলিতেছে সেই সময় মিঃ ব্যাট্‌সন্ (Mr. Batson) হেষ্টিংসকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালে চড় মারেন। অবশ্য এজন্য তাঁহাকে সভ্যপদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল এবং ক্ষমা ভিক্ষার পর পুনরায় সেই পদ দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু এরূপ ব্যাপারও তখন গভর্ণরের সভায় সম্ভব ছিল।

* * * *

পূর্ব্বে ব্যঙ্গাত্মক চিত্র—আজকালের মত পূর্ব্বে এ দেশে অধিক পরিমাণে ব্যঙ্গচিত্রের প্রচলন না থাকিলেও পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কতকগুলি চিত্র পাওয়া যায়। ইংরাজী "The Indian charivari" এবং বাঙ্গালা "বসন্তক" হইতে তাহার কতিপয় নমুনা দিলাম। এই দুইখানি পত্রই প্রায় আইট বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

* * * *

ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ—১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সহরের মধ্যে এবং পুরাতন দুর্গের ছয় মাইলের মধ্যে কোম্পানীর বা সরকারি কার্য্যের জন্য কণ্ট্রাক্টরগণ ব্যতীত অন্যের পক্ষে ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ হয়।

* * * *

প্রথম দেশীয় জুরি—১৮৩৪ সালে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সুপ্রীম্ কোর্টে প্রথম জুরির কার্য্য করেন।

আশুতোষ দে	দ্বারকানাথ ঠাকুর
রসময় দত্ত	বীর নরসিং মল্লিক
রাধাকৃষ্ণ মিত্র	কাশীপ্রসাদ ঘোষ
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	

* * * *

চৌরঙ্গীর পুষ্করিণী—এই জলাশয়টি বেনারসের ব্যাঙ্কার মনোহর দাস দ্বারা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত হয়। ইহার সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করিয়াছিলেন। পুষ্করিণীটি লম্বে ৩৫০ ফিট্, এবং প্রস্থে ২২৫ ফিট।

* * * *

শত্রুরাজ্যের অধিবাসীদের প্রতি আদেশ—সমস্ত ফরাসী বা ফ্রান্সের মিত্র রাজ্যের লোক, অথবা যে সব দেশের সহিত গ্রেট্ বৃটেনের যুদ্ধ বাধিয়াছে তাহাদের দেশের যে সকল লোক কলিকাতায় বাস করিতেছে, তাহাদের পুলিশে নাম লেখাইবার জন্য এবং তাহারা বিনা অনুমতিতে কলিকাতা ত্যাগ করিলে বা উক্ত প্রকারের লোক অন্য বিভিন্ন উপনিবেশ হইতে বিনা অনুমতিতে আসিলে দণ্ডনীয় হইবে বলিয়া ১৮০০ সালের ১৯শে মে এবং ১৮০৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল।

* * * *

রবিবারে ঘোড়দৌড় ও জুয়াখেলা বন্ধের আদেশ—১৭৯৮ সালের ৯ই নভেম্বর গভর্ণর সাহেবের আদেশে রবিবার ঘোড়দৌড় ও সকল প্রকার জুয়াখেলা বন্ধ হইয়াছিল।

* * *

বিলাতি মসলিনের প্রথম আমদানী—১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলিশ্ মস্‌লিনের নমুনা বাঙ্গালায় প্রথম আইসে। *

---

* এবার যে সকল চিত্রাদি প্রকাশিত হইল তাহার অনেকগুলির সহিত এ প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। সময়ে না পাওয়ায় এখন দিলাম।

শেষের পরিচয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১)

রাখাল-রাজের নূতন বন্ধু জুটিয়াছে তারকনাথ। পরিচয় মাস তিনেকের কিন্তু 'আপনি'র পালা শেষ হইয়া সম্ভাষণ নামিয়াছে 'তুমি'তে। আর এক ধাপ নিচে আসিলেও কোন পক্ষের আপত্তি নাই ভাবটা সম্প্রতি এইরূপ।

বেলা আড়াইটায় তারকের নিশ্চয় পৌঁছিবার কথা, তাহারই কি-একটা অত্যন্ত জরুরি পরামর্শের প্রয়োজন, অথচ, তাহারই দেখা নাই, এদিকে ঘড়িতে বাজে তিনটা। রাখাল ছটফট্ করিতেছে,—পরামর্শর জন্যও নয়, বন্ধুর জন্যও নয়, কিন্তু ঠিক তিনটায় তাহার নিজেরই বাহির না হইলেই নয়। ভবানীপুরে এক সুশিক্ষিত পরিবারে সন্ধ্যার পরেই মহিলা-মজলিসের অধিবেশন, বহু তরুণী বিদুষীর পদার্পণের নিঃসংশয় সম্ভাবনা জানাইয়া বেগার খাটিবার সনির্ব্বন্ধ আহ্বান পাঠাইয়াছেন গৃহিণী স্বয়ং। অতএব, বেলা-বেলি না যাইলে অতিশয় অন্যায় হইবে; অর্থাৎ, কি না যাওয়াই চাই।

এদিকে যাত্রার আয়োজন তাহার সম্পূর্ণ। দাড়ি-গোঁফ বার দুই কামাইয়া বার চারেক হিমানী লাগানো শেষ হইয়াছে, শয্যার পরে সু-বিন্যস্ত গিলে-করা পাঞ্জাবী, সিল্কের গেঞ্জি, কোঁচানো দেশী ধুতি-চাদর, খাটের নিচে সদ্য ক্রিম-মাখানো বার্ণিশ করা পাম্প, তে-পায়ার উপরে রাখা সুবর্ণ-বন্ধনী সংবদ্ধ সোনার চৌকা-রিষ্ট ওয়াচ—মেয়েদের চিত্ত-হারিণী বলিয়াই ছেলেমহলে প্রখ্যাত—সবই প্রস্তুত। টেবিলে টি-পটে চায়ের জল গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া প্রায় অপেয় হইয়া উঠিল, কিন্তু বন্ধুবরের সাক্ষাৎ নাই। সুতরাং দোষ যখন বন্ধুরই তখন, দ্বারে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেই বা দোষ কি! কিন্তু কোথায় যেন বাধিতেছে। অথচ, ও-দিকের আকর্ষণও দুর্নিবার্য্য।

প্রবল চঞ্চলতায় রাখাল চটি পায়ে দিয়া বড় রাস্তা পর্য্যন্ত একবার ঘুরিয়া আসিল, তারপরে চা ঢালিয়া একলাই গিলিতে সুরু করিয়া মনে মনে শেষবারের মত প্রতিজ্ঞা করিল, এ পেয়ালা শেষ হইলেই ব্যস্! আর না। মরুকগে তার পরামর্শ। বাজে—বাজে, সব বাজে। সত্যকার কাজ থাকিলে সে আধঘণ্টা আগেই হাজির হইত, পরে নয়। না হয়, কাল সকালে একবার তার মেস্টা ঘুরিয়া আসা যাইবে,—ব্যস্!

তারকের পরিচয় পরে হইবে, কিন্তু রাখালের ইতিহাসটা মোটামুটি এইখানে বলিয়া রাখি।

কিন্তু ওকে জিজ্ঞাসা করিলেই বলে, আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ হে। অর্থাৎ, মাতৃ-পিতৃকুলের সবাই গেছেন লোকান্তরে, সে-ই শুধু বাকি। ইহলোক সমুজ্জ্বল করিয়া একদিন তাঁহারা ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-সব খবর রাখাল ভালো জানেনা। যদি বা কিছু জানে, বলিতে চায়না! অধুনা পটল-ডাঙায় তাহার বাসা। বাড়ী-আলা বলে দুখানা ঘর, সে বলে একখানা। ভাড়ার দিক দিয়া শেষ পর্য্যন্ত দেড়খানার দরে রফা হইয়াছে। একতালা, সুতরাং যথেষ্ট স্যাঁত্-সেঁতে। তবে, হাওয়া না থাকিলেও আলোটা আছে,—দিনে দেশলাই জ্বালিয়া জুতা খুঁজিয়া ফিরিতে হয়না। ঘর যাই হোক, রাখালের আসবাবের অভাব নাই। ভালো খাট, ভালো বিছানা, ভালো টেবিল-চেয়ার, ভালো দুটা আলমারি,—একটা বইয়ের, অন্যটা কাপড়-জামা পোষাকে পরিপূর্ণ। একটি দামী ইলেক্ট্রিক ফ্যান্, দেয়ালের ঘড়িটাও নেহাৎ কম মূল্যের নয়,—এমন, আরও কত-কি সৌখীন ছোট খাটো টুকি টাকি জিনিস। একজন ঠিকার বুড়ী-ঝি রাখালের কুকার, চায়ের

সাজ-সরঞ্জাম মাজিয়া ঘষিয়া দিয়া যায়, ঘর-দ্বার পরিষ্কার করে, ভিজা কাপড় কাচিয়া শুকাইয়া তুলিয়া দিয়া যায়,—সময় পাইলে বাজার করিয়াও আনে। রাখাল পাল-পার্ব্বনের নাম করিয়া টাকাটা সিকাটা যাহা দেয় তাহা বহু সময়ে মাস-মাহিনাকেও অতিক্রম করে। রাখাল মাঝে মাঝে আদর করিয়া ডাকে নানী। রাখালকে সে সত্যই ভালোবাসে।

রাখাল সকালে ছেলে পড়ায়, বাকি সমস্ত দিন সভা-সমিতি করিয়া বেড়ায়। রাজনীতিক নয়, সামাজিক। সে বলে সে সাহিত্যিক,—রাজনীতির গণ্ড-গোলে তাহাদের সাধনার বিঘ্ন ঘটে।

ছেলে পড়ায়, কিন্তু কলেজের নয়,—স্কুলের। তাও খুব নিচের ক্লাসের। পূর্ব্বে চাকুরির চেষ্টা অনেক করিয়াছে, কিন্তু জুটাইতে পারে নাই। এখন সে চেষ্টা ছাড়িয়াছে।

কিন্তু একবেলা ছোট ছেলে পড়াইয়া কি করিয়া যে এতটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভবপর তাহাও বুঝা যায়না। সে সাহিত্যিক, কিন্তু প্রচলিত সাপ্তাহিক বা মাসিকপত্রে তাহার নাম খুঁজিয়া মেলেনা। রাত্রে, অনেক রাত্রি জাগিয়া খাতা লেখে, কিন্তু সেগুলা যে কি করে কাহাকেও বলেনা। ইস্কুল-কলেজে সে কি পাশ করিয়াছে কেহ জানেনা, প্রশ্ন করিলে এমন একটা ভাব ধারণ করে যে সে গুরু-ট্রেনিং হইতে ডক্টরেট পর্য্যন্ত যা-কিছু হইতে পারে। তাহার আলমারিতে সকল জাতীয় পুস্তক। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—মোটা মোটা বাছা বাছা বই। কথাবার্ত্তা শুনিলে হঠাৎ বর্ণ-চোরা মহামহোপাধ্যায় বলিয়া শঙ্কা হয়। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র হইতে wireless পর্য্যন্ত তাহার অধিগত। তাহার মুখে শুনিলে বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ-প্রবাহের জ্ঞান মার্কোনির অপেক্ষা নিতান্ত কম বলিয়া সন্দেহ হয়না। কন্টিনেন্টাল গ্রন্থকারদের নাম রাখালের কণ্ঠস্থ,—কে কয়টা বই লিখিয়াছেন সে অনর্গল বলিতে পারে। হিউমের সহিত লকের গরমিল কতটুকু এবং স্পিনোজার সঙ্গে দেকার্তের আসল মিল কোন্‌খানে, এবং ভারতীয় দর্শনের কাছে তাহা কত অকিঞ্চিৎকর এ সকল তত্ত্বকথা সে পণ্ডিতের মতোই প্রকাশ করে। বুয়ার-ওয়ারের সেনাপতি কে-কে, রুশ-জাপান যুদ্ধে কিসের জন্য রুশের পরাজয় ঘটিল, আমেরিকানরা কি করিয়া এত টাকা করিল এ সকল বিবরণ তাহার নখাগ্রে। ভারতীয় মুদ্রা বিনিময়ে বাট্টার হার কি হওয়া উচিত, রিভার্স কাউন্সিল বেচিয়া ভারতের কত টাকা ক্ষতি হইল, গোল্ড ষ্টাণ্ডার্ড রিজার্ভে কত সোনা আছে এবং কারেন্সি আমানতে কত টাকা থাকা উচিত এ সম্বন্ধে সে একেবারে নিঃসংশয়। এমন কি নিউটনের সহিত আইন্‌ষ্টিনের মতবাদ কতদিনে সামঞ্জস্য লাভ করিবে এ ব্যাপারেও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে তাহার বাধেনা। শুনিয়া কেহ-কেহ হাসে, কেহ বা শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু একটা কথা সকলেই অকপটে স্বীকার করে যে রাখাল পরোপকারী। সাধ্যে কুলাইলে সাহায্য করিতে সে কোথাও পরাঙ্মুখ হয়না।

বহু গৃহেই রাখালের অবাধ গতি, অবারিত দ্বার। খাটাইয়া লইতে তাহাকে কেহ ছাড়েনা। যে-সব মেয়েরা বয়সে বড়, মাঝে মাঝে অনুযোগ করিয়া বলেন, রাখাল এ তোমার ভারি অন্যায়, এইবার একটা বিয়ে-থা কোরে সংসারী হও। কত কাল আর এমনভাবে কাটাবে,—বয়স তো হোলো।

রাখাল কানে আঙুল দিয়া বলে আর যা বলেন বলুন, শুধু এই আদেশটি করবেননা। আমি বেশ আছি।

তথাপি আদেশ-উপদেশের কার্পণ্য ঘটেনা। যাঁহারা ততোধিক শুভানুধ্যায়ী তাঁহারা দুঃখ করিয়া বলেন, ও নাকি আবার কথা শুনবে! স্বদেশ ও সাহিত্য নিয়েই পাগল।

কথা সে না শুনিতে পারে, কিন্তু পাগ্‌লামি সারে কি না যাচাই করিয়া আজও কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী দেখে নাই। কেহ বলে নাই রাখাল তোমার পাত্রী স্থির করিয়াছি তোমাকে রাজি হইতে হইবে।

এম্‌নি করিয়া রাখালের দিন কাটিতেছিল এবং বয়স বাড়িতেছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। দর্শন-বিজ্ঞানে যাই হোক, সংসারে আপনার বলিতে তাহার যে কোথাও কিছু নাই এবং ভবিষ্যতের পাতেও শূন্য অঙ্ক দাগা এ খবরটা আর যাহার চোখেই চাপা পড়ুক, মেয়েদের চোখে যে চাপা পড়ে নাই এ কথা রাখাল বোঝে। তাই বিবাহের অনুরোধে সে তাঁহাদের সদিচ্ছা ও সহানুভূতিটুকুই গ্রহণ করে। তাঁহাদের কাজ করে, বেগার খাটে, তার

বেশিতে প্রলুব্ধ হয়না। এক ধরণের স্বাভাবিক সংযম ও মিতাচার ঐখানে তাহাকে রক্ষা করে।

চা খাওয়া শেষ করিয়া রাখাল কোঁচানো কাপড়টি পরিপাটী করিয়া পরিয়া সিল্কের গেঞ্জি আর একবার ঝাড়িয়া গায়ে দিবার উপক্রম করিতেছে এম্‌নি সময়ে তারক আসিয়া প্রবেশ করিল।

রাখাল কহিল, বাঃ—বেশ তো! এরই নাম জরুরি পরামর্শ? না?

কোথাও বেরুচ্চো না কি?

না, সমস্ত বিকেলটা ঘরে বসে থাক্‌বো।

না সে হবেনা। বিকেলের এখনো ঢের দেরি—বোসো।

না হে না—তার যো নেই। পরামর্শ কাল হবে। এই বলিয়া সে গেঞ্জির উপরে পঞ্জাবি চড়াইল।

তারক তাহার প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তাহলে পরামর্শ থাক্‌লো। কাল সকালে আমি অনেক দূরে গিয়ে পড়বো। হয়ত আর কখনো,—না, তা না হোক্—অনেকদিন আর দেখা হবার সম্ভাবনা রইলনা।

রাখাল ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল,—তার মানে?

তার মানে আমি একটা চাকরি পেয়েছি। বর্দ্ধমান জেলার একটা গ্রামে। নতুন ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টারি।

প্রাইমারি?

না, হাই-ইস্কুল।

হাই-ইস্কুল? ম্যাট্রিক? মাইনে?

লিখ্‌চে তো নব্বুই টাকা। আর একটা ছোট-খাটো বাড়ী,—থাক্‌বার জন্যে অম্‌নি দেবে।

রাখাল হাঃ হাঃ করিয়া একচোট হাসিয়া লইল, পরে কহিল, ধাপ্পা—ধাপ্পা—সব ধাপ্পাবাজি। কে তামাসা করেচে। এ তো একশ টাকার ওপরে গেলো হে। কেন, তারা কি আর লোক পেলেনা?

তারক কহিল, বোধ হয় পায়নি। পাড়াগাঁয়ে সহজে কি কেউ যেতে চায়?

না চায়না! একশো টাকায় যমের বাড়ী যেতে চায় এ তো বর্দ্ধমান! ইঃ—তিনটে দশ। আর দেরি করা চলে না। না না, পাগ্‌লামি রাখো,—কাল সকালে সব কথা হবে। দেখা যাবে কে লিখেচে আর কি লিখেচে। এটা বুঝ্‌চোনা যে একশো টাকা! অজানা—অচেনা—ছ্যাৎ! অ্যাপ্‌লিকেশনের জবাব তো? ও ঢের জানি, হাড়ে ঘুণ ধরে গেছে। ছ্যাৎ! চল্‌লুম। বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারক মিনতি করিয়া কহিল, আর দশ মিনিট ভাই। সত্যি মিছে যাই হোক্ রাতের গাড়ীতে যেতেই হবে।

রাখাল বলিল, কেন শুনি? কথাটা আমার বিশ্বাস হোলোনা বুঝি?

তারক ইহার জবাব দিলনা, কহিল,—অথচ, এম্‌নি অভ্যাস হয়ে গেছে যে দিনান্তে একবার দেখা না হলে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

রাখাল কহিল, আমারই তা' হয়না বুঝি?

ইহার পরে দুজনেই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

তারক বলিল, বেঁচে যদি থাকি বড়দিনের ছুটিতে হয়ত আবার দেখা হবে। ততদিন—

রাখালের চোখে সামান্যতেই জল আসিয়া পড়ে, তাহার চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

তারক আঙুল হইতে একটা বহু ব্যবহৃত সোনার শিল-আঙটি খুলিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিল, কহিল, ভাই রাখাল, তোমার কাছে আমি কুড়িটা টাকা ধারি—

কথাটা শেষ হইল-না—এ কি তার বন্ধক না কি? বলিতে বলিতে রাখাল ছোঁ মারিয়া আঙটিটা তুলিয়া লইয়া ঝোঁকের মাথায় জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতেছিল, তারক হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, আরে না না বন্ধক নয়,—বেচ্‌লে এর দাম দশটা টাকাও কেউ দেবেনা,—এ আমার স্মরণ-চিহ্ন, যাবার আগে তোমার হাতে নিজের হাতে পরিয়ে যাবো, এই বলিয়া সে জোর করিয়া বন্ধুর আঙুলে পরাইয়া দিল। বলিল, দশ মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু পোনর মিনিট হয়ে গেছে, এবার তোমার ছুটি। নাও, পোষাক টোষাক পরে নাও,—এই বলিয়া সে হাসিল।

মহিলা-মজলিসের চেহারা তখন রাখালের মনের মধ্যে ম্লান হইয়া গেছে, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ড্রেসিঙ্ টেবিলের আয়নায় পাশাপাশি দুই বন্ধুর ছবি পড়িল। রাখাল বেঁটে, গোল-গাল, গৌরবর্ণ, তাহার পরিপুষ্ট মুখের পরে একটী সহৃদয় সরলতা যেন অত্যন্ত ব্যক্ত—মানুষটি যে সত্যই ভালোমানুষ তাহাতে সন্দেহ জন্মায়না, কিন্তু

তারকের চেহারা সে শ্রেণীরই নয়। সে দীর্ঘাকৃতি, কৃশ, গায়ের রঙটা প্রায় কালোর ধার ঘেঁসিয়া আছে। বাহিরে প্রকাশিত নয় বটে, কিন্তু ঠাহর করিলেই সন্দেহ হয়, লোকটি বোধহয় অতিশয় বলিষ্ঠ। মুখ দেখিয়া হঠাৎ কোন ধারণা করা কঠিন, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে একটি আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য আছে। আয়ত বা সুন্দর নয়, কিন্তু মনে হয় যেন নির্ভর করা চলে। সুখে দুঃখে ভার সহিবার ইহার শক্তি আছে। বয়স সাতাশ আটাশ, রাখালের চেয়ে দুই-তিন বছরের ছোট, কিন্তু কিসে যেন তাহাকেই বড় বলিয়া ভ্রম হয়।

রাখাল হঠাৎ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমি বল্‌চি তোমার যাওয়া উচিত নয়।

কেন?

কেন আবার কি? একটা হাই-ইস্কুল চালানো কি সোজা কথা! ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে পড়াতে হবে, তাদের পাশ করাতে হবে—সে কোয়ালিফিকেশন কি—

তারক কহিল, কোয়ালিফিকেসন তারা চায়নি, চেয়েছে য়ুনিভারসিটির ছাপ ছোপের বিবরণ। সে সব মার্কা কর্ত্তৃপক্ষদের দরবারে পেশ করেছি, আর্জ্জি মঞ্জুর হয়েছে। ছেলে পড়াবার ভার আমার কিন্তু, পাশ করার দায় তাদের।

রাখাল ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, সে বল্‌লে হয়না হে হয়না। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, কিন্তু আমাকেও তো তুমি সত্যি কথা বলোনি তারক। বলেছিলে পড়াশুনা তেমন কিছু করোনি।

তারক হাসিয়া কহিল, সে এখনও বল্‌চি। ছাপ-ছোপ আছে, কিন্তু পড়া-শুনা করিনি। তার সময় পেলাম কই? পড়া-মুখস্তর পালা সাঙ্গ হতেই লেগে গেলাম চাকরির উমেদারিতে,—কাট্‌লো বছর দু'তিন—তার পরে দৈবাৎ তোমার দয়া পেয়ে কলকাতায় এসে দুটো খেতে পরতে পাচ্চি।

ভাখো তারক, ফের যদি তুমি—

অকস্মাৎ, আয়নায় দুই বন্ধুর মাথার উপরে আর একটি ছায়া আসিয়া পড়িল। নারীমূর্ত্তি। উভয়েই ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল একটি অপরিচিতা মহিলা ঘরের প্রায় মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহিলাই বটে। বয়স হয়ত যৌবনের আর এক প্রান্তে পা দিয়াছে, কিন্তু সে চোখেই পড়েনা। বর্ণ অত্যন্ত গৌর, একটু রোগা, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া মর্য্যাদার সীমা নাই। ললাটে আয়তির চিহ্ন। পরনে গরদের শাড়ী, হাতে গলায় প্রচলিত সাধারণ দু-চার খানি গহনা, শুধু যেন সামাজিক রীতি পালনের জন্যই। দুই বন্ধুই কিছুক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রাখাল চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল,—এ কি! নতুন-মা যে! তাহার পরেই সে উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ের উপর গিয়া পড়িল, দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম যেন তাহার আর শেষ হইতেই চাহেনা।

উঠিয়া দাঁড়াইলে রমণী হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করলেন। তিনি চৌকিতে বসিলে রাখাল মাটিতে বসিল, এবং তারক উঠিয়া গিয়া বন্ধুর পাশে বসিল।

হঠাৎ চিন্‌তে পারিনি মা।

না পারবারই তো কথা রাজু।

মনে মনে ভাব্‌ছি, চোখ পড়ে গেল আপনার চুলের ওপর। রাঙা আঁচলের পাঁড় ডিঙিয়ে পায়ে এসে ঠেকেচে। এমনটি এ দেশে আর কারু দেখিনি। তখন সবাই বল্‌তো এর খানিকটা কেটে নিয়ে এবার প্রতিমা সাজানো হবে। মনে পড়ে মা?

তিনি একটুখানি হাসিলেন, কিন্তু কথাটা চাপা দিলেন। বলিলেন, রাজু, ইনিই বুঝি তোমার নতুন বন্ধু? নামটি কি?

রাখাল বলিল, তারক চাটুয্যে। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

তিনি এ প্রশ্নও চাপা দিলেন, শুধু বলিলেন, শুনেচি তোমাদের খুব ভাব।

রাখাল বলিল, হাঁ, কিন্তু সে বুঝি আর টেঁকেনা। ও আজই চলে যেতে চাচ্চে বর্দ্ধমানের কোন্ এক পাড়াগাঁয়ে,—ইস্কুলের হেড্-মাষ্টারি জুটেছে ওর, কিন্তু আমি বলি, তুমি এম-এ, পাশ করেছো যখন, তখন মাষ্টারির ভাবনা নেই, এখানেই একটা যোগাড় হয়ে যাবে। ও কিন্তু ভরসা করতে চায়না। বলুন তো অন্যায়।

শুনিয়া তিনি মৃদুহাস্যে কহিলেন, তোমার আশ্বাসে বিশ্বাস করতে না পারাকে অন্যায় বল্‌তে পারিনে রাজু। তারকবাবু কি সত্যিই আজ চলে যাচ্চেন?

তারক সবিনয়ে কহিল, এটি কিন্তু তার চেয়েও অন্যায় হোলো যে। রাখাল-রাজের পৈতৃক মুড়োটা স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়ে করে দিলেন ওকে ছোট্ট একটুখানি রাজু, আর

আমারই অদৃষ্টে এসে জুটলো এক উট্‌কো বাবু? তার সইবেনা নতুন-মা, ওটা বাতিল করতে হবে।

তিনি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই হবে তারক।

সম্মতি লাভ করিয়া তারক সকৃতজ্ঞ-চিত্তে কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সময় পাইলনা, তাঁহার সস্মিত মুখের উপর হঠাৎ যেন একটা বিষণ্ণতার ছায়া আসিয়া পড়িল, গলার স্বরটাও গেল বদ্‌লাইয়া, বলিলেন, রাজু, আজকাল ও-বাড়ীতে কি তুমি বড়-একটা যাওনা?

যাই বই কি নতুন-মা। তবে, নানা ঝঞ্ঝাটে দিন পনেরো কুড়ি—

রেণুর কাল বিয়ে,—জানো?

কই না! কে বল্‌লে?

হাঁ, তাই। আজ বেলা দশটায় তার গায়ে-হলুদ হয়ে গেল। এ বিয়ে তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

কেন?

হওয়া অসম্ভব বলে। বরের পিতামহ পাগল হ'য়ে মারা যায়, এক পিসী পাগল হয়ে আছে, বাপ পাগল নয় বটে, কিন্তু হলে ছিল ভালো। হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে লোকে ফেলে রাখতে পারতো।

কি সর্ব্বনাশ! কর্ত্তা কি এ সব খোঁজ করেননি?

রমণী কহিলেন, জানোই ত কর্ত্তাকে। ছেলেটি রূপবান, লেখা-পড়া করেছে, তাছাড়া ওদের অনেক টাকা। ঘটক সম্বন্ধ এনেছে, যা বলেছে তিনি বিশ্বাস করেছেন। আর জান্‌লেই বা কি? সমস্ত শুনেও হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তিনি বুঝ্‌তেই পারবেননা এতে ভয়ের কি আছে!

রাখাল বিষণ্ণ-মুখে কহিল, তবেই তো!

তারক চুপ করিয়া শুনিতেছিল, বন্ধুর এই নিরুৎসুক কণ্ঠস্বরে সে সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল,—তবেই তো মানে? বাধা দেবার চেষ্টা করবেনা, আর এই বিয়ে হয়ে যাবে? এত বড় ভীষণ অন্যায়?

রাখাল কহিল, সে বুঝি, কিন্তু আমার কথায় বিয়ে বন্ধ হবে কেন ভাই? আর কর্ত্তাই তো শুধু নয়, আর সবাই রাজী হবে কেন?

তারক বলিল, কেন হবেনা? বরের বাড়ীর মত মেয়ের বাড়ীরও কি সবাই পাগল যে বল্‌লেও শুন্‌বেনা,—বিয়ে দেবেই?

কিন্তু গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে যে!- এটা ভুল্‌চো কেন?

হলোই বা গায়ে-হলুদ! মেয়েকে তো জ্যান্ত চিতায় তুলে দেওয়া যায়না! বলিয়াই তাহার চোখ পড়িল সেই অপরিচিতা রমণী তাহার প্রতি নীরবে চাহিয়া আছেন। লজ্জিত হইয়া সে কণ্ঠস্বর শান্ত করিয়া বলিল, আমি জানিনে এঁরা কে, হয়ত কথা কওয়া আমার উচিত নয়, কিন্তু মনে হয় রাখাল, তোমার প্রাণপণে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন মতেই এ ঘট্‌তে দেওয়া চলেনা।

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, এঁরা কারা রাজু? মেয়ের সৎ-মা তো? তাঁর আপত্তি করার কি অধিকার?

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। তিনি নিজেও ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলেন, তোমাকে তাহলে একবার বাগবাজারে যেতে হবে, ছেলের মামার কাছে। শুনেচি, ও-পক্ষে তিনিই কর্ত্তা। তাঁকে মেয়ের মায়ের ইতিহাসটা জানিয়ে বারণ করে দিতে হবে। আমার বিশ্বাস এতে কাজ হবে; যদি না হয়, তখন সে ভার রইলো আমার। আমি রাত্রি এগারোটার পরে আবার আস্‌বো বাবা,—এখন উঠি। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাখাল ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু তার পরে যে রেণুর আর বিয়ে হবেনা নতুন-মা। জানা-জানি হয়ে গেলে—

না-ই হোক্ বাবা, সে-ও ভালো।

রাখাল আর তর্ক করিলনা, হেঁট হইয়া আগের মতই ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তাহার দেখা-দেখি এবার তারকও পায়ের কাছে আসিয়া নমস্কার করিল। তিনি দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তারক, তোমাকে বলা হয়ত আমার উচিত নয় কিন্তু তুমি রাজুর বন্ধু, যদি ক্ষতি না হয়, এ দুটো দিন কোথাও যেওনা। এই আমার অনুরোধ।

তারক মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু সহসা জবাব দিতেও পারিলনা। কিন্তু এ জন্য তিনি অপেক্ষাও করিলেননা, বাহির হইয়া গেলেন। রাখাল জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল তিনি পায়ে হাঁটিয়াই গেলেন, শুধু গলির বাঁকের কাছে দরওয়ানের মতো কে-একজন অপেক্ষা করিতেছিল সে তাঁহাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করিল।

(ক্রমশঃ)

বিদায়

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

"My native land 'Good Night."
Child Harolde.

বিদায় বিদায় তবে স্বদেশ আমার—
বিস্তৃত জলধি-পারে তব ক্ষীণ রেখা
ধীরে ধীরে ঘিরি নেয় সন্ধ্যার আঁধার,
বুঝি হায় তোর সনে এই শেষ দেখা!

ওই যে বিহঙ্গকুল চলিয়াছে ছুটি'
আপন কুলায় বুঝি কাননে তোমার;
শুধু মোর তরে আর রহিবে না ফুটি'
সান্ধ্য দীপ কোন ঘরে জননী আমার।

ওই নামে সন্ধ্যা ধীরে স্নিগ্ধ করি' দিন
সিন্ধুবুকে ছল ছল শুধু উছলায়,
ক্ষীণ রেখা তটভূমি নিমেষে বিলীন,
পুনঃ আর বার তবে—বিদায়—বিদায়!

বিদায়—বিদায় মোর অতি আপনার,
বিদায় কাননে তোর শ্যামল অঞ্চল,
যে আঁখি মোছেনি কভু নয়ন-আসার
আজি দেয় তোর তরে দুটী বিন্দু জল।

যদি কভু দূর দেশে হিয়ার মাঝার
উঠি ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস গগনে মিলায়,
জানিস্ জানিস্ তবে জননী আমার
তোরি তরে উচ্ছ্বসিত ক্ষুব্ধ নিরাশায়।

স্বপ্ন এ কি? নহে নহে স্বপ্ন এ তো নয়,
ওই যে সিন্ধুর বুকে উর্ম্মিমালা দলি'
কোন্ দিগন্তের পানে অশান্ত হৃদয়
হায় বুঝি চিরতরে ছুটিয়াছি চলি'।

আর কি ফিরাবে মোরে জননী আমার
তোমার স্নেহের কোলে শ্যামল অঞ্চল,
কিম্বা আজীবন হায় সপ্ত পারাবার
তোমার আমার মাঝে রবে ছল্ ছল্।

আর কি কভু গো হায় সন্ধ্যা আগমনে
ফিরিব না ক্লান্ত দেহে আপনার মাঝে?
কভু কি স্নেহের ডাক শ্রান্ত প্রাণ মনে
করিবে না ক্লান্তি দূর জীবনের কাজে?

একে একে সান্ধ্য নভে ওই ফোটে তারা
না জানি মা তোর কত কোটী পল্লী মাঝে,—
হেথা শুধু চতুর্দ্দিকে তরঙ্গের সাড়া,
বিশ্বের বেদনা বুঝি এই বুকে বাজে!

কত গৃহে ফিরিল মা, বৎস ধেনু সবে,
ঘরে ঘরে জ্বলিল মা সন্ধ্যার প্রদীপ,
মুখরিত গৃহাঙ্গন শিশু-কলরবে
কিশোরী বধূর ভালে সরমের টীপ্।

কত গৃহে পল্লীবধূ দীপ লয়ে যায়
তুলসীর মঞ্চতলে লাজ-নত-আঁখি
অঞ্চল আড়াল করি পাছে নিভে যা'য়,—
বংশ-বটমূলে কত ঝিঁঝিঁ ওঠে ডাকি'।

লক্ষ দেবালয়ে বাজে সন্ধ্যার আরতি
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশরের ওঠে ভীম রোল,
ধূপের সৌরভ ছায় চতুর্দ্দিক মথি',—
হায় হেথা বিশ্বে শুধু তরঙ্গের দোল।

কত ঘাট পারে হ'ল শেষ খেয়া পার—
—পারাণির কড়ি নিয়া বুঝি কোলাহল—
ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকিরা ঘেরে দীঘিধার
বাঁশবনে জেগে ওঠে বাদুড়ের দল।

হাট থেকে হাটুরেরা ফিরে যায় গেহ—
—সঙ্গীহারা পথে বুঝি কেহ ঘন হাঁকে—
সান্ধ্যদীপ সনে যেথা পথ চলে স্নেহ,
ওই সেই গ্রামখানি নদীটির বাঁকে।

কত ঠাকুমারে ঘিরি' শিশুদের মেলা,
কঙ্কাবতী তুলাবতী বেদনা অশেষ,
কোথায় রাক্ষসপুরী দূর সিন্ধু-বেলা
রাজকন্যা অচেতন বার হাত কেশ;

কোথা বা পারুলদিদি, চম্পা সাত ভাই,
সাতটী চাঁপার মাঝে ঢুলু ঢুলু চোখ,
রাজা ডাকে রাণী ডাকে কোন সাড়া নাই,
ঘুঁটে-কুড়ুনির ডাকে ফুটিবে আলোক;

রাজপুত্র ওই কোথা রাজ্য ছেড়ে যায়
তেপান্তর মাঠ পানে কোন্ ডাক শুনি';—
কত লক্ষ গৃহে মাগো সন্ধ্যার ছায়ায়
রূপকথা চলে তার জাল বুনি' বুনি'।

কিন্তু হায় স্বপ্ন সব—সব আজি মায়া!
কোথা বঙ্গপল্লী মার শ্যামল অঞ্চল,
কোথা তার সুনিবিড় সুশীতল ছায়া—
আর কোথা কূলহীন বারিধি চঞ্চল!

সেই বারিধির বুকে চলিয়াছি ছুটি'
কোথা কোন্ দিগন্তরে না-জানি সন্ধান;
সান্ধ্য নভে ও মা তোর তারাগুলি ফুটি'
সুধাবে কি—"কোথা তোর একটী সন্তান?"

"কোথা সে ছুটিয়া গেছে বিভ্রান্ত একাকী—
তোর কোলে কভু আর ফিরাবি কি তায়?"
দিক অন্ধ হয়ে আছে অন্ধকার মাখি'
ও মা তবে শেষ বার—বিদায়—বিদায়।

রুদ্রের আবির্ভাব

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত

বিবাহের পর ব্যোমকেশ কয়দিন হইতে আমার কাছে একটা চাকুরির জন্য ঘুরিতেছে। বলিলাম,—এখেনে চাকরি আমি পাবো কোথায়? তবে কল্‌কাতায় যেতে চাও ত' মামার কাছে লিখে দিতে পারি।

বড়োবাজারে পিপুলের দোকান করিয়া মামা বিস্তর পয়সা করিয়াছেন। তাঁহাকে লিখিয়া দিলাম। উত্তরে তিনি লিখিলেন: পরের জন্য মাথা না ঘামাইয়া নিজেই সোজা চলিয়া এস। গ্রামে বসিয়া কী কেবল পচিয়া মরিতেছ? চাকরি করিতে চাও ত' একটা বন্দোবস্ত অনায়াসেই করিয়া দিতে পারিব। লোক আমারো চাই বটে, কিন্তু অনাত্মীয় অপরিচিতকে আমার একেবারেই ভরসা হয় না। কি করিব, ব্যবসা করিতেছি। কতো লিখিব, নিজে তুমি একবার আসিতে পারো না?

মামার চিঠি পাইয়া মনে-মনে হাসিলাম। গ্রামে বসিয়া পচিয়াই মরিতেছি বটে!

ব্যোমকেশকে বলিলাম,—চাকরি করে' কী হ'বে? তোমাকে কিছু জমি ছেড়ে দিচ্ছি, চাষ করো! খাজনা বাবদ কিছু চাই না, ফসল হ'লে কিছু ভাগ দিয়ো না-হয়। কেমন, রাজি?

ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিল। গরু-লাঙল কিনিবার পয়সা নাই, আমিই ধার দিলাম। কিছু একটা মহৎ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছি এমনি ভাবে কহিলাম,—জমিতে সুবিধে যদি কিছু না করতে পারো ত' এই ধার তোমার শোধ করতে হ'বে না।

মহাসমারোহে ব্যোমকেশ লাঙল ঠেলিতে লাগিল। জাঁকালো ভাষায় খবরের কাগজে এক রিপোর্ট পাঠাইয়া

দিলাম। বি-এ পাশ-করা ছেলে চাকুরির খোঁজে ফ্যা-ফ্যা না করিয়া নিজ হাতে জমি চষিতেছে—বড়ো-বড়ো হেড্‌লাইনে খবরটা দিগ্বিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। ব্যোমকেশ ভাবিল কী যেন একটা করিতেছি! আমি ভাবিলাম মামার উপর খুব একটা প্রতিশোধ নেওয়া হইল যা হোক্!

বাসন্তী প্রথমে এখানে আসিতে রাজি হয় নাই। কিন্তু চারদিকের খোলা মাঠ, দূরে নদী ও নতুন ছবির মতো ঝক্‌ঝকে বাড়িখানি দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। ছেলে-বেলা হইতে শহরে মানুষ হইয়াছে, গ্রামের কথা শুনিতেই তাহার মনে গরুর গাড়ির চাকার একঘেয়ে করুণ আর্ত্ত-নাদের মতো একটা ক্লান্তিকর অবসাদ আসিত। কিন্তু অপর্য্যাপ্ত বাতাসে আঁচল ফুলাইয়া নদীর পাড়ে যখন আসিয়া সে দাঁড়াইল, তখন স্পষ্ট অনুভব করিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি আরো কালো ও গভীর এবং শরীরের শহুরে রুক্ষশ্রী সবুজ ও ঠাণ্ডা হইয়া উঠিয়াছে। এতো বড়ো সাম্রাজ্যে তাহার কর্ত্রীত্ব অসীম; তাহার মুখের একটি কথায় জন-মজুর একশোখানা কাজ নিমেষে সমাধা করিয়া আনে;— দেখিতে দেখিতে তাহার হুকুমে সামনের জমিটা ফুলন্ত বাগান হইয়া উঠিল; দুইটি শিশু গাছ যেখানে ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার নিচে বাঁশের একটি মাচা বাঁধা হইল;—সেখানে সকালবেলা সে পড়িবে ও বিকেলে বেড়াইয়া আসিয়া বিশ্রাম করিবে। বেড়ার গা বাহিয়া মালতীর লতা উঠিল, লোক লাগাইয়া আগাছা দূর করিয়া ছোট উঠানটি সে তাহার পায়ের তলার মতো নরম ও তক্‌তকে করিয়া তুলিল। দিল্লির দেওয়ানি-খাস্‌এর সিলিঙের মতো বাসন্তীও এইখানে ফুলের অক্ষরে লিখিয়া দিল যে স্বর্গ, বলিয়া যদি কিছু থাকে ত' এইখানে, এইখানে!

বিবাহের দান-সামগ্রীর যাবতীয় জিনিস আসিয়া পৌঁছিল—দক্ষিণের ঘরটাকে ছোটখাটো একটা ড্রয়িং-রুম বানাইয়া ফেলিলাম। বন্ধু-বান্ধবের বালাই নাই, আমরাই পরস্পরের নির্জ্জনতা কথায় ও স্পর্শে, হাসিতে ও দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছি। বাসন্তী যখন একা ঘরে বসিয়া রান্না করে ও আমি যখন একা ঘরে বসিয়া গল্প লিখি তখনো আমরা নির্জ্জন নই—যখন কিছুই নেহাৎ করি না তখনো আকাশ ও আলো, তারা ও অন্ধকার মিলিয়া আমাদের পরিপার্শ্বের শূন্যতাকে স্বপ্নের মতো আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

মা মারা যাইবার পর বাবা একা-একা এইখানে বসিয়া বিস্তৃত আকাশের সঙ্গে অপরিসীম বিরহ ভোগ করিতে-ছিলেন। আমি তখন কলিকাতায় মেস্‌-এ থাকিয়া কলেজে পড়িতেছি ও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের যুবকের মতো কলেজ ঠিক না পলাইলেও শনিবার-শনিবার শ্বশুরালয়ে নিয়মিত আতিথ্য নিতেছি। এবং আশ্চর্য্য এই, গল্পে-গুজবে খাওয়া-দাওয়ার অসাবধানে রাত্রি যখন বেশি করিয়া ফেলিতাম ও জোরে ঘণ্টা বাজাইয়া লাষ্ট ট্রামকে যখন অনায়াসে চলিয়া যাইতে দিতাম, তখন চট্ করিয়া মনে পড়িয়া যাইত যে আজ রাত্রে মেস্‌-এ যাইবার কোনো পথ-ই আর খোলা রাখি নাই। এবং শনিবারের রাতটাই যখন যাই-কি-না-যাই এমনি মিথ্যা উত্তেজনার মধ্য দিয়া কাটাইয়া দিলাম, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া রবিবারের রাতটাই বা ঘুমাইয়া লইতে কী হইয়াছে! এমনি এক সোমবার জোরে অনিদ্রা-ক্লিষ্ট চক্ষু লইয়া মেস্‌-এ ফিরিয়া আসিয়া দেখি আমার নামে একটা টেলি কখন হইতে পড়িয়া আছে। খবর আর কিছু নয়, বাবা হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা গিয়াছেন।

সে-সব অনেক কথা। শ্বশুর-মহাশয় এখানেই একটা কাজ দেখিয়া লইতে বলিলেন—মেয়েকে চোখের কাছে রাখিবেন ও পচা পুকুরের জল ঘাঁটিতে দিবেন না এমনি একটা অজুহাতে আমার জন্য বাড়ি-ভাড়ার টাকা গুণিতেও রাজি হইয়া গেলেন। কিন্তু গ্রামে যাইবার কী যে গোঁ ধরিয়া বসিলাম, মনে হইল ত্রেতা যুগে রাম হইয়া অবতীর্ণ হইলে সেই জোরে অনায়াসে হরধনু চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিতাম। গ্রামে ত' আসিলামই, বাসন্তীকেও সঙ্গে লইয়া আসিলাম। সে যতোই কেন না নাসাগ্রভাগ কুঞ্চিত করুক, এতো বড়ো আকাশ ও মাঠ-নদী ভরিয়া এতো প্রচুর জ্যোৎস্না তাহার দুই চোখে আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। বাপের বাড়িতে নিতান্তই সে পরগাছা ছিল, কিন্তু এইখানে সে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে কোথায় যে তাহার আসন, এতো দিনে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিয়া তাহার অহঙ্কারের আর সীমা নাই।

বাসন্তীকে লইয়া আসিবার সময় শ্বশুর-মহাশয়ের সঙ্গে

ছোটখাটো একটা বচসায় সূত্র ধরিয়া ভীষণ কলহের অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গেল। তিনি সরাসরি বলিয়া বসিলেন : বাসন্তী যদি আমার কথার অবাধ্য হয়, তবে ওর মুখ আমি কখনো দেখ্‌বো না। বাসন্তীর মুখের দিকে তাকাইলাম, —সে ধীরে আমার পাশে সরিয়া আসিল। মেয়ের এই দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুট একটা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বাসন্তীকে লইয়া ট্যাক্সি করিয়া ষ্টেশনের পথে আসিতে-আসিতে কহিলাম,—তুমি রামায়ণে সীতার মতোই একটা অসমসাহসিক সতীর দৃষ্টান্ত দেখালে।...

রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বিয়ের সময় শ্বশুর-মহাশয় সখ করিয়া যাহা-যাহা যৌতুক দিয়াছিলেন স্পষ্ট রূঢ় কণ্ঠে তাহা দাবি করিয়া বসিলাম। খাট টেবিল আল্‌না-দেরাজ বাসন-কোসন হইতে সুরু করিয়া বাসন্তীর চুলের পিন্‌ ও আমার ফাউন্টেন-পেন্‌এর ক্লিপটি পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিল। সঙ্গে শ্বশুর-মহাশয় কড়া করিয়া একটা চিঠি দিয়াছিলেন বটে যে এই সব জিনিস ঘরে পুঁজি করিয়া রাখিতেও তাঁহার ঘৃণা হইতেছে, কিন্তু নিজের ঘরে পুঁজি করিয়া রাখিবারো যে কোন কালে তাঁহার অধিকার ছিলনা সবিনয়ে এই কথাটাও তাঁহাকে জানাইয়া রাখিলাম। যাহা হোক্‌, সেইখানেই যবনিকা পড়িল। কিন্তু বাসন্তী এততেও ক্ষান্ত হইল না,—সময়ে-অসময়ে কেবল নানাজাতীয় ক্যাটালগ্‌ লইয়া নাড়া-চাড়া করে, আর এটা-ওটা ফরমাজ করিয়া কলিকাতার সাহেব-পাড়ার দোকানগুলিকে ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তোলে। বিয়েতে নগদ যাহা কিছু পাইয়াছিলাম তাহা দিয়া বইয়ে-আসবাবে ঘর-দুয়ার ভরিয়া ফেলিলাম। পা-পোষের মতো পুরু কার্পেট হইতে সুরু করিয়া দেয়াল-জোড়া বড়ো-বড়ো দিশি-বিলিতি ছবিতে ঘর-দুয়ার গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল।

নিজের শরীর সম্বন্ধে যতোটা না হোক্‌, গৃহ-প্রসাধনে বাসন্তী একেবারে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি কিন্তু গৃহ ছাড়িয়া গৃহস্বামিনীকেই শুধু দেখিতেছি। বাসন্তীকে দেখিতে এখন কতো যে সুন্দর হইয়াছে ভাবিয়া তৃপ্তির কূল পাইতেছি না। প্রত্যেক ছবির প্রকৃত আবেদন যেমন তাহার পটভূমিতে, তেমনি অন্তরালহীন আকাশের প্রতি-বেশের মধ্যে এতদিনে তাহার সত্যিকার রূপ উদ্‌ঘাটিত হইল! পায়ের রক্তাভ নখকণা হইতে সুরু করিয়া কৌতূহলা-বিষ্ট ভুরু দুটির চঞ্চল সঙ্কেতে লাবণ্যের তরল একটি নদী-রেখা নিঃশব্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বলিতাম,—এতো সব জিনিস-পত্রে ঘর বোঝাই করছ, এ তোমার দেখবে কে? লোককে দেখাতে না পারলে বিলাসিতায় সুখ কী!

বাসন্তী কোমরে আঁচলটা জড়াইতে-জড়াইতে কহিত,—কে আবার দেখবে? আমি আর তুমি।

হাসিয়া বলিতাম,—নিজেদের দেখবার জন্য নিজেরাই ত' যথেষ্ট আছি। এ-সব বাজে আড়ম্বরে নিজেদের খালি সঙ্কীর্ণ করে' রাখা!

বাসন্তী সেই সব কথা শুনিবারই মেয়ে বটে! ততক্ষণে পেট্রোম্যাক্সটা ফিট্‌ করিলে তাহার কাজ দিবে।

জীবনে নূতন একটি আবহাওয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত গাঢ়, প্রথম চুম্বনের মতো রোমাঞ্চময়। চারিদিকে কেমন একটা মুক্তির নিমন্ত্রণ পাইতেছি, আকাশের প্রত্যেকটি তারা বাসন্তীর দেহের প্রত্যেকটি রোমকূপের মতো পরিচিত, ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বাসন্তীর দেহে নূতন স্বাদ, আমার অনুভূতিতে নূতন তীব্রতা! গ্রামের এই বিরাট সঙ্গহীনতায়ও নিজেদের কিছুমাত্র নির্জ্জন লাগে না; যখন আমি ঘরে বসিয়া লিখি ও বাসন্তী রান্নাঘরে বসিয়া রান্না করে, তখনও প্রকৃতি শব্দে নিঃশব্দে আমাদেরই মতো পরস্পরের কাছে অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। অথচ শহরের জন-বহুল বিপুল উৎসব-আয়োজনের মধ্যেও নিজেকে কতো একা ও অনর্থক মনে হইয়াছে।

এই নতুনতরো নেশা ছাড়িয়া আমি শহরে গিয়া চাকুরি করিব ও রাস্তায় চলিতে প্রতিমুহূর্ত্তে গাড়ি-ঘোড়ার উৎপাত হইতে বাঁচাইয়া চলিবার স্নায়বিক উত্তেজনায় দিনের পর দিন ক্লান্ত হইতে থাকিব—শ্বশুর-মহাশয় আমাকে কী ভাবিয়াছেন!

বাবা নগদ টাকা কিছু রাখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু এই ছোট সুন্দর বাড়িখানি, বিঘে পাঁচ-সাত আবাদি জমি, কয়েক ঘর প্রজা এই নিয়াই আমি আমার জীবনকে সুদীর্ঘ একটি রবিবারের সুরে ভরিয়া নিতে পারিব। চাকুরি করিব কোন্‌ দুঃখে? জীবিকা-নির্ব্বাহের ক্ষমাহীন কঠিন প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব এড়াইয়া এই যে অবারিত একটি

আলস্য ভোগ করিতেছি কী বলিয়া ইহার তুলনা দিব! আমার এই অবকাশের আকাশ হইতেও তারার স্ফুলিঙ্গের মতো কত কাহিনী কত ঘটনা কত চরিত্র মূর্তিময় হইয়া উঠিবে কে বলিতে পারে!

রাত করিয়া গাছ-পালা ঝাপসা করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। শিয়রে মোমবাতি জ্বালিয়া নতুন একটা গল্প লিখিতেছি। ইজিচেয়ারের গভীর কোলে ডুবিয়া গিয়া বাসন্তী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

কান পাতিয়া দূরে নদীর তরল কোলাহল শুনিতেছি!

আবছা অন্ধকারে বাসন্তীকে কেমন-যেন অত্যন্ত ক্লান্ত বলিয়া মনে হইল। মনে হইল গ্রামের এই অজস্র প্রশান্তি ধীরে-ধীরে তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। সে হয়ত' গভীরতার বদলে বিস্তার কামনা করে—প্রচুর বৈচিত্র্যের মাঝে নিজেকে সে প্রকাশিত, বিকীর্ণ করিতে চায়—এইখানে তাহার আর ভালো লাগিতেছে না। একটানা বৃষ্টির শব্দে তাহার দীর্ঘশ্বাসটি স্পষ্ট কানে বাজিল।

পায়রার বুকের মতো তাহার নরম তপ্ত দেহটিকে কোলে করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। জাগিয়া উঠিয়া সে আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। কহিল,—আমার বড্ড ভয় করছে।

বলিলাম,—ভয়? ভয় কিসের?

আর সে কথা কহিল না। আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

মোমবাতিটা নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম। চারিদিকের রাশি-রাশি কোলাহল যোজনব্যাপী বিরাট স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে। এই কোলাহলও বাসন্তী সহ্য করিতে পারে না, তাহার ভয় করে। জনবিরল মাঠের মধ্য দিয়া ঝোড়ো হাওয়ার উদ্দাম দীর্ঘশ্বাস তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে, সারা রাত ঘুমাইতে দেয় না।

কিন্তু ভোর হইতেই আবার সেই নিঃশব্দতা! বাসন্তী পরিচিত জগতে নামিয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়ে। হাসিমুখে জিনিস-পত্র ঝাড়ে-পোঁছে, ঘর-দুয়ার ছুরির ফলার মতো ঝক্‌ঝকে করিয়া তোলে।

নদী কাল রাত্রে নাকি অনেক দূর ভাঙিয়া আসিয়াছে—বাসন্তীকে লইয়া তাহাই দেখিতে চলিলাম।

বৃষ্টি পাইয়া ব্যোমকেশের ক্ষেত মাতামাতি সুরু করিয়াছে। গাঢ় সবুজে ফিকে সোনালির আভা দিয়াছে দেখা যায়। ব্যোমকেশের স্ফূর্তি আর ধরে না। সেও আমাদের সঙ্গে চলিল।

বেশি দূর যাইতে হইল না—নদীই যা-হোক অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছে। এখনো তাহার আর্তনাদ থামে নাই। সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া এখনো তাহার উত্তাল উৎসাহ। ভীষণ খাড়া পাড়, নিচে চাহিলে দস্তুরমতো পা কাঁপিতে থাকে। দাঁড়াইয়া আছ, অমনি তোমাকে বেষ্টন করিয়া মাটিতে প্রকাণ্ড একটা চিড়্ ধরিয়া গেল, সাবধান না হইলেই অমনি তোমাকে শুদ্ধ্ গ্রাস করিয়া বসিবে। দূরে চাহিলে মনে হয় একটা ফিন্‌ফিনে শাদা সিল্কএর আঁচল ফাঁপাইয়া কে যেন সাঁতার কাটিতেছে—খালি পাড়ের কাছেই তাহার দিগ্‌বসনা রাক্ষুসি মূর্তি! কাল শেষরাত্রের দিকে নটবর ভূমালির ঘরটা নিয়াছে—অন্নের জন্য ছেলেপিলে লইয়া সে বাহির হইতে পারিয়াছিল; চালের কুটাটি পর্য্যন্ত বাঁচাইতে পারে নাই। নদী একটু জুড়াইলে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে অন্তত তাহার স্ত্রীর গলার হাঁসুলিটা সে উদ্ধার করিতে পারে কি না। স্ত্রী মারা গিয়াছে পর এই একটিমাত্র চিহ্নই সে কোনোক্রমে আঁকড়াইয়া ছিল,—শত অভাবে পড়িয়াও তাহা সে বিক্রি করে নাই। কাহারো বাধা সে মানিবে না, জলটা একটু জুড়াইলেই সে নামিয়া পড়িবে। অমাবস্যা ছাড়িতে আর ঘণ্টা দুইমাত্র বাকি।

বাসন্তী বেশিক্ষণ সেইখানে আমাকে দাঁড়াইতে দিল না। গর্জ্জমান বিরাট নদীর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ভয় করে। মনে হয় ফেনময় বাহু বাড়াইয়া অলক্ষ্যে সে আমাদের দুইজনকে ডাকিতেছে। পায়ের কাছের মাটিতে হঠাৎ একটা চিড়্ ধরিতেই সন্ত্রস্ত হইয়া বাসন্তীকে লইয়া পলাইয়া আসিলাম।

বিকেল হইলেই মা'র কোলে ঘুমন্ত খুকিটির মতো নদীর জল স্তিমিত হইয়া আসিল। বাসন্তী এতক্ষণে হাসিয়া কথা কহিতে পারিতেছে। দুইজনে আবার বেড়াইতে বাহির হইলাম—ব্যোমকেশ অবশ্য এইবার সঙ্গে

আসিল না। চলিতে-চলিতে শ্মশান ছাড়িয়া একটা নির্জ্জন মাঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছি। নদী-ভাঙা প্রকাণ্ড একটা অশ্বথের গুঁড়ির উপর পাশাপাশি দুইজনে বসিলাম। সামনেই নদী—এখন দেখিতে নিতান্তই বাঙালি মেয়ের মতো নিরীহ, রূপালি গলায় মৃদু-মৃদু কথা কহিতেছে। যতো ভাবি নদীর দিকে বেড়াইতে আসিব না, ততোই নদী আমাদের কাছে টানিয়া আনে। আর যাইবারই বা জায়গা কোথায়? যেখানে যাইব সেইখানেই নদী তাহার চঞ্চল ও সুনীল চক্ষু মেলিয়া রাখিয়াছে! দেখিতে-দেখিতে কতো কাছে যে আগাইয়া আসিল। আমাদের বাড়ির দক্ষিণে যে ঝাউগাছের সারি ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া আকাশকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, দেখি তাহা হঠাৎ কোন্‌দিন ফাঁকা হইয়া গেছে! এখন দক্ষিণটা একেবারে শাদা, সবুজ বা নীলের কোথাও এতটুকু বাধা নাই—যেন অবিনশ্বরতার গাঢ় রঙ। এত বড়ো মুক্তির চেহারা দেখিয়া দুইজনে মনে-মনে ভীত হইয়া পড়ি, কিন্তু সেই ভয় পরস্পরের থেকে লুকাইতে গিয়া আরো সহজে ধরা পড়িয়া যাই।

যে-জায়গাটায় আসিয়া বসিলাম তাহা গাছ-পাতার আড়ালে, কা'র একটি কুটীরের নিভৃত আঙিনায়! কোন চাষা-ভুষোর বাড়ি হইবে, নদী কাছে আসিয়া পড়ায় আগেই বিদায় নিয়াছে। ছোট উঠানটি ঘিরিয়া সংসারের ছোট-ছোট চিহ্ন এখনো এখানে-সেখানে ছড়ানো আছে দেখিলাম। তাড়াতাড়িতে সব জিনিস হয় ত' সরাইতে পারে নাই—মানুষের প্রাণের চেয়ে কতকগুলি ডালা-কুলোর দাম ত' আর বেশি নয়। তবু সেই পরিত্যক্ত শূন্য ঘরের নিরানন্দ চেহারা দেখিয়া মন ভারি বিমর্ষ হইয়া উঠিল। এখন তাহারা কোথায় উঠিয়া গেছে না জানি!

বাসন্তী হাল্‌কা সুরে অনেক সব কথা কহিতে লাগিল। সম্প্রতি এখানে সে ছোটখাটো একটা পাঠশালা করিতে চায়—বিনে-মাইনের ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে পড়াইয়া তবু যা-হোক্ করিয়া দিন তাহার কাটিবে। আমি উহার আবদার চিরকাল পালন করিয়াছি, আজো কহিলাম,—সরকার-মশায়কে বলে' দেব, সামনের বাগানের ধারে তালপাতার ছাউনি দিয়ে একখানা ঘর তুলে দেবেন।

বাসন্তী ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল,—একটুখানি ত' ঘর, তা আবার তালপাতার কেন? রাণিগঞ্জের টালি দেবে।

—একটুখানি বলে'ই ত' তালপাতার বল্‌ছি।

—গরিব ছেলে-মেয়েরা পড়বে বলে'ই বুঝি এমনি হেনস্তা করতে হয়? বেশ পাকা দালান হ'বে—উঁচু ক্লাশের ছাত্র জুট্‌লে তুমিও মাষ্টারি করতে পারো,—অবশ্যি আমি যদি দরখাস্ত মঞ্জুর করি। দু'জনে কাজ পেয়ে বেঁচে যাবো। এমনি আর পারিনে।

বলিলাম,—খালি পাকা দালান হ'লেই চল্‌বে?

—বাঃ, বেঞ্চি-চেয়ার কিনতে হ'বে না? গ্লোব, ম্যাপ, ব্ল্যাকবোর্ড, আলমারি—সে-সব ফর্দ্দ আমি ঠিক করে' রাখ্‌বো। সরকার-মশায়কে বলে' তুমি কেবল টাকা জোগাড় করে' দেবে।

—সে যে অনেক খরচ।

—টাকা তবে আছে কী করতে? এ ত' আর বাজে কাজে উড়োচ্ছি না—দস্তুরমতো দেশের কাজ।

—কিন্তু টাকা পাবো কোথায়?

—সরকার-মশায়কে বল্‌লেই তিনি বন্দোবস্ত করে' দেবেন। কাজ ছাড়া আমি বাঁচি কী করে' বলো? ওদিকে আমার ভারি-হাতে একটা অসুখ করুক্, তখন ত' উঠে পড়ে' খরচ করতে সুরু করবে! কেমন, ঠিক কি না।

তাহার একটি হাত নিজের মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম। মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক গাঙ-শালিক উড়িয়া গেল। পাখার চাঞ্চল্যে সমস্ত নিঃশব্দতা হঠাৎ স্বচ্ছ, তরল হইয়া আসিল। দূরে খেজুর গাছের দীর্ঘ পাতার ফাঁকে একটি তারা উঠিয়াছে। সূর্য্য কখন ডুবিয়া গিয়াছে খেয়াল করি নাই।

অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেই নদীকে পিছনে রাখিয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। যতো এগোই ততোই মনে হয় নদীও যেন নিঃশব্দে আমাদের অনুসরণ করিতেছে। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি নিঝুম কালো নদী বালির বিছানায় গা এলাইয়া ঘুমাইতেছে—কোথাও যেন এতটুকু নিশ্বাসের স্পন্দন নাই। দেখিয়া ভারি নিশ্চিন্ত হইলাম। বাসন্তী আমার দিকে চাহিয়া কেমন করিয়া যেন একটু হাসিল।

দিন পনেরো-কুড়ির মধ্যে বাসন্তীর স্কুলের দালান উঠিয়া গেল।

বাসন্তীর আনন্দ দেখে কে! নিতাই কামারের দুইটি ছেলে নিয়া সে অ-আ সুরু করিয়া দিল। ইহাদের একটিও যে ভবিষ্যতে হাইকোর্টের জজ হইবে না এমন কথা হলফ করিয়া বলিবার আর সাহস রহিল না।

দুপুরের আগেই বাসন্তী খাওয়া-দাওয়ার পাট তুলিয়া 'ডাষ্টার' ও খড়ি লইয়া ইস্কুলে গিয়া ঢোকে, আর নিতাই কামারের দুরন্ত দুই ছেলে অক্ষর ভুলিয়া যতোই ঘরময় দাপাদাপি করিতে থাকে, বাসন্তীর উৎসাহ ততোই বাড়িয়া যায়। শাসন করিবার পদ্ধতিটা তাহার অতিমাত্রায় আধুনিক। একটুও রাগে ত' সে না-ই, বরং দুরন্ত ছেলে দুইটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমায়-চুমায় চোখ-মুখ আচ্ছন্ন করিয়া উহাদের সায়েস্তা করিতে চেষ্টা করে।

দক্ষিণের কোঠায় বসিয়া আমি তাহা দেখি ও লিখিবার কিছু প্লট্ খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে একটি সন্তানকামনাতুরা নারীর নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা লইয়া গল্প লিখিবার ভাষা খুঁজিয়া বেড়াই।

গ্রামে সম্প্রতি কে-একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছে। যাগ-যজ্ঞ করিয়া নদী শুকাইয়া দিবে বলিয়া আমাদেরই সম্মুখের মাঠে তাঁবু গাড়িয়াছে। সেখানে আজ বড়ো ভিড়। পূজা যখন একটা হইবেই, প্রসাদ নিশ্চয় আর বাদ পড়িবে না,—অতএব সেইখানে না গিয়া এইখানে বসিয়া ভালুকের মতো ভীষণ দুইটা অক্ষরের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া তাহাদের অবয়বের অলৌকিক গঠন-প্রণালীটা আয়ত্ত করিতে হইবে নিতাই কর্ম্মকারের ছেলেরা তাহা বরদাস্ত করিতে পারিল না। বাসন্তীর আঁচলের তলা হইতে কখন্ ছুটিয়া পলাইল।

বাসন্তী বিরত হইবার মেয়ে নয়। কখন আবার ইস্কুলের জন্য উমেদারি করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে!

মাসখানেক কাটিয়া গেল। এত করিয়াও ছেলেতে-মেয়েতে মিলাইয়া চার-পাঁচটির বেশি সে জোগাড় করিতে পারিল না। নদীতে গ্রাম লোপাট হইতে চলিল, বাসন্তীর হাতে দিগ্‌গজ হইবার জন্য কে এখানে সথ করিয়া বসিয়া থাকিবে?

সন্তানকামনাতুরা নারীর সেই গল্পটা আজ রাত্রে ঘুমাইবার আগে বাসন্তীকে শুনাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু নদীর গর্জ্জনের সঙ্গে রাত্রির অপার নিঃশব্দতা মিলিয়া তাহাকে এমন অভিভূত ও ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে প্রস্তাবটা পাড়িবার আগেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার শুইবার ভঙ্গিটা এত করুণ ও কৃশ যে মায়া করিতে লাগিল। ছুইয়া পড়িয়া তাহার দেহে—রাত্রির নিঃশব্দতার মতো শীতল দেহে চুমা খাইলাম, কিন্তু সে একটুও সাড়া দিল না। ভাটার নদীর মতো নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া রহিল।

আশ্চর্য্য, আমার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল নদীর এই ক্ষিপ্ত উদ্বেলতা বাসন্তীর যৌবনকে ক্রমে-ক্রমে ম্লান, স্তিমিত করিয়া আনিয়াছে। নদীর লবণাক্ত তিক্ত স্বাদের কাছে বাসন্তীর দেহের মদিরা অনেকাংশে জলীয়, তাহাতে আর সেই আনন্দময় জ্বালা নাই। নদী এখন এত প্রত্যক্ষ, এত নিদারুণ, এত অজস্র-উচ্ছ্বসিত যে বাসন্তীকে সে অনায়াসে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। প্রকৃতির কাছে মানুষের এই অপ্রতিবাদ পরাভব ইহার আগে আর কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

বাসন্তীর আর সেই লীলা নাই, সেই আবেগের আগুন তাহার নদীর জলে নিভিয়া গেছে। আমি বোধ হয় দিনে-রাত্রে নদীর এই উন্মাদনায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিলাম—বাসন্তীকে আর চোখে ধরিল না।

গফুর তরি-তরিকারি বেচিয়া দিন গুজ্‌রাইত—একদিন সপরিবারে সে আসিয়া আমার কাছে ইস্কুল ঘরে থাকিবার মিনতি জানাইল,—কাল রাত্রে তাহার ঘর-বাড়ি ক্ষেত-খামার নদীর জলে উজাড় হইয়া গেছে। আজ রাতটা কোনো রকমে কাটাইয়া সে অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে—কোথায় যে যাইবে এখনো তাহা ঠিক করে নাই। বাসন্তীর থেকে চাবি চাহিয়া সরকার-মহাশয়কে দিয়া দরজা খুলাইলাম। উহাদের জায়গা হইল—এবং দেখিতে দেখিতে ইস্কুল-ঘরটা বিচিত্র একটা ধর্ম্মশালার চেহারা নিয়া বসিল। কাহারো নড়িবার নাম নাই। শেষে কেবলই মনে হইতে লাগিল নদী এই হতভাগাদের খুঁজিয়া ফিরিতেছে—উহাদের না সরাইলে হয়ত' আমারই দরজার কাছে আসিয়া হানা দিবে! গরুর গাড়ি ডাকাইয়া পোঁটলা-পুঁটলিতে চিঁড়ে-চাল বাঁধিয়া উহাদের

পথ দেখিতে বলিলাম। রাজি না হওয়া ছাড়া উহাদের উপায় ছিল না—উহাদের তাড়াইবার জন্ত বাসন্তী এমন বিজাতীয় গোঁ ধরিয়াছে! যদি ক্ষুধার তাড়নায় একদিন সকলে মিলিয়া লুঠ-তরাজ করিয়া আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ফেলে! উহারা একে-একে বিদায় নিল বটে, কিন্তু নতুন গৃহ-প্রবেশের সম্ভাবনায় কেহ যে বিশেষ খুসি হইল এমন মনে হইল না। রাজা মিঞা ত' ঝাঁঝালো গলায় দস্তুরমতো শাসাইয়া গেল যে, এমন করিয়া যে গৃহহীনদের তাড়ায় রাক্ষুসী নদী তাহাকেও তাড়াইয়া ফিরিবে!

আমাদের অতিথিবৎসল না হওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না, কয়েকদিন পরেই আরেক দল লোক আসিয়া হাজির—ইস্কুল-ঘরে আজ রাত্রের জন্ত তাহাদের ঠাঁই দিতে হইবে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল,—কণ্ঠস্বরটা যে কাহার প্রথমে ঠিক চিনিতে পারিলাম না। জান্‌লা ফাঁক করিয়া দেখিলাম লোকটার পিছনে একটি স্ত্রীলোক ও তাহাকে ঘন করিয়া ঘেরিয়া কতগুলি শিশু ভিজা কাপড়ে হি-হি করিয়া কাঁপিতেছে—এতো বড়ো আকাশের তলে কোথাও তাহাদের এতটুকু আশ্রয় নাই। লণ্ঠন জ্বালিয়া ছাতা মাথায় দিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম এ আর কেহ নয়, আমারই প্রজা—নবীন মাইতি। বুঝিতে বাকি রহিল না, নদী আমারো জমিতে থাবা বসাইয়াছে!

বলিলাম,—ঘর-দোর সব গেলো?

নবীন গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—সব বাবু, কোনো রকমে সেরে আসতে পেরেছি। আজই এমন ঝড়-বৃষ্টি করে' না এলে আরো কিছুদিন থাকতে পারতাম। এখন আপনি জায়গা না দিলে ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় যাই বলুন।

পরিষ্কার বুঝিলাম তাহার কাছে যে বাকি-খাজনা পাওনা ছিল নদী তাহাও কাড়িয়া নিয়াছে।

ধমক দিয়া উঠিলাম: সময় থাকতে সরতে পারিস নি? জিনিসপত্র কতক ত' অন্তত বাঁচ্‌তো।

কিন্তু ধমকাইয়া তাহাকে কী করিব? স্ত্রী-পুত্র লইয়া যে বাঁচিতে পারিয়াছে, এই ঢের—তুচ্ছ কতকগুলি জিনিস দিয়া তাহার কী হইবে?

নবীন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল,—তাড়াতাড়িতে এই মাদুর আর বালিশ দুটো শুধু নিতে পেরেছি—

ও-দিক হইতে নবীনের ছোট ছেলে বলিয়া উঠিল:—আর আমি আমার এই নাটাইটা, বাবা!

মুখ-চোখ বিবর্ণ করিয়া সরকার-মহাশয় ভয়ে-ভয়ে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লেখা হইতে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম: আজকে কী নতুন খবর?

সরকার-মহাশয়ের মুখে তক্ষুনি ভাষা জুয়াইল না। অনেক ঢোঁক গিলিয়া পরে কহিলেন,—আমগাছগুলি কাল গেছে।

বিস্মিত হইব না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু খবরটা এমন মর্ম্মান্তিক যে মনে হইল যেন এইমাত্র কোনো আত্মীয়তম পরমবন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনিতেছি। চমকাইয়া উঠিলাম: কোন্ আমগাছ? সিঁদুরেটা?

—সব। সরকার-মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারিলেন না।

মনে আছে গত বৎসর এমনি বৈশাখের সন্ধ্যায় বাসন্তীকে লইয়া এই আমবাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়া নির্লজ্জ এই নদীর বন্তার মতো অকস্মাৎ আকাশে তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। জোরে বাতাস ছাড়িতেই কচি-কচি আম অজস্র শিলাবৃষ্টির মতো এখানে-ওখানে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল,—কোঁচড় বাঁধিয়া বাসন্তীর সে কী আম কুড়াইবার ঘটা! ধূলায় সমস্ত মাঠ-বাড়ি একাকার হইয়া গেছে, খানিকটা গরম থাকিয়া সমস্ত শূন্ত পাথরের মতো ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, কোথায় কাহাদের গরু-ছাগল ভয় পাইয়া চীৎকার পাড়িতেছে—বৃষ্টি এই আসিল বলিয়া! আর, আকাশের যেমন চেহারা, বৃষ্টি একবার আসিলে সহজে থামিবার নাম করিবে না। কিন্তু কথা শুনিবার মেয়ে বাসন্তী নয়। হাওয়ায় চুল ও আঁচল এলো করিয়া প্রাণপণে সে আম কুড়াইতে লাগিল। ঝড় এমন দুর্দান্ত যে তাহাকে প্রবল পুরুষ-স্পর্শের আলোড়নে একেবারে বিপর্যস্ত ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বলিলাম,—কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ? ঝড় থামলে চাকরকে পাঠিয়ে দেব, সব আম কুড়িয়ে নেবে।

বাগান ত' আমাদেরই—ভাবনা কিসের? বাসন্তী তবুও কথা শুনিল না। উন্মত্ত বাতাসে কাপড়ের প্রান্ত উড়াইয়া পিঠময় চুলের ঢেউ তুলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আম কুড়াইতে লাগিল। আবহাওয়াটি এতো গম্ভীর ও এতো ভয়ঙ্কর যে তাহাকে আমার অত্যন্ত অপরিচিত ও অপরিচিত বলিয়াই প্রখরতররূপে সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

বাসন্তীকে বলিলাম,—চলো, দৃশ্যটা একবার দেখে আসি।

নিজে ত' যাইবেই না, আমাকেও সে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া রহিল। খবরটা তাহার কাছে এতো নিদারুণ যে শতপুত্রশোকে গান্ধারীর মতো সেও বোধহয় অন্ধ হইয়া যাইবে।

আজকাল আমরা আর বেড়াইতে বাহির হই না, স্থানের ও সময়ের সমস্ত পরিধি নদী অনায়াসে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। ঘরে বসিয়াই নদী দেখি, প্রচুর হাওয়ায় দেয়ালের প্রকাণ্ড ছবিগুলি মেঝের উপর ভাঙিয়া পড়ে। বিস্তৃত জলরাশির কিনারে মর্ত্যের দুইটি প্রাণী মৃত্যুর প্রলোভন এড়াইয়া কোনোরকমে একের পর এক মুহূর্ত্ত গুণিতেছি!

তারপরে আসিল ব্যোমকেশ। খবরটা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার দরকার ছিল না, সময় থাকিতে বুদ্ধিমানের মতো হাটে গিয়া সে যে লাঙল ও বলদ-জোড়া বিক্রি করিয়া আসিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে তারিফ্ করিলাম—পয়সাটা ঠিক তাহারই প্রাপ্য কি না তাহা আর বিচার করিয়া দেখিলাম না। কেবল এই-ই দুঃখ হইতে লাগিল যে তাহাকে এইবার সত্যি-সত্যিই চাকরির জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। কিন্তু খবরের কাগজের সম্পাদক সেই কথা জানিতে আসিবেন না। জানিলেও এতো বড়ো ব্যর্থতার কথা সসমারোহে ছাপিবার আর তাঁহার আগ্রহ থাকিত না। প্রকৃতির কাছে মানুষের এই পরাভবের ব্যর্থতার মধ্যে মহিমা নাই, এই পরাজয় মানুষের নিজের সৃষ্টি নয় বলিয়া। এতো দুঃখেও ব্যোমকেশ তাই সুখী হইতে পারিল না।

এইবার সময় হইল। শত-লক্ষ হাত মেলিয়া নদী ইস্কুল-ঘরটাকে আক্রমণ করিয়াছে।

নবীন আগেই সরিয়াছে, অতএব কাহারো জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইবার নাই।

বাসন্তী বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল,—অমনি-অমনি নেতে দেবে নাকি?

এতো বড়ো বিপদের সমুখে পড়িয়াও যদি বাসন্তী দার্শনিক না হয় তবে কী করিতে পারি? বলিলাম,—কোন্ জিনিস তুমি আঁকড়ে ধরে' রাখতে পারো শুনি? যা যায়, যাক্।

বাসন্তী কহিল,—কিন্তু টুল-চেয়ারগুলিও ত' বেচ্‌তে পারতে?

—কোথায় বেচ্‌বো? কিনবে কে? কতোই বা দাম পাওয়া যাবে? পয়সা যা পাবে তাও কি অমনি যাবে না খরচ হ'য়ে? ও নিয়ে মিথ্যে মন খারাপ করো না—দেখ, মৃত্যুর এমন চমৎকার চেহারা আর দেখেছ কখনো?

দক্ষিণের কোঠায় পাশাপাশি চেয়ারে দুইজনে বসিলাম। দেখিলাম সরকার-মহাশয় লোক লাগাইয়া ইস্কুল-ঘরের জিনিস পত্রগুলি বাহির করিতেছেন। মনে-মনে হাসিলাম, কোথায় এগুলি তিনি সরাইয়া রাখিবেন—কত দূরে? কে ইহাদের বোঝা টানিয়া বেড়াইবে? তবু নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ইহাদের তুলিয়া দিতে সরকার-মহাশয়ের মন যেন কেমন করিতেছিল।

হাওয়ায় বাসন্তীকে একেবারে উড়াইয়া নিতেছে। নদী যতো তাহার আবরণ কাড়িয়া লইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতেছে ততই সে কুণ্ঠিত, ম্রিয়মাণ হইয়া এতটুকু হইয়া যাইতেছে। ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো তাহাকে এমন দুর্ব্বল লাগিল—এই বিরাট সৌন্দর্য্য-সমারোহের মাঝে সব এমন অকিঞ্চিৎকর মনে হইল যে সেই মুহূর্ত্তে বাঁচিয়া থাকিবার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না!

আমাদের চোখের সমুখে ইস্কুল-ঘরের একটা ধার নদীর মধ্যে ধ্বসিয়া পড়িল। বাসন্তী সভয়ে একটা চীৎকার করিয়া উঠিতেই তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া কহিলাম,—ভয় কী!

বুকে মুখ গুঁজিয়া বাসন্তী কাঁপিতেছে; চাপা গলায়

কহিল,—একেবারে আমাদের পায়ের কাছে এসে পড়লো যে।

—আসুক। বাড়ি নিতে এখনো দেরি আছে। পূব দিক ঘেঁসে চরও পড়ছে শুনছি—সবাই ত' বলছিল এই বর্ষাটা কোনো রকমে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারলেই বেঁচে গেলাম। ভয় কী, বাসন্তী? আর যদি যায়-ই, যাবে—জিনিসপত্র স্তূপাকার করে' রেখে লাভ কী? দু'জনে আবার ফাঁকা হ'য়ে যাবো।

বাসন্তী তেমনি মুখ গুঁজিয়া কহিল,—আমি চোখ মেলে তা দেখতে পারবো না। তার আগেই আমরা এখান থেকে পালাবো।

আস্তে-আস্তে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ইস্কুল-ঘরটা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নিতাই কর্ম্মকারের ছেলেরা মুন্সেফ-কোর্টের সামান্য একটা পেস্‌কারও আর হইতে পারিল না।

এখন একেবারে নদীর কোলে শুইয়া আছি। ফুলের বাগানটাও গেছে। এখন এক পারে আমি আর বাসন্তী, আর আমাদের সমুখে নদী—স্রোতমুখর, ফেনিল, লালায়িত,—সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া-কাড়িয়া তাহারই মতো আমাদের সে বন্ধুর জগতে একেবারে উলঙ্গ করিয়া দিবে!

কৌচগুলিতে ধূলা জমিতেছে, আলমারির কাঁচগুলি আর পরিষ্কার করা হয় নাই। কার্পেটটা জায়গায়-জায়গায় ফুটা হইয়া গিয়াছে—সেই দিকে কাহারো লক্ষ্য নাই। টিপয়ের উপর পিতলের বড়ো ডাবরে পাতাবাহারের গাছ দুইটা কবে মরিয়া গেছে—কে আর উহাদের আদর করিয়া জল দিবে! দেয়ালের বড়ো ক্লকটা বন্ধ—চাবি দিতে ভুলিয়া গেছি। অনেক দিন ধোপা আসিতেছে না—বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড়গুলো এত ময়লা হইয়া গেছে যে যেন তাহারই জন্য আমাদের চোখে ঘুম আসে না। ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলানো হয় নাই কত দিন—জানিবার কিছু প্রয়োজন বোধ করি না। আমরা পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া কেবল সেই পরম ক্ষণটির প্রতীক্ষা করিতেছি।

বাসন্তী অস্থির হইয়া বলিল,—এখানে থেকে আর কী হ'বে—চলো পালাই।

বলিলাম,—নাটকের শেষ অঙ্কটাই নাটকের সমস্ত। একেবারে যবনিকা পড়লে তবে উঠবো। এমন একটা চমৎকার দৃশ্য দেখতে তোমার কুণ্ঠা কিসের?

—এ আমি সইতে পারবো না।

—যা কিছু অসহ্য তাইতেই ত' তীব্র আনন্দ আছে। বলিয়া বাসন্তীর মুখে চুমা খাইলাম। কেমন যেন ভালো লাগিল না। উহার চেহারা এই ঘর বাড়িরই মতো কেমন রুক্ষ, বিবর্ণ হইয়া গেছে। কতদিন উহাকে একটু আদর পর্য্যন্ত করি নাই। মৃত্যুর এই অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের মাঝে ক্ষণ-ভঙ্গুর প্রেমের অভিনয় করিতেও কেমন যেন হাসি পায়।

ভিতরের উঠান ছাড়াইয়া খানিক দূরে সরকার-মহাশয় সময় থাকিতে ছোট-খাটো একখানি ঘর বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সময় আসিলে এই বাড়ি ছাড়িয়া সেখানে উঠিয়া যাইব। তাহার পরেও যে নিস্তার নাই তাহাও সরকার মহাশয় ভালো করিয়া জানিতেন; তবু আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র সরাইয়া রাখিবার জন্য হাতের কাছে একটা আশ্রয় থাকা উচিত। কোন্ জিনিসগুলি যে অধিকতর আবশ্যকীয়, ঘরের চারদিকে চাহিয়া চট্ করিয়া ভাবিয়া নিতে পারিলাম না। বাসন্তীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন লাভ নাই—সবগুলি জিনিসই তাহার একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার;—কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টার প্রতি যে সে পক্ষপাতিতা দেখাইবে সে একটা কঠিন সমস্যা। অতএব মাত্র শুইবার খাটখানা, বিছানা-পত্র, কাপড়-চোপড় ভরিয়া একটা বড় ট্রাঙ্ক, লিখিবার ছোট একটি টেবিল এমনি মোটামুটি কয়েকটা জিনিস সরাইয়া রাখিলাম। আমার গল্পের খাতা ও বাসন্তীর গয়নার বাক্সটা হাতের কাছেই রহিল—নদী আসিয়া পড়িলে সেগুলিও সঙ্গে নিতে হইবে।

ছোট ঘরখানি—রাণিগঞ্জের টালিতে নয়, উলুখড়ে কোন রকমে ছাওয়া হইয়াছে। চাকর সেই ঘরে একটা বাতি জ্বালিয়াছে দেখিলাম। বিপুলকায় গর্জ্জমান নদীর পাড়ে বসিয়া ঐ মৃদু শিখাটিকে ভারি করুণ মনে হইতে লাগিল। বাসন্তী বলিল,—চলো ঐ ঘরে আজই উঠে যাই।

অভয় দিয়া বলিলাম,—আজই কী! এখনো হাত পঞ্চাশ দূরে আছে। আজ রাতটা অনায়াসে এখানেই ঘুমিয়ে নিতে পারবো।

জল, জল, ক্ষুরের মতো ধারালো, বিদ্যুতের মতো দ্রুত,—ধাবমান ঘোড়ার মতো ঢেউগুলি পাড়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িতেছে। কোথাও এতটুকু বিশ্রাম নাই, স্তব্ধতা নাই—ফুঁসিয়া গর্জিয়া ছিঁড়িয়া-কাড়িয়া অনড় স্থবির মৃত্তিকাকে একেবারে চূর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া দিবে। অমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দিবে না। সেই নিয়ত বেগবান বিরাট শক্তির কাছে আমাদের অস্তিত্ব কেমন ম্লান, সঙ্কুচিত হইয়া গেছে। পরিমিত নিশ্বাস ফেলিয়া আমাদের এই জীবনধারণের তুচ্ছতাকে নদী যেন চারিদিকের উগ্র খলহাস্যে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল।

জল আর জল—শাদা, গাঢ় জল! বেগের প্রাবল্যে কোথাও এতটুকু বিশ্রামের রঙ নাই—ফেনায়িত, প্রখর শাদা! অমন তীব্র শুভ্রতা চক্ষু মেলিয়া সহ্য করিতে পারি না।

রাত্রে কখন একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—ঘুমের মধ্যেও নদীর সেই ডাক শুনিতেছি। তাহার আর ঘুম নাই, প্রবল আর্ত্তকণ্ঠে কী যেন সে চাহিতেছে! তাহার ভাষা বুঝিতে পারি না, ঘুমের মধ্যে বাসন্তীকে শরীরের সঙ্গে চাদরের মতো আলিঙ্গন করিয়া ধরি। কী যেন সে চাহিতেছে—সেই ভাষা আমরা কী করিয়া বুঝিব!

হঠাৎ কোথায় কী একটা শব্দ হইল—হয় ত' এক চাক্ মাটি পড়িল—সঙ্গে সেই শিমুল গাছটাও। ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম—দেখি পাশে বাসন্তী নাই। চারিদিকে প্রবল শব্দে ঝড় বহিতেছে—চীৎকার করিয়া উঠিলাম: বাসন্তী।

কোথাও এতটুকু সাড়া মিলিল না।

তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিয়া পড়িলাম। আলো জ্বালিবার কথা মনেও হইল না। দেখি দক্ষিণের দরজাটা খোলা, প্রচুর উচ্ছ্বসিত হাওয়ায় ঘরের মধ্যে ধুলা উড়িতেছে—এতো বাতাসে ও ধুলায় নিশ্বাস টানিতে কষ্ট হইতে লাগিল। আবার ডাকিলাম: বাসন্তী। অজস্রকণ্ঠে নদী ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল। স্পষ্ট মনে হইল নদীর ডাকে বাসন্তী কখন দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

পাগলের মতো সামনের জমিতে ছুটিয়া আসিলাম। ঝাপ্সা অন্ধকারে খেজুর-গাছের নিচে কি-একটা কাপড়ের মতো চোখে পড়িল। কাছে আসিয়া দেখি—বাসন্তী; নদীর পাড়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

ব্যস্ত হইয়া কহিলাম,—এখানে উঠে এসেছ যে!

সে যেন কেমন করিয়া হাসিল; কহিল,—একটুও ঘুম আসছে না। বলিয়া আবার স্তব্ধ হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। প্রবল চাঞ্চল্যের তীরে তাহার এই ধ্যানময় স্তব্ধতা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মনে হইল। তাহাকে বেষ্টন করিয়া এই নির্জ্জনতা এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাকে আমার অতি-পরিচিত বাসন্তী বলিয়া যেন চিনিতে পারিলাম না।

গায়ে ঠেলা দিয়া কহিলাম,—এখানে বসে' আছ কী করতে? ঘরে চলো।

বাসন্তী কহিল,—এই বেশ লাগছে। তুমিও আমার পাশে এসে বোস না।

তাহার পাশে বসিলাম; কিন্তু তাহার পর কী যে বলিব বা বলা যাইতে পারে—সমস্ত ভাষা নীরব হইয়া গেল। উহার সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইয়া আমিও জল দেখিতেছি। তাহার পর জল কখন চোখ হইতে মিলাইয়া গিয়াছে—বাধাহীন অশরীরী বেগ ছাড়া কিছুই আর চোখে পড়িতেছে না।

বাসন্তীকে এত কাছে রাখিয়াও নিজেকে এই নদীর মতো অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতে লাগিল। আগে তবু এখানে-সেখানে কয়েকখানা নৌকা দেখা যাইত, ছইয়ের তলায় বসিয়া মাঝিদের রান্না ও গল্পগুজবের শব্দ কানে আসিলে কতকটা যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিতাম। সামনের রাস্তাটা ভাঙিয়া গেছে বলিয়া একটা গরুর গাড়ির চাকার শব্দও আর শুনিতে পাই না। সব যেন বিরাট গতির ঘূর্ণিতে পড়িয়া কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে!

একটা শকুন অন্ধকারে পাখার শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখি বাসন্তীও কেমন অসাড়, উদাসীন হইয়া বসিয়া আছে। উহাকে আমার যেন কেমন ভয় করিতে লাগিল। গায়ে ঠেলা দিয়া কহিলাম,—এখান থেকে উঠে চলো, নইলে এবার ভেঙে পড়বো।

বাসন্তী তবু নড়িল না। চকিতে মনে হইল উহার চোখে মৃত্যুর স্পর্শ লাগিয়াছে, এমন স্তব্ধ-মত্ততায় তন্ময় হইতে আর কখনো উহাকে দেখি নাই। নদী যেন এখুনি উহাকে আমার বাহুবন্ধন হইতে ছিনাইয়া নিবে! আর দেরি নাই।

আমাদের ঘেরিয়া সত্য-সত্যই অনেকখানি জায়গা লইয়া মাটিতে চিড় ধরিল। দুই বলিষ্ঠ হাতে মাটি হইতে উহাকে বুকের মধ্যে কাড়িয়া লইলাম। কোনোদিকে না চাহিয়া বাসন্তীকে বুকে করিয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিলাম,—দেখি আমারই বুকের উপর কখন সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে!

অবশ ভাবটা কাটিলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—এখন কেমন লাগছে বাসন্তী?

দুর্ব্বল হাত দুইটি দিয়া আমার গলা জড়াইয়া সে কহিল,—ভীষণ ভয় করছে। আমাকে তুমি ধরে' রাখো। আমাকে ছেড়ে দিয়ো না।

আমার দেহ দিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া রহিলাম। কহিলাম,—কেন তোমাকে ছেড়ে দেবো? কা'র সাধ্য তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে রাখে?

লক্ষ লক্ষ ঢেউ তুলিয়া নদী আমাদের এই গভীরতম মিলন-মুহূর্ত্তকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। যেন উদ্দাম প্রবাহে এই মুহূর্ত্তটিকে সে ভাসাইয়া নিয়া যাইবে।

তাহার পর আমাদের জীবনে সেই পরম লগ্নের আবির্ভাব হইল।

রাত অনেক হইয়াছে—অকূল আকাশ ভরিয়া জ্যোৎস্নার আর অবধি নাই। সেই পরিপূর্ণতম প্রশান্তির নিচে নদীর এই লেলিহান উন্মত্ততার কোথাও এতটুকু সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

সময় থাকিতেই ছোট খড়ের ঘরে উঠিয়া আসিয়াছি। চাকর ছোট টেবিলের উপর তেমনি বাতি জ্বালাইয়া খাট জুড়িয়া বিছানা করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আজ রাতে গল্প লিখিবার বা ঘুমাইবার কথা ভাবিতে গেলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

লিখিবার খাতা ও গয়নার বাক্সটার সঙ্গে আরো কিছু খুচরা জিনিস সরাইয়া ফেলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু শেষকালে কেন জানি না আর হাত উঠিল না। কী ফেলিয়া কী নিব, নিয়াই বা কী করিব, কোথায় রাখিব, এমনি একটা মূঢ় সন্দেহে বা বৈরাগ্যে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তাহার চেয়ে বাসন্তীকে লইয়া মুক্তির এই উজ্জ্বল ও প্রখর উলঙ্গতা দেখিতে শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

লক্ষ-লক্ষ অমিতবিক্রম শ্বেতহস্তী আমাদের বাড়িটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—যে-বাড়িতে বাসন্তী কার্পেট ও কৌচ বিছাইয়া ড্রয়িং রুম তৈরি করিয়াছিল, যে-বাড়ির ছোট একটি নিভৃত কোঠায় বসিয়া আমি যতো না লিখিয়াছি তাহার চেয়ে ভাবিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি বেশি, যে-বাড়িতে বিছানা পাতিয়া বাসন্তীকে লইয়া দুই দেহের নিগূঢ় রহস্য সন্ধান ও সমাধান করিয়াছি, যে-বাড়িতে বাবা মা'র অপূর্ব্ব বিচ্ছেদ-স্মৃতির স্বপ্নটি রাখিয়া গিয়াছেন।

অথচ, আকাশে যে এখন প্রচুর নির্মেঘ জ্যোৎস্না—এই জ্যোৎস্না-রাতে আমরা দুইজনে যে শিশু-গাছের তলায় বাঁশের মাচার উপর বসিয়া কতো গল্প করিয়াছি—এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

অসহায় চোখের সামনে বাড়িটার মৃত্যু দেখিতে লাগিলাম।

বড়ো বড়ো ছবি, কৌচ টেবিল চেয়ার আলমারি বাসন-কোসন খেলনা-পত্র বিম বরগা ইট-কাঠ জানলা-দরজা—সব যেন একসঙ্গে কানের কাছে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সমস্ত কিছুর যেন প্রাণ আছে, চেতনা আছে, দুঃখ অনুভব করিবার তীব্র ক্ষমতা আছে—আর আছে মৃত্যুর আক্রমণে আমাদেরই মতো কঠিন পরাঙ্মুখতা। কিছুতেই আশ্রয় ছাড়িবে না, মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে, সাধ্যমত সংগ্রাম করিবে, বাধা দিবে, আর্ত্তনাদ করিবে। সহজে হার মানিবে না। বেগের সঙ্গে বস্তুর সেই অপরূপ যুদ্ধ দেখিতে-দেখিতে সারা দেহে ভয় ও বিস্ময়ের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে কে কবে পারিয়াছে? ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বাড়িটার আর চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকাণ্ড একটা মুক্তির আকাশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। সমস্ত কিছু আকাশের মতো শাদা হইয়া গিয়াছে।

•

সকালবেলায় দিকে সরকার-মহাশয় গরুর গাড়ি ডাকিয়া আনিলেন। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা

গাড়িতে বোঝাই হইল। বাসন্তীকে লইয়া ঘুর-পথে রেল-ইষ্টিশান্‌এর দিকে রওনা হইলাম।

খড়ের ঘরে সরকার-মহাশয় কিছুকাল আরো থাকিবেন ও বর্ষার শেষেও যদি পুব দিকের চর মাথা চাড়া দিয়া না উঠে তবে একদিন বাড়ির দিকে রওনা হইলেই চলিবে।

ট্রেনে চড়িয়া এতক্ষণে বাসন্তী সহজ করিয়া কথা কহিতে পারিল। আমরা কলিকাতায়ই যে যাইতেছি ও আশ্রয় ভিক্ষা করিতে যে বাগবাজারে তাহার বাপের বাড়িতে গিয়া উঠিব না ইহাতে সে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করিল। তাহার বাবা যে আমাদের এই পরাজয়ের লজ্জাকে সগৌরবে ব্যঙ্গ করিবেন আমার স্ত্রী হইয়া তাহা তাহার অসহ্য।

বলিতে কি, মামার কাছে গিয়াও হাত পাতিলাম না। কালিঘাটের অঞ্চলে একটা বাড়ির একতলাটা ভাড়া লইলাম। দুইখানি মাত্র ঘর—একটিতে সামান্য কয়টি রান্নার সরঞ্জাম ও অন্যটিতে মেঝের উপর মাদুর-বিছানো শয্যা ছাড়া আর কোন উপকরণ নাই। দেয়ালে একটিমাত্র ল্যাম্প জলে ও গল্প লিখিবার কথা মনে না আনিয়া সেই আলোতে বসিয়া কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া-দেখিয়া দরখাস্ত লিখি।

নদী-স্রোতের মতো সময়ও উত্তাল বেগে সমানে আগাইয়া আসিতেছে।

একটা ছোটখাটো চাকরি জোগাড় করিয়াছি—নিজেরই একার চেষ্টায়। সেই অহঙ্কারে কিছু দরকারি জিনিস-পত্র কিনিবার ইচ্ছা হইল। বউবাজারে কোথায় খুব সস্তায় নিলাম হইতেছে—চার টাকা দিলে অনায়াসে ঘরে একখানা করিয়া টেবিল ও চেয়ার আসে। কথাটা ভয়ে-ভয়ে বাসন্তীর কাছে উত্থাপন করিলাম। বাসন্তী ম্লান হইয়া হাসিয়া কহিল,—ভাড়াটে বাড়ি, কখন উঠে যেতে হয় ঠিক নেই, জিনিসপত্র কাঁধে করে' কোথায় ঘুরে বেড়াবে? এই বেশ আছি।

টেবিল চেয়ার আর কেনা হইল না। চার টাকা দিয়া ঠিকে একটা ঝি রাখিলে বরং কাজ দিবে।

ভাড়াটে বাড়ি! কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তীরের বন্ধন হইতে নদী আমাদের বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া আসিয়াছে।

নদী আমাদের বাড়ি ভাঙিয়াছে, কিন্তু সময়ের স্রোত আমাকে ও বাসন্তীকে ধীরে-ধীরে জীর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল।

গেল সোমবার হইতে ছোট খোকাটার জ্বর—ডাক্তার একজন ডাকিয়া আনিলে হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে যদি সারে, মিছামিছি কয়েকটা টাকা খরচ করিয়া এমন আর বিশেষ কী লাভ হইবে? আরো কয়েক দিন যাক্।

ঝি-র সঙ্গে বাসন্তী নিতান্ত খেলো শহুরে ভাষায় ঝগড়া করিতেছে। উনুনের ধোঁয়ায় ঘর-দুয়ার সব আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কে যেন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঝি-কে তাড়াইবার জন্য তাগিদ দিতে বাসন্তী আসিল, না, বাকি মাসের মাহিনা লইয়া বিদায় হইতে ঝি আসিল সহসা বুঝিতে পারিলাম না।

আফিসে যাইবার জামাটা বাসন্তীকে কত দিন সেলাই করিয়া রাখিতে বলিয়াছি, তাহাতে তাহার গ্রাহ্য নাই। রোদে তোষক মেলিবার জায়গা নাই বলিয়া ছারপোকার কামড়ে রাত্রে একটু ভালো করিয়া ঘুমাইতেও পারি না। চাহিয়া-চিন্তিয়া তাজমহলের ছবি-ওয়ালা সুন্দর একটা ক্যালেণ্ডার আনিয়া দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিয়াছিলাম, দুরন্ত ছেলে দুইটা কাড়াকাড়ি করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে।

নদীর হাত হইতে রক্ষা পাইলেও সময়ের হাতে আমাদের আর নিস্তার নাই।

শুনিতেছি আফিসে কর্ম্মচারীদের ছাঁট সুরু হইয়াছে। আমি এখনো কোনো রকমে টিঁকিয়া আছি—তবে বলা যায় না। নদী আমাদের বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া আসিয়াছে।

তবু রাশি-রাশি ফেনিল জলের থেকে এ অনেক ভালো। টাইম্‌পিস্ ঘড়িটির মতো হৃৎপিণ্ড মৃদু-মৃদু ধুক্ ধুক্ করিতেছে—কোনো রকমে যে নিশ্বাস নিতেছি এই একরকম ভালো লাগিতেছে। তীব্র সুখের মধ্যে এই যে শত দারিদ্র্যেও শ্বশুরের কাছে গিয়া হাত পাতি নাই—ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকেই না-হয় আরেকবার মামার পিপুলের দোকানে পাঠাইয়া দিব। সে না-জানি এখন কী করিতেছে।

প্রাচীনার প্রলাপ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

চারকুড়ি তো বয়েস হ'ল, একটা বছর বাকী—
যমও পোড়া আমার মতন কালাই হ'ল নাকি!
অষ্টপ্রহর খুঁড়ছি মাথা, ডাক্‌ছি এত তা'কে,
তবু কি তার হুঁস্ আছে এই হতভাগীর ডাকে?
পাঁচটা ছেলে পোড়ার মুখে নিয়েছে পর-পর,
তবু বলে, হয়নি সময়—এখনো ঘর কর!
কিসের ঘর লা? পাঁচ-পাঁচটা বেটার মত বেটা—
পাড়ার লোকে মরত ফেটে—যমের মুখে ঝেঁটা!
স্বামী গেল, পুত্তুর গেল—একটা তো ঐ মেয়ে—
তাও বিধবা—ফিরে' এলেন হাতের নোয়া খেয়ে!

—দাঁড়িয়ে কে ও? বৌমা নাকি? এত ঠাটও জানো,
আচ্ছা, কেন নিত্যি ঘরে পিণ্ডি টেনে আনো?
খুঁড়িয়ে হোক্ হেঁচ্‌ড়িয়ে হোক্, নড়্‌তে যখন পারি,
ঘরের মধ্যে রাশ্ গেলা'তে কি সাত-তাড়াতাড়ি?
ঐ যে তখন, কথার পিঠে পারবে খোঁটা দিতে!
সব জানি লো, জানিনেক জল্‌বে কবে চিতে।
এবার যদি আন্‌বে টেনে, বেটার মুখে ছাই—
বালাই বালাই—কি বলি আর কি বলতে বা যাই!
—মাথা গেল, গতর গেল, গিয়েছে চোখ কান—
তবু পোড়া মরণ নাইরে, হায়রে ভগবান!

বিন্দি ছুঁড়ী এমন সময় কোথায় গেল আবার?
আড়াই পহর বেলা হ'ল—হুঁস্ আছে তার খাবার!
বৌ ক'টা যে খেটে ম'লো সকাল থেকে কাজে,
হাত লাগিয়ে শেষ করে' তা' নে না ননদ-ভাজে।
তা না, পাড়ায় মর্‌বে ঘুরে' অষ্ট-প্রহর কাল,
সাধে অমন দশা তোদের, সাধে বেরোয় গাল?
ঝেঁটা মারি কপাল খানায়,—অমন খাসা বর,
—সইবে কেন? দুটো বছর গেল কি পর-পর?
দিব্যি তাজা যোয়ান ছেলে, এক বয়সী বিধুর—
কি কাল রোগেই ধরল এসে, ঘুচ্‌ল সীঁথের সিদুঁর!

মিন্সেকে তো বলেইছিলাম—কুষ্টিখানা মিলাও,
একটা মেয়ে, বুঝে'-সুঝে' পরের হাতে বিলাও,—
শুন্‌লো না তো মাগীর কথা—শুন্‌বে কেন কাণে?
আপন লোকে পর হয়ে যায়, ভাগ্যি যেদিন টানে!
বুঝ্‌লো শেষে, মেয়ে যখন ফিরল কেঁদে ঘরে,
সেই থেকে আর হাসেননিক একটি দিনের তরে;
ধন্দ হয়ে গেলেন যেন,—ফুড়ুক ফুড়ুক টান—
তামাক নিয়েই কাট্‌ত সময়, য'দিন ছিল প্রাণ।
গেলেন যদি, আমায় কেন নিলেননাক' সাথে?
আশী বছর এক সাথে ঘর—সহ্য হ'ল ধাতে!

ভালোই গেছেন, আমার মতন পাপী তো আর নয়,
নইলে যা সব ঘট্‌ল পরে—মানুষ পাথর হয়!
—আবার কেন দাঁড়িয়ে বৌমা? সবাই মিলে গিয়ে
সেরে-সুরে' নেওনা হেঁসেল, মুখে যা-হোক্ দিয়ে।
বেলার কি আর কসুর আছে? রাঁড়ীভুঁড়ির বাড়ী—
এঁটো-কাঁটা নিয়ে তখন লাগ্‌বে কাড়াকাড়ি!
ঐপান্‌টায় থাক্‌না পড়ে'—যখনই হোক্ উঠে,
—আমার আবার ক্ষিদে-তেষ্টা ছিষ্টি গিলে' কুটে'!
তসরখানা সরিয়ে রাখো গঙ্গাজলের কাছে—
আচার-বিচার শিখ্‌বে কবে—বয়েস কি আর আছে?

ফেল্‌লে ছুঁয়ে জপের মালা, সাধ করে' কি রাগি?
বলব কত গুণের কথা—কি যে বেহুঁস্ মাগী!
বংশী আমার থাক্‌ত বেঁচে, তাকে দিয়েই আজ
শিখিয়ে দিতাম কেমন করে' করে ঘরের কাজ।
—রাজার মতন ছেলে আমার, মুখের কি বা ছিরি,
মায়ের উপর ছেদ্দা কত!—থাকুক বাবুগিরি—
আমার কাছে কেঁচো হয়ে থাক্‌ত, সবাই জানে,
—সাধ্যি ছিল চোখের সাম্‌নে তাকায় বৌ-এর পানে?
শীতের জ্বালায় গেল তো সে—পাহাড় পড়্‌ল খসে',
—আর ঐ মাগী, আমার সঙ্গে পিণ্ডি গিল্‌ছেন বসে'!

শরৎ ছিল আরেক ধরণ—পাৎলা তাঁরি মতো,
ছিপ্‌ছিপে তার গড়ন, তবু সাহস ছিল কতো!
মামার বাড়ী যেতে সেবার—চণ্ডীতলার বিলে—
ডাকাৎ পড়ে' গাড়ী যখন ঘিরল সবাই মিলে!
—ঐ তো ছিল সঙ্গে সেবার, তাইতো পেলাম পার,
নইলে কি আর রক্ষা ছিল—সাধ্যি হ'ত কার?
আমি তো মা ভয়েই মরি—আকাট হয়ে প্রাণে,
কতই বয়েস? কি করে' যে বাঁচালো, সেই জানে!
অমন ছেলে—কি যে হ'ল কোন্ সাহেবের সাথে,
বিদেশ-ভুঁয়ে প্রাণটা দিল বে-ঘোরে কার হাতে!

ওগো, তুমি কোথায় গেলে—একলা আমায় ফেলে,
আশীর পারে এমন দাসী কোথায় আবার পেলে?
আমার উপর বিরাগ তোমার দু'দিন টেকেনি তো,
সেই আমি আজ তোমার কাছে নিমের মতন তিতো!
পুরুষ হ'লেও এতোদিনের মন তো তোমার চিনি,
তাইতো আজও আগের কথা সম্‌ঝাতে পারিনি।
নইলে আমার বয়েই গেছে—এই ভরা দুপুরে
বাসি-মুখে তোমার কথায় মরতে জ্বলে-পুড়ে'!
পুরুষ কখন্ আপন হয় না? শত্তুর চিরকাল,—
সংসারে সে নুনের ছিটে—সগ্‌গে গেলেও ঝাল।

ওরে আমার সত্যিবাদী! বুঝ্‌ছি তারি ব্যথা;
কেন তখন বল্‌লে আমায় মন-ভুলানো কথা?
ভুলে' গেছ? সেই সেবারে পঞ্চু যেবার পেটে,
তোমার সাথে বদ্দিনাথের তীথি যেতে হেঁটে,
বল্‌লে কত—তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবনাকো;
তীথি পথের বাক্যি আমার সত্যি ধরে' রাখো।
—রাখ্‌বনাতো, তোমায় আমি একলা দিব ছেড়ে,
যমের সঙ্গে ফিসির-ফিসির দিচ্ছি এবার ঝেড়ে!
ক্ষান্ত-বামুনি ভয় করে না যমের বাবা এলে;
—ধম্মবাক্যি মিথ্যা হবে?—যাওনা দেখি ফেলে!

ওমা! ঐ তো বাহির-দোরে দিচ্ছে কড়া নাড়া—
পষ্ট কানে শুনতে পাচ্ছি, কর্ত্তারি তো সাড়া!
ওরে বিন্দি, ওগো বৌমা—দুয়োর খুলে' দে'না—
এত ডাকেও থল মাগীদের টনক কি নড়ছে না!
পোড়ার-মুখী শতেক-খাকি—কানের মাথা খেয়ে
জটলা বেঁধে মরে' আছিস্—আমার দিকে চেয়ে!
মরুক মরুক,—আমিই যাচ্ছি,—ধরতো একটু তুলে,
কি আর করি, নিজেই গিয়ে দিচ্ছি দুয়োর খুলে';
যাচ্ছি—যাচ্ছি—শ্মশানপুরে কেউ কি আছে তোমার?
দুয়োর খুলে' দিবে উঠে'? মরণ হ'ল আমার!

উদয়-পথের সহযাত্রী

শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য

এবারের পত্রখানি একটু বড় করে লেখবার ইচ্ছা আছে,—শেষ পর্য্যন্ত দেখি কতদূর হয়! সময় আমার এত কম যে আপাততঃ সব জায়গার সব বর্ণনা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য আমরা এখন জার্ম্মাণী পরিভ্রমণ কর্চ্ছি এ খবরটা বোধ হয় আগেই পেয়েছ। ভ্রমণকাহিনী লিখ্‌তে হলে আবার একটু প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা কর্ত্তে হয়। তা ছাড়া, সোজা জিনিষটা কবিরা যে ভাবে বাঁকা ক'রে দেখে থাকেন, সে সূক্ষ্ম দৃষ্টিও আমার নাই। যদিও বা চেষ্টা করে কিছু লিখে ফেলি, তাহলে দেখি, এদিকে আমি অনেক পিছিয়ে পড়ে আছি, দেশের কবিরা এগুলো এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যে আমাদের জন্য আর কোন ফাঁক রাখেন নাই। তবে আমার বর্ণনা ইওরোপে সকলের সুনজরে পড়বে না এটা ঠিক; কারণ, "ভারতবর্ষ" আমার চোখে আরও সুন্দর লাগে—আর এদেশের বিখ্যাত জায়গার দৃশ্য আমার কাছে ভারতের দৃশ্যের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় না—তুলনা কর্ত্তে গেলেই মনে হয় অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কথা—"ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ"। এ আমার অত্যুক্তি নয়, নিছক সত্য। ভারতের বাইরে না এলে ভারতকে বোঝা যায় না—

আমরা এবারে খুব বড় সফরে ঘুরছি। জার্ম্মাণীর

প্রায় সমস্ত প্রধান ও অপ্রধান সহরে আমাদের Show দিতে হবে। ইতিমধ্যে আমরা Holland ও Belgium ঘুরে এসেছি। Hollandএ একটু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গিয়েছে। প্রথমতঃ এরা কিছুতেই আমাদের হল্যাণ্ডে ঢুকতে দিল না; তাদের কি রকম ধারণা হল, এত যন্ত্র এবং কাপড় কখনো Artistদের সঙ্গে যেতে পারে না—এরা নিশ্চয় ব্যবসাদার। তারা এই সমস্ত যন্ত্রের দাম চেয়ে বস্‌ল এবং অনুকম্পা একটু দেখাল যে, যন্ত্র এবং বস্ত্রের দামগুলি রেখে যান—ফিরে যাবার সময়—যদি বিক্রয় না করি—তবে দাম ফেরৎ দেওয়া যাবে। অনেক তর্ক-বিতর্কে কোন ফল হোল না দেখে বাক্স খুলে আমার "স্বরদ্" বের করে বাজাতে আরম্ভ কর্‌ল্‌ম (ভেবে দেখ স্থান, কাল এবং পাত্রের কথা)। যাই হোক, বোধ হয় এই অভিনব যন্ত্র,—তার আওয়াজে এই কর্ত্তব্যপরায়ণ ভদ্রলোকটি খুসীই হলেন; যেহেতু খানিক বাজাবার পর তাঁর রুদ্র মূর্ত্তি প্রশান্ত হল এবং আমরাও নিস্কৃতি পেলুম। এই সব কর্ম্মে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৮টা বেজে গিয়েছিলো, তখনও Amsterdamএর দূরত্ব ১১০ কিলোমিটার (প্রায় ৬৫ মাইল)।

এই দেশটা কৃপণতার জন্য বিশেষ বিখ্যাত। বড় বড় নদী বা Canal পার হবার জন্য পোল নাই। বড় বড় Steamerএ গাড়ী বা মোটর পার হয়, অবশ্য পয়সা দিয়ে ছোট ছোট পোল যাও বা ২।১টা আছে, তা পার হতেও পয়সা দিতে হয়। যাই হোক, আমরা রাত্রি ১১টায় "আমষ্টারডাম্"এ এসে পৌঁছুলাম। এখানে আর এক বিপদ। যতগুলি হোটেল সব আলো নিভান, অথচ সেগুলি খোলা আছে। শুধু শুধু এরা আলো জেলে পয়সা নষ্ট কর্‌তে চায় না। দরদস্তুর হবার পর আমরা যেমন বাক্সগুলি নামিয়েছি, আর একজন লোক এসে খবর দিলেন,—ম্যানেজার তাঁর মত বদ্‌লেছেন—আরো কিছু দক্ষিণা না দিলে হোটেলে থাকতে দেওয়া হবে না। আমরা ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্য যেমন তার ঘরে ঢুক্‌বো—সঙ্গে সঙ্গে আলোও নিভে গেল; অন্ধকারে হাতড়ে তাকে বের করা অসম্ভব ভেবে অন্য হোটেলে আস্তানা নেওয়া গেল। এখানকার আসরে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। পরে Hague, Antwerp, Brussels ও Leigeএ আমাদের Show দেওয়া হয়েছিল। শেষের তিনটি সহর Belgiumএ। এ সমস্ত বিবরণ পরে জানাব। জার্ম্মাণীতে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি সহরে গিয়াছি, সে সমস্ত স্থানে জনসাধারণ আমাদের যে কি ভাবে অভ্যর্থনা ও সমাদর করেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—এবং তোমরা ভাব্‌তেও পার্ব্বে না। অবশ্য প্যারিসের খবর ত জানই। Spainএ একরকম হয়েছে। Switzerlandএর জেনেভা ও জুরিচের কথা চিরকাল মনে থাক্‌বে। কিন্তু জার্ম্মাণীতে আমরা যে আদর পাচ্ছি তার তুলনা নাই। এবং আমরা এখানে সময় সময় অতি আদরে ও অভ্যর্থনায় সত্যই লজ্জিত হয়ে পড়্‌ছি। ইতিমধ্যে আমরা Berlin, Permasens, Wiesbaden, Manheim, Gieben, Gelsenkirchen, Rhein, Dusselsorf, Freiburg, Kolu, Lihehmgal, Saal, Heidelburg, Dillingen, Saarbrucken, Munich, Hamburg, Leipzig, Baden-Baden, Karlsruhe, Heilbrown, Pforzheim, Cologne, Charlottenburg, Settin, Meinihgen, Chemnitz, Dresden, Halle, Hallerstadt, Hannover. Frankfurt, Dusseldorf, Giebon, Griefswald, Rostock, Selwerin. Kiel, Flensburg, Breman প্রভৃতি স্থানে Show দিয়াছি। এখানকার আরোও প্রায় ২৫টি সহরে এক মাসের মধ্যে যেতে হবে। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক স্থানেই আমাদের Showতে full house তো হয়েই ছিল; তা ছাড়া কত লোক যে ফিরে গিয়েছে তার ঠিকানা নাই। আমাদের programme অনুযায়ী কোথাও একদিন বা দুদিনের বেশী থাকবার উপায় ছিল না—তবে প্রত্যেক জায়গায় পুনরায় আস্‌বার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে। এদের আতিথ্য আমাদের মুগ্ধ করেছে। আমরা যেখানেই গিয়েছি, রাস্তায় বেরুলেই ৫।৬ শত লোক আমাদের সঙ্গ নিয়েছে এবং আমাদের সামান্য উপকারের বা সাহায্যের জন্য যেন এরা লালায়িত। Hamburgএ যখন আমরা Show দিই, শেষ হয়ে যাবার পর প্রায় ২০ মিনিট ধরে দর্শকরা হাততালি ও আনন্দধ্বনি করেছিলেন। তার পরে আমাদের জিনিষপত্র Pack করে রঙ্গালয় থেকে বেরুতে অনেক দেরী হয়েছিল—বাইরে প্রায় সমস্ত লোকই আমাদের জন্য অপেক্ষা কচ্ছিলেন। আমাদের দেখেই সকলে হর্ষধ্বনি ও হাততালি দিতে



দেবী চৌধুরাণী

শিল্পী—[illegible]

আরম্ভ কর্‌লেন—আমরা সেদিন সত্যই ভারী লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম, অত রাত্রে ঐ শীতে ওখানকার সমস্ত বড় বড় মনীষী, ধনকুবের এবং মহিলারাও ঐ ভাবে অপেক্ষা কচ্ছিলেন দেখে। একটা কথা—ফ্রান্স বা অন্যান্য দেশের মত জার্ম্মাণীতে সকলেই Showর পরে Dressing roomএ আসেন না—যাঁরা অত্যন্ত পরিচিত শুধু তাঁরাই ভেতরে এসে দেখা করেন—বাকী সকলেই বাইরে অপেক্ষা করেন। ৪৫ মিনিটের বেশী সেখানে আমাদের অপেক্ষা কর্ত্তে হয়েছিল। Manheimএর "জাতীয় রঙ্গালয়ে"ও ঠিক এই ব্যাপার ঘটেছিল। এই "জাতীয় রঙ্গালয়ে" অমর নাট্যকার Schillerএর অপূর্ব্ব নাটকগুলির প্রথম অভিনয় হয়েছিল। এখানেও Parisএর Champs-Ellysseesএর মত শুধু উচ্চ-শ্রেণীর art ছাড়া কিছুই প্রদর্শিত হয় না। Lihenmgal Saalএ দর্শকের সংখ্যা ছিল ৩৫০০। শ্রীযুক্ত উদয়-শঙ্করের শিব তাণ্ডব দেখে এরা প্রায় পাগল হয়ে গেছে—সে স্মৃতির আনন্দ অনির্বচনীয়। আর একদিনের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৪ই জানুয়ারী সকাল ৮টার সময় Stuttgurt থেকে রওনা হলুম Meiningenএ যাবার জন্য। একটা কথা লিখতে ভুল হয়েছে। আমরা এই যে জার্ম্মাণী পরিভ্রমণ কর্চ্ছি, তাহা Train এ নয় একটি Auto-Bus এ। শুধু একবার Hamburgএ Hanging trainএ উঠেছিলুম—সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। যদি কখনো চড়বার সুযোগ হয় তা হলেই বুঝতে পার্ব্বে। যাক্—সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল। আমাদের ৩৬৭ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ২৩০ মাইল যেতে হবে। সকাল থেকে বৃষ্টি সুরু হয়েছিল—আমাদের Auto-Bus ধীরে ধীরে চলছিল; কারণ, রাস্তাটা বড় পিছল হয়েছিল,—তা ছাড়া রাস্তাটা পাহাড়ের উপর দিয়ে। বেলা ১টা পর্য্যন্ত আমরা বেশ নির্ব্বিঘ্নে এলুম। এক জায়গায় ৩।৪ জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তারা আমাদের বেশী অগ্রসর হতে বারণ কর্লে; কারণ, কিছু দূরে একটা পোল আছে—সেটার উপর দিয়ে ৪ টনের উপর ভার নিয়ে যাওয়া যায় না। আমরা তাদের কথা বিশ্বাস না করে এগিয়ে গেলুম—আমাদের Auto-Busটার ওজন ৯টন। খানিক এগিয়ে পোল পাওয়া গেল। আমাদের সফার সেটা পার হতে রাজী হলেন না—জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন ব্রীজটা পার হতে পারি—তবে ৪টন পার হবে আর বাকী ৫টন পড়ে থাকবে। আরো মুস্কিল অত বড় বাস



তাণ্ডব নৃত্যে—রবীন্দ্র, উদয়শঙ্কর, তিমিরবরণ

ঘোরাবার জায়গা নাই; আর তেলও ফুরিয়ে এসেছে। অনেক ভেবে নিরুপায় হয়ে সেটাকে পেছু হটাতে আরম্ভ করা গেল। আধ মাইল এই ভাবে আসার পর ঘোরাবার জায়গা পাওয়া গেল। তখন আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে যাত্রা সুরু কর্লুম। বেলা ৫টায় আমরা Rotteuburg গ্রামে এসে হাজির হলুম। এই গ্রামটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এবং ইহা না কি জার্ম্মাণীর একটী অতি

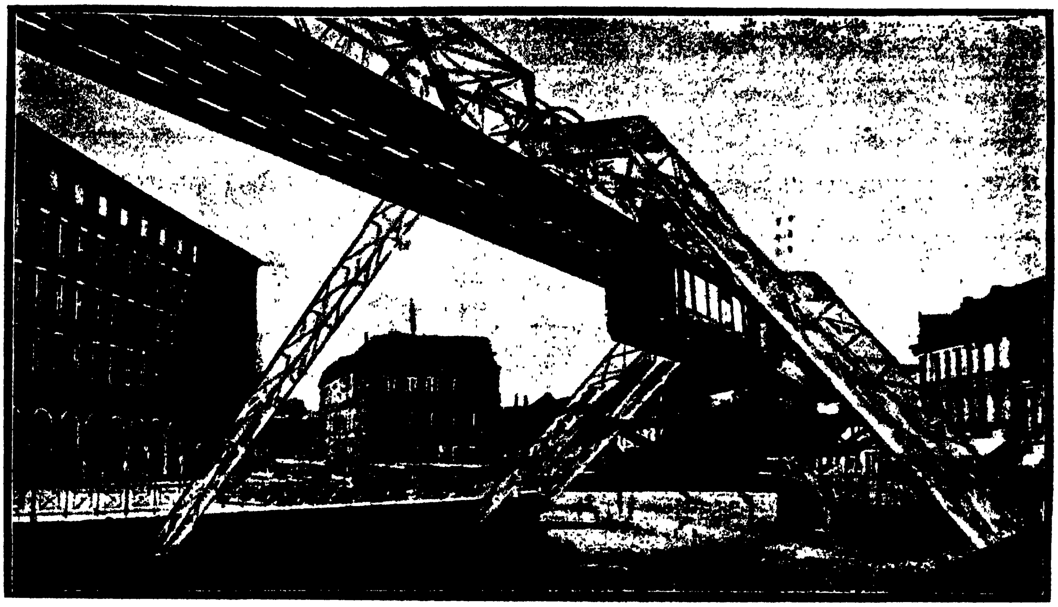
পুরাতন গ্রাম। সমস্ত দিন উপবাসের পর এখানে এসে পেটে কিছু পড়ল। তখন আবার রওনা হলুম। এখানকার পাহাড়ের রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। যদিও তখন ৬টা বেজেছে, তবু রাত্রি হয়ে গেছে। একেই বৃষ্টিতে পিছল, তার উপর ঘন কুয়াসা। এ ধরণের ঘন কুয়াসা চোখে না দেখলে ধারণা করা যায় না। সাম্‌নে থেকে যে দু একটা Motor আসছে, আলো দেখে মনে হয় এক মাইল দূরে আছে, কিন্তু বাস্তবিক সেটার দূরত্ব মাত্র ১০ হাত। আমাদের Busএর তীব্র Head lightএ ৩।৪ হাত দূরের বেশী কিছুই



Koln গির্জ্জার সম্মুখে ভারতীয় নর্ত্তক-দল

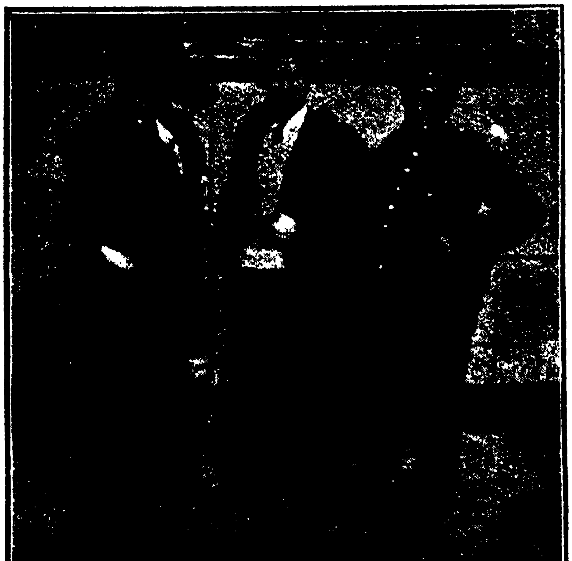
দেখা যায় না। আমাদের সোফার গাড়ী দাঁড় করিয়ে lightএর উপর হল্‌দে রঙের কাচ পরিয়ে দিল, তাতে না কি কুয়াসা ভেদ করে কিছু কিছু দেখা যায়। আমরা কিন্তু বিশেষ তফাৎ বোধ কল্লুম না। শুধু এতক্ষণ আমরা সাদা কুয়াসা (ধোঁয়া) দেখ্‌ছিলুম—এইবার সেগুলো হলদে হয়ে গেল (কতকটা সরষে ফুলের মত!)। আমরা যতই পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলুম—ততই কুয়াসা ঘন হতে লাগল। আমরা সাম্‌নে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না, শুধু পাশে দেখতে পাচ্ছিলুম যে, আমরা রাস্তার উপর দিয়ে চলেছি। রাত্রি ৯॥০টা পর্য্যন্ত এইভাবে চলবার পর আমাদের বাস্‌টা পিছলে এক ধারে গিয়ে পড়ল—সোফার অনেক চেষ্টাতেও থামাতে পারল না। পাশে একটা খানার মত ছিল—এক দিকের দু'টো চাকাই তার মধ্যে ঢুকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে Busটাও কাত হয়ে পড়ল। একেবারে উল্টে যায় নাই এই ভাগ্য। আমরা তাড়াতাড়ি নেমে পড়লুম। সোফার আর একবার চেষ্টা কর্ল গাড়ীকে তুল্‌তে। ফলে কাদার মধ্যে চাকাগুলো আরো এক ফুট বসে গেল। তখন নিরুপায়। বাইরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা, তার উপর তুষারপাত; সারা রাত্রি এ ভাবে থাক্‌লে তুষার-সমাধি নিশ্চিত। ইতিমধ্যে দূরে একটা Motorএর আলো দেখা গেল। আমাদের সেক্রেটারী Mr. Lasto Bogner তাদের হাত নেড়ে থামিয়ে জার্ম্মাণ ভাষাতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। তাঁরা বল্লেন প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম আছে; সেখান থেকে সাহায্য নিতে হবে। এই বলে Mr Bongerকে সঙ্গে করে তাঁরা নিয়ে গেলেন। আমাদের ব্যবস্থা হল, যতক্ষণ না সাহায্য আসে আমরা শীতে কাঁপব। আমাদের সেক্রেটারী Mr. L. Bogner একজন হাঙ্গেরিয়ান (Hungarian) ভদ্রলোক। এঁর একটি বিশেষত্ব—কোন বিপদে না পড়লে ইনি বড় বিমর্ষ থাকেন যেন;—বিপদে পড়তে পাল্লেই বাঁচেন—কাযেই এই ব্যাপারে তাঁর যে বিশেষ আনন্দ হয়েছিল সে কথা বলা বাহুল্য। কিছুক্ষণ পরে একটা Motor cycle ভীষণ বেগে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু খানিকটা গিয়ে সেটা আবার ফিরে এল। তাতে দুজন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁরা আমাদের ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করলেন। সেটা আমরা ভাবে বুঝলুম—ভাষা এক বর্ণও বুঝতে পাল্লুম না। আমরাও "মুদ্রা" অভিনয় দ্বারা তাঁদের সব বুঝিয়ে দিলুম। তাঁরা বুঝতে পেরে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং আমাদের সাহায্য করতে চাইলেন। এটা জার্ম্মাণদের মজ্জাগত স্বভাব—ইওরোপের অন্য কোন জাতি এ অবস্থায় সাহায্য করতে রাজী হত না। আমরা তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে বুঝিয়ে দিলুম যে আমাদের লোক নিকটবর্ত্তী গ্রামে

গিয়েছে এবং আপনাদের দুজনের দ্বারা এ কাযটা মোটেই সম্ভব নয়। অগত্যা তাঁহারা ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিলেন—ব্যবস্থা করবেই। আমরা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর দেখা গেল যে সেই দুজন লোক Motor cycleএ আবার



শূন্যে রেলপথ—এলবার ফেণ্ড

আমরাও শীতে কাঁপতে লাগলাম। আমাদের একটা বিশ্বাস ছিল যে Bogner যখন গিয়েছে, সে একটা না একটা



ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর সীমান্তে তিমিরবরণের বস্ত্রাদি কাষ্টম অফিসাররা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছে—সিগারেট আছে কি না

ফিরে এসেছেন। তাঁরা জানালেন, কাছেই একটি ছোট গ্রাম আছে এবং সেখানে একটি ছোট Hotel আছে। খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই; তবে শোবার জায়গা হতে পারে। তা ছাড়া এই রাত্রে এ রকম কুয়াসাতে কেউ সাহায্য করতে আসবে না। আমরা কিন্তু যেতে রাজী হতে পাল্লুম না নানা কারণে। তা ছাড়া এই সব জিনিষ-পত্র অজানা জায়গায় ফেলে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। যাই হোক লোক দুটি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিলেন। এই ভাবে রাত্রি ১১টা বেজে গেল। কিছু পরেই Bogner একটা Tractor ও কয়েকজন লোক সঙ্গে করে নিয়ে এল। অত রাত্রে এদের আনতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় তৎক্ষণাৎ আর একটি ঐ রকমের Tractor এবং কয়েকজন লোক এসে হাজির হল। এদের যোগাড় করে নিয়ে এলেন সেই দুজন লোক যারা Mo'or cycle করে এসেছিলেন। যাই হোক তারা খুব তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ কর্ল। Busএ মোটা শিকল বেঁধে Tractor দিয়ে টানাটানি আরম্ভ কর্‌ল। আমরাও সকলে মিলে Busটাকে ঠেলে রেখেছিলুম যাতে না উল্‌টে যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেটা রাস্তার উপর উঠে এল। আমরাও উদ্ধার পেলুম।

এ যাত্রা আমাদের এত সহজে উদ্ধার পাবার প্রধান কারণ যে এ দেশটা জার্ম্মাণী। অন্য কোন দেশের লোক এত রাত্রে বিদেশী লোককে সাহায্য কর্ব্বার জন্য আসত না। পরোপকার-বৃত্তি এই জার্ম্মাণ জাতির একরকম মজ্জাগত। যাই হোক, আমরা সকলকে যথেষ্ট ধন্যবাদ ও বক্‌শিষ দিয়ে রওনা হয়ে পড়লুম। রাত্রি একটার সময় নিকটস্থ একটি ছোট গ্রামে এসে পৌঁছুলাম। সেখানে কিছু খাবার



Chemnitzএর রাস্তায় তুষার-রাশি

যোগাড় হল অনেক কষ্টে। অত রাত্রেও আমাদের চারি পাশে ভীড় জমে গেল। আমরা যে কোন্ দেশের লোক তা তারা বেশ বুঝতে পেরেছিল। তাদের মধ্যে একজন Auto Busএর কাচের উপর যে কুয়াশার জলীয় পর্দা জমে



বার্লিনের পথে

ছিল, তাতে আঙ্গুল দিয়ে লিখে দিল "Gandhi Bravo"। যাই হোক আমরা রওনা হয়ে অতি কষ্টে সেই পাহাড়ের রাস্তা অতিক্রম করে গন্তব্য স্থানে রাত্রি ৪টের সময় এসে পৌঁছিলাম। সে রাত্রে ঐ পিছল পাহাড় থেকে যে কোথাও গড়িয়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন বা লোপ পেয়ে যাই নাই এই যথেষ্ট।

২৪শে জানুয়ারি আমরা বার্লিনে পৌঁছুলুম—তার পরের দিনই Stettinএ আমাদের Show ছিল। আমরা Chemnitzএ যে Show দিয়েছিলাম সেটা সকাল ১০টায় আরম্ভ হয়েছিল। সেই অসময়েও অসম্ভব ভীড় হয়েছিল। সেই দিন সন্ধ্যাতেই Leipzigএ আর একটি Show দিতে হয়েছিল। এখানে নানা দেশের Stage, সাজঘর, আলোর ব্যবস্থা সম্বন্ধে লিখতে গেলে অনেক কথাই লিখতে হয়। প্রত্যেক জায়গায়ই নূতন নূতন ব্যবস্থা দেখতে পাই। এই সমস্ত আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক আলোর বন্দোবস্ত,ষ্টেজ ঘোরাবার বন্দোবস্ত, এ সমস্ত সত্যই দেখবার মত। আমরা এখানে জার্ম্মাণ বায়স্কোপ ও থিয়েটার দেখলাম। এদের বায়স্কোপে আখ্যান-ভাগ ফ্রান্সের মত একেবারে বাজে, কিন্তু ফটোগ্রাফী ও টেক্‌নিক্ এত উচ্চ ধরণের যে মনে হয় আমেরিকার ফটোগ্রাফী এর কাছে তুচ্ছ।

জার্ম্মাণীর কয়েক জায়গায় Anti-French feeling অত্যন্ত বেশী। সেই জন্য আমাদের প্রধান ভয় ছিল যে আমাদের মোটর চালক একজন ফরাসী এবং আমাদের নিজেদের যে মোটর Bus সেটিও ফরাসী দেশে প্রস্তুত—Made in France! গাড়ীর মেকার ছিল প্রসিদ্ধ "Renault"। অতএব হয়ত জার্ম্মাণীতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে। কিন্তু সুখের বিষয় যে দু-একটা সামান্য ঘটনা ছাড়া এজন্য আমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। একবার Grunburgএর হোটেলের ম্যানেজার আমাদের ফরাসী বাস ও বাসচালককে কিছুতেই তাদের Garrageএ স্থান দিতে চায়নি। অতি কষ্টে দ্বিগুণ ভাড়া দণ্ড দিয়ে তবে এক রাত্রির জন্য রাখবার উপায় হলো!

২০শে জানুয়ারী আমরা Halleএ ইউরোপের শত সংখ্যক Show দিলাম। (গত বৎসর 3rd March 1931এ Parisএ প্রথম আমরা অবতীর্ণ হই—এ কথা বোধ

হয় মনে আছে।) সেদিন আমরা এখানে ডিনারএ' এখানকার বড় বড় লোক এবং ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। সে রাত্রি খুব আমোদে কেটেছে।

১৯শে তারিখে Dresdenএ Concert Hallএ আমরা Show দিয়েছিলাম। এখানে সবশুদ্ধ দেড় হাজার লোকের বস্‌বার আসন ছিল; লোক হয়েছিল দু'হাজারেরও উপর—বাকী সকলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখানে Mary Wigmanএর বিখ্যাত নাচের স্কুল আছে। এখানে একজন ভারতীয় মহিলাকেও (মুসলমান) দেখিলাম। তিনি দিল্লী হইতে এখানে নৃত্য শিখতে আসিয়াছেন। এখানে সাধারণতঃ আমেরিকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা নৃত্য শিখ্‌তে আসেন, কারণ টেক্‌নিকের দিক্ দিয়ে এত ভাল নাচের স্কুল না'কি ইওরোপে আর নাই। এখানে যতগুলি জায়গায় আমাদের Show দেওয়া হয়েছে, প্রায় সর্ব্বত্রই পুনরায় আস্‌তে হবে এই রকম কথা দিতে হয়েছে। এরা আমাদের মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত আটকে রাখতে চায়, কিন্তু "মার্কের" দাম যদি হঠাৎ নেমে যায় (এর সম্ভাবনা খুব বেশী), তাহলে আমাদের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে, তাই তাড়াতাড়ি যেখানে যেখানে Show দেবার কথা আগে থেকে ছিল, সেইগুলি শেষ করে প্যারীতে ফিরে যাব।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটী কথা লেখবার আছে। গত অগ্রহায়ণ মাসের "ভারতবর্ষে" ডাঃ শ্রীযুক্ত রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের "প্যারিসে কয় রাত্রি" পড়লাম। তিনি তাতে আমাদের নামেরও উল্লেখ করেছেন দেখলাম। এঁর প্রবন্ধ পড়ে প্যারীর লোকেরা, আমরা যে ভাবে মিস্ মেয়োকে দোষ দি, সেই ভাবেই দোষ দিবেন। তিনি এখানকার খারাপ জিনিষগুলির বর্ণনাই বেশী করেছেন; কিন্তু এর ভাল জিনিষগুলি এত ভাল যা অন্য কোন সভ্য দেশে পাওয়া দুষ্কর। তবে তাঁকেও বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। এখানে যাঁরা নূতন আসেন Thos. Cook তাঁদের Paris by night দেখাবার ভার নেয়, অবশ্য উপযুক্ত দক্ষিণা নিয়ে; এবং তারা যা দেখায় তা তো ভদ্রলোক বর্ণনা করেছেন। আমি এখানকার অনেক লোককে জানি যাঁরা জীবনে "ক্যাজিনো দি প্যারী" বা ফলি বার্জা প্রভৃতি উল্লিখিত স্থানে জীবনে যান নাই। এই সমস্ত স্থানে বিদেশীর ভীড়ই বেশী হয় এবং তাদের অর্থেই এগুলি পরিপুষ্ট।

আমরা এত জায়গায় যাচ্ছি—সমস্ত দেশের বড় বড় লোকের ও বড় বড় সাময়িক পত্রে আমাদের যে সমস্ত সুখ্যাতি বেরুচ্ছে—সত্য কথা বল্‌তে গেলে সেগুলি আমাদের প্রাপ্য নয়। তারা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের



ড্রেসডেনের রাস্তায়

হিন্দু সভ্যতা, তার সঙ্গীত ও নৃত্যের নমুনাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে, আর প্রত্যেকেই বলে হিন্দু সভ্যতা বা "কাল্‌চার" যে কত উচ্চ স্তরে গিয়েছিল, তা আমরা ধারণা কর্ত্তেই পার্ব্ব না। আমাদের দেশ, ও সভ্যতার



হাম্বার্গে জনতা
এই ভারতীয় দল যেখানেই গিয়াছে সেইখানেই
এইরূপ জনতা হইয়াছে

প্রতি তাদের এ ধরণের ভক্তি ও উচ্ছ্বাস আমাদের মনে যে কি আনন্দ আনে তা ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব। এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের নিন্দা, সুখ্যাতি, লাভ বা ক্ষতির কথা আমাদের মনেই আসে না। তা ছাড়া আর একটা

কথা—এখানে সমস্ত দেশের বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞগণের সঙ্গে আলাপ কর্ব্বার এবং তাঁদের গান বা বাজনা শোনবার এবং তাঁদের সঙ্গে সঙ্গীত-আলোচনা কর্ব্বার সৌভাগ্য হয়েছে। আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতের "আলাপ" সম্বন্ধে আলোচনায় যখন এঁদের বুঝিয়ে দিই যে আমাদের রাগের আলাপের কোন সীমা নেই এবং এখানে শুধু গায়ক বা বাদকের ভাব অনুযায়ী সেটা যত ইচ্ছা বাড়ানো যেতে পারে এবং সঙ্গীতের রস-সৃষ্টি শুধু

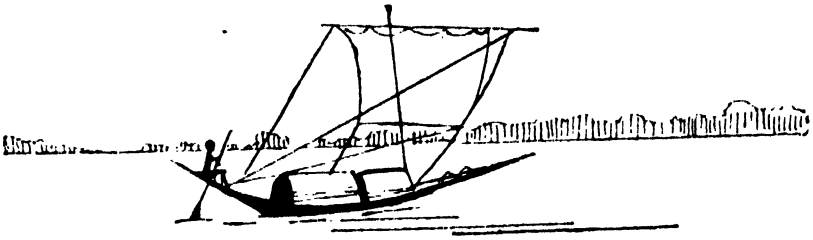


Auto Busএর ভিতরের দৃশ্য

গায়ক বা বাদকের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে—ইওরোপের মত সঙ্গীত রচয়িতার (composer) স্থান ভারতীয় সঙ্গীতে নাই, ইত্যাদি এঁদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলে তাঁরা বেশ বুঝতে পারেন এবং সকলেই বলেন স্মরণাতীত কাল থেকে এ সঙ্গীত আপনাদের মধ্যে চলে আসছে—আমরা ধারণা কর্ত্তেই পারি না সভ্যতা কোন স্তরে উঠলে এ ধরণের সঙ্গীত সৃষ্ট হতে পারে!! কেউ কেউ বলেন—আমরা এখন বিশ্বাস কর্চ্ছি আপনাদের সঙ্গীত মনুষ্য-সৃষ্ট নয়,—দেব-সৃষ্ট। আমাদের দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে এখানে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞের এ ধরণের উচ্ছ্বাস—আমাদের যে কোথায় নিয়ে যায়—তা তোমরা ভাবতেই পার্ব্বে না। এই ত গেল সঙ্গীতের কথা। হিন্দু-নৃত্য সম্বন্ধে ওদের যা ধারণা শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর করিয়ে দিয়েছেন, তা' তোমরা ধারণা কর্ত্তে পার্ব্বে না। যেখানেই আমাদের Show হয়েছে, প্রত্যেক স্থানেই ২০।২৫ বার করে Encore হয়েছে এবং এক একটা নৃত্য ২।৩ বার দেখাবার পর তাঁর শরীরের অবস্থা যা হয় বুঝতেই পাচ্ছ। কাযেই অধিকাংশ সময়েই দর্শকবৃন্দের উল্লাসধ্বনি এবং Encore উপেক্ষা করেই চলে আসতে হয়। তা'ছাড়া এ দেশের সমস্ত ছোট-বড়ো সাময়িক পত্র এবং গুণগ্রাহী মনীষীরা উদয়শঙ্করকে যে ভাবে স্তুতি ক'রেছে, তা' দেবতারই যোগ্য। আমাদের প্রধান গর্ব্ব আমরা উদয়শঙ্করের সঙ্গী এবং তার এই পাশ্চাত্য প্রদেশাভিযানের সহযাত্রী! এবং আরও বড় গর্ব্ব যে প্রাচীন হিন্দু-নৃত্যকলার যিনি পুনরুদ্ধার করেছেন এবং বিশ্বের দরবারে তাকে মহনীয় ক'রে তুলেছেন, তিনি আমাদেরই একজন বাঙালী।

আমাদের আপাততঃ এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এইভাবে ঘুরতে হবে। দক্ষিণ ইওরোপের প্রায় পঞ্চাশটি শহরে আমাদের Show শেষ করে যদি জীবিত অবস্থায় প্যারিসে ফিরতে পারি আবার বড় ক'রে চিঠি লিখবো।

Hotel Excelsior
Bremer haven
(Germany)



দেবদাসী *

শ্রীঅনুরূপা দেবী

(নাটিকা)

স্থান—ত্রিণাবেলীর শ্রীরঙ্গনাথজীউর মন্দির

পাত্রগণ	পাত্রীগণ	
প্রধান পুরোহিত	বিশোকার মাতা	
(বিজয় রাঘবাচারিয়ার)	বিশোকা	
মহারাজা উৎপলাদিত্য	চম্পা	দেবদাসীগণ
পুরোহিতগণ, দেবসেবকগণ,	ভদ্রা	
সারেঙ্গীওয়ালা, তব্‌লচী	চিন্তা	
প্রভৃতি	রম্ভা	
দর্শকগণ	আর্দ্রা	
	রঙ্গিলা—গৃহস্থবধূ	
	শিশু	
	দর্শিকাগণ	

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির-চত্বর

প্রধান পুরোহিত বিজয় রাঘবাচারিয়ার অন্যান্য দেবসেবকগণ, দেবদাসী, চম্পা, বিশোকার মাতা, বিশোকা (আদরিণী)

বিশোকার মাতা। (প্রধান পুরোহিতের প্রতি) ঠাকুরমশাই! আপনি তো জানেন সবই; যখন উপরি উপরি পাঁচটী ছেলেমেয়ে জন্মেই মরে গেল, কেঁদে এসে বাবার দরজায় লুটিয়ে পড়লুম, তখন আপনিই তো আমার হাতে ধরে তুলে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, কেঁদো না বাছা, বাবার কাছে মানত করে যাও যে, এবার যদি ছেলে হয় তাকে দেবসেবক করে দেবে, আর মেয়ে হয় ত সে হবে দেবদাসী। তা'ই করে এই আমার সাত রাজার ধন আদরিণীকে পেয়েছিলুম; কিন্তু বাবা! লোভে পড়ে ওকে আমি বাবার দোরে দিতে পারিনি, ওঁর কাছ থেকে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিলুম, তার ফলও আমি পেতে বসেছিলুম বাবা! মেয়ে আমার যমের দোয়ারে পৌঁছে গিয়েছিল; আবার কত কেঁদেকেটে বাবার উদ্দেশে মাথামুড় খুঁড়ে ফের মান্‌ত করে তবে আবার এই মেয়ে আমি ফেরৎ পেয়েছি। আর না, আর লোভে পড়ে দত্তাপহারী হয়ে মহাপাতক করবো না। এই নিন বাবা ঠাকুর! আমার—(কাঁদিতে কাঁদিতে) আমার সর্ব্বস্বধন, আ—আ—আমার ঘরের আ—আলো, অ—অন্ধের নড়ি আপনার (জিভ কাটিয়া শিহরিয়া উঠিয়া একটু সংযত ভাবে) ভগবান শ্রীরঙ্গজীর চরণে সমর্পণ করে দিলুম (আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল)। ওরে আপনারা দেখবেন, যত্ন কর্ব্বেন (মুখে কাপড় গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কান্না)।

প্রধান পুরোহিত। (অগ্রসর হইয়া আসিয়া আদরিণীর হাত ধরিল) দেবতার গচ্ছিত ধন দেবতাকে ফিরিয়ে দি'তে এসেছ, এতে এতো কাঁদবার কি আছে? অশ্রদ্ধার সঙ্গে যে দান সে কি দেবতা গ্রহণ করেন? গীতায় ভগবান বলেছেন—

"অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।"

বিশোকার মাতা। অশ্রদ্ধা যদি করবো বাবা! তবে আমার অন্ধের নড়িটুকু তাঁর চরণে সঁপে দিতে এলুম কেন? তবে কি জানেন বাবা! মায়ের প্রাণ, পাষাণে বুক বাঁধলেও বুকের পাষাণ ধ্বসে পড়ে;—পোড়া চোক (মুখ ফিরাইয়া চোক মুছিতে লাগিল)।

প্র-পুরোহিত। (মৃদুহাস্যে) কেমন করে জানবো

* প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ভারতী-পত্রিকায় এবং পরে আমার চিত্রদীপ নামক ছোট গল্পের বইএ দেবদাসী ছোট গল্পরূপে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী ভাবে ইহাকে একখানি ক্ষুদ্র নাটিকারূপে পরিবর্ত্তিত করিলাম। অভিনয়কালে পাত্র পাত্রীগণের বেশভূষাদি যতদূর সম্ভব দক্ষিণ দেশের উপযোগী করা আবশ্যক; যেহেতু দেবদাসী-প্রথা প্রধানত: দক্ষিণ দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। —লেখিকা

বাপু! মা' তো হই নি, মায়ের প্রাণের খবর কে রাখে? জানি ঐ ওঁকে, ঐ একমাত্র ওঁকেই পেয়েছি, ওঁকেই চিনেছি, তাই জানি। ওঁর কাছে সংসারের কান্না-হাসি কিছুই কিছু নয়। ক্ষুদ্র মোহ, তুচ্ছ স্নেহ ওঁর চরণে এসে লয় হয়ে গেছে।

বিশোকার মাতা। (ঈষৎ শান্ত ভাবে) মুক্‌খু মেয়েমানুষ, কিছুই তো জানিনে বাবা! ঘর সংসার, স্বামী, সন্তান এই-ই চিনেচি। তবে এ সবই যে ওঁর দয়ার দান এটুকুই শুধু জানি।

প্র-পুরোহিত। বেশ বেশ! তা মেয়েটাকে একটু গানটান শিখিয়েছ, না, শুধু ভাত ডাল নেড়ে হাত পাকিয়েছে?

মাতা। গান বাবা! গরীব গেরস্তর মেয়ে কার কাছে শিখবে বাবা ঠাকুর! তবে পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এম্‌নি আপন মনেই যা গায়। গা' তো মা! আদর! সেই তোদের খেলার গানটা গেয়ে বাবা ঠাকুরকে শোনা ত মা! ভয় কি মা, গাও, গাও, মা, কিছু লজ্জা নেই! এঁদের কাছে গাইতে হয়।

বিশোকা। (অনিচ্ছার সহিত) আমি পারবো না মা!

প্র-পুরোহিত। এ মেয়ে তো দেখি বড্ডই অবাধ্য! পারবো না কি কথা? ও রকম ঠ্যাটাপনা এখানে চলবে না। গাও।

মাতা। (গায়ে হাত বুলাইয়া) গাও মা, গাও।

বিশোকা। (ছল ছল চোখে) একলা একলা কেমন করে গাইব (প্রধান পুরোহিতের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সভয়ে) গাচ্ছি গাচ্ছি—

গীত

চলরে ও ভাই খেলতে চল, খেলতে চল।
সঙ্গীরা সব খেলতে গেল কেমন করে থাকবো বল্?
বনের ছায়ায় রচবো মোরা লুকোচুরির ঘর,
আবার, আমি হবো বৌটী তোমার, তুমি আমার বর।
তুল্‌বো কুসুম, গাঁথবো মালা, পাড়বো গাছের পাকা ফল।

প্র-পুরোহিত। গলা ভাল, তবে শেখাতে হবে। দেখ, এ সব গান এখানের জন্যে নয়। এখানে শুধু ভগবানের বন্দনা-গান গাইতে হবে। তুমি সে রকম গান জানো?

বিশোকা। (ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়িল) না—

প্র পুরোহিত। এঃ, মেয়েকে কোন শিক্ষা দাওনি! আচ্ছা হয়ে যাবে। শিখিয়ে নেওয়া যাবে। দেখ বাপু! কান্না কি তোমার শেষ হবে না? কি বিপদ!

বিশোকার মাতা। (সভয়ে চোক মুছিবার চেষ্টা করিয়া ভগ্নস্বরে) না না, কাঁদছি কই? কাঁদিনি, কাঁদিনি, এ আমার চোখের ব্যারামের জন্যে জল পড়চে। (আদরিণীর হাত লইয়া পুরোহিতের হস্তে দিল) আপনার চরণে সঁপে দিলুম বাবাঠাকুর! ওকে দেখো। (ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

আদরিণী। (মাকে জড়াইয়া) না না, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না। না, না, আমায় ছেড়ে যেও না—(কান্না)

প্র-পুরোহিত। (মায়ের প্রতি) দেখ বাপু! যদি দেবতার সঙ্গে খেলা করতে না চাও, তাহলে ওঁর দরজায় দাঁড়িয়ে আর এ অভিনয় করো না। এতে প্রত্যবায় হচ্ছে, তা কি বুঝতেও পারচো না? যেন উনিই জোর করে তোমার কোল থেকে তোমার মেয়ে ছিনিয়ে নিচ্চেন! কেন, রাখতে পারলে না মেয়েকে? চুরি তো করেই ছিলে,—চোরাই মাল পৌঁছে দেবার জন্য ফের এলে কেন?

মা। (সভয়ে) না না, আর কাঁদবো না, আর কাঁদবো না, এই চোক মুছলুম। আদর! তুই এইখানে থাক্ মা! বাবা রঙ্গনাথজীকে তোকে তোর জন্মের আগেই সঁপে দিয়েছি,—আমি আর তোর মা নই, কেউ নই, তুই ওঁর, ওঁর শুধু—ওঁর, আমি—আমি—আমি চল্লুম,……

বিশোকা। (সবলে হাত ছাড়াইয়া মাকে ধরিল) না, না—যেও না, আমায় ফেলে যেও না, আমি থাকতে পারবো না মা!—

প্র-পুরোহিত। দেখ, অত আহ্লাদেপানা এখানে থেকে চলবে না,—এ দেবতার ঘরকন্না, এখানে ও সব ন্যাকামীর জায়গা নেই। (সবলে টানিয়া লইল)

মাতা। আমি যাই—চল্লেম রে আদর! জন্মের মতন এই শেষ—(উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া দুই হাতে মুখ চাপিয়া ধরিয়া ছুটিয়া প্রস্থান)

বিশোকা। মা! মা! (লুটাইয়া পড়িল)

চম্পা। (ছুটিয়া আসিয়া কোলে তুলিয়া লইতে গেল) চুপ কর মা! চুপ কর। ভয় কি? কান্না কিসের? আমি—আমরা রয়েছি, আমি—আমরা তোমায় দেখবো, যত্ন করবো, ভয় কি তোমার ওঠো, মা, ওঠো।

প্র-পুরোহিত। (সব্যঙ্গে হাসিয়া) বড়-ঠাকরুণের বুঝি একটী পুষ্যি কন্যের দরকার হয়েছে? মেয়ে জামাই নাতিপুতি নিয়ে ঘরকন্না পাতাবে বুঝি? বাঃ বাঃ।

বিশোকা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) মা! মা! (চম্পার গলা জড়াইয়া ধরিল)

চম্পা। (পুরোহিতের বিদ্রূপের ভয়ে ত্রস্তে সরিয়া গিয়া) না না, মা নয়, মা নয়, আমরা যে দেবদাসী, আমাদের তো মা বাবা ভাই বন্ধু কেউ থাকতে নেই, আমাদের শুধু ঐ উনি আছেন। (হাত দিয়া মন্দিরাভিমুখে প্রদর্শন) ঐ উনিই আমাদের সব, ঐ উনিই আমাদের সব। পাতা পতি পরমসখা স্বামী।

বিশোকা। (আকুল চক্ষে চাহিয়া কাঁদিয়া) না না, না, ও নয়, ও নয়, ও তো ঠাকুর! ও আমার কেউ নয়, আমার মা!—(কান্না)

প্রধান-পুরোহিত। চম্পা! কাল থেকেই এর শিক্ষা আরম্ভ করবে; নাচ গান কলাবিদ্যা সমস্ত খুব ভাল করে শেখাবে; এর নাম হলো বিশোকা। ও আদর টাদর এখানে চলবে না, একটু বয়েস হয়ে গ্যাছে, শীঘ্র শীঘ্র সব শেখানো চাই। তারপর শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে শুভ দিনে শুভ মাল্য-বিনিময় হবে। আরতির সময় হয়ে এলো, আমি যাই।

[সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—প্রথম দৃশ্যেরই স্থান। পুরোহিতগণ, দেবসেবকগণ, বিশোকা। প্রধান পুরোহিতের হস্তে আরতি-প্রদীপ, দেবদাসীগণের নৃত্য ও গীত।

গীত

জীবন যমুনাকূলে, দুলে দুলে ওঠে আনন্দ তরঙ্গ-মালা,
বাঁশরী বাজায় কালা—
বাজে বাজে বাঁশী বাজে, বাঁশি বাজে ভরা সাঁজে, চিতমাঝে,
এ কি রে বিষম জ্বালা—
বাঁশী গাহিয়া ডাকে রাধা রাধা, বাঁশি ভুলায়ে দেয় যত বাধা,
বাঁশির রবেতে প্রাণ পড়ে বাঁধা, কালার চরণে পরাণ ঢালা।

পটক্ষেপণ

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরের একাংশে দেবদাসীদের জন্য নির্দিষ্ট একটী ক্ষুদ্র কক্ষে, শয্যাশায়িত বিশোকা

বিশোকা। উঃ, মাথার কি রকম কষ্ট হচ্চে! আমি সইতে পারচিনে। কে আমার মাথা টিপে দেবে? জল, জল কে দেয়? মা! ওমা! মাগো! তুমি কোথায়? এখানে কি করে থাকি, এখানে কারুকে মা বলতে পাই না, দুঃখ হলে কাঁদতে পাই না, পুজো না হলে কিছু খেতে পাই না,—আর রাত নেই, দিন নেই, কেবল গান বাজনা নাচ শেখা! কখন ওসব ভাল লাগে? বাবার সঙ্গে কেমন বেড়াতে যেতুম, সেখানে কত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সব আসতো, খেলা করতুম। এখানে কিছু করলেই বকে, বলে তুমি দেবদাসী, তোমার কি ছেলেমানুষী করতে আছে! আমি দেবদাসী হতে চাইনে, বড়-ঠাকরুণ!

(চম্পার প্রবেশ)

চম্পা। বিশোকা আমায় তুমি ডাকচো?

বিশোকা। হ্যাঁ, ডাকচি, এসো—

চম্পা। (কাছে আসিয়া) কি বলচো? কি চাই?

বিশোকা। (হাত ধরিয়া) তুমি বসো, আমার কাছে বসে থাকো, চলে যেতে পাবে না।

চম্পা। (বসিয়া) পাগল আর কাকে বলে।

বিশোকা। হাসলে হবে না, আমি একলা থাকতে পারিনে, একলা থাকতে আমার ভয় করে, আমার ঘুম হয় না, কান্না পায়, কেন আমি একলা থাকবো? তুমি আমার কাছে থাকো।

চম্পা। ছিঃ মা! (সচকিতে) ছি বিশোকা! এখন তুমি বড় হচ্চো, এখনও কি আর অত ছেলেমানুষী কর্ত্তে আছে! ভয় কিসের? এই তো সামনের ঘরেই আমি আছি, দরকার হলেই তুমি ডেকো, ডাকলেই আসবো। নাও এখন ঘুমোও, আমি যাই।

বিশোকা। কেন, তুমি আমার ঘরে শোবে না? এতদিন তো শুতে···

চম্পা। জানো ত দেশপাণ্ডে মশাই তার জন্তে আমায় ভর্ৎসনাও তো কম করেন নি। এখন তুমি শীঘ্রই দেবদাসী হবে, ভয় ভাবনা মোহ এ-সব কি দেবদাসীদের সাজে? তাই তোমার চিত্ত নির্ব্বিকার কর্ব্বার জন্তেই উনি আমায় তোমার কাছে বেশি থাকতে বারণ করেছেন। জানতে পারলে রাগ কর্ব্বেন, আমি যাই। (গমনোদ্যত)

বিশোকা। বেশ যাও, আমি মরে যাবো।

চম্পা। (ফিরিয়া আসিয়া বিশোকাকে জড়াইয়া ধরিল) নিষ্ঠুর মেয়ে! আমায় খুন না করে তুই ছাড়বি না? তুই আমায় মারতে এসেছিস্! ধর্ম্ম কর্ম্ম আমার সব জলাঞ্জলি গেছে,—তোর চিন্তায় আমার একদণ্ড শান্তি নেই। ওদিকে তিনি এদিকে তুই—আমায় কেটে কেটে দিনরাত নুন দিচ্ছিস্। না, ও-সব ছেলেমানুষী ছাড়! মনকে শক্ত করতে শেখ, খা-দা, গান গা, সুখে থাক, সব্বাই তো আছে, তুই অমন কেন? (চোখ মুছিতে মুছিতে) ঘুমিয়ে পড়ো।

বিশোকা। (গলা ধরিয়া) মা! তুমি কাঁদলে? কখন তো কাঁদো না?

চম্পা। ওরে এ বুক পাষাণ হয়ে গেছলো, পাষাণ দেবতাকে বুকে রেখে। তা'তে কোমলতা ছিল না। তুই কোথা থেকে এসে তা'তে এমন করে প্রাণ ফিরিয়ে আন্লি জানিনে। জানিনে কেন মিথ্যে এ দুঃখ পাওয়া, যখন এর কোন প্রতিকার নেই;—না না, আমি যাই, যদি পাণ্ডে মশাই জান্তে পারেন— [দ্রুত প্রস্থান।

বিশোকা। মা! মা! বড়-ঠাকরুণ! আর আমি তোমায় মা বলবো না, সত্যি বলছি আর বলবো না, তুমি এসো—তুমি এসো! উঃ এমন ভয় করচে, কেন এরা আমায় দেবদাসী করবে, আমি দেবদাসী হ'তে চাইনে!

(রোদন)

পটক্ষেপণ

চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরের নাট্যশালা

বিবাহ-বেশে সজ্জিতা বিশোকা (মাল্যহস্তে)

দর্শকগণ ও অন্যান্য দেবদাসী, পুরোহিত,

সদাশিব প্রভৃতি।

বিশোকার লীলা-নৃত্য ও গীত

যে চরণ যোগীজনে সুধীজনে পায় না ধ্যানে।
ফুলের মালায় কোমল বাঁধন বেঁধেছি আজ
সেই চরণে, আমার সনে।
প্রাণে প্রাণে, হৃদয় মনে, সযতনে।
কি পুলক উথ্‌লে ওঠে অন্তরে, আজ আশায়
নাহি অন্ত-রে,
বিপুল সুখে বাজ্‌ছে হৃদয় যন্ত্ররে, জীবন-বীণা পূর্ণ
কেবল তোমার গানে, তোমার গানে।

বিশোকার পুনশ্চ গীত

জীবন যৌবন হৃদয় প্রাণ
নাথ, সকলি তোমারে করেছি দান।
আর, কি দিব? কি আছে? সবই তো গিয়াছে,
বিষাদ আনন্দ মান অভিমান,
আমি সবই যে তোমারে করেছি দান।

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত চত্বর

ঝুলনোৎসব উপলক্ষে অধিকতররূপে সজ্জিত। বহুতর দর্শকমধ্যে মহারাজা উৎপলাদিত্য সমাসীন। এক ধারে ওস্তাদ ও তব্‌লচী ও দেবদাসীগণ বসিয়া আছে। ঝুলনের উপর বিগ্রহ সংস্থাপিত।

বিশোকার ও অন্যান্য দেবদাসীদের নৃত্যসহ গীত

কানাইয়া আজে ঝুলন্ খেলাবে,
কদম্‌কে পেঁড় পরে ঝুল্‌না ঝুলাবে।
ঝুলে কালা, ঝুলে বনমালা
মাতোয়ারা বায়ু চন্দনগুলাবে।

ঐ— গীত

ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ বাজে নূপুর, ঝুলে কানাইয়া,—
ঝুলে কানাইয়া।
বন্‌শী বাজত বাজত মধুর খেলে কানাইয়া মেরে
খেলে কানাইয়া।

বনশী রাবে, চিত দোলাবে, ফুল ছোড়াবে,
আপনা ভুলাবে,
পাঁওয়ে লুটাবে, বড়ি খল-নিঠুর, শঠ কান্হাইয়া।
(দর্শকগণের প্রশংসাধ্বনি ; ঝুলনের উপর পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ। পট পরিবর্ত্তন)

ষষ্ঠ দৃশ্য

মন্দির নাট্যশালা

মহারাজা উৎপলাদিত্য, সদাশিব, অন্যান্য দর্শকগণ, দেবদাসীগণ, ওস্তাদগণ।

বিশোকার লীলা-নৃত্য ও গীত

মম হৃদয়-সরসী-নীরে,—
শতদল হয়ে ফুটে উঠ বঁধু! ধীরে অতি ধীরে।
মলয় পবন সঙ্গে, তোমার অঙ্গবাস যেন সখা!
মিশে এসে মম অঙ্গে,
উষার শিশির মুকুতায়, তোমারই গলার
মালাটী গাঁথিব,—
কুন্দ শেফালি দিব পায়।
ললাটে আমার ললাটিকা হয়ো, হেমহার হয়ো বক্ষে,
সুনীলাঞ্চল হৃদয়ের পরে, কাজল চোখের তীরে,
কুণ্ডল কানে হয়ো নাথ! সদা গণ্ড পরশি রবে,
নাসার মুকুতা হয়ে থেকো মিতা! অধর পরশ লবে,
কঙ্কন হয়ে কলকল রবে কহিও হে প্রেমবাণী,—
শুধু চরণ নূপুর হয়ো নাকো প্রিয়!
শেষে লোকে হবে জানাজানি।
ভিতরে বাহিরে তোমারই পরশ থাকে যেন
মোরে ঘিরে।

উৎপলাদিত্য। (স্বগতঃ) বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এই দেবদাসী! যতই দেখছি ওকে, দর্শন-পিপাসা নিত্যই যেন বর্দ্ধিত হচ্চে! যতই শুন্‌চি ওর গান, মনে হচ্চে কল-কণ্ঠী কোকিলার সঙ্গীত-লহর কাণে ঢুকছে! এ কি অচ্ছেদ্য আকর্ষণে পড়ে গেছি, সেদিন নিমন্ত্রিত হয়ে এসে! এমন্ জান্‌লে যে আসতাম না! কিন্তু তাই কি? একে যে চোখে দেখে নি, তার চোখের সার্থকতা কোথায়? এ গান যে না শুনেছে সে বৃথাই বধির হয় নি। (সম্মোহিত ভাবে চাহিয়া থাকিল)

রাঘব। (মনে মনে) এ রাজা ব্যাটা তো ভাল আপদ ঘটালে দেখছি! ঝুলনের দিনে বরাবরের নিয়ম আছে রাজা এসে ঝুলনা খাটায়। এতদিন নাবালক ছিল, বিদেশে থাকতো, প্রতিনিধিতেই কাজ হচ্ছিল; এবার দেশে এসে সিংহাসনে বসেছে,—ভাবলাম, চিরকালের প্রথাটা ওকে দিয়েই করাই। নাঃ, ভুল করেছি! একে তো মেয়েটা একবগ্‌গা, একরোখা, আবার যদি তরুণ কন্দর্পের মতন এই ছোঁড়াটার ওপোর চোখ পড়ে, সামলানো দায় হবে। উপায়ই বা কি? একটা তো যে সে নয়, স্বয়ং রাজা! তাড়িয়ে দেওয়া তো যায় না।

উৎপলাদিত্য। (মৃদুকণ্ঠে) সুন্দরি! এ সুর কেন অনন্ত হয়ে রইলো না!

বিশোকা। (চমকিত হইয়া আসন গ্রহণোদ্যত হইতে হইতে দাঁড়াইল) কে এ? এ কথা কে বল্লে? প্রশংসা তো আজ দু-বছর ধরে অনবরতই শুনচি, কিন্তু এঁর সুর, এঁর ভাষা, এতে যেন অন্য কিছু আছে,—এ যেন আমার প্রাণকে মাতাল করে দিলে! কে'এ?—কে'এ? (চাহিয়া দেখিয়া) এ যে স্বয়ং রাজ্যাধিপতি! (দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই সলজ্জভাবে নতমুখী হইল।)

রাঘব। (স্বগতঃ) এই যে! আর একতরফা নেই! চোখে চোখে এক্ষণি বেশ একটুখানি গোপন অভিনয়ও হয়ে গেল! নাঃ, আর না, আর এ খেলায় প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সময় থাকতে থাকতে ঘর সামলে নিতে হবে, নৈলে সিঁধ কেটে চোর ঢোকা তো বিচিত্র নয়।

পটক্ষেপণ

সপ্তম দৃশ্য

উৎপলাদিত্যের বিশ্রামাগার

রাজা, বয়স্য ও নর্ত্তকীগণ

নর্ত্তকীগণ।　　নৃত্য ও গীত

কোয়েলী শুনাও কুহু তান,
ধর ধর পঞ্চমে গান—
ফুল গন্ধে ভরা মধু সাঁঝে, অলস সুরে বাঁশি বাজে,
শিহরে পরাণ হিয়া মাঝে, আবেশে অবশ দেহ প্রাণ।

রাজা। থাক, থাক, গান আমার আজ একটুও ভাল লাগছে না, বন্ধু! এদের যেতে বলো। আমার নির্জ্জনে থাকতেই ভাল লাগছে।

বয়স্য। ওগো, তোমরা এখন যাও গো! তোমাদের গান আজ এঁর ভাল লাগছে না।

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান।

হুঁ! বটে! গান ভাল লাগছে না,—নির্জ্জনে থাকতে ভাল লাগছে! লক্ষণটা অভিজ্ঞান শকুন্তলের রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গেই দেখছি ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে! কিন্তু—কই মৃগয়া-ব্যপদেশে মহারাজাধিরাজের তো ইতিমধ্যে বনগমন ঘটেছিল বলে মনে পড়চে না? কণ্বসুতা শকুন্তলার সঙ্গে পরিণয়-ঘটা—

রাজা। নিশাকর! কি উন্মাদের মতন যা'তা বকতে লাগলে? সব দিনই কি মানুষের মন এক সুরেই বাঁধা থাকতে হবে? সেই একই নিয়মে খাওয়া, বেড়ান, নাচদেখা, আর গান শোনা, এর কি আর কোনই ব্যতিক্রম হতে নেই? হলে কোন পাপ আছে?

বয়স্য। কি কর্ব্বেন মহারাজ! এ সব যে রাজ-কায়দা! রাজার ঘরে যখন জন্মেছেন, তখন কেমন করে রাজবাড়ীর বেদস্তর চালে চলবেন বলুন তো? রাজা যে সকল অবস্থাতেই রাজা।

রাজা। (উৎক্ষিপ্তভাবে) না, না—এমন করে নিয়মের নিগড়ে আমি আর চিরদিন ধরে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারছিনে। আমি আর পারবো না, রাখতে পারবো না। ইচ্ছে করছে—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে যে-দিকে দু-চোখ যায় সেই দিকেই চলে যাই।

নিশাকর। বটে! এত দূর! নাঃ, এটা দুষ্মন্তের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিল হচ্ছে না,—এ যেন আর এক গ্রাম ওপোরে উঠে গ্যাছে। আচ্ছা, বুদ্ধদেবের ব্যাপার নয় ত? রাজবাড়ীর নদীর ঘাটে চিতার ধূম দেখতে পেলেন না কি? না—

রাজা। আঃ, কি পাগল তুমি নিশাকর! কোথায় ভগবান গৌতম, আর কোথায় নরকের কীট আমি! বিবেক বৈরাগ্য সে-সব কিছুই না, শুধুই একটা প্রাণের জ্বালা,—শুধুশুধু আশাহীন বেদনার একটা অভিব্যক্তি—আর কিছু না।

নিশা। হুঁ! আশাহীনও আছে, বেদনাও আছে! তবে কি মহারাণী-মাতার কাছে কানমলা খেয়েছেন না কি? শুনতে পাই ইদানীং তাঁর মেজাজটা একটু বেশী রকম রুক্ষ হয়ে উঠেছে! কাশী যাবার জন্য বেজায় তাগিদ দিচ্চেন?

রাজা। কে, মা? হ্যাঁ, তা দিচ্চেন বটে, কাশী যাবার দিন স্থিরও হয়েছে; কিন্তু তার জন্য নয়, মার মত স্নেহময়ী মা কে পেয়েছে? শৈশবে বাপ হারিয়ে পিতা মাতা শিক্ষক সবই যে তাঁকে পেয়েছি।

নিশা। ঠিক্! ঠিক্! মহারাণী-মা কাশী যাবেন, সেই জন্যই আপনার এতটা মন খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এখনি যাচ্চি, দেখছি কেমন করে তিনি আপনাকে ফেলে কাশী যান।

[প্রস্থান।

রাজা। না না, তাঁকে বাধা দিও না। জননীর পুণ্য-কর্ম্মে সন্তানের কি বাধা দেওয়া উচিত? (স্বগতঃ) শুধু তা নয়, তা নয়,—আমার মন একান্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বিশোকার চিন্তা আমি বারেকের জন্যও ত্যাগ করতে পারচি না। গান ভাল লাগবে কি? তার মধুর কণ্ঠ যে আমার দুই কানকে ভরিয়ে রেখেছে। তার চিন্তাও আমার পক্ষে পাপ। (ক্ষণকাল নিমিলিতনেত্রে উপাধান-পৃষ্ঠে মস্তক রাখিয়া নীরবে চিন্তা) সে দেবতার জিনিসে লোভ করা অর্থ ধ্বংস;—কিন্তু সত্যই কি সে দেবতার? (মৃদুহাস্য) মিথ্যা ছল মাত্র! সে দেবদাসী নামে পুরোহিতেরই সেবাদাসী! উঃ অসহ্য! অসহ্য! না—তা' হবে না, আমি তাকে রক্ষা কর্ব্বো। তাকে এত-বড় অধঃপতনে নেমে যেতে কিছুতেই দিতে পার্ব্বো না। তাকে রক্ষা কর্ব্বো, দেবদাসীকে দেবী রাখবো, রক্ষা কর্ব্বো, ওদের হাত থেকেও, আর আমার নিজের হাত থেকেও। যখন তাকে রাণী করতে পার্ব্বার অধিকার আমার নেই, তখন, তাকে ভোগের সহচরী কর্ব্বার চেষ্টা, না,—সে অসম্ভব! অসম্ভব! হ্যাঁ তাই কর্ব্বো, তাকে জগতের লোভের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে জগদতীতেরই পায়ে সত্যি করে সঁপে দোব। না হলে, না হলে আমি বাঁচবো না—।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

নাট্যশালার স্তম্ভপার্শ্ব

(বিশোকার অন্যমনস্কভাবে প্রবেশ)

বিশোকা। 'সুন্দরি! এ স্বর কেন অনন্ত হলো না!' আমার মনে হচ্চে ফিরিয়ে যদি বলি, "ওহে সুন্দর, তোমারই ওই কণ্ঠস্বর তার চেয়ে অফুরন্ত হোক!" কি মধুর কণ্ঠ! কি সস্নেহ আহ্বান! মনে হচ্ছিল যেন জগতের সমস্ত ফুলের সমুদয় মধু নিংড়ে নিয়ে কে ওঁর গলায় ঢেলে দিয়েছে! 'সুন্দরি! ও স্বর কেন অনন্ত হলো না!' আঃ প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল! কানে যেন অমৃত বর্ষণ হলো! আর রূপ! ফুলশর রেখে কন্দর্প নিজেই যেন মূর্ত্তি ধরে এসে বসেছিলেন। অনেক দিন ধরেই দেখছি—এত দিন ভাল করে দেখি নি,—আজই প্রথম যেন দেখলুম। রাজা! হ্যাঁ—রাজা বটে! যাকে রাজা বলে! কিন্তু—(চিন্তামগ্ন)

(স্তম্ভ-পার্শ্ব হইতে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত হইল) সুন্দরি!

বিশোকা (সচকিতে) কে? (স্বগতঃ) সেই স্বর! সেই সম্বোধন! আমি স্বপ্ন দেখছি না ত?

উৎপলাদিত্য। (সম্মুখীন হইয়া) ভয় পেয়ো না, আমি তোমায় শুধু এই কথাটা বলতে এসেছি, তুমি স্বর্গের পবিত্র ফুল, ভয় হয় পৃথিবীর পাপ-পঙ্কে পাছে কোন দিন মলিন কলুষিত হও। যদি অভয় পাই, একটা আবেদন আছে, নিবেদন করি।

বিশোকা (বিস্ময়ানন্দে নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া থাকিল)

উৎপলাদিত্য (একটু নিকটস্থ হইয়া) এ দেবধাম পুণ্যভূমি সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবদাসীর পক্ষে পবিত্র জীবন যাপন করা সুকঠিন! দেবদাসী নামেই শুধু দেবদাসী, প্রকৃত পক্ষে তারা পুরোহিতের সেবাদাসী ব্যতীত আর কিছুই নয়। শিউরে উঠছো? তুমি বালিকা, হয় ত অত্যন্ত সরলা; তাই যে জীবনের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়েছ, তাকে ভাল করে এখনও চিনতে পারো নি। কিন্তু জেনো, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য! আর তোমার বিপদের দিন আসতেও বেশি বিলম্ব নেই। যদি এমনই পবিত্র, নির্ম্মল থাকতে চাও, অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করো—

বিশোকা। (ভয়বিবর্ণ কম্পিত দেহে পতনোন্মুখ হইতেই রাজা তাহাকে ধরিয়া পতন হইতে রক্ষা করিলেন) (স্বগতঃ) এ' সমস্ত কি বলছেন! না—না, আমি দেবদাসী, দেবদাসীর আবার বিপদ কি? (সহজভাবে সরিয়া দাঁড়াইল)

রাজা। বিশোকা! এ বুকের মধ্যে যা আছে তা' চিরকাল এমনই অব্যক্তই থাক। দেবনির্ম্মাল্য মানুষে শুধু মস্তকে ধারণ করবার অধিকারী, তাতে ভোগাধিকার নেই। সেই অধিকার আজ তুমি আমায় দাও,—এমন কোন নিরাপদ স্থানে তোমায় রক্ষা করি, যেখানে এমন কি, আমি নিজেও তোমায় আর কখনও না দেখতে পাই। মা আমার কাশীধামে যাত্রা করছেন, তুমি তাঁর সাথী হও।

বিশোকা। (স্বগতঃ) কিছু যে ভেবে পাচ্চিনে! কি বলছেন? কি চাচ্ছেন? কেন এ-সব বলছেন? কি বলি? কি উত্তর দিই?

রাজা। (ক্ষণকাল প্রতীক্ষান্তে) ত্বরা নেই, সময় নাও, ভেবে দেখ, কাল এইখানে আবার সাক্ষাৎ হবে। যথার্থ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নাই;—আমার নিজের উপরেও আমার খুব বেশি বিশ্বাস হয় না। কি জানি, বিশ্বাসঘাতক চিত্তে কখন কি ভাব প্রবল হয়ে উঠে, কি না জানি বিপদ ঘটিয়ে বসে! দেবতার জিনিষে মানুষের এ লোভ কেন? এ কি ধ্বংস আনবার জন্য? কিন্তু হায় হায়, দেবতাই বা কোথায়? তুমি তো সম্পূর্ণরূপেই পুরোহিতের! ঐ বিজয় রাঘবাচারিয়ারের! সে তোমার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে সমর্থ; তার হাত থেকে তোমায় রক্ষা করতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই—কারু নেই। তাই অনেক ভেবেচিন্তে এই উপায় আমি স্থির করেছি। তোমায় নিরাপদ করে তোমার সঙ্গে পার্থিব জগতের সকল বন্ধন এ জন্মের মতই আমি বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো; এ না হলে বুঝি তা' পারবো না, পারবো না।

(একটা ছায়ামূর্ত্তি যেন ধীরে ধীরে সরিয়া গেল)

উৎপলাদিত্য। (সচকিতে) আজ তবে বিদায় বিশোকা! কাল এমনি সময় এইখানে—

(উৎপলাদিত্যের প্রস্থান। বিশোকার মুহ্যমানভাবে অবস্থিতি)

নবম দৃশ্য

বিশোকার কক্ষে নর্ত্তকীবেশে সজ্জিতা হইয়াই গভীর চিন্তামগ্না বিশোকা শয্যাতলে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় মৃদুমৃদু হাসিতেছিল।

গীত

দুঃখের কালো মেঘ আইল রে,
হৃদি গোপন বিষাদে ছাইল রে।
আঁখি তন্দ্রাহারা, চিত উদাসপারা,
কে' এ বেদনার রাগিণী গাইল রে।

(চিন্তিতভাবে) আজ কেন, আজ কেন উনি অমন করলেন? ও-সব কথা আমায় এসে বল্লেন কেন? এ কথার অর্থ কি? কেন বল্লেন, 'দেবতা কোথায়? তুমি পুরোহিতের। সদাশিব তোমার 'পরে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে। তার হাত থেকে তোমার রক্ষা করতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই।' এ কি কথা? সে পুরোহিতের? কে এমন কথা বলে? সে দেবতার, সে একান্তভাবেই শুধু দেবতার, সে দেবী—সে দেবী! কার সাধ্য তার এই দেবভোগ্য দেহের উপর অধিকার স্থাপন করতে আসে। রাজা নিশ্চয় ভ্রমে পতিত হয়েছেন। (নেপথ্যে বিশোকা!) কে? কে আমায় ডাকে?

(রাঘবাচারিয়ারের প্রবেশ)

রাঘবাচারিয়ার। (স্মিতহাস্যে অগ্রসর হইয়া) কি বিশোকা! গভীর চিন্তায় মগ্ন যে! তা' থাকো, থাকো, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি রাজা তোমায় অতি গোপনে কি পরামর্শ দিচ্ছিলেন দেবদাসি? হয় ত তেমন কিছু গূঢ় রহস্য তাতে নেই, যা আমায় বলতে পার্ব্বে না?

বিশোকা। (আত্মগত) সেই সুর সেই বাণী ক্রমাগতই কানে বেজে উঠছে, দেবদাসী নামেই তারা দেবদাসী, যথার্থ ত তারা পুরোহিতেরই সেবাদাসী—(শিহরিয়া) সত্য কি? তাই কি? হয় ত, হয় ত এ ভ্রান্তি নয়, হয় ত এই ঠিক! ভদ্রা, চিন্তা, রম্ভা, স্বয়ং বড়-ঠাকরুণ চম্পাদেবী—

রাঘব। (আর একটু কাছে আসিয়া) কি দেবদাসি! রাজার পরামর্শটা বড়ই গোপন না কি? নীরব হয়ে রইলে যে?

বিশোকা। (আহত চিত্তে মাথা তুলিল) দেখুন, কারু সঙ্গে আমার কোন গোপন কথা নাই। তিনি শুধু আমার এ স্থান শীঘ্র করে ত্যাগ করতে বল্লেন। বল্লেন, আমার বিপদের দিন শীঘ্রই আসবে;—যদি পবিত্র থাকতে চাই, যেন এ মন্দির ত্যাগ করে যাই।

রাঘব। (বক্র হাসিয়া) বেশ!—কোথায়? রাজোদ্যানে? মন্দিরের চেয়ে স্থানটা পবিত্র বটে!

বিশোকা। (বিরক্তি-বিরস-কণ্ঠে) না, তা' তিনি বলেন নি, রাজোদ্যানে আমায় ডাকেন নি, তাঁর মায়ের সঙ্গে কাশীধামে পাঠিয়ে দিতে চান। বল্লেন, দেবদাসী *নামেই শুধু দেবদাসী, প্রকৃতপক্ষে সে পুরোহিতেরই সেবিকা।* নিশ্চয়ই তিনি ভ্রমে পড়ে—

রাঘব। রাজা তো ঠিক কথাই বলেছেন! তাঁর তো কোনই ভুল হয় নি! ও কি! অমন করে চমকালে কেন? যেদিন বিগ্রহের কণ্ঠে মাল্যদান করেছ, সেইদিনই কি বুঝতে পারো নি, সে মালা কার গলায় পড়েছে? পুরোহিত দেব-প্রতিনিধি; সমস্ত দেব-সম্পত্তিতে তাঁরই অপ্রতিহত অধিকার। দেবতা তো নিজের শরীর দিয়ে কিছুই ভোগ করেন না, ভোগ করে তাঁর প্রতিনিধি। এ'তে রাজার কোনই হাত নেই; তাঁর সাধ্য কি যে তোমায় তিনি এখান থেকে নিয়ে যান! তুমি সম্পূর্ণরূপেই আমার,—আমার!

বিশোকা। (সমস্ত বুঝিয়া আত্মগত) এই সত্য! রাজার ভ্রম নয়, ভ্রম আমার? দেবদাসী দেবতার নয়, সে দেবতার উৎসর্গিতা পুরোহিতের সেবাদাসী! এরই এত গৌরব? এর জন্য মা সন্তান দান করে যায়? ওঃ রঙ্গনাথজী?

রাঘব। (শয্যার নিকটস্থ হইয়া তদুপরি আসন গ্রহণ করিলেন ও মৃদুহাস্যের সহিত) তুমি নিতান্ত শিশু-প্রকৃতি এবং অত্যন্ত নির্ব্বোধ; তাই এ'তে এতই বিচলিত হয়েছ। না হলে আশ্চর্য্য বা অধীর হবার কথা এর মধ্যে এমন কিছুই নেই; এ তো আবহমান কালের লোকাচার-সম্মত; নূতন সৃষ্টি নয়!—আসল কথা, তুমি রাজার রূপে মুগ্ধ, রাজাও নিজে তাই;—কিন্তু এর কি প্রয়োজন ছিল? রাজার অনেক আছে, মন্দিরসেবিকা রাজার জন্য নয়। এ দুরাশা তাঁকে বাধ্য হয়েই ত্যাগ করতে হবে। আর আমি বলি কি, তুমিও করো। রাজরাণী তো হতে পার্ব্বে না; যে পদ পাবে, তার চেয়ে

শ্রেষ্ঠ পদেই আছ। রাজার শত চেষ্টা তোমায় এই মন্দির-সীমার বাইরে এক পাও নিয়ে যেতে পার্ব্বে না; বরং দরকার মনে করলে আমিই তাঁর এ মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ করতে পারি। এমন ক্ষমতা আমার আছে। তুমি দেবদাসী, ধরিতে গেলে দেব-প্রতিনিধিত্বে আমার স্ত্রী, আমি সে অধিকার আজ থেকে গ্রহণ করলেম। তুমি আমার। (হাত ধরিল)

বিশোকা। (সচমকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভয়ে বিস্ময়ে ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে) না, আমি দেবতার! প্রভু শ্রীরঙ্গনাথজী আমার স্বামী! আপনি আমায় অমন অপমানজনক কথা বলবেন না।

রাঘব। বটে! আমি বল্‌বো না? আর রাজা যখন বলছিলেন, তখন শুনতে তো বেশ মিষ্টি লাগ্‌ছিল! সে আমার চেয়ে সুন্দর বলে বুঝি?

বিশোকা। (সতেজে) না, তিনি অমন খারাপ লোক নন, তিনি আমায় ও-সব কথা কিছুই বলেন নি। আপনি যান্‌,—শীঘ্র যান, না হলে আমি এক্ষণি বড়-ঠাকরুণকে ডাকবো।

রাঘব। (আসন ছাড়িয়া উঠিয়া সহাস্যে) ডেকে কি হবে? চিরদিনই এই প্রথা। দেবদাসী মাত্রেই পুরোহিতের সম্পত্তি; তোমার বড়-ঠাক্‌রুণটাই কি দেবদাসী ছাড়া? না, তিনি দেখেশুনে অবাক হয়ে যাবেন? পাগল! দেব-প্রতিনিধির স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য বড় তুচ্ছ ভেবো না। থাক, আজ আমি চল্লাম, রাজার আশা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আজ নিদ্রা যাও। কাল রাত্রে এসে যেন তোমায় ব্যর্থ চিন্তায় উত্তেজিত না দেখি। মাথা ঠাণ্ডা রেখো। তুমি কারু নও, শুধু আমার। [প্রস্থান।

বিশোকা। (শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া) রঙ্গনাথ! এই আমি পেলেম?

পটক্ষেপণ

দশম দৃশ্য

মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগ

প্রাচীর-গাত্রে হেলান দিয়া বিমনা বিশোকার মৃদুকণ্ঠে গান।

যেতে দাও—দাও যেতে দাও, যেতে দাও, যাক্ সে ঘুচে।
যা' গেছে যা' ফুরায়েছে; যা:ক্ তা যাক্ তা মুছে!
ফিরাতে যায় পারিবে না, কেন তাকে পিছু ডাকি,
ফাঁকি দিতে দিতেই হবে, যে তোমারে দেবেই ফাঁকি,
ধরতে তারে পারচিনেরে, মিছে কেঁদেই মরা বারে বারে,
বৃথা ফেরা দ্বারে দ্বারে সেই হারিয়ে যাওয়ার পিছে পিছে।

(শিশুপুত্র-কক্ষে রঙ্গিলার প্রবেশ। পশ্চাতে দাসী-হস্তে পূজা-সম্ভার)

রঙ্গিলা। হ্যাঁগা! তুমি এখানে আজ এমন করে বসে কেন গো? যেদিনই আসি, তোমায় দেখি, ফুল সাজাচ্চো নয় গান গাচ্চো। হাসিটী তো মুখখানিতে লেগেই থাকে। আজ কেন তোমার চোখে জল?

বিশোকা। (চোখ মুছিতে মুছিতে) কিছু ভাল লাগছে না। (নতমুখী হইল)

রঙ্গিলা। কেউ বুঝি বকেছে?

বিশোকা। (নীরবে মাথা নাড়িল)

[রঙ্গিলার শিশু কোল হইতে নামিয়া বিশোকার কাছে আসিল। তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গলা জড়াইয়া মুখে মুখ দিয়া ডাকিল—]

শিশু। মা-ম্-মা! মা-ম্-মা! মাঃ!—

বিশোকা। (চমকিয়া চাহিয়া ব্যগ্রভাবে শিশুকে টানিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল, তার চোখ দিয়া অবাধে অশ্রু ঝরিতে লাগিল)

বিশোকা। ধন! ধন! ধন! মাণিক! (স্বগতঃ) কি সুখের এই ছেলেটী! ও আমায় মা বল্লে! মা! মা! আমার মনে হচ্চে ও যদি আমার ছেলে হতো, ও যদি আমার কাছে থাকতো, আমায় মা বলতো, আমি—আমি ওকে এক মুহূর্ত্ত মাটীতে নামাতুম না,—এই এম্‌নি করে বুকে চেপে রাখতুম, বুক জুড়িয়ে যেত। (পুনঃ পুনঃ চুম্বন)

রঙ্গিলা। (শিশুকে টানিয়া লইয়া চারিদিকে চাহিল) দাও গো ছেলে দাও, কেউ যদি দেখে, আমায় নিন্দে করবে।

বিশোকা। (তৃষিতভাবে শিশুকে বুকে চাপিয়া) কেন ভাই? তা' কেন করবে?

রঙ্গিলা। ও মা, বল কি? তা' করবে না? তোমরা

হচ্চো নাচ্‌নেওলি, তোমাদের সঙ্গে কি আমাদের মতন ঘর-গেরস্থালীর ঝি-বউদের মিশতে আছে? তবে তুমি না কি বড্ড ছেলেমানুষ, আর এত সুন্দর, তাই দু'একটা কথা না কয়ে পারিনে। তা' আহা, তুমি যদি এ কাজ না করে বে'থা করে সংসার-ধর্ম্ম করতে, বেশ ভাল হতো! দেখ দেখি, মেয়েমানুষ হয়ে এমন পোড়া কপাল! তোমাদের তো বে'থা হয় না?

বিশোকা। (আহতভাবে) শ্রীরঙ্গনাথজীই আমার স্বামী।

রঙ্গিলা। ও মা! এ যে ক্ষ্যাপার কথা। মানুষের আবার ঠাকুর স্বামী হয়? ও ভাই, একটা মিথ্যে বায়নাক্কা, আসলে হচ্চো তোমরা নাচনেওলি! বড় ছোট কাজ! মন্দিরে বসে বসে পাপ করা, বুকের পাটা কিন্তু তোমাদের খুব শক্ত! ভয় করে না? আয়রে খোকা, পূজো দিই গে, আয়।

(শিশুকে টানিয়া কোলে লইয়া চলিয়া গেল)

বিশোকা। রঙ্গনাথ! ভাল রঙ্গ দেখালে! এই আমার পদ? এইখানে আমার স্থান? এই কি আমার দেবীত্ব? এই গর্ব্বেই আমি এতদিন মাটীর পৃথিবীকে তুচ্ছ করে চলেছি? বিশ্বাস করে চলেছি, আমার দেহ এখানে বাঁধা থাকলেও, আসন পাতা আছে আমার জন্যে বৈকুণ্ঠে! ওঃ! গৃহস্থ-বধূ আমার সঙ্গে কথা কইতে ঘৃণা বোধ করে। পবিত্রতম শিশু দেহ তৃষ্ণা-কাতর স্পর্শে কলুষিত হয়ে যায়। জগদীশ্বর! কি দুর্ব্বহ এ জীবন!—পিতা নেই, মাতা নেই, স্বামী পুত্র সখা কিছু না, কেউ না! কেউ থাকবে না! একটী সেবা-স্নিগ্ধ দুঃখে-সুখে ভরা আপনার বলতে কুটীর-গৃহ পর্য্যন্ত না। এই আশা-বাসনায় ভরা তরুণ জীবনে আশাহীন অন্তহীন অপার দুঃখ-সমুদ্র মাত্র সাথী হয়ে আছে। ইহকাল তো ফুরিয়ে গেছেই, পরকালের পথও কণ্টকাকীর্ণ, আতপ-তপ্ত মরু-ক্ষেত্রের মধ্যগত। রঙ্গনাথ! রঙ্গনাথ! এ কি করলে? আমায় কেন দেখালে? হায় রাজাধিরাজ! ওরে ক্ষুদ্র শিশু! তোমরা এ কি দুরন্ত ক্ষুধা আমার প্রাণে জড়িয়ে দিলে? এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে এই মহা শূন্যতার মধ্যে মানুষে কি বেঁচে থাকতে পারে?—

(জানুর মধ্যে মুখ ঢাকিল)

শেষ দৃশ্য

(পূজার আসনের নিকট পুষ্পাঞ্জলি হস্তে বিশোকা।)

নৃত্যগীত

তোমারই গীতি বন্দনে, কুসুমে, সুরভিচন্দনে,
অঞ্জলি ভরে এনেছি নাথ দিতে ঐ দুটি রাঙ্গা পায়।
কণ্ঠে ফুটে না ভাষা গান, বেদনা-বিধুর সারা প্রাণ,
অবসাদে ভরা দেহখান, চরণে লুটায়ে স্থান চায়।
তুমি সৎ, তুমি সুন্দর, হে মম চির-নির্ভর,
লহ এ জীবন দুর্ভর, শান্তি শীতল পদছায়।

(ধীরে ধীরে আসনের উপর শুইয়া পড়িল)

(অদূরে ছদ্মবেশী রাজার প্রবেশ)

উৎপলাদিত্য। (অনুচ্চকণ্ঠে) বিশোকা! বিশোকা! কই তুমি? কোথায় তুমি বিশোকা? যান-বাহন প্রস্তুত, মহারাণীর পার্শ্বচারিণী মন্দ্রাদেবী স্বয়ং তোমায় নিতে এসেছেন। কই? বিশোকা তো নেই? (অগ্রসর হওন) কেন, কেন সে এলো না? সময় যে বয়ে যাচ্ছে। এ কি? কিসের এ কলরব? কি যেন একটা আকস্মিক আশ্চর্য্য-জনক ঘটনা ঘটে যাচ্চে, এম্‌নি করে সবাই মন্দিরাভিমুখেই ছুটে যাচ্চে! (অগ্রসর হওন)

মন্দিরের সম্মুখে অত্যন্ত জনতা। সকলেই মন্দিরের ভিতর ঢুকিবার জন্য পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করিতেছিল। ছদ্মবেশী রাজা সন্দিগ্ধকণ্ঠে একজনকে প্রশ্ন করিলেন।

রাজা। মন্দিরে কি এমন ঘটেছে যার জন্য সকলে এমন উৎসুক হয়ে উঠেছে?

লোক। কি এমন ঘটেছে বল্‌ছো কি হে? কি এমন ঘটে নি তাই বল্‌লেই পার্‌তে! যা ঘটেছে, শ্রীরঙ্গনাথজীর এ মন্দির বর্ত্তমান থাকতে আর তা' কোনদিনই পূর্ণ হবে না। কনিষ্ঠা দেবদাসী দেবমন্দিরে পূজা করতে করতে দেবলোকে প্রস্থান করেছে। যেমন তার অলৌকিক রূপ, যেমন তার অশ্রুতপূর্ব্ব সুকণ্ঠ, যেমন তার অনন্যসাধারণ দেবনিষ্ঠা, তা'রই উপযুক্তই এ মহাপ্রস্থান।

[প্রস্থান।

রাজা। (আর্ত্তকণ্ঠে) দেবদাসি! ভেবেছিলেম আমি

তোমার সংসারের অপবিত্রতা থেকে রক্ষা কর্বো; কিন্তু নিজের চিত্ত আমার দেব নির্ম্মাল্যের প্রতি যে লোভাকৃষ্ট হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই; তাই বুঝি দেবতা তাঁর নিজের দাসীকে নিজেই নিজের সর্ব্বনিরাপদ নিষ্কলুষ অঙ্কে আশ্রয় প্রদান করে—সকলকেই নিশ্চিন্ত করলেন?

বিজয়রাঘবের প্রবেশ

বিজয়রাঘব। ঠিক বলেছ মহারাজাধিরাজ উৎপলাদিত্য! ঠিক বলেছ; আমি তাকে তাঁর সর্ব্বনিরাপদ চরণাশ্রয়ী হতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি, কিন্তু তোমার হাতে তাকে দিতে পারতেম না। প্রধান পুরোহিত আরতি করবার জন্যে এসে দেখেন সর্ব্বের কনিষ্ঠা দেবদাসী বিশোকা পূজার আসনের উপর চির নিদ্রাগতা। স্বর্গের উর্ব্বশী হয়ত ইন্দ্রের অভিশাপে দুদিনের খেলা খেলতে ধরাধামে নেমে এসেছিলেন, শাপান্ত হয়ে স্বর্গে ফিরে চলে গেলেন। আহা, অত রূপ, অমন কণ্ঠ আর কখন কেউ দেখবে না।

উৎপলাদিত্য। (প্রাচীর ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে) বিশোকা, আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ। ওঃ ওঃ কেন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলেম!

প্রধান পুরোহিত। (ধীর পদে আসিয়া রাজার কাঁধে হাত রাখিলেন) ভুল ভুল, ভুল করেছেন, মহারাজাধিরাজ! যদি বিশোকার হত্যাকারী বলে কেউ গৌরব কর্ব্বার অধিকারী থাকে, সে আমি।

পটক্ষেপণ

বিবিধ-প্রসঙ্গ

গীতার পরিচয়

প্রতিবাদ

বিগত বৈশাখ মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় 'গীতার-পরিচয়' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি প্রতিবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উক্ত প্রবন্ধের শেষ ভাগে প্রদত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে যে কয়েকটী প্রতিবাদ আসিয়াছে, তাহার সকলগুলি আদ্যন্ত প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর হইবে না জন্য আমরা কয়েকজন প্রতিবাদকারীর মূল বক্তব্য তাঁহাদেরই ভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বীরেশ্বর বাবু বলিয়াছেন যে গীতার পূর্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ শুনিতেছিলেন। তাহার পর যে ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবেন যে কৌরব ও পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল—ইহা হইতেই পারে না; কারণ, এই প্রশ্নের সহিত পূর্বাধ্যায়ের শেষ অংশের বা অন্য অংশের কোন সম্বন্ধ বা ধারাবাহিকতা নাই। কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাব গীতার অন্যত্রও দেখা যায়, এবং অন্য পুরাণেও দেখা যায়। গীতার পূর্ব্বাধ্যায়গুলির যে বিবরণ বীরেশ্বরবাবু সংকলন করিয়া দিয়াছেন তাহাতেও ধারাবাহিকতার অভাব দেখা যায়; যথা, প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, পাণ্ডবেরা পশ্চিম ভাগে এবং কৌরবেরা পূর্ব ভাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে কোন্ কোন্ দেশ হইতে পাণ্ডবেরা সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সৈন্য-সংগ্রহ পূর্বে হয়, শিবির-সন্নিবেশ পরে হয়, সুতরাং এখানে ধারাবাহিকতার ব্যত্যয় হইল। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইল যে ভীষ্ম মারা গিয়াছেন, তাহার পর ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে যুদ্ধারম্ভের বর্ণনা হইল, এখানেও ধারাবাহিকতার ব্যত্যয়। কি উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকতা ব্যাহত হইয়াছে এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এরূপ ব্যত্যয় যে বহু স্থলে দেখা যায়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যিনি গীতা রচনা করিতে পারেন, তাঁহার কিছু বুদ্ধি ছিল ইহা বীরেশ্বর বাবু অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি যদি ধারাবাহিকতা রাখিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে ভীষ্মপর্বের ২৪ অধ্যায়ের পরে গীতা না বসাইয়া ১৫ অধ্যায়ের পর গীতা বসাইলেই পারিতেন। মহাত্মা তিলক বলিয়াছেন যে গীতার ভাষা ও মহাভারতের ভাষা একই-রূপ। তিলকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বীরেশ্বর বাবু ইহা বলাই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন যে, গীতায় যেমন নানা প্রকার ছন্দের শ্লোক আছে মহাভারতে অন্যত্র তেমন নাই, এবং গীতায় যেরূপ অপাণিনীয় প্রয়োগ আছে মহাভারতে সেরূপ নাই। এ কথা বীরেশ্বর বাবুর মনে হইল না যে, গীতাকার যখন গীতাকে মহাভারতকারের রচনা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখন কয়েকটা নূতন ছন্দের শ্লোক রচনা না করিলেই অথবা পাণিনি মানিয়া চলিলেই যদি তাঁহার জোচ্চুরি বেমালুম চলিয়া যাইত, তাহা হইলে কেন তিনি সেরূপ করিলেন না? মহাভারতে অন্যত্র ভিন্ন ছন্দের শ্লোক বিরল—বীরেশ্বর বাবুর এই উক্তি কিরূপ যথার্থ তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই ভীষ্মপর্ব্বের প্রথম ২২ অধ্যায়ের মধ্যে

অনুপ্রাস ভিন্ন অন্য ছন্দের শ্লোক ৩১টি পাওয়া যায় *। সমগ্র গীতার এরূপ শ্লোক ৫৩টি, † তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ১১শ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ-দর্শনে। ১১শ অধ্যায় বাদ দিলে অপর অধ্যায়গুলিতে মোটে ২০টি এরূপ শ্লোক আছে। গীতার ১৮টি অধ্যায়ের মধ্যে ১৩টি অধ্যায়ে এরূপ শ্লোক একটিও নাই। গীতায় অপাণিনীয় প্রয়োগ সম্বন্ধে "ভারতবর্ষ" সম্পাদক মহাশয় যথার্থই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে বীরেশ্বর বাবু "যদি দেখাইতে পারিতেন যে গীতায় আর্ষগুলি পদ্মনাভের ব্যাকরণ-সম্মত তবে তাঁহার প্রমাণ দৃঢ়তর হইত"। বীরেশ্বর বাবু কি বলিতে চাহেন যে সুপদ্মব্যাকরণ অনুসারে "প্রিয়ায়াঃ + অর্হসি" সন্ধি করিয়া "প্রিয়ায়ার্হসি" হয়, এবং সেনানী শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে সেনানীনাং হয়? বাস্তবিক এগুলি আর্ষ-প্রয়োগ। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে এরূপ হয় না।

শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু অতঃপর লিখিয়াছেন :—

"বীরেশ্বর বাবু তাঁহার প্রবন্ধের যে অংশে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে গীতায় "অনেক নূতন মত সন্নিবেশিত (সন্নিবিষ্ট?) হইয়াছে" সেই অংশে বড় বেশী ভুল দেখা যায়। তিনি বলিয়াছেন 'সাধারণতঃ ভারতবর্ষবাসীর এই মত যে পরমাত্মা এবং জীবাত্মা দুইটি পৃথক বস্তু ; কিন্তু ৺মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রদর্শন করিয়াছেন যে গীতায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ স্বীকৃত হয় নাই।" বীরেশ্বর বাবু নিশ্চয় অদ্বৈতবাদ নামক মতের কথা বলিয়াছেন। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বলা যাইতে পারে। এই অদ্বৈতবাদ অনুসারে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। বীরেশ্বর বাবু যেন না মনে করেন যে অদ্বৈতবাদ গীতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ সকল মত গুলিই শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেরূপ কোন শ্রুতিবাক্য অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক এবং কোন শ্রুতিবাক্য অদ্বৈতবাদ বিরোধী বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, সেইরূপ গীতার কোন বাক্য অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক এবং কোন বাক্য অদ্বৈতবাদ-বিরোধী বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে গীতা কোন নূতন মত প্রতিপাদন করেন নাই।

বীরেশ্বর বাবু বলিয়াছেন "ভারতীয় ধর্মপ্রবর্ত্তকেরা সকলেই কত যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, কত কৃচ্ছ সাধন, কত ব্রত উপবাস করিতে বলিয়াছেন ; কিন্তু গীতাকার বলিয়াছেন কেবল ভাণ করিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম করাই ধর্ম-যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"। সকল ধর্ম-প্রবর্ত্তক যাগযজ্ঞ করিতে বলেন নাই। যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক তাঁহারা বলেন, কেবল জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হইবে, অপর কিছুর প্রয়োজন নাই। ভক্তিমার্গের সাধক বলেন কেবল প্রেম-ভক্তি দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। প্রত্যুত গীতা যাগ-যজ্ঞ করিতেও বলিয়াছেন। যথা,

"যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেবতৎ," "যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা ত্যাগ করিবে না, ইহাদের অনুষ্ঠান করিবে।"

---

* ২য় অধ্যায় ৬৫-৬৯ শ্লোক ; ২০ অধ্যায় ১—১৪, ১৯ শ্লোক ; ২২ অধ্যায় ৫—১৩, ১৫, ১৬।

† ২য় অধ্যায় ৫—৮, ২০-২২, ২৯, ৭০ ; ৮ অধ্যায় ৯-১১, ২৮ ; ৯ অধ্যায় ২০-২১ ; ১১ অধ্যায় ১৫—৫০ ; ১৫ অধ্যায় ২—৫, ১৫

কৃচ্ছ্র সাধন না করিলে তপস্যা হয় না ; সুতরাং গীতা কৃচ্ছ্র সাধন করিতেও বলিয়াছেন।

"মৎকর্মপরমো ভব" অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্যে কর্ম কর। ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্রত উপবাসাদি কর্ম করিলেও সিদ্ধিলাভ করা যায় ইহাও গীতার মত। বীরেশ্বর বাবু বলিয়াছেন, "ভাণ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম করাই ধর্ম" ইহার অর্থ কি বুঝিলাম না। "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্" বাক্যের ত এরূপ অর্থ হয় না। এই বাক্যের অর্থ "কর্ম করিবার কৌশলকে যোগ কহে।" সে কৌশল কি তাহা গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন—ফললাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না, কর্মের প্রতি আসক্তি থাকিবে না, এই ভাবে কর্ম করিতে হয়, তাহা হইলে কর্মফল বন্ধনের কারণ হয় না। কিন্তু ইহা ছাড়া গীতার মতে অন্য ধর্ম কর্ত্তব্য নাই, বীরেশ্বর বাবু ইহা কোথায় পাইলেন? বীরেশ্বর বাবু বলিয়াছেন "ভারতীয় ধর্ম-প্রবর্ত্তকেরা খাদ্যাখাদ্য বিচার কত করিয়াছেন। গীতাকার কিন্তু সে সকল বিচার কর্ত্তব্যের মধ্যেও আনেন নাই। তাঁহার মতে যাহা শরীর মনের পক্ষে ভাল তাহাই সাত্ত্বিক আহার।" ভারতীয় অন্য ধর্ম-প্রবর্ত্তকেরা যে খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিয়াছেন, সে বিচারও ত এই বিচার,—প্রভেদের মধ্যে তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন যে এই এই দ্রব্য খাইলেই শরীরের উত্তেজনা হয়, তমোগুণ বৃদ্ধি হয়। গীতাকার সকল দ্রব্যের উল্লেখ করেন নাই। রাজসিক ও তামসিক আহার কিরূপ, গীতা তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বিচার গীতা পুনরুল্লেখ করেন নাই। কিন্তু সেই বিচার যে গীতাকারের অভিমত তাহা গীতাকারের সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক আহারের উল্লেখ হইতে বুঝিতে হইবে। গীতা অন্যত্রও স্পষ্ট বলিয়াছেন।—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বাশাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥

"কোন্ কার্য্য করা উচিত, কোন্ কার্য্য করা উচিত নয়, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ, শাস্ত্রের বিধান জানিয়া তোমার কর্ম করা উচিত। এই সকল স্পষ্ট বাক্য থাকা সত্ত্বেও বীরেশ্বর বাবু কি করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে অপর সকল শাস্ত্রের বিধান পরিত্যাগ করিয়া গীতা নূতন মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা বীরেশ্বর বাবুই বলিতে পারেন।

তাহার পর বসন্তবাবু বলিয়াছেন—

গীতায় আছে—

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং ॥

বীরেশ্বর বাবু বলেন এখানে "অপর্য্যাপ্ত" মানে প্রয়োজনের অধিক অর্থাৎ বাঙ্গলা ভাষায় অপর্য্যাপ্ত পদের যে অর্থ হয়, তাহা। কিন্তু ইহা ঠিক মনে হয় না। দুর্য্যোধনের বল যদি প্রয়োজনের অধিক হয়, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের বল প্রয়োজনের কম হয়। কিন্তু বলা হইয়াছে যে যুধিষ্ঠিরের বল "পর্য্যাপ্ত" অর্থাৎ প্রয়োজনানুরূপ। সুতরাং অপর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ প্রয়োজনের কম। সত্য বটে যে, পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী এবং কৌরবদের এগার অক্ষৌহিণী। কিন্তু সেনাবল কেবল সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, বিশেষতঃ পৌরাণিক যুদ্ধ-কাহিনীতে দেখা যায় যে বড় বড় বীর একা বহু

সংখ্যক শত্রুসৈন্য বিনাশ করিতেছেন। দুর্য্যোধন এখানে উভয় পক্ষের সেনাপতির নাম উল্লেখ করিয়া দেখিলেন যে পাণ্ডবপক্ষে বড় বীর বেশী। যদি দুর্য্যোধনের মনে বিষাদ না হয় তাহা হইলে পরবর্ত্তী শ্লোকের অর্থ সুসঙ্গত হয় না। পরবর্ত্তী শ্লোকে দুর্য্যোধন বলিতেছেন সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করুন। অর্থাৎ তিনি পরাজয় আশঙ্কা করিতেছেন। পুনশ্চ গীতায় আছে—

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃশংখং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥

ভীষ্মদেব দুর্য্যোধনের মনে হর্ষ সঞ্চার করিয়া শংখধ্বনি করিলেন। দুর্য্যোধনের মনে পূর্ব্বে বিষাদভাব থাকিলেই হর্ষ উৎপাদনের কথা সুসঙ্গত হয়।

"হে" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া বীরেশ্বরবাবু অনুমান করিয়াছেন যে গীতাকার বাঙ্গালী। কিন্তু "অয়ি" "ভোঃ" যেরূপ সংস্কৃত শব্দ, "হেও" সেরূপ সংস্কৃত শব্দ। কাব্যে 'হে' শব্দের প্রয়োগ কম, ইহার কারণ, অনাদর অর্থে হে শব্দের প্রয়োগ হয়। গীতায় অনাদর অর্থেই প্রয়োগ হইয়াছে।

বীরেশ্বরবাবু যে যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে গীতাকারের নাম পদ্মনাভ, সে যুক্তি একেবারেই বিচারসহ নহে। বীরেশ্বরবাবু এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনিঃসৃতা॥

ইহার অর্থ,—গীতা ভাল করিয়া পাঠ করা উচিত, অন্য বহু শাস্ত্র পাঠ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ গীতা স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। এখানে পদ্মনাভ শব্দের অর্থ বিষ্ণু বা ভগবান। স্বয়ং ভগবানের মুখ হইতে গীতা বাহির হইয়াছে, এজন্য অপর শাস্ত্র পাঠ না করিলেও চলে। কারণ অপর সকল শাস্ত্র ঋষিমুখ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং সেই ঋষিদিগের মধ্যে অনুপ্রেরণা দিয়াছেন ভগবান। *

ভগবান অন্যের মুখ দিয়া যে সকল শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন তাহার মূল্য বেশী। কিন্তু পদ্মনাভ শব্দের অর্থ যদি সুপদ্ম-প্রণেতা পদ্মনাভ দত্ত হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের কোন অর্থ হয় না। কারণ অপর শাস্ত্র সকল ত পদ্মনাভ দত্তের অনুপ্রেরণায় রচিত হয় নাই। বস্তুতঃ উপরিউক্ত শ্লোকে পদ্মনাভ শব্দের অর্থ এত সুস্পষ্ট যে ইহাতে কোন সন্দেহই হয় না।

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রতিবাদে বলিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় বলেন, গীতাকার বাঙ্গালী। তাঁহার প্রথম যুক্তি এই—বঙ্গদেশে বড় কবির জন্ম হইয়াছে, বড় বড় ধার্ম্মিকের আবির্ভাব হইয়াছে, অতএব গীতাকার বাঙালী হওয়া অসম্ভব কি? আর একটী যুক্তি এই যে গীতায় কতকগুলি কথা আছে তাহা কেবল বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হয়; যথা,—

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ১।১০

এই স্থলে তিনি বলেন, বঙ্গদেশে অপর্য্যাপ্ত অর্থে প্রয়োজনাতীত, অনেক বুঝায়। গীতাতেও তাহাই অর্থ। বাস্তবিক তাহা নহে। এস্থলে অপর্য্যাপ্ত অর্থ পর্য্যাপ্ত নয়, অপ্রচুর। গীতার টীকা সমূহেও সেই অর্থ ধৃত হইয়াছে।

নব্য ও প্রাচীন অভিধানেও ঐরূপ অর্থই আছে। কাজেই সেন মহাশয়ের অর্থ ব্যর্থ হইতেছে। সেন মহাশয় বলেন যে একাদশ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে আছে—

"হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি"

'হে' শব্দ সম্বোধনে কেবল বাঙ্গালী লোকেই ব্যবহার করে। অতএব গীতাকারও বাঙ্গালী। হে, সংস্কৃত কথা। সংস্কৃত কোষ মধ্যে অমরকোষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অমর খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ পাশ্চাত্য মনীষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই অমরকোষে সম্বোধনবাচক শব্দের পর্য্যায়ে এইরূপ আছে "সম্বোধনার্থ কাঃ স্যুঃ পাটপাড়ঙ্গ (পাট্, অঙ্গ) হে হে ভোঃ।" শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত মেদিনী-কোষে আছে—"হে সম্বোধনম্, আহ্বানম্। অতএব হে যে সংস্কৃত শব্দ তাহাতে ভুল নাই। পৌরাণিক প্রণাম মন্ত্রে আছে—"

"হে কৃষ্ণ দ্বারকানাথ ক্বাসি যাদবনন্দন
মথুরেশ হৃষীকেশ ত্রাতা ভব জনার্দ্দন।"

ঋষিকল্প শঙ্করাচার্য্য কৃত শিবের নাম স্তোত্রে আছে

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে

* * * *

হে পার্ব্বতী হৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে

* * * *

হে রামদেব ভবরুদ্র পিনাকপাণে

ইত্যাদি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন :—

ইহার পর সেন মহাশয়ের শেষোক্ত প্রশ্নের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন হইলেও পাঠক মহোদয়গণের অবগতির জন্য এইটুকু আলোচনা করিব।

মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের ২৪ অধ্যায়ের পর, অর্থাৎ ঐ পর্ব্বের ২৫ অধ্যায় হইতে ৪২ অধ্যায় পর্য্যন্ত, অষ্টাদশ অধ্যায়ে গীতা সমাপ্ত। ৪২ অধ্যায়ের পরে ৪৩ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যাঃ কি মান্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা।

কোন কোন স্থলে "বিস্তরৈঃ" স্থলে "সংগ্রহৈঃ" পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহার সরলার্থ এই—

যে গীতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে পতিত হইয়াছে, সেই গীতাই সুন্দররূপে গীত হওয়া উচিত। অন্য শাস্ত্র সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন।

সেন মহাশয় মহাভারতের এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া বলিতে সাহস

---

* "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে যে সকল শাস্ত্রের মূল কারণ ভগবান।

করিয়াছেন যে "স্বয়ং পদ্মনাভ" সুপদ্ম-ব্যাকরণ রচয়িতা পদ্মনাভ দত্ত। অবশ্য তিনি জানিতেন না যে এই শ্লোকটী মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্তির, অব্যবহিত পরের শ্লোকই। তাহা হইলে তিনি বালুকাময়ী ভিত্তির উপর তাঁহার এই সিদ্ধান্তরূপ অট্টালিকার নির্ম্মাণ-কার্য্যের প্রচেষ্টা করিতে সাহস পাইতেন না। যাহা হউক একটুকু কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান বিশিষ্ট বালকও বুঝিবে যে "স্বয়ং পদ্মনাভ" বলিলে সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীবিষ্ণুকেই বুঝায়। ভগবানের সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে বলিয়াই "মুখপদ্ম হইতে বহির্গত" লিখিত হইয়াছে। ইহা যদি ব্যক্তি-বিশেষের সম্পর্কে লিখিত হইত তবে "মুখপদ্ম" বা "বিনিঃসৃত" লিখিত হইত না। কারণ পদ্মনাভ দত্ত মহাশয় তাঁহার প্রণীত সুপদ্ম ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মুখপদ্ম বিনিঃসৃত হয় নাই। দেখা যাইতেছে যে গীতায় অনেক আধুনিক ব্যাকরণ-দুষ্ট শব্দ, সন্ধি ও ছন্দঃ আছে। সুপদ্মকার একজন বড় বৈয়াকরণ, তিনি ঐরূপ কেন লিখিবেন? সুপদ্ম কেন এমন কোন ব্যাকরণ নাই যাহাতে সখে + ইতি = সখেতি, শুদ্ধ বলিবে। অথবা, সেনান্যাং স্থলে সেনানীনাং বলিবে।

শ্রীযুক্ত রামশরণ ঘোষ এম-এ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বীরেশ্বরবাবু তিন জন পদ্মনাভের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন এবং আর একজন ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের কেহ গীতাকার হইতে পারেন না; কারণ, গীতা শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল যেহেতু শঙ্করাচার্য্য (৭৮৮—৮৫০) গীতার ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। অতএব অবশিষ্ট পদ্মনাভ অর্থাৎ সুপদ্ম-ব্যাকরণকারই গীতাকার ছিলেন। বীরেশ্বরবাবু যদি সুপদ্মব্যাকরণকার পদ্মনাভের সম্বন্ধে একটু সন্ধান লইতেন তাহা হইলে তিনি কখনও ঐ দুই পদ্মনাভের অভিন্নত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিতেন না। বৈয়াকরণ পদ্মনাভ দত্ত সুপদ্ম ব্যাকরণ, সুপদ্ম পঞ্জিকা, পরিভাষা, যঙ্লুগবৃত্তি, উনাদিবৃত্তি ধাতুকৌমুদী, প্রয়োগদীপিকা, গোপাল-চরিত, আনন্দলহরী টীকা, ভূরিপ্রয়োগ ও আচারচন্দ্রিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন

"বিশ্বপ্রকাশামরকোষটীকাত্রিকাণ্ডশেষোজ্জ্বল দত্তবৃত্তী।
হারাবলীমেদিনী কোষমল্যস্বালোক্য লক্ষ্যং লিখিতং ময়ৈতৎ"॥

ইহাদের মধ্যে উজ্জ্বলদত্ত ত্রয়োদশশতাব্দীর এবং ত্রিকাণ্ডশেষ রচয়িতা পুরুষোত্তম দেব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর। সুতরাং পদ্মনাভ দত্ত চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে।

বীরেশ্বরবাবু লিখিয়াছেন সুপদ্মকার সম্পূর্ণরূপে পাণিনিকে মানিয়া চলিতেন না। এ কথা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া গীতায় যে সমস্ত অপাণিনীয় শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা যে সুপদ্মব্যাকরণের অনুমোদিত তাহা নহে।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

সুপদ্মকার পদ্মনাভ দত্ত ও গীতাকার অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সেন মহাশয় প্রধানতঃ—নিম্নলিখিত যুক্তি কয়েকটীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,— (১) গীতায় অপাণিনীয় বহু প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, পদ্মনাভ দত্ত সম্পূর্ণরূপে পাণিনিকে মানিয়া চলিতেন না, (২) গীতায় কতিপয় সংস্কৃত শব্দের বঙ্গদেশে প্রচলিত অসংস্কৃত (?) অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, (৩) গীতার মূল উপনিষদ্ হইলেও ইহার সর্ব্বত্র উপনিষদের অর্থ অবিকল গৃহীত হয় নাই। আপাততঃ এই কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লেখকের অন্য কয়েকটী যুক্তির উত্তর না হউক, অন্ততঃ প্রতিপ্রশ্ন স্বয়ং 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক মহাশয় করিয়াছেন। আশা করি এই সকল প্রতিপ্রশ্নের সম্বন্ধে বীরেশ্বর বাবুর বক্তব্য 'ভারতবর্ষ' পত্রের সৌজন্যে আমরা জানিতে পারিব। সুতরাং বীরেশ্বর বাবুর উত্তর শুনিবার পূর্ব্বে এই সকল বিষয়ে কোনও আলোচনা না করাই ভাল।

'পদ্মনাভ দত্ত পাণিনি মানিয়া চলিতেন না এবং গীতায় যথেষ্ট অপাণিনীয় পদের প্রয়োগ আছে, সুতরাং গীতাকার ও পদ্মনাভ দত্ত এক ব্যক্তি' এই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য :—

(১) পদ্মনাভ দত্ত সুপদ্ম ব্যাকরণের প্রারম্ভে পরমদেব, বাগ্দেবী, ঋষি ও গুরু সমূহকে নমস্কার করিয়া বলিতেছেন, "অথ বিবরণঞ্চ তস্য শব্দানুশাসনেন সহ পাণিনীয়াদি শব্দস্মৃতী রত্যালক্ষ্য সৌকর্য্যোপাধয়ে প্রতিসংস্কৃতস্য শব্দ লক্ষণস্য (আহ)।।" ইহা দ্বারা গ্রন্থকারের পাণিনি প্রভৃতির প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাই প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) "ঝযস্তাচাং গড়দবাং দ্বিতীয়ঃ সধ্বোশ্চ" সুপদ্ম ব্যাকরণের এই সূত্রের বিবরণে পদ্মনাভ 'মৃগাবিৎ' প্রভৃতি স্থানে পাণিনি-বিরোধী বিকল্পে মৃগাভিৎ প্রভৃতি পদের সমর্থন না করিয়া ও "অপাণিনীয়াঃ কেচিদিহ বিকল্পন্তে" এইরূপ বলিয়া তিনি স্বয়ং যে পাণিনির মতাবলম্বী তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) পদ্মনাভ দত্তের ব্যাকরণে পাণিনি-বিরোধী "মঘুস্বী' প্রভৃতি কয়েকটী শব্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই জন্য তাঁহাকে পাণিনি-বিরোধী বলা যায় না; কেন না, পরবর্ত্তী বৈয়াকরণ পণ্ডিতেরা পাণিনির সূত্রানুসারে অসিদ্ধ, অথচ ভাষায় প্রযুক্ত কতিপয় পদ-সিদ্ধির জন্য সূত্র করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কদাপি পাণিনির রীতি ব্যতিক্রম করিয়া চলেন নাই। পাণিনির মতে অসিদ্ধপদের সিদ্ধির জন্য সূত্র করিলেই যদি পাণিনি-বিরোধী হইতে হয়, তাহা হইলে বার্ত্তিককার কাত্যায়ন হইতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ প্রণেতা ক্রমদীশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই পাণিনির ঘোর শত্রু, কিন্তু কোনও শাব্দিক পণ্ডিত তাহা স্বীকার করেন না। বলা বাহুল্য—যাঁহারা পাণিনি প্রভৃতি বিরুদ্ধ পদ স্বীয় ব্যাকরণে সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য পাণিনির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নহে। তাঁহাদের যুক্তি এই যে ভাষা দৃষ্টেই ব্যাকরণ হইয়া থাকে, ব্যাকরণ দৃষ্টে ভাষা হয় না। যদি পাণিনি প্রভৃতির ন্যায় ঋষিগণও ব্যাকরণ প্রণয়নকালে দুই একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের অগৌরব কি? তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহার বলেই জগদ্গুরু হইবার উপযুক্ত। এই সম্বন্ধে পদ্মনাভেরই মত একজন পরবর্ত্তী বৈয়াকরণের কথা স্মর্ত্তব্য। কলাপ পরিশিষ্টকার শ্রীপতি দত্ত বলিয়া গিয়াছেন—

সমীষ তত্রাপি ময়া মুনীনাং
যদত্র ভাষ্যাদি বিরুদ্ধ মুক্তম্।
নতদ্ বিগৃহ্যং কৃতিভির্মুনীনাং
সাধারণী বাচি খলু প্রতিষ্ঠা॥

পদ্মনাভ দত্তও যদি ভাষ্যাদিবিরুদ্ধ কিছু সমর্থন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারও যুক্তি শ্রীপতির যুক্তির অনুরূপ হওয়াই সম্ভব। পাণিনি ব্যাকরণে—'ঋতে' শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তির ব্যবস্থা নাই, কিন্তু ভাষায় প্রয়োগ আছে বলিয়া চান্দ্রব্যাকরণে "ঋতে দ্বিতীয়া চ" ও সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে "ঋতে যুক্তাদ্ দ্বিতীয়া চ" সূত্র করা হইয়াছে। পূর্ব্বকালের ক্রিয়া-বোধক সমান কর্ত্তৃক ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় হয় ইহাই পাণিনির মত, কিন্তু ভাষায় তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ক্রমদীশ্বর "ক্বচিদ প্রাক্‌কালেঽপি" ও কচিৎ স্থিত্যাদি পদাধ্যাহারেণৈক কর্ত্তৃতা" ইত্যাদি বিশেষ সূত্র করিয়াছেন; কিন্তু সেই অপরাধে কেহ তাঁহাকে পাণিনি-বিরোধী বলিয়া স্থির করেন নাই।

তাহার পর সেন মহাশয় বলিয়াছেন—

শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গীতার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, অতএব পদ্মনাভ দত্তকে তাহার পূর্ব্বে স্থাপন করা প্রয়োজন, ইহা বীরেশ্বর বাবুও বুঝিয়াছেন। কিন্তু সিলভাঁ লেভিও যখন সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের সময় নির্ণয় করিতে পারেন নাই, এবং পঞ্চম শতাব্দীর হিন্দু উপনিবেশ যবদ্বীপে গীতাহীন মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, তখন বীরেশ্বর বাবু এই দুই অতিশয় দৃঢ় প্রমাণের বলে নিঃশঙ্কচিত্তে সুপদ্মকার পদ্মনাভকে সহসা এক ধাক্কায় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিয়া ফেলিয়াছেন। এখন দেখা যাউক এই যুক্তি (?) বিচারসহ কি না! পদ্মনাভ দত্ত তাঁহার ব্যাকরণে বাক্যপদীয়, মহাভাষ্য, ও ভাগবৃত্তি হইতে গ্রন্থাংশ উদ্ধার করিয়াছেন, বিংশত্যাদেরেকত্বমনাবৃত্তৌ, স্বতন্ত্রতৎপ্রযোজকৌ- কর্ত্তা, ক্রিয়াব্যাপ্যং কর্ম্ম, ইত্যাদি কারকপ্রকরণের সূত্র সমূহের বৃত্তি দেখিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অযথাযুক্তাখ্যানেঽব্যয়াৎ কৃঞঃ‌ক্ত্বা বা' এই সূত্রের বৃত্তিগ্রন্থে ভট্টিকাব্য হইতে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। বাক্যপদীয়কার ভর্ত্তৃহরি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে (৬১৮ খ্রীঃ) ও ভট্টিকাব্যকার খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে (৬২৯ খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। পদ্মনাভ দত্ত যে কিরূপে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন তাহা বীরেশ্বর বাবুরই বিবেচ্য। কারক প্রকরণের ষট্‌ত্রিংশ সূত্রের বৃত্তিগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে "লঙ্কাণাং পঞ্চ লেভে বররুচি রিতি কালিদাসঃ।" বলা বাহুল্য এই কালিদাস শকুন্তলা প্রণেতা কালিদাস নহেন, ঐ উক্তি যে কালিদাসের তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক। "শেষাৎ কর্ত্তরি পরস্মৈপদম্" এই সূত্রের বৃত্তিতে আত্মনেপদী ধাতুর কখনও কখনও পরস্মৈপদেও শিষ্টপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ইহা দেখাইবার জন্য পদ্মনাভ দত্ত "বলদ্‌বাধাং রাধাং শিক্ষদ্‌বলয়ঃ" এই কবিপ্রয়োগটীর উদ্ধার করিয়াছেন। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, এমন কি (বীরেশ্বর বাবুর মতে আধুনিক বোপদেবাদি প্রণীত) ভাগবতেও রাধার উল্লেখ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাধার উল্লেখ আছে, কিন্তু উক্ত পুরাণ সকলের মতেই অতিশয় আধুনিক গ্রন্থ। বীরেশ্বর বাবু যে যোগেশবাবুর উক্তি প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধার করিয়াছেন তাঁহার মতেই ত উক্ত পুরাণ ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, সুতরাং পদ্মনাভ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত উক্ত বাক্য জয়দেবাদির সমকালীন বা পরবর্ত্তী কোনও কবির লিখিত। অর্থাৎ পদ্মনাভ দত্ত নিজেই প্রমাণ দিতেছেন যে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী দূরে থাকুক অষ্টম শতাব্দীরও অনেক পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। জানি না বীরেশ্বর বাবুর ইহার বিরুদ্ধে কোনও বক্তব্য আছে কি না!

কলিকাতায় স্বাস্থ্যতত্ত্বের ক্রমবিকাশ

ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি

(১)

জল

জল, বায়ু, খাদ্য ও আবাস, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-মন্দিরের এই চারিটী প্রধান স্তম্ভ। এ দেশে জলের নাম জীবন। বিশ্বসৃষ্টি প্রকরণের প্রথম অধ্যায় নারায়ণের জলশয্যা। সমুদ্রজল হইতে উঠিল অমৃত। ধন্বন্তরীর কলসীস্থিত সেই অমৃত পান করিয়া দেবতারা মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

পবিত্র জলের প্রতিনিধি ও আধারস্বরূপা গঙ্গা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বলেন :—

স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং সন্ত পুণ্যস্য ভাজনং

ভবিষ্য পুরাণ বলেন :—

"গণ্ডুষ পানমাত্রেণ অশ্বমেধ ফলং লভেৎ।
স্বচ্ছন্দং যঃ পিবেদাপস্তস্য মুক্তি করে স্থিতা॥"
"আরোগ্য বিত্তসম্পত্তির্গঙ্গা স্মরণজং ফলং॥"

গঙ্গায় কি কি কার্য্য নিষেধ, তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিতেছেন :—

শৌচমাচমনং সেকং নির্ম্মাল্যং মল ঘর্ষণম্॥
গাত্র সংবাহনং ক্রীড়াং প্রতিগ্রহেমথো রতিং।
বস্ত্রত্যাগমথাঘাতং সন্তারঞ্চ বিশেষতঃ॥

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, কাবেরী, গোদাবরী প্রভৃতি বড় বড় নদী সকলকে তীর্থ বলা হইয়াছে। স্থান-বিশেষে ঝরণার নির্ম্মল জলেও মহাজনেরা সর্ব্বতীর্থ দর্শন করিয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য্য যখন ছিলেন বালক কমলাক্ষ, তাঁহার মাতা লাভা দেবী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাঁহার কোলে যে শিশু কমলাক্ষ, তিনিই শঙ্খচক্রগদাধারী মহাবিষ্ণু। লাভা দেবী তাঁহার পাদোদক প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "তোমার চরণে কোটী কোটী তীর্থ আছে, অতএব তোমার পাদোদক দাও।" কমলাক্ষ বলিলেন "এমন কথা আর বলো না মা। আমি কাল সকালেই এইখানে সর্ব্বতীর্থ এনে দেব।"

"প্রভাতে অদ্বৈতচন্দ্র কহে জননীরে।
সর্ব্বতীর্থের আবির্ভাব হৈল শৈলোপরে॥

লাভা কহে কৈছে মুই করিমু প্রত্যয়।
প্রভু কহে অত্যাশ্চর্য্য দেখিবা নিশ্চয়॥
এত বলি জননীরে সঙ্গে করি গেলা।
পর্ব্বতের পার্শ্বে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইলা॥
উচ্চৈস্বরে হরিধ্বনি করিবা মাত্রেতে।
ঝর ঝর তীর্থজল লাগিল ঝরিতে॥
প্রভু কহে দেখ মাতা সদা জল ঝরে।
শঙ্খ আদি ধ্বনি কৈলে বহু জল পড়ে॥
ঐ দেখহ শ্রীযমুনা শ্যামরসামৃতে।
মেঘসম তুয়া অঙ্গ হৈল আচ্ছাদিতে॥
উলটি ঐ দেখ গঙ্গা স্ফটিক নিন্দিয়া।
পুণ্যামৃত জলে তোঁহে ফেলিল ঢাকিয়া।
পুন দেখ রক্তপীত আদি পুণ্য জল।
তব শিরে পড়িতেছে করি কল কল॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া লাভা নমস্কার কৈলা।
ভক্তি করি স্নান দানাদিক সমাপিলা॥
তদবধি গণাতীর্থ হইল বিখ্যাত।
বারুণী যোগেতে স্নান বহু ফলপ্রদ॥

অদ্বৈতপ্রকাশ

নির্ম্মল-জল-বিশিষ্ট নদী প্রস্রবণ প্রভৃতি তীর্থজ্ঞানে পূজিত হইত বলিয়া তাহার পবিত্রতা রক্ষার জন্ম চেষ্টা করা হইত। এখন এই গঙ্গার জলে সহরের নর্দ্দমার জল এমন কি কলের সাহেব ও কুলীদের ময়লা পড়ে। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের নিষেধ উল্লেখ করিয়াছি। গঙ্গায় শৌচ, আচমন, গা রগড়ান, কাপড় ধোয়া বা কাচা, জলক্রীড়া, স াঁতার প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল। তাই বোধ হয় গঙ্গাজল ইতিপূর্ব্বে এত অপবিত্র ছিল না। তীর্থজ্ঞানে নদীর জলের পবিত্রতা রক্ষা করা হইত। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ সাইমন বলেন পুরাকালে উচ্চ শ্রেণীর জাতির মধ্যে এই ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত ছিল বলিয়া নদীজলের পবিত্রতা রক্ষিত হইত, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে।

"Among the best known branches of the Aryan stock, as notably in India (when it still holds its sway) it seems to have been general". *Simon's English sanitary Institutions.*

এই ধর্ম্মবুদ্ধির অভাবে সভ্যতাভিমানী লণ্ডনবাসীরা তাঁহাদের টেম্‌স্‌ নদীর কি প্রকার অবমাননা করিতেন, ১৮৮৬ সালের ল্যান্‌সেট পত্রিকা তাহা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন :—

"The Thames, for a mile's length of its course, where supposed to be sacred to the water supply of London had had, on and abont of its surtace, a floating and riparian encampment of some thousands of holiday-makers, using the river as their latrine and midden-stead."..."What sentiment of cleanliness prevailed among the thousands who could thus deal with their neighbour's drinking water, and among the millions who were placidly bearing the ontrage, is a question which may be left for such future historians as will discuss the curiosities of Engiish civilization at the close of the nineteenth century—"*Simon.*

উনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগেও সুসভ্য ইংরাজেরা টেম্‌স্‌ নদীর প্রশস্ত বক্ষে প্রমোদ-তরণীতে বসিয়া মলত্যাগ করিতেছেন এবং ময়লা ফেলিতেছেন, এই বর্ণনা পাঠ করিয়া সাইমন বলিতেছেন হাজার হাজার ব্যক্তির পানীয় জল এইভাবে দূষিত করিয়া এবং লক্ষ লক্ষ লোক অবাধে সেই জল পান করিয়া কি প্রকার স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞান ও পরিচ্ছন্নতার পরিচয় দিতেছে, ঐতিহাসিকেরাই তাহার বিচার করিবেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজেরা যখন লালদীঘীর চারিদিক বেষ্টন করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন কলিকাতায় পানীয় জল উনবিংশ শতাব্দীর জলের মতন এত দূষিত ছিল কি না জানিবার উপায় নাই। বরং ভাল ছিল বলিয়াই বোধ হয়। সুতানতি এবং গোবিন্দপুরের মাঝখানে যে কলিকাতা ছিল তাহার নাম নাকি ছিল ডিহি কলিকাতা। সেখানেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আফিস ও ইংরাজদের আদি বসতি বা ব্রিটিশ কলিকাতা।

ইংরাজেরা লালদীঘীর জল ব্যবহার করিতেন। লালদীঘীকে বলা হইত Great Tank বা বড় দীঘী। কখন এবং কেন যে ইহার নামকরণ হইল লালদিঘী তাহা ঐতিহাসিকেরাই বলিতে পারেন। লালমুখদের ব্যবহার্য্য বলিয়া কি? অন্য অন্য সহরেও দেখা যায় আফিস অঞ্চলের নিকটস্থ বড় পুষ্করিণীকে লালদীঘী বলা হয়। ১৭০৯ সালে সেই পুষ্করিণীর সংস্কার ও আয়তন বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। ইহারই মিষ্ট জলের লোভে নাকি ইংরাজেরা আশেপাশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৭২৭ সালে যদিও মিউনিসিপাল শিশুর জন্ম, কিন্তু তাহার পোষণের ভার ছিল সরকারের উপর। ট্যাক্স আফিসের ভীতি ছিল না, ট্যাক্সের বালাইও ছিল না। লুর্টিখেলায় টাকা উঠিত; সেই টাকার কিয়দংশ জল ও রাস্তার উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হইত। বিলাতে যাঁহারা ঘোড়দৌড় প্রভৃতি জুয়াখেলায় উন্মত্ত, তাঁহাদের প্ররোচনায় ভারতে এই লুর্টিখেলা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া রহিত হইল। যাহা হউক ১৮০৫ হইতে ১৮৩৬ সাল পর্য্যন্ত লুর্টি-কমিটী-উপার্জ্জিত টাকায় হেদো, পটলডাঙ্গার গোলদীঘী, বহুবাজারের গোলদীঘী, মাদ্রাসার দীঘী, চাঁপাতলার তালাও, সুরতীবাগান পুকুর প্রভৃতি খনন করা হইয়াছিল। এই সব পুষ্করিণীর জল নাকি বিশুদ্ধ ছিল। উত্তর কলিকাতায় বাড়ীর ভিতরে যে সব পুষ্করিণী ছিল তাহার জল ততটা ভাল ছিল না। ভাটার সময় দশমী তিথিতে গঙ্গার জল সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত। আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত নাকি জল ভাল থাকিত। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় জল লবণাক্ত এবং অব্যবহার্য্য। শরৎকালীন জল ছিল ঘোলা; ফটকিরি দিয়া পরিষ্কার করিয়া মলমল কাপড়ে ছাঁকা হইত। সম্পত্তিপন্ন ব্যক্তিরা হুগলী ও খুলনা হইতে জল আনিতেন। দরিদ্র মুসলমানেরা ভিস্তির জল এক পয়সায় এক মশক কিনিয়া ব্যবহার করিত। সাহেবেরা বর্ষাকালে বৃষ্টির জল

ধরিয়া রাখিতেন। স্কট টমসন্ লালদীঘীর জলে সোডা ওয়াটার প্রস্তুত করিতেন এবং বিলাত-যাত্রীদের নিকট তিনি এই জল বিক্রয় করিতেন।

১৮২০ সালে পাকা জলপ্রণালী (aqueduct) প্রস্তুত হইয়াছিল। চাঁদপাল ঘাটে ছিল দমকল। এই কলের সাহায্যে প্রণালীতে গঙ্গাজল তোলা হইত। ধর্ম্মতলা, চৌরঙ্গী, লালবাজার, বহুবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে এই জল ব্যবহৃত হইত।

লাটভবনের পূর্ব্বে যে প্রণালী ছিল তাহার চিত্রে দেখা যায় প্রণালী হইতে জল সংগ্রহ করা হইতেছে।

১৮৫৪ সালে কলেজ ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত এই প্রণালী বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৮৬৫ সাল পর্য্যন্ত এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। এই প্রণালীস্থিত জল ব্যবহারেও আপত্তি ছিল। বাউলেরা গাহিত :—

ভুলোনা মন হরিবল।
আমাদের জাতের দফা
ক্রমে ক্রমে রফা হল॥
পেলে জাত ইষ্টিশনে, উইলসনে, কেশব সেনে,
ডাক্তারের প্রেস্কিপশনে
মুরগীর ঝোলটা চল্‌বে ভাল॥
ইংরেজে লহর টেনে,　গঙ্গাজল দিচ্চে এনে,
সে চরণামৃত পানে
চৌদ্দপুরুষ তরে গেল॥

ঊনবিংশ শতাব্দী যখন ঘাটের কোঠায় ঘুরিতেছিল, ৺ডাক্তার গুডীভ চক্রবর্ত্তী কলিকাতার পানীয় জল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। জনসাধারণ বক্তৃতা শুনিল না। শুনিয়া কাজ করিবার লোক ছিলেন যাঁহারা তাঁহারা একাগ্রচিত্তে গঙ্গায় নাটোর মাঝি-ত্যক্ত ভাসমান মলের বর্ণনা এবং স্নানের ফলে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ স্নায়ী ও স্নায়িনীদের মস্তকে ঐ মলধারণের কথা শুনিলেন। যাঁহারা শুনিলেন তাঁহাদের এবং কমিশনরদের চেষ্টায় ১৮৬৫ সালে জল-কল-প্রতিষ্ঠার আরম্ভ। ধর্ম্ম গেল বলিয়া যাঁহারা চীৎকার করিলেন কিছুদিন তাঁহারা গো-চর্ম্ম স্পৃষ্ট জল পান করিলেন না। অবশেষে 'আপঃ নারায়ণ স্বয়ং' বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক তাঁহারা এবং তাঁহাদের বংশধরেরা সেই জল অমৃতজ্ঞানে পান করিলেন।

কাল-ভয় বড় ভয়। কলিকাতা তখন ছিল ওলাইচণ্ডীর লীলাভূমি। হনিবার্জার এবং রাজেন্দ্র দত্তের শিষ্যদের নাকি স্নানাহারের অবসর ছিলনা, ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের দরুণ। জল-কল-প্রতিষ্ঠার পর সেই রোগের হ্রাস বেশ বুঝিতে পারা গেল। কল-জল পানে আর আপত্তি রহিল না।

কলের জল চলিয়াছে, গঙ্গা-স্নানও সমান ভাবে চলিয়াছে। কলের জল প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ওলাউঠার যে প্রকার প্রকোপ ছিল, তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ যোগ-যাগ পর্ব্ব উপলক্ষে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। চন্দ্র গ্রহণ, অৰ্দ্ধোদয় যোগ, গঙ্গাসাগর মেলা, বারুণী স্নান প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে রেল-ষ্টীমার প্রভৃতিতে যাতায়াতের অধিকতর সুযোগবশতঃ যাত্রীর খুব ভিড় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। দূষিত জলই যে ইহার একমাত্র কারণ, এ কথা বলিলেও স্নান-যাত্রীদের কর্ণে তাহা প্রবেশ করে না।

তীর্থ যাত্রা ও গঙ্গাস্নান করিলেই যে সকল পাপ ধুয়ে মুছে ফেলা যায় না, মহাপ্রভু একদিন এই কথা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন—

মীনঃ স্নানপরঃ ফণীপবনভুক্ মেষোঽপিপর্ণাশনঃ
শশ্বদ্ভ্রাম্যেতি চক্রিণো পরিচরণ দেবান্ সদাদেবলঃ॥
গর্ত্তে তিষ্ঠতি মুষিকোঽপি গহনে সিংহো বকঃ ধ্যানবান্।
কিংতেষাং ফলমস্তি হন্ত তপসা সদ্ভাবসিদ্ধিং কুরু॥

তীর্থস্নান করিলেই যদি পুণ্যবান।
কার এত পুণ্য আছে মাছের সমান?
বাতাহারী হইলেই যদি হয় যোগী।
যোগীর প্রধান হয় সর্প বায়ুভোগী॥
যতি হয় করিলেই যদি তৃণাহার।
মেষের সমান যতি কেবা আছে আর?
বনে বনে বেড়ালেই যদি ঋষি হয়।
শৃগাল ভল্লুক তবে কেন ঋষি নয়?
পূজা করিলেই যদি মুক্তি অধিকারী।
জীবন্মুক্ত হইয়াছে যতেক পূজারি॥
গুহাবাসে শুধু যদি হইল সন্ন্যাসী।
মুষিক সন্ন্যাসীবর হয়ে গর্ত্তবাসী॥
বনে থাকিলেই যদি হইল তপস্বী।
তপস্বীর মধ্যে তবে সিংহই যশস্বী॥
চক্ষু বুজিলেই যদি করা হল ধ্যান।
এত বড় ধ্যানী কেবা বকের সমান?

সদ্ভাবে গৃহে থাকিয়া শারীর ধর্ম্ম পালন করিয়া ধার্ম্মিক হওয়া যায় শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশের এই মর্ম্ম। এই মর্ম্ম জন-সাধারণ যতদিন না হৃদয়ঙ্গম করিবে ততদিন কেবল স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়নের দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান হয় না। জনশিক্ষার প্রয়োজন।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের শুভাশুভের জন্য দায়ী ; একের মঙ্গল অপরের মঙ্গলের উপর নির্ভর করে। এই সত্যের উপলব্ধি যতদিন পর্য্যন্ত হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশেও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় নাই।

১৯২৪ সালে নববিধি প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা কর্পোরেশন এই সত্য প্রচার উদ্দেশ্যেই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যসমিতি বা ওয়ার্ড হেল্‌থ্ এসোসিয়েশন-মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার স্বাস্থ্য ও সম্পদের ভার ছিল এক বা কতিপয় কর্ম্মচারীর উপর। ১৮৫৬ সালে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন কমিশনর বোর্ড নামক ত্রিমূর্ত্তি। ১৮৯৯ সালে সেই ত্রিমূর্ত্তি ঢালাই হইয়া সর্ব্বশক্তিমান চেয়ারম্যান বিগ্রহে পরিণত হইলেন। করদাতাদের প্রতিনিধি রূপে যাঁহারা তাহাদের শুভাশুভ লইয়া বাদানুবাদ করিতেন, তাঁহারা জনসাধারণের মতামতের ততটা অপেক্ষা রাখিতেন না, যতটা নির্ভর করিতেন চেয়ারম্যান বা ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের শুভ-দৃষ্টির উপরে। করদাতারা

জানিত ঐ কর্ম্মচারীরাই তাহাদের মুনিব। তাঁহারা রুষ্ট হইলে ট্যাক্সবৃদ্ধি হইবে। মিউনিসিপাল আফিস ট্যাক্স আফিস নামেই অভিহিত হইত।

জনসাধারণের মতাপেক্ষা বোধ হয় নূতন কর্পোরেশনের হেল্‌থ কমিটীই প্রথম করিয়াছিলেন। কলিকাতায় মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল তিনটী রোগ,—ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও যক্ষ্মা। এই তিনটী নিবার্য্য রোগ নিবারণ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা অনেক দিন হইতে চলিতেছিল। সেই জল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত হেল্‌থ্ অফিসার ডাক্তার ক্রেক্ ষাট হাজার টাকা (৬০০০০্) ব্যয়-সাধ্য এক ব্যবস্থা নূতন স্বাস্থ্য কমিটীর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। ব্যবস্থা মামুলী—কতিপয় কর্ম্মচারী এবং কিঞ্চিৎ অর্থ। কমিটী বলিলেন জনসাধারণের পরামর্শ ও সহানুভূতি ভিন্ন প্রকৃত স্বাস্থ্যোন্নতি অসম্ভব। স্বাস্থ্যবিধি-লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে নালিশ ও জরিমানা বহুদিন হইতে চলিতেছে, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে রোগের হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই হইতেছে। সুতরাং জন-সাধারণকে ডাকিয়া তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। সহরের বিখ্যাত কর্ম্মী ও চিকিৎসকদের পরামর্শে পল্লীতে পল্লীতে ওয়ার্ড হেল্‌থ এসোসিয়েশন বা পল্লীস্বাস্থ্য-সমিতি সংস্থাপনের ব্যবস্থা হইল। ঐ সমিতি-মণ্ডলীর কার্য্য-সহায়ের জন্ত পূর্ব্বোক্ত ৬০০০০্ টাকা দেওয়া হইবে; কিন্তু তাঁহারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবেন।

প্রত্যেক সমিতির একটি চিকিৎসা-কেন্দ্র থাকিবে, পূর্ব্বোক্ত তিনটী রোগ চিকিৎসার জন্ত। চিকিৎসা মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, মুখ্য উদ্দেশ্য—রোগীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা জানিয়া রোগ নিবারণ করা।

এ যাবৎ ১৯টী স্বাস্থ্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলা সরকারকেও ইহাদের কৃতকার্য্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছে! এ বৎসর যাদুঘরে যে সরকারী স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে স্বাস্থ্য-সমিতির কার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব বঙ্গীয় লাট-পত্নী লিখিয়াছেন—

"আপনাদের প্রশংসনীয় কার্য্য অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।"

এই চিত্রে দেখান হইয়াছে ১৯৩০ সালে সমিতি কর্ত্তৃক সওয়া দুই লক্ষ রোগী রোগিণী চিকিৎসিত হইয়াছে এবং বিনামূল্যে কেবল ঔষধ নয়, দুগ্ধ, কড্‌লিভার ওয়েল প্রভৃতি পথ্য, থুথু ফেলিবার পাত্র, ডিস্‌ইন্‌ফেক্‌টেন্ট্ প্রভৃতি পাইয়াছেন। রোগীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির জন্তও বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে।

যাদুঘরে যে সমস্ত চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার একটীতে দেখান হইয়াছে, সমিতির কার্য্যারম্ভের পর হইতে সহরের মৃত্যু-সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ—নাগরিক ও নাগরিকাদের স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে জাগরণ। এই জাগরণের কারণ সমিতি সমূহ কর্ত্তৃক স্বাস্থ্য-তত্ত্ব প্রচার।

বৎসরে বৎসরে সমিতি যে সমুদয় স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে সহস্র সহস্র নরনারী প্রতিদিন সমবেত হইয়া স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রাদির ব্যাখ্যা আগ্রহ সহকারে শুনিয়া থাকেন। সঙ্গীতের ভিতর দিয়াও বালক বালিকাদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

এবার ৫নং ওয়ার্ডের প্রদর্শনীতে বালক বালিকারা উপযোগী অসি-চালনা সহকারে এই সঙ্গীত গাহিয়াছিল—

বাউলের সুর

ওরে ভাই সঙ্গাতা,
কাল সাপের ভাবনায় কেন
কাঁপিস্ রে দিন রাত?
ভবের খেলায়, কর রে হেলায়,
হেসে খেলে বাজী মাত॥
ঐ আকাশ বাতাস,
বিনে কড়ি তড়ি ঘড়ি
চাইলেই ত পাস্;
রাখলে খোলা, কোনো বেলা,
আসবে না কাল্ তোর সকাশ॥
ঐ জল নারায়ণ,
তার গায়ে না ফেলিস্ যদি
মল নিষ্ঠীবন;
চণ্ডী ওলাই, যক্ষ্মা বালাই,
থাকবে দূরে হাজার হাত॥
ঐ টাটকা ফল মূল,
সহজেই ত পাস্‌রে ও ভাই,
দু এক পয়সা মূল;
চাল আছাঁটা, যাঁতার আটা,
দেশের এই সম্পদ অতুল॥
গো মাতার দে ভোগ,
দুধ নবীন খেলে কাছে
আসবে না ভাই রোগ;
মাঠে বাটে, মোহন নাটে
বাজাস্ বাঁশী রাখাল সাথ॥
এ দেহ হরির,
সাফ্ করে সাজাস্ রে ও ভাই
এ দেব-মন্দির;
শাঁখ বাজারে, নাচ রে গা রে,
পড়বে না দুখ-রেখাপাত॥

হেল্‌থ কমিটীর সভাপতি ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় জনসাধারণের এবং পল্লী সমিতির প্রতিনিধিদের পরামর্শ লইয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এ বিষয়েও জনশিক্ষার প্রয়োজন। অনেকে পুষ্করিণীতে বা বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া পাইখানার জলের ট্যাঙ্কে কেরোসীন ঢালিতে দেয় না। পুষ্করিণী সম্বন্ধে আপত্তির কারণ মাছের মৃত্যু সম্ভাবনা। চাপরাসহীন কর্ম্মচারীকে কেহ আমলই দেয় না; আর ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হইলে মাছ খাবে কে এ কথাটা বুঝাইবারও তাহার

শক্তি নাই। ময়লা জলে কেরোসীন ঢালায় আপত্তির গূঢ় কারণ আছে। এখনও অনেক বাড়ীতে ময়লা জলে বাসন মাজা এবং স্নান চলে। জল সরবরাহ বিভাগের কর্ম্মচারীরা চক্ষু বুজিয়া কাজ করেন। তাঁহাদের চক্ষের সামনেই কাঁকা ফাঁপানল হাইড্রেণ্টে গুঁজিয়া লোকেরা অবাধে স্নান করে, কাপড় কাচে এবং মহিষকে স্নান করায়। এই কার্য্য প্রত্যহ দিবা দ্বিপ্রহরে চলিতেছে; কর্ম্মচারীরা বোধ হয় মাহিষ-শৃঙ্গের তাড়নায়ই হউক আর যে কারণেই হউক, "শৃঙ্গিণঃ দশহস্তেন" এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া, দশ হাত দূরে দাঁড়াইয়াই এই জলক্রীড়া দর্শন করেন। শুধু হাইড্রেণ্ট পরিদর্শনের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন বৎসরে ৪।৷০ হাজার টাকা (৪,৩৭০৲) ব্যয় করেন। ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের বেতন ১৩৬ হাজার; কিন্তু তাঁহার কার্য্য যখন উচ্চতম তত্ত্বাবধান, তাঁহার উচ্চ দৃষ্টি নিম্নে পড়িতে পারে না। তাঁহার এবং তাঁহার নিম্নতম কর্ম্মচারীদের বেতন প্রায় পৌণে দুই লক্ষ (১,৬৯,৩০০৲)। সংখ্যায়ও তাঁহারা কম নহেন। আশা করা যায় তাঁহারা যদি ময়লা জলের এই অসদ্ব্যবহার রহিত করিতে পারেন, তাহা হইলে পাইখানায় জলের অভাব মোচন হইতে পারে এবং নাগরিকেরা নানাবিধ সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে।

বানরের মানবত্ব প্রাপ্তি

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

মানবজাতির আদি-উৎপত্তি-স্থান নিরাকরণ করিবার জন্য নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহারা উহা নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারেন নাই; তবে ভূনিম্নস্থ শৈলস্তর সকল অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মৎপ্রণীত বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব নামক পুস্তকে "মানবের ইতিহাস" প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ কি প্রকার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন এক বানর জাতির ক্রমবিকাশ হইয়া মানবের উৎপত্তি হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর আদি স্তরের উৎপত্তি কালকে আরকেইক (Archaic) যুগ, তৎপরবর্ত্তী স্তরের উৎপত্তি কালকে পেলিওজোয়িক (Paleozoic), তৎপরবর্ত্তী স্তরের কালকে মেসোজোয়িক (Mesozoic) এবং শেষ স্তরের উৎপত্তি কালকে হোলিওসিন (Holcocene) যুগ আখ্যা দিয়া থাকেন। আরকেইক যুগে পৃথিবীর উপরিভাগে কোন প্রকার উদ্ভিদ বা প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না, পেলিওজোয়িক যুগে কেবলমাত্র শামুক, গেঁড়ি, চিংড়ি মাছ জাতীয় জীব সকল উৎপন্ন হইয়াছিল; মেসোজোয়িক যুগে পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং হোলিওসিন যুগে চতুষ্পদ ও বানর জাতীয় জীব সকলের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই হোলিওসিন বা শেষ স্তরটাকে পাঁচটা অন্তর স্তরে বিভাগ করা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শেষ তিনটী স্তরকে যথাক্রমে মাইওসিন (Miocene) প্লাইওসিন (Pliocene) এবং প্লাইওষ্টিসিন (Pleiostocene) স্তর বলা হয়। মাইওসিন স্তরের গঠন হইতে ৬০ লক্ষ বৎসর, প্লাইওসিন স্তরের গঠন হইতে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার বৎসর ও প্লাইওষ্টিসিন অর্থাৎ আধুনিক স্তরের গঠন হইতে ২০ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছিল। মাইওসিন স্তরে ওরাং, সিম্পাঞ্জি, গরিলা প্রভৃতি নরাকৃতি বানরের প্লাইওসিন স্তরে রোডেসিয়ান, পিল্টডাউন প্রভৃতি বানরাকৃতি নরের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং ঐ স্তরের পরবর্ত্তী অবস্থায় প্রকৃত মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। এ সকল কথা আমার উক্ত গ্রন্থে চিত্রসহ বিবৃত করিয়াছি।

আপনারা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, বানরগণের মধ্যে সিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাং ও গিবন জাতীয় বানরের আকার-প্রকার কতকটা মানুষের মত। ইহারা সকলেই উচ্চ শ্রেণীর বানর। বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাদের এনথ্রোপইড এপস্ (Anthropoid apes) নর-বানর অর্থাৎ কিয়ৎ পরিমাণে নরাকারবিশিষ্ট বানর বলা হয়। এই সকল নর-বানরের মধ্যে গিবন ও ওরাং সকলকে বোর্ণিও, সুমাত্রা ও যাবা, দ্বীপে এবং গরিলা ও সিম্পাঞ্জিগণকে আফ্রিকার জঙ্গলময় প্রদেশ সমূহে অদ্যাপি দেখা যায়। মানবের সহিত সিম্পাঞ্জি ও গরিলার অধিক সৌসাদৃশ্য থাকায় ডারউইন অনুমান করিয়াছিলেন যে মানবের প্রথম উৎপত্তি সম্ভবতঃ আফ্রিকা মহাদেশেই হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে রোডেসিয়া ও পিল্টডাউন নামক স্থানে ৫০।৬০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বকার প্লাইওসিন স্তরে যে সকল প্রাণীর প্রস্তরীভূত অস্থিপঞ্জর পাওয়া গিয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণ সেই সকল প্রাণীকে রোডেসিয়ান (Rhodesian) ও পিল্টডাউন (Piltdown) মানব বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। জর্ম্মণির অন্তর্গত নিয়াণ্ডারথাল নামক প্রদেশে, জিব্রাণ্টর, ফ্রান্স, ইটালি, যুগোশ্লাভিয়া, দক্ষিণ রুসিয়া, প্যালেষ্টাইন, ও চীনদেশে ৩০।৪০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বকার প্লাইওষ্টিসিন স্তরে যে সকল প্রস্তরীভূত অস্থি কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহাদের নিয়াণ্ডারথাল মানব আখ্যা দিয়াছেন। নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সেই সকল অস্থিপঞ্জর পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে উহা পূর্ব্বোক্ত নর-বানর (Anthropoid apes) জাতীয় প্রাণী অপেক্ষা কোন উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর কঙ্কাল। ঐ সকল প্রাণী মানুষের ন্যায় সোজা হইয়া পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিত এবং হস্ত দ্বারা কোন কোন কার্য্য করিতে পারিত; কিন্তু মানুষের মত কথা কহিতে পারিত না। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাদিগকে পিথেক্যানথ্রোপস (Pethecanthropus) বানর-নর অর্থাৎ বানরাকৃতি নর বলা হয়। এই সকল অস্থিপঞ্জর যে সকল প্রাণীর, তাহাদের কাহাকেও এক্ষণে জীবিত দেখা যায় না। বহু কাল হইতে তাহাদের বংশ লোপ পাইয়াছে এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান মানবের আবির্ভাব হইয়াছে। মানবের আবির্ভাব সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর কোন্ স্থানে হইয়াছিল তদ্বিষয়ে নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিস্তর গবেষণা করিতেছেন; এখনও পাকা রকম কিছুই স্থির হয় নাই।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে দিল্লীর উত্তরে সিবালিক পর্ব্বত-শ্রেণীর মাইওসিন যুগের (অর্থাৎ প্রায় এক কোটী বৎসর পূর্ব্বেকার) ভূমধ্যস্থ মৃত্তিকা স্তরে যুগান্তরীয় বৃহদাকার বানর জাতীয় প্রাণীর অস্থিপঞ্জর পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই সকল প্রাণীকে ড্রাইওপিথেকস্ (Dryopethecus) বলা হয়। এই ড্রাইওপিথেকস্ বানর জাতিই বর্ত্তমান হনুমান,

জাম্ববান প্রভৃতি নানাবিধ লাঙ্গুল বিশিষ্ট বানর এবং গিবন, ওরাং, গরিলা ও সিম্পাঞ্জি প্রভৃতি নর-বানরদিগেরও অতীত যুগের ধ্বংস প্রাপ্ত পিল্টডাউন মানব, রোডেসিয়ান মানব, পিকিং মানব, নিয়াণ্ডারথাল মানব প্রভৃতির এবং বর্ত্তমান মানব জাতির অর্থাৎ আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। পৃথিবীর প্লাইওসিন যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী অলিগোসিন যুগে অর্থাৎ এক কোটী ৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হনুমান, জাম্ববান প্রভৃতি নানা জাতীয় বানর এবং গরিলা, সিম্পাঞ্জি প্রভৃতি নর-বানর সিবালয় প্রদেশ হইতে পূর্ব্ব দিকে সুমাত্রা, বোর্ণিও, ও যাবা পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম দিকে পারস্য ও আরবের ভিতর দিয়া স্পেন, ফ্রান্স, ও আফ্রিকা পর্য্যন্ত যাইয়া বসবাস করিয়াছিল। তৎকালে ভূমধ্যসাগরের উৎপত্তি না হওয়ায় ইয়োরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড ছিল ; সুতরাং ঐ সকল প্রাণীগণের পক্ষে তাহাদের আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে ছড়াইয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

ডাক্তার প্রাবো এবং ডাক্তার ডেভিড্‌সন বলেন, মাইওসিন যুগে ভারতবর্ষের উত্তরে সমুদ্র গর্ভ হইতে হিমালয় পর্ব্বত উত্থিত হওয়ায় তৎপ্রদেশের জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্যক পরিবর্ত্তন বশতঃ কোন এক শ্রেণীর নর-বানর (Anthropoid apes) তৎকালীন নূতন অবস্থার সহিত নিজদের সামঞ্জস্য রাখিতে চেষ্টা করিবার ফলে মানবাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অধ্যাপক জি, এলিয়ট স্মিথও ঐ মতের পোষকতা করেন। তিনি তাঁহার "Search for man's ancestor" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষের সিবালিক নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে মাইওসিন যুগে যে সকল বৃহদাকার বানর বাস করিত তাহারা তুর্কিস্থান পর্য্যন্ত উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে পরিভ্রমণ করিত, ইহার বিশেষ প্রমাণ না পাইলেও ইহা অসম্ভব নয়, কারণ, তৎকালে উত্তর-ভারত ও তারিম উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রাকৃতিক বা জল বায়ুর পার্থক্যরূপ কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। তৎকালে হিমালয় পর্ব্বত সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া এই দুই দেশকে পৃথক করিয়া দেয় নাই। মাইওসিন যুগে যখন হিমালয় পর্ব্বত উত্থিত হইয়া সিবালয় প্রদেশকে চীনদেশের সিংকিয়াং প্রদেশ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছিল, তখন তত্রস্থ ড্রাইওপিথেকস্ বানর জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। যাহারা সিবালিক প্রদেশে রহিয়া গেল তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে প্রকার জলবায়ু উপভোগ ও প্রাকৃতিক অবস্থায় বসবাস করিতে অভ্যস্ত ছিল এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশজাত যে সকল উদ্ভিদ ও ফলমূলাদি আহার করিত, তাহার কোন পরিবর্ত্তন না হওয়ায় তাহাদের অভ্যাস ও শারীরিক গঠন পরিবর্ত্তিত হইবার কোন কারণ হয় নাই, তাহারা যে বানর সেই বানরই রহিয়া গেল। তাহারা ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকস্থ প্রদেশ সমূহে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। তাহাদের মধ্যে ওরাং ও গিবন জাতীয় বানরেরা পূর্ব্ব দিকে বোর্ণিও দ্বীপ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। সিম্পাঞ্জি ও গরিলার পূর্ব্বপুরুষ বানরগণ পশ্চিমে আফ্রিকা এবং ইওরোপ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। যে সকল ড্রাইওপিথেকস্ বানর জাতি হিমালয় পর্ব্বতের উত্থানে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সিংকিয়াং প্রদেশে রহিয়া গেল, তাহারা শীত-প্রধান প্রদেশে আটকাইয়া যাওয়ায়, তাহাদিগকে জীবন রক্ষার্থে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার জল বায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের বিপক্ষে কঠিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাহার ফলে তাহাদের শারীরিক গঠন ও অভ্যাস তদানীন্তন অবস্থার উপযোগী হইবার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

অনেক নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন যে, মাইওসিন যুগে হিমালয় পর্ব্বতের হঠাৎ অভ্যুত্থানে ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ডের অধিবাসী এক দল আদিবানর এমন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল যে, তৎকালীন পরিবর্ত্তিত প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত নিজদের খাপ খাওয়াইতে না পারায়, নৈসর্গিক নিয়মানুসারে হয় তাহাদের ধ্বংস প্রাপ্তি হইয়াছিল, অথবা তাহারা বাধ্য হইয়া তৎকালীন পরিবর্ত্তিত প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য ঘটাইয়া আপনাদিগকে সেই অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহারা অনুমান করেন যে শেষোক্ত ঘটনাই ঘটিয়াছিল এবং তত্রস্থ ড্রাইওপিথেকস্ আদি বানর সকল প্রথমে পিল্টডাউন, রোডেসিয়ান, পিকিন বানর প্রভৃতি বানর-নরে পরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর বানর নর নিয়াণ্ডারথাল মানবে পরিণত হইয়াছিল। তাহারা প্রাচীন মহাদ্বীপের ইওরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি নানা প্রদেশে এক এক দলপতির অধীনে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিত, পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করিত, বন্য ফলমূল, বৃক্ষের কচি পাতা ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া নদীতীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিয়া ও ক্ষুদ্র জন্তু হত্যু বধ করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিত ও জঙ্গলময় পার্ব্বত্য বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সমতলভূমিতে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যে প্রকার নৈসর্গিক কারণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িয়া কোন এক শ্রেণীর নর-বানর বানর-নরে পরিণত হইয়াছিল, সেই প্রকার কোন কারণে পৃথিবীর কোন এক স্থানে মাইওসিন যুগের শেষ ও প্লাইওসিন যুগের প্রথম এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ কাল মধ্যে কোন এক শ্রেণীর নর-বানর প্রকৃত মানবে (true man) পরিণত হইয়াছিল এবং কথা কহিতে সমর্থ হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পৌরাণিক কাহিনী রামায়ণ গ্রন্থে যে বানর ও রাক্ষসের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে অনুমান করা যায়, দক্ষিণ ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে বানর ও অরণ্যবাসী বন্য মানবের বসবাস ছিল। বানরগণের সহিত তাহাদের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া তৎসাময়িক লোকেরা রাক্ষসগণ অর্থাৎ বন্য মানবগণ ও বানরগণকে পরস্পরের কুটুম্ব মনে করিত। বোধ হয় মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা কালে এইরূপ কিম্বদন্তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কল্পনার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে ২০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বকার পৃথিবীর প্লাইওষ্টোসিন যুগের স্তরে যে সকল পিল্টডাউন ও নিয়াণ্ডাথাল মানব প্রভৃতি যে সকল বানর-নর জীবিত ছিল, তাহাদের বংশধরগণ এখন কোথায় ? এখন তাহাদের কুত্রাপি দেখা যায় না কেন ? ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করিয়া নিজকে গড়িয়া তুলিতে না পারা ইত্যাদি যে সকল নৈসর্গিক কারণে বৃহদাকার ম্যামথ প্রভৃতি যুগান্তরীয় প্রাণী সকলের

অস্তিত্ব লোপ হইয়াছিল, বর্ত্তমান কালে অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি জনপদের বর্ব্বর আদিম অধিবাসিগণের তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর মানব শ্বেতাঙ্গদিগের প্রাদুর্ভাবে যে ভাবে ধ্বংস সাধন হইতেছে, সেই সকল নৈসর্গিক কারণে এবং তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর জীব প্রকৃত মানবের আবির্ভাবে নিয়াণ্ডারথাল প্রভৃতি নব-বানরগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর মানব তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন বানরের মানবত্ব প্রাপ্ত হইতে কত দিন লাগিয়াছিল। ইহার উত্তর হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রশ্নকর্ত্তার মন হইতে সময় সম্বন্ধে তাঁহার অভ্যস্ত ধারণা বদলাইতে হইবে। এই প্রকার ক্রম বিকাশ কত লক্ষ বা কত সহস্র বৎসরে হইয়াছিল মনে করিলে ঐ প্রশ্ন করিবার আর আবশ্যক বোধ হইবে না।

অধ্যাপক এলিয়ট স্মিথ বলেন উপরিউক্ত মীমাংসা সকল মানবতত্ত্ববিৎ-গণের কল্পনা-প্রসূত হইলেও, মানব জাতির আদি জন্মস্থান সম্বন্ধে যে কতকগুলি নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে সিংকিয়াং প্রদেশে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের বানরত্ব হইতে মানবত্ব প্রাপ্তির প্রথম্ সোপান রচিত হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

ভাঙা পাথরের বাটি

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

একরাশ এঁটো বাসনের মাঝে একলা পা-দুটি মেলে,
খিড়কির ঘাটে নতুন বৌটি নয়নের জল ফেলে।
বাসনের ভার সাম্‌লানো দায়, নাসিতে পিছল ঘাটে,
পাথর বাটিটি প'ড়ে ভেঙে গেছে ঠেকিয়া তালের কাঠে।
দশ পয়সার পাথর বাটিটি বয়সে জীর্ণ এবে,
তায় কোণ ভাঙা,—তুচ্ছ জিনিস একটু দেখিলে ভেবে।

দুইটি টুকরা জোড়া দিয়ে বধূ অঞ্জলিপুটে ধরি',
ঝাপ্‌সা চক্ষে চেয়ে আছে আহা মুখখানি নত করি'।
হেরিছে অভাগী জমা-লাঞ্ছনা বাটির মুকুর-পুটে,
অন্ন খাবার বাটিটি ক্রমেই লোণা জলে ভ'রে উঠে।

ভাবে বসে হায়, লাগে না কি জোড়া কোন মন্ত্রের বলে?
কোন' গুণী এসে সহসা যদি বা জুড়ে দেয় কৌশলে।
শ্বশুর বাড়ীতে আসিবার আগে কেন লয়নিক শিখে,
কি দিয়ে জুড়িলে জোড়া যায় ভাঙা পাথরের বাটিটিকে।
দেবতায় ডাকে অভ্যাস বশে,—দেবতা বাঁচাবে যেন।
বাটিটা ভাঙিল, পড়িয়া তাহার মাথা ভাঙিল না কেন!
বড় অভিমানে দেবতার পানে চেয়ে অভাগিনী কাঁদে,
'বল ভগবান হাত কেঁপে গেল কোন্ গূঢ় অপরাধে?'

একবার ভাবে, নতুন একটি কিনে এনে এর মত
কোণা ভেঙে যদি চালানো যাইত, তা হলে কেমন হ'ত?
কোথায় পয়সা? কে বা দিবে এনে? কোথায় মিলিবে বাটি?
সময়ই বা কই? সকলি স্বপ্ন. ভাঙাটাই শুধু খাঁটি।
পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিতে কেমন লাগে যে ভয়,
একবার ভাবে—বাপের বাড়ীতে পালালে কেমন হয়?
কোন্ পথে যাবে? কারে সাথে পাবে? না—না তা' অসম্ভব।
ভাঙা বাটি ঘেরি ভাবনা-জনতা ভুলে নানা কলরব।

হাঁসগুলি ঘেঁষে ঘাটপানে আসে ঘনাইয়া মমতায়,
পাখীরা নীরব—বাঁশ-বনে বেজি করুণ নয়নে চায়।
ভুলো লেজ নেড়ে জানায় বেদনা, জিভ ঝুলে পড়ে তার,
থমথম করে দুপুর বেলার খিড়কি পুকুর ধার।
ফুলের গরবে মাথা-উঁচু ক'রে ছিল যে কল্‌মী-লতা,
মুষড়িয়া পড়ি ঝলসিয়া সেও জানায় মমতা ব্যথা।

সবাই ব্যথিত মা বলিয়া বালা ডাকে যারে ফিরি ঘুরি'
সেই শুধু তার হৃদয় চিরিতে শানায় রসনা-ছুরি।
পাথরের বাটি ভেঙে যায়, যদি বধূর চরণ টলে,
পাথরের হৃদি ভাঙে না গলে না বধূর নয়ন-জলে।

"—শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে—"

শ্রীরাধারাণী দেবী

নহবত্ বড় করুণ সুরে বাজছে।—

অন্তরের নিতল প্রদেশ আলোড়িত করে' ভাষাতীত এক উদাস-গভীর বেদনা জেগে উঠছে তার কাতর-কোমল তানে।···যেন আজ এখানে কে নেই—যেন কা'কে অনেক চেয়েও পাওয়া যায়নি,—যেন সবার চেয়ে প্রাণ যাকে চায় সে আজ আসেনি।···অভিমানে বুঝি কে চিরদিনের তরে চলে গেছে!···তারই নিবিড়-বিরহ-ব্যথা আজ সমস্ত আকাশ বাতাসকে অশ্রুভারাতুর করে' সানাইয়ের সুরধারায় কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ছে!···বাঁশী যেন বলতে চায় তার আকুল কান্নাভরা মিনতির সুরে,—ওগো, সে কোথায়?—তাকে নিয়ে এসো – নিয়ে এসো! যে-বিহনে এই উৎসব-আয়োজন, এই ফুলের গন্ধ, বাঁশীর তান, হাসির প্রবাহ সবই ব্যর্থ—সবই মিথ্যা!

বিয়ে বাড়ী।

চারতলার প্রকাণ্ড ছাদ জুড়ে হোগ্‌লার ম্যারাপ্ বাঁধা হয়েছে। তার নীচে একধারে মিষ্টান্নের ভিয়ান্ বসেছে। ঘৃত ও ছানা-ক্ষীরের সুগন্ধে ম্যারাপের নীচেটা আচ্ছন্ন।

গোলাপী রংয়ের ধুতি ও বাসন্তী রংয়ের উত্তরীধারী ভৃত্যবর্গ নানা কাজের ভীড়ে অত্যন্ত ত্রস্ত-ব্যস্তভাবে হাজারবার উপর-নীচেয় ওঠানামা ছুটাছুটী করে' হাঁপিয়ে পড়ছে।

ঝিয়েরা গলায় সোণার হেলেহার বাহুতে সোণার তাগা এবং রংকরা কাপড় পরে কেউবা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের তীব্রোচ্চ ধ্বনিতে সারা বাড়ী সরগরম করছে, কেউবা বড় বড় শীল পেতে সশব্দে বাঁটনা বাঁটতে বসে গেছে।

বৈঠকখানায় কর্ত্তাবাবু তাঁর ছোট ভায়েদের এবং উপযুক্ত ছেলে ও জামাইদের নিয়ে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে ফুলশয্যার তত্ত্বের ফর্দ্দ প্রস্তুত করাচ্ছেন আলবোলায় সুদীর্ঘ নল মুখে দিয়ে।

বা'র বাড়ীর অন্য একখানি ঘরে তরুণ যুবাদের মজলিশ্ বসেছে। ধুমায়মান গরম চায়ের পেয়ালা ও সিগারেট বিড়ির ধোঁয়ায় চলচ্চিত্রের রাজধানী 'হলিউডে'র 'ষ্টার' অভিনেত্রীদের সৌন্দর্য্য ও অভিনয়-নৈপুণ্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গ সেখানে বেশ জমাট্ বেঁধে উঠেছে।

উপরে দোতলার এক মহলে বর্ষীয়সী নারীরা স্তূপীকৃত কাঁচা আনাজের পাহাড় নিয়ে কুট্‌নো কুটতে বসে গেছেন। প্রকাণ্ড দালানখানি জুড়ে বঁটী পড়ে গেছে প্রায় থান-কুড়ি-বাইশ! কে কতো বড় বড় কুমড়ো বাগিয়ে ধ'রে বেগুণের মতো অনায়াসে দু'ফালা করে ফেলতে পারে তাই নিয়ে বেধে গেছে বিরাট বিতর্ক!

অন্য মহলে কিশোরী ও তরুণীদের ভীড়। বরপক্ষীয়ের প্রেরিত গায়েহলুদের তত্ত্বের উপহার সম্ভারে বড় বড় দু'খানি ঘর পূর্ণ হ'য়ে গেছে। ঝক্‌ঝকে রূপার বাসন, রূপার প্রসাধন-সামগ্রী, রূপার খেলনা হ'তে সুরু করে'—বেণারসী, কাশ্মিরী, সুরাটী, মারাঠী, গুজরাটী, ম্যাড্রাসী, মুর্শিদাবাদী, ঢাকাই প্রভৃতি নানা দেশের নানা ডিজাইনের বিচিত্র শাড়ী, ব্লাউজ, একাধিক ট্রে ভর্ত্তি সুরভি প্রসাধন-সামগ্রী, নানারকম সৌখীন প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য,—খেলনা-পুতুল, মিষ্টান্ন, ফলমূল ইত্যাদিতে ঘরের মেঝেতে পা রাখবার স্থান নেই।

একটি ষোড়শী তন্বী মরালের মতো শুভ্র সরু ঘাড়ের উপরে কালোচুলের প্রকাণ্ড এলো খোঁপা বেঁধে, ছোট্ট মাথাটি নেড়ে নেড়ে হাতের লম্বা কাগজের লিষ্টের সাথে নম্বর-আঁটা ট্রেগুলির দ্রব্যসামগ্রী মিলিয়ে নিচ্ছে। ঝক্‌ঝকে সোণালী মুগার ডুরে শাড়ীখানি তার সর্ব্বাঙ্গে জড়ানো। আঁচলটা শক্ত করে কোমরে আঁটা।

বছর সাতাশ-আটাশ বয়সের একটি হৃষ্টপুষ্টা যুবতী, গায়ে আঁট্‌সাঁট্ চিকণের সেমিজ, পরনে রেশমীপাড় শান্তিপুরে শাড়ী। প্রকোষ্ঠের ঝক্‌ঝকে পালিশ করা ভাটিয়া প্যাটার্ণের সরু সোণার চুড়ীর গোছায় মধুর

ঝণৎকার-ধ্বনি তুলে সমস্ত ট্রের জিনিষগুলি নেড়েচেড়ে একটির পর একটি নাম বলে বলে ফর্দ্দ মেলানোয় সাহায্য করছে।

খদ্দরের শাড়ী এবং খদ্দরেরই এমব্রয়ডারীদার খাটো-ব্লাউজ-পরা শ্যামবর্ণা একটি মেয়ে ফর্দ্দের সাথে মেলানো ট্রেগুলি একদিকে সরিয়ে রেখে, না মেলানো ট্রেগুলি অন্যদিক থেকে এনে এগিয়ে ধরছে।—

অগুন্তি সধবা ও কুমারী বধূ ও কন্যা মুখে উৎফুল্ল হাসি, সোৎসাহ-কলগুঞ্জরণ, দু'চোখে উৎসবের আনন্দ কণ্ঠে ভরে নিয়ে সেখানে প্রত্যেকটি জিনিষ নেড়েচেড়ে লক্ষ্য ক'রে দেখছে।

তা'দের বিচিত্র শাড়ীর বাহার, সুগন্ধি এসেন্সের সুরভি ও অলঙ্কারের ঝিকিমিকি, স্থানটিকে উজ্জ্বল মাধুর্য্যময় ও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। লুব্ধ পুরুষ আত্মীয়েরা অনেকেই কারণে ও অকারণে একএকবার এসে সেখানে উঁকি মেরে যাচ্ছেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সেজেগুজে রঙীণ প্রজাপতিরই মতো লঘু চঞ্চল পদে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা'দের আনন্দ-প্রদীপ্ত মুখে একটা বিপুল উৎসাহের উত্তেজনা। অকারণ সিঁড়ি ওঠানামার যেন আর তা'দের বিরাম নেই।

তেতোলাটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন।

একটি ঘরে অল্প মাসকয়েক মাত্র বিবাহিত এক নবদম্পতী এই গণ্ডগোল ভীড়ের অবকাশে সুযোগমত চুপি চুপি মিলিত হয়েছে।

তরুণীটি তা'র প্রিয়ের বক্তব্য সত্বর-সমাপন ক'রতে তাড়া দিচ্ছিল, কারণ, কেউ জানতে পারলে তাকে নাকি ভয়ঙ্কর লজ্জায় প'ড়তে হবে। ত্রস্তা প্রিয়ার কোমল হাত দু'খানি দৃঢ়মুঠিতে চেপে তরুণ যুবা কেবলই অভয় দিচ্ছে এবং তার বক্তব্যের বাকীটুকু—যা' হয়তো সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি ধ'রে বললেও তার বলা শেষ হবেনা, সেই চির-অসম্পূর্ণ বাণীর শেষটুকু শুনে যাওয়ার জন্য ঐকান্তিক অনুনয় করছে।

তা'দের অধরপুটে সলজ্জ ও সানন্দ মধুর হাসির রেখা! আঁখিতলে অতলগভীর স্নিগ্ধ আবেশ! রসনার চেয়ে চাহনিই তাদের অধিকতর মুখর। কথার অপেক্ষা হাসির ভাষাই যেন তাদের বেশী সুস্পষ্ট।

তেতোলার আর একখানি ঘরে স্কুলের ছাত্রছাত্রী জন চার পাঁচ ছেলেমেয়ে মিলে একজোড়া তাস সংগ্রহ করে নিরিবিলি আসর জমিয়ে বসেছে। তারই অনতিদূরে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে একখানি মস্ত 'ক্যারম্‌বোর্ড' পেতে একান্ত মনোযোগে লক্ষ্যভেদে ব্যস্ত।

তেতোলার সিঁড়ির ঘরের পাশের দিকে করোগেট্ টীন ছাওয়া রৌদ্রতপ্ত একটি ছোট কুঠুরীর অতি নির্জ্জন একটি কোণে দু'টি বছর চৌদ্দ-পনেরো বয়সের কুমারী মেয়ে কোথা হতে একখানি তাদের পাঠনিষিদ্ধ বই সংগ্রহ করে অতি সঙ্গোপনে পরস্পর পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মাথায় মাথা ঠেকিয়ে পাশাপাশি বসে, একান্ত নিবিষ্টচিত্তে রুদ্ধশ্বাসে পাঠ করছে।

একজনের পিঠে এক ঝলক্ বৈশাখী রৌদ্র এসে পড়েছে, সে দাহে তার খেয়ালও নেই।

বইখানি তা'রা কোন্ এক বৌদিদির দেরাজের খোলা-ড্রয়ার হ'তে অভাবিত রূপে হঠাৎ আবিষ্কার করে' ফেলে' —পড়বার লোভ সম্বরণ করতে না পারায় চুরি করে' নিয়ে এই নিরিবিলি কোণে দু'জনে পালিয়ে এসেছে। যথাসম্ভব শীঘ্র পড়া শেষ করে আবার যথাস্থানে চুপি চুপি রেখে দিয়ে আসতে হবে।

তা'দের চ'খে মুখে একটা বিপুল কৌতূহল এবং গোপন রহস্য-আবিষ্কারের বিস্ময়মায়া স্পষ্ট ঘনিয়ে উঠেছে।

বয়স্থা গৃহিণীরা একতলা ও দোতলার চারিদিক ঘুরে ঘুরে তদারক করে বেড়াচ্ছেন এবং কাজকর্ম্মের নির্দ্দেশ ক'রছেন।

দোতলার একখানি ঘরে ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা ঘুরছে, তার তলায় ঈজিচেয়ারে শুয়ে আছে একটি তরুণী কিশোরী। পরণে লাল ক্রেপের পাতলা বেনারসী শাড়ী, কপালে চন্দনের পত্রলেখা, পায়ের তলা দু'টি আলতায় টুকটুকে রাঙা। গলায় বেলফুলের প্রকাণ্ড গোড়ে মালা হাঁটুর 'পরে লুটিয়ে এসেছে,—সর্ব্বাঙ্গে পালিশ-উজ্জ্বল নতুন সোণার গহনা, হাতের মুঠিতে সোণার ছোট্ট কাজললতা!

তাকে ঘিরে তার সমবয়সী অনেকগুলি মেয়ে উচ্ছল হাসি ও রহস্যালাপের আবর্ত্ত রচনা করেছে।

মেয়েটির চ'খে মুখে একটি অতি মধুর আনন্দ স্নিগ্ধ লজ্জার ছায়া লেগে আছে। চাহনির তলে যেন একটি

অপূর্ব্ব স্বপ্নমায়া ঘনিয়ে নেমেছে। তার চলাফেরা নড়া-চড়ায় এমন একটি মধুর লালিত্য ও সুকোমল ভঙ্গী এবং সর্ব্বাঙ্গে এমন একটি সুকুমার শ্রী ফুটে উঠছে যে, যা'রা প্রতিদিন তা'কে সদাসর্ব্বদা চ'খের সামনে দেখেও চেয়ে দেখার আবশ্যকতা অনুভব করেনি, - তা'রাও আজ বারে-বারে আনন্দ-বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তুলে তা'র পানে তাকিয়ে দেখছে! যেন তা'কে আজই এই প্রথম দেখতে পেল তা'রা।

দেউড়ীর নহবতে ভোর থেকে ভৈরবী রামকেলী আশোয়ারী তোড়ী ভীমপলশ্রী একের পর একে বিচিত্র মূর্চ্ছনায় বেজে চলেছে।

নহবত বড় করুণ সুরে বাজছে।

অন্তরের নিতলপ্রদেশ আলোড়িত করে' ভাষাতীত এক উদাস-গভীর বেদনা জেগে উঠছে তার কাতর-কোমল তানে!...যেন আজ এখানে কে নেই—যেন কা'কে অনেক চেয়েও পাওয়া যায়নি,—যেন সবার চেয়ে প্রাণ যা'কে চায় সে আজ আসেনি!...অভিমানে বুঝি কে চিরদিনের তরে চলে গেছে!...তারই নিবিড় বিরহ-ব্যথা আজ সমস্ত আকাশ-বাতাসকে অশ্রু-ভারাতুর করে' সানাইয়ের সুর-ধারায় কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ছে!...ওগো সে কোথায়? —তা'কে নিয়ে এসো—নিয়ে এসো! যে-বিহনে এই উৎসব-আয়োজন, এই ফুলের গন্ধ বাঁশীর তান হাসির প্রবাহ সবই ব্যর্থ—সবই মিথ্যা।

উৎসব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখবার জন্য যে তরুণী মেয়েটি উৎসবের রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ-শব্দকে প্রাণপণে এড়িয়ে চলছিল, সে বিধবা।

তার চারিদিক বেষ্টন করে' উৎসবের এই ঘূর্ণীপাক কিন্তু বারম্বার তার দৃষ্টি ও মনকে সেদিকে আকৃষ্ট করছিল।

অল্প বয়সে বিবাহিতা হ'য়ে বৎসরের মধ্যেই তার সাংসারিক জীবনের দেনা-পাওনার প্রাপ্তির হিসাবটা একেবারেই চুকে গেছে দেনার দিকটাকেই দীর্ঘতর করে দিয়ে।

তার নিজের জীবন সম্বন্ধে এতবড় ব্যাপারটা যখন নিঃশেষে চুকে গিয়েছিল, তখন তার অপরিণত বালিকাচিত্ত কেবলমাত্র একটা নূতনত্বের বিস্ময় ছাড়া অন্য কিছুই উপলব্ধি করতে পারেনি। অবশ্য তা'র নিজ-জীবনধারা গ্রহণ সম্বন্ধে তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা মতামতের মূল্য কোনও দিন কিছু ছিল না এবং আজও তা নেই!

মেয়েটির গায়ের রং উজ্জ্বল-শ্যাম। এ' রংয়ে মত্ততা নেই বা তীব্রতা নেই, আছে স্নিগ্ধ-শীতল সুষমা।

নববর্ষার ছোঁয়ায় প্রান্তরের সবুজ দূর্ব্বার যে সিক্ত-সৌন্দর্য্য, প্রথম আষাঢ়ের মেঘচ্ছায়াতলে বনানীর যে স্নিগ্ধ-গভীর-রূপশ্রী, তারই আভাস যেন এই মেয়েটির শান্ত রূপের মাঝে মিশিয়ে রয়েছে।

ঘন কালো তার চুলের রাশি। ক্ষুদ্র ললাটখানি অবারিত করে' চুলগুলি সাধাসিধা ভাবে আঁচড়ানো এবং ঘাড়ের অল্প উঁচুতে নরম করে সহজ-হাত ফেরানো খোঁপা বাঁধা। খোলা কাণ দু'টির প্রান্তদেশে আঁচড়ানো চুলের প্রান্ত নেমে এসেছে নত হয়ে।

পরনে দেশী কালাপাড় শাড়ী। গায়ে ফিকে বাদামী রংয়ের ব্লাউজ। প্রকোষ্ঠে চারগাছি করে' তীরকাটা সোণার চুড়ী, গলায় সরু সোণার হার, কাণে দু'টি মুক্তার টাপ্।

ভাবহীন উদাস-মুখশ্রীতে আনন্দ কিম্বা নিরানন্দ কোনোটাই সুস্পষ্ট নয়। চোখ দু'টি যেন কোন্ বহু-দূর-পথের দিশাহারা তীর্থ-পথিক!

শিথিলপদে ততোধিক শিথিল মন নিয়ে চারতলা থেকে একতলা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অনির্দ্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে। তেতালার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামছে যখন,—একদল তরুণী এসে তার গতিপথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলল—

—কোথায় ছিলি ভাই সাবু? সারা বাড়ী তোকে খুঁজে মরছি আমরা।

বিধবা মেয়েটি সপ্রশ্ন চ'খে তাদের পানে তাকিয়ে থাকে।

—শোন্ ভাই সাবিত্রী, তোকে একটা কাজ করতে হবে। তুই ছাড়া আর কারুর দ্বারা এ' কাজ হবে না।

সাবিত্রী বিস্মিতস্বরে বলে—কী?—

—আমাদের ভারী ক্ষিধে পেয়েছে। গোটাকতক টাট্‌কা গরম গরম লেডীকেনি সন্দেশ ঐ মেজ ঠাকুর্দ্দা-বুড়োর কাছ থেকে আদায় করতে পারবি? সরকার-মশাই একলা যদি ভিয়ানের তদারকে থাকতেন, তা'হলে ঠিক আদায় করে' আনতে পারতুম ভাই! মুস্কিল হয়েচে, জ্যাঠামশাই তাঁর হুতুমপ্যাঁচা মামাটিকে ওখানে দরোয়ান করে বসিয়ে রেখেচেন যে!—

চারতলার উপরে ভিয়ানের কাছে কারুর ঘেঁষ্‌বার জো' নেই। গৃহকর্ত্তার মেজমামাবাবু বেজায় কড়া ও রাশভারী লোক। রোমবহুল প্রকাণ্ড পর্ব্বতের মত দেহ নিয়ে ভিয়ানের সামনেই মোড়া পেতে বসে গুড়গুড়ি টানছেন। তা' ছাড়া পুরাণো সরকার মশায়ও ভিয়ানের 'চার্জ্জে' আছেন তাঁর সহকারীরূপে।

ভিয়ান্‌-ম্যানেজার মেজমামার নাত্‌নী সম্পর্কীয়া জনকতক তরুণী মধুর হাসি, মধুর বাক্য, মধুর আবদার প্রভৃতি অনেক কিছু আয়ুধ প্রয়োগ করেও নীরস গম্ভীর মেজমামার কাছ থেকে একটিও টাট্‌কা মিষ্টান্ন আদায় করতে না পেরে ক্ষুণ্ণমনে নেমে আসছিল। তারাই এবার সবাই মিলে সাবিত্রীকে সুপারিশ্‌ ধরলে।

সাবিত্রী কুণ্ঠিতভাবে বল্‌লে—আমাকে দেবেন কেন?

—হ্যাঁ দেবে, নিশ্চয় দেবে। আমাদের তাড়িয়ে দিলে ব'লে তোকে কি কখনও তাড়িয়ে দিতে পারে? তুই পাগল নাকি সাবু?

—যা' না ভাই! একবার গিয়েই দেখ্‌না! তারপর যদি না দেয়,—না-ই দেবে!

—ঈষ্‌! সাবুদি চাইলে দেবেনা বৈকি? মেজ ঠাকুর্দ্দার ঘাড় দেবে। জ্যাঠামশাই যদি শোনেন, সাবুদি টাট্‌কা মিষ্টি চেয়ে পায়নি, তা'হলে রক্ষে রাখবেন কিনা!!

সাবিত্রীর দিদি শকুন্তলা এগিয়ে এসে সাবিত্রীর হাত ধরে বলে—যা'না সাবি! আমরা সকলে মিলে এত করে বল্‌ছি—

সাবিত্রী ম্লান হেসে চারতলার দিকে রওনা হয়।

•

ভিয়ানের কাছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সারাদিনই মৌমাছির মতো ঘুর্‌ঘুর্‌ করছে।

কোন্‌ মিষ্টিটা কেমন তৈরী হচ্ছে, আমসন্দেশ উৎকৃষ্ট না দেলখোস্‌ সন্দেশ উৎকৃষ্ট, রসগোল্লার চেয়ে লেডীকেনি শ্রেষ্ঠ, বালুসাইয়ের চেয়ে দরবেশ অধিকতর সুস্বাদু কিনা, কে একসঙ্গে ক' গণ্ডা সন্দেশ বা লেডীকেনি অনায়াসেই উদরসাৎ করতে পারে,—এই সকল গবেষণা ও তর্কালোচনায় চারতলার ছাদ সরগরম।

সাবিত্রী এসে কুণ্ঠিতপদে মেজমামার মোড়ার কাছে দাঁড়ায়। গুড়গুড়ির কাঠের নলটা মুখ থেকে নামিয়ে গম্ভীরমুখে হাসির রেখা টেনে মেজমামা বলেন,—

—এই যে—সাবুদিদি যে! কী মনে করে?

সাবিত্রী একটু অপ্রতিভ হেসে সকুণ্ঠস্বরে বলে—কিছু মিষ্টি দরকার হয়েছে মেজঠাকুর্দ্দা! এখন দেবার সুবিধা হবে কি?

—মিষ্টি চাই? তোমার নিজের চাই, না ঐ শুকু, লক্ষ্মী, মেন্তি শালাদের জন্যে চাইতে এসেচ, সত্যি করে বলো তো দিদি?—

সাবিত্রীর উদ্দেশ্য যেন ধরে ফেলেছে এমনিতর অর্থপূর্ণ মৃদুহাস্য মেজঠাকুরদাদার মুখে চ'খে ফুটে ওঠে।

সরকারমশায় জোরে হেসে উঠে বলেন—যার জন্যেই হোক্‌, ছোট মা যখন নিজে দরবার করতে এসেছেন তার উপরে আর অন্য কোনও কথা চল্‌বে না মেজমামাবাবু! আপনি হুকুম দিয়ে দিন্‌।

সাবিত্রী কুণ্ঠিত নতমুখে নিরুত্তরে পায়ের আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ টানতে থাকে।

মেজমামা বলেন—কত মিষ্টি চাই দিদি?—

সাবিত্রী আস্তে আস্তে বলে—সামান্য কিছু দিন্‌—

সরকারমশায় উচ্চহাস্যে বলে ওঠেন—আমরা যদি তোমায় গুণে দু'টি সন্দেশ মাত্র দিই, তা'তে কি তোমার হবে না?

একটু ভেবে নিয়ে সাবিত্রী বলে—সবরকম মিষ্টি গোটা আষ্টেক ক'রে না হ'লে যে কুলুবেনা!—

মেজমামা হাঃ হাঃ শব্দে হেসে উঠে বলেন—এত মিষ্টি তো তুমি একলা খেতে পারবেনা সাবুদি!

সাবিত্রী উত্তর দেয় না, সলজ্জ মৃদু হাসে মাত্র।

বামুনদের প্রতি হুকুম হয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজন একখানি থালায় ছ'রকম সন্দেশ, লেডীকেনি,

রসগোল্লা দরবেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন সাজিয়ে নিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে নীচের তলায় গিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসে।

উল্লসিতা তরুণীর দল সাবিত্রীর জয়ধ্বনি করে'—মিষ্টান্নের থালাখানি ঘিরে চক্রাকারে বসে।

সাবিত্রী নীরবে চলে যায়।

তা'রা সাবিত্রীকে ডাকে,—চলে যাচ্ছিস্ কেন সাবু? আয়না, আমাদের সঙ্গে একত্রে খাবি।

সাবিত্রী ম্লানমুখে সংক্ষেপে মাথা নেড়ে বলে—না। তোমরা খাও।

মেয়েরা তবু তাকে সাধাসাধি করে।

সাবিত্রী বলে—মিষ্টি তো আমি খেতে পারিনে জানো।

সে চলে গেলে সবাই বলাবলি করে—সাবু যত বড় হচ্ছে, ততই দিনদিন যেন শুখিয়ে যাচ্চে! দেখেছিস্ ভাই? ওর সেই ছেলেবেলাকার স্ফূর্ত্তি হাসি এখন যেন একেবারে মুছে গেছে।

সাবিত্রীর চেয়ে দু'বছরের বড় তার দিদি শকুন্তলা একটি চপ্‌সন্দেশে কামড় দিতে দিতে বলে—হাজার হোক্, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থা তো বুঝতে পারছে দিন-দিন। যতই কেননা ওকে আইবুড়ো মেয়ের মতন গয়না কাপড় পরিয়ে রাখো আর আদর-যত্ন কর! মনটাতে যে ওর সুখ নেই সে তো বোঝাই যায়।

সাবিত্রী তখন একটু নিরিবিলিতে গিয়ে তার ক্লান্ত তনু এলিয়ে দেবার জন্য স্থান খোঁজে। সকাল থেকে সমস্তক্ষণই সে কাজে এবং বিনা কাজে, প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে লক্ষ্যহীন ভাবে সারা বাড়ীময় ঘুরেঘুরে ও উপরে নীচেয় ওঠানামা করে বেড়িয়ে এখন হয়তো একটু শ্রান্ত বোধ করছে!

কোনও ভারী কাজ বা কঠিন কাজের ভার তাকে কেউ দেয়নি।

সে যেই প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাদের সঙ্গে কুটনো কুটতে গেছে,—তাঁরা সকলেই সমস্বরে হাঁ হাঁ করে' উঠেছেন।

—না সাবু! তোকে এখানে বসে কুটনো কুটতে হবেনা। কেন? তোর সমবয়সী খেলুনীরা, তোর বৌদিরা দিদিরা সকলে যেখানে রয়েছে তুইও সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে হাস্‌গে খেল্‌গে। তোকে এখানে বসে কুটনো কুটতে দেখলে তোর জ্যাঠামশাইরা রক্ষে রাখবেননা।

সাবিত্রী একবার মৃদু আপত্তি জানিয়ে হেসে বলে—না পিসিমা, আমি যে কুটনো কুটতে ভালোবাসি!—

কিন্তু বর্ষীয়সীদের মহলে তার সে যুক্তি টেঁকেনা। উপরন্তু—'বাছারে--' 'আহা—' 'কোথায় আজ সবাইকার সঙ্গে হেসেখেলে বেড়াবে—তা' যেমন পোড়া বরাত্—' ইত্যাদি হা-হুতাশ ও অঞ্চলপ্রান্তে শুষ্ক চক্ষু-মার্জ্জনা পর্য্যন্ত সুরু হয়ে যায় দেখে সাবিত্রী সভয়ে সে-মহল থেকে সরে পালায়।

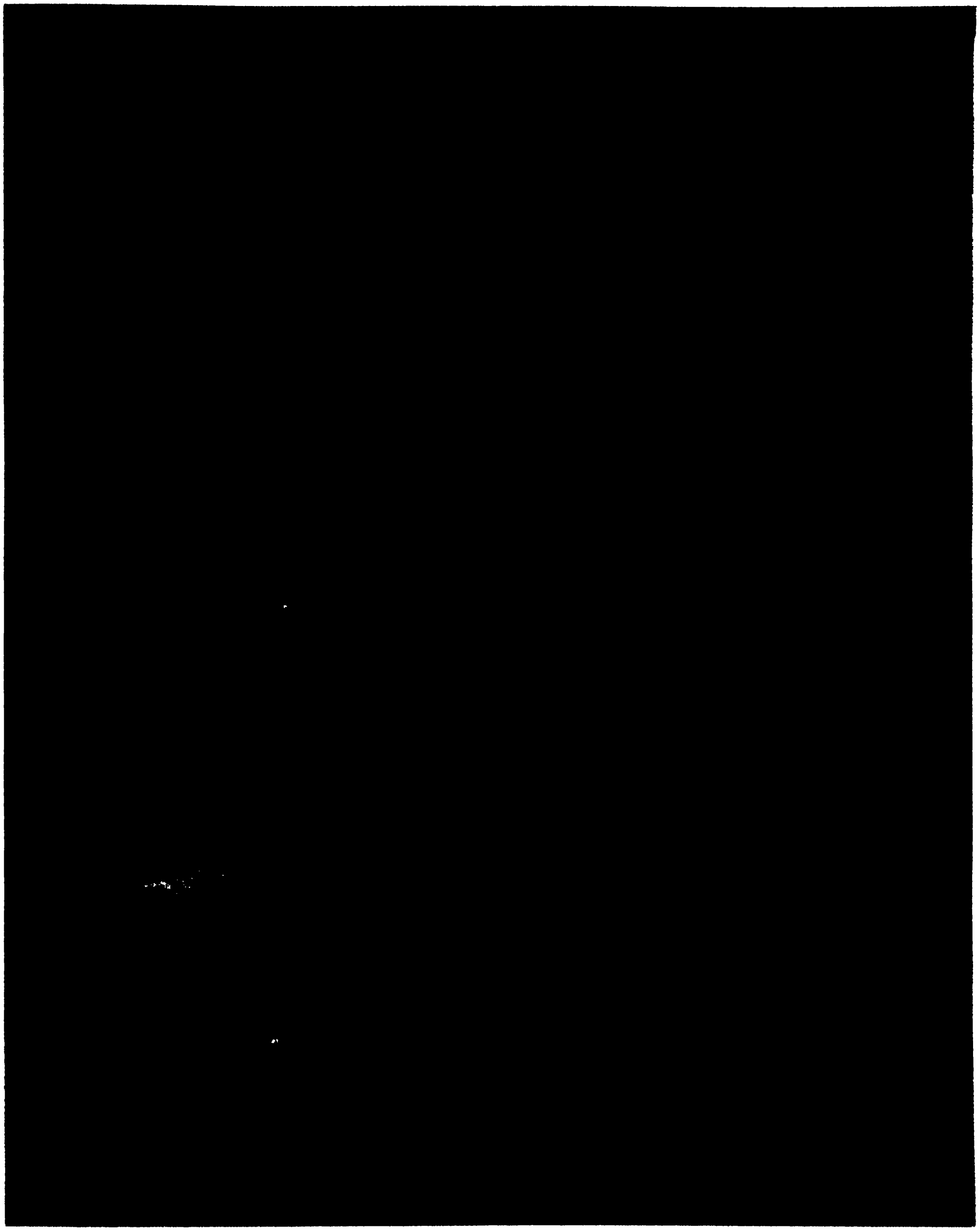
তাকে নিয়ে এই হা-হুতাশ, তাকে যত্ন আদর করার এই যে বিশেষতর সতর্কতা, তার দুর্ভাগ্যের প্রতি এই যে সকলের দয়ার্দ্র করুণা ও সহানুভূতি—এইটাই তার বর্ত্তমান জীবনের যেন অসহ্য-অপমান ও অসহনীয় বেদনার হেতু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তার দিন ও রাত্রিকে যেন অভিশপ্ত ক'রে তুলেছে!

দোতলায় যেখানে গায়ে হলুদের তত্ত্ব সবাই দেখছে ও ফর্দ্দ মিলিয়ে নিয়ে তুলে রাখা হচ্ছে, সেখানে সে গিয়ে দাঁড়াতেই দম্‌কা বাতাসে দীপ নিবে যাওয়ার মতো একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত-আলোচনা হঠাৎ যেন থেমে গেল।

সাবিত্রী স্পষ্ট লক্ষ্য করলে তা'র ন'বৌদিদি তাঁর বেল-ফুলের মালা জড়ানো সযত্নরচিত কবরীটির উপরে ত্রস্তে মাথায় কাপড় ঢাকা দিতে দিতে ব'লে উঠলেন—যাক্‌গে যাক্, যা' দিয়েচে, বেশই দিয়েচে। এ' নিয়ে এত তর্কাতর্কির কী আর আছে? নে, তোরা চট্‌পট্ সব তুলে ফেল্ দিকি! ঢের কাজ এখনও বাকী পড়ে আছে!—

ন'বৌদির চোখটিপে আলোচনা বন্ধ করার ইসারাটুকুও সাবিত্রীর দৃষ্টি এড়ায়নি। কারণ, তার নির্ব্বোধ জ্যাঠতুতো বোন রমা তখনও পাঁচ এয়োর ডালার নিখুঁত্ সুন্দর উপহার সামগ্রীগুলির মূল্যাধিক্য ও সূক্ষ্ম সৌখীনতা সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসায় রসনাবেগ সংযত করতে পারেনি।

পাঁচ এয়োর ডালাতে সধবাদের জন্য বরপক্ষীয়েরা শুধু শাড়ী ব্লাউজ্ সেমিজ-রুমাল, টোয়ালে-গামছা, আয়না চিরুণী সিঁদুর, সুরভি তৈল, তরল আলতা, এসেন্স, পমেটম, ক্রীম্ স্নো ইত্যাদিই পাঠাননি, প্রত্যেক ডালায় এক-একছড়া ক'রে বেল ফুলের বড় গোড়ে মালা, এক-একডিবা সোণালী



গৃহস্থালী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নলিনী মজুমদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

তবক্ মোড়া সুবাসিত মিঠা পান,—এক রেকাবী ক'রে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন দিয়ে জলখাবার পর্য্যন্ত সাজিয়ে পাঠিয়েছেন!

সেই পাঁচছড়া বেল ফুলের গোড়ে ছিঁড়ে আকারে ছোট ছোট করে প্রায় পনেরো কুড়িজন সধবা তরুণী তাদের খোঁপায় জড়িয়েচে। জলখাবারের রেকাবীগুলিও সকলে মিলে নিঃশেষিত করে তবক্-মোড়া মিঠা পান চিবাতে চিবাতে পানের রসে টুকটুকে রাঙা ঠোঁটে খুশী ও তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে সকলে তখন তাঁদের স্বামী-সোহাগের গর্ব্ব ও এয়োতি-সৌভাগ্যের সুখ-সুবিধার উচ্চ প্রশংসায় মুখর।

এমন সময়ে সাবিত্রী সেখানে এসে পড়ায় সকলেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে বাক্যস্রোত রুদ্ধ করে। ছোট্ট একটু ক'রে সকরুণ নিঃশ্বাস ফেলে।

ন'বৌদি ডাকেন—ছোট-ঠাকুরঝি! এতক্ষণ কোথায় ছিলি ভাই? আয় না, রূপোর খেল্‌না-টেল্‌না, টয়লেটের রূপোর সামগ্রীগুলো সো-কেসের মধ্যে উঠিয়ে রাখ্। তোর বেয়াই ম'শায়ের কিন্তু ভাই নজর উঁচু আছে। সাবানদানীটি পর্য্যন্ত খাঁটী রূপোর গড়িয়ে দিয়েছে দেখেচিস্?—একটিও কিছু ইলেক্‌ট্রোপ্লেট্ নয়!—নে, এ'সব তো তোরই দেখেশুনে তুলবার গুছুবার কথা ভাই! তা' নয়, তুই কোথায় ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্—"

তারপরে যে-মেয়েরা জিনিষপত্রগুলি তুলে কাঁচের আলমারীর মধ্যে সাজিয়ে রাখছিল, তা'দের ন'বৌদি অহেতুক তাড়া দিয়ে বলেন—তোরা সরদিকি বাপু! এই লক্ষ্মি! তুই এ'দিকে উঠে আয়। ও'গুলো সব ছোট্ট ঠাকুরঝী তুলবে। ও' ঐ সমস্ত জিনিষ বেশ সুন্দর সাজাতে গোছাতে পারে।

সকলেই একবাক্যে বলে ওঠে—হাঁ, হাঁ, সাবিত্রীকেই ঐ কাজের ভার দেওয়া উচিত! তাদের প্রত্যেকের চ'খে সদয়-করুণা সুস্পষ্ট।

সাবিত্রী ম্লানহেসে বলে—না ভাই ন'বৌদি! আমি ও' পারবো না। আমায় মাপ করো।

তারপর সত্বর সেখান থেকে সরে যায়। তার অবস্থার প্রতি নির্ব্বিশেষ সকল মানুষের এই সানুগ্রহ-অনুকম্পা তাকে যে কতো নিষ্ঠুর ভাবে পীড়িত করে এ'কথা তারা কেউ বোঝেনা।

গাত্রহরিদ্রার পর আল্‌পনা আঁকা পিঁড়ির 'পরে কণে' যে ঘরে বসে আছে সাবিত্রী সেই ঘরে প্রবেশ করে।

তার পরম স্নেহাস্পদা প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্রীর বিবাহ।

সাবিত্রীর অন্তরে আজ সত্যই আনন্দ ও তৃপ্তির সীমা নেই। এই উৎসব তার কাছে কতো আনন্দের, কতো উৎসাহের সে কথা সে বাইরের মানুষকে বোঝাতে অক্ষম। —কিন্তু ঐ উৎসবে সে আনন্দিত হবে কী করে? প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেকেই যে তাকে তাদের অহেতুক সমবেদনার ভারে সচেতন করে দিচ্ছে,—এই উৎসবের মধ্যে আর সমস্ত মেয়ে হতে তার আসন বহুদূরে—পৃথক। সে এই উৎসবের কেউ নয়; ঐ উৎসবে যে তার সহজ অধিকার নেই এ'কথা প্রত্যেকের অতি সতর্ক করুণাপূর্ণ ব্যবহারে সে বিশেষ করেই উপলব্ধি করতে পারছে।

সাবিত্রী ক'ণে'র কাছে গিয়ে দেখে—সখীবেষ্টিতা শোভারাণীর কবরী-রচনার আয়োজন হচ্ছে! তারই সেজদিদি শকুন্তলা, জরী-ফিতে কাঁটা চিরুণী গন্ধতৈল ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে কণে'র চুল বেঁধে দিতে বসেছে।

সাবিত্রী সেখানে গিয়ে একধারে বসে' কণে'র দিকে চেয়ে সস্মিত মুখে বলে—কাল এমন সময়ে আমাদের ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যাবি শোভন?—

শোভারাণী লজ্জানত মুখে মৃদু হাসে।

শকুন্তলা শোভার চুলে চিরুণী চালনা করতে করতে বলে ওঠে—তুই সবাইকার চুল বেঁধে দিতে ভালোবাসিস্ সাবি,—দে'না তুই আজ তোর শোভনের চুল বেঁধে!—

সাবিত্রী সচকিত হয়ে উঠে ধীরে বলে—তুমিও তো চুল বেঁধে দিতে কম ভালোবাসোনা সেজ্‌দি—

—হ্যাঁ, আমিও চুল বেঁধে দিতে ভালোবাসি বটে! তা'হলেও, তুই-ই দে'না আজ ভাই! আমি উঠ্‌ছি—

শোভার সখীদের মধ্য হতে কে একটি সদ্যঃবিবাহিতা কিশোরী মেয়ে বলে ওঠে—ও মা! তা' কি হয়? সাবিত্রী পিসিমা আজ আর কি ক'রে চুল বেঁধে দেবেন? গায়ে-হলুদের পর থেকে কণে'কে আর বিধবাদের ছুঁতে নেই যে!!

শকুন্তলা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সমস্ত মেয়েরা এমন কি কণে' শোভারাণী পর্য্যন্ত সকলে একসঙ্গে তর্জ্জন ক'রে—নির্ব্বোধ মেয়েটিকে ধমক্ দিয়ে উঠলো।

—কে বল্লে তোকে? ভারী গিন্নী হয়েছেন!! নে নে

চুপ্ কর,—যতো সব বাজে-কথা! ছুঁতে নেই না হাতী!—

এমনিধারা কত কি মন্তব্য একসঙ্গে ঘরের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল।

কে একজন বলে উঠ্‌ল—পাড়াগাঁয়ে বিয়ে হয়ে মেন্তিটার কথাবার্ত্তা বুদ্ধিশুদ্ধি সবই যেন পাড়াগেঁয়েদের মতন হয়ে গেছে!

মেন্তি বেচারী কথাটা ফস্ করে বলে ফেলে—সকলকার ভাবভঙ্গী দেখে মহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। ধমকে বকুনিতে উপহাসে বিদ্রূপে সে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে আসে।

সাবিত্রী তাকে সস্নেহ-বাহুপাশে জড়িয়ে ধ'রে বলে—অপ্রিয় হলেও তুমি সত্যি কথাই বলেচো মেন্ত! এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই।

—হ্যাঃ! সত্যি না ছাই!! কেন? ছুঁলে হয় আবার কী?—

সাবিত্রী শকুন্তলার কথার কোনও উত্তর দেয়না।—শোভা জেদ্ করে বলে—আমি আজ ছোটপিসিমার কাছেই চুল বাঁধবো। আর কারুর কাছেই বাঁধবো না। সেজ-পিসিমা, তুমি ওঠো।

শকুন্তলা হাসতে হাসতে শোভার চুলের জট্ ছাড়ানো বন্ধ করে সরে' বসে, বলে—আয় সাবি! তুই নইলে শোভা আর কারুর কাছে চুল বাঁধবে না!—

সাবিত্রীর শান্তমুখ হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে। তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।

সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কঠিন স্বরেই বলে যায়—আমাকে যা' করতে নেই, আমি তা' করিনা! এ'তো জানো তোমরা—

সাবিত্রীর চলে যাওয়ার পানে শোভা হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকে।

শকুন্তলা সরে এসে চিরুণীখানি হাতে তুলে নিতে নিতে বলে—সরে আয় শোভা! বেলা গড়িয়ে আসছে! সাবি কখন যে কী মেজাজে থাকে বোঝবার জো' নেই বাপু!

একটি বয়স্থা কুমারী মেয়ে টিপ্পনী কেটে বলে—জ্যাঠামশাইরা থেকে দাদারা থেকে বাড়ীশুদ্ধু সকলে সাবি-দি'কে এত ক'রে আদর করছে, যত্ন করছে,—মাথায় তুলে রেখেছে,—সাবিদির বাপু কিছুতেই যেন মন ওঠেনা! দিনরাত্রি মুখ গম্ভীর করেই আছে—

শোভা চুল বাঁধতে বাঁধতে ধমক্ দিয়ে ওঠে—তোমরা থাম' দিকি! ছোটপিসিমাকে নিয়ে তোমাদের অতো আলোচনা করতে হবে না।

আর একটি সধবা ঝিউড়ী মুরুব্বিয়ানার সুরে বলে—কেন? সত্যিকথা বলবেনাই বা কিসের জন্যে?

শোভা বলে—ঠাকুর্দ্দারা, বাবা-কাকারা সকলে ওকে যত্ন করেন সেই হিংসেতেই তোমরা গেলে বাপু!—

ওধার থেকে আর একটি যুবতী ফোঁস্ ক'রে ব'লে ওঠে—বালাই! ও' সধবা-মেয়ে, ও' কোন্ দুঃখে সাবিত্রী ঠাকুর্ঝির হিংসে করতে যাবে? ব'য়ে গেছে!…তবে সাবিত্রী ঠাকুর্ঝি যে মানুষটা একটু দেমাকে, এ'কথা সকলেই বলবে,—তা' যা'ই বল!

এ'কথার পর সাহস পেয়ে আর একটি মুখরা মেয়ে বলে ওঠে—তা' আর বলতে?—কথার রকম শুনলে না? 'যা' আমায় করতে নেই তা' আমি করিনি—' তা' যদি না-ই করো তবে শাড়ী চুড়ী গহনাগুলো গায়ে রেখেছো কেমন করে?—

বাধা দিয়ে শোভা রাগ করে কী যেন উত্তর দিতে যায়, শকুন্তলা তাড়াতাড়ি থামিয়ে দেয়!—চুপ্ চুপ্, আজ রেগে উঠতে নেই শোভা! আজ তোকে কারুর সাথে তর্ক করতে নেই।

সাবিত্রী তেতালার ঘরগুলি একটু নিরিবিলি ব'লে সেইদিক পানে চলেছে।

অন্যমনস্কভাবে চলায় সে লক্ষ্য করেনি যে, তেতালার সিঁড়ির ডান পাশের ঘরেই তার ছোটদাদা শিশির চুপি চুপি তরুণী-বধূর সাথে বিশ্রম্ভালাপে মত্ত।

হঠাৎ সাবিত্রীর কাণে এল, শিশির চাপাস্বরে বল্‌ছে—সরো মিনু,—আমি পালাই। সাবু তেতলায় এসেছে। ও' যদি আমাকে এখন তোমার কাছে দেখতে পায়,—ভারী অপ্রস্তুত হবো তা'হলে!

বধূ দুষ্টামীর স্বরে উত্তর দেয়—কেন? তুমি তো বলো তুমি নাকি দুনিয়ার কাউকেই লজ্জা করোনা!…ইচ্ছা করলে বাড়ীশুদ্ধু লোকের সামনেই নাকি তুমি আমায় আদর করতে পার? এতই যদি বীর তুমি,—তবে কেন ছোটবোনের ভয়ে লজ্জায় পালাচ্ছ?—

শিশিরের ঈষৎ গম্ভীর অথচ চাপা স্বর আবার শোনা

যায়। সে বলে—না মিনু, সবার সামনেই পারি, কিন্তু সাবিত্রীর সামনে তোমাকে আদর সোহাগ করতে আমি লজ্জা পাই,—দারুণ লজ্জা পাই,—ব্যথাও পাই। ও' আমার চেয়ে অ—নেক ছোট,—কিন্তু ওর 'পরে আমরা আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর ব্যবস্থা ও হাজারো রকম বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিয়ে—নিজেরা এই—

বাকী কথাগুলি স্পষ্ট সবটা শোনা গেল না। সাবিত্রীর আর শোনার প্রবৃত্তিও ছিল না।

অপমানে ক্ষোভে তার সমস্ত দেহের মধ্যে একটা নিদারুণ অস্বস্তি অনুভূত হচ্ছিল।

পৃথিবীশুদ্ধ মানুষের এই আহা-উহু বাণী ও করুণাপূর্ণ দয়া আর সে সহ্য করতে পারে না।

যদি ওরা এতই দুঃখিত, এতই কাতর, সাবিত্রীর বর্ত্তমান অবস্থায়,—তা'হলে দিক্‌না কেন অবস্থান্তর ঘটিয়ে!

আজীবন অনবরত সকলকারই দয়া ও করুণার পাত্রী হ'য়ে থাকা—এ যে কী অভিশাপ এবং কতোবড়ো লাঞ্ছনা সে চুপ করে ভাবতে থাকে।

নিজের অবস্থায় সে তো একটুও দুঃখিত কিম্বা অসন্তুষ্ট নয়, সে তো বেশ সহজভাবেই সকলের সাথে মিশতে চায়; কিন্তু ওরা তা' দেয় কৈ?—তার জন্ম যে ওদের বিশেষ যত্ন, বিশেষ স্নেহ, বিশেষ করুণা, বিশেষতর সদয়-সহানুভূতি সে-ই-তো ওর অবস্থার দৈন্যকে সবার সম্মুখে অহর্নিশি সুস্পষ্ট করে রেখেচে এবং ওকেও সর্ব্বদা সচেতন করে দিচ্ছে ওর নিজের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে।

মেজ ঠাকুর্দ্দা তাকে যদি আর সকল মেয়েদের মতই মিষ্টান্ন না দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতেন, সে যে তা'তে কতো স্বাচ্ছন্দ্যের শান্তি পেতো তা' কে বুঝবে?—সে যে এই উৎসববাড়ীর সমস্ত মেয়ে হ'তে পৃথক, এ'কথা একদণ্ড তাকে কেউই ভুলতে দিতে রাজী নয় যেন!

সাবিত্রী নিজের কুমারী-বেশের পানে তাকিয়ে ঘৃণায় হাসে। ভাবে—ছিছি!—কতো বড়ো মিথ্যা এ' সাজ!... ওরা কি কেউ এক মুহূর্ত্তের জন্মও ভাবতে পারছে সে কুমারী!—তার নামমাত্র বিবাহিত জীবন তার কুমারী-জীবনে কিছুমাত্র ছায়াপাত করেনি!!—

ওদের মনের মধ্যে অহর্নিশি জেগে আছে আমার বৈধব্য,—অথচ ওদের সেই একান্ত সত্যকে মিথ্যার আবরণে আবৃত করে রাখার জন্যই ওরা আমাকে পরিয়ে রেখেচে কুমারীর সাজ!...এ'সাজ ওদের কাছে একটুও যদি সত্য হয়ে উঠতে পারতো, তা'হলে আজকের এই উৎসব আনন্দের মাঝখানে এককণাও সহজ অধিকার আমার মিলতো!

তবে এ'সব পরে থাকা কেন? এ-ও আমার ওদেরই করুণার দান বৈ তো নয়?—

না,—ওদের একবিন্দুও করুণা সে আর সইতে পারবে না!...বইতে পা:বে না।

সাবিত্রী হঠাৎ ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর দীপ্তচখে গিয়ে বড় আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

প্রকোষ্ঠের চুড়িগুলি, গলার হারছড়া ও কাণের টাপ্ দু'টি খুলে নিরাভরণা হয়ে—সিমলার কালাপাড় শাড়ীর উভয় প্রান্ত হ'তে কুচকুচে কালো পাড় দু'খানি ছিঁড়ে ফেলে দেয়। একখানা কাঁচি সংগ্রহ করে এলো খোঁপাশুদ্ধ ঘন কালো চুলের রাশি মুঠা করে বাম হাতে চেপে ধরে—ডানহাতে কাঁচি চালিয়ে খোঁপাসমেত চুলের রাশি নির্ম্মূল করে ফেলে।

উৎসব মণ্ডপের তোরণ-শীর্ষে নহবতে তখন পূরবী রাগিণী বেজে উঠেছে। সাবিত্রা বড় আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বৈধব্য-বেশের প্রতি বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে যেন!

ক্ষণ পরে তার ডাগর চোখের কোল বেয়ে দু'ফোঁটা মুক্তার মত বড় বড় অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ে।

নহবত্ বড় করুণসুরে বাজছে।—

অন্তরের নিতল-প্রদেশ আলোড়িত করে ভাষাতীত এক উদাস গভীর বেদনা জেগে উঠছে তার কাতর-কোমলতানে। ...যেন আজ এখানে কে নেই—যেন কা'কে অনেক চেয়েও পাওয়া যায়নি,—যেন সবার চেয়ে প্রাণ যাকে চায় সে আজ আসেনি!...অভিমানে বুঝি কে চিরদিনের তরে চলে গেছে! —তারই নিবিড় বিরহব্যথা আজ সমস্ত আকাশ বাতাসকে অশ্রুভারাতুর করে' সানাইয়ের সুরধারায় কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ছে!...বাঁশী যেন বলতে চায় তার আকুল কান্নাভরা মিনতির সুরে,—ওগো সে কোথায়?—তা'কে নিয়ে এসো —নিয়ে এসো। যে-বিহনে এই উৎসব-আয়োজন, এই ফুলের গন্ধ, বাঁশীর তান, হাসির প্রবাহ সবই ব্যর্থ—সবই মিথ্যা!

—শেষ—

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

হিতবাদীর কর্ণধার রূপে বাঙ্গলা সংবাদপত্র পরিচালনে যিনি অসাধারণ তেজস্বিতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক রূপে যিনি কংগ্রেসকে বঙ্গদেশে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন, অপূর্ব্ব কাব্যরসের সঞ্চার করিয়া যিনি বাঙ্গলার লোক সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষ" আজ সেই পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের স্মৃতি তর্পণ করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইল।

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ পণ্ডিতরত্নী মেলের কুলীন—শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। ২৪পরগণার অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নিবাসভূমি ছিল। তাঁহার পিতা ৺রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাল্যকালে ইছাপুর হইতে কলিকাতা ভবানীপুরে আসিয়া তদীয় জ্যেষ্ঠাগ্রজ তারিণীচন্দ্রের আশ্রয়ে বাস করেন। রাখালচন্দ্র ভবানীপুরের মিশন স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়া উত্তর কালে সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া সমগ্র জীবন যাপন করেন। কালীঘাটের ৺কালীমাতার অন্যতম সেবায়েৎ ৺গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা বেচামণি দেবীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক ভবানীপুরে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া রাখালচন্দ্র স্থায়ী ভাবে তথায় বাস করেন।

সন ১২৬৮ সালের ২৮এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার কাব্যবিশারদ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাখালচন্দ্রের অষ্টম পুত্র। ৺কালীমাতার অনুগ্রহে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার নাম কালীপ্রসন্ন রাখা হয়।

ভবানীপুরের চরকডাঙ্গা বঙ্গ বিদ্যালয়ে কালীপ্রসন্নের শিক্ষারম্ভ হয়। কিছু দিন পরে ইংরেজী শিক্ষার্থ তিনি মিশন স্কুলে প্রবেশ করেন। এই স্কুল হইতে ১৫ বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দানের জন্য প্রস্তুত হন, এবং টেষ্ট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া চলিত না। সেইজন্য তাঁহাকে আরও এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়। পর বৎসর পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

কালীপ্রসন্ন যখন লণ্ডন মিশনারী স্কুলে পড়িতেন, তখন স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "সোমপ্রকাশ" ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হইত। তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় হইতে কালীপ্রসন্ন "সোমপ্রকাশে" লিখিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও সর্ব্ব-প্রযত্নে তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন। এইরূপে কালীপ্রসন্ন পঠদ্দশা হইতেই বাঙ্গলা ভাষার লিপি-কৌশল ও সংবাদপত্র-সম্পাদন-প্রণালী আয়ত্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। "সোমপ্রকাশে" তাঁহার সরস ব্যঙ্গাত্মক কবিতাসমূহ প্রকাশিত হইত। গুণগ্রাহী বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাব্যবিশারদের কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, কাব্যবিশারদও তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কাব্যবিশারদ মিশনারী কলেজে ভর্ত্তি হন। কিছুদিন পরে কলেজী শিক্ষা ভাল না লাগায় তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত কাব্য-ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন; এবং কালে এই সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতেই "কাব্যবিশারদ" উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি ভবানীপুরের বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামক ছাত্রসভায় বক্তৃতা করিতেন; এবং ভবানীপুর ষ্টুডেণ্টস এ্যাসোসিয়েশন নামক সভার মাসিকপত্রে ছাত্রাবস্থা হইতেই প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

মিশনারী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে মিশনারীদিগের শিক্ষাপ্রভাবে কালীপ্রসন্ন খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণে উদ্যত হন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া পিতা রাখালচন্দ্র পুত্রকে প্রথমে বাইবেল পড়িতে উপদেশ দেন। বাইবেল পড়িবার পর কাব্যবিশারদের মত পরিবর্ত্তিত হয়—তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার

সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে দুই-তিনটি যুবক তৎকালে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ভুবনবিখ্যাত কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস অন্যতম।

১২৭৯ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ কাব্যবিশারদের উপনয়ন-সংস্কার হয়। ১২৮২ সালের মাঘ মাসে ১৪ বৎসর বয়সে ভবানীপুরের ৺ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা যোগেশ-মোহিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১২৮৮ সালে শ্রীমতী সুরবালা নাম্নী কন্যা এবং ১২৯১ সালের ১৯এ বৈশাখ শ্রীমান মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯২ সালের পৌষ মাসে কাব্যবিশারদের পত্নী-বিয়োগ ঘটে। ১২৯৪ সালে পত্নীর স্মরণার্থ তিনি "স্মরণচিহ্ন" ও "প্রেমোপহার" নামে দুইটি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ বৎসর শ্রাবণ মাসে বিশারদ বাঁকুড়া জেলার সোণামুখী গ্রামের ডাক্তার বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ইন্দুমতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই।

১২৮৬ সালে ১৭ বৎসর মাত্র বয়সে কাব্যবিশারদ "লুক্রেশিয়া" নামক ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তৎকালীন সংবাদ ও সাময়িক পত্রে ইহার উচ্চ প্রশংসা হইয়াছিল এবং লেখক কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য ও বি, এস, এসোসিয়েশন হইতে পদক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভবানীপুর হইতে "পঞ্চানন্দ" প্রকাশ করিতেছিলেন। কাব্যবিশারদ উহাতে "শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী" এই ছদ্ম নামে "বঙ্গীয় সমালোচক" শীর্ষক এক ব্যঙ্গকবিতা প্রকাশ করেন। এই কবিতায় বঙ্কিমবাবু, হেমবাবু, ঈশানবাবু, ডাকহরকরা সম্পাদক ও নববিভাকর সম্পাদক প্রভৃতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ ছিল। কবিতাটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

কাব্যবিশারদের অসাধারণ প্রতিভা, কবিত্বশক্তি ও লিপিচাতুর্য্য দর্শনে "সোমপ্রকাশ" সম্পাদক বিদ্যাভূষণ মহাশয় এতাদৃশ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন যে, অন্নাদনের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইলে তিনি দুই এক সপ্তাহ "সোম প্রকাশ" পরিচালনের ভার বালক কাব্যবিশারদের উপর অর্পণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। সেই অল্প বয়স হইতেই রাজনীতিক বিষয়ে কাব্যবিশারদের জ্ঞান ও বিচারশক্তির স্ফুরণ হইতে আরম্ভ হয়। ধলার হাতে কালার প্লীহা ফাটা সম্বন্ধে তিনি সেই বয়সেই "সভ্যতা সোপান" নামে একটি প্রহসন রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। এই রচনার জন্য রাজপুরুষরা অত্যন্ত বিরক্ত হন, এবং লেখকের নামে অভিযোগ উপস্থাপনের উদ্যোগ হন। কিন্তু তৎকালীন ছোটলাট যখন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মুখে অবগত হইলেন যে উহার লেখক অপরিণত-বয়স্ক বালক মাত্র তখন অভিযোগ আনয়নের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। এই সময়ে কাব্যবিশারদ মহাশয় "নির্দ্দোষের অপরাধ" শীর্ষক আর একটি কবিতা "সোমপ্রকাশে" প্রকাশ করেন। তাহাতে তাঁহার দুর্জ্জয় সাহস প্রকাশ পায়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটনের মুদ্রাযন্ত্র বিধানের কল্যাণে "সোমপ্রকাশ" বন্ধ হইয়া যায়। তদুপলক্ষে কাব্যবিশারদ "বিনাদোষে রাজরোষ" শীর্ষক যে কবিতা রচনা করিয়া-ছিলেন, উহা সোমপ্রকাশের শেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে কাব্যবিশারদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন; এবং স্বেচ্ছাস্বরূপ বিজ্ঞান শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া "প্রকৃতি" নামে এক বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকার প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক কোন সাময়িক পত্র ছিল না; সেইজন্য "প্রকৃতি" প্রকাশ করিয়া কাব্যবিশারদ মহাশয় কাশীমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে দুই শত টাকা সাহায্যলাভ করেন। কিন্তু তৎকালে দেশে বিজ্ঞানবিষয়ক পত্র চলিবার সময় আসে নাই—লেখক, পাঠক এবং অর্থ তিনেরই অসদ্ভাব ছিল। কাজেই "প্রকৃতি" চলে নাই। পরিশেষে তিনি উহা ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত "কল্প-লতা"র সহিত সম্মিলিত করিয়া দেন।

বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে বিশারদের চিত্ত আর এক দিকে নিবিষ্ট হয়। কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া তিনি "আর্য্য ঐন্দ্রজালিক সমিতি" সংগঠনপূর্ব্বক বঙ্গের ও ভারতের নানা স্থানে কিছু দিন পাশ্চাত্য প্রণালীর ইন্দ্রজাল ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মেসমেরিজম

বা সম্মোহন বিদ্যাতেও ঐ সময়ে তাঁহার পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল।

স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কাব্য-বিশারদের অচলা শ্রদ্ধা ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রবাবু যখন আদালতের অবমাননার অপরাধে কারাগারে প্রেরিত হন তখন কাব্যবিশারদ মহাশয় "ধর্ম্মাবতারের কেচ্ছা" নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন রচনা করেন। ইহাতে বিচার-পতি নরিশের প্রতি তীব্র আক্রমণ ছিল বলিয়া উহার প্রচার করা হয় নাই।

এই বৎসরই কাব্যবিশারদের "বিষাদ-প্রতিমা" (দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ বিষয়ক নাট্যগীতি) ও পর বৎসর "চিন্তাকুসুম" (খণ্ড কবিতা সংগ্রহ) প্রকাশিত হয়।

এক সময়ে কাব্যবিশারদ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে উদ্যত হইয়া-ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে উহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তিনি মিশনারীদিগের বিরুদ্ধাচরণপূর্ব্বক বাইবেল ও খৃষ্টধর্ম্মের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন। মিশনারীরা হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিতেন, পুস্তিকা ও পত্রাদি মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেন। ইহা কাব্যবিশারদ সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক বক্তৃতাদি করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন এবং বিডন স্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা করিতেন এবং খৃষ্টধর্ম্মের নিন্দাবাদপূর্ণ ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও পত্র মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেন। দুই তিন বৎসর এইরূপ বক্তৃতাদির পর তিনি "এণ্টিক্রিশ্চান" নামক এক ইংরেজী মাসিকপত্র বাহির করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। দুই বৎসর চলিবার পর উহা বন্ধ হইয়া যায়। এ দেশ অপেক্ষা বিলাতেই উহার প্রচার অধিক ছিল। এই পত্র উপলক্ষে ভারতবন্ধু মহাত্মা ব্রাডল সাহেবের সহিত কাব্য-বিশারদের বন্ধুত্ব হয়। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। এই উপলক্ষে মিঃ ফুট, বিবি বেশান্ত প্রভৃতি খৃষ্টধর্ম্মদ্বেষী-দিগের সহিতও বিশারদের পরিচয় হয়। এণ্টিক্রিশ্চান পত্রের প্রচার বন্ধ করিবার জন্য, কাব্যবিশারদকে বিপন্ন করিবার জন্য, ডাকযোগে কাগজ প্রেরণ রহিত করিবার জন্য শক্তিশালী মিশনারীগণ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু কাব্যবিশারদ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই।

"এণ্টিক্রিশ্চান" বন্ধ হইবার ছয় বৎসর পরে কাব্যবিশারদ "কসমোপলিটান" নামক আর একখানি ইংরেজী মাসিক-পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতেও কোমল ভাবে খৃষ্টধর্ম্মের উপর আক্রমণ থাকিত। দুই বৎসর পরে ইহাও বন্ধ হইয়া যায়। খৃষ্টান মিশনারীদিগের সহিত দ্বন্দ্ব উপলক্ষে অর্থ ও ছাপাখানার প্রয়োজন অনুভব করিয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বিশারদ ভবানীপুরে "পার্থিব যন্ত্র" (Secular Press) নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। উক্ত দুইখানি ইংরেজী মাসিকপত্র ও খৃষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত বাদানুবাদমূলক পুস্তিকা সকল এই ছাপাখানায় ছাপা হইত। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি Mrs. Annie Besant In India নামে একখানি ইংরেজী পুস্তিকার প্রচার করিয়া বিবি বেশান্তের তৎকালীন কার্য্যের সমালোচনা করেন।

সঙ্গীতে কাব্যবিশারদের অনুরাগ ছিল। তিনি ভাল গাহিতে না পারুন, সুর-তাল-মান-লয়-সঙ্গত ভাবে সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। ভবানীপুরের হাফ আখড়াই দলে তিনি অনেক গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের সময় তাঁহার রচিত অনেক জাতীয় সঙ্গীত সভা-সমিতিতে গীত হইত। লব্ধপ্রতিষ্ঠ হাফ আখড়াই সঙ্গীত রচয়িতা স্বর্গীয় মনোমোহন বসু বিশারদের সঙ্গীত রচনায় অসাধারণ দক্ষতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এক হাফ আখড়াই গানের সভায় মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ইহার পর কাব্যবিশারদ স্বর্গীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথের "ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন" পত্রের সম্পাদক হইয়া এলাহাবাদে গমন করেন। তদুপলক্ষে বিখ্যাত পাইয়োনীয়ার পত্রের সহিত তাঁহার প্রায়ই মসীযুদ্ধ হইত। "বাবু ইংলিশ" বলিয়া পাইয়োনীয়ার ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালীদের ইংরেজী লেখার ভ্রমপ্রদর্শনপূর্ব্বক বিদ্রূপ করিতেন। বিশারদ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন পত্রে পাইয়োনীয়ারের লেখার ভ্রম প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। কয়েকবার ভ্রম প্রদর্শিত হইলে পাইয়োনীয়ারের তৎকালীন সম্পাদক একদিন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পাইয়োনীয়ারের ভ্রম প্রদর্শনে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। ইহার পর হইতে পাইয়োনীয়ারও বাঙ্গালীর ইংরেজী লেখার ভ্রম প্রদর্শনে বিরত হন।

কাব্যবিশারদ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় লোকান্তরে প্রস্থান করিলে বঙ্গের সকল সংবাদপত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণকীর্ত্তন করিয়া শোক প্রকাশ করেন। কিন্তু পরলোকগত ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "রইস এণ্ড রাইয়ত" পত্রে বিদ্যাসাগরকে লঘু প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হয়। কাব্য-বিশারদ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এলাহাবাদে কাব্যবিশারদ দেড় বৎসর ছিলেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথের মৃত্যু হইলে তিনি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া কাব্যবিশারদ মহাশয় "হিন্দু পেট্রিয়টে"র সহকারী সম্পাদক হন। কিন্তু হিন্দু পেট্রিয়টের পূর্ব্ব নীতির পরিবর্ত্তন হওয়ায় এবং নূতন নীতির অনুমোদন করিতে না পারায় কাব্যবিশারদ হিন্দু পেট্রিয়টের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। কিছু দিন পরে "বঙ্গ-নিবাসী" পত্রের পরিচালকরা কাব্যবিশারদকে সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিয়া আভাস দেন যে সম্পাদক সুদক্ষ হইলে তাঁহারা তাঁহার হস্তে উহার স্বত্ব ও পরিচালন-ভার অর্পণ করিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে সেরূপ কোন লক্ষণ না দেখিয়া, এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে বঙ্গ-নিবাসীর স্বত্ব হস্তান্তরিত হওয়ায় বিশারদ বঙ্গ নিবাসীর সহিত সংস্রব রহিত করেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের "মিঠেকড়া" নামক ব্যঙ্গ কাব্য প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের "কড়ি ও কোমল" পুস্তকের কয়েকটি কবিতা উপলক্ষে মিঠে কড়া রচিত হইয়াছিল।

১২৯৮ বঙ্গাব্দে সম্মিলিত মূলধনে "হিতবাদী"র প্রচার হয়। কিন্তু উহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ায় ১৩০১ বঙ্গাব্দে কাব্যবিশারদ কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় উহার স্বত্ব গ্রহণ করেন এবং ৮ই বৈশাখ তারিখে তাঁহার সম্পাদকত্বে উহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। হিতবাদীর সংস্রবে কাব্যবিশারদের প্রতিভা উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। তাঁহার হাতে হিতবাদীর চরম উন্নতি হয়। এমন কি, তৎকালে বঙ্গের সংবাদপত্র-পাঠক জনসাধারণ হিতবাদী ও কাব্য-বিশারদকে পৃথক চক্ষে দেখিত না—হিতবাদী বলিতে কাব্যবিশারদ এবং কাব্যবিশারদ বলিতে হিতবাদী বুঝিত।

হিতবাদীর ভার গ্রহণের অল্প দিন পরে কাব্যবিশারদ মহাশয়-সঙ্কলিত সটীক "বিদ্যাপতি" প্রকাশিত হয়। বিদ্যাপতির এই নূতন সংস্করণ কাব্যবিশারদের কাব্য-প্রতিভার সম্যক পরিচয়। ইহা হইতেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশারদ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা বদ্ধমূল হয়।

হিতবাদীর সম্পাদকরূপে কাব্যবিশারদ মহাশয় যে নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বঙ্গের সর্ব্বসাধারণ তাহা অবগত আছেন।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে হিতবাদীতে একটি প্রাপ্ত কবিতা প্রকাশের জন্য বিশারদ মহাশয়ের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মোকদ্দমা রুজু হয়। ঐ কবিতা প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করায় এবং লেখকের নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত হওয়ায় মোকদ্দমার বিচার ফলে বিশারদ মহাশয় ৯ মাস কালের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু তাঁহাকে পূর্ণ নয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই। কিঞ্চিৎ অধিক পাঁচ মাস গত হইলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উপলক্ষে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কাব্যবিশারদ মহাশয় হিতবাদীতে ধারাবাহিক ভাবে যে কারাকাহিনী প্রকাশ করেন, তাহাতে জনসাধারণ কারাজীবন ও কারা-গারের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছিল এবং সেই লেখার ফলে কারাগারের অনেক দোষ-ত্রুটি, বিশৃঙ্খলা-অব্যবস্থার সংস্কারও সাধিত হইয়াছিল।

হিতবাদীর সংস্রবে বিশারদ মহাশয় "হিতবার্ত্তা" নামে একখানি হিন্দী সাপ্তাহিক এবং হিতবাদীর একটি দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁহার লোকান্তরে প্রস্থানের পর তদীয় পুত্র শ্রীমান মনোরঞ্জন হিতবার্ত্তার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। আর দৈনিক হিতবাদীর সম্পাদন-ভার অপরের হস্তে পড়িলে গবর্ণমেণ্ট মুদ্রণ শাসনী ব্যবস্থা অনুসারে জামিন তলব করায় শ্রীমান মনোরঞ্জন

জামিন দেওয়ার পরিবর্ত্তে কাগজের প্রচার বন্ধ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। তদনুসারে উহাও বন্ধ হইয়া যায়।

হিতবাদীর ছাপাখানা হইতে বিশারদ মহাশয়ের সম্পাদনে স্বর্গীয় রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সঙ্কলিত শব্দকল্পদ্রুম এবং স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অনূদিত মহাভারতের সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

হিতবাদীর সম্পাদন কালে বিশারদ মহাশয় আর একটি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে সময় অত্যন্ত অর্থকষ্টে পতিত হইয়াছিলেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় সেই সময়ে তাঁহার গ্রন্থাবলী হিতবাদীর গ্রাহক-বর্গকে উপহার স্বরূপ অল্প মূল্যে প্রদান করিয়া হেম বাবুকে কিছু টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে কবির শেষ জীবনে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত, হিতবাদীতে কাব্য বিশারদ মহাশয়ের আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্ট হেমবাবুর জন্য মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

হিতবাদী সম্পাদনের গুরু শ্রমের উপর কংগ্রেসের কার্য্যে এবং দেশের নানা স্থানে স্বদেশী প্রচার কার্য্যে তাঁহাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সেই অতি-পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। স্বাস্থ্য লাভার্থ তিনি বিদেশ যাত্রা করেন। কিন্তু বিদেশেই ১৩১৪ সালের ১৯এ আষাঢ় (৪ঠা জুলাই, ১৯০৭) তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

কাব্যবিশারদ মহাশয় সাহিত্য সভার সদস্য এবং সাহিত্য-সংহিতার সম্পাদক ছিলেন, এবং এই কার্য্যও তিনি সুশৃঙ্খলে সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তাঁহার ছাত্রাবস্থা হইতে সমগ্র জীবনে তাঁহার সকল কার্য্যে স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যের ভাবটি সুস্পষ্ট ও সুপরিণত দেখা যাইত। স্বদেশের ও স্বজাতির লাঞ্ছনা, নিগ্রহ, অপমানের প্রতিকারের জন্য তাঁহার আগ্রহের সীমা ছিল না। ভারতবর্ষ আজ এই প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিকের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ধন্য হইল।

বিদায়-বেলায়

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী বি-এ

সময় হইবে নিকট যখন, বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
নিশি-অবসানে সুদূর গগনে, কাঁদিবে আঁধার বিদায়-লগনে,
প্রভাতে ধরনী জাগিবে সঘনে, আলো-হাসি গানে যবে॥
তুমি ত তখন বিবশ-শোভায় ঘুমাবে মোহন বেশে,
ম্লান শুকতারা মুখপানে তব চেয়ে রবে অনিমেষে।
সমীর লুটাবে শিথিল অলকে, নয়ন ভরিবে হাসির ঝলকে,
কাঁপিবে অধর পুলকে পলকে, মধুরিমা-গৌরবে॥
আঁখি দুটি মেলি' বাতায়ন-পথে আন-মনে র'বে চাহি'।
জানিবে কি তুমি, একা কোন জন গেছে সেই পথ বাহি'।
যে গিয়াছে চলি', তারি আঁখিজল, শিশিরে শিশিরে করে টলমল,
তারি বাণী-ব্যথা হবে চঞ্চল, প্রভাতের কলরবে॥
যে আঁধার আজি চলিল ভাসিয়া, প্রভাতের উপকূলে।
তারি কোন মায়া স্মরণে তোমার পড়িবে কি কভু ভুলে?
নাহি যদি পড়ে,—তবু জেনো মনে, নিশীথ-রাতের একেলা-শয়নে,—
সারা তনু ঘিরি আধ-জাগরণে, সেই শুধু কথা ক'বে॥

ছায়ার মায়া

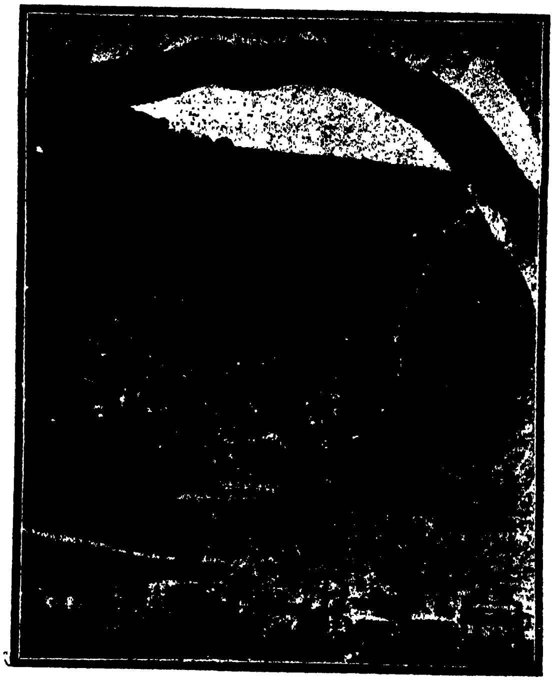
শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রের গল্প-গঠন ও চিত্র-নাট্যের রচনা-রীতি)

কোনো প্রসিদ্ধ গল্প বা উপন্যাসকে চিত্র-নাট্যে রূপান্তরিত করা যে কত কঠিন তা' পূর্ব্বেই বলেছি। রঙ্গালয়ে অভিনীত জনপ্রিয় নাটককে 'চিত্র-নাট্য' ক'রে তোলা আরও শক্ত। কারণ, 'ষ্টেজের' প্রভাব বড্ড বেশী রকম এসে পড়ে সে নাটকের মধ্যে। এই সব নাটক, উপন্যাস বা গল্পকে চিত্র-নাট্যে রূপান্তরিত ক'রতে হ'লে আগে চার পাঁচবার সেইটি পড়ে নিয়ে তারপর স্মৃতি থেকে 'চিত্র-নাট্য' লেখবার চেষ্টা করা উচিত। তাহ'লে লেখকের কল্পনা-শক্তি অনেকখানি বাধা-মুক্ত হয়ে কাজ ক'রতে পারবে। রঙ্গমঞ্চের রঙীন আবহাওয়া এবং উপকথার অলীক মোহের আবেষ্টন থেকে আত্মরক্ষা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে কেবলমাত্র আখ্যান-বস্তুটুকু বেছে নিয়ে তাকে ঠিক নবরচিত গল্প বা কাহিনী মনে ক'রে তার চিত্র-নাট্য সুরু করা; কারণ প্রত্যেক চিত্র-নাট্যেরই প্রধান উপকরণ হচ্ছে ওই গল্প বা আখ্যান-বস্তু।

চিত্র-নাট্য রচয়িতাদের মনে রাখা উচিত যে তাঁদের কাজ গল্পকে ছবিতে রূপান্তরিত করা, নাটক রচনা করা নয়। ছবির ভিতর দিয়ে গল্পটিকে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে পারলেই তাঁরা সাফল্য লাভ করবেন। কিন্তু ছবির একটা অসুবিধা হ'চ্ছে, সে পাত্র পাত্রীদের মনোভাব—তাদের উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা বা কল্পনাকে রূপায়িত ক'রে তুলতে পারে না। অথচ গল্পের প্রাণই হ'চ্ছে এই মনো জগতের লীলা-বৈচিত্র্য!

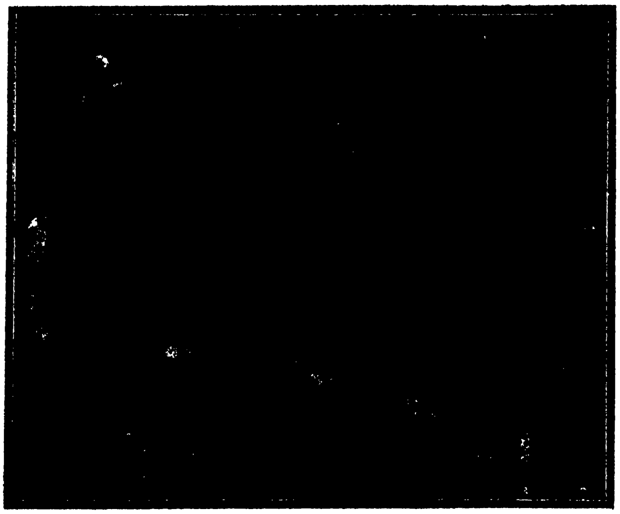
এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—যা ছবিতে এঁকে বোঝানো যায় না, তাকে ছবিতে পরিস্ফুট ক'রে তোলা যাবে কেমন ক'রে? এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন যিনি, চিত্র-নাট্য-রচনায় সিদ্ধিলাভ করা তাঁর পক্ষে সহজ হ'য়ে যাবে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে কারণ ব্যতীত কোনো কার্য্য হয় না। মানুষ যা কিছু করে তার পিছনে একটা চিন্তা বা যুক্তি থাকেই। ক্যামেরার চোখে তার সে চিন্তা বা যুক্তির ছবি ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু তার কাজটা দেখা যায়। তখন তার সেই কাজ দেখে আমরা তার মনের খবর পেতে পারি। অতএব চিত্র-নাট্যে পাত্র পাত্রীদের মনোভাবের পরিচয় দিতে হ'লে রচয়িতাকে নানা ঘটনার (situations) সমাবেশ করতে হবে—যার মধ্যে তাদের কার্য্য-কলাপ ও অভিনয়-ভঙ্গী (Actions) তাদের মনোজগতের চিত্রখানিকেও আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরবে! সুতরাং, মনে রাখতে হবে যে গল্পকে



অকুস্থান (Location) (কোনো একখানি ছবির জন্য এই অনুকূল স্থান-নির্ব্বাচন করে নিয়ে চিত্র-সম্প্রদায় সদলবলে এসে কাজ সুরু করেছে)

ছবি করে তুলতে হ'লে চিত্র-নাট্যের প্রধান অবলম্বন হ'চ্ছে ঘটনার পর ঘটনার ভিতর দিয়ে পাত্র পাত্রীদের নানা কার্য্য-কলাপ দেখিয়ে যাওয়া।

অনেকে হয়ত মনে ক'রতে পারেন যে আজকের এই মুখর চিত্রের যুগে আমরা যখন ছবির মুখে ভাষা দিতে পেরেছি, তখন ছবিতে পাত্র পাত্রীর কার্য্য-কলাপ দেখাবার



আভ্যন্তরীণ দৃশ্যপট (Interior Set) চিত্রগড়ের ভিতর

জন্য ঘটনার বাহুল্য না রেখে, 'কথা' দিয়েই ত কাজ সারতে পারি! অবশ্য, তা যে তাঁরা পারেন না এমন কথা কেউ



মন্দালোক সন্ধান (Soft Focus)

ব'লবে না; কিন্তু এটা ঠিক্, যে তাহলে ছবি কোনো দিনই 'চলচ্চিত্র' হিসাবে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হবে না। কারণ, ছবিকে শুধু কথা কওয়ালেই চলবে না—ছবিকে ঠিক্ ছবি ক'রেও তোলা চাই।

এই ছু'টি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য না রাখার ফলেই—কি বাংলার—কি বোম্বাইয়ের কোনো দেশী ছবিই এদেশে অনেক দিন পর্য্যন্ত দেখবার যোগ্য হ'য়ে উঠতে পারেনি। কেবলমাত্র কয়েকজন নর-নারী ছবিতে উঠে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে এবং পর্দ্দার উপর গল্পের বিষয়টি পাতার পর পাতা অক্ষরে লিখে দেখানো হ'চ্ছে—এই ছিল এত-দিন এদেশে পার্শি কোম্পানীর তোলা বাংলা ছবি! একটা বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে এ দেশের চিত্রানভিজ্ঞ হাজার হাজার দর্শক ভীড় করে গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সে ছবিও দেখেছে; কিন্তু আজ আর সে ছবি দেখে তারা ভুলবে না, হোলিউডের কৃপায় তারা একাধিক ভালো ছবির স্বাদ পেয়েছে—তার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মর্ম্ম গ্রহণ করতে শিখেছে; এখন দেশী ছবি অযোগ্য হ'লে সপ্তাহকালের অধিক আর দর্শক আকর্ষণ করতে পারে না। এটা অতি সুলক্ষণ নিশ্চয়।

এই যে সুদূর আমেরিকার চলচ্চিত্র-গড়ে তোলা অসংখ্য ছবি আজ শুধু বাংলার নগরে নগরেই নয়—পৃথিবীর সকল দেশেই এতটা সমাদর পাচ্ছে, এর কারণ কি? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যে প্রত্যেক ছবিতেই তারা এমন একটি বিশ্ব-মানবের চিত্তাকর্ষক সার্ব্বজনীন গল্প বেছে নিয়ে রূপায়িত ক'রেছে যা সহজেই বিশ্বের নরনারীর অন্তর স্পর্শ ক'রে। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে সাফল্যলাভ করার পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে প্রত্যেক চিত্র-নাট্য-রচয়িতার প্রথম কর্ত্তব্য হ'চ্ছে এমন একটি গল্প তার চিত্র-নাট্যের জন্য বেছে নেওয়া যার মধ্যে একটা universal appeal—বা বিশ্বজনীন আবেদন আছে।

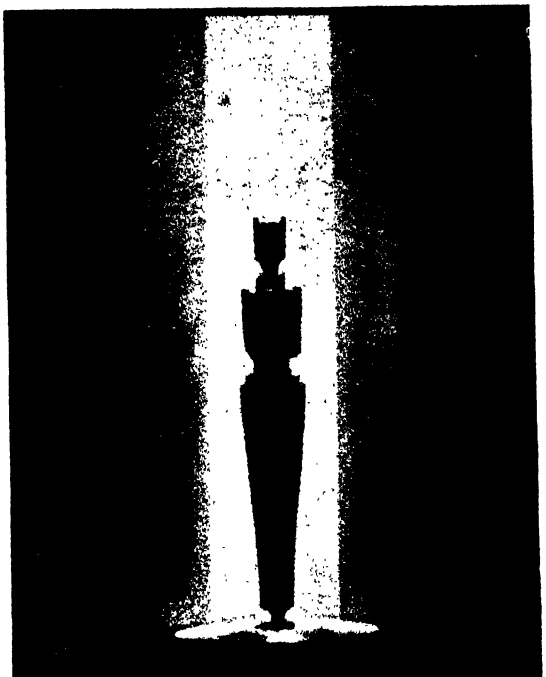
এমন কতকগুলি চিত্ত বৃত্তি আছে যা সকল দেশের সকল জাতির মানব-প্রকৃতির মধ্যে স্বভাবতঃই স্ফূর্ত্তিলাভ করে। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে তার প্রভাব ধনী নির্ধন সভ্য অসভ্য সকল মানুষের উপরই সমভাবে বিস্তৃত দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে যৌন-ধর্ম্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই যৌন-ধর্ম্মের প্রভাবে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে একটা সহজাত

আকর্ষণ অনুভূত হয়, তাই থেকেই তাদের মধ্যে—হয় জঘন্য লালসা-নয়ত প্রগাঢ় প্রেমের উৎপত্তি হ'তে দেখা যায়; এবং তারই ফলে তাদের পরস্পরের প্রাণে একটা মিলনাকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। এই মিলনাকাঙ্ক্ষা তাদের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে। তারা সংসার পাতে, সন্তান-সন্ততি লাভ করে; জীবনে সুখী হয়। কিন্তু, যেখানে এই মিলনে বাধা আছে—তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব আছে—হিংসা বিদ্বেষ আছে—সেখানে বেদনার সৃষ্টি, জীবন দুর্ব্বহ ও দুঃখময়। বাধা দূর করবার জন্য



মধ্যম দূরপট (Medium long Shot—দেবী আইসিসের উপাসনা)

মানুষ অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হয়, জীবন তুচ্ছ ক'রে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রেমের জন্য সে ক'রতে পারে না এমন কাজ নেই! আবার প্রেম যখন অন্তর্হিত হয়, তখন সাজানো সংসার শ্মশান হ'য়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষের জীবনকে তোলপাড় করে দিতে পারে এই প্রেম! সাধুকে শয়তান করে, দস্যুকে দেবতা, কাপুরুষকে বীর—ভীরুকে দুঃসাহসী, অলসকে উদ্যমশীল ক'রে তোলে। অতএব মানব-জীবনে প্রেমের প্রবল প্রাধান্য আমরা স্বীকার করে নিতে বাধ্য। সুতরাং, যে গল্পের ভিত্তি মানবের চিরন্তন যৌন-আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারই ছন্দানুসরণে পুষ্ট ও পরিণত হ'য়ে ওঠে, তার মধ্যে একটা বিশ্বজনীন আবেদন নিহিত থাকেই। এমনিতর আরও কতকগুলি সাধারণ মানব-মনোবৃত্তির সন্ধান রাখা চাই যার সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম অস্বীকার করা যায় না—যেমন জনন-ধর্ম্ম। এর মধ্যে আছে মাতৃত্বের ক্ষুধা, পিতৃত্বের পিপাসা, মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ, সন্তানবাৎসল্য, সোদরপ্রীতি, মাতৃ-ভক্তি, পিতৃভক্তি, পুত্র শোক, কুপুত্রের কৃতঘ্নতা, কন্যাদায়,



দৃশ্যপটের আধুনিক পরিকল্পনা (modern design)

কন্যার বৈধব্য, পুত্র-কন্যার অবাধ্যতা, বিদ্রোহাচরণ, উচ্ছৃঙ্খলতা, অধঃপতন ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও কতক-গুলো ব্যাপার আছে যা সকল মানব-সমাজেই বিদ্যমান বলে মানুষকে সে কাহিনী আকৃষ্ট করে, যেমন—বন্ধুত্ব, দাক্ষিণ্য, অর্হত্ব, আদর্শবাদ, শক্তি বা বীর্য্য, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, উৎসাহ, উদ্যম, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি সৎগুণ, এবং ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, শত্রুতা, পরশ্রীকাতরতা, লালসা, লোভ, দারিদ্র্য, পীড়া,

নেশা, মোহ, উন্মত্ততা, অহঙ্কার, নৃশংসতা, চুরি, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অধর্ম্ম, অন্যায়, ব্যভিচার ইত্যাদি মানবের সনাতন পাপ ও দৌর্ব্বল্য।

এর মধ্যে যে কোনোও একটা ব্যাপারকে গল্পের ভিত্তি (Theme) ক'রে আখ্যানবস্তু (Plot) গড়ে তুলতে পারলে সে ছবি সকল দেশে সমাদৃত হবে। গল্পের এই গঠন-প্রণালীর (Treatment) উপরই কিন্তু ছবির ভালো মন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। গল্পের গঠন-প্রণালী যেখানে যত বেশী স্বাভাবিকতার অনুসরণে বাস্তব ভঙ্গীর অনুগামী হয়, সেখানেই তা' তত নির্দ্দোষ ও পরিপাটি হ'য়ে ওঠে। দ্বন্দ্ব ও জটিলতা গল্পকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলে। বাধা ও বিপদ উত্তীর্ণ হ'য়ে, বন্ধন ও মুক্তির ভিতর দিয়ে চিত্রের নায়ক নায়িকা যখন অগ্রসর হয়, দর্শকের মন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাদের অনুবর্ত্তী হ'য়ে চলে। পর্দ্দার উপর প্রতিফলিত সেই দুটি প্রাণীর সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ ও বেদনা তখন দর্শকদের আপন অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে ওঠে। সে ছবি তারা তন্ময় হ'য়ে দেখে এবং তৃপ্ত হ'য়ে বাড়ী ফেরে। সুতরাং চিত্র-নাট্য-রচয়িতাকে এ কথা মনে রেখে দক্ষতার সঙ্গে লেখনী পরিচালনা ক'রতে হবে। কথা যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। ঘটনার বাহুল্য ও কার্য্যকলাপের প্রাচুর্য্য ছবির পক্ষে দোষ না হ'য়ে বরং গুণই হ'য়ে ওঠে। আলাপ ও বাক্‌চাতুর্য্য (Conversations&Dialogue) উপন্যাসের পক্ষে হয়ত খুব ভালো ; কিন্তু, ছবির পক্ষে তা যথাসাধ্য বর্জ্জন করাই বাঞ্ছনীয়। মুখর ছবিতে বরং একটু আধটু তার স্থান আছে, কিন্তু নীরব ছবিতে তা একেবারেই অচল। নেহাৎ যেখানে কথা দিয়ে কিছু বোঝাবার প্রয়োজন অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠবে সেখানে সামান্য একটু পরিচয়লিপি (Titles) দেওয়া যেতে পারে।



দূরপট (Long Shot) (ধীবর ও দৈত্য)

গল্পের ঘটনাগুলির স্থানকাল সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। দেড়'শো বছর আগের কলিকাতা সহরের কোনো ঘটনা যদি দেখানো দরকার হয়, তাহ'লে মনে রাখতে হবে তখন এ শহরে ইলেক্‌ট্রিক আলো ত' দূরের কথা গ্যাসের আলোও ছিল না। মটোর কার্ তো দূরের কথা ঘোড়ার ট্রামও ছিল না। হাবড়ার পুল তখনও হয়নি, হাবড়া ষ্টেশনেরও অস্তিত্ব ছিল না। গঙ্গায় ষ্টীমল্যাঞ্চ্ দেখা দেয়নি। উইল্‌সন্ হোটেল, মনুমেণ্ট্, জেনারেল পোষ্ট অফিস, হাইকোর্ট, মিউজিয়ম্, পরেশনাথের মন্দির এ সব ছিল না। তখনকার দিনের পোষাক পরিচ্ছদ আজকের দিনের সাজসজ্জার সঙ্গে মেলে না। এ ছাড়া, গল্পের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘট্‌ছে তারও একটা সময়ের পারম্পর্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। একই লোককে একই সময়ে যাতে দিল্লী ও বোম্বাই শহরে দেখতে না পাওয়া যায় সে বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। দিল্লী থেকে বোম্বাই যেতে হ'লে যে সময়টুকুর ব্যবধান থাকা দরকার সেটুকু দিতে যেন ভুল না হয়। এমন কি উপর থেকে নীচেয় আসবার বা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাবার জন্য যে

সময়টুকু লাগে তারও হিসাব মনে রাখা চাই। 'মিশ্রণ' এবং 'ক্রমবিকাশ' 'ও ক্রমবিনাশের' সাহায্যে চিত্রে এই সময় নির্দ্দেশ করা যায়। তা'ছাড়া এইমাত্র একটা কাজে যাকে বাড়ীর বাইরে যেতে দেখা গেলো, পরক্ষণেই তাকে আবার যেন ড্রয়িংরুমে দেখতে না পাওয়া যায়। এ বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

চিত্র-নাট্যে নায়ক নায়িকা ছাড়া আর যে কটি চরিত্র থাক্‌বে তারা যেন কেউ অবান্তর না হয়। গল্পটিকে গ'ড়ে



শিস্‌পট (Reflection) (আয়নায় প্রতিবিম্ব)

তোলবার জন্ম যে কজন লোক একেবারে না হ'লে নয়, তার চেয়ে আর একটিও অনাবশ্যক চরিত্র বাড়ানো উচিত নয়। পূর্ব্বেই বলেছি গল্পের একটি চুম্বক (Synopsis) এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি চরিত্রলিপি (hart) বা পাত্র-পাত্রীর পরিচয় (List of characters) লিখে তারপর গল্পটিকে গড়ে তুলতে হবে তার প্রত্যেক দৃশ্যের খুঁটিনাটি বর্ণনা (Details) দিয়ে। এই বর্ণনা থেকে পরে চিত্র-নাট্য প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু তার আগে গল্পের প্রত্যেক দৃশ্যের প্রত্যেক ছবির (Shots) এক একটি ধারা (Sequences) বিভাগ ক'রে ফেলা দরকার। ধারা বিভাগ করবার নিয়ম হ'চ্ছে, একই স্থানে একই সময়ের মধ্যে ঠিক পরপর যে-সব ঘটনা ঘটে সেগুলিকে গল্পাংশের এক একটি ধারা হিসাবে একত্র করা; অর্থাৎ তার মধ্যে আর স্থানকালের পরিবর্ত্তন বা ব্যবধান থাকবে না। স্থানকালের পরিবর্ত্তন ঘটলেই তখন আবার সে দৃশ্য-



শিস্‌পট (Glass Shot) (নকল জলের ছায়া)

গুলিকে দ্বিতীয় ধারার ছবি ব'লে ধরতে হবে। "বর্ষকালপরে" কিম্বা "তারপর দেখতে দেখতে পাঁচটি বৎসর কেটে গেছে!" এই ধরণের পরিচয়-লিপি ব্যবহার হ'লেই, তারপর থেকে দ্বিতীয় ধারার ছবি (Shots) একত্র করা হয়। যে ছবিতে সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও স্থান-কালের পরিবর্ত্তন ঘটেনা, সেখানে ছবির ধারা-বিভাগ

ক'রতে হয় গল্পের চিত্তাকর্ষক অংশের শেষে ছেদ দিয়ে। অর্থাৎ গল্পের যে যে অংশ স্বল্প পরাকাষ্ঠায় (minor climax) পৌঁছেচে সেই সেই স্থানে বিরামকাল নির্দ্দেশ করে। আর ছবিতে গল্পের রস যেখানে পূর্ণমাত্রায় জমে উঠেছে তাকে বলে—Climax ! অর্থাৎ চিত্রকথার পরম পরাকাষ্ঠা।

যদিও 'চিত্র-নাট্য' অবলম্বনে পরিচালক নিজের ব্যবহারের জন্য একখানি 'ছবির নক্সা' (Shooting



মন্দালোক সন্ধান (Soft Focus)
(কৃত্রিম কুজ্ঝটিকার জন্য)

Script বা Scenario plan) তৈরি ক'রে নেন, তবু, চিত্র-নাট্য-রচয়িতাকে এমন ভাবে গল্পটি সাজিয়ে লিখতে হবে যেন পরিচালক একটি নিরেট্ মূর্খ, এ বিষয়ে তিনি একেবারে কিছুই জানেন না ! ছবিখানির কোথায় কি ক'রতে হবে, কখন কোন্‌খানে ক্যামেরা বা ছায়াধর যন্ত্র কি ভাবে কাজ করবে, কোন্ দৃশ্যে কি আলোক থাকা চাই, কি সঙ্গৎ (Music) কোন্‌খানে বাজাতে হবে। দৃশ্যপট (Set) কোথায় কেমনতর হবে। অভিনয় (Action) কোনখানে কী ভাবে হওয়া উচিত। পাত্র-পাত্রীরা কোথায় কি বেশে (costume) দেখা দেবে। কোন্ কোন্ দৃশ্যের পটভূমিকায় (back-ground)—পুরোভূমিকায় (Fore-ground) মধ্যাংশে (centre) কি কি সরঞ্জাম (Properties) থাকবে তা' নির্দ্দেশ করে দেবে। ছবিতে প্রত্যেক চরিত্রটির কার্য্যকলাপ (Business) চিত্রনাট্যে উল্লেখ করা চাই। কোন্ দৃশ্যের কি রকম পট (Shots) কতক্ষণ এবং কতখানি নেওয়া হবে, কি ভাবে সে ছবি নেওয়া সুরু হবে—এবং কি ভাবে শেষ হবে, পরের দৃশ্যে কেমন করে গিয়ে পৌঁছতে হবে, এ সমস্তই চিত্র-নাট্যকারকে লিখে দিতে হবে। অর্থাৎ চিত্রনাট্যখানি হওয়া চাই একেবারে ছবির কোষ্ঠি-পত্র !

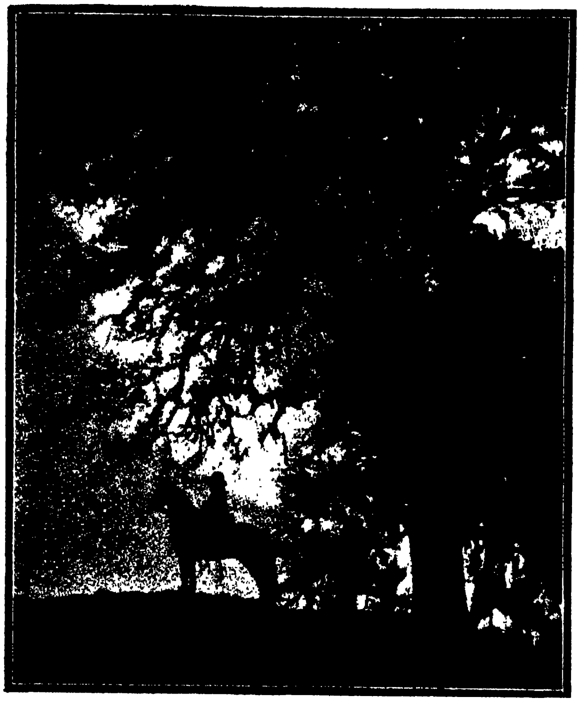
সুতরাং সুপরিচালককে যেমন চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সব কিছু ব্যাপারেই অভিজ্ঞ হ'তে হয়, চিত্রনাট্য-রচয়িতারও সেইরূপ চলচ্চিত্রের সকল বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া দরকার, বিশেষতঃ ছায়াধর যন্ত্রের ব্যবহার তাঁর ভালোরকমই জানা থাকা চাই। প্রথমতঃ কোন্ দৃশ্যের কতদূর থেকে ছবি নিলে দর্শকদের চোখে দেখতে বেশ ভালো হয় এবং তার নাটকীয় রস নিবিড় হ'য়ে ওঠে, ও গূঢ় অর্থ পরিস্ফুট ক'রে তোলা যায় সেটি জানা ও শিক্ষা করা দরকার। আজ পর্য্যন্ত দৃশ্যপট থেকে ছায়াধর যন্ত্রের দূরত্বের সাতটি বিভিন্ন অবস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে ; যথা—

১। **Long-Shot**—দূর পট, অর্থাৎ, অভিনেয় দৃশ্যটির যতটা সম্পূর্ণ ছবি নেওয়া যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ছায়াধর যন্ত্রটি যথাসম্ভব দূরে রেখে ছবি তোলা।

২। **Medium Long-Shot**—মধ্যম দূরপট, অর্থাৎ ছায়াধর যন্ত্রটিকে আরও একটু কাছে এনে অভিনেয় দৃশ্যটির কতক অংশের বা জনকতক অভিনেতৃর সম্পূর্ণ ছবি তোলা।

৩। **Meduim Mid-Shot**—মধ্যম-অর্দ্ধপট, অর্থাৎ

ছায়াধর যন্ত্রটিকে দ্বিতীয় অবস্থানের চেয়ে আরও একটু কাছে সরিয়ে এনে কেবলমাত্র একজন কোনো অভিনেতার বা দৃশ্যপটের



ছায়াপট (Silhouette)

একটা কোনো বিশেষ সরঞ্জামের তিন-চতুর্থাংশ ছবি।

৪। Mid-Shot—অর্দ্ধপট, অর্থাৎ ছায়াধরযন্ত্রটিকে তৃতীয় অবস্থানের চেয়ে আরও কাছে সরিয়ে এনে কোনো দৃশ্যের বা অভিনেতার অপেক্ষাকৃত বড়ো বা অর্দ্ধাংশ ছবি তোলা।

৫। Medium Close-up—মধ্যম নিকট পট, অর্থাৎ, অভিনেতৃদের মাথা থেকে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ছবি নেওয়া, কাজেই ছায়াধর যন্ত্রকে আরও কাছে সরিয়ে আনতে হয়।

৬। Close-up—নিকট পট, অর্থাৎ ছায়াধর যন্ত্রকে খুব কাছে এগিয়ে এনে কেবলমাত্র মুখখানির ছবি তোলা।

৭। Big Close-up—বৃহত্তর পট, অর্থাৎ,—কেবলমাত্র চোখদুটি, বা একটিমাত্র চোখ, অথবা শুধু অধরপুট বা করপদ্ম বা চরণকমলের পর্দ্দা জোড়া প্রকাণ্ড ছবি।

কেবলমাত্র মুখখানি বা চোখ দুটির ছবি ব'লছি বলে এমন যেন কেউ না মনে করেন যে নট-নটী ভিন্ন অন্য কোনো



ছায়া-কায়া (Silhoutte)

কিছুর ছবি এ-ভাবে নেওয়া চলবে না। বোঝবার সুবিধা হবে বলেই আমি মানুষের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছি, মানুষ,



চিত্রারূঢ় চিত্র (Superimpose)
মাঝের জাহাজখানির Soft Focusএ ছবি তুলে তার উপর পূর্ণ ফোকাসে সামনের দুখানি জাহাজের ছবি নেওয়া হয়েছে

জীবজন্তু, তৈজসপত্র, আস্‌বাব, সরঞ্জাম সব কিছুরই প্রয়োজন মত 'নিকট পট' (Close-up) ও বৃহত্তরপট—(Big Close:up) নেওয়া যেতে পারে—যেমন একগ্লাস জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে দেখাবার জন্য জলপূর্ণ গেলাসের কেবলমাত্র কানার সীমানায় জলের সঙ্গে বিষের ধীর-সংমিশ্রণ দেখানো যেতে পারে। কোনো সংবাদপত্রের একটি বিশেষ সংবাদের প্রতি বা কোনো চিঠির একটি বিশেষ শব্দের দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার আবশ্যক হ'লে এই 'নিকট পট' ও 'বৃহত্তর পট' কাজে



স্থিত-চিত্র (Still Photo)

লাগে! কাণের দুলের একটি মুক্তা—হাতের আংটির একটি অক্ষরকেও ছবিতে এইভাবে তোলা চলে।

ছায়াধর যন্ত্রের এই সব নির্দ্দেশ চিত্রনাট্যে কি ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সেটা চিত্রনাট্যের গল্পের ও ঘটনাবলীর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যেমন, ধরুন যদি এমন একটি গল্পের চিত্রনাট্য লিখতে সুরু করে থাকেন যার গোড়াতেই আছে' এক দরিদ্র গৃহের বধূ,—তাহ'লে দারিদ্র্যের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্য সে দৃশ্যপট বা রঙ্গস্থল (Set) হওয়া উচিত—রন্ধনশালা, কারণ, এইখানেই মানুষের প্রধান অভাব তাকে পীড়া দেয়! অতএব আরম্ভ করা যেতে পারে :—

Fade-in (ক্রমবিকাশ) প্রথম দৃশ্য—দূরপট—(long-shot) রন্ধনশালা, দ্বার বন্ধ দেখা যাচ্ছে!—এইখানে গল্পের গঠন (Treatment) অনুযায়ী



শিস্‌ পট (Glass Shot)

রন্ধনশালার বর্ণনা দিতে হবে—যেমন উনুন নিভে গেছে। কাঠ নেই, কয়লা নেই, হাঁড়িতে চাল বাড়ন্ত, তেল নুণও ফুরিয়েছে। তরিতরকারীর একান্ত অভাব! একটা বেরাল কেঁদে বেড়াচ্ছে। এ-পাত্র ও-পাত্র উঁটকে খেতে

যাচ্ছে, দেখে সবই শূন্য!—(এখানে একটা শূন্য ভাঁড়ের নিকট পট (close-up) দেওয়া চলে!) এমন সময় দ্বার ঠেলে খুলে সে ঘরে বধূর প্রবেশ। তারপর, মধ্যম দূরপট—(Medium long-shot)—দ্বিতীয় দৃশ্য,—রন্ধনশালার অভ্যন্তরে বধূর আগমন। বধূর কার্য্য-কলাপ (Action) বর্ণনা করবার জন্য এখানে (Business) বা 'অভিনয় নির্দ্দেশ' থাকা চাই! যথা:—বধূ ধীর মন্থরপদে রান্নাঘরে ঢুকে উনান ও ভাঁড়ারের অবস্থা দেখে হতাশ হ'য়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললে। এটা ওটা নেড়ে-চেড়ে দেখে ক্ষুণ্নমনে ও অবসন্ন পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় একটা ছোট চুপ্‌ড়ি ঘরের মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলে,—বধূর ছিন্নমলিন বেশ, হাতে দু'গাছি গালার রুলি এবং কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ না থাকলে—বিধবা ব'লেই মনে হ'ত!



অর্দ্ধ-পট (Mid-Shot)

প্রথম দৃশ্যের শেষ ও দ্বিতীয় দৃশ্যের সুরু কি ভাবে হবে কিছু লেখা নেই। কাজেই পরিচালক এখানে ছায়াধর-যন্ত্রীকে (Camera-man) নির্দ্দেশ কর'বেন—'Cut' অর্থাৎ 'ছেদ'। কোনো কোনো চিত্রনাট্য-রচয়িতা—যে যে দৃশ্যের যেখানে 'ছেদ' হবে তা উল্লেখ ক'রে দেন, উল্লেখ করাটাই ভালো, কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি—পরিচালকের উপর নির্ভর করা চিত্রনাট্য-রচয়িতার পক্ষে নিষেধ!

তারপর ধরুন গল্পে আছে, বধূ রন্ধনশালা থেকে চুপড়ি হাতে বেরিয়ে খিড়কীর পুকুরে গেল কলমীশাক তুলতে; চিত্রনাট্যে লিখতে হবে—Third scene—বাগানের পথ— Medium long-shot Trucking forward to—খিড়কীর পুকুর। তৃতীয় দৃশ্য—রন্ধনশালা থেকে বেরিয়ে বধূ চলেছে বাগানের পথ দিয়ে—খিড়কীর পুকুরের দিকে (মধ্যম দূরপট) আমবাগান পার হয়ে পেয়ারাতলা ঘুরে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে সুপুরী গাছের সারির ভিতর দিয়ে বধূ চলেছে (Truck-shot—অনুধাবন পট) খিড়কীর পুকুরে।

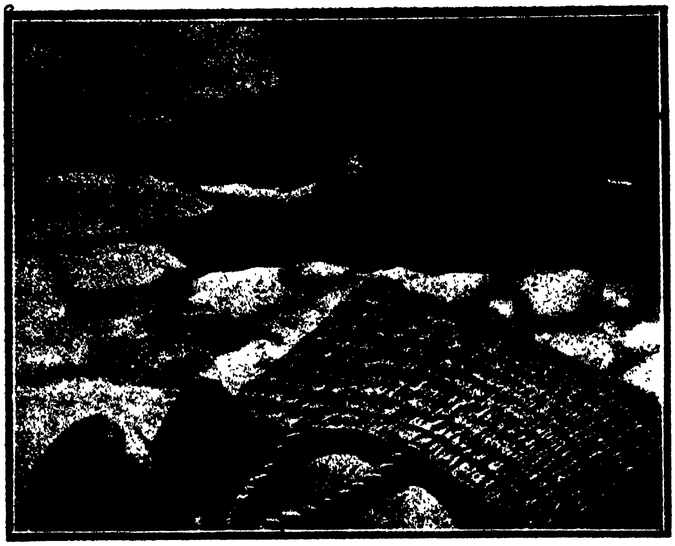
চতুর্থ দৃশ্য—খিড়কীর পুকুরঘাটে বধূ এসে পৌচেছে—সমস্ত পুকুরটার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে কলমীশাক আছে কিনা;—চিত্রনাট্যে লিখতে হবে Truck-shot leads বধূ to scene IV—খিড়কীর পুকুর, বধূ ঘাটে দাঁড়িয়ে—



মধ্যম-অর্দ্ধ পট (Medium Mid-Shot)

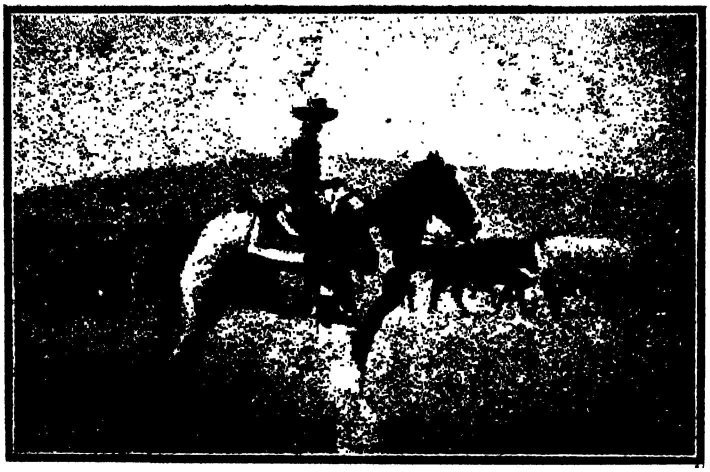
medium long-shot (মধ্যম দূরপট) mix to (মিশ্রণ) পঞ্চম দৃশ্য—খিড়কীর পুকুর, দূরপট (long-shot) বধ

দেখছে আশে পাশে চেয়ে কল্মীশাক আছে কিনা—(পর্য্যবেক্ষণ পট) (Panoram) পুকুরের এক কোণে চারটি কলমীশাক দেখা গেল—(মধ্যম নিকট-পট)—(medium close-up) বধূ সন্তর্পণে জলে নামছে সেই



মধ্যম নিকট-পট (Medium Close-up)

শাক্ তুলতে ; শ্যাওলায় পিছলে তার পা হড়কে যাচ্ছে—(নিকট-পট) (close-up) বধূ পুকুরে নেমে শাক তুলতে হেঁট হ'য়ে হাত বাড়ালো—দূরপট (long-shot)



পর্য্যবেক্ষণ-পট (Panoram)

পা' পিছলে জলে পড়ে গেলো—দূরপট (long-shot) বধূ জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে—(Iris in—বৃতি মুক্তি,) বাঁচবার জন্ত বধূর প্রাণান্ত চেষ্টা (নিকট পট) বধূ ডুবে গেলো ! (বৃতিরোধ—Iris out)—এই যে দৃশ্যগুলি পরের পর তোলা হ'লো—একে বিভাগ করবার সময় একই ঘটনার একই দৃশ্যের বিভিন্ন চিত্রগুলিকে এক একটি ধারায় (Sequence) বিভক্ত করতে হবে। এর মধ্যে আরও দুটি বিভাগ আছে—আভ্যন্তরীণ দৃশ্য (Interior scene) যেমন রান্নাঘর এবং বহির্দৃশ্য (Exterior scene) যেমন বাগান ও খিড়কীর পুকুর। চিত্রনাট্যের প্রত্যেক দৃশ্যে ঘটনাস্থল সম্বন্ধে এ বিভাগেরও উল্লেখ থাকা চাই। ছায়াধর-যন্ত্রের দূরত্বের পরিমাপ বা অবস্থা নির্দ্দেশপূর্ব্বক চিত্রনাট্য রচনা ক'রতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য সম্পর্কে আরও যে সব মন্তব্য যে যে অবস্থায় লেখা প্রয়োজন হয় এখানে সেগুলির বিশেষ সংজ্ঞা (Technical Terms) একত্র করে দিলুম—

বাঁকা পট (Angle-shot)—

অর্থাৎ যে ছবি সাম্নে দিক থেকে না তুলে একটু ট্যারচা ভাবে বাঁকা দিক থেকে বা কোণাকোণি তোলা হয়।

অস্থির পট Akeley shot)—

অর্থাৎ যে ছবিতে দ্রুত-গতিশীল বা বেগবান কোনো কিছুর—যেমন চলন্ত ট্রেন, মটোর গাড়ী বা যে ছুটচে তার ছায়া-ছবিকে দর্শকের দৃষ্টির বাইরে যেতে না দিয়ে ক্রমাগত শুধু সে ছবির পট-ভূমিকা দূরে সরে সরে যাচ্ছে দেখানো হয়। Akeley নামে একজন শিল্পী এই ধরণের ছবি তোলার এই কৌশল প্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন ব'লে তাঁর নামেই এর নামকরণ হ'য়েছে। এঁর নামের 'একলী ক্যামেরা'ও প্রসিদ্ধ।

ছেদ (Cut)—একই দৃশ্যের ভিন্ন ভিন্ন ছবি নেবার সময় প্রত্যেক ছবির পর যে ছেদ্ পড়ে তাকে বলে Cut। ছবির রকম যেখানে বদলে যায় সেইখানে ছায়াবাহন (Film) কেটে দ্বিতীয় ছবির সুরু হচ্ছে যে অংশে সেইখানে লাগিয়ে দেওয়া হয়। আবার রঙ্গস্থলে পরিচালকরাও অনেকেই ছবি তোলা বন্ধ রাখবার নির্দ্দেশ দেবার সময় এই 'cut' শব্দ ব্যবহার করেন। এবং ছবি তোলবার ইঙ্গিত করেন তাঁরা 'Camera' এই শব্দ উচ্চারণ করে।

সন্নিবেশ (Insert)—চিঠি, টেলিগ্রাম, সংবাদপত্রের খবর, বিজ্ঞাপন, উইল, দলিল, ইত্যাদির আলোক-চিত্র পৃথক তুলে নিয়ে পরে চলচ্চিত্রের মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশ করা।

বৃতিমুক্তি (Iris in)—অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত ক্রমশ চক্রাকারে প্রসারিত ও বিবর্দ্ধিত হ'য়ে প্রদর্শনীয় চিত্রখানিকে পর্দ্দার উপর মুক্ত ক'রে ধরে।

বৃতিরোধ (Iris-out)—অর্থাৎ উক্ত চক্রাকারে প্রসারিত ও বিবর্দ্ধিত বৃত্ত ক্রমশ সংহত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে এসে প্রদর্শনীয় চিত্রখানিকে দর্শকদের দৃষ্টিপথ থেকে রোধ করে।

বৃতি-বিকাশ (Iris-View)—চক্রাকার বৃতি- বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শনীয় চিত্রের পূর্ণ-বিকাশ। ঠিক্ গোল ফ্রেমে আঁটা ছবির মত।

সংযুক্ত পট (Composite shot)—অর্থাৎ একই ছায়া বাহনের উপর একাধিক চিত্র তোলা অথবা কোনো বিশেষ দৃশ্যের এক সঙ্গে তিনদিকের ছবি নেওয়া)

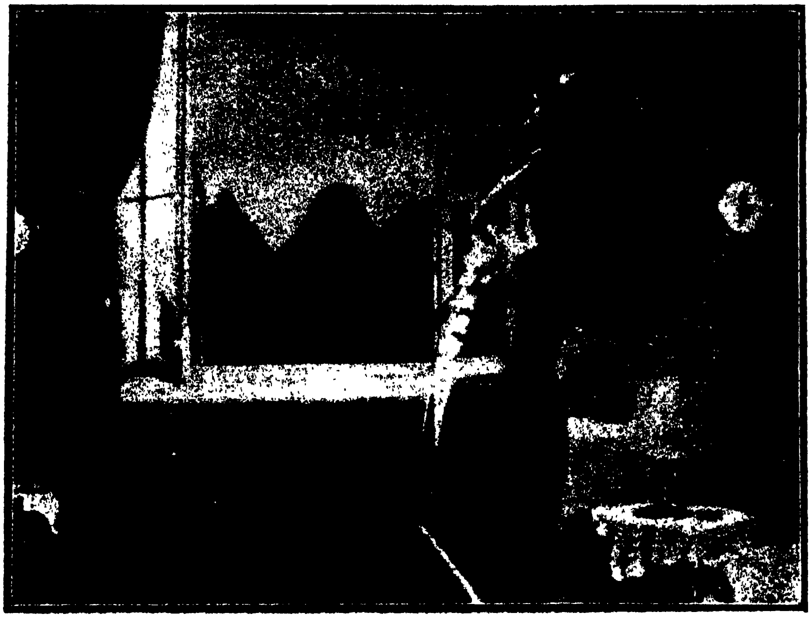
বিলয় (Dissolve)—একখানি ছবি পর্দ্দার বুকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতর থেকে আর একখানি ছবি ফুটে ওঠা।



অনুধাবন-পট (Truck Shot)

মিশ্রণ (Mix)—দু'খানি ছবির পরস্পরের মধ্যে মিশিয়ে এক হওয়া। এটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঘটে, কিন্তু 'বিলয়' ছায়াধর-যন্ত্রেই হয়।

অন্তর্লোপ (Lap-dissolve)—অর্থাৎ দ্বিতীয় ছবিখানি পর্দার উপর সম্পূর্ণ ফুটে ওঠবার পর প্রথম ছবিখানি ক্রমশঃ ছোট হ'য়ে তার কোলে মিলিয়ে যাওয়া।



ছিদ্র পট (Mask Shot)
(জানালার ফাঁক দিয়ে বাহিরের দৃশ্য তোলা হয়েছে)



কারু-চিত্র (Art Film) এই ছবির পটভূমিকা আগাগোড়াই শিল্পীর কল্পনালোকের, স্বাভাবিক নয়

ক্রম-বিকাশ (Fade-in)—শূন্য পর্দার উপর ক্রমশ একখানি ছবি ফুটে ওঠা। এটা প্রায়ই ছবির ধারা (Sequence) পরিবর্ত্তনের মুখে সময় জ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার হয়। ক্রমবিকাশের গতি তিন রকম—সহজ ক্রমবিকাশ, দ্রুত-ক্রমবিকাশ, মন্থর ক্রমবিকাশ।

ক্রমবিনাশ (Fade-out)—ঠিক্ ক্রমবিকাশের বিপরীত। ক্রমশঃ ছবিখানি পর্দার উপর থেকে সরে গিয়ে পর্দা শূন্য হয়ে যায়। এরও তিন রকম গতি—সহজ, দ্রুত ও মন্থর।

আলোক-সন্ধান (Focus)—একটা কিছু লক্ষ্য ক'রে সমস্ত আলো তারই উপর একত্রে নিক্ষেপ করা। ছায়াধর-যন্ত্রের আলো ছায়ার সন্ধানকেও 'ফোকাস্' করা বলে।

চমক পট (Flash shot)—দীর্ঘ চলচ্চিত্রের মধ্যে একআধবার এক টুক্‌রো ছায়া-বাহন কয়েকটা মাত্র ছবি নিয়ে

হঠাৎ পর্দ্দার উপর চমক্ দিয়ে যায়, নায়ক নায়িকার মনে কোনো অতীত সুখ বা দুঃখের স্মৃতিটুকু অকস্মাৎ জাগাতে! আলোক-সম্পাতের ব্যাপারেও এই 'ফ্ল্যাশ্' ব্যবহার হয়; সেখানে এর অর্থ হ'চ্ছে অন্ধকারের মধ্যে কোন কিছুকে হঠাৎ আলো ফেলে দীপ্ত ক'রে তোলা।

শিস্-পট (Reflection or Glass-shot)—অর্থাৎ যেখানে দৃশ্যপটের (Set) অর্দ্ধেকটা তৈরি ক'রে নিয়ে বাকীটা আয়নার সাহায্যে সম্পূর্ণ করে তুলে ছবি নেওয়া হয়। অথবা ছবির সঙ্গে অভিনেতৃদের মুকুরে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বও তোলা হয়।

অকু-স্থান (Location)—চিত্রের বহির্দৃশ্য তোলবার উপযোগী যে অনুকূল স্থান নির্ব্বাচন করে নেওয়া হয় তা কে বলে—'লোকেশান্'।

ছিদ্র-পট (Mask-shot)—অর্থাৎ বিশেষ কোনো একটা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ছবিখানি দেখতে পাওয়া। যেমন ধরুণ দরজার চাবী-কলের ফুটো দিয়ে, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যুগ্মনলের ভিতর দিয়ে, ঘরের নর্দ্দমার ফাঁক দিয়ে, জানালার ভাঙা সার্শীর ভিতর দিয়ে, দেওয়ালের ঘুলঘুলির ফুটো দিয়ে ইত্যাদি। ক্যামেরা মুখে প্রয়োজনীয় ছিদ্রের আকারে একটি মুখোস কেটে লাগিয়ে দিয়ে এই রকম ছবি তোলা হয় ব'লে এর নাম—'মাস্ক্ শট্'।

পর্য্যবেক্ষণ-পট (Panoram)—অর্থাৎ যখন কোনো স্থিতমূলের উপর কেবলমাত্র ছায়াধর যন্ত্রটিই উপর নীচের বা ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে কোনো ছবি তোলে—যেমন ধরুণ যদি একটি মেয়ের দুটি আলতাপরা পা থেকে ক্রমে ক্রমে তার মাথার খোঁপাটি পর্য্যন্ত ছবিতে দেখাবার দরকার হয়—তাহ'লে স্থিতমূলের (Fixed base) উপর মাত্র ছায়ধর-যন্ত্রটি নড়বে ধীরে ধীরে নীচ থেকে উপরের দিকে। একে ব'লে 'ঊর্দ্ধ-পর্য্যবেক্ষণ' (Panoram up !) এই-রকম নিম্ন-পর্য্যবেক্ষণ (Panoram down) এবং বামে ও দক্ষিণে পার্শ্ব-পর্য্যবেক্ষণ (Panoram Right or Panoram left) পট তোলা হয়। এর আবার ত্রিবিধ গতির পার্থক্য আছে—দ্রুত, মধ্যম ও মন্থর। ছায়াধর যন্ত্রীকে ডেকে চিত্র নাট্যের প্রয়োজনমত পরিচালক হাঁকেন—"Quick Panoram down !"—দ্রুত-নিম্ন পর্য্যবেক্ষণ! ইত্যাদি।



প্রতীক (Symbol)

(রুষ দেশে বসন্তকালে শ্বেত ভাল্লুক দেখা যায় খুব বেশী তাই বসন্তের আবির্ভাব বোঝাবার জন্য এখানে শ্বেত ভল্লুকের প্রতীক্ ব্যবহার করা হয়েছে)

দোলন পট (Rocking shot)—আগে ছায়াধর যন্ত্রটিকে ঢুলিয়ে এই দোলনপট নেওয়া হ'তো, আজকাল আর তা হয়না; এখন ছায়াধর যন্ত্রকে স্থির রেখে সমস্ত দৃশ্যপটটি ঢুলিয়ে এই দোলনপট তোলা হয়। সমুদ্রের ঢেউয়ে ঝড়ের দোলা লাগা জাহাজের কামরার ভিতরের ছবি ইত্যাদি নেবার সময় এই দোলোন-পট নিতে হয়—এতে ঝড় তুফানের রূপটা চিত্রে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে!

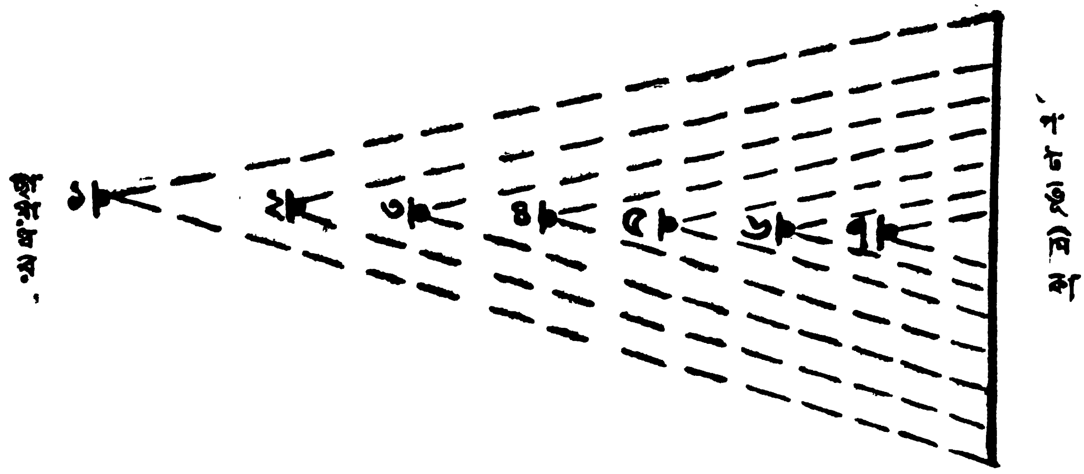
চিত্র-ধারা (Sequence)—একই সময়ে সংঘটিত একই দৃশ্যাভিনয়ের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন চিত্র নেওয়া হয়—সেগুলিকে এক একটি পৃথক ধারা হিসাবে গণ্য করা হয়।

চিত্রনাট্য (Scenario)—চলচ্চিত্রের গল্পটি ছায়াধর যন্ত্রের সম্মুখে যে ভাবে অভিনীত হবে তারই একটি সম্পূর্ণ বিবরণীকে বলে চিত্রনাট্য।

সংক্ষিপ্তসার (Synopsis)—গল্পের চুম্বককে বলে সিনপ্‌সিস্‌।

গল্পের কাঠামো (Treatment)—গল্পের চুম্বক থেকে গল্পটির চিত্রনাট্য হিসাবে কতটা সম্ভাবনা আছে দেখাবার জন্য তার একটি রস-বিশ্লেষণমূলক আদরা গড়ে তোলা।

ছবির নক্সা (Shooting Script or Scenario-Plan)—চিত্রনাট্য থেকে পরিচালক তাঁর কাজের সুবিধার জন্য যে খস্‌ড়ায় দৃশ্যপট ও দৃশ্যাভিনয়ের শ্রেণী-



দূরত্ব সঙ্কেত (Distance Denomination) (দৃশ্যাভিনয়ে ছায়াধর-যন্ত্র পটভূমিকার কতটা দূর হ'তে ছবি নেবে তারই সঙ্কেত)

১ দূর-পট ২ মধ্যম দূর-পট ৩ মধ্যম অর্দ্ধপট ৪ অর্দ্ধপট ৫ মধ্যম নিকট পট ৬ নিকট পট ৭ বৃহত্তর পট

দৃশ্যাভিনয় (Scene)—চলচ্চিত্রে 'সীন' ব'লতে দৃশ্যপট বোঝায় না, 'দৃশ্যাভিনয়' বোঝায়। কিন্তু অনেকেই ভুল করে দৃশ্যপটকে (Set) 'সীন' বলে উল্লেখ করেন। চলচ্চিত্রে গল্পের যে যে অংশ ছায়াধর যন্ত্রের সম্মুখে অভিনীত হয় তাকেই বলে 'সীন্' অর্থাৎ দৃশ্যাভিনয়। এবং 'দৃশ্যপট'কে বলে 'সেট্'।

বিভাগ, ধারা নিরূপণ, বর্ণনা, সংখ্যা, ও সময় নির্দ্দেশ, পট-নির্ঘণ্ট, আলোক-বিধি ও ছায়াধর যন্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে সব কিছু সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করে নেন।

পটগ্রহণ (Taking or Shooting)—ছবি তোলাকে বলে।

পট (Shot)—দৃশ্যাভিনয়ের অংশ বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড চিত্র।

অনুধাবন পট (Truck Shot)—চলমান বা গতিশীল কোনো ব্যাপারের অনুধাবন করতে করতে ছায়াধর-যন্ত্র যে সচল ছবি তোলে। এরও গতি তিন রকম—দ্রুত, মধ্যম, মন্থর! ধরণও একাধিক, যেমন সম্মুখ বা পশ্চাৎ অনুধাবন—Forward or backward Trucking.

চিত্রারূঢ় পট (Superimpose)—অর্থাৎ এক খানি ছবির উপর আর একখানি ছবি নেওয়া। যেমন—চিত্রের উপরই চিত্র-পরিচয় ছাপা (double exposure)

চিত্র পরিচয় (Titles)—ছবির পরিচয় ও ব্যাখ্যা। চিত্র পরিচয় দুরকম—'শ্রেষ্ঠ পরিচয় (Grand Title) ক্ষুদ্র পরিচয় (Sub-Title) 'শ্রেষ্ঠ পরিচয়' হচ্ছে ছবির ভাবোদ্দীপক রসের সংজ্ঞা, 'ক্ষুদ্র পরিচয়' হ'চ্ছে তিনরকম—কথোপকথন, বিষয়-বর্ণনা, সময়-নির্দেশ।

সঙ্কর পট (Vignette Shot)—একই ছবির এক অংশ স্পষ্ট, অন্য অংশ অস্পষ্ট!—ছায়াধর-যন্ত্রের ব্যবহার-কৌশলে আলো-ছায়ার তারতম্য সৃষ্টি করে এই সঙ্কর পট নেওয়া হয়।

পটচ্ছেদ (Vignetting)—দৃশ্যপট বা চিত্রাভিনেতাদের ছবির খানিকটা বাদ দিয়ে খানিকটা রাখা। যেমন ধরুণ একটি মেয়ে ঝোপের মধ্যে একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিতে ঝোপ উড়িয়ে দিয়ে, গাছের মাথাটাও খানিকটা বাদ দিয়ে শুধু দেখানো হ'ল গুঁড়িতে হেলান দিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে।

মন্দালোক সন্ধান (Soft Focus)—যে চিত্র ছায়াধর যন্ত্রের রকমারি ঠুলির (Focus disc or Gauze Cover) ভিতর দিয়ে তোলা হয়—একটা মৃদুল পেলব রহস্যময় ঝাপ্সা ধরণের ছবি নেবার জন্য।

মন্থর পট (Slow Shot)—এ ছবি নেওয়া হয় ছায়াধর-যন্ত্রের হাতল প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়ে, অর্থাৎ যেখানে মিনিটে ২৪খানি ছবি নেবার কথা সেখানে হয়ত মিনিটে ১৪৪ খানি ছবি নেওয়া হ'লো কিন্তু পর্দ্দায় ফেলে দেখাবার সময় প্রদর্শক-যন্ত্রে মিনিটে ২৪ খানির বেশী ছবি না দেখালেই ছবির দৃশ্যাভিনয়ের গতি মন্থর হ'য়ে যাবে।

স্থিত-চিত্র (Still Photograph)—চলচ্চিত্রের কোনো দৃশ্যের সাধারণ আলোক-চিত্র।

প্রতীক (Symbol)—চিত্রনাট্যের নায়ক নায়িকার মনের অবস্থা বা তাদের আসন্ন ভবিষ্যৎ বা বিপদের সূচনার ইঙ্গিত দেবার জন্য প্রকৃতি বা পশু-পক্ষীর দৃষ্টান্ত দিয়ে জীবনের প্রতিকূল বা অনুকূল অবস্থার আভাস দেওয়া।

ছায়া পট বা ছায়া-কায়া (Silhouette)—অর্থাৎ মৃদু আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যে নরনারী বা পশু-পক্ষীর কেবলমাত্র ছায়া-মূর্ত্তিটী দেখা'ন।

চিত্রনাট্যের রচয়িতাকে এই সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশগুলির প্রত্যেকটি কথা মনে রেখে ছবিতে কোথায় কোন্‌টি কি ভাবে ব্যবহার হ'লে ছবিখানি অধিকতর সুন্দর ও মনোজ্ঞ হবে তা সবিশেষ বিবেচনা ক'রে তবে ব্যবহার করতে হয়। পূর্ব্বেই বলেছি ছবিতে 'চিত্র পরিচয়' যত কম ব্যবহার করা হয় ততই ভালো। যেখানে ব্যাপারটা ছবিতেই বোঝানো চলবে—সেখানে 'কথা দিয়ে' কখনই তা বোঝাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। যেখানে 'কথা' ব্যবহার করতেই হবে সেখানে 'চিত্রপরিচয়' যত ছোট হয় ততই ভালো। ছোট হলেও কিন্তু, লক্ষ্য রাখতে হবে যে তার রচনাভঙ্গী সাহিত্য রসের ও ভাব-ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে যেন একটুও নিকৃষ্ট না হয়! ধরুন, গল্পে আছে কোনো নায়ক মনের দুঃখে সংসার ত্যাগ করে কাশীবাস করতে গেলেন,—এখানে চিত্র-পরিচয়ে যদি শুধু দেওয়া হয়—তখন তিনি কাশী গেলেন—তারপর ছবিতে যদি কাশীর 'পর্য্যবেক্ষণপট' দেওয়া হয় তাহ'লে জিনিসটা অতি তুচ্ছ হ'য়ে যায়! কিন্তু সেখানে চিত্র-পরিচয়ে যদি দেওয়া হয়—"তখন তিনি কাশী গেলেন—ভারতের প্রাচীনতম পুণ্যতীর্থ বারাণসী—কত দেবর্ষি, রাজর্ষি, সাধুসজ্জনের সাধনভূমি, পতিতপাবনী গঙ্গার পূত-তরঙ্গ-বিধৌত শ্রীভগবান বিশ্বনাথের অনন্ত শান্তি-নিকেতন বারাণসী—তাপিত প্রাণ যাঁর কোলে আশ্রয় পেয়ে জুড়িয়ে যায়—তারপর যদি কাশীর 'পর্য্যবেক্ষণ পট' দেখানো হয় ছবিখানির মর্য্যাদা অনেক বেড়ে যাবে। এমনি করে সবদিক ভেবে বিবেচনা ক'রে তবে চিত্র-পরিচয় লিখতে হয়। 'সম্ম চিত্রপরিচয়' পড়ে যাতে ছবির ঘটনার দিকে দর্শকের আগ্রহ আরও বেড়ে ওঠে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

গ্রাম-দেবতা

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গ্রামের ঠিক মাঝখানে বাবা রুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মন্দিরটি বহুকালের পুরাতন এবং সম্প্রতি সংস্কার অভাবে জরাজীর্ণ। চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনের সময় আগে না কি খুব ঘটা করিয়া পূজা হইত; পূজা এখনও হয় কিন্তু আগেকার মত সে জাঁকজমক আর নাই।

নাই বলিয়া যে কাহারও বিশেষ ক্ষোভ আছে তাহা নয়, তবে মন্দিরটির সংস্কারের জন্য গ্রামের লোক প্রায় প্রতি বৎসরই একবার করিয়া চেষ্টা করে। গাজনের আগে ষোলো আনার একটি মজলিস ডাকা হয়। মন্দিরের সুমুখে প্রকাণ্ড বটগাছটির তলায় জনকতক লোক আসিয়া বসে। কেহ হয় ত এই বলিয়া কথাটা প্রথমে উত্থাপন করে যে, মন্দিরের উপরে অশ্বত্থের গাছটি দিনে-দিনে যেরূপভাবে বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয়, যেন আর বছর কয়েকের মধ্যেই মন্দিরটিকে সে ফাটাইয়া চৌচির করিয়া দিবে, সুতরাং অচিরে ইহার একটা প্রতিবিধান আবশ্যক।

সকলেই একবাক্যে তাহার সমর্থন করে।

শম্ভু বলে, 'তা ঠিক। এই শালা অশ্বত্থগাছ এমন পাজি যে, দালানের ওপর হ'লে আর তার রক্ষে নেই। সালানপুরের বাবুদের বাড়ীটা দেখেছ ত?'

রতন বলে, 'ও শালাদের নাম আর মুখে এনো না। শালারা নিজেদের অমন সুন্দর বাড়ীঘর ছেড়ে দিয়ে কি না বাস করলো গিয়ে কলকাতায়। দালান ফাটবে না ত' কি হবে? আজকাল দিনের বেলা ওখানে শেয়াল ডাকে, তা জানো?'

'আর ওই জাম্‌জুড়ি যেতে বাঁহাতি সেই গাঁটা ঢুকতে—'

কথাটা আর-একজন লুফিয়া লয়। বলে, 'হাঁ, সেই পাথরের মন্দিরটা! গেছে একেবারে ফেটে চৌচির হ'য়ে।'

এমনি করিয়া এ-কথা সে-কথা হইতে হইতে কথার ধারাটা চলিয়া যায় অন্য দিকে। কে একজন বলিয়া ওঠে,

'গাছে তাহ'লে পাথরও ফাটিয়া দেয়। কি বল, এ্যাঁ?'

শম্ভু বলিল, 'পাথর পুড়ে, তা জানো?'

অবিনাশ বিশ্বাস করিল না। বলিল,—'হ্যাঁ গো! তাই আবার পুড়ে!'

শম্ভু বলিয়া উঠিল, 'এ শালা কোথাকার মুখ্খু হে! চল্ তোকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। রাণীগঞ্জের একটা কয়লা-খাদে আগুন লেগেছে। আমি সেদিন স্বচক্ষে দেখে এলাম—পাথর পুড়ছে—একেবারে রাঙা টক্‌টকে হয়ে।'

'সব্বনাশ! পাথরেও আগুন লাগছে। তবে আর বহ্মাগ্নি-দেবকে এত ভয় করি কেনে। যে ঝড়ঝড়ে' বাতাস! গাঁয়ের ও-মুড়োয় লাগলে একেবারে এ-মুড়োয় এসে থামবে।'

বছর-দুই আগে গ্রামে একবার আগুন লাগিয়া অনেকের অনেক কিছু ক্ষতি হইয়া গেছে, সেই অবধি আগুনের নামে সকলেই অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া ওঠে।

রামাই বলিল, 'ওরে থাম্। আগুনের নাম করিস না। বলি হাঁ হে রাখহরি, বহ্মার পুজো হয়েছে এ-বছর?'

রাখহরি বলিল, 'কই আর হ'লো? বিনোদের বাড়ী একসের চাল চাইতে গেলাম, তা সে কিছুতেই দিলে না, বললে, 'তুমিই এখন চালিয়ে নাওগে ঠাকুর, তারপর দোবো।' আমিও রেগে বললাম, তবে রইলো তোমাদের পুজো।'

এই লইয়া বচসা সুরু হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত মন্দির সংস্কারের ব্যবস্থা আর কিছুই হইল না।

এম্‌নি করিয়া বছরের পর বছর কাটিয়াছে।

মন্দিরের উপরে অশ্বত্থগাছ প্রথমে ছিল একটি। এখন হইয়াছে তিনটি। চার বৎসর আগে একটুখানি চিড় খাইয়াছিল, এখন দেখা যায়, মন্দিরের পূর্ব্বদিকের ফাটলের মুখে একটা মানুষ অনায়াসে পার হইয়া যাইতে পারে।

মন্দিরটি সারাইতে হইলে এখন যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ গ্রামের লোকের কাছে চাঁদা করিয়া পাইবার উপায় নাই, কাজেই বর্ত্তমানে সকলেই একরকম হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে। কেহ কোনোদিন সে সম্বন্ধে কোনও কথা

উত্থাপন করিলে বলে, 'বাবার ব্যবস্থা বাবা নিজেই ক'রে নেবেন দেখো।'

কিছুদিন পরে দৈবাৎ একটা উপায় মিলিয়া গেল।

রাখহরির বৃদ্ধ পিতাকে বাবা রুদ্রেশ্বর না কি এক দিন স্বপ্নে বলিয়াছেন, 'মন্দিরে বাস করিতে তাঁহার আর ইচ্ছা নাই। সর্ব্বত্যাগী ভিখারী দেবতার মনে না কি গাছের নীচে বাস করিবার সাধ জাগিয়াছে।'

কথাটা মনে ধরিয়াছে সকলেরই। কারণ এত বড় জাগ্রত দেবতা, যাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার বহু দৃষ্টান্ত তাহারা বহুবার পাইয়াছে, ইচ্ছা করিলে মন্দিরের উপরের সামান্য তিনটি অশ্বত্থের গাছ তিনি বহুপূর্ব্বেই সমূলে বিনাশ করিয়া দিতে পারিতেন। তাহা যখন তিনি দেন নাই, তখন তাঁহার গাছতলায় বাসের ইচ্ছা সম্বন্ধে আর কাহারও কোনোরূপ সন্দেহ প্রকাশ করা অনুচিত।

কাজেই মন্দির সংস্কারের কোনও কথাই আজকাল আর ওঠে না। ভিন্ন গ্রামের আত্মীয় কুটুম্ব কেহ কাহারও গ্রামে আসিয়া মন্দিরের কথা যদি উত্থাপন করে ত' তাহাকে ওই স্বপ্নের কথাটা বলিয়া দেওয়া হয়।

বলে, 'বাবার আচ্ছা আজগুবি খেয়াল যা-হোক্! ব্যাটা ভিখিরী কি না!'

কিন্তু গ্রামের লোক বিশ্বাস করিলেও, বাহিরের যাহারা, স্বপ্নের কথাটা সব সময় তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না।

তখন বাবা রুদ্রেশ্বরের নামে বহুকালের প্রচলিত বহু অলৌকিক কীর্ত্তিকাহিনীর কথা একে-একে উঠিতে থাকে।

এমন জাগ্রত দেবতা না কি এ-জেলায় আর কোথাও কেহ কখনও দেখে নাই।

যথা—

কদমের ফুল বাবা বড় ভালবাসেন। গাজনের দিন অন্ততঃ একটি কদমের ফুল তাঁহার চাই-ই। অথচ বর্ষা না নামিলে কদমগাছে ফুল কখনও ফোটে না।

কিন্তু বাগ্‌দি-পাড়ার সেই বড় খেল্‌-কদমের গাছটায় একটি ফুল সেদিন অন্ততঃ ফুটিবেই।

চৈত্র-সংক্রান্তির আগের দিন উপবাসী ভক্তের দল স্নান করিয়া ঢাক-ঢোল বাজাইয়া কদমগাছটিকে জাগাইয়া আসে এবং তাহার পরের দিন প্রভাতে ঠিক তেমনি ঘটা করিয়া তাহারা গাছের তলায় গিয়া দেখে, অত বড় গাছটার কোথাও না কোথাও একটি কদমের ফুল ঠিক ফুটিয়া আছে!

বাবার মাহাত্ম্য নয় ত' কী!

গাজনের দিনে ভক্তের দল আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, কাঁট্‌কারি গাছের কাঁটার উপর গড়াগড়ি দেয়, ধারালো লোহার শিক্ দিয়া হাত ফোঁড়ে পা ফোঁড়ে, কেহ-বা হাঁ করিয়া জিবের মাঝখান দিয়া শিকটা এ-ফোঁড়্ ও-ফোঁড়্ করিয়া ফেলে, আর মূল দেয়াসীর ত' কথাই নাই! সে নিজে যে-সব অত্যদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসে, দেখিলে চোখ বুজিতে হয়, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে, মনে হয় বুঝি-বা ব্যাটা মরিল বলিয়া!

কিন্তু কাহারও কিছুই হয় না। পরের দিন দেখা যায়—দিব্য সুস্থ শরীরে গ্রামের মধ্যে তাহারা সকলেই ঘোরা-ফেরা করিতেছে।

কেহ বলে, 'আমাদের বাপ ঠাকুর্দার আমলে যে-সব ব্যাপার হ'তো এখন ত' তার কিছুই নেই।'

'আগে ত' আর লোকে এত পাপ করতো না। এখন যার যা খুশী সে তাই করছে। এখন আর অত সইবে কেন?'

'আর সেই বাণেশ্বর!'

হাঁ, বাণেশ্বরের গল্প! সে এক অদ্ভুত ব্যাপার।

লম্বা একটা কাঠের পাটাতনের উপর সারি সারি অসংখ্য ধারালো লোহার গজাল বসানো।—ইহাই বাণেশ্বর। অতটা আর উচ্চারণ করিতে হয় না; লোকে তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছে—বাণ্!

আগে ওই বাণের উপর মূল ভক্ত নিজে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িত, আর তাহাকেই সকলে ধরাধরি করিয়া কাঁধে তুলিয়া পুকুরে লইয়া যাইত স্নান করাইতে। সে বৎসর চণ্ডে বাউরি বাণে শুইয়া স্নান করিতে যায়। কিন্তু ব্যাটা বজ্জাত-বাট্‌পাড়ের একশেষ। বাণে শোওয়া তাহার সহিবে কেন? পিঠের ঘা তাহার আর শুকাইল না। বছর ঘুরিতে না ঘুরিতেই সে মরিয়া গেল। এখন আর সে বাণে কেহ শোয় না। মানুষের বদলে ধারালো গজালের মাথায় গোটাকতক কাঁচা আম ফুঁড়িয়া দিয়া বাণ্‌টিকে তাহারা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া স্নান করাইয়া লইয়া আসে।

এই বাণ্ লইয়া সে-বছর একটা ভারি মজার ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

বাণের গায়ে সিঁদুর মাখাইয়া আম ফুঁড়িয়া ভক্তের দল নূতন পুকুরে লইয়া গিয়াছে স্নান করাইতে। ঘাটের কাছে পাড়ের উপর তখন ঢাক-ঢোল কাঁশর ঘণ্টা বাজিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার—বাণটিকে ধরাধরি করিয়া এক-বুক জলে লইয়া গিয়া যেই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া, আর তৎক্ষণাৎ ভীষণ গর্জ্জনে পুকুরের জলটাকে একেবারে তোলপাড়্ করিয়া দিয়া পাক্ খাইতে খাইতে সকলের চোখের সুমুখে সোঁ করিয়া সশব্দে গভীর জলে বাণ্ যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, কেহ আর তাহাকে ধরিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ সকলে ব্যাকুল হইয়া বাবার নাম করিতে করিতে সাঁতার কাটিয়া ডুবিয়া ডুবিয়া পুকুরের এদিক-ওদিক তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজাখুঁজি করিল, কিন্তু তাহাকে আর পাওয়া গেল না। অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে আসিয়া বাবার কাছে গড়াগড়ি দিয়া পড়িল। নূতন বাণ্ সেইদিনই তৈরি হইল বটে, কিন্তু সে রকমটি আর হইল না। ভীষণ কোনও অমঙ্গল আশঙ্কায় গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা জোড়হস্তে বাবার মন্দিরচত্বরে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মূল দেয়াসী সেইদিনই গভীর রাত্রে স্বপ্নে দেখিল, দীর্ঘ জটাজূটধারী নরকঙ্কালবিভূষিত শূলপাণি রুদ্রেশ্বর আসিয়া তাহার শিয়রে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'বাণের মাথায় চুরি-করা আম দিয়াছিলি, সেইজন্যই বাণ্ তোদের হাত হইতে চলিয়া গেছে।'

পরদিন অনুসন্ধান করিয়া জানিল, সত্যই তাই। রসিক স্যাক্‌রার গাছের আমগুলা বেশ বড় বড় হইয়াছিল বলিয়া বাণে দিবার জন্য লখু বাউরি গোটাকতক চুরি করিয়া আনিয়াছিল।

সে জীবন্ত জাগ্রত বাণেশ্বরকে গ্রামের লোক এখনও মাঝে-মাঝে দেখিতে পায়। পাড়ার মেয়েরা আগে যখন-তখন কলসী কাঁখে লইয়া নূতন-পুকুরে জল আনিতে যাইত। এখন আর একা সে পুকুরের ত্রিসীমানায় কাহারও যাইবার উপায় নাই। সে বছর গ্রামে একবার মারীভয় হয়। ওই নূতন পুকুরের পাশ দিয়াই শ্মশানে যাইবার পথ। শ্মশানযাত্রীর দল শবদেহ কাঁধে লইয়া যতবার ওই পুকুরের পাশ দিয়া পার হইয়াছে, বাণেশ্বরের ভীষণ গর্জ্জন ততবারই তাহারা স্বকর্ণে শুনিয়াছে এবং ওই পুকুরের পাড়ে সমবেত হইয়া গ্রামের লোক বাণেশ্বরের পূজা যতদিন করে নাই, 'ওলাউঠা' এবং 'মায়ের কৃপা' ততদিন পর্য্যন্ত গ্রামের উপর দিয়া সমানে চলিয়াছে।

অমাবস্যা রবিবারের গভীর রাত্রে এখনও যদি কেহ সাহস করিয়া নূতন পুকুরের পাড়ে গিয়া দাঁড়াইতে পারে ত' কালো একটা মহিষের পিঠের মত বাণেশ্বরকে সে জলের উপর দেখিতে পায়।

'আরে, আমাদের স্বচক্ষে দেখা বটগাছটার কথা বল না হে!'

স্বচক্ষে-দেখা বটগাছের গল্প সুরু হয়।

বাবা রুদ্রেশ্বরের ওই মন্দিরের সুমুখে পুরাকালে কে কবে না জানি একটি বটগাছ পুঁতিয়াছিল। শাখাপ্রশাখ বিস্তার করিয়া নাবাল্ নামাইয়া সেই গাছ দিনে-দিনে বড় হইয়া ওঠে। শেষে এত বড় হয় যে, বাবার কাছে ছাগবলির জন্য হাড়িকাঠ পুতিবার জায়গা আর হয় না! অতি কষ্টে ডালপালাগুলা সরাইয়া দড়ি দিয়া টানিয়া ধরিয়া জায়গা যদি বা হয়, ত' বলি করিতে গিয়া হন্তারকের হাতের খাঁড়া বটের ডালে গিয়া লাগে। এবং এই অসুবিধার জন্য বলির একটি ছাগল সে-বৎসর দু' চোট্ হইতে হইতে রহিয়া গেছে। হন্তারকের কব্জির জোর ছিল বলিয়াই রক্ষা, তাহা না হইলে সর্ব্বনাশের আর বাকি কিছু থাকিত না।

এখন উপায়?

বটগাছের গোটা-দুই-তিন ডাল কাটিয়া ফেলিবার যুক্তি-পরামর্শ চলিতে লাগিল।

কিন্তু কাটে কে?

কুড়ুল চালানো দূরে থাক্, বাবার গাছের কেহ একটি পাতা ছিঁড়িতে চায় না!

নিরুপায় হইয়া গ্রামের লোক তখন বাবার কাছে ধর্ণা দিয়া পড়িল।—'যাহোক্ একটা উপায় তুমি নিজেই করো বাবা!'

অবাক্ কাণ্ড! বেশি দিন নয়; মাত্র দশটি দিন পরের কথা। পূজা গিয়াছে চৈত্রের সংক্রান্তির দিন, আর ঘটনাটা ঘটিয়াছে বৈশাখের দশোই। অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত্রি তখন গ্রামের উপর থম্ থম্ করিতেছে। শেয়ালগুলা

যে ক'বার ডাকিয়া গেছে কে জানে। হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর শব্দে সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শব্দটা যে কিসের, তাহাই জানিবার জন্য দু'একজন বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই! কেহ আর বাড়ীর বাহির হইতে পারিল না। মনে হইল যেন শান্ত সমাহিত সুখসুপ্ত বৈশাখ-নিশীথিনী অকস্মাৎ কিসের যেন একটা অব্যক্ত বেদনায় তীব্রতম আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর বাহিরে ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ। ঝড়ের উন্মত্ত গর্জ্জন গ্রামের উপর দিয়া তখনও হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। একে চারিদিকে নিরন্ধ্র গভীর অন্ধকার, কোন্ দিক দিয়া যে কি হইতেছে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, তাহার উপর নাকে মুখে ক্রমাগত ধূলা ঢুকিয়া নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম! যাহারা বাহির হইয়াছিল, ভয়ে-ভয়ে তাহারা আবার ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল। মাটির ঘরের খোড়ো চালা ঝড়ের দাপটে মচ্ মচ্ করিতে লাগিল। বৈশাখ মাস, ঘরে নূতন খড় তখনও সকলের চাপানো হয় নাই, ঘরের চাল উড়িয়া যাইবার ভয়ে বাবা রুদ্রেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া জোড়হস্তে বসিয়া বসিয়াই সকলে রাত্রি কাটাইল।

প্রভাতে দেখা গেল, প্রতিদিনের মত শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামপ্রান্তে নীলাঞ্জনবর্ণ তরুশ্রেণীর মাথার উপরে পূর্ব্বদিক-চক্রবাল উদ্ভাসিত করিয়া সূর্য্যোদয় হইতেছে। বিগত রাত্রির উন্মত্ত ঝঞ্ঝার উপদ্রব দুঃস্বপ্নের মতই অতীত হইয়া গেছে। সমস্ত গ্রামের মধ্যে কোথাও তাহার এতটুকু চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, কোথাও এতটুকু খড়কুটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না, অথচ ভৌতিক কাণ্ডের মত বাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের সুমুখে যে বটগাছটিকে লইয়া গ্রামবাসীর দুর্ভাবনার আর অন্ত ছিল না—শুধু সেই বিরাট বটবৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হইয়া অতিকায় একটা দৈত্যের মত গ্রামের পথ জুড়িয়া পড়িয়া আছে।

এতগুলি প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনার পরেও বাবা রুদ্রেশ্বরকে অবিশ্বাস করিবার মত মন কাহারও নাই।

বয়স্ক নরনারীর কথা না-হয় ছাড়িয়াই দিলাম, গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলা পর্য্যন্ত বাবা রুদ্রেশ্বরের নামে ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া যায়।

মুরলী চক্কোত্তির ছোট ছেলেটা তাহার মামার বাড়ীতে সেদিন ষষ্ঠী অপেরা পার্টির যাত্রা শুনিয়া আসিয়া ছেলেদের মজলিসে তাহারই গল্প করিতেছিল। বলিল, 'মাইরি বলছি, এমন সুন্দর যাত্রা তোরা কখনও শুনিস্‌নি। সন্ধ্যেবেলায় আরম্ভ করে' একেবারে সকাল করে' দিলে।'

হেটো বলিয়া আর-একটা ছেলে তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল! উহাদের যাত্রা সে তাহার দিদির শ্বশুরবাড়ীতে একবার শুনিয়া আসিয়াছে সুতরাং সন্ধ্যায় আরম্ভ করিয়া সকাল করিয়া দেওয়ার কথাটা মিথ্যা। সন্ধ্যায় জুড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল রাত্রি একটা বাজিতে না বাজিতে। উহাদের চেয়ে মথুরসা'র যাত্রার দল ঢের ভালো। তাহারা বরং সন্ধ্যায় জুড়িয়া সকাল করিয়া দিতে পারে।

মুরলী চক্কোত্তির ছেলে নারা বলিল, 'তুই শুনিস্‌নি, কেন মিছে কথা বলছিস হেটো, তুই চুপ কর্।'

হেটো বলিল, 'শুনিনি? মাইরি! বাঃ! অমনি বলে' দিলেই হলো কি না! আচ্ছা, দিদি আসুক্ শ্বশুর-বাড়ী থেকে, তারপর শুধিয়ে দেবো, দেখিস্।'

নারার বিশ্বাস, সে মিথ্যা বলিতেছে। বলিল, 'চল্ তুই বাবার মন্দিরে হাত দিয়ে বলবি—চল্।'

হেটো উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'হ্যাঁ—চল্।'

কে একটা ছেলে সাবধান করিয়া দিল। বলিল, 'খবরদার হেটো, মিছে কথা হয় যদি ত' ফেটে যাবি।'

'মিছে কথা নয় যে!' বলিয়া হেটো মন্দিরে হাত দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এবং শেষ পর্য্যন্ত দিলও।

কিন্তু পাঁচ সাত দিন ধরিয়া হেটোর সঙ্গে দেখা হয় আর ছেলেরা বলে, 'কই দেখি হেটো, তোর হাতটা দেখি।' বলিয়া তাহার হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল, মুখ, কান, নাক, বেশ ভাল করিয়া সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখে, সে ফাটিয়াছে কি না।

কিছুতেই যখন সে ফাটিল না তখন সকলে নিশ্চিন্ত হইল।—ষষ্ঠী অপেরা পার্টির যাত্রা শোনার কথা সে মিথ্যা বলে নাই, বলিলে এতদিন সে নিশ্চয়ই ফাটিয়া কাঁকুড়-ফাটা হইয়া যাইত।

বাল্যকাল হইতেই বাবার উপর এম্‌নি তাহাদের অখণ্ড বিশ্বাস !

দেশে সে-বৎসর অনাবৃষ্টি হইল। মাঠ-ঘাট সব শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। পোঁতা ধান বুঝি বা মাঠেই মরিয়া যায় !

গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা উপবাস করিয়া বাবার কাছে গিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িল। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া সকাল হইতে বাবার পূজা চলিতে লাগিল। কল্‌সি কল্‌সি জল আনিয়া বাবার মাথায় ঢালা হইল।

অশিক্ষিত অসহায় দীন দরিদ্র গ্রামবাসী জোড়হস্তে গলবস্ত্র হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল—'বাবা, জল দাও ! জল দাও !'

বৈকালের দিকে পশ্চিমের আকাশ অন্ধকার করিয়া কালো মেঘ দেখা দিল, গুড়্ গুড়্ করিয়া মেঘ ডাকিতে লাগিল, বিদ্যুৎ চমকাইল এবং দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন কত প্রার্থনা যে বাবাকে শুনিতে হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

* *
*

মন্দিরের পশ্চিম দিকের খান-দুই ঘর বাদ দিয়া একটি কুল ও একটি বাতাপী লেবুর গাছওয়ালা অনেক দিনের পুরাতন একখানি বাড়ী। বাড়ীটির অবস্থা ঠিক ওই মন্দিরের মতই জরাজীর্ণ। একতলা ইঁটের দালান। পূর্ব্বপুরুষ কেহ বোধ হয় আরম্ভ করিয়া আর শেষ করিতে পারেন নাই। বাহিরের দিকে ইঁদুরে গর্ত্ত করিয়া বিস্তর মাটি ফেলিয়াছে, ভিতরের দিকের মাটিগুলা বোধ হয় রোজই পরিষ্কার করিয়া বাতাপী লেবুর গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। রোয়াকের সুমুখে ছোট্ট একটুখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঠান, তাহার পরেই আগাছার জঙ্গল। উঠানের ওদিকে বাতাপী, এদিকে কুল,—দুদিকের দুটি গাছের দুইটি ডালে ভিজা কাপড় টাঙাইবার জন্যই বোধ করি লম্বালম্বি লোহার একটি সরু তার আটকানো।

নিতান্ত ছোট্ট সংসার। লোকজন একরকম নাই বলিলেই হয়। বিধবা মা আর একটি চার-পাঁচ বছরের ছোট ছেলে।

ছেলেটি দেখিতে চমৎকার! সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের রং, গোল-গাল নিটোল শরীর, মাথায় কোঁক্‌ড়ানো কালো কালো চুল। বিধবা মায়ের ওই একটিমাত্র সন্তান। আদরে-সোহাগে মানুষ।

মা তাহার বিধবা হইলে কি হয়, অমন সুন্দরী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না—এত রূপ! দাঁড়াইয়া দু'দণ্ড দেখিবার মত চেহারা।

পাড়ার সমবয়েসী মেয়েরা এ-বাড়ী বেড়াইতে আসে। কথায় কথায় হাসি-রহস্য করিয়া বলে, 'বিধবাই যদি হবি ত' ভগবান তোর এত রূপ দিয়েছিল কেন লা নলিনী ?'

নলিনী মৃদু হাসিয়া তাহার মুখের পানে বড় করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। খানিক্ পরে বলে, 'তা কি আর জানে কেউ ?'

কিন্তু জানা অন্ততঃ উচিত।

নলিনীর স্বামী কেদার মুখুজ্যের গর্ব্ব করিবার মত ছিল শুধু তিনখানি নাঙ্গলের জমি আর নিকষ কৌলিন্য। চেহারা ছিল ঠিক যেন কঙ্কাল ; মাথায় বড় বড় চুল, গায়ের রংটা পরিষ্কার, আর গাঁজা না কি তাহার মত এ তল্লাটে কেহই খাইতে পারিত না। কেহ কিছু বলিলে কেদার হাসিত। বলিত, 'কারও কাছে মেগে ভিক্ষে করে' ত' খাই না বাবা, খাই নিজের পয়সায়।'

বিবাহ যে তাহার কোনোদিন হইবে, কেহই তাহা ভাবে নাই। বাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দির তাহার বাড়ীর কাছেই। ওইখানেই ছিল তাহার আড্ডা। আরও অনেককে জুটাইয়া লইয়া প্রায় চব্বিশঘণ্টাই সেইখানে পড়িয়া পড়িয়া গাঁজা টানিত আর ব্যোম্ ব্যোম্ করিত।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল, তাহার এক দূর সম্পর্কের মামা আসিয়া কেদারকে কোথায় লইয়া গেছে। কি জন্য লইয়া গেছে কেহ কিছুই জানিল না।

দিন দশেক পরে কেদার ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিল—একেবারে পাল্‌কী চড়িয়া,—সঙ্গে নলিনীর মত পরমাসুন্দরী এক বৌ লইয়া।

বৌ দেখিয়া সকলেই অবাক্। সবাই কানাকানি

করিতে লাগিল,—'মেয়েটার আচ্ছা কপাল যা হোক্। বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার।'

কিন্তু বলিহারি মেয়ে ওই নলিনী!—যেমন একাগ্র পাতিব্রত্য তাহার, তেম্‌নি অক্লান্ত সেবা!

বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে কেদারের কঙ্কালে মাংস লাগিল, মাথার তেল-চিটে চুলগুলা কাটিয়া যেন মানুষের মত হইল। গাঁজা ছাড়িতে পারিল না, কিন্তু মন্দিরের মজলিস ছাড়িয়া দিল।

নলিনী হাসিয়া বলিত, 'ও-সব তোমাদের তিন-পুরুষের অভ্যেস্ না কি বলছিলে সেদিন, ও ত' আর তাহ'লে সহজে ছাড়তে পারবে না! তা যাই হোক্, ঘরের মধ্যে লুকিয়ে খেয়ো। তোমায় লোকে গাঁজাখোর বললে আমার বড় কষ্ট হয়।'

সেইদিন হইতে কেদার ঘরের মধ্যে লুকাইয়াই গাঁজা খায়। মুখে বলে, 'ছেড়ে দিয়েছি ভাই।'

লোকে তাহা বিশ্বাস করে না। বলে, 'পয়সা না হয় এক-আধটা করে' আমরাও দেবো এবার থেকে। না কি বল হে রঞ্জন!'

রঞ্জন হাত নাড়িয়া বলে, 'থাম্ থাম্! তুই শালা আর কথা বলিস্ না।'

এই লোকটির উপর রঞ্জনের রাগ বহুদিনের। তাহার ধারণা এই নিকুঞ্জর দায়েই কেদার গাঁজা ছাড়িয়াছে। কারণ—নিকুঞ্জ এত কৃপণ যে, গাঁজার জন্য একটি পয়সাও সে কোনোদিন খরচ করে না, অথচ, কলিকাটি একবার হাতে পাইলে হয়, কোঁৎ কোঁৎ করিয়া ধোঁয়া গিলিয়া দম চুরি করিয়া একবারের জায়গায় পাঁচবার টানিয়া লইয়া নিমেষের মধ্যে যত বড় কলিকাই হোক্, পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেয়। এবং ক্রমাগত এ-রকম করিলে বিনা পয়সায় মানুষ আর তাহাকে কত গাঁজা খাওয়াইবে! সুতরাং গাঁজা খাওয়া ছাড়িয়া দেওয়া কেদারের মিথ্যাই হোক্ সত্যই হোক্,—তাহাদের সঙ্গে মজলিস করিয়া গাঁজা খাইয়া রোজ রোজ এত পয়সা খরচ সে যে আর করিবে না, ইহা জানা কথা।

দেখিতে দেখিতে এমন হইল যে, ওই এক রঞ্জনের মত দু'একজন ছাড়া কেদারের কাছে কেহই আর আসে না। স্বার্থের সম্বন্ধও তাহাদের চুকিয়া গেছে।

নলিনী বলে, 'এবার একটি গাই কিনতে হবে।'

কেদার বলে, 'কেন? দুধ খাওয়া কি তোমার অভ্যেস ছিল নাকি?'

নলিনী ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'হ্যাঁগো, দুধ একটুখানি না খেলে আমার আর চল্‌ছে না। তোমার ওই গাঁজা আমাকেও একটান্ করে' দিতে পার?'

কেদার বুঝিল, কথাটা নেহাৎ হাসি রহস্যের কথা। বলিল, 'আমার দুধ খাওয়ার কথা বলছ? দুধ খেয়ে আমার আর কিছু হবে না। শরীরটে একেবারে পেকে ঝুনোট্ হয়ে গেছে।'

'তাহ'লেও খেতে হবে। গাই একটি তুমি দেখ সন্ধান করে।'

কেদার বলিল, 'টাকা! টাকা ত' এখন নেই আমার হাতে।'

নলিনী আর কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল এবং দিন দুই-তিন পরেই দেখা গেল, ঘরে একটি গাই ও তাহার একটি সদ্যপ্রসূত বাছুর আসিয়াছে।

কেদার কিছুই জানিত না। গাই বাছুর দেখিয়া অবাক্ হইয়া নলিনীর মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন করে' এলো?'

নলিনী বলিল, 'অত সব তোমার জেনে দরকার কি বাপু, যেমন করেই হোক্ আনিয়েছি।'

'সেবা করবে কে?'

'কেন আমি কি রাজার মেয়ে না কি যে, একটা গাইয়ের সেবা করতে পারব না!'

কেদার মনের আনন্দে হাত নাড়িয়া গান ধরিল—

'ও গোকুলের গয়লা দিদি, শোনো গো শুনবে যদি,
রাধা সতী কলঙ্কিনী, এ-কথা হায় কে বলিল।'

কেদারের গলা বড় চমৎকার। গান সে বেশ ভালই গায়। হাসিয়া নলিনী তাহার কাছে গিয়া বসিল। বলিল, 'গাইলে ত' সবটুকুই গাও, শুনি।'

গান শেষ হইলে কেদার বলিল, 'কীর্ত্তনের একটা দল করব ভেবেছিলাম, তা আর হ'লো না।'

নলিনী বলিল, 'থাক্, আর কেত্তোনের দল করতে

হবে না। গান গেয়ে মাঝে-মাঝে আমাকে শুনিও. আমি তোমায় বখ্‌শীস্‌ দেবো।'

বলিয়া হাসিয়া সে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

এমনি করিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় দিন তাহাদের বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল। বছর দুই তিন চমৎকার কাটিল।

নলিনীর বয়স তখন আঠারো। ভাদ্রের ভরা নদীর মত রূপ যেন তাহার দুকূল ছাপাইয়া উপ্‌চাইয়া পড়িতেছে!

নলিনী তাহার ছোটখাটো গৃহস্থালীর সমস্ত কাজকর্ম্ম নিজের হাতেই করে, একদণ্ডের জন্যও বসিয়া থাকে না। আর দূরে বসিয়া কেদার তাহার এই অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী বধূর দিকে একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গুন্‌গুন্‌ করিয়া আপন মনেই গান গায়!

সেদিন অমনি চোখোচোখি হইতেই কেদার হাসিয়া ফেলিল।

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'হাসলে কেন বল!'

কেদার বলিল, 'এম্‌নিই।'

'না, কি ভাবছিলে তোমায় বলতে হবে।'

কেদার বড় বিপদে পড়িল। বলিল, 'কি আর ভাবব? ভাবছিলাম, ভগবান তোমায় আমার জন্যে এমন নিখুঁৎ করে' গড়েননি। তুমি রাজরাণী হ'তে পারতে, ভুল করে' আমার কাছে চলে এসেছ।'

নলিনী হাসিয়া বলিল, 'বেশ করেছি।—ত্যাখো, সকালবেলা ঝগড়া কোরো না বলছি, ভাল কাজ হবে না।'

হাসি যেন মুখে তাহার চব্বিশঘণ্টা লাগিয়াই আছে। বলিল, 'টেনেছ ত?'

ঘাড় নাড়িয়া কেদার বলিল, 'হাঁ।'

নলিনী বলিল, 'তাহ'লে ওঠো। বসে থাকলে এখন কত কি ভাববে তার ঠিক নেই, তার চেয়ে—যাও, জেলেদের বাড়ী গিয়ে মাছ নিয়ে এসো।'

কেদার উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'এইবার আমাদের একটি ছেলে হ'লেই—'

'যাঃও!' বলিয়া মুখের কথাটা তাহাকে আর শেষ করিতে না দিয়া সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া নলিনী ঘরে ঢুকিল।

কি কুক্ষণে কথাটা যে কেদার তাহার মুখ দিয়া বাহির করিল কে জানে, সেইদিন হইতে খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে দিবারাত্রি নলিনীর মনে শুধু সেই এক চিন্তা!—এইবার একটি সন্তান হইলে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

ছেলে হইবার বয়স তাহার হইয়াছে। শ্বশুর শাশুড়ী আত্মীয়স্বজন থাকিলে হয় ত এতদিন ছেলে ছেলে করিয়া তাহারা পাগল হইয়া উঠিত, ঠাকুরের কাছে মানৎ করিত, পূজা দিত, কবচ আনিত, মাদুলি আনিত, আরও কত-কি করিত তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু সে-সব তাহার করিবে কে? সুতরাং যাহা কিছু করিবার এখন তাহাকে নিজেকেই করিতে হইবে।

কি আর করিবে, হাতের কাছে বাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দির, সন্ধ্যায় সেদিন সে তাহার আঁচলের তলায় সন্ধ্যা-প্রদীপটি ঢাকিয়া লইয়া প্রতিদিনের মত বাবার মন্দিরে সন্ধ্যা দেখাইতে গিয়া গলায় কাপড় দিয়া হাঁটু গাড়িয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিবার সময় অন্যদিন সে তাহার স্বামীর মঙ্গল কামনা করে, কিন্তু সেদিন তাহার সুপ্তোত্থিত সদ্য-জাগ্রত মাতৃহৃদয় একমাত্র সন্তান কামনা ছাড়া আর কোনও কামনাই করিতে পারিল না। মনে-মনে বলিল, 'সম্বৎসরের মধ্যে আমার কোলে একটি ছেলে দাও ঠাকুর, পুজোর সময় ষোড়শোপচারে পূজা দেবো, তিন দিন ধ'রে মন্দিরে তোমার ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে আরতি করব।'

মনে-মনে নলিনীর খুবই ভরসা ছিল, রুদ্রেশ্বর জাগ্রত দেবতা, প্রতিদিনের ব্যাকুল প্রার্থনা তাঁহার কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, ঘর-আলো-করা রাজপুত্রের মত একটি শিশুসন্তান এইবার তাহার কোল আলো করিয়া দেখা দিবে। কিন্তু নলিনীর দুর্ভাগ্য, মাসের পর মাস পার হইয়া শেষে বৎসর পার হইল, তবু তাহার ছেলে হইবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না।

নলিনীর ইচ্ছা করে, কোনও ঠাকুর-দেবতার কবচ যদি

কেহ তাহাকে আনিয়া দেয় ত' সেটি সে সযত্নে ধারণ করিতে পারে; কোথাও কোনও ঔষধ পাইলেও খায়। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা কাহাকেও সে বলিতে পারে না।

এমনি করিয়া দিন চলিতে চলিতে প্রতিবেশিনী সুশীলা একদিন তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া একটি ভারি মজার খবর দিয়া গেল। বলিয়া গেল, বাবা রুদ্রেশ্বরের পূজার দিন বাগদি-পাড়ার জাগানো কদমের গাছটিতে কদমের যে ফুলটি ধরে, পূজার পর মূল-দেয়াসী সেই ফুলটি লইয়া গ্রামের জমিদারের বাড়ীতে দিয়া আসে; সেই ফুল যদি কেহ মূল-দেয়াসীর কাছ হইতে টাকা দিয়া হোক্ চুরি করিয়া হোক্ লইয়া প্রতিদিন প্রভাতে সেই ফুল-ধোওয়া জল খাইতে পারে ত' বাঁজা মেয়েরও ছেলে হয়।

সেইদিন হইতে নলিনীর মন সেইখানেই পড়িয়া রহিল। মূল-দেয়াসীকে টাকা দিয়া সে ফুল তাহাকে লইতেই হইবে। স্বামীকে বলিবার উপায় নাই। লজ্জা করে। নিজে সে গ্রামের বৌ,—মূল-দেয়াসীকে ফুলের কথা বলিবেই বা কেমন করিয়া? অবশেষে ওই সুশীলাকে দিয়াই বলাইল। দেয়াসীর টাকার দরকার ছিল, বলিবামাত্র রাজিও হইল।

পর বৎসর গাজনের পরে নগদ পাঁচটি টাকা দিয়া বাবা রুদ্রেশ্বরের সেই কদমের ফুলটি লইয়াই নলিনীর ছেলে হইয়াছে।

ছেলে হইয়াছে সত্যই ঠিক রাজপুত্রের মত।—ঘর-আলো-করা, কোল-আলো-করা ছেলে!

ছেলের নাম রাখিল—বিশ্বনাথ। ডাক-নাম—বিশু।

বাবা রুদ্রেশ্বরের পূজার ঘটা দেখিয়া সবাই জানিল, ছেলেটি বাবার দেওয়া। দেবতার দেওয়া ছেলে না হইলে এমন ছেলে কখনও হয় না।

কেদারের যত আনন্দ, নলিনীর তত!

ছেলে কোলে লইয়া কেদার রুদ্রেশ্বরের মন্দির-চত্বরে ছাড়িয়া দেয়। হামাগুড়ি দিয়া বিশু খেলা করিয়া বেড়ায়। পাড়ার লোক আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছেলে দেখে আর তারিফ্ করে। আনন্দে গর্ব্বে কেদারের বুক যেন দশ হাত ফুলিয়া ওঠে। বলে, 'বাবার মন্দিরে যে চব্বিশঘণ্টা পড়ে' থাকি, পড়ে' পড়ে' যে চাপ্রাশির মত পাহারা দিই, তার ত' একটা পুরস্কার আছে!'

সবাই সে-কথা স্বীকার করে। বলে, 'হাঁ তা বটে।'

কিন্তু মানুষের যে কখন কি হয় কিছুই বলিবার জো নাই। এত আদরের ছেলে বিশ্বনাথকে লইয়া আনন্দ করা কেদারের আর বেশি দিন চলিল না। বিশ্বনাথের বয়স তখন মাত্র দু'বৎসর। এমন দিনে কেদার অসুখে পড়িল এবং প্রায় মাসাবধিকাল অসুখে ভুগিয়া হঠাৎ একদিন সে মরিয়া গেল।

মরা বাঁচা মানুষের হাত নয়, কেদার তাহা জানিত এবং জানিত বলিয়াই মরিবার আগে নলিনীকে কাছে ডাকিয়া কেদার তাহার গায়ে হাত দিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিবার মত সান্ত্বনার কোনও বাক্য খুঁজিয়া না পাইয়াই বোধ করি ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল। নলিনীও কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, 'কেঁদো না।'

অতি কষ্টে কেদার বলিল, 'দুঃখ কোরো না নলিনী, আমার আর সময় বোধ হয় নেই। বিশ্বনাথ রইলো।'

তাহার পর স্বল্পালোকিত সেই গৃহপ্রান্তে বাক্যহারা এই দুই বিচ্ছেদকাতর দম্পতির শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধতার মধ্যেই ধীরে-ধীরে কেদারের দুইচক্ষে চিররাত্রি ঘনাইয়া আসিল,—অজানা সে কোন্ অনির্দ্দেশ্য পরপার হইতে মৃত্যু-দেবতার নির্ম্মম হস্ত প্রসারিত হইয়া একজনকে ছিনাইয়া লইয়া গেল।

একাকিনী পড়িয়া রহিল নলিনী আর তাহার শিশুপুত্র বিশ্বনাথ। নলিনীর কাতরতা দেখিয়া সকলেই ভাবিয়াছিল, মেয়েটাও বুঝি আর বাঁচিবে না, কিন্তু দুঃখ যত বড়ই হোক, একমাত্র মানুষেই তাহা সহ্য করিতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, বিশ্বনাথের মুখ চাহিয়া নলিনী বাঁচিয়া আছে।

নিদাঘতপ্ত বৈশাখী মধ্যাহ্নের গুমোট্ গরমে তৃষ্ণার্ত্ত ধরিত্রী যখন হাহাকার করিতে থাকে, নলিনী তখন তাহার বিশ্বনাথকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া স্বামীর দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করে।

বিশ্বনাথ শুধায়, 'মা, বাবা কোথায়?'

নলিনী কোনও জবাব খুঁজিয়া পায় না। নীরবে শুধু সে সজলচক্ষে সুমুখের পানে তাকায়। বাতাপী লেবুর

গাছের ডালে কা কা করিয়া কাক ডাকে, বাবা রুদ্রেশ্বরের বিদীর্ণ মন্দিরের উপর অশ্বত্থের ছোট ছোট ডালপালাগুলির মাঝে বাঁকা ত্রিশূলটি দেখা যায়। নলিনী সেই দিক পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, আর নিপীড়িত অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা তাহার প্রকাশের ভাষার অভাবে অন্তরের মধ্যেই গুমরিয়া গুমরিয়া মরে।—হে বাবা রুদ্রেশ্বর, দুঃখ আমার যত বড়ই হোক্‌, তোমারই দেওয়া বলিয়া তাহা আমি নীরবে সহ্য করিব, কিন্তু তোমার কাছে এ দুঃখিনীর শুধু একটি প্রার্থনা—আমার বিশ্বনাথকে দয়া করিয়া যখন আমার কোলে দিয়াছ তখন তাহাকে তুমি বাঁচাইয়া রাখিও।

বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে বড় হয়। বাবা রুদ্রেশ্বরের দয়ায় রোগব্যাধি তাহার একেবারেই নাই। চাষের চাল বেচিয়া টাকা করিয়া ছেলের জন্য শহর হইতে নলিনী জামা আনায়, কাপড় আনায়, মাথার টুপি কিনিয়া দেয়, জুতা কিনিয়া দেয়, লাট্টু লাটিম্‌ লাটাই ঘুড়ি—ছেলে যখন যাহা চায়, তাহাই কিনিয়া দিতে নলিনী কসুর করে না। বিশ্বনাথ ছুটিয়া ছুটিয়া প্রাঙ্গণের উপর খেলা করিয়া বেড়ায়, মুগ্ধ মৌনদৃষ্টিতে নলিনী সেইদিক পানে তাকাইয়া থাকে। এত আদরের ছেলে তাহার বিশ্বনাথ, কোনও আকাঙ্ক্ষাই তাহার সে অপূর্ণ রাখিবে না। বাবার কৃপায় ছেলে তাহার রাজা হইবে।

তা রাজা হইবার মত ছেলে বটে!

সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর পরে সেই ছেলের হইল অসুখ।

বৈকালে সেদিন খেলা করিয়া আসিয়া বিশ্বনাথ জ্বরে পড়িল।

নলিনীর চোখে আর ঘুম নাই। সারা দিন রাত সে উপবাস করিয়া ছেলের শিয়রে বসিয়া ক্ষণে ক্ষণে গায়ের উত্তাপ অনুভব করিতে লাগিল।

দু'দিন যায়, তিন দিন যায়, জ্বর কিছুতেই আর ছাড়ে না!

দুপুরে রুদ্রেশ্বরের পূজার সময় ছেলের কাছ হইতে চট্‌ করিয়া একবার উঠিয়া নলিনী তাহার দুটি হাত পাতিয়া মন্দিরের দুয়ারে গিয়া দাঁড়ায়। লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়া ঈষৎ ঘোম্‌টা টানিয়া নলিনী বলে, 'পুজোর ফুল দুটি আপনি যদি দয়া করে'—

পূজারী বুড়া মানুষ। বলে, 'আমায় তোমার লজ্জা কি মা, চল আমি নিজেই দিয়ে আসি।'

বলিয়া বৃদ্ধ পূজারী তাহার ঘরে গিয়া বিশ্বনাথের জ্বরতপ্ত রক্তাভ দুটি ঠোঁটের ফাঁকে বাবা রুদ্রেশ্বরের স্নানের জল একটুখানি ঢালিয়া পুষ্পচন্দন মাথায় ঠেকাইয়া দিয়া বলিল, 'কিছু ভয় নেই মা, তোমার রুদ্রেশ্বরের দেওয়া ছেলে, এতেই ও সেরে' উঠবে দেখো।'

প্রতিবেশিনী বর্ষিয়সী মহিলারা ছেলে দেখিতে আসিয়া গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, 'বাবার চানজল আর ফুল বিল্লিপত্তর্‌…এই ওর ওষধ মা, ওকে আর ডাক্তারী-কোব্‌রেজি করিয়ো না।'

নলিনীরও তাহাই বিশ্বাস। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না মা, বাবার দেওয়া ছেলে—বাবাই ভাল করবে।'

বাবার স্নানের জল, ফুল-বিল্বপত্র নিত্য নিয়মিতই চলিতে লাগিল, তবু সে সারে না দেখিয়া মায়ের মন একটুখানি বিচলিত হইবারই কথা।

নলিনী বারে বারে বিশ্বনাথের গায়ে হাত দিয়া দেখে,—গা যেন আগুনের মত গরম। শেষে আর গায়ে হাত না দিয়া নলিনী তাহাকে তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া শুইয়া রহিল।

গা তাহার ঠাণ্ডা আর কিছুতেই হয় না!

ডাক্তার কবিরাজ দেখাইবার কথা নলিনী যে ভাবে নাই তাহা নয়, কিন্তু ভাবিয়াই আবার পরক্ষণে এই কথা তাহার মনে হইয়াছে যে, ডাক্তার কবিরাজের কথা ভাবিয়াছে বলিয়াই হয় ত' বাবা রুদ্রেশ্বর রাগ করিয়াছেন,—হয় ত বা সেইজন্যই বিশ্বনাথ সারিতেছে না।

পরদিন বাবা রুদ্রেশ্বরের বৃদ্ধ পূজারী ছেলেকে স্নানের জল ও ফুল-বিল্বপত্র দিতে আসিয়া দেখিল, নলিনী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। বলিল, 'অত কাতর হ'লে ত' চলবে না মা!'

নলিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। কাঁদিয়া বলিল, 'ছেলে আমার সারবে ত' বাবা?'

বৃদ্ধ পূজারী বলিল, 'বিশ্বাস থাকলেই সারবে মা।

যে-বিশ্বাসে ওকে তুমি পেয়েছ সেই বিশ্বাসেই ও আবার সেরে যাবে দেখো।'

নলিনী বলিল, 'বিশ্বাস ত' আমার আছে বাবা!'

পূজারী বলিল, 'তাহ'লে ওতেই সারবে!

নলিনী আবার সেদিন তাহার রান্নাবান্না ঘরের কাজকর্ম্ম সবই পরিত্যাগ করিল। রোগীর সঙ্গে নিজেও রোগী সাজিয়া উপবাস দিয়া পড়িয়া রহিল। আর সারা দিবারাত্রি শুধু ওই বাবা রুদ্রেশ্বরকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিল, বিধবার ওই প্রথম ও শেষ পুত্র বিশ্বনাথ, তোমারই দেওয়া—তুমিই রক্ষা করিও। আর যদি অমঙ্গল কিছু ঘটে ত' সে-দৃশ্য যেন তাহাকে আর চোখে দেখিতে না হয়।

এমনি করিয়া সারা দিনমান কাটিল, রাত্রি কাটিল, পরদিন পূজারী আসিয়া দেখিয়া গেলেন, ছেলে কিছু ভাল আছে। বলিলেন, 'এইবার সারবে মা, আর কোনও চিন্তা নেই।'

নলিনীর মনে আশা হইল। তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা এইবার বুঝি বাবা রুদ্রেশ্বর স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। সেদিন সে উঠিয়া বসিল। যেমন পারিল, চারটি রান্না করিয়া খাইল। খাইয়া আবার বিশ্বনাথের কাছে গিয়া ডাকিল, 'বিশু!'

বিশু বলিল, 'উঁ!'

নলিনী তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুমা খাইল, তাহার পর আবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া রহিল।

সারাদিনের পর সন্ধ্যা হইল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। বাহিরে অজস্র জ্যোৎস্না। এ কয়দিন বাহিরের এই জ্যোৎস্নালোকিত পুলকিত ধরিত্রীর দিকে তাকাইবার অবসর নলিনীর ছিল না। আজ তাহার ছেলে ভাল আছে, বাবা রুদ্রেশ্বর তাহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন—সেই আনন্দে নলিনী চুপ করিয়া বাহিরের প্রাঙ্গণে নবপত্রপল্লব-সমাচ্ছন্ন বাতাপী লেবুর গাছটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া তাকাইয়া ভাবিতেছিল,—বিশু তাহার বড় হইবে, বড় হইলে তাহার বৌ আসিবে, ছেলে বৌ নাতি নাৎনী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবে···এমনি করিয়া নলিনী যখন তাহার ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্নে বিভোর, এমন সময় বিশু তাহার মাথাটা একবার এপাশ-ওপাশ করিয়া মুখে তাহার কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর শব্দ করিয়া উঠিল। নলিনী চমকিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল, গায়ে-মাথায় হাত দিয়া উত্তাপ অনুভব করিল, কিন্তু তাহার সে ছটফটানি কিছুতেই থামিল না। নলিনী ডাকিল, 'বিশু! বিশ্বনাথ!'

বিশু সাড়া দিল না, গোঁ গোঁ করিয়া মাথাটা তাহার এপাশ-ওপাশ করিয়া অস্থিরভাবে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। গায়ের উত্তাপ যেন কিছু কম বলিয়া মনে হইতেছে। তাহা হইলে জ্বরটা হয় ত' তাহার এইবার ছাড়িবে। নলিনী একমনে রুদ্রেশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অবশেষে রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর! বিশ্বনাথ অনেকক্ষণ হইতেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া আছে। হঠাৎ একবার সে চোখ মেলিয়া তাকাইল এবং বারকতক খাপ্‌চি খাইয়া চোখ দুইটি উল্‌টাইয়া দিল।

বিশ্বনাথ যে এমন করিয়া মরিয়া গেল নলিনী তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। নাকের নিশ্বাস বন্ধ, বুকের স্পন্দন নাই, নিঃসাড় নিস্পন্দ, নিস্তেজ, হিমশীতল আড়ষ্ট মৃতদেহ!

নলিনী ভাবিল, বাবা রুদ্রেশ্বর হয় ত' তাহাকে ছলনা করিতেছেন, ছেলে তাহার এমন করিয়া মরিতে কিছুতেই পারে না, মরিতে তাহাকে সে দিবে না, বাবা রুদ্রেশ্বরের দেওয়া ছেলে বাবাকেই সে ফিরাইয়া দিয়া আসিবে।

এই ভাবিয়া নলিনী তাহার পুত্রের মৃতদেহ অতি কষ্টে কোলে তুলিয়া লইয়া বাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে গিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্না তখন ডুবিয়া গিয়াছে। বিপুল অন্ধকারে বিশ্রাম-নিরত গ্রাম তখন নিস্তব্ধ। উন্মাদিনীর মত নলিনী তাহার মৃত পুত্রটিকে কোল হইতে দরজার কাছে নামাইয়া মন্দির খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল। এবং কোনোদিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অন্ধকারেই বাবা রুদ্রেশ্বরকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া সেইখানেই উপুড় হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রাণান্তকর বেদনায় যে রুদ্ধ অশ্রুরাশি এতক্ষণ তাহার বুকের তলায় গুমরিয়া মরিতেছিল, ছাড়া পাইয়া এইবার যেন তাহা বন্যাবেগে বাহির হইয়া আসিল।—অনাথা এ-বিধবাকে আর বিড়ম্বনা করিও না ঠাকুর, বিশুকে আমার বাঁচাও, তুমি বাঁচাও!

এই বলিয়া সেই পাষাণ দেবতার গায়ে নলিনী বারম্বার তাহার মাথা ঠুকিতে আরম্ভ করিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিয়া সে উঠিয়া বসিল। চৌকাঠের বাহিরে সে তাহার বিশ্বনাথকে শোয়াইয়া রাখিয়াছে। দেখিবার জন্ত বাহিরে আসিতেই দেখিল, বিশ্বনাথ সেখানে নাই। অন্ধকারে হাতড়াইয়া কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। ভাবিল, বাবা রুদ্রেশ্বর এখনও হয় ত' এম্‌নি করিয়াই তাহাকে পরীক্ষা করিতেছেন। এখনই হয় ত বিশুকে বাঁচাইয়া তিনি আবার তাহার কাছে রাখিয়া যাইবেন। এই ভাবিয়া আবার সে রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে ঢুকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মন্দিরের উত্তর দিকটা ফাঁকা। বহুদূর বিস্তৃত ধানের মাঠ ছাড়া আর কোথাও কিছুই নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে নলিনীর মনে হইল, সেই মাঠের উপর কিসের যেন শব্দ হইতেছে। শব্দটা কিসের তাহাই জানিবার জন্ত, উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিতেই চট্ করিয়া নলিনীর ধারণা জন্মিল—আচ্ছা, এমনও ত' হইতে পারে যে, বিশুর মৃতদেহ শেয়ালে-কুকুরে এখান হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি করিতেছে!

নলিনী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মন্দিরের পশ্চাতে মাঠের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল সত্যই তাই। মানুষ দেখিয়া মসীবর্ণ সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে কয়েকটা শৃগাল খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া উঠিল এবং কি যেন একটা বস্তু মনে হইল যেন তাহারা মাটির উপর দিয়া সর্‌সর্ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

নলিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না, অশ্রুসজল দুইটি চক্ষুর ম্লান দৃষ্টি যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়া অন্ধকার মাঠের উপর ত্রস্তপদে অগ্রসর হইতে গিয়া একবার আছাড় খাইয়া পড়িল। মনে হইল, শোকসন্তপ্ত উপবাসক্লিষ্ট দেহে যেন আর শক্তি নাই, তবু সে আবার একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া অগ্রসর হইতে গিয়া দেখে, মৃতদেহ লইয়া শৃগালগুলা বহু-দূরে চলিয়া গেছে। গ্রাম্য কয়েকটা কুকুরমাত্র তাহারই কাছে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে।

উন্মাদিনীর মত নলিনী কতক্ষণ ধরিয়া যে মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করিল কে জানে!

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে বাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের দিকে ছুটিতেছে। মন্দিরের সুমুখে খড়ের চাল-দেওয়া ছোট নাট-শালাটি ঘিরিয়া এত লোক জড়ো হইয়াছে যে, সেখানে আর তিল-ধারণের স্থান নাই।

কাণ্ড দেখিয়া সকলেই অবাক্!

আট-চালার ঠিক মাঝখানে মাথার উপরের একটি কাঠে ফাঁসি লট্‌কাইয়া নলিনী আত্মহত্যা করিয়াছে। পরনের কাপড়খানি ছিল নূতন, তাহারই প্রায় আধখানা ছিঁড়িয়া সে দড়ির মত করিয়া পাকাইয়া গলায় দিয়াছে আর বাকি আধখানা এখনও সে কোনোরকমে পরিয়া আছে। সুদীর্ঘ একপিঠ ভ্রমরের মত কালো চুল, গায়ের রং যেন দুধে-আলতায় গোলা,—বিধবা বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। যে অন্তঃপুরচারিণীকে সহজে কেহ দেখিতে পাইত না, আজ সে তাহার দুঃসহ দুঃখভার হইতে চির-নিষ্কৃতি লাভ করিবার দুর্ব্বার আগ্রহে মৃত্যুর হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আপামর সাধারণের কাছে নিজের প্রাণহীন দেহটিকে নির্লজ্জভাবে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে।

সুমুখে উৎকট মৃত্যুর এই ভয়াবহ দৃশ্য, চারিদিকে কেমন যেন একটি অবাঞ্ছিত নীরবতা, কাহারও মুখে কোনও কথা নাই, কেহ কোনও কথা বলিতে সাহস করিতেছে না।

সংবাদ পাইয়া হায় হায় করিয়া বৃদ্ধ পূজারী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃতদেহের দিকে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিতেই চোখ দুইটি তাহার জলে ভরিয়া আসিল।—বলিল, 'ছি ছি, এ কি করলি হতভাগী! —ছেলেটা কোথায়? বিশু? যার জ্বর হয়েছিল?'

কে একজন বলিয়া উঠিল, 'বিশুর মাথাটা দেখলাম পড়ে রয়েছে মাঠে। হাত-পাগুলো শেয়াল-কুকুরে খেয়ে ফেলেছে।'

এ রকম ঘটনা যে কেন ঘটিল কেহই ভাল বুঝিতে না পারিয়া যাহার যা খুশী তাহাই বলিতে আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধ পূজারী চোখের জল মুছিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।—এখন উপায়?

নিবারণ বলিল, 'চৌকিদার পাঠানো হয়েছে থানায়।'

পূজারী বলিল, 'চৌকিদার? কেন?'

'বা-রে! অপমৃত্যুর মড়া, ওর জন্তে কে দায়ী হবে বাপু?'

ইহার উপর আর কথা চলে না। সুতরাং সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

পূজারী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহ'লে হাঁরে অবিনাশ, বামুনের মেয়ে···অমনি ঝুলবে? কেটে ওকে নামাতে হবে না?'

অবিনাশ বলিল, 'তোমার সাহস থাকে ত' নামাও।'

'তা নামাচ্ছি বাবা, আমি আর দেখতে পাচ্ছি না, আমার যা হয় তাই হবে।' বলিয়া একটা ছেলেকে সে তাহাদের বাড়ী হইতে একটা বঁটি আনিতে বলিল।

বঁটি আনিলে পূজারী কাপড় কাটিয়া অতি কষ্টে ধরাধরি করিয়া নলিনীকে সে নিজেই নামাইল। নামাইয়া আলুলায়িত কুন্তলা লক্ষ্মীপ্রতিমার মত নলিনীকে সেইখানেই শোয়াইয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া দিয়া বলিল, 'আমায় যখন বাবা বলে' ডেকেছিস্ মা, তখন তোর জন্তে আমায় জেলে যেতে হয় যাব।'

নলিনীর মৃতদেহ সারাদিন সেইখানেই পড়িয়া রহিল। থানা হইতে ইন্সপেক্টর আসিলেন বৈকালে। আসিয়াই মৃতদেহ দেখিয়া রিপোর্ট লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মরবার কারণ আপনারা কেউ কিছু বলতে পারেন?'

হাত জোড় করিয়া সকলেই একবাক্যে কহিল, 'আজ্ঞে না হুজুর।'

'নিজের বাড়ী ছেড়ে এখানেই বা মরতে এলো কেন?'

'তাও কেউ বলতে পারে না।'

'আত্মীয় স্বজন কেউ আছে?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহ'লে সন্দেহজনক ব্যাপার। কি বলেন?'

'তা আজ্ঞে যখন বলছেন আপনি তখন তা···'

ইন্স্পেক্টরবাবু কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া মৃতদেহের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর কি যেন ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃতদেহের সৎকার আপনারা যদি করতে চান ত' লাশ আমি আর চালান্ দিই না। রিপোর্টে আপনাদের সহি করে' দিতে হবে কিন্তু।'

রিপোর্টে সহি করিতে কেহই রাজি হইল না। বলিল, 'আজ্ঞে না হুজুর, আমাদের গাঁ বড় খারাপ। কে কখন খুঁচে-টুচে দেবে, বিশ্বাস নেই।'

ইন্স্পেক্টরবাবু বলিলেন, 'তাহ'লে আমার আর দোষ নেই। ওরে ও চৌকিদার, একজোড়া গাড়ী ডাক!'

মৃতদেহ লইয়া যাইবার জন্ম গ্রামে কাহারও গাড়ী পাওয়া মুস্কিল। শেষে অতি কষ্টে অনেক বলিয়া কহিয়া অনেকক্ষণ পরে চৌকিদার একজোড়া গরুর গাড়ী ডাকিয়া আনিল এবং চৌকিদারে-কনেষ্টবলে ধরাধরি করিয়া মৃতদেহ গাড়ীতে তুলিল।

বৃদ্ধ পূজারী কি যেন বলিবার জন্ত ইন্সপেক্টরবাবুর কাছে একবার আগাইয়া গেল, সমবেত লোকগুলার মুখের পানে বিহ্বলের মত বার-কতক তাকাইল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই তাহার বলা হইল না, বার-দুই ঢোঁক্ গিলিয়া বোকার মত সে সেইখানেই হাঁ করিয়া সজলচক্ষে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গরুর গাড়ীর বাঁশের শক্ত ব্যাকারির উপর নলিনার মৃতদেহ দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গায়ের এবং মুখের ঢাকা তখন সরিয়া গিয়াছে।—সেই দুটি খোলা পা, সেই অলসবিন্যস্ত নিস্পন্দ বাহুবল্লরী, সেই মনোহারিণী মুখশ্রী, অর্দ্ধনিমীলিত দুটি দৃষ্টিহীন নিরুদ্বেগ চক্ষু, আমীলিত রক্তিম ওষ্ঠাধর, মুক্তার মত শুভ্রসুন্দর, দন্তপঙ্‌ক্তি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কৃষ্ণকুঞ্চিত সুদীর্ঘ আলুলায়িত কেশপাশ,—সেই জগজ্জয়ীরূপ! মৃত্যুদেবতা তখনও পর্য্যন্ত তাহার সে সুকুমার কপোলের রক্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ করে নাই—তখনও পর্য্যন্ত সহসা দেখিলে মনে হয় যেন সে নিদ্রা যাইতেছে!

নলিনীর উন্মুক্তদ্বার গৃহপ্রাঙ্গণে বাতাপী লেবুর সুচিক্কণ পত্রপল্লবগুলি রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া দিবসের সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে। মন্দিরের মাথার উপর ধূসরবর্ণ আকাশের গায়ে শুক্লপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রলেখা!

প্রতাপান্বিত গ্রাম-দেবতা রুদ্রেশ্বরের মন্দির পার হইয়া বাণ-ডাকা নূতন-পুকুরের পাশ দিয়া গ্রামপ্রান্তের বটবৃক্ষটি অতিক্রম করিয়া, মাঠের পথে হট্ হট্ করিতে করিতে গরুর গাড়ী ক্রমশ বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গ্রামে সে বৎসর মারীভয়ের সময় শবযাত্রীর দল নূতন পুকুরে যে-বাণেশ্বরের ভীষণ গর্জ্জনে চমকিয়া উঠিয়াছিল, আজ বোধ করি হতভাগী নলিনীর এই শোচনীয় আত্মহত্যার রাগ করিয়াই তিনি নীরব রহিলেন। গর্জ্জন দূরে থাক্, নূতন পুকুরের নিস্তরঙ্গ কালো জলের উপর এতটুকু আলোড়নও কেহ দেখিতে পাইল না।

আষাঢ়ে

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আজিকে আসিছে মেঘ কালো ও ধূসর,
শাদা, নীল, ছেঁড়া-ছেঁড়া, কোনটি সুন্দর,
গগন-প্রান্তরে আজ যেন দলে দলে
ছোট বড় পথিকেরা ধীরে ধীরে চলে
কোন্ দেশ হ'তে কোথা !

নিদাঘ-জর্জ্জর
দগ্ধ নভে যেই দৃষ্টি নিয়ত কাতর,
সে আজি জুড়ায়ে যেন বারংবার চাহে
মেঘের উপরে মেঘে, মেঘে অবগাহে।—
আঁখিতে যে-সুখ লাগে সে-সুখ নামিয়া
পরতে পরতে যেন জুড়াইছে হিয়া।
মেঘে মেঘে মিশে যায় কালোয়-শাদায়,
শত মেঘে এক মেঘ রচিয়া দাঁড়ায়—
বিরাট্ অসীম মূর্ত্তি ! অসীম পুলকে
শুষ্ক মুখে ম্লান হেসে ধরা তা' নিরখে।
ক্লিষ্টা ধরণীর এই সুখ-অনুভূতি
আমারো হৃদয়ে রচে আনন্দের শ্রুতি
অবিরাম।

চেয়ে থাকি, চেয়ে থাকি খালি—
মেঘে মেঘে এ কি আজ করিল মিতালি !
এ কি স্নিগ্ধ আবরণ নয়ন মোহন !
এ কি ছত্র সুবিশাল করিতে রক্ষণ
কোমলাঙ্গী ধরণীরে সূর্য্য-তাপ হ'তে !
এ কার বিরাট্ স্নেহ এল বায়ু স্রোতে
জুড়াতে ধরার জ্বালা ? এরে দেখে দেখে
সাধ যায় এরি' পরে—তপ্ত দেহ রেখে
জুড়াই দাহন যত।—এ তো মেঘ নয়,
এ যেন রে সুশীতল সুখস্পর্শময়
কোমল বিছানা !

বিরাট্ সে মেঘ-গা'য়
আসিল চেতনা যেন, চপল লীলায়
বিজলী উঠিল জ্বলি', 'গুরু গুরু ডাক
মেঘেরে করিল যেন সজীব সবাক্।

চাহে নর, চাহে জীব, চাহে তরু লতা,
উর্দ্ধপানে মুগ্ধ নেত্রে ; নীরদের কথা
গুরু গুরু বজ্রভাষে শুনিছে সবাই—
এল তৃপ্তি, এল সুখ, আর দেরী নাই !

ঝরে ঝরে ঝরে ওই ঝরিল বাদল
তৃণে পত্রে নর-শিরে গৃহে অবিরল—
গলিত আনন্দ যেন, তৃপ্তি ধারা সম
দরদী কাহার দয়াবিন্দু অনুপম।

যে-বায়ু ছড়াল অগ্নি দিকে দিগন্তরে
সে আজি উল্লাসে আসি' উন্মুক্ত প্রান্তরে
বরষার ধারা সাথে নৃত্যে মেতে ওঠে।
বায়ু নাচে, নাচে জল,—ঘোরে আর ছোটে
দৌড়ায় যে-দিকে খুসী শিশুর সমান ;
মাতামাতি দাপাদাপি এ কি বেগবান্ !

এ মাতনে এ উল্লাসে এ হিয়া উদ্দাম
ধেয়ে যায়, মিশে যায়, নাচে অবিরাম
বাহিরে উন্মুক্ত বিশ্বে। সর্ব্ব কামনার
আজি এল পরিতৃপ্তি। তৃপ্তি-পারাবার
বাহিরে অন্তরে আজ সমান বিরাজে
উত্তাল-তরঙ্গ সাথে,—আজি তারি মাঝে
পড়ুক ঝাঁপায়ে প্রাণ, মাতুক্ উল্লাসে
বনে বনে, নদী-জলে, যক্ষের উচ্ছ্বাসে,

বিজলী নাগিনী সাথে সর্ব্বদিক্ ভরি',
শূন্যে আর মরুভূমে তরু-শিরোপরি,
গহন-আঁধার ভেদি', করি' সচকিত
জড় যাহা, স্তব্ধ যাহা, যা রহে বিস্মিত।

তারি সাথে জলবেগ, সহস্র ধারায়
মুখে চোখে সর্ব্ব-অঙ্গে হেসে ঝাপটায়।
যাক্ দেহ ভেসে চ'লে, ক্রীড়ণক আমি
সপবন বরষার, তারি অভিগামী।

দুর্দ্দান্ত বরষা সাথে ছেড়ে দিয়ে প্রাণ,
ব'সে আছি অচঞ্চল নিস্তব্ধ পাষাণ
বাক্যহীন, কম্পহীন। দেহেরে ঘেরিয়া
নাচিছে উন্মত্তবায়ু, আসে আস্ফালিয়া

চিত্ত মোর মিশে গেছে মেদুর-অম্বরে;
প্রাণ নাচে বজ্রঘোষে দিকে দিগন্তরে;
দেহ যায় ভেসে ভেসে বিপুল প্লাবনে;—
বর্ষা হ'তে কেবা প্রিয় আজি এ ভুবনে?

শেষের দান

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

(১)

"ডাক্তারবাবু, তবে কি বাঁচবে না?"—

উত্তর দিবার কিছু ছিল না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে, বিদ্যা যতদূর ছিল প্রয়োগ করিয়াছিলাম; কিন্তু মানুষ ভগবান নহে। মাথা নত করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

চট্টগ্রামের মুসলমান। দরিদ্র, সহায়হীন যুবক স্বামী আমার পশ্চাতে বাহিরে আসিল। তাহাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া বলিলাম, "আমার সাধ্যে যা ছিল করেছি। এখন শুধু ভগবানের হাত, ভাই।"

যুবকের নয়ন বাহিয়া ধারা-স্রোত নামিতে লাগিল। স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া সে জীবন-সংগ্রামে নামিয়া পড়িয়াছিল—রেঙ্গুনে আসিয়া কুলির কাজ করিতেছিল। কিছু লেখাপড়া জানিত, কিন্তু বিদ্যা তাহাকে জীবনোপায় আনিয়া দিতে পারে নাই। তাই বিদেশে আত্মগোপন করিয়া সামান্য কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া কষ্টে সংসার চালাইতেছিল।

সংসারচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া আমিও রেঙ্গুনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম;—অর্থোপার্জ্জনের প্রেরণায় নহে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য ছিল না। পিতা যথেষ্ট সম্পত্তি এবং নগদ অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্যাধি-পীড়িত গ্রামবাসিগণের পীড়ায় সাহায্য করিতে পারিব, ইহাই ছিল জীবনের সংকল্প।

কিন্তু নিজের কর্ম্মদোষে জন্মভূমি হইতে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিতে হইয়াছে। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়া আমিও পাপের বোঝা মাথায় করিয়া ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন আবহাওয়ায় আপনাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছি।

নিজের জীবনের অপকার্য্য—থাক্। প্রতিদিন যে অনুশোচনার অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতেছি, পীড়িতের কুটীর-দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহাকে চিন্তা করিবার শক্তি নাই।

রেঙ্গুনে আসিয়া কর্ম্মহীন জীবনকে কর্ম্মরত করিবার নিমিত্ত, অনুতাপের জ্বালা বিস্মৃত হইবার জন্য, চিকিৎসা-ব্যবসায়ে আপনাকে আবার লিপ্ত করিয়াছিলাম। দরিদ্রের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতাম না। ধনীরা উপযাচক হইয়া যাহা দিতেন, তাহা গ্রহণ করিতে হইত। যথেষ্ট অর্থ দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। শীঘ্র অর্থাভাব ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না।

নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু আজ

পীড়িতা মুসলমান তরুণীর চিন্তা আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। তরুণ যৌবনে জীবনের সাধ না মিটিতেই এই যুবতী মৃত্যুর পথে মহাপ্রয়াণ করিতেছে কেন?

বিধিলিপি?

সহসা সমস্ত অন্তরে একটা প্রদাহ-জ্বালা অনুভব করিলাম। আজ এক বৎসর দেশত্যাগী—কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়াছি। কিন্তু—কিন্তু—

চিন্তার বৃশ্চিক-জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। সত্যই ত, আমি এত দিন শুধু নিজের কথাই ভাবিয়াছি। নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায়, লোকাপবাদের, কলঙ্কের কর্দ্দম-প্রলেপ হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। অন্য আর একটা দিক আছে; অন্যের দুঃখ, লাঞ্ছনা, অপমান কিরূপ নিদারুণ হইতে পারে, সেদিকে একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি কি?

সহায়হীনা, আশ্রয়হীনা নারীর কি হইল তাহা ত এত কালের মধ্যে একবারও চিন্তা করিয়া দেখি নাই। সেও যদি এমনই ভাবে—

যন্ত্রণার আতিশয্যে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। না, আর একদিনও বিলম্ব করা চলিবে না। আজই ফিরিতে হইবে। এতদিন এ-দিকটা ভাবিয়া দেখিবার মত পৌরুষ কোথায় ছিল?

অপরাহ্ণে রোগিণীকে দেখিতে গিয়া শুনিলাম, তাহার সকল দুঃখের অবসান হইয়া গিয়াছে। শোক-সন্তপ্ত স্বামী তাহার অন্তিম কার্য্য করিবার অর্থের অভাবে ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া আছে।

তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত রাখিয়া ডাকিলাম, "বন্ধু!"

ক্রন্দনস্ফীত আরক্ত নয়নযুগল তুলিয়া সে আমার দিকে সবিস্ময়ে চাহিল।

বলিলাম "হাঁ, আমিও তোমার অপেক্ষা দুঃখী। মহাপাপী আমি। তোমাকে বন্ধু বলে ডাকবার অধিকারও বুঝি আমার নেই!"

সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি আমার যে উপকার করেছেন, তার জন্য আমরণ কৃতজ্ঞ ও ঋণী থাকব। আপনার মত মহৎ লোক আমাকে বন্ধু বলছেন এর চেয়ে—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "না, বন্ধু, তোমার কাছে দাঁড়াবারও যোগ্য নই। তোমার স্ত্রীর সৎকারের জ[ন্য] মাটি দেবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিচ্ছি। বন্ধুত্বের নিদর্শ[ন] অগ্রাহ্য কোরো না, ভাই!"

দুইখানা দশ টাকার নোট হাতে গুঁজিয়া দিয়া দ্রুতপ[দে] পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার দিকে ফিরি[য়া] চাহিবার সাহস হইল না।

প্রায়শ্চিত্ত জীবনব্যাপী হইয়া আছে। ভগবান্! ভগবান্

(২)

সীমারেখাহীন জলরাশির বক্ষ চিরিয়া বাষ্পীয় পোত চলিয়াছে। তরঙ্গরাশি মথিত করিয়া এই অভিযান দুই দিন পরে সমাপ্ত হইবে। অনন্ত, বিশাল, তরঙ্গশীর্ষ সমুদ্রের বিরাট্, মৌন ভাষা পরস্পরের কাণে কাণে কহিয়া নিজেরই বক্ষে আঘাতের পর আঘাত করিয়া অবিরাম মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। তাহার অতলস্পর্শ হৃদয় আলোড়িত করিয়া কোন্ বাণী, কোন্ বিশেষত্ব প্রতি মুহূর্ত্তে নীল অম্বরতলে অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে?

কাণ পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। মনে হইতেছে, ফেন-পুষ্পিত প্রতি তরঙ্গে শুধু একটা ধিক্কার-ধ্বনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জলদ-গম্ভীর স্বরে নিনাদিত হইতেছে—কাপুরুষ! স্বার্থপর!

সত্যসত্যই আমি কাপুরুষ, ঘোর স্বার্থপর, হৃদয়হীন পিশাচ! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। মূঢ়তা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম আমাকে পৌরুষের মর্য্যাদাচ্যুত করিয়াছে। সারা-জীবনের তপস্যা কি এমনই ভাবে মোহের চরণে লুটাইয়া দিতে হয়?

পরিপূর্ণ যৌবনে, আঠাশ বৎসর বয়সে এ কি নিদারুণ অভিশাপের মর্ম্মন্তুদ জ্বালা!

কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই! হঠকারিতার, মোহের শাস্তি ভোগ না করিলে চলিবে কেন?

ডেক অথবা কেবিন—কোথাও মুহূর্ত্ত মাত্র স্থির থাকিতে পারিলাম না। অতীত যেন নির্ম্মমভাবে আমার মানসদৃষ্টির সম্মুখে উজ্জ্বল দৃশ্যগুলি চলচ্চিত্রের ছবির মত ফুটাইয়া তুলিতেছিল। মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার বিরাম ছিল না।

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন চলিয়া গেল।

আউটরাম্ ঘাটে ষ্টীমার ভিড়িল। যন্ত্র-চালিতের মত ষ্টীমার হইতে নামিয়া ষ্টেসনে চলিয়া গেলাম। দেশ—পল্লী,—জন্মভূমি ব্যগ্র বাহু মেলিয়া আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামের ষ্টেসনে নামিলাম। ট্রঙ্ক ও বিছানা একখানা গরুর গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। গাড়োয়ান আমার বাড়ী জানিত। সে আমারই প্রজা। মনিবকে বহু দিন পরে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়াছিল। তাহাকে আসিতে বলিয়া আমি পদব্রজে চলিলাম। তিন মাইল পথ গরুর গাড়ীর মধ্যে বসিয়া যাইবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না।

চিরপরিচিত পথে চলিতে লাগিলাম। ত্রয়োদশীর চাঁদ জনবিরল পথে জ্যোৎস্না-প্লাবন ঢালিয়া দিয়াছিল। চৈত্র-সন্ধ্যায় বাতাবি লেবুর পুষ্প-সৌরভ, বাতাসকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। পশ্চাতে গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে আসিতেছিল। গাড়োয়ান চন্দ্রালোকে গলা খুলিয়া নিধুবাবুর চিরপ্রসিদ্ধ অমর গান গাহিতেছিল—

"ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে!"—

সত্য! প্রকৃত প্রেমিক অথবা প্রেমিকার ইহাই শুধু প্রাণের ভাষা নহে, প্রকৃত প্রেম। কিন্তু প্রতীচ্য শিক্ষার মোহে পড়িয়া আমরা বাঙ্গালার প্রাণের ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি। যেখানে কামগন্ধহীন ভালবাসা প্রেমিকের আদর্শ ছিল, এখন সেখানে কামনা, প্রতিদান-স্পৃহা তাহার ষোল-আনা দাবী লইয়া উপস্থিত।

বহু দূরে গরুর গাড়ীকে ফেলিয়া দ্রুত পাদক্ষেপে নিজের গৃহদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলাম। তিন পুরুষের বৃহৎ অট্টালিকা যেন সমাধিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। বাহিরের কাছারীঘরের আলোক তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। আমলা গোমস্তারা তখনও কাজ সারিয়া কেন যে চলিয়া যায় নাই তাহা বুঝিলাম না। মনিব দেশান্তরে—কর্ম্মচারী কর্ত্তব্য আঁকড়িয়া থাকিবে, বিংশ শতাব্দীতে এমন প্রত্যাশা অসম্ভব নহে কি?

নায়েব মহাশয় আমাকে দেখিয়া যেন ভূতগ্রস্তের মত কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পিতার আমলের কর্ম্মচারী! সম্ভবতঃ তিনি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না।

পর মুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "ফিরে এসেছ, দাদা?"

আমি তাঁহাকে নায়েব দাদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার কর্ম্মতৎপরতা ও বিশ্বস্ততার গুণে পিতার মৃত্যুর পর, কেহ আমাদিগকে ঠকাইয়া লওয়া দূরে থাকুক, আমাদের সম্পত্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। মাকে তিনি মা বলিয়াই ডাকিতেন।

গোমস্তারা সচকিত ও শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

নায়েব দাদা সঙ্গে করিয়া দ্বিতলে চলিলেন, আমার শয়নকক্ষের দ্বার মুক্ত হইল। দেখিলাম নায়েব দাদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফলে এক বৎসরের অব্যবহৃত গৃহ ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করিতেছে। যেন এইমাত্র আমি ঘর ছাড়িয়া গিয়াছি।

চিত্তের অশান্ত অবস্থাতেও অন্তর যেন কৃতজ্ঞতাভারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নায়েব দাদা আমার পরিচর্য্যার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, চারিদিক সরগরম্ করিয়া তুলিলেন।

আমি সংক্ষেপে বলিলাম, "দাদা, আমি একটু নিরালায় থাক্তে চাই।"

"তাই হবে ভাই," বলিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

(৩)

নাই?—কোথায় গেল?

মাতা ও কন্যা উভয়েই আমার দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট জনারণ্য মধ্যে কোথায় আত্মগোপন করিয়াছে, কেহ জানে না। নায়েব মহাশয় দীর্ঘকাল ধরিয়া যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গভীর রজনীতে ঘনান্ধকারের ছায়ায় কোন্ পথ দিয়া কোথায় তাহারা চলিয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার বিন্দুমাত্র আভাস তিনি পান নাই। কেন যে তাহারা এমন ভাবে আত্মগোপন করিয়াছে, গ্রামের কোন লোকেরই সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞান নাই।

আমার দেশত্যাগের এক সপ্তাহ পরে একদিন সকালে নায়েব মহাশয় জানিতে পারিলেন, একবস্ত্রে, বিনা সম্বলে তাহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। জনরব অনেক রকমেরই কাহিনী প্রচার করিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত রহস্য আজ পর্য্যন্ত যবনিকার অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে।

কোথায় গেল? অর্থ ত তাহাদের ছিল না! কোথায় গিয়া তাহারা এই দীর্ঘকাল রহিয়াছে? কেমন করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে?

মণি-পিসিমা তাঁহার শ্বশুরের ভিটায় যান নাই। সেখানে যে তৃণ-কুটীর ছিল, আমাদের এখানে আসিবার কিছু কাল পরেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল।

জননীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই বিধবা তাঁহার ভাগ্যহীনা তরুণী কন্তাকে লইয়া আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংসারে তাঁহাদের আপনার জন কেহই ছিল না।

মণি-পিসিমার মাতা এবং আমার ঠাকুর-মা গঙ্গাজল পাতাইয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে বাবা মণি-পিসিমাকে নিজের সহোদরার মত স্নেহ করিতেন। দরিদ্র স্বামীর হাতে পড়িলেও বাবা মণি-পিসিমাকে নিজের সহোদরার মত স্নেহ করিতেন। বিধবা হইবার পর মণি-পিসিমা তাঁহার মাতার কাছে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিতেন। মার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। মণি-পিসিমার একমাত্র সন্তান মাধুরী আমাদের বাড়ী দিনের অধিকাংশ সময় মার কাছেই থাকিত। তাহার শ্যাম রূপে এমন একটা চমৎকার মাধুর্য্য-শ্রী ছিল যে, সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাধুরী আমার কাছেই তাহার পড়া জানিয়া লইত। তাহার সহিত আমার বয়সের ব্যবধান ছয় বৎসর। আমি তাহার রমেশ-দা ছিলাম। এখন গোপন করিয়া কোন লাভ নাই, তাহার প্রতি আমার যে স্নেহ জন্মিয়াছিল, যৌবনের উন্মেষে তাহা এমনই গাঢ় হইয়াছিল যে, তাহাকে না পাইলে আমার জীবন ব্যর্থতায় পূর্ণ হইয়া যাইবে মনে করিতাম। তখন তাহার বয়স পঞ্চদশ। আমি মেডিক্যাল কলেজে তখন চতুর্থ বৎসর পার করিয়াছি। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিবার মত সরলতা ও সাহস আমার মনে ছিল না। কারণ, জানিতাম, মা মণি-পিসিমাকে যতই ভালবাসুন, দরিদ্রের এই কন্যার অপেক্ষা সুন্দরী পাত্রী আমার জন্ম সন্ধান করিতেছিলেন। বাবা তখন লোকান্তরে। মাকে ভালবাসিতাম, আবার অত্যন্ত ভয়ও করিতাম। সুতরাং বিবাহে এখন স্পৃহা নাই এই কথাটাই প্রকারান্তরে অন্তের দ্বারা মাকে জানাইয়া দিয়াছিলাম।

এম্-বি পাশ করিবার পূর্ব্বে মাও বিবাহ দিবেন না বলিয়া আমার কাছে সত্যবদ্ধ হইয়াছিলেন। পল্লীগ্রামের ষোড়শী কন্যা অবিবাহিত রাখা দায়। মণি-পিসিমা পাঁচজনের সাহায্যে—মাও সে বিবাহে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন—মাধুরীকে এক রুগ্ন এবং দরিদ্র পাত্রে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সে সংবাদ আমি কলিকাতায় পাইয়াছিলাম।

হৃদয়ে যে গভীর বেদনা পাইয়াছিলাম, সে কথা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ইহজীবনে বিবাহ আমি করিব না। প্রেম মানুষের একবারই হয়। জানিতাম, এ ব্যাপারে মাধুরী ও আমার উভয়ের জীবন অন্ধকার হইয়া গেল। অবশ্য তাহার নারীসুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমার কাছে সে তাহার হৃদয়ের কথার আভাস দেয় নাই; কিন্তু তথাপি—তথাপি আমি তাহার মনের, অন্তরের গোপনতম অংশ দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছভাবে দেখিতে পাইয়াছিলাম।

আমাদের মিলন সম্ভবপর নহে জানিয়াই আমরা দূরে দূরে সরিয়া থাকিতাম। বাল্য ও কৈশোরের মধুর স্মৃতি আমার জীবনকে একনিষ্ঠ ভাবে রাখিবার সহায় হইয়াছিল। কিন্তু মাধুরীর স্বামী বিবাহের ছয় মাসের মধ্যেই তরুণীর সীমন্তের শোভা মুছিয়া দিয়া রহস্যলোকে চলিয়া গেল। দুর্ভাগিনী নারী ষোড়শ বর্ষেই যোগিনী সাজিল।

এই ঘটনার পর মণি-পিসিমা শ্বশুরের ভিটায় কন্যাকে লইয়া পড়িয়া থাকিতেন।

ডাক্তার হইয়া গ্রামে আসিলাম। মা বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে এবার দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিলাম, আজীবন কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াই থাকিব। মা যদি বেশী পীড়াপীড়ি করেন, দেশে আর আসিব না।

মা আমার হৃদয়ের কোথায় ক্ষত হইয়াছে তাহা জানিতেন কি না বলিতে পারি না! কিন্তু আমার দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় পাইয়া অবশেষে সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন।

নিস্তব্ধ রজনীতে শয়ন-কক্ষে অতীতের চিত্রগুলি যেন মূর্ত্তি ধরিয়া আমার নয়ন সমক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। খোলা জানালা দিয়া জ্যোৎস্না-চিত্রিত প্রকৃতির রহস্যপূর্ণ রূপ-জ্যোতিঃ আমার অন্তরকে ধিক্কার দিতেছিল।

আকাশের অগণিত নক্ষত্ররাজি কানাকানি করিয়া আমারই প্রতি যেন বিদ্রূপ কটাক্ষপাত করিতেছিল।

মনে পড়িল—মার পীড়া যখন সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল, তখন তিনি কাহারও নিষেধ না মানিয়া দেখাশুনা করিবার জন্য মণি-পিসিমাকে আনাইলেন। পিসিমার স্নেহদৃষ্টির ছায়াতলে আমার কোন কষ্ট হইবে না—মা লোকান্তরে গেলে, আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করিবার লোকাভাব হইবে না—ইহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল। আমার আপত্তি মা গ্রাহ্য করিলেন না, আসন্ন মৃত্যুকালেও সন্তানের জন্য এ কি ব্যাকুলতা!

মণি-পিসিমা মাধুরীকে লইয়া আসিলেন। মার মুখে একটা সন্তোষের আলোক-দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। নিশ্চিন্ত-ভাবে আমার সংসার-মরুভূমির একমাত্র স্নেহচ্ছায়া-সুশীতল উদ্যান শুকাইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

মণি-পিসিমার স্নেহ-যত্ন কখনও ভুলিব না। মাধুরীও সংযত ভাষা ও গাম্ভীর্য্যের আশ্রয়ে আপনাকে রক্ষা করিয়া আমার সেবা-যত্নের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। জীবন হয়ত এইভাবেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু মানুষের যৌবনকে বিশ্বাস নাই! উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তিকে শাসনে রাখিতে গেলে যে সাধনার প্রয়োজন, তাহা কয়জনের আয়ত্ত? মাধুরীর পুষ্পিত, যৌবনোচ্ছ্বসিত দেহতটে শ্যাম-শ্রীর সমগ্র গরিমা যেন আমাকে উপহাস করিতে থাকিত।

মনের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অবশেষে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, তখন মাধুরীকে বিদ্যাসাগরের মতে বিবাহ করিব সংকল্প করিলাম। সমাজে যদি স্থান না হয়, অন্যত্র গিয়া থাকিব। কিন্তু যাহাকে সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছি, তাহাকে আমার প্রয়োজন।

মাধুরীও অবশেষে আমার প্রস্তাবে অস্বীকার করিতে পারিল না।

কিন্তু সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে নানা প্রকার বাধা পড়িতে লাগিল।

পরস্পর পরস্পরকে চাহে—বিবাহের বন্ধন উভয়কে পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া দিবে, সুতরাং মনও আনন্দে দুর্ব্বার হইয়া উঠিল।

এই গৃহ, এমনই জ্যোৎস্না-প্লাবিত মাধবী রজনী। কূল-প্লাবী যৌবন-স্রোত, উদ্দাম মোহ, প্রলোভনের অসম্বরণীয় মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিল!

কিন্তু সত্য সূর্য্যের ন্যায় চিরদিনই স্বপ্রকাশ। তাহার অমোঘ নির্ম্মম আলো এবং দহন-জ্বালা একদিন সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল।

মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মান সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি মুহূর্ত্তে ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে। জনরব সহস্র মুখ হইয়া চারি দিকে গ্লানির কর্দ্দম-বৃষ্টি করিতে থাকিবে! অসহ্য, অসহ্য!

কাপুরুষতা বোধ হয় আমার অস্থিমজ্জাগত অপরাধ। কোন দিকে চিন্তা করিয়া না দেখিয়া কয়েক সহস্র মুদ্রা লইয়া আপনাকে পরিচিত জন-সমাজ হইতে বহু দূরে লইয়া চলিলাম।

পরম বিশ্বাস-ভরে যে আমাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়াছিল, তাহার কি ঘটিল তাহা দেখিবার মত সাহস আমার ছিল না।

কক্ষের বাতাস যেন আজ ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরের প্রকৃতি, আমার পৌরুষকে ধিক্কার দিয়া বলিতে-ছিল—অধম নির্ম্মম মানুষ! কাপুরুষ—স্বার্থপর!

মিথ্যা নহে! মিথ্যা নহে। সমগ্র মানব সমাজের কাছে আমি কঠোর দণ্ডের সম্পূর্ণ উপযুক্ত!

অশান্তভাবে কক্ষ মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলাম।

(৪)

কোথায় তাহাকে পাইব? বাঁচিয়া আছে কি না তাহাই বা কে জানে?

মন্ত্রবলে মা ও মেয়ে কোথায় অন্তর্হিত হইল?

ভগবান!—তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবার অধিকারী আমি নহি, তাহা জানি। তথাপি, তথাপি হে অনাথশরণ, আমাকে পথ দেখাইয়া দাও, প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবকাশ দাও, প্রভু!

নানা স্থান ঘুরিয়া আজ এক সপ্তাহ কাশীধামে আসিয়াছি। শান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, অবিশ্রান্ত কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, যদি তাহার সন্ধান পাই, দেখা পাই।

এমন নিশ্চিহ্ন ভাবে কেহ আপনাকে লোকারণ্য মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে পারে? অনুসন্ধানে যাহা জানিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, মাধুরী ও তাহার জননী ঘুণাক্ষরেও

কোন কথা প্রকাশ করে নাই। যে অবস্থা লোক-লোচনের অগোচর রাখা কঠিন, তাহা প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই মাতা ও পুত্রী লোকাপবাদ এড়াইবার জন্য এমনই ভাবে আত্ম-গোপন করিয়াছে। অবশ্য আমার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের হঠাৎ চলিয়া যাইবার হেতু, সমালোচনার সৃষ্টি করিয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কেহ অনুমান করিতে পারে নাই।

বুঝিয়াছিলাম, মাধুরী সমগ্র মন প্রাণ দিয়া আমাকে ভাল না বাসিলে, আমার কলঙ্ককে গোপন রাখিবার জন্য তাহার এমন প্রবল আগ্রহ হইত না। আমার অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার নারী-জীবনের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে—তাহার ভবিষ্যৎ জীবনকে শুধু অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে, মহাকলঙ্কে মলিন করিয়া দিয়াছে, তথাপি চির-স্নেহশীলা নারী কোন অভিযোগ না জানাইয়াই আপনাকে আমার পথ হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে এমন ভাবে মাধুরী কখনই নিজেকে লুকাইয়া রাখিত না।

দেহে যতক্ষণ শক্তি থাকিবে, চরণ যতক্ষণ চলিবার ক্ষমতা ধারণ করিবে, তাহার সন্ধানে বিরত হইবে না। যদি সে জীবিত থাকে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। একটি বৎসর নষ্ট করিয়াছি। নিষ্ঠুর স্বার্থপরের মত, নিজের কথা মনে করিয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছি। ভগবান কি মহাপাপীকে প্রায়শ্চিত্তের অবকাশও দান করিবেন না?

বাবা বিশ্বনাথের আশ্রয় লইয়াছি। তিনি আশুতোষ, করুণাময়।

শত শত পূজার্থী তাঁহার শিরে বিল্বপত্র, গঙ্গোদক ঢালিয়া দিয়া তৃপ্তি পাইতেছে। হে অনাথনাথ, এই হতভাগ্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ কর।

কিন্তু আমার এই অসংযম,—নির্ভরপরায়ণা, একান্ত আশ্রিতা তরুণীর আত্মবিসর্জ্জনের অবকাশ গ্রহণ করিয়া, ভোগায়তন দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তির মহাপাপ,—কি ক্ষমার যোগ্য? বিশ্বনাথ সকলের প্রতিই সমান দয়া, সমান অনুগ্রহ—পাপের সমান দণ্ড প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেই আমার অপরাধের সমাপ্তি হইবে?

বুঝি নাই—পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারি নাই, তাই আপাতমনোরম ভোগসুখের মায়ায় পথভ্রষ্ট হইয়াছি। কিন্তু তাহার জন্য লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে কে? আমি ত জনসমাজে উন্নত শিরে চলা-ফেরা করিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু যে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরম নির্ভয়ে, একান্ত নির্ভরতার পরিচয় দিয়া আমার প্রলোভনের অগ্নিতে ইন্ধন স্বরূপ আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহাকে আশ্রয় দিয়া, সম্মান দিয়া, আনন্দ দিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছি কি?

না, না—আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! নরকের দহন-জ্বালা আমার প্রাপ্য।

গঙ্গার তীরে তীরে ঘুরিয়া, অসংখ্য দেবতার মন্দির-তলে দেহ লুটাইয়া ফিরিলাম। মনের মধ্যে যে তীব্র অনল জ্বলিতেছে, তাহা আমাকে দগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত করুক!

সারা দিন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা আমাকে বর্জ্জন করিয়াছিল। মাথায় নরকাগ্নি জ্বলিতেছিল, বুকের মধ্যে প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছিল। আবার বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে আসিলাম। তখন সন্ধ্যা-বন্দনা আরম্ভ হইয়াছিল। বহু কণ্ঠোচ্চারিত দেবাদিদেবের মহিম-গাথা ঘণ্টা-নিনাদের সহিত মন্দির-তল মুখরিত করিয়া গগন-পথে উত্থিত হইতে লাগিল। সে অপূর্ব্ব বন্দনা-সঙ্গীতে সমগ্র অন্তর-রাজ্য যেন পরিপূর্ণ—পরিপ্লুত হইয়া গেল।

শত শত ভক্তের কণ্ঠোচ্চারিত স্তব মহাপাপীর অন্তরকেও পবিত্র করিয়া দেয়। আশার বাণী মূর্ত্ত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে পুলক-বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল। দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

প্রেমময়! দয়াময়!

বাহিরে আসিলাম। কোথায় চলিয়াছি?

সহসা পৃষ্ঠদেশে কাহার করস্পর্শ অনুভব করিলাম।

ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলাম আমার কলেজ-জীবনের সতীর্থ উমাপদ।

সে বলিল, "রমেশ, তুমি এখানে?"

হাসিবার চেষ্টা করিয়া সংক্ষেপে বলিলাম, "হাঁ, এখানে সকলকেই আসতে হয়।"

উমাপদ বলিল, "শুনছিলুম ডাক্তারী পাশ করে দেশে বসেই চিকিৎসা করছিলে—হাঁসপাতালের চাকরী নেও নি। ডাক্তারী চলছে কেমন?"

উত্তর দিতেই হইবে। বলিলাম "এক-রকম মন্দ নয়। তুমি এখানে কি কর?"

উমাপদ প্রসন্ন হাস্যে বলিল, "মাষ্টারী করি। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েই আছি। আমাদের আর অন্য উপায় ত নেই। তুমি কোথায় উঠেছ?"

—"কাশী হোটেলে" বলিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলাম।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া উমাপদ বলিল, "তুমি ত ডাক্তার। পাশও করেছ ভাল ভাবে। একজন অনাথাকে দেখ্‌তে যাবার অবকাশ হবে? তারা বড় গরীব, আমার সাধ্যে যা ছিল করেছি। মেয়েটি বোধ হয় বাঁচবে না, চরম অবস্থা বলেই মনে হয়। তবু শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা—"

বাধা দিয়া বলিলাম "ডাক্তারী করে পয়সা উপার্জ্জন করা আমার লক্ষ্য নয়, তা ত জান। চল, আমি এখুনি যেতে রাজি।"

(৫)

জীর্ণ, ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙ্গালী-টোলার দরিদ্রতম অংশে উমাপদ আমায় পথ দেখাইয়া চলিল। সে বলিল, "আমিও গরীব, তাই এর চেয়ে ভাল জায়গায় বাসা করবার উপায় নেই। আমার বাসার একটি ঘরে তাদের স্থান দিয়েছি। তাদের এ সংসারে কেউ নেই।"

চিরন্তন দুঃখ সংসারের কোটি কোটি নরনারীকে প্রতিদিন চূর্ণ করিতেছে। ইহাই সংসার-রাজ্যের প্রকৃত ইতিহাস। প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও এ অবস্থার অপরোক্ষ পরিচয় বাঙ্গালা দেশের বুকে নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

আলোকবিহীন পথে চলিতে চলিতে কয়েকবার পদস্খলনের উপক্রম হইল। উমাপদ আমার হাত ধরিয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইল। তার পর একটি ক্ষুদ্রায়তন একতল কক্ষের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "এই ঘর।"

ঘরের মধ্যে প্রদীপের ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছিল। ঘরের অন্ধকার এই স্বল্পালোকে যেন আরও ভীষণ দেখাইতেছিল। একটি মলিন শয্যায় কে যেন শায়িত। তাহার শিরোদেশে আর একটী রমণীমূর্ত্তি ছায়ার মত বসিয়া আছে।

উমাপদ বলিল, "একটু দাঁড়াও। আমি একটা লণ্ঠন নিয়ে আসি।"

সে লঘু ও ত্বরিত গতিতে চলিয়া গেল।

আমি নীরবে চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অত্যল্প কালের মধ্যেই একটা লণ্ঠন হস্তে উমাপদ ফিরিয়া আসিল। তাহার নীরব আহ্বানে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোকে কক্ষতল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা বৃদ্ধা আমাদিগকে দেখিয়া মস্তকের অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া দিয়া ব্যাকুল, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, মেয়ে কেমন করছে।"

সে কণ্ঠস্বরে আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমার সমস্ত দেহ টলিয়া উঠিল।

এ কাহার কণ্ঠ? মণি-পিসিমার চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর সহস্র জনের মধ্য হইতেও আমি চিনিয়া লইতে পারি।

ভগবান! ভগবান!—

প্রভূত বলে আপনাকে সংযত করিয়া লইলাম। কোথায় কাহার কাছে আসিয়াছি, বিধাতার অমোঘ বিধানে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু এই দৃশ্য দেখিবার জন্য, তাহা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম!

লণ্ঠনটা এক পাশে রাখিয়া উমাপদ বলিল, "দাঁড়াও, আমি একটু দুধ নিয়ে আসি।"

সে চলিয়া গেল। রুদ্ধ-নিশ্বাসে কম্পিতপদে শয্যার দিকে অগ্রসর হইলাম।

পিসিমা আমার দিকে চাহিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, "কে বাবা, রমেশ?"

কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র অভিযোগের তিরস্কার নাই। ক্ষমাশীলা নারীর স্নেহাপ্লুত কণ্ঠস্বরে আমার অন্তর মথিত, চূর্ণ হইবার উপক্রম হইল।

কম্পিত বক্ষে চাহিয়া দেখিলাম। আমারই পৈশাচিকতায়, আমারই কাপুরুষতায়, তরুণ জীবন কেমন করিয়া পলে পলে চূর্ণ হইয়া অনন্ত পথের অভিমুখে মহাপ্রয়াণ করিতেছে।

আমার দৃষ্টির সম্মুখে পৃথিবী যেন ঘনান্ধকার যবনিকা

টানিয়া দিল। আমারই উচ্ছ্বসিত অশ্রুবন্যায় আমার দেহ প্রচণ্ডভাবে দুলিয়া উঠিতে লাগিল। পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্র সে তপ্ত অশ্রু-প্রবাহকে ধারণ করিতে পারিবে ?

যে তন্বী, তরুণী মাধুরীর দেহে—যৌবন-নিকুঞ্জে পুষ্প-প্রাচুর্য্যের মাধুর্য্যে একদিন অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এখন দীন-হীন, ছিন্ন, মলিন শয্যায়,—তাহার বিগত-যৌবন কঙ্কালসার দেহ মাটির সঙ্গে মিশাইতে চলিয়াছে।

রূঢ় আলোক-প্রবাহ তাহার নয়নে পড়িবামাত্র সে একবার তাহার কোটর-প্রবিষ্ট দীর্ঘায়ত নয়নযুগল উন্মীলিত করিল।

তাহার অস্বাভাবিক দীপ্তি বিশিষ্ট আঁখি-তারকায় ও কি জ্বলিয়া উঠিল ? বিস্ময়, আনন্দ, না পরিতৃপ্তির তড়িৎ-শিখা ?

চীৎকার করিয়া ডাকিলাম "মাধুরী! রাণী!—"

অকস্মাৎ প্রচণ্ড কাসির উন্মাদনায় রোগিনীর সর্ব্বদেহ আকুঞ্চিত, উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দুই ঝলক্ তাজা শোণিতধারা মুখের পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল। তাহার পার্শ্বে একটি ছয় মাসের শিশু ঘুমাইতেছিল। মাধুরীর বাম হস্ত কাঁপিতে কাঁপিতে উর্দ্ধে উঠিয়া নিদ্রিত শিশুর বক্ষের উপর নিক্ষিপ্ত হইল—তাহার শীর্ণ দক্ষিণ হস্ত আমার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। প্রাণপণ বলে আমার দিকে চাহিবার চেষ্টার সঙ্গেসঙ্গেই তাহার দীপ্ত তারকাদ্বয় উর্দ্ধে উঠিয়া সহসা স্থির হইয়া গেল।

দুগ্ধপূর্ণ কাংসপাত্রটি উমাপদর হস্ত হইতে মধ্যপথে ঝন্ ঝন্ করিয়া মাটিতে পড়িতেই শিশুটি চমকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভূলুণ্ঠিতা সন্তানহীনা শোকাতুরা বৃদ্ধার মর্ম্মভেদী হাহাকার তীব্র ছুরিকাঘাতের মত যেন আমার বক্ষে চাপিয়া বসিল। তাহার বুকফাটা আর্ত্তনাদ আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়া কোন্ এক অদৃশ্য মহাশক্তির চরণতলে আছড়াইয়া ফাটিয়া পড়িল।

জর্জ্জর দেহে টলিতে টলিতে শয্যাপ্রান্ত হইতে উঠিয়া দৃঢ় কম্পিত হস্তে ক্রন্দনরত শিশুকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলাম। তাহাকে মাথায় ঠেকাইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম, "তোমার এ শেষ দানের মর্য্যাদা আমি অক্ষুণ্ণ রাখব—এর জন্য আমার সমগ্র জীবন দান করব।"

বন্ধুর প্রতি চাহিয়া ভগ্নস্বরে বলিলাম, "উমাপদ! আমার পানে চেয়ে দেখ্‌ছ কি? পাপিষ্ঠ স্বহস্তে এই চির-বিশ্বস্তা নারীকে বধ করেছে! কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত—ওঃ--ভগবান!—"

অনুরোধ

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

জ্যোৎস্না-রৌদ্র-গোধূলি-মেশানো রঙ্ কি কখনো দেখেছ ?
একাধারে যেই রমা বীণাপাণি তারে কি চিনিয়া রেখেছ ?
পড়িয়াছে চোখে এমন কি কেহ সুধা ধরে আঁখি-নীলে যে,
কোকিল-ভ্রমর-বীণা-গান যার ললিত বাণীতে মিশেছে ?
দেখ নাই ? তাকি জানিনেকো
পারুলকে দেখো।

*

নির্ঝর-নদী-সাগর যাহার চঞ্চলতার উপমা,
অঙ্গহারের ছন্দে যাহার হিল্লোলি উঠে সুষমা,
দেখেছ কি তারে ? দেখেছ কি কভু কল্পকুসুম মরতে,
বসন্তে যেবা মাধবী-মুকুল, বিকচ কমল শরতে ?
এমন হয়না ? মানিনেকো
পারুলকে দেখো।

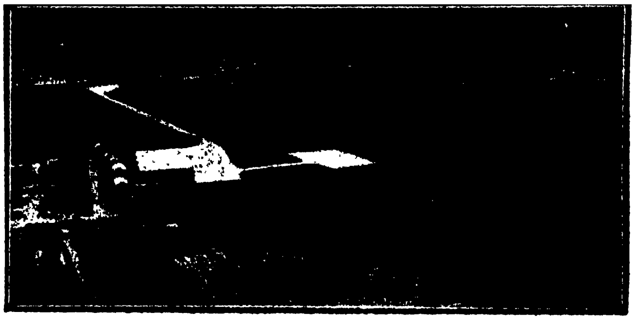
*

তনু দেহ যার পরাগ-পেলব, নিশীথিনী-কালো অলকে,
দক্ষিণে বামে যুগল বেণীর শোভা মন্ হরে পলকে
অলি বার বার ফুল্ ভ্রমে যার চুমিবারে আসে শ্রীমুখে,
তাহারে না দেখি মানব-জীবন না জানি যাপিছ কি সুখে!
ধন্য হইবে, কথা রেখো
পারুলকে দেখো।

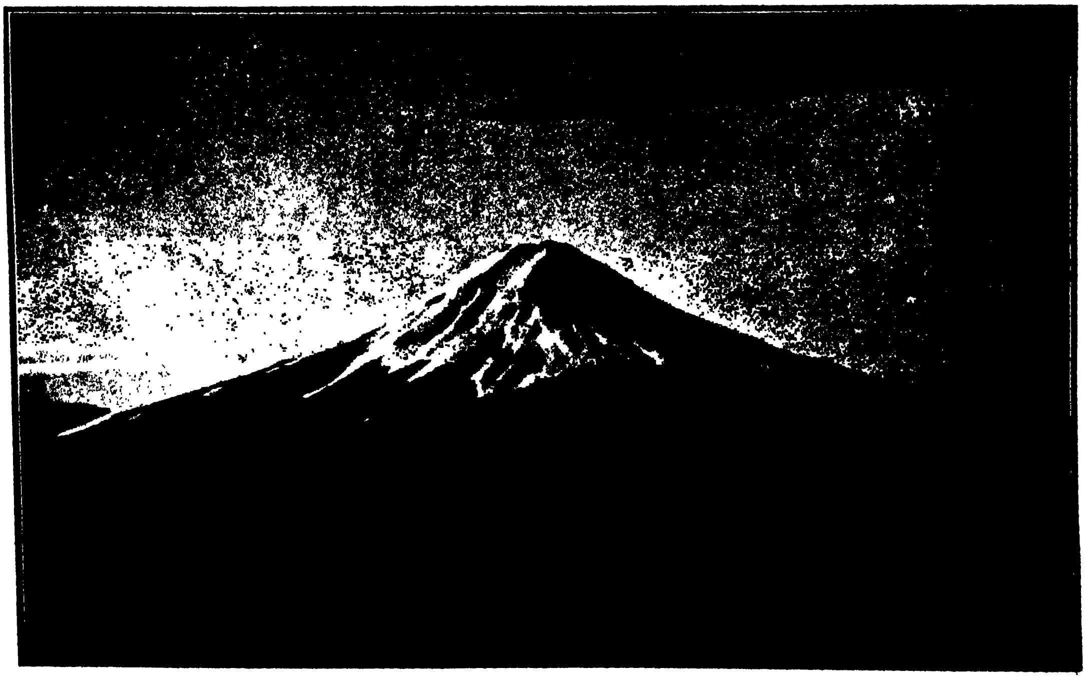
তরুণ জাপান

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

তরুণ জাপানকে যদি প্রাচ্যের ইতালী বলি, তা'তে আর যাই হোক না কেন, অতিশয়োক্তির অপরাধ হয় না। ছোট্ট—এতটুকু একটা দ্বীপের অধিবাসীরা পৃথিবীর বড় বড় শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা অগ্রাহ্য করে, ভূমিকম্পের ভীষণ অত্যাচার অবহেলা করে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কি করে একটা আত্ম-প্রতিষ্ঠ এবং আত্ম-সম্পূর্ণ জাতি-হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে নিজের আসনটাকে কায়েমী করে নিল, তা ভাবতে গেলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। অতীত জাপানের কথা পরে বলব; কিন্তু জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আজকের বলে মনে হয় না। আজকের জাপান বলতে আমি তার বড় বড় অট্টালিকা, তার প্রশস্ত রাজ-পথ এবং সেখান-



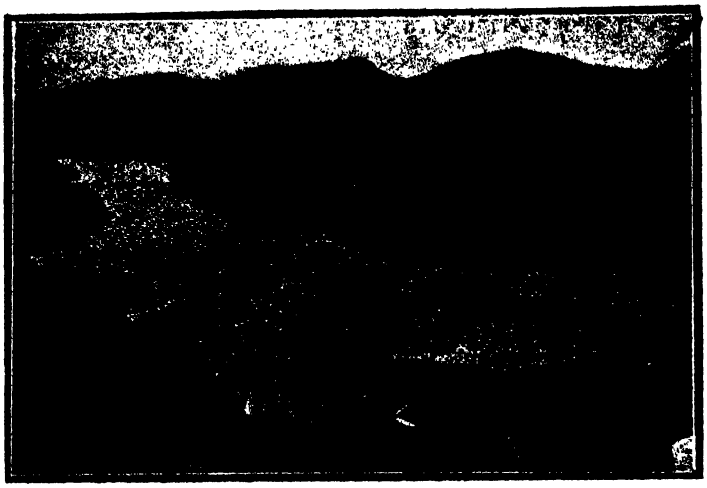
বিমান-পোত থেকে টোকিয়োর দৃশ্য



ফুজী পাহাড়—বিমান-পোত থেকে

জাপানের উন্নতির যে পরিচয় পাই, তা' জাপানের পূর্ব্ব ইতিহাসের চেয়ে কোন অংশে কম হৃদয়গ্রাহী কার মেয়েরা বেতের ঝুড়ি কি করে তৈরী করে, বর্ত্তমান জাপানের সীমা-রেখা কতদূর পর্য্যন্ত গেছে—এ সব বিষয়ের

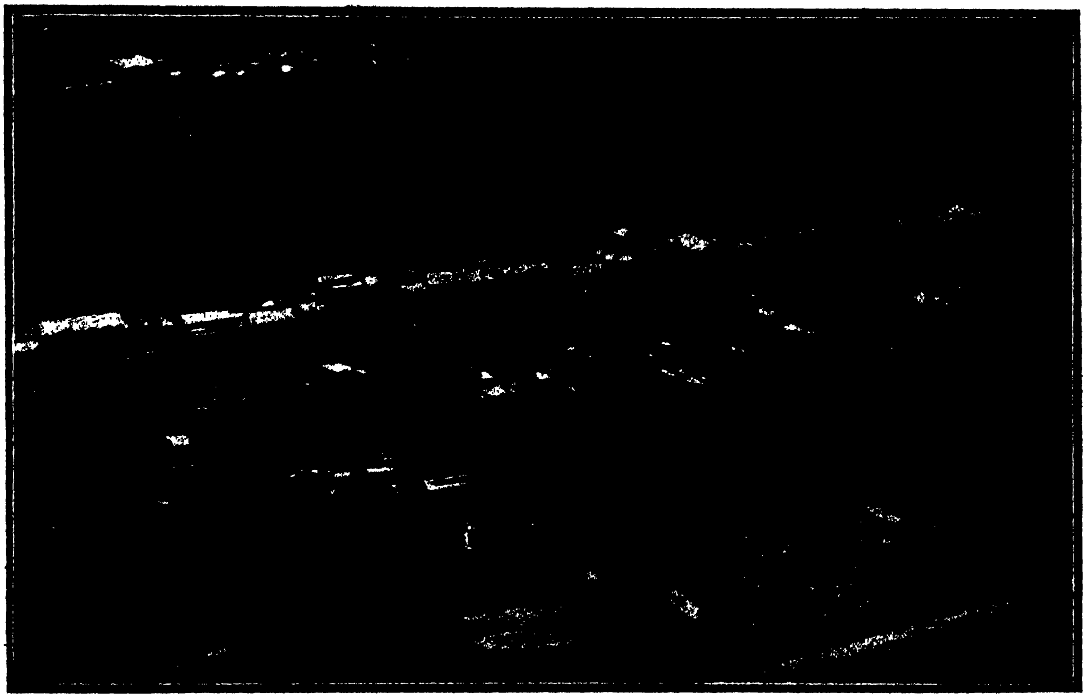
আলোচনা করব না; কারণ সে আলোচনা তার ভৌগোলিক ইতিবৃত্তের পুনরাবৃত্তি ছাড়া অন্য কিছু হ'বে না। আমি



আশিনোকো হ্রদ

ক্রমে ক্রমে তার বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রচেষ্টা, তার ব্যবসা-বাণিজ্য, তার শিল্প-সাধনা, তার সৌন্দর্য্য-রুচির পরিচয় পরিচয় নয়। সে দেশের লোকে কি দিয়ে রুটী খায়, তাদের মধ্যে কি কি কুসংস্কার চলে আসচে, তাদের বনে-জঙ্গলে কত রকম অদ্ভুত জানোয়ার মেলে—এ সবের কোনটাই কোন জাতির পরিচয় নয়। জাতির পরিচয় তার চিন্তা-ধারায়, তার শিক্ষায়, তার সামরিক শক্তিতে, তার সাহিত্যে, তার শিল্পে।

জাপানকে প্রাচ্যের ইতালী বলেচি, তার একটা কারণ ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে এই দুটী নব-প্রবুদ্ধ জাতির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ইতালীর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য দেখবার জন্যে দেশ-বিদেশের টুরিষ্টরা সেখানে গিয়ে হাজির হয়; এবং সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এক একজন এক একরকম বিবরণ দাখিল করে। ফলে, সে দেশ সম্বন্ধে কোন্‌টা সত্যি, আর কোন্‌টা নয়, তাই নির্ণয় করা হয়ে



সাকাইদের লবণ উৎপাদন কেন্দ্র

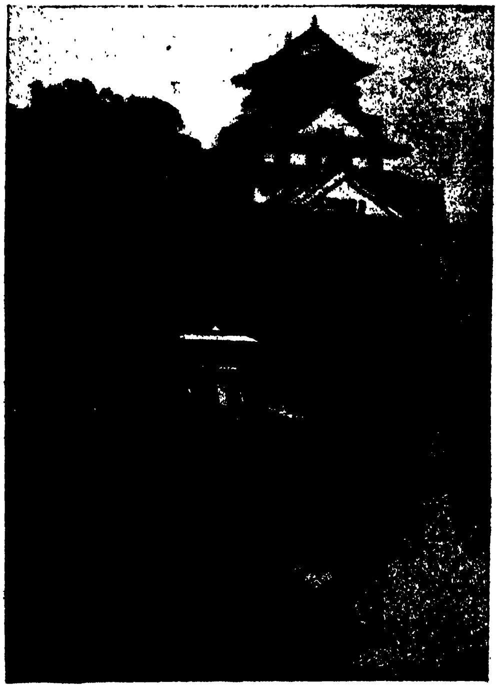
দেবার চেষ্টা করব। কারণ ভৌগোলিক এবং দৈনিক সংবাদপত্রের বিবরণই একটা সুপ্রতিষ্ঠিত জাতির সম্পূর্ণ দাঁড়ায় কঠিন। জাপান সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। প্রাচ্যের এই মনোহর দ্বীপটাকে দেখবার জন্য উভয় ভূ-খণ্ডের লোকই

সেখানে ছোটে ; আর এই সেদিন চীন-জাপানের একচোট যে লড়াই হয়ে গেল, প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ-দর্শীরা তার কত রকম বিবরণই যে দাখিল করেচেন, তার হিসেব রাখাই কঠিন।

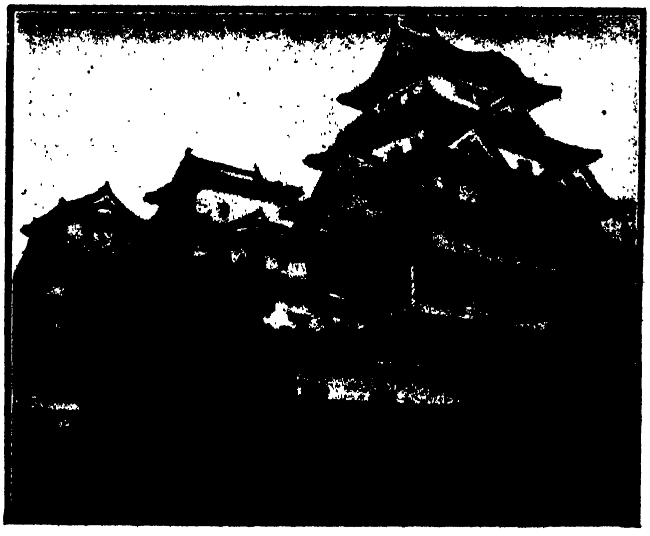
কিন্তু সাদৃশ্য কেবল এইটুকুই নয়।

ইতালী যেমন হঠাৎ নতুন করে গড়ে উঠেচে এবং নিজের মধ্যে সুসম্পূর্ণ হ'বার চেষ্টা করচে, জাপানের বর্ত্তমান ইতিহাসের মধ্যে আমরা সেই প্রচেষ্টার পরিচয়ই পাই। সেদিন পর্য্যন্ত যে জাপান পৃথিবীর উপহাস কুড়িয়েচে, নৌ-বলের দিক দিয়ে আজ তার স্থান জগতের দু'একটা প্রকাণ্ড শক্তির পরেই। জাপানের কবি নেগুচির খ্যাতি আজ দ্বীপের সীমানা অতিক্রম করে গেছে ; জাপানের বস্ত্র-শিল্পের প্রতিপত্তি অনেক দেশের পক্ষে অসহ্য এবং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েচে।

পোর্ট-আর্থারে প্রাচ্যের নব জন্ম হয়েচে,—এমনি একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় ; কিন্তু এর মধ্যে অতিশয়োক্তি নেই। পোর্ট-আর্থারে জাপান যেদিন যুদ্ধে রুশবাহিনীকে হটিয়ে দিল, সেদিন সমস্ত প্রাচ্যের চোখের উপর থেকে যেন মোহের একটা আবরণ ঘুচে গেল। এত কাল তারা মনে করে আসছিল যে, প্রতীচ্যের কোন শক্তির বিরুদ্ধেই লড়াই করে জয়ী হ'বার ক্ষমতা তা'দের নেই। পোর্ট-আর্থারে তা'দের সেই ধারণা অমূলক বলে প্রমাণ হয়ে গেল। তার পর থেকে জাপানের নব-জন্ম,—সেই সঙ্গে প্রাচ্যেরও।



ওসাকার নূতন প্রাসাদ



হিমেজীর হাকুরো প্রাসাদ



কবরী-শোভা—প্রজাপতি ধরণের

আজকের জাপানকে দুই-রূপী বলে পরিচিত করলে কোন দোষ হয় না। তার একটী রূপ—তার সামরিক

শক্তি বাড়াবার অক্লান্ত চেষ্টা, ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবীর বাজার অধিকার করা। এ হ'ল তা'র আসুরিক এবং বণিক রূপ। জাপানের আর একটা রূপ—ওদের দেশের 'হক্কু'—কবিতার মত কোমল, রমণীয়। সেখানে জাপান ধ্বংসপ্রিয় নয়, ধনলোভী নয়; জাপান সেখানে সৃষ্টির নেশায় মাতাল এবং শিল্পী। বর্ত্তমান জাপানে এই দুই মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব।

প্রথমে জাপানের রাজনৈতিক দিকটা সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলে রাখি।

জাপানের পার্লামেণ্টের অধিবেশনকে ইংরাজীতে 'ইম্পীরিয়াল ডায়েট' বলা হয়। বিলাতের মত জাপানের ব্যবস্থাপক-সভা দু'রকমের; একটা উর্দ্ধ সভা, অপরটী নিম্ন সভা। বিলাতের মত একটী মন্ত্রীসভা শাসনকার্য্য পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু আর একটা প্রতিষ্ঠান আছে, যা ইংলণ্ডে বা অন্ত কোন দেশে নেই বললেই হয়। এই প্রতিষ্ঠানটীর ইংরিজী নাম—প্রিভি-কাউন্সিল। কিন্তু ইংরাজের শাসন-ব্যবস্থায় প্রিভি-কাউন্সিল বলতে যা বোঝায়, এটির সঙ্গে তার কোনরকম সাদৃশ্য নেই। এই প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্যরা এক একজন প্রবীণ বুরোক্র্যাটিক রাজনীতিক। এককালে তাঁদের শক্তি ছিল—শুধু এই কারণেই আজও তাঁরা রাজনৈতিক জাপানের উপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করে বসে আছেন। মন্ত্রীসভার বা শাসনকার্য্যের কোথাও এতটুকু ত্রুটি হলেই এঁরা চীৎকারে সবাইকে অস্থির করে তোলেন। এক কথায় বলা যায় যে, এঁরা হচ্ছেন জাপানের রাজনীতিক কার্য্যের নিষ্ক্রিয় সমালোচক।

১৯৩১ সালে জাপানে যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, তাতে প্রধান মন্ত্রীর আসন পেয়েছিলেন ব্যারণ ওয়াকৎসুকী। ওয়াকৎসুকীর আগে হেমাগুচি জাপানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩০ সালের ১৪ই নভেম্বর প্রধান মন্ত্রী হেমাগুচি এক সামরিক কুচকাওয়াজে উপস্থিত থাকবার জন্তে টোকিয়ো রেলষ্টেশনে উপস্থিত হন; কিন্তু ট্রেণ ছাড়বার আগেই এক ব্যক্তি তাঁকে গুলী করে এবং সেই গুলী তাঁর তলপেটে লাগে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে হেমাগুচি কার্য্যভার ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তাঁর স্থানে পররাষ্ট্র-সচিব ব্যারণ শিদেহারাকে অস্থায়ীভাবে



সমুদ্র-বেষ্টিত জাপান

প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে বলা হয়। কিন্তু ব্যারণ শিদেহারার কার্য্যে সকল সম্প্রদায়ের লোক সুখী হ'তে না পারায়, ১৯৩১ সালের ১৪ই এপ্রিল পরবর্ত্তী মন্ত্রীসভা গঠন করবার জন্য ব্যারণ ওয়াকৎসুকীকে আদেশ দেওয়া হয়; এবং তিনি যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন তা' হেমাগুচির সময়কার মন্ত্রীসভার নামান্তর মাত্র। ফলে নীতি বা কার্য্যপন্থার দিক দিয়ে এই মন্ত্রীসভা বিশেষ কোন নূতনত্বের পরিচয় দিতে পারেনি। সেইজন্যে তাঁর শাসনকালের আয়ুও অত্যন্ত শীঘ্র নিঃশেষ হয়ে গেল। জাপানের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর নাম—ইনুকাই। এই প্রবন্ধ রচনার সময়,



কবরী-শোভা—বালিকাদের

টোকিয়ো থেকে রুটার যে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, তা'তে জানা গেল যে, কতকগুলি লোক তাঁর বাসভবনে প্রবেশ করে প্রধান মন্ত্রী ইনুকাইকে গুলী করেছে। এই গুলী করাটাকে জাপানের আধুনিক ইতিহাসে কেবলমাত্র পুরাতনের পুনরাবৃত্তি বলে মনে করলে বোধ হয় ভুল হ'বে। এর আড়ালে হয় ত কোন রাজনীতিক বিক্ষোভ ঢাকা আছে, কে জানে!

জাপানের আধুনিকতম রাজনীতিক ঘটনা হচ্চে—চীনের সঙ্গে জাপানের লড়াই। এই যুদ্ধে জাপানী সৈন্যরা চীনের যে ক্ষতি করেচে তাতে কেবল তার উপরেই একখানি স্বতন্ত্র বই লেখা যেতে পারবে এবং এই ঘটনা এত সম্প্রতি ঘটেচে



কবরী-শোভা—প্রাচীন-পদ্ধতি

যে তার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। তার চেয়ে বোধ করি, চীন-জাপানের সম্পর্কটা কেন এমন বিষময়



পুতুল-নাচে পৌরাণিক দৃশ্য

হয়ে উঠল, সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯৩১ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে জাপানের পার্লামেন্টের সভায় পররাষ্ট্র-সচিব ব্যারণ শিদেহারা বলেছিলেন যে, চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক বজায় রাখাই তাঁদের উদ্দেশ্য এবং এই জন্যেই ইয়েন-সিং-চিয়াং এবং ফেং-উ-সিয়াংএর বিদ্রোহ দমিত হতে দেখে তাঁরা আনন্দ-বোধ করেচেন। এই সময় অনেকে না কি জাপানকে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে বলেছিল; কিন্তু নানকিং গভর্ণমেন্টের প্রতি জাপানের সদাশয়তা না কি অসীম, তাই জাপান এই প্রস্তাবে কান দেয় নি। তা ছাড়া, কিছুদিন পূর্ব্বেও জাপানের বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীরা যত্র-তত্র ঘোষণা করে বেড়িয়েচেন যে, প্রতিবেশী চীনের সঙ্গে বন্ধুভাবে পাশাপাশি বাস করাই তাঁদের উদ্দেশ্য এবং এই সেদিন



পুতুল-নাচের আর একটী দৃশ্য

চীন থেকে এক দল ইঞ্জিনিয়ার এসেছিল জাপানের রেল-পথ-পরিচালন-ব্যবস্থা দেখে যেতে; জাপানী পুলিশের কার্য্য-কলাপ দেখে শিক্ষা করবার জন্য চীন একদল পুলিশ কর্ম্মচারীও জাপানে পাঠিয়েছিল এবং চীন জাপানকে না কি দুটী বড় বড় ক্রুইজার তৈরী করে দেবার ভারও দিয়েছিল বলে শোনা যায়।

কিন্তু এই মধুর সম্পর্ক হঠাৎ এমন তিক্ত হয়ে উঠল কি করে? ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা এবং অসুবিধাই যে এর একটা মস্ত কারণ তা বললে বোধ করি ভুল হয় না। এই দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে সন্ধি ছিল, সেইটেই সকলের চেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল এবং সে কাজে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করল মাঞ্চুরিয়া। রুশ আর জাপানীদের লড়াইয়ের পর মাঞ্চুরিয়ায় এই দুই দেশের একটা ঐতিহাসিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কিন্তু জাপানের মতে চীনের গভর্ণমেণ্ট না কি এই সম্বন্ধবিরোধী কতকগুলি কাজ করছিল। মাঞ্চুরিয়ার স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট রেল-পথ সম্বন্ধে এমন এক ব্যবস্থা করেন,—জাপানের মতে যা দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ার রেলপথের স্বার্থের বিরোধী। সেখানে বিদেশীরা বহিষ্কৃত হয়, এবং জাপানীদের ট্যাক্সের গুরু ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়। জাপানী ব্যবসায়ীরা যা'তে নিরুপদ্রবে ব্যবসা চালাতে না পারে সেজন্য সকল প্রকারে চেষ্টা করা হয়। চীনা ব্যবসায়ীদের সাহায্যে যাতে জাপানী পণ্য রপ্তানী করা সম্ভবপর না হয়, সে জন্যও চেষ্টার ত্রুটী থাকে না। এ সমস্তই জাপানের নিজের কথা। এর কতটা সত্যি, আর কতটা নয়, তা নিয়ে পরে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। এখন কেবল জাপানের মনোভাবটা খুলে দেখাবার চেষ্টা করচি।

মুকদেন প্রাসাদ থেকে এক মাইল উত্তরে—কায়োলিয়াং প্রান্তরের মাঝখানে পী-তা-ইং নামে একখানি প্রকাণ্ড বাড়ী। চীনের উত্তর-পশ্চিম বাহিনীর সপ্তম বৃগেড এই বাড়ীখানিতে আস্তানা পেতে বাস করছিল। ওয়াং-ই-চে ছিলেন এই বৃগেডের জেনারেল। জাপানীরা বলে যে চীনের এই তরুণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনা-নায়কটী না কি জাপানীদের কাল্পনিক শত্রুরূপে খাড়া করে নিজের অধীনস্থ সৈন্যদের শিক্ষা দিতেন। এই সৈন্যদলের আড্ডা থেকে কিছু দূরেই দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেল-পথের সুরু। জাপানী সৈন্যরা এই রেলপথ পাহারা দিত এবং ওয়াং-এর দল না কি তাদের প্রতি আদৌ প্রসন্ন ছিল না।

১৯০৫ সালে পোর্টসমাউথ সন্ধি অনুসারে জাপান এই দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেলপথে কিছু দূর অন্তর ১৫ জন করে লোক রাখবার অধিকার অর্জ্জন করেছিল। কিন্তু—জাপানের মতে—চীন না কি ক্রমে এই সন্ধির সর্ত্ত অবহেলা করে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হতে থাকে। জাপানের অধিকার

নষ্ট করবার জন্ম একটা আন্দোলনও চীনে আত্মপ্রকাশ করে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই রেলপথের পাহারায় নিযুক্ত জাপানী সৈনিকরা চীনা সৈনিকদের দ্বারা ক্রমাগত অপমানিত হতে থাকে। জাপানের মতে এই দুই দলের সৈন্সরা যে তখনই পরস্পরকে আক্রমণ করে নি, এইটেই বিস্ময়ের বিষয়।

১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর; বেলা দশটা ২০ মিনিট। লিউতিয়াও কেউর ছোট্ট একটী সেতুর নিকট এক বিস্ফোরণের শব্দে জাপানী সৈন্সরা চকিত হয়ে উঠল। এই সেতুটী চীন-সেনানিবাসের পশ্চিমে এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে ব্যারাকের অত্যন্ত নিকটে। শব্দ শুনে তারা ছুটলো সেই দিকে এবং কোয়ালিয়াং প্রান্তরে তাদের উপর গুলী বর্ষিত হ'ল। ফলে একটা সংঘর্ষ বেধে গেল। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী সৈন্সদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প। জাপানের মাত্র তিনটী ব্যাটেলিয়ান, কিন্তু চীনের ৬টীর উপর বৃগেড। তবু জাপানী সৈন্সদল চীনের সেনানিবাস আক্রমণ করল এবং ১৯শের তারিখে মধ্যাহ্নের মধ্যে প্রাচীর-ঘেরা মুকদেন সহর দখল করে নিল। এর পর আরও দুএকটী ছোটখাট সংঘর্ষের পর চীনের সৈন্সদের নিরস্ত হতে বাধ্য করা হল এবং চার হাজার জাপানী সৈন্স তাদের এবং রেলপথের নির্ব্বিঘ্নতার জন্যে অগ্রসর হ'তে হ'তে চিলিন, তুন্‌হুয়া, চেংচিয়াতুন্, তুংলিয়াও এবং তাওনান্ দখল করে ফেলল। ২৫শে তারিখ থেকে জাপান উপরিউক্ত অধিকৃত স্থানগুলি থেকে সৈন্সদল প্রত্যাহার করে নিয়ে বললে যে, কেবল রেলপথ ও সেই অঞ্চলের জাপানীদের জীবন নির্ব্বিঘ্ন করবার জন্যেই তারা এতদূর অগ্রসর হয়েচে। ২৫শে তারিখে জাপান এ কথা বিশ্বের অন্যান্য শক্তিকে জানিয়ে দিয়ে বলল যে, এখন দুই দেশের সোজাসুজি আপোষের কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন এবং চীন যদি সোজাসুজি আলোচনায় যোগদান করতে সম্মত না হয়, তা হ'লে দুই জাতির মধ্যে আরও অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হ'বে এবং তখন জাতি-সঙ্ঘ হস্তক্ষেপ করলেও সহজে কোন ফল হ'বার সম্ভাবনা থাকবে না।

ভিতরের কথা বিশেষ কিছু প্রকাশ না পেলেও এটুকু অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে, কথাবার্ত্তা বেশী দূর অগ্রসর হয় নি এবং অগ্রসর হলেও তা বিশেষ সুবিধাজনক হয় নি। মাঞ্চুরিয়া নিয়ে এই বিদ্বেষ প্রশমিত হ'বার কোন পথ না পেয়ে এই দীর্ঘ দিন ধরে ভিতরে ভিতরে ধোঁয়াচ্ছিল;



দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেল-পথে জাপানী সৈন্সদের পাহারা

তার পর সে দি'ন হঠাৎ তার নগ্ন মূর্ত্তি সংগ্রামের বীভৎসতা নিয়ে নিজেকে সমস্ত পৃথিবীর সামনে প্রকট করে তুলল। কিন্তু চীনের সঙ্গে জাপানের বিরোধের কারণ বোধ করি



জাপানের মহিলা মোটর-চালক

কেবল এইটুকুই নয়। এই সংগ্রামে যত কথা ব্যক্ত হয়েচে তার তুলনায় অনেক কিছু অব্যক্ত থেকে গেছে বলে মনে

হয়। কেউ কেউ বলেচেন যে, এই সংগ্রামের পিছনে তৃতীয় কোন পক্ষের প্ররোচনা আছে; নইলে সামান্য একটা রেলপথ সংক্রান্ত এই বিরোধের ঘরোয়া মীমাংসা হওয়া হয় ত একেবারে অসম্ভব ছিল না। বিদেশের অনেক সংবাদপত্র এই সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার নাম করেচে এবং অনেক সংবাদপত্র এমন কথা বলতেও ইতস্ততঃ বোধ করে নি যে চীন-জাপান ছাড়া একাধিক শক্তির একটা গূঢ় মনোভাব না কি এই দুই দেশের অপ্রীতিকর মনোমালিন্যের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে এবং সেই শক্তিগুলি শক্তি, সামর্থ্য এবং রাজ্যলোভে না কি পৃথিবীর কয়েকটী সেরা জাতি বলে পরিচিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করে, কৃতনিশ্চয় হয়ে কোন কথা বলবার সময় এখনও আসে নি; সুতরাং এই বিষয় নিয়ে বেশী কথা বলতে যাওয়ার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

আগামী সংখ্যায় জাপানের ব্যবসায় বাণিজ্য এবং গণ-আন্দোলনের কথা আলোচনা করব।

চিত্র-লেখা

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ-রায়

(এক)

ছবি আঁকত সে। দিন নাই, রাত নাই, শুধু আঁকতই। তন্ময় হ'য়ে আঁকত। চিত্র-লেখা হঠাৎ কখন বন্ধ হ'য়ে যেত। আকাশ-পানে সে তুলিকা-হাতে চে'য়ে থাকত। কি যে চায়, কেউ বোঝে না—বুঝত সুধু সে-ই। তার স্নিগ্ধ আঁখির অনিমেষ দৃষ্টি যখন আকাশেই লীন, আকাশ তখন হয় ত বৈচিত্র্য-বিহীন। তার দৃষ্টিরই মতন আকাশও যেন একটা অর্থ-হীন সৃষ্টি। আকাশের গায় মেঘেরা তখন সুপ্তি-মগন, নাই হেথা আষাঢ়ের বাদল-বরিষণ—শ্রাবণের দেয়া-গরজন; নাই হেথা রক্ত-উষার সুষমা—গোধূলির লালিমা। নির্ব্বাত নিষ্কম্প আকাশ—নাই হেথা ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বিলাস; নাই অমানিশায় সন্ধ্যা-তারার দীপালি, নাই জ্যোছনা-রাতে চন্দ্রালোকের ঝর্ণা-ধারা—পাপিয়ার গীতালি।

খেয়ালী চিত্রকর। তবু সে চে'য়েই থাকত। তার সে চে'য়ে-থাকা মুরতি, যেন পটুয়ার পটে-আঁকা ছবিটি। হাতের তুলিকাটি খ'সে পড়ত শিথিল করাঙ্গুলির ফাঁকে। কখন, তা' সে টের পেত না। তুলিকার ডগায় রঙের অনুলেপটুকু শুকিয়ে যেত। চিত্র-লেখন শেষ হ'তে পারত হয় ত আর কয়টি রেখাঙ্কনে, না-হয় খানিকটা বর্ণ-সম্পাতে। চিত্রখানি অসমাপ্ত, তুলিকাটি কর-চ্যুত। তারা পরিত্যক্ত, অবহেলিত হ'য়ে পড়ে' থাকত এখানে-সেখানে।

চিত্রকরের এই যে চাওয়া, সে কি চাওয়ার জন্যেই চাওয়া, না কোন্ না-পাওয়াকে পাওয়ার জন্যে চাওয়া, তা কে জানে?

তার লেখন শেষ হ'ত যে-চিত্রে, সেখানি হ'ত একটা অপূর্ব্ব বস্তু। একটা পরিপূর্ণ সৃষ্টির রস-ধারা উৎসারিত হ'ত তারই মধ্যে দিয়ে। পরিকল্পনায়, অঙ্কন-নৈপুণ্যে, বর্ণ-সম্পাতে সে কি মনোরম, অতুলনীয়!

(দুই)

ঘন বন। বনান্তে গিরি। গিরি-গাত্রে নির্ঝরিণী। ঝর-ঝর সে নির্ঝর-ধারা। সে স্বচ্ছ নির্ম্মল জল-ধারা নিয়ে বহমান। কিছু দূরে অনুচ্চ উপল স্তূপে প্রতিহত হ'য়ে তারই মন্দীভূত গতি দু'ধারে রেখাকারে প্রবাহিত। উপল-স্তূপের সামনে খানিকটা সমতল স্থানে ছায়া-শীতল তরুতলে একখানি কুটীর।

কুটীরের তিন দিকেই পত্র-পল্লবে-শোভিত কয়েকটি বৃক্ষ। দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে অর্দ্ধ-চক্রাকারে তারা দাঁড়িয়ে। পুষ্পিত লতার আবেষ্টনে সুশোভন সে তরু। তরুর আশ্রয় ছে'ড়ে লতাগুলি স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে গিয়েই এলিয়ে পড়েছে কুটীরের বিচিত্র ছাউনির 'পরে। লাজ নমিতা লতিকার আচ্ছাদনে, মনে হয় যেন, কুটীরখানি রচিত লতা-বিতানেরই ছায়ায়।

বিচিত্র সে কুটীর। একখানি সুলিখিত আলেখ্যেরই মতন। কুটীরের ভিতরে-বাইরে সুনিপুণ শিল্পীর কারু-কৌশলের অভিনব স্ফূর্ত্তি। রস-পিপাসু শিল্পীর সরল চিত্তটির খোঁজ মিল্‌তে পারে সে কুটীরখানিতে, কুটীরে থাকে এই চিত্র-শিল্পী। তারই নিজ হাতে রচিত এ কুটীরখানি।

(তিন)

সে রাজ্যের রাজা এলেন শীকারে। পথ হারিয়ে উঠ্‌লেন সে পাহাড়ে। কুটীরে গিয়ে দেখ্‌লেন ওই শিল্পীরে। সে তখন চিত্রাঙ্কনে নিরত। যেন যোগাসনে তাপস সমাহিত-চিত্ত। সম্মোহিতের মত রাজা চে'য়ে রইলেন। রাজা দেখ্‌তে পেলেন, চিত্র-লেখক তার রসাল চিত্তটি উজাড়ি করে' দিয়েছে সে চিত্রে। তারই মোহন তুলিকায় উচ্ছল রস-ধারা শত ধারায় ব'য়ে যায়।

রাজা ভাব্‌লেন—এ ধ্যানীর ধ্যান ভঙ্গ হ'লে রস-সৃষ্টির ব্যাঘাত হবে। বেরিয়ে এলেন রাজা। যেম্‌নি নিঃশব্দে কুটীরে গেলেন, তেম্‌নি নিঃশব্দে বেরুলেন। শিল্পী এর কিছুই টের পায়নি।

একদিন রাজান্তঃপুরে রাজা শীকার-কাহিনী বল্‌ছিলেন। রাজমহিষী, রাজ-কুমারী, রাজ-পরিবারের আরো সব মহিলারা সেখানে বসে'। সেদিনের শীকার-কাহিনীতে কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। শুধু সে চিত্রকরের কথা রাজা যখন বল্‌তে লাগ্‌লেন, সবাই নিবিষ্ট-চিত্তে তা' শুন্‌লেন।

চিত্রকরের কাহিনীতে সব চে'য়ে বেশী আকৃষ্টা হ'ল রাজকুমারী। ষোড়শী রূপসী সে রাজকুমারী। ললিত-কলা-বিদ্যায় অনুরাগিনী। নিজে চিত্র-বিদ্যার অনুশীলন করে। চিত্রকর আর তার চিত্র দেখ্‌তে চাইলে রাজকুমারী। রাজ-সভায় ডাক পড়্‌ল সে চিত্রকরের।

(চার)

চিত্রকরের খোঁজ হ'ল। সে রাজ-সকাশে। রাজাদেশে রাজ-শিল্পীর পদে তার নিয়োগ হ'ল। তার ডাক পড়্‌ল রাজান্তঃপুরে।

তরুণ সে শিল্পী। সুস্থ, সুশ্রী। রাজকুমারী দেখ্‌তে পেল—তার সুন্দর দু'টি আঁখির দৃষ্টিতে যেন একটা মায়াপুরীর সৃষ্টি। বিশ্ব শিল্পী অমিয়-সাগর মন্থন করে' দু'টি চোখে অমিয়-রাশি ঢেলে' দিয়েছেন।

রাজকুমারী চিত্রাঙ্কন শেখে তার-ই কাছে। রাজকুমারীর একাগ্র সাধনায়ও সে চিত্রখানি পরিপূর্ণ রূপ পেল না, রাজ শিল্পীর তুলিকার খানিকটা বর্ণ-সম্পাতে সে চিত্র সম্পূর্ণ হ'ল। চিত্রাঙ্কনে রাজকুমারীর নিপুণতা স্বভাব-জাত। রাজকুমারী আশৈশব চিত্র-বিদ্যার অনুশীলন করে' আস্‌ছে। রাজ্যের কত বিশিষ্ট কলাবিদের প্রশংসা সে পেয়েছে।

একদিন একখানি চিত্রে রাজকুমারী কত করে'ও তার পরিকল্পিত ভাবটি ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌ল না। শিল্পীর তুলিকায় কয়েকটি রেখাঙ্কনে ভাবটি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। রাজকুমারী ভাব্‌ত—এ চিত্রকর, না যাদুকর!

শিল্পী যখন চিত্র-লেখায় নিরত, রাজকুমারীর মুগ্ধ দৃষ্টি তখন তার-ই পানে। তার কম করের চম্পকাঙ্গুলির ফাঁকে মোহন তুলিকাটির লীলায়িত গতি ও মৃদু কম্পন—জাগিয়ে তুল্‌ত রাজকুমারীর স্নিগ্ধ বুকের মাঝে কি একটা স্পন্দন। সে খেয়ালী শিল্পী উদাস নয়নে যখন আকাশে চে'য়ে থাক্‌ত, করুণায় ভরে' উঠ্‌ত তখন তার নারী-চিত্তটি।

(পাঁচ)

শ্রাবণ-শেষে। শুক্লা-ত্রয়োদশীর রাত্রি। বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশ নীল-নির্ম্মল। নিঃশেষ বরিষণে মেঘ দান-রিক্ত —জল-ভার-শূন্য। নীল আকাশে চাঁদের আলো ছড়িয়ে গেছে। ধরণী হাস্যোজ্জ্বলা। রাজান্তঃপুরের স্বচ্ছতোয়া সরসীর দূর্ব্বাদল-শ্যামল তীরে নীপ-বনে চিত্রকর উপবিষ্ট। প্রস্ফুট কদম্ব-কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধে বিভোর বাতাস। নীপ-কুঞ্জে নিরালা বসে' আকাশের পানে চে'য়ে সে চিত্রকর। প্রকৃতির রসাল বক্ষ হ'তে সৌন্দর্য্য-সুধা-ধারা উৎসারিত। আর তার পিপাসিত দু'টি আঁখি সে সুধা-ধারা পানে নিরত।

রাজকুমারী তার পাশে দাঁড়িয়ে। ডাক্‌ল—"শিল্পী! শিল্পী!" রাজকুমারীর কণ্ঠ-স্বর করুণ—কোমল। শিল্পী তন্ময়। সে কণ্ঠ-স্বর তার কানে পৌঁছয় নি। রাজকুমারী তাকে আরো কতদিন এমনটি পে'য়ে এম্‌নি করে'ই ডেকেছে। সাড়া পায় নি বলে' ব্যাথাহত হ'য়ে নিঃশব্দে চলে' গেছে; বলেছে—এ পাষাণ-দেবতা। রাজকুমারী ভাব্‌ল, আজ আর সে এম্‌নি ফিরে' যাবে না।

কার পুষ্প-পেলব পরশে শিল্পী অকস্মাৎ কল্পলোক

থেকে নেমে এল। এ পরশখানি কি তার মানসীর? আঁখি ফিরিয়ে দেখ্‌তে পেল, পাশে বসে' রাজকুমারী। তারই দু'খানি হাতের মধ্যে শিল্পীর হাতখানি—যেন, কনক-চাঁপায় অঞ্জলি ভরে' পূজারিণী প্রতীক্ষমানা। শিল্পী ভাব্‌ল—এ কি স্বপ্ন! অপলক দৃষ্টিতে স্বপ্ন-বিহ্বলের মতন সে রাজকুমারীর পানে চে'য়ে। "শিল্পী! শিল্পী! ভয় পেয়েছ?"—সকরুণ কণ্ঠে রাজকুমারী জিজ্ঞাসে। অস্ফুট স্বরে শিল্পী কহে—"না।" "শিল্পী! আমায় বল না, তোমার আঁখি দু'টি কার খোঁজে এম্‌নি পাগল!" রাজকুমারীর কণ্ঠ-স্বরে কত মিনতি। শিল্পী মৃদুকণ্ঠে কহে—"আমার মানসীর।" "কে তোমার মানসী?"—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসে রাজকুমারী। শিল্পী নিরুত্তর। রাজকুমারীও নীরব। ক্ষণেক পরে শিল্পী কহে—"রাজকুমারী! আর কত দিন আমাকে এম্‌নি বন্দী থাক্‌তে হবে?" শিল্পীর কণ্ঠ-স্বরে কি গভীর বেদনা! রাজকুমারীর মরমে গিয়ে পৌঁছ্‌ল তা'। "তুমি ত বন্দী নও শিল্পী!"—সমবেদনা-ভরা কণ্ঠে রাজকুমারী কহে। বিস্মিত হ'য়ে শিল্পী জিজ্ঞাসে—"বন্দী নই রাজকুমারী?" তেম্‌নি সমবেদনা-ভরা কণ্ঠে আবার রাজকুমারী কহে—"বন্দী নহ তুমি, শিল্পী!"

নীপ-বন ছে'ড়ে বাপী-তটের দূর্ব্বা-কোমল সরু পথটি বে'য়ে চল্‌ল সে খেয়ালী শিল্পী। রাজকুমারীর সাশ্রু নয়নের অনিমেষ দৃষ্টি তারই পানে। ভাব্‌ল, ডাকি তারে। মুখে কথা ফুট্‌ল না। আবার ভাব্‌ল, যাই তার পেছনে ছু'টে। চরণ চল্‌ল না। ভূমি-পথে সে তার পদ-চিহ্ন রে'খে যায় নি, রে'খে গেছে শুধু রাজকুমারীর চিত্ত-পথে তার অস্পষ্ট চরণ-রেখাটি।

(ছয়)

চিত্রকর কুটীর-দুয়ারে। উষার অরুণ-রাঙা হাসি তখন পূব-আকাশের ভালে ফু'টে উঠেছে। তার ডাক শু'নে বনের পাখীরা সব কল-কাকলীতে কুটীর-আঙিনা মুখরিত করে' তুল্‌ল। কেউ তার হাতে, কেউ তার মাথায়, কেউ কাঁধের 'পরে এসে বস্‌ল। তার পায়ের কাছে ছুটোছুটি কর্‌তে লাগ্‌ল কতগুলো। একটিকে ধরে' সে চুমো খে'য়ে ছে'ড়ে দেয়, আর-একটিকে বুকের পরশটি দিয়ে উড়িয়ে দেয়। হরিণ-শিশুরা ছু'টে এল সেখানে। একটি তার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ল, তার পদ-লেহনে তৃপ্ত আর-একটি—সব চে'য়ে ছোট্টটির কচি কচি চোখের মিনতি-ভরা দৃষ্টি তারই মুখ-পানে।

কুটীরে এসে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ল কতদিন পরে। রাজপুরীর আবহাওয়া তার ভালো লাগে নি।

উপল-স্তূপ বে'য়ে দাঁড়াল গিয়ে সে নির্ঝরের ধারে। তখন ঠিক্‌রে পড়েছে প্রভাত-রবির কিরণ—স্বচ্ছ, শুভ্র ঝর্ণা-ধারায়। হীরার ছোট্ট টুক্‌রোগুলো যেন জ্বলছে তার-ই মাঝে মাঝে।

(সাত)

একদিন অপরাহ্ণে রাজকুমারীর প্রেরিত দূত এল সে কুটীরে। চিত্রকরের হাতে দিল রাজকুমারীর প্রেরিত লিপিকা। খুলে' দেখে সে—রাজকুমারীর নিজ হাতে আঁকা ছোট একখানি চিত্র। মুগ্ধ নয়নে চে'য়ে রইল সে চিত্র-পানে।

চিত্রের পরিস্ফুট ভাবটি—শ্যাম-বনানীর প্রান্তে তমাল-ডালে পত্র-পল্লবের আড়ালে বিহগী কত যত্নে নীড় রচনা করেছে। বেলা-শেষে ফিরে এল সে। এল না তার সাথীটি। বিহগী আর কুলায় যায় না। সন্ধ্যার ম্লান ছায়া নে'মে আস্‌ছে। সে বসে' আছে তমালেরই ডালে তার সাথীটির প্রতীক্ষায়। তার কালো ছোট্ট দু'টি চোখ ছলছল। মৃদু কম্পিত চঞ্চু-পুটে কি গভীর মরম ব্যথা উঠ্‌ছে ফুটে'। শিল্পী অনুভব কর্‌ল, রাজকুমারী সারা চিত্তটি উজাড় করে' রস-ধারা নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে সে চিত্রে। শিল্পীর আঁখি দু'টি দিয়ে ঝরে' পড়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু।

রাজকুমারীর চিত্র-লিপির উত্তরে লিখিত হ'ল আর একখানি চিত্র-লিপি। নিশি ভোর করেছে সে চিত্র-লেখায়। প্রভাতে রাজ-দূতের হাতে দিল সে লিপিখানি।

(আট)

রাজান্তঃপুরে ফিরে' এসে রাজ-দূত সে লিপি দিল রাজকুমারীর হাতে। আদি-অন্ত সমস্ত সে বলে' গেল। চিত্রকরের অশ্রু-জলের অভিনন্দন, লিপি-লেখায় বিনিদ্র রজনী যাপন—কিছুই সে বল্‌তে ভোলে নি।

রাজ-দূত চলে' গেল। তখন সন্ধ্যা। রাজপ্রাসাদ সহস্র স্বর্ণ-প্রদীপের আলোতে উজ্জ্বল। রাজকুমারী একাকিনী লিপি খুলে' প্রদীপালোকে বসে'। বুকের ভিতর ঘন স্পন্দন। শিল্পীর লিখিত চিত্রে পাঠ কর্‌ল সে—নীল আকাশের ছায়া-তলে জ্যোছন'-সায়র। অচ্ছোদ-সরসী-নীরে ভাসমান প্রস্ফুট কমলের মত সে জ্যোছ্‌না-সায়রে কত শত চন্দ্রমা ফুটে' রয়েছে আলোর বিচিত্র পাপ্‌ড়িগুলো মেলে'। তার-ই মাঝে শিল্পী-মানসী অপরূপ রূপে প্রতিভাত। মানসীর ললিত অঙ্গের লাবণি আকাশ-ভুবন উজল করে' তুলেছে। সে জ্যোছ্‌না-সায়রের লহরে লহরে তার দেহ-লতিকা দুল্‌ছে। তার স্নিগ্ধ দু'টি আঁখির মৌন আহ্বান নে'মে আস্‌ছে জ্যোছ্‌নালোকের ঝর্ণা-ধারায়।

রাজকুমারীর সুন্দর দু'টি চোখের কূল ছাপিয়ে অশ্রু-ধারা প্রবাহিত। চিত্র-লেখা মুছে' গেল সে অশ্রু-জলে।

শোক-সংবাদ

যোগাচার্য্য স্বর্গীয় আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী

সাংখ্য-যোগাচার্য্য হংসস্বামী ব্রহ্মর্ষি শ্রীমৎ কেবলানন্দ ভারতীতীর্থ মহারাজ যিনি পূর্ব্বাশ্রমে আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী বেদান্ত-সরস্বতী নামে পরিচিত ছিলেন, ১৩৩৮, ২৪এ চৈত্র রাত্রি ৯—৩১ ঘটিকার সময় ৺কাশীধামে সজ্ঞানে বিদেহ হইয়াছেন। ইনি কাশীধামস্থ ৺যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট যোগক্রিয়ার দীক্ষা গ্রহণ করেন। খুলনা জেলার ঘরসঙ্গ গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী দিবসে শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ম হয়। শৈশব কাল হইতেই তিনি ধর্ম্মপিপাসু ও মেধাবী ছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় তিনি নিজের চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার যত্নে সংস্কৃত কলেজ হইতে কাব্য, ন্যায় প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লাহোরের প্রাজ্ঞ বিশারদ ও শাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের সঙ্কল্প করেন, কিন্তু মাতাঠাকুরাণীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া দার- পরিগ্রহ করিয়া সংসারী হন। কয়েক বৎসর পরে তিনি কাশীধামে গিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মানব-সমাজের কল্যাণার্থ বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দুইটি টোল স্থাপন করিয়া যুবকগণকে সংস্কৃত ও ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি দামোদর নদের তীরে ডিহিকা গ্রামে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আশ্রমে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহা প্রথমে ডিহিকা হইতে মুর্শিদাবাদ ও পরে তথা হইতে রাঁচিতে স্থানান্তরিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় গোড়া হইতে বরাবরই ঐ আশ্রমের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য ও কর্ণধার থাকিয়া ছাত্রগণকে ব্রহ্মচর্য্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষা দান করিতেন। পরে তিনি উপযুক্ত শিষ্যগণের হস্তে আশ্রম পরিচালনের ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং কাশীধামে গিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সেই-খানে লাহিড়ী মহাশয়ের যোগিরাজ আশ্রমে অবস্থান কালে তাঁহার দেহান্ত হয়।



স্বর্গীয় আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী

৺সুদর্শন চক্রবর্ত্তী

বিগত ২০এ বৈশাখ (১৩৩৯) মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন ৬টা ৪২ মিনিটের সময় রাজসাহীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল বিশ-

বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, আমাদের পরম বন্ধু সুদর্শন চক্রবর্ত্তী মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন।

১২৭৪ বঙ্গাব্দের ৩২এ আষাঢ় সুদর্শন বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পৈতৃক নিবাস ঢাকা—বিক্রমপুরের অন্তর্গত নৌলপরাণ গ্রামে হইলেও ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মস্থল সাধারণতঃ রাজসাহীতেই ছিল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজসাহী কলিজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা



স্বর্গীয় সুদর্শন চক্রবর্ত্তী

দিয়া সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বি-এল পাশ করিয়া সুদর্শনবাবু রাজসাহীতে ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৩০১ বঙ্গাব্দ হইতে তিনি রাজসাহীর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়া উহার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজসাহীর অ-মুসলমান নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। বিগত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের রাজসাহী অধিবেশনে তিনি রাজসাহীর পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সভার সভাপতিরূপে সমিতির ঐ অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত করেন। তিনি বহুকাল রাজসাহী কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে দেশের ও দশের সেবা করিয়াছিলেন। রাজসাহীর দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে তিনি রাজসাহী সহরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ একাডেমী নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি বহুকাল রাজসাহীর উকীলসভায় সভাপতিত্ব করেন, এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের নির্দ্দেশক্রমে সাময়িকভাবে ওকালতী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছিলেন।

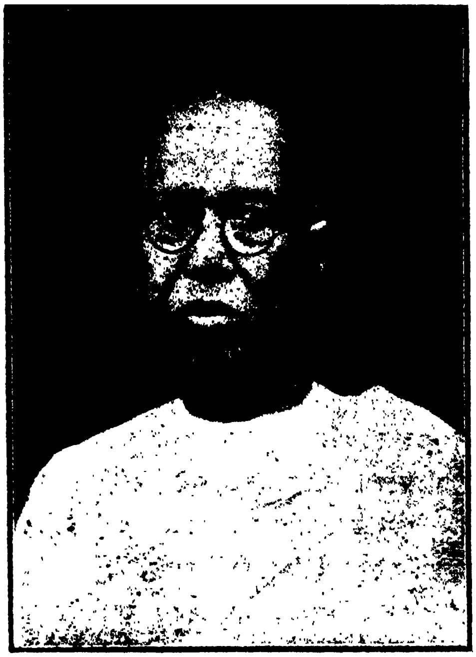
আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

পরলোকে বিপিনচন্দ্র পাল

নবযুগের বাঙ্গলার অদ্বিতীয় বাগ্মী, স্বদেশী যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, অনন্যসাধারণ রাজনীতি-পণ্ডিত, সুসাহিত্যিক, সুবিজ্ঞ সমালোচক ও বহুদর্শী সাংবাদিক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা সওয়া একটার সময়, পি, ৫০৯নং রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, বালিগঞ্জস্থিত ভবনে সন্ন্যাস রোগে লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর শ্রীহট্ট জেলার পৈল গ্রামে বিপিনচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামচন্দ্র পাল মুন্সেফ ছিলেন। বিপিনচন্দ্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে আসেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে, পরীক্ষার পূর্ব্বে পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনি এফ-এ পরীক্ষা দিতে পারেন নাই।

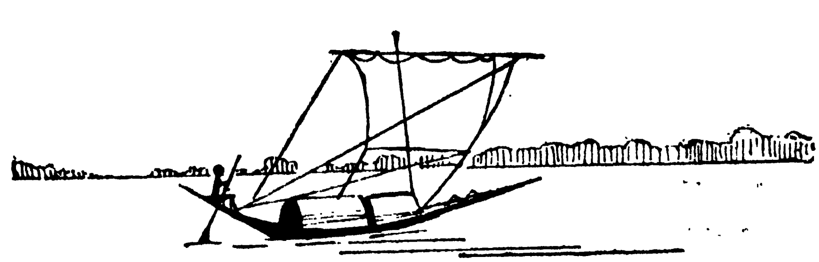
পর বৎসর পরীক্ষা দেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দেও তিনি পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যাপারের সংস্রবে পিতার সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি পরীক্ষা দেন নাই। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কটক এ্যাকাডেমীতে হেডমাষ্টার হইয়া গমন করেন। এই সময় কলেজের ছাত্রগণ স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাগ্মিতায় আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিলেন—বিপিনবাবু ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে তাঁহারা কেশববাবুর দল ত্যাগ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। কটক হইতে ফিরিয়া শ্রীহট্টে গিয়া বিপিনচন্দ্র "পরিদর্শক" নামে একখানি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রের প্রচার করেন। এই সঙ্গে তথায় একটি জাতীয় বিদ্যালয়ও তিনি পরিচালন করিতেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালোরের একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার হইয়া যান। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া সংবাদপত্রের সেবায় নিযুক্ত হন এবং ইংরেজী ও বাঙ্গলা প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। ১৮৮৭-৮৮ সালে তিনি লাহোরের ট্রিবিউন পত্রে কার্য্য করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারী ও লাইব্রেরীয়ান এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিবার পর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া দক্ষতার সহিত পরিচালন করেন। ১৯০৫-০৬ সালে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে মনে প্রাণে যোগদান করেন এবং চরমপন্থী-দলের অদ্বিতীয় নেতার আসন গ্রহণ করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আদালতের অবমাননার অভিযোগে তিনি ছয় মাসের কারাদণ্ড লাভ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গিয়া "স্বরাজ" নামক মাসিক পত্র বাহির করেন। ১৯১১ অব্দে স্বদেশে ফিরিয়া বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিবামাত্র রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়া এক মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া



স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল

"সত্তর বৎসর" নামে তাঁহার আত্মজীবনচরিত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি, এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।



সাময়িকী

আমাদের নববর্ষ—

এই মাসে 'ভারতবর্ষে'র বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। তাই, সর্ব্বাগ্রে বিশ্ব-বিধাতার পবিত্র নাম স্মরণ করিতেছি। তাহার পর আমাদের লেখিকা, লেখক, পাঠিকা, পাঠক ও অনুগ্রাহকবর্গকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আর যিনি এই পত্রের প্রতিষ্ঠাতা, সেই দেশবরেণ্য, পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলালের নাম পরম শ্রদ্ধান্তরে স্মরণ করিতেছি। যাঁহাদের সাহায্যে, যাঁহাদের অনুগ্রহে, যাঁহাদের সাহচর্য্যে 'ভারতবর্ষ' বিগত উনিশ বর্ষকাল বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছে, এ বৎসরও তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভে 'ভারতবর্ষ' নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে, এ বিশ্বাস তাহার আছে। নববর্ষে আমরা কি আয়োজন করিয়াছি, তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া আমরা স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিব না, পাঠকপাঠিকাগণ তাহা নিজেরাই দেখিতে পাইবেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, এতদিন যে-ভাবে 'ভারতবর্ষে'র সেবা করিয়া আসিয়াছি, উনিশ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখনও যথাশক্তি, যথাসাধ্য সে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্ত কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিব।

বিশ্বকবির স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দেড় মাসের অধিক কাল পারস্তদেশে ভ্রমণ করিয়া সুস্থ শরীরে, নিরাপদে বিগত ১লা জুন বুধবার অপরাহ্ণে বিমান-রথ হইতে দমদমায় অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীও তাঁহার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কবিবরের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের ভ্রমণ এখনও শেষ হয় নাই: শুনিলাম, তাঁহারা পক্ষকাল পরে বিমানযোগেই দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। বিশ্বকবি ও তাঁহার পুত্রবধূ যে এই বিঘ্নবহুল বিমান-পথ নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, এ জন্ত আমরা ভগবানের চরণে প্রণাম করি। কবি-সম্রাটের অসাধ্য কার্য্য নাই। যে বয়সে লোকে গৃহকোণ ত্যাগ করিতে ভীত হয়, সেই বয়সে তিনি কি না গেলেন পারস্ত-ভ্রমণে; তাও আবার বাষ্পযানে বা জলযানে নহে—একেবারে বিমান-রথে। তাঁহার এই পারস্ত-ভ্রমণ-কাহিনী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে; তাহ তেই কবি-সম্রাটের এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হইবে। এই স্থানে আর একটী কথার উল্লেখ করিব। বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারতবর্ষে' 'পারস্তে বিশ্বকবি' শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহার সমস্ত সংবাদই 'লিবার্টি' পত্রের নিজস্ব ছিল। আমরা সে কথা বলিতে ভুলিয়াছিলাম; আজ সেইজন্য 'লিবার্টি'-পরিচালকগণের নিকট ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

ময়মনসিংহে খণ্ডপ্রলয়।—

ময়মনসিংহ জেলার নানা স্থানে, বিশেষতঃ সহরের উপর দিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে যে ঘূর্ণাবর্ত্ত প্রবাহিত হইয়া অধিবাসী-



১নং। জেলখানার মধ্যের দোতালা দালানের যে ছাদ উড়িয়া গিয়াছে তাহাই দেখান হইয়াছে। সম্মুখে একটি একতালা দালান একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

দিগকে বিপন্ন ও সন্ত্রস্ত করিয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ পাঠকপাঠিকাগণ দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রেই পড়িয়াছেন। ময়মনসিংহের অন্যান্য স্থানের কথা থাকুক, ঐ স্থানের কারাগারের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত; কয়েক-জন বন্দী নিহত ও অনেকে আহত হইয়াছিলেন। আমাদের ময়মনসিংহ-প্রবাসী সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় ময়মনসিংহ কারাগারের ও নিকটবর্ত্তী স্থানের যে সকল আলোক-চিত্র নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকখানি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ সেই চিত্রগুলি প্রকাশিত হইল।

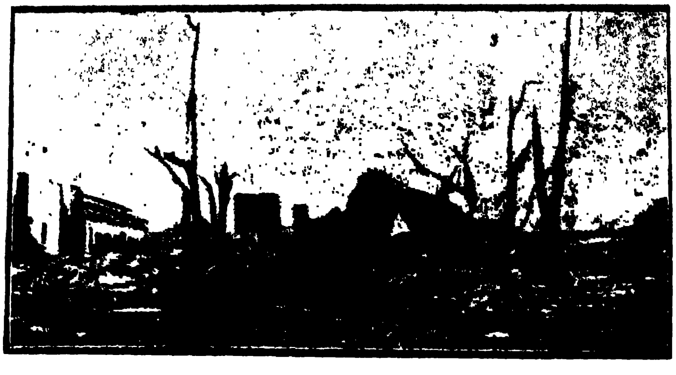
২নং। জেলখানার ভিতরের আরেকটি একতালা দালানের কোন চিহ্নই নাই। পশ্চাৎভাগের প্রাচীর একেবারেই পড়িয়া গিয়াছে। এইখানে কয়েক জন বিশেষ ভাবে আহত হইয়াছিল।





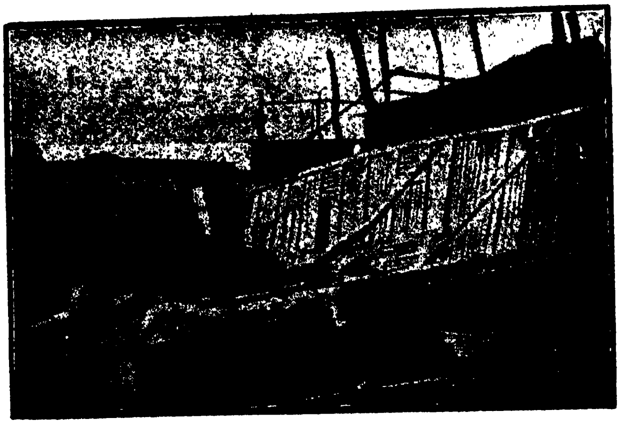
৩নং। উক্ত ২নং দৃশ্যের অপরাংশ।

৪নং। জেল ওয়ার্ডারদিগের ব্যারাক একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। দালানটি কত বড় ছিল তাহা 'ক্রশ' চিহ্ন দ্বারা দেখান হইয়াছে।





৫। 'কিসমৎ' গ্রামের একটি মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীর শেষ অবস্থা। এই গৃহের কয়েকটি বাসীন্দা মারা গিয়াছে এবং কয়েকটি আহত হইয়াছে।



৬নং। ঐ গ্রামের আরেকটি গৃহস্থের বাড়ীর অবস্থা। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বাড়ী।



৭নং। একটি অতি বৃহৎ ও বহু পুরাতন বট গাছের অবস্থা;— শিকড় উপড়াইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালায় নূতন অর্ডিনান্স—

বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করিবার উদ্দেশ্যে বিগত ২৮শে মে তারিখে ১৯৩২ সালের বেঙ্গল জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে।

১৯৩১ সালের বেঙ্গল জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্সের ৪১টি ধারা ছিল; নূতন অর্ডিন্যান্সে তৎপরিবর্ত্তে ৭টি ধারা আছে। ১৯৩১ সালের বেঙ্গল জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ ২৯এ মে শেষ হয়। নূতন অর্ডিন্যান্সে মাত্র ৭টী ধারা থাকার কারণ এই যে, উক্ত অর্ডিন্যান্সে প্রদত্ত বিভিন্ন ক্ষমতা পরে জেনারেল এমার্জ্জেন্সী পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্সে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স এখনও বলবৎ আছে। পূর্ব্বেকার অর্ডিন্যান্সে তিনজন হাইকোর্টের জজ লইয়া স্পেশাল ট্রাইবিউন্যাল গঠন করিবার বিধান ছিল; নূতন অর্ডিন্যান্সে ঐ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে অনুরূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। পূর্ব্বেকার অর্ডিন্যান্স অনুসারে বিধান করিবার প্রবর্ত্তন এবং সামরিক কর্ম্মচারীদিগের হাতে অধিকার প্রদান করিবার যে সব ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করা হইয়াছিল, নূতন অর্ডিন্যান্সে তাহা পুনরায় নূতন করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ঐ দুইটি ধারা কেবলমাত্র চট্টগ্রাম জেলাতেই প্রযুক্ত হইবে, ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে ঐগুলি অন্য কোন জেলায় প্রবর্ত্তন করা যাইবে না। ২নং অর্ডিন্যান্স অনুসারে যে সব মামলার বিচার করিতে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, অথবা বিচার আরম্ভ হইয়াছে, সেগুলি সমাধা করিবার বিধান ৪ ধারাতে করা হইয়াছে। আসামীরা যে সব আপীল করিয়াছে ঐ ধারা অনুসারে সেগুলির শুনানী সম্ভব হইবে এবং পূর্ব্ব অর্ডিন্যান্সে দণ্ডিত আসামীরা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবে। তিনজন হাইকোর্টের জজকে লইয়া স্পেশাল ট্রাইবিউনাল গঠনের ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু বৈপ্লবিক অপরাধ-সম্পর্কে প্রাণনাশের চেষ্টার অপরাধে বঙ্গীয় ফৌজদারী বিধি সংশোধন আইন অনুসারে কমিশনারদের দ্বারা বিচারের ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হইয়াছে। পূর্ব্বকার অর্ডিন্যান্স অনুসারে তিনজন হাইকোর্টের জজদের বিচারে প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিবার অধিকার ছিল না। কিন্তু এখন তিনজন কমিশনারের দ্বারা বিচারে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিবার অধিকার থাকিবে। ঐ তিনজন কমিশনার হাইকোর্টের জজ হইবেন না, তাঁহারা দায়রা জজের পদমর্য্যাদাসম্পন্ন হইবেন। ষষ্ঠ ধারায় পর্দ্দার আড়ালে বিচারের অধিকারপ্রদত্ত হইয়াছে। কোন্ অপরাধ বৈপ্লবিক বলিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিলে সেই মামলার বিচার বঙ্গীয় ফৌজদারী বিধি সংশোধন আইন অনুসারে কমিশনারদের দ্বারাই হউক, কিংবা জেনারেল এমার্জ্জেন্সী পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্স অনুসারে স্পেশাল জজ এবং স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটদের দ্বারাই হউক, উভয় ক্ষেত্রেই পর্দ্দার আড়ালে হইতে পারিবে। সপ্তম ধারায় বেয়াড়া আসামীদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বঙ্গীয় ফৌজদারী বিধি সংশোধন আইন অনুসারে নিযুক্ত কমিশনারদিগকে কতকগুলি ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

ভারতে বিদেশী বস্ত্র আমদানী—

গত ২১শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে এবং ১৯৩১ সালের অনুরূপ সপ্তাহে কত হাজার গজ বিদেশী বস্ত্র ভারতে আমদানী হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কোরা কাপড়

বন্দর	২১শে মে	গত বৎসর
কলিকাতা	১০৫৩	৪২০
বোম্বাই	১৫৫০	৯২২
করাচী	২৭৬	×
মাদ্রাজ	৩৬০	১১৬
রেঙ্গুণ	২০৯	৯৮

ধোয়া কাপড়

কলিকাতা	৭৩৭	৮৯০
বোম্বাই	৯২২	৩৭০
করাচী	৬২১২	
মাদ্রাজ	১৪	
রেঙ্গুণ	১৬৭৫	

রকমারি কাপড়

কলিকাতা	৯৬১	৫৮৩
বোম্বাই	১৮১৫	৫৮৩
করাচী	৩০৫৬	৪৯৫
মাদ্রাজ	১৯	৬৩
রেঙ্গুণ	২৪০৯	৬৮০

গত তিন মাসের হিসাব

গত তিন মাসে কোন দেশ হইতে কত লক্ষ বর্গগজ কাপড় আসিয়াছে, তাহার হিসাব যথা—

ধোয়া কাপড়

বিলাত	১৬২	১৪৪	২৫৯	৫৬৫
অন্যান্য দেশ	৮৩	৫৭	৫৫	১৯৫
মোট ১৯৩২—	২৪৫	২০১	৩১৪	৭৬০
" ১৯৩১—	১৬৮	১৬৪	২৬০	৫৯২
" ১৯৩০ —	৪৩১	৪৩৫	৬০৭	১৩৭৩

রঙ্গীন ও ছাপা

বিলাত	১০৪	৯০	১৪৫	৩৩৯
ইউরোপ	১৫	৬	১০	৩১
জাপান	১০৭	৭০	৮৫	২৬২
অন্যান্য দেশ	১	৩	×	৪
মোট ১৯৩২—	২২৭	১৬৯	২৪০	৬৩৬
" ১৯৩২—	১৬২	১৪৪	১৭৩	৪৭৯
" ১৯৩০—	৪৩৮	৪০৫	৪৬৭	১৩১০

ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরের বক্তৃতা।—

বিগত ৩০শে মে লণ্ডনের কমন্স সভায় রক্ষণশীলদের ভারতীয় কমিটির এক ঘরোয়া বৈঠকে স্যার ষ্ট্যান্‌লি জ্যাকসন এই মর্ম্মে এক বক্তৃতা দেন যে, ভারতবর্ষে বিপ্লববাদ দমনের একমাত্র উপায় হইতেছে জনমতকে উহার বিরুদ্ধে গঠন করা। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে এখন পর্য্যন্ত এমন কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, যাহাতে মনে করা যাইতে

পারে যে, যাঁহাদের হাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চালাইবার দায়িত্ব দেওয়া হইবে, তাঁহারা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবেন। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লববাদকে জনমত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা যায় না। তবে বিপ্লববাদের ফলাফল সত্ত্বেও প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তন করা উচিত। যদি নূতন শাসনতন্ত্র যুক্ত রাষ্ট্রীয় আকারের হয়, তবে সকলেই তাহাতে আনন্দিত হইবে।

স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন আরও আশা করেন যে, ভারতবর্ষকে যেন সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ধরণের গণতান্ত্রিক শাসন দেওয়া না হয়, কারণ ভারতের পক্ষে উহা উপযোগী নহে। ভারতবাসীরা উহার জন্য প্রস্তুত নহে এবং তাহারা ইহা চাহেও না। ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে রাখিতে হইলে, উহাকে যথেষ্ট পরিমাণ অধিকার দিতে হইবে। ইহা ভারত ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য করা উচিত। কিন্তু এই দায়িত্ব ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতে হইবে।

উড়িষ্যায় নূতন প্রদেশ—

উড়িষ্যা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটীর সদস্যগণ সকলেই একমত হইয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। রিপোর্টের মর্ম্ম এই যে, প্রায় ৩৩ হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থান লইয়া নূতন উড়িষ্যা প্রদেশ গঠিত হইতে পারে। উহার লোক-সংখ্যা প্রায় ৮২ লক্ষ ৭৭ হাজার হইবে। উড়িষ্যা বিভাগের আঙ্গুল, রায়পুর জিলার খায়িরার জমিদারী, গঞ্জাম জেলার অধিকাংশ স্থান ও ভিজাগাপট্টম এজেন্সী অঞ্চল নূতন উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই প্রদেশের আয় ১ কোটী ৩৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা এবং ব্যয় ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৫০ টাকা হইবে; ইহার সহিত পৃথক করার ব্যয় ১৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা হইবে; সুতরাং প্রথম বৎসরে ঘাটতি হয় ৩৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। ইহার সহিত প্রথম বৎসরে আনুষঙ্গিক ব্যয় কিছু বাড়িতে পারে। ইহা ধরিয়া প্রথম বৎসরে ঘাটতি হইবে প্রায় ৩৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। ভাষা, জাতি, জনসাধারণের মনোভাব, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থ নৈতিক স্বার্থ ও শাসন সৌকর্য্য—এই সকল বিষয় কমিটি বিবেচনা করিয়াছেন। নূতন প্রদেশের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুতকালে উহার সীমার উভয়পার্শ্বকার লোকদের অভিমত উপেক্ষিত হয় নাই। বর্ত্তমানে যে সকল আয়ের পন্থা রহিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এবং মিতব্যয়িতা-মূলক ব্যবস্থা ধরিয়া কমিটী আয় ব্যয়ের আনু-মানিক হিসাব তৈয়ারী করিয়াছেন। নূতন প্রদেশের নিজস্ব কোন হাইকোর্ট বা বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবে না এবং দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডিত বন্দী, কনেষ্টবলদের শিক্ষা প্রভৃতি ইহাকে বিহারের জেল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে হইবে ও তাহার ব্যয়ের অংশ প্রদান করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে সকল আইন ও নিয়মাবলী প্রচলিত আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া কমিটী হিসাব করিয়াছেন এবং উহার পরিবর্ত্তন ভার নূতন গবর্ণমেণ্ট ও তাহার ব্যবস্থাপক সভার উপর দিয়াছেন।

ভারতে ভোটাধিকার—

ভারতবর্ষে যে নূতন শাসন-প্রণালী ব্যবস্থিত হইবে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই, সে বিবরণ বাহির হইবার এখনও বিলম্ব হইবে। এদিকে কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থায় এ দেশের কাহারা ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইবেন, তাহার নির্দ্ধারণের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে একটী কমিটি গঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত লোথিয়ান সাহেব সেই কমিটীর সভাপতি ছিলেন, বলিয়া এই কমিটির 'লোথিয়ান কমিটি' নামকরণ হইয়াছে। এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ ভারতের নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর সংখ্যা ৭০০০০০০ হইতে ৩৬০০ ০০০ করা হইয়াছে, অর্থাৎ মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা ৫.৫ হইতে ২৭.৬ করা হইয়াছে। সমস্ত ব্রিটীশ ভারত সম্বন্ধে এই কমিটির যে বিস্তৃত রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদানেরও আমাদের স্থানাভাব, এইজন্য বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে কমিটির রিপোর্টের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল এবং স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার সম্বন্ধে কমিটি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বাঙ্গলাদেশ সম্বন্ধে কমিটী বলেন যে, তাঁহারা স্থানীয়

গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত কম সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রাদেশিক কমিটি সর্ব্বত্র পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে পরোক্ষ ভোটাধিকার দান করা প্রথমে মত করিয়াছিলেন, কিন্তু ভোটাধিকার কমিটীর বিশ্বাস যে বর্ত্তমানে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎভাবে ভোট দিবার অধিকার ভোগ করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করিলে যে পরিমাণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা করা হয় নাই। অধিকন্তু যদি মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৷৷৹ ভাগের অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় তবে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রস্তাব করেন যে সাক্ষাৎ নির্ব্বাচন পদ্ধতির সহিত পরোক্ষ নির্ব্বাচন পদ্ধতিও থাকিবে সে বিষয়ে তাঁহারা একমত নহেন। তাঁহারা কাজ চলিবার দিক দিয়া এরূপ কোন আবশ্যকতা দেখিতে পান না যে, ভোটাধিকার শতকরা ৭৷৷ ভাগে সীমাবদ্ধ থাকিবে, কিন্তু বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট যে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের কথা প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কোন কার্য্যপদ্ধতি না দেওয়ায় তাঁহারা অসুবিধায় পড়িয়াছেন। সুতরাং কমিটী প্রস্তাব করেন যে, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ও অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ও রিপোর্টের সাহায্যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে রেট ও ট্যাক্স দেওয়া হয় তাহার উপর ভিত্তি করিয়া একটি কার্য্যপদ্ধতি প্রস্তুত করিবেন। ইহার সঙ্গে পুরুষদিগের পক্ষে উচ্চ প্রাইমারী শিক্ষার যোগ্যতা এবং যে ব্যবস্থা অন্যত্র প্রস্তাবিত হইয়াছে স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার বিষয়ে তাহাও যোগ করিয়া লইতে হইবে।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার—

ইহার পর কমিটী স্ত্রীলোকদিগের নির্ব্বাচন বিষয়টী সমষ্টিরূপে বিবেচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভোটাধিকার প্রাপ্ত স্ত্রীলোকের হার পুরুষের তুলনায় মাদ্রাজে ১জন স্ত্রীলোক ও ১০জন পুরুষ; এইরূপে আসামে ১জন স্ত্রীলোক ও ১১৪জন পুরুষ। প্রধান মন্ত্রী মহোদয় ও গোলটেবিল বৈঠকের ভোটাধিকার সাব-কমিটী উভয়েই স্ত্রীপুরুষের ভোটের ক্ষমতার মধ্যে যে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহা কমাইতে বলিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদিগের প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ প্রতিনিধিই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার সূত্রে পুরুষদিগের সহিত সমান অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয় প্রণালীর কোনটাই কার্য্যকর নয়, এজন্য, কমিটী ভোটাধিকার সাব-কমিটীর ন্যায়, স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশেষ যোগ্যতার প্রস্তাব সমর্থন করেন; কারণ কোন সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার, স্ত্রী ভোটারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা কমান না হইলে, কাগজেকলমে সমান হইলেও কার্য্যকালে অতীব অসমান হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহারা মনে করেন যে, বর্ত্তমান ভোটাধিকার প্রথায় স্ত্রীলোকগণ যে ভোট দিতে অনিচ্ছুক তাহার কারণ কতকটা এই যে, তাঁহারা সংখ্যায় অল্প বলিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নির্ব্বাচনপ্রার্থী যাহাতে স্ত্রীলোকদের স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করিতে বাধ্য হয় তজ্জন্য ভোটারের তালিকায় যথেষ্ট সংখ্যায় স্ত্রীলোকদের নাম থাকা অত্যাবশ্যক। এইরূপে সম্পত্তি ও শিক্ষাবিষয়ক সাধারণ যোগ্যতাসূত্রে স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের আইনতঃ সমান অধিকারের ব্যবস্থা করিয়া কমিটী স্ত্রীলোকদিগের জন্য কতকগুলি অতিরিক্ত যোগ্যতার কথা বলেন, ইহাতে তাহারা মোট ভোট সংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পাইতে পারিবে। ইহার হার মাদ্রাজে এক-চতুর্থাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিহারে এক নবমাংশ হইয়াছে। এইরূপ যোগ্যতার মধ্যে প্রথমটি অক্ষর-জ্ঞান মাত্র থাকা এবং দ্বিতীয়টি এমন ব্যক্তির স্ত্রী হওয়া যিনি সম্পত্তি থাকার দরুণ বর্ত্তমান ভোটাধিকারবলে প্রাদেশিক আইন-সভাগুলির জন্য ভোট দিতে অধিকারী। মধ্যপ্রদেশে বর্ত্তমান নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর সংখ্যা খুব কম হওয়ায় এই শেষোক্ত যোগ্যতাটি আরও বিশেষভাবে বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। স্বামীর সম্পত্তির দরুণ যোগ্যতাবলে ভোটাধিকার প্রদান করায় যে অসুবিধা আছে কমিটি তাহা স্বীকার করেন; কিন্তু যে সকল স্ত্রীলোকের উহাতে আপত্তি থাকিবে তাহারা খুব সম্ভব অক্ষর-জ্ঞানবলে ভোটের অধিকার পাইবে। আইন সভাগুলিতে প্রতিনিধিস্বরূপে স্ত্রীলোকদের নির্ব্বাচিত হওয়া সম্বন্ধে চারিটি উপায় প্রস্তাবিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, নব নির্ব্বাচিত কাউন্সিলগুলিতে একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্ট প্রথায় স্ত্রীলোকদিগকে কো-অপ্ট্ করিয়া দেওয়া

হইবে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ নির্ব্বাচন-মণ্ডলী কর্তৃক স্বতন্ত্র পদে নির্ব্বাচন হইবে। তৃতীয়তঃ, যে সকল স্ত্রীলোক সাধারণ নির্ব্বাচনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বাচিত হইতে পারে না, তাহাদিগকে এইরূপ স্বতন্ত্র পদের যেগুলি খালি থাকিবে সেইগুলি দেওয়া হইবে, এবং চতুর্থতঃ, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট এলাকায় স্ত্রীলোকদিগের জন্ত পদ পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং ঐ এলাকায় নির্ব্বাচনকারীদিগের দুইটি করিয়া ভোট থাকিবে, একটি সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রের জন্ত এবং অপরটি একজন স্ত্রীলোক পদপ্রার্থীর জন্ত। কমিটী এই শেষোক্ত প্রণালীটিরই অনুমোদন করেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত শশধর দত্ত প্রণীত নারী-সমস্যা-পূর্ণ নাটিকা "মুক্তি-বাঁধন"; মূল্য—॥০

শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত প্রণীত গল্পের বই "ভুলের ফুল" মূল্য—১৲

শ্রীমতী হেমলতা রায় প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী "কুম্ভমেলা ও সাধুসঙ্গ" মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "হাতের নোয়া" মূল্য—১৲

ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পিএইচ-ডি প্রণীত "যৌবনের সাধনা" মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত জহরলাল বক্সী প্রণীত "সোভিয়েট রাশিয়া" মূল্য—১॥০

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ গুপ্ত প্রণীত গীতি-কবিতা "কল্লোল" মূল্য—॥৵০

ভাগবতাচার্য্য শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত "শ্রীমদ্ভগবদগীতা" প্রথম খণ্ড, মূল্য—১॥০

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী প্রণীত কাব্য গ্রন্থ "সীঁথি-মৌর" মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত উপন্যাস "দিদির বর" মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অপরূপ" মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার সেন এম-এ প্রণীত খণ্ড কাব্য "সুরহারা" মূল্য—৸০

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত গল্পের বই "শূন্যতার প্রেম" মূল্য—২৲

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী "ইতালিতে বারকয়েক" মূল্য—১।০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত "সুখ দুঃখ"—২॥০

মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী কর্তৃক পরশুরাম লিখিত চিকিৎসা সঙ্কট হইতে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত "মনপ্যাথি" মূল্য—১।০



Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA.
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.



[illegible]

Bharatvarsha Halftone & Printing Works



শ্রাবণ—১৩৩৯

প্রথম খণ্ড | বিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

হিন্দুর পূজাপদ্ধতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

বৈশাখের প্রবাসীর "পত্রধারা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটী পত্র ছাপা হইয়াছে। হিন্দুর পূজাপদ্ধতি এবং সাধনা সম্বন্ধে ইহাতে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুরা ঠাকুরকে কাপড় পরায়, স্নান করায়,—এসব ব্যর্থ, শুধু ব্যর্থ নহে অনিষ্টকর; দেবপ্রতিমার নিকট পাঁঠা বলি দিলে অজ্ঞানের প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র; এইসব পাপের ফলে আমরা বিদেশীদের কাছে মার খাচ্চি। হিন্দুরা যে ভাবে পূজা করে সে ভাবে পূজা করা অপেক্ষা নাস্তিক হইয়া বিশ্বমানবের সেবা করা ভাল, এইরূপ নাস্তিকরা যথার্থ ভক্ত।

কোনও কার্য্য ব্যর্থ কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে, কি উদ্দেশ্যে সে কার্য্য করা হইতেছে। কার্য্যটি যদি সে উদ্দেশ্যের সহায়ক হয় তাহা হইলে উহা ব্যর্থ নহে, যদি সহায়ক না হয় তাহা হইলে উহা ব্যর্থ। যে উদ্দেশ্যের জন্য ঐ কার্য্য সাধিত হয় নাই, কার্য্যটি সে উদ্দেশ্যের সহায়ক হয় নাই বলিয়া তাহাকে ব্যর্থ বলা যুক্তিযুক্ত নহে,—এই অপর উদ্দেশ্যটি যতই মহৎ হউক না কেন।

ভগবানকে লাভ করা, এবং দুঃখীর দুঃখ মোচন করা দুইটি বিভিন্ন উদ্দেশ্য। দুঃখীর দুঃখ মোচনার্থ যে কর্ম্ম করা যায়, সে কর্ম্ম ঈশ্বরলাভের সহায়ক হইতে পারে। কিন্তু সেই কারণে উভয় উদ্দেশ্যের পার্থক্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না। রবীন্দ্রনাথ এখানে এই দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্যের পার্থক্য রক্ষা করেন নাই, এবং "ঠাকুরকে কাপড় পরান, স্নান করান" প্রভৃতি কার্য্য দুঃখীর দুঃখমোচন রূপ উদ্দেশ্যের সহায়ক নহে বলিয়া তিনি ইহা ব্যর্থ বলিয়াছেন।

"ঠাকুরকে কাপড় পরান, স্নান করান" এই সকল কার্য্য কি ঈশ্বর লাভের সহায়ক হইতে পারে? নিশ্চয় পারে। ঈশ্বর লাভ করিবার উপায়—ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া রাখা, ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া যাওয়া। এই হইল সাধারণ উপায়। এই সাধারণ উপায়ের উপযোগী নানাবিধ বিশেষ

উপায় আছে। লোকের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বিভিন্ন। এজন্য এক উপায় সকলের পক্ষে উপযোগী হয় না। কেহ নির্জন স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া দীর্ঘকাল ভগবানে চিত্ত একাগ্র করিয়া রাখিতে পারেন; কেহ বা তাহা পারেন না, সর্বদা ভগবানের নাম জপ করিতে ভালবাসেন; কেহ বা তাঁহার স্তব করিতে বা নাম সঙ্কীর্তন করিতে ভালবাসেন; কেহ বা তাঁহার বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে এবং পুষ্পনৈবেদ্যাদি নিবেদন করিতে ভালবাসেন। এ সকল উপায়ই ভগবানকে পাইবার পক্ষে এবং মনকে ভগবদভিমুখী করিবার পক্ষে উপযোগী। একটি নির্দিষ্ট প্রথার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ, অপর প্রথায় উপাসনা করিলে কোনও ফল লাভ হয় না, ইহা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা। হিন্দুধর্মে এরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। ভগবানের শ্রীমুখের বাণী হিন্দু শুনিয়াছে,

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
> মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ গীতা ৪।১১

"যে যে প্রকারেই আমার পূজা করুক, সেই প্রকারেই আমি তাহাকে অনুগ্রহ করি। সকল মানব সকল প্রকার উপায়ে আমার মার্গই অনুসরণ করে।"

"ঠাকুরকে কাপড় পরালুম, সে কাপড় কি পৌঁছবে বস্ত্রহীনের কাছে, ঠাকুরকে স্নান করালুম সেই স্নানের জল কি পাবে যে মানুষ জলের অভাবে তৃষিত-তাপিত? তা যদি না হ'ল এ সেবা কোন্ কাজে লাগল? কেবল নিজেকে ভোলাবার কাজে?"

ঈশ্বরের পূজা যাহার জীবিকা এমন দরিদ্র পুরোহিতের সাধ্বী পত্নীর নিকট সে কাপড় হয় ত পৌঁছিতে পারে,—কিন্তু, নাও পারে। জল যে জলহীনের নিকট পৌঁছিবে না তাহা নিশ্চয়। কিন্তু তাই বলিয়া এ সেবা কোনও কাজে লাগিবে না ইহা বলিতে পারিবেন না। হৃদয়কে ভগবদভিমুখী করা, কিছুকালের জন্য ভগবৎ-সান্নিধ্য উপলব্ধি করা, বুঝি তাঁহার স্পর্শ পাইয়া আমার এই অপবিত্র দেহ পবিত্র ও সার্থক হইল, এইরূপ অনুভূতি হৃদয় মধ্যে সঞ্চারিত করা,—এই সকল উদ্দেশ্যে বস্ত্র এবং জল অর্পিত হইয়াছিল। এই সকল উদ্দেশ্য যদি সার্থক হয়, তাহা হইলেও কি ইহা ব্যর্থ?

রবীন্দ্রনাথ এখানে একটা খাঁটি কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই ভাবে উপাসনা "কেবল নিজেকে ভোলবার কাজে" লাগিবে। কিন্তু নিজেকে ভোলানও যে একটা বড় প্রয়োজনীয় কাজ। আমার ঘরবাড়ী, ধনখ্যাতি, আমার স্ত্রীপুত্রকন্যা, আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার বন্ধু, আমার শত্রু,—এই সব চিন্তায় যে আমাদের হৃদয় অধিকাংশ সময়ই পরিপূর্ণ থাকে। এ-সব চিন্তা মধ্যে মধ্যে আমাদের হৃদয় হইতে সরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন,—আমাদের "নিজেকে ভোলান" দরকার। মনকে বলা দরকার, "ওরে তোর এই সব সুখদুঃখ কয় দিনের জন্য? যদি এই সবেই মগ্ন হইয়া থাকিস, তাহা হইলে প্রায়ই নানাবিধ সাংসারিক দুঃখে কষ্ট পাইতে হইবে,—আর যেদিন ওপর হইতে ডাক আসিবে, সেদিন বড় অসহ্য কষ্ট হইবে। দিন থাকিতে তাঁহার কথা স্মরণ কর, যাহা সংগ্রহ করিতে পারিস তাহা লইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া যা। তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট, তোর অন্তরের ভক্তি মাখাইয়া তুই যাহা দিবি তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন,—অন্ন, বস্ত্র, নৈবেদ্য, পুষ্প, এমন কি শুধু জল দিলেও তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।" হিন্দু পূজা করিয়া এইভাবে মনকে ভোলায়। রবীন্দ্রনাথ কি ইহা ব্যর্থ বলেন?

হিন্দুর পূজাপদ্ধতিকে যে ভাবে পরীক্ষা করিয়া রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ বলিয়াছেন, সেই ভাবে পরীক্ষা করিলে অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের পূজাপদ্ধতিকেও ব্যর্থ বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্ম-সমাজে উপাসনার জন্য ভজনালয় নির্মাণ করা হয়। যে অর্থ ব্যয় করিয়া ভজনালয় নির্মাণ করা হয় সেই অর্থ ব্যয় দ্বারা হাঁসপাতাল নির্মাণ করিলে কিছু পরিমাণে দুঃখীর দুঃখমোচন হইত। তাহা হইল না বলিয়া ব্রাহ্মদের ভজনালয় নির্মাণ কি ব্যর্থ হইবে? ধ্যান ও উপাসনাতে তাঁহারা যে সময় অতিবাহিত করেন, সেই সময় রোগীর পরিচর্য্যা করিলে কিছু পরিমাণে দুঃখীর দুঃখমোচন হইতে পারিত। তাহা হইল না বলিয়া ধ্যান এবং উপাসনাকে কি ব্যর্থ বলিতে হইবে? মুসলমান ও খৃষ্টানের মস্‌জিদ ও গির্জা নির্মাণ এবং ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেও সেই এক কথাই বলা যায়। বস্তুতঃ, হিন্দুর পূজাপদ্ধতিকে যে ভাবে বিচার করিয়া তিনি ব্যর্থ ও অনিষ্টকর বলিয়াছেন, সেই ভাবে বিচার করিলে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের উপাসনা করিবার পদ্ধতিকেও ব্যর্থ বলা

যায়। তিনি অপর কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতিকে এ ভাবে বিচার না করিয়া কেবল হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়ের পূজাপদ্ধতিকে এই ভাবে বিচার করিয়া ইহাকে ব্যর্থ এবং অনিষ্টকর বলিলেন। অবশ্য তিনি বলিতে পারেন, যে, মুসলমান, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম যে ভাবে উপাসনা করে তাহাতে তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, কিন্তু হিন্দু যে ঠাকুরকে কাপড় পরায় এবং স্নান করায় তাহাতে হিন্দুর আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। হিন্দুর যে উপাসনা-পদ্ধতিকে তিনি ব্যর্থ ও অনিষ্টকর বলিয়াছেন, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অনেকে যে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা বিভিন্ন দেশবাসী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে জীবের দুঃখমোচনকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া ভগবদুপাসনার উপরে স্থান দিলে অবশেষে নাস্তিকতাবাদে আসিয়া পৌঁছিবার আশঙ্কা আছে। সোভিয়েট রাশিয়াতে ইহাই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা মানবের দুঃখ নিবারণই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা কিছু কালের মধ্যে বুঝিতে পারেন—জগতে দুঃখের পরিমাণ কত বেশী। এই দুঃখের পরিমাণের তুলনায় তাঁহাদের নিজের ক্ষমতার অল্পতা তাঁহাদের হৃদয়ে নৈরাশ্যের সঞ্চার করে। ঈশ্বর যদি দয়াময় এবং সর্ব্বশক্তিমান হন, তাহা হইলে কেন জগতে এত দুঃখ, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া প্রথমতঃ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন—ঈশ্বর কখনও দয়াময় এবং সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না। তাহার পর তাঁহাদের মনে হয় ঈশ্বর যদি দয়ালু এবং সর্ব্বশক্তিমান না হন, তাহা হইলে ঈদৃশ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন কি? এই ভাবে পরিণামে তাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়েন। য়ুরোপে কোনও কোনও জ্ঞানী, পণ্ডিত ও পরোপকারী ব্যক্তি এই ভাবে নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছেন।

এই ধরণের যুক্তি রবীন্দ্রনাথও এই পত্রে কিছু পরিমাণে অনুসরণ করিয়াছেন; এবং যাঁহারা এই ভাবে নাস্তিক হইয়াও পরোপকার-ব্রত আছেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "য়ুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধি দ্বারা তাঁদের ধর্মকে মহৎ ক'রে তোলেন,—তাঁরা দূর কালের জন্য প্রাণপণ করেন, সর্ব্বদেশের জন্যে। তাঁরা যথার্থ ভক্ত।" কিন্তু এই সমস্যার কি সমাধান হইবে রবীন্দ্রনাথ তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। উদ্ধৃত অংশের পরেই তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "যাঁরা আচারে অনুষ্ঠানে সারা-জীবন অত্যন্ত শুচি হ'য়ে কাটালেন, ভাবরসে মগ্ন হ'য়ে রইলেন, তাঁরা ত নিজেরই পূজা করলেন,—তাঁদের শুচিতা তাঁদেরই আপনার, তাঁদের রস-সম্ভোগ নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত, আর মুক্তি বলে যদি কিছু তাঁরা পান তবে সেটা তো তাঁদেরই পারলৌকিক কোম্পানীর কাগজ।" এখানে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য যে আচারপরায়ণ হিন্দু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। না হয় স্বীকার করা গেল যে, আচারপরায়ণতা হিন্দুদের কুসংস্কার মাত্র, ইহাতে তাহাদের কোনও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। কিন্তু যাঁহারা আচার মানেন না,—তাঁদের ধ্যান উপাসনাও কি ব্যর্থ? ভগবানকে লাভ করিবার জন্যই ত তাঁহারা ধ্যান উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজেদেরই লাভ, জগতের দুঃখী লোকের তাহাতে কি লাভ? মুক্তি কথাটা অবশ্য হিন্দুদের মধ্যেই বেশী ব্যবহার হয়। অন্য ধর্মে তাহার পরিবর্ত্তে স্বর্গলাভের কথা আছে, তাহাও ত তাহাদের নিজেদেরই লাভ। তাহা হইলে কি স্বীকার করিতে হয় যে, যাহারা ঈশ্বরলাভই জীবনের লক্ষ্য করে এবং তাহার জন্য নিজ ধর্মানুমোদিত সাধনা করে, তাহারা সকলে স্বার্থপর, এবং যে সকল নিরীশ্বর ব্যক্তি পরোপকারই জীবনের ব্রত করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ? রবীন্দ্রনাথ এত বড় সমস্যা তুলিলেন, অথচ তাহার কোন সমাধান করিলেন না, ইহা বড়ই বিচিত্র।

অথচ এই সমস্যার সমাধান হিন্দুধর্মে যেমন আছে অন্য কোনও ধর্মে তেমন নাই। হিন্দুধর্ম বলিয়াছে, তুমি জীবের দুঃখ ঘুচাইবার চেষ্টা কর, ইহা ভাল কাজ। কিন্তু ভাল কাজও করিবার নিয়ম আছে। সেই নিয়ম না মানিয়া কাজ করিলে, ভাল কাজেরও খারাপ ফল হয়। দুঃখীর দুঃখমোচন করিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য—কারণ এইরূপ চেষ্টা করিলে ভগবান প্রীত হন,—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু এই কর্মে নিরত হইয়া ইহা কিছুতেই ভোলা উচিত নহে যে, "একজন সর্ব্বশক্তিমান ভগবান আছেন, তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ চলিতেছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই দুঃখী দুঃখ পাইতেছে, তাঁহার ইচ্ছা হইলে অত্যন্ত

দুঃখীর দুঃখও অনায়াসে ঘুচিয়া যায়। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কাহারও দুঃখ একবিন্দু কমাইতে পারা যায় না। যেখানে দুঃখ প্রয়োজন সেখানে দুঃখ কমাইলে কল্যাণ হয় না। এই সকল কথা ভুলিয়া দুঃখমোচন ব্রত গ্রহণ করিলে অহঙ্কার এবং নাস্তিকতার আবির্ভাবের আশঙ্কা আছে।

গীতায় কর্ত্তব্য কর্ম করিবার যে কৌশল বা প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিলে অনিষ্টের আশঙ্কা কম। সে প্রণালী হইতেছে (১) কর্ম-ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। দুঃখমোচনের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এজন্য চেষ্টা করিব। ফল ভগবানের হাতে, আমার হাতে নহে। (২) কর্মে আসক্তি ত্যাগ করা। দুঃখমোচন করিতে আমার ভাল লাগে এই জন্তে দুঃখমোচনের চেষ্টা করা উচিত নহে। দুঃখমোচনের চেষ্টা করিলে ভগবান প্রীত হইবেন এই ভাবিয়া পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করা উচিত। (৩) আমি যে কাজ করি তাহাতেও আমার কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করা। ভগবান সকলের হৃদয় মধ্যে অবস্থান করেন,—তিনি যাহাকে যে ভাবে প্রেরণা দেন, সে সেই ভাবে কার্য্য করে, এই ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে পোষণ করা।

হিন্দুর বিশ্বাস, জীব পূর্বকৃত কর্মফল অনুসারে দুঃখভোগ করে। যদি কেহ বলেন যে এইরূপ বিশ্বাস থাকিলে দুঃখীর প্রতি সমবেদনা কমিয়া যায় এবং দুঃখমোচনের আগ্রহ শিথিল হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হইবে, পাপীর প্রতি ঘৃণা একটা হৃদয়ের দুর্বলতা, তাহা ত্যাগ করা উচিত। অন্যায় করিয়া দুঃখ পাইতেছে সত্য, তথাপি তাহার দুঃখমোচনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, ঈশ্বরলাভ এবং পরোপকার এই দুইটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গোলযোগ করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটি উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইলেও ইহাদের মধ্যে যে কোনও সম্পর্ক নাই এমত নহে। পরোপকার ব্রত ঠিকমত অনুষ্ঠিত হইলে ইহা ঈশ্বরলাভের পক্ষে সহায়ক। কারণ ইহা দ্বারা স্বার্থপরতা কমিয়া যায়, চিত্ত শুদ্ধ হয়, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষেই ভগবানকে লাভ করা সম্ভব হয়। পরোপকার-ব্রতের উদ্দেশ্য হইবে নিজ চিত্ত শুদ্ধ করা। দুঃখীর দুঃখমোচন ইহার চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ সর্বশক্তিমান ভগবান ইচ্ছামাত্র সকলের দুঃখমোচন করিতে পারেন,—যেখানে দুঃখদান করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন সেখানে তিনি দুঃখদান করেন, যখন যেখানে দুঃখ-মোচন করা প্রয়োজন মনে করেন তখন সেখানে দুঃখ-মোচনের ব্যবস্থা করেন। হয় ত আমাদের দ্বারাই এই দুঃখমোচন কার্য্য করান। পরোপকার ব্রতের ঠিকমত অনুষ্ঠান না করিলে ইহা হইতেই চিত্তে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাতে চিত্ত মলিন হয়। পরোপকার কার্য্যে অতিরিক্ত আসক্তি হইলে এবং কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি না হইলে, হৃদয়ে নাস্তিকতার সঞ্চার হইতে পারে। য়ুরোপের এইরূপ বিশ্বহিতৈষী নাস্তিকের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "তাঁরা যথার্থ ভক্ত"। কিন্তু যাঁহারা নাস্তিক তাঁহাদিগকে কিরূপে ঈশ্বর-ভক্ত বলা যায়? তাঁহাদিগকে বিশ্বপ্রেমিক বলাও কঠিন, কারণ সাধারণতঃ তাঁহাদের মঙ্গল চেষ্টা মানবজাতির মধ্যেই আবদ্ধ, মানবেতর প্রাণীর মঙ্গলচিন্তা তাঁহারা বিশেষ করেন না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন, "ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হ'লে কি বলবি, হে ঈশ্বর, অনেক ইস্কুল আর হাঁসপাতাল করে দাও?···একজন কালীঘাটে মা-কালীকে দর্শন করিতে গেল, কিন্তু সেখানে ভিখারীর ভীড় দেখে তা'দিকে পয়সা দিতে এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল যে মা কালীর দর্শনই পেল না।" আমরা যে সকল কথা বলিয়াছি সে সকল কথা স্মরণ রাখিলে পরমহংসদেবের উক্তির তাৎপর্য্য বোঝা যাইবে। পরোপকার জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। পরোপকার-ব্রত যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরলাভের সহায়ক, সে পর্য্যন্তই ইহা অনুশীলন করা উচিত। ঈশ্বরলাভের অন্তরায় হইলে পরোপকার-ব্রতের কোন মূল্য নাই। ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনার উদ্দেশ্য পরোপকার না হইলেও এই সাধনার ফলে অনেক জনহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত পরমহংসদেবের সাধনা! তিনি নিজে জীবের শারীরিক দুঃখমোচন ব্রত গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সাধনার ফলে ভারতবর্ষে পরোপকারব্রত যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছে দেখা যাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ নাস্তিক বিশ্বহিতৈষীর সহিত তুলনা করিয়া আচারনিষ্ঠ হিন্দুর নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু আচারনিষ্ঠা দ্বারা

পরোপকার সাধিত হয় না, অত এব ইহা নিন্দনীয়, রবীন্দ্রনাথের এ যুক্তি বিচারসহ নহে। কারণ আচারনিষ্ঠার উদ্দেশ্য পরোপকার নহে, ইহার উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। যদি ঈশ্বরলাভের জন্য সহায়ক না হয়, তাহা হইলে সে আচার নিন্দনীয়। কিন্তু যদি ইহা ঈশ্বরলাভের সহায়ক হয়, তাহা হইলে ইহার দ্বারা পরোপকার সাধিত না হইলেও ইহা সার্থক। শুদ্ধ আচার অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের পূজা করিলে ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়, হিন্দুশাস্ত্র ইহা প্রচার করিয়াছে, সাধক হিন্দুর জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। এ ক্ষেত্রে আচার মাত্রই ব্যর্থ—রবীন্দ্রনাথের এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায় না।

হিন্দুর পূজাপদ্ধতির নিন্দা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ এমন কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার সহিত বাস্তব জগতের মিল নাই। তিনি বলিয়াছেন "মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য যদি বা শাস্ত্রের শ্লোকে থাকে, আচারে নেই।" ইহা কি সত্য? দরিদ্রকে দান হিন্দুরা যাহা করে তাহা কি নগণ্য? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ভারতে এত অসংখ্য ভিক্ষুক ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতেছে কিরূপে? ইংলণ্ডে Poor Law এবং Work House আছে সত্য, কিন্তু Ruskin, Wordsworth প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন যে, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া দরিদ্র ব্যক্তির সেখানে বাস করা সম্ভব নহে। দরিদ্র হইলেই যে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন করিতে হইবে তাহার কোনও মানে নাই। টলষ্টয় বলিয়াছেন, যে দেশের পুলিসে ভিক্ষা করিবার অপরাধে নিঃস্ব লোককে ধরিয়া লইয়া যায়, সে দেশের লোক কি করিয়া বলিতে পারে যে তাহারা যিশুখৃষ্টের অনুবর্ত্তী? Poor Law না থাকিলেও আমাদের দেশে এত ভিক্ষুক খাইতে পাইতেছে, এবং তাহাদিগকে যাহারা ভিক্ষা দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত। ধর্ম্মলাভেচ্ছু হিন্দু যদি দুঃখীর অভাবের প্রতি একান্ত উদাসীন হন, তাহা হইলে হিন্দুর তীর্থস্থানে এবং দেবালয়ের নিকটে ভিক্ষার্থীর এত ভীড় হয় কেন? আজকালই পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে মুষ্টিভিক্ষার নিন্দাসূচক বাক্য শোনা যায়,—Indiscriminate charity, এবং drones of society; পূর্ব্বে এরূপ কথা শোনা যাইত না। পূর্ব্বে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত,

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥

"যাহার গৃহ হইতে অতিথি ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া চলিয়া যায়, অতিথি তাহাকে নিজ পাপ প্রদান করিয়া গৃহস্থের পুণ্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়।"

বিদেশী ভ্রমণকারিগণও হিন্দুর অতিথিপরায়ণতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর অন্যত্র এরূপ দেখা যায় না। মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য লোকের আচারে যদি বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে কি ইহা সম্ভবপর হইত? বিনা ব্যয়ে অতিথির থাকিবার জন্য এত অধিক সংখ্যক ধর্ম্মশালা আর কোনও দেশে আছে কি? ধর্ম্মার্থে বৃক্ষ ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা আজকাল ইংরাজি শিখিয়া না হয় আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু সেটা কি হিন্দুধর্ম্মের দোষ? পাশ্চাত্যদেশে পরোপকার সাধারণতঃ নিজ জাতির মধ্যে, বড় জোর মানব জাতির মধ্যে আবদ্ধ। হিন্দুর পরোপকার সর্ব্ব জীবে প্রসারিত, কারণ হিন্দুর বিশ্বাস এক ব্রহ্ম আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। অক্ষম গরু কাটিয়া তাহার মাংস ভোজন করাই পাশ্চাত্য প্রথা। হিন্দু অক্ষম গরুর জন্য আশ্রয় এবং আহারের বন্দোবস্ত করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করে। এজন্য গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য পঞ্চ যজ্ঞের মধ্যে প্রাণিগণকে আহার প্রদান এবং অতিথি পূজা উভয়ই বিহিত হইয়াছে।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞো তিথিপূজাং ॥

"অধ্যাপনা করার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ হইতে পিতৃযজ্ঞ, হোম করা দেবযজ্ঞ, প্রাণিদিগকে আহার প্রদান করা ভূতযজ্ঞ (সর্বপ্রাণির পূজা) এবং অতিথিপূজা নরযজ্ঞ (মানবের পূজা)।"

শুণাং চ পতিতানাং চ শ্বপচাং পাপরোগিণাং।
বায়সানাং কৃমাণাং চ শনকৈর্নিবপেদ্ভুবি ॥

"কুকুর, নীচজাতীয় ব্যক্তি, চণ্ডাল, কুষ্ঠ বা ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, কাক ও কৃমি সকলকে যত্নপূর্ব্বক আহার প্রদান করিবে।"

শাস্ত্রে আছে, কিন্তু হিন্দুর আচারে এসব কিছু নাই এ কথা বলিলে চলিবে না। হিন্দু বড় বেশী শাস্ত্র মানিয়া

চলে এ কথা রবীন্দ্রনাথই অনেকবার বলিয়াছেন। আর আজকাল যদি শিক্ষিত হিন্দুর আচার হইতে এ সকল অদৃশ্য হইয়া থাকে, তাহার জন্য কি পাশ্চাত্য শিক্ষাই বেশী দায়ী নহে ?

রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে লিখিয়াছেন, "জাতকুল দেখে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করা সহজ ; * * যথার্থ ব্রহ্মণ্যগুণে যিনি ব্রাহ্মণ তিনি যে জাতেরই হ'ন্, তাঁকে ভক্তির দ্বারা সত্যফল পাওয়া যায়, কিন্তু যেহেতু সেটা সহজ নয়, এই জন্যই অস্থানে ভক্তির দ্বারা কর্ত্তব্যপালনের তৃপ্তিভোগ করা প্রচলিত হয়েচে।" যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণোচিত আচার এবং গুণকর্ম নাই তিনি নিন্দনীয়, শাস্ত্রে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। কোন্ ব্রাহ্মণ গুণবান, এবং কে গুণহীন ইহা স্থির করা যতদূর দুরূহ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ইহা ততদূর দুরূহ নহে। কে ভাল, কে মন্দ, কে সাধু, কে ভণ্ড সমাজে সকলেই ইহা চেনে এবং তদনুরূপ সমাদরও করিয়া থাকে। বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে ভাল লোক থাকিলে তখনই তাহাকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিতে হইবে ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। বৈশ্য বাল্যকাল হইতে কৃষি, গো-পালন, বাণিজ্য এই সবই দেখিয়াছে এবং এই সবই শিখিয়াছে। সে খুব আদর্শ-চরিত্রের ব্যক্তি হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মণ করিয়া টোলে অধ্যাপনা করিতে বসাইয়া দিলে অধ্যাপনার কার্য্য কি ভালরূপে চলিবে ? কৃষি বাণিজ্যে কি আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তির কোনও প্রয়োজন নাই ? বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা জন্মগত ভিন্ন অন্যরূপ করা সম্ভবপর নহে। অল্পবয়স্ক বালকের ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণোচিত গুণ হইবে অথবা বৈশ্যোচিত গুণ হইবে তাহা কি করিয়া জানা যাইবে ? তাহা না জানিতে পারিলে তাহার ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইবে, না বৈশ্যোচিত ? হিন্দুর বিশ্বাস, জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনা নহে, পূর্ব কর্মের ফল। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত সাধনার উপযুক্ত, ভগবান তাহাকেই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করান। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও কুকর্ম-নিরত হয়, সে ইহজন্মে নিন্দনীয় হয় এবং পর জন্মে নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়। ইহজন্মেই পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। কোনও কালেই ইহজন্মে এরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তনের নিয়ম প্রচলিত ছিল না। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি যে কয়েকটি ইহজন্মে বর্ণ পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত পুরাণে পাওয়া যায় সে সকল স্থানে বুঝিতে হইবে যে অসাধারণ অবস্থায় নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল মাত্র (exceptians to the general rule in extraordinary circumstances)। নচেৎ সকল যুগেই জন্মগত বর্ণ ব্যবস্থাই সাধারণ নিয়ম ছিল। এইরূপ ব্যবস্থাতেই প্রত্যেক বর্ণের কর্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা অধিক।

রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে হিন্দুরা দেবতার নিকট পাঁঠা বলি দেয় বলিয়া খুব নিন্দা করিয়াছেন। পাঁঠা বলি এবং আমিষ আহার এই দুইটি প্রথা পরস্পর সম্বদ্ধ। আমিষাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ইহা তত বেশী দোষাবহ নহে, তবে ত্যাগ করিতে পারিলে খুব ভাল। মনু বলিয়াছেন—

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥

"মাংস, মদ্য ও মৈথুনে দোষ নাই। কারণ প্রাণীদের এই-রূপই প্রবৃত্তি। কিন্তু এই সকল ত্যাগ করিতে পারিলে খুব উন্নতি হয়।"

মাংস ভক্ষণ যাহাতে সমাজে কমিয়া যায় এ জন্য শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, যজ্ঞে পাঁঠা বলি দিয়া মাংস-ভোজন করিতে পার, নচেৎ বৃথা মাংস ভক্ষণ করা মহাপাপ। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে মাংসভক্ষণ একেবারে বর্জ্জন করিতে বলিলে কেহ কেহ শুনিতে পারে, কিন্তু সকলে শুনিবে না। যাহারা মাংস ভক্ষণ একেবারে ছাড়িতে পারিবে না, তাহাদেরও মাংস ভক্ষণ কমান প্রয়োজন। এজন্য তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। হিন্দুধর্মের একটি নিয়ম এই যে তুমি যাহা কিছু আহার করিবে পূর্বে ভগবানকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং ॥

"যাহা কিছু করিবে, আহার, হোম, দান, তপস্যা,—সকলই আমাকে অর্পণ করিবে।"

মাংস ভোজন করিবার সময়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না। বৈষ্ণবগণ আমিষাহার করেন না, তাঁহারা পশু বলিও দেন না। শাক্তগণ আমিষাহার করেন, তাঁহারা পশু বলি দেন। প্রবৃত্তিভেদে অধিকারভেদের ব্যবস্থা আছে। পশুবলি প্রথা সত্ত্বেও হিন্দুদের মধ্যে আমিষ

ভোজন অন্য জাতি অপেক্ষা কম, ইহা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করিবেন না। যদি পশুবলি অনিষ্টকর হইত তাহা হইলে হিন্দুদের মধ্যে আমিষ ভোজন প্রথা অন্য জাতি অপেক্ষা বেশী প্রচলিত হইত। পশুবলি দেয়, অতএব হিন্দুরা অতি পাষণ্ড, মুখে এ কথা বলিব, অথচ আমিষ আহার করিব, ইহাতে পশুর প্রতি যতটা করুণা দেখান হয়, তাহা অপেক্ষা পরধর্ম নিন্দার প্রবৃত্তি বেশী পরিমাণে প্রকাশ করা হয় না কি?

আমাদের দেশ অনেক দুঃখ পাইতেছে তাহা স্বীকার করি, তাহার কারণও আছে তাহা মানি। কিন্তু হিন্দু-ধর্মের প্রকৃতি এবং হিন্দুর শাস্ত্র মানিবার প্রবৃত্তিকে যদি রবীন্দ্রনাথ ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাঁহার এ নির্দেশ বিচারসহ নহে। বহুদিন ধরিয়া হিন্দু যখন ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ছিল, তখনও হিন্দু এই সকল শাস্ত্রই মানিত, এই ধর্মই পালন করিত। কালিদাসের যুগ হিন্দুর সবদিক দিয়া গৌরবের যুগ, সে সময় কোন আদর্শ উচ্চ করিয়া ধরা হইয়াছিল তাহা কালিদাস নিজে এ ভাবে বলিয়াছেন,—

"রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাৎ আমনোঃ বর্ত্মনঃপরং
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ।"

মনুর সময় হইতে যে পথ কাটা হইয়াছিল তাহা হইতে এক বিন্দুও বিচলিত না হওয়াই রাজা ও প্রজা উভয়েরই গৌরব-সূচক ইহাই কালিদাসের মত। উচ্চ নীতি সম্পদে হিন্দুধর্ম কোন ধর্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইবেন হিন্দুধর্ম হিন্দুর অধঃ-পতনের কারণ নহে, ইহার অন্য কারণ আছে।

তারা

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

তারায় তারায় আকাশ ভরা, ধরার পারে ধরা,
কোন্ আগুণের ফুল্কি বুনে শূন্য পূরণ করা?
নিশীথ রাতের নীরবতায় তাকাই ওদের পানে,
মর্ম্ম কথা কইতে যেন চাহে কাণে কাণে।
ঢুলে আসে চোখের পাতা, বুঝি না তার মানে
দুঃখ-ব্যথার জন্ম-কথা ওরা কিগো জানে।

তারার বাণী আমার কাণে ঘুমপাড়ানির চুমায়
থেই হারিয়ে মধুর নেশায় নিঝুম ঘুমে ঘুমায়।
গোপন কথা কইতে তারা যদি আছে চেয়ে,
কেন হেন অবশ-করা সুপ্তি আসে ছেয়ে!
ঘুমের ধারায় চিত্ত হারায় প্রশ্ন বেদন-লাগা;
ওগো মধুর, জাগিয়ে সুদূর জাগা, আমায় জাগা!

প্রেমে যাঁহার ক্ষেমে যাঁহার চুমার মধু ভরা—
তাঁহার মাঝে আছে কিগো গুপ্ত-ব্যথার ঝরা?
নন্দনে আনন্দ কিগো দুখের বোঁটায় গাঁথা?
পরশ কেন সরস তবে? এ কি বিষম ধাঁধা!
আকাশ-ভরা তারা কহে, স্বপ্ন নহে সাঁচা;
আঁধার বলে আমার কোলে ঘুমিয়ে পড় বাছা!

কাটিয়ে নেশা ঘুমের বাসার ঘুরাই চেতন চাকা,
আকাশ জুড়ে শূন্যে উড়ে সাপটে চলি পাখা।
বায়ুর শাঁ-শাঁয় তারার ভাষা জড়িয়ে যে যায় আধা;
ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধ পথে এড়িয়ে চলি বাধা।
ভেসে আসে তবুও স্বপন, গোপন রহে বাণী—
বাসার পানে আমায় টানে নিশীথ রাতের রাণী।

আঁধার বাসায় তারার পরশ! পিউরে ডাকে পাখী,
ঘুমন্ত অন্তরে জাগে অন্তহীনের ঝাঁকি!
তারার গোপন বাণীর বেদন পাখীর গানে ঝরে,
নিশার মদির স্বপ্ন-নদী বহে তরতরে।
এড়িয়ে স্বপন জাগো গোপন! জাগাও চেতন-সাড়া;
জেগে থাক, প্রাণে জাগো আকাশ-ভরা তারা!



শেষের পরিচয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২)

রাখাল জামা খুলিয়া ফেলিল।

তারক প্রশ্ন করিল, বেরুবে না?

না। কিন্তু তুমি? যাচ্চো আজই বর্দ্ধমানে?

না। তুমি কি করো দেখ্‌বো,—স্বেচ্ছায় না করো জোর করে করাবো।

চায়ের কেৎলিটা আর একবার চড়িয়ে দিই,—কি বলো?

দাও।

কিছু জলখাবার কিনে আনিগে,—কি বলো?

রাজি।

তাহলে তুমি চড়াও জলটা, আমি যাই দোকানে। এই বলিয়া সে কোচার খুঁট গায়ে দিয়া চটি পায়ে বাহির হইয়া গেল। গলির মোড়েই খাবারের দোকান, নগদ পয়সার প্রয়োজন হয়না, ধার মেলে।

খাবার খাওয়া শেষ হইল। সন্ধ্যার পরে আলো জ্বালিয়া চায়ের পেয়ালা লইয়া দুই বন্ধু টেবিলে বসিল।

তারক প্রশ্ন করিল, তার পরে?

রাখাল বলিল, আমার বয়েস তখন দশ কি এগারো। বাবা চার-পাঁচ দিন আগে একবেলার কলেরায় মারা গেছেন, সবাই বল্‌লে বাবুদের মেজ মেয়ে সবিতা বাপের বাড়ীতে পূজো দেখ্‌তে এসেছে, তুই তাকে গিয়ে ধর্। বাবুদের বুড়ো সরকার আমাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে অন্দরে গিয়ে উপস্থিত হোলো। তিনি পৈঁইটের একধারে বসে কুলোয় কোরে তিল বাছ্‌ছিলেন, সরকার বল্‌লে, মেজ-মা, ইটি বামুনের ছেলে, তোমার নাম শুনে ভিক্ষে চাইতে এসেছে। হঠাৎ বাপ মারা গেছে,—ত্রিসংসারে এমন কেউ নেই যে এ দায় থেকে ওকে উদ্ধার করে দেয়। শুনে তাঁর চোখ ছল্ ছল্ করে এলো, বল্‌লেন, তোমার কি আপনার কেউ নেই? বল্লুম, মাসী আছে কিন্তু কখনো দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রাদ্ধ করতে কত টাকা লাগ্‌বে? এটা শুনেছিলুম, বল্লুম পুরুত মশাই বলেন পঞ্চাশ টাকা লাগ্‌বে। তিনি কুলোটা রেখে উঠে গেলেন, আর একটা কথাও জিজ্ঞেসা করলেননা। একটু পরে ফিরে এসে আমার উত্তরীয়ের আঁচলে দশ টাকার পাঁচখানি নোট বেঁধে দিয়ে বল্‌লেন, তোমার নাম কি বাবা? বল্লুম রাজু, ভালো নাম রাখালরাজ। বল্‌লেন, তুমি যাবে বাবা আমার সঙ্গে আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশে? সেখানে ভালো ইস্কুল আছে, কলেজ আছে, তোমার কোন কষ্ট হবেনা। যাবে? আমাকে জবাব দিতে হোলোনা, সরকার মশাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো, বল্‌লে, যাবে মা, যাবে, এক্ষুনি যাবে। এত বড় ভাগ্য ও কোথায় কার কাছে পাবে? ওর চেয়ে অসহায় এ গাঁয়ে আর কেউ নেই মা,—মা দুর্গা তোমাকে ধনে-পুত্রে চির-সুখী করবেন। এই বলে বুড়ো সরকার হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগ্‌লো।

শুনিয়া তারকের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, পিতৃ শ্রাদ্ধ ও মহামায়ার পূজো দুই-ই শেষ হলো। ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা ক'রে চিরদিনের

মত দেশ ছেড়ে তাঁর স্বামী-গৃহে এসে আশ্রয় নিলুম। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; তাই সবাই বলে নতুন-মা, আমিও বললুম নতুন-মা। শ্বশুর শাশুড়ী নেই, কিন্তু বহু পরিজন। অবস্থা সচ্ছল, ধনী বল্‌লেও চলে। এ বাড়ীর শুধু তো তিনি গৃহিণীই নয়, তিনিই গৃহকর্ত্রী। স্বামীর বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরতে সুরু করেছে, কিন্তু যেন ছেলে-মানুষের মত সরল। এমন মিষ্টি মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি,—দেখ্‌বামাত্রই যেন ছেলের আদরে আমাকে তুলে নিলেন। দেশে জমি-জমা চাষ-বাসও ছিল, দু-একখানি ছোট-খাটো তালুকও ছিল, আবার কলকাতায় কি-যেন একটা কারবারও চলছিল। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তিনি থাক্‌তেন বাড়ীতে, তখন দিনের অর্দ্ধেকটা কাট্‌তো তাঁর পূজোর ঘরে,—দেব-সেবায়, পূজো-আহ্নিকে, যপ তপে।

আমি ইস্কুলে ভর্ত্তি হোলাম। বই, খাতা-পেন্সিল-কাগজ-কলম এলো, জামা-কাপড়-জুতো-মোজা অনেক জুট্‌লো, ঘরে মাষ্টার নিযুক্ত হলো, যেন আমি এ-বাড়ীরই ছেলে,—নিরাশ্রয় বলে মা যে সঙ্গে করে এনেছিলেন এ কথা সবাই গেল ভুলে। তারক, এ জীবনে সে-সুখের দিন আর ফিরবেনা। আজও কতদিন আমি চুপ করে শুয়ে সেই সব কথাই ভাবি। এই বলিয়া সে চুপ করিল, এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেমন যেন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

তারক কহিল, রাখাল, কি জানি কেন আমার বুকের ভেতরটা যেন ঢিপ্ ঢিপ্ করচে। তার পরে?

রাখাল বলিল, তারপরে এমন অনেকদিন কেটে গেল। ইস্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে আই-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছি, এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন সমস্ত উল্টে-পাল্টে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেল। ভাঙ্‌তে চুরতে কোথাও কিছু আর বাকি রইল্‌না। এই বলিয়া সে নীরব হইল।

কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিলনা, কহিল, এতদিন কাউকে কোন কথা বলিনি। আর, বলবই বা কাকে? আজও বলা উচিত কিনা জানিনে, কিন্তু বুকের ভেতরটায় যেন ঝড় বয়ে যাচ্চে—

চাহিয়া দেখিল তারকের মুখে অপরিসীম কৌতূহল, কিন্তু সে প্রশ্ন করিলনা। রাখাল নিজের সঙ্গে ক্ষণকাল লড়াই করিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তারক, নিজের মাকে দেখিনি, মা বল্‌তে আমার নতুন-মাকেই মনে পড়ে। এই আমার সেই নতুন-মা। এতক্ষণে সত্যই তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। প্রথমে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, তারপরে বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মিনিট দুই-তিন পরে চোখ মুছিয়া নিজেই শান্ত হইল, কহিল, উনি তোমাকে দিন দুই থাক্‌তে বলে গেলেন, হয়ত তোমাকে তাঁর কাজ আছে। বারো-তেরো বছর পূর্ব্বের কথা,—সেদিন ব্যাপারটা কি ঘটেছিল তোমাকে বলি। তারপরে থাকা না-থাকা তোমার বিবেচনা।

তারক চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, তখন কে-একজন ওঁদের কলকাতার আত্মীয় প্রায়ই বাড়ীতে আস্‌তেন। কখনো দু-একদিন, কখনো বা তাঁর সপ্তাহ কেটে যেতো। সঙ্গে আস্‌তো তেল-মাখাবার খানসামা, তামাক সাজবার ভৃত্য, ট্রেনে খবরদারি করবার দরওয়ান,—আর, নানা রকমের কত-যে ফল-মূল-মিষ্টান্ন তার ঠিকানা নেই। পাল-পার্ব্বণ উপলক্ষে উপহারের তো পরিমাণ থাক্‌তোনা। তাঁর সঙ্গে ছিল এঁদের ঠাট্টার সুবাদ। শুধু কোন সম্পর্কের হিসেবেই নয়, বোধকরি বা ধনের হিসেব থেকেও এ বাড়ীতে তাঁর আদর-আপ্যায়ন ছিল প্রভূত। কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা যেন ক্রমশঃ কি একপ্রকার সন্দেহ করতে লাগ্‌লো। কথাটা ব্রজবাবুর কানে গেল, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, উল্টে করলেন রাগ। দূর-সম্পর্কের এক পিসতুতো বোন্‌কে যেতে হোলো তার শ্বশুরবাড়ী। শুনেচি, এমনিই নাকি হয়ে থাকে,—এই হোলো দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম। তাছাড়া, এইমাত্র তো ওঁর নিজের মুখেই শুন্‌তে পেলে কর্ত্তার মতো সরল-চিত্ত ভালোমানুষ লোক সংসারে বিরল। সত্যিই তাই। কারও কোন কলঙ্ক মনের মধ্যে স্থান দেওয়াই তাঁর কঠিন। আর, সন্দেহ কাকে, না নতুন-মাকে। ছি।

দিন কাটে, কথাটা গেল বাহ্যতঃ চাপ পড়ে, কিন্তু বিদ্বেষ ও বিষের বীজাণু আশ্রয় নিলে পরিজনদের নিভৃত গৃহ-কোণে। যাদের সবচেয়ে বড় কোরে আশ্রয় দিয়েছিলেন একদিন নতুন-মাই নিজে,—তাদেরই মধ্যে। কেবল আমাকেই যে একদিন 'যাবে বাবা আমার কাছে?' বলে ঘরে ডেকে এনেছিলেন তাই নয়, এনেছিলেন আরও

অনেককেই। এ ছিল তাঁর স্বভাব। তাই পিসতুতো বোন গেল চলে, কিন্তু পিসি রইলেন তার শোধ নিতে।

তারক শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। রাখাল কহিল, ইতিমধ্যে চক্রান্ত যে কত নিবিড় ও হিংস্র হয়ে উঠ্‌ছিলো তারই খবর পেলাম অকস্মাৎ একদিন গভীর রাতে। কি-একপ্রকার চাপা-গলার কর্কশ কোলাহলে ঘুম ভেঙে ঘরের বাইরে এসে দেখি সুমুখের ঘরের কবাটে বাইরে থেকে শেকল দেওয়া। উঠোনের মাঝখানে গোটা পাঁচ ছয় লণ্ঠন, বারান্দার একধারে বসে শুব্ধ-অধোমুখে ব্রজবাবু. এবং সেই ঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নবীনবাবু,—কর্ত্তার খুড়তুতো ছোট ভাই—রুদ্ধদ্বারে অবিরত ধাক্কা দিয়ে কঠিন কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ হাঁক্‌চেন,—রমণী বাবু, দোর খুলুন। ঘরটা আমরা দেখবো। বেরিয়ে আসুন বলচি!

ইনি কলকাতার আড়ত থেকে হাজার কুড়ি-পঁচিশ টাকা উড়িয়ে কিছুকাল হোলো বাড়ীতে এসে বসেছেন।

বাড়ীর মেয়েরা বারান্দার আশে পাশে দাঁড়িয়ে, মনে হলো চাকররা কাছাকাছি কোথায় যেন আড়ালে অপেক্ষা করে আছে;—ব্যাপারটা ঘুম-চোখে প্রথমটা ঠাওর পেলামনা কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত বুঝলাম। এখনি ভীষণ কি-একটা ঘট্‌বে ভেবে ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভেসে গেল, চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো; হয়ত মাথা ঘুরে সেইখানে পড়ে যেতাম, কিন্তু তা' আর হলোনা। দোর খুলে রমণীবাবুর হাত ধরে নতুন-মা বেরিয়ে এলেন, বল্‌লেন, তোমরা কেউ এঁর গায়ে হাত দিয়োনা আমি বারণ করে দিচ্চি। আমরা এখুনি বাড়ী থেকে বার হয়ে যাচ্চি।

হঠাৎ যেন একটা বজ্রপাত হয়ে গেল। এ কি সত্য-সত্যই এ বাড়ীর নতুন-মা! কিন্তু তাঁদের অপমান করবে কি বাড়ীশুদ্ধ সকলে যেন লজ্জায় মরে গেল। যে-যেখানে ছিল সেইখানেই শুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে,—তাঁরা সদর দরজা যখন পার হয়ে যান, কর্ত্তা তখন অকস্মাৎ হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠে বল্‌লেন, নতুন-বৌ, তোমার রেণু রইলো যে! কাল তাকে আমি কি দিয়ে বোঝাবো!

নতুন-মা একটা কথাও বল্‌লেননা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বার হয়ে গেলেন। সেদিন সেই রেণু ছিল তিন বছরের, আজ বয়স হ'য়েছে তার ষোল। এই তেরো বচ্ছর পরে আজ হঠাৎ দেখা দিলেন মা, মেয়েকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

এইবার এতক্ষণ পরে কথা কহিল তারক,—নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর এই তেরোটা বচ্ছর মেয়েকে মা চোখের আড়াল করেননি। এবং শুধু মেয়েই নয় খুব সম্ভব, তোমাদের কাউকেই না।

রাখাল কহিল, তাইতো মনে হচ্চে ভাই। কিন্তু কখনো শুনেছো এমন ব্যাপার?

না, শুনিনি, কিন্তু বইয়ে পড়েচি। একখানা ইংরিজি উপন্যাসের আভাস পাচ্চি। কেবল আশা করি উপসংহারটা যেননা আর তার মতো হয়ে দাঁড়ায়।

রাখাল কহিল, নতুন-মার ওপর বোধ করি এখন তোমার ঘৃণা জন্মালো তারক?

তারক কহিল, জন্মানোই তো স্বাভাবিক রাখাল।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। জবাবটা তাহার মনঃপুত হইলনা, বরঞ্চ মনের মধ্যে গিয়া কোথায় যেন আঘাত করিল। খানিক পরে বলিল, এরপরে দেশে থাকা আর চল্‌লোনা। ব্রজবাবু কলকাতায় এসে আবার বিবাহ করলেন,—সেই অবধি এখানেই আছেন।

আর তুমি?

রাখাল বলিল, আমিও সঙ্গে এলাম। পিসিমা তাড়াবার সুপারিশ করে বল্‌লেন, ব্রজ, সেই হত-ভাগীই এই বালাইটাকে জুটিয়ে এনেছিল,—ওটাকে দূর করে দে।

নতুন-মার স্নেহের পাত্র ব'লে আমার 'পরে পিসিমা সদয় ছিলেননা।

ব্রজবাবু শান্ত মানুষ, কিন্তু কথা শুনে তাঁর চোখের কোণটা একটু রুক্ষ হয়ে উঠ্‌লো, তবু শান্তভাবেই বল্‌লেন, ওই তো তার রোগ ছিল পিসিমা। আপদ-বালাই তো আর একটি জুটোয়নি,—কেবল ও-বেচারাকে তাড়ালেই কি আমাদের সুবিধে হবে?

পিসিমার নিজেদের কথাটা হয়ে গেছে তখন অনেক-দিনের পুরণো,—সে বোধহয় আর মনে নেই। বল্‌লেন, তবে কি ওকে ভাত-কাপড় দিয়ে বরাবর পুষতেই হবে না কি? না না, ও যেখানের মানুষ সেখানে যাক, ওর মুখ থেকে বাপ-মা মেয়ের কীর্ত্তি-কাহিনী শুনুক। নিজেদের বংশ-পরিচয়টা একটুখানি পাক্।

ব্রজবাবু এবার একটুখানি হাস্‌লেন, বল্‌লেন, ও ছেলে-

মানুষ, গুছিয়ে তেমন বল্‌তে পারবেনা পিসিমা, তার বরঞ্চ তুমি অন্য ব্যবস্থা করো।

জবাব শুনে পিসিমা রাগ করে চলে গেলেন, বলে গেলেন, যা' ভালো বোঝো বাছা করো, আমি আর কিছুর মধ্যেই নেই।

নতুন-মা যাবার পরে এ বাড়ীতে পিসিমার প্রভাবটা কিছু বেড়ে উঠেছিল। সবাই জানতো তাঁর বুদ্ধিতেই এতবড় অনাচারটা ধরা পড়েচে। এতকালের লক্ষ্মী-শ্রী তো যেতেই বসেছিল। নবীনবাবুর দরুণ যে কারবারের লোক-সান তার মূলেও দাঁড়ালো এই গোপন পাপ। নইলে কই এমন মতি বুদ্ধি তো নবীনের আগে হয়নি! পিসিমা বল্‌তেও আরম্ভ করেছিলেন তাই। বল্‌তেন, ঘরের লক্ষ্মীর সঙ্গে যে এসব বাঁধা। তিনি চঞ্চল হলে যে এমন হতেই হবে। হ'য়েছেও তাই।

তারক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় এসে ওঁদের বাড়ীতেই কি তুমি থাক্‌তে?

হাঁ, প্রায় বছর দশেক।

চলে এলে কেন?

রাখাল ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, আর সুবিধে হলনা।

তার বেশি আর বল্‌তে চাওনা?

রাখাল আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, বলে লাভও নেই, লজ্জাও করে।

তারক আর জানিতে চাহিলনা, চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, শেষে বলিল, তোমার নতুন-মা যে তোমাকে এতবড় একটা ভার দিয়ে গেলেন তার কি? যাবেনা একবার ব্রজবাবুর ওখানে?

সেই কথাই ভাব্‌চি। না হয় কাল—

কাল? কিন্তু, তিনি যে বলে গেলেন আজ রাত্রেই আবার আসবেন, তখন কি তাঁকে বল্‌বে?

রাখাল হাসিয়া মাথা নাড়িল।

তারক প্রশ্ন করিল, মাথা নাড়ার মানে? বল্‌তে চাও তিনি আস্‌বেননা?

তাই তো মনে হয়। অন্ততঃ, অত রাত্রে আস্‌তে পারা সম্ভবপর মনে করিনে।

এবার তারক অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি করি। সম্ভব না হলে তিনি কিছুতে বল্‌তেননা। আমার বিশ্বাস তিনি আস্‌বেন, এবং ঠিক এগারোটাতেই আসবেন। কিন্তু তখন তোমার আর কোন জবাব থাক্‌বেনা।

কেন?

কেন কি? তাঁর এতবড় দুশ্চিন্তাকে অগ্রাহ্য কোরে তুমি একটা পা-ও বাড়াওনি এ কথা তুমি উচ্চারণ করবে কোন্ মুখে? না, সে হবেনা রাখাল, তোমাকে যেতে হবে।

রাখাল কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, আমি গেলেও কিছু হবেনা তারক। আমার কথা ও-বাড়ীর কেউ কানেও তুল্‌বেনা।

তার কারণ?

কারণ, পাগল-বরের পক্ষেও যেমন এক মামা কর্ত্তা আছেন, কনের দিকেও তেম্‌নি আর এক মামা বিদ্যমান। ব্রজবাবুর এ পক্ষের বড়-কুটুম। অতি শক্তিমান পুরুষ। বস্তুতঃ, সে-মামার কর্ত্তৃত্বের বহর জানিনে, কিন্তু এ-মামার পরাক্রম বিলক্ষণ জানি। বাল্যকালে পিসিমার অতবড় সুপারিশেও আমাকে নড়াতে পারেনি, কিন্তু এঁর চোখের একটা ইসারার ধাক্কা সামলানো গেলনা, পুঁটুলি হাতে বিদায় নিতে হোলো। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, ভগবান জুটিয়েছেন ভালো। না ভাই বন্ধু, আমি অতি নিরীহ মানুষ,—ছেলে পড়াই, রাঁধি-বাড়ি, খাই, বাসায় এসে শুয়ে পড়ি। ফুরসৎ পেলে অবলা সবলা নির্ব্বিচারে বড়লোকের ফাই-ফরমাস খাটি,—বক্‌শিশের আশা করিনে—সে সব ভাগ্যবানদের জন্যে। নিজের কপালের দৌড় ভাল কোরেই জেনে রেখেচি,—ওতে দুঃখও নেই, একরকম সয়ে গেছে। দিন মন্দ কাটেনা, কিন্তু তাই ব'লে মল্লভূমি ঘেঁসে দাঁড়িয়ে মামায়-মামায় কুস্তি লড়িয়ে তার বেগ সম্বরণ করতে পারবোনা।

শুনিয়া তারক হাসিয়া ফেলিল। রাখালকে সে যতটা হাবা-বোকা ভাবিত, দেখিল তাহা নয়। জিজ্ঞাসা করিল, দু-পক্ষেই মামা রয়েছে বলে মল্ল যুদ্ধ বাধ্‌বে কেন?

রাখাল কহিল, তাহলে একটু খুলে বল্‌তে হয়। মামা মশায় আমাকে বাড়ীটা ছাড়িয়েছেন, কিন্তু তার মায়াটা আজও ঘোচাতে পারেননি, কাজেই অল্প-স্বল্প খবর এসে কানে পৌছয়। শোনা গেল ভগিনীপতির কন্যাদায়ে শ্যালকের আরামেই বেশি বিঘ্ন ঘটাচ্চে,—এ ঘটকালিও

তাঁর কীর্ত্তি। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে আমাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবেনা, এবং সম্ভবতঃ, কাউকে দিয়েই না। পাকা-দেখা, আশীর্ব্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, অতএব এ বিবাহ ঘট্‌বেই।

তারক কহিল, অর্থাৎ, ও-পক্ষের মামাকে কন্যার মায়ের কাহিনী শোনাতেই হবে; এবং তারপরে ঘটনাটা মুখে-মুখে বিস্তারিত হতেও বিলম্ব ঘট্‌বেনা। এবং, তার অবশ্যম্ভাবী ফল ও-মেয়ের ভালো-ঘরে আর বিয়েই হবেনা।

রাখাল বলিল, আশঙ্কা হয় শেষ পর্য্যন্ত এম্‌নিই কিছু-একটা দাঁড়াবে।

কিন্তু মেয়ের বাপ তো আজও বেঁচে আছেন?

না, বাপ বেঁচে নেই, শুধু ব্রজবাবু বেঁচে আছেন।

তারক ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, রাখাল, চলোনা একবার যাই। বাপটা একেবারেই মরেছে, না লোকটার মধ্যে এখনো কিছু বাকি আছে দেখে আসিগে।

তুমি যাবে?

ক্ষতি কি? বল্‌বে ইনি পাত্রের প্রতিবেশী,—অনেক কিছুই জানেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল, ভালো বুদ্ধি। প্রথমতঃ, সে সত্যি নয়, দ্বিতীয়তঃ, জেরার দাপটে তোমার গোলমেলে উত্তরে তাঁদের ঘোর সন্দেহ হবে তুমি পাড়ার লোক, ব্যক্তিগত শত্রুতা বশে ভাঙ্‌চি দিতে এসেচো। তাতে কার্য্যসিদ্ধি তো হবেইনা, বরঞ্চ, উল্টো ফল দাঁড়াবে।

তাই তো। তারক মনে মনে আর একবার রাখালের সাংসারিক বুদ্ধির প্রশংসা করিল, বলিল, সে ঠিক। আমাদের জেরায় ঠক্‌তে হবে। নতুন-মার কাছে আরও বেশি খবর জেনে নেওয়া উচিত ছিল। বেশ, আমাকে তোমার একজন বন্ধু বলেই পরিচয় দিও।

হাঁ, দিতে হলে তাই দেবো।

তারক বলিল, এ-বিয়ে বন্ধ করার চেষ্টায় তোমার সাহায্য করি এই আমার ইচ্ছে। আর কিছু না পারি, এই মামাটিকে একবার চোখে দেখেও আস্‌তে পারবো। আর অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে শুধু ব্রজবাবুই নয়, তাঁর তৃতীয় পক্ষেরও হয়ত দেখা মিলে যেতে পারে।

রাখাল বলিল, অন্ততঃ, অসম্ভব নয়।

তারক প্রশ্ন করিল, এই মহিলাটি কেমন রাখাল?

রাখাল কহিল, বেশ ফর্সা মোটা-সোটা পরিপুষ্ট গড়ন অবস্থাপন্ন বাঙালী-ঘরে একটু বয়স হলেই ওঁরা যেমনি হয়ে ওঠেন তেম্‌নি।

কিন্তু মানুষটি?

মানুষটি তো বাঙালী-ঘরের মেয়ে। সুতরাং, তাঁদেরই আরও দশজনের মতো। কাপড়-গয়নায় প্রগাঢ় অনুরাগ, উৎকট ও অন্ধ সন্তান-বাৎসল্য, পরদুঃখে সকাতর অশ্রুবর্ষণ, দু-আনা চার-আনা দান, এবং পরক্ষণেই সমস্ত বিস্মরণ। স্বভাব মন্দ নয়,—ভালো বল্‌লেও অপরাধ হয়না। অল্প-স্বল্প ক্ষুদ্রতা, ছোট খাটো উদারতা, একটু আধটু—

তারক বাধা দিল,—থামো থামো। এসব কি তুমি ব্রজবাবুর স্ত্রীর উদ্দেশেই শুধু বোল্‌চো, না সমস্ত বাঙালী-মেয়েদের লক্ষ্য করে যা' মুখে আস্‌চে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্চো,—কোন্‌টা?

রাখাল বলিল, দুটোই রে ভাই দুটোই। শুধু তাৎপর্য্য গ্রহণ শ্রোতার অভিজ্ঞতা ও অভিরুচি সাপেক্ষ।

শুনিয়া তারক সত্যই বিস্মিত হইল, কহিল, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার মনেমনে যে এতটা উপেক্ষা আমি জানতামনা। বরঞ্চ ভাবতাম যে—

রাখাল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ঠিকই ভাব্‌তে ভাই, ঠিকই ভাব্‌তে। এতটুকু উপেক্ষা করিনে। ওঁরা ডাক্‌লেই ছুটে যাই, না ডাক্‌লেও অভিমান করিনে, শুধু দয়া করে খাটালেই নিজেকে ধন্য মানি। মহিলারা অনুগ্রহও করেন যথেষ্ট, তাঁদের নিন্দে করতে পারবোনা।

তারক বলিল, অনুগ্রহ যাঁরা করেন তাঁদের একটু পরিচয় দাওতো শুনি।

রাখাল বলিল, এইবারেই ফেল্‌লে মুস্কিলে। জেরা করলেই আমি ঘাবড়ে উঠি। এ বয়সে দেখ্‌লাম শুনলাম অনেক, সাক্ষাৎ পরিচয়ও বড় কম নেই, কিন্তু এম্‌নি বিশ্রী স্মরণ-শক্তি যে কিছুই মনে থাকেনা। না তাঁদের বাইরের চেহারা না তাঁদের অন্তরের। সাম্‌নে বেশ কাজ চলে, কিন্তু একটু আড়ালে এলেই সব চেহারা লেপে মুছে একাকার হয়ে যায়। একের সঙ্গে অন্যের প্রভেদ ঠাউরে পাইনে।

তারক কহিল, আমরা পল্লীগ্রামের লোক, পাড়ার আত্মীয় প্রতিবেশীর ঘরের দু'চারটি মহিলা ছাড়া বাইরের কাউকে চিনিওনে, জানিওনে। মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের

এই তো জান। কিন্তু এই প্রকাণ্ড সহরের কত নতুন, কত বিচিত্র—

রাখাল হাত তুলিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, কিছু চিন্তা কোরোনা তারক, আমি হদিশ বাৎলে দেব। পাড়াগাঁয়ের বলে যাঁদের অবজ্ঞা কোরচ কিম্বা মনে মনে যাঁদের সম্বন্ধে ভয় পাচ্চো তাঁদেরকেই সহরে এনে পাউডার রুজ প্রভৃতি একটু চেপে মাখিয়ে মাস দুই খানকয়েক বাছা বাছা নাটক-নভেল এবং সেই সঙ্গে গোটা-পাঁচেক চল্‌তি চালের গান শিখিয়ে নিও—ব্যস্! ইংরিজি জানে না? না জানুক্, আগাগোড়া বল্‌তে হয়না, গোটাকুড়ি ভব্য কথা মুখস্থ করতে পারবে ত? তা' হলেই হবে। তার পরে—

তারক বিরক্ত হইয়া বাধা দিল,—তারপরেতে আর কাজ নেই রাখাল, থাক্। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি কেন তোমার গা নেই। ঐ মেয়েটীর যেখানে যার সঙ্গেই বিয়ে হোক্ তোমার কিছুই যায় আসেনা। আসলে ওদের প্রতি তোমার দরদ নেই।

রাখাল সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, দরদ হবে কি করে বলে দিতে পারো?

পারি। নির্বিচারে মেলা-মেশাটা একটু কম করো,—যা' হারিয়েছো তা' হয়ত একদিন ফিরে পেতেও পারো। আর কেবল এই জন্যেই নতুন-মার অনুরোধ তুমি স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারলে।

রাখাল মিনিট খানেক নিঃশব্দে তারকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরিহাসের ভঙ্গীটা ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিল, বলিল, এইবার ভুল হোলো। কিন্তু তোমার আগের কথাটায় হয়ত কিছু সত্যি আছে,—ওদের অনেকের অনেক কিছু জান্‌তে পারায় লাভের চেয়ে বোধ হয় ক্ষতিই হয় বেশি। এখন থেকে তোমার কথা শুন্‌বো। কিন্তু যাঁদের সম্বন্ধে তোমাকে বল্‌ছিলাম তাঁরা সাধারণ মেয়ে,—হাজারের মধ্যে ন'শ নিরানব্বুই। তার মধ্যে নতুন-মা নেই। কারণ, ঐ যে একটি বাকি রইলেন তিনিই উনি। ওঁকে অবহেলা করা যায়না, ইচ্ছে করলেও না। কিসের জন্যে আজ তুমি বর্দ্ধমানে যেতে পারচোনা সে তুমি জানোনা কিন্তু আমি জানি। কিসের তাগাদায় ঠেলে-ঠুলে আমাকে এখুনি পাঠাতে চাও মামাবাবুর গহ্বরে তার হেতু তোমার কাছে পরিষ্কার নয়, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্চি। ওঁর বিগত ইতিহাস শুনে ঐ যে কি না বল্‌ছিলে তারক অমন স্ত্রীলোককে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক,—তোমার ঐ মতটি আর একদিন বদ্‌লাতে হবে। ওতে চলবে না।

তারক মুখে হাসি আনিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল, না চললে জানাবো। কিন্তু ততক্ষণ নিজের কথা অপরের চেয়ে যে বেশি জানি এটুকু দাবী করলে রাগ কোরোনা রাখাল। কিন্তু এ তর্কে লাভ নেই ভাই,—এ থাক্। কিন্তু, তোমার কাছে যে আজ পর্য্যন্ত একটি নারীও শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে টিকে আছেন এ মস্ত আশার কথা। কিন্তু আমরা ওর নাগাল পাবোনা রাখাল, আমরা তোমার ঐ একটিকে বাদ দিয়ে বাকি ন'শ নিরানব্বুইয়ের ওপরেই শ্রদ্ধা বাঁচিয়ে যদি চলে যেতে পারি তাতেই আমাদের মত সামান্য মানুষে ধন্য হয়ে যাবে।

রাখাল তর্ক করিলনা,—জবাব দিলনা। কেবল মনে হইল সহসা সে যেন একটুখানি বিমনা হইয়া গেছে।

কি হে যাবে?

চলো।

গিয়ে কি বল্‌বে?

মোটের ওপর যা সত্যি তাই। বল্‌বো বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই ভালো।

দুই বন্ধু উঠিয়া পড়িল। রাখাল দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যুক্তপাণি কপালে ঠেকাইয়া বলিল, দুর্গা! দুর্গা! অতঃপর উভয়ে ব্রজবাবুর বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

তারক হাসিয়া কহিল, আজ কোন কাজই হবেনা। নামের মাহাত্ম্য টের পাবে। (ক্রমশঃ)



প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

১৬৮৬ হইতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ

এই পরিচ্ছেদে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আগমন হইতে শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির *ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল।*

১৬৮৬—এই বৎসরের ২০শে ডিসেম্বর জব্‌চার্ণক্ প্রথম হুগলী হইতে সুতানুটীতে আইসেন।

১৬৮৭—চার্ণক্ ফেব্রুয়ারি মাসে এই স্থান হইতে হিজ্‌লী যান। পরে পুনরায় এই বৎসরেই আগমন করেন।

১৬৮৮—নবাবের সহিত গোলযোগ ঘটায় ৮ই নভেম্বর পুনরায় চার্ণক্ এই স্থান ত্যাগ করেন।

১৬৯০—২৪শে আগষ্ট চার্ণক্ তৃতীয় এবং শেষবার ত্রিশজন সৈন্য এবং লোকজন সহ সুতানুটীতে আগমন করেন।

১৬৯১—চার্ণক্ বাঙ্গলার নবাব ইব্রাহিম্ খাঁর নিকট হইতে বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিবার সর্ত্ত সকল সম্বলিত পরোয়ানা প্রাপ্ত হন।

১৬৯২—চার্ণকের মৃত্যু হয় ১০ই জানুয়ারি।

১৬৯৪—গোল্ডস্‌বারো (Sir John Goldsborough) কমিশারি জেনারেল রূপে আগমন করেন।

মিঃ এলিস্ (Mr. Ellis) চার্ণকের স্থানে নিয়োজিত হন। তিনি উপরিতম কর্ম্মচারী ও তত্ত্বাবধারক গোল্ডস্‌বারোকে সন্তুষ্ট করিতে না পারায় ঢাকার প্রধান কর্ম্মচারী আয়ার (Mr. Eyre) তৎপদে নিযুক্ত হন।

১৬৯৫—সুতানুটীতে বাঙ্গালার প্রধান এজেন্টের বাসভবন স্থির হয়। এই স্থান হইতেই টাউন্ ডিউটী আদায় হইত। এ বৎসর দুই হাজার টাকা ডিউটী আদায় হইয়াছিল।

১৬৯৬—হিন্দু জমিদার শোভা সিং এবং আফগান সর্দ্দার রহিম খাঁর বিদ্রোহ হয়। কোম্পানী নবাবের নিকট প্রার্থনা করায় স্থানটিকে সুরক্ষিত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইহাতেই পুরাতন দুর্গ নির্ম্মাণের সূত্রপাত হয়।

১৬৯৮—কুমার আজিম্ উস্মানের নিকট হইতে মিঃ ওয়ালস্ (Mr. Walsh) গোবিন্দপুর কলিকাতা ও সুতানুটী নামক গ্রাম তিনটী ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

১৬৯৯—জন্ বেয়ার্ড্ (*John Beard*) মাসিক দুই শত টাকা বেতনে বাঙ্গলার কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য চারিজন সদস্য নিযুক্ত হন।

১৭০৩—জন্ বেয়ার্ড্ United Company of Merchants Trading to the East Indiesএর কাউন্সিলের সভাপতির পদে পাকা হন এবং তাঁহার অধীনে আটজন কমিশনার কার্য্য-তত্ত্বাবধারণের জন্য নিযুক্ত হন।

১৭০৬—সভাপতি বেয়ার্ডের মৃত্যুর পর মেসার্স্ হেজেস্ (Hedges) এবং শেলডন্ (Sheldon) তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হন। এই সময় কামানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এবং ১৩০ জন গোরা সৈনিক দ্বারা ফোর্ট্ উইলিয়মের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময়ই স্থানটি সুরক্ষিত বিবেচনা করিয়া অন্যত্র হইতে বহু লোক ব্যবসায়ার্থ এখানে আসিয়া কলিকাতার পত্তন করে।

১৭১৩—বাৎসরিক ৩০০০্ টাকা লইয়া সমস্ত কাষ্টম্ ডিউটী ছাড়ের জন্য বাদসাহ আরঙ্গজেবের ফার্ম্মাণ্ পাওয়া সত্ত্বেও নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর শতকরা ২॥ টাকা ডিউটী পাওয়ার জন্য তৎকালীন গভর্ণর মিঃ হেজেস্ দিল্লীতে বাদসাহের নিকট অসুবিধা জ্ঞাপনের জন্য দূত পাঠাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

১৭১৫—জন্ সারম্যান্ (John Surman) এডোয়ার্ড ষ্টিফেন্‌সন্ (Edward Stephenson) দূত মনোনীত হইয়া দিল্লী যাত্রা করেন এবং সেই বৎসর ৮ই জুলাই তথায় পৌছান। তাঁহাদের সহিত খোজা শেরহাগু (Khoja

Serhand) নামক একজন ইহুদি ব্যবসায়ী দোভাষী রূপে এবং উইলিয়ম্ হ্যামিল্টন্ (William Hamilton) চিকিৎসক রূপে গমন করেন।

১৭১৬—কলিকাতার প্রথম গির্জ্জা বর্ত্তমান রাইটার্স্ বিল্ডিংয়ের পশ্চিমে এবং পুরাতন দুর্গের দক্ষিণে নির্ম্মিত হয়। ইহার নাম হয় সেণ্ট জনস্ চার্চ্চ। ইহার প্রথম পাদ্রী নিযুক্ত হন স্যামুয়েল্ ব্রেরেটন্ (Rev. Samuel Brereton) অথবা ব্রায়েন্ক্লিফ্ (Revd. S. Briencliffe)

১৭২০—কলিকাতায় জমিদারের পদ সৃষ্টি হয় এবং গোবিন্দরাম' মিত্র দেওয়ান নিযুক্ত হন। তিনি কালো জমিদার (Black Zamindar) নামে খ্যাত ছিলেন। জমিদার অর্থে সাধারণত যাহা বুঝায় এ তাহা নহে। তাঁহার মিউনিসিপ্যাল, রাজস্ব বিষয়ক সিভিল্ ও ফৌজদারী সকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব ছিল; এমন কি জরিমানা করার ও কয়েদ দেওয়ার পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা ছিল।

১৭২৪—মেয়র কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রাণ্টএর (Grant) মতে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে একজন মেয়র ও নয়জন অল্ডারম্যান্ থাকিত। অল্ডারম্যানেরাই প্রতি বৎসর মেয়র নির্ব্বাচন করিত। তাহাদের বেতন ছিল মাসিক কুড়ি টাকা।

এই বৎসরই অষ্টেণ্ড কোম্পানী বাঁকিবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বৎসর আরমেনিয়ান্ গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়, এবং সেণ্ট নাজেরথের (St. Nazareth) নামে উৎসর্গীকৃত হয়। ইহাই বর্ত্তমানে প্রাচীনতম খৃষ্টান উপাসনা-মন্দির।

হুগলীর ফৌজদার একখানি রেশমপূর্ণ নৌকা আটক করায় উহাকে মুক্ত করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরিত হয় এবং তাহারা উহার উদ্ধারে কৃতকার্য্য হয়। ইহাতে তদানীন্তন বাঙ্গালার নবাব সুজাউদ্দীন খাঁ ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিশেষ উত্তেজিত হন। তাঁহারা পরিশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অনেক জরিমানা দিতে বাধ্য হন।

১৭২৬—এই বৎসর আগষ্ট মাসে বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই তিনটী পৃথক এবং বিভিন্ন প্রদেশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। বিলাতের লিডেনহল্ ষ্ট্রীটে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউস্" নামক কোম্পানীর বাটীটি এই সময় নির্ম্মিত হয়।

১৭২৭—বহু ইংলণ্ডীয় ব্যবসায়ী এবং ইহুদী, পোর্ত্তুগীজ, হিন্দু ও মোগল ব্যবসাদারদের দ্বারা স্থানটী পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং এ বৎসর ১০০০০ টনেরও অধিক পরিমাণে মাল রপ্তানি হয়।

মিঃ বুশিয়ে দ্বারা প্রথম দাতব্য-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, উহাই পরে ফ্রী স্কুল নাম প্রাপ্ত হয়। এই বুশিয়ে সাহেব পরবর্ত্তী কালে বোম্বাইয়ের গভর্ণর হন।

১৭৩৩—মিঃ ফ্রেক্ (Mr. Freke) কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন।

ডাচ্ এবং ইংরাজদের প্ররোচনায় হুগলীর ফৌজদার ভাগীরথীর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বাঁকিবাজারস্থিত জার্ম্মাণ কোম্পানীকে আক্রমণ করেন। তাঁহারা বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সহিত বাধা দান করিয়াও শেষে স্থানটী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। ফৌজদার সৈন্যের অধিনায়ক মিরজাফর পরিত্যক্ত দুর্গ অধিকার করিয়া উহার ধ্বংস সাধন করেন। এই হইতেই অষ্টেণ্ড্ কোম্পানীর অস্তিত্ব লোপ ঘটে।

১৭৩৪—মিঃ বুশিয়ে দাতব্য স্কুলটী কোম্পানীর হস্তে বাৎসরিক চারিসহস্র টাকা ব্যয়ে উহার পরিচালন করিবে এই সর্ত্তে দান করেন।

১৭৩৭—ভীষণ ঝটিকা ও ভূমিকম্পে কলিকাতার সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। ১৭৩৮-৩৯ সালের Gentleman's Magazine পত্রিকায় ইহার যে বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে জানা যায় কলিকাতায় তখন দুইশতখানি বাটী ভূমিসাৎ হয়। প্রথম চূড়াওয়ালা গীর্জ্জা সেণ্ট্ জনের চূড়াটি ভূপতিত হয়। নয় খানি ইংরাজ কোম্পানীর জাহাজের মধ্যে আটখানি এবং চারিখানির মধ্যে তিনখানি ডাক্ জাহাজ লোকজন ও মালপত্রসহ জলমগ্ন হয়। ঝটিকা এত প্রবল হইয়াছিল যে, অনেক বড় বড় নৌকাও গাছের উপর উঠিয়া গিয়াছিল। কথিত আছে, এই দৈব দুর্ব্বিপাকে সর্ব্ব সমেৎ গঙ্গাতে ২০০০০ জাহাজ, নৌকা, স্লুপ্ প্রভৃতি জলমগ্ন হয় এবং তিনলক্ষ প্রাণী বিনষ্ট হয়।

১৭৩৮—মিঃ ক্রুটেন্ডেন্ (Mr. Cruttenden) মিঃ ফ্রেকের স্থানে কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন।

১৭৩৯—মিঃ ব্রাডেল্ (Mr. Braddyll) মিঃ ক্রুটেন্-ডেনের স্থানে কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন।

১৭৪২—মহারাষ্ট্রীয়েরা ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বাঙ্গালা

আক্রমণ করিলে নদীর পশ্চিম দিকস্থ গ্রাম সকলের অধিবাসী দিগের মধ্যে অনেকে নিরাপদ বিবেচনা করায় কলিকাতায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তদানীন্তন নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজরা সহরের সকল দিকে গভীর পরিখা কাটিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতেই মহারাষ্ট্র খাতের উৎপত্তি।

১৭৪৪—কলিকাতায় ফ্রী ম্যাশন্ লজের নাম প্রথম উল্লিখিত হয়।

১৭৪৬—মিঃ ফ্রষ্টার (Mr. Froster) ব্রাডেলের স্থানে কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন।

১৭৪৭—মিঃ ডসন্ (Mr. Dawson) ফ্রষ্টারের স্থানে কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন।

১৭৪৮—মিঃ ফ্রষ্টার পুনরায় কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন।

বর্গীর ভয় হেতু ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় একটী সাধারণ পরামর্শ সভা হয়। মাননীয় জন্ ফস্টর্ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উমিচাঁদের নাম এই বৎসরে প্রথম কলিকাতার ইতিহাসে স্থান পায়। তিনি ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রদের মধ্যস্থ স্বরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইংরাজরা হুগলীর ফৌজদারকে বাৎসরিক ২৭৫০৲ টাকা দিতেন।

বেঙ্গল আর্টিলারি প্রথম গঠিত হয়। মেজর জেমস্ মস্‌ম্যান্ (Major James Mosman) উহা গঠন করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক্রনলজিষ্টের মতে মিঃ ডসন্ পুনরায় এই বৎসর গভর্ণর হন এবং এই বৎসরই পদত্যাগ করেন। তৎপরে মিঃ ফিচ্ (Mr. W Fytche) তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৭৪৯—আরমেনিয়ন্ এবং ইংরাজের মধ্যে বিবাদ হয় এবং আরমেনীয়রাই তাহা নবাবের গোচরে আনয়ন করেন।

উপনিবেশটিকে শ্রীসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সহরের জল নিকাশের জন্য নর্দ্দামাগুলির জরীপ ও মেরামত করিবার জন্য জমিদারের প্রতি উহার মাপযোগের আদেশ হয়।

হল্‌ওয়েল্ (Mr. John Zephaniah Holwell) যিনি ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে কেরাণীরূপে এ দেশে আইসেন, ডাক্তার লিণ্ডসের (Dr. William Lindsay) মৃত্যুর পর উপনিবেশের সার্জ্জন্ নিযুক্ত হন।

১৭৫০—মিঃ ফিচের পর মিঃ বারওয়েল্ (Mr. Barwell) গভর্ণর নিযুক্ত হন।

১৭৫১—মাননীয় মিঃ ডসন্ পুনরায় কাউন্সিলের সভাপতি হন।

১৭৫২—মাননীয় ড্রেক্ (Hon'ble Roger Drake) গভর্ণর নিযুক্ত হন।

সভাপতি, ক্রটেণ্ডেন্ ও বীচারের সহিত মূল্যবান উপঢৌকন সহ নবাব সিরাজদ্দৌলার জন্য অপেক্ষা করেন। নবাব তাহা গ্রহণ করেন।

এপ্রেল মাসের মোট রাজস্ব আদায় হয় ৯৭২৯৲ টাকা, উহা আদায়ের ব্যয় হয় ২৪৮১৲ টাকা। উপনিবেশের সমগ্র মাসিক ব্যয় হইত প্রায় ২০০০০৲ টাকা। সভাপতির বেতন ছিল পারিতোষিক সহ মাসিক ২৫৪৲ টাকা। পাত্রী পাইত মাসিক ৮৪৲ এবং ডাক্তার ৩০৲ টাকা। ইহা ভিন্ন তাহারা মালের উপর কমিশন পাইত।

কালো জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র হলওয়েল্ কর্ত্তৃক প্রতারণার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হন; কিন্তু কাউন্সিলের অধিকাংশের মতানুসারে তাঁহাকে পুনঃ নিযুক্ত করা হয়, যদিও ৩৩৯৭৲ টাকা তাঁহাকে ফেরৎ দিতে হইয়াছিল।

১৭৫৩—কোর্ট অব্ রিকোয়েষ্ট নামক আদালতের জন্য নূতন রাজাজ্ঞাপত্র পাওয়া যায় এবং বার জন কমিশনর নিযুক্ত হন। কর্পোরেসন্ এলডারম্যান্ মিঃ অরিয়্যাল্ (Mr. Auryall) কে মেয়র নির্ব্বাচিত করেন। তিনি এই কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায় ৫০ পাউণ্ড জরিমানা দিতে বাধ্য হন। তৎপরে মিঃ প্লেসটেড্ (Mr. Plaisted) ঐ পদে নির্ব্বাচিত হন।

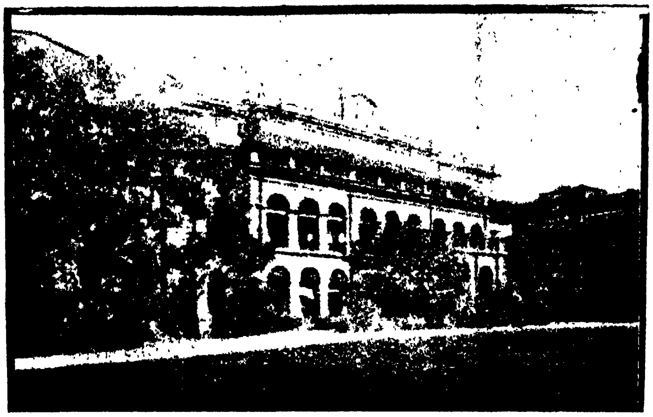
গভর্ণর ড্রেক্ কর্ত্তৃক একটী টাঁকশাল স্থাপনের প্রস্তাব হয়।

১৭৫৪—পূর্ব্বে চাউলের দর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় উহার রপ্তানি বন্ধ ছিল। এক্ষণে চাউল ব্যবসায়ীদের রপ্তানি করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এখন সরু চাল টাকায় ৮২॥ সের হয়।

গ্রীষ্ম ও বর্ষার সময় ব্যতীত কোম্পানীর কেরাণীদের পাল্কি চড়িয়া আফিসে আসা নিষিদ্ধ হয়।

১৭৫৫—কলিকাতাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য এখন পর্য্যন্ত ব্যয় অতি অল্পই করা হইত। বাগবাজারের দিকটা

দৃঢ়রূপে রক্ষণের জন্ত ৩৫৮।৶১৫ ব্যয় করা হয়। ইঞ্জিনীয়ার কর্ণেল সিম্‌সন্ (Colonel Simson) দুর্গকে সুরক্ষিত করিবার জন্ত দুর্গ-মধ্যস্থ কতিপয় বাটী বিনষ্ট করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু কাউন্সিল্ তাহা মঞ্জুর করেন নাই। কর্ণেল্ স্কট্ (Colonel Scott) সহরকে পরিখা-বেষ্টিত করিবার জন্ত একটি প্রস্তাব করেন। কাউন্সিল এজন্ত ১৫০০০৲ টাকা মঞ্জুর করেন।



সার্ভেয়ার জেনারেল অফিস্

খৃষ্টান ফৌজদারী অপরাধীদের বিচার জন্ত একটি স্বতন্ত্র আদালত স্থাপিত হয়।

হোয়াইট্ টাউনে সাহেবদের বাটী বিক্রীতে শতকরা ৫৲ টাকা ডিউটি ধার্য্য হয়।

১৭৫৬—ঢাকার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ কলিকাতায় আশ্রয় লইলে নবাব গভর্ণর ড্রেকের নিকট তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্ত আদেশ করেন; কিন্তু ইহা মৌনভাবে অস্বীকৃত হয়। ইহাতে নবাব সিরাজ-দ্দৌলা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং প্রথম কাশীমবাজারের ইংরাজ কুঠি আক্রমণ করেন। তৎপরে তাঁহার সৈন্তবাহিনীর সহিত কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং প্রথম নগরের উত্তরাংশ বাগবাজারে আক্রমণ করেন ও তাহাতে বাধা প্রাপ্ত হন। তিন দিন পরে সমস্ত ফাঁড়ীগুলি নবাব সৈন্তের হস্তগত হয়। জাহাজের জনৈক কর্ম্মচারীর সাহসিকা স্ত্রী মিসেস্ কেরি (Mrs Carey) স্বামীকে ত্যাগ করিতে অস্বীকৃতা হওয়ায় তাঁহাকে ভিন্ন অপর সমস্ত মহিলাকে গঙ্গাবক্ষে জাহাজে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের অছিলায় প্রথম মেসার্স মানিংহাম্ (Manningham) ও ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড্ (Finkland) এবং পরে গভর্ণর মিঃ রোজার ড্রেক্ (Mr. Roger Drake) কাউন্সিলের জনৈক সদস্য মিঃ ম্যাকেট্ (Mr. Macket) কাপ্তেন্ মিন্‌চিন্ (Minchin) ও কাপ্তেন্ গ্রাণ্ট্ (Grant) ঐ পথ অবলম্বন করেন। এই ব্যাপারের পর কাউন্সিলের নির্দ্দেশ মত মিঃ হলওয়েল্ তাঁহাদের অধ্যক্ষ মনোনীত হন এবং যাহাতে অপর কেহ দুর্গ হইতে পলায়ন করিতে না পারে সেজন্ত নদীর দিকের দ্বার বন্ধ করিয়া দেন। এই সময় ১৭০ বা ১৯০ জন ইংরাজ যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা সাহসিকতার সহিত বাধা দিবার যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্বেও নবাবের সৈন্ত সকল দিক দিয়া দুর্গ আক্রমণ করে এবং ইংরাজদের পরাস্ত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। ২০শে জুন বৈকালে নবাব দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং কোষাগারে মাত্র অর্দ্ধলক্ষ টাকা পাওয়ায় হলওয়েল্‌কে নিকটে উপস্থিত করান ও বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

কথিত আছে নবাবের আদেশে হলওয়েল্ ও অন্তান্ত মোট ১৪৬ জনকে একটি কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।



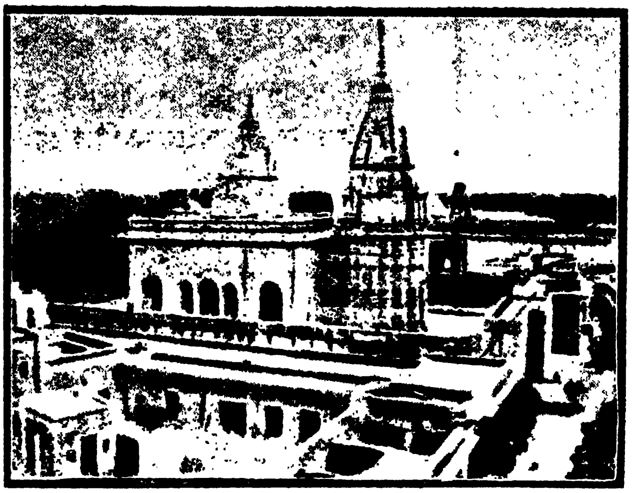
আলিপুরের পুল

পর দিবস প্রাতে দরজা খুলিলে মাত্র ২৩ জনকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ইংরাজ ঐতিহাসিক ইহাকে অন্ধকূপ হত্যা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অতঃপর নবাব কলিকাতার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া

আলিনগর রাখেন এবং তিন সহস্র সৈন্তসহ হুগলীর ফৌজদার মাণিকচাঁদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ২রা জুলাই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মুর্শীদাবাদ যাত্রা করেন।

১৭৫৭—এড্‌মিরাল্ ওয়াটসনের (Admiral Watson) ও কর্ণেল্ ক্লাইভের (Colonel Clive) অধিনায়কত্বে মান্দ্রাজ হইতে ৯০০ ইংরাজ সৈন্ত, ১৫০০ সিপাহি ও যুদ্ধ জাহাজ আসিয়া দুর্গ ও কলিকাতা নগরী পুনরধিকার করে।



লালাবাবুর মন্দির—বৃন্দাবন

তৎপরে ২২শে মার্চ্চ ক্লাইভ্ ও ওয়াট্‌সন্ টাইগার, কেণ্ট্ ও স্যালিশবারি নামক তিনখানি রণতরি লইয়া চন্দননগর আক্রমণ করেন এবং নয় দিনের পর টেরান্যু (Terreneau) নামক একজন ফরাসী কর্ম্মচারীর



গভর্ণমেণ্ট প্রেস—১৮৪০

বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে উহা জয় করেন। তৎপরে এই স্থান হইতেই তাঁহারা মুর্শীদাবাদ যাত্রা করেন এবং ২৩শে জুন পলাশি প্রাঙ্গণে নবাবের সেনাপতি মিরজাফর ও অন্য কয়েকজনের ষড়যন্ত্রে সিরাজদ্দৌলাকে পরাস্ত করেন।

২৯শে জুন্ ক্লাইভ্ এক দরবারে মিরজাফরকে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা করেন। নবাব ইংরাজদের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ বহু অর্থ প্রদান করেন ও বহু সুযোগ করিয়া দেন।

১৬ই আগষ্ট ওয়াট্‌সনের মৃত্যু হয় এবং সেণ্ট্ জর্জ্জ গির্জ্জার সমাধিক্ষেত্রে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

২৯শে আগষ্ট কলিকাতার ট্যাঁকশালে প্রথম আলিনগর নামাঙ্কিত টাকা প্রস্তুত হয়।

১৭৫৮—অতঃপর নূতন মুদ্রায় আলিনগর নাম মুদ্রিত হইবে না স্থির হয়।

নূতন দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য গোবিন্দপুর হইতে পল্লী, বাজার ও অধিবাসীগণকে স্থানান্তরিত হইতে হয় এবং বাসগৃহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। দেশীয় অধিবাসীবৃন্দ শোভাবাজারের দিকে চলিয়া যান।

জর ও কলেরায় বহু লোক বিশেষ ইংরাজদের মৃত্যু হয়।

কলিকাতা হইতে মুর্শীদাবাদ পর্য্যন্ত প্রথম ডাক স্থাপনা হয়।

১৭৫৯—শেঠেরা মুদ্রার মূল্য কমাইবার চেষ্টা করার জন্য কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষগণ টাঁকশালে সিক্কা মুদ্রা প্রস্তুতে লোকশান হইতেছে বলিয়া অনুযোগ করেন।

জগৎশেঠ এবং নবাবকে উপঢৌকনাদি দিতে ৯৬৯৭৬।৵ ব্যয় হয়।

১৭৬০—কলিকাতার অধিবাসীদের আবশ্যকরী অনুরূপ শস্য মজুৎ না থাকায় রপ্তানি নিষিদ্ধ হয়।

দুর্গনির্ম্মাণ কার্য্য সত্বর শেষ করিবার উদ্দেশ্যে অন্যত্র হইতে ৮০০০ কুলি ধরিয়া আনিবার জন্য কলেক্টরের প্রতি আদেশ হয়।

লোকজনের নিম্নলিখিতরূপ মাসিক বেতন ধার্য্য করিয়া দেওয়া হয়,—

দাসী—৩্ নাপিত—১্ জমাদার—৫্ এবং কোচম্যান—৪্

প্রাণদণ্ডের আসামিদের চাবুক মারার পরিবর্ত্তে তোপের মুখে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা হয়।

ক্লাইভ্ ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমে পদত্যাগ করেন এবং ভ্যানসিটার্টের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হলওয়েল্ তাঁহার স্থানে কাজ করেন।

ইংরাজ বালিকা ও যুবতীদের জন্য মিসেস্ হেজেস্ (Mrs. Hedges) দ্বারা প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসর ১০০৲ টাকা করিয়া চাঁদা করিয়া একটি থিয়েটার নির্ম্মিত হয়।

১৭৬১—দুর্গ নির্ম্মাণের ভার যাহাদের উপর অর্পিত ছিল তাঁহারা বহু অর্থ আত্মসাৎ করেন। কাপ্তেন্ ব্রোয়ের (Captain Brohier) এবং মিঃ লুইস (Mr. Louis) এই সম্পর্কে পলাতক হন।

মিঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংস নবাবের দ্বিভাষী নিযুক্ত হন।

১৭৬২—সেণ্টপল্‌স্ ক্যাথিড্রাল্ যে স্থানে আছে এবং ময়দান, যাহা ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাসভূমি ছিল, বোর্ডের আদেশে তথাকার জঙ্গল পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয়।

খাস সহরের মধ্যে জমির খাজনা দ্বিগুণ করা হয়। এতাবৎ ৬০৫৬ বিঘা ১৩ কাঠা জমিতে বাৎসরিক ১৭৭৪৪৸১ পাই খাজনা পাওয়া যাইত।

১৭৬৩—রাইটার্স্ বিল্ডিংয়ের উত্তরে যে টাউন্‌হল ছিল তাহার বাৎসরিক ভাড়া ছিল ২০০০৲ টাকা।

কালীঘাটে টলিনালার উপর হেষ্টিংসের বেল্‌ভেডিয়ার নামক বাগানবাটীতে যাইবার পথে পুল নির্ম্মাণের আদেশ হয়।

কিয়ারন্যাণ্ডার্ (Kiernander) কে প্রোটেষ্টাণ্ট গির্জ্জার জন্য একটা বাটী দেওয়া হয়।

কাউন্সিলের সদস্য মিঃ বাট্‌সন্ (Mr. Batson) কাউন্সিলের সভাধিবেশন কালে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্‌কে অপমান করেন এবং মিথ্যাবাদী বলেন। এজন্য তিনি সভা হইতে অপসারিত হন এবং পরে ক্ষমা প্রার্থনা করায় পুনরায় তথায় স্থান প্রাপ্ত হন।

১৭৬৪—বাঙ্গালার মধ্যে দুইজন করিয়া যাজক থাকিবেন স্থির হয়। ফার্নিভ্যাল্ বোয়েন্ (Reverend Furnival Bowen) এবং উইলিয়ম্ হার্ষ্ট (Reverend William Hurst) এজন্য নিযুক্ত হন।

প্রেসিডেন্সীর মধ্যে ইয়োরোপীয়দের বৎসরে একবার করিয়া গণনা করার কথা হয়।

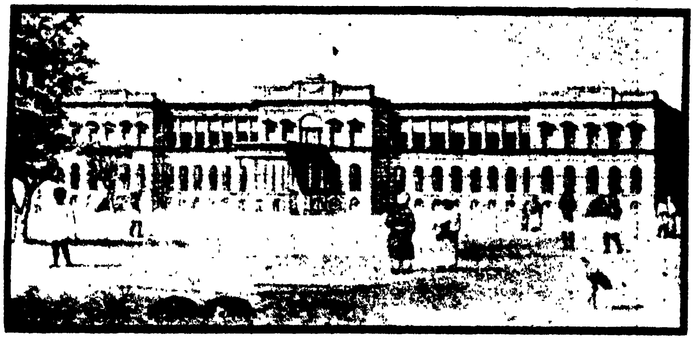
বর্ত্তমান লাটভবন যে স্থানে আছে তথায় নূতন



ফোর্টউইলিয়ম—১৮৫৪

কাউন্সিল্ হাউস্ নির্ম্মিত হয়। মিঃ ফোর্টনম (Mr. J. Fortnom) এ কার্য্যে স্থপতি নিযুক্ত হন।

নবাব ৩রা নভেম্বর কলিকাতায় আগমন করেন এবং তাঁহাকে বিশেষ উৎসব ও সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করা হয়। ৫ই তারিখে বোর্ডের সমস্ত সদস্য



সেকালের কলিকাতার একটি অট্টালিকা

তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দাবী জ্ঞাপন করেন।

১৭৬৫—হাঁসপাতালে প্রত্যেক রোগীর জন্য ১৭৬০ সালে ডাক্তার মাসিক ৮৲ টাকা করিয়া পাইত, তৎপূর্ব্বে ছিল ৬৲ টাকা। এক্ষণে বর্দ্ধিত হইয়া হয় মাসিক ১৮৲ টাকা।

ভ্যান্সিটার্ট অবসর গ্রহণ করিলে লর্ড ক্লাইবের না আসা পর্য্যন্ত মিঃ স্পেন্সার (Mr. Spencer) তাঁহার স্থানে কার্য্য করেন। ক্লাইব্ ৩রা মে কলিকাতায় পৌছেন।

১২ই আগষ্ট দিল্লির বাদশা শাহ আলামের নিকট হইতে বাৎসরিক দুই লক্ষ টাকা বার্ষিক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত



রোম্যান্ ক্যাথলিক গির্জ্জা মুরগীহাটা

হইয়া ক্লাইব্ বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হন। ইহা হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা হন এবং রাজ্যশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

লইয়া একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশন বিশেষ বিরুদ্ধ রিপোর্ট দাখিল করেন।

১৭৬৬—রাধাচরণ মিত্র নামে এক ব্যক্তির জাল করা অপরাধে ফাঁসির হুকুম হয়। ইহার বিরুদ্ধে বহু দেশীয় লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র প্রদত্ত হয়। তাহার ফলে এই দণ্ড স্থগিত হয়।

পুরাতন কেল্লাকে কাষ্টম্ হাউসে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হয়।

১৭৫৭ সালে যে নূতন দুর্গ আরম্ভ হইয়াছিল উহা সমাপ্ত হয়। এই কার্য্যে মোট ব্যয় হয় বিশ লক্ষ টাকা।

এই বৎসর বাৎসরিক অতিরিক্ত দুই সহস্র টাকা দাতব্যের জন্য ব্যয় মঞ্জুর হয়।

কলিকাতার অধিবাসী ও সরকারি কর্ম্মচারীদের গভর্ণরের আদেশ ব্যতিরেকে সহর হইতে দশ মাইলের অধিকদূরে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়।

সহরের মধ্যে এ্যারাক্ মদ্যের দোকান সকল ভাড়া বিলি করিয়া দিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হয়।

একটী নূতন হাঁসপাতাল ও একটী গোরস্থান নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়।

নবাবের নিকট হইতে যে ডবল বাটা পাওয়া যাইত



রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির

কলিকাতার চ্যারিটি স্কুলটির বিশেষ উন্নতি সাধন হয় এবং গভর্ণমেণ্ট মাসিক ৮০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন।

সিভিলিয়নদের চরিত্র বিষয় অনুসন্ধানের জন্য ক্লাইব, সাম্নার (Sumner) এবং ভেরিলেষ্ট (Verelst) কে

তাহা ১লা জানুয়ারি হইতে বন্ধ হওয়ায় বেঙ্গল্ আর্ম্মির কর্ম্মচারীদের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ক্লাইব্ ইহা দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৭৬৭—লর্ড ক্লাইব্ জানুয়ারি মাসে পদত্যাগ করেন

এবং ভেরলেষ্ট্ (Mr. Harry Verelst) তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হন।

সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন প্রোটেষ্টাণ্ট গির্জ্জা—মিশন্‌চার্চ্চের ভিত্তি-প্রস্তর মে মাসে স্থাপিত হয়। উহার প্রতিষ্ঠাতা কিয়ারন্তানডার (Kiernander) এবং স্থপতি দে মেডেল (Mr. M. B. de Meudl)। কুলিংগার-স্থিত সারমন্ সাহেবের উদ্যান দশ হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করার সঙ্কল্প হয়।

জেমস্ রেণেল্ (Captain James Rennell) মাসিক তিনশত টাকা বেতনে সার্ভেয়ার জেনারেল পদে নিযুক্ত হন।

নন্দকুমার এবং বোলষ্টের (William Bolst) প্ররোচনায় রামনাথ দাস ও কতিপয় ব্যক্তি শোভাবাজার রাজবাটীর প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কয়েকটী গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করেন। তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় রামনাথ, নন্দকুমার, বোলষ্ট প্রভৃতি সাজা প্রাপ্ত হন।

দক্ষিণ পার্ক ষ্ট্রীটের গোরস্থান সাধারণতঃ যাহাকে পুরাতন গোরস্থান বলে তাহা ২৫শে আগষ্ট খোলা হয়।

১৭৬৮—জেনারেল হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হয়।

এ সময় লালবাজার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রাস্তা ছিল।

সিম, মটরশুঁটী, কপি প্রভৃতি বিলাতি শাকসব্জি এ সময় কলিকাতায় প্রচলিত হইয়াছিল।

১৭৬৯—মিঃ ভেরলেষ্ট্ (Mr. Verelst) পদত্যাগ করেন এবং সাত লক্ষ টাকা লইয়া দেশে যান্। জন্ কার্টিয়ার (John Cartier) তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হন।

১৭৭০—এই বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হয়। এরূপ লোকক্ষয় কখন হয় নাই। ইহাকেই "ছিয়াত্তরে মন্বন্তর" বলিয়া থাকে।

এই সময় পুরাতন দুর্গে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল।

মিশন চার্চ্চ গির্জ্জা প্রস্তুত শেষ হয়।

ওল্ড কোর্ট হাউসে এই সময় এসেম্ব্লি রুম ছিল।

১৭৭২—মিঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ মিঃ কার্টিয়ারের স্থানে গভর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি এই পদ গ্রহণ করিয়াই বহু বিষয়ে সংস্কার করেন। যথা—

কোষাগার ও রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র মুর্শীদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনয়ন করেন।

রাজস্ব আদায়ের ভার সিভিলিয়ানদের হস্তে অর্পণ করেন এবং তাঁহারা কলেক্টর নামে অভিহিত হন।



পলাশীর যুদ্ধ

সদর দেওয়ানি আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করেন।



দ্বারকানাথ মিত্র

মহম্মদ রেজা খাঁ যাঁহার উপর ফৌজদারি ও রাজস্ব বিষয়ে প্রায় সমস্ত ভারাপিত ছিল,—বহু অর্থ তছরুপের

সন্দেহে তাঁহাকে সপরিবারে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া চিৎপুরে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। দুই বৎসরের পর বিচারে তিনি মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু পূর্ব্বের কার্য্যে আর তাঁহাকে রাখা হয় নাই।

১৭৭৩—রেগুলেটিং এক্ট্ অনুসারে ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল্ পদ প্রাপ্ত হন এবং বার্ষিক ২॥০ লক্ষ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত হয়। তাঁহার সভায় চারিজন সদস্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তাঁহারা—মিঃ বারওয়েল্ (সিনিয়র মেম্বর) ক্লেভারিং (Lieutenat General Clavering) কর্ণেল্ মনসন্ এবং ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্।



প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী

মেয়র কোর্টের পরিবর্ত্তে সুপ্রীম্ কোর্ট স্থাপিত হয়। বার্ষিক ৮০০০০৲ টাকা বেতনে স্যার এলিজা ইম্পে প্রধান বিচারপতি এবং বার্ষিক ৬০০০০৲ টাকা বেতনে মেসার্স চেম্বার, হাইড্ ও লে-মেষ্টার তিনজন পিউনি জজ নিযুক্ত হন।

এ সময় বাঙ্গালার রাজস্বাদি মোট আদায় ছিল ১৪৮৮৪৩৫ পাউণ্ড।

১৭৭৪—ক্লেভারিং, মনসন্ এবং ফ্রান্সিস্ ১৯শে অক্টোবর চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে দুর্গ হইতে ১৭টি তোপধ্বনি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। এ সম্মান পূর্ব্বে লর্ড ক্লাইবও পান নাই; কিন্তু ১৭ তোপে তাঁহারা অসম্মান বোধ করেন এবং সেই দিন হইতেই তাঁহারা শত্রুভাব ধারণ করেন। বারওয়েল্ বরাবর হেষ্টিংসের পক্ষে থাকিলেও তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া রহিলেন।

১৭৭৫—মহারাজা নন্দকুমার জাল করা অপরাধে চরম দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং কুলিবাজারে তাঁহার ফাঁসি হয়। এই ব্রহ্মহত্যার জন্য দেশে হুলস্থুল পড়িয়া যায়।

মিঃ লে গ্রাণ্ডের (Mr. Le Crand) এর স্ত্রী মাদাম গ্রাণ্ডের শয়ন কক্ষ হইতে দড়ির সিঁড়ি দিয়া ফ্রান্সিসের



গোপীমোহন ঠাকুর

নিষ্ক্রামণ কালে ধরা পড়ায় বিচারে তাঁহার ৫০০০০ সিক্কা টাকা জরিমানা হয়।

১৭৭৬—কর্ণেল্ মনসনের মৃত্যু হয়। হেষ্টিংসের বিলাতের এজেণ্ট্ কর্ণেল্ ম্যাক্লীন (Colonel Macleane) হেষ্টিংসের পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন। তাহা মঞ্জুর হয় এবং মিঃ হুইলার (Mr. Wheeler) গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার না আসা পর্য্যন্ত ক্লেভারিং তাঁহার কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৭৭৭—ক্লেভারিং এই সংবাদ পাইয়া দুর্গের চাবি এবং

খাতাপত্র হস্তগত করেন, কিন্তু হেষ্টিংস ঘোষণা করেন তাঁহার পদত্যাগপত্র দিবার ম্যাকলীনের অধিকার ছিল না। এ বিষয় লইয়া প্রথম কিছু গোলযোগ হইলেও পরে তিনিই গভর্ণর জেনারেল থাকেন এবং হুইলার গভর্ণরের পরিবর্ত্তে একজন কাউন্সিলের সদস্য হন।

ব্যারণ্ ইমহফের (Baron Imhoff) স্ত্রীর সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদের পর হেষ্টিংসের সহিত মহা ধুমধামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ক্লেভারিংয়ের মৃত্যু হয়।

গার্ডেন রিচের নিকট আক্‌রাতে যে ঘোড়্দৌড়ের মাঠ ছিল, সম্ভবতঃ তাহাই প্রথম। কেল্লার সম্মুখে ময়দানে আর একটী ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল।

কলিকাতার প্রথম সাপ্তাহিক হিকিস্ বেঙ্গল্ গেজেট্ প্রকাশিত হয়।

বড়দিনের সময় লাটভবনে প্রায় সারাদিনব্যাপী পান-ভোজন ও নৃত্যাদির দ্বারা উৎসব হইত।

১৭৮১—প্রাদেশিক সভা (Provincial Council) উঠাইয়া দিয়া তৎস্থানে কমিটি অব্ রেভিনিউ প্রতিষ্ঠিত হয়।



অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়



উইলিয়ম হিকি

১৭৭৮—হালহেড্ (Mr. N. B. Halhead C. S.) সাহেবের লিখিত বাঙ্গালা পুস্তক (ব্যাকরণ) হুগলিতে ছাপা হয়। চার্লস্ উইলকিন্স্ (Charles Wilkins) এই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পঞ্চানন কর্ম্মকার কাঠের অক্ষরগুলি খোদাই করিয়া দিয়াছিলেন।

১৭৮০—আলিপুরের পুলের নিকট হেষ্টিংস্ ও ফিলিপ্ ফ্রান্সিসের দ্বৈরথ-যুদ্ধ হয়, তাহাতে উভয়ের মধ্যে গুলি চলিয়াছিল এবং ফ্রান্সিস্ অধিকতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ঘোড়দৌড় খেলা এ সময়ে বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল।

হেষ্টিংস দ্বারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৮৩—দমদমায় কর্ণেল্ ডফের (Colonel Duff) দ্বারা ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মেজর কিক্‌পাট্রিক্ (Major Kirkpatrick) দ্বারা হাওড়ায় মিলিটারি অর্ফ্যান্ স্কুল্ স্থাপিত হয়।

১৭৮৪—স্যর উইলিয়ম্ জোন্স দ্বারা এসিয়াটিক্ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

Calcutta Gazette and Oriental Advertiser এর প্রথম সংখ্যা ফ্র্যান্সিস্ গ্লাডউইন্ (Francis Gladwin) দ্বারা ৪ঠা মার্চ প্রকাশিত হয়।

কাউন্সিলের সদস্য মিঃ হুইলার দ্বারা সেণ্ট্ জন্ গির্জ্জার ভিত্তি স্থাপনা হয়।

১৭৮৫—হারমনিক্ ট্যাভার্ণ্এ ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্কে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা ১লা ফেব্রুয়ারি এক বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করেন। এই সভায় মাননীয় চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট্ (Hon'ble Charles Stuart) সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মিঃ দালাস্ (Mr. Dallas) অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন।

হেষ্টিংস্ ৮ই ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেন এবং তাঁহার স্থানে মিঃ ম্যাক্ফার্সন্ (Mr. Macpherson) নিযুক্ত হন।

দেখা যায় এই সময় গভর্ণমেণ্ট অবিবাহিত অপেক্ষা



বিশপ হিবর

বিবাহিত কর্ম্মচারীদের অধিক পছন্দ করিতেন এবং বিবাহিত সিভিলিয়ন্দের মাসিক ২০০৲ টাকা অধিক বেতন দিতেন।

কাউন্সিলের শেষ হইলে প্রতি বৎসর ১লা মার্চ্চ ফ্যান্সি বল্ হইত।

১৭৮৬—৮ই জুন জেনারেল্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া খোলা হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ১২ই সেপ্টেম্বর আসিয়া পৌঁছেন এবং গভর্ণর জেনারেল্ ও প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন।

১৭৮৭—সেণ্ট্ জন্ গির্জ্জা ২৪শে জুন উৎসর্গীকৃত হয়।

১৭৮৯—লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজস্ব-বিষয়ক সংস্কার এই বৎসর হইতে আরম্ভ হয়।

১৭৯০—মিঃ কর্ণেল্ লেনক্স (Molonel Lennox) ও মিঃ সুইফ্ট (Mr. Swift) উভয়ের সহিত উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। ইহাতে শেষোক্ত ব্যক্তি নিহত হন। মিঃ ওয়েব্ (Mr. Webb) নামক এক ব্যক্তি দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত হন বলিয়া জানা যায়।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্কে ৩৩০ জন ভদ্রলোক স্বাক্ষরিত একখানি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়।

১৭৯১—ষ্ট্র্যাণ্ডরোড্ হইতে চার্চ্চ লেনে ট্যাঁকশাল্



ফ্যানস মিড্লটন

উঠিয়া যায়। স্যার রবার্ট্ চেম্বার্স্ প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন।

ফরাসীরা তাঁহাদের জাতীয় পতাকার বর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া লাল, শ্বেত ও নীল হইয়াছে ইহা বৃটিশ্ কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনেন।

১৭৯২—কলিকাতা প্রেস্ হইতে প্রথম সংস্কৃত গ্রন্থ কালিদাসের 'ঋতুসংহার' প্রকাশিত হয়। উহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয় দশ টাকা।

১৭৯৩—লর্ড্ কর্ণওয়ালিস্ ২৮শে অক্টোবর পদত্যাগ করেন এবং তাঁহার স্থানে স্যর্ জন্ শোর নিযুক্ত হন।

বজ্‌বজ্‌ দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

ব্যাপ্টিষ্ট মিশন্‌ সোসাইটীর কার্য্য এই বৎসর আরম্ভ হয়।

প্রসিদ্ধ মিশনারি ডাক্তার কেরি ১২ই নভেম্বর কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছেন।

১৭৯৪—দেশীয় অধিবাসীদের জন্ত চিৎপুরে হাঁসপাতাল খোলা হয়।

কলিকাতায় পাথরের রাস্তার প্রথম প্রচলন হয়।

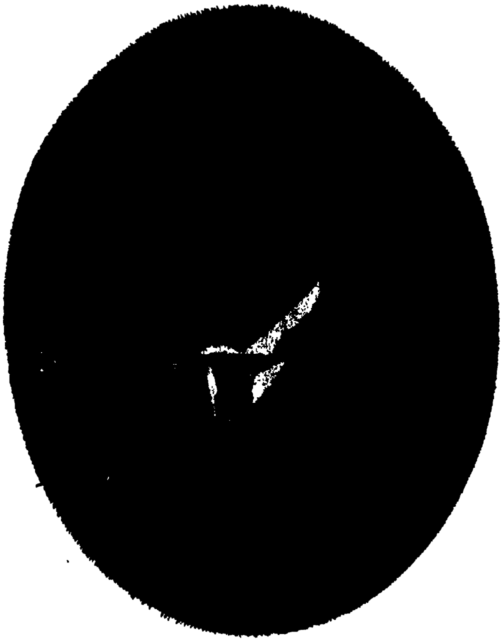
স্যর উইলিয়ম্‌ জোন্সের মৃত্যু হয়। দক্ষিণ পার্ক ষ্ট্রীট্‌ গোরস্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

ওয়েলেস্‌লি (Richard Wellesley) লর্ড মর্ণিংটন্‌ ১৮ই মে কলিকাতায় পৌঁছেন।

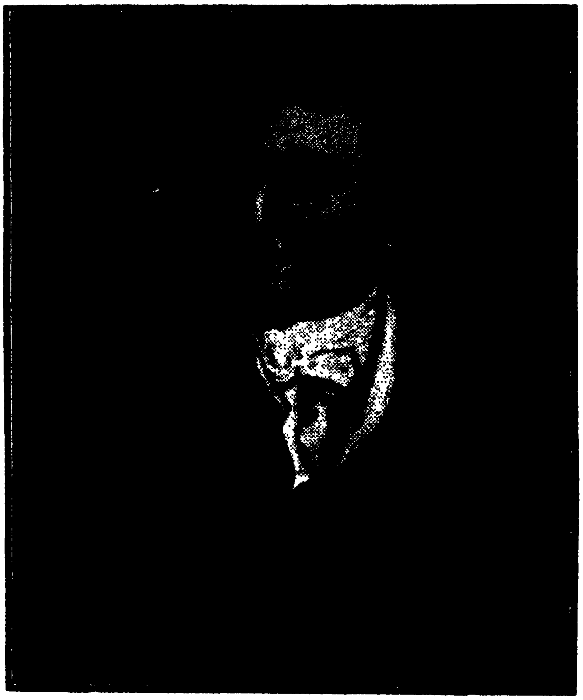
নেটিভ্‌ হাঁসপাতাল্‌ কমিটি হাঁসপাতালের জন্ত ধর্ম্মতলা রাস্তার পর্শ্বে একখণ্ড জমি ক্রয় করেন।

রিচার্ড বারওয়েলের্‌ খিদিরপুর হাউস্‌ বেঙ্গল্‌ মিলিটারি অর্ফেন সোসাইটী ৭৫০০০৲ টাকায় খরিদ করেন।

১৭৯৯—বর্ত্তমান লাটপ্রাসাদ মার্ক্‌ইস্‌ অব্‌ ওয়েলেস্‌লি দ্বারা নির্ম্মিত হয়। জমি খরিদে ব্যয় হয় ৮০০০০৲, বাটী নির্ম্মাণে ১৩ লক্ষ টাকা এবং আসবাব-পত্রে ৫০০০০৲ ব্যয় হয়।



কর্ণেল জি, বি, ম্যালিসন



লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিং

১৭৯৫—খিদিরপুরে কলিকাতার প্রথম ডক্‌ ওয়াডেল্‌ (Waddel) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলিপুরের সেতুটী ভগ্ন হয়।

১৭৯৬—স্যর জেমস ওয়াট্‌সনের এবং বিচারপতি হাইডের মৃত্যু হয়।

১৭৯৭—পোর্ত্তুগীজ চার্চ্চ ষ্ট্রীটে রোম্যান্‌ ক্যাথলিক্‌ গির্জ্জা প্রস্তুত হয়।

১৭৯৮—স্যর্‌ জন্‌ শোর ১২ই মার্চ্চ গভর্ণর জেনারেলের পদ ত্যাগ করেন।

১৮০০—লর্ড ওয়েলেসলির দ্বারা ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং ডাক্তার কেরি বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৮০২—সাগরে সন্তান বিসর্জ্জন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়।

বসন্তের জন্ত টিকা দেওয়া প্রথম আরম্ভ হয়। মিঃ রাসেল্‌ (William Russell) টিকা দিবার জন্ত প্রথম নিযুক্ত হন।

যুদ্ধশান্তির জন্ত ২৬শে জানুয়ারি কলিকাতায় একটি

বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে নূতন লাট-প্রাসাদে প্রথম মহা ধূমধামের সহিত ভোজ ও নৃত্যগীত হয়।

লর্ড ভ্যালেন্‌সিয়া (Lord Valentia) কলিকাতায় আগমন করেন।

১৮০৪—লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। কলিকাতার অধিবাসাগণ লর্ড লেক্‌কে একখানি ১৫০০০৲ টাকা মূল্যের এবং জেনারেল্ ওয়েলেসলি (পরে ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন)কে একখানি ১০০০০৲ টাকা মূল্যের তরবারি উপহার দেন।

১৮০৬—বহুবাজারের ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ্চ নির্ম্মিত হয়। চার্লস্ রায়েন্ (Lieutenant Charles Ryan) লেফ্‌টেন্যাণ্ট করিকে (Lieutenant Corry) হত্যা করা অপরাধে সুপ্রীম্ কোর্টের বিচারে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন ও ১০০৲ জরিমানা দেন।

টাউন হল্ নির্ম্মাণার্থ ১২ই ফেব্রুয়ারি গভর্ণমেণ্টের লটারি খেলা হয়।

১৮০৭—লর্ড মিণ্টো ৩১শে জুলাই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন।



স্তর চার্লস্ নেপিয়ার



স্তর জন্ লরেন্স্

সাধারণের প্রদত্ত চাঁদায় গভর্ণমেণ্ট-ভবনে লর্ড ওয়েলেসলির প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

টলি নালায় টোল আদার গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আইসে।

১৮০৫—লর্ড ওয়েলেস্‌লি পদত্যাগ করেন এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্ তাঁহার স্থানে আইসেন।

৫ই অক্টোবর লর্ড কর্ণওয়ালিসের গাজিপুরে মৃত্যু হয়। কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বর স্তার জর্জ্জ বারলো (Sir Geo. Barlow) তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন।

জেনারেল্ পোষ্ট অফিস চৌরঙ্গী হইতে ২নং বাঁকশাল ষ্ট্রীটে উঠিয়া আইসে। তৎপূর্ব্বে উহা ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে ছিল।

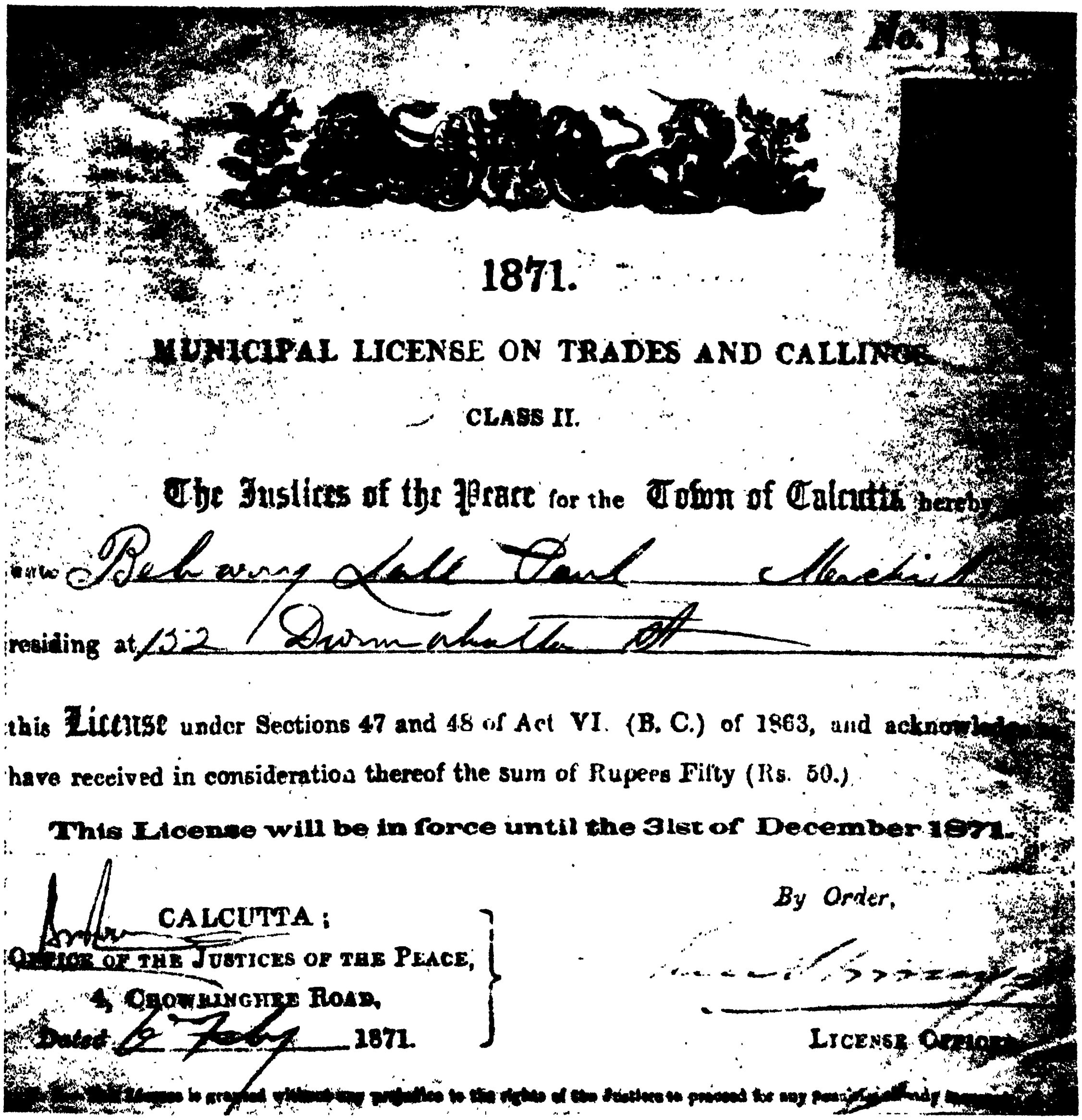
এডোয়ার্ড হল্ (Edward Hall) নামক এক ব্যক্তি ভদ্রমহিলা ও ভদ্র লোকেদের ইংরাজি শিক্ষার জন্ত ৩৬ নং বহুবাজারে একটি স্কুল খোলেন।

স্বরস্ রুম নামক ভবনটীতে এই সময় টাউন্ হলের কাজ হইত।

১৮০৮—সাগর দ্বীপে আলোকস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়।

১৮০৯—মিড্‌লটন্‌ রোডে সেণ্ট টমাস্‌ গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়।

দরিদ্র-বন্ধু চার্লস্‌ ওয়েষ্টনের (Charles Weston) মৃত্যু হয়।


No.

1871.

MUNICIPAL LICENSE ON TRADES AND CALLIN…

CLASS II.

The Justices of the Peace for the Town of Calcutta hereby

…to Behary Lall Paul Merchant

residing at 132 Durmahatta St

this License under Sections 47 and 48 of Act VI. (B. C.) of 1863, and ackno…

have received in consideration thereof the sum of Rupees Fifty (Rs. 50.)

This License will be in force until the 31st of December 1871.

CALCUTTA:
Office of the Justices of the Peace,
4, Chowringhee Road,
Dated 12 Feby 1871.

By Order,

License Officer.

লাইসেন্সের রসিদ্‌—১৮৭১ সাল

১লা জানুয়ারি ব্যাঙ্ক অব্‌ বেঙ্গল্‌ স্থাপিত হয়।

ইংরাজ-সমাজে বিবাহের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া এ সময় ব্যবস্থা ছিল।

১৮১০—বহুবাজারে রোম্যান্‌ ক্যাথলিক গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সহরতলিতে প্রথম হাউস্‌ ট্যাক্স স্থাপিত হয়।

১৮১১—যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষার্থী রবিন্‌সন্‌ (Cadet John Robinson) কেনেডির (Cadet Knnedy) সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করেন। এজন্য প্রথমোক্ত যুবককে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

বাইবেল্ সোসাইটির (The Calcutta Auxiliary Bible Society) কার্য্য এই বৎসর আরম্ভ হয়।

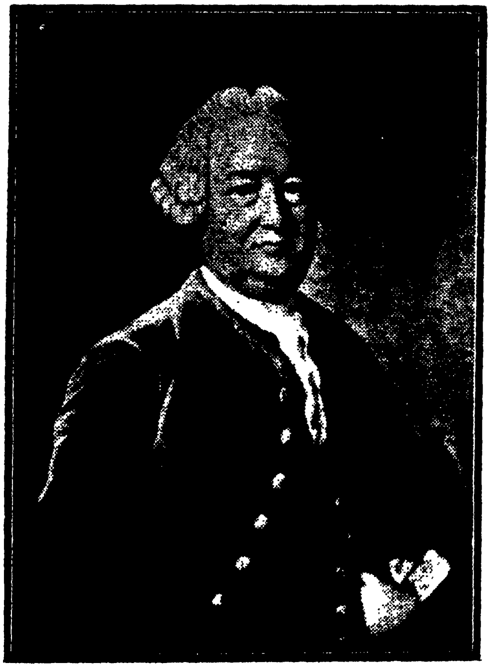
১৮১২—এথেনিয়াম্ (Athenæum) নামে নূতন থিয়েটার মিঃ মরিশ (Mr. Morris) কর্ত্তৃক সার্কুলার রোডে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮১৩—লর্ড মিণ্টো পদত্যাগ করিয়া দেশে যান।

টাউন্‌হলের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়।

বেঙ্গল্ আর্টিলারির প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা হইতে দমদমায় স্থানান্তরিত হয়।

১৮১৪—কলিকাতার প্রথম প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ বিশপ্



রিচার্ড বুশিয়ের

মিড্‌লটন্ (Right Revd. Thomas Fanshaw Middleton) ২৮শে নভেম্বর আসিয়া পৌছেন।

এই বৎসর খৃষ্টান সোসাইটি (Society for the Promotion of Christian Knowledge) স্থাপিত হয়।

ওয়াটার্লু বিজয়ের জন্য ১৪ই ডিসেম্বর কলিকাতা আলোকমালার দ্বারা সজ্জিত হয়।

সরকারি আদেশে ৬ই এপ্রেল হইতে কলিকাতা ও ব্যারাকপুরের মধ্যে রাজকীয় ডাকগাড়ির চলাচল আরম্ভ হয়।

১৮১৬—হিন্দুকলেজ, যাহাকে দেশীয় লোকেরা মহাবিদ্যালয় বলিত, তাহা এই বৎসর প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮১৭—এই বৎসর সেণ্ট্ এণ্ড্রু গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়।

১৮১৮—বাঙ্গালা-সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" এই বৎসর প্রকাশিত হয়।

কলিকাতার পথে প্রথম জল দেওয়া আরম্ভ হয়।

১৮১৯—প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র The Calcutta Journal প্রকাশিত হয়। উহার মাসিক চাঁদা ছিল ৮্।

বর্ত্তমান রেস্‌কোর্স্ সম্ভবতঃ এই বৎসর নির্ম্মিত হয়।

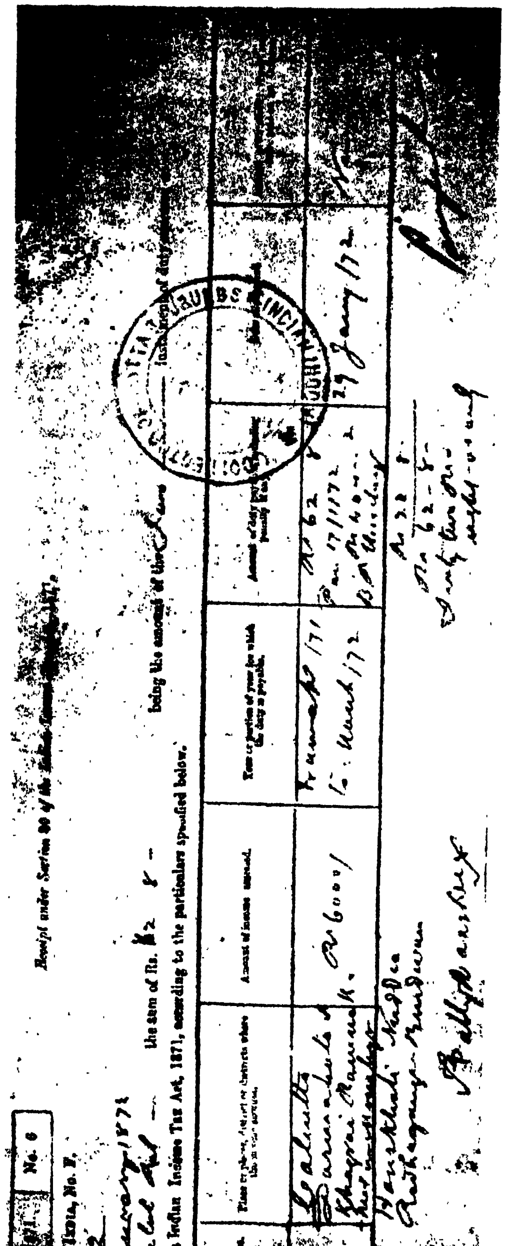


লর্ড মেট্‌কাফ্

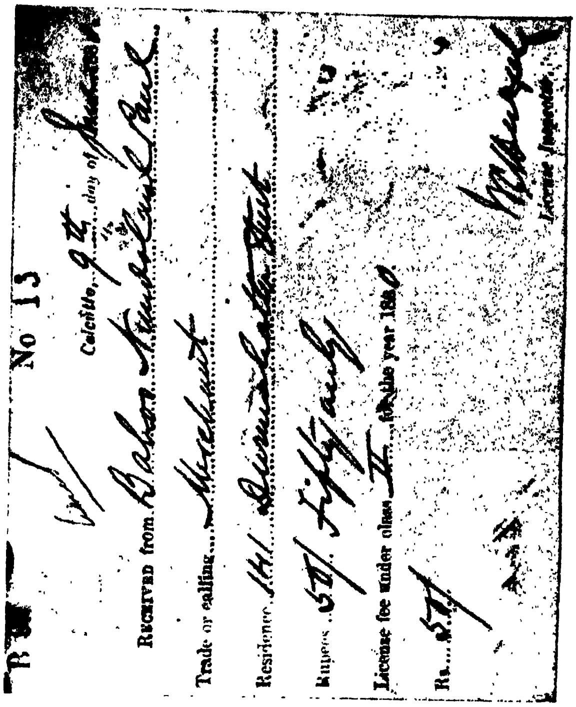
১২ই ফেব্রুয়ারি নূতন কাষ্টম্ হাউসের ভিত্তিপ্রস্তর মিঃ লিণ্ডসে (Hon'ble C. R. Lindsey) দ্বারা স্থাপিত হয়।

১৮২০—এগ্রি হর্টিকালচার সোসাইটি এই বৎসর স্থাপিত হয়।

সাধারণ ভাবে শোকচিহ্ন ধারণের জন্য এ বৎসর দুইবার আদেশ প্রচার হয়। রাজা তৃতীয় জর্জ্জের মৃত্যুর জন্য ৫ই জুন এবং ডিউক্ অব্ কেণ্টের মৃত্যুর জন্য ৬ই জুন। শেষোক্ত দিনে ৪র্থ জর্জ্জের সিংহাসনারোহণের জন্য তোপ হয়।


Receipt under Section 30 of the ... Number 3762 Date 29 January 1871 Received from ... the sum of Rs. 62 8 - under the Indian Income Tax Act, 1871, according to the particulars specified below.

ইনকম্‌ ট্যাক্সের রসিদ—১৮৭১ সাল


No 13

Calcutta, 9th day of ...

RECEIVED from Baboo ...

Trade or calling Merchant

Residence ...

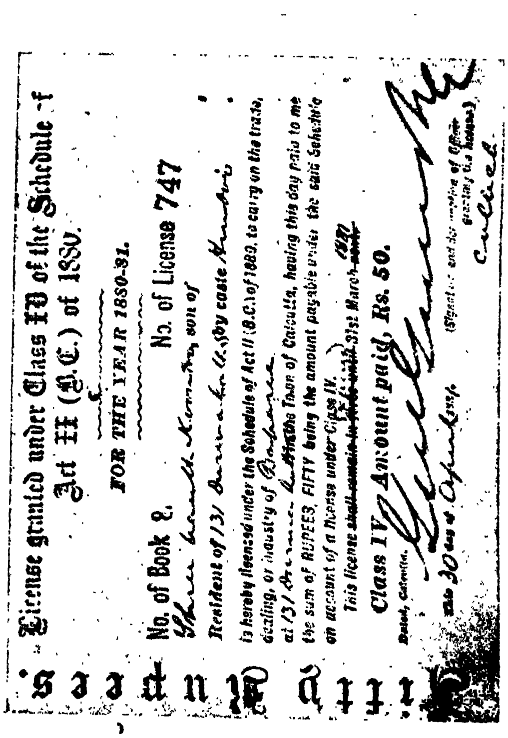
Rupees 50/ Fifty only

License fee under class IV for the year 1880

Rs. 50/

License Inspector

লাইসেন্স ইন্সপেক্টরের রসিদ


License granted under Class IV of the Schedule of Act II (B.C.) of 1880.

FOR THE YEAR 1880-81.

No. of Book 8. No. of License 747

Resident of ... is hereby licensed under the Schedule of Act II (B.C.) of 1880, to carry on the trade, dealing, or industry of ... in the Town of Calcutta, having this day paid to me the sum of RUPEES FIFTY being the amount payable under the said Schedule on account of a license under Class IV.

This license shall ... 31st March 1881.

Class IV. Amount paid, Rs. 50.

Dated, Calcutta, the 30 day of April 1880.

লাইসেন্সের রসিদ। ১৮৮০-৮১

১৫ই ডিসেম্বর হাওড়ায় বিশপ্ মিড্লটনের দ্বারা বিশপ্ কলেজের বাটীর ভিত্তি-স্থাপন হয়। মিঃ জোন্স (Mr. Jones) এই বাটী নির্ম্মাণ করেন।



খিদিরপুরের পুল

কলিকাতায় ভয়ানক কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়।

১৮২১—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ইউনিয়ন্ চ্যাপেল্ নির্ম্মিত হয়।



স্যর জেমস্ উট্রাম্

এই বৎসর কলিকাতার পথঘাটের বহুল উন্নতি সাধন করা হয়।

১৮২২—বিশপ্ মিড্ল্টনের ৮ই জুলাই মৃত্যু হয়। প্রথম আচ ডিকন্ লয়েড্ লরিং (Revd. Henry Lloyd Loring) ৪ঠা সেপ্টেম্বর মারা যান।

কলিকাতার অধিবাসীবৃন্দ লর্ড ও লেডি হেষ্টিংস্কে একটি সাধারণ ভোজ দ্বারা ও অভিনন্দন দিয়া সম্বর্দ্ধিত করেন।

১৮২৩—লর্ড হেষ্টিংস্ জানুয়ারি মাসে এদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন। জন এ্যাডাম্স্ (John Adams, Esq) লর্ড আমর্হাষ্টের না আসা পর্য্যন্ত তাঁহার স্থানে কার্য্য করেন।

লর্ড আমহার্ষ্ট ১লা আগষ্ট আসিয়া পৌছেন।

সেপ্টেম্বর মাসে ভীষণ বন্যা ও মে মাসে ভীষণ বাত্যাবর্ত্তে সহরের অনেক ক্ষতি হয়।

জন্ উইলিয়ম্ রিকেট্ (John William Ricketts) দ্বারা পেরেণ্ট্যাল্ একেডেমি নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

"ডায়না" নামক কলের জাহাজখানি প্রথম নদীতে ব্যবহৃত হয়।

বিশপ্ হিবার ১০ই অক্টোবর আইসেন এবং পরদিন তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

১৮২৪—সংস্কৃত কলেজ এই বৎসর প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রধান বিচারপতি স্যর ক্রষ্টোফার ফুলারের মৃত্যু হয়।

পোর্ত্তুগিজ ব্যবসায়ী জোসেপ্ বোরেটোর মৃত্যু হয়।

১৮২৫—প্রথম কলের জাহাজ, এণ্টারপ্রাইজ্ প্রায় চারি মাসের পর ৮ই ডিসেম্বর ইংলণ্ড হইতে সাগরে আসিয়া পৌছে।

স্যর ডেভিড্ অক্টার্লনীর (Sir David Ochterlony) মৃত্যু হয় এবং তাঁহার সম্মানার্থ চার্লস্ মেট্কাফের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভা হয় এবং সাধারণের চাঁদায় ময়দানে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি মনুমেণ্ট্ নির্ম্মিত হয়।

বিশপ্ হিবারের মৃত্যু হয়।

১৮২৬—রাজা বৈদ্যনাথ রায় দেশীয় মহিলাদের শিক্ষার জন্য ২০০০০৲ টাকা দান করেন। কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ারে তাঁহাদের শিক্ষামন্দির নির্ম্মাণের জন্য ১৮ই মে ভিত্তি-স্থাপন হয়।

১৮২৭—ভারতীয়েরা প্রথম জুরীরূপে বসিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

১৮ই জানুয়ারি কলিকাতার তৃতীয় বিশপ্ টমাস্ জেমস্ (Right Revd. John Thomas James) আগমন করেন।

১৮২৮—লর্ড আমহার্ষ্ট অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন এবং লর্ড ইউলিয়ম্ বেন্টিঙ্ক ৪ঠা জুলাই আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

বিশপ্ জেমস্ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যান।

১৮২৯—দে উ লি য়া দে র সুবিধার্থ আইন প্রণীত হয়।

ইয়োরোপীয়রা এ-দেশে নিজ নামে ষাইট বৎসরের জন্য জমি রাখিবার অধিকার প্রাপ্ত হন।

কলিকাতার চতুর্থ বিশপ মাথিয়া টার্ণার (Right Revd. John Mathias Turner D. D.) বৎসরের শেষভাগে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন।

সহমরণ-প্রথা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়।

১৮৩০—বিশপ্ টার্ণারের উদ্যোগে ডিষ্ট্রিক্ট্ চ্যারিটেবল্ সোসায়িটি স্থাপিত হয়। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পামার কোম্পানী দেউলিয়া হন।

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৩১—রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করেন।

এলেকজেণ্ডার কোম্পানী নামে এক বড় ব্যবসায়ী ফার্ম্ম দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন।

১৮৩২—২৫শে জুলাই ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গের মধ্যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়।



ডভটন্ কলেজ

দেওয়ানি মোকদ্দমায় জুরির দ্বারা বিচার বিধিবদ্ধ করাইবার জন্য বিলাতের সভায় আবেদনার্থ ডেভিড্ হেয়ারের সভাপতিত্বে ১৪ই এপ্রেল্ টাউনহলে এক বিরাট সভা হয়। *

* এই প্রবন্ধে একখানি গ্রন্থ হইতেই বিশেষ ঘটনাগুলির কথা লিখিত হইয়াছে।



বন্যা

শ্রীসীতাদেবী বি-এ

(৩)

শ্রাবণের সন্ধ্যা নিবিড় হইয়া গ্রামটিকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। বিজয় নদের ভৈরব গর্জ্জন ভিন্ন, আর কোনো শব্দ কাণে আসে না। গ্রামের মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত,—কখন না জানি নদের করাল ক্ষুধা জাগিয়া উঠিয়া, ছোট গ্রামখানিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কাজকর্ম্ম সারিয়া, যে যাহার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে,—বাহিরের প্রকৃতির বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিকে তাহারা দেখিতে ভরসা পাইতেছে না। এই সামান্ত মাটির এবং বেড়ার দেওয়াল যেন কত বড় আশ্রয়,—ইহারই পরপারে জগতের সব দুঃখ-ভয় যেন তাহাদের জন্ম অপেক্ষা করিয়া আছে।

কিন্তু এমন দুর্য্যোগের দিনেও একটি মানুষ ঘরের বাহিরে ছিলেন। তাহাও আবার অন্য কোথাও নয়, বিজয় নদের ধারেই দাঁড়াইয়া। সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখশ্রী পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল না; কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের তীব্র আলোক তাঁহার মুখের উপর খেলিয়া যাইতেছিল। তাহাতে বুঝা যাইতেছিল, সে মুখ কি দারুণ উদ্বেগ-পীড়িত, কি চিন্তাকুল! নদের জলরাশি এখন অনেকখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে;—পূর্ব্বে যেখানে জেলে ও মাঝিদের ঘর ছিল, এখন সেগুলির চিহ্নও নাই। খেয়া নৌকার ঘাটটিও অদৃশ্য হইয়াছে। প্রচণ্ড জলস্রোত যেখান দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার দুই তীরের তটভূমি যেন ভয়ে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া মহাশব্দে বড় বড় মাটির চাপ ভাঙিয়া পড়িয়া নদের গর্ভে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

প্রৌঢ় প্রতুলচন্দ্র। সুবর্ণর বিবাহের পর পাঁচ বৎসর প্রায় কাটিয়া গিয়াছে,—তাহার ভিতর তিনি আর গ্রামে আসেন নাই। তিনি রাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর, তাঁহার জননী আর সংসারে বাস করিতে না চাহিয়া, কাশী চলিয়া যান। সেইখানে বৎসর দুই আগে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নারায়ণী মধ্যে মধ্যে শাশুড়ীর কাছে থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে নিজের বাপের বাড়ীতেও থাকিতেন। তবে বৎসরের ভিতর কয়েকটা মাস অন্ততঃ জামাইদের বাড়ীতে কাটাইয়া যাইতেন; কারণ, এখানে না থাকিলে মেয়ের কোনোই খোঁজ খবর পাওয়া যাইত না। একলা এক বাড়ীতে মেয়েমানুষের বাস করা কঠিন,—তাই এখানে থাকার তাঁহার অসুবিধা ছিল। তবু মেয়ের মায়া কাটাইতে পারিতেন না। কখনও নিজের বিধবা ভগ্নীকে লইয়া আসিতেন, কখনও একলাই থাকিতেন।

শরীর তাঁহার ক্রমেই ভাঙিয়া পড়িতেছিল। স্বামীর দারুণ ঘৃণা এবং বিরাগ তাঁহার হৃদয়ে শেলের মত ফুটিয়া ছিল। যে সংসার ভাল করিয়া বাঁধিবার জন্ম তিনি স্বামীর অতখানি বিপক্ষতা করিয়াছিলেন, সেই সংসারেও যেন সুবর্ণর বিবাহের পর হইতেই ভাঙন্ ধরিল। স্বামী গৃহত্যাগ করিলেন, শাশুড়ী কাশীবাসিনী হইলেন। মেয়েও চিরদিনের মত কোলছাড়া হইয়া গেল। নারায়ণীর আশা ছিল মেয়ের বিবাহ দিয়া, জামাতাটিকেও পুত্ররূপে পাইবেন, কিন্তু সে আশায় একেবারে ছাই পড়িল। বিবাহের পর বছর দুই মাত্র সুবর্ণ মায়ের কাছে ছিল, তাহার পর শাশুড়ী তাহাকে আর রাখিতে রাজী হইলেননা। নারায়ণী মেয়ে বড় ছোট বলিয়া অস্ফুট আপত্তি করাতে, নিস্তারিণী ঠাকুরাণী বলিলেন, "তা একেবারে ধিঙ্গী করে মেয়ে দিতে চায় নাকি? তখন আর বাগ মানবে? অত-সব আমার কাছে চলবেনা বাপু। আমরাও ত ন বছর বয়সে শ্বশুরঘর করতে এসেছি, কই মারা ত পড়িনি?"

তাহার পর এই আড়াই বৎসর, হাজার সাধ্য-সাধনা, অনুনয়-বিনয় করিয়াও সুবর্ণকে তিনি কাছে আনাইতে পারেন নাই। চিঠি লিখিলে কোনও উত্তর পাইতেননা। লোক পাঠাইলে, দুঘণ্টা পরেই তাহারা ফিরিয়া আসিত; বলিত মেয়েকে দেখিয়া আসিয়াছে বটে, চেহারা বিশেষ

ভাল নাই। কথাবার্ত্তা বলিবার কোনো সুযোগ পাওয়া যায়না; শাশুড়ী, ননদ পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। নারায়ণী কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেন; সহায়হীনা হিন্দুকুলবধূ তাঁহার আর কোন উপায় ছিলনা। প্রতুলচন্দ্র স্ত্রীর কোনও খবরই লইতেন না, মধ্যে মধ্যে শুধু খরচের টাকা পাঠাইয়া দিতেন। তিনি যে অশুভ ভবিষ্যৎ-বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিতে বসিয়াছিল। নারায়ণীর সকল দর্প চূর্ণ হইয়াছিল,—মেয়ের দারুণ অকল্যাণ নিজের বুদ্ধির দোষে ঘটাইয়াছেন, এই চিন্তা বৃশ্চিক দংশনের মত নিয়ত তাঁহাকে যন্ত্রণা দিত। স্বামীর কাছে দুঃখের কাহিনী জানাইবার তাঁহার মুখ ছিলনা।

ধীরে ধীরে নিজে যে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা বুঝিতেই পারিয়াছিলেন। নিজের বোনকে অনেক লেখালিখি করিয়া আনাইয়াছিলেন। নিরানন্দ গৃহে দুইটি স্ত্রীলোকের দিন নিতান্তই বৈচিত্র্যহীনভাবে কাটিয়া যাইত। সুবর্ণকে আনাইবার জন্ত চিঠির উপর চিঠি লিখিতেন, কোনো সাড়াশব্দ পাইতেননা। নিজে যে বেশী দিন বাঁচিবেননা, কন্যার মুখ না দেখিয়াই তাঁহাকে মরিতে হইবে, এই ব্যথা এখন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অসহনীয় হইয়াছিল। কিন্তু কাহার কাছে আর তিনি দুঃখ জানাইবেন?

শেষে একেবারে তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। বর্ষার হাওয়ায় তাঁহার রোগ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। তাঁহার ভগিনীর আর একলা তাঁহাকে লইয়া থাকিতে ভরসা হইলনা। কোথা দিয়া একটা কি ভালমন্দ হইয়া যাইবে, পরে তিনি নিমিত্তের ভাগী হইবেন। তাহার চেয়ে, যাহার জিনিষ, সে আসিয়া বুঝিয়া লউক। প্রতুলচন্দ্রকে নারায়ণীর অসুখের খবর দিয়া, অনেক করিয়া বুঝাইয়া তিনি আসিবার জন্ত চিঠি লিখিয়া দিলেন।

কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন বিনা খবরেই প্রতুল হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণীর দিদি রান্নাঘরে বসিয়া দুধ জ্বাল দিতেছিলেন; ভগ্নীপতিকে দেখিয়া, আর সাম্‌লাইতে না পারিয়া, উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

প্রতুলচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার কি বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে?"

বিধবা শ্যালিকা কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিলেন "শুধু তোমায় দেখবার আশায় প্রাণটা এখনও বেরোয়নি ভাই, নইলে আর কিছু নেই।"

প্রতুলচন্দ্র চৌকাঠের উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুকি আসেনি?"

নারায়ণীর দিদি বলিলেন "না, তাকে পাঠায়নি। তোমায় ত আমাদের বল্‌বার মুখ নেই ভাই, কিন্তু তুমি বিদ্বান মানুষ ঠিক বুঝেছিলে। মানুষের হাতে ত তাকে দেয়নি, কশাইয়ের হাতে দিয়েছে।"

প্রতুলচন্দ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর নিজের স্যুটকেস্‌টা হাতে করিয়া শয়নকক্ষে গিয়া ঢুকিলেন। নারায়ণী কথাবার্ত্তার শব্দে বুঝিয়াছিলেন, স্বামী আসিয়াছেন। সমস্ত হৃদয়ের আগ্রহ দুই চক্ষে ভরিয়া তিনি দরজার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার পাংশুবর্ণ মুখে একঝলক রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহার পরই আবার তিনি বিছানার উপর এলাইয়া পড়িলেন।

প্রতুলচন্দ্র বিছানার উপর বসিয়া স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "এখন কেমন আছ?"

নারায়ণী দুই হাতে স্বামীর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "তুমি একবার মুখ ফুটে বল আমায় ক্ষমা করেছ, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত মন নিয়ে যেতে পারব। আর আমার কিছু চাইনা।"

প্রতুলচন্দ্র সজলচক্ষে বলিলেন "যাবে কেন? তোমার কি যাবার বয়স হয়েছে? তোমাকে আমরা সারিয়ে তুলব।"

নারায়ণী বলিলেন, "আর পারবেনা। বুকের ভিতর ছেঁদা হয়ে গেছে। যে পাপ নিজে করেছি, তাতে নিজে পুড়ে মরলাম বলে দুঃখ নেই, কিন্তু মেয়েটাকেও বলি দিলাম। তাকে তুমি দেখো,—মায়ের দোষে মেয়েটাকে অকূলে ভাসাইওনা।"

প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন, পত্নী নারায়ণী উত্তেজনায় হাঁফাইতেছেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিয়া বলিলেন, "থাক এখন ও-সব কথা। তুমি ভাল হও, তারপর সব ব্যবস্থা হবে। মেয়ের জন্তে ভেবোনা, আমি এখনি তাকে আস্‌বার জন্তে চিঠি লিখে লোক পাঠাচ্ছি।" নারায়ণী কি যেন বলিতে গেলেন, কিন্তু

প্রতুলচন্দ্র তাঁহাকে হাতের ইঙ্গিতে কথা বলিতে বারণ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

স্ত্রীর অসুখের খবর দিয়া, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তিনি বেয়ান ঠাকুরাণীকে পত্র লিখিলেন। পত্রবাহকের সঙ্গে সুবর্ণকে যেন অবিলম্বে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহার মা তাহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আছেন। জামাতাও আসিতে পারিলে অত্যন্ত খুসি হইবেন, তাহাও লিখিলেন।

বিশ্বস্ত একজন লোকের হাতে পত্র দিয়া নৌকাযোগে তিনি তখনই রওয়ানা করিয়া দিলেন। তাহার পর নারায়ণীর পাশে আবার গিয়া বসিলেন। শ্যালিকার অনুরোধে নাওয়া খাওয়া একরকম করিয়া সারিয়া লইলেন, কিন্তু কোনো কিছুতে আর তাঁহার রুচি ছিলনা! নারায়ণীর অস্থিরতা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল, ক্রমাগত মেয়ের নাম করিয়া তিনি কাতরোক্তি করিতেছিলেন। প্রতুলচন্দ্র আর সান্ত্বনা দিবার কোনো কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলেননা,—স্ত্রীর হাত ধরিয়া নীরবে বসিয়া ছিলেন।

বিকাল হইয়া আসিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে আলোর চিহ্ন প্রায় সম্পূর্ণ মুছিয়া আসিল! বাতাসের শব্দ আরো তীক্ষ্ণতর হইল, বিজয় নদের গর্জ্জন আরো বাড়িয়া উঠিল। নারায়ণী আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন, "মেয়েটাকে দিলে না গো তারা, ওকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না?"

প্রতুলচন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। শ্যালিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দিদি, একবার বসুন, এই ঘরে। একবার ঘুরে দেখে আসি, হারাণ ফিরল কিনা।"

নারায়ণীর দিদি ঘরে আসিয়া বসিলেন, প্রতুলচন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন। বহুক্ষণ অন্ধকার নদের তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোথাও নৌকার চিহ্ন নাই, খালি জলরাশি ভৈরব কল্লোল করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। চারিদিকে কেবল ধ্বংসের লীলা, রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যে ধরণী যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মৃত্যুশয্যাশায়িনী স্ত্রীর নিকট ফিরিবার জন্য তাঁহার মন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, কিন্তু কোনো সংবাদ না লইয়া তিনি ফিরিবেন কি প্রকারে? সেই চোখ দুটির আকুল আগ্রহের তিনি কি প্রত্যুত্তর দিবেন? দুইবার চলিয়া যাইবার জন্য কয়েক পা অগ্রসর হইয়াও তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন।

অবশেষে কালো জলের উপর শাদা কি যেন একটা দেখা দিল, ক্রমেই জাম্‌রালের তটভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। প্রতুলচন্দ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, নৌকাই বটে। তাঁহার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল, হয়ত এতদিন পরে একমাত্র সন্তানকে দেখিতে পাইবেন।

কিন্তু নৌকা কাছে আসিতেই, তাঁহার সকল আশা যেন কাহার নিষ্ঠুর ফুৎকারে নিভিয়া গেল। নৌকার ভিতর হারান একলা বসিয়া,—হাতে তাহার একখানা চিঠি,—মুখ গম্ভীর, বিষণ্ণ।

হারান নামিতেই প্রতুলচন্দ্র হতাশাপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাঠালে না হারান?"

হারান চিঠিখানা তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল "এই নেন্ চিঠি কর্ত্তা। ভ্যালা কুটুমবাড়ী আমায় পাঠিয়েছিলেন। ওরা আবার ভদ্দর লোক। না বল্‌লে একবার বস্‌তে, না দিলে এক গেলাশ জল খেতে। দিদির সঙ্গে কথা শুদ্ধ কইতে দিলনা। দেখলাম খালি দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আপনার বেয়ান, মাপ করবেন কর্ত্তা, ঠিক যেন রায়বাঘিনী! ভদ্দর লোকের ঘরে এমন গলা কখনও শুনিনি। ছোট লোকের ঘরে শোনা যায় বটে। মা ঠাকরুণের অসুখের কথা বল্‌লাম, তা বল্‌লে, 'অমন অসুখ সকলের করে। ও সব মেয়ে নিয়ে যাবার ছল।'"

প্রতুলচন্দ্র হারানের কথায় বড় একটা কান দিতে-ছিলেননা। মহামান্যা বেয়ান ঠাকুরাণীর চিঠি পড়িতেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। হাতের লেখা বেশ পাকা, বুঝিলেন জামাতা বাবাজীই মায়ের জবানীতে এই সুমধুর পত্রখানি লিখিয়া দিয়াছেন। চিঠিখানি এইরূপ।—

মদেকসদয়েষু,

ভাটগ্রামের গুহদের বৌদের সেই বংশের সম্ভ্রম রাখিয়া চলিতে হয়। তাহারা জাম্‌রালের প্রতুলচন্দ্র মিত্রের প্রজা নয় যে লোক পাঠাইয়া তলব করিবামাত্র সদরে গিয়া হাজির হইবে। কন্যাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, স্বয়ং আসিবেন। তখন বিবেচনা করিয়া দেখিব। কথা দিতে অবশ্য পারিনা। ছেলে কলেজের পরীক্ষার পর, ছুটিতে কয়েক দিনের জন্য মাত্র বাড়ীতে আসিয়াছে। বিবাহের পর বধূর সঙ্গে এই তাহার প্রথম সাক্ষাৎ।

আশা করি বেহানের অসুস্থতাটা মেয়েকে লইয়া যাইবার ওজর মাত্র।

ইতি

শ্রীবিলাসের মাতা।

প্রতুলচন্দ্র চিঠি হাতে করিয়া কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। তাঁহার পা যেন চলিতে চাহিতেছিলনা, নিতান্ত মনের বলে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন। মৃত্যু-শয্যাশায়িনী পত্নীকে তিনি বলিবেন কি? নিতান্ত মেয়ের দেখা পাইবার জন্যই সে এখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে। একমাত্র সন্তান, তাহার অদৃষ্টলিপি এই! প্রতুলচন্দ্রের কত আশা আকাঙ্ক্ষা এই মেয়েটিকে ঘিরিয়া ছিল; আর আজ তাহার দশা কি? সমাজের নিষ্ঠুরতার যজ্ঞে সে বলির পশু মাত্র। স্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত অন্তর একবার বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে ত মরিতে বসিয়াছে, কি লাভ তাহার উপর রাগ করিয়া? পার্থিব দুঃখ-শোক, রাগ-অভিমান, সকলই এখন তাহার কাছে মিথ্যা।

প্রতুলচন্দ্র বাড়ীতে ঢুকিলেন। নারায়ণীর দিদি ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন, "মেয়ের কোনো খোঁজ পেলে?"

প্রতুলচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, "তারা পাঠাবেনা।" ঘরের ভিতর অস্ফুট আর্ত্তনাদ শোনা গেল। প্রতুলচন্দ্র তাড়াতাড়ি ছুটিয়া নারায়ণীর বিছানার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। নারায়ণী বালিশে ভর দিয়া উঁচু হইয়া বসিয়া হাঁফাইতেছেন, বক্ষের অস্থিগুলি পর্য্যন্ত যেন নিঃশ্বাসের বেগে দুলিয়া উঠিতেছে, চক্ষু একেবারে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়।

স্বামীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন "ওগো, তুমি নিজে যাও। তাহলে ওরা পাঠাবে, 'না' করতে পারবেনা।"

প্রতুলচন্দ্র দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন "আমি যাবনা।"

নারায়ণী কাঁদিয়া বলিলেন, "এই শেষ ভিক্ষা, আর ত কখনও কিছু চাইবনা।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "তোমাকে এই অবস্থায় রেখে যাওয়া কখনও সম্ভব? ফিরে এসে আর তোমাকে দেখতে পাব?"

নারায়ণী ভাঙ্গা গলায় বলিলেন, "পাবে গো পাবে। বাছার মুখখানি একবার না দেখে আমি মরতে পারবনা।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বেশ, তবে তাই যাচ্ছি।' কিন্তু কি রকম রাত্রি দেখছ ত? আর বিজয়ের ডাক এখান থেকে শোনা যাচ্ছে। মোচার খোলার মত নৌকায় নদ পার হওয়া এখন সম্ভব হবে?"

নারায়ণী অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন "কাল ভোর-বেলা।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "দেখা যাক।" ঘরের ভিতর তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

রাত্রি গভীরতর হইয়া আসিতে লাগিল। রোগিণীর ঘরে একটি আলো জ্বলিতেছে, রন্ধনশালায় আর একটি। আর চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, আলোর লেশ মাত্র নাই। বিজয় নদের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন দানবের হুঙ্কারের মত শুনাইতেছে। প্রতুলচন্দ্র প্রস্তরের মূর্ত্তির মত বসিয়া আছেন। নারায়ণীর দিদি অস্থিরভাবে কেবল ঘর আর বাহির করিতেছেন, ভগিনীর নিকট বসিতে প্রাণে ভরসা পাইতেছেননা। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেই ভয়ে তাঁহার অর্দ্ধেক প্রাণ উড়িয়া যাইতেছে।

হঠাৎ বাহিরের দরজায় সজোরে কে ধাক্কা দিল। প্রতুলচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া পড়িলেন, শ্যালিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আলোটা ধরুন ত দেখি কে এল এমন দুর্য্যোগে।"

বিধবা আলো লইয়া ব্যস্ত হইয়া আগাইয়া আসিলেন। প্রতুলচন্দ্র দরজা খুলিতেই একটি ক্ষীণকায়া বালিকামূর্ত্তি তাঁহার পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "মা আছে ত?"

প্রতুলচন্দ্র মেয়ের দিকে তীক্ষ্ণ, তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। এই নাকি সুবর্ণ? এই তাঁর সেই আদরিণী মেয়ে? কিন্তু মেয়ে তখনও শঙ্কাকুল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। প্রতুলচন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ, আছেন। চল, ঘরে চল।"

দরজার বাহিরে মাঝি একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সে মিনতির সুরে বলিল "কর্ত্তা আমার ভাড়াটা?"

প্রতুলচন্দ্র পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া মাঝির সম্মুখে ছুড়িয়া দিলেন। সে চলিয়া গেল।

সুবর্ণ পিতার পিছন পিছন মায়ের ঘরে গিয়া ঢুকিল। নারায়ণী উত্তেজনার বশে একেবারে খাড়া হইয়া বসিলেন. হাত বাড়াইয়া ডাকিলেন "আয় মা আয়!"

মেয়ে ছুটিয়া গিয়া মায়ের বুকের উপর পড়িল। নারায়ণীর সমস্ত শরীর একবার কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পর তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ আবার শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। প্রতুলচন্দ্র তাড়াতাড়ি সুবর্ণকে টানিয়া সরাইয়া দিলেন। সুবর্ণর মাসীমা আলোটা লইয়া দৌড়াইয়া আসিলেন, ব্যগ্রভাবে বলিলেন "কি হল ভাই, দেখ ত ভাল করে, মুচ্ছো গেল নাকি?"

প্রতুলচন্দ্র স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইলেন, একবার নাড়ী দেখিলেন এবং বক্ষস্থলে হাত দিয়া পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর বিছানা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

সুবর্ণ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নারায়ণীর মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিলনা!

(৪)

প্রতুলচন্দ্রের সংসার ভাঙিয়া গেল, কিন্তু কালের স্রোত এক মুহূর্ত্তের জন্যও সংহত হইলনা। মানুষের জন্মমৃত্যু এই স্রোতে ঢেউয়ের মত উঠে পড়ে রাত্রিদিন, কেই বা তাহার খবর লইতে যায়।

তিনটা দিন কাটিয়া গেল। বাড়ীর ভিতর তিনটি যে মানুষ, তাহারা নিজে নিজেকে লইয়া বিব্রত, অন্যের খবর বড় একটা লয়না। সুবর্ণ দিনরাত কাঁদে, চীৎকার করে, মায়ের ঘরের চৌকাটের উপর গিয়া মাথা খোটে। পাড়ার মেয়েরা সারাক্ষণই যায় আসে; তাহারাই উহাকে ধরিয়া তোলে, স্নানাহার করায়, সান্ত্বনা দেয়। নারায়ণীর দিদি বেশীর ভাগসময় মুড়ি-সুড়ি দিয়া এক কোণে বসিয়া থাকেন। স্নানাহারের প্রবৃত্তিও তাঁহার নাই। মালা লইয়া জপ করেন, প্রতিবেশিনীদের কাছে গলা ছাড়িয়া কাঁদেন, আবার কত শীঘ্র এই শোকাচ্ছন্ন গৃহ ছাড়িয়া নিজের বাড়ী ফিরিতে পারিবেন, তাহার জল্পনা কল্পনাও করেন। প্রতুলচন্দ্র কি যে ভাবেন, কেহ তাহার খবর পায়না। তাঁহার কেহ বন্ধু নাই, সাথী নাই। শূন্য গৃহে নিরানন্দ দিন কোনোমতে কাটিয়া যায়। পড়াশুনা লইয়া থাকিবার চেষ্টা করেন, মাঝে মাঝে তীব্র দৃষ্টিতে কন্যার দিকে তাকান, আবার তখনই চোখ ফিরাইয়া লন। সুবর্ণকে দেখিলে তাঁহার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত জ্বালা করে। কি ছিল কি হইয়াছে। তাহার সে রূপ কোথায়, যাহা দেখিয়া পিতামহী আদর করিয়া সুবর্ণ নাম দিয়াছিলেন? এই মেয়েকে জ্ঞানে গুণে কত মহিয়সী করিয়া তুলিবার আকাজ্ক্ষা তাঁহার ছিল। আর সে কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তাহার না আছে স্বাস্থ্য, না আছে শিক্ষা, না আছে মানসিক বল। নিতান্ত উৎপীড়িত হইলে আর্ত্তনাদ করে, না হইলে মুখ বুজিয়া নির্য্যাতন সহ্য করে, এই তাহার জীবনযাত্রা। দৈব বলিতে কি বুঝায়, তাহা সে খানিক খানিক জানে; পুরুষকার বলিতে কি বোঝায়, তাহা বোধ হয় কর্ণে কখনও শোনে নাই। প্রতুলচন্দ্রের কন্যা এই হইয়াছে, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই-ই থাকিবে বোধ হয়। ভিত্তির অবস্থা এমন যখন, তখন তাহার উপর কোথা হইতে আকাশস্পর্শী সৌধ গঠিত হইবে?

চতুর্থ দিনের দিন সুবর্ণ চোখ মেলিয়া চাহিবামাত্র তাহার মাসীমা বলিলেন, "আর ত এ রকম করে পড়ে থাক্‌লে চলেনা বাছা। সবই ত করতে হবে? আজই ত চতুর্থী, তুই একমাত্র সন্তান, মায়ের কাজটাও ত তোকে করতে হয়।"

সুবর্ণ হতাশভাবে তাকাইয়া বলিল "কোথা দিয়ে, কি হবে মাসিমা, আমি ত কুল খুঁজে পাইনা। আমার হাতে ত একটা পয়সা পর্য্যন্ত নেই।"

মাসিমা বলিলেন, "শোনো কথা। তোমায় কেউ কি দানসাগর করতে বলছে, বৃষোৎসর্গ করতে বলছে? যা না করলে নয়, বামুন ডেকে সেইটুকু করে নাও, আমি মিত্তিরের কাছে টাকা চেয়ে দিচ্ছি।"

সুবর্ণ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আচ্ছা।" প্রতুলচন্দ্রের কাছে চাহিবামাত্র তিনি টাকা দিলেন, কিন্তু শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আর কোনো প্রকার অভিমত প্রকাশ করিলেননা। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকিয়া, অতি সংক্ষেপে নারায়ণীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় প্রতুলচন্দ্র নিজের ঘরে বসিয়া, এমন সময় সুবর্ণর মাসী আসিয়া চৌকাঠের উপর বসিলেন। প্রতুলচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন "ওখানে কেন? উঠে চৌকীতে বসুন।"

শ্যালিকা বলিলেন, "থাক ভাই থাক, ও সব চৌকী-মৌকিতে বসা অভ্যেস্ নেই, এই বেশ বসেছি। তা যা হবার তা ত হয়ে গেল, এখন আর দুঃখু করে কি করবে? এর পর আবার সংসারের ভাবনা ত ভাবতে হবে? সে ত আর কোনোমতে আট্‌কা থাকবে না?"

প্রতুলচন্দ্র ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন "আমার আর সংসার কি? আপনার বোন বেঁচে থাকতেই ত ও-সব আমার চুকে গেছে। সুবর্ণকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে, আমি আবার কলকাতাই ফিরে যাব। আপনি কবে যেতে চান বলুন, তার ব্যবস্থা করা যাবে।"

সুবর্ণর মাসীমা বলিলেন "মেয়েকে আগে রেখে এস, তার পর আমি যাব। নইলে বাড়ী খালি পড়ে থাকবে যে? আর এ-সবেরও ত একটা বিলি ব্যবস্থা করতে হবে?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "তা হবে বটে, তবে তার জন্যে কোনো তাড়া নেই।"

সুবর্ণ কখন আসিয়া মাসীমার পাশে জড়সড় হইয়া বসিয়া ছিল, প্রতুলচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করেন নাই। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল "বাবা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় পাঠিও না।" তাহার কথাটা শুনাইল ঠিক কান্নার মত।

প্রতুলচন্দ্র অবাক্ হইয়া গেলেন। সুবর্ণর মাসিমা বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, ও কি অলুক্ষুণে কথা গা? শ্বশুর-ঘর যাবি না ত, যাবি কোথা? মেয়েমানুষের ওর বাড়া জায়গা আছে?"

সুবর্ণ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিতে লাগিল "ওরা তাহলে আমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌বে, আর কি রাখবে?"

প্রতুলচন্দ্রের বুকের ভিতরটা রাগে ক্ষোভে জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার একমাত্র কন্যা, এই দশা তাহার? ভয়ে বিমূঢ়, শক্তিহীন, আত্মরক্ষায়ও অসমর্থ, ক্রন্দন ভিন্ন ইহার কোনো অস্ত্র নাই। ইহার নাম হিন্দু সমাজের মেয়ে মানুষ করা। ইহার ভিতর মনুষ্যত্বের আছে কি?

কিন্তু মেয়ের কান্না তাঁহার চিন্তাকে বেশীদূর যাইতে দিল না, আবার মেয়ের দিকেই তাঁহার মন ফিরিয়া আসিল। সুবর্ণ তাঁহার সহিত বিশেষ কথা বলে না, তবু এখন তাহাকে বলাইতেই হইবে। কি ব্যাপার তিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলেননা। সুবর্ণর মাসি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "এত কাঁদছিস্ কেন? শাশুড়ী ননদের হাতে খোয়ার আর কোন্ মেয়ের না হয় বল? ও সব গোড়ায় সইতেই হয়। তার পর ত নিজেই গিন্নিবান্নি হবি।"

সুবর্ণ বলিল "আমি পালিয়ে এসেছি, এখন গেলে আমায় নিশ্চয় মেরে ফেল্‌বে।"

প্রতুলচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "পালিয়ে এলি কেন?"

সুবর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "মা মারা যায়, তবু ওরা আস্‌তে দিচ্ছিল না। শাশুড়ী বলে 'ওসব ছল আমরা ঢের জানি।' কি করব তখন? তিনি জপে বসতেই আমি পালালাম। মাঝিটা চেনা মানুষ, তুমি ভাড়া নিশ্চয় দেবে বলাতে পৌঁছে দিয়ে গেল।"

মাসিমা বলিলেন, "তা মেয়েটা না এসেই বা কি করে ভাই? মা হেন জিনিষ, তাকেও শেষ দেখা দেখবে না? শাশুড়ী মাগী পিচেশ্ কম না। তা কি আর করবি বাছা? গালমন্দ কিছু অদেষ্টে আছে, তা শুন্‌তেই হবে। তাই বলে ফিরে যাবি না, তাও কি কখনও হয়? তোর বাপ নিজে গিয়ে রেখে আসুক, তাহলে একটু শান্ত হবে। বড়-মানুষ কুটুমের মন রাখতে সবাই চায়।"

প্রতুলচন্দ্রের বুকের ভিতর যেন জ্বলিয়া যাইতেছিল, তিনি কোনো কথা বলিলেননা। এই দলে শেষে তাঁহাকেও ভিড়িতে হইল? সুবর্ণ শুধু আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল, যাইবে, কি যাইবে না, তাহা কিছু বলিলনা।

মাসিমা বলিলেন "এখন ত দেবার দিন না, না হলে ভাল করে তত্ত্ব তালাশ করলে বেয়ানের মনটা একটু ভিজত।"

প্রতুলচন্দ্র তিক্তকণ্ঠে বলিলেন "থাক, ও সবে আর কাজ নেই। কাল আমি ওকে নিয়ে যাব। নেয় ভাল, না নেয়, অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।"

বিধবা শ্যালিকা বলিলেন "অন্য ব্যবস্থা আর কি করবে ভাই? ওদের হাতে যখন পড়েছে, তখন ঐ ঘরেই মানিয়ে চল্‌তে হবে যেমন করে হোক।"

সুবর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গেল। তাহার মাসীমাও অল্প পরে তাহার অনুসরণ করিলেন। অন্ধকার ঘরে একলা বসিয়া প্রতুলচন্দ্র কি যে ভাবিতে লাগিলেন, তাহা তিনি ভিন্ন কেহ আর জানিলনা।

পরদিন সকাল হইতেই সুবর্ণকে লইয়া যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। সুবর্ণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ

মুখ ফুলাইয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু তাহার আপত্তির ভিতর জোর ছিল না। তাহার কান্নায় যখন কেহ কান দিল না, তখন সে ধরিয়াই লইল যে তাহাকে যাইতে হইবে। মাসীমা তাড়াতাড়ি রান্না করিতেছিলেন, তাহাদের খাওয়াইয়া দিতে হইবে; সে রান্নাঘরে বসিয়া এটা ওটা আগাইয়া দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিল।

সুবর্ণ একবস্ত্রে পলাইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং জিনিষ গুছাইবার হাঙ্গাম খুব বেশী তাহার ছিল না। তবু জিনিষ কিছু হইলই। প্রতুলচন্দ্র শ্যালিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দিদি, ওর মায়ের ট্রাঙ্ক দুটো ওর সঙ্গে দিয়ে দিন্। গহনা কাপড়-গুলো শুধু শুধু এখানে ফেলে রেখে কি হবে? বারোভূতে লুটে নেবে। ওর মায়ের জিনিষ, ওরই কাছে থাক।"

মাসীমা হিসাবী মানুষ। বলিলেন "সব একসঙ্গে দিয়ে দেবে ভাই? ওতে ত কম নেই? গহনাই কোন্ দু তিন হাজার টাকার না হবে? আমি বলি খানিক এখন দিই, খানিক তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও। পরে সময় বুঝে, আস্তে আস্তে দিলেই হবে। ও সব লোককে তুমি চেন না, আমরা ওদের সঙ্গে কারবার করে করে পেকে গেছি।"

প্রতুলচন্দ্রের মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল, তিনি বলিলেন, "আচ্ছা তাই করুন। তবে বাকিগুলো আমি আর কলকাতা নিয়ে যাবনা, সেখানেও বারো ভূতের কারবার। আপনি ওগুলো সঙ্গে নিয়ে যান, যখন দেওয়া দরকার মনে করবেন, তখন দেবেন।"

সুবর্ণর মাসীমা বলিলেন, "তা বেশ, আমিই রাখব না হয়। আমাদেরও কোঠা-ঘর, চোর ডাকাতের ভয় বেশী নেই। তা ছাড়া, আমার ভাসুরপোর নামে এখনও বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এই যে রান্নাটা হয়ে যাক না, তখন সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিচ্ছি।"

রান্না খাওয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া একরকম হইয়া গেল। সুবর্ণর মাসীমা নারায়ণীর বাক্স খুলিয়া গহনা কাপড় সব দুই ভাগ করিতে লাগিলেন। ভালো ভাগটা তুলিয়া রাখিলেন, মন্দের ভাগটা সাজাইয়া মেয়ের সঙ্গে দিলেন। মায়েরই কাপড় জামা পরিয়া, সুবর্ণ আবার শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য সাজিয়া বসিল। তাহার বুক তখনও দুঃখে ভয়ে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিন্তু পিতার মুখের দিকে চাহিয়া সে মনে সাহস সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেছে।

প্রতুলচন্দ্র আজই সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন; ততক্ষণ সুবর্ণর মাসীমা বাড়ী আগ্‌লাইয়া থাকিবেন; পরদিন সকালে তিনিও বাড়ী চলিয়া যাইবেন। প্রতুলচন্দ্র স্থির করিয়াছিলেন, কোনো আত্মীয়স্বজনের হাতে বাড়ীঘর জিম্মা করিয়া দিয়া, তিনি কলিকাতা ফিরিবেন, গ্রামে আর এক মুহূর্ত্তও তাঁহার থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল না।

গরুর গাড়ীতে জিনিষপত্র উঠান হইল। সুবর্ণও মাসীমাকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিল। সকালবেলা, কিন্তু রাত্রির অন্ধকার তখনও যেন পৃথিবীর মায়া কাটাইতে পারে নাই। সূর্য্যালোকের সামান্য একটু আভাষমাত্র পাওয়া যাইতেছে। প্রতুলচন্দ্র গাড়ী চড়িলেননা, ছাতা হাতে করিয়া গাড়ীর পাশে পাশে হাঁটিয়া চলিলেন।

ঘাটে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। নৌকা আগে হইতেই বলা ছিল। এক-হাঁটু কাদা ভাঙ্গিয়া গিয়া নৌকায় উঠিতে হইল। নদের ধারে আজকাল লোকজন বড় একটা ঘেঁষে না; দুই চারিজন লোক কার্য্যগতিকে যাহারা আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহারাই সুবর্ণর বিদায়গ্রহণ দেখিল।

নদের তীরেই শ্মশানভূমি! সেখানেও পাড় ধ্বসিয়া পড়িতেছে। সুবর্ণ কাঁদিয়া উঠিল, "মাগো, আমায় ফেলে, কোথায় গেলে মা?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "চুপ কর, চুপ কর। যা হয়ে গেছে তার জন্যে দুঃখ করে আর কি হবে? যা এখনও বাকি আছে, তার জন্যে মনকে প্রস্তুত কর।"

নৌকা চলিতে লাগিল। চারিদিকে শুধু প্রচণ্ড জলস্রোতের হুঙ্কার। সুবর্ণর কানে উহা যেন প্রেতলোকের তাণ্ডবের ধ্বনির মত বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কাহার কাছে সে দুঃখ জানাইবে? জগতে আপন বলিতে তাহার কেহই নাই। মা চলিয়া গিয়াছেন, পিতা তাহার অপরিচিত। সমাজের বন্ধনে যে সকল নূতন আত্মীয় সে লাভ করিয়াছে, তাহাদের সে যমের মত ভয় করে। বিজয় নদের বক্ষে সে যেমন আশ্রয়হীন, সংসারের বক্ষেও তেমনি। তাহার কোনো অবলম্বন নাই, নিয়তির স্রোতে সে কোথায় যে ভাসিয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়াই কূল পায় না।

ভাটগ্রাম পৌঁছিতে দুপুর হইয়া গেল। এখন দিনের আলো একটু প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। এখানেও ঘাটের কাছে লোকজন বিশেষ নাই, তবে নৌকা ভিড়িতে দেখিয়া

একটা জেলের ছেলে অগ্রসর হইয়া আসিল। প্রতুলচন্দ্র নামিয়া পড়িয়া, তাহাকে বলিলেন, "একখানা পাল্‌কী জোগাড় করা যায় বাপু?" ছেলেটা বলিল "পাল্‌কী ত ধারে কাছে কোথাও নেই কর্ত্তা, তবে বলেন ত ছিদামের গরুর গাড়ীটা ডেকে আনি। কোথায় যাবেন?" প্রতুলচন্দ্র গন্তব্য স্থানের উল্লেখ করিলেন। ছেলেটা হাসিতে মুখ ভরিয়া তুলিয়া তাড়াতাড়ি গরুর গাড়ী আনিবার জন্ত দৌড়িয়া চলিল। সুবর্ণ নামিল, লম্বা করিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া পিছিল পথে দাঁড়াইয়া রহিল। মাঝির সাহায্যে প্রতুলচন্দ্র জিনিষপত্র যাহা কিছু ছিল, বাহির করিয়া লইলেন। মাঝিকে বলিলেন, "তুমি ঘণ্টাখানেক সবুর কর বাপু, আমি আবার ফিরে যাব।" গরুর গাড়ী আসিয়া জুটিল। সুবর্ণ উঠিল, প্রতুলচন্দ্র এবারেও হাঁটিয়া চলিলেন।

(ক্রমশঃ)

জুয়ারী

শ্রীসুকুমার সরকার

নিজের জীবন ল'য়ে খেলিয়াছি জুয়া এতকাল!
শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই; সর্ব্বনাশী নেশায় মাতাল
টলিয়াছি রূপ-মুগ্ধ; কত লাভ কত ক্ষতি ক্ষয়
ছোটো সুখ ছোটো দুঃখ বেদনার ক্ষণিক সঞ্চয়
লভিয়াছি ক্ষণে ক্ষণে; আশা দিয়া ধরিয়াছি বাজি,
চাহিয়াছি কল্প-লোক; নিত্য নবরূপে সাজি সাজি
চলিয়াছি অভিসারে; আশার অধিক কভু পাওয়া
স্বপ্নে ভোলা যৌবনের অন্তহারা বসন্তিয়া হাওয়া!
কখনো হারায়ে গেছে মৃত্তিকার ধরণীতে মোর
সঙ্গীতের সুরগুলি; নন্দনের পারিজাত-ডোর
হয়ে গেছে ধূলিম্লান; প্রেম দিয়া লভিয়াছি ঘৃণা!
মানসী হয়েছে মোর কামনার কলুষ-মলিনা!
প্রতিটি মুহূর্ত্তে মোর হয় যেন জন্মলাভ নব
পাপে পুণ্যে চালায়েছি নিত্য নব জুয়ার উৎসব
দিকে দিকে; হারি-জিতি নাই কোনো ক্ষোভ!
সর্ব্ব দেহ মন দিয়া বিজয়ী হইতে তবু লোভ!
নারী দেয় নাই তৃপ্তি, উপভোগে ক্লান্তি নেমে আসে।
বাস্তবের কারাগারে বন্দী মন অশ্রুর উচ্ছ্বাসে
কাঁদে একা অসহায়; আপনারে ল'য়ে কত আর
চলিবে এ ছল জুয়া; কত হাসি ক্রন্দন আমার
ব্যর্থ দেবতার পায়ে; প্রাণহীন এ দেহ-দেউলে
আর কি সুন্দর মোর প্রেম হ'য়ে উঠিবে গো দুলে!
সুদূরে ঘনায়ে এলো, সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার
মূক মূঢ় কান্না ল'য়ে বঞ্চিত এ পৃথিবী আমার
গুমরি গুমরি ওঠে; কত যুগ হ'তে যুগান্তরে
পৃথ্বীও খেলিছে জুয়া; না পাওয়ারে লভিবার তরে
ধরেছি অনন্ত বাজি; রূপে রসে ঘ্রাণে গন্ধে গানে
আলোকে ও অন্ধকারে জন্ম হ'তে মৃত্যুর আহ্বানে
হারায়ে আবার পায়; পে'য়ে পুনঃ আবার হারায়;
অতৃপ্ত অদ্ভুত সৃষ্টি হাসে কাঁদে জুয়ার কারায়!



সেকালের বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র

অধ্যাপক শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত, এম-এ

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে "সমাচার চন্দ্রিকার" ১২৩৭ সালের ফাইল আছে। উহার ১লা বৈশাখের সংখ্যার ক্রমিক নম্বর ৪১৬। "সমাচার চন্দ্রিকা" কলিকাতার কলুটোলা ২৬নং বাটীতে চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া সোমবার প্রাতে ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে প্রকাশিত হইত। * এই পত্রিকা কলিকাতার ধর্ম্মসভার মুখপত্র ছিল এবং ধর্ম্মসভা সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। ধর্ম্মসভার বিবরণী সমূহ ইহাতে প্রকাশিত হইত। ভবানীচরণ ও তাঁহার রচনাবলীর বিস্তৃত পরিচয় শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। (১) ধর্ম্মসভা সম্বন্ধে ভবানীচরণ বিজ্ঞাপন দিতেছেন যে ১৭৫১ শকের ৫ই মাঘ এই সমাজ স্থাপন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবদাস মল্লিক প্রথমে ইহার ধনরক্ষক ছিলেন। তাঁহার পদত্যাগের পর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দেব ধনরক্ষক নিযুক্ত হন। ১লা বৈশাখ (ইং ১২ এপ্রিল, ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকার বিজ্ঞাপনে যে-সকল পুস্তকের নাম আছে তাহার মধ্যে "দূতী বিলাস" ও "কলিকাতা কমলালয়" ভবানীচরণের নিজের রচনা। "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকের পয়ার ভাষায় যে রচনার নাম আছে তাহা কাহার কৃত বোঝা যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গঙ্গাধর ন্যায়রত্ন এবং রামকিঙ্কর শিরোমণি প্রণীত "আত্মতত্ত্ব-কৌমুদী" নামে ১৮২২ খৃঃ প্রকাশিত যে "সাধুভাষারচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ" আছে তাহার ভাষা গদ্য। সমাচার চন্দ্রিকায় বিজ্ঞাপিত গ্রন্থের রচয়িতা কে ছিলেন আজিও নির্দ্দেশ হয় নাই।

ধর্ম্মসভা সহমরণ প্রথার সমর্থক ছিলেন। ৪ঠা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল, ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকার বিবরণে প্রকাশ যে ৩রা বৈশাখের ধর্ম্মসভায় সহমরণানুসরণ শাস্ত্রসঙ্গত ও তৎপ্রসঙ্গে বিলাতে এক আরজি প্রেরণ করা উচিত কিনা এই আলোচনা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অনেক সংখ্যাতেই সতীদাহ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ১৮ই বৈশাখ (২৯ এপ্রিল, ১৮৩০) কোন পত্রপ্রেরক 'বঙ্গদূত' পত্রের উল্লেখ করিতেছেন। ঐ দিন কোন পত্রপ্রেরকের চিঠিতে জানা যায় যে তিনি "নবসুশিক্ষিত বাবুগণের উপাখ্যান" লিপির প্রকাশ-ব্যয় জানিকে ইচ্ছুক। সমাচার দর্পণ ও সমাচার চন্দ্রিকার মধ্যে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল না। ২২শে বৈশাখ (৩ মে ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকা সমাচার দর্পণের কোন মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৩ মে ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশ যে ৬ই মে বৈকালে গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ও লেডী বেণ্টিক প্রভৃতি হিন্দু কালেজ পরিদর্শন করেন। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ (৩১ মে ১৮৩০) নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় :—

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে উক্ত গ্রন্থ সংস্কৃত নাগরাক্ষরে এবং তাহার বাক্যার্থ গৌড়ীয় ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে আর সর উং জুন সাহেবের কৃত ইংরাজী তরজমা সহিত শ্রীরামপুরের কাগজে বিলাতি কালী দ্বারা শোভাবাজারে শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ছাপাখানায় ছাপা হইতেছে গ্রন্থ পরিমাণ অনুমান ৪০০ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য ১০ টাকা মাত্র স্থির করিয়াছেন ইতি তারিখ ১৭ জ্যৈষ্ঠ।—(১)

ঐদিন আর লিখিত হয়—"আমরা পরম্পরা শ্রুত হইলাম এতন্নগরের বহুবাজারের কএক জন বিজ্ঞ একত্র হইয়া পরামর্শ স্থির করিয়াছেন যে সংবাদ রত্নাকর নামক এক সম্বাদপত্র সৃজন করিবেন তজ্জন্য গবরনমেণ্টের অনুমতি প্রাপ্ত নিমিত্ত

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (৩য় সংখ্যা ১৩৩৮ সাল) প্রকাশিত শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস" প্রবন্ধে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

(১) 'শনিবারের চিঠি'—মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩৩৮।

১ ৮ই আষাঢ় (২১ জুন ১৮৩০) পর্য্যন্ত এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল।



[illegible]

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

প্রার্থনা পত্র প্রদান করিয়াছেন ইহাতে বোধ হয় ত্বরায় প্রকাশ পাইবেক কিন্তু কি রীতিক্রমে কোন্ দিবসে প্রকাশ হইবেক তদ্বিশেষ আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই অনুমান করি সাপ্তাহিক কাগজ হইতে পারে এবং বুধবারে কোন বাঙ্গালা কাগজে প্রকাশ হয়না ঐ বার তাহারা ধার্য্য করিতে পারেন যাহা হউক বিশেষ অবগত মাত্রই পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইব এই বিষয় শ্রবণ মাত্র প্রকাশ করিলাম ইহার কারণ এ সংবাদ আমরা সুসম্বাদ জ্ঞান করি যেহেতু সমাচার পত্রের যত বাহুল্য হইবেক ততই দেশের উপকারের সম্ভাবনা তদ্বিশেষ অনেকেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ এই নূতন সমাচারের অধ্যক্ষ হিন্দু ইহাতে বোধ হয় তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মের বিপলক্ষে লিখিবেন না অতএব সংবাদ রত্নাকর সৃজন সুতরাং সুসম্বাদ বলা যায়।"

"বঙ্গদূত" পত্রিকার সহিত সমাচার চন্দ্রিকার সদ্ভাব ছিল না। ২২ জ্যৈষ্ঠ (৩ জুন ১৮৩০) সম্পাদকীয় মন্তব্য ও প্রেরিত পত্র প্রভৃতি হইতে ইহা বেশ দেখা যায়। ১লা আষাঢ় (১৪ জুন ১৮৩০) "শ্রীরামপুরের কালেজ" সম্পর্কে লিখিত হয়, "আমরা সমাচার পত্র দ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে শ্রীরামপুর কালেজের প্রতি শ্রীশ্রীযুত ডেনমার্কের অধিপতি এক চারটর অর্থাৎ সনন্দ প্রদান করিয়াছেন ইহাতে বোধ হইতেছে যে উক্ত বিদ্যালয়ের এক্ষণে উন্নতি হইতে পারিবেক।" ২২শে জ্যৈষ্ঠ (৩ জুন ১৮৩০) ও ৮ আষাঢ় (২১ জুন ১৮৩০) "তিমিরনাশক" নামক সংবাদ-পত্রের উল্লেখ আছে। ১১ই আষাঢ় (২৪ জুন ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকা লিখিতেছেন :—

শাস্ত্রপ্রকাশ।

আমরা পরম প্রীত হইয়া লিখিতেছি এতন্মহানগরে শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকৃত শাস্ত্রপ্রকাশ নামক পত্র প্রকাশ হইয়াছে সেই শাস্ত্রপ্রকাশে সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিপাদ্য প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে সর্ব্বদেশীয় সকল হিন্দু জাতীয় ভদ্র মহাশয়দিগের মহোপকার হইতে পারে যেহেতুক সংগ্রাহক ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহামহোপাধ্যায়ের নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে পরন্তু পত্রেও বেদ পুরাণ স্মৃতি সংহিতাদি নানা শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধোপাখ্যান করিয়াছেন এ পত্র আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সুপ্রশংসনীয় বোধ হইয়াছে ইহার মূল্য প্রতি মাসে ১ এক টাকা প্রতি বুধবারে বন্টিত হইয়া এক পত্র দিবেন।"

১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে ১৮৩০) হইতে সমাচার চন্দ্রিকায় শ্রীধর স্বামীর টীকাসহ শ্রীমদ্ভাগবত গীতার এক সংস্করণের বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছিল। ১৭৪৯ শকের বৈশাখ মাসে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৭৫২ শকের ৩১ বৈশাখ ৩ বৎসরে উহা সমাপ্ত হয়। এই সম্বন্ধে চন্দ্রিকা ১১ই আষাঢ় লেখেন :—

"গত ৯ আষাঢ় তারিখে দর্পণে তৎ প্রকাশক মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবদ্বিষয়ক সম্বাদ প্রকাশ করাতে আমরা উপকৃত হইলাম পরন্তু এই পুস্তক দৃষ্টি গোচর না হওয়াতে যে সন্দিগ্ধ আছেন তাহা ফোর্ট উলিয়ম কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্টর উলিয়ম কেরি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে সন্দেহ ভঞ্জন হইবে যেহেতুক মুদ্রাঙ্কিতের উপক্রমে কালেজ কমিটি গ্রাহক হওনের প্রার্থনা পত্রের সহিত মুদ্রিত কএক তুলাত পত্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া ছিলাম ঐ বিজ্ঞ মহাশয় তাহা দৃষ্টিমাত্র সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

১৮ই আষাঢ় (১ জুলাই ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকা লিখিতেছেন :—

চৌরঙ্গীর নৃত্যশালা।

আমরা জ্ঞাত হইলাম যে চৌরঙ্গীর নৃত্যশালার তামসিক ব্যাপার আগামি ৯ জুলাই তারিখে আরব্ধ হইবেক।"

২৫ আষাঢ় (৮ জুলাই) সমাচার চন্দ্রিকায় কলিকাতা হাই স্কুল নামে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকট এক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হয়। ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল কলিকাতা গ্রামার স্কুল। ইহার সম্পাদক হইলেন রেভারেণ্ড এ. মেক্‌ফরসন ও কমিটীর সভ্য দিগের মধ্যে কলিকাতার লর্ড বিশপ, ভেনারেবল আর্চডিকন করি সাহেব, মিঃ জে. কিড, মিঃ লেসলি, মিঃ পি. সদরল্যাণ্ড, মিঃ টিব্রি, মিঃ এল. বেট্‌স প্রভৃতি ছিলেন। প্রধান শিক্ষক হইলেন রেভারেণ্ড জে. মেক্‌কুইন। ঐদিন "আসাম বুরঞ্জি" প্রসঙ্গে লিখিত হয় :—

"শ্রীযুত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মুল্লুক আসাম বুরঞ্জি নামক গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া ঐ গ্রন্থের প্রথম

খণ্ড গ্রাহক দিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার অপর তিন খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে অতএব পূর্ব্ব গ্রাহকেরা চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে লোক প্রেরণ করিলে ঐ গ্রাহক দিগের নিকটে উক্ত গ্রন্থের তিন খণ্ড প্রেরিত হইবেক।" (১)

১ শ্রাবণ (১৫ জুলাই ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকা বলেন, "গত ৮ জুলাই বৃহস্পতিবার টৌন হলে চৌরঙ্গীর নৃত্যশালার অধ্যক্ষদিগের সাম্বৎসরিক সাধারণ সভা হইয়াছিল তাহাতে অনেক কথোপকথন হইয়া যাহা২ প্রয়োজনীয় ছিল তাহা স্থির হইয়াছে।" ৫ই শ্রাবণ (১৯ জুলাই) প্রকাশ যে কাঁচরাপাড়া নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ রায় গদ্যে পদ্যে বৈদ্যোৎপত্তি নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ৮ই শ্রাবণ (২২ জুলাই) শ্রী:গৌরমোহন আঢ্য স্বাক্ষরিত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী বিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞাপন বাহির হয়। ঐ বিদ্যালয় দুই বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। গৌরমোহনের বিজ্ঞাপনে শিক্ষকদিগের মধ্যে মিঃ টরনবুল ও মিঃ মালিসের নাম আছে ও ইহারা রামমোহন রায়ের বিদ্যালয়ে ও হেয়ার সাহেবের বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ঐ দিন প্রকাশিত ধর্ম্মসভার বিবরণীতে প্রকাশ যে মিঃ ফ্রেন্সিস বেথি সাহেব সতীর পক্ষ ও কলনিজেসান বিষয়ক আরজী লইয়া ২৭শে জুলাই বিলাত যাত্রা করিবেন। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব, শ্রীযুক্ত রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমানন্দন ঠাকুর, মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। "দমদমার নৃত্যশালা" সম্বন্ধে চন্দ্রিকা লেখেন, "আমরা জ্ঞাত হইলাম যে আগামি ২৭ জুলাই তারিখে দমদমার নৃত্যশালার তামাসা হইয়াছিল গ্রীষ্ম প্রযুক্ত সকলে আসিতে পারেন নাই বোধ হইতেছে যে এবার অনাআসে আসিতে পারিবেন।"

১৫ই শ্রাবণ (২৯ জুলাই ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকা লিখিতেছেন: "অদ্যকার চন্দ্রিকায় শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কর্ত্তৃক পুরুষ পরীক্ষা গ্রন্থের তরজমা বিষয়ক লিপি প্রকাশ করিলাম পাঠকবর্গ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন যেহেতু মহারাজ অত্যল্প বয়স্ক ইহাতেই এই ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন অনুমান হয় দেশের উপকারার্থ বহুবিধ বিষয় ইহার দ্বারা হইতে পারিবেক এমত ভরসা হইতেছে প্রধান লোকের সন্তানদিগের ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেননা পিতৃপিতামহাদির ধন প্রাপ্ত হইয়া কেবল গাড়ী ঘোড়াদির দ্বারা সে ধন ক্ষয় না করিয়া আপন কীর্ত্তি ও লোকোপকার করত জগতে খ্যাত হএন।" (২) "পুরুষ পরীক্ষা" সম্বন্ধে নিম্নলিখিত লিপি প্রকাশিত হয়:

"সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে প্রাচীন পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুরুষ পরীক্ষা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে তাহা প্রায় সকল পণ্ডিতেই জ্ঞাত আছেন এবং ভাষা রচিত ও তদ্‌গ্রন্থ আছে তাহাও অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবগত আছেন পরন্তু ইদানী শ্রীযুত মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ঐ উক্ত গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অবিকল রচিত অর্থাৎ তরজমা করিয়া পাত্রবিশেষে বিতরণ করিতেছেন তদ্বিধায় মহারাজ বাহাদুরের ইংরাজী বিদ্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ ও তদ্বিতরণ দ্বারা দাতৃত্ব ব্যক্ত হইতেছে অপিচ অস্মদাদির এতাদৃশ বিবেচিত হইল যে ঐ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য যে বীর ও সুধী ও বিদ্বান ও পুরুষার্থযুক্ত এই চতুষ্টয় পুরুষ লক্ষণ লিখিত আছে মহারাজ বাহাদুরের উক্তানুষ্ঠান দ্বারা চতুষ্টয় পুরুষ লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে তদ্বিবরণ প্রথমতঃ সেনানী লেখনীদ্বারা সংস্কৃত শব্দ বৃন্দ সহিত বিপুল যুদ্ধ পূর্ব্বক ঐ দেব বাক্যাগার হইতে ভাবার্থ চিত্তহরণ পূর্ব্বক ইংরাজী ভাষাগারে রক্ষিত করণ দ্বারা মহাবীরত্ব ব্যক্ত হইয়াছে এবং ঈদৃশ ব্যাপারে সুধীত্ব বিদ্বত্ব সুতরাং বিরাজমান। অপর স্বীয় বুদ্ধি বিদ্যাধীন ভাষান্তর রচনা ও স্বকীয় ধনব্যয়ে বহু সংখ্যক ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া দান দ্বারা যথার্থ পুরুষার্থ বিকাশের সম্ভাবনা বুঝা যায় অতএব মহারাজ উক্ত বিষয়ে শত ধন্যবাদের যোগ্য ইহা যোগ্য ব্যক্তির বিবেচনা সিদ্ধ হইতে পারে পরন্তু ঐ গ্রন্থের প্রস্তাবায়ত্ত বহুতর বৃত্তান্ত লিখিত আছে সে সমুদয় প্রকাশ অতি বাহুল্য হয় অতএব তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম।"

২৯শে শ্রাবণ (১২ আগষ্ট, ১৮৩০) প্রকাশ যে উকীল বেথি সাহেব যিনি সতীধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ প্রার্থনা পত্র লইয়া

(১) India Office Library Catalogue Vol. II, pt. IV (1905), p. 345এ 'Assam-buranji" History of Assam, pullished from an ancient mancsriept. Sicesagar 1844 এই উল্লেখ আছে।

(২) ১৮১৫ খৃঃ শ্রীরামপুর হইতে হরপ্রসাদ রায় কৃত পুরুষপরীক্ষার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

বিলাতগামী জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন তিনি জাহাজ কোনক্রমে ভগ্ন হওয়ায় কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াছেন। (৩) ১১ই ভাদ্র (২৬ আগষ্ট, ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকা বলেন যে গুরুপ্রসাদ রায়ের আদেশে শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন যে বৈদ্যোৎপত্তি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক চন্দ্রিকা যন্ত্রে "অবোধ বৈদ্যোদয়" নামক গ্রন্থ শ্রীরাজনারায়ণ মুন্শী দ্বারা প্রস্তুত হইয়া মুদ্রিত হইতেছে। ১৮ই ভাদ্র (২ সেপ্টেম্বর, ১৮৩০) প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত উমানন্দন ঠাকুরের বাটীতে জ্ঞান সন্দীপন নামক সমাজ স্থাপন হইয়াছে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর সভাপতি হইয়াছেন, প্রতি শনিবার রাত্রিতে ঐ সভা হইয়া বিদ্যাদি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর মীমাংসা হইয়া থাকে। জ্ঞান সন্দীপন সভার সম্পাদকের পত্র ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ২৫শে ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকায় জ্ঞানসন্দীপন সভার এক সংস্কৃত এবং বাংলা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। চন্দ্রিকায় অধিকন্তু প্রকাশ যে ধর্ম্মসভা ও জ্ঞান সন্দীপন সভা ব্যতীত বঙ্গবাগ্‌বিচার সভা ও বঙ্গহিত সভা স্থাপিত হইয়াছে। ৫ই আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৩০) হিন্দু কালেজের কোন ছাত্র সমাচার চন্দ্রিকায় লেখেন যে হিন্দু কালেজের বালকদিগকে বিধর্ম্মী ও নাস্তিক করার চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত তাহা সত্য নহে। (৪) জ্ঞান সন্দীপন সভার সম্পাদকের আর এক বিজ্ঞাপন ২৬ আশ্বিন (১১ই অক্টোবর ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত হয় :—

"বিশিষ্ট শিষ্ট সমূহ মান্য গুণিগণাগ্রগণ্য মহাশয়েরদের প্রতি পত্রিকা দ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি। এতন্মহানগরান্তঃপাতি পাতর ঘাটায় শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুরের বৈঠকখানা বাটীতে উপরি লিখিতা সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে। ঐ সভা প্রতিমাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবারে রাত্রি ইং ৭ ঘণ্টার পর ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইবেক ঐ সভাতে বহু সুপণ্ডিত মহাশয়েরা আগমন করিয়া কেবল বিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি করেন কিন্তু ঐ সভাতে কোন জাতীয় পক্ষপাতি ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি হয় না অপর যদ্যপি কোন মহাশয় কেবল বিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি প্রেরণ করেন তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবেক কিন্তু অন্যবিষয়ক হইলে গ্রহণ করা যাইবেক না। সভার নিয়ম যদ্যপি সভাস্থ সভ্যগণ মধ্যে কোন সভ্য মহাশয় স্বীয় কার্য্যানুরোধে ঐ উক্ত নিরূপিত দিবসে না আসিতে পারেন তবে সম্পাদক সমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিবেন যদ্যপি পত্র প্রেরণ না করিয়া পুনঃ পুনঃ অনাগমন করেন তবে নিয়ম পত্র হইতে তাঁহার নাম বহিষ্কৃত করা যাইবেক এতদ্বিষয়াবগত হইয়া যাঁহার এই সভার সভ্য হইতে বাঞ্ছা হইবেক তিনি সম্পাদক সমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিলেই নিয়ম পত্রে তাঁহার নাম লেখা যাইবেক।"

১৩ কার্ত্তিক (২৮ অক্টোবর ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকা লিখিতেছেন, "শ্রীযুত রামমোহন রায় মহাশয়ের বিলাতগমন উদ্‌যোগ সংবাদ আমরা চন্দ্রিকায় এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করি নাই এজন্য তিন চারি জন চন্দ্রিকা পাঠক পত্র লিখিয়াছেন যে কি কারণ প্রকাশ কর না উত্তর, এ সংবাদ প্রায় তাবৎ লোকের শ্রুতিগোচর হইয়াছে অতএব লিখনের আবশ্যক বুঝা যায় নাই।......রায় বাবুর বিলাত গমনে কাহার শঙ্কালেশও হয় নাই যেহেতুক সুবিচারক রাজার নিকট পক্ষপাত হইতে পারিবেক না অতএব সতী ও কলনিজেসিয়ান বিষয়ে শঙ্কা নাই শাস্ত্র ও সুবিচার বলে ডঙ্কা বাজাইয়া উকীল জয়ী হইয়া আসিবেক।"

২০শে ও ২৪শে কার্ত্তিক (৪ও৮ই নবেম্বর ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকায় "দ্বিজরাজের খেদোক্তি" নামে এক ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি রাজা রামমোহন রায়কে উদ্দেশ করিয়া লিখিত। ইহাতে তাঁহার পুত্র রাজারামের উল্লেখ আছে। কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত হইল :—

"যবনী প্রেয়সী গর্ভে সুপুত্র জন্মিল।
রাজা নাম দিনু তার নিকটে রহিল।
....
বাতিক হইল জোর স্বপ্ন দেখি কত।
পাতশাই পাঞ্জা পাই এই অভিমত॥
এদেশের রাজা হয়ে প্রজারে পালিব।
আপন মতের মধ্যে তাবতে আনিব॥

---

(৩) ৫ আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৩০) চন্দ্রিকায় প্রকাশ যে ৩১শে ভাদ্র বেথি সাহেব পুনর্ব্বার বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

(৪) হিন্দু কলেজের বিরুদ্ধে সমাচার চন্দ্রিকায় অনেক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

কাহার সাক্ষাতে এই মনের বাসনা।
কহিবাতে সে আমারে কহিল মন্ত্রণা ॥
যদ্যপি বিলাতে তুমি যেতে পার ভাই।
পূরিবে বাসনা তার সন্দেহ ত নাই ॥ *

২৪শে কার্ত্তিকের (৮ই নবেম্বর) সমাচার চন্দ্রিকায় প্রেরিত পত্রে স্পষ্ট লেখা আছে যে রাজা রামমোহন রায় অতি শীঘ্র বিলাত গমন করিবেন এবং ৮ই কার্ত্তিকের সমাচার দর্পণে প্রকাশ যে তিনি এলবিয়ান নামক জাহাজে গমন করিবেন। ৪ অগ্রহায়ণ (১৮ নবেম্বর) সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বুঝা যায় যে ২৪ ও ২৭ কার্ত্তিকের 'সম্বাদকৌমুদী' পত্রে "চন্দ্রিকাকারের প্রতি নানা প্রকার কটুকাটব্য উক্ত হইয়াছে।" উহাতে আরও জ্ঞাত হওয়া যায় যে কয়েক মাস পূর্ব্বে বড় আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত ওয়াইট সাহেবকে গালি দেওয়ার অপরাধে রামমোহন রায়ের এক টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। ৮ই অগ্রহায়ণ (সোমবার ২২ নবেম্বর) রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে লিখিত হয়, "গত শুক্রবার শ্রীযুত রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র ও চারিজন পরিচারক সমভিব্যহৃত হইয়া আল্‌বিয়ন নামক জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক বিলাতে গমন করিয়াছেন।" ১১ই অগ্রহায়ণের (২৫ নবেম্বর) সমাচার চন্দ্রিকায় হেদো পুষ্করিণীর থানার নিকটে ওরিএনটেল একাডিমি নামক ইংরাজী বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন ছিল। ২৯শে অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) 'সমাচার চন্দ্রিকা' কোন পাঠকের অভিপ্রায় যে এই পত্র দৈনিক হউক এই সম্বন্ধে বলেন যে ইহা ব্যয়সাধ্য, সমাচার চন্দ্রিকা পূর্ব্বে কেবল সোমবার প্রকাশিত হইত কিন্তু প্রায় দুই বৎসর গত হইল পাঠক গণের তুষ্টির নিমিত্ত সপ্তাহে দুইবার অর্থাৎ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতি বার প্রকাশ করা যাইতেছে।

৯ই পৌষ (২৩ ডিসেম্বর ১৮৩০) চন্দ্রিকায় ড্রামণ্ড ও উইলসন সাহেবদিগের ধর্ম্মতলা একাডিমি নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ও কলিকাতা হাই স্কুলের বালকদিগের পরীক্ষার সংবাদ বাহির হয়। ১৩ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) প্রকাশ শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবদিগের প্রতিষ্ঠিত বিনিবোলেণ্ট ইন্‌সটিটিউসনের ছাত্রদিগের পরীক্ষা ডাক্তার মার্সমেন সাহেব লইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে ফিরিঙ্গী, দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান ও বাঙ্গালী ছাত্র আছে। ১৬ই পৌষ (৩০ ডিসেম্বর) সমাচার চন্দ্রিকা বলেন যে এক্ষণে চারি পাঁচটা বাংলা সমাচার পত্র হইয়াছে। এই দিনের চন্দ্রিকায় "জামজাহাঁনমা" নামক পারস্য সংবাদপত্রের নাম এবং "আখবারে শ্রীরামপুর" নামক এক পারস্য সংবাদপত্র যে কয়েক মাস প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ আছে। পারসী ও বাংলা ভাষায় কলিঙ্গা নিবাসী মিয়া আলি মোল্লা মৌলভি এক সংবাদপত্র ও গৌড়ীয় ভাষায় সম্বাদসুধাকর নামে এক পত্র শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ রায় প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন ইহাও উক্ত সংখ্যায় পাওয়া যায়। ২০ পৌষ (৩ জানুয়ারী ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকা বলিতেছেন যে বাংলা ভাষায় পাঁচটা সংবাদপত্র হইয়াছে, পারসী ভাষায় চারিটা কাগজ হইয়া ছিল ধনাভাবে তাহার তিনটার নিধন হইয়াছে, "উদন্ত মার্তণ্ড" নামক একটা হিন্দী ভাষায় নাগর অক্ষরে প্রকাশিত সংবাদপত্র অর্থাভাবে রহিত হইয়াছে।*

৮ই মাঘ (২০ জানুয়ারী ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশ: "রামমোহন রায়ের বিলাত গমন যদ্যপি আশ্চর্য্য বিবেচনা হইতেছে তথাপি এ ঘটনা প্রথম নহে কেননা এদেশের বার্ত্তা দ্বারা সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে যে প্রায় চব্বিশ বৎসর গত হইল বাজেরাও পেশোয়ার পিতা রাঘবা বা রঘুনাথ রাও পুনা হইতে নিরাকৃত হইয়া বোম্বেতে বাস করিয়া দুইজন ব্রাহ্মণকে উকীল করিয়া জাহাজ দ্বারা ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন তাহার দিগের প্রত্যাগমন হইলে ম্লেচ্ছাক্ত কহিয়া জাত্যন্তর করিয়াছিল পরে অনেক পণ্ডিত দ্বারা নানাপ্রকার তথ্যানুসন্ধানপূর্ব্বক স্থির হইল যে ইহারা স্বেচ্ছায় একর্ম্ম করে নাহি এবং দেশের উপকারের নিমিত্ত রাজার দ্বারা প্রেরিত পুনঃ সংস্কার করাইলে নির্দ্দোষী হইতে পারে এই প্রকার ব্যবস্থা হওয়াতে রঘুনাথ রাও অনেক ব্যয় করিয়া সমারোহ পূর্ব্বক বিধিবৎ পুনঃ সংস্কার করাইলেন তবে ব্রাহ্মণেরা হিন্দু দিগের গ্রাহ্য হইল।

---

* রাজারাম সম্বন্ধে 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় (১৩৩৬, অগ্রহায়ণ ও চৈত্র) শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

* এই প্রবন্ধে যে-সকল সাময়িক পত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সে গুলির বিস্তৃত পরিচয় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'র (৩য়, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩৮) প্রকাশিত শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাসে" পাওয়া যাইবে।

আমরা কহিতে পারি না যে রামমোহন রায় প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার দেশে কি প্রকারে চলিত হইবেন কিন্তু তাঁহার ভ্রমণেতে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি যে কোন অপরাধ হইয়া থাকে তাহা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্তে এই এক পূর্ব্বে দৃষ্টান্ত আছে ইহা তিনি স্মরণ রাখিবেন।"

২২ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকা লিখিতেছেন: "পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকর নামক সমাচার পত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল সংপ্রতি গত ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে তদবলোকনে বোধ হইতেছে যে তৎপ্রকাশক হিন্দুধর্ম্ম নাশেচ্ছুক দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন যেহেতু প্রভাকর প্রকাশকের যুক্তি উক্তি দ্বারা শক্তি ভক্তি ব্যক্ত হইয়াছে সাধু সদাশয়রা এ সম্বাদ পত্রের সম্বাদ শুনিলে ঔদাস্য না করিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন।" ২৬শে মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩১) সংবাদ প্রভাকর সম্বন্ধে 'সমাচার চন্দ্রিকা' দ্বিতীয় বার লেখেন, "আমরা গত শুক্রবারের সম্বাদ প্রভাকর পত্র দৃষ্টি করিয়া আমাদিগের তুষ্টি ব্যক্ত করিতেছি যদ্যপিও প্রভাকরের নবানুরাগ বটে কিন্তু অরুণ কিরণ সর্ব্বসাধারণ প্রয়োজনক পরন্তু তৎপত্রের প্রকাশকের উক্তিতে সাধু সকলের পবিত্র চরিত্র অবশ্য আর্দ্র হইবেক যেহেতুক তাহাতে তাহাতে পঞ্চ উপাসকের মতের পরস্পর বিবাদ বিরহ কিন্তু শুনিতে পাই সেই সকল কবিতায় শ্রীশ্রী আদি পুরুষাদির গুণ কীর্ত্তন বর্ণন আছে তদ্দৃষ্টে কোন মহাশয় কহিয়াছেন এ সম্বাদ প্রভাকর কি সংকীর্ত্তন একথায় আমরা সন্তুষ্ট হইলাম কেননা কথিত আছে কানু ছাড়া কীর্ত্তন নাই অতএব প্রভাকর প্রকাশক যে কীর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছেন তাহা হরি ছাড়া নহে সুতরাং প্রভাকরের প্রভাক্রমে প্রভাকরের ন্যায় প্রকাশ পাইবেক।"

১৪ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশ যে আঁদুল গ্রামে তর্ক সভা নামে এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, ঐ সভাতে প্রতি রবিবার বৈকালে প্রশ্নের বিচার হয় (১)। ১৮ই ফাল্গুন (২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকা সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন:—

"আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠক বর্গকে জ্ঞাত করাইতেছি গত ১৩ ফাল্গুণ বুধবার প্রাতে সম্বাদ সুধাকর নামক এক সমাচার পত্র এতন্নগরের যোড়াবাগান ষ্ট্রীটে শ্রীযুত দেবীচরণ প্রামাণিকের আলয়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে গত বৃহস্পতিবার চন্দ্রিকা পত্র মুদ্রিত হইলে ঐ পত্র প্রাপ্ত হইলাম সুতরাং তদ্দিবসে ঐ সম্বাদ পত্রের সমাচার পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইতে পারি নাই সুধাকরের অনুষ্ঠান পত্র চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল ··

এক্ষণে পাঠকবর্গ নিকটে প্রার্থনা করিতেছি সুধাকর সম্বাদ সুধাস্বাদনে সকলেই মনোযোগী হউন।"

২৮ ফাল্গুন (১০ মার্চ্চ ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশ:—

"সমাচার সভা রাজেন্দ্র নামক বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় এক সমাচার পত্র সৃজন হইবার কল্প ছিল তাহা গত ২৫ ফাল্গুণ সোমবার প্রকাশ হইয়াছে প্রথম সংখ্যা দৃষ্টি করিয়াছি তাহাতে তৎ প্রকাশকের প্রতিজ্ঞা বা অভিপ্রায় কিছুই ব্যক্ত হয় নাই কেবল কএকটী সংবাদ ও তাহারি অবিকল অনুবাদ পারস্য ভাষায় হইয়া চারিতা কাগজ মুদ্রিত হইয়াছে বোধ হয় আগামিতে তৎপ্রকাশক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন যাহা হউক সকল প্রকার কাগজ প্রকাশ হইল পূর্ব্বে কেবল ইংরাজী সমাচার পত্র ছিল ইহাতে লোকের দিগের বাঞ্ছা হইত বাঙ্গালা হইলে ভাল হয় তাহা হইলে পারস্য ভাষায় কাগজে প্রয়াস হইল সে অভিলাষ পূর্ণ হওনান্তে ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় একত্রে দেখিবার সাধ ছিল তাহাও হইয়াছে পারস্য বাঙ্গালা উভয় ভাষায় কোন গ্রন্থাদি দেখা যায় নাই ৺ঈশ্বরেচ্ছায় সে খেদও রহিল না এক্ষণে শুনিতেছি পারস্য বাঙ্গালা ও উড়িস্যা ভাষায় কটক অঞ্চলে হইবেক ইহা হইলে অধিকতর মঙ্গল জ্ঞান করিব।"

২ চৈত্র (১৪ মার্চ্চ, ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকার বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে মিঃ সেরব্রোন সাহেবের যোড়াসাঁকোর ইংরাজী বিদ্যালয় তথা হইতে বহুবাজারে উঠিয়া গিয়াছে। ৯ই চৈত্রের (২১ মার্চ্চ ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকায় কলিকাতার কয়েকটী সংবাদপত্রের প্রকাশকের নাম আছে। জাম-

(১) ২৮ ফাল্গুন (১০ মার্চ্চ ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকায় উক্ত সভার সম্পাদকের পত্রে প্রকাশ যে উহার প্রকৃত নাম "ধর্ম্মসভা"। ১২ চৈত্র (২৪ মার্চ্চ ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকা স্পষ্ট বলিতেছেন যে ইহা কলিকাতা ধর্ম্মসভার শাখা সভা।

জাঁহানুমা সংবাদপত্রের প্রকাশক কলুটোলা নিবাসী শ্রীহরিহর দত্ত, সুধাকর পত্রের প্রকাশক কাঁচড়াপাড়া নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব শ্রীপ্রেমচাঁদ রায়, সভারাজেন্দ্র কাগজের প্রকাশক মুসলমান। সংবাদ প্রভাকর সম্বন্ধে এই সংখ্যা চন্দ্রিকা বলেন, "প্রকাভর অত্যল্প দিবস প্রকাশ হইয়াছে বটে কিন্তু ইহাতেই এতন্নগরের প্রায় যাবদীয় ভদ্রলোক তৎপত্রের আদর করিয়াছেন এবং নানা দিগেদশ হইতে ঐ পত্রের গ্রাহক হইয়া অনেক লোক পত্র লিখিতেছেন।" ২৩ চৈত্র (৪ এপ্রিল ১৮৩১) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সম্বন্ধে সমাচার চন্দ্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়:—

"বিলাত হইতে জাহাজ আসিয়াছে তদ্দ্বারা এমত ব্যক্ত করে যে কালেজ আফ ফোর্ট উইলিয়ম অর্থাৎ কোম্পানির কেরানিদিগের বিদ্যালয় একবারে উঠিয়া যাইবেক এমত আজ্ঞা হইয়াছে। সেক্রেটরি, শিক্ষক, পণ্ডিত, মুন্সী ইহারদিগের প্রভেদ থাকিবেক না।" ২৬ মার্চ্চ ৬৭১ সংখ্যা সমাচার দর্পণে "প্রাচীন বিপ্র" নামক কোন লেখক এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র দ্বারা লোকের কোন উপকার হইতেছে-না এইরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়। ২৩ চৈত্রের সমাচার চন্দ্রিকা এই পত্রলেখকের মত খণ্ডন করেন এবং বলেন যে ইংরাজী সমাচার পত্রের তুল্য বাংলা পত্র হইবে ইহার কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই কারণ ইংরাজী পত্রিকার দামের তুলনায় বাংলা পত্রিকার দাম সামান্য এবং লেখকের অন্যান্য যুক্তির কোনই তাৎপর্য্য নাই।

পরিশিষ্ট

সমাচার চন্দ্রিকা

(১৭৩৭ সালের ১ বৈশাখের বিজ্ঞাপন)

সমাচার চন্দ্রিকা পত্র এ প্রদেশে প্রায় সচিত্র বিখ্যাত হইয়াছে এতন্নগরের প্রায় যাবদীয় শিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু লোক গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কাশী কটক ঢাকা রংপুর মুরশিদাবাদ, যশোহর নদীয়া বর্দ্ধমান হুগলী প্রভৃতি জেলায় গিয়া থাকে এপত্রের গ্রাহক এক্ষণে প্রায় পাঁচশত জন হইয়াছেন যদ্যপি কোন মহাজনাদির কোন বস্তুর ক্রয় বিক্রয়াদির সংবাদ প্রকাশাবশ্যক হয় চন্দ্রিকা পত্রে সংবাদ দিলে অনায়াসে এদেশের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইতে পারে এতৎ পত্রে কোন বিষয় বিজ্ঞাপন অর্থাৎ ইস্তেহার করিবার ব্যয় প্রথম বার পঙক্তি ।০ আনা পরে ঐ বিষয় ক্রমিক যতবার প্রকাশ হইবেক ঐ চারি আনা লাগিবেক কিন্তু শতকরা দশ টাকা বাদ দেওয়া যাইবেক। ইতি—

দামোদরের বিপত্তি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

একাদশ পরিচ্ছেদ

"রবিবাবুর আধ্যাত্মিক আকাশ"

পরদিন প্রভাতে শচীনের আহ্বানে দামোদরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে চোখ চাহিয়া দেখিল, শচীন, রমেশ ও নগেন সজ্জা করিয়া প্রস্তুত। শচীন বলিল, "উঠুন মশাই, আটটা বাজে!"

দামোদর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া দেখিল সত্যই বেলা হইয়াছে। কাল রাত্রে নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাহার ঘুম আসিতে দেরী হইয়াছিল; তাই এত বেলা হইয়া গিয়াছে। সে যথাসম্ভব শীঘ্র মুখ ধুইয়া কাপড়টা ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া পরিয়া, জামাটা মাথায় গলাইয়া লইয়া বলিল, "চলুন।"

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "দরখাস্ত নিয়েছেন?"

দামোদর দরখাস্ত নিতে ভুলিয়াছিল। দরখাস্তখানি উঠাইয়া পকেটে পুরিতে গেল। নগেন বলিল, "করেন কি? অমন পাট কর্ত্তে আছে? গোল ক'রে পাকিয়ে হাতে নিন্। হাঁ, ঐ রকম। এইবার চলুন।"

চারজনে বাহির হইয়া পড়িল। চারুবাবু দ্বিতল হইতে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, "কোথায় সব, নগেন?"

নগেন উত্তর দিল, "প্রাতর্ভ্রমণে। এক্ষুনি আস্‌ছি।"

চারজনে আসিয়া শিয়ালদহে জমা হইল, ট্রামের

অপেক্ষায়। দাঁড়াইয়া প্রায় পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল। নগেন একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিল, "এ ছাই ট্রাম কি ঠিক দরকারের সময়ই দেরী করে আস্‌বে। এমনি হ'লে এতক্ষণ পঞ্চাশখানা ট্রাম সামনে দিয়ে যেত। আর এখন দেখ না; দাঁড়িয়ে রৌদ্রে মাথা ধরে গেল, ট্রামের দেখা নেই।"

শচীন একটু আগাইয়া দেখিয়া বলিল, "কোনও চিহ্ন নেই, হেঁটেই চল্‌বো নাকি?"

নগেন উত্তর দিল, "তো'র বুদ্ধি ভগবান্ ঠিক তো'র বাপের পয়সার মাপে দিয়েছেন। অত পয়সা না হ'লে তো'র উপায় কি হোত?"

রমেশ কহিল, "ঝগড়া করিস্ নি। ঐ ট্রাম আস্‌ছে।" ট্রাম আসিলে ট্রামে চারজন উঠিয়া বসিল। নগেন একবার দামোদরের হাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল দরখাস্ত-খানা ঠিক আছে কি না। তা'র পর বলিল, "সাবধান, দামোদরবাবু, ওখানা যেন ভুলে বেঞ্চের উপর ফেলে যাবেন না।

দামোদর কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর দিল, "না।"

নগেন বলিল, "কি জানি, মশাই। আমার ত' মাসে একখানা ক'রে খাতা হারায়। শচীর কোন মাসে তিনখানা কোন মাসে চারখানা; রমেশের ও বালাই নেই। ও শুধু হাতে যায় আসে; কাজেই ওর হারায় কি না জানি না। তবে ও পড়ে, অথচ ওর বই নেই, খাতা নেই; তা'তে সন্দেহ হয় যে ও সমস্তই এই রকম করে হারিয়েছে। এখন বুদ্ধিমান হয়েছে।"

ট্রামের কন্‌ডাক্‌টর টিকিট্ দিতে আসিল। দামোদর, পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দিল। চারখানি পার্ক ষ্ট্রীটের টিকিট লইল।

রমেশ বলিল, "দামোদরবাবু, এ কাজটা ভাল কর্লেন না। আপনি টিকিট কর্লে, আমাদের বাধ্য হ'য়ে আপনাকে ধুতি ও জামা কিনে দিতে হবে।"

দামোদর হাসিয়া জবাব দিল, "তা' দেবেন।"

এস্‌প্লানাডে বদল করিয়া, পার্ক ষ্ট্রীটের সাম্‌নে চারজনে নামিল। তা'রপর দুইজন এক ফুট পথে, অন্য দুইজন অন্য ফুট পথে বাড়ীর নম্বর দেখিতে দেখিতে চলিল। শচীন ও নগেন বলিল, "আমরা ১০৫ পেলেই ডাক্‌বো। তোমরা পেলেই আমাদের ডাক্‌বে। বল্‌বে, পেয়েছি।"

চারজনে চলিল। ক্রমে শচীন ও নগেনের ভাগ্যেই ১০৫ মিলিল। নগেন ডাক্ দিল, "হে! রমেশ! পেয়েছি।"

রমেশ ও দামোদর দু'জনে রাস্তা পার হইয়া অপর ফুটপথে উঠিল। শচীন বলিল, "দোকানের ঠেলায় বাড়ী কি চিন্‌বার উপায় আছে। কোন্‌টা বাড়ী আর কোন্‌টা দোকান চিন্‌তে পারি না।"

১০৫ নম্বর বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইয়া চারজনে পরামর্শ করিল। ভিতরে উঁকি মারিয়া রমেশ বলিল, "দু'তিনখানা বাড়ীত কম্পাউণ্ডে দেখছি। কোন্‌টাতে রাজা মশাই আছে কে জানে?"

নগেন ফটকে সমস্ত নামের প্লেট দেখিয়া বলিল, "উঁহু। এ যে সব সাহেব মেমের নাম, বাবা। শেষে কি ধাপ্পায় পড়া গেল না কি?"

শচীন রায় দিল, "একটা দরওয়ান কি বেহারাকে জিজ্ঞাসা ক'রেই দেখা যাক্ না। কাগজখানা যদি বুদ্ধি ক'রে আন্‌তিস্।"

দামোদর এত বড় বাড়ী ও ফটক্ দেখিয়াই পিছাইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, "ও বাজে বিজ্ঞাপন! চলুন,ফিরে যাই।"

নগেন উত্তর দিল, "তা' কি হয়?" সে ভিতরে অগ্রসর হইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আরও একটু অগ্রসর হইতেই একটা প্রকাণ্ড বিলাতী কুকুর তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিতে পাইল। তাহার মুখ শুষ্ক হইল; বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল; যদি কামড়ায়, তা' হলেই 'ত সে গেছে। পিছনে তাকাইয়া দেখিল, পলায়নের পথ নাই; ফটক অনেক পিছনে। সে যথাসম্ভব সাহস সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কুকুরটি আসিয়া তাহার জুতা জামার গন্ধ লইল; সে সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল, "হপ্; চপ্; হুস্। স্টপ্।" কুকুরটা একটু সরিয়া গিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইল। নগেনের ভয় বাড়িল; সে অগ্রসরও হইতে পারিল না, পিছাইতেও সাহস করিল না। দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "স্টপ্; হুস্! কোয়েট্! গো!" কিন্তু কুকুর হটিল না, সেও অগ্রসর হইতে পারিল না।

সৌভাগ্যক্রমে একজন মালী আসিয়া উপস্থিত হইল। নগেন বলিল, "মালী, এখানে কে কে থাকে?"

মালী জানাইল, আগে তিনজন সাহেব থাকিত; এখন দু'জন সাহেব আছে, ও একজন বাঙালীবাবু আছে—ব্যারিষ্টার! শেষের বাড়িটা সব পিছনে—সেইটা ব্যারিষ্টারের।"

নগেনের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। সে আর সেই কুকুরের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া চক্ষু মুদিয়া ফটকের ধারে আসিয়া সংবাদ দিল।

রমেশ বলিল, "দামোদর বাবু, আপনি যান। খোঁজ করুন; দেখা করুন। ঐ হবে। ৯॥০টা প্রায় হয়েছে।"

নগের সাবধান করিয়া দিল, "একটা প্রকাণ্ড কুকুর আছে, সাহস করে যাবেন; যেন ভয় খাবেন না। ভয় খেলেই কুকুর কামড়ায়। যদি তাড়া করে, তবে দাঁড়িয়ে পড়্‌বেন। ছুট্‌বেন না।"

দামোদর ফিকা হাসি হাসিয়া একটু জোর মুঠাতে দরখাস্তখানি ধরিয়া ভিতরে অগ্রসর হইল। দূর হইতে সে কুকুরটাকে দেখিল; কিন্তু তাহার নগেনের মত ভয় হইল না। সে সোজা অগ্রসর হইয়া পিছনের বাড়ীখানির সম্মুখে আসিয়া, একজন বেহারাকে প্রশ্ন করিল, "বাবু আছে?"

বেহারা সংশোধন করিয়া দিয়া বলিল, "সাহেব আছেন।"

দামোদর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব? বাঙালী নয়?"

বেহারা হাসিল। জানাইল, "হাঁ, বাঙালী 'ত বটে, তবে সাহেব।"

তা'র পর জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?"

দামোদর কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "দেখা কর্ত্তে চাই একবার। একটু যদি বলে দেখ তুমি।"

বেহারা তাহার ব্যবহারে খুসী হইয়া একখণ্ড কাগজ ও একটা পেন্সিল লইয়া আসিয়া বলিল, "এইতে নাম, আর কি দরকার লিখে দিন।"

দামোদর লিখিয়া দিল। বেহারা কাগজখণ্ড লইয়া চলিয়া গেল ও মিনিট পাঁচ ছয় বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আসুন।"

দামোদর বেহারার পিছনে পিছনে চলিল। বাড়ীর আসবাবপত্র দেখিয়া সে ভীত হইল। এত ব্যাপার! না জানি কত অর্থবান্! উপরে উঠিবার সিঁড়ির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে সে উপরে ছেলেমেয়ের হাসির আওয়াজ শুনিতে চেষ্টা করিল। বেহারা তাহাকে লইয়া গিয়া একটা ঘরের পর্দ্দা সরাইয়া বলিল, "ভিতরে যান্, সাহেব আছেন।"

দামোদর ভিতরে প্রবেশ করিয়া, প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। চারি দিকে নানা রঙ্-বেরঙের চেয়ার, সোফা, টেব্‌লই দেখিল। অনেকক্ষণ পরে এক দিকে একটা আওয়াজ শুনিল, "আসুন"। তখন সেই দিকে তাকাইয়া একজনকে দেখিতে পাইল। প্রায় ৬০ বৎসর বয়স। মাথায় দু'চার গাছি মাত্র পাকা চুল আছে। ঢিলে পায়জামা ও তাহার উপরে একটা বিলাতী ড্রেসিঙ গাউন। পায়ে পশমের ফুল স্লিপার। বেশ স্নেহপূর্ণ, উদার মুখভাব। চোখ দুটি উজ্জ্বল। লম্বা ও গৌর দেহ।

দামোদর অগ্রসর হইয়া তাঁহার সমীপস্থ হইতেই, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বসিতে বলিলেন। দামোদর অত্যন্ত বিনীত ভাবে বসিল। তখন ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বিজ্ঞাপন পড়ে এসেছেন বুঝি?"

দামোদর মুগ্ধভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "আজ্ঞে, হাঁ।"

"আপনার নাম? বাড়ী?"

দামোদর হস্তস্থিত দরখাস্তখানা দিয়া বলিল, "এইতে সব আছে; দয়া করে পড়ুন।"

ভদ্রলোক টেব্‌লের উপরিস্থিত একখানি কেস্ হইতে সোণার চসমা বাহির করিয়া তাহা পরিয়া দরখাস্তখানি পড়িলেন। তা'র পর একবার দামোদরের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "আপনি সাহিত্যিক? ইংরাজি সাহিত্যে বেশ দখল আছে?"

দামোদর উত্তর দিল, "বেশ দখল আছে, বল্‌তে পারি না। তবে একটু আধটু চর্চ্চা করি।"

ভদ্রলোক টেব্‌লের উপরস্থিত বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাইলেন। একজন বেহারা আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে তিনি আদেশ দিলেন, "দিদিমণিকে ডাক!"

বেহারা যাইবার প্রায় ২০।২৫ মিনিট বাদে একজন স্ত্রীলোক—যুবতীই—বয়স অনুমানে বছর ২২।২৩ হইবে—ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, বাবা?"

ভদ্রলোক দামোদরকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই ইনি

এসেছেন বিজ্ঞাপনের উত্তরে। ইনি সাহিত্যিক। তোমার এঁকে কিছু পরীক্ষা করবার আছে?"

যুবতীটি দামোদরের দিকে একবার চাহিয়া ভদ্রলোককে বলিল, "একটু দেখবে না পরীক্ষা করে? ওঁর কি বইটই আছে?"

দামোদর মাথা নীচু করিয়াই ছিল। একবার মাত্র চাহিয়া জবাব দিল "না।"

যুবতীটি ভদ্রলোককে প্রশ্ন করিল, "তবে? আপনি ওঁকে বরং ঐ বিষয়ে—যেটা আপনাকে সেদিন দিয়েছি—সেই বিষয়ে একটু লিখতে দেন। লাইব্রেরিতে বসে লিখবেন; সেখানে বই যা' দরকার পাবেন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "ঠিক কথা।" তা'র পর দামোদরকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "দেখুন; আপনাকে একটা রচনা এইখানে লিখে দেখাতে হবে। আপনার আপত্তি নাই ত?"

দামোদর জানাইল তাহার আপত্তি নাই। যুবতীটি ইতিমধ্যে একখণ্ড কাগজে কি লিখিয়া দিলেন। ভদ্রলোক কাগজখণ্ডটি হাতে করিয়া উঠিয়া দামোদরকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। সেই ঘরের ভিতর দিয়া ভিতরে এক লাইব্রেরি-ঘরে উপস্থিত হইয়া তিনি সেই কাগজখণ্ড দামোদরের হাতে দিয়া কহিলেন, "এইখানে কাগজ কলম সব আছে। বইও যা' প্রয়োজনীয় তা' আছে। এইখানে বসে ধীরে সুস্থে এই প্রবন্ধটা লিখুন। এখন ১০টা; ১১টার ভিতর শেষ হবে বোধ হয়?"

দামোদর কাগজখণ্ড পড়িয়া দেখিল, প্রবন্ধের বিষয়, "রবিবাবুর আধ্যাত্মিক আকাশ ও তাহার মানচিত্র!" সে সবিনয়ে জানাইল যে সে চেষ্টা করিবে। ভদ্রলোক তাহাকে একাকী রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

দামোদর গালে হাত দিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। "রবিবাবুর আধ্যাত্মিক আকাশ"-প্রবন্ধের বিষয়ীভূত ব্যাপারের কথা নহে; এই প্রবন্ধ যাহারা লিখিতে দিয়াছে তাহাদের কথা। সেই তরুণীটিকে সে ভাল করিয়া দেখে নাই; তা'র আসা ও উপস্থিতিই তাহার চৈতন্যে একটা মৃদুমন্দ আঘাত করিয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহাতেই সে বুঝিয়াছে ইহাদের ভিতর বৈচিত্র্য আছে। তাহার আফশোষ হইল, একবার কেন সে সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া দেখিল না। আবার তাহার সে কাগজের খণ্ডে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। "রবিবাবুর আধ্যাত্মিক আকাশ ও তাহার মানচিত্র!" তাই ত! বেশ শুনিতে ও পড়িতে বটে; কিন্তু কি লিখিবে সে? আকাশের মানচিত্র জ্যোতিষ ত? রবিবাবুর আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ? সে কি রকম? দামোদর বৈদ্যুতিক পাখা সত্ত্বেও ঘামিয়া উঠিল। যদি রমেশ কি নগেন কি শচীন এরা কেউ থাকিত, হয় ত ইহার কিছু নিশানা দিতে পারিত। রবিবাবুর কবিতাই সে পড়িয়াছে; গল্পগুচ্ছ, নৌকাডুবি, চোখের বালি পড়িয়াছে; সেই গুলিই সে বুঝিতে পারিত, তাহার সর্ব্বদাই ভাল লাগিত। শেষের দিকের কবিতাও সে বুঝিতে পারিত না, গল্পও বুঝিতে পারিত না। সেইজন্য সে সেগুলি পড়িতে পারে নাই। এখন সে কি করিবে? কোথায় সুরু করিবে? এদিকে ঘরের ঘড়িতে ১০৷৷০টা বাজিয়া প্রায় পৌনে এগার হইল। আর মাত্র ১৫ মিনিট বাকী। সে উঠিয়া চারি দিকের আলমারির ভিতরের বইগুলির নাম পড়িতে লাগিল। নানা দেশের নানা সাহিত্যের ও দর্শনের পুস্তক। হাঁ, সখ বটে; শুধু সখ্ নয়—বিদ্যাও বটে! কিন্তু যাহারা এত পড়ে, তাহারা এমন প্রশ্ন কি করিয়া ক'রে? হয় ত' ইহা কূট প্রশ্ন; খুব জ্ঞানের, বিজ্ঞানের, চিন্তার বিষয়। সত্যই ত, যাহারা পড়িয়াছে, বিদ্যা অর্জন করিয়াছে, তাহারা একটু কঠিন প্রশ্নের সমাধানেই আনন্দ পায়। ঐ তরুণীটি নিশ্চয়ই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে পূর্ণ; তাহা না হইলে এমন প্রশ্ন করা যায়? সে ঘড়ি দেখিল; ১১টা বাজিতে ৫ মিনিট, সে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। না, সে পারিবে না। চেষ্টা করিয়াও আর সে পারিবে না। ১১টা বাজিল; সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হয়েছে?"

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া, তাঁহার লিখিত কাগজখণ্ড তাঁহার হাতেই দিয়া বলিল, "কিছুই হয় নাই। আমি পার্লুম না; মাফ কর্ব্বেন। শুধু শুধু সময় নষ্ট ও আপনাদের বিরক্ত কর্লুম।" ভদ্রলোক কাগজখণ্ড না পড়িয়া ভাঁজ করিয়া বলিলেন, "না, না।" তা'রপর তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহিরের বর্ষাতি পর্য্যন্ত আগাইয়া দিলেন। দামোদর নমস্কার করিয়া দ্রুতপদে ফটকের দিকে চলিল,—এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! ফটকের বাহিরে

আসিয়া দেখিল, শচীন ও নগেন এক দিকে দাঁড়াইয়া; রমেশ আর এক দিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সকলেরই মুখে উদ্বেগ; কপাল কুঞ্চিত। তাহাকে দেখিয়া নগেন বলিল, "এসেছেন? পুলিসে খবর দেব কি না ভাব্‌ছিলুম। রমেশ শুধু রাজী নয় বলেই দিইনি। কি ব্যাপার? কি হয়েছিল?"

দামোদর বলিল, "চলুন। বল্‌ছি সব।"

রমেশ আসিয়া পৌঁছিলে, চা'র জনে আবার গৃহাভিমুখে ফিরিল। পথে ট্রামে দামোদর সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইল। রমেশ বলিল, "ওরা পাগল। ভদ্রলোকের নাম কি?"

নগেন কহিল, "এ আশ্চর্য্য বটে? অদ্ভুত!"

শচীন বলিল, "অদ্ভুত কি? রবিবাবুর আধ্যাত্মিক জগৎ যদি থাক্‌তে পারে, তা'র আকাশ থাক্‌তে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। আকাশ ছাড়া জগৎ কি করে হবে? আর আকাশ থাক্‌লেই তা'র মানচিত্র থাক্‌বে। খুব কূট প্রশ্ন; কিন্তু ইহাতে অদ্ভুতত্ব কিছু নেই।"

রমেশ উত্তর দিল, "যেমন তুই গাধা—এটাতে কোন অদ্ভুতত্ব নেই।"

শচীন বলিল, "কিন্তু, দামোদর বাবু, আপনি সেই অদ্ভুত মেয়েটিকে দেখ্‌লেন না? ছিঃ! আপনি কি? দাঁড়ান, কাল আমি যাবো দরখাস্ত নিয়ে; দেখে আস্‌বো।"

দামোদর তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "তা মন্দ হবে না, তৈরি হ'য়েও যেতে পার্ব্বেন। আধ্যাত্মিক আকাশের ম্যাপ্‌ চাই।"

চৌরঙ্গী পার হইয়া তাহারা কলেজ ষ্ট্রীটের ট্রাম ধরিল। নগেন বলিল, "একবার গোলদীঘির ধারে নাম্‌বো।" কেহই আপত্তি করিল না! শুধু শচীন একবার বলিল, "বড় ক্ষুধার উদ্রেক হচ্ছে।"

নগেন ধমক্‌ দিল, "বাড়ী গিয়ে খাবি।"

গোলদীঘির মোড়ে নামিতেই, দামোদর দেখিল, গোলদীঘির ধারে হিন্দু স্কুলের গায়ে এক জ্যোতিষী বসিয়া। সে তাড়াতাড়ি রমেশকে বলিল, "রমেশবাবু, আপনার যা' দরকার দোকানে সেরে আসুন, আমি ঐ জ্যোতিষীর কাছে যাই হাতটা দেখাতে।"

রমেশ উত্তর দিল, "ও'র কাছে? ও বেটা জ্যোতিষ বানান কর্ত্তে পারে?"

শচীন বলিল, "চল সবাই যাই। কাপড় পরে কেন হবে। বেলা যখন হয়েছে, তখন ভাল করেই হোক্‌।"

নগেন কহিল, "আর দরকার নেই অত পাকামোতে। হাতে তোর কি আছে শুণাতে যাবি। তোর কপালে বিধাতাপুরুষ যা' লিখে গেছে, তাই ভাঙা আর খা'। একপুরুষে শেষ হবে না।"

শচীন শুনিল না। সে ও দামোদর অগ্রসর হইল; বাধ্য হইয়া নগেন ও রমেশও তাহাদের অনুসরণ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"কপালে রাজতিলক রহিয়াছে"

চারজনে জ্যোতিষীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। জ্যোতিষী কপালে দীর্ঘ তিলক দিয়া, সম্মুখে এক পুরাতন, ছিন্ন, চিত্রিত জ্যোতিষের পুঁথি লইয়া আসন পাতিয়া বসিয়াছিল। তাহাদের চারজনকে নিমন্ত্রণ করিল, "আইয়ে, বাবু, আইয়ে।"

শচীন বলিল, "আইয়েছি, পণ্ডিতজী, কোথায় জ্যোতিষ পড়েছিলে? পাঠশালে না বড়বাজারে?"

পণ্ডিতজী যেন কিছু বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "কাশীতে বাবু, বারাণসীতে জ্যোতিষ পড়িয়েছিলুম। ভৃগুসংহিতা কার্য্যালয়ে।"

নগেন কহিল, "কার্য্যালয়ে? কম্পোজিটর ছিলে না কি? সংস্কৃত অক্ষর চেন?"

দামোদরের আগ্রহ ধৈর্য্য মানিতে ছিল না। সে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, পণ্ডিতজী, আমার হাতটা দেখুন ত?"

শচীন তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া সরাইয়া বলিল, "উহুঁ; আগে আমার! পণ্ডিতজী দেখ। হাত দেখ আর কপালও দেখ।"

পণ্ডিতজী মৃদু হাসিয়া তাহার হাত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "আপনার ভাগ্য খুব ভাল আছে, বাবু। আপনার বিস্তর রূপেয়া। আপনার কোনও দুখ্‌ নেই। খুব ভাল সাদী হবে। জমিদারকি লেড়কীর সাথে সাদি হবে। শীঘ্রই হবে। ১ সালের অন্দরে।"

শচীন বলিল, "বল 'ত, পণ্ডিতজী, আমার বি-এ শেষ হবে কি না। ফোর্থ ইয়ার ঘুচ্‌বে কি না জীবনে?"

পণ্ডিতজী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, "না। বাবুজি, তোমার পরীক্ষা শেষ হবে না। তা'তে দুখ্‌ নেই। তোমার জরুরত্‌ নেই।"

শচীন বলিল, "তাই ত! সবই প্রায় ঠিক বলেছ। দুঃখের বিষয় মিল্‌ছে না কিছু।"

নগেন তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল, "হয়েছে তো'র; এইবার আমি। পণ্ডিতজী, আমার হাত দেখ। ওর ত' চেহারা দেখে সব বলা যায়। আমার হাত দেখ।"

পণ্ডিতজী অবিচলিত ভাবে তাহার হস্তরেখা দেখিয়া বলিল, "না বাবুজি, কিছু বলা গেল না। এ রকম লেখা থেকে নিশ্চয় কিছু বলা যায় না। তবে আপনার জীবনে বহুত্‌ কষ্ট আছে। আপনার টাকা যা' আছে, তা' থাক্‌বে না। তখন আপনার বড় বিপদ, দুরবস্থা হবে।"

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "বল কি? টাকা আমার কবে ছিল? কোনদিনই ছিল না পণ্ডিতজি। সাদি হবে? না, তা'ও হবে না?"

পণ্ডিতজী আর একবার তাহার হস্তরেখা নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "হ'বে। সাদী হবে। সন্তান ভি হবে।"

নগেন বলিল, "ও সব ছাড়, পণ্ডিতজি। এখন ঠিক ঠিক কিছু শুনাও। কি হবে না হবে তুমিও যত জান আমিও তত জানি। আপাতত দু'টা এমন কিছু শুনাও যাতে বুঝি তোমার জ্যোতিষের জ্ঞান টন্‌টনে।"

পণ্ডিতজি হাত ছাড়িয়া দিল বলিল, "না, বাবু। আমি পার্‌ল্‌ম না। আপনার অতীতও বুঝা যায় না। তবে আপনার শনি প্রবল।"

নগেন হতাশ হইল। রমেশ বলিল, "ওর শনি নেই, পণ্ডিতজি; ওই শনি।" তা'র পর নগেনকে সরাইয়া দিয়া নিজে বসিল, বলিল, "বল ত পণ্ডিতজি, আমার ভাগ্যের কি খবর?"

পণ্ডিতজি রমেশের হাত ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আপনি ভাল ভাগ্য পাবেন। এখনই আপনার উপর ভাল দৃষ্টি আছে। পরে তাই থেকেই আপনার বহুত ফয়দা হবে। তবে একটু বিপদ আছে। নিজেকে যেমন সাম্‌লে চলেছেন চল্‌বেন। অনেকে এই রকম অপ্রত্যাশিত দৈবের দান পায়।"

রমেশ বেশ একটু যেন চঞ্চল হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "সাদি?"

পণ্ডিতজি ঈষৎ হাসিয়া তাহার পুঁথির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "সাদি? আপনার সাদি 'ত হয়ে গেছে, বাবুজি। আমাকে ছলনা করে লাভ কি আপনার?"

রমেশ উঠিয়া পড়িল। শচীন ও নগেন তখন তাহাদের নিজেদের ভাগ্যনির্ণয় নিয়ে তর্ক করিতেছিল। কেবল দামোদরই বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। রমেশ জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "দামোদর বাবু, আপনার হাতটা দেখান। আশ্চর্য্য জ্যোতিষের মন্ত্রণা একবার শুনুন।"

দামোদরের হাত দেখিয়া পণ্ডিতজি একটু যেন বিস্মিত হইল; তার পর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দামোদরের বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি পণ্ডিতজি, বল!"

পণ্ডিতজি মাথা নাড়িয়া সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "বাবুজি, তোমার কপালে রাজতিলক আছে।"

দামোদরের সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ দেখা দিল। সে সাগ্রহে বলিল, "ভাল করে দেখ পণ্ডিতজি! আমার কি অবস্থা তা' বল, আর কি হবে তা বল।"

পণ্ডিতজি বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার হাত দেখিল। শেষে বলিল, "বাবুজি, তুমি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছ। না? তোমার ঘরে তোমার স্ত্রী, মা, বাপ সব আছে। কেন? তা', যাই হোক্‌, তোমার কপালে রাজতিলক আছে।"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি আবার সাদি হবে পণ্ডিতজি?"

পণ্ডিতজি উত্তর দিল, "হোতে পারে। ঠিক বল্‌তে পার্‌ল্‌ম না। কিন্তু তোমার পিছনে ভয় আছে।"

দামোদর উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি?

পণ্ডিতজি বলিল, "তা' ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তোমার আগেকার স্ত্রীর সম্বন্ধে ভয় আছে।"

দামোদরের নিতাই ঘোষের কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। অসম্ভব নহে। নিতাই ঘোষ কি সহজে ছাড়িবে? সে জিজ্ঞাসা করিল, "সেটা কি সত্যি, পণ্ডিতজি?"

পণ্ডিতজি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "বল্‌তে পারি না। তবে সন্দেহ হয়। না হলে পরে সবই আপনার ভাল।"

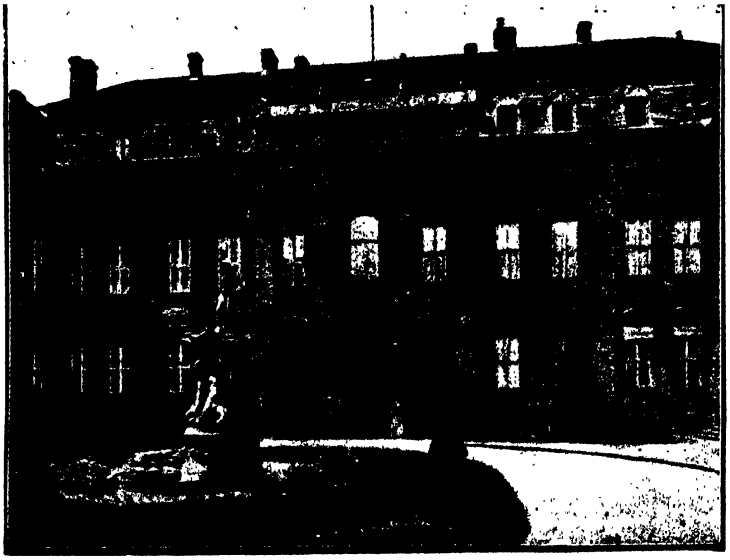
দামোদর উঠিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া পণ্ডিতজিকে দিল। তার পর চারজনে আবার দোকানের দিকে চলিল। নগেন ও শচীনের তর্ক থামিল না। কিন্তু রমেশ ও দামোদর দু'জনেই চিন্তাকুল চিত্তে চলিল। দামোদরের মনে হইল তবে তাহার আর সময় নষ্ট করা উচিত কার্য্য হইবে না। আজই সন্ধ্যার সময় সে আবার নারাণবাবুর বাড়ী যাইবে। অবশ্য বিবাহের বিষয় এখন কিছু বলা বা স্বীকার করা উচিত হইবে না। আগে দু'চারদিন নারাণবাবুর সহিত ঘুরিয়া সমস্ত বিষয়ে একটু পরিচিত হওয়া চাই। নারাণবাবুর সম্বন্ধে বাজারে ও সাধারণে কি ধারণা তাহার সন্ধান করা উচিত। তা'র পর বিবাহ করিলেই হইবে। একটু দেরী করাই ভাল; কেন না নিতাই ঘোষের কথা বলা যায় না। সেও কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া একটা গোলযোগ বাধাইতে পারে। রমেশ কি ভাবিতেছিল, তাহা সেই জানে। তাহার মনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য যেন জ্যোতিষী নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, শুধু এইটুকুই দামোদর বুঝিল, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য মনে করিল না। বিশেষতঃ তাহার নিজের ভাবনাতেই সে পূর্ণ ছিল।

(ক্রমশঃ)

বার্লিনে

ডাক্তার শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, ডি-এস্‌সি, এম্‌-বি, এম্‌-আর সি-পি

২রা মার্চ্চ ভোরে আটটায় জার্ম্মেণীর রাজধানী বার্লিনে এসে পৌঁছা গেল। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর মালগুলি আমার তত্ত্বাবধানে রেখে বন্ধুবর মুখুয্যে ছুটলেন ত্বরায় তাদের একটা বিহিত ব্যবস্থা কর্‌তে। সুবিশাল প্ল্যাটফর্ম্মের এক প্রান্তে লটবহরগুলির মাঝখানে, আমি বোধ হয় ততক্ষণ পণ্ডিত চাণক্যের মত শোভা পাচ্ছিলুম; কারণ, ভাষানভিজ্ঞতার জন্য কারো সঙ্গে একটিও বাক্যালাপ কর্‌বার উপায় ছিল না। বন্ধুবর একটু দেরী কর্চ্ছিলেন, আর তার জন্য মনে মনে চটে উঠ্‌ছিলুম তাঁর উপর; এম্নি সময় বন্ধু গম্ভীরমুখে বিড়্‌বিড়্‌ কর্ত্তে কর্ত্তে ফিরে এলেন। তাঁর মুখের ভাবখানা খুব আশাব্যঞ্জক নয় দেখে জিজ্ঞেস্‌ কল্লুম "কি হলো?"



রিশ্‌ প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ

বন্ধুবর উত্তর কল্লেন "অনেক কষ্টে "গ্যাপেক রোমে" (ক্লোক রুম) এর সন্ধান পাওয়া গেছে।"

আমি বল্লুম "তবেই তো হলো!"

বন্ধুবর মুখ বিকৃত করে বল্লেন "হ্যাঁ হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যাটাছেলেগুলি জ্বালিয়ে খেলে!"

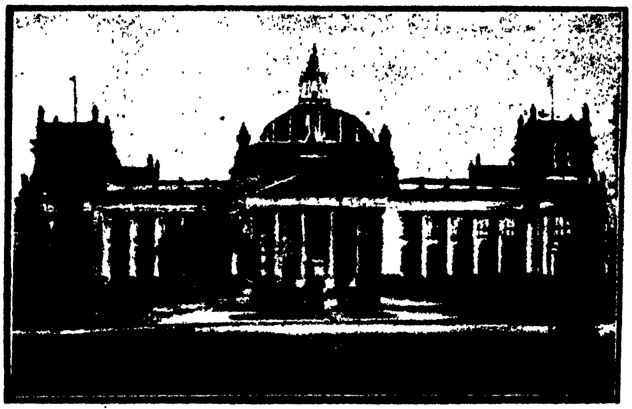
অনেক কষ্টে বার কয় প্রশ্ন করার পর বন্ধুবর

বল্লেন, তার সার মর্ম্ম এই—ষ্টেশনের কেরাণী—টিকেট্ কালেক্টর, পোর্টার—অনেককেই বিশুদ্ধ বইএর লেখা জার্ম্মেণ ভাষায় জিজ্ঞেস করে ক্লোক রুমের সন্ধান ও আমাদের গন্তব্য স্থল উলাণ্ড্ ষ্ট্রাসে যাবার পথের সংবাদ তিনি বের কর্ত্তে পারেন নি কারো মুখে! তখন অগত্যা ভাঙা ফ্রেঞ্চ ও পরে বিশুদ্ধ কথ্য ইংরেজীতে কথা বলেও তাদের বোঝাতে পারেন নি! দু' একজন তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছিল, দু একজন একটু মুখ টিপে হেসে মাথা নেড়েছিল! এতেও তিনি কিছু মনে করেন নি। শেষে কি না এক বেটা পোর্টার স্কন্ধদেশ সঙ্কুচিত করে, বিস্ফারিত নেত্রে, অস্বাভাবিক হস্ত ভঙ্গিমার দ্বারা তাঁর প্রশ্নের নির্ব্বাক জবাব দিলে! এতে কার না রাগ হয়!

সত্যি কথা! রাগ হয় বটে, কিন্তু রাগ করে লাভ নেই কিছু; বরং আমার একটু হাসিই পাচ্ছিল! ঠোঁট চেপে কোন রকমে তার বাইরের অভিব্যক্তিকে সংযত করে বল্লুম "চল তবে, ক্লোক্‌রুমে এগুলিকে রেখে, ষ্টেশন থেকে বেরোনো যাক্, তখন যা' হয় হবে।" চারখানা হাতই লটবহরের গুরুভারে, আজানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত করে আমরা ক্লোকরুমের উদ্দেশে রওয়ানা হলুম। বন্ধুবর তখনো রাগে গজ্‌গজ্ কর্ত্তে কর্ত্তে বলছিলেন "ব্যাটাছেলেরা না বুঝে ইংরেজী, না বুঝে ফ্রেঞ্চ, না বুঝে বিশুদ্ধ জার্ম্মেণ—একেবারে হস্তীমূর্খ নয় কি?"

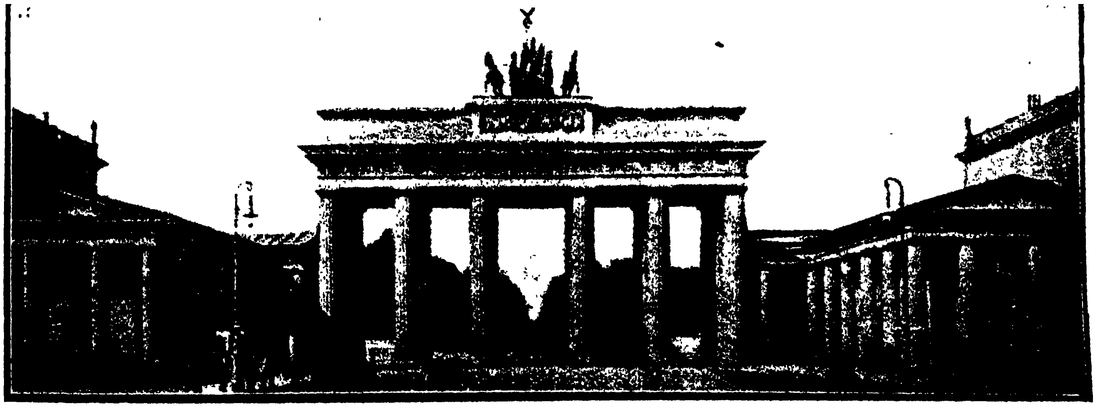
মুখে হাসি চেপে গম্ভীর ভাবে বল্লুম "তা, আর বলতে!"

মালপত্রগুলি ক্লোকরুমে রেখে, আমরা ষ্টেশন হতে বেরিয়ে এসে একটা প্রকাণ্ড চৌমাথায় পড়লুম! চৌমাথায় দাঁড়িয়ে, পৌনে সাত ফিট লম্বা ও তেম্নি চওড়া, পুলিশম্যান যেখানে রাস্তার চলাচল নিয়মিত ক'রে দিচ্ছে, তাই দেখতে পাওয়া গেল। চিরাচরিত রীতি অনুসারে, তার মাথার হেলমেটের উপর উঁচু শৃঙ্গটিই এ স্থলে হল আমাদের লক্ষ্য-স্থল! দুই বন্ধুতে তার কাছে পৌঁছে, হাত পা নেড়ে,



রিশ্‌ট্যাগ

দু একবার উলাণ্ড ষ্ট্রাসে, ও দু একবার প্যারিসের বন্ধু সেনগুপ্তের নির্দ্দেশমত "বানহফ্ জু," এবং মাঝে মাঝে বন্ধুবর তাদের পূর্ব্বে "নাখ্" লাগিয়ে, আরো দু একটা জার্ম্মেণ শব্দ সংযোজনের প্রয়াসের পর, পুলিশম্যান্—



ব্রেনডেন্‌বার্গ আর্ক

আমাদের অদূরস্থিত বাস্ ষ্ট্যাণ্ড দেখিয়ে, তর্জ্জনী নির্দ্দেশে এবং মুখে "আইন" উচ্চারণ করে বুঝিয়ে দিলে আমাদের এক নম্বর বাস ধর্ত্তে হবে! যাক্ বাঁচা গেল, তাকে "ডাংকে" জানিয়ে দুই বন্ধুতে গিয়ে বাসে চড়লুম! পয়সা

দেবার সময় বন্ধুবর বল্লেন "নাখ্ উলাণ্ড ষ্ট্রাসে।" ঠোঁট দুটি কুঞ্চিত করে মাথা নেড়ে বাস-চালক জানালে, না। তখন বন্ধুবর বল্লেন "বানহফ্ জু।" চালক সম্মতিসূচক শিরঃসঞ্চালন করে, দুখানা টিকেট দিয়ে চেঞ্জ ফিরিয়ে দিলে।



বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়

বাস্-চালক আমাদের জু ষ্টেশনের কাছে নামিয়ে দিলে, আমরা আবার অগতির গতি পুলিশম্যানের শরণাপন্ন হলুন। তখন প্রায় সাড়ে আটটা, কিন্তু বার্লিনের পথগুলি জনবিরল! তার উপর অল্প অল্প বরফ পড়ছিল। ফ্রান্স ও বেলজিয়মে শীত মোটেই ছিল না; কিন্তু জার্ম্মেণীতে প্রবেশের পর হতেই শীত বেশ লাগছিল! তাই ওভারকোটগুলির খোলা বুক, কাণ পর্য্যন্ত উঁচুতে তুলে, পকেটের মধ্যে হাত পুরে পুলিশম্যানের নির্দ্দেশমত আমরা বার্লিনের সুপ্রশস্ত রাজপথ দিয়ে চলছিলুম। পথগুলি যদিও প্যারিসের পথের মত সুন্দর নয়, তবু লণ্ডনের পথের চেয়ে অনেকটা খোলা, ও চওড়াও অনেক বেশী! আমরা খানিকক্ষণ এগিয়ে গিয়ে পুলিশম্যানের নির্দ্দেশ-মত বাঁয়ে ফিরে, উলাণ্ড ষ্ট্রাসে পেলুম, কিন্তু দু তিন মিনিট পরেই, বাড়ীর নম্বরগুলি দেখে বুঝতে পার্লুম আমরা উল্টো দিকে এসেছি! সুতরাং "এবাউট্ টার্ণ" করে আমরা উলাণ্ড ষ্ট্রাসের ডান দিকের ফুটপাথ ধরে চল্তে চল্তে প্রায় মিনিট দশ পরেই আমাদের গন্তব্য স্থল "হিন্দুস্থান এসোসিয়েশন" গৃহের দরজায় পৌঁছলুম। গন্তব্য স্থল পাওয়া গেল, কিন্তু দ্বার বন্ধ; বেলা তখন প্রায় ন'টা বাজে। সারারাত্রির ভ্রমণজনিত বেশ ক্ষিদেও পেয়েছিল, তাই বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়েই, কি করা যায় তাই দুই বন্ধুতে জল্পনা কল্পনা চলছিল! প্যারিসের বন্ধু মিঃ সেনগুপ্তের মুখে শুনেছিলুম, হিন্দুস্থান রেস্তোরাঁর মালিক মিঃ শোভানের সঙ্গে দেখা হলেই আমাদের সব বন্দোবস্ত ঠিক হবে! কিন্তু মিঃ শোভানের খোঁজ পাওয়া দূরে থাকুক, একজন লোকেরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না যাকে জিজ্ঞেস্ করা যায় কখন হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের দোর খুলবে, আর কখনই বা মিঃ শোভানের সঙ্গে দেখা হতে পারে! প্রায় আধ ঘণ্টা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে কাটিয়ে, অধীর ভাবে, আমি কড়া নাড়তে আরম্ভ কর্লুম, যদি বা তাতে কেউ সাড়া দেয়। যেদিকে চেয়ে কড়া নাড়ছিলুম সেদিক থেকে কেউ সাড়া দিলে না; প্রায় পাঁচ মিনিট পরে, উল্টোদিকের ফ্ল্যাট হতে একটি মহিলা বের হয়ে এলেন। কিন্তু তাতেও সুবিধা বিশেষ কিছু হলো না, কারণ, বন্ধু অনেক কষ্টেও তাঁর কথা বুঝতে পার্লেন না! শেষে আকারে ইঙ্গিতে, ঘড়ির দিকে দেখিয়ে মহিলাটি বুঝিয়ে দিলেন যে এগারোটার আগে হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের দোর খুলবে না। অগত্যা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা পথে বেরিয়ে পড়লুম।



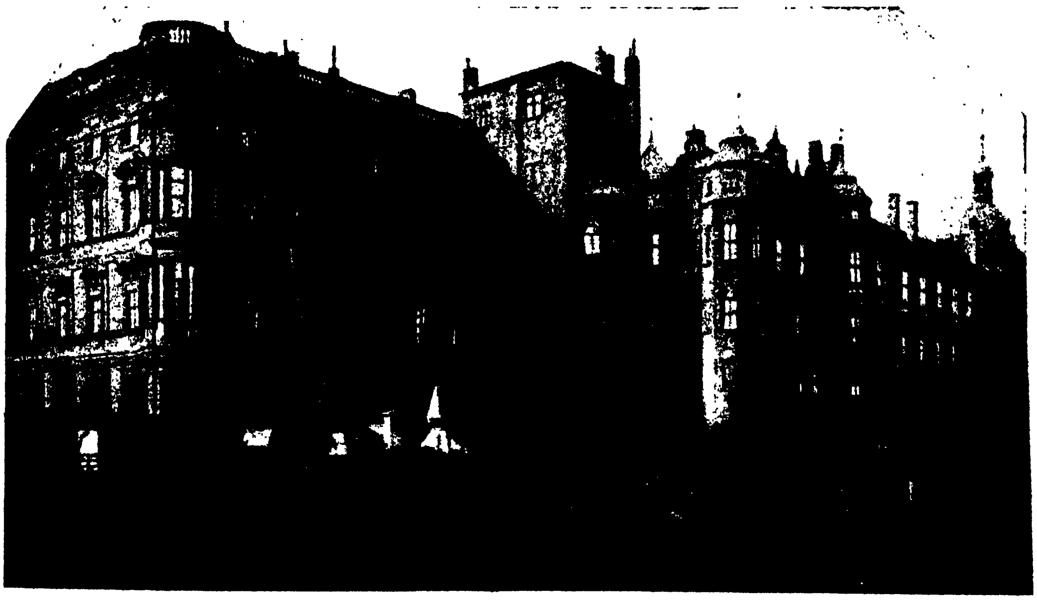
বার্লিনের নৈশ দৃশ্য (ফ্রিড্‌রিকষ্ট্রাসে ইউণ্টার ডেন্ লিন্‌ডেন

তখন আমাদের গন্তব্য স্থল হল, যে কোন রেস্তোরাঁ; কারণ, না খেলে আর চলছে না! খানিক দূর এগিয়ে যেতেই একটার সন্ধান পাওয়া গেল ও দুই বন্ধুতে ঢুকে

পড়ে, চিমনির কাছটা ঘেঁসে বসলুম, কারণ বাইরের শীতে হাত পা অসাড় হয়ে আস্‌ছিল, তার উপর বন্ধুবরের হাতে দস্তানা ছিল না। আমাদের কি চাই জানবার জন্ম ছুটে এলো একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে। তার পর আরম্ভ হল, বন্ধুতে ও তাতে অবাক্ চিত্রাভিনয়, ও মাঝে মাঝে সবাক্‌ও (গ্রীক্‌. আমার কাছে অন্ততঃ) বটে! মেয়েটি ত হেসেই খুন! বন্ধুবর যতই তাকে বোঝাতে চান্ ততই সে হাসে! স্পষ্টই বুঝতে পার্লুম, বন্ধুবর তাতে একটু রেগে উঠছেন। অবশেষে বন্ধু আগুনের কাছ ছেড়ে অনিচ্ছা সত্বেও



বার্লিনস্থ রাজপ্রাসাদ সম্মুখে প্রথম উইলহেলম ন্যাশান্যাল মনুমেণ্ট



রাজপ্রাসাদ ও স্প্রী নদী—বার্লিন

উঠে দোকানে গেলেন মেয়েটির সঙ্গে ও অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে কতকগুলি খাবার নিয়ে ফিরে এলেন! আড় চোখে দেখতে পেলুম মেয়েটি তখনো হেসে লুটোপুটি খাচ্চে!

যাক্, কোন রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে ও প্রায় আধ ঘণ্টা আগুনের কাছে বসে, দোকানওয়ালী মেয়েটিকে তার

জিনিষের দাম বুঝিয়ে দিয়ে, আমরা আবার পথে বেরিয়ে পড়লুম! মেয়েটিও আমাদের যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ দোরে দাঁড়িয়ে আমাদের পানে তাকিয়ে রইল,—কিন্তু তখন আর তার মুখে সে হাসি ছিল না! আমরা আবার ফিরে এলুম শোভান্ ভাইয়ের খোঁজে! কিন্তু দ্বার যেই রুদ্ধ সেই রুদ্ধ! এগারোটার পর সাড়ে এগারোটা বাজলো, তবু কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। তখন আমরা কি করা যায় তাই ভেবে বেরিয়ে এলুম, এবং পুলিশম্যানকে জিজ্ঞেস করে গিয়ে পৌঁছলুম, অগতির গতি বিদেশের বন্ধু কুক্ কোম্পানীর আড্ডায়। তাদের কাছে বার্লিনের দ্রষ্টব্য অনেক বিষয় জানতে পারা গেল, ও আড়াইটা হতে সেই সময় তাঁকে ভগবান্ প্রেরিত বলেই মনে হয়েছিল আমাদের। দুই বন্ধুতে, তাঁর বাড়ীতে গেলুম ও ঘর দেখে ভাড়া ঠিক করে, যতদূর সম্ভব সত্বর, প্রাতঃকৃত্য (যদিও তখন বেলা বারোটা) শেষ করে, তাঁকে জিজ্ঞেস কর্লুম ষ্টেশনে শীগ্‌গির যাওয়া যায় কোন্ পথে, কারণ, মালপত্র-গুলি আনতে হবে! তাঁর কথামত আমরা "টিউবে" চড়েই রওয়ানা হলুম, 'ফ্রেডিরিক্ বানহফের' উদ্দেশে! গন্তব্য স্থলে নামলুম বটে যথাসময়ে, কিন্তু তার পরেই হল বিপদ্। রেলওয়ে ষ্টেশনে যাবার পথ জানি না, যাকে জিজ্ঞেস করি, হয় আমাদের কথা বুঝে না, না হয় আমরা তাদের কথা বুঝি না, অথবা কেউ জিজ্ঞেস করে "কোন



বার্লিন—রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষ

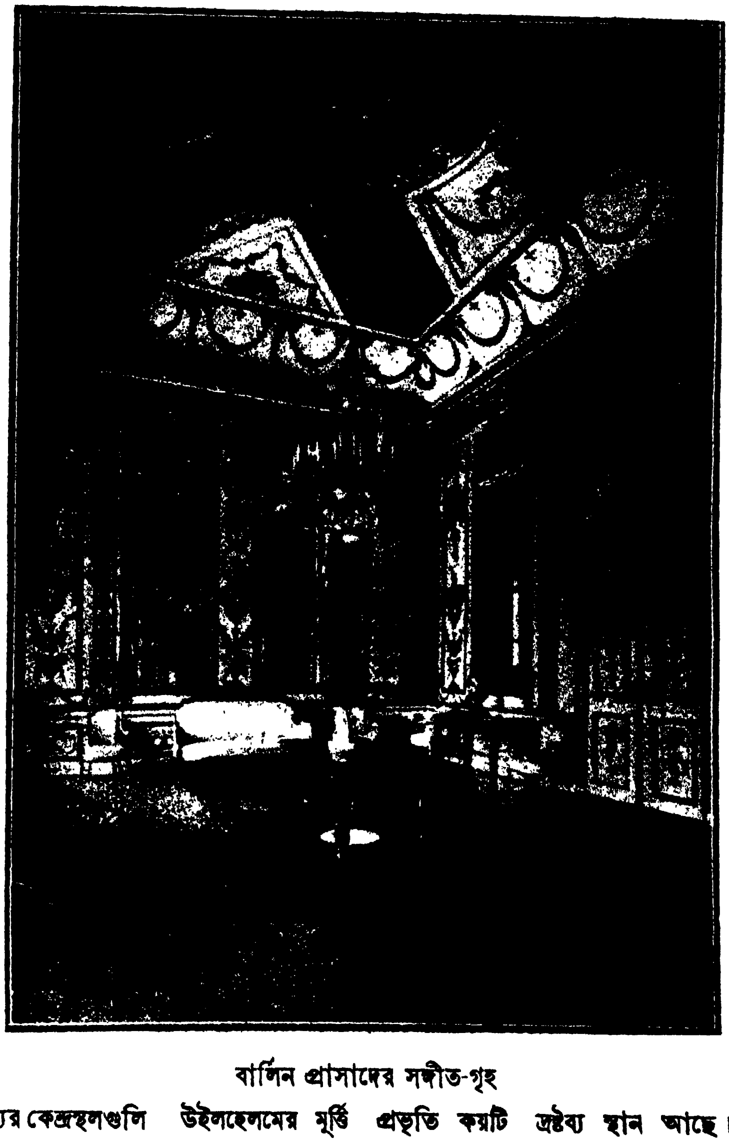
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, বার্লিন নগরীর সাধারণ দৃশ্য দেখার বন্দোবস্ত করে আবার ফিরে এলুম হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের বন্ধ দ্বারে! এবার ভাগ্যক্রমে সেখানেই একজন মহিলার সঙ্গে দেখা হলো, তাঁর নাম "বোজেন বোম্"। তিনি ভাঙ্গা ইংরেজীতে জিজ্ঞেস কর্লেন আমরা নূতন এসেছি বলে মনে হচ্চে। থাকবার স্থান চাই কি না; হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনে কেউ নূতন এলে তাঁর বাড়ীতেই তাঁরা স্থান ঠিক করে দেন ইত্যাদি! বাড়ীও দূরে নয়, একটি বাড়ী পরেই!

ষ্টেশন," আমরা বলি "রেলওয়ে ষ্টেশন"। তার উত্তরে মাথা নেড়ে চলে যায়! এদিক, সেদিক, এপথে, ওপথে, একে জিজ্ঞেস্ করে, তাকে জিজ্ঞেস করে, এমন কি পুলিশম্যান্‌কে পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস করে বিফল-মনোরথ হয়ে বোকার মত প্রায় এক ঘণ্টা নষ্ট করে আমরা শেষে বুদ্ধিমানের মত ফ্রেডরিক বানহফে গিয়ে আবার 'বানহফ্‌জুর' উদ্দেশে টিউবে চড়লুম; উদ্দেশ্য আবার ওখানে গিয়ে তবে 'আইন' নম্বর' বাস চড়লে যদি ষ্টেশনের উদ্দেশ পাওয়া যায়। যথা চিন্তিতম্ তথা কৃতম্; তবে গিয়ে পৌঁছলুম, রেলওয়ে

ষ্টেশনে; দেখলুম বড় বড় করে লেখা আছে "Potsdam।" অথচ এই নামটুকু বলতে না পারার দরুণই, বেশী দূরে নয়, কাছেই প্রায় এক ঘণ্টা ঘুরতে হয়েছিল আমাদের! এরি নাম দুর্দ্দৈব!

যাক্ ক্লোকরুমের হেপাজত হতে লটবহরগুলি উদ্ধার করে, আবার ফিরলুম "পেন্‌শন্ বোজেন বর্মে"র গৃহে! আমাদের সেদিনের এ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথা কারো কাছে বলিনি, লোকের কাছে বোকা হবার ভয়ে। কিন্তু নিজকে ত ফাঁকি দেওয়া যায় না, বোকা যে হয়েছিলাম, সেটা ঠিক! এর পর যখন হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনে পৌঁছলুম, তখন চিরবদ্ধ দ্বারের অর্গল খুলে গেছে! সেখানে কজন পূর্ব্ব-পরিচিত, ও অপরিচিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা ও পরিচয় হ'ল। কথাবার্ত্তার মধ্যে সেখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন রূপ অত্যাবশ্যকীয় কাজটি শেষ করে আমরা বের হলুম বার্লিন সহরের সাধারণ দৃশ্য দেখতে!

প্রায় আড়াইটার সময় উন্‌টার্ ডেন লিনডেন, ফ্রিডরিক্ ষ্ট্রাসের মোড় হতে আমাদের বাস ছাড়লে, এবং উইলহেলম্ ষ্ট্রাসের মাঝে দিয়ে চলতে আরম্ভ কল্লে। এ অঞ্চলেই বার্লিনের সরকারী দপ্তরখানাগুলি এবং রিশ্‌এর প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সেলারের প্রাসাদ অবস্থিত। অতঃপর আমরা প্রিন্স্ এলবার্ট ষ্ট্রাসে হয়ে এথ্‌নোলোজিকেল মিউজিয়মের পাশ দিয়ে পট্‌স্‌ডামের প্ল্যাপ্, লিপ্‌জিগ্ ষ্ট্রাসে, ফ্রিড্‌রিক এবং মারগ্রাটেন্ ষ্ট্রাসে প্রভৃতি, বার্লিনের জগদ্বিখ্যাত ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলগুলি অতিক্রম করে গেলুম। সেখান হতে ষ্টেট্ অপেরার কাছ দিয়ে, রাজপ্রাসাদ ও প্রথম উইলহেলমের ন্যাশনেল মনুমেণ্ট ছাড়িয়ে, শ্লশ্ প্ল্যাজে নেপ্‌চুন্ ফোয়ারা দেখে, ব্রিট্‌ষ্ট্রাসের মধ্য দিয়ে, বার্লিনের পুরাতন অংশের মধ্যে প্রবেশ করলুম। এখানে অনেকগুলি পুরাতন রাস্তা একে একে পার হয়ে, আমরা সহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছলুম! এখানেই বার্লিনের দুটি সুপ্রসিদ্ধ টাউন-হল অবস্থিত। তার পর কোনিগ্‌ষ্ট্রাসের মধ্য দিয়ে, নূতন বাজার ও বিখ্যাত লুথার মনুমেণ্ট দেখে আমরা লুষ্ট্‌গার্টেনে পৌঁছলুম। এ স্থানে কেথিড্রেল, পুরাতন মিউজিয়ম ও তৃতীয় ফেড্‌রিক উইলহেলমের মূর্ত্তি প্রভৃতি কয়টি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। তার পর আমরা মিউজিয়ম ষ্ট্রাসে দিয়ে চলতে আরম্ভ কর্লে, হাতের ডান দিকে ন্যাশনেল গ্যালারি, নূতন মিউজিয়ম, ডিউট্‌স্ ও কাইজার ফ্রেড্‌রিক মিউজিয়ম দেখতে পেলুম। শেষোক্ত মিউজিয়মটির প্রকাণ্ড গম্বুজটি



বার্লিন প্রাসাদের সঙ্গীত-গৃহ

অনেক দূর হতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখান হতে আমরা আবার উন্টার ডেন্ লিন্ডেনে পড়ে এক মোড় হতে অন্য মোড় পর্য্যন্ত আগাগোড়া দেখে গেলুম; এবং কনসার্ট একাডেমি, বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রেড্‌রিক দিদ গ্রেটের মূর্ত্তি, ষ্টেট্ লাইব্রেরী ও হোম অফিস্ প্রভৃতি দেখতে পেলুম। উন্টার ডেন লিন্ডেনের এক প্রান্তে, ফরাসী দূতাবাস ও আর্ট স্কুল অবস্থিত। এর পর আমরা ব্রেন্ডেন্‌বার্গ আর্কের নীচে দিয়ে টায়ারগার্টেনএ পৌছলুম। আর্কের উপরে বিজয় রথের জয়যাত্রার মূর্ত্তিটি অতীব জীবন্ত বলে মনে হয়। টায়ার গার্টেন পুরাকালে মৃগয়ার স্থান ছিল, এবং বর্ত্তমানে প্রকৃতির বিজন বিপিন বলে পরিচিত। এখানে প্রত্যহ অসংখ্য কর্ম্মক্লান্ত লোক, প্রমোদোপনোদনের জন্য ছুটে আসে। ব্রেন্ডেনবার্গ আর্ক পার হয়েই সিগাসেলি অথবা এভিনিউ অব্ ভিক্টরি অবস্থিত! ভূতপূর্ব্ব কাইজার ইহা নির্ম্মাণ করেন। বার্লিন নগরীতে, এটা যুগযুগান্তর ধরে তাঁর একটা শ্রেষ্ঠ দানরূপে পরিগণিত হবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। রাস্তার দু' পাশে শ্রেষ্ঠ শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বত্রিশটি মর্ম্মরমূর্ত্তি আছে।

তার মধ্যে সম্রাটের নিজের মূর্ত্তি ও তৎপশ্চাতে সমসাময়িক দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিকৃতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক কথায় বলতে গেলে, এই মূর্ত্তিগুলির মাঝেই যেন সমস্ত ব্রেন্ডেন্‌বার্গ-প্রুশিয়ার ইতিহাস মর্ম্মর-অক্ষরে লিখিত আছে।

অতঃপর আমরা গিয়ে পৌছলুম রিপাব্‌লিক প্লাজে! এখানের জয়স্তম্ভটি উল্লেখযোগ্য! ইহা প্রায় দুহাজার ফিট্ উঁচু, এবং ১৮৬৪, ১৮৬৬ ও ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে প্রুশিয়ার বিজয় যাত্রার স্মৃতিস্তম্ভরূপে নির্ম্মিত হয় ও ১৮৭৩ ইংরেজীতে এর আবরণ উন্মোচিত হয়। এরই ডান দিকে জার্ম্মেণীর হাউস্ অব পার্লামেণ্ট অথবা রিশ্‌ট্যাগ্ অবস্থিত। ইহার নির্ম্মাণ ১৮৮৪ ইংরেজীতে আরম্ভ হয়ে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। রিশ্‌ট্যাগের সম্মুখেই, বিখ্যাত রাজনীতিক প্রিন্স্ বিসমার্কের মূর্ত্তি! স্কোয়ারের উত্তরে ক্রূপ্ ও পশ্চিমে মুলট্‌কি মনুমেণ্ট ও তৎপশ্চাৎ ক্রোল্ নামক অপেরা অবস্থিত! সেখান হতে ইন্‌ডেন্ জেলটেন্ রাস্তা হয়ে আমরা স্প্রী নদীর তীরে তীরে চারটি স্মৃতিস্তম্ভ সম্বলিত গ্রোসার ষ্টার্ণে পৌছলুম। এখানে



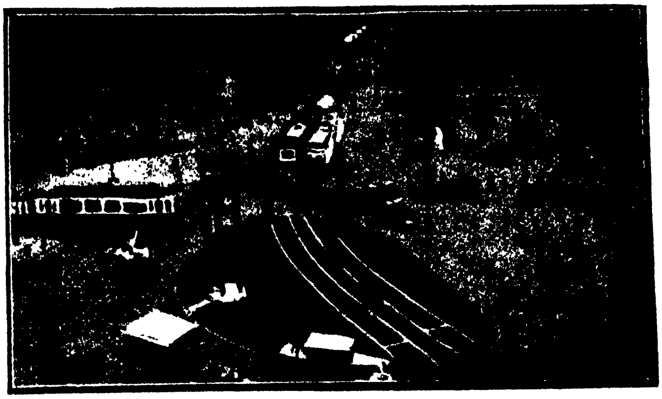
বার্লিন প্রাসাদের সিংহাসন-গৃহ

একটি সুদৃশ্য ফোয়ারা আছে। এগুলির সব কটিই ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মেণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেলম্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়েছিল। অতঃপর আমরা আবার টায়ার গার্টেনের



বার্লিন প্রাসাদে চিত্রপূর্ণ দেয়াল

মধ্য দিয়ে শার্লোটেনবার্গ পুলের উপর দিয়ে, শার্লোটেনবার্গে পৌছলুম। এই পুলের উভয় পার্শে, প্রথম ফ্রেডেরিক ও তাঁহার রাণী সোফি শার্লটের দুইটি ব্রোন্জ্ মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সেখানে বার্লিনার ষ্ট্রাসে দিয়ে যেতে যেতে, আমরা ডান দিকে শার্লোটেনবার্গ টাউনহল দেখতে পেলুম ও সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডেরিকের মনুমেণ্ট সংযুক্ত লুইসেন প্ল্যাজ্ নাম স্কোয়ারে পৌছলুম। স্কোয়ারের পশ্চাতেই শার্লোটেনবার্গ প্রাসাদ। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে রাণী সোফি শার্লট এখানে থাকতেন এবং পরে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডেরিকের একোনশত দিনের স্বল্পায়ু রাজত্বকালে, ইহা সম্রাটের আবাসস্থল ছিল। পরে এখানেই রাজমাতা ভিক্টোরিয়া থাকতেন! প্রাসাদের সংলগ্ন পার্কে মুসোলিয়ম্ অবস্থিত। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয় এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে একে অনেকটা বাড়ানো হয়। এখানে রাজা তৃতীয় ফ্রেডেরিক ও তাঁর রাণী লুইস্, এবং সম্রাট প্রথম উইল্হেলম ও সম্রাজ্ঞী আগাষ্টার সমাধি আছে! এখানকার মর্ম্মর-নির্ম্মিত সমাধিস্থানগুলি বাস্তবিকই অতি চমৎকার!

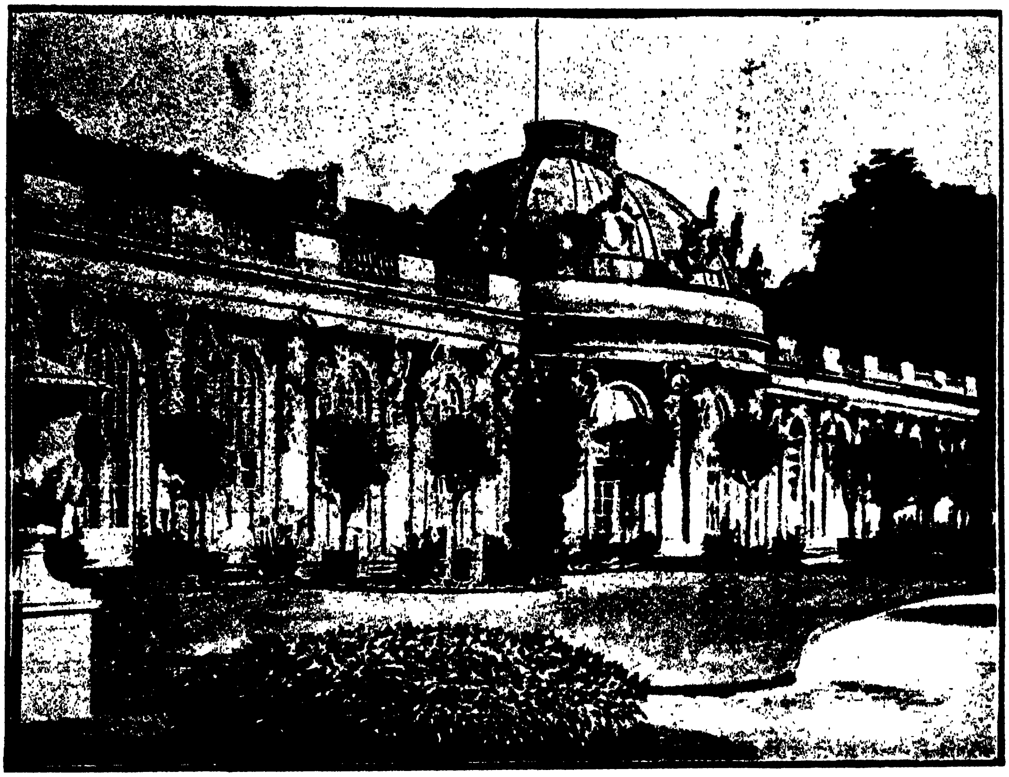


পট্স্ডাম প্লাজ

এর পরে স্প্রশ্ ষ্ট্রাসে, কাইজারড্যাম্ ও হির ষ্ট্রাসে হয়ে আমরা বার্লিনের প্রদর্শনী কেন্দ্রে (Exhibition centre)

পৌছলুম। এ স্থানটি অতি আধুনিক এবং সম্প্রতি নির্ম্মিত হয়েছে! এখানে আটটি সুবিশাল কক্ষ আছে এবং বেতারবার্ত্তা প্রচারের টাওয়ার অবস্থিত। ইহা প্রায় সাড়ে চারশো ফিট্ উঁচু এবং গাইডের মুখে শুনলুম এর উপর হতে না কি সমস্ত বার্লিন সহরটিকে চমৎকার দেখায়! অতঃপর আমরা লিট্জেন্সি নামক একটি হ্রদের পাশ দিয়ে কোনিগস্উয়েগ্ পার হয়ে বিসমার্ক ষ্ট্রাসেতে পৌছলুম ও অল্পক্ষণের মধ্যেই বার্লিনের সুপ্রসিদ্ধ উন্টার ডেল্ লিনডেন্ হয়ে আমাদের রওয়ানা হওয়ার স্থানে আবার ফিরে এলুম!

যা' মনে হল, তাতে ধারণা করতে পার্লু'ম, বার্লিন যদিও প্যারিসের মত জাঁকজমক ও সৌন্দর্য্যের দাবা রাখে না, তবু তার একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য আছে! যদিও দ্বাদশ শতাব্দীতেই বার্লিনের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, তবু নব প্রুশিয়ার রাজধানীরূপে ছ'শো বছর পরে, ফ্রেডেরিক প্রথম উইলিয়াম ও ফ্রেডেরিক দি গ্রেটের রাজত্ব সময়েই বার্লিন প্রথম খ্যাতিলাভ করে! অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বার্লিনের লোকসংখ্যা ছিল, দেড় লক্ষ। উনবিংশ শতাব্দীতে একশো বছরেও আট লক্ষ ছিল তার সংখ্যা!

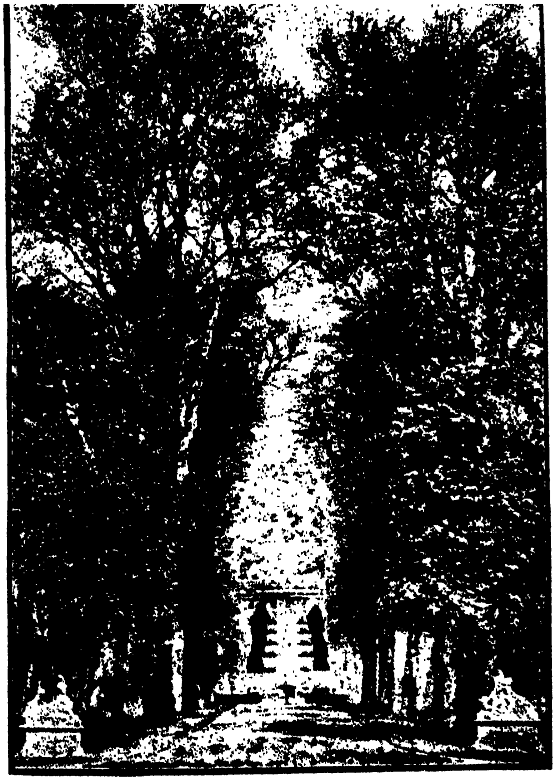


সেনসাউসি প্রাসাদ—পটস্ডাম

একে ত আগের রাত্রির, ভ্রমণজনিত ক্লান্তি, তৎপর অকারণে ষ্টেশন হতে ষ্টেশনান্তরে শুরু প্রাতভ্র'মণ; তার উপর একদিনে সমস্ত বার্লিন ভ্রমণ! সুতরাং যখন বাস্ হতে নামলুম তখন আমাদের অবস্থা ঠিক, জনসমাকীর্ণ সিনেমা হলে, সারাদিন সিরিয়েল, সমগ্র একখানা ছবি দেখে বাইরে এলে, অবস্থা যেমন হয় ঠিক তেমি! বায়োস্কোপের ছবির মত একটির পর একটি, কত ছবি ভোঁ ভোঁ করে চলে গেছে, "পিবন্তইব চক্ষুভিঃ" দেখেছি, কিন্তু তাতে

কিন্তু মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বার্লিন এত খ্যাতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে যে—তার লোক সংখ্যা আট লক্ষ হতে তেতাল্লিশ লক্ষে দাঁড়ায় ও বার্লিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরীদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করে! যদিও আমাদের অভিজ্ঞতা অতি অল্প সময়ের, তবু আমাদের মনে হ'ল, এমন দিনও আসতে পারে, যেদিন ধনে, জনে ও সমৃদ্ধিতে বার্লিন হয় ত—তার চেয়ে শ্রেয়ঃ অপর তিনটি নগরীকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে!

সে রাত্রিতে আমাদের বেড়োবার মত মনের অথবা শরীরের অবস্থা ছিল না। হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনে, দিব্যি ডাল, ভাত, মাছের ঝোল প্রভৃতি, বিদেশ বিভুঁয়ে আয়াস-লভ্য দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যযোগে আহার শেষ করা গেল! তার পর পূর্ব্ব ও সদ্যঃ-পরিচিত বার্লিনবাসী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প-গুজব করা গেল অনেকক্ষণ! তাদের মধ্যে দু'চারজন ভাগ্য বিড়ম্বনায় স্বদেশের ক্রোড় হতে নির্ব্বাসিত হয়ে বার্লিনে নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন কচ্ছেন! তাঁদের মুখে, সে দেশ, লোকজন, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ



সেনসাউসি পার্ক, দূরে প্রাসাদ

পাওয়া গেল! বন্ধুবর জার্ম্মেণ জাতির সাধাসিধে ও বিলাসবিহীন অথচ শ্রমসহিষ্ণু জীবনের কথা জিজ্ঞাসা কর্লে, তত্রত্য জনৈক বন্ধু বল্লেন, জার্ম্মেণীর সম্বন্ধে বাস্তবিকই ও কথাগুলি খাটে! তবে বেচারারা যুদ্ধের গুরু ঋণের ভারে একেবারে মুষড়ে পড়েছে। তবু এত অল্প সময়ের মধ্যে যা' উন্নতি এদেরহয়েছেতা' বাস্তবিকই বিস্ময়কর! ব্যবসা-বাণিজ্য, কি শিল্প-বিজ্ঞানে এরা এতদূর এগিয়েছে যে, অন্য যে কোন জাতির সে স্থানে পৌছাতে আরো পঞ্চাশ বছর লাগবে। কথাটা যে খুবই সত্যি, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না; কারণ, এডিনবরায়, একটা প্রকাণ্ড বেল্-জার (Bell-Jar) হঠাৎ ভেঙ্গে গেলে, লেবরেটরী বয়কে তা' কিনে এনে রাখতে বল্লুম। সে হেসে বল্লে তার জন্য এক মাস সময় দরকার; কারণ, জার্ম্মেণী হতে না এলে, ওর স্থান শূন্যই থাকবে! তা' ছাড়া বিলাতে দেখেছি নিত্য-



প্রিয় কুকুরসহ সম্রাট—ফ্রেডেরিক দি গ্রেট

ব্যবহার্য্য অনেক দ্রব্য যেমন, সুঁচ, কাঁটা প্রভৃতি, সবই জার্ম্মেণীতে প্রস্তুত! আর ঔষধপত্রের ত' কথাই নেই। বন্ধু আরো বলছিলেন, কিন্তু দুঃখের কথা—আধুনিক সভ্যতা ও বিলাসের ঢেউও এ দেশে এসে লেগেছে! তার প্রমাণ পাওয়া যায় ডাই

ভেরাইটি, বু'ন প্রভৃতি সঙ্গীতগৃহ, ও সিনেমা ও নৃত্যগৃহগুলিতে! এদের কোন কোন নৃত্যগৃহে না কি দর্শকদের মধ্যে টেলিফোন ও অটোমেটিক চিঠি পাঠাবার বন্দোবস্ত আছে! পরিচিত কি অপরিচিত যে কেউ, পরিচিতা কি অপরিচিতা যে কোন কিশোরী অথবা যুবতীকে, নৃত্যসঙ্গিনীরূপে প্রার্থনা করেন, অথবা তাদের কাছে প্রেম নিবেদন করেন, তারের মারফতে বার্তা ও পত্র পাঠিয়ে! ইত্যাদি ইত্যাদি! আধুনিকতার লীলানিকেতন, প্রেক্ষা অথবা নৃত্যগৃহে হয় ত এম্নি হতে পারে, কিন্তু ফরাসী দেশের হাটে,



ভলটেয়ার কক্ষ—সেনসাউসী প্রাসাদ

ঘাটে, মাঠে, অথবা ইংলণ্ডের নানা স্থানে যেমন বিলাস ও ব্যসনের অবাধ স্রোত বইতে দেখেছি, আমাদের স্বল্প অভিজ্ঞতায় জার্ম্মেণীতে তেমনটি দেখতে পাই নি, এই অন্ততঃ আমার মনের দৃঢ় ধারণা!

রাত্রিতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিশেষ কিছু নেই, শুধু রাত সাড়ে এগারোটায়, চাবী খুলে প্রথমতঃ বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে ও দ্বিতীয়তঃ ফ্ল্যাটে ঢুকবার সময় যা নাকালের শেষ হতে হয়েছিল, সেটা ছাড়া! অন্ধকারের মধ্যে কিছুতেই চাবী দিয়ে দরজা খোলে না; পকেটের দেশলাইর সব কটি কাঠি পুড়ে গিয়ে হাতে ধর্লো, তবু রুদ্ধ দ্বার খোলে না! বন্ধুবর ত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন! শেষে শেষবারের মত চেষ্টা করতে গিয়ে—একবার নয় দু'দুবারই—কোন রকমে দোর খুললো! দুপুর রাতে চোর বলে যে পুলিশের হাতে পড়তে হয় নি সেই ভাগ্যি! যাক্, তার পর সারা দিনের পরিশ্রান্ত দেহটাকে "শয়নে পদ্মনাভঞ্চ"র হাতে ছেড়ে দিয়ে কখন যে নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়েছিলুম তা' নিজেই জানি না।

পরদিন ভোরে প্রায় নটায়, বাড়ীতেই প্রাতরাশ শেষ করে, বের হওয়া গেল বাজারে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেখবার জন্য! তখন দোকানপাটগুলি সব খুলে নাই; তাই কতক কতক দেখে ট্রামে চড়ে গেলুম শ্লশ্ মিউজিয়ম দেখতে! এটি শ্লশ্ প্লাজে অবস্থিত এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব কাইজারের বার্লিনস্থ প্রাসাদ ছিল! তখন বোধ হয় কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি, যে অত অল্প সময়ের মধ্যেই তা' মিউজিয়মরূপে, সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য হয়ে উঠ্‌বে! উয়োরোপের সব দেশেই রাজপ্রাসাদগুলির পরিণতি হয়েছে যাদুঘরে। যে যে দেশ হতে, রাজতন্ত্র নির্ব্বাসিত হয়ে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সব স্থানেই প্রাসাদগুলির মধ্যে মিউজিয়ম স্থাপিত হয়েছে। প্যারিসের পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মিউজিয়ম, লুভ্‌ও এক কালে রাজপ্রাসাদ ছিল। চতুর্দ্দশ লুইর লীলা-নিকেতন ভার্সেল প্রাসাদও এখন সাধারণের দ্রষ্টব্য স্থান! ভিয়েনায়ও সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফের প্রাসাদের ভাগ্যে একই পরিণতি ঘটেছে। শুনেছি সেন্ট পিটার্স‌্বার্গে (বর্ত্তমান লেনিনগ্রেড) জারের প্রাসাদও সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বলে পরিগণিত! এমন কি স্কটল্যাণ্ডের মেরী কুইন অব স্কটের বাসস্থান হলিরুড্ প্রাসাদ পর্য্যন্ত এ ভাগ্য এড়াতে পারে নি! সুতরাং ভূতপূর্ব্ব কাইজারের বার্লিনস্থ রাজপ্রাসাদ, এবং শার্লোটেনবার্গ প্রাসাদ প্রভৃতিও বর্ত্তমানে মিউজিয়মরূপেই পরিবর্ত্তিত হয়েছে! এই সুবিশাল প্রাসাদটির বাইরে

চেহারা দেখে মনে হয় না, এক কালে, বেশী দিন আগে নয়, পোনর বছর আগেই ইহা প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট কাইজারের আবাসগৃহ ছিল! সমস্ত প্রাসাদটিই যেন কেমনতর একটা বিষণ্ণভাব মাখানো; দেখে মনে হয়, যেন যুদ্ধের পর, কেউ একদিনের জন্যও ওর সংস্কারে হাত দেয় নি, অথবা পুরাতন ঐশ্বর্য্য ও জাঁকজমকের দিন হারিয়ে, দেশদেশান্তর হতে আগত অসংখ্য দর্শকের কাছে বিমর্ষভাবে যেন বলছে "দেখ কি ছিলুম, আর কি হয়েছি!"

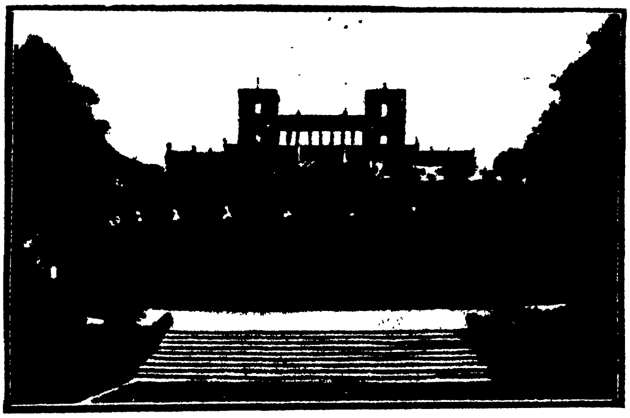
প্রাসাদের সম্মুখে সম্রাট প্রথম উইলহেল্‌মের ন্যাশনাল মনুমেণ্ট! সু-উচ্চ বেদীর উপরে সম্রাটের যোদ্ধবেশে অশ্বারোহণের প্রতিমূর্ত্তি! বেদীর চারি দিকে অনেকগুলি দেবদূত ও দেবকন্যার মূর্ত্তি! তারা যেন সমস্বরে—জার্ম্মেণীর নব অভ্যুদয়ের গাথা প্রচার কর্চ্ছে! চারি দিকে চারিটি সিংহের প্রতিমূর্ত্তি—জার্ম্মেণ জাতির সিংহ-বিক্রমের প্রতীক-রূপেই যেন নির্ম্মিত হয়েছে! রাজপ্রাসাদটির নীচে দিয়েই, ক্ষীণকায়া স্প্রী নদী ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে! স্প্রী নদী হলেও আমাদের দেশের তুলনায় নদী নামের সম্পূর্ণ অনুপ-



এরোপ্লেন হইতে নূতন প্রাসাদের দৃশ্য

যুক্ত; আমার মনে হল মারাঠা খাতের মতনই! অথচ এই নদী বার্লিনে অবস্থিত বলেই তার এত নাম! শুনেছি প্রাসাদের নীচে প্রবহমানা ক্ষীণকায়া স্প্রা নদী ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মেণ সম্রাটের অতীব প্রিয় ছিল! প্রাসাদের দ্বিতল ও ত্রিতলের কক্ষগুলি হতে, স্প্রী নদীকে বাস্তবিকই খুব সুন্দর দেখায়!

ভূতপূর্ব্ব কাইজারের খাস কক্ষগুলি, আগে যেমন সজ্জিত ছিল, এখনও তেমি সজ্জিত রাখা হয়েছে। কক্ষ-

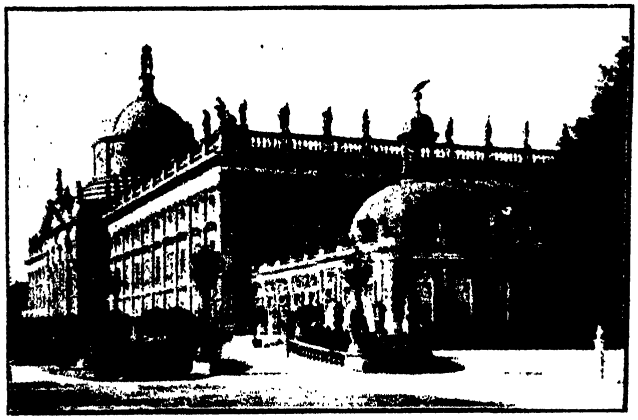


ওরেন্‌জেরি

গুলির সজ্জা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব! কোন কোন কক্ষে, জার্ম্মেণ জাতির নানা যুদ্ধে বিজয় লাভের সুবৃহৎ চিত্রগুলি দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত আছে; আবার কোন কোন হলে প্রুশিয়ার রাজাদের এবং পরবর্ত্তী জার্ম্মেণ সম্রাটগণের প্রকাণ্ড তৈলচিত্রগুলি সযত্নে রক্ষিত আছে! ভূতপূর্ব্ব কাইজারের যোদ্ধ-বেশে চিত্রই অনেকগুলি আছে! তা' দেখে মনে হয়, সম্রাট একজন তীক্ষ্ণধী, আত্ম-নির্ভর, যুদ্ধকুশল ব্যক্তি ছিলেন! জার্ম্মেণ বাহিনীর নায়করূপে, অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার যে প্রতিকৃতি আছে, তাহা বাস্তবিকই অতি চমৎকার! কী উন্নতবক্ষ, কী বীরত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী, এবং কী অদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন তাঁর তীক্ষ্ণ নয়ন-জ্যোতিঃ! জন্মাবধি তাঁর একখানি হাত অকর্ম্মণ্য ছিল; তা সত্ত্বেও যুদ্ধবিদ্যায় ও সেনা-পরিচালনায় তিনি এতটা পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। তা' ছাড়া সম্রাট ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেট, প্রথম উইলহেলম্, ফ্রেডেরিক্ উইলহেল্‌ম প্রভৃতি সম্রাটগণের প্রতিকৃতিগুলি সযত্নে দেওয়ালের গায়ে রক্ষিত আছে। পাঠকপাঠিকা

গণের জন্ত এতৎসঙ্গে গ্রস্ মিউজিয়মের কয়টি কক্ষের ছবি সন্নিবেশিত কর্চ্ছি।

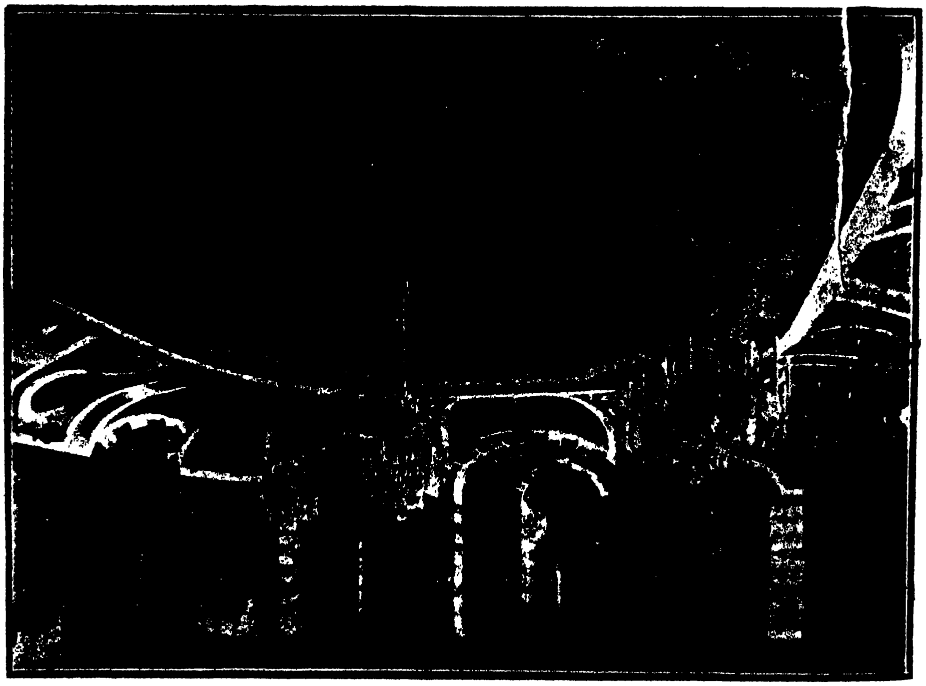
মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আবার বাজারে যাওয়া গেল! সন্তোষের বন্ধু অজিতবাবুর জন্ত বাইনোকুলার, বন্ধুবরের নিজের জন্ত ক্যামেরা ইত্যাদি কেনা গেল! তার পর লণ্ডনের সেলফ্রিজের মত প্রকাণ্ড একটা বাড়ীতে ভেরাইটী ষ্টোরে গেলুম! ইচ্ছা ছিল কম্বল প্রভৃতি শীতবস্ত্র কেনবার, কিন্তু কি কারণে মনে নেই—শেষ পর্য্যন্ত তা' কেনা হয়ে ওঠে নি।



নূতন প্রাসাদ—পটস্‌ডাম

বন্ধুবান্ধবদের মুখে পট্‌স্‌ডামের কথা অনেক দিন থেকে শুনে এসেছি! তাই বার্লিনের অনেক কিছু দেখবার বাকী রেখেই গেলুম পরদিন পট্‌স্‌ডামে। প্রায় সাড়ে দশটার সময় 'বানহফ্‌ জু'তে টিউবে চড়ে, গিয়ে প্রায় এগারোটার সময় পট্‌স্‌ডাম বান্‌হফ টিউব ষ্টেশনে নামলুম। এই স্থান পূর্ব্বে ব্রেনডেনবার্গ এর ইলেক্টরদের আবাসস্থল ছিল, এবং পরে প্রুশিয়ার রাজা এখানে বাস কর্ত্তে আরম্ভ করেন। পরবর্ত্তী সময়ে প্রুশিয়ার রাজগণ কর্ত্তৃক পটস্‌ডাম একটি সুদৃশ্য উদ্যান-নগরীতে পরিণত হয়। মনে হয় প্রকৃতি-রাণী, চারিদিকের বনানী, শৈলমালা ও নির্ঝরের অপূর্ব্ব সম্ভার লয়ে যেন শুধু প্রুশিয়ার রাজগণের অঙ্গুলী-সঙ্কেতেরই প্রতীক্ষা কচ্ছিল! হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল বন্য-প্রকৃতির মূর্ত্তি যেন কার যাদুদণ্ড স্পর্শে এক-মুহূর্ত্তে মানুষের রম্য উপবনে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল! বাস্তবিকই না দেখলে, তা' যে কত সুন্দর, তা' ধারণা করা অসম্ভব!

পটস্‌ডামে উদ্যানের ভিতর প্রবেশের পূর্ব্বেই আমরা অত্যাবশ্যক মধ্যাহ্ন ভোজনটি একটু গুরুতর রূপেই সমাধা করে নিলুম। তার পরেই আমরা গিয়ে 'পার্ক ভন্ সেনসাউসি'তে প্রবেশ কর্লুম! বার্লিনের উপকণ্ঠে এর মতন মনোহর উদ্যান আর নাই! এর বিস্তৃতিও বড় কম নয়,—নূতন প্রাসাদ হতে, প্রায় ব্রেনডেনবার্গ আর্ক পর্য্যন্ত; এবং এর ভিতরে কয়টি প্রাসাদ, গ্যালারি, মন্দির ও অনেকগুলি মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। উদ্যানের ভিতর



সঙ্গীত-কক্ষ—নূতন প্রাসাদ

একটু এগিয়ে গেলেই হাতের ডান দিকে, 'সেনসাউসি' প্রাসাদ দেখা যায়। প্রাসাদের সম্মুখেই বাগান। তাতে অতি চমৎকার ভাবে সারি সারি নানা জাতীয় সুদৃশ্য তরুলতা লাগানো হয়েছে ;—তারি মাঝে দিয়ে ধাপে ধাপে প্রাসাদে যাবার সিঁড়ী! সম্মুখের পথটির দুপাশে ছোটবড় গাছের সারি। তার মাঝে দিয়ে দেখলে দূরে প্রাসাদটি ও তৎসম্মুখস্থ বাগানটি অতি চমৎকার দেখায়,—ঠিক যেন একখানা দৃশ্যপট! ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেটের ইচ্ছানুসারে ও আদেশক্রমে প্রাসাদটি ১৭৪৫—১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে নোবেলসডর্ফ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর প্রুশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি এখানে বাস করেন! এখানেই তিনি ১৭৮৬ ইংরেজীতে মারা যান, এবং তৎপরে চতুর্থ ফ্রেডেরিক্ উইলহেলম্ এখানেই বাস কর্ত্তেন। তিনিও ১৮৬১ ইংরেজীতে এখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি কক্ষে যেখানে বিখ্যাত সুলেখক ভলটেয়ার ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেটের অতিথি হয়ে ছিলেন, এখনও তা' ভলটেয়ার-কক্ষ নামে পরিচিত। কক্ষে বানর, সারস, তোতাপাখী, প্রভৃতি ভলটেয়ারের প্রিয় জন্তুগুলির প্রতিকৃতি কাঠের উপর অঙ্কিত আছে। প্রাসাদের যে কক্ষে ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেট লেখাপড়া করতেন, এবং যেখানে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে মারা যান, সে কক্ষে ঠিক আগেরই মতন আসবাবপত্রগুলি স্থাপিত আছে! তা ছাড়া একটি ছোটখাটো গ্যালারি ও লাইব্রেরী আছে, তাহাতে সম্রাট ফ্রেডরিকের হস্তাক্ষর, ভলটেয়ারের নিকট লেখা পত্র, ও ভলটেয়ারের নানা পুস্তকাবলী সযত্নে রক্ষিত আছে। শুধু তাই নয়, প্রাসাদটির ভিত্তি স্থাপনের সময়কার অঙ্কিত ম্যাপটিও আছে। এগুলি ছাড়া, চতুর্থ ফ্রেডেরিক উইলিয়ামের কক্ষগুলি, ডিম্বাকার ভোজনগৃহ যেখানে সুপ্রসিদ্ধ 'গোলটেবিল পার্টি' বসিত, অভ্যর্থনা-গৃহ ও সঙ্গীতগৃহ প্রভৃতিগুলিও উল্লেখযোগ্য!

প্রাসাদ হতে নামবার সিঁড়ীগুলি ছয় ধাপে অবস্থিত ও প্রায় ৬৫ ফিট্ উঁচু! তার দু'পাশে, আঙ্গুর, পিচ্ ও অন্যান্য নানা জাতীয় ফলের গাছ অতি চমৎকারভাবে রোপিত! নীচেই প্রকাণ্ড ফোয়ারা! এর জল প্রায় ৬০ ফিট পর্য্যন্ত উঁচুতে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাসাদের উল্টা দিকেই "ধ্বংস পাহাড়" নামক কৃত্রিম পাহাড় এবং তার উপরেই ফোয়ারাগুলির জল-সরবরাহের জন্য ট্যাঙ্ক্ অবস্থিত!

প্রাসাদের ডান দিকে এগারোটি সমাধি-প্রস্তর স্থাপিত আছে। ওগুলি ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেটের প্রিয় 'গ্রে হাউণ্ড' গুলির সমাধিস্থান চিহ্নিত কর্চ্ছে। সম্রাটের নিজেরও ইচ্ছা ছিল যে মৃত্যুর পর তাঁহাকে যেন তাঁর প্রিয় কুকুর-গুলির সমাধিস্থানের পাশেই সমাহিত করা হয়। ফ্রেডেরিক্ দ্বিতীয় উইলিয়াম, এ আদেশ পরিবর্ত্তন করে, গ্যারিসন্ গীর্জ্জায় সম্রাটের সমাধিহর্ম্ম নির্ম্মাণ করেন। প্রশস্ত পথটি অতিক্রম কর্ব্বার বেলা হাতের বাঁ দিকে, পিক্চার গ্যালারিটি পড়ে; গ্যালারিটি ছোট, প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই তা' দেখে আমরা 'অবেলিস্ক' দ্বার-পথে বেরিয়ে এলুম। বেরিয়ে আসতে আসতে হাতের ডান দিকে ফ্রিডেন চার্চ্চ অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ গীর্জ্জাটি দেখতে পেলুম। চতুর্থ ফ্রেডেরিক উইলিয়ামের রাজত্ব'কালে, সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডেরিক ও সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সমাধিস্থানের নিকটবর্ত্তী পুরাতন খৃষ্টান বেসিলিকার অনুকরণে পার্শিয়াস কর্ত্তৃক এই গীর্জ্জাটি নির্ম্মিত হয়।

'সেনসাউসি' প্রাসাদ ত্যাগ করে, আমরা নূতন প্রাসাদের অভিমুখে রওয়ানা হলুম। একটু এগিয়ে যেতেই হাতের ডান দিকে 'অরেঞ্জেরি' নামক ফ্লোরেনটাইন শিল্পকলানুসারে নির্ম্মিত একটি লম্বা অট্টালিকা দেখতে পেয়ে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ কর্লুম! এই অট্টালিকাটি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট চতুর্থ ফ্রেডেরিক উইলিয়াম নির্ম্মাণ করেন। এর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সম্রাটের মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে! এই প্রাসাদটি রাজ-অতিথিদের বাসগৃহ রূপেই ব্যবহৃত হতো। মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড হলটিতে ৪৮খানি রাফেলের অঙ্কিত চিত্র আছে। এর সম্মুখেও চমৎকার বাগান আছে। বাগানগুলি চতুর্থ ফ্রেডেরিক উইলিয়াম ও দ্বিতীয় উইলিয়ামের আদেশক্রমে রচিত হয়। তারি একটিতে বার্লিনে উণ্টার্ ডেন্ লিন্ডেনে স্থিত অশ্বপৃষ্ঠে ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেটের প্রতিকৃতির অনুকরণে আর একটি মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

অতঃপর মালবেরি এভিনিউ দিয়ে অগ্রসর হতে হতে, ডান দিকে ড্রেগন্ হাউস্ ও গার্ডেন অব প্যারেডাইজ্ দেখতে পাওয়া গেল। এখান হতেই দূরে একটি ছোট

পাহাড়ের উপর সেনসাউসির ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মিল্ দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের সময় অল্প ও পরে গেলে হয় ত নূতন প্রাসাদের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে, এজন্য আমরা আর আশে পাশে তাকিয়ে সময় নষ্ট না করে দ্রুত-পদে এগিয়ে চলুম নূতন প্রাসাদের অভিমুখে ও প্রায় পোনর মিনিটের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছলুম সেখানে। সৌভাগ্যক্রমে তখনো প্রাসাদের দ্বার খোলা ছিল এবং জিজ্ঞেস করে জানতে পারলুম যে আরো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরেই বন্ধ হয়ে যাবে। নূতন প্রাসাদটি বাস্তবিকই স্থাপত্যকলার উৎকর্ষের একটি চরম নিদর্শন। দূর হতে অতি চমৎকার দেখায়। শুনলুম, আকাশ হতে এর দৃশ্য না কি অতীব মনোহর! ১৭৬৩—১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডরিক্ দি গ্রেট, এই প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করান। দীর্ঘ সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর সম্রাটের ঐশ্বর্য্য ও বিত্তের পরিচায়ক রূপে প্রাসাদটি অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। মূল প্রাসাদটি ছাড়া, সভাসদদের বাসের জন্যও প্রায় দুশোটি কক্ষ আছে। তা ছাড়া, অনেকগুলি সুপ্রশস্ত হল আছে এবং প্রায় পাঁচশো লোকের বসবার উপযুক্ত একটি রঙ্গগৃহও আছে! রঙ্গগৃহটিতে শুধু রাজপরিবারের ব্যক্তিরা ও পারিষদবর্গ ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না।

ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেটের রাজত্বের শেষ সময়ে নূতন প্রাসাদটি রাজাবাস ছিল! পরে ভূতপূর্ব্ব কাইজারের পিতা তৃতীয় ফ্রেডেরিক্ এখানে থাকতেন এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ভূতপূর্ব্ব কাইজারও এখানে গ্রীষ্মকালে থাকতে খুবই ভালবাসতেন এবং মহাযুদ্ধের পর বিপ্লবের সময়, তিনি এখানেই ছিলেন। প্রাসাদের মধ্যে তাঁর প্রাইভেট্ কক্ষগুলি এখনো আগের মতনই সজ্জিত আছে! প্রাসাদের কক্ষগুলি নানা ভাবে, নানা উপাদানে নির্ম্মিত হয়েছিল এবং প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে! দেখেই মনে হয়, জার্ম্মেণ সম্রাটদের কত সুরুচি ও কলাজ্ঞান ছিল! সঙ্গীত-গৃহ, নৃত্য-গৃহ প্রভৃতি বাস্তবিকই চেয়ে থাকবার মত কারুকার্য্যে শোভিত! কি ছাদ, কি দেয়াল, কি মেঝে, সবগুলিই অতি মনোমুগ্ধকর ভাবে সজ্জিত! নৃত্যগৃহটিতে প্রায় হাজার লোকের এক সঙ্গে নৃত্যের স্থান আছে! কক্ষগুলির সব কটিতেই উৎসব প্রভৃতির সময় সম্রাট, ক্রাউন প্রিন্স প্রভৃতিরা যে সব নির্দ্দিষ্ট আসনে বসতেন, এখনো সেগুলি যথাস্থানে স্থাপিত আছে! রাজ-পরিবারস্থ প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ নির্দ্দিষ্ট ছিল! তার মধ্যে, ভূতপূর্ব্ব ক্রাউন প্রিন্সের কক্ষগুলিই, দেখে মনে হ'ল, একটু বেশী সৌখীন বিলাসিতার পরিচয় দিচ্ছে! তা ছাড়া, মার্ব্বেল-কক্ষটিও চমৎকার। শুভ্র মর্ম্মরময় প্রকাণ্ড হলটি বাস্তবিকই আমাদের চোখে খুব নয়ন-তৃপ্তিকর বলে মনে হয়েছিল! রাজকীয় ভোজনের হলটিও সৌখীনতায় ভরপুর! কিন্তু সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ঝিনুক-ঘর অথবা রত্নকক্ষ! ছাদ হতে আরম্ভ করে দেয়ালগুলি সবই, দেশ-দেশান্তর সাত সমুদ্রের বুক হতে, সযত্নে আহরিত নানা বর্ণের, নানা আকারের শঙ্খ ও ঝিনুক দিয়ে তৈরী! ঝিনুকের আর এক নাম রত্নগর্ভা, তার পরিচয় রত্নগৃহে অনেকগুলি আছে! রত্ন বুকে নিয়ে অসংখ্য রত্নগর্ভা সে কক্ষের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে! তাদের বুক হতে যে ঝলমল্ আলো সমস্ত কক্ষময় ছড়িয়ে পড়েছে, সেটা না দেখলে ধারণা করা অসম্ভব! দাঁড়িয়ে দেখে দেখেও আমাদের তৃপ্তি হচ্ছিল না এবং আরো দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল। এমন সময় প্রাসাদের পরিচারকেরা এসে তাড়া দিল যে সময় হয়ে গেছে, আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। দেখে দেখে, আরো দেখার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে, বন্ধু দুটি বেরিয়ে এলুম প্রাসাদ হতে! যুগপৎ একই সময়ে, দুই বন্ধুর মুখ হতে বেরিয়ে পড়লো একটি ছোট্ট কথা—"চমৎকার"! রামের অযোধ্যা তেমি আছে, কিন্তু সে রাম আজ নেই! এ কথা মনে হওয়াতেই আমার নাসিকাপ্রান্ত হতে, একটা সুদীর্ঘ সহানুভূতির দীর্ঘনিশ্বাস নিজেরই অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে পড়লো!

প্রাসাদ হতে বাইরে এসে আমরা খানিকক্ষণ অপলক-নেত্রে ভূতপূর্ব্ব সম্রাটদের আবাস-ভবনটির পানে চেয়ে রইলুম। সারা দিনই কেমন একটা মেঘলা ভাব ছিল। এম্নি সময় হঠাৎ পশ্চিমের আকাশে দিনকর উঁকি মেরে দেখা দেওয়াতে—মেঘের কোল থেকে একটুখানি রোদ সমস্ত উদ্যানটিতে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়লো। আর যায় কোথা, বন্ধুবর নূতন কেনা ক্যামেরা খুলে, আমাকে নূতন প্রাসাদের সম্মুখস্থ একটা মর্ম্মরমূর্ত্তির নীচে দাঁড় করিয়ে, নিলেন তুলে ফটো একখানা! নূতন ক্যামেরায় নেওয়া প্রথম ছবি, আর নূতন বিয়ের পর প্রেয়সীর প্রথম

স্পর্শ, সে সময় মনের যে ভাবখানা হয়, তা' দেখবার মত সৌভাগ্য আমার সেদিন হয়েছিল! কিন্তু সেদিন রাত্রিতেই ডেভেলপ করার বেলা যখন দেখা গেল যে সেই প্রথম প্রচেষ্টাই, আণ্ডার একস্‌পোসারের জন্য একান্ত বিফল হয়ে গেছে, তখন আর বন্ধুবরের আক্ষেপের অন্ত ছিল না! ছবি নেওয়ার দু'মিনিটের মধ্যেই, সূর্য্যদেব আবার মুখ ঢাকলেন! আর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এদিক ওদিক প্রায় আধঘণ্টা বেড়িয়ে আবার প্রত্যাবর্ত্তন কর্ল্‌ম পটস্‌ডাম্‌ হতে ট্রামে চড়ে, বানহফ পটস্‌ডামে; আর সেখান হতে টিউবে করে ফ্রেডরিক্‌ ষ্ট্রাসে বানহফে; সেখান হতে ট্রামে করে "জাইস্‌"এর দোকানে; ও অতঃপর বাসে করে বানহফ্‌ জুতে, এবং তৎপর পদব্রজে হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের দ্বারে!

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই দু'বন্ধু গেলুম, বার্লিনের সুবিখ্যাত প্লেনেটোরিয়ম্‌ দেখতে! সেদিন সেখানে বক্তৃতা ছিল! ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে ফিল্‌মের সাহায্যে নকল আকাশ তৈরী করে, গ্রহ নক্ষত্রাদির সংস্থান ও গতি দেখান হচ্ছিল। প্লেনেটোরিয়ান্‌টির গঠনই এ-রকম যে তার অভ্যন্তরস্থ নকল আকাশ ও প্রকৃত আকাশের মধ্যে তফাৎ করা যায় না। বক্তৃতাটি ভালই হচ্ছিল বলতে হবে, কিন্তু অত্যন্ত টেক্‌নিক্যাল হওয়াতে আমাদের আর ভাল লাগছিল না। আর ওদিকে সময়ও কম, সুতরাং অসমাপ্ত বক্তৃতার মাঝামাঝি পথেই বাধ্য হয়ে উঠে পড়তে হয়েছিল আমাদের!

হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনেই সান্ধ্য-ভোজন শেষ করে বার্লিনস্থিত বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিদায় নিলুম। একজন বন্ধু, অযাচিত ভাবে ছুটে গিয়ে, একখানা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসে আমাদের তুলে দিলেন তাতে। অন্যান্য সহৃদয় বন্ধুগণ দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, করমর্দ্দন করে ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন! আমাদের গাড়ীখানা নৈশ-পথ মুখরিত করে বার্লিনের রাস্তায় ষ্টেসনের উদ্দেশ্যে ছুটলো! বার্লিন ছাড়বার বেলা, মনে একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়েই ছাড়তে হলো! সময়ের অল্পতার জন্য আমাদের আর দেরী করবার উপায় ছিল না, কারণ বন্ধুবরের জাহাজে চড়ার দিন অতি সন্নিকটবর্ত্তী হয়ে এসেছিল! তাই বার্লিনের দ্রষ্টব্য অনেক কিছু অদৃষ্ট রেখেই বার্লিন ছাড়তে হয়েছিল আমাদের! আমার একান্তই ইচ্ছা ছিল যে বার্লিনের সুবিখ্যাত অপেরা হাউস্‌ ও নৃত্যগৃহগুলি দেখে আসি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সময়ের অল্পতার জন্য তা' হয়ে উঠে নি! ভবিষ্যতে আবার কখন সে আশা পূর্ণ হবে, জানি না!

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের অভিষেক-সংবৎসর

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

ক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কি বলেন?

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের মোটা মোটা ঘটনার তারিখগুলি এই বৎসরাঙ্কটির উপর নির্ভর করিয়া গণিত; কাজেই ইতিহাস যাঁহারা ভালবাসেন, ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে ঠিক কোন্‌ বছরে এই ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল তাহা নির্ভুলরূপে নির্দ্ধারণ করা কতখানি দরকারী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এমন দরকারী নির্দ্ধারণেও গলদ রহিয়া গিয়াছে। ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে এই রকম অদ্ভুত ব্যাপার প্রায়ই হাতে পড়িয়া যায়। আমরা ছেলেবেলা হইতে এই তারিখটি মুখস্থ করিয়া আসিতেছি। খ্রীষ্টজন্মের ৩২৩ বছর পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার মারা গেলেন। তাহারই বছর দুই পরে অর্থাৎ ৩২২-২১ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে চাণক্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নন্দবংশকে সরাইয়া নিজে ভারত-সম্রাট হইয়া বসিলেন। এই তারিখটি এতকাল ধরিয়া চলিতেছে যে ইহা ঠিক কি না, কোন্‌ কোন্‌ প্রমাণের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার কথাও কাহারও মনে উদিত হয় না!

আজকাল কলেজে যে সকল ইতিহাস পড়ান হইয়া

থাকে, তাহাতে এই তারিখটি কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে, একবার পরখ করিয়া দেখা যাউক।

১। ডাঃ ভি, এ, স্মিথের আর্লি হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, তৃতীয় সংস্করণ, ১১৬ পৃষ্ঠা। মূলের অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।

"৩২৩ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দের জুন মাসে এলেকজেণ্ডারের মৃত্যু হওয়াতে, 'হয়ত আবার তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিতে পারেন' এই ভয় সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল এবং ভারতীয় রাজাগণ যে প্রথম সুযোগেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গ্রীক প্রভুত্বের পোষক অপ্রবল বৈদেশিক সৈন্যদলগুলিকে নিঃশেষে সংহার করিয়া ফেলিয়াছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।......আমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারি যে বিজেতা এলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর খবর যখন প্রকৃতই সত্য বলিয়া জানা গেল এবং অবাধে সৈন্যচলাচলের উপযোগী ঋতু উপস্থিত হইল, তখন (গ্রীকশাসনের বিরুদ্ধে) সর্ব্বত্র বিদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং ৩২২ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দের প্রথম ভাগেই ভারতে মেসিডোনীয় প্রভুত্ব শেষ হইয়া গেল।"

পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, এ সমস্তই আগাগোড়া ডাঃ স্মিথের অনুমান মাত্র। অনুমানের উপর ইতিহাস রচনা করিতে বসিয়া—"সন্দেহ মাত্র নাই"—"নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারি"—ইত্যাদি জোরের কথা না বলাই সতর্ক ঐতিহাসিকের লক্ষণ। ঐতিহাসিকের কার্য্যই সন্দেহ করা এবং অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সেই সন্দেহ দূরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু বিশ্বাস না করা।

২। কেম্‌ব্রিজ হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া। ডাঃ এফ্‌-ডব্লিউ-টমাস কৃত প্রবন্ধ—৪৭১, ৪৭৩ পৃষ্ঠা—বঙ্গানুবাদ।

"আমাদের হাতে বর্ত্তমানে যে সমস্ত প্রমাণ আছে তাহাদের সাহায্যে নন্দরাজের পরাজয়ের ঠিক তারিখ নির্ণয় করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।...৩২১ খ্রীঃপূঃ হইলেও হইতে পারে। পুরাণ ও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির মতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ২৪ বৎসর ব্যাপী ছিল।.. আরম্ভ বৎসরটি কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট।......এই অনিশ্চিততাপূর্ণ বিষয় লইয়া আর অধিক আলোচনা নিরর্থক। (চন্দ্রগুপ্তের আমলের) দেশ এবং দেশশাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ঐ আমলের সন তারিখের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের তুলনায় আশ্চর্য্য রকমে প্রচুর।"

ডাঃ ভি-এ-স্মিথের অসংযত কল্পনার তুলনায় ডাঃ টমাসের উক্তিগুলির সতর্কতা সর্ব্বতোভাবে উপভোগ্য।

৩। ইন্‌স্‌ক্রিপশন্‌স্‌ অব অশোক। ডাঃ হুলজ্‌ সম্পাদিত। ভূমিকা, ৩৫ পৃষ্ঠা। বঙ্গানুবাদ।

"এইরূপে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ বৎসর খ্রীঃপূঃ ৩২৩ (এলেকজেণ্ডারের মৃত্যু) এবং খ্রী পূঃ ৩০৪ (সেলিউকাসের সহিত সন্ধি) এই দুই বৎসরের মধ্যে পড়ে। মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য পাটনা হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই বিপুল সাম্রাজ্যের গঠনে নিশ্চয়ই অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। কাজেই চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ-বৎসরটি ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ এর দিকে সরাইয়া লইতেই আমার অভিলাষ হয় এবং ডাঃ ফ্লিট্ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত খ্রীঃ পূঃ ৩২০কেই এই ঘটনার তারিখ বলিয়া আপাততঃ গ্রহণ করিয়া কাজ চালাইতে চাই।"

পাঠকগণ বুঝিতে পারেন, ইহাও অনুমানই মাত্র।

তবেই দেখা যাইতেছে, যে তারিখ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই বলিয়া আমরা ছেলেবেলা হইতে মনে করিয়া আসিতেছি, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া প্রাচীন আমলের সমস্তগুলি বড় বড় ঘটনার সন তারিখ গণিত হয়, সেই গোড়ায়ই কত গলদ রহিয়া গিয়াছে!

একটি একটি করিয়া সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করা যাক্।

খ। চন্দ্রগুপ্ত কি প্রথমে নন্দ সিংহাসন ও সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং পরে গ্রীকদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়াছিলেন, অথবা প্রথমে গ্রীকদিগকে তাড়াইয়া পরে নন্দ সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন?

এই বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামতগুলি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল।

১। ভি-এ-স্মিথের আর্লি হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, তৃতীয় সংস্করণ ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠা। বঙ্গানুবাদ।

"ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে বিদেশী আক্রমণকারী অধিকৃত দেশ দখলে রাখিবার জন্য যে সৈন্যদল এই দেশে রাখিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা আরম্ভের পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার জনপ্রিয় আত্মীয় নন্দরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন।"

২। উক্ত গ্রন্থকারেরই লিখিত 'অশোক' দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩-১৪ পৃঃ "চন্দ্রগুপ্ত কি প্রথমে মগধের রাজা হইয়া পরে উত্তরাভিমুখে মেসিডনীয় সৈন্যগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, অথবা প্রথমে পঞ্জাবে জন-বিদ্রোহের নায়কত্ব করিয়া (মেসিডনীয়দিগকে দূরীভূত করিয়া) শক্তি সঞ্চয়পূর্ব্বক অনুগাঙ্গ মগধরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না।" ইহার পাদটীকায় আছে—" 'Deinde' শব্দটি হইতে বোধ হয় যে চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজা হইয়া পরে এলেকজেণ্ডারের সেনাপতিগণের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

৩। কেম্ব্রিজ হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, ডাঃ এফ-ডব্লিই-টমাস্ কৃত প্রবন্ধ, ৪৭০-৭১ পৃষ্ঠা।

"চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজের প্রধান সেনাপতিরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। (এই সময়) তিনি নন্দরাজের বিরাগভাজন হ'ন। কথিত আছে যে তিনি ব্রাহ্মণ বিষ্ণুগুপ্ত কতৃক প্রোৎসাহিত হইয়া নিজ প্রভু নন্দরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফলে তিনি নিজের সঙ্গীগণকে লইয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে বাধ্য হ'ন।··· অতঃপর চন্দ্রগুপ্তের নায়কত্বে একটি প্রবল দল গঠিত হয়। তাঁহার প্রধান সহায় হ'ন হিমালয় প্রদেশের একজন রাজা। এই দলের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত মগধরাজ্য আক্রমণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের মগধ আক্রমণ যে প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এই বিষয়ে একটি বৌদ্ধ ও একটি জৈন গল্প প্রচলিত আছে।"

যে সকল মূল পুস্তকের তথ্যাবলির উপর উপরি-উদ্ধৃত মতগুলি প্রতিষ্ঠিত, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(ক)। ম্যাক ক্রিণ্ডল্ কৃত গ্রীক ঐতিহাসিক জাষ্টিন হইতে অনুবাদ। হুলজের Inscriptions of Asoka পুস্তকের ভূমিকায় ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। বঙ্গানুবাদ।

"এলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর পর ভারতীয়গণ যেন এলেকজেণ্ডারের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে এই মনে করিয়া এলেকজেণ্ডারের ভারতশাসনে নিযুক্ত সেনাপতিগণকে সংহার করিয়া ফেলিল। যে নায়কের নায়কত্বে ভারতীয়গণ পুনরায় এইরূপে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, তাহার নাম চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু বিজয় লাভের পরে চন্দ্রগুপ্ত প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার করিয়া দেশের স্বাধীনতার উদ্ধারকারী বলিয়া বিবেচিত হইবার সমস্ত অধিকার হারাইয়াছিলেন। কারণ বিদেশীয় অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া তিনি নিজের অত্যাচারে প্রজাবর্গকে পুনরায় দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাধিয়া ফেলিলেন।

"চন্দ্রগুপ্ত সামান্য অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একদা এক দৈব ব্যাপারে তিনি রাজত্বাভিলাষে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। এই দৈব ঘটনায় বুঝা গিয়াছিল যে অতুলনীয় সৌভাগ্য তাঁহার ভাগ্যে লিখিত আছে।

"নিজের রূঢ় ব্যবহারে তিনি নন্দরাজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং নন্দরাজ তাঁহার হত্যার আদেশ দিলে তাঁহাকে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। (পলায়নকালে একদা) যখন তিনি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন তখন একটি প্রকাণ্ডকায় সিংহ নিদ্রিত চন্দ্রগুপ্তের নিকটস্থ হইয়া, তাহার শরীর হইতে প্রচুররূপে যে ঘর্ম্মস্রাব হইতেছিল তাহাই জিহ্বা দিয়া চাটিতে আরম্ভ করিল এবং চন্দ্রগুপ্তের নিদ্রাভঙ্গ হইলে শান্তভাবে একদিকে চলিয়া গেল। এই বিচিত্র ব্যাপারে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে লাগিলেন এবং একদল দস্যু সংগ্রহ করিয়া তিনি ভারতবর্ষীয়গণকে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত শাসন বিনষ্ট করিতে উৎসাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তিনি এলেকজেণ্ডারের সেনাপতিগণকে যখন আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন তখন এক প্রকাণ্ডকায় বন্যহস্তী তাঁহার নিকটে আসিয়া গৃহপালিত হস্তীর মত নিতান্ত নম্রভাবে তাঁহার নিকট অবনত হইয়া তাঁহাকে পীঠে তুলিয়া লইল এবং সৈন্যদলের পুরোভাগে তাঁহাকে লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে সিংহাসন লাভ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারতে যখন রাজত্ব করিতেছিলেন তখন সেলিউকাস নিজের ভবিষ্য সৌভাগ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন।"

বিশ্লেষণ করিলে জাষ্টিনের এই বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলির উদ্ধার করা যায়।

(i) ভারতে গ্রীক অধীনতা দূর করিবার চেষ্টা এলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর পরে আরব্ধ হয়।

(ii) এই চেষ্টার নায়ক ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত।

(iii) গ্রীক সেনাপতিগণকে বিনাশ করিয়া

ভারতীয়গণকে গ্রীক অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অতঃপর কি করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারতীয়গণকে গ্রীক অধীনতা হইতে মুক্ত করেন, জাষ্টিন তাহারই বিবরণ দিতেছেন।

(iv) তিনি নন্দরাজের বিরাগভাজন হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে বাধ্য হ'ন।

(v) এই নির্ব্বাসিত অবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত এক দস্যুদল সংগ্রহ করিয়া ভারতীয়গণকে তৎকাল-প্রতিষ্ঠিত শাসনপাশ ছিন্ন করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এই তৎকাল প্রতিষ্ঠিত শাসন যে গ্রীক শাসন—নন্দরাজ শাসন নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কারণ এই শাসনপাশ ছিন্ন করিতে চন্দ্রগুপ্তকে গ্রীক সেনাপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। দস্যুদলের সাহায্যে বন্য হস্তীর পৃষ্ঠে গ্রীক সেনাপতিগণের সহিত নাসিরে (যুদ্ধের পুরোবর্ত্তী সৈন্যদলে) যুদ্ধের যে বর্ণনা জাষ্টিন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নন্দ সাম্রাজ্যের অধিপতি স্বয়ং প্রবল-প্রতাপ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তে প্রয়োগ করা যায় না। স্পষ্টই বুঝা যায়, এই সময় চন্দ্রগুপ্ত ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা মাত্র ছিলেন এবং গ্রীকদিগকে পরাজিত করিয়াই তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হয়।

(vi) এইরূপে পঞ্জাব হইতে গ্রীকদিগকে তাড়াইয়া পঞ্জাবের অধিপতি হইয়া ক্রমশঃ চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য অধিগত করেন।

জাষ্টিনের এই বিবৃতিতে গ্রীক সেনাপতিগণের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সঙ্ঘর্ষের বিবরণই আছে—নন্দের সহিত নহে। ডাঃ ভি-এ স্মিথ উল্টা কি করিয়া বুঝিলেন তাহা বোধগম্য নহে।

(খ) এই সঙ্গে প্লুটার্ক নামক ঐতিহাসিকের নিম্ন-লিখিত বিবরণও বিবেচ্য।

"চন্দ্রগুপ্ত নিজে এই সময় অল্পবয়স্ক যুবক মাত্র এবং স্বয়ং এলেকজেণ্ডারের সহিত তিনি দেখা করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত অতঃপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে এলেকজেণ্ডার সহজেই সমগ্র ভারতবর্ষ দখল করিতে পারিতেন কারণ প্রজাবর্গ ভারতের তৎকালীন সম্রাটকে তাহার দুষ্ট স্বভাব ও নীচকুলে জন্মের জন্য ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিত।"

প্লুটার্ক লিখিত এলেকজেণ্ডারের জীবন-চরিত—ভি-এ-স্মিথের আর্লি হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, ৩য় সং, ৪৩ পৃষ্ঠা, পাদ-টীকায় উদ্ধৃত। বঙ্গানুবাদ।

চন্দ্রগুপ্ত যে নির্ব্বাসিত অবস্থায় পঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তথায়ই তিনি এলেকজেণ্ডারের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, প্লুটার্কের উপরি-উদ্ধৃত বিবরণ হইতে তাহাই বুঝা যায়। এই উক্তি হইতে এই অনুমানও অসঙ্গত নহে যে পঞ্জাবই চন্দ্রগুপ্তের আদি কার্য্যক্ষেত্র।

(গ)। সিংহলের বৌদ্ধগ্রন্থে কোন এক মাতাপুত্রের আলাপ হইতে চন্দ্রগুপ্তের উপদেশ গ্রহণের গল্পটি এই :—

"(নির্ব্বাসন কালে) এক গ্রামে এক স্ত্রীলোকের ঘরে চন্দ্রগুপ্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রমণী পিষ্টক ভাজিয়া পুত্রকে দিতেছিল। পুত্র পিষ্টকের মধ্যভাগ খাইয়া কিনারাগুলি দূরে ছুড়িয়া ফেলিতেছিল এবং ফেলিয়াই আর একখানা চাহিতেছিল। ইহা দেখিয়া রমণী বলিল, "এই (হতভাগা) ছেলের কাণ্ড ঠিক চন্দ্রগুপ্তের (নন্দ) রাজ্য আক্রমণের মত।" বালক বলিল—"কেন মা, আমি কি করিলাম, আর চন্দ্রগুপ্তই বা কি করিয়াছিল ?" রমণী বলিল—"পুত্র, তুমি পিষ্টকের কিনারা ফেলিয়া মধ্যে কামড় বসাইতেছ। চন্দ্রগুপ্তও তেমনি (বোকার মত) কিনারা হইতে রাজ্যজয় এবং নগরগুলি একটির পর একটি অধিকার করিতে চেষ্টা না করিয়া প্রথমেই রাজ্যের মধ্যভাগ (রাজধানী) আক্রমণ করিয়াছে।…আর তাই দেখ, তাহার সৈন্যদল শত্রু কর্তৃক ঘেরাও হইয়া সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। ইহাই হইল তাহার বোকামী।"

মহাবংশ টীকা। রিজ্ ডেভিড্ কৃত Buddhist India নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত। ২৬৯ পৃষ্ঠা।

চন্দ্রগুপ্ত এই আলাপ শুনিয়া জ্ঞানসঞ্চয়পূর্ব্বক প্রান্তদেশ হইতে রাজ্য জয় আরম্ভ করিলেন এবং অবশেষে জয়ী হইলেন।

(ঘ)। এই বিষয়ে জৈনগ্রন্থের গল্পটি হেমচন্দ্র কৃত স্থবিরাবলি চরিতে নিম্নলিখিতরূপে লিপিবদ্ধ আছে :—

একদা চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য নন্দরাজধানী পাটলীপুত্র আক্রমণ করেন এবং পরাজিত ও শত্রুকর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইতেছিলেন—

"সন্ধ্যায় চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য এক গ্রামে যাইয়া পৌছিলেন এবং খাদ্যান্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা এক দীনা বৃদ্ধার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা তখনই মাত্র পুত্রদের জন্য খাদ্য রাঁধিয়া থালায় ঢালিয়াছে। পুত্রদের মধ্যে একজন আর রহিতে না পারিয়া থালার মধ্যে হাত দিয়া ফেলিল এবং গরম খাদ্যে হাত পুড়িয়া গেলে কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধা পুত্রকে চাণক্যের মত প্রকাণ্ড বোকা বলিয়া গালি দিতে লাগিল। (বুদ্ধ্যাভিমানী) চাণক্য নিজের নাম এইরূপে উল্লিখিত হইতে শুনিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং বৃদ্ধাকে তাহার বাক্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটি বলিল— "এই (বোকা) ছেলে থালার খাদ্যের গরম মধ্যভাগে হাত দিয়া হাত পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। কিনারার খাদ্য হইতে খাইতে চেষ্টা করিলে হাত পুড়িত না; কারণ, কিনারার খাদ্য এতক্ষণে ঠাণ্ডা হইয়াছে। ঠিক ঐ রকম করিতে যাইয়াই চাণক্যও পরাজিত হইয়াছেন। কারণ প্রান্তদেশ প্রথমে আক্রমণ না করিয়া তিনি শত্রুর যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বল সেই রাজধানীই আক্রমণ করিয়া বসিয়াছেন, তাই পরাজিতও হইয়াছেন।

এই অজ্ঞাতসারে প্রদত্ত উপদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া চাণক্য হিমবৎকূটে যাইয়া তথাকার রাজা পর্ব্বতকের সহিত মিত্রতা করিলেন। প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে এইবার আক্রমণ আরব্ধ হইল। (বিষকন্যা গ্রহণ করিয়া পর্ব্বতক মরিয়া গেল)। এইরূপে চন্দ্রগুপ্ত পর্ব্বতক ও নন্দের রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৫৫ বৎসর পরে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।"

স্থবিরাবলি চরিত—বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পরিশিষ্ট।

এই বৌদ্ধ ও জৈন গল্পের সহিত যদি আমরা গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বিবরণগুলি মিলাইয়া পাঠ করি তবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি স্থিরীকৃত করা যায়:—

(i) চন্দ্রগুপ্তের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দরাজ চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে চন্দ্রগুপ্ত প্রাণ লইয়া পলাইতে বাধ্য হ'ন।

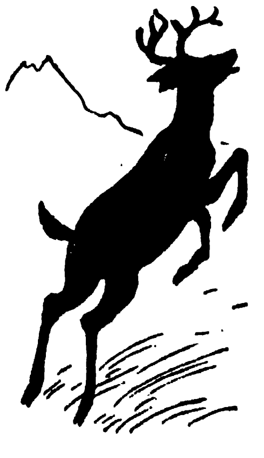
(ii) চাণক্যের সাহায্যে তিনি কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নন্দরাজধানী পাটলীপুত্র আক্রমণ করেন এবং পরাজিত হইয়া পঞ্জাবে পলায়ন করেন।

(iii) পঞ্জাবে তিনি একটি দল গঠন করিয়া গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হ'ন এবং গ্রীকদিগকে দূর করিয়া পঞ্জাবের অধিপতি হইয়া বসেন।

(iv) এইরূপে পঞ্জাব অধিকার করিয়া ক্রমশঃ তিনি নন্দরাজধানী পাটলীপুত্রের দিকে অগ্রসর হ'ন এবং নন্দরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ভারত-সম্রাট হইয়া বসেন।

ভারতে গ্রীকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং গ্রীকদের পরাজয় ঠিক কোন্ বৎসর হইয়াছিল, এইবার তাহার নির্দ্ধারণ আবশ্যক। *

* বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণেলে লেখকের সদ্য- প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।



তাজমহলে

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

(১)

উঠি তাজমহলের সুগঠিত সমুচ্চ মিনারে
মনে হয় আজি মোর, কত কবি রসছন্দোচ্ছাহারে
পূজিয়াছে এ মন্দিরে, দিব্য-প্রেমে মর্ম্মরের রূপ
এখানে দিয়াছে বুঝি প্রিয়াহারা ভারতের ভূপ।
আমার অকবি চিত্ত চলে যায় অতীতের পানে
যখন অযুত-শিল্পী জুটিয়াছে ইহার নির্ম্মাণে
স্বেদসিক্ত ক্লিষ্ট-দেহে। কত কৃষকের শ্রমজল
প্রজার হৃদয়শুক্তি—নয়নের কত মুক্তাফল
রাজার শাসনে এসে অঙ্গপুষ্টি করেছে ইহার
রাজশ্রীমণ্ডন শিল্পে। হাহাকার করেছে পাহাড়,
তাহার হৃদয় ভেদি লুণ্ঠিতার শোণিত-পঞ্জর
বসুন্ধরা কুক্ষি চিরি সম্রাটের শাণিত-খঞ্জর
এনেছে সর্ব্বস্বধন। কত বধূ কর্ণের কুণ্ডল,
সঁপেছে রাণীর শবে। যমুনা ভুলিয়া কোলাহল
করিয়াছে আর্ত্তনাদ। শত শত শিল্পীর ছেদনী
উৎকীর্ণ করিছে শিলা, ঊর্দ্ধে জাগে শাসন-তর্জ্জনী;—
শত শত প্রহরীর রৌদ্রোজ্জ্বল মুক্ত তরবার
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর তলে। কত জনে করিয়া বঞ্চনা
নিজ নিজ প্রেয়সীর বক্ষে হানি বিচ্ছেদ-বেদনা
কত শিল্পী প্রণয়ের প্রথমাঙ্ক না হতে সমাধা
জুটিল যে রাখিবারে সম্রাটের প্রেমের মর্য্যাদা
সর্ব্বব্রত পরিহরি। তারপর বিদায়ে জানি না—
তাহারা লভিল কিনা দাক্ষিণ্যের প্রতুল দক্ষিণা
কিনিতে মথুরা হ'তে এক গাছি কণ্ঠহার হায়
প্রেমের রাজশ্রী-গর্ব্বে সাজাইতে আপন কান্তায়;
অথবা ফিরেছে যবে বক্ষে বহি প্রেম উপহার
দেখেছে তাদের গৃহ অন্ধকার,—উঠে হাহাকার!
প্রেম ধরিয়াছে শোকে মর্ম্মরের মর্ম্মে অবয়ব
তাই যদি সত্য হয়, শোকার্ত্তের রাজশ্রী-গৌরব
রাজদম্ভ আড়ম্বর কোথা গেল? রাজার প্রতাপ
সমারোহে ঘটা ক'রে কোথা তবে করিছে বিলাপ?

(২)

আজি শুধু মনে পড়ে,—গিয়াছিনু দূরবর্ত্তী গ্রামে—
শুক্ল অষ্টমীর চাঁদ, যখন সে অস্তে নামে নামে,—
ফিরিয়া আসিতেছিনু মাঠপথে; সম্মুখেই গ্রাম;
কোথা সাড়া শব্দ নাই, জীবলোক করিছে বিশ্রাম
নিদ্রার বৎসল অঙ্কে। পাশে এক তেঁতুলের গাছে
বাদুড়েরা জানাইছে একমাত্র তারা জেগে আছে।
আম-বাগানের পাশে নিমগাছে ঘেরা গোরস্থান,
পাশ দিয়া আসিবারে ভয়ে ভয়ে ধরিলাম গান।
চেয়ে দেখি মোরে দেখে তাড়াতাড়ি কে যেন লুকায়,
বিদ্যুৎ তাড়নে যেন অকস্মাৎ পরাণ শুকায়,
ত্রস্তকণ্ঠে প্রাণপণে চীৎকারিয়া বলিলাম—'ও' কে?'
নিশাচর এল কাছে—দেখিলাম জ্যোৎস্নার আলোকে,
মোদের জসিম মিঞা। বাঁচা গেল— ভূত প্রেত নয়,
শুধালাম—"এত রাত্রে হেথা তুই? করে না'ক ভ ?"
জসিম কহিল, "কত্তা এ গরমে ঘরে থাকা দায়;
একটুও হাওয়া নাই—জ্বালাতন করিল মশায়,
হেথা বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া—পায়ে পায়ে বেড়াতে বেড়াতে,
জ্যোছনার আলো পেয়ে—এখানেই এলাম এ রাতে—"
কুণ্ঠিত জসিম যেন করিয়াছে কত অপরাধ।
অন্যমনা হয়ে চলি, মনে মোর বিস্ময় অগাধ।
জসিমের মুখে চেয়ে দেখি তার দুই চোখে জল,
চন্দ্রালোকে মুক্তাসম তখনো করিছে টলটল।
চলিয়াছি নিরুত্তর কত কথা জিজ্ঞাসে জসিম—
আমি ভাবিতেছি শুধু জসিমের কি প্রেম অসীম;
একবর্ষ হলো গত জসিম হয়েছে মৃতদার,
কবরে শায়িত দেহ আজো সে ত ভুলেনি প্রিয়ার;
শুব্ধরাত্রে আসে হেথা লুকাইয়া। রহিল না ছাপা
হৃদয় যমুনা-কূলে কথা দিয়া যত দিক্ চাপা।

অপরাহ্নে

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

সাঁওতাল পরগণার একটি ছোট ষ্টেশন্। ষ্টেশনটিকে কেন্দ্র করিয়া আশপাশে ক্ষুদ্র শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। শহরটিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একজোড়া রেল-লাইন অজগর সাপের মত চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। দিনে ও রাতে খান চারেক ট্রেণ তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়।

ষ্টেশনের ধারে রেল-কর্ম্মচারীদের কয়েকখানা বাংলা। দুই তিন ঘর বাঙালী চাকুরে বহুদিন হইতে সেখানে বসবাস করেন। সম্প্রতি একটি ছোক্‌রা য়্যাসিষ্ট্যান্টের উপর ভার দিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার কিছুদিনের জন্য ছুটি লইয়া কন্যার বিবাহ দিতে দেশে গিয়াছেন। ছোক্‌রাটি তাঁহার জায়গায় অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে কাজ চালাইতেছিল।

ছেলেটির বয়স অল্পই; তাহার গোঁফের তাম্রবর্ণ এখনও কালো হয় নাই। নাম সুকান্ত। সেদিন বেলা দশটা আন্দাজ হাতের খুচ্‌রা কাজগুলি যেমন-তেমন ভাবে শেষ করিয়া ষ্টেশন্ হইতে অতি নিকটবর্ত্তী বাসায় ফিরিয়া গিয়া সে ডাকিল, মা? মা কোথায় গো?

এই সময়টায় প্রত্যহই সে জল খাইবার জন্য একবার করিয়া বাসায় আসে; অতএব তাহার ছোট বোন সময় বুঝিয়া তাহার জন্য অতি যত্নে পেঁপের খোসা ছাড়াইতেছিল। মেয়েটি সদ্য বিবাহিতা। মুখ তুলিয়া সে কহিল, কি মাষ্টার মশাই, আপনার সময় হলো এতক্ষণে!

থাম্ থাম্, আর ঠাট্টা করতে হবে না, মুখপুড়ি!

মাষ্টার মশাই বলা কি ঠাট্টা? গাধা বললেই বুঝি ভাল হতো?

সুকান্ত কহিল, ভারি মুখ হয়েছে তোর, সত্যি যেদিন মাষ্টার মশাই হবো সেদিন এই শর্ম্মার পায়ে ধরে' সাধাসাধি করতে হবে ফ্রী পাশের জন্যে!

ইস্, অত অংখার করিসনে দাদা!

দেখিস্, পায়ে পড়ে' কাঁদতে হবে। এই পায়ে, এই ছাখ্—

মনু চীৎকার করিয়া উঠিল, মা, এই ছাখো দাদা আবার আমায় লাথি দেখাচ্ছে, ভাল হবে না কিন্তু বলে' দিচ্ছি।

মুখ বিকৃত করিয়া সুকান্ত বলিল, তোর বর ত গরীব!

বেশ, গরীব আছে আছে, তোমার খায় না ত সে? যা, আমি তোর পেঁপে ছাড়াতে পারব না।—বলিয়া মনু উঠিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই খপ্ করিয়া তাহার একটা হাত সুকান্ত ধরিয়া ফেলিল। তারপর তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া বলিল, ওরে বাপরে, রাগ দেখ মেয়ের!

স্বামীর প্রতি কটাক্ষে রাগে মনুর চোখে জল বাহির হইয়া আসিয়াছিল। ভাইকে আঁচ্ড়াইয়া, খিম্‌চি কাটিয়া, কিল মারিয়া, চুল ধরিয়া টানিয়া কিছুতেই যখন সে শান্ত হইল না, তখন সে সুকান্তর একটা হাত ধরিয়া কামড়াইয়া দাঁতের দাগ বসাইয়া দিল।

সুকান্ত হাসিয়া বলিল, যাই ডাক্তারখানায়, তোর দাঁতের যে বিষ, হয় ত আবার গোঁদলপাড়ায় গিয়ে—

চোখ মুছিয়া মনু এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আমার দাঁতে বিষ? তোর বউ এলে দেখব তার দাঁতে কত মধু থাকে!

এমন সময় মহামায়া বাহির হইয়া আসিলেন। শুদ্ধ শুচি তাঁহার মূর্ত্তি, পরণে গরদের থান, মাথার মাঝখানে সাদা একটি সিঁথি, দেখিয়া মনে হয় এই বোধ করি সেদিনও সিঁদুরের বিন্দু ওই সিঁথিটিতে শোভা পাইত। চোখ দুটি তাঁহার স্নেহকোমল; সে-চোখে একটি উদাস এবং করুণ আনন্দ স্বপ্নস্মৃতির মত জড়াইয়া রহিয়াছে। সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় তাঁহার কাছে দাঁড়াইলে মাথা নত হইয়া আসে। মৃদুকণ্ঠে আহ্নিকের মন্ত্র শেষ করিয়া তিনি কহিলেন, আমি একদণ্ড না থাকলেই তোদের ঝগড়া মারামারি,—মনু খেতে দিলি সুকান্তকে?

মাকে দেখিয়া তাহারা একটি মুহূর্ত্তেই শান্ত হইয়া গিয়াছিল। সুকান্ত শুধু কহিল, দেবে কেমন করে'? রাগে মেয়ে যে হাঁসফাঁস কচ্ছে!

ঝঙ্কার দিয়া এবার মন্থু বলিয়া উঠিল, ও কেন বল্‌বে মা, আমার বর গরীব, আমার দাঁতে বিষ, আমার—

মহামায়া স্নিগ্ধ স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন, তুই রাগিস বলেই ত বলে!

রাগের কথা বললে কা'র মাথা ঠাণ্ডা থাকে?

সুকান্ত মায়ের দিকে তাকাইয়া এমন ভাবে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল যে, এবার অকস্মাৎ গভীর লজ্জায় মন্থু মাথা হেঁট না করিয়া থাকিতে পারিল না। কোনো রকমে পেঁপেগুলি থালায় সাজাইয়া দিয়া আড়ালে গিয়া কাঁদিবার জন্ত তাড়াতাড়ি সে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

সুকান্ত খাইতে আরম্ভ করিলে মহামায়া তাহার কাছে বসিলেন। সুকান্ত কহিল, আমার আর বেশিদিন মাষ্টারী করতে হলো না মা!

মহামায়া কহিলেন, কি রকম?

নতুন মাষ্টার মশাই আজ সকালে এসে পৌঁছেচেন।

ও, তাই নাকি? বাঁচ্‌লাম। ভয়ে তটস্থ হয়ে আছি; দায়িত্বের কাজ, ভাগ্যি এ কদিনে কোনো বিপদ আপদ ঘটিয়ে ফেলিসনি!

সুকান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি ত খুসী হবেই, তোমার ছেলের ঘাড় থেকে বোঝা নেমে গেল! আমি কিন্তু বেশ ছিলাম মা, সবাই মান্য করে চল্‌ত।

মান্য যারা সত্যিই করে, তারা মান্য করবেই রে। বেশ বেশ, মাষ্টার মশায়ের নাম কি?

নাম এখনো জিজ্ঞেসা করিনি। আমার সঙ্গে কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেছে মা।

মহামায়া কহিলেন, তুইও একদিন মাষ্টার হবি, সেই আশায় আমি বেঁচে থাকব, দিন গুণ্‌ব। এইবার কোম্পানী থেকে তোর মাইনে বাড়িয়ে দিক্ না, এক বছর ত হলো?

বাড়িয়ে দেবার কথা চল্‌চে।—সুকান্ত বলিল।

মহামায়া কহিলেন, মাষ্টারের সঙ্গে কে কে এসেছে?

কেউ না, তিনি একাই। আমি জিজ্ঞেসা করেছিলাম, বললেন, চাকরটা ছাড়া তাঁর সঙ্গে আসবার আর কেউ নেই!

দূর হোক গে ছাই, বৌ-ঝি এলে কেমন হতো! এই মাঠের মাঝখানে একা থাকা যে কী কষ্টকর! আগেকার মাষ্টারের বাড়ীর মেয়েরা এসে পড়লে বাঁচি আমি। বিয়ে দিতে আজো গেল, কালও গেল!

সুকান্ত কহিল, আমিও দিন গুণ্‌চি, এখনো কুড়িদিন তাঁর আসবার দেরী রয়েছে। কিন্তু তাঁর চেয়ে এ লোকটি অনেক ভাল মা।

বেশ, তোর কাছে ভাল হলেই ভাল!

সুকান্ত একটু উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, আমাকে বলেছেন রাতের ডিউটি আমার করবার দরকার নেই, তিনিই করবেন। রাতে তাঁর নাকি ঘুম না-হওয়ার রোগ আছে মা।

মহামায়া কহিলেন, সামান্য দু' ঘণ্টার মধ্যে তোর সঙ্গে এত আলাপ হয়ে গেল?

সুকান্ত আত্মগৌরবের হাসি হাসিয়া কহিল, আমি বললাম, আপনার শরীর তেমন ভাল নয়, চাকর ছাড়া অন্তত আর একজন কাউকে আন্‌লে পারতেন? উনি হেসে বললেন, আর কে আসবে বল, দু'টি জিনিস আমার সম্বল,—চাকর আর চাকরি।

বঁটিখানা টানিয়া কুটনো কুটিতে বসিয়া মহামায়া বলিলেন, সংসার করেনি, বুঝতে পেরেছি। অমনি ছন্নছাড়া লোক আজকাল মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে!

মায়ের তাচ্ছিল্যে মনে মনে একটু আহত হইয়া সুকান্ত কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল; তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, একদিন কিন্তু ওঁকে নেমন্তন্ন করে' খাওয়াতেই হবে মা, তা বলে রাখছি।

তা বেশ ত, আগে থাকতে বলিস্। এ আর এমন কি কথা!

সুকান্ত খুসী হইয়া বাহির হইয়া গেল।

মাষ্টার মশাইয়ের কোয়ার্টার খুব কাছেই। মাঝামাঝি খানিকটা রেলওয়ে ইয়ার্ড পার হইয়া সুকান্ত সোজা ভিতরে ঢুকিয়া দালানে উঠিয়া আসিল। সাত নম্বর আপ্ এক্‌স্‌প্রেস্‌কে বিদায় দিয়া মাষ্টার মশাই তখন ধীরে সুস্থে একখানি ডেক্ চেয়ারে বসিয়া একটি বর্ম্মা চুরুট টানিতেছিলেন। বয়স তাঁহার পঁয়তাল্লিশের বেশী হইবে না, বলিষ্ঠ ও সৌম্য মূর্ত্তি। কানের পাশে দুইটি রগের চুল একটু একটু পাকিয়াছে। সুকান্তকে দেখিয়া তিনি স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন, তোমার জন্তেই বসে আছি

সুকান্ত, ডাক্তারবাবু এতক্ষণ ছিলেন, এইমাত্র তিনি,—ওরে রামলগন ?

রামলগন তাঁহার হিন্দুস্থানী চাকর, কিন্তু সে বাঙালী বনিয়া গিয়াছে। রান্না করিতে করিতে সে আসিয়া দাঁড়াইল। মাষ্টার মশাই বলিলেন, ডেক্‌চিতে সরপুরিয়া আছে, ছোটবাবুকে এনে দে, অম্‌নি চা তৈরী করে' নিয়ে আয়।

সুকান্ত ব্যস্ত হইয়া কহিল, আমি এইমাত্র বাসা থেকে খেয়ে এলাম যে মাষ্টার মশাই, তা ছাড়া চা খাওয়া—

মাষ্টার মশাই তেমনি করিয়া হাসিয়া তাহার পিঠে মৃদু আঘাত করিয়া প্রতিবাদ করিতে বারণ করিলেন। কথা তিনি অল্প বলেন, এবং ধীরে ধীরে বলেন। তাঁহার দিকে একবার তাকাইয়া রামলগন চলিয়া গেল।

চুরুটে একটা টান্ দিয়া তিনি কহিলেন, আমি এখানকার কিছুই বিশেষ চিনিনে, এদিকে নাকি কোথায় এক যোগিনীর আশ্রম আছে সুকান্ত ?

হ্যাঁ, সে ওই পশ্চিম দিকে মাঠ পার হয়ে যেতে হয়, অনেকখানি পথ। আপনি কি অতদূর হাঁট্‌তে পারবেন ?

কি আছে সেখানে ?

মেয়েরা থাকেন, তাঁদেরই আশ্রম। সন্ধ্যের সময় ঠাকুরের আরতি হয়। মা মাঝে মাঝে মেয়েদের দেখতে যান্, মন্টুও যায়। আপনি যাবেন একদিন ? আপনি এসেছেন খবর পেলে যোগিনী-মা নিজেই আসবেন আপনার কাছে চাঁদা চাইতে। চাঁদা উঠিয়েই ওঁদের চলে কিনা !

মাষ্টার মশাই আর একবার চুরুটে টান্ দিতে গিয়া কাশিয়া ফেলিলেন। কাশিতে কাশিতে তাঁহার মুখ-চোখ টক্‌টকে রাঙা হইয়া উঠিল। কাশি যখন থামিল তখন দেখা গেল তাঁহার মুখ দিয়া কয়েক ফোঁটা রক্ত উঠিয়া আসিয়াছে।

শঙ্কাব্যাকুল দৃষ্টিতে সুকান্ত তাঁহার দিকে তাকাইয়া ছিল। মাষ্টারবাবু উঠিয়া মুখ ধুইয়া আবার আসিয়া বসিতেই সে ভয়ত্রস্ত কণ্ঠে কহিল, ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, তখন বললেন না কেন আপনার অসুখের কথা ? আমি ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে আন্‌ব, মাষ্টার মশাই ?

মাষ্টার মশাই হাসিয়া কহিলেন, ভয় নেই, এ এমনিই, তুমি ব্যস্ত হয়ো না সুকান্ত।

সুকান্ত কহিল, রোগ ত সারানো দরকার !

এ ত' রোগ নয় সুকান্ত, এ অসুখ। এ সারবেও না, বাড়বেও না।

ভেতর থেকে রক্ত উঠলো যে মাষ্টার মশাই !

মাষ্টার মশাই তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, বদ্‌রক্ত কিনা, তাই ভেতরে ওর জায়গা নেই !

চিন্তিত হইয়া সুকান্ত কহিল, কিন্তু এমনি ক'রে আপনি ভুগবেন ?

ভুগিনি একদিনও, এ অসুখের যন্ত্রণা নেই সুকান্ত, আছে দুঃখ। রোজ একবার কি দু'বার করে' এই কাশি ওঠে !

আপনাকে দেখে কিন্তু বোঝবার যো নেই, যে, এই অসুখ আপনার আছে।

মাষ্টার মশাইয়ের মুখ বিচিত্র হাসিতে একটু একটু করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, বোঝবার যো নেই, না ?

এমন সময় রামলগন চা ও মিষ্টান্ন আনিয়া রাখিল। মাষ্টার মশাই এক পেয়ালা চা ও এক প্লেট্ মিষ্টান্ন সুকান্তর দিকে সরাইয়া দিয়া নিজেও লইলেন। তারপর কহিলেন, ঠিক বলেছ, বোঝবার যো নেই, এ বোধ হয় এমনিই, ভেতরের অসুখ ভেতরেই থাকে।

কথাটি ভাল করিয়া তলাইয়া সুকান্ত বুঝিল না বটে কিন্তু মনে মনে কথাগুলিকে সে আস্বাদন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে চা পান করিয়া এক সময় মাষ্টার মশাই কহিলেন, তুমি এত ছোটবেলায় চাকরী করতে এলে কেন সুকান্ত ? পড়াশুনো কি তোমার ভাল লাগছিল না ?

সুকান্ত একটু করুণ হাসিয়া কহিল, আপনাকে কি আর বুঝিয়ে বল্‌তে হবে কেন এর মধ্যেই চাকরী করতে এলাম ?

কিন্তু এতে ত তোমার নিজের উন্নতি হবে না, হবে তোমার চাকরির উন্নতি।

সুকান্ত আবার একটু হাসিয়া কহিল, সংসার তাইতেই সুখী হবে মাষ্টার মশাই !

চা খাওয়া শেষ করিয়া মাষ্টার মশাই তাহার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। শীত শেষ হইয়া তখন সবেমাত্র বসন্তকাল পড়িয়াছে। মাথার উপরে মধ্যাহ্নের

সূর্য্য প্রখর রৌদ্র বর্ষণ করিতেছিল। মাঠের চারি দিকে ধূলি-জঞ্জাল উড়াইয়া এলোমেলো বাতাস থাকিয়া থাকিয়া হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

প্লাট্‌ফরম্ পার হইয়া আপিস ঘরে ঢুকিয়া তিনি কহিলেন, এবেলা তুমি আমার এখানেই খাবে সুকান্ত।

সুকান্ত ব্যস্ত হইয়া কহিল, বাসায় রান্না হয়েছে, আজ থাক্ মাষ্টার মশাই। খাওয়া ত আছেই।

আচ্ছা, তবে আজ রাত্রে খেও আমার সঙ্গে, কেমন? —বলিয়া তিনি তাহাকে কাছে লইয়া একান্ত সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন, আমার কাছে কোনো দিন কিছু লজ্জা করো না সুকান্ত!

ষ্টেশনের জন দুই কেরাণী এবং জন চারেক চাপরাশি ও কুলী আসিয়া তাঁহার কাছে কাজ বুঝাইয়া দিল এবং বুঝিয়া লইল। সুকান্ত ইতিমধ্যে দুই তিনখানা খাতা নাড়াচাড়া করিয়া কয়েকটা সই সাবুদ ও রবার-ষ্ট্যাম্প বসাইয়া দিল। তার পর একখানি কাগজে কি যেন লিখিয়া সে সুমুখে ধরিয়া বলিল, এতে একটা সই করে' দিতে হবে মাষ্টার মশাই।

সই? বলিয়া মাষ্টার মশাই তাহার দিকে একবার তাকাইলেন। এই পুত্রতুল্য তরুণটিকে মনোযোগ দিয়া কোনো কাজ করিতে দেখিলেই তাঁহার ভিতর হইতে কেমন একটি কৌতুকের হাসি বাহির হইয়া আসিতেছে। এত অল্পবয়স্ক বালককে লইয়া তিনি গম্ভীর হইয়া কাজ চালাইবেন কি করিয়া? তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে এই ছেলেটিই কি ষ্টেশন-মাষ্টারের কাজ চালাইতেছিল? আশ্চর্য্য!

কাগজখানি লইয়া তিনি একটি সই করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। তার পর কহিলেন, এবার তুমি বাড়ী যাও সুকান্ত।

সুকান্ত মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইতেই তিনি পুনরায় কহিলেন, চান করে' খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমোওগে। মুখ তোমার ভারি শুকিয়ে গেছে।

সুকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, অনেক কাজ রয়েছে যে আমার?

থাক্ না, আমি কি করতে আছি এখানে?

ইহার উপর আর কথা চলে না। সুকান্ত চুপ করিয়া রহিল। একজনের কাজ যে নিঃস্বার্থভাবে আর একজন করিয়া দেয়—এমন উদাহরণ সচরাচর তাহার চোখে পড়ে নাই। সে শুধু মৃদুকণ্ঠে কহিল, আর একটু থাকি, এখনো আমার ক্ষিধে পায়নি।

ষ্টেশনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। একখানা ডাউন্ ট্রেণ্ আসিবার সময় হইয়াছে। মাষ্টার মশাই খাতাপত্র লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। লাল এবং সবুজ দুইখানা ফ্ল্যাগ্ হাতে করিয়া সুকান্তও তাঁহার পিছনে পিছনে বাহির হইয়া আসিল। চাপরাশিটা গিয়াছিল কেবিনে সিগ্‌নাল্ ডাউন্ করিতে; সুকান্ত লাল ফ্ল্যাগটা উড়াইয়া ষ্টেশন্‌কে সতর্ক করিয়া দিল। মিনিট খানেক পরেই দেখা গেল, অতিকায় বন্য জন্তুর মত ট্রেণখানা হু হু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

গাড়ী আসিয়া মিনিট তিনেক দাঁড়াইল, মাষ্টার মশাই ডাক এবং মালের কাজ সারিয়া লইলেন। জনকয়েক যাত্রী উঠা-নামা করিল, গোটা দুই ফিরিওয়ালা পসরা সাজাইয়া হাঁকাহাঁকি করিয়া গেল, তার পর আবার বাঁশী বাজাইয়া ও সবুজ নিশানা উড়াইয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

ধীরে ধীরে ষ্টেশন আবার জনবিরল হইয়া উঠিল। মাষ্টার মশাই ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, চলন্ত ট্রেণের দূর পথের দিকে তাকাইয়া তখনও সুকান্ত অন্যমনস্কভাবে ফ্ল্যাগ্ উড়াইতেছে। তাহার পিঠের উপর অতি ধীরে হাত রাখিয়া তিনি কহিলেন, কি ভাবচ সুকান্ত?

সুকান্ত পিছন ফিরিয়া সলজ্জ একটু হাসিল, বলিল, এম্‌নি, গাড়ী চল্‌তে দেখলে আমার বেশ লাগে।

সেদিন দুপুর বেলায় ভিতরে আসিয়া সুকান্ত কহিল, চলুন মাষ্টার মশাই, আমাদের রান্না হয়ে গেছে।

মাষ্টার মশাই চুরুটটা নামাইয়া রাখিয়া ইজিচেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর হাসিয়া বলিলেন, চল, ভাল রান্না অনেক দিন খাওয়া হয়নি, দেখি তোমরা কি রকম নেমন্তন্ন খাওয়াও।

সুকান্ত বিনীতকণ্ঠে কহিল, কিছুই না, অতি সামান্য—

মাষ্টার মশাই তাহার পিঠ চাপড়াইয়া পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, অতি সামান্য, না? আচ্ছা, তোমাদের সামান্যটাই একবার চেখে আসা যাক্ সুকান্ত। কিন্তু নেমন্তন্ন করে' নিয়ে গিয়ে সামান্যই বা খেতে দেবে কেন বল ত? 'সামান্য' আমি খাবো না সুকান্ত!

দুইজনেই বিমল আনন্দে হাসিয়া উঠিলেন। সুকান্তর বিনয়, সৌজন্য, সঙ্কোচ যেন একটি মুহূর্তেই ঝড়ে উড়িয়া গেল।

ব্রাহ্মণের ঘর। বাসায় ঢুকিয়া তিনি একবার পা ধুইয়া লইলেন। সুকান্ত গামছা দিল। তিনি পা মুছিয়া আসনে গিয়া বসিলেন। ষোড়শ উপচারে অন্ন ও ব্যঞ্জন থালায় করিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, মাষ্টার মশাই তাহার দিকে তাকাইয়া দিশেহারা হইয়া গেলেন। মনু পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। মহামায়া আসিয়া আরও বার দুই পরিবেশন করিয়া ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন। সেই গিয়া ঢুকিলেন, আর বাহির হইলেন না।

মাষ্টার মশাই সস্নেহে মনুকে কাছে ডাকিলেন। পাখা রাখিয়া মনু তাঁহার কাছে সরিয়া আসিতেই তিনি আদর করিয়া তাহাকে পাশে বসাইলেন। মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, তোমার খাওয়া হয়েছে মা?

আমি মা'র সঙ্গে বস্‌ব।—মনু কহিল, আপনি খেতে বসুন।

তোমার ভাল নামটি কি?

মণিমালা দেবী।

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মাষ্টার মশাই বলিলেন, একে মণিমালা, তায় আবার দেবী? ভয় পাবার কথা যে!

মনু ও সুকান্ত ছেলেমানুষের মত হাসিয়া উঠিল।

সুকান্তর সঙ্গে তিনি তার পর খাইতে বসিলেন। খাইতে খাইতে গল্প করিয়া মনু তাঁহার পরম বন্ধু হইয়া উঠিল। কথা রহিল, মনুর শ্বশুরবাড়ী গিয়া কোনো সময় তিনি জামাইকে দেখিয়া আসিবেন।

খাওয়ার শেষাশেষি মনু এক-সময় উঠিয়া ভিতরে গেল, ভিতর হইতে কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হইয়া সুকান্তর সহিত চোখচোখি করিয়া কি যেন একটা ইঙ্গিত করিল। ইঙ্গিত করিয়া একবার পাশের ঘরে ঢুকিল এবং কয়েক মুহূর্ত পরে আবার বাহির হইয়া আসিল।

উঠিবার আগে মনু কহিল, আপনার পেট ভরল না মাষ্টার মশাই।

সুকান্ত কহিল, তুই যে রকম বকাচ্ছিলি, খাওয়ার সময়ই পেলেন না। বা রে, আমার দোষ হলো বুঝি?

মাষ্টার মশাই হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনু কহিল, তাড়াতাড়িতে কী যে খেলেন, মা এসে একবার দেখতেও পারলেন না, তাঁর শরীর ভাল নেই, শুয়ে পড়েছেন।

সুকান্ত কহিল, শুয়ে পড়েছেন? কেন রে?—বলিয়া সে ভিতরে গেল।

গলা নামাইয়া মনু কহিল, বোধ হয় কোথাও ফিক্ ব্যথা ধরেছে!

মাষ্টার মশাই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ব্যথা? অসুখ শরীর বুঝি?

না, অসুখ ত মা'র কিছু নেই!

হাত ধুইয়া বাহির হইয়া যাইবার আগে মাষ্টার মশাই কহিলেন, ভয় নেই, দাঁড়াও, ডাক্তারবাবুকে আন্‌ছি, ষ্টেশনেই তিনি আছেন বোধ হয়।—বলিতে বলিতে তিনি বাহিরের দরজায় পা বাড়াইতেছিলেন, এমন সময় ভিতর হইতে সুকান্ত বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, মা বললেন ডাক্তার আনবার দরকার নেই, এখুনি সেরে যাবে, এ রকম তাঁর হয় মাঝে মাঝে।

মাষ্টার মশাই কহিলেন, বাড়চে, না কম্‌চে একটু একটু?

সুকান্ত আবার গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসিল। বলিল, বললেন এ কিছু না, এখুনি সেরে যাবে। মনু, মা ভয়ানক রাগ করেছে তোর ওপর, তোর কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই,—তাঁর এমন কিছুই হয়নি অথচ তুই বল্‌লি—

মনু কহিল, আমি কি করব? মুখ থুব্‌ড়ে শুয়ে আছে দেখেই না এসে বললাম?

আচ্ছা, আমি ষ্টেশনে আছি, খবর দিও মনু দরকার হলে। বলিয়া মাষ্টার মশাই বাহির হইয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর মনু ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, লোকে যখন খেতে বসে তখন কেউ গিয়ে শোয়? মা যেন কী!

সুকান্ত কিছুই না বলিয়া বাহির হইয়া গেল। মায়ের এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে মনটা তাহার যেন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। মা যে তাহার কাছে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা ও সৌজন্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!

দিন চলিয়া যায়।

বিকাল বেলায় সাধারণতঃ মাষ্টার মশাইয়ের হাতে

কোনো কাজ থাকে না। রেলের লাইনের ধার দিয়া তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে প্রত্যহ অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া যান্; নির্জ্জনে বেড়াইতে তাঁহার ভাল লাগে। প্রায় আধ মাইল দূরে একটা বড় সাঁওতাল দীঘির ধারে গিয়া তিনি যেন ক্লান্ত হইয়াই বসিয়া পড়েন। দেখিতে দেখিতে জলের উপর ছায়া ফেলিয়া সূর্য্যাস্তের আরক্ত আকাশ একটু একটু করিয়া অন্ধকার হইয়া আসে।

শহরে গিয়া তিনি দুই একদিন ঘুরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু শহরে যাইতে তাঁহার ভাল লাগে না। শহরের দোকান বাজার এবং লোকজনের কোলাহলের মাঝখানে মানুষের যে লোলুপ ক্ষুধার্ত্ত মূর্ত্তি তাঁহার চোখে ভাসিয়া ওঠে, তাহাতে তিনি দিশাহারা হইয়া যান্।

এদিকে কোথায় ধানের একটা কল্ আছে। দিনমজুরি করিয়া সাঁওতালি স্ত্রী পুরুষ যখন সারাদিনের পর পরিশ্রান্ত পায়ে মাঠের পথ ধরিয়া গ্রামের দিকে চলিতে থাকে, তখন তাহাদের দিকে তাকাইয়া থাকিতে মাষ্টার মশাইয়ের মনটি একটি বেদনার আনন্দে দোল খাইতে থাকে।

সেদিন তিনি ষ্টেশন হইতে নামিয়া অন্য পথে চলিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া যোগিনীর আশ্রম হইতে তাঁহার কাছে বার বার নিমন্ত্রণ আসিতেছিল। যোগিনী-মা আসিয়া একদিন তাঁহার নিকট হইতে চাঁদাও লইয়া গিয়াছেন। সেখানে একবার না গিয়া আর তাঁহার চলিতেছিল না। সুকান্ত তাঁহার সঙ্গে যাইবে বলিয়াছিল,—তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেও ভাল হইত; কিন্তু সে তখন আপিস-ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিল। অগত্যা মাষ্টার মশাই একাই বাহির হইয়া আসিলেন; প্লাটফরম্ ছাড়াইয়া, রেলওয়ে ইয়ার্ড্ পার হইয়া সুমুখের উঁচু পাকা সড়কের উপর উঠিলেন।

সড়ক অতিক্রম করিয়া তিনি যখন মাঠে নামিলেন, পশ্চিম দিকে শালবনের মাথায় তখন রাঙা সূর্য্য হেলিয়া পড়িয়াছে। ঘন নীল পরিচ্ছন্ন আকাশ সূর্য্যাস্তের আভায় ঈষৎ ধূসর হইয়া উঠিয়াছিল। দূরে দুম্‌কার অস্পষ্ট পাহাড়ের শ্রেণী এত দূর হইতেও দেখা যাইতেছে। মাষ্টার মশাই প্রান্তরের উপর দিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন; তাঁহার পথের দুই পাশে নূতন বসন্তকালের অনামা ও অখ্যাতনামা নানা রকমের ঘাসের ফুল ফুটিয়া বাতাসে মৃদু মধুর গন্ধ বিলাইতেছিল।

অনেকক্ষণ হইতে যে অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তিটি তাঁহার সুমুখের পথে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, তাহা এতক্ষণে স্পষ্ট হইয়া তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি একবার বিপন্ন হইয়া ইতস্ততঃ করিলেন, মুখ ফিরাইয়া একবার অন্য পথে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কাঁটাগাছের ঝোপ ও ফণী-মনসার জঙ্গলে চারি দিক আকীর্ণ দেখিয়া তিনি পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইতে পারিলেন না। দেখিলেন, মহিলাটিও সেই অবস্থায় পড়িয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এমনি বিমূঢ় অবস্থার মধ্যে নিরুপায় হইয়া মাষ্টার মশাই একবার মুখ তুলিলেন। কিন্তু মুখ তুলিয়া তিনি আর সহসা দৃষ্টি নামাইতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শান্ত ও কোমল চক্ষু দুইটি বিচিত্র ও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব একপ্রকার বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। পাছে এই নির্জ্জন ও নিঃসঙ্গ পথের প্রান্তে বাক্যালাপ করিলে এই নিরাভরণা শুভ্রবেশিনী ভদ্র-মহিলার কোনোওরূপ অসম্মান ঘটে, এ কারণে তিনি নীরবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার জন্য আর একবার পা বাড়াইলেন; কিন্তু চলিতে গিয়াই তাঁহার অবাধ্য কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল, এ কি, এদিকে যে? এ দেশে কোথায়?

মহিলাটি চোখ নামাইয়া মাথায় আর একটু ঘোমটা টানিয়া দিলেন। তাঁহার আপাদমস্তক অস্বাভাবিক আতঙ্কে ও লজ্জায় কেমন করিয়া যে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহা মাষ্টার মশাই এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া কাঁটার জঙ্গলের উপর উঠিয়া গিয়া তিনি যাইবার পথ করিয়া দিলেন।

ঘোমটার ভিতর হইতে মুখ না তুলিয়া কম্পিত ও বিপন্ন কণ্ঠে মহিলাটি আস্তে আস্তে বলিলেন, আমি সুকান্তর মা, আপনি আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন না, ছেলে-পুলেরা রয়েছে এখানে…

ক্ষণেকের জন্য মাষ্টার মশাই একটু অপ্রস্তুত হইলেন। তার পর বলিলেন, আমাকে 'আপনি' বলতে পারো, কিন্তু আমি তোমাকে 'তুমিই' বলব মহামায়া। ভাবচি,

পনেরো বছর পরে তোমাকে এত সহজে কি করে' চিন্‌তে পারলাম! কি আশ্চর্য্য, আমিই আবার এখানকার ষ্টেশন্‌-মাষ্টার হয়ে এসেছি? এ কি নিয়তি?

মহামায়া কথা কহিলেন না। ফোয়ারার মুখ হইতে উচ্ছ্বসিত বারিধারার ন্যায় মাষ্টার মশাই বলিলেন, হ্যাঁ, সুকান্তকে দেখে তোমারই কথা আমার মনে হয়েছিল, তাকে আমার মন যেন চিন্‌তে পেরেছিল,—আশ্চর্য্য!

নির্ব্বাক ও নিশ্চল হইয়া মহামায়া ক্ষণকালমাত্র দাঁড়াইলেন; তার পরই আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে ইতস্ততঃ পা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের দিকে চলিতে সুরু করিয়া দিলেন। একটা ভয়ানক বিপদ হইতে তিনি যেন আত্মরক্ষা করিয়া পলাইতেছিলেন—বোধ করি অনেকটা এমনিই।

পথ হারাইয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া মাষ্টার মশাইও চলিতে লাগিলেন। কি করিয়া ও কি বলিয়া যে এই দুইটি মিনিট কাটিয়া গেল, তাহাই একবার ভাবিতে গিয়া তাঁহার মাথার মধ্যে গোলমাল হইয়া গেল। উন্মত্ত আনন্দে পাগলের মত তিনি অস্থির হইয়া একবার হাসিয়া উঠিলেন। বহুকাল দুঃখভোগের পর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তুকে অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে পাইলে বেদনা ও আনন্দে মানুষের যাহা হয়, মাষ্টার মশায়ের তাহাই হইয়াছিল।

পিছন ফিরিতে যেন তাঁহার সাহস হইতেছিল না, কিছুদূর গিয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রান্তরের উপরে পূর্ব্ব দিক হইতে সন্ধ্যার ঘনকৃষ্ণ ছায়া ইহারই মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে। দূরের বস্তু আর কিছুই দেখা যায় না, তবু তিনি স্থিরনিশ্চয় করিয়া বুঝিলেন, মহামায়া চলিয়া গিয়াছেন। ছি ছি, এ তিনি করিলেন কি? যুবজনোচিত এই তারল্য তাঁহার আসিল কোথা হইতে? পথের উপরে ভদ্রমহিলাকে থামাইয়া আলাপ করিবার মত মূঢ়তা তাঁহার কোথায় আত্মগোপন করিয়া ছিল? পূর্ব্ব-পরিচয়? প্রেম? তাঁহার মত প্রবীণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে জনসমাজকে লুকাইয়া এই কদর্য্য কুৎসিত চৌর্য্যবৃত্তি—ইহার নাম প্রেম? লাম্পট্য তবে কাহাকে বলে? সুযোগ পাইয়া এক শুদ্ধচিত্তা সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিধবাকে অপমান করিবার কি অধিকার তাঁহার ছিল?

হঠাৎ ভিতর হইতে তাঁহার কাশি উঠিয়া আসিল। কাশিতে কাশিতে তিনি বসিয়া পড়িলেন। এই কাশি যেন দানবের মত তাঁহার বুকের ভিতর বাসা বাঁধিয়া আছে। জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার ভিতরে নাড়িভুঁড়ি মুচড়াইয়া, ওলোট-পালট করিয়া, দলিত ও মথিত করিয়া দাপাদাপি সুরু করিল। কাশি থামিবার সঙ্গে সুড় সুড় করিয়া মুখের ভিতর হইতে অন্ধকারে রক্ত গড়াইয়া আসিল। যাক্, তিনি বাঁচিলেন, আজকে আর তাঁহাকে কাশিতে হইবে না। তিনি মুখ মুছিয়া সুস্থ হইয়া লইলেন।

যোগিনীর আশ্রমে যাইবার উৎসাহ এবং অভিরুচি তাঁহার চলিয়া গিয়াছিল। পথ ভাঙিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিয়া প্লাটফরমের উপর তিনি খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াইলেন। সুকান্ত কাজ শেষ করিয়া বোধ করি বাসায় গিয়াছে, রাত এগারোটার আগে সে আর ফিরিবে না। আপ্‌ ট্রেণখানা আসিয়া পৌঁছিতে তখনও অনেক বিলম্ব ছিল। টিকিট-ঘরের জানালাটি বন্ধ করিয়া কেরাণীটি বাসায় খাইতে গিয়াছে; চাপরাশি এবং কুলী কেহ কোথাও নাই,—ষ্টেশন খাঁ খাঁ করিতেছিল। মাষ্টার মশাই নিঃশব্দে আসিয়া একখানি বেঞ্চির উপর ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন। এ চাকরি আর তিনি বেশী দিন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। চাকরি করিয়া সংস্থান করিবার কোনও প্রয়োজন তাঁহার ছিল না, শুধু দিনের পর দিন কাটানই সংসারে তাঁহার একমাত্র কাজ। সে কাজ তাঁহার এইবার হয় ত ফুরাইবে! কোথাও কোনো দূর নদীতীরে অথবা কোনো নিভৃত পল্লীচ্ছায়ায় গিয়া তিনি এই ভগ্ন জীবনের বাকি দিনগুলি শান্তিতে কাটাইয়া দিবেন। কেহ জানিবে না, কেহ শুনিবে না, একদিন মরণ আসিয়া চুপি চুপি তাঁহার দ্বারে হাত পাতিয়া অঞ্জলি চাহিবে!

অনেক রাত্রে তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আপিস-ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, রামলগন ইতিমধ্যে কখন্‌ আসিয়া তাঁহার খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া গেছে। তাহারই পাশে টেবিলের উপর আলোর সুমুখে তাঁহারই নামে একখানি চিঠি পড়িয়া আছে। চিঠিখানি খুলিয়া তিনি পড়িয়া দেখিলেন, এখানকার পুরাতন ষ্টেশন-মাষ্টার রজনীবাবু লিখিয়াছেন, আগামী সোমবার প্রাতে তিনি

সপরিবারে আসিয়া আবার কাজ হাতে লইবেন। ছুটি তাঁহার ফুরাইয়াছে।

চিঠি রাখিয়া মাষ্টার মশাইয়ের দৃষ্টি পড়িল ঘরের ওপাশে জানালার কাছে। ইজি-চেয়ারে শুইয়া সুকান্ত ইতিমধ্যে কখন্ অচেতন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমের জানালা দিয়া শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো আসিয়া তাহার নিষ্পাপ ও তরুণ সুন্দর মুখখানিকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ঘুমাইলে সুকান্তর মুখখানি সুস্মিত হইয়া উঠে।

অপলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া তিনি ভাল করিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য ধীরে ধীরে কাছে সরিয়া আসিলেন। কাছে আসিয়া তিনি চেয়ারের পাশে মেঝের উপরেই নিঃশব্দে বসিয়া পড়িয়া সুকান্তর হাতখানির উপর নিজের হাত রাখিলেন। মনে হইল, এই বালকটির মুখখানি যুগ-যুগান্ত কাল ধরিয়া তাঁহার অতি-পরিচিত—ইহার চেয়ে বড় আত্মীয় সংসারে আর তাঁহার কেহ নাই! ভাবিতে ভাবিতে ভিতরটা তাঁহার উদ্বেল হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে রাত্রির নিভৃত নির্জ্জনে তাঁহার কাঙাল ও তৃষিত দুইটি চক্ষু জলে-জলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল।

আবার ধীরে ধীরে তিনি এক সময় উঠিয়া গেলেন।

পরদিন ষ্টেশন্ হইতে বাসায় ফিরিয়া সুকান্ত পূজার ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া খবর দিল, মা, মাষ্টার মশায়ের বড় অসুখ।

আহ্নিক করিতে করিতে মহামায়া তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন। সুকান্ত কহিল, ডাক্তারবাবু দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তুমি সাবু তৈরী করে' মন্নুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও মা।

পূজা শেষ করিতে মহামায়ার অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। সুকান্ত শঙ্কাকুল কণ্ঠে পুনরায় কহিল, জ্বরে প্রায় বেহুঁস, কেবল কাশি উঠ্‌চে, তার সঙ্গে চাপ চাপ রক্ত!

আচমন করিয়া এবার মহামায়া কহিলেন, এ রোগে ত মানুষ বাঁচে না! সাবু করে' দিতে হবে? কেন, রামলগন রয়েছে না?

রামলগন ঘুরে ঘুরে ফাই-ফরমাস খাট্‌চে যে।

মহামায়া কহিলেন, এবার বুঝি আমাদের রুগীর পথ্যি যোগাতে হবে? সংসার যে করেনি, বুড়ো বয়সে তার এই শাস্তিই হয়। বলি, তোর এত মাথা ব্যথা কেন রে সুকান্ত? রোগ হয়েছে, চাকর-মনিবে বুঝুক গে, আমাদের কি?

দুইটি ভাই-বোন মায়ের দিকে সবিস্ময়ে তাকাইয়াছিল। মহামায়ার এই অস্বাভাবিক রূঢ়তার সহিত কোনো দিনই তাহাদের পরিচয় নাই। তাঁহার কর্কশ চেহারার দিকে তাকাইয়া সুকান্ত আর কিছু না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রামলগনকে সুকান্ত আগেই বলিয়া রাখিয়াছিল, খানিক বেলায় সে সাগু লইতে আসিল। মহামায়া বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাবুর জ্বর কমেছে রামলগন?

সে কহিল, কমেনি মা।

ভয় নেই, সেরে যাবে। ওঁর কাছে ক'বছর তুমি চাকরী করছ?

এই বারো বছর হলো।

ও। বলিয়া মহামায়া একবার কি যেন ভাবিয়া লইলেন, তার পর পুনরায় কহিলেন, বাবু তোমার কেমন লোক রামলগন?

রামলগন শুধু কহিল, ছেড়ে যেতে পারি নি মা।

আচ্ছা, এর আগে উনি কোথায় ছিলেন?

পানাগড়ে, বর্দ্ধমানের কাছে।

মহামায়া সাগুর বাটি তাহার হাতে দিয়া কহিলেন, এক সময়ে এসে বলে' যেও উনি কেমন আছেন। ভুলবে না ত' বাবা?

নিশ্চয় বলে' যাবো।—বলিয়া রামলগন তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

সুকান্তর সহিত মন্নুও বাহির হইয়া গেছে, বাড়ীতে কেহ নাই। মহামায়া আসিয়া চুপ করিয়া এক জায়গায় বসিলেন। এখনো উনুনে আগুন পড়ে নাই, কুটনো-বাট্‌না সব পড়িয়া রহিয়াছে, রান্নার জল এইবার না তুলিলেই নয়। আহ্নিক করিয়া তিনি যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এইবার উঠিয়া দুড়্‌দাড় করিয়া তিনি কাজে লাগিয়া যাইবেন।

ট্রেণের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, সাত নম্বরের গাড়ীখানা



কোথায় আলো
কোথায় ওরে আলো —রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

এইবার ছাড়িল বুঝি! মানুষের জীবন সম্ভবতঃ ট্রেণেরই মত,—যাত্রী নামাইয়া এবং উঠাইয়া দীর্ঘ পথ সে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। কত যাত্রী কত পথে হারাইয়া যায়; কেহ পরিচিত, কেহ সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। একই পথের দুই যাত্রী বহুকাল পরে হয় ত মুখোমুখি হয়,—একজন হয় ত চিনিতে পারে, আর একজন পারে না। পারে না, তাহার কারণ, বিস্মরণের অতল অন্ধকারে তাহাদের সত্য পরিচয় অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাই নিয়ম, ইহাই জীবনের গভীরতম অর্থ!

পায়ের শব্দে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, মনু আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি ভাবিলেন, মেয়ে বড় হইয়াছে, প্রশ্ন করা হয় ত সঙ্গত হইবেনা। মনু কিন্তু নিজেই সে সমস্যার সমাধান করিয়া কহিল, ঘর এমন এলোমেলো হয়ে রয়েছে মাষ্টার মশায়ের, কি বল্‌ব! এমন অবস্থায় রয়েছেন, দেখলে কান্না পায়।

মহামায়া কহিলেন, কাঁদলিনে কেন, তোর ত ছিঁচ-কাঁদুনে স্বভাব।

মনু কহিল, সত্যি মা, তুমি জানো না তাই বল্‌চ।

মহামায়া কহিলেন, কেমন আছেন এখন?

সকালের চেয়ে অসুখ বেড়েছে, সাবু খেতে পারলেন না। তুমি একবার দেখতে যাবে মা?

আমি? দেখতে যাবো? তোদের কি মাথা খারাপ?

গেলেই বা, কি দোষ?

না বাপু, না। আমার অনেক কাজ, রান্না, জলতোলা, কুটনো বাটনা—তোদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই?

মনু চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু এতই বেলা হইয়া গিয়াছিল যে, সাড়ম্বরে সেদিন রান্না করিবার আর সময় ছিল না; যা হোক করিয়া ভাতে-ভাত রান্না হইল। মনুকে খাইতে দিয়া মহামায়া কহিলেন, আমার গেলে ত চল্‌বে না, তুই না হয় গিয়ে বসগে মা, একজন তবু কাছে থাকলে রুগী সুস্থ থাকে।

খাওয়া দাওয়া করিয়া মনু মাষ্টার মশায়ের কাছে চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া সে সুকান্তকে স্নানাহার করিতে পাঠাইয়া দিল। সুকান্ত ফিরিয়া আসিতেই মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর রে?

একই রকম। যখন কাশি ওঠে তখন দেখলে ভয় করে মা। মনে হয় এখুনি বোধ হয় বুক ফেটে যাবে। ভারি কষ্ট পাচ্ছেন।

কথা বলচেন?

সুকান্ত কহিল, একটু একটু। আমার একটা হাত অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে' রইলেন; যখন ছাড়লেন তখন দেখি আমার হাতটা তাঁর চোখের জলে ভিজে গেছে মা। আস্তে আস্তে বললেন,—

মহামায়া পুত্রের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। সুকান্ত প্রথমে একটু লজ্জা বোধ করিল, কিন্তু কথাটা সে বলিয়াই ফেলিল, বলিল, বললেন, 'তুমি আমার বড় আপনার সুকান্ত।'

উদাসীন হইয়া মহামায়া কহিলেন, রুগীর কাছে থাকলে এর চেয়েও আজগুবী কথা শুনতে হয়!—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

স্নান করিয়া সুকান্ত আসিয়া খাইতে বসিল। মহামায়া ভাত বাড়িয়া দিয়া কহিলেন, আর কিছু বলছিলেন না?

ঘাড় হেঁট করিয়া সুকান্ত কহিল, আরো যেন কি বলছিলেন, আমি বুঝতে পাচ্ছিলাম না।

মহামায়া উত্তপ্ত হইয়া কহিলেন, কী এমন কথা? ছেলে-মানুষকে বাজে কথা শোনানো ভারি সুবিধে। তুই আর যাসনি সুকান্ত।

সুকান্তর খাওয়ায় রুচি চলিয়া গেল। বলিল, আমি ছাড়া কেউ যে এখন নেই তাঁর মা? না গেলে চল্‌বে কি করে?

এত দিন তাঁর চলেনি? কোথাকার কে তার ঠিক নেই—

তখন যে রোগ ছিল না! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যেতে বারণ ক'রো না।

বেশ যেও, কিন্তু ঘ্যান্‌ঘ্যানানি শুনতে যেও না। রুগীর সকল কথায় কান দেওয়া বড় কষ্টকর।—উত্তেজনায় তাঁহার চোখের দৃষ্টি অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল।

নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া হাত ধুইয়া সুকান্ত আবার তখনই বাহির হইয়া গেল।

মহামায়া তাহাকে অনুসরণ করিয়া একবার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, সুকান্ত তাড়াতাড়ি গিয়া

মাষ্টার মশায়ের বাসায় ঢুকিল। আতঙ্কে তাহার সর্ব্বশরীর কি রকম করিতে লাগিল। তাঁহার ছেলেমেয়ের বয়স হইয়াছে, অনেক কথাই তাহারা এখন বুঝিতে পারে, রোগের প্রলাপে লোকটা কি বলিতে কি বলিবে তাহার ঠিক নাই। তাহাদের তরুণ মনে যদি কোনওরূপ সন্দেহের কুশাঙ্কুর ফোটে, তবে তাহার চেয়ে লজ্জার ও আত্মগ্লানির আর কিছুই নাই। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার শরীর আর একবার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এক জায়গায় চুপ করিয়া তিনি দাঁড়াইতে পারিলেন না, বাড়ীময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ভিতরে আলোটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছিল। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আসিয়াছে। নিস্তব্ধ অন্ধকার চারিদিকে থম্ থম্ করিতেছে। দক্ষিণের স্নিগ্ধ বাতাস মাঠের উপর দিয়া গাছপালায় শব্দ জাগাইয়া হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল।

দরজার বাহিরে একটা মাদুর বিছাইয়া রামলগন পড়িয়া ছিল; পায়ের শব্দ পাইয়া মুখ তুলিয়া সে কহিল, কে?

আমি রে রামলগন, আমি এসেছি।—মহামায়া কহিলেন, তোর বাবু কেমন আছেন বাবা?

ঘুমিয়েচেন বোধ হয়।

ঘুমিয়েচেন? ও,—ছোটবাবু কোথায়?

তিনি ইষ্টিশানে গেছেন। দিদিমণি আছেন ঘরে··· বাতাস করচেন।

তোর আর উঠ্‌তে হবে না, আমি দেখছি। বলিয়া মহামায়া মৃদু পদক্ষেপে ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

রোগীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া মনু ততক্ষণে বাতাস করিতে করিতে খাটে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মহামায়া একবার তাহার দিকে তাকাইলেন। কিন্তু সে একটি মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই বুঝিলেন, মাষ্টার মশাই ঘুমান্ নাই, বরং মহামায়াকে দেখিয়া হাত বাড়াইয়া তিনি আলোটা একবার উজ্জ্বল করিয়া দিলেন।

মহামায়া বলিলেন, তবে যতটা মনে হয়েছিল ততটা নয়?

এই তাঁহার প্রথম সম্ভাষণ! তাঁহার ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠ শুনিয়া মাষ্টার মশাই একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, মনু-মার কাছে অনেক সেবা নিয়ে গেলাম। আমি একে আশীর্ব্বাদ করে' যাচ্ছি।

মহামায়া কাছে গিয়া মনুকে ডাকিয়া মেঝের উপর আনিয়া শোয়াইয়া দিলেন। একবার ঘুমাইলে মেয়ের আর কোনও হুঁস্ থাকে না। তাহারই পাশে তিনি এইবার বসিয়া পড়িলেন।

অতি কষ্টে মাষ্টার মশাই একবার উঠিয়া বসিলেন। আলোয় স্পষ্টই মহামায়াকে দেখা যাইতেছিল। রূপ দেখিয়া মনে মনে প্রশংসা করিবার মত বয়স তাঁহার ছিল না; মুখ তুলিয়া শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে আবার তিনি মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িলেন। তার পর ক্লান্ত ও মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, রামলগনটা বুঝি শুয়ে আছে বাইরে?

হ্যাঁ, কিছু দরকার?

না। শুধু বলছিলাম, আমায় তুমি ক্ষমা ক'রো মহামায়া।

মহামায়া অত্যন্ত স্পষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, আমার নাম ধরে' আর ডাকবেন না, মেয়ে রয়েছে এখানে।

মাষ্টার মশাই বলিলেন, কেবল অসামাজিক নয়, তোমার সঙ্গে কথা বলে' আমি অভদ্র আচরণ করেছি, আমি মাপ চাইছি।

আপনি কবে যাবেন এখান থেকে?

আজকেই ত যাবার কথা ছিল। ভোর রাতের গাড়ীতে।

তবে আজকেই যান্ না? মিথ্যে দেরী করে'—

আজকেই? এই রাতে? বড় অসুখ যে—

যে অসুখে এত কথা বলা যায়, সে অসুখে—

মাষ্টার মশাই কহিলেন, হ্যাঁ, আমাকে এমনি করে' তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত!—কিন্তু, আচ্ছা, অন্য দিকের কথা কি কিছু নেই? এতে কি শুধু লজ্জাই আছে? কেবল কি অগৌরব মহামায়া?—দপ্ করিয়া তাঁহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল।

মহামায়া কহিলেন, নাম ধরে' আমায় ডাকবেন না। ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে এক পাশে পড়ে' আছি, আপনার কি সইচে না? এত দেশ থাকতে আপনি এখানে এলেন কেন?

মাষ্টার মশাই কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। তারপর কহিলেন, সকল কথা আমার মনে পড়ে না। মনে পড়লে চেঁচিয়েই বলতাম, আমার এ অবস্থার জন্তে তুমিই দায়ী। তুমিই। তুমি ছাড়া আর কেউ না।

মহামায়া কহিলেন, আমি আমার মেয়েকে নিতে এসেছিলাম, আপনার কথা শুন্‌তে এত রাতে আসিনি। সুকান্তর সঙ্গেও আপনার বেশী কথা বলার দরকার কিছু নেই। সে ছেলেমানুষ!

মাষ্টার মশাই মরিয়া হইয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন। তার পর টলিতে টলিতে বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, রামলগন!

রামলগন ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, বিছানা বাক্স গুছিয়ে নে রে, এখুনি যেতে হবে। ছোটবাবুকে একবার ডাক্।

রামলগন কহিল, বাবু, অসুখ যে—

ছি, মনিবের কথায় আপত্তি করতে নেই, রামলগন যা।

রামলগন সুকান্তকে ডাকিতে ষ্টেশনে ছুটিয়া গেল।

ভিতরে টলিতে টলিতে আসিয়া দাঁড়াইতেই মহামায়া কহিলেন, এখনো এত তেজ আপনার?

তেজ ত নয়, এ বিচার। নিজের ওপরেই বিচার। তুমি ফিরে যাও মহামায়া। এত রাতে বাড়ীর বাইরে থাকা—

মহামায়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, মনু রয়েছে পাশে, আমার নাম ধরে' ডাকবেন না বল্‌চি। চিরকাল আপনি লোকের অবাধ্য।

মাষ্টার মশাই একবার তাঁহার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইলেন। মহামায়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, নিজের দরকারেই আমি এসেছিলাম; সুকান্ত বড় হয়েছে, যদি কখনো আবার তার সঙ্গে দেখা হয়, তা হলে যেন আগেকার কোনো কথা—

কি কথা বল ত?

এই ধরুন, আপনি আমাকে চিনতেন, এই সব—

তোমাকে ত আমি চিন্‌তে পারিনি,—আচ্ছা ধর, যদি কিছু কিছু বলেই থাকি?

কিছু কিছু?—মহামায়া ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, কি বলেচেন বলুন, কতদূর পর্য্যন্ত? এই সর্ব্বনাশ করতে আপনি এসেছিলেন?—ভয়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া কান্না আসিল।

মাষ্টার মশাই সানন্দে হাসিতেছিলেন। যত হাসি তাঁহার ভিতরে সঞ্চিত ছিল, তাহা যেন তিনি টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন। এই যেন তাঁহার শেষ হাসি! বলিলেন, এ কথা হয় ত বলব না যে তোমার অন্তত একশোখানা চিঠি এখনো আমার বাক্সে তোলা রয়েছে! অবশ্য সকল চিঠিই তোমার বিয়ের আগে।—বলিয়া তিনি আবার হাসিলেন।

স্বর্গগত স্বামীকে স্মরণ করিয়া অপমানে ও আত্মগ্লানিতে মহামায়ার মাথা হেঁট হইয়া আসিল। পরকালে তাঁহার অনন্ত নরকবাস হইবে!

একটু থামিয়া মাষ্টার মশাই কহিলেন, কতদিন হলো তোমার স্বামী মারা গেছেন?

এই লোকটার মুখে তাঁহার দেবপ্রতিম স্বামীর কথা শুনিতে মহামায়ার সমস্ত মন কুঞ্চিত হইয়া আসিল। তবু তাঁহাকে বলিতে হইল, দু' বছর।

দু' বছর? কি করতেন তিনি?

কলেজের প্রফেসর ছিলেন।

কথা ফুরাইয়া গিয়াছিল, ইহার পর আর কোনও কথা আসিতেছিল না। মাষ্টার মশাই তাহাই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি এত বড় হয়ে গেছ আর এত ভারিক্কে হয়েছ যে ভাল করে' কথা বলতে সাহসই হয় না!

মহামায়া একটু সন্ত্রস্ত হইয়া গা ঠেলিয়া মনুকে ডাকিতে লাগিলেন। ঘুমের ঘোরে মনু একবার ভুল বকিয়া উঠিয়া আবার নাক ডাকাইতে লাগিল।

ঘরের ভিতর থাকিতে তাঁহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, মনে হইল একটু একটু করিয়া কে যেন তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিতেছে।

মাষ্টার মশাই ধীরে ধীরে বলিলেন, একটা কথা বলবে মহামায়া?

মহামায়া উত্তর দিলেন না, নিজের নাম পুনরায় এই লোকটার মুখে উচ্চারিত হইতে দেখিয়া গায়ের রক্ত তাঁহার অচেতন হইয়া আসিতে লাগিল, কানের মধ্যে লক্ষ লক্ষ উন্মাদের দল ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, চোখে আসিল তাঁহার অস্বাভাবিক নিদ্রার আবিলতা, তিনি প্রাণপণে একটু নড়িয়া আবার সজাগ হইয়া বসিলেন। বলিলেন, থাক্, আর আমি কিছু শুনতে চাইনে। সুকান্ত এল বুঝি!

মাষ্টার মশাই বলিলেন, একখানা গাড়ী পাস্ করে' গেলে তবে সে আসতে পারবে।

বিছানায় হেলান্ দিয়া আবার তিনি শুইয়া পড়িলেন। তার পর পুনরায় বলিলেন, আমার এক একবার কি মনে হয় শুনবে? মনে হয় নিজের হাত-পা-গুলো ধারালো ছুরি দিয়ে কুচিয়ে ফেলি। মহামায়া, এক রকম পোকা আছে জানো, মাথার মধ্যে বাসা করে' থাকে? সে-পোকা মাথার ঘি কুরে' কুরে' খায়, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর···

মনু, ও মনু, হতভাগির ঘুম আর ভাঙে না, বলি শুনচিস্?

মনু একবার সাড়া দিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

আচ্ছা, এই বোধ হয় আমাদের শেষ দেখা, কি বল?

তাই যেন হয়।—মহামায়া উত্তর দিলেন, ভগবান যেন এমন বিপদে আর না ফেলেন।

বিপদ? এতে বিপদ কি মহামায়া?

চুপ। আবার বলচি চুপ করুন, বিপদে আমাকে ফেলবেন না, চুপ করুন।—তাঁহার কণ্ঠ কাঁপিতেছিল।

মাষ্টার মশাই কহিলেন, তোমাকে বলতে হবে মহামায়া, কিসের বিপদ!

মস্ মস্ করিয়া মাঠের উপর দিয়া পায়ের শব্দ নিকটতর হইয়া বারান্দার উপর উঠিয়া আসিল। ক্ষণমাত্র সেই দিকে তাকাইয়া বিদীর্ণ কণ্ঠকে যথাসম্ভব চাপিয়া মহামায়া কহিলেন, বিপদ, বিপদ নয় ত কি, ভয়ানক বিপদ, তোমাকে নিয়ে আমার বিপদ চিরদিন!—বলিতে বলিতে তাঁহার গলা ধরিয়া আসিতেই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া অন্ত দরজা দিয়া অন্ধকারে বাহির হইয়া গেলেন।

শোয়ে-ডাগন

শ্রীসরলাদেবী চৌধুরাণী বি-এ

নমস্য সেই মহাপুরুষেরা যাঁরা বর্ম্মায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যেখানে কথায় কথায় মানুষে মানুষের মুণ্ডপাত



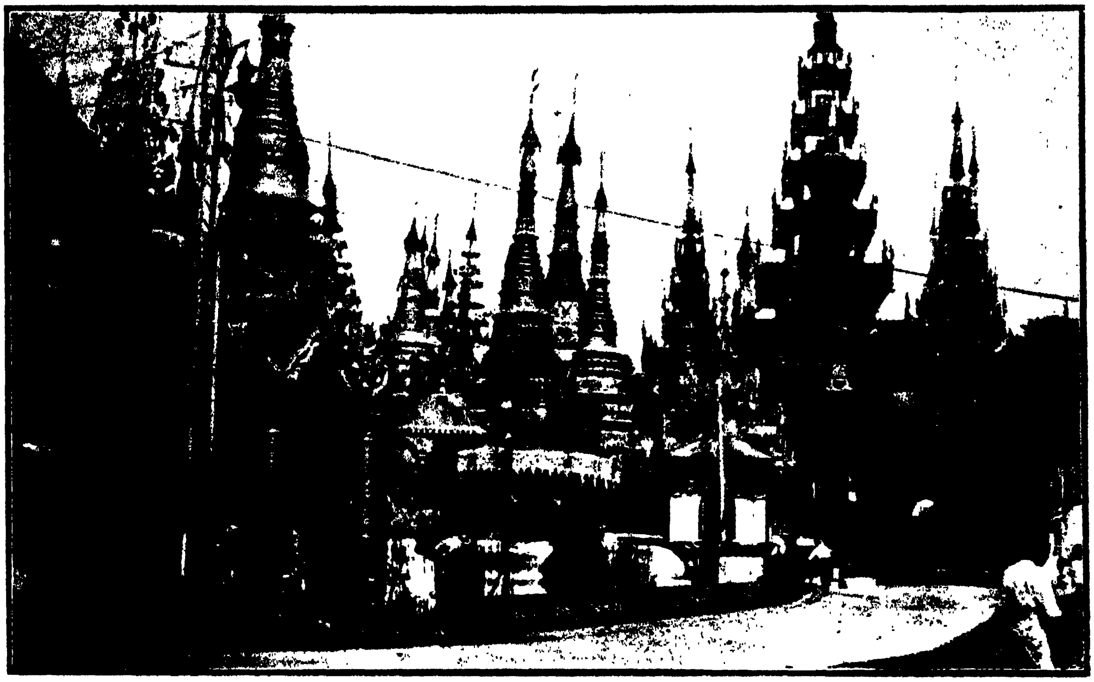
মহোৎসবের দৃশ্য

করে এসেছে, যে দেশের প্রতি ধূলিকণা নররক্তে রক্তাক্ত, সেই আপূর্ব্ব-পশ্চিম-দক্ষিণোত্তর সমস্ত বর্ব্বর দেশটার বুক ফুঁড়ে ফুঁড়ে উঠেছে সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন এক একটি প্রকাণ্ড সুধাধবল স্বর্ণচূড়ান্বিত মন্দির,—বুদ্ধের ও তাঁর শিষ্যগণের শান্ত মূর্ত্তির অধিষ্ঠানস্থল।

বর্ম্মার ইতিহাসে পাওয়া যায় জীবনের প্রচণ্ড মধ্যাহ্নে যে যত ক্রূরতা করেছে, জীবনের শান্ত সন্ধ্যায় সে তত শান্তি-নিদান বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়েছে। শুনা যায় বর্ম্মীজদের প্রকৃতি শিশুসুলভ। এই হাসিখুসী, আমোদ আহ্লাদে রত, এই ক্রোধে উন্মত্ত এবং একবার ক্রুদ্ধ হলে দিক্‌বিদিক্ বা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। সেই আদিম মানবের পাশব প্রকৃতিকে দমন করে যাঁরা ক্ষমা ও দয়ার অবতার বুদ্ধের নিকট মাথা নত করিয়েছিলেন তাঁদের শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য-পর্ব্বত ও উত্তালতরঙ্গময় সমুদ্রলঙ্ঘন করে দেশবিদেশে অভিযান সার্থক হয়েছিল।

নির্দ্দয়তা ও হত্যার দেশে যাঁরা দয়া ও অহিংসার বাণী প্রচার করেন, তাঁরাই যথার্থ মরুভূমিতে কমণ্ডলু ভরে ভরে তৃষ্ণার বারি বিতরণ করেছেন। কিন্তু কি তপস্যা, কি অধ্যবসায় এবং কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির বলেই তা

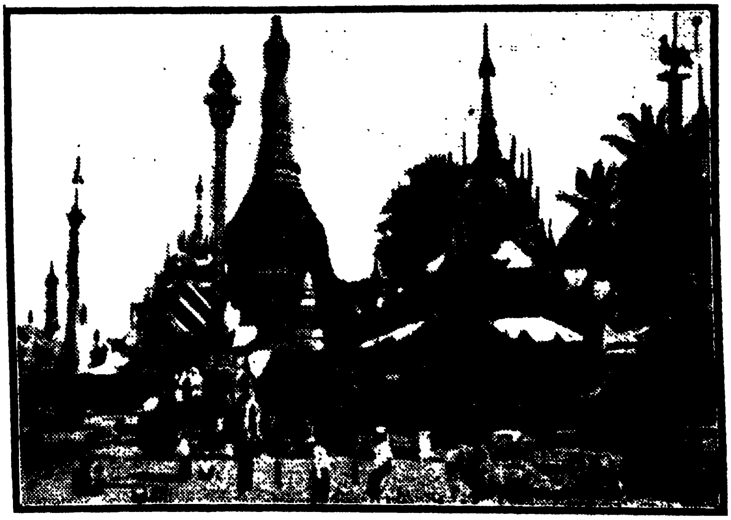
হতে পেরেছিল। সেই শ্রদ্ধার প্রেরণা ভারতের বর্ত্তমান হিন্দুর মধ্যে আছে কি? যদি বিশ্বাস করি, আমার ধর্ম্মে বিশ্বাসী সামান্য প্রজাও রাজাদেশে আগুনে পুড়ে মরা স্বীকার করেছে, তবুও নিজের ধর্ম্মকে অস্বীকার করেনি



শোয়ে ডাগন মন্দির

অমৃত আছে, এবং যদি সে অমৃত নিজে পান করে থাকি, তবেই তার মর্ম্মগ্রাহী হয়ে তা অপরকে দানের ইচ্ছা ও প্রেরণা-শক্তি আসে।

এই যে এত লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে থেকেও বিধর্ম্মী হয়ে গেল, কেউ বা বাইবল্, কেউ বা কোরাণের তথ্যকে ধর্ম্মের চূড়ান্ত বাক্য বলে গ্রহণ করলে—ভারতীয় হিন্দুর নিজধর্ম্মে ও ধর্ম্ম গ্রন্থাবলীতে অনাস্থাই কি তার মূল কারণ নয়? মুসলমান বাদশার অনুচরেরা জোর করে মুসলমান করেছিল? নিজের ধর্ম্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকলে কেউ কাউকে জোর করে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে পারে কি? রোমের সমস্ত রাজকীয় বলও তৎপরবর্ত্তী কত সহস্র খ্রীষ্টানকে স্বধর্ম্ম ত্যাগে রত করতে পারেনি কেন? ইংলণ্ডে এবং সমস্ত ইউরোপে ল্যাটিমার প্রভৃতি শত শত স্বধর্ম্মে

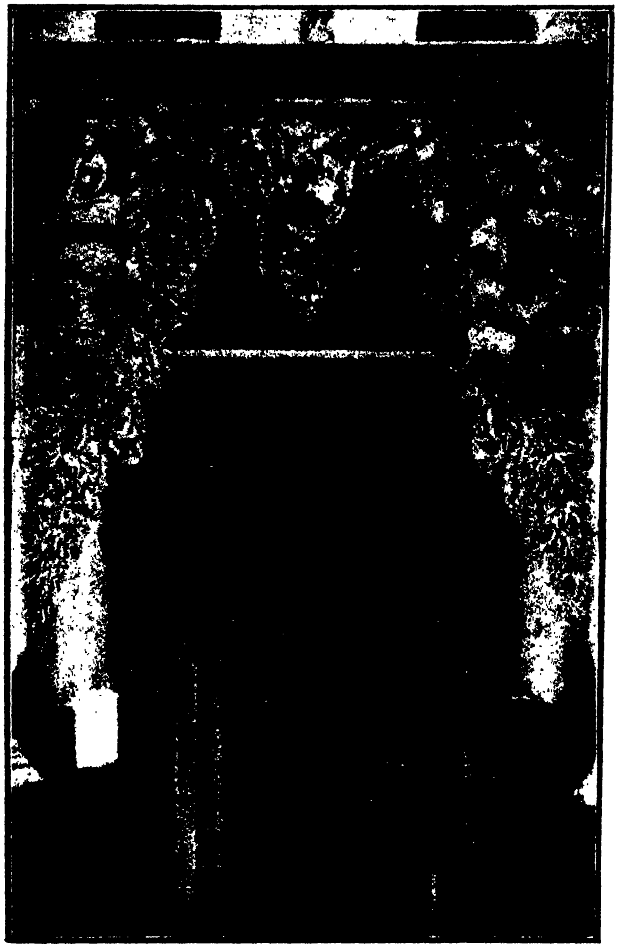


শান-মন্দিরে বৃহৎ ঘণ্টা

কেন? ভারতবর্ষেও মোগল বাদশাদের হুকুমে শিখগুরু এবং তাঁদের বীর অনুচরেরা প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু ধর্ম্ম দেন নি কেন? তাঁরা স্বধর্ম্মের অমৃতের মধ্যে অবগাহন করেছিলেন; নিজের ধর্ম্ম ছেড়ে পরধর্ম্ম গ্রহণে যে গঙ্গাস্নানের পর

গোস্পদে স্নান করা হবে তা জানতেন; সে হীনতা সে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে প্রস্তুত হননি। তাই মৃত্যু-বরণ করেছিলেন কিন্তু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন নি।

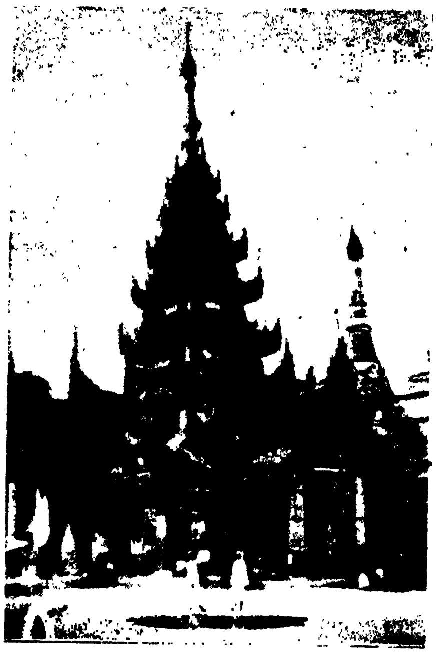
খ্রীষ্টধর্ম্মে বা মহম্মদীয় ধর্ম্মে এমন কোন নূতন তত্ত্ব, জ্ঞান বা রস নেই যা হিন্দুধর্ম্মে পাওয়া যায় না, সুতরাং জন্ম হিন্দুর শুধু ধর্ম্মের তৃষ্ণায় অপর ধর্ম্ম গ্রহণ অনাবশ্যক, এবং যে ভারতবাসী মাত্রই হিন্দুধর্ম্মের বৃহৎ খনির পাশেই বসে আছে



শোয়ে-ডাগন প্যাগোডা অঙ্গনে একটী ছোট প্যাগোডায় কাঠের কারুকার্য্য

তার পক্ষে শত সমুদ্র পারের ছোট ছোট খনির থেকে আমদানী-করা ধর্ম্মগ্রহণও নিষ্প্রয়োজন। তবে এ কথা সত্য যে, ভারতে ধর্ম্মখনির প্রহরীরা তাদের খনিজ অমূল্য পদার্থের ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছিল বলেই বাইরের মাল এতদিন চলেছে। সুধাসাগরের তীরে বসে সুধা পান না করে শুধু সুধার প্রহরীগিরি করায় হিন্দুর ধর্ম্মভাব মৃতকল্প, তার ধর্ম্মদান-শক্তিও পরিক্ষীণ। কবে সে আবার সুধা-পানে মাতোয়ারা হবে? নিজের ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের হ্রদে ডুবে যাবে? কবে তার বার্ত্তা অন্যদের কাছে বহন করবার জন্যে পাগল হবে?

সেই যে একদল পাগল ভারতবাসী বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ম্মার দিকে ছুটেছিলেন, তার ফলে ভারতের বাইরে ভারত-ধর্ম্ম আজও মৌলিক অবস্থায় বর্ত্তমান। পাঁচবৎসর বয়সে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা, গুরু-গৃহবাস, ও স্বাধ্যায় ভারতবর্ষ থেকে উঠে গেছে, কিন্তু বর্ম্মায় এখনও স্থির আছে। রাজপুত্র হোক বা সামান্য গৃহস্থের



শোয়ে-ডাগন মন্দিরের দৃশ্য (২)

পুত্র—সকলকেই কয়েক বৎসরের জন্য বিহারে গিয়ে ভিক্ষা ব্রত গ্রহণ ও গুরুর নিকট বিনয়ত্রিপিটক শিক্ষা করতে হয়। বর্ম্মীজ শিশুদের বর্ণমালা-জ্ঞান ধর্ম্মযাজকদের কাছে আরম্ভ হয়। শতাবধি কাল থেকে সমগ্র বর্ম্মায় এইভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা (Free Primary Eduction) চলে আসছে। বর্ম্মায় নিতান্ত গরীবগুরবা, চাষাভুষোরাও তাই নিরক্ষর নয়, সকলেই বই পড়ে ও খবরের কাগজ পড়ে। শুনা গেল, এ অবস্থা আর

বেশীদিন টিকে কিনা সন্দেহ; কারণ প্রাচ্য সভ্যতার নজর লেগেছে; আজকাল ভারতবর্ষের ন্যায় বর্ম্মায়ও কর্পোরেশন



বুদ্ধমূর্ত্তি—শোয়ে-ডাগন

থেকে প্রাইমারী স্কুলের সৃষ্টি হচ্ছে; তাতে করে বৌদ্ধধর্ম্ম-যাজকদের কাছে গিয়ে গুরুগৃহবাস ও অক্ষর-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠও ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসবে।

বর্ম্মায় প্রত্যেক পাগোডা বা 'ফয়া'র সংলগ্ন বিহার বা 'ফুঙ্গিচঙ' আছে; সেখানে শত শত ফুঙ্গি বা বৌদ্ধ-সাধু বাস করেন। এই সকল সাধুদের আহারের ব্যয় সমস্ত গৃহস্থেরা বহন করেন। ভোর বেলা প্রত্যেক বর্ম্মীজ গৃহিণীর প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে বৌদ্ধ ভিক্ষুর জন্যে ভাত রাঁধা। অধিকাংশ ভিক্ষু নির্দ্দিষ্ট বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করে আনেন; যাঁরা চলতে অক্ষম গৃহিণীরা তাঁদের ভিক্ষান্ন পাঠিয়ে দেন। অন্ততঃ চার পাঁচটি ভিক্ষুকে না খাইয়ে কোন গৃহস্থ বা গৃহিণী নিজে অন্নগ্রহণ করেন না। বৌদ্ধ সাধুদের থাওয়া একবেলা, তাও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সেরে ফেলতে হবে; সূর্য্য বিষুবরেখায় চড়লে আর খাওয়ার নিয়ম নেই। তাই গৃহস্থদের সাধুসেবাটা একবেলাতেই সমাপ্ত হয়।

অনেক সময় অনেক ডাকাত সাধু আবাসগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে; দিনের বেলায় ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে



প্রাতঃকালের উপাসনা

ফুঙ্গিচঙে লুকিয়ে থাকে, রাত্রে সুযোগ হোলেই ডাকাতি করতে বেরোয়। সেই জন্যে বর্ম্মীজ গৃহিণীরা সময় সময় বড়

ভীত হন, অজানা সাধুকে বিশ্বাস করবেন কিনা ভেবে পান না। আমাকেও একজন বৃদ্ধা বর্মীজ-মহিলা সাবধান



ব্রহ্মদেশীয় স্ফটিক প্রাসাদ

করে দিলেন যে-সে সাধু-আবাস দেখতে যেন না যাই, আর একলা যেন কখনই না যাই।

ভারতবর্ষের দিল্লী আগরা প্রভৃতি পশ্চিমের সহরগুলির আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য হচ্ছে—কবরের পর কবর—সেগুলি মোগল বাদশা ও তাঁদের অনুচরগণের স্বনাম-প্রতিষ্ঠার মূর্তিমান আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা; কিন্তু বর্মার অধমাধম নরপতিও নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রভু বুদ্ধের প্রতিষ্ঠাতেই মনঃপ্রাণ ও ধন ঢেলে দিয়েছেন। বর্মার কত সহরে, কত গ্রামে, কত ধূ ধূ প্রান্তরে কত পুরাতন ভগ্নমন্দিরের কারুকার্য্যময় ইঁটকাঠ পড়ে রয়েছে। তাদের জীর্ণসংস্কার হয়নি; তারই পাশে নূতন যুগের নূতন ভক্তের নূতন



শোয়ে-ডাগন মন্দিরের দৃশ্য (১)

মন্দির ও বিহার গড়ে উঠেছে। এই সকল মন্দির ও বিহার, বা 'ফয়া' বা পাগোডাই, বর্মার আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য। ইংরেজরা বর্মায় প্রবেশমাত্র এটা লক্ষ্য করে এর নাম দিয়েছেন—The Land of Pagodas—প্যাগোডার দেশ। বর্মার সমস্ত পাগোডার মধ্যে রেঙ্গুনের শোয়ে-ডাগন পাগোডা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এর চেয়েও বড় পাগোডা অন্যত্র আছে, কিন্তু এত কারুকার্য্য আর কোন পাগোডায় দেখা যায় না।

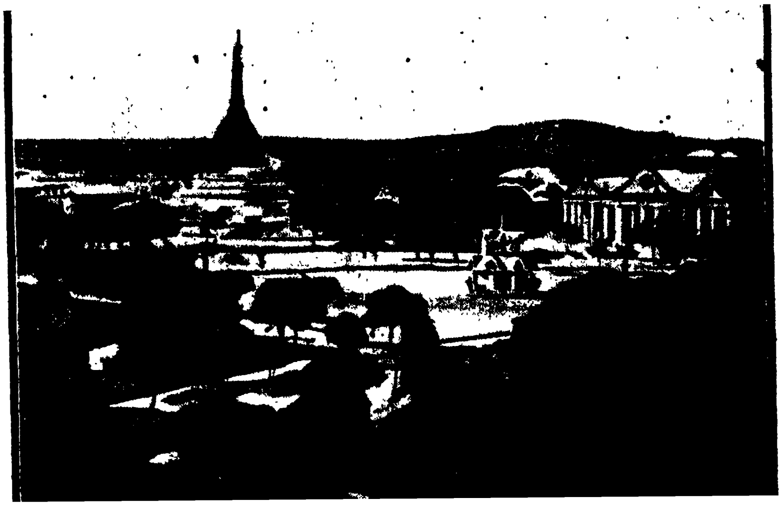
এর চারদিকে চারটি সিংহদ্বার; সোপানের পর সোপান আরোহণ করে তবে দ্বারে প্রবেশ করা যায়। গুটি দশ পনের ছোটছোট সোপানের পর একটি করে প্রশস্ত সোপান আসে, তার একধারে বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে আবার অগ্রসর হওয়া যায়। সব সোপানগুলি শেষ হলে মাথার উপর ছাদযুক্ত একটা লম্বা দালান; দালানের দুধারে বিপণি। এই পণ্যবীথিকায় বর্মাজাত সব রকম শিল্পবস্তু পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রভু বুদ্ধের জন্য সুন্দর সুন্দর তাজা ফুলও কিনতে পারা যায়। দোকানদার খুব

অল্প, সবই প্রায় দোকানদারণী; পরিষ্কার ফিটফাট কাপড় পরা, কারো হাতে সোনার চুড়ি, হয়ত বা পায়েও সোনার মল, কাণে হীরের ফুল, গলায় সোনার চেন,—কখনো বা মুক্তোর মালা,—খোঁপায় সুন্দর চিরুণি বা ফুল। বিক্রেয় জিনিষ এবং বিক্রেত্রী দুই আমার পক্ষে সমান আকর্ষণজনক হল। অনেকের দোকানখানিই ঘরবাড়ী। সেখানে বসেই প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা পরচুলা বিছিয়ে, আঁচড়িয়ে নিজের চুলের সঙ্গে জড়িয়ে মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড উঁচু খোঁপা খাড়া করে তুলছে। কেউ বা প্রাতরাশ করছে, বর্ম্মিচেলি সিদ্ধর সঙ্গে 'নাপি' (শুটকি মাছ) মিশিয়ে খাচ্ছে। আর যাই করুক আর না করুক, খদ্দেরকে হাত-ছাড়া কেউ করছে না। কোন কোন দোকান মেয়ে পুরুষ দুজনে মিলে চালাচ্ছে। আমি কতকগুলি বর্ম্মিজ জিনিষ সংগ্রহ করলুম। মিসেস্ বার্দ্‌ন এক মুঠো ফুল কিনলেন। এখানে যে ফুল বিক্রী হয় তা বৃন্তচ্যুত ফুল নয়, লম্বা লম্বা বৃন্তযুক্ত ফুল—তার কারণ পরে উপলব্ধি হল।

বাইবেলে পড়েছিলুম ইহুদিদের ধর্ম্ম-মন্দিরে এই রকম পণ্যদ্রব্যসম্ভার দেখে যীশুখ্রীষ্ট একদিন ক্রোধোম্মত্ত হয়ে বিক্রেতাদের চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—তাদের দ্রব্য-সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ-মন্দিরে বুদ্ধদেবের চরণছায়ে বসে এই সকল বিক্রেতা ও বিক্রেত্রীরা তাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ করে বলে বৌদ্ধ-পুরোহিতেরা তাদের কখন দোষ ধরেন না, বা তাদের তাড়াবার জন্যে যত্নবান্ হন না।

বিপণি বীথিকার শেষে ডাইনে ও বাঁয়ে দুধারে খোলা শান-বাঁধান অঙ্গন; সেই অঙ্গনের স্থানে স্থানে মন্দির। এক একটি মন্দিরে এক একটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি, তাঁ'র পাশে পাশে আনন্দ প্রভৃতি তাঁর পারিপার্শ্বিকদের ছোট মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলির অসাধারণ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ্য বোধ হয় বর্ম্মার ভাস্কর্য্যের বিশেষত্ব—ভারতবর্ষে কোথাও এত বড় মূর্ত্তি দেখা যায় না। অথচ প্রাত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান এই যে বর্ম্মার শিল্পসমৃদ্ধির যা কিছু পরিচয় তার সূত্রপাত হয়েছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পরীতির প্রভাবে। দেওয়ালের চিত্রগুলি দেখলে তা সম্ভব মনে হয়—বুদ্ধের জীবনচরিতের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত রামায়ণের অনেক কাহিনীও কোন কোন মন্দিরের দেওয়ালে চিত্রিত রয়েছে।

আমরা মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করে প্রথমতঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। বৃহৎ অঙ্গনের উপর বসেই অনেক ভক্ত ও ভক্তানী জপ করছেন। মন্দিরগুলির কারুকার্য্যের প্রতি বার্দ্‌ন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কাঠের উপর খোদাই-কার্য্যই এদের বিশেষত্ব দেখলুম। শুধু দুটি থামে ভারতবর্ষের মোগল আমলের শিস্‌মহলের তুল্য ছোট ছোট আয়না চিত্রকারী করে বসান আছে, তার উপর সূর্য্যের আলো পড়ে থামগুলি ঝকঝক করছে। অঙ্গনে বহু বর্ম্মিজ মন্দিরের মধ্যে একটি চীনা মন্দিরও আছে; সেটি বাইরে থেকেও যেমন দেখতে স্বতন্ত্র, তার ভিতরের সাজসজ্জা ও মূর্ত্তিগুলিতেও তেমনি প্রভেদ—তাদের অধিকাংশই তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি।

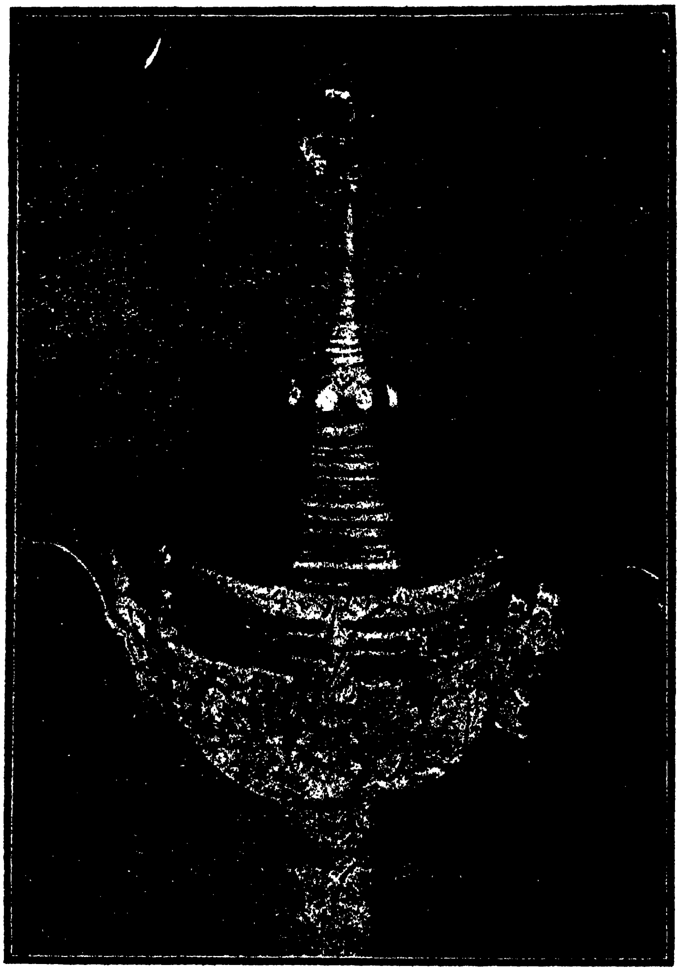


রাণী-বাগিচা—রেঙ্গুণ

গতবৎসর বজ্রপাতে শোয়ে-ডাগনের একটি মণিমাণিক্য-বিজড়িত চৈত্যচূড়া পড়ে যায়—আমাদের মন্দিরের কলসের মত বর্ম্মিজ মন্দিরের এই চূড়া—বর্ম্মিজ ভাষায় 'টী' বলে আখ্যাত। এটি বজ্রাহত হয়ে ভূপতিত হওয়া রেঙ্গুনের বর্ম্মীজরা বড় অশুভ লক্ষণ মনে করেন। তাঁরা চাঁদা

তুলে, একটি শুভদিন দেখে, খুব ধূমধাম করে আবার সেটি পুনঃস্থাপিত করেন।

এই অঙ্গনের এক জায়গায় একটি অতিকায় ঘণ্টা আছে, সেটি নাড়ান যার তার সাধ্যি নয়। কিন্তু যদি কেউ কোন ইচ্ছা মনে রেখে সেটি নাড়াতে পারে, তার নাকি সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। রেঙ্গুনেরই আর একটি পাগোডায় আর একটি ঘণ্টা আছে; সেটি নাড়ান সহজ, কিন্তু সেটি নাড়ালেই নাকি বিদেশীকে এদেশে আর একবার ফিরে আসতেই হবে। এর সত্যতা সম্বন্ধে রেঙ্গুন-প্রবাসিনী দুই একটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মমহিলা আমায় সাক্ষ্য দিলেন।



শোয়ে-ডাগন চৈত্যচূড়া—বজ্রাঘাতে ভূপতিত

আমরা স্বচ্ছন্দভাবে দেখেশুনে বেড়াচ্ছি—কিন্তু কোন পাণ্ডার চিহ্ন নেই; তাদের ধ্বস্তাধ্বস্তি নেই; তাদের হাতে পড়ে যজমানের প্রাণ নিয়ে টানাটানি নেই—ভারতবর্ষের মন্দির-দর্শন থেকে মগের মুলুকের এই এক অত্যাশ্চর্য্য শান্তিময় সুশোভন প্রভেদ। তাতে যে দেবতার উদ্দেশে দান বন্ধ থাকে তা নয়। প্রত্যেক মন্দিরের কাছাকাছি বড় বড় বাক্স এঁটে বসান আছে দেখলুম; তাতে যে যার ইচ্ছে-মত টাকা পয়সা সিকি আধুলি ফেলে যাচ্ছে। এই সব বাক্সে যত টাকাকড়ি জমা হয় তা 'পাগোডা ট্রষ্টে'র হাতে যায়। ট্রষ্টীরা মন্দিরসংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা করেন। প্রতি রাত্রে মন্দিরকে দীপান্বিত করার খরচ এবং মন্দির ও মন্দিরবাসী সাধুদের সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ এই দানের টাকা থেকে নির্ব্বাহ হয়। টাকা পয়সা ছাড়া ভক্তেরা অন্যান্য দানও নিয়ে আসেন—অন্ন, বস্ত্র, ছাতা, পাখা, হীরা, মতি সবই আসে, দেবতার কিছুরই অপ্রতুল হয় না। আমাদের মন্দিরের ঠাকুরের মত এখানকার ঠাকুর পুরোহিত ছাড়া আর সকলের অস্পৃশ্য বা অনধিগম্য নন। ঠাকুরের কাছে গিয়ে ঠাকুরের গলায় স্বহস্তে যে চায় মালা পরিয়ে আসতে পারে, স্বর্ণমণ্ডিত ঠাকুরের গালে ও ভালে নিজেদের হাতে আরো সোণার পাতা লাগিয়ে আসে। ঠাকুর সকলেরই নিজস্ব, সকলেরই স্বহস্তে সেবনীয়, শুধু পাণ্ডা পুরোহিতের নয়।

আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে বার্দ্দন হঠাৎ একবার একটি সাধুর সঙ্গে অন্তর্ধান হলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বল্লেন—ঐ সাধুটি তাঁর কলেজের বন্ধু ছিলেন, একজন খুব প্রতিপত্তিশালী অফিসার হয়েছিলেন, হঠাৎ কয়েক বৎসর থেকে তাঁর আর কোন সম্বাদাদি পান নি। আজ তাঁকে অকস্মাৎ এই সাধুর বেশে দেখলেন। তিনি আপাততঃ মৌনব্রত নিয়েছেন, তাই আর কথাবার্ত্তা হতে পারল না।

বর্ম্মায় প্রায় প্রত্যেক বড় বড় পাগোডায় সংলগ্ন একটি পুষ্করিণী থাকে, তাতে পোষা মাছ ও কচ্ছপ বিচরণ করে।

এই কচ্ছপদের খাওয়ান, মন্দির-দর্শনে আগন্তুকের একটি অতি অবশ্য করণীয় কার্য্য। পুকুরের সান-বাঁধান ঘাটের উপরেই খই, পাঁউরুটির টুকরো প্রভৃতি মৎস্যজাতির প্রিয় নানা খাদ্য কিনতে পারা যায়। প্রায় দশ মিনিট ধরে আমরা তাদের খাইয়ে তাদের ক্রীড়া দেখতে লাগলুম।

আমরা ঘুরতে ঘুরতে প্রধান মন্দিরটিতে এসে পৌছলুম। ইতিমধ্যে নানাভাবে, নানা মুদ্রায় বুদ্ধের স্থির, শান্ত, বসা মূর্ত্তি ত অনেকই দেখেছি, তার উপরে একটি সুদীর্ঘ শয়ান মূর্ত্তিরত্নের অতি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি অনুভব করেছি। এখানে একটি বৃহৎ ছত্রের নীচে আসীন বুদ্ধমূর্ত্তির সামনে দেখলুম, আমিও তাই করলুম। আমাদের পরে যারা এল, তারাও তাই করলে। ভারতবর্ষের মন্দিরে যেমন পুরোহিতের নির্দ্দেশ অনুসারে মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করে ফুল ছুঁড়ে ফেলা হয়, কাদায় জলে পায়ে পায়ে থেঁৎলে ফুলগুলি ম্লান হয়ে যায়—এখানে তেমন নয়। বুদ্ধের মূর্ত্তির সামনে ও আশেপাশে ছোট বড় নানারকমের খালি ফুলদানি রাখা থাকে, প্রত্যেক দর্শক ও ভক্ত নিজের নিজের সুদীর্ঘ বৃন্তসমেত ফুল সেই ফুলদানির একটিতে গুঁজে দেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই রকম ফুলের স্তবকে মন্দিরের শোভা বাড়ে ও ফুলের মহিমাও অক্ষুণ্ণ থাকে। কোন



শোয়ে-ডাগন মন্দিরে কাঠের কারুকার্য্য



রয়েল লেকে রাজপথ

অনেকগুলি ফুলদানিতে ফুল সাজান রয়েছে দেখলুম। ভাবলুম বুঝি মন্দিরের ব্যবস্থাপকেরা এইরূপে মন্দিরকে সজ্জিত করেছেন। তা নয়, এ ভক্তদের নিজ হাতের সাজান। এইবার মিসেস বার্ন্ যে ফুলগুলি কিনে এনেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলি আমার হাতে দিলেন, কতকগুলি তাঁর স্বামীর হাতে দিলেন ও কতকগুলি নিজে রাখলেন। তাঁরা উভয়ে অগ্রসর হয়ে পূর্ব্বোক্ত ফুলদানির একটিতে তাঁদের ফুলগুলি সাজিয়ে রেখে দিলেন কাদা নেই, জল নেই, মলিনতা নেই—সবই সুশ্রী, শোভন, পরিপাটি। ফুলবিন্যাস জাপানে একটি বিশেষ কলা বলে গণ্য হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই কি ভারতের যত সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি বৌদ্ধজগতে পলাতকা হয়েছে? আর তাকে হতভাগ্য ভারতে ফিরে আনা যায় না? যে মন্দিরের পুরোহিতেরা আচারে ব্যবহারে, আকারে প্রকারে অপরিচ্ছন্নতা ও শ্রীহীনতার প্রতিমূর্ত্তি, সে মন্দিরগুলিও যে শ্রীহীন এবং তার দেবতারাও শ্রীহীন হবেন তার আর আশ্চর্য্য কি?

মন্দিরের অভ্যন্তরে মূর্ত্তিখানির সামনে শ্বেত মর্ম্মর বাঁধান হলের মত অনেকটা লম্বা জায়গা আছে; তার উপর কতকগুলি মাদুর বিছান। ভক্তেরা ফুল সাজিয়ে সেখানে বসে খানিকক্ষণ বুদ্ধের ধ্যান করেন, কেউ কেউ পালিগ্রন্থ খুলে পাঠ করেন, কেউ মন্ত্র জপ করেন, তারপর উঠে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে চলে যান। বাদু্নরা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে প্রার্থনা করে দণ্ডবৎ হলেন। আমিও ভক্তিভরে প্রণাম করে মনে মনে আত্মনিবেদন করলুম—

বাসনাদিগ্ধ নয়নে স্নিগ্ধ
নয়ন রাখ হে বুদ্ধ!
অন্তর-জ্বালা জুড়াইয়ে যাক্
শান্ত হউক লুব্ধ!
পুণ্য মুরতি-ধ্যানেতে বিরতি
লভুক লজ্জাশুদ্ধ
হিংসা কুটিল আচরণ, হোক্
কলরব নিঃশব্দ।
তব দয়ার্দ্র অমৃত ভদ্র
বাণীতে ভরুক চিত্ত!
কামনার পার লয়ে যাও মোরে,
এস হে পরম বিত্ত!
এস তথাগত! শ্রীপদে আনত
তাপিত জনের শরণ!
জনমে জনমে আন হে ধরমে
দুঃখ কলুষ হরণ!

বিবিধ-প্রসঙ্গ

হিন্দীভাষা ও কবি-সমাদর

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

—পাঁচ—

··হিন্দীভাষার বিস্তৃতি ক্রমেই বেড়ে চলেছিলো। তখন এদেশে যারা ছিলো হিন্দীকে আপনার ভাষা করে নিয়েছিলো।

এমন কি মুসলমানগণও এ ভাষার পরম ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। পূর্ব্বে কয়েকজন মুসলমান কবির উল্লেখ করা হয়েছে।

হিন্দী ভাষা যে সকল প্রাদেশিক ভাষার মূল তাহা সকলেই যেন বুঝে নিয়েছিলো।

···পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে ও আক্ষরিক অনুবাদের দ্বারা হিন্দীভাষাকে উর্দ্দুভাষাতে পরিণত করে এককালে মুসলমানদের সহানুভূতি পাওয়ায় প্রভূত চেষ্টা কেউ কেউ করেছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা আদৌ ফলবতী হয়নি। বরং সর্ব্বভুক্ হিন্দীভাষা ফারসী ও আরবী ভাষা থেকে অনেক শব্দ আপনার করে নিয়েছিলো।

ইহার মূলে ছিল আমীর ওমরাহ, বাদ্‌শা নবাব, রইস রায় ও সর্ব্বোপরি 'শাহান শাহ' আকবর ও শাহজাদা আমীর খুসরুর হিন্দীভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও প্রগাঢ় সমাদর।·· তা যেমনি আন্তরিক ছিল, তেমনি ব্যাপক ছিল।

এঁদের হিন্দীভাষায় সেবার কথা উল্লেখ করতে গেলে পরম আনন্দ হয়।···এ কথাও এখানে বলা আবশ্যক যে, এই কথার খাঁটি প্রমাণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত,—তা এই প্রবন্ধের শেষভাগে সাদরে স্বীকৃত হয়েছে।

মুসলমানরা যেদিন এদেশে এলো সেদিন থেকেই হিন্দীর সহিত তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হোলো। রাজ্যের লেখাপড়া বেশীর ভাগই হিন্দীতে করা হোতো। মুহম্মদ কাশিম, মহমুদ গজনবী, আর সাহাবুদ্দীন ঘোরী তাঁদের দপ্তরে হিন্দীভাষারই ব্যবহার কর্ত্তেন।

আমীর খুসরু হিন্দীভাষায় একজন মহাকবি ছিলেন। তিনি হিন্দু কবিতায় বহু নতুন ছন্দের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। তিনি বাস্তবিকই অতুল প্রতিভাশালী হিন্দু কবি ছিলেন। তাঁর বিস্তৃত জীবনকথা এখানে বলা অসম্ভব। তবে তাঁর কবি-প্রতিভার একটি উদাহরণ এখানে দিচ্চি।

খুসরুর গান হিন্দুস্থানে খুব প্রচলিত। প্রায় সবাইর মুখে আমীর খুসরুর গান শোনা যায়—এমনি মধুর ও প্রাণস্পর্শী তাঁর সঙ্গীতাবলী!

একদিন আমীর খুসরু বেড়াতে বেরিয়েছেন। কিছুদূর গিয়েই তাঁর পিপাসা পেল এবং রাস্তার ধারেই একটি বাঁধান কূপের কাছে তিনি গেলেন। গিয়ে দেখেন সেখানে চারটি মেয়ে বির্মী দিয়ে তাদের কলসীতে জল তুলছে। তিনি তাঁদের কাছে খাবার জল চাইলেন। মহাকবি আমীর খুসরুকে দেখেই তারা চারজনই কবির গানের কথা বলাবলি

করতে লাগল—এ সেই কবি যাঁর গান আমরা প্রায়ই গেয়ে থাকি—যাঁর কবিতা ছেলে বুড়ো সবার মুখেই শুনতে পাই।

অবশেষে মেয়েরা কবিকে বল্লে,—"কবি, আমাদের চারজনকে চারটি বিষয়ের কবিতা শুনাতে হবে—তারপরে আমরা আপনাকে জল দেব।" চার জনই যথাক্রমে ক্ষীর, চর্কা, কুকুর ও ঢোল (ঢোলক বাদ্য যন্ত্র) সম্বন্ধে কবিতা শুনতে চাইলে। কবি তৎক্ষণাৎ একটি কবিতার উল্লিখিত চারটি বিষয়ের অবতারণা করে শুনিয়ে দিলেন ও তার পরে জল পেতে চাইলেন।

কবিতাটি এই—

"ক্ষীর পকাই যতন সে, চরখা দিয়া চলা,
আয়া কুত্তা খা গয়া, তু বৈঠী ঢোল বজা,
লা পানী পিলা।"

অর্থাৎ তুমি খুব যত্ন সহকারে ক্ষীর তৈরী করলে, কাঠ ছিল না তাই চর্কা জ্বালিয়ে ক্ষীর তৈরী হোলো, কিন্তু তুমি যখন ঢোল বাজিয়ে আমোদ কচ্ছিলে তখন কুকুর এসে ক্ষীর খেয়ে গেল। ব্যস্—হয়েছে এখন জল দাও।

পাঠক দেখতে পাবেন দু লাইনের ছোট্ট কবিতাটিতে ক্ষীর, চরকা, কুকুর ও ঢোল চারটি বিষয় সম্বন্ধেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এমনি আমীর খুসরুর অজস্র কবিতা আছে। খুসরু ছিলেন সকলের কবি, ধনীর প্রাসাদে, গরীবের কুঁড়েতে সব জায়গায় তার সমান আদর ছিল। সকলের সাথে প্রাণ ঢেলে মিশতেও তিনি পারতেন।

আকবর বাদশার রাজত্বকাল হিন্দীর স্বর্ণযুগ। এমন হিন্দীর আদর আজ পর্য্যন্ত হয়নি। আকবর বাদশা নিজে হিন্দীতে অনেক কবিতা রচনা করে গেছেন।

আকবর বাদশা উঁচু দরের বিদ্বান ছিলেন না, কিন্তু তাই বলে তাঁকে নিরক্ষর বলা যায়না। সামান্য লেখাপড়া তিনি জানতেন।

তাঁর কবিতায় একটা নমুনা দিচ্ছি—

"জাকো যশ হৈ জগৎ মেঁ, জগৎ সরাহৈ জাহি,
তাকো জীবন সফল হৈ, কহত অকব্বর শাহি।"

অর্থাৎ যাকে জগতে সকলে প্রশংসা করে ও যার যশ জগৎব্যাপী, আকবর শাহ্ বলেন তার মানব জন্ম নেওয়া সফল হয়েছে।

বোধ হয় এ কবিতাটি তাঁর জীবনের একটা motto ছিল। আকবর চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জগতের শ্রেষ্ঠতম সম্রাটদের মধ্যে স্থান পাবেন। খুঁজলে আকবর বাদশার রচিত কবিতা আরো পাওয়া যেতে পারে।

আকবর নিজের ছেলে জাহাঙ্গীরকে হিন্দী শিখিয়েছিলেন। আর নিজ পৌত্র খুসরুকে হিন্দী শিক্ষা দেওয়ার জন্য পণ্ডিত ভুদত্ত ভট্টাচার্য্যকে শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন।

শাজাহান হিন্দীভাষায় পরম পণ্ডিত ছিলেন এবং দরবারে হিন্দী কবিগণকে পরম সম্মান করতেন। সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার হিন্দী ও সংস্কৃত সাহিত্যে অপূর্ব্ব অতুলনীয় অধিকার। বাবা—ঠাকুর্দার চাইতে এমন কি বাদশার আত্মীয়বর্গের চাইতে দারার হিন্দী ও সংস্কৃতে সকলের চেয়ে বেশী দখল ছিল। যুবরাজ দারা অতি যত্ন সহকারে উপনিষদের ফার্সীতে প্রাঞ্জল অনুবাদ করেছিলেন। সে অনুবাদ যেমনি বিশদ, তেমনি যথাযথ হয়েছিল।

আওরঙ্গজেব বাদশা হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু তিনিও হিন্দীভাষাকে পরম প্রীতির চোখে দেখতেন। একবার শাহজাদা মুহম্মদ আজম দুই ঝুড়ি উৎকৃষ্ট আম আওরঙ্গজেব বাদশার নিকটে পাঠিয়ে দেন এবং তার সঙ্গে প্রার্থনা করে পাঠান যে দু রকমের আম বাদশার জন্য দুই ঝুড়ীতে পাঠান গেল—বাদশা আওরঙ্গজেব যেন দয়া করে আমের নামকরণ করে দেন।

আওরঙ্গজেব বাদশা উত্তরে লিখলেন,—"তুমি স্বয়ং বিদ্বান হয়েও বুড়ো বাপকে আর কেন কষ্ট দিচ্ছ। যা হোক্ তোমার খুসীর জন্য দু রকমের আমের নাম আমি "সুধারস" ও "রসনাবিলাস" রাখলাম।" শাহজাদা মুহম্মদ আজম আওরঙ্গজেব বাদশার পুত্র এবং ঢাকা নগরীতে সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হিন্দীভাষায় এমন একদিন ছিল যেদিন আওরঙ্গজেব বাদশার মতন "কট্টর" বাদশা পর্য্যন্ত তার সেবা করে গেছেন।

*
* *

হিন্দীর অনেক ছোট বড় কবির কথা বিশদ করে বলা হোলো না। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বাঘেলখণ্ডের "মরমিয়া" কবি জ্ঞান দাস, ঘন-আনন্দ, রসলীন, দাস, রসনিধি ও চরণদাস প্রভৃতির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কেবল প্রধান প্রধান কবির কথাই বলা হয়েছে।

ঘাঘ-কবি ছিলেন পাড়াগেঁয়ে কবি। চাষা-ভুষাদের ভাষায় অজস্র কবিতা তিনি রচনা করে গেছেন। সে কবিতার ভাষা পাড়াগেঁয়ে হলেও তার লালিত্য পুরোপুরি বজায় রাখা হয়েছে। অনেক কবিতা খুব উচ্চভাবপূর্ণ।

হাসির কবিতা ও ঘাঘ অনেক লিখিতেছেন। সেগুলি খুব উপভোগ্য। সে কবিতাগুলি ছোটদের জন্য রচনা করা হয়েছে। ছেলেরা একদিন একটা কপুর ধামি দেখে ঘাঘ-কবিকে জিজ্ঞেস্ করলে—এটা কি? তিনি কবিতায় বল্লেন যে ওটা খোদায় পুরাণা সুর্ম্মাদানি।

গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে রাজার হাতী চলে গেছে। মোটা-মোটা পায়ের দাগ রাস্তার উপরে অঙ্কিত হয়ে আছে। ছেলেরা তা দেখে ঘাঘ-কবিকে জিজ্ঞেস করলে—এটা কি? উত্তরে কবি বল্লেন, বিড়ালটা তার পায়ে জাঁতা বেঁধে লাফাতে লাফাতে এই রাস্তা দিয়ে চলে গেছে—তারি দাগ রাস্তার বুকে রয়েছে।

ঘাঘ্ আবার বাংলায় খনার বচনের মত অনেক "বচন" রচনা করে গেছেন। সেগুলি হিন্দুস্থানী চাষাদের মুখে অনেক শোনা যায়।

ঘাঘের কবিতা বিমল হাসির প্রস্রবণ—আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

তোষনিধি আর একজন কবি। এঁর কবিতা সরস ও উচ্চভাবপূর্ণ।

রঘুনাথ কাশীর মহারাজা বরিবণ্ড সিংহের রাজকবি ছিলেন। কাশী-নরেশ তাঁর কবিতা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কবিকে "চৌরা"

নামক মৌজা জায়গীর দিয়েছিলেন। কবি সপরিবারে সেই গ্রামেই থাক্‌তেন।

পিহানীর মোহম্মদী অধিপতি আলি আকবর খাঁ কবিবর গুমান মিশ্রকে নিজের সভাকবি নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর-ই আদেশে কবিবর গুমান মিশ্র শ্রীহর্ষ কৃত মহাকাব্য নৈষধের বিবিধ সুললিত ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন।

আর একজন বড় কবি ছিলেন গিরিধর কবিরায়। তাঁর রচিত কবিতাগুলি সর্বজনসমাদৃত। তিনি কবিতায় বহু নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তক। তন্মধ্যে "কুড়্‌লিয়া" খণ্ড কবিতাগুলি খুবই প্রসিদ্ধ।

এরূপ কথিত আছে যে গিরিধর কবিরায়ের বাড়ীর পাশেই এক ছুতার মিস্ত্রী বাস করত। সেই মিস্ত্রী একটি বিচিত্র চারটি পাখাযুক্ত পালঙ্ক তৈরী করেছিল। সে পালঙ্কে কেউ শুলেই পাখা কয়টি আপনিই বাতাস দিতে সুরু করত। মিস্ত্রী সেই পালঙ্কটি নিয়ে রাজার কাছে বিক্রয় করে। কিছুদিন পরে রাজা মিস্ত্রীকে আরো কয়েকটি ঐ রকমের পালঙ্ক প্রস্তুত করতে আদেশ করেন। মিস্ত্রী জানালে যে কবিবর গিরিধর কবিরায়ের বাড়ীতে একটি কুলের (বড়ই) গাছ আছে। সেটি পেলে কয়েকটি ঐ রকমের সুদৃশ্য পালঙ্ক তৈরী করে দিতে পারে। কবিবর গিরিধর অনেক মিনতি করে রাজাকে জানালেন যে তিনি ঐ গাছটি দিবেন না। কিন্তু রাজা তা শুনলেন না। জোর করে গাছটি গিরিধরের বাড়ী থেকে আনা হোলো। গিরিধর এতে এতই মর্ম্মাহত হন যে তিনি ঐ রাজার রাজ্য তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে যান।

গিরিধরের ছেলেপুলে ছিল না। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রীও প্রতিভাশালিনী কবি ছিলেন। তিনি সকলের নিকটে "সাঁই" নামে পরিচিত।

কবিবর সূদন ভরতপুরের মহারাজ সুরজমলের পরম প্রিয় সভাকবি ছিলেন এবং সুরজমলের বহু অভিযানের বর্ণনা করেছেন। তিনি যুদ্ধের কবিতা ও গান রচনা করে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন।

শীতল ও ব্রজবাসীদাসও বেশ উঁচুদরের কবি ছিলেন।

সহজোবাঈ ও দয়াবাঈ বিখ্যাত স্ত্রী-কবি ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই মহাসম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা। উভয়েই পরম পুণ্যবতী ও ধার্ম্মিক রমণী ছিলেন।

কবিবর ঠাকুরের রচিত কবিতাও খুব প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত।

কবিবর বোধার পুরা নাম বুদ্ধিসেন ছিল। ইনি পান্নার মহারাজার সভাকবি ছিলেন ও তাঁর দরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল।

কলিকাতার সর্ব্ব পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক লল্লুজী লাল একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। ইনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

রেওয়া-কণ্ঠার মহারাজা জয়সিংহ পরম পণ্ডিত ও বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি কবিগণকে পরম আদর ও সম্মান করতেন। তিনি জীবিত থাকা অবস্থায়ই তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ সিংহের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। নিজে রাজ-কাষ হতে অবসর নিয়ে কাব্যচর্চ্চা ও সাধুসঙ্গ নিয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করে গেছেন।

রামসহায় দাস একজন কবি ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। সেগুলি খুব প্রসিদ্ধ।

গ্বাল কবির কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। দীনদয়াল গিরি আর একজন বড় কবি। কাশী-নরেশ তাঁকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। অন্য অনেক রাজা মহারাজা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক সাধু কবি ছিলেন।

রণধীর সিংহ নিজে অভিজাতবংশে জন্মগ্রহণ করেও কাব্যলক্ষ্মীর ষোড়োশোপচারে পূজা করেছিলেন এবং অচিরে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

স্বাধীন রেওয়া রাজ্যের অধিপতি মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহ হিন্দীভাষার একজন মহাকবি ছিলেন।

নিজে কবি বলেই গুণী ও কবিকে চিরদিন পরম সমাদর করে গেছেন। হাজার হাজার কবিকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেও তাঁর কবি-সমাদরের অদম্য স্পৃহা দমে যায় নি।

রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে সরস্বতী দেবীর চিরদিন বিরোধ; কিন্তু মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহ লক্ষ্মী-সরস্বতীর বড় আদরের দুলাল ছিলেন।...... হিন্দীভাষাতে রচিত তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থ আছে।......ছন্দের নৈপুণ্য, শব্দচয়ন প্রভৃতি গুণ তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচায়ক।

তাঁর মৃত্যুতে এক কবি লিখেছিলেন যে "আজ সকল দীনহীন জনের দয়ার সিন্ধু চিরতরে শুকিয়ে গেল।"......

তাঁর মৃত্যুর পরে রচিত শোকগাথাগুলিও হিন্দী সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ।

কমলার বরপুত্র আর একজন সরস্বতীরও বরপুত্র হতে পেরেছিলেন— তিনি রায় রাজা ঈশ্বরী প্রতাপনারায়ণ রায়। ইনি পড়রৌনার রাজা ছিলেন। পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন বলেই তাঁর প্রায় কবিতা রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়েই রচিত।......তাঁর রচিত গানও অনেক আছে।

কবিবর পজনেশ একজন শৃঙ্গার রসের বড় কবি ছিলেন।

হিন্দীভাষায় সেবা স্বাধীন রাজা-রাজড়ারাই বেশী করে' করে গিয়েছেন। স্বাধীন রেওয়া-কণ্ঠার মহারাজাদের মধ্যে অনেকেই সরস্বতীরও বরপুত্র ছিলেন। তাঁরা যে-সে কবি ছিলেন না। তাঁহাদের অনেকেরই অতুলনীয় প্রতিভা ছিল। রেওয়ার মহারাজা রঘুরাজ সিংহ একজন অতুল প্রতিভাশালী কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি ছিল।

কবিত্ব মহারাজ রঘুরাজ সিংহের পৈতৃক সম্পত্তি বলা যেতে পারে। ......তাঁর পিতা ও পিতামহও শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।

সুন্দরশতক, বিনয়পত্রিক, রুক্মিণীপরিণয়, ভক্তি-বিলাস, ভক্তমাল, বিনয়মালা প্রভৃতি গ্রন্থাবলী মহারাজ রঘুরাজের অমর প্রতিভার নিদর্শন— সন্দেহ নেই।

অযোধ্যার মহারাজা মানসিংহ ওরফে দ্বিজদেবও একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।......তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহও হিন্দীভাষায় একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও পাণ্ডিত্যের জন্য 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পেয়েছিলেন।

কবি রামদয়াল নেউটিয়ার প্রেমাঙ্কুর প্রভৃতি গ্রন্থও বিশেষ আদৃত।

রাজা লক্ষ্মণ সিংহও একজন হিন্দী কবি ছিলেন। তাঁর মেঘদূতের অনুবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের পিতা গিরিধর দাসও একজন বড় কবি ছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি হিন্দীভাষার সকল কবিগণের বিস্তারিত জীবন-কথা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের রচিত সমস্ত 'কাব্য-পরিক্রম' করে বর্ণন করাও এখানে সম্ভব হবে না।

হিন্দী সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবিগণের উল্লেখ মাত্র করা গেল।

এ ছাড়া হিন্দী সাহিত্যে অজস্র কবিতা পাওয়া গেছে যার কে রচয়িতা এখনও নির্ণীত হয় নি।

লোকমুখে বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা, খণ্ড-কাব্য, গীতি-কবিতা শোনা যায়; কিন্তু কবির নাম এখনও ঠিক করা যায় নি।

*

* *

কাশীর 'নাগরী প্রচারিণী-সভা' বাংলাদেশের সাহিত্য-পরিষদের আর এক সংস্করণ। সেখানে বাংলা সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-তালিকার মতই কায করা হচ্চে।

বাৎসরিক হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন ও কবি-সম্মেলন রীতিমতই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

প্রত্নতত্ত্ব-অনুসন্ধান সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রীতিমত তার কায চলছে।

বর্ত্তমানে হিন্দীভাষায় বড় কবি হচ্চেন অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়। তার পরেই হচ্চেন মৈথিলীশরণ গুপ্ত। প্রেমচন্দ্ ছোট গল্প লিখে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ও তাঁর লেখা গল্প ও উপন্যাস সর্ব্বজন-সমাদৃত।

বদরীনাথ ভট্টেরও গল্প ও উপন্যাস লেখায় সুখ্যাতি আছে। তাঁর লেখার ছটা ও সলীল গতি মনকে মুগ্ধ করে।

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকে হিন্দী ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র বলে অভিহিত করা যেতে পারে। হিন্দী সাহিত্যে তাঁর অমূল্য অবদানের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বদরীনারায়ণ চৌধুরী একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন এবং তাঁর কবিতাও খুব সমাদৃত হয়েছিল।

বিনায়ক রাও, প্রতাপনারায়ণ মিশ্র, অম্বিকা দত্ত ব্যাস, লালা সীতারাম, নাথুরাম শঙ্কর শর্ম্মা, জগন্নাথ দাস 'রত্নাকর' শ্রীধর পাঠক, মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী, রাধাকৃষ্ণ দাস, লালা ভগবান দীন, জগন্নাথ প্রসাদ চতুর্বেদী, মিশ্র বন্ধু নামে পরিচিত শ্যামবিহারী মিশ্র ও শুকদেব বিহারী মিশ্র ভ্রাতৃদ্বয়, গিরিধর শর্ম্মা, রঘুনাথ সিংহ, রূপনারায়ণ পাঁড়ে, দুলারে লাল ভার্গব, রামচন্দ্র সুকুল, মন্নন দ্বিবেদী, লোচনপ্রসাদ পাণ্ডে, লক্ষ্মীধর উপাধ্যায়, শিবমাধার পাঁড়ে, গোলাপ শরণ সিংহ, বিয়োগী হরি প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকগণ হিন্দী সাহিত্যের দরবারে নিজস্ব আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন।

হিন্দী ভাষায় গ্রন্থাদি পড়তে গেলেই এঁদের বই পড়তে হবে।

এ ছাড়া হিন্দী ভাষায় অজস্র কবিতা ও গান পাওয়া গেছে, যার রচয়িতার নাম এখনও পাওয়া যায় নি—আর পাওয়া যাবে বলেও আশা করা যায় না।…এ ধরণের কবিতাগুলিও খুব উচ্চ ধরণের এবং প্রথম শ্রেণীর কবির রচিত বলে বোধ হয়।

*

* *

হিন্দী ভাষার পুরানো নাম হিন্দ্‌বী বা হিন্দুই ছিল। পূর্ব্বেই বলেছি হিন্দু শব্দের সহিত হিন্দী নামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়ে গেছে।

হিন্দী ভাষা বৈষ্ণবদেরও পরম প্রিয় ছিল। বিষ্ণু সম্প্রদায়, রামানুজ সম্প্রদায়, মধ্ব সম্প্রদায় ও বল্লভ সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য বিষ্ণু, রামানুজ, মধ্ব ও বল্লভের লীলা-কাহিনী হিন্দীতেই রচিত হয়েছে এবং তাঁদের ভক্তবৃন্দ ঐ হিন্দী ভাষাতেই তাঁদের গুণ-গান করে থাকেন। উক্ত আচার্য্য চতুষ্টয়েরও রচিত অনেক হিন্দী-পদাবলী প্রক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া যায়।

হিন্দী-বৈষ্ণব-পদাবলী এমনি মধুর ও প্রাণস্পর্শী হয়েছিল যে রহিম ও মালিক মুহম্মদ জায়সীর মতো মুসলমানদেরও বৈষ্ণব কবিতে পরিণত করেছিল।

জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরাও হিন্দী ভাষার সেবা করেছেন এবং জৈন-প্রধান বানারসী দাস হিন্দী ভাষার একজন মহা কবি ছিলেন।

হিন্দী সাহিত্যের দুটি মণি-কোঠা এই দুই ধর্ম্মের আচার্য্যদের অবদান উজ্জ্বল করে রেখেছে।

তাঁদের দানের বৈশিষ্ট্য ভাবতে গেলেই মন অপূর্ব্ব পুলকে ভরে উঠে।

শিখ-গুরুদের অনেকেই হিন্দীভাষার পরম সমাদর ও সেবা করে গেছেন।

শিখদের আদি-গুরু নানক হিন্দী ভাষার বহুল প্রচার করেন। যেখানে যেতেন সেখানেই হিন্দীতে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদেব হিন্দীভাষায় প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। তিনি তাঁহার আগের সমস্ত শিখ-গুরুদের বাণী সংগ্রহ করে "গুরু গ্রন্থ সাহেব" নামে পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থ এখন পাঞ্জাবে করতারপুরে মজুদ আছে।

গুরু তেগবাহাদুর সংসারের অসারতা সম্বন্ধে হিন্দী ভাষাতেই সম্রাট আওরঙ্গজেবকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শিখ গুরুদেব মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী হিন্দী ভাষার আদর করে গেছেন গুরু গোবিন্দ সিংহ। হিন্দী ভাষা প্রচারের জন্য তিনি কয়েকটি হিন্দী পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন।

ভাই সন্তোষ সিংহও হিন্দী ভাষার অনেক উন্নতি সাধন করে গেছেন।

শিখদের আর একটা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সূর্য্য প্রকাশ" হিন্দী ভাষাতেই তিনি রচনা করেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর একজন প্রিয় শিষ্য গুলাব সিংহকে হিন্দী শিখবার জন্য কাশী পাঠিয়ে দেন। কালে তিনি হিন্দী ভাষার একজন

খ্যাতনামা লেখক হতে পেরেছিলেন এবং তাঁর দ্বারা হিন্দী ভাষার উপকার ও উন্নতি সাধিত হয়েছে।

বর্ত্তমানেও জ্ঞানী জ্ঞানসিংহ হিন্দী ভাষা প্রচারের জন্ম কায়মনোবাক্যে যথাসাধ্য যত্ন-চেষ্টা করচেন এবং "জ্ঞান প্রকাশ" নামক তাঁর রচিত হিন্দী গ্রন্থটি সমাদৃত হয়েছে।

হিন্দীভাষার সমাদর গুজরাতীরাও যথাসাধ্য করেছে।......মীরা বাঈয়ের হিন্দী কবিতায় গুজরাতী ভাষার দু-একটা শব্দ যেখানে সেখানে এসে পড়েছে।

নরসী মেহতা গুজরাতী ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।......তিনি খুব ভাল হিন্দী জানতেন্ ও তাঁর কবিতায় যথাসাধ্য হিন্দীভাষার ব্যবহার করেছেন।

গুজরাতী কবিগণের মধ্যে দয়ারাম, শ্যামল ও নর্ম্মদা শঙ্করের স্থান খুব উঁচুতে।...এঁরা সকলেই হিন্দী ভাষার সহিত বিশেষ পরিচিত।

হিন্দী ভাষাতে তুলসী দাসের চৌপাই, সুরদাসের পদাবলী ও গিরিধরের কুঁড়লিয়া যেমন প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত ঠিক তেমনি গুজরাতী ভাষায় নরসী মেহতার প্রভাতী, মীরা বাঈয়ের ভজন, সামলের চপ্পর, দয়ারামের গরমিয়াঁ ও নর্ম্মদাশঙ্করের রোলা ছন্দ পরম আদরণীয়।

*

* *

হিন্দী ভাষার আদি কবি হচ্চেন,—চন্দ, জল্হ ও জগনক। হিন্দী ভাষার প্রারম্ভকালের মুখ্য কবিদের নাম,—বিদ্যাপতি, অমীর খুসরো, কবীর, নানক ইত্যাদি।

... হিন্দী ভাষার প্রৌঢ়কালের কবি হচ্চেন,—সুরদাস, তুলসীদাস, মীরাবাঈ, হিতহরিবংশ, দাদূ দয়াল, গঙ্গ, রহীম, কেশবদাস, রসখান, সেনাপতি, সুন্দরদাস, বিহারী, ভূষণ, মতিরাম, লাল, ঘন-আনন্দ, দেব, বৃন্দ ইত্যাদি।

......হিন্দী ভাষায় উত্তর সময়ের কবির নাম—দাস, দূলহ, গিরিধর, ঠাকুর, পদ্মাকর, গ্বাল্, দীনদয়াল, রঘুরাজ, দ্বিজদেব, লক্ষ্মণসিংহ ও গিরিধর দাস।

এই যুগের মুখ্য গদ্য-লেখক হচ্চেন,— লল্লুলাল, সদলমিশ্র ও রাজা লক্ষ্মণ সিংহ।

হিন্দী ভাষার কবিদের কথা অল্পপরিসরের মধ্যে যথাসাধ্য উল্লেখ করা হয়েছে।..... হিন্দী সাহিত্যে দু রকম ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। এক ব্রজভাষা, দ্বিতীয় বর্ত্তমান হিন্দী—যাকে হিন্দী ভাষাভাষীরা "খড়ী বোলী" বলে থাকেন।

পুরাতন কবিদের অনেকের লেখা-ই ব্রজ ভাষাতে লেখা। সে হিন্দী পুরাতন।

হালের কবিগণের রচনা "খড়ী বোলী" ভাষাতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

ব্রজভাষায় রচিত কাব্য আজকালকার হিন্দী পাঠকদের নিকট অতি সহজবোধ্য নয়। অনেক জায়গায় কবিতার মর্ম্ম গ্রহণ করা শক্ত হয়ে পড়ে।

আজকালকার ভাষা যেন সহজ সরল পরিষ্কার রাস্তা, পাহাড়-ঝোপ্-ঝাড়-জঙ্গল কেটে তৈরী করা হয়েছে। বুঝতে বাধে না—একদম্ একটানা সাফ্ সড়ক চলে গেছে।......লেখার ছটা, ছন্দের গতি অব্যাহতভাবে, উদ্দাম্ বেগে ছুটে চলেছে।

......পড়তে গিয়ে থাম্‌তে হয় না। কবিতার বর্ণিত বিষয় শতদল পদ্মের মত চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

এ কথার উল্লেখ করায় অবশ্য এ কথা বলা হোলো না যে পুরাকালের রচিত কবিতা সবই অবোধ্য বা সহজে তার ভাব গ্রহণ করা যায় না। বরং সুরদাস, তুলসীদাসের লেখা, পড়তে গিয়ে মনে হয়, বর্ত্তমান কালের লেখার চেয়েও সরল ও সহজবোধ্য। কিন্তু অনেক পুরানো লেখা-ই বোঝা আয়াসসাধ্য।

ভানুকবি রচিত গ্রন্থাবলীতে সবিস্তারে নানা প্রকার ছন্দের পরিচয়, পরিমাপ ও গঠনপদ্ধতি দেওয়া আছে। শব্দালঙ্কারও বিশদ ভাবে বর্ণিত রয়েছে।

বাংলা ও হিন্দীর ব্যাকরণ প্রায় এক রকমের। সম্প্রতি কয়েক রকম ছন্দের নাম করা গেল—যথা, দোহা, চৌপাই, শোরঠা, বার, সবইয়া, মরহঠা, কুঁড়লিয়া, কবিত্ত, মত্তগয়ন্দ ইত্যাদি।

হিন্দীভাষার জন্মদাতা হচ্চেন তদ্দেশীয় ভাটগণ। এঁরা যে রাজার রাজত্বে বাস করতেন, তাঁহাদেরই যশ কীর্ত্তন করে কবিতা, গান, গাথা রচনা করতেন।

*

* *

কবিদের ও তাঁদের লেখার কথা বলা হোলো। এখন তাঁদের রাজ-দরবারে কাব্যচর্চ্চার দু-একটি চিত্র দিয়েই এই প্রবন্ধ শেষ করা যাবে।

...কবি হরিনাথের কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। তিনি একদিন রেওয়ার মহারাজার দরবারে গিয়ে উপস্থিত। রেওয়ার রাজা মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহ নিজে একজন কবি।

বিশ্বনাথ সিংহের খ্যাতি তখন দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি যেমন কমলার আদরের দুলাল, তেমনি বাণীর বরপুত্র ছিলেন। তাঁর সভায় কবিদের খুব সমাদর করা হোতো।

...হঠাৎ কি কারণে তিনি আদেশ প্রচার করেন যে, নূতন বিষয়ের কোনো কবিতা শোনাতে না পারলে তিনি কোনো কবিকেই "বিদাই" (কবিকে পুরস্কার) দিবেন না।

দরিদ্র কবিদের বড় দুঃখ হোলো। কারণ তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই "যে জন সেবিবে ও রাঙ্গা চরণ সেই ত দরিদ্র হবে।" তাঁরা গিয়ে হরিনাথকে ধরলেন।...হরিনাথকে রেওয়া নরেশের দরবারে যেতে হোলো।

রাজার দেউড়ীর নিকটে গিয়ে কবি তিন তিনবার ফিরে এলেন। অবশেষে প্রহরী ও সান্ত্রীকে অনেক বলে কয়ে তিনি প্রাসাদে ঢোকবার সুবিধা করে নিলেন। রাজার বাসভবনের নিকটে গিয়ে দেখেন

সামনের দ্বিতল বারান্দায় মহারাজ স্বীয় মহারাণী সমভিব্যাহারে ভোলানাথ বিশ্বনাথের পূজায় নিমগ্ন। শিব, পার্শ্বে পার্ব্বতী; মহারাজ শিবানী-পতি শিবের ও মহারাণী পার্ব্বতীর স্বর্ণার্ঘ্যে পুজাঞ্জলি দিচ্ছেন।

কিন্তু রাজার খাস হুজুরী সান্ত্রী তাঁকে ভিতরে যেতে দেয় না। রাজারও পুজা তখন শেষ হয়ে এসেছে। কবি আর কি করেন—তিনি নিম্নতলে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে এক কবিতা রাজার উদ্দেশে শোনালেন। তখন প্রভাত। মহারাজ কবিতা শুনলেন। কবিত্বের মাধুর্য্য, কবিত্বে ভাব-প্রেরণা প্রাণের মধ্যে গুমরে উঠল। প্রাকৃতিক প্রভাতী সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিত হয়ে, আকাশ-বাতাস মাতিয়ে, সেই কবিতার তান রাজার কানে ভেসে গেল। কবিতার অর্থ এই "আমি মহারাজ বলে তোমার সাথে দেখা করতে আসিনি; তুমি কবি, কাব্যচর্চ্চা ভালোবাস; আর আমিও কাব্যরচনা-ব্যবসায়ী; তাই তোমারি সাথে শুধু কাব্য-চর্চ্চা করতে এসেছি। অর্থপ্রাপ্তি বা পুরস্কারের লোভে আসিনি।" কবিতায় সরস, সরল, সুললিত আবৃত্তি রাজাকে মুগ্ধ করল। আর কি থাকা যায়—অমনি কবির তলব হোলো। কবি সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে উপরে বারান্দায় যে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখলেন তাতে মুগ্ধ ও তৃপ্ত হয়ে গেলেন।

রাজা-রাণী কুশাসনে বসে শিব-পার্ব্বতীর পুজায় তন্ময় ও তদ্গত চিত্ত।...তখন কবির হৃদয়বীণা আবার বেজে উঠল। আবার কবি একটি কবিতা শোনালেন। রাজার দেবভক্তি নিয়েই এই কবিতা রচিত। কবিতাটি পড়তে গেলেই মর্ম্মস্পর্শ করে!

হিন্দী কবিগণের আরো অনেক কায ছিল। রাজাদের গুণ-গরিমা ও দানশৌণ্ডতা নিয়ে কবিতা রচনা করা কবিদের কায ছিল। আবার রাজাদের যে সব দোষ আছে তাহাও নানা উপায়ে সংশোধন করার প্রয়াস তাঁরা পেতেন।

যুদ্ধ-বিগ্রহাদির সময় কবিগণ নানাপ্রকারের প্রাণমাতান, রণোন্মাদনাপূর্ণ সঙ্গীতাবলী রচনা করে ভীরু, সাহসহীন সৈনিককে অসম সাহসিক সৈন্যে পরিণত করতেন। এই রণ-সঙ্গীত গেয়ে তাদের সাহস শত গুণ বেশী বেড়ে যেতো।

পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার বিবাহ ও অন্যান্য ঘটনা নিয়ে হিন্দুস্থানে "আহলহা" নামক এক রকমের গাথা বহুদিন থেকে প্রচলিত আছে। সে গান খুব উন্মাদকতাপূর্ণ। ঢোল্ বাজিয়ে অনেকে এই গাথা গেয়ে থাকে।

অনেক ছোটখাট কবিও হিন্দীভাষাতে অনেক মূল্যবান কাব্য লিখেছেন। সে সবও নগণ্য বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। হিন্দী ভাষার বিস্তারিত ইতিহাস বেরোলে তাঁদের কথাও তাতে থাকবে সন্দেহ নেই।

রহীম শেষ জীবনে সর্ব্বরিক্ত হয়ে পড়েন।...অগাধ অপরিমিত অর্থ জলের মত দান করে দারিদ্র্যব্রতী তাঁকে হতে হয়েছিল।... আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁর বড় সাধের "নওরতন" ভেঙ্গে যায়।

মিথ্যা রাজদ্রোহ অপবাদে রহীমকে জাহাঙ্গীরের আদেশানুযায়ী জেলে যেতে হয়েছিল। রহীমের সমস্ত সম্পত্তি বাদশার সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।...অনেকদিন পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

কারামুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়।... প্রতিদিন তিনি লাখ্-লাখ্ টাকা গরীব দুঃখীকে বিলিয়ে দিতেন— আজ তাঁর গৃহে অন্ন নাই! কারামুক্তির পরেও বহু যাচক উপযাচক, রাজ্যসংক্রান্ত নানারূপ জটিল সমস্যা-সমাধানের পরামর্শ নেওয়ার জন্য বহু রাজন্যবর্গ তাঁর কুটীর-দুয়ারে সমাগত হতেন। তিনি তাঁদের অনেক বোঝাতেন যে, যেন তারা আর তাঁর নিকটে না আসে। কিন্তু সে কথা কেউ মানত না। একদিন তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি উপস্থিত পাঠক-বর্গের নিকটে বলে চিত্রকুটে চলে যান।

এ রহীম দর দর্ ফিরে, মাঁগি মধুকরী খাহিঁ;
য়ারো য়ারী ছোঁড় দো ওই রহীম অব নাহিঁ।

অর্থাৎ

এ রহীম এবে যেথায় সেথায় ফিরে,
মাধুকরী করি কোনো রকমে পায়;
বন্ধুরা আর এস না তাহার কাছে
এ রহীম ওগো সে রহীম আর নয়।

এই কবিতাটি যেন রহীমের মর্ম্মন্তুদ দুঃখের দু-ফোঁটা অশ্রুজল। অজস্র অর্থ দুই হাতে গরীব-দুঃখীকে যে আজন্ম বিলিয়েছে, আজ তাকে মাধুকরী বৃত্তি, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করতে হয় এ ভাবতেও যেন প্রাণে বাজে।

তবুও যাচকবর্গ তাঁকে সর্ব্বদাই ঘিরে থাক্তো। তিনি তাঁদের কিছুতেই ছাড়াতে পারতেন্ না। একদিন এক গরীব ব্রাহ্মণ তাঁকে বলেই ফেল্লে—

"রহিমন দানি দরিদ্রতর, তউ যাচিবে যোগ;
জোঁ সরিতন সুখা পড়ে কুআঁ খনাবত লোগ।"

অর্থাৎ রহীম আজ সব বিলিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন; তবুও তিনি-ই একমাত্র উপযুক্ত যোগ্য লোক, যাঁর নিকটে সবাই প্রার্থনা করতে পারে। নদী শুকিয়ে গেলেও সেখানেই জলের জন্যে লোকে কুঁয়ো (ইন্দারা) করে নেয়।

রহীম বহুদিন অযোধ্যার সুবাদার ছিলেন বলে তাঁকে অনেকে 'অওধ-নরেশ' বলে ডাক্তো; অর্থাৎ যেমন খবরের কাগজওয়ালারা বাঙলার লাটসাহেবকে অনেক সময় বঙ্গেশ্বর বলে উল্লেখ করে।

গরীব ব্রাহ্মণটি যখন কিছুতেই রহীমকে ছেড়ে যায় না, তখন তিনি আর কি করেন, তাঁর পরমপ্রিয় মিত্র রেওয়ার মহারাজার নিকট একটি দু-লাইনের কবিতায় চিঠি লিখে দিয়ে তাকে রেওয়া-দরবারে পাঠিয়ে দেন। কবিতাটি এই—

"চিত্রকুট মে রমি রহে,
রহিমন অওধ-নরেশ;
যাপর বিপদা পড়তি হয়,
সো আবত য়হ দেশ।"

এর অর্থ হোলো এই যে 'অওধ-নরেশ' রহীম দুরবস্থায় পড়ে এখন

চিত্রকূটে বাসা বেঁধেছেন। যার উপর বিপদ পড়ে সেই শুধু এ দেশে এসে থাকে।

মহারাজা তৎক্ষণাৎ তাঁকে এক লাখ টাকা পাঠিয়ে দেন। তিনি সেই টাকা পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাহা যাচকবর্গকে দান করে ফেলেন।

প্রার্থী ও যাচকদের উপদ্রবে তিনি আর চিত্রকূটে থাকতে পারলেন না। সেখান থেকে পালিয়ে রেওয়া রাজ্যের রাজধানীতে এসে এক ছোলা-ভাজাওয়ালার দোকানে সামান্য "ভাঝোকার" অর্থাৎ ছোলাভাজাওয়ালার চুলো জ্বালাবার কার্য্য গ্রহণ করেন। মাধুকরী ব্রত ত্যাগ করে তিনি আত্মগোপন অভিপ্রায়ে এই নগণ্য চাকুরী গ্রহণ করেন।

একদিন তিনি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে "ভার্ ঝোঁক ছেন অর্থাৎ চুলোতে কয়লা ভরে দিচ্ছেন, ঠিক এমনি সময় রেওয়া-নরেশ সেই রাস্তা দিয়ে রথে চড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি রহীমকে ঐ অবস্থায় দেখ্‌তে পান; দেখতে পেয়েই রাজা রথ থেকে নেমে তাঁর নিকটে এসে এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন। বলা বাহুল্য রেওয়ার মহারাজদের মধ্যে অনেকে সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন।

"যাকে শির অস ভার্

সো কস্ ঝোঁকত ভার অস।"

অর্থাৎ যাঁর মস্তকে অত বড় দায়িত্বের ভার ছিল সে এখন কেমন করে এমন ভাবে 'ভার' ঝোঁকছে। এখানে ভার শব্দটির দুই অর্থ হয়েছে। রহীম তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

"রহিমন উতরে পার,

ভার্ ঝোঁক সব ভার্ মেঁ।"

অর্থাৎ রহীম সব ভার্ (দায়িত্ব) ভারে দিয়ে (চুলোয় দিয়ে) চলে এসেছেন। এখন তিনি বন্ধনমুক্ত - দায়িত্বের কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা নহেন।

রেওয়ার মহারাজ তাঁকে তাঁর পরিবারবর্গসহ চিরদিন পালন করবেন—এ প্রতিজ্ঞা করেও তাঁকে রেওয়ায় রাখতে পারেন নি। তিনি অবিলম্বে রেওয়া ত্যাগ করেন।

রহীম ও আমীর খুসরু হিন্দীভাষা-সৌধের মহাগৌরবময় স্তম্ভদ্বয়। এঁদের লেখা গোঁড়ামি ও বিদ্বেষ-ভাব-বর্জ্জিত।

রহীমের কাব্যচর্চ্চা ও দানের অজস্র কাহিনী শোনা যায়। রহীমের জীবন যেন তাঁরই রচিত একটি কবিতার এক কলির মতো—

"তরুবর ফল নহি খাত হয়,

সরবর পিয়ঁহি ন পান,

কহি রহীম পরকাজ হিত

সম্পতি সুঁচহি সুজান।"

অর্থাৎ বৃক্ষ নিজের ফল নিজে খায় না—পরকে সব বিলিয়ে দেয়; সরোবর নিজের জল নিজে পান করে না—সে জলে অন্য লোক তৃষ্ণা নিবারণ করে। তেমনি সু-জন অর্থ-সম্পত্তি সঞ্চয় করে পরের হিতের জন্যে দান করে থাকে।

…এ যেন তাঁরই জীবনের কথা।…এ যেন সর্ব্বস্ব বিলিয়ে তিনি যে সর্ব্বরিক্ত সন্ন্যাসী—দারিদ্র্যব্রতী জ্ঞানভিক্ষু সেজেছিলেন—তারই ছবি! আর এক জায়গায় তিনি বলছেন—

"রহিমন দেখি বড়েনকো

লঘু নদীজিয়ে ডারি;

জহাঁ কাম আয়ে সুই,

কহা করে তরবারি।"

এর অর্থ হোলো এই যে রহীম তুমি 'বড়'র সঙ্গ কর বলে 'ছোটো'কে ঘৃণা কর না; কারণ অনেক সময় সুঁচ দ্বারা যে কাজ সাধিত হয় বৃহৎ তরবারি দিয়ে তাহা পারা যায় না।

*

* *

হিন্দী সাহিত্যে দুইজন দেবতার অসীম প্রভাব লক্ষিত হয়ে থাকে। আজন্ম রঘুবীরভক্ত সাধক তুলসীদাস ভগবান শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের ও অন্ধ পরম ভক্ত, কবি সুরদাস শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তনের প্রবাহের বন্যায় সারা দেশটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।…অফুরন্ত—অনন্ত-লীলাময় ভগবানকে নিয়ে এমন কাব্য, মহাকাব্য, গান, গীতিকবিতা আর কোনো দেশে কোনো কবি রচনা করেছেন বলে শুনি নি।…রাম ও কৃষ্ণের যশঃ-কীর্ত্তন যেন আর ফুরাতে চায় না। পাহাড়ী ঝরণার অবাধ গতি ছুটে চলেছে। অথচ সব চেয়ে উপভোগের কথা হচ্চে এই যে ইহা যতই পড়া যাক্ না কেন পুরাতন বলে মনে হয় না। পড়তে সুরু করলে পড়বার ইচ্ছা বেড়েই চলে।…এ যেন চিরনতুন!

হিন্দীভাষাভাষীদের দেশে প্রত্যেক ঋতুর উপযোগী গীতাবলী শুনতে পাওয়া যায়।…বেশী করেই চোখে পড়ে বর্ষার ও বসন্তের সঙ্গীতাবলী।

বর্ষাকালে ও-দেশে 'কজরী' উৎসব অর্থাৎ মেঘের উৎসব হয়ে থাকে। শ্রাবণ মাস ভরেই এই উৎসব চল্‌তে থাকে। আর সমাপ্ত হয় কোথাও কৃষ্ণা-তৃতীয়াতে; কোথাও বা শুক্ল-তৃতীয়া অথবা ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত এই উৎসব চলে।

বাংলা দেশে থেকে, বর্ষা যে কি সন্তাপহারী কত সাধনার ধন—তা বোঝাই যায় না। পশ্চিমে চৈত্র হইতে আষাঢ়ের মাঝে যখন অসহ্য গ্রীষ্মের পর আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়, শীতল হাওয়া বইতে আরম্ভ করে, তখন সে দেশে ঘরে ঘরে উৎসব লেগে যায়। শিখীর কেকারব ও বিচিত্র কাকলীতে দেশ ছেয়ে যায়। সবাইর মনে আর আনন্দ ধরে না।

মেয়েরা ধানী রঙের ঘাঘ্‌রা ও আকাশ-রঙের ওড়না গায় দিয়ে নগরের উপকণ্ঠে উদ্যানে সব সমবেত হয়।……উদ্যান, কুঞ্জ ও তরুবীথিকা মুখরিত হয়ে ওঠে নারীদের কলোচ্ছ্বাসে……আকাশ-বাতাস ছেয়ে যায় তাদের 'কাজরী' গানের মধুর ঝঙ্কারে; আর সকলের মনে জাগে অপূর্ব্ব পুলক।

……বড় গাছের ডালে-ডালে হিন্দোলা পড়ে যায়। তরুণীরা তাদের দোলার সাথে সাথে কাজরী গান গায়। আর তাদেরি একদল, যারা মাটিতে বসে থাকে, ধুয়া দেয় ও সঙ্গীতটি পুরো করে দেয়।

……হিন্দোলায়-চড়া মেয়েরা গায় ঘনঘটা ও নীল আকাশের গান;

আর নীচের তরুণীরা গায় হরিৎ বর্ণের শস্যের ও নব দূর্ব্বাদলের সবুজ গীতি। এমনি করে বর্ষার ও গানের ধারা সমানে প্রবল বেগে বেয়ে চলে দেশকে প্লাবিত করে দেয়।

কাশী ও মির্জাপুর অঞ্চলে এই উৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়ে থাকে।

......হোলীর গান ফাগের দিনে আবার সমগ্র দেশবাসীকে মাতিয়ে তোলে। যেমনি আবীর ও রঙে সব একেবারে লালে লাল্ হয়ে যায়, তেমনি হোলীর গানে সকলে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। আনন্দ আর ধরে না।

গানের সুর অতি মধুর। বহু রকমের গান আছে।

আবার রামলীলায় সময় গান। তার সুর যেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনি মধুর।

গ্রাম্য মেয়েলী সঙ্গীতও বহু রকমের আছে। স্ত্রী-আচারের প্রত্যেক উৎসবে সেই উৎসবোচিত গান গীত হয়ে থাকে।

বিবাহে, উপনয়নে, মস্তকমুণ্ডনে, নামকরণে, অন্নারম্ভে, মেয়েদের পর্ব্বের দিনে উৎসব-গীতিতে গৃহ মুখরিত হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া কথকতা, বেদপাঠ, সত্যনারায়ণ ও শনিদেবের কথা, নানারূপ দেবদেবীর পাঁচালী হিন্দী ভাষায় ঢের ঢের আছে।

বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতি ও অন্যান্য বহু রকমের পুরাণী চালের উপাখ্যানমালা অজস্র আছে।......তোতাপরীর কথা, রাজকন্যা, সেনাপতি রাজকুমারের কথা, লায়লা মজনু, সোরাব রস্তম, হাতেম তাই ও সেকেন্দর শাহেরও অনেক উপাখ্যান আছে।

আর এক উপন্যাস আছে যাকে হিন্দীভাষাভাষীরা "তিলস্‌মী" উপন্যাস বলে থাকে। তাতে সব যাদু-মন্ত্রের কথা, ডাকিনী-শঙ্খিনীদের ও যাদুকরের কথা আছে।

"বটতলা" যেমন পূর্ব্বদিনের বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ঠিক তেমনি ধরণের অনেক গ্রন্থ হিন্দী ভাষাতে আছে।

অনেক বাজে বই-ও এ পর্য্যায়ে আছে। আরবী ফারসীতে নানা রকমের প্রেম-কাহিনী বিকৃত অনুবাদ করেও চালানো হয়েছে। তবে যেমন বাংলা ভাষায় "বটতলার" বাজে মালের মধ্যে মণি-মুক্তাও পাওয়া যায়, তেমনি হিন্দীতে এই সব ঝুঁটা মালের মধ্যে দু-একটি সাঁচ্চা জিনিসও পাওয়া যায়।

ভাঁড়ে ভাঁড়ে লড়াই এখনও ও-দেশে হয়ে থাকে। এক-একজন এক-এক রকমের কবিতা বলে অপরকে জব্দ করতে চায়।

শিশুদের "ঘুম-পাড়ানিয়া গান", মেয়েদের ব্রত কথা, শিশুদের 'জুজু' ও 'ভূতের গল্প, 'লোহা ও সোনার ঝগড়া', 'ছারপোকার কথা', রাজ্যের ডাইনি বুড়ী, রাক্ষস খোক্কসের কথা অনেক আছে।

ছেলেদের খেলার গানও অনেক আছে। গ্রাম্য ছড়াও বহু রকমের আছে। এমন কি মেয়েদের জাঁতা ঘুরোবার সময়ের গান পর্য্যন্তও আছে।

*

* *

হিন্দী ভাষার প্রসার ও সমাদর এবং তারি সাথে হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি এখন বাড়িয়ে তুলছে হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন ও কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভা।...এ দুটি সংঘের কায খুবই প্রশংসার্হ।

হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনকে ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ-প্রসারী করার চেষ্টা করা হচ্চে। এরি মধ্যে মান্দ্রাজে হিন্দী ভাষা প্রচার করার জন্য বহু সহস্র টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সেখানে এই প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হবে—এ আশা সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের মনে ক্রমেই দৃঢ়মূল হচ্চে। তা ছাড়া হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন থেকে প্রতি বৎসর সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ রচনা করার জন্য ১২০০৲ টাকা পুরস্কার গ্রন্থকারকে দেওয়া হয়ে থাকে।

হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের প্রধান কেন্দ্র হচ্চে প্রয়াগে। কিন্তু তার শাখা-প্রশাখা যুক্তপ্রদেশের সহরগুলি ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সহরে ছড়িয়ে পড়েছে।

হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমেই সুদূর-প্রসারী হচ্চে এবং আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আরো ছড়িয়ে পড়বে।

কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভা হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন থেকে অনেক পুরানো। এই সভাকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত তুলনা করা যেতে পারে।

নাগরী-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য বহুমুখী। যাতে দেবনাগরী লিপি সারা ভারতবর্ষে প্রচারিত হয় তার সুব্যবস্থা করা, পুরানো শিলালিপি, কাব্য, হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ ও উদ্ধার করা। পুরানো ঐতিহাসিক যত প্রকারের উপাদান সংগ্রহ করা যায়, তার জন্যে যথাযোগ্য যত্ন-চেষ্টা করাও এই সভার অন্যতম উদ্দেশ্য।

নাগরী-প্রচারিণী সভার আর এক উদ্দেশ্য হচ্চে ভালো-ভালো বই প্রকাশ করা। এক বিরাট বিশ্বকোষ হিন্দীভাষায় লিখিত হচ্চে এই নাগরী-প্রচারিণী সভারই একান্ত যত্নে। আরো নানা রকমের দুষ্প্রাপ্য পুরাতন হিন্দী লিপি আবিষ্কার করাও এই সভার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

বহু সচিত্র মাসিক-পত্র হিন্দীতে বেরিয়েছে। তন্মধ্যে সরস্বতী, মাধুরী, প্রভা ও শ্রীসারদা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সাপ্তাহিক পত্রের মধ্যে প্রতাপ, অভ্যুদয়, কর্ম্মবীর প্রভৃতির প্রচার খুব বেশী।

দৈনিক পত্রের মধ্যে ভারতমিত্র, স্বতন্ত্র, আজ ও কলিকাতা সমাচারের প্রচার খুব বেশী এবং জনতার উপর প্রভাবও এই সব পত্রের খুব বেশী।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে, বিদ্যার্থী শিশুদের জন্যে বালসখা, বালক ও শিশু প্রভৃতি পত্র পরম সমাদৃত।

মেয়েদের জন্যে স্ত্রীদর্পণ, গৃহলক্ষ্মী, জ্যোতি প্রভৃতি পত্র খুবই উপযোগী ও খুব সমাদৃত।

অন্যান্য অনেক রকমের কাগজ হিন্দীতে বেরিয়েছে। এ ছাড়া স্কুল-কলেজেও অনেক ছোট-ছোট কাগজ প্রকাশিত হচ্চে।

এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে, পুনায় চিত্রময়-জগৎ বলে একখানি অতি সুন্দর মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। মান্দ্রাজে হিন্দী-প্রচারক নামে একটি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হচ্চে।

এ ছাড়া বহু সাময়িক পত্র প্রায় প্রত্যেক ছোট-খাটো সহরে বেরোচ্ছে।

যাতে ভাষার গতি সতেজ হয়, বহুপ্রসারী হয়, তার জন্যে অন্য প্রাদেশিক ভাষায় যে সব ভালো বই আছে তার অনুবাদ করা হচ্চে। এ অনুবাদ দেখে মনে হয় যে যতটুকু অনুবাদিত গ্রন্থ আবশ্যক তার বেশীই করা হচ্চে।

বাংলা ভাষার প্রায় সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থই হিন্দী ভাষাতে অনুবাদিত হয়েছে।······অনুবাদে মূলের সহিত ঠিক যতটুকু সম্বন্ধ রক্ষিত হতে পারে তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে।

হিন্দীভাষাতে অন্যান্য ভাষার অনেক শব্দ দেখ্‌তে পাওয়া যাবে—যা এই ভাষা হজম করে ফেলেছে। আরবী ও পারসী শব্দও বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বহু ইংরাজি শব্দও এই ভাষা আপনার করে নিয়েছে।

আর হিন্দী লেখকগণও এই সব শব্দ অবাধে নিজেদের রচনায় ব্যবহার করে চলেছেন ঠিক যেন ঐ ভাষারই শব্দের মতো।

*

* *

বর্ত্তমানে হিন্দী ও উর্দ্দুতে বিরোধ ক্রমেই বেড়েই চল্‌ছে। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখ্‌তে গেলে উর্দ্দুকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা চলে না।

হিন্দী ভাষাতে অল্পবিস্তর আরবী, ফারসী বা তুর্কী শব্দ প্রয়োগ করলেই তা আর এক বিভিন্ন ভাষা হয়ে উঠে না। আরো দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষার ব্যাকরণ ঠিক এক ই রকমের।

বাংলা বা হিন্দীভাষাতে কথা বলবার সময় তাতে দু-চারটা ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে বল্লেই তা আর স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে ওঠে না।

এখন দেখ্‌তে হবে দুই ভাষার বিভিন্নতা কোথায়? হিন্দী দেবনাগরী লিপিতে লিখিত হয়ে থাকে, আর তাতে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। উর্দ্দু ফারসী ভাষাতে লিখিত হয়ে থাকে, আর তাতে আরবী ও ফারসী শব্দের আধিক্য দেখা যায়।

ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে গুজরাতী ভাষারও দুই রূপ দেখা যায়। এক রকমের গুজরাতী ভাষা হোলো যা পারসীরা (Bombay Parsis) বলে থাকে। আর এক রকমের গুজরাতী ভাষা হোলো যা গুজরাতীরা বলে থাকে।

দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ হচ্চে এই যে, যে গুজরাতী ভাষায় পারসীগণ কথোপকথন করে তাতে ফারসী ও আরবী শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। আর গুজরাতীরা যে ভাষায় কথা বলে তাতে সংস্কৃত ও বহু অপভ্রংশ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হোলো এই যে তাতে গুজরাতী ভাষার দুই বিভিন্ন নাম হয়ে যায় নি। সেই গুজরাতী নাম-ই বজায় আছে।

হিন্দীভাষাতে আরবী ও ফারসী শব্দের প্রয়োগ বহু পূর্ব্বকাল হতেই দেখা যায়। এমন কি মুসলমানদের এ দেশে আগমনের বহু পূর্ব্বের রচিত হিন্দী গ্রন্থে অনেক ফারসী ও আরবী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পৃথ্বীরাজের সভা-কবি চন্দবরদাইর কবিতায় বহু আরবী ও ফারসী শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

তার পর যখন মুসলমান এ দেশে এল তখন যেন হিন্দু মুসলমানের মিলনের সাথে সাথেই হিন্দী ভাষায় রাশি-রাশি ফারসী ও আরবী শব্দ এসে জমা হতে লাগল। হিন্দুরা যেমন মুসলমানদের পরম সমাদরে ভাই বলে গ্রহণ করলে, হিন্দী ভাষাও তেমনি তাদের ফারসী ও আরবী ভাষার বহু শব্দ আপনার করে নিলে—এ যেন গভীর সৌহার্দ্দ্যের মিল স্থাপিত হোলো।

মুসলমানরাও খুসী হয়ে তাদের ফারসী ও আরবী ভাষার বহু শব্দকে হিন্দীতে মিলিয়ে দিলে। তাতে ভাষা বোঝবার পক্ষে উভয়েরি সুবিধা হোলো।

এই ভাবেই বহু দিন গত হোলো। তার পরে এখন দেখ্‌তে হবে উর্দ্দু স্বতন্ত্র ভাষা কবে থেকে হয়ে উঠ্‌লো। যেখানে হিন্দী ভাষা দ্বারাই সব কায হচ্চিলো সেখানে আবার উর্দ্দু ভাষার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে কি দারুণ বিরোধ-ই না সৃষ্টি করা হোলো। মুসলমানেরা যখন এ দেশে এলো, বসবাস করতে আরম্ভ করল, তখন নিজেদের সুবিধার জন্যে অনেক ফারসী ও আরবী শব্দ হিন্দীভাষাতে এসে জুড়ে বস্‌তে লাগল।··· হিন্দীভাষা তাদের প্রত্যাখ্যান করলে না- পরম সমাদরে নিজের করে নিলে।

শাজাহান বাদ্‌শার সময় এই আধ-হিন্দী আধ-ফার্‌সী ভাষা উর্দ্দু ভাষা বলে পরিগণিত হোলো।

কিন্তু এই নামকরণ হওয়ার অনেক আগে থেকেই কবীর, সুরদাস ও তুলসীদাস তাঁদের রচনায় আরবী ও ফারসী অনেক শব্দ ব্যবহার করে গিয়েছিলেন।

উর্দ্দুর আর এক নাম 'রেখ্‌তা' অনেক আগে রাখা হয়েছিল। আর পূর্ব্বের লোকে না কি এ ভাষাকে বাজারের ভাষা বল্‌ত।

*

* *

হিন্দীভাষার উৎপত্তি-কাল বিক্রমাদিত্যের সময় অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী থেকে ধরা হয়ে থাকে।

এর পর থেকেই কাব্য-সাহিত্যের ধারা ক্রমেই প্রবল বেগে বয়েছে এবং অবশেষে শতমুখী হয়ে সমস্ত দেশকে প্লাবিত করেছে।

বাংলা কীর্ত্তনের মতো হিন্দীতে কীর্ত্তনেরও পদাবলী অজস্র আছে।

হিন্দীভাষার কাব্যে দুইজন দেবতার অসীম প্রভাব লক্ষিত হয়।··· ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে বহু কাব্য ও গীতি-কবিতা রচিত হয়েছে। অনন্ত লীলাময় ভগবানের অফুরন্ত লীলা নিয়ে এই সব কবিতার অবতারণা।

এ ছাড়া বারোমাসী, জেলায়-জেলায় প্রচলিত তিথি পর্ব্বোপলক্ষে মেয়েদের ছড়া ও গান, বৈরাগী বাউলের গান অনেক আছে।

গাড়োয়ানদের মেঠো সুরের অনেক গান আছে।···বলা বাহুল্য এ সব গান গ্রাম্য অমার্জ্জিত ভাষায় রচিত হলেও মনকে মুগ্ধ করে।

এখনও আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশের গাঁয়ে গাঁয়ে অনেক গ্রাম্য কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তারা কবিতা শুনিয়ে দু পয়সা আয় করে থাকে। এরা প্রায় সবই নিরক্ষর।

অভিসার, নায়িকাভেদ ও শৃঙ্গার রসেরও অজস্র কবিতা হিন্দীভাষাতে পাওয়া যায়।

দেবতার পুজার্চ্চনারও গান হিন্দীতে আছে। মোটের উপর হিন্দীতে অনেক নতুন নতুন ধরণের গীতাবলী আছে।

বাংলার সাহিত্য রসিক হিন্দীভাষায় আলোচনা করলেই দেখ্‌তে পাবেন পুরানো হিন্দীভাষাতে অনেক জানবার জিনিস আছে। বাংলায় হিন্দীর সেই সব জ্ঞাতব্য বিষয় অনুবাদিত হলে—তা এক অপূর্ব্ব জিনিস হবে সন্দেহ নেই।...কিছুদিন হোলো 'ভারতবর্ষে' 'কবীর কসৌটী' নাম দিয়ে কবীরের দোঁহা ও তাঁর বাণীর যে অনুবাদ বেরোতো, তা অনেক বাংলা-সাহিত্য মোদীকে আনন্দ দিয়েছে।

হিন্দীভাষার ও হিন্দী কবিদের কথা বল্‌তে গিয়ে আমি সব কথা বিশদ ভাবে বল্‌তে পারিনি। কবিদের বিস্তারিত জীবন-কথা লিখ্‌তে গেলেই তা এক একখানি পুঁথি হয়ে দাঁড়াবে।

*

* *

হিন্দীভাষার নাটক এখনও খুব ভালো হয়ে ওঠে নি। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্র যা দিয়ে গিয়েছেন, তেমনি ভাবে হিন্দীভাষাতে কেউ নাটক লিখতে পারেনি এখনও।

বাংলার নাটক-নভেল, কাব্য ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থরাজি হিন্দীতে খুব অনুবাদিত হচ্চে এবং তার কাটতিও হচ্চে যথেষ্ট।

বর্ত্তমান হিন্দী কবিতা বাংলার কবিতার মতোই বেশ বহমান ও সলীল ছন্দে লেখা হচ্চে। সোজা অথচ ভাবপূর্ণ শব্দ প্রয়োগে কবিতা লেখা হচ্চে।

তবে এ কথা মান্‌তেই হবে যে হিন্দীভাষার বর্ত্তমান অবস্থা তার পূর্ব্বেকার অবস্থার মতো গৌরবোজ্জ্বল নেই।...আগের মতো মহাপ্রতিভাশালী কবি ও গ্রন্থকার এখন এ ভাষাতে নেই। কিন্তু তার সাথে এ কথাও জান্‌তে হবে যে, ভারতে অন্য কোনো ভাষার পূর্ব্ব ইতিহাস এত গৌরবোজ্জ্বল নয়।...এক এক জন কবির খ্যাতি আজও ম্লান হয় নি—কোনো দিন হবেও না।

হিন্দী সঙ্গীতের কথা বেশী করে বল্‌বার আবশ্যকতা নেই ; কারণ, হিন্দী সঙ্গীত এখন বাঙালীর প্রায় নিজস্ব হয়ে উঠেছে।...হিন্দী গান তাঁদের নিকটে বাংলা গানের চেয়ে বেশী আদর পেতে আরম্ভ করেছে।

হিন্দীভাষার সবচেয়ে বড় গৌরবের কথা হচ্চে সে মহাত্মা গান্ধিজী প্রভৃতির শুভাশীষ মস্তকে নিয়ে বসে আছে সেই দিনের অপেক্ষায় যেদিন ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলে হিন্দী সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

হিন্দী যেমন মেথর মুচি, কুলী মজুর গাড়োয়ান কোচয়ানের প্রিয় ভাষা, তেমনি দেশের প্রায় সকল স্বাধীন রাজন্যবর্গের দরবারী ও পারিবারিক কথাবার্ত্তারও বাহন বটে।

অন্য ভাষাভাষীর সংখ্যার চেয়ে ভারতে হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা অনেক বেশী। আর এ কথাও ঠিক যে, প্রায় সকল প্রাদেশিক ভাষারই গোড়াপত্তন হয়েছে এই হিন্দী ভাষা নিয়েই।

হিন্দী ভাষায় বর্ত্তমান সাহিত্য বৈভব বাঙালীর চোখ ধাঁধিয়ে দেবে না—কিন্তু তার পুরানো জহরৎ যে মণি কোঠায় সঞ্চিত রয়েছে—এবং যুগে যুগে যা বেড়েই এসেছিল অজস্র পূজার্থীর দানে—তা যদি আজ বাঙালী সাহিত্য রসিকেরা দেখ্‌তে পায় তবে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে এ কথা নিশ্চয়।

মীরাবাঈ, কবীর, দাদু, নানক, সুরদাস ও তুলসীদাসের সমগ্র বাণী, দোঁহা ও গ্রন্থরাজি অনুবাদিত হলে যে কোনো ভাষার সম্পদ বেড়ে যাবেই যাবে।

*

* *

হিন্দীভাষার ইতিহাস বিশদভাবে লিখতে গেলেই যে সকল বইয়ের সাহায্য নিতে হয়—এবং আমিও সে সাহায্য নিয়েছি—আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনায় তাদের কথা এখানে লিখছি।

সার জর্জ্জ গ্রীয়াস´ন মন ও মিষ্টার ভিনসেণ্ট স্মিথ হিন্দীভাষার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেছেন। তাঁদের লেখা এই হিন্দীভাষার ইতিহাস যে কত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও যত্নের ফল তা তাঁদের রচিত হিন্দীভাষার ও ভারতীয় ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধাবলী আলোচনা করলেই চোখে পড়বে।

বাংলা ভাষায় কেরী সাহেবের যে স্থান হিন্দীভাষাতে গ্রীয়াস´ন সাহেবেরও সেই স্থান অসঙ্কোচে দেওয়া যেতে পারে।

হিন্দীভাষার ইতিহাস জান্‌তে হলে আর একখানি বই পড়া নিতান্ত আবশ্যক—সেখানি হচ্চে মিশ্রবন্ধু-বিনোদ। তিন ভাইতে মিলে এই গ্রন্থখানি রচনা করা হয়েছে। বইখানির প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে খ্যাতি।...এ বহিখানিও অসাধারণ অনুসন্ধিৎসার ফল।

এ ছাড়া নাগরী প্রচারিণী পত্রিকার পুরানো সংখ্যাগুলির সাহায্যও এই প্রবন্ধে নেওয়া হয়েছে।

প্রচলিত প্রবচন ও হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের প্রবন্ধাবলীর সাহায্যও আমাকে নিতে হয়েছে।

হিন্দীভাষায় সব কথাই বিশদ-ভাবে এই প্রবন্ধে লিখ্‌তে পারি নি। তবে যাতে ঐ ভাষার একটা মোটামুটি ধারণা জন্মান যায়—শুধু তারই চেষ্টা করা হয়েছে।...হিন্দীভাষা-জননীর মহামহিমময়ী মূর্ত্তি আমি তাঁর পরিপূর্ণ মহিমায় দেখাতে পারি নি—তার জন্যে আমি সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা অনুভব করছি।

আগে যে কথা বলেছি শেষে সেই কথা-ই বলে বিদায় নিতে চাই—হিন্দী কবিতা রচনার মধ্যে দিয়ে দেশবাসীর অপার আনন্দের ধারা বহুমুখী হয়ে রয়েছে, আর সবাই তা আকণ্ঠ পান করেছে—এ কথা ভাব্‌তে গেলে মন অপূর্ব্ব পুলকে ভরে ওঠে।

শেষ

রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজিতে লিখিত বাংলা ব্যাকরণ

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

মহাত্মা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার কার্য্যের ন্যায় তাঁহার মাতৃভাষা-সেবাও সর্ব্বজন বিদিত। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান বাংলা গদ্যের তিনিই যে প্রথম প্রবর্ত্তক, এবং দেশীয় ভাষায় ছেদচিহ্ন ব্যবহারের তিনিই পথপ্রদর্শক, এ কথা বোধ হয় শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন।

রামমোহন রায়-প্রণীত বাংলা ব্যাকরণই কি বাংলা ভাষার আদি ব্যাকরণ? ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তৎপ্রণীত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনীতে উক্ত ব্যাকরণের ভূমিকা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদ্ধৃত অংশে রাজা বলিতেছেন যে, তিনি বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়নে এই জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে তৎকালে কোন বাংলা ব্যাকরণ ছিল না। কিন্তু ৺রামগতি ন্যায়রত্ন রাজার ব্যাকরণকে ঐ শ্রেণীর পঞ্চম পুস্তক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং লং সাহেবের তালিকায় রাজার ব্যাকরণের পূর্ব্বে প্রকাশিত কয়েকখানি ব্যাকরণের নাম দেখা যায়।

যাহা হউক, রাজার জীবনী-লেখক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে উক্ত বাংলা ব্যাকরণখানি প্রধানতঃ রাজার প্রণীত ইংরাজিতে লিখিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণের অনুবাদ। এই পুস্তকই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

এই পুস্তক (Bengali Grammer in the English Language by Raja Rammohan Roy) ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। ভূমিকায় গ্রন্থকার নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে বাংলা ভাষা-শিক্ষার্থী ইয়োরোপীয়গণের সুবিধার জন্যই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। বিদেশীয় শিক্ষার্থীদিগের জন্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দানের ইহাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা। রামমোহনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিস্ময়কর পরিচয় ইহা হইতেই পাওয়া যাইবে যে, এক শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত এই পুস্তকখানি ইয়োরোপে প্রচলিত আধুনিকতম "স্বয়ং শিক্ষক" (Self-taught Readers) শ্রেণীর পুস্তকের অনুরূপ। পাশ্চাত্য দেশের অভিজ্ঞ ভাষাবিদ্‌গণ বিদেশী পাঠককে শিক্ষকের সাহায্য বিনা বহু প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে সকল "স্বয়ং শিক্ষক" রচনা করিয়াছেন, রাজা রামমোহনের উদ্ভাবনী শক্তিও সেইরূপ পুস্তক প্রণয়নে প্রযুক্ত হইয়াছিল। ইংরাজিতে ব্যুৎপন্ন যে কোন ব্যক্তি রামমোহনের পুস্তক পাঠে বাংলা ভাষার ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন। পুস্তকখানির আর একটী বিশেষত্ব—ইংরাজি ব্যাকরণের অনুযায়ী পরিভাষা নির্দ্ধারণ। যাঁহারা বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষার সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন যে এ কার্য্য কত কঠিন। কিন্তু রামমোহন সহজবোধগম্য প্রণালীতে বাংলা ব্যাকরণকে প্রায়শঃ নূতন অবয়ব দান করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

এক্ষণে, যাহাতে পাঠক আলোচ্য পুস্তকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারেন, সেইজন্য উহার উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি নিয়ে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

বর্ণমালা—প্রকরণ

এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার, যে সমস্ত বাংলা অক্ষরের উচ্চারণ সম্বন্ধে কোন বিশিষ্টতা আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। যথা:—

"ঙ—ইহা অনুনাসিক ও'র মত উচ্চারিত হয়—উদাহরণ—ঙকারায় নমোনমঃ।"

"ঞ—অনুনাসিক ই'র মত উচ্চারিত হয়—যথা—ঞকার।"

(পুরাতন বাংলায় এই দুইটী বর্ণের উচ্চারণ অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—গোসাঞ ইত্যাদি)।

"বর্ণের উচ্চারণ ব্যতিক্রম" শীর্ষক অনুচ্ছেদে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—

"ছ—অজ্ঞ লেখকেরা ইহাকে প্রায়ই ইংরাজি s অক্ষরের ন্যায় উচ্চারণ জন্য ব্যবহার করেন—যথা, মোছলমান, পাত্‌ছা।"

(অনেক মুসলমান লেখক এইরূপ ছএর ব্যবহার নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন)।

"ঞ—ইহা চ, ছ, জ, ঝ, এই চারি বর্ণের পূর্ব্বে যুক্ত হইলে নএর ন্যায় উচ্চারিত হয়, যথা—সঞ্চয়, বাঞ্ছা, পিঞ্জর ইত্যাদি। কিন্তু জএর পরে যুক্ত হইলে অনুনাসিক গএর মত উচ্চারিত হয়।"

"ণ—কেবল সংস্কৃত মূলক শব্দে ব্যবহৃত হয়।"

"য—শব্দের অথবা শব্দাংশের (syllables) প্রথমে থাকিলে এই বর্ণ ইংরাজি jএর মত উচ্চারিত হয়; কিন্তু আর সর্ব্বত্রই ইহা ইংরাজি yoke শব্দের y বর্ণের মত উচ্চারিত হইয়া থাকে।"

"শ, ষ, স—সংস্কৃত ভাষায় এই তিন বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ আছে বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু বাংলায় কয়েকটী স্থল ব্যতিরেকে, তিন বর্ণকেই এক রকমে উচ্চারণ করা হয় এবং নির্ব্বিচারে একের বদলে অপরটী লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দ সকলের ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে, এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া দরকার।"

"ক্ষ—ব্যুৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৈয়াকরণেরা বলেন যে এই বর্ণটী ক ও ষ'র মিশ্রণে রচিত। কিন্তু কার্য্যতঃ উহার উচ্চারণ খ ও যএর মিশ্রণের মত। যথা—পরীক্ষা—উচ্চারণ—পরীখ্যা।"

তিনটী "স", দুইটী "ন" এবং "ক্ষ"এর উচ্চারণ করিয়া বিদেশীগণের গোলযোগ তো হইবারই কথা। বাঙ্গালী বালকগণও "বর্ণ পরিচয়ের" সময় ঐ ঐ বর্ণযুক্ত শব্দের বানান লইয়া কত বিপদে পড়িয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন।

বাংলায় অধিকাংশ অকারান্ত শব্দই যে হলন্ত উচ্চারিত হয়, গ্রন্থকার তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই।

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমানেও উচ্চারণের এই খুঁটি-নাটি বাংলা ভাষার

খুব কম ব্যাকরণেই বুঝাইয়া দেওয়া হয়, যদিও বুঝাইয়া দেওয়া বিশেষ দরকার।

পদ-প্রকরণ (Etymology)

ব্যাকরণের এই অংশে গ্রন্থকার সম্পূর্ণ অভিনব ও মৌলিক প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। যদিও তিনি ইংরাজি ব্যাকরণের পদ্ধতি অনুকরণ করিয়াছেন, তথাপি পরিভাষা রচনা ও পদ বিভাগে তাঁহার অনন্য-সাধারণ প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে।

বিশেষ্য (Substantives)

"বিশেষ্যে"র যে পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে তাহার ভাবার্থ এই :—

"যে বস্তু বা ব্যক্তির ধারণা, বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা (যেমন, রাম, মনুষ্য), অথবা মন দ্বারা (যথা, আশা, ভয়) করা যায়, তাহাকে বিশেষ্য কহে।"

মূল ইংরাজি এই :—"A substantive is the name of a subject of which we have a notion either through our external senses, as Ram, man, or by our internal power of mind as hope, fear, submission."

ইংরাজি অথবা বাংলার কোন ব্যাকরণে বিশেষ্যের এই পরিভাষা আছে কি না সন্দেহ। অথচ, দার্শনিক দৃষ্টিতে, "ব্যক্তিবাচক, গুণবাচক" ইত্যাদি না বলিয়া সোজাসুজি "বাহ্য-ইন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-গুলির নাম বিশেষ্য"—এইরূপ বলায় কোন ভুল হয় না।

ইংরাজি ব্যাকরণে Common Noun ও Proper Noun এই দুইটীর প্রয়োগ আছে। কিন্তু, বাংলায় এইরূপ নাই। বিশেষ্যের ঐরূপ বিভাগ ও উহার প্রতিশব্দও বাংলায় নাই। রামমোহন Common Noun ও Proper Nounএর বাংলা যথাক্রমে "সামান্য সংজ্ঞা" ও "ব্যক্তি সংজ্ঞা" এইরূপ করিয়াছেন।

"সর্ব্বনাম"কেও তিনি "বিশেষ্য" এই শ্রেণীভুক্ত করিয়া "প্রতিসংজ্ঞা" নাম দিয়াছেন।

বিশেষণ (Attributives),

"বিশেষ্য" ভিন্ন সমস্ত পদকেই রাজা "বিশেষণ" এই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। এই "বিশেষণ" গুলি সাত রকমের যথা :— Adjectives Verbs, Participles, Adverbs, Prepositions, Conjunctions ও Interjections. এই পদগুলির পরিচয় ইংরাজি শিক্ষিত পাঠক মাত্রেই পাইয়া থাকিবেন। রাজা রামমোহন এই গুলির যে পরিভাষা (definition,) দিয়াছেন তাহাতে কিছু কিছু নূতনত্ব আছে। যথা :—

"যাহা বিশেষ্যের কালনিরপেক্ষ গুণ অথবা অবস্থা প্রকাশ করে তাহাকে **গুণাত্মক বিশেষণ** কহে।"

[Attributes, that express the properties or circumstances of Nouns without relation to time are called adjectives].

"যাহা বিশেষ্যের কেবল কালাপেক্ষ গুণই প্রকাশ করে তাহাকে **ক্রিয়াত্মক বিশেষণ** কহে।"

[Those that express the attributes or accidents of nouns with absolute relation to time are called verbs].

"এবং যে বিশেষণগুলি অন্য ক্রিয়াত্মক বিশেষণের উপর নির্ভর করিয়া বিশেষ্যের কালাপেক্ষিক অবস্থা প্রকাশ করে তাহাদিগকে **ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ** কহে।"

[Those that express the circumstances of nouns with regard to time depending on that noted by another verbal attributive are called Participles].

"যাহারা অন্য বিশেষণের গুণ প্রকাশ করে তাহাদিগকে **বিশেষণীয় বিশেষণ** কহে।"

[Such as express the attributes of other attributives are called adverbs].

এইস্থানে কোন নূতনত্ব নাই এবং Prepositionএর (**সম্বন্ধনীয় বিশেষণের**) পরিভাষায়ও নূতনত্ব নাই।

"**সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ**" (Conjunction)—ইহার পরিভাষার নূতনত্ব এইটুকু যে ঐ পদ "দুই বা ততোধিক বাক্য অথবা শব্দের মধ্যে থাকিয়া "সংযোজন অথবা বিযোজন" গুণ প্রকাশ করে"—এইরূপ বলা হইয়াছে।

[express the attribute of copulative or disjunctive relation].

Interjectionকে রাজা "অনুভাব বিশেষণ" এই আখ্যা দিয়াছেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত পরিভাষাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন রাজা রামমোহন কোন্ কোন্ ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই নূতন পদ-বিভাগ ও নামকরণ করিয়াছেন।

নিম্নে প্রদত্ত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিষয়টী সহজে ও সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা যাইবে।

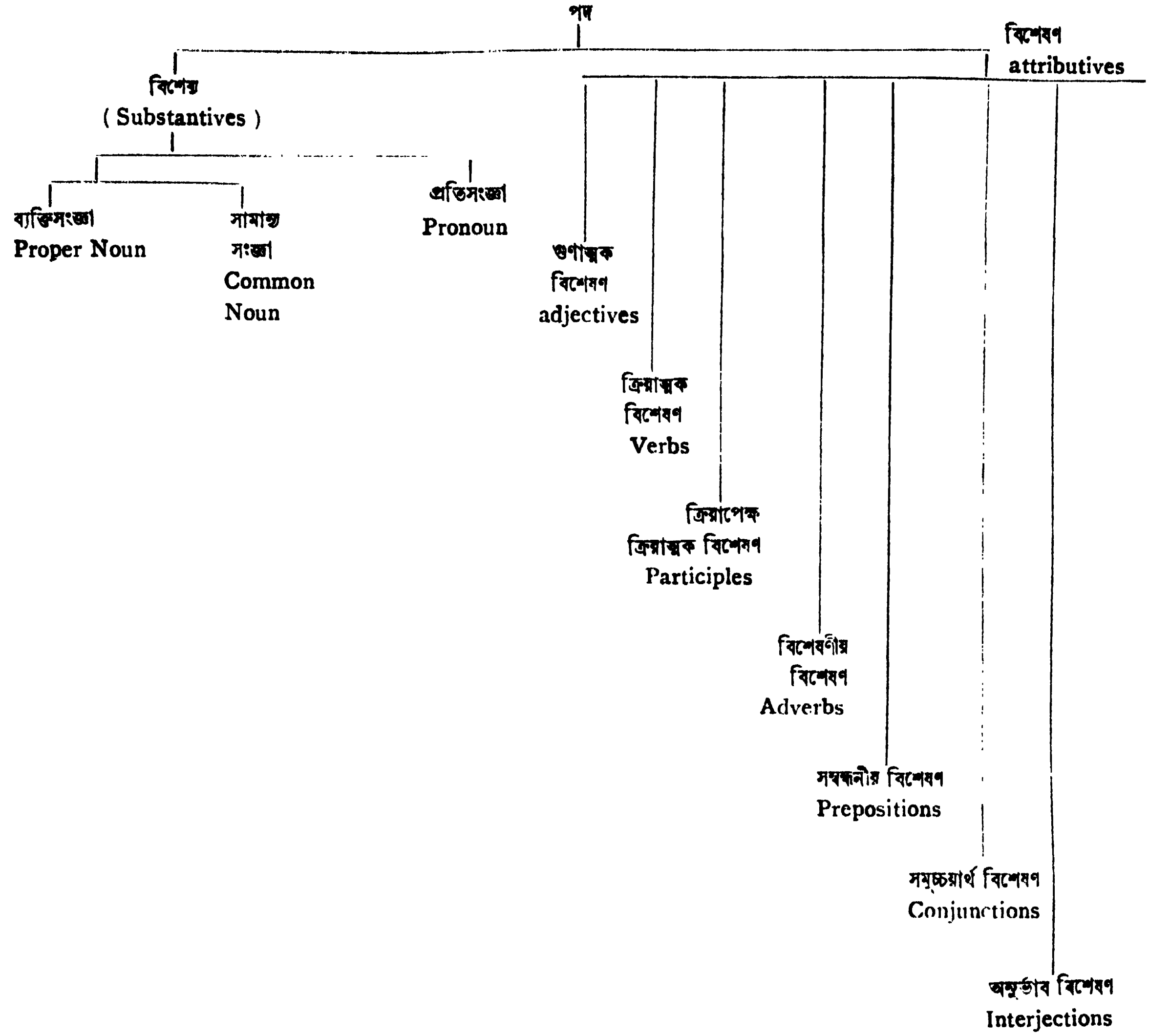
পরিনমন (Cases)

বাংলা ব্যাকরণে সাধারণতঃ যাহাকে "কারক" বলা হয়, রামমোহন তাহাকে "**পরিনমন**" এই নূতন নাম দিয়াছেন। কারকের সংখ্যা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে চারিটী কারকেই চলিতে পারে। যথা, কর্ত্তা, কর্ম্ম, অধিকরণ, ও সম্বন্ধ (Nominative, Accusative, Locative, Genitive)।

কর্ত্তাকারক কাহাকে বলে? সাধারণতঃ বাংলা ব্যাকরণে "যে করে তাহাকে কর্ত্তা কহে" এইরূপ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের পরিভাষা (definition) একটু নূতন রকমের। রাজা যে ইংরাজি পরিভাষা দিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এই :—

"কোন বিশেষ্য যদি কোন ক্রিয়াত্মক বিশেষণের সহিত এইরূপ ভাবে যুক্ত থাকে যাহাতে উভয়ে, বাক্যের অন্য পদের অপেক্ষা না রাখিয়া অর্থ প্রকাশ করিতে পারে তবে বিশেষ্যের কর্ত্তৃকারক বুঝিতে হইবে।"

[The nominative case is that in which a noun stands when coupled with a verb, so that together



they convey a meaning though separated from all other words of the sentence expressed or understood].

গ্রন্থে করণকারকের আবশ্যকতা অস্বীকার করা হইয়াছে—যেহেতু বাংলায় করণকারক কোন বিভক্তি-চিহ্ন দ্বারা সূচিত হয় না—"সম্বন্ধনীয় বিশেষণ" (Preposition) দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে।

এইরূপ, "হইতে" এই সম্বন্ধনীয় বিশেষণ কর্ত্তৃকারকে যুক্ত হইয়া অপাদানকারক সূচিত করে। সুতরাং অপাদানের স্বতন্ত্র সত্ত্বা স্বীকার করার দরকার নাই।

সম্বোধন নামে কোন "কারক" স্বীকার করা হয় নাই। আধুনিক অনেক বাংলা ব্যাকরণেও সম্বোধন "কারকের" অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। কারণ, সম্বোধনে কর্ত্তৃকারকেরই ব্যবহার হয়। সম্প্রদান ও কর্ম্মে বাংলায় কোন ব্যবহারিক পার্থক্য নাই।

কিন্তু অন্য কোন বাংলা ব্যাকরণে করণ ও অপাদান এই দুই কারক বর্জ্জন করা হয় নাই। এই বিষয়টী রাজার সম্পূর্ণ মৌলিকতাপ্রসূত। কর্ত্তাকারককে গ্রন্থকারস্থানে স্থানে "অভিহিত" এই নাম দিয়াছেন।

আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিলেই রাজার বাংলা ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য-পরিচয় শেষ হইবে। ইংরাজি ব্যাকরণে যাহাকে Mood বলে, বাংলা ব্যাকরণে তাহার কোন প্রতিশব্দ অথবা আলোচনা দেখা যায় না। রামমোহন ইহারও বাংলা প্রতিশব্দ দিয়াছেন। তিনি Moodএর বাংলা নাম দিয়াছেন "**প্রকার**"। বিভিন্ন Moodএর নাম নিম্নরূপ দেওয়া হইয়াছে :—

Indicative—**অবধারণ**
Subjunctive—**সংযোজন**
Imperative }
Oplative } —**নিয়োজন**

গ্রন্থকার—Tenseএর বাংলা প্রতিশব্দ দিয়াছেন—**বিভক্তি বাচ্যকাল**। এক স্থানে তিনি Verbএর বাংলা করিয়াছেন "আখ্যাতিক পদ"।

কলিকাতা পরিচয়ে সিরাজ ও মীরজাফর

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি-এল

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়ে' অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়া গবেষণার পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু কলিকাতার সহিত যাঁহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদের কথা কলিকাতা পরিচয়ে উল্লেখ করিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের কথা বলা যাইতে পারে। তাঁহার সহিত কলিকাতার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। আর সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফর সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। সিরাজ কলিকাতায় দুইবার মাত্র আসিয়াছিলেন এবং মীরজাফর ২।৩ বৎসর মাত্র অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, সিরাজ ও মীরজাফর সম্বন্ধে শেঠ মহাশয় যাহা বলিতেছেন, তাহার দু-এক স্থলে আমাদের কিছু কিছু বক্তব্য আছে। নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমে তিনি যে ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে সিরাজউদ্দৌলার জন্ম বলিতেছেন, তাহা কিরূপে স্থির করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। সিরাজউদ্দৌলার জন্ম-সময় লইয়া ইংরেজ ও মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে, কিন্তু কোন মতেই ১৭৩৯ খৃঃ অব্দ স্থির হয় না। ইংরেজ ঐতিহাসিক Orme ও Stewart সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—"Thus perished Surajuh Dowlah, in the 20th year of his age, and the 15th month of his reign," (July 1757) তাহা হইলে তাঁহাদের মতে ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে সিরাজের জন্ম হয়, ৩৯ নহে। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকদের এ মত যে ঠিক নহে, তাহা সায়র উল মুতাক্ষরীণ হইতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়। সায়র উল্ মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, নবাব সুজাউদ্দীনের সময় আলিবর্দ্দী খাঁ বিহারের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হন; তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে সিরাজের জন্ম হয়—"History ought to remark that a few days before this elevation (Deputyship or Niabet of Azim-abad) a grandson was born to Aly-verdi-qhan from his youngest daughter married to his youngest nephew Zein-eddin-ahmed-qhan, and as he had no son of his own he called him Merza Mohemed, after his own name, adopted him for his son, and had him educated in his own house." ১১৪০ হিজরী বা ১৭২৬-২৭ খৃঃ অব্দে ফকরউদ্দৌলা বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ৫ বৎসর তাহার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি পদচ্যুত হইলে বিহার প্রদেশ বাঙ্গলার সহিত মিলিত হয়। তখন সুজাউদ্দীন বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা; তিনি আলিবর্দ্দী খাঁকে বিহারের শাসনভার প্রদান করেন। তাহা হইলে ১১৪৪-৪৫ হিজরী বা ১৭৩১-৩২ খৃঃ অব্দে আলিবর্দ্দীর বিহারের শাসনভার প্রাপ্তি ও সিরাজউদ্দৌলার জন্ম হয়। ষ্টুয়ার্ট ১১৪৩ হিঃ বা ১৭২৯-৩০ খৃঃ অব্দে আলিবর্দ্দীর বিহারের শাসন ভার গ্রহণের কথা বলেন, কিন্তু মুতাক্ষরীণের কথাই প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয়। কাজেই কোন মতেই যে ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে সিরাজের জন্ম হয় না, তাহা আমরা দেখাইলাম।

সিরাজ সম্বন্ধে শেঠ মহাশয়ের আর একটী কথারও আলোচনা করিতেছি। শেঠ মহাশয় বলিতেছেন, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ক্লাইব কলিকাতা পুনরধিকার করিলে সিরাজের সহিত সন্ধি হয়। সন্ধি হইলেও সিরাজ ইংরেজদিগকে বাঙ্গলা হইতে বিদূরিত করিবার জন্ম গোপনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ কথা যে সত্য নহে, তাহা এক্ষণে ইংরেজ ও এ-দেশীয় ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সন্ধির অব্যবহিত পরেই ইংরেজেরা ফরাসীদিগের চন্দননগর অধিকারের জন্ম অগ্রসর হন। ইহা লইয়া গোলযোগ বাধিয়া উঠে। নবাব অবশ্য ফরাসীদিগকে রক্ষা করারই অভিপ্রায় করেন। তাহার দুইটী কারণ থাকিতে পারে। একটী ফরাসীরা তাঁহার আশ্রিত বলিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করা তিনি কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। আর দ্বিতীয় কারণ, সিরাজ ইংরেজদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পূর্ব্ব ব্যবহারই তাহার কারণ। সেইজন্ম তিনি আত্মরক্ষার জন্ম ফরাসীদিগকে হাতে রাখিতে চেষ্টা করিয়াও থাকিবেন। ফরাসীদিগের সহিত সিরাজের যে পত্র লেখালিখি হইয়াছিল, তাহাই লইয়া তাঁহার গোপনভাবে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণের একটা কথা প্রচলিত আছে, এমন কি নবাব ফরাসীদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজেরা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ফরাসীদিগকে নবাবের হাতে রাখিবার যে কারণ ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নবাবের সৈন্যদলে ফরাসী সৈনিকও ছিল। পলাশীতে তাহারা নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। সৈন্যরক্ষার জন্ম ফরাসীদের সহিত নবাবের অর্থ সম্বন্ধ থাকা সম্ভবও হইতে পারে। সিরাজ ইংরেজ সৈন্য গ্রহণের জন্ম ইংরেজদিগকেও অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এই ফরাসীদিগের ব্যাপার ব্যতীত ইংরেজদিগকে গোপনে বিদূরিত করার আর কোন চেষ্টা সিরাজ করিয়াছিলেন কি না তাহা ইতিহাস হইতে জানা যায় না। ফরাসীদিগকে রক্ষা করার জন্ম নবাব প্রকাশ্য ভাবেই রাজা দুর্ল্লভরামকে সসৈন্যে হুগলীতে পাঠাইয়াছিলেন ও হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকেও আদেশ দিয়াছিলেন। ইংরেজেরা নন্দকুমারকে হস্তগত করিয়া তাঁহারই দ্বারা দুর্ল্লভরামকে ফেরত দিয়াছিলেন এবং নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চন্দননগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার 'সিরাজউদ্দৌলা' গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশেষ রূপ আলোচনা করিয়াছেন। আমরা কর্ণেল ম্যালেসনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে শেঠ মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি,—

"Whatever may have been his faults, Sirajud daulah had neither betrayed his master nor sold his country. Nay more, no unbiased Englishman sitting in judgment on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June can deny that the name of Suraju'ddaulah stands

higher in the scale of honor than does the name of Clive. He was the only one of the principal actors in that tragic drama who did not attempt to deceive !" ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সন্ধি ও ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল।

মীরজাফরের প্রসঙ্গে শেঠ মহাশয় বলিয়াছেন যে, তিনি খিদিরপুরের নিকট বাস করিয়াছিলেন। শেঠ মহাশয় পূর্ব্বেও তাহাই লিখিয়াছিলেন। মীরজাফর ১৭৬০ খৃঃ অব্দে রাজ্যচ্যুত হইয়া ১৭৬৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তিনি যে খিদিরপুরের নিকট থাকিতেন ইহা জানা যায় না। তিনি কলিকাতার কোথায় থাকিতেন, তাহা আমরা প্রথমে মুতাক্ষরীণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি। মসনদচ্যুত হইয়া মীরজাফরের কলিকাতায় আগমন সম্বন্ধে মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে,—All these beiog put on board together with a number of servants of both sexes he (Mir-djaafar qhan) departed for Calcutta. * * * * * Arrived there, he purchased in the most populous part of the city and near the market-place, a spot of ground whereon he raised several buildings according to his own mind and taste" খিদিরপুর অবশ্য সে সময়ে বহু জনাকীর্ণ স্থান ছিল না এবং তথায় যে কোন প্রসিদ্ধ বাজার ছিল তাহাও জানা যায় না। ফলতঃ মীরজাফর খিদিরপুরে বাস করেন নাই, তিনি নিজ কলিকাতাতেই বাস করিয়াছিলেন। সে স্থান কোথায় তাহাও বলিয়া দিতেছি। বর্ত্তমান টেরিটী বাজারের নিকট চিৎপুর রোডের উপর মুর্শিদাবাদের নবাব বংশীয়দের গোলকুঠী বলিয়া যে সৌধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই মীরজাফরের বাসভবন। নবাব বংশীয়েরা বরাবরই ঐ ভবনে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। উহা যে মুতাক্ষরীণের বর্ণিত স্থান তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়।

কুষ্মাণ্ড

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ভিষগ্‌রত্ন,

এল্‌-এ-এম্‌-এস্‌

আমরা যে সকল দ্রব্য ভোজ্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার দ্বারা বহু রোগের সুন্দর চিকিৎসা হইতে পারে। তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত আমি পত্রান্তরে দেখাইয়াছি। আজ যে দ্রব্যটীর কথা লিখিতেছি তাহা একটী উৎকৃষ্ট 'খাদ্যৌষধি'। ইহার নাম—

কুষ্মাণ্ড

প্রকারভেদ—ইহা দুই প্রকার (১) চালকুমড়া (২) বিলাতী কুমড়া। চালকুমড়াই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহার গুণ লিখিত হইল।

বিভিন্ন নাম—বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে ছাঁচি কুমড়া, দেশী কুমড়াও বলে।

ইংরাজী নাম—Benin casa cerifera.

সংস্কৃত নাম—কুষ্মাণ্ড, পুষ্পফল, পীতপুষ্প, বৃহৎফল এইগুলি ইহার পর্য্যায়।

প্রাপ্তিস্থান—ইহা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায় এবং বাঙ্গালাদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

ঔষধার্থ ব্যবহার

(১) ফল শস্য
(২) বীজ
(৩) মূল

ঔষধের ক্রিয়া—

(১) শরীরের পুষ্টিকর
(২) শুক্রবর্দ্ধক
(৩) রক্তপিত্ত নাশক
(৪) উরঃক্ষত ও ক্ষয়কাস নাশক
(৫) বায়ুশান্তি কারক
(৬) শূল নিবারক
(৭) মূত্র কারক
(৮) পিত্ত নাশক
(৯) প্রমেহে হিতকর
(১০) মৃদু বিরেচক
(১১) অপস্মার নাশক,
(১২) ক্রিমি বিনাশক
(১৩) বিষক্রিয়া নাশক
(১৪) হৃদ্রোগে হিতকর

বিশেষ ক্রিয়া

(১) শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধনে
(২) রক্তপিত্তে—
(৩) উরঃক্ষতে ও ক্ষয়কাসে বিশেষতঃ রক্তস্রোত সমূহের উপর ইহার একটী বিশেষ ক্রিয়া আছে। তজ্জন্য ইহা অতি শীঘ্র ফুসফুস হইতে রক্তনির্গম বন্ধ করিতে পারে। মহামতি শার্ঙ্গধর বলেন যে, ইহা 'উরঃ সন্ধানকৃৎ' অর্থাৎ বক্ষঃক্ষত সংযোজক।
(৪) বায়ু শান্তিতে যথা উন্মাদ ও অপস্মারে এবং বিবিধ ক্ষত ব্যাধিতে
(৫) শূলে
(৬) পিত্ত প্রশমনে

বীজ

(১) মূত্র কৃচ্ছে
(২) ক্রিমি রোগে

(৩) পুষ্টি বর্দ্ধনে, বিশেষ করিয়া মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য

(৪) মূল—শ্বাসে

ব্যবহার-বিধি—

মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, উন্মাদ, অপস্মার ও শূলে প্রধানতঃ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ রোগে কিরূপ ভাবে ইহা প্রয়োগ করিতে হয় নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

রক্তপিত্তে—কুষ্মাণ্ড শাঁস উৎকৃষ্ট ঔষধ। কুষ্মাণ্ডের তরকারী রক্তপিত্ত রোগীর খাদ্য এবং ঔষধ উভয়ের কার্য্য করিয়া থাকে।

(১) প্রত্যহ এক তোলা হইতে দুই তোলা মাত্রায় কুষ্মাণ্ডের রস একটু চিনি সহ সেবন করিতে দিলে রক্তপিত্তে চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

(২) কুষ্মাণ্ডের রস এক তোলা ও বাসক পাতার রস এক তোলা একটু চিনিসহ সেবন করিতে দিয়া রক্তপিত্তে সুন্দর ফল পাইতে দেখা গিয়াছে।

(৩) সুপক্ব কুমড়ার শাঁস রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উহার চূর্ণ আধ তোলা মাত্রায় একটু মধুসহ সেবন করিতে দিলেও রক্তপিত্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

ফুসফুস্ হইতে রক্তস্রাবেও উপরিউক্ত যোগগুলি দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। উরঃক্ষতেও ইহা অমৃতবৎ কার্য্যকরী।

কুষ্মাণ্ডের হালুয়া ও কুষ্মাণ্ডের পালো রক্তপিত্ত ও উরঃক্ষত রোগীর এবং ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে চমৎকার খাদ্য ও ঔষধ। ইহা এইরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়।—

কুষ্মাণ্ডের হালুয়া—

সুপক্ক কুষ্মাণ্ড শস্য রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। উনানে কড়াই চাপাইয়া তাহাতে গব্যঘৃত দিয়া ঐ শুষ্ক কুষ্মাণ্ড-চূর্ণ কিয়ৎ পরিমাণে ভাজিয়া লইবে, তাহার পর উহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে ছাগ দুগ্ধ দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে ও আবশ্যক মত চিনি মিশাইয়া উহাতে ছোট এলাইচ, তেজপত্র ও দারুচিনির অল্প গুঁড়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া যখন থস্‌থসে মত হইবে তখন নামাইয়া লইবে। ইহাকে কুষ্মাণ্ডের হালুয়া বলে। ইহা প্রত্যহ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

কুষ্মাণ্ডের পালো—কুষ্মাণ্ডশস্য রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া হামানদিস্তায় গুঁড়া করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই কুষ্মাণ্ডের পালো প্রস্তুত হয়। এই কুষ্মাণ্ড-শস্য চূর্ণ বা পালো কিঞ্চিৎ লইয়া খানিকটা গরম ছাগ দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সুন্দর উপকার হয়।

কুষ্মাণ্ডের সরবৎ—সুপক্ব কুষ্মাণ্ড শস্যের রস করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ ঘোল বা ছানার জল দিয়া গুলিয়া আবশ্যক মত চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে অল্প কেওড়ার জল বা গোলাপজল দিতে হয়। ইহাকে কুষ্মাণ্ডের সরবৎ বলে। এই সরবৎ রক্তপিত্তে, উন্মাদ, অপস্মারে প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ইহা অতীব স্নিগ্ধ ও বলকারক। মূত্রকৃচ্ছ্রে ও জ্বালা যন্ত্রণাময় প্রমেহ রোগীকে এই সরবৎ পান করিতে দিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

কুষ্মাণ্ডের মেঠাই ও মোরব্বা রক্তপিত্ত, যক্ষ্মা, উন্মাদ ও অপস্মার রোগীদিগকে খাইতে দিলে পথ্য ও ঔষধ উভয়ের কাজ হইয়া থাকে।

কুষ্মাণ্ড কাবলেহ—ইহা রক্তপিত্ত, যক্ষ্মা, উন্মাদ, অপস্মার, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতায় বিশেষ উপকারী, বিশেষ করিয়া বক্ষঃক্ষত সংযোজক।

ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—ত্বগবীজাদি রহিত খণ্ডখণ্ডীকৃত সুপক্ব কুষ্মাণ্ড ১২॥০ সের, ২৫ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১২॥০ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল গ্রহণ করিবে এবং কুষ্মাণ্ড খণ্ডগুলি বস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া সূর্য্যতাপে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিবে। পরে শূলাগ্র-শলাকাদি দ্বারা সেই কুষ্মাণ্ডগুলি বহুবার বিদ্ধ করিবে। অনন্তর তাম্র-কটাহে এক সের ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে ঐ কুষ্মাণ্ডগুলি অল্প ভাজিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কুষ্মাণ্ড সিদ্ধ জল এবং ১২॥০ সের চিনি দিয়া পাক করিবে। সুপক্ব হইলে তাহাতে পিপুল, শুঁঠ, জীরাচূর্ণ প্রত্যেক ১৬ তোলা, ধনে, তেজপাতা, ছোট এলাইচ, গোল মরিচ ও দারুচিনি প্রত্যেক চূর্ণ চারি তোলা নিক্ষেপ করিবে এবং শীতল হইলে তাহাতে ৩২ তোলা মধু মিশ্রিত করিবে। ইহাকে কুষ্মাণ্ডকাবলেহ বলে।

এই ঔষধ প্রত্যহ আধতোলা মাত্রায় সেবন করিতে দিতে হয়। খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ, বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ, কুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ প্রভৃতি রক্তপিত্তরোগাধিকারের ঔষধগুলির প্রধান উপাদান কুষ্মাণ্ডশস্য। ঐ সকল ঔষধগুলি রক্তপিত্ত ভিন্ন, কাস, শ্বাস, ক্ষয় ইত্যাদি রোগ নাশক। ঐ ঔষধগুলি সবই শাস্ত্রীয়, সে কারণ উহাদের প্রস্তুত প্রণালী প্রদান করিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উহাদের প্রস্তুত প্রণালী আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকে পাইবেন।

রক্তপিত্তে—নিম্নলিখিত যোগগুলি বিশেষ উপকারী।

মকরধ্বজ, কড়িভস্ম প্রত্যেক সমভাগে লইয়া বেশ করিয়া মর্দ্দন করিয়া ঐ চূর্ণ রোগীর বল বিবেচনা করিয়া একরতি হইতে দুই রতি মাত্রায় কুষ্মাণ্ডের শস্যের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিলে রক্তপিত্তে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। রক্তপিত্তে যখন দেখা যে মুখ দিয়া খুব বেশী রক্ত উঠিতেছে তখন কুষ্মাণ্ড শস্যের রস ও আয়াপানের পাতার রস এবং একটু মধুসহ উহা খাইতে দিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

রক্তপিত্তে আয়ুর্ব্বেদীয় অন্য ঔষধের অনুপানরূপে কুষ্মাণ্ডের রস সহ ঔষধ খাইতে দিয়া অতীব উপকার পাওয়া যায়।

যক্ষ্মার প্রথম অবস্থায়—এক রতি মুক্তাভস্মের সহিত কুষ্মাণ্ড শস্যের রস ও একটু মধুসহ সেবন করিতে দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। Calcium অপেক্ষা ইহা যে খুব বেশী উপকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শরীরের কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্র হইতে যদি রক্ত নির্গম হয় তাহা হইলে কুষ্মাণ্ড শস্যের রস একতোলা হইতে দুই তোলা মাত্রায় খাইতে দিলে রক্ত নির্গম বন্ধ হইয়া থাকে।

মস্তিষ্কের বেদনায়—কুষ্মাণ্ড শস্যের পাতলা ফালি 'জল পটির' মত

কপালে 'পটি' দিলে নিবৃত্তি হইয়া" থাকে। কুষ্মাণ্ডের জল মস্তিষ্কে মাথাইলেও মস্তিষ্ক শীতল হইয়া থাকে।

শ্বাসে—কুষ্মাণ্ডের মূল চূর্ণ দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত পান করিলে শ্বাসের টান বন্ধ হইয়া থাকে।

শূলে—সুপক্ক কুষ্মাণ্ডের শস্য পাতলা পাতলা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া একটী মৃৎপাত্রে উহা রাখিয়া সরা ঢাকা দিবে ও সন্ধিস্থান গোময় মিশ্রিত মাটীর বস্ত্র খণ্ড দিয়া বেশ করিয়া লেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে উহা ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া লইবে, যখন উহা লাল হইয়া যাইবে তখন আল হইতে তুলিয়া লইবে। অতঃপর উহা শীতল হইলে ঢাকা সরা খুলিয়া তন্মধ্যস্থ ভস্ম বাহির করিয়া লইবে। এই চূর্ণ দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রা। দুই আনা শুঁঠচূর্ণ ও একটু গরম জল সহ সেবন করিলে বহুবিধ শূল আরোগ্য হইয়া থাকে।

উন্মাদ—কুষ্মাণ্ড শস্যের রস এক তোলা, কুড় চূর্ণ দুই আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া একটু মধুসহ সেবন করিলে উন্মাদ ভাল হইয়া থাকে।

অপস্মারেও ঐরূপভাবে সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

উন্মাদে—কুষ্মাণ্ড বীজের শস্যও বিশেষ উপকারী। দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় বীজের শস্য একটু মধুসহ সেবন করিতে দিলে উন্মাদ রোগে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

যাঁহাদিগকে মস্তিষ্কের কার্য্য বেশী করিতে হয় তাঁহাদের পক্ষে কুষ্মাণ্ডের বীজের শস্য বিশেষ উপকারী। তাঁহারা যদি প্রত্যহ দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় বীজের শস্য একটু মধুসহ সেবন করেন, তাহা হইলে অতীব উপকার পাইবেন।

বীজ শস্যের হালুয়া—বীজ শস্য বেশ করিয়া পেষণ করিয়া একটু ঘৃতে ভাজিয়া ছাগদুগ্ধে সিদ্ধ করিতে হইবে। ঐ সঙ্গে কিছু কিসমিস দিয়া পরে আবশ্যকমত চিনি মিশাইয়া ও তাহাতে অল্প দারুচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপাতা দিয়া যখন 'থমথমে' মত হইবে তখন নামাইয়া লইবে। ঐ হালুয়া অতীব পুষ্টিকর ও মস্তিষ্কের বলদায়ক। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা ইহা প্রত্যহ কিছু পরিমাণে খাইলে সবল হইবেন।

কুষ্মাণ্ডের বীজের শস্য দুই আনা, ব্রাহ্মীশাকের রস এক তোলা একটু মধুসহ সেবন করিলে মস্তিষ্ক শীতল হইয়া থাকে ও মেধা এবং স্মৃতি-শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মূত্ররোধে—সুপক্ক কুষ্মাণ্ডের বীজ শীতল জলসহ বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব বেশ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

কুষ্মাণ্ডের শস্যের রস ও কিঞ্চিৎ যবক্ষার বেশ করিয়া মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিলে প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া থাকে।

উদরাধ্মানে—কুষ্মাণ্ড শস্যের রস পেটে মর্দ্দন করিলে পেটফাঁপা ভাল হইয়া থাকে ও প্রস্রাব রোধ হইলে প্রস্রাব সরল হইয়া থাকে।

ক্রিমিতে—কুষ্মাণ্ডের বীজের শস্য দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় চূণের জল সহ সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া ইহা পৃথুক্রিমি (Tape worms) নাশক।

পারদ সেবন জন্য দোষ নিবারণার্থ—প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে এক তোলা হইতে দুই তোলা মাত্রায় সুপক্ক কুষ্মাণ্ড শস্যের রস সেবন করিলে পারদ সেবন জনিত বিবিধ দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে। মাদক দ্রব্য সেবন জনিত মত্ততা নিবারণার্থ কুষ্মাণ্ড শস্যের রস পান হিতকর।

বিশেষ কথা এই যে সুপক্ক কুষ্মাণ্ড ও কচি কুষ্মাণ্ড ইহাদের গুণ পৃথক। অনেক সময় কুষ্মাণ্ড ঠিকমত লওয়া হয় না; সেজন্য ইহার গুণ সেরূপ হয় না। তরকারীর জন্য কচি কুমড়া লইতে হয়; ঔষধার্থ সুপক্ক কুমড়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কুষ্মাণ্ড সম্বন্ধে শাস্ত্রকার নিম্নলিখিত গুণ বর্ণনা করিয়াছেন।

কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্রবাতনুৎ।
বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্॥
বৃদ্ধং নাতিহিমং স্বাদু সক্ষারং দীপনং লঘু।
বস্তিশুদ্ধিকরং চেতো রোগহৃৎ সর্ব্বদোষজিৎ॥

অস্যার্থঃ পক্ক কুমড়া শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক, শুক্রকর, ঈষৎ গুরুপাক, রক্ত-পিত্ত ও বায়ুনাশক। কচি কুমড়া পিত্তনাশক ও শীতল, মধ্যম কুমড়া কফকর। সুপক্ক কুমড়া অতি শীতল নহে, মিষ্টাস্বাদ ও ক্ষারযুক্ত; অগ্নিদীপক ও লঘুপাক। ইহা প্রস্রাব পরিষ্কারক হৃদ্রোগ নাশক ও ত্রিদোষ শান্তিকারক।



নিষ্ফল সম্ভাবনা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

গল্প, গল্প—একটা গল্প চাই—ক'দিন ধরে' সত্যপ্রিয় অবিশ্রান্ত এই কথা ভাবছে। আকাশের কাছে, বাতাসের কাছে, সমস্ত দিক্-দেবতার কাছে প্রার্থনা করছে: একটা গল্প দাও। রাত্তিরে আলো নিবিয়ে দিলে রাস্তার গ্যাসের আলো তা'র মশারির ওপর এসে পড়ে; ঘুমের আগে সেই দিকে তাকিয়ে সে বলে: ঈশ্বর, একটা গল্প দাও। রাস্তা দিয়ে যখন চলে, দু'দিকে ভালো করে' তাকাতে-তাকাতে যায়; একটা মোটার চলে' গেলে ভেতরের আরোহীদেরকে যেটুকু পারে দেখে নেয়—যদি কোথাও কোনো গল্প পাওয়া যায়। বাস্-এ যখন চলে, অন্যান্য যাত্রীদের কথাবার্ত্তা শোন্‌বার জন্য কান পেতে থাকে—অসম্ভব নয়, ও-সব অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন আলাপ থেকে হঠাৎ কোনো গল্পের সূত্র পাওয়া যেতে পারে। কোনো একটা কথা মনে এসে লাগ্‌লো; তারপর—কোনো লোককে দেখেছি, বন্ধুর মুখে কোনো ঘটনা শুনেছি, চট্ করে' নিজকে তা'র মধ্যে বিস্তৃত করে' দিলাম, কল্পনা উঠ্‌লো উত্তেজিত হ'য়ে, মনের কলের চাকাগুলো দ্রুতগতিতে ঘুরছে—বেরিয়ে এলো এক পুরোদস্তুর, ফিট্‌ফাট্, ঝক্‌ঝকে গল্প। এই মানসিক প্রক্রিয়া সত্যপ্রিয় ভালো ক'রেই জানে। ক'দিন ধরে' এই প্রক্রিয়াকে নিজের মধ্যে চালনা করবার জন্য সে কী চেষ্টাই না করছে! মনটাকে ঠিক সুরে বাঁধ্‌বার জন্য কখনো এ-বই, কখনো ও-বইয়ের পাতা ওন্টাচ্ছে; চুপচাপ বসে' সিগ্রেট ধ্বংস করছে; মস্তিষ্ককে রীতিমত হাতুড়ি-পেটা করে' ছেড়েছে; কিন্তু বৃথা, গল্প আসে নি। জোর করে' ভালোবাসা হয় না; মনের ওপর জোর চলে না। তা'র মনেরও যেন কী হয়েছে—একেবারে বেঁকে বসেছে, কিছুতেই কাজ করবে না। তা'র মস্তিষ্কে কী-রকম একটা অসাড়তা, বৈক্লব্য এসেছে; সেই সূক্ষ্ম যন্ত্রের চাকাগুলি যেন আট্‌কে গেছে; কোনো রকম উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারছে না; কল্পনার আগুন ধরতে চাইছে না। অথচ, গল্প একটা তা'র তৈরি করা চাই-ই—যত শীগ্‌গির পারে। হাতের টাকা ফুরিয়ে এসেছে। আর দিন কয়েকের মধ্যে গল্প লিখ্‌তে না পার্‌লে তা'র সংসার অচল হ'য়ে পড়্‌বে। এ-মাসে এরি মধ্যে পনেরো টাকা ধার হ'য়ে গেছে—আর করা যায় না। নব-প্রকাশিত এক মাসিকপত্র তা'র কাছে লেখা চেয়ে রেখেছে; একটা গল্প তা'দের হস্তগত কর্‌তে পার্‌লেই কিছুদিনের জন্য অন্তত দম পাওয়া যাবে। তারপর—পরের কথা পরে, এখন থেকেই তা'র জন্য ভেবে লাভ নেই। সম্প্রতি, একটা গল্প দরকার। একটা গল্প!

কিন্তু কোথায় গল্প? তিনটে দিন কেটে গেলো—একটি লাইনও তা'র লেখা হ'লো না। কাগজ কলম নিয়ে বস্‌তেই পার্‌লো না। কী করে' যে কাটালো তিনটে দিন, নিজের কাছেও তা'র হিসেব দিতে সে পার্‌বে না। একটা নতুন বই পড়ে নি; খুব যে একটা আড্ডা দিয়েছে, তা-ও নয়। বসে' শুয়ে' কুঁড়েমি করে,' কিছু না করে' ক্লান্ত হ'য়ে সময় কাটিয়ে দিয়েছে। এ-ক'টা দিন সে যেন সম্পূর্ণরূপে বাঁচেও নি। কী-রকম এক মোহ তা'কে আচ্ছন্ন করেছে, বুদ্ধিতে গাঢ় জড়তা; হঠাৎ সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে: তা'র মানসিক মৃত্যু হচ্ছে না তো? হয়-তো এ-ই শেষ, হয়-তো তা'কে দিয়ে আর-কোনো লেখা হ'বে না। যতই সে এ কথা ভাবে, ততই এক বিশাল হতাশা তা'কে অভিভূত করতে থাকে; লেখা ব্যাপারটা ততই আরো অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। তারপর মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে' সে নিজকে বিশ্বাস করাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে যে, এ-অবস্থাটা নিতান্ত সাময়িক বই কিছু নয়, কেটে গেলো বলে'। তা'র শরীর ক'দিন থেকে ভালো যাচ্ছে না—হয়-তো সেটাই কারণ। এই মেঘলা ওয়েদারে মন অনেক সময় এম্‌নিই নির্জীব হ'য়ে পড়ে—রোদ উঠ্‌লেই আবার সেরে যায়। আর, স্বাভাবিক ক্লান্তির জন্যেও অবিশ্যি এ-রকম হ'তে পারে; লিখ্‌তে তো আর তা'কে কম হয় না, কত আর লেখা যায়! আপিসের বা

যে-কোনো রুটিন-বাঁধা কাজ অনায়াসে রোজ করে'-যাওয়া যায়; মানসিক অবস্থার সূক্ষ্ম তারতম্যে সে-কাজের কিছু আসে-যায় না; আর, ইচ্ছা কি অনিচ্ছা, আনন্দ কি বিতৃষ্ণার কথা তো ওঠেই না; কারণ, ও-সব কাজ কখনো কেউ ইচ্ছে করে,' আনন্দ নিয়ে করে না; নিস্পৃহ, বীতরাগভাবে সহ্য করে' যায় মাত্র। কিন্তু লেখার কথা আলাদা; সেটা সম্পূর্ণরূপে মনের ইচ্ছার ওপর, মুডের ওপর নির্ভর করে; আকাশের অবস্থা, কোনো অপ্রিয় লোকের সাহচর্য্য, দ্বৈপ্রহরিক নিদ্রা, কি আরো তুচ্ছ কোনো কারণ মনটাকে বিগ্‌ড়ে দিতে পারে। আর, তা ছাড়া এমন এক-একটা সময় আসে, যখন দিনের পর দিন লেখা হয় না, লেখার কথা ভাবা যায় না, লিখ্‌তে ইচ্ছে করে না। তখন মনকে ছুটী দে'য়া ছাড়া আর উপায় থাকে না; বিশ্রাম পেয়ে মন স্বতঃই যথোচিত অবস্থায় ফিরে' আসে। এখন যদি সত্যপ্রিয় দিনকয়েক নিশ্চিন্ত আরামে অবকাশ যাপন কর্‌তে পারে, তা হ'লেই—সে জানে—পরে আর তা'কে লেখ্‌বার জন্য ভাবতে হ'বে না। নিশ্চিন্ত আরাম! অবকাশ! বটেই তো। ও-সব কথা তা'র মুখেই তো মানায়, একটা দীর্ঘ উপন্যাসের উপার্জ্জনে যা'র টায়ে-টুয়ে দু'মাসের খরচ চলে। বাঁচ্‌বার জন্য, বেঁচে থাক্‌বার জন্য অবিশ্রান্ত, অনবরত লিখে' যেতে তা'কে হ'বেই। পরশুর মধ্যে কিছু টাকা তা'র না হ'লেই নয়; যেমন করে' হোক্, একটা গল্প তা'কে দাঁড় করাতেই হ'বে।

এ-ক'টা দিন দ্বিধায়, যন্ত্রণায়, আত্ম-ধিক্কারে কেটেছে—আর সহ্য করা যায় না, যা থাকে কপালে, একবার আরম্ভ করে' তো দে'য়া যাক্, এই আড়ষ্টতার জাল তো ছিন্ন হ'বে। আর-কিছু না হোক্, সেটাই লাভ। মরীয়া হ'য়ে সত্যপ্রিয় আজ লিখ্‌তে বসেছে। তিন দিন বাদ্‌লার পর আজ রোদ উঠেছে; সকালে ঘুম থেকে উঠে'ই সত্যপ্রিয় বেশ একটু প্রফুল্ল বোধ কর্‌ছিলো। তখনি সে ভাব্‌লে, এ-সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। চা খেতে-খেতে সে মনে-মনে একটা খস্‌ড়া তৈরিও করে' ফেল্‌লে। একটা নির্দ্দোষ, নিরামিষ প্রেমের গল্প লিখ্‌বে—সেমি-প্লেটোনিক। কোনো ঝাঁঝ থাক্‌বে না, ঝাল থাক্‌বে না—মিষ্টি গল্প, চকোলেটের মত, সিরাপের মত, গ্লুকোসের মত মিষ্টি। লিখ্‌তে খুব সোজা হ'বে, সময় লাগ্‌বে কম: তা ছাড়া, কাগজটার আবার একটু শুচিবাই আছে—সেদিক থেকেও নিরাপদ হ'বে। মনে-মনে সে একরকম ঠিক করে' আন্‌লে, কিন্তু লিখ্‌তে বস্‌তে বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছিলো না। সেই সময় যা হোক্ তা'র এক বন্ধু এসে উপস্থিত হ'লো—বাঁচলো সে। কাজে বাধা পেয়ে কেউ কখনো এত খুসি হয় নি। গল্পে-গল্পে সকালটা গেলো কেটে—কিন্তু তা'র কী দোষ? সে তো লিখ্‌তোই, অনুতোষটা এসেই তো মাটি করে' দিলে।

কিন্তু দুপুরবেলা আর ফাঁকি চল্‌লো না; লিখ্‌তে না-বস্‌বার কোনো অছিলাই সে আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌লে না। সুতরাং, বাধ্য হ'য়ে তা'কে আরম্ভ করে' দিতে হ'লো। প্রথম পৃষ্ঠাটা অত্যন্ত নিরুৎসাহে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে লেখা হ'লো; এক লাইন লেখে আর ভাবে—ইস্, কতক্ষণে শেষ হ'বে! লিখ্‌তেই যখন তা'র এত খারাপ লাগ্‌ছে, সে ভাব্‌লে, তখন পড়্‌তে না জানি আরো কত খারাপ লাগ্‌বে। কিন্তু না—যেটুকু লিখেছে, সে একবার পড়ে' দেখ্‌লে—মোটেই অপাঠ্য হয় নি। লিখতে খুব বেশি অভ্যেস থাক্‌লে এই একটা লাভ হয় যে যে-কোনো রাবিশ বেশ পঠনীয় করে' চালিয়ে দে'য়া যায়। বাঙ্‌লা দেশের পাঠক যে কত অল্পে খুসি, তা ভেবে অবাক্ হ'তে হয়।

নিজের মনে একটু হেসে সত্যপ্রিয় আবার লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। এইবার একটু-একটু করে' তা'র আত্ম-সচেতন ভাবটা দূর হ'য়ে গেলো; এতক্ষণে তা'র মন সত্যি-সত্যি কাজ কর্‌তে আরম্ভ করেছে, গল্পটা নিজের মধ্যেই জমে' আস্‌ছে। কাগজের সঙ্গে প্রায় মাথা ঠেকিয়ে দ্রুতগতিতে লিখ্‌তে-লিখ্‌তে সে টের পেলো, তা'র মা ঘরে ঢুকে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু সে মাথা তুলে' একবার তাকালেও না।

একটু পরে তা'র মা ডাক্‌লেন, 'এই, সতু,' কিন্তু সতু মাথা তুল্‌লো না। আরো একটু অপেক্ষা করে' মা আবার বল্‌লেন 'শোন্, একটা কথা আছে।'

"কী, বলো।' কাগজ থেকে চোখ না তুলে'ই সত্যপ্রিয় বল্‌লে।

'রাণীর পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে; ফার্স্‌ট্ ডিভিশনে পাশ করেছে।'

সত্যপ্রিয় বল্‌লে, 'হুঁ।'

'বিপিনবাবুর স্ত্রী আজো আমাকে বল্‌ছিলেন,' মা ভয়ে ভয়ে কথাটা পাড়্‌লেন. 'এই আষাঢ়ের মধ্যেই ওঁরা মেয়ের বিয়ে দিতে চান্।'

কষ্টে মেজাজ ঠিক রেখে সত্যপ্রিয় বল্‌লে, 'তা বেশ তো; তোমার আমার তা'তে কী?' বলে' এমন ভাব করে' লিখতে আরম্ভ কর্‌লে, যেন এর পরে আর এ-বিষয়ে কোনো দিক থেকেই কিছু বলা যেতে পারে না।

মা একটু চুপ করে' থেকে সাহস করে' একেবারে ঝাঁপ দিলেন: 'তুই রাণীকে বিয়ে কর্ না।' সত্যপ্রিয় হাতের কলম রেখে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলে। তারপর স্থির দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে বল্‌লে, 'না।'

'তা কর্‌বি কেন? যেমন কপাল তোর, তেম্‌নি হ'বে তো। তুই একেবারে হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া—জীবনটাই তোর কষ্টে কাট্‌বে, বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। এ বিয়েটা কর্‌লে তুই বেশ সুখে থাক্‌তে পারিস্ কিনা, তা তুই কর্‌বি নে। যা তুই চাস্, তা-ই ওঁরা দিতে রাজি। এম্‌নি টাকা নিতে না চাস্, বিলেতে পড়্‌বার খরচও ওঁরা দিতে পারেন। আর তা ছাড়া, কল্‌কাতায় একটা বাড়ি—সেটাই কি কম কথা? টাকার জোরই তো জোর;—তা যদি না থাকে, ভারি তো হ'বে তোর বিদ্যে আর বুদ্ধি দিয়ে। তুই এখনো ভেবে দ্যাখ্—'

'কী ছাই তুমি প্যান্‌প্যান্ কর্‌ছো!' সত্যপ্রিয় আর আত্মসংযম বজায় রাখ্‌তে পার্‌লে না, 'তুমি যাও এখান থেকে—দেখ্‌তে পাচ্ছো না, আমি কাজ কর্‌ছি?'

'কাজ—খুব এক কাজ পেয়েছিস্ যা হোক্। কলম-বাজি করে' কদ্দিন আর চালাবি তুই শুনি? লিখ্‌তে-লিখ্‌তে পিঠ তো কুঁজো হ'য়ে গেলো, চোখ তো যাচ্ছে গর্ত্তে বসে'। দু' টাকা পাঁচ টাকার জন্য ফ্যা-ফ্যা করে' এখান থেকে ওখানে ঘুরে'-বেড়ানো—এরি জন্যে কি তুই এত লেখাপড়া শিখেছিলি? টাকাই যদি না হ'বে, তা হ'লে পরীক্ষাগুলো পাশ না কর্‌লেই হ'তো! তখন সবাই পই-পই করে' বল্‌লে, আই সি-এস্ কি বি-সি-এস্ যা হোক্ একটা পরীক্ষা দে;—না, ছেলের তা'তেও মন উঠ্‌লো না। এই তো নির্ম্মল দিব্যি ডেপুটি হ'য়ে গেছে—এখন আর ওকে পায় কে? ও কি তোর চেয়ে বড় একটা ভালো ছেলে! সবারি একটা কিছু হ'য়ে যাচ্ছে, তুই-ই শুধু না খেয়ে মর্‌ছিস্। লক্ষ্মীছাড়া আর কা'কে বলে!'

মা-র এ-সমস্ত প্রলাপ ও বিলাপ শুনে' সত্যপ্রিয় অভ্যস্ত; অন্য সময় হ'লে সে মোটে গ্রাহ্যই কর্‌তো না, কথাগুলো ভালো করে' তা'র কানেও ঢুক্‌তো না। কিন্তু এখন—ঠিক যখন গল্পটা তা'র জমে' আস্‌ছে (আর যে-গল্প অন্ন-সংস্থানের জন্য লিখ্‌তে হচ্ছে), এখন এ-রকম বিশ্রী বাধা পেয়ে তা'র মাথায় রক্ত চড়ে' গেলো; জ্বলে' উঠে' বল্‌লে, 'হয়েছে, অনেক হয়েছে; তুমি এখন যাও, যাও এখান থেকে।'

কিন্তু মা-ও বোধ হয় একেবারে মন স্থির করে' এসে-ছিলেন—এতেও ঘাব্‌ড়ালেন না। বরং মিষ্টি করে' বল্‌তে লাগলেন, 'আমি বলি, শোন্—পাগ্‌লামি করিস্ নে। রাণীকে তুই বিয়ে কর্। তোর মত ছেলে বিলেত যেতে পার্‌লে অনেক-কিছুই কর্‌তে পার্‌বে—তোর বাবা বেঁচে থাক্‌লে যেমন করে'ই হোক্ তোকে কি আর না পাঠাতেন! আমার কথাটা রাখ্—তোরি ভালোর জন্য বল্‌ছি, আমার কী? আমি তো দু'দিন পরেই চোখ বুজ্‌বো। টাকা নিতে তোর আপত্তি? বেশ তো, মনে কর্ না, কেউ তোকে বিলেতের খরচের টাকাটা ধার দিচ্ছে, ফিরে' এসে তুইও তো বড় হ'তে পার্‌বি—তখন শোধ দিয়ে ফেল্‌লেই হ'বে। এতে কোথায় যে অপমানের কী আছে, আমি তো বুঝ্‌তে পারি নে। আর, ও-সব যদি তুই না চাস্, বিপিনবাবু চেষ্টা কর্‌লে তোকে একটা চাকরিও জুটিয়ে দিতে পার্‌বেন—তবু তো একটু সুস্থির হ'তে পার্‌বি। তুই আজ যে-রকম কষ্টে পড়েছিস্, তা কি আমারি খুব ভালো লাগ্‌ছে দেখ্‌তে? লক্ষ্মী, এ বিয়েতে তুই মত দে।'

'উঃ, তোমার যন্ত্রণায় আমি পাগল হ'য়ে যাবো, মা! এক মুহূর্ত্ত কি তুমি আমাকে শান্তিতে থাক্‌তে দেবে না?'

'দ্যাখ্, বিপিনবাবুদের বেজায় গরজ, কিন্তু তাঁরা বেশি আর দেরি কর্‌তে পার্‌বেন না। ওঁরা বল্‌ছিলেন, তুই যেন অন্তত একবার মেয়েটিকে গিয়ে দেখে আসিস্।'

'দেখ্‌বো আবার কী? ও-মেয়েকে তো আমি প্রায় রোজই দেখি। ওঁদেরকে তুমি বলে' দিয়ো, মা, যে এখন আমি বিয়ে কর্‌বো না; আর যদি বা করি, ওঁদের মেয়েকে কিছুতেই কর্‌বো না।'

'আহা—হা, কথার কী ছিরি! তা তো বটেই—যাতে তোর ভালো হ'বে, এমন-কোনো কাজ কি তুই কখনো কর্‌তে পারিস্‌! একবারো যদি তোকে দেখ্‌তুম, বুদ্ধিমানের মত একটা কাজ কর্‌তে। খালি কতকগুলো বই গিল্‌তেই শিখেছিলি তা ছাড়া আর এক ছিটে বুদ্ধিও যদি থাক্‌তো! চিরকালই তোর ও-ভাবে কাট্‌বে—'

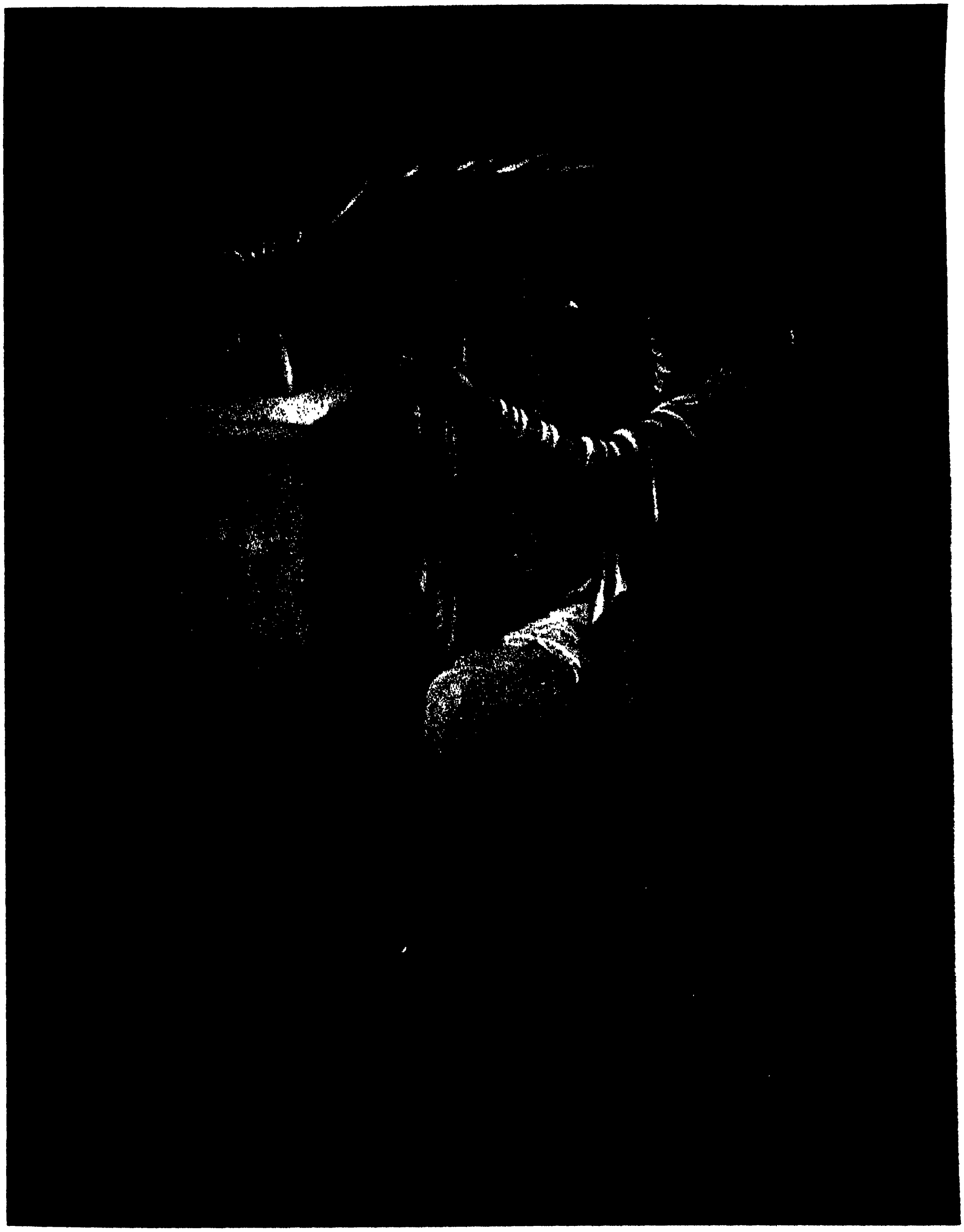
'দ্যাখো, মা,' সত্যপ্রিয় অনাবশ্যক রকম বেশি শব্দ করে' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, 'হয় তুমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে' যাও, নয় আমি যাই। তোমার সঙ্গে থাকা আর আমার পোষাবে না।'

* * * *

গেলো—চুলোয় গেলো, গোল্লায় গেলো গল্প, মেঘের মধ্যে উড়ে' অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে হারিয়ে গেলো দশদিকের বায়ুতে। লেখাটা বেশ সহজভাবে আস্‌ছিলো, বাধা না পেলে এ-বেলার মধ্যে অনেকটা লিখে' ফেল্‌তে পার্‌তো। কিন্তু—উঃ, কেন পৃথিবীর লোক এমন নির্বোধ হয়? মা মুখ-ভার করে' বকুলবাগানে তাঁর 'দিদি'র বাড়ি চলে' গেছেন; সে-ই তো গেলেন—একটু আগে গেলেই হ'তো। এখন বাড়ীতে সে একা; কিন্তু মনটা এমন বিশ্রী, বেসুরো হ'য়ে গেছে, কী যে কর্‌বে, সত্যপ্রিয় ভেবে উঠ্‌তে পার্‌ছিলো না; কিছু চীনে বাসন ভাঙ্‌তে পার্‌লে ভালো লাগ্‌তো। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে সে অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি কর্‌তে লাগ্‌লো। আজ প্রথম নয়, অনেক দিন ধরে'ই মা তা'র কানে সুর ভাঁজ্‌ছেন: বিয়ে কর্‌, বিয়ে কর, তা হ'লেই তোর সব দুঃখ ঘুচ্‌বে। কোনো এক নবযৌবনা, পরমা-সুন্দরী উচ্চ-শিক্ষিতা ধনী-কন্যার পাণি-গ্রহণ—পার্থিব সমস্ত ব্যাধির সে-ই হচ্ছে ধন্বন্তরি। জীবন-জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। সর্ব্বজ্বর-গজসিংহ। শুধু তা'র মা-ই নন্‌, যেখানে তা'র যে আত্মীয় আছে, সবাই তা'কে এই বিশল্যকরণী সেবন করাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। তা'র বি-এ পাশ কর্‌বার সময় থেকে এ-ব্যাপার চল্‌ছে। পরীক্ষায় তা'র ফলটা আশাতীত রকম ভালো হ'য়ে গিয়েছিলো, সেইজন্যই বোধ হয়। তা না হ'লে, তা'র প্রতি কন্যাপক্ষের এমন উগ্র উন্মুখতার আর কী কারণ থাক্‌তে পারে? প্রথমে এলো হাজ্‌রা-রোডবাসী এক ব্যারিস্টর-দুহিতা—জুনিয়র (না সিনিয়র? ও দুটো ব্যাপার সে ভালো করে' বুঝে' উঠ্‌তেই পার্‌লো না) কেম্ব্রিজ পাশ; টেনিস খেলে, পিয়ানো বাজায়, ফরাসী বলে—মাগো, ভাব্‌তেই ভয় করে। বিস্তর পয়সা; সে যদি বিয়ে করে, ব্যারিস্টর-সাহেব তা'কে বিলেত থেকে 'তৈরি করিয়ে' আন্‌তে রাজি আছেন। বাকি জীবনের জন্য সে পয়সা-ওলা আভিজাত্যের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে—কিছু আর ভাব্‌তে হ'বে না। সে-ফাঁড়া যদি বা কাট্‌লো, এলেন মৈমনসিং-এর এক জমিদার। একমাত্র মেয়ে তাঁর; মনের মত ছেলে পেলে এক্ষুনি মেয়েকে পাত্রস্থ কর্‌তে রাজি। বড়লোকের ছেলের ওপর—বোধ হয় নিজের দিয়ে বিচার করে'—তাঁর গভীর অনাস্থা; সাধারণ ঘরের কোনো লেখাপড়া-জানা ছেলে পেলে তিনি ধন্য হ'য়ে যান্‌। মেয়েটি অবিশ্যি একটু ছোট—সবে তেরোয় পড়েছে, কিন্তু বয়েস তো আর কারো জন্যে বসে' থাকে না। আর, দেশে ছিলো বলে' লেখাপড়া শেখ্‌বারো বিশেষ সুযোগ পায়নি; তা বিয়ের পরেও কি আর শিখিয়ে না নে'য়া যায়! ভদ্রলোক নিজে সত্যপ্রিয়র কাছে এসে-ছিলেন—উঃ, কী অসম্ভব টাক ভদ্রলোকের! তারপর রেঙ্গুনের সেই কনট্রাক্টরের মেয়ে—নামটা তা'র মনে আছে, গ্লাডিস্‌;—চেহারা দেখে নাকি মেমসাহেব না বাঙালী চেন্‌বার জো নেই; ইংরিজি বলে নাকি পঞ্জাব মেইলের এঞ্জিনের মত। গায়ের রঙ্‌ আগুনের মত—না, গিনি-সোনার মত? কোন্‌টা, ভুলে' গেছি। যা-ই হোক, সোনার মত মেয়েই বটে। সোনার মেয়ে—ছেলেবেলায় সত্যপ্রিয় এক কবিতা লিখেছিলো:

শোনো গো সোনার মেয়ে,
আমার পরাণ অধীর হয়েছে তব আঁখি-পানে চেয়ে।

কিন্তু এখানে সোনার মেয়ে মানে একটু আলাদা; মানে, এ-মেয়ে তা'র সমান ওজনের সোনার তুল্য—ভয়ানক ব্যাপার। ঐশ্বর্য্যের এমন-কোনো দুর্গম শিখর নেই, সত্যপ্রিয়র চোখের সাম্‌নে যা তখনকার মত তুলে' ধরা না হয়েছিলো। বেচারা সত্যপ্রিয়! এততেও নিস্তার নেই—শেষ পর্য্যন্ত তা'দেরি রাস্তায়, দুটো বাড়ি ছেড়ে উল্টো দিকের বাড়িতে—এই রাণী! যেন এম্‌নিই জীবনে যথেষ্ট দুঃখ নেই, তা'র ওপর এই উপদ্রব এসে না জুট্‌লে চল্‌তো না। এই রাণীকে নিয়ে মা তা'র জীবন দুর্বিসহ



Bharatvarsha Halftone & Printing Works

করে' তুল্‌লেন একেবারে। বিপিনবাবু রাইটার্স্‌ বিল্ডিংস্‌-এর একজন হোম্‌রা-চোম্‌রা, যথেষ্ট পয়সা জমিয়েছেন। তা'র ওপর, অনেক সরকারী চাকরির স্বর্গের চাবি নাকি তাঁর হাতে। এ পর্য্যন্ত যত আক্রমণ হয়েছে, তা'র মধ্যে এটাই সব চেয়ে মারাত্মক, নাছোড়বান্দা; এঁদের প্রতি-বেশিতাই হয়েছে বিষম বিপদের। মেয়ের মা-র সঙ্গে মা-র আবার এক অশুভ বন্ধুতা হয়েছে; এবং তা'র ফলে সত্যপ্রিয়র জীবনের আর শান্তি নেই। মা-র ক্লান্তিহীন প্যান্‌প্যানানি শুনে'-শুনে' তা'র মাথা খারাপ হ'য়ে গেলো। রাণীকে বিয়ে না কর্‌লে এমন এক সুযোগ সে হারাবে, যা জীবনে কখনো ফিরে' আস্‌বে না, এ কথা নানা যুক্তি-তর্কের সাহায্যে মা তা'কে বুঝিয়ে দিয়েছেন! রাস্তা দিয়ে যেতে-আস্‌তে মাঝে মাঝে দোতলার বারান্দায় মেয়েটিকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে সে দেখেছে; মেয়েটি তা'কে দেখে সরে' ঘরের ভেতর চলে' গেছে। এবং এ জিনিষটি সত্যপ্রিয়র ভালো লাগে নি। কেন? সে একজন রাস্তার লোক মাত্র, তা'র প্রতি এ-সম্মান কেন? তা'র মনে কেমন একটা বিশ্রী অস্বস্তি খচ্‌খচ্‌ কর্‌তে থাকে;—রাণী নিশ্চয়ই তা'কে চেনে, এবং রাণীর সঙ্গে যে তা'র বিয়ে দেবার চেষ্টা চল্‌ছে, তা-ও তা'র না জান্‌বার কোনো কারণ নেই। হয় তো মেয়েটি মনে-মনে—ছি-ছি, এ কী অন্যায়! যেন দু' বাড়ির মধ্যে গোপনে এটা ঠিক হ'য়ে গেছে যে বিয়ে হ'বেই।

টাকা, টাকা, টাকার দরকার—সত্যপ্রিয় ভাব্‌তে লাগ্‌লো—খুবই দরকার, তা ঠিক; কিন্তু তাই বলে' বিয়ে! হে ঈশ্বর, তার আগে মৃত্যু হোক্‌। বিয়ে যদি সে কখনো করেই, ভালোবাসার জন্তেই কর্‌বে; আর, সে-সুযোগ যদি না-ই হয়, না-হয় নিছক শারীরিক প্রয়োজনের তাগিদে কর্‌বে; কিন্তু টাকার জন্তে—তা সে কখনো পার্‌বে না, তার প্রকৃতিতে সে-অত্যাচার সইবে না। তার আত্ম-সম্মান-বোধে, প্রায় প্রবৃত্তির মত গভীর ও মূলগত নীতিজ্ঞানে সে-চিন্তা প্রচণ্ড আঘাত করে। বরং সে রাশি-রাশি বাজে কাগজে ঝুড়ি-ঝুড়ি বাজে গল্প লিখে' যাবে; বরং সে মেয়ের ছদ্মনামে যৌন-বিজ্ঞানের বই লিখ্‌বে। হয়-তো তা'র পক্ষে এটা বোকামিই হচ্ছে; যে যেচে দিতে চায়, তা'র কাছ থেকে নেবেই বা না কেন?—বিশেষ, সে প্রত্যাখ্যান কর্‌লে যখন আর-একজন সেটা লুফে' নেবে। এটা হচ্ছে তা'র মা-র যুক্তি। হ্যাঁ, টাকার জন্ত অনেক ছেলে বিয়ে করে বই কি; তেম্‌নি, অনেক মেয়েও তো টাকা নিয়ে ভালোবাসে। আর তা ছাড়া, যুক্তি দিয়ে, ব্যবসাবুদ্ধি দিয়ে, ঠাণ্ডা মাথার গণনা দিয়ে তা'কে হারিয়ে দে'য়া খুবই সোজা হ'তে পারে, নিজের সমর্থনে তেমন কোনো জোরালো তর্কেরই সে অবতারণা কর্‌তে পার্‌বে না। কারণ, এটা তর্কের বিষয় নয়; এক-একজন লোক এক-একটা কাজ কর্‌তে পারে না; সে-অক্ষমতা প্রকৃতিগত, মজ্জাগত। যেমন, এ-ব্যাপারটা সে কর্‌তে পার্‌বে না; এটা কোনো তত্ত্বের কথা নয়, কার্য্যকারণঘটিত যুক্তির কথা নয়, নিছক অক্ষমতা। টাকা—হ্যাঁ, টাকা দরকারী জিনিষ; টাকায় সুখ হয় বটে—একটা সীমা পর্য্যন্ত। যত বেশি টাকা, তত বেশি সুখ, এ-কথা ভুল। সুখের পক্ষে যে-জিনিষের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি, সে হচ্ছে নিজের স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে বাঁচ্‌বার অধিকার। নিজের মন যা'তে সায় দেয় না, জোর করে' তেমন কোনো কাজ করলে—আপাতত তা যতই শুভ ফলপ্রসূ হোক্‌, শেষ পর্য্যন্ত জীবনের মূলের তা উচ্ছেদ-সাধন করে,—না করে'ই পারে না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনো কোনো কাজ কর্‌তে নেই, সেটাই একমাত্র অন্যায়। নিজের ইচ্ছা অনুসারে বাঁচ্‌তে না পার্‌লে কোনো অবস্থাতেই যে সুখ হ'তে পারে না, এই অতি সাধারণ কথা মা-কে সে কী করে' বোঝাবে? কী করে' সে বোঝাবে যে এত অভাবে, এত কষ্টেও সে—হ্যাঁ, সুখী, সুখী বই কি। এই জীবন সে সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় বরণ করে' নিয়েছে—চোখ খোলা রেখে, এর সমস্ত দায়িত্ব, বিপদ সম্পূর্ণরূপে জেনে। সম্পূর্ণরূপে এ জীবনকে সে স্বীকার করে' নিয়েছে; এর বিরুদ্ধে তা'র কোনো অভিযোগ নেই। সমস্ত দুঃখের মধ্যেও, তাই, সে সুখী। তা'র অন্তরে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, নিজের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মৈত্রীতে সে জীবন-যাপন কর্‌ছে। এমন-কোনো মূল্যবান জিনিষ পৃথিবীতে নেই, যা'র জন্ত এই সুখ হারানো যায়। না, সে অনুতাপ করে না; এই স্বাধীনতা নিয়ে যদি দারিদ্র্যে তা'র জীবন কেটে যায়, সে নিজেকে খুব ক্ষতিগ্রস্ত মনে কর্‌বে না। নিঃসংশয়ে সে বুঝেছে,

এ-ই তা'র পথ। বারো বছর বয়েস পর্য্যন্ত তা'র মনে সন্দেহ ছিলো; মন ঠিক করে' উঠ্‌তে পারে নি। চার বছর বয়েসে—সে মনে কর্‌তে পারে—তা'র জীবনের অ্যাম্‌বিশন্ ছিলো সার্কাসের ক্লাউন্ হওয়া। তারপর একদিন এক ব্যাণ্ড্‌পার্টি দেখে সে মত পরিবর্ত্তন কর্‌লে—যে যা-ই বলুক, ব্যাণ্ড্‌মাষ্টারই সে হ'বে। সেটা শীগ্‌গির দূর হ'য়ে এলো—যেমন সব ছোট ছেলেরই এসে থাকে—এঞ্জিন-ড্রাইভারের যুগ; যে-এঞ্জিনটা বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখ্‌তেও গা-ছম্‌ছম্ করে, সেখানেই সব সময় বসে' থাক্‌বে, কলকব্জাগুলো সত্যি-সত্যি হাত দিয়ে ছোঁবে, যত খুসি নাড়াচাড়া কর্‌বে—কেউ কিছু বল্‌বে না। ওঃ, কী ভয়ানক! তারপর—যখন তা'র লেখাপড়া শেখ্‌বার সময় এলো—বিদ্যার একটু স্বাদ পেয়েই তা'র উচ্চাভিলাষ অন্যদিকে ধাবিত হ'লো। সে হাইকোর্টের জজ হ'বে, অত বড় চাক্‌রি আর নেই; সবার ওপরে পঞ্চম জর্জ্জ, আর তার পরেই হাইকোর্টের জজ। জজিয়তি অবস্থাটা তা'র অনেকদিন ছিলো। তারপর হঠাৎ একদিন—তখন তা'র বয়স বছর দশেক হ'বে—সে এক অদ্ভুত কাণ্ড কর্‌লে; এক পদ্য লিখে' ফেল্‌লে। একটা পদ্য লিখে' থামা যায় না; সে আরো লিখ্‌লে, আরো, আরো। রোজ দুপুরবেলা বসে' সে পদ্য লিখ্‌তো;—দেখ্‌তে-দেখ্‌তে খাতার পর খাতা ভরে' উঠ্‌লো। বারো বছর বয়েসে সে একেবারে মন স্থির করে' ফেলেছে—সে লেখক হ'বে। শেষ পর্য্যন্ত তা'র ব্যত্যয় হয় নি; লেখকই সে হ'লো। ষোলো বছরের মধ্যে সে গদ্য-পদ্য মিলিয়ে যা লিখেছিলো, তা একত্র করে' ছাপালে অন্তত হাজার পৃষ্ঠার একটা বই হয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে তা'র বাবা গেলেন মারা; লাইফ্-ইন্‌শিয়োরেন্স্-এর সামান্য টাকা নিয়ে তা'র মা আর সে একা পড়্‌লো। সেই টাকায় কলেজের শেষ বছর পর্য্যন্ত কষ্টে তা'দের চলেছে। অবিশ্যি তা'র নিজের রোজগারও ছিলো;—কলেজে জলপানি, লেখার আয়। সমস্ত মন দিয়ে সে অবিশ্রান্ত লিখে' গেছে। সে লেখক, লেখাই তা'র জীবনের কাজ। বি-এ পাশ কর্‌বার আগে তা'র দুটো বই বেরিয়ে গেলো। পরীক্ষার ফল যখন বেরুলো—শৈশবের পর এই প্রথম তা'র মনে মুহূর্ত্তের জন্য দুর্ব্বলতা এলো। খানিকটা অন্য লোকের প্ররোচনায়, খানিকটা লোভ সাম্‌লাতে না পেরে সে ভাব্‌লে: আচ্ছা, আই সি-এস্‌টা দিয়ে দেখা যাক্ না। সে পরীক্ষার সব নিয়ম কানুন আনালে; ঐ পর্য্যন্তই। আই-সি-এস্ দিলে হয়-তো সে হ'য়ে যেতো, কিন্তু তা'র বদলে সে নতুন একটা উপন্যাস লিখ্‌লে। লীন হ'য়ে গেলো মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা। যথাসময়ে এম্-এ পাশ কর্‌বার পর সে আবিষ্কার কর্‌লে যে তা'দের হাতে আর এক পয়সাও নেই; এখন তা'র উপার্জ্জনের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর। দেশে দুর্দ্দিন; ইস্কুলমাষ্টারি ছাড়া অন্য যে-কোনো কাজ দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠেছে। তা'র যা কাজ, সত্যপ্রিয় তা'তে আরো জোর দিয়ে লাগ্‌লো। কতটুকুই বা তা'দের দরকার, তা-ই মেটাতে—কী কষ্ট! হোক্ কষ্ট, তবু—এতে মজা আছে। এ-ই তা'র ভালো লাগে। এই স্বাধীনতা, সংগ্রামের উত্তেজনা, নিজের শক্তি-পরীক্ষার আনন্দ—এ-সব জিনিষ কোনো এক বড়লোকের মেয়ের বাপের কাছে বেচে' দেবে কিনা সে,—সে, সত্যপ্রিয় বিশ্বাস! মা, মা, তুমি একটু বুঝ্‌তে চেষ্টা করো।

দীর্ঘ দুপুরবেলাটা একেবারে মাটি হ'লো; কোনো কাজ হ'লো না। নিজের মনে খানিকক্ষণ ছট্‌ফট্ করে' সত্যপ্রিয় বিছানায় শুয়ে'-একটা বই পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌তে-কর্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌লো। জাগ্‌লো—মা যখন চা তৈরি করে' তা'কে ডাক্‌লেন। মা-র মুখের অপ্রসন্ন ভাব তখনো কাটে নি। দিনে ঘুম সত্যপ্রিয়র সয় না; শরীরে আর মনে একটা বিশ্রী অসুস্থ ভাব নিয়ে সে উঠে' বস্‌লো। পাঁচটা বাজে। উঃ, প্রায় দু' ঘণ্টা সময় সে ঘুমিয়ে নষ্ট কর্‌লো—যে-ঘুমের কিছুমাত্র শারীরিক প্রয়োজন ছিলো না। দু' ঘণ্টা—এ-সময়ে অন্তত চারটে পৃষ্ঠা লেখা যেতো, ভালো একটা বই পড়া যেতো। তা'র বেজায় রাগ হ'লো-কিন্তু কা'কে সে দোষ দেবে, নিজকে ছাড়া? নিজের ওপর রাগ করে' সে ঝগ্‌ড়া কর্‌লো চায়ের সঙ্গে; তা'র মা তা'কে অত্যন্ত নির্দ্দোষ কী-একটা কথা বল্‌তেই খিট্‌খিট্ করে' উঠ্‌লো, অনাবশ্যক উষ্ণতার সহিত ঘোষণা কর্‌লে যে এক্ষুনি সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর ফির্‌বে রাত বারোটায়, তা'র ভাত চাপা দিয়ে রাখ্‌লেই চল্‌বে। মেজাজ কমাতে গিয়ে সে ভালো করে' চা-টাও

খেতে পারলে না—ও-রকম বিচ্ছিরি, পাৎলা চা খেয়ে মানুষ বাঁচে? ও-রকম চা খাওয়ার চাইতে ক্লীন একদিন মরে' যাওয়া ভালো। গন্‌গন্ করতে-করতে সে বাথ্‌রুমে ঢুকে' মুখ-চোখ ধুয়ে' এলো; কিন্তু কাপড় বদ্‌লাতে গিয়ে ছাখে, বাক্সে আর ফর্সা কাপড় নেই। তা'র ভয়ানক ইচ্ছে হ'লো, কাউকে মাথায় এক বাড়ি দিয়ে খুন করে' ফেলে। নাঃ, এ-রকম হ'লে আর বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই; ধোপা যে ধোপা, সে-ও তা'র জীবন বিষময় করে' তোল্‌বার চক্রান্তে সহায়তা করছে। অসম্ভব, অসম্ভব—আর পারা যায় না। মা তা'কে একটা অপেক্ষাকৃত ফর্সা কাপড় এগিয়ে দিলেন—সে সেটা ছুঁড়ে' ফেলে দিলে। কী আর আসে-যায়—নোঙ্‌রা জামা-কাপড়ই তা'র ভালো। সে যখন ডুব্‌ছে, ভালো করে'ই ডুবুক্। হাতের কাছে যে পাঞ্জাবিটা পেলো, সেটাই সে গায়ের ওপর চড়িয়ে দিলে। পাঞ্জাবিটা আধ-ময়লা, ইস্ত্রী নষ্ট হ'য়ে গেছে—লক্ষ্য করে' সত্যপ্রিয়র মনে রীতিমত আনন্দই হ'লো। বেশের অপরিচ্ছন্নতা দিয়ে সে যেন কোন্ দুর্জ্জেয় শক্রর ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। চুলও সে আঁচ্‌ড়ালে না, দু'দিন আগে বুরুশ-করা জুতোর ভেতর পা ঢুকিয়ে এঞ্জিনের মত ফোঁসফোঁস করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো।

পূর্ণ থিয়েটারের কাছে গিয়ে সে দাঁড়ালো—একটা খোলা দোতলা বাস্-এর জন্ত; গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় গরীবের ও-ই তো সব চেয়ে বড় বিলাসিতা। বেজায় ভিড় হয়; যেদিন বেশি গরম থাকে, বাস্‌গুলো সব ডিপো থেকেই ভর্ত্তি হ'য়ে বেরোয়; চড়কডাঙার মোড়ে আস্‌তে আস্‌তেই আর বস্‌বার জায়গা থাকে না। অন্তান্ত দিন সে ডিপোর দিকে হাঁট্‌তে-হাঁট্‌তে এগিয়ে গিয়ে বাস্ ধরে; কিন্তু আজকে তার এক পা হাঁটতে ইচ্ছে করছে না; স্টপের কাছে সে দাঁড়িয়েই রইলো। কিন্তু বাস্-এর দেখা নেই। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট কাটলো—একটা খোলা আস্‌ছে না। পর-পর চার-পাঁচটা খোলা কালি-ঘাটের দিকে চলে' গেলো। অ—ফুল্! বাস্-সিণ্ডিকেটের এ-আচরণ অসহ্য। তোমাদের স্বদেশী লোকদের হাতে যা গেছে, তা'রি কী অবস্থা! কল্‌কাতার বাস্-সার্ভিস হচ্ছে আমাদের জাতীয় জীবনের একটা মূর্ত্তিমান কলঙ্ক। এই বাস্-সার্ভিস নিয়ে আবার আমরা স্বাধীনতা-স্বাধীনতা করে' আস্ফালন করি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সত্যপ্রিয়র পা ধরে' গেলো। যাক্—ঐ বুঝি একটা দেখা যাচ্ছে। ওটা আবার পাঁচ নম্বর, ওপরটা শিখদের নোঙ্‌রা পাগ্‌ড়িতে আচ্ছন্ন;—তা হোক্, ওতেই সে যাবে। গাড়িটা এসে দাঁড়ালো। ওঠ্‌বার আগে দৈবাৎ সে একবার পকেটে হাত দিলে—এ কী! অন্ত পকেট দেখ্‌লো—যা ভেবেছে! মান্থ্‌লি টিকিটটা আন্‌তেই সে ভুলে গেছে; সঙ্গে একটা পয়সা নেই। এ-ভুল তা'র কখনো হয় না, কিন্তু আজকে—

আজকে যে এ-রকম হ'বে, তা আর আশ্চর্য্য কী? সমস্ত দিনের সঙ্গে ব্যাপারটা বেশ মানিয়ে গেছে। এখন আবার যাও বাড়ি ফিরে'—উঃ, কোথায় তা'র বাড়ি, ভাব্‌তে পারে না। কিন্তু না গিয়ে উপায়ও নেই। কোনোদিকে না তাকিয়ে সে হন্‌হন্ করে রাস্তা পার হ'য়ে গেলো; মনে-মনে ক্ষীণ একটু আশা ছিলো, হয় তো কিছু একটা এসে তা'কে চাপা ফেল্‌বে। তা'র গা ঘেঁষে একটা ট্যাক্সি চলে' গেলো—আধ ইঞ্চির জন্ত তা'কে বাঁচিয়ে গেলো। সমস্ত পৃথিবী একত্র হ'য়ে তা'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে; তা'কে জব্দ করতে, বিপর্য্যস্ত করতে, নিরাশ করতে সবাই উঠে'-পড়ে' লেগেছে; সে যা চায়, তা কখনো হ'বে না। বাস্-রাস্তা থেকে তা'র বাড়ি কতদূর—পথ আর ফুরোয় না। নাঃ, বাড়িটা না বদ্‌লালে আর চল্‌ছে না। বিচ্ছিরি এক বাড়ি—দক্ষিণটা একেবারে বন্ধ, একটু যদি হাওয়া আস্‌তো। রাত একটা-দেড়টা অবধি রাস্তায় উড়েদের হল্লা চলেইছে—ঘুমোয় কা'র সাধ্যি। তার আবার ইলেক্‌ট্রিক বিল নিয়ে বাড়িওলার সঙ্গে খিটিমিটি চল্‌ছেই—একটা পাখা আন্‌তে দেবে না। অসম্ভব—ও-বাড়িতে আর থাকা অসম্ভব।

সমস্ত সৃষ্টিকে অভিশাপ দিতে-দিতে সে তা'র ঘরে গিয়ে—ঠিক ঢুক্‌লো না, ঢুক্‌তে গিয়ে দরজার কাছে থম্‌কে দাঁড়ালো। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে বই-পত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বাইরে তখনো দিনের আলো; ঘরের ভেতর আধো অন্ধকার। মেয়েটিকে সে স্পষ্ট চিন্‌তে পার্‌লো; আর-কেউ নয়, রাণী, ও-বাড়ির মেয়ে রাণী। রাণী একেবারে তন্ময় হ'য়ে আছে, তা'র পায়ের শব্দ টের

পায় নি। সত্যপ্রিয় চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো— না, তা'র মা বাড়ি নেই। কী মুস্কিল, এখন সে কী করে? ঐ টেবিলের ড্রয়ারেই যে তা'র টিকিটটা রয়েছে। দরজার কাছেই সুইচ্‌টা ছিলো, সে হাত বাড়িয়ে সেটা টিপ্‌লে।

রাণী ভীষণ রকম চম্‌কে মুখ ফেরাতেই তা'র চোখ একেবারে সত্যপ্রিয়র মুখের ওপর এসে পড়্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে তা'র সমস্ত ফর্সা মুখ টুক্‌টুকে লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। সত্যপ্রিয়র মনে হ'লো, ভালো করে' সে-মুখের দিকে একটু তাকিয়ে ভাখে। কিন্তু সময় পেলো না; পরমুহূর্ত্তেই রাণী অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। শুধু তা'র আঁচলের কি চুলের একটা ক্ষীণ, অবর্ণনীয় গন্ধ ঘরের হাওয়ায় ঘুরে' বেড়াচ্ছে। মুহূর্ত্তের স্বপ্ন। সত্যপ্রিয় ব্যাপারটা ভালো করে' উপলব্ধি কর্‌তেই পার্‌লে না। নিজের মনে এটা যেন সে ঠিক বিশ্বাস করে' উঠতে পার্‌ছে না।

খানিকক্ষণ সে যেখানে ছিলো, ঠায় সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর—রাস্তা দিয়ে একটা ট্যাক্সি গেলো, তা'র হর্ণের শব্দে তা'র চমক ভাঙ্‌লো। আস্তে-আস্তে সে একটা চেয়ারে গিয়ে বস্‌লো। এর মানে কী? এর মানে কী? তা'র জন্তে কি ফাঁদ পাতা হচ্ছে? এ কি তা'কে আট্‌কাবার একটা কৌশল? কিন্তু তা'র মুখের ওপর রাণীর সেই সচকিত, লজ্জাভারাক্রান্ত দৃষ্টি স্মরণ করে' কিছুতেই সে সে-কথা মনে কর্‌তে পার্‌লে না। কোনো সন্দেহ নেই, রাণী লুকিয়ে তা'র ঘরে এসেছিলো; বাড়িতে কেউ নেই, তা জেনেই এসেছিলো। মা হয়-তো তা'দেরি বাড়িতে। কেন এসেছিলো সে? কেন? টেবিলের ওপর বইগুলো দেখ্‌ছিলো—কোনো বই চেয়ে নিতেও তো পার্‌তো। কিন্তু তা'কে দেখেই রাণী যে-রকম ঘাবড়ে গেলো! তা'র লাল হয়ে-ওঠা, ছুটে-পালিয়ে-যাওয়া এ-সবের মানে কী? মানে কী? মানে বোঝা অত্যন্ত সোজা। সে কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই আসে নি; এবং তা'র পক্ষে এখানে এ-ভাবে আসা যে অন্যায়, সে-বিষয়ে সে সম্পূর্ণরূপে সচেতন। সেই অপরাধের মধুর চেতনাই তা'র রক্তিম মুখকে অমন সুন্দর করে' তুলেছিলো। মেয়েটি যে কত সুন্দর, তা সত্যপ্রিয় কখনো ভাবে নি। এর আগে দূর থেকে তা'কে দেখেছে মাত্র—এবং দূর থেকে একজন যুবকের চোখে সব যুবতীই কম কি বেশি এক রকম দেখায়।

মা'র কাছে সে শুনেছে বটে যে রাণী খুব সুন্দর দেখ্‌তে—শুন্‌তে শুন্‌তে তা'র সুধু পাগল হ'য়ে যেতে বাকি ছিলো। হ্যাঁ—সুন্দর বটে। কী চোখ—আর কী ভুরু। মুহূর্ত্তের বিদ্যুৎ-ঝলকের মত তা'র দৃষ্টির সাম্‌নে উদ্ভাসিত হ'য়ে মিলিয়ে গেলো; শাড়ির ফিকে নীল রঙ্‌টা স্বপ্নের স্মৃতির মত, তা'র চোখে লেগে রয়েছে। আর, আঁচলের কি চুলের সেই গন্ধ—এখনো যেন তা সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায় নি। ঠিক তা'র গা ঘেঁষে রাণী দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো, হঠাৎ তা'র নাক চুল্‌বুল্ করে' উঠেছিলো—মনে কর্‌তে সত্যপ্রিয়র মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে' উঠ্‌লো।

বাস্‌-এর টিকিটটা পকেটে ফেলে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লো—খানিক আগে ওই রাস্তা দিয়েই সে গিয়েছিলো—সে-ই কি? সমস্ত দিন কী হয়েছে—কী করেছে না করেছে, সব তা'র মনে আব্‌ছা। সে যেন একটা স্বপ্নের ভেতরে হাঁট্‌ছে। এই, এই মেয়ে, রাণী, যা'কে সে ইচ্ছে কর্‌লেই বিয়ে কর্‌তে পারে। কী চোখ, আর কী ভুরু! ভাব্‌তে ভাব্‌তে তা'র মনে নেশা ধরে' গেলো। রাণী একটা কথাও বল্‌লে না—কেমন ওর গলার স্বর? যদি কথা কইতো, কী কথা কইতো? ওর সঙ্গে আলাপ করা যায় না? ও কি আর-একদিন আস্‌বে—সন্ধ্যের আগে সত্যপ্রিয় যখন একা বাড়ি বসে আছে? না কি সে-ই যাবে, যাবে ওদের বাড়িতে? ওর সঙ্গে আলাপ কর্‌লে ওকে ভালোবাসা বোধ হয় খুব কঠিন হ'তো না। আর রাণী—ও তো আজ স্পষ্ট ধরাই পড়ে' গেলো। অদ্ভুত এই বাঙ্গালী মেয়েরা; প্রত্যক্ষভাবে যাকে চেনেও না—শুধু বিয়ের কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে, এই কারণে—ছি ছি, এ কী অন্যায়। কথাবার্ত্তা হচ্ছে মানে কী? বিয়ে তো কখনোই হ'বে না—রাণীর মাথায় এ-সব ঢোকালে কে?

কখনোই হ'বে না? মা, যে-ভাবে অদৃষ্ট ওদেরকে পরস্পরের কাছে এনে ফেলেছে—তা'তে, কখনোই নয়। শুধু রাণী যদি বিপিনবাবুর মেয়ে না হ'তো—যে-বিপিনবাবু মস্ত চাকরি করেন, জামাইকে যিনি বিলেতের খরচ দিতে চান্, টাকা দিয়ে কিনে' রাখ্‌তে চান্। শুধু যদি এমন না হ'তো যে রাণীকে বিয়ে করা মানেই এক লাফে পরের ওপর বড়লোক হ'য়ে যাওয়া। শুধু যদি আগে থেকে কোনো কথাবার্ত্তা না হ'তো, যদি রাণীর সম্বন্ধে সে কিছুই না

জান্‌তো, শুধু যদি এম্‌নি কোনোক্রমে তা'র সঙ্গে রাণীর দেখা হ'য়ে যেতো, আলাপ হ'তো! তারপর···একদিন হয়-তো ওরা মনে কর্‌তে পার্‌তো যে ওদের বিয়ে করা দরকার। তা যদি হ'তো—তা হ'লে, রাণীর বাপের যে প্রচুর পয়সা আছে, তা'তেও কিছু এসে-যেতো না। দু'জনের ইচ্ছের যে-বিয়ে, তা'র ওপর আর কোনো কথা চলে না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়—কী করে', রাণীকে যদি সে এখন বিয়ে করে, নিজের কাছেই তা'র মুখ থাক্‌বে? তা হ'লে, টাকার লোভেই সে বিয়ে করেছে, এ-ব্যাখ্যা কিছুতেই এড়ানো যাবে না। কেন রাণী তা'র মতই গরীব হ'লো না? রাণী যে বড়লোক, এ-ব্যাপারটা দেয়ালের মত তা'কে ঘিরে' রয়েছে; সত্যপ্রিয় একটু এগোতে গেলেই ধাক্কা লাগে।

বাস্-এ করে' অল্প একটু ঘুরে' সত্যপ্রিয় শীগ্‌গিরই বাড়ি ফিরে এলো। খাওয়ার পর বস্‌লো সেই গল্প শেষ কর্‌তে। গল্পের নায়িকার নাম তখনো দে'য়া হয় নি; নাম—রাণীই থাক্। রাণী! যতবার তা'কে কলম দিয়ে রাণী কথাটা লিখ্‌তে হ'লো, বুকের ভেতর অদ্ভুত এক আনন্দ অনুভব কর্‌লো। রাত প্রায় তিনটের সময় গল্প শেষ করে' সে শুতে গেলো। সারাটা ঘুম সে রাণীর কথা চিন্তা কর্‌লে; ঘুমের আড়ালে, স্বপ্নের আচ্ছাদনে বার-বার রাণীর কথা তা'র মনে পড়লো—কী চোখ, আর কী ভুরু!

পরের দিনও তা'র নেশার ঝোঁক সম্পূর্ণ কাট্‌লো না। নানা কাজের ফাঁকে থেকে-থেকে রাণীকে তা'র মনে পড়্‌তে লাগ্‌লো। রাণীকে সে তা'র স্ত্রী-রূপে কল্পনা করে' দেখছে; অবাধ্য, অসংলগ্ন মন তা'র বিবাহিত জীবনের ছবি আঁক্‌ছে। তা'র ছোট সংসারে আর একজন অংশী—একটি মেয়ে। একটি মেয়ে তা'র কথায়, হাসিতে, বেশে, সৌরভে, চুড়ির টুংটাং শব্দে—তা'র উষ্ণ উপস্থিতিতে সমস্ত বাড়ি আচ্ছন্ন করে' আছে। বাথরুমে ছপ্‌ছপ্ শব্দ হচ্ছে—সে স্নান কর্‌ছে, মাঝে-মাঝে গুন্‌গুন্ গান শোনা যাচ্ছে। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে কপালে সিঁদুর পর্‌ছে, অলসভাবে শুয়ে'-শুয়ে' সত্যপ্রিয় তা'কে লক্ষ্য কর্‌ছে—তা'র চলা-ফেরা, হাত-তোলা, চোখ তুলে' তাকানো' তা'র শরীরের প্রতিটি ছোট ভঙ্গী তা'র মুখস্থ হ'য়ে গেছে। সত্যপ্রিয় অনেক রাত অবধি জেগে লিখ্‌ছে, রাণী বিছানা থেকে উঠে এলো, নিদ্রা-জড়িত স্বরে বল্‌লে, 'আর নয়, এখন এসো, শোবে।' না হয়—কাজ শেষ করে' সে যখন শু'তে গেলো—তা'র পিঠ ব্যথা হ'য়ে গেছে, আঙুলগুলো টাটাচ্ছে, অন্ধকারে একখানা অতি-পরিচিত নরম হাত তা'র বুকে এসে লাগ্‌লো। সমস্ত দিন, সমস্ত রাত্রি সেই একটি মেয়ের উপস্থিতিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। ভাবতে বেশ লাগে।

কিন্তু নেশা ক্ষণিক; এমন কি, যৌবনের যে-নেশা, ভালোবাসার সম্ভাবনাতেই যা নিবিড় হ'য়ে ওঠে, তা-ও কেটে যায়। সত্যপ্রিয়র নেশাও আস্তে-আস্তে কেটে গেলো। সেই সন্ধ্যার পর তা'র চোখ আর রাণীর ওপর পড়ে নি; এমন কি, রাস্তা দিয়ে যেতে-আস্‌তে বারান্দায় তা'কে দাঁড়িয়ে থাকতেও আর ছাখে নি। কল্পনা নিয়ে বেশিদিন চলে না; মাটির আশ্রয় না পেলে কল্পনা শুকিয়ে যায়, মরে' যায়। শিগ্‌গিরই এমন সময় এলো, যখন রাণীর অস্তিত্ব সত্যপ্রিয় একরকম ভুলে'ই গেলো। তা'র কথা তা'র আর একবার মনে পড়লো, যেদিন সে শুনলো রাণীর বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে। ইউনিভার্সিটির এক ভীষণ নাম-করা ছাত্র, আগাগোড়া ফাস্ট হয়েছে, বি-ই-এস্-এ ঢুকেছে। তার বিলেত যাবার দরকার নেই—দশ হাজার টাকা নিচ্ছে। যাক্, ভালোই—বিপিনবাবু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, মেয়ের বিয়েতে এমন খরচ কর্‌বেন, যা সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। তাঁর সে-ইচ্ছা পূর্ণ হ'লো। তবু সত্যপ্রিয় একবার এ-কথা মনে না করে' পার্‌লে না যে অন্য-কোনো অবস্থায়—যদি তাঁদের অদৃষ্টের পথ অল্প একটু বেঁকে যেতো, যদি রাণীর সঙ্গে তা'র অন্য ভাবে, অন্য কোথায় পরিচয় হ'তো, তা হ'লে সে-ই হয়-তো রাণীকে বিয়ে কর্‌তো, ভালোবেসে, ইচ্ছে করে'ই কর্‌তো; এবং সে-বিয়েতে—তা'রা দু'জনেই হয়-তো সুখী হ'তো। সত্যপ্রিয় খানিকক্ষণ কথাটা ভাব্‌লে; তারপর কলম তুলে' নিয়ে আবার লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লো। তা'র বেশি সময় ছিলো না; তা'কে একটা উপন্যাস আরম্ভ কর্‌তে হয়েছে।

মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এম-আর-এ-এস

(২)

কলিকাতায় প্রত্যাগমন

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে রাজকৃষ্ণ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। শিক্ষাবিভাগে তখন এতদ্দেশবাসিগণের উন্নতির বেশী আশা ছিল না দেখিয়া তিনি হাইকোর্টে ওকালতীর সঙ্কল্প করিলেন। জুন মাসে তিনি এই উদ্দেশ্যে লাইসেন্স লন।

'বেঙ্গলী' সম্পাদন

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গলী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরলোক গমন করিলে 'বেঙ্গলী' পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ, ও তাঁহার বন্ধু কৈলাসচন্দ্র বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যাচার্য্য চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সদ্বিদ্বান ব্যক্তিগণের সাহায্যে উক্ত পত্রখানিকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। শ্রীনাথ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হন। কৈলাসচন্দ্র রাজস্ব বিভাগে অতি উচ্চ কর্ম্ম (এসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলার জেনারেলের সহকার্য্য) করিতেন। তারাপ্রসাদ ও চন্দ্রনাথ বাবুরও অবসর অধিক ছিল না। সুতরাং বেচারাম রাজকৃষ্ণকে 'বেঙ্গলী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। যদিও বেচারাম 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত ছিলেন, রাজকৃষ্ণই যথার্থ সম্পাদক ছিলেন। সার সুরেন্দ্রনাথ তদীয় আত্মচরিতে যদিও লিখিয়াছেন যে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন 'বেঙ্গলী' পত্র নিজ হস্তে গ্রহণ করেন, তখন বেচারাম উহার সম্পাদক ছিলেন; তিনিই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গলী'তে রাজকৃষ্ণের মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন "He was the Editor of this journal before we took charge of it; and it will be for the readers of the Bengalee to say with what conspicuous ability and with what rare and single-minded honesty of purpose, he discharged his editorial duties." "আমরা এই পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং "বেঙ্গলী"র পাঠকেরা অবগত আছেন কিরূপ অসাধারণ নিপুণতাসহকারে এবং কিরূপ অপূর্ব্ব ও একনিষ্ঠ সাধুতার সহিত তিনি তাঁহার সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।"

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও এই সময়ে তৎ-সম্পাদিত 'রেইস এণ্ড রায়ত' পত্রে লিখিয়াছেন "He was long the editor of the Bengalee" 'নেশন' সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অন্যান্য সংবাদপত্র সম্পাদকগণও তাঁহাকে 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সেকালে সংবাদপত্রের সাময়িক সন্দর্ভগুলিতেও সাহিত্যের উচ্চতম আদর্শ অনুসৃত হইত, এবং যদিও তখন 'বেঙ্গলী' পত্র সাপ্তাহিক ছিল, উহার সম্পাদনের জন্য রাজকৃষ্ণকে যথেষ্ট ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য দেশের ও সমাজের সেবার জন্যই তিনি এই গুরুভার দীর্ঘকাল বহন করিয়াছিলেন; কারণ, তখন সংবাদপত্র-সম্পাদন দ্বারা আর্থিক উন্নতি-লাভের কোনও আশা ছিল না। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বিনামূল্যে এই পত্র বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, কেবল দলীলটি আদালত-গ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত এটর্নি রমানাথ লাহা মহাশয় উহাতে দশ টাকা মাত্র মূল্য প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন।

"এডুকেশন গেজেট"

এই সময়ে রাজকৃষ্ণ ঋষিকল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' এবং অন্যান্য সাময়িক পত্রে

বাঙ্গালা কবিতাদি প্রকাশিত করেন। কিন্তু যে পত্রের সহিত তিনি দীর্ঘকাল লেখকরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহার বিষয় পরে বিবৃত হইতেছে।

"বঙ্গদর্শন"

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এই বৎসরেই বঙ্গবাণীর বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত 'বঙ্গদর্শন' পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ের কথায় লিখিয়াছেন :

"তখন বঙ্গসাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদের সেইরূপ, বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

"পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি; কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলে-বকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত। মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিক পত্র, কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

বঙ্গভাষায় সেই প্রথম যৌবনোন্মেষকালে যাঁহারা তাঁহার প্রসাধন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজকৃষ্ণের স্থান অতি উচ্চে। বহুতথ্যপূর্ণ, সারগর্ভ, চিন্তাশীল ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধে তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠাগুলি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত তদ্বিরচিত Literature of Bengal নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

"Raj Krishna Mukerjee and Chandra Nath Basu were among the most eminent of Bankim Chandra's collaborators, and have written much that is valuable and thoughtful. Raj Krishna was a man of accurate scholarship and learning, and his Prabandhas are marked by a spirit of honest research."

"রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতম সহযোগিগণের মধ্যে গণ্য। তাঁহারা অনেক মূল্যবান ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার প্রবন্ধসম্পদে সত্যান্বেষিণী গবেষণার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।"

কিন্তু চন্দ্রনাথ রাজকৃষ্ণের বহুদিন পরে 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথম যে চারি বৎসর 'বঙ্গদর্শন' বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত করিয়াছিলেন, তাহাতে চন্দ্রনাথের একটিও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। চন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিয়াছেন,

"যাহা লিখিতাম, ইংরাজীতেই লিখিতাম। 'বঙ্গদর্শন' পড়িতে ভাল লাগিত, ইচ্ছা হইত উহাতে লিখি : কিন্তু লিখিতে সাহস হইত না। তাহার পর বাঙ্গলায় মন গেল, এবং কলিকাতা রিভিউ নামক ত্রৈমাসিক ইংরাজী পত্রে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা পড়িয়া বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালা লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন বঙ্গদর্শন সঞ্জীব বাবুর হাতে। 'বঙ্গদর্শনে' অভিজ্ঞান শকুন্তলের আলোচনা লিখিতে আরম্ভ করিলাম।" বঙ্গদর্শনের সপ্তম বর্ষে চন্দ্রনাথের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'—সমালোচনা প্রকাশিত হয়। রাজকৃষ্ণ প্রথম বর্ষ হইতেই বঙ্গদর্শনের লেখক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

'বঙ্গদর্শনে'র অনুষ্ঠানপত্রে নিম্নলিখিত লেখকগণের নাম বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল :

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামদাস সেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হইতে পারে যে যাঁহার অসংখ্য প্রতিভাদীপ্ত প্রবন্ধাবলী বঙ্গদর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এবং উহার প্রভূত গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিল, সেই রাজকৃষ্ণের নাম প্রথমবারে বিজ্ঞাপিত হয় নাই। ইহার

কারণ এই যে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে যাইবার কয়েক মাসের মধ্যেই রাজকৃষ্ণ পাটনা কলেজে যান, এবং "বঙ্গদর্শনে"র আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালা প্রবন্ধকার বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু যখন তিনি "বঙ্গদর্শনে" একবার লেখকরূপে আবির্ভূত হইলেন তখন তিনি অনায়াসেই বঙ্কিমমণ্ডলে আপনার গৌরবময় আসন অধিকার করিয়া লইলেন। চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন: "আলিপুরে বদলী হইলে বঙ্কিম বাবু কলিকাতায় বাসা করিয়াছিলেন। তখন প্রত্যেক ছুটীর দিন বৈকালে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম। নানাশাস্ত্রজ্ঞ, গম্ভীর প্রকৃতি, বালকবৎ-সরলতা-শোভিত রাজকৃষ্ণকে বঙ্কিম বাবু যেমন ভালবাসিতেন, তেমনই ভক্তি করিতেন।"

প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিষ্টারে রাজকৃষ্ণকে 'বঙ্গদর্শনের' সহযোগী সম্পাদক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যদিও তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা নাই, 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদকের উপর যে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। এতৎ-সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত একটি ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতে পারে। ভারতমহিলার চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া ছাত্রাবস্থায় শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধ-পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়গণ কর্ত্তৃক মহারাজ হোলকার প্রদত্ত পুরস্কার পাইবার যোগ্য বিবেচিত হন। লেখকরূপে সুপরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র 'আর্য্যদর্শন'-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। কিন্তু প্রবন্ধলেখকের মতের সহিত তাঁহার মতানৈক্য থাকায় তিনি 'আর্য্যদর্শনে' উহা প্রকাশিত করিতে অসম্মত হইলেন। গুণগ্রাহী রাজকৃষ্ণ হরপ্রসাদকে স্নেহ করিতেন। তিনি বলিলেন "তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা 'বঙ্গদর্শনে' ছাপাইয়া দিতে পারি।" হরপ্রসাদ বলিলেন "'আর্য্যদর্শনে' যাহা লয় নাই, 'বঙ্গদর্শনে' তাহা লইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।" তিনি বলিলেন "সে ভাবনা তোমার নয়।" তাহার পর একদিন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমের সহিত হরপ্রসাদের পরিচয় করিয়া দিয়া রাজকৃষ্ণ উহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় বলিয়াছিলেন "নন্দের ভাই বাজালা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।" সম্পাদক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং 'খাদির নাদারত' ছিলেন তাহা সকলেই জানেন। রাজকৃষ্ণের বিচার-শক্তির উপর অচলা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই যে তাঁহাকে এক কথায় অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

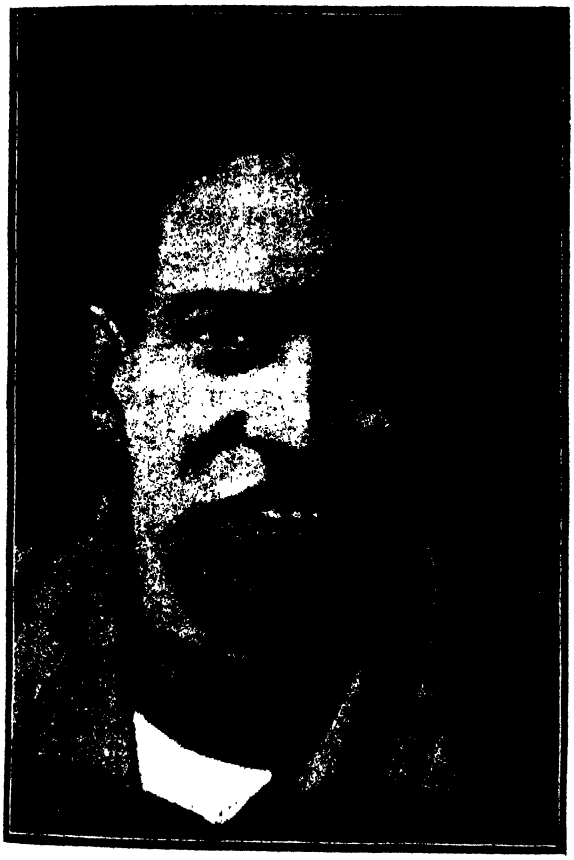
বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণের যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

১।	জ্ঞান ও নীতি	১২৭৯	আষাঢ় ও আশ্বিন
২।	ভাষার উৎপত্তি	"	চৈত্র
৩।	প্রতিভা	১২৮০	আষাঢ়
৪।	কার্য্যকারণ সম্বন্ধ	"	মাঘ
৫।	শ্রীহর্ষ	১২৮১	বৈশাখ
৬।	চার্ব্বাক দর্শন	"	শ্রাবণ ও কার্ত্তিক
৭।	ঐতিহাসিক ভ্রম	"	ভাদ্র
৮।	দেবতত্ত্ব (প্রথম প্রস্তাব)		আশ্বিন
৯।	কোম্‌ত দর্শন	"	পৌষ
১০।	ভারত-মহিমা	"	মাঘ
১১।	সমাজ বিজ্ঞান	"	ফাল্গুন
১২।	দেবতত্ত্ব (দ্বিতীয় প্রস্তাব)	১২৮২	বৈশাখ
১৩।	বিদ্যাপতি	"	জ্যৈষ্ঠ
১৪।	মনুষ্য ও বাহ্য জগৎ	"	আষাঢ়
১৫।	সভ্যতা	১২৮৪	আষাঢ়
১৬।	প্রাচীন ভারতবর্ষ	১২৮৫	শ্রাবণ

এতদ্ব্যতীত রাজকৃষ্ণের কতকগুলি অনবদ্য কবিতাও হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের হীরকের ন্যায় সমুজ্জ্বল কবিতানিচয়ের সহিত "বঙ্গদর্শন"কে দীপ্ত করিয়াছিল।

১। "জ্ঞান ও নীতি"। সুপ্রসিদ্ধ পুরাবৃত্তবিৎ বাক্‌ল্ "সভ্যতার ইতিহাস" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই মত সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে মনুষ্যের জ্ঞানের উন্নতি আছে, নীতির উন্নতি নাই। রাজকৃষ্ণ 'জ্ঞান ও নীতি' নামক প্রবন্ধে অনেক দেশের ও জাতির সামাজিক ইতিহাসের আলোচনা করিয়া প্রমাণিত করেন যে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কেবল জ্ঞানের নহে, নীতিরও উন্নতি হইয়াছে।

২। "ভাষার উৎপত্তি।" ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটী মত আছে, ১ম অপৌরুষেয়ত্ববাদ, ২য় সম্মতিবাদ, ৩য় অনুকৃতিবাদ। অপৌরুষেয়ত্ববাদীরা বলেন যে ভাষা মনুষ্যনির্ম্মিত নহে, ঈশ্বর প্রদত্ত। সম্মতিবাদীরা বলেন যে কতকগুলি লোক পূর্ব্বকালে একত্রিত হইয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিল যে এই পদার্থের এই এই নাম দেওয়া যাইবে। অনুকৃতিবাদীরা বলেন যে, কোন বস্তু হইতে যে প্রকার শব্দ নির্গত হয়, অথবা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আকস্মিক



পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

চিত্তাবেগে আমাদের মুখ হইতে স্বভাবতঃ যেরূপ স্বর নিঃসৃত হয়, সেইরূপ শব্দ বা স্বরের অনুকরণে ভাষার উৎপত্তি। রাজকৃষ্ণ তিনটী মত বিচার করিয়া শেষোক্ত মতের সমর্থন করেন। প্রবন্ধ-রচনাকালে অনুকৃতিবাদই প্রবল ছিল, কিন্তু পরে Sayce প্রভৃতি দেখাইয়াছেন উহা অসম্পূর্ণ এবং তদতিরিক্ত সমাজ-সম্মিলনে ভাষার আর একটী উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৩। "প্রতিভা।" এই প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ বলেন যে প্রতিভা যদিও স্বাভাবিক শক্তি, তথাপি উহা শিক্ষানিরপেক্ষ নহে। "যিনি যে প্রকার শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করুন না কেন, উপযোগী অবস্থায় পতিত না হইলে তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইতে পারে না। একটী সতেজ বৃক্ষও ছায়ায় প্রোথিত করিলে, তাহা সূর্য্য-কিরণাভাবে হতশ্রী ও নিস্তেজ হইয়া যায়। প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনাসমূহে সমাবৃত হইলে, স্বাভাবিক তেজস্বিতা অন্তর্হিত হয়। প্রতিকূল সংসর্গে



সি-এইচ-টনি

বিপদেরই সম্ভাবনা। * * প্রতিভার বিকাশ নিমিত্ত অনুকূল শিক্ষার প্রয়োজন।"

৪। "কার্য্যকারণ সম্বন্ধ"। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কি প্রকার এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ দার্শনিকদের মত কতদূর সত্য, তাহা এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হয়।

৫। "শ্রীহর্ষ"। ১২৭৯ সালের ফাল্গুন মাসের "বঙ্গদর্শনে" পুরাতত্ত্ববিৎ রামদাস সেন মহাশয় শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ

লিখেন। উহাতে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলীর রচয়িতা; এবং আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে যিনি চট্টোপাধ্যায়দিগের পূর্ব্বপুরুষ তিনিই নৈষধকার। রাজকৃষ্ণ কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন রামদাস বাবুর দুইটী সিদ্ধান্তেই ভ্রম আছে।

৬। "চার্ব্বাক দর্শন।" এই প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ সংক্ষেপে নাস্তিক দর্শনান্তর্গত চার্ব্বাক দর্শনের সমালোচনা করিয়াছেন।



ডাক্তার জেম্‌স্‌ ওগিল্‌ভি

৭। "ঐতিহাসিক ভ্রম।" প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই উহার উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে।—"অনেকের মনে তিনটি সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল আছে। প্রথমটী এই যে বাঙ্গালীরা কখনও বিদেশ বিজয় করে নাই; দ্বিতীয়টী এই যে, যেদিন বখ্‌তিয়ার খিলিজি সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে প্রবেশ করিলেন, সেই দিনেই সেন বংশের রাজত্ব বিলুপ্ত এবং সমুদায় বাঙ্গালাদেশ মুসলমানদিগের পদানত হইল; তৃতীয়টী এই যে, মুসলমান ভূপালদিগের সময়ে যে ক্ষমতাপন্ন জমীদারদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহারা করসংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারী ছিল মাত্র। আমরা প্রমাণ করিব যে, এ তিনটী সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক।" বলা বাহুল্য, যে সকল যুক্তি দ্বারা রাজকৃষ্ণ তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত করিয়াছেন তাহা ইউক্লিডের প্রতিজ্ঞা পূরণে অবলম্বিত যুক্তির ন্যায় অকাট্য।

৮ ও ১২। "দেবতত্ত্ব।" কিরূপে হিন্দু দেবদেবীর উৎপত্তি হইল তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গবেষণায় পরিপূর্ণ এই প্রস্তাবটী দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে।

৯। "কোম্‌ত দর্শন।" হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ স্যামুয়েল লব্‌, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের উৎসাহে তাঁহার পত্রে সর্ব্বপ্রথম ফরাসী দার্শনিক অগস্ত কোম্‌তের 'ধ্রুবদর্শন'-এর আলোচনা আরম্ভ করেন। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মনস্বীগণ শীঘ্রই কোম্‌তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বাঙ্গালার কৃতবিদ্য সমাজে কোম্‌ত-দর্শন লইয়া মহা আন্দোলন আরম্ভ হয়। রাজকৃষ্ণ এই প্রবন্ধে সরলভাবে কোম্‌তের প্রধান প্রধান মতগুলির পর্য্যালোচনা করেন।

১০। "ভারতমহিমা।" ভূমণ্ডলের উন্নতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। যে বিজ্ঞান লইয়াই বর্ত্তমান সভ্য জাতির গৌরব, সেই বিজ্ঞানের মূল গণিত শাস্ত্র ভারতবর্ষেই উৎপন্ন। নয়টী অঙ্ক এবং শূন্যের সাহায্যে সমুদায় সংখ্যা লিখিবার রীতি, পাটীগণিতের দশগুণোত্তর সংখ্যালিখন-প্রণালী, বীজগণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি হিন্দুরাই আবিষ্কৃত করেন। রসায়ন, চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূলও ভারতবর্ষে। যে প্রখর প্রতিভা হইতে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়ন সমুদ্ভূত, তাহারই গুণে একটী নূতন বর্ণমালারও সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে ৩টী বর্ণমালা আছে,—চীনদেশীয়, ফিনিসীয় এবং ভারতবর্ষীয়। কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ এইরূপ উচ্চারণ স্থানভেদে বর্ণোৎপত্তি কল্পিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় বর্ণমালাটী যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত অন্য দুইটী তদ্রূপ নহে। বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাপুরুষের জন্ম দিয়া ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে ভারতবর্ষ মনুষ্য সমাজের মহদুপকার করিয়া-

ছেন। ভারতবাসীরা সিংহল, যব ও বালিদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং অর্ণবপোতে মুক্তা, দারুচিনি, এলাচ, কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রাদি পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। প্রবন্ধের উপসংহারে রাজকৃষ্ণ তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বলেন : "ভারতবর্ষ বহুকাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ সভ্য জনপদের কার্পাস ও রেশমী কাপড় যোগাইতেন। ইংরেজদিগের লিখিত গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় যে একশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ঘরে ঘরে চরকা ঘুরিত এবং গ্রামে গ্রামে বস্ত্র ব্যবসায়ী লোক ছিল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। আমরা পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও ইংরেজ-



পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

দিগের মুখ চাহিয়া থাকি। ম্যানচেষ্টরের কলের কাপড়ই এখন আমাদিগের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। সকল বিষয়েই এইরূপ। যে দেশে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়নের সৃষ্টি, সেই দেশের লোকেরাই এখন বিদেশী বিজ্ঞানের ছিটাফোটা পাইয়াই আপনাদিগের জন্ম সার্থক জ্ঞান করেন। যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, সেই দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সামান্য বিলাতী লেখকদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে গুরু বলিতে লজ্জিত হন না। আর কতকাল এইরূপ চলিবে? হে ভারত সন্তানগণ, ভারতের পূর্ব্ব মহিমা স্মরণ পূর্ব্বক সকলে একবার আপনাদিগের দুরবস্থা মোচনের চেষ্টা কর। তোমরা কি ছিলে এবং কি হইয়াছ, ভাবিয়া কি দেখিয়াছ?"

১১। "সমাজবিজ্ঞান।" এই প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ বলেন "যদি জ্ঞানোন্নতিই সকল উন্নতির মূল হয়, তাহা হইলে জ্ঞানোন্নতির নিয়মই সামাজিক উন্নতির প্রধান নিয়ম হইবে, এবং যে সকল কারণে জ্ঞানোন্নতির সাহায্য করে, সেইগুলি সামাজিক উন্নতিরও সহায় হইবে।"

১৩। "বিদ্যাপতি।" বঙ্গভাষার প্রথম ইতিহাস



তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

লেখক মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" রচয়িতা রামগতি ন্যায়রত্ন, মিঃ জন বীম্‌স প্রভৃতি অনেকেই বিদ্যাপতির জন্মস্থান ও আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ভুল করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ এই বহুগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে প্রমাণিত করেন যে বিদ্যাপতি মৈথিল কবি ছিলেন এবং লক্ষ্মণাব্দের কাল স্থির করিয়া বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল নিরূপিত করেন। বীম্‌স সাহেব Indian Antiquary নামক প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক পত্রে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে

যে ভুল তথ্যের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধ পাঠের পর তিনিই উক্ত পত্রের ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর সংখ্যায় ভুল বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন * :

"It has been usual to speak of this poet as the earliest writer of Bengal and as his language is decidedly Hindi in type, the opinion has been held by myself and others that the Bengali language had at that time not fully developed itself out of Hindi.

This view is very distasteful to Bengalis.



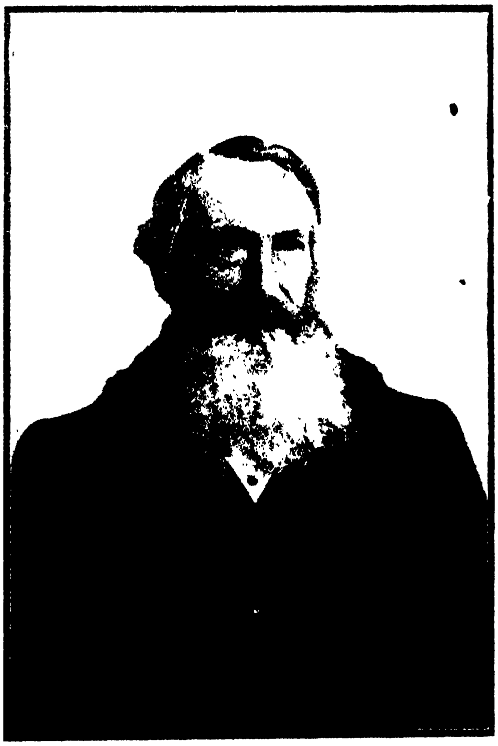
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

who are proud of their language and wish to vindicate for it an independent origin from some local form of Prakrit. They have apparently set to work to search out the age and country of Bidyapati, so as to show whether he was really a Bengali or not.

A very able article has appeared on the subject in the last number of that excellent Bengali magazine the Banga Darsana (no. 2, pt. IV for Joistho 1282, say June 1875). It leaves something to be desired in the shape of clearer indication of the authorities on which the statements are founded and there are some points on which I still feel unsatisfied, but the *main conclusions are*, I think, *unassailable.*

* * * *

One point however I was wrong about and must now abandon. From the expression in Padakalpataru 1317 "pancha Gaurisvara" I



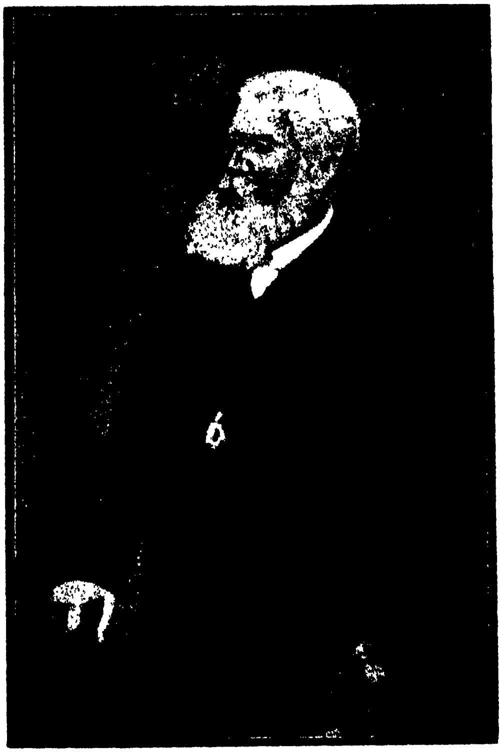
স্যর জন বাড্‌ ফিয়ার

and the pandits whom I consulted were led to suppose that the poet resided at Nadiya. ** The conclusion as to the poet's country being Nadiya did not even then seem to us to harmonize with his language.

To solve this question the writer in the Banga-Darsana starts by observing that Bidyapati's contemporary Chandidas writes Bengali and this explodes the theory that Bengali was in that age unformed and closely resembling

* On the Age and Country of Bidyapati By John Beames, B. C. S.

rustic Hindi. After discussing this point he goes on to show, from the celebrated meeting of the two poets that Bidyapati's home must have been in some place not very far from Birbhumy and he has been led by this argument to seek for it in the nearest Hindi speaking province; for if Chandidas being a Bengali wrote Krishna hymns in his mother tongue, it is a fair inference that Bidyapati would also use his mother tongue and as the language he uses is Maithile Hindi, the conclusion is that he was a native of Mithila. * * *



ডাক্তার এফ-জে-মোয়াট

By a happy inspiration he appears to have thought of consulting some learned men of the province of Mithila, which was nearly co-extensive with the modern district of Trihut, occupying the country between the Ganges to the Himalayas and extending on the west as far as the Gandak river and on the east quite up to, if not beyond, the old bed of the Kusi river in Purneah. * * *

As the result of his researches he found that Bidyapati is still well-know in Trihut, and has left some lyrics which are still sung by the people and are in Maithile.

"সচরাচর এই কবি বাঙ্গলার অন্ততম প্রথম কবি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন, এবং যেহেতু তাঁহার ভাষা নিঃসন্দেহ হিন্দী ছাচের, আমি এবং অন্যান্য কোন কোন ব্যক্তির এই অভিমত ছিল যে তখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা হিন্দী হইতে আপনার বৈশিষ্ট্য লইয়া সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

"বাঙ্গালীর নিকট এ অভিমত রুচিকর হয় নাই। তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষার জন্য গর্ব্বিত, এবং উহা যে কোনও স্থানীয় প্রাকৃত ভাষা হইতে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট



ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হইয়াছে ইহা প্রমাণ করিতে উৎসুক। ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে তাঁহারা বিদ্যাপতির দেশ ও কাল নির্ণয় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং তিনি যথার্থ বাঙ্গালী ছিলেন কি:না তাহা স্থির করিতে চাহেন।

"বঙ্গদর্শন' নামক উপাদেয় বাঙ্গালা মাসিকপত্রের শেষ সংখ্যায় (২য় সংখ্যা ৪র্থ খণ্ড জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ অর্থাৎ জুন ১৮৭৫) এই বিষয়ে একটি অতি সারগর্ভ সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে কোন কোন সিদ্ধান্তের মূলে যে সকল প্রমাণ আছে তৎসম্বন্ধে স্থানে স্থানে আরও একটু স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকিলে

হইত এবং যদিও কোনও কোনও বিষয়ে আমি ও সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই, তথাপি মূল সিদ্ধান্ত- আমার বিবেচনায়, অধৃষ্য।

* * * *

একটি সিদ্ধান্তে আমার ভ্রম হইয়াছিল, তাহা আমাকে র করিতে হইবে। পদকল্পতরুতে উল্লিখিত 'পঞ্চ শ্বর' শব্দ হইতে আমি (ও আমার পরামর্শদাতা গণ) মনে করিয়াছিলাম যে কবি 'নদীয়া'য় বাস তেন। * * * অবশ্য তখনও নদীয়ায় কবির ান এবং তাঁহার ভাষার সহিত অসামঞ্জস্য লক্ষ্য াছিলাম।



গঙ্গাচরণ সরকার

এই প্রশ্নের সমাধানারম্ভে বঙ্গদর্শনের লেখক প্রথমেই করিয়াছেন যে বিদ্যাপতির সমসাময়িক চণ্ডীদাস া ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন; ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে বাঙ্গালাভাষা যে তৎকালে বিকশিত হইয়া উঠে নাই এবং উহা গ্রাম্য হিন্দীর ল এই মত ভ্রান্তিমূলক। এই বিষয়ের আলোচনা। তিনি কবিদ্বয়ের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্মেলন হইতে দেখাইয়াছেন যে বিদ্যাপতি বীরভূমের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে অবস্থান করিতেন এবং এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া বীরভূমির নিকটতম কোন প্রদেশে হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহার সন্ধান করিয়াছেন; কারণ যদি চণ্ডীদাস কৃষ্ণগীতি বাঙ্গালায় লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক যে বিদ্যাপতিও তাঁহার মাতৃভাষায় রচনা করিয়া থাকিবেন এবং যেহেতু বিদ্যাপতির ভাষা মৈথিল হিন্দী, তিনি যে মিথিলার অধিবাসী এরূপ সিদ্ধান্তও ঠিক। * *

"শুভক্ষণে মিথিলাপ্রদেশে কতিপয় পণ্ডিতের সহিত তিনি পরামর্শ করেন। মিথিলা এখনকার ত্রিহুত জেলায় সমবিস্তৃত ছিল (অর্থাৎ উহা গঙ্গা ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী



মনোমোহন ঘোষ

প্রদেশটুকু— যাহার পশ্চিমে গণ্ডক নদী এবং পূর্ব্বে পুরাতন কুশী নদী)।

"তাঁহার গবেষণার ফলে তিনি অবগত হইয়াছেন যে বিদ্যাপতি এখনও ত্রিহুতে সুপরিচিত কবি এবং মৈথিল ভাষায় লিখিত তাঁহার কতকগুলি গীতিকবিতা এখনও তত্রত্য অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে।"

বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও রাজকৃষ্ণ তাঁহাকে বাঙ্গালি কবিগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি লিখিয়াছেন "বল্লাল সেন বাঙ্গালা দেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত

করেন, তন্মধ্যে মিথিলা এক ভাগ।" রাজকৃষ্ণের এই আবিষ্ক্রিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নূতন আলোকপাত করিয়াছিল। বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্যতম সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এক স্থানে লিখিয়াছেন * :

"১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে স্বর্গগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে বিদ্যাপতির প্রকৃত ইতিহাস নির্ণয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। তৎপূর্ব্বে এই কবির সম্বন্ধে লোকে যাহা জানিত, তাহা লোক-প্রবাদ মাত্র। প্রকৃত কথা কেহ জানিত না, জানিবার তেমন



জন এলিয়ট্ ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন

কোন প্রয়াসও হয় নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অসামান্য মৌলিক গবেষণা দ্বারা কবির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করিলেন।"

রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বিদ্যাপতির পদাবলীর আলোচনায় কিরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ পুনশ্চ লিখিয়াছেন :

"রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' সঙ্কলনে ব্রতী হইলেন। বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলন ও টীকা প্রভৃতির ভার সারদাবাবু লইলেন, অবশিষ্ট গ্রন্থসমূহ অক্ষয়বাবু সম্পাদন করেন। পরে বিদ্যাপতির পদাবলী সারদাবাবু স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। * * * সারদাবাবু মেধাবী, সহপাঠীদিগের অগ্রণী, কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ যশস্বী হইয়া এক্ষণে উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। একদিকে রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য, বহু শাস্ত্রবিশারদ, চিন্তাশীল, মনীষী লেখকের আবিষ্কার, অপর দিকে সদ্য পরীক্ষোত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়-ভূষণ ছাত্রের উৎসাহপূর্ণ আগ্রহ—শিক্ষিত সমাজে বিদ্যাপতির আদর হইবার উপক্রম হইল। এতকাল এই মৈথিল কবি ভিক্ষুক বৈষ্ণবের কণ্ঠে ও কন্থায় আশ্রয়



কৈলাসচন্দ্র বসু

লইয়াছিলেন, বটতলায় জীর্ণ মলিন বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, এতদিনে তাঁহার ভদ্রবেশে ভদ্রসমাজে স্থান হইল।"

১৪। "মনুষ্য ও বাহ্য জগৎ।" মানুষ, পূজা করা দূরে থাকুক, অগ্নি, বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে। কালে বোধ হয় প্রাকৃতিক শক্তি পরম্পরা এতদূর মনুষ্যের আজ্ঞাধীন হইবে যে তাহা কবিরাও কখন কল্পনা করিতে সাহস করেন নাই।

১৫। "সভ্যতা।" বাঙ্গালার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৯শে এপ্রিল বেথুন

* বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়)—১৩১১

সভায় "বাঙ্গালী সমাজের উপর ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহার এক স্থানে তিনি বলেন্—

"It is curious to reflect that the most learned works on European literature and science should be studied and appreciated by the student who sits on a mat, eats with his fingers, does not think it necessary to cover his body, and reads under the light of the primitive lamp."

অর্থাৎ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমরা ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বুঝিতে শিখিয়াছি, অথচ মাদুরে বসি,



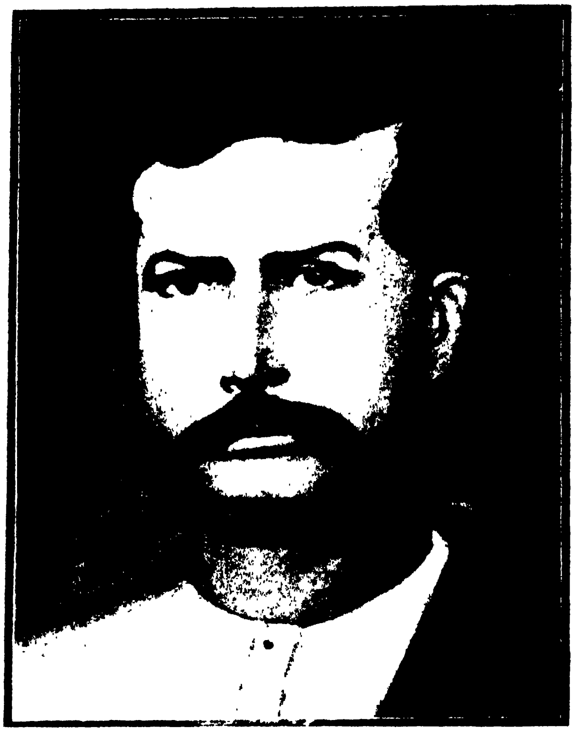
শ্রীনাথ ঘোষ

হাত দিয়া আহার করি, সর্ব্বদা গায়ে বস্ত্র রাখি না, ও মৃন্ময় দীপের আলোকে লেখাপড়া করি।

মনোমোহনের বক্তৃতাটী সভায় একটু আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। এমন কি একজন পাদ্রী রেভারেণ্ড সি, এম্, গ্রাণ্ট বলেন যে বক্তা য়ুরোপীয় সভ্যতার যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কিছু অতিরঞ্জিত। য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত কল্যাণকর নয়, উহার অনেক দোষ আছে। এতদ্দেশবাসিগণ জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া য়ুরোপীয়ের অনুকরণে তাঁহাদের ও স্ত্রীদিগের চরিত্র গঠিত করিলে সমাজের মঙ্গল হইবে না। রাজকৃষ্ণ এই প্রবন্ধে সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিবার যোগ্য।

১৬। "প্রাচীন ভারতবর্ষ।" মেগাস্থিনিসের বিবরণ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা এই প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ বিবৃত করেন।

রাজকৃষ্ণের সকল প্রবন্ধই তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। তিনি যাহা লিখিতেন তাহার সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করিতেন। প্রবন্ধের পাদটীকায় পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ



সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণের মতের উল্লেখ করিবার প্রথা 'বঙ্গদর্শনে' রাজকৃষ্ণই প্রবর্ত্তিত করেন। এতৎসম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য্য চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নিকট বিবৃত স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:

"এককালে আমাদের লেখকদিগের মধ্যে পাদটীকায় পুস্তকের নামোল্লেখ—authority quote করা রোগের অত্যন্ত প্রাবল্য ঘটিয়াছিল। এখনও সে রোগ একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। আবার এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁহারা যে মূল পুস্তক দেখেন নাই—অন্যত্র তাহাতে

প্রকাশিত মতের উল্লেখমাত্র দেখিয়া পাদটীকায় মূল পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়া বিদ্যাবাহুল্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাঙ্গালায় ইহার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে।' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই প্রথম সপ্রমাণ করেন, বিদ্যাপতি মৈথিল কবি ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবি বলিয়াই জানিত। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য জ্ঞান ও নীতিবিষয়ক সন্দর্ভ (প্রথম বর্ষ) লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে দিলে তিনি উহা পাঠ করিয়া বলিলেন, 'এই প্রবন্ধে যে সব মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সমর্থন করিয়া authority quote করিলে তবে এ প্রবন্ধ ছাপান যায়।' রাজকৃষ্ণ বাবু তাহাই করিলেন—প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি স্বীয় মন্তব্যের সমর্থনে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ লেখকদিগের মতের উল্লেখ করিলেন। সেই সময় হইতে বাঙ্গালা রচনার পাদটীকায় এইরূপ নামোল্লেখ আরব্ধ হইল। আর এই প্রথার যে যথেষ্ট অপব্যবহার হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।"

"বঙ্গদর্শনে" রাজকৃষ্ণ যে ষোলটি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চৌদ্দটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত প্রথম চারি বৎসরের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি 'বঙ্গদর্শনে'র প্রতিষ্ঠা কতদূর বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল তাহা এক্ষণে বাঙ্গালী পাঠকগণ বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছেন। চারি বৎসর সম্পাদনের পর যখন বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রচার বন্ধ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"তৎপরে, যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমায় অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।"

"প্রথম-শিক্ষা বীজগণিত"

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজকৃষ্ণ কেবল 'বেঙ্গলী'তে রাজনীতির আলোচনা এবং 'বঙ্গদর্শনে' কবিতা, ইতিহাস, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। এই সময়ের মধ্যে নানা বিষয়ক কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থও প্রকাশিত করিয়া মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সকল শাস্ত্রেই সমান পারদর্শী ছিলেন। কয়েক বৎসর দর্শন ও ব্যবহার-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিবার পর 'বীজগণিত' সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রকাশ ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণের 'প্রথম-শিক্ষা বীজগণিত' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' এই পুস্তকের সমালোচন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"ইংরাজী হইতে নূতন একটি শাস্ত্র বাঙ্গালায় সঙ্কলিত করা কত বড় কঠিন কাজ, তাহা যাঁহারা এমন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। বীজগণিত সঙ্কলন, বোধ হয়, অন্যান্য বিষয়াপেক্ষাও কঠিন। এই দুরূহ ব্যাপারে রাজকৃষ্ণবাবু যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এমত বিষয়ে এতাদৃশ কার্য্য সিদ্ধি রাজকৃষ্ণ বাবুর বুদ্ধিপ্রখরতার বিশেষ পরিচয়। রাজকৃষ্ণ বাবু সুকবি, উত্তম আখ্যায়িকার প্রণেতা, সুযোগ্য দার্শনিক, রাজব্যবস্থার অধ্যাপনায় প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত —এ সকল বিষয়ের পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের দ্বারা গণিতশাস্ত্রেও তাঁহার যে বিশেষ অধিকার আছে, তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। এরূপ সর্ব্বব্যাপিনী বুদ্ধি অতি বিরল। এই গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ে ব্যবহার হইবার বিশেষ উপযোগী।"

রাজকৃষ্ণের এই গ্রন্থ এবং "পরিমিতি" নামক আর একখানি গণিত-বিষয়ক গ্রন্থ বহুদিন বাঙ্গালার বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

"মানস বিকাশ"

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণের "মানস বিকাশ" নামক একটি অভিনব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ২য় বর্ষের বঙ্গদর্শনে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধে উহার সমালোচনা করেন। উক্ত সমালোচনা হইতে আমরা অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ। বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি—জয়দেব—গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ; কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য-প্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তৎপরে কতকগুলি 'কবিওয়ালার' প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরুঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীতি এমত সুন্দর আছে, যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই। আধুনিক কবিদিগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একজন অত্যুৎকৃষ্ট। হেমবাবুর গীতি-কাব্যের মধ্যে এমত অংশ অনেক আছে, যে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় তুলনা-রহিত। অবকাশ-রঞ্জিনীর কবি, আর একজন উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য-প্রণেতা। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত কাব্য-নিচয়ের মধ্যে এক একখানি অতি সুন্দর গীতিকাব্য পাওয়া যায়। সম্প্রতি "মানস-বিকাশ" নামে যে কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তৎসম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে।

* * * *

"বঙ্গীয় গীতিকাব্য লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর একদল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য হৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। একদল মানব হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য-প্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন; আর একদল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্য-চরিত্র খনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্যাপতি।

* * * *

আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্য লেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরেজি গীত কবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরেজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতাবৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব্ব কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্ত্তী যাহা তাহা চিনিতেন, যাহা আভ্যন্তরিক, বা নিকটস্থ তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অনুকরণীয় চিত্রসকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাস-বেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িনী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও বহুবিষয়িনী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূর সম্বন্ধ গ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূর সম্বন্ধ প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতায় বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতায় বিষয় বিস্তৃত, বা বিচিত্র, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব শক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণকূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না। 'মানস বিকাশ' এই কথা প্রমাণ করিতেছে। আমরা 'মানস বিকাশ' পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি—'মিলন' ও 'কাল' নামক দুইটি কবিতা উৎকৃষ্ট। 'কাল' হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

সহসা যখন বিধির আদেশে,
সুধাংশু কিরণ শোভি নভোদেশে,
রজত ছটায় ধাইল হরষে, ভুবনময়,
নরনারী কীট পতঙ্গ সহিত
বসুন্ধরা যবে হইল সৃজিত
গ্রহ উপগ্রহ হইল শোভিত হলো উদয়
তখন ত কাল প্রচণ্ড শাসনে,
রাখিতে সকলে আপন অধীনে সব সময়॥

দুরন্ত দংশন কাল রে তোমার
তব হাতে কারো নাহিক নিস্তার,
ছোট বড় তুমি কর না বিচার, বধ সকলে,
রাজেন্দ্র মুকুট করিয়া হরণ,
দুঃখনীরে তুমি কর নিমগন
পদযুগে পরে কর রে দলন, আপন বলে,
সুখের আগারে বিষাদ আনিয়া,
কত শত নরে যাও ভাসাইয়া, নয়ন জলে।

*　　*　　*　　*

'মানস বিকাশে'র কবিতার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা 'মিলন', কিন্তু তাহার অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে তাহার উৎকর্ষ অনুভূত করা যায় না।

*　　*　　*　　*

'মানস বিকাশ' অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য নহে—অনুৎকৃষ্টও নহে। অনেক স্থলেই নবীনত্বের অভাব—অনেক স্থানে তাহার অভাব নাই। কবির বাক্‌শক্তি, এবং পদবিন্যাস শক্তি প্রশংসনীয়। "মিলন" নামক কাব্যের প্রথমাংশ এমন সুন্দর, যে তাহা হেমবাবুর যোগ্য বলা যায়; কিন্তু শেষাংশ তত ভাল নহে। ফলে এই কবি বিশেষ আদরের যোগ্য সন্দেহ নাই।"

কটকের ব্যবস্থা-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদ গ্রহণ ও ত্যাগ

বোধ হয় এই সময়ে রাজকৃষ্ণ আর একবার কটকে ব্যবস্থা শাস্ত্রের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি তিনি অধ্যাপক পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন এইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। *

* আষাঢ় মাসের এই প্রবন্ধে একটা ভুল হইয়াছে, ২৪ পৃষ্ঠায় সার ষ্টুয়ার্ট বেলির প্রতিকৃতির নিম্নে ভ্রমক্রমে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের নাম এবং ২৮ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণদাস পালের প্রতিকৃতির নিম্নে রামগোপাল ঘোষ মুদ্রিত হইয়াছে।

দেওয়ান রামকমল সেন

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

গৌরিফার সেনবংশ ধনে মানে বংশমর্য্যাদায় বিদ্যাবত্তায় বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ। এই বংশীয়েরা বলেন, তাঁহারা বল্লাল সেনের বংশধর। দেওয়ান রামকমল সেন ছিলেন এই বংশের অলঙ্কার।

গৌরিফা ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম, ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত। এখান হইতে সেন বংশের এক শাখা কলিকাতা, কলুটোলায় আসিয়া বাস করেন।

রামকমলের পিতার নাম গোকুলচন্দ্র। সন ১১৮৯ সালের চৈত্র মাসে (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ) রামকমলের জন্ম হয়। রামকমল পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠের নাম ছিল মদন এবং কনিষ্ঠের নাম রামধন।

রামকমলের পিতা পারস্য ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি হুগলীর সেরিস্তাদার ছিলেন এবং মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেন। রামকমল প্রথমে এক শিরোমণি উপাধিক বৈদ্যের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন।

কলিকাতায় তখন সবেমাত্র ইংরেজী শিক্ষার গোড়াপত্তন হইতেছে। Yes, no, very well বলিতে পারিলে, বাকীটা আকারে-ইঙ্গিতে সারিয়া একরকম করিয়া কাজ চলিয়া যাইত। এই উপায়েই তখন অনেকে কলিকাতায় চাকুরী এবং ব্যবসা করিয়া প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতেন। পূর্ব্বে লোকে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইবে বলিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষা করিত। এখন ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিলে অর্থোপার্জ্জন করা যায় দেখিয়া ইংরেজী শিখিবার জন্য লোকের মনে আগ্রহ জন্মিতে লাগিল। তাহার ফলে দুই একটি করিয়া ইস্কুলও প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে কলুটোলা অঞ্চলে রামজয় দত্তের একটি ইস্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। অনুমান ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামকমল কলিকাতায় আসিয়া এই ইস্কুলে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন। রামকমল বলেন, এই ইস্কুলে তখন "তুতিনামা" এবং "আরব্য উপন্যাস" এই দুইখানি ইংরেজী বই ক্লাসে

পড়া হইত, বালকরা ইহা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ইংরেজী শিখিত। অভিধান কিম্বা ব্যাকরণ পড়িবার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

এখন যেখানে কলুটোলা ষ্ট্রীট, রামকমল সেইখানে একখানি ছোট বাড়ী ক্রয় করেন। পরে এই বাড়ী বিক্রয় করিয়া মাধবচন্দ্র সেন পূর্ব্বে যে বাড়ীতে বাস করিতেন, কলুটোলার সেই বাড়ীখানি ক্রয় করেন।

ইংরেজী ও বাঙ্গলা ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের অভাববশতঃ এবং কতকটা দারিদ্র্যের জন্তও বটে, ইস্কুলে রামকমলের শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে Mr. Namey নামক এক ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকের নিকট তিনি কর্ম্ম করিতেছিলেন। Mr. Namey কলিকাতার তৎকালীন প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্ল্যাকোয়ারের সহকারী ছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার বিবাহ হয়। ঐ বৎসরই তাঁহার পিতা তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের সিবিল স্থপতি মিঃ আর, ব্রেকিনডেনের নিকট আনিয়া শিক্ষানবীশীতে নিযুক্ত করিয়া দেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রামকমল মাসিক ৮ টাকা বেতনে হিন্দুস্থানী প্রেসে একটি কম্পোজিটরের চাকুরী পান। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় তিনি চাঁদনী হাসপাতালে চাকুরী করিতেছেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কর্ণেল রামজের অধীনে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

হিন্দুস্থানী প্রেসে কর্ম্ম করিবার সময় তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় ও সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞতা দর্শনে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ডাক্তার এইচ, এইচ, উইলসনের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। সেই সূত্রে রামকমল ১৮১৮-১৯ সালে মাসিক ১২ টাকা বেতনে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির আপিসে একটি কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এখানে তিনি এমন সন্তোষজনক ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন যে, পরে তিনি ঐ সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক, এবং তাহার পর উহার কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করেন।

দারিদ্র্যবশতঃ ১৭।১৮ বৎসর মাত্র বয়সে আরব্ধ শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিয়া উদরান্নের সংস্থানের জন্ত রামকমল অর্থ উপার্জ্জনে নিযুক্ত হইতে বাধ্য হন বটে, কিন্তু যে জ্ঞানার্জ্জনের প্রবল স্পৃহা লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সেই অতৃপ্ত স্পৃহার পরিতৃপ্তির জন্ত তিনি একদিনের জন্তও জ্ঞানার্জ্জনে বিরত হন নাই। যখনই যে কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকুন না কেন, অবসর কালটুকু তিনি অধ্যয়নে ও আত্মোন্নতি সাধনে কাটাইয়া দিতেন। এইরূপে নিজের চেষ্টায় তিনি প্রচুর জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এইরূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এবং প্রাচীন বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছিল। বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রগুণে তিনি তৎকালীন ইংরেজ-সমাজে এবং রাজকর্ম্মচারী মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

এ দিকে বৈষয়িক কর্ম্মেও তাঁহার ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল। ৮ টাকা বেতনে কম্পোজিটর রূপে তিনি জীবন আরম্ভ করিযাছিলেন; ক্রমে তিনি (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতার টাঁকশালের দেওয়ান হইলেন। সেখানেও তিনি কর্ম্মদক্ষতার এমন পরিচয় দিলেন যে দুই বৎসর পরে তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী লাভ করিলেন। এই পদের বেতন মাসিক দুই হাজার টাকা।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে তিনি ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ জর্জ্জ উদনীর (Mr. George Udny) দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু এক সময়ে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। এই ঘটনা বিচারার্থ ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টারগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়। বিচার ফলে রামকমল সসম্মানে জয়লাভ করেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তিনি ডাইরেক্টার-গণের অধিকতর বিশ্বাসভাজন হন। অবশেষে ডাইরেক্টাররা রামকমলের পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্ত প্রায়ই তাঁহাকে তাঁহাদের পরামর্শ-সভায় আহ্বান করিতেন।

সামান্য অবস্থা হইতে অর্থ, প্রতিপত্তি ও পদ-মর্য্যাদার অধিকারী হইলে অনেককেই আত্মহারা হইয়া পড়িতে দেখা যায়। কিন্তু রামকমলের ক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। চিরজীবন তিনি পরিশ্রমী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, নিরহঙ্কার ছিলেন। ধনীজনোচিত বিলাসিতা, ধনগর্ব্ব তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। দরিদ্র অবস্থায় যেরূপ সামান্য অশন বসন জুটিত, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও তিনি সেই সাবেকী সরল সামান্য চাল বজায় রাখিয়াছিলেন। সেকালে ইংরেজী উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিলেন; রামকমল

সেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রশ্রয় কখনই দেন নাই। স্বধর্ম্মে তিনি চিরদিন আস্থাবান ছিলেন—ইংরেজী শিখিয়া হিন্দু-ধর্ম্মে আস্থা হারান নাই। প্রাচীন কালের হিন্দুজনোচিত আচার অনুষ্ঠান তিনি পালন করিতেন। পরিণত বয়সে নিষ্ঠাবান হিন্দুরা যেমন স্বপাক অন্ন আহার করেন, তিনিও তাহাই করিতেন। আহার-বিহারে সংযম হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তর্গত; রামকমলও সেইরূপ সংযত-চরিত্র ছিলেন।

রামকমল কেবল আত্মোন্নতি সাধন করিয়াই নিরস্ত হন নাই। সাধারণের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কর্ম্মে যোগদান করিতেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারী হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরই কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি গঠিত হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লোক শিক্ষার্থ সাধারণ সমিতি (General Committee of Public Instruction) প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইবার অব্যবহিত পরেই উহার ম্যানেজিং বডি বা পরিচালক-সঙ্ঘের সদস্যরূপে উহার সহিত রামকমলের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা উপলক্ষে মিঃ কার লিখিয়াছেন যে, হিন্দু কলেজ স্থাপনে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন, রামকমল সেন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। আবার যখন মিঃ ডিরোজিওর শিক্ষা প্রভাবে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল, তখন যাঁহারা ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ হইতে অপসারিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, রামকমল সেনও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে রামকমল কাউন্সিল অব এডুকেশনের সদস্য ছিলেন। স্কুল বুক সোসাইটিরও তিনি গোড়া হইতেই সদস্য হন। স্কুল বুক সোসাইটির কমিটির সদস্য থাকা কালেই সম্ভবতঃ ইংরেজী বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলনের কল্পনা তাঁহার মনে উদয় হয়। Agricultural and Horticultural Society of India [স্থাপিত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি তাহার সদস্য হন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এই সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ও কলেক্টরের কার্য্য করিতেছিলেন দেখা যায়। তদ্ব্যতীত ইহাও জানা যায় যে তিনি সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক, চ্যারিটেবল সোসাইটির সদস্য, চাঁদনী হাস-পাতালের সদস্য এবং আরও অন্যান্য সভা-সমিতির সভ্য-তালিকা-ভুক্ত ছিলেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের তিনি নামমাত্র সভ্য ছিলেন না—রীতিমত কর্ম্মীও ছিলেন। এগ্রি-হটিকালচারাল সোসাইটির মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণীতে কাগজ প্রস্তুত সম্বন্ধে তাঁহার একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া-ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এই সোসাইটির অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন।

রামকমল সংস্কৃত কলেজের কেবল সম্পাদক ছিলেন না; সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ এত প্রবল ছিল যে, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণের সহিত প্রত্যহ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার জন্য তিনি কলেজের সান্নিধ্যে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই বাটীই পরে এলবার্ট হল নামে পরিচিত হয়।

কেবল স্বদেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিয়া শিক্ষা ব্যাপারে তাঁহার উৎসাহ পর্য্যবসিত হয় নাই—বিদেশীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারেও তাঁহার সমান আগ্রহ লক্ষিত হইত। সেই জন্য Parental Academyর (অধুনা ডভটন কলেজ নামে পরিচিত) পরিচালকবৃন্দের মধ্যেও তাঁহাকে দেখিতে পাই। ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির সদস্যপদ হইতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি উহার সহকারী সভাপতির পদে উন্নীত হন।

সেন মহাশয়ের ইংরেজী বাঙ্গালা অভিধানের মুদ্রণকার্য্য ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। উহার পত্র সংখ্যা ছিল ৭০০।

কলিকাতায় একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যে প্রাথমিক কমিটি গঠন করেন, রামকমল সেন তাহার অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য যে সকল প্রস্তাবের আলোচনা হইত, রামকমল সেন মহাশয়ের তাহাতেও একটা প্রধান অংশ থাকিত। রামকমলের আমলে কলিকাতা-প্রবাসী সাহেবদিগের পীড়া হইলে চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার জন্য হাসপাতাল, দুস্থ সাহেব-দিগের জন্য আশ্রয় ও খাদ্যের যথোচিত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দেশীয়দিগের জন্য ভাল রকম কোন ব্যবস্থা ছিল না; যাহাও ছিল তাহাও যথেষ্ট ছিল না। এই কারণে সহরের কেন্দ্রস্থলে দেশীয়দিগের জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপনের

প্রস্তাব হয়। তৎকালে আমাদের দেশের ধর্ম্মগত সংস্কার অনুযায়ী মুমূর্ষু ব্যক্তিগণকে অন্তর্জলি করা হইত। সেই সময়ে না কি শীঘ্র শীঘ্র নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াসে মুমূর্ষুর বাহক ও সহচরগণ অন্তর্জলির অছিলায় মুমূর্ষু ব্যক্তিগণকে গঙ্গায় ডুবাইয়া মারিত। হাসপাতাল স্থাপন প্রস্তাবের ইহাও একটা কারণ ছিল। এই প্রস্তাব উপলক্ষে সংবাদ-পত্রে অনেক আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছিল। অন্তর্জলির সূত্রে মুমূর্ষুকে ডুবাইয়া মারা, চড়কের সময় গাজনের সন্ন্যাসীদিগের পিঠে বাণফোঁড়া প্রভৃতি কুপ্রথা-গুলির সম্বন্ধে রামকমল সেন মহাশয় যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তদনুসারে ঐ কুপ্রথাগুলি রহিত হয়। এজন্য সেন মহাশয় বঙ্গবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছিলেন।

রামকমল কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। শ্রমবিমুখ অবস্থায় তিনি একদণ্ডও থাকিতে পারিতেন না। দেহ-মনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ক্রমে ভগ্ন হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিয়া সুস্থ হইবার আশা না দেখিয়া তিনি গৌরিফায় গমন করিলেন। সেখানে একুশ দিন গঙ্গাবাসের পর তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান পূর্ণ-মাত্রায় ছিল। মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া গৌরিফায় আসিবার দুই দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি জপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাক্‌রোধ হইবার পূর্ব্বে তিনি পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে সময়োচিত ও পাত্রোচিত উপদেশ দান করেন। সন ১২৫১ সালের ১৯এ শ্রাবণ, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট ৬১ বৎসর বয়সে তাঁহার ৺গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া বহু উচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষের সহিত রামকমলের সৌহৃদ্য ছিল। তাঁহারা সর্ব্বদা সেন মহাশয়ের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন।

রামকমল চারিটি পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠপুত্র হরিমোহন ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি পিতার সদ্‌গুণ-রাশির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ডাক্তার উইলসনের অধীনে পুরাণ অনুবাদের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে তিনি টাঁকশালের দেওয়ান, ট্রেজারির দেওয়ান, বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদে কার্য্য করেন। সহরের প্রায় তাবৎ বড় বড় সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর আগ্রার দরবারে জয়পুরের মহারাজের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা জন্মে। সেই-সূত্রে তিনি উক্ত রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়া রাজ্যের বহু সংস্কার সাধন ও উন্নতিমূলক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি পাঁচ পুত্র রাখিয়া যান—যদুনাথ, মহেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, ও উপেন্দ্রনাথ। ইঁহাদের মধ্যে চতুর্থ নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় থাকিয়া "ইণ্ডিয়ান মিরার" সম্পাদন করিতেন। অপর চারি ভ্রাতা জয়পুরে কোন না কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন।

রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত ধর্ম্ম-সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইঁহারই পুত্র। তৃতীয় পুত্র বংশীধর টাঁকশালে কর্ম্ম করিতেন। চতুর্থ পুত্র মুরলীধর কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী ছিলেন।



নারীর কর্ত্তব্য

শ্রীঅনুরূপা দেবী

মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের লেখার এবং তাঁর অশেষবিধ সমাজ-কল্যাণকর সৎকর্ম্মমালার সংবাদ আমি বহুকাল হ'তেই পেয়ে এসেছি। চন্দননগরে যাতায়াতের কালে ৺কৃষ্ণভাবিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সুপরিচ্ছন্ন গৃহখানি আমার অনেকবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নৃত্যগোপাল-লাইব্রেরী ভবনের সম্বন্ধেও আমি সংবাদপত্রে ও লোকমুখে সংবাদ পেয়ে মনে মনে তাঁর মাতৃ-পিতৃ ভক্তির অজস্র প্রশংসা করে এসেছি এবং মনে মনে এই বলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি যে, 'আপনার দেশের প্রত্যেক অবস্থাপন্ন লোক যেন আপনার এই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে পারে; আপনার এই সাত্ত্বিক দানের ফলে যেন এই দানের আদর্শ আমাদের সমাজে দৃষ্টান্তস্থল হয়ে ওঠে। এ দেশের ধনী যেন আপনার মত দেশহিতব্রত হয়।'

আজ তাঁর কাছ থেকে আমি যখন নিমন্ত্রণ পেলেম, যোগ্যতা অযোগ্যতার হিসাব খতিয়ে দেখার অবসর আমার হলো না, আমি সাগ্রহে সম্মত হলেম। মনে হলো, মনের মধ্যে যেন এই কর্ম্মবীরের কর্ম্মের সঙ্গে আমার অন্তরের একটা গোপন সংযোগ ইতিমধ্যেই ঘটে গ্যাছে; আমার কাছে এ নিমন্ত্রণ কিছুই নূতন ঠেকলো না। এসে পৌঁছে গেলেম।

কিন্তু আসাটা যত সহজ, তার পরের কর্ত্তব্যটা ঠিক তেমন সোজা নয়। আপনারা নারীর শিক্ষা বা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার জন্য আমায় এখানে আমন্ত্রণ করেছেন; সে সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার অনুযায়ী কিছু বলবারও ইচ্ছা আছে, কিন্তু বলতে গিয়ে আমি যে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হই নি তা' বলতে পারি নে। বলা কওয়া আমার দিনের চাইতে তার আগের দিনে অনেকখানিই যেন সহজ ছিল, আজকের দিনে আর তা' নেই। আজকের দিনে আমাদের বলবার কথা যত বেশি হয়ে উঠেছে, বলবার পথ হয়ে যাচ্ছে ততই সঙ্কীর্ণ। এ কথা শুধু আমিই নয়, অনেকেই হয় ত স্বীকার করবেন। কারুকে কিছু বলতে গেলে, লিখ্‌তে গেলেই মনে পড়ে যায়—

"ভয়ে ভয়ে বলি কি বলিব আর?"

আমাদের মনের মধ্যের স্থূল সূক্ষ্ম অনেক তারই ভাবের সুরে ভরা থাকে, একটুখানি আঙ্গুলের ছোঁয়া লাগার অপেক্ষা; কিন্তু সেই আঙ্গুলের স্পর্শ যদি আনাড়ীর স্পর্শ হয় তা' হলেই সমস্ত সুর বেসুরা হয়ে যায়, শ্রবণে বিরক্তি উৎপাদন করে মাত্র। শ্রবণেচ্ছায় আসে অবসাদ। আমি এই দু'রকমেরই ভয় করছি। প্রথমতঃ আজকের দিনের সব কথা, আসল কথা, বলার পথ সেই পথের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে, যে পথকে লক্ষ্য করে আমাদের প্রাচীন কালের ঋষিরা লিখে গেছেন "—দুর্গমপথস্তৎ—"

এই দুর্গম পথকে "ক্ষুরস্য ধারা"র সঙ্গে তাঁরাই সমতুলিত করে গেছেন বলে সেই পথের যাত্রী হ'তে আমার মত ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্যেরা একটুখানি ভয় রাখে। তা' না রাখলে, আজকের দিনের মত দিনে আপনাদেরও আমায় নিমন্ত্রণ কর্ব্বার সুবিধা হতো না, আর আমারও আপনাদের নিমন্ত্রণ নে'বার সুযোগ থাকতো না। এই সব কারণে কোন কিছু বলতে গেলে ভেবে দেখে হিসাব খতিয়ে বিচারসিদ্ধ করে নিয়ে তা' প্রকাশ করতে হবে।

তার পর দেখুন, আমাদের এই চির-বৈচিত্র্যময়ী নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই বহু মত ও বহু পথাবলম্বী নানা ধর্ম্মী এবং নানা কর্ম্মীর সমবায়ে বিচিত্রতর-যাদের জন্য আবহমান কাল হইতেই "ঋজু কুটিল নানাপথ" সুবিস্তৃত রহিয়াছে, সেই ভারতবর্ষীয়দের মধ্যেও আজকালকার-মত দিনে কোন উপদেশের মত কথা বলতে যাওয়া আর তেমন সহজ নেই। উপদেষ্টার অভাব কোন দেশেই ছিল না, আজও নেই; এ দেশেও তাই; কিন্তু পর-মত-সহিষ্ণুতা এ দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও, এ দিনে যে সে বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপেই সংরক্ষিত আছে, তা বলা চলে না। বিশেষতঃ আমাদের মত সেকেলেদের মতামত এই নব্য-

তান্ত্রিকতার যথেচ্ছাচারের যুগে একান্তই অসহনীয় হয়ে ওঠা কিছুই বিচিত্র নয়। তাই একটু ভয় রাখতে হয় যে আমার কথা হয় ত বা কারু কারু কানে গিয়ে বেসুরা সুর উৎপাদন করে শান্তির বদলে অশান্তি উৎপাদন করবে।

তবে এ-কথাটাও ঠিক যে, যদি আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাই ঘটে, তবে সে দোষ আমার আনাড়ী আঙ্গুলের; মনোবীণার তার আমার উঁচু সুরেই বাঁধা আছে। আমি আপনাদের কাছে যা বলতে চাই তা'তে যদি আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকে, থাক, কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছার কিছুমাত্র অভাব ঘটে নি। যাঁর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই তিনিও, যাঁর সঙ্গে আমার মতের মিল আছে তিনিও যেম্নি আমার কাছে আজ এসেছেন, আমিও তেম্নিই সবিনয়বাক্যে তাঁদের নিবেদন করে বলছি; আমার মতামত যদি আপনাদের মতের সঙ্গে না মেলে নাই মিলুক, দুঃখিত তা'তে যদি আপনারা হন, সেটুকু স্বীকার করেই নেবেন, কিন্তু তার জন্ত পরস্পরের মধ্যে যেন আমাদের মনের মিলের অভাব না ঘটে। পরস্পরকে সহ্য করতে যেন আমাদের না বাধে। পরমত-খণ্ডন-চেষ্টা এ দেশে চিরদিনই হয়ে এসেছে। না হলে ষড়্দর্শনের সৃষ্টি হতো না এবং এই অসংখ্য মতবাদের স্থান ধর্ম্মে সমাজে সাহিত্যে থাকতো না। কিন্তু পরমত খণ্ডন করা এক, আর বিরুদ্ধ মতবাদীদের মধ্যে দল বন্ধন করে বিরোধকে পাকিয়ে তোলা সম্পূর্ণ অন্ত জিনিষ। পরমত-সহিষ্ণুতা এ দেশের ধর্ম্ম, পরম ধর্ম্ম,—এ দেশ তর্ক দিয়ে মতবাদ স্থাপন করেছে, কুতর্ক দিয়ে নয়। আর কোন দেশ এমন করে মত-বিরোধের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে নিতে পারে নি। সহস্রটা চোরা গলিকে নিয়ে এসে একটা সরল রাজবর্ত্মে মিলিয়ে দিতে পারে নি, অসংখ্য নদী তড়াগকে বইয়ে এনে এক মহার্ণবে ডুবিয়ে দিতে পারে নি, বহুকে একের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। সে এ দেশই পেরেছিল, চিরদিনই পারছে;—ইচ্ছা করলে আজও পারে, এবং চিরভবিষ্যকাল ধরে পারবেও তা।

এখন আমাদের আসল কথায় পৌছান যাক্।—

নারীর কর্ত্তব্য কি? হয় ত আমাদের এই-ই প্রশ্ন? কিন্তু এ প্রশ্ন কেন ওঠে? নারী কি এ-দেশে ছিলেন না? আজই কি তাঁদের এ দেশে এই প্রথম অভ্যুদয় ঘটলো? কিন্তু তা' তো নয়, শাস্ত্রবাক্য আমাদের শুনিয়ে দিচ্ছেন;—

পরমাত্মা নিজ শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগে পুরুষ এবং তার আর এক ভাগে নারীর সৃষ্টি করেছিলেন,—

এই যদি সত্য হয়, তা'হলে নর এবং নারী একই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাগে পরস্পরের সহজাত রূপেই সৃষ্ট হয়েছেন, তাঁদের স্রষ্টাও সেই একই; এবং সৃজন-উপাদানও তাঁদের বিভিন্ন নয়। অতএব আমরা এইটুকু নিশ্চিতরূপেই জেনে রাখলেম যে নরনারী কোন দিনই অনন্তসহায় রূপে এই বিশ্বজগতের উষর বক্ষে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ স্নেহপ্রেমের বুবুক্ষায় শুষ্ককণ্ঠ লইয়া অভ্যুদিত হন নাই। বিশ্বপ্রভাতেই তাঁরা তাঁদের পরস্পরের স্নেহ প্রেম আশা ও বাসনা পরস্পরকে বিনিময় করিয়া দিয়া রিক্ততার গৌরবে গৌরবান্বিত রূপেই দেখা দিয়েছিলেন। জগতের সেই প্রথম প্রভাতেই সুপ্তিময় জগদ্বাসী জেগে উঠেছিল, তাদের জননীর স্নেহে, ভগ্নীর ভালবাসায়, পত্নীর অনুরাগে এবং দুহিতার অপরিসীম শ্রদ্ধায় পরিপূরিত হইয়া। কিন্তু আমি তারও আগের থেকে একটুখানি বর্ণনা দোব। প্রভাত যখন হয় নি, বিশ্ব যখন জাগে নি, সৃষ্টিকর্ত্তা যখন নিজেই সৃষ্টিছাড়া হয়ে পড়েছেন, সেই সময়কার সেই ভয়াবহ এবং অসহায় অবস্থাটুকু তাঁর আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিতে চাই;—

প্রলয়ের কালে যখন কারণ জলে ডুবলো ধরা,
তখন পুরুষ হলেন পরশহারা, বিশ্ব হলো জ্যান্তে মরা,
আবার এ জগত উঠ্‌লো জেগে আদ্যা নারীর বীণার তানে
তাই নারী যেথায় সম্পূজিতা নারায়ণের বাস সেখানে।

দেখুন, তাহলে, শুধু সৃষ্টির প্রথমে পরমাত্মা নর এবং নারীকে তাঁর দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করেই যে সৃষ্টি করেছেন, তা'ও না; তারও একটুখানি আগে; যখন আদ্যাশক্তি তাঁকে ছেড়ে সরে গেছলেন, যখন সেই পরম-পুরুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে নির্গুণত্ব লাভ করে কাজের বার হয়ে গেছলেন! অতএব নর এবং নারীর সৃষ্টি যে পরস্পরকে ছেড়ে হয় নি এবং তাঁদের যে পরস্পরকে বাদ দিয়ে পুনঃ-প্রলয়কাল পর্য্যন্ত চলতে পারা সম্ভব নয়, এটা আমরা অস্বীকার করতে কোন মতেই আর পারছি নে।—

নরের এবং নারীর সৃষ্টি যদি একত্রই হয়ে থাকে, তাহলে নরের কর্ত্তব্য এবং নারীর কর্ত্তব্য একসঙ্গেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, এ কথাও অবিসম্বাদীরূপে সত্য বলেই স্বীকার করে নিতে হয়। 'নারীর কর্ত্তব্য' বলে নতুন কোন প্রশ্ন যে আজকাল কেন জেগে উঠ্‌ছে এ কথা আমি ভেবেই পাইনে। যখনই এতদ্বিষয়ে কোনই প্রশ্ন উঠ্‌বে, তখন নর এবং নারী দুজনকার সম্পর্কেই ওঠা সঙ্গত, আমার এই মনে হয়। যেহেতু নরনারী পরস্পর পরস্পর হইতে অভিন্ন! সেই হেতুই তাদের কর্ত্তব্যও পরস্পরকে বাদ দিয়া কোন মতেই নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। এদের একজনকার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে, আর একজনকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন আসিয়া পড়িবেই পড়িবে এবং মীমাংসা করিতে হইবে, দুজনকার কর্ত্তব্যকে তেমনই ভাবেই এক করিয়া লইয়া, যেমনভাবে এক ব্রহ্ম নিজেকে তা'দের দুজনকার জন্য দ্বিধা বিভক্তিত করিয়াছিলেন। তাঁদের কর্ত্তব্য তেমনই ভাবেই মূলতঃ এক হইয়াও বাহ্যতঃ দুই প্রকারের—যেমন তাঁরা একই ব্রহ্মের দুই বিভিন্ন প্রকাশ।

বাস্তবিকই নরের কর্ত্তব্য আর নারীর কর্ত্তব্যে মূলতঃ কোনই প্রভেদ নাই, স্থূলতঃ দুজনকার কর্ত্তব্যই মোটামুটি এক। তার নীতিসূত্রে সেই "সত্যং বদ"—"ধর্ম্মং চর"—সেই—"অহিংসা পরমোধর্ম্ম"—সেই—"নাস্তি জ্ঞানাৎ পরং তপঃ।"—নর এবং নারীর শিক্ষার এই মূল বিষয়ে কোনই প্রভেদ নাই, প্রভেদ থাকা উচিত নয়, থাকা অসম্ভব ও অসঙ্গত;—কিন্তু যেমন মূল লক্ষ্যে উভয়ের ধর্ম্ম একই তেমনই আবার এর আর একটা দিক আছে সেটা—এর স্থূল দিক নয়, সূক্ষ্ম দিক। যেহেতু ব্রহ্ম তাঁর শরীরকে একলা রেখে দ্বিধা বিভক্তিত করেছিলেন, সেই দ্বিধা বিভাজিত দুইয়ের মধ্যের একেকে নর এবং অপরকে নারীরূপে পরস্পরে বিভিন্নধর্ম্মীরূপে তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই হেতু স্থূল বিষয়ে মুখ্য বিষয়ে যতই একত্ব থাকুক, সূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁদের মধ্যে একটুখানি প্রভেদ আছে এ কথা মান্‌তেই হবে। যতই আমরা মানতে না চাই, তবু সেই শেষকালে তর্কের শেষে মেনে নিতে বাধ্য হবোই যে, হ্যাঁ, তা' আছে; নারীর কর্ত্তব্য এবং নরের কর্ত্তব্যে একটুখানি প্রভেদ আছে; এবং নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই সেটুকু যেন থেকেই যাবে, যতই আমরা মেয়েরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মরি না কেন, সৃষ্টির শেষ দিনে পর্য্যন্ত সেটুকু হয় ত নিঃশেষ হয়ে কোন দিনেই মুছে যাবে না।

'নারীর কর্ত্তব্য' বলে যখন প্রশ্ন ওঠে, তর্ক চলে, মতদ্বৈধ ঘটে, তখন সেইটুকু নিয়েই এ-সব হয়। মূল ধর্ম্ম সে এক এবং অটুট সত্য এবং সনাতন; তার সঙ্গে কারুই কোন বিবাদ ঘটা সম্ভব নয়। সে ধর্ম্মবলে নর এবং নারী সত্যাচরণ করবেন, ধার্ম্মিক হবেন; জ্ঞানার্জ্জন করাতে



শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

(কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরে ১লা মের গৃহীত ফটোগ্রাফ)

দুজনকারই অধিকার আছে। নরের সততা এবং নারীর সতীত্ব কোনটাই তুচ্ছ নয়, পরন্তু উভয়েরই এ বিষয়ের সাধনা একাগ্র এবং অপ্রতিহত হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু এর পর নারীর সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্ম নারীধর্ম্ম আছে, সেইটার সম্বন্ধে দেশভেদে এবং কালভেদে কখন কখনও একটু আধটু পরিবর্ত্তন দেখা দেয় এবং বিবর্ত্তন আসে। এ দেশে এই নারীধর্ম্মের যেমন চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল, অন্য কোন দেশে

তেমন ঘটিতে পারে নাই। তার একটু অর্থও আছে,—এই ভারতবর্ষীয় হিন্দুর মত এমন সুদীর্ঘজীবী জাতি আর কোন জাতির ভিতর নাই। সকল জাতিরই পতন-অভ্যুদয় একটা নির্দ্দিষ্ট বর্ষ-শতকের মধ্যেই যেন সীমা-নিবদ্ধ। কেবল এই ভারতবর্ষীয় হিন্দুই বহু সহস্র বর্ষজীবী-রূপে ধরাপৃষ্ঠে আজ বর্ত্তমান রয়ে গ্যাছে। দীর্ঘ জীবন যে অভিজ্ঞতার আকর, এ বিষয়ে সংশয় কর্ব্বার উপায় নেই! ভারতবর্ষীয় হিন্দু তার জাতীয় জীবন গঠনের প্রথম প্রভাত থেকে আরম্ভ করে তার অত্যুন্নতির দীপ্ত মধ্যাহ্নে, আবার তার অবনতির জীবনসন্ধ্যায়, সর্ব্বত্রই তার বিরাট সমাজভুক্ত নরনারীর কল্যাণ-কামনাকে একাগ্রচিত্তে পর্য্যালোচনা করেছিল। "নেতি নেতি" করে সে তার সমাজগত নারী-পুরুষের কর্ত্তব্যকে একটার পর আর একটা ধাপে তুলে সম্যক্ রূপেই পরীক্ষা করে গেছে; তার প্রত্যেকটী পরীক্ষার ফল আমরা প্রাচীনকালের পুঁথিপত্র হতে জানতে পারি। তার পর তার সেই এক্সপেরিমেণ্ট্যাল ষ্টেজ পার হয়ে এসে সে যখন তার সমাজকে তার সেই সকল পরীক্ষার ফল দিয়ে লব্ধ পূর্ণ অভিজ্ঞতার বলে এক আদর্শ সমাজে গঠিত করে তুলতে পারলে, তখনই তার মাথার উপর গৌরব-ভাস্কর প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌লো। ভারতবর্ষীয় হিন্দুর যা কিছু নিয়ে আজও এই পরাধীন দৈন্যগ্রস্ত জীবনে গর্ব্ব কর্ব্বার আছে, সে তার সেই একান্ত শুভদিনেরই দান। আজও যদি সেদিনের সেই মহিমময় গরীমাদীপ্ত যুগের অত্যুচ্চ আদর্শ-বাদকে আমরা অনুসরণ না করিতাম, তবে ভারতবর্ষীয় হিন্দুর এই সাত শত বর্ষকালব্যাপী পরাধীন জীবনে এমন কি আছে, যার বলে সে জগৎ সমাজের মধ্যে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে ভরসা করে? কি আছে তার, যার জোরে সে তার বহুদিনের হৃতরাষ্ট্র ফিরিয়া পাওয়ার অধিকার চায়? যার বলে সব হারাইয়াও সে নিঃস্ব নয়, ভিখারী হইয়াও রাজা। সে কি? সেই ভারতীয় সভ্যতা—যে সভ্যতার অংশভাগী হইয়াও গ্রীস রোম মিসর কোথায় কবে ধ্বংস হইয়া গেলেও, যে সভ্যতার পূর্ণ রূপকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকার জন্য, ভারতের নারী-পুরুষ এই বহুতর শতাব্দীর ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও উৎপীড়ন অত্যাচার অধঃপাতের তলায় পড়িয়াও পূর্ণরূপে তলাইয়া যায় নাই, আজও মাথা তুলিয়া অটল অচল দাঁড়াইয়া আছে—এ সেই সর্ব্বশক্তিমৎ ভারতীয় সভ্যতা। যা বহুতর সহস্রাব্দির অভিজ্ঞতা-জ্ঞানলব্ধ কমট-কঠোর তপস্যায় অভীষ্ট দেবতার বরপ্রাপ্তিরূপে পাওয়া। যার জোরে ভারতীয় নরনারী পরাধীন-তার মধ্যেও স্বাধীন, বিজিত হইয়াও আজও অপরাজেয়।

সেই ভারতীয় সভ্যতা তার সমাজকে যে আদর্শ দিয়ে গঠন করে'ছিল, তার বাইরে গিয়ে তার চাইতে বড় আদর্শ ভারতবর্ষের নরনারী আর কোথাও থেকে পেতে পারেন না। যেহেতু অন্য দেশের বর্ত্তমান সমস্ত সমাজেই এখনও গঠনক্রিয়া চল্‌ছে; এমন কোন মানব-সমাজ আজ পৃথিবীতে বর্ত্তমান নেই যা ভারতবর্ষীয় সমাজের সমকালীন। পরিপক্ক-বুদ্ধি, পরিণত-দেহ বৃদ্ধ যদি শিশুর বা বালকের অনুকরণ করতে যায়, তা'তে সে কি রস পায় সেই জানে,—অপরের জন্য প্রচুরতর রূপে সৃষ্টি করে সে নিছক হাস্যরস। ভারতবর্ষীয় নরনারীর মধ্যে যে আদর্শবাদ রয়েছে, তাকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য সমাজের আধগড়া কোন নবীনতর সমাজের আপাত-মনোরম কোন আদর্শকে গ্রহণ করার তার পক্ষে বৃদ্ধ শিশুর হামা টানার মতই অপ্রয়োজনীয় পশ্চাদ্‌বর্ত্তন বলেই মনে হবে। ভারতবর্ষীয় সমাজ ও-সব ধাপ পার হয়ে এসেছে। ও-সব ধাপে সে কখনও যে পা দেয়নি তা' নয়। ওগুলো সকল সমাজের পক্ষেই ওপোরে ওঠ্‌বার সিঁড়ি, বাস কর্ব্বার গৃহ নয়।

তাই আমার মতে 'নারীর কর্ত্তব্য' যা ভারতবর্ষীয় সমাজ তার গৌরবোজ্জ্বল উন্নতি সমুচ্চ যুগে স্থির করে দিয়েছিল, সেই আদর্শই তার পক্ষে শ্রেয়স্কর ও যশস্কর উচ্চাংশ;—তার থেকে বার হয়ে তার চেয়ে যথেষ্ট হীনতর আদর্শে নেমে যাওয়া তার পক্ষে একটুও সম্মানের নয়। সুবিধারও নয়। ত্যাগ সংযম শ্রদ্ধা বিশ্বাস এ-সব উচ্চতর জীবের জন্য। আরণ্যকের জন্যই অসংযম অশ্রদ্ধা স্বার্থপরতা এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং তার ফলে প্রতি-বিধিৎসার ঘৃণ্য স্পৃগ। ভারতবর্ষীয় হিন্দু মহিলার পক্ষে এই অসংযমের পথ অনুবর্ত্তনীয় নহে। ত্যাগের পথ কঠোর ও বন্ধুর হ'লেও সেই পথই শ্রেয়ের পথ, শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নাণি হ'লেও সেই পথই তাঁদের অনুসরণীয়। যে পথে গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, মদালসা এবং এই সেদিনেও বিদ্যাসাগর মাতা, ভূদেব জননী, সার রাজেন্দ্রের, সার আশুতোষের,

সার গুরুদাসের, হরিহর শেঠের গর্ভধারিণীগণ অনুবর্ত্তন করে ঐ সকল পুত্ররত্ন লাভ করেছিলেন, এর চেয়ে সমাজ-হিতৈষণা আমাদের মেয়েরা যে আর কি দিয়ে করতে পার্বেন তা' আমার মত সামান্যার বোধগম্য হয় না। জগৎপূজ্যা ভারতীয়া নারী-সমাজে বৈদেশিক অপুষ্ট সমাজের অনুকরণ, যৌথপরিবারপ্রথা নষ্ট করা, বয়স্ক নর-নারীর লালসা-প্রণোদিত স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচন, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অহিন্দু বিবাহ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি দ্বারা ভারত-সতীর বৈশিষ্ট্য নাশ করায় সমাজ যে কতখানি মঙ্গল লাভ করিবে, বুঝিতে পারি না। যাদের মধ্যে ঐ সব ব্যাপার আছে, তারা কি এ দেশের মেয়েদের চেয়ে খুব বেশী সুখী? এ-সব প্রথা কি সমাজের অপরিণততা প্রমাণ করে না? এগুলি কি মানব সমাজের আদিমাবস্থা, বর্ব্বরতা প্রতিপাদিত করে না? তা যদি না হইত, বন্য এবং অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মধ্যেই এ সকল প্রথা আমরা দেখিতে পাইতাম না। এগুলি আমাদের সমাজের সর্ব্ব নিম্নস্তরের মধ্যে প্রচুরতর রূপে বর্ত্তমান থাকিত না। এর বিধি-ব্যবস্থা খুঁজিয়া মিলিত কেবলমাত্র ইয়োরোপীয় শিক্ষিত সমাজে মাত্র!

অতএব ভারতবর্ষীয়া নারীর কর্ত্তব্য নয় যে তার সমাজ-সংস্কার জন্য নব্য-তান্ত্রিক ইয়োরোপীয়ের দ্বারস্থ হয়। তার সমাজ-সংস্কার জন্য তার নিজের ঘরের মধ্যে চাহিলেই সে তার বিধিবিধান খুঁজিয়া পাইবে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যথার্থ ই বলিয়াছেন, "আমাদের সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন মহৎ স্মৃতি এবং বৃহৎ ভাবের দ্বারায় আদ্যোপান্ত সজীব সচেষ্ট হইয়া ওঠে—নিজের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বহু শতাব্দীর জীবনপ্রবাহ অনুভব করিয়া আপনাকে সরল ও সবল করিয়া তোলে, তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও অন্য সকল দুর্গতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে। সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়।"—"হিন্দুত্ব।"

এখন এই যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে, এই সেই সামাজিক স্বাধীনতার রূপ? পর-সমাজের অনুকৃতিকে কোনমতেই কেহ সামাজিক স্বাধীনতার নাম দিতে পারেন না। স্বাধীন কথার মধ্যেই এই স্বা-ধী-নতা শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া প্রকট হইতেছে। তাহা স্ব-অধীনতা, স্বেচ্ছাচার নয়?—

ভারতীয়া নারী স্বতন্ত্র, বিলাসিনী, স্বেচ্ছাচারের স্রোতে আত্মনিমজ্জিতা, "নহ মাতা নহ কন্যা নহ ভগ্নি, শুধুই প্রেয়সী" এই আদর্শে গঠিতা হইবেন না। তিনি কন্যা, ভগ্নি, গৃহিণী এবং জননী; তিনি প্রথমে আদর্শ সতী, তার পর সুপুত্রের মাতা। তিনি স্বামীর সহধর্ম্মিণীরূপে গৃহে এবং বাহিরে, সংসারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই তাঁহার অনুবর্ত্তনশীলা হউন, কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দু-সমাজ পত্নীকে পতির অনুসারিণী করিয়া তাঁর জন্য সতীধর্ম্ম, সহধর্ম্মিণীর পদ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাঁকে তো যথেষ্ট এবং যথার্থ উচ্চাধিকারই প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যদি ভারতীয় পুরুষ তাঁর নিজের আদর্শে সুস্থির থাকিতেন, তবে আজ ভারতীয় নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতেই পারিত না। ভারত-সতীর একমাত্র কর্ত্তব্য তার স্বামীর ধর্ম্মের সহায়তা করা; কিন্তু তাঁর অধর্ম্মেরও অনুবর্ত্তন করা ইহা সতীধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। এইখানে অনেকেই ভ্রম করিয়া থাকেন; স্বামীর অধর্ম্মকে তিনি অনুসরণ করিতে বাধ্য নহেন, যেহেতু স্ত্রী স্বামীর সহ-ধর্ম্মিণী! তাঁর সংস্রব তাঁর ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে; অধর্ম্ম-জীবনে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিতা! *

* চন্দননগর পুস্তকাগারের উদ্যোগে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে' ১লা মে তারিখের বিশেষ সভায় পঠিত।

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রে ইতরপ্রাণীর অভিনয়)

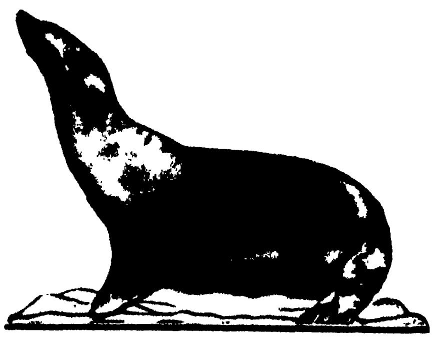
অধিকাংশ ছবিতেই আমরা কোনোও না কোনো রকম জীবজন্তুর সাক্ষাৎ পাই। এ পর্য্যন্ত চলচ্চিত্রে যত রকমের পশু পক্ষী ও সরীসৃপ দেখানো হ'য়েছে সেগুলিকে সব একত্রে জড়ো করলে একটা বৃহৎ পশুশালা হ'তে পারে। ছবিতে যে সব জীবজন্তুর সাহায্য নেওয়া হয়, তাদের প্রত্যেককেই চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষিত ক'রে তোলা হয়। সার্কাসে অভিনয়ের জন্য পশুপক্ষীকে



'রীন্ টিন্-টিন্' ও তার প্রভু 'লী ডান্কান্'

শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য ঐ-সব ইতর প্রাণীকে শিক্ষিত ক'রে তোলা অত্যন্ত কঠিন; তাই, চিত্রগড়ে অভিনয়ের উপযোগী শিক্ষিত জীবজন্তুর পারিশ্রমিক প্রায় 'ষ্টার'-অভিনেতৃদেরই সঙ্গে সমান।

হাতী, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জানোয়ারদের সার্কাসে অভিনয় করতে শিক্ষা দেওয়া যতটা কঠিন—তার চেয়ে যে ঢের বেশী কঠিন তাদের চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'রতে শিক্ষা দেওয়া, তার কারণ—সার্কাসের ঘোড়া বা হাতীকে কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী শিখিয়ে নিয়ে প্রত্যহ দু'বার ক'রে সেই একই খেলা দেখাতে বাধ্য করা হয়; কাজেই তারা সে খেলায় শীঘ্রই অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে। সুতরাং তাদের নিয়ে খুব বেশী মুস্কিলে পড়তে হয়না। কিন্তু, বিভিন্ন চলচ্চিত্রের জন্য বিশেষ বিশেষ জীবজন্তুকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অভিনয় শিক্ষা দিতে হয়; কাজেই, শিক্ষকদের প্রতিবারই নূতন ক'রে পরিশ্রম না করলে চলে না। এই জন্য, একেবারে বাছা-বাছা সব চেয়ে

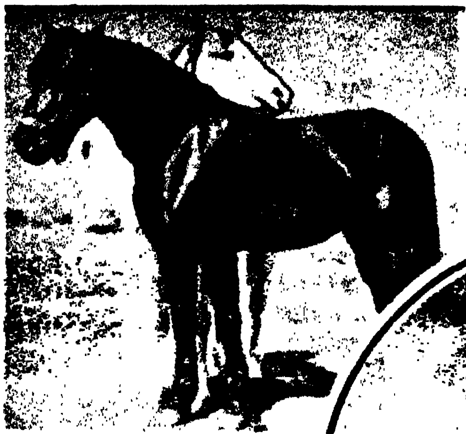


'ফ্রেডী'—শিক্ষিত শীলমাছ (চলচ্চিত্রে এর অভিনয় দর্শকদের বিস্ময়োৎপাদন করে)

সেরা জানোয়ার না হ'লে চলচ্চিত্রের অভিনয়ে নেওয়া চলেনা।

পশু পক্ষীদের যাঁরা খেলা দেখাতে বা অভিনয় ক'রতে শিক্ষা দেন, তাঁদের সকলের পদ্ধতি সমান নয়। প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে। মারের চোটে শেখানো সেকালের পাঠশালাতেও ছিল, পশুশালাতেও ছিল; কিন্তু, আজকাল বেত বা চাবুকের রেওয়াজ উভয় শিক্ষালয়েই অপ্রচলিত হ'য়ে পড়েছে, কারণ দেখা গেছে—ভয় দেখিয়ে—মেরে—শেখানোর চেয়ে, মিষ্টি কথায়—

আদর ক'রে—অথচ দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে শিক্ষা দিলে ফল ঢের ভাল পাওয়া যায়। অবোধ জানোয়াররা সুকুমার শিশুর মতই অবোধ; পাঁচবার দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তারা যদি শিক্ষকের ইচ্ছার অনুরূপ অভিনয় ক'রতে না পারে, তাহ'লে তাদের নির্দ্দম প্রহার করাটা শুধু নিষ্ঠুরতা নয়—শিক্ষকের একান্ত নির্ব্বুদ্ধিতাও বটে! মার খেলে জানোয়ারদের মাথা খোলে না, বরং উল্টে তারা ভড়কে যায় এবং আজ যা শেখে কাল তা' ভুলতে বিলম্ব হয়না।



'রেক্স্' ও 'লেডী'—দুটি শিক্ষিত সুন্দর অশ্ব ও অশ্বিনী



'মার্কুইস্' (শিক্ষিত অশ্ব। দুরন্ত ঘোড়ার অভিনয়ের জন্য খ্যাত)

তবে, যেখানে কোনো কোনো বিশেষ পশু দুষ্টুমী ক'রে কিম্বা কুড়েমীর জন্তে শিক্ষকের নির্দ্দেশ না মেনে তাঁর অবাধ্য হয়, সেস্থলে শিক্ষকের একটু কড়া হওয়া দরকার। কুকুরের বেলা কিন্তু তা' হবার প্রয়োজন নেই। একটু ধমক্ দিলেই, পিঠে একটা আস্তে চাপড় দিলেই যথেষ্ট! ভালো কুকুর হ'লে—শিক্ষকের চেয়ে সেই-ই নিজে বেশী লজ্জিত ও বিরক্ত হ'য়ে ওঠে—যদি



সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী 'ল্যুপে ভেলী' ও তাঁর শিক্ষিত বানর

শিক্ষকের নির্দ্দেশ না বুঝতে পারে! সেস্থলে একটু ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় থাকলে এবং মাথা ঠাণ্ডা রেখে জানোয়ারের উপরই তার ভুল সংশোধনের ভার ছেড়ে দিলে সহজে সুফল পাওয়া যায়। একটু চাপড়ে আদর করে উৎসাহ দিলেই সে ঠিক শিখতে পারে, এবং শিক্ষক যদি তার কৃতকার্য্যতার পুরস্কার স্বরূপ তাকে কিছু বখশীস্ দেন—যেমন একখানা বিস্কুট কিংবা একটি চকোলেট্, তাহ'লে সে আর সে খেলা ভোলে না।

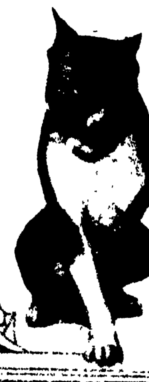
বাঘ-সিংহ সম্বন্ধেও ঠিক এই ব্যবস্থাই খাটে; কিন্তু যদি এরা কখনো শিক্ষকের শুধু অবাধ্য হওয়া নয়, তাঁকে দাঁত খিঁচিয়ে আক্রমণ ক'রতে তেড়ে আসে—তাহ'লে তাদের তৎক্ষণাৎ সাজা দেওয়া দরকার। এদের অবাধ্যতা রূঢ়-ভাবে দমন ক'রতে না পারলে, শিক্ষকের প্রায়ই অমর্য্যাদা হবার সম্ভাবনা থাকে। তবে এ-কথা ঠিক যে এরা সবসময়ে

দুষ্টুমী ক'রেই অবাধ্য হয় যে তা' নয়, অনেক সময় শরীর ভালো না থাকলে এদের মেজাজ খারাপ থাকে, কাজেই কিছু ভাল লাগে না। অভিজ্ঞ শিক্ষকের পক্ষে তাদের অবস্থা বুঝতে বিলম্ব হয় না। তিনি তৎক্ষণাৎ শিক্ষা বন্ধ রেখে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এই চিকিৎসার হ'তে আরোগ্য ক'রতে পারলে তারা এত বেশী কৃতজ্ঞ হ'য়ে পড়ে যে, শিক্ষকের বিরুদ্ধে আর কখনো বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে না।

চলচ্চিত্রানুরাগী মাত্রেই 'রীণ্-টিন্-টিন্' কে জানেন। চলচ্চিত্রে এই কুকুরটির অদ্ভুত অভিনয় ভোলবার নয়।



'সিল্‌ভারষ্ট্রীক্'—চলচ্চিত্রের অভিনয়ে সুদক্ষ কুকুর (ফ্যাংস অফ জাস্টিস্' ছবিতে এর অভিন অতুলনীয়)



'জিগস্' (ফায়ার্-ব্রিগেড্ ছবিতে এই সুচতুর কুকুরটির অভিনয় ভোলবার নয়)



'রেঞ্জার' (চলচ্চিত্রের আর একটি শিক্ষিত কুকুর



'পুশিফুট' শিক্ষিত বিড়াল ('বেবি-মাইন' ছবিতে এর অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে)

কিছুদিন হ'ল রীণ্-টিন্ মারা গেছে। রীণ্-টিনের শিক্ষক শ্রীযুক্ত লী-ডান্‌কান বলেন—রীণ্ টিন্‌কে তিনি কুকুরের মতো শিক্ষা দেননি, ছোট ছেলের মতোই পড়িয়েছিলেন। খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি তাকে তাঁর ভাষা বুঝতে শিখিয়েছিলেন। কোন্ কথার কি মানে, কী ব'ললে কী ক'রতে হবে—রীণ্-টিন্ ক্রমে মানুষের মতই বুঝতে শিখেছিল। রীণ্-টিন্‌কে কখনো চোখ রাঙিয়ে, ধমকে কিছু ব'লতে হ'ত না। চাবুক দেখিয়ে কিছু করাতে হ'ত না। সহজভাবে

ব্যবস্থা করার ফলে অনেক সময়ে আশ্চর্য্যজনক সুফল পাওয়া যায়। বাঘ ও সিংহকে কোনো যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি

বন্ধুর মতো কথা ক'য়ে তাকে যা ক'রতে বলা হ'তো সে তাই ক'রতো। চলচ্চিত্রের দৃশ্যপটে ক্যামেরার চোখের আড়ালে দাঁড়িয়ে লী ডানকান্ তাকে যেমনটি ক'রতে করেছে। নেহাৎ বাচ্ছা বয়সেই ফ্ল্যাশ ১২০্ টাকায় বিক্রী হ'য়ে গেছলো; কিন্তু কিছুদিন পরেই যে ফ্ল্যাশকে কিনেছিল সে ফিরিয়ে দিয়ে গেলো—কুকুরটা কোনো কাজের নয়,



'বোনাপার্ট'—শিক্ষিত কুকুর-পুলিশ! (মুখে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার বন্ধু শিক্ষিত কাঠবিড়াল' 'নটী'কে)



'থাণ্ডার' ও 'হোয়াইট ফ্যান্' (এই শ্ব-দম্পতী 'উলফ্-ফ্যাঙ্' প্রভৃতি একাধিক চিত্রে অভিনয় করেছে)



'পীট্' ও 'পল' (এরা দুই বাপ্ বেটা তাদের মনিব 'হ্যারী ল্যুসিনের' দু'পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছে)

বলতেন রীণ্-টিন্ সুবোধ বালকের মত তৎক্ষণাৎ তাই ক'রতো। একবারের বেশী দুবার কোনো ছবিতে রীণ্-টিন্‌কে নিয়ে মহলা দেবার প্রয়োজন হয়নি। ডানকান্ যেই ব'লতেন—"রীনটী! তুমি যা ক'রেছো সে জন্য তুমি দুঃখিত ও অনুতপ্ত হও! এই সুন্দরীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তুমি ক্ষমা চাও। উনি তোমায় ক্ষমা করেছেন। তুমি খুশী হ'য়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াও! সুন্দরীকে চুমু দাও—" চলচ্চিত্রের অনেক অভিনেতার চেয়েও নিপুণভাবে রীণ্'টিন্ এই প্রত্যেকটি আদেশ পালন ক'রতো। অনেক সুদক্ষ পরিচালক মানুষকে দিয়ে যা করাতে পারতেন না—ডানকান্ সাহেব অবলীলাক্রমে রীন্ টিন্‌কে দিয়ে তার চেয়েও কঠিন অভিনয় করাতে পারতেন।

আর একটি কুকুরও চলচ্চিত্র-দর্শকদের বহুবার বিস্মিত ক'রেছে—তার নাম 'ফ্ল্যাশ্'। মেট্রোগোল্ড্উইন মেয়ার্ কোম্পানীর একাধিক চিত্রে এর অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ



শিক্ষিত ক্যাঙারু ('ট্যু ফ্লেমিং ইয়ুথস্' চিত্রে 'চেষ্টার কঙ্ক্লীনের' সঙ্গে অভিনয় করেছে। মুষ্টিযুদ্ধেয় (Boxing) জন্য এই ক্যাঙারুটি বিখ্যাত

নেহাৎ মোটা বুদ্ধি ব'লে! আজ সেই ফ্ল্যাশের বাজার-দর উঠেছে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা! ফ্ল্যাশ যদি আরও কিছুদিন বাঁচে, তাহ'লে শুধু চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'রেই সে এর চতুর্গুণ টাকা উপার্জ্জন করতে পারবে। রীন্‌টিনের মতই ফ্ল্যাশ তার মনিবের সব কথা বোঝে, সব জিনিষের নাম জানে, সব বন্ধুদের নাম জানে; ডান ও বাম সম্বন্ধে তার এত বেশী জ্ঞান যে, তাকে যদি বলা হয় ডানপাটি জুতোটা নিয়ে এসো, বাঁ হাতের দস্তানাটা নিয়ে এসো—সে ঠিক চিনে তাই আনে—কখনো ভুল করেনা।



'লীয়ো'

'প্যাল' ব'লে আর একটি খুব চতুর কুকুর চলচ্চিত্রে অভিনয় করতো। এখন সে অবসর গ্রহণ ক'রেছে, কারণ তার উপযুক্ত ছেলে 'পীট্' আজকাল চলচ্চিত্রে নেমে সকল দিক দিয়ে তার বাপের নাম বজায় রাখছে। 'প্যাল' ছিল হাস্যরসের অভিনেতা। সে ঠিক মানুষের মতোই হাসতে পারতো, কাঁদতে পারতো, ঠাট্টা তামাসায় মুখ ভ্যাংচাতে পারতো; শিক্ষিত কুকুরের মত সব রকম খেলা ও অভিনয়েই সে সুপটু ছিল। তার ছেলে 'পীট্' বাপের মতই হাস্যরসের অভিনয়ে অপ্রতিদ্বন্দী হ'য়ে উঠেছে। 'পীটে'র একচোখে চশমার মতো একটি গোল কালো দাগ কাটা আছে, তাই ওর নাম হয়েছে 'একচোখো পীট!' 'মেট্রো'র "আমাদের দলের (Our Gang) সঙ্গে পীটের খুব ঘনিষ্ঠতা।



'নোয়া'

'খাওার' আর 'ফণ্' নামে আর একজোড়া কুকুরকে চিত্র-প্রিয়রা অনেকেই ভালো ভালো ছবিতে অভিনয় ক'রতে দেখেছেন। এদের মজা হ'চ্ছে যে, এরা দু'জনে একসঙ্গে না নামলে অভিনয় ক'রতে চায় না। 'বোনাপার্ট' বলে একটি পুলিশের শিক্ষিত চোর-ধরা কুকুরকেও ছবিতে দেখা গেছে। সে আবার 'স্কুটীর' বাহন। 'স্কুটী হ'চ্ছে একটি শিক্ষিত ও অভিনয় দক্ষ কাঠবিড়ালী। বোনাপার্টের ক্ষুদে বন্ধু!

'মিনী' ব'লে একটি সুশিক্ষিত প্রকাণ্ড হাতী চলচ্চিত্রে প্রায়ই চমৎকার হাস্যরসের অভিনয় করে। ইতর প্রাণীদের মধ্যে 'মিনী'র মত সুচতুর জানোয়ার খুব কম দেখা যায়। হাসির ছবিতে 'মিনী' একেবারে অতুলনীয়। তার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি বটে, কিন্তু, একটি ভেড়ার চেয়েও সে ঠাণ্ডা! 'মিনী'র কাছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'! চেনা-অচেনা সবার সঙ্গেই সে সমানই বন্ধুভাবে ব্যবহার করে। 'ফক্স্' কোম্পানীর তোলা একখানি হাসির ছবিতে একটি শিশুর আদেশে



'ফ্ল্যাশ্' ('আওার্ দি ব্ল্যাক্ ঈগল্' ছবিতে এই কুকুরটির অভিনয় চমকপ্রদ)

সে পরিচালিত হ'য়েছে। তার এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি যে, সেই শিশু যখন তাকে আদেশ ক'রলে যে "মিনী, তুমি এই ভীড় সরিয়ে দাও,সার্কাস ভেঙে দাও"—মিনী মত্ত হস্তীর মত তেড়ে গিয়ে সেই লোকারণ্যকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তু'ললে এবং ডাইনে বাঁয়ে সব কিছু ধ্বংস ক'রতে ক'রতে এগিয়ে গিয়ে সার্কাসওয়ালাদের তাঁবুর আধখানা ভেঙে উড়িয়ে দিলে। তার সে অভিনয় এত স্বাভাবিক হয়েছিল যে দলের অনেকেই ভয় পেয়ে গেছ্‌লো—বুঝি হাতীটা সত্যই

ক্ষেপে গেছে। কিন্তু, 'মিনী' জানতো যে সে অভিনয় ক'রছে, তাই দলের একটি প্রাণীকেও সে আহত করেনি। খুব সাবধানী সে।

মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারের প্রত্যেক ছবিতে সর্ব্বপ্রথম যে সিংহটি মুখ বাড়িয়ে গর্জ্জন ক'রে দর্শকদের অভিবাদন জানায়—তার নাম "লীয়ো"। 'লীয়ো' হ'চ্ছে দক্ষিণ

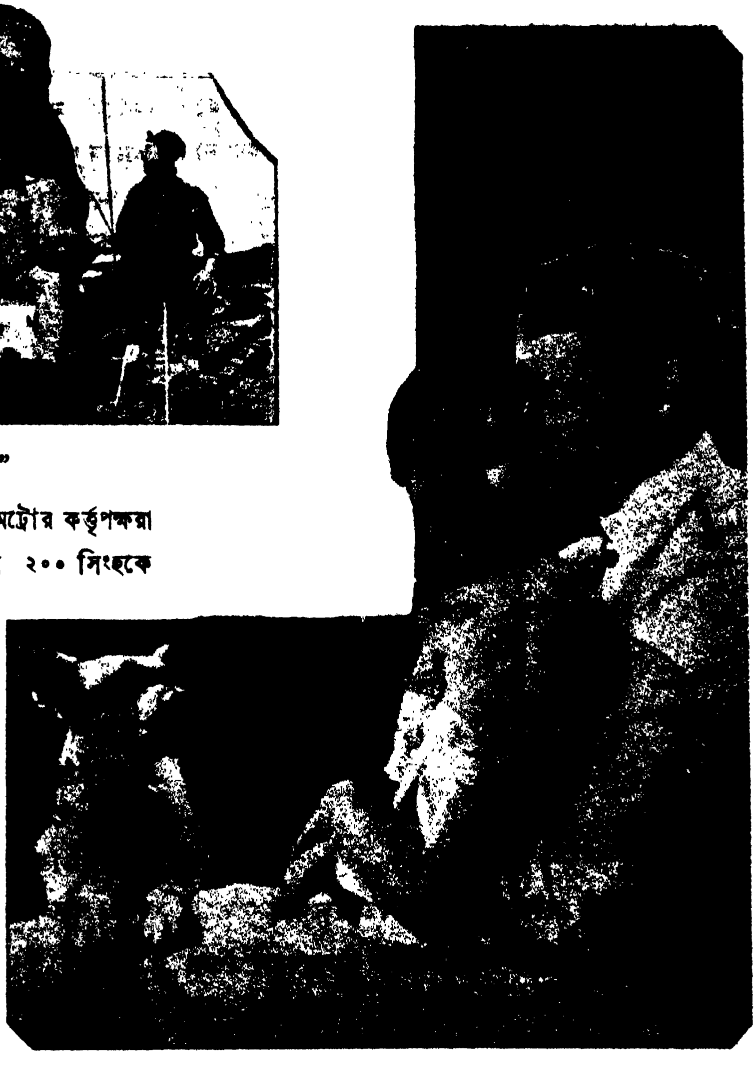


"মিনী"

আফ্রিকার নি উ বী য়া র অধিবাসী। মেট্রোর কর্ত্তৃপক্ষরা একে নির্ব্বাচন ক'রে নেবার আগে প্রায় ২০০ সিংহকে পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন; কিন্তু 'লীয়ো' ছাড়া আর কেউ তাদের মধ্যে চলচ্চিত্রের উপযোগী ব'লে বিবেচিত হয়নি। চেহারায়, কণ্ঠস্বরে, অভিনয় চাতুর্য্যে-'লীয়ো' অদ্বিতীয়।

চলচ্চিত্রে পরিচিত চি তা বা ঘ 'নোয়া'র ভীষণমুখখানি অত্যন্ত ভয়াবহ বলে মনে হ'লেও আসলে কিন্তু সে নেহাৎ নিরীহ। নোয়ার খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অভিনেতা হিসাবে সে খুব শান্ত ও বাধ্য। শিক্ষকের নির্দ্দেশ সে কখনো অমান্য করেনা। কাজেই, ছবিতে তাকে নিরুদ্বেগে নেওয়া চলে, কারণ তার উপর বিশ্বাস স্থাপন ক'রতে পারা যায়।

চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য ইতরপ্রাণী নির্ব্বাচন করবার সময় কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এই বিশ্বাস স্থাপন ক'রতে পারা যায় কিনা দেখা। যে জানোয়ার বেশ ঠাণ্ডা ও কথার বাধ্য এবং শিক্ষকের নির্দ্দেশ অবিলম্বে বুঝতে পারে, নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এলে বা অপরিচিত মানুষ দেখলে বা শব্দ শুনলে ভয় পায়না বা ভড়কে যায়না—এমন ভাবে শিক্ষিত প্রাণীর উপরই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারা যায়। নচেৎ, যে জানোয়ারের অস্থির মেজাজ, খামখেয়াল স্বভাব, যখন খোশ-মেজাজে থাকে

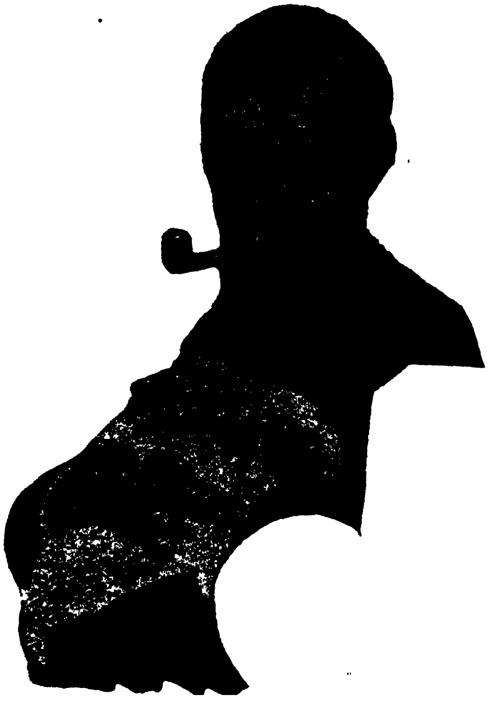


'ডগ অফ্ ওয়ার' ছবিতে 'ফ্ল্যাশের' অভিনয়—(প্রভু আর একজনকে আদর করছেন দেখে ফ্ল্যাশের ঈর্ষা)

তখন ভালো অভিনয় করে, যখন চটে তখন ক্ষেপে উঠে কামড়াতে যায়, তাকে নিয়ে চলচ্চিত্রে খেলানো বিপজ্জনক! কারণ, জানোয়ারটি যদি হঠাৎ বেঁকে দাঁড়ান, তাহ'লে একটি দৃশ্য পরিচালনা ক'রতে গিয়েই পরিচালকের

মাথার কালো চুল ভয়ে ভাবনায় একঘণ্টার মধ্যেই সব পেকে সাদা হ'য়ে উঠবে!

হাতী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, চিতা, সাপ, ক্যাঙারু, হরিণ, বানর, বনমানুষ, গরিলা, ভাল্লুক, এমন কি ছাগল, ভেড়া, গাধা, উট, গরু, মহীষ, হাঁস, মুরগী, পায়রা, কেনেরী, কাকাতুয়া, ময়ূর, তোতাপাখী, তিতির, শীলমাছ, বেজী, বাজ, টিয়া, কোকিল, বুলবুল্ যা কিছু পশুপক্ষী আমরা ছবিতে দেখি, তাদের সকলকেই শিখিয়ে পড়িয়ে ছবিতে অভিনয়ের জন্য' প্রস্তুত ক'রে নেওয়া হয়। জীবজন্তুদের বহুবার মহলা না দিয়ে নামানো হয় না।



ওয়াল্টার্ ফোর্ড ও তাঁর শিক্ষিত খরগোস্

অনেক সময় অভিনেতা অভিনেত্রীরা বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া সত্বেও ক্যামেরার সামনে এসে ভড়কে যান' এবং ভুল ক'রে বসেন, কিন্তু এই মূক প্রাণীরা উপযুক্ত শিক্ষা পেলে ক্যামেরার সামনে এসে কখনই ভুল করেনা! এই জন্য পরিচালকেরা তাঁদের মুখর অভিনেতাদের চেয়ে এই মূক অভিনেতাদের সম্বন্ধে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন থাকেন।

বন্যজন্তুর জন্য চিড়িয়াখানা ও সার্কাসের পশুশালার উপরই চলচ্চিত্রওয়ালাদের সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রতে হয়। কারণ, একসঙ্গে অনেকগুলি হিংস্র পশুকে ছবিতে নামাতে হ'লে এদের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কেবল, যে ছবিতে মাত্র একটি কোনো বিশেষ জানোয়ারের সম্পর্ক আছে, সেখানে লী ডান্কানের রীন্‌টিনের মতো কোনো ভদ্রলোকের নিজের গৃহপালিত পশুকে খুঁজে নেওয়া হয়।

চলচ্চিত্রের দর্শকেরা অনেকেই ছবিতে অরণ্যের হিংস্র পশুরা দাপাদাপি ক'রছে—দেখে হয়ত' অবাক হয়ে ভাবেন যে, এ ব্যাপারটা কেমন ক'রে সম্ভব হয়! সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বনমানুষ সমাকীর্ণ গভীর জঙ্গলের মধ্যে বিপদাপন্ন নায়ক নায়িকাকে দেখে নিশ্চয়ই তাঁরা সভয়ে শিউরে ওঠেন! কিন্তু, কেমন ক'রে এ ছবি তোলা হয় জানা থাকলে তাঁরা ভয় পেতেন না। শুনে হয়ত' অনেকেই আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন যে, এ সব ছবির অধিকাংশই লৌহ-পিঞ্জরের মধ্যে তোলা! পরিচালক যেমন ক্যামেরার চোখের আড়ালে থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীদের গতি নির্দ্দেশ করেন, তেমনি সার্কাসে যিনি বাঘের খেলা দেখান, বা চিড়িয়াখানায় যে লোক সেই বিশেষ পশুর রক্ষক, ক্যামেরার চোখের আড়ালে থেকে সেই সেই লোকই তাদের জানোয়ারগুলিকে ছবিতে পরিচালিত করেন চলচ্চিত্র পরিচালকের ইচ্ছা ও আদেশ অনুযায়ী।

লৌহ পিঞ্জরগুলি এত সুবৃহৎ যে, তারমধ্যে কৃত্রিম অরণ্যের দৃশ্যপট প্রস্তুত করে নেওয়া চলে। নদী ও পর্ব্বত কিম্বা ঝরণা বা গভীর জঙ্গলের দৃশ্যপট যদি কৃত্রিম না ক'রে স্বাভাবিক দেখাবার ইচ্ছা হয়, তাহ'লে সেইরূপ স্থান বেছে নিয়ে তার খানিকটা অংশ লৌহদণ্ড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়, এবং জানোয়ারদের তার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা সেই নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়লে তখন সেখানেই ছবি তোলার ব্যবস্থা হয়। পশুরক্ষক বা শিক্ষকরা ইতিমধ্যে তাদের সঙ্গে নায়ক নায়িকাদের পরিচিত ক'রে দেয় এবং মহলা দিয়ে পশুদের চিত্রোপযোগী শিক্ষা দিয়ে রাখে। যেখানে নায়ক নায়িকারা হিংস্র বন্যপশুদের সম্মুখীন হ'তে ভয় পায় সেখানে ছায়াধর-যন্ত্র তাদের সাহায্য ক'রে। অর্থাৎ পশু ও অভিনেতাদের চিত্র পৃথক পৃথক নেওয়া হয় এবং পরে উভয় চিত্রকে একত্রে সংযুক্ত করে একই ছবিতে পরিণত করা হয়। ক্যামেরার এই কৌশলের গুণে চলচ্চিত্রে অনেক অসাধ্য সাধন দেখানো সম্ভব হ'য়েছে।

অনেক সময় আমরা ছবিতে দেখতে পাই নিউইয়র্কের বড় বড় গগনস্পর্শী (Sky-scrapper) বাড়ীর দেওয়াল বয়ে বয়ে একটি লোক উপরে উঠে যাচ্ছে বা নেমে আসছে। একবার যদি হাত ফস্কে পড়ে যায় তাহ'লে একেবারে চুর্ণ বিচুর্ণ হ'য়ে যাবে? আসলে কিন্তু সে লোক কোনো বাড়ীর দেয়াল বেয়ে ওঠে না। মাটীর উপর শোয়ানো বাড়ীর কৃত্রিম দৃশ্যপটের দেওয়ালের গায়ে গুঁড়ি মেরে মেরে চলে। 'ছায়াধর যন্ত্র উচ্চমঞ্চের উপর থেকে তার সেই ছবি তুলে নেয়। পরে ক্যামেরার কৌশলের গুণে তোলা সে ছবি যখন উল্টো ছাপা হ'য়ে পর্দ্দার উপর এসে পড়ে তখন দেখে মনে হয় একটি লোক যেন যথার্থ ই সেই আকাশ-চুম্বী সৌধের দেওয়াল ব'য়ে ব'য়ে সোজা উপরে উঠে যাচ্ছে! হিংস্র পশু সংক্রান্ত অধিকাংশ ছবিই প্রায় ক্যামেরার কৌশলের গুণেই দর্শকদের চোখের সামনে সত্য ঘটনা বলে প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে, এবং তা দেখে তাদের বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। উচ্চ পর্ব্বতের চূড়া থেকে বা বিশতলা বাড়ীর ছাতের উপর থেকে একটা লোক ঠিক্‌রে সমুদ্রের জলে পড়ে গেলো বা রাস্তার উপর আছাড় খেয়ে পড়লো দেখে আমরা অবাক্ হ'য়ে ভাবি—কী আশ্চর্য্য! এ কেমন ক'রে করে? প্রাণের ভয় নেই! কিন্তু, আসলে পাহাড়ের চূড়ো থেকে বা ছাতের উপর থেকে যেটা সমুদ্রের জলে বা রাস্তার উপর এসে পড়ে সেটা সেই মানুষের একটা কৃত্রিম মূর্ত্তি—আসল মানুষটি নয়! ক্যামেরায় শুধু আসল মানুষটির পড়ার ভঙ্গীটুকু পর্য্যন্ত নিয়ে পরে নকল মূর্ত্তিটির পড়ে যাওয়ার ছবি তোলে, এবং জলের ভিতর থেকে, বা রাস্তার উপর থেকে আবার আসল মানুষটির ছবি নেওয়া হয় একেবারে সে জলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে, নয়ত'—রাস্তার উপর অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে! মাঝের এই ফাঁকিটুকু ক্যামেরায় এত সহজে সেরে নেওয়া যায় ব'লেই—ছবিতে মানুষের পক্ষে বড় বড় পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া, সমুদ্র সাঁতরে পার হওয়া প্রভৃতি অসম্ভব কাণ্ড করাও তুচ্ছ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

হিংস্র পশু নিয়ে নাড়াচাড়াটা অবশ্য এতটা সহজ ব্যাপার হ'য়ে ওঠেনি এখনো। পূর্ব্বেই বলেছি, তাদের জন্য বড় বড় খাঁচা ব্যবহার করতে হয়। ক্যামেরায় ছবি নেবার সময় খাঁচাটি ওঠে না! কারণ, সেটি এত বড়ো যে ক্যামেরার দৃষ্টির বাইরেই থেকে যায়। তাই অতি সহজেই খাঁচাটি বাদ দিয়ে কেবল জানোয়ারগুলির ছবি তোলা হয়। ক্যামেরা নিয়ে ক্যামেরাম্যান থাকেন সেই বড় খাঁচার ভিতর স্থাপিত আর একটি ছোট খাঁচার মধ্যে। অনেক দৃশ্যের ছবি আবার এ-সব ক্ষেত্রে জন্তুদের সঙ্গে একত্র অভিনয় ক'রে তোলা হয় না—বৃহৎ আয়নার



'টমমিক্স্' ও 'টনি' (টমমিক্সের এই শিক্ষিত অশ্ব 'টনি' না থাকলে টমমিক্সকে আজ কেউ চিনতো না)

সাহায্যে জানোয়ারদের প্রতিবিম্ব সহযোগে অভিনয় করা হয়। 'ট্রেডারহর্ণ' ছবির কয়েকটি দৃশ্য প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার অরণ্যে গিয়ে তোলা হ'য়েছে বলে শোনা যাচ্ছে; অবশ্য বাকীগুলি হোলিউডের চিত্রগড়েই তৈরি ক'রে নিয়ে তোলা হ'য়েছে। 'চ্যাঙ্' 'রঙ্গো' বা আফ্রিকা কথা বলে' প্রভৃতি হিংস্র জীবজন্তু বহুল ছবিগুলির



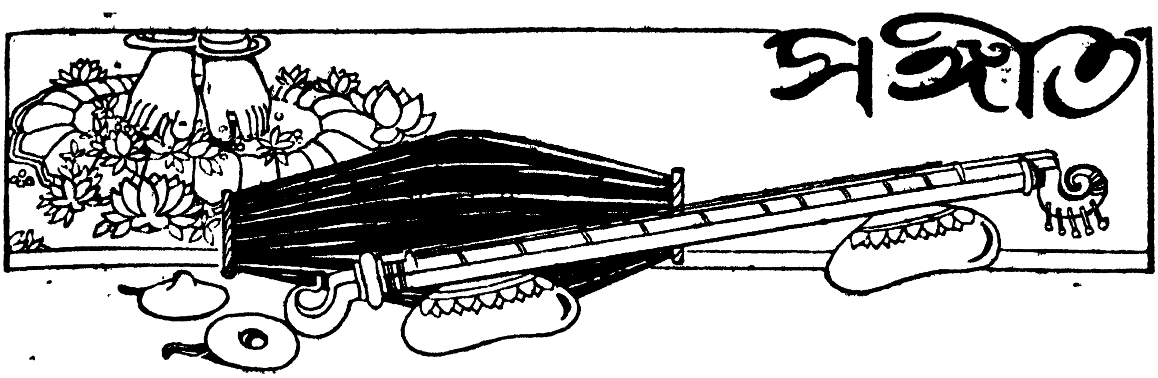
কোর্ড টমসন্ ও তাঁর শিক্ষিত কাকাতুয়া

অধিকাংশই এই ভাবে তোলা হয়। কতক আসল, কতক নকল!

যে ছবিতে একটিমাত্র বাঘ বা একটিমাত্র ভালুক, বা একটি চিতা কি একটি সিংহ অভিনয় ক'রছে দেখা যায় সেখানে বুঝতে হবে—ঐ হিংস্র পশুটি গৃহপালিত কুকুর বিড়ালের মতই অত্যন্ত পোষমানা এবং একেবারে নিরীহ। 'লীয়ো' 'নোয়া' মিনী' প্রভৃতি এই জাতীয় জীব। এদের নিয়ে শিশুরাও নির্ভয়ে অভিনয় করতে পারে।

কোনো কোনো ছবিতে চরম দৃশ্যে (climax) নাটকীয় রস ঘনীভূত ক'রে তোলবার জন্য ইতর-প্রাণীর সাহায্য খুব কাজে আসে। যেমন ধরুন—অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আত্মীয় বন্ধু যখন 'নায়ককে' ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলো, এমন কি তার স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত যখন তার মুখের দিকে চাইলে না—যখন সে সংসারে নিতান্ত অসহায় ও একা—তখন, ছু'টি চোখে অসীম সমবেদনা পূরে কোনো প্রভুভক্ত মূক জীব যদি সেই সবার পরিত্যক্ত মানুষটিকে বন্ধুর মত ঘিরে থাকে তাহ'লে সে দৃশ্য দর্শকের অন্তর স্পর্শ না ক'রে পারে না। অথবা, কোনো কঠিন বিপদের মধ্যে জীবন-মরণের সমস্যার মাঝখানে কেউ যখন রক্ষা করবার নেই—সেই সময় কোনো মূক প্রাণী যদি নিজ জীবন বিপন্ন ক'রেও তার প্রিয় প্রভুকে সেই আপদ থেকে পরিত্রাণ করে, তাহ'লে সে দৃশ্য ছবিখানিকে স্মরণীয় করে রাখে।

অকারণ ছবিতে ইতর প্রাণীর সমাবেশ ক'রে কোনো লাভ নেই। হাস্যরস-প্রধান চিত্র ছাড়া অন্য কোনো ছবিতে তাদের আনতে হ'লে পরিচালকের লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে তাদের সাহায্যে চিত্রের নাটকীয় রস ঘনীভূত ক'রে তোলা যায়। অনেক সময় 'প্রতীক্' স্বরূপ ছবিতে ইতর প্রাণীর ব্যবহার দেখা যায়—যেমন আসন্ন অমঙ্গলের সূচনা স্বরূপ কালপেঁচা, কালো বিড়াল,—আসন্ন মৃত্যুর আভাসরূপে শৃগাল বা শকুন, বসন্তের সমাগম বোঝাতে কোকিল বা পাপিয়া, প্রেমিক যুগলের নিবিড় মিলনের ইঙ্গিত দিতে কপোত মিথুন, ভিটে মাটি যাবার আগে সেখানে ঘুঘু চরাণো—ইত্যাদি প্রতীক্ ছবিকে সুন্দর ক'রে তোলে। চ্যাঙ, রঙ্গো, ট্রেডারহর্ণ, 'আফ্রিকা কথা বলে' প্রভৃতি ছবি বিশেষভাবে ইতর প্রাণীদের খেলা দেখাবার জন্যই তোলা এবং সেই ভাবেই গল্প লেখা! সুতরাং ও ছবিগুলিকে 'জীব চিত্র' বা Animal Series-এর ছবি বলা চলে।



পাহাড়ী-কানাড়া মিশ্র – রূপক

বিরহের গুলবাগে মোর ভুল ক'রে আজ
ফুটলো কি বকুল।
অবেলায় কুঞ্জ বীথি মুঞ্জরিতে
এলে কি বুলবুল্॥
এলে কি পথ ভুলে মোর আঁধার রাতে
ঘুম-ভাঙান চাঁদ,
অপরাধ ভুলেছ কি, ভেঙেছে কি
অভিমানের বাঁধ॥
প্রদীপ নিভে আসে—ইহারি ক্ষীণ আলোকে,
দেখে নিই শেষ দেখা যত সাধ আছে চোখে;
মরণ আজ মধুর হ'লো পেয়ে তব
চরণ রাতুল॥
হে চির-সুন্দর মোর,—জীবন-সন্ধ্যা মম,
রাঙালে রাঙা-রঙে, উদয় উষার সম;
ঝরে পড়ুক তব পায়ে আমার এ
জীবন মুকুল॥

কথা ও সুর :—কাজী নজরুল্ ইস্‌লাম্ স্বরলিপি :—শ্রীজগৎ ঘটক

সা II II সা -া রা মা | মা পা পমা | মজ্ঞা -া রা -া | সা -া ধা I
বি র • হে র্ গু ল্ বা গে • মো র্ ভু ল্ ক
• বে • লা য়্ কু ন্ জ বী • থি • মু ন্ জ

I সা -া সা -া | রা -া সা | রা -া রপা -মপা | মজ্ঞা -া সা II II
রে • আ জ্ ফু ট্ লো কি • ব • • • কু • ল্ অ
রি • তে • এ • লে কি • বু • ল্ • বু • ল্ বি

সা II সা -া রমা -পধা | ধা -া ধা | ধা -া ণধা -পমা | মা রমা -মা I
এ লে • কি • • • প থ্ ভু লে • মো • র্ • আঁ ধা • র

I মপা -া পা -া | মপা -ধা ধা | ধা -া পধা -পমা | মপা -া -া I
রা • • তে • ধু • ষ্ ভা ঙা • ন • • • চাঁ • •

I গমা -গরা -সা -া | -সরা -সরা -গা | -সা -া -া -া | া া সা I
• • • • • • • • • • • • • • • দ্ • • অ

I সা -া রা মা | মা -পা পমা | মজ্ঞা -া রা -া | সা -া ধ্া I
প • রা ধ্ ভু • লে ছ • কি • ভে • ঙে

I সা -া সা -া | রা -া সা | রা -া রপা -মপা | মজ্ঞা -া -া II
ছে • কি • অ • ভি মা • নে• র্ • বাঁ • ধ্ •

শেয়র্ * II গমা গমা -পধা -না -ধা না না | না নর্রা -র্সনা -ধনা -ধা া া I
প্র • দী • • • • প্ নি ভে আ সে• • • • • • • •

I নর্সা সা র্সা -া র্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া -া -া -া -া I
ই • হা রি • ক্ষী ণ্ আ লো কে • • • • •

I ধনা না না না নর্সা -নর্সা -র্রা | র্সা র্না -া -া -া -া -া I
দে• খে নি ই শে• • • য্ দে খা • • • • •

I না না না না না র্সনা -ধপা | পধা পা -া -া -া -া সা I
য ত সা ধ্ আ ছে• • • চে• খে • • • • • ম

তালে II সা সা রা মা | মা -পা পমা | মজ্ঞা -া রা -া | সা -া ধ্া I
র ণ্ আ জ্ ম ধু র হ' • ল • পে • য়ে

I সা -া সা -া | রা -া সা | রা -া রপা -মপা | মজ্ঞা -া সা II II
ত • ব • চ • র ণ • রা• • • তু • ল্ বি

শেয়র্ * II পা পা -পা পজ্ঞা -গজ্ঞা -গা গপা | -পা পা -া -া -া -া -া I
হে চি র সু • • • ন্ দ • র যো • • • • র্

I জ্ঞা পা পনা -ধনা -ধা ধপা -ধা | পা -জ্ঞপজ্ঞা -গা গমা গা -া -া I
জী ব ন • • • • স ন্ ধ্যা • • • • ম • ম • •

I গমা -মা -মা -া মা গমা -পা | মপা -পা পদা দপা -দা -পদপা -মা I
রা • ভা লে • রা ভা • • • • • র• ঙে • • • • •

I মা মা গমগা -ঋা গা গমা -া | -গমপা -পদা পদা -পা -দপা -দমা -া I
উ দ য়• • • উ বা • • • • • র্ • স • ম • • • • •

I পমা -া -া -ঋা ঋা -ঋা ঋসা | -া -া সা -সা -া া সা II
হে • • • চি র সু ন্ • দ র • • অ

তালে II সা -া রা মা | মা -পা পমা | মজ্ঞা -া রা -া | সা -া ধ্া I
রে • প • ড়ু ক ত ব • পা য্ আ • মা

I সা -া সা -া | রা -া সা | রা -া রপা -মপা | মজ্ঞা -া সা I II
র • এ • জী • ব ন • মু• • • কু • ল্ বি

* 'শেয়র্' সাধারণতঃ তালে গীত হয় না ; এই হেতু, 'শেয়র' গাহিবার সময় সঙ্গত বন্ধ রাখাই নিয়ম। 'শেয়র' গীত হওয়ার পর যে স্থল হইতে সঙ্গত চলিবে তাহার পূর্ব্বে 'তালে'—এই কথা লিখিত হইল।

গ্রন্থ-প্রাপ্তি-স্বীকার

সমালোচনার জন্য আমরা নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি—

ব্রহ্মসঙ্গীত, একাদশ সংস্করণ (মাঘ, ১৩৩৮) ; সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ।

"ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা" ; শ্রীঅরবিন্দ। [শ্রীঅরবিন্দের A Defence of Indian Culture হইতে অনূদিত] অনুবাদক শ্রীঅনিলবরণ রায়। মডার্ণ বুক্ এজেন্সি। মূল্য ১।•

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" প্রথম খণ্ড (১—৬ অধ্যায়) ; অন্বয়, স্বামিটীকা, অনুবাদ ও বিবৃতার্থ সহিত। প্রভুপাদ—শ্রীনীলকান্ত গোস্বামি ভাগবতাচার্য্য কর্ত্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত। ১৪,২।১ বাহির মির্জ্জাপুর রোড, গড়পার হইতে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষাল দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১।•

"আধুনিকী" শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। নয়টি প্রবন্ধে আধুনিক সকল ব্যাপারের আলোচনা। মডার্ণ বুক্ এজেন্সি। মূল্য ১৲।

"সরল বাইওকেমিক চিকিৎসা"—ডাক্তার শ্রীশেখরচন্দ্র সামন্ত প্রণীত। ি সামন্ত ফার্ম্মেসী, বর্দ্ধমান। মূল্য ৩৲

"দু-ভাই" সামাজিক ও নৈতিক উপন্যাস ; শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক প্রণীত। ৩৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস। মূল্য ১৲।

"মন্দিরের চাবি" খণ্ডকাব্য ; শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত। ১২৮।৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।•

"সীতা-চিত্র" পৌরাণিক কাহিনী ; শ্রীমতী রত্নমালা দেবী প্রণীত। Aryan Library, 204 Cornwallis St. Calcutta. মূল্য ।•

"বিস্মৃতি" শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কের পদ্যানুবাদ—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য ।•

"নারীর কথা" প্রবন্ধ পুস্তক ; শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। শ্রীঅরবিন্দ লাইব্রেরী, ২০৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। মূল্য ১।•

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" প্রথম খণ্ড (প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়) ; সংস্কৃত ভাষ্য ও টীকা সম্বলিত ; শ্রীআনন্দগোপাল সান্ন্যাল সম্পাদিত। ১১৫নং বাবুডাঙ্গা রোড, সালখিয়া, হাবড়া। ও ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। মূল্য ২৲

"গীতা সোপান"—কুমার শ্রীবিপ্রনারায়ণ তত্ত্বনিধি বি এ প্রণীত। ১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৲

"ফুলের ডালি" ছেলেদের গল্পের বই—শ্রীরামেন্দু দত্ত প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। মূল্য ।•

"লামাদের দেশ তিব্বতে" শিশুপাঠ্য ভ্রমণ কাহিনী—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।•

"মানব-জীবন" ভাবাত্মক প্রবন্ধাবলী।—ডাক্তার লুৎফর রহমান প্রণীত। প্রকাশক—মৌলভী মইনুদ্দীন জোয়ার্দ্দার, পোঃ হাজরাপুর, যশোহর। মূল্য ৸•

"জম্ জম্" খণ্ডকাব্য ; মহম্মদ কজর আলি খান প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান মালপাড়া, পোষ্ট ঘোড়ামারা, জিলা রাজসাহী। মূল্য ১৲

"ক্রীতদাসের আত্মকাহিনী" "Up from Slavery" নামক পুস্তক হইতে অনূদিত। শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ৮৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।৶•

"স্বপ্ন-ছবি" খণ্ডকাব্য ; শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। লালা বিনয়কৃষ্ণ, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲

"কুহমিকা" খণ্ডকাব্য ; শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ২ বি কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা, ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। মূল্য ।৶•

"ব্যথার সাথী" ছোট গল্প ; শ্রীশচীন্দ্রকুমার সিংহ প্রণীত। ৮৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। মূল্য ১।•

"বাঙ্গলা দেশের গাছপালা" কবিরাজী ঔষধ সংক্রান্ত বই। কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন প্রণীত। বাণী ট্রেডার্স, ৭০।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ।/•

"সটীকঃ জাতকালঙ্কারঃ" জ্যোতিষঘটিত বই। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ পাঠক—কাব্য-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ কৃত—বঙ্গানুবাদ সহিতঃ। ৯৭।৩ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲

"যক্ষ্মা-প্রশমন" শিশুমঙ্গল সমিতিতে পঠিত প্রবন্ধ—শ্রীবিধুভূষণ পাল প্রণীত। ১১ আনন্দ রায় ষ্ট্রীট, আর্ম্মাণীটোলা, ঢাকায় প্রাপ্তব্য। মূল্য ।•

"নয়াবাঙ্গলার গোড়া পত্তন" প্রথম ভাগ (তত্ত্বাংশ) শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত। চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২।•

"লোহাগড়া কাহিনী"—স্থানীয় ইতিহাস ; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বৈজপত্রিকা কার্য্যালয়, যশোহর ; ও মজুমদার ব্রাদার্স, লোহাগড়া। মূল্য ৩৲

"চলার পথে"—উপন্যাস ; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—এনুয়াল রেজিষ্টার আফিস, ৭৯।২৫ ডি, লোয়ার সার্কুলার রোড। মূল্য ২৲

"ফেরার পথে"—উপন্যাস, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—এনুয়াল রেজিষ্টার আফিস, ৭৯।২৫ ডি, লোয়ার সার্কুলার রোড। মূল্য ১।•

"মরণের পরপারে"—দর্শন ; শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি-বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—২৫৫, অগস্ত্য কুণ্ড, কাশী। মূল্য এক মুদ্রা।

সন্ধান

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ এম-এ, বি-এল, ডি-লিট (পেরিস)

(হাফিয হইতে মূলের ছন্দের অনুকরণে)

সন্ধানে থাম্‌বো না তার, যাবৎ না পাই তার মিলন ;
হয় পাবো সেই জীবন নাথ, নয় দেহ ছাড়্‌বে জীবন।

দেখো গো মরণ পরে আমার সে কবর খুঁড়ে,
অন্তরের আগুন হ'তে উঠ্‌ছে ধূম "কাফন" ফুঁড়ে।

মুখখানি একটু দেখাও, হ'ক্ সারা বিশ্ব ব্যাকুল ;
ঠোঁট দু'টী একটু খোলো, লোক হউক কেঁদে আকুল।

পরাণ মোর ঠোঁটে এল, মনে খেদ তার অধরে
কিছুই না পেয়েই বুঝি পরাণ মোর যাত্রা করে।

তোমার ঐ মুখের খেদে প'ড়েছি প্রাণ সঙ্কটে,
গরীবের মনের আশা ঐ মুখে পূর্ণ বটে।

বলিলাম নিজের মনে, "তার থেকে মন ফিরে নে ;"
বলিল "এ কাজ সাজে নিজ পরে হয় প্রভু যে।"

তোমার কি' চুলের পেঁচে পঞ্চাশটা ফাঁদ র'য়েছে ;
এ ভাঙ্গা মনের কি ছাই সে পেঁচে উদ্ধার আছে ?

ফুটবে ফুল গোলাপ-বাগে তোমার ঐ মুখটী হেন,
এই আশে মলয় আসে বাগিচায় পুনঃ পুনঃ।

শঠের ন্যায় নিতুই নব বঁধু কি করবো গ্রহণ !
আমি আর আস্তানা তার যাবৎ না ছাড়্‌বো জীবন।

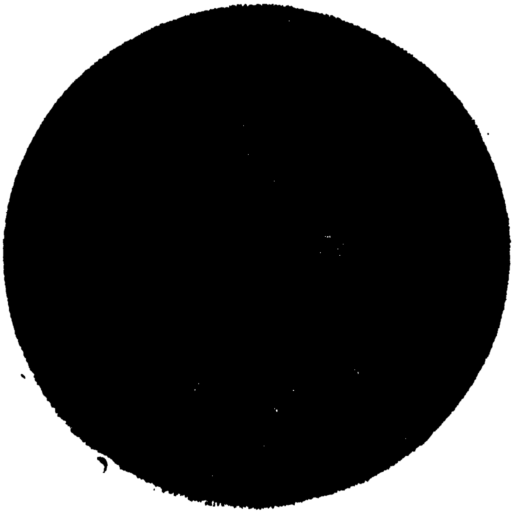
দাঁড়াও হে, তোমার গঠন আর গতির মাধুরীতে,
জন্মাবে "সার্ভ"—"আনার" বাগিচায় চারি ভিতে।

প্রেমিকের দলের মাঝে হাফেযের সুনাম রটে,
যেখানেই নামটী তাহার লোক-মুখে বেরোয় ঠোঁটে

শোক-সংবাদ

পরলোকে স্বর্ণকুমারী দেবী

সত্যসত্যই বাঙ্গালা-সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল—পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী আর ইহজগতে নাই। বিগত ১৯শে আষাঢ় রবিবার পূর্ব্বাহ্নে তিনি তাঁহার বালিগঞ্জের বাসভবনে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। আমরা আয়োজন করিতেছিলাম, আগামী ১৪ই ভাদ্র তিনি সাতাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ করিলে, আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিব, বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিব; হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল পাঁচদিনের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিলেও আমরা তাঁহার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছি।



স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী

১২৬৪ সাল (ইং ১৮৫৭) ১৪ই ভাদ্র স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়। ইনি স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বাঙ্গলা, ইংরাজী ও সংস্কৃতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস-রচয়িত্রী এবং সর্ব্বপ্রথম পত্রিকা-সম্পাদিকা। স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে ছোট গল্পের প্রবর্ত্তন করেন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। ১২৯১ হইতে ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত (মধ্যে চার পাঁচ বৎসর বাদ) যেরূপ যোগ্যতার সহিত তিনি "ভারতী"র সম্পাদনা করেন, বাঙ্গলা পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাহা আজিও আদর্শ হইয়া আছে।

নারীজাতির উন্নতিকল্পে তিনি অগ্রণী ছিলেন। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের একত্র মিলন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও বিধবাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করিয়া বিধবাদের সাহায্য প্রভৃতি উদ্দেশ্য লইয়া ১২৯৩ সালে তিনি তাঁহার পরলোকগতা জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর সহযোগে "সখি সমিতি" নামে এক মহিলা-সমিতি স্থাপন করেন। মহিলা সমাজের মধ্যে শিল্পোন্নতিকল্পে "মহিলা শিল্প মেলা" নামে এক মেলাও তাঁহার চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে প্রথম উপন্যাস—দীপ-নির্ব্বাণ, হুগলীর ইমামবাড়ী, ছিন্ন মুকুল, স্নেহলতা, বিদ্রোহ, কাহাকে, মেবার-রাজ, ফুলের মালা, নবকাহিনী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে 'ফুলের মালা' ও 'কাহাকে' ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহার অপরিমেয় দানের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'জগত্তারিণী স্মৃতি পদক' প্রদান করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ভবানীপুরের অধিবেশনে তিনি সভানেত্রীর পদে বৃত হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার যে পরিবার শিক্ষায়, দীক্ষায়, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও শিল্প-কলায় বাঙ্গলাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তিনি ছিলেন সেই বিখ্যাত ঠাকুর বংশের সার্থক-জন্মা মহিলা। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী পরলোকগতা হইয়াছেন; এখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষাল ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী জীবিত আছেন।

৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, ঋষি-প্রতিম মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিগত ৪ঠা জুন সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি 'মাষ্টার মহাশয়' নামেই পরিচিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে 'মাষ্টার মহাশয়' গৃহ-দেবতার মত ছিলেন। মাষ্টার মহাশয় নির্লিপ্ত গৃহ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে; এমন

সুন্দর পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি কমই আছে—নাই বলিলেই হয়। তিনি এই কথামৃতে নিজের নাম দেন নাই, 'ম-লিখিত' বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গুরু-ভক্তি অনন্য-সাধারণ ছিল, রামকৃষ্ণদেবের নাম করিতেই তিনি আবেশ-বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পরলোক-

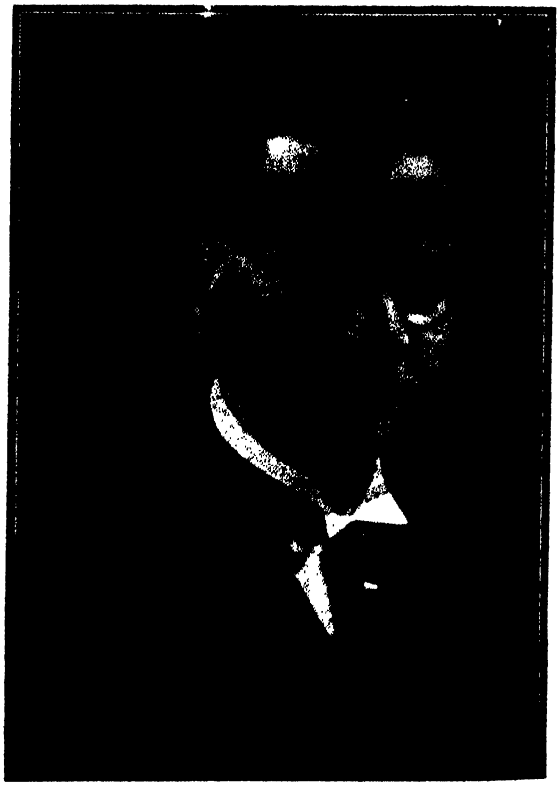


স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

গমনে আমরা শোকপ্রকাশ করিব না, তিনি তাঁহার চির জীবনের বাঞ্ছিত গুরু-চরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন যে !

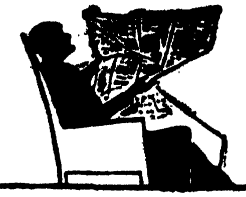
পরলোকে দ্বিজেন্দ্রনাথ

বিগত ১০ই আষাঢ় শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪টা ১০ মিনিটের সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার ১৪নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ক্রম ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রথমে বি, এল পাশ করিয়া ওকালতী ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। পরে বিলাত গিয়া তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসেন। তিনি কলিকাতা হাই-কোর্টের একজন প্রবীণ ব্যারিষ্টার ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত যশঃ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের (বেঙ্গল) সহঃ-সভাপতি এবং কলিকাতা ফুটবল লীগের সভাপতি ছিলেন। গত বৎসর তিনি ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গত কয়েক বৎসর হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি মোহনবাগান ক্লাবের জেনারাল সেক্রেটারী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বেঙ্গল ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পৃথিবীতে তাঁহার শত্রু বলিতে কেহ ছিল না। তিনি দরিদ্রের বন্ধু ও দানশীল ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোকগমন করেন এবং মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবেদার-মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার চার পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান; তন্মধ্যে দুইটী বিবাহিতা। তাঁহার দুই ভ্রাতা বর্ত্তমান। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু। তিনি পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহা-



স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

শয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা দ্বিজেন্দ্রবাবুর আত্মীয় স্বজনগণের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।



সাময়িকী

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বজেট—

বিগত ২৮শে জুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সিনেটের সম্মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেট দাখিল করেন। এই বাজেটে আলোচ্য বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয় ১৯৬৭৬৮৩৲, ব্যয় ১৯:৭৭৮৫৲ এবং উদ্বৃত্ত ৩৯৯৩৭৲ টাকা দেখিতে পাওয়া যায়। বাজেট দাখিল করিতে গিয়া ডাক্তার রায় এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ৫ লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য চাহিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট যদি উহা মঞ্জুর না করেন, তাহা হইলে দুই এক বৎসরের ভিতরই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমান বাজেটে যে টাকাটা উদ্বৃত্ত দেখা যাইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া, আয় বৃদ্ধি করিয়া এবং গবর্ণমেণ্ট ৩৬০,০০০৲ টাকা অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, তাহা হিসাবে ধরিয়া ঐ টাকা উদ্বৃত্ত দাড়াইয়াছে। তিনি আরও বলেন, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অর্থসাহায্যের দ্বারাই হউক, কিম্বা আয়ের নূতন পথ বাহির করিয়া, অথবা ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া আয় বৃদ্ধি না করিতে পারিলে দুই এক বৎসরের অধিককাল সুযোগ্যভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চালান আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। অতঃপর ডাক্তার রায় বলেন, এই নবম বার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট উপস্থিত করিয়া সৌভাগ্যলাভ করিলেন। গত ১৯২২ সাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কট আরম্ভ হইয়াছে। স্যার আশুতোষ মুখুয্যের মৃত্যুর পর হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্দ্দিন দেখা দিতে থাকে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা আপোষ নিষ্পত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাকে খুব সন্তোষজনক বলা যায় না।

শোনা কথা—

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থা কি হইবে, তাহা জানিবার জন্য দেশের অনেকেই উৎসুক হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিলাতের ভারত-সচিব, এ দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সেদিন যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেই মোটামুটি অনেক কথা জানিতে পারা গিয়াছে। স্থানান্তরে আমরা সে বিবরণ প্রকাশ করিলাম। কিন্তু, এ বিষয়ের গুজবের আর অন্ত নাই। এখানকার সংবাদপত্রগুলির সিমলার সংবাদদাতাগণ যখন-তখনই 'বিশ্বস্তসূত্রে' অবগত হইয়া অনেক সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকেন; সরকার হইতে সে সম্বন্ধে কোন কথাই জানিতে পারা যায় না এবং তাহার সত্যমিথ্যাও নির্দ্ধারণ করা যায় না। এই রকম একটা বিশ্বস্তসূত্রে শোনা কথা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কথাটা এই—

"শোনা গেল, ভারত গবর্ণমেণ্ট নাকি মোটামুটি সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের ১৪ দফা দাবী মিটাইয়া দিবার জন্য লণ্ডনে সুপারিশ করিয়াছেন। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথা থাকিবে, বাঙ্গলা ও পঞ্জাবে শতকরা ৫১টি পদ মুসলমানদের ভাগে পড়িবে—এমন কি জমীদার, ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিশেষ যুক্ত নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যেও মুসলমান পদসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, মন্ত্রিমণ্ডলেও মুসলমান মন্ত্রীপদ সংখ্যা "রিজার্ভ" থাকিবে ইত্যাদি। বড়লাটের মন্ত্রিসভার মধ্যে নাকি স্যার ব্রজেন্দ্র মিত্র এবং স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার এই সুপারিশের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং সাহস করিয়া নাকি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে হিন্দু সমাজের প্রতি ঘোরতর অবিচার হইবে।" 'আনন্দ বাজার' কিন্তু এ সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং ইহাকে সাম্প্রদায়িক ধাপ্পাবাজী বলিয়াছেন।

ভারত-সচিবের বক্তৃতা—

বিলাতের কমন্‌স সভায় ভারত-সচিব শ্রীযুক্ত সার সামুয়েল হোর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার সার-মর্ম্ম বিবৃত হইল। তিনি তিনটী বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন (১) অর্ডিনান্স,

(২) সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও (৩) রাষ্ট্রতন্ত্র-রচনার পদ্ধতি। প্রথমেই অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে সার সামুয়েল বলেন, ভারতের কর্তৃপক্ষ যে কার্য্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সাধারণভাবে বলিতে গেলে তাহা আইন অমান্য আন্দোলনকে সম্পূর্ণ দমনে রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। আমি এখনও বলিতে চাই যে, অত্যধিক ক্ষমতা প্রয়োগের যে অভিযোগ করা হয় তাহার মূলে ভিত্তি নাই। তবে এই সব ক্ষমতা যে খুব কঠোর তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু রাষ্ট্রের সুসংহত বল ও শক্তি নষ্ট করিয়া আইন অমান্য আন্দোলন যে সাফল্য লাভ করিতে পারে না, তাহা প্রমাণ করিবার আবশ্যকতাবোধে এই সব কঠোর ক্ষমতা একান্তই সমর্থনীয়। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দশ হাজার লোকের মধ্যে এক জনকেও এবং অর্ডিন্যান্স অনুসারে কুড়ি হাজারের মধ্যে একজনকেও অভিযুক্ত করা হয় নাই। পক্ষান্তরে, এই সব জরুরী ক্ষমতা থাকায় লোকের ধন প্রাণ নষ্ট হওয়া নিবারিত হইয়াছে এবং বল প্রয়োগ করিবার প্রয়োজনীয়তাও বহুল পরিমাণে যে কমিয়া গিয়াছে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বাস্তবিক যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে, শুধু সেখানেই অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং এখন ইহার প্রয়োগও ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুষ্কৃতকারীরা দমিত হইলেও তাহারা এখনও তাহাদের ধ্বংসকর অভিযান ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন।

এইরূপ অবস্থায় গবর্মেণ্টের নীতি কত দূর সঙ্গত তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে,—আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং গবর্মেণ্টের মঙ্গলকল্পে গবর্মেণ্টের এই কার্য্য আবশ্যকীয় কি না এবং ইহা দ্বারা জাতিকে অত্যাচার-উৎপীড়নের হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে কি না। গবর্ণমেণ্ট এই দিক দিয়া পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিশেষ ক্ষমতাগুলি রাখা একান্তই প্রয়োজন। প্রদেশ সমূহের এবং জেলাসমূহের প্রয়োজন অনুসারে এই সমস্ত ক্ষমতা খুব সতর্কতা ও সমবেদনার সহিত প্রয়োগ করা হইবে। এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাকে যে সংঘর্ষে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আহ্বান করা হইয়াছে, আমরা তাহা দমন করিবার জন্য আমাদের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

তাহার পর সার স্যামুয়েল সদস্যদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, যাবৎ সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা না হইবে, তাবৎ কেন্দ্রীয় কিম্বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টে কোন শাসনতন্ত্রগত উন্নতি বিধান করা যাইবে না। গবর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন যে, সম্প্রদায় সমূহ নিজেরাই এই সমস্যার মীমাংসা করিবেন; কিন্তু সেই আশায় নিরাশ হইতে হইয়াছে। গত ৬ মাসে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তীব্র ও জটিল হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই এই বিষয়ের একটা সিদ্ধান্ত করিবেন এবং সেই সিদ্ধান্ত তাঁহারা গ্রীষ্মকালেই প্রকাশ করিবেন। কবে এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হইবে, তৎবিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তবে বাধা-বিঘ্ন যতই প্রবল হউক না কেন এবং বিপদ যতই থাকুক না কেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের শাসনতন্ত্রগত কার্য্যপদ্ধতি লইয়া অগ্রসর হইবেনই এবং গ্রীষ্মকালের মধ্যেই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবেন।

নিখিলভারত যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়া সার স্যামুয়েল হোর বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকের মত বৃহৎ সভার নিয়মমাফিক অধিবেশন দ্বারা গুরুতর সমস্যা-গুলির মীমাংসা করিতে গেলে শুধু বিলম্বই ঘটিবে। সুতরাং তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত দিতে চান। ভারতের অন্যান্য সমস্যাগুলি সম্বন্ধেও যদি অনেকখানি অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে কোন বিল পেশ করিবার পূর্ব্বেই শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করিবার জন্য পার্লামেণ্টের উভয় গৃহের একটি মিলিত কমিটি গঠন করা হইবে। এই কমিটি ভারতীয় প্রতিনিধি-গণের সহিত পরামর্শ করিবেন এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় মতের প্রভাব বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বিবৃতি—

কমন্স সভায় ভারত-সচিব যে বিবৃতি প্রদান করিয়া-ছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা স্থানান্তরে দিলাম। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী রাইটার্স বিল্ডিংএর এক বিশেষ অধিবেশনে সেই সকল বিষয় সম্পর্কে একটী তালিকা পেশ করিয়াছেন। কলিকাতার বিভিন্ন

সংবাদ-পত্রের এবং সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পেষ করা হইয়াছে।

(১) একটি বিলে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইবে, এই নীতি গৃহীত হইয়াছে।

(২) শাসন সংস্কারের পথে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে মহামান্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

(৩) প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ভারতবাসীদের সহযোগিতা এবং পরামর্শ অনুসারে মীমাংসিত হইবে।

(৪) গ্রীষ্মকালের ভিতর সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান (৫) কি প্রকারে ভারতবাসীদের মতামত গ্রহণ করা হইবে তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা।

(ক) পরামর্শ-সমিতির দীর্ঘ অধিবেশন, (খ) যে সকল বিষয় পরামর্শ-সমিতি আলোচনা করেন নাই, সেই সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ভারতীয়গণের সহিত লণ্ডনে আলোচনা, (গ) বিল পেশ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় প্রতিনিধিগণের সহিত বিশেষ প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটী যুক্ত-কমিটী গঠন। ১৯১৯ সনের যুক্ত-কমিটির সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্য থাকিবে। পার্লামেণ্ট বিল গ্রহণের পূর্ব্বে কমিটি সরকারী প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন এবং সে সকল ভারতীয়গণের সহিত আলোচনা করা হইবে তাঁহারা সাক্ষী বলিয়া গ্রাহ্য হইবেন না। (ঘ) প্রয়োজন হইলে (ক) ও (গ) সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য লণ্ডনে আলোচনার বন্দোবস্ত করা হইবে।

(৬) মোট কথা এই যে, কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইবে গোলটেবিল বৈঠকের নীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্য্য করিবার জন্যই এই তালিকা উপস্থিত করা হইয়াছে।

প্রবেশিকা-পরীক্ষা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার সার হাসান সারওয়ার্দির সভাপতিত্বে গত ডিসেম্বর মাসে এক কমিটী নিযুক্ত হয়! এই কমিটির রিপোর্ট শীঘ্রই সিনেট সভায় পেশ হইবে। সিনেট সভায় গৃহীত এবং গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে আগামী ১৯৩৭ সাল হইতে উহা কার্য্যকরী হইবে। প্রকাশ, কমিটি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পরীক্ষার্থিগণ ইংরাজী ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে মাতৃভাষা, যথা বাঙ্গালা, উর্দ্দু, আসামী বা হিন্দী ভাষার সাহায্যে উত্তর দিতে পারিবে। পরীক্ষার্থিগণকে (১) ইংরাজী, (২ গণিত, (৩) মাতৃভাষা, (৪) একটী প্রাচীন ভাষা, যথা, সংস্কৃত, পার্শি, ল্যাটিন প্রভৃতি, (৫) প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং (৬) ইতিহাস ও ভূগোল, এই কয়েকটী বিষয়ে পরীক্ষা দিতেই হইবে। মাতৃভাষা দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। মুখ্য মাতৃভাষা, যথা,—বাঙ্গলা, উর্দ্দু, আসামী ও হিন্দী এবং গৌণ মাতৃভাষা, যথা,—খাসী, গারো, মণিপুরী ও নেপালী। তাহা ছাড়া, যে কেহ ইচ্ছা করিলে মেকানিকস্, প্রাথমিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ব্যবহারিক ভূগোল প্রভৃতি যে কোন একটী বিষয় লইতে পারিবে। ইহার নম্বর ১০০র মধ্যে ৩০এর অধিক হইলে তাহা মোট নম্বরের সহিত যোগ হইবে। যে সকল পরীক্ষার্থী মুখ্য মাতৃভাষা না লইয়া গৌণ মাতৃভাষা লইবে, তাহাদিগকে এই ইচ্ছাধীন বিষয় সমূহের মধ্যে একটী লইতেই হইবে, কিন্তু দুইটীর অধিক লইতে পারিবে না। ছাত্রীদের জন্য কমিটি পৃথক ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছাত্রীরা ইচ্ছা করিলে বাধ্যতামূলক গণিত, প্রাচীন ভাষা বা প্রাথমিক বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কারুশিল্প, সঙ্গীত ও পারিবারিক বিজ্ঞান—এই কয়টী পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে। ইংরাজী শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন জন্য কমিটী প্রতি স্কুলে অন্ততঃ তিন জন এম, এ কিম্বা বি,এ অনার্স অথবা বি-টি পাশ শিক্ষক রাখিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে সকল হেডমাষ্টার ও সহকারী মাষ্টার ১০ বৎসরকাল অধ্যাপনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যোগ্যতার সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত অপর শিক্ষকদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যোগ্যতার সার্টিফিকেট লইতে হইবে। যাহারা ইংরাজী পড়াইবার জন্য নিযুক্ত হইবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাদের নাম রেজেষ্টারী করিতে হইবে। কমিটী আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে কৃষিকার্য্য, বয়ন, সূত্রধরের কাজ, কর্ম্মকারের কাজ প্রভৃতির যে কোন একটী বিষয়ে কর্ম্মকারের কিছুকালের জন্য শিক্ষালাভ

করিতে হইবে এবং স্কুলে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

'ভারতবর্ষে'র খ্যাতনামা লেখক, কবি শ্রীমান্ হুমায়ুন কবীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সরকারী বৃত্তি লইয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য অক্সফোর্ডে গিয়াছিলেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "মডার্ণ গ্রেট্‌সে" প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় "মডার্ণ গ্রেটসে" প্রথম শ্রেণী লাভ করেন নাই। অক্সফোর্ডে তিনি ইউনিভার্সিটী ইউনিয়ানের সেক্রেটারী এবং পরে লাইব্রেরীয়ান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারত বাসীর পক্ষে লাইব্রেরীয়ানের পদ লাভও এই প্রথম। তিনি গত ১০ই জুন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে যোগদান করিবেন। ডাঃ সৈয়দ হেদায়েতুল্লাও সরকারী বৃত্তি লইয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য লণ্ডনে গিয়াছিলেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "বোটানী"তে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়া ১০ই জুন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা ইঁহাদের উন্নতি কামনা করি।

অর্ডিনান্সের পুনরাগমন—

সিমলা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বিগত ৩০শে জুন স্পেশ্যাল ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিনান্স জারী করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে কয়েকখানি অর্ডিনান্স জারি হইয়াছিল, তাহার মেয়াদ ৩রা জুলাই শেষ হইয়া যাওয়ায় এই মিলিত অর্ডিনান্স জারি হইল। ইহাতে জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্স, বে-আইনী সমিতি বিষয়ক অর্ডিন্যান্স এবং বয়কট অর্ডিন্যান্সের অধিকাংশ বিশেষ বিধানই স্পেশাল ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্সের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

কয়েকটি বিধান পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহা এই :—

(১) সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা।

(২) জাহাজের সম্পত্তি দখল করার ক্ষমতা।

(৩) অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ করার ক্ষমতা এবং রেল স্টীমার ইত্যাদি। সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় যানবাহন নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা।

স্পেশাল ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্স দ্বারা কতকগুলি বিধান বৃটিশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এগুলি ভারতের সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইবে। এই শ্রেণীর বিধানগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইল—প্রেস আইন সংশোধক বিধান। অন্যান্য বিধানগুলি অবশ্য ভারত শাসন আইন অনুসারে যে কোন প্রদেশে অথবা প্রদেশের অংশ বিশেষে প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। তবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেগুলি কার্য্যতঃ প্রচলিত হইবে না।

নূতন অর্ডিন্যান্সের দ্বারা গৃহীত ক্ষমতা একরূপ সীমাবদ্ধ ও সংযতভাবে প্রয়োগ করা হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। যথা :—

১। নূতন অর্ডিন্যান্সের মধ্যে এমন কয়েকটি বিধান আছে যেগুলি ভারতের সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইবে। এইগুলি ব্যতীত অন্যান্য বিধানগুলি বৃটিশ ভারতের নিম্নলিখিত অংশে মোটেই প্রয়োগ করা হইবে না :—(ক) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঁচটি জেলার মধ্যে চারিটি জেলায়, (খ) মুলতান ও রাওলপিণ্ডি বিভাগসহ পাঞ্জাব প্রদেশের ২৯টি জেলার মধ্যে ১৭টি জেলায়, (গ) যুক্তপ্রদেশের ৪৮টির মধ্যে ২৬টি জেলায়, (ঘ) বাঙ্গালার ১১টি জেলায়, (ঙ) মধ্য-প্রদেশে ২২টি জেলার মধ্যে ১০টি জেলায়, (চ) আসামের ১৪টি জেলার মধ্যে ছয়টি জেলায়।

ইহাতে দেখা যায় যে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের অর্দ্ধাংশেরও বেশী স্থান অর্ডিন্যান্স দ্বারা আবদ্ধ হইবে না। তথাকার অধিবাসীরা যদি গোল-মাল না করে তাহা হইলে অর্ডিন্যান্সের কোন বিশেষ বিধান তথায় প্রয়োগ করা হইবে না। এইরূপে মধ্য প্রদেশেরও প্রায় অর্দ্ধাংশ অর্ডিন্যান্স-মুক্ত থাকিবে।

২। উপরোক্ত স্থানগুলি ব্যতীত মান্দ্রাজ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ এবং আজমীঢ়মাড়োয়ারের সমস্ত স্থানই জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্সের অনুরূপ বিশেষ বিধানের অধীন হইবে।

(৩) বে-আইনী প্ররোচনা নিবারক অর্ডিন্যান্সের অনুরূপ বিশেষ বিধানগুলি (যাহাতে খাজনা বন্ধ ও রাজস্ব বন্ধ

আন্দোলন দমনের বিধান আছে) খুব অল্প পরিমিত স্থানেই প্রচলিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে যুক্ত-প্রদেশের ২১টি জেলায়, বোম্বাইয়ের একটি জেলায় এবং আজমীঢ়মাড়োয়ারের একটু সামান্য স্থানে এই সমস্ত বিধান প্রবর্ত্তন করা হইবে।

(৪) এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কতিপয় ক্ষমতা রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেও অপর-কয়েকটি ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অথবা কোন কোন জেলায় সেগুলি প্রয়োগ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। দৃষ্টান্তস্থলে মধ্যপ্রদেশের কথা বলা যাইতে পারে। বয়কট অর্ডিনান্স তথায় প্রচলিত রহিয়াছে বটে ; তবে ছয়টি জেলায় তথাকার গবর্ণ্মেণ্ট এই বিধানগুলি প্রয়োগ করিতেছেন না।

জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিনান্সের অনুরূপ কতিপয় ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন বলিয়া দিল্লীর শাসনকর্ত্তা জানাইয়াছেন। বর্ত্তমানে মাদ্রাজের তিনটি জেলায় বে-আইনী প্ররোচনা নিবারক অর্ডিনান্স প্রচলিত রহিয়াছে। এই অর্ডিনান্সের অনুরূপ ক্ষমতাগুলি পরিত্যাগ করিতে মাদ্রাজ গবর্ণ্মেণ্ট সম্মত হইয়াছেন। বোম্বাই গবর্ণ্মেণ্ট ২০টি জেলায় বয়কট ও ভীতি প্রদর্শক অর্ডিনান্সের অনুরূপ ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করিবেন না।

বাঙ্গলা গবর্ণ্মেণ্ট বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে তাঁহাদের যে বিশেষ ক্ষমতা আছে, তাহার কোনটির ১০টির জেলায় প্রয়োগ করা হইবে না।

যুক্তপ্রদেশের ২৬টি এবং পাঞ্জাবের ১৭টি জেলায় বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইবে না।

বিহার উড়িষ্যা গবর্ণ্মেণ্ট ৫টি জেলায় কয়েকটি বিধান প্রবর্ত্তন করিবেন না।

বয়কট ও ভীতি প্রদর্শন নিবারক অর্ডিনান্সের অনুরূপ ক্ষমতা আসামের ছয়টি জেলায় প্রবর্ত্তন করা হইবে না।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণ্মেণ্ট একমাত্র পেশোয়ার জেলা ছাড়া আর সমস্ত জেলা হইতেই সমস্ত প্রকার বিশেষ বিধান তুলিয়া লইতেছেন।

কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে বলা হইতেছে, বিশেষ ক্ষমতার বন্ধন একটু শিথিল করা হইল বটে, কিন্তু ইহাতে যদি দেখা যায় যে, কোনও স্থলে আবার বে-আইনী কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, তাহা হইলে গবর্ণ্মেণ্ট সেই সকল স্থলে প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে বিরত হইবেন না।

বাঙ্গলা সরকারের ইস্তাহার—

শ্রীযুক্ত বড়লাট ৩০শে জুন তারিখে ১৯৩২ সালের স্পেশাল পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। বিগত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখ যে ৪টি অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছিল, তাহার বিধানাবলী মিলাইয়া এই অর্ডিন্যান্স রচিত হইয়াছে। এই নূতন অর্ডিন্যান্সের পঞ্চম অধ্যায় বাদে অন্যান্য সমস্ত অংশ বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের ইচ্ছা যে, বাঙ্গলা দেশের যে সমস্ত স্থানে এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে, সেই সমস্ত স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে বর্ত্তমানে এই অর্ডিন্যান্স জারী করা হইবে না। তদনুসারে নিম্নলিখিত কয়টি জেলা' অর্ডিন্যান্স প্রযুক্ত করা হইবে না :—

দার্জ্জিলিং, মালদহ, বগুড়া, ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, খুলনা, নোয়াখালি এবং পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম।

ভরসা করা যায় যে, এই সমস্ত জিলার কোনটিতে অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করা হইবে না। কিন্তু এই সমস্ত জিলার অধিবাসীদের আচরণের ফলে গবর্ণ্মেণ্ট যদি উহা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, তবে তাহা প্র... করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

সম্পাদকের বিপত্তি—

এদেশে সংবাদপত্র পরিচালনের অনেক বিপদ আছে ; মানহানির জন্য আদালতে অভিযুক্ত হওয়া তাহার অন্যতম। সংপ্রতি সাপ্তাহিক "বাঙলা"র সম্পাদক, সাহিত্যিক স্নেহাস্পদ শ্রীমান বিজয়রত্ন মজুমদার এই বিপদে পড়িয়াছিলেন। আদালতের বিচারে তিনি বিপন্মুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। "বাঙলা" বহুদিন হইতে বঙ্গদেশীয় টেক্সটবুক কমিটির কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন ; যে সকল পুস্তক কমিটির বিজ্ঞ সভ্যদিগের মতে ছাত্রদিগের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত, সে সকল পুস্তক কিরূপ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ তাহা দেখাইয়া সহযোগী "বাঙলা" বাঙ্গালার ছাত্রদিগের উপকার সাধনের চেষ্টা করিতেছেন।

সেই প্রসঙ্গে সহযোগী ডাক্তার গিরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত বলিয়া প্রকাশিত 'শরীর পালন' পুস্তকের আলোচনা করিয়া তাহার ত্রুটী প্রদর্শন করেন এবং বলেন, জানা গিয়াছে, উহা অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির লিখিত। ইহাতে গিরীন্দ্রবাবু তাঁহার মানহানি হইয়াছে বলেন নাই বটে, কিন্তু অবনীবাবু মানহানির দাবীতে নালিশ রুজু করেন। বিচারকালে অনেক রহস্য প্রকাশ পাইয়াছিল। বিজ্ঞ বিচারক যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, কতকগুলি লোকের পাঠ্যপুস্তক-লেখক ও ব্যবসায়ী ভিন্ন ভিন্ন নামে পুস্তক ছাপাইয়া কোন কৌশলে যেমনি কমিটির দ্বারা পাঠ্যপুস্তক-তালিকাভুক্ত করিয়া লন। বিচারক মিঃ জে, কে, বিশ্বাস মহাশয় এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া অনাচারের মূলোৎপাটন করিবার জন্য টেক্সট বুক কমিটিকে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। এখন কমিটি তাহা করেন কি না, তাহা দেখিবার জন্য বাঙ্গালার শিক্ষার্থীদিগের অভিভাবকবর্গের কৌতূহল অবশ্যই স্বাভাবিক; কেন না, অনাচারের অভিযোগ যথাযথ বলিয়া উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা যায় না।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "খরস্রোতা"—২৲

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
"শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজিউর উপদেশাবলী" ১ম ভাগ—১৲

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য-লহরী উপন্যাস-মালার অন্তর্গত
"পৈশাচিক প্রতিহিংসা" ও "বিষাক্ত বাষ্প-রহস্য"
প্রত্যেকখানি—৸০

শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ বি-এল প্রণীত উপন্যাস
"ঋষিকের ছেলে"—২৲

শ্রীযুক্ত শিবভূষণ বারিক বি-এ প্রণীত "মুসোলিনি"—৸০

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সাঁঝের আলো"—৷০

অবসর-প্রাপ্ত সাবজজ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এল প্রণীত
"সন্ধ্যা-বন্দনা বা ভগবচ্চিন্তা"—৷০

শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "দশচক্র"—১৲

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী
"ইতালিতে বারকয়েক"—১৷০

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী প্রণীত কাব্য "তীর্থপথে"—১৲

শ্রীযুক্ত রাইমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রবন্ধাবলী "গুচ্ছ"—৷৶০

শ্রীযুক্ত বন্দে আলী মিঞা প্রণীত গল্পের বই "মেঘকুমারী"—৷০

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই "এ যুগের দৈত্য"—৷০

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি-বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত
"মরণের পরপারে বা বৈদিক সাহিত্যে পরলোক-তত্ত্ব"—১৲

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী প্রণীত উপন্যাস "সোনার বাঙলা"—৷০

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বাঙ্গালীর বউ"—৷০

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত উপন্যাস "মায়াজাল"—১৲

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী সেন প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই
"সোণার কবচ"—৷৶০

শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "অমর প্রেম"—১৲

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ প্রণীত কাব্য "পঞ্চদল"—১৷০

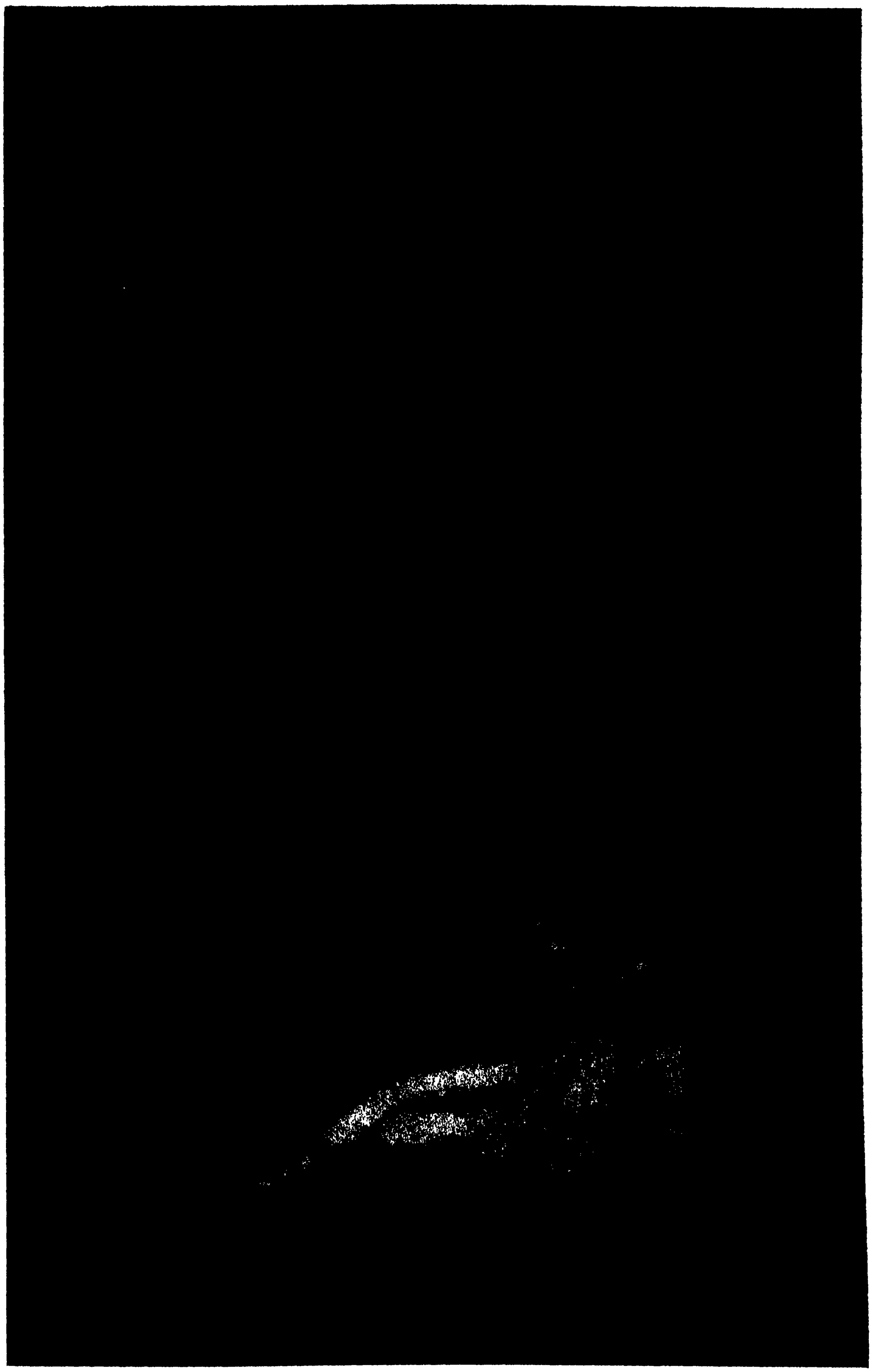
ডাক্তার এস, কে, বসু এল-এম-এস, জি-সি-এম-সি প্রণীত
হোমিওপ্যাথিক "চিকিৎসা-প্রকরণ"—৩৲

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত কাব্য "দীপা"—১৷০

শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত "রাগ-সংগ্রহ"—২৲

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons.
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—NARENDRA NATH KUNAR.
The Bharatvarsha Printing Works.
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



কর্ণের মৃত্যু

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ভারতবর্ষ

ভাদ্র—১৩৩৯

প্রথম খণ্ড | বিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

তুলসী রামায়ণ

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস এম-এ

রাম-চরিত্র

তুলসী রামায়ণখানা হিন্দী ভাষায় লেখা। হিন্দী কবিতা অনেকটাই ব্রজ-ভাষায় লেখা হয়; তুলসী রামায়ণের ভাষাও ইহাই। ইহা গ্রাম্য ভাষা—হিন্দী-জানা লোকের বুঝিতে কোন কষ্ট নাই। এই রামায়ণের মত আর একখানা বহিও ভারতবর্ষে নাই যাহা এত লোকে পড়ে। অন্য দেশেও কোনও এক ভাষার একখানা বহি এত লোকে পড়ে কি না সন্দেহ। তুলসী রামায়ণের বিক্রয়ের শেষ নাই। যত ছাপা হয় বিক্রয় হইয়া যায়। একখানা চারি টাকা দামের রামায়ণের ৭ম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে প্রকাশক লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ৮০ হাজার বই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। অল্প দামের রামায়ণ যে কতই বিক্রয় হয়, তাহার সংখ্যা নাই।

তুলসী রামায়ণ প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে লেখা। এই গ্রন্থখানা আজও প্রথম দিনের মত নূতন রহিয়াছে। সারা ভারতের স্ত্রী-পুরুষ ইহা পড়িয়া পড়িয়া আশ মিটাইতে পারে না। ইহার অন্তরের সৌন্দর্য্য এত বেশী যে, ইহা নিজের গুণে হিন্দুস্থানের সকল হিন্দীভাষী বা হিন্দী-জানা লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এমন হিন্দীভাষী চাষা নাই যে, ইহার দুই দশটা চৌপাই বা দোঁহা না জানে ও প্রয়োজনমত উল্লেখ না করিয়া থাকে।

বাংলায় এ জিনিষের অনুরূপ কোন গ্রন্থ নাই। বাংলার কৃত্তিবাসী রামায়ণ একমাত্র লোকপ্রিয় রামায়ণ, কিন্তু তুলসী রামায়ণ উহা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। ইহাতে গল্পাংশ বড়ই কম। যাহাতে রামের প্রতি ভক্তি হয়, যাহাতে মানুষ নীতি-পথ চিনিয়া লইতে পারে ও আচরণ করিতে পারে, তুলসী তাহার অবলম্বন দিয়াছেন। ঘটনা-গুলিও এমন করিয়া সাজান ও বর্ণনায় এই ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, রাম সীতা যেমন এক দিক দিয়া হৃদয়-রাজ্যের রাজাসনে বসিয়াছেন, অমনি আমাদের ঘরে আমাদের ছেলে-মেয়ে বধূ হইয়াও রহিয়াছেন। রামসীতা ভরতাদির কথা ভাবিতে তুলসী আমাদিগকে রাজবাড়ীতে লইয়া যান নাই, কাঙ্গালের ঘরের ছেলে মেয়ে বউ দিয়াই তৃপ্ত করিয়া-ছেন। তিনি রামের গলায় সোণার হার ও সীতার গায়ে

মণিমুক্তার ভূষণ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেগুলি নিতান্তই আলগোচে গায় লাগিয়া আছে, উহা তাঁহাদের পরিচ্ছদের অংশ নয়—মামুলি ভাবে রাজার ছেলে বউকে দিতে হয় বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের চালচলন কথাবার্ত্তা গ্রামের যে-কোনও গরীবের ঘরে খাপ খায়।

জনক সীতার বিবাহে ত কত আয়োজন করিলেন—কত লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ বিদায় করিলেন, এ সব তুলসী খুব গম্ভীর ভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু গোঁসাই এমনি চাতুরী করিয়াছেন যে, যখন তাঁহার সীতার বিবাহ-বর্ণনা পড়ি, তখন মনে হয় আমাদেরই ধোপা নাপিত বামুন কায়স্থ গরীব মধ্যবিত্তের ঘরে যে বিবাহ হয় সেই বিবাহই যেন দেখিতেছি। আমাদের পাড়ায় কাঙালের ঘরে যে বিবাহ দেখিয়াছি, সেই বিবাহের বরই যেন রাম, সেই কনেই যেন সীতা। যে বিবাহে মোট পাঁচ টাকা খরচ হয়, সে বিবাহে বেয়াইয়ের আদর যেন জনকের আদরেরই মত।

রাম যখন একেবারে শিশু, কেবল চলিতে শিখিয়াছেন তখন্‌

ভোজন করত বোল জব রাজা
নহিঁ আবত তজিবাল সমাজা
কৌসল্যা যব বোলন জাঈ
ঠুমুকি ঠুমুকি প্রভু চলহিঁ পরাঈ
ধুসর ধূরি ভরে তনু আয়ে
ভূপতি বিহঁসি গোদ বৈঠায়ে

ভোজন করত চপল চিত ইত উত অবসরু পাই
ভাজি চলে কিল কত মুখ দধি ওদন লপটাই।

রাজা যখন রামকে খাইতে ডাকেন তখন সঙ্গী ছেলেদেরকে ফেলিয়া সে আসিতে চায় না। কৌশল্যা ডাকিতে গেলে সে ছেলে থুপথাপ করিয়া ছুটিয়া পালায়। ধূলায় ধূসর ছেলেকে রাজা হাসিয়া কোলে বসান। চঞ্চল মনে যাইতে যাইতে একটু অবসর পাইলেই, খিল খিল করিয়া সে হাসিয়া পাল য়—মুখে দধি ভাত লেপ্‌টিয়া থাকে।

এই রামকে দেখিতে রাজার বাড়ী যাইতে হয় না, দেশ জুড়িয়া ঘরে-ঘরেই এই রাম আছে। এই জন্যই তুলসীর এত আদর। ইহা প্রত্যেকের নিজের ঘরের নিজের হৃদয়ের জিনিষ। তুলসী রাম লক্ষ্মণ সীতাকে সাধারণ লোকের আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন।

কেবল তাহাই নয়; গীতার আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিও নীতির ভিতর ও আচরণের ভিতর দিয়া তিনি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। তুলসী রামায়ণের কাব্য-সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। এমন সহজ ভাষায়, এমন গ্রাম্য কথায় এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনে হয় যে সংস্কৃত ভাষা ছাড়া আর কোনও অলঙ্কারময় ভাষাতেই যেন সে ভাব প্রকাশ করা যাইত না।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ সর্ব্ব-সাধারণের চলতি ভাষায় লেখা হইলে যাহা হয় তুলসী রামায়ণ তাহাই। তুলসী রামের প্রতি অনুরাগে ডুবিয়াছিলেন। রাম-ভক্তিরস তিনি তাঁহার রামায়ণে অকাতরে বিলাইয়া হিন্দী ভারতবাসীকে রামায়ণ-ভক্ত করিয়াছেন। রাম-ভক্ত করিয়াছেন এ-কথা বলিতে পারি না, কেননা তুলসীর যে রাম তাহার ভক্ত হওয়া অতি-বড় সৌভাগ্য। সে সৌভাগ্য যেদিন ভারত-বাসীর হইবে, সেদিন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য বসিবে—কলিযুগের মধ্যেই সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে।

তুলসী রামায়ণ পড়িতে হ্রস্ব দীর্ঘ বুঝিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। তুলসী রামায়ণে 'শ' নাই বলিলেই চলে। সকল স্থানেই 'স' ব্যবহৃত হইয়াছে—উচ্চারণ ইংরাজী sএর মত। তুলসীর ষ ও সএর একই উচ্চারণ করিতে হইবে। বাঙ্গালী পাঠক দুই চার লাইন কোনও হিন্দুস্থানীকে দিয়া পড়াইয়া লইলেই তুলসীর দোঁহা ও চৌপাইয়ের পড়ার ধাঁচ ধরিতে পারিবেন। তুলসী রামায়ণ সুর করিয়া পড়িতে হইবে, নচেৎ উহার রস পাওয়া যাইবে না। ছন্দের মিল্‌ রাখার জন্য সুবিধামত ঈ ব্যবহার হইয়াছে, কোথাও বা "সিয়া" কোথাও বা "সীয়া" কোথাও বা 'সিতা' কোথাও বা 'সীতা'। চৌপাইয়ের শেষ অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারণ হইবেই, কাজেই সেখানকার বানান দীর্ঘ হইতেই হইবে।

তুলসী রামায়ণ বাঙ্গালীর পক্ষে পড়া সহজ—বোঝা আরো সহজ। দুই চারিটা চৌপাই পড়িয়া আড় ভাঙ্গিয়া লইলেই হইল;—আর গোটাকতক হিন্দী শব্দের মানে শিখিতে হয়; তাহাও পড়িতে পড়িতে শেখা যায়। যাহাতে বাঙ্গালী পাঠকেরা তুলসী রামায়ণের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন, সেই জন্য এই রামায়ণের চরিত্র ও বিষয় লইয়া কিছু আলোচনা করিব। যথাসম্ভব তুলসীর রামায়ণের

শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অর্থাৎ তুলসীদাসের ভাষাতেই চরিত-গুলির আলোচনা করিয়াছি। যদি এই আলোচনা পড়িয়া তুলসী রামায়ণের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে ও পাঠকেরা আগ্রহের সহিত রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করেন, তবে ধন্য হইব।

রাম কে ?

তুলসীদাস রামায়ণখানার নাম দিয়াছেন "রাম চরিত মানস" অর্থাৎ রাম চরিত্ররূপ মানস-সরোবর। ইহাতে রাম-কথারূপ হাঁস বিচরণ করে। লোকে তুলসীর নাম ছাড়িয়া সোজাসুজি তুলসী রামায়ণই বলিয়া থাকে।

তুলসী যে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার মন-গড়া জিনিষ। উহা বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ নয়। বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়া অন্যান্য যে সকল গ্রন্থে রাম-কথা আছে, তুলসীদাস সে সকলেরও সাহায্য লইয়া নিজের অন্তরের তৃপ্তির জন্য এই রামায়ণ লিখিয়াছেন।

তুলসী সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছেন যে, জীবন সফল করার জন্য রাম-ভক্তি চাই। রাম-কথা পড়িলে রাম-ভক্তি আসিবে; মন শান্ত হইবে, দুঃখ শোক দূর হইবে। তাঁহার রামায়ণ ভক্তির ভাব জাগাইবার ও পুষ্ট করিবার বিশেষ সহায়ক।

রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। তিনি মাতার ষড়যন্ত্রে বনে যান। রাবণ সীতা হরণ করিয়া লইয়া গেলে তিনি যুদ্ধ করিয়া রাবণ বধ করেন ও সীতাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন। রামচন্দ্র মানুষের মতই চলিয়া ফিরিয়া সুখে দুঃখে জীবন কাটাইয়াছেন। সেই জন্য রামকে আদর্শ চরিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে কি না বলিয়া বাদানুবাদ আছে। কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তি রামকে কেবলমাত্র সমালোচকের চক্ষে দেখেন। ঈশ্বরই যে রাম অবতার হইয়া নিজ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সে অনুভূতি না থাকায় রামকে একজন লোক মাত্র বলিয়া ধরা হয়, যিনি রাবণবধাদি কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রকারের রামে তুলসীদাসের প্রয়োজন নাই। তুলসীর রাম তাঁহার ইষ্টদেব, জগৎ-পিতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, ভক্তের দুঃখ-হারী, প্রভু।

তুলসীদাস নিজে যে রস আস্বাদ করিয়াছেন, সেই রস সকলকেই বিলাইতে চান। উহার প্রধান বাধাই বুদ্ধির বাধা।

যে রাম মানুষের পুত্র, যিনি স্ত্রী-বিরহে কাতর হইয়া বনে-বনে পথে-পথে সীতাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন, যাঁহাকে মেঘনাদ নাগপাশে ধরিয়া কাবু করিয়া ফেলিতে পারেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, এ কথা কেমন করিয়া বলা যায়? বুদ্ধির এই প্রশ্নকে তুলসীদাস এক বড় স্থান দিয়াছেন এবং উহাকেই অবলম্বন করিয়া রামের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া রাম-চরিত খুলিয়া দেখাইয়াছেন।

'রাম চরিত মানসে'র অবতরণিকায় যেখানে রাম কথা সুরু হইল সেইখানে "রাম কে?" এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাজ্ঞবল্ক্য আসিয়াছেন। তিনি প্রয়াগে আসিয়াছিলেন। মকর স্নান করিয়া ফিরিবার পূর্ব্বে ভরদ্বাজকে দেখিতে আসিয়াছেন। ভরদ্বাজ গুরুকে বলিলেন যে, তাঁহার একটা বিষয়ে বড় সন্দেহ আছে; উহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে।

"রাম কবনু প্রভু পূছউঁ তোহীঁ
কহিয় বুঝাই কৃপানিধি মোহীঁ
এক রাম অবধেস কুমারা
তিন্হকর চরিত বিদিত সংসারা
নারি বিরহ দুখ লহেউ অপারা
ভয়উ রোষু রণ রাবণু মারা
প্রভু সোই রামু কি অপর কোউ জাহি জপত ত্রিপুরারী
সত্যধাম সর্ব্বজ্ঞ তুম্হ কহহু বিবেকু বিচারি।

হে প্রভু, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি রাম কে? হে কৃপানিধি আমাকে তুমি বুঝাইয়া বল। এক রাম ত ছিলেন অযোধ্যাপতি দশরথের কুমার। তাহার চরিত-কথা সকলেই জানে। তিনি স্ত্রী-বিরহে বড়ই দুঃখ পান ও রাগ করিয়া রাবণকে যুদ্ধে মারেন। হে প্রভু, শিব যাঁহাকে জপ করেন তিনিই কি সেই রাম, অথবা অপর কেহ। তুমি সত্যনারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ, তুমি জ্ঞানের সহিত বিচার করিয়া বল।

ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য হাসিয়া বলেন, তুমি ত কায়মনোবাক্যে রামভক্ত, তোমার চাতুরী আমি জানিয়াছি। তুমি রাম-গুণ শুনিতে চাও বলিয়াই এমন বোকা সাজিয়া প্রশ্ন করিয়াছ, রাম কে! তিনিই কি ভগবান? এই

প্রশ্ন হইতে তুলসী রামায়ণ আরম্ভ। তুলসীদাস আর একটু অগ্রসর হইয়া বালকাণ্ডেই সতীর মুখ দিয়া সেই প্রশ্নই করিতেছেন—রাম কে? রাম তখন দণ্ডকবনে। সেই স্থান দিয়া শিব সতীকে লইয়া চলিয়াছেন: তখন—

"বিরহ বিকল নর ইব রঘুরাঈ
খোজত বিপিন ফিরত দোউ ভাঈ।

সীতা আশ্রমে নাই। রাম বিকল হইয়া খুঁজিতেছেন।

হাগুণ খানি জানকী সীতা
রূপশীল ব্রত নেম পুনীতা
লছিমন সমুঝায় বহু ভাঁতী
পূছত চলে তরু লতা পাঁতী
হে খগ মৃগহে মধুকর শ্রেণী
তুহ দেখী সীতা মৃগনৈনী।

রামচন্দ্র তরুলতা পশুপক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়াছেন যে তাহারা কি মৃগনয়নী সীতাকে দেখিয়াছে। এমনি ব্যাকুল অবস্থায় শিব রামকে দেখিতে পান। রামকে তিনি নিজ ইষ্টদেব জানিয়া "জয় সচ্চিদানন্দ" বলিয়া প্রণাম করিলেন। শিব এত অভিভূত হইলেন যে তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইল। শিবের এই অবস্থা দেখিয়া সতী আশ্চর্য্য হইলেন। যিনি জগতের পূজ্য বিশ্বেশ্বর শিব, তিনি আবার একজন রাজার ছেলেকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া প্রণাম করিলেন, ইহা দেখিয়া সতী বড় সন্দেহে পড়িলেন।

শিব সতীকে বুঝাইয়া সন্দেহ করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, যে রামের কথা আমরা এইমাত্র অগস্ত্য ঋষির নিকট শুনিতেছিলাম, যাঁহাকে ভক্তি করার কথা আমি মুনিকে শুনাইলাম ও যিনি আমার ইষ্টদেব, ইনিই সেই রাম। কিন্তু সতীর সন্দেহ যায় না। সতী ভাবেন যে যদি বিষ্ণু দেবতাদের হিতের জন্য মানুষের শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, তবে ত তিনিও শিবেরই মত সর্ব্বজ্ঞ। সেই বিষ্ণু কি অজ্ঞের মত স্ত্রী খুঁজিয়া বেড়াইতে পারেন?

"খোঁজই সো কি অজ্ঞ ইব নারী
জ্ঞানধাম শ্রীপতি অসুরারী।

সতীর মনে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। তিনি তখন শিবের কথায় রামকে পরীক্ষা করিতে যান। গিয়া রামকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া যান। সতী সীতার বেশ ধরিয়া রামকে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া শিব তাঁহাকে ত্যাগ করেন।

পরে সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের ঘরে পার্ব্বতী হইয়া জন্মিয়া শিবকে পাইবার জন্য অনেক হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। বিবাহের পর পার্ব্বতী শিবকে আবার সেই প্রশ্ন করেন—"রাম কে?" পূর্ব্বজন্মে একবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু তখন ভাল করিয়া বুঝি নাই, আবার বলুন!

"রামু সো অবধ নৃপতি-সুত সোঈ
কী অজ অগুণ অলখ গতি কোঈ।

যিনি অযোধ্যার রাজপুত্র তিনিই রাম। অথবা আর কোনও অজন্মা গুণরহিত পুরুষ যাহার গতি দেখা যায় না।

জৌঁ নৃপ তনয় তো ব্রহ্ম কিমি নারি বিরহ মতি ভোরি।
দেখি চরিত মহিমা সুনত ভ্রমতি বুদ্ধি অতি মোরি॥

যদি রাজপুত্রই হয় তবে ব্রহ্ম কেমন করিয়া হইল? স্ত্রীর বিরহে রামের বুদ্ধিই ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অথচ এদিকে রাম-চরিত দেখিয়া তাঁহার মহিমার কথা শুনিয়া মাথা ঘুরিতেছে।

শিব পার্ব্বতীকে আবার উপদেশ দেন, বলেন—

ঝুঠউ সত্য জাহি বিনু জানে
জিসি ভুজঙ্গ বিনু রজু পহিচানে।
জেহি জানে জগ জাই হেবাঈ
জাগে জথা সপন ভ্রম জাঈ॥
বন্দউ বালরূপ সোই রামু
সব সিধি সুলভ জপত জিসু নামু॥

"তিনিই রাম যাহাকে না জানিলে মিথ্যাও সত্য বলিয়া মনে হয়, জাগিলে যেমন স্বপনের ভুল মিলাইয়া যায়। তেমনি রামকে জানিলে জগৎ হারাইয়া যায়। যাঁহার নাম জপিলে সকল সিদ্ধিই সুলভ হয়, সেই বালক রামকে বন্দনা করি!"

পার্ব্বতী যে প্রশ্ন করিলেন ও রাম-কথা শুনিতে চাহিলেন, সেজন্য শিব তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া কেবল একটা কথার ব্যথা পাইয়াছেন বলেন—

এক বাত নহিঁ মোহি সুহানী
জদপি মোহবস কহেহু ভবানী।

তুহ্ জো কহা রাম কোউ আনা
জেহি শ্রুতি গাব ধর্বহিঁ মুনিধ্যানা ॥

'তুমি মোহ-বশে বলিলেও তোমার একটা কথা আমার কাছে ভাল লাগে নাই। তুমি যে বলিয়াছ যে যাহার কথা বেদ বলে, মুনিরা যাহার ধ্যান করে সে রাম কি আর কেহ?'

কহহিঁ সুনহিঁ অস অধম নর গ্রমে জে মোহপিসাচ্।
পাখণ্ডী হরি-পদ-বিমুখ জানহিঁ ঝুঠ ন সাচ্ ॥

এমন কথা সেই মানুষেরাই বলে ও শোনে যাহাদিগকে মোহ-পিশাচ পাইয়া বসিয়াছে; যাহারা পাষণ্ড, যাহারা হরিপদে বিমুখ ও যাহারা সত্যমিথ্যা জানে না। এই ভাবে নর-দেহধারী রাম যে নির্গুণ ব্রহ্ম তাহাই বুঝাইতে গিয়া বলেন—

জো গুণ রহিত সগুণ সোই কৈসে
জলু হিম উপল বিলগ নহি জৈসে।

গুণরহিত যিনি তিনিই সগুণ হন, যেমন জল ও বরফ একই জিনিস, ভিন্ন নয়।

জগত প্রকাস্য প্রকাশক রামূ
মায়াধীন জ্ঞানগুণধামূ
জাসু সত্যতা তেঁ জড় মায়া
ভাস সত্য ইব মোহ সহায়া।

রামচন্দ্রই দৃষ্টিগোচর জগৎ। তিনিই জগতের প্রকাশক, তিনি মায়াপতি জ্ঞান ও গুণের আলয়। তাঁহারই সত্যতায় জড়মায়া মোহের সাহায্যে সত্যের মত বলিয়া দেখা যায়।

রজত সীপ যহঁ ভাস জিমি জথা ভানুকর বারি।
জদপি মৃষা তিহুঁ কাল সোই, ভ্রম ন সকই কোউ টারি ॥

ঝিনুক দেখিয়া রূপা বলিয়া বোধ হয়, সূর্য্য-কিরণকে মরীচিকার জল বলিয়া বোধ হয়। ইহারা ত্রিকালে মিথ্যা হইলেও এ ভ্রম দূর করা যায় না।

এহি বিধি জগ হরি আস্রিত রহঈ
জদপি অসত্য দেত দুখ অহঈ।
জোঁ সপনে সির কাটই কোঈ
বিনু জাগেন দূরি দুখ হোঈ ॥

তেমনি ভাবে জগত রামচন্দ্রের আশ্রিত হইয়া আছে। ঐ জগত অসত্য হইলেও দুঃখ দেয়। স্বপ্নে মাথা কাটা গেলে যেমন দুঃখ হয়, আর না জাগা পর্য্যন্ত যেমন সে দুঃখ যায় না, তেমনি রাম যে কে, তাহা না জানা পর্য্যন্ত জগতের মিথ্যা দুঃখ যায় না।

রামচন্দ্র কেমন?

বিনু পদ চলই সুনই বিনু কানা
কর বিনু করম করই বিধি নানা
আনন রহিত সকল—রস-ভোগী
বিনু বাণী বকতা বড় জোগী।
তন বিনু পরস নয়ন বিনু দেখা
গ্রহই ঘ্রাণ বিনু বাস অসেখা
অসি সব ভাঁতি আলোকিক করণী
মহিমা জাসু জাই নহিঁ বরণী।

তাঁহার পা নাই তবুও তিনি চলেন। কান বিনাই শোনেন, হাত না থাকিলেও কাজ করেন। কথা না বলিলেও তিনি বক্তা, শরীর না থাকিলেও তিনি স্পর্শ করেন, চোখ না থাকিলেও তিনি দেখেন, নাক না থাকিলেও তিনি গন্ধ লয়েন। এমনি সকল রকম কার্য্য তাঁহার অলৌকিক, তাঁহার মহিমা বর্ণনা করা যায় না।

'সোই দসরথ সুত ভগতহিত কোসলপতি ভগবান' ভক্তের মঙ্গলের জন্য সেই অরূপ ভগবানই কোশলপতি রামচন্দ্র হইয়াছেন।

সোই প্রভু মোর চরাচর স্বামী
রঘুভর সবউর অন্তর জামী ॥

সেই সচরাচরের স্বামীই আমার প্রভু রঘুনাথ, তিনি সকলের হৃদয়ের কথাই জানেন।

রাম সো পরমাত্মা ভবানী
তহঁ ভ্রম অতি অবিহিত তব বাণী
অস সংসয় আনত উর মাহীঁ
জ্ঞান বিরাগ সকল গুণ জহীঁ।

শঙ্কর বলিলেন ভবানী, রাম সেই পরমাত্মা, এ বিষয় তোমার ভুল করাটা বড় অন্যায় হইয়াছে। এ-রকম সন্দেহ মনে আনিলেও জ্ঞান বৈরাগ্য ও সকল গুণ চলিয়া যায়।

এমন করিয়া উপদেশ দিয়া শঙ্কর পার্ব্বতীকে শান্ত করিলেন। পার্ব্বতীর তপস্যা ছিল, সংস্কার ছিল, তিনি এবার বুঝিলেন। কিন্তু সকলে ত বুঝে না। যাহারা বুঝে না, তাহারা বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা কেবলই প্রশ্ন করিতে থাকে—

সর্ব্বজ্ঞ হইলে অজ্ঞের মত ঘুরিয়া বেড়াইলেন কেন?

রাবণকে মারিতে এত বেগ পাইতে হইল কেন? ইচ্ছা করিলেই ত রাবণকে মারিতে পারিতেন? তিনি অমন করিয়া পিছন হইতে ব্যাধের মত বালীকে বধ করিলেন কেন? সীতার অগ্নি-পরীক্ষা করিলেন কেন? এমনি সকল প্রশ্ন ধরিয়া তুলিয়া মানুষকে তাহার বুদ্ধি বিব্রত করে। এই বুদ্ধিকে ঠিক পথে চালাবার প্রশ্ন এখন আসিয়া পড়িতেছে।

মেঘনাদ রামকে নাগপাশে বাঁধিলে গরুড় গিয়া সেই বাঁধন কাটিয়া দিয়া আসিল। ইহাতে গরুড়ের মোহ হইল। সে শুনিয়াছে যে রাম বিষ্ণু অবতার। তিনি কেমন অবতার যাঁহাকে বাঁধা যায়, আর গরুড়ের সাহায্যে যাঁহার বাঁধন কাটিতে হয়?

ব্যাপক ব্রহ্ম বিরজ বাগীসা
মায়া মোহপার পরসীসা
সো অবতার সুনেউঁ জগমাহীঁ
দেখেউঁ সো প্রভাব কছু নাহীঁ
ভব বন্ধন তেঁ ছুটহিঁ নর জপি-জাকর নাম
খর্ব্ব নিসাচর বাঁধেউ নাগপাস সোইবাম

শুনিয়াছিলাম যে ব্যাপক ব্রহ্ম বিরাজ, বাক্‌পতি, মায়া-মোহের অতীত পরমেশ্বর রাম অবতার লইয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম তাঁহার কোনও প্রভাব নাই। যাঁহার নাম জপ করিয়া লোকে ভব বন্ধন হইতে মুক্তি পায়, ক্ষুদ্র রাক্ষস তাঁহাকে নাগপাশে বাঁধে?"

গরুড়ের মানসিক অশান্তি হইল। সে নারদকে জিজ্ঞাসা করিল। নারদ বলিলেন, ঐ প্রকার মোহ তাহাকে অনেক নাচাইয়াছে, গরুড় যেন ও-কথা ব্রহ্মাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে। ব্রহ্মা বলিলেন, ঐ মায়া তাহাকেও অনেক নাচাইয়াছে। তুমি গিয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা কর। শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—

"তবহিঁ হোই সব সংসয় ভংগা
জব বহুকাল করিয়া সত সংগা
জেহি মহঁ আদি মধ্য অবসানা
প্রভু প্রতিপাদ্য রামু ভগবানা
বিনু সত সংগ ন হরি কথা তেহি বিনু মোহ ন ভাগ
মোহ গয়ে বিনু রামপদ হোই ন দৃঢ় অনুরাগ

তুলসী মহেশ্বরের মুখ দিয়া এইবার শেষ কথা বলাইলেন। অনেকদিন সৎসঙ্গ করিলে তবে সন্দেহ যায়। সৎসঙ্গে হরি-কথা শুনিবে। নানা প্রকারে মুনিরা উহা গাহিয়া থাকেন। সে কথার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে ঐ একই বিষয়ের প্রমাণ করা হয় যে, প্রভু রাম হইতেছেন ভগবান। সৎসঙ্গ ছাড়া রাম-কথা হয় না। রাম-কথা ছাড়া মোহ যায় না। আর মোহ না গেলে রামপদে গভীর অনুরাগ হয় না।

ভক্তি না হইলে বিশ্বপতি রামই যে ভগবান, সে বিশ্বাস আসে না। রাম ত ভক্তের জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

ভগত হেতু ভগবান প্রভুরাম ধরেউ তনু ভূপ
কিয়ে চরিত পাবন পরম প্রাকৃত নর অনুরূপ
জথা অনেক বেষধরি নৃত্য করই নট কোই
সোই সোই ভাব দেখাবই আপুন হোই ন সোই
অসি রঘুপতি লীলা উরগারী
দনুজ বিমোহিনি জন সুখকারী
জে মতি মলিন বিষয় রস কামী
প্রভুপর মোহ ধরহিঁ ইসি স্বামী।

ভক্তের হিতের জন্যই ভগবান রাম রাজার শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের মত অথচ পরম পবিত্র চরিত্র দেখাইয়া গিয়াছে। কিন্তু রামের মানুষরূপ সম্পূর্ণ নিজের রূপ নয়। কোনও নট যেমন নানা প্রকার বেশ যেমন নানা প্রকার বেশ ধরিয়া নৃত্য করেন ও যে বেশ ধরিয়াছেন সেইরূপ ভাব দেখান, কিন্তু সে সকল ভাবের কোনটাই নটের নিজের নয়, ভগবান তেমনি নটের মত মানুষ হওয়ার নাটকে রাম সাজিয়াছিলেন—ইহাই রাম-চরিত বুঝিবার ও আলোচনা করিবার প্রথম ধাপ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

অবতারবাদ সম্বন্ধে গান্ধীজি বলিয়াছেন যে, কোনও যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ পরের যুগে অবতার বলিয়া গণ্য হন ও তাহার পর মানুষ তাঁহার উপর পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া পূজা-করিতে থাকে।

গীতার কৃষ্ণ মূর্ত্তি শুদ্ধ জ্ঞান কিন্তু কাল্পনিক। ইহাতে কৃষ্ণ নামক অবতার-পুরুষকে অস্বীকার করা হইতেছেনা, মাত্র বলা হইতেছে যে, পূর্ণ-কৃষ্ণ কাল্পনিক। পূর্ণ অবতারের কল্পনা পরে আরোপিত হইয়াছে।

রামায়ণের রাম সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। অবতার রাম জন্মিয়াছেন, খেলা করিয়াছেন, বিবাহ করিয়াছেন,

বুদ্ধ করিয়াছেন—সকলই করিয়াছেন, কেবল তাঁহার উপর পূর্ণত্ব আরোপিত হইয়াছে। অপূর্ণের উপর পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া লইতেছে। পদেপদেই মানুষ রূপধারী অপূর্ণ অবতারের অপূর্ণত্ব ও ত্রুটি ধরা যাইতে পারে। কিন্তু নিজের হিতের জন্য তাহা না করিয়া আদর্শ পুরুষত্ব তাঁহাতে আরোপ করিয়া লোকে কার্য্য সিদ্ধ করিয়া আসিতেছে, ভক্তি সমর্পণ করিতেছে। যাঁহারা রাম-চরিত্রে মানুষের দোষগুণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার বিচার করিতে চাহেন, আদর্শত্ব বা ঈশ্বরত্ব আরোপ করিতে চাহেন না, তাঁহারা তাহা না করুন; ভক্তের তাহাতে ক্ষতি নাই। ভক্ত যাহা চায়, রামচন্দ্রে পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া সে তাহা পায়। যে পথে সে চলিতে চায়, কাল্পনিক অবতার তাহার কাছে ইতিহাসের লোক অপেক্ষাও সত্য।

রামচন্দ্র মানব-চরিত্র গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য হওয়ার পথ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্ম কর্ম্মের চিন্তা আমাদিগকে মুক্তির পথে লইয়া যায়। এক খণ্ড শিলারও কোনও চরিত্র নাই; তথাপি মানুষ তাহাতেও পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া—শালগ্রাম শিলাকে ভক্তি দিয়া নিজের যাহা পাওয়ার তাহা পাইয়া থাকে। তুলসীদাসের অভিজ্ঞতা এই যে, যত রকম আরোপ ও কল্পনাই করা যাক্, রামনামে ও রাম-ভক্তিতে যত সহজে কাজ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। মুক্তি-পথের দীন পথিকের নিকট এই আশ্বাসের কথার মধ্যে মন্ত্রশক্তি রহিয়াছে। এই দিক দিয়াই রাম-চরিত বিচার করার বিষয়। প্রত্যেক ঘটনাটি লইয়া চুল চিরিলে বুদ্ধির দাবা-খেলা হইবে। কিন্তু দাবা-খেলায় যেমন সত্যই চতুরঙ্গ সেনায় সেনায় যুদ্ধ হয়, তেমনি ঐ ভাবের রাম-চরিত্র আলোচনাও অলীক। রাম হরিণ শিকার করিতেন—

> বন্ধু সখা স গ লেহিঁ বোলাঈ
> বন মৃগয়া নিত খেলহি জাঈ
> পাবণ মৃগ মারহি জিয় জানী
> দিন প্রতি নৃপহি দেখাবহি আনী।

তুলসীদাস এই বর্ণনা দিয়াছেন। যাঁহার সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি, তিনি অকারণ প্রাণী বধ করিতেন। ইহাই কি আদর্শ চরিত্র? উত্তরে বলা যায় যে, তখনকার দিনে রাজার ছেলের মৃগয়া করা একটা অবশ্য করণীয় ছিল। তিনি সমসাময়িক লোকাচার-সম্মত কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মনুষ্য-চরিত্র অনুসরণ করিয়াই মানুষকে পরমপদ পাওয়ার অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর হিসাবে বিচার করিলে তাঁহার প্রত্যেক কাজের জন্যই তাঁহাকে দোষ দিতে হয়। স্ত্রী-বিরহে তিনি কেনই বা কাতর হইলেন—তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও আদর্শ চরিত্র হইলেও ঐ সময় সাধারণ মানুষের মতই আচরণ করিয়া গিয়াছেন। তাহা করিয়াছেন বলিয়াই রাম-চরিত্র এত মধুর, এত আকর্ষক ও এত শক্তিশালী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের শিক্ষার ধারার ভিতর রূপকের আশ্রয় লওয়ার একটা মনোহর পথ ছিল। উহা দ্বারা কঠিন বিষয় সহজে বুঝান যাইত। আমরা যখন পুতুল-নাচ দেখি, তখন পুতুলগুলি পুতুল, সে কথা জানিয়াও পুতুলের আর্ত্ত চিৎকারে আর্ত্তি বোধ করি, আনন্দে আনন্দ করি, যুদ্ধ করিতে দেখিলে উত্তেজিত হই। আমরা সত্য ঘটনা দেখিয়া যে রসের আস্বাদ পাইতাম, পুতুল-নাচ দেখিয়াও প্রায় তাহাই পাই। এই জন্যই পুতুল-নাচ, যাত্রা থিয়েটার বায়োস্কোপ সমাজে একটা স্থান লইয়াছে।

সাহিত্যের ভিতর দিয়াও এই পুতুল-নাচ বা রূপকের স্রোত চলিয়া গিয়াছে। কথা-সাহিত্য রূপকের এই মোহন বেশে সাজান। কাশী ও কোশল রাজের ভিতর প্রতি-দ্বন্দ্বিতার কথা এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। উহাই আশ্রয় করিয়া কত না গল্প রচিত হইয়াছে, লোকশিক্ষার পথ দিয়াছে।

গল্প আছে, একদিন কোশলরাজ বলিলেন, লোকে তাঁহাকে কি রকম মনে করে তাহা ছদ্মবেশে দেখিবেন। তিনি বিনা আড়ম্বরে রথে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন প্রজার সুখ দুঃখ দেখিয়া এই প্রকার ঘুরিতে ঘুরিতে এমন একটা পথে আসিয়া পড়িলেন যাহার দুইদিকে খাত। পথও এমন সরু যে, একখানা মাত্র রথ চলিতে পারে। এদিকে আবার এই হইয়াছে যে, কোশলরাজ যেদিন যাত্রা করেন, কাশীরাজও সেইদিনই নিজের প্রজাদের কথা জানিবার জন্য সেই সময়ে সেই ভাবে যাত্রা করিয়াছেন। তিনিও প্রজাদের অবস্থা দেখিতে দেখিতে ঠিক সেই সময় সেই রাস্তার বিপরীত দিক হইতে রথ লইয়া আসিয়া

উপস্থিত। দুই রথ মুখোমুখি দাঁড়াইল। কাশীরাজের সারথি হাঁকিয়া বলে—পথ ছাড়িয়া দাও—এ রথে রাজা আছেন। অপর সারথি বলে—এ রথেও রাজা আছেন। এ বলে—এ রাজার বয়স এত, ও বলে—সে রাজার বয়স তত। এ বলে—ইঁহার রাজ্য এত বড়, ও বলে—তাঁহার রাজার রাজ্যও তত বড়। সৈন্য-সংখ্যা—তাহাও দুইজনের ঠিক সমান। তখন কাশী-সারথি বলে—তাহার রাজা বিপুল শক্তিমান, তাঁহার ক্রোধ হইলে শত্রুকে তিনি মর্দ্দন করেন, গ্রাম নগর বিধ্বস্ত করেন। প্রতিদ্বন্দ্বির প্রতি তাঁহার হিংসাবৃত্তি ভয়াবহ। কোশল-সারথি বলে—তাঁহার রাজা অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ জয় করেন, অহিংসা দ্বারা হিংসা জয় করেন, বিনয় দ্বারা অবিনয় জয় করেন। তখন কাশী-সারথি মাথা নীচু করিয়া নিজ রথ খুলিয়া কোশলের রথের জন্য পথ ছাড়িয়া দিল।

এই গল্পে গল্পকার তাঁহার রঙ্গমঞ্চে ক্রোধ ও অক্রোধ, হিংসা ও অহিংসা, বিনয় ও অবিনয়কে দাঁড় করাইয়া অক্রোধ, অহিংসা ও বিনয়ের জয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কথা বুঝাইবার জন্য কাশী-কোশল-রাজ লইয়া আসিয়াছেন; কেন না পাঠকের তৃপ্তির জন্য রঙ্গমঞ্চ চাই; রথ ও রথী, সারথি ও রাজা চাই। কথাকার এমন সুন্দরভাবে জিনিষগুলি সাজাইয়াছেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি জানেন ও তাঁহার পাঠকেরাও জানে যে, কাশী-কোশলের অবলম্বন তিনি বিশেষ উদ্দেশ্যে করিয়াছেন। এই গল্পে মূলের অসম্ভাবনা, একই সময় একই উদ্দেশ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার যাত্রা করা, তাহাদের সম বয়স, সম রাজত্ব ও সম সৈন্যবল হওয়ার অসম্ভাবনা কাহাকেও পীড়া দেয় না। কথাকার যে রূপকের আশ্রয় লইয়াছেন তাহা তাঁহার পাঠকেরা জানে বলিয়াই তাঁহার গল্প বাস্তবের মত সুন্দর লাগে।

আর একটা উদাহরণ ধরুন, নচিকেতার উপাখ্যান। নচিকেতার পিতা সর্ব্বস্ব-দান যজ্ঞ করিলে নচিকেতা পিতাকে বলিল—এই পীতদুগ্ধ গাভীগুলি দান করিয়া লাভ নাই। আর তুমি আমাকেই বা কাহাকে দিয়া দিলে? তিন বারের বার ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করায় পিতা রাগ করিয়া বলিলেন "তোমাকে যমকে দিলাম"। বলা মাত্র নচিকেতার মৃত্যু হইল; সে যমের বাড়ী গিয়া হাজির। যম তখন বাড়ীতে নাই, কোথাও নিমন্ত্রণে গিয়াছেন। যম আসিয়া দেখেন ব্রাহ্মণ অতিথি, তিন দিন অভুক্ত রহিয়াছে। যম বলিলেন, নচিকেতা—তোমাকে তিনদিন অভুক্ত রাখায় দোষ হইয়া গিয়াছে। এখন তুমি বর চাও। নচিকেতা বলিল, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা দাও। যম বলিল, ঐটি ছাড়া আর যাহা চাও তাহাই দিব। সসাগরা পৃথিবীর রাজত্ব চাও, অমরত্ব চাও, বহু দাস দাসী, রমণী চাও, হস্তী অশ্ব রথ চাও, নৃত্যগীত-কুশলা স্ত্রীলোক চাও, যাহাই ভোগের জন্য চাও না কেন, তাহাই দিব। নচিকেতা বলিল, ইন্দ্রিয়-ভোগের সুখ আর তুমি আমাকে কি দেখাইতে চাও? উহার তৃপ্তিতে সুখ নাই। ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহারে ক্রমে জরাগ্রস্ত হয়। ও-সকলে দরকার নাই। দাসদাসী হাতী ঘোড়া নৃত্যগীত তোমারই থাকুক—আমার উহাতে দরকার নাই। আমি যাহা চাহিয়াছি, তুমি ছাড়া উহা দেওয়ার মত আর কেহ নাই, আমাকে উহই দাও। যম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, লোকে যাহা চায় সে সমস্তই আমি তোমাকে দিতে চাহিয়াছি। তুমি সে সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। তুমিই উপযুক্ত অধিকারী। আমি তোমাকে সেই গুপ্ত-বিদ্যা দিতেছি।

এই ত গেল উপন্যাস। ইহার ভিতর ইতিহাস খুঁজুন, সত্যঘটনা খুঁজুন, গল্পের কি পড়িয়া থাকিবে? যমরাজ কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি নয়—তাহার বাড়ীতে কেহ অতিথি থাকে না, সে কাহাকেও বিদ্যা দেয় না, তথাপি এই উপাখ্যান নিরর্থক নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাসনার নিবৃত্তি না হইয়াছে, যতক্ষণ উহাদের মৃত্যু না হইয়াছে, ততক্ষণ ব্রহ্মবিদ্যা পাওয়ার বা চাওয়ার অধিকার হয় না। বাসনার মৃত্যুর ভিতর দিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পথ। এই উপাখ্যানের পশ্চাতে ঐতিহাসিকতার ছাপ চাওয়ার কোনও মানে নাই। ইহা দেখাই যাইতেছে যে, গল্পটা কল্পিত। একটা উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য উহার সৃষ্টি হইয়াছে। উহার ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকিলেও নচিকেতা-উপাখ্যানের ঘটনাগুলি বা কাশী-কোশল কাহিনীর ঘটনাগুলির মূল্য কম নহে। ঐ সকল ঘটনার আশ্রয়েই আমাদের কাম্য শিক্ষা আমরা পাই।

রামায়ণের ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকিলেও রামায়ণে রূপক হিসাবেই উহা ব্যবহার হইয়াছে। যে রামের অয়ন

বা পথ রামায়ণ, সে রাম হৃদয়বিহারী ; যে রাবণের সহিত রাম যুদ্ধ করিয়াছেন, সে রাবণও হৃদয়েই আছে ; আর সে যুদ্ধক্ষেত্রও হৃদয়ই।

শুভ আচরণ কতহুঁ নহিঁ হোঈ
দেব বিপ্র গুরু মানন কোঈ
নহিঁ হরি ভগতি জজ্ঞ জপদানা।
সপনেহু সুনিঁয় ন বেদ পুরানা

জপ জোগ বিরাগা তপ মখভাগা শ্রবন সুনই দসসীসা।
আপুন উটি ধাবই রহই ন পাবই ধরি সব ঘালই খীসা॥
অসভ্রষ্ট অচারা ভা সংসারা, ধরম সুনিয় নহিঁ কানা।
তেহি বহু বিধি ত্রাসই দেস নিকাসই জো কহ বেদ পুরানা।
বরনিন জাই অনীতি ঘোর নিসাচর জো করহিঁ
হিংসা পর অতি প্রীতি তিন্হ কে পাপহিঁ কবণি মিতি।

জিন্হ কে ইহ আচরণ ভবানী
তে জানহু নিসিচর সব প্রাণী
অতিসয় দেখি ধরম কৈ গ্লানী
পরম সভীত ধরা অকুলানী।

কোনও স্থানে আর কোনও শুভ আচরণ রহিল না। কেহ আর দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরুকে মানে না। হরিভক্তি নাই। যজ্ঞ জপ দানাদি নাই। স্বপ্নেও বেদ ও পুরাণ কেহ শোনে না। জপযোগ বিরাগ তপস্যা যজ্ঞ এ সকলের কথা কানে শুনিলেই রাবণ উঠিয়া নিজেই ছোটে। সমস্ত লণ্ড ভণ্ড করিয়া দেয়। সংসার এমন ভ্রষ্টাচার-সম্পন্ন হইল যে ধর্ম্মের কথা আর কানেও শুনা যায় না। যে বেদ পুরাণের কথা বলে, তাহাকে নানা ভয় দেখাইয়া দেশের বাহির করা হয়। পার্ব্বতী, যাহাদের আচরণ এইরূপ জানিবে তাহারা রাক্ষস। ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া পৃথিবী বড় ভীত ও আকুল হইলেন।

রামের সহিত রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল। রাবণ রাক্ষসদের রাজা। রাক্ষস কাহারা? যাহারা শুভ আচরণ করিতে দেয় না, দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু মানে না, যজ্ঞ পণ্ড করে, সংসার ভ্রষ্টাচারী করে। বেদ পুরাণের কথা বলিলে তাহাকে দেশছাড়া করিয়া তাড়াইয়া দেয়, তাহারাই রাক্ষস জানিবে। এই রাক্ষস খুঁজিতে বেশীদূর যাইতে হয় না। মানুষের হৃদয়েই এই রাক্ষস-দল বাস করে। তাহাদের সর্দ্দার বা রাজা হৃদয়েই বাস করে। এই রাক্ষসের অত্যাচারে পৃথিবী পীড়িতা হইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন—

গিরি গরি সিংধু ভার নহিঁ মোহী
জস মোহি গরুঅ এক পরদ্রোহী
সকল ধরম দেখই বিপরীতা
কহিন সকই রাবণ ভয় ভীতা।

পৃথিবী কাঁদিয়া বলে একজন পরদ্রোহী আমার কাছে যত ভার, পর্ব্বত নদী সাগর এ সকল আমার কাছে তত ভার বোধ হয় না। আমি সমস্তই ধর্ম্ম-বিপরীত দেখিতেছি, রাক্ষস ভয়ে ভীত হইয়া কিছু বলিতে পারিতেছিনা। কিন্তু এক পরদ্রোহ রূপ রাক্ষস নয়, নানা হিংস্র ও পাপ-বৃত্তির রাক্ষস পুষিয়া মানুষ হৃদয়-পুরকে রাবণপুরী লঙ্কা করিয়া রাখিয়াছে।

পৃথিবী কাঁদিয়া ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, তাঁহার দ্বারা কিছুই হইবে না। তাঁহারা সকলেই রাবণ-ভয়ে ভীত। একমাত্র বিষ্ণু রক্ষা করিতে পারেন। তখন গাভীর বেশে পৃথিবী ও দেবতারা মিলিয়া উতলা হইয়া খুঁজিতে লাগিলেন—কোথায় বিষ্ণুকে পাওয়া যায়। কেহ বলে, চল বৈকুণ্ঠে যাই ; কেহ বলে, তিনি ক্ষীর-সমুদ্রে বাস করেন।

পুর বৈকুণ্ঠ জান কহ কোঈ
কোউ কহ পয়নিধিমহঁ বস সোঈ"

শিব ছিলেন রামভক্ত ; রাম বা বিষ্ণু কোথায় থাকেন তাহা তিনি জানেন।

"তেহি সমাজ গিরিজা মৈঁরহেউঁ
অবসর পাই বচন এককহেউঁ।
জাকে হৃদয় ভগতি জস প্রীতী
প্রভুতহঁ প্রগট সদা তেহি রীতি
হরি ব্যাপক সর্ব্বত্র সমানা
প্রেম তেঁ প্রগট হোহিঁ মৈঁ জানা
দেস কাল দিসি বিদিসহু মাহীঁ
কহহু সো কহাঁ জহাঁ প্রভু নাহীঁ
অগ জগময় সব রহিত বিরাগী
প্রেম তেঁ প্রভু প্রগটই জিমি আগী।"

শঙ্কর বলিলেন "সেই সকলের মধ্যে আমিও ছিলাম। অবসর পাইয়া একটা কথা বলিলাম। যাহার হৃদয়ে

ভক্তি যেমন, প্রভু সেই ভাবে সেখানে প্রকাশ হয়েন, ইহাই রীতি। হরি সকল স্থানে সমানভাবে ব্যাপ্ত থাকেন। আমি জানি তিনি প্রেমের বলে প্রত্যক্ষ হন। দেশ কালে দিকবিদিকে কোথায়ই বা তিনি না আছেন। সর্ব্বশূন্য বৈরাগী প্রভু স্থাবর জঙ্গমে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। আগুন যেমন কাঠের ভিতরেই আছে, ঘসিলেই প্রত্যক্ষ হয়, হরি তেমনি হৃদয়েই আছেন—প্রেমেই প্রত্যক্ষ দেখা দেন।

রাক্ষসেরা হিংসা পরদ্রোহ লোভ ও কামাদির রূপ লইয়া হৃদয়-ক্ষেত্রকে পীড়িত করিতেছিল। হরি তাহাদিগকে দমন করিবেন। হরি বা রামও হৃদয়ের ভিতরেই আছেন। চাই কেবল রামভক্তি; তাহা হইলেই তিনি প্রকাশ হইতে পারেন।

হৃদয়ে যখন রাক্ষসের উৎপাতের বোধ দেখা দেয়, তখনই রাম-জন্মের সূচনা হয়। দেবতারা যখন রাক্ষস দ্বারা পীড়িত হইয়া বিষ্ণুকে খুঁজিতেছিলেন এবং শিব যখন তাঁহাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, বিষ্ণুকে খুঁজিতে কোথাও যাইতে হইবে না, নিজের হৃদয়ের মধ্যে খুঁজিলেই তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে, তখন দেবতারা শ্রীভগবানের স্তুতি আরম্ভ করিলেন। ভগবান প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, তিনি দশরথ রাজার ঘরে দশরথ কৌশল্যার পুত্ররূপে জন্মিবেন। কেন না মনু ও শতরূপা তাঁহাকে পাওয়ার জন্য অনেক তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাই এ জন্মে দশরথ কৌশল্যারূপে জন্মিয়াছেন।

কস্যপ অদিতি মহাতপ কীন্হা
তিন্হকহঁ মৈঁ পূরব বর দীন্হা
তে দসরথ কৌশল্যা রূপা
কোসলপুরী প্রগট নর ভূপা।
তিন্হকে গৃহ অবতরি হউঁ জাঈ
রঘুকুল তিলক সো চারিউ ভাঈ।

রাবণের উৎপাতে হৃদয়ের প্রভু জাগিয়া উঠিয়া রাক্ষস মারার সঙ্কল্প লইলেন। রাবণ সদলে মারা গেল। রাক্ষসের শক্তি কম নয়। সে সমস্ত সৎগুণ দাবাইয়া রাখিয়াছিল; সে পার্থিব ধনে ও পার্থিব শক্তিতে পূর্ণ। সেও শক্তি অর্জ্জনের জন্যে তপস্যা করিয়াছে। সেই তপস্যার ফলে রাবণ রাজসিকতাই ক্রমশঃ অধিক করিয়া পাইয়াছে। সীতাকে হরণ করিয়া সে জগৎপিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যাহার হৃদয়ে রামভক্তি আছে, সেখানে কালক্রমে রাক্ষসের পরাজয় হয়। সহজে ত দুষ্টবৃত্তি পরাজয় মানে না। বিপুল যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়। রাবণ মরিয়াও মরে না—বার বার তাহার মাথা গজায়, দুষ্প্রবৃত্তি ও হিংসা নির্ম্মূল করা বড়ই শক্ত। অবশেষে রাবণ মারিলে ধর্ম্মরাজ্য বা রামরাজ্য হৃদয়ে স্থাপিত হয়।

ইহাই রাম-রাবণের যুদ্ধের অন্তরের দিক। ইহার বাহিরের দিক হইতেছে রাম-অবতারের অযোধ্যায় জন্ম ও কর্ম্ম। সে কাহিনীও পবিত্র, মঙ্গলদায়ক ও ভক্তিপ্রদ। রামায়ণের ভিতর দিয়া এই দুইটা ধারা—একটা বাহিরের একটা অন্তরের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। দুই-ই মনোহর, দুই-ই ভক্তিদায়ক। এই বর্ণনা করিতে করিতে তুলসীদাস বার বার মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, এমন প্রিয় হিতকারী এমন নিকটতম প্রভু রামকে কেন না ভজনা করিবে?

যাঁহারা রামায়ণের বাহ্যিক ধারায় খাঁটি ইতিহাস খোঁজেন, তাঁহাদিগকেও বাল্মীকি মহারাজ প্রথমেই ব্যর্থ করিয়া রাখিয়াছেন; স্বর্গ, পাতাল, দৈত্য দেবতা, আনিয়া রাবণের ঘাড়ে দশটা মাথা চাপাইয়া, যখন-তখন মায়া-মূর্ত্তি ধরার শক্তি দিয়া, বানর ভালুক ও পাখীকে দিয়া কথা বলাইয়া, হনুমানকে কখনও বা মাছির মত ছোট কখনো বা শতযোজন পরিমিত করিয়া, অতিপ্রাকৃত করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, কেহ যেন ইহার মধ্যে ইতিহাস না খোঁজেন।

এই রাম-কথার একজন প্রধান বক্তা কাক ভুষণ্ডী। সে কালের অতীত। মহাপ্রলয়েও তাহার মৃত্যু নাই। শুদ্ধ ভক্তিই কাকের রূপ ধরিয়া আছে। ধর্ম্মের ও সত্যের মতই সে কাক অবিনশ্বর। বার বার, কল্পে-কল্পে রাম অযোধ্যায় জন্মিতেছেন, বার-বার কাক তাঁহার শিশু-লীলা দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছে।

"জব জব অবধপুরী রঘুবীরা
ধরহিঁ ভগতহিত মনুজ সরীরা
তব তব জাই রামপুর রহঊ
সিসুলীলা বিলোকি সুখ লহঊ

যে অযোধ্যা কল্পে-কল্পে দেখা দেয়, বার বার যে

অযোধ্যায় রামের জন্ম হয়, যে দণ্ডকবন হইতে রাবণ বার বার সীতাহরণ করে, যে অযোধ্যায় বার বার রামের অভিষেক হয়, সে কি কোন ইতিহাসের, কোন ভূগোলের রামসীতা, অযোধ্যা ও দণ্ডকবন ?

কিন্তু তাই বলিয়া বাহ্যিক ধারার ঘটনা-স্থান ও চরিত্রগুলি কি অসত্য ? এই রামসীতার কাহিনী, রামের জন্ম, বাল্যলীলা, সীতার সহিত রামের সাক্ষাৎ, ধনুর্ভঙ্গ, বিবাহ, কৈকেয়ীর মন্ত্রণা, রামের বনবাস, রাবণের সীতাহরণ, লঙ্কায় যুদ্ধ এ সকল কি অসত্য ? আমি দৃঢ়ভাবে বলি যে উহা কখনো অসত্য নয়। ইতিহাস হিসাবে উহার কোনও স্থান নাই ; কিন্তু কল্পলোকে উহা সৃষ্ট। কতক বা ঐতিহাসিক কিছু আছে, তাহা হইলেও সকল মিলিয়া কাহিনীটা ইতিহাসের কাহিনী অপেক্ষাও সত্য ও বাস্তব। তাঁহারা বাস করিয়া গিয়াছেন এই ভারতভূমিতে ; ঐ অযোধ্যা, ঐ চিত্রকূট তাঁহারা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। যেখান যেখান দিয়া সীতাদেবী শুধু পায় হাঁটিয়া গিয়াছেন সেই স্থানের ধূলিকণা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। সেই ধূলিতে জন্মিয়া ভারতীয় কন্যারা নির্ম্মল হইয়াছে, সাধ্বী হইয়াছে।

রামায়ণের অঙ্গীভূত হর-পার্ব্বতী-কাহিনী, সতীর দক্ষযজ্ঞে দেহনাশ, পরে পর্ব্বতগৃহে, জন্ম, নারদের উপদেশ, উমার হাজার হাজার বৎসর তপস্যা, এ সকল কি মিথ্যা ? এ সকল মিথ্যা নহে ; ইতিহাসের সত্য অপেক্ষা অধিকতর সত্য। এমন সত্য যে, ভারতবাসী সমস্ত হিন্দুই নিজ অনুভূতি ও ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে উহার সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া সত্য বলিয়া প্রমাণ দিবে।

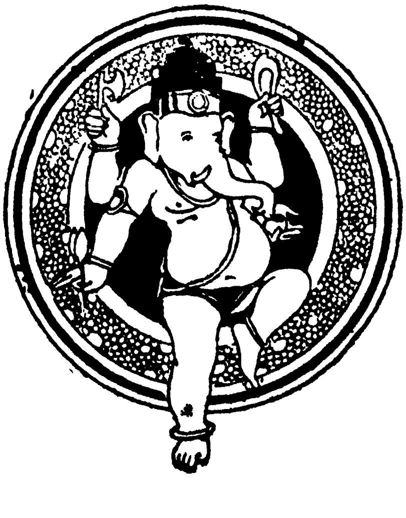
রামায়ণ পড়িতে বসিয়া এই অনুভূতি ও এই বিশ্বাসের সাক্ষ্য লইয়া পড়িলে ফল পাওয়া যাইবে। রামায়ণকে ছেলে-ভুলানো গল্প বলিয়া যিনি মনে করেন, তিনি কৃপার পাত্র। রামায়ণে হয় ত বা সবটাই কাল্পনিক, হয় ত বা কতকটা ঐতিহাসিক আছে। কিন্তু সমস্তটুকুই শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য।

তুলসীদাস লিখিয়াছেন যে তাঁহার রাম-কথা সকলের জন্য নয় ;—

যহ ন কহীজে সঠ হঠ—সীলহিঁ
জো মন লাই ন সুন হরি লীলহিঁ
কহিয় ন লোভিহি ক্রোধিহি কামিহি
জো ন ভজই সচরাচর স্বামিহি।

এই কথা, দুষ্ট জেদী লোক, যাহারা মন দিয়া হরিলীলা শুনে না, তাহাদিগকে বলিবে না। এ কথা কামী ক্রোধীকে ও যে জগৎপতিকে ভজনা করে না, তাহাকে বলিবে না। হয় ভক্তির সহিত পড়িবে, নয় ত পড়িবে না—ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায়।

তুলসী রামায়ণ পাঠের পূর্ব্বে ইহার কতকগুলি চরিত্র লইয়া আলোচনা করিলে শ্রদ্ধার ভাব বাড়া সম্ভব। পরে আরও কতকগুলি চরিত্র আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।





বন্যা

শ্রীসীতা দেবী বি-এ

(৫)

বৃষ্টি বাদলের দিন, গ্রামের পথে বেশী লোক-চলাচল নাই। প্রতুলচন্দ্র হাঁটিয়া যাইতে যাইতে দুই-চারিটির বেশী মানুষ দেখিলেন না। সকলেই বিস্মিত দৃষ্টিতে গরুর গাড়ীর দিকে তাকাইতে লাগিল। প্রতুলচন্দ্রকে কেহই এ গ্রামে চেনেনা, গরুর গাড়ীর ভিতর সুবর্ণ দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে, তাহাকেও ভাল করিয়া দেখা যায়না। যাহারাই তাঁহাদের দেখিল, মনে মনে নানারকম কল্পনা করিতে লাগিল।

গাড়ী আসিয়া একটি বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। প্রতুলচন্দ্র ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। বাড়ীটি দেখিলে সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ী বলিয়াই বোধ হয়। বাহিরের বৈঠকখানা-ঘরটি পাকা, ভিতরের ঘরগুলিও যা দেখা যায়, পাকা দেওয়াল, খড়ের চাল। চালে নূতন খড় পড়িয়াছে। সদর দরজাটি বেশ ভাল মজবুৎ কাঠের। সম্প্রতি উহা বন্ধ রহিয়াছে।

সুবর্ণ কম্পিতপদে গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া পিতার পাশে দাঁড়াইল। প্রতুলচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, ভয়ে মেয়ের মুখ একেবারে শাদা হইয়া গিয়াছে। একটুখানি হাসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "এত ভয় কিসের রে? আমার সঙ্গে এসেছিস্, তাতেও সাহস হচ্ছেনা?"

সুবর্ণ ঢোঁক গিলিয়া কোনোমতে চোখের জল সাম্‌লাইয়া লইল। অত্যাচারের স্মৃতি তাহার বক্ষ জুড়িয়া রহিয়াছে, তাহা সে ভুলিবে কেমন করিয়া? তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা কেহ কোনোদিন করে নাই, সুতরাং পিতার আশ্বাস-বাণী তাহার কানে ঢুকিল বটে, কিন্তু মনকে স্পর্শ করিলনা।

প্রতুলচন্দ্র দরজায় আঘাত করিলেন। সুবর্ণর বোধ হইল আঘাতটা যেন তাহারই বুকের উপর পড়িতেছে। ভয়ে, উত্তেজনায়, তাহার সারা শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল।

হঠাৎ করিয়া দরজাটা খুলিয়া গেল। একজন যুবতী বিধবা কপাটের আড়াল হইতে গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রতুলচন্দ্রের দিকে চাহিল। তিনিই সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু অবগুণ্ঠিতা সুবর্ণকে দেখিতে পাইয়া, তাহার মুখ কুটিল হাস্যে একেবারে ভরিয়া উঠিল। কপাট ধরিয়াই সে বাড়ীর ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া, ডাকিয়া বলিল "ওগো, রাজনন্দিনী দেশ বেড়িয়ে ফিরে এলেন গো, এবার রসুনচৌকী বাজাও!"

পরক্ষণেই দরজাটা দড়াম্ করিয়া তাঁহাদের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দিল!

সুবর্ণ ক্রন্দন-জড়িত স্বরে বলিল, "দেখ্‌লে ত বাবা!"

প্রতুলচন্দ্রের মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিল। তিনি প্রাণপণ বলে নিজেকে সংযত করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ভয় পাস্‌নে, এর শেষ দেখে যাওয়া যাক্।" তিনি দরজাটায় ঠেলা দিয়া দেখিলেন, হুড়কা বন্ধ করা হয় নাই, শুধু ভেজান আছে। সুবর্ণকে টানিয়া আনিয়া দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকাইয়া দিলেন, বলিলেন, "ভিতরে যা, এ বাড়ীতে তোর অধিকার আছে। কম দাম দিস্‌নি

এর জন্যে। দরজা ভেজিয়ে দিলেই এত বড় শেকলের বাঁধন কেটে যাবে?"

সুবর্ণ অগত্যা কাঁপিতে কাঁপিতে চলিল। প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন বৈঠকখানার জানালার কাছে একজন ছেলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে উগ্র কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছে। তিনি তাহার দিকে চাহিবামাত্র, সে চোখ নীচু করিল। প্রতুলচন্দ্র আন্দাজ করিলেন এইটিই তাঁহার জামাই হইবে। জোর করিয়া মুখে একটুখানি হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন "দরজাটা খোলো, আমি কি রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে থাকব?"

যুবক অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলিয়া দিল। প্রতুলচন্দ্র গরুর গাড়ীর দিকে নির্দ্দেশ করিয়া যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জিনিষপত্র কোথায় রাখবে?"

যুবক নির্ব্বোধের মত বলিল "তা আমি কি জানি?"

প্রতুলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি শ্রীবিলাস না?"

যুবক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে শ্রীবিলাসই বটে। প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আমি সুবর্ণর বাবা, তাকে নিয়ে এসেছি, দেখতেই পাচ্ছ। জিনিষপত্রের কি ব্যবস্থা হবে, সেটা কে বলে দেবে?"

শ্রীবিলাস কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। প্রতুলচন্দ্রের শেষের প্রশ্নগুলির কোনো উত্তর দিলনা। কোনোমতে অবনত হইয়া, প্রতুলচন্দ্রকে একটা প্রণাম করিয়া বলিল, "বসুন।"

ঘরে একজোড়া তক্তপোষের উপর ফরাশ পাতা; মোটা মোটা তাকিয়াও কয়েকটা আছে। এক কোণে ছোট একটা টেবিল এবং চেয়ার। ইহা শ্রীবিলাসের পড়িবার আড্ডা। প্রতুলচন্দ্রের ফরাশে বসা তত অভ্যাস ছিলনা, তিনি চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া বসিলেন। জামাইয়ের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পড়?"

শ্রীবিলাস একটু যেন বিরক্তভাবে বিড়বিড় করিয়া বলিল, "এবার সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছি।"

প্রতুলচন্দ্র আবার কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সুবর্ণর ভয়ার্ত্ত চিৎকার তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। চেয়ার ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি তিনি উঠিয়া পড়িলেন। সুবর্ণ পরমুহূর্ত্তেই আর্ত্তনাদ করিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝাঁটা হাতে এক বিধবা প্রৌঢ়া।

প্রতুলচন্দ্র এক লাফে সিঁড়ি কয়েকটা অতিক্রম করিয়া উঠানে নামিয়া পড়িলেন; ঝাঁটা-গাছ আবার উদ্যত হইয়াছিল, ডানহাতে সেটাকে ঠেকাইয়া, কঠোরস্বরে বলিলেন, "এ কি কাণ্ড? আপনি করছেন কি?"

প্রৌঢ়া বিকট মুখভঙ্গি সহকারে, গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "এত বড় আস্পর্দ্ধা, পোড়ামুখ নিয়ে আবার আমার বাড়ীতেই ঢুকেছে? এই দণ্ডে বেরিয়ে যাও, নইলে আঁশবটি দিয়ে কেটে দুখান করব।"

প্রতুলচন্দ্র ঝাঁটাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিলেন। সুবর্ণকে পিছনে ঠেলিয়া দিয়া, নিজের শরীর দিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া বলিলেন, "আপনি এ-সব কি বল্‌ছেন বেয়ান? মা মৃত্যুশয্যায়, তাকে দেখ্‌তে গিয়েছিল, সেটা কি এমন অপরাধ?"

শ্রীবিলাসের মা ক্ষিপ্তের মত মুখ খিঁচাইয়া উঠিলেন "আ মরি মরি, যেমন বেটি, তার তেমনি বাপ! ইনি আবার এলেন সাফাই গাইতে, ধর্ম্ম দেখাতে। বলি এতদিন ছিলে কোথা? এতদিন ত কোনো বাপের সন্ধান মেলেনি? গেরস্তবাড়ীর বৌ, রাত-বেরাত পালিয়ে গেলে অপরাধ হয় না? কোন্ দেশ থেকে এসেছ?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "যে দেশ থেকেই আসি, তাতে কিছু এসে-যাচ্ছেনা। আপনারা সুবর্ণকে ঘরে নেবেন কিনা, সেইটা আমার জানা দরকার।"

সুবর্ণর শাশুড়ী হাত নাড়িয়া বলিল "ও বাবা, আবার চোখ রাঙানি! বেরোও মেয়ে নিয়ে।"

শ্রীবিলাসও বৈঠকখানার দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে একটা কথাও বলে নাই। প্রতুলচন্দ্র এবার তাহার দিকে ফিরিয়া রোষতিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমারও কি ঐ মত নাকি?"

শ্রীবিলাস একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কি যেন বলিতে যাইতেছিল, আবার সাম্‌লাইয়া গেল। সুবর্ণ তখন পিতার পিছনে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। শ্রীবিলাস একবার বিরক্তভাবে তাহার দিকেও চাহিয়া দেখিল। প্রতুলচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা

করিলেন "কি, তোমার এ বিষয়ে বলবার কিছুই নেই নাকি? বিয়েটা তুমিই ত করেছিলে?"

শ্রীবিলাস নীচুগলায় বলিল "আমার মা যা বল্‌ছেন, তার উপর আমার আর বল্‌বার কিছু নেই। আপনার মেয়ে নিয়ে যান্‌।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বেশ কথা, রেখে যেতে হলেই দুঃখের কারণ হত। কিন্তু এই নিয়ে যাওয়াটাই শেষ নিয়ে যাওয়া, তা মনে রেখো।"

সুবর্ণর হাত ধরিয়া, এক টান দিয়া তিনি মাটি হইতে উঠাইয়া ফেলিলেন। বাঁ হাতের লোহাটা তাঁহার হাতে ফুটিয়া গিয়া, নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া দিল। তিনি একবার তীব্র দৃষ্টিতে সেটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর সজোরে সেটা টানিয়া মেয়ের হাত হইতে খুলিয়া ফেলিলেন। শ্রীবিলাসের গায়ের উপর লোহাটা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, "আমার মেয়ের স্বামী নেই জান্‌লাম। মাটির ঢেলার সঙ্গে কখনও স্ত্রীলোকের বিয়ে হয়না।"

শ্রীবিলাসের বোন্‌ আকাশ ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রতুলচন্দ্র সুবর্ণকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। গরুর গাড়ীর হতবুদ্ধি গাড়োয়ানকে ঠেলা দিয়া সচেতন করিয়া বলিলেন, "নাও, চল, আবার নৌকার ঘাটে যেতে হবে।"

সুবর্ণ আবার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। প্রতুলচন্দ্রও এবার গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

নৌকার ঘাটে আসিতে বেশী দেরি হইলনা। মাঝি সুবর্ণকে শুদ্ধ ফিরিতে দেখিয়া অত্যন্তই অবাক হইল, কিন্তু প্রতুলচন্দ্রের ভ্রূকুটি দেখিয়া কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে আর সাহস করিলনা। জিনিষপত্র নৌকায় তুলিয়া দিয়া গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান বিদায় হইয়া গেল।

নৌকার ভিতর সুবর্ণ মুখ গুঁজিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্ষুদ্র মনের ভিতর কি যে ঝড় বহিতেছিল, তাহা অন্তর্য্যামাই জানেন। তাহার অপরিণত বুদ্ধি দিয়া সে বুঝিতেছিল, এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, নারীর জীবনে যাহার চেয়ে শোচনীয় আর কিছু ঘটিতে পারেনা! জন্মাবধি সে দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, স্বামীর আশ্রয়ে বাস করা ভিন্ন গৃহস্থ-ঘরের নারীর অন্ত কোনো গতি নাই। আজকার ঘটনায় চিরদিনের জন্ত সে সেই আশ্রয় হারাইল। ইহার পর সে কোথায় যাইবে, কি ভাবে দিন কাটাইবে? বালিকা ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ভীষণ অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইল না। নিজ হইতেই চোখ তাহার জলে ভরিয়া আসিল, হৃদয়ের দারুণ বেদনা ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িল। নারী দুঃখ পাইলে ভাগ্যকে অপবাদ দিয়া কাঁদিতে বসে, ইহা ভিন্ন আর কিছু সে দেখে নাই।

প্রতুলচন্দ্র কাছে আসিয়া, তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন, বলিলেন, "কার জন্তে কাঁদছ মা? ওদের মত কশাইয়ের হাত থেকে মুক্তি পেলে, এতে ত দুঃখ করবার কিছু দেখছি না?"

সুবর্ণ মুখ তুলিয়া বলিল, "কিন্তু এর পর আমার কি হবে বাবা?"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। "কি হবে কি রকম? এখন তো অনেক কিছু হবার পথ খোলা পড়ে রয়েছে? বরং, তোমাকে যদি ওরা ঘরে নিত, তা হলেই কিছু হবার পথটা বন্ধ হত। আমি তোমাকে যেমন ভাবে মানুষ করব ভেবেছিলাম, তাই এখন করব; আরম্ভ করতে অনেকটা দেরী হয়ে গেল, এই যা। তোমাকে এ-সব একেবারে ভুলে যেতে হবে; সমস্ত মন দিতে হবে নিজেকে তৈরী করার জন্তে। কোনো কিছুতে আপত্তি করবেনা, কিছুতে ভয় পাবেনা, দুঃখ পাবেনা।"

সুবর্ণ সব কথা ভাল করিয়া বুঝিল কিনা কে জানে; কিন্তু, পিতা যে তাহাকে আশ্বাস দিতেছেন তাহা বুঝিল; তিনি থাকিতে তাহার আশ্রয়ের অভাব নাই, তাহাও বুঝিল! চোখ মুখ মুছিয়া সে শান্ত হইয়া বসিল। শ্বশুরবাড়ীর কাহারও সহিত তাহার স্নেহ, ভালবাসার সম্বন্ধ হয় নাই, সুতরাং তাহাদের ছাড়িয়া আসিতে তাহার কোনো বেদনা বোধ হইলনা। তাহার ভয় ছিল খালি অপবাদের, খালি আশ্রয়হীনতা, অবলম্বনহীনতার।

নৌকা যখন জামগ্রালের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল, তখন বর্ষা-সন্ধ্যার অন্ধকার ধরণীকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়াছে। প্রতুলচন্দ্র সম্মুখে তাকাইয়া বলিলেন, "ওহে, একটা হারিকেন-টেন জোগাড় করতে পার? যা আঁধার দেখছি, এতে ত পথ-চলা অসম্ভব।"

মাঝির সঙ্গে ভাঙা হারিকেন লণ্ঠন একটা ছিল।

তাহাতে আলো যত হোক বা নাই হোক, ধোঁওয়া হয় প্রচুর। কিন্তু অন্য আলোর অভাবে, এই লণ্ঠনই জ্বালা হইল। রাত্রি হইয়া আসিয়াছে, এখন আর গরুর গাড়ীর আশা করা বৃথা। মাঝি হাঁকডাক করিয়া দুইজন লোক জোগাড় করিল। তাহাদের কাঁধে জিনিষপত্র চাপাইয়া, নিজে সুবর্ণর হাত ধরিয়া প্রতুলচন্দ্র সাবধানে অগ্রসর হইলেন। রাস্তায় জনমানব নাই। পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হইলনা, কোনো কৈফিয়ৎ যে তাঁহাকে দিতে হইলনা, ইহাতে প্রতুলচন্দ্র খুসিই হইলেন।

সুবর্ণর মাসী-মা কোনোমতে একটা প্রদীপ জ্বালাইয়া, গৃহস্থঘরের অকল্যাণ দূর করিয়াছিলেন। আর সারা বাড়ী অন্ধকার। নিজে সামান্য জলযোগ করিয়া, মুড়িসুড়ি দিয়া শুইয়া ছিলেন। ঘুমান নাই, কারণ প্রতুলচন্দ্রের ফিরিয়া আসার কথা ছিল। ভদ্র কুটুম্ববাড়ী হইলে, তাহারা আদর-আপ্যায়ন করিয়া ধরিয়া রাখিত। এ-ক্ষেত্রে সে-রকম সম্ভাবনা কিছুই ছিলনা। বিধবা ভগিনীপতির খাবার তৈয়ারী করিয়া রান্নাঘরে উনুনের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া, শুইয়াছিলেন; প্রতুলচন্দ্র আসিলে উঠিয়া বাড়িয়া দিবেন। ভয়ও খানিকটা করিতেছিল। এই সে-দিন এ-বাড়ী হইতে শ্মশান-যাত্রা ঘটিয়াছে, ভাবিতেই গা কেমন ছম্‌ছম্ করিতেছিল। সংসারে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালবাসার সম্বন্ধ কি নিবিড়! কিন্তু একবার এই পার্থিব জগতের গণ্ডি পার হইয়া গেলেই, সে ভালবাসা কেমন করিয়া দারুণ ভীতিতে পরিণত হয়। ভগিনীকে দেখিবার কথা আর যেন তিনি মনেই করিতে পারেননা।

হঠাৎ বাহিরের দরজায় করাঘাত হইল। প্রতুল ফিরিয়া আসিল নাকি? আচ্ছা চামার কুটুম্ব হইয়াছে, মানুষটাকে একেবারে দাঁড়াইয়া বিদায় দিয়াছে, বসিবার আসনও দেয় নাই বোধ হয়। নহিলে এত চট্ করিয়া ফিরিয়া আসিবে কেমন করিয়া?

ডাকিয়া বলিলেন, "একটুখানি সবুর কর ভাই, লণ্ঠনটা জ্বেলে নিয়ে গিয়ে দোর খুল্‌ছি। পিদিম নিয়ে বেরুলে, এখনি হাওয়ায় নিভে যাবে।"

বালিশের তলা হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বালাইলেন। আঁচলটা ভাল করিয়া দুই ফের দিয়া গায়ে জড়াইয়া, উঠানে নামিয়া সদর দরজার হুড়কো খুলিয়া বলিলেন "এস ভাই এস, বা—"তাঁহার মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল। হতবুদ্ধি-ভাবে তিনি সুবর্ণর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রতুলচন্দ্র ভিতরে ঢুকিয়া, পিছনের লোক দুজনকে বলিলেন, "এই দিকে নিয়ে এস হে। ঐ ঘরের ভিতর নামিয়ে রাখ।"

লোক দুইজন বাক্স বিছানা নামাইয়া রাখিয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। মাঝিও ভাঙা লণ্ঠন লইয়া পথ দেখাইয়া আসিয়াছিল; সেও নিজের পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া বিদায় হইল। প্রতুলচন্দ্র মেয়েকে লইয়া ঘরের ভিতর গিয়া বসিলেন।

বিধবা শ্যালিকা এতক্ষণে মুখ খুলিলেন; "এ কি কাণ্ড ভাই, সুবর্ণকে ফিরে নিয়ে এলে যে?"

প্রতুলচন্দ্র মাথা নীচু করিয়া জুতার ফিতা খুলিতে-ছিলেন। তিনি সেইভাবে থাকিয়াই বলিলেন, "ওরা বৌ নেবেনা।"

মাসী-মা গালে হাত দিয়া বলিলেন, "কি কাণ্ড, মাগো মা! এমন চামারের ঘরেও মেয়ে দিয়েছিল গা! এখন মেয়েটার গতি কি হবে?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "এইবার সদ্গতি একটা কিছু হলেও হতে পারে। ও-বাড়ীতে আবার ঢুকলে, নিতান্ত জানোয়ারের গতির বেশী কিছু হতনা।"

শ্যালিকা সব কথা তলাইয়া না বুঝিয়া বলিলেন, "মিথ্যে না ভাই। নামেই ভদ্দরলোক। তা যা হবার তা হল, হাতমুখ ধুয়ে খাও দাও। যা ভাত আছে, হয়ে যাবে হয় ত। কম হয় ত ফলটল রয়েছে, কিছু কেটে দেবো।"

কম পড়িলনা। সারাদিনের উত্তেজনা এবং ক্লান্তির ফলে পিতা বা কন্যা কাহারও আহারে বিশেষ রুচি ছিলনা। নামমাত্র খাইয়া, বিছানা করিয়া সকলে শুইয়া পড়িলেন। সুবর্ণই ঘর ঝাঁট দিয়া বিছানা পাতিল। পিতার জন্য পান সাজিয়া আনিল, খাবার জল আনিয়া ঢাকা দিয়া রাখিল। পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল "মশারি টাঙিয়ে দেব বাবা? এ ঘরটাতে মাঝে মাঝে মশা লাগে।"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "না মা, মশারিতে আমার দরকার নেই, ও বেরাটোপের মধ্যে আমি ঘুমুতে পারিনা।

দ্বারের নিকট দণ্ডায়মানা শ্যালিকাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এইটুকু মেয়ে ত খুব গুছিয়ে কাজ করতে শিখেছে ?"

সুবর্ণর মাসী-মা বলিলেন, "তা খুব। না হলে রক্ষেকালী শাশুড়ী, ওকে আস্ত রাখত ? দজ্জাল শাশুড়ীর হাতে পড়লে, খোয়ার হয় বটে, তবে কাজকর্ম্ম ভাল শেখে।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "হ্যাঁ, তবে ভাল কাজ শেখার ওর চেয়ে সুবিধাজনক ব্যবস্থাও হতে পারে।"

সুবর্ণর মাসী-মা একটুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমার কিন্তু কাল না গেলেই চলবেনা ভাই। ঘরসংসার সব ত ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি, গিয়ে কি অবস্থা যে দেখ্‌ব তাও জানিনা।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আমিও ত কালই যাচ্ছি। সুতরাং আপনার যাওয়ার কোনো অসুবিধে হবেনা।"

বিধবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলকাতায়ই আপাতক যাবে ত ?"

প্রতুলচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন "হ্যাঁ।"

(৬)

পরদিন সকাল হইতে-না-হইতে এ বাড়ীতে যাওয়ার ধূম লাগিয়া গেল। কোনোমতে ভাতে-ভাত দুটা সিদ্ধ করিয়া সুবর্ণর মাসীমা নিজে খাইলেন; বোন্‌ঝি, ভগিনীপতিকেও খাওয়াইলেন, কারণ কিছু মুখে না দিয়া এতখানি পথ যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়না। তাঁহার নিজের সঙ্গে ছোট একটি টিনের প্যাঁট্‌রা ভিন্ন অন্য কোনো জিনিষ ছিলনা, সুতরাং তাঁহার গোছগাছ সহজেই হইয়া গেল। প্রতুলচন্দ্রের সব ব্যবস্থা সাঙ্গ করিতে খানিকটা দেরি হইল। দেশের বাড়ীতে আর শীঘ্র ফিরিবার কোনো সম্ভাবনা ছিলনা, সুতরাং জিনিষপত্র এখানে কিছু আর না রাখিয়া যাওয়াই ভাল। যাহা কিছু লইয়া যাওয়া যায়, তাহা সুবর্ণ গুছাইয়া লইল। বাকি জিনিষ, যেমন বাসন-কোষণ, খাট, চৌকী প্রভৃতি এক নিকট আত্মীয়ের ঘরে রাখিয়া আসা হইল। বাড়ীতে থাকিবার লোক চট্ করিয়া কাহাকেও পাওয়া গেলনা; প্রতুলচন্দ্র কলিকাতায় গিয়া সে ব্যবস্থা করিবেন মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন। সম্প্রতিকার মত, গ্রামের পাঁচু নাপিতকে রাত্রে আসিয়া শুইয়া থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মাসিক চারিটা টাকা পাইবার লোভে সে সহজেই রাজী হইল।

বিধবা শ্যালিকা প্রথমে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার বাড়ী যে গ্রামে, তাহা আম্‌রালের উত্তর দিকে; সেখানে যাইতে হইলে বিজয়নদ পার হইতেই হয়না। তাঁহার জন্য গরুর গাড়ী আসিল। একটি নীচ-জাতীয়া স্ত্রীলোক তাঁহার সঙ্গে যাইবে, সেও খাইয়া দাইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিল।

সুবর্ণ তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পরিচিত সংসারের এই মাসিমাই শেষ প্রতিনিধি। আর যাহাদের চিনিত, তাহাদের জন্মের মত সে ছাড়িয়া আসিয়াছে। সকলের চেয়ে আপন যিনি ছিলেন, সেই মা তাহাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়া গিয়াছেন। পিতাকে সে চেনেনা। তাঁহার গম্ভীর মুখ, রাশভারি কথাবার্ত্তা সুবর্ণর মনে অনেকটা ভয়েরই সঞ্চার করে। তবু বারো তেরো বৎসরের মেয়ে, বুদ্ধিশুদ্ধি খানিকটা হইয়াছে। পিতাই যে তাহার এখানকার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তিনি যে তাহার একান্ত হিতকামী, তাহা সে বুঝিতে পারে। তবু মাসিমাকে ছাড়িয়া দিতে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

মাসিমাও কাঁদিতে লাগিলেন। চোখ মুছিতে মুছিতে প্রতুলচন্দ্রকে বলিলেন "তোমাকে কি আর বল্‌ব ভাই, এখন এই মেয়ে নিয়ে না জানি কত বিপদ হবে। মেয়ে সন্তান, কুসন্তান, চিরটা কাল দুঃখ দিতেই আছে। ওর মা হতভাগীও এমন সময় গেল!"

সুবর্ণকে বলিলেন, "কাঁদিস্‌নে মা, কেঁদে আর হবে কি ? তোর অদৃষ্টের লিখনই এই রকম। বরাতে থাকে ত ওদের মন কোনোদিন ফিরেও যেতে পারে। ঠাকুর-দেবতার উপর মতি রাখিস্, বাপকে যেন কখনও তোর জন্যে দুঃখ না পেতে হয়।"

প্রতুলচন্দ্র কথা বলিলেন না। মাসিমার আক্ষেপ শুনিয়া তাঁহার মুখে একটু যেন শ্লেষের ভাব দেখা দিল। সুবর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে মাসিমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিল।

তাহার পর আসিল নিজেদের বিদায়ের পালা। দুই তিনখানা গরুর গাড়ী ডাকিতে হইল, কারণ জিনিষপত্র সঙ্গে অনেকগুলি। পাড়া-প্রতিবেশী যাহারা বিদায় দিতে

আসিয়াছিল, সংক্ষেপে তাহাদের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া, তিনি মেয়েকে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। পাঁচু আসিয়া বাড়ীর চাবি লইয়া গেল। সুবর্ণ মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল; তাহার পরিচিত জীবন আজ সকল দিক হইতেই শেষ হইতে চলিল, তাহার আর কাহারও মুখের দিকে চাহিতে ইচ্ছা করিতেছিলনা। তাহার বুক নিরুদ্ধ ক্রন্দনের বেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। পিতাই এখন তাহার একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র অবলম্বন; কিন্তু এই পিতাকে সে একেবারেই চেনেনা। মাতার নিকট পিতার বিষয় কোনো কথাই সে কোনোদিন শুনে নাই; শাশুড়ী ননদের কাছে যাহা শুনিয়াছে তাহাতে পিতার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বা ভালবাসা কিছুই তাহার জন্মে নাই। পিতার মতিগতি ভাল নয়, ইহাই সে বারবার শুনিয়াছে। তিনি যে সুবর্ণকে কোন্ পথে চালাইতে চাহিবেন, তাহা কিছুই সে বুঝিলনা। কিন্তু যে পথেই চালান, তাহাকে চলিতে হইবে। আর তাহার গতি নাই, স্বামীর ঘরের দরজা চিরদিনের মত তাহার কাছে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

নৌকায় অনেকক্ষণ যাইতে হইল। জলপথ তাহার কাছে সুপরিচিত, চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে তাহার বেশী কিছু ইচ্ছা করিলনা। তাহা ছাড়া বিজয়নদের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া মনে আশঙ্কা বই অন্য কোনো ভাবের উদ্রেক হয়না। সুবর্ণর মন এমনই কাতর ছিল, সে আর কোনোদিকে না তাকাইয়া এক কোণে একটা মাদুরের উপর গুটি-সুটি মারিয়া শুইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রতুলচন্দ্র সারাটা পথ একাসনে বসিয়াই কাটাইয়া দিলেন। বিশ্বের ভাবনা তাঁহার মাথার ভিতর ভীড় করিয়া আসিতেছিল, ভাবিয়া তিনি শেষ করিতে পারিতেছিলেনা।

অনেকখানি পথ আসিয়া তবে ট্রেন পাওয়া যায়। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে বেলা দুপুর হইয়া গেল। কলিকাতাগামী ট্রেন আসিতে তখনও ঘণ্টা-খানেক দেরি ছিল। প্রতুলচন্দ্র মেয়েকে নামাইয়া একটা গরুর গাড়ীতে বসাইলেন, জিনিষপত্র আর একখানা ছইবিহীন গাড়ীতে বোঝাই করা হইল। নৌকার ঘাট হইতে ষ্টেসন কিছু দূরে, জিনিষ-পত্র লইয়া হাঁটিয়া যাওয়া যায় না। জিনিষ তোলা শেষ হইলে পর সুবর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খিদে পেয়েছে নাকি? তাহ'লে সামনের দোকানে খাওয়া-দাওয়া করে নেওয়া যায়।"

সুবর্ণ বলিল, "না বাবা, আমার একেবারে কিছু খেতে ইচ্ছা করছেনা।" সুতরাং গরুর গাড়ী একেবারে ষ্টেসনে গিয়া দাঁড়াইল।

সুবর্ণ ইতিপূর্ব্বে কোনোদিন ট্রেনে চড়ে নাই। ট্রেন চোখে দেখিবারও তাহার প্রয়োজন হয় নাই। জন্মিবার পর কয়েকটা বৎসর তাহার কাটিয়াছিল জামুয়ালে, বাকি কয়েকটা বৎসর শ্বশুরালয় ভাটগ্রামে। এক গ্রাম হইতে আর একটা গ্রাম নৌকাযোগেই যাইতে হয়, কাজেই ট্রেনের সহিত সুবর্ণর চাক্ষুষ পরিচয়ও এতদিন হয় নাই।

ছোট গ্রাম্য ষ্টেশন; যাত্রীর ভীড় খুব বেশী যে, তাহা নয়। লাল সুরকি-বিছান প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম, দুখানি মাত্র পাকা-ঘর, আর কয়েকটা টিনের শেড্। ইহাই সুবর্ণর চোখে কি আশ্চর্য্যই লাগিল! বাবা, লোক কত! ইহারা সব চলিয়াছে কোথায়? কি কোলাহল! ঐ পাগড়ী-বাঁধা লোকটা কোন্ দেশের কে জানে? কি অদ্ভুত ভাবে কথা বলিতেছে, ইহাই কি হিন্দি ভাষা? সুবর্ণ হিন্দিও কোন দিন কাণে শোনে নাই। মেয়েমানুষটি উহার কে? বউ হইবে বোধ হয়। মেয়েমানুষ আবার সামনে কোঁচা দিয়া কাপড় পরে। এতক্ষণ পরে সুবর্ণর মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিল। প্রতুলচন্দ্র টিকিট কেনা, লগেজ করা, কলিকাতায় টেলিগ্রাম করা প্রভৃতি সব কাজ সারিয়া, মেয়ের কাছে আসিয়া বসিলেন। সুবর্ণ তখনও সেই হিন্দুস্থানী মেয়েটির দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে। পিতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ বাবা, ওরা কোন্ দেশের মানুষ?"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "কেন, তোরা কি হিন্দুস্থানীও দেখিস্‌নি? আচ্ছা চল, কলকাতায় দুনিয়ার যত জাতের মানুষ আছে সবই সেখানে দেখ্‌তে পাবি।"

সুবর্ণর চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বালিকার মনের উপর এতকাল সমাজ যেন পাষাণ-ভার চাপাইয়া রাখিয়াছিল। হাসিতে পর্য্যন্ত সে ভুলিয়া গিয়াছিল। একদিন কি কারণে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠায় শাশুড়ীর হাতে যা লাঞ্ছনা হইয়াছিল, তাহা সে এখনও পর্য্যন্ত ভুলিতে পারে নাই। শাশুড়ী গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিলেন, "গেরস্ত ঘরের বৌ, অমন দাঁত বার করে হা হা করে হাসে? কেমন মায়ের মেয়ে গা তুমি? ভদ্দর ঘরের চালচলন কিছুই জাননা দেখি। অমন

দাঁত বার করা দেখলে এরপর নোড়া দিয়ে দাঁত ভেঙ্গে দেব।" সেই অবধি ভয়ে সুবর্ণ আর হাসে নাই। অবশ্য শাশুড়ী, ননদের কল্যাণে হাসির খোরাক যে নিত্যই তাহার জুটিত, এমন কিছু নয়।

অচেনা পথের যাত্রী হইয়া ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতেছিল বটে। কিন্তু বুকের পাষাণভার অনেক খানিই যে হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে, তাহা সে অনুভব না করিয়া পারিতেছিলনা। বাবা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ বটে, কিন্তু কথা বলিলে কথার জবাব দেন, হাসিতে দেখিলে নোড়ার ঘায়ে দাঁত ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব করেন না। কালে সঙ্গে থাকিতে থাকিতে ইঁহার সম্বন্ধে ভয় সঙ্কোচ সব দূর হইয়া যাওয়াই সম্ভব।

ট্রেন আসিয়া পড়িল। ইহাতেই যাইতে হইবে? বিপুলকায় লৌহ-দানবের দিকে চাহিয়া সুবর্ণর বুক ভয়ে বিস্ময়ে যেন স্তম্ভিত হইয়া আসিতে লাগিল। এমন জিনিষ জীবনে সে কখনও দেখে নাই। এমন তীব্র বেগে গাড়ী যাইতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করে নাই।

প্রতুলচন্দ্র মেয়েকে নাড়া দিয়া বলিলেন "আরে, হাঁ করে দেখ্‌ছিস্ কি? শীগ্‌গির চল্, গাড়ী দাঁড়ায় ত মোটে তিন মিনিট!"

সুবর্ণ সচেতন হইয়া বাবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিল। সব গাড়ীগুলিই মানুষে ভরপুর, কোথায় তাহারা উঠিবে? মাত্র তিন মিনিট গাড়ী দাঁড়ায়? হায়, হায়, তাহাদের বুঝি আর যাওয়া হইল না।

প্রতুলচন্দ্র একটা গাড়ীর দরজা টানিয়া খুলিয়া বলিলেন "উঠে পড় শীগ্‌গির।" তিনি একরকম তাহাকে কোলে করিয়াই গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। কুলীরা হুড়াহুড়ি করিয়া বাক্স প্যাঁটরা যেমন তেমন ভাবে গাড়ীর ভিতর ঢুকাইয়া দিতে লাগিল। বিস্ময়ে আতঙ্কে সুবর্ণর বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ওমা গো, কি হইবে? হতভাগা কুলীরা বাবাকেই যে উঠিতে দিতেছেনা? এই বুঝি গাড়ী ছাড়ে। সুবর্ণ একলা মেয়ে গাড়ীর মধ্যে, আর সব পুরুষ মানুষ! কি সর্ব্বনাশ! বাবা যদি না উঠিতে পারেন, তাহা হইলে সে ত একেবারে অকূলে ভাসিয়া যাইবে।

যাহা হউক, শেষ মুহূর্ত্তে একটা কুলীকে প্রায় ঠেলিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া প্রতুলচন্দ্র গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন। গাড়ীও সেইক্ষণেই ছাড়িয়া দিল। কুলী কয়টা পয়সার জন্য চিৎকার করিতে করিতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া চলিল। তাহারা যাহা চাহিল, প্রতুলচন্দ্র দরদাম না করিয়া তাহাই দিয়া দিলেন। তাঁহার তখন এ সকল ছোট কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় ছিলনা।

গাড়ীটায় ভীড় খুব বেশী ছিলনা। দুইখানা বেঞ্চি ভরিয়া গিয়াছিল, তৃতীয়টিতে একজন বৃদ্ধ এতক্ষণ শুইয়াছিলেন। সুবর্ণকে ঢুকিতে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিয়া নিজের কম্বল প্রভৃতি গুটাইয়া লইয়া তাহাকে বসিবার জায়গা করিয়া দিলেন। সুবর্ণ জড়সড় হইয়া বসিল বটে, কিন্তু প্রতুলচন্দ্র যতক্ষণ গাড়ীতে উঠিয়া তাহার পাশে না বসিলেন, ততক্ষণ সে পাথরের মূর্ত্তির মত নিঃস্পন্দ হইয়া রহিল।

প্রতুলচন্দ্র বসিয়া বলিলেন, "ওকি রে, অমন করে বসেছিস্ কেন? ঢের ত জায়গা রয়েছে, ভাল করে বোস্ না? এখনও রাত দশটা অবধি এই গাড়ীতেই যেতে হবে।"

সুবর্ণ একটু আরাম করিয়া বসিল। সহযাত্রী বৃদ্ধ প্রতুলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মশায় কি কল্‌কাতা যাচ্ছেন?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "হ্যাঁ।"

বৃদ্ধের বোধ হয় আরো কিছু কথাবার্ত্তা বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রতুলচন্দ্র স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী, চেনা মানুষের সঙ্গেই তিনি সহজে কথা বলিতেন না; অপরিচিতের সঙ্গে একেবারেই বলিতেননা। বৃদ্ধের কথার উত্তর সংক্ষেপে এক কথায় চুকাইয়া দিয়া, সেই যে তিনি পাশ ফিরিয়া বসিয়া, জান্‌লা দিয়া বাহিরে চাহিয়া রহিলেন, আর ঘণ্টা দুইয়ের ভিতর নড়িলেননা। মাঝে কেবল একবার সুবর্ণকে বলিলেন, "ক্ষিদে পেলে আমায় বলিস্, সেই কোন্ সকালে দুটো ভাতে-ভাত মুখে গুঁজে বেরিয়েছিস্।"

কিন্তু খাইবার দরকার আর সুবর্ণর হইলই না। তাহার দুই চক্ষুর যা খোরাক জুটিতেছিল, তাহাতেই ক্ষুধাতৃষ্ণা তাহার মিটিয়া গিয়াছিল। সে একেবারে আকুল আগ্রহে জানলার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেছিল। পৃথিবী বলিয়া একটা জিনিষের নাম সে কথায় কথায় শুনিত বটে, কিন্তু তাহার অর্থ বুঝিতনা। ছোট দুইখানি

গ্রাম, ভৈরব মূর্ত্তি বিজয় নদ, এই ছিল তাহার জগৎ। ইহার সীমানার বাহিরে এতবড় পৃথিবী পড়িয়া ছিল? তাহার এমন বিচিত্র রূপ? বিস্ময়ে বালিকার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আরো কত না জানি তাহার দেখিতে বাকি আছে।

এক-একটা ষ্টেসনে গাড়ী থামিতেছিল, আর সুবর্ণর বিস্ময় আরো যেন বাড়িয়া যাইতেছিল। বাবা রে, কতরকম লোক, কি ভীষণ গোলমাল। বুদ্ধি দিয়া পরিষ্কারভাবে না বুঝিলেও সে অনুভব করিতে লাগিল, এই বাহিরের পৃথিবীটা যেমন বড়, মানুষের জীবনও হয় ত তেমনি বড়। উহার মধ্যে খালি স্বামীর অবহেলা, শাশুড়ী ননদের অত্যাচার নাই, আরো কিছু থাকিতে পাবে। সে যে কি, তাহা সুবর্ণ জানেনা; কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই তাহার অপরিণত মন সেই অদূর ভবিষ্যতের অচেনা জীবনকে বরণ করিয়া লইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল।

গাড়ীর অবিশ্রাম শব্দ আর দোলানিতে ক্রমে তাহার চোখের পাতা বুজিয়া আসিতে লাগিল। প্রতুলচন্দ্র তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে, ঘুম পেয়ে গেছে নাকি? শুবি একটু?"

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এতক্ষণে আর একটা কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া বলিলেন "হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুইয়ে দিন, ছেলেমানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ও-দিকের বেঞ্চে অনেকখানি জায়গা খালি হয়ে গিয়েছে, আমি উঠে গিয়ে বসছি।"

তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন। প্রতুলচন্দ্র খানিকটা সরিয়া বসিলেন; সুবর্ণ পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল এবং মিনিট দুইয়ের মধ্যেই গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল।

কলিকাতা আসিয়া পড়িল। দূর হইতে তাহার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা নৈশ আকাশকে রঙীন করিয়া যেন নিজের দৃপ্ত জয়ধ্বজা তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রতুলচন্দ্র সুবর্ণকে ঠেলা দিয়া বলিলেন "এইবার ওঠ, হাওড়া এসে পড়ল বলে।"

সুবর্ণ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ঘুম-জড়ান চোখে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। এত আলো, এত কোলাহল কিসের? কিছু যেন বুঝিতেই পারিলনা। পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল "এটা কি বাবা?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন "এই ত কলকাতার ষ্টেসন। খুব বড়, না?"

সুবর্ণ হাঁ করিয়াই রহিল। এ ধরণের বিরাট ব্যাপার সে কখন কল্পনাও করে নাই। দেখিয়াও যেন নিজের চোখকানকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলনা। এমন জায়গায় সে থাকিবে? গ্রামের কটা মানুষ এতবড় জায়গা দেখিয়াছে? সে যদি কখনও ফিরিয়া যায়, জাম্‌রালের সকলকে গল্প করিয়া তাক্ লাগাইয়া দিতে পারিবে। গর্ব্বে তাহার ক্ষুদ্র বুক ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া থামিবামাত্র ভয়ে তাহার হাত-পা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এই ভীষণ জন-সমুদ্রের ভিতর তাহাকে নামিতে হইবে? কোথায় সে ভাসিয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই। কান যে তাহার বধির হইয়া আসিতেছে?

প্রতুলচন্দ্র মেয়ের মুখ দেখিয়া তাহার মনের অবস্থা বুঝিলেন; হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নেই, ভয় নেই, জিনিষপত্রগুলো কুলীরা নামিয়ে নিক্, তারপর তুই আমার সঙ্গে নামিস্ এখন। কিছু ভাবনা নেই।"

সুবর্ণ শুটিসুটি হইয়া বেঞ্চির কোণে বসিয়া রহিল। কুলীরা হুড়াহুড়ি করিয়া বাক্স বিছানা সব নামাইতে লাগিল। প্রতুলচন্দ্র বলিয়া দিলেন ট্যাক্সিতে লইয়া গিয়া উঠাইতে। পথ একটুখানি সুগম হইবামাত্র তিনি সুবর্ণর হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িলেন।

সুবর্ণর আর পা চলেনা। সে বাপের হাত আঁকড়াইয়া ধরিয়া একেবারে ঝুলিয়া পড়িল। প্রতুলচন্দ্র বলিলেন "অত ভয় পেলে চল্‌বে কেন? কলকাতা দেখেই এই? এরপর যে তোকে বিলেত শুদ্ধ যেতে হবে?"

সুবর্ণ কথা বলিলনা। বিলাত যে কি বস্তু, তাহা বিশেষ সে জানিতনা। বিলাতে সাহেব মেমরা থাকে, এই পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান। বিলাত যখন যাইবার যাইবে, সম্প্রতি কলিকাতার ঠেলা সাম্‌লাইতে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছিল।

কোনো রকমে টানিয়া ঠেলিয়া প্রতুলচন্দ্র মেয়েকে ট্যাক্সিতে আনিয়া বসাইলেন। সুবর্ণকে বলিলেন "এই দেখ, এরই নাম মোটর গাড়ী, কত জোরে যায় দেখিস্ এখন।"

সুবর্ণকে কিছু দেখিতে বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিলনা। এত দেখিবার খোরাক তাহার চোখের সারা-জীবনে জোটে নাই। মেসের সামনে আসিয়া গাড়ী যখন দাঁড়াইল, তখনও সুবর্ণ গাড়ী হইতে নামিতে চায়না।

মেসের বাড়ীখানা তিনতলা। একতলা দুইতলায় মেস, তিনতলায় মাত্র দুখানি ঘর; আলাদা ভাড়াটে কখনও বা থাকিত, কখনও থাকিতনা। রান্নাঘর উপরে ছিলনা, মেসের রান্নাঘরের পাশে ছোট একটা রান্নাঘর তালা বন্ধ থাকিত, তিনতলার ভাড়াটে আসিলে খুলিয়া দেওয়া হইত। এই অসুবিধার জন্য বড় কেহ তিনতলায় আসিতনা। পরিবার লইয়া এখানে থাকার বিশেষ সুবিধা ছিল না। জলও পাওয়া যাইতনা, নীচের তলার কল হইতে তুলিতে হইত।

প্রতুলচন্দ্র এই ঘর দুইখানির জন্য মেসে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। সুবর্ণকে লইয়া মেসের ঠিক মধ্যে থাকা চলেনা, কিন্তু একেবারে আলাদা বাড়ী করিয়া ঝি চাকর রাখিয়া হাঙ্গাম করিবার তাঁহার ইচ্ছা সম্প্রতি ছিলনা। এই ঘর দুইখানিই ঠিক হইবে। মেস হইতে দূরত্ব রক্ষা করাও হইবে, আবার খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতিও একসঙ্গে হইতে পারিবে।

মেসের লোকেরা তাঁহার টেলিগ্রাম পাইয়া বাড়ী-ওয়ালাকে বলিয়া ঘর ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতুলচন্দ্র সুবর্ণকে লইয়া উপরে উঠিয়া দেখিলেন, একটা ঘরে তাঁহার খাট, টেবল্ চেয়ার, বইয়ের আল্মারী, বাক্স প্রভৃতি সব আনিয়া সাজান হইয়াছে। আর একখানা ঘরও খালি নাই। ছোট একটা তক্তাপোষ এবং কাপড় চোপড় রাখিবার আল্না, সে ঘরে বিরাজ করিতেছে। দুইটাই নূতন। মেসের বাবুরা অনেকেই ঘুমাইয়া পড়িয়া-ছিলেন, দুই চারিজন থিয়েটার বায়োস্কোপ্ দেখিতেও বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ম্যানেজার হিমাংশুবাবু এবং চাকর বামুনের দ্বারাই প্রতুলচন্দ্রের অভ্যর্থনা সম্পন্ন হইল। হিমাংশুবাবু বলিলেন "তক্তপোষ আর আল্নাটা আমিই কিনেছি, যদিও আপনি লেখেননি। নইলে খুকীর শুতে অসুবিধা হত।"

সুবর্ণ চমকিয়া উঠিল! খুকী আবার কে? সেই নাকি? সে যে বালিকা, তাহা সে বহুকাল ভুলিয়া গিয়াছিল।

প্রতুলচন্দ্র হিমাংশুবাবুকে বলিলেন "বেশ করেছেন, আমার অর্দ্ধেক কথা মনেই থাকেনা। তা আপনি আর রাত করবেননা, শুয়ে পড়ুন গিয়ে। ঠাকুর আমাদের খাবার দিয়ে যাবে এখন।"

হিমাংশুবাবু নীচে চলিয়া গেলেন। চাকর বিছানা খুলিয়া দুই ঘরে পরিপাটি করিয়া পাতিয়া দিল। চাকর বামুনে মিলিয়া খাবার উপরে লইয়া আসিয়া জায়গা করিল, জল গড়াইয়া দিল, আরো কিছু চাই কিনা জানিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল।

আদর যত্ন বহুকাল সুবর্ণর অনভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। মনটা তাহার আনন্দ ও সঙ্কোচে ভরিয়া উঠিল। ভাবিল ভবিষ্যৎ জীবনটা এমনই সুন্দর কি হইবে? কে জানে?

(ক্রমশঃ)



মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এম-আর-এ-এস

(৩)

প্রথম-শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে পঠিত হইবার জন্ত তাঁহার প্রসিদ্ধ "প্রথম-শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রকাশিত করেন। কিন্তু এই বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তিকার মধ্যে তিনি এত নূতন তথ্যের সমাবেশ করিয়াছিলেন এবং এরূপ ঐতিহাসিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তাহাতেই তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখিয়াছিলেন :

His little work on the History of Bengal throws a flood of light upon an unexplored region of historical research. It is a little unpretentious work which more ambitious authors would hesitate to call a book, but in point of research and learning, it stands unsurpassed among the modern works on the History of Bengal.

"তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি ঐতিহাসিক গবেষণার তমসাবৃত প্রদেশের উপর অজস্র আলোকপাত করিয়াছে। উহা একটি ক্ষুদ্র অপ্রতিষ্ঠাকামী পুস্তক, যাহা হয় ত যশোলিপ্সু গ্রন্থকারগণ একটি গ্রন্থ বলিতেই ইতস্ততঃ করিবেন; কিন্তু পাণ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণার জন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান গ্রন্থগুলির মধ্যে উহা অতুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী।"

এই ইতিহাসখানি সঙ্কলন করিবার জন্ত তিনি অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহা রচিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তৃতীয় বর্ষের 'প্রচারে' লিখিয়াছিলেন : "তিনি ভারতীয় ইতিহাসে এতদূর পণ্ডিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার গভীর-গবেষণা-পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাসখানি লিখিতে সাত দিন মাত্র সময় লাগিয়াছিল।" বঙ্কিমচন্দ্র যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধে' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না ;—

"এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি সম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্য্যে ক্ষমবান্ বাঙ্গালি অতি অল্প। কি বাঙ্গালি, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এ দুরূহ কার্য্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন; কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি, যে তদ্দ্বারায় আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণ বাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালক-শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য, এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় দিয়াছে।

"মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অন্নের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন; এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজাগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস। বালক-শিক্ষার্থ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার ন্যায় উত্তম গ্রন্থ অল্প। ইংরেজিতেও যে সকল ক্ষুদ্র

ইতিহাস বালক-শিক্ষার্থ প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এরূপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন।"

এই গ্রন্থখানি বহু বৎসর বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উহার চতুঃপঞ্চাশৎ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৫৭টী সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি। তাহার পর আর হইয়াছে কি না অবগত নহি।

পাইকপাড়ার রাজকুমারের শিক্ষক

বেলগাছিয়া থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, দেশের সকল সদনুষ্ঠানে অগ্রণী রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিন-চারি বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। গবর্ণমেণ্ট এই পুত্রের (পরে রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ) শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। মেজর আর ডি অসবোর্ণ নামক একজন য়ুরোপীয় ইঁহার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইনি অবসর গ্রহণ করিলে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে রাজকৃষ্ণ চারি শত টাকা মাসিক বেতনে উক্ত পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞান-সভা

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার বঙ্গবিশ্রুত বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজকৃষ্ণ ও তাঁহার অগ্রজ রাধিকাপ্রসন্ন এই প্রতিষ্ঠানে যথোচিত অর্থসাহায্য করেন। রাজকৃষ্ণ প্রথম হইতে উক্ত সভার কার্য্য-নির্ব্বাহিকা সমিতির অন্যতম উৎসাহশীল সদস্য ছিলেন।

কবিতামালা

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল তাঁহার "কবিতামালা" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে যে সকল কবিতা সন্নিবিষ্ট আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই 'এডুকেশন গেজেট' 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "যৌবনোদ্যান" যত খণ্ড ছাপা হইয়াছিল তাহা বহুদিন পূর্ব্বে নিঃশেষিত হইয়াছিল, এজন্য উহাও এই নব-প্রকাশিত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়।

রাজকৃষ্ণের অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের এই কবিতাগুলিতে বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তখন বাঙ্গালার কাব্যরাজ্যে হেমচন্দ্র একচ্ছত্র অধিপতি, সুতরাং তাঁহার প্রভাব তৎকালীন অনেক কবির কাব্যেই লক্ষিত হয়,—রাজকৃষ্ণের অনেকগুলি কবিতাতেও পরিদৃষ্ট হয়। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন "এই সকল কবিতা দুষ্ট প্রণয় বা হতাশ প্রণয়ের বিকাশ নয়। ইহার বিষয় সকল অতি উদার—মহান্। তাঁহার 'সৃষ্টি' নাম্নী কবিতা যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন।" বাস্তবিক আমরা 'সৃষ্টি'র ন্যায় কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে অতি অল্পই পাঠ করিয়াছি। উহাতে একাধারে কাব্য, দর্শন ও বিজ্ঞান। এই দীর্ঘ কবিতাটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই, কিন্তু উহার অন্ততঃ কিয়দংশ না পাঠ করিলে কেবল প্রশংসাবাক্য দ্বারা উহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে;—

"ধূ ধূ ধূ করিত অনন্ত আকাশ,
নাহি ছিল তাহে রবির প্রকাশ,
নাহি ছিল শশী, নাহি ছিল তারা,
নাহিক ছুটিত আলোকের ধারা,
পুলকে প্রকাশি রূপের রাশি।
না হাসিত দিবা কিম্বা বিভাবরী,
না খেলিত সন্ধ্যা-লাবণ্য-লহরী,
না আসিত উষা অদিতিনন্দিনী,
মুকুতা-জড়িত কুসুম-মালিনী,
প্রফুল্ল বদনে মধুর হাসি॥

* * * *

দশদিক্ ব্যাপি আছিল তিমির,
অনাদি অনন্ত গাঢ় সুগম্ভীর,
অকূল অতল অলঙ্ঘ্য অপার,
আকৃতিবিহীন ভীম পারাবার,
ভাবিলে হৃদয়ে উপজে ভয়।
অজ্ঞাত অজ্ঞেয় জগত কারণ
সে তিমির মাঝে নিদ্রিত মতন
আছিলা অনন্ত আকাশে বিলীন,
অতরঙ্গ-কাল-সলিলে আসীন,
অনন্ত শয়নে শকতিময়॥

* * * *

আন্তরিক বলে ভাব-সংঘর্ষণে
বাহিরিল তেজ অচিন্ত্য কারণে ;
আলোক ছুটিল ঝলকে ঝলকে,
নব নব বেশে পলকে পলকে,
তিমিরের ঘটা হাসিতে নাশি ;
পাতল পাতল জলধর তুল,
হাসিল সহসা পরমাণু কুল,
অনন্ত আকাশে গাঁথা থরে থরে,
বিবিধ বরণ শোভা কলেবরে,
বরষি নূতন সৌন্দর্য্য রাশি ।

* * * *

রঙ্গের তরঙ্গে, স্তবকে স্তবকে,
নাচিতে নাচিতে বিচিত্র ঠমকে,
সে জলদতুল পরমাণু কুল,
ঘুরে অবিরত আবর্ত্ত সঙ্কুল,
অখণ্ড গগনে মণ্ডলাকারে ;
আত্মাশক্তি বলে ঘুরিতে ঘুরিতে
একে একে এক স্তবক হইতে
কত অণু রাশি ছুটিয়া পড়িল,
মাঝে তমোময় সবিতা রহিল,
অন্ধ স্তূপগণ বেড়িয়া তারে ।

* * * *

অবনী মণ্ডল ঘুরে অবিরল
জলদে বেষ্টিত গোলক তরল,
যেন কুজ্ঝটিকা আবৃত জলধি,
নাহি কূল স্থল নাহিক অবধি,
নিয়ত প্রবল পবনাহত ;
এ মহী ক্রমশঃ তাপ বিকিরণে
তরলতা ঢাকে কঠিনাচরণে ;
কুজ্ঝটিকাসম জলধরদল
জলে পরিণত হইয়া শীতল,
জনমিল সিন্ধু সলিল-গত ।

* * * *

সাগর গভীর অভ্যন্তর স্থিত
উত্তাপ উগরি ক্রমে সঙ্কুচিত ;
সঙ্কুচিত তাহে ধরার শরীর,
কোথা উঠে ফুটে গিরি অভ্রশির,
কোথায় জাগিয়া উঠয়ে স্থল ;
পর্ব্বত শিখরে জলদ বরষে,
তরঙ্গিণী পড়ে ছুটিয়া হরষে,
বঙ্কিম তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে
চলে নিজ পথ করিতে করিতে,
পাইতে অন্তিমে অনন্ত জল ।

* * * *

দ্বীপ মহাদ্বীপ পর্ব্বত জাগিল ;
জল হৈতে স্থল পৃথক্ হইল ;
জীব-লীলা-ভূমি উদ্ভিদ্ আবাস,
নবসৃষ্ট ক্ষেত্রে পাইল প্রকাশ ;
অভিনব কাণ্ড দেখ আবার ।
আত্মাশক্তি বলে সবিতা হইতে
তেজ নিরন্তর ছুটিতে ছুটিতে
পড়িয়া জীবন-বিহীন ধরাতে
সজীবন বীজ রচিল তাহাতে,
পরমাণু পুঞ্জে প্রাণ সঞ্চার ।

* * * *

অংশুরূপ ধরি জগতকারণ
জড় অণুপুঞ্জে হইলা জীবন ;
তেজের প্রভাবে সে বীজ হইতে
অঙ্কুর সুন্দর বাহিরে ত্বরিতে,
জীব কি উদ্ভিদ্ না হয় স্থির ।
পরিণামে তাহে দ্বিবীজ জন্মিল,
এক হৈতে জীব উৎপন্ন হইল,
অপর হইতে উদ্ভিদ্ শোভন ;
ভাতিল ধরায় নূতন ভূষণ,
উথলি উঠিল সুখের নীর ।

* * * *

'কবিতামালা'য় সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত একটি কবিতাও আছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমাদের প্রথম সাধারণ নাট্যশালা—"ন্যাশন্যাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে ৺কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভারতমাতা" নামক একটি একাঙ্ক নাট্যলীলা অভিনীত

হইত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দ্বারা স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনের ইহাই বোধ হয় প্রথম প্রচেষ্টা। প্রপীড়িতা ভারতমাতা যেখানে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় ভগবানকে এবং তাঁহার পরলোকগত সুসন্তান—"হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদক স্বদেশ-বৎসল হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও বেঙ্গলীর প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষকে সাশ্রুনয়নে ডাকিতে ডাকিতে মূর্চ্ছা গেলেন, সে দৃশ্য দর্শকদিগের হৃদয়ে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের তরঙ্গ তুলিত, তাহার আভাস আমরা কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট শুনিয়াছি। রাজকৃষ্ণও এই অভিনয় দর্শনান্তে 'ভারতমাতা' নামক কবিতায় তাঁহার মনোভাব অতি সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা

যখন "কথাসরিৎসাগর" "মালবিকাগ্নিমিত্র" প্রভৃতির ইংরাজি অনুবাদক সুপণ্ডিত চার্লস এইচ টনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষপদে সমাসীন, তখন উক্ত বিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপকের পদ শূন্য হয় এবং রাজকৃষ্ণ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। তাঁহাকে ইংরাজী, ইতিহাস ও দর্শন সকল বিষয়েই অধ্যাপনা করিতে হইত। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ রাজকৃষ্ণ অতি সন্তোষজনক ভাবেই তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত তিনি দর্শন ও ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। 'প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিষ্টারে' কিন্তু তাঁহাকে ১৮৭৬ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজীর অধ্যাপক বলিয়া দেখান হইয়াছে। শেষোক্ত তারিখগুলি বোধ হয় ঠিক নহে।

গবর্ণমেন্টের বাঙ্গালা অনুবাদক

গবর্ণমেন্টের অনুবাদের কার্য্য এতকাল রবিন্সন নামক একজন য়ুরোপীয়র দ্বারাই সম্পাদিত হইত। কিন্তু গোপাল উড়ের যাত্রা' যখন Flying Journey of cowherdএ রূপান্তরিত হইত, তখন উহা সাধারণের হাস্য-রসই উদ্রিক্ত করিত। বিদেশীয়ের দ্বারা বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী অনুবাদের কার্য্য যে যথোচিত ভাবে সম্পাদিত হইতেছেনা, কিছুদিন হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল। স্যার অ্যাশ্‌লি ইডেন রবিন্সনের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থানে একজন এতদ্দেশবাসী সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার চার্লস টনি এবং শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌-এর সুপারিসে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি হইতে রাজকৃষ্ণ বাঙ্গালা অনুবাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার বেতন মাসিক ছয়-শত টাকা হইতে সাত শত টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"It was impossible to have selected a more scholarly man; and the ability and conspicuous devotion with which Rajkrishna applied himself to his new duties fully justified his selection. It was the first time that a native of India, and a native of India of the new school, had been appointed an Oriental Translator, and Rajkrishna has completely vindicated the claims of his countrymen to this office. We know from personal knowledge that he worked hard and that he prolonged his labours far into the small hours of the morning. But in the midst of his arduous official duties, his zeal for his favourite studies continued, and Rajkrishna Mukerjee will be remembered not as the Oriental Translator to Govt. but as the antiquarian, the poet and the linguist."

"তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করা অসম্ভব ছিল; এবং যে নিপুণতা এবং অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত তিনি তাঁহার নূতন কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে যোগ্যলোকই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সেই প্রথম একজন ভারতবাসী—নূতন যুগের ভারতবাসী, প্রাচ্য অনুবাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দেশবাসী যে উক্ত পদের সম্পূর্ণ যোগ্য তাহা রাজকৃষ্ণ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন, এমন কি শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত কায করিতেন। কিন্তু রাজকার্য্যের এই গুরু ভারেও

তাঁহার প্রিয় বিষয়সমূহের আলোচনায় উৎসাহ একটুও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই ; এবং রাজকৃষ্ণ গবর্ণমেণ্টের প্রাচ্য অনুবাদক বলিয়া নহে, পরন্তু কবি এবং বহুভাষাবিৎ বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।"

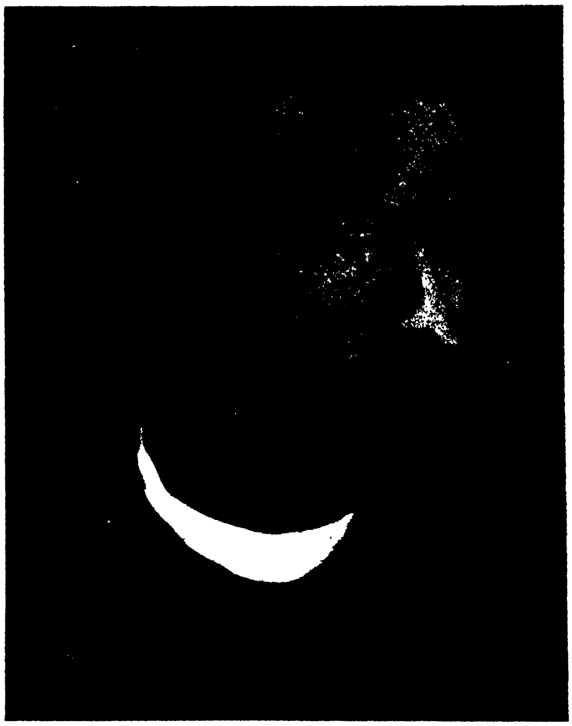
বাস্তবিক এই পদে নিযুক্ত থাকার সময় রাজকৃষ্ণকে অসামান্য পরিশ্রম করিতে হইত। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং রেণ্ট বিল এবং ইলবার্ট বিলের আলোচনার সময় তাঁহাকে অহোরাত্র পরিশ্রম করিতে হইত। তৎকালে অনুবাদকের পদ এতদ্দেশবাসীর পক্ষে অতি



স্যর রিভার্স টমসন্

লোভনায় উচ্চ পদ বলিয়া গণ্য হইলেও রাজকৃষ্ণের প্রতিভার উহাই কি চরম পুরস্কার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে ? 'ইণ্ডিয়ান নেশন-'এর সুধী সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই :

"রাজকৃষ্ণবাবুর জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে মর্ম্মান্তিক দুঃখ হয়। দুঃখ আরও এই জন্য যে, ভবিষ্যতেও তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী ও মনস্বিগণকেও ঐরূপ অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে। এ জীবনে কৃতকার্য্যতা আছে, কিন্তু পুরস্কার নাই। এত বিদ্যা, এত প্রতিভা আফিসে তৃতীয়শ্রেণীর গাধার খাটুনীর নীচে চাপা পড়িল। যে ভাবে এরূপ বহুমূল্য জীবন নষ্ট হইতেছে তাহা কি সাধারণ, কি গবর্ণমেণ্ট কাহারও গৌরবের পরিচায়ক নহে। অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ অলঙ্কার ফেলোশিপ পাইতেন, সাহিত্যসেবায় সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে পারিতেন। এখানে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শিক্ষা-বিভাগে লইলেন বটে, কিন্তু যিনি প্রথম শ্রেণীর অক্সফোর্ড গ্রাজুয়েটের সমকক্ষ, অক্সফোর্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রাজুয়েট-দিগের অপেক্ষা নিম্নতর পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল।



কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজকৃষ্ণ 'দর্শন'শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শিতা দেখাইলেন ; তাঁহাকে পড়াইতে দেওয়া হইল কখনও ইতিহাস, কখনও বা ইংরাজী সাহিত্য। আশ্চর্য্য আমাদের এই শিক্ষা-বিভাগটী ! এখানে যে কেহ যে কোন বিষয়ে অধ্যাপনার যোগ্য বিবেচিত হন। শিক্ষা-বিভাগে বেতন অল্প, রাজকৃষ্ণ ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। ইহাতে সাফল্যলাভ করিতে গেলে কেবল গুণ ও বিদ্যা থাকিলেই হয় না, কতকগুলি দোষও থাকা চাই—যাহা

তাঁহার ছিল না। তাঁহাকে ব্যবসায় ছাড়িয়া সংবাদপত্র-সেবী হইতে হইল। কিন্তু ইহাতেও অর্থ নাই। রীতিমত সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিলেন, উহারও ফল ঐরূপ। আবার গবর্ণমেণ্টের চাকুরী লইতে হইল। টনি ও ক্রফটের সুপারিসে, তাঁহার নিজের গুণের জন্য নয়, গবর্ণমেণ্ট একটি পদ দিলেন, মন্দ নহে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতিভার কি সম্মান দিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোও করিলেন না। এ সকল চিন্তা করিলে কি দুঃখ হয় না?"

পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন-সমিতির সদস্য

নগেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনেকাংশে সত্য। এদেশে যথার্থ গুণের পুরস্কার নাই! ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে



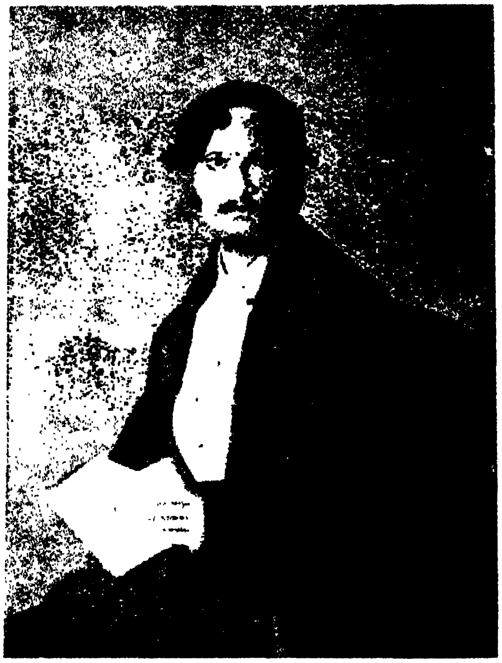
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়

২৪শে ফেব্রুয়ারি স্যর এলফ্রেড ক্রফ্‌ট রাজকৃষ্ণ ও চন্দ্রনাথ বাবুকে পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদের প্রতিভার কথঞ্চিৎ মান রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজকৃষ্ণ এই সমিতির অন্যতম উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন।

'মেঘদূত'

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর রাজকৃষ্ণ বাঙ্গালা পদ্যে 'মেঘদূতে'র একটি সুললিত অনুবাদ প্রকাশিত করেন। উহাতে কালিদাসের প্রত্যেক শ্লোক ছয় ছত্রে অনুবাদিত হইয়াছে। যথা,—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্রসাদ্যুবতি বিষয়ে সৃষ্টি রাদ্যেব ধাতুঃ॥
কৃশাঙ্গী যৌবনযুতা, সুপ্রান্তদশনা,
ক্ষীণমধ্যা, নিম্ননাভি, পক্কবিম্বাধরা,
চকিত হরিণীতুল্য ললিত-লোচনা,
স্তনভরে কিছু অবনত-কলেবরা



শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রোণীভারে মন্দগতি তথা সে বিরাজে
বিধাতার আদ্য সৃষ্টি যুবতী সমাজে॥

রাজকৃষ্ণের পূর্ব্বে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী প্রভৃতি 'মেঘদূতে'র বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজকৃষ্ণের অনুবাদটি একটু বিভিন্ন প্রণালীতে সম্পাদিত। "মেঘদূতে"র ভূমিকায় প্রারম্ভে রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন:—

"আমি যখন বাঙ্গালা পদ্যে মেঘদূতের অনুবাদ

লিখিতে আরম্ভ করি, তখন বঙ্গভাষায় ইহার যে অন্য কোন পদ্য'নুবাদ আছে, তাহা জানিতাম না। পূর্ব্ব-মেঘের প্রায় অর্দ্ধেক লেখা হইলে, জানিতে পাইলাম যে শ্রীযুত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী এবং আরও কেহ কেহ বাঙ্গালা ছন্দোবন্ধে মেঘদূতের অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম যে, তাঁহারা যে প্রণালীতে অনুবাদ করিয়াছেন আমার অনুবাদ সে প্রণালীর হইতেছে না। উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের যত স্বতন্ত্র অনুবাদ বঙ্গভাষায় থাকে, মূল বুঝিবার পক্ষে তত সুবিধা হইবে, বিবেচনা করিয়া আমার অনুবাদও শেষ করিলাম। অনুবাদকালে শ্রীযুত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুত পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও তারাকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

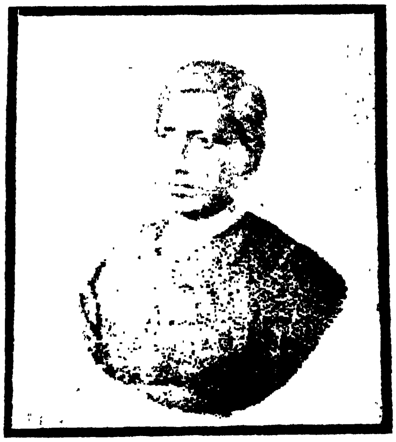


শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়

"পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠাদিবিবেক ও মল্লিনাথের টীকা সহিত মেঘদূতের যে সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া, এই অনুবাদ পুস্তক লিখিত হইল। কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ দুইটী শ্লোক উত্তর মেঘের দ্বিতীয় শ্লোকের পর রাখিয়া দিয়াছি। শ্লোক দুইটী অনেকে মেঘদূত হইতে উদ্ধৃত করেন বলিয়া রাখিলাম।"

সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একটী দীর্ঘ প্রবন্ধে 'মেঘদূতে'র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন :

"কালিদাস কবি, মেঘদূত কাব্য, রাজকৃষ্ণবাবু অনুবাদক, এ তিনের কিছুতেই তাঁহার কোন বক্তব্য থাকা সম্ভব নহে। কালিদাসের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই; মেঘদূতের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন; রাজকৃষ্ণবাবু গবর্ণমেণ্টের বঙ্গানুবাদক, সুতরাং তাঁহারও পরিচয় দিবার প্রয়োজনাভাব। মূলের ভাব রাখিয়া সংস্কৃতের প্রতি বাক্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ করণে রাজকৃষ্ণবাবুর ন্যায় দক্ষ ব্যক্তি বাঙ্গালায় অতি দুর্লভ। রাজকৃষ্ণবাবু নিজে কবি এবং কালিদাসের সম্পূর্ণ মর্ম্মগ্রাহী। আমরা তাঁহার অনুবাদ আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। যদি কেহ সংস্কৃত পাঠের পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া মেঘদূত পাঠের ফললাভ করিতে চান, তাঁহার পক্ষে রাজকৃষ্ণবাবুর গ্রন্থ অত্যন্ত উপযোগী হইবে। বাঙ্গালায় মেঘদূতের আর দুই একখানি অনুবাদ আছে,



জগদীশনাথ রায়

তদপেক্ষা মূলের সহিত ঐক্য রাখা সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবাবুর অনুবাদ যে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট তাহা বলা অনাবশ্যক।"

"সোমপ্রকাশ"-সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাকবি কালিদাস-বিরচিত সংস্কৃত মেঘদূতের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন। প্রথমে অনুবাদ, তাহার নীচে সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে একটী ভূমিকাও লিখিত হইয়াছে। অনুবাদের বিশেষ প্রশংসা করা বিফল। কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবু এই অনুবাদে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার বিশেষ প্রশংসা করা আবশ্যক। অনুবাদিত

পদ্যগুলি সংস্কৃতের ঠিক অনুরূপ এবং রচনাও প্রাঞ্জল হইয়াছে। অধিকাংশ অনুবাদক মূল অবলম্বন করিয়া ইচ্ছামত অনুবাদ করিয়া থাকেন। তাহাতে মূলের কোন কোন স্থলে কিছু কিছু পরিত্যক্ত, কোন কোন স্থলে বা কিছু কিছু পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবু সেরূপ করেন নাই, ইনি মূলের অনুগত হইয়া অনুবাদ করিয়াছেন। মেঘদূত যেমন একবিধ ছন্দে বিরচিত, অনুবাদও সেইরূপ একবিধ ছন্দে করা হইয়াছে।"

কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রেও এই গ্রন্থের প্রশংসাসূচক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কালিদাস ও তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য মেঘদূতের পরিচয় দিয়া সমালোচক লিখিয়াছিলেন :—

"The growing literature of Bengal demanded a translation of this wonderful poem for



প্রেসিডেন্সী কলেজ

the sake of its reputation, for its enrichment, and, above all, for its guidance. And Babu Rajkrishna Mukerji has furnished us with a noble translation. A man of thoroughly scholarly instincts Babu Rajkrishna Mukerji has nowhere forgotten the reverence that was due to the great Poet. His translation is accordingly as faithful as possible from the beginning to the end, and reflects in a remarkable degree the majestic and dignified tune of the original. The translation of the second part of the poem is particularly beautiful. We think it will move the reader's mind as deeply as the great original itself. Considering the difficulty of translating a thing of perfection like the *Meghaduta* into a language which is yet so undeveloped as the Bengali, we are bound to say that Babu Rajkrisna Mukerji has performed his work with a tact and skill which do him immense credit. That he has been able to produce a work of such a difficult and delicate nature in the midst of his very arduous and undoubtedly prosaic duties as the Government Translator, speaks greatly in his favour and for the cause of Bengali literature."

"বাঙ্গলার ক্রমবর্দ্ধমান সাহিত্যের সম্মান, সমৃদ্ধি ও আদর্শের জন্য এই অপূর্ব্ব কাব্যের অনুবাদের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উহার একটি



রমানাথ লাহা

অনুবাদ বাণীচরণে উপহার দিয়াছেন। প্রকৃত পণ্ডিতজনোচিত প্রতিভার অধিকারী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহাকবির প্রাপ্য সম্মান দিতে কোথাও বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং তাঁহার অনুবাদ আদ্যোপান্ত যতদূর সম্ভব মূলানুসারিণী, এবং মূলের উদাত্ত স্বর ও রাজগাম্ভীর্য্য উহাতে আশ্চর্য্যভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। কাব্যের উত্তর খণ্ডের অনুবাদের সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের মনে হয় উহা পাঠ করিলে মূল কাব্য পাঠের ন্যায় পাঠকের মনকে উদ্বেলিত করিবে। বাঙ্গালা ভাষা এখনও সম্পূর্ণ-

ভাবে বিকশিত হয় নাই ; সুতরাং মেঘদূতের ন্যায় অনবদ্য কাব্য অনুবাদ কিরূপ দুরূহ তাহা স্মরণ করিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গ্রন্থখানিতে অতি প্রশংসনীয় শক্তি ও লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের কঠোর ও নীরস কার্য্যের উপর তিনি যে এরূপ শ্রমসাধ্য ও কমনীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।"

এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা মে রাজকৃষ্ণ এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই সভার সদস্য

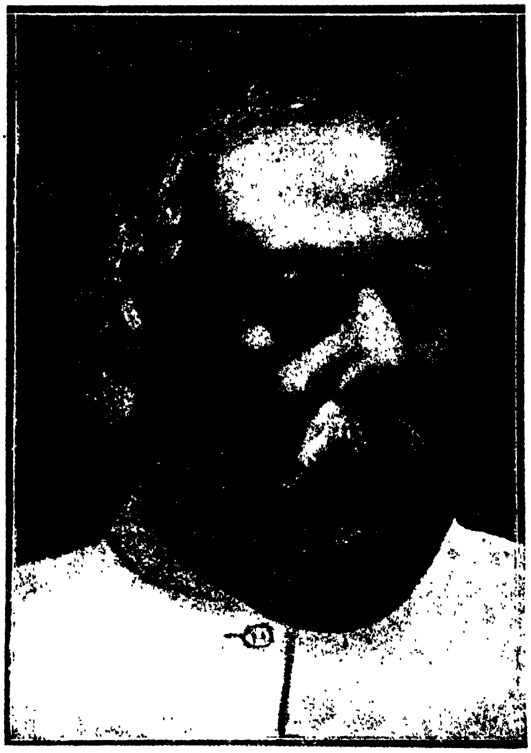


দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হইবার বহু পূর্ব্বেই তিনি নানা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি মৌলিক গবেষণার জন্য সংস্কৃত, উড়িয়া, হিন্দী, উর্দ্দু, পারসী প্রভৃতি বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবগণের সিদ্ধান্ত-সমূহ পরীক্ষা ও আলোচনা করিবার জন্য তিনি ফরাসী, জার্ম্মাণ এবং ল্যাটিন ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সভার সদস্যপদ গ্রহণের পর বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া গবেষণা করিবার জন্য তিনি যত্ন সহকারে পালি ভাষা শিক্ষা করেন। 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সম্পাদক রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর লিখিয়াছেন, "His knowledge of Pali and Sanskrit enabled him to prosecute original researches into the Buddhistic scriptures which commanded the admiration of his fellow-members of the Asiatic Society."

হিন্দু জ্যোতিষের আলোচনা

এই সময়ে রাজকৃষ্ণ প্রভূত পরিশ্রম সহকারে হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর গভীর রাত্রি অবধি



রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

হিন্দু জ্যোতিষের আলোচনা করিতে তিনি ক্লান্তিবোধ করিতেন না।

"নানা প্রবন্ধ"

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২১শে নভেম্বর রাজকৃষ্ণ 'বঙ্গ-দর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি একত্রিত করিয়া 'নানা প্রবন্ধ' নামে প্রকাশিত করেন। আমরা পূর্ব্বেই এই প্রবন্ধগুলির

পরিচয় দিয়াছি। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের বেঙ্গল লাইব্রেরীর রিপোর্ট হইতে কিয়দংশ এতৎপ্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য :—

"The most important work received under this head (miscellaneous) is *Nana Prabandha*, a collection of essays, by the Late Babu Raj Krishna Mukerji, on subjects of historical, philosophical, sociological, moral, literary, linguistic and antiquarian interest. The work is a monument of the industry and scholarship of the writer. Some of his conclusions on the subject of Indian antiquities have been accepted as final by great scholars. The work shows clear marks of the spirit of research that animated him, and of the maturity of judgment which he possessed."



রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

"বিবিধ গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "নানা প্রবন্ধ"। উহাতে ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক অনেকগুলি সন্দর্ভ আছে। এই গ্রন্থ লেখকের পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় লেখকের কতকগুলি সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা ও বিচার-ক্ষমতার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়।"

এই গ্রন্থ কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং উহার একাধিক সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

স্বর্গারোহণ

রাজকৃষ্ণ, কালিদাসের ভাষায় "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ" ছিলেন। তাঁহার শরীরে প্রভূত বল ছিল এবং তিনি প্রচুর পরিমাণে আহার করিতে পারিতেন। তিনি যে অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কেহ সন্দেহ করিতে পারিত না। কিন্তু অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভঙ্গ হইল। তিনি বহুমূত্র রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। অবশেষে কার্য্যাক্ষম হইয়া ২৫শে আশ্বিন ১ ৯৩ সালে (ইং ১০ই অক্টোবর ১৮৮৬) তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে এবং দেশবাসীকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

তিনি মৃত্যুকালে ক্ষেত্রমোহন, সুশীলা, ললিতমোহন ও সরলা এই চারিটী সন্তান রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষেত্রমোহন এখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য করিতেছেন, কনিষ্ঠ পুত্রটী অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। জামাতৃগণের মধ্যে বঙ্কিমানুজ ৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় সমাজের একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি এবং অপরটি এলাহাবাদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

উজ্জ্বল রত্ন এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাপন্ন এডভোকেট ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলাও আর ইহলোকে নাই।

শোক প্রকাশ

রাজকৃষ্ণের মৃত্যু জাতীয় শোকের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সাধু, সদাশয়, দেবতুল্য লোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি নিরভিমান, অমায়িক, ঋজুস্বভাব ও ধীর প্রকৃতির ছিলেন। বাঙ্গালায় যে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলিও মহীয়ান্ চিত্রসমূহে পরিপূর্ণ। ইংরেজি, সংস্কৃত সাহিত্যে যাহা কিছু মহান্, সমস্ত তাঁহার কবিতায় আছে; তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ, সদ্ভাবাবলী পরিপূর্ণ।”

রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর পর সমস্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাময়িক-পত্র তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত “প্রচার” নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে রাজকৃষ্ণের একটি বিস্তৃত জীবন চরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন



রাজকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী (পুত্রদ্বয় ও কনিষ্ঠা কন্যা সহ)

অল্প কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর সন্দর্ভকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন অত্যুৎকৃষ্ট। ঐতিহাসিক ও কবি বলিয়াও তিনি স্বল্প সমাদর লাভ করেন নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৯৩ সালে ৩০শে চৈত্র সাবিত্রী লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত “বাঙ্গালা সাহিত্য” নামক উপাদেয় প্রবন্ধের এক স্থানে বলিয়াছেন “বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ একসংখ্যায় সামান্য কিয়দংশ লিখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নিরস্ত হন। সুকবি রাজকৃষ্ণ রায় তৎসম্পাদিত “বীণা” নাম্নী মাসিকপত্রিকায় রাজকৃষ্ণের মৃত্যু উপলক্ষে “বীণার রোদন” শীর্ষক একটি শোকগীতি লিখিয়াছিলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারি এসিয়াটিক সোসাইটীর বাৎসরিক অধিবেশনে উহার সভাপতি (বাঙ্গালার ভূত-

নয়নে অমৃত-রাশি,
মুখে পূত পুণ্য-হাসি
একাধারে গুণ-রাশি রাজকৃষ্ণ-কায় ;

কেমনে ভুলিব সখা ! (লইতে বিদায়)
বিদরি যে যায় বুক কি বলিব হায় !

হায় !
আঁধার মলিন পুরী,
রতন গিয়েছে চুরি !
নিভেছে উজ্জ্বল দীপ কাল-ঝড়-বায় !

ফেল, দু বিন্দু শোকাশ্রু-বারি স্মরি সবে তাঁয়
স্মরি' সে পবিত্র মূর্ত্তি রাজকৃষ্ণ-কায় !

বন্ধুতার প্রতিদান, বিজয়ের সসম্মান,
থাকে যদি লোকালয়ে থাকে মুগ্ধ মন,
(তবে, আসিবে নয়নে বারি স্মরি' সে আনন) !

আজি বসন্তের দিন, ফুটেছে মুকুল,
গাঁথিছে পলকে মালা কুড়াইয়া ফুল,

স্নেহ-প্রতিদান ছলে,
পরাবে সখার গলে ;

হায় ! মোরা স্মরি' গুণ তব হয়েছি ব্যাকুল !
অভাগা বঙ্গেরে বিধি সদা প্রতিকূল !

আজি এ মিলন হেন,
প্রতিমা বিসর্জ্জি যেন !
আঁধার মণ্ডপ মাঝে আনত আনন।

লিখি' তব গুণ-গাথা,
স্মরি তব প্রেম-কথা !
গভীর হৃদয় ব্যথা, হবে কি মোচন ?

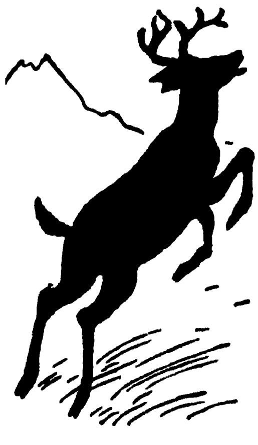
কি বলিব আর ?
সখা !
এই শত-আঁখি-আগে
নবীন অরুণ রাগে,
সদা যেন রহে জেগে তোমার আনন।

হবে কি প্রসন্ন ভাল,
করেছে যে ক্ষতি কাল,
লয়ে অসময়ে তোমা, দীন বঙ্গ হ'তে।

সে ক্ষতি পূরাতে বিধি
পুনঃ কি মিলাবে নিধি,
তোমার অভাব যাহে পারিবে পূর্ণিতে !

হায় !
"সাবিত্রী" তোমারে স্মরে,
কাঁদিবে গো চির-তরে,
করিবে সতত তব গুণের কীর্ত্তন,
(রাখিবে হৃদয়ে তব মূরতি মোহন) !
হায় ! শত আঁখি অশ্রুবারি,
ঝরিবে তোমারে স্মরি'
আদর্শ সে গুণ যেন সবাকারি হয়।

যশের মন্দির মাঝে
উজ্জ্বল পবিত্র সাজে
সদা, অমর হইয়া থাক সাধু সদাশয় !"



বিজিত

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

মঞ্জুলার বাপ কলেজের অধ্যাপক। বৃদ্ধ হলেও আধুনিক তন্ত্রের মতাবলম্বী। মঞ্জুলাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, গান শিখিয়েছেন,—এক কথায়, আধুনিক শিক্ষার সব কিছুই মঞ্জুলা আয়ত্ত করেছে,—আয়ত্ত করতে পারে নি কেবল সত্যকার শিক্ষা। বাপের স্নেহ-দৃষ্টির নিকট সেটুকু ত্রুটি ধরা পড়ে নি। মঞ্জুলার ত্রুটি বা দোষ তার বাবা সুধাময়বাবু মেয়ের ছেলেমানুষী ব'লেই লোকের কাছে উড়িয়ে দিতে চাইতেন। এর ফলে হয়েছিল মঞ্জুলা, চঞ্চলা। তার সাজগোছের অন্ত ছিল না। ধারণা ছিল তার মত সুন্দরী নারী আর কেউ আছে কি না সন্দেহ। নিত্য নতুন কাপড়, নিত্য নতুন জামা, সকলের ফ্যাশানকে টেক্কা দেবার জন্ত তার চাই। এসব আবদারও সুধাময় বাবু হাসিমুখে সহ্য করতেন।

মঞ্জুলার মা সুধাময়বাবুকে অনুযোগ ক'রে বলতেন—গরীবের মেয়ের অত বাবুয়ানী কেন? যা রয় সয় তাই ভাল। তোমার আস্কারাতেই ও অমন হচ্ছে। আজ বাদে কাল পরের বাড়ী যেতে হবে, তখন কি হবে।

সুধাময়বাবু স্ত্রীর অভিযোগে হেসে বলতেন—কিছু ভাবতে হবে না, বড় হ'লে সব শুধরে যাবে।

কথাটা সুধাময়বাবুর স্ত্রীর মনঃপুত হ'তো না। তিনি মুখ ভার ক'রে চ'লে যেতেন। তিনি মেয়েমানুষ বলেই মেয়ের ভবিষ্যৎ দুর্গতির কথা স্মরণ ক'রে শিউরে উঠতেন। মেয়েকে পরের বাড়ী যেতেই হবে। সেখানে কি তারা মেয়ের এত আবদার ও বাবুগিরি সহ্য করবে? যদি না করে, আর না করাই তো সম্ভব, তা হ'লে মেয়ের সমস্ত জীবন কি হবে ভাবতেও তাঁর গা কাঁটা দিয়ে উঠতো। যা হয় হবে ভেবে তিনি বেশী কথা বলতেন না।

সেদিন সুধাময়বাবু ঘরে ব'সে পড়ছিলেন। ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে মঞ্জুলা তাঁর হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে ব'লে উঠলো—বাবা, আমি বায়স্কোপ দেখতে যাচ্ছি। "বীণা থিয়েটারে" 'স্বামী' বই দেখাচ্ছে। আমি যতীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখতে যাচ্ছি। ব'লে যেমন ঘরে ঢুকেছিল তেমনি বের হ'য়ে গেল।

সুধাময়বাবু মেয়ের অপস্রিয়মান দেহের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। সমস্ত ঘরটা মঞ্জুলার অঙ্গ-সৌরভে ভরে গেল। তার শাড়ীর বাহার যেন তখনও ঘরটাকে ঝলমলিয়ে দিচ্ছিল।

রাত্রে মঞ্জুলা বাড়ী ফিরে সুধাময়বাবুকে বললে—জান বাবা, "স্বামী" বইটা পড়তেও আমার ভাল লাগে না আর, দেখতেও ভাল লাগলো না। শরৎবাবু মেয়েদের ভারী ছোট ক'রেছেন। কেন, মেয়েরা কি এতই হীন যে, তাকে স্বামীর কাছে মাথা নোয়াতেই হবে? তা স্বামী তার মনের মত হোক আর না হোক। নাঃ, আমি সব সইতে পারি মেয়েদের এই হীনতা,—পুরুষের কাছে নত হওয়া কিছুতেই আমি সহ্য করতে পারবো না কোন দিন। নিজেও পারবো না এমন করে নিজের সত্তা ভুলে মাথা নত করতে।

সুধাময়বাবু মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। যতীন্দ্র সেখানে ছিল, সে বললে—আমারও তাই মত। মেয়েদের আমরা নারী, দেবী বলবো, আর পরে দু'পায়ে ঠেংলাবো, এ আমিও চাই না। স্বামী স্ত্রীর অধিকার সমান সমান হওয়া উচিত। হয় না বলেই তো এত ঝগড়া, বিবাদ, মনকষাকষি। আমাদের হিন্দুর সংসার একেবারে যাচ্ছেতাই।

মঞ্জুলা প্রশংসমান দৃষ্টি তুলে যতীন্দ্রের মুখের দিকে তাকালে। যতীন্দ্র আত্মগর্বে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো।

যতীন্দ্র সুধাময়বাবুর ছাত্র। এ বাড়ীতে তার অবাধ মেলামেশা। সে মঞ্জুলার প্রতি অনুরক্ত, মঞ্জুলাও তাকে ভালবাসে। যতীন্দ্র মঞ্জুলার প্রতি কথায় সায় দেয়, তার সমস্ত ফরফাস খাটে। মঞ্জুলা ভাবে, হাঁ, পুরুষ তো এই রকমই হবে। মেয়েদের স্বাধীন মতকে স্বাধীনভাবে উপভোগ করতে দেবে। যতীন্দ্র এই বাড়ীর সঙ্গে এত

ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গিয়েছিল যে, সে ও মঞ্জুলা একলা কোথাও বেড়াতে গেলেও কারো মনে কিছু সন্দেহ হতো না। সকলেই জানে মঞ্জুলার সঙ্গে যতীন্দ্রের বিয়ে হবে। তারা দু'জনেও তাই জানে—অন্ততঃ মঞ্জুলা জানে তাই।

শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ আকাশে হাসছে। শরৎকালের প্রথম। তখনও বৃষ্টির জল গাছের পাতা হ'তে, মাটির গা হ'তে শুকিয়ে যায় নি সম্পূর্ণ। শেফালী ফুলের গন্ধ, প্রথম-বিবাহিত লাজ-ভীত বধূর মত বাতাসে নিজেকে হারিয়ে দিয়েছে। মৃদু গন্ধ ঘরে ভেসে আসছে।

মঞ্জুলা ছবির মত সেজে জান্‌লায় বসেছিল। যতীন্দ্র এক গোছা আধফোটা গোলাপগুচ্ছ নিয়ে ঘরে ঢুক্‌লো। মঞ্জুলা মৃদু হেসে বল্‌লে—বাঃ, কি সুন্দর গোলাপ!

যতীন্দ্র কৃতার্থ হ'য়ে ফুলগুলো মঞ্জুলার হাতে দিয়ে বল্‌লে—মঞ্জু, আমার কাছে কিন্তু এ ফুলগুলোর দাম তোমার দামের চেয়ে ঢের কম।

ব'লে জান্‌লাতেই মঞ্জুলার পাশে ব'সে পড়্‌লো। দু'জনের শরীরের বিদ্যুৎপ্রবাহ চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। মঞ্জুলা হেসে বল্‌লে—পুরুষগুলো ভারী খোসামুদে। তাদের সঙ্গে কথায় পারবার উপায় নেই।

যতীন্দ্র মঞ্জুলার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্‌লে—না, মঞ্জু, এ একেবারে আমার প্রাণের কথা। তোমার ভালবাসার দাম নির্দ্ধারণ করতে গেলেই আমার নিজেকে নিজের ছোট মনে হয়। সত্যিই আমরা পুরুষরা এতো হীন যে, তোমাদের কোন মূল্যই দিতে পারি না।

যতীন্দ্রের কথাগুলো মঞ্জুলার মন্দ লাগ্‌লো না। সে মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়্‌লো।

সুধাময়বাবু মঞ্জুলার বিয়ের জন্য এতদিন বাদে একটু সচেতন হ'য়ে পড়েছেন। লোক নাকি যতীন্দ্র ও মঞ্জুলার নাম নিয়ে একটু বেশী রকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

সুধাময়বাবু একদিন নিভৃতে যতীন্দ্রকে ডেকে বল্‌লেন—বাবা যতীন, আমার ইচ্ছে তোমার হাতে মঞ্জুলাকে দিই—তা তোমার কি মত?

যতীন্দ্র মাথা নীচু ক'রে বল্‌লে—বাবার অমতে তো আমি বিয়ে কর্‌তে পার্‌বো না।

সুধাময়বাবু তার বাবাকে জানালেন; কিন্তু যতীন্দ্রের বাবা মত দিলেন না।

মঞ্জুলার কানে সব কথাগুলো গেল। সে একদিন যতীন্দ্রকে নিভৃতে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—যা শুন্‌ছি তা কি সত্যি?

যতীন্দ্র মঞ্জুলার হাতটা ধর্‌তে গেল। মঞ্জুলা ছিট্‌কে সরে গিয়ে দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—আগে যা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি তার উত্তর দাও।

যতীন্দ্র মাথা নীচু করেই বল্‌লে—তোমায় সত্যই ভালবাসি মঞ্জু, কিন্তু তাই ব'লে বাবার অমতে তোমায় গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই।

মঞ্জুলা বাধা দিয়ে বল্‌লে—থাক্, ভালবাসার আর অপমান করো না। তুমি দেখ্‌ছি কলিযুগের পরশুরাম। পিতৃ আজ্ঞাই তোমার কাছে যখন বড় তখন কথা বাড়িয়ে ভালবাসার অমর্য্যাদা করো না। আজ থেকে এইখানেই তোমার আমার মধ্যে চিরদিনের মত যবনিকা পড়্‌লো।

এই ঘটনার পর মঞ্জুলা কিছুতেই আর বিয়ে করতে চায় নি—পুরুষের উপর বিদ্বেষ তার দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল বলে। পরে সুধাময়বাবু অনেক বুঝিয়ে মঞ্জুলাকে বিয়ে কর্‌তে রাজী করেছেন এই সর্ত্তে যে, মঞ্জুলা যেখানে বিয়ে কর্‌তে চাইবে সেইখানে বিয়ে হবে। অনেক পাত্র এলো, গেল, কোনটাই মঞ্জুলার পছন্দ হয় না। শেষ তার পছন্দ হলো সঞ্জয়কে।

সঞ্জয় তরুণ সাহিত্যিক। সাহিত্যের বাজারে তার একটু পসার আছে। মঞ্জুলা সঞ্জয়ের গল্প পড়েছে মাসিকে। গল্প প'ড়ে ও সঞ্জয় নামটা শুনে তার মন্দ লাগ্‌লো না। সঞ্জয়ের গল্পের বিশেষত্বই ছিল মেয়েদের গুণগরিমা প্রচার করা। মঞ্জুলা মনে কর্‌লে লোকটা মন্দ হবে না। অন্ততঃ তাকে আদর না করুক অনাদর কর্‌বে না। মঞ্জুলা সঞ্জয়কে বিয়ে কর্‌তে রাজী হ'লো। কিন্তু তাই ব'লে তার মন থেকে পুরুষের উপরকার বিদ্বেষ কিছুমাত্র কমলো না। বিয়ে করাটা হ'লো যেন পুরুষকে কৃতার্থ করা।

যেদিন সঞ্জয় সবান্ধবে মঞ্জুলাকে দেখ্‌তে এলো, সেদিন মঞ্জুলা মুখ নীচু ক'রে গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলো, কোন কথাই বল্‌লে না। তার সাজসজ্জা করবার যতখানি ক্ষমতা ছিল সে তা করেছিল সেদিন। সে যেন দেখাতে চায় সেও বড় কেউ কেটা নয়। তোমরা যে যাচাই কর্‌তে এসেছো, আমিও তোমাদের যাচাই কর্‌তে জানি।

আমার কাছে তোমরা কিছুই না। সে সঞ্চয়কে ভাল করে দেখেও দেখলে না এমনি বিতৃষ্ণা।

সঞ্চয়ের সঙ্গেই বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেল। মঞ্জুলা সঞ্চয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন কিছুই ইচ্ছে ক'রে জান্‌লে না। কারণ, বিয়ে কর্‌তে হবে, অতএব বিয়ে করা চাই একজনকে। সেই একজন অন্য আর কেউ হয় নি, সঞ্চয়কে সে পছন্দ করেছে। এ কথাটা পরে সঞ্চয়কে জানিয়ে দিয়ে মঞ্জুলা তাকে কৃতার্থ ও ধন্য কর্‌বে। সে অন্য কাউকে বিয়ে কর্‌লেও কর্‌তে পার্‌তো, এমন কি যতীন্দ্রকেও জোর ক'রে বিয়ে কর্‌তে পার্‌তো, কিন্তু, সে তা করেনি শুধু তার নিজের স্ত্রীস্বত্ব বজায় রাখ্‌বার জন্য। অতএব সঞ্চয়ের ভাগ্য যে, মঞ্জুলা তাকে স্বামীত্বে বরণ কর্‌তে রাজী হয়েছে। এর ভিতর আবার জানাজানির কি আছে।

বিয়ের দিন সঞ্চয়ের চেহারা দেখে তার পিত্ত জ্বলে উঠ্‌লো। মা গো, এ কি বিশ্রী চেহারা আর সাজ! পরনে আধময়লা মোটা কাপড়, গায়ে তেমনি একটি জামা। বুরুশের মত কড়া খোঁচা খোঁচা না-কামানো গোঁপ দাড়ি। চুলগুলো রুক্ষ আর এলোমেলো। এই লোকটাই যে এমন লিখ্‌তে পারে এ মঞ্জুলা কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না। সে শুনেছিল বিয়েতে কনে বদল হয়, এ কি তার বরাতে বর বদল হলো? এমন সাজে কি কেউ বিয়ে কর্‌তে আসে না কি? অসভ্যরাও বোধ করি এর চেয়ে সভ্য। সমস্ত মন সঞ্চয়ের উপর বিরূপ হ'য়ে উঠ্‌লো। শুভদৃষ্টির সময় জ্বালাময়ী তীব্র দৃষ্টি হেনে সে সঞ্চয়কে পুড়িয়ে ফেল্‌তে চাইলে। সঞ্চয় তার মুখের ভাব দেখে নিজের মুখে কোন ভাবই ফুটিয়ে তুল্‌লে না।

ফুলশয্যার দিন সঞ্চয়ের বন্ধুরা তার ঘর ফুল দিয়ে চমৎকার ক'রে সাজিয়ে দিলে। রাত্রে সঞ্চয় আগেই ঘরে এসে শুয়েছিল। মঞ্জুলাকে একরকম জোর ক'রে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো। মঞ্জুলা ঘরে ঢুকে দোরে খিল লাগিয়ে দিলে এবং এসে খাটের ফুলগুলো দু'হাতে ছিঁড়ে ফেল্‌তে লাগলো। সঞ্চয় মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ও কি কর্‌ছো?

মঞ্জুলা ব্যঙ্গস্বরে বল্‌লে—ভারী তো বিয়ে তার আবার দু' পায়ে আল্‌তা। আর ফুলশয্যা করে না। একটা জানোয়ারের পাশে শুতে ঘৃণা হয় না, কিন্তু তোমার কাছে শুতে ঘৃণা হচ্ছে। মানুষ সবাই সুন্দর হয় না জানি; কিন্তু পরিষ্কার হওয়া তো নিজের হাত। সেটাও কি শিখিয়ে দিতে হয় না কি।

সঞ্চয় কোন উত্তর কর্‌লে না। সে নীরবে চোখ বুজে শুয়ে রইলো। তার নীরবতা মঞ্জুলাকে আরো বেশী বিঁধতে লাগ্‌লো, বেশী ক'রে আঘাত দিতে লাগ্‌লো। শেষে বল্‌লে—সরে শোও, আর লোক হাসিও না, তোমার লজ্জা কর্‌ছে না কিন্তু আমার লজ্জা কর্‌ছে।

এই তাদের প্রথম মিলন-রাত্রির প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ।

মঞ্জুলা যে-পরিমাণ সাজ-গোছ করে থাক্‌তো সঞ্চয় ঠিক সেই-পরিমাণ অগোছালো হ'য়ে থাক্‌তো। দু'জনের মধ্যে পাল্লা চল্‌তো যেন কে কাকে হারাতে পারে। মঞ্জুলা রেগে ব'কে অনর্থ বাধাতো, সঞ্চয় স্থির ধীরভাবে সহ্য কর্‌তো। এতে মঞ্জুলা আরো রেগে যেতো।

একদিন মঞ্জুলা একটা ফর্সা জামা আর কাপড় এনে সঞ্চয়কে দিয়ে বল্‌লে—এইটা পর, আমার সঙ্গে বায়স্কোপ দেখ্‌তে যেতে হবে।

সঞ্চয় কোন কথা না ব'লে সেগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। মঞ্জুলা রাগে ফুল্‌তে লাগ্‌লো। এ কী অপমান! অপমান সে কোন দিন সয় নি, আজো সইবে না—বেশ ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দেবে। কিন্তু এই লোকটার কি হায়া আছে? কোন সাড়াই যে দেয় না। এক পক্ষে লড়াই চলে কতক্ষণ? মঞ্জুলা বুঝ্‌তে ঠিক পার্‌তো না যে, এ লোকটি কি প্রকৃতির। তার মধ্যে ভালবাসার নিদর্শন সে জান্‌তে পেরেছে, যদিও সে তা আমোলে আনে নি। কত রাত্রে মঞ্জুলা ঘুম ভেঙে দেখেছে যে, সঞ্চয় তাকে হাওয়া কর্‌ছে, তার ঘর্ম্মাক্ত মুখ সন্তর্পণে মুছিয়ে দিচ্ছে। সঞ্চয়ের তপ্ত নিশ্বাস তার মুখে লেগে অপূর্ব্ব আবেশ এনে দিয়েছে, কিন্তু মঞ্জুলা জোর ক'রে ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে থেকেছে। মনকে জানিয়েছে এ আর এমন বেশী কি করেছে। স্বামীর সম্বন্ধ তো শুধু নেবারই নয়—দেবার তো বটে। সঞ্চয়কে তার এই ক'দিনে ভালও লাগ্‌তো না, অথচ মন্দ মনে কর্‌তেও কোথায় যেন বাধতো। সঞ্চয়কে বুঝ্‌তে পার্‌তো না ব'লে, অবুঝ-রাগে সে জ্ব'লে উঠ্‌তো। সে এতদিন কারো অধীনতা স্বীকার করে নি, সঞ্চয় কি করে তাকে

অধীন কর্‌বে। না, সে কিছুতেই হবে না। কিন্তু সঞ্জয় তো খুলে বলে না সে কি চায়। এ কি জ্বালা! মঞ্জুলার মন হাঁপিয়ে উঠ্‌তো—এ কি বিড়ম্বনা!

সেদিন রাত্রে সঞ্জয় ঘরে আস্‌তেই মঞ্জুলা বোমার মত ফেটে উঠে বল্‌লে—জান, তোমায় বিয়ে করেছি দয়া ক'রে। পুরুষগুলো এমনি অকৃতজ্ঞ যে, দানের মূল্য বোঝে না। জান, আমি যাকে ভালবাসতাম তার নাম যতীন্দ্র—ইচ্ছে কর্‌লে তাকে আমি বিয়ে কর্‌তে পারতাম। কিন্তু তার বাপের অমতে বিয়ে করার অনিচ্ছার জন্যে আমি তাকে বিয়ে করি নি। তাকে আমি সত্যিই ভালবাস্‌তাম, বিয়ের দিন সকালে পর্য্যন্ত তার জন্যে কেঁদেছি। সে ভালবাসার মূল্য বোঝে নি ব'লে তাকেও দূরে ঠেলেছি। তোমাকে আমি একটুও ভালবাসি না—জান!

সঞ্জয় প্রায় মঞ্জুলার কথার সঙ্গে সঙ্গে ধীর ভাবে উত্তর কর্‌লে—হ্যাঁ।

আর কিছু না ব'লে শুয়ে পড়্‌লো। মঞ্জুলা যে এত কথা ব'লে গেল, এত কাণ্ড ক'রে গেল—সঞ্জয়ের কাছে যেন সেগুলো কিছুই না। এমন কিছু নতুন মঞ্জুলা বলে নি বা এমন কিছু নতুন সঞ্জয় শোনে নি যেন। সবই যেন তার জানা কথা। সঞ্জয় চোখ বুজে চুপ কোরে শুয়ে রইল—কোন সাড়া শব্দ দিলে না। মঞ্জুলা খানিকক্ষণ সঞ্জয়ের মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রইল। এ লোকটা কি মানুষ না কি! আঘাত কর্‌লেও, অপমান কর্‌লেও, ভাল মন্দ কিছু বলে না। সে আস্তে-আস্তে নীচে নেমে মেঝের উপর শুয়ে পড়্‌লো। হঠাৎ তার তন্দ্রা ভেঙে গেল। দেখ্‌লে সঞ্জয় তার মাথার নীচে বালিশ দিয়ে দিচ্ছে সস্নেহে। ঘুমের ঘোরে এ ব্যাপারটা তার মন্দ লাগ্‌লো না। সব ভুলে গিয়ে সে পাশ ফিরে পরম আরামে শুলো। একখানি হাত তার অজ্ঞাতে সঞ্জয়ের কোলের উপর এসে পড়্‌লো। তেমনি ভাবে মঞ্জুলা আবার ঘুমিয়ে পড়্‌লো। সঞ্জয় স্থির হ'য়ে ব'সে রইলো।

সেই অবস্থাতেই যখন মঞ্জুলার ভাল ক'রে ঘুম ভাঙ্‌লো, তখন সে নিজের এই লজ্জাকর ব্যবহারে নিজেই চম্‌কে উঠ্‌লো। যে লোক তাকে অবজ্ঞা করে, সে যাকে অবজ্ঞা করে, তারই কোলের উপর হাত রেখে সে পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছে! কিন্তু কে জানে কেন আজ সে আর তেমন করে রূঢ় আচরণ কর্‌তে পার্‌লে না সঞ্জয়ের উপর, শুধু মুখখানা গম্ভীর ক'রে পাশ ফিরে শুলো। সঞ্জয় কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইলো।

মঞ্জুলা সঞ্জয়কে বল্‌লে—দেখ, কাল তো আমি বাবার কাছে যাবো, তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে, কিন্তু দোহাই অমন ক'রে যেও না। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে ভাল জামা কাপড় প'রে যেও। নইলে সবাই বল্‌বে, মঞ্জুলা এমন বাবুয়ানী ক'রে চলে আর তার স্বামী এমন। তোমার লজ্জা না করুক আমার লজ্জার শেষ থাক্‌বে না।

মঞ্জুলা এখন ক'দিন থেকে তার রাগের ঝাঁজ সাম্‌লেছে। কেন সেই জানে। সঞ্জয়ের সঙ্গে সে কোন মতেই পার্‌ছে না। বাইরে সে হার না মান্‌লেও মনে মনে সে বুঝ্‌ছে যে, সঞ্জয় নীরবতার মধ্যে দিয়েই তাকে জয় কর্‌ছে। রাগও হচ্চে অথচ রাগ প্রকাশ করবার ক্ষমতাও যেন তা'র কমে আস্‌ছে। এক রকম সাপ আছে, তার দৃষ্টির সাম্‌নে কোন জন্তু পড়্‌লে, সে তাকে তার দৃষ্টির আকর্ষণী শক্তি দিয়ে মোহাচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। তার পর তাকে ক্রমশঃ গ্রাস করে। সঞ্জয়ও যেন মঞ্জুলাকে তেমনি ভাবেই আয়ত্ত কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ছে। বিষের জ্বালায় মঞ্জুলা মনের মধ্যে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে, অথচ বাইরে তার প্রকাশ করবার ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ পেয়ে আস্‌ছে। নিজের হীনতা বুঝ্‌তে পেরেও নিরুপায় হ'য়ে পড়্‌ছে। অভিমানে তার চোখ ফেটে জল আস্‌তো। কিন্তু মুক্তির আর কোন পথই দেখ্‌তে পেতো না। তাই এখন বোধ করি সুর বদ্‌লেছে।

সঞ্জয় বল্‌লে—আমার তো এ ছাড়া আর কিছু পোষাক নেই। আমি না হয় নাই যাবো তুমি যদি লজ্জা পাও।

মঞ্জুলা ঝম্‌কে উঠে সঞ্জয়ের কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠ্‌লো—ওগো, না, না, না, সে হবে না। তাতে আরো বেশী লজ্জা পাবো। সকলকে কৈফিয়ৎ দিতে পার্‌বো না কেন তুমি আস নি। তোমার দোহাই আমার আর জ্বালিও না। যা খুশী তাই কর—নিজের স্ত্রীর লজ্জা অপমানও তোমার কাছে কিছুই নয়।

মঞ্জুলা আজ বোধ করি প্রথম সঞ্চয়ের সাম্‌নে নিজমুখে উচ্চারণ কর্‌লে সে সঞ্চয়ের স্ত্রী। নিজের কথায় নিজেই চম্‌কে উঠ্‌লো। এতখানি পরিবর্ত্তন কেন হচ্ছে!

বাপের বাড়ী এসে মঞ্জুলার হ'লো আর এক জ্বালা। সকলে বলে—হ্যাঁরে তুই এমন ফিট্‌ফাট্ তোর স্বামী কেন এমন। তাকে সাজাতে পারিস নে।

মঞ্জুলা এ কথায় উত্তরই বা কি দেবে? রাগ হ'তো সঞ্চয়ের উপর, আর এই লোকগুলোর উপর। তোদের কেন এত মাথাব্যথা? হায়! তার অদৃষ্টে এতো নিগ্রহও ছিল! পুরুষগুলোর নিজেদেরও কি মান-অপমান-জ্ঞান নেই। লজ্জায় মাথা কাটা যায়, আর ঐ লোকটা পরম নির্ব্বিকার চিত্তে সব সহ্য কর্‌ছে। মঞ্জুলা নিজের নারী-অভিমানকে যত সোজা ক'রে রাখ্‌তে চায়, ততই যেন বেশী ক'রে তাতে ঘা দেয় সঞ্চয়। রেগে, ব'কে, মিনতি করেও লোকটার সাড়া পাওয়া যায় না।

মঞ্জুলা বাপের বাড়ী আস্‌তেই যতীন্দ্র আবার আসা-যাওয়া সুরু করেছে। মঞ্জুলা প্রথমটা ঘৃণাভরে তার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাই বলে নি। কিন্তু তার পর তার মনে হ'লো সঞ্চয়কে আঘাত কর্‌বার এই একমাত্র পথ। এটা সে জান্‌তো যে, পুরুষ সব সহ্য কর্‌তে পারে কিন্তু ভালোবাসার অপমান সহ্য কর্‌তে পারে না। মঞ্জুলা এই অস্ত্র অবলম্বন কর্‌লে। সঞ্চয়কে দেখিয়ে দেখিয়ে সে যতীন্দ্রের সঙ্গে হাসি গল্প কর্‌তো, যদিও সে যতীন্দ্রকে মনে মনে ঘৃণাই কর্‌তো। মঞ্জুলা সঞ্চয়কে যতই জয় কর্‌তে চায়, সঞ্চয় যেন ততই তাকে পরাজিত করে। মঞ্জুলার জেদী একরোখা মন এ কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পারে না, তাই মনে হীনতা স্বীকার করেও তাকে যতীন্দ্রের সঙ্গে ভাব জমাতে হলো। অথচ সে বুঝ্‌তেও ঠিক পার্‌তো না যে, সঞ্চয় যখন তাকে চায়ই না তখন তারই বা এত আগ্রহ কেন সঞ্চয়কে জয় কর্‌বার। এ কেনর উত্তর সে মনের মধ্যে খুঁজে পেতো না। আর সেই জন্যেই সে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হ'য়ে যেতো।

যতীন্দ্রের সঙ্গে মঞ্জুলা আবার তেমনি পূর্ব্বের মত ব্যবহার কর্‌তে লাগ্‌লো। যতীন্দ্রও কৃতার্থ হ'য়ে গেল। মঞ্জুলার ব্যবহারে যতীন্দ্রের পৌরুষ সাহস অনেকখানি বেড়ে গেল। মঞ্জুলা কিন্তু মুখে যতই স্ফূর্ত্তি টেনে আনুক না কেন, মনের মধ্যে তৃপ্তি পেলে না। কারণ সঞ্চয় এবারেও কোন ভাবান্তর দেখালে না। যেন এও তার কাছে কিছুই নয়। সঞ্চয় যদি রাগ্‌তো, বোক্‌তো, তাহ'লে হয় তো মঞ্জুলার মনের অবস্থা এমন হ'তো না। সঞ্চয়ের নীরব উপেক্ষাই তাকে সব থেকে পীড়া দিতে লাগ্‌লো।

সেদিন যতীন্দ্র এসে মঞ্জুলাকে বল্‌লে—চল মঞ্জু, আজ একটু বেড়িয়ে আসি নদীর ধারে।

বেশ, চলো—ব'লে উৎফুল্ল মঞ্জুলা একবার পাঠ-নিরত সঞ্চয়ের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। কিন্তু ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লে না সঞ্চয় কথাগুলো শুন্‌তে পেলে কি না।

মঞ্জুলার বাড়ী হ'তে নদীর ধার বেশী দূর নয়। দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে গল্প কর্‌তে কর্‌তে চল্‌লো। যতীন্দ্র কত কথাই ব'লে যেতে লাগ্‌লো, কিন্তু মঞ্জুলার মনের অবস্থা তখন এমন যে, সে সব কথা শুন্‌ছিল কি না সন্দেহ। শুধু হাঁ, হুঁ, না, ক'রে যতীন্দ্রের কথার উত্তর দিচ্ছিল।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন। ব্রহ্মপুত্রের একটা ক্ষীণ স্রোত-ধারা এই ক্ষুদ্র সহরের নীচে দিয়ে ব'য়ে গেছে। তারই তীরে সন্ধ্যায় নরনারীর মেলা ব'সে যায়। ওপারে অস্তগামী ম্লান সূর্য্যের রক্তাভ রৌদ্র এপারে বেদনাতুর হৃদয়ের রক্তের মত পৃথিবীর বুকের উপর পড়েছে। তারই এক ঝলক মঞ্জুলার মুখের উপর পড়লো। মঞ্জুলা কতদিন এখানে বেড়াতে এসেছে। কত লোকের সঙ্গে গল্প করেছে, হেসেছে, নিজের সুখ-সম্পদ সকলকে দেখিয়ে গর্ব্ব অনুভব করেছে। আজ কিন্তু সে সহজ সরলভাবে এখানে বেড়াতে পার্‌লে না। সকলে যেন তারই দিকেই কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে! সে দৃষ্টি সহ্য কর্‌বার ক্ষমতা সে আজ নিজের অজ্ঞাতে কোথায় হারিয়ে ব'সে আছে। অথচ অন্য দিন সে সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে গর্ব্বিতভাবেই সোজা বুকে চ'লে বেড়িয়েছে। আজ তার এ কি পরিবর্ত্তন! সে যতীন্দ্রকে এক রকম টেনে নিয়ে নিভৃতে নিরালায় গিয়ে বস্‌লো। ব'সে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে। যতীন্দ্র যদি একটু চোখ খুলে দেখ্‌তো তো বুঝ্‌তে পার্‌তো আজ মঞ্জুলার মনের মধ্যে কী ঝড় উঠেছে। কিন্তু যতীন্দ্র মঞ্জুলাকে কাছে পেয়েছে, তার মনের কামনা জেগে উঠেছে। সে সহজ বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে আজ একটা যা হোক বোঝা-পড়া কর্‌তে চায়।

সন্ধ্যারাণী রাত্রির ঘোমটায় মুখ ঢাক্‌লেন। তারা-বধূরা দিগন্তরাল হ'তে এক এক ক'রে প্রিয়তমের উদ্দেশে অভিসার-যাত্রায় বের হ'লেন।

যতীন্দ্র মঞ্জুলার পাশে ব'সে বল্‌লে—চল মঞ্জু, আমরা কোথাও চ'লে যাই। জীবনকে এমন হেলা-ফেলায় কাটিয়ে দিও না। বল যাবে?

মঞ্জুলা স্থির নিষ্কম্প।

মঞ্জুলার সাড়া না পেয়ে যতীন্দ্রের সাহস বেড়ে গেল। সে অনুনয়ের স্বরে বল্‌লে—বল মঞ্জু, যাবে কি না। আমার সাহস তো তুমিই বাড়িয়ে দিয়েছো।

ব'লে সে মঞ্জুলার হাত দু'টো দু' হাতে ধ'রে তাকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টা কর্‌তেই মঞ্জুলা ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। তার হাতের হঠাৎ-ঝাপ্‌টা বেশ জোরেই যতীন্দ্রের চোখে লাগ্‌লো। যতীন্দ্র উঃ ক'রে দু' হাতে চোখ ঢাক্‌লে।

মঞ্জুলা ক্রন্দন-রুদ্ধ স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে—এত বড় স্পর্দ্ধা, তুমি আমায় স্পর্শ করো! জান, তোমায় আমি কতখানি ঘৃণা করি। আর কোন দিন যদি আমার সাম্‌নে আস্‌বে তো তোমার অপমানের শেষ থাক্‌বে না।

ব'লে একরকম ছুটেই সে বাড়ীর দিকে রওনা হলো। কান্নায় তার সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। চোখের জলে অন্ধকার আরো ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠ্‌লো। কোনো দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। কতবার সে পড়্‌তে পড়্‌তে নিজেকে সাম্‌লে নিলে—কোন খেয়াল নেই।

বাড়ী এসে যখন পৌঁছলো তখন মঞ্জুলার চেহারা দেখ্‌লে তাকে আর আগের মঞ্জুলা ব'লে চেনা যায় না। এইটুকুর মধ্যে শরীর ও মনের উপর তার এতখানি পরিবর্ত্তনের ঝড় ব'য়ে গেছে।

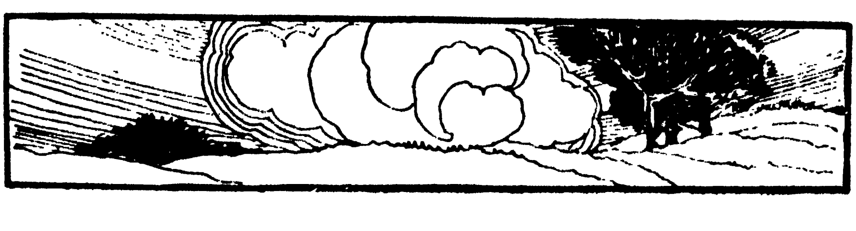
সে ছুটে তেমনি অবস্থায় এসে ঘরে ঢুকলো। সঞ্জয় তখনও একলা একটা আরাম-চেয়ারে ব'সে পড়্‌ছে,—নির্ব্বিকার, নিশ্চিন্ত। মঞ্জুলা ঘরে এসেই সঞ্জয়ের পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রে হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের সঙ্গে ব'লে উঠ্‌লো—ওগো, কেন এমন ক'রে আমায় দূরে ঠেলে দিচ্ছ। আমি তো তোমার স্ত্রী, তোমার কী উচিত নয় আমার মূঢ়তাকে শাস্তি দেওয়া? আমায় ক্ষমা করো, এমন ক'রে শাস্তি দিও না। আমার ভুলের শাস্তি তুমি সহজভাবে দাও।

সঞ্জয় মঞ্জুলার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বল্‌লে—তোমায় তো শাস্তি আমি দিতে কোন দিনই চাইনি মঞ্জু। আমি জান্‌তুম তুমি একদিন নিজের ভুল বুঝ্‌তে পারবে নিজেই, তাই আমি কোনো কথা বলি নি। জান মঞ্জু, মানুষ যখন নিজে নিজের ভুল বুঝ্‌বে না মনে করে, তখন তার ভুল সংশোধন কর্‌তে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই। তুমি তো দোষ কিছুই কর নি, তা ক্ষমা কি কর্‌বো?

মঞ্জুলা তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে—ওগো না, তুমি বল আমায় ক্ষমা করেছো। তুমি জান না আমি কত বড় পাপিষ্ঠা। আজ তোমার অপমান করেছি, নিজের অপমান করেছি—

সঞ্জয় মঞ্জুলাকে বাধা দিয়ে বল্‌লে—থাক্, যা হয়ে গেছে তার জন্যে দুঃখ কি মঞ্জু, আমি কিছু শুন্‌তে চাই না। আমি জানি তুমি একান্ত আমার। তোমার আসন যেখানে, সেখান থেকে তুমি এতটুকুও দূরে স'রে যাও নি। আমি শুধু চেয়েছিলাম যে, তুমি যেন নিজেই বুঝ্‌তে পার যে, বাহ্য আবরণের ভিতর দিয়ে অন্তরের যাচাই হয় না। আজ সে ভুল তোমার ভেঙ্গেছে। তোমার নিজের আসন তুমি নিজেই দখল করেছো। আমার বেশভূষার বাহ্য আবরণ শুধু তোমার ভুল ভাঙ্গবার জন্য।

ব'লে সঞ্জয় মঞ্জুলাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিলে। তার মুখখানা মঞ্জুলার কান্না-ধোয়া মুখের উপর নত হ'য়ে পড়্‌লো।



অভিমান !

শ্রীঅনিলবরণ রায়

আজিও তোমারে আমি চাহিতে নারিনু, স্বামি !
সর্ব্ব প্রাণ-মনে,
চলিতেছে অবিরত লুকোচুরি খেলা কত
আপনার সনে !

হৃদে বড় হয় সাধ কম কান্তি তব, নাথ !
পূজি দিবাযামী,
তোমারে আড়াল করে আজো নানা মূর্ত্তি ধরে
আসে মোর "আমি" !

যে শুধু তোমারে চায় আপনি খসিয়া যায়
তার সব বন্ধ ;
শত দিকে আমি ধাই তাই দিশা নাহি পাই,
নাহি ঘুচে দ্বন্দ্ব ।

বসি সুধাসিন্ধুতীরে চাহিতেছি ফিরে ফিরে
মরীচিকা পানে,
বদ্ধ অন্ধ বাসনায় প্রাণ করে, হায়. হায় !
প্রবোধ না মানে ।

তোমা ছাড়া কিছু আমি দেখি না, অন্তর-যামী !
যবে খুলে আঁখি,
তবু মায়া-স্বপ্ন দিয়ে রচিত বাস্তব নিয়ে
বেশ ভুলে থাকি !

করুণার অবতার আপনি লয়েছ ভার
তথাপি সংশয় !
জননীর স্নেহভরে রাখিয়াছ বক্ষে ধরে
তবু নিরাশ্রয় !

ছিনু মত্ত মোহ-ঘোরে টানিয়া লইলে মোরে
আপনার ঠাঁই,
বন্ধু তুমি, প্রিয় তুমি, তোমার চরণ চুমি
তবু তৃপ্তি নাই !

রহিয়াছ প্রতীক্ষায় দিতে ধরা আপনায়
প্রেম-প্রতিদানে,
নয়ন বাঁধিয়া রেখে দেখিয়াও নাহি দেখে
ভাসি অভিমানে ।

তোমারে চাওয়াতে আছে যে-সুখ, তাহার কাছে
তুচ্ছ সর্ব্বধন,
রহি চেয়ে তোমা পানে জাগিছে মর্ত্ত্যের প্রাণে
মন্দার-স্বপন ;

কাঁটা ফুল হয়ে ফোটে তটিনী উল্লাসে ছোটে
অসীমের পানে,
হয়ে ঊর্দ্ধ-স্বয়ম্বরা অটবী উজলে ধরা
পাখী মাতে গানে ।

তোমারে চাওয়ার স্বাদ যে পেয়েছে—পরমাদ
সাজে কি তাহার ?
আনন্দের পাল তুলি যাবে সে দুঃস্বপ্ন ভুলি
তমসার পার ।

সংসারে রয়েছে যারা তুচ্ছ সুখে আত্মহারা
তোমাতে বঞ্চিত,
এই করো, দয়াময় ! শিরে যেন নাহি হয়
সে-শাপ বর্ষিত ।

তোমার বিরহানলে দিবানিশি মরি জ্বলে
সেই মোর ভালো,
তোমা ছাড়া প্রাণ মম হোক্ মরুভূমি সম,
নিভে যাক্ আলো ।

প্রতি রক্ত বিন্দু মোর তব প্রেমে হোক্ ভোর
আপনা-বিস্মৃত,
জানি ভোর হবে নিশা তুমিই মিলাবে দিশা
মরণে অমৃত ।

পঞ্জাবে গ্রীক-শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণের বিদ্রোহ *

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা দেখাইয়াছি যে, গ্রীকগণকে তাড়াইয়া পঞ্জাব অধিকার করিয়া পরে চন্দ্রগুপ্ত নন্দ সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া ভারত-সম্রাট হইয়াছিলেন। কাজেই কোন্ বৎসর পঞ্জাব হইতে গ্রীকগণ বিতাড়িত হয়, তাহা ঠিক করিতে পারিলে সম্রাট হইয়া কোন্ বৎসর চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার নির্ণয় সহজ হয়।

৩২৫ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের শেষে এলেকজেণ্ডার যখন ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যা'ন, তখন তিনি বিজিত পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের শাসনের নিম্নলিখিত মত ব্যবস্থা করিয়া যা'ন।

১। পঞ্জাবের নদীগুলির সহিত সিন্ধু নদীর সঙ্গম পর্য্যন্ত সিন্ধু দেশে এগেনরের পুত্র পাইথনকে শাসনকর্ত্তা করা হইল।

২। এই সঙ্গমের উত্তরস্থ স্থানগুলি, যথা মালব, ক্ষুদ্রক ইত্যাদি স্বাধীন জাতির দেশ যাহা এলেকজেণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহা ফিলিপের অধীনে রাখা হইল। এই ফিলিপ-শাসিত প্রদেশের উত্তরে তক্ষশীলা রাজ্য। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন আম্ভি। আম্ভি এলেকজেণ্ডারকে ভারতে অবস্থানকালে বিবিধ উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। আম্ভিকেও কিন্তু ফিলিপের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হইত। ফিলিপের অধীনে প্রকাণ্ড এক দল সৈন্য ছিল। এই সৈন্যদলে গ্রীক, মেসিডোনীয়, থ্রেসীয় ইত্যাদি বিবিধ জাতির সৈন্য ছিল। থ্রেসীয় সৈন্যগণের সেনাপতি ছিলেন ইউডেমস্ নামক এক ব্যক্তি।

৩। ইহার পূর্ব্বে ছিল পুরুর রাজ্য। এলেকজেণ্ডারের আগমনের পূর্ব্বে পুরু ঝিলাম ও চিনাব নদীদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ (আয়তনে প্রায় মেদিনীপুর জেলার সমান) ক্ষুদ্র একটি রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এলেকজেণ্ডারের সহিত সন্ধি হইলে পর তিনি পুরুর রাজ্যসীমানা অনেক বাড়াইয়া দেন। গ্রীক সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া পুরু নিজের রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

৪। আম্ভি ও ফিলিপের রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে পারোপনিসিদৈ নামক প্রদেশে এলেকজেণ্ডারের শ্বশুর অক্ষিআর্ত্তিস্ নামক এক ব্যক্তি শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। এই রাজ্য হিন্দুকুশ পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ বর্ত্তমান কাবুল রাজ্যের পশ্চিমাংশ লইয়া গঠিত ছিল।

৩২৪ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে ফিলিপকে তাঁহার নিজেরই কয়েকজন সৈন্য হত্যা করে। এলেকজেণ্ডারের নিকট এই খবর পৌঁছিলে তিনি অন্য কোন প্রকৃষ্টতর ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত ইউডেমস্কে ফিলিপের স্থানে অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ফিলিপের বিস্তৃত রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলার জন্য তক্ষশীলারাজ আম্ভি এবং নবনিযুক্ত ইউডেমস্, এই দুইজনকে যুক্তভাবে দায়ী করা হইল। আম্ভি বরাবরই গ্রীকদের পোষকতা করিয়া আসিতেছিলেন এবং এলেকজেণ্ডারও তাঁহাকে খুব বিশ্বাস করিতেন।

খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দের জুন মাসে এলেকজেণ্ডার বেবিলন নগরে প্রাণত্যাগ করেন, কাজেই অস্থায়ী ইউডেমস্ই ফিলিপের স্থানে স্থায়ী হইলেন, অন্য কোন ব্যবস্থা আর হইয়া উঠিল না।

এলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর পরে তাঁহার সেনাপতিগণ বেবিলন নগরে এক মন্ত্রণা-সভায় মিলিত হইলেন এবং এলেকজেণ্ডারের বিজিত বিস্তৃত সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সভায় ভারতীয় গ্রীক প্রদেশগুলির শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন করা হইল না। এলেকজেণ্ডারের ব্যবস্থাই এই ক্ষেত্রে বলবৎ রহিল। (ভি, এ, স্মিথের 'অশোক' ১ পৃষ্ঠা। কেম্ব্রিজ হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, ৪২৮ পৃষ্ঠা—২৩-২৮ পংক্তি।) কাজেই পঞ্জাবের বিভিন্ন রাজ্যগুলির শাসনের ব্যবস্থার বিবরণ পূর্ব্বে যাহা বিবৃত করিয়াছি উহার কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

সিরিয়া প্রদেশের ট্রিপারাডিসস্ নামক স্থানে ৩২১ খ্রীষ্ট

* "চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের অভিষেক সংবৎসর"। দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্বাব্দে সেনাপতি এন্টিপেটরের নেতৃত্বে আবার গ্রীক সেনাপতিগণের একটি সভা হয়। এই সভায় রাজ্য বিভাগ ও রাজ্যশাসন ব্যবস্থার নানা রকম পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ভারতীয় গ্রীকরাজ্য সমূহের রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থায় যে পরিবর্ত্তনগুলি হইল তাহা এই—

(i) পাইথনকে সিন্ধু প্রদেশ ছাড়িতে হইল। সিন্ধু নদীর পশ্চিমস্থ এবং পারোপনিসিদৈ রাজ্যের পূর্ব্বস্থ ভূভাগ পাইথনের অধীনস্থ হইল।

(ii) পুরুর রাজ্যসীমা অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহাঁর প্রভুত্ব সিন্ধু নদী ধরিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। এই ব্যবস্থা হইতে বুঝা যায়, সিন্ধু প্রদেশ শাসনে রাখিবার মত বল পাইথনের ছিল না। তাই 'উড়ু খৈ গোবিন্দায় নমঃ' নীতির অনুসরণ করিয়া সিন্ধু প্রদেশ পুরুর অধীনস্থ করিয়া দেওয়া হইল।

(iii) আম্ভি ও পুরুর ক্ষমতা খর্ব্ব করার কোন চেষ্টা হইল না, কারণ গ্রীক সেনাপতিগণ বুঝিলেন, উহা তাহাঁদের সাধ্যাতীত।

(iv) এই ট্রিপারাডিসসের ব্যবস্থায় ইউডেমসের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই বুঝিতে হইবে, ইউডেমস্ এলেকজেণ্ডারের নিয়োগ এবং বেবিলনের ব্যবস্থা মত পূর্ব্ববৎ ফিলিপের রাজ্যশাসন করিতেই রত ছিলেন। কারণ ইতিহাসে দেখিতে পাই, তিনি ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত পঞ্জাবে ছিলেন। ঐ বৎসর তিনি পুরুকে হত্যা করিয়া তাহাঁর অনেকগুলি রণহস্তী হস্তগত করেন এবং সমস্ত গ্রীক সৈন্য ও পুরুর রণহস্তীগুলি সমেত ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন।

এই বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই, গ্রীক প্রভুত্ব ও গ্রীক শাসন-ব্যবস্থা পঞ্জাবে ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। এই বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত বা অন্য কেহ পঞ্জাব হইতে গ্রীক শাসন দূর করিতে কোন চেষ্টা করেন নাই। তবে কবে এই চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল? কবে চন্দ্রগুপ্ত জাষ্টিনের বর্ণনা মত এলেকজেণ্ডারের সেনাপতিগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন?

পরলোকগত ঐতিহাসিক ডাঃ ভি, এ, স্মিথ্ এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসঙ্গত ও অসংযত চিন্তাপ্রণালীর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যথা—"গ্রীক সেনাপতি ইউডেমসের অধীনে এত সৈন্য ছিল না যে, তিনি জোর করিয়া নিজের শাসন ও প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারেন। তাঁহার প্রভুত্ব নিশ্চয়ই নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছিল।"—আর্লি হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, ১১৫ পৃষ্ঠা।

এই অনুমানের কি কোন ভিত্তি আছে? দীর্ঘ আট বৎসর কাল (৩২৪—৩১৭ খ্রীঃ পূঃ) ইউডেমস্ ভারতে একমাত্র গ্রীক সেনাপতি ছিলেন। দুই দিকে দুইজন শক্তিশালী রাজা আম্ভি ও পুরুর রাজ্যের মধ্যে তাহাঁর রাজ্য অবস্থিত ছিল এবং ইহাদের মধ্যে থাকিয়াও তিনি বেশ আত্মরক্ষা করিয়া ৩১৭ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত পঞ্জাবে ছিলেন। ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে তিনি পুরুকে হত্যা করিয়া তাহাঁর রণহস্তীগুলি আত্মসাৎ করিয়া সমস্ত গ্রীক সৈন্যসহ আম্ভির রাজ্যের মধ্য দিয়া ভারত হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ভারত হইতে বাহির হইয়া যাইবার অন্য কোন সহজ রাস্তাও ছিল না। এই বহির্গমন কি দুর্ব্বল, অল্পশক্তি, নামমাত্র প্রভুত্বশালী ব্যক্তির পলায়নের মত বোধ হয়?

ডাঃ ভি, এ, স্মিথ্ বলেন—"এই ব্যবস্থায় (ট্রিপারাডিসসের ব্যবস্থায়) পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, এলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর দুই বৎসর মধ্যে ৩২১ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে সিন্ধুনদের পূর্ব্ব-পারে গ্রীক প্রভুত্ব ও শাসন একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। তবে সামান্য একটুক্‌রা রাজ্য (সে রাজ্য যেখানেই হউক না কেন) যথায় ইউডেমস্ কোন রকমে আঁকড়িয়া ছিল, তথায় গ্রীকশাসন লুপ্ত হয় নাই, এবং ইউডেমস আরও কয়েক বৎসর সেখানে টিকিয়া ছিল।"—আর্লি হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, ১১৬ পৃষ্ঠা।

এইখানেও ডাঃ স্মিথের অসঙ্গত ও অসংযত চিন্তার বিকাশ দেখা যায়। ৩২১ খ্রীষ্টাব্দের ট্রিপারাডিসসের ব্যবস্থায় আম্ভি এবং পুরুকে গ্রীক সাম্রাজ্যের অধীনস্থ রাজা বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। এদিকে বহু গ্রীক সৈন্যের সেনাপতি ইউডেমস্‌ও ফিলিপের রাজ্যে, ফিলিপের স্থানে ক্ষত্রপের কাজ করিতেছিল। ট্রিপারাডিসসের ব্যবস্থার যে বিবরণ আমরা পাইয়াছি তাহাতে দেখা যায়, পুরু ও আম্ভি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়াছেন। তাই তাহাঁদিগকে ইচ্ছা থাকিলেও রাজ্যচ্যুত করিবার ক্ষমতা ট্রিপারাডিসসে মিলিত কর্ত্তাদের ছিল না। বেশ কথা।

কিন্তু ক্ষমতাশালী হইলেও তাঁহারা যে গ্রীক শাসনে বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন এমন কথার আভাসও কোথাও নাই। ইউডেমসেরও যে কোনরূপ দুর্ঘটনায় কোন প্রকার বলহানি ঘটিয়াছিল, এমন কথাও কোথাও পাই না। এ অবস্থায় ৩২১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে গ্রীক প্রভুত্ব ও শাসন একেবারেই লুপ্ত হইয়াছিল এমন অনুমান কি যুক্তিসঙ্গত? যদি অমন হইয়াই আসিবে, তবে দীর্ঘ আরও চারি বৎসর কাল ইউডেমস্ কি করিয়া কোথায় টিকিয়া ছিল? চারি দিকে আগুনের মধ্যে ইউডেমস্ চারি বৎসর কাল টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল এই কথা বড় যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

ডাঃ স্মিথ্ বলেন—"এলেকজেণ্ডারের মৃত্যু সংবাদে যথন আর কোন সন্দেহ রহিল না, এবং সৈন্য চলাচলের উপযোগী ঋতু উপস্থিত হইল, তথন ভারতে একযোগে যে সকলে গ্রীক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ফলে ৩২২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের শেষে ভারত হইতে গ্রীক শাসন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কেবল একটুকরা জমীতে ইউডেমস্ কোন রকমে আঁকড়িয়া ছিল।"—আর্লি হিষ্টরি, ১১৬-১১৭ পৃঃ।

এই প্রবন্ধে আদিতেই বলিয়াছি, কল্পনাযোগে নিঃসন্দেহ হওয়া ঐতিহাসিক ব্যাপারে বড়ই বিপজ্জনক,—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রমাণ খুঁজিয়া ঐ প্রমাণের বলে নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত। ৩২২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের শেষে পঞ্জাবে সার্ব্বজনীন বিদ্রোহের কোন বিবরণ কোথাও আছে কি? পর বৎসর অর্থাৎ ৩২১ খ্রীঃপূঃতে ট্রিপারাডিসসে নির্ব্বিবাদে গ্রীক নায়কগণ বিস্তৃত গ্রীকসাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন—পঞ্জাবেরও শাসন-ব্যবস্থা হইল। তবু যদি কেহ বলেন যে, ৩২২ সালে অর্থাৎ ট্রিপারাডিসসের ব্যবস্থার পূর্ব্ব বৎসরেই পঞ্জাব হইতে গ্রীক শাসন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে নিতান্ত অসঙ্গত জবরদস্তি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। প্রচুর গ্রীক সৈন্য লইয়া ৩১৭ খ্রীঃপূঃ পর্য্যন্ত ইউডেমসের পঞ্জাবে অবস্থিতি ব্যাপারটা ডাঃ ভি, এ, স্মিথ্ মোটেই তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই, এই কথা আমরা বলিতে বাধ্য।

ঠিক যে কি ঘটিয়াছিল তাহা বলিবার মত উপকরণ আমাদের হাতে নাই। কিন্তু ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে পুরুকে হত্যা করিয়া তাহার রণহস্তীগুলি হস্তগত করিয়া ইউডেমসের ভারতবর্ষ ত্যাগ দেখিয়া প্রকৃত ঘটনার ধারাটা অনুমান করা যায়। মনে হয় এই বৎসরই চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকশাসনের বিরুদ্ধে পঞ্জাবে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। এই বৎসরের পূর্ব্বে যে তিনি এই সুযোগ পান নাই, সেই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। পুরু যে এলেকজেণ্ডারকে কি প্রবল বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা গ্রীক কর্ত্তাগণ নিশ্চয়ই ভুলেন নাই। কাজেই পুরুকে সম্ভবতঃ তাঁহারা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। তাই চন্দ্রগুপ্তের বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়া মাত্র পাছে পুরু ঐ দলে যাইয়া যোগ দেন, গ্রীককর্ত্তা ইউডেমসের মনে এই সন্দেহ জাগিয়াছিল। এই সন্দেহের ফলেই সম্ভবতঃ পুরুর হত্যা। কিন্তু সম্ভবতঃ পুরুর হত্যায় পঞ্জাব আরও গরম হইয়া উঠিল এবং চন্দ্রগুপ্তের নায়কত্বে পঞ্জাবের জনসাধারণের সমবেত চাপে ইউডেমসকে চিরকালের জন্য ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ভারত ছাড়িয়া প্রস্থান করিতে হইল।

মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ বৎসর নির্ণয় *

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, চন্দ্রগুপ্তের পঞ্জাবে গ্রীক শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান এবং পঞ্জাব অধিকার ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বে হওয়া সম্ভবপর নহে। ইউডেমসকে ভারত হইতে খেদাইয়া দেওয়া এবং ভারতে গ্রীক অধিকারের সমস্তগুলি মূল একে একে উৎপাটিত করা ব্যাপারে নিশ্চয়ই অনেকখানি সময় আবশ্যক হইয়াছিল। ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ইউডেমস ভারত পরিত্যাগ করিয়া গেলেও পঞ্জাব প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপে স্ববশে আনিতে আরও বছর দুই লাগিবার কথা। কাজেই ৩১৭ ও ৩১৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ এই সকল ব্যাপারে ব্যয়িত হইয়াছিল, ধরা যায়। ৩১৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে চন্দ্রগুপ্ত নন্দ-সাম্রাজ্য অধিকারের জন্য অভিযান আরম্ভ করেন, এই অনুমান অযৌক্তিক

* চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের অভিষেক-সংবৎসর, তৃতীয় প্রস্তাব।

নহে। জৈন গ্রন্থ স্থবিরাবলি চরিতে হেমচন্দ্র চন্দ্রগুপ্তের নন্দ-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের এক বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত পর্ব্বতক নামক এক পার্ব্বত্য সর্দ্দারের সহযোগে ধীরে ধীরে নন্দরাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। একটি একটি করিয়া নগরগুলি ক্রমশঃ অধিকৃত হইতে লাগিল। একটি নগর দখল করিতে চন্দ্রগুপ্তের বিশেষ বেগ পাইতে হয় এবং অনেক মাস সময় অতিবাহিত হয়। অবশেষে চাণক্যের কৌশলে দীর্ঘকাল চেষ্টার পরে ঐ নগর হস্তগত হয়। এই বিবরণের সমস্তই যে ঐতিহাসিক সত্য এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু কিনারা হইতে অভিযান আরম্ভ করিবার উপদেশমূলক বৌদ্ধ ও জৈন গল্পগুলি হইতে বুঝা যায়, প্রত্যন্ত পঞ্জাব হইতে আরম্ভ করিয়া পাটলীপুত্রের দিকে অভিযান ধীরে ধীরে এই ভাবেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এই অবস্থায় প্রকাণ্ড নন্দসাম্রাজ্য মন্থন করিয়া রাজধানীতে পৌঁছিতে ২।৩ বৎসর লাগা কিছুমাত্র অসম্ভব মনে হয় না। যদি ৩১৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে এই অভিযান আরব্ধ হইয়া ২।৩ বৎসর লাগিয়া থাকে তবে ৩১৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে নন্দবংশের পতন হইয়াছিল এবং চন্দ্রগুপ্ত ভারতসম্রাট হইয়াছিলেন, ইহা ধরিলে কি অসঙ্গত হয়? ইহার উপর যখন দেখা যায় যে, প্রাচীন জৈন শাস্ত্রসমূহের গণনা মতে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক সংবৎসর ৩১৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ বলিয়াই গৃহীত, তখন অনেকটা নিশ্চিততার সহিতই চন্দ্রগুপ্তের অভিষেকের এই জৈনশাস্ত্র-সম্মত সংবৎসর সমর্থন করা যায়।

চন্দ্রগুপ্তের এই অভিষেক সংবৎসর অনেকগুলি প্রাচীন জৈন গ্রন্থে দেওয়া আছে। ডাক্তার কার্পেণ্টিয়ার ১৯১৪ সালের ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি পত্রিকায়, বুদ্ধ ও মহাবীরের নির্ব্বাণের তারিখ সম্বন্ধীয় তদীয় প্রবন্ধে একটি জৈন পুস্তক হইতে এই তারিখটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। (১) পুস্তকখানির নাম বিচারশ্রেণী,—প্রণেতা মেরুতুঙ্গ; প্রণয়নের তারিখ—১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহার তদীয় An Epitome of Jainism নামক গ্রন্থেও এই তারিখটি দিয়াছেন। নাহার মহাশয় তিত্থগলীয় পয়ন্না এবং তীর্থোদ্ধার প্রকীর্ণক নামক দুইখানা প্রাচীন জৈন গ্রন্থ হইতে তারিখটি দিয়াছেন। (২) এই পুস্তক দুইখানার কোন বিবরণ নাহার মহাশয় দেন নাই। বিক্রমাব্দ ৫৮ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে আরব্ধ হইয়াছিল। এই সকল জৈন পুস্তকে বিক্রমাব্দের পূর্ব্বে কোন্ রাজবংশ কত কাল স্থায়ী হইয়াছিল, তাহার মোট বৎসর সংখ্যা দেওয়া আছে। এই সংখ্যা-গুলি যোগ করিয়া দেখা যায় যে মৌর্য্যবংশের আরম্ভ ৩১৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে পড়ে—এবং উহাই চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ বৎসর বলিয়া ধরিতে হইবে।

চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ বৎসর ভারতের ইতিহাসের একটি অসাধারণ ঘটনা। প্রাচীন জৈন গ্রন্থকারগণ এই ঘটনার একটা তারিখ দিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য ঐতি-হাসিকগণ এই ক্ষেত্রে কল্পনাকে যথেচ্ছ ছুটিতে দিয়াছেন, তবু ভারতীয় জৈন গ্রন্থকারগণের প্রদত্ত এই তারিখটি সঙ্গত কি না তাহার বিচারে তেমন করিয়া প্রবৃত্ত হ'ন নাই সমস্ত জৈন গ্রন্থে এক ঘটনার যে এই একই তারিখ পাওয়া যায়, ইহাও তাঁহারা বিচার করেন নাই। (৩) ডাঃ কার্পেণ্টিয়ার—কেম্ব্রিজ হিষ্টরিতে প্রকাশিত তদীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"জৈনদের (প্রাচীন সাহিত্যে প্রাপ্ত) বংশাবলিতে দেখা যায় যে, বিক্রমাব্দের প্রারম্ভ বৎসরের ২৫৫ বৎসর পূর্ব্বে—অর্থাৎ ৩১৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে (৫৮+২৫৫=৩১৩) চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই

(১) "এই তিনটি শ্লোক (যাহা হইতে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের বৎসর পাওয়া যায়) জৈনদের অনেক টীকায় এবং সময়নির্ণায়ক গ্রন্থে আছে।" ডাঃ কার্পেণ্টিয়ারের প্রবন্ধ, ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি, ১৯১৪, ১২০ পৃষ্ঠা।

(২) "এই ৩১২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দটি চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ বৎসর বলিয়া অতি প্রাচীন অনেক জৈন গ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়।" নাহার ও ঘোষ প্রণীত—An Epitome of Jainism,—Appendix A. Page iv. শ্রীযুক্ত নাহার বিক্রমাব্দের আরম্ভ ৫৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ধরিয়া হিসাব করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উহা ৫৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে আরব্ধ হইয়াছিল। কেম্ব্রিজ হিষ্টরি, ১৫৫ পৃ।

(৩) এইখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, জৈন প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থানে উল্লিখিত এই তারিখটি যে কয়টি শ্লোকে বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহাদের প্রথম দিক দিয়া কিছু গোলমাল আছে। ডাঃ কার্পেণ্টিয়ার তদীয় ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারীর প্রবন্ধে এই গোলযোগের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই গোলযোগে কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের তারিখের কোন ইতরবিশেষ হয় না।

তারিখ যদি ঠিক তারিখ না-ও হয় তবু বিশেষ বেশ-কম হইতে পারেই না।" কেম্ব্রিজ হিষ্টরি, ১৫৮ পৃষ্ঠা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে কার্পেন্টিয়ার সাহেব অস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, জৈনদের তারিখই ঠিক—কিন্তু বিচার-বিতর্ক দ্বারা এই অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করিতে আর তিনি চেষ্টা করেন নাই।

জৈনদের এই তারিখটি আশ্চর্য্যরূপে বৌদ্ধ সাহিত্য দ্বারাও যে সমর্থিত হয়, এই পর্য্যন্ত এই ব্যাপার কেহই লক্ষ্য করেন নাই। মৌর্য্যরাজগণের রাজত্বকালের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোথায় কি পাওয়া যায়, হুল্‌জের (Inscriptions of Asoka, Introduction, P. XXXII হইতে তাহা সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

কোথায় প্রাপ্ত	চন্দ্রগুপ্ত	বিন্দুসার	অশোক
পুরাণ	২৪ বৎসর	২৫	৩৬
দীপ বংশ	„ „	×	৩৭
মহাবংশ	„ „	২৮	৩৭
বুদ্ধ ঘোষ	„ „	২৮	×
ব্রহ্মদেশীয় জনশ্রুতি	„ „	২৭	×

দীপবংশ ও মহাবংশে আরও লিখিত আছে যে বুদ্ধের নির্ব্বাণের ২১৪ বৎসর পরে বিন্দুসারের মৃত্যুতে অশোক রাজ্য প্রাপ্ত হ'ন এবং তাহার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ নির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে অশোকের অভিষেক হয়।

মৌর্য্যরাজগণের রাজত্বকালের দৈর্ঘ্যের যে নক্সা উপরে দিয়াছি তাহাতে দেখা যাইবে যে পুরাণ মতে বিন্দুসারের রাজত্বের দৈর্ঘ্য ২৫ বছর ; আর বৌদ্ধদের মতে ২৭ এবং ২৮ বছর। অশোকের রাজ্যলাভ এবং অভিষেকের মধ্যে যে চারি বৎসরের ব্যবধান ছিল, তাহারই জন্য বিন্দুসারের রাজত্বের দৈর্ঘ্যে পুরাণে ও বৌদ্ধ সাহিত্যে এই বিরোধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক ধরিয়া নেওয়া যাক্ যে পুরাণের প্রদত্ত রাজত্ব দৈর্ঘ্যগুলিই ঠিক। (Pargiter সাহেবের Dynasties of the Kali Age নামক পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) এই পুরাণকথিত মৌর্য্যরাজগণের রাজত্ব দৈর্ঘ্য ঠিক বলিয়া ধরিয়া যে ফল পাওয়া যায়, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক।

চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ ৩১৩ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের রাজত্বকাল—২৪ + ২৫ = ৪৯ বছর বাদ দিলে ২৬৪ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে অশোকের রাজ্যলাভ নির্দ্ধারিত হয়। ইহার সহিত ২১৪ যোগ দিলে বুদ্ধের নির্ব্বাণ ৪৭৮ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়।

এক্ষণ স্মরণ করা আবশ্যক যে ৫৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিক্রমাব্দের আরম্ভ ধরিয়া ডাক্তার কার্পেন্টিয়ার অশেষ পরিশ্রম করিয়া ৪৭৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দকে বুদ্ধের নির্ব্বাণাব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন (ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী পত্রিকা, ১৯১৪ সাল, ১৭৩ ও পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাসমূহ)। কাজেই ৫৮ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিক্রমাব্দের আরম্ভ ধরিলে এই তারিখ ৪৭৮ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দই হয়। বুদ্ধের নির্ব্বাণ কোন বৎসর হইয়াছিল, ইহা লইয়া নানা মুনির নানা মত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল মত এই যে, উহা ৫৪৪ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে হইয়াছিল। ঠিক কোন্ বৎসরটিতে নির্ব্বাণ ঘটিয়াছিল, জ্যোতিষিক গণনা করিয়া তাহা বাহির করিবার উপকরণ বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। কোন্ বার, কোন্ তিথিতে বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন, কোন্ বার, কোন্ তিথিতে, কত বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন ইত্যাদি বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রাচীন কাল হইতেই লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। জ্যোতিষে অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন পরলোকগত দেওয়ান বাহাদুর স্বামীকান্নু পিলাই মহাশয় ১৯১৪ সালেরই ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী পত্রে বিস্তৃত গণনা ও গবেষণামূলক এক প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে, একমাত্র ৪৭৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে নির্ব্বাণ ধরিলেই জ্যোতির্ষিক গণনায় বুদ্ধের জীবনের ঘটনাগুলির বার, তিথি ও বয়সের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়। অন্য কোন সালে নির্ব্বাণ ধরিলে এইগুলি আদপেই মিলে না। স্বামী কান্নু পিলাই মহাশয়ের মত অসাধারণ জ্যোতিষীর প্রভূত পরিশ্রমের ফল এই প্রবন্ধটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টি তেমন ভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। এই প্রবন্ধে স্বামী কান্নু পিলাই জোর করিয়াই বলিয়াছেন—বুদ্ধের নির্ব্বাণ অন্য কোন বৎসর হইতেই পারে না।

এখন ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। প্রাচীন জৈন সাহিত্য মতে চন্দ্রগুপ্ত ৩১৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। পুরাণ মতে তাহা হইলে ২৬৪ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে অশোকের রাজ্য প্রাপ্তি সিদ্ধ হয়। বৌদ্ধ সাহিত্য মতে ইহার ২১৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪৭৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে বুদ্ধের নির্ব্বাণ সংঘটিত হইয়াছিল। স্বামী কান্নু পিলাইএর মত প্রবীণ জ্যোতিষী বিশেষ সূক্ষ্ম গণনা করিয়া বলিতেছেন, নির্ব্বাণ একমাত্র এই ৪৭৮ খ্রীঃ পূঃ তে ধরিলেই বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত বুদ্ধের জীবনের ঘটনার বার, তিথি, নক্ষত্র ও বুদ্ধের বয়সের সামঞ্জস্য হয়। নির্ব্বাণের অব্দ যতগুলি বৎসরাঙ্ক প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকটি বিচার করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে ৪৭৮ ছাড়া অন্য কোন বৎসরই গণনায় মিলে না। এ অবস্থায় শঙ্কা-দুরু-দুরু চিত্তে এই আশা করা কি নিতান্তই অসঙ্গত যে, শতাব্দী কাল ধরিয়া যে সমস্যার মীমাংসা প্রাত্নতাত্ত্বিকগণ খুঁজিয়া আসিতেছেন, অবশেষে তাহার সমাধান মিলিয়াছে? চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ বৎসর, এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণ বৎসরের উপর ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সমস্ত সন তারিখগুলি নির্ভর করে। কাজেই এই দুই ঘটনার সঠিক সমাঙ্ক নির্দ্দেশের গুরুত্ব যে কতখানি, তাহা আর ইতিহাসের পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না। এই দুই ব্যাপার লইয়া যে আজ পর্য্যন্ত কত তর্কবিতর্ক, কত লেখালেখি হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এতদিন পরে এই বহু-বিতর্কিত সমস্যার সমাধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

উপরে যে সামঞ্জস্য দেখাইলাম, তর্কের মুখে যে তাহা উড়াইয়া দেওয়া কঠিন নহে, সেই বিষয়ে আমি অন্ধ নহি। যেমন, দীপবংশ ও মহাবংশ কথিত অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণের মধ্যের ব্যবধান ২১৪ বৎসর গ্রহণ করিতেছি, অথচ ঐ পুস্তকদ্বয়েই প্রদত্ত মৌর্য্য রাজগণের রাজত্বকালের দৈর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছি না—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সকল তর্ক ন্যায়বাগীশগণের জন্য রহিল।—আপাততঃ আমাদের গৃহীত তারিখগুলির বিরুদ্ধে সকলের অপেক্ষা যে গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহারই মাত্র বিচার এ স্থলে করা আবশ্যক।

ঐতিহাসিকগণ জানেন, অশোকের ত্রয়োদশ সংখ্যক গিরিলিপিতে পাঁচজন গ্রীক রাজার নাম উল্লিখিত আছে। ইহারা কে এবং কোথায় কখন রাজত্ব করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য হুলজের Inscriptions of Asoka পুস্তকের ভূমিকার ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই পুস্তক হইতে এই পাঁচ জন গ্রীক রাজার নাম ও তারিখ সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

সিরিয়ার রাজা এণ্টিয়কস্ (দ্বিতীয়) থিয়স্—২৬১-২৪৬ খ্রীঃ পূঃ।

মিশরের রাজা টলেমি (দ্বিতীয়) ফিলাডেল্‌ফাস্—২৮৫-২৪৭ খ্রীঃ পূঃ।

মেসিডোনিয়ার রাজা এণ্টিগনস্ গোনটস্—২৭৬-২৩৯ খ্রীঃ পূঃ।

সাইরিন দেশের রাজা মগস্—আনুমানিক ৩০০—আনুমানিক ২৫০ খ্রীঃ পূঃ।

কোরিন্থ্ দেশের রাজা এলেকজেণ্ডার অব্দ—২৫২—অব্দ—২৪৪ খ্রীঃ পূঃ।

আমাদের গণনা অনুসারে অশোক ২৬৪ খ্রীঃপূঃতে রাজ্য-লাভ করিয়াছিলেন এবং ২৬০ খ্রীঃ পূঃতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। অশোকের ত্রয়োদশ গিরিলিপি অশোকের ত্রয়োদশ অভিষেক সংবৎসরের পূর্ব্বে হইতে পারে না, ইহা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করেন। কাজেই ত্রয়োদশ গিরিলিপির তারিখ ২৪৮—২৪৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ। হুল্‌জ ধরিয়া লইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের সম্রাট অশোক তদীয় ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে যে বৎসর গ্রীকরাজাগণের উল্লেখ করেন, সে বৎসর ঐ পাঁচজন রাজা সকলেই জীবিত ছিলেন। এই অনুমান সত্য নাও হইতে পারে। সেই সুদূর অতীতে এক দেশ হইতে আর এক দেশে খবর পৌঁছিতে অনেক সময় লাগিত। ভারতের পশ্চিম উত্তর প্রান্তের দুর্গম পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশগুলি অতিক্রম করিয়া মিশর ও সিরিয়া ইত্যাদি দেশ হইতে আসিয়া খবর ভারতে পৌঁছিতে দীর্ঘকাল লাগিবারই কথা। কাজেই অশোক ভারতে যখন কোন গ্রীক রাজার উল্লেখ করিতেছেন, তাহার দুই এক বৎসর আগেই হয়ত ঐ রাজা মরিয়া গিয়াছেন, এমন হওয়াও অসম্ভব ছিল না। তবু পূর্ব্বের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ২৪৮—২৪৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে অশোক যখন পাঁচজন গ্রীকরাজার উল্লেখ করেন, তখন তাহারা সকলেই জীবিত ছিল,—কেবল সাইরিণের মগস্ ছাড়া। হুল্‌জ ইহার রাজত্ব সমাপ্তি বৎসর আনুমানিক ২৫০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া লিখিয়াছেন। আনুমানিক ২৫০

আসলে ২৪৮—২৪৭ ও হইতে পারে। মগসের রাজত্ব সমাপ্তি বৎসর নির্ভুলরূপে নির্দ্ধারিত করিবার কোন উপকরণ আমার হাতে নাই। যদি এই বৎসর ২৫০ খ্রীঃ পূঃ বলিয়া নির্দ্ধারিতও হয়, তবু সহজ বুদ্ধিতে ইহাই বুঝা যায় যে, সাইরিনে মগসের মৃত্যুর দুই বৎসর পরেও ভারতে তাহার উল্লেখ অসম্ভব নহে, হয়ত অতদিনেও ভারতে তাহার মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পৌছায় নাই।

এই প্রবন্ধের বিচারের ফলে যে তারিখগুলি স্থিরীকৃত হইল, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ—বিম্বিসারের মৃত্যু এবং অজাতশত্রুর রাজ্যপ্রাপ্তি।

৪৮৪ খ্রীঃ পূঃ—জৈনদের আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গোশালের মৃত্যু।

৪৭৮ খ্রীঃ পূঃ—বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভ।

৪৬৮ খ্রীঃ পূঃ—মহাবীরের কৈবল্য লাভ।

অনু-৩১৭ খ্রীঃ পূঃ—চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে পঞ্জাবে গ্রীক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণের অভ্যুত্থান ও শেষ গ্রীক-ক্ষত্রপ ইউডেমসের ভারতবর্ষ ত্যাগ।

৩১৩ খ্রীঃ পূঃ—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের অভিষেক।

২৮৯ খ্রীঃ পূঃ—বিন্দুসারের অভিষেক।

২৬৪ খ্রীঃ পূঃ—অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি।

২৬০ খ্রীঃ পূঃ—অশোকের অভিষেক।

বর্ষা-তৃপ্ত

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ভেসে যাক্ ভেসে যাক্, ধরণী ডুবিয়া যাক্ উদ্দাম প্লাবনে ;
অজস্র ধারার ধোঁয়া ঢেকে দিক, ঢেকে দিক ভুবনে গগনে।
স্তব্ধ তৃপ্ত নত দেহে এ পৃথিবী বরষারে করুক গ্রহণ ;
দীর্ণ মৃত্তিকার বুকে তৃণকুল জলস্রোতে লভুক জীবন।
ধারার শায়ক-বেগ মৃত্তিকার স্তরে স্তরে করুক প্রবেশ ;
প্রাণে মনে দেহে ধরা পাক আজি অবিরাম আনন্দ-আবেশ।
তরুদল তৃপ্ত হোক, তৃপ্ত হোক ব্যথাতুর জীব আর নর ;
দিশি দিশি তৃপ্ত কর হে পবন তৃপ্তিময় সজল মন্থর।
বরষা নেমেছে ঘোর উতরোল উদ্দাম উচ্ছল ;—
পথে পথে জলস্রোত, মাঠে মাঠে অবারিত জল-কলকল।
ডাকে মেঘ গুরু গুরু একখানি সীমাহীন সুবিশাল মেঘ ;
ধূসর একক মেঘে এ কি প্রাণ, এ কি শক্তি, একি রে আবেগ !
বৃক্ষ-শাখে চক্ষু বুজি' কাক করে বরষা ভুঞ্জন ;
পত্রে পত্রে দোলা দিয়ে তরুরা প্রকাশে হরষণ।
আমার নয়ন দু'টি জুড়াল জলের ধোঁয়া, এ কালো নীরদ ;
মেঘের হরষ-ভাষা ভরে বুক জুড়াইয়া শ্রবণের পথ।
বরষণ-হরষণে নিমগন আমি আজ কায়ে মনে প্রাণে ;
বড় তৃপ্তি, বড় শান্তি, বড় সুখ আজিকার এ বরষা আনে।



জীবন ও মরণ

শিল্পী—শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

দামোদরের বিপত্তি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দামোদরের ভয়

বাসায় ফিরিয়া চারজনে স্নান ও আহারাদি শেষ করিয়া নিজেদের ঘরে গিয়া বিশ্রাম মানসে শয়ন করিল। বেলা প্রায় ১॥০টা; সুতরাং এ সময় বাহিরে যাইতে কাহারও ইচ্ছা হইল না। শুইয়া শচীন বলিল, "দামোদরবাবু, আজ 'ত কিছুই হো'ল না। আজ আবার বিকালে খানকতক সংবাদপত্র কিনে দেখ্‌তে হবে। কিন্তু এবার যদি কোথাও গিয়ে অমন কিছু না দেখে-শুনে চলে আসেন, তবে বস্, আর আপনার সঙ্গে আমাদের পোষাবে না।"

দামোদর উত্তরে কহিল, "তা' আপ্‌নি 'ত গেলেই পারেন কাল, ব্যাপার দেখে আস্‌বেন।"

শচীন সখেদে বলিল, "আর কৈ যাওয়া হো'ল। নগেনের জন্যে আমার কিছু কর্ব্বার যো' আছে? ও আমার শনি। পণ্ডিতজি শুনে ঠিকই বলেছে।"

নগেন উত্তরে কহিল, "তো'র সবেতেই জ্যাঠামো কর্ত্তে হবে না। কিসের জ্যাঠামো? তুই 'রবিবাবুর আধ্যাত্মিক আকাশে'র কিছু বুঝিস্?"

শচীন বলিল, "আমি বুঝি না, তুই বুঝিস্। হয়েছে 'ত?"

রমেশ কোন কথায় কান দিতেছিল না। সে চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। এখন হঠাৎ চোখ খুলিয়া দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রলোকটিকে দেখেছেন? কি রকম দেখ্‌তে?"

দামোদর বর্ণনা করিল। রমেশ শুনিল; তার পর জিজ্ঞাসা করিল, "বেশ্ সৌম্যমূর্ত্তি, নয়? কপালের শির উঁচু? ডান দিকে একটু কাটা দাগ? ঠিক ঝুল্‌পির নীচে?"

দামোদর বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "হাঁ, ঠিক তাই। আপনি কি দেখেছেন না কি?"

রমেশ উত্তর দিল না। শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশদা, রমেশ, কি ব্যাপারটা তোমার শুনি?"

রমেশ বলিল, "শচী, বকিস্ নি। শুয়ে থাক্। আমার ঘুম পাচ্ছে, তুই বাজে বকে মাথা ধরাস্ নি।"

নগেন সখেদে বলিল, "দামোদরবাবু, আমার ভাগ্যের ঘটা দেখ্‌লেন? আচ্ছা, পণ্ডিতজিকে কি বিশ্বাস হয়?"

দামোদর উত্তর করিল, "অবিশ্বাসের কারণ কিছু দেখ্‌লুম না। অবশ্য এ রকম লোক খুব চতুর হয়; তা'দের হাত গুণ্‌বার ক্ষমতা না থাকলেও লোকের মন বুঝ্‌বার ক্ষমতা যথেষ্ট থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ লোকটার মনে হয় কিছু কিছু বিদ্যা—এই সামুদ্রিক বিদ্যা অন্তত আছে।"

নগেন বলিল, "তবেই 'ত বিপদ বাড়ালেন। কিন্তু শুণে 'ত ঠিক বলেছে পিতৃধন পেয়েছি, ও তা'ও শেষ ক'রে এনেছি। এটা 'ত আর ফাঁকা কথা নয়। না, এ দেখ্‌ছি ভাবালে। ছিলুম ভাল, শচে'র পাল্লায় পড়ে আজ দুর্ভাবনা জুটালুম। এখন দিনরাত কেবল মনে হবে ভাগ্য বড়ই দুরভিসন্ধি কর্‌ছে। এর ঔষধ কি, দামোদরবাবু? আপনি কি সত্যি রাজা হবেন?"

শচীন বলিল, "আমি অর্দ্ধেক জমিদার হবো।"

নগেন বলিল, "শচী, তো'র 'ত ভাব্‌না নেই; টাকার গদীতে বসে থাক্‌বি, রাজকন্তে বিয়ে করবি, আমাকে তো'র নায়েব, গোমস্তা যা' হয় রাখিস্। আমি চুরি কোর্ব্ব আর চাকরি কোর্ব্ব, বুঝেছিস্?"

শচীন গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন দিনরাত গাল দিচ্ছিস্, ধমক্ দিচ্ছিস্, তখন খোসামোদ কোর্‌বি 'ত?"

নগেন ভাবিয়া বলিল, "চেষ্টা কো'রে দেখ্‌বো। তা'ছাড়া দামোদরবাবু রাজা হলে আমায় কোন্ না একটা সেনাপতি, কি মন্ত্রী, করে দেবেন? যা' মেহনত ওঁর

জন্তে কোরছি? উঃ! আজ কুকুরটা আর একটু হলেই কামড়ে ছিল আর কি। জানিস্ শচী? ভাগ্যিস্ মনে পড়ে গেল, কুকুরকে দেখে ভয় খেতে নেই। অমনি সাহস করে তা'কে তাড়া দিলুম, "শুট্! শ্যাট্!" বস্, সরে গেল। কিন্তু বড় ফাঁড়া গেছে।"

শচীন মন্তব্য দিল, "ব্যাকরণ শুন্‌লে কুকুর কেন ভূতও পালায়। তো'র শান্তিপুরে বাড়ী কি না; ভয়ের ঠেলায় সংস্কৃত বেরিয়েছে।"

শুইয়া শুইয়া কোন রূপে চারিটা বাজিল। আর সময় কাটিতে চাহে না। দামোদর উঠিয়া বসিল। এখনও দু'তিন ঘণ্টা দেরী করিয়া তবে নারাণবাবুর বাসায় যাওয়া। এতক্ষণ কি ক'রে? এইখানে শুইয়া কত আর শচীন ও নগেনের বিবাদ বিতর্ক শুনিবে? সে উঠিল। ভাবিল, একবার সুরেনবাবুর চা-এর দোকানে যাইবে। সে ভদ্রলোকের সংবাদ নেওয়া ভাল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "কি? মাঠে যাবেন না কি? হকি দেখ্‌তে? তা'হলে চলুন আমিও যাই।"

দামোদর বলিল, "না। আমি একটি লোকের সহিত দেখা কো'রে আস্‌বো।"

"কোন্ দিকে?"

"এই কাছেই। আপনি কোথায় যাবেন?"

শচীন বলিল, "আমার 'ত সর্ব্বত্র যাবার ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গী নেই। এ দু'জনে নড়্‌তে চায় না। আপনি 'ত কোথাও যাচ্ছেন?"

দামোদর কহিল, "হাঁ; আমার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সন্ধ্যে বেলায় দেখা কর্ত্তে হবে।"

"তবে আর কি হ'বে?" বলিয়া শচীন আবার শুইল।

দামোদর বাহির হইয়া গেল, নগেনের কাপড় জামা পরিয়াই। ভাবিল আজ ফিরিবার সময় একখানা ধুতি ও একটা জামা কিনিবে—ধোয়াই কিনিবে। পকেটে হাত দিয়া দেখিল আর সাত টাকা আর ছ'আনা আছে মাত্র। তিন টাকা জামা কাপড় কিনিলেও চার টাকা হাতে থাকিবে। তাহার 'ত আর বিশেষ কোনও খরচ নাই।

সুরেনবাবুর দোকানে গিয়া দেখিল, সুরেনবাবু হিসাবের খাতা দেখিতেছেন। তাঁ'র উনান ধরান হয় নাই; কেট্‌লির জলও গরম হয় নাই; খরিদ্দার 'ত নাই-ই। দামোদরকে দেখিয়া সুরেনবাবু বলিলেন, "দামোদরবাবু? এসেছেন? আজ আর চা' নেই। আজ চা' দিতে পার্‌বো না। কয়লা নেই; চা' নেই; চিনিও নেই। পয়সা 'ত নেই ই।"

দামোদরের মন অত্যন্ত কাতর হইল। বলিল, "সুরেনবাবু, কি করি বলুন। আপনাকে সাহায্য কর্ত্তে আমার খুবই ইচ্ছা; কিন্তু আমি নিরুপায়। আমার নিজেরই অবস্থা অতি সঙ্গীন।"

সুরেনবাবু কহিলেন, "না, না, দামোদরবাবু; সাহায্য করার উপায় আর নেই। কি ক'রে করবেন? আপনি এক দিন কি এক মাসও সাহায্য করে কি কর্ব্বেন? তা'র পর? আমাকে কি চিরকাল খাওয়াতে, সাহায্য কর্ত্তে কেউ পার্‌বে? তবে? এই দেখুন হিসাবের খাতা দেখ্‌ছি। আগে কত লোক চা' খেয়ে গিয়ে দাম দেয় নি; এক একজনের কাছে ৫৲, ৭৲, ১০৲, ১৫৲, এই রকম করে প্রায় ২০০৲ টাকা পড়ে গেছে; কেউ তা'র এক পয়সা দেয় নি। কিন্তু কি কোর্‌বো? আদায় কর্ত্তে যেতে পার্‌বো না। অথচ আমার কাছে আসে পাওনাদার, আদায় কর্ত্তে ঝুলোঝুলি করে। এই 'ত হয়েছে বিপদ্। তাই খাতা খুলে মনকে প্রবোধ দিচ্ছি, যে আমিও পাওনাদার এককালে ছিলুম।"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "দোকানের কি হ'বে তা'হ'লে, সুরেনবাবু? উঠিয়ে দেবেন?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আমি উঠাবো না, ঐ আপনি উঠ্‌লো। না টিক্‌লে আর কি করা যাবে?"

দামোদর আর কোনও প্রশ্ন করিতে সাহসী হইল না। কি জানি আঘাত যদি অজ্ঞাতসারেও দেয়, তাহাতে ব্যথা ত কম বাজে না। সে তবু জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেনবাবু, অন্য কোনও ব্যবসা কর্লে হয় না? আসুন না, আমরা ভেবে দেখি!"

সুরেনবাবু ম্লানভাবে বলিলেন, "দামোদরবাবু, ঘাটের কিনারায় বসে আর কি কিছু কর্ত্তে পারি? চাকরি ছেড়ে এই দোকান খুলেছিলুম, ১৫ বৎসর এই করেছি। আর কি এখন কিছু কর্ত্তে পারি?"

দামোদর শুনিল। কিন্তু কিরূপে সাহায্য করিবে সে এই লোকটির তাহা বুঝিতে পারিল না। সে রাস্তার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সুরেনবাবু বলিতে লাগিলেন, "ঘরে স্ত্রী রুগ্না, বয়স্থা; ৪টি কন্যা; ২টির তবু বিবাহ দিয়াছি, তা'রা শ্বশুর-গৃহে। মেয়ে ৪টিও বয়স্থা। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; একটি ছোট ছেলে, তা'র এখন লেখাপড়া বাকী; একটি অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্র, সেও পড়াশুনা করিতেছে; একটি বিধবা ভগ্নী; এতগুলির আহার সংস্থান কি মুখের কথা, দামোদরবাবু?"

দামোদর বলিল, "তা বটে!"

সুরেনবাবু কহিলেন, "তা বটে নয়। আপনি ছেলে-মানুষ, জানেন না। গরীব যা'রা তা'দের অভাব যে কি ও কতমুখী তা' বুঝ্‌তে পার্ব্বেন না। বিশেষত এই ভদ্র-ঘরের গরীব যারা। তা'রা না পারে খাট্‌তে, না পারে এই সব মুটে মজুরদের মত নির্ভাবনা হো'তে। তা'দের বাঁচাই বিড়ম্বনা।"

দামোদর কহিল, "আপনি দোকান তুলবেন না, সুরেনবাবু। আমি দেখি, আমাদের মেসে বলে আপনার খদ্দের জোগাড় ক'রে দিবার চেষ্টা করি। আরও দু'একটা মেসে না হয় বলে দেব।"

সুরেনবাবু উত্তর দিলেন, "খদ্দের না হয় আপনি জোগাড় ক'রে দিলেন, দয়া করে ছেলেরা না হয় এলো, কিন্তু আমার যে একটা পয়সাও নেই। আমি চালাবো কি ক'রে?"

দামোদর ভাবিল শচীন, রমেশ ও নগেনকে বলিয়া একটা উপায় করা যাইতে পারে। দরকার হয় চারুবাবুকেও বলিবে। কিছু টাকা চাই; তাহার কাছে সাত টাকা আছে, সে না হয় তাই দিবে। জামা কাপড় দুদিন বাদেই কিন্‌বে, তার আর কি? এখন ত' নগেনের জামা কাপড়েই চল্‌ছে। সে সুরেনবাবুকে আশ্বাস দিল আগামী কাল প্রভাতেই সে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবে। আপাতত সে সাত টাকা না হয় সুরেনবাবুকে ধার দিচ্ছে। তাহাতে সব প্রয়োজনীয় কিছু কিছু ক্রয় করিয়া কাল ব্যবস্থা করেন; পরে দেখা যাইবে। তা' ছাড়া অন্য উপায় সে ত' খুঁজিয়া পায় না।

সুরেনবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখে জল আসিল। দামোদর পকেট হইতে সাতটি টাকা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "এই নিন্। আমি এখন যাই; কাল সকালে আস্‌বো।" সে আর দাঁড়াইল না।

রাস্তায় নামিয়া সে নারাণবাবুর বাড়ীর দিকে চলিল। ৫৷৷৹টা প্রায় বাজিতে চলিয়াছে; তখনও রৌদ্র মরে নাই। সে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে পশ্চিম দিকে, হ্যারিসন রোড ধরিয়াই অগ্রসর হইল। আজ নারাণবাবুর বাড়ীতে পৌছিতে তাহার বিশেষ দেরী হইল না। দিনের পরিষ্কার আলোকে সে বাড়ীখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লইল; সত্যই ইহা স্মৃতি বিশেষ; ইহাকে বাড়ী বলা চলে না। গলিটি যেমন আবর্জ্জনাপূর্ণ, তেমনি দুর্গন্ধময়। ১২।১৩ একই বাড়ীর নম্বর। ১২তে কাহারা থাকে তাহার জানিবার একটু কৌতূহল হইল। সে তাহার বন্ধ দরজার ভিতর দিয়াই যেন উহার অধিবাসীর সন্ধান করিতে চেষ্টা করিল। দু'টি বাড়ীর দরজাও একই রকমের। বড় বটে; কিন্তু অনেকটা জমির নীচে বলিয়া অত্যন্ত ছোট ও অস্বাভাবিক দেখাইতেছে। জান্‌লার পরিবর্ত্তে শুধু ছোট ছোট ঘুলঘুলি দেখিল। একেবারে সেকেলে; বাড়ীর ভিতর আলোক ও হাওয়ার প্রবেশ নিবারিত। নারাণবাবু নিশ্চয়ই কৃপণ, হাড় কৃপণ; যাহার কোনও সঙ্গতি আছে সে কি এই বাড়ীতে বাস করিতে পারে? দামোদর কখনও এই বাড়ীতে থাকিবে না; ইহার অপেক্ষা গাছতলা ভাল।

দামোদর ইতস্তত করিয়া দরজার শিকল নাড়িল। সে জানিত যে নারাণবাবুর এখন থাকার কোনও সম্ভাবনা নাই; তবু সে শিকল নাড়িল। ভাবিল, যখন ইহাই তাহার ভবিষ্যতের পীঠস্থান হইবে, তখন তাহার আর লজ্জা কি?

পাঁচ সাত মিনিট কাটিয়া গেল; কোনও উত্তর আসিল না। সে আবার আর একটু জোরে শিকল নাড়িল। এইবার ভিতর হইতে কাহার পদশব্দ শুনিল। তা'র পর দরজা খুলিয়া গেল। দামোদর দেখিল—মানদা। সে জিজ্ঞাসা করিল, "নারাণবাবু? নারাণবাবু কি আছেন? আমি সকালে আস্‌তে পারি নি বিশেষ কারণে, এবেলায় তাই এসেছি।"

মানদা তাহার স্থির আয়ত চোখে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের কোনও রূপ ভাব-পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

কিন্তু সে কোনও কথা কহিল না। দামোদর পুনরায় প্রশ্ন করিল, "নারাণবাবু কখন ফিরবেন ?" এবারও কোনও উত্তর আসিল না। দামোদরের কেমন ভয় হইল। এ কি মূক না কি ? একেবারে কথা কহিতে পারে না ? সে আরও একটু নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার—ইএ—আপনার বাবা কখন আসবেন ? আমি—" তাহার কথা শেষ করিতে সে পারিল না। সে কি আর বলিবে বুঝিতে পারিল না। এমন অসময়ে আসিয়া পড়ার জন্য সে নিজের উপর একটু বিরক্ত হইল।

মানদা এইবার কথা বলিল ; তাহার গলার স্বর তাহার চাহনির মত একঘেয়ে, সোজা, সটান ; তাহাতে কোন রকম উচ্চাবচতা, কড়িকোমল নাই। বলিল, "বাবা এখানে নেই।" একটু আশ্বস্ত হইয়া দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেছেন ?"

মানদা জানাইল, সে জানে না ; বাড়ীতে কেহ জানে না। কবে যে ফিরিবে তাহাও কেহ জানে না।

দামোদর নিরুৎসাহ হইল। একটু ভাবিয়া বলিল, "এখানে তুমি আছ, আর কে আছে ? তোমাদের একলা থাকতে ভয় করে না ? এ পাশের বাড়ীতে কে আছে ?"

মানদা তাহার জবাব না দিয়া তাহাকে ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিল। দামোদর ভিতরে যাইতে একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "ভিতরে কি কর্ত্তে আর যাবো ? তোমার বাপ নেই। আমি না হয় তিন-চার দিন পরে আবার আসবো।"

মানদা দাঁড়াইয়া রহিল। দামোদর চলিয়া যাইবার জন্য ফিরিয়া, কি ভাবিয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল যে মানদা সেইরূপই তাহার দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াই রহিয়াছে। সে পুনরায় কহিল, "তুমি যাও। আমি আজ চলি।" কিন্তু মানদা কোনও চাঞ্চল্য দেখাইল না। দামোদর আবার অগ্রসর হইল। দু'চার পা' যাইয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিল মানদা সেইরূপ দাঁড়াইয়া আছে। সে দাঁড়াইল। কি ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিল না। মানদা কি তাহাকে কিছু বলিতে চাহে ? উহার ভাবে 'ত তাহাই অনুমান হইতেছে। সে প্রত্যাবর্ত্তন করিল ; মানদার কাছে গিয়া বলিল, "আমায় কিছু বলতে চাও।"

মানদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

"তবে চল" বলিয়া দামোদর কম্পিত হৃদয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মানদার পিছনে পিছনে চলিল।

মানদা তাহাকে পথ দেখাইয়া সেই গত রাত্রের উঠান পার হইয়া এক কোণে এক সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। দামোদরের একবার মনে হইল, উপরে উঠা কি ঠিক হইবে ? মানদা তাহাকে উপরে কোথায় লইয়া যাইবে ? সে ভাবিল, মানদাও নিশ্চয়ই নারাণবাবুর ও তাহার কথোপকথন শুনিয়াছে ; তাই সে দামোদরকে দেখিয়া কোনও সঙ্কোচ করিতেছে না। তাহার সহিত ত' অদূর ভবিষ্যতেই একটা প্রীতির বন্ধন হইবে ; তখন আর কি ? দামোদর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিল। দ্বিতল বলিতে যাহা তাহা দেখিয়া দামোদর স্তম্ভিত হইল, ইহাকে গুদাম বলিলেও হয়। ঘর কোথায় সে খুঁজিয়া পাইল না। যেন এক দিকে একটা প্রকাণ্ড গুদাম, অন্য দিকে একটা ছোট গুদাম-ঘর—আর সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই একটু ছাত—তাহাতে পাঁচ সাতজন লোক দাঁড়াইতে পারে। মানদা দামোদরকে সঙ্গে করিয়া সেই বড় গুদামের ভিতর দিয়া ছোট গুদামের দিকে অগ্রসর হইল। দামোদর তাহার সহিত দু'একটা কথা কহিতে পারিলে হয় 'ত অতটা অশ্বস্তি অনুভব করিত না। কিন্তু মানদার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না। সে সেই ছোট গুদামের ভেজান দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া, তাহার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইল। দামোদর নিকটে আসিতে, সে তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিয়া ভিতরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

দামোদর দরজায় দাঁড়াইয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিল, ভয়ানক অন্ধকার ; কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। একে এই আলোকবিহীন কক্ষ ; তাহার উপর সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সে ভিতরে প্রবেশ করিতে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কেমন একটা অদৃশ্য ভয়ের স্পর্শে ও অনুভূতিতে কণ্টকিত হইল। সে অগ্রসর হইতে পারিল না। অস্ফুটস্বরে ডাকিল, "মানদা !"

কোনও উত্তর আসিল না। তাহার পরিবর্ত্তে ঘরের যেন সুদূর কোণ হইতে একটা অব্যক্তব্য গোঁয়ানি, কাতরানির শব্দ অস্বাভাবিক হইয়া তাহার কাণে

আসিল। দামোদরের চুল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল। সে আবার কোনও রকমে গলা হইতে বাহির করিল, "মানদা!"

আবার গোঁয়ানির শব্দ,—ভাঙ্গা, ভারী, ছিন্ন শব্দ—সে শুনিতে পাইল। শব্দ যেন দামোদরকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল; সে পড়িতে পড়িতে কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইল। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, জনপ্রাণীও নাই। পার্শ্বের বাড়ীতে 'ত কাহারও অস্তিত্বের লক্ষণ নাই! এ সব কি কাণ্ড! ঘর হইতে গোঁয়ানির সেই শব্দ রহিয়া রহিয়া, বিচ্ছিন্ন প্রবাহে, বিভীষিকার খণ্ডিত অনুভূতির মত, তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল। দামোদর আর দাঁড়াইল না। সে দ্রুতপদে সিঁড়ি অবতরণ করিয়া, উঠান পার হইয়া, একেবারে একদমে সদর রাস্তায় গিয়া পড়িল। ভয়ে তাহার গলার ভিতর পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়াছিল; সে অত্যন্ত পিপাসা অনুভব করিল। নিকটে একজন পাণওয়ালার দোকানে দুই পয়সা দিয়া এক ভাঁড় সরবৎ খাইয়া তবে যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইল; রাস্তার আলোক, মানুষ, হাওয়ায় তাহার মন ক্রমশঃ সুস্থির হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা আসিবেই"

ভয়ে, উত্তেজনায়, পরিশ্রান্তিতে অবসন্ন দেহ মনে দামোদর মেসে ফিরিল। তখন সকলেরই প্রায় আহারাদি সমাপ্ত হইয়াছে। নিধি তাহাকে দেখিয়া বলিল, "বাবু, এত রাত্রে এলেন? ৯টা থেকে ১০টার ভিতর সব খাওয়া চুকে যায়! আমরা ভাব্‌লুম আপনি বাহিরে খেয়ে আস্‌ছেন। চারুবাবু আপনাকে কত খুঁজ্‌ছিলেন!"

দামোদর কহিল, "নিধি, আমি আজ আর খাব না। খেয়েই এসেছি। চারুবাবু কেন খুঁজ্‌ছিলেন? কোথায় তিনি?"

নিধি জানাইল চারুবাবু শুইয়া পড়িয়াছেন। কে একজন লোক দামোদরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল; বোধ হয় সেই জন্যই।

দামোদর বুঝিতে পারিল না, কে। তাহার সন্ধানে কে আসিবে? সুরেনবাবু বোধ হয়। সে ভাবিতে ভাবিতে উপরে উঠিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, নগেন ও শচীন দু'জনে দু'খানা চেয়ারে গম্ভীর ও নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া আছে। রমেশ নাই। দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশবাবু কোথায়? তাঁ'কে দেখ্‌ছি না।"

নগেন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিয়া আবার মুখ ফিরাইল। শচীনও তাহাকে দেখিয়া লইল। কেহ কথা কহিল না।

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, শচীনবাবু? আমাকে বলুন। রমেশবাবু কোথায়?"

শচান নগেনের দিকে চাহিল। নগেনও শচীনের দিকে চাহিল। তা'র পর নগেন উঠিয়া তাহার বিছানায় বসিল; হাতের কাছের আয়না লইয়া তাহাতে মুখভঙ্গী করিয়া, তাহার ছাঁটা গোঁফ নাড়িয়া দেখিয়া লইল। তা'র পর চুলের ভিতর হাত দিয়া চুলগুলিকে অবিন্যস্ত করিতে করিতে বলিল, "দামোদরবাবু, আপনার শ্বশুর নিতাই ঘোষ এসেছিল। শালা রমাই ঘোষ এসেছিল। আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে বোধ হয়।"

দামোদরের মুখ শুকাইল। সে প্রশ্নপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া রহিল।

শচীন বলিল, "এসেছিল। এসে এই ঘরে এই দুই চেয়ারে বসে ছিল।"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "কখন?"

নগেন বলিল, "তা' কি জানি? আমরা সন্ধ্যেবেলায় বেড়াতে গিছ্‌লুম। রমেশ কেবল যায় নি; বেড়িয়ে এসে দেখ্‌লুম,—তখন ৮॥০টা ৯টা হবে, দু'জনে এখানে বসে। রমেশ একেবারে অন্তর্হিত। সম্ভব আপনার শ্বশুরের ভয়েই।"

দামোদর প্রশ্ন করিল, "তা'র পর?"

শচীন বলিল, "আমরা পরিচয় নিলুম। শ্বশুরমশায় বল্লেন, চারুবাবু এখানে তাঁ'কে বস্‌তে বলে দিয়েছেন। তাই তিনি বসে আছেন। নগেন তাঁহাকে বলিল, বেশ্, তবে বসে থাকুন্। আমরা যাই। তা'তে আপনার শ্বশুর নিতাই ঘোষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। হাঁ, শ্বশুর বটে। দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়। আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'য়েছে।"

নগেন বলিল, "দেখ, শচী, তুই সব কথার মাঝে কথা

বলিস্ নি।" সে আয়না রাখিয়া দিল। তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ভয় নেই, দামোদর বাবু, সে নিতাই ঘোষ আর আস্‌বে না। তা'কে যে ঠিকানা দিয়েছি, এখন তা'ই খুঁজে বার করুক।"

শচীন কহিল, "নগেন, সবটা বল দামোদর বাবুকে।"

নগেন বলিল, "জানেন, দামোদর বাবু, নিতাই ঘোষ আমাকে কি না বলে, দামোদরকে এখানে রেখেছ? আমি জবাব দিই, রেখেছিলুম; কিন্তু রাখ্‌তে পার্‌লুম না। তোমার ভয়ে সে দেশান্তরী হয়েছে। আজ বেলা তিনটার গাড়িতে সে পেশোয়ার গেছে। তা'কে রাখ্‌তে পার্‌লুম না। নিতাই ঘোষ পেশোয়ারের নাম বাপের জন্মে শোনে নি। জিজ্ঞাসা কর্লে সে দেশ কোথায়? আমি তা'কে টাইমটেবল দেখালুম—টাইমটেবলের ছবি; কোথায় পেশোয়ার সে দেখে নিলে। তা'র পর কট্‌মট্‌ করে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্লে, সত্যি গেছে? আমি চটে গেলুম। বল্লুম, গিয়েছে ত' দেখেছি; ট্রেণেও উঠেছে; তা'র কি আর আস্‌বার যো' রেখেছ তুমি? নিতাই ঘোষ তদীয় পুত্রর দিকে চাহিয়া দু'জনে কি কথা কহিল; তা'র পর উঠিয়া বলিল, আচ্ছা; আমি ষ্টেশনে খোঁজ কোর্‌ছি। আমি বল্লুম, এখনি। হাওড়া ষ্টেশনে নিতাই ঘোষ খোঁজ কর্চ্চে? করুক্। সে এখন ষ্টেশনে গেছে।"

দামোদর ম্লান মুখে কহিল, "সে আবার আস্‌বে, নগেনবাবু। আজ রাত্রে না আসে 'ত কাল সকালে নিশ্চয়ই আস্‌বে। তাই 'ত কি করা যায়?"

শচীন উত্তর করিল, "কিছু ভাব্‌বেন না। সে কাল ঠিক করে তা'কে আর একটা কোথাও পাঠালেই হ'বে। রমেশটা যে ফেরার; সে থাক্‌লে এমন ঠিকানায় পাঠাতো নিতাই ঘোষকে যে ফির্‌তে হোত না। এ কি নগেনের কাজ?"

এমন সময় সিঁড়িতে জুতার আওয়াজ হইল। কাহারা উপরে উঠিতেছে; নগেন বলিল, "শচী দেখ্ ত!"

শচী দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া কহিল, "শ্বশুরমশাই।"

দামোদর ভয়ে বিমূঢ় হইল। নগেন বলিল, "দামোদর বাবু, আমার তক্তপোষের নীচে শিগ্‌গির! শীগ্‌গির!"

শচীন দামোদর'ক টানিয়া নগেনের তক্তপোষের নীচে ঠেলিয়া বেশ করিয়া ঢুকাইয়া দিল। নগেন বিছানায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া একটা সিগারেট ধরাইল; শচীনকে বলিল, "তুই গলা ছেড়ে গান ধর্—আর এই তক্তপোষ বাজা। জোরে বাজাবি। আমি এই বইখানা বাজাই।"

শচীন গান ধরিল, "বি-ই-র হ আগুনে পু-উ ড়ে—"

তাহার গান এইখানে পৌঁছিতেই, নিতাই ঘোষ ও তাহার পশ্চাতে রমাই ঘোষ প্রবেশ করিল। নগেন ও শচীন কেহই কথা কহিল না—গান ও বাজ্‌নাতেই প্রমত্ত রহিল।

"—পু-উ-ড়ে দেহ হোল সারা-আ—"
বি-ই-রহ-আগু-নে!—"

নিতাই ঘোষ বলিল, "দামোদর এসেছে?"

নগেন একমুখ ধুঁয়া ছাড়িয়া কাসিতে কাসিতে বলিল, "কে? ও আপনি আবার? কি হো'ল? হাওড়াতে খোঁজ পেলেন? নিশ্চয়ই খোঁজ কর্ত্তে পারেন নি। সে কি আপনার কাজ? দেখে শুনে ভড়্‌কে গেছেন বুঝি?" নগেন হাসিয়া উঠিল।

শচীনও হাসিল, "ভড়্‌কে গেছেন? তা' যাবেন বৈ' কি! হাওড়া ষ্টেশন কি আর আপনাদের দেশের ষ্টেশন! লাইফে দেখেন নি এমন, না? বিলকুল্ ভড়্‌কে গেছেন।"

নিতাই ঘোষ জিজ্ঞাসা করিল, "দামোদর এসেছে? নীচে যে বেহারা বল্লে, এসেছে।"

নগেন উত্তর দিল, "আপনাকে প্রণাম, শ্বশুর মশাই! সরে পড়ুন, দামোদর নেই। আমাকে দিয়ে কাজ হয় 'ত বলুন। আমি প্রস্তুত আছি।"

শচীন বলিল, "আমিও প্রস্তুত। নাই বা দামোদর গেল? ভারী এক দামোদর ধরে বসে আছেন। আমার চেহারাটা দেখুন ত'? জামাই যদি কর্ত্তে হয়, তবে এমনি। এ জোর করে বল্‌তে পারি।"

নিতাই ঘোষ জিজ্ঞাসা করিল, "সে আসে নি?"

নগেন উত্তর করিল, "বেহারাতে ঠাট্টা করে' আপনাকে বলেছে, শ্বশুরমশাই। বেটা সম্পর্ক বুঝে না, উড়ে কি না। দামোদর এতক্ষণ পেশোয়ার! ফেরার! তা'র সঙ্গে আমাদের আর একটি বন্ধুও ফেরার! তা'র শ্বশুরবাড়ী কাবুল। দু'জনেই ফেরার। আপনি বৃথা কষ্ট কর্ব্বেন

না—বাড়ী যান্। আর আমাদের দু'জনের কা'কেও দিয়ে যদি কাজ চলে, তবে বান্দা প্রস্তুত।"

রমাই নিতাই ঘোষকে অস্ফুটস্বরে কি বলিল। নিতাই ঘোষ বাহির হইয়া গেল। শচীন উঠিয়া দেখিল, দু'জনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচে গিয়া নিধিকে কি জিজ্ঞাসা করিল; তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

নগেন বলিল, "শচীন, নিধেকে ডাক 'ত।"

শচীন নিধিকে ডাকিল। নিধি উপরে আসিতে নগেন বলিল, "এই নিধে; তুই কি চিরকাল বোকা থাক্‌বি? মর্‌বি কি শেষে ঐরকম হাঁদারাম হয়ে? তো'র শ্রাদ্ধও হবে না, বেটা। ঐ দুটো লোক, কি অন্য কেউই দামোদর বাবুর খোঁজে এলেই বল্‌বি, দামোদরবাবু পেশোয়ার গেছে। বুঝ্‌লি? এখন তো'কে কি জিজ্ঞাসা ক'রে গেল?"

নিধি মাথা চুলকাইয়া বলিল, "দামোদর বাবু এসেছে কি না? আমি ঠিক জানি কি না? নিজে দেখেছি কি না? কোন ঘরে তিনি ঢুকেছেন? এই সব।"

শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি জবাব দিলি?"

নিধি বলিল অজ্ঞতাবশতঃ সে সব সত্য কথাই বলিয়াছে। সে সেজন্য অনুতপ্ত।

নগেন রাগিয়া বলিল, "হাঁদারাম! নিধি ত' নিধি! খবরদার! এবার এলে বল্‌বি, যে জানিস্ না। বাবুদের খবর তুই জান্‌বি কি ক'রে? কাউকে দামোদরবাবুর নাম করে উপরে উঠতে দিবি না। আমাদের ঘরে তালা দিয়ে রাখবি! বুঝেছিস্?"

নিধি সম্মতি জানাইয়া প্রস্থান করিল।

শচীন দামোদরকে ডাকিল। দামোদর বাহিরে আসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। মাথায় ধূলা ও চুণ লাগিয়া মাথাটা অদ্ভুত হইয়াছে; কাপড়ের খানিকটা হাঁটুর কাছে ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

নগেন বলিল, "আপাতত শত্রুপক্ষ রণে ভঙ্গ দিয়াছে, দামোদরবাবু। আপনি নির্ভয় হউন। ভবিষ্যতে পুনরাক্রমণে পুনরায় ব্যবস্থা হইবে। আপাতত বোধ হয় ফাঁড়া কাট্‌লো।"

শচীন হাসিতে লাগিল। দামোদরও হাসিল; বলিল, "যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে কি হবেই?"

নগেন উত্তর দিল, "তা হবে। দামোদরবাবু, এখন কি করণীয়। শুয়েই পড়া যাক্। কি বলেন? রমেশটা আজ এলো না। সে থেকে থেকে এমন কোথায় গায়েব হয়, কে জানে! ভাল সব জ্বালা, বাবু, আমার! শচী! তুই কিছু তা'র খোঁজ জানিস্? সে কোথা যায় জানিস্?"

শচী নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িয়া উত্তর করিল, "না।"

নগেন মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "না! কি জান? তো'র বাপ্ তো'কে ত্যাজ্যপুত্র আর আমাকে পোষ্যপুত্র কোর্‌ত, 'ত ঠিক্ হো'ত, না, দামোদরবাবু?"

দামোদরও নিজের নির্দ্দিষ্ট বিছানায় শুইয়া বলিল, "তা' যখন হয় নি, তখন আর কি করা যাবে, নগেনবাবু।" শচীন হাসিয়া বলিল, 'বাবাকে লিখে দেখ্ না। তোর যে রূপ—নিতেও পারে।"

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "শচী, এ মাসে কত টাকা নিয়েছিস্?"

শচী মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল "১২৫্।"

"কত হাতে আছে?"

শচী উত্তর দিল, "তা আছে ১০।১২ টাকা। কেন?"

নগেন বলিল, "জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। এখনও মাস কাবারের ১০।১২ দিন দেরী। রোজ ১্ টাকা পড়্‌লো, তা'হলে, না? ক'দিন তা'হলে হাত টেনে খরচ কর্ত্তে হবে বল?" শচী জিজ্ঞাসা করিল, "তো'র কাছে কিছু নেই?"

নগেন কহিল, "কাছে বিশেষ নেই। ১৫্ টাকা ছিল, আজ বেরুবার সময় রমেশকে দিয়েছি। এ মাসে আর মাহিনা দেওয়া হবে না। তুই মাহিনা দিয়েছিস্? আমি আর দেব না। অনেক ঠকিয়েছে।"

শচীন বলিল, "না।" তা'র পর দামোদরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "দামোদরবাবু, আপনার তহবিল আছে? exchequer?"

দামোদর উত্তর করিল, সাত টাকা সাড়ে ছ'আনা। উপস্থিত ।৶০ আনা আছে। সাত টাকা একজনকে ধার দিয়াছে: ८১০ পয়সার সরবত খাইয়াছে।

নগেন বলিল, "কা'কে ধার দিলেন? এর ভিতর তেজারতি কোথায় সুরু কর্লেন?"

দামোদর সুরেনবাবুর কথা নগেন ও শচীনকে বিবৃত করিয়া শুনাইল।

শচীন বলিল, "বটে! বল্‌তে হয় এতদিন! নগেন, কা'ল থেকে সব ছেলে ধরে সেই দোকানে চা' খেতে যেতে হবে।"

নগেন জবাব দিল, "দামোদরবাবু, কাল আমাকে সকালে দোকানটা দেখিয়ে দেবেন ত'। জোচ্চর নয় ত'? কল্‌কাতায়, বাবা, বিশ্বাস হয় না। কি জানি বেটা ফাঁকি দিয়ে সাত টাকা গাফ্‌ কর্লে কি না। কাল হয় ত' গিয়ে দেখ্‌ব সব লোপাট্‌; কাকস্য পরিবেদনা।"

দামোদর জানাইল সে সুরেনবাবুকে বহুদিন হইতেই জানে। শুনিয়া নগেন বলিল, "সে কালই বোঝা যাবে।" বাতি নিভাইয়া তিনজনে চুপ করিয়া কিছুকাল শুইয়া রহিল; কিন্তু কেহই ঘুমাইল না। শেষে নগেন উঠিয়া পড়িল; বলিল, "বড় গরম, শচী! ঘুম আসছে না। শ্বশুরমশাই মেজাজ বিগ্‌ড়ে দিয়ে গেছেন। কি চাহনি, কি ভাষার তেজ, কি delivery!"

শচী চোখ বুজিয়াই বলিল, "রমেশ গেল কোথা?"

দামোদর চুপ করিয়া ভাবিতেছিল, সে কি করিবে? এদিকে নিতাই ঘোষ উদিত হইয়াছে, ওদিকে নারাণবাবু অস্তমিতপ্রায়; সে যে কোথায় তাহার কোনও সন্ধান নাই। তা'ছাড়া নারাণবাবুর বাড়ীর কথা মনে হইতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল।

নগেন বলিল, "দামোদরবাবু! ঘুমুলেন না কি? না, শুয়ে শুয়ে নিজের স্ত্রীর কথা ভাব্‌ছেন? ফিরেই যাবেন না কি? দেখুন, তা'হলে নিতাই ঘোষের খোঁজ করি। স্ত্রীর জন্যে কি খুব বেশী মন কেমন কোর্‌ছে?"

শচীন বলিল, "তুই কি ক'রে বুঝ্‌বি? ও রসে বঞ্চিত মধু। নগেন, এইবার একটা বিয়ে কর্‌। দেখ, বলিস্‌ ত' কাল থেকেই কনে দেখ্‌তে লেগে যাই।"

নগেন উত্তর দিল, "ব্যস্ত হোস্‌ নি। আমার বিয়ে অমন ঘটকালি ক'রে দিতে পার্‌বি না। আমার মতন পাত্র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার পক্ষেও অবাঞ্ছনীয়। কেন না, আমার অবস্থা দেবাদিদেব মহাদেবেরই সামিল। শেষে দক্ষযজ্ঞ বাধাবি ঘটকালি কর্ত্তে গিয়ে!"

শচীন মন্তব্য করিল, "নিতাই ঘোষের মতন শ্বশুর হলে, তবে তুই জব্দ হবি!"

নগেন সে কথায় সায় না দিয়া আপন মনে বলিল, "তাই ত' রমেশটা গেল কোথায়?" তা'র পর অন্ধকারেই একটা সিগারেট ধরাইল। দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "নগেনবাবু? আপনার সন্ধানে অন্য মেস আছে?"

নগেন বলিল, "কেন?"

"তা' হলে সেইখানেই না হয় দিনকতক থাক্‌তুম্‌।"

নগেন উত্তর দিল, "এখানে ভয় কিসের? আমরা থাক্‌তে কোন ভয় নেই। কিন্তু স্ত্রীকে ফেলে আসা আপনার উচিত হয় নি, দামোদরবাবু! তা'কে নিয়ে এলে আরও রোমান্টিক হোতো।"

দামোদর কহিল, "যে স্ত্রীর হৃদয়ে ভালবাসা নেই, সে স্ত্রী নিয়ে কি ঘর করা যায়?"

নগেন উত্তর দিল, "স্ত্রী আবার ভালবাস্‌বে কি? রাঁধবে, বাড়বে, খাওয়াবে, সেবা কর্ব্বে, ছেলে মানুষ কর্ব্বে। তা'র ভালবাসার ফুরসৎ কোথায়? ও-সব আপনার অন্যায় বাগানা। কোন স্ত্রী ভালবাস্‌তে পারে না।"

শচীন বলিল, "তুই শো। বেশী বকিস্‌ নি রাত্রিবেলায়। তো'র ঘুম নেই বলে কি কা'কেও ঘুমুতে দিবি না?"

নগেন সিগারেট নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

প্রভাত না হইতে হইতেই নিতাই ঘোষ পুনরায় আসিয়া মেসে উপস্থিত হইল। এবার সে চারুবাবুর সহিত দেখা করিতে চাহিল। চারুবাবু ৮টার আগে কোনও দিনই শয্যাত্যাগ করিতেন না। কিন্তু নিতাই ঘোষ ডাকাডাকি করিয়া তাঁহাকে তুলিল। চারুবাবু নিতান্ত বিরক্ত চিত্তে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই?"

নিতাই ঘোষ বলিল, "দামোদরকে চাই,—দামোদরকে। আপনি একটু দেখে খোঁজ ক'রে তা'কে ডেকে দিন। আমি চাষাভুষা মানুষ, আপনি ডেকে দিন। আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ছোক্‌রারা সব ঠাট্টা কর্‌ছে।"

চারুবাবু তাহাকে বসিতে বলিয়া উপরে ত্রিতলে নগেনদের ঘরের দরজায় গিয়া ধাক্কা দিয়া ডাকিলেন, "নগেন, শচীন, রমেশ!"—ভিতরে সকলেই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল। চারুবাবু ধাক্কা দিয়া আবার আরও উচ্চ স্বরে ডাকিলেন। নগেনের ঘুম ভাঙ্গিল। সে আসিয়া দরজা খুলিয়া বলিল, "কি? এত সকালে ডাকাত পড়া কেন?"

চারুবাবু বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "ভাল জ্বালা দেখ না। দামোদরের শ্বশুর এসে কাল থেকে পাগল ক'রে তুলেছে।

এই ভোরে এসে ঘ্যান্ ঘ্যান্ সুরু করেছে। সে কোথায়? এখানেই ত' আছে? কি বিপদেই পড়া গেল! একবার গিয়ে দেখাই করুক্ না ছাই।"

নগেন উত্তর দিল, "চলুন, আমি তাকে ভাগিয়ে দিয়ে আস্‌ছি।"

চারুবাবু বলিলেন, "সে থাকে ত' যাক্ বাবু। এ প্রাণ ওষ্ঠাগত ক'রে তুলেছে। নড়তে চায় না। আরে, বাবু, পালাবে না ত' কি কর্ব্বে? সখ্ করে কে সংসার ক'রে? আমরা পালাই নি? সবাই পালায়, উপায় থাকলে। তা'র জন্যে এত ধর্‌পাকড়্ কিসের? চুরি করেছে না ডাকাতি ক'রেছে? ওয়ারেন্টের আসামী?"

নগেন বাহিরে আসিয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া বলিল, "চলুন, তা'কে দেখ্‌ছি। বড় বেহায়া লোক ত'।"

চারুবাবুর সহিত সে নীচে আসিয়া নিতাই ঘোষকে বলিল, "কি, ফের্ এসেছেন? দামোদরকে না হ'লে চল্‌বেই না?"

নিতাই ঘোষ উত্তর দিল, "আমি চাষাভুষা মানুষ! সে কোথায়? এখানে আছে। আপনারা রেখেছেন। তা'কে আমি নিয়ে যাবো।"

নগেন বলিল, "সে যাবে না। সে আবার বিয়ে কর্ব্বে! সব ঠিক ঠাক হয়েছে। আমরাই বিয়ে দেব। চাষার মেয়ে আর নয়!"

নিতাই ঘোষ তাহার দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিল। তা'র পর উঠিয়া দাঁড়াইল; আবার বসিল। আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চেয়ারের একটা হাতল ধরিয়া ঝুঁকিয়া বলিল, "আবার বিয়ে কোর্‌বে?"

নগেন উত্তর দিল, "হাঁ। কর্ব্বে না ত' কি? কে আট্‌কাবে?"

নিতাই ঘোষ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "সে কোথায়?"

নগেন বলিল, "সে কাল রাত্রে এসে, তখনি চলে গেছে। তুমি এসেছ শুনে আর দাঁড়ায় নি। ভয়ে পালিয়েছে।"

নিতাই ঘোষ চারুবাবুর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "সে কোথায়?"

চারুবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ভাল জ্বালা। কালা না কি? সে নেই—নেই! শুন্‌তে পেয়েছ? সে নেই।"

নিতাই ঘোষ হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। নগেন চারুবাবুর মুখের দিকে চাহিল, চারুবাবু নগেনের দিকে হতাশভাবে চাহিলেন। রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া নগেন বলিয়া উঠিল, "রমেশ! এই নিতাই ঘোষ! এমন নাছোড়বান্দা দেখি নি। কিছুতেই উঠ্‌বে না। বলছি দামোদর এখানে নেই, তবু উঠ্‌বে না, কি না-ছোড়্‌-বন্দ্ লোক, বাবা!"

রমেশ আসিয়া নিতাই ঘোষকে দেখিল। ক্রমে একে একে মেসের সব ছেলে উঠিল; সবাই আসিয়া নিতাই ঘোষকে দেখিল। নিতাই ঘোষ চুপ করিয়া চারুবাবুর ঘরে বসিয়া রহিল। চারুবাবু প্রমাদ গণিলেন। নরেন, মোহিনী, সতীশ, প্রভৃতি সকলে আসিল। সকলেই বলিতে লাগিল, "ঐ নিতাই ঘোষ!" "ঐ নিতাই ঘোষ!"

চারুবাবু নরেন ও রমেশের সহিত পরামর্শ করিলেন, কি করা যায়। চারুবাবু বলিলেন, "দামোদরকে ডেকে দাও। তা'কে না নিয়ে ও উঠ্‌বে না। দেখ্‌ছো না কি না-ছোড়্‌বন্দা; একগুঁয়ে। ও জমি নিয়ে বসেছে।"

নরেন বলিল, "তাই 'ত। ওকে তাড়াতে গেলেও একটা হাঙ্গাম হবে!"

রমেশ কিছুই কহিল না। সে উপরে উঠিয়া গিয়া দামোদরকে ডাকিয়া সব কথা শুনাইল। দামোদর বিমূঢ় হইল। আবার নিতাই ঘোষের সহিত ফিরিতে তাহার কোনরকমে প্রবৃত্তি হইল না। অথচ মেস্‌শুদ্ধ সবাই বিব্রত হইয়াছে; একটা কিছু করা চাই। শচীনও উঠিয়া সব শুনিল। বলিল, "দামোদরবাবু, আপনার অন্য কোথাও গিয়ে থাক্‌বার উপায় নেই?"

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল 'না'। তাহার অনুতাপ হইল কেন সে সোজা সন্ন্যাস লইয়া একেবারে অজ্ঞাতবাস করে নাই! কিন্তু সে ক্রমে মরিয়া হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া জামাজুতা পরিল; রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবেন?"

দামোদর উত্তর দিল, "যে দিকে হয়।"

রমেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনি আপাতত

কোথাও ঘণ্টা পাঁচ-ছয় গিয়ে অপেক্ষা করুন। পরে ভেবে ব্যবস্থা করা যাবে।"

শচীন পরামর্শ দিল, "সুরেনবাবুর চা-এর দোকানে না হয় যান্। সোজা ছুটে পালিয়ে যান্।"

রমেশ বলিল, "তাই যান্। আমরা পরে যাবো। সেইখানেই অপেক্ষা করবেন।"

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল 'আচ্ছা'। তা'র পর সে দ্বিতলে নামিয়া চারুবাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। চারুবাবু নিতাই ঘোষকে বলিলেন, "ঐ দামোদর।"

নিতাই ঘোষ তাহাকে দেখিয়া এক লাফে উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিতে গেল। দামোদর সরিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিল, "আমি যাবো না। আপনার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছি।" তা'র পর সে মুহূর্ত্ত কালও আর সেই স্থানে দাঁড়াইল না; ছুটিয়া, সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিল, ও সদর দরজা দিয়া নির্গত হইয়া গেল। নিতাই ঘোষও দ্রুতপদে তাহার অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিল, কিন্তু রাস্তার ভিড়ে তাহাকে দেখিতে পাইল না। আপন মনেই একবার কি ভাবিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দ্রুতপদে শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে চলিল। ষ্টেশনে রমাই তাহার অপেক্ষা করিতেছিল। নিতাই ঘোষ তাহাকে গিয়া বলিল, "তুই বাড়ী যা'। আমি তা'কে দেখেছি, সে যাবে না বলেছে। দেখ্‌বো যায় কি না। একবার পেলে হয়—হাতে পেলে হয়। আমি এখন থাক্‌বো। তা'কে নিয়ে যাবো। আমাকে ভাঁড়ানো! নিতাই ঘোষকে ভাঁড়ানো! তুই যা'! এই গাড়িতে চলে যা'। আমি পরে জানাবো সব।"

রমাই বিস্মিত হইয়া কহিল, "এল না?"

নিতাই ঘোষ আপন মনেই যেন বলিল, "আমি তা'কে নিয়ে যাবো। দেখি সে কোথায় যায়?" তা'র পর রমাইকে পাঁচটি টাকা দিয়া টিকিট করিয়া চলিয়া যাইতে বলিয়া নিজে আপনার বাস-স্থানে চলিয়া গেল। সেও শিয়ালদহের কাছে এক হোটেলে উঠিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও ব্যায়াম

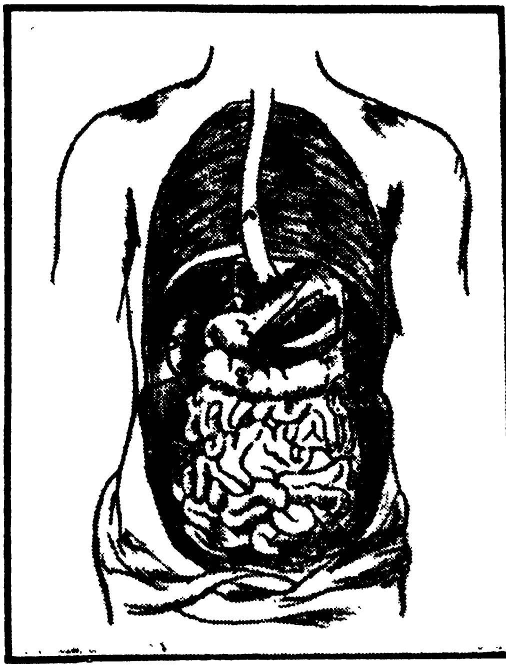
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

মানুষ চায় বাঁচিয়া থাকিতে এবং বাঁচিয়া থাকিতে হইলে চাই স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যহীন মানব জীবনে সুখ, স্বচ্ছন্দতা, আনন্দ কিছুই উপভোগ করিতে পারে না। যে রুগ্ন, যে স্বাস্থ্যহীন, সে নিজে তাহার ইচ্ছামত কিছুই করিতে পারে না; বরং অপরকে তাহার জন্য নিযুক্ত থাকিতে হয়। এই সকল কারণে মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য শরীরের যত্ন করা ও স্বাস্থ্যবান্ হওয়া। ইহার জন্য সে নিজের কাছে,—শুধু নিজের কাছে নয়, তাহার সংসারের নিকট, তাহার প্রতিবেশীর নিকট, দেশের নিকট, এমন কি সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটও দায়ী। অনেকের ধারণা, রোগ আপন হইতে আসে, তাহাকে রোধ করা যায় না। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। শরীরের উপর অযত্ন হইলে রোগ আপনিই আসিবে। সেইজন্য শরীরে যাহাতে রোগ প্রবেশ করিতে না পারে তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্ত্তমানে ইয়োরোপের সহিত আমাদের দেশের মানুষের আয়ুর তুলনা করিতে গেলে দেখিতে পাই যে, আমাদের অপেক্ষা ইয়োরোপীয়গণ অধিক দীর্ঘায়ু। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, উহারা স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখে। তাহারা শুধু নিজেরা নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে তাহা নয়, দেশের মানুষ যাহাতে স্বাস্থ্যবান্ হয় তাহার দিকে শাসনকর্ত্তারাও লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হয়। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" শাস্ত্রবাক্য। শরীর রক্ষা করা মানবের আদি ধর্ম্ম।

এখন মনে হইতে পারে—রোগ হয় কেন? উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে, কিম্বা কুখাদ্য ভক্ষণে বা শরীরে কোন বিষ প্রবেশ করিলে—যে কোনও কারণে আমাদের শরীর অসুস্থ হইতে পারে। শরীরের উপর অযথা অন্যায়ভাবে অত্যাচার করিলেও রোগ জন্মিতে পারে। কোনও রোগের বীজও

শরীরে প্রবেশ করিলে তাহাতে রোগ হয়। কোনও রোগের একটীমাত্র বীজ শরীরে প্রবেশ করিলে দশ ঘণ্টার মধ্যে দশ লক্ষ বীজ শরীরে জন্মগ্রহণ করে ও এইরূপে বৃদ্ধি পাইয়া শরীরকে অসুস্থ করে। আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই সকল বীজ যেন কোন প্রকারে আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে।

শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলিকে ঠিক ভাবে চালাইলে ও যত্ন করিলে শরীর সুস্থ থাকে। যেমন, কোন ইঞ্জিনকে ভারী গাড়ী টানিতে হইলে তাহাকে উপযুক্ত কয়লা, জল দিতে হয়, যে সকল অংশ কাজ করে তাহাদের তৈল দিতে



১। গলনালী ২। পাকস্থলী ৩। যকৃৎ
৪। বৃহৎ অন্ত্র ৫। ক্ষুদ্র অন্ত্র

হয়, ছাই বাহির করিয়া ফেলিতে হয় ও ইঞ্জিনটি পরিষ্কার রাখিতে হয়, এই সকল না করিলে ইঞ্জিনটি খারাপ হইয়া যায়. তেমনি মানুষের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে শরীরকে উপযুক্ত আহার ও পানীয় দেওয়া ও তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

যেমন ইঞ্জিন্-চালকের ইঞ্জিনের সমস্ত অংশগুলি ভাল করিয়া জানিতে ও যত্ন করিতে হয়, নতুবা ইঞ্জিন খারাপ হইয়া যায়, সেইরূপ সকল মানুষের, তাহার শরীরের কি ভাবে যত্ন করা উচিত, তাহা জানা দরকার। শরীরকে অযত্ন করিলেই শরীর রোগগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে, চাই উপযুক্ত আহার, পানীয়, মুক্ত বাতাস, রৌদ্র। শরীরের ময়লা যাহাতে নিয়মিতভাবে পরিষ্কৃত হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোনও রোগের বীজ যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এবং সকলের চেয়ে বেশী দরকার—প্রত্যহ উপযুক্ত ব্যায়াম ও বিরাম। সাধারণতঃ এই কয়টী নিয়ম পালন করিলেই শরীরকে সুস্থ রাখিতে পারা যায়।

এবার মানুষের দেহের বিষয় কিছু বলিব। এই দেহটাকে মোটামুটি আমরা তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম



১। গলনালী ২। যকৃৎ ৩। পাকস্থলী ৪। পিত্তকোষ
৫। বৃহৎ অন্ত্র ৬। ক্ষুদ্র অন্ত্র

—মাথা (head), দ্বিতীয়—ধড় (trunk), তৃতীয়—হাত ও পা (limbs)। ধড়ের ভিতরে একটি বড় গর্ত্ত (cavity) আছে। এই গর্ত্তটি আবার একটী সরু প্রাচীরের দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত, এই সরু প্রাচীরটিকে diaphragm বলে। গর্ত্তের উপর অংশকে বুক (thoracic cavity) ও নিম্ন অংশটিকে পেট (abdominal cavity) বলে। আবার এই উপর অংশের সামনের দিকে হৃৎপিণ্ড (heart) ও ফুস্‌ফুস্ (lungs) আছে। এবং ইহাদের

পিছন দিকে শ্বাসনালী (trachea or wind pipe) এবং গলনালী (gullet or oesophagus) অবস্থান করিতেছে। পেটের মধ্যে যকৃৎ (liver), পাকস্থলী (stomach), প্লীহা (spleen), pancreas, বৃহৎ অন্ত্র ও ক্ষুদ্র অন্ত্র (large and small intestines) অবস্থান করিতেছে। কিন্তু মূত্রাশয় (kidneys) ইহাদের পিছনে পিঠের দিকে দুই ধারে দুইটি আছে।

শরীরের এই সকল যন্ত্রগুলি শরীরের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কায করিতেছে। কতকগুলিকে আবার একসঙ্গে কাজ করিতে হয়। যথা, কোন খাদ্য হজম করিবার সময়,



১। শ্বাসনালী ২। দক্ষিণ-ফুস্‌ফুস্ ৩। বাম-ফুস্‌ফুস্ ৪। হৃৎপিণ্ড

মুখ, দাঁত, গলনালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র এবং pancreas প্রভৃতি শরীরের এই সকল যন্ত্রগুলি একসঙ্গে কায করে। শরীরের এই সকল যন্ত্রগুলিকে এক সঙ্গে পাকযন্ত্র (digestive organ) বলে।

শরীরের মধ্যে শ্বাস (oxygen) লইতে বা শ্বাস (carbon dioxide) ছাড়িতে হইলে নাক, গলনালীর ঊর্দ্ধভাগ, শ্বাসনালী এবং ফুস্‌ফুস্ এই সকল যন্ত্রগুলিকে এক সঙ্গে কায করিতে হয়। তাহাকে শ্বাসযন্ত্র (respiratory organ) বলে।

সমস্ত শরীরের মধ্যে রক্ত চলাচল করিবার জন্য হৃৎপিণ্ড ও সমস্ত বড় ও ছোট শিরাগুলি (blood vessels) এক সঙ্গে কায করে। তাহাকে ইংরাজীতে circulatory organs বলে।

প্রস্রাবের যন্ত্র, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্, যকৃৎ এবং বৃহৎ অন্ত্র এই সকল যন্ত্রগুলি শরীর হইতে ময়লা বাহির করে। সেইজন্য ইহাদিগকে Excretory organs বলে।

মস্তিষ্ক (brain) মেরুদণ্ড (spinal cord), এবং ছোট বড় সমস্ত শিরা উপশিরাগুলি শরীরের সমস্ত যন্ত্রগুলিকে চালিত করিতেছে। এই চালন শক্তিকেই স্নায়ুমণ্ডলী (nervous system) বলে।

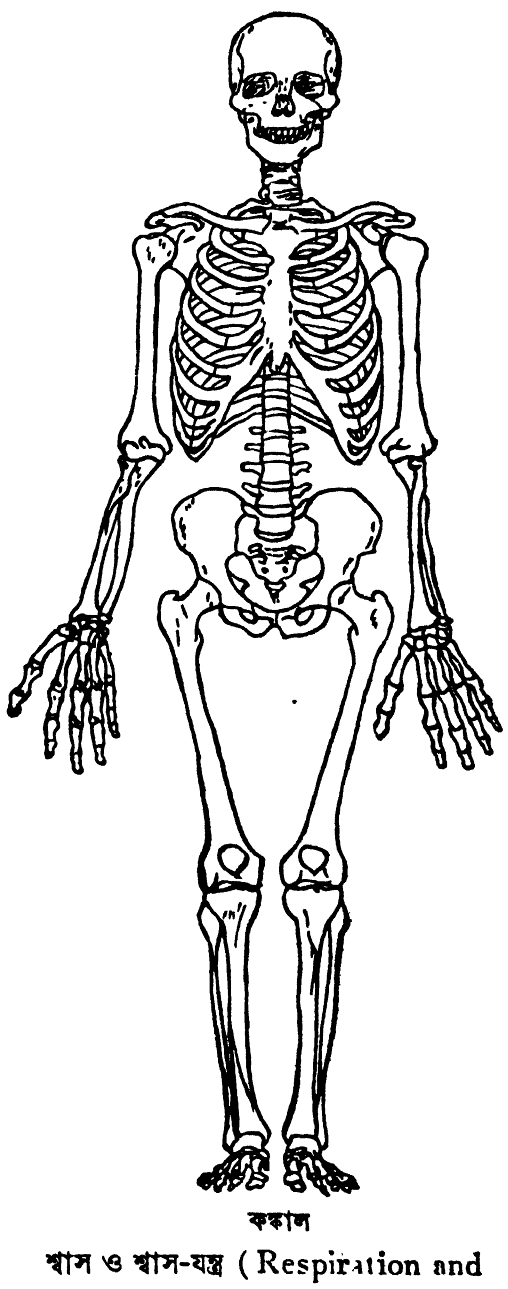
এই সকল যন্ত্র ছাড়াও শরীরের মধ্যে হাড় ও পেশী (bones and muscles) আছে। হাড়গুলি দ্বারা শরীরের আকৃতি ঠিক হয় ও পেশীগুলি সকল অঙ্গকে নাড়া-চাড়া করিতে সাহায্য করে।

পাকযন্ত্র (Digestive organs)

মানুষের শরীর অনেকগুলি পদার্থে তৈয়ারী। যথা—হাড়, চামড়া, শিরা ইত্যাদি। কি জাগ্রত অবস্থায়, কি নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের কোন না কোন অংশ সর্ব্বদাই কাজ করিতেছে। যেমন কোন ইঞ্জিন সর্ব্বদাই কায করিতে করিতে তাহার কোন কোন অংশ নষ্ট হইতে থাকে, সেইরূপ মানুষের শরীরেরও কোন কোন অংশ নষ্ট হইতে থাকে। তাহাকে আবার মেরামত করিতে হয়। যেমন কয়লা ও জল ঠিকভাবে পাইলে ইঞ্জিন তাহার চলচ্ছক্তি বজায় রাখিতে পারে, সেইরূপ খাদ্যের দ্বারা মানুষ তাহার জীবনীশক্তি লাভ করিয়া তাহার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক ভাবে চালনা করিতে পারে। কি শীতকালে, কি গ্রীষ্মে, সকল সময়েই শরীরে একটা উত্তাপ থাকে। এই উত্তাপও আমরা খাদ্যের মধ্য হইতে পাই। আবার, যে খাদ্য আমরা খাই, তাহা ভালভাবে হজম করিতে হইবে। কারণ, খাদ্য পুরাভাবে হজম হইলে আমরা শরীরে উত্তাপ,

জীবনীশক্তি পাই এবং শরীরের পুষ্টি হয়। শরীরের কোন অংশ কাটিয়া গেলে যদি তাহাতে খাদ্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষত অংশ সারিয়া যাইবে না যতক্ষণ না খাদ্য খাইয়া তাহা ভালভাবে হজম করিয়া জীবনীশক্তি বাড়িতেছে।

কোনও খাদ্য মুখের মধ্যে যাইলে তাহা দাঁতের দ্বারা ভাল করিয়া চিবাইতে হয়। চিবাইতে চিবাইতে Salivary glandsএর মধ্য হইতে একরূপ রস বাহির হইয়া খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়। তাহাকে লালা (saliva) বলে। এই লালা হজম করিতে সাহায্য করে। সেইজন্য না চিবাইয়া একেবারে গিলিয়া খাইলে হজম হইতে দেরী হয়। খাদ্য গিলিলে গলনালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। পাকস্থলীটি একটি বড় থলির ন্যায়, ঠিক গলনালীর নীচে অবস্থিত। পাকস্থলীর মধ্যে যাইয়া ভুক্ত খাদ্য আবার gastric juiceএর সহিত মিশ্রিত হয়। খাদ্য হজম করিবার জন্য লালা প্রথম ও gastric juice দ্বিতীয় সহায়ক। খাদ্যের উপর ও চিবাইবার উপর নির্ভর করিয়া খাদ্য পাকস্থলীতে আধ ঘণ্টা হইতে কিছু ঘণ্টা থাকিয়া আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্র অন্ত্রটি একটী নলের ন্যায়—প্রায় বিশ ফিট লম্বা—পেটের মধ্যে ইহা জড়ানো অবস্থায় আছে। যকৃৎ ও পিত্তকোষ (gall bladder) হইতে একটী ছোট নল ক্ষুদ্র অন্ত্রের উপর অংশকে যোগ করিয়াছে। আবার পিত্ত (bile) এই নলের মধ্য দিয়া যাইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে গিয়াছে। এই পিত্ত (bile) হজমেরও সাহায্য করে। আর একটী ছোট নল pancreas (পাকাশয়স্থ শ্লেষযন্ত্র) হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্রে গিয়াছে। এবং এই pancreas এর মধ্যে যে একটী রস জন্মে তাহাও হজমের জন্য বিশেষ দরকার। এই রূপে খাদ্য ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্য হইতে তাহার সার পদার্থ বাহির করিয়া লইয়া আইসে এবং রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। এবং তাহার মধ্যে যে অংশ মোটেই হজম হয় না তাহাই বৃহৎ অন্ত্রের ভিতর আসিয়া জমে। প্রত্যহ ভালরূপে মল-মূত্র ত্যাগ না করিলে, ইহা হইতে বদ্ গন্ধ ও বিষ জন্মিয়া রক্তের সহিত মিশিয়া গেলে শরীরের অত্যন্ত ক্ষতি করে। এই রূপে খাদ্য সম্পূর্ণভাবে হজম হইয়া জলের ন্যায় তরল পদার্থে পরিণত হয়। আবার, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের গায়ে যে সকল শিরা, উপ-শিরা আছে তাহারা এই তরল পদার্থকে চুষিয়া লয়। এইরূপে খাদ্যের সার পদার্থ রক্তের সহিত মিশিয়া মানুষের শরীরে উত্তাপ ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে। আবার, বৃহৎ অন্ত্রের মধ্য হইতে জলীয় পদার্থটী বাহির হইয়া মূত্রাশয়ে জমে।

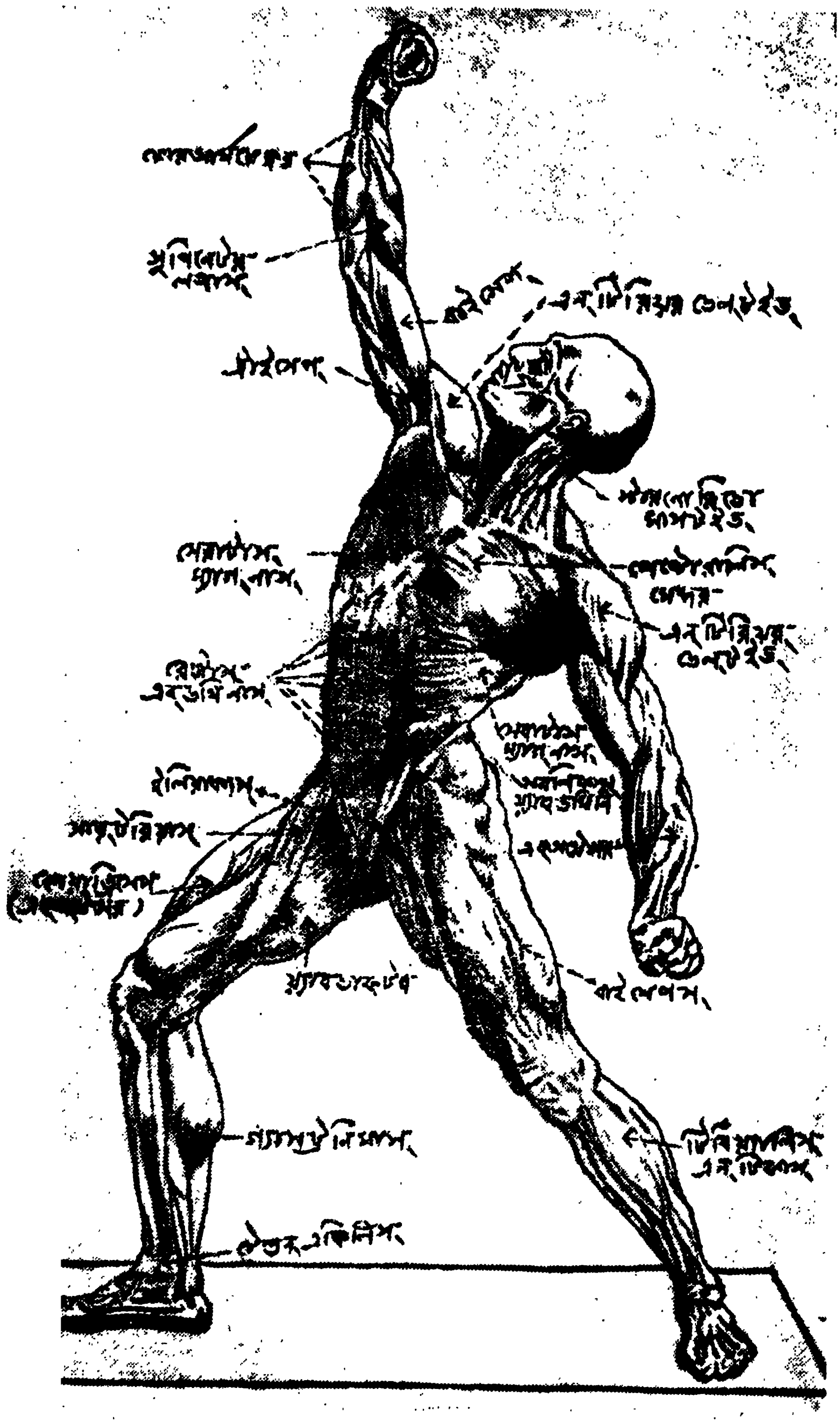


কঙ্কাল

শ্বাস ও শ্বাস-যন্ত্র (Respiration and the Respiratory organs)

মানুষ কিছুদিন মোটে না খাইয়া বাঁচিতে পারে। কিন্তু বিনা বাতাসে মুহূর্ত্ত কালের জন্যও বাঁচিতে পারে না।

ইহাতেই বুঝিতে পারি বাতাস মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমরা নাকের মধ্য দিয়া, ফুস্ফুসের মধ্য দিয়া যে বাতাস লই, তাহা অম্লজান বাষ্প (oxygen)। এই অম্লজান বাষ্প প্রথমে ফুস্ফুসে পরে রক্তের মধ্য দিয়া সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়। তাহাতে জীবনীশক্তি (energy) পাই। এবং শরীরের মধ্য হইতে রক্তের ভিতর দিয়া ফুস্ফুসের মধ্য হইতে যে বায়ু বাহির হয় তাহা অঙ্গারাম্লজান ব (carbon dioxide)। ইহা সম্পূর্ণ বিষাক্ত। যে বাতাস আমরা লই তাহা নাকের মধ্য দিয়া গলনালীর উর্দ্ধভাগে যাইয়া পরে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে। শ্বাস-নালী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ফুস্ফুসের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—একটী দক্ষিণ ফুস্ফুসে ও অপরটী বাম ফুস্ফুসে। ফুস্ফুসের মধ্যে ছোট ছোট হাওয়া যাওয়ার গর্ত্ত আছে। যখন আমরা শ্বাস লই তখন সেইগুলি পূর্ণ হয় ও শ্বাস ছাড়িলে ওইগুলি খালি হয়।



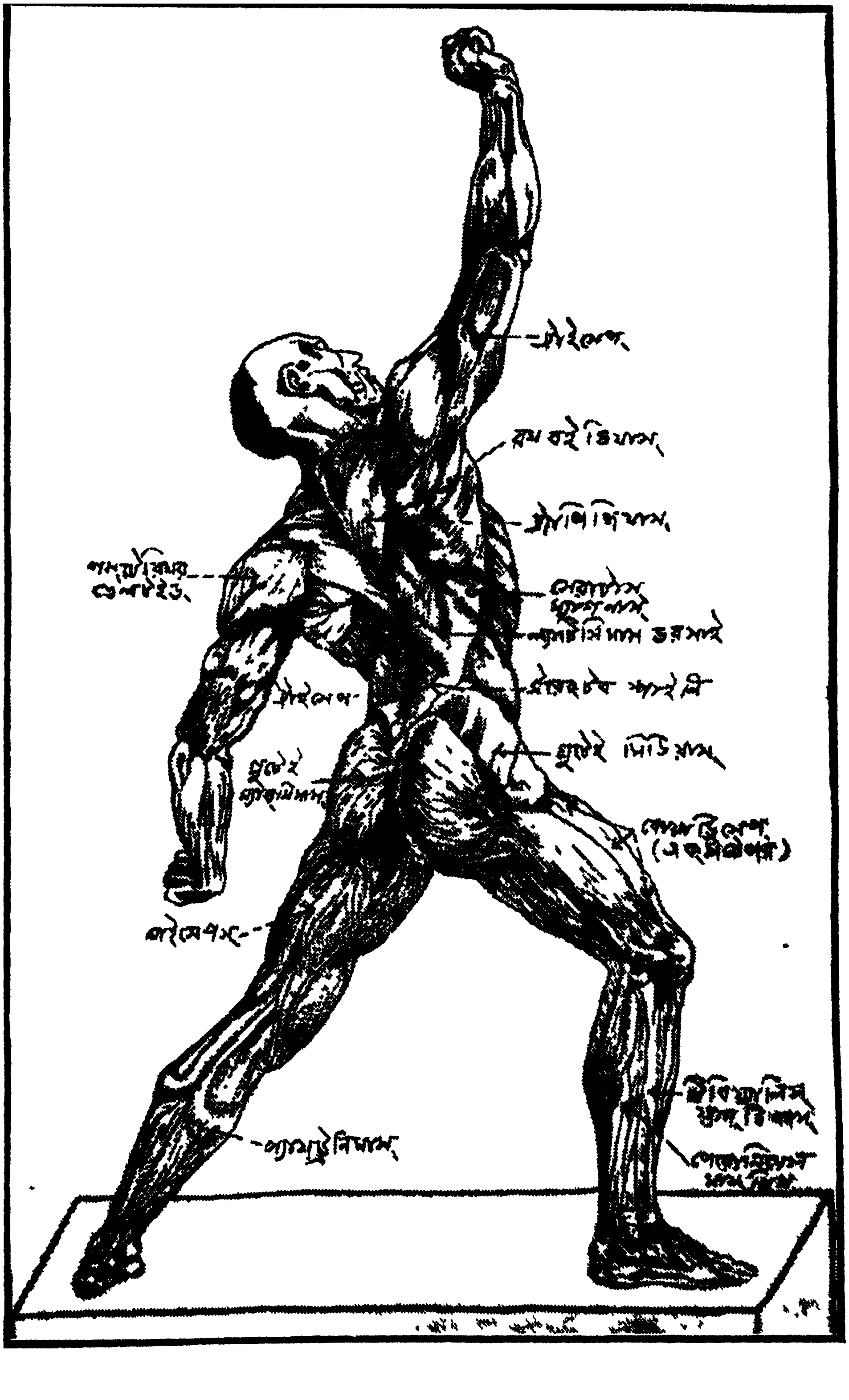
মানব-দেহ—সম্মুখ ভাগ

শ্বাস-প্রশ্বাস
(Breathing)

বিনা শ্বাসে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। জাগ্রত অবস্থায় মানুষকে শ্বাস লইতেই হয়; এমন কি নিদ্রিত অবস্থায় যখন শরীরের অন্য সকল কায বন্ধ থাকে, শ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের কায বন্ধ হইতে পারে না।—তাহা হইলেই

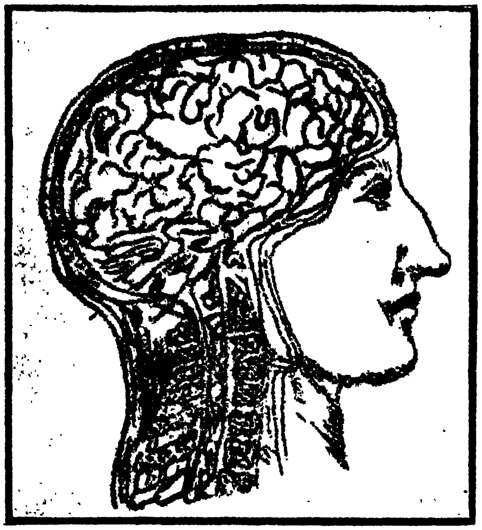
মৃত্যু। সাধারণতঃ মানুষ এক মিনিটে ১৬ হইতে ১৮ বার শ্বাস লয় এবং প্রত্যেক শ্বাসে হৃৎপিণ্ড চার বার ধাকা দেয়।

শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে কিম্বা ব্যায়াম করিবার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের কায দ্রুতভাবে চলে।



মানব-দেহ—
পশ্চাৎ ভাগ

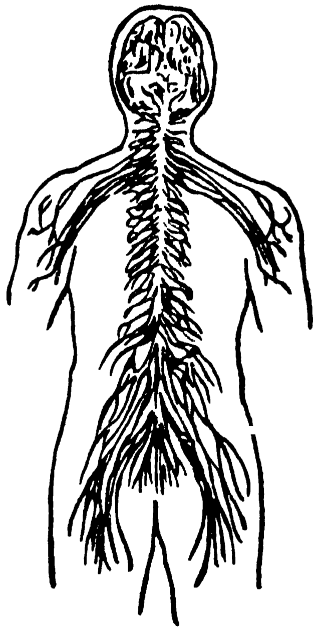
সকল সময় নাক দিয়া শ্বাস লওয়া উচিত। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। নাকের মধ্যে যে চুল আছে তাহা ধূলা ও ময়লা জিনিষ ভিতরে যাইতে দেয় না। পরন্তু নাক দিয়া



মস্তিষ্ক

শ্বাস লইলে বাতাস সিক্ত (moistened) হইয়া ফুস্‌ফুসের মধ্যে যায়। কিন্তু মুখ দিয়া শ্বাস লইলে গলনালীর ঊর্দ্ধ ভাগে যাইবার পূর্ব্বেই তাহা শুকাইয়া যায়। গলনালী শুকাইয়া গিয়া শ্লেষ্মা (mucus) জন্মে। ফুস্‌ফুস প্রভৃতির অসুখ জন্মে। সেই জন্য শ্বাস-নালীকে ভাল রাখিবার জন্য কতকগুলি মোটামুটি নিয়ম পালন করা উচিত।—

(১) সকল সময় কি জাগ্রত অবস্থায় কি নিদ্রিত অবস্থায়, কি দিনে কি রাত্রে খোলা বিশুদ্ধ বাতাসে বাস করিতে হয়।



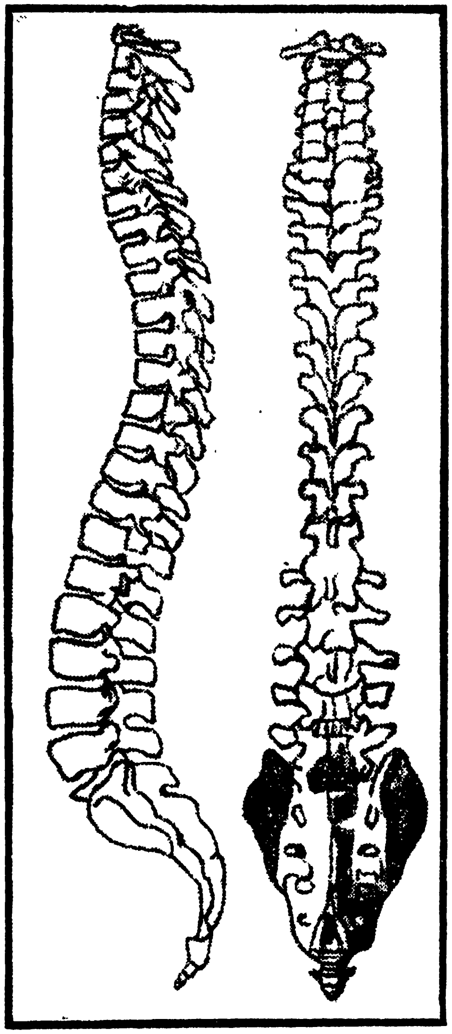
স্নায়ুমণ্ডল

(২) ফুস্‌ফুস্‌কে কোন অবস্থাতেই না চাপিয়া সকল সময়েই পুরা শ্বাস লইতে ও ছাড়িতে হয়।

(৩) যাহাতে ধূলা বাতাসের সহিত শরীরে প্রবেশ না করে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৪) সকল সময়েই শ্বাস নাক দিয়া লইতে হইবে।

৫। মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ; তাহাতে ফুস্‌ফুস্‌ খারাপ করে।



মেরুদণ্ড

৬। শুইবার সময় কখনও মুখে চাপা দিয়া শুইবে না ইত্যাদি

রক্ত এবং রক্তবাহী-যন্ত্র—

(Blood and the organs af Circulation)

এক ফোঁটা রক্ত পরীক্ষা করিলে আমরা তাহার মধ্যে অনেক ছোট ছোট লাল লাল পদার্থ দেখিতে পাই। এই

গুলিকে red corpuscles (লাল অণুকোষ) বলে। তা ছাড়াও অনেক এইরূপ সাদা পদার্থ দেখিতে পাই। সেই গুলিকে white corpuscles বলে এবং হজম হইয়া খাদ্যের সার পদার্থ ইহার মধ্যে চলাচল করে। সেই জন্য রক্তকে এক কথায় ইংরাজীতে শরীরের transportation department বলে। কারণ, রক্ত ফুস্‌ফুসের মধ্য হইতে অম্লজান বাষ্প সমস্ত শরীরে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং পাকস্থলীতে ও অন্ত্রে খাদ্য হজম হইলে পর তাহার সার পদার্থটীও শরীরে বহন করিয়া লইয়া যায়। তা ছাড়া শরীরের সমস্ত আবর্জ্জনা ও অঙ্গারাম্লজান বাষ্প বহন করিয়া লইয়া আসিয়া ফুস্‌ফুস্, মূত্রাশয় এবং চর্ম্মের মধ্য দিয়া বাহির করিয়া দেয়।

শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরার (vessels and capillaries) মধ্য দিয়া রক্ত সকল সময়েই চলাফেরা করিতেছে। হৃদ্‌পিণ্ড এক শক্তিশালী pumpএর ন্যায় শরীরের মধ্যে কায করিতেছে। তাহার দ্বারা শরীরের মধ্যে রক্ত-চলাচল হইতেছে। একটী সুপুষ্ট পুরুষের হৃদ্‌পিণ্ড প্রায় মিনিটে ৭০ বার কায (beat) করে। ব্যায়ামের সময় কিম্বা শরীরে উত্তাপ হইলে তাহা বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীলোকের হৃদ্‌পিণ্ড পুরুষ অপেক্ষা ১ মিনিটে ৮।১০ বার বেশী কায করে। আবার একটী বালকের ১ মিনিটে ৯০।১০০ বার কায করে।

হৃদ্‌পিণ্ড একটী বড় গর্ত্ত। তাহাতে সকল সময়ই রক্ত চলাচল করে। Aorta নামে একটী শিরা হৃদ্‌পিণ্ডের উপরে বাম দিকের কোণে সংযুক্ত আছে। ইহা উপর দিকে গিয়াছে এবং তাহার দ্বারা মাথায় ও হাতে রক্ত-চলাচল হইতেছে এবং পরে নীচে বাঁকিয়া আসিয়া শরীরের আর সমস্ত জায়গায় রক্ত-চলাচল হইতেছে। যখন হৃদ্‌পিণ্ড সঙ্কুচিত (contract) হয়, তখনই তাহার মধ্য হইতে রক্ত সকল aortaর ভিতর যাইয়া সমস্ত শরীরের মধ্যে প্রবাহিত হয়। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপশিরার মধ্য দিয়া রক্ত সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়, তাহাকে capillaries বলে। এই গুলি এত ছোট যে ইহাদিগকে ৩০০০ একত্র জড় করিলেও ১ ইঞ্চি জায়গার দরকার হয় না। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র capillariesএর মধ্য দিয়া ও veinsএর মধ্য দিয়া রক্ত পুনরায় হৃদ্‌পিণ্ডে ফিরিয়া আসে।

হৃদ্‌পিণ্ডটীকে ভাগ করিলে ঠিক দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। হৃদ্‌পিণ্ডের বাম দিক হইতে aortaর মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ রক্ত (pure blood) শরীরের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে এবং শরীরের সমস্ত জায়গা হইতে দূষিত রক্ত (impure blood) হৃদ্‌পিণ্ডের ডানদিকে ফিরিয়া আসিয়া ফুস্‌ফুসের দিকে যায়। ফুস্‌ফুসের মধ্যে যাইয়া সমস্ত শরীরের যে সকল দূষিত পদার্থ বহন করিয়া লইয়া আসে তাহা সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া তথা হইতে অম্লজান বাষ্প লইয়া সমস্ত শরীরের মধ্যে বহন করে।

রক্তের মধ্যে মানুষের জীবনীশক্তি রহিয়াছে। যদি শরীরের কোন অংশে কিছু দিনের জন্য রক্ত-চলাচল বন্ধ হইয়া যায়, তবে সেই অংশটী একেবারে অবশ হইয়া যায়। ইহাতেই আমরা বুঝিতে পারি রক্তের উপর মানুষের জীবনীশক্তি নির্ভর করিতেছে। শরীরের কোন অংশ ক্ষত হইলে রক্তই তাহা পূরণ করে। শরীরে কোন রোগের বীজ প্রবেশ করিতে আসিলে রক্তের white cells তাহাকে বাধা দেয় ও নষ্ট করে। এই সকল নানা কারণে আমরা দেখিতে পাই রক্তই আমাদের জীবনীশক্তি এবং যে খাদ্য আমরা আহার করি তাহা হইতেই রক্ত উৎপন্ন হয়। ভাল খাদ্য আহার করিলে বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন হয়। প্রচুর জল খাইলে রক্তের মধ্যের দূষিত পদার্থ পরিষ্কার হইয়া যায়। রক্ত ভাল রাখিতে হইলে ব্যায়াম বিশেষ প্রয়োজন।

হাড় ও পেশী (Bones and muscles.)

২০৬টী হাড় যথাস্থানে মিলিত হইয়া মানুষের যে কঙ্কাল (skeleton) বা হাড়ের আকৃতি তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই জীবিত, কারণ প্রত্যেকটীরই মধ্যেই শিরা আছে ও রক্ত চলাচল করিতেছে। এই কঙ্কালের দ্বারা মানুষের আকৃতি ঠিক হয় এবং মানুষ দাঁড়াইতে সক্ষম হয়। যদি হাড়গুলি এরূপভাবে যথাস্থানে মিলিত না হইত, মানুষ মোটেই দাঁড়াইতে পারিত না, পোকার মত হামাগুড়ি দিতে হইত। প্রত্যেক হাড়টিই এমনভাবে মিলিত হইয়াছে যে, তাহার প্রত্যেকটিরই বিশেষ ব্যবহার আছে। মস্তিষ্কে যাহাতে আঘাত না লাগে, তাহার জন্য মাথায় খুলি (skull) গোলাকৃতি শক্ত হাড়ের দ্বারা আবৃত আছে। সেইরূপ হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুস্‌ফুসে যাহাতে উপর হইতে আঘাত না লাগে, তাহার জন্য পাঁজরাগুলি (ribs) যথাস্থানে

স্থাপিত হইয়া তাহাদের রক্ষা করিতেছে। হাতের ও পায়ের হাড়গুলি লম্বা থাকার দরুণ আমরা হাত পা সহজে তাড়াতাড়ি নাড়াচাড়া করিতে পারি। শৈশবকালে হাড়গুলি নরম থাকে। সেইজন্য যাহাতে হাড়গুলি বিকৃত না হইয়া যায় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি একটী সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে সকল সময়ই একভাবে শোয়াইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক হইয়া যায়। সেইজন্য শিশুদিগকে মধ্যে মধ্যে অদল বদল করিয়া শোয়াইতে হয়। শিশুদিগকে অল্প বয়স হইতে যদি দাঁড় করান হয়, তাহা হইলে তাহার পা বাঁকিয়া যাইবে। হাড় ছোট থাকা ও দুর্ব্বলতার জন্য বালকদিগের বাড় (growth) হইতে দেরী হয়, তাহার একমাত্র কারণ উপযুক্ত আহারের অভাব। সেইজন্য তাহাদের খাদ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

দুইটী হাড়ের সন্ধিস্থলকে joint বলে। আঙ্গুলের হাড়গুলি একভাবে যুক্ত হইয়াছে; আবার গাঁটের হাড়গুলি আর একভাবে যুক্ত হইয়াছে। এইরূপ পৃথক পৃথক স্থান, পৃথক পৃথক ভাবে যুক্ত হওয়ার বিশেষ ব্যবহার আছে। এবং হাড়ের সন্ধিস্থলগুলি খুব শক্ত শক্ত সরু সূতার ন্যায় ligaments দ্বারা আটকাইয়া আছে। এইগুলি কোন প্রকারে ছিঁড়িয়া গেলে হাড়ে মোচড় (sprain) লাগে। হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে যদি তাহার ভাল করিয়া যত্ন লওয়া হয়, তাহা আবার সারিয়া যায়।

পেশী (Muscles)

মানুষের শরীরের চামড়া ও চর্ব্বির নীচে পেশী থাকে। শরীরের মধ্যে যে পেশীগুলি জীবিত সেগুলি লাল। শরীরে ৫০০র উপর পেশী আছে এবং তাহাদের প্রত্যেকটীরই আকৃতি ও আয়তন (shape and size) পৃথক্ পৃথক্। কোন কোনগুলি লাল, কোন কোনগুলি লম্বা ও বেঁটে, কোন কোনগুলি বড় ও ছোট। পেশীগুলি শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে নাড়াচাড়া করিবার সহায়তা করে। এমন কি শুধু দাঁড়াইয়া থাকিবার সময়ও কতকগুলি পেশী এরূপভাবে সঙ্কুচিত (contracted) হইয়া থাকে যাহাতে আমরা দাঁড়াইতে পারি।

স্নায়ু-মণ্ডলী (Nervous System)

শরীরের মধ্যে অনেক প্রকারের যন্ত্র আছে ও তাহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কায করিতেছে। যথা, পাকস্থলী খাদ্য হজম করিতেছে, মূত্রাশয় শরীরের সমস্ত দূষিত পদার্থ বাহির করিতেছে। চর্ম্ম শরীরের উত্তাপ নিয়মিত করিতেছে। হৃদ্‌পিণ্ডের সাহায্যে শরীরের মধ্যে রক্ত-চলাচল হইতেছে। প্রত্যেক যন্ত্র যথাসময়ে ও একত্র মিলিত হইয়া শরীরের মধ্যে কায করিতেছে। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই শরীর অসুস্থ হয়।

শরীর ও ইহার যন্ত্রগুলিকে একটী ফৌজের সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। একটী ফৌজের ভিন্ন ভিন্ন কায অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত থাকে ও তাহারা যথাসময়ে কায করে; এবং যখন ইহারা একত্র কায করে তাহাই বিশেষ করিয়া লক্ষ্যের বিষয়। এই সকল কায ঠিকভাবে চালিত করিবার জন্য, এবং প্রত্যেক সৈন্যের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য একটী লোক আবশ্যক হয়। সেইরূপ শরীরের মধ্যে সমস্ত যন্ত্রগুলি ঠিকভাবে চালিত করিবার জন্যও একটী চালক বিশেষ আবশ্যক। স্নায়ু-মণ্ডলী শরীরকে চালিত করিতেছে। এই স্নায়ু-মণ্ডলীই শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দিয়া যথাসময়ে ও ঠিকভাবে কায করাইয়া লইতেছে। যখন আমরা কোন জিনিষ ধরিতে কিম্বা চলিতে ইচ্ছা করি, স্নায়ু-মণ্ডলীই আমাদিগের দ্বারা উহা করাইয়া লয়। এক কথায়, স্নায়ু-মণ্ডলীই আমাদের সমস্ত কার্য্য চালিত করিতেছে। যখন আমরা কোন বিষয় চিন্তা করি, বা স্মরণ করি, এই স্নায়ু-মণ্ডলীই আমাদের ঐ কার্য্যে সাহায্য করে।

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড (Brain and Spinal cord)

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড, এই দুইটী স্নায়ু-মণ্ডলীর প্রধান বিভাগ। মস্তিষ্কটী একটী মোটা হাড়ের বাক্সের দ্বারা আবৃত আছে। তাহাকে খুলি (skull) বলে। বাস্তবিকই মেরুদণ্ড একটী লম্বা রজ্জুর আকৃতিতে মস্তিষ্কেরই প্রসারণ। মেরুদণ্ডটী প্রায় একটী আঙ্গুলের ন্যায় মোটা। ইহা মস্তিষ্কের নিম্ন অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়া মাথার

খুলির মধ্য দিয়া, বড় গর্ত্তের মধ্য দিয়া নামিয়া আসিয়াছে। মেরুদণ্ডের এক একটী হাড়কে vertebra বলে। এইরূপ ৩৩টী vertebra একটীর উপরে একটী যথাস্থানে মিলিত হইলে যে আকৃতি হয় তাহাকে vertebral column বলে। তাহার মধ্যস্থলে একটী বড় গর্ত্ত আছে। এইরূপে হাড়-গুলি যথাস্থানে একটীর উপর একটী মিলিত হইয়া যে গর্ত্তের সৃষ্টি হইল তাহাই মেরুদণ্ডের অবস্থানের স্থান। মেরুদণ্ডটী এই গর্ত্তের মধ্য দিয়া একেবারে পাছার কাছে নামিয়া আসিয়াছে, আবার মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড হইতে অনেক ছোট ছোট শিরা উপশিরা শরীরের সমস্ত জায়গায় চালিত হইয়াছে। এই শিরা উপশিরাগুলি এত বেশী ও এত কাছাকাছি ভাবে শরীরের মধ্যে অবস্থান করিতেছে যে একটী খুব সরু ছুঁচও তাহাদের কাহাকে না কাহাকেও আঘাত না করিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

স্নায়ু রন্ধ্র ও স্নায়ু অংশু

(Nerve cells and fibres)

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডটীকে যদি পৃথক পৃথক ভাবে বাছা যায় তাহা হইলে তাহার মধ্যে অনেক ছোট ছোট সাদা সুতা পাওয়া যায়। তাহাদিগকে স্নায়ু অংশু (Nerve fibre) বলে। প্রত্যেক স্নায়ু-অংশুর মুখে (end) একটী করিয়া ছোট গ্রন্থি আছে। ইহাদিগকে স্নায়ুরন্ধ্র (Nerve cell) বলে। প্রায় প্রত্যেকটী স্নায়ুরন্ধ্রই মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। মস্তিষ্কের এই স্নায়ুরন্ধ্রগুলির দ্বারাই আমরা চিন্তা ও কোন জিনিষ স্মরণ করিতে সক্ষম হইতেছি এবং ইহাই আমাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি চালিত করিতেছে। যেমন টেলিগ্রাফের তারগুলি সদর ও শাখা অফিসের সহিত যুক্ত হইয়া কাজ করিতেছে, সেইরূপ স্নায়ুরন্ধ্রগুলি শরীরের সমস্ত স্থান হইতে মস্তিষ্কে যুক্ত হইয়া শরীরের সমস্ত কাজগুলি চালিত করিতেছে। আবার স্নায়ুঅংশগুলি মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের হুকুমমত শরীরের মধ্যে দূতের ন্যায় কাজ করিতেছে।

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের কর্ত্তব্য

(Function of the brain and spinal cord)

যেমন কোন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সহরে থাকিয়া তাহার কাজ করে, সেইরূপ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডও শরীরের মধ্যে কাজ করিয়া থাকে। যেমন টেলিগ্রাফের তারগুলি শাসনকর্ত্তার সহিত সমস্ত সহরে যুক্ত আছে, সেইরূপ শিরা-গুলিও শরীরের সকল স্থানের সহিত যুক্ত আছে। কোন কিছু ঘটিলে টেলিগ্রাফের তারের সাহায্যে শাসনকর্ত্তা সমস্ত খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ হুকুম জারী করে, সেইরূপ মস্তিষ্ক যে শুধু স্নায়ুঅংশুর দ্বারা শরীরের পৃথক পৃথক স্থান হইতে খবর লইয়া হুকুম জারি করে তাহা নহে, শরীরের পেশীগুলি নাড়াচাড়া ও হৃৎপিণ্ডটীরও কাজ করে। যখন আমাদের হাঁটিবার ইচ্ছা হয়, মস্তিষ্কই আমাদের পায়ের পেশীগুলিকে চলিতে হুকুম করে। যদি চক্ষুর নিকট হইতে খবর আসে যে শরীরের নিকটেই একটী সাপ রহিয়াছে, তাহা হইলে মস্তিষ্কই শরীরের পেশীগুলিকে সেইখান হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতে হুকুম করিবে। যদি আঙ্গুলে গরম অনুভব হয়, তাহা হইলে আঙ্গুলের শিরাগুলি তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডে খবর দিবে এবং মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডও তৎক্ষণাৎ হাতের পেশীগুলিকে সেই স্থান হইতে অঙ্গুলীটাকে সরাইয়া লইতে হুকুম করিবে। যদি শিরাগুলি শরীরের মধ্যে না থাকিত তাহা হইলে আমরা কোন জিনিষই অনুভব করিতে ও তাহার কাজ করিতে পারিতাম না। স্মরণ করা, চিন্তা করা, অনুভব করা, ভালবাসা, ঘৃণা করা, এই সকলই মস্তিষ্কের কাজ। কোন কিছু করিতে বা বলিতে ইচ্ছা করিলে মস্তিষ্কই আমাদের সমস্ত ঠিক করিয়া দেয়। এক কথায় মস্তিষ্কই শরীরের সমস্ত কিছু চালিত করিতেছে। যে সকল স্নায়ু-অংশুগুলি শরীরের অন্য স্থান হইতে মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত আছে, যদি তাহাদের কোন একটীকে দুই ভাগে বিভক্ত বা আঘাত করা যায়, তাহা হইলে সেইটী অবশ হইয়া যাইবে। তাহার ফল স্বরূপ আমরা সে স্থানের কোন কিছুই অনুভব করিতে পারিব না। যাহারা মাদক দ্রব্য সেবন করে বা যাহাদের শরীরে পায়া

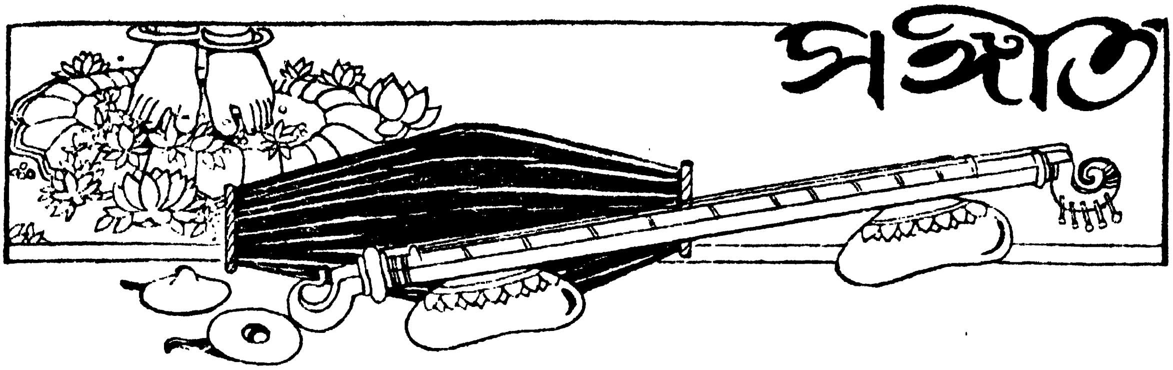
আছে, তাহাদের শরীরের অনেক অংশ অবশ হইয়া থাকে; কারণ মাদক দ্রব্যগুলির বা পারার বিষ স্নায়ু-অংশগুলিকে ধ্বংস করে।

স্নায়ুমণ্ডলীর স্বাস্থ্য
(Hygiene of the Nerve System)

স্নায়ুমণ্ডলীকে সুস্থ রাখিতে হইলে শরীরের আর আর সকল অংশকে সুস্থ ও সবল রাখিতে হইবে। স্নায়ু-মণ্ডলীকে কার্য্যকরী রাখিতে হইলে উপযুক্ত আহার, মুক্ত বাতাস, নিদ্রা ও শরীরের উপযুক্ত ব্যায়াম ও মনের সুস্থতা প্রয়োজনীয়। মনের উপর স্বাস্থ্যের ও স্নায়ুমণ্ডলীর উভয়েরই অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। মনের উত্তেজনার সময় হৃৎপিণ্ড জোর চলে। যখন কেহ ভয় পায় তখন তাহার শরীরে উত্তাপ না অনুভব করিলেও তাহার শরীর হইতে আপনিই ঘাম বাহির হয়। অনেক সময় অপত্যাদি বিয়োগে মনে আঘাত লাগিয়া মানুষকে অজ্ঞান হইয়া যাইতে দেখা যায়। দুঃখের সময় বা রাগের সময় না খাইয়াও থাকিতে পারা যায়; তাহাতে ক্ষুধাও হয় না। মন যখন প্রফুল্ল থাকে, তখন ক্ষুধাও বাড়ে এবং সমস্ত শরীরও সুস্থ থাকে। এই সকল হইতে আমরা দেহের উপর মনের আধিপত্য অনুমান করিতে পারি। সৎ চিন্তার দ্বারা শরীরকে ও মনকে সুস্থ রাখিতে পারা যায়।

ব্যায়াম (Exercise)

শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে ব্যায়াম একান্ত দরকার। সকলেরই জানা আছে একটী যন্ত্র ব্যবহার না করিলে তাহা খারাপ হইয়া যায়। সেইরূপ ব্যায়াম ব্যতিরেকে শরীরও খারাপ হইয়া যায়। যদি আমরা কিছু দিনের জন্ম কেবল বসিয়া ও শুইয়া থাকি, পায়ের কোন কাজ না করি, তাহা হইলে পা টী এত দুর্ব্বল হইয়া যাইবে যে, দাঁড়াইতে কিম্বা হাঁটিতে মোটেই সক্ষম হইব না। যদি আমরা ব্যায়াম না করি, তাহা হইলে মাংসপেশীগুলি ছোট এবং নরম (atrophy) হইয়া যাইবে; এবং রক্তের তেজ কমিয়া শরীরে অন্ত রোগের বীজ প্রবেশ করিবে। ব্যায়ামের সময় হৃৎপিণ্ডটী জোরে তাড়াতাড়ি কাজ করে। তাহাতে রক্ত শরীরের মধ্যে ভালভাবে চালিত হয়। ব্যায়ামের সময় শরীরের মধ্যে নিশ্বাস দ্রুতভাবে চলা ফেরা করে; তাহাতে অম্লজান বাষ্প শরীরের মধ্যে ভালভাবে প্রবাহিত হয়। একটী প্রবাদ আছে শরীর ভাল থাকলে মনও ভাল থাকে। শরীরের ব্যায়াম না করিলে মনও ভাল থাকে না। আমার মনে হয়, যদি কেহ বেশী খাটিতে ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করিতে চায়, তাহা হইলে প্রত্যহ বিধিপূর্ব্বক ব্যায়াম করা বিশেষ প্রয়োজন। অনেকের ধারণা আছে যাহারা মস্তিষ্কের কাজ বেশী করে তাহাদের ব্যায়াম করিবার দরকার হয় না। ইহা একেবারে ভুল। শারীরিক ব্যায়াম যেমন বালকের ও সকল লোকেরই দরকার, তেমনি বালিকাদিগের এবং স্ত্রীলোকদিগেরও বিশেষ দরকার। প্রত্যেকেরই তাহার শরীরের দুর্ব্বলতার দরুণ লজ্জা পাওয়া উচিত। যখন ভগবান মানুষের শরীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন সেই শরীর যাহাতে সুস্থ ও সবল থাকে তাহার পন্থাও নির্ণয় করিয়াছেন। শরীরকে পুষ্ট রাখিবার জন্ম তিনি যে কেবল খাদ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে, মানুষকে যাহাতে খাদ্য জোগাড় করিবার জন্ম শরীরের কাজ কিছু করিতে হয় তাহার পন্থাও ঠিক করিয়াছেন। যে প্রত্যহ কেবল খাইয়াই যায় এবং শরীরের কোন ব্যায়াম করে না, তাহার দ্বারাই স্বাস্থ্য রাখিবার প্রধান নিয়মটী লঙ্ঘিত হইয়া তাহার ফলস্বরূপ শরীর দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বালক-বালিকা-দিগকে সকল সময়ই যদি বসিয়া পড়িতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিশ্বাসের কাজ কম হইয়া আসিয়া ফুসফুসে বাতাস কম প্রবেশ করিবে। তাহাতে হৃৎপিণ্ডের কাজও কম হইবে। মনও ঠিক রাখিতে পারিবে না এবং ভালরূপ পড়াও হইবে না। সেইজন্ম বালকদিগকে জোর করিয়া খেলিতে দেওয়া উচিত। এই সকল খেলাধূলা ছাড়াও প্রত্যেককে সকালে ও বৈকালে কিছুক্ষণের জন্ম নিয়মিত ব্যায়াম করিতে হইবে। তাহাতে তাহাদের শরীর আরো ভাল হইবে, মনও প্রফুল্ল থাকিবে।



আশাপূরণ

(স্বরমাত্রিক ছন্দ)

নৃত্যসঙ্গীত

কথা ও সুর—শ্রীদিলীপকুমার রায় স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী

কৃষ্ণের মঞ্জীর মাঝ
সুরহীন স্বর পায় লাজ,
অন্তর গায় : "সাজ সাজ—
উৎসব-রব-ছন্দে।"
মন্থর প্রাণ-কুঞ্জে
মূর্চ্ছন মিড় মুঞ্জে,
ভৃঙ্গের আশ গুঞ্জে—
ফাল্গুন স্তব গন্ধে।

"দোল্ দোল্"—গায় মর্ম্মে,
"দূর কর দায় কর্ম্মে
"তোল্ নর্ত্তন-নর্ম্মে
সঙ্গীত স্রোত চঞ্চল
"ভক্তির রঙ্ দীপ্ত,
বিশ্বের হৃদ্ তৃপ্ত,
"স্বপ্নের দল রিক্ত
ভরপূর রস-উচ্ছল।"

অম্বর ঐ গল্‌ল,
অঙ্কুর লাখ ফল্‌ল,
খঞ্জন মন টল্‌ল—
পাথ্‌নায় নীল নৃত্য,
সুপ্তির ঘোর ছুট্‌ল
সিন্ধুর বাঁধ টুট্‌ল
চিত্তের ফুল ফুট্‌ল
বিহ্বল প্রেম-সিক্ত।

আজ সুন্দর বল্লভ !
শিঞ্জন-রূপ-সৌরভ
বায় পাণ্ডুর বৈভব
ঐহিক সাজ সজ্জা :
সংশয় সব কাট্‌ল
নন্দন-বন জাগ্‌ল
মুক্তির ভায় কাঁপ্‌ল
মুখ—বন্ধন-লজ্জা। *

FULFILMENT

The sound of Krishna's anklets has put to shame the toneless voice of the earth :
The heart sings : "Don thy bridal robes to celebrate the festival advent of the Lover."
In the slow bower of life bursts out a revelry of song
And a bee-hum of welcome tones the fragrance-hymn of Spring.

* আমার এ অনুবাদটি শ্রীঅরবিন্দ কর্ত্তৃক সংশোধিত।

There is a chant in the soul : Swing in the swing of joy, push care and toil away ;
Plunge into the play of the Dance, bathe in the swirling rapids of the universal symphony ;
Relumed is the bonfire of adoration the heart of the world is satisfied ;
The band of once empty dreams are now flushed with the wine of fulfilment."

The sky melts in a passion of sweetness, the barren seeds bear by the millions :
The bird of paradise soars towards her skies the dance of the blue glistering on her wings :
The heavy haze of slumber has fled the embankments are broken :
The flower of the heart has budded in a dewy ecstasy of Love.

Today O Beautiful O Beloved thy loveliness is like a fragrant breeze
And the glories of the world fade before it and are turned into a garish pallor.
All doubts are dispelled, the gardens of Paradise flower in the dust of earth
Before the sunshine of Love's liberation darkness and bondage are ashamed and have
hidden their faces.

একতালা

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
সা -া মা | গা মগা মা | গা মা ধা | -া -া -া | পা ধা র্সা | ণা ধা পা | ধা র্রা র্সা | -া -া ণা |
কৃ ষ্ নে র মন্ - জী র মা - - ঝ্ সু র হী ন ম্ব র পা য় লা - - জ্

ণা -া ণা | ণধা ণধা ণা | র্র্সা ণা ধা | -া -া ণা | পধা -া পা | ধা র্সা ণর্সা | ধণা ধপা মা | -া -া -া |
অ ন্ ত র গা য় সা জ সা - - জ্ উ ত্ স ব র ব ছন্ - দে - - -

মা -া মা | মা মগা পমা | রা মা ধা | -া -া -া | ধা -া ধা | ধা ধণা ধপা | পধা র্সা নর্সা | ণা -া -া |
ম ন্ থ র প্রা ণ কু ন্ জে - - - মূ র্ ছ ন মি ড় মু ন্ জে - - -

ণা -া ণা | ণা র্রা র্সর্রা | ণর্সা ণা ধা | -া -া ণা | পধা পা পা | পধা ধর্সা ণর্সা | ধণা ধপা মা | -া -া -া
ভৃ ঙ্ গে র আ শ গু ন্ জে - - - ফা ল্ গু ন স্ত ব গন্ - - ধে - -

মা -া মা | -া পমা গমা | পা রা রা | -া -া -া | সা রা মা | পা ধা ধপা | পধা পধা র্সণা | -া -া -া
দো ল্ দো ল্ গা য় ম র্ মে - - - দূ র্ ক ম্ দা র ক র্ মে - - -

ধা -া ধা | -া ধা র্রা | র্সা -া র্জর্রা | র্সণা ধণা -া | ধা -া ধা | ধা ধা র্সা | ণা -া ণা | -া -া র্সা |
তো ল্ ন ম্ ত ন ন র্ মে - - - স ঙ্ গী ত স্রোত চ ন্ চ - - ল

ধা ণা ধপা | ধা পমা পা | রা মা পা | ধা পমা -া | সা রা মা | পা ধা র্সা | র্রা র্গা র্র্সা | -া -া ণা |
ভ ক্ তি র র ঙ দী প্ ত - - - বি শ্ শে র হৃ দি তৃ প্ ত - - -

ণা -া ণা | ণা র্রা র্সর্রা | ণর্সা ণা ধা | -া -া ণা | পধা -া পা | ধা ধর্সা ণর্সা | ধণা ধপা মা | -া -া -া |
স্ব প্ নে র দ ল রি ক্ ত - - - ভ র্ পূ র র স উ - চ্ছ - - ল্

মা -া মা | মা পমা গমা | পা রা রা | -া -া -া | সা রা মা | পা ধা পা | ধা মা মা | -া -া -া |
অ ম্ ব র ও ই গল্ - ল - - - অ ঙ্ কু র লা থ ফ ল্ ল - - -

মা -া ধা | পা ণা ধা | ণধা পা মা | ণা -া -া | ধা ণা ধণা | র্সা না র্সা | র্রসা নর্সা ধণা | র্সা না র্সা |
থ ন্ জ ন ম ন টল্ - ল - - - পা থ্ না র নী ল নৃ - ত্য - - -

র্সা -া মজ্ঞা | রজ্ঞা র্রা সর্রা | সনা র্সা র্রা | -া -া ধা | ধা ণা র্সা | র্সপা পা পা | পা ধা পধা | ণা -া -া |
সু প্ তি র ঘো র ছু ট্ ল - - - সি ন্ ধু র বাঁ ধ্ টু ট্ ল - - -

ধা ণা র্সা | সনা র্সা র্রা | নর্সা -া ণর্সা | ণা ধা পা | সা রা মা | পা ধা র্সা | র্রা র্গা রর্সা | -া -া -া |
চি - ত্তে র ফু ল ফু ট্ ল - - - বি উ ভ ল প্রে ম সি ক্ ত - - -

র্সা র্গা র্গা | -া র্গা র্মা | র্রগা র্মা র্গা | -া র্মগা র্রসা | র্সা র্রা র্রা | র্রণা ণা ণা | ণা র্সা র্সা | -া -া ণা |
আ জ সু ন্ দ র বল্ - ল - - ভ শি ন্ জ ন রূ প .স উ র - - ভ

ধা ণা র্সা | র্রা র্সা ণা | ধা ণা ণা | -া পা -া | সা রা মা | পা ধা মা | পা ধা র্সা | -া -া -া |
বা য় পা ন্ ডু র ব ই ভ - - ব ও ই হি ক সা জ স জ্ জা - - -

না র্সা র্রা | মজ্ঞা র্রা সর্রা | না র্সা র্রা | -া -া -া | সর্মা -া র্মা | র্মা রমা রর্মা | জ্ঞা -া র্রা | -া -া -া |
স ঙ্ শ য় স ব কা ট্ ল - - - নন্ - দ ন ব ন জা গ্ ল - - -

র্সা -া র্সা | র্সা র্রা র্সা | ণর্সা ণা ধা | -া -া ণা | পধা পা ধা | -া র্সা ণর্সা | ধণা ধপা মা | -া -া -া |
মু ক্ তি র ভা য় ঝাঁ প্ ল - - - মু থ ব ন্ ধ ন ল - জ্জা - - -

এ গানটি নানারূপ লয়কারী দ্রুত তান দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে এখানে স্বরলিপি দিলাম না—স্বরলিপি-পুস্তকে দিব। এ গানটি নৃত্যসঙ্গীত—তাই ঠায়ে না গাইয়া দ্রুত গেয়। এ গানটির ছন্দও নূতন। স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি পর্ব্বে পাঁচটি সিলেবল্ দিয়ে গান বা কবিতা ইতিপূর্ব্বে রচিত হয় নি। এটি প্রবোধ সেনের পরিভাষায়—পঞ্চস্বর চৌপদী—স্বরবৃত্ত। অবশ্য মাত্রাবৃত্তেও এটিকে আবৃত্তি করা যায়—(ইহা স্বরমাত্রিক ছন্দেরচিত বলিয়া ইহার প্রকৃতি কবিতা উভধর্ম্মী) কিন্তু ইহার প্রকৃত রসটি স্বরবৃত্ত—শ্রীঅরবিন্দেরও মতে। ইহার scansion এইরূপ

```
+           +           +           +
।     ।     ।     ।     ।           ।     ।     ।     ।     ।
কৃষ্  নের্  মন্  জীর্  মাঝ্  |     সুর্  হীন্  স্বর্  পায়্  লাজ্  |
অন্  তর্  গায়্  সাজ্  সাজ্  |     উত্  সব্  রব্  ছন্দ্  দে    |
```

এবং তাল বা প্রস্বন প্রথম ও তৃতীয় সিলেব্‌লে। এইভাবে পড়িলে ছন্দটির গতি লচক ও নূতনত্ব সম্যক্ ফুটিয়া উঠিবে। মাত্রাবৃত্তে পড়িলে ইহার ভঙ্গী অনেকটা সাধারণ মনে হইবে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

দর্শনের পূর্ব্ব পরিচয়

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ

মানুষ যখন থেকে বাহিরের ও ভিতরের কথা ভাবিতে শিখিয়াছে তখন হইতেই দর্শনের রচনা আরম্ভ হইয়াছে। 'মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় যায়' এই প্রশ্নটী সনাতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষ যখন ভাল করে ভাবিতে শিখে নাই, তখন তাহার চিন্তারাজ্যের রুদ্ধ-দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্ম সবেগে করাঘাত করিয়াছিল এই চির-অনাদৃত বিয়োগ। মৃত্যু মানবের অপ্রিয় হইলেও পরম মিত্র। একটী জীবনের জ্ঞানধারার বিরাম ইহারই নিশিত বাণের আঘাতে হইলেও সহস্র সহস্র জ্ঞানের প্রস্রবণও উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে। প্রিয়জনের উচ্ছ্বসিত শোক-বন্যা চিত্তভূমি প্লাবিত করিলেও উর্ব্বর করিয়া দেয়। প্রিয় বন্ধুর স্মৃতিকে এমনিই উজ্জ্বল করে তুলে এই বিয়োগ যে জাগ্রত অবস্থায় সেই বন্ধুর কায়াখানি বাহিরের বস্তুরূপে যে-ভাবে প্রত্যক্ষ হইত ঠিক্ সেই ভাবেই স্বপ্নাবস্থায় সেই দেহটী শোক-সন্তপ্ত প্রিয়-জনকে দেখা দেয়। স্বপ্নের দেহটী কি ছায়া? না সেই দেহই অন্য স্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। যেটী ইন্দ্রিয়ের অধিকারে ছিল, সেটীতে এখন মনের মাত্র অধিকার। যে জাগ্রত অবস্থায় দিনের আলোকে কোলাহলে আপনাকে পাঁচজনের সঙ্গে দেখা দিত, এখন সে নিদ্রিতাবস্থায় রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে গোপনে একা এসে দেখা দেয়। কিন্তু সেই আসে। তার সেই সুন্দর দেহ, সেই ব্যাকুল দর্শন-পিপাসু চোখ দুটী, সেই মেঘের মত কাল চুল, সেই বহু আলিঙ্গিত ও পরিচিত বক্ষ, সেই কণ্ঠস্বর, তার সবই পুরাতন নিয়ে সে আসে। সে যদি থাকে, তাহা হইলে সে কাতর প্রার্থনায় মূক হইয়া থাকে কি করিয়া? যদি তাহার দেহ থাকে, তাহা হইলে তাহা দেখা যায় না কেন? যদি নাই থাকে, তাহা হইলে মাঝে মাঝে আসে কি করিয়া? এই প্রেতের বিচিকিৎসাই প্রাচীন যুগের মানবের চিন্তা-শরীরের যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত।

এই যন্ত্রণার শান্তি পাইবার জন্য মানব কত দেবতা গড়িল। তাঁহাদের উদ্দেশে কত স্তোত্র পাঠ করিল, কত যজ্ঞের আয়োজন হইল; কিন্তু অতৃপ্ত মন বুঝিল না। নচিকেতার মত প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই আকুল হইয়া উঠিল। মানবের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অন্তর্মুখীন হইল। জ্ঞানলাভের তীব্র-তৃষ্ণা মানবকে স্তব্ধ করিয়া দিল। সকল চাঞ্চল্যের বিশ্রাম হইল। প্রশান্ত মন-সমুদ্রে চিদাকাশের প্রতিবিম্ব পড়িল। মানবের তীব্র তৃষ্ণার অপশম হইল। মানবের জীবনেরও বিশ্রাম-ঘাটের সন্ধান পাওয়া গেল। জীবনের সঙ্কীর্ণ ধারার বিরাট বিলয় নদীর সমুদ্রে আত্ম-সমর্পণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সে আপনার সত্তা হারাইল বা লুপ্ত আকার পুনরায় পাইল। মৃত্যুর পরিচয়ও হইল আপনার পরিচয়ের সঙ্গে। বিশ্বের কেন্দ্র-শক্তির নিত্য নৃত্যের মহিমা অবগত হইতেছে একমাত্র সঙ্গতকারী এই মৃত্যু। যে অমঙ্গলরূপে আমাদের নিকট পরিচিত, সেই মৃত্যুই মঙ্গল-বেদীর আলিপনা রচনা করিতেছে আপনার দক্ষিণ হস্তে। পদ্মের কাছে যেমন স্নিগ্ধ চন্দ্রাতপ উদ্বেগের কারণ, সেইরূপ ব্যথিতের কাছে ব্যথার দেবতা ভয়াবহ। তাঁর অমৃত-স্পর্শে হলাহলের তীব্র জ্বালা অনুভূত হয়। প্রাচীন যুগের ঋষি সুখ-দুঃখের আস্বাদে বঞ্চিত। তিনি মিলনেও আনন্দিত নহেন, বিয়োগেও অণুমাত্র ব্যথিত নহেন। তিনিই সমাধির আলোকে সংসারের অন্ধকার ভেদ করিয়া বিশ্বনাথের ছন্দোবদ্ধ নর্ত্তনের অনুসন্ধান পাইলেন। এই নৃত্যই বিশ্বের কর্ম্মগতি। কর্ম্ম এখানে নিয়মানুসারে ফল প্রসব করে। এর বিরাম বা আধিক্য নাই; কিন্তু বৈচিত্র্য আছে। এর সামঞ্জস্যও বৈচিত্র্যের মধ্যে। সে সামঞ্জস্যের অনুভূতি ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে হয় না। সমাধির পূত আবেশে মনের শুদ্ধি না হইলে কে সে অপূর্ব্ব নূপুর-শিঞ্জন শুনিতে পায়? সংসারের দৈন্য ও মনের দৈন্য আমাদের দৃষ্টির দৈন্য এনে দেয়। আমাদের দৃষ্টি নির্ম্মল করিতে হইলে মনকে নির্ম্মল করিতে হইবে। মন নির্ম্মল হয় সমাধির তুষার-লেপে। জ্ঞানের যখন পূর্ণ বিকাশ, তরঙ্গ আদৌ নাই তখনই দর্শন, এ জ্ঞান সাধারণের নাই, তাহারা অন্ধ। দিবার আলোক তাদের কাছে পাতাল-পুরীর অভ্যন্তরের কুঞ্জবনের মধ্যবর্ত্তী পুঞ্জীভূত অন্ধকার। এ যুগের দর্শন প্রকৃত দর্শনই বটে। দ্রষ্টার আপন-পর নাই, অহমিকা নাই। আছে তন্ময়তা, আছে অনির্ব্বাচ্য উল্লাস। এ মানসিক অবস্থা আমাদের সংসার-দশায় হয় না। প্রিয়তমের আলিঙ্গনে ইন্দ্রিয়গণ বিবশ হইয়া পড়ে, শরীরের প্রতি রোমকূপে পুলক নৃত্য করে; আমরা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ি। ব্রহ্ম-রসাস্বাদে সকল ইন্দ্রিয় অন্তর্গামী হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে; কিন্তু প্রজ্ঞান-দীপ নিশ্চল ভাবে জ্বলিতে থাকে। দর্শনের প্রতিষ্ঠা হইল সত্য দীর্ঘ সাধনার বলে মনের অন্তরতম প্রদেশে; কিন্তু এ লোকে নয় অতিলোকে। আসরে থাকিলে আসল পাওয়া যায় না। আসল পাইতে হইলে জন-সমাজ ত্যাগ করিয়া, সকল কামনা বিসর্জ্জন দিয়া শুধু একেরই চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতে হইবে।

এখানে দর্শন খুবই সত্য হইল। জ্ঞান ও ব্যবহারের কোনই দ্বৈত-ভাব বা বিরোধ রহিল না। দার্শনিক সকল বিরোধে অবিরোধ, সকল অসামঞ্জস্যে সামঞ্জস্য ও সকল অসঙ্গতিতে সঙ্গতি দেখিতে লাগিলেন। আত্মীয়-বিয়োগে মনে বিকারের দাগ নাই; গৃহদাহে চিন্তায় ললাট সঙ্কুচিত হয় নাই; অর্থের জন্য ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ নাই। অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত অন্ন-মুষ্টিতেই সন্তোষ। অর্থনাশে মর্ম্মন্তুদ হাহাকার-ধ্বনি নাই। এ যুগের দার্শনিক এক নূতন ধরণের জীব। সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে

সংস্কারহীন যেমন আশ্চর্য্য বস্তু, তেমনই সংসারীর কাছে এই সন্ন্যাসী। দর্শনের স্বর্গভূমিতে অবস্থান বেশী দিন রহিল না। মর্ত্ত্যের নিম্ন স্তরে দর্শনকে নামিতে হইল। যে ব্যক্তি সমাধির যোগ্য নয়, সে কি প্রেতলোক, জন্ম, মৃত্যু, আত্মা, প্রভৃতির রহস্য জানিতে পারিবে না? মানবের এই সব জানিবার আকাঙ্ক্ষা স্বভাব-প্রদত্ত। এই সব জানিবার ইচ্ছা শিক্ষার ফলে হয় না। চিন্তা করিতে শিখিলেই লোকের মনে এই সব প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়।

উপনিষদের যুগে নীতি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছিল। সক্রেটিসের ধর্ম্মই জ্ঞান যে কি বস্তু তাহা এই যুগের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বৃদ্ধ বয়স দর্শন আলোচনার সময়। তখন মনের গতি মন্দ হইয়াছে যদিও সংস্কারের দৃঢ়মূল স্তূপ অচ্ছেদ্য পর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই সংস্কারকে প্রতি ভাবনার দ্বারা দূর করিতে হইবে। সেই বয়সে সংসারের প্রতি বীতরাগ প্রায় সাধারণ লোকের আসিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সে তেজ নাই। ভোগের ব্যাঘাত প্রতি পদে। সামর্থ্যাভাবে ভোগ করিতে যাইলেই লাঞ্ছনা। ভোগের স্পৃহাও সুতরাং সুপ্ত হইয়া পড়ে। ভোগের স্মৃতি ইহার নিদ্রা ভঙ্গ করিলেও সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারে না। শারীরিক জড়তা, অস্বাস্থ্য, জরা প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর বার্ত্তা এনে দিতেছে। বৃদ্ধের অতীত জীবনের সকল কথার স্মরণ হইতেছে। কত গোপন ব্যথা হৃদ্-যন্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। তারই পরিচয় আমরা মুখের অব্যক্ত চিহ্ন হইতে পাইয়া থাকি। কত গুপ্ত লীলা অনিদ্র রজনীতে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া থাকে। কোথায় যাব? কি হবে? প্রতি কার্য্যের কি কড়ায় গণ্ডায় প্রতিশোধ পাব? শাস্তি কি ভীষণই হবে? এই সব চিন্তা-বৃশ্চিকের দংশন বৃদ্ধকে আরও অনাসক্ত করিয়া দেয়। তখনই সে আশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত হয়। নিবিড় অন্ধকার রাত্রে আলোকের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকে। সে ভাবে আশ্রয় কি নাই? অন্তরবাণী কি শুনিতে পাব না? গতি কি হবে না? সবই অন্ধকার! ভাবিতে তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠে। সে থাকিতে পারে না—তাহার আশ্রয় চাই-ই চাই। বৃদ্ধ লাভের আশায় যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায়, নিজের জীবন ব্যাপী অকার্য্যের সংশোধনের আশায় নিষ্ফলতায় প্রতিশোধের আশায় গৃহত্যাগী হয়। তার চাই সকল দুঃখ হইতে অব্যাহতি, বিশ্বের অণুপরমাণু হইতে বৃহত্তম পর্য্যন্ত সকল বস্তুর জ্ঞান, আর বিশ্বের অন্তস্থল সঞ্চরণশীল প্রাণশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ —এক কথায়, সকল অসম্পূর্ণতার বিমুক্তি।

বৃদ্ধের মুক্তি চাইই। অন্ততঃ এই আলোচনা চাই। নতুবা তিনি সহজ সরলভাবে বাঁচিতে পারেন না। চিন্তা বা দুশ্চিন্তা তাঁহাকে আপনারই যন্ত্রণাময় ভার নামাইবার জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়া দেয়। তিনি জগতের বিষয়ে নিপুণভাবে ভেবে এক চমকপ্রদ আশার রাজ্যে উপস্থিত হন্। তিনি জ্ঞানের দ্বারাই আপনাকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লন যে, পূর্ব্বজীবনের জ্ঞানের অস্পষ্ট রেখাটি পর্য্যন্ত থাকে না। এই জ্ঞানকে এরূপ দীর্ঘ ও কঠোর অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করেন, যে তাঁহার যে অল্প জ্ঞান ছিল তাহা বুঝা যায় না। আর নূতন জীবনে যাহাতে স্খলন না হয় তাহার জন্য সর্ব্বদাই জাগরূক থাকেন। এই পুণ্য প্রয়াগতীর্থে পবিত্র সঙ্গমস্থলে হংসের ন্যায় নিরতই সেই সিদ্ধযোগী বিহার করিয়া থাকেন। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত তাঁহাকে আর কষ্ট দেয় না। তিনি জ্ঞানতরণীতে অতীত জীবনের সকল ভীষণ পাপ-নদী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘ ক্লিষ্ট সাধনার দ্বারা যে নব মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছেন ও সর্ব্বদা জাগ্রত বিবেক প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন, এই রাজ্যে অন্য রাজ্যের অনভিমত লোকের সহসা প্রবেশের সুযোগ নাই। এক কথায়, এই সব যোগীর আদর্শ জীবনের অনুশাসনে বাস্তব-জীবন চালিত হয়—একসূত্রেও ব্যতিক্রম হয় না। সে সুশিক্ষিত সারথির মত পূর্ব্বরথচক্রক্ষুণ্ণ মার্গ রেখা অনুসরণ করিয়া পথ অতিক্রম করে। যোগীকে দেখিলে মনে হয় আদর্শ জীবন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

নীতি ও জ্ঞানের মৈত্র চিরস্থায়ী হইল না। জ্ঞানপিপাসা নীতি-বাগীশের যেরূপ আছে উচ্ছৃঙ্খলের তার চেয়ে কিছু কম নয়। দর্শন-দুর্গের সংযম ও বৈরাগ্য প্রবেশপত্র বেশী দিন রহিল না। নিয়ম শুধু কাগজেপত্রে রহিল। গৃহীরও হাতে জীব জগতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনায় ব্যাপার এসে পড়িল। দর্শনের তত্ত্ব দেখা উঠে গেল। যুক্তি সোণার কাঠিতে পরিণত হইল সত্য কিন্তু জ্ঞানের চর্চ্চা, যুক্তির পারিপাট্য, নব নব বিষয়ের অবতারণা, পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, পুরাতন মতের অভিনব ব্যাখ্যা ও সংশোধন, সকল শ্রেণীর সাহিত্যের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার যে হইয়াছে তাহাতে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে কি? দেখার চেয়েও যুক্তির ক্ষমতা দেখে লোকে অবাক্ হয়ে থাকে। উপনিষদের 'সবই ব্রহ্ম' 'আত্মা ব্রহ্ম', 'আমি ব্রহ্ম', 'জগন্মিথ্যা' 'তাঁহাকে জানিলেই অমৃত হয়' 'জীবই ব্রহ্ম' এই সব সিদ্ধান্তের মধ্যে যে এত গূঢ় রহস্য আছে তাহার পরিচয় আমরা যুক্তি-বাদীদের নিকট হইতেই পাইয়া থাকি। যুক্তিবাদীর গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে মনে হয় ঋষিরা কি ভাল করিয়া দেখেন নাই? আর যদিও দেখিয়া থাকেন তাহা হইলেও ভাল করিয়া বলেন নাই। তাঁহাদের দেখা জিনিসেও বেশ যুক্তি বিন্যস্ত সাক্ষ্য দিয়াছেন। যুক্তির দাম চিরদিনই থাকিবে।

সমাধি প্রসূত দৃষ্টিশক্তির ও অলৌকিক প্রত্যক্ষের এত অপব্যবহার হইতে লাগিল যে সাধারণ লোকের সমাধিজ শক্তির উপর সন্দেহ বেশ গাঢ় হইল। জৈন দার্শনিকেরা সমাধি দ্বারা স্যাদ্বাদ প্রচার করিলেন, ও বৌদ্ধেরা ক্ষণিকবাদই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বৈদান্তিকেরা বলিলেন যে, জগতের পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম ও ইহা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। পাতঞ্জলেরা যোগের বিশ্লেষণ সুনিপুণভাবে করিয়াছেন, যোগই তাঁহাদের মতে প্রকৃষ্ট সিদ্ধির উপায়। যোগই ধর্ম্মমেঘ। এই দর্শনে দ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। এইজন্য বহু আর্য্য দার্শনিক সমাধিকে অত্যুচ্চ আসন দিলেও প্রাচীন সাংখ্যকেই অধিকতর প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষিদের কথাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে মনে হয়, তাঁহাদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ ছিল। সাংখ্যের প্রকৃতির, কণাদের

পরমাণুর, বেদান্তের মায়ার, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের, স্বভাববাদের, অদৃষ্টবাদের ও অন্যান্য বহু বাদের উল্লেখ আমরা পাইয়া থাকি। পরবর্ত্তী যুগে উপনিষদের মত বলিয়া অদ্বৈতবাদ; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি ব্যাখ্যাচাতুর্য্যে দেখান হইয়াছে। উপনিষদের বাক্যাবলীর সামঞ্জস্য করিতে গিয়া ইঁহারা বহু বাক্যের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহাবাক্য নির্ব্বাচন ইহার একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

কুমারিল ভট্ট তাঁহার শ্লোক-বার্ত্তিক নামক মীমাংসা গ্রন্থে যোগি প্রত্যক্ষের উপর আপনার নির্ভরতা দেখান নাই। তাঁহার মতে কোন প্রত্যক্ষই ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ক হইতে পারে না। প্রত্যক্ষের সীমা সকল সময়ই আছে। সমাধির কালে আমরা কোন বস্তুবিষয়ক ধ্যান করি। আমরা সেই বিষয়েরই অবিশ্রান্তভাবে স্মরণ করিয়া থাকি। সেই বিষয় স্মরণের সময় অন্য বিষয়ের কথা আমাদের মনের মধ্যে আসে না। সেই স্মরণ সেই বিষয়ের দৃঢ় ও অচল সংস্কার মনের মধ্যে গড়িয়া দিতে পারে। তাহারই ফলে আমাদের শয়নে স্বপনে জাগরণেও জনগণের সঙ্গে আলাপনে, ইতস্তত বিচরণেও স্থির হইয়া অবস্থানে, সেই বস্তুই একমাত্র আকর্ষণের সামগ্রী হইয়া থাকে। ইহার ফলে চিত্তে অসাধারণ একাগ্রতা জন্মিতে পারে ও ইচ্ছাশক্তির উপর বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণভাবে শাসন আসিতে পারে, পূর্ব্বার্জ্জিত সমস্ত সংস্কার ধ্বস্ত হইতে পারে ও নূতন মানুষ নির্ম্মিত হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বদর্শিতা কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না। এরূপ একাগ্রতার ফলে বুদ্ধির মার্জ্জন বেশ হইতে পারে। বুদ্ধির বিষয় থাকিলে বিষয় প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি আলোকের মত বিষয় সৃষ্টি করে না। কিন্তু বিষয় যখন অতীত ও অনাগত তখন বুদ্ধি বিষয় প্রকাশ করিবে কি করিয়া? যোগীর কল্পনাশক্তি প্রবল হইতে পারে এবং অনুমান করিবার শক্তিও অসাধারণ হইতে পারে; কিন্তু সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ তাঁহাদের কোনমতেই হইতে পারে না। তাঁহাদের দৃঢ়চিত্ততার, অদূর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার ও দূরদর্শিতার উপলব্ধি করিয়া প্রায় সকল লোকই তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যোগীও যে মানুষ এই কথাটী চাপা পড়িয়া যায় লোকে যখন তাঁহার অন্যান্য অলোকসুলভ শক্তি প্রত্যক্ষ করে। কুমারিল এই কথাই বারবার করিয়া বলিয়াছেন যে প্রত্যেক মানুষের ভ্রম প্রমাদ আছেই আছে। আর এক কথা যোগীদের মধ্যে মতভেদ হয় কি না? দুইটী বিরুদ্ধ মত সত্য হইতে পারে না। অতএব অন্ততঃ একজন প্রমাদী বলিতেই হয়। যোগী প্রত্যক্ষের অনুকূলে যতই যুক্তি দেওয়া হইয়াছে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশ্বাসের কথা আসিয়াছে। বিশ্বাসের কথা ধরিতে পারি না।

বেদ পবিত্রতার বর্ম্মে আপনাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে বলিবার ধৃষ্টতা কাহারও নাই। কিন্তু এখন একটা হাওয়া এসেছে উল্টা। 'সন্দেহ প্রত্যেক স্থানেই হওয়া উচিত, এই দাঁড়িয়েছে মতবাদ। পবিত্রতমও এ যুগে অপরীক্ষিত হইয়া নিস্তার পাইবে না। বেদ ভগবানের দ্বারা রচিত বলিলেও বেদের প্রতি সন্দেহ থাকিয়া যায়। বেদের রচয়িতা ভগবান্ হইলেন কেন? বেদ অভ্রান্ত সুতরাং ভগবান্ ইহার রচয়িতা। অভ্রান্ত ত কত গ্রন্থ আছে—সকলের রচয়িতা কি ভগবান্? বেদ অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, সুতরাং বেদ ভগবানের দ্বারা রচিত। বহু অভিধান অভ্রান্ত ও বহু জ্ঞানের ভাণ্ডার; কিন্তু সেই গ্রন্থসমূহও ভগবদ্দত্ত নহে। বেদে বহু অতীন্দ্রিয় বিষয় আছে, সে বিষয়াবলী সত্য; সুতরাং বেদ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ (ঈশ্বর) রচিত। বহু বিজ্ঞান-গ্রন্থে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের বিচার আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের গ্রন্থসকল ঈশ্বর প্রোক্ত নহে। বেদ সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। জগতের আদি অবস্থায় ভগবান্ ব্যতীত কি আর কেহ শিক্ষাগুরু থাকিতে পারেন? সুতরাং বেদ ঈশ্বর নির্ম্মিত। জগতের আদি অবস্থায় যে সব প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা। তাঁহাদের জ্ঞান ও বিদ্যাশিক্ষা সহজ। পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বশতঃ তাঁহারা জন্মের পর হইতেই সকল বিদ্যায় ও জ্ঞানে পারদর্শী। তাঁহাদের শিক্ষার জন্য বেদরচনা অনর্থক। অন্য প্রাণী সকল ত প্রজাপতিদের দ্বারাই শিক্ষিত হইতে পারেন, তাঁহাদের জন্য ভগবানের এত আয়াস স্বীকারের আবশ্যকতা কি? বেদ ভগবানের গ্রন্থ হইলেও তাহাতে প্রায় প্রতি বিষয়ের স্বল্প কথা বলা হইয়াছে কেন? বেদে বিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে কেন? সত্যকালের লোকেরা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিলেন' ইহাই হইতেছে প্রাচীন মত। এই মত মানিলে কলা বিজ্ঞানের বীজমাত্র আমরা প্রাচীনযুগে দেখি কেন? তাঁহাদের বিশদ বিদ্যা শিখিবার ক্ষমতা ছিল না? হ্যাঁ বা না যে কোন পক্ষ বলা যাক্ না কেন বিপদ ঘটিবেই ঘটিবে।

কেহ কেহ মনে করেন বেদের রচনার ও বিষয়ের কোন পরিবর্ত্তন নাই। এ জগতে যেমন হইয়াছে পর পর জগতেও তেমনিই হইবে ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জগতে ঠিক্ এইরূপই হইয়া গিয়াছে যেন বায়স্কোপের একটা ফিল্ম। যতবারই সেই পালা হইবে, ততবারই তাহা পূর্ব্বের একান্ত অনুরূপ হইবে। জগতে একবার যে বৈচিত্র্য হইয়া গিয়াছে, সেই বৈচিত্র্যের পুনরাবৃত্তি অন্য সকল জগতে হইয়া থাকে। বিশ্বনাথের একটীমাত্র গান জানা আছে। সেই গানটীর তিনি কেবলই আবৃত্তি করিয়া থাকেন। এই সব কথা যুক্তির ধার দিয়া যায় না। এরূপ মত মানিলে ঐশী শক্তির অনন্ত বৈচিত্র্য থাকে না। সেই শক্তি সসীম হইয়া পড়ে। বৃক্ষের দৃষ্টান্তে ঐশী শক্তির এই ধরণের সৃষ্টিশক্তি কল্পনা করা হইয়াছে। বৃক্ষ একবার বহু ফল দেয় ও সেই জাতীয় ফলই সে প্রতি বৎসর দিয়া থাকে। ঐশী শক্তির সৃষ্টি শক্তি এই ধরণের নয় কি? সৃষ্টি অনন্ত ও অনাদি—বেদও অনাদি। এই বেদ চিরদিনই স্মৃত হইয়া আসিতেছে; কারণ প্রথম জগতের উল্লেখ কোন স্থলেই পাওয়া যায় না। স্মৃতি অনুভবের ফল। কোথাও অনুভব না থাকিলে স্মৃতি হয় না; সুতরাং বেদের অনুভব কোন কালে হইয়াছে বলিতেই হইবে। সেকালের উল্লেখ করিলে সংসারের অনাদিত্ববাদ ধূলিসাৎ হয়। আর অনুভব স্বীকার না করিলে বেদই থাকে না, কারণ প্রতিকল্পেই বেদের স্মৃতি হইতে পারে না।

মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন বেদ নিত্য। বেদের রচনা কোন দিন

হয় নাই। এই শব্দরাশি চিরদিনই ছিল ও থাকিবে। দুইটা দিক্ দিয়ে এই মতের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কোন লোক বেদের রচয়িতা হইলে ইহার মধ্যে ভ্রম ও প্রমাদ থাকিবেই থাকিবে। অতএব ইহার কর্ত্তা স্বীকার করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয় কথা এই যে আমাদের একটা ধারণা আছে যে যত প্রাচীন সে ততই ভাল। সত্যকাল সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, কারণ সত্যকাল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বেদ প্রাচীনতম, কারণ বেদের প্রাচীনতার কোন সীমা নির্দ্দেশ নাই। সুতরাং বেদ পবিত্রতম। এ মতও আমাদের হৃদ্য বলিয়া মনে হয় না। পুরুষ কৃত শব্দেরই অর্থ বুঝা যায়। অন্য শব্দের অর্থ জানা যায় না। বজ্রনির্ঘোষে কে না শুনিতে পায় কিন্তু তাহার কোন অর্থ আছে কি? বেদ অর্থহীন শব্দরাশি ইহা কেহ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন কি? এরূপ বহু দোষ এই মতে আছে।

আমাদের আজকাল দর্শন রচনা করিতে হইলে বেদ বা সমাধি হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের উপর নির্ভর করা চলিবে না। বেদকে আমরা অসম্মান করিতেছি না ও সমাধিকেও ব্যর্থ বলিতেছি না। কিন্তু এদের দর্শনের উপর প্রভুত্ব থাকিবে না। বর্ত্তমানকালে দর্শন সম্পূর্ণ নূতনভাবে রচিত হইবে।

—

গৌতম বুদ্ধের উপদেশ

শ্রীচারুচন্দ্র বসু

যে মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, অনেকেই অনেক নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে বলেন অবতার, কেহ বলেন World Teacher, কেহ বলেন Great man, ইংরাজ কবি তাঁহাকে Teacher of Nirvan and Law বলিয়াছেন। যে নামেই তাঁহাকে অভিহিত করা যাউক না কেন, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, জগতের ইতিহাসে আর কোন দেশে, এত বড় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় প্রদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ভারতবর্ষ ধন্য হইয়াছে, পবিত্র হইয়াছে ও পৃথিবীর মধ্যে বরণীয় হইয়াছে। আমাদের পুরাণ বলিতেছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সহায়তায় ভারতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করেন ও সেই সঙ্গে মহাভারতের পরিকল্পনা করেন; কিন্তু ইতিহাস বলিতেছে যে, প্রকৃত যে মহাভারত বা Greater India গৌতম বুদ্ধই তাহার প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁহার যে অমৃতময় বাণী—তোমরা মনুষ্যের হিতের জন্য, মঙ্গলের জন্য, সুখের জন্য, জগতের প্রতি দেব-মনুষ্যের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ দেশে দেশে বিচরণ কর, আমার ধর্ম্ম প্রচার কর, সর্ব্বত্র পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও—তাহা ভারতের চতুঃসীমা মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, এসিয়া মহাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। সেই কারণে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের সংযোগ গৌতম বুদ্ধই সর্ব্বপ্রথম স্থাপন করেন ও সেই সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম্মের, সভ্যতার ও চিন্তার ধারা দেশে বিদেশে প্রচারিত হয়। এই প্রাচীন সভ্যতার অনুসন্ধান করিবার জন্যই আজ আমাদের বিশ্বকবি চীনে, জাপানে, তাতারে ও পারস্যে এমন কি সুদূর বালিদ্বীপেও গমন করিতেছেন। আপনারা শ্রবণ করিয়াছেন যে বৈশাখের পবিত্র তিথিতে তিনি কপিলবস্তুর অতি সন্নিকটে অবস্থিত লুম্বিনি উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই বৈশাখেরই পূর্ণিমা তিথিতে গয়াপ্রদেশে বোধি-বৃক্ষমূলে ছয় বৎসর ব্যাপী কঠোর সাধনার পর বুদ্ধত্ব লাভ করেন ও পরে পঁয়তাল্লিশ বৎসর মগধ, কাশী, কোশল ও শ্রাবস্তী প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিবার পর আশী বৎসর বয়সে কুশীনগরে মহাপরি-নির্ব্বাণ লাভ করেন। অদ্য এই পবিত্র দিনে তাঁহার সেই পুণ্যময় জীবন কাহিনী স্মরণ করে তাঁহার স্মৃতির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্যই আমরা সমবেত হইয়াছি।

যুগে যুগে মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া মানব-জীবনের রহস্য সমাধান করিয়াছেন। জীব কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল এবং কোথায় বা ইহার পরিণতি, ভারতভূমে এই প্রশ্ন বারম্বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, ভারতের ঋষি ও মনীষি-বৃন্দ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, উপনিষদ্‌কার ঋষিগণও অতি উজ্জ্বল কবিত্বপূর্ণ ভাষাতে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু গৌতম বুদ্ধ যেমন পরিষ্কার ভাষায় ও প্রবল যুক্তির সহিত এই জটিল প্রশ্নের সমাধান করিয়া গিয়াছেন, এরূপ অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রশ্নের সমাধান করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে বারম্বার এই প্রশ্ন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন মায়াবিজৃম্ভিত সংসার সাগরে জীবকুল নিরন্তর ভাসিতেছে। এই সংসার প্রবাহের বারির ন্যায় নিয়ত গতিশীল ও জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণ-স্থায়ী। সুখদুঃখের ভীষণ চক্রের আবর্ত্তনে জীবকুল নিষ্পেষিত হইতেছে। দুঃখের করাল কবল হইতে জ্ঞানহীন কামনার ক্রীড়নক অসহায় মানবের মুক্তির পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর রহস্যভেদ পূর্ব্বক জীবকে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর পরপারে লইয়া যাওয়াই তাঁহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য ছিল। এই নিমিত্ত ললিতবিস্তর গ্রন্থকার তাঁহাকে জরামরণবিঘাতীভিষগ্‌বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গৌতমের উপদেশকে সাধারণতঃ লোকে দুঃখবাদ বলিয়া থাকে। তাঁহার পূর্ব্বে কি পরে ঠিক বলিতে পারি না, আমাদের দেশে সাংখ্যকার ও অন্যান্য দার্শনিক-গণও এই দুঃখের অস্তিত্ব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ও সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু গৌতম বুদ্ধই এই সত্য নিজ জীবনে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার জন্যই কঠোর জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ও উহার মূলতত্ত্বে উপনীত হইবার জন্য ছয় বৎসর ব্যাপী কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সাধনার বিবরণ মহাবস্তু, ললিত বিস্তর ও বুদ্ধচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত ও অর্দ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থে ও জাতক ও মহাবগ্‌গ প্রভৃতি পালিগ্রন্থ মধ্যে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। অনাহার অনিদ্রায় দিন

কাটিতে লাগিল ; কত শীত, আতপ, বর্ষা, বিদ্যুৎ বজ্র তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া গেল, তথাপি সে সমস্তে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না ; ঈদৃশ তপ.সাধনে কাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার কান্তি কালিমায় পরিণত হইয়াছিল, শরীরের রক্ত মাংস শুকাইয়া গিয়াছিল, শরীর অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল, তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না, কঠোরতার সীমা ছিল না। এই সময়ে প্রথমে আস্ফানক ধ্যান ও পরে ললিতব্যূহ নামক ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ক্রমে তিনি এই প্রকার 'কৃচ্ছ্র সাধনের অসারতা বুঝিতে পারিলেন, অনাহার ব্রত পরিত্যাগ করিয়া সুযাতা প্রদত্ত পায়সান্ন গ্রহণ করিলেন। নৈরঞ্জনাতীর হইতে কিছু দূরে অবস্থিত এক অশথবৃক্ষমূলে আগমন করিলেন ও এক দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত ধ্যানের উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে লাগিলেন :—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং,
ত্বগস্থি মাংস প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্যবোধিং বহুকল্প দুর্লভং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যত॥

এই আসনে আমার শরীর শুষ্কতা লাভ করুক্ এবং আমার ত্বক্, অস্থি ও মাংস এই স্থানে বিলীন হউক্ : কিন্তু দুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া আমার দেহ এই আসন হইতে বিচলিত হইবে না। ক্রমে বৈশাখের পূর্ণিমা তিথিতে উপনীত হইলেন। রাত্রির প্রথম যামে তাঁহার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল, দ্বিতীয় যামে তাঁহার পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি মনোমধ্যে উদয় হইল এবং রাত্রির শেষ যামে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা বিলোড়ন পূর্ব্বক দুঃখের মূলতত্ত্বে উপনীত হইলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন, জীব জন্মিতেছে, মরিতেছে, পুনরায় জন্মিতেছে, অনবরত সংসারস্রোতে জীবকুল ভাসমান হইতেছে, কুম্ভগত ভ্রমরের ন্যায় জীবকুল ঘুরিতেছে, জরাব্যাধিমরণের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় পাইতেছে না.তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন, তিনি প্রণিধান করিলেন,"কস্মিন সতিজরামরণ ভবতি, প্রণিধান মাত্র প্রতিভাত হইল, জাতি থাকাতেই জরামরণ হইতেছে, তাহা হইলে জাতিই বলুন, জন্মই বলুন বা শরীরোৎপত্তিই বলুন, যে নামেই অভিহিত করুন না কেন, ইহাই জরামরণের কারণ। এক্ষণে কি থাকাতে এই জন্ম বা শরীরোৎপত্তি হইতেছে, তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল যে, ভব বা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মমূলক কর্ম্ম বশতঃ জীবের জন্ম হইতেছে,তাহার পর তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল, এই ভব বা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মমূলক কর্ম্ম কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, কি থাকাতে এই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মমূলক কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, প্রতিভাত হইল, উপাদান থাকাতেই এই ভব বা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মূলক কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। উপাদান অর্থে কায়িক, বাচিক বা মানসিক উদ্যম। এক্ষণে এই উপাদান বা কায়িক, বাচিক বা মানসিক উদ্যম কি হইতে উৎপন্ন হয়? সহজেই প্রতিভাত হইল তৃষ্ণা হইতেই উপাদানের উৎপত্তি ; তৃষ্ণা অর্থে আসক্তি বা সুখস্পৃহা। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা জন্মিল, এই তৃষ্ণার মূল কোথায়? কোথা হইতে এই তৃষ্ণার উৎপত্তি? অমনি প্রতিভাত হইল বেদনা। বেদনা অর্থে সুখ-দুঃখাদি ভোগ, এই সুখ-দুঃখাদি ভোগ বা বেদনা হইতেই তৃষ্ণার উৎপত্তি। কি থাকাতেই এই বেদনার উৎপত্তি হয়। প্রণিধান মাত্র দেখিতে পাইলেন স্পর্শ থাকাতেই বেদনার উৎপত্তি। স্পর্শ অর্থে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের সংযোগ। পরে প্রণিধান করিলেন, কি থাকাতে স্পর্শ হয়, প্রতিভাত হইল ষড়ায়তন থাকাতেই স্পর্শের উৎপত্তি হয়, ষড়ায়তন অর্থে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন, তার পর প্রশ্ন হইল কি থাকাতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি? ষড়ায়তনের বীজ কি? নামরূপ থাকাতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি? নামরূপ অর্থে ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ ও বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কার এই স্কন্ধ ত্রয়। এক্ষণে নামরূপের কারণ দেখিলেন, বিজ্ঞান ; বিজ্ঞান থাকাতেই নামরূপের উৎপত্তি ; পঞ্চইন্দ্রিয় ও তাহার কার্য্য, যেমন দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ ইহাকেই বিজ্ঞান বলে, এই বিজ্ঞানই নামরূপের কারণ, এক্ষণে কি হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি? দেখিলেন সংস্কার বা বাসনা সমূহ হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এক্ষণে এই সংস্কারের উৎপত্তি, কোথা হইতে হয়, সংস্কারের উৎপত্তি অবিদ্যা হইতে, অবিদ্যা অর্থে অহংকার বা মমকার, ইহাই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। দুঃখের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান, দুঃখের কারণ বিষয়ে অজ্ঞান, দুঃখের নিরোধ বিষয়ে অজ্ঞান, দুঃখ নিরোধের উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞান, অর্থাৎ চারি আর্য্যসত্য সম্বন্ধে অজ্ঞান ; ইহার ফল হইতেছে, অনিত্য বস্তুকে নিত্যজ্ঞান, দুঃখকে সুখ জ্ঞান, অনাত্মকে আত্মজ্ঞান ; এই অজ্ঞানই ভ্রমের জননী। এখন উপলব্ধি করিলেন, অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরামরণ শোকপরিদেবদুঃখদৌর্ম্মনস্য উপায়াস ইত্যাদি। জগতে যত কিছু দুঃখ কষ্টের উৎপত্তি অবিদ্যা হইতে, এই অবিদ্যার ধ্বংসে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। ইহারই নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ বা দুঃখের দ্বাদশ নিদান, এই বিষয়টী বুদ্ধের নিজস্ব, ইহাই তাঁহার সাধনার ফল। তিনি সেই সঙ্গে উপলব্ধি করিলেন, দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়। তিনি আরও দেখিলেন, জাতি বা জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ও অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, পঞ্চস্কন্ধ ধারণই দুঃখ, পুর্নজন্মের হেতুভূত কারণ তৃষ্ণা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি ও তৃষ্ণার নিবৃত্তিতেই দুঃখের নাশ।

ভগবান বুদ্ধ দুঃখ বিমোচনের উপায় স্বরূপ চারি আর্য্য সত্যের উপদেশ দান করিয়াছেন ; দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় বা মার্গ। চিকিৎসা শাস্ত্রেও এই চারিপ্রকার মূল সত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা রোগ, রোগের হেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য। চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণেতা শারীরিক ব্যাধি বিমোচনের জন্য ব্যাধি ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যোগশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি ভবব্যাধি হইতে জীবের মুক্তির জন্য হেয়, হেতু, হান ও হানোপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। দুঃখবহুল সংসার হেয়, প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ সংসার হেতু, এই সংযোগের নিবৃত্তি হান, ও হানের উপায় সম্যগদর্শন।

বোধিসত্ত্ব যে মুহূর্ত্তে জগতে দুঃখের উৎপত্তি ও তাহার নিরোধের উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াই নিম্নোক্ত উদান উচ্চারণ করিলেন।

অনেক জাতিসংসারং সন্ধ্যাবিস্সম অনিবিবসং
গহকারক গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুনগেহং না কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসঙ্খিত—
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হান খয়মজ্ঝগা।

সেইরূপ গৃহনির্ম্মাতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে, কিন্তু তাহাকে না পাইয়া কতবার ভ্রমণ করিলাম, কতবারই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিলাম, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ দুঃখকর। হে গৃহকারক, এইবার তোমাকে দেখিয়াছি, আর গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারিবে না, (সংসারাবর্ত্তে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিব না ; তোমার সকল কাষ্ঠদণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, গৃহকূট (গৃহযুক্ত কর্ণিকামণ্ডল) নষ্ট হইয়া গিয়াছে, নির্ব্বাণগত (সংস্কার সমূহ হইতে মুক্ত) আমার চিত্তে সকল তৃষ্ণা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ—
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার
হে গৃহকারক ! গৃহ না পারিবে রচিবারে আর
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কার বিগতচিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া গৌতম বুদ্ধই উহাকে সর্ব্বপ্রথম এই ভারতভূমে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি বা নির্ব্বাণলাভের উপায়, এই উপায়কেই Noble Eightfold path বা আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। তিনি বলেন—প্রব্রজিতগণ প্রায়শঃ দুইটী পন্থার একটী অবলম্বন করেন। কেহ হীন গ্রাম্য ও সাধারণ লোকের ন্যায় সর্ব্বদা কামসুখে রত থাকে, তাহারা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান বা ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধের প্রয়াস করে না। অপর শ্রেণীর প্রব্রজিতগণ সতত নিজকে নিপীড়িত করেন, শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই উভয় পদ্ধতিই হেয় ও আর্য্যজনবিগর্হিত ; এই উভয় অন্ত ত্যাগ করিয়া তথাগত মধ্যপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দেন। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই মধ্যপথ বা middle path। সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসঙ্কল্প, সম্যকবাক্, সম্যককর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসমাধি। ইহা সাধনার সহজ, সরল উপায়; ইহাতে শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন নাই বা কোনরূপ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি নাই, ইহাতে আছে চিত্তবিক্ষেপ নিবৃত্তি, মনের উপর সংযম ও চিত্তের একাগ্রতা সাধন, ইহাতে আছে, সকল প্রকার পাপ কর্ম্ম হইতে বিরতি ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ; ইহাতে আরও আছে বিশ্বের প্রতি মৈত্রী ও জরাব্যাধিক্লিষ্টের প্রতি করুণা। এই আটটী মার্গ বা প্রস্থান শীল সমাধি ও প্রজ্ঞায় বিভক্ত। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্পকে প্রজ্ঞাস্কন্ধ বলে ; সম্যক ব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসমাধি, এই তিনটীকে সমাধি স্কন্ধ বলে ও সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম্মান্ত এবং সম্যক আজীব ইহা শীল স্কন্ধের অন্তর্গত। ইহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, ও অন্তে কল্যাণ, ইহাই কল্যাণ ধর্ম্ম। নিম্নোক্ত দশটী নিষেধবিধিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—



গৌতম-বুদ্ধ

১। পানাতিপাত—প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি
২। অদিন্নাদান—অদত্তা দান বা চুরি
৩। কামেসুমিচ্ছাচার—মিথ্যা কামাচার বা পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি
৪। মুসাবাদ—মিথ্যা কথা বলা
৫। পিসুনবাদ—ভেদবাক্য
৬। করুসবাদ—কর্কশ কথা বলা

৭। সম্ভপ্পলাপ—সম্প্রলাপ বা নিরর্থক কথা বলা

৮। অভিজ্ঝা—পরদ্রব্যে লোভ

৯। ব্যাপাদ—মানসিক হিংসা

১০। মিচ্ছাদিট্‌ঠি—বিপরীত জ্ঞান

এই অকুশল বিধিগুলি কায় বাক্য ও মনভেদে ত্রিবিধ।

অর্দ্ধযুগব্যাপী অবিচলিত সাধনার পর তাঁহার সমস্ত কামনা বা প্রবৃত্তি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। পূর্ণ শান্ত উপরত হইয়া তিনি নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক বোধিবৃক্ষমূলে নির্ব্বাণ বা বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধদেব ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে সেই মহারত্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন। সেই তেজঃপুঞ্জ জ্বলন্তপাবকোপম মহাগুরুর চরণে লক্ষ লক্ষ লোক ভক্তিভরে প্রণত হইল। দলে দলে ভিক্ষুগণ তাঁহার শ্রীমুখ-কীর্ত্তিত পবিত্র ধর্ম্ম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে সর্ব্বসাধারণে বিলাইতে লাগিলেন। উচ্চনীচ ভেদ তিরোহিত হইল, প্রেমের প্রবল বন্যায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হইল। প্রচলিত শুষ্ককর্ম্মকাণ্ড-বহুল ধর্ম্ম সেই উদীয়মান নবধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রভায় মলিন হইয়া গেল। জনসাধারণ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বুদ্ধদেবের সেই উদার উন্মুক্ত ধর্ম্মরাজ্যে আশ্রয়লাভ করিয়া নবজীবন লাভ করিল। ধীরে ধীরে বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া সেই ত্যাগ ও নিষ্কাম মূলক পবিত্র ধর্ম্ম পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ভারতের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্মরূপ বৃহৎ অট্টালিকা তিনটী স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহা হইতেছে, অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। জগতের যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি ও চিন্তা করিতেছি, সকলেই অনিত্য এবং পরিবর্ত্তনশীল, এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার কোন পরিবর্ত্তন নাই, কি কামলোক, কি রূপলোক বা অরূপলোক সকল স্থানেই পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমরা বাল্যে যাহা ছিলাম, যৌবনে তাহা নাই, যৌবনে যাহা ছিলাম, বার্দ্ধক্যে তাহা নাই, এমন কি প্রাতে যাহা ছিলাম, বৈকালে তাহারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দীপশিখার দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, রাত্রির প্রথম যামে যে দীপশিখা জ্বলিয়াছে, দ্বিতীয় যামে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং তৃতীয় যামে যাহা জ্বলিয়াছে, দ্বিতীয় হইতে স্বতন্ত্র। তবে যে আমরা একই দীপশিখা দেখিতেছি, উহা একটা ধারামাত্র। নদীমধ্যে যে জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, একটীর সহিত অন্যের সংযোগ নাই, আছে কেবল একটা ধারামাত্র। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থই, Molecule বলুন, Atom বলুন, এমন কি যাহা কল্পনারও অতীত, যাহাকে Electrons বলে, তাহাও অস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল, সেই কারণেই অনিত্য। পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, পতি, পত্নী, পুত্র ও কন্যা সকলেই অনিত্য; আমরা অবিদ্যা বশতঃ, এই অনিত্য পদার্থকে নিত্য বলিয়া ধারণা করি, ইহাই দুঃখ কষ্টের মূল কারণ। যতদিন পর্য্যন্ত জীব বা পুদ্গল জন্মমৃত্যুর অধীন থাকিবে, ততদিন দুঃখ অপরিহার্য্য। এই দুঃখের মূল কারণ কি? ইহার কারণ কাম বা তৃষ্ণা। গৌতম বুদ্ধ ইহাকে রূপকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, গৃহকারক বা দেহরূপ গৃহ-নির্ম্মাতা। কাম বা আসক্তির নিবৃত্তিই হইল দুঃখের নিবৃত্তি, ইহারই নাম বিরাগ বা তৃষ্ণাক্ষয়, ইহারই নামান্তর নির্ব্বাণ বা মুক্তি। এই কামকেই সমস্ত পাপ বা দুঃখের মূল কারণ বলিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহারই নাম মার বা মৃত্যু। এই মারকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া, নিজের আয়ত্তাধীনে আনয়ন করিয়াই গৌতম বুদ্ধ মারজিৎ হইয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধত্ব বলুন, অমৃতত্ব বলুন বা নির্ব্বাণই বলুন, যে নামেই অভিহিত কর না কেন, এই মারকে জয় করিয়া সেই অবস্থা লাভ করেন। এই কারণেই এই মার-বিজয় আখ্যায়িকাটী বৌদ্ধ গ্রন্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা একটী রূপকমাত্র, ইহার অর্থ পাপের সঙ্গে পুণ্যের সংগ্রাম, মোহের সঙ্গে বিবেকের সংগ্রাম, প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির সংগ্রাম। কালিদাস কুমারসম্ভবে এই কথাই বলিয়াছেন, কালিদাসের হাতে, এই কন্দর্প বিজয় আখ্যায়িকাটী আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তিনি দেখাইয়াছেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কাম দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছিল, ততক্ষণ পার্ব্বতী মৃত্যুঞ্জয়—মারজিৎ-মহাদেবকে লাভ করিবার আনন্দ অনুভব করিতে পারেন নাই। উভয় বর্ণনায় অনেক সৌসাদৃশ আছে, বলা বাহুল্য, কুমারসম্ভব কাব্য বা শিবপুরাণ ললিতবিস্তর গ্রন্থের অনেক পরবর্ত্তী। বোধিসত্ব মারের সহিত যুদ্ধ ও তর্ক করিতে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেব বৃথা তর্ক বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া একেবারে ক্ষণকাল মধ্যেই কন্দর্পকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ অনিত্য, দ্বিতীয় লক্ষণ দুঃখ এবং তৃতীয় লক্ষণ অনাত্ম। ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তা সমূহের মধ্যে পরস্পর অতি বিরুদ্ধ দুইটী মত দেখা যায়। এক মতে বলে, আত্মা আছে, অন্য মতে বলে আত্মা নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রভেদ এই স্থানে। বেদপন্থী বা আত্মবাদীদের মূল কথা হইল, আত্মার নিত্যত্ব, বৌদ্ধ মতাবলম্বী আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। আত্মবাদীরা বলেন আত্মা স্বতন্ত্র, দেহাদির স্বামী, নিত্য কর্ত্তা, জ্ঞাতা ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বলেন, আত্মা যদি এইরূপই হয়, তবে সে আত্মা কোথায়? তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই বিশ্বের মধ্যে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নাই। অতএব আত্মা নামে যদি কিছু থাকে, তবে এইগুলির মধ্যে কোন একটী অথবা ইহাদের সমষ্টি বলিতে হয়। আত্মা বলিয়া বস্তুতঃ কোন পদার্থ নাই; উহা কেবল একটা সঙ্কেত মাত্র। যাহাকে আত্মা বলা যায়, পঞ্চস্কন্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবান বুদ্ধ তন্ন তন্ন ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারাই দেখাইয়াছেন যে, জগতের কোন বস্তুই আমার নহে, কোন বস্তু আমি নহি বা কোন বস্তুই আমার আত্মা বা সত্বা নহে। ন এতং অস্মিং, ন এসহি অহম অস্মিতি, নমে এস অত্ততি। এই অনাত্মবাদকেই কোন কোন দার্শনিক ইংরাজ লেখক, The flower of Indian thought বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গৌতম বুদ্ধ আত্মার লেশ মাত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতে কোন প্রকার আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই জীব বা পুদ্গল দুঃখ কষ্টের ভাগী হয়। মোট কথা আমরা আত্মা বলিয়া যাহা বুঝি তাহা অনিত্য ও দুঃখপদবাচ্য।

গৌতম বুদ্ধ আত্মার নিত্যত্ব বা পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে পুদ্গল কেবলমাত্র স্কন্ধের সমষ্টি। তাহা হইলে স্কন্ধের বিনাশের পর কি অবশিষ্ট থাকে, কেই বা নির্ব্বাণ লাভ করে? এই সংশয় কেবল যে আমাদের মনে উদয় হয়, তাহা নহে, বুদ্ধশিষ্য মালুঙ্ক পুত্রের মনোমধ্যেও এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি ভগবান বুদ্ধ সমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন—"ভগবন! দেহ ও আত্মা এক কি না, কিম্বা দেহ ও আত্মা পৃথক, দেহত্যাগের পর ভগবান কি অবস্থায় অবস্থান করিবেন, সে বিষয়ে ত কোন উপদেশ দান করেন নাই।" ভগবান উত্তর করিলেন—মালুঙ্কপুত্র, মনে কর, তুমি কোন সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছ ও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছ, তোমার আত্মীয়গণ যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য, চিকিৎসক আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তখন কি তুমি বলিবে যে, বিদ্ধ বাণ মোচন করা আবশ্যক নাই, আমি অগ্রে জানিতে চাই যে, যে ব্যক্তি আমাকে বাণ বিদ্ধ করিয়াছে, সে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, তাহার কোন জাতি বা কি কুল, সে দীর্ঘাকৃতি বা খর্ব্বাকৃতি। সেইরূপ হে মালুঙ্কপুত্র, জন্ম, জরা ব্যাধি ও মৃত্যু তোমাকে আক্রমণ করিয়াছে, বাসনা বা তৃষ্ণাজালে তুমি আবদ্ধ, এক্ষণে বৃথা বিতর্কাদি পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্ম জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাও, তোমার কি তাহাই করা উচিত নহে? কারণ বৃথা বিতর্কাদি দ্বারা সত্য লাভ হয় না বা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, ধর্ম্মসিদ্ধ হয় না, ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয় না, ইহারা নির্ব্বেদের জন্য নহে, বৈরাগ্যের জন্য নহে, নিরোধের জন্য নহে, উপশমের জন্য নহে, অভিজ্ঞার জন্য নহে, সম্বোধের জন্য নহে, নির্ব্বাণের জন্য নহে। আমি তোমাকে চারি আর্য্য সত্য ও অষ্টাঙ্গ মার্গ শিক্ষা দিয়াছি, তোমার কি উচিত নহে, তদ্রূপ সেই শিক্ষা অনুশীলন করা? আমি এই বিষয়গুলিকে ঐকান্তিক বলিয়া দিয়াছি ও জানাইয়াছি। সেই বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা যখন অবিদ্যা দূরে যাইবে, সম্যক সমাধির অবস্থায় উপনীত হইবে, তখন তোমার সর্ব্ব সংশয় অপনীত হইবে, নির্ব্বাণ কি আপনিই প্রতিভাত হইবে। ভগবান বারম্বার বৃথা বিতর্কাদি পরিত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দান করিয়াছেন।

সিঞ্চ ভিক্‌খু ইমং নাবং, সিত্তাতে লহুমেস্সতি
ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নির্ব্বাণ মেহিসি।

নৌকা যেমন জলপূর্ণ থাকিলে শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারে না, অপর দিকে ডুবিবার ভয় থাকে, সেরূপ স্থলে নৌকা হইতে জলসিঞ্চন আবশ্যক হয়, সেইরূপ হে ভিক্ষু তোমার দেহরূপ নৌকা হইতে বৃথা বিতর্কাদি রূপ জল সিঞ্চন কর, উহা লঘু হইবে, রাগ দ্বেষাদির বন্ধন ছেদন করিয়া তুমি শীঘ্র নির্ব্বাণ সাগরে উপনীত হইবে।

গৌতমের প্রধান শিক্ষা হইতেছে বাসনার ক্ষয় বা তৃষ্ণার নিবৃত্তি। তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইলেই জীবের রাগ দ্বেষ ও মোহ দূরে যায় ও সেই সঙ্গে জীবও জন্ম জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। অনেকেই প্রশ্ন করেন যে, জীব যদি পাঁচটী স্কন্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তখন এই স্কন্ধের বিনাশ বা ধ্বংসের পর আর কি থাকে? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, স্কন্ধরূপ অনিত্য বস্তু যখন দূরে যায়, তখন একমাত্র নিত্য বস্তু যে নির্ব্বাণ তাহাই বিদ্যমান থাকে, কারণ উহা নিত্য, শাশ্বত, অনিমিত্ত ও বিমোক্ষ; উহা Annihilation or Extinction or Negation নহে। ইহাকে নির্ব্বাণই বলুন বা শূন্যই বলুন, উহা মানব চিন্তার সর্ব্বোচ্চ সোপান। দার্শনিক চিন্তা ইহা অপেক্ষা আরও উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে অনেক প্রকার ধ্যান ধারণার উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে শূন্যতার ধ্যানই সাধন মার্গের উচ্চতম সোপান। এখানে কোন পার্থক্য বা ভেদাভেদ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, অস্তি নাই, নাস্তি নাই, উহা অস্তিনাস্তির সমন্বয়, এখানে উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, উহা উৎপত্তি ও বিনাশের মিলন স্থান, এখানে নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব এই সকল আপাত-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম পরস্পরের বিরোধ ত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থিত আছে; ইহা সৎ নহে, অসৎ নহে, সৎ ও অসতের মিলন নহে, বা সৎ ও অসতের অভাব নহে। ইহা বাক্য ও মনের অগোচর; এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। এই কারণেই ঋষিগণ নেতি নেতি বলিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, এই নেতি নেতি Negation নহে; ইহা অস্তি নাস্তি এবং ভাব ও অভাবের মিলন। সেই জন্যই ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন—হে সুভূতে, ইহা (এই নির্ব্বাণ বা শূন্যতা) গম্ভীর, ইহা অপ্রমেয় ও অক্ষয়। ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—

মুঞ্চ পুরে, মুঞ্চ পচ্ছতা, মজ্‌ঝে মুঞ্চ, ভবস্স পারগূ।
সব্বত্থ বিমুক্ত মানসো ন পুন জাতি জরা উপেহিসি।

হে ভিক্ষু তোমার সম্মুখে, মধ্যে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সংসারের পরপারে গমন কর এবং সর্ব্ব প্রকারে বিমুক্ত চিত্ত হইলে তোমাকে জন্ম জরা ভোগ করিতে হইবে না

গৌতম বুদ্ধই সর্ব্বপ্রথম ভারতভূমে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহার পূর্ব্বে ধর্ম্মের উচ্চতত্ত্ব কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। গৌতম বুদ্ধই সর্ব্বপ্রথম সকল শ্রেণীর ও সকল বর্ণের লোককে তাঁহার ধর্ম্মমধ্যে আশ্রয় দান করেন। তাঁহার শিক্ষা অতি উদার, অতি উচ্চ, তাহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা আদৌ লক্ষিত হয় না। সেই সকল উপদেশ সর্ব্বদেশের সকল জাতি ও সকল সময়ের উপযোগী। ভিক্ষুদিগের আদর্শ জীবন তিনি সকল শ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন, সেই কারণে কাশ্যপ ও সারিপুত্র প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সংঘমধ্যে যেরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, নাপিত জাতীয় উপালিও সেইরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অনন্ত অসীম সমুদ্রবারির যেমন একটীমাত্র স্বাদ অনুভব করা যায়, সেটী হইতেছে তাহার লবণত্ব, সেইরূপ নির্ব্বাণরূপ মহাসাগরের একটীমাত্র স্বাদ বিদ্যমান আছে, সেটী হইতেছে মুক্তি। যেমন গঙ্গা, যমুনা, মাহি ও অচিরাবতী প্রভৃতি নদী একবার সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলে, তাহার আর পার্থক্য থাকে না, উহারা যেমন মহাসমুদ্রে এক হইয়া যায়, সেইরূপ নির্ব্বাণরূপ মহাসাগরে জীব প্রবিষ্ট হইলে, তাহার জাতি বর্ণের আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। গৌতম বুদ্ধ জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড কোথায়, তাহা

বুঝিয়াছিলেন, জাতির প্রাণশক্তি কোথায় তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ত্যাগের মন্ত্রে যেরূপ সাড়া দেয়, এরূপ আর কিছুতেই লক্ষিত হয় না। আজ স্বামী বিবেকানন্দ যে ত্যাগ ও সেবা ধর্ম্মের মহিমা চারিদিকে প্রচারিত করিয়াছেন ও যাহার মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া শত শত গৈরিকধারী যুবক তাঁহার পতাকাতলে মিলিত হইয়াছেন, সেই ত্যাগ ও সেবা ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম পথ প্রদর্শক গৌতম বুদ্ধ।

বুদ্ধদেবের দেহ ত্যাগের অব্যবহিত পরে, মহাস্থবির কাশ্যপের নেতৃত্বে, সপ্তপর্ণি গুহাতে যে প্রথম ধর্ম্মসঙ্গীতির অধিবেশন হয়, তাহাতে ৫০০ সংসারত্যাগী ভিক্ষু যোগ দান করেন। ইহার শত বৎসর পরে বৈশালী নগরীতে স্থবির যশের নেতৃত্বে যে দ্বিতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতির অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রায় সাত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু যোগদান করেন। তাহার পর বুদ্ধ নির্ব্বাণের ২৩৬ বৎসর পরে, দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরে পাটলিপুত্রের ধর্ম্মসঙ্গীতির তৃতীয় অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রায় এক হাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। প্রায় নয় মাস ধরিয়া এই অধিবেশন চলিয়াছিল।

এরূপ কথিত আছে যে, অশোকপুত্র স্থবিরমহেন্দ্র যখন সিংহল দেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, সিংহলরাজ তিষ্য তাহার গৈরিক-বাস দেখিয়া আশ্চর্য্য হন ও সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যে, মগধে কয়জন এরূপ ভিক্ষু আছেন। ইহার উত্তরে মহেন্দ্র বলেন যে, সমগ্র মগধ কাষায়বাসের উজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত। Magadha glitters with yellow robes. এক্ষণে আমরা Missionary বলিলে যাহা বুঝি, গৌতমবুদ্ধই জগতের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম Missionary। তাঁহার ধর্ম্ম যে, তিব্বত, চীন, মহাচীন, তাতার, জাপানে একদিকে, অন্যদিকে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, আসাম প্রভৃতি দেশে, পশ্চিমে এমন কি এসিয়া মাইনর, ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, উহা তাঁহার জরামরণ-সঙ্কুল সংসারে শান্তিপ্রদ নির্ব্বাণ ধর্ম্ম প্রচারেরই ফল।

তাঁহার ধর্ম্মমধ্যে পুরুষদিগের যেরূপ অধিকার ছিল, স্ত্রীলোকদিগকেও সেইরূপ সমান অধিকার দিয়াছিলেন। জগতের ইতিহাসে ইনিই সর্ব্বপ্রথম ভিক্ষুণি সংঘ স্থাপন করেন ও তাঁহার মাতৃস্বসা মহাপ্রজাবতী গৌতমী প্রথম ভিক্ষুণী সংঘে যোগদান করেন। তৎপরে তাহার পত্নী যশোধরা উহাতে যোগদান করেন। অনেকেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক নটীর পূজা দেখিয়াছেন, ইহা বৌদ্ধ আলেখ্য, সেইরূপ অনেক স্ত্রীলোক তাঁহার ধর্ম্মে আশ্রয়লাভ করিয়া পরাশান্তি লাভ করিয়াছেন।

বৌদ্ধনীতি জগতে অতুলনীয়, কোন দেশের বা কোন ধর্ম্মের নৈতিক উপদেশ ইহার সহিত তুলনা হয় না। অতি সহজ ও সরল কথায় এই নীতির মূল তত্ত্বগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

সব্বপাপস্স অকরণ কুশলস্স উপসম্পদা
সচিত্তপরিয়োদপণং এবং বুদ্ধানসাসন

কোনপ্রকার পাপকর্ম্ম না করা, কুশলকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা এবং চিত্তকে নির্ম্মল রাখা ইহাই বুদ্ধের শাসন।

নহি বেরেন বেরানি সম্মীতীধ কুদাচন
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্ততো।

জগতে শত্রুতা দ্বারা কখনও শত্রুতা দমন করা যায় না, পরন্তু শত্রুতা শূন্যতা দ্বারা ইহাকে দমন করা যায়, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

অকোধেন জিনে কোধং অসাধু সাধুনা জিনে
জিনে কদরিয় দানেন সচ্চেন অলিকবাদিন।

ক্রোধকে অক্রোধ (ক্ষমা) দ্বারা জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে, কৃপণকে দান দ্বারা জয় করিবে এবং মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করিবে।

তাঁহার সময়ে সমাজমধ্যে ব্রাহ্মণদিগের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। এই ব্রাহ্মণ একাধিপত্যের মূলে তিনি আঘাত করিয়াছিলেন ও সকল বর্ণকে সমান অধিকার দান করিয়াছিলেন।

তিনি ধম্মপদের ব্রাহ্মণবগ্‌গে বলিয়াছেন যে,ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইলে, কিংবা ব্রাহ্মণগর্ভজাত হইলে আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি না, যিনি আসক্তি রহিত এবং যিনি নিষ্পাপী, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

যাঁহার তৃষ্ণা বিদ্যমান নাই এবং যিনি সম্যক জ্ঞান দ্বারা সংশয় ছেদন করিয়া অমৃতপদ লাভ করিয়াছেন তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। যিনি পাপ ও পুণ্য উভয় বন্ধন হইতে মুক্ত আছেন, যিনি শোকশূন্য, রাগাদি রূপ রজ হইতে মুক্ত ও নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। এইরূপ শত শত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার উপদেশের উদারতা ও মহত্ব বুঝাইতে পারা যায়।

গৌতমবুদ্ধের মহত্ব আমরা ভুলিয়াছি; তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব বা তাঁহার চরিত্রের সম্যক ধারণা করিবার সামর্থ্য আমরা হারাইয়াছি, ভারতীয় চিন্তা ধারায় বা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যে বৌদ্ধ-যুগের প্রভাব আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। উহা কেবলমাত্র ইতিহাসের গবেষণার বিষয় হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধের প্রতি অনাদরই আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির কারণ হইয়াছে। যে জাতি আত্মবিস্মৃত, বা যে জাতির অতীত দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, তাহাদের ভবিষ্যতের দৃষ্টিও সঙ্কীর্ণ অবস্থা লাভ করে। কিন্তু সুখের বিষয় মহাবোধি সোসাইটী গত ৪০ বৎসর ব্যাপী চেষ্টায়, বিশেষতঃ ইহার প্রতিষ্ঠাতা ভিক্ষু দেবমিত্র ধর্ম্মপালের ঐকান্তিক চেষ্টায়, যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে ও সেই সঙ্গে কতিপয় ভারতবাসীর সহায়তায় বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার জন্মস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম, সাহিত্য ও দর্শনের পুনঃ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। মহাবোধি সোসাইটী এই কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে প্রাচীন বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন অনুসারে এক মন্দির স্থাপন করিয়াছেন এবং এই মন্দির মধ্যে এক মনোরম বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ও সেই সঙ্গে এক বৃহৎ স্তূপের মধ্যে বুদ্ধদেবের পবিত্র অস্থি রক্ষিত আছে। সম্প্রতি এই সোসাইটী বারাণসীর সারনাথ নামক স্থানে, যে স্থানে গৌতম বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথম তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই পবিত্র তীর্থে একটী উচ্চ চূড়া বিশিষ্ট বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গত নভেম্বর মাসে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে দেশ বিদেশ হইতে শত শত ব্যক্তি যোগদান

করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত উক্ত সোসাইটী অন্যান্য স্থানে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতা ব্যতীত মাদ্রাজ ও বোম্বাই নগরীতেও বুদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে উঁহারা Mrs. Foster নাম্নী এক মহীয়সী আমেরিকান মহিলার সাহায্য লাভ করেন, তাঁহারই সহায়তায় এই সকল কার্য্য সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতের এই প্রাচীন যুগের প্রতি যদি আমরা শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে অগ্রসর হইতে পারি এবং গৌতম বুদ্ধের উপদেশের প্রতি যদি আমারা যথোপযুক্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারি, তবেই আমরা জাতীয় জীবনে পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পাইব এবং জগতের দ্বারে সেই প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারীরূপে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইব। উপসংহার করিবার পূর্ব্বে সেই দেবেন্দ্র, নাগেন্দ্র, নরেন্দ্র পূজিত মহাপুরুষের শ্রীচরণে বারম্বার প্রণাম জানাইতেছি। ব্রহ্মা ও দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন, বাসুকীনাগ ফণা দ্বারা যাঁহাকে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছেন ও মহারাজ বিম্বিসার ও অজাতশত্রু প্রভৃতি নৃপতিগণ যাঁহার চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, অদ্য এই পবিত্র তিথিতে তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম জানাইতেছি।

নমোস্তু বুদ্ধায় নমোস্তু বোধয়ে
নমো বিমুক্তায় নমো বিমুক্তয়ে
নমোস্তু জ্ঞানস্য নমোস্তু জ্ঞানিনো
লোকাগ্র শ্রেষ্ঠায় নমো করোথ।

ইংরাজ কবি Edwin Arnoldর সহিত আমরাও বলিতেছি—

Lord Buddha—Prince Siddartha styled on Earth
In Earth and Heavens and Hells Incomparable
All-honoured wisest best, most pitiful ;
The Teacher of Nirvan and Law.

কবি পদ্মগুপ্ত পরিমল

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, পিএইচ-ডি

পরমার রাজগণ খ্রীঃ নবম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যান্ত মালব দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে মালবে বহুসংখ্যক যশস্বী কবির আবির্ভাব হয়। ইহাঁদের মধ্যে কবি পদ্মগুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মৃগাঙ্ক গুপ্ত। পদ্মগুপ্তের অপর একটী নাম পরিমল। তৎকালে বাকপতি মুঞ্জ মালবের অধিপতি ছিলেন—তিনি স্বয়ং কবি ছিলেন। গুরুতর রাজকার্য্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিলেও, তিনি সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় মালবদেশ যেন সাহিত্যে নবজীবন লাভ করিয়াছিল।

এই বিদ্যানুরাগী নৃপতির অনুপ্রেরণায় পদ্মগুপ্ত পরিমলের কবি-প্রতিভার উন্মেষ হয় এবং তিনি সরস্বতীর আরাধনায় জীবন মন সমর্পণ করেন। কবিত্বে তিনি এতদূর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন, যে মুঞ্জ নৃপতি সমাদরে তাঁহাকে সভাপণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজের রচনায় এক স্থলে লিখিয়াছেন "সরস্বতী রূপ কল্পলতার মূলাধার বাকপতি রাজের প্রসাদে তিনি প্রসিদ্ধ কবিবৃন্দের দ্বারা রচিত পথে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।" ইহাতে কবির মুঞ্জ নৃপতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাস, গুণাঢ্য, বাণ ও ময়ূর প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত কবিবৃন্দের উপর তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। তাঁহার রচনায় উক্ত কবিদিগের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুদিনের জন্য কবির লেখনী বন্ধ হয়। ইহার সহিত একটী মর্ম্মন্তুদ দুঃখ-কাহিনী জড়িত আছে। যে মুঞ্জ নৃপতির পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া পদ্মগুপ্ত লেখনী ধারণ করেন সেই পরম শুভানুধ্যায়ীর শত্রুহস্তে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুই ইহার কারণ।

বাকপতি মুঞ্জ তাঁহার রাজ্য বিস্তারকল্পে গুর্জ্জরদেশ আক্রমণ করেন এবং স্বীয় রণকৌশলে গুর্জ্জরাধিপতি মূলরাজকে পরাজিত করেন। ক্রমে তাঁহার আধিপত্য রাজপুতনার মারবার প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। মালবের দক্ষিণ সীমান্তে কর্ণাটরাজ্য অবস্থিত ছিল। সেই সময় কর্ণাটে চালুক্য বংশের নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কর্ণাটরাজ দ্বিতীয় তৈলপ কয়েকবার মালবদেশ আক্রমণ করেন ও লুণ্ঠনের চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই মুঞ্জের নিকট পরাজিত হয়েন। পরমার রাজদের প্রতি দৈববাণী হইয়াছিল যে, তাঁহারা সসৈন্যে গোদাবরী অতিক্রম করিলে তাঁহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় তৈলপ মালবরাজের নিকট ষষ্ঠবার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও যখন পরমার রাজ্য লুণ্ঠনে বিরত হইলেন না—তখন মুঞ্জ গোদাবরী অতিক্রম করিয়া তৈলপের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অদৃষ্টের লিখন মুঞ্জের খণ্ডন করিবার উপায় ছিল না। তিনি তৈলপের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তাঁহাকে চালুক্য রাজধানী কল্যাণনগরে এক প্রাসাদে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তৈলপ স্বীয় ভগ্নী মৃণালবতীকে বন্দী নৃপতির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে মুঞ্জ মৃণালবতীর প্রণয়াবদ্ধ হইলেন। এদিকে মালবের অমাত্যবর্গ মৃত্তিকার নিম্নে এক সুড়ঙ্গ খনন করিয়া মুঞ্জের বন্দীশালার সঙ্গে সংযোগ করিলেন এবং তাহার মধ্য দিয়া মালবরাজের পলায়নের বন্দোবস্ত করিলেন। মুঞ্জের মুক্তিপথের আর কোনই অন্তরায় রহিল না। কিন্তু তিনি মৃণালবতীকে ছাড়িয়া যাইতে বিশেষ কষ্টানুভব করিলেন। রাজকুমারীকে নিজ রাজ্যে লইয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি তাঁহাকে নিজের পলায়নের সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন ও তাঁহার সহিত মালবদেশে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মৃণালবতী মনে মনে ভাবিলেন যে বন্দী নৃপতি তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াই এ কথা বলিতেছেন। মানুষের রূপ ক্ষণস্থায়ী—প্রৌঢ়াবস্থায় যখন রূপ নষ্ট হইয়া যাইবে তখন নৃপতি তাঁহাকে হেলায় পরিত্যাগ করিবেন। মুঞ্জের নিকট নিজের

মনোভাব গোপনপূর্ব্বক তিনি স্বীয় ভ্রাতা তৈলপের সমীপে মালবরাজের গুপ্ত সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিলেন। মুঞ্জের মুক্তির আশা চূর্ণ হইয়া গেল। তৈলপ মালবরাজের পলায়নের সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার আদেশে বন্দীর নিগড় আরও কঠিন হইয়া উঠিল। মুঞ্জের আর দুঃখের অবধি রহিল না। প্রত্যহ তাঁহাকে হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্রসহ একটী কাষ্ঠপিঞ্জরে নিক্ষেপ করা হইত এবং ভিক্ষার জন্য নগরবাসীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরাইয়া আনা হইত। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি চরিতার্থের একমাত্র উপায় ছিল। এই দুঃখের দিনে মুঞ্জ অনেক মর্ম্মস্পর্শী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন—তাহারই কতকাংশ মেরুতুঙ্গ তাঁহার প্রবন্ধ চিন্তামণিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দিনের পর দিন মুঞ্জ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার দুঃখের অবসান হইল। একদিন প্রত্যূষে প্রহরীরা তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। অচিরে ঘাতকের অসির আঘাতে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। তৈলপের প্রতিহিংসাবৃত্তি ইহাতেও চরিতার্থ হইল না। তিনি মুঞ্জের ছিন্ন মস্তক শূলে বিদ্ধ করিয়া রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে স্থাপন করিলেন। এই দুঃসহ সংবাদ যখন মালবরাজ্যে ছড়াইয়া পড়িল—মালববাসীরা শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। পদ্মগুপ্তের হৃদয় দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার শুভানুধ্যায়ীর এইরূপ নৃশংস হত্যা—তাঁহার বক্ষে শেল সম বিদ্ধ হইল। এই মর্ম্মভেদী দুঃখ তিনি নিজের রচিত কবিতায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই রচনার সমস্ত অংশ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। তাহার কয়েকটী ছন্দ দ্বাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র নিজের রচিত "সুবৃত্ত তিলকে" লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কবিতার প্রথমাংশে পদ্মগুপ্ত পরিমল মুঞ্জের রাজ্যজয় বৃত্তান্ত এবং অন্যান্য সদনুষ্ঠান প্রকাশ করেন এবং শেষ ছন্দে প্রভুর শোচনীয় মৃত্যুকাহিনী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেন। এই নিদারুণ শোক কি ভাবে তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল, আমরা ইহা হইতে কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন :—

হা শৃঙ্গারতরঙ্গিণী কুলগিরি	হা রাজচূড়ামণি
হা সৌজন্য সুধানিধি	হা জ্ঞানের দুগ্ধরূপী মহাসাগর
হা উজ্জয়িনীর প্রেমিক	হা যুবতীর প্রত্যক্ষ কন্দর্প
হা সখাব্ধব	হা অমৃতরূপী চন্দ্র

হা আমার রাজা কোথায় তুমি অন্তর্হিত হইয়াছ! আমার জন্য অপেক্ষা কর।

ইহার পর কিছুদিনের জন্য পদ্মগুপ্ত সাহিত্যচর্চ্চা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেন। মুঞ্জের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই নৃপতির অভাবে তিনি সরস্বতীর মন্দির দ্বারে সহায়হীন হইয়া পড়েন।

মুঞ্জের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিন্ধুরাজ মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিন্ধুরাজও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি পদ্মগুপ্তকে অনেক অনুরোধ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে পুনরায় অবতীর্ণ করাইলেন। তাঁহারই আগ্রহে পদ্মগুপ্ত বিখ্যাত গ্রন্থ 'নবসাহসাঙ্কচরিত' রচনা করেন। উক্ত পুস্তকের গ্রন্থপ্রশস্তিতে তিনি লিখিয়াছেন যে, 'বাকপতিরাজের মৃত্যুতে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছিল, কিন্তু সিন্ধুরাজ সেই বাক্যপথের দ্বার খুলিয়া দেওয়ায় পুনরায় তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।'

নবসাহসাঙ্ক চরিতের বিষয়টী এই :—'একদা নৃপতি নবসাহসাঙ্ক সিন্ধুরাজ, মন্ত্রী রামাঙ্গদ সমভিব্যাহারে, বিন্ধ্য পর্ব্বতে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। সহসা তিনি একটী বিচিত্র মৃগ দেখিতে পাইলেন। তাহার গলদেশে একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত হার ছিল। মৃগটীকে পাইবার জন্য নৃপতির অত্যন্ত কৌতূহল হইল। তিনি ইহাকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। শরবিদ্ধ হরিণ শরসহ দ্রুত পলায়ন করিল। সন্ধ্যা আগত হওয়ায় নৃপতি মৃগের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইলেন। পরদিবস আবার তিনি মৃগের অন্বেষণে বাহির হইলেন। কত পর্ব্বতশিখর এবং উপত্যকা তিনি অতিক্রম করিলেন; কিন্তু প্রাণিটীর সন্ধান পাইলেন না। নর্ম্মদ-তীরে পর্ব্বতোপত্যকায় নীল সরোবর তীরে এক রাজহংস চঞ্চুপুটে একটী মুক্তার মালা লইয়া বিচরণ করিতেছিল। সহসা উহা ক্লান্ত নৃপতির দৃষ্টি-পথে পতিত হইল। নৃপতি অনায়াসেই হংসটীকে ধরিতে পারিলেন এবং মালাটী পরীক্ষা করিয়া তাহাতে শশীপ্রভা নামাঙ্কিত দেখিতে পাইলেন। এই শশিপ্রভাকে দেখিবার জন্য নৃপতির বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক হইল।

শশিপ্রভা নাগরাজ শঙ্খপালের কন্যা। তিনি হরশৈলে, মলয় পর্ব্বতে, এবং হিমাচলে ভ্রমণ করিতে খুব ভালবাসিতেন। তিনি অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। কোন এক সময় তিনি বিন্ধ্য পর্ব্বতে ভ্রমণ-কালীন শশাঙ্কদ্যুতির সৈকত ভূমিতে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি তাঁহার প্রিয় হরিণটীকে বাণবিদ্ধাবস্থায় সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। তিনি শরটী মৃগদেহ হইতে বিমুক্ত করিলেন এবং তাহাতে নবীন সাহসাঙ্ক সিন্ধুরাজ এই নাম অঙ্কিত দেখিতে পাইলেন। তিনি মনে মনে কল্পনা করিলেন যিনি নবীন সাহসাঙ্ক এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই প্রবলপ্রতাপশালী নৃপতি। রাজকন্যার সেই নৃপতিকে দেখিবার জন্য প্রবল বাসনা হইল এবং নিজের মনোভাব সখীদের নিকট প্রকাশ করিলেন। এদিকে সহচরী পাটলা রাজকুমারীকে জানাইল যে তাঁহার মুক্তার মালা কেহ হরণ করিয়াছে। একটী বন্য-রাজহংস রাজকুমারীর মালাটী মৃণাল ভাবিয়া অপহরণ করিয়াছিল এবং উহাই সিন্ধুরাজের হস্তগত হয়। পাটলা মালা অন্বেষণে বহির্গত হইয়া পার্ব্বত্যপথে সহসা সিন্ধুরাজকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে শশিপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ করাইল। সিন্ধুরাজ ও শশিপ্রভা পরস্পর দর্শনমাত্র প্রণয়াবদ্ধ হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক দৈববলে রাজকন্যা সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে অদৃশ্যা হইলেন ও নাগরাজধানী ভোগবতীপুরে নীত হইলেন। নৃপতি রাজকন্যার রূপে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। তিনি মন্ত্রী রামাঙ্গদ সমভিব্যাহারে নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিলেন। দেবী নর্ম্মদার নিকট জানিতে পারিলেন যে, শশিপ্রভা

নাগরাজ শঙ্খপালের কন্যা। শঙ্খপালের প্রবল শত্রু ছিল দৈত্য সম্প্রদায়। নর্ম্মদা নদী হইতে ৫০ গব্যুতি (২০০ মাইল) দূরে দৈত্যরাজ বজ্রাঙ্কুশের রাজধানী রত্নাবতী অবস্থিত ছিল। শঙ্খপাল তাঁহার এই সংকল্প সমস্ত রাজ্যে প্রচার করিয়া দেন যে যদি কেহ ঐ দৈত্যরাজকে পরাজিত করিয়া তাহার প্রাসাদ সংলগ্ন সরোবর হইতে স্বর্ণপদ্ম আহরণপূর্ব্বক শশিপ্রভাকে উপহার দিতে সমর্থ হয় তবে তাহারই হস্তে তিনি রাজকুমারীকে সমর্পণ করিবেন।

অনেক নৃপতি রাজকন্যার পাণিগ্রহণের জন্য বজ্রাঙ্কুশের সহিত যুদ্ধ করেন; কিন্তু সকলেই দৈত্যরাজের নিকট পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়েন। এই কথা জানিতে পারিয়াও সিন্ধুরাজ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে প্রকারেই হউক তিনি শশিপ্রভার পাণিগ্রহণ করিবেন। তিনি বিপুল সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। মালব সৈন্যের সাহায্যার্থে নাগসৈন্য ও বিদ্যাধরগণ যোগদান করিল। ৫০ গব্যুতি পথ অতিক্রম করিয়া সিন্ধুরাজ ত্রিমার্গগাতীরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। তৎপর তিনি ত্রিমার্গগা অতিক্রম করিয়া দৈত্যরাজকে আক্রমণ করিলেন। সেই তুমুল সংগ্রামে মন্ত্রী রামাঙ্গদ দৈত্যরাজপুত্র বিশ্বাঙ্কুশের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু অবশেষে সিন্ধুরাজই জয়ী হইলেন। বজ্রাঙ্কুশ সমরে প্রাণ হারাইল ও তাহার রাজ্য সিন্ধুরাজের হস্তগত হইল। সিন্ধুরাজ দৈত্য সরোবর হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণপদ্ম নাগরাজকন্যাকে উপহার দিলেন। বিপুল সমারোহে নাগরাজ্যে সিন্ধুরাজ ও শশিপ্রভার বিবাহ হইল।

নবসাহসাঙ্ক চরিতের আখ্যানটী উপাখ্যানের ন্যায় বোধ হইলেও ইহাতে যে ঐতিহাসিক সত্য আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কবি গ্রন্থপ্রশস্তিতে লিখিয়াছেন যে এই গ্রন্থ তিনি তাঁহার কবিত্ব শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিদর্শন করাইবার জন্য রচনা করেন নাই। ইহাতে তিনি সিন্ধুরাজের আদেশে উক্ত নৃপতির জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মন্ত্রী রামাঙ্গদের শত্রুহস্তে নিধনবার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিয়া কবি আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে সিন্ধুরাজ ও তাঁহার অনুচরদের বীরত্ব কাহিনী ঘোষণা করিবার জন্যই তিনি এই পুস্তক রচনা করেন নাই, ঐতিহাসিক সত্য প্রচারও তাঁহার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য।

মনীষী ব্যুলার (Mr. Buhler) নবসাহসাঙ্ক-চরিত জার্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ করিবার সময় মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এই গ্রন্থ যে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ইহার প্রকৃত তথ্য উদ্ধারে তিনি স্বয়ং অসমর্থ এবং আশা করেন যে ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকেরা প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হইবেন।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে কবি প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা আখ্যান দ্বারা প্রচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মৎপ্রণীত "পরমার বংশের ইতিহাস" নামক পুস্তকে আমি নানা প্রমাণ দ্বারা নবসাহসাঙ্ক চরিতের প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছি এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহারই সারাংশ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

খ্রীঃ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্যপ্রদেশের বস্তর রাজ্যে এক নাগবংশ রাজত্ব করিত (Epigraphia Indica vol. IX) নাগদের পরমশত্রু ছিল বস্তররাজ্যের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত বজ্রাগরের অধিপতি অনার্য্য মানবংশীয় নৃপতিগণ। নাগরাজ মানদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া পরম প্রতাপান্বিত পরমার বংশ সম্ভূত মালবাধিপতি সিন্ধুরাজের সাহায্য ভিক্ষা করেন। সিন্ধুরাজ তাঁহাকে সাহায্যদানে ইচ্ছুক হইয়া মন্ত্রী রামাঙ্গদ সহ সসৈন্যে বজ্রাগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পথে তাঁহাকে গোদাবরী নদীর শাখা ওয়েইন গঙ্গা অতিক্রম করিতে হয়। যুদ্ধে রামাঙ্গদ নিহত হয় কিন্তু সিন্ধুরাজ মানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া তাহাদের মণি-রত্ন লুণ্ঠন করেন। নাগরাজ ইহাতে পরম তুষ্ট হইয়া সিন্ধুরাজের হস্তে তাঁহার পরমা সুন্দরী কন্যা সমর্পণ করেন। সিন্ধুরাজ সেই কন্যাকে লুণ্ঠিত মণি-রত্নে সুসজ্জিত করিয়া মালবদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নবসাহসাঙ্ক চরিত একটী বিশেষ পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থ। ইহা হইতে অনেক শ্লোক বল্লভদেবের রচিত গুণরত্ন মহোদধিতে, কাব্যপ্রকাশে এবং জয়রথের অলঙ্কার বিমর্শিণীতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পদ্মগুপ্ত আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সারঙ্গধর পদ্ধতিতে তাঁহার রচিত একটী পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

পদ্মগুপ্ত একজন বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবি ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে দুঃখের বিষয়, তাঁহার রচিত আর কোন বিশেষ গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয় নাই।



ভরা ভাদরে

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

ঘন আঁধিয়ারে ঘেরি ভাদরের সেদিন দুপুরে
বাদরের বারিধারা এলো নেমে দশদিক জুড়ে ;
রুদ্ধ গৃহমাঝে বসি সুকোমল অলস শয়নে
অপূর্ব্ব রসের হর্ষ উচ্ছলিয়া উঠিল এ মনে
অকারণে। এ মুহূর্ত্ত যেন আজ ব্যর্থ নাহি হয়,
ভাবিনু কবিতা রচি এরে আমি করিব অক্ষয়।

একটি জানালা খোলা তার ফাঁক দিয়ে যায় দেখা,
—মুছে গেছে জলস্রোতে একেবারে দিগন্তের রেখা,
অই ফাঁকে চলে গেল অলক্ষিতে দুরন্ত কল্পনা
দিগন্তের পরপারে, হেরিতেছি আমি অন্যমনা
—ভিজিছে গাভীর দল তরুতলে, কাঁপিছে রাখাল
মলিন গামোছা গায়ে জড়াইয়া। ভিখারী কাঙাল
আছে আজি উপবাসে, জলে ভেজা হ'লো তার সার,
কোন গৃহে সাড়া নেই—সব গৃহ আজি রুদ্ধদ্বার।

মাঠে মাঠে খাটে চাষী—এই তার খাটার সময়,
দিতে নারে ভাঙা টোকা আজ তার মাথারে আশ্রয়।
কাঙালের কুঁড়ে ঘরে থই থই করে কাদা জল,
জ্বলেনি উহুন তার,—ভিজে চাল চিবায়ে কেবল
শান্ত করে ক্ষুধানল। ক্ষুব্ধচিত্তে ব'সে গৃহকোণে
নদী-পানে লুব্ধদৃষ্টি, জেলে আজি শুধু জাল বোনে।

ভুবন ভাসিছে জলে,—তবু হায় কে অই রূপসী
ভিজে ভিজে চলিয়াছে দূর ঘাটে ভরিতে কলসী,—
গ্রামের পিছল বাটে বধূ তার ভাঙ্গিয়াছে শাঁখা,
ভেঙেছে পাথর বাটি। শাশুড়ীর বাক্য বিষমাখা
বিঁধিছে ব্যথিত অঙ্গে।

কাদা জলে বসেনিক' হাট,
পশারীরা এসেছিল পার হয়ে দূরদূর মাঠ,
তরুতলে বসি ভাবে,—শিরে বহি পশারার ভার
সেই মাঠ পার হয়ে কেমনে বা ফিরিবে আবার।

ডাক-হরকরা ছুটে মাঠপথে বহি বার্ত্তাভার
দুর্গম দুর্য্যোগ-পথে,—তিন ক্রোশ ছয় ক্রোশ তার,
পথে যেতে যেতে দেখে, বসে গেছে কাদা পাঁক জলে
একটি গোরুর গাড়ী। ঠেলে তারে প্রাণপণ বলে
তুলে দিয়ে নিরুপায় গাড়োয়ানে পরিত্রাণ করে,
প্রতীক্ষা না করি আর আরোহীর ধন্যবাদ তরে
চলে পুনঃ গ্রামদূত সহি পথে দুর্য্যোগের ব্যথা
বহি পৃষ্ঠে জলধৌত অক্ষরের প্রাণের বারতা।

বন্ধ খেয়া পারাপার। খেয়া-তরী বাঁধি তরুমূলে
পাটনী কোথায় গেছে,—কূলে বসি ভাসিছে অকূলে
পারার্থীরা নিরুপায়। তুলি দূরে ধূমের কেতন
মাঝে মাঝে তরীগুলি ভেসে যায় উল্কার মতন।
কোথাও বা দূরপান্থ বটতল করেছে আশ্রয়
মাঝপথে এসে তার প্রাণে মনে দারুণ-সংশয়,
ফিরে-যাওয়া আগে-চলা এবে তার দুই-ই সমান,
গ্রামান্তের রেখা লুপ্ত,—অনন্ত সে পথ ব্যবধান।
মাঠঘাট ছেড়ে এসে উঁকি দিয়ে দেখি ঘরে-ঘরে
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ—কাঁথা গায়ে ধুঁকিতেছে জ্বরে।
আরো দূরে গিয়ে দেখি—এ কি সেই সমুদ্র সৈকত ?
এরি মধ্যে অতিক্রম করিয়াছি এত দীর্ঘপথ ?
ভাল ক'রে চেয়ে দেখি—এ'ত নয় নীলের পাথার,
চালাঘর, পালাখড়, গাছপালা দিতেছে সাঁতার ;
বন্যায় ভাসিছে দেশ—

অকস্মাৎ পশিল এ কাণে
পাখীদের কলরব,—হৃষ্টকণ্ঠে তারা একতানে
ক্ষণিক বর্ষণ-ক্ষান্তি—দিগ্বিদিকে করিল ঘোষণা
ভাঙ্গি দিবাস্বপ্ন-ঘোর। হেরি ফিরে এসেছে কল্পনা
পাখা দুটি গুটাইয়া কাঁপিতেছে শীতে থর থর

নতমুখ অবসন্ন ঘনশ্বাসে চকিত কাতর,
কেশান্ত পক্ষাগ্র হ'তে জলবিন্দু ঝরে অবিরল ;
যতনে মুছানু তাহা দিয়া মোর শুকানো আঁচল।
বুঝিনু আরাম-কক্ষে রুদ্ধ করি দ্বার বাতায়ন
হয় নাক' বিশ্বসনে এ চিত্তের বিচ্ছেদ সাধন,
ভুবন ভাসিবে জলে,—আরামের শয্যা 'পরে তবু
শুয়ে শুয়ে আনন্দের গান রচা হয়নাক' কভু।

শেষের পরিচয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৩)

পরদিন অপরাহ্নের কাছাকাছি দুই বন্ধু চায়ের সরঞ্জাম সম্মুখে লইয়া টেবিলে আসিয়া বসিল। টি-পটে চায়ের-জল তৈরি হইয়া উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া রাখাল চাম্‌চে ডুবাইয়া ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগিল।

তারক কহিল, নামের মাহাত্ম্য দেখ্‌লে তো?

রাখাল বলিল, অবিশ্বাস ক'রে মা দুর্গাকে তুমি খামোকা চটিয়ে দিলে বলেই তো যাত্রাটা নিষ্ফল হলো,—নইলে হোতোনা।

প্রতিবাদে তারক শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সত্যই কাল কাজ হয় নাই। ব্রজবাবু বাড়ী ছিলেননা, কোথায় নাকি নিমন্ত্রণ ছিল, এবং মামাবাবু কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকায় একটু সকাল-সকাল আহারাদি সারিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাখাল বাটীর মধ্যে দেখা করিতে গেলে সে যে এখনো তাঁহাদের মনে রাখিয়াছে এই বলিয়া ব্রজবাবুর স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং ফিরিবার সময়ে অন্যের চোখের অন্তরালে রেণুও কাছে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ঠিক এই মর্ম্মেই অনুযোগ জানাইয়াছিল।

—তোমার বাবাকে বল্‌তে ভুলোনা যে আমি সন্ধ্যার পরে কাল আবার আস্‌বো। আমার বড় দরকার।

—আচ্ছা। কিন্তু চাকরদেরও বলে যাও।

সুতরাং ব্রজবাবুর নিজস্ব ভৃত্যটিকেও এ কথা রাখাল বিশেষ করিয়া জানাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যথাসময়ে বাসায় পৌঁছিতে পারে নাই। আসিয়া দেখিল দরজার কড়ায় জড়ানো এক-টুকরা কাগজ; তাহাতে পেন্সিলে লেখা—আজ দেখা হোলোনা, কাল বৈকাল পাঁচটায় আসবো। ন-মা।

আজ সেই পাঁচটার আশাতেই দুই বন্ধুতে পথ চাহিয়া আছে। কিন্তু, এখনো তা'র মিনিট কুড়ি বাকি। তারক তাগাদা দিয়া কহিল, যা হয়েছে ঢালো। তাঁর আস্‌বার আগে এ সমস্ত পরিষ্কার করে ফেলা চাই।

কেন? মানুষে চা খায় এ কি তিনি জানেননা?

ত্যাখো রাখাল, তর্ক কোরোনা। মানুষে মানুষের অনেক-কিছু জানে, তবু, তার কাছেই অনেক-কিছু সে আড়াল করে। গরু-বাছুরের এ প্রয়োজন হয়না। তা ছাড়া এ গুলোই বা কি? এই বলিয়া সে অ্যাষ-ট্রে সমেত সিগারেটের টিনটা তুলিয়া ধরিল। বলিল, পৌরুষ ক'রে এ-ও তাঁকে দেখাতে হবে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিল,—দেখে ফেল্‌লেও তোমার ভয় নেই, তারক, অপরাধী যে কে তিনি ঠিক বুঝ্‌তে পারবেন।

তারক খোঁচাটা অনুভব করিল। বিরক্তি চাপিয়া বলিল, তাই আশা করি। তবু, আমাকে ভুল বুঝ্‌লেও ক্ষতি নেই, কিন্তু একদিন যাকে মানুষ কোরে তুলেছিলেন তাকে বুঝ্‌তে না পারলে তাঁর অন্যায় হবে।

রাখাল কিছুমাত্র রাগ করিলনা, হাসিমুখে নিঃশব্দে চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

তারক চা খাইতে আরম্ভ করিয়া মিনিট দুই পরে কহিল, হঠাৎ এমন চুপ্‌চাপ্ যে?

কি করি? তিনি আসবার আগে সেই ন'শো নিরানব্বুয়ের ধাক্কাটা মনে মনে একটু সাম্‌লে রাখ্‌চি ভাই, এই বলিয়া সে পুনশ্চ একটু হাসিল।

শুনিয়া তারকের গা জ্বলিয়া গেল। কিন্তু, এবার সেও চুপ করিয়া রহিল।

চা খাওয়া সমাপ্ত হইলে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দুজনে প্রস্তুত হইয়া রহিল। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। ক্রমশঃ পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিট অতিক্রম করিয়া ঘড়ির কাঁটা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দেখা নাই। উন্মুখ অধীরতায় সমস্ত ঘরটা যে ভিতরে ভিতরে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও পরস্পরের কাছে অবিদিত নাই; এম্‌নি সময়ে

সহসা তারক বলিয়া উঠিল, এ কথা ঠিক যে তোমার নতুন-মা অসাধারণ স্ত্রীলোক।

রাখাল অতি-বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বন্ধুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

তারক বলিল, নারীর এম্‌নি ইতিহাস শুধু বইয়ে পড়েচি, কিন্তু চোখে দেখিনি। যাঁদের চিরদিন দেখে এসেচি তাঁরা ভালো, তাঁরা সতী-সাধ্বী, কিন্তু ইনি যেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইবার আর অবসর পাইলনা।

—রাজু, আস্‌তে পারি বাবা?

উভয়েই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাখাল দ্বারের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল, কহিল, আসুন।

তারক ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু তখনি পায়ের কাছে আসিয়া সেও নমস্কার করিল।

সকলে বসিবার পরে রাখাল বলিল, কাল সব দিক দিয়েই যাত্রা হোলো নিষ্ফল; কাকাবাবু বাড়ী নেই, মামাবাবু গুরু-ভোজনে অসুস্থ এবং শয্যাগত, আপনাকে নিরর্থক ফিরে যেতে হয়েছিল; কিন্তু এর জন্যে আসলে দায়ী হচ্চে তারক। ওকে এইমাত্র তার জন্যে আমি ভৎর্সনা করছিলাম। খুব সম্ভব অপরাধের গুরুত্ব বুঝে ও অনুতপ্ত হয়েছে। না দেবে ও মা-দুর্গাকে রাগিয়ে, না হবে আমাদের যাত্রা পণ্ড।

তারক ঘটনাটা খুলিয়া বলিল। নতুন-মা হাসি-মুখে প্রশ্ন করিলেন, তারক বুঝি এসব বিশ্বাস করোনা?

বিশ্বাস করি বলেই তো ভয় পেয়েছিলাম আজ বোধ হয় কিছু আর হবেনা।

তাহার জবাব শুনিয়া নতুন-মা হাসিতে লাগিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কারু সঙ্গেই দেখা হোলোনা?

রাখাল কহিল, তা' হয়েছে মা। বাড়ীর গিন্নী আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পথ ভুলে এসেছি কিনা। ফেরবার মুখে রেণুও ঠিক ঐ নালিশই করলে। অবশ্য আড়ালে। তাকেই বলে এলাম বাবাকে জানাতে আমি আবার কাল সন্ধ্যায় আসবো। আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। জানি, আর যে-ই বলতে ভুলুক, সে ভুল্‌বেনা।

তোমরা আজ আবার যাবে?

হাঁ, সন্ধ্যার পরেই।

ওরা সবাই বেশ ভালো আছে?

তা' আছে।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া মনের অনেক দ্বিধা সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলেন, রেণু কেমনটি দেখতে হয়েছে রাজু?

রাখাল বিস্ময়াপন্ন মুখে প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে কহিল, প্রশ্নটি তো শুধু বাহুল্য নয়, মা, —হোলো অন্যায়। নতুন-মার মেয়ে দেখ্‌তে কেমন হওয়া উচিত এ কি আপনি জানেন না? তবে রঙ্‌টা বোধ হয় একটুখানি বাপের ধার ঘেঁষে গেছে;—ঠিক স্বর্ণ-চাঁপা বলা চলেনা। বলুন, তাই কি নয় নতুন-মা?

মেয়ের কথায় মায়ের দুই চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল; দেয়ালের ঘড়ির দিকে এক মুহূর্ত্ত মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোমাদের বার হবার সময় বোধ হয় হয়ে এলো।

না, এখনো ঘণ্টা দুই দেরি।

তারক গোড়ায় দুই একটা ছাড়া আর কথা কহে নাই, উভয়ের কথোপকথন মন দিয়া শুনিতেছিল। যে অজানা মেয়েটির অশুভ, অমঙ্গল-ময় বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিবার সঙ্কল্প তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, সে কেমন দেখিতে, জানিতে তাহার আগ্রহ ছিল, কিন্তু ব্যগ্রতা ছিলনা, কিন্তু, এই যে রাখাল বর্ণনা করিলনা, শুধু অনুযোগের কণ্ঠে মেয়েটির রূপের ইঙ্গিত করিল, সে যেন তাহার অন্ধকার অবরুদ্ধ মনের দশ দিকের দশখানা জানালা খুলিয়া আলোকে আলোকে চকিত চঞ্চল করিয়া দিল। এতক্ষণ সে যেন দেখিয়াও কিছু দেখে নাই, এখন মায়ের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিলনা।

নতুন-মার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রূপে খুঁৎ নাই তা' নয়, সুমুখের দাঁত দুটি উঁচু, তাহা কথা কহিলেই চোখে পড়ে। বর্ণ সত্যই স্বর্ণ-চাঁপার মতো, কিন্তু হাত-পায়ের গড়ন ননী মাখনের সহিত কোন মতেই তুলনা করা চলেনা। চোখ দীর্ঘায়ত নয়, নাকও বাঁশী বলিয়া ভুল হওয়া অসম্ভব; কিন্তু একহারা দীর্ঘচ্ছন্দ দেহে সুষমা ধরেনা। কোথায় কি আছে না জানিয়া অত্যন্ত সহজে মনে হয় প্রচ্ছন্ন মর্য্যাদার এই পরিণত নারী-দেহটি যেন কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। আর সব চেয়ে চোখে পড়ে নতুন-মার আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর। মাধুর্য্যের যেন অন্ত নাই।

তারকের চমক্ ভাঙিল নতুন-মার জিজ্ঞাসায়। তিনি

হঠাৎ যেন ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিলেন, রাজু, তোমার কি মনে হয় বাবা এ বিয়ে বন্ধ করতে পারবে ?

সে কথা তো বলা যায়না মা।

তোমার কাকাবাবু কি কিছুই দেখ্‌বেন না ? কোন কথাই কানে তুল্‌বেন না ?

রাখাল বলিল, চোখ-কান তো তাঁর আর নেই মা। তিনি দেখেন মামাবাবুর চোখে, শোনেন গিন্নীর কানে। আমি জানি এ বিয়ের সম্বন্ধ তাঁরাই কোরেছেন।

কর্ত্তা তবে কি করেন ?

যা' চিরদিন করতেন,—সেই গোবিন্দজীর সেবা। এখন শুধু তার উগ্রতা বেড়ে গেছে শতগুণে। দোকানে যাবারও বড় সময় পাননা। ঠাকুর-ঘর থেকে বার হতেই বেলা পড়ে আসে।

তবে বিষয় আশয়, কারবার, ঘর-সংসার দেখে কে ?

কারবার দেখেন মামা, আর সংসার দেখেন তাঁর মা—অর্থাৎ শাশুড়ী। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি বলুন, কিছুই আপনার অজানা নয়। একটু থামিয়া বলিল, আমরা আজও যাবো সত্যি, কিন্তু তার নিশ্চিত পরিণামও আপনার জানা নতুন-মা।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন, শুধু মুখ দিয়া একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। বোধহয় নিরুপায়ের শেষ মিনতি।

হঠাৎ শোনা গেল বাহিরে কে-যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, ওহে ছেলে, এইটি কি রাজুবাবুর ঘর ?

বালক-কণ্ঠে জবাব হইল, না মশাই, রাখালবাবুর বাসা।

হাঁ হাঁ, তাঁকেই খুঁজ্‌চি, এই বলিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, রাজু আছো ? বাঃ—এই তো হে! রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই সরল স্নিগ্ধ হাস্যে গৃহের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, ভেবেছিলাম বুঝি খুঁজেই পাবোনা। বাঃ—দিব্যি ঘরটিতো।

হঠাৎ শেল্‌ফের ঈষৎ অন্তরালবর্ত্তিনী মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি পড়ায় একটু বিব্রত বোধ করিলেন, পিছু হটিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া কিন্তু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নিরীক্ষণ করার পরে বলিলেন, নতুন-বৌ না ? বলিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া তিনি রাখালের প্রতি চাহিলেন।

একটা কঠিনতম অবমাননার মর্ম্মভেদ দৃশ্য বিদ্যুদ্বেগে রাখালের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়া মুখ তাহার মড়ার মতো ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তারক ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়াও করিতে পারিলনা, তথাপি অজানা ভয়ে সেও হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। ভদ্রলোক পর্য্যায়ক্রমে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন,—তোমরা করছিলে কি ? ষড়যন্ত্র ? গুলির আড্ডায় কনেষ্টবল ঢুকে পড়লেও ত তারা এতো আঁৎকে ওঠেনা। হয়েছে কি ? নতুন-বৌ ত ?

মহিলা চৌকি ছাড়িয়া দূর হইতে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, হাঁ, আমি নতুন-বৌ।

বোসো, বোসো। ভালো আছো ? বলিয়া তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া চৌকি টানিয়া উপবেশন করিলেন; বলিলেন, নতুন-বৌ, আমার রাজুর মুখের পানে একবার চেয়ে দেখো। ও বোধ হয় ভাবলে আমি চিন্‌তে পারামাত্র তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করে এক ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়ে দেবো। ওর ঘরের জিনিসপত্র আর থাক্‌বেনা, ভেঙে তচ্‌নচ্‌ হয়ে যাবে।

তাঁহার বলার ভঙ্গীতে শুধু কেবল তারক ও রাখালই নয়, নতুন-মা পর্য্যন্ত মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তারক এতক্ষণে নিঃসন্দেহে বুঝিল ইনিই ব্রজবাবু। তাহার আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রহিলনা।

ব্র-বাবু অনুরোধ করিলেন, দাঁড়িয়ে থেকোনা নতুন-বৌ, বোসো।

তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিলে ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন, পশু রেণুর বিয়ে। ছেলেটি স্বাস্থ্যবান সুন্দর, লেখা-পড়া, করচে,—আমাদের জানা-ঘর। বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়িও মন্দ নেই। এই কলকাতা সহরেই খান চারেক বাড়ী আছে। এ-পাড়া ও-পাড়া বল্‌লেই হয়, যখন ইচ্ছে মেয়ে-জামাইকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। মনে হয়তো সকল দিকেই ভালো হলো।

একটু থামিয়া বলিলেন, আমাকে তো জানোই নতুন-বৌ, সাধ্যি ছিলনা নিজে এমন পাত্র খুঁজে বার করি। সবই গোবিন্দর কৃপা! এই বলিয়া তিনি ডানহাতটা কপালে ঠেকাইলেন।

কন্যার সুখ-সৌভাগ্যের সুনিশ্চিত পরিণাম কল্পনায়

উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সমস্ত মুখ স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, একটা তিক্ত ও একান্ত অপ্রীতিকর বিরুদ্ধ প্রস্তাবে এই মায়া-জাল তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইলনা।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমাদের রাখাল-রাজকে তো আর চিঠিতে নিমন্ত্রণ করা যায়না, ওকে নিজে গিয়ে ধরে আনতে হবে। ও ছাড়া আমার করবে কর্ম্মাবেই বা কে? কাল রাত্রে ফিরে গিয়ে রেণুর মুখে যখন খবর পেলাম রাজু এসেছিলো, কিন্তু দেখা হয়নি,—তার বিশেষ প্রয়োজন, কাল সন্ধ্যায় আবার আসবে—তখনি স্থির কোরলাম এ সুযোগ আর নষ্ট হতে দিলে চলবেনা—যেমন কোরে হোক্ খুঁজে-পেতে তার বাসায় গিয়ে আমাকে ঐ ত্রুটি সংশোধন করতেই হবে। তাই দুপুর বেলায় আজ বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু, কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম মনে নেই, আমার এক-কাজে কেবল দু-কাজ নয়, আমার সকল কাজ আজ সম্পূর্ণ হলো।

স্পষ্টই বুঝা গেল তাঁহার ভাগ্য-বিড়ম্বিতা একমাত্র কন্যার বিবাহ ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এ কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। মেয়েটা যেন তাহার অপরিজ্ঞাত জীবন-যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে জননীর অপ্রত্যাশিত আশীর্ব্বাদ লাভ করিল।

রাখাল অত্যন্ত নিরীহের মত মুখ করিয়া কহিল, বেরোবার সময় মামাবাবু ছিলেন বলে কি মনে পড়ে?

কেন বলো ত?

তিনি ভাগ্যবান লোক, বেরোবার সময়ে তাঁর মুখ দেখে থাকলে হয়ত—

ওঃ—তাই। ব্রজবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

নতুন-মা রাখালের মুখের প্রতি অলক্ষ্যে একটুখানি চাহিয়াই মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার হাসির ভাবটা ব্রজবাবুর চোখ এড়াইল না, বলিলেন, রাজু, কথাটা তোমার ভালো হয়নি। যাই হোক্, সম্পর্কে তিনি নতুন-বৌয়েরও ভাই হন; ভাইয়ের নিন্দে বোনেরা কখনো সইতে পারে না। উনি বোধ করি, মনে মনে রাগ করলেন।

রাখাল হাসিয়া ফেলিল। ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, অসঙ্গত নয়, রাগ করারই কথা কি না।

তারকের সহিত এখনো তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই, এ লোভটা সে সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল, আজ বার হবার সময়ে আপনি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেননি নিশ্চয়ই?

ব্রজবাবু প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন, কই না। অভ্যাস মতো আমি গোবিন্দ স্মরণ করি, আজও হয়ত তাঁকেই ডেকে থাকবো।

তারক কহিল, তাতেই যাত্রা সফল হয়েছে, ও-নামটা করলে শুধু-হাতে ফিরতে হোতো।

ব্রজবাবু তথাপি তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। রাখাল তারকের পরিচয় দিয়া কালকের ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, ওর মতে দুর্গা নামে কার্য্য পণ্ড হয়। কালকে যে আপনার দেখা না পেয়ে আমাদের বিফল হয়ে ফিরতে হয়েছিল, তার কারণ বার হবার সময় আমি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেছিলাম। হয়ত এ রকম দুর্ভোগ ওর কপালে পূর্ব্বেও ঘটে থাকবে, তাই ও-নামটার ওপরেই তারক চটে আছে।

শুনিয়া ব্রজবাবু প্রথমটা হাসিলেন, পরে হঠাৎ ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যে মুখখানা অতিশয় ভারি করিয়া বলিলেন, হয় হে রাখালরাজ হয়,—ওটা মিথ্যে নয়। সংসারে নাম ও দ্রব্যের মহিমা কেউ আজও সঠিক জানেনা। আমিও একজন রীতিমত ভুক্তভোগী। 'ফুট-কড়াই' নাম করলে আর আমার রক্ষে নেই।

জিজ্ঞাসু মুখে সকলেই চোখ তুলিয়া চাহিল; রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, কিসে?

ব্রজবাবু বলিলেন, তবে ঘটনাটা বলি শোন। ব্রজ-বিহারী বলে ছেলেবেলায় আমার ডাক-নাম ছিল বলাই। ভয়ানক ফুট-কড়াই খেতে ভালোবাসতাম। ভুগতামও তেমনি। আমার এক দূর-সম্পর্কের ঠাকুরমা সাবধান করে বলতেন—

ব'লাই, কলাই খেয়োনা—
জানলা ভেঙে বউ পালাবে দেখতে পাবেনা।

ভেবে দেখ দিকি ছেলে-বেলার ফুট-কড়াই খাওয়ার বুড়ো-বয়সে আমার কি সর্ব্বনাশ হলো! এ কি দ্রব্যের দোষ-গুণের একটা বড় প্রমাণ নয়? যেমন দ্রব্যের তেমনি নামেরও আছে বৈকি!

তারক ও রাখাল লজ্জায় অধোবদন হইল। নতুন-মা ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া চাপা গলায় ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, ছেলেদের সাম্‌নে এ তুমি কোরচ কি?

কেন? ওদের সাবধান করে দিচ্চি। প্রাণ থাক্‌তে যেন কখনো ওরা ফুট-কড়াই না খায়।

তবে, তাই করো, আমি উঠে যাই।

ঐ তো তোমার দোষ নতুন বৌ, চিরকাল কেবল তাড়াই লাগাবে আর রাগ করবে, একটা সত্যি কথা কখনো বল্‌তে দেবে না। ভাব্‌লাম, আসল দোষটা যে সত্যিই কার, এতকাল পরে খবরটা পেলে তুমি খুশী হয়ে উঠবে,—তা হোলো উল্টো।

নতুন-মা হাত জোড় করিয়া কহিলেন, হয়েছে,—এবার তুমি থামো। রাজু?

রাখাল মুখ তুলিয়া চাহিল। নতুন-মা বলিলেন, তুমি যে জন্যে কাল গিয়েছিলে ওঁকে বলো।

রাখাল একবার ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু ইঙ্গিতে পুনশ্চ সুস্পষ্ট আদেশ পাইয়া বলিয়া ফেলিল, কাকাবাবু, রেণুর বিবাহ তো ওখানে কোনমতেই হতে পারে না।

শুনিয়া ব্রজবাবু এবার বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিলেন, তাঁহার রহস্য কৌতুকের ভাবটা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল, বলিলেন, কেন পারেনা?

রাখাল কারণটা খুলিয়া বলিল।

কে তোমাকে বল্‌লে?

রাখাল ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, নতুন-মা।

ওঁকে কে বল্‌লে?

আপনি ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ব্রজবাবু স্তব্ধভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, নতুন-বৌ, কথাটা কি সত্যি?

নতুন-মা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ, সত্য।

ব্রজবাবুর চিন্তার সীমা রহিলনা। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে বলিলেন, তা'হলেও উপায় নেই। রেণুর আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, পর্শু বিয়ে, একদিনের মধ্যে আমি পাত্র পাবো কোথায়?

নতুন-মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তুমি তো নিজে পাত্র খুঁজে আনোনি মেজকর্ত্তা, যাঁরা এনেছিলেন তাঁদের হুকুম করো।

ব্রজবাবু বলিলেন, তারা শুন্‌বে কেন? তুমি তো জানো নতুন-বৌ, হুকুম করতে আমি জানিনে,—কেউ আমার তাই কথা শোনেনা। তারা তো পর, কিন্তু তুমিই কি কখনো আমার কথা শুনেচো আজ সত্যি ক'রে বলো দিকি।

হয়ত' বিগত দিনের কি-একটা কঠিন অভিযোগ এই উল্লেখটুকুর মধ্যে গোপন ছিল সংসারে এই দুটি মানুষ ছাড়া আর কেহ তাহা জানেনা। নতুন-মা উত্তর দিতে পারিলেননা, গভীর লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কাটিল। ব্রজবাবু মাথা নাড়িয়া অনেকটা যেন নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব।

রাখাল মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, অসম্ভব কি কারণে কাকাবাবু?

ব্রজবাবু বলিলেন, অসম্ভব বলেই অসম্ভব রাজু। নতুন বৌ জানেনা, জানবার কথাও নয়, কিন্তু তুমি তো জানো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে, চোখের দৃষ্টিতে নিরাশা যেন ফুটিয়া পড়িল। অন্যথার কথা যেন তিনি ভাবিতেই পারিলেননা।

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, নতুন-বৌ তো জানেনা, তাকে বুঝিয়েই বলোনা মেজকর্ত্তা, অসম্ভব কিসের জন্যে? রেণুর মা নেই, তার বাপ আবার যাকে বিয়ে করেছে তার ভাই চায় পাগলের হাতে মেয়ে দিতে,—তাই অসম্ভব? কিছুতেই ঠ্যাকানো যায়না এই কি তোমার শেষ কথা? তাঁহার মুখের পরে ক্রোধ, করুণা, না তাচ্ছল্য কিসের ছায়া যে নিঃসংশয়ে দেখা দিল বলা কঠিন।

দেখিয়া ব্রজবাবুর তৎক্ষণাৎ স্মরণ হইল যে-অবাধ্য নতুন-বৌয়ের বিরুদ্ধে এইমাত্র তিনি অভিযোগ করিয়াছেন এ সেই। রাখালের মনে পড়িল যে-নতুন-মা বাল্যকালে তাহার হাত ধরিয়া নিজের স্বামী-গৃহে আনিয়াছিলেন ইনি সেই।

লজ্জা ও বেদনায় অভিসিঞ্চিত যে-গৃহের আলো-বাতাস স্নিগ্ধহাস্য-পরিহাসের মুক্তস্রোতে অভাবনীয় সহৃদয়তায় উজ্জ্বল হইয়া আসিতেছিল, এক মুহূর্ত্তেই আবার তাহা শ্রাবণের অমানিশার অন্ধকারের বোঝা হইয়া উঠিল। রাখাল ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা, অনেকক্ষণ তো আপনি পাণ খান্‌নি? আমার মনে ছিলনা মা, অপরাধ হয়ে গেছে।

নতুন-মা কিছু আশ্চর্য্য হইলেন—পাণ? পাণের দরকার নেই বাবা।

নেই বই কি! ঠোঁট দুটি শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেচে। কিন্তু আপনি ভাবচেন এখুনি বুঝি হিন্দুস্থানী পাণ-বালার দোকানে ছুটবো। না মা, সে বুদ্ধি আমার আছে। এসো ত তারক, এই মোড়টায় কাছে আমাকে একটু দাঁড়াবে, এই বলিয়া সে বন্ধুর হাতে একটা প্রচণ্ড টান দিয়া দ্রুতবেগে দুজনে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

এইবার নিরালা গৃহের মধ্যে মুখোমুখি বসিয়া দুজনেই সঙ্কোচে মরিয়া গেলেন। নিঃসম্পর্কীয় যে-দুটি লোক মেঘ-খণ্ডের ন্যায় এতক্ষণ আকাশের সূর্য্যালোক বাধাগ্রস্ত রাখিয়াছিল, তাহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বিনির্ম্মুক্ত রবিকরে ঝাপসা কিছুই আর রহিলনা। স্বামী-স্ত্রীর গভীর ও নিকটতম সম্বন্ধ যে এমন ভয়ঙ্কর বিকৃত ও লজ্জাকর হইয়া উঠিতে পারে এই নিভৃত নির্জ্জনতায় তাহা ধরা পড়িল। ইতিপূর্ব্বের হাস্য-পরিহাসের অবতারণা যে কত অশোভন ও অসঙ্গত এ কথা ব্রজবাবুর মনে পড়িল, এবং অপরিচিত পুরুষদের সম্মুখে ঐ লজ্জাবলুণ্ঠিত নিঃশব্দ নারীর উদ্দেশে অবক্ষিপ্ত ফুট-কড়াইয়ের রসিকতা যেন এখন তাঁহার নিজেরই কান মলিয়া দিল। মনে হইল, ছি ছি, করিয়াছি কি!

পাণ আনার ছল করিয়া রাখাল তাঁহাদের একলা রাখিয়া গেছে। কিন্তু সময় কাটিতেছে নীরবে। হয়ত তাহারা ফিরিল বলিয়া। এমন সময়ে কথা কহিলেন, নতুন-বৌ প্রথমে। মুখ তুলিয়া বলিলেন, মেজকর্ত্তা আমাকে তুমি মার্জ্জনা কর।

ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জ্জনা করা সম্ভব বলে তুমি মনে করো?

করি কেবল তুমি বলেই। সংসারে আর কেউ হয়ত পারেনা, কিন্তু তুমি পারো। তাঁহার চোখ দিয়া এতক্ষণে জল গড়াইয়া পড়িল।

ব্রজবাবু ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ, মার্জ্জনা করতে তুমি পারতে?

নতুন-বৌ আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমরা তো পারিই মেজকর্ত্তা। পৃথিবীতে এমন কোন মেয়ে আছে যাকে স্বামীর এ অপরাধ ক্ষমা করতে হয়না? কিন্তু আমি সে তুলনা দিইনে, আমার ভাগ্যে এমন স্বামী পেয়েছিলাম যিনি দেহে-মনে নিষ্পাপ, যিনি সব সন্দেহের ওপরে। আমি কি ক'রে তোমাকে এর জবাব দেবো?

কিন্তু আমার মার্জ্জনা নিয়ে তুমি করবে কি?

যতদিন বাঁচ্‌বো মাথায় তুলে রাখ্‌বো। আমাকে কি তুমি ভুলে গেছো মেজকর্ত্তা?

তোমার মনে কি হয় বলো ত নতুন-বৌ?

এ প্রশ্নের জবাব আসিলনা। শুধু স্তব্ধ নত-মুখে উভয়েই বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জ্জনা চেয়োনা নতুন-বৌ, সে আমি পারবোনা। যতদিন বাঁচবো তোমার ওপরে এ অভিমান আমার যাবেনা। তবু, পাছে স্বামীর অভিশাপে তোমার কষ্ট বাড়ে এই ভয়ে কোনদিন তোমাকে অভিশাপ দিইনি। কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ মুখ না তুলিয়াই বলিল, পারি।

ব্রজবাবু বলিলেন,—তা'হলে আর আমি দুঃখ কোরব না। সেদিন আমাকে সবাই বল্লে অন্ধ, বল্লে নির্বোধ, বল্লে দেখিয়ে দিলেও যে দেখ্‌তে পায়না, প্রমাণ করে দিলেও যে বিশ্বাস করেনা তার দুর্দ্দশা এমন হবেনা তো হবে কার! কিন্তু দুর্দ্দশা হয়েছে বলেই কি নিজেকে অন্ধ বলে মেনে নিতে হবে নতুন-বৌ? বল্‌তে হবে যা' করেছি আমি সব ভুল? জানি, ভাই আমাকে ঠকিয়েছে, আমাকে ঠকিয়েছে বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী কর্ম্মচারী, —ঠকিয়েছে অনেকেই। কিন্তু, যখন সব যেতে বসেছিল সেই দুর্দ্দিনে তোমাকে বিবাহ ক'রে আমিই তো ঘরে আনি। তুমি এসে একে একে সমস্ত বন্ধ করলে, সব লোকসান পূর্ণ হয়ে এলো,—সেই-তোমাকে অবিশ্বাস করতে পারিনি বলে আমি হোলাম অন্ধ, আর যারা চক্রান্ত কোরে, বাইরের লোক জড়ো করে তোমাকে নীচে টেনে নামিয়ে বাড়ীর বার করে দিলে তারাই চক্ষুষ্মান? তাদের নালিশ, তাদের নোঙ্‌রা কথায় কান দিইনি বলেই আজ আমার এই দুর্গতি? আমার দুঃখের এই কি হলো সত্যি ইতিহাস? তুমিই বলো ত নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ কখন্ যে মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল বোধহয় তাহা নিজেই

জানিতনা, এখন হঠাৎ তাঁহার কথা থামিতেই সে যেন চমকিয়া আবার মুখ নীচু করিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি ছিলে শুধুই কি স্ত্রী? ছিলে গৃহের লক্ষ্মী, সমস্ত পরিবারের কর্ত্রী, আমার সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, সকল বন্ধুর বড় বন্ধু,—তোমার চেয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি আমাকে কে কবে করেছে? এমন জোরে মঙ্গল কে কবে চেয়েছে? কিন্তু একটা কথা আমি প্রায় ভাবি নতুন-বৌ, কিছুতে জবাব পাইনে। আজ দৈবাৎ যদি কাছে পেয়েছি বলো ত সেদিন কি হয়েছিল? এত আপনার হয়েও কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসতে পারোনি? না বুঝে তুমি তো কখনো কিছু করোনা,--দেবে এর সত্যি জবাব? যদি দাও, হয়ত আজও মনের মধ্যে আবার শান্তি পেতে পারি। বল্‌বে?

নতুন-বৌ মুখ তুলিয়া চাহিলনা, কিন্তু মৃদুকণ্ঠে কহিল, আজ নয় মেজকর্ত্তা।

আজ নয়? তবে, কবে দেবে বলো? আর যদি দেখা না হয়, চিঠি লিখে জানাবে?

এবার নতুন-বৌ চোখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, না, মেজকর্ত্তা, আমি তোমাকে চিঠিও লিখ্‌বনা, মুখেও বোলবনা।

তবে, জান্‌বো কি করে?

জান্‌বে যেদিন আমি নিজে জান্‌তে পারবো।

কিন্তু, এ যে হেঁয়ালি হোলো।

তা' হোক্‌। আজ আশীর্ব্বাদ করো এর মানে যেন একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।

দ্বারের বাহিরে হইতে সাড়া আসিল, আমার বড্ডো দেরি হয়ে গেল। এই বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল, একডিবা পাণ সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, সাবধানে তৈরি করিয়ে এনেছি মা, এতে অশুচি স্পর্শদোষ ঘটেনি। নিঃসঙ্কোচে মুখে দিতে পারেন।

নতুন-বৌ ইঙ্গিতে স্বামীকে দেখাইয়া দিতে রাখাল ঘাড় নাড়িল। ব্রজবাবু বলিলেন, আমি তেরো বচ্ছর পাণ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, নতুন-বৌ, এখন তুমি হাতে ক'রে দিলেও মুখে দিতে পারবোনা।

সুতরাং, পাণের ডিবা তেম্‌নিই পড়িয়া রহিল, কেহ মুখে দিতে পারিলেননা।

তারক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বাসায় যাইবার কথা, অথচ যায় নাই, কাছেই কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। যে-কারণেই হোক সে দীর্ঘক্ষণ অনুপস্থিত থাকিতে চাহেনা। তাহার এই অবাঞ্ছিত কৌতূহল রাখালের চোখে বিসদৃশ ঠেকিল, কিন্তু সে চুপ করিয়াই রহিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, নতুন-বৌ, তোমার সেই মোটা বিছে-হারটা কি ভট্‌চায্যি মশায়ের ছোট মেয়েকে বিয়ের সময়ে দেবে বলেছিলে? বিয়ে অনেকদিন হয়ে গেছে, দুটি ছেলে-মেয়েও হয়েছে, এতকাল সঙ্কোচে বোধ করি চাইতে পারেনি, কিন্তু এবার পুজোর সময়ে এসে সে হারটা চেয়েছিল,—দেবো?

নতুন-বৌ বলিলেন, হাঁ, ওটা তাকে দিয়ো।

ব্রজবাবু কহিলেন, আর একটা কথা। তোমার যে-টাকাটা কারবারে লাগানো ছিল সুদে-আসলে সেটা হাজার পঞ্চাশ হয়েছে। কি করবে সেটা? তুলে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো?

তুল্‌বে কেন, আরও বাড়ুক্‌না।

না নতুন-বৌ সাহস হয়না। বরিশালের চালানি সুপারির কাজে অনেক টাকা লোকসান গেছে,—থাক্‌লেই হয়ত টান্‌ ধরবে।

নতুন-বৌ একটু ভাবিয়া বলিলেন, এ ভয় আমার বরাবর ছিল। গোকুল সাহাকে সরিয়ে দিয়ে তুমি বীরেনকে পাঠাও। আমার টাকা মারা যাবেনা।

ব্রজবাবুর চোখ দুটা হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল। সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, নিজেও তো বুড়ো হোলাম গো, আরও খাট্‌বো কত কাল? ভাব্‌চি সব তুলে দিয়ে এবার—

ঠাকুরঘর থেকে বার হবেনা,—এই তো? না, সে হবেনা।

ব্রজবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একটি কথাও কহিলেন না। মনে মনে কি যে ভাবিতে লাগিলেন বোধ হয় একটিমাত্র লোকই তাহার আভাস পাইল।

হঠাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিলেন, দেখো নতুন-বৌ, সোনাপুরের কতটা অংশ দাদার ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া তুমি উচিত মনে করো?

নতুন-বৌ বলিলেন, তাদের তো আর কিছুই নেই। সবটাই ছেড়ে দাওনা।

সবটা?

ক্ষতি কি?

বেশ, তাই হবে। তোমার মনে আছে বোধ হয় দাদার বড় মেয়ে জয়দুর্গাকে কিছু দেবার কথা হয়েছিল। জয়দুর্গা বেঁচে নেই, কিন্তু তার একটি মেয়ে আছে, অবস্থা ভালো নয়, এরা ভাগ্নীকে কিছুই দিতে চায় না। তুমি কি বলো?

নতুন-বৌ বলিলেন, সোনাপুরের আয় বোধ হয় হাজার টাকার ওপর। জয়দুর্গার মেয়েকে একশো টাকার মতো ব্যবস্থা করে দিলে অন্যায় হবেনা।

ভালো, তাই হবে।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল।

হাঁ, নতুন-বৌ, তোমার গয়নাগুলো কি সব সিন্দুকেই পচ্‌বে? কেবল তৈরিই করালে, কখনো পরলেনা। দেবো সেগুলো তোমাকে পাঠিয়ে?

নতুন-বৌ হঠাৎ বোধ হয় প্রস্তাবটা বুঝিতে পারেন নাই, তারপরে মাথা হেঁট করিলেন। একটু পরেই দেখা গেল টেবিলের উপরে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

ব্রজবাবু শশ-ব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, থাক্ থাক্, নতুন-বৌ তোমার রেণু পরবে। ও-কথায় আর কাজ নেই।

মিনিট পাঁচ ছয় পরে তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, সন্ধ্যা হয়ে আস্‌চে, এবার তাহলে আমি উঠি।

তাঁহার সন্ধ্যা-আহ্নিক, গোবিন্দর সেবা—এই সকল নিত্যকর্ত্তব্যের কোন কারণেই সময় লঙ্ঘন করা চলেনা তাহা রাখাল জানিত। সেও ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রৌঢ়কালে ব্রজবাবুর ইহাই যে প্রত্যহের প্রধান কাজ নতুন-বৌ তাহা জানিত না। আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, রেণুর বিয়ের কথাটা তো শেষ হলোনা মেজকর্ত্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি যখন চাওনা তখন ও-বাড়ীতে হবেনা।

নতুন-বৌ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বাঁচলাম।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু বিয়ে তো বন্ধ রাখা চল্‌বেনা। সুপাত্র পাওয়া চাই, দুটো খেতে-পরতে পায় তাও দেখা চাই। রাজু, তোমার তো বাবা অনেক বড় ঘরে যাওয়া-আসা আছে, তুমি একটি স্থির করে দিতে পারোনা? এমন মেয়ে তো কেউ সহজে পাবেনা।

রাখাল অধোমুখে মৌন হইয়া রহিল।

নতুন-বৌ বলিলেন, এত তাড়াতাড়ির দরকার কি মেজকর্ত্তা।

ব্রজবাবু মাথা নাড়িলেন,—সে হয়না নতুন-বৌ। নির্দ্দিষ্ট দিনে দিতেই হবে,—দেশাচার অমান্য করতে পারবোনা। তা'ছাড়া আরও অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

কিন্তু এর মধ্যে সুপাত্র যদি না পাওয়া যায়?

পেতেই হবে।

কিন্তু না পাওয়া গেলে? পাগলের বদলে বাঁদরের হাতে মেয়ে দেবে?

সে মেয়ের কপাল।

তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে ওকে জলে ফেলে দিয়ো। তাই তো দিচ্ছিলে।

আলোচনা পাছে বাদানুবাদে দাঁড়ায় এই ভয়ে রাখাল মাঝখানে কথা কহিল, বলিল, মামাবাবু কি রাগারাগি করবেন মনে হয় কাকাবাবু?

ব্রজবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মনে হয় বই কি। হেমন্তর স্বভাব তুমি জানোই ত রাজু। সহজে ছাড়বেনা।

রাখাল খুব জানিত,—তাই চুপ করিয়া রহিল।

নতুন-বৌ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তোমার মেয়ে, যেখানে ইচ্ছে বিয়ে দেবে, ইচ্ছে না হলে দেবেনা, তাতে হেমন্তবাবু বাধা দেবেন কেন? দিলেই বা তুমি শুন্‌বে কেন?

প্রত্যুত্তরে ব্রজবাবু না বলিলেন বটে কিন্তু গলায় জোর নাই তাহা সকলেই অনুভব করিল। নতুন-বৌ বলিতে লাগিলেন, তোমার ছেলে নেই, শুধু দুটি মেয়ে। এরা যা পাবে তাতে খুঁজলে কলকাতা সহরে সুপাত্রের অভাব হবেনা, কিন্তু সে ক'টা দিন তোমাকে স্থির হয়ে থাক্‌তেই হবে। আশীর্ব্বাদ, গায়ে-হলুদের ওজর তুলে ভূত-প্রেত, পাগল-ছাগলের হাতে মেয়ে সম্প্রদান করা চল্‌বেনা। এর মধ্যে হেমন্তবাবু বলে কেউ নেই। বুঝ্‌লে মেজকর্ত্তা?

ব্রজবাবু বিষণ্ন মুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

রাখাল কথা কহিল। বলিল, এ হোলো সহজ যুক্তি ও

ন্যায়-অন্যায়ের কথা মা, কিন্তু হেমন্তবাবুকে তো আপনি জানেন না। রেণু অনেক-কিছু পাবে বলেই তার অদৃষ্টে আজ মামাবাবুর পাগল আত্মীয় জুটেছে, নইলে জুটতোনা—ও নিশ্বাস ফেল্‌বার সময় পেতো। মামাবাবু এক কথায় হাল ছাড়বার লোক নয় মা।

কি করবেন তিনি শুনি?

রাখাল জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ চাপিয়া গেল। ব্রজবাবু দেখিয়া বলিলেন, লজ্জা নেই রাজু, বলো। আমি অনুমতি দিচ্চি।

তথাপি রাখালের সঙ্কোচ কাটেনা, ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিল, ও লোকটা গায়ে হাত দিতে পর্য্যন্ত পারে।

কার গায়ে হাত দিতে পারে রাজু? মেজকর্ত্তার?

হাঁ, একবার ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, পোনর-ষোল দিন কাকাবাবু উঠ্‌তে পারেন নি।

নতুন-মার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—তারপরেও ও বাড়ীতে আছে? খাচ্চে পরচে?

রাখাল বলিল, শুধু নিজে নয়, মাকে পর্য্যন্ত এনেছেন। কাকাবাবুর শাশুড়া। পরিবার নেই, মারা গেছেন, নইলে তিনিও বোধ করি এতদিনে এসে হাজির হতেন। শেকড় গেড়ে ওরা বসেছে মা, নড়ায় সাধ্য কার? আমাকে একদিন নিজে আশ্রয় দিয়ে এনেছিলেন বলে কেউ টলাতে পারেনি, কিন্তু মামাবাবুর একটা ভ্রূকুটির ভার সইলোনা, ছুটে পালাতে হলো। সত্যি কথা বলি মা, রেণুর বিয়ে নিয়ে কাকাবাবুর সম্বন্ধে আমার মস্ত ভয় আছে।

নতুন-বৌ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। নিরুপায় নিষ্ফল আক্রোশে তাঁহার চোখ দিয়া যেন আগুনের স্রোত বহিতে লাগিল।

রাখাল ইঙ্গিতে ব্রজবাবুকে দেখাইয়া বলিল, এখন হেমন্তবাবু বাড়ীর কর্ত্তা, তাঁর মা হলেন গিন্নী। এই দাবানলের মধ্যে এই শান্ত, নিরীহ মানুষটিকে একলা ঠেলে দিয়ে আমার কিছুতে ভয় ঘোচেনা। অথচ, পাগলের হাত থেকে রেণুকে বাঁচাতেই হবে। আজ আপনার মেয়ে, আপনার স্বামী বিপদে কুল-কিনারা পায়না মা, এ ভাবলেও আমার মাথা খুঁড়ে' মরতে ইচ্ছে করে।

নতুন-মা জবাব দিলেননা, শুধু সম্মুখের টেবিলের পরে ধীরে ধীরে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তারক উত্তেজনায় ছটফট্ করিয়া উঠিল। সংসারে এতবড় নালিশ যে আছে ইহার পূর্ব্বে সে কল্পনাও করে নাই। আর ঐ নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, পাষাণ মূর্ত্তি,—কি কথা সে ভাবিতেছে!

মিনিট দুই-তিন কাটিল, কে জানে আরও কতক্ষণ কাটিত,—বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে ঘা পড়িল। বুড়ি-ঝি মনে করিয়া রাখাল কবাট খুলিতেই একজন ব্যস্ত-ব্যাকুল বাঙালী চাকর ঘরে ঢুকিয়া পড়িল,—মা?

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন,—তুই যে?

সে অত্যন্ত উত্তেজিত, কহিল, ড্রাইভার নিয়ে এলো মা। শীগ্‌গীর চলুন, বাবু ভয়ানক রাগ করচেন।

কথাটা সামান্যই, কিন্তু কদর্য্যতার সীমা রহিলনা। ব্রজবাবু লজ্জায় আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

চাকরটার বিলম্ব সহেনা, তাগাদা দিয়া পুনশ্চ কহিল,—উঠে পড়ুন মা, শীগ্‌গীর চলুন। গাড়ী এনেচি।

কেন?

লোকটা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। স্পষ্টই বুঝা গেল বলিতে তাহার নিষেধ আছে।

বাবু কেন ডাক্‌চেন?

চলুননা মা, পথেই বোল্‌ব।

আর তর্ক না করিয়া নতুন-মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, চোল্‌লাম মেজকর্ত্তা।

চল্‌লে?

হাঁ। এ কি তুমি ডেকে পাঠিয়েচো যে জোর করে, রাগ করে বোল্‌ব, এখন যাবার সময় নেই তুই যা? আমাকে যেতেই হবে। যাকে কখনো কিছু বলোনি, তোমার সেই নতুন-বৌকে আজ একবার মনে করে দেখো ত মেজকর্ত্তা, দেখো ত তাকে আজ চেনা যায় কিনা।

ব্রজবাবু মুখ তুলিয়া নির্ণিমেষে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

নতুন বৌ বলিলেন, মার্জ্জনা ভিক্ষে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বীকার করোনি,—উপেক্ষা করে বল্‌লে এ নিয়ে তোমার হবে কি! কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি, চাইতে তোমার কাছে আমার লজ্জা করে,—অভিমান হয়। কিন্তু আর যে-যাই বলুক মেজকর্ত্তা, অমন কথা তুমি কখনো আমাকে বোলোনা। বল্‌বেনা বলো?

ব্রজবাবুর বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্প হইয়া গেল। বহুদিন পূর্ব্বের একটা ঘটনা মনে পড়িল,—তখন রেণুর জন্মের পরে নতুন-বৌ পীড়িত। কি-একটা জরুরি কাজে তাঁহার ঢাকা যাইবার প্রয়োজন, সেদিনও এই নতুন-বৌ কণ্ঠস্বরে এম্নি আকুলতা ঢালিয়াই মিনতি জানাইয়াছিল,—ঘুমিয়ে পড়লে ফেলে রেখে আমাকে পালাবেনা বলো? সেদিন বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে ঢাকা যাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সেদিনও স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহাকে গঞ্জনা দিতে লোকে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু আজ?

চাকরটা বুঝিলনা কিছুই, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া হঠাৎ কেমন ভয় পাইয়া বলিয়া ফেলিল, মা, তোমার নীচের ভাড়াটে একজন আফিং খেয়ে মর-মর হয়েছে,—তাই এসেচি ডাক্‌তে।

নতুন-বৌ সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে আফিং খেলে রে?

জীবনবাবুর স্ত্রী।

জীবনবাবু কোথায়?

চাকরটা বলিল, তাঁর সাত-আটদিন খোঁজ নেই। শুনেচি, আফিসের চাক্‌রি গেছে বলে পালিয়েছে।

কিন্তু তোর বাবু করছেন কি? হাঁসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে?

চাকরটা বলিল, কিছুই হয়নি মা, পুলিশের ভয়ে বাবু দোকানে চলে গেছেন।

তোমার বাড়ী, তোমার ভাড়াটে, তুমিই তার উপায় করো মা। বউটা হয় ত বাঁচবেনা।

রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, দরকার হতে পারে মা, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারবেনা বাবা, এসো।

যাবার পূর্ব্বে এবার তিনি হাত দিয়া স্বামীর পা দুটি স্পর্শ করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন।

সকলে বাহির হইলে রাখাল ঘরে তালা দিয়া নতুন-মার অনুসরণ করিল। (ক্রমশঃ)

ওপারে

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল

সারথি, রথের গতি সংযত করগো ক্ষণতরে;
পিছু পথে, নীচু পথে ফিরে দেখি, যেথা স্তরে স্তরে
পর্ব্বত-প্রান্তর-সিন্ধু সঙ্কুচিত আকাশের তটে,
আলোকের তুলিকায় অঙ্কিত রয়েছে চিত্রপটে।

অই সেই জন্মভূমি, জীবনের স্পন্দনেতে কাঁপে;
ব্যথা তার, গাথা তার ফুটে ওঠে কিরণের তাপে।
শঙ্কিত আকাঙ্ক্ষা লোটে বাতাসের প্রবাহে ধূলায়;
সমীরে সুরভি তার আপনারে মাতায়ে ভুলায়।

প্রীতির নির্ঝর তার উছলিয়া ঝরে নিজপদে;
প্রতিবিম্বে আপনার ছায়া নাচে আপনার হ্রদে।
কল্লোলে কাঁদিয়া বলে—কত দূরে আমার প্রসার!
নিজের ক্ষুদ্রতা মাঝে রচিছে সে অসীম অপার।

চিরকান্ত অফুরন্ত মহিমায় যে প্রতিমা ঘেরা—
জানি, জানি, অসম্ভব আর বার তার মাঝে ফেরা।
রূপ-রস-গন্ধ তার একবার আহরিয়া যাই,—
লুপ্ত পুলকের স্বপ্নে একবার শিহরিয়া চাই।

সারথি, চালাও রথ, দেখি পথ নবতা-নন্দিত।
অই কিগো লুপ্ত প্রীতি প্রতিবিম্বে রয়েছে রঞ্জিত!
জগতের ক্ষুদ্রধারা অই যেন গ্রথিত ভূমায়;
জাগিছে চেতনা নব লুপ্তপ্রায় ভাবের ধূঁয়ায়।
চূর্ণ চক্রবাল-রেখা, কোথা একা চলেছি জানাও!
সারথি, রথের গতি আর বার থামাও, থামাও।

পঞ্জাব-সীমান্তে কয়দিন

ডাক্তার শ্রীষষ্ঠিদাস মুখোপাধ্যায় এম-বি (হোমিও)

গত পূজার পর মধ্যভারত ও বোম্বাই—নাসিক ভ্রমণ করিয়া বাটী ফিরিবার দিন হইতে যে ম্যালেরিয়া সাড়ম্বরে আক্রমণ করিল, দীর্ঘ চারিমাসের বিবিধ চেষ্টা সত্বেও তাহার কবল হইতে অব্যাহতির আশা সুদূর রহিল। তখন 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' এই নীতি অবলম্বন করিয়া ম্যালেরিয়ার 'এলাকা' অতিক্রম করিয়া স্থানান্তরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত কি না ইত্যাদি যখন বিবেচনা করিতেছি, তখন সুদূর পঞ্জাব-সীমান্ত হইতে মদীয় কুটুম্বপ্রবর শ্রীযুক্ত সরোজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জরুরী তলব তাঁহার ভ্রাতা পঙ্কজনাথের মারফতে পাইলাম। একেবারে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা (body warrant)—অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ শান্তিপুরের আদি অধিবাসী হইলেও তিন পুরুষ যাবৎ কর্ম্মোপলক্ষে ('রুজী রোজগারকা ওয়াস্তে' ইতি ভাষ্য) পঞ্জাব প্রদেশেই আছেন। সরোজ বাবুর পিতামহ স্বর্গীয় বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে Assistant Engineer হইয়া N. W. Railwayতে কর্ম্ম-জীবন আরম্ভ করেন ও নিজ কর্ম্মকুশলতায় 'রায় সাহেব' উপাধি পান এবং সরগোডা জেলায় সরকার-প্রদত্ত ২৫০ একর নিষ্কর জমি 'ইনাম' লাভ করেন। অনেক প্রবাসী বাঙ্গালী স্বদেশের সহিত যাবতীয় বন্ধন-সূত্র ছিন্ন করিয়া নিজেদের 'ছাতু' বানাইয়া গৌরবান্বিত বোধ করেন; ইঁহারা সেরূপ নহেন। ইঁহাদের পৈতৃক ভিটা ও বসতবাটী অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভবানীপুরেও 'ইঁট গাড়িয়া' দেশের সহিত সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি কুলগত সংস্কারগুলি দেশে আসিয়া সম্পন্ন করেন এবং কর্ম্ম-জীবনের মধ্যে অবকাশ পাইলেই দেশস্থিত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আসিয়া নিজেরা তৃপ্তিলাভ করেন। N. W. Railway ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে লিপ্ত থাকায় পঞ্জাব, সিন্ধু-প্রদেশের, এমন কি বেলুচিস্থানের বিভিন্ন স্থানেও ইঁহাদিগকে ঘুরিতে হয়। বর্ত্তমানে সরোজবাবু পঞ্জাব সীমান্তে 'খুসাব' নামক স্থানে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেছেন।

তাঁহার তলব গ্রহণ করিলাম এবং সনাতন প্রথানুসারে শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখিয়া ১১ই মার্চ্চ তারিখে সপরিবারে হাওড়া হইতে E. I. R. কোম্পানীর ট্রেণের রাজা 'তুফান মেলে' রওনা হইলাম। সরোজবাবুর অপরা ভগিনীও সপুত্রকন্যা আমাদের সহিত হাওড়া ষ্টেশনে মিলিতা হইলেন। ১২ তারিখ বৈকালে আমরা দিল্লী পৌঁছিলাম। দিল্লী হইতে রাত্রির ট্রেণে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে লাহোর আসিলাম। লাহোরে একদিন বিশ্রাম করিয়া মধ্যাহ্নের ট্রেণে রওনা হইয়া সন্ধ্যা নাগাদ লালামুসায় গাড়ী বদল করিলাম। লালামুসা হইতে মুলতানগামী ট্রেণে উঠিয়া আমরা রাত্রি ১১টার সময় খুসাব ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। লাহোর হইতে লালামুসার মধ্যে গুজরাণওয়ালা, ওয়াজিরাবাদ, গুজরাট প্রভৃতি স্থানগুলি পড়িয়াছিল। লালামুসা ছাড়িয়া খুসাব আসিতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চিলিনওয়ালার যুদ্ধক্ষেত্র পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই পঞ্জাবের গৌরব-রবির শেষ রেখা অস্তমিত হয়। কুটুম্বপ্রবর সস্ত্রীক ষ্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া বাধিত করিলেন। ষ্টেশনের নিকটেই ব্যানার্জ্জী সাহেবের বিস্তৃত বাংলো। বাংলোর 'হাতার' মধ্যে সব্জি ও ফুলের বাগান।

রাওলপিণ্ডি ডিভিসনের মধ্যে শা-পুর জেলার অন্তর্গত খুসাব একটী ছোট মহকুমা সহর। এ অঞ্চলের চতুর্দ্দিকেই মরুভূমি। দিবা দ্বিপ্রহরে সূর্য্যকিরণ-ঝলকিত বালুরাশির দিকে চাহিলে চক্ষুপীড়া অবশ্যম্ভাবী। তবে স্থানে স্থানে নয়নরঞ্জন মরীচিকার আভাষ পাওয়া যায়। দেখিলে মনে হয়, যেন কোন জলস্রোত মরুবক্ষ শীতল করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ভ্রমাত্মক। সহরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমায় ঝিলাম নদী; উত্তর-পশ্চিম সীমায় Salt Range; অবশিষ্টাংশ মরুভূমি। এই Salt rangeটী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সিন্ধুনদের অপর পারস্থিত সুলেমান পর্ব্বত হইতে শাখারূপে বাহির হইয়া Sind Sagar Doab

নামক সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর মধ্যস্থিত ভূভাগের উপর অবস্থিত। এই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে তিনটী লবণের খনি পাশাপাশি ভাবে থাকায় ইহাকে Salt Range নাম দেওয়া হইয়াছে; ১নং কালাবাগ, ২নং ওয়রেছা, ৩নং খেওড়া খনি। শেষোক্ত খনিটীই বৃহৎ। এই খনিগুলি হইতে Rock Salt (সৈন্ধব লবণ) সমগ্র ভারতে সরবরাহ হইতেছে। খেওড়া খনিটী আমরা দেখিয়াছি ও তৎসম্বন্ধে পরে বলিতেছি। খুসাবের লোকসংখ্যা দশহাজার। তাহার মধ্যে হিন্দু মাত্র দুই হাজার, অবশিষ্ট মুসলমান। এ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর মধ্যে মনোমালিন্ত এখনও প্রকট নহে। অধিবাসীদিগকে দেখিলে মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়। দৈহিক বল-বিক্রমের অনুপাতে মানসিক গুণেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সরল ব্যবহারের উত্তর ইহারা সরলভাবেই দেয় এবং বাঙ্গালীকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে। হিন্দুর সংখ্যা কম হইলেও, অর্থে, বিদ্যাবত্তায় ও প্রতিপত্তিতে হিন্দুই অগ্রগামী। পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাধারণ আচার-ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য বোঝা নবাগতের পক্ষে শক্ত। এ অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদিগকেই আমরা কলিকাতায় তথা সমগ্র বাঙ্গলায় 'পেশোয়ারী' বলিয়া ধরিয়া লই। স্থানীয় মহকুমা আদালতটী একটী দুর্গ-বিশেষ। ইহা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। চারিদিকে দুর্গ-প্রাকারের অনুকরণে সুদৃঢ় ও সুউচ্চ প্রাচীর। প্রবেশপথ সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত। সহরের প্রধান পথটী বাজারের মধ্যে দিয়া ঝিলাম নদীর তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাজার অতি ক্ষুদ্র। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিরও কিছু কিছু পাওয়া দুষ্কর। তবে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সহর অপেক্ষা অনেক সস্তা। এখানকার জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর। ঝিলাম নদীর সান্নিধ্যবশতঃ মরুভূমি-মধ্যে অবস্থিত হইলেও এখানে জল-কষ্ট নাই। পানীয় জলের আস্বাদ ঈষৎ লবণাক্ত। ভূমিজ দ্রব্যের মধ্যে কনক (গম) প্রধান। নদীতীরস্থিত নিম্ন-ভূমিতেই কৃষিকার্য্য সম্ভব হইয়াছে; অবশিষ্ট অনুর্ব্বর উচ্চভূমি। এই মরুভূমির মধ্যে বাবলা ও ঝাউজাতীয় এক-রকমের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়; অনেক স্থানে আবার তাহাও বিরল। এই মরুভূমির মধ্য দিয়া একটী প্রশস্ত পথ লাহোর হইতে 'মিয়াঁওয়ালী' ছাউনী হইয়া বান্নু, কোহাট প্রভৃতি সীমান্ত অঞ্চলে গিয়াছে। এই পথে উষ্ট্রপৃষ্ঠে সীমান্তবাসী পাঠানের দল শীতাবসানে দেশে ফিরিতেছে। ইহাদের সঙ্গে অশ্বতর, দুম্বা, ছাগল, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী ও যাবতীয় গৃহস্থালীর সরঞ্জামের অসদ্ভাব নাই। ইহাদের সঙ্গে ভীষণকায় দীর্ঘলোমাবৃত কতকগুলি কুকুর থাকে; তাহারা প্রহরীর কার্য্য করে। এই কুকুরগুলিকে 'গদ্দি' কুকুর বলে এবং এই কুকুরের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শ্বাপদ-সঙ্কুল পার্ব্বত্য-পথে যাতায়াত করে ও স্বচ্ছন্দে রাত্রিতে আকাশতলে নিদ্রা যায়। অনেক চেষ্টা করিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জীর এতদ্দেশীয় চৌকীদারের সাহায্যে এই জাতীয় একটী কুকুরের বাচ্ছা গজনীবাসী এক পাঠান সর্দ্দারের নিকট হইতে মুদ্রা-বিনিময়ে আদায় করিয়াছি। বাচ্ছাটী মাত্র চারি মাসের। বাঙ্গলার জলহাওয়ায় 'গজনী-বীর' কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বলা যায় না।

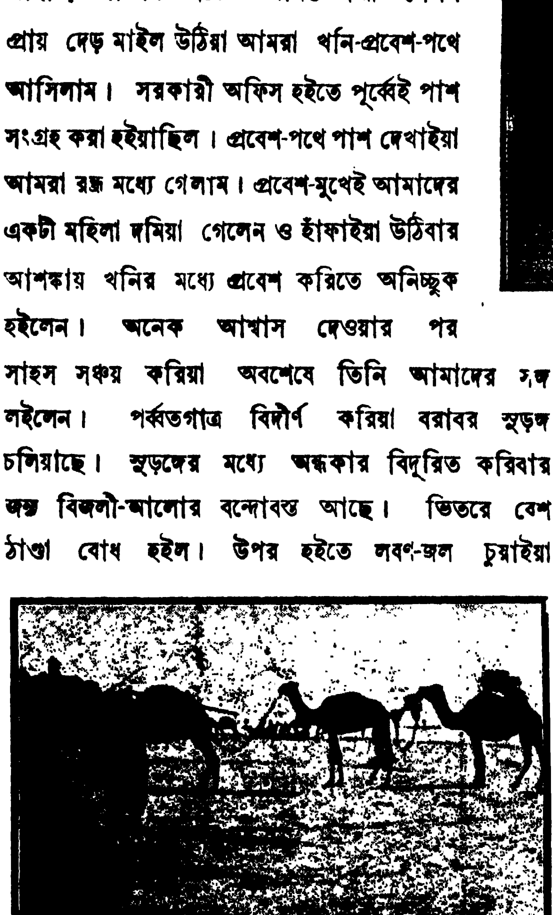
স্থানীয় সরকারী হাইস্কুলের পারিতোষিক-বিতরণ উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত ছিলাম। মহকুমার 'মা বাপ' (S. D. O.) Mr. Tollinghon I. C. S. উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। সেই মামুলী আবৃত্তি, গীত, অভিনয়াংশ, এবং 'হাল ফ্যাসানের' scout display ছাড়া নূতনত্ব কিছু দেখিলাম না। তবে হেডমাষ্টার Mr. Kolhi সুযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার report হইতে বুঝা গেল, স্কুলটী স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে এবং ছাত্রদিগের চরম পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতাও বিশেষ প্রশংসনীয়। মিঃ ব্যানার্জ্জীর সহিত অনত্রাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সকল স্থানেই যথেষ্ট সৌজন্যের পরিচয় পাইয়াছি ও বিদেশীকে বিশেষ করিয়া সম্মান দেখাইবার আগ্রহ সর্ব্বত্র লক্ষ্য করিয়াছি। আদব-কায়দায় এ অঞ্চলের অধিবাসীরা আমাদের পরাস্ত করিয়াছে, ইহা অবিসংবাদী সত্য।

খুসাবে মাসখানেক থাকিবার পর নষ্ট-স্বাস্থ্য অনেকটা ফিরিয়া পাইলাম। 'মোটে রুটী, দুম্বাকা গোস্ত' সহজেই হজম হইতে লাগিল। তখন নিকটবর্ত্তী দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিবার আগ্রহ হইল।

একদিন প্রত্যুষে ৫॥০ টার ট্রেণে আমাদের নাতি-বৃহৎ দলটী খেওড়া লবণ খনি ও পার্ব্বত্য তীর্থ 'কটাস-রাজ' দেখিতে রওনা হইল। খুসাব হইতে লালামুসার

দিকে আসিতে 'পিণ্ডাদান খাঁ' নামক ষ্টেশনে আমরা বেলা ৭॥০ টায় নামিলাম। ষ্টেশনের Rest Roomএ চা-যোগ সারিয়া আমরা মোটর-যোগে ৪॥ মাইল সমভূমি অতিক্রম করিয়া খেওড়া ষ্টেশনে আসিলাম। এখানে ভারত-সরকারের লবণ বিভাগের অফিস, কর্ম্মচারী-বৃন্দের বাসগৃহ ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের উপযুক্ত একটী বাজার আছে।

মোটর হইতে নামিয়া উঁচু-নীচু আঁকা-বাঁকা পাহাড়ে রাস্তায় উঠিতে আরম্ভ করা গেল। প্রায় দেড় মাইল উঠিয়া আমরা খনি-প্রবেশ-পথে আসিলাম। সরকারী অফিস হইতে পূর্ব্বেই পাশ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। প্রবেশ-পথে পাশ দেখাইয়া আমরা রন্ধ্র মধ্যে গেলাম। প্রবেশ-মুখেই আমাদের একটী মহিলা দমিয়া গেলেন ও হাঁফাইয়া উঠিবার আশঙ্কায় খনির মধ্যে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। অনেক আশ্বাস দেওয়ার পর সাহস সঞ্চয় করিয়া অবশেষে তিনি আমাদের সঙ্গ লইলেন। পর্ব্বতগাত্র বিদীর্ণ করিয়া বরাবর সুড়ঙ্গ চলিয়াছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকার বিদূরিত করিবার জন্ম বিজলী-আলোর বন্দোবস্ত আছে। ভিতরে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইল। উপর হইতে লবণ-জল চুয়াইয়া



মরুপথে পাঠানদের সীমান্তে প্রত্যাবর্ত্তন—খুসাব

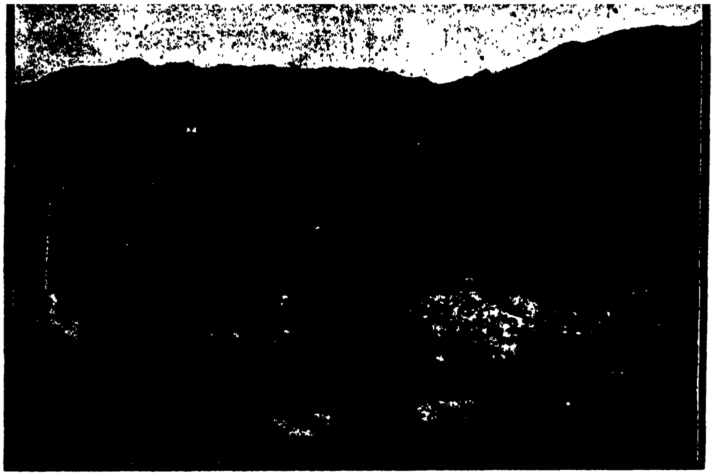
পড়িতেছে ও সেগুলি জমিয়া শলাকার রূপ ধারণ করিয়াছে। সুড়ঙ্গস্থিত উভয়পার্শ্বের দেওয়ালে ও ছাতে বিজলী-বাতির সাহায্যে লবণের চাঙড়গুলি বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। এই সুড়ঙ্গ ঘুরিয়া-ফিরিয়া প্রায় সাত মাইল চলিয়াছে। অবশেষে আমরা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া একটী বৃহৎ চৌবাচ্চার ধারে আসিলাম। উক্ত চৌবাচ্চার তলদেশ লবণ-জলে পরিপূর্ণ। আমাদের সঙ্গে যে সরকারী পরিদর্শকগুলি আসিয়াছিল, তাহারা রংমশাল জ্বালিয়া ও ২।৪টী ফানুস ছাড়িয়া ঐ স্থানটী স্পষ্ট দেখিবার সুযোগ করিয়া দিল। উপরের ছাতটী সমস্তই লবণের, আশ-পাশের দেওয়ালগুলিও তদ্রূপ। উজ্জ্বল আলোক-ছটায় বৃহৎ গুহাটী সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়া সপ্তবর্ণের



ঝটিকার আক্রমণে আদালত গৃহ—খুসাব

সমাবেশে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিল। এ স্থানে সুড়ঙ্গ-গাত্রে লবণের চাঙড়ের মধ্যে একটী বৃহৎ কাঠের গুঁড়ি প্রোথিত অবস্থায় দেখা গেল। শুনিলাম, উহা কি কাঠ এবং কিরূপ ভাবে এখানে আসিল তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার জন্ম উহার কিয়দংশ বিলাতে পাঠান হইয়াছে। এই লবণ-প্রস্তর-রাজ্যে উদ্ভিদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা খনিবিদ্‌গণের গবেষণার বিষয়। আরও কিছুদূর যাইয়া আমরা একটী লবণ-স্তম্ভের (column) নিকট আসিলাম। স্তম্ভটী ২৫ ফিট উচ্চ ও ৭ ফিট গভীর। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ; এক পার্শ্বে বাতি জ্বালিয়া অপর পার্শ্বে আলোকরশ্মি ভেদ করিয়া আসিতেছে দেখা গেল। বিশ্বস্রষ্টা নির্জ্জনে বসিয়া কতই অপরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন ও সেই সৃষ্টিকলা মানব-বুদ্ধি কিরূপে আপন কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যথার্থ আনন্দ পাওয়া যায়। কাচ্চা-বাচ্চা ও মহিলাত্রয় সঙ্গে থাকায় এই রন্ধ্রপথে অধিকক্ষণ থাকিতে সাহস হইল না। যে পথে যাওয়া হইয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া মনে হইল বুঝি রাত্রির অন্ধকারে এক স্বপ্নরাজ্যে যাওয়া হইয়াছিল।

তাহার পর খেওড়া ষ্টেশনের Waiting Roomএ আসিয়া মধ্যাহ্নভোজন শেষ হইল ও পুনরায় বেলা ২টার সময় মোটরে উঠিলাম। অতঃপর মোটরখানি ধীরে ধীরে পার্ব্বত্যপথে উঠিতে লাগিল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই আমরা প্রায় ৩০০ ফুট উচ্চে উঠিলাম। পথটীর



পাহাড়ের উপর সহরের দৃশ্য—খেওড়া

এক ধারে সুউচ্চ পর্ব্বত-প্রাচীর, অপরদিকে ঢালু খাদ নামিয়া গিয়াছে। মোটরচালকের মুহূর্ত্তের ভ্রমপ্রমাদে গাড়ীখানির ও যাত্রীদিগের কি অবস্থা হইতে পারে তাহা



খনি হইতে আনীত লবণ ট্রেণে বোঝাই হইয়াছে—খেওড়া

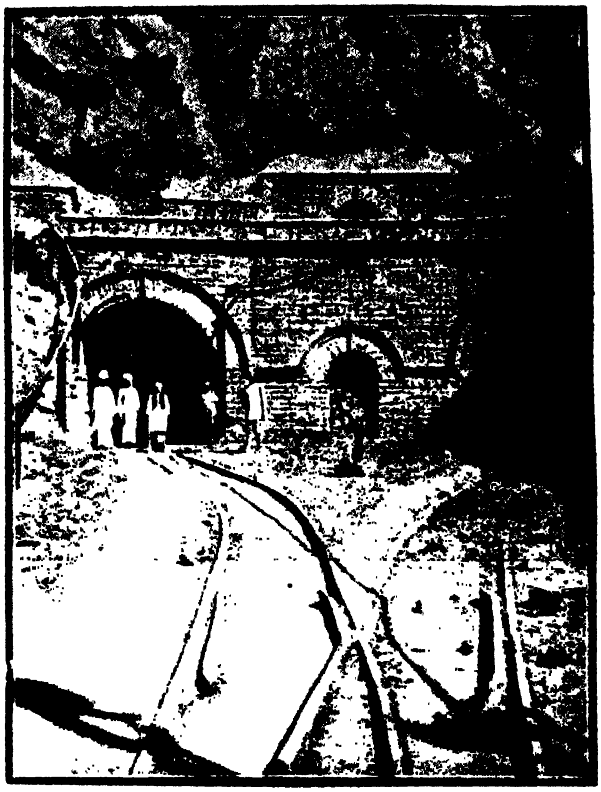
কল্পনা করিতেও রোমাঞ্চ হয়। ক্রমশঃ আরও উচ্চে, আরও উচ্চে উঠা গেল। এক স্থানে danger post দেওয়া আছে। এখানে চড়াই এতই বেশী যে, যাত্রীদিগকে নামাইয়া খালি গাড়ী চালাইবার আদেশ দেওয়া আছে। আমরা নামিয়া পায়ে হাঁটিয়া উপরে আসিলাম। এই স্থানে একটী যাত্রীপূর্ণ গাড়ী একেবারে ছিটকাইয়া প্রায় ৮০০ ফিট নীচে পড়িয়া অস্তিত্ব হারাইয়াছিল; তদবধি সরকার-পক্ষ হইতে এই নিয়ম জারী হইয়াছে। এখান হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেকগুলি 'লুপ' ভাঙ্গিয়া অবশেষে আমরা প্রায় ২৫০০ ফিট উচ্চে উঠিলাম। এখান হইতে পথটী ক্রমশঃ নামিয়া গিয়াছে। ৮ মাইল পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমরা উপত্যকায় নামিলাম। এখান হইতে চাষবাসের ও গাছপালার দেখা পাইলাম। বেলা ৪৷৷০ টার সময় আমরা উপত্যকাস্থিত 'চুয়া সদন সা' নামক মনোরম পল্লীতে উপস্থিত হইলাম।

'চুয়া সদন সা' নামের তাৎপর্য্য এই যে, এই স্থানে অনেকগুলি 'চুয়া' বা উৎস আছে। সেই উৎসগুলি হইতে যে নির্ম্মল জল বাহির হইতেছে, তাহাই স্থানীয় অধিবাসীদিগের পানীয়। নিঃসৃত জলধারাগুলি মিশিয়া একটী নদীরূপে গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; তাহার জল গৃহকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। গ্রামবাসীরা অধিকাংশ পার্ব্বত্যজাতির ন্যায় কৃষিকার্য্য ও পশুপালন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। এখানে অনেকগুলি সুন্দর বাগিচা আছে; তাহাতে গোলাপ ফুলের বিস্তৃত চাষ হইয়া থাকে। ঐ ফুলগুলি বাজারে টাকায় ।/৪ সের হিসাবে বিক্রয় হয়। ঐ ফুল হইতে গোলাপ-নির্য্যাস প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম। ছোট নদীটির উভয় পার্শ্বে গোলাপ-জলের ছোট ছোট কারখানা। কলিকাতা অঞ্চলে গাজিপুর, জৌনপুর প্রভৃতি সহরের গোলাপ-জলই আনীত হইয়া থাকে। এ স্থানের গোলাপের নির্য্যাস ঐ সকল স্থানের নির্য্যাস অপেক্ষা আদৌ নিকৃষ্ট নহে। এখানকার

উৎপন্ন জল পঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ও বোম্বাইয়ে চালান হইয়া থাকে।

বৈকালে আমরা বাগিচা দেখিতে বাহির হইলাম। পথে নদীর পুলের নিকটে তিন চারিটী বিপুলকায় ষণ্ড পরস্পরের সহিত লড়াই করিতেছিল। আমাদিগের সঙ্গিনী মহিলাদিগের রঙ্গীন সাড়ী দেখিয়া উহার মধ্যে একটী ষণ্ডরাজ অকস্মাৎ 'যুদ্ধং দেহি' ভাবে পথরোধ করিলেন। ষণ্ডরক্ষক অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া আমরা পথিপার্শ্বে এক দালানের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ষণ্ডরাজও আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দালানের সন্নিকটে শ্রুতিমধুর গান্ধার রাগিণী আলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমাদের 'বুঢ়োরস্কঃ বৃষস্কন্ধঃ' ভৃত্য রূপলাল এক বংশখণ্ড সহযোগে ষণ্ডরাজকে শিক্ষাদান করিলে, তিনি নিম্নপুচ্ছ হইয়া আপন দলে ভিড়িয়া গেলেন। বুঝিলাম 'অসহযোগ' অপেক্ষা চণ্ডনীতি ক্ষেত্র-বিশেষে কার্য্যকরী। দু-চার পদ অগ্রসর হইতে-না-হইতে আর একটী ষণ্ডের দল অভদ্রভাবে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, 'শৃঙ্গীনাং শতহস্তেন' এই নীতি অনুসারে পূর্ব্ব হইতেই নিরাপদ স্থানে সরিয়া দাঁড়াইলাম। এ স্থানের ষণ্ডবাহুল্য দেখিয়া মনে হইল স্থানটীর নাম 'ষণ্ডসন্দন সা' হইলেও অসঙ্গত হইত না।

অতঃপর আমরা কতকগুলি বাগিচা দেখিতে দেখিতে একটী অপেক্ষাকৃত বড় বাগিচায় প্রবেশ করিলাম। বাগিচার মধ্যে সহস্র সহস্র গোলাপ ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা ও সুবাস বিতরণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে



লবণ খনির প্রবেশ-পথ—খেওড়া

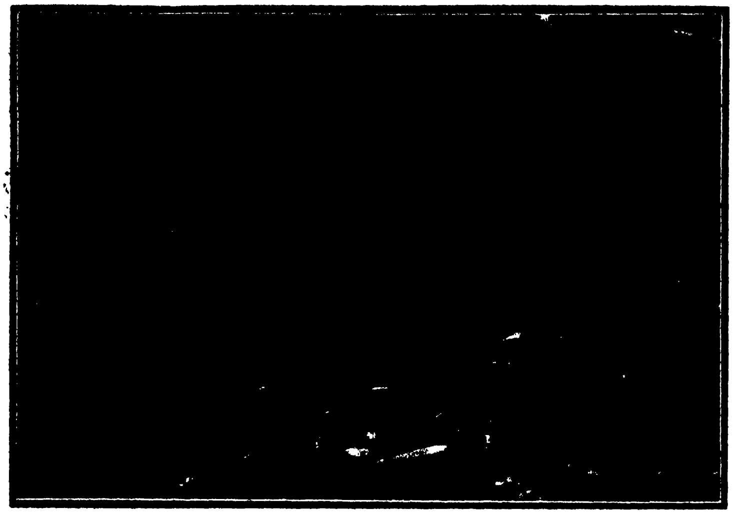
দ্রাক্ষা, লোকাট, আনার, আপেল, আখরোট প্রভৃতি মূল্যবান মেওয়ার গাছ। এ সময়ে লোকাট ও আলুচা (আলুবোখার জাতীয়) ব্যতীত অপর ফল হয় না। পঞ্জাবে মেওয়ার রাজ্যে আসিয়া মেওয়ার আস্বাদ পাওয়া হইল না. ইহা বাস্তবিক আক্ষেপের বিষয়। বাগিচা-মধ্যে ঘুরিয়া-ফিরিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা বাসায় ফিরিলাম। বাসাটী বাজারের মধ্যে ছিল। রাত্রে বেশ শীত অনুভব করা গেল; ঘরের জানালা, দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও মধ্য রাত্রে কম্বল টানিতে হইয়াছিল।



পার্ব্বত্য পথে ভ্রমণকারীদের মোটর—Salt Range.

প্রাতে পুনরায় মোটর-যানে আরোহণ

করিলাম ও চারি মাইল চড়াই ভাঙিয়া 'কটাসরাজ' তীর্থে পৌঁছিলাম। পথে সরকারী ডাক-বাংলোয় ভারত-সরকারের অন্যতম সদস্য স্যর ফজলী হোসেন 'সফরে' আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন শুনিলাম।



পার্ব্বত্য-পথে লুপের দৃশ্য—Salt Range.

'কটাসরাজ' একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। চারিদিকে ধূসর গিরি-শ্রেণীর রুদ্রমূর্ত্তি। ঐ সকল পাহাড়ে সবুজের নাম-গন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রাম-মধ্যে প্রবাহিতা

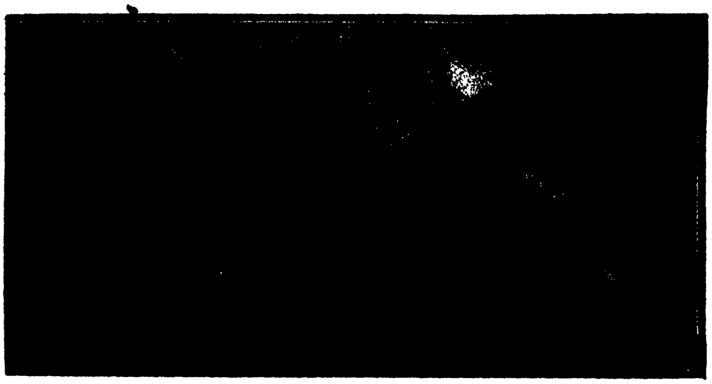


নদী-তীরে গোলাপ জলের কারখানা—চুয়াসদন সা

ক্ষীণকায়া তটিনীর উভয় কূলে কিছু গাছপালা আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই স্থানে পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। একটী পাহাড়ের শীর্ষদেশে তাঁহাদের 'আস্তানা' দেখান হয়। পাহাড়গুলির উপরে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। ২।৪টী গৃহের ভগ্নাবশেষ ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া মনে হয় সেগুলি কোন সুদূর অতীতের শিল্প-নমুনা। কোন্‌টী কোন্ যুগের বা কাহার কীর্ত্তি, তাহা জানিবার উপায় নাই, কারণ স্থানীয় অধিবাসীরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মহারাজ রণজিৎ সিংহের আমলেরও একটী দুর্গের প্রাকার এখনও বর্ত্তমান আছে। এখানকার প্রধান কার্য্য 'অমৃত কুণ্ড' নামক উৎস-নিঃসৃত সরোবরে স্নান। এখানে স্নান করিয়া আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম, এরূপ তৃপ্তি ইহার পূর্ব্বে হরিদ্বার স্বর্গাশ্রমের ঘাটে স্নান করিয়া পাইয়াছিলাম। স্নানকালে একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমাদের স্নান শেষ হইলে মহিলারা যখন স্নান করিতেছিলেন, তখন আমাদের একটী বালিকা অন্যমনস্ক হইয়া গভীর জলে পড়িয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্ত চীৎকারে নিকটস্থ একজন স্নানার্থী ভদ্রলোক সাঁতরাইয়া ঐ বালিকাটীকে উদ্ধার করেন। আমরা সে সময়ে ঘাটে উপস্থিত ছিলাম না। মহিলারা স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের নিকট আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া 'কটাসরাজ'কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। যদি এই বালিকাকে না ফিরিয়া পাইতাম, তবে যে কিরূপ হরিষে বিষাদ হইত তাহা সহজেই অনুমেয়।

স্নানের পর মন্দিরগুলি দেখিতে যাওয়া হইল। মন্দিরগুলি পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত, কাজেই অনেক চড়াই-উৎরাই ভাঙিতে হইয়াছিল। ২।৩টী শিবমন্দির, একটীতে রামসীতা ও মহাবীর আছেন, বাকী অধিকাংশই পাণ্ডবদিগের কীর্ত্তি-সংশ্লিষ্ট। চৈত্র-সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাসের ৩।৪ তারিখ পর্য্যন্ত এখানে

এক বিরাট মেলা হয়। ঐ সময়ে পঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু স্ত্রী পুরুষ, সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। প্রবাদ এই যে, ১লা বৈশাখে ঐ অমৃতকুণ্ডে সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে শেষনাগ মহারাজ আসিয়া দেখা দেন। তাঁহার দর্শন আশায় সহস্র সহস্র নরনারী কুণ্ডপার্শ্বে জমায়েত হয়, কিন্তু পুণ্যাত্মা ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার দর্শন পায় না। আমরা মেলার পর গিয়াছিলাম, কাজেই প্রবাদ শুনিয়াই ক্ষান্ত



অমৃতকুণ্ড—কটাসরাজ

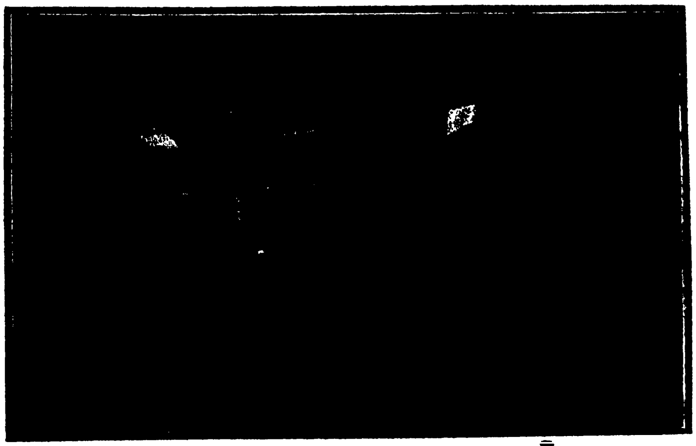


পাণ্ডবদিগের বাস-মন্দির—কটাসরাজ

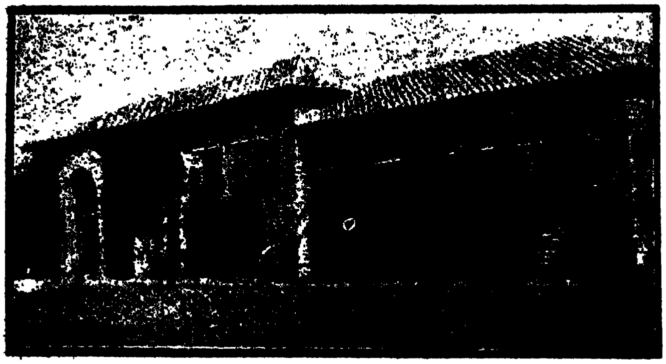
হইলাম। দর্শনাদি কার্য্য শেষ করিয়া 'আড্ডায়' ফিরিয়া আমিষ-পলাণ্ডু-বর্জ্জিত সাত্বিক আহার শেষ করিলাম। বেলা ২॥০টায় আমরা 'কটাস' ছাড়িলাম।

প্রত্যাবর্ত্তন-পথে 'চুয়াসদন সা' হইয়া 'খেওড়া' আসিলাম। 'খেওড়া'য় সপরিবারে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে গেলাম। ভদ্রলোক লবণ-বিভাগে কর্ম্ম করেন ও গত সাত বৎসর যাবৎ 'খেওড়া'য় আছেন। তাঁহার স্ত্রী ও একটী আত্মীয় বালক সম্প্রতি 'টাইফয়েড' হইতে ভুগিয়া উঠিয়াছেন। এখনও উভয়েই শয্যাশায়ী। এই সুদূর প্রবাসে তাঁহার বিপদ দেখিয়া প্রবাস-বাসের কষ্ট প্রত্যক্ষ করিলাম। তাহার পর আমরা সমতল ভূমিতে নামিয়া 'পিণ্ডদাদন খাঁ' সহরে মিঃ ব্যানার্জ্জীর জনৈক পঞ্জাবী বন্ধুগৃহে হাজির হইলাম। বন্ধুটী আমাদের অভ্যর্থনা ও অতিথি-সৎকারের বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য জলবায়ুর গুণে সকলেই ক্ষুধায় পীড়িত ছিলাম; সুতরাং চব্যচুষ্য লেহ্যপেয়—সকল উপকরণগুলির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা হইল।

'পিণ্ডদাদন খাঁ' সহরটীও ঝিলাম নদীর উপর অবস্থিত। 'পিণ্ডদাদন খাঁ' নামের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম, রাজপুতানা হইতে তিন রাজপুত-মুসলমান সহোদর পঞ্জাব-সীমান্তে আসিয়া বিভিন্ন



পাহাড়ের উপর হইতে সাধারণ দৃশ্য—কটাসরাজ



প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মিউজিয়ম—তক্ষশীলা

স্থানে বাস করেন। তাঁহাদের নাম গাজি খাঁ, ইস্মাইল খাঁ, ও দাদন খাঁ। তাঁহাদেরই নাম অনুসারে যথাক্রমে 'ডেরাগাজি খাঁ,' 'ডেরা ইস্মাইল খাঁ' (ডেরা অর্থে বাসস্থান) ও 'পিণ্ডদাদন খাঁ' (পিণ্ড অর্থে গ্রাম) তিনটী সহর হইয়াছিল। রাত্রি ৯ টার ট্রেণে 'পিণ্ডদাদন খাঁ' ছাড়িয়া কিছুদূর আসিতে না আসিতে তুমুলবেগে মরুভূমির 'তুফান' (Dust Storm) আরম্ভ হইল। 'তুফানের' বেগে ট্রেণের গতি মন্থর হইল; সার্সি, জানালা বন্ধ করিয়াও ধূলিরাশির আক্রমণ রোধ করা কঠিন হইল। এ অঞ্চলে ইহাই 'কাল বৈশাখী'। আকাশে মেঘ-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বন্ধ হইয়া 'গুমট' আরম্ভ হয়। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবের পর প্রকৃতির উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ হয়। যেরূপ কর্ণবধিরকারী প্রলয় সঙ্গীত, সেইরূপ বালুরাশির তাণ্ডব বিক্ষেপ। এই 'তুফানের' জন্য অনেক সময় রেলপথের উপর ২।২॥০ ফিট বালি জমিয়া ট্রেণের গতিরোধ করে এবং যাত্রীদিগের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু এইরূপ ঝটিকার



সারকাপে গ্রীকদিগের আস্তানা ভূমি—তক্ষশীলা

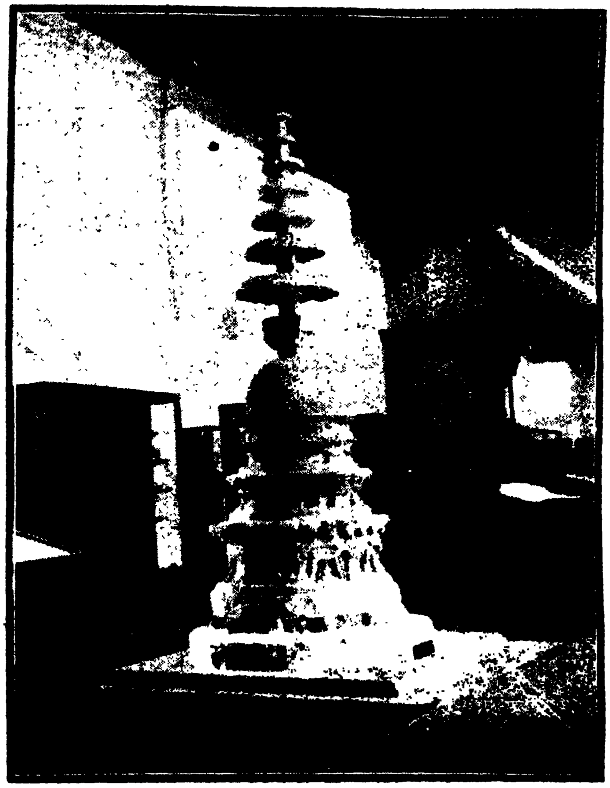
অব্যবহিত পরেই যে ঠাণ্ডা পড়ে, তাহা বড়ই আরামদায়ক। প্রায় ২ঘণ্টা 'তুফান' খাইতে খাইতে অবশেষে আমরা খুসাবে রাত্রি ১১টার সময় ফিরিলাম।

খুসাব হইতে রাওলপিণ্ডি হইয়া আমরা অতঃপর একদিন তক্ষশীলা দেখিতে গিয়াছিলাম। তক্ষশীলা ষ্টেশনের নিকটেই ভারত-সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের একটী সুন্দর মিউজিয়ম আছে।



জুলিয়ান খনন কার্য্যে আবিষ্কৃত গৃহাবশেষ—তক্ষশীলা

এখানে যে সকল খননকার্য্য হইয়াছে ও প্রাচীন যুগের সভ্যতার ও শিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন আছে, তাহা দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়। সুপ্রাচীন হিন্দু সভ্যতা, গ্রীক্ সভ্যতা, সিথিয়ান্ সভ্যতা, বৌদ্ধযুগের শিল্প ও ইতিহাস, এই সমস্ত নিদর্শনের মধ্য দিয়া স্ব স্ব বিশিষ্টতার পরিচয় দিতেছে। ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী মিঃ দত্তগুপ্ত এখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। তিনি অতি অমায়িক লোক। তাঁহার সৌজন্যে আমরা যাবতীয় দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়াছি ও জানিয়াছি। গত ১৭ বৎসর যাবৎ এই ভদ্রলোক এই সুদূর প্রবাসে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেছেন। স্থানীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ে ইনি অনেক গবেষণা করিতেছেন। আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অনেক অভাব, অসুবিধা স্বীকার করিয়া প্রকৃতির এই নিভৃত বক্ষে বসিয়া ইনি জ্ঞানার্জ্জনে ও স্বদেশের অতীত গৌরবের প্রমাণ সংগ্রহে ছাত্র-সুলভ ঐকান্তিকতার সহিত নিবিষ্ট আছেন। তক্ষশীলা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে মাসিক পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সেজন্য তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কয়েকখানি চিত্র ইহার মধ্যে দেওয়া হইল।



মিউজিয়ম অভ্যন্তরে রক্ষিত স্তূপের দৃশ্য—তক্ষশীলা

তক্ষশীলা হইতে খুদাবে ফিরিবার এক সপ্তাহ মধ্যেই দেশে ফিরিবার আয়োজন পড়িয়া গেল। 'ঘরমুখো বাঙ্গালী আর রণমুখো সেপাই'—দুইয়ের অবস্থাই সমান। বিদায়ের আসন্ন মুহূর্ত্তে পঞ্চনদবিধৌত, ঋক-সাম-যজু-মুখরিত, হোমাগ্নিপূত এই পুণ্যভূমিকে আন্তরিক বন্দনা না করিয়া থাকিতে পারি না। অতীতের অন্ধকারের স্তর ভেদ করিয়া কোন্ এক ভাস্বর যুগের ক্ষীণ আলোকরশ্মি আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে; যে আকর্ষণ আমরা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে উপলব্ধি করিতেছি এবং অযোগ্য পঙ্গু হইলেও আপনাদিগকে এক সুযোগ্য, মহান্ পূর্ব্বপুরুষের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবে উৎফুল্ল হইতেছি। কে জানে কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে প্রাচীনের এই বিরাট সম্বন্ধ পঙ্গুদিগকে মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া বিশ্বের দরবারে আপন মাহাত্ম্য পুনঃ প্রকট করিবে? সে নবযুগের সূচনা কি দৃষ্টিপথে আসিয়াছে?



মিউজিয়মে প্রাপ্ত নিদর্শন সমূহ—তক্ষশীলা

অকাল-বসন্ত

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মেয়েদের হস্‌টেলে ঘরে-বারান্দায় তুমুল হট্টগোল সুরু হয়েছে। দীপ্তি খবরটা এতোক্ষণ লুকিয়েছিলো, সদলবলে বায়স্কোপ থেকে ফিরে কাপড় ছাড়বার সময় ব্লাউজের তলা থেকে চিঠিটা বের করে' সে সুষমার হাতে দিলে।

আর যায় কোথা! তাই মেয়ের আজ এতো ফুর্ত্তি! তাই সবাইকে সে আজ নিজের পয়সায় বায়স্কোপ দেখালে।

দীপ্তিকে সবাই ছেঁকে ধরলো। কারুর কাঁধের থেকে আঁচল তখন বাহুর ওপর আল্‌গা হ'য়ে ঝল্‌মল্ করছে, এলানো চুলের মধ্যে মোটা-দাঁড়া রঙিন চিরুনি চালিয়ে দাঁতে ফিতে কামড়ে কেউ এসে হাজির, তাড়াতাড়িতে স্যাণ্ডেলের ষ্ট্র্যাপ্‌টা কেউ ঠিকমতো পায়ে বসাতে পারে নি।

চিঠিটা শূন্যে নাড়তে-নাড়তে সুষমা খবরটা চারদিকে রাষ্ট্র করে' দিলো।

—ওমা, মেয়েটা ডুবে-ডুবে এতো জলও খেতে পারে!

—তাই ক'দিন থেকে এমনি উড়ু-উড়ু, শাড়িগুলো রোদে পেড়ে নতুন করে' শুকোতে দেওয়া হচ্ছে।

—বিকেল-বিকেল মেয়ের আর দেখা পাওয়া যায় না। বেণীতে ফাৎনা ঝুলিয়ে চলেছেন তিনি কালীঘাটে—মামার বাড়িতে।

—মামাবাড়ি না হাতি। কালীর মন্দিরে হত্যে দিতে। পেটে তোর এতো বুদ্ধিও ছিলো, দীপ্তি।

—ছাখ্, ওর দিকে চেয়ে ছাখ্ একবার। খুসিতে একেবারে ফেটে পড়ছে। আনন্দে ওকে ম্যালেরিয়ায় ধরলো বুঝি।

—অতো অংখার কিসের লো ছুঁড়ি! আমাদেরো একদিন হ'বে।

—খুসিতে আমরাও একদিন অমনি হি-হি করে' কাঁপ্‌বো। বোকা একটু আমাদেরো হ'তে হ'বে।

অনেক হাসি ও কোলাহল, অনেক ক্ষিপ্র পদশব্দ।

সুষমা চারদিকে চোখ ফিরিয়ে বললে,—শান্তি, শান্তি কোথায়? খবরটা ওর কাছেই বা চাপা থাকে কেন?

দক্ষিণে বারান্দাটা যেখানে বাথ্-রুমের দিকে ঘুরে' গেছে তারই পাশে শান্তির ঘর। দরজায় মোটা খদ্দরে নীল রঙ-করা পরদা ঝুলছে।

হুড়মুড় করে' মেয়ের দল এবার সেই ঘর আক্রমণ করলে।

হস্‌টেলের মধ্যে এই ঘরটিই সব চেয়ে ছোট, নিরিবিলি —একজনের থাক্‌বার মতো। এই ঘরের ওপর শান্তির দাবির কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী জোটে নি। এই ঘরেই তাকে বেশি মানায়, কেননা সব চেয়ে সে কম কথা কয়, সবার থেকে নিজেকে সে আড়াল করে' রাখে। নিজের উপস্থিতিটা অনুচ্চারিত রাখতে পারলেই সে খুসি হয়। কিন্তু এমন রোমহর্ষক খবরটার কিছু ভাগ তাকে না দিলে তাকে নিয়ে হস্‌টেলে একসঙ্গে থাকার কোনোই মানে হয় না।

সিলিঙ থেকে ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর বাল্‌বটা ঝুলছে, তারই দিকে পিঠ করে' শান্তি লোহার চেয়ারে বসে' সামনের টেব্‌লের ওপর এক-রাজ্যের বই-খাতা ছড়িয়ে পড়ায় মগ্ন হ'য়ে আছে। টেব্‌লের ওপর গোল একটু ছায়া পড়েছে, পাশের বাড়ির একটা ঘর উদ্ধত চোখে এই দিকে তাকায় বলে' দক্ষিণের জান্‌লাটা বন্ধ, ছোট ঘরটি ঘিরে কঠিন স্তব্ধতা।

এতো গোলমালেও কেউ কুঁজো হ'য়ে বসে' পড়া করে' যেতে পারে—মেয়ের দল রীতিমতো খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌লো।

ছোঁ মেরে শান্তির চোখের সাম্‌নে থেকে বোটানির নোট্‌টা কেড়ে নিয়ে সুষমা বল্‌লে,—হয়েছে লো হয়েছে, বিদ্যের জাহাজ হ'লেই আর সংসার-সমুদ্রে ভেসে পড়তে পারবি নে। এদিকে ব্যাপার কী, জানিস্?

চেয়ার থেকে না উঠে মাত্র ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে শান্তি সস্মিতমুখে বল্‌লে,—কী?

—আর কী! সুষমা দীপ্তির এক গোছা চুল মুঠো করে' চেপে ধরে' সাম্‌নের দিকে তাকে টান্‌তে-টান্‌তে



প্রহ্লাদ

শিল্পী—[illegible]

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

বল্‌লে,—এই পোড়ারমুখির কীর্ত্তি। আসছে পঁচিশে তারিখে ওর বিয়ে।

—বিয়ে? চেয়ার নিয়ে শান্তি এবার ঘুরে বস্‌লো: তাই তোদের এতো ফুর্ত্তি! কান্নাকাটি না করে' দিব্যি মাতামাতি সুরু করেছিস্?

—কাঁদতে যাবে কোন্ দুঃখে? শতদল বল্‌লে: এ তো আর কাঠগড়ায় গলা পেতে বলি হওয়া নয়, দস্তরমতো লাভ্-মেরেইজ্। বাবা ওর মত নিয়ে চিঠি লিখেছেন।

প্রতিভা বল্‌লে,—ও তার কী করে' বুঝ্‌বে বল্? ও তো আগাগোড়া একটি কাঠ—মূর্ত্তিমান য়্যান্টি-সেপ্‌টিক্।

শান্তি ঠোঁট কুঁচকে নীরবে একটু হাস্‌লো।

সুষমা খাতাটা শান্তির কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌লে,—নে, বাবা, পড়্ বসে'-বসে'। ডজন-খানেক লেটার পেয়ে ডিগ্‌বাজি খেয়ে গেজেটের মাথায় গিয়ে ওঠ্। আমরা ভাই এখন থেকেই জোলাপ্ নিতে সুরু করি।

সুনন্দা বল্‌লে,—দীপ্তির বিয়েতে আমরা ভাই নিয়ম উল্‌টে দেব। মিছিল করে' মেয়ে যাবে বিয়ে করতে, সঙ্গে আমরা যাবো বধূযাত্রিনীর দল। বলে'ই তার অনর্গল হাসি।

এক-এক করে' আস্তে-আস্তে সবাই সরে' পড়তে লাগ্‌লো। যাবার আগে সুষমা বল্‌লে,—মুখ গোম্‌রা করে' যতোই কেন পড়ো না বাপু, শেষকালে একদিন গাঁটছড়া বেঁধে এমনি সরে' পড়তে হ'বে। কোথায় বা তখন তোমার মেকলের ষ্টাইল্, কোথায় বা তোমার ইকলজি!

ঘরটি আবার ছোট হ'য়ে এলো। শান্তি টেব্‌লের ওপর ঝুঁকে পড়ে' আবার পড়ায় মন দিলে। দুই চক্ষু দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ করে' বইয়ের অক্ষরগুলিকে সে স্পষ্ট, পরস্পর-সংলগ্ন ও অর্থবান্ করে' ধরে' রাখবার চেষ্টা কর্‌তে লাগলো; কিন্তু তার মন কখন বিমুখ হ'য়ে উঠেছে।

বই খাতা তেমনি ছড়িয়ে রেখে চেয়ারে পিঠ দিয়ে সে চুপ করে' একমনে মেঝের দিকে চেয়ে রইলো।

একপাশে নিচু একখানি তক্তপোষ পাতা, সেল্‌ফ্-এর অভাবে তারই শিয়রের দিকে এক তা খবরের কাগজ বিছিয়ে শান্তি তার ওপর থরে-থরে তার বই সাজিয়ে রেখেছে—প্রত্যেকটি বইয়ে পুরু করে' মলাট দেওয়া। অনেক বই—কেরোসিন-কাঠের ছোট টেব্‌লে কুলিয়ে ওঠে না। বইর ওপর তার ভীষণ যত্ন; ময়লা-সাড়িতে নিজে সে দু' সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু মলাটের ওপর একটি কালির আঁচড় সে সইতে পারে না। সামান্য একটা দাগ পড়লে বা কোণ দিয়ে একটু ছিঁড়ে গেলে তক্ষুনি সে মলাট বদ্‌লে ফেলা চাই। যা-তা কাগজে মলাট দিলে চল্‌বে না—মলাটের জন্যে সে আর-আর মেয়ের ঘরে কাগজ খুঁজে বেড়ায়—ডাইং-ক্লিনিংএর দোকান থেকে যদি কারুর কাপড়-ব্লাউজ ব্রাউন্-পেপারের প্যাকেটে কোথাও এসে থাকে। ব্রাউন্-পেপার না হ'লে অন্তত ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্এর ছবির পৃষ্ঠাটা। তা না জুট্‌লে মাসান্তে দেয়াল-জোড়া ক্যালেণ্ডারের রঙচঙে দু' একটা ছেঁড়া পাতা। নিজের না জুট্‌লেও বইগুলিকে তার এমনি জ্যাকেটে সাজিয়ে রাখা চাই। ওদের পৃষ্ঠার ধারে-ধারে হিজিবিজি নোট টুকতে পর্য্যন্ত তার মায়া করে।

এ-ছাড়া আর তার কোনো আসবাব নেই। তক্তপোষের নিচে ছোট একটা টিনের ট্রাঙ্ক—মা'র অধিবাসের সময় পাওয়া, বাবার সঙ্গে অনেক দূর দেশ অতিক্রম করবার অভিজ্ঞতা তার সর্ব্বাঙ্গে মুদ্রিত হ'য়ে আছে। এই ট্রাঙ্কটিই মা তাকে দিয়ে দিয়েছেন। বাড়িতে বেতের দু'য়েকটা যে বাক্স আছে তাতেই ওঁদের চলে' যাবে। রাত হ'য়ে এলে পাশের বাড়ির কোলাহল যখন থেমে যায়, তখন দক্ষিণের জান্‌লাটা সে খুলে দেয়। দেয়ালের বাধা ডিঙিয়ে কোথা থেকে ফুর্‌ফুরে একটু হাওয়া আসে—সারা দিনের শ্রান্তির পর ঠিক মা'র ঝিমিয়ে-পড়া ক্লান্ত স্বরের ঘুম-পাড়ানি ছড়া-কাটার মতো—তার মশারির দরকার হয় না। যেদিন রাত জেগে পড়বার খুব ইচ্ছে হয়, প্রতিভার ঘর থেকে চীনে ধূপের দু'-একটা 'কয়েল্' সে চেয়ে আনে। শীত এসে পড়লে আর তো ভাবনাই নেই, মাথা পর্য্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়ে আগাগোড়া নিটোল একটি ঘুম। তা, শীত এই এসে গেলো আর-কি।

ভারি তো দুয়েকখানা সাড়ি—তার জন্য ব্র্যাকেট চাই না হাতি! দুটো দেয়াল যেখানে এসে মিশেছে তারই দু' পাশে দুটো পেরেক পুঁতে একটা দড়ি সে টাঙিয়ে

নিয়েছে—তারই ওপর সাড়ি সেমিজ পেটিকোটগুলি ঝুলছে। একখানি আয়না পর্য্যন্ত নেই, না একটা চিরুনি,—যে-কোনো ঘরে গেলেই সে নির্ব্বিবাদে চুল-বাঁধা সেরে আসতে পারে। যা একখানা মুখ, তার জন্যে আবার স্নো-পাউডার চাই, না, আর-কিছু। সেলুলয়েডের কয়েকটা কাঁটা, আর একটা কেলে-কুষ্টি তেল-কুচকুচে ফিতে। মা নেহাৎ রোজ সন্ধ্যায় চুল বাঁধতে বলে' দিয়েছেন বলে'ই শান্তি এই একটু যা প্রসাধন করে, চুল আঁচড়াবার সময় তার মা'র কথা, খেলা ছেড়ে ছোট ভাই দু'টির বাড়ি-ফেরার কথা, গ্রামের সন্ধ্যার কথা, দীপান্বিত পরিচ্ছন্ন তুলসী-তলাটির কথা মনে হয়।

হ্যাঁ, টেব্‌লের ওপর এক বাণ্ডিল মোমবাতি—কয়েকটা তার খরচ হয়েছে বটে। এগারোটার পর আলো জ্বাল্‌বার নিয়ম নেই—দারোয়ান মেইন্ সুইচ্ বন্ধ করে' দেয়। তখন এই মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোয়—পড়ায় যখন আর মন বসে না—শান্তি মা'র কাছে চিঠি লেখে। শুধু মা'র কাছে লিখেই তার নিস্তার নেই, ছোট ভাই দু'টিকেও লিখ্‌তে হয়—তাদের কারুর প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব করলে চলবে না। দস্তুরমতো তারা পৃষ্ঠা মেপে ও লাইন্ মিলিয়ে নেয়,—এবং কোন্ মূল্যবান খবরটা কাকে জানানো উচিত ছিলো এই নিয়ে দিদির কাছে অভিযোগের তাদের অন্ত থাকে না। খবর দেবার মৌলিকতায় দিদিকেও তারা ছাড়িয়ে গেছে। গ্রামের ঝাকুরকাটির জঙ্গলে কোথায় একটা বাঘ এসেছে বলে' শোনা যাচ্ছে—দিদিকে চিঠিতে সেই খবর দিতে গিয়ে দুই ভাই কালি-কলমের সাহায্যে প্রকাণ্ড দুটো বাঘ এঁকে বসে। সেই দুটো গোলাকার-চক্ষু বিস্ফারিত-দন্ত নামহীন জন্তুর দিকে চেয়ে কাকে যে সে প্রতিযোগিতায় জয়ী করবে শান্তি কিছুতেই তা ভেবে ঠিক করতে পারে না।

আর, দেয়ালের এক কোণে একটা ছাতি—অতোটা পথ সে খালি-মাথায় হাঁট্‌তে পারে না। একটা রিক্‌সা করে' গেলে হয় বটে, কিন্তু অতো তার পয়সা কোথায়? তারপর বিকেলে আবার টিউসানি আছে, বলা-কওয়া নেই ঝুপ্‌ঝাপ্ করে' নেমে এলেই হ'লো!

টেব্‌লের সামনে চেয়ার টেনে এনে শান্তি আবার পড়ায় মন দিলে। কুড়েমি করবার তার সময় নেই। সামনেই একটা পরীক্ষা আছে—কিছুই তৈরি হয় নি। আর, এখন না পড়লে তার সময় কই? রাত জেগে আজ একটু পড়বে বলে' বেলাবেলিতেই সে রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছে।

কিন্তু বল্‌তে কি, পড়ায় সে কিছুতেই মন বসাতে পারলো না।

সহরের ইট-কাঠ পাথর-লোহা ডিঙিয়ে মন তার কখন তাদের গ্রামের আকাশে পাখা মেলেছে। এখন গ্রাম একেবারে নিঝুম, কবির অলিখিত পৃষ্ঠাটির মতো নিঃশব্দ। রান্নাবান্না চুকিয়ে মা এতোক্ষণে ঘরে গিয়ে পাখা-হাতে বসে' মশা তাড়াচ্ছেন আর দেয়্‌খোতে মাটির বাতি জ্বালিয়ে মোহন গুনগুন করে' পড়া করছে। এই সবে তার থার্ড-ক্লাস্। টপাটপ্ বেরিয়ে পড়া চাই—এক বছরো তার সবুর করা চল্‌বে না। ভোর-রাতে উঠে মা আবার তাকে জাগিয়ে দেবেন। মিণ্টুরই মজা—অতো পড়ে'ও সে ফার্ষ্ট হ'য়ে ফিফ্‌থ-ক্লাসে উঠেছে। তার জন্যে দিদির ভাবনা নেই, ম্যাট্রিকে সে তাঁকে মাস মাস অন্তত পনেরো টাকার বৃত্তি এনে দেবে ঠিক।

নিজের ওপর বিরক্ত হ'য়ে শান্তি এবার গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগলো। একটা-কিছু মুখস্থ করবার কসরৎ না করলে মন তার সায়েস্তা হচ্ছে না।

মেয়ের দল খেতে নিচে চলে' গেছে। আঁচিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠ্‌তে-উঠ্‌তেও তাদের সেই কথা: যাই বলো, দীপ্তি খাসা শিকার বাগিয়েছে—বিলেত থেকে ফিরে এসেও কি না সে এই জীবন্ত পুতুলটাই চেয়ে বস্‌লো। বলিহারি ভাই প্রেম, অত দূরে গিয়েও মানুষে মনে করে' রাখতে পারে। এতোও পোষায়! আর, বাপই বা মত দেবেন না কেন শুনি? অমন একটি চৌকস চাকরি যখন জোটাতে পেরেছে, তখন স্বয়ং উনিই প্রেমে পড়ে' যেতে পারেন—মেয়ে তো কোন্ ছার!

হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ শুনে শান্তি চম্‌কে উঠ্‌লো। দীপ্তি এসেছে। সারা শরীরে খুসি আর সে বইতে পারছে না।

শান্তি সামনের দিকে ডান-হাতটা সামান্য একটু বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে,—এসো। বিয়ের নামে মাটিতে যে আর পা পড়ছে না।

আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দীপ্তি তক্তপোষের উপর

বস্‌লো ; বল্‌লে,—একেবারে উড়ে চলেছি, না ? তা, বিয়ের নাম শুনে নয়, পাত্রের নাম শুনে। বিলেত যাবার আগে বাবার কাছে সে নেহাৎই ছিলো একটা চাষা, আসতে-না-আসতেই পুণায় একটা এগ্রিকাল্‌চারেল্ কলেজে চাকরি পেয়ে প্রায় সে এখন প্রিন্‌স্‌-অফ্‌-ওয়েল্‌স্। রাজকুমারী তো বটেই, বাবা দস্তুরমতো এখন পণ দিতে রাজি আছেন।

শান্তি নীরবে একটু হেসে বইর পৃষ্ঠা ওল্‌টাতে লাগ্‌লো। এতোতেও তার একটু সাড়া নেই, শরীরের রেখাগুলি এতোতেও সে একটু কোমল করে' আন্‌লো না। দীপ্তি রীতিমতো অস্থির হ'য়ে শান্তির কোলের থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে বল্‌লে,—কী কেবল রাত-দিন পড়ো ?

শান্তি বল্‌লে,—কই আর পড়ি। এই রাত্তেই যা একটু সময় পাই। সকালে কলেজ, দুপুরে ইস্কুল-মাষ্টারি, বিকেলে আবার টিউসানি। রাত ছাড়া আর পড়বো কখন ? তাও, এতো খেটে আসবার পর এক-একদিন এমন ঘুম পায় যে খেয়ে-দেয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর মাথাটা তো একরকম সব সময়েই ধরে' থাকে।

দীপ্তি পা দোলাতে-দোলাতে বল্‌লে,—অতো পড়ে' কী হ'বে ? আমার তো বাপু এইখেনেই খতম্। চেহারাখানা কী করেছ আয়নায় একবার দেখ তো গিয়ে।

অল্প একটু হেসে শান্তি বল্‌লে,—আমি চেহারা দিয়ে কী করবো ? আমি তো আর পাত্র জোটাবার জন্তে পড়ছি না।

—তবে কিসের জন্তে পড়ছ ? মেয়েরা তবে কিসের জন্তে পড়ে ?

—আমার ছোট ভাই দু'টিকে মানুষ করতে হ'বে। আমি ছাড়া মাথার ওপরে তাদের কেউ নেই। গেলো-বছর হঠাৎ বাবা মারা গেলেন বলে'—

দীপ্তি বল্‌লে,—তোমার বাবা কিছু রেখে যান নি ?

—কিছু ঋণ রেখে গেছেন। সব আমার কাঁধে। কর্পোরেসান্‌এর ইস্কুলে টিচারি করে' মোটে পঁয়ত্রিশটি টাকা পাই, আর টিউশানিতে কুড়ি। আমার হস্‌টেলের খরচ রেখে বাড়িতে যা পাঠাই তা দিয়ে সুদের টাকা শোধ করে' মা আর ছোট ভাই দু'টির কিছুতেই চলে না। তবু আমি যতোদূর পারি, কম করে' চালাই। তা, এই অল্প টাকায় কি করে' কী হ'বে বলো ?

—তারপর কী করবে ?

—কী আবার করবো ! অন্তত বি-এটা তো এমনি করে'-করে' পাস্ করি। চাকরিতে তা হ'লে একটা লিফ্‌ট্ পাবো মনে হয়। বি-এর সময় প্রাইভেটে পড়বো ভাবছি, তা হ'লে সময় করে' আরো এক-আধটা টিউসানি জোগাড় করতে পারবো। ওদিকে ভাইয়েদেরো তখন খরচ বাড়বে।

—তারপর ?

শান্তি দূর ভবিষ্যতের দিকে অন্ধ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো, কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। অসহায়ের মতো হেসে উঠে বল্‌লে,—তারপর আর জানি না। ভাইয়েরা একটা-কিছু সুবিধে করে' নিতে পারলে ট্রেইনিঙেও চলে' যেতে পারি, ঠিক নেই। তখনকার কথা তখন। অতো দূরের কথা এখনো ভাবতে পারি না।

দীপ্তি হেসে বল্‌লে,—মাত্র এইটুকু তোমার ambition ?

—ভাইয়েদের মানুষ করতে চাই, বলতে গেলে এর চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জীবনে সম্প্রতি আমার আর কিছু নেই। আমার ছেলে হ'য়ে জন্মানোই উচিত ছিলো—তা হ'লে আরো কত কাজ করতে পারতাম। মেয়েদের পদে পদে কতো বাধা, কতো দারিদ্র্য।

—আর কতো প্রলোভনও।

—হ্যাঁ, প্রলোভনও কম নয়। তা আমি কোনোদিন আমোলে আনিনি, দীপ্তি। ভাই দুটিকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার নিদারুণ লোভই আমাকে পেয়ে বসেছে।

একটা বালিস কোলের ওপর কনুইয়ের তলায় দুমড়ে নিয়ে দীপ্তি বল্‌লে,—কোনোদিন তবে বিয়ে করবে না ?

আধো লজ্জায় আধো বিদ্রূপে শান্তি হেসে উঠ্‌লো। বল্‌লে,—পাগল নাকি ? বিয়ে করবার আমার সময় কই—আর করবোই বা কাকে ? ভাই দুটিকে তবে দেখবে কে ? বাবার ঋণ কোত্থেকে তবে শোধ হ'বে ? মাথামুণ্ডু কী যে তুমি বলো।

দীপ্তি বল্‌লে,—তবে চিরকাল তুমি এমনি আইবুড়ো হ'য়ে থাকবে নাকি ?

—আমার আবার 'চিরকালটা' তুমি কোথায় দেখ্‌লে ? আগে বাঁচতে দাও তো। তা, না বাঁচলেই বা চলছে কেন ? আমি ছাড়া ওদের আর কে-ই বা আছে ? তা, রইলামই বা না আইবুড়ো—সংসারে আমার কাজের তো কিছু

অভাব নেই। বলে' শান্তি বিমনা হ'য়ে টেব্‌লের ওপর থেকে আরেকখানা বই কোলের ওপর টেনে নিলো।

দীপ্তি বল্‌লে,—এই বয়সে কাউকে কোনোদিন ভালোবাসো নি, শান্তি?

—আদার বেপারি, জাহাজের খবর কী করে' রাখবো বলো? অতো বাবুয়ানা কি আমাদের পোষায়? ভালোবাসা হ'লেই তো আর হ'লো না, তাকে টিঁকিয়ে রাখবার মুরোদ কই? ভগবান পৃথিবীতে সব লোককেই ত' সমস্ত কাজের জন্যে উপযুক্ত করে' পাঠান্‌ না। কী জানি মিল্‌টনের সেই লাইন্‌টা? "They also serve who only stand and wait." বলে' শান্তি হেসে ফেল্‌লো।

এবং সেই হাসি মেলাতে-না-মেলাতেই আলো নিভে ঘর অন্ধকার হ'য়ে গেলো।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে' দীপ্তি বল্‌লে,—রাত তো নেহাৎ কম হয়নি দেখছি। তোমাকে একটা চিঠি দেখাতে এসেছিলুম, শান্তি।

—কা'র? তোমার বাবার? খবর তো শুন্‌লুমই। বিয়ে কোথায় হ'বে?

দীপ্তি দরজার কাছে এগিয়ে এলো; বল্‌লে,—না, বাবারটা তো পোস্‌ট্ কার্ড। এটা একটা রঙিন খাম। বিয়ে ঠিক হ'বে জেনে লিখেছে।

দরজার একটা পাল্লা খুলে ধরে' দীপ্তি একটু থাম্‌লো: দেশ্‌লাই জেলে শান্তি ক্যাণ্ডেল্‌ ধরাচ্ছে।

টেব্‌লের ওপর ফোঁটা ফেলে মোমবাতিটা বসাতে-বসাতে শান্তি বল্‌লে,—ও-সব আমি কিছু বুঝবো না ভাই, আমাকে দেখিয়ে লাভ কী!

পল্‌তেটা খানিক পুড়ে আলোটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠতেই দেখা গেলো দীপ্তি চলে' গেছে। এবং সেই অসহ্য নির্জ্জনতায় করবার কিছুই না পেয়ে হাতের হাওয়ায় শান্তি আলোটা নিবিয়ে দিলো। আবার সেই অন্ধকার। দক্ষিণের জান্‌লার পাখির ফাঁক দিয়ে ও-বাড়ির ঘরের আলো একটু-একটু দেখা যায়।

দরজা বন্ধ করে' শান্তি তক্ষুনি শুয়ে পড়্‌লো।

এই অন্ধকারে সে যেন তার নিজের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে।

স্কুলে ঢুকেইছিলো সে বেশি বয়সে, এবং তারপর ম্যাট্রিক যখন সে পাস্‌ করলে তখন তার বাবা তাকে হঠাৎ পাত্রস্থ করবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। গাঁয়ের লোকদের প্ররোচনা একটু ছিলো বটে, কিন্তু বাবার মত ছিলো অতিমাত্রায় মৌলিক ও অসাধারণ। মেয়েদের লেখাপড়া-শেখার মোটেই তিনি বিরোধী নন্‌, বরং লেখা-পড়া শিখলেই তারা পারিবারিক জীবনে লাবণ্য বিস্তার করতে পারবে; কিন্তু সেইদিক থেকেই মেয়ের শিক্ষানুরাগকে তিনি নিজ হাতে নষ্ট করতে চান্‌ নি। তাড়াতাড়ি তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে চাচ্ছেন এই ভেবে যে শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে জীবনে মাধুর্য্য এলেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে শরীরের লাবণ্য যাবে বিবর্ণ হ'য়ে। একমাত্র সাড়ি পরে' নারী বলে' পরিচিতা হওয়াটাই হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার বিড়ম্বনা। তাই বয়সের স্বাভাবিক সম্পদে দেউলে হ'বার আগেই মেয়েকে তিনি পার করতে চান্‌।

সে-আশা তাঁর পূর্ণ হ'লো না। মেয়ে দেখাবার আগেই তিনি মারা গেলেন।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে' শান্তি সেই সব কথাই এখন ভাবছিলো। বাবা সেই ফাঁড়াটা উৎরে গেলে এতোদিনে সে নিশ্চয়ই কোন্‌ সে অপরিচিত পুরুষের দাসত্ব করতে গেছে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন, এই বহুবিশ্রুত নীতি-কথাটা এখেনেই বা সে খাটাতে যাবে না কেন? বিয়ে হ'য়ে গেলে জীবন-সংগ্রামের এই কঠিন ও নিষ্ঠুর আনন্দ থেকে সে চিরদিন বঞ্চিত হ'য়ে থাক্‌তো। তার স্নায়ু তখন শিথিল, দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ও আকাঙ্ক্ষা পঙ্গু হ'য়ে গেছে। অহোরাত্র এই যে উন্মুখ যুদ্ধমত্ততা—এর তীব্র স্বাদ তা হ'লে সে পেতো না। সে যে এতো ত্যাগ করতে পারে, এতো সহ্য করতে পারে, এতো প্রতীক্ষা করতে পারে—নিজেকে অলক্ষ্যে এই আবিষ্কার করার অহঙ্কার সে পেতো কী করে'? সংসারে সেই প্রবল মৃত্যু তাকে উলঙ্গ জীবনের সামনে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে এই নির্লজ্জ সঙ্ঘর্ষে শান্তি ক্ষণে-ক্ষণে নূতন শক্তি সংগ্রহ করছে। কিছুতেই সে হারবে না—এই তার প্রতিজ্ঞা।

বিয়েটা তার জীবনের পক্ষে সামান্য একটা ব্লাউজের প্যাটার্নের মতো তুচ্ছ বাবুগিরি মাত্র—তার চেয়ে কতো বড়ো অসাধ্যসাধন তাকে করতে হ'বে। সে এখন পরিপূর্ণ একটি ব্যক্তি, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, আপনাতে আপনি পরিচিত। সে নিজেই নিজের সারথি। কারুর সে সম্পূরক নয়, কারুর সাহায্যপ্রার্থিনী হ'য়ে সে যুদ্ধে নামে নি, এবং এই একাই তাকে যুদ্ধজয় করতে হ'বে।

অনেক ক্লান্তি, অনেক অবসাদ—তা হোক্—তবু ভাইয়েদের সেই একমাত্র দিদি, মাসান্তে মা তার মাইনের ঐ ক'টি টাকার জন্যে চেয়ে আছেন। বাবার ঋণের টাকাটা শান্তি নিজের নামে লিখে নিয়েছে—তা পরিশোধ করে' তবে সে পরিষ্কার করে' নিজের দিকে চাইতে পারবে। মোহনের পড়া-শোনায় মন নেই, ছোটখাটো একটা মাষ্টার রেখে দিলে ভালো হয়। আসছে মাসে কিছু ছিট কিনে ওদের দুটো সার্ট তৈরি করে' দিতে হ'বে। মা তো তাঁর নিজের অভাবের কথা কিছুই লেখেন না, কিছু লিখতে গেলে উল্টে তাকেই তিনি ভালো দেখে একজোড়া সাড়ি কিন্‌তে বলেন, হাতের মোটা রুলি দু'গাছ ভাঙিয়ে সরু করে' চার গাছ ঝুরো চুড়ি যেন সে তৈরি করিয়ে নেয়—বানির টাকা আস্তে-আস্তে শোধ করে' দিলেই চল্‌বে। তার চেয়ে সেই টাকায় বাড়িতে একটা চাকর রাখলে কাজ দিতো। দু' বেলা রান্না করে' মাকে আবার বাসন মাজতে হ'তো না।

অন্ধকারে কখন সে তার গ্রামে চলে' গিয়েছিলো, পাশের বাড়িতে কিসের একটা শব্দ হ'তেই শান্তি আবার নিজের কাছে ফিরে এলো। চট্‌ করে' মনে পড়ে' গেলো আজ শনিবার—রাত এগারোটা কখন বেজে গেছে। হঠাৎ খুসি হ'য়ে উঠে বিছানা ছেড়ে আস্তে-আস্তে দক্ষিণের জান্‌লার ছিট্‌কিনি তুলে সামান্য একটু ফাঁক করলে। হ্যাঁ, আজকেই তো তাঁর ফেরবার কথা।

এখনো তিনি ফেরেন নি। বউটি মেঝের ওপর ছেলেকে কোলে করে' বসে' ঝিনুকে করে' দুধ খাওয়াচ্ছে। বাটির দুধের চেয়ে বুকের দুধের জন্যেই ছেলেটির বেশি লোভ, দুর্ব্বল ক'টি আঙুল মেলে মার বুকের কাপড়ের কাছে আঁকুপাঁকু করছে। বউটি বাটির গায়ে ঝিনুকের শব্দ করে'-করে' ছেলেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছে, আর সুর করে' ছড়া কাট্‌ছে :

দেয়া, বাও করো রে,
খোকার দুধ জুড়িয়ে দাও।

একপাশে পেতলের টোপে ভাত ঢাকা, সাম্‌নে পাড়-মোড়া চটের একখানি আসন, কলাই-করা ছোট্ট একটি প্লেটে পাৎলা করে' দু'খানা নেবু কাটা আর একটু নুন। স্বামী তার এক্ষুনি এসে পড়বেন। ব্যাণ্ডেলে না সাঁৎরাগাছিতে কোথায় নাকি ইষ্টিশানে কি কাজ করেন, শনিবারের কাজ চুকিয়ে রাত্রে তিনি বাড়ি ফেরেন। শনিবারের রাত্রি আর রবিবারের সমস্তটা দিন—রাত দশটা বাজতে না বাজতেই আবার তাঁর পাততাড়ি গুটোতে হয়—সেই ভোরবেলায় তাঁর ডিউটি। সপ্তাহান্তে এই ক'টি ঘণ্টার মাত্র সান্নিধ্য। তারি জন্যে বউটি প্রতিমুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত গোণে। আগেভাগেই ছেলেকে দুধ খাইয়ে জামা ছাড়িয়ে বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখে—পাছে তার নির্ব্বোধ দৌরাত্ম্যে তাদের এই প্রতীক্ষাপ্রখর মিলনের আনন্দে কোনো ব্যাঘাত না হয়। অল্প একটু পাখি তুলে শান্তি চোরের মতো চুপিচুপি সেই দৃশ্যটি আনুপূর্ব্বিক অনুধাবন করে। শনিবারের রাত্রে কখন সেই স্বামীটি ফিরে আসেন তারই প্রতীক্ষায় ঐ বউটির মতো সে জেগে থাকে, ঘুমুতে যেতে পারে না।

তারপর সিঁড়িতে জুতোর শব্দ করতে-করতে যখন তিনি আসেন, বউটির মতো তারো সর্ব্বাঙ্গ সহসা আনন্দে ও আশায় আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। মূর্ত্তিটা ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হ'তেই বউটি তার অতি-প্রগল্‌ভ আনন্দ লুকোবার লজ্জায় স্বামীরই বুকের মধ্যে মুখ ঢাকে—সেই পরিপূর্ণ, পরুষ আলিঙ্গনের তাপ সহসা শান্তিকে ঘিরে নির্জ্জীব অন্ধকারের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মিলনের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কাটিয়ে উঠ্‌তেই স্বামী ওপরের জামাটা খুলে ফেলে পেছনের বারান্দায় চলে' যান্—আগেই সেখানে বউটি বাল্‌তি ভরে' জল ও সোপ্‌কেস্‌এ সাবান সাজিয়ে রেখেছে—তোয়ালেখানা হাতে নিয়ে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর স্বামী খেতে বসেন—বাটি-উপুড়-করা ভাত তাঁর আঙুলের চাপে ভেঙে-ভেঙে পড়ে, আর পাশে বসে' বউটি আস্তে-

আস্তে পাখা করে। কতো কি-সব খুঁটিনাটি কথা—রেল্-ইষ্টিশানের গল্প, কোথায় কি নতুন লাইন বস্‌ছে, কবে সেদিন একটা কুলি-কামিন ট্রেনে কাটা পড়লো। বউটির পুঁজিতেও গল্প কম নেই,—খোকার ওণ্ডা-ওণ্ডা কেমন এখন স্পষ্ট মা হ'য়ে উঠেছে, সুতো দিয়ে মশারির সঙ্গে রঙিন একটা বল ঝুলিয়ে দিলে কেমন সে হাত-পা তুলে হাসে, ফিডিং-বোতল কিছুতেই সে মুখে তুলবে না। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলেই দেখতে-না-দেখতে দরজায় খিল পড়ে, টুপ্ করে' সুইচ্‌টা উঁচু-মুখো ঠেলে দিয়ে স্বামী আলো নিভিয়ে দেন। তখন শান্তির ঘরেও আগাগোড়া অন্ধকার।

বউটি কতো সুখেই না আছে। তার জীবনটা আগাগোড়া সমতল, একেবারে স্বচ্ছন্দ। কোথাও এতোটুকু বাধা নেই, ছন্দচ্যুতি নেই—একটানা ভাটিয়াল একটি সুর। যা কিছু সে ক্ষয় করে তারই গৌরবে ধীরে-ধীরে সে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। নিজেকে নিঃশেষ করে'ও সে রিক্ত হয় না।

কথাটা আজ এখন মনে হ'তেই শান্তি আর-দিনের মতো ধড়মড় করে' উঠেছিলো, কিন্তু ব্যাপারটা কেমন-যেন তার আজ ভারি বিস্বাদ ঠেকলো। পুরুষ হ'য়ে জন্মানোই তার উচিত ছিলো, তা হ'লে এমনি উদার বিশ্বাসে বউটি কখনোই তাদের ঘরের এই জান্‌লাটা খোলা রাখতো না। তা ছাড়া লুকিয়ে এই দৃশ্য কল্পনায় অনুরঞ্জিত করে' রোমাঞ্চিত হ'বার লজ্জা তাকে বারে-বারে আজ দংশন করতে লাগ্‌লো। ঐ পরিমিত সীমা-ঘন তুচ্ছ জীবন-যাপনে কোথায় কী অহঙ্কার!

শান্তি জান্‌লাটা বন্ধ করে' টেব্‌লের ওপর ফের আলো জ্বালালো। আলোটা নিতান্ত সামনে বলে' দেয়ালে তার মুখের অতিকায় একটা ছায়া পড়েছে। সেই ছায়ার দিকে তাকিয়ে শান্তি স্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইলো। দেখ্‌তে সে কুৎসিত তা সে জানে, কিন্তু সে যে কতো শূন্য এই ছায়ার দিকে তাকিয়ে সে আজ বুঝতে পারলো। নিজেকে সে যেন এখন মুখোমুখি দেখতে পারছে,—হাতের ঝাপ্‌টায় তাড়াতাড়ি সে আলো নিভিয়ে দিলে। এখুনি বউটির স্বামী এসে পড়বেন,—সময় এই হ'য়ে এলো। তারপর তাদের সেই অনর্গল হাসি আর কথা, এবং কথা থেমে গেলে তাদের সেই স্পর্শময় নিঃশব্দ উপস্থিতি। তাঁর বাড়ি পৌঁছুবার আগেই তাকে ঘুমিয়ে পড়তে হ'বে।

তবু, দেহ-সম্পদে হোক্ সে কুরূপা, তার সৌন্দর্য্য একমাত্র তার এই নির্ভীক বলশালিতায়, এই নিষ্ঠুর রূপোল্লাসে। জীবনকে সে গোলাপের বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখেনি, ঝড়ের আকাশে অবারিত বিদ্যুৎ-দীপ্তির মাঝে মুক্তি দিয়েছে। এতো সহজে পরাজয় স্বীকার করলে তার চলবে কেন? ঐ পরিমিত তুচ্ছ জীবন নিয়ে সে কী করবে?

শিয়রের বইগুলির ওপর অতি স্নেহে বাঁ হাতখানি মেলে দিয়ে শান্তি আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকাল হ'তেই তাদের কলেজ—চোখে-মুখে জল দিয়ে আঁচলটা দু'হাতে বুকের ওপর সামান্য একটু পাট্ করে' এক মাথা রুখু চুল নিয়েই সে বেরিয়ে পড়ে। হস্‌টেলে ফিরে আস্‌তে-আস্‌তে সাড়ে ন'টা। আধঘণ্টার মধ্যে স্নান, খাওয়া, বেশবাস। বেশবাসের মধ্যে পারত-পক্ষে সাড়িটা বদ্‌লে নেয়, ভিজে চুলগুলিতেই ফাঁস একটা গেরো দিয়ে মাথার ওপর ছোট্ট করে' একটি ঘোম্‌টা তুলে দেয়, হাতে একটা চামড়ার সস্তা ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ক'দিন মুচির একটাও দেখা নেই, জুতোর ঘুন্টি দুটো কবে ছিঁড়ে পড়ে' আছে।

সেই চিত্তরঞ্জন এভিনিয়ু থেকে একফালি একটা গলি বেরিয়েছে—তাইতেই কর্পোরেসান্‌এর সেই স্কুল। বাস্ নেবার সুবিধে নেই—এক, রিক্‌সা। রোজ-রোজ অতো পয়সা সে কোথায় পাবে? অগত্যা হেঁটেই সে যায়, আসেও তেমনি হেঁটে। চারটের তার ছুটি—কখনো-কখনো আগেই বেরিয়ে পড়ে। আগে বেরিয়ে পড়লে সোজা সে হস্‌টেলে চলে' আসে, চারটেয় বেরুলে সোজা সে বিডন্ ষ্ট্রিটে পড়ে' তার টিউসানির জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। তা, সপ্তাহের মধ্যে যদি দুটো দিন সে দুপুর-বেলা হস্‌টেলে ফিরে একটু জিরিয়ে নিতে পারে! এক শনিবার আর বুধবার।

আর-আর দিন চারটের পর চিত্তরঞ্জন এভিনিয়ু ধরে' বিডন্-ষ্ট্রিটের দিকে যাবার বেলায় শান্তি টের পায় তার

পেছনে কারা তাকে সমানে অনুসরণ করছে। প্রথম-প্রথম সে তা মোটে আমোলেই আনে নি, কিন্তু পদক্ষেপের দ্রুততা বাড়িয়ে তারা যখন ক্রমে-ক্রমে তার সন্নিহিত হ'বার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো তখন রীতিমতো সে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো। একে-অন্যের মধ্যে কী-সব খোলাখুলি কথা বলে, অন্য চিন্তায় মনকে শত ব্যাপৃত রাখলেও কানে তার কতক এসে ঢোকেই—এবং সে-ই যে তাদের আলোচনার বিষয়ীভূত, তাতে আর তার সন্দেহ থাকে না।

রাগে-দুঃখে শান্তির চোখে জল এসে পড়ে। কিন্তু নিঃশব্দে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কী করবার আছে! জীবনে কতো বড়ো ব্যর্থতাকেই সে হাসিমুখে স্বীকার করে' নিয়েছে, আর এই ক্লান্তিকর অনাহূত অপমানের সে পাশ কাটাতে পারবে না? জীবন-যুদ্ধে সে একাকিনী, পথে কোথাও তার সঙ্গী নেই, সে নিতান্ত নিঃস্ব ও নিরালা—তাই তারা তাকে এমন অসম্মান করতে সাহস করছে, কিন্তু নীরব উপেক্ষা ছাড়া এই অপমানের কী প্রতিবিধান হ'তে পারে!

কানকে সমস্তক্ষণের জন্যে কালা করে' রাখা অসম্ভব—তা ছাড়া লোকগুলি এতো ঘেঁসে যাচ্ছে যে তাদের উপস্থিতিকে আর উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাদের এগিয়ে দেবার জন্যে শান্তি দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু অসাধারণ তাদের বাধ্যতা—তারাও তেমনি থেমে পড়েছে। এবার তাদের দিকে চোখ না-ফেরানোই শান্তির পক্ষে অসম্ভব ছিলো। দুটো লোক—পোষাকে ভদ্রতা থাকলেও চেহারায় বিন্দুমাত্র শালীনতা নেই। তাদের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত গা রি-রি করতে লাগ্‌লো, কিন্তু ফুটপাতের এক ধারে চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া সে কী করতে পারে?

সামনে দিয়ে একটা রিক্‌সা যেতে দেখে শান্তি তাড়াতাড়ি সেটাকে হাত তুলে ডেকে দাঁড় করালে, দরাদরি না করে'ই সোজা উঠে বস্‌লো। খানিকদূর আসতেই টের পেলো তারাও একটা রিক্‌সা নিয়ে পিছু-পিছু আসছে, আর সামনের রিক্‌সাটাকে ধরবার জন্যে তারা রিক্‌সাওয়ালাকে প্রবলকণ্ঠে উৎসাহিত করছে। পেছনের রিকসাটা একেবারে শান্তির পাশে এসে পড়লো। তখন কোলের ওপর বই মেলে ধরে' ঘাড় হেঁট করে' রুদ্ধ নিশ্বাসে তা পড়া ছাড়া তার পথ থাকে না। এখানেও এই বই-ই তাকে রক্ষা করে।

কিন্তু রোজ-রোজ এমনি রিক্‌সা করে' যাওয়াও অসম্ভব। অথচ শনিবার ও বুধবার ছাড়া (সেদিন তার দুপুরেই ছুটি হ'য়ে যায়, এবং কখন সে পড়াতে যায় ঠিক তারা হদিস্ পায় না বলে') প্রত্যহই তাদের রাস্তায় এই হাজিরা দেওয়া চাই। ঘাম্‌তে-ঘামতে শান্তি পথ ভাঙে, এবং ছেলে হ'য়ে জন্মানোই যে তার কতো উচিত ছিলো তা ভেবে চোখে তার জল এসে পড়ে। তা হ'লে সহজেই সে এই অন্যায় কদাচারকে শাসন করতে পারতো—এমনি করে' নির্লজ্জের মতো হাসতে দিতো না।

হয়েছেই বা না মেয়ে—তাই বলে' এমনি মুখ বুঁজে সে অপমান হজম করবে নাকি? পুরুষের মতোই সে স্বাধীন, এবং এই স্বাধীনতার সম্মান তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'বে নিজেরই দৈহিক শক্তিতে। একেক সময় হঠাৎ পেছন ফিরে সমস্ত ভঙ্গিটা কঠিন করে' ঐ লোক দুটোকে তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে হয় মুহূর্ত্তমাত্র প্রস্তুত হ'বার সুযোগ না দিয়ে একটার গাল বাড়িয়ে প্রকাণ্ড একটা চড় মেরে বসে—কথাটা মনে হ'তেই শান্তির কেমন হাসি পায়—এবং ঐ অভিনয়ের কোন্ দৃশ্যে যে যবনিকা পড়বে ভাবতে গিয়ে সারা গা তার শিউরে ওঠে। প্রথমে একটা তুমুল হৈ-চৈ, হয় তো মেয়ে বলে' পথচারী ও পাড়ার বাসিন্দাদের সে দলে পাবে, সব কথা সজল চোখে ও শোকার্ত্ত গলায় সবিস্তারে তাদের খুলে বলতে হ'বে—সে নিতান্ত একটা থিয়েটারি ঢং; তার পর নিজেদের মুখ বাঁচাতে গিয়ে ও-পক্ষও আর মুখ বুঁজে থাকবে না, কোথা দিয়ে কী বলে' বসে তার ঠিক নেই এবং ইচ্ছে করলে কী তারা বল্‌তে না পারে! তারপর শান্তিকে আবার সেই সব কথা সাড়ম্বরে খণ্ডন করতে হ'বে, অনেক-সব সাক্ষী মানতে হ'বে, অনেকসব সার্টিফিকেট্ দেখাতে হ'বে—ব্যাপারটা শেষপর্য্যন্ত ফৌজদারি দাঁড়িয়ে যেতে পারে। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে কেলেঙ্কারির আর অন্ত থাকবে না, আত্মরক্ষা করতে গিয়ে চাকরিটি সে বাঁচিয়ে রাখতে পারে কি না সন্দেহ।

বিডন্-স্কোয়ারের কাছাকাছি এসে তবে তার টিউসানির জায়গা। বাড়ির মধ্যে সোজা ঢুকে পড়ে' শান্তি হাঁপ

ছেড়ে বাঁচে। লোকদু'টো আস্তে-আস্তে তখন সরে' পড়ে।

শান্তি হাতের ছাতাটা ও পায়ের জুতো জোড়া সিঁড়ির নিচে রেখে ওপরে উঠে যায়। প্রকাণ্ড কৌচের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে সরমা ফার্ষ্ট-বুকখানা নাড়া-চাড়া করছে।

বড়-লোকের ঘরের বউ—বয়েস এই ষোলো-সতেরো হ'বে, কিন্তু সমস্ত দেহ ভরে' তার উত্তাল রূপ, রেখার বন্ধন উত্তীর্ণ হ'য়ে ভঙ্গিতে উথ্‌লে পড়ছে। মেয়েও বড়ো ঘরের—এতো দিন লাবণ্যচর্চ্চা ছাড়া আর-কিছুতে তার হাত পাকে নি। নতুন বিয়ে হয়েছে—স্বামী আয়-কর আফিসের বড়ো চাকুরে। তাঁর ইচ্ছা ইংরিজি-ভাষার কয়েকটি অন্তত ছিটে-ফোঁটা সরমার পাতে পড়ুক। অন্তত তার সঙ্গে আলাপ করবার সময় তিনি যেন দুয়েকটা নতুন কথা পান্। একটু যেন মুখ-ফেরানো চলে।

অন্য সময় শান্তির সুবিধে হয় না বলে' এই বিকেলের দিকটাই সে বেছে নিয়েছে। সরমা এই সময় তাকে চা এনে দেয়, কতো রাজ্যের খাবার, কতো রকম সাধ্যসাধনা করে, অথচ নিজে এক কামড় খাবে না। আপিস্ থেকে স্বামী বাড়ি ফিরলে তবে তাঁর সঙ্গে তারো ব্যবস্থা হ'বে। আর, শান্তিই কি না এতো সহজে তার এই শিক্ষয়িত্রীর সম্মান খোয়াতে বসেছে! জলখাবারের ধার দিয়েও সে যায় না, ভঙ্গিতে অবিচল একটি কাঠিন্য এনে সে দূরত্ব বজায় রাখে, টেবলের ওপর বইটা মেলে ধরে' সে বলে: কাল্‌কের পড়া তৈরি হয়েছে তো? বানান্ করুন্—

সরমা ফিক্ করে' হেসে বলে: কখন তৈরি করবো বলুন দিকি। সারা সকালটা শুধু-শুধু উনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করলেন। মিছিমিছি অমন ঝগড়া করলে মেজাজ কারো কখনো ভালো থাকে? আমিও দিলুম কথা শুনিয়ে। মন ভারি খারাপ হ'য়ে গেলো। সারা দুপুর বই আর ছুঁতে পারলুম না।

শান্তি বলে: তবে ডিক্‌টেসান্ নিন্।

সরমা শব্দ করে' হেসে ওঠে; বলে: আপনি অমনি দারোগার মতো মুখ করে' থাকলে আমার ভয় করে। ডিক্‌টেসান্ নিয়ে কী হ'বে?

—না, কিছুই আপনার প্রোগ্রেস্ হচ্ছে না।

—ভীষণ হচ্ছে, বাইরে থেকে আপনি কিছু টের পান্ না। আমাকে কাল উনি চীনে-হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলেন, দস্তুরমতো হ্যাম্‌এ কামড় দিয়ে এসেছি—শ্বশুরঠাকুর শুন্‌লে আমাদের আর আস্ত রাখবেন না।

তবু বস্‌বার ভঙ্গিটা একটুও কোমল না করে' শান্তি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে: কিন্তু আমার তো একটা কাজ করতে হ'বে, নিন্, লিখুন।

—বা, আপনি যে রোজ দয়া করে' আসেন এই তো আপনার কাজ। এই গাধা পিটিয়ে মানুষ করার অনর্থক কষ্ট করতে যাবেন কেন? বসে'-বসে' আমার সঙ্গে গল্প করলেই তো পারেন—দিব্যি সময় কাটে।

আর গল্প করতে গেলেই তো সরমার স্বামী ছাড়া কোনো কথা নেই। শিক্ষয়িত্রী বলে' শান্তিকে সে এতোটুকু গুরুত্বের মর্য্যাদা দেয় না। ভঙ্গিটা অমন উদাসীন ও রুক্ষ করে' না রাখলে খুসিতে সরমা কখন তারই কোলের ওপর উছ্‌লে পড়তো।

শান্তি বলে: কিন্তু আমাকে তো এমনি বসে' থাকার জন্যে রাখা হয় নি।

সরমা কৌচের ওপর আরো একটু বিস্তৃত হ'য়ে বসবার ভঙ্গিটা শিথিল ও নরম করে' আনে; বলে: আপনিও যেমন, বসে' থাকলেই বা আপনাকে কে তাড়ায়! ফাঁকি দিতে না পারলে কর্ত্তব্যকাজে সত্যিই কোনো সুখ নেই। আর আপনাকে সত্যি বলছি শান্তি-দি, আমার মাথায় ও-সব মাথামুণ্ডু কিচ্ছু ঢোকে না।

শান্তি হাসি চাপতে গিয়ে মুখ আরো গম্ভীর করে' তোলে।

টেব্‌লের ওপর থেকে বই-খাতা ঠেলে দিয়ে সরমা বলে: কী হ'বে এ সব ছাই-পাঁশ মাথায় ঢুকিয়ে। ওঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে আমার এই বাঙলা ভাষাই যথেষ্ট। আর বাঙলা ভাষা কতো যে মিষ্টি! আপনাদের মতো অমনি গ্যাড্‌ম্যাড্ করতে গেলেই হয়েছে—গানের আসরে গদা-হস্তে ভীমের প্রবেশের মতো সব মাটি হ'য়ে যাবে।

আবার বলে: আমার তো আর পেটের ধান্দায় চাকরি খুঁজতে হ'বে না, চাকরি তো আমি পেয়েই গেছি—একেবারে ইম্পিরিয়াল সার্ভিস্, কী বলেন? মিছিমিছি কী হ'বে এ-সব হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুৎ করে'?

এমন সময় আপিস থেকে সরমার স্বামী ফিরে আসেন।

সরমাকে মাষ্টারের কাছে পড়তে দেখে ঘরের মধ্যে দ্রুত একটা উঁকি মেরেই তিনি তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকেন। অরণ্যে বসন্তের আবির্ভাবের মতো, সরমার সারা দেহে যৌবন সহসা ঊর্মি-চূড়ার মতো আলোড়িত হ'য়ে ওঠে।

অভিভাবক কাছেই উপস্থিত ভেবে শান্তি অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে, তাড়াতাড়ি বই-খাতা টেনে এনে প্রায় ধমক দিয়ে বলে: লিখুন এবার, কোনোদিনই পড়া আপনি তৈরি করবেন না। এ রকম করলে কী করে' চলে বলুন্। নিন্।

দু' হাত তুলে আড়মোড়া ভেঙে সরমা বলে: আজ থাক্, শান্তি-দি। আমি এবার উঠি।

—এখুনি উঠ্‌বেন কি? এক লাইনো আপনার পড়া হয় নি। বসুন্।

—আপনি কিচ্ছু বোঝেন না, শান্তি-দি। আমার পড়ার অমনোযোগের জন্যে যার কাছে আপনি নালিশ করছেন, পড়া বন্ধ করলে সব চেয়ে তিনিই যে বেশি খুসি হ'বেন। এইমাত্র আপিস্ থেকে ফিরলেন, এখন সামনে ঘরের শুকনো দেয়াল দেখলে কখনো ভালো লাগে? আপনিই বলুন না। তা ছাড়া, উনি যে আপিস থেকে ফিরলেন সে-খবরটা ঢাক পিটিয়ে রাষ্ট্র করার চালাকিটা ওঁর ধরতে পেরেছেন তো? অমন লোকের জন্যে মায়া না করে' পারে? বলে' সরমা উঠে পড়লো।

শান্তি কঠিন হ'য়ে বলে: কিন্তু আমি যে এসেছি—আধ ঘণ্টাও হয় নি।

—ভালোই ত'। সরমা খুসিতে টলমল্ করতে থাকে: আপনার খাটুনিই বরং বেঁচে যাচ্ছে,—আমারো। আধ ঘণ্টাই ঢের, যেন কাটতে চায় না—কখন উনি আপিস্ থেকে ফেরেন!

শান্তি বলে: অন্য সময় বদলে নেবার সুবিধে হ'লে—

—খবরদার ওটি করবেন না, শান্তি-দি। আমারই সময় হ'বে না। আপিস্ থেকে ফেরার চাইতে আপিসে যাবার বেলায়ই যে বেশি সমারোহ। তারপর আজকাল আবার কথায়-কথায় রাগ করতে শিখেছেন। কী হ'বে ঐ সব পড়ে'-শুনে দিগ্‌গজ হ'য়ে? বলে' চঞ্চল পায়ে চৌকাঠ অবধি এগিয়ে সহসা সে থেমে বলে: এবার তবে যাই, শান্তি-দি, ওঁর জলখাবারের বন্দোবস্ত করতে হ'বে।

পরদাটা গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে নিয়ে সরমা ছেলেমানুষের মতো হাসতে-হাস্‌তে বেরিয়ে যায়, পরদাটা আবার নিজের জায়গায় এসে স্থির হয়।

ঘণ্টা খানেক হয়তো কাটে। কি-একটা কাজে সরমা ফের পড়ার ঘরে ঢুকে পড়ে। দেখে, চেয়ারটায় তখনো শান্তি চুপ করে' বসে' আছে—মুখ-চোখ অত্যন্ত ম্লান, যেন কি-একটা সাঙ্ঘাতিক অসুখ থেকে এই উঠে এসেছে। সরমা চম্‌কে উঠে বলে: এ কি শান্তি-দি, আপনি এখনো যান্‌নি?

কোলের বইটা হঠাৎ ক্ষিপ্র হাতে ঘাঁট্‌তে সুরু করে' নিতান্ত লজ্জিত মুখে শান্তি বলে: না, এই বসে'-বসে' একটু পড়ছিলাম। হস্‌টেলে যা গোলমাল—একদম্ পড়া হয় না, তা ছাড়া সময়ো আমার কম। এই, এবার উঠি। বলে' কুণ্ঠিত মুখে সে উঠে পড়ে।

সরমার দিকে না তাকিয়ে পারে না; বলে: কোথাও এখুনি বেরুচ্ছেন নাকি?

—হ্যাঁ, ফের ভাব হ'য়ে গেলো কি না, তাই আমাকে নিয়ে তাঁর বায়স্কোপে যাবার সখ হয়েছে। দু'পা এগিয়ে এসে নিতান্ত সরল ছেলেমানুষের মতো সরমা বলে: আপনিও যাবেন, শান্তি-দি?

শান্তি থেমে পড়ে: দূর বোকা মেয়ে।

—বা, বাড়ি-শুদ্ধ্ সবাইকে ফেলে আমিও যেন ওঁর সঙ্গে ট্যাং-ট্যাং করে' একা-একা যাচ্ছি আর-কি। ননদরাও সঙ্গে যাচ্ছেন। আপনিও চলুন না।

এ-কথায় কোনো উত্তর দরকার করে না। ম্লান একটু হেসে শান্তি আস্তে-আস্তে নেমে যায়।

ফেরবার সময় সেই লোক দুটোর উৎপাত আর থাকে না,—ও-বাড়ি থেকে কখন সে ঠিক বেরুবে তা জান্‌তে পারে না বলে'ই তাদের ধৈর্য্য আর কুলিয়ে ওঠে না, কখন আবার সরে' পড়ে। শান্তি সামনের দিকে চেয়ে দ্রুত পায়ে সমানে হাঁটতে থাকে। এক-একবার ইচ্ছা করে এই টিউসানিটা সে ছেড়ে দেয়, লোক দুটোর অভদ্র আচরণে অনন্যোপায় হ'য়ে নয়, সরমারই জন্যে। পড়তে যে চায় না, তার আবার এ কোন্ দিশি বাবুয়ানা?

তার প্রগল্‌ভতাকে প্রশ্রয় দেবার এ কী চমৎকার কৌশল বের করা হয়েছে! যেন তার মুখে তার স্বামীর গল্প শোনবার জন্তেই মাসে-মাসে সে মাইনে পাচ্ছে!

কিন্তু তবু কুড়িটে করে' টাকা। মোহন আর মিণ্টুর স্কুল-মাইনে, জামা-জুতো,—কতো কী! তার জন্তে কী না সে সহ্য করতে রাজি আছে, মাত্র তো নির্বোধ বর্বর লোকের অসম্মানসূচক ইঙ্গিত, মাত্র তো স্বামীর প্রতি সরমার সেই পূর্ণোচ্ছ্বসিত স্নেহ!

তারপর একদিন সেই লোক দুটোর উৎসাহ অত্যন্ত বেড়ে গেলো, পেছন থেকে একজন আল্‌তো করে' শান্তির আঁচলটা টেনে ধরলো।

শান্তি কী করবে কিছু ঠিক করবার আগেই অন্যদিকের ফুটপাত থেকে একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক সাঁ করে' এই পারে ছুটে এলো—হাতে তার একটা চেন্‌-বাঁধা কুকুর। কিছু জিগ্‌গেস করবার আগেই লোক দুটো পাশের গলি দিয়ে সরে' পড়েছে।

লজ্জায় শান্তি তখন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। যুবক জিগ্‌গেস করলে: কী ব্যাপার?

শান্তি স্নিগ্ধ গলায় বল্‌লে,—আমার সঙ্গে একটু চলুন, বলছি। এখানে এখুনি ভিড় জম্‌তে সুরু করেছে।

ফুটপাত ধরে' বিডনষ্ট্রিটের দিকে এগোতে-এগোতে যুবক বল্‌লে,—তখন থেকে দেখছি আপনি 'ফলোড্‌' হচ্ছেন, লোক দুটো কে?

—ক' মাস থেকেই আমাকে এমনি ওরা জ্বালাতন করে। ঐ প্রাইমারি ইস্কুলটায় আমি টিচারি করি, এ-সময়টায় ইস্কুল ছুটি হ'লে টিউসানি করতে যেতে হয়, সেই প্রায় বিডন্‌-স্কোয়ারের কাছে। আর রোজ ঐ দুটো লোক আমার পেছনে হাঁটতে থাকে।

—বলেন কি! ক' মাস থেকে! লোক দুটো যে ক্লীন্‌ ভেগে পড়লো। আমি এক্ষুনি ওদের কুকুর লেলিয়ে দিতাম। কিছু শিক্ষাই যে ওদের দে'য়া হ'ল না।

শান্তি আশ্বস্ত হ'য়ে বল্‌লে,—আপনাকে আসতে দেখেই সরে' পড়েছে। বোধহয় এইবার চুপ করে' যাবে।

—না, বলা যায় না। দেখি, কী করতে পারি, বের আমি ওদের করবোই। আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?

—আমার সেই টিউসানিতে।

—চলুন। সঙ্গে একটা দারোয়ান নিতে পারেন না?

—ইস্কুল থেকে নিলে তাকে আমার এক্‌স্ট্রা দিতে হয়। আর, এইটুকুন তো মাত্র পথ।

—আপনাকে একা-একা এমনি আসা-যাওয়া করতে দেখেই ওদের এই বেজাতীয় সাহস বেড়েছে। দেখি, আমি ওদের ছাড়ছি না।

দু'জনে বিডন্‌-ষ্ট্রিটে পড়ে' নিঃশব্দে আরো খানিকক্ষণ হেঁটে এলো। হঠাৎ থেমে পড়ে' যুবক বল্‌লে,—এই হচ্ছে আমাদের বাড়ি, আর আমার নাম হচ্ছে রণেন মজুমদার।

কথাটা এমন সুরে বলা হ'লো যেন রণেন এক্ষুনি বিদায় নিয়ে তার বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে। শান্তি আরেকটু হ'লে নমস্কার করতে হাত তুলছিলো, কিন্তু রণেন তার সঙ্গে-সঙ্গেই আসছে।

শান্তির ইচ্ছা হ'লো বলে—আর কেন উনি কষ্ট করে' আসছেন? কিন্তু এ নিতান্তই প্রাণহীন ভদ্রতার মতো শোনাবে—অন্তত যে তাকে এই বিপদ ও লজ্জা থেকে উদ্ধার করলো ও যে পাশে আছে বলে' তার এখন রীতিমতো সাহস হচ্ছে, তার প্রতি এই মিথ্যা ও মামুলি চাটুবাদটা তার মানায় না।

আরো খানিকটা রাস্তা নিঃশব্দে অতিবাহিত হ'লো। শান্তি ফিরে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বল্‌লে,—এই বাড়িতে আমি পড়াই। আচ্ছা, আসি, নমস্কার। বলে' সুন্দর করে' একটু হেসে ছোট একটি নমস্কার করে' শান্তি ভিতরে অন্তর্হিত হ'লো।

কিন্তু আজো সরমা পড়বে না। তার আজ সর্দ্দি করে' চোখ-মুখ ছল্‌ছল্‌ করছে। ইউক্যালিপ্‌টাস্‌-এর তেলে কিছু হচ্ছে না, গরম জিলিপিও সে ঢের খেলো, উনি এখন তাকে ফুট্‌-বাথ দেবেন। তারি জন্তে আগে-ভাগেই তিনি আপিস থেকে বেরিয়ে পড়েছেন।

—এ তো আপনার ভালোই হ'লো, শান্তি-দি। অনর্থক আধঘণ্টাও কাটতে দিলুম না। এখুনি আপনি পালান, পড়াবার নাম শুনলে গরম জলের গাম্‌লা নিয়ে না উনি

তেড়ে আসেন। বলে' ভারি, খন্‌খনে গলায় সে অনর্গল হেসে উঠ্‌লো।

নিষ্প্রাণ গলায় শান্তি বল্‌লে,—আমার কী। আমার মাইনে পেলেই হ'লো।

—নিশ্চয়। আমরা তো ভাবছি আপনার মাইনে আরো বাড়িয়ে দেব, প্রায় রোজই কষ্ট করে' এসে শুধু-শুধু ফিরে যান। এবার থেকে যেদিন একদম্ পড়বো না শান্তি-দি, আপনাকে চিঠি লিখে জানাবো।

শান্তি হেসে বল্‌লে,—তা হ'লে রোজই আপনি একখানা চিঠি লিখবেন।

—কিম্বা এক চিঠিতেই আপনাকে একমাসের লম্বা ছুটি দেব, কেবল মাসের পয়লা তারিখে আসবেন এতোদিন প্রতীক্ষা করার দক্ষিণা নিতে! তা হ'লেই ভালো হ'তো, কিন্তু ওঁর কাছে ভিজে বেরাল সাজতে হ'বে যে। মুখোসটা ঠিক রাখতে হ'বে—নইলে বিপদ আমাদের দু'জনেরই, শান্তি-দি।

—আচ্ছা, এবার তবে আসি। বলে' নিচে নেমে জুতো পরে' ছাতা কুড়িয়ে শান্তি বাইরে চলে' এলো।

দেখলে কুকুর-হাতে রণেন তখনো দাঁড়িয়ে আছে।

শান্তি বিব্রত হ'য়ে পড়লো; বল্‌লে,—আমার জন্যে এখনো আপনি দাঁড়িয়ে আছেন নাকি?

রণেন বল্‌লে,—হ্যাঁ, চলুন, আপনাকে বাড়ি পর্য্যন্ত রেখে দিয়ে আসি। বাড়ি থেকে আসা-যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করতে পারেন না?

এক পা দু' পা করে' চলতে চলতে শান্তি বল্‌লে,—বাড়ি কোথায়, থাকি সেই হেদোর কাছে একটা প্রাইভেট হস্টেলে। বন্দোবস্ত আর কী করবো? তা থাক্, কষ্ট করে' আপনাকে আর এগিয়ে দিতে হ'বে না, আমি একাই যেতে পারবো। এ-সময় আর কেউ উৎপাত করতে আসে না।

যেন রণেনই এখন উৎপাত সুরু করেছে এমনি ভাব দেখিয়ে শান্তি জোরে-জোরে পা ফেলতে লাগলো। রণেন বল্‌লে,—কিন্তু আমার বাড়ি পর্য্যন্ত তো আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি।

শান্তির পদক্ষেপগুলি আবার মন্থর হ'য়ে এলো।

এই তাদের বাড়ি—শান্তি স্পষ্ট তা চিনে রেখেছে। বাইরে থেকে দেখতে অট্টালিকাটা শান্তির অসম্ভব স্বপ্নের মুহূর্ত্তে উচ্চতম আকাঙ্ক্ষাকেও ছাড়িয়ে গেছে। হ্যাঁ, কুকুর নিয়ে রণেন সেই বাড়িতেই ঢুকলো।

বাকি পথটা কাট্‌লো তার সেই মা'র কথা নিয়ে, মোহন আর মিণ্টুর ভবিষ্যতের কল্পনা করে', ছুটি হ'লে কার জন্যে সে কোন্ জিনিস কিনে নেবে সেই চিন্তায়!

তার পর দিন চারটের সময় ইস্কুল থেকে বেরিয়ে শান্তি দেখতে পেলো রণেন গেইটের কাছে কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শান্তি একটু হাসলো। রণেন বল্‌লে,—ক'দিন আমি আপনাকে এস্কর্ট করে' দেখি—বেটাদের নাগাল পাই কি না।

কতো দূর এগিয়ে এসেই পেছন ফিরে তাকিয়ে শান্তি বল্‌লে,—আপনার ভয়ে ওরা আর ঘেঁস্‌ছে না, এবার ওদের দস্তুরমতো ভয় ধরে' গেছে।

—নিশ্চয়। আসুক না এগিয়ে। রণেন তার বলিষ্ঠ হাতে কুকুরের চেন্‌টা টেনে ধরে' বল্‌লে,—এই আমার মুসোলিনিকে দেখছেন, একবার লেলিয়ে দিলেই কামড়ে একেবারে টুকরো-টুকরো করে' ফেল্‌বে। তার পর পকেটে আমার এই হাণ্টার।

সত্যি শান্তির কেমন-যেন এখন অত্যন্ত নির্ভাবনা লাগে, দিব্যি অনায়াসে গল্প করতে-করতে দু'জনে তারা পথ চলতে থাকে। কুকুরটা থেকে সান্নিধ্যে একটু অন্তরাল এনে দিয়েছে।

শান্তি একদিন বল্‌লে,—কিন্তু আপনি চলে' গেলেই আবার হয়তো সূর্য্য-চন্দ্র দুজনে সমানে উদয় হ'বেন।

রণেন বল্‌লে,—না, না, সূর্য্যচন্দ্রবধ সমাধা না করে' আমি ছুটি নিচ্ছি না। আপনার ভাবনা নেই।

সরমার বাড়ি থেকে বেরিয়েও শান্তি রাস্তায় রণেনকে প্রত্যাশা করে। তার পর তার বাড়ি পর্য্যন্ত এসে হঠাৎ দেহের ক্ষিপ্রতা বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি নমস্কার করে' বলে: আচ্ছা, এবার চলি। অনেক ধন্যবাদ।

ধন্যবাদটা ক্রমে-ক্রমে উঠে যায়।

চারটে বাজতে-না-বাজতেই শান্তি অস্থির হ'য়ে ওঠে, গেইট্ দিয়ে বেরিয়ে এসেই রণেনকে দেখে তার মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করে' গভীর তৃপ্তির একটি ছায়া নামে। আস্তে-আস্তে রণেনের হাত থেকে কুকুরের চেনটা কখন খসে' গেছে,

শান্তির ছাতাটা সে আজকাল মাথায় ধরে। আদ্ধেক ছাতায় বাইরে চলে' গিয়েও শান্তি ব্যবধানটা প্রশস্ত করতে পারে না, আবার আদ্ধেক কখন ভেতরে চলে' আসে।

শান্তি রণেনদের বাড়ির কাছে এসে অল্প একটু থেমে হেসে, নমস্কার করে' রোজ বিদায় নেয় না, মাঝে-মাঝে অন্তঃপুরেও ঢুকে পড়ে। আজকাল বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে তার ভাব হ'য়ে গেছে, রণেনের মা'র কাছে সে তার বাড়ির গল্প করে, তাদের আধুনিক কালের দারিদ্র্যের ইতিহাস নয়—সেই সেকেলে তার ঠাকুরদাদা কবে কোন্ ডাকাতের দল ধরে' দিয়ে সকলের থেকে ইনাম পেয়েছিলেন তার কথা। সব চেয়ে মজা এই, বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে' রণেনের সঙ্গেই সে আলাপ করতে পারে না।

বনেদি বাড়ি—ঐশ্বর্য্যে ঘর-দোর গম্‌গম্ করছে। শান্তি যেন কেমন হাঁপিয়ে ওঠে।

না, শান্তির সময় নেই, সংসারে তার অনেক কাজ। ছোট ভাই দুটিকে মানুষ করতে হ'বে, বাবার ঋণটা শোধ না করলেই নয়—জীবনের তুচ্ছ বিলাসিতায় তার রুচি নেই। মাঝে-মাঝে বিশ্রামের জন্যে সে লুব্ধ হ'য়ে ওঠে বটে—কিন্তু এই ক্ষমাহীন রূঢ়মনস্ততারই তার সত্যিকারের আশ্রয়। স্বপ্নের রঙিন মুখোস খুলে ফেলে রূঢ় জাগ্রত রৌদ্রে সে অবতীর্ণ হ'লো।

সরমাকে শান্তিই যা-হোক্ চিঠি লিখলে। লিখলে, টিউসানি সে আর করতে পারবে না।

সরমা নিয়মমতো পড়ে না বলে' নয়, পথচারীদের উৎপাতের জন্যে ঐ রাস্তাই সে ছাড়তে চায়। কারণটা অবিশ্যি সরমা জানতে পারলো না। তবু কী মনে করে' কার্ট-বুকটা কুটি-কুটি করে' ছিঁড়ে ফেলে স্বামীর কোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

নহ পুরাতন

শ্রীনিধিরাজ হালদার

(১)

ওহে পুরাতন নূতনের মাঝে,
খুঁজেছি তোমায় আকুল পরাণে,
কভু পাই নাই তব দরশন।

(২)

জাগ্রত স্বপনে ভেবেছি যে কত,
আঁধার নিশিতে প্রদীপ জ্বালি,—
তবে কি নহ গো তুমি পুরাতন ?

(৩)

নূতনের অতি-জীর্ণ কঙ্কাল,
রাখিয়াছ শুধু করিয়া সাক্ষী,—
কত যুগ-যুগান্ত ধরিয়া।

(৪)

শরতের গোধুলি লগনে,
ঘুরিয়াছি কত দ্বার হতে দ্বারে,—
নয়ন-জলেতে পরাণ ভরিয়া।

(৫)

হেমন্ত কেটেছে, চলে গেছে শীত,
বসন্ত আজিকে অতিথি দ্বারে,
কি বলিব তাহে, ওগো পুরাতন ?
তুমি সাক্ষী মোর কোরোনা আর,—
বলিতে যা চাহ বলিও তারে।

(৬)

নূতনের মাঝে তব দরশন,
কে বলিবে ওগো তুমি পুরাতন ?

সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতনী *

অধ্যাপক শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত এম-এ,

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে ১২৭২ সালের (ইং ১৮৬৫-৬৬) "সংবাদ প্রভাকর" পত্রের এক ফাইল আছে কিন্তু উহাতে অনেক সংখ্যা নাই। বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, "এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রিটের মধ্যে ৫৪নং ভবনে শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।"

৩রা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসের এক সুদীর্ঘ সমালোচনা বাহির হয়। উক্ত প্রসঙ্গে "সংবাদ প্রভাকর" বলেন :—

"বাঙ্গালা ভাষা সম্পন্না না দরিদ্রা? এই প্রশ্নের উত্তর দান আজকাল অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কে এই কাঠিন্য উৎপাদন করিলেন? বিদেশীয়েরা না বাঙ্গালীরা? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তাদৃশ কঠিন নহে, বস্তুতঃ অতিশয় সহজ। বাঙ্গালীরা আপনারাই আপনাদিগের ভাষাকে অসম্পন্না দেখিতেছেন এবং আপনারাই তদ্দ্বারা কোন প্রকার অভীষ্ট লাভ করা দুরূহ ভাবিয়া কাতর হইতেছেন। কিন্তু রত্নাকর সদৃশ সংস্কৃত ভাষা যাহার জননী, তাহার প্রতি এরূপ দোষারোপ করা অসহ্য শোচনীয় সন্দেহ নাই।

* * *

অদ্য আমরা যে একখানি নূতন গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহা উপলক্ষ করিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে···ইহার নাম দুর্গেশনন্দিনী। এখানি ইতিহাসমূলক উপাখ্যান। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, এই পুস্তকের প্রণয়ন কর্ত্তা। গ্রন্থকারের প্রণয়োপহার স্বরূপ আমরা সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদের সহিত এই পুস্তকখানি গ্রহণ করিলাম। দুর্গেশনন্দিনীর এক এক পৃষ্ঠা করিয়া পাঠ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে আমরা ইহার আদ্যোপান্ত সমাপ্ত করিয়াছি। পাঠকালে অন্তঃকরণে কিরূপ অপরিসীম আনন্দের উদয় হইয়াছিল, পাঠকগণ স্বয়ং পাঠ করিয়া না দেখিলে সে আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন না।

* * *

বাঙ্গালা ভাষায় নূতন উপাখ্যান এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই, দুর্গেশনন্দিনী-গ্রন্থকার বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদিও স্বপ্রণীত পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে ইংরাজী ভাব সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তথাপি যখন ইহা অনুবাদিত পুস্তক নহে, তখন ইহা অবশ্যই নূতন।

পাঠকগণ যেন এরূপ মনে না করেন যে, আমরা ইংরাজী উপাখ্যান সমুদয়ের সহিত দুর্গেশনন্দিনীর উৎকর্ষের তুলনা করিতেছি। ইংরাজীতে যেরূপ উত্তম২ উপাখ্যান আছে, বাঙ্গালা ভাষায় সেরূপ নাই, এই নিমিত্ত আমরা এই উৎকৃষ্ট ও প্রথম বাঙ্গালা উপাখ্যানকে গৌরবস্থানীয় করিলাম। বাস্তবিক বঙ্কিম বাবু এই পুস্তকে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালার প্রথম উপাখ্যানকার (First Novelist) উপাধির অধিকারী হইয়াছেন। আমাদিগের দেশে যে সকল উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, তৎ সমুদয়ই প্রায় অদ্ভুত ও অনৈসর্গিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। দুর্গেশনন্দিনী সর্ব্বাংশে সেই বিতৃষ্ণাকর দোষে পরিবর্জ্জিতা। বিশেষতঃ ইতিবৃত্তের সহিত ইহার সংস্রব থাকাতে আরো একটী মনোহর শোভা হইয়াছে।"

উক্ত বৎসরের ৩১শে বৈশাখের (ইং ১২ মে, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে "বারুইপুর পরিদর্শন" মন্তব্যে লিখিত হয় "মেং ডিকটর বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, বঙ্কিম বাবু দারোগাগিরি হইতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটীতে উন্নত হন নাই।" মন্তব্য কোন ডাকাইতি মোকর্দ্দমায় মিথ্যা পীড়নের

* ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে রক্ষিত ১২৭২ বঙ্গাব্দের "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকার ফাইল অবলম্বনে লিখিত। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য ধন্যবাদভাজন।

দায়ে অভিযুক্ত একজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে বঙ্কিমচন্দ্র শাস্তি দিলে লিখিত হয়। ২৭শে ভাদ্রের (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে সম্পাদকীয় স্তম্ভে পাইকহাটী পরগণার ১৪জন সারগ্রাহী যুবক ও চাকড়িপোতা নিবাসী শ্রীযুক্ত সীতানাথ বসু বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" পাঠে যে নিদর্শন সংবাদ প্রভাকরের নিকট প্রেরণ করেন তাহা প্রকাশিত হয়। এই অভিনন্দন পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হয় :—

"হে! দেশহিতৈষী মহাত্মন্। আপনি স্বদেশের একটী মহান্ উপকার সাধন করিলেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গদেশ আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলেন। আমরা জন্মাবধি এদেশীয় মাতৃভাষাপ্রিয় পণ্ডিতগণের সুকোমল হস্ত হইতে যদিও অনুবাদলতার মধুর ফল আস্বাদন করিয়া আসিতেছি, তথাপি আপনি এক্ষণে আমাদিগকে নব-পল্লবিত অক্ষয় বৃক্ষের অমৃত ফলের রসাস্বাদন করাইলেন। দুর্গেশনন্দিনী আমাদিগকে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নব নব আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের স্বদেশীয় ভাষা সংস্কারকগণ যদি আপনার অনুকরণ করিতে যত্নশীল হন, বঙ্গদেশ অপরিসীম উপকার প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। আপনি যথার্থই এক্ষণে অভিনব আদর্শস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।"

১৮ই কার্ত্তিক, ১২৭২ (২ নবেম্বর, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরের প্রেরিত পত্রের মধ্যে দুই জন মহিলা বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর বিশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন। কলিকাতা হইতে শ্রীমতী পঞ্চাননী দেবী লেখেন, "আমি কোন গুরুর নিকটে শিক্ষা পাই নাই, তথাচ দুর্গেশনন্দিনী আমার উত্তম শিক্ষা পুস্তক হইয়াছে।" ভবানীপুর হইতে শ্রীমতী হরসুন্দরী দাসী লেখেন, "এমন উত্তম রচনা আমার চক্ষে আর পড়ে নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে এইরূপ প্রশংসা লাভ বিশেষতঃ পাঠিকামণ্ডলী হইতে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

৯ই বৈশাখের (ইং ২০ এপ্রিল, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর বলিতেছেন যে ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস নামক ইংরাজী প্রাত্যহিক পত্র গত আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহার অন্যূন দুই সহস্র গ্রাহক হইয়াছে। ১৪ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল, ১৮৬৫) শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত "কাকভুষণ্ডীর কাহিনী" নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে সংবাদ প্রভাকর লেখেন, "পুস্তকখানি নির্দ্দোষ না হইলেও নিতান্ত কদর্য্য হয় নাই।" গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে "দেশের অবস্থা ও আচারব্যবহার সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত মূলক উপন্যাস"-রূপে পরিচয় দিয়াছেন। ইহার রচনাপ্রণালী "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"র ভাষার অনুকরণ।

তখনকার বাংলা সংবাদপত্রসেবীদের মধ্যে যে একতা ছিল না তাহার প্রমাণ সংবাদ প্রভাকরে পাওয়া যায়। ২৬শে বৈশাখ (৪ মে, ১৮৬৫) "চন্দ্রিকা সম্পাদকের মতিচ্ছন্ন" প্রসঙ্গে এই পত্রিকা লিখিতেছেন :

"চন্দ্রিকা সম্পাদকের ইংরাজী বর্ণপরিচয় আছে কিনা, তাহা সাধারণে জানিবার নিমিত্ত চাতকের ন্যায় ঊর্দ্ধকণ্ঠ হইয়া থাকেন নাই, তবে তিনি কি জন্য আপনার সৌজন্য ও পারদর্শিতা দেখাইতে শশকের ন্যায় স্বতঃ প্রধাবিত হন? "ইলেম বাজ" অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতে কি তাঁহার উন্নত মস্তক অবনত হয়। আমরা পুনঃ পুনঃ তাঁহার ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছি, অদ্য অত্যন্ত দুঃখে তাঁহাকে সতর্ক করিতে হইল।.....এই সকল বরপুত্র বীরপুরুষগণের হস্তে পড়িয়াই বাঙ্গালা সংবাদপত্র সকল সাধারণের নিকটে এত অশ্রদ্ধাস্পদ হইতেছে।"

২২শে জ্যৈষ্ঠের (৩ জুন, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ কলিকাতা পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ব্রাম্সন সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া বিচারালয়ে আসিতে অশক্ত হওয়ায় অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার কার্য্য করিতেছেন এবং ব্রাম্সন সাহেবের নিয়োগের পূর্ব্বে সিংহ মহাশয় ঐ পদে কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। ২৪ জ্যৈষ্ঠের (৫ জুন ১৮৬৫) কাগজে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত "জয়দ্রথ নাটক" সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়, "জয়দ্রথ নাটকে বটতলার প্রসাদচিহ্ন লক্ষিত হয় না। এতৎ পাঠে নাটকের প্রকৃত মধুর রস আস্বাদন করা যায়। ফলতঃ বাঙ্গালা কাব্য, সাহিত্য ও নাটকের উন্নতিকল্পে হরিশ বাবুর বিশেষ উৎসাহ আছে। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। জয়দ্রথ নাটক ঢাকার

সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত।" ২৩শে আষাঢ় (৬ জুলাই ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে অনুবাদিত ভাস্করাচার্য্যের "লীলাবতী" গণিতের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন, "অনেক যুবককে এখনো খেঁউড় ও কুৎসিত নাটক প্রভৃতি লিখিয়া বটতলার শোভা সম্পাদন করিতে অধিক আগ্রহবান দেখা যায়, তাঁহারা যদি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, বাঙ্গালা দেশ অনেক পরিমাণে কৃতার্থম্মন্যা হন।" উক্ত সংখ্যায় আরো প্রকাশ—যে ব্যক্তি আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় নাটকাকারে সুরাপানের ফল বিষয়ক পুস্তক লিখিতে পারিবেন, বাবু প্যারীচরণ সরকার তাঁহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার দিবেন। (১)

১৩ই শ্রাবণের (২৭ জুলাই ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত কোন পত্রপ্রেরকের বিবরণে জানা যায় যে শোভাবাজারস্থ রাজভবনে সম্প্রতি একটী অভিনয় সভা স্থাপিতা হইয়াছে। ৪ঠা শ্রাবণ রজনীযোগে সভার ব্যবস্থাক্রমে শ্রীযুক্ত রাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত "একেই কি বলে সভ্যতা?" প্রহসনের প্রথমবার অভিনয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। ২০শে শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর "নাট্যাভিনয়" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উক্ত অভিনয় সম্পর্কে লেখেন :

"কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রস্তাবিত প্রহসন মধ্যে যেরূপ নিপুণতা ও ব্যবহার ভাবুকতা গুণের পরিচয় দিয়াছেন, অভিনয়কর্ত্তাগণ কোন অংশেই তাঁহার হৃদ্গত ভাব প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। যে সকল ব্যক্তির সমক্ষে অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ন্যায় স্বভাবের লোক থাকেন, তাঁহারাও স্ব স্ব গোপনীয় ক্রীড়ার প্রকাশ্য অভিনয় দর্শনে লজ্জিত ও হর্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমরা কায়মনবাক্যে অভিনয় কর্ত্তাগণকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। বাঙ্গালা দেশ যাঁহাদিগের প্রযত্নে পূর্ণ সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা সাধু সমাজের মহামূল্য রত্ন বলিয়া পুনঃ পুনঃ অভিহিত হইবেন, এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয়াভাব।" (২)

[অভিনয়স্থলে বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি এক শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন]

১৮ই শ্রাবণ (১ আগষ্ট ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুবাদিত পুরাণ সংগ্রহের পঞ্চদশ খণ্ড প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন। উহার পরবর্ত্তী দিবস হইতে কয়েক দিন উক্ত পুরাণ সংগ্রহের প্রধান বিতরিতা শ্রীরাধানাথ বিদ্যারত্ন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন সংবাদ প্রভাকরে বাহির হয়। ২৪ শ্রাবণ (৭ আগষ্ট ১৮৬৫) "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রাবলম্বনে সংবাদ প্রভাকর লিখিতেছেন যে বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অযোধ্যার তালুকদারগণের স্বত্ব স্থাপনার্থ ইংলণ্ড গমনের অভিলাষ করিয়াছেন। ঐ দিনই প্রকাশ যে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকজন ব্রাহ্মের মতানুযায়ী নিয়ম প্রবর্ত্তনে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসম্মত হওয়ায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার নিকট নূতন সমাজ স্থাপনের উপদেশ চাহিয়াছিলেন এবং আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ লেখেন—দেশের মধ্যে যত অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল।

৩১শে শ্রাবণ (১৪ই আগষ্ট, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর লিখিতেছেন, "আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠকগণকে অবগত করিতেছি যে, যিনি ১৮৬৬ অব্দের ১লা জুনের মধ্যে হিন্দুমহিলাগণের বর্ত্তমান অবস্থা উৎকৃষ্ট নাটকাকারে লিখিয়া জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় প্রেরণ করিতে পারিবেন, তিনি ২০০ টাকা পারিতোষিক পাইবেন এবং ঐ সালের ১লা ফেব্রুয়ারির মধ্যে যিনি জমিদারগণের আচার ব্যবহার ঐরূপ নাটকের প্রণালীতে লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবেক। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র পুস্তক পরীক্ষা করিবেন।" (৩)

(১) ১৩ কার্ত্তিক (২৮ অক্টোবর ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর 'কলিকাতা সুরা নিবারণী" সভা শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।

(২) "ডেলী নিউজ" পত্রে একজন পত্রপ্রেরক প্রশ্ন করেন, "শোভাবাজারের নাট্যশালায় একেই কি বলে সভ্যতা? অভিনয়ন দ্বারা কি ফল হইল?"—সংবাদ প্রভাকর, ৩১শে শ্রাবণ, ১২৭২।

(৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৮, শ্রীযুত

৬ই আশ্বিন (২১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় স্তম্ভে "খেম্‌টার নাচ, যাত্রা এবং ওস্তাদী কবি" এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত হয়। উক্ত তিন প্রকার আমোদ প্রমোদের সমালোচনা প্রসঙ্গে সংবাদ প্রভাকর মন্তব্য প্রকাশ করেন :

"পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবিধ নৃত্য গীতে বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় হয়, বাঙ্গালা দেশ যদি অন্য কোন অধ্যবসায় সম্পন্ন জাতির জন্মভূমি হইত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা এতদিনে জগত্তৃপ্তিকর সঙ্গীতশাস্ত্রের উন্নতি হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, অদ্য এ বিষয়ে আর অধিক বাক্য ব্যয় করিবার প্রয়োজন রাখে না। উপসংহার স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, সঙ্গীতের তুল্য মনোরঞ্জন বিষয়ে বাঙ্গালীরা যতদিন নাটকাভিনয়রূপ বিশুদ্ধ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিতেছেন, ততদিন বরং নির্দ্দোষ যাত্রা কবি প্রচলিত থাকুক, কিন্তু জঘন্য খেম্‌টা নাচকে দেশত্যাগী করা আশু কর্ত্তব্য হইয়াছে। এই মহান্ অনিষ্টকর প্রথা এদেশের অধঃপতন সাধনের প্রধান যন্ত্র স্বরূপ।"

২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর ১৮৬৫) যোড়াসাঁকোস্থ সিংহবংশীয় বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের পরলোকগমনে প্রভাকর শোক প্রকাশ করেন। (৪) ১০ই কার্ত্তিক (২৫ অক্টোবর ১৮৬৫) "গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক নির্ব্বাচন" প্রসঙ্গে সংবাদ প্রভাকরে লিখিত হয় :

"বাবু রাজেন্দ্রলাল একজন যোগ্য পাত্র বটেন, তথাপি তাঁহার অবলম্বিত বাঙ্গালা ভাষাটী সর্ব্বজন হৃদয়গ্রাহিণী নহে। তাহার স্থানে২ শ্রীরামপুরী বাঙ্গালার গন্ধ অনুভূত হয়। আমাদিগের মতে একমাত্র বিদ্যাসাগরই ঐ পদের অদ্বিতীয় অধিকারী। উপসংহার স্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের অনুবাদ যথেষ্ট হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট অনুবাদক অসম্ভব সংক্ষিপ্ত উদারতা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনুবাদ বিভাগ যদি সংশোধিত হয়, সেই সময়ে যেন, আমাদিগের এই আক্ষেপের কারণটী অবিলুপ্ত না থাকে।" (৫)

১৭ই কার্ত্তিকের (১ নবেম্বর ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র বাবু জ্ঞানেন্দ্র-মোহন ঠাকুর শীঘ্রই বিলাত হইতে কলিকাতা পৌঁছিবেন এবং হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী কর্ম্ম করিবেন। (৬) ১৯শে কার্ত্তিক (৩ নবেম্বর ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর লিখিতেছেন :

"সোমপ্রকাশের ন্যায় ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদকের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ঢাকাপ্রকাশ এতদিন শ্রীযুক্ত গোবিন্দ প্রসাদ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছিল, এক্ষণ অবধি প্রসন্নকুমার ভৌমিক কর্ত্তৃক প্রচারিত হইবে। এবং শুক্রবারের পরিবর্ত্তে রবিবার প্রকাশের নিয়ম হইয়াছে। আজিকাল সম্পাদকদিগের নাম পরিবর্ত্তন একটী অভ্যাস হইয়া উঠিল। এখন আর সাধ্যপক্ষে কেহ আপনার উপর ঝোঁক রাখিতে চাহেন না। এ উপায় মন্দ নয়!"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সংবাদ প্রভাকরের কয়েকটী মন্তব্য পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ২৬ কার্ত্তিক (৯ই নবেম্বর ১৮৬৫) এই পত্রিকা লেখেন :

"সৌভাগ্যক্রমে বারুইপুরের এলাকাবাসিগণ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পাইয়াছেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে আমাদিগের যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানাস্পদ, বিচার বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের এবং প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসাভাজন। ইনি চতুর্ব্বিধ কার্য্য করেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কালেক্টর, দলীলের রেজিষ্ট্রার ও ট্যাক্সের সংগ্রহাধ্যক্ষ।............ ....বাবু বঙ্কিমচন্দ্র অভিমানের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যথা-যোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বোধ না করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচার-কার্য্য সম্পাদন করেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বারুইপুরে

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "জোড়াসাঁকো নাট্যশালা" প্রবন্ধে "ইণ্ডিয়ান মিররের" বিজ্ঞাপনের সহিত "সংবাদ প্রভাকরে"র কিছু প্রভেদ আছে।

(৪) ২২শে চৈত্র (৩রা এপ্রিল ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকরে তাঁহার বিষয় বিভবাদির কর্ত্তৃত্বকরণের বিজ্ঞাপন বাহির হয়।

(৫) হিন্দু পেট্রিয়ট পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই দুই জনের নাম প্রধান অনুবাদকের পদের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

(৬) ২২ কার্ত্তিক (৬ নবেম্বর) প্রকাশ যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

যে রাসযাত্রা হয়, তাহাতে অসম্ভব জনতার মধ্যস্থলে তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া শান্তিস্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ের তদন্ত করিয়াছেন। স্বকার্য্য বিষয়িনী কর্ত্তব্যতা পক্ষেও ইঁহার নিকটে অনেক বিচারক পরাস্ত হন।............... অতএব বঙ্কিমবাবু সকল বিষয়েই প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র।"

২রা অগ্রহায়ণ (১৬ নবেম্বর ১৮৬৫) "হিন্দু নাট্যাভিনয়" প্রসঙ্গে "সংবাদ প্রভাকর" লিখিতেছেন :

"সভ্যতা মানব জীবনের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। এক সময়ে ইহার উন্নতি ও এক সময়ে অবনতি হয়, পৃথিবীর গতিই এই। আজকাল ভারতবর্ষে শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীত প্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তৎ প্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা এদেশের পক্ষে শ্লাঘনীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই। গত জগদ্ধাত্রী পূজার সময় বহুবাজারের মৃত বাবু বিশ্বনাথ মতিলালের বাটীতে সাবিত্রী সত্যবান নাটকের গীতাভিনয় হইয়াছিল। গত মঙ্গলবার কার্ত্তিক পূজার রজনীতে উক্ত বহুবাজারের বাবু রাজেন্দ্র দত্তের বাটীতে মাইকেল মধুসূদন প্রণীত পদ্মাবতী নাটকের গীতাভিনয় হইয়াছে। শুদ্ধ যবনিকা অবলম্বন করিয়া ইহার অভিনয় হয়। নট, নটী, বিদূষক ও নায়ক নায়িকাগণ দর্শকবৃন্দের সর্ব্ববিষয়ে মনোরঞ্জন করিয়াছেন। দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইলে জগদ্বিখ্যাতক সঙ্গীতবিদ্যার নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু কালী-প্রসন্ন সিংহ, বাবু হীরালাল শীল, বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক, ও মৌলবী আবদুল লতিফ প্রভৃতি বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক অভিনয় স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

...একটী দুঃখের বিষয় এই, গৃহমধ্যে বহু জনতা ও স্থান সঙ্কীর্ণ হওয়াতে বাটীর বহির্ভাগ হইতে অনেক ভদ্রলোককে হতাশ হইতে হইয়াছে। সচরাচর বহু সমারোহস্থলে সার্জ্জনেরা যেরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে, উপস্থিত স্থলেও তাহার অন্যতা হয় নাই। রাজেন্দ্র বাবু যদি টিকিটের নিয়ম করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ অসুবিধা হইত না।"

৯ই অগ্রহায়ণ (২৩ নবেম্বর ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর লিখিতেছেন :

"শুনা গেল, আগামী শনিবার বহুবাজারের বাবু রাজেন্দ্র দত্তের বাটীতে পুনরায় পদ্মাবতী নাটকের গীতাভিনয় হইবে। ২রা অগ্রহায়ণের প্রভাকরের ইঙ্গিত অনুসারে টিকিট করা হইতেছে। আমরা ভরসা করি, নটনটী ও নায়কনায়িকাগণ যখন যবনিকাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিবেন, তখন শ্রোতাদিগের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া একটী স্বতন্ত্র বেদীতে অবস্থিত হইবেন। তাহা হইলে দর্শকগণের দর্শন করিবার অসুবিধা থাকিবে না!"

১৩ই অগ্রহায়ণ (২৭ নবেম্বর ১৮৬৫) "পদ্মাবতী গীতাভিনয় পুনর্ব্বার" শীর্ষক প্রসঙ্গে প্রভাকরে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল :

"অনুষ্ঠান দেখিয়া বোধ হইতেছে, এদেশের যাত্রাগুলির প্রাণবায়ুস্বরূপ কালুয়া ভুলুয়া ও ভিস্তি মেথ্রাণীদিগের অন্ন লোপ হইল। আমাদিগের বহুকালের পরিচিত দূতী, কয়াধু, যশোদা ও মালিনী গোয়ালিনীরা শীঘ্র বাঙ্গালী সমাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবেন। চিরাকাঙ্ক্ষিত নাট্যাভিনয়ের মধুর ফল আজকাল অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। যাঁহারা গীতাভিনয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম আরম্ভ অপেক্ষা দিন দিন অধিকতর নিপুণতার সহিত দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

ঐ সংখ্যা সংবাদ প্রভাকরে একজন দর্শকের পত্রে প্রকাশ যে ১১ই অগ্রহায়ণ শনিবার রাত্রে শোভাবাজারের রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে সাবিত্রী সত্যবান নাটকের নূতন যাত্রা হইয়া গিয়াছে। ৫ই পৌষের (১৯ ডিসেম্বর ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে উল্লেখ আছে শনিবার (২রা পৌষ) তালতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামধন ঘোষের বাটীতে পদ্মাবতী নাটকের গীতাভিনয় হইয়া গিয়াছে। "শুনা গেল, অভিনেতৃগণ ইতিপূর্ব্বে দুই রাত্রি বহুবাজারের দত্তবাবুদিগের ভবনে যেরূপ

নাট্যাভিনয়ের প্রয়োজন করিয়াছিলেন. রামজন বাবুর বাটীতেও সেইরূপ মনোহারকর অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন।"

২০ পৌষ (৩ জানুয়ারী, ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ যে রেওয়ার মহারাজের কলিকাতা আগমনোপলক্ষে বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বীয় ভবনে বিদ্যাসুন্দর নাটকাভিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ৩রা ফাল্গুন মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ :

"গত শনিবার রজনীযোগে পাতুরিয়া ঘাটা নিবাসী যশোধর্ম্মরাশি দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে বঙ্গনাট্যালয়ে বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম বসু দ্বারা অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।"

১০ই ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত *"সন্ন্যাসী"* নামক রূপক কাব্যের *সমালোচনা* প্রকাশ করেন। ১৪ই ফাল্গুনের (২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ যে মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের জীবনচরিত যাহা বিগত নবেম্বর মাসে মেজর ম্যালিসন বেথুন সভায় পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। "স্ত্রীলোকগণ কি বালকগণ এই পুস্তকখানি মনোযোগ সহ পাঠ করেন, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়।"

১৭ ফাল্গুন মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকর লিখিতেছেন :

"গত শনিবার যামিনীযোগে বিশুদ্ধস্বভাব ধনিবর শ্রীযুত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহা সন্দর্শনার্থ শোভাবাজারীয় রাজপরিবার, ঠাকুরবংশীয়গণ ও অন্যান্য অতি সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা গমন করাতে তাঁহার বিচিত্র হাল বহু ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, নাট্যশালা বিবিধ বর্ণের পতাকার দ্বারা খচিত ও অতি উজ্জ্বল আলোকমালায় শোভিত হইয়াছিল, নাটকের মধ্যে মধ্যে বাদ্যকরেরা সুমধুর স্বরে নানাবিধ বাদ্যোদ্যম করিয়া সভাস্থ সকলকে পুলকিত করিয়াছিলেন, বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় যেপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র অঙ্গহীন হয় নাই, নট ও নটীগণ উপযুক্ত পরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া উপযুক্ত বক্তৃতা এবং গান দ্বারা সকলকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে নাটকাভিনয় প্রদর্শন বিষয়ে নগরীয় ধনাঢ্য লোকদিগের যেরূপ অনুরাগ ছিল, এইক্ষণে তাহার অধিকাংশ প্রায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, পাইক পাড়ার রাজভবন ও যুগল সেতুর সিংহ বাবুদিগের ভবনের নাট্য মন্দির বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যেহেতু বহুদিবস হইল তথায় নাটকাভিনয় প্রদর্শিত হয় নাই, এইক্ষণে কেবল বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে নাট্য-ক্রীড়ার আমোদপ্রমোদ হইতেছে, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তদনুজ বাবু সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় এই অতি কর্ত্তব্য বিষয়ে যথোচিত অনুরাগ এবং প্রযত্ন প্রকাশ করিতেছেন, আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহাদিগের এই অনুরাগ কিছুকাল স্থায়িনী হইয়া বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল করুক।" (১)

১৬ই চৈত্র (২৮ মার্চ্চ, ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ যে গত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে গীত বাদ্যের আমোদপ্রমোদ হইয়াছিল, শোভাবাজারীয় নাট্যশালার সভ্যগণ তাহাতে নিযুক্ত হইয়া সভাস্থ মহাশয়দিগকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও লেডী বিডন ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

২৬ চৈত্র (৭ এপ্রিল, ১৮৬৬) শ্রীমতী সৌদামিনী সিংহ কর্ত্তৃক সংগৃহীত "নারী চরিত" নামক নূতন গ্রন্থের সমালোচন প্রসঙ্গে "সংবাদ প্রভাকর" লেখেন :

"এই অভিনব গ্রন্থখানি শ্রীমতী সৌদামিনী কর্ত্তৃক

---

(১) ২৭শে ফাল্গুন (৯ মার্চ্চ, ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিরচিত বিদ্যাসুন্দরাপেক্ষা এই বিদ্যাসুন্দর নাটকাভিনয় অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। "বিশেষতঃ নাটকাচ্ছলে লিখিত হওয়াতে অভিনয় প্রদর্শন সময়ে ভাব রস তাৎপর্য্য ইত্যাদি প্রকাশের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।······এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের দ্বারা মূল সংস্কৃত হইতে যে২ নাটক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, বিদ্যাসুন্দর নাটক তাহার অনেকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট হইয়াছে।"

সংগৃহীত হইয়া সাধারণ সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। ইনি কলিকাতা ফিমেল নর্ম্মাল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্বা ছাত্রী, এবং কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাদাত্রী। ভারতবর্ষের পরম বন্ধু ও এতদ্দেশীয় সাহিত্যের উৎসাহদাতা শ্রীল শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড জেম্‌স লং সাহেব মহোদয়কে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রণেত্রীর উদ্দেশ্য অতি উৎকৃষ্ট। তিনি বঙ্গবিদ্যার্থিনী বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী হইবার আশয়ে ইহা ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় সংগ্রহ করিয়াছেন। স্বদেশীয় সহৃদয় মহোদয়দিগের প্রযত্নে সৌদামিনীর সদভিপ্রায় শীঘ্রই সুসিদ্ধ হইবেক, সন্দেহ নাই।"

এই সকল প্রসঙ্গ ব্যতীত "সংবাদ প্রভাকরে" অন্যান্য সাময়িক নানা প্রকার বিষয়ে সম্পাদকীয় মতামত প্রকাশিত হয়। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত সন্দর্ভ কয়েকটী উল্লেখযোগ্য :—

২রা বৈশাখ—সার চার্লস ট্রিবিলিয়ানকে অভিনন্দন পত্র দান।

২৫শে বৈশাখ—গোহত্যাকারীর দণ্ড হওয়া উচিত কি না?

৩০শে বৈশাখ—নূতন পুলিসের অভিসার।

৬ই জ্যৈষ্ঠ—ফুলদোল (নৈতিক অবনতির সমালোচনা)।

৮ই জ্যৈষ্ঠ—কালীঘাট ও ইহার উন্নতি।

১২ই জ্যৈষ্ঠ—বালিকা বিক্রয় ও গবর্ণর জেনেরেল।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ—নীলপ্রধান দেশে অগ্ন্যুৎপাত।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ—নীলপ্রধান প্রদেশের বিচার প্রণালী।

২১শে জ্যৈষ্ঠ—বিনা অত্যাচারে নীল জন্মিবে না কেন?

২৪শে জ্যৈষ্ঠ—শান্তি না সংগ্রাম? (সভাপতি লিঙ্কনের মৃত্যুর পরে)

২৬শে জ্যৈষ্ঠ - নীল পুনর্ব্বার।

ঐ লিঙ্কনের জীবনবৃত্তান্ত।

৩রা আষাঢ়—হাতুড়ে ডাক্তার।

৪ঠা আষাঢ়—নীলকর সাহেব ও ছোট আদালত।

১৪ই আষাঢ়—বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালীগণ।

২৩শে আষাঢ়—সামাজিক উন্নতি (প্রাপ্ত)।

২৪শে আষাঢ়— ঐ (")।

২৫শে আষাঢ়—ভারতবর্ষের বিচারালয়ের দুর্ভাগ্য।

১০ই শ্রাবণ—কলিকাতার স্বাস্থ্য রক্ষা।

১৫ই শ্রাবণ—বাঙ্গালা দেশের মফস্বল।

২৬শে শ্রাবণ—সুরাপানের চরম ফল।

২রা ভাদ্র—মফস্বলের দুরবস্থা।

১৭ই ভাদ্র—কলিকাতায় ধাত্রীদিগের দৌরাত্ম্য।

২৯শে ভাদ্র—কলিকাতা পুলিসের দুর্নাম।

২৮শে আশ্বিন—হিন্দুদিগের অলস প্রতিপালন।

২রা কার্ত্তিক—কয়েদী পরিচ্ছদ।

৪ঠা কার্ত্তিক—পুলিস প্রপীড়ন। (৮)

১১ই কার্ত্তিক—বাঙ্গালীরা এত অপদার্থ কেন?

১৩ই কার্ত্তিক—কলিকাতা সুরাপান নিবারণী সভা।

৩রা অগ্রহায়ণ—চা-করের দৌরাত্ম্য ও কলিকাতা পুলিস।

৯ই অগ্রহায়ণ—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রগণ কোন কার্য্যে লাগিবেন?

১০ই অগ্রহায়ণ—কৃতবিদ্য যুবকদিগের নিদ্রা ও তাঁহাদিগের জাগ্রতাভিমান।

১১ই অগ্রহায়ণ—আমাদিগের রমণীগণকে কতদূর স্বাধীনতা দেওয়া উচিত?

২রা পৌষ—অস্মদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের অবস্থা।

১৮ই মাঘ—শারীরিক দণ্ড বিধান।

২৮শে চৈত্র—চড়কপূজা ও বাণফোঁড়া ইত্যাদি।

সংবাদ প্রভাকরে সাময়িক পত্রের উল্লেখ

২৭শে বৈশাখ (৮ মে, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে "সত্যান্বেষণ" পত্রের উল্লেখ আছে। ২৯শে বৈশাখ (১০ মে, ১৮৬৫) "বাঙ্গালা ভাষা ও বিজ্ঞাপনী সম্পাদক" নামে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঢাকা হইতে এই পত্রিকা বাহির হইত। ১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে, ১৮৬৫) রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশের নাম পাওয়া যায়। ২৪ জ্যৈষ্ঠ (৫ জুন, ১৮৬৫) আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটী দেখিতে পাই :

(৮) দারোগাদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে ইহার বহু বৎসর ১ আষাঢ় ১২৩৭ (১৪ জুন, ১৮৩০) "সমাচার চন্দ্রিকা"র এক পত্র প্রকাশিত হয়।

"রাজনীতি সংগ্রহ। এখানি সাপ্তাহিক সমাচার পত্র। ভবানীপুর চড়কডাঙ্গা অপূর্ব্ব রত্নোদয় নামক অভিনব যন্ত্র হইতে বৈশাখ মাসের প্রথম সোমবার অবধি ইহা প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীযুত বাবু রামগোপাল বসু মল্লিক ইহার অধ্যক্ষ ও সম্পাদক। আমরা ইহার ৪র্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১।২।৩।৫ এই ৪ খণ্ড প্রাপ্ত হই নাই। কলিকাতা নগরে রাজনীতিমূলক একখানি সংবাদ পত্রের অভাব ছিল। রাজনীতি সংগ্রহের নাম শুনিয়া ও ইহার আরম্ভ দেখিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম, এতদ্দ্বারা সেই অভাবের পরিপূরণ হইবে। কিন্তু আশানুরূপ ফল দৃষ্ট হইতেছে না।"

এই সাময়িক পত্রিকা দুই মাসের বেশী স্থায়ী হয় নাই। সংবাদ প্রভাকর (২৬শে শ্রাবণ, ইং ৯ আগষ্ট ১৮৬৫) পাঠে তাহা বুঝা যায়। মহারাণী স্বর্ণময়ী ইহার স্থায়িত্বের জন্য ১০০৲ টাকা সাহায্য দান করিয়াছিলেন।

১৫ই আষাঢ় (২৮ জুন ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর "ধর্ম্ম প্রচারিণী" নামক মাসিক পত্রিকার প্রথমাবধি দশ সংখ্যার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু রাজেন্দ্রনাথ গুহ ইহার সম্পাদক। প্রভাকর বলেন, "এতদ্দ্বারা ধর্ম্মানুরাগী ও ধর্ম্মান্বেষী ব্যক্তিগণের সবিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবে। মুদিয়ালী মিত্র যন্ত্রে মুদ্রিত।"

২রা কার্ত্তিক (১৭ অক্টোবর ১৮৬৫) জনৈক পত্র প্রেরক সংবাদ প্রভাকর সম্পাদককে লিখিতেছেন: "মহাশয়! নয় মাস অতীত হইয়া গেল, কলিকাতা রাজধানীর পূর্ব্ব প্রান্ত ভাগে "সত্যান্বেষণ" নামে একখানি ধর্ম্ম সংক্রান্ত উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। সত্যান্বেষণ যে চক্ষে সত্য অন্বেষণ করিতেছেন, তাহা আমাদিগের যথেষ্ট বোধ হইতেছে না। চক্ষুগুলি কিছু দীর্ঘায়তন না হইলে সকল পদার্থ দর্শন করা দুরূহ। অনুবীক্ষণ লইয়া দর্শন করা নয় মাসের শিশুর পক্ষে সহজ কথা নহে। অতএব সত্যান্বেষণের জন্মদাতৃগণকে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা কিঞ্চিৎ স্নেহবান্ হইয়া চক্ষুগুলি আর কিছু বাড়াইয়া দিন। তাঁহারা সত্যান্বেষণের শিরোনামটী কোথায় পাইয়াছেন? সেই স্থানের কারিকরেরা কি সমুদয় চক্ষুগুলি সেইরূপ উজ্জ্বল করিয়া দিতে পারেন না?

শ্রীনব্বুই বছরে জন্মান্ধ।

সাং গোবর্দ্ধনগঞ্জ।"

সংবাদপত্র সম্পর্কে ২৬শে কার্ত্তিক (১০ নবেম্বর ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর "ঢাকা প্রকাশ" হইতে উদ্ধৃত প্রসঙ্গে বলেন যে ১১ই কার্ত্তিকের "বিজ্ঞাপনী"তে তৎ সম্পাদক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের স্বপক্ষে কিঞ্চিৎ লিখিলে হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভার কোন সভ্যের নির্দ্দেশানুসারে বিজ্ঞাপনীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রায় সম্পাদককে ভবিষ্যতে ঐরূপ লিখিতে নিষেধ করেন। স্বাধীন চিত্ত সম্পাদক তাহাতে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন এবং পূর্ব্ববৎ স্বাধীনতা তাঁহাকে দেওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২৪ ফালগুন (৬ই মার্চ্চ ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ যে "চিকিৎসক" নামে একখানি নূতন সাময়িক পত্র প্রকাশ হইয়াছে। আহিরীটোলায় চিকিৎসক সভার অধীনে আপাততঃ এই পত্রখানি সংখ্যাক্রমে প্রকাশিত হইবেক। চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় বঙ্গভাষায় সঙ্কলন ও অনুবাদ কিম্বা রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইবে। চিকিৎসক সভার কর্ম্মাধ্যক্ষগণ শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরসিকলাল দাস, শ্রীক্ষেত্রগোপাল লাহা ও শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত অনুষ্ঠান পত্রে লিখিতেছেন:—

"বঙ্গভাষায় চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকার গুরুতর অসদ্ভাব দর্শনে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া এই অসদ্ভাব সাধ্যানুসারে সংপূরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। ভরসা করি, আমাদিগের দেশের যাবতীয় চিকিৎসক সংপ্রদায় আমাদিগকে, এই মহদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য বিবিধ প্রকারে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য দান করিবেন।"

২৮শে ফাল্গুন (১০ মার্চ্চ ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় স্তম্ভে "সর্ব্বার্থসংগ্রহ" নামক মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা বাহির হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতি ও শিল্পশাস্ত্রবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধাত্মক এই মাসিকপত্রের সম্পাদকীয় উক্তিতে লিখিত হয়।

"বিলাতে লিজের আওয়ার কি কাসেলস্ ফেমেলি পেপর প্রভৃতি যে সকল পত্রিকা আছে, ইহাও প্রায় তদনুযায়ী হইবেক।·····বাঙ্গালা ভাষায় আমাদিগের এদেশে এপ্রকার পত্র নাই, বোধ হয়, এ সংগ্রহ অনেকের মনোরম্য হইতে পারে।" "সর্ব্বার্থসংগ্রহ" পত্রিকার প্রথম সংখ্যা চোরবাগান সকুল বুক প্রেসে মুদ্রিত।

৮ই বৈশাখ (১২৭২) সংবাদ প্রভাকরে বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকার নবম সংখ্যার প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়।

১৫ই পৌষ (২৯ ডিসেম্বর ১৮৬৫) "মফঃসলাইট" নামে ইংরাজী পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যের উপর সংবাদ প্রভাকরে টিপ্পনী প্রকাশিত হয়।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

যিনি সত্যসত্যই ব্রাহ্মণ ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' ছিলেন না, যাঁহার উদারতা ছিল আকাশ-তুল্য, যাঁহার মহানুভবতার সীমা ছিল না, গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই শতমুখে যাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিতেন, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, যাঁহার সুললিত, সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও গল্পে 'ভারতবর্ষ' একদিন সুশোভিত হইয়াছিল, যাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও কবিত্বশক্তির তুলনা মিলিত না, অভিমানশূন্যতা যাঁহাকে সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় করিয়াছিল, সেই ঋষিকল্প মহাপুরুষ মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাট পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের স্মৃতিতর্পণের সুযোগ পাইয়া 'ভারতবর্ষ' আজ ধন্য বোধ করিতেছে।

জন্ম

উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুর জেলায় অতি ক্ষুদ্র পল্লী ইটাকুমারী। আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও পল্লীটি গৌরবে অতুলনীয়—অনাড়ম্বর অগাধ পাণ্ডিত্যের আধার—জ্ঞানালোচনার কেন্দ্র—বঙ্গের দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এক সময়ে এই পল্লী বহু অধ্যাপক ও দেশ-বিদেশাগত বহু ছাত্রের অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের কলরবে মুখরিত হইত। এই সকল অধ্যাপক-বর্গের অগ্রগণ্য পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কারের নাম ও অধ্যাপনার খ্যাতি সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই গ্রামে পণ্ডিত রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বংশে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় যাদবেশ্বরের পিতৃশিষ্যগণ শিক্ষালাভার্থ তাঁহাকে বারাণসীধামে প্রেরণ করেন। সেখানে যাদবেশ্বর ষড়্দর্শনবেত্তা অধ্যাপক কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন এবং বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট বেদান্ত ও যোগদর্শন অধ্যয়ন করেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে শিরোমণি মহাশয়ের নিকট তিনি 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন। প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া কাশীর কুইন্স কলেজের প্রধান অধ্যাপক গ্রিফিথ্স্ সাহেব তাঁহাকে প্রতীচ্য দর্শনের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য উক্ত কলেজে আহ্বান করেন। এইরূপে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের তুলনায় সমালোচনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন।

কর্ম্মজীবনে প্রবেশ

অধ্যয়ন শেষ করিয়া যাদবেশ্বর দেশে ফিরিলেন। ফিরিয়াই রঙ্গপুরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ পাইলেন। কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইবার পর রঙ্গপুরের জমিদারেরা মিলিয়া একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় খুলেন। সেইটি পরে কলেজে উন্নীত হয়।

পূর্ব্বোক্ত স্কুলের অধ্যাপনা ছাড়িয়া যাদবেশ্বর পরে ঐ কলেজের অধ্যাপক হন। কিন্তু কলেজটি বেশীদিন টি'কে নাই। অধুনা রঙ্গপুরে যে বিখ্যাত কারমাইকেল কলেজ নামে প্রথম শ্রেণীর কলেজ রহিয়াছে, সেই কলেজের উদ্যোক্তাদিগের মধ্যে পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বরও ছিলেন, এবং তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কলেজ-কমিটির সদস্য ছিলেন।

সাহিত্যালোচনায় বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই রঙ্গপুর জেলার খ্যাতি আছে। রঙ্গপুর কুণ্ডীর জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী ছিলেন স্বয়ং কবি এবং বিদ্যোৎসাহী জমিদার। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" প্রকাশিত হইত। কবি কালীচন্দ্রের মৃত্যুর পর পত্রখানি হস্তান্তরিত ও ও নামান্তরিত হয়—কাকিনাধিপতি শম্ভুচন্দ্রের ব্যয়ে "রঙ্গপুর দিক-প্রকাশ" নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। যাদবেশ্বরের বহু প্রবন্ধে এই পত্র সুসমৃদ্ধ হইত। তদ্ব্যতীত রাজসাহীর "হিন্দু-রঞ্জিকা"তেও যাদবেশ্বর বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কাকিনারাজ শম্ভুচন্দ্র উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের অনুসরণ করিয়া "নবরত্ন সভা" গঠন করিয়াছিলেন। এই সভায় অন্যতম রত্ন ছিলেন পণ্ডিত-রাজ যাদবেশ্বরের ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার। সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ ডাক্তার স্যার গ্রীয়ারসন বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার Linguistic Survey of India নাম গ্রন্থের অন্তর্গত উত্তরবঙ্গের ভাষাতত্ত্ব রচনাকালে পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর সাহায্য করিয়াছিলেন।

রঙ্গপুরের প্রথম কলেজ উঠিয়া গেলে যাদবেশ্বর অনুরুদ্ধ হইয়াও আর কোথাও চাকুরী স্বীকার করেন নাই। তিনি চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতে অভিলাষী হইলেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের পূজনীয় পিতৃদেব কৃষ্ণধন ঘোষ (কে, ডি, ঘোষ) মহাশয় তখন রঙ্গপুরের সিবিল সার্জ্জন ছিলেন। রঙ্গপুরের সকল প্রকার জনহিতকর কর্ম্মের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। তিনি শাস্ত্রানুরাগী ছিলেন। তর্করত্ন মহাশয়ের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন। রঙ্গপুর জেলার বিদ্যোৎসাহী বদান্য জমিদার বিস্তর ছিলেন। কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় জমিদার ও রাজপুরুষদিগের অর্থ-সাহায্যে তর্করত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইল। যাদবেশ্বরের পাণ্ডিত্যে ও অধ্যাপনাগুণে সেই চতুষ্পাঠী আজিও চলিতেছে এবং রঙ্গপুরে শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। তর্করত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে দেশ-বিদেশ হইতে বহু ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। তর্করত্ন মহাশয় প্রধানতঃ কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তদ্ব্যতীত প্রয়োজন হইলে অন্যান্য শাস্ত্রেরও অধ্যাপনা হইত। অধ্যাপক মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী হওয়ায় নানা শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ হইবে বলিয়া সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থী এই চতুষ্পাঠীতে আগমন করিতেন। পণ্ডিতরাজের মুখে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের ব্যাখ্যা ও তুলনায় সমালোচনা শুনিবার জন্য অনেক দার্শনিক পণ্ডিতও এখানে সমবেত হইতেন। দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় জটিল বিষয়ের সরল, প্রাঞ্জল, সহজ-বোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে পণ্ডিতরাজ অদ্বিতীয় ছিলেন। ভক্তিশাস্ত্রেও পণ্ডিতরাজের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার ভাগবত ব্যাখ্যাও অতুলনীয় ছিল। তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত স্মৃতিশাস্ত্রে বিচারের ফলে স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও মধুসূদন স্মৃতিরত্ন তর্করত্ন মহাশয়কে অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

তর্করত্ন মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্রে সমান পারদর্শী ছিলেন বলিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "পণ্ডিতরাজ", তাঁহার অনন্যসাধারণ কবিত্বশক্তির জন্য বারাণসী-ধামে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "কবিসম্রাট" এবং তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল তাঁহাকে "পণ্ডিত-কেশরী" উপাধি দান করেন। সরকার হইতে উত্তরবঙ্গে তিনিই সর্ব্বপ্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অধ্যাপকরূপে যাদবেশ্বর অনেককে উপাধি প্রদানও করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে যিনি যে উপাধি পাইয়াছিলেন, তিনিই তাহা সাদরে ও সসম্মানে ব্যবহারে করিয়াছিলেন। তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে "বিশ্বকোষে"র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "প্রাচ্য বিদ্যা-মহার্ণব", টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় "শ্রীকণ্ঠ", বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক হাস্যরসিক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বিদ্যাভূষণ", রাজসাহীর ইতিহাসাচার্য্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "পঞ্চানন", অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "তত্ত্বসরস্বতী" শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় "বিদ্যাভূষণ" এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব কর্ণধার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "সরস্বতী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (কিন্তু স্বর্গীয় সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "সরল বাঙ্গালা অভিধানে" দেখিতেছি, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "সরস্বতী" উপাধি "নদীয়ার পণ্ডিতগণে"র নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।)

সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্য-চর্চ্চা

সংস্কৃত ভাষায় তর্করত্ন মহাশয়ের অসাধারণ অধিকার ছিল। আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী ও পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যে বিচার হয়, যাদবেশ্বর তাহাতে তর্করত্ন মহাশয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত-রাজ অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী সংস্কৃত কবিতায় পণ্ডিতরাজের সহিত আলাপ ও সমস্যাপূরণ করিয়া প্রীতি লাভ করেন এবং ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। অনেক সংস্কৃত সাময়িক পত্রে যাদবেশ্বর বহু সংস্কৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি "বাণ বিজয়" নামক একখানি আখ্যান পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুভদ্রাহরণ রুদ্রদূত, প্রণামকুসুম, অশ্রুবিন্দুম্, অশ্রুবিসর্জ্জনম্, রাজ্যা-ভিষেক কাব্যম্, রঙ্গকোষকাব্যম্, অন্নপূর্ণা স্তোত্রম্, শিব-স্তোত্রম্, গঙ্গাদর্শন কাব্যম্, ভারতগাথা প্রভৃতি তাঁহার সংস্কৃত কবিত্ব-শক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন। উপাধি পরীক্ষায় তিনি দর্শন ও কাব্যের পরীক্ষক ছিলেন, এবং সংস্কৃত-বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চাতেও তিনি অবহিত ছিলেন। পূর্ব্বকালে সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ বাঙ্গালা সাহিত্যকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিতেন; বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা সাহিত্য রচনা করা তাঁহারা পাপ বিবেচনা করিতেন। এখনও অনেকে তাহাই করিয়া থাকেন; কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য পণ্ডিতরাজের নিকট অনাদৃত হয় নাই। "ভারতবর্ষে" তিনি বহু সুচিন্তিত, সুলিখিত, গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তর্করত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে রঙ্গপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। এই শাখা-পরিষদের তিনিই ছিলেন সভাপতি। রঙ্গপুর ত্যাগের পরও সভার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই—দূরে থাকিয়াও চিরদিন তিনি এই শাখা-সভার মঙ্গল চেষ্টা করিয়াছেন। বগুড়া নগরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি দর্শন শাখায় সভাপতি পদে বৃত হন। বাঙ্গালা বহু মাসিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রেও তাঁহার অনেক বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা কবিতা রচনায়ও তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল। তাহার পরিচয়স্থল তাঁহার "দ্রৌপদী" কাব্য। এতদ্ব্যতীত, বাঙ্গলা-ভাষায় রচিত তাঁহার সংশয়-নিরসন প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, অশোক উপন্যাস, একাদশী-তত্ত্ব, ত্রিসন্ধ্যা তত্ত্ব, আশা কাব্যের সমালোচনা, বঙ্কিমবাবুর মৃণালিনীর সমালোচনা, বিলাতী বিচার, 'আমি একটি অবতার' প্রভৃতি গম্ভীরও লঘু সাহিত্য, সমালোচনা, নক্সা বাঙ্গলা সাহিত্যকে চির অলঙ্কৃত করিয়া রাখিবে।

পোলিটিক্যাল পণ্ডিত

আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যকে ইংরেজী সাহিত্যের তর্জ্জমা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নব্য বাঙ্গলা-সাহিত্য ইংরেজী ভাবে ভরপুর। কিন্তু তর্করত্ন মহাশয়ের রচনায় বিদেশীয় ভাবের আভাষ মাত্র দৃষ্ট হয় না—উহা স্বদেশীভাবে পূর্ণ। বস্তুতঃ পণ্ডিতরাজ স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি-সম্পন্ন ছিলেন। তাহার আর একটা পরিচয়—তাঁহার রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ আন্দোলন হইতে তিনি আপনাকে দূরে রাখিতে পারেন নাই। রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ কল্পে জেলা-সমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার সভাপতিরূপে তিনি বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ করিয়া-ছিলেন। এই কারণে জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত তিনি Special constableএর কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু হাইকোর্টের নির্দ্দেশে এই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। ইহার প্রতিবাদস্বরূপ তর্করত্ন মহাশয়

অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পরিত্যাগ করেন। রাজদত্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগেও তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে তদনুষ্ঠানে প্রতিনিবৃত্ত হন।

যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত"-সুলভ সঙ্কীর্ণতা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তাঁহার চিত্ত উদার ছিল। সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিহিত কি না এই আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলে, এই উদারতা বলে তিনি সমগ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সমাজের মতের সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে এরূপ মত অকুতোভয়ে প্রচার করিয়াছিলেন। বাল্য বিবাহ ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহার মতের উদারতা উল্লেখযোগ্য। অধুনা 'সমাজ-সংস্কারক' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, ততদূর না হউক, তিনি সমাজের অনেক জটিল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেন। রাজনীতির সহিত সংস্রবের জন্য রাজপুরুষরা তাঁহাকে 'পোলিটিক্যাল পণ্ডিত' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

সন ১৩৩১ সালের ৭ই ভাদ্র পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় লোকান্তরে প্রস্থান করেন।

তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয় পিতৃ-পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া সাহিত্যসেবায় নিরত আছেন। *

* রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (চতুর্দ্দশ ভাগ, ২য় সংখ্যা) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখিত "পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর" অবলম্বনে।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব-জ্ঞানের ক্রমবিকাশ

ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি

জল

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, যতদিন জলে দেবতা-জ্ঞান জনসাধারণের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল, ততদিন জলে মলমূত্র, নিষ্ঠীবন প্রভৃতি নিক্ষেপ অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। রীতিমত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জলের এই স্তব করা হইত :

ওঁ তোয় প্রাণিনাং প্রাণঃ সৃষ্টেরাদ্যন্ত নির্ম্মিতং।
শুদ্ধেশ্চ কারণং প্রোক্তং দ্রব্যানাং দেহিনাং তথা॥

'হে জল! তুমি প্রাণিদের প্রাণ; সৃষ্টির আদিতে তোমার সৃষ্টি। দেহী ও দ্রব্যের শুদ্ধির কারণ তুমি।'

পুরাণের মতে জল আনিয়াছিলেন ভগীরথ স্বর্গ হইতে। ব্যবহার্য্য জল বাস্তবিকই স্বর্গ হইতে আসে। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন, সমুদ্রের প্রত্যেক বর্গ-মাইল হইতে প্রতি মিনিটে ৮৭।৷৹ মণ জল বাষ্পীভূত হইয়া আকাশে উঠে। আকাশ হইতে বৃষ্টি, বরফ, শিলা বা শিশিররূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। বৃষ্টির জল হইতে নদী, নির্ঝরিণী, হ্রদ, পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতির সৃষ্টি। আয়ুর্ব্বেদ-মতে গাঙ্গ বা নদীর জল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেখানে এবং যতদিন নদীর জল পবিত্র থাকে, তীরের নিকটস্থ নর্দ্দামা খাল প্রভৃতি হইতে প্রবাহিত ময়লার পরিমাণ নদীজলের পরিমাণের তুলনায় খুব অল্প যতদিন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত ব্যবহারের পক্ষে নদীর জলই প্রশস্ত।

এই কারণেই বোধ হয় কলিকাতায় পাকা জল-প্রণালীর সৃষ্টি। ১৮২০ সালে চাঁদপাল ঘাটে একটী দমকল বসান হয়। সেই কলে গঙ্গার জল তুলিয়া খোলা পাকা প্রণালীতে রাখা হইত। বৎসরে আট মাস সাত ঘণ্টা ধরিয়া এই কল চলিত। অক্টোবর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত নাকি ঐ জল পান স্নান রন্ধন প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হইত।

বড়-লাটের প্রাসাদের সদর দরজার নিকট এক জল-প্রণালী ছিল।

ইংরাজী বিশেষজ্ঞেরা বলেন, নদীতে জল বেশি এবং ময়লা অল্প থাকিলে সে জল ব্যবহার করা যায়। মধ্য স্রোতের জল এবং গভীর জল শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা বলেন, যেখানে কলের জলের অভাব, সেখানে নদী-তীর হইতে ২০।৩০ ফুট দূরে সংগৃহীত জল ব্যবহার করা যায়। দশ মাইলের মধ্যে কোন গ্রাম যদি না থাকে, জোয়ার-ভাটার প্রভাব যদি না থাকে, এবং নর্দ্দামা প্রভৃতির ময়লা আসিয়া পড়িবার যদি কোন সম্ভাবনা না থাকে, এবং সেই

দূষিত জলের জন্য কি কি রোগ হয়? প্রধানতঃ কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি পেটের অসুখ। ওলাউঠা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে 'মরিয়াও না মরে রাম' —আজ হ্রাস, কাল বৃদ্ধি। অকস্মাৎ কলেরার রব উঠিল 'চলরে, চল রে'। 'হয় ভবধাম ছেড়ে চল, আর নয় বাঁচতে চাও ত হাসপাতালে চল'। আধুনিক প্রণালীতে শতকরা ৮০ জন বেঁচে যায়। যাহা হয়, তড়িঘড়িই হয়। দু-এক সপ্তাহের মধ্যে কলেরা-ওয়ার্ড শূন্য। আবার কিছুদিন পর কলেরার সেই 'চল রে' রব। কলিকাতায় ওলাই-চণ্ডী নাকি বৎসরে দুই তিন বার নাচিয়া উঠেন। পঞ্জিকা দেখিয়াও



বড়-লাটের প্রাসাদ—পাকা জল-প্রণালী হইতে জল তোলা হইতেছে

স্থানে যদি নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি নঙ্গর না করে, সেইখানকার জল ব্যবহার করা যাইতে পারে; অথবা কোন সহরে গিয়া জল ফিল্টার করিয়া তদ্দ্বারা পান ও স্নানের ব্যবস্থা হইতে পারে। পলতায় যে স্থান হইতে কলিকাতায় পানীয় জল সংগ্রহ করা হয়, সে স্থানের জল কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর পরীক্ষক পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, সে জলে মলের অসংখ্য জীবাণু রহিয়াছে। নিকটেই কামারহাটী প্রভৃতি কলের খেতখানার ময়লা আসিয়া পড়িতেছে, প্রায় অশোধিত অবস্থায়।

নাকি আসেন; কখনও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে, কখনও মাঘ ফাগুন চৈত্রে। তাই যদি হয়, পূর্ব্ব হইতে অভ্যর্থনার আয়োজন করিলে হয় না? প্রথম আয়োজন টীকার। দ্বিতীয় আয়োজন পল্লীর মধ্যে প্রথম আগমনের বার্ত্তা ঘোষণা। তৃতীয় আয়োজন, রোগ ও প্রতিকার সম্বন্ধে পল্লীবাসীর জ্ঞানসঞ্চার। কর্পোরেশন স্বাস্থ্য-বিভাগ এবং পল্লীস্বাস্থ্যসমিতি বা ওয়ার্ড হেল্‌থ এসোসিয়েশন্‌ সমূহ দ্বারা এই তিন প্রকার কার্য্যই চলিতেছে। স্বাস্থ্যসমিতি রোগ ও তাহার প্রতিকার এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে ১৯৩০



ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানিজেশন সমূহের বাৎসরিক কার্য্য

সালে যে কার্য্য করিয়াছিলেন পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় ছবিতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এই পল্লীস্বাস্থ্য-সমিতি সমূহের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থানে স্থানে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হয়, ওলাই-চণ্ডীকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। ইঁহার আকার অতি ক্ষুদ্র, বাঁকা ডাক্তারী সূঁচের মতন। তাই কি ইঁহার নাম বিসূচিকা? আকার কতকটা ইংরাজী কমার মত (,), তাই ইঁহার নাম কমা ব্যাসিলাস্। কলেরা রোগীর মল-লিপ্ত কাপড় পুষ্করিণীতে কাচিলে ঐ বীজাণু হাজারে হাজারে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া জল দূষিত করে; ঐ জল পান করিলে কলেরা হয়। কিন্তু ঐ জল ফুটাইলে বীজাণু মরিয়া যায়। রোগীর মলে মাছি বসিয়া ঐ মাছি যে খাদ্যে বসে, সেই খাদ্য পেটে গেলেই কলেরা হয়। খাবার সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিলে মাছির ভয় থাকে না। পাইখানায়, ড্রেনে, মেজেতে ফিনাইল ছড়াইলে কলেরার বিষ নষ্ট হয় এবং মাছির উপদ্রবও কমে। তাই পল্লীস্বাস্থ্য-সমিতির বক্তাগণ বলেন কলেরাকে ভয় করিতে নাই। ভয়ে রোগ ছড়াইয়া পড়ে এবং নানাপ্রকার বিভ্রাট ঘটে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। দাসগ্রামের একটী যুবতী, তাহার স্বামী ও বিশজন আত্মীয় স্বজন সহ রথযাত্রা উপলক্ষে যখন শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত, তখন ওলাউঠার রণবাদ্যে পুরীধামে ভীষণ আতঙ্ক। যুবতীর স্বামী আক্রান্ত হইয়া যখন হাসপাতালে শয্যাশায়ী এবং সহযাত্রীরা পলায়নোন্মুখ, যুবতী অনন্যোপায় হইয়া সহযাত্রীদের সঙ্গে গ্রামে ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন ওলাই-চণ্ডী। তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ করিতে না পারিয়া ঐ সহযাত্রীদলের বারো আনা লোক কাল-কবলে পতিত হইল। অন্তঃস্বত্বা যুবতী কিন্তু রক্ষা পাইলেন। দশ বৎসর পরে সেই গ্রামের এক অশ্বত্থবৃক্ষ-মূলে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর নিকট লোকের ভিড়। কিছুদিন পরে তিনি এক গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তারানাথের কন্যার কি বিয়ে হয়েছে?" গ্রামবাসীরা বলিল "দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পুরীধামে ওলাউঠা রোগে দেহত্যাগ করেছেন, তাঁর মেয়ের বিবাহের উদ্যোগ কে করবে?" ঐ সন্ন্যাসীর আকারে-প্রকারে যখন বুদ্ধিমান গ্রামবাসীরা বুঝিল তিনিই তারানাথ, তাহারা স্ত্রীকে স্বামীগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। যুবতীর সন্দেহ যখন কিছুতেই ঘুচিল না, সন্ন্যাসী গ্রামবাসীর উপর কন্যার বিবাহের ভার অর্পণ করিয়া একদিন নিরুদ্দেশ হইলেন।

তাই পল্লীসমিতির প্রথম উপদেশ (১) ভয় বর্জ্জন করিয়া কলেরার বীজনাশ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয় উপদেশ (২) ওলাই-চণ্ডীর বাৎসরিক আগমন সম্ভাবনার সময় পেটের অসুখ হইবামাত্র স্বাস্থ্য-সমিতির ডাক্তার কিম্বা অন্য কোন ডাক্তারকে জানাইতে হইবে। তৃতীয় উপদেশ (৩) রোগ ওলাউঠা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিয়া চিকিৎসা করিবার অথবা হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। হাসপাতালে রোগী ভাল হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার মল কলেরা-বীজাণুমুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে বাড়ী ফিরিতে দেওয়া উচিত নয়। ইটালী চিত্তরঞ্জন কলেরা-ওয়ার্ডে এই ব্যবস্থা আছে।

স্বাস্থ্যসমিতির উপদেশ রোগের সূচনা মাত্র কর্পোরেশনের ও স্বাস্থ্য-সমিতির কর্ম্মচারীদের জানান আবশ্যক। স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারীদের সংবাদ দিলে মফঃস্বলেও তাঁহারা নর্দ্দামা খেতখানা প্রভৃতিতে ফিনাইল ঢালা এবং টীকা দিবার ব্যবস্থা করিবেন্। চতুর্থ উপদেশ (৪) জল ফুটাইয়া খাওয়া, এবং গঙ্গাজল কি নদীর দূষিত জল প্রভৃতি স্নান, বাসন ধোয়া প্রভৃতি কোন কাজে ব্যবহার না করা। পঞ্চম উপদেশ (৫) খালি পেটে রোগীর নিকট যাওয়া কিম্বা শুশ্রূষা করা উচিত নয়। রোগীকে দেখিয়া ভুলবশতঃ হাত লোশনে না শোধন করিয়া সেই হাত যদি মুখে দেওয়া যায়, এবং ইতিপূর্ব্বে যদি কিছু খাওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে অম্ল পাকরসে কলেরা বীজাণু নষ্ট হয়। ষষ্ঠ উপদেশ (৬) ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সময় বাজারের খাবার বর্জ্জনীয়। (৭) প্রধানতঃ তিনটী কথা মনে রাখা আবশ্যক:—

১। আমরা ওলাউঠা পান করি।

২। আমরা ওলাউঠা আহার করি।

৩। আমরা ওলাউঠা নিশ্বাসের সঙ্গে টানি না। রোগীর ঘরের হাওয়ায় ওলাউঠা থাকে না। রোগীর কাছে গেলে রোগ তেড়ে আসে না।

উনবিংশ শতাব্দী নব্বইয়ের কোটায় পা দিয়ে পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল। স্বর্গীয় আবদুল লতিফ খাঁর সাহিত্য-সমিতির সাম্বৎসরিক অধিবেশনের খুব ঘটা। টাউন-হলে

সভার অধিবেশন। আমার উপরে তার ছিল কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজাণু প্রদর্শন করিবার। তখনকার বড়লাট ছিলেন বোধ হয় লর্ড ল্যান্সডাউন। কলেরার নীলদ্যুতি-সম্পন্ন বীজাণুপুঞ্জ যাই তাঁহাকে দেখাইতে গিয়াছি, অমনি তিনি দু হাত দূরে হটিয়া গেলেন। দশ হাত দূরে নয়, কারণ আমার শিং ছিল না। ইংরাজদের কলেরাকে ভয় করিবার বিশেষ কারণ আছে। তাঁহাদের কলেরা প্রায়ই সাংঘাতিক হয়। বোধ হয় ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান

কলেরার ভৈরব নাদে আতঙ্কিত হয়ে যদি কেহ বলেন ওখানে কাজ করতে যাব না, আমার শরীর অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হচ্চে, শরীর ভয়ে কাঁপচে, স্বাস্থ্য-সমিতির সদস্যেরা তাঁদের সঙ্গে লইয়া কলেরা-আক্রান্ত পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিতেছেন :

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ"

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ"

হে কর্ম্মী তরুণ! এসো আমাদের সমিতির সদস্যদের সঙ্গে এস; ক্লৈব্য ত্যাগ কর, দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর; ভয়



গোরাচাঁদ রোডে কলেরা ওয়ার্ড (মক্ষিকা-প্রবেশ-নিবারক জাল-বেষ্টিত)

তদানন্তীন রেভেনিউ বোর্ডের সদস্য সার হেনরী হ্যারিসন চট্টগ্রামে কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্য সাহেবদের মতন তিনি কাঁচা দুধ খাইয়াছিলেন। তাহাতে কলেরার বীজাণু ছিল।

কলেরা থাকে জলে ও খাবারে; বাতাসে থাকে না। সুতরাং কলেরা-রোগীর কাছে, কি সেই বাড়ীতে যাইবামাত্র আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

"সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি
বেপথুশ্চ শরীরে মে"

পেয়ো না; অদৃশ্য শত্রু ঐ সংক্রামক জীবাণু ধ্বংস করবার অস্ত্র—বৈজ্ঞানিক গাণ্ডীব হাতে নিয়ে অগ্রসর হও। নিবার্য্য রোগ নিবারণ ক'রে দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হও। এই এক কলিকাতা সহরে বৎসর বৎসর আড়াই হাজার, সমগ্র বাংলায় ষাট হাজার লোককে বলিদান দিতে হয় ওলাই-চণ্ডীর নিকটে। কলিকাতায় দশ হাজার এবং বাংলায় আড়াই লক্ষ লোক অনেক সংগ্রাম করে রাক্ষসীর কবল হতে মুক্ত হয়। নির্ভীক চিত্তে এই অত্যাচার নিবারণে অগ্রসর হও।

গারোদের দেশ

শ্রীঅমলকৃষ্ণ রাহা

পাশ্চাত্য জগতের একই সহর ও জায়গাগুলির ছবি ও ভ্রমণ-কাহিনী আজকাল মাসিক-পত্রে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও দুর্গম দেশের খবর বড়-একটা বাহির হয় না। আমাদের দেশেও এরূপ অনেক জায়গা আছে, যেখানে আদিমকালের মানুষেরাই এখনও নগ্নদেহে বসবাস করে ও চলিয়া-ফিরিয়া বেড়ায়। সভ্য মানুষের মধ্যে জঙ্গল-বিভাগের কোনও কোনও কর্ম্মচারী কখনও কখনও এখানে আসিয়া থাকেন। তাঁহারাও সব গভীর বন জঙ্গলের বেশী ভিতরে যান না। যেখানে যেখানে তাঁহাদের প্রয়োজন, সেইটুকু দেখিয়াই চলিয়া আইসেন।

আসামের গারো-পাহাড় ও তৎসংলগ্ন জঙ্গল এইরূপ একটী জায়গা। গরিলা থাকিলে ইহাকে ভারতীয় আফ্রিকা বলা অসঙ্গত হইত না। গারোরা বলে যে, তাহাদের পাহাড়ে সিংহ আছে। এ কথা কতদুর সত্য জানি না। হয় ত ছিল এক-কালে।

গারো-পাহাড় অসংখ্য পাহাড়ের শ্রেণীবদ্ধ সমষ্টি। এক ধারে ময়মনসিং, রংপুর, অন্য ধারে গোয়ালপাড়া এই বিস্তীর্ণ পাহাড়শ্রেণীকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বহুদিন আগে এই পাহাড়শ্রেণীর মালিক ছিলেন সুসং দুর্গাপুরের মহারাজা। একবার গারোরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তখন ইংরাজ-সরকার গারো হিলস্‌ আইন পাশ করিয়া এই পাহাড়-শ্রেণী নিজেদের অধীনে লইয়া আসেন। ইহার জন্য সুসং পরিবার ইংরাজ-রাজের নিকট টাকা পাইয়া থাকেন।

গারো-হিলস্‌-ট্র্যাক্ট নামে এখন ইহা একটী পলিটিকাল ডিষ্ট্রিক্ট; একজন ডেপুটী কমিশনার ইহার রক্ষক। টুরা তাঁহার হেড-কোয়াটার। টুরাই গারো-পাহাড়ের একমাত্র সহর। এখানে একদল ইংরাজের পল্টন থাকে। আগে আগে পল্টনের একজন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী টুরার ডেপুটী কমিশনার হইতেন। আমি যখন টুরায় ছিলাম, তখন একজন সিভিলিয়ান ডেপুটী কমিশনার ছিলেন।

গারো-পাহাড়ে ময়মনসিং ঝরিয়া ঝঙ্গাল হইয়া যাওয়া যায়। সুসং দুর্গাপুর হইতে পাহাড়ের সীমা



সমতলভূমিতে ক্যাম্প—অদূরে পাহাড়-শ্রেণী

কাছেই। কিন্তু সহজ রাস্তা, আসাম মেলে গিয়া শান্তাহারে গাড়ী বদলী করা। পরে মিটার লাইনে উঠিয়া গোলকগঞ্জে ধুবড়ী লাইনের জন্য গাড়ী বদল করিয়া ধুবড়ী হইতে ষ্টীমারে গোয়াল-পাড়া অথবা মানকাচরে নামিতে হয়।



সমতল প্রদেশে একটী গ্রাম

গোয়ালপাড়া হইতে গারো-পাহাড়ের নীচে দামড়া পর্য্যন্ত মোটার সার্ভিস আছে। গ্রীষ্ম ও শীতকালে মোটর চলে। মানকাচর হইতে গরুর গাড়ীতে টুরা পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। দামড়া

হইতেও গরুর বা মহিষের গাড়ী দাম্বু পর্য্যন্ত চলে। তাহাও অতি কষ্টে। আমি যখন ও অঞ্চলে ছিলাম, তখন দাম্বুর ওপাশেও যাহাতে গো যান চলে, তাহার চেষ্টা হইতেছিল। রাঙ্গনে সেই জন্য নদীর উপর একটা পোল তৈয়ারী জঙ্গল-বিভাগ হইতে হইতেছিল। তাহার পর যাইতে হইলে হাতীর



গারো পাহাড়শ্রেণী

পিঠে তাঁবু ও আহারাদির সব জিনিষপত্র চাপাইয়া পায়ে হাঁটা ছাড়া উপায় নাই। রাস্তা এক-রকম ভাল। সরকারী রাস্তা আছে। তবে অসংখ্য পাহাড়িয়া নদীতে পোল নাই। এই জন্য গরুর গাড়ী চলে না। তাহা ছাড়া সরকারী রাস্তা ছাড়িয়া একটু এদিক-ওদিক যাইতে হইলেই



রং রং গিরির উপর হইতে পাহাড়ের দৃশ্য

গারোদের পায়ে-চলা পথ ছাড়া উপায় নাই। অনেক স্থানে তাহাও নাই।

টুরায় ডেপুটী কমিশনার বাদে, সিবিল সার্জ্জন, পুলিস সাহেব ও ডিভিসনাল ফরেষ্ট-অফিসার থাকেন। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন একজন বাঙ্গালী শ্রীযুত যতীন্দ্র দাস ছিলেন ফরেষ্ট-অফিসার। এখানে আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিসনের একটা প্রকাণ্ড আড্ডা আছে।

গারোরা এক হিসাবে স্বাধীন। তাহারা জমির কোনও ট্যাক্স দেয় না। তবে সরকার প্রত্যেক যুবা গারোর উপর একটা কর লইয়া থাকেন। শুনিয়াছিলাম যে গারো-পাহাড়ের ভিতর ইংরাজের পুলিশ পর্য্যন্ত টুরার ডেপুটী কমিশনারের হুকুম ব্যতীত যাইতে বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে না। গারো-পাহাড়ের সংলগ্ন সমতল ভূমিতে জায়গায় জায়গায় থানা আছে ও পুলিসের বন্দোবস্ত আছে। পাহাড়ের মধ্যে নাই। সরকারের নিয়োজিত গারো লস্করেরা অপরাধীকে ধরিয়া আনিয়া ডেপুটী কমিশনারের নিকট হাজির করে।

গারোরা টিবেটো-বর্ম্মাণ জাতি। তাহারা কাপড়ের বিশেষ ধার ধারে না। ছেলেরা একটা কৌপীন ব্যবহার করে। মেয়েরা কোমর হইতে হাঁটুর অনেক উপর পর্য্যন্ত একটা বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া রাখে। দেহের উপরিভাগে শেলাই থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের হাতেই সাধারণতঃ আমাদের দেশের রাম-দার মত লম্বা লম্বা একপ্রকার দা থাকে। ইহাই তাহাদের প্রধান অস্ত্র। অবশ্য তীর ধনুকও আছে। আজকাল দুই চারজন বন্দুকও রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গারোরা চাষবাস করে না, অর্থাৎ আমাদের মত জমিতে লাঙ্গল দেয় না। যাহারা সমতল ভূমিতে থাকে, তাহারা লাঙ্গল ব্যবহার করে। পাহাড়ের উপরে যাহারা থাকে, তাহারা সাধারণতঃ ঝুম্ করে। পাহাড়ের যে জায়গায় চাষ আরম্ভ করে, প্রথমে সেখানকার বনজঙ্গল পোড়াইয়া ফেলে। তাহার পর কোদালের মত এক রকম যন্ত্র দিয়া মাটী উপর-উপর খুঁড়িয়া ফেলে। এই প্রকার আবাদ করার নাম ঝুম্। ফসল তাহারা নানাপ্রকার করে না। ধান ও তুলাই তাহাদের প্রধান ফসল। আমার মনে হয়, গারোরা স্বাধীনতাপ্রিয় ও অত্যন্ত অলস জাতি। শুনিয়াছি পুলিসে সিপাহী করিবার জন্য আসল পাহাড়ী

গারো পাওয়া যায় না। যদিও বা এক-আধজন মেলে, তাহাদের কিছু বলিবার উপায় নাই। কোন অন্যায় করিলে যদি কিছু বলা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা সরকারী সাজপোষাক ফেরৎ দিয়া পাহাড়ে ফিরিয়া যায়। অভাব তাহাদের অত্যন্ত কম। অল্প একটু আধসিদ্ধ ভাত ও নদীর মধ্যে ধৃত একপ্রকার পোকার মশলা-বিহীন তরকারী হইলেই তাহাদের দিন চলিয়া যায়। কাপড়ের খরচ ত নাই-ই। কাঁচা পয়সার দরকার নাই, কারণ পাহাড়ের ভিতরে দোকান বড়-একটা নাই। কিন্তু তাহারা নেশা জিনিষটা বিলক্ষণ ভালবাসে। একটী গারোকে একটা টাকা দিয়া যত কাজ করান না যাইতে পারে, একটী রেড্ ল্যাম্প-মার্কা সিগারেট বা একটু আফিম দিয়া তাহার দশগুণ কাজ করান যাইতে পারে।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু ও মুরগী দেখা যায়। প্রায় অধিকাংশ গারোই মুরগী পোষে। গরু রাখা মুস্কিল। কখন যে শার্দ্দূলরাজ লইয়া যান, ঠিক নাই। এই জন্য ছাগল গরু প্রভৃতি রাখা মুস্কিল।

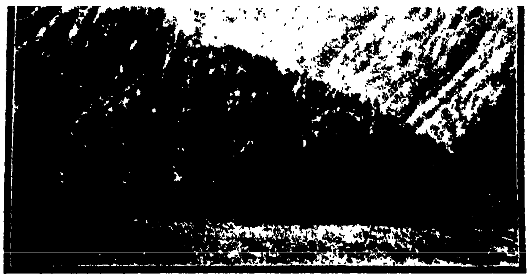
গারোদের লিখিবার অক্ষর নাই। সরকার তাহাদের ইংরাজী অক্ষর ধার দিয়াছেন। ব্যাপটিষ্ট মিশনের পাদ্রীরাও বোধ হয় ইহার জন্য কিছু দায়ী। আসামীদের বা খাসিয়াদের মত বাঙ্গালা অক্ষর ইহাদের মধ্যেও প্রচলিত হইলে ভাল হইত। কিন্তু করে কে? বাঙ্গালী রাজার অধীনে ত ইহারা বহুকালই ছিল।

আজকাল অনেক গারো, বিশেষ সমতল প্রদেশের গারোরা ইংরাজী লেখাপড়া শিখিতেছে। সভ্যতার আলোক পাইয়া অনেকে দেহের আবরণেরও ব্যবস্থা করিতেছে। ছেলেরা খাকী হাফ-প্যাণ্ট ও সার্ট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েরা, যাহারা কিছু কম শিক্ষিত, তাহারা বুকের উপর হইতে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত সাড়ী বাঁধিতেছে। যাহারা আর একটু বেশী শিক্ষা পাইয়াছে, তাহারা পুরা মেম-সাহেব। পাহাড়ের মধ্যে যে সব জায়গায় গির্জ্জা ও স্কুল আছে, সেখানে অনেক সময় বাঙ্গালী মেম সাহেবদের মান্দ্রাজী ধরণের সাড়ীপরা গারো মেম সাহেব আমার সভ্যতায় অভ্যস্ত চোখ দুটাকে বেশ আরাম দিয়াছিল। নগ্ন প্রকৃতির সহিত নগ্ন মানুষের চেয়ে, বিলাতী সাড়ী হইলেও আবরণে দেওয়া মানুষ বেশ লাগিয়াছিল। শিক্ষিত গারোরা খাসিয়াদের মতই একটু বেশী ইংরাজী-ভাবাপন্ন। নামধামও বিলাতী ফেশান; বিশেষ ক্রীশ্চানদের। এরূপ অবশ্য আমাদের দেশেও যথেষ্ট দেখা যায়। মান্দ্রাজের দিকে ত কথাই নাই। সুতরাং গারোদের আর দোষ কি? ইহার প্রধান কারণ গারোদের উপর ইংরাজের প্রভাব, মিশনারী সাহেব-মেমদের সহিত সব সময় ঘনিষ্ঠ মিলামিশা



ক্যাম্প হইতে একটী দৃশ্য। নীচে খাদ গারোদের একটী গ্রাম

এবং বাঙ্গালী বা অন্য কোনও স্বদেশীয় শিক্ষিত জাতির সহিত দেখাশুনা না হওয়া। ধন্য এই পাশ্চাত্য জাতি, আর ধন্য তাহাদের মনের ও অর্থের উদারতা। কোথায় এই ভয়ানক পথহীন দুর্গম দেশে গিয়া যে তাহারা গির্জ্জা



ঢেপা। গারো পাহাড় শ্রেণী। আসাম—দামড়া হইতে পাহাড়ে উঠিবার আগের দৃশ্য। সমতল প্রদেশ ও পাহাড়ের মাঝে নদী

ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ করিতে হয়।

এই সব জঙ্গলে চলা-ফেরার বিপদের কথা একটু বলি। জঙ্গলের মধ্যে, গারো পাহাড়ের ভিতরের জঙ্গলে নহে,

আমাদের সমতল ভূমির সুবিস্তীর্ণ জঙ্গলের যে সব অংশ হইতে কাঠ বাহির করা হইতেছে, সেখানে চলা-ফেরার পথ দুই রকম আছে। এক রাইড লাইন। জঙ্গলের মধ্য হইতে গরু বা মহিষের গাড়ী করিয়া কাঠ বাহিয়া আনিবার জন্য যে সব একটু চওড়া রাস্তা আছে, তাহার নাম রাইড লাইন। রাস্তা সাধারণতঃ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সমতল করা মাত্র। আর এক কূপলাইন। জঙ্গল-ব্যবসায়ীদের যাহার যেটুকু অংশ, তাহা সরু করিয়া জঙ্গল কাটিয়া একের অংশ হইতে অন্যের অংশ ভাগ করিয়া দেওয়ার জন্য যে রাস্তার মত আছে, তাহার নাম কূপ লাইন। অধিকাংশ সময়েই, অন্য চলাচলের পথ না থাকায়, এই সব কূপ লাইন ধরিয়া মানুষ চলা-ফেরা করে বলিয়াই ইহা শেষে রাস্তা হইয়া যায়। ইহা ছাড়া যে সব জঙ্গলের মধ্যে আদিম মানুষ বাস করে, সে সব জঙ্গলে তাহাদের পায়ে-



পর্ব্বতের উপরে ছোট হ্রদ। গারো পাহাড় শ্রেণী

চলা পথও অর্থলোভী সভ্য মানুষ ব্যবহার করিয়া থাকে। অবশ্য সব নিয়ে সহজ পথ বোধ হয় দলবদ্ধ হাতীরাই বাহির করিয়া থাকে এই সব গভীর পাহাড় ও জঙ্গলে।

এই সব পথ অত্যন্ত বাঁকা-চোরা এবং এই সব অসংখ্য বাঁকের মুখে, বিশেষ যে সব জায়গায় নদী অতিক্রম করিতে হয়, কোথায় যে শার্দ্দুলরাজ বা ভল্লুক-প্রবর অথবা অন্য কোনও হিংস্র জন্তু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে এ কথা বলা যায় না। জঙ্গলে হাতীই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মম শত্রু। ভীমের দেহ ও শক্তি সে পাইয়াছে বলিয়াই, বোধ করি, সে দুর্ব্বল মানুষকে ধরিয়া সবল জরাসন্ধের মত মধ্য হইতে দেহটা দুইখানি করিয়া চিরিয়া মারিয়া ফেলে। একটা পা তাহার নিজের পদ দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া অন্য পা-খানা শুঁড় দিয়া ধরে; তাহার পরই জরাসন্ধ-বধ।

এই সব বড় বড় হিংস্র পশুকে দেখা যায়, কিন্তু সর্পরাজকে দেখা কঠিন; এবং সংখ্যায় তিনি এত অধিক যে বলাই বাহুল্য মাত্র। গাছের তলা দিয়া চলিয়াছেন, উপরে সর্ সর্ শব্দ। তখনি সরিতেই হইবে। কেন না মাথার উপর লাউডগা চলিয়াছে। যদিও বা লাউডগা প্রাণটা না লয়, পাতার উপর হইতে নানা আকারে জোঁক আস্‌ছে গায়ের উপর; কখন যে লাফাইয়া পড়ে তাহা জানা যায় না, যতক্ষণ না তাহাদের রক্ত-শোষণের জ্বালায় লাউডগার দেওয়া প্রাণটা অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। কি করিয়া কখন যে তাহারা বুটের ফিতার গর্ত্তগুলির মধ্য দিয়া অন্দরে স্থান করিয়া লইয়া আপনার কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহা জানিবার উপায় ওই একমাত্র দংশনের জ্বালা। এরূপ নীরব কর্ম্মী দেখা যায় না।

একদিন এইরূপ সমতল জঙ্গলের এক স্থান হইতে বাইকে করিয়া ফিরিতেছিলাম। এই সব শাল জঙ্গলে অন্ধকার বড় তাড়াতাড়ি হয়। বাহির হইতে প্রায় চারটা বাজিল। সেখানে যে অধস্তন কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি রাত্রিটা সেখানে থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরদিন সকালেই বেস্ ক্যাম্পে (Base Camp) বিশেষ দরকার। এই কথা বলিয়া সাইকেলে উঠিয়া পড়িলাম।

পথ মাত্র বাইশ মাইল। জঙ্গলের রাস্তা। সাইকেলের টায়ার না ফাটে; অবশ্য সারাইবার যন্ত্রাদি সঙ্গে আছে। মুস্কিল সম্মুখে অন্ধকার। চাঁদ উঠিবে নিশ্চয়ই। কিন্তু রাস্তায় আলো পড়িবে কি না সন্দেহ এবং কখন যে পড়িবে তাহাও বলা যায় না। মাথার উপরে আসিলে যদি পড়ে। আলো জ্বালিবার উপায় নাই। কারণ বন্য-বরাহের আলোর প্রতি মারাত্মক বিদ্বেষ এবং তিনি সব চেয়ে সংখ্যায় অধিক।

আর মাইল খানেক যাইতে পারিলেই ভয়ের নদীটা পার হইতে পারি। এখানে নদীর নাম হেল্ অর্থাৎ নরক। রাস্তার নাম আছে যমদুয়ার। নদীতে গেলেই বোধ হয় কুমীর বা আর কাহারও উদরস্থ হইতে হয়। এই জন্যই সেটা

মানুষের ভয়ের নরক। আর ওই সব রাস্তায় যাহারাই গিয়াছে, বোধ হয় যমের রাজ্যেই তাহারা পঁহুছিয়াছে।

ঘড়িতে দেখি প্রায় পাঁচটা। প্রাণের দায়ে খুব জোরেই চলিয়াছি। নদীর ওপারে মাইলখানেক অথবা আর একটু অধিক মাত্র জঙ্গল। তাহার পর জঙ্গল দুই পাশে সরিয়া গিয়া দুই বাহুর মত চলিয়াছে। মাঝখানটা উলু-ঘাসের রাজত্ব। এইরূপ প্রায় Base Camp পর্য্যন্ত। এই স্থানে ভাল্লুকের ও হাতীর উপদ্রব খুব বেশী। অবশ্য কি করিয়া কাহাকে ঠেকান যায়, তাহা সব শিখিয়া লইয়াছি। হাতীকে বিজলী বাতি বা অন্য কোনও আলো দেখাইলেই হয়। ব্যাঘ্ররাজের চোখে চাহিয়া থাকিলেই বাধা হয়। ভাল্লুক মহাশয় ছুটিয়া আসিয়া সাপের মত ফণা ধরেন, পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে নাড়ুগোপালের মত নাচিয়া নাচিয়া আইসেন আলিঙ্গন করিবার জন্য। তখন তিনি মুখখানা পাশের দিকে ফিরাইয়া থাকেন, পাছে কেহ নাকের উপর আঘাত করে। নাকটা তাহার বড় নরম জায়গা। সেই সময় নাকে একটা ঘুসি মারিলেই সে পলায় নিশ্চয়। সবই শেখা; ভয়ের আর তখন আছে কি? সুতরাং নির্ভয়ে প্রাণের দায়ে খুব জোরেই সাইকেল ছুটাইয়াছি।

নদীর খদে নামিয়া দেখি যে বাঁকের মুখে কি যেন একটা অদৃশ্য হইয়া গেল। যাহার মনের চিন্তা যখন যেরূপ থাকে, সে তখন পারিপার্শ্বিককে সেই ভাবেই দেখিতে পায়। আমার তখন মনে হইতেছিল পথে যদি একটা ভুটিয়াও পাইতাম। ভুটিয়ারা এই পথে তরী-তরকারী বিক্রয় করিবার জন্য যাতায়াত করিয়া থাকে। এই সব জঙ্গল ভুটান পাহাড়ের নীচেই। আগে ইহা ভুটানের রাজারই ছিল; পরে কোন এক যুদ্ধের সময় ইংরাজ-সরকার লইয়াছেন।

আমারও মনে হইল যে যাহা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল, সে একজন ভুটিয়াই হইবে। বাঁকের মুখ তখনও প্রায় পাঁচশত গজ দূরে। ঢালু জমি। আরও জোরে সাইকেল চালাইলাম। বাঁকের পর রাস্তা নদীতে সোজা নামিয়া গিয়াছে, প্রায় একশত গজ। নীচেই প্রস্তর-বহুল নদী। শুনিয়াছিলাম যে, একজন ভুটিয়া একলা আসিবার সময় আসিয়া দেখে যে একটা হাতী শুঁড় দিয়া তাকে জড়াইতেছে। ভয় না পাইয়া কুকরী বাহির করিয়া কোনও মতে শুঁড়ে দাগ বসাইয়া দিলেই হাতীটা যন্ত্রণায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু আবার আক্রমণ করিতে আসে। তখন সেই ভুটিয়া ক্ষিপ্রগতিতে কুকরী দিয়া তাহার শুঁড়ে এত জোরে মারে, যে শুঁড় দুইখান হইয়া যায়। সুতরাং এই ভুটিয়া সঙ্গীকে লইয়া নদী ও জঙ্গল-রেখা পার হইতে পারিলে পুনরায় সাইকেলে নিরাপদে চড়া যাইবে।

আমি যখন সাইকেল চালাইয়া বাঁকটা পার হইয়াছি, তখন সামনে যে মন্থর গতিতে চলিতেছিল, সে সাইকেলের শব্দে ফিরিয়া দাঁড়াইল। ভুটিয়াই বটে, তবে চার পায়ে চলে। দেহে তাহার কালো কালো লম্বা লম্বা ডোরা-কাটা। বোধ হয় নদীতে জল খাইতে যাইতেছিল। সাইকেলের শব্দে ভাবিয়াছিল যে হরিণের একটা দলও জল খাইতে আসিয়াছে। আহার ও পানীয় একই সঙ্গে আজ। বেচারা বোধ হয় নিরাশ হইল; কেন না কোনও কিছু করিবার চেষ্টা না করিয়াই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি প্রাণপণ জোরে ব্রেক কষায় উল্টাইতে উল্টাইতে পথের পাশে একটা বড় পাথরে পা লাগাইয়া কোনও মতে বাঁচিয়া গেলাম। বাঁচিবার জন্যই জগতে আসিয়াছি, বাঘের উদরে পড়িব কেন।

বিপদ যত ঘনীভূত হইয়া উঠে, আমার মনের শক্তি ও শিরা উপশিরার স্থিরতা যেন বাড়িয়া যায়। রক্তের এতটুকু চঞ্চলতা নাই। চুপ করিয়া পাথরে পা লাগাইয়া সাইকেলে বসিয়া আছি। শার্দ্দূল-রাজের ও আমার মধ্যে দূরত্ব প্রায় পনের গজ। দুই জনেই দুইজনের দিকে চাহিয়া আছি। এমনভাবে প্রায় আধঘণ্টা কাল কাটিল। মনে হইল যুগ ধরিয়া যেন বসিয়া আছি। সম্মুখে মৃত্যু। শীতকাল। আসামের শীতে গা ঘামিয়া জামা কাপড় হইতে জল ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাকে মারিবার উপায় নাই। চেষ্টা করা শুধু বৃথাই নয়, অন্যায়। আসামের ব্যাঘ্রদের মানুষের প্রতি লোলুপতার বদনাম নাই। তাহারা গরু মহিষ ধরিয়াই খায়; এবং এত শক্তি রাখে যে, বিশ পঁচিশ মন বড় বড় মহিষ মারিয়া পিঠে ফেলিয়া লইয়া যায়। সামনে রেলের উঁচু লাইন পড়িলে, তাহা অনায়াসে অক্লেশে লাফাইয়া পার হয়। ইহাকে মারিবার চেষ্টা ওরূপ সামনা-সামনি হইতে করিলে, সেও আক্রমণ করিবে; এবং যদি মারিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সে

মানুষের মাংস ও রক্তের আস্বাদ পাইয়া মনুষ্যলোভী হইয়া যাইবে।

যাহা হৌক, আর দেরী করা যায় না। হাত-পা না নাড়িয়া আঙুলের দ্বারা সাইকেলের ঘণ্টায় শব্দ করিলাম। সে একটু চমকাইয়া সামনের দিকে তিন চার পা আগাইয়া আসিল। আগে সে শুধু ঘাড় ফিরাইয়া তাকাইয়াছিল। শরীরটা রাস্তার চওড়া-চওড়ি থাকায়, অনেকটা রাস্তা বন্ধ ছিল। ভাবিলাম মরিব কি বাঁচিব আজই তাহার পরীক্ষা হইয়া যাইবে। সাইকেল ছাড়িয়া দিলাম। কতকটা চালাইবার জোরে, কতকটা ঢালু জমির টানে একেবারে গিয়া নদীর জলে পড়িলাম। জল হইতে উঠিয়া বিজলী বাতিটার কথা মনে হইল। আলো দেখিলে সে পশ্চাতে আসিলেও ফিরিয়া যাইবে, এই আশায় কোমরের সঙ্গে আট্‌কান বাতির বোতাম টিপিলাম। বাঁচিব নিশ্চয়ই, নহিলে বাতিটা ভাঙ্গিয়া যাইত। আলো জ্বলিয়া উঠিল। কাঁধে সাইকেল লইয়া যতটা সম্ভব জোরে নদীটা পার হইলাম। পারে উঠিয়া দেখি হাত-দুটা ভয়ানক কাঁপিতেছে। সাইকেলে ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। প্রায় একশত দেড়শত গজ দৌড়িয়া নদীর পাড়ের উপর উঠিলাম। বাতিটা দিয়া যতদূর দেখিতে পাইলাম, চারপা-বিশিষ্ট ভূটিয়া প্রবর তখনও সেইখানেই দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল; আলো চোখে লাগাতে বোধ হয় সরিয়া গেল।

ভয় হইল, অন্য পথে সে না আসিয়া পড়ে। বাতি আর নিভাইলাম না। ফ্লাস্ক হইতে খানিকটা গরম কফি খাইয়া ফেলিয়া পুনরায় সাইকেলে উঠিলাম।

তাহার পর বাকী পথ যে কি ভাবে আসিয়াছি জানি না। পরদিন ঘুম ভাঙ্গিতে দেখি গায়ে খুব বেদনা। তখন সব মনে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রাত প্রায় নয়টায় ক্যাম্পের সামনে আসিয়া সাইকেল হইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাই। সকলে ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়ায়। গায়ের উত্তাপ তখন প্রায় ১০৪°। অনেক রাত্রে জ্ঞান হয়। তখন বাসার লোকেরা বুদ্ধি করিয়া গরম দুধ ও ব্রাণ্ডি মিশাইয়া খাওয়াইয়া দেওয়ায় তখনি আবার ঘুমাইয়া পড়ি।

পরে শুনিয়াছিলাম যে, যাহাকে আমি দেখিয়া আসিয়াছি, সে ব্যাঘ্ররাজ নহে, রাণী। ওইখানেই বরাবর থাকে। অনেকেই দেখিয়াছে। কাহাকেও কিছু বলে না। এখন বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে। মনে পড়িল বটে যে, তাহার শরীরটা খুব হলদে নহে বা কালো দাগগুলাও খুব কালো আর নাই। মনের ভুল কি না জানি না। আরও শুনিলাম, একবার একদল লোক নদীর ওইখানটায় রান্না করিয়া খাইয়া বিশ্রাম করিতে যাইবে দিনের বেলায়, এমন সময়ে একজন দেখে যে মহারাণী অল্প দূরে বসিয়া বসিয়া তাহাদের অনধিকার-প্রবেশ ও তাঁহার বিশ্রাম ভঙ্গজনক কার্য্যকলাপ দেখিতেছেন। তখনই সকলে দৌড়।

গারো-পাহাড় ইহা অপেক্ষাও অনেক অধিক বিপদ্‌জনক। তাহার উপর পাহাড়ের রাস্তা, ভয়ানক উঁচু-নীচু। তথাপিও যে খাস সহরের পাদ্রী সাহেব-মেমেরা এই সব জায়গায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান, ইহা প্রশংসার কথা। আমাদের দেশের লোককে অধিক মাহিনা দিয়াও এ সকল স্থান পাঠান যায় না। আমার অভিজ্ঞতা বাঙ্গালী ছেলেদের সম্বন্ধে এই বিষয়ে অত্যন্ত খারাপ। কোনও কিছু জুটিতেছে না, বা কিছুতেই আপত্তি নাই, এইরূপ ছাড়া বাঙ্গালী ছেলেকে এই সব যায়গায় আনিতে পারা যায় না। অথচ যে সব সাহেব বা মেম পাদ্রী হইয়া আসিয়া এত কষ্ট স্বীকার করেন, তাঁহারা প্রায়ই ভাল পরিবারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী। আমার মনে হয়, উপার্জ্জন করিতেই হইবে, এই যে একটা সুদৃঢ় ধারণা, তাহাই ইঁহাদের এত কষ্টসহিষ্ণু করে।



ভূমানন্দ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ছোট্ট একটা পক্ষী, অতি বিশাল বিশ্ব ;—
ঐশ্বর্য্যের নাই অন্ত ; নিতান্তই সে নিঃস্ব !
প্রভাত হ'তে রাত্রি কেবল জীবন-চেষ্টা,
অপার ক্ষুধার কষ্ট অফুরন্ত তেষ্টা :
চতুর্দ্দিকেই বিঘ্ন, জোটা কঠিন খাদ্য,
শক্তিমানের রাজ্য, ক্ষুদ্র তাহার সাধ্য !

পাখায় সোণার বর্ণ, কণ্ঠ তাহার মিষ্ট,—
তাইত সদা শঙ্কা, সর্ব্বদাই অতিষ্ঠ !
বীর্য্যবানের শক্তি, বুদ্ধিমানের ফন্দী
চাইছে লোভে নিত্য করতে তারে বন্দী !
বাদুড়-পেঁচার হস্তে তবুও আছে রক্ষে,
কেমন করে' নিস্তার মিল্‌বে নরের চক্ষে ?

চৈৎ-বোশেখের ঝঞ্ঝা, বর্ষাকালের বর্ষণ,
কাঁপ্‌ছে ভয়ে অঙ্গ, ঝাপ্‌সা চোখের দর্শন !
কুলায় ভাঙে বৃক্ষে, বাচ্ছা তিনটে নষ্ট,
একটা পক্ষ ভগ্ন, শেষ পরিণাম পষ্ট ;
লুপ্ত সংজ্ঞাশক্তি, চক্ষে নাইক দৃষ্টি—
তবু জীবন চেষ্টা—হায়রে অনাসৃষ্টি !

বল্‌ব তবু ঈশ্বর, তুমি কৃপার সিন্ধু,
জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে সাক্ষী দিচ্ছে সূর্য্য ইন্দু !
দীনের তুমি বন্ধু—লিখ্‌ছে শাস্ত্রগ্রন্থ,
তপস্বীদের দৃষ্টি পায়না তোমার অন্ত !
ছোট্ট একটা পক্ষী—তা'র আবার সে কষ্ট !
অনন্ত এই সৃষ্টি—কতই হবে নষ্ট ?

সুখের নামই দুঃখ—বুঝ্‌তে হবে অর্থ !
জীবনের কি মূল্য—না জান্‌লে সব তত্ত্ব ?
পক্ষী তো ছার পক্ষী—মানুষ যারা মূর্খ—
শক্তিমানের রাজ্যে আছেই তাদের দুঃখ !
কিন্তু সে সব দুঃখের গভীর ভূমানন্দ
তারাই পাচ্ছে জান্তে অন্ধ পথ যার বন্দ !

কথিকা

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কবি লিখ্‌তেন ছেঁড়া মাদুরে ব'সে নল-খাগ্‌ড়ার কলম দিয়ে, মাটির দোয়াত থেকে কালি নিয়ে দেশের কোন্ প্রান্তে কোন্ অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লী-আবাসে ; কিন্তু, কবি ছিলেন ঐশ্বর্য্যের কবি—কি অন্তরে, কি বাহিরে। তাই তাঁর নল-খাগ্‌ড়ার কলমের মুখে জেগে ওঠে শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য বিভব প্রণয় গৌরব দিয়ে পূর্ণ এক জগত। তাঁর কলমের মুখে জেগে ওঠে তরুণ তরুণী, তাদের হিল্লোলিত প্রাণ, কল্লোলিত কণ্ঠস্বর, জ্যোতিঃ-পুলকিত আঁখি, হাস্য-বিকশিত আনন ;—আবার সেই তরুণ-তরুণীদের কণ্ঠে কণ্ঠে বেজে ওঠে প্রণয়-উচ্ছ্বসিত বাঁশি ফাল্গুনের সুরে সুরে, বর্ষা-বাদলের ঝর ঝর ধারায়, শরৎ-আকাশের হাসিতে হাসিতে ; —যেখানে দুঃখ নেই দৈন্য নেই, শোক নেই অশ্রু নেই, অনুতাপ নেই পরিতাপ নেই—যেখানে তরুণ বলে

চাহরে চাহ গাহরে গাহ জয়—

তরুণী বলে

দুখানি হিয়া হ'ল কি বিনিময়—

যেখানে তরুণ গান ধরে

আজ্‌কে মোরা রাজার পথে
জীবন-রথে
(স্বর্ণ-রথে)
ছুট্‌ব রে ভাই দুর্ণিবার—

আর তরুণী তার উত্তর দেয়

হৃদয়-নদীর তীরে তীরে
নীরে নীরে
(শীতল নীরে)
ফুট্‌ব মোরা কি দুর্ব্বার—

কবি ছিলেন ঐশ্বর্য্যের কবি – কি অন্তরে কি বাহিরে ;—তাই তাঁর কলমের মুখে জেগে ওঠে রাজার ঐশ্বর্য্য, সম্রাটের দিগ্বিজয়-কাহিনী—মণি মুক্তা মকরত চুনি পান্না মোতি চতুর্দ্দিকে জ্যোতিঃ-রশ্মি বিকীরণ ক'রে সজাগ হ'য়ে ওঠে - হয় হস্তী স্যন্দন চতুরঙ্গ-বাহিনীর মত্ত উল্লাসে তুরী ভেরী কাড়া-নাকাড়ার প্রমত্ত কোলাহলে দিক্‌-দেশ বধির হ'য়ে যায়। এমনি ছিলেন কবি, কোন্ দূর অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লী-আবাসে ছেঁড়া মাদুরে ব'সে নল-খাগড়ার কলম দিয়ে মাটীর দোয়াত থেকে কালি নিয়ে কাব্য রচনায় ব্যাপৃত।

কিন্তু কবির খ্যাতি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়্‌ল—পল্লী থেকে জনপদে—জনপদ থেকে নগরে নগরে—অবশেষে রাজধানীতে এবং সর্ব্বশেষে রাজপ্রাসাদে সম্রাটের কাছে।

সম্রাট মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মন্ত্রী, কে এ কবি ? কোথাকার এ কবি ?"

মন্ত্রী উত্তর দিলেন—"মহারাজ কে এ কবি, তা আমরা কেউ জানি নে। কোন্ দূর পল্লী-প্রান্তের নির্জ্জন আবাসে ব'সে কবি তাঁর কাব্য রচনায় ব্যাপৃত।"

সম্রাট বললেন—"কিন্তু এ কবি-আত্মার সঙ্গে মিল ত দূর নির্জ্জন পল্লী-আবাসের বিজনতার রিক্ততার নয়। এ-কবি জীবনের কবি, ঐশ্বর্য্যের কবি ; শব্দ গন্ধ রূপ রসময়ী এই ধরণীর স্পন্দনে স্পন্দনে এর প্রাণ, ছন্দে ছন্দে এর গতি, তানে তানে এর মতি ;—এই ধরণীর আশা আকাঙ্ক্ষা গৌরব বিভব দিয়ে কবির জীবনের রস প্রবুদ্ধ।—না মন্ত্রী, এ কবির স্থান নির্জ্জন পল্লীবাসে নয়—এ কবির স্থান সম্রাটের সিংহাসনের পাশে। আমি বাহুবলেই শুধু এই পৃথিবীকে জয় করেছি, কিন্তু আসল জয় করেছে এ পৃথিবীকে এই কবি তার নিবিড় রসানুভূতি দিয়ে। আমার জয় স্থূল। আমি এই পৃথিবীর অধীশ্বর মাত্র। কিন্তু এই পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যকে প্রকৃত ভোগ করে এই কবি। এই কবির জয়ই জয়। এ-জয়ের পরাজয় কারো হাতেই নেই। মন্ত্রী, এই কবিকে সসম্মানে রাজসভায় নিয়ে আসা হোক্।"

মন্ত্রী বল্‌লেন—"যে আজ্ঞে মহারাজ।"

এক বিরাট শোভাযাত্রা সজ্জিত হ'ল। হয় হস্তী স্যন্দন, লোক লস্কর, পাইক প্রতিহারী, কাড়া নাকাড়া এক সঙ্গে জেগে উঠল। তারপর সেই শোভাযাত্রা নানা বর্ণের নানা আকৃতির কেতন উড়িয়ে সেই দূর পল্লীপ্রান্তে কবির আবাস-অভিমুখে যাত্রা করল।

কবি একদিন মুখ তুলে দেখেন তাঁর কুটীর-দুয়ারে এক বিরাট শোভাযাত্রা। যার ঐশ্বর্য্যে দ্যুতিতে চারিদিক ঝক্ ঝক্ করছে। ক্ষুদ্র পল্লীর বুকে এক বিরাট শোভাযাত্রা। যেন জীর্ণ কন্থার উপরে মণি-মুক্তা চুনি পান্নার কাজ। কবি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন !

মন্ত্রী অগ্রসর হ'য়ে তাঁর মাথা হেলিয়ে স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বললেন—"কবি, সম্রাট আপনাকে আহ্বান করেছেন।"

কবি আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন—"সম্রাট আমাকে আহ্বান করেছেন ! কেন ? কি জন্য ?"

মন্ত্রী বল্‌লেন—"কবি, এই নির্জ্জন পল্লী ত আপনার উপযুক্ত স্থান নয়। আপনি জীবনের কবি, ঐশ্বর্য্যের কবি,—সেই জীবন যেখানে শত ধারে সহস্র ধারে আপনাকে বিচ্ছুরিত ক'রে দিচ্ছে, সেই ঐশ্বর্য্য যেখানে সমস্ত রস সমস্ত সৌরভ সমস্ত গৌরব নিয়ে আপনাকে মূর্ত্ত ক'রে তুলেছে, সেইখানে আপনার স্থান ; আপনার স্থান রাজ-সভায়—সম্রাটের সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে। আসুন, সম্রাট অপেক্ষা ক'রে আছেন।"

কবি উন্মনা হলেন। তারপর সন্দেহাকুল চিত্তে তাঁর নল-খাগড়ার কলম ও মাটীর দোয়াতটী নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন ;—যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো বল্‌লেন—"চলুন।"

মন্ত্রী ব'লে উঠ্‌লেন—"কবি আপনার ঐ লেখনী ও মস্যাধার পরিত্যাগ করুন, ও আপনার উপযুক্ত নয়। সম্রাটের প্রাসাদে সুবর্ণময় লেখনী ও সুবর্ণের মস্যাধার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

কবি আরও উন্মনা হলেন। তারপর আপনার লেখনী ও মস্যাধারের দিকে শেষ একবার চেয়ে বুঝি একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে তাদের পরিত্যাগ করলেন। তারপর সেই বিরাট শোভাযাত্রার সঙ্গে রাজধানী-অভিমুখে যাত্রা করলেন।

* * * *

কবি রাজসভায় থাকেন। সম্রাট তাঁর কণ্ঠে বিজয়-মাল্য দুলিয়ে দেন—নাগরিকেরা তাদের অভিনন্দন জানায়—কিশোরী কুমারীরা বুঝি তাঁদের হৃদয়ের পূজা দেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

কিন্তু সেই জগতের আর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, যে-জগত তাঁর চোখের সামনে তাঁর কল্প-জগতে নির্জ্জন পল্লী-কুটীরে সত্য হ'য়ে উঠ্‌ত। বাস্তব জগতের বাস্তবতা তাঁর কল্প-জগতের কল্পনাকে দরিদ্র ক'রে তুলেছে। স্থুল জগতের ভোগ তাঁর সূক্ষ্ম জগতের ভোগানুভূতিকে ম্লান করে দিয়েছে। সুবর্ণময় লেখনী সুবর্ণের মস্যাধার যেমনকার তেমনি থাকে। তাতে কবির আঙুলের স্পর্শমাত্র পড়ে না।

সম্রাট এক-একদিন জিজ্ঞাসা করেন—"কবি, কাব্য-রচনা চল্‌ছে ?"

কবি নত মস্তকে অস্ফুটস্বরে উত্তর দেন—"না মহারাজ !"

বাইরের ঐশ্বর্য্য তাকে ভিতরের ঐশ্বর্য্য থেকে বঞ্চিত করেছে। ভোগকে আর কবির কাব্যের রূপ দেবার সামর্থ্য নেই।

এমনি ক'রে দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, বছর গেল। সহসা একদিন কবির চোখদুটী জ্বল্ জ্বল্ ক'রে উঠ্‌ল, তার হৃদ্‌পিণ্ডটা ধ্বক্ ধ্বক্ ক'রে উঠ্‌ল, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল, শোণিত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। কাব্যের প্রেরণা আবার তার দেহ মন প্রাণকে অধিকার করল। সুবর্ণময় লেখনী তার হাতে উঠ্‌ল—সুবর্ণ মস্যাধার থেকে কালি নিয়ে বকের পাখার মতো সুশুভ্র কাগজের উপর তার কাব্য-রচনা আবার আরম্ভ হ'ল।

কবির কাব্য-রচনা চল্‌তে লাগ্‌ল—ছত্রের পর ছত্র, কলির পর কলি, পত্রের পর পত্র—গো-মুখী থেকে উচ্ছ্বসিত ভাগীরথী-স্রোতের মতো—মাতৃস্তন্য থেকে উৎসৃষ্ট ক্ষীরধারার মতো—আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত অগ্ন্যুদ্‌গমের মতো—দুর্নিবার অনিবার্য্য, স্বতঃস্ফূর্ত।

অবশেষে রচনা শেষ হ'লে একদিন রাজসভায় এসে কবি বললেন—"মহারাজ, আমি কাব্য রচনার প্রেরণা আবার পেয়েছি—নব-কাব্য রচনা করেছি।"

সম্রাটের চোখ দুটী উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল; সোৎসাহিত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন—"কবি, শোনাও শোনাও তোমার নব কাব্য, তোমার নবীন সঙ্গীত।"

মন্ত্রী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন—তিনি বল্লেন—"মহারাজ-সম্রাটের জন্মদিন আগত। সেই জন্মোৎসবের দিন রাজ-সভায় সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজন্যবর্গের সম্মুখে কবির কাব্য পাঠের উপযুক্ত সময় ও স্থান।"

সম্রাট প্রশংসমান দৃষ্টিতে কবির দিয়ে চেয়ে বললেন—"সেই ভাল কবি—সেই ভাল। সম্রাটের জন্মোৎসব ও কবির কাব্যোৎসব এক সঙ্গে মিলিত হোক্। সম্রাটের দৈন্য ঘুচুক—কবি অমর হোক্।"

* * * *

সম্রাটের জন্মদিন। সারা সাম্রাজ্য ব্যেপে মহোৎসব। আবার তারই সেরা উৎসব রাজধানীতে। রাজপথে-পথে বিজয়-তোরণ বিজয়-স্তম্ভ—গৃহ-দ্বারে-দ্বারে কদলীবৃক্ষ, পূর্ণ-কুম্ভ, পুষ্পমাল্য;—নরনারী বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত হ'য়ে ইতঃস্ততঃ বিচরণ করছে, বালক বালিকা হাস্যে কলরবে চারিদিক মুখরিত ক'রে তুলেছে—সমস্ত মহানগরীর যেন একটা বিরাট আনন্দ-অবসর।

প্রকাণ্ড সুসজ্জিত রাজসভা। সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজন্যবর্গ ইন্দ্রসভায় দেবতাদের তুল্য শোভা পাচ্ছে। তাঁদের পরিচ্ছদের জ্যোতিতে অলঙ্কারের দ্যুতিতে সমস্ত সভা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে; তাঁদের মাথায় মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তার মালা ঝলমল্ করছে—যেন এই পৃথিবীর কোথাও দৈন্য নেই, দারিদ্র্য নেই,—একটীও দুঃখের রেখা নেই।

যখন রাজ-কুলগুরুর আশীর্ব্বচন শেষ হ'য়ে গেল, তখন সম্রাট কবির দিকে ফিরে স্মিতহাস্যে বললেন—"কবি, শোনাও এইবার তোমার কাব্য। কি রচনা করেছ এবার কবি ? কোন্ ঐশ্বর্য্যের কাহিনী ? কোন্ বিজয়-বার্ত্তার অভিনন্দন ? কোন্ সুখস্বপ্নের কমনীয় স্পর্শ ?"

সমস্ত রাজন্যবর্গ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠ্‌ল।

কবি ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদের নীচে থেকে আপনার নব রচিত কাব্য বের করলেন। তাঁর চোখ দুটী জ্বল্ জ্বল্ করছে—শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে। কবি কাব্যপাঠ আরম্ভ করলেন। সমস্ত রাজসভা ছবির মতো অচল—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যায় না।

কবি কাব্যপাঠ করতে লাগলেন।

কিন্তু এবার আর 'ঐশ্বর্য্যের' কাহিনী নয়,—এবারকার কাহিনী দুঃখের দৈন্যের দরিদ্রতার। শুন্‌তে শুন্‌তে সুখ বিস্বাদ হ'য়ে ওঠে, ভোগের জীবন দুর্বিসহ হ'য়ে ওঠে, ঐশ্বর্য্যকে আরামকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।

এবার আর সুখের সুন্দরের কাহিনী নয়। এবারকার কাহিনী কুশ্রী কদর্য্যতার—যা মনে প্রাণে দারুণ জুগুপ্সা জাগিয়ে তোলে, ঘা থেকে পড়া রক্ত পুঁজের মতো, গলিত শবদেহে পচা-মাংসের মধ্যে ক্রিমিদের ভোজনোল্লাসের মতো। যা শুনে স্বতঃই মুখ থেকে বেরিয়ে আস্‌তে চায়—রক্ষা কর, রক্ষা কর কবি—জীবনের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলো না।

এবার আর ভোগ ঐশ্বর্য্য আনন্দ নয়—এবার দৈন্য দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য।

কবি প'ড়ে চল্‌লেন……

এই ঐশ্বর্য্য সম্পদ থেকে বহু বহু দূরে—সাম্রাজ্যের কোন্ এক প্রত্যন্ত প্রদেশে এক ক্ষুদ্র পল্লী। তার নদীতে জল নেই, ক্ষেতে ক্ষেতে শস্য নেই, মাঠে মাঠে তৃণ নেই, পত্রবিরল বৃক্ষরাজি যেন মানুষের কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে; তারি ফাঁকে ফাঁকে যখন তপ্ত হাওয়া নিশ্বাস ফেলে তখন যেন কোন্ প্রেত-লোক থেকে একটা চাপা হো-হো অট্টহাসিতে চারিদিক শিউরে ওঠে।

কবি পড়ে চললেন……

ঐশ্বর্য্য সম্পদ থেকে বহু বহু দূরে—এক মৃত্যুর মতো শান্ত নির্জ্জন পল্লী। এখানে মানুষ বাস করে কি না বোঝা যায় না—কোনদিন একটু আনন্দের আভাসও এর আকাশ বাতাসকে চঞ্চল ক'রে তোলে নি, একটু হাসির রেখা একটু স্নেহের ইঙ্গিত এর কোনখান থেকেই কোন দিন জন্ম নেয় নি, একটু আশা আকাঙ্ক্ষা একটুকু সুখভোগ করবার ইচ্ছা, একটু সোয়াস্তি পাবার বাসনা এর কাছে ইন্দ্রসভায় অপ্সরী-পরিবেষ্টিত হ'য়ে সোমপানের তুল্য দুরাশা—ঐশ্বর্য্য সম্পদ থেকে বহু বহু দূরে সাম্রাজ্যের কোন্ প্রত্যন্ত প্রদেশে সেই ক্ষুদ্র পল্লীর বুকে।

কবি প'ড়ে চললেন……

ঐশ্বর্য্য সম্পদ থেকে বহু বহু দূরে নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তে একখানি জীর্ণ কুটীর—বর্ষায় বৃষ্টি রোধ করে না—গ্রীষ্মে সূর্য্য রোধ করে না;—সেই কুটীরের দাওয়ায় জীর্ণ ছিন্ন ময়লা ত্যানা দিয়ে তৈরি একটী ছোট্ট বিছানা—সেই বিছানা থেকে একটা চিম্‌সে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আস্‌ছে—তারি উপরে শোয়ান' একটা শিশু—হঠাৎ দেখ্‌লে বোঝা যায় না, কিন্তু ভাল ক'রে দেখ্‌লে বোঝা যায় যে একটা মানব-শিশুই—তার সরু সরু খ্যাংরা কাঠির মতো হাত পা—ডাগর পেট—বুকের পাঁজরার হাড়গুলো স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে যেন আপনাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে—তারি নীচে একটা ক্ষুদ্র হৃদ্‌পিণ্ড ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ করছে—শিশুর মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে—কয়েকটী মাছি তারি উপরে কখনও বসে, কখনও আবার ভন্ ভন্ ক'রে তারি আশে পাশে উড়ে বেড়ায়—অদূরে শিমুলগাছটার কঙ্কালের উপর ব'সে দুটী শকুন শকুনি…

একটী নারী, বুঝি এই শিশুটীরই মা—শতছিন্ন একখানি কাপড় পরণে—সেই ছিন্ন ফাঁক দিয়ে নারীর নগ্ন দেহ স্থানে স্থানে দেখা যাচ্ছে—কিন্তু সে নগ্নতা মনে কোন মোহ কোন লোভই জাগিয়ে তোলে না……হায় এমন নারীও সন্তানবতী হয়!

ভক্ ক'রে একটা শব্দ—শিশু বমি করেছে—নারী ত্রস্তে এসে দেখে একটা সাদা তরল পদার্থ শিশুর গণ্ড বেয়ে গ্রীবায় এসে পড়েছে—বুঝি তার আপনারই বুকের দুধ… …

সম্রাট কাঁপছিলেন—সর্ব্ব শরীর তাঁর থর থর থর থর ক'রে কাঁপছিল। সহসা সিংহাসন থেকে তিনি বেগে উঠে দাঁড়ালেন—উত্তেজিত কণ্ঠে কবির কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—"থামাও, থামাও কবি, তোমার কাব্যপাঠ;—এ কি দুঃস্বপ্ন, কোথায় পেলে এ দুঃস্বপ্ন?—কোথায় গেল সেই ঐশ্বর্য্যের গান, জীবনের জয়সঙ্গীত, সৌরভ-সৌন্দর্য্যের স্পর্শ—ফুলের গন্ধ, পাখীর গান, তরুণ তরুণীর প্রণয়-লীলা—কোথায় গেল সে-সব—এ কি দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করেছ কবি?"

কবি তাঁর কাব্য বন্ধ করলেন;—তারপর বললেন—"মহারাজ, পল্লীর রিক্ততার মাঝে ঐশ্বর্য্য আমার কল্পনার কাছে সত্য হয়ে উঠেছিল—আর এই ঐশ্বর্য্যের বাস্তবতার মাঝে আর এক জগত আমার কল্পনার কাছে সত্য হ'য়ে উঠেছে—মহারাজ, কল্পনার ধর্ম্মই চিরকাল আপনার পারিপার্শ্বিককে ছাড়িয়ে যাওয়া।"

সম্রাট সিংহাসনে অসহায় ভাবে ব'সে পড়লেন। তাঁর মাথা বুকের উপরে নমিত হ'য়ে গেল—তাঁর মাথার মুকুটের মণি-মাণিক্য যেন সব নিষ্প্রভ হ'য়ে উঠেছে। রাজন্যবর্গের শির সব নত হ'য়ে গেছে।

সবার চোখের সামনে যেন ভাসছে একটী অস্থিচর্ম্মসার শিশু আর একটী ক্ষুধাজর্জ্জর নারীমূর্ত্তি।

রাজন্যবর্গের হেঁট মুণ্ড আর ওঠে না।

উৎসব যেন একটা উপহাস—পৃথিবী একটা পরিহাস।

জীবন একটা বিভীষিকা।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম্‌-এ

কুহেলিকা-মাখা শীতের তামসী নিশীথের অবসানে, বঙ্গের সাহিত্য-তপোবনে মধুমাস তা'র অফুরন্ত মাধুরীর পশরা নিয়ে দেখা দিল। বাংলার আধুনিক সাহিত্য-গগনের কোণে 'প্রত্যুষের শুকতারা' অবোধ-বন্ধুর কবি বিহারীলালের আবির্ভাবের সঙ্গে 'প্রভাত সূর্য্য' বঙ্গদর্শনের ঋষি, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের দ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ-প্রতিভার সুবর্ণ-কিরণে দশদিক সমুজ্জ্বল করে' সাহিত্য-নিকেতন কল-কাকলী-মুখর করে তুল্লেন।

তারপর আর এক অপূর্ব্ব অভিনব আনন্দ-অনুষ্ঠানের উদ্বোধন। বঙ্গ-সাহিত্য-লক্ষ্মীর পূত বেদীতলে আপন-করা মনোহর ভঙ্গীতে ভারতীর আরতি-দীপ-সজ্জা-সমারোহের ভার নিয়ে অগ্রসর হলেন পুরোহিত বেশে বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ। সাথে এলেন অগণিত কুশল ব্রতী শিষ্য-জনমণ্ডলী। সকলেরই হৃদয়-যন্ত্রে বিচিত্র তন্ত্রীর ঝঙ্কার। কিন্তু সে সমস্ত সুর অতিক্রম করে' বাঁশীর একটি সুমিষ্ট তান ক্ষণেকের তরে কর্ণে মধু-ধারা বর্ষণ করে' চির-নীরব হয়ে গেল। তার সে মধুর মনমাতোয়ারা সুরে নিখিল মানব-অন্তর, অনন্ত অন্তরীক্ষ সবই মধুময় হয়ে উঠল। বংশীর মোহন স্বর-লহরীর সেই রূপ-দক্ষ যাদুকর আমাদের চির-আদরের সত্যেন্দ্রনাথ!

ভারতের একটি বৈশিষ্ট্য—এখানকার সমস্ত বড় কবিই আপনাকে দীনভাবে বিতরণ করে গেছেন বিশ্বমানবের সেবাব্রতে। কবে সেই কোন্ যুগে 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' উজ্জয়িনীর কবি সামান্য উডুপের সাহচর্য্যে তরঙ্গ-সঙ্কুল দুস্তর পারাবার পারাপার হতে চেয়েছিলেন, তারই প্রতিধ্বনি বারে বারে কত কবির মধ্যে পরিস্ফুট। সত্যেন্দ্রনাথের ধাতুতেও সে বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাই যখন তিনি লিখ্‌লেন,

> "প্রসন্ন মনে লও যদি সবে
> সোনা হয়ে যাবে এ ক্ষুদ কুঁড়া,
> দোষ ধর যদি রোষ কর মনে,
> কুবেরেরও হয় গরব গুঁড়া।"

তার মধ্যে অন্তরের সেই দীন ভাবটি নিহিত করে দিলেন। এই সুরটি বাংলার কবির একান্ত নিজস্ব।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ ওতঃপ্রোতভাবে চিরন্তন বিদ্যমান্। রবীন্দ্রনাথ একখানি অপ্রকাশিত পত্রে বলেছেন, "প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব করে'। এই নিত্য সঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণ লতা তরু গুল্ম —এই জল-ধারা—এই বায়ু-প্রবাহ—এই সতত ছায়ালোকের আবর্ত্তন, এই ঋতুচক্র—এই অনন্ত আকাশ-পূর্ণ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত-- পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্য্যায়,—এ সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্ত-চলাচলের যোগ রয়েছে। সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো।"

তাই 'ফুলের ফসলে'র কবির মুখবন্ধেই আমরা দেখতে পাই,

> "জোটে যদি মোটে একটি পয়সা, খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি'
> দুটী যদি জোটে তবে অর্দ্ধেকে ফুল কিনে নিও হে অনুরাগি!
> বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
> হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল দুনিয়ার মাঝে সেই ত' সুধা।"

কবি ফুল ভালবাসেন। বনের চির-উৎসারিত ছায়া, প্রকৃতির গভীর মায়া তাঁ'কে পাগল করে তুলেছে। তাই ঝোড়ো হাওয়ায় পাতার নাচনের মাঝে, শেফালি ফুলের ঝরার মত কোমল সুরে কবিতা এসে তাঁ'র প্রাণে ঝরে' পড়ে—নিস্তব্ধ দিনের ঝাউয়ের পাতায় শিশিরের ফোঁটার মত নিঃশব্দ নিস্পন্দ চরণে।

'যাকে আমরা অন্যায় পূর্ব্বক জড় বলে থাকি, সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে।' তারি আভাস কবির প্রাণে আল্‌গোছে এসে ছুঁয়ে যায়—

> "বনের যত মনের কথা সেই জেনেছে অন্তরে
> কিশোর কিশলয়ের আশা তারি সে সুর যন্তরে।
> শীতের গড়ে পাথর নড়ে মুহুর্মুহু হয় ঢিলা
> মোচন হ'ল বন্দী যত মুকুল কুহু মন্তরে।"

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত সত্যেন্দ্রনাথও জীবনে আলোকের ঝর্ণাধারার সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই তিনি লিখেছিলেন,

> "কুঞ্জ ভবনে লতার দুয়ারে পল্লব-দল নাচে
> অযুত-গ্রন্থি তন্তু লতার খুলিলে পরাণ বাঁচে।
> উন্মাদ ভালবাসা
> ছিঁড়ে দিলে তুমি বন্ধন ওগো কেড়ে নিলে তুমি আশা।"

আবার— "তরুণ প্রাণে নূতন প্রীতি
নূতন রীতি নূতন গীতি
বিভোল ধরা আপন হারা সোনার চোখে চায়;
বিশ্বসনে তরুণ মনে পুলক উছলায়।"

জগতের চির-সুন্দর শিশু মানবকে দেখে তাই কবির প্রাণ নেচে উঠল।

"ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে
দুনিয়াতে আজ নূতন মানুষ ভুলিয়ে নে রে ভুলিয়ে নে।"

একদিন এমনিতর আষাঢ়ের প্রারম্ভে ভারতের কবি জলভারাক্রান্ত মেঘ সন্দর্শনে বিরহী যক্ষের মুখে অতুলনীয় আকুল-করা ভাষা দিয়েছিলেন, তারি ঝরঝরাণি গানের মোহে সত্যেন্দ্রনাথের মনে স্বপ্ন এঁকে দিলে।

"ঝর্ঝর ঝর ঝরে বারিধারা শিথিলিত কেশ বেশ;
গর্জ্জন-ধ্বনি সহসা উঠিল ব্যাপিয়া সর্ব্ব দেশ।
এ-পারে বজ্র অট্ট হাসিল ও-পারে প্রতিধ্বনি,
সংজ্ঞা হারানু কি যে হ'ল পরে আর কিছু নাহি জানি।"

সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা আধুনিক বিংশ শতাব্দীর বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তরুণ বাংলার মনের কথা, তার আশা আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ উদ্দীপনা তাঁ'র লেখায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। মানব-সমাজের প্রাচীন কীর্ত্তি কাহিনীতেও তিনি কম শ্রদ্ধাবান নন্। তাঁ'র 'মমি' 'তাজমহল' প্রভৃতি রচনায় সে ইঙ্গিত প্রতিভাত!

জীবন ও মৃত্যু—সংসারের দুইটী বিভিন্ন প্রকাশ। আমাদের কবি এ উভয়ই পরিপূর্ণভাবে পান করে গেছেন। তাঁর বৈষ্ণব সাহিত্যিক আদর্শ—

"চোখের দাবী মিট্‌লে পরে তখন খোঁজে মন
তাই ত প্রভু সবার আগে রূপের আকিঞ্চন।"

—ইহার পাশেই আবার মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শুনতে পাই,

"জেনেছি মৃত্যুর স্বাদ না যেতে জীবন,
অশ্রুশূন্য হাহাকার।"

কবির অন্তর ছিল উদার, মহান্। তিনি ছিলেন সত্যের উপাসক। ক্ষুদ্র সামাজিক সঙ্কীর্ণতার আবেষ্টনে তাঁ'র হৃদয় হয়েছিল ব্যথিত, চিত্ত হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহী। নূতনের পূজারী কবি লিখেছিলেন,

"নিতি নব নব নব উন্মেষে নবীন জীবন করুক লীলা,
রসাল মুকুলে না লাগে যেন গো অকালে মেঘের দারুণ শিলা।"

শূদ্রজাতির অপমানে তাই তাঁ'র বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল,

"শূদ্র মহান্ গুরু গরীয়ান্, শূদ্র অতুল এ তিন লোকে;
শূদ্র রেখেছে সংসার ওগো শূদ্রে দেখো না বক্রচোখে।"

নিখিল মানবের সাহায্যে তিনি চেয়েছিলেন একটি পরিপূর্ণ বিরাট অখণ্ড জাতির সৃষ্টি করতে।

"জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি সে জাতির নাম মানুষ জাতি
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত একই রবি শশী মোদের ভাতি।"

কিন্তু তাই বলে' দেশমাতৃকার ধ্যান তিনি কখনও বিস্মৃত হন নি। দেশকে উদ্দেশ করে' তাঁ'র লেখা—

"সোনার কাঠি রূপার কাঠি ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি;
গৌরবিনী মূর্ত্তি ধর, শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গভূমি।"

তাঁর 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল' প্রভৃতি লেখা তো জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়ে গেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের বিষয়ে নূতন করে' কোন কথা আর বলব না, যেহেতু তাহা ধৃষ্টতার নামান্তর মাত্র হবে; কারণ তিনি ছিলেন ছন্দের রাজা। বাংলা ছন্দোজগতে যুগান্তরের সৃষ্টি যে তিনিই করে' গেছেন—এতো আর আজ নূতন কথা নয়। তাঁ'র 'পাল্কী চলে' 'চরকার গান' প্রভৃতি রচনা বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে চির-সমুজ্জ্বল হয়ে থেকে আমাদের 'মানসভোজের আয়োজনে' পরিতুষ্টি এনে দেবে।

হে বঙ্গসাহিত্যের বসন্তের কোকিল! তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার। তুমি ছিলে একটি বিকচোন্মুখ কমল-কলি—শুভ্র শারদ-প্রাতের অকালে-ঝরে-পড়া মমতা-মাখা একটি সুন্দর প্রসূন! ইংরাজ কবি কীট্‌স্‌এর মতই তুমি ছিলে—The inheritor of unfulfilled renown. কালের নিষ্করুণ কষাঘাতে মথিত না হ'লে কচি-কিশলয়-কোমল তোমার অন্তর-লতা কালে বিশাল বনস্পতিরূপে ফলে ফুলে কত না রস-পিপাসুর রস-ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করতে পারত'!

আজ এই শুভ স্মৃতি-বাসরে, সেই 'ভাব-ভুবনের প্রদীপ' কবিকে আমাদের আমাদের অন্তরের অন্তরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করি। *

* সাহিত্য-সেবক-সমিতির সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-বাসরে পঠিত।



পথ ভিখারী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রে অভিনয় প্রণালী)

পূর্ব্বেই বলেছি যে পরিচালকই হ'চ্ছেন চলচ্চিত্রের প্রধান শিল্পী—যিনি ছায়াধর যন্ত্রী, দৃশ্যকার, দাপ-দক্ষ (Light-expert) ও নট-নটীগণের সমবায়ে চিত্র-নাট্যের গল্পটিকে রূপায়িত ও প্রাণবন্ত করে তোলেন। সুপরিচালক বলে



ওয়ালেস্ বীরি (হাস্যরসের অভিনেতা)

যিনি খ্যাত হ'তে চান তাঁকে একাধারে চলচ্চিত্রাভিজ্ঞ, সাহিত্য-রসিক, সুর-সঙ্গীতজ্ঞ, আলোক-চিত্র-নিপুণ এবং শিল্প ও অভিনয় কলায় সুদক্ষ হ'তে হবে। এ ছাড়া তাঁকে আরও জানতে হবে—মনস্তত্বের গুহ্য-রহস্য, মানব-চরিত্র-বৈচিত্র্য, প্রকট ও প্রচ্ছন্ন রূপের সন্ধান, চিন্তার ব্যঞ্জনা, ভাবের অভিব্যক্তি, রস-লীলা, সুতনুর অন্তরালে



মারী ড্রেস্লার্ (হাস্যরসের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী)

অতনুর আবেদন—তবেই তাঁর ছবি বিশ্বের মনোরঞ্জন করবার যোগ্য হ'তে পারবে। চলচ্চিত্রের অভিনেতারা পরিচালকেরই হাতের ক্রীড়নক মাত্র! তিনি তাদের নিয়ে

যেমনটী খেলাবেন—তারা তেমনই খেলবে, তা'ব'লে তারা 'কাণাকড়ি' হ'লে চলবে না—তাদেরও 'খেলুড়ে' হওয়া চাই।

কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতা নিয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'রতে গেলে সে খেলোয়াড়ের পক্ষে বাজি মাৎ করা সম্ভব হবে না, কারণ, অনেকবার এ কথা বলেছি যে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের সঙ্গে চিত্রাভিনয়ের নানাদিক দিয়ে অনেক রকম প্রভেদ বিদ্যমান। কাজেই, চলচ্চিত্রের অভিনেতৃগণকে ছবির উপযোগী পৃথক্ অভিনয় প্রণালী শিখতে হবে, রঙ্গালয়ের অভিনয়-ধারাকে ধ'রে থাকলে চলবে না। রঙ্গালয়ের অবস্থান সম্পূর্ণ কৃত্রিম। সাধারণ কথা বলার যে কণ্ঠস্বর, রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের তার চেয়ে অনেক বেশী জোরে চীৎকার করতে হয়, নইলে দূরস্থ দর্শকেরা শুনতে পাবে না। হাত পা একটু বেশী রকম প্রসারিত ক'রে অস্বাভাবিক জোরে ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নাড়তে হয়। ওঠা-বসা ও চলা-ফেরার একটা বিশেষ রকম নাটকীয় ভঙ্গী থাকে। অর্থাৎ নাট্যমঞ্চে সব কিছুই দেখাতে হয় সাধারণ বা স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেকখানি বড়ো ক'রে এবং বেশী করে। কিন্তু, চলচ্চিত্রে কিছুই বাড়িয়ে বা বেশী ক'রে করবার দরকার হয় না। স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা ব'ললেই চলে; কারণ বিবর্দ্ধক যন্ত্র (Amplifier) ও উচ্চবাক যন্ত্রের (Loud Speaker) সাহায্যে সে কণ্ঠস্বর লক্ষ দর্শকের শ্রুতিগোচর করা চলবে। কাজেই—চলচ্চিত্রের অভিনয় প্রণালী অনেকখানি সহজ ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তিরই অনুসারি। ছায়াধর যন্ত্রের সামনে অভিনয় করবার সময় কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা ভুল। তা' ছাড়া চলচ্চিত্রাভিনয়ে অভিনেতাদের নড়াচড়া নাটকের দৃশ্য ও ঘটনানুযায়ী সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। ছায়াধর যন্ত্রের দৃষ্টির বাইরে এতটুকু পা' বাড়াবার তাদের অধিকার নেই। হঠাৎ টপ্ ক'রে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ানো বা মুখ ফেরানো কিম্বা ত্বরিত অস্থির পদে ঘনঘন এধার-ওধার পদচারণা করা চলচ্চিত্রাভিনয়ে চলবে না। মুখের ভাব কেবলমাত্র অধরোষ্ঠ ও আঁখিদ্বয়ের সাহায্যে



প্রণয়ে অসুখী (শ্রীমতী হেলেন্ টুয়েল্ভ্‌ট্রি ও শ্রীযুক্ত রবার্ট্ এম্স্)



রিচার্ড ডিক্স্ (চলচ্চিত্রের বহুগুণ সম্পন্ন অভিনেতা)

প্রকাশ ক'রতে হবে। সমস্ত মুখ বিকৃত করা নিষেধ। অকারণ কোনো রকম অঙ্গভঙ্গী করা চলচ্চিত্রাভিনয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অনেকের ধারণা ছবিতে অভিনয় ক'রতে হ'লে বুঝি অনবরত মুখভঙ্গী ক'রতে হয়। এ ধারণা



চার্লি চ্যাপলিন (সকরুণ হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা)

তাঁদের সম্পূর্ণ ভুল। বাংলা ছবিতে একাধিক অভিনেতাকে প্রায়ই এ ভুল ক'রতে দেখা যায়। ফলে তাঁদের অভিনয় হ'য়ে ওঠে যেন আনাড়ীর ভাঁড়ামী! ছবির পর্দ্দার উপর অত্যন্ত হাস্যাস্পদ এবং অশ্রদ্ধেয় হ'য়ে ওঠেন তাঁরা দর্শকের সামনে। অতি-অভিনয়ের দোষ পর্দ্দায় যেমন ক'রে চোখে পড়ে রঙ্গমঞ্চে তেমন পড়ে না, সুতরাং চপল অভিনেতাদের উচিত ছায়াধর যন্ত্রের সামনে সংযত হ'য়ে অভিনয় করা।

চিত্রাভিনয়ে কথা বলবার সময় ঠোঁট যাতে খুব বেশী না নড়ে সে দিকেও মনোযোগী হওয়া দরকার। ছবিতে যত বেশী কম কথা কওয়া হয় ততই ভালো। রঙ্গমঞ্চে যেমন—কথাই হ'লো অভিনেতার একটা প্রধান সম্পদ, ছবিতে তেমনি বেশী কথা বলাই হ'চ্ছে অভিনেতার মস্ত বড় বিপদ! বেশী ঠোঁট নাড়লেই ছবিতে মুখ বিশ্রী হ'য়ে ওঠে এবং সবাকযন্ত্রের ভিতর দিয়ে ঠিকৃরে আসা বেশী কথা কোনো মতেই শ্রুতিমধুর হ'তে পারে না, এটা যেন প্রত্যেক চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা স্মরণ



রোণাল্ড্ কোলম্যান ও লিলিয়ান গিশ্
(চলচ্চিত্রের প্রসিদ্ধ নটনটী)

রাখেন। কথা কওয়া ছবিতে অল্প দু' চারটি বাছা বাছা ভালো ভালো কথা ঠিক তাল বুঝে লাগাতে পারলে সে কথা-



চোখের ভাষা—(ক) বিজয়িনী (ক্লারা বো)



(খ) রহস্যময়ী (গ্রেটা গার্ব্বো)

কওয়া ছবির দাম হ'য়ে ওঠে লাখটাকা! গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত গানে ও কথায় ভরা ছবির চেয়ে স্বল্প-বাক চলচ্ছবি যে অধিকতর জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে



(গ) মোহিনী (মার্লানা ডিয়েট্রিক্)



(ঘ) সুনয়নী (মীর্ণা লয়)



(ঙ) চতুরা (ক্যে ফ্রান্সিস্)



(চ) সুন্দরী (ক্ল্যডিট্ কোলবার্ট)

তার পরিচয় আমরা 'মরক্কো' প্রভৃতি একাধিক ছবিতে পেয়েছি।

রঙ্গমঞ্চে যেমন অভিনেতাদের পর্দ্দায় পর্দ্দায় বক্তৃতার সুর চড়াতে হয় নামাতে হয়, চলচ্চিত্রে সে রকম ক্রমোচ্চ গ্রামে স্বর তোলা বা ফেলার প্রয়োজন নেই। ছবিতে অভিনয় করবার সময় যে কথা গুলি বলবার সেগুলি বেশ সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে, একটু বিলম্বিত ল'য়ে এবং প্রত্যেক কথাটির পর ঈষৎ বিরাম দিয়ে পরের কথাটি উচ্চারণ করলে সবাক্ যন্ত্রে সে কথা খুব ভালো ও স্পষ্ট ওঠে। তবে, একটা কথা এখানে বলা উচিত যে সকল অভিনেতার কণ্ঠস্বরই সবাক যন্ত্রের উপযোগী নয়। যাদের গলা শব্দ সম্প্রসারণ যন্ত্রে বিশ্রী শোনায় তাদের উচিত নয় মুখর ছবিতে অভিনয় করা।

হাত পা নাড়া সম্বন্ধেও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ছবির পর্দ্দার অভিনয়ের ঐ একই প্রভেদ। জোরে বা বিদ্যুৎবেগে নড়া চড়া ও হাত পা নাড়া চাড়া একেবারে নিষেধ! নাচের ভঙ্গীতে চলা,—কাঁধ কাঁপানো, দু'হাত অকস্মাৎ সম্পূর্ণ প্রসারিত ক'রে দেওয়া, হঠাৎ হাত তোলা বা আঙুল পাকানো— রঙ্গমঞ্চে এসব ভঙ্গী যে কোনো অভিনেতাকে দর্শকদের কাছে সুদক্ষ নট ব'লে পরিচিত ক'রে দেবে, কিন্তু ছবির পর্দ্দায় এ সব প্যাঁচ দেখাতে গেলে ঠকতে হবে। কারণ, তাঁদের এই সব সবেগ গতি ছবিতে ঠিক যেন ঝাঁকুনি বা খিঁচুনি হ'য়ে উঠবে।

ছবির পর্দ্দায় ভাব প্রকাশের সব চেয়ে প্রশস্ত উপায় হচ্ছে অভিনেতার দুই চোখ। বেশ ভাসা ভাসা টানা দুটি ডাগর চোখে ভাবের সাগর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে পারে। চিত্রাভিনেতার সব চেয়ে বড় যোগ্যতা হ'চ্ছে —তার ডাগর দুটি চোখ, যার গভীর দৃষ্টি মুখের ভাষার চেয়েও মুখর, সুচ্ছন্দ কাব্যের চেয়েও মধুর। হোলিউডের একাধিক চিত্রগড়ে ছবির জন্য অভিনেতৃ নির্ব্বাচনের সময় নট-নটীদের মুখে এমনভাবে রুমাল বেঁধে দেওয়া হয় যে কেবলমাত্র তার

চোখ দুটি দেখা যাবে। তার পর, তাকে পরীক্ষা করা হয় যে, সে কেবলমাত্র চোখের সাহায্যে দুঃখ, বেদনা, আনন্দ,



নটদম্পতী (শ্রীমতী রুথ্ চ্যাটার্টন ও শ্রীযুক্ত রাল্ফ্ ফর্বস)



মার্লানা ডিয়েট্রিক্ ('মোহিনী' অভিনেত্রী)

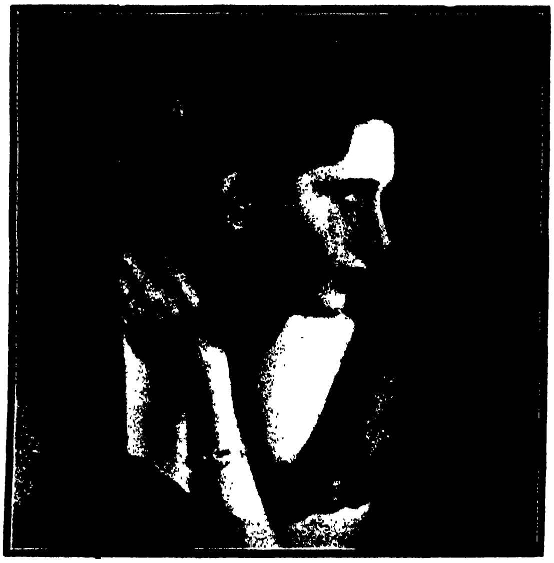
ক্রোধ, হিংসা, লোভ, ভয়, দুর্ভাবনা প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ ক'রতে পারে কিনা। যিনি এ পরীক্ষায় যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন তাঁর ভবিষ্যৎ চিত্রজগতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রঙ্গালয়ে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁরা যখন ছবির পর্দার অভিনয় পদ্ধতির সঙ্গে নাট্যমঞ্চের অভিনয় প্রণালীর পার্থক্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন চিত্রাভিনয়েও তাঁরা যশস্বী ও জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠেন; অবশ্য যদি তাঁদের আরও কতকগুলি অতিরিক্ত গুণ থাকে। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রে প্রসিদ্ধিলাভ করবার জন্য ভালো ঘোড়সওয়ার হবার প্রয়োজন নেই, মোটর চালাতে বা সাইকেল চড়তে না শিখলেও চলে; সাঁতার জানা অত্যাবশ্যক নয়, বন্দুক ছোঁড়ায় ও সব রকম খেলায় ওস্তাদ হবার প্রয়োজন হয়না, কিন্তু চলচ্চিত্রে একজন নামজাদা সু-অভিনেতা হ'তে হ'লে তাঁকে উল্লিখিত সব রকম গুণের অধিকারী হ'তে হবে। কারণ, চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট রঙ্গমঞ্চের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। খোলা মাঠে, নদীর তীরে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে, পথে



ম্যরিস্ শিভেলিয়ার (প্রসিদ্ধ ফরাসী গায়ক অভিনেতা)

যেখানে সেখানে নাটকের নির্দ্দিষ্ট অবস্থান ও ঘটনা অনুযায়ী গল্পের নায়ক নায়িকা বা সঙ্গী ও অনুচরদের হয়ত ঘোড়ায় পিঠে উঠে ছুটতে হয়, সাইকেল চ'ড়ে দৌড়তে হয়,—সাঁতার কেটে নদী পার হ'য়ে পালাতে হয়, বন্দুক বা রিভলবারও



ক্যে ফ্রান্সিস্ ('চতুরা' অভিনেত্রী)

ব্যবহারের দরকার হয় ; কাজেই চলচ্চিত্রে সুঅভিনেতা হ'তে হ'লে এসবও জানা খুবই দরকার।

চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়া, তেতলার ছাত থেকে



মিলিত শিল্পী সম্প্রদায় (United Artists Corporation. ডগলাস্, মেরী, চাপলীন ও গ্রিফীথ্)

ঝাঁপ খাওয়া, জলঝড়ে সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজডুবি হওয়া, উড়ো জাহাজ থেকে ঠিক্‌রে পড়ে যাওয়া—এসব ছবির অধিকাংশই যে 'ছায়াধর' যন্ত্রের কৌশলে ও আলোক চিত্র শিল্পীর হাতের কায়দায় সুসম্পন্ন হয় এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি, তাহ'লেও, ছবিতে নটনটীদের অনেক সময় এমন সব দৃশ্য অভিনয় ক'রতে হয় যা মোটেই নিরাপদ নয়। ঘোড়ার



জন ব্যারিমোর (অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা) রঙ্গমঞ্চ হইতে চলচ্চিত্রে উদয়

উপর থেকে পড়ে যাওয়া—ভালো ক'রে না শিখলে অক্ষত থাকা সম্ভব নয়। নৌকোর ছই থেকে নদীর জলে ঝাঁপ খেয়ে প'ড়তে হলে সাঁতার জানা থাকা চাই। কারণ, ছায়াধর যন্ত্র এখানে অভিনেতাকে খুব বেশী সাহায্য ক'রতে পারে না। চলন্ত মেল ট্রেন থেকে একজন লোক ধাঁ ক'রে দরজা খুলে বা জানলা গলে লাইনের ধারে লাফিয়ে পড়লো বা ট্রেনের চালের উপর উঠে পড়ে এক গাড়ী থেকে আর এক গাড়ীর মাথায় টপকে চলে গেলো দেখে আমরা অবাক্ হয়ে ভাবি—লোকটা কী দুঃসাহসী! একটু প্রাণের ভয় নেই! আসলে এ ছবি যখন নেওয়া হয় তখন ট্রেন মোটেই ছোটেনা,—ধীরে ধীরে চলে! কিন্তু ছায়াধর যন্ত্রে তার—ছবিটা নেওয়া হয়—খুব তাড়াতাড়ি এবং পর্দ্দার উপর সে ছবি ফেলাও হয়—খুব তাড়াতাড়ি। কাজেই আমরা দেখি চলন্ত মেল ট্রেন একেবারে বিদ্যুৎবেগে ছুটছে—

আর তারই ভিতর থেকে একটা লোক মরিয়ার মতো জীবন তুচ্ছ ক'রে লাফিয়ে পড়লো !

ছায়াধর যন্ত্রের সামনে অভিনয় করতে নামবার আগে



ক্লডিট্ কোলবার্ট ('সুন্দরী' অভিনেত্রী)

প্রত্যেক অভিনেতার উচিত খুব ভালো ক'রে তাঁর ভূমিকার মহড়া দেওয়া ; যে পর্য্যন্ত না তাঁর অভিনয় নিঁখুত হয় সে



মীর্ণা লয় ('সুনয়নী' অভিনেত্রী)

পর্য্যন্ত ছায়াধর যন্ত্রের সম্মুখীন হওয়া অন্যায়, কারণ, সে সময় কোথাও সামান্য একটু ভুল করলেই সেই ক্রটি সংশোধনের জন্য অনেকখানি মূল্যবান ছায়াবাহন বাতিল হ'য়ে যাবে এবং সেই অংশের চিত্র আবার তোল্‌বার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় ও অযথা সময় নষ্ট হবে। কোম্পানী এই ক্ষতির জন্য তাঁকে দায়ী করতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে প্রত্যেক ছায়াচিত্রাভিনেতার বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।



সুতনু অভিনেত্রী (শ্রীমতী ডোলোরেস্ ডেলরায়ো)

কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার এতটা সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়না। আজ রাত্রে তাঁর অভিনয়ে কোথাও কোনো ক্রটী হ'লে পরের রাত্রে সেটা তিনি শুধ্‌রে নিতে পারেন—সম্পূর্ণ বিনা খরচেই। তা'ছাড়া রঙ্গমঞ্চে কোনো

দৃশ্যের অভিনয়-'কাল' সম্বন্ধে তেমন কিছু বাঁধাবাঁধি কড়া নিয়ম নেই। আজ যে দৃশ্য অভিনয় করতে কুড়ি মিনিট লেগেছিল কাল সে দৃশ্য অভিনয় ক'রতে যদি আধ ঘণ্টা সময় লাগে, তাতে এমন কিছু আসে যায়না, অভিনয় ধারাও প্রতিরাত্রে বদলাতে পারে। কিন্তু চলচ্চিত্রে মহলার সময়ই প্রত্যেক দৃশ্যটির যাবতীয় কার্য্য এবং অভিনয়-'কাল' একেবারে ঘড়ী ধরে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া থাকে, কাজেই ছায়াধর যন্ত্রের সামনে ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই অভিনয়ের যাবতীয় খুঁটিনাটি শেষ করা দরকার, নইলে পরের দৃশ্যগুলি সমস্ত বেবন্দোবস্ত হ'য়ে পড়বে।



ভিক্টর্ ম্যাক্ল্যাগ্লেন্ ও ডোলোরেস্ ডেলরায়ো
(Loves of Carmen চিত্রে)

আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে আজকাল অনেকেই চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জেনেই ওস্তাদ হ'য়ে উঠতে চান্। কোনো বিষয়ে সাধনা না থাকলে যে সিদ্ধিলাভ করা যায়না এ সত্য বিস্মৃত হ'য়ে তাঁরা নির্ব্বোধ ধনীর অর্থে নিজেদের খেয়াল খুশী চরিতার্থ করেন। ফাঁকি দিয়ে বিনা পরিশ্রমে সবজান্তা ব'নে বাজীমাৎ ক'রতে চেষ্টা করেন। ফলে তাঁদের পরিচালনায় যে ছবি তৈরী হয় তার জীবন সপ্তাহকালের মধ্যেই নিন্দার কলঙ্ক-পঙ্কে ও ব্যর্থতার মধ্যে নিঃশেষিত হ'য়ে যায়। চলচ্চিত্রকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলবার জন্য চাই এর পরিচালকের সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা ও সাধনা এবং তাঁর প্রাণপাত পরিশ্রম। বহুচিন্তিত ও বহু বিনিদ্র রজনীর পরিকল্পিত নানা খুঁটি নাটির যোগাযোগে, সজ্জা ও অলঙ্কারের সযত্ন সমাবেশে এবং আলোকপাত ও অভিনয় ভঙ্গীর সুনির্দ্দেশের উপরই ছবির পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করে। প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য হ'চ্ছে পরিচালককে এ বিষয়ে সকল দিক দিয়ে সাহায্য করবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করা।

মূক ছবির অভিনেতাদের একটি কথাও না ব'লে নিঃশব্দে মনের ভাব ব্যক্ত ক'রতে হয় ব'লে অনেকেই ভাবেন একটু বেশী রকম মুখভঙ্গী করতে হবে নিশ্চয়, কিন্তু এরূপ মনে করা অত্যন্ত ভুল। কি মূক অভিনয়ে—কি মুখর অভিনয়ে যে কোনো ছবিতেই অতিরিক্ত মুখভঙ্গী ও অঙ্গ সঞ্চালন অভিনেতার পক্ষে ক্ষতিকর। ছবিতে বরং খুব সংযত ও ধীরভাবে অভিনয় করাই সু-অভিনেতার কর্ত্তব্য। কথা ব'লবে তাঁদের চোখ, কথা বলবে তাঁদের মুখের ভাব, তাঁদের চলা বসা ওঠা দাঁড়ানো। মনে রাখতে

হবে তাঁদের হাসি অশ্রুটি পর্য্যন্ত রাশ-বাঁধা, ওজন করা! প্রত্যেক নড়া-চড়াটুকুও গণ্ডী কাটা! তাঁদের যা কিছু ভাব প্রকাশ তা শুধু আভাসে ইঙ্গিতে। ইংরাজীতে যাকে বলে Suggestive Action.

নীরব ছবিতেও নায়ক নায়িকারা মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত কথা বলে। সে কথার শব্দ নেই বটে, কিন্তু ভাষা আছে। তা' দর্শকেরা কাণে শুনতে পায়না, কিন্তু প্রাণে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে। দু'খানি ঠোঁট একটু কেঁপে উঠে, অল্প নড়ে কি কথা ব'ললে তার প্রত্যেকটি হরফ্ দর্শকেরা লুফে নিতে পারে যদি সেই দৃশ্যে সেই ঘটনায় সেই অবস্থায় যে কথাটি বলা উচিত ঠিক্ সেই কথাটিই অভিনেতার মুখে বসিয়ে দেওয়া হয়। পরিচালকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, রসবোধ ও অভিজ্ঞতার উপরই এই সময়োপযোগী বাক্য-নির্ব্বাচন করা নির্ভর করে। চিত্রনাট্য রচয়িতাও এ বিষয়ে খানিকটা সাহায্য ক'রতে পারেন।

চিত্র-জগতে সু-অভিনেতা হ'তে হ'লে তাঁকে অভ্যাস করতে হবে যথাসাধ্য কম কথা বলে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করা। মুখে কোনো কথা না বলেও যিনি কেবল চোখ-মুখের ভাবভঙ্গীতেই অনেক কিছু আমাদের ব'লতে ও বোঝাতে পারেন চলচ্চিত্রে তাঁর স্থান যে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সুনির্দ্দিষ্ট সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই। এই চোখ মুখের ভাব ভঙ্গীকে মুখের কথার চেয়েও মুখর ক'রে তুলতে হ'লে সে জন্য সযত্নে সাধনা করতে হবে। একখানি বড় আয়নার সামনে নিজের মুখে রুমাল বেঁধে কেবলমাত্র চোখ দু'টি বার করে রেখে চেষ্টা করতে হবে যাতে শুধু চোখের সাহায্যেই ভয়, সন্দেহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, আনন্দ, বেদনা, ক্লান্তি, উৎসাহ, উত্তেজনা, দয়া, মায়া, সহানুভূতি, সান্ত্বনা, স্নেহ, প্রেম, আশা, নিরাশা প্রভৃতি মনোভাব ব্যক্ত করা যায়। সাধনাই মানুষের চেষ্টাকে জয়যুক্ত ক'রে তোলে। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধনা ক'রতে পারলে মানুষ অনেক কিছু শক্তি ও গুণের অধিকারী হ'তে পারে যা দুর্লভ ও অনন্যসাধারণ।

চোখের গড়ন বা আকৃতি আঁখি পল্লবের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম দেখায়—এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটুকু আজ আর কারুর অবিদিত নেই। এখন, কোনো উৎসাহী তরুণ অভিনেতা যদি কিছুদিন সাধনা ও অভ্যাসের দ্বারা ইচ্ছামত এই আঁখি পল্লবের অবস্থান পরিবর্ত্তন ক'রে ফেলতে সক্ষম হ'ন, তাহ'লে যে কোনো মুহূর্ত্তে তিনি তাঁর মুখের চেহারাও বদলে ফেলতে পারবেন। একজন অভিনেতার পক্ষে—বিশেষ ক'রে চলচ্চিত্র অভিনেতার পক্ষে এটা যে একটা মস্ত গুণ এ কথা বলাই বাহুল্য; কারণ টানা চোখ, ড্যাবরা চোখ, ভাঁটা-চোখ, বসা চোখ, ভাসা চোখ, পায়রা চোখ, হরিণ চোখ, এমন কি পদ্ম আঁখি ও খঞ্জন লোচনও যদি একই মানুষ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজেরই আঁখি পল্লবের পেশী সঙ্কুচন ও প্রসারণের দ্বারা এত বিভিন্ন রূপান্তর ঘটাতে পারেন, তাহ'লে চিত্রাভিনয়ে পরিচালকের ও অভিনেতার উভয়েরই সেটা অনেক সুবিধায় ও কাজে লাগে।

চিত্রাভিনয়ের সময় বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছুর দিকে ঝুঁকে দেখা বা ভ্রূ-কুঁচকে চাওয়া উচিত নয়। যাদের চোখ খারাপ তারাই অমনি ক'রে চেয়ে দেখে। চিত্রগড়ের তীব্র বৈদ্যুতিক আলো, বা বহির্দৃশ্যে মুকুরে প্রতিফলিত সূর্য্যালোকের দীপ্তির মধ্যে অনেকেই সহজভাবে ও পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে পারেনা! এটাতে অভ্যস্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত কোনো অভিনেতারই উচিত নয় ছায়াধর যন্ত্রের সম্মুখীন হওয়া।

দু'জন লোকে যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে তখন দূর থেকে তাদের চোখ মুখের ভাব ও হাতমুখ নাড়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি বোঝবার চেষ্টা করা যায় যে তারা কি বলাবলি ক'রছে তাহ'লে ভাব প্রকাশের ভঙ্গী সহজেই আয়ত্ত হ'তে পারে। বন্ধুমহলে এটা পরীক্ষা ক'রে দেখা মন্দ নয়, কারণ, তাহ'লে বুঝতে পারা যাবে যে তাদের কথা না শুনেও তাদের বক্তব্যটা তুমি ঠিক আন্দাজ ক'রতে পেরেছো কিনা।

নিয়মিত চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই কেবলমাত্র মুখের সাহায্যে ভাবের অভিব্যক্তি আয়ত্ত করা যায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি যদি ভাবো তোমার জীবনের কোনো বিগত বেদনা বা আনন্দের স্মৃতি যা তোমার প্রাণকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, চিত্তকে সঘনে দোলা দেয় – লক্ষ্য কোরো তোমার মুখের ভাবের কি পরিবর্ত্তন ঘটে। সে সময় কিন্তু চেষ্টা ক'রে মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করবার প্রয়াস পেয়োনা। আপনা-আপনিই মুখের যে স্বতঃ পরিবর্ত্তন ঘটবে, তারই রূপটি মনের মধ্যে

এঁকে রেখে দেবে। পরে, সেই মুখভাবটি আয়নার সামনে পুনঃপ্রকাশের চেষ্টা করবে। এ সাধনা নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। এতে একাগ্রতা আনা দরকার, অথচ আত্মহারা বা তন্ময় হওয়া চলবেনা। নিজের দেহ মনের উপর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ নিজের হাতের মধ্যে থাকা চাই, অথচ ভাবের প্রবাহ যাতে তোমাকে অবাধে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেদিকেও সচেতন থাকা দরকার। এমনি ক'রে নানা ভাবান্তর প্রকাশে অভ্যস্ত হ'তে হবে। শুধু তাই নয়, যে কোনোও মুখভাবকে ইচ্ছামত বহুক্ষণ ধ'রে রাখতেও শেখা চাই। কারণ চিত্রনাট্যের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালকের ইঙ্গিতে এবং আলোক চিত্রকরের প্রয়োজনে হয়ত একাধিক দৃশ্যের সুস্পষ্ট ছবি, বা 'নিকট পটে'র জন্য কোন্ সময় হঠাৎ হুকুম হবে Hold it! বা—"অমনি থাকো!" তখন আর এতটুকু নড়চড় করা চলবেনা। মর্ম্মর মূর্ত্তির মত স্থির হ'য়ে থাকতে হবে সেই ভাবটি মুখে নিয়ে!

চলচ্চিত্রাভিনেতার পক্ষে শুধু ভাবপ্রকাশ, ভাব পরিবর্ত্তন ও ভাব ধারণে অভ্যস্ত হলেই চলবেনা, ভাবকে বা ভাব-প্রকাশকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে গভীরতর ও নিবিড়তর ক'রে তুলতেও শেখা চাই। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বললুম এই জন্য যে চলচ্চিত্রে সময় সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক ও সজ্ঞান থাকা প্রত্যেক অভিনেতার প্রধান কর্ত্তব্য। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপর একটি দৃশ্য অভিনয় হ'তে হয়ত' পনেরো মিনিট সময় লাগে কিন্তু, সেই দৃশ্যই চলচ্চিত্রে হয়ত এক মিনিটেই শেষ ক'রে নিতে হয়। কারণ, চলচ্ছবি যে চিত্রবাহনে তোলা হয় তার দৈর্ঘ্যের একটা পরিমিত সীমা আছে। মহলা দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দৃশ্যটি অভিনয় হ'তে কতক্ষণ লাগে সেই সময়ের একটা বাঁধা ধরা তালিকা করে দেখা হয় সেটি ক' Reel (চিত্রবাহন গুটিয়ে রাখা কাঠিম) অর্থাৎ ক'হাজার ফুট ছবি হতে পারে। এক কাঠিমে প্রায় হাজার ফুট চিত্রবাহন গোটানো থাকে। এই হাজার ফুট ছবি পর্দ্দায় ফেলে দেখাতে কুড়ি মিনিটের বেশী সময় লাগেনা। কাজেই, চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য এক মিনিট বড়জোর দেড় মিনিটের বেশী দর্শকের চোখের সামনে থাকেনা। সুতরাং একথা বোধহয় আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে চলচ্ছবির পক্ষে প্রত্যেক মিনিট কেন, প্রত্যেক সেকেণ্ড—এমন কি প্রত্যেক সেকেণ্ডের প্রত্যেক অংশটুকু পর্য্যন্ত সময় অতি মূল্যবান। কোন্ অভিনয় পর্দ্দায় কতটুকুর মধ্যে শেষ হ'য়ে যাবে এ ধারণা ও জ্ঞান যে অভিনেতার থাকে তিনি তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য ও ভাবাভিব্যক্তি অনেকখানি তাঁর নিজের দখলের মধ্যে রাখতে পারেন।

সময়ে কুলিয়ে উঠছেনা দেখলে পরিচালক বাধ্য হ'য়ে অনেক দৃশ্যের অভিনয় সংক্ষিপ্ত ক'রে দেন, অনেক টুকিটাকি ব্যাপারও বাদ পড়ে যায়। পুনঃ পুনঃ মহলা দিয়ে সে দৃশ্য যতক্ষণ না ঠিক সময়ের মধ্যে খাপ খায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাটাকুটি ও অদলবদল চলতে থাকে, তার পর সেটা ছবিতে তোলা হয়। বাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে চড়া, বা গাড়ী থেকে নেমে বাড়ী ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা এসব ব্যাপারের জন্য সময় নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার দরকার হয়না কারুরই, কিন্তু, গ্যাঁড়া-তলার বস্তির একটা নিভৃত আড্ডা-ঘরে গোপনে জনকয়েক বদ্‌মায়েস্ একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র কর'ছে বা কোনো একটা পোড়ো বাগানবাড়ীর ঘরে জনকতক জালিয়াৎ লুকিয়ে বসে একজন নামজাদা বড়লোকের নামে উইল জাল করছে বা চেক জাল ক'রছে—এসব দৃশ্যের ছবি তোলব'র আগে প্রত্যেক খুঁটিনাটির ভালো করে মহলা দিয়ে সময় ঠিক ক'রে নিতে হয়। কাজেই এসব স্থলে পরিচালক এবং অভিনেতা উভয় পক্ষেরই একটু মাথা খেলানো চাই; যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাপারটা শেষ হতে পারে, অথচ দৃশ্যের গুরুত্ব কিছুমাত্র না ক্ষুণ্ণ হয়।

চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার সময় পরিচালকের বিশেষ আদেশ ব্যতীত কোনো অভিনেতারই উচিত নয় ছায়াধর যন্ত্রের দিকে সোজা চোখ ফিরিয়ে দেখা। ছায়াধর যন্ত্র যে সামনেই খাড়া করা রয়েছে এবং তারই সামনে যে সমস্ত দৃশ্য অভিনয় হচ্ছে এটা সর্ব্বদা খেয়াল থাকা চাই বটে, কিন্তু পরিচালক না বল'লে সরাসরি সেদিকে চেয়ে দেখা একেবারে নিষেধ!

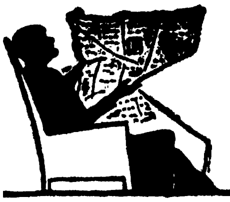
অভিনয় দক্ষতা হ'চ্ছে মানুষের একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত গুণ, যার নিয়ত সাধনা ও অনুশীলন তাকে ক্রমে একজন নিপুণ নট-শিল্পীতে পরিণত করে। নট-প্রবৃত্তি যার মধ্যে অন্তর্নিহিত নেই, সে শতচেষ্টা সত্ত্বেও কোনোদিনই একজন

সু-অভিনেতা ব'লে খ্যাত হ'তে পারেন না। কবি, শিল্পী নট, এরা সব 'জন্মায়'—কারখানায় 'তৈরি' হয় না। তবু, অভিনয়কলা একটা বিদ্যা এবং সেই বিদ্যা অর্জ্জন ক'রতে হ'লে এর কতকগুলি প্রাথমিক ও উচ্চপাঠ আছে যা সকলকেই ভালো ছেলের মত মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয় ও শিখতে হয়।

যে কোনো ভূমিকা অভিনয়ের জন্ত নির্ব্বাচিত হলে অভিনেতার প্রধান কর্ত্তব্য সেই চরিত্রটি ভালো ক'রে বুঝে নিয়ে তার সঙ্গে নিজের একাত্ম হ'তে চেষ্টা করা। তাহ'লে আর প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারের জন্ত প্রতিবার শিক্ষকের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয় না। ধরুন, যদি তাঁকে পল্লীগ্রামের পাঠশালার 'গুরুমশাই' সাজতে হয়, বা মস্‌জেদের মক্তবের মৌলবী সাজতে হয়, কিম্বা ভক্ত পরিবারের বৈষ্ণব 'গুরুদেব' অথবা সওদাগরী হৌসের জাঁদরেল্‌ মুৎসুদ্দি, বড়বাবু কি পাটের দালাল সাজতে হয় তাহ'লে এই ধরণের লোকের চরিত্র অনুধাবন ক'রে একটা স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত রূপ খাড়া ক'রে তোলাই হ'চ্ছে সু-অভিনয়ের সহজ উপায়। এমনি করেই ডাক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টার, কবিরাজ, স্কুলমাষ্টার, চাষা, জমীদার, কেরাণী, ভিখারী, চোর, ডাকাত, খুনে, লম্পট, মাতাল, ভৃত্য, সরকার, গোমস্তা, নায়েব, দেওয়ান, মুটে, মজুর, গাড়োয়ান, দারোগা প্রভৃতি যে কোনো ভূমিকা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন করে অভিনেতা তাঁর অভিনেয় চরিত্রটিকে দর্শকদের সামনে আসলরূপেই পরিস্ফুট ক'রে তুলতে পারেন।

মোট কথা, চলচ্চিত্রে অভিনয় হওয়া উচিত একেবারে যতদূর সম্ভব স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সাবলীল ও সকল দিক দিয়ে সুসম্পূর্ণ সহজ ও স্বাভাবিক। কোথাও এতটুকু কৃত্রিমতা বা চেষ্টা ক'রে কিছু কায়দা দেখাবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হ'লে পর্দ্দার উপর সে অভিনয় দর্শকদের বিরক্তি ও অশ্রদ্ধাই অর্জ্জন ক'রবে। কারণ, যা অপ্রাকৃত ও অস্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে তার কোনো সহজ যোগ থাকে না, কাজেই সে অভিনয় হ'য়ে ওঠে প্রাণহীন ও অনুপভোগ্য!

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার—চিত্রজগৎ হ'চ্ছে সৌন্দর্য্যের রাজ্য। এখানে কোনো কিছু অসুন্দর বা অশোভন হ'লে চলবে না। ঘরে ঢোকা, ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া, গাড়ীতে ওঠা, গাড়ী থেকে নামা,—চিঠি লেখা, বইপড়া, ওঠা, বসা, দাঁড়ানো, চলা, হাত-পা নাড়া, এ সবের মধ্যেই একটা বেশ কমনীয় শ্রী যাতে বজায় রাখতে পারা যায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই। চলচ্চিত্রে অভিনয় করা রঙ্গমঞ্চের চেয়ে কঠিন বলেছি—আরও এই জন্ত যে, রঙ্গমঞ্চে একখানি নাটক দীর্ঘকাল ধরে মহলা দেওয়া হয় এবং একই রাত্রে সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত বেশ ধারাবাহিক অভিনয় হয়, কাজেই চরিত্রের ক্রম-পরিণতি ও ভাব বিকাশের দিক দিয়ে প্রস্তুত হবার জন্ত অভিনেতা যথেষ্ট সময় ও সুবিধা পায়, কিন্তু, চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্যের সমাপ্ত দৃশ্যগুলি একদিনে তোলা হয় না, এবং গল্পের ধারা অনুসারেও তোলা হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দিনে এবং ছবির সদর ও অন্দরের ধারা অনুসারে তোলা হয়, মহলা দেবার সময়ও বেশী পাওয়া যায় না, কাজেই, একই দিনে, একই সময়ে অভিনেতাকে হয়ত এক দৃশ্যে সম্পদের প্রাচুর্য্যে ভাসমান একজন স্ফূর্ত্তিবাজ ও পরক্ষণেই হয় ত' অভাব ও দৈন্যের পীড়নে কাতর ও আর্ত্তের চরিত্র অভিনয় ক'রতে হয়। কাজেই, প্রস্তুত হবার সময় ও সুযোগ চিত্রাভিনয়ে খুব অল্প মেলে। সুতরাং প্রত্যেক অভিনেতার উচিত চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার পূর্ব্বে চরিত্রটি উত্তমরূপে আয়ত্ত ক'রে রাখা।



সাময়িকী

বঙ্গীয় ব্যায়াম-শালা—

বাঙ্গলার শিক্ষা মন্ত্রী মাননীয় মিঃ কে, নাজিমুদ্দীন বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ এইচ, ই, ষ্টেপলটনের সহযোগে গত ১৯এ জুলাই, ১৯৩২, মঙ্গলবার, বালীগঞ্জে দি বেঙ্গল সেণ্টার অব ফিজিক্যাল ট্রেনিং (the Bengal centre of Physical Training) বা বঙ্গীয় ব্যায়ামশালার উদ্বোধন করিয়াছেন। কলিকাতার অনেক খ্যাতনামা পদস্থ ব্যক্তি এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সরকারের ফিজিক্যাল ডাইরেক্টর মিঃ বুকাননের তত্ত্বাবধানে ব্যায়ামশালার কার্য্য পরিচালিত হইবে—এখানে স্কুল কলেজের জন্ম ব্যায়াম-শিক্ষক তৈয়ার হইবে।

ব্যবস্থাটি সময়োচিত ও সমীচীন হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন, ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদিগকে অন্যান্য বিষয়ের সহিত ব্যায়ামেরও পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে: তবে তাহারা কলেজে পড়িবার অধিকার পাইবে। ইহাও অতি উত্তম ব্যবস্থা এবং আমরা সর্ব্বান্তঃ-করণে এই ব্যবস্থার সমর্থন করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বাঙ্গলার প্রত্যেক উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার; এবং সে জন্ম প্রত্যেক স্কুলে অন্ততঃ একজন করিয়া ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। কোন স্কুলে ছাত্র-সংখ্যা অধিক হইলে একাধিক ব্যায়াম শিক্ষকের প্রয়োজনও হইতে পারে। অতএব সরকার এই ব্যায়ামশালা স্থাপন করিয়া উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন। সরকারী ব্যায়ামশালায় কি ভাবে ব্যায়াম শিক্ষক তৈয়ার করা হইবে তাহার এখনও কোন আভাষ পাই নাই। ব্যায়াম শিক্ষকের কেবল ব্যায়াম কৌশল জানিলেই যথেষ্ট হইবে না—শারীর সংস্থান, শারীর তত্ত্ব এবং প্রাথমিক চিকিৎসা (first aid) সম্বন্ধেও তাঁহাদের মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ব্যায়াম শিক্ষকগণকে যে এই সকল বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহাও আমরা স্বচ্ছন্দে অনুমান করিতে পারি।

উদ্বোধন সভায় বক্তৃতা উপলক্ষে মিঃ ষ্টেপলটন বাঙ্গলার খেলা ধূলা—ফুটবল, হকি, এথলেটিক স্পোর্টস প্রভৃতির প্রবর্ত্তনের প্রাথমিক ইতিহাসের অভাব দেখিয়া দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়ই বটে, কেন না, এই ইতিহাস একটা মস্ত বড় ইতিহাস এবং তাহা লিখিয়া রাখিবার যোগ্যও বটে। কিন্তু লিখিবে কে? লিখিবার যোগ্যতা যাহাদের আছে তাহারা 'সুবোধ বালক' (good boy), কেবল পড়াশুনা লইয়া থাকে—খেলা ধূলায় তাহাদের উৎসাহ, তথা অভিজ্ঞতার অভাব। আর যাহারা ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলা-ধূলায় ওস্তাদ, তাহারা তেমন 'লিখিয়ে' নহে। যা'ও বা দু'চার জন শিক্ষিত ছেলে লেখাপড়া ও খেলা-ধূলায় সমান ওস্তাদ, তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার কেহ নাই—এ সম্বন্ধে 'লোক-মত'ও এখনও যথাযথ ভাবে গঠিত হইয়া উঠে নাই।

বস্তুতঃ, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া বাঙ্গলার ছেলেরা কেবল নিজেদের চেষ্টায় খেলাধূলায় লায়েক হইয়া উঠিতেছে। বাড়ীতে বাপ-দাদা ও অন্যান্য অভিভাবক, স্কুল-কলেজে শিক্ষক ও অধ্যাপক শ্রেণীর লোকদের নিকট হইতে তাহারা এতটুকু উৎসাহ ত পায়ই না, বরং যথেষ্ট বাধা পাইয়া থাকে। তাহারা, পুষ্টিকর, বলকর খাদ্য ত দূরের কথা, সাধারণ ডাল ভাত পেট ভরিয়া দুই বেলা সকলে হয় ত খাইতে পায় না। দিনান্তে এক ফোঁটা দুধ শতকরা নিরানব্বই জনের কপালে জুটে না—শতকরা একজনও খাইতে পায় কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে। তাহাদের খেলিবার মাঠ নাই। এই এত বড় কলিকাতা সহরে, দশ-বারো লক্ষ লোকের বাস; তাহাদের লক্ষ লক্ষ ছেলেপুলে; কিন্তু তাহাদের ফুটবল, হকি খেলিবার মাঠ কই? সহরের পত্তন হইয়া অবধি কেবল

বাড়ী তৈয়ার হইতেছে—কেবল বাড়ী—বাড়ী—আর বাড়ী—ইটের 'পরে ইট মাঝে মানুষ কীট"—ফাঁকা জায়গা একটুও থাকিতেছে না। "প্রাসাদ নগরীর" (City of Palaces) নামের মর্য্যাদা রক্ষার্থ এত বাড়ী তৈয়ার হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে যে, ইহাতে যে নগরের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে সেদিকে কি সহরবাসী, কি কর্পোরেশন কাহারও দৃষ্টি নাই—সে বিষয়ে জ্ঞানই নাই। এই ভাবে চলিতে চলিতে অবস্থা এমন সঙ্গীন হইয়া উঠিল যে, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গড়িয়া বাড়ী ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করিতে হইল।

—

কিন্তু ছেলেদের উৎসাহ অদম্য। কিছুতেই তাহারা দমে না। যেখানেই একফোঁটা খোলা জায়গা পায়, সেই খানেই একটা করিয়া ফুটবল ক্লাব গড়িয়া জল-খাবারের পয়সা জমাইয়া চাঁদা করিয়া ফুটবল কিনিয়া খেলা করে। সে রকম জায়গা না পাইলে লোকের বাড়ীর উঠানে, কিম্বা গলি রাস্তায় তাহারা ফুটবল খেলে। মিঃ ষ্টেপলটন যদি এই সময় একদিন বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে উত্তরাঞ্চলে আসেন তাহা হইলে দেখিবেন, প্রায় প্রত্যেক গলি রাস্তায় ছোট, মাঝারি, বড় ছেলেরা মিলিয়া ফুটবল খেলা করিতেছে। গাড়ী-ঘোড়া, মোটর, বাস কোন কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই, একটুও ভয়ডর নাই—তাহারা উন্মত্ত হইয়া ফুটবল খেলিতেছে—ফুটবল তাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। বাঙ্গলার এই সব শিশু, বালক, কিশোর, যুবক—ইহারা খেলিবার জায়গা পায় না বলিয়া রাস্তায় খেলা করে। আজকাল মোটর, বাসের যুগ—দুর্ঘটনা ঘটিতে কতক্ষণ? ছেলেদের অপরাধ কি? কেন তাহারা খেলিবার জায়গা পাইবে না? যদি তাহারা রীতিমত ফুটবল, হকি খেলিবার গ্রাউণ্ড বা ফীল্ড পাইত, তাহা হইলে তাহারা কি না করিতে পারিত? কলিকাতা কর্পোরেশন মেছুয়াবাজারে কলাদীঘি বুজাইয়া মার্কাস স্কোয়ার করিয়া দিয়াছেন, সেজন্ত তাঁহারা ছেলেদের ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন। কিন্তু সেখানে কয়টি ক্লাব খেলিতে পায়? খেলিবার জন্ত গ্রীয়ার পার্ক করিয়া দিলেন, তাহাও আবার কাড়িয়া লইয়া মেয়েদের দিলেন। লেডিজ পার্ক করা কিছু অন্তায় হয় নাই, আরও কতকগুলা ঐ রকম পার্ক মেয়েদের জন্ত দরকার। কিন্তু ছেলেদের যে আরও বেশী দরকার—তাহার কি? ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সহর ভাঙ্গিয়া গড়িতেছেন, দু একটা পার্কও করিয়া দিতেছেন—ভাল কথা। ঐ সঙ্গে ছেলেদের খেলিবার মাঠও যে দরকার। আমরা ট্রাষ্টকে এবং কর্পোরেশনকে অনুরোধ করি, তাঁহারা ছেলেদের ফুটবল খেলিবার জন্ত কয়েকটা মাঠ করিয়া দিন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের শুভ দিন কি সত্য সত্যই আসিল? দিকে দিকে নানা লক্ষণ দেখিয়া তাহাই ত অনুমান হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষা আজ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন হইতে চলিয়াছে। বন্দোবস্ত প্রায় সবই ঠিক—কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এবং সরকারের অনুমোদনের মাত্র অপেক্ষা। আর এক দিকে আরও একটা শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন; এবং রবীন্দ্রনাথও এই পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। লেকচারের বিষয় নির্ব্বাচন ও সংখ্যা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে কোন বিষয়ে যে কয়টী ইচ্ছা বক্তৃতা রবীন্দ্রনাথ দিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স এবং বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিলে বলিতে হয় এই পদ গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ অসমসাহসিকতার পরিচয় দিলেন। বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গলা সাহিত্য ও বাঙ্গলার দেশমাতৃকার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম অনুরাগের ফলেই এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইল। এই পদের বাৎসরিক পারিশ্রমিক পাঁচ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল। রামতনু লাহিড়ী ফেলোসিপের আয় বৎসরে দশহাজার টাকা। বর্ত্তমান ব্যবস্থা-অনুসারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া অবশিষ্ট পাঁচ হাজার টাকায় আর একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইবে। এক দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যাপারে বাঙ্গলা ভাষার প্রবর্ত্তন, অপর দিকে বিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগে বাঙ্গলার অধ্যাপকের পদে রবীন্দ্রনাথের নিয়োগ বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে যে নিতান্তই শুভ সংযোগ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

পতিতা-সমস্যা—

কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে পতিতা-সমস্যা একটা গুরুতর সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধির প্রতিকারের জন্য বহু দিন হইতে নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সমস্যাটি এতই জটিল এবং সমগ্র সমাজ-গঠন-পদ্ধতির সহিত এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত যে ইহার মীমাংসা করা বড় সহজ নহে। পতিতা-সমস্যার সমাধানকল্পে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় Bengal Suppression of Immoral Traffic Bill নামে একটি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছে। গত ২৩এ জুলাই, ১৯৩২, শুক্রবার ওয়াই, এম, সি, এ'র চৌরঙ্গী শাখায় ক্যালকাটা ভিজিল্যান্স এসোসিয়েসনের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির পদ হইতে কলিকাতার লর্ড বিশপ মহোদয় জনসাধারণকে, বিশেষতঃ বাঙ্গলার নারীসমাজকে, এই পাণ্ডুলিপির সমর্থন করিতে অনুরোধ করিয়া একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। তা ছাড়া, এই বিলের সমর্থন কল্পে অন্যান্য স্থানেও সভা-সমিতির অধিবেশন হইতেছে। এরূপ একটি সমাজ-হিতসাধনোদ্দেশ্যে রচিত বিলের সমর্থন করা যে সকলেরই উচিত, তাহাতে মতদ্বৈধ ঘটিতে পারে না। তবে বিষয়টি এমন জটিল যে, আইনের ফলাফল না দেখিলে, উহার দ্বারা সামাজিক ব্যাধির যথার্থ প্রতিকার হইবে কি না বলা যায় না। বারনারী-সমস্যা সম্বন্ধে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী একটি ঘটনার কথা আমরা, যতদূর স্মরণ হয়, উল্লেখ করিতেছি। তাহা হইতে, বিষয়টির জটিলতা পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। সেই সময় বরাবর ভূপালের তদানীন্তন বেগমসাহেবা একবার আদেশ দিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে বারনারী থাকিতে পারিবে না। বারনারীদের মধ্যে যাহারা বিবাহ করিয়া দাম্পত্য জীবন যাপন করিবে, কেবল তাহাদেরই তাঁহার রাজ্যে স্থান হইবে। অবশিষ্ট সকলকে তাঁহার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে। যেদিন এই হুকুম জারি করা হইল, সেইদিন রাত্রেই সাত শত বারনারীর বিবাহ হইয়া গেল—পরদিন হইতে তাহারা প্রকাশ্যতঃ দাম্পত্য জীবন যাপন করিয়া ভূপাল রাজ্যে বাস করিতে লাগিল। অবশিষ্ট বারনারীরা অবশ্য বেগম সাহেবার আদেশ অনুযায়ী রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইল। কয়েক দিনের মধ্যেই কিন্তু দেখা গেল, ঐ সাতশত বারনারী, দাম্পত্য জীবনের আবরণে—প্রকাশ্যভাবে নয়, গোপনে—আগেকার মতই বারনারী বৃত্তি চালাইতেছে। এইরূপে কার্য্যতঃ বেগম সাহেবার মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। সম্প্রতি বোম্বাই সহরে আইন প্রণয়ন করিয়া তত্রত্য পতিতালয়গুলি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফল যে খুব ভাল হইয়াছে তাহা মনে হয় না। কয়েক দিন পূর্ব্বে অমৃত বাজার পত্রিকায় দেখিতেছিলাম যে, বোম্বাইবাসীরা অভিযোগ করিতেছেন—বোম্বায়ের পতিতালয়গুলি তুলিয়া দেওয়াতে বারনারীরা সহরের যত্রতত্র গিয়া বাস করিতেছে—যাহা কয়েকটিমাত্র স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল, সেই ব্যাধি সমগ্র সহরে এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, কে পতিতা, কে পবিত্রা তাহা বাছিয়া লওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতাতেও যাহাতে এইরূপ অবস্থা না ঘটে, আইনটি এমনভাবে রচিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেও, কার্য্যক্ষেত্রে উহা প্রয়োগ করিয়া ফলাফল না দেখিলে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর জের—

বিগত বড়দিনের সময় যখন মহাসমারোহে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়, তখন দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানই বিশ্ব-কবিকে অভিনন্দিত করেন, কেবল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ই সে সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই। বিশ্ব বিদ্যালয় সেই সময়ই আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তখন তাঁহাকে অভিনন্দিত করা সম্ভব-পর হয় নাই। এতদিন পরে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিলেন। বিগত ২১শে শ্রাবণ তাঁহারা কলিকাতা সিনেট গৃহে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। ২০শে তারিখে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কয়েকজন সদস্য বোলপুরে গমন করেন এবং সেইদিনই মাননীয় গজনবী সাহেবের সরকারী সেলুন যোগে কবিকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। হাবড়া ষ্টেসনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্যগণ কবিকে সাদর অভ্যর্থনা করেন এবং পরদিন যথাসময়ে সিনেট ভবনে লইয়া আসেন এবং সিনেটের সোপানে ভাইস চ্যান্সেলর ও অন্যান্য সদস্যগণ কবিকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া সভাগৃহে লইয়া যান এবং সেখানে তাঁহাকে মাল্যভূষিত করিয়া

যথারীতি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন ; কবিবরও এই অভিনন্দনের উত্তর প্রদান করেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই অনুষ্ঠান সর্ব্বাংশে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল।

কলিকাতা বন্দরে আমদানী রপ্তানী—

গত জুন মাসে কলিকাতা বন্দরে আমদানীর পরিমাণ মে মাসের তুলনায় আরও হ্রাস পাইয়াছে। মে মাসে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল, জুন মাসে হইয়াছে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার। গত বৎসর জুন মাসে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা।

রপ্তানীর পরিমাণও মে মাসে ৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার স্থলে জুন মাসে ৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা হইয়াছে। গত বৎসর জুন মাসে রপ্তানী হইয়াছিল ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার।

এ বৎসর জুন মাসে কোন্ জিনিষ কত লক্ষ টাকার আমদানী হইয়াছে এবং গত বৎসরের জুন মাসের তুলনায় কত লক্ষ টাকা হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জিনিষ	লক্ষ টাকা	হ্রাস-বৃদ্ধি
কার্পাস দ্রব্য	৫২	বৃঃ ৬
কলকব্জা	৩৬	„ ৪
তৈল ও খনিজ	১৯	হ্রাঃ ১৩
লৌহ ও ইস্পাত	১৭	„ ১
অন্যান্য ধাতু	১০	বৃঃ ১
ধাতব জিনিষ	১০	„ ১
চিনি	৯	হ্রাঃ ৪
মদ্য	৫	„ ১
তামাক	১	„ ৪

কাপড়ের আমদানী ১ কোটি ৯০ লক্ষ বর্গগজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ৩০ লক্ষ বর্গগজে এবং মূল্য হিসাবে ৩৫ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে।

চিনির আমদানী ১২ হাজার টন হইতে ৬ হাজার টনে, মূল্য হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা হইতে ৬ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে।

আমেরিকা হইতে কেরোসিনের আমদানী খুব কমিয়া গিয়াছে।

সিগারেটের আমদানীও খুব বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

রপ্তানী

১৯৩২ সালের জুন মাসে কোন্ জিনিষ কত লক্ষ টাকার রপ্তানী হইয়াছে এবং ১৯৩১ সালের জুন মাসের তুলনায় কত লক্ষ টাকা হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পাটের জিনিষ	১৫৭	হ্রাস	৫
কাঁচা পাট	৩৩	„	১৩
চা	৩১	„	১০
খাদ্য শস্য	১৪	„	১
চর্ম্ম	১১	„	১২
লাক্ষা	৮	„	৩
লৌহ	৫	„	৩
ম্যাঙ্গানিজ	৩	„	২

রপ্তানির দিকে সমস্ত জিনিষেরই পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

স্বর্ণ-রপ্তানী—

গত ২৩শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ভারতবর্ষ হইতে ৯৫ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২৩শে জুলাই পর্য্যন্ত ১৭ কোটি ১১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার রপ্তানী হইয়াছে। মার্চ্চ মাসে ৬ কোটী ৮৯ লক্ষ ৩৯ হাজার, এপ্রিল মাসে ৪ কোটী ২৩ লক্ষ ৭৮ হাজার, মে মাসে ৩ কোটী ৩০ লক্ষ ৪২ হাজার এবং ১৯৩১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩২ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ৬০ কোটী ৭৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩২ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্বর্ণের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ মোট ৫৭ কোটী ৯৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বেশী হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গন প্রণীত 'জমিদারী দর্পণ ও সার্ভে সেটেলমেণ্ট বিধি'। গ্রন্থকার কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার। প্রকাশক কমলা বুক ডিপো, লিমিটেড ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৮০।

দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধারমণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ ও ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত "চন্দ্রশেখর তত্ত্ব"—অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখরের" আলোচনা। সোল এজেণ্টস কমলা বুক ডিপো, লিমিটেড। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৷৶০।

শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণের অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যা, অবাধ আত্মদর্শন বা সত্যবাদ। ঈশোপনিষৎ। স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। উপনিষৎ রহস্য কার্য্যালয়, শ্রীগুরু মন্দির—কোঁড়ার বাগান, হাওড়া। মূল্য ১৷০।

শ্রীযুক্ত আশীষ গুপ্ত প্রণীত গল্পের বই "ইহাই নিয়ম"। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার সেন এম-এ প্রণীত কবিতার বই 'সুর-হারা'। প্রকাশক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বাগচি, ইলাবাস, হিন্দুস্থান পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

"দিদির বর" উপন্যাস; শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত। সিটি লাইব্রেরী, ৪৪, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও ২৬, বাঙ্গলা বাজার ঢাকা। মূল্য একটাকা।

ভক্তপ্রবর মহাকবি সুরদাস—জীবনী ও কাব্যালোচনা; শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল, ভাষাতত্ত্বরত্ন, এম-এ লিখিত, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেস। মূল্য লেখা নাই।

উপনিষদ রহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা—শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—শ্রীগুরু মন্দির, কোঁড়ার বাগান, হাওড়া। মূল্য ৸০।

ইতালিতে বারকয়েক—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত, সিটি লাইব্রেরী, ৪৪ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

কালিদাস—স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত বালকদিগের আবৃত্তি ও পাঠের উপযোগী ক্ষুদ্র নাটক; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ প্রণীত। গুরুচরণ পাবলিসিং হাউস, ৫৯ অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর প্রণীত উপন্যাস "উৎস"—১৲
শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "মারণমন্ত্র"—১৷০
শ্রীযুক্ত গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "স্মৃতিকাব্য"—৸০
শ্রীযুক্ত প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সেজদার ডায়েরী"—১৷০
শ্রীযুক্ত অনিল রায় প্রণীত "মার্ক্সবাদ"—৷৶০
শ্রীযুক্ত মণিময় প্রামাণিক প্রণীত "কাল মার্ক্স"—৸০
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "দুঃখের দেওয়ালী"—১৷০
শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "প্রথম প্রেম"—২৲
শ্রীযুক্ত শশধর দত্ত প্রণীত "নীলমণির লীলা" প্রহসন—৷০
রায় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন দাস বাহাদুর প্রণীত "সমবায় সোপান"—।০
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "গৌরী"—১৷০
শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গণ প্রণীত "জমিদারী দর্পণ"—১৸০
শ্রীযুক্ত রাধারমণ চক্রবর্ত্তী এম-এ ও শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত "চন্দ্রশেখর তত্ত্ব"—৷৶০

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' আগামী ২৫শে ভাদ্র এবং কার্ত্তিক সংখ্যা ১০ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপন-দাতৃগণ আশ্বিন কার্ত্তিক দুই মাসের বিজ্ঞাপন এক সঙ্গে ছাপিতে দিবার ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করিবেন।

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRA NATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA



দেবদাসী

শিল্পী—ভুবন বি-এ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ভারতবর্ষ

আশ্বিন—১৩৩৯

প্রথম খণ্ড | বিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

বাঙ্গালীর মায়াবাদ

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

মায়াবাদ সম্বন্ধে সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থে অনেক আলোচনা আছে এবং বাংলা সাহিত্যেও অনেক হইয়াছে। কিন্তু এই প্রাচীন দার্শনিক মতবাদে বাঙ্গালীর যে বিশেষ দান আছে, যাহা মায়াবাদকে ঢালিয়া সাজিয়া তাহার নূতন রূপ দিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত সেদিকে বিশেষ কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। পড়িলে বাংলার গৌরব বাড়িত।

মায়াবাদ বলিতে সাধারণতঃ আমরা এখন বুঝি, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—মায়া। অগভীর অন্ধকারে দড়ি দেখিয়া যেমন সাপ মনে হয়, তেমনি অস্তি বা সৎ স্বরূপ ব্রহ্মে এই জগৎ ভ্রম হইতেছে। আসলে—যেমন সাপ নেই, তেমনি জগৎও নেই। কতক্ষণ আছে?—যতক্ষণ ভ্রম। ইহাই আচার্য্য শংকরের ব্যাখ্যা, এবং মায়াবাদ সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যাই বিশেষ প্রচলিত। কিন্তু এই মতবাদও বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। বৈদিক যুগে 'মায়া' বলিতে অনেকটা ইন্দ্রজাল বা ভেল্কি বুঝাইত; "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" ইন্দ্র মায়া দ্বারা নানা রূপ ধারণ করিলেন। কিন্তু, মায়ার এইরূপ ব্যাখ্যা বৈদিক যুগেরই পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যেমন ঋগ্বেদের ১০ম, মণ্ডলে, ৮২ সূক্তে, ৭ম ঋকে দেখিতে পাই—"নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উকথশাসশ্চরংতি।" অর্থাৎ—আমরা জল্পক, ইন্দ্রিয় সুখে পরিতৃপ্ত ও বাসনাপর বলিয়া এই সত্যকে নীহারাবৃত করিয়া রাখিয়াছি। এখানে 'মায়া' শব্দের কোন উল্লেখ যদিও নেই, কিন্তু ঐ ভাবই প্রকাশ করিতেছে। মায়ার অর্থ এ স্থলে কুয়াসা। দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যের মাঝখানে কুয়াসা যেমন দৃষ্টি-শক্তির প্রতিরোধ করে, তেমনি প্রাকৃত মানব ও সত্য বা ব্রহ্মের মাঝখানে কুয়াসার মত যে আবরণী-শক্তি, ঋগ্বেদের ৮২ সূক্তে তাহাই মায়ারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনে হয়—'মায়া' তখনও কোন দার্শনিক মতবাদে পরিণত হয় নাই। যাহা কিছু হেঁয়ালীর মত চোখ দিয়া দেখা যায় অথচ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, যাহা কিছু রহস্যাবৃত, সাধারণ মানব-বুদ্ধিতে সোজাসুজি যাহা জানা যায় না, তাহাকেই তখনকার আর্য্যগণ 'মায়া' আখ্যা দিতেন।

তারপর আসিলেন শ্রীবুদ্ধ একটা মস্ত বড় দর্শন লইয়া।

তিনি বেদ মানিলেন না, জগৎ গ্রাহ্য করিলেন না; সুতরাং মায়াকেও গ্রহণ এবং ত্যাগ করিবারও তাঁহার কোন প্রয়োজন হইল না। কিন্তু দেখা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন মতবাদ পরবর্ত্তী দার্শনিক বা সংস্কারকগণ কর্ত্তৃক অস্বীকৃত হইলেও নিজের একটা ছাপ তাঁহাদের মনের কোণে গোপনে রাখিয়া যায়, যাহা ঐ ঐ দার্শনিক ও সংস্কারকদের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের উপর ক্রিয়া করে। যেমন—বৌদ্ধদর্শন বেদ অস্বীকার করিয়াছে; তথা মায়াও স্বীকার করে নাই, কিন্তু বৌদ্ধ ক্ষণিক-বাদ একেবারে না হইলেও অনেকটা মায়াবাদের মত। বৌদ্ধ মতে—দৃশ্য জগৎ 'অলাত চক্রবৎ'। অর্থাৎ—একটা অগ্নিপিণ্ড অতি দ্রুত ঘুরাইলে অগ্নি-চক্র বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা অগ্নি-চক্র নহে, অগ্নিপিণ্ডের ঘন ঘন আবর্ত্তন মাত্র। এইরূপ ক্ষণস্থায়ী ও চির-পরিবর্ত্তনশীল মন ও বিষয় লইয়া এই বিরাট বিশ্বের ধারণা ও রচনা; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা বিরাটও নহে, বিশ্বও নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৈদিক 'মায়ার' মূল ভাবটি বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে অন্তের অজ্ঞাতসারে যথেষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

তারপর আসিলেন আচার্য্য শংকর। বেদান্ত-দর্শন ও মায়াবাদের ইহা চিরস্মরণীয় যুগ। বৈদিক সময়ে 'মায়া' বলিতে যে মনোভাব বা রহস্যের আভাস পাওয়া যাইত, তিনি তাহাতে কিছু পরিবর্ত্তন আনিয়া, সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শংকরের মায়াবাদ কি, তাহা সংক্ষেপে প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা অনেকটা Idealistic। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দুইজন বাঙ্গালী দার্শনিকের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী রাজা রামমোহন বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ গ্রহণ ও প্রচার করিলেও শংকরের মায়াবাদ গ্রহণ করেন নাই। পরবর্ত্তী স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত এবং অদ্বৈতবাদ, এমন কি মায়াবাদও গ্রহণ এবং প্রচার করিলেন; কিন্তু শাংকর মায়াবাদ গ্রহণও করিলেন না, প্রচারও করিলেন না। আচার্য্য শংকরের মতে—যাহা নেই তাহা আছে মনে করার নাম মায়া, যথা—রজ্জুতে সর্পভ্রম। স্বামী বিবেকানন্দ এই শাংকর মায়াবাদের ধার দিয়াও গেলেন না। তিনি বলিলেন, যাহা কিছু ঘটে তাহার যথাযথ বিবৃতির নামই 'মায়া' (statement of facts), যথা—"নরনারী হইতেছে ও যাইতেছে, সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইতেছে, গ্রহাদি খণ্ড খণ্ড হইয়া ধূলিবৎ চূর্ণ হইয়া বিভিন্ন গ্রহস্থিত বায়ুপ্রবাহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এইরূপ অনাদি কালই চলিয়াছে। ইহার লক্ষ্য কি? মৃত্যুই সকলের লক্ষ্য। মৃত্যু জীবনের লক্ষ্য, এমন কি ধর্ম্মেরও লক্ষ্য। সাধু ও পাপী মরিতেছে, রাজা ও ভিক্ষুক মরিতেছে, সকলেই মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি জীবনের প্রতি এই বিষম মমতা বিদ্যমান রহিয়াছে। কেন আমরা এ জীবনের মমতা করি? কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না? ইহা আমরা জানি না। ইহাই মায়া।"

"জননী সন্তানকে লালন করিতেছেন। তাহার সমস্ত মন, সমস্ত জীবন ঐ সন্তানের প্রতি রহিয়াছে। বালক বর্দ্ধিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং হয় ত কুচরিত্র ও পশুবৎ হইয়া প্রত্যহ মাতাকে তাড়না করিতে লাগিল। জননী তথাপিও পুত্রে আকৃষ্ট। তাঁহার যখন বিচার-শক্তি জাগরিত হয়, তখন তিনি তাহাকে স্নেহাবরণে আবৃত করিয়া রাখেন। তিনি কিন্তু জানেন না যে, এ স্নেহ নহে, এক অপরিজ্ঞেয় শক্তি তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী অধিকার করিয়াছে; তিনি ইহা দূর করিতে পারেন না। ইহাই মায়া।" * বেশ বুঝা গেল, আচার্য্য শংকরের রজ্জুতে সর্প ভ্রমরূপ মায়াবাদের ব্যাখ্যা হইতে স্বামী বিবেকানন্দের মায়াবাদের ব্যাখ্যায় অনেক প্রভেদ, এমন কি শাংকর মায়াবাদ হইতে সম্পূর্ণ 'প্রস্থান' বলিলেও চলে। এক-কথায়—মানুষের বুদ্ধিকে যাহা মোহগ্রস্ত করিয়া রাখে, তাহাই মায়া—স্বামীজীর কথা হইতে এই ভাবেরই আমরা ইঙ্গিত পাই।

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বৈতবাদীও নহেন, খাঁটি অদ্বৈতবাদী। অথচ তিনি জগৎকে শংকরের ন্যায় উড়াইয়াও দিলেন না। ইহা কিরূপে সম্ভব? তিনি আরো স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "বেদান্ত প্রকৃত পক্ষে জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহে না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, আর কোথাও তদ্রূপ নাই; কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ আত্ম-হত্যা নহে—নিজেকে শুকাইয়া ফেলা নহে। বেদান্তে বৈরাগ্যের অর্থ জগতের ব্রাহ্মীভাব—জগৎকে আমরা যে

* জ্ঞান-যোগ। 'মায়া'।

ভাবে দেখি, উহাকে আমরা যেমন জানি, উহা যেরূপে প্রতিভাত হইতেছে তাহা ত্যাগ কর এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও। উহাকে ব্রহ্মরূপে দেখ।" *

এখানে সহজেই কৌতূহল হইতে পারে—স্বামী বিবেকানন্দের গুরু পরমহংস দেবের এ সম্বন্ধে মতামত কি ছিল? তিনি বলিতেন,—এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে মুখোস পরিয়া ভয় দেখাইতেছে। যাহাকে ভয় দেখাইতেছে, সে যখনই জানিতে পারে উহা মুখোস, তখনই অন্য ব্যক্তি মুখোস খুলিয়া, হাসিয়া চলিয়া যায়। তেমনি মায়াকে জানিতে পারিলে মায়া পলায়ন করে। অর্থাৎ চারিদিকে মৃত্যু দেখিয়াও মানুষ চিরকাল বাঁচিব মনে করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকে, জাগতিক পদার্থের অনিত্যতা বুঝিয়াও তাহা সম্যক ধারণা করিতে পারে না, কিন্তু জগতের নশ্বরতা উপলব্ধি করিলে, তৎক্ষণাৎ মানুষের ঐ সমস্ত বিষয়ে আসক্তি কাটিয়া যায়; আকাঙ্ক্ষা ও মমত্বের বন্ধনীশক্তি আর কার্য্যকরী হয় না। ইহাই মায়ামুক্তি। তিনি আরো বলিতেন,—অণুলোম ও বিলোম। জগৎ হইতে ব্রহ্মে গিয়া, ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, পুনরায় জগতে নামিয়া আসা। বলিতেন,—বেল বলিতে শুধু শাঁসটুকু বুঝায় না, তার শাঁস, বীচি, খোলা, সবই বুঝায়; তেমনি ঈশ্বর বলিতে শুধু নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝায় না, জীব—জগৎ—ব্রহ্ম সবই বুঝায়। আবার বলিতেন,—এই বিড়ালই বনে গিয়া বনবিড়াল হয়। অর্থাৎ—এই মর্ত্ত্য মানবই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া অমর্ত্ত্য হয়। উপরিউক্ত বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য এই যে, জগৎ আছে, ব্রহ্মও আছেন। তবে, ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইলে এই জগৎ ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিভাত হয়, ব্রহ্মে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরিত হওয়া এবং প্রথম হইতেই জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা—এক কথা নহে। শংকরের সহিত রামকৃষ্ণের পার্থক্য এইখানে; এবং ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, শংকরের ন্যায় রামকৃষ্ণও মায়াবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। অবশ্য, তাঁহার বৈদান্তিক মতই একমাত্র মত নহে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মায়াবাদ, খাঁটি বাংলার মায়াবাদ,—যাহার নব্য ন্যায়, যাহার গোড়ীয় বৈষ্ণব মত, যাহার ব্রাহ্মধর্ম্ম। ন্যায়দর্শন পূর্ব্বেও ছিল; কিন্তু তাহাতে বাংলার যে দান তাহাই নব্য ন্যায়; বৈষ্ণব-মত পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহাতে শ্রীচৈতন্যের যে বৈশিষ্ট্য তাহাই গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম; উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু তাহাতে রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের যে সাধন-সংযোগ তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া ইহাদের সব কয়টিই জগতে আলোড়ন আনিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, দার্শনিক জগতের এক একটা দিক খুলিয়া দিয়াছে। তেমনি, মায়াবাদ তখনও ছিল এখনও আছে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী বিবেকানন্দ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, বিনশ্বর ও অবিনশ্বর বস্তুর সহিত সংযোগ রাখিয়া যে মায়াবাদ প্রচার করিয়া গেলেন, বিংশ শতাব্দীর বাঙালী তাহাকে জগতের মহাজন-সভায় তুলিয়া ধরিয়া রক্ষা করিতে পারিল না। ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দপন্থী আমরা। তাঁহাদের মায়াবাদের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, পুনরায় শাংকর মায়াবাদেরই গর্ত্তে গিয়া পড়িলাম; কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিলাম না। ফলে জগতের দার্শনিক-সমাজে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর দান অজ্ঞাত রহিয়া গেল এবং বাংলা দেশও নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইল।

* জ্ঞানযোগ। 'সর্ব্ব বস্তুতে ব্রহ্ম দর্শন।'





বন্যা

শ্রীসীতা দেবী বি-এ

(৭)

ভোর হইতে না হইতেই সুবর্ণর ঘুম ভাঙিয়া গেল। বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইবার অভ্যাস তাহার একেই ছিলনা, তাহার উপর মহানগরীর কলকোলাহল পূর্ব্বের আকাশ স্বচ্ছ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হইয়া যায়, তাহাতে অনভ্যস্ত মানুষের ঘুম ভাঙিতে আর বিন্দুমাত্রও দেরি হয়না। সুবর্ণও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। প্রথমেই ঘুমজড়ান চোখে চাহিয়া বুঝিতে পারিলনা যে সে কোথায় আছে! সব নূতন, অপরিচিত। তাহার পরক্ষণেই স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, সব কথা মনে পড়িল। ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া খোলা ছাদের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। ইহারই মধ্যে রাস্তা লোকজন গাড়ীঘোড়ায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কতরকম গাড়ী, সুবর্ণ সাতজন্মে এ-সব দেখে নাই। এত রকম মানুষ যে জগতে আছে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। কল্পনা-জল্পনা করিবার সময়ও অবশ্য বেশী তাহার ছিলনা। দারুণ উৎপীড়নের ভিতর তাহার জীবন কাটিয়াছিল। অত্যাচারের পেষণে তাহার হৃদয়মন একেবারে শুকাইয়া গিয়াছিল। পশুর মত খাটিত, পশুর মত মুখ বুজিয়া মার খাইত, এ ভিন্ন তাহার জীবনে আর কিছু ছিলনা।

হঠাৎ কয়েকটা দিনের মধ্যে তাহার কারাগারের প্রাচীর অপ্রত্যাশিতভাবে ভাঙিয়া পড়িল। এমন পরিপূর্ণ মুক্তির মাঝখানে, সুবর্ণ যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। কি করিবে, কি ভাবিবে. কিছুই যেন স্থির করিতে পারেনা। তাহার মন শুদ্ধ পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, ভাল করিয়া চিন্তা করিবার ক্ষমতাও নাই। তের চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে সে, কিন্তু এক এক দিকে এখনও শিশুরই ন্যায় অল্পজ্ঞান, আবার অন্য দিকে এখনই তাহার বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়িয়াছে। জীবনে তাহার আনন্দ নাই, আশা করিতেও তাহার ভয় হয়। আজন্ম পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীকে মুক্ত আকাশে হঠাৎ ছাড়িয়া দিলে, সে যেমন দিশাহারা হইয়া পড়ে, সুবর্ণরও অবস্থা হইয়াছিল সেইরূপ।

আধঘণ্টাখানিক দাঁড়াইয়া সে নীচের জনস্রোত দেখিল, তাহার পর আবার নিজের শুইবার ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিছানাটা গুটাইয়া রাখিল। জাগিয়া উঠিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাহার কোন কালে অভ্যাস নাই, কিন্তু কি কাজ যে সে এখানে করিবে তাহাই ভাবিয়া পাইলনা। বাবার ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল, তিনি তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তাহার শুইবার ঘরের পাশে ছোট একটি স্নানের ঘর। তবে ইহাতে আপনা হইতে জল বড় একটা আসিত না। নীচে ইলেকট্রিক্ পাম্প্ ছিল, প্রয়োজন হইলে তাহার সাহায্যে, উপরে জল উঠান হইত। তিনতলায় আজ জলের প্রয়োজন হইবে জানিয়া মেসের চাকররা আজ সকালেই পাম্প্ চালাইয়া জল উঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কল দিয়া ঝিরঝির করিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া সুবর্ণ গিয়া ভাল করিয়া হাত মুখ ধুইয়া আসিল। তাহার পর ট্রেণের ছাড়া কাপড়গুলি লইয়া গিয়া কাচিতে বসিয়া গেল। একটা কাজ পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

একমনে কাপড় কাচিতেছে, এমন সময়ে পিতার কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। প্রফুল্লচন্দ্র

বলিলেন, "ও কি করছিস রে? তোর হাতে না হতেই জল ঘাঁটতে বসে গেছিস্ কেন?"

সুবর্ণ বলিল, "ট্রেণের ছাড়া কাপড়গুলো কেচে রাখছি বাবা।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "এর পর ঢের ট্রেণের কাপড় জমা হবে। কত কাচ্‌বি? ও-গুলো আমি ধোপার বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুই উঠে আয়।"

আধখানা করিয়া, কোনো কাজ ফেলিয়া রাখা একেবারে সুবর্ণর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে কাপড়গুলি ধুইয়া, নিঙড়াইয়া তাহার পর বাহির হইয়া আসিল। পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এগুলো কোথায় মেলে দেব বাবা?"

একজন চাকর মস্ত বড় ট্রেতে করিয়া চা প্রভৃতি সাজাইয়া লইয়া আসিল। প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "দে ওর হাতে। ওরে সুখ্‌খ্যি, এগুলো মেলে দে ত!"

চাকর প্রতুলচন্দ্রের ঘরে টেব্‌লের উপর ট্রেটা নামাইয়া রাখিল, তাহার পর সুবর্ণর হাত হইতে কাপড় লইয়া আলিসার উপর শুকাইতে দিতে চলিল। প্রতুলচন্দ্র মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই মুখ ধুয়েছিস্ ত, চা খাবি আয়।"

সুবর্ণ একটু অবাক্ হইয়া বলিল, "আমি ত চা কোনো দিনও খাইনি বাবা।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "চা নাই খেলি, জলখাবার ত খাবি? আয়, আয়, দেরি করিস্ নে।"

বাপের ডাকাডাকিতে অগত্যা সুবর্ণ আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল, যদিও বহুকাল হইল সকালে খাওয়ার উৎপাত তাহার চুকিয়া গিয়াছে। সকলকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া, নিজে মুখে জল দিতে তাহার বেলা একটা বাজিয়া যাইত। সকাল হইবামাত্র বধূকে খাইতে বসাইয়া দিবেন, এমন ন্যাকা মেয়েমানুষ সুবর্ণর শাশুড়ী ছিলেননা। এ-সব বিবিয়ানা তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারিতেননা। বাল্যকালে এবং যৌবনে নিজে অতি কড়া শাশুড়ীর শাসনে ছিলেন, সেই শিক্ষার পরীক্ষা তিনি এতকাল নিজের বধূর উপরে করিয়া আসিতেছিলেন। ইহাতে ফল ভাল হয় বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল। আরাম সুখ করিবার দিন ত পড়িয়াই আছে, তাই বলিয়া মেয়েমানুষ আজন্মই আরাম করিবে না কি? শাশুড়ী ননদ যতদিন আছে, ততদিন ত নয়।

প্রতুলচন্দ্র একটা চেয়ার টানিয়া দিয়া মেয়েকে বলিলেন, "বোস্ এখানে। কি খাবি বল ত? এই ত রুটি মাখন, ডিমভাজা দিয়েছে, এ কি খেতে পারবি?"

সুবর্ণ নাকটা একটুখানি কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ কি মুসলমানের তৈরি রুটি বাবা?"

প্রতুলচন্দ্র গম্ভীর হইয়া গেলেন। বলিলেন, "তা হতে পারে, কিন্তু ও-সব বাছবিচার তোমার এর পর ছাড়তে হবে। প্রথম দিনই আমি জোর করবনা, কিন্তু আস্তে আস্তে সব অভ্যেস্ বদলে ফেলবার চেষ্টা কর্। কি খাবি এখন বল ত? এই মিষ্টি রয়েছে খা, আর এই কলা দুটো খা। মিষ্টি আরো আনিয়ে দেব?"

যে বাসনে রুটি ডিম আসিয়াছে তাহাতেই ফল মিষ্টান্নও আসিয়াছে। সুবর্ণর ইহা খাইতেও আপত্তি ছিল। কিন্তু প্রতুলচন্দ্রের মুখ দেখিয়া সে বুঝিল যে পিতা রাগ করিয়াছেন। অগত্যা ভয়ে ভয়ে প্লেটখানা নিজের দিকে টানিয়া লইল, এবং কোনোমতে চোখের জল চাপিয়া আস্তে আস্তে খাইতে লাগিল।

খাওয়া শেষ হইলে প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "চা ত খেলিনা, তোর জন্যে দুধ পাওয়া যায় কি না একটু দেখ্‌তে বল্‌ব?"

সুবর্ণর হাসি পাইল। বাবা তাহাকে পাইয়াছেন কি? সে কি কচি ছেলে, না রোগী যে দুধ খাইতে বসিবে? পিতার কথার উত্তরে সে বলিল, "না বাবা, দুধের কিছু দরকার নেই। এতগুলো ত খেলাম।" সে তাড়াতাড়ি নিপুণভাবে উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া, বাসনকোষণ তুলিতে আরম্ভ করিল।

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্, ও-সব গিন্নিপণায় এখন দরকার নেই। ওসব সুখ্‌খ্যি নিয়ে যাবে এখন। আমাকে ত এখন বেরিয়ে যেতে হবে, ফিরতে হয় ত দেরি হতে পারে। তুই ততক্ষণ কি করবি বল ত? একলা এই মেসে থাকাও শক্ত। আমার সঙ্গে যাবি?"

সুবর্ণ বলিল, "তাই চল বাবা। একলা এখানে আমার বড় ভয় করবে। চাকরগুলো ক্রমাগত উপরে উঠ্‌বে ত? ঝি হলেও না হয় হত।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "ভাল কথা, একটা ঝিয়ের চেষ্টা দেখ্‌লে হয় ত। তাহলে সারাক্ষণ তোকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হয়না। ওহে সুখ্‌খ্যি, একটা ঝি আজকের মধ্যে

জোগাড় করে আন্‌তে পার ? সারাদিন থাকবে দিদিমণির কাছে, উপরের সব কাজ করবে, রাত হলে বাড়ী যাবে।"

সূর্য্য বাসনকোষণ ট্রেতে উঠাইতে উঠাইতে বলিল, "তা পারি আজ্ঞে। একটা লোক হাতে ছিল, বাজারে ত যাচ্ছি, দেখব তাকে পাই কি না। মাইনে কত করে দেবেন ?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "লোক নিয়ে ত আয়, তার পর মাইনে ঠিক করা যাবে এখন। খবরের কাগজ একখানা উপরে দিয়ে যাস্। সুবর্ণ তুই পড়তে পারিস্ ?"

সুবর্ণ লজ্জিতভাবে বলিল, "বাংলা পড়তে পারি বাবা।"

প্রতুলচন্দ্র পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন, "বাংলা কাগজও একখানা আনিস্।"

চাকর চলিয়া গেল। সুবর্ণ বলিল, "একখানা ঝাঁটা পেলে ঘর-দোরগুলো ঝাঁট্ দিয়ে নেওয়া যেত।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "চাকররা সে সব করবে এখন। একটু পরেই আমাদের বেরতে হবে। তোর জন্তে কাপড়-চোপড় জুতো মোজা-টোজা সবই কিনতে হবে বোধ হয়। একজন কাউকে জিগ্‌গেস্ করে নিলে হত। আমিও যেমন আনাড়ী, তুইও তাই। কি যে করতে হবে তাও জানিনা।"

সুবর্ণ বলিল, "তাহলে এখন থাক্ বাবা, কাউকে জিগ্‌গেস্ করে কিনো। শুধু শুধু টাকা নষ্ট করে কি হবে ? শাড়ী আর কিনোনা, শাড়ী আমার ঢের রয়েছে। শাশুড়ী ত কিছু পরতে দিতেননা, আর মা খালি কাপড় পাঠাতেন, সব ভাল ভাল কাপড়। সব নূতন, তোলা রয়েছে।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা, তা শাড়ী থাক্ এখন। অন্ত জিনিষই দেখি কি রকম কেনা যায়। ক'দিন খুব ঘোরাঘুরি করতে হবে।"

চাকর দুইখানা খবরের কাগজ দিয়া গেল, একখানা ইংরাজী, একখানা বাংলা। বাংলাখানা মেয়ের দিকে ঠেলিয়া দিয়া প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "ভাখ্ পড়ে, দেশ বিদেশের ঢের খবর পাবি।"

সুবর্ণ কাগজ লইয়া পড়িতে বসিল, কিন্তু কিছুই প্রায় বুঝিতে পারিলনা। এ-সব দেশের নামও সে শোনে নাই, এসব কি যে ব্যাপার তাহাও সে জানেনা। তবু পড়িয়া চলিল। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কাছে গল্পের বই আছে বাবা ?"

মেয়ের পড়াশুনার দিকে মন আছে দেখিয়া খুসি হইয়া প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আমার কাছে নেই, তবে নীচে বাবুদের কাছে নিশ্চয়ই আছে। দেখ্‌ছি আমি।" তিনি তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলেন।

মেসের বাবুদের ভিতর বই সব চেয়ে বেশী প্রতুলচন্দ্রেরই ছিল, তবে তাহার ভিতর বাংলা বই বড়ই কম। যাহাও বা আছে, তাহাও গল্পের বই নয়। অন্ত বাবুদের ভিতর বইয়ের ধার ধারেন কম লোকেই। Statesman-এর sporting column এবং বায়োস্কোপের বিজ্ঞাপন পড়িয়াই তাঁহারা সাহিত্যচর্চ্চা শেষ করেন। দুই চারিজন ইংরাজী নভেল কেনেন বটে, কিন্তু বন্ধুবান্ধবে সেগুলি পড়িতে লইয়া গিয়া আর দয়া করিয়া ফেরৎ দেয়না, কাজেই কাহারও ঘরে বিশেষ কিছু থাকেনা। সুতরাং অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া প্রতুলচন্দ্র গোটা দুই পুরাতন মাসিকপত্র, এবং একখানি ছেঁড়া "রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী" লইয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। মেয়েকে বলিলেন, "এইগুলো এখন নেড়ে-চেড়ে দেখ, তার পর বেরব যখন, তখন বই আরো গোটা কয়েক কিনে আনা যাবে।"

সুবর্ণ বলিল, "এই ঢের হবে বাবা, আবার বইয়ের কি দরকার ? কত আর পড়ব ?"

প্রতুলচন্দ্র মেয়ের উচ্চাশার অভাব দেখিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন, "এতেই হলে চলবে কেন ? পড়াশুনো এখন রীতিমত করা দরকার, বয়স ত ঢের হয়ে গেছে। তোর মার কাছে যা অল্প স্বল্প পড়তে শিখেছিলি তার পর আর কিছু বুঝি পড়িস্‌নি ?"

সুবর্ণ বলিল, "আর পড়বার সময় কোথায় পেলাম বাবা ? ও-বাড়ীতে কি বই হাতে করবার জো ছিল ? শাশুড়ী অমনি গাল দিয়ে বাড়ী মাথায় করতেন। বল্‌তেন যত অলক্ষুণে কাণ্ড, মেয়েমানুষের অত বিদ্যের কাজ কি ? আমরা যে পড়াশুনো করিনি তা আমরা কি মানুষ নয় ?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "মানুষ বলা চলেনা বিশেষ। তা যাক্, তুই দরজা বন্ধ করে বসে পড়, আমি একটু ঘুরে আসি। তোর ভয় নেই, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আস্‌ব।"

সুবর্ণর ভয় যথেষ্টই করিতেছিল, কিন্তু আপত্তি করিতে সাহস করিলনা। প্রতুলচন্দ্র বাহির হইয়া যাইতেই তাড়াতাড়ি দরজার হুড়কা আঁটিয়া বই লইয়া বসিল। পড়িতে বেশীক্ষণ ভাল লাগিলনা। তখন বাক্সগুলি খুলিয়া ভিতরের

জিনিষপত্র সব গুছাইতে লাগিল। মায়ের বাক্স দুটি খুলিয়া তাহার দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাক্সের উপর মাথা রাখিয়া সে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

হঠাৎ কে দরজায় ঘা দিল। সুবর্ণ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। দরজাটা চট্‌ করিয়া খুলিতে ভরসা হইলনা। কে জানে কে? চাকরগুলিকেও তাহার বড় ভয় ছিল। পল্লীগ্রামে কলিকাতার চাকর সম্বন্ধে কতরকম গল্পই যে শুনিত তাহার ঠিকানা নাই। তাহারা নাকি সব করিতে পারে। দরজায় একটা ফুটা ছিল, তাহার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। মেসের চাকর সূয্যি একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

স্ত্রীলোক দেখিয়া সুবর্ণর সাহস হইল। দরজাটা খুলিয়া বলিল "বাবা ত এই একটু আগে বেরিয়ে গেলেন।"

সূর্য্য বলিল, "বাজার যাবার পথেই রাজুর মাকে দেখলাম, তাই ভাবলাম আগে পৌঁছে দিয়ে আসি। তা তুমি বোসো, বাবু আসবেন এখনি, আমি ততক্ষণ বাজারটা সেরে আসি। নইলে বামুন ঠাকুর আবার গণ্ডগোল করবে।"

সূর্য্য নামিয়া গেল। রাজুর মা ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুবর্ণ আবার দরজা বন্ধ করিতে যাইতেছে দেখিয়া বলিল, "থাক্ দিদিমণি, আমিই বস্‌ছি, দোর বন্ধ করে আর কি হবে? তুমি এই বুঝি প্রথম কলকাতায় এলে?"

সুবর্ণ খাটের উপর বসিয়া বলিল "হ্যাঁ, এই প্রথম। তুমি কি আগে এখানে কাজ করতে?"

ঝি বলিল, "করেছিলাম কিছুদিন, তা এ-সব বাবুদের মেসে মেয়েমানুষের কাজ পোষায়না।"

সুবর্ণ একটু যেন ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কেন? এঁরা কি লোক ভাল নয়?"

ঝি জিব কাটিয়া বলিল, "ওমা, তা কেন হবে? তবে এঁদের বাইরের কাজ বড় বেশী কি না, মেয়েমানুষ কি অত দৌড়ধাপ করে কাজ করতে পারে? তাই আমিই ত সূয্যিকে এনে দিলাম। ও আমারই গাঁয়ের লোক কি না।"

সুবর্ণ বলিল, "তোমার বাড়ী কোন্ গাঁয়ে ঝি? আমাদের গাঁয়ের দিকে কি? আমার বাপের বাড়ী জাম্‌রাল গাঁয়ে।"

ঝি বলিল, "না মা, আমাদের গাঁ সে অনেকদূর। রেলের গাড়ীও নেই, কিছুই না, চল্‌তে চল্‌তে ঠ্যাং দুখানা যেন খসে যায়। যাদের ট্যাকার জোর আছে, তারা অবিশ্যি গাড়ী পাল্‌কী করে যেতে পারে।"

রাজুর মাকে সুবর্ণর ভালই লাগিতেছিল, মোটের উপর। এ পাড়াগাঁয়ের মানুষ, অনেকটা তাহারই মত। সহরের লোকগুলি কেমন যেন, এমন কি প্রতুলচন্দ্রও। তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতেই ভরসা হয়না। আর কি কথাই বা সে বলিবে? সে যে সকল বিষয়ে গল্প করিতে পারে, তাহার ভিতর ইঁহারা কোনোই রস পাইবেননা। আবার ইঁহারা যে সকল বিষয়ে কথা বলেন, সুবর্ণ নিজে তাহা বুঝিতে পারেনা। সে জানে গ্রামের সরল, নিরাড়ম্বর জীবনকে, যাহা সে চিরদিনের মত ছাড়িয়া আসিয়াছে। কালক্রমে সে এই সহরবাসীদেরই মত হইয়া যাইবে, ভাবিতে তাহার মনে কেমন একটা মিশ্রিত ভাবের উদয় হইতে লাগিল। সেও কি নিজের বাল্য-জীবনকে অবজ্ঞা করিতে শিখিবে? এই জীবনটার ভিতর দুঃখ যন্ত্রণা অনেক ছিল, তবু ইহাকে ছাড়িতে ত কষ্ট হয়। এই জীবনে তাহার মায়ের স্মৃতি জড়ান, তাহা কি কখনও অবজ্ঞা করিবার জিনিষ? এমন ভালবাসা জগতে আর কোথাও আছে কি? কিন্তু মানুষের মত মানুষ হইতে পারিবে, কাহারও অত্যাচারের কাছে মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইবেনা, ইহা মনে করিয়া আনন্দও একটু হইল। উৎপীড়নের ভিতর বাস করিয়া সে যে মানবজীবনের বহু মূল্যবান জিনিষ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহা যেন অল্প অল্প করিয়া বুঝিতে আরম্ভ করিল।

প্রতুলচন্দ্র অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন। রাজুর মাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে? তুমি ত আগে এখানেই কাজ করতে না?"

রাজুর মা বলিল, "হ্যাঁ বাবু। তা কি কাজের জন্তে ডেকেছেন আমায়?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "কাজ বেশী আর কি? উপরে এর কাছে থাকবে, যা দরকার হয় করবে। আমাকে ত বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে সারাক্ষণ, ওর কাছে একজন মানুষ থাকা দরকার।"

রাজুর মা বলিল, "তা বাবু আপনি নিশ্চিন্দি মনে

যেখানে খুসি যাবেন, আমি থাকতে ভাবনা নেই কিছু। পেটের দায়েই ঝিগিরি করতে বেরিয়েছি, নইলে আমরা ভাল গেরস্তঘরের বউ। বাবু, তাহ'লে মাইনেটা কি রকম দিচ্ছেন ?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আমি বেশী দিনের জন্তে তোমায় রাখছিনা ত ? যে ক'দিন এখানে থাকি, তুমি কাজ কোরো, দিনে আট আনা করে পাবে।"

এতখানি পাইবার আশা রাজুর মা করে নাই। সে খুসি হইয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার পর, স্বর্ণকে লইয়া পাশের ঘরে গিয়া আবার আড্ডা জমাইয়া বসিল। সকালের কাজ চাকররা সারিয়া গিয়াছে, নাওয়া খাওয়ার আগে আর কোনো কাজ নাই।

প্রতুলচন্দ্র চিঠি লিখিতে বসিয়া গেলেন। স্বর্ণকে কলিকাতায় রাখিবার ইচ্ছা তাঁহার বিশেষ ছিলনা। গ্রামের এত কাছে না থাকাই ভাল, শ্বশুরবাড়ীর উৎপাত আবার আসিয়া জুটিতে পারে। এখনকার মত রাগের মাথায় তাহারা বউকে বিদায় করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু আবার ফিরিয়া চাহিতে আটক নাই। প্রতুলচন্দ্রের টাকার খ্যাতি আছে, স্বর্ণ তাঁহার একমাত্র সন্তান। সুতরাং জামাই যে স্ত্রীকে আজ না হয় কাল আবার ফিরিয়া চাহিবেন, তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, মেয়েকে আর সে কশাইখানায় ঢুকিতে দিবেননা।

(৮)

কলিকাতায় আসিয়া স্বর্ণর প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। সে এরই ভিতর নানারকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। মোটর গাড়ী বা ট্রাম দেখিলে আর সে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকেনা, নানা জাতির নানা রকম পোষাক-পরা লোক দেখাও তাহার অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। রাজুর মা যদিও ঝি, তবু সে কলিকাতার অনেক শিক্ষিত পরিবারে কাজ করিয়াছে, সেখানকার মেয়েরা কেমন করিয়া চুল বাঁধে, কি কি কাপড় পরে, তাহা তাহার খানিক খানিক জানা আছে। স্বর্ণ তাহার কাছে কিছু কিছু শিক্ষা পাইতেছে, যদিও পুরাপুরি আধুনিক সাজ-সজ্জা শিখিতে এখনও অনেক বাকি।

বিকাল হইয়া আসিয়াছে। রাজুর মা এক ঘরে স্বর্ণর চুল বাঁধিতে বসিয়াছে আর এক ঘরে প্রতুলচন্দ্র দাড়ি কামাইতেছেন। স্বর্ণকে লইয়া তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ী যাইবেন, বন্ধুপত্নীর সঙ্গে নানা রকম পরামর্শ করিতে হইবে।

চুলবাঁধা শেষ করিতে করিতে রাজুর মা বলিল, "আমি যেমন জানি, বেঁধে দিলাম দিদিমণি। বোস্‌বাবুর বাড়ীর খুকীগুলো কিন্তু ভারি সুন্দর চুল বাঁধে, তারা বিনুনীও করেনা, এমনিই বাঁধে।"

স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করিল, "চুল খুলে যায় না ?"

রাজুর মা বলিল, "খুলবে কেন গা ? এই গোছাভরা কাঁটা নিয়ে বসে। সে কাঁটাও আবার কত রকমের, কোনোটা বা কচ্ছপের খোলার, কোনোটা বা সেলুলাডের। আমি কি আর অত চেয়ে দেখতাম, নইলে শিখে নিতে কতক্ষণ ?"

প্রতুলচন্দ্র পাশের ঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "তোর হল রে ?"

স্বর্ণ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "এই যে হল বাবা, কাপড়টা পরে নিলেই হয়।" সে তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে মুখ ধুইতে ছুটিল।

কি কাপড় পরিবে, কেমন করিয়া পরিবে, সে হইল আর এক ভাবনা। পোষাক পরিচ্ছদ কিছু কেনা হইয়াছে বটে, তবে স্বর্ণ সেগুলির ব্যবহার জানেনা। রাজুর মা সমস্তার সমাধান করিয়া দিল। বলিল "তুমি দিদিমণি, যেমন সাদাসিদে জান, তাই পর। আর ও-সব বিলিতি জুতো আজকাল কেই বা পরছে ? মেয়েরা সব জায়গায় এই খোট্টাই নাগ্‌রা জুতো পরেই ত যায় ? তুমিও তাই পর। তার পর ওদের বাড়ীর মেয়েদের কাছে শিখে নিও এখন।"

স্বর্ণ সাদাসিধা হইয়াই চলিল। প্রতুলচন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিলেন, "কেউ কথা বললে কথা বলবি, বুঝলি ? সেদিনকার মত একেবারে মুখ গুঁজে থাকিস্‌নে। এখানে তোর শ্বশুরবাড়ীর নিয়ম চলেনা, এখানে সব মানুষেই কথা বলে।"

স্বর্ণ সত্যই কথা বলিতে ভয় পাইত। সাত চড়ে বউয়ের মুখে রা থাকিবেনা, এই আদর্শেই সে শিক্ষিতা হইতেছিল। সকলের সঙ্গে সমানে কথা বলার অভ্যাসই

তাহার ছিলনা। কোন্‌খানে কথা বলিতে হইবে, এবং কোন্‌খানে হইবেনা, তাহা কিছুতেই সে স্থির করিতে পারিতনা, ইহার জন্যও তাহার লাঞ্ছনার সীমা ছিলনা। শাশুড়ী বা ননদ কথায় উত্তর শুনিলে মারিতে আসিত, আবার শ্রীবিলাসের কথার উত্তর না দিলে, সেও চড় চাপড় দু-একটা লাগাইত। দুই দলের মধ্যে পড়িয়া বেচারী সুবর্ণ কথা বলিতেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল।

ঘোড়ার গাড়ী করিয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়িল। দু-ধারে কত বড় বড় বাড়ী, রাস্তার উপর সবই দোকান। কত সুন্দর সব জিনিষ যে, সুবর্ণর ইচ্ছা করিতে লাগিল, সব দুই হাতে উঠাইয়া লইয়া যায়। সুন্দর জিনিষ, কিছু কিছু হাতে পাইয়া, সে এখন ইহার ভিতর কি যে আনন্দ আছে, তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বড় রাস্তা ছাড়িয়া, গাড়ী একটা গলির ভিতর ঢুকিল। প্রতুলচন্দ্র হাঁকিয়া বলিলেন "এই ডাহিনা রোকো।" ছোট একটি দোতলা বাড়ীর সামনে গাড়ী আর্ত্তনাদ করিয়া থামিয়া গেল।

সদর দরজাটা বন্ধ ছিল। কড়া নাড়িতেই, একজন খাকি হাফপ্যান্ট-পরা ছোট ছেলে আসিয়া দরজাটা খুলিয়া দিল। প্রতুলচন্দ্রকে দেখিয়া বলিল, "বাবা এক্ষুনি বেরিয়ে চলে গেলেন।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন "আর সকলে ত আছেন? তোমার মা?"

ছেলেটি বলিল "মা আছেন, রান্নাঘরে, আপনি চলুন।"

গাড়োয়ানকে দাঁড়াইতে বলিয়া প্রতুলচন্দ্র মেয়েকে লইয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন।

উপর তলায় তিনখানি মাত্র ঘর, কিন্তু বোধ হয় মানুষ অনেকগুলি, সবক'টি ঘরেই মানুষ থাকে, খায় দায়, ঘুমায়, তাহা বেশ বোঝা যায়। তবু মোটের উপর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ছেলেটি তাঁহাদের একটা ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, "বসুন, আমি মাকে ডেকে আনি।" ঘরের ভিতর দুই তিনখানি চেয়ার, এবং লঙ্কোএর ছিট্ দিয়া ঢাকা একটা তক্তাপোষ, প্রতুলচন্দ্র চেয়ারে বসিলেন, সুবর্ণ গিয়া তক্তাপোষেই বসিল।

বাড়ীর গৃহিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতুলচন্দ্রকে নমস্কার করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন "বসুন, বসুন, আমার চাকরটি পালিয়েছে, তাই সব ঠেলা একলাই ঠেল্‌ছি।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "তাহলে ত এসে আমরা আপনার কাজের ব্যাঘাত করলাম।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওমা সে কি কথা, চাকর পালিয়েছে বলে আমার বাড়ী কেউ আসবে না না কি? আমি ভাত চড়িয়ে এসেছি, সে হতে ঢের দেরি, খোকা সে দেখবে এখন। খোকা আমার ভারি কাজের ছেলে।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "এইটি আমার মেয়ে সুবর্ণ, এরই বিষয় আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে এনেছি।"

ভদ্রমহিলা বলিলেন, "এই না কি সুবর্ণ? কই দেখতে ত তের চোদ্দ বছরের লাগেনা? মনে হয় যেন এগারো বারো বছরের। আমাদের অমিতাও এই বয়সী, কিন্তু অনেকটা বড় দেখতে।"

পিতার ইঙ্গিতে সুবর্ণ উঠিয়া গৃহিণীকে প্রণাম করিল। তিনি তাহাকে আদর করিয়া আবার বসাইয়া দিলেন। বলিলেন "বোসো মা, বাড়ীতে ত একটা মেয়েও নেই যে একটু গল্প করবে। সব ক'টা হয়েছে ছেলে, হাড় জ্বালাতন একেবারে।"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "কি বলেন যে আপনি। আমাদের দেশে ছেলে হলেই ত লোকে খুসি হয়, মেয়ে আর চায় কে?"

গৃহিণী বলিলেন, "সেটা নিতান্ত অবস্থা গতিকে, মেয়ে নিয়ে অনেক ভুগ্‌তে হয় তাই। নইলে মেয়ে সন্তানের মত জিনিষ নেই, অন্ততঃ মায়ের কাছে। আমার ত একগণ্ডা ছেলে, কিন্তু বাড়ী যেন ভূতের বাথান। সব ক'টা বাইরে ঘোরে সারাক্ষণ, ঘর দোর একেবারে খাঁ খাঁ করে, একেবারে টিঁকতে ইচ্ছে করেনা। একটু যদি অসুখ করল, তা এমন একটা মানুষ নেই যে মুখে জল দেয়, কি গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেয়। ছোট খোকাটা এখনও তত বারমুখো হয়নি তাই রক্ষা, নইলে একেবারে অচল হত।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন "এ-সব কথা আপনার সভা ডেকে বলা উচিত, তাহলে আমাদের দেশের লোকের মত ফিরতে পারে।"

ভদ্রমহিলা বলিলেন, "সভা করবার সময় কই বলুন, ঘর-সংসার নিয়েই অস্থির। এই চাকর পালাচ্ছে, এই ঝি পালাচ্ছে। যদি বড় একটা মেয়ে থাকত, তাহলে কত অবসর পেতাম, ঘরও আলো হয়ে থাকত। আপনার এই সুন্দর মেয়েটিকে দেখে আমার বড় হিংসে হচ্ছে, কেড়ে নেবার জিনিষ হলে কেড়ে নিতাম।"

সুবর্ণ হাঁ করিয়া ইঁহার কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। এ ধরণের কথা সে জীবনে কখনও শুনে নাই। মেয়ে আবার কেহ জগতে কামনা করে, তাহা সে ভাবিতেও পারিতনা। জন্মাবধি সে শুনিয়া আসিতেছে যে মেয়ে সন্তান, কুসন্তান, তাহারা কেবল পিতামাতার যন্ত্রণাস্বরূপিণী। মেয়েও যে আনন্দদায়িনী, তাহার অভাবেও যে কেহ পীড়িত হয়, ইহা সুবর্ণের কাছে একেবারে নূতন খবর। এই অপরিচিতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ইঁহার কোলে ভগবান কন্যা দিলেন না কেন? তাহার নিজের মায়ের কথা মনে পড়িল; আদর দিয়া, স্নেহ দিয়া, সুবর্ণকে তিনি ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সুবর্ণ যে যন্ত্রণা দিতেই জন্মিয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহারও সন্দেহ ছিলনা। সন্তান বলিয়া স্নেহ তিনি করিতেন বটে, কিন্তু মেয়ের মূল্য কিছু তাঁহার কাছে ছিলনা। মাসীমাও এই একই কথা নিরন্তর তাহার কানে ঢালিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন নারীও তাহা হইলে জন্মিয়াছে, যে পুত্রের বদলে কন্যা কামনা করে?

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আপনার হাতে দিয়ে দেবার যদি সুবিধা করা যেত, তাহলে আমিও বেঁচে যেতাম। চিরদিন বই নিয়ে কাটিয়েছি, ছেলেমেয়ে মানুষ যে কি করে করতে হয়, সে বিদ্যা একেবারেই জানা নেই। মেয়েকে যথাসাধ্য সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করতে চাই, যাতে নিজের ভার সম্পূর্ণভাবে সে নিতে পারে, দুনিয়ার কারো মুখাপেক্ষী তাকে না হতে হয়। কিন্তু কোথা দিয়ে যে কি করব, কোথায় তাকে রাখব, কেমনভাবে শিক্ষা দেব, সব ভেবে যেন দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি।"

খোকার মা বলিলেন, "ভাববার ত কথাই বটে। বিশেষ করে মেয়ে বড় হয়ে গিয়েছে, সাধারণভাবে স্কুলে দিয়ে পড়ালে চল্‌বেনা। ওর তাড়াতাড়ি এগোনো দরকার, ভাল প্রাইভেট্ টিউটার রেখে কিছুদিন পড়ান, তার পর খানিকটা শিখে গেলে, তখন স্কুলে দেবেন। এখন দিতে গেলে নিতান্ত নীচু ক্লাশে নেবে, ছোট ছোট মেয়ের সঙ্গে পড়তে ওরও লজ্জা করবে।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "সে ত ঠিক, আর অকারণ সময় নষ্ট করা চলেনা। প্রাইভেট্ টিউটার ত এখনি রাখতে পারি, কিন্তু ওকে রাখব কোথায় সেও এক ভাবনা। নানা কারণে কল্‌কাতায় আমি রাখতে চাইনা। এমন স্থানে রাখতে চাই, যেখানে যা সব ঘটে গেছে, তা ভুলে যাবার ও সম্পূর্ণ অবসর আর সুযোগ পায়। কাজের জন্তে আমাকে থাকতে হবে কলকাতায়, অথচ মেয়েকে রাখতে হবে বাইরে, এইটাই হয়েছে এখন সব চেয়ে বড় সমস্যা।"

গৃহস্বামী শশধরবাবু এমন সময় ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন "রান্নাঘরে খোকাকে দেখেই বুঝেছি, আপনি এসেছেন। এইটি মেয়ে বুঝি?"

এবার আর সুবর্ণকে ইঙ্গিত করিতে হইলনা, সে নিজে উঠিয়াই শশধরবাবুকে প্রণাম করিল। তিনি বলিলেন, "বোসো, বোসো, তোমার নাম কি মা?"

সুবর্ণ নত মুখে বলিল "শ্রীমতী সুবর্ণলতা গুহ।"

শশধরবাবু বলিলেন, "আপনার মত আধুনিকের মেয়ের এ রকম নাম কেন?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "নাম রাখাটা আমার দ্বারা হয়নি।"

শশধরবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "ওর আগেকার সব কিছু যখন আপনি বদলে দিতে চাইছেন, তখন নামও দিন বদলে। তা হলে শ্বশুরবাড়ীর লোক এর পর নাম শুন্‌লেও আর তাকে চিন্‌তে পারবেনা।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "তা মন্দ নয়। গুহ নামটা ত বাদ দেব স্থিরই করেছি, সুবর্ণটা ও বদলে দিলে হয়। কি নাম তোর পছন্দ বল ত খুকি?"

সুবর্ণর হঠাৎ হাসি পাইল। বাবা যেন কি? নাম কি কাপড় চোপড়ের মত, বদ্‌লাইয়া ফেলিলেই হইল? তবু বাবা যখন বলিতেছেন তখন বদলাইতে তাহার আপত্তি নাই। নিজের নামের উপর বিশেষ কোনো মমতা সুবর্ণর ছিলনা। সে বলিল, "আপনার যা ইচ্ছে, রাখুন বাবা।"

শশধরবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আমিই তাহলে খুকীর নামকরণ করে দিই। সুপর্ণা নামটা আমার বড় পছন্দ,

ইচ্ছে ছিল নিজের যদি মেয়ে হয় তা হলে তার নাম রাখব। তা ত হলনা, নামটা আপনার মেয়েকেই উপহার দিলাম।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বেশ নাম। শ্রীসুপর্ণা মিত্রকে শ্রীমতী সুবর্ণলতা গুহ বলে কেউ identify করতে পারবেনা। নাম ত পাওয়া গেল, এখন থাকবার জায়গা একটা ঠিক হলেই হয়।"

শশধরবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আমি একটা জায়গার কথা বলতে পারি, আপনার চেনাশোনাও খুব বটে, কিন্তু বড় দূর হবে।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "দূরে হলে বেশী আপত্তি নেই, খুব কাছেতেই আপত্তি। কোথায় বলুন ত ?"

গৃহিণী বলিলেন, "আমি বল্‌ছিলাম দিল্লীর কথা; অমিতাদের বাড়ী রাখলে হয় না ? একটি সমবয়সী মেয়েও থাকবে, সব দিক দিয়ে সুবিধে।"

শশধরবাবু বলিলেন, "ভালই হয় বেশ। আপনি ত মেয়েকে শক্ত সমর্থ করে গড়তে চাইছেন, ও কাটখোট্টার দেশে রাখাই ভাল। বাংলাদেশে থাকলে বাঙালীর মেয়ে খানিকটা নরম-সরম হয়েই পড়ে। আব্‌হাওয়ার দোষ বা গুণ একেবারে কাটাতে পারেনা। অমিতাটা এরি মধ্যে ডাকাত হয়ে উঠেছে। লাঠি খেল্‌তে পারে, ছুরি খেলতে পারে, মোটর হাঁকাতে শিখ্‌ছে, কিছুই তার বাকি নেই। ভয় ডর জানেনা।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আমিও ঠিক ঐ রকমই চাই। তারণবাবু যদি আমার মেয়েটার ভার নিতে রাজী হন, তার চেয়ে সুব্যবস্থা আর কিছু হতে পারেনা। তবে ঘরে গৃহিণী নেই, নিজের একটি মেয়ে রয়েছে, আর ভার বাড়াতে রাজী হবেন কি না সন্দেহ।"

শশধরবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আহা, সেই জন্যেই ত আরো রাজী হওয়ার কথা। মেয়ের একটি সঙ্গী জুটলে তিনি ত বর্ত্তে যান। কতবার আফশোষ করেন যে অমিতাটাকে একেবারে একলা থাকতে হয়। দূরে কোথাও একটু যেতে হলে তাঁর অসুবিধার অন্ত থাকেনা। সুপর্ণা গেলে, ছুটিতে দুই বোনের মত দিব্যি থাকবে। চাকরবাকর যথেষ্ট আছে, বাড়ী বেশ বড়, গাড়ী রয়েছে, কোনো রকম অসুবিধারও ত আমি সম্ভাবনা দেখিনা। ওখানে পড়াশুনোর ব্যবস্থাও বেশ ভাল, যে লাইনে দিতে চান, দিতে পারবেন।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "সেটাও ভাবছিলাম। অন্য লাইনের চেয়ে মেডিক্যাল্ লাইনে মেয়েদের পসার করা সহজ। ওকে ডাক্তারীই পড়াব ভেবেছি, যদি আই-এ পাশ করতে পারে। তা লেডী হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজে দিব্যি পড়তে পারবে।"

শশধরবাবু বলিলেন, "আপনি আজই গিয়ে তারণবাবুকে চিঠি লিখুন। আমিও আজ লিখব। তিনি রাজী হবেনই। তার পর আর কি—টিকিট কেটে রওনা হওয়া। সুপর্ণার বেশ দেশ বেড়ানও হয়ে যাবে।"

সুপর্ণা নামটা তখনও নামধারিণীর কানে কেমন যেন ঠেকিতেছিল। তবু ঐ নামেই ত তাহাকে ইহার পর চলিতে হইবে তাহা সে মানিয়াই লইল। সুবর্ণর চেয়ে সুপর্ণা নামটা কিছু খারাপ নয়, বরং শুনিতে বেশী মিষ্ট বলিয়াই বালিকার বোধ হইল। তাহাকে সকল দিক দিয়াই যদি নূতন হইতে হয়, তা নামটাও না হয় নূতনই হইল।

আরো আধঘণ্টাখানিক গল্পের পর প্রতুলচন্দ্র যাইবার জন্য উঠিলেন। কিন্তু খোকার মা জলযোগ না করাইয়া ছাড়িলেননা। বলিলেন, "খুকি এই প্রথম দিন এল আমার বাড়ী, শুধু মুখে কখনও যেতে পারে ?"

মায়ের আদেশমত খোকা নিকটের দোকান হইতে কচুরি, শিঙাড়া, রসগোল্লা প্রভৃতি কিনিয়া আনিল। বাড়ীতে চিঁড়াভাজা হইল, চা তৈয়ারী করা হইল। বিধিমতে জলযোগ করিয়া তাহার পর প্রতুলচন্দ্র সুপর্ণাকে লইয়া বাড়ী চলিলেন। যাইবার সময় সুপর্ণা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া শশধরবাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া গেল। ইঁহাকে তাহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। কলিকাতার লেখাপড়া-জানা মেয়েদের নামে কত কথাই না সে শুনিয়াছিল। তাহারা না কি সারা দিন জুতামোজা আঁটিয়া চেয়ারে বসিয়া থাকে, শূওর গরু খায়, বল নাচে, আরো কত কি। সুপর্ণা বুঝিল, সে সকলই মিথ্যা।

বাড়ী ফিরিয়া রাজুর মায়ের কাছে সব গল্প করিল। সে বলিল, "ভালই ত দিদিমণি, লেখাপড়া শিখবে, ডাক্তার হবে। আমাদের পাড়ায় এক লেডী ডাক্তার আছে, মুঠো

মুঠো টাকা আন্‌ছে। কারো কি সে তোয়াক্কা রাখে? কত মানুষ বরং তার খোসা-মুদি করে।"

(৯)

সুপর্ণা আজ মহা ব্যস্ত। তাহার দিল্লাতে থাকিয়া পড়াই স্থির হইয়াছে। তারণবাবু খুব আগ্রহের সঙ্গেই প্রতুলচন্দ্রের কন্যাকে নিজের গৃহে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার কন্যা অমিতাও সুপর্ণাকে চিঠি লিখিয়াছে। সুপর্ণা সে চিঠি সবটা না বুঝিলেও, মানুষগুলি যে খুব ভাল, এবং সে তাহাদের ঘরে গেলে তাহারা যে অত্যন্ত সুখী হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়াছে। তাহাকে লেখাপড়া যখন শিখিতেই হইবে, তখন বোর্ডিংএ না থাকিয়া, একটা অন্ততঃ বাঙালী পরিবারে থাকিতে যে পাইতেছে, ইহাই যথালাভ। এই কয়েক দিনের ভিতর তাহার মনের বয়স অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। পিতার সঙ্গে নানা বিষয়ে সে আলোচনা করিয়াছে, সে যেমন ভাবে যাহা বোঝে তাহা জানাইয়াছে। মোটের উপর দিল্লী গিয়া থাকাটাই সকলের সবচেয়ে সুবিধা-জনক ব্যবস্থা বলিয়া মনে হইয়াছে।

কাল তাহাদের যাত্রার দিন। সুপর্ণা অতিশয় ব্যস্ত-ভাবে কোমরে কাপড় জড়াইয়া জিনিষপত্র গুছাইতেছে। প্রতুলচন্দ্র বাহিরে বাহিরেই ঘুরিতেছেন। সুপর্ণার জন্য শশধরবাবুর স্ত্রীর উপদেশমত জিনিষ কেনা হইয়াছে একরাশ। তিনি বলেন, "বাঙালীর মেয়ের কাপড়-চোপড় ও খোট্টার দেশে কি পাবেন? যা করাবার তা এখান থেকেই করিয়ে নিয়ে যান।" প্রতুলচন্দ্র তাঁহার হাতে টাকা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তিনিই কাপড় কিনিয়াছেন, দরজী ডাকাইয়া-ছেন, শেলাই করাইয়াছেন। সুপর্ণা দিন দুই তাঁহার ওখানে গিয়া কাপড় চোপড় পরার শিক্ষা লইয়া আসিয়াছে। উঁচু হিলের জুতা পরিয়া হাঁটিতে এখনও তাহার অসুবিধা হয়, তবে নাগ্‌রা জুতা পরিয়া এখন সে বেশ খরখর করিয়া চলিতে পারে। পড়িবার জন্য বইও কেনা হইয়াছে অনেকগুলি।

রাজুর মা জিনিষ একটা একটা করিয়া অগ্রসর করিয়া দিতেছে, সুপর্ণা গুছাইতেছে। জিনিষের মায়ায় তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে,—পাছে নষ্ট হয়, পাছে ছেঁড়ে এই ভয়েই সে অস্থির। পুরান ট্রাঙ্ক ছাড়া, নূতন একটা স্যুট্‌কেস্ আসিয়াছে, তাহার ভিতর সদা-সর্ব্বদা দরকার এমন জিনিষ সব সুপর্ণা গুছাইয়া রাখিতেছে।

রাজুর মা বলিল, "দিনে দিনে কত রকম জিনিষই হচ্ছে দিদিমণি। এত রকম বাক্স প্যাটরাই বা আগে কোথায় ছিল? বড় বড় সিন্দুক থাকত, তাতেই বাসন-কোষণ, দুচারখানা সোনারূপো যা থাকত গেরস্তর, তা তোলা থাকত। কাপড়চোপড় এত কেই বা পরত? একখানা পাটের শাড়ী, কি বালুচরী শাড়ী থাক্‌ল ত ঢের। কোথাও কেউ গেল ত পোঁট্‌লা করে কাপড়চোপড় নিয়ে গেল, ব্যস্।"

সুপর্ণা বলিল "এখনও পাড়াগাঁয়ে এ সব জিনিষ কোথায় ঝি? নিতান্ত গরীবের ঘরে ত ছিলামনা, কিন্তু এ-সব কখনও চোখেও দেখিনি। যাক্, আমার একরকম হয়ে গেল, খালি বাকি বিছানা বাঁধা, আর খাবারদাবার গুছিয়ে নেওয়া। তা বিছানাটা ত এখন বাঁধা চলবেনা, আর খাবার-দাবার রাত্রির আগে পাওয়াই যাবেনা।"

রাজুর মা বলিল, "বাবা, কোন্ রাজ্যি দিদিমণি, যেতেই তিনটে দিন। আমার ত তিন ঘণ্টার বেশী চার ঘণ্টা টেরেণে থাকলেই গায়ে পায়ে ব্যথা হয়ে যায়। নেহাৎ তুমি ছেলেমানুষ একলা যাবে, তাই যেতে রাজী হয়েছি, নইলে কি আর আমি এগুই? আর বয়স হোলো, মাঝপথে পৈরাগেও তোমরা একদিন থাকবে বল্‌ছ, ভাবলাম ডুবটা একবার দিয়ে নেব ত্রিবেণীতে।"

সুবর্ণা বলিল "যা হুড়োহুড়ির কাণ্ড বাপু, ডুব দেওয়া টেওয়া কতদূর হবে জানিনা।"

রাজুর মা বলিল, "সে আমি ঠিক করে নেব, দিদিমণি, তুমি দেখো এখন।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। প্রতুলচন্দ্র তখনও ফেরেন নাই। সুপর্ণা একলাই জলযোগ সারিয়া, চুল বাঁধিয়া, মুখ ধুইয়া, ছাতে খানিকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। কত দিনের জন্য বাংলাদেশ ছাড়িয়া চলিল, কে জানে? সত্য বটে, এখানে তাহার আপনার জন বিশেষ কেহ রহিলনা, তবু দেশটার উপরেও ত মায়া পড়ে? তাহার বাল্য জীবনের লীলাক্ষেত্র জাম্‌রাল, কৈশোরের বিভীষিকাময় ভাটগ্রাম, এগুলি কি আর সে চোখে দেখিবে? আর, আর শ্রীবিলাস? সুপর্ণা যেন এক ঝট্‌কায় মনটাকে সেদিক

হইতে সরাইয়া লইল। আর সব স্মৃতি সে মনের কোণে লুকাইয়া রাখিবে, অবসরমত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবে, কিন্তু এই মানুষটিকে একেবারে তাহাকে ভুলিতে হইবে। সে বুঝিয়াছে, পিতা ইহাই চান। নিজের বুদ্ধিতেও অনুভব করিতেছে, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে ইহার স্থান কোনাখানেও নাই। কিন্তু ভুলিয়া যাওয়া এতই কি সহজ? ভালবাসা সে শ্রীবিলাসের নিকট হইতে পায় নাই, দিতেও সাহস করে নাই। তবু সুপর্ণার অস্ফুট জীবন-কলিকায় কীটেরই মত শ্রীবিলাস বিহার করিতেছিল। তাহার অভিযানচিহ্ন এখনও বালিকার কোমল হৃদয়ে দারুণ ক্ষতের মত জাগিয়া আছে। তাহাকে ভুলিতে সে পারিবে কি?

প্রতুলচন্দ্র রাত্রে বাড়ী ফিরিলেন। যাইবার ব্যবস্থা করা, ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করা প্রভৃতি লইয়াই তাঁহার সারা দিন কাটিয়া গিয়াছে। সুপর্ণাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, এখনও জেগে বসে আছিস্ কেন? সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়তে হয়। এর পর দুটো দিন হয় ত বসে কাটাতে হবে।"

সুপর্ণা বলিল, "আপনার জিনিষপত্র কিছু গোছান হলনা, শুই কি করে? কি কি নিয়ে যাবেন, আমি ত জানিনা, নইলে গুছিয়ে রাখতাম।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আমার আবার কি জিনিষ? দুচারটে ধুতি, পাঞ্জাবী, আর বই—এই ত আমার যাবে? সে আমি গুছিয়ে নেব, তুই শুগে যা। রাজুর মা যাচ্ছে ত?"

সুপর্ণা বলিল, "হ্যাঁ যাচ্ছে, সে ত কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে ঘর থেকে চলে এসেছে, রাত্রে আমার ঘরেই শোবে।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "ভাল, নইলে সকালে আবার হুড়োহুড়ি বেধে যেত। তোর কাজ হয়ে থাকে ত তুই খেয়ে শুয়ে পড়্গে।"

রাজুর মা নীচে খাবারের জন্য তাগাদা করিতে গেল। প্রতুলচন্দ্র রাত্রে নীচে অন্য বাবুদের সঙ্গেই গিয়া খাইতেন। এই সময়টা সকলকে একসঙ্গে পাওয়া যাইত, গল্পগুজব হইত। সুপর্ণা একলাই উপরে খাইত। আজও খাওয়া সারিয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িল। রাজুর মা নীচে খাইতে গেল। সে একবার নীচে নামিলে ঘণ্টা দুইয়ের কমে উপরে আসিতে চাহিতনা, এইজন্য সুপর্ণা তাহাকে পারতপক্ষে নীচে যাইতে দিতে চাহিতনা। দিনের বে রাজুর মা কোনোমতে এ অন্যায় আবদার সহিয়া যাই কিন্তু রাত্রে আর তাহাকে আট্‌কান যাইতনা। সুপর্ণা এঁটো বাসন লইয়া সে যে নামিত, আর রাত এগারোটা আগে তাহার দর্শন মিলিতনা।

সকালবেলাই গাড়ী। হাজার গোছান থাকিলে শেষ মুহূর্ত্তে দেখা যায়, কতগুলা কাজ বাকি পড়িয়া আছে। বিছানা বাঁধা, খাবার গোছান, ছাড়া কাপ তোলা, জলের কুঁজা ঠিক করা, কাজের কি আর অ আছে? যাহারা সদাসর্ব্বদা ভ্রমণে অভ্যস্ত তাহারা এ সময় স্থৈর্য্য হারাইয়া ফেলে, রাগারাগি করে, হাঁকডাক করে। সুপর্ণা বেচারী জীবনে কখনও এত দূরদেশ যাত্র করে নাই। ভয়ে, উত্তেজনায়, তাহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। প্রতুলচন্দ্র বিশেষ অধীর মানুষ নয় তাই রক্ষা। রাজুর মা এবং চাকররা মিলিয়া কোনো গতিকে কাজ উদ্ধার করিয়া দিল। গাড়ীতে উঠিয়া সুপর্ণা যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু ষ্টেশনের গোলমাল, ট্রেণে ওঠা, সব ত তখনও বাকি। এখানে আসিয়া সুপর্ণা আবার সেই কলিকাতায় আসার দিনের মত জড়পিণ্ড হইয়া গেল। রাজুর মা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ভয় কি দিদিমণি? কত গোমুখ্যু বুড়ো-হাবড়া সব রেলে চড়ে আজকাল দেশ-বিদেশ চলে যাচ্ছে। তোমার ভয় কিসের? তুমি ত বাপের সঙ্গে যাচ্ছ।"

সুপর্ণার তবু ভয় ঘোচেনা। এত লোক, এত কোলাহল, তাহাকে কেমন যেন অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল। প্রতুলচন্দ্র তাহাকে ঠেলিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিবার পর সে প্রথম চাহিয়া দেখিল যে কোথায়, কাহাদের সঙ্গে সে গাড়ীতে উঠিয়াছে।

সেকেণ্ডক্লাশে ফিরিঙ্গী বা ইংরাজের সহিত যাইতে সুপর্ণা অত্যন্ত ভয় পাইবে মনে করিয়া প্রতুলচন্দ্র তাহার জন্য ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশেরই টিকিট কিনিয়াছিলেন। রাজুর মা সঙ্গে আছে, সুতরাং তাহাদের মেয়েদের গাড়ীতেই তুলিয়া দিলেন। তাঁহার সঙ্গে লইতে আপত্তি ছিলনা, কিন্তু সুপর্ণা একদল অপরিচিত পুরুষ যাত্রীর সামনে খাইতে, ঘুমাইতে পারিবেনা, তাহার সকল দিকেই

অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। রাজুর মা তাঁহাকে প্রবল রকম আশ্বাস দিয়া বলিল,"কোনো অসুবিধে হবেনা বাবু, আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন। এই বয়সে, কাশী, গয়া, গঙ্গাসাগর সব একলা ঘুরে এসেছি। পথের হালচাল আমি আবার জানিনা? কই কেউ এগুক দেখি আমার সামনে?"

গাড়ীতে বেশী যাত্রিনী ছিলনা। এক বেঞ্চে একটি প্রৌঢ়া বিধবা বসিয়া ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে বছর সাত-আটের একটি ছেলে। অন্য একটা বেঞ্চে একটি ঘোমটা দেওয়া বউ শিশু কোলে বসিয়াছিল। তৃতীয় বেঞ্চখানি সুপর্ণারা গিয়া দখল করিল। কুলিরা সরবে এই গাড়ীতেই তাহাদের জিনিষপত্র উঠাইতে লাগিল।

অন্যান্য ষ্টেশনে সময়ের অভাবে লোকে ব্যতিব্যস্ত হয়, হাবড়াতে হয় সময়ের আতিশয্যে। গাড়ী আর ছাড়িতেই চায়না। সুপর্ণারও প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিল। গাড়ীটা ছাড়িলেই সে বাঁচে, এত গোলমাল আর তাহার সহ্য হইতেছিলনা। রাজুর মাও এত দেরি বিশেষ পছন্দ করিতেছিলনা। সে বলিল "আর কি দরকার বাপু, এর পর ছেড়ে দিলেই ত পারে। আবার হট্ করে কখন একগাদা মানুষ ঢুকে পড়বে।"

সেই প্রৌঢ়া মহিলাটি বলিলেন "তা বল্লে কি হয় বাছা, গাড়ী ত আর একজনের দরকারের জন্যে নয়? কত মানুষ হয় ত এই শেষ পাঁচ মিনিটে ছুটোছুটি করে আসবে, গাড়ী না পেলে তাদের কত কাজ মাটি হবে।"

রাজুর মা বলিল "সে কথা ঠিক মা, তবে মানুষে নিজের গরজই দেখে কি না? আপনি কোথায় যাচ্ছেন মা?"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "আমি যাচ্ছি চুনার, সেইখানেই বছরের ছ' মাস আমার কাটে। কলকাতায় ছেলে কাজ করে, চুনারে আছে মেয়ে-জামাই, এ আমার এক আচ্ছা টানা-পড়েন হয়েছে। তোমরা কোথায় যাচ্ছ গা? লগেজ্ ত দেখছি এক পর্ব্বত সমান?"

রাজুর মা গর্ব্বের সহিত বলিল, "যাচ্ছি কি আর এ দেশে? সেই যার নাম দিল্লী। তবে মাঝে একদিন পৈরাগে নেমে থাকব তাই রক্ষে।"

বিধবা বলিলেন, "দিল্লী যাচ্ছ? বাবা, গা হাতে বাত ধরে যাবে। ঠিকই বলেছ, সে কি আর এ দেশ?"

রাজুর মা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কখনও সেখানে গেছেন না কি মা?"

বিধবা বলিলেন, "যাইনি আর আমি কোথায় বাছা? পাঞ্জাব মেল, বোম্বাই মেল ত আমার ঘর-বাড়ী হয়ে উঠেছে। জন্মেছিলাম পাঞ্জাবে, বিয়ে হয়েছিল পশ্চিমে, তাও ডেপুটির সঙ্গে, যারা না কি সাতঘাটের জল খাওয়ার জন্যে বিখ্যাত। তার পর ছেলে হয়েছেন বাংলা দেশের চাকুরে, মেয়ে আছেন পশ্চিমে, কাজেই আমার আর ঠ্যাং ছুখানা অবসর পাচ্ছে কৈ?"

বাঙালীর মেয়ে জন্মাবধি এত দেশ-দেশান্তর বেড়াইয়াছে শুনিয়া সুপর্ণার ভারি কৌতূহল হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এত ঘোরাঘুরি করতে আপনার ভাল লাগে?"

বিধবা হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বয়স যখন ছিল মা, তখন ত ভালই লাগ্‌ত। পরে অবিশ্যি কচি কচি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বড় নাকাল হয়েছি। এখন আবার ঝাড়া হাত পা, এখন মন্দ লাগেনা। ঘুরতেই ভাল লাগে, এক জায়গায় বস্‌লেই প্রাণটা হুহু করে।"

এমন সময় আর একটি মহিলা গুটি দুই ছেলেমেয়ে এবং প্রচুর জিনিষপত্র লইয়া হুড়্‌মুড় করিয়া গাড়ীর ভিতর আসিয়া পড়িলেন। যাহারা আগে আসিয়া জায়গা জুড়িয়া বসে, তাহারা পরবর্ত্তী যাত্রীদের বড়ই বিদ্বেষের চক্ষে দেখে, যেন তাহারা অত্যন্তই অনধিকার-প্রবেশ করিতেছে। রাজুর মা নাকমুখ সিঁটকাইয়া ঘুরিয়া বসিল, সুপর্ণারও মুখের ভাবটা বিশেষ অমায়িক দেখাইলনা। গাড়ী তখন ছাড়ে ছাড়ে, কুলিরা জিনিষপত্র নির্ব্বিচারে বসিবার বেঞ্চে, অন্যের জিনিষের উপর, এমন কি মানুষের উপরেও চাপাইয়া দিয়া, পয়সা লইয়া নামিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে। একটা কুলির সঙ্গে ত রাজুর মার প্রায় হাতাহাতিই হইয়া গেল,—সে ছাতুখোর চোখের মাথা খাইয়া, একটা মস্ত বড় ট্রাঙ্ক সুপর্ণার বেতের টিফিন বাস্কেটের উপর চাপাইয়া দিয়াছিল আর কি? তাহা হইলেই ত এত যত্নে তৈয়ারী অত ভাল ভাল খাবার সব চুলায় যাইত!

সেই বিধবা মহিলাটির চেষ্টায় আবার শান্তি স্থাপিত হইল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আরে বাছা, অত ব্যস্ত হতে আছে কি? ওরা ছাতুখোর একে, তাতে গাড়ী ছাড়বার সিটি দিচ্ছে, ওদের কি আর মাথার ঠিক আছে?

একটু ছোঁয়াছুঁই ত পথ চলতে গেলে হবেই! শাস্ত্রেই আছে, বৃহৎ কাষ্ঠে গজ পৃষ্ঠে নিয়ম নেই। তা এমন বৃহৎ কাষ্ঠ আর পাচ্ছ কৈ? ধর ত দেখি এই পোঁটলাটা, এটা ঐ ট্রাঙ্কের উপর তুলে দাও। আর খোকা তুমি ঐ কাল বাক্সটা বেঞ্চের তলায় ঠেলে দাও ত বাবা? আর এই মাদুরের বাণ্ডিলটা কোণে দাঁড় করিয়ে দাও ত খুকি। বাস্, এইবার সব হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বোসো। অত দূরের পথ কি আর অমন কুণ্ডুলি পাকিয়ে বসে মানুষে যেতে পারে?"

নবাগতা মহিলা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আপনি ত খুব কাজের লোক দিদি, চট্ করে কেমন ব্যবস্থা করে দিলেন।"

প্রৌঢ়া হাসিয়া বলিলেন, "প্রতিভা চাই ভাই, অমনি কি হয়? তা ছাড়া জন্মে অবধি ঘরে যতদিন থেকেছি, গাড়ীতেও ততদিনই থেকেছি। কাজেই পাঞ্জাব মেলের হালচাল আমার বেশ জানা হয়ে গেছে। চোখ বুজে কোথায় কখন আছি বলে দিতে পারি।"

গাড়ী এতক্ষণে পূর্ণবেগে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সকলে যথাসম্ভব আরাম করিয়া বসিল। ছোট ছেলে মেয়ে যাহারা ছিল, তাহারা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। অন্য সকলে কাহার সহিত ভাল করিয়া গল্প জমান যায় তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিল। প্রৌঢ়ার সঙ্গে সকলেরই ভাব বেশ জমিয়া উঠিল।

সুপর্ণা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও কাহারও সহিত কথা বলিতনা। কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে, আর লোকে মুখ-চাওয়াচায়ি করিয়া হাসিবে, এই ছিল তাহার মর্ম্মান্তিক ভয়। কিন্তু এই বিধবাটিকে তাহার বড় ভাল লাগিয়া গেল। নিজের কথাতেই বোঝা যায়, তিনি বড় মানুষের মেয়ে, বড় মানুষের স্ত্রী, কিন্তু কেমন নিরহঙ্কার সাদাসিদা, সকলের সহিত কেমন হাসিয়া কথা বলিতেছেন। আবার কথাতে রস কত, হাসিতে হাসিতে পেটে ব্যথা ধরিয়া যায়। কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বলিবার সে সুবিধাই পাইলনা, সকলেই কথা বলিতে এমন বিষম ব্যস্ত। মধ্যে দুইজন ছেলের মা, পরস্পরের সহিত কথা বলিতেছেন দেখিয়া, সুপর্ণা একটু অগ্রসর হইয়া বসিল। বিধবা বুঝিতে পারিলেন, সুপর্ণা কথা বলিতে চায়। বলিলেন, "তুমি মা, দিল্লী চলেছ কার সঙ্গে?"

সুপর্ণা বলিল, "বাবা রয়েছেন ও-গাড়ীতে, আর এই ঝি আছে।"

বিধবা জিজ্ঞাসা করিলেন "দেশ বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি? তুমি কি স্কুলে পড়ো মা?"

সুপর্ণা বলিল, "না, আমি পড়বার জন্যেই দিল্লী যাচ্ছি। এখানে আমার পড়বার সুবিধে নেই। আপনি দিল্লী অনেকবার গিয়েছেন, না?"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "তা বার তিনেক গিয়েছি, সেকালে। এখনকার দিল্লী অনেক বদলে গিয়েছে শুনি, নূতন রাজধানী-টানি হয়ে। তা তোমার ভালই লাগ্‌বে,—দেখবার জায়গা, বেড়াবার জায়গা এমন আর কোথাও নেই। ছেলেবয়সে ফুর্ত্তি করেই দেখা যায়, তবে একটু বয়স হয়ে গেলে, মন খারাপ লাগে, খালি ভাঙাচোরা, খালি কবর শ্মশান। মানুষের জীবন যে কত ছোট জিনিষ, তা এই সব জায়গা দেখলে ভাল করে বোঝা যায়।"

সুপর্ণা অর্দ্ধেক বুঝিল, অর্দ্ধেক বুঝিলনা। আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে বাঙালী কি অনেক আছে?"

বিধবা বলিলেন, "অনেক না হলেও কিছু কিছু আছে বই কি? তবে বহুদিনের বাসিন্দা যারা, তারা প্রায় পাঞ্জাবীই হয়ে গিয়েছে। কথাবার্ত্তা বলবে, তাও এমন সুর করে, শুনলে তোমার হাসি পাবে। আগে আগে অনেকে ওড়না গায়ে দিত, আঙ্গিয়া পরত। গহনাগাঁটি ঐ দেশী প্যাটার্ণের এখনও পরে। তবে আজকাল কলকাতার লোক হরদম আস্‌ছে যাচ্ছে, কাজেই দেখে দেখে ওরাও শিখে নিচ্ছে।"

বেলা হইয়া পড়িল। রাজুর মা বলিল, "হাত মুখ ধুয়ে নাও দিদিমণি, তোমার খাবার বার করে দিই। এখনও লুচি গরম আছে।"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাছা, এই বেলা খেয়ে-দেয়ে নাও, নয় ত কোথাও হুড়মুড় করে এক পাল ঘোম্‌টানী উঠে পড়লে তাদের মধ্যে বসে খেতে ইচ্ছে করবেনা।"

রাজুর মা যত্ন করিতে সিদ্ধহস্ত। সুপর্ণাকে সব গুছাইয়া গাছাইয়া দিল। বড় একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র প্রতুলচন্দ্রকেও ডাকিয়া পাঠাইয়া খাবার দিল।

গাড়ীতে বালক বালিকা গুটি পাঁচ ছয় ছিল, তাহারা লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া সুপর্ণা তাহাদেরও প্রত্যেকের হাতে এক একটা করিয়া রসগোল্লা তুলিয়া দিল।

তাহার পর গাড়ী হুহু করিয়া ছুটিয়া চলিল। বাঙলা দেশ ছাড়াইয়া গেল, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ভিতর আসিয়া পড়িল। ষ্টেশনগুলিতে আর বাঙালীর মুখ দেখা যায়না, সব বিদেশী। গাড়ীর ভিতরেও যাত্রিনী বাড়িতে লাগিল। প্রতুলচন্দ্র মধ্যে মধ্যে নামিয়া মেয়ের খোঁজ লইতে লাগিলেন, রাজুর মার তদারকে তাহার আরামের কোনো ত্রুটি হইতেছেনা দেখা গেল। রাত্রি নামিয়া আসিল, যাত্রীদের মুখরতা ক্রমে নিদ্রার অঙ্কে বিরতি লাভ করিল। (ক্রমশঃ)

স্বর্ণকুমারী

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ

যেদিন শুধু পুরুষদলে বাণীর পূজার তরে
গাঁথিতে মালা তুলিত ফুল, আনিত সাজি ভ'রে,
জ্বালিত দীপ, জ্বালিত ধূপ, সাজাত থালি যত,
রমণীহীন দেউলতলে থাকিত ধ্যান-রত ;
সেদিন তুমি একেলা এলে আপনি রাণী হ'য়ে,
তোমার কাজ করিতে সারা বাণীর দেবালয়ে ;
সেদিন তুমি প্রথম নারী আসিলে পথ চিনি,
পূজার ঘরে কাঁকন তব বাজিল রিণিঝিনি !
দেখিল সবে চেয়ে,
মায়ের কাজে বাহিরে এল, মায়েরি কোনো মেয়ে !

সেদিন পথে অনেক বাধা, অনেক কটুকথা,
অনেক হাসি, কুটিল চোখে অনেক মলিনতা,
সকলি তুমি করেছ হেলা, সয়েছ অনায়াসে ;
সরম-ভরে শরণ তুমি লহনি গৃহপাশে।
শঙ্কাহীন মানস লয়ে সকল বাধা ঠেলি
মানুষ যারা, তাদেরি সনে দাঁড়ালে বাহু মেলি ;
লভিলে তুমি আসন তব, হেরিলে নব রবি,
বরিলে তুমি সেবার ব্রত প্রথম নারী কবি !
পরিলে জয়টীকা,
সকল দিকে উঠিল বাণী—স্বাগত সাহসিকা !

এখন দেখি সেবিকা বহু বাণীর পীঠতলে,
জয়ের ধ্বনি তাঁদেরো শুনি বিপুল কোলাহলে।
সহজ আজি হয়েছে পথ, সরল আজি গতি,—
করেছ তুমি একা এ কাজ, দেখনি ক্ষয় ক্ষতি !
কিশোরকালে যে ব্রত তুমি নিয়েছ শিরে বহি,
পালন তাই করেছ দেখি যখন পিতামহী !
আরতি তব 'ভারতী' হাতে সে কথা মোরা স্মরি,
ভাবিয়াছিনু প্রাচীন জনে নূতনতম করি !
ভাবিয়াছিনু মনে,
রহিতে নাহি দিব গো আর তোমারে নিরজনে !

চলিল দূত সকল দিকে বহিয়া সেই বাণী,—
তোমারি প্রীতি লভিতে হবে, তোমারে কাছে আনি,
মিলিত-গানে জানাতে হবে, তোমারে ভালোবাসি,
মধুর তব রচনা,—মোরা তাহারি অভিলাষী,
তোমারে জানি, তোমারে মানি,—এ কথাটুকু ব'লে
তোমারি জয় গাহিতে চাহি অসীম কলরোলে !—
সে আয়োজনই চলিতেছিল,—সহসা কেবা জানে
ধরণীতল ছাড়িয়া গেলে সে কোন্ অভিমানে !
চাহ না পূজা তুমি,
আপন পূজা করিলে শেষ জননীপদ চুমি !

জীবনে তব বেদনা বহু, নয়নে বহু বারি,
মরমে তব কত না ব্যথা, কে খোঁজ পেল তারি ?
বিলালে সুধা সেটুকু লহি, দেখি না কেহ ফিরে,
পারের পানে চাহিয়া তুমি দাঁড়ায়েছিলে তীরে !
সকল সাথী চলিয়া গেছে, আপন যারা ছিল,
বন্ধু যত স্বজন যত সকলি মিলাইল ;—
খ্যাতির নেশা এমন দিনে কভু কি জাগে চোখে ?
যেমনি ডাক শুনিলে তুমি, মিলালে দূরলোকে !
দীর্ঘকাল ধরি
যে গীতিগান গুঞ্জরিলে, উঠিল মরমরি।

আসিবে যাবে সেবিকা বহু মাতার দেউলে ত',
আসন তব শূন্য রবে ভরিবে না গো সে ত' !
তোমার কথা সবার আগে ধ্বনিবে বহু মনে,
আপনি জল উঠিবে জমি' সকল আঁখি কোণে !
সোণার রেখা আঁকিয়া গেলে, মুছিয়া যাবে যবে
সেদিন দেশ ভরিবে জানি গভীর হাহারবে !
মুছিবে না সে, মুছিবে না সে, মুছিতে নাহি পারে,
ঝলিবে নব-যাত্রীদলে পন্থা বলিবারে ;
প্রথম পূজারিণী,
বলিবে সবে—তোমারে চিনি তোমারে মোরা চিনি।

শেষের কবিতা

শ্রীঅবনীনাথ রায়

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ লিখতে স্বতঃই মনে সঙ্কোচ আসে এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ উক্ত গদ্য-কাব্যে যে বস্তুর উপর জোর দিয়েচেন সে হচ্চে ষ্টাইল। শেষের কবিতা আর কিছুর না হোক্, নতুন লিখন-ভঙ্গীর আধুনিকতম নিদর্শন; আর এ নিদর্শন একেবারে অনমুকরণীয়। সুতরাং 'শেষের কবিতা' সম্বন্ধে তাঁরাই প্রবন্ধ লিখ্‌বেন যাঁদের নিজস্ব ষ্টাইল আছে। আর বাংলা দেশে লেখায় যাঁদের নিজের ষ্টাইল আছে তাঁদের নাম করকোষ্ঠিতে গোণা যায় এ কথা সকলেই জানেন!

তবু অনুরোধে উপরোধে প'ড়ে অনেক দুর্ঘটনা জগতে ঘটে; বক্ষ্যমান প্রবন্ধ সেই সনাতন নীতিরই একটি অবশ্যম্ভাবী ফল।

'শেষের কবিতার' ষ্টাইল অনমুকরণীয় বল্‌ছিলুম এই হিসেবে যে ও-লিখন-ভঙ্গী অন্য হাতে খেল্‌বে না, আর ওর উপকরণ কম পরিমাণের কবি-প্রকৃতি জোগান দিতে পারবে না। যে বিশেষ শব্দগুলি পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের হাতে সালঙ্কার হ'য়ে উঠেচে সেগুলি অন্যত্র নেহাত খেলো শোনাবে। যেমন, 'যে কোন আলাপিতার সঙ্গেই কথা বলে', 'আনো ফজলিতর আম', 'চমৎকারা চিন্তা পড়াশুনার কাঁধে চেপে বসে', 'কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর সর্ব্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচ্‌কে না হেসে মরতেও জানে না', 'ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান আমীরদের কণ্ঠস্বরে এই রকম গদ্‌গদ জড়িমা', 'আমার হ'লো নিরাসবাবের তপস্যা', 'যকৃতের বিকৃতি-শোধনের জন্যে কুমার কিছুদিন এখানে থাক্‌বে বলেই স্থির ছিলো', 'মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল করা', 'উত্তরচ্ছদে অসম্মতির সীমানা এখনো আলজ্জতার অভিমুখে', 'কিন্তু তারা এমনি অবুঝের মতো ভাব করতো যেন হাওয়ার ক্ষুধাকরতা ছাড়া শিলঙে আর কিছু আছে এ কথা কেউ ভাবতে পারে না', ক্ষুধাকরতা অর্থাৎ কিনা ক্ষুধার উদ্রেক করিয়ে দেওয়া। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এর থেকে একটা কথা এই প্রমাণ হয় যে বইখানি প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় যাকে বলে "ফুর্ত্তি করে লেখা।" বইখানিতে নতুন লিখন-ভঙ্গী এবং ষ্টাইল নিয়ে এক্‌সপেরিমেণ্ট করা হয়েচে। কিন্তু এ এক্‌সপেরিমেণ্ট তাঁকেই শোভা পায় যাঁর হাতে আছে অজস্র বাছা-বাছা শব্দ, মাথায় আছে উদ্ভাবনী-শক্তি এবং লেখার মধ্যে আছে দীর্ঘ বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত ক'রে বল্‌বার অপূর্ব্ব কৌশল।

বইখানির নাম কবি কেন রাখ্‌লেন 'শেষের কবিতা' এ-কথা বহুবার আমার মনে উদয় হয়েচে, বিশেষ যখন বইখানি কবিতার বই নয়, বরঞ্চ উপন্যাস। দু' তিনটি কারণ আমার মনে হয়েচে, কিন্তু সে-গুলি সুধীসমাজে গ্রাহ্য হবে কিনা জানি নে। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে 'শেষের কবিতা' সম্বন্ধে লেখা কোন প্রবন্ধ আমি এখনো পড়ি নি—শুনেচি অনেকে লিখেচেন।

একটা কারণ আমার এই মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ যেন অনেক কাল বেঁচে থাকার জন্যে লজ্জিত; তাই কবি-যশঃপ্রার্থী নিবারণ চক্রবর্ত্তীকে সম্মানের আসন ছেড়ে দিয়ে নিজে অন্তরালে সরে যেতে চান। অতএব অনাগতকে সিংহাসন ছেড়ে দেওয়ার আগে শেষ শক্তি দিয়ে 'শেষের কবিতা'টি উৎসর্গ ক'রে বিদায় নিতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য তাঁর এ বিদায় মঞ্জুর হয়নি। এ বই লেখায় পরও তিনি উল্লেখযোগ্য অনেক কবিতা রচনা করেছেন এবং অমিত রায় যত বড়ই অনাগত-বিধাতা হোন্, রবীন্দ্রনাথকে সিংহাসনচ্যুত করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। ধাবমান কালের জালে রবীন্দ্রনাথ যে ধরা পড়েন নি তার প্রমাণ তাঁর অধিকাংশ লেখায় এখনো পাওয়া যাচ্ছে।

দ্বিতীয় কারণ এই মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ বল্‌তে চেয়েছেন মানুষের অন্তরতম সম্বন্ধটির প্রকাশ মানুষ একমাত্র কবিতার ভাষাতেই করতে পারে, গদ্যের ভাষা সেখানে অচল। লাবণ্য এবং অমিত রায়ের মধ্যে প্রেমের যে সম্বন্ধটি গ'ড়ে উঠেছিল ভাষার সাহায্যে তাকে প্রকাশ

করতে গিয়ে উভয়েই কবিতার আশ্রয় নিয়েচে। তার কারণ, মানুষ যখন ভালবাসে তখন সে তার উল্লাস, হর্ষকে মুক্তি দিতে চায় কথার মধ্যে—ছন্দোবদ্ধ কথা তখন তার মনের সুরকে যতটা প্রতিধ্বনিত ক'রে তুলতে পারে গদ্যের সে সাধ্য নেই। কেন না গদ্য ততটাই প্রকাশ করে যতটা তার বাইরের মূল্য, তার পেছনে কোন ধ্বনি বা ইঙ্গিত নেই। কবিতা ছন্দোগুণে তার ভাষাগত অর্থের অনেক বেশি দ্যোতনা করে, তার অর্থ বস্তু-জগতের সীমা ছাড়িয়ে একটা বিরাট ভাব-জগতের ইঙ্গিত করে, যার মধ্যে প্রেমিকের মন যথেচ্ছ গুঞ্জরণ করতে অবকাশ পায়। তাই অমিত রায় অনেক সময়েই তার মনের ভাবকে কবিতায় প্রকাশ না ক'রে তৃপ্তি পায় নি এবং লাবণ্যকেও টেনে এনেচে কবিতার রাজ্যের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ হয় ত 'শেষের কবিতা'র দ্বারা তাদের ঐ সম্বন্ধটির কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।

আর একটি সম্ভাবনার কথা-ও মনে হয়। বইখানি যদিচ গদ্যে লেখা, কিন্তু সে যে গদ্য-কাব্য তাতে আর সন্দেহ নেই। তাই হয় ত সমস্ত ঘটনা তথা বইখানিকে কবি একটি কবিতা বলতে চেয়েছেন। দু' একটা জায়গা থেকে এই গদ্য-কাব্যের একটু নমুনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :—

"কিন্তু লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গল গ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্ত্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করবো, তার পরে কি হ'বে ভেবে দেখো।" (১০-১১ পৃঃ)

"সন্ধ্যাতারা উঠেচে, জোয়ার এসেচে গঙ্গায়, হাওয়া উঠলো ঝির ঝির ক'রে ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠলো স্রোতের ছলছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদীঘি, সেইখানে খিড়কির নির্জ্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেচো, তোমার এক-একদিন এক-একরঙের কাপড়। ভাবতে ভাবতে যাবো আজকে সন্ধ্যেবেলার রঙটা কি। মিলনের জায়গারও ঠিক নেই, কোনোদিন শান-বাঁধানো চাঁপাতলায়, কোনোদিন বাড়ির ছাতে, কোনোদিন গঙ্গায় ধারের চাতালে। আমি গঙ্গায় স্নান সেরে সাদা মলমলের ধুতি আর চাদর পরবো, পায়ে থাকবে হাতির দাঁতে কাজ-করা খড়ম। গিয়ে দেখবো গালচে বিছিয়ে বসেচো, সামনে রূপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ে মালা, চন্দনের বাটিতে চন্দন, এক কোণে জ্বলচে ধূপ। পূজোর সময় অন্তত দু-মাসের জন্যে দু-জনে বেড়াতে বেরোবো। কিন্তু দু-জনে দু'-জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্ব্বতে, আমি যাব সমুদ্রে। * *

(১৪৩-১৪৪ পৃঃ)

এ নমুনাগুলিকে গদ্যের আকারে পদ্য ব্যতীত আর কি বোলবো? কেন না এর প্রাণ হচ্ছে কল্পনা, বর্ণনা নয়।

আর একটা কথাও সভয়ে পেশ করতে চাই। অমিত এবং লাবণ্য পরস্পরের কাছ থেকে দু'টি কবিতার ভিতর দিয়েই বিদায় নিয়েছিল, তাদের আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। কবি হয়ত বিদায়ের ঐ পরম মুহূর্ত্ত-দু'টিকে শেষের কবিতার বন্ধনে চিরন্তন ক'রে রাখতে চেয়েছেন। কেন না এটা অভিজ্ঞতাগত সত্য যে এ-জগতে ওর চেয়ে বেশি ভাগ্য মানুষের বিধিলিপি নয়। কবি-জীবন-সম্ভোগ কল্পনার রাজ্যেই সম্ভবপর, বাস্তব-জগতে তার প্রতিচ্ছায়া সুদুর্লভ।

এইবার গল্পের প্লট বা আখ্যানবস্তুর বিষয় চিন্তা করা যাক্। এ-কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে এর প্লটে কোন নূতনত্ব বা বিশেষত্ব নেই, কিন্তু নূতনত্ব আছে এর সাধারণ ঘটনার পিছনকার মনস্তত্ত্বের অসাধারণ বিশ্লেষণে। ঘটনাটি মোটামুটি এই যে, ধনীর দুলাল ব্যারিষ্টার অমিত রায়ের মোটরের সঙ্গে সুরমার গভর্ণেস্ লাবণ্যর মোটরের একদিন শিলং পাহাড়ে ধাক্কা লেগে গেল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মোটর দু'খানির ততটা বেহাল হয় নি, যতটা হয়েছিল উভয়ের মনের। পাহাড়ের এক নির্জ্জন বেঁকের মুখে কাল্পনিক অপরাধের ভিতর দিয়ে এক পরম সুন্দর যুবক চেয়ে দেখলে এক বিশিষ্টা রমণীকে—যে রমণী বুদ্ধির প্রভায় দীপ্তা, আত্মসম্মান-বোধের মহিমায় দৃপ্তা। অমিতর হৃদয়ের ওপর ওদের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মহিলাবৃন্দের অবাধ পরশ চলেচে, তথাপি ইতিপূর্ব্বে হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের কোন লক্ষণই ধরা পড়ে নি, কিন্তু

সেদিন পর্ব্বতচূড়ায় গোধূলিলগ্নের সেই পরমক্ষণে বিরাট নির্জ্জনতার পটভূমির সম্মুখে উভয়ের মনের মধ্যে একটা গ্রন্থি প'ড়ে গেল। পরস্পরকে যাচনা করার আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠ্‌লো। অমিত এবং লাবণ্য উভয়েই শিক্ষা দীক্ষা এবং মেজাজের প্রসাদে এমন শ্রেণীর জীব হ'য়ে হ'য়ে উঠেছিল যারা একটি বিশেষকে কামনা করতো। লাবণ্যর অধ্যাপক পিতা ছিলেন সেই শ্রেণীর মানুষ যাঁরা বিশ্বাস করেন যে পড়াশুনা দিয়ে মনটাকে ভরাট ক'রে রাখ্‌লে সেখানে কন্দর্পদেবের শরক্ষেপলীলায় অবকাশ ঘটে না। কিন্তু এর অন্যথার প্রমাণ একদিন তাঁর নিজেকেই দিতে হ'ল। লাবণ্য কিন্তু পিতার আদর্শ অনুযায়ীই তৈরি হয়েছিল—পড়াশুনা করেছিল সুপ্রচুর, কিন্তু মনের দরজা ছিল অর্গলাবদ্ধ। তাই পিতার কৃতী-শিষ্য শোভনলালের ভীরু প্রণয়োপচার অনাবশ্যক রূঢ়তায় লণ্ডভণ্ড হ'য়ে গেল—লাবণ্য স্বেচ্ছায় বেরুলো জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায়। তারপর শিলং শৈল-শিখরে একটি বাঞ্ছিত মুহূর্ত্তে অমিতর সঙ্গে হ'ল তার দেখা—শুধু দেখা নয়, পরিচয়। এতদিন যেন সে ঐ ঘটনাটির অপেক্ষাতেই বসে ছিল। মনের দুয়ার কার সোণার অঙ্গুলীস্পর্শে উন্মুক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

লাবণ্য মেয়েমানুষ—সুতরাং অমিতর সঙ্গে আলাপ হওয়ার কয়েকদিন পরেই বুঝ্‌তে পারলে যে অমিত নক্ষত্রলোকের জীব—বিবাহ বা সংসার ওর জন্যে নয়। লাবণ্যকে ও আবিষ্কার করেচে—লাবণ্যকে অবলম্বন ক'রে ওর কবি-প্রাণ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেচে, ওর সমস্ত মন একসঙ্গে কথা ক'য়ে উঠেচে। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের নিত্যতায় ওর প্রকৃতি ক্লিষ্ট হ'তে বাধ্য। তাই লাবণ্য অমিতর স্বরূপ সম্বন্ধে ঠিক তারটিতেই আঘাত করলে, যখন সে বল্‌লে, "তুমি সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ফেরো; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেচো।" লাবণ্য সম্বন্ধে অমিতর আবেগবহুল বন্দনার মধ্যেও লাবণ্য বিচারশক্তি হারায় নি; বলেছিল, "ধন্তোই আমার আলো থাক্ আর ধ্বনি থাক্, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে ছায়াকে আমি ধ'রে রাখ্‌তে পারবো না।" যত খুশী আলো আর ধ্বনি অমিত লাবণ্যর উপর আরোপ করুক না কেন, সে আরোপই গ্রহণ-যোগ্য নয়, এ-কথা লাবণ্য বুঝেছিল। যোগমায়াও যে বোঝেন নি তা' নয়। তিনি বলেছিলেন, "বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর তোমার কথাবার্ত্তায় লাগ্‌চে না," কিন্তু তাঁর স্নেহদুর্ব্বল মাতৃহৃদয় অমিতর দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকেছিল। যাই হোক্, অবশেষে লাবণ্য গেল শিলং থেকে পালিয়ে। অমিত কল্‌কাতায় ফিরে পূর্ব্ববন্ধু কেতকী মিত্রের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হ'ল এবং তাদের দু'জনের বিবাহের কথা শোনা যেতে দেরি হ'ল না। লাবণ্যেরও বিয়ে স্থির হ'ল শোভনলালের সঙ্গে। এই হ'চ্চে গল্পের কাঠামো।

অমিত এবং লাবণ্য যে পরস্পরকে গভীর ভাবে ভাল বেসেছিল এ-কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু লাবণ্য ধরা দিতে চাইলে না। লাবণ্য দিলে অমিতকে মুক্তি, কেন না সে বুঝেছিল অমিতর প্রকৃতির পক্ষে মিলনের চেয়ে মুক্তিই হচ্চে অনুকূল। সব প্রকৃতিতে বিবাহের বন্ধন সহ্য হয় না। কেউ চান অব্যাহত মুক্তির মধ্যে বন্ধন, আবার কেউ চান বন্ধন থেকে মুক্তি। শোভনলাল চেয়েছিল লাবণ্যর হাতের যে কোন রকমের বন্ধন, আর অমিত ছিল বন্ধন-ভীরু আইডিয়ালিষ্ট। শোভনলাল ভাগ্যকে একান্ত ক'রে মেনে নিয়েছিল, কোন-দিন বিদ্রোহ করে নি। সে দূর থেকে ভালবেসেই ক্ষান্ত ছিল, তার পূজা গৃহীত না হ'লে কুরুক্ষেত্র বাধায় নি। ব্যথা পাওয়াই তার স্বভাব, ব্যথা দেওয়া নয়। সুতরাং এ প্রকৃতির লোককে বিয়ে করতে পারে মেয়েরা পরম নিশ্চিন্তভাবে। শোভনলালের এতদিনকার নীরব প্রতীক্ষার মাথায় বিধাতা নিজের হাতে জয়টীকা পরিয়ে দিলেন।

কিন্তু শোভনলাল যদিচ লাবণ্যকে নিজের মত ক'রে পেলে, অমিত-ও যে পায় নি তা' নয়। যোগমায়া ত ওদের দু'জনের বিয়ের একটা অনুষ্ঠানও করেছিলেন, "লাবণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দু-জনের হাত বেঁধে বল্‌লেন, তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক্।" লাবণ্য তার শেষের কবিতায় চিঠিতেও এ বন্ধন স্বীকার করেছে,

"তোমারে যা দিয়েছিনু, তার
পেয়েছো নিঃশেষ অধিকার।"

আর শোভনলালেরও নিজের সৌভাগ্যের জন্যে অমিতর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন আছে। কেন না অমিত

যদি লাবণ্যর মনের দুয়ার খুলে তাকে জাগাতে না পারতো তবে শোভনলালও কোনদিন তার নাগাল পেত না। তাই লাবণ্য বলেছে,

"যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।"

এ ত প্রেম নয়, এ আত্ম-সমর্পণ, ভক্তের প্রতি দেবীর বরদান।

অতএব অমিতর এ-কথা বোঝা এখন আর অসম্ভব নয় যে "যে ভালোবাসা ব্যাপ্ত-ভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে-ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব কিছুতে যুক্ত হ'য়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।"

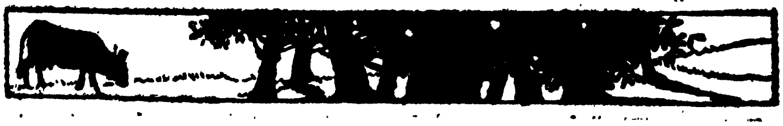
কেউ কেউ অনুমান করেন উপরের লাইনগুলির আইডিয়া থেকে শরৎচন্দ্র "শেষ প্রশ্নের" বীজমন্ত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। সত্য কি না বলতে পারি নে, কিন্তু এটুকু বলা যায় যে ও-একটি কল্পলোকের কথা, কাব্যের রাজ্য থেকে ওকে বাস্তবের মাটিতে নামালে যে ফল হবে সহসা মানুষ তাকে শিরোধার্য্য করবে না।

কেতকীর চরিত্রে কবি ক্রমবিবর্ত্তনের একটি ইতিহাস দেখিয়েছেন। অমিত একদিন প্রাক্-যৌবনে তাকে ভালবেসেছিল, কিন্তু খেয়াল মাফিক একনিষ্ঠ হ'য়ে থাকে নি। ফলে কেতকী গেল বদলে—অতিরিক্ত মেমসাহেব হ'য়ে গেল, কিন্তু তার ভিতরকার সনাতন নারী একেবারে মরলো না। তাই যখন শুনলে লাবণ্যর সঙ্গে অমিতর বিবাহের সব ঠিক-ঠাক্ হয়ে গেছে, তখন বললে, "এ আঙটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মুহূর্ত্ত হাত থেকে খুলি নি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হ'য়ে গেচে।' কেতকীর এ উক্তি যেন বিধাতার সময়োচিত সাবধানতার বাণী বলে মনে হ'ল। ফলে কেতকী ফিরে পেলে তার পূর্ব্বতন প্রণয়ীকে, আর নিজেও লাবণ্য তার অপেক্ষমান প্রণয়াস্পদের নিকট ফিরে গেল। অমিতকে পেয়ে কেটি মিত্তির আবার হ'লো কেতকী।

অমিত লাবণ্যকে বিবাহ করার পর দাম্পত্য-জীবনের যে ছবি এঁকেছিল রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত ও ছবি আর কেউ আঁকতে পারতেন না। সে ছবি বাস্তবে পরিণত হ'তে পারে নি সত্য, কিন্তু ও-চিত্র কবি-মনের জীবন উপভোগের একটি চিরন্তন উদাহরণ হ'য়ে রইল। কাল্‌চার এবং রুচির দ্বারা সংস্কৃত এবং বিশেষিত মনকে ও-চিত্র যুগ যুগ ধরে প্রলুব্ধ করবে:—

"স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, গঙ্গার ধার; পাড়ির নীচে তলা থেকে উঠেচে ঝুরি-নামা অতি পুরাণো বটগাছ। ধনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিল তখন হয়তো এই বটগাছে নৌকো বেঁধে গাছতলায় রান্না চড়িয়েছিল। ওরি দক্ষিণ-ধারে ছ্যাত্‌লা-পড়া বাঁধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল-ধরা, কিছু কিছু ধসে যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজে সাদায় রঙ করা আমাদের ছিপ্‌ছিপে নৌকোখানি। তারই নীল নিশানে সাদা অক্ষরে নাম লেখা * * * * মিতালি। * * * * বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু একটি খাড়ি চলে গেচে, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন ব'য়ে। তার ও-পারে তোমার বাড়ি, এ-পারে আমার। * * * তোমার বাড়িটির নাম মানসী, আমার বাড়ির নাম * * দীপক। নামের উপযুক্ত একটি দীপ আমার বাড়ীর চূড়োয় বসিয়ে দেবো, মিলনের সন্ধ্যেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল। কলকাতা থেকে ফিরে এসে রোজ তোমার কাছ থেকে একটি চিঠি আশা করবো। এমন হওয়া চাই যে চিঠি পেতেও পারি, না পেতেও পারি। সন্ধ্যে আট্‌টার মধ্যে যদি না পাই তবে হতবিধিকে অভি-সম্পাৎ দিয়ে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের লজিক পড়বার চেষ্টা করবো। আমাদের নিয়ম হচ্ছে অনাহূত তোমার বাড়িতে কোন মতেই যেতে পাবো না।"

এ শুধু কাব্যিক জীবন নয়, সুন্দরতর এবং পরিপূর্ণতর জীবনের আবেদন!



আবহাওয়া

শ্রীবিমল মিত্র

জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাইয়া দিতে স্থানটি মন্দ নয়।

একদিন আশা ছিল কত বড় হইব—কত কিছু করিব। কত উদ্যম কত উৎসাহ প্রথম যৌবনের রক্তে রক্তে প্রবাহিত হইত; আজ মনে হইল ভালই হইয়াছে, তিরিশ টাকা মাহিনায় পোষ্টমাষ্টারী—ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল বলিয়াই চাকরীটি মিলিয়াছে। নহিলে বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া কত লোকই তো বেকার বসিয়া আছে!

সন্ধ্যা হয় হয়;—

নবীন চিঠি ডেলিভারী দিয়া আসিয়াছে—সামনের দাওয়ায় বসিয়া তামাক সাজিবার উদ্যোগ করিতেছে। গায়ে পাঞ্জাবীটা চড়াইয়া চটি-জোড়া পায়ে দিলাম।—কাল তো সবে এখানে আসিয়াছি; গ্রামের পথ-ঘাট এখনও ভাল করিয়া চিনি না। মনস্থ করিলাম—উত্তর দিকটায় আজ বেড়াইতে গেলে হয়—

নবীন ভিতরে আসিল। বলিল—দেশলাইটা একবার দেবেন—আমারটা পাচ্ছি না। যে সব লোক এসে জোটে—নিয়ে গেছে হয় ত কেউ—দিন্—

পকেট হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া নবীনের হাতে ফেলিয়া দিলাম।

নবীন চলিয়াই যাইতেছিল, হঠাৎ আমার জুতার দিকে নজর পড়ায় বলিল—বেরোচ্ছেন বুঝি? আজ কোন্ দিকে যাবেন?…আর কিই বা দেখ্‌বার আছে এখেনে। কলকাতার মানুষ—পাড়াগাঁয়ে আর কি-ই বা ভাল লাগবে। কাল তো পুব পাড়ার দিকে গেচ্‌লেন—আজ বরং—

বলিলাম—ভাবছি উত্তর দিকে যাবো আজ—ওই দিকেই তো ইচ্ছামতী—না? শুনেছি ওই দিকেই তো সেই নীলকুঠি আছে, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' পড়েছিলুম—এখন দেখতে ইচ্ছে করে;—আচ্ছা নবীন, সেই সব ভাঙা বাড়ী-গুলো একেবারে ভেঙে গেছে, না কিছু আছে—

নবীন চোখ দুটো ভয়ে জড়সড় করিয়া বলিল—ওরে বাপুরে…বলেন কি আপনি—পাগল হয়েছেন?…এই সন্ধ্যেবেলা সেখেনে?…অমন কাজটিও করবেন না! আজ বরং থাক—কাল আপনার সঙ্গে আমি যাবো—

দেশলাই জ্বালিয়া নবীন টিকে ধরাইতে লাগিল।

বলিলাম—কিছু ভয় টয় আছে বুঝি সেখেনে?

হুঁকাটি আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া নবীন বলিল—কাজ কি বনে-জঙ্গলের দিকে গিয়ে—কাল বরং এক জায়গায় নিয়ে যাবো আপনাকে…বিলের দিকে…এই এতখানি এতখানি যোলমাছ ছিপ ফেলতে না ফেলতে… তবে কি হয়েছিল একবার শুনুন—

যোলমাছ লইয়া একটা কিছু কাণ্ড হইয়াছিল নিশ্চয়ই… এবং নবীন তাহাদেরই গল্প বলিত হয় ত—কিন্তু মাঝপথে বাধা পড়িয়া গেল—

—হেই—হেই—শব্দ করিতে করিতে একটা বাকারী লইয়া নবান দাওয়া ছাড়িয়া দৌড়িল—দেখি একটি গরু তাহার অতি সাধের বাগানে ঢুকিয়া সব উপড়াইয়া ফেলিতে ব্যস্ত!…গরুটার পিছন পিছন কিছুক্ষণ দৌড়াইয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে নবীন বলিল—দেখেছেন আক্কেলটা—এত করে' নটে শাক লাউচারা আজ্যেছি—ওদের মুখে দেবার জন্তে…মুমুন্দির পো, একদণ্ড দরজাটা খুলেছি কি অমনি এসে হাজির।—

নবীনের সাধের বাগানই বটে—

নিজ হাতে মাটি খোঁড়া, জল দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া শাকসব্জির তরকারী রাঁধিয়া খাওয়া সবই নবীন একা করে!

ফিরিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ বাগানের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পড়িয়া পুব-মুখো নবীন কি যেন দেখিতে লাগিল।

বলিলাম—কি দেখছো নবীন—কেউ আসছে না কি?

নবীন বলিল—দাঁড়ান, এ যে গাড়ীর মধ্যে মেয়েলোক দেখছি—

ঔৎসুক্য আমারও হইল। কা'র না হয়? তবু

গাড়ীর অপেক্ষায় দাওয়ার উপরই দাঁড়াইয়া রহিলাম! কে আর আসিবে? আমার কেউ নয় ত? না, আসিবার সময় কাহাকেও তো খবরও দিই নাই—কেই বা জানে আমি এখানে আছি—তা' ছাড়া তিরিশ টাকা মাহিনার পোষ্টমাষ্টারী—জানাইবার মত খবর ইহা নয়!

আসিবার সময় মা বলিয়াছিলেন—চিঠি দিতে ভুলিস নে!··

উত্তরে বলিয়াছিলাম—চিঠি দিই আর না দিই—মাসে মাসে টাকা ঠিক পাবে—

পথে আসিতে আসিতে পিছন ফিরিয়া দেখিয়াছিলাম —চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করিয়া মা বাড়ীর সামনের রাস্তায় বাহির হইয়া আমার দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া আছেন—

চট্‌ করিয়া চোখ ফিরাইয়া লইয়াছিলাম—কি জানি হঠাৎ যেন আমার চোখেও জল আসিবার উদ্যোগ হইয়াছিল!

কিন্তু—মনে হইল—চিঠি-পত্র নাই, মা কি আর এই অচেনা অজানা জায়গায় আসিবেন?—কে জানে?

নবীন তখনও তেমনি ভাবে সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

বলিলাম—এই দিকেই আসছে না কি নবীন?

নবীন উত্তর দিল না! বাগানের দরজার দিকে আগাইয়া গেলাম।

দেখি ছই দেওয়া গরুর গাড়ীর মধ্যে স্ত্রীলোক—পুরুষও আছে···

নবীন বলিল—এ যে কেষ্টগঞ্জের গাড়োয়ান দেখ্‌ছি—ইষ্টিশান্ থেকেই আসছে ওরা তা'হ'লে।

গাড়ী কাছে আসিতেই কান্নার শব্দ পাইলাম। নবীনকে বলিলাম—শুনছো?

ও যেন শোনে নাই—কিম্বা ইহাই যেন আশা করিয়াছিল। নিশ্চিন্তের মত হাঁপ ছাড়িয়া বলিল—ওঃ—বুঝেছি!

আমার কাছে কিন্তু ব্যাপারটি জটিল ঠেকিল। বলিলাম —কি বুঝলে নবীন? ওরা চেনা-শোনা কেউ বুঝি তোমার?

নবীন নির্ব্বিকার ভাবে বলিল—সাপে-টাপে কেটেছে বোধ হয় ছেলেটাকে—দেখ্‌ছেন না—পাশে ওই যে মেয়েলোকটা কাঁদছে—ছেলে কোলে?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম···তোমার কেউ হয় না কি ওরা?

নবীন বলিল—হবে আর কে···একটু দাঁড়ালেই বুঝতে পারবেন—এই পথ দিয়েই তো যাবে।

সাপে না কামড়াইয়া অন্য কিছুও তো কামড়াইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু নবীন এত দূরে দাঁড়াইয়া কেমন করিয়া কান্নার আসল কারণটি জানিতে পারিল—তাহা বুঝিতে পারিলাম না!

বলিলাম—সাপে কেটেছে তা' এ দিকে কোথায় আন্‌ছে?

নবীন বলিল—আনছে রামানন্দর কাছে···রামানন্দ ওঝা কি না—চার ঘণ্টার মধ্যে যদি তা'র কাছে রোগীকে দেখাতে পারে—তবেই বাবে উৎরে—নইলে কাবার—

গাড়ী কাছে আসিল।

কান্নার শব্দে মনটায় ধাক্কা লাগিল। দেখি, নবীনের কথাই ঠিক্—ছেলেটির হাতের কনুইএর কাছে মোক্ষম করিয়া কাপড়ের ফেটি বাঁধা। স্ত্রীলোকটি যেন উন্মাদপ্রায়—ভদ্রলোকটি মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—রামানন্দ ওঝার বাড়ীটে কোন্ দিকে মশাই?

নবীন প্রস্তুতই ছিল।

কোমরে কাপড়টা জড়াইয়া বলিল—আসুন আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি···আধ পো পথও হবে না ওই যে বড় তে-পল্‌তে গাছটা দেখ্‌ছেন—আচ্ছা চলুন না, আমিই সঙ্গে যাচ্ছি···

নবীন সত্য সত্যই গাড়ীর আগে আগে চলিতে লাগিল।

হুঁকাটা রাখিয়া দিলাম। এত যত্ন করিয়া সাজিয়া নবীন একটা টানও দিতে পারিল না। বাগানের দরজাটি ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। শেষে গরু ঢুকিয়া নবীনের সাধের নটে শাক লাউডগা খাইয়া ফেলিবে?···কাজ কি!

উত্তর দিকটায় আজ আর গেলাম না।—ভয়-টয় কিছু আছে নিশ্চয়ই··নূতন জায়গায় আসিয়া শেষে একটা বিপদ ঘটাইব;—সোজাসুজি পথটা বাহিয়া চলিলাম।

শহরের মানুষ···বেশ আরাম লাগিল।

চারিদিকের এমন একটি আবহাওয়াই যেন আমার মন চাহিতেছিল।

এমন খোলা মাঠ! প্রাণ যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে; কল্পনা আপনার পাখা মেলিয়া যতদূর খুসী চলুক—কেহ বাধা দিবে না। ওই দূর আকাশের শেষ সীমাটি যে

তেপান্তরের মাঠে গিয়া মিশিয়াছে—সেখানেও শেষ নয়—পাখী আপনার পাখা মেলিয়া সেই দিকে উড়িয়া যাক্—যেখানে তিরিশ টাকা মাহিনার পোষ্টমাষ্টারি নাই—ছেঁড়া চটি জুতা নাই—কেবল উড়িয়া চলার সুখ—যতদূর খুসী।

ছোট বেলায় গল্প লিখিতাম—এখন আর লিখি না—কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হইল—আবার যেন চেষ্টা করিলে লিখিতে পারি। এমন অখণ্ড অবসর—সারা দিনই একরকম ছুটি—এই পল্লীগ্রামের সরল সাদাসিধা জীবনের প্লট্ লইয়া গল্প লিখিবার জন্ম যেন ভিতর হইতে তাগিদ আসিল।

আমবাগান পার হইয়া আসিয়াছি। এইবার বরাবর ধানের জমি। যতদূর দৃষ্টি চলে ধানের মাঠ। মাঝে মাঝে আলের উপর দিয়া সরু রাস্তা। দূরে জলের মত কি যেন দেখা যায়—বিল বোধ হয়। নবীন বোধ হয় ওই বিলের কথাই বলিয়াছিল···এতখানি এতখানি যোলমাছ···ওইখানেই তো আছে···একবার যোলমাছ ধরিতে গিয়া কি একটা কাণ্ডও হইয়াছিল—সেই গরুটা বাগানে না ঢুকিলে তাহাও হয় ত শুনিতাম।

আসিবার সময় খানকয়েক ভাল ভাল ইংরেজী নভেল লইয়া আসিয়াছিলাম। আর তো কিছু কাজ নাই—ইহাতেই যা সময় কাটে!

দাওয়ার উপর তোলা উনানে নবীন রাঁধিতেছিল।

ঘরে আসিয়া বলিল—দেখেছেন—কি হয়েছে?

মুখ তুলিলাম! কি আবার হইল! নবীনের কথার জ্বালায় এক দণ্ড চুপ করিয়া থাকার উপায় নাই; কাছে থাকিলে সারা রাতই কথা কহিয়া কাটাইয়া দিতে পারে—নবীন এমনি!

বলিলাম—কি, হোল কি তোমার?

—দেখুন না—বলিয়া নবীন তাহার হাতের জামাটির একটি জায়গা বেশ সোজা করিয়া খুলিয়া তুলিয়া ধরিল। দেখি, জামাটির এক কোণ পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—আর পরিবার উপায় নাই।

নবীন বলিল—কন্নের ওপর দিয়ে গেছে তাই রক্ষে—নইলে ধরুন যদি চালটাই ধরে' যেতো···তিনিই রক্ষে করেছেন—বলিয়া নবীন দুই হস্ত যোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল।

বলিলাম—একটু সাবধান হ'য়ে রাঁধতে হয় নবীন—দেখ দিকিনি, কি বিপদটাই হোত তা' হ'লে—জামাটা বুঝি হাওয়ায় উড়ে গিয়ে উনুনে পড়েছিল?

নবীন বলিল—আজ্ঞে তা' কেন—আপনি হুঁকোটা তো ওই কোণডায় রেখে গিছ্লেন—হাওয়ায় আগুন উড়ে এসে পড়েছে জামার ওপর গিয়ে—এসেই দেখেছিলাম তাই—নইলে···

আহা! জামাটি নূতনই ছিল একরকম। নবীনকে ওটি কোনও দিন পরিতে দেখি নাই—কেন যে বাক্স হইতে সেদিন ওটিকে বাহির করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল—কি জানি।

ভাবিলাম: আগামী মাসে মাহিনা পাইয়া নবীনকে একটা জামা কিনিয়া দিতে হইবে—ওটি তো আমার দোষেই পুড়িয়াছে!

নভেলটি বন্ধ করিয়া—বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি।

নিশীথের পাড়াগাঁ বেশ লাগে!

যতদূর চা'ও কেবল অন্ধকার; ও অন্ধকারের ভাষা আছে! বাঁশবনের কাছ ঘেঁসিয়া অন্ধকার-শিশুরা খেলিয়া বেড়ায়; বলে: এ দিকে আসিও না তোমরা, এদিকে চাহিও না · আমাদের এই তো অবসর···সারা দিনের ঘুমের শেষে এখনই আমাদের খেলিবার পালা; তোমাদের জানালাগুলি সব বন্ধ করিয়া দাও—আমাদের রাজত্বে তোমাদের আলোক জ্বালাইও না! সহরের পর সহর তো তোমরা আলোয় আলো করিয়া দিয়াছ—পল্লীগ্রামের একটি কোণে আমাদের খেলিতে দাও—

কি জানি কেন—এখানে আসিবার পর হইতেই সারা দিন এই সব চিন্তা মাথায় আসিয়া জোটে।

পোষ্ট আপিসের ফাইলের উল্টাপিঠে একটা গল্পও ফাঁদিয়া ফেলিয়াছি।

খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম:

নবীন আসিয়া বলিল—তা' হ'লে চন্দ্র-হারিকেনটা নে'যাই, কি বলেন;—হ্যাঁ আর দেখুন, আপনার শিয়রের কাছে লাঠিটা রেখে শোবেন, পল্লীগ্রাম দেশ—বুঝ্লেন না?

বলিলাম—যাচ্ছ না কি তুমি ?···কোথায় ?

—আজ্ঞে যেখানে যাই—

বলিলাম—ঘরে শোবে না ?

নবীন বলিল—বলেন কি ! ঘরে শোব না তো কি পথে ? এই ভয়ের দেশে ?···বাপ্‌রে—

তবু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম—বলি তুমি কোথায় যাচ্ছো ?

—ও আপনি জানেন না বুঝি ?—

এবার নবীন বুঝাইয়া দিল : রামানন্দর কাছে যে মন্তর শিখতে যাই—লতার মন্তর···

বুঝিলাম লতা অর্থাৎ সাপ ; রাত্রিতে সাপ উচ্চারণ করাতেও বিপদ ! · একটু হাসি আসিল।

নবীন বলিল—না মশাই, বলা তো যায় না—কবে মা মোনসার কৃপা হয়—শিখে রাখা ভালো ; আপনি হাসুন আর যাই করুন, আমার মশাই বিশ্বাস হয়।

তার পর গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিল—রামানন্দর কাছে কি আর তাই বলেছি ?···বলেছি : লোকের উব্‌কার টুবকার করাও হবে—নিজেও নিরাপদ···আসল উদ্দেশ্যটা কি জানেন ?···শুনুন তবে···

নবীন আরো কাছে সরিয়া আসিল, তার পর কানের কাছে মুখ আনিয়া আস্তে আস্তে বলিল—আসল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে গিয়ে—পৃথিবীতে লতা আর রাখবো না মশাই, ওর বড় শত্রু আর মানুষের নেই—বুঝ্‌তাল্লেন ?

কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে নবীন বাহির হইয়া গেল।

মনে হইল—নবীনটা আস্ত পাগল—আমার মত ঘর-ছাড়া লোকের সঙ্গীটি মিলিয়াছে মন্দ না !

মশারির ভিতর চিত হইয়া শুইয়া থাকি। ঠিক এমনি সব মুহূর্ত্তগুলিতে যত রাজ্যের অতীতের ভাবনা আসিয়া মনটা জুড়িয়া বসে। সারা জীবন যাহাকে অনুসরণ করিয়া চলি, তাহার কাছে ঘেঁসিতে পারি না।··· আবার যাহার কাছে ঘেঁসিতে পারি তাহাকে চাই না। এই নবীন—ইহাকে কোনও দিন চাহি নাই—কিন্তু কেমন কাছে পাইয়াছি।—আপনার মত করিয়া ! আবার একদিন যাহাকে চাহিয়াছিলাম—সেই ঠাণ্ডা মেয়েটি—কাক জ্যোৎস্নার মত ফুটফুটে···কখনও তাহার কাছে ঘেঁসিতে পারিলাম না ! আমার কপালে চাহিয়া পাওয়ার সুখ আসিল না—না-চাহিয়া পাওয়ার দুঃখেই জীবন ভরিয়া গেল।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

বিলের দিকে বেড়াইতে গিয়া দেহ বেশ ক্লান্ত হইয়াছিল—তাই ঘুম আসিতে দেরী হয় নাই।

একটা আচম্‌কা ঝটপট্‌ শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। আন্দাজে বুঝিলাম—নবীন এখনও ফেরে নাই—ফিরিলে ঘর এমন নীরব থাকিত না ! কিন্তু একা ঘরে যেন ভয় করিতে লাগিল ! নবীন বলিয়াছে—ভয়ের দেশ। কিসের ভয় ? চোর ডাকাতের ? চোর ডাকাতকে আর ভয় কিসের ? টাকা পাইলেই তাহারা চলিয়া যায় ; সিন্দুকের চাবী ফেলিয়া দিলে তাহারা পৈত্রিক প্রাণটাকে ছাড়িয়া দ্যায়। কিন্তু কেন জানি না—ভূতকে আমি ভয় করি—রীতিমত ভয় করি !

ঠিক যে শব্দটা কোন্ দিক হইতে আসিতেছিল—বুঝিতেছিলাম না।

প্রথমটায় মনে হইল উত্তর দিকে—পরে মনে হইল—পূব দিকে ;—খানিক পরেই মনে হইল—উত্তরেও নয় পূবেও নয়—উত্তর-পূব কোণাকুণি ! আর একটু পরেই মনে হইল—শব্দটা ঘরের ভিতর হইতেছে না—বাহিরে !

নবীন বলিয়াছিল—শিয়রের কাছে একটা লাঠি রাখিয়া দিতে—তাহা তো রাখিয়া দেওয়া হয় নাই !

হঠাৎ দড়াম করিয়া দরজাটি খুলিয়া গেল।

প্রাণপণে চীৎকার করিতে যাইতেছিলাম—কিন্তু আলোয় ঘরটি ভরিয়া যাইতেই দেখি নবীন হারিকেন লইয়া ফিরিয়াছে !

আরামের সহিত একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

নবীন যেন আপন মনেই বলিতে থাকে :

—একবার কাণ্ডখানা দেখ দিকিন্—ঘর একেবারে নোঙ্‌রায় একাকার করেছে যে—দেশের যেমন গরু তেমনি পাখী—

বলিলাম—কা'র কথা বলছো নবীন ?

—এই যে জেগে আছেন দেখছি—বল্‌ছিলাম—পাখীদের কাণ্ড···ঘরের ঘুলঘুলিতে চড়াই পাখীরা বাসা করেছে···দিন থাকতে খোপে ঢুকতে পারে নি—এখন অন্ধকারে মরছে ঝটপট্‌ করে'—

এতক্ষণে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

বলিলাম—কি করেছে—কি?

নবীন বলিল—খড় কুটো ফেলে ঘর একসাই করেছে··· এ যেন ঠিক রামানন্দর ঘর হয়েছে মশাই; ঘরময় জিনিস-পত্তর ছড়ানো—কবে থেকে ছড়ানো তা'র কি ঠিক-ঠিকানা আছে! আর গোছাবেই বা কে বলুন! ঘরের গৃহ-লক্ষ্মীই ঘরে নেই—

তবে কি রামানন্দ বিবাহ করে নাই!

বলিলাম—তা' হ'লে আমাদেরি দলে বুঝি?

নবীন অবিবাহিত—আমিও তাই—রামানন্দও এই দলে। বুঝিলাম তাই নবীনের সঙ্গে তাহার এত মিল।

নবীন বলিল—আর বিয়ে হয় নিই বা বলি কি করে বলুন, মনে মনে বিয়েও তো বিয়ে—মন্তর পড়া হয় নি এই যা'—

নবীন এত কথাও জানে! আশ্চর্য্য হইবারই কথা!

বলিলাম—তা'র মানে—রামানন্দ কি তবে—

নবীন বলিল—সেই কুসুমকুমারীর গল্প পড়েন নি? অনেকটা তাই মশাই! চক্রধরপুরে দু'জনকে দু'জনে ভালবাসতো!···সে হচ্ছে জজ্ বেরেষ্টারের মেয়ে·· কত বড় বড় লোক তা'কে বিয়ে করতে চায়—এ বেচারী তা'কে ভালবেসেছে; মেয়েমানুষের মন, সেও একে ভাল বেসেছিল—বাপকে পর্য্যন্ত বলেছিল মশাই—'ওকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করবো না'—দেখুন কেলেঙ্কারীটা—শেষে যেমন কম্ম—রামানন্দকে দিলে দেশ থেকে তাড়িয়ে,—কে ওই যক্ষ্মা রুগীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে মশাই?···

বলিলাম—যক্ষ্মা রোগ আছে না কি ওর?

নবীন বলিল—তা' আর নেই—তার পর শুনুন তো—এই গাঁয়ে এক পিসি ছিল—সেই রেঁধে ছায় দু'বেলা—তাই পেট চলে—আর তা' ছাড়া লতার মন্তর—সে-ও কি কম আয় মনে করেছেন না কি—মাস্ গেলে কুড়িটে টাকা বাড়ী বসে' হেসে খেলে—

বলিলাম—সত্যি?

নবীন নিজের বিছানা পাড়িতে পাতিতে বলিল—সত্যি বই কি! এ আর এমন কথা কি!···কোনও মাসে চল্লিশও হয় মশাই—এই তো মরসুম কি না—

বলিলাম—না—না, সে কথা নয়—আগে যা' যা' বললে সব সত্যি?

—যেমন যেমন শুনেছি তেমন তেমন বলেছি—আর না বিশ্বাস করবার কি-ই বা আছে বলুন। আপনি "কুসুম-কুমারী" পড়েন নি বুঝি? পড়বেন—আমার কাছে আছে··· এ তো আকছার ঘট্‌ছে···বইতে কি আর মিথ্যে কথা লেখে ভেবেছেন?···তা' হ'লে ছাপ্‌বে কেন?

বলিলাম—রামানন্দ কি বলে?

নবীন বলিল—কি আর বলবে বলুন—যে যা' চায় তাই যদি পেতো তা' হ'লে আর ভাবনা কি?···শুনেছি মেয়েটার বাপ কিছু দিন হোল মারা গেচে; তা' মেয়ের আর ভাবনা কি বলুন—বাপ অগাধ সম্পত্তি রেখে গেচে—মেয়েই সবের মালিক—এখন যা' ইচ্ছে তাই করবে—

বলিলাম—একে সে চিঠি টিঠি লেখে না—নবীন?···

নবান বলিল—লিখতো বৈ কি!···আমিও খুলে খুলে পড়তুম, আবার এঁটে দিতুম গিয়ে। যা' হোক, মশাই, হাঁ ভালবাসা যা'কে বলে, আমার তো পড়ে' গা শিউরে উঠতো—এক একবার ভাবতুম দিই ছিঁড়ে ফেলে; এই দেখুন না—আবার চিঠি এল বলে'—এবার তো মাথার ওপর বাপ নেই—

বলিলাম—এবার বোধ হয় সেই চক্রধরপুরে যেতে লিখবে—কি বল?

নবীন বলিল—লিখলেই যেন ওর হাতে যাচ্ছে—কি যে বলেন! আমাদের হাত দিয়েই তো যাবে মশাই—আট্‌কাবো না?

বিস্মিত হইয়া গেলাম।

বলিলাম—কেন, তুমি আটকাতে যাবে কেন? না, না—অমন কাজ কোর না—শেষে চাকরীটাও খোয়াবে—কাজ কি—ওরা দু'জনে ভালবাসাবাসি করছে—তা'তে তোমার আমার নজর দেবার কি দরকার?—কাজটা কি আর খুব গর্হিত কিছু—

—আজ্ঞে তা' নয়, বুঝছেন না আপনি, ও চলে' গেলে আমি মন্তর শিখবো কা'র কাছে মশাই? আমি মন্তর শিখে নিলে তখন ও যেখেনে খুশী যাক্—আটকাচ্ছি না—আপনাকে তো বলেছি মশাই পৃথিবীতে সাপ আর রাখবো না—ওর মত শত্তুর আর মানুষের নেই বুঝ-তাচ্ছেন?

নবীন এই রকম।

কথা কহিয়া আরাম নাই উহার সঙ্গে! বেশ গল্প করিতে করিতে এমন গম্ভীর হইয়া কি কথা আনিয়া ফেলে—উত্তর দেওয়া যায় না···মনে হয়···মাথায় ওর ছিট্ আছে নিশ্চয়!

রামানন্দর কথা ভাবি :

এমনও হয় আবার! নবীন অশিক্ষিত, রামানন্দর বেদনাটাকে না বুঝিয়া এমনি রসিকতা করিল; ভালবাসার নবীন কি জানিবে! জগতের বড় বড় কাব্য নাটক পড়ে নাই তো—জীবনের একটা মহৎ রসের আস্বাদ হইতেও আজও বঞ্চিত!

মনে হইল—উহাকে অনায়াসে কৃপা করা যায়!

আপন মনে বেড়াইতে বেড়াইতে কি জানি কখন নদীর ধারেই চলিয়া আসিয়াছি!

এ দিকটা জঙ্গল। মানুষের গতায়াত এখানে নাই। প্রাচীন একটি ভাঙা বাড়ীর ইষ্টক-স্তূপের উপর বড় বড় অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়াছে!

বুঝিলাম এই নীলকুটি। সাহেবদের নীলকুটি!

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ আপনাদের ইচ্ছামত বাড়িয়া চলিয়াছে, কাঠুরের কুঠার উহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বাধা দ্যায় নাই! লতা কণ্টক গুল্ম মিলিয়া স্থানটিকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে—অতীতের অত্যাচার-কাহিনীকে ইহারা যেন ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিতে চায়!

নদীর দিকে ঘাট—উপরেই উঠান!

সান-বাঁধানো জায়গাটি, কি জানি কেন এখনও তেমনি নূতন রহিয়াছে—ফাটলের ভিতর হইতে কেবল দুই একটি কাঁটা-গাছ মাথা তুলিয়া উঁকি দিতেছে।

সে ইচ্ছামতী আজ আর নাই—ঘাট ছাড়িয়া নদী অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। কোণের একটা পৈঁঠার উপর গিয়া বসিলাম।

সন্ধ্যা আসিয়া গিয়াছে···ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকও সুরু হইল।

এই উঠানেই কত চাষীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে—কত অত্যাচার চলিয়াছে—কত হত্যাকাণ্ড হইয়াছে—তাহার হিসাব আজ আর কেহ রাখে না।

এ নদী দিয়া এখন নৌকা চলে না। ও-পারের পা ভাঙিতে আরম্ভ হইয়াছে—পাড়ের গায়ে ছোট ছোট গর্ত—দু'একটা গাঙ্ শালিক উহার ভিতর ফুড়ুৎ করিয়া ঢুকিয় পড়ে। সন্ধ্যা হইতেছে—বাসায় যাইবার সময়।

চারি দিকে নিবিড় নিস্তব্ধতা।—হঠাৎ যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলি।

নবীনের কাছ হইতে সেই "কুসুমকুমারী" বইটা পড়িতেছিলাম :

রাজার প্রকাণ্ড প্রাসাদ;

অনন্ত রায় কুসুমকুমারীকে মাত্র পূর্ব্ব রাত্রে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন; নব-বিবাহিত দম্পতির শুভ মিলনের দিনে সারা রাজধানীতে উৎসব—রাজার আদেশ!

কাহারো কাজ-কর্ম্ম নাই; পানমত্ত নাগরিকগণের মিছিল চলিয়াছে, ফুলওয়ালী বাগানের সমস্ত ফুল উজাড় করিয়া আনিয়াছে—নাচওয়ালী রত্নহারে ভূষিত হইয়া রাজার অভিমুখে চলিয়াছে!

সহসা জনতা ছত্রভঙ্গ হইল।···দ্বারপাল খবর আনিয়াছে; কর্ণাটরাজ নগর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন—সঙ্গে অসংখ্য সৈন্য।

উৎসব থামিয়া গেল। সারা নগরে চলিল যুদ্ধের আয়োজন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দুই সৈন্যদলে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—আর অর্দ্ধমৃত সৈন্যদের চীৎকারে নৈশ গগন ভরিয়া উঠিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে অনন্ত রায় শিবিরে বসিয়া খবর পাইলেন : কুসুমকুমারী কর্ণাট-শিবিরে বন্দিনী! নৈশ গগনে তখন পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমিয়াছে···ঝড় আসিবার পূর্ব্ব-লক্ষণ! কিন্তু অনন্ত রায়ের জীবনের ঝড় অনেকক্ষণ আসিয়াছে তাহার দাপট তিনি শুনিতে পাইলেন।

অনন্ত রায় একাই অশ্বারোহণ করিয়া ছুটিলেন; বিপক্ষ শিবিরে গিয়া দেখিলেন—শত্রু নাই—অপরূপ-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না কুসুমকুমারীকে পাইয়া তাহাদের যুদ্ধ জয়ের আশ মিটিয়াছে।

···কতক্ষণ এই গল্পটি ভাবিতেছিলাম; ভাবিতেছিলাম : রামানন্দর গল্পর সঙ্গে কুসুমকুমারীর কি যে সম্বন্ধ আছে—তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না।

হঠাৎ পাশ ফিরিতেই দেখি—দূরে সিঁড়ির নীচের ধাপে একটা লোক বসিয়া। এতক্ষণ নজর পড়ে নাই।

কিন্তু সন্দেহ হইল—ও লোক, না আর কিছু ?

অন্ধকারে অস্পষ্ট ; ভাল করিয়া কিছু দেখাও যায় না। ভয়ও হইল ; ভূতকে আমি বরাবর ভয় করি—রীতিমত ভয় করি।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। মনে হইল—নবীন সেদিন এখানে আসিতে বারণ করিয়াছিল, এই জন্তই না কি ?

আশ্চর্য্যও কিছু নয়। কত হত্যাকাণ্ড এই নীলকুঠিতে হইয়া গিয়াছে—তাহার কি সংখ্যা আছে! সেই সব অশরীরি আত্মারা যদি এখানে এই সময়ে ঘুরিয়া বেড়ান তাহাতেই বা আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! তাঁহাদের লীলাভূমিতে একজন জীয়ন্ত মানুষের আবির্ভাবে তাঁহারা যদি চঞ্চল হইয়াই ওঠেন ? মনটা চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিল।

শ্বাস বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিলাম ; কোনও দিকে দৃকপাত নাই—একবার বাসায় ফিরিতে পারিলেই বাঁচি—

আমাকে দেখিয়াই নবীন হুঁকা রাখিয়া দিল।

কোনও রকমে ধোঁয়াটুকু গিলিয়া ফেলিয়া বলিল—যাক্—বাঁচা গেল—যা' ভাবিয়ে তুলেছিলেন মশাই—না বলে' ক'য়ে কোথায় গিচ্‌লেন বলুন দিকি ?···একবার ভাবলাম—হয় ত মাঠের দিকে গিয়েচেন—কিন্তু না, দেখলাম, যেখানকার গাড়ু সেইখানেই রয়েচে—তবে আর কোথায়!···তা' এত দেরী হোল যে আপনার ?

জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিলাম—ও দিকে আর যাচ্ছি না—নবীন, তুমি ঠিকই বলেছিলে—তখন কি জানতাম অপদেবতারা ওখানে নৈশ বিহার করেন—

নবীন আশ্চর্য্য হইয়া গেল ;-কোথায় মশাই ?

বলিলাম—সেই নীলকুঠির দিকে ইচ্ছামতীর ধারে—

এবার নবীন নিশ্চিন্ত হইল : ও তাই বলুন, তা' অপদেবতা বলছেন কেন ? লতাকে বুঝি আপনারা অপদেবতার সামিল ধরেন ?···তা' ওরা একরকম তাই মশাই—

বলিলাম—লতা নয় নবীন—ভূত! ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—ঘাটের পৈঁটেতে বসে হাওয়া খাচ্ছেন—ভালো করে' তা'কে দেখবারই কি সাহস হোল—যদি সাম্‌দো ভূতই হয়।

কথাটা শুনিয়া নবীন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি আর থামিতে চায় না।

খানিক পরে থামিয়া বলিল—খুব ভয় পেয়েছিলেন বুঝি ?···ভয় হবারই যে কথা মশাই—আমারই এক এক সময় হয় ; তেল না মেখে মেখে মাথাটা করছে ওই রকম ;—বাবুইএর বাসার মত, এত করে' বলি : চুল কাটো কাটো—তিনটে পয়সার মামলা তো মোটে—

নবীনের কথার কিছুই বুঝিতেছিলাম না।

বলিলাম—কা'র কথা বলছো তুমি নবীন ?]

নবীন বলিল—কেন রামানন্দর ? সন্দেটুকু নিত্যই ওইখেনে গিয়ে ওর একটু বসা চাই—

এ ওর অব্যেস—আর একটু থাকলেই বাঁশী শুনতে পেতেন—আড় বাঁশী। পাগল কি আর সাধে বলে ; ওইখানে বসে' বসে' বাঁশী বাজাবে—আর যত রাজ্যের লতা এসে ওকে ঘিরে ঘিরে ঘুরবে।···

তার পর গলাটা নীচু করিয়া বলিল,—একবার মন্তরগুলো শিখে নিতে দিন মশাই—তখন দেখবেন লতাদের নিশ্বেস আর পড়তে হবে না—ইছামতীর পাড়ে এসে মাথা আছড়াবে আর মরবে—লতার মতন শত্তুর আর মানুষের নেই—বুঝতাপ্লেন ?

নবীনের কথাগুলি যেন গিলিতেছিলাম।

রামানন্দকে কোনও দিন ভাল করিয়া দেখি নাই—তাহার সহিত আলাপ-পরিচয়ও নাই—কিন্তু মনে হইল : তাহাকে দেখিবার পূর্ব্বে যেন তাহাকে ভাল করিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছি—আর দেখিবারও দরকার হইবে না!···

ইচ্ছা করিলে রামানন্দর নাড়ীর রক্ত-চলাচলের শব্দও শুনিতে পাইব যেন।

পনেরো দিনের মাহিনা পাইয়াছিলাম।

মা'র কাছে পাঁচ টাকা পাঠাইয়াছি!

মা লিখিয়াছেন :—একটি ভাল পাত্রীর সন্ধান পাইয়াছি—তোমার মত হয় তো এই আগামী আষাঢ়েই কাজটি সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করি—আর যখন তাঁ'র

আশীর্ব্বাদে একটি চাকরী জুটিয়াছে—তা'ছাড়া কিছু নগদ টাকাও দিবে—আমি আর ক'দিন আছি—এই বেলা না দেখিয়া বুঝিয়া লইলে দেখাইবার বুঝাইবার কেহ নাই—

…ইত্যাদি!

মা'র চিঠি পাইয়া ভাবি:

না চাহিতেই যাহারা আসে তাহাদের সংখ্যাই বেশী—চাহিলে কাহাকেও পাইবার উপায় নাই। কিন্তু যাহারা চাহিলে আসে তাহাদেরি আমি চাই যে।

মাহিনার টাকা হইতে নবীনকে একটা জামাও কিনিয়া দিয়াছিলাম।

আজ রবিবার—হাতে কিছু কাজ নাই।

সকালবেলা বৃষ্টি আসাতে বাহিরে যাওয়া গেল না।

ফাইলের উল্টাপিঠে যে গল্পটি ফাঁদিয়াছিলাম সেইটি লইয়া পড়িলাম। লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম বটে কিন্তু প্লটটি মনোমত হয় নাই। পাতার পর পাতা লিখিয়া যাইতেছিলাম—মনে করিয়াছিলাম: যাহা অদল-বদল করিবার শেষে করিলেই চলিবে!

নবীন ঘরে ঢুকিল।

বলিল—আপনার চিঠি লেখা হ'লে পেন্সিলটা একবার দেবেন তো—আমারও একটি চিঠি লিখতে হবে—

বলিলাম—তা' দেবো—কিন্তু চিঠি তো লিখছি না নবীন—

নবীন বলিল—তা' মণিঅর্ডারগুলো কাল লিখলেই চল্‌তো—আজ আর কেন মিছিমিছি মাথা ঘামাচ্ছেন মশাই—একটু আরাম করে' জিরোন না—

বলিলাম—মণিঅর্ডার নয় নবীন—গল্প লিখছি—

নবীন যেন অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া গেল—তার পর একটু হাসিয়া বলিল—ছাপ্‌বেন তো?

বলিলাম—ছাপাবো বৈ কি—কিন্তু তোমার কোনও গল্প জানা আছে নবীন?—এ প্লট্‌টা তত ভাল লাগছে না—

নবীন কাঠের বাক্সটির উপর বসিয়া পড়িল। বলিল—একটা গল্প শুনবেন—শুনুন তবে—এই শ্রাবণের মাঝামাঝি—বুঝেছেন—বিলে অথৈ জল তখন—গাঙের জল আর মাছ এসে বিল গেছে ভরে'—রামানন্দ আমায় ডেকে বললে—তোমার কোন কাজ আছে নবীন—ছিপটা নিয়ে চল না বিলের দিকে যাই? বললাম—না, কাজ তেমন কিছু নেই বটে—তবে যুতসই একটা বঁড়শি টড়শি—

বুঝিলাম—সেই সেদিনের যোলমাছের গল্পটি বলিতেছে।

বলিলাম—ও গল্প নয়—নবীন. মাসিক পত্রিকায় একটু অন্য ধরণের গল্প লোকে চায়—বুঝছ না—সেই রকম কিছু জানা আছে?

নবীন বলিল—ওই কুসুম-কুমারীর মত গল্প? খুব জানি—আমাদের তিনকড়িকে চেনেন তো?…না তা'কে আর আপনি চিনবেন কি করে'—আমাদের গাঁয়ের ছেলে—তা'তে আমাতে ছোটবেলায় একসঙ্গে 'চু-রে রাঙ্‌ তাঙ্‌' খেলে এসেছি মশাই—সেই তিনকড়ি—বললে বিশ্বাস করবেন না—মনে করবেন গালগপ্প বলছি—একদিন বোসেদের কেতুকে ভালবেসে ফেললে—কেতু সহরের ইস্কুলে পড়া মেয়ে…সেলাই জানে‥ বুনতে জানে—তা'কে বিয়ে করতে পারা ভাগ্যির কথা!…কেতুর কাকার অসুখের সময় মাথায় জলপটি লাগাতে লাগাতেই তা'দের জানা-শোনা আরম্ভ—শেষে এমন হোল—একদিন না দেখ্‌তে পেলে—বুঝতেই পার্চ্ছেন!…কিন্তু কেউ জানতে পারে নি মশাই এ কাণ্ড—এক আমি ছাড়া—

নবীন থামিয়া গেল।

বলিলাম—এই তোমার গল্প?

নবীন বলিল—এই একটু গুছিয়ে বাড়িয়ে দিন না লিখে—একেবারে সব সত্যি! নিজের কানে শোনা—চোকে দেখা—লিখে দিন, আলবৎ ছাপাবে,—সত্যি গল্প—ছাপ্‌বে না কেন?—আর না ছাপে আপনি বরং নিজে—

চুপ করিয়া রহিলাম।

নবীন যে কি রকম গল্প বলিবে তাহা আমার আগে হইতেই জানা উচিত ছিল। অশিক্ষিত আনাড়ী লোকের কাছে মৌলিক প্লটের আশা করাই অন্যায় যে।

নবীন বলিল—কিন্তু টিঁকলো না মশাই—

বলিলাম—কি টিক্‌লো না নবীন;…বিয়ে হোল না বুঝি তা'দের?

নবীন বলিল—বিয়ে হবে না কেন—বিয়ে হোল—কিন্তু ভালবাসা টিঁকলো না আর…

নবীন এত কথা শিখিল কোথা হইতে! বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম—তা'র মানে?

নবীন বলিল—এই সহজ কথাটুকু বুঝতে পারলেন না মশাই—কেতু ইস্কুলে পড়া মেয়ে—শেলাই জানে—বুনতে জানে—আর তিনকড়ি মুখ্যু দিগ্‌গজ লেখা-পড়া জানা মেয়ে মুখ্যুকে কখনো ভালবাসতে পারে—আপনিই বলুন—তাই একদিন তিনকড়িকে ছেড়ে কেতু পালিয়ে গেল—

গল্পটা মন্দ জমিতেছে না! অশিক্ষিত স্বামীকে ছাড়িয়া শিক্ষিতা স্ত্রীর পলায়ন—বেশ জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে! ইহার পর আরও কিছু রহস্য আছে নিশ্চয়ই!

বলিলাম—আর তিনকড়ি?

নবীন বলিল—তা'র কথা আর বলেন কেন—কোথায় চাকরী পেয়েছে বলে' সেই যে চলে' গেল দেশ ছেড়ে—কাউকে এক কলম খবর দিলে না মশাই—জানবার মধ্যে কেবল আমি—

বলিলাম—তার পর?

—তার পর আর কি—কেতু নিজের হাতে শেলাই করা একটা ফতুয়াতে তিনকড়ির নাম লিখে দিয়েছিল—তিনকড়ি নিজের কাছে সেইটে রেখে দিয়েছে—বিয়ে আর করলে না মশাই—

আমার দিকে ঝুঁকিয়া নবীন বলিল—কেমন—ভাল লাগছে কি না বলুন দিকি—এর এক বর্ণ মিথ্যে নয়। আমি বলছি লিখে দিন—চট্‌পট্ নাম হ'য়ে যাবে—

বলিলাম—কিন্তু—কোথায় পালাল—কা'র সঙ্গে পালাল—কিছু জানতে পার নি?

নবীন মুখ নীচু করিয়া বলিল—কোথায় গেছে সে কি জানতে আর বাকি আছে মশাই?

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কোথায় নবীন, কোথায়?

নবীন উঁচু দিকে হাত দেখাইয়া বলিল—স্বগ্যে—

চমকাইয়া উঠিলাম;—এতক্ষণ নবীন হেঁয়ালীর মত কথা কহিতেছিল না কি! অশিক্ষিত স্বামীর উপর ঘৃণা করিয়া শিক্ষিতা স্ত্রীর স্বর্গে পলাইয়া যাওয়াতে বেশ নূতনত্ব আছে বৈ কি!

নবীন বলিল—কিন্তু পালিয়ে গেল—তাই বা বলি কি করে' বলুন—এক রকম কেড়ে নিয়ে গেছে বলাই চলে।

হাসি আসিল। মৃত্যুকে কত লোকে কত রকম অর্থ ই করে; পলাইয়া যাওয়া—কাড়িয়া লওয়া···যে নামই দিই—মৃত্যু বলিলেই হয়—তা' না বলিয়া নবীন এমন কবিত্ব করিতেছে কেন—বুঝিলাম না!

নবীন বলিল—শুনুন তবে: ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর-কল পেতেছিল—ইঁদুর না পড়ে' তা'তে পড়েছিল সাপ্—হ্যাঁ মশাই জ্যান্ত সাপ্;—ঘটাং করে' একটা শব্দ হ'তেই—অন্ধকার থেকে জাঁতিকলটাকে আলোয় সরাতে গিয়ে মারলে ছোবল—ঠিক রগে—কেতুর রগে—ঠিক এই জায়গায়—

বলিয়া নবীন নিজের রগ্‌টি দেখাইয়া দিল।

চুপ করিয়া রহিলাম। এ গল্পটি মন্দ নয়। আমি কিন্তু এ রকম গল্প চাহি নাই তো! তরুণ-তরুণীর প্রেমের কাহিনী লইয়া যে গল্প তাহা যেমন জমে—আর কিছু তেমন জমিবে না—ইহা নিশ্চয়।

কোনও উত্তর না পাইয়াই বোধ হয় নবীন চলিয়া গেল।—আমি পুরান গল্পটা লইয়া কাটাকুটি করিতে লাগিলাম!

যাইবার সময় নবীন বলিয়া গেল—সাপের মতন শত্তুর আর মানুষের নেই—বুঝতাল্লেন?

দিনকতক বড় কাজ পড়িয়াছিল।

সারা সকাল কাজ করিয়াও সময় পাই না। নবীনও ব্যস্ত; ···তাহাকেও আর রাত্রে মন্তর শিখিতে যাইতে দিই না।

উপরওয়ালার নিকট হইতে পুরান ফাইলের কড়া তাগিদ আসিয়াছে। ফাইলগুলি যথাযথ সাজানো ছিল না।

দু'জনে মিলিয়া বহু পুরাতন কাগজপত্র নাড়াচাড়া করিয়া গুছাইয়া সাজাইতে থাকি।

নবীনও সাহায্য করে।

আমার পূর্ব্বে যিনি এই পোষ্টে ছিলেন, তাঁহার কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হই। কোথায় যে কি রাখিয়া গেছেন—হিসাব নাই। ফাইলের মধ্যেই মাসিকপত্র হইতে কাটা সুন্দরীদের ছবি—স্ত্রীর চিঠি—জুতার বল—সবই আছে!

এ কয় দিনে সেই উত্তর দিকে একবারও রামানন্দকে দেখিতে যাওয়া হয় নাই! নবীনের তিনকড়ির গল্পও শোনা হয় নাই—ফাইলের উল্টাপিঠে সেই অর্দ্ধ-সমাপ্ত লেখাটিতেও হাত দেওয়া হয় নাই।

সকালবেলা নূতন আসা চিঠিগুলিতে ষ্ট্যাম্প্ মারিতেছি—নবীন আমার কাছে দেশ্‌লাই লইয়া গেছে—তামাক সাজিতে হয় ত! বৃষ্টি থামিয়া বেশ চন্‌চনে রোদ উঠিয়াছে। নবীনের বাগানের নটে-শাক আর লাউডগা সে রোদে চক্‌চক্ করে।

বাহিরে নবীনের গলা শুনিতে পাই।

নবীন বলিতেছে: এটা যে পাগলের মত কথা হোল অনাথ-দা'—আমি কি চিঠি খেয়ে ফেলবো—না তা' খাবার সামিগ্রী—বৌঠানের চিঠি যদি এসেই থাকে, তা' সে ওখানেই আছে—মাষ্টার-বাবুর কাছে জিগ্যেস করুন গিয়ে—কিন্তু কাজের সময় খচ্‌মচ্ করলে উনি চটে' লঙ্কা-কাণ্ড বাধাবেন—তা' আমি আগে ভাগে বলে' রাখছি—

কাজের ফাঁকে একটু হাসিই আসিল। আমি যা' নই—নবীন আমাকে তাহাই করিয়া তোলে।

আবার সুরু হয়,— তুমি কি রকম মানুষ গা কাঁচির-মা, দেখছো তামাকটা সেজে সবে ধরিয়েছি—আর এলে তো এলে এই সময়ে জ্বালাতে? ছেলে যদি টাকা তোমায় পাঠাত—পেতুম আমরা ঠিকই—পেয়ে তোমার হাতের টিপ্‌-সই নিতুম—তবে দিতুম তোমায়! সে কি আর টাকা পাঠাবে ভাবছো?···সে—আমি শুনেছি— সেখানে বিয়ে থা করে' কোটা বানিয়েচে—তোমার যেমন পোড়া বরাত—তুমি আবার সেই ছেলের জন্যে হা পিত্যেস করো—

এইবার নবীন হুঁকা টানিতে থাকে।

বার কয়েক সজোরে টানিয়া আবার আরম্ভ করে—এ কোম্পানীর আপিস—বুঝেছ কাঁচির-মা—গণেশ হাজরার মুড়কী-বাতাসার দোকান নয়, যে বুড়ো মানুষ দেখে এক পয়সায় আড়াইগণ্ডা বাতাসা ঠোঙায় পুরে বন্ধ করে দিলি;—এখেনে একটি পয়সার নড়চড় হবার জোটি নেই—ঠকাক্ দিকিন কেউ—কা'র ধ'ড়ে ক'টা প্রাণ;—গবরমেণ্টের রেজেষ্টারীতে দেখো লেখা আছে—শ্রীনিবারণ-চন্দ্র মিত্তির—গাঁ' ফতেপুর—পোষ্টাপিস্ গাজনা—তস্য পুত্র—শ্রীনবীনচন্দ্র মিত্তির—কাঁকুড়গাছি সাবডিবিসনের পিওন—দেখো লেখা আছে—না বিশ্বেস হয় তো জিগ্যেস করো ওই মাষ্টার বাবুকে—

কাঁচির-মা বোধ হয় নবীনকে অবিশ্বাস করিল না—কিংবা মাষ্টার বাবুর ঘরে ঢুকিতে সাহস করিল না—গজ-গজ করিতে করিতে চলিয়া যাইতে শুনিলাম।

নবীন এবার ভিন্ন-স্বরে আস্তে আস্তে কহিতে থাকে:

—নাও ধরো রসিক—হাঁ তার পর যা' বলছিলুম—এই দশ বছর কাজ করছি বুঝলে—কিন্তু এমন বাবু পাই নি—এই তোমায় বলে' রাখলুম!—এই আমাদের পেঁপুলবেড়ের অঘরি শা'কে দেখেছি—ও গিয়ে তোমায় মধুগঞ্জের মাধব-গণকে দেখেছি—দেখেছি কেন—এক নৌকোয় হাঁস্‌খালির মেলা দেখতে গিয়ে পাশাপাশি চিঁড়ে ভিজিয়েছি—কিন্তু—যাই বল রসিক—কলকাতার মানুষ হ'লে কি হবে—এমন—

নিজের কাজে মন দিই।

হারাণচন্দ্র মৌলিক—মেয়েলি হাতের লেখা মনে হইতেছে, নূতন বিবাহ করিয়াছে শুনিয়াছি—বউ লিখিতেছে হয় ত।

এটা বিপিনবিহারী চাক্‌লাদার—ব্যাপারীদের চিঠি বোধ হয়—পাটের কারবার করিয়া মাটিতে আর পা পড়ে না যে।

এটি রসিকদাস মাইতি—সেকেলে লেখা—শুনিয়াছি রসিক না কি বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া হরিবোল দাসের শিষ্য—তিনিই লিখিতেছেন হয় ত—বার্ষিকী বাকী পড়িয়াছে না কি!

এক একখানা করিয়া চিঠি লইয়া নবীনের ঝুলির ভিতর ফেলিয়া দিই।

একখানা চিঠির নাম পড়িয়াই হঠাৎ চমকিয়া গেলাম।

ডাকিলাম—এ দিকে একবার এসো তো নবীন।

রসিককে বিদায় দিয়া নবীন আসিল। বলিল—হ'য়ে গ্যাচে আমার—আপনার তামাকটা সেজে দিয়ে যাই—চিঠির যে পাহাড় আজকে— মশাই—

বলিলাম—সে থাক্—দেখ তো নবীন এটা কা'র!

নবীন চিঠিটা হাতে লইয়া খানিকক্ষণ বানান করিয়া পড়িয়া বলিল—এ যে রামানন্দর দেখছি মশাই—

তার পর বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিল: দাঁড়ান—বলিয়া জল দিয়া খামের শুষ্ক গঁদ ভিজাইয়া খুলিয়া ফেলিল।

বলিলাম—ও কি করলে নবীন—করলে কি?

নবীন কোনও উত্তর দিল না। চিটিটা খুলিয়া আগা-গোড়া পড়িয়া যাইতে লাগিল।

বলিলাম—কে লিখছে দেখো তো।

নবীন এবারও কোনও উত্তর দিল না। কি লেখা আছে উহাতে কে জানে। চিঠি যখন খোলাই হইয়াছে—

তখন আর পড়িতে দোষ কি! নবীন পড়িয়া নিক— পরে আমিও একবার পড়িব—তার পর আবার আঁটিয়া দিলেই চলিবে!

কিন্তু একটু এদিক ওদিক চাহিয়াছি ইতিমধ্যে যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ে আমার বাক্‌রোধ হইয়া গেল।

বলিলাম—ও কি, করলে কি নবীন!

কে কাহার কথা শোনে—নবীন ততক্ষণে চিঠির শেষ অংশটি পর্য্যন্ত টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। পড়িবার আর কোনও উপায়ই রাখে নাই। ঘরময় ছেঁড়া কাগজের টুক্‌রা ছড়ানো! রাগে সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল।

নবীন বলিল—যা' বলেছি তাই—কেন মশাই— আমাদের বুঝি প্রাণ নেই—না আমাদের সাপে কাটে না—

বলিলাম—কি বল্‌তে চাও তুমি বল, চিঠিটা যে না বলে' ক'য়ে ছিঁড়ে ফেললে—তোমার মতলবটা কি শুনি!

নবীন বলিল—দেখুন না মশাই—যেতে লিখেছে তো কিতাব করেছে আমায়—ছিঁড়বো না তো কি রামানন্দর কাছে গিয়ে দেবো, বলবো—নাও;—পাগল হয়েছেন?

বলিলাম—পাগল আমি না তুমি—এই যে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললে—যদি তোমার নামে রিপোর্ট করে' দিই— তখন কে তোমার চাকরীটি রাখে শুনি?

নবীন বলিল—ভালর জন্যে তো করেছি মশাই— রামানন্দ চলে' গেলে সাপে কাটলে কে সারাবে বলুন তো! ও আছে—তাই আশপাশের চার পাঁচখানা গাঁয়ের লোক নিশ্চিন্দি—নইলে ··

তার পর করুণ স্বরে বলিল—আর ও চলে' গেলে আমি মন্তর শিখবো কা'র কাছে—সেটা বলুন দিকি?

নবীন একটা ঝাঁটা দিয়া ঘরটি পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল। নবীনের উপর রাগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলাম।

নবীন অশিক্ষিত—ভালবাসার আসল রূপটি আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল না—সে রামানন্দর মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবে কেমন করিয়া! সে কাব্য উপন্যাস নাটকের ধার দিয়া যায় নাই—জীবন-ধারণকেই সে চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানে—সে রামানন্দকে যে বুঝিতে পারিবে না ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই তো;—তাই তাহাকে আমি বরাবর ক্ষমা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু তা' বলিয়া তাহার চিঠিটা অমন নির্দ্দয় সঙ্কোচহীন ভাবে ছিঁড়িয়া ফেলা···ইহা ক্ষমার অযোগ্য।

মনে হইল: ও যদি নবীন না হইয়া অন্য কেউ হইত তাহা হইলে কিছুতেই আমার রাগ মিটিত না!

বলিলাম—নবীন—তোমাকে আর এখানে কাজ করতে হবে না—আমি তোমার নামে আজই এক রিপোর্ট লিখে দিচ্ছি; তোমার চাকরী কালই খতম, অন্য কোথাও কাজের চেষ্টা দেখো তুমি—

ভাবিলাম—যত আনাড়ী আসিয়া জোটে কি আমারই কাছে!

নিজের কাজে আবার মন দিলাম।

কিন্তু মন কি বসে? ওই চিঠিটার জন্য রামানন্দ হয় ত বসিয়া বসিয়া দিন গুণিতেছিল—হয় ত কত বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছিল, তা'র কি ঠিক আছে!—আর সেই চিঠিটা লইয়াই যে এতবড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল—রামানন্দ তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিল না!

নবীন তামাক সাজিয়া আনিয়া সন্ত্রস্ত চিত্তে আমার দিকে হুঁকাটি বাড়াইয়া দিল।

বলিলাম—কে চেয়েচে তোমার তামাক—যাও এখান থেকে সরে'—তোমার ও মুখ আর দেখতে চাই না—যাও।

নবীন চলিয়া গেল।

কি যেন বলিবার জন্য একবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু আমার মুখ দেখিয়া বলিতে সাহস করে নাই।

মনে হইল: ভালই হইল, যাহাদের চাহি না—তাহাদের কাছেও ঘেঁসিতে দিব না!

সন্ধ্যাবেলা আর কোথাও বাহির হই নাই।

রামানন্দর চিঠি আসিবার পর হইতে এমন একটি আবহাওয়া সারা মন জুড়িয়া বসিয়াছিল—যাহা বাহিরে বেড়াইতে যাইবার অনুকূল নয়।

খাতা পেন্সিল লইয়া বসিলাম। রামানন্দর গল্পটাই লিখিব ভাবিলাম—এমন একটা ট্র্যাজেডি, জমিবেও বেশ!

নবীন ঘরে ছিল না—ছিপ লইয়া বিকালে বাহির হইয়া গিয়াছে।

বলিয়া গ্যাছে—চায়টি চার পেলে ভাল হোত মশাই—

এমন চালাক মাছ আপনি আর কক্ষনো দেখেন নি—এ আমি দিব্যি করে' বলতে পারি—ফাৎনার চার পাশে ঘাই দেবে—তবু টোপটি ছোঁবার নাম করবে না মশাই—

নবীনের কথার কোনও উত্তর দিই নাই ; সকালেই যে উহাকে এত বকিয়াছি সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছে হয় ত !

গল্পটি লিখিতে লিখিতে কখন যে পেন্সিলের শিষটি ক্ষয় হইয়া লয় প্রাপ্ত হইয়াছে—সে দিকে জ্ঞান ছিল না—যখন সে দিকে নজর পড়িল দেখি, আর লিখিবার উপায়ই নাই।

নবীনের কাছে একটা ছুরি ছিল দেখিয়াছিলাম।

জানিতাম নবীনের টিনের বাক্সটিতে চাবির দরকার হয় না। ডালা টানিলেই খুলিয়া যায়।

ঘরে গিয়া দেখি : আমার কিনিয়া দেওয়া সেই নূতন জামাটি ধূলায় গড়াইতেছে—সেটি তুলিয়া মশারির চালের উপর রাখিলাম।

বাক্সটির ডালা টানিতেই খুলিয়া গেল। উহারই মধ্যে যত রাজ্যের জিনিষ! ছিপের ফাৎনা—ভাঙা আয়নার কাচ—ফাঁকা দেশলাই-কৌটো।...

সব একে একে নামাইলাম—ছুরির সন্ধান তবু মিলিল না। অনেক নীচে দেখি : বেশ ভাল করিয়া কাগজে মোড়া কি একটা রহিয়াছে! সেই দিশি কাপড়টি বোধ হয় ?

কিন্তু খুলিয়া দেখিয়া বিস্ময়ের অবধি রহিল না—

পোড়া জামাকে এমন করিয়া সযত্নে কেউ বাক্সে পুরিয়া রাখে ? নূতন জামাটির প্রতি অত হতশ্রদ্ধ হইয়া পোড়াটির প্রতি এত মায়া কেন বুঝিতে পারিলাম না।

ভাল করিয়া নজর করিয়া দেখি—জামাটি হাতে শেলাই—অপটু হাতের কাট-ছাট—এক কোণে সূতা দিয়া লেখা রহিয়াছে—'তিনকড়ি' !

হঠাৎ যেন সব জলের মত সোজা হইয়া গেল।

তিনকড়ি তাহা হইলে আর কেউ নয়—আমাদের নবীন! কেতু তাহা হইলে নবীনের স্ত্রী—তাহাকেই তো সাপে কামড়াইয়াছে—রগে ছোবল মারিয়াছে! নবীন যে কেন এত আগ্রহে রামানন্দর কাছে সাপের মন্তর শিখিতে যায়—তাহার কারণ আজ স্পষ্ট হইয়া গেল। আশ্চর্য্য—অথচ একদিনের তরেও কিছু জানিতে পারি নাই—

মনে বড় ধিক্কার আসিল। বাহির হইতে মানুষকে এতটুকু চিনিবারও যো নাই! সারা হৃদয়টা অনুশোচনায় লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। মনে হইল : এখনও ভাল করিয়া মানুষ চিনিতে শিখি নাই—তবু গল্প লিখিবার দুঃসাহস!

আজ সকালেই তো ইহাকে যা' ইচ্ছা তাই বলিয়া বকিয়াছি—চাকরী হইতে ছাড়াইয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছি!

হঠাৎ বাহিরে নবীনের গলা শুনিয়া যেখানকার যা' সব বাক্সর ভিতর পুরিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম।

চাহিয়া দেখি নবীন ফিরিয়া আসিয়াছে—মস্ত বড় দুটি বোল মাছ লইয়া। মাছ দুটি আমার দিকে তুলিয়া নবীন বলিল—দেখেছেন ?

নবীনের সে কথায় কান না দিয়া বলিলাম—আচ্ছা—সত্যি করে' বল তো নবীন—তিনকড়ি কার নাম ?

নবীনের মাথা নীচু হইয়া গেল। বলিল—বাবা মারা যাবার পর, ও-নামে আমায় আর কেউ ডাকে নি মশাই—বাবারই একচেটে ছিল কি না!...কিন্তু এ দিকে দেখুন একবার—দেখেছেন এমন পাকা মাছ—ওজন করুন—দু'টোয় আটসের না হয় তো আমার নামই—

"কুসুম-কুমারী"র শেষ পরিচ্ছেদটি মনে পড়িল।

কর্ণাটরাজ কুসুমকুমারীকে বন্দী করিয়া লইয়া গেছে। অনন্ত রায় ক্ষুব্ধ মনে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার বিছানার উপর ফুলশয্যা-রাত্রের ফুলের মালাটি তখনও তেমনি অম্লান রহিয়াছে—একটি পাপড়িও তাহা হইতে খসিয়া পড়ে নাই!



প্যারিস আন্তর্জ্জাতিক ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী

বহু বৎসরের আয়োজনের পর গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জাতি প্যারিস নগরীতে বিরাট একটি প্রদর্শনী করেছিলেন। এই প্রদর্শনীর নাম হয়েছিল "ইণ্টার ন্যাশন্যাল কলোনিয়াল একজিবিশন, প্যারিস, ১৯৩১"। ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে Exposition Coloniale Internationale, Paris, 1931" প্যারিসের উপপ্রান্তে একটি রমণীয় বনময় অঞ্চলে প্রায় তিন বর্গমাইল পরিমাণ ক্ষেত্রের উপর এই প্রদর্শনী গঠিত হয়েছিল।

৬ই জুন তারিখে এই প্রদর্শনী আরম্ভ হয় এবং পূর্ণ ছয় মাস পর্য্যন্ত অতি জাঁক জমকের সহিত পরিচালিত হয়। ইয়োরোপের অধিকাংশ স্বাধীন জাতি এবং আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্ এই প্রদর্শনীতে তাদের নিজস্ব এক একটি বিরাট প্যাভেলিয়ন বা বাড়ী তৈরী করেছিল। এই ভাবে জগতের প্রধান প্রধান শক্তিশালী জাতির সহযোগে এই প্রদর্শনী পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শনী বলে ঘোষিত হয়েছে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরীতে বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিশন হয়। উহা গুরুত্বে জগতের সমস্ত প্রদর্শনীকে পরাজিত করেছিল। কিন্তু প্যারিসের এই প্রদর্শনী বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিসনের উপর টেক্কা দিল। বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিসনের দর্শক-সংখ্যা হয়েছিল আড়াই কোটী; আর এই প্যারিস প্রদর্শনীতে জগতের নানা স্থান থেকে প্রায় দশ কোটী দর্শক উপস্থিত হয়েছিল। সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যা যদি দুই শত কোটী ধরা যায়, তবে পৃথিবীর কুড়ি ভাগের এক ভাগ লোক এই প্রদর্শনীটি দেখতে এসেছিল।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের লণ্ডন নগরীস্থ বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিসনে আমরা আমাদের কলিকাতাস্থ ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের একটি ষ্টল করেছিলাম। ঐ প্রদর্শনীর অভিজ্ঞতা আমি আমার "বিলাত ভ্রমণ" নামক গ্রন্থখানিতে



প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর একটি য়্যাভেনিউ

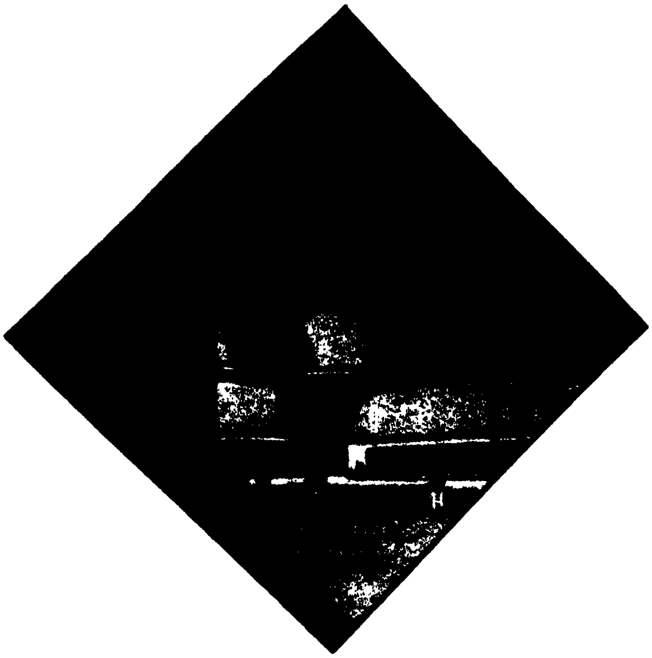


প্যারিস প্রদর্শনীতে গ্রন্থাগারের সম্মুখভাগ



প্রদর্শনীর অন্তর্গত জু-গার্ডেনের আংশিক দৃশ্য (২)

লিপিবদ্ধ করেছি। সেবার এক বৎসর-কাল ইয়োরোপে বাস করেও আমার ইয়োরোপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা মেটা দূরে থাক বরং বেড়েই গিয়েছিল।



Belgium



Denmark

প্যারিসের এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীটিতেও ভারতের ডাক পড়েছিল এবং ভারতের জন্যে বৃহদায়তন দুইটি বাড়ি তৈরী হয়েছিল। একটি ফরাসী-ভারতের জন্য, আর একটি ভারতীয় শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনের জন্য। আমি এই প্রদর্শনীতে যোগদান করবার লোভ সম্বরণ করতে পারি নাই। এবার আমি ভারতের নানা স্থান থেকে কয়েক প্রকার শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করে নিয়ে সেখানে উপস্থিত করেছিলাম। দিল্লীর হস্তীদন্তের উপর অঙ্কিত মোগল রাজত্বের কীর্ত্তিসমূহ সম্বলিত ছবি, আগ্রা ও জয়পুরের শ্বেত পাথরের দ্রব্যাদি, কাশীর পিতলের তৈরী খেলনা, আমাদের বাংলার নানা স্থানের ধাতু-শিল্প এবং হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত দ্রব্য, আমাদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের স্বল্প-মূল্যের অলঙ্কার প্রভৃতি আমার প্রদর্শনের দ্রব্য ছিল। আমি ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের একটি বাজার ইয়োরোপে প্রচলন মানসেই এবার এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম।

এই প্রদর্শনীতে যে সকল ভারতীয় শিল্পদ্রব্য প্রদর্শিত হয়েছিল, তার বেশীর ভাগই ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীগণ উপস্থিত করেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে মাত্র তিনজন ব্যবসায়ী সেখানে ভারতীয় দ্রব্যাদি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার মধ্যে বঙ্গদেশ থেকে মাত্র আমরাই গিয়েছিলাম।

আমার দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কা কন্যা কুমারী অপরাজিতা ইয়োরোপ দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে আমার সঙ্গে গিয়েছিল। প্রদর্শনীতে আমাদের কার্য্য অথবা তথাকার শিল্প-বাণিজ্যাদির কথা স্থগিত রেখে প্রথমতঃ একটি দিনে আমরা যে-ভাবে সমগ্র প্রদর্শনীটি দেখা শেষ করেছিলাম, তারই কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করব।

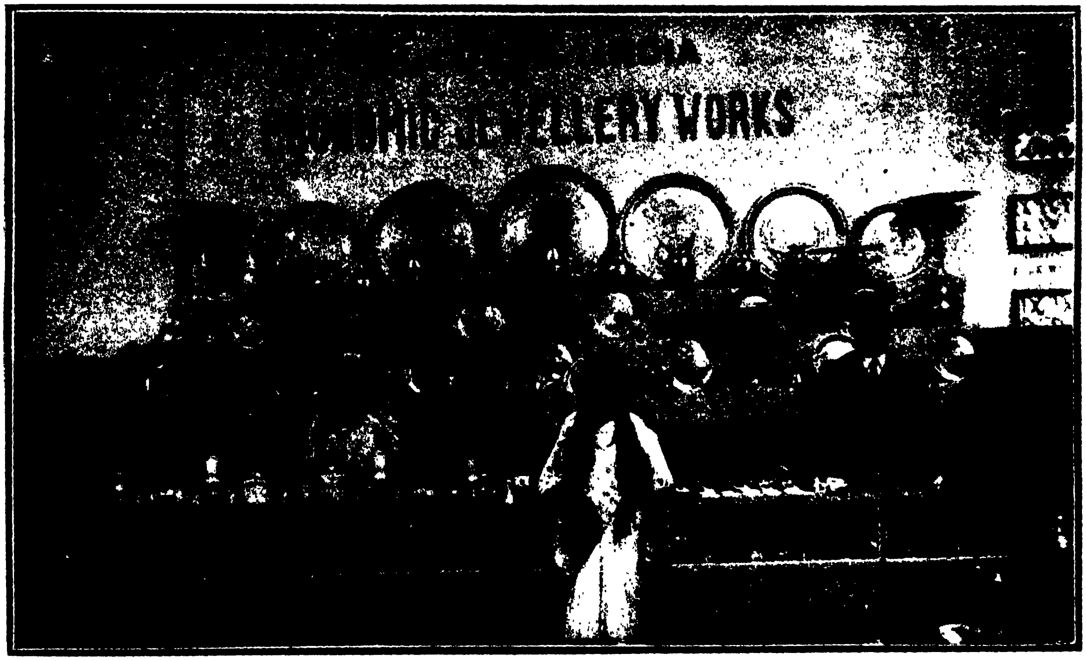
প্রদর্শনীর পনরটি প্রবেশ-দ্বারের মধ্যে সদর-দ্বার পোর্ত দে দোরে (Port de dore) গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, প্রবেশ-পথে দুই ধারে

অতি উচ্চ আলোক-স্তম্ভশ্রেণী। তার মাঝখানে বিরাট একটি স্তম্ভের গাত্রে উপনিবেশ-স্থাপনকারী জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিগণের নাম অঙ্কিত করা হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষ যাদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছে, সেই ক্লাইভ, ডুপ্লে প্রভৃতির নামও তার মধ্যে রয়েছে দেখলাম।

প্রদর্শনীর ভিতরে প্রবেশ করে প্রথমেই দক্ষিণ পার্শ্বে City de Information অর্থাৎ খবরাখবর লইবার স্থান। জগতের বড় বড় দেশ, বড় বড় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে প্রতিনিধি এসে এখানে



প্রদর্শনীর অন্তর্গত হ্রদের তীরের দৃশ্য



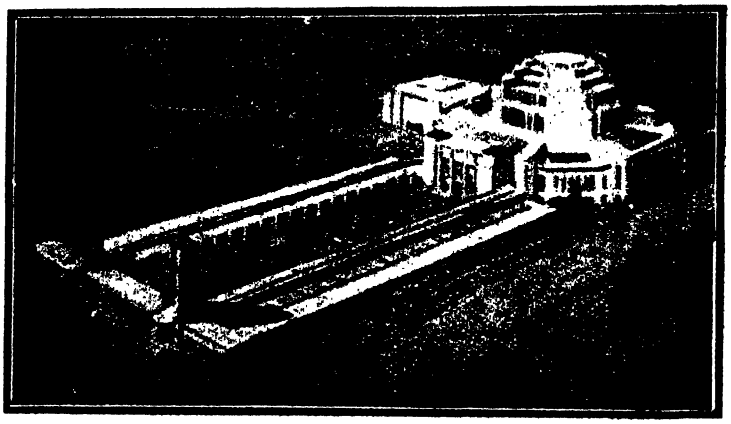
প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বাংলার শিল্পের ষ্টল দক্ষিণ পার্শ্বে—অক্ষয়কুমার নন্দী (লেথক) মধ্যে অক্ষয়বাবুর কন্যা কুমারী অপরাজিতা বামপার্শ্বে—বড়টি জার্ম্মাণ কুমারী এবং ছোটটি রাশিয়ান কুমারী (ভারতীয় পরিচ্ছদে)

সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য আপিস খুলেছে। পৃথিবীর যে-কোন দেশ সম্বন্ধীয় যে-কোন বিবরণ ও সংবাদাদি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা এখানে হয়েছিল।

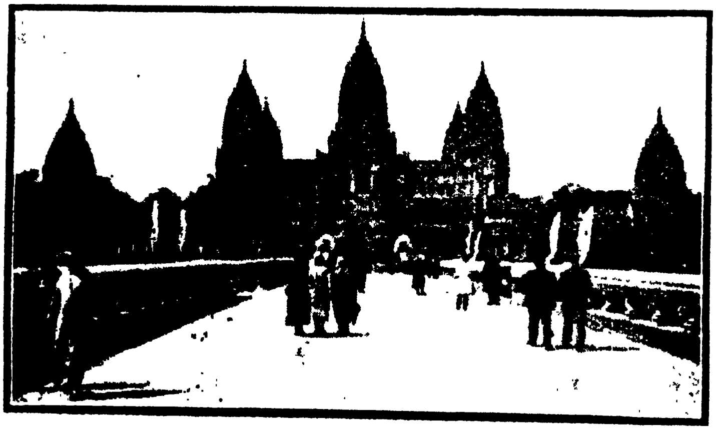
City de Informationএর শেষাংশে গম্বুজাকৃতি চূড়া দেখা গেল। সেটি অতি বৃহৎ। তার এক দিকে নানা দেশের বড় বড় ব্যাঙ্ক তাদের আপিস খুলেছে। অপর দিকে প্রেস বিভাগ। ওখানে পৃথিবীর নানা দেশের সাংবাদিকগণের



প্রদর্শনীর অন্তর্গত জু গার্ডেনের আংশিক দৃশ্য (১)



সিটি দে ইনফরমে শিয়ঁ



প্যারিস্ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ইণ্ডোচীনের "ওঙ্কার মন্দির"



প্রদর্শনীতে ইণ্ডোচীন রেস্তোরাঁ

বসবার স্থান হয়েছে। বিনামূল্যে প্রদর্শনার সর্ব্বত্র দেখতে এঁদের পৃথক রকম Journalists' card দেওয়া হয়েছে। ঐ গম্বুজের অপর পার্শ্বে উৎসব-গৃহ। সেখানে প্রতি রাত্রিতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকমের আমোদ-উৎসব হয়ে থাকে।

পরে আমরা Musee de Colonie দেখলাম। মিউজি দে কলোনি মানে আন্তর্জ্জাতিক যাদুঘর। এটির নীচের অংশ খাঁটি পাথর এবং উপরের অংশ কৃত্রিম পাথরে তৈরী। আর সমস্ত একজিবিসন শেষ হয়ে গেলে মাত্র এইটিকেই এই প্রদর্শনীর স্মৃতি স্বরূপ চিরস্থায়ী করে রাখা হবে। কি সুন্দর মডেল অঙ্কন হয়েছে এই বিশালায়তন গৃহটির গাত্রে! এ গুলি ফরাসী দেশের অধিকৃত দেশসমূহের বিভিন্ন চিত্র। আফ্রিকার বন-জঙ্গলের নক্সা এবং কোন্ দেশ থেকে কি কি দ্রব্য দেশে আমদানী করা হয় তার নক্সা এর গাত্রে অঙ্কিত হয়েছে। বিখ্যাত ফরাসী ভাস্করগণ এই সব মডেল অঙ্কন করেছেন। এই গৃহের মধ্যে ফরাসীদের অধিকৃত দেশসমূহের প্রধান প্রধান দর্শনীয় দ্রব্য রাখা হয়েছে। প্রদর্শনীর অন্তে সমগ্র প্রদর্শনীর সংগৃহীত দ্রব্যসমূহ হতে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য নিয়ে এ ঘরটি পূর্ণ করে রাখা হবে।

এইবার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

এই ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বাড়ীটিই হয়েচে প্রদর্শনীর মধ্যে সব-চেয়ে বড়। লণ্ডনের ১৯২৪এর বৃটিশ এম্পায়ার একজিবিসনের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগীয় বাড়ীটিকে ইংরেজ জাতি গর্ব্ব করে বলেছিলেন এত বড় আচ্ছাদিত স্থান একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে হয় নাই; কিন্তু ফরাসীরা ইংরেজের সেই গর্ব্বও এবার খর্ব্ব করেছে। এবার এইটাই হয়েছে না কি জগজ্জয়ী বড় গৃহ। এর ভিন্ন ভিন্ন অংশে

কোথাও এরোপ্লেন প্রস্তুত, কোথাও রেলগাড়ী প্রস্তুত, কোথাও মোটরগাড়ী প্রস্তুত, কোথাও পোল প্রস্তুত প্রভৃতির শিক্ষা-প্রণালী দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

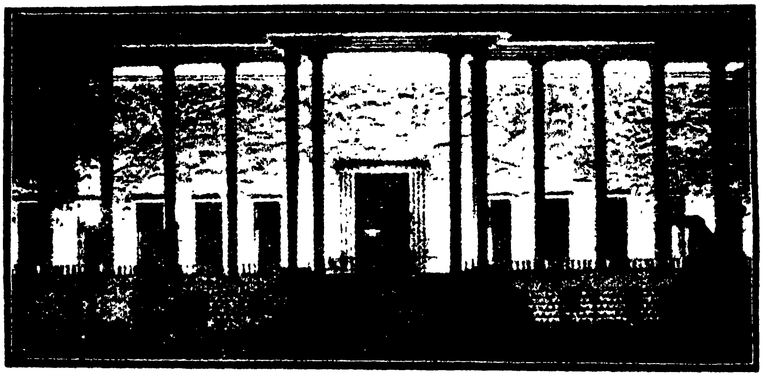
এইবার শিল্প বিভাগ।

ফরাসী শিল্পদ্রব্যাদি যে ঘরে রক্ষিত হয়েছে এটি এরই পরবর্ত্তী বিরাট গৃহ। সৌন্দর্য্য জ্ঞান সবচেয়ে ফরাসী জাতিরই বেশী; কাজেই এই বাড়ীতে যে সকল দ্রব্য স্থান পেয়েছে তার বর্ণন না করলেও অনেকটা অনুমান করা যায় যে এ সকল শিল্পের তুলনা হয় না। ইমিটেশন মার্ব্বেল পাথরের নানাবিধ দ্রব্য এমনই প্রস্তুত করেছে যে, কোন মতেই এগুলিকে খাঁটি



আর্ট প্যাভেলিয়ঁর সম্মুখ

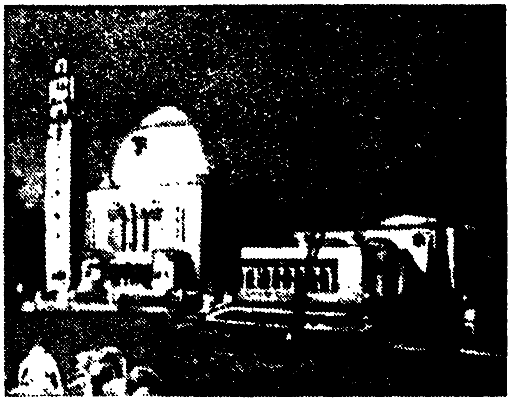
মার্ব্বেল পাথর না বলে পারা যায় না। বড় বড় খাট পালঙ্ক টেবিল চেয়ার দুয়ারের কবাট থেকে আরম্ভ করে অতি ক্ষুদ্র জুয়েলারী অলঙ্কার পর্য্যন্ত এই ইমিটেশন মার্ব্বেল পাথরে তৈরী হয়েছে। কত রকমের মূর্ত্তি, খেলনা, পুতুল, কত রকমের



নব-গঠিত স্থায়ী কলোনিয়াল মিউজিয়ম

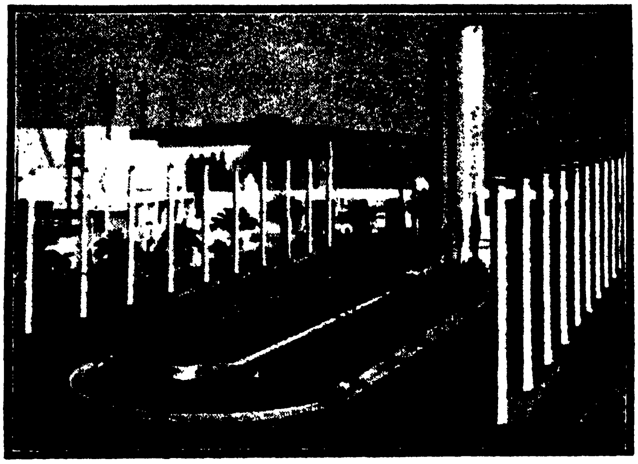


Central Africa

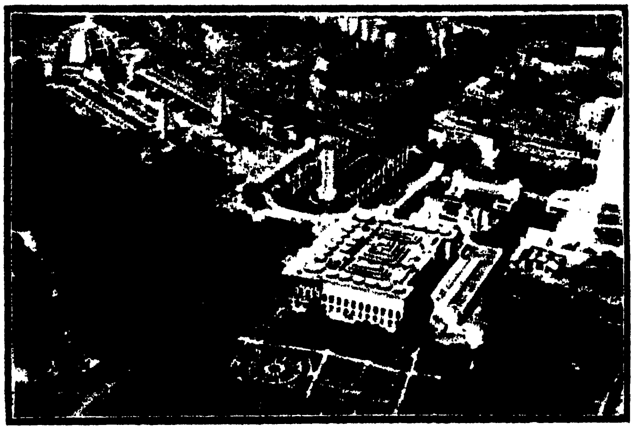


Algiria

পোষাক পরিচ্ছদ, কত কি বিলাসদ্রব্য। যে দিকে দেখি ফ্যাসানের চূড়ান্ত।



প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর প্রধান প্রবেশ-দ্বার



এরোপ্লেন হইতে প্রদর্শনীর প্রধান প্রবেশ-দ্বারের দৃশ্য; চিত্রের উপরের অংশে প্যারীস নগরীর সীমান্তের সৌধশ্রেণী দেখা যাইতেছে—



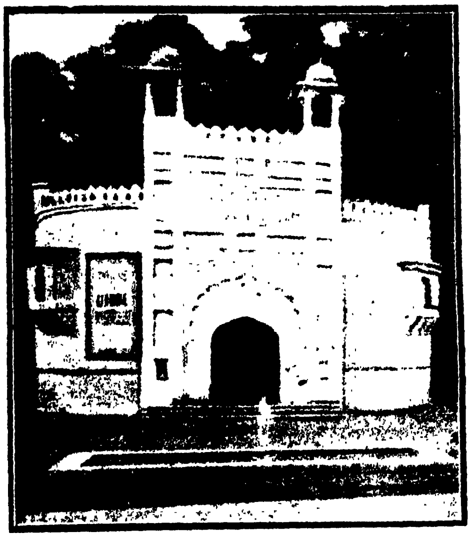
প্রদর্শনীতে আমেরিকা বিভাগ; মধ্যের বাড়ীটি জর্জ্জ ওয়াসিংটনের গৃহের অনুকরণে প্রস্তুত

প্যালেস অব আর্ট—অর্থাৎ চিত্রশিল্পের গৃহ। গৃহের বাহিরের গঠন বড়ই সাদাসিদে—যেন সেকেলে মেটে কোটা। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে কি দেখলাম—যত বিখ্যাত চিত্র-শিল্পীর চিত্র এখানে স্থান পেয়েছে। প্রত্যেক চিত্রটি অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখতে ইচ্ছা করে। দু একটি নগ্ন চিত্র কিছু নির্লজ্জভাবে অঙ্কিত করেছে—তাহলে কি হয়, কি মাধুর্য্যই ফুটেছে এই নগ্ন চিত্রের মধ্য দিয়ে। শিল্পী সৌন্দর্য্যের দিকে মন দিয়ে লজ্জা-সরম ভুলে গেছে। কত গভীর সাধনার ফল এর এক একটি চিত্রের মধ্যে ফুটেছে। একখানি ভারতীয় চিত্র দেখলাম—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ বংশী বাদন করছেন, গোপবালাগণ তন্ময় হয়ে শুনছে। তাদের গাত্রের বসন স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছে, সেদিকে তাদের লক্ষ্য নাই। বনের ধেনু বৎস মৃগ ময়ূরাদিও তন্ময় হয়ে বাঁশী শুনছে। প্রাচ্যের ভাবধারা পাশ্চাত্য শিল্পীর হাতে পড়ে আরও সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে। কত দেশের কত ভাবই না দেখছি এই আর্টের ঘরে।

সম্মুখেই ইটালী প্যাভিলিয়ন—বাড়ীটি খুবই বড়। কি সুন্দর সারি সারি পাথরের মূর্ত্তি সাজানো রয়েছে।—এই মূর্ত্তি-শিল্পের জন্য ইটালী বিখ্যাত। চিত্রবিদ্যায়ও ইটালীর সুযশ জগদ্ব্যাপী। চিত্র-বিভাগে দেখলাম—রোম, ফ্লোরেন্স, মিলান, ভিনিস প্রভৃতি সহরগুলির বিখ্যাত শিল্পের অনুকরণ এখানে সাজানো হয়েছে।

সকাল দশটায় আমরা প্রবেশ

করেছি, মধ্যাহ্নকালে আমরা একটু ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। আহারের সময় হয়েছিল, একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসব ভাবছিলাম, সম্মুখে ইতালীয় ভোজনালয় পাওয়া গেল। ইটালীয়

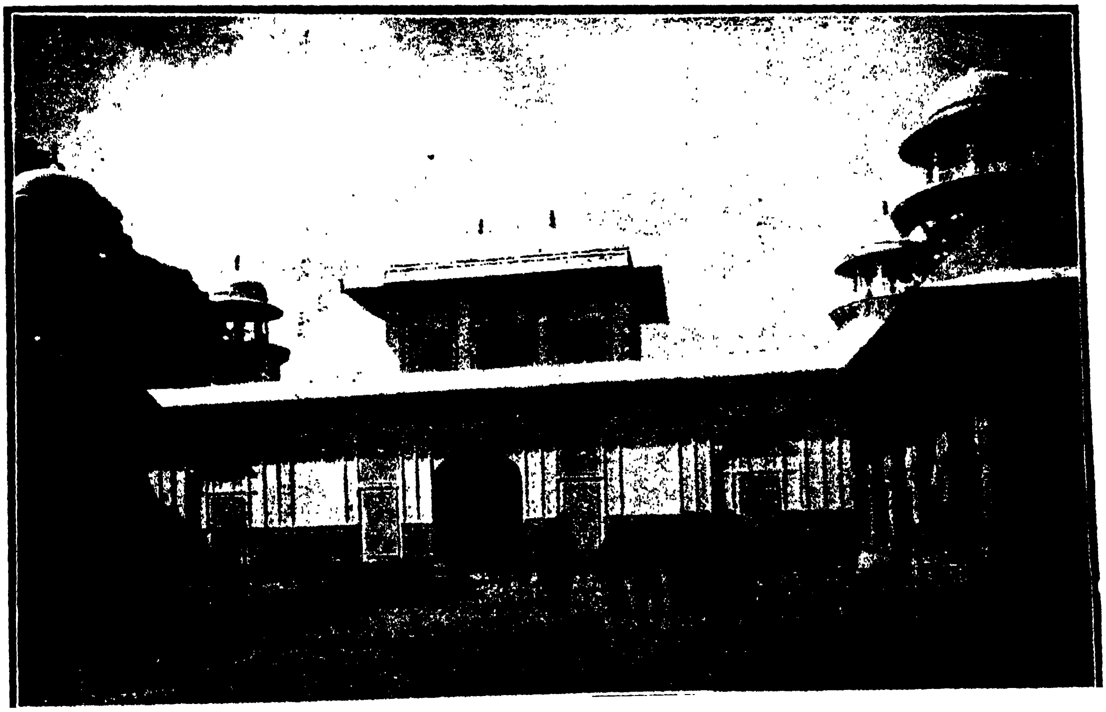


প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে হিন্দুস্থান থিয়েটার হল

এইবার ভারতবর্ষ। এখানে ব্যবসায়ীগণের জন্য অতি সুন্দর বাড়ী তৈরি হয়েছে। এটি আগরার সুবিখ্যাত



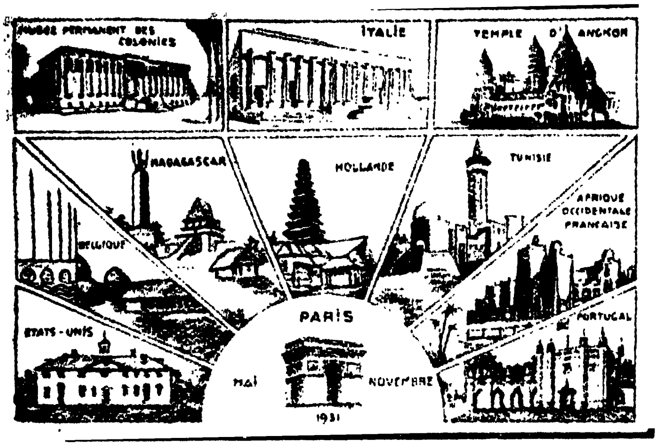
প্রদর্শনীতে ইণ্ডোচীনের নৃত্য—



প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে হিন্দুস্থান বিভাগ—

ময়দার প্রস্তুত কয়েক প্রকার পিষ্টক আমাদের দেশের ভোজ্যের অনেকটা অনুকূল।

এতমাৎ-উদ্দৌলার মত গঠনে হয়েছে। নিকটেই ইণ্ডিয়ান থিয়েটার ও ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁ। প্রকৃতপক্ষে এ-গুলি



প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগের দৃশ্য


প্রদর্শনীতে ফ্রেঞ্চ-ইণ্ডিয়া প্যাভেলিয়ঁ


প্যারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ওলন্দাজদিগের—বালীদ্বীপ

পরিচালিত হয়েছিল বাগদাদের য়িহুদীদের দ্বারা। কাজেই এর মধ্যে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু স্থান পায় নাই। পূর্ব্বেই বলেছি এখানে ভারতীয় দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীগণই বেশীর ভাগ স্থান গ্রহণ করেছিলেন। ভারত থেকে একজন বম্বেওয়ালা আর একজন মুলতানবাসী আর কলিকাতার আমি নিজে। পারিসে কতকগুলি ভারতীয় লোক আছেন; তাঁরা মুক্তার ব্যবসায় করেন। এঁদের অধিকাংশই গুজরাটবাসী। এঁরা দু-তিনজন ভারতীয় বিভাগে মুক্তার অলঙ্কারের ষ্টল করেছিলেন।

এ ভিন্ন ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ভারতের চন্দননগর, পণ্ডিচেরী প্রভৃতি স্থান থেকে কিছু কিছু দ্রব্য সংগ্রহ করে পৃথক একটি অট্টালিকা সজ্জিত করেছিলেন।

এইবার হলণ্ড। হলণ্ডের বাড়ীটি হয়েছে—জাভা দ্বীপের মন্দিরের মত। হলণ্ড এখানে তাদের নিজ দেশের বেশী কিছু উপস্থিত করে নাই। তাহাদের অধিকৃত বোর্ণিয়ো সুমাত্রা জাভা প্রভৃতি স্থানের বহু দৃশ্য উপস্থিত করেছে। ক্ষুদ্র এক জাভা দ্বীপেই এদের সাড়ে তিন কোটি লোকের বাস। এই যে ইক্ষুক্ষেত্রে কৃষকগণ কাজ করছে, খনি থেকে কেরোসিন তৈল, মেটে তৈল, পেট্রোল তুলছে। ঐ দেখুন বিখ্যাত Shell মার্কা পেট্রোল ব্যবসায়ীদের একটি কারখানার মডেল তারা এখানে স্থাপিত করেছে। জাভার মানুষগুলি ভারতবাসীর মত, মন্দিরগুলিও ভারতীয় ভাবের। বুদ্ধ, গণেশ, বিষ্ণু, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা সবই যে আমাদের মত। এই সুদূর ইয়োরোপ-ক্ষেত্রে এসে বলা চলে—জাভা আমাদেরই বাড়ীর কাছে।

এর পর আমরা প্রদর্শনীর এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম খণ্ডে এসে পড়লাম। এই যে সিরিয়া দেশ য়িহুদী জাতির প্রাচীন বাসস্থান, ভিতরে প্রবেশ করলে আমাদের সময়ে

কুলোবে না বুঝে বাহির থেকেই দেখা শেষ করলাম। তার পর প্যালেষ্টাইন। প্যালেষ্টাইন প্যাভিলিয়নে প্রবেশ করলাম। দরজায় লেখা রয়েছে Holy Land "পবিত্র ভূমি।" এই দেশে ঈশা জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তাই খ্রীষ্টান ইয়োরোপ একে পবিত্রভূমি আখ্যা দিয়াছে। প্রথমেই আমরা দেখলাম যেরুশালেমের প্রাচীন মন্দির। নিকটেই ঈশার জন্মস্থান বেৎলেহম নগরের চিত্র। ঐ যে গ্যালিলি প্রদেশ—ঐ যর্দ্দনের তীরভূমি। এ সমস্তই ঈশার ধর্ম্ম-প্রচারের ক্ষেত্র। প্যালেষ্টাইন দেশ বর্ত্তমানে ইংরেজের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। ইংরেজ সেখানে যে সকল আধুনিক ধরণের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রভৃতি গড়েছে, তারও নমুনা এখানে অনেক দেখছি। বর্ত্তমানে ইয়োরোপের অনেকে প্যালেষ্টাইনে বেড়াতে যায়। যাত্রীদের জন্যে ইংরেজ কত রকমের বন্দোবস্ত করেছে তার বহু বিবরণ এখানে দেখতে পেলাম।

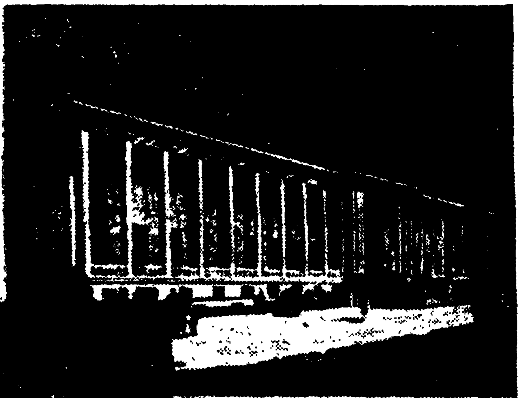
নিকটেই ছোট একখানি বাড়ী—"সুয়েজ" নাম দেওয়া রয়েছে;—প্রবেশ করলাম। সুয়েজ খালের মডেল কি চমৎকারই করেছে। খালের দু-ধারের দৃশ্য, নগর, বন্দর, রেলপথ, খালের জাহাজ সবই ঠিক ঠিক ভাবে গড়েছে। সুয়েজ খালটি প্রথমে ফরাসীরাই কেটেছিল।

কত কি দেখলাম—চোখে ধাঁধাঁ লেগে গিয়েছিল। আর প্যাভেলিয়নের পর প্যাভেলিয়ন দেখা ভাল লাগছিল না। প্রদর্শনীর জু-গার্ডেনে প্রবেশ করলাম। পাহাড়ের উপর নানা জাতীয় বানর বেড়াচ্ছে! এক এক জাতীয় বানর পৃথক পৃথক দল বেঁধে খেলা করছে। খোলা জমিতে পাহাড়ের উপর কত সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারি দিকে গড় কাটা রয়েছে; তাই মানুষদের উপর আক্রমণ করতে পারে না।

হাতী, উট, গাধা, কত রকমের পাখী। জেব্রা, জিরাফ, পৃথিবীতে যেখানে যত রকমের জীবজন্তু আছে, সবই ঐ উদ্যান-মধ্যে রাখা হয়েছে। এটা দেখতেই যে অন্ততঃ তিন ঘণ্টার দরকার। যাক, আর দেখে কাজ নাই। এইবার রেস্তোরাঁয় বসে এক কাপ করে কাফি খাওয়া গেল। আমাদের সব ক্লান্তি দূর হল।

আমরা বেশ একটু তাজা হলাম। এইবার আফ্রিকা মহাদেশ। গথিক ষ্টাইলে গড়া মরক্কোর বড় বড় বাড়ীগুলির গম্বুজ দেখা যাচ্ছিল—আলজিরিয়া দেশ, দীর্ঘ চতুষ্কোণ উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট বাড়ীগুলি, তুনিস দেশ (Tunish)। এক একটা দেশের কীর্ত্তি কত বড় করেই গড়া হয়েছে—এ-গুলি সব ফরাসীদের অধিকৃত রাজ্য। অধিবাসীরা অধিকাংশই মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী।

প্রকাণ্ড বড় বড় খড়ের তৈরী বাড়ী দেখা গেল। লেখা রয়েছে "কঙ্গো বেলজিক্" অর্থাৎ বেলজিয়মবাসীদের



Italy.



Martinic.

অধিকৃত কঙ্গো রাজ্য। ঐ যে অপর দিকে সাহারার মরুময় দেশ। মানুষগুলি কী ভীষণ কুৎসিত কালো! ঐ যে দূরে দেখুন তোগো এবং কমেরুণ রাজ্য। এ সবই মধ্য আফ্রিকার রোদে-পোড়া বালীতে ভাজা দেশ। ইয়োরোপের অধিবাসীরা এই সব দেশ দখল করে এ থেকে নানা প্রকার উৎপন্ন-দ্রব্য নিয়ে নিজ দেশের কাজে লাগাচ্ছে।

এইবার মাদাগাস্কর—বেশ সুন্দর দেশ। আমাদের বাংলার মতই শস্যপূর্ণ দেশ, অধিবাসী লোকগুলো যে ঠিক বাঙ্গালী মুসলমানের মত,—আফ্রিকার আর আর দেশগুলির মত নয়। মাদাগাস্করবাসীদের আদি বাসভূমি না কি ভারতবর্ষ। এরা সকলেই তা স্বীকার করে' গৌরব অনুভব করে।

তার পর ইণ্ডো-চীন। এর ওঙ্কার মন্দিরটি সমগ্র প্রদর্শনীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর আর সব চেয়ে গৌরবের

জিনিস। ইণ্ডোচীন আমাদের ভারতবর্ষের অতি নিকটের দেশ। বাংলা থেকে উত্তর পূর্ব্বে—ব্রহ্মদেশটি অতিক্রম করলেই ইণ্ডোচীন দেশ। এ দেশটি ফরাসীদের অধিকৃত এবং এশিয়াখণ্ডের এই ইণ্ডোচীন ফরাসীদের অতি গৌরবের কলোনি। ওঙ্কার মন্দিরে আমরা প্রবেশ করলাম।

ভিতরে চমৎকার দৃশ্য—নানা প্রকারের বুদ্ধ-মূর্ত্তি পাথরের তৈরী। এই যে মনোরম কারুকার্য্যপূর্ণ বাড়ী-ঘরের নক্সা ও কতই সুন্দর শিল্পকর্ম্ম নানা রকমের। ইণ্ডোচীনের আরও কত বাড়ী ঐ যে রয়েছে—এই অংশ দেখতেই যে পূর্ণ একটি দিনের দরকার। সংক্ষেপে শেষ করা যাক, সন্ধ্যা হল।

সন্ধ্যার পর ওঙ্কার মন্দিরের মাথার উপরে অতি বিরাট আকারের তিনটি আলোর রশ্মি দেখা দিল। আকাশে মেঘের উপর তার কিরণ পড়ে মেঘগুলি ঝকমল করছিল। হ্রদের তীরের আলোগুলি জ্যোৎস্নার মত আলোক দিয়ে সমগ্র হ্রদটি শোভিত করে তুললো। হ্রদের মধ্যে দুইটি দ্বীপ আমোদ উৎসবে ভরপুর। কত ভীষণ রকমের ক্রীড়া-কৌতুক হচ্ছিল। হ্রদের মধ্যে ভ্রমণ করতে ইচ্ছা হল। নৌকায় উঠবো কি মোটর-বোটে—ভাবছিলাম। নৌকায় বেড়াতেই বেশী আনন্দ, কিন্তু আমাদের সময় নাই—মোটর বোটেই চাপলাম।

আমাদের মোটর-বোট ছেড়ে দিল। কি দ্রুতই চলছিল। একে একে সাতটি ঘাটে সাতটি ষ্টেসনে আমাদের নৌকা ধরল। হ্রদের মধ্যের কয়েকটি ফোয়ারা একজিবিসনের একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য। এর কোন একটি দেখবার জন্তেও এই একজিবিসনে আসা সার্থক হয়। ঐ যে বিশালকায় ফোয়ারাটি, ওর নাম রাখা হয়েছে—জল থিয়েটার। কত শত বিভিন্ন রকমের ফোয়ারা ওর মধ্যে রয়েছে—প্রতি মুহূর্ত্তে বিভিন্ন রকমের আলো প্রতিফলিত হয়ে' কত রকমের শোভা ধারণ করছে। একটি ফোয়ারা শতাধিক হস্ত উর্দ্ধে উত্থিত হচ্ছে, ঐ আর এক রকমের ফোয়ারা হ্রদের তীরভূমিতে সারি সারি সাজানো রয়েছে। প্রত্যেক ফোয়ারাটিই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিভিন্ন বর্ণের আলোক-সম্পাতে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করছে।

এশিয়া এবং ইয়োরোপের অনেক দেখা হলে, আমরা আমেরিকা রাজ্যে গমন করলাম। সকলের বড় বাড়ীটি করা হয়েছে এখানে জর্জ্জ ওয়াসিংটনের বাড়ীর অনুকরণে। ওয়াসিংটনের বাড়ীর মধ্যে যে সকল আসবাব ছিল সে-সকলেরই অনুকরণ করা হয়েছে। আমরা চিকাগো ভবনে প্রবেশ করলাম। এখানে চমৎকার একটি দৃশ্য করা হয়েছিল,—আগামী ১৯৩৩এর চিকাগো একজিবিসন কি ভাবে হবে তার একটি মডেল এখানে স্থাপিত করা হয়েছে। আমেরিকার বিখ্যাত অনেক বড় বড় বাড়ীর মডেল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম।

এইবার আমেরিকার আর একটি কলোনি—হাওয়াই দ্বীপ। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে এই হাওয়াই দ্বীপশ্রেণী। এ দেশের লোকজন, ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র সবই যে অত্যন্ত নতুন ধরণের। জগতের কোন দেশের সঙ্গেই এদের সম্বন্ধ নেই। কত নতুন রকমের জীবজন্ত, নতুন রকমের মৎস্য এখানে দেখতে পেলাম। কত বৈচিত্র্যই দেখা হল এই প্রদর্শনীটিতে।

এইবার ফিলিপাইন দ্বীপশ্রেণীতে প্রবেশ করলাম। ফিলিপাইন আমেরিকার কলোনি। ফিলিপাইনের লোকের নানা রকম কাজকর্ম্ম এখানে দেখানো হয়েছে,—কত রকমের ফল—এ যে আমাদের ভারতবর্ষেরই মত। ঐ যে ইক্ষুর চাষ। ঐ যে বেতের কাজ, ঐ যে ফলের মোরব্বার কারখানা। ঐ যে ম্যানিলা সহরের মডেল। কি সুন্দর সহরটি!

অনেক রাত্রি হয়েছিল—বিশেষতঃ আমরা এমনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে আর একটুও হাঁটতে ইচ্ছা করছিল না। এইবার আমরা প্রদর্শনীর ছোট রেলগাড়ীতে চেপে সমস্ত প্রদর্শনীটি একবার প্রদক্ষিণ করে আমাদের দেখা-শুনা শেষ করব মনস্থ করলাম।

আমরা ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ষ্টেসনে ট্রেণে চাপলাম। কি সুন্দর দুধারে খোলা ছোট ছোট গাড়ী গুলি, বসতেই বা কি আরাম! ট্রেণ ছেড়ে দিল। আমরা ডেনমার্ক, আর পোর্টুগাল দুটি বড় বড় প্যাভিলিয়ন ডাইনে রেখে চললাম। এই যে প্রদর্শনীর ১৪নং প্রবেশদ্বার। এইটিই শেষ দ্বার। এখানে দমনিল এভিনিউ ষ্টেসনে আমাদের ট্রেণ এক মিনিট দাঁড়িয়ে ছেড়ে দিল।

প্রদর্শনীর বাহিরে। এখানে প্রদর্শনী সংক্রান্ত আফিস শ্রেণীবদ্ধভাবে দেখা যাচ্ছে। পাশেই বনের বৃক্ষশ্রেণী।

তার পর বৃহৎ দুইটি বাড়ী—কলোনিয়াল মিউজিয়ম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্যালেস। এইবার প্রদর্শনীর সদর-দ্বারে আমাদের ট্রেণ ধরল। রাত্রি এখন দশটা—তবুও হাজার হাজার লোক এখনও প্রদর্শনীতে ঢুকছে। সম্ভবতঃ এরা অনেকেই থিয়েটার দেখবার যাত্রী। এইবার City de Information ডাইনে আর বন-বিভাগ বাঁয়ে রেখে আমরা চলছিলাম। ও কি—মহিষের মুণ্ডুর মত গঠনে বিকট উচ্চ স্তম্ভ—ওটা কি? হাঁ'—মাদাগস্কার প্যাভিলিয়নের চূড়া বটে। বোধ হয় মাদাগাস্কারে প্রচুর মহিষ। এইবার আমরা ২নং প্রবেশদ্বার অতিক্রম করলাম। দ্বারদেশে কি সুন্দর স্তম্ভযুক্ত ফোয়ারা। ঐ যে হাজার হাজার মোটর গাড়ী এক স্থানে রয়েছে। দর্শকরা ওখানে গাড়ী জমা রেখে গিয়েছে। এইবার সোমালী, ফরাসী গিয়ানা, ওশিয়ানিয়া, নব কালিডোনিয়া, মার্ত্তিনিক, রি-ইউনিয়ন, গোয়াডে লুপ, প্রভৃতি দেশের প্যাভিলিয়নগুলি অতিক্রম করলাম।

এইবার আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থান (amusement park) এর ধার দিয়ে চলেছি। ঐ যে নাগোরদোলা, অশ্বচক্র, এরোপ্লেন চক্র, মোটর গাড়ীর ধাক্কা খেলা প্রভৃতি উৎসবগুলি অতিক্রম করছি। এক স্থানে কৃত্রিম পাহাড়ের উপর নীচে দিয়ে খেলনা ট্রেণ চলেছে। উপর থেকে নীচে নামবার সময় আনন্দ ও ভয়ে লোকগুলি কি ভীষণ চীৎকার করছিল।

সেই ওঙ্কার মন্দিরের পার্শ্ব দিয়েই আবার চললাম। তার পর মধ্য আফ্রিকা। এইবার উত্তর আফ্রিকা, মরক্কো, আলজিরিয়া, তুনিশ প্রভৃতি দেশ। Amusement parkএ একবার ট্রেণ ধরেছিল, এইবার মরক্কো ষ্টেসনে ধরল। এইবার ট্রেণ বেলজিয়ম প্যাভিলিয়নের মধ্য দিয়া চলেছে। এইবার ডাইনে জু-গার্ডেন, বামে সুয়েজ, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া প্রদেশ। এই যে বামে হ্রদ, দক্ষিণে প্রদর্শনীক্ষেত্রের প্রান্তদেশের বনরাজি। আমরা যে সকল প্যাভিলিয়ন দেখেছিলাম সেইগুলির অনেক আবার দেখতে পাচ্ছিলাম। এইবার ইটালী গেট, তার পর ইটালী প্যাভিলিয়ন, ঐ যে ইটালীর রেস্তোরাঁয় আমরা মধ্যাহ্নে খেয়েছিলাম। এখানে ইটালী ষ্টেসনে ট্রেণ একটু থামল। পুনরায় আমরা বামে Palace of Art এবং Palace of Industry অতিক্রম করলাম। আবার আমাদের ইণ্ডিয়া প্যাভিলিয়ন। অনতি-দূরে ইণ্ডিয়া গেট্ নামক ১৩নং বৃহৎ প্রবেশ-দ্বার। দুয়ারে ও কি বিশ্রী এঁকেছে—হাঁ, বোধ হয় পুরীর জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা আঁকা হয়েছে। আমরা যে ষ্টেসন থেকে ট্রেণে চেপেছিলাম সমস্ত প্রদর্শনীক্ষেত্রে পরিবেষ্টন করে সেই ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ষ্টেসনে এলাম। একটি প্রশস্ত রাস্তায় দেখলাম লোকে লোকারণ্য! এত লোকের ভীড় কিসের! জানলাম—কলোনিয়াল প্রসেশন্। শত দেশের শত রকম মানুষ যার যার দেশের উৎসবের প্রসেশন বের করেছে। কোন্ দেশের কি এ যে বোঝা দায়! ঐ যে ইণ্ডোচীন—বুঝি রামযাত্রা বের করেছে। কত হাতী ঘোড়া চলেছে, কত কৃত্রিম মন্দির, রথ, ময়ূরপঙ্খী নৌকা বের করেছে, এ যে কলিকাতার বিয়ের প্রসেশনের মত! এইবার ফরাসী আর্টিষ্টদের প্রসেশন—হাঁ সুন্দর বটে; কিন্তু কী লজ্জা—মেয়ে পুরুষে যে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় আপন আপন দেহ নানা বিচিত্র চিত্রে রঞ্জিত করেছে। তা হক এরা নির্লজ্জ, কিন্তু কি মনোহর সাজেই সেজেছে। তাদের দেশের উৎসবের গান আর তার সঙ্গে নানা ভঙ্গিমায় নৃত্য করে চলেছিল। এই ভাবে প্রত্যেক রাত্রি ১১টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রসেশনের ব্যবস্থা।

রাত্রি ১১॥টা। জানলাম এর পর একজিবিসনের ফেরতা লোক জনে ট্রাম, মটর, বাস, আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেল পথ প্রভৃতি এমন ভর্ত্তি হয়ে যাবে, এখানেই হয়ত আমাদের দু ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতে পারে। তাই এখানেই আমরা এদিনকার মত শেষ করলাম। আমাদের যে দেখা-শোনা হল বাস্তবিক একটি লোক বহু বৎসরের পরিশ্রমে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেও এত বিভিন্ন বিষয় দেখতে সুযোগ পায় না।

দামোদরের বিপত্তি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সুরেনবাবুর উপদেশ

দামোদর একেবারে সুরেনবাবুর দোকানে গেল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সে কলেজ ষ্ট্রীট, বহুবাজার, লালবাজার, চীনেপটি, রাধাবাজার, ক্যানিঙ্ ষ্ট্রীট বেড়াইয়া বেলা প্রায় ১০টা নাগাদ সুরেন বাবুর দোকানে পৌঁছিল। দেখিল রমেশ, শচীন ও নগেন তিনজনে বসিয়া চা খাইতেছে; আর সুরেন বাবু কপের উপর কপ্ কেবলই দিয়া যাইতেছেন। আজ তাঁহাকে অন্য দিনের চেয়ে অনেকটা প্রফুল্ল, অনেকটা সুস্থ দেখাইল। দামোদর ক্লান্ত ভাবে বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "দামোদরবাবু, চা' দিই?"

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া চা দিতে বলিল। সুরেনবাবু তাহাকে চা দিলেন; তার পর তাহারই পাশে বসিয়া পড়িলেন।

শচীন দামোদরের দিকে চাহিয়া বলিল, "দামোদরবাবু, সুরেনবাবুর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছে। আমরা ওঁকে বলেছি, যে, উনি যত খদ্দের চা'ন, জোগাড় ক'রে দেব। ওঁর দোকান জাঁকিয়ে তুলবো। দু' দিনেই দেখতে পাবেন যে বড় ঘর না নিলে চল্‌ছে না।"

সুরেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ভগবান্ আপনাদের পাঠিয়েছেন, আমাকে দয়া কর্ব্বার জন্যে। তাঁর দয়া হ'লে সব হবে।"

নগেন দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরী হলো যে, দামোদরবাবু? আমরা প্রায় এক ঘণ্টা বসে আছি।"

দামোদর বলিল, "আমার প্রাণ বড় কাতর হয়েছে, নগেনবাবু। আমি আর দেরী কোরবো না,—আজই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়্‌বো। কল্‌কাতাতে থাকা নিরাপদ নয়,—আমি কোথায়ও দূরে জঙ্গলে পাহাড়ে যাবো।"

সুরেনবাবু বিস্মিত হইয়া দামোদরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রমেশ বলিল, "তা'র জন্য আর তাড়া কিসের? সে' ত গেলেই হবে। সত্যি ত সাধন-ভজনের জন্যে যাবেন না। বৈরাগ্য অমন হয়। ঐ ভাবটা থাকে বেশী দিন তখন যাবার বন্দোবস্ত করা যাবে। তা ব'লে নিতাই ঘোষের ভয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।"

নগেন বলিল, "উঃ! কি নাছোড়বান্দা লোক কিন্তু!"

সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের এ সব প্রাইভেট কথায় আমার কথা কওয়া উচিত নয়। কিন্তু আপনারা যে রকম উদ্বিগ্ন হয়েছেন ও আমাকে যে রকম দয়া কর্‌ছেন, তা'তে আমার দ্বারা যদি কোনও উপকার হয়, তা' আমি কোরব। তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কি ব্যাপারটা শুন্‌তে পারি?"

শচীন, রমেশ ও নগেন দামোদরের মুখের দিকে চাহিল। দামোদর বলিল, "হাঁ, শুন্‌তে পারেন, সুরেন-বাবু। আপনি এখন আমাদের বন্ধু লোকই।" সে একে-একে সুরেনবাবুকে সমস্ত কথা শুনাইল। শুনিয়া সুরেনবাবু বলিলেন, "এই কল্‌কাতা সহরে মানুষকে মানুষ খুঁজিয়া বা'র কর্ত্তে পারে না। এ লোকারণ্য। এখানে আপনার সন্ধান সে কিছুতে পাবে না, যতই কেন সে অনুসন্ধান ক'রে বেড়াক্। তবে ঐ মেসে আর থাকা ঠিক হবে না; কেন না, ও সন্ধান পেয়েছে। আর কোথাও থাকার কি আপনার ব্যবস্থা হ'তে পারে না?"

দামোদর কহিল, "না। প্রথমতঃ, আমার জানাশোনা বড় কেউ নেই। দ্বিতীয়তঃ, আমার নিজের অর্থ-সামর্থ্য নেই, আমি একেবারে রিক্ত। তৃতীয়তঃ, আমাকে থাক্‌তে হলে চাক্‌রিরই হোক্ কি অন্য কোনও কাজেরই হোক্ চেষ্টায় রাস্তায় ঘুর্‌তে হবে। বসে থাকলে চল্‌বে না। সুতরাং আমার কল্‌কাতায় থাকা অসম্ভব। ফের কাজ-কর্ম্ম করাও অসম্ভব। রাস্তায় দৈবক্রমেও ত নিতাই ঘোষের সঙ্গে দেখা

হয়ে যেতে পারে। সে আমাকে হাতে পেলে ছাড়্‌বে না। সে অতি একগুঁয়ে বদমেজাজী লোক্—আস্ত ডাকাত। আপনারা জানেন না, ওর কোন কাজ আট্‌কায় না—খুন-জখমও কর্ত্তে পারে।"

শচীন কহিল, "পুলিশে খবর দিয়ে ওকে bound down করা যায় না—যা'তে ও ভদ্রলোককে বিরক্ত না কোরতে পারে?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "তা' হয় ত' যেতে পারে। কিন্তু তা'তে সমস্ত কথা প্রচার হয়ে হট্টগোল হবে, আর সেটা একটা পারিবারিক ব্যাপারকে অযথা পাঁচজনের সমালোচনার বিষয় করে দেওয়া হবে। সে ঠিক পথ নহে। আমার শক্তি নেই, না হলে দামোদরবাবুকে আমার বাড়ীতেই দিন কতক রাখ্‌তুম। সেখানে ত' আর চট্ করে সে লোকটা গিয়ে হাজির হো'তে পারবে না। কিন্তু আমার যে নিজেরই জুটে না। তা'র উপর ওঁর একটা চাক্‌রির সন্ধান কর্ত্তে হবে ত'! বড়ই মুস্কিল বটে।" সুরেনবাবু চিন্তিত হইলেন।

নগেন বলিল, "দেখুন ত' কি গ্রহ! আমরা এতগুলো লোক একজনের ভয়ে এত উৎকণ্ঠিত! কি comic!"

শচীন উত্তর দিল, "লোকটিকে ত' দেখেছ, একটু নমুনাও পেয়েছ। সে আমাদের চারজন কেন, চল্লিশজনকেও ভ্রূক্ষেপ করে না। তা' ছাড়া এ যে delicate ব্যাপার। শ্বশুর জামাই সম্বন্ধ বাঁচিয়ে চল্‌তে হ'চ্ছে।"

সুরেনবাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন। রমেশও বিমনা হইয়া ভাবিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে চা-এর পেয়ালাতে চুমুক দিতে লাগিল। নগেন একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিল। শচীনও বিরস হইয়া বসিয়া রহিল। দামোদরের ত' কথাই নাই।

শেষে সুরেনবাবু বলিলেন, "এক কাজ করা যেতে পারে। দামোদরবাবুকে কোনও পেণ্টারের বাড়ী নিয়ে গিয়ে ওঁর সমস্ত ভোল্ বদ্‌লে দিলে কেমন হয়? ওঁকে চিন্‌তে পারা যাবে না, এমন করে দিতে হবে। যখন রাস্তায় বেরুবেন, তখন সেই বেশে বেরুবেন। ওঁর রঙটা ত কাল, ওঁকে সাদা করে দেওয়া যায়। চুলগুলো না হয় আরও ছোট বড় করে কাটা যাবে। মুখটাও একটু আধটু বদ্‌লে দেওয়া যাবে। গলার আওয়াজ অবশ্য ওঁকেই বদ্‌লাতে হবে। একটু নাকে, কি একটু দাঁত চেপে কথা বল্‌লেই হবে। তা' হলে আপনাদের মেসেও থাক্‌তে পারবেন—অন্য নামে। অথচ বাইরে বেরুলেও কেউ চিন্তে পার্‌বে না। এ রকম ত' হওয়া সম্ভব। প্রায়ই হয়। এ পরামর্শ-টা আপনাদের কেমন মনে হয়?"

শচীনের ইহা খুবই পছন্দ হইল। সে বলিল, "ঠিক্! এটা আর কা'রও মাথায় আস্‌ছিল না! চলুন, এখনি চলুন, দামোদরবাবু। চিৎপুরে অনেক পেণ্টার আছে। তার পর নিজেরা দেখেশুনে নিয়ে নিজেরাই আপনাকে রোজ পেণ্ট করে দেব। সে মন্দ হবে না।"

নগেন কহিল, "অবশ্য এটা সম্ভব বটে; তবে কতটা practical হবে, কাজের হবে, তাহা জানি না। দেখ্‌তে দোষ কি?"

দামোদর ঘাড় নাড়িল, বলিল, "না। যতই কেন ভোল বদলান যাক্, নিতাই ঘোষকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। তা' ছাড়া তা'তে অনেক গোলযোগ। সব সময়ে কি আর মনে থাক্‌বে যে আমি দামোদর নই, আমার গলার আওয়াজ আলাদা, কি আমার গায়ে রঙ্ দেওয়া। যদি ঘেমেই উঠি রাস্তাতে, তবে হয় ত' মুখ মুছে রঙ্ উঠিয়ে ফেল্‌বো; না হয় ত' রাস্তার কলে ধুয়েই তুলে ফেল্‌বো অন্যমনস্ক হয়ে। তখন বড় বিপদ হবে। রঙ্ মেখেও ত' চিরকাল চল্‌বে না। দু' বছর, কি চার বছর বাদে রঙ্ বদ্‌লালে লোকে কি ভাব্‌বে?"

শচীন কহিল, "সে পরের কথা। আপাততঃ চেষ্টা করে দেখ্‌লে হোত।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "তা ছাড়া অন্য উপায় ত দেখি না। যতটা অসুবিধা হ'বে ভাব্‌ছেন ততটা হবে না। ক্রমশঃ সয়ে যাবে, অভ্যাস হয়ে যাবে। আমি কেন বল্‌ছি জানেন? আমার এক আত্মীয় এই রকম ছদ্মবেশে প্রায় আট বৎসর ছিল। অবশ্য পুলিসের ভয়ে করেছিল। কোথায় কি মারামারিতে খুন করে ফেলে। তার পর সেখান থেকে পালিয়ে এখানে এই কল্‌কাতাতে আসে। আমি তখন চাকুরি করি—কর্‌ণাম্ কোম্পানীর কাপড়ের গুদামে। এসে আমাকে সব বলে। তখন তা'র নামে হুলিয়া বেরিয়েছে। থানায় থানায় তা'র নামে কাগজ বেরিয়েছে; ছবি বেরিয়েছে। মহা বিপদে পড়ে গেলুম।

তখন তা'কে গুদামেই লুকিয়ে রাখ্‌লুম। রাত্রে বাড়ী আস্‌বার পথে, তা'কে নিয়ে গেলুম এক রঙ্‌ওয়ালার কাছে। সে মশাই, এমনি রঙ্‌ বদ্‌লে, চেহারা বদ্‌লে দিলে যে তা'র মাও তা'কে আর চিন্‌তে পারত না। সেই রকমে সে প্রায় আট বৎসর কল্‌কাতায় কাটালে, চাকরি ক'র্লে। তা'র পর পশ্চিমে কোথায় চাকরি নিয়ে চলে গেল। সে প্রায় ১০।১৫ বৎসরের কথা হো'ল। এখনও ধরা পড়েছে তা' শুনিনি।"

নগেন কহিল, "হাঁঃ, এই ত কাশীমপুরের রাজ-বাড়ীতে কি হ'চ্ছে। এমন স্রেফ রাজপুত্র সেজে এসেছে সে রাণীরাও, স্ত্রীরাও চিন্‌তে পারছে না। যেখানকার যা' সব হুবহু একেবারে।"

শচীন বলিল, "আর জাল প্রতাপচাঁদ। সে ত গল্প নয়!"

সুরেনবাবু সায় দিলেন, "ঐ রকম জাল কত এই কলকাতা সহরে রোজ হচ্ছে তা'র কি ইয়ত্তা আছে মশাই? কে যে কি, কিছুতে চট্‌ করে বুঝা দায়! আজ যাকে হয় ত' পশ্চিমী মাড়োয়ারি বলে জানেন, কাল সে হয়ে গেল দিল্লীওয়ালা। আজ যে দিল্লীওয়ালা কাল সে বাঙালী। আজ যে বাঙালী, কাল সে মহিমচাঁদ ফতেচাঁদ গুজরাটি। এই রকম হচ্ছেই, বুঝেছেন দামোদর বাবু। সন্ন্যাসী হলেও, আপনাকে গেরুয়া পর্‌তে হবে, মাথায় চুল রাখ্‌তে হবে, রুদ্রাক্ষ পরতে হবে, ছাই অবশ্য মাখুন আর না মাখুন, সে আপনার ইচ্ছা। অনেক সন্ন্যাসী ছাই মাখে না, বিশেষত আজকালকার সন্ন্যাসী যা'রা লেখাপড়া শিখে বেকার থাক্‌তে চায়—তা'রা। কিন্তু সেও ত আপনার এক রকম ছদ্মবেশই, কি বলেন, শচীনবাবু!"

শচীন উত্তর দিল, "তা'তে আর সন্দেহ আছে? ও সাধু-সন্ন্যাসীর দলে কত রকম আছে তা' কে জানে? শুধু ও-পথে থেকে খেতে পাওয়া যায়, পরবার ভাব্‌না নেই, তাই দেখেই ত লোকে যায়। চুরি দাগাবাজি ক'র্লে অনেকে ধরা পড়্‌বার ভয়ে সন্ন্যাসী সাজে।"

নগেন দামোদরকে বলিল, "চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে ক্ষতি কি? এতে অসুবিধার চেয়ে সুবিধা বেশী। প্রথমতঃ, আপনি আমাদের মেসেই থাক্‌তে পার্‌বেন, তা'তে আপাততঃ নগদ পয়সা খরচ নেই; দ্বিতীয়তঃ, চাকরির খোঁজও ক'র্ত্তে পার্‌বেন নির্ভয়ে; তৃতীয়তঃ, আমাদের সঙ্গেই থাক্‌বেন। দরকার-মত সাহায্য পাবেন। অবশ্য আপনিও ভেবে দেখুন কি করা উচিত। রমেশ কি বল?"

রমেশ সুরেনবাবুকে আবার চা' দিতে বলিল। সুরেন উঠিয়া চা দিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রমেশ চা-এর পেয়ালা সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "অবশ্য চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এখন মেসে যাওয়া সুযুক্তি নহে। আমাদের সঙ্গেই আবার আমাদের ঘরে লোক গেলেই, সকলে বুঝ্‌বে ও দামোদরবাবুই এসেছে। তা' ছাড়া এমন অজানা লোক মেসের ভিতরে রাখাও—অজানা অপরের কাছে—ঠিক নয়। চারুবাবুর উপর অবিচার করা হবে। শেষের কথা এই, আমারও যতদূর বিশ্বাস, ও রঙ্‌ বদ্‌লালে, কি চেহারা বদ্‌লালে নিতাই ঘোষকে ঠকান যাবে না। সে খুব খেলোয়াড় ও ব্যবসায়ী লোক। অন্য কোনও ব্যবস্থা করা চাই, ও মতলব ঠিক মনে হচ্ছে না।"

সুরেনবাবু হতাশভাবে বলিলেন, "আর কি মত্‌লব এর চেয়ে ভাল হো'তে পারে বলুন!"

দামোদরেরও ইচ্ছা হইতেছিল না, ছদ্মবেশ করিতে। সে আবার কি? অমন করে নিজের কাছে নিজেকে পর করিয়া কি করিয়া থাকিবে? এ তাহার কি বিপদ ক্রমশঃ হইতেছে? তবে সন্ন্যাসী হইতে গেলেও 'ত ছদ্মবেশ কিছু চাই। সে ত ঠিক কথা। কিন্তু মুস্কিল ত ঐ। সব সময়ে মনে থাকিবে না; রঙ্‌ যদি চটিয়া বা গলিয়া যায়? তা' ছাড়া কি ছদ্মবেশ লইবে? সে কিছুই জানে না।

বেলা ক্রমশঃ বাড়িল, অথচ কোনও রকম উপায় উদ্ভাবিত হইল না। ১১½টা বাজিয়া ১২টার ঘরে সময় পড়িল। সুরেনবাবুর দোকান বন্ধ করিবার সময় হইল ক্রমে। শচীন, নগেন ও রমেশেরও মেসে ফিরিবার কথা মনে পড়িল; শচীন বলিল, "আজ একবার কলেজে যাবো। সব ছেলেদের কাছে সুরেনবাবুর জন্য বিজ্ঞাপন ক'র্ত্তে হবে!" সকলেরই মন অস্বস্তিতে ও অশান্তিতে পূর্ণ হইল। দামোদর কোথায় যাইবে? কোথায় খাইবে? কি করিবে?

সুরেনবাবু বলিলেন, "আজ না হয় আমার বাসাতেই চলুন। ঐখানেই আহারাদি হবে। তেবে চিন্তে আবার দেখা যাক্‌। ও বেলায় অন্য বন্দোবস্ত হবে।"

নগেন বলিল, "হাঁ, সেই ভাল। আমরা আবার সন্ধ্যেবেলায় আস্‌বো। ৬৷৭টা নাগাদ। আবার পরামর্শ করা যাবে।"

শচীন মত দিল, "আমরা এত ভাব্‌ছি; কিন্তু নিতাই ঘোষ হয় ত এতক্ষণ বাড়ী ফিরলো। সে কি আর কল্‌কাতায় থাক্‌বে? এও 'ত হতে পারে যে সে বাড়ী ফিরে গেছে—আর আস্‌বে না।"

সুরেনবাবু কহিলেন, "তা' সম্ভব। তবু সাবধানের মার নেই। দু' এক দিন একটু নজর রেখে সতর্ক হয়ে চলা-ফেরা করা ভাল। আমার মতে ত রঙ্‌ বদ্‌লালে, চেহারা বদ্‌লালেই সব গোল চুকে যেত। তখন আর কে কা'কে চেনে?"

সকলে উঠিল। শচীন হিসাব করিয়া সুরেনবাবুকে পয়সা দিল।

সুরেনবাবু বলিলেন, "নিতান্ত অভাব আমার, তাই আপনাদের কাছ থেকেও পয়সা নিতে হচ্ছে। এতে আমার কত কষ্ট ও হীনতা অনুভব হচ্ছে তা' কি ক'রে জানাবো।"

নগেন বলিল, "আচ্ছা, আপনার দোকান জমুক না, তখন অমনি এসে চা' খেয়ে যাবো।" তা'র পর দামোদরকে বলিল, "দামোদরবাবু, সন্ধ্যেবেলায় নিশ্চয়ই আস্‌বেন—বুঝেছেন। এখন খেয়ে দেয়ে না হয় বিশ্রাম ক'রে নেবেন।"

রমেশ বলিল, "বিকালে যা' হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবেই। তবে একটা কাজকর্ম্ম ঠিক হলে ভাল হোত। দেখি কিছু করে উঠ্‌তে পারি কি না। আমি ভাব্‌ছি, কোন কিছু সুবিধা হয় কি না।"

সুরেনবাবুর বাসাবাড়ী শুঁড়াতে। সুতরাং সকলে একসঙ্গে শিয়ালদহ ষ্টেশন পর্য্যন্ত চলিল। হ্যারিসন্‌ রোড ও সার্কুলার রোডের মোড়ে আসিয়া সবাই দুইটি দলে বিভক্ত হইল। এমন সময় হঠাৎ শচীন নগেনের জামা ধরিয়া টানিল। নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "কি? জামা ছিঁড়বি না কি?"

শচীন আঙুল দিয়া দেখাইল, নিতাই ঘোষ ঠিক সাম্‌নের ফুটপথ ধরিয়া আসিতেছে—মির্জাপুরের দিক হইতে আসিতেছে। তাহাদের কাছে পৌঁছিতে আর বড় দেরী নাই। নগেন ফিরিয়া দেখিল, একটু দূরেই সুরেনবাবু ও দামোদর চলিয়াছে। তাহারা রাস্তা উত্তীর্ণ হইতেছে। শচীন বলিয়া উঠিল, "ঐ যা! দেখ্‌তে পেয়েছে!" সত্যই নগেন দেখিল, নিতাই ঘোষ দীর্ঘ পা' ফেলিয়া প্রায় ছুটিয়াই দামোদর ও সুরেনবাবুকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। ফুটপথ হইতে নীচে নামিয়াছে। সে চাৎকার করিয়া বলিল, 'দামোদরবাবু, পালান। শ্বশুরমশায় ধর্লে!"

দামোদর শুনিতে পাইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল নিতাই ঘোষ। সুরেনবাবুও পিছনে চাহিয়া দেখিলেন। দামোদর আর কথার অপেক্ষা করিল না। ছুটিয়া সাম্‌নের বাজারের ভিতর ঢুকিয়া পিছনে বৈঠকখানা রোডের ভিতর দিয়া একেবারে স্কট্‌ লেন ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত দ্রুতপদে পার হইল। ইহার ভিতর সে পিছন ফিরিয়া আর চাহিল না। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে সে একটা বাড়ীর বাহিরের রোয়াকে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। বাঘের মুখে পড়িলেও লোকে এমন পলাইতে পারে না।

ভাবিল, ভাগ্যে চোর ভাবিয়া পিছনে লোকে তাড়া করে নাই। এখন নিতান্ত ঠিক দুপুর বলিয়াই সে এত সহজে পলাইতে পারিয়াছে। কিন্তু, না, আর কলিকাতায় থাকা নহে। শচীন রমেশ নগেন যতই বলুক—ও কিছুতেই আর থাকা চলিবে না। সে আজই কলিকাতা ত্যাগ করিবে। নিতান্তই যদি থাকিতে হয়, ছদ্মবেশ লইবে। কি ছদ্মবেশ লইবে? বাঙালী থাকিবে না; বেহারী হইবে, না প্রয়াগী হইবে, না পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, সিন্ধি, গুজরাটি, পার্শী এই রকম কিছু সাজিবে। যা' হয় একটা সাজিবে। পার্শীই সাজিবে। তাহা হইলে চট্‌ করিয়া বুঝা যাইবে না। তবে মুস্কিল এই যে সে পার্শী ভাষা জানে না। ইংরাজিতেই চালাইবে। ইংরাজি ত' বলিতে পারে। তবে আর কি?

কিন্তু উপস্থিত কোথায় সে যাইবে? সকাল হইতে নানা উৎপাতে ছুটাছুটি করিয়া তাহার ক্ষুধাও বিলক্ষণ পাইয়াছিল। সে একটু সুস্থির হইলে, উঠিয়া বহুবাজারের মোড়ে একটা খাবারের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পকেটে হাত দিয়া দেখিল, পয়সা ছ'-আনা আছে কি না। দেখিল আছে। সে দোকান হইতে তিন আনার কচুরি ও এক আনার আলুর দম কিনিয়া দোকানের ভিতর বসিয়াই খাইল। তার পর প্রাণ ভরিয়া জল পান করিল। খাইয়া তাহার শরীর সুস্থ হইল; মন একটু সবল হইল।

সে দোকান হইতে বাহির হইয়া বহুবাজার ধরিয়া চিৎপুর রোডে পড়িল; চিৎপুরে পড়িয়া সে উত্তরে চলিল। ক্রমশঃ তাহার মনে হইল, সে যদি এখন এই সময়ে নারাণ বাবুর বাড়ী যায় ত' কি হয়? কাল সন্ধ্যাতে তাহার ভয় হইয়াছিল; আজ দিনের বেলায় ভয়ের কি আর থাকিতে পারে? দিনে সে সব দেখিতে পাইবে। আর যদি সুবিধা বুঝে, তবে মানদাকে বলিয়া তাহাদের বাড়ী দু'-চার দিন লুকাইয়া থাকিবে। সেই নীচের ঘরে—যেখানে সে বসিয়াছিল—সেইখানেই থাকিবে। উপরে উঠিবে না। সেখানে নিতাই ঘোষের ভয় নাই। এই চিন্তা করিয়া দামোদর রতনচাঁদ গার্ডেন লেনে চলিল। যদিও বেলা তখন মোটে দুইটা, তবু সে ভাবিল, এই ঠিক্ সময়। এখন গেলে সব বুঝা যাইবে, বলা যাইবে। সন্ধ্যেবেলায় কেমন ভয় করে। যদি সে ভকতরামের ঠিকানাটা নারাণবাবুর কাছে জানিয়া লইত, তবে সেখানে খোঁজ করিতে পারিত। তা'র ছদ্মবেশ লওয়ার এই একটা মস্ত আপত্তি। ছদ্মবেশে যদি নারাণবাবু কি মানদা তাহাকে চিনিতে না পারে! আর যদি সন্দেহ করে! ছদ্মবেশ করিলেই নারাণবাবুকে জানাইতে হইবে যে কেন তাহা করিয়াছে। সে বড় গণ্ডগোল হইবে। তাহা হইলে কি নারাণবাবু আর তাহার সহিত মানদার বিবাহ দিবেন? কখনও নহে। না; আগে নারাণবাবুর সহিত পাকা কথা কহিয়া কি নিতান্তপক্ষে মানদার সহিত বুঝা-পড়া করিয়া তবে সুরেনবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

নারাণবাবুর বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছিয়া কিন্তু দামোদর চারি দিকের নীরবতা দেখিয়া একটু ভীত হইল। দরজার শিকল নাড়িবে কি না ইতস্ততঃ করিল। কি করিয়া সে মানদাকে কালকের ব্যবহারের পর মুখ দেখাইবে? মানদাকে ফেলিয়া সে পলাইয়াছিল, তাহার মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা হইল। তাহার রাধারাণীর কথা মনে হইল, 'সে বড় ভীতু'। রাধারাণী তাই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল; মানদাও যদি করে? তবে? মানদাকে সে বুঝিতে পারে নাই। তবু মানদাকে সে রকম মনে হয় না। মানদার ভিতর অন্য রকম কিছু প্রকৃতি আছে। সে রাধারাণীর চেয়ে ঢের সুন্দরী। দেখিবার মত রূপ বটে! তবে কেমন যেন!

সে শিকল ধরিয়া নাড়িল। আবার পাঁচ-সাত মিনিট অপেক্ষা করিয়া আবার নাড়িল। কোনও সাড়া-শব্দ নাই। সে বিস্মিত হইয়া তৃতীয়বারও খুব জোরে শিকল নাড়িল। কিন্তু কোনও উত্তর পাইল না। প্রায় দশ-পনর মিনিট অপেক্ষা করিল। ১২ নম্বর বাড়ীর দরজার কাছে গিয়া কাণ পাতিয়া শুনিল,—কোনও শব্দ কোথাও নাই। ভাবিল, নিশ্চয়ই সব ঘুমাইতেছে। বেলা ২॥০টা ৩টাতে সবাই আহারাদির পর ঘুমায়। এটা বড়ই অসময়। সে আবার ফিরিয়া আসিয়া শিকল নাড়িল। কিন্তু কোনও সাড়া পাইল না। আরও দশ-বার মিনিট দাঁড়াইয়া দেখিয়া সে নিরাশ হইয়া প্রস্থানোদ্যম করিতেছে, এমন সময়ে দরজা খুলিয়া গেল। দামোদর ফিরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"ভাঙ্গা বাড়ীতে এত আরাম"

রৌদ্র হইতে অন্ধকার বাড়ীর ভিতর পৌঁছিয়াই দামোদরের ভারী তৃপ্তি হইল। সে মানদার দিকে তাকাইয়া দেখিল, মানদাও তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। সে বলিল, "মানদা, দরজা বন্ধ করে দিই?"

মানদা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। দামোদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "তোমার বাবা আসে নি?"

মানদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "না।"

দামোদর বলিল, "আমাকে নীচের ঘরটা একবার খুলে দাও। আমি একটু শোব। তা'র পর তোমাকে সব কথা খুলে বল্‌ছি। তোমার মা কোথায়?"

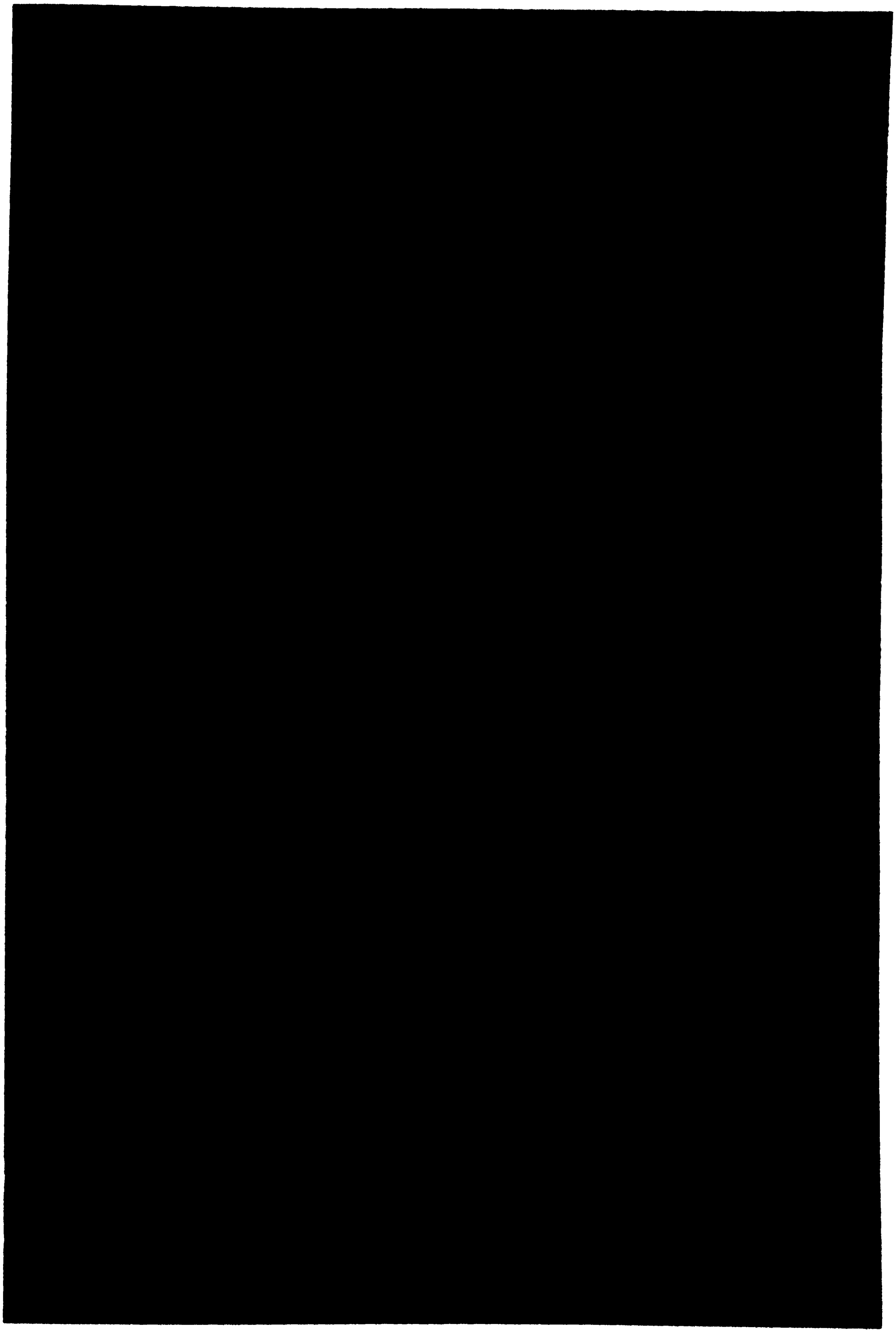
মানদা কোনও উত্তর না দিয়া অগ্রসর হইয়া ভিতরে গেল; উঠানের উপর সেই ঘরের শিকল খুলিয়া দিল। দামোদর তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া ঘরের দরজা ঠেলিয়া দরজা ফাঁক করিয়া বলিল, "তোমার মা কোথায়?

মানদা উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইল উপরে।

দামোদর প্রশ্ন করিল, "আমার সঙ্গে দেখা হবে?"

মানদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "না, দেখা হইবে না।"

দামোদরের এইবার কথা ফুরাইয়া গেল। সে এইবার একটু মুস্কিলে ও লজ্জায় পড়িল। এ রকম আসা ঠিক হয় নাই। পরক্ষণেই মনে পড়িল, মানদার সহিত তাহার



ভবিষ্যতের স্বপ্ন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

বিবাহ ত' হইবেই, তখন আর লজ্জা বা সঙ্কোচ কিসের। মানদার সহিত বরং বুঝা-পড়া করিয়া লইবে। সে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "মানদা, তুমি কথা কইছ না কেন? ছুটো' কথা বল না। বাড়িতে আর কে আছে?"

মানদা উত্তর করিল, "কেউ নেই। শুধু মা। মা'র অসুখ। পক্ষাঘাত, উঠ্‌তে পারে না।"

দামোদরের মনে পড়িল যে হয় ত' কালকের সেই কাতরাণি তাহার মায়েরই; কিন্তু লজ্জায় সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অন্য কথা পাড়িয়া বলিল, "তোমার বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে, শুনেছ?"

মানদা উত্তর করিল, "শুনেছি।"

"তোমার আমাকে পছন্দ হয়? তুমি আমাকে বিয়ে কোরতে ইচ্ছে কর? আমাকে ভালবাস্‌তে পারবে?"

মানদা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। কোনও উত্তর করিল না।

দামোদর ভাবিল, বোধ হয় লজ্জাতে মানদা কোনও কথা বলিতেছে না। তাহার মন ভারী খুসী হইল। এ রকম লজ্জা সে কখনও রাধারাণীর দেখে নাই। রাধারাণীর খুব কথা ছিল; কোনও দিন দামোদরকে সে সমীহ করে নাই।

দামোদর তক্তপোষের উপর—খালি তক্তপোষের উপর শুইল। মানদা দেখিয়া বলিল, "দাঁড়াও! সতরঞ্চি এনে দি।"

সে সতরঞ্চি আনিতে গেল। দামোদর চক্ষু মুদিয়া শুইয়া অত্যন্ত আরাম অনুভব করিল। ভাবিল, এই ভাঙ্গা বাড়িতে এত আরাম। কলিকাতার এত রাস্তা, এত সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে এ-রকম আরাম মিলে না কেন?

মানদা একখানি সতরঞ্চি, জীর্ণ ও পুরাতন, আনিয়া তাহাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিল। দামোদর উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল; মানদা তাহা তক্তপোষের উপর বিছাইয়া পাতিয়া দিল। তার পর আবার দরজার কাছে বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

দামোদর তক্তপোষের উপর বসিয়া বলিল, "মানদা, আমি বড় বিপদে পড়ে এসেছি। যেখানে আমি ছিলুম, কোনও কারণে আর সেখানে থাকার উপায় নেই, কল্‌কাতার আর কোথায়ও থাক্‌বার আমার জায়গা নেই, কাউকে চিনি না। পয়সাও নেই। তোমার বাবা থাক্‌লে ভাব্‌তুম না। যা' হয় ব্যবস্থা করে দিত। কিন্তু এখন কি করি। এখানে থাকা কি সুবিধা হবে? আমার আর কোথায়ও জায়গা নেই।"

দামোদর অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে কথা বলিল। সে নিজেই আশ্চর্য্য হইল, তাহার এত ভাল করিয়া সোজা ও অবাধে কথা কহার শক্তি কি করিয়া কোথা হইতে আসিল!

মানদা শুনিয়া বলিল, "বাবা রাগ কর্ব্বে।"

দামোদর কহিল, "রাগ কর্ব্বে কেন? আমি থাক্‌লে রাগ কোর্‌বে না। আমাকে ত' এসে থাক্‌তেই বলেছে।"

মানদা পুনশ্চ জানাইল, "বাবা রাগ কর্ব্বে।"

দামোদর হাসিয়া বলিল, "না, মানদা, রাগ কর্ব্বে না। আমি এমনি আলাদা বাইরে এইখানে থাক্‌বো। তোমার সঙ্গে না হয় দেখা-শোনাও করবো না। বাইরে বাইরেই দিনের বেলায় থাক্‌বো। রাতে শুধু শোব, আর খেতে দাও ত' খাবো।"

মানদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বাবা রাগ করবে। বাবা এলে এসো।"

দামোদর ভাবিয়া দেখিল কথাটা ঠিক। কিন্তু সে উপস্থিত কোথায় যায়। এ বাড়ী শুধু নিরাপদ আশ্রয় নয়, একমাত্র আশ্রয়; তা' ছাড়া, এখানে থাকিলে মানদাকে সময় সময় দেখিতে পাইবেই। তাহার মানদাকে ভারি ভাল লাগিতেছিল। মানদা কথা যখন বলে কোন রকম কৃত্রিমতা দেখায় না; ইহা খুব ভাল। রাধারাণীর মত উহার অন্তর-বাহির বিভিন্ন নহে। বেশ সরল প্রকৃতি।

দামোদর একটু ভাবিয়া বলিল, "মানদা, তুমি যাও না, আমি থাকি না?"

মানদা চুপ করিয়া রহিল। দামোদর ভাবিল, উহার ইচ্ছা আছে আমি থাকি শুধু নারাণবাবুর ভয়েই ও সম্মত হইতে পারিতেছেনা। কহিল, "তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছ, মানদা। তোমার বাবা রাগ কর্ব্বে না। বরং খুসী হবে। তা' না' হলে আর আমার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয়েছে। আর বিয়ের কথা এক রকম পাকাই। আমি ঠিক করে ফেলিছি, তোমাকে বিয়ে কোরবই।"

মানদা সমানভাবে বলিল, "বাবা এলে এসো।"

দামোদরের অভিমান হইল; কহিল, "তবে আমাকে

এনে বসালে কেন? সোজা বিদেয় করে দিলেই ত' পারতে!"

মানদা উত্তর করিল না। বাহিরে নামিয়া কাণ খাড়া করিয়া কি যেন শুনিল; তারপর আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া দরজার উপর বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দামোদর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। সে কি বলিবে ও কি করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে, শান্ত করিবে, ভাবিয়া পাইল না। অথচ তাহার অনুমান হইল যে তাহারই কথাতে মানদার মনে আঘাত লাগিয়াছে, তাই সে কাঁদিল। এই অনুমানে তাহার মনের ভিতরও একটু সরস ভাবের উদয় হইল। মানদা পাঁচ-সাত মিনিট কাঁদিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চোখ মুছিয়া লইল। তার' পর বলিল, "বাবা এলে এসো। এখন নয়।"

দামোদর তখন অনুতপ্ত হইয়াছে। উত্তর করিল, "তাই আস্‌বো। তুমি কেঁদ না। তোমার বাবা কবে আস্‌বে?"

মানদা জানাইল, ২।৩ দিনে আস্‌বে। এ-রকম মাঝে মাঝে হঠাৎ কোথায় যায়। আবার আসে। সে জানে না।

দামোদর বলিল, "আচ্ছা, আমি রোজ এসে খোঁজ নেব। রোজ এই সময়ই আস্‌বো। তুমি একটু হুঁস্ রেখো। আজ প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলুম। তার' পর তোমার বাবা এলে কথা হবে। সব ঠিক হবে। এই মাসেই বিয়ে হয়ে যাবে, কি বল? বেশী দেরী করে লাভ কি?"

মানদা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

দামোদর উঠিল। বলিল, "বড় আরাম হচ্ছিল, মানদা, শুয়ে। এ বাড়ীতে তুমি আছ বলে এর শ্রী হয়ে গেছে।" তার' পর জুতা পায়ে দিতে দিতে বলিল, "আচ্ছা, তোমার বাবা কোথায় কাজ করে জান? ভকতরাম বলে মাড়োয়ারি কোথায় থাকে জান?"

মানদা চমকিয়া উঠিল। এক দৃষ্টিতে দামোদরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না।"

দামোদর কহিল, "জান্‌লে ভাল হোত। তার সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তুম।"

মানদা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

দামোদর বলিল, "সে তোমার বাবা'র খবর ঠিক বল্‌তে পারত।"

মানদা অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া বলিল, "না, না। তা'র সঙ্গে দেখা কর্ত্তে যেও না, যেও না।"

দামোদর তাহার ভাবান্তর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তা'কে চেন না কি?"

মানদা উত্তর দিল না। দামোদর তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। বাহির হইতে যাইবার সময় দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া তাহার মন আবার বিকল হইল, বিষণ্ণ হইল। সে এই মনের পরিবর্ত্তন স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। তাহার মনে নিতাই ঘোষের ভয় প্রবল হইয়া উঠিল। লক্ষ্য-হীন হইয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া সুরেনবাবুর দোকানে চলিল। কি আশ্চর্য্য! এত বড় কলিকাতা, কিন্তু তাহার কাছে কত ছোট! তাহার ইহাতে স্থান নাই। পকেটে হাত দিয়া দুই আনা পয়সা হাতে ঠেকিল। দুই আনায় কি হইবে? কিছুই না। রাত্রেই বা কি করিবে? কোথায় থাকিবে? মেসে ত যাওয়া ঘটিবেই না। দেখাই যাক্ কি পরামর্শ হয়।

সুরেনবাবুর দোকানের সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখিল, দোকানে খুব ভিড়—অনেকগুলি ছেলে চা খাইতে বসিয়াছে; বেঞ্চ ভরিয়া গিয়াছে; খুব হট্টগোল হইতেছে। দু' তিন জন দাঁড়াইয়াই আছে; একজন বাহিরে সুরেনবাবুর লোহার চেয়ারে বসিয়াছে। সুরেনবাবু ব্যস্ত হইয়া চা দিতেছেন; নানা রকম ফরমাইস শুনিতেছেন; কোন দিকে লক্ষ্য করিবার অবসরই পাইতেছেন না। দামোদর ভিতরে লক্ষ্য করিয়া শচীনকে দেখিল। সে খুব কথা বলিতেছে। দামোদর বাহিরেই কিছু কাল দাঁড়াইয়া রহিল। এখন ভিতরে যাওয়া চলে না। সুরেনবাবু অকারণ অনর্থক উদ্‌ব্যস্ত হইবেন। কিন্তু তাহার সাহায্যে সুরেনবাবুর পুরাতন ব্যস্ততা ও প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিয়াছে ভাবিয়া সে মনে মনে তৃপ্তি ও একটু গর্ব্ব অনুভব করিল।

সুরেনবাবু বাহিরে গরম জল লইতে আসিয়া দামোদরকে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, "ভিতরে আসুন।"

দামোদর আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "ভিতরে দরকার নেই, এইখানেই আছি আমি।"

সুরেনবাবু হাস্যমুখে বলিলেন, "আজ তিনটা থেকে চলেছে; দোকানে এসে দেখি—শচীনবাবু দল-বল নিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। তার পর ব্যাচের পর ব্যাচ্ আস্‌ছে। উনি বসে সব সভা জমাচ্ছেন। আমার উপর অত্যন্ত দয়া। ভগবান্ আপনাদের মঙ্গলই করবেন, দামোদর বাবু!"

দামোদরের চোখে জল আসিল। সুরেনবাবুরও চোখে জল আসিল। সুরেনবাবু তাড়াতাড়ি গরম জল লইয়া ভিতরে গেলেন, শচীন উঠিয়া বাহিরে আসিল। দামোদরকে ডাকিয়া একান্তে লইয়া গিয়া বলিল, "দামোদর-বাবু, কোথায় ছিলেন?"

দামোদর উত্তর দিল, "রাস্তায়। আর কোথায় যাব?" শচীন জিজ্ঞাসা করিল "খাওয়া হয়েছে?"

দামোদর বলিল, "ছ আনা ছিল; চার আনা খেয়েছি। দু আনা এখনো আছে। আর সব কোথায়? রমেশবাবু ও নগেনবাবু?"

শচীন উত্তর করিল, "তা'রা বাসাতেই আছে। আমি কলেজে বেরিয়েছিলুম, খাওয়া দাওয়া করে। আপনার জন্যে সকলেরই মনটা উদ্বিগ্ন রয়েছে। লোকটা 'হাঁ' ক'রে মেসের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে কড়া নজর। ও জানে আপনার আর অন্য-জায়গাও নেই। বড় বেয়াড়া লোক!"

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল, "নিতাই ঘোষ বড় সোজা লোক নয়। ও কা'কেও ভয় খায় না; পুলিসকেও না। ডাকাতি করে। খুন জখম ওর ভাত ডাল।"

ছেলের দল চা' খাইয়া বাহিরে আসিল। শচীনকে একজন বলিল, "চল্‌লুম রে, শচী। এইখানেই এবার থেকে চা' খাবো ও খাওয়াতে নিয়ে আস্‌বো। বেশ ভদ্রলোক! তবে জায়গা বড় কম।"

শচীন উত্তর দিল, "পয়সা হলেই জায়গা বাড়্‌বে। তো'রা দিন কতক এসে দেখ্। সব বন্দোবস্ত হবে।"

ছেলের দল চলিয়া গেলে, শচীন ও দামোদর ভিতরে আসিয়া বসিল। সুরেনবাবু চা-এর বাসন পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। দামোদর বলিল, "বেলা ত ৫টা হো'ল বোধ করি। কি ব্যবস্থা হবে তা' ত বুঝ্‌ছি না।"

শচীন কহিল, "দামোদরবাবু! আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আপনার এ-সব বদ্‌লান যাক্। সুরেনবাবু! কৈ, আপনি ঠিকানাটা বলুন ত সেই পেণ্টারের। চিৎপুরে? চিৎপুরের কোথায়? শোভাবাজারের কাছে? আচ্ছা। এখান থেকে ট্রামে গিয়ে, চিৎপুরের মোড়ে বদল কর্লেই হবে। চলুন দামোদরবাবু। আর দেরী করা নয়। সব ব্যবস্থা করেছি আমি।"

দামোদর অবাক হইল। বলিল, "সে কি? রমেশবাবু, ও নগেনবাবু আসুন। তবে 'ত মীমাংসা হবে।"

শচীন হাসিল। সুরেনবাবু, চা-এর বাসন আনিয়া টেব্‌লের উপর রাখিয়া মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "দামোদর-বাবু, আমরা দু'জনেই ঠিক করেছি। ঐ মেস থেকে নগেনবাবু ও রমেশবাবুর এখানে আসা ঠিক হবে না। আপনার শ্বশুর মশাইও পিছনে পিছনে এসে হাজির হবেন—বুঝেছেন? তখন এ আড্ডাও আপনার যাবে। এই বেলা যান্। শচীনবাবু ঠিক বল্‌ছেন।"

দামোদর ভাবিয়া দেখিল কথা যুক্তিযুক্ত। রমেশ ও নগেনের পিছু লইয়া নিতাই ঘোষের আসাটা কিছুই বিচিত্র নহে। আর এ আড্ডা ভাঙিলে সে যাইবে কোথায়? সে সম্মত হইল। ইহা ছাড়া তাহার উপায় নাই। শচীন তাহাকে লইয়া ট্রামে উঠিল। বালাখানার মোড়ে ট্রাম বদল করিয়া—শোভাবাজারের দিকে চলিল। সেখানে অনেক অনুসন্ধান করিয়া, সে একজন রঙ্-কারের খোঁজ পাইল। তাহাকে সমস্ত কথা না ভাঙিয়া বলিল যে, থিয়েটার, সখের থিয়েটার হবে। এই ভদ্রলোককে একটু রঙাইয়া দিতে হইবে।

রঙ্-কারের নাম নবীন কর্ম্মকার। নবীন হাসিয়া বলিল, "তা' দিচ্ছি। পাকা না কাঁচা?"

শচীন উত্তর দিল, "পাকাই দাও। যে গরম! কাঁচা চটে যাবে।"

নবীন বলিল, "পাকা কি আপনারা উঠাতে পার্বেন? সে উঠান বড় শক্ত।"

শচীন বলিল, "কি ক'রে উঠাতে হয় তুমি দেখিয়ে বলে দিয়ো। আর কি কি রঙ দাও, তা'ও বলো।"

নবীন বলিল, "আমার বিদ্যে মার্‌বেন, বাবু?"

শচীন উত্তর দিল, "না হে না। তোমার বিদ্যে মেরে

আমার কোটা-বালাখানা হবে না। তোমার বিদ্যে তোমারই থাক্‌বে। এখন খপ্‌ করে তুমি একে ঠিক করে দাও। যেন চেনা যায় না কিছুতেই। চেনা গেলে পয়সা দেব না।"

দামোদর বলিল, "পার্শী—বম্বেওয়ালা বানিয়ে দাও। বুঝেছ?"

নবীন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "ঠিক বানিয়ে দেব। রামতারণ অপেরা পার্টি—গরাণহাটায়—তা'র পেণ্টার আমিই। আপনি বসুন না। আমার হাতে আপনার সব বদ্‌লে যাবে। দিনের বেলাতেও কেউ বুঝ্‌তে পার্ব্বে না যে রঙ্‌-করা।"

শচীন বলিল, "আচ্ছা, তুমি পেণ্ট্‌ কর; আমি আস্‌ছি।"

সে বাহির হইয়া গিয়া আধ ঘণ্টা বাদে এক লম্বা পার্শী কোট্‌, চুড়িদার পাজামা ও একটা পার্শী টুপি কিনিয়া আনিল। ততক্ষণে দামোদরের সাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। নবীনের হাতের বাহাদুরি ছিল। সে দামোদরের চেহারা বদ্‌লাইয়া দিয়াছিল। তাহার রঙ্‌ সাদা; চুল কটা; কপালে কুঞ্চন। শচীনের আনীত পোষাক পরিয়া তাহাকে চেনে কাহার সাধ্য! শচীন মহা আনন্দিত হইল। নবীনকে বলিল, "নবীন, তোমার কারিগরি আছে। এবার যখন আমাদের কোথাও থিয়েটার হবে, নিশ্চয়ই তোমাকে বায়না করবো। এ যা' হয়েছে, তা'র মার নেই।"

প্রায় সাতটা নাগাদ শচীন ও দামোদর যখন সুরেনবাবুর দোকানের কাছে পৌঁছিল, তখন রমেশ ও নগেন বসিয়া চা' খাইতেছিল। শচীন বলিল, "দামোদরবাবু, সাবধানের মার নেই, আমি আগে যাই। দেখি নিতাই ঘোষও আছে কি না।"

দামোদর রাস্তার একান্তে দাঁড়াইল। শচীন দেখিয়া আসিয়া বলিল, "না। দেখ্‌লুম না। আসুন, আমি আগে যাই। আপনি পিছনে একটু পরে আসুন। দেখি নগেন ও রমেশ চেনে কি না।"

শচীন আগে প্রবেশ করিতেই নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "দামোদরবাবু? তা'কে কোথায় রেখে এলি আবার?"

শচীন বুঝিল সুরেনবাবুর কাছে ইহারা সংবাদ পাইয়াছে। বলিল, "সে আস্‌ছে।"

একটু পরে যখন দামোদর আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন সকলের একেবারে বিস্ময়ের সীমা রহিলনা। কে বলিবে, এই লোক পালঘাটির দামোদর দত্ত? নগেন বলিয়া উঠিল, "এইবার ঠিক্‌ হয়েছে। খুব বেশী অসুবিধা হচ্ছে কি?"

দামোদর উত্তর করিল, "হচ্ছে না কেমন করে বলি। এ রকম করে চল্‌বে কি ক'রে? তবে উপায়ান্তর নেই।"

শচীন বলিল, "চল্‌বে না কেন? এ' ত বেশ্‌। আপনি সবাইকে চিন্‌তে পার্‌বেন, আপনাকে কেউ চিন্‌তে পার্‌বে না। আজই রাতে পরখ হবে। চলুন মেসে ফিরি। তা' হলেই বুঝা যাবে।"

সুরেনবাবুও মত দিলেন, "ভয়টা তাড়িয়েই আসুন। মনের অস্বস্তি কেটে যাবে। নিতাই ঘোষের সঙ্গে কথা বলে আসুন।"

নগেন উত্তেজিত হইল। বলিল, "ঠিক, চলুন। আপনার নাম আমরা দাদাভাই করিমভাই দেব, বুঝ্‌লেন।"

রমেশ বলিল, "তো'রা যা'। আমি পিছনে যাবো না।"

নগেন ও শচীন দামোদরকে লইয়া চলিল। সার্কুলার রোড দিয়া আসিয়া মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট পড়িয়া কিছু দূরেই মেস। মির্জ্জাপুরে আসিয়া শচীন ও নগেন বলিল, আমরা এগুই। যদি নিতাই ঘোষ থাকে ভালই। আপনি সোজা গিয়ে তা'কে জিজ্ঞাসা কর্বেন, মেস কোথায়? কোন্‌ বাড়ীতে। প্রথমে ইংরাজিতে, পরে হিন্দীতে। তা' হলেই বুঝা যাবে চিন্‌তে পেরেছে কি না।" দু'জনে অগ্রসর হইয়া দেখিল, নিতাই ঘোষ সাম্‌নের পাণের দোকানে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। দু'জনে অত্যন্ত উল্লসিত হইল। তাহারাও পাণের দোকানে গিয়া নিতাই ঘোষের পাশে দাঁড়াইয়া পান কিনিতে লাগিল। নগেন একটা সিগারেট লইয়া ধরাইল। নিতাই ঘোষ অচপল দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহাদের দেখিতে লাগিল।

দামোদর দূর হইতে নিতাই ঘোষকে দেখিয়াই কেমন শঙ্কিত হইল। তাহার বুক দুর্‌ দুর্‌ করিয়া উঠিল। নিজের দিকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। চিনিবার ত কোনও উপায় নাই, শুধু কথাটার একটু সুর বদ্‌লাইতে এখন পারিলে হয়! সে এদিক-ওদিক তাকাইয়া পাণের দোকানের দিকে চলিল। পা' তাহার ভারি হইয়া উঠিল। ঘাম ছুটিতে লাগিল। শুধু নগেন ও শচীনের খাতিরে সে অতি কষ্টে চলিল। পাণের দোকানের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া সকলকেই উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

ইংরাজিতে, এখানে মেস্ কোথায়? তার পর হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, "ইটার মেস্ কাঁহা আছে?" নিতাই ঘোষ একটু দূরে সরিয়া গেল। নগেন সিগারেট মুখে, আঙুল দিয়া মেস-বাড়ী দেখাইয়া বলিল, "উটার আছে। হাম্‌রা সাথ্ এসো।" শচীন অনেক কষ্টে হাসি চাপিল।

নগেন ও শচীন দামোদরকে সঙ্গে লইয়া মেসবাড়ীতে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শচীন চাহিয়া দেখিল, নিতাই ঘোষও তাহাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। সে দামোদরকে সে কথা বলিল না। কে জানে যদি সে ভয় পাইয়া সব মাটি করে। এ তামাসা মন্দ জমিতেছে না। তাহাদের একঘেয়ে জীবনে এমন আনন্দের সুযোগ বড় আসে নাই; তাই সে মজা করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া দামোদরকে লইয়া এক কাণ্ড করিল। কিন্তু নিতাই ঘোষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে অশুভ কল্পনা করিল। ঐ লোকটার চাহনির ভিতর যেন বিভীষিকা আছে। সে ভাল করিল কি মন্দ করিল, বুঝিতে পারিল না।

কিন্তু যৌবনসুলভ তারল্য হেতু সে মন হইতে সমস্ত দুর্ভাবনা দূর করিয়া দিল। দেখাই যাক্ না। আপাততঃ তাহাদের ত কোনও ভয়ের কারণ নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

"ছাই দিয়া আগুন চাপা যায় না"

নিজেদের ঘরে গিয়া শচীন ও নগেন হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। দামোদর কেমন অত্যন্ত অস্বস্ত চিত্তে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার উদ্বেগ যায় নাই। নিতাই ঘোষ তাহাকে চিনিতে পারিল কি পারিল না, তাহাও বুঝিতে পারিল না। তা' ছাড়া এইরূপে সে যে কি করিয়া মানদার কাছে যাইবে, তাহাই তাহার প্রধান দুর্ভাবনার কারণ হইল। সে নিতান্ত অপ্রসন্ন মুখে বসিয়া রহিল।

শচীনের হাসির দমক্ অতীত হইলে, সে বলিল, "সাহেব, টুপি খোল।" বলিয়াই আবার হাসিল।

নগেন ধমক্ দিল, "শচী, হাসিস্ নি বল্‌ছি। বরং দরজা খুলে দেখ, নিতাই ঘোষ এসেছে কি না পিছু পিছু।"

শচীন দরজা খুলিয়া বারান্দা ও নীচেকার তলা দেখিয়া লইয়া আসিয়া বলিল, "না। সে কিছুতেই চিন্‌তে পারে নি। আমি বাজি রাখ্‌তে পারি। এ চেনা কা'রও সাধ্য নেই। একদম নিরাপদ।"

নগেন তাহার বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, "যাক্! এখন একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। উঃ! শ্বশুর না ত', জোঁক, গোসাপ, তক্ষক,—মেঘ না ডাক্‌লে ছাড়ে না। এ রকম শ্বশুর হ'লেই ত গেছি। শ্বশুর যদি এমন হয়, শ্বশুর-কন্যাকে ত আন্দাজই করে নেওয়া যায়। Higher dilution, কড়া পাক্! দুধ মরে ক্ষীর!"

শচীন দামোদরকে বিরস দেখিয়া তাহার সামনে নগেনের আয়না খানা ধরিয়া বলিল, "এই মুখ দেখ, সাহেব। ভয় ছুটে যাবে। এত দুর্ভাবনা কিসের? সব অভ্যাস হয়ে যাবে।"

দামোদর মুখ অবশ্য আগেই নবীনের কারখানাতে দেখিয়াছিল। আবার একবার দেখিল। নাঃ! মন্দ মানায় নাই! সত্যই ত তাহার শ্রী বাড়িয়াছে; রঙ্ একেবারে সাহেবদের মত; বিশেষ যে তৈল-চিক্কন তাহাও নহে। রাত্রে ত কিছুই ধরা যায় না। টুপীও মানাইয়াছে বেশ। তাহার গোঁফ ছোটই ছিল; তবু তাহা কামাইয়া মুখের ধরণ একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। মানদা তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইবে না। কিন্তু—

দামোদর আর ভাবিল না। ইচ্ছা করিয়াই চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিল। সে আয়নাখানি শচীনকে ফিরাইয়া দিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল।

নগেন বলিল, "কি, পছন্দ হয়েছে?" তার' পর শচীনকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "শচী, কত টাকা লাগ্‌লো?"

শচীন হিসাব করিয়া বলিল, "৩৫৲ টাকা।"

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় পেলি?"

শচীন বলিল, "কলেজে ধার করেছি। ৫৲, ৭৲, ১০৲, এই কোরে।"

দামোদর কহিল, "আপনাদের মিথ্যা এত উৎপীড়ন কল্লুম, শচীনবাবু। অকারণ আপনাদের উদ্ব্যস্ত কল্লুম ও অর্থব্যয় ঘটালুম। তবু আপনাদের ঋণ আর পরিশোধ কর্ত্তে জীবনে পার্‌বো না। কিন্তু এটা কি কোন কাজের হো'ল?"

শচীন ধমক্ দিল, "বেশী চালাকি কর্বেন আর বক্তৃতা করেন যদি নিতাই ঘোষ নীচে আছে। ডেকে দেব।"

রমেশ আসিয়া দরজায় টোকা দিল। নগেন উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। রমেশ একবার ঘরের ভিতর দেখিয়া লইয়া নিজের বিছানায় বসিতে গিয়া বলিল, "শচী, তোরা যে অনন্তশয্যা পেতেছিস্, এ আর জীবনে উঠ্‌বে না? কত ময়লা, কত ধূলা দেখ্ দেখি!"

নগেন জবাব দিল, "অত নবাবী কিসের শুনি? ধূলোতে আর শোয়া যায় না, না? তাই যাও রাতে আর কোথায়ও শুতে?"

রমেশ উত্তর না দিয়া নিজের বিছানা হাত দিয়া ঝাড়িয়া লইয়া বসিয়া বলিল, "দামোদরবাবু, নিতাই ঘোষ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আমি কথা কইতে গেলুম, কথা কইলে না।"

শচীন মন্তব্য করিল, "রেগে গেছে!"

রমেশ বলিল, "লোকটার ব্যবহার দেখ্‌লে রাগও হয়, আবার দুঃখও হয়। আপনার কি ফিরে যাওয়া একেবারে অসম্ভব? কোনমতেই যেতে পারেন না?"

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

রমেশ কহিল, "আমি অবশ্য জানি না। তাই আমার কোনও কথা বলা হয় ত অনুচিত। কিন্তু আপনি ঠিক জানেন যে এ ক্ষেত্রে আপনি কিছু বাড়াবাড়ি কর্‌ছেন না? কোনও কাল্পনিক ব্যাপারকে নিয়ে বড় ক'রে তুলে অনর্থ ঘটাচ্ছেন না?"

তাহার গাম্ভীর্য্য ও কথা বলার ধরণ দেখিয়া নগেন ও শচীন চুপ করিয়া রহিল। দামোদরও চিন্তিতভাবে যেন নিজের মনের ভিতর ইহার উত্তর খুঁজিতে লাগিল।

রমেশ বলিল, "অনেকটা ছেলেমানুষি করা গেছে। আর এগুবার পূর্ব্বে, বেশ করে বিবেচনা করা উচিত। তাই আমি ক'দিন এত করে ভাব্‌ছি। নগেন ও শচীন এত ভাব্‌তে পারে না। কিন্তু আমাকে ভাব্‌তে হয়। অবশ্য ওরা যা' কর্‌বে, আমাকে তা' কর্‌তেই হবে। কিন্তু তা'র আগে ওরা কি কর্‌বে না কোরবে একটু ভেবে দেখা চাই। আপনি বেশ করে বিবেচনা করে দেখুন, যে—আপনি ফিরে যেতে পারেন কি না। যদি পারেন, তবে গোলযোগ চুকে যায়। যদি না পারেন, তবে বলুন কেন পারেন না। তা'রপর আপনার কারণ শুনে, আমরা আপনার সাহায্য কোর্‌বো।"

ঘরের ভিতর সবাই নীরব হইয়া রহিল। দামোদর বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "না, যাওয়া হতে পারে না।"

রমেশ কহিল, "তাড়া নেই। আমরা খেয়ে আসি। আস্‌বার সময় আপনার খাবার আন্‌বো। আপনি আগাগোড়া সব ভেবে দেখুন। আমাদের বয়সে এমন হঠকারিতা করা, প্রবৃত্তির ঝোঁকে চলা স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও দেখা চাই, যখন তিন চার জন রয়েছি, তখন দেখা উচিত, যে যাই করি, যেন পরে অনুতাপ না কর্ত্তে হয়।"

রমেশ, নগেন ও শচীনকে লইয়া আহারের জন্য চলিয়া গেল। দামোদর বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রমেশের কথাই তাহার মনে অনেকবার উঠিয়াছিল; কিন্তু সে বিবেচনা করিয়াই দেখিয়াছে তাহার ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। শুধু যে তাহার নিজের বাড়ীতে শান্তির কোনও সম্ভাবনা নাই তাহা নহে; নিতাই ঘোষও হাতে পাইলে কি করিবে কে জানে? তাহার উপর পুলিশের ভয়। এক আকর্ষণ—আকর্ষণ যাহা ছিল—রাধারাণী। কিন্তু রাধারাণীতে তাহার আর মন নাই। রাধারাণী মানদার কাছে কিছুই নহে। সে আর রাধারাণীকে চাহে না। তবে কথা এই, রাধারাণী তাহার স্ত্রী! তা' মানুষে কি দুই সংসার করে না? ভবিষ্যতে যদি রাধারাণী আসিতে চাহে, নিতাই ঘোষ যদি মরে, তখন না হয় সে রাধারাণীকে লইয়া আসিবে। কিন্তু এখন নহে। এখন সে মানদাকে চাহে। সে পুরানো জীবনের উপর বিতৃষ্ণ হইয়াছে; আবার নূতন করিয়া সুরু করিবে।

রমেশ, শচীন ও নগেন ফিরিয়া আসিলে, সে তাহাদিগকে তাহার সমস্ত কারণ, শুধু মানদার কথা বাদ দিয়া, বলিল। শেষে কহিল, "আমার যাওয়ার কি আকর্ষণ থাকিতে পারে? আমার নিজের গৃহে শান্তি নাই, সুখ নাই; শ্বশুরের বাড়ীতে থাকা চলে না; স্ত্রী আমার উপর প্রীত নহে, আমিও আর নহি; তা' ছাড়া শ্বশুরালয়ে প্রতিদিনই পুলিশের ভয়। এই জীবন যাপন কর্ত্তে আমি কেন যাবো? আপনারা যেতে বলেন?"

রমেশ সমস্ত শুনিয়া বলিল, "আচ্ছা। তবে আপনার ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি। ঐ বেশে থাকা চলে না। আপনি এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাল সুরেনবাবুর দোকানে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হ'য়ে সকালে ১০৫ নং

পার্ক ষ্ট্রীটে যাবেন। আমি একখানা চিঠি দেব। আপনি খুল্‌বেন না বা পড়্‌বেন না। যা'র নামে চিঠি, গিয়ে তাঁ'কে দেবেন। সেইখানেই আপনার কাজ হবে। আপাতত তাই করুন; পরে অন্য ব্যবস্থা হবে। সেখানে আপনার শ্বশুর আর যেতে পার্ব্বে না, সন্ধানও পাবে না।"

শচীন ও নগেন বিস্ময়াভিভূত হইয়া রমেশের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কেহ কোনও কথা বলিল না। দামোদর তখনকার মত সম্মত হইল।

শচীন একটু পরে বলিল, "দামোদরবাবু, খেয়ে নিন। ভাত জুড়িয়ে গেল।"

নগেন অন্যমনস্ক হইয়া সিগারেটের পর সিগারেট পুড়াইতে লাগিল। রমেশও চিন্তিতভাবে শুইয়া রহিল। দামোদরের ক্ষুধা পাইয়াছিল। সে উঠিয়া আহার করিয়া, আহারের বাসন নামাইয়া এক কোণে রাখিয়া দিয়া হাত ধুইয়া বসিতে যাইতেছে, এমন সময়ে বাইরে চারুবাবু ডাকিলেন, "নগেন্, ওরে নগেন্। দরজাটা খোল।"

দামোদর চমকিত হইল; শচীন রমেশের মুখের দিকে চাহিল; নগেন ভিতর হইতেই উত্তর করিল, "কেন?"

চারুবাবু বলিলেন, "দরজাটা একবার খোল্। দরকার আছে।"

নগেন রমেশের মুখের দিকে চাহিল। রমেশ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই চারুবাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দামোদরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে? দামোদর?"

রমেশ বলিল, তাহাদের কলেজের একজন সহাধ্যায়ী।

চারুবাবু ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, "ঠিক্ করে বল্, রমেশ। সেই লোকটা এসে আমাকে আবার এত রাত্রে জ্বালাতন কোর্‌ছে। হত্যা দিয়ে পড়েছে।"

রমেশ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, "তা'কে উপরে পাঠিয়ে দিন। দেখে যাক্। দামোদর হয় নিয়ে যাবে।"

চারুবাবু আপন মনে বকিতে বকিতে চলিয়া গেলেন, "ভাল উৎপাত, শেষে কি পুলিশে খবর দিতে হবে না কি? না একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাতে হবে? এমন ত' কখনো দেখি নি, শুনি নি।" ইত্যাদি।

রমেশ দ্বারের সম্মুখে বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল। অবিলম্বে নিতাই ঘোষ আসিয়া বলিল, "সে কোথায়? দামোদর কোথায়?"

রমেশ কোন উত্তর না দিয়া তাহাকে ঘরের ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজে ঘরে পুনঃপ্রবেশ করিল। নিতাই ঘোষ আসিয়া চারি দিকে চাহিয়া দামোদরের মুখের উপর তীক্ষ্নদৃষ্টি স্থাপন করিল।

রমেশ বলিল, "ঐ দামোদর! নিয়ে যাও।"

নিতাই ঘোষের তীক্ষ্ন দৃষ্টি যেন একটু ঘোলাটে হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে? দামোদর?"

রমেশ বলিল, "হাঁ। তোমার মনে শান্তি নেই, তুমি কেবলই সন্দেহ করছো আমরা তা'কে লুকিয়ে রেখেছি। আমরা ত' বল্‌ছি ঐ দামোদর, নিয়ে যাও। দেখ্‌তে পাচ্ছ না?" সে দামোদরের কাছে গিয়া তাহার টুপী খুলিয়া বলিল, "এই যে চুল! এ চুল দেখে চেন না? এই যে রঙ্—এ রঙ্ দেখে চেন না? এই যে মুখ, চেন না? এই দামোদর! নিয়ে যাও। নিজের মেয়ের কাছে একে চালিয়ে দাও গে যাও, শীগ্‌গির নিয়ে যাও। আমাদের জ্বালিয়ো না আর! শেষে কি একটা রক্তারক্তি বাধাবে? আমরা আর সহ্য কর্ত্তে পারছি না।" রমেশ অগ্রসর হইয়া নিতাই ঘোষের মুখের কাছে হাত আগাইয়া দিয়া কঠিন কণ্ঠে বলিল, "বুঝ্‌তে পার? এটা তোমার পাড়াগাঁ নয়? তোমার এলাকা নয়? যা' ইচ্ছে তাই করবে! তোমাকে যতই রেহাই করি ততই তোমার বাড় হয়। কিন্তু সাবধান্! কুকুরের মত তোমায় মার্‌বো! বুঝেছ? কুকুরের মত! এ মেসে কি কোর্ত্তে ঢুকেছ?"

নিতাই ঘোষ এতক্ষণ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া একদৃষ্টে দামোদরের দিকেই চাহিয়া ছিল। কিন্তু শেষের কথা শুনিয়া সে চম্‌কাইয়া, সোজা হইয়া উঠিল। তাহার চোখ্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রমেশ বুঝিল ইহার কোথায় ঘা' লাগে। তাহাকে তাড়াইবার জন্যই সে বলিল, "তোমার ঘৃণা নেই, লজ্জা নেই; তুমি বেহায়া শীগ্‌গীর যাও। উঠে যাও, ঘর থেকে! এ ঘরের মধ্যে ঢুকেছ, এই যথেষ্ট! যাও!"

নিতাই ঘোষ দাঁত দিয়া ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিল। তার' পর আগাইয়া আসিয়া দামোদরের মুখের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল! দামোদর উঠিয়া সরিয়া গেল। নিতাই

ঘোষ তাহার হাত ধরিতে গেল, তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "ঐ দামোদর।"

দামোদরের ভিতর এতক্ষণ ভাবের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। সে হঠাৎ জোরে হাসিয়া উঠিল। একেবারে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে শচীন ও নগেনও উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহাদের হাস্যধ্বনিতে নিতাই ঘোষ থমকিয়া দাঁড়াইল। তা'র পর কি ভাবিয়া রোষ-কষায়িত চক্ষে সকলের দিকে চাহিয়া সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। রমেশ গিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার মনটা অব্যক্ত একটা গ্লানিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অকারণ একটা লোককে কতকগুলা কটু কথা বলা বড়ই গর্হিত কাজ হইয়াছে। অথচ উপায়ও কিছু ছিল না; তাহার ক্রোধের সীমা ছিল না।

শচীন ও নগেনের হাসি থামিল। দামোদরের হাসি শেষে অশ্রুতে পরিণত হইল। সে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল। তাহারও মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবৃত্তি পুনরায় বলবতী হইল। সে বলিল, "রমেশ বাবু, আমি আর কিছু কর্ত্তে চাই না। আমি সন্ন্যাসীই হবো। কালই হ'বো। আমার জন্তে আপনারা আর নিজেদের মনোকষ্ট, লাঞ্ছনা বাড়াবেন না। আমি লোকালয়ে থাক্‌বো না।"

রমেশ উত্তর দিল না। তাহারও মনে হইতেছিল, এ উৎপাত না ঘটিলেই হইত। সামান্য আমোদের ছলে যাহা করিয়াছে, তাহা এখন ক্রমশঃ গুরুতর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহাতে আর আনন্দের কোনও রেশ নাই। কেন সে শচী ও নগেনকে নিষেধ করে নাই?

শচীন বলিল, "বা। তা' হলে ঐ পোষাকের কি হবে? তা' কি হয়? দামোদর বাবু, এ কলকাতাও জনহীনই প্রায়।"

নগেন কহিল, "সন্ন্যাস নিতে হয়, দু'দিন পরে নেবেন। তত দিন 'ত নূতন বেশে বিহার করুন। চিন্‌তে 'ত পারে নি।"

দামোদর বলিল, "না। এ আমার ভাল লাগ্‌ছে না। আপনারা যা' করেছেন, ভালর জন্তেই। তার জন্তে আপনাদের ধন্যবাদ। কিন্তু আর অগ্রসর হওয়া এই পথে উচিত নহে।"

শচীন উত্তর করিল, "আপনার বক্তৃতা রাখুন। আপনি দু'চার দিন ঐ পরে বেড়ান। এখন ভয় পেয়ে গেলেও বিপদ। নিতাই ঘোষ ভাব্‌বে যে আপনিই দামোদর—তা'র জামাতা। আমাদের উপর তা'র ক্রোধ বাড়্‌বে। সেটা কি ভাল? বরং এখনও ওর সন্দেহ রয়েছে। দু'চার দিন আরও সাহস করে ওকে দেখালে ও আর সন্দেহ কর্ত্তেও সাহস পাবে না। অন্য পথ ধর্‌বে।"

রমেশ বলিল, "আপনি ইচ্ছা করেন, সন্ন্যাস নিতে পারেন, আর ইচ্ছা হয় আমি যা' বলেছি কোর্ত্তে পারেন। আমরা কিছু আর এতে হাত দিতে চাই না। আপনার বিবেচনামত কাজ করুন।"

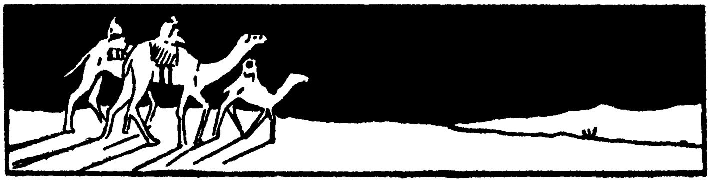
নগেন বলিল, "এখন পরামর্শ হবে না। সব শুয়ে পড়। কাল সকালে সুরেনবাবুর দোকানে বসে যা' হয় একটা final (শেষ) মীমাংসা করা যাবে। এখন সব মাথার গোলযোগ রয়েছে। লোকটা মেজাজ খারাপ ক'রে দিয়ে গেছে। ও'র ঐ ক্ষমতাটা অদ্ভুত।"

শচীন আলো নিভাইয়া শুইয়া বলিল, "ওঃ! কি রকম চাহনি! যেন বাঘ! আমার 'ত ভয়ই হয়েছিল, বুঝি রমেশের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে! ছাই চাপা আগুন! ঢাকা আর থাকে না।"

রমেশ বিরক্ত স্বরে কহিল, "শচী! চুপ্‌ ক'রে শো।"

শচীন চোখ মুদিয়া বলিল, "পোষাকটা নষ্ট হলে অনেকগুলা টাকা যাবে। কি করা যায়? নিজেই পর্‌বো নাকি? নগেনের ঠিক হবে, আমার বড় হবে। পার্শী হয়ে জন্মালে মন্দ হোত না। পুরুষানুক্রমে ক্রোরপতি থাকা যেত!"

(ক্রমশঃ)



দ্বারকা

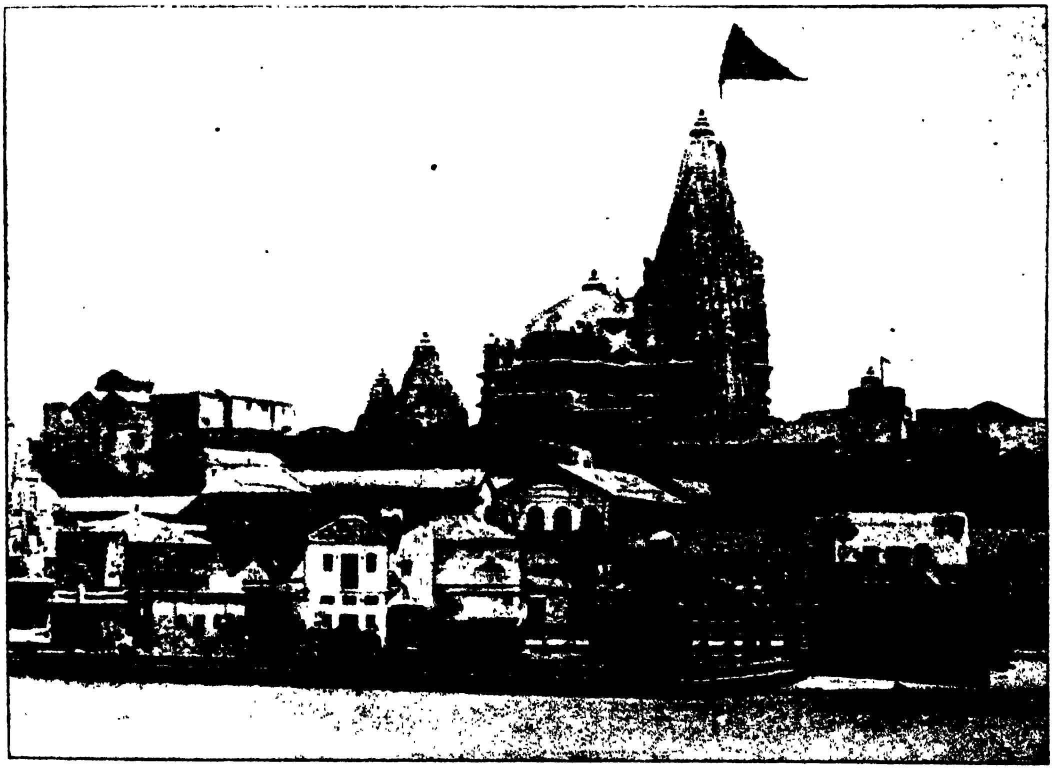
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি-এ

কৃষ্ণলীলা চারি ভাগে বিভক্ত এবং এক-এক স্থানে এক-এক লীলাভিনয় হইয়াছিল—

মাধুর্য্য ব্রজের লীলা, ঐশ্বর্য্যের লীলা মথুরায়,
চক্রিলীলা কুরুক্ষেত্রে, অন্ত্যলীলা দূর দ্বারকায়।

প্রথম লীলা বৃন্দাবনে। বৃন্দাবন-লীলার আলোচনাকল্পে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন :—

ব্রজলীলার বৈশিষ্ট্য—তাহাতে মানবের কোমল বৃত্তি পরিতৃপ্তির উপায় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য—ভক্তির এই চারি রূপ রস, বা রতি পরিতৃপ্তির ক্ষেত্র বৃন্দাবন। তাহার পর মথুরা। অনাচার উন্মূলিত করিয়া প্রজাপালনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা মথুরায়; মথুরা ঐশ্বর্য্যলীলার কেন্দ্র। কুরুক্ষেত্রে খণ্ড-ভারতের স্থানে



দ্বারকা গোমতী তীর্থ (১)

"বৃন্দাবন কাব্যজগতে অতুল্য সৃষ্টি। হরিৎ পুষ্প-শোভিতপুলিনশালিনী কলনাদিনীকালিন্দীকূলে কোকিল-ময়ূরধ্বনিত কুঞ্জবন পরিপূর্ণা, গোপবালকগণের শৃঙ্গ-বেণুর মধুর রবে শব্দময়ী, অসংখ্য কুসুমামোদসুবাসিতা, নানাভরণ-ভূষিতা, বিশালায়তলোচনা ব্রজসুন্দরীগণ সমলঙ্কৃতা বৃন্দাবন-স্থলী স্মৃতিমাত্র হৃদয় উৎফুল্ল হয়।"

মহাভারত রচনা। তাহার পর দ্বারকায় লীলা শেষ। গীতায় কৃষ্ণোক্তিতে প্রকাশ—যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদিগের বিনাশ সাধন ও ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সেই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার পর কৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিলে তথায়—তাঁহারই

বিধানে—যদুবংশ ধ্বংস হয় এবং তিনি স্বয়ং দেহরক্ষা করেন।

কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বলিয়াই দ্বারকা পুণ্যতীর্থ হইয়াছে। পুরাণের কথা, তাঁহার দ্বারকাও তাঁহারই মত অন্তর্হিত হয়। যে সমুদ্র দ্বারকা রচনার জন্য তাঁহাকে স্থান প্রদান করিয়াছিল, সেই সমুদ্রই তাঁহার তিরোভাবের পর আপনার জলবাহু বিস্তার করিয়া কৃষ্ণহীন দ্বারকাকে আপনার সীমাহীন বক্ষে বিলুপ্ত করিয়া দেয়।

বর্ত্তমান দ্বারকায় সেই দ্বারকার স্মৃতি বিদ্যমান। সেইজন্য বৃন্দাবন ও দ্বারকা একই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যায়। বৃন্দাবনেরই মত দ্বারকা পীঠস্থান—এই স্থানে ভগবতী রুক্মিণীরূপে বিরাজিতা—"রুক্মিণী দ্বারকত্যাস্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে!"

ভারতবর্ষের সাতটি মোক্ষপ্রদ কেন্দ্রের দ্বারকা অন্যতম—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবস্তিকা।

পুরী দ্বারাবতী চৈচ সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের নিকট পুরী নির্ম্মাণ জন্য শত যোজন বিস্তৃত স্থান চাহিয়া পরে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। তাহাতেই দ্বারকার উৎপত্তি। সেই ভূমিখণ্ডে স্বল্পকালস্থায়ী অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কংস নিহত হইবার পর তাঁহার বিধবাগণের প্ররোচনায় তাঁহাদিগের পিতা বহুবল জরাসন্ধ জামাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য বার বার মথুরা আক্রমণের ও কৃষ্ণকে লাঞ্ছিত করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। মথুরা যে স্থানে অবস্থিত, তাহাতে তাহা সুরক্ষিত করা কষ্টসাধ্য; শ্রীকৃষ্ণও অনাবশ্যক লোকক্ষয়ের বিরোধী। সেইজন্য শান্তিপ্রিয় কৃষ্ণের নেতৃত্বে যাদবগণ মথুরা হইতে সুরাষ্ট্রে সুরক্ষিত স্থানে গমন করেন। সেই সুরক্ষিত স্থান রৈবতক। তথা হইতে যাদবগণ সমুদ্রতীরে দ্বারকায় গমন করিয়া পুরী নির্ম্মাণ করেন। বোধ হয়, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের উপক্রমে জরাসন্ধ-বধের পর যজ্ঞশেষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রতীরে দ্বারকা নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ যুদ্ধবিমুখ হইয়া মথুরা ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই দ্বারকায় তিনি "রণছোড়জী" অর্থাৎ যুদ্ধত্যাগকারী বলিয়া পরিচিত। দ্বারকায় কৃষ্ণমূর্ত্তি রণছোড়জীর।

পূর্ব্বে জগন্নাথক্ষেত্রে যাইতে হইলে যেমন কতক পথ সমুদ্রে জাহাজে যাইতে হইত, পূর্ব্বে দ্বারকায় যাইতে হইলেও তেমনই বোম্বাই হইতে পোরবন্দর হইয়া দ্বারকায় যাইতে হইত। দীর্ঘ পথ যে ভাবে অতিক্রম করিতে হইত, তাহাতে বঙ্গদেশ হইতে বহু যাত্রীর দ্বারকাগমন সম্ভব হইত না। এখন দিল্লী হইতে রেলেই দ্বারকায় গমন করা যায়।

দিল্লী হইতে রেলপথে দ্বারকায় যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এই সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি দ্বারকাযাত্রার কল্পনা করিলাম এবং যিনি সঙ্গে যাইবেন তাঁহার উৎসাহে ও আগ্রহে কল্পনা আর কল্পনামাত্র রহিল না।

কলিকাতা হইতে দিল্লীতে উপনীত হইয়া তাহার পরদিনই আমরা দ্বারকাভিমুখগামী হইলাম। যেদিন সন্ধ্যায় দিল্লী ত্যাগ করিতে হইল, তাহার পরদিন ও পররাত্রি পথেই অতিবাহিত হইল;—তাহার পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ট্রেণ দ্বারকা ষ্টেশনে উপনীত হইল। ট্রেণ ষ্টেশনে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই দ্বারকানাথের মন্দিরের উচ্চ চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল। পূর্ব্বের ষ্টেশনেই পাণ্ডার দল গাড়ীতে উঠিয়া যাত্রী সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মন্দি চূড়া দেখাইয়া দিলেন।

দিল্লী হইতে যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়, তাহার অধিকাংশই মরুময় স্থানের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই প্রদেশে উষ্ট্র ভারবহন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পথে দেখা যায়, দলে দলে উষ্ট্র কণ্টকগুল্ম ভক্ষণ করিতেছে। স্থানে স্থানে হরিণ ও ময়ূরও দেখা যায়। কৃষকদিগকে অতি কষ্টে সেচের দ্বারা শস্যোৎপাদন করিতে হয়। বাঙ্গালার সহিত এই প্রদেশের বিভিন্নতা প্রথম দর্শনেই প্রতিভাত হয়।

দ্বারকা বরোদার গায়কবাড়ের অধিকারভুক্ত ওখামণ্ডলে অবস্থিত। স্থানীয় কিম্বদন্তী—"ওখামণ্ডল" "উষামণ্ডলের" বিকৃতি—এই স্থান বাণপুত্রী উষার নামে পরিচিত। বর্ত্তমান শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে দ্বারকা নিরাপদ ছিল না,—দস্যুরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া দ্বারকাবাসীদিগের ধন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। নগরটি রক্ষার জন্য ইহা প্রাচীরপরিবেষ্টিত করা হইয়াছিল। প্রাচীর এখনও বিদ্যমান। এই প্রাচীর দিল্লীর প্রাচীরেরই অনুরূপ। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে দ্বার।

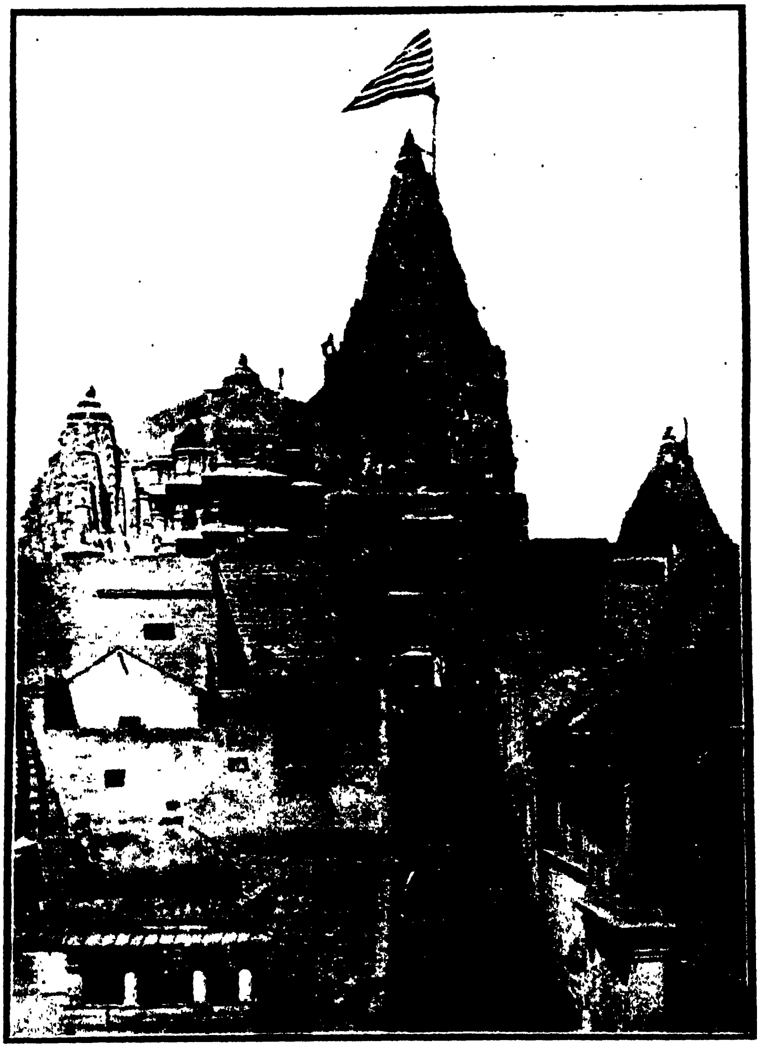
দ্বারকা সমুদ্রতীরে অবস্থিত হইলেও মন্দির হইতে সমুদ্র কিছু দূরে অবস্থিত। সমুদ্রের একটি জলবাহু মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে আসিয়াছে; তাহাকে "গোমতী" বলা হয়। স্থানীয় লোক দ্বারকাকে "গোমতী দ্বারকা" ও কিয়দ্দূরে সমুদ্রের খাঁড়ির মধ্যস্থ দ্বীপটিকে "বেট (দ্বীপ) দ্বারকা" বলিয়া থাকে।

দ্বারকা নগরটি বৃহদায়তন নহে। মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার উৎপত্তি ও স্থিতি। যাত্রি-সমাগমই এই স্থানের অধিবাসীদিগের জীবিকার্জ্জনের সর্ব্ব প্রধান উপায়। এই প্রদেশে খাদ্যদ্রব্য সুলভ নহে; ফলমূল দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেবতার "ভোগ" মিছরী। আবার দ্বারকায় পানীয় জলের অভাব—সহরের বাহিরে কূপ হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়; সেই জল কলসে কলসে গো-যানে বাহিত হয় এবং কলস হিসাবে বিক্রীত হয়।

সহরটি ক্ষুদ্রায়তন হইলেও তাহাতে ধর্ম্মশালার অভাব নাই এবং সেইজন্য কখনই যাত্রীদিগের বাসস্থানের অভাব হয় না। কলিকাতায় ব্যবসা করিয়া ধনবান কয়জন মাড়বারী দ্বারকায় ধর্ম্ম শালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাঙ্গলার যাত্রীরা প্রায়ই সেই সকল ধর্ম্মশালায় স্থান পাইয়া থাকেন।

কলিকাতার একজন মাড়বারী ধনীর ধর্ম্মশালা "দেবী ভবনে" আমরা আশ্রয় পাইয়াছিলাম। পাণ্ডাই সে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ষ্টেশন হইতে মোটর-বাসে ধর্ম্মশালায় উপনীত হই। ষ্টেশনেই ভারবাহীর বিস্ময়কর স্বল্পতা দৃষ্টিগোচর হয়। দেখিলাম—একজন অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক ও কয়টি বালকই ষ্টেশনে যাত্রীদিগের দ্রব্যাদি বহন করিতেছে।

জগন্নাথক্ষেত্রের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, দ্বারকার যাত্রিসমাবেশ অল্প; বৎসরে অর্দ্ধ লক্ষ মাত্র। তবে রেলপথে গতায়াতের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রিসংখ্যা বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা। হিন্দুর তীর্থস্থানে ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী-সমাগম দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুধর্ম্ম বিততশতশাখ বিশাল ন্যগ্রোধের মত এ দেশে বিরাজিত—তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করা সংস্কারক বা ভিন্নধর্ম্মপ্রচারকদিগের পক্ষে



শ্রীজগৎ দেবল

অসম্ভব। হিন্দুর তীর্থস্থান সমূহ যত সুগম হইতেছে, সে সকলে যাত্রীর সংখ্যা ততই বর্দ্ধিত হইতেছে।

আমরা যে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় পাইলাম, তাহা মন্দিরের নিকটেই অবস্থিত—বৃহদায়তন। গৃহটি পরিচ্ছন্ন। তাহার অনেক কক্ষই শূন্য।

দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতেই সন্ধ্যা হইল! তখন আমরা মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখিতে গমন করিলাম।

পথে লক্ষ্য করিলাম—এ প্রদেশে মহিলাদিগের বেশের পরিচ্ছন্নতা ও বৈচিত্র্য দেখিলে মনে হয়, দারিদ্র্য তাহাদিগের গৃহে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত। গুর্জ্জরের নানারূপ ফুল, পত্র ও নক্সা-ছাপা শাড়ী ও জামা পরিধান করিয়া সকলে গতায়াত করেন; যেন কোন উৎসবের জন্য সজ্জা করিয়া যাইতেছেন। বঙ্গদেশে যখন দুর্গোৎসব—প্রায় সেই সময় গুর্জ্জরে গরবাপর্ব্ব। গরবায় স্ত্রীলোকরা ছিদ্র-বহুল মৃৎপাত্রমধ্যে দীপ স্থাপিত করিয়া দেবতার জন্য লইয়া যায়েন। গরবার গীতও আছে।

দ্বারকানাথের মন্দিরটি দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের মত নহে—মন্দিরচূড়া সূক্ষ্মাগ্র। ইহা ১ শত ৭০ ফিট উচ্চ। মন্দিরের গর্ভগৃহ মধ্যস্থানে অবস্থিত—সম্মুখে মন্দিরসংলগ্ন ভোগমণ্ডপ—ইহার ছাত ৬০টি প্রস্তর স্তম্ভের উপর অবস্থিত। মন্দিরটি পঞ্চতল এবং উপরে উঠিবার সোপান-শ্রেণী আছে।

আরতির সময় দ্বারকার নরনারী দলে দলে মন্দিরে সমাগত হইয়া থাকেন—দেবদর্শন করেন।

দেবতার মূর্ত্তি বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কৃষ্ণ-প্রস্তরে ক্ষোদিত—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীমতিসহচর মূর্ত্তি বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় এবং বৃন্দাবনেও যুগলমূর্ত্তিই সাধারণ। অন্যান্য স্থানে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিরই আধিক্য। দ্বারকায় মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তির বিশেষ ইতিহাস আছে। মন্দিরে প্রথমে যে মূর্ত্তি ছিল, তাহা ছয়শত বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে পূজারীরা চুরী করিয়া গুজরাতে ঢাকুরে লইয়া গিয়াছিল। তাহা এখনও তথায় পূজিত। দ্বিতীয় মূর্ত্তিও প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে অপহৃত হয়। তাহা এখন বেট দ্বারকায়। সুতরাং বর্ত্তমান মূর্ত্তি যে তৃতীয় মূর্ত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দ্বারকায় কৃষ্ণমূর্ত্তি রণছোড়জীর। তিনি যে স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় হইয়াও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। কুরুক্ষেত্র যে জন্য ধর্ম্মক্ষেত্র, সেই কারণেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণের আবির্ভাব। সেই যুদ্ধের ফলে ভারতে মহাভারত স্থাপিত হয় এবং শান্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতের অন্যান্য তীর্থে যেমন, দ্বারকায়ও তেমনই মন্দির-প্রাঙ্গণে আরও কতকগুলি মন্দির আছে। সে সকলের মধ্যে প্রদ্যুম্নের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিলে বাতায়নপথে মন্দিরের পতাকা-সম্বলিত উচ্চ চূড়া সর্ব্বাগ্রে নয়নপথের পথিক হইল।

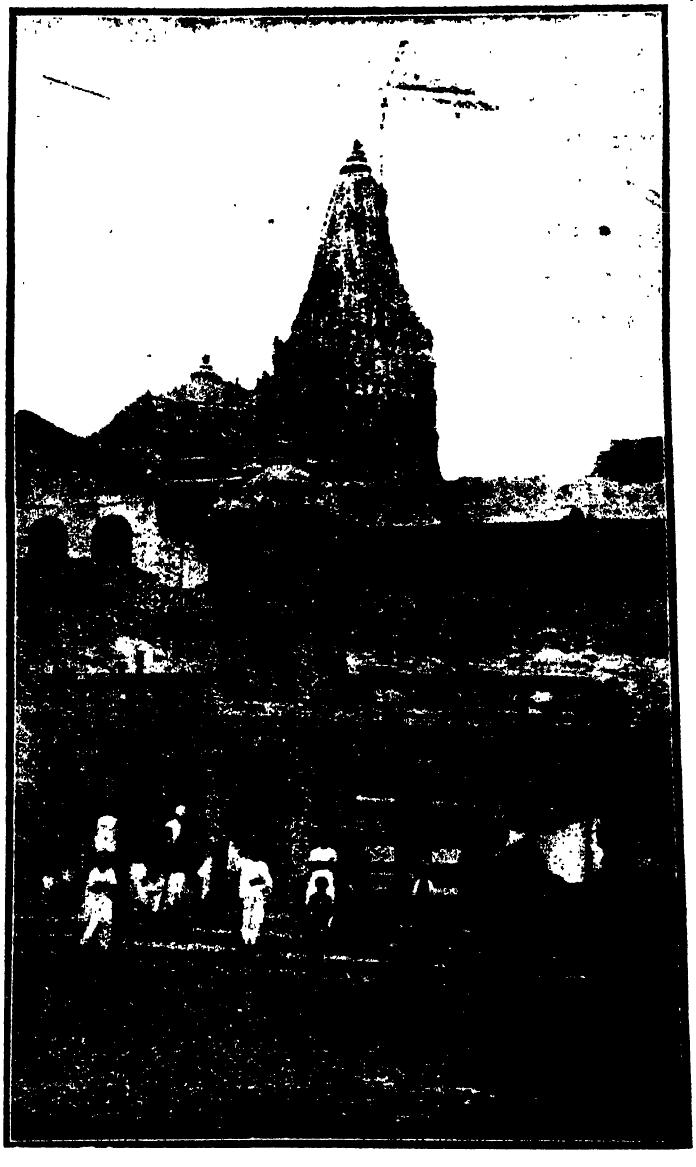
দ্বারকায় মন্দিরে ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য;—তীর্থযাত্রীরা প্রাতে দেবতার "বেশ" হইবার পূর্ব্বে মূর্ত্তিকে স্নান করাইতে পারেন। আজ যখন ভারতবর্ষের নানা স্থানে কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকের মন্দির-প্রবেশাধিকার লইয়া আলোচনা, আন্দোলন ও কলহ চলিতেছে, তখন দ্বারকার মত প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থের এই ব্যবস্থা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, সন্দেহ নাই। এই ব্যবস্থার উদারতার সহিত দক্ষিণ ভারতের মন্দিরসমূহে ব্রাহ্মণাতিরিক্ত বর্ণের যাত্রীদিগের সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার অনুদারতা তুলনা করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। এই প্রসঙ্গে রামেশ্বর মন্দির সম্বন্ধে একটি প্রচলিত গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গল্পটি হয়ত গল্প মাত্র; কিন্তু ইহার মূলে যে ব্রাহ্মণাতিরিক্ত বর্ণ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার বাসনা বিদ্যমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। নেপালের সেনাপতি রামেশ্বর তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় শিবলিঙ্গে প্রদান জন্য তিনি গঙ্গোত্রী হইতে জল লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মন্দিরের পূজারীরা তাঁহাকে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে জল প্রদানের অধিকার দিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি পূজারীদিগকে বলিলেন, "আমি সূর্য্যবংশসম্ভূত। আমার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রই এই শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষরা নহেন। তবে আমি কেন প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হইব?" পূজারীরা কিন্তু প্রচলিত প্রথা বলিয়া ব্রাহ্মণাতিরিক্ত বর্ণের সেনাপতিকে সে অধিকারে বঞ্চিত করিতে চাহিলেন। তখন সেনাপতি তাঁহার গুর্খা দেহরক্ষীদিগকে আদেশ করিলেন, "ইঁহাদিগকে বাঁধিয়া রাখ।" তাহারা তাঁহার আদেশ পালন করিল। সেনাপতি মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া শিবপূজা করিলেন। তিনি পূজা শেষ করিবার পর পূজারীরা বন্ধনমুক্ত হইলেন। তখন সেনাপতি স্বর্ণমুদ্রাদানে পূজারীদিগের আত্মসম্মানে আঘাতের বেদনা দূর করিয়া হাসিতে হাসিতে মন্দির ত্যাগ করিলেন।

বলা বাহুল্য, উদারতায় জগন্নাথক্ষেত্রের তুলনা নাই।

তথায় খাদ্য বিষয়ে বর্ণভেদ সে ক্ষেত্রে প্রবেশমাত্র দূর হইয়া যায় এবং তথায় জনগণের দেবতা রথের সময় মন্দির ত্যাগ করিয়া রাজপথে জনগণমধ্যে আসিয়া তাহাদিগকে তাঁহার রথরজ্জু আবর্ষণের অধিকার প্রদান করিয়া অস্পৃশ্যতার অযৌক্তিকতা বুঝাইয়া দেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও উদারতা সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা যে লক্ষিত হয় না, এমন নহে।

দ্বারকায় মন্দিরের আর একটি বৈশিষ্ট্য—দেবস্থান-সমিতি। এই সমিতি বরোদা দরবারের প্রতিনিধি, দ্বারকাবাসীদিগের প্রতিনিধি ও পূজারীদিগের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। মন্দিরে যাত্রীরা—যে জন্যই কেন হউক না—অর্থ, অলঙ্কার বা বস্ত্র প্রদান করিলে তাহা মন্দিরের ভাণ্ডারে যায় ও খাতায় জমা করা হয়। কেহ মূর্ত্তি স্পর্শ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রাবেশিক বা "ভোগের" জন্য অর্থ দিলে তাহার রসিদ পাইয়া থাকেন। শুনিলাম, যে টাকা আয় হয়, তাহা পূজারীদিগকে দেওয়া হয়। আবার পূজারীরা মন্দিরে আলোক প্রদানের জন্য এবং মন্দির পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সমিতিকে নির্দ্দিষ্ট টাকা দিতে বাধ্য। তাঁহাদিগকে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ "ভোগ"ও প্রস্তুত রাখিতে হয়। নিত্য ভোগের মধ্যে অন্ন ভোগ ও মিষ্টান্ন ভোগ—ভিন্ন ভিন্ন রন্ধনশালায় প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালীর কাছে এই দূর দেশে অন্নভোগ যে বিশেষ আদৃত হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

আমি যখন মূর্ত্তি স্পর্শ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট "প্রাবেশিক" দিয়া রসিদ লইবার জন্য আমার নাম বলিলাম, তখন দেবস্থান-সমিতির পক্ষ হইতে নিযুক্ত প্রধান লেখক আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমি আপনাকে চিনি।" দূর দ্বারকায় এই গুজরাটী ভদ্রলোক আমাকে চিনেন শুনিয়া বিস্মিত হইলাম—তাঁহার আমাকে চিনিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, বরোদা দরবার তাঁহাকে পল্লীগঠন-পদ্ধতি শিক্ষার্থ বোলপুরে পাঠাইয়াছিলেন; তিনি তথায় দুই বৎসর ছিলেন এবং সেই সময় সাংবাদিক বলিয়া শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ও আমার নাম শুনিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয়ে আমাদিগের মূর্ত্তিদর্শনের ও পরে আরতি দেখার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল—আমরা কিছু-



দ্বারকা গোমতী তীর্থ (২)

ক্ষণের জন্য মন্দিরের গর্ভগৃহে অনন্তসঙ্গী হইয়া থাকিতে পাইয়াছিলাম।

মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি অনতিদীর্ঘ আসনের উপর দাঁড়াইলে বেদীর উপর স্থাপিত মূর্ত্তি স্পর্শ

করিতে পারা যায়। যাত্রীরা তাহাতে গন্ধ-তৈল লিপ্ত করিতে পারেন। পূজারীরা জল ঢালিয়া মূর্ত্তিটির স্নান করাইয়া থাকেন। তাহার পর "বেশ"।

মন্দির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মন্দিরটি ভাল করিয়া দেখিলাম। আজকাল কলিকাতায় কতকগুলি বৃহৎ হর্ম্ম্যের সম্মুখভাগ যে প্রস্তরে আস্তৃত হয় এবং যাহা অপেক্ষাকৃত কোমল বলিয়াই অধিক ব্যবহৃত, মন্দিরটি সেই "পোরবন্দরের প্রস্তর" বলিয়া পরিচিত প্রস্তরে রচিত। মন্দিরের গাত্র ভিত্তির উপর হইতে চূড়া পর্য্যন্ত ক্ষোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতিতে পূর্ণ। কালবশে সেগুলি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে—কোন কোন স্থানে প্রস্তর-সংযোগও শিথিল হইয়াছে।

মন্দিরে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কন্যার সহিত মহিলাদিগের পরিচয় হইল। ইঁহার স্বামী সন্ন্যাসী। ইনি দ্বারকার পূর্ব্ববর্ত্তী শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হইয়া দ্বারকায় আসিয়া ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য মন্দির হইতে ইঁহার বৃত্তি-ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। তখন যিনি শঙ্করাচার্য্য ছিলেন, তিনি শক্তিশালী ছিলেন। দ্বারকাও অন্যতম শঙ্কর মঠ। কিন্তু মন্দির মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের "আসন" থাকিলেও মন্দিরের কর্ত্তৃত্ব তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পূজারী গৃহস্থদিগের হস্তগত হইয়াছে। মন্দিরে শঙ্করাচার্য্যের অধিকারের কেবল এই নিদর্শন আছে যে, মন্দির-চূড়া পর্য্যন্ত যে সোপানশ্রেণী গিয়াছে, তাহাতে আরোহণ করিতে হইলে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। ভূতপূর্ব্ব শঙ্করাচার্য্য পুনরায় মন্দিরের প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন—বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্য সে চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছেন। সন্ধ্যাকালে আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তখন তিনি তাঁহার আসনে শার্দ্দূলচর্ম্মের উপর উপবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণলীলা গান করিতেছিলেন। সম্মুখে মাদুরে আস্তৃত হর্ম্ম্যতলে দক্ষিণে নারীরা ও বামে পুরুষরা বসিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া সঙ্গীত পুষ্ট করিতেও ছিলেন। গানের সুর "একঘেয়ে" হইলেও মধুর এবং বামাকণ্ঠের সুরই সুস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-কন্যাটির প্রতি পূজারীরা ও পাণ্ডারা বড়ই বিরক্ত। তাহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম—ইঁনি যে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যা, তিনি পূজারী ও পাণ্ডার প্রভুত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়—তিনি বাঙ্গালী যাত্রীদিগকে মন্দিরের নিয়মাদি জানাইয়া দেন এবং সেইজন্য পাণ্ডাদিগের পক্ষে যাত্রীদিগের নিকট হইতে অধিক অর্থ লইবার সুবিধা হয় না। মন্দির হইতে ইঁহার বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী যাত্রী-মহিলা ও পুরুষ সকলেই এই দূর দেশে এই বাঙ্গলী দুহিতাকে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। তবে এই শত্রুপুরীতে তিনি কত দিন থাকিতে পারিবেন, বলিতে পারি না।

মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে সোপান-শ্রেণীতে অবতরণ করিয়া আমরা "গোমতী"-তীরে উপনীত হইলাম। গোমতী-স্নানের জন্যও নির্দ্দিষ্ট অর্থ দিয়া ছাড় লইতে হয়। এই অর্থের একাংশ মন্দিরের ও অপরাংশ স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর প্রাপ্য। কেহ কেহ এইস্থানে মস্তক মুণ্ডনও করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের পিণ্ডদান করিব বলিয়া আমি পাণ্ডাকে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিয়া গোমতী-স্নানে গমন করিলাম। জল অগভীর এবং বিশেষ পরিষ্কারও নহে। সেই জলে দলে দলে ক্ষুদ্র ও অনতিক্ষুদ্র মৎস্য বিচরণ করিতেছে—ভয় নাই। তাহারা স্নানার্থীদিগের অঙ্গও স্পর্শ করিয়া যাইতেছে।

স্নানান্তে কূলে আসিয়া পিণ্ডদান সমাপন করিয়া মন্দিরের পথেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। মধ্যাহ্নে পূজারীদিগের এক জন তথায় আসিয়া আমাদিগকে অন্ন-প্রসাদ পাইবার জন্য মন্দিরে লইয়া যাইলেন।

অপরাহ্নে আমরা নগরের বাহিরে—কিয়দ্দূরে রুক্মিণীর মন্দির দেখিতে গমন করিলাম। এই মন্দিরটি পুরাতন এবং আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার অঙ্গ ক্ষোদিত চিত্রে পরিপূর্ণ। এই সকল চিত্রের মধ্যে পুরীর ও সিমাচলমের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ যৌন-সম্মিলন চিত্রও আছে। মন্দিরের ছাত গম্বুজের মত—চূড়াকৃতি নহে। বেলাবালুর উপর প্রস্তর-বেদীতে মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সমৃদ্ধির অভাব ও ভোগরাগাদির দৈন্য দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, যাত্রীদিগের নিকট হইতে ইহার আয় অধিক নহে।

সন্ধ্যায় আবার আরতি দর্শন করিয়া আসিয়া আমরা বিশ্রামলাভ করিলাম; পরদিন প্রত্যূষে মোটরে বেট দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে।

গায়কবাড় নিজ অধিকার মধ্যে ওখায় বন্দর নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং জামনগর-দ্বারকা রেলপথ সমুদ্রতীরে ওখা পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেইজন্য অধিকাংশ যাত্রী এখন সেই

পথে বেট দ্বারকায় গমন করেন। কিন্তু তাহাতে পথে নাগেশ্বর মহাদেব ও গোপীতালাও দেখা হয় না বলিয়া আমরা মোটরে গমন করিলাম। মাঠের মধ্য দিয়া মোটর অগ্রসর হইল—মাঠে ফসলের অভাব। নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির ক্ষুদ্রায়তন—উচ্চ বেদীতে উঠিয়া সোপান-শ্রেণীতে অবতরণ করিয়া গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতে হয়। তথায় ঘৃতপূর্ণ প্রদীপের আলোকে দেবদর্শন। গোপীতালাও একটি সামান্য পুষ্করিণী—ঘাট বাঁধান; স্নান করিতে হইলে দর্শনী দিতে হয়। পুষ্করিণীর পাহাড়ে কয়টি ছোট ছোট মন্দির। কিন্তু এই স্থানে আরও দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে—গোশালা ও ময়ূরের ঝাঁক। দ্বারকায় আসিবার সময় পথে উঠিতে হয়। ঘাটটি আর কিছুই নহে কেবল প্রস্তর-নির্ম্মিত দীর্ঘ বেদী সমুদ্রের জলমধ্যে কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার উপর হইতে নৌকায় উঠিতে হয়। বেদীর উভয় পার্শ্বে বহু নৌকা ভাড়ার জন্য অপেক্ষা করে। পোর্ট সইদে সুয়েজ খালের পরিকল্পনাকারী লেসেপ্‌সের মূর্ত্তি এইরূপ বেদীর প্রান্তে সমুদ্রের মধ্যে দণ্ডায়মান। পূর্ব্বে জলদস্যুর ভয়ে নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত রাজপুরুষরা যাত্রীদিগকে এই খাঁড়ি পারাপার হইতে দিতেন না। এখন সে ভয় নাই। খাঁড়ি পার হইবার নৌকা-ভাড়া অতি অল্প। খাঁড়িতে সাগর-সলিলের তরঙ্গভঙ্গ প্রবল নহে বলিয়া নৌকাযাত্রী-দিগের কোন অসুবিধা হয় না।



বেট সংখ্যোদ্ধার

মাঠের মধ্যে ময়ূর, হরিণ ও উট দেখিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এক স্থানে এত ময়ূর আর কোথাও দেখি নাই। কোন কোন গৃহস্থগৃহে যেমন পালিত পারাবতের বাহুল্য, এই স্থানে তেমনই ময়ূরের বাহুল্য। কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া ময়ূর-লীলা দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা হইল না; কেন না, বিলম্ব হইলে ভাঁটার সময় ঘাট হইতে বেট দ্বারকায় যাইবার জন্য নৌকায় উঠিতে অসুবিধা ঘটিবে। তিথি অনুসারে জোয়ারের সময় বুঝিয়া দ্বারকা হইতে যাত্রা করিয়া নৌকায়

বেট অর্থাৎ দ্বীপ-দ্বারকা সমুদ্রের নীলাম্বুমধ্যে অবস্থিত —"কৌস্তভরতন যথা মাধবের বুকে।" দ্বীপ একখানি গ্রাম। এই স্থানে সমুদ্রে শঙ্খ সংগৃহীত হয়—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা জাতীয় ও নানা আকারের শঙ্খ এই স্থান হইতে নানা স্থানে রপ্তানী হয়। বাঙ্গালার মহিলারা ঢাকার যে শাঁখা সাদরে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার জন্য শঙ্খ এই দ্বারকা হইতে রপ্তানী হয়। শঙ্খের ব্যবসা গায়কবাড়ের রাজ্যের একচেটিয়া ব্যবসা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র শঙ্খ গ্রথিত করিয়া যে মালা রচিত হয়, তাহা মনোরম। আবার এই স্থানের শঙ্খ ঢাকার কারীগরের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া আসিয়া দ্বারকায় অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়।

নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া অল্প দূর যাইলেই মন্দিরে উপনীত হওয়া যায়। এ মন্দির মন্দিরাকৃতি নহে—প্রাসাদের মত, বলা যায়। দ্বারকার মন্দিরে ঐশ্বর্য্য-পরিচয় নাই—কেবল গর্ভগৃহের দ্বার রৌপ্যপত্রাবৃত। বেট দ্বারকা যে বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের তীর্থ সেই সম্প্রদায়ে বহু ধনী ব্যবসায়ী থাকায় এই স্থানে ঐশ্বর্য্য-পরিচয়ের বাহুল্য। গৃহমধ্যস্থ প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বে কক্ষে কক্ষে দেবদেবীর মূর্ত্তি; সকল কক্ষের দ্বারই রৌপ্যপত্রাবৃত। মন্দিরের মধ্যে এক-স্থানে দ্বিতলে কতকগুলি পুত্তলে পৌরাণিক ঘটনার প্রদর্শনী। মন্দিরে রৌপ্যনির্ম্মিত আসবাবও অনেক। বৃন্দাবনে শেঠের মন্দিরে এইরূপ আসবাব দেখা যায়।

মন্দিরে প্রবেশের জন্য প্রাবেশিক প্রদান করিলে ছাড়ের পরিবর্ত্তে বাহুতে ছাপ দেওয়া হয়। সাধারণ যাত্রীরা ভায়লেট কালীতে মোহরের ছাপ লইয়া থাকেন—বৈষ্ণবরা কেহ কেহ এবং সন্ন্যাসীরা লৌহের মোহর তপ্ত করিয়া ছাপ লয়েন—সেই চিহ্ন যাবজ্জীবন তাঁহাদিগের দ্বারকা-দর্শনের পরিচয়রূপে বিদ্যমান থাকে।

মন্দিরে ভোগরাগের ব্যবস্থা ও মন্দিরের সমৃদ্ধি-পরিচায়ক। দ্বারকায় তাহা নহে—তথায় সবই পরিমিত।

বেট দ্বারকায় আমরা দ্বারকা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী বৈরাগী ও তাঁহাদিগের সঙ্গিনীদিগকে দেখিতে পাইলাম।

ফিরিবার সময় আমরা বেট দ্বারকায় নৌকায় আরোহণ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ ওখায় উপনীত হইলাম। বন্দরটির এখনও রচনা শেষ হয় নাই। পানীয় জলের অভাবে দূর হইতে কলে জল আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ওখা গায়কবাড়ের রাজ্যে স্থিত; তাই ওখায় যে মাল জাহাজ হইতে নামান হয়, তাহার জন্য শুল্ক আদায় করিতে না পারায় ইংরাজ সরকার বীরঙ্গমে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ওখা হইতে ট্রেণে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়া আমরা সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতি দর্শন করিলাম।

পরদিন আমরা আবার দ্বারকা নগরী দর্শনে বাহির হইলাম। নগরীর আয়তন বৃহৎ না হইলেও এক সময় যে ইহা দস্যুভয়ে সুরক্ষিত করিতে হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রাচীরে কামান রাখিবার ব্যবস্থাও ছিল।

বর্ত্তমানে নগরে হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরও বাস আছে এবং বিচারালয় প্রভৃতিও স্থাপিত হইয়াছে। গায়কবাড়ের ওখা-সৈন্যদলের সৈনিকরাই মন্দিরে প্রহরীর কার্য্য করিয়া থাকে।

সেই দিনই অপরাহ্নে আমরা দ্বারকা ত্যাগ করিয়া দিল্লীর দিকে যাত্রা করিলাম। স্থির হইল, পথে আজমীরে নামিয়া পুষ্কর ও সাবিত্রী দর্শন করা হইবে।

এই পথে গমন করিলেই বাঙ্গালার সহিত অন্যান্য প্রদেশের প্রভেদ প্রতিভাত হয়; বুঝিতে পারা যায়, কেন মা'র যে রূপ বঙ্কিমচন্দ্র ধ্যানে দেখিয়াছিলেন, তাহা আর কোন প্রদেশের কবি বা ভক্ত সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম।"

বাঙ্গালার মত আর কোথাও ধরিত্রীর বক্ষের পীযূষধারা অপত্যস্নেহের প্রাচুর্য্য হেতু স্বতঃক্ষরিত হয় না। সেই স্নেহের প্রাচুর্য্যই বাঙ্গালীর প্রকৃতিকে তাহার বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে।



পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রে বিগত শতাব্দীর বাংলার কথা

অধ্যাপক শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত, এম-এ

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে গত শতাব্দীর কোন কোন বাংলা সংবাদপত্র সংগৃহীত আছে। উহার মধ্যে অনেকগুলিই আজকাল বাংলাদেশে দুষ্প্রাপ্য। ইহার সামান্য পরিচয়ই বঙ্গীয় সুধীসমাজের নিকট পৌঁছিয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক উৎসাহে আগ্রহান্বিত হইয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।

হিন্দুরত্ন কমলাকর

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে "হিন্দুরত্ন কমলাকর" পত্রিকার ১৮৫৮-১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের কয়েকটী সংখ্যা আছে। ইহা প্রতি মঙ্গলবারে শ্রীধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় দ্বারা ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইত। ১৮৫৮, ২০শে এপ্রিলের এই পত্রিকার বিজ্ঞাপনমধ্যে ভগবদ্গীতা, কাশীদাসি মহাভারত, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের চণ্ডী ও বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুরের অনুমতিক্রমে যে মহাভারত প্রকাশিত হইবে তাহার এবং নীতিরত্ন, জ্ঞানপ্রদীপ, পারস্য উপন্যাস ও ও সপত্নী নাটকের (১) উল্লেখ আছে। "হিন্দুরত্ন কমলাকর" প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের বৈরতাচরণ করিতেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। গদ্যে ও পদ্যে ঈশ্বর গুপ্তকে এই পত্রিকায় নানাপ্রকার ব্যঙ্গ ও কটূক্তি করা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে "সম্বাদ ভাস্কর" সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ১৮৪৩ খৃঃ "পাক-রাজেশ্বর" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (২) ১১ই মে, ১৮৫৮ খৃঃ "হিন্দুরত্ন কমলাকর" পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়:

"আমরা সর্ব্বসাধারণ ছাপাকর গণকে সাবধান করিতেছি পাকরাজেশ্বর গ্রন্থ কেহ ছাপাইবেন না, যদি মুদ্রাঙ্কিত করেন তবে রাজবিচারে বিপদে ঠেকিবেন আমরা শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমান রাজ্যেশ্বর বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে পাকরাজেশ্বর গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলাম তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা বর্দ্ধমানবাসি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ও তৎপুত্র আমারদিগের বিপক্ষে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করেন পরে আমরা বর্দ্ধমানে যাইয়া শ্রীল শ্রীযুতের সাক্ষাতে তাঁহারদিগকে আনাইলাম অধিরাজ বাহাদুর স্বয়ং তাঁহারদিগকে টাকা দিয়া ঐ গ্রন্থ স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমারদিগকে দিয়াছেন ইহার সাক্ষ্য প্রমাণ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে অতএব ছাপাকরেরা কেহ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।"

১লা জুনের "হিন্দুরত্ন কমলাকরে" বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কারের পুত্র দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্যের বিজ্ঞাপনে প্রতীয়মান হয় যে গৌরীশঙ্কর বাস্তবিক পাক রাজেশ্বর গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন না, তর্কালঙ্কারই গ্রন্থকর্ত্তা ছিলেন। (৩)

উক্ত সংখ্যা "হিন্দুরত্ন কমলাকরে" প্রকাশ যে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রদের শিক্ষার পরীক্ষায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ইংরাজি চারি শ্রেণীতে বাংলা বিষয়ে প্রশ্ন প্রদান ও উত্তম লেখক চারি বালককে পদক প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বাংলা শিক্ষার পরীক্ষা করিয়া, ছাত্রগণকে পারিতোষিক দিয়া এবং এক বক্তৃতা দ্বারা তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সিংহ মহাশয়ের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১লা জুনের পত্রিকায় কোন পাঠকের পত্রে জানা যায় যে গৌরীশঙ্কর "জ্ঞানান্বেষণ" পত্র সম্পাদন করিতেন। এই "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকা হিন্দু কলেজের ছাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পরিচালনা করিতেন। ৮ই জুনের "হিন্দুরত্ন কমলাকরে" 'সমাচার চন্দ্রিকায়' ভগবতী-

(১) নীতিরত্ন ও জ্ঞানপ্রদীপ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কৃত। "সপত্নী নাটক" তারকচন্দ্র চূড়ামণির রচনা।

(২) Dr. S. K. De—Indian Historical Quarterly, 1927, p. 21.

(৩) ৯ পৌষ ১২৩৭ (২৩ ডিসেম্বর, ১৮৩০), সমাচার চন্দ্রিকায় "পাক রাজেশ্বর" গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য তর্কালঙ্কারের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

চরণ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে এক গদ্য পদ্য ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশিত হয়। ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয় Indian Historical Quarterlyতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শীর্ষক প্রসঙ্গে বলেন যে ভবানীচরণের মৃত্যুর পরে বোধ হয় তাঁহার পুত্রদ্বয় রাজকৃষ্ণ ও রামাচরণ ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সহকারিতায় 'সমাচার চন্দ্রিকা' পরিচালনা করিয়াছিলেন। (৪) উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্যক্তি ইহার সম্পাদকতা কিছুদিন করিয়াছিলেন। "হিন্দুরত্ন কমলাকরে" তাহার উল্লেখ আছে। ১৮৫৮ খৃঃ ২৯শে জুনের "হিন্দুরত্ন কমলাকর" ভগবতীচরণকে স্পষ্টই "সমাচার চন্দ্রিকা"র সম্পাদকরূপে সম্বোধন করিয়াছেন। এই দুই পত্রিকায় যে রেষারেষি ভাব চলিত নিম্নলিখিত কবিতা দৃষ্টে তাহা বোঝা যায় :

"বাঙ্গালা ভাষায় মূর্খ শ্বেত জাতি গণ
কেরাণিরা চন্দ্রিকায় দেন বিজ্ঞাপন।"

কবিতার অনেক স্থলই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। প্রভাকর সম্পাদকও প্রচুর গালি খাইয়াছেন। ইহার দুই একটীর নমুনা :

শুনহে চতুর বৈদ্য,
আর না চলিবে গদ্য,
তব পদ্যে হইয়াছে গন্ধ।
বিশিষ্ট লোকের করে,
ঘৃণাঘৃণি প্রভাকরে,
করিতেছে সকলের ধন্দ।

(৬ই জুলাই, ১৮৫৮)

"দেখ সবে কি আছে মাসিক প্রভাকরে
প্রাত্যহিক প্রভাকরে কি সুপ্রভা ধরে—
মনে করি লাথি মারি বার্ষিকের শিরে
প্রভাকর ফেল সবে জাহ্নবীর নীরে॥
নাসা কর্ণ কাটিয়া মুণ্ডন কর চুল।
দূর কর পৃথিবীর অনর্থের মূল॥
অনাদরে প্রভাকরে দূর কর সবে।
এমন অশুদ্ধ ভাঁড় হয় নাহি ভবে॥"

(১৩ই জুলাই, ১৮৫৮)

১৩ই জুলাইয়ের "হিন্দুরত্ন কমলাকরে" "বন্ধু হইতে প্রাপ্ত" এক পত্রে প্রকাশ যে শ্রীরামপুরের দে চৌধুরী মহাশয়গণের ছাপাখানায় "বিজ্ঞান মিহিরোদয়" পত্র প্রকাশ আরম্ভ হয়। (৫) উক্ত সংখ্যায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ এক বিজ্ঞাপন দেন যে শ্রাবণ (১২৬৫) মাসের প্রথমে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদারম্ভ— হইবে। ২০শে জুলাইয়ের এই পত্রিকায় অনেক কুলীন কন্যার কুলীন বালিকাদিগের দুরবস্থা সম্বন্ধে পত্র লেখেন। ২০শে জুলাই ও ৩রা আগষ্ট "হিন্দুরত্ন কমলাকর" আড়বেলে নিবাসী শ্রীমনোমোহন বসুর কবিতা প্রকাশিত করেন। ৩১শে আগষ্টের কাগজে "চমৎকার মোহন" সমাচার পত্রের সম্পাদকের "কাফ্রি ভাষায় ইংরাজি ভাষা" ও "কুলি ভাষায় যে বাঙ্গালা ভাষা লিখিত হইয়াছে" গদ্যে পদ্যে তাহার তীব্র সমালোচনা বাহির হয়। (৬) এই সংখ্যায়ই প্রকাশ যে বহরমপুরে শ্রীযুক্ত রামদাস সেন (ডাক্তার রামদাস সেন) একটি উত্তম পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ "হিন্দুরত্ন কমলাকরে" প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট হয় যে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের কলেবর ত্যাগে ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্থলে "ভাস্কর" পত্রের সম্পাদক হইলেন। উক্ত সংখ্যায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক শ্রীরাধানাথ বিদ্যারত্ন বিজ্ঞাপন দেন যে অতি সত্বর দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ মহাভারতের আদিপর্ব্ব মুদ্রিত হইয়া সাধারণে বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে। ১৮৫৯ সনের ৫ই এপ্রিল "ভাস্কর" সম্পাদক বিজ্ঞাপন দেন যে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের "চণ্ডা" মুদ্রাঙ্কন সমাপন হইয়াছে। 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' এই সংখ্যার পর ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে নাই।

সংবাদ প্রভাকর (১৮৫৮)

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে ১২৬৫ সালের ১লা বৈশাখ (১৩ই এপ্রিল, ১৮৫৮) এর "সংবাদ প্রভাকর" ও ও তাহার সহিত বাৎসরিক সংবাদ প্রভাকরের ক্রোড়পত্র (১২৬৪এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ) এক সংখ্যা আছে। ইহাতে

(৪) 1926, p. 55.

(৫) ১৮৫৮ (১৩ই এপ্রিল) সংবাদ প্রভাকরের ক্রোড়পত্রে এই পত্রিকার উল্লেখ আছে।

(৬) "চমৎকার মোহনের" পরিচয় পরে দেওয়া হইতেছে।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিতেছেন: "হে পরমপূজ্য পরমাত্মন্! অদ্য তোমার কৃপায় এই প্রভাকর পত্রের বয়ঃক্রম ২৮ অষ্টবিংশতি বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমরা তোমাকে স্মরণ করিয়া বাঙ্গালা ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ শুক্রবার দিবসে ইহার জন্ম প্রদান করি। তৎকালে সপ্তাহে শুদ্ধ একবার করিয়া প্রকাশ হইত। ১২৪৩ অব্দের ২৭ শ্রাবণ বুধবার অবধি ১২৪৬ হায়নের ৩০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সপ্তাহে বারত্রয়িক রূপে প্রকাশ হইয়া তৎপরদিবসেই অর্থাৎ ঐ সম্বতের ১ আষাঢ় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যথা-নিয়মে ক্রমশই দৈনিক রূপে প্রকাশ হইয়া আসিতেছে।"

অন্যান্ত বিষয়ের মধ্যে ১২৬৪ সালের বিদায় ও ১০৬৫ সালের রাজ্যাভিষেক (গদ্য ও পদ্য) উল্লেখযোগ্য। বহুবাজারস্থ দত্ত বংশীয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত ইংরাজী কবিতা হইতে বঙ্গানুবাদের জন্য যে পুরস্কার প্রদান করেন পার্ণেলের "হার্মিট" কবিতা অনুবাদ করিয়া জনৈক কলিকাতা নিবাসী ছাত্র সেই পুরস্কার লাভ করেন। প্রভাকরে সেই কবিতা প্রকাশিত হয়। (৭) ইহা ব্যতীত শ্রীমতী ঠাকুরাণী দাসী বিরচিত লঘু ত্রিপদী ছন্দে একটী কবিতাও এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। সেকালে এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র মহলে বাঙ্গালী বিদ্বেষ সম্বন্ধে "সংবাদ প্রভাকর" বলিতেছেন: "ধর্ম্ম এবং সত্যের যন্ত্র স্বরূপ যে সংবাদ পত্র, সেই সংবাদপত্রের ইংরাজী সম্পাদকেরাও অধুনা আমার দিগের কপাল দোষে সম্পাদকীয় নামে কলঙ্কগ্রহণ করিতেছেন। বুড়ো হরকরা ক্রমে যেন শিশু হইয়া দিন দিন এক একটা আবদার করিতেছেন। 'ইংলিসম্যান্' "English man" এই ক্ষণে নূতন ইংলিসম্যান্ হইয়া আর বাঙালিঘেঁসা হন না। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া, তিনি কেবল নামে মাত্র ফ্রেণ্ড, কিন্তু ইণ্ডিয়ার প্রতি তাঁহার ন্যায় শত্রুতা আর কেহই করেন না।"

হাদে—"ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" নামক এক খানি নূতন পত্র, এখনো তাঁহার আটকৌড়ে হয় নাই, গায়ে আঁতুড়ে গন্ধ ভন্ ভন্ করিতেছে, ইনি ভুঁয়ে পড়িয়া "ট্যাঁ" করিতে শিখিয়াই আমার দিগের বিরুদ্ধে বিলক্ষণ আস্ফালন করিতেছেন।...যেমন ইংরাজ এবং ইংরাজ সম্পাদকগণ এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যুবক বাঙালিদিগকে উপহাস ছলে "Young Bengal" এই শ্লেষের শব্দ উল্লেখ করিয়া থাকেন, সেইরূপ সম্প্রতি আমরাও পরিতাপ ছলে বুড়ো যুবা সমুদয় ইংলিসকে "Young English" এইরূপ বিলাপের বাক্য ব্যক্ত করিব।"

১২৬৪ সালের সমস্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ মধ্যে প্রকাশ যে শ্রীরামপুর তমোহর যন্ত্রালয় হইতে বৈশাখের প্রথমাবধি "বিজ্ঞান মিহিরোদয়" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশারম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গুপ্ত "অজেন্দুমতী চরিত" নামক একখানি বাংলা পুস্তক প্রকাশ করেন।—কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেবের বন্ধুরা প্রকাশ্যরূপে সভা করিয়া তাঁহাকে এক এড্রেস ও রজতময় আহারোপযুক্ত তৈজস প্রদান করেন এবং মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রেরাও তাঁহাকে এক কৃতজ্ঞতাসূচক আবেদন পত্র এবং এক উৎকৃষ্ট রূপার মৎস্যাধার দিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংবাদে প্রকাশ যে কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব বিলাত গমন করেন।—কোর্ট অফ ডিরেকটার্স সাহেবেরা কলিকাতার শিল্প বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ মাসিক ৩৫০৲ টাকা প্রদানের অনুমতি প্রেরণ করেন। (৮) ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিশন বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চূড়ামণি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ বাংলা অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার প্রথমভাগ প্রকাশ করেন।—গবর্ণমেণ্ট ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা এক বৎসরের জন্য নিবারণ করণার্থ এক নূতন নিয়ম প্রকাশ করেন।

শিপাহী বিদ্রোহ সংক্রান্ত নানাপ্রকার ঘটনার বিবরণ এই ক্রোড়পত্র পাঠে পাওয়া যায়। শ্রাবণ মাসের সংবাদ মধ্যে প্রকাশ যে ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা নামক আইন প্রচার হইবায় রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্র ও হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর প্রভৃতি কয়েকখানা পত্র উঠিয়া যায়।—সুধাবর্ষণ, (৯) দূরবীণ, এবং

(৭) এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, ৫ই আগষ্ট, ১৮৫৯ —হরিমোহন গুপ্ত প্রণীত পার্ণেলের হার্মিট নামক উপকাব্যের বঙ্গানুবাদ 'সন্ন্যাসী উপাখ্যানে'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

(৮) সমাচার সুধাবর্ষণে (১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮) কলিকাতা নগরস্থ শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের হস্তজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

(৯) সমাচার সুধাবর্ষণের পরিচয় পরে দেওয়া হইতেছে।

সুলতানল আখবর পত্রের সম্পাদকদিগের বিরুদ্ধে ইওাইটী বিল গ্রাহ্য হয়।—সমাচার সুধাবর্ষণ সম্পাদক ইওাইটী মোকদ্দমায় নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হন এবং দুরবীণ ও সুলতানল আকবর সম্পাদকেরা দোষ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাহাতে উভয়েরি ১৲ করিয়া দণ্ড হয়।—ভাদ্র মাসের সংবাদ মধ্যে প্রকাশ যে হিন্দু স্কুল ৺শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের বাটীতে উঠিয়া আইসে। কালেজ বাটীতে গোরা স্থাপিত হয়।—স্বর্গগত বাবু আশুতোষ দেবের ভবনে "মহাশ্বেতা" নামক নাটকের অভিনয় হয়। আশ্বিন মাসের সংবাদের মধ্যে দেখিতে পাই শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ কালিদাসের "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটক মূল সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক মুদ্রিত করেন। অগ্রহায়ণ মাসের সংবাদমধ্যে প্রকাশ—বাঙ্গাল সেক্রেটরি আপিসে এক বাটী নির্ম্মিত হইতেছে, তথায় গবর্ণমেণ্টের ছাপাখানা স্থাপিত হইয়া রাজকীয় সকল বিষয় ছাপা হইবে।—১০ই অগ্রহায়ণ দিবসে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের "বিদ্যোৎসাহিনী" রঙ্গভূমিতে বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অনুরূপ সুন্দররূপে প্রদর্শিত হয়।—সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিত রামজয় তর্কালঙ্কার লোকান্তরিত হওয়াতে উক্ত কোর্টের পণ্ডিতী পদ এককালে রহিত হয়।

পৌষ মাসের সংবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জন্য মিঃ ফেরগুসন সাহেব সরিফ কলিকাতার প্রধান এবং উকীল সেণ্ডিস সাহেব ডেপুটী সরিফ হইলেন।—কলিকাতার মদ্যালয় সকল অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বন্ধ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হয়।—কলিকাতার সব-ট্রেজরর মিঃ হার্ব্বি সাহেব হিন্দু-পর্ব্বাহের ছুটী রহিত করিবার জন্য যে অভিপ্রায় পত্র গবর্ণমেণ্টে প্রদান করেন তাহা অগ্রাহ্য হয়।—কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্সেরা এমত অনুমতি করেন, প্রকাশ্য পদের অধ্যক্ষেরা সর্ব্বসাধারণের ন্যায় পুলিস মোকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। মাঘ মাসে দেখিতে পাই—বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় লোকান্তরিত হয়েন।—৬ই মাঘ দিবসে "কলিকাতা বার্ত্তাবহ" নামে একখানি নূতন সমাচার পত্র প্রকাশ হয়।—চুঁচুড়া নিবাসী রামচন্দ্র দিক্ষিত কর্ত্তৃক "সুবোধিনী পত্রিকা" নাম্নী একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিতা হয়।—বৈকালে মদের দোকান বন্ধ হওয়াতে বিক্রয়ের হানি জন্য রাধাবাজারের দোকানদারেরা পুলিস কমিশনারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ করেন।—জেলা যশোহরের অধীন রাঁড়ুলি গ্রামের রাজকীয় বাংলা পাঠশালার ছাত্রেরা অতি উৎকৃষ্ট রূপে শকুন্তলা নাটকের অভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক অনেকের মনমুগ্ধ করে।

ফাল্গুন মাসের সংবাদে প্রকাশ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিমলা হইতে লাহোরে আগমন করেন। তিনি আবার লাহোর হইতে সিমলায় যাত্রা করিয়াছেন।—সংপ্রতি এখান হইতে বিলাতে এবং বিলাত হইতে এখানে বিদ্যুতীয় বার্ত্তাবহ যোগে সপ্তাহে সংবাদের যাতায়াত হইতেছে।—ভারতবর্ষের সমস্ত প্রজার প্রতিনিধি হইয়া বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিলাত গমন করিবেন, এমত শুনা যাইতেছে।—কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পূর্ব্বতন ছাত্র বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র বিলাতে চিকিৎসা বিদ্যার পরীক্ষায় প্রশংসিত হইয়াছেন।—নেত্ররোগিদিগের জন্য মেডিকেল কলেজে স্বতন্ত্র এক খণ্ড অথবা স্বতন্ত্র এক বাটী নির্ম্মিত হইবেক।—"রচনা রত্নাবলী" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ হয় (১০)।—"বিচারক" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ হয়।—বিদ্যাশিক্ষার্থ জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পাদ্রী ডল সাহেবের দ্বারা আমেরিকায় গমন করেন। (১১)

চৈত্রের সংবাদে প্রকাশ—বিলাতের কর্ত্তারা আমাদিগের রাজপুরুষদিগের এমত আদেশ করেন যে, ভারতবর্ষের প্রজারা কর্ম্মসংক্রান্ত কোন উৎসবে বা অন্যান্য ব্যাপারে যেন কোনরূপ মনস্তাপ না পায়, এবং ধর্ম্মের সংক্রান্তের উপর যদ্যপি কোনোরূপ আইন প্রচলিত থাকে তবে তাহা অবিলম্বে রহিত করা হয়।—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নরম্যাল স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত আদালতে কর্ম্ম প্রদান করণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করায়, তাঁহারা তাহাতে সম্মত হয়েন।—মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র যিনি বিলাতে চিকিৎসা-

(১০) চমৎকার মোহনে (২৭ নবেম্বর, ১৮৫৮) ইহার ১, ২ সংখ্যার বিজ্ঞাপন আছে।

(১১) এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে, ১৫ এপ্রিল, ১৮৫৮, জগৎচন্দ্রের আমেরিকা হইতে লিখিত পত্র ও প্রস্তাব প্রকাশিত হয়।

বিষয়ক পরীক্ষা দিবার জন্য গিয়াছিলেন তিনি তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিষয়ে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। —কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এল উপাধিসূচক আইনের পরীক্ষা গত ১ মার্চ্চ দিবসে সমাধা হয়, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ বি এ উপাধি প্রাপ্ত হইলে অবিলম্বে বি. এল. উপাধি প্রাপ্ত হইবেন।—মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় নীলমাধব হালদার, দীনবন্ধু দত্ত, করুণাকুমার সেন, রহিম খাঁ ও কালীচন্দ্র দত্ত উত্তীর্ণ হন।—সম্প্রতি কোন স্থূলেখক ব্যক্তি দ্বারা বঙ্গভাষায় কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেবের জীবনবৃত্তান্ত ঘটিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হয়।

"ছাত্র এবং পারিতোষিক" শীর্ষক বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে গদ্যে অথবা পদ্যে রচনার নিমিত্ত পুরস্কার কালীকৃষ্ণ শর্ম্মা, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র রায়, অবিনাশচন্দ্র রায়, রাধামাধব মিত্র এবং গিরিশচন্দ্র কুণ্ডুকে দেওয়া হয়। "প্রভাকর" প্রদত্ত পুরস্কার ব্যতীত ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও রায় তারকনাথ সেন বাহাদুর ২০৲ টাকা প্রেরণ করেন। বিজ্ঞাপন পাঠে বুঝা যায় যে উৎসাহ দেওয়ার জন্য 'প্রভাকর' অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে উত্তম রচনা ২৯শে চৈত্র শনি বাসরে প্রেরণ করিলে তাহা সভামধ্যে পঠিত হইবে ও সভাস্থ মহাশয়েরা লেখকদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন এবং তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য যৎকিঞ্চিৎ পারিতোষিক দেওয়া হইবে। রচনার বিষয় ছিল: —১। বর্ত্তমান রাজবিদ্রোহিতা বিঘটিত বিপদ বিনাশের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা। ২। বিদ্যাবিষয়ের উৎসাহদাতার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। মাত্র সাতজন রচকের রচনা আইসে এবং প্রত্যেকেই পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

(১৮৫৮র এই সংখ্যা "সংবাদ প্রভাকর" ও তৎসংলগ্ন ক্রোড়পত্রের কোন পরিচয় ডাক্তার সুশীলকুমার দে মহাশয়ের Indian Historical Quarterly (1926)র প্রবন্ধে নাই]

চমৎকারমোহন

চমৎকারমোহন নামে ইংরাজী-বাংলা সংবাদপত্র প্রতি সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার শ্রীশ্রীকান্ত শর্ম্মার দ্বারায় চমৎকার মোহন যন্ত্রে প্রকাশিত হইত। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট (১ম কাণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা) হইতে ২৭শে নবেম্বরের (১ম কাণ্ড, ৪৭ সংখ্যা) এই পত্রিকার কোন কোন সংখ্যা ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে আছে। ৩১শে আগষ্ট (১৮৫৮) "হিন্দুরত্ন কমলাকর" ইহার তীব্র সমালোচনা করেন এবং উক্ত সমালোচনা পাঠে বুঝা যায় যে "প্রিয়ম্বদ" গ্রন্থের প্রণেতা কেদারনাথ দত্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। "প্রিয়ম্বদ" ১৮৫৫ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি তথাকথিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। কেদারনাথ দত্ত "নলিনীকান্ত" নামক আর একখানি করুণ-রসাশ্রিত উপন্যাস ১৮৫৯ খৃঃ প্রকাশ করেন। ১৯শে আগষ্ট, ১৮৫৮, "চমৎকার মোহন" সংবাদপত্রে উহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা ফরাসী হইতে ইংরাজীতে অনুবাদিত কোন গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হয়।

১৮৫৮এর ১৬ই আগষ্টের চমৎকার মোহনে বঙ্গীয় নাটকের এক ইংরাজীতে লেখা সমালোচনা বাহির হয়। ইহা পূর্ব্ব প্রকাশিত কোন প্রবন্ধের শেষ অংশ মাত্র। রামনারায়ণের "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" এবং সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্রে প্রকাশিত "উত্তর রামচরিতে"র বঙ্গানুবাদের প্রশংসা এই প্রবন্ধে আছে। শিক্ষা বিষয়ে বাঙ্গালীর দৈন্য এবং বঙ্গদেশীয়দিগের নৈতিক দুর্দ্দশার সমালোচনা এই পত্রিকা প্রায়ই করিতেন। ২৬শে আগষ্ট হইতে কয়েকটী সংখ্যায় এই পত্রিকা বাল্যবিবাহের অশুভ ফলের আলোচনা করেন। কেদারনাথ দত্ত ১৮৫৬ শকে "ভারতবর্ষের ইতিহাস" লিখিতে আরম্ভ করেন। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ তাহা হইতে উদ্ধৃত। ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীর ১৮৮৬ খৃঃ বাংলা পুস্তকের তালিকানুসারে (পৃঃ ৫০) এই গ্রন্থের প্রকাশকাল বাংলা ১২৬৬ সাল ও ইংরাজী ১৮৫৯ খৃঃ। "ভারতবর্ষের ইতিহাস" হইতে অন্যান্য কয়েকটী নিবন্ধও চমৎকার মোহনে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

৯ই সেপ্টেম্বরের চমৎকার মোহনে কোন ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রীবিয়োগে যে ইংরাজী কবিতা লেখেন তাহা প্রকাশিত হয়। ইহাতে বাংলা কবিতাও ছাপা হইত। ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে শ্রীশ্রীকান্ত শর্ম্মা চমৎকার মোহনের প্রকাশকের কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলেন। উক্ত বিজ্ঞাপনে স্পষ্টই লেখা আছে যে কে, এন, দত্ত এণ্ড কোং এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন। শ্রীকান্ত শর্ম্মার পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত

নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক-পদ গ্রহণ করেন। ১৬ই সেপ্টেম্বরের চমৎকার মোহনে লিখিত হয়:

"শোভাবাজারের রাজার পুরস্কার

হরকরার সম্পাদক শোভাবাজারের কোন রাজার বিদ্যা-বিষয়কের পুরস্কার বিষয় ইংলিসমেন পত্র হইতে সংগ্রহ করতঃ আপন পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার অত্যাশ্চর্য্য আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু হরকরার একজন পত্রপ্রেরকের পত্র দেখিয়া হরকার দোষ সম্পূর্ণ অনুভব হইল। ঐ পত্রপ্রেরক লেখেন, যে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রষিয়া দেশাধিপতির নিকটে পুরস্কার প্রার্থনা করেন নাই এবং প্রষিয়াধিপ তাঁহাকে পুরস্কার দেনও নাই। সপ্তাহ গত হইল তিনি বারলিন দেশের রায়েল একাডেমি নামক বিদ্যামন্দির হইতে এক ডিপ্লোমা পাইয়াছেন।" (১২)

৭ই অক্টোবরের চমৎকার মোহনে কলিকাতা শহরে তস্করবেশী চোরের প্রাচুর্ভাব হইয়াছে এইরূপ বলা ও কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ হয়। (১৩) ২১শে অক্টোবরের চমৎকার মোহনের সম্পাদকীয় স্তম্ভে এইরূপ মত প্রকাশিত হয়:

"বাজারেতে অনেক সংবাদপত্র আছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহা সুপ্রণালিতে লিখিত হয় না। বাঙ্গালা সম্পাদকেরা সম্পাদকী কার্য্যে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, কতকগুলি কল্পিত বচনে সম্বাদপত্র পরিপূরিত করেন। কোথায় কি শ্রাদ্ধ হইল, ব্রাহ্মণেরা কি কি দিয়া বলায় করিলেন, এই তাঁহাদিগের "সংবাদ লহরী"। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের রচনা অতি কাঠিন্য শব্দে বিভাসিত হয়, অতএব তাহা সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাৎপর্য্যাকর্ষণ করা দুরূহ। মহিলারা সুতরাং তাহার বিন্দু বিসর্গ মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। সম্বাদপত্র চলিত ভাষায় লেখা উচিত…… বাঙ্গালা পত্র বিশেষ ইতরতার আধার, বাঙ্গালা সম্পাদকেরা রহস্য শব্দের তাৎপর্য্য বোঝেন না, ইতরত্বই তাঁহাদিগের পত্রের রহস্য। অতএব তাঁহারা মরণান্তে অনন্তনীয় নিন্দানল সহ্য করিবেন। আমাদিগের পত্রে এ সকল বিরল "কারণেই" ইহা সকলের আদরণীয় হইবে। কেহ কেহ আমাদিগের পত্রের গৌরব (যে গৌরব অল্পকাল মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে) দেখিয়া ঈর্ষা করেন। করুন, ক্ষতি নাই।" (১৪)

২০শে নবেম্বর, ১৮৫৮, "কবিতা কাহাকে বলে" (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) শীর্ষক প্রবন্ধে "চমৎকার মোহন" লেখেন:—

"আমরা এক্ষণে বঙ্গভাষার উৎপত্তি স্থান নিরূপণাধীন হই। বঙ্গভাষা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ীদিগের দ্বারায় লিখিত ভাষায় নিবিষ্ট হয়, বঙ্গীয় কথিত ভাষা সংস্কৃত, হিন্দি, প্রাকৃত পারস্য, আরব্য, প্রভৃতি অনেক ভাষা হইতে জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু সংস্কৃত ইহার সর্ব্বাংশে মূল। নানা গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদিগের বোধ হইতেছে বিদ্যাপতির "প্রাচীন পদ্যাবলি" নামক গ্রন্থ বাঙ্গালার প্রথম গ্রন্থ সন্দেহ নাই। ইহা চৈতন্যচরিতামৃতের এক শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হয়, "বিবিধার্থ সংগ্রহের" ৪৯ খণ্ডে ইহার এক পদ সংগৃহীত আছে।"

চমৎকার মোহনের পুস্তক-বিজ্ঞাপনের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত মাতালের দুরবস্থা ও হাস্যরত্নাকর, এবং হরিশ্চন্দ্র দাস পালিতের রহস্য ইতিহাস প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। এই পত্রিকায় ২৭শে নবেম্বর (১৮৫৮) প্রাণনাথ দত্ত যে "রচনারত্নাবলী"র ১ম ও ২য় সংখ্যার বিজ্ঞাপন দেন সেই পত্রিকায় উল্লেখ সংবাদ প্রভাকরেও আছে।

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট মাসের কয়েকটী সংখ্যা "এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ" ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে আছে। বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে:

"এই এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ প্রত্যেক শুক্রবারে কলিকাতা চৌরঙ্গী সদর ষ্ট্রীট ১০ নম্বর ভবনে সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।"

১৮৫৮ খৃঃ ২৭শে আগষ্টের এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে জনৈক পত্রপ্রেরক রামনারায়ণ তর্ক-

(১২) ১৮৫৮এর ১৬ই সেপ্টেম্বরের সমাচার সুধাবর্ষণে প্রকাশ যে প্রুশিয়াধিপতি রাজা রাধাকান্ত দেবকে এক প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

(১৩) সংবাদ প্রভাকর, ১৯শে শ্রাবণ, ১২৭২ (২ আগষ্ট, ১৮৬৫)—পুরোহিত চোর, কৃত্রিম গুরু চোর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(১) এই শ্লেষ "হিন্দুরত্ন কমলাকর" পত্রিকার উদ্দেশে লিখিত মনে হয়।

রত্নের রত্নাবলী নাটকের অভিনয়ের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন :—

"সম্প্রতি কিয়দ্দিবস মাত্র অতীত হইল রত্নাবলী নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত হইয়া কোন ভাগ্যধর সন্তানের উদ্যানগৃহে অভিনীত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্করত্ন ইহার প্রণেতা। ইনি সুশিক্ষিত সমাজের এক অপূর্ব্ব নাটক রচক বলিয়া পরিচিত আছেন।......এই গ্রন্থ অভিনয় কালেই প্রস্তুত হইয়াছে তজ্জন্য চলিত বঙ্গীয় ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে সংস্কৃতের ভাবও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে .....তর্করত্ন মহাশয় আপনার গ্রন্থকে সরল করিয়াছেন......রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের বেলগাছিয়া উদ্যানে এই নাটকের অভিনয় ক্রিয়া সমারোহ পূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়াছে। নাট্যকারেরা ভাবভঙ্গী ইত্যাদি বিষয়ে আপনাপন ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন।... অতীব আক্ষেপের বিষয় এই যে এক্ষণে নাটকামোদ বৃদ্ধি পাইয়া লোকের মন কুসংস্কার পরতন্ত্র হইল। প্রণয় ঘটিত উপাখ্যানেই লোকে বিশেষ অনুরাগী। বিশেষ দুষ্মন্ত ও পুরুরবা রাজার ন্যায় উদয়নের প্রেম নির্দ্দোষ নহে। এরূপ নাটক দর্শনে কোন উপকার লব্ধ না হইয়া বরং মন দুষ্ট হয়। নাটকের যথার্থ অভিপ্রায় এই যে স্বদেশের কুনীতি কুরীতি দূরীভূত হইয়া সন্নীতি প্রচলিত হয়, সভ্যদেশে যখন নাটকের প্রথম সৃষ্টি হয় তখন এই উদ্দেশই লোকদিগের প্রথম প্রবৃত্তি ছিল। এদেশেও কুপ্রথার অভাব নাই সুতরাং নাটক স্থলে তাহার পরিচয় দেওয়াই অত্যাবশ্যক। কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফল, বাল্যবিবাহের দোষ, জাত্যভিমানের অনিষ্ট, বিধবা বিবাহ প্রতিষেধ ব্যবস্থার সুফল, মদ্যপান ও বেশ্যা শক্তির দোষ, প্রজার প্রতি জমীদার ও নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য এই সমস্ত নাটকে অভিনীত হইলে দেশের কথঞ্চিৎ কল্যাণ সম্পাদিত হয়। জ্ঞানজনক আমোদই যথার্থ আমোদ, তদিতর বিশুদ্ধ নহে... শুনিতে পাই এই অপবিত্র পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়া সভ্য মণ্ডলী মধ্যে বিতরিত হইতেছে।"

[এবিষয়ে আমাদিগের যে কিছু বক্তব্য আছে তাহা আগামি সংখ্যক পত্রে প্রকাশিত হইবেক। অদ্য স্থানাভাব। এং গেং সং।]

উক্ত তারিখের এডুকেশন গেজেটে জনাই ট্রেনিং স্কুলের শ্রীশ্রীপতি মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞাপন দেন :—"এতদ্দেশীয় বাল্য-বিবাহ কুপ্রথার দোষোদঘাটন পূর্ব্বক আমি একখানি নূতন নাটক রচনা করিতেছি।" [বিজ্ঞাপনের শিরোনামা "বাল্যবিবাহ নাটক"]

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহে প্রকাশ যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৬০ সালের নিমিত্ত প্রবেশ প্রয়োজক পরীক্ষার বিষয়ের মধ্যে বাংলার জন্য—হিতোপদেশ (অশ্লীল অংশ ত্যক্ত), বিদ্যাকল্পদ্রুম (সমুদ্র যাত্রা এবং ভ্রমণ বিষয়ক), মহাভারত, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাকৃতিক ভূগোল প্রভৃতির নির্ব্বাচিত অংশ পাঠ্য ছিল। (৮ জুলাই ১৮৫৯)

উক্ত বৎসরের ১৩ই মে এডুকেশন গেজেট সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "স্ত্রীশিক্ষা বিরোধিদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ বক্তব্য" লিপিবদ্ধ করেন। ২৪শে জুন ও ৮ই জুলাইয়ের এডুকেশন গেজেট "এতদ্দেশে শিক্ষার উন্নতি" প্রবন্ধে দেশ বিদেশীয় লোকের এদেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে দানের প্রশংসা করেন। ৮ই জুলাইয়ের এই পত্রে প্রকাশ যে ইয়ং সাহেবের সংস্কৃত কলেজ তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের সঙ্গে কথোপকথন করেন।

সম্বাদ ভাস্কর

এই পত্রিকার কয়েকটী মাত্র সংখ্যা (১৮৫৮-৬১) ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে আছে। বিজ্ঞাপনে প্রকাশ : "এই সম্বাদ ভাস্কর পত্র সহর কলিকাতার শোভাবাজারীয় বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিজ ভবনে প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার ও শনিবাসরীয় প্রাতঃকালে প্রকাশ হয়।" ১৮৫৮ খৃঃ ২রা অক্টোবরের বিজ্ঞাপন মধ্যে নীতিরত্ন, জ্ঞানপ্রদীপ, ভগবদ্গীতা, পারস্য উপন্যাস, সপত্নী নাটক, পাকরাজেশ্বর, ভূগোলসার, চণ্ডী প্রভৃতির নাম আছে। ইহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ গৌরীশঙ্করের রচনা। (১৪) উক্ত সংখ্যায় বাবু গৌর দাস বসাখ প্রবন্ধে

(১৪) ডাঃ দে Indian Historical quarterly 1927 নীতিরত্নের নাম উল্লেখ করেন নাই। ইহার প্রকাশকাল ১৮৫৪ খৃঃ।

লিখিত হয় : "আসিয়াটিক সোসাইটীর আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী উক্তবাবু ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, এই বাবু পূর্ব্বে প্রথম শ্রেণীর দারোগা পদে নিযুক্ত ছিলেন নৈপুণ্যগুণে উচ্চ পদস্থ হইলেন।" অন্যান্য পুস্তকের বিজ্ঞাপনের মধ্যে হিন্দুদিগের রাজভক্তি, বসু পালিতের উপাখ্যান, স্বপ্নদর্শন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাকৃত ভূগোল, বৃহৎ কথা, আহানিরার চরিত্র, কৌতুক বিলাস, তর্ক বিলাস, চারি ইয়ারের তীর্থযাত্রা প্রভৃতির তালিকা আছে। ২৭শে অক্টোবরের সম্বাদ ভাস্করে শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন দেন :—

"এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে, মহাকবি কালিদাস প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় মালবিকাগ্নিমিত্র নামক যে সুরসাভিষিক্ত নাটক আছে তাহা অস্মদ্দেশীর চলিত ভাষায় নাটকাকারে প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। অতএব প্রার্থনা করি এবিষয়ে অন্য কেহ হস্তার্পণ করিবেন না ইতি।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।"

১৮৫৯ খৃঃ ২৯শে মার্চ্চ সংখ্যা সম্বাদ-ভাস্করে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের স্থলে প্রকাশক ও মুদ্রাকর রূপে শ্রীক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যের নাম পাওয়া যায়। উক্ত বৎসরের ৮ই মার্চ্চের "হিন্দুরত্ন কমলাকর" পত্রিকায় ক্ষেত্রমোহনের সম্পাদকীয় ভারগ্রহণ স্পষ্টভাবেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রমোহন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দেও যে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তাহা ঐ বৎসরের ৭ই ডিসেম্বরের সম্বাদ ভাস্করে প্রকাশিত যশোহর জেলা হইতে কোন পত্রপ্রেরকের চিঠিতে এবং মুদ্রাকরের বিজ্ঞাপনে বুঝা যায়। উক্ত দিনের সম্বাদ ভাস্করে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী ছাপা হয় :

শব্দকল্পদ্রুম

উক্ত প্রসিদ্ধ অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ড বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে গ্রহণার্থিগণ ভাস্কর যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিবেন। মূল্য বারো টাকা।

সমাচার সুধাবর্ষণ

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে "সমাচার সুধাবর্ষণ" নামে এক প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের কয়েকটী সংখ্যা আছে। রক্ষিত সংখ্যার প্রথমটীর তারিখ সন ১২৬৫ সাল ২৬ ভাদ্র শুক্রবার ইংরাজী সন ১৮৫৮ সাল ১০ই সেপ্টেম্বর (৫ বালম, ১৯০৯ সংখ্যা)। এই পত্রিকা হিন্দী ও বাংলা ভাষায় কলিকাতা বড়বাজার হইতে শ্রীশ্যামসুন্দর সেন দ্বারা প্রকাশিত হইত। ১০ই সেপ্টেম্বরের (১৮৫৮) "সমাচার সুধাবর্ষণ" সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হয় যে মিশনরি সাহেবেরা বালকদিগের নিকটে পাঠ্যবেতন গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের যে সকল বিদ্যালয় অবৈতনিক ছিল তাহা বৈতনিক হইয়াছে এবং পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কালেজ স্কুলে ছাত্রদিগকে যে বেতন দিতে হইত এক্ষণ তদ্দ্বিগুণ বেতন দিতে হইতেছে। সমাচার সুধাবর্ষণে দেশীয় বিদ্যোৎসাহীদিগকে স্বদেশের হিতসাধনে যত্নশীল হইয়া দেশীয় দুঃখী বালকদিগের অবৈতনিক বিদ্যালাভের উপায় চেষ্টা করিতে বলা হইতেছে।

১৩ই সেপ্টেম্বরের (১৮৫৮) এই পত্রে প্রকাশ : "ইংলিসম্যান পাঠে অবগতি হইল ১ ভাদ্র দিবসে চন্দ্রকোণ গ্রামে এক ভদ্র বিধবার বিবাহ হইয়াছে।" ১৬ই সেপ্টেম্বরে লিখিত হয় : "শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রুবিয়ার বাদসাহের নিকট তাঁহার সংগৃহীত শব্দকল্পদ্রুম এক সেট প্রেরণ করিবায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে এক প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।" ঐদিন আরো প্রকাশ : "আমরা উড়া ভাষা শুনিয়া অখণ্ড আক্ষেপপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে, প্রেসিডেন্সি কালেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, এ প্রস্তাবের বিশেষ তদন্ত আগামিতে অবগত হইয়া স্বাভিপ্রেত ক্ষেদ প্রকাশ করিব।" ২০ সেপ্টেম্বর সমাচার সুধাবর্ষণ লিখিতেছেন :

"পাঠকেরা অনেকেই অবগত আছেন, যে গবর্ণমেণ্ট ফরাসীদিগের চন্দ্রনগরের বিনিময়ে তাহাদিগকে পন্দিচরির নিকটে কোন স্থান প্রদানের মনস্থ করেন। এক্ষণে শুনিলাম এতৎ বিষয়ের যত লেখা হইয়াছে, তাহা লার্ড কেনিংয়ের নিকটে আছে।

ইংরাজেরা চন্দ্রনগর পাইলে অনেক মঙ্গল হয় দুর্ব্বৃত্ত দায়গ্রস্তেরা তাহা হইলে তথায় গিয়া নিরাপদে থাকিতে পারে না।" (১৫)

(১৫) সংবাদ প্রভাকর, ২৪ শ্রাবণ, ১২৭২ (৭ আগষ্ট, ১৮৬৫) দ্রষ্টব্য।

২৭শে সেপ্টেম্বরের সমাচার সুধাবর্ষণে প্রকাশ যে ১৬ই সেপ্টেম্বর কাশীপুরস্থ কাশীনাথ স্কুলের ছাত্রদিগের বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে পাদরি ডফ সাহেব, পাদরি ডল সাহেব, ডাক্তার মৌএট সাহেব প্রভৃতি অনেকানেক ভদ্র ও মান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালীরা উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষান্তে রেভারেণ্ড ডল এবং মৌএট সাহেবেরা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদিগের ধন্যবাদ করিয়া এবং বিদ্যালয়ের মঙ্গলেচ্ছায় বক্তৃতা করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর সমাচার সুধাবর্ষণ "দারোগার পদলোপ" সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন :

"আমরা শ্রুত হইলাম যে অত্র ভারতবর্ষীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কল্পনা করিয়াছেন যে তিনি দারোগার পদ একেবারে উঠাইয়া দিবেন, যেহেতু দারোগা রক্ষা করিয়া শান্তিরক্ষার প্রণালী ক্রমে দূষিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে যে প্রদেশে নিয়োগ করা যায় তথায় তাহারা সর্ব্বভক্ষ হইয়া বসেন, উৎকোচ গ্রহণ তাহাদিগের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে, করিতে কোন দ্বিধা নাই প্রজারা এইরূপে দৌরাত্ম্যে পীড়িত হইয়া সতত মাজিষ্ট্রেটীতে আবেদন করে অতএব এইক্ষণে এই প্রথা উঠিয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর। তন্নিমিত্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর দারোগাদিগের পরিবর্ত্তে মাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করিবেন তাহা হইলে প্রজামণ্ডলীর ক্লেশের পরিশেষ হইবেক।"

মরণের আধকার

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি

বাহিরে যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া রমেশ একবার স্ত্রীর শয়নগৃহে আসিল। উষার তখনও শয্যা ত্যাগ করিবার ক্ষমতা হয় নাই। একখানি মেঘরঙ্গের পাতলা শীতবস্ত্রে তাহার ক্ষীণ কিন্তু সুন্দর দেহখানি আবৃত। চূর্ণ কুঞ্চিত কুন্তলগুলি কপালের উপর কাণের কাছে পড়িয়া কাতর মুখখানিকে মনোরম করিয়া তুলিলেও রমেশের মনের উপর তাহা কোন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই।

রমেশ ড্রয়ার খুলিয়া কি একটা জিনিষ লইয়া আপনার পকেটে রাখিয়া স্ত্রীর শয্যার কাছে একবার দাঁড়াইল। একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে স্ত্রীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'এটা কি প্রেমের ব্যাধি ?'

উষা চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণে কাতর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিল, কিছু বলিলনা।

রমেশ আবার বলিল, উত্তর দিচ্ছনা যে ? শুনতে পাচ্ছনা ?

উষা কাতর কণ্ঠে বলিল, ও কথা কেন বলছ ?

শ্লেষের সহিত রমেশ বলিল, যেন কিছু জানেননা! এমনি তো পুরানো সম্পর্ক ঝালানো যায় না। তাই অসুখের নাম করে পীযূষ ডাক্তারকে ডাকানো হয়েছে। নইলে তো বুকের কাছে পাওয়া যায়না !

উষা ব্যথিত স্বরে বলিল, দোহাই তোমার এমন করে বোলোনা। আমি তো ডাক্তার ডাকতে একবারও বলিনি।

রমেশ বলিল, না, তুমি কেন বলবে !—আমি বলেছিলাম। দেখ, এখানে বসে প্রেমলীলা চলবেনা। ও-সব চালাতে চাও তো ওর বাসায় গিয়ে ওঠ গে। আমোদ পাবে।

বলিয়া রমেশ আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাচ্ছিল্যের সহিত সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। উষা ছিন্ন কপোতীর মত যন্ত্রণায় শয্যার উপর লুটাইতে লাগিল।

এ ভাবে বাহির হওয়া রমেশের প্রতি রাত্রের ঘটনা। সে যে আর প্রভাতের পূর্ব্বে ফিরিবেনা তাহাও উষার পরিচিত নিষ্ঠুর সত্য। এ-সব তাহার ক্রমে ক্রমে সহিয়া গিয়াছিল। তাহার আজিকার দুঃখ অন্তবিধ। এ দুঃখের মধ্যে বেদনা ও লজ্জা অসীম। স্বামীর কঠিন কথায় উষার চক্ষে যে জল আসিয়াছিল সেই বেদনা ও লজ্জায় সে অশ্রু শুকাইয়া গেল। কিছুক্ষণের জন্য সে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া রহিল।

এখন কেমন আছ বৌমা? আবার বসে বসে ভাব্‌ছ কেন মা? বলিয়া যে নারী কক্ষে প্রবেশ করিলেন তাঁহাকে দেখিবামাত্র উষা লজ্জিত হইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িয়া বলিল—অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে ভাল লাগ্‌ছিলনা, তাই একটু উঠে বসেছিলাম, মাসীমা।

মাসীমা শয্যাপার্শ্বে বসিলেন ও উষার ঈষৎ তপ্ত ললাটে তাঁহার শীতল হস্ত রাখিয়া বলিলেন, কিন্তু মুখ এমন শুক্‌নো কেন মা? রমেশ বুঝি আবার কিছু বলে গেছে?

উষা লজ্জিত হইয়া বলিল, না মাসীমা, কিছু তো হয়নি। আমারি ভাল লাগ্‌ছিলনা—তাই উঠে বসেছিলাম।

মাসীমা উষার চূর্ণ কুন্তলগুলি, কপালের উপর হইতে সরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, কেবল বসে বসে ভাব্‌বে, শরীরের উপর একটু মায়া কর্‌বেনা, তাই তো সেরে উঠ্‌তে পার্‌ছনা, মা। নইলে অসুখ তো তেমন কিছুই শক্ত নয়; কিন্তু তোমার দোষেই বেড়ে চলেছে। শরীরকে এত অযত্ন কর্‌লে কি শরীর টেঁকে মা!

উষা লজ্জিত হইয়া বলিল, না মাসীমা, এখন তো যত্ন কর্‌ছি শরীরের। ওষুধ পত্তোর যা বল্‌ছ তাই তো নিয়ম মত খাচ্ছি।

পার্শ্বস্থ টিপয়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া মাসীমা বলিলেন, কই মা, নিয়ম মত খেয়েছ? এই তো মিক্‌শ্চার এখনো দু'দাগ পড়ে আ'ছে। তুমি আর একটুও আমার কথা শোননা।

উষা অনুতপ্তকণ্ঠে বলিল, না মাসীমা আপনার সব কথা শুন্‌ব এবার থেকে। আর এক দাগ ওষুধ দিন—এখনি খেয়ে ফেলি।

মাসীমা শিশি হইতে ধীরে ধীরে ঔষধ ছোট কাচের পাত্রে ঢালিয়া উষাকে খাওয়াইয়া দিয়া মুখে একটু জল দিলেন। তার পর বেদানার রস করিয়া তাহাও একটু খাওয়াইয়া দিলেন ও আপনার অঞ্চলে মুখ মুছাইয়া দিলেন।

মাসীমা বলিলেন, এবার চোখ বুজে শোও তো, বৌমা; একটু ঘুম আসুক।

উষা ক্ষুদ্র বালিকার মত মাসীমার আদেশে—শয্যায় শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া রহিল। মাসীমা মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। উষা ধীরে ধীরে সত্যই ঘুমাইয়া পড়িল।

মাসীমা নিঃশব্দে মশারি ফেলিয়া দিয়া মাথার দিকের জানালা বন্ধ করিয়া অন্যান্য জানালা খুলিয়া দিলেন। পরে আপনার কাজ সারিয়া পাশের ঘরে আসিয়া শয়ন করিলেন।

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। পথের লোক-চলাচল কমিয়া আসিল। কোলাহল-মুখরিত নগরীর উপর শান্ত নীরবতা নামিয়া আসিল। এমন সময় এক দারুণ ঘটনা ঘটিল।

একখানি মোটর তাহাদের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া ঘন ঘন বাঁশী দিতে, ভৃত্যেরা আসিয়া দ্বার খুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, তাহাদের প্রভু রুধিরাপ্লুত দেহে গাড়ীর মধ্যে শায়িত। ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে তুলিয়া আনা হইল। সন্ধান লইয়া জানা গেল, রাত্রে যে স্থানে সে গিয়াছিল, সেখানে অপর এক পুরুষকে দেখিয়া, সন্দেহে তাহাকে আহত করিতে গিয়া, নিজে আহত হয় ও পুলিশের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি গাড়ী ডাকাইয়া অতি কষ্টে চলিয়া আসে। আঘাত যে এত গুরু হইয়াছিল তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু এ আঘাতেও তাহার মুখের কঠিন বাক্যের হ্রাস হয় নাই। উষাকে জাগিয়া উঠিতে উদ্যত দেখিয়া সে তাহাকে একটা ইতর ও কঠিন বাক্যে নিরস্ত করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল। মাসীমা রমেশের অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ মাসীমার নির্দ্দেশমত ডাক্তার আনিতে লোক ছুটিল। ক্ষণকাল মধ্যেই গাড়ী করিয়া ডাক্তার পীযূষকান্তি আসিয়া পৌঁছিলেন।

রমেশের আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছিল। তথাপি পীযূষকে দেখিবামাত্র তাহার মুখভাব কঠিন হইয়া আসিল। কথা কহিবার শক্তি তাহার কমিয়া আসিতেছিল, তবুও জোর করিয়া অতিকষ্টে বলিল, মশায়ের এখানে কি প্রয়োজন? মশায়কে কে ডেকেছে?

পীযূষকান্তি রমেশের বিরুদ্ধভাবের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া বলিল, আপনি বিচলিত হবেন না, একটু স্থির হয়ে থাকুন। আমার উপর যদি আপনার কোন আক্রোশ থাকে তাও বিস্মৃত হোন্। আমি এখানে চিকিৎসক ছাড়া কেউ নই। কাজ শেষ হওয়া মাত্র আমি চলে যাব।

তার পর পীযূষ রমেশকে আর কিছু বলিবার অবসর মাত্র না দিয়া তাহার আহত স্থানে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু আঘাত অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়াছিল, বিলম্বও যথেষ্ট

হইয়াছিল। সেজন্য পীযূষের যত্ন ও চেষ্টার কোন ফল হইলনা। শেষ রাত্রে রমেশের ধনুষ্টঙ্কার দেখা দিল। প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু ঘটিল।

উষা সংজ্ঞা হারাইয়া রোগশয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

(২)

গরিফায় উষার পিত্রালয় ছিল। পীযূষকান্তিদের গৃহও ঐ স্থানে। উষার পিতার সুরম্য দ্বিতল অট্টালিকা ও পীযূষকান্তির পিতার একতলা ভগ্ন গৃহের বৈষম্যের অন্তরালে উভয় গৃহস্বামীর মধ্যে যে প্রীতির বন্ধন ছিল তাহা গ্রামবাসী সকলেরই বিস্ময় আকর্ষণ করিত। দুইজনের পুত্রকন্যার মধ্যে এই প্রীতির বন্ধন বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উভয় একসঙ্গে পড়িত, একসঙ্গে খেলিত, একসঙ্গে বেড়াইত ও একসঙ্গে আগতপ্রায় যৌবনের সুখস্বপ্ন দেখিত। উষার পিতামাতার মনে জাগিল এ দুটিকে চিরদিন একত্র থাকিতে দিতেই হইবে। দু'জনকে একসঙ্গে গাঁথিয়া দিবার সংকল্পও স্থির হইয়া গেল। পীযূষ তখন হুগলি কলেজে পড়িতেছে, উষা উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অধীনে শিক্ষা পাইতেছে। দুজনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবার উপক্রম হইতেছিল।

এমন সময় মাত্র একদিনের ব্যবধানে উষার পিতা ও মাতা অতর্কিতে ইহলোক ত্যাগ করিলেন—উষার সম্বন্ধে আপনাদের সংকল্পের কথা কাহাকেও বলিয়া যাইবারও অবকাশ পাইলেননা। উষার মামা কলিকাতার বিখ্যাত ধনী। উষার মাতামহ তখনও বর্ত্তমান। তিনি আভিজাত্যের অতিশয় অভিমান রাখিতেন। উষাকে কাছে রাখিয়া তাহাকে দেশের সমস্ত সংস্রব হইতে দূরে রাখিলেন। কিশোর কিশোরীর স্বপ্ন আকাশ-কুসুমের মত কোথায় মিলাইয়া গেল।

পীযূষকান্তির পিতা পুত্রের ম্লান মুখ দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। কিন্তু তিনি নিরুপায়। পুত্রকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে ভগবানের ইচ্ছা অন্যবিধ; নহিলে এমন অকস্মাৎ উষার পিতামাতা দু'জনেরই মৃত্যু হইবে কেন? এখন উষার সহিত বিবাহের আশা দুরাশা মাত্র।

পিতা বুঝাইলেন, পুত্র শুনিয়া গেল। অন্তরে তাহাতে একটি রেখাপাতও হইল না। যৌবনের প্রেম কবে হিসাব করিয়া কাজ করিয়া থাকে? অনুরাগের উচ্ছল প্রমত্ত বারিরাশি সম্ভব অসম্ভবের সীমা-রেখার অনুশাসন কবে মানিয়া থাকে?

পিতা সব বুঝিলেন। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া একবার কলিকাতায় উষার মাতামহের কাছে গেলেন। উষার বিবাহের কথা পাড়িতেই মাতামহ প্রায় আকাশ হইতে পড়িলেন। উষা এখনও নিতান্ত বালিকা এবং তাহার বিবাহের এখন বহু বিলম্ব।

কি রকম পাত্রে উষার বিবাহ দিবার ইচ্ছা কথাটা ভয়ে ভয়ে পাড়িতে মাতামহ বলিলেন, তা এখন হইতে বলা কঠিন; তবে তাঁহার ইচ্ছা মতে যদি বিবাহ হয় তবে ভাল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার দেখিয়া উষাকে পাত্রস্থ করিবেন।

পীযূষের পিতার ভাল করিয়া বুঝাইবার ইচ্ছা ছিল যে উষার পিতার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, এবং তাঁহার পুত্রের সঙ্গে উষার বিবাহের কথা একেবারে স্থির হইয়াছিল; কিন্তু মাতামহের গাম্ভীর্য্যের কাছে কথাটা তেমন ভাল করিয়া বলিতে পারিলেননা। যেটুকু বলিলেন, তাহাতে মাতামহের মনকে স্পর্শ করিতে পারিলেননা। ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুত্রকে এই সংবাদটুকু দিলেন যে ভাল ডাক্তার বা এঞ্জিনিয়ার হইবার পূর্ব্বে উষার সঙ্গে বিবাহের আশা অসম্ভব।

সেই বৎসরই পীযূষ বি-এ পাশ করিল। প্রথমে স্থির ছিল সে এম এ পড়িবে। পড়িবার ব্যবস্থাও পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা ছিল। উষার পিতা দরিদ্র, কিন্তু আত্মাভিমানী বন্ধুকে অন্য কোন প্রকারে সাহায্য করিতে না পারিয়া পীযূষের শিক্ষার জন্য কিছু অর্থ পীযূষের নামেই রাখিয়া যান্। সেই ব্যবস্থার ফলে এম-এ ও আইন শেষ করিয়া যথেষ্ট টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত। পীযূষ কিন্তু এম্-এ পড়িতে চাহিল না; পিতার অনুমতি লইয়া সে কলিকাতায় গিয়া মেডিকেল কলেজে নাম লিখাইল। পাঁচ বৎসরে প্রশংসার সহিত পীযূষ পাশ করিল। কলেজের অধ্যক্ষ পীযূষকে সরকারি ব্যয়ে বিলাতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পীযূষের পিতা আর একবার লুব্ধ আশ্বাসে উষার মাতামহের কাছে গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। মাতামহ শুনিয়া তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন, বিলাত হইতে কিছু শিখিয়া না আসিলে ডাক্তারি শেখা সম্পূর্ণ হয় না এবং অসম্পূর্ণ ডাক্তার হওয়া না হওয়া সমান।

পীযূষ ইহা শুনিবামাত্র অধ্যক্ষকে ধরিয়া বিলাতে চলিয়া গেল। বৎসর দুই পরে যখন কৃতবিদ্য হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন উষা পরস্ত্রী। পাটনায় রমেশের সহিত তখন তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে! রমেশ বিশেষ ধনী; বিহারে তাহার বড় জমিদারী।

পিতা অনেক করিয়া বুঝাইলেন। অন্যত্র বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। বহু মিনতি করিয়া পীযূষ পিতাকে নিবৃত্ত করিল। বৎসর খানেকের মধ্যে পীযূষের পিতার মৃত্যু হইল। মাতাকে পীযূষ বহু পূর্ব্বেই হারাইয়াছিল। কাজেই পীযূষ অকৃতদারই রহিয়া গেল। কিন্তু উষা পরস্ত্রী জানিয়াও সে একদিনের জন্যও তাহার চিন্তা হইতে বিরত হইলনা। সংবাদ লইয়া পীযূষ জানিল যে উষা স্বামীর সহিত পাটনায় আছে। সে চেষ্টা করিয়া পাটনায় কাজ লইয়া আসিল। রমেশের সহিত পরিচয় করিল। সে উষার পিতৃ-বন্ধুর পুত্র – এই পরিচয় দিল। উষার সহিত সাক্ষাৎ করিল। কিন্তু নিজের মনোভাবের কথা কাহাকেও জানাইলনা।

রমেশ স্বার্থপর, কূটবুদ্ধি। Civil ডাক্তারের সহিত বন্ধুত্বে লাভ বই ক্ষতি নাই ইহা ভাবিয়া সে পীযূষের সহিত ঘনিষ্ঠতায় আপত্তি করে নাই। সে প্রথম হইতে অসচ্চরিত্র ছিল। পঠদ্দশা হইতে তাহার নিষিদ্ধ স্থানে গতায়াত ছিল ও অন্যবিধ চরিত্র-দোষও ঘটিয়াছিল। সেজন্য কয়েক দিনের মধ্যে সে পীযূষকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। ক্রমে আপনার স্বাভাবিক চাতুর্য্যের ফলে পূর্ব্বকথা কিছু কিছু জানিয়া লইল। রমেশ সন্দেহ করিল পীযূষ এখনও পর্য্যন্ত উষার প্রতি অনুরক্ত। প্রথম হইতেই সে উষার প্রতি অল্প-বিস্তর অত্যাচার করিত। এই সন্দেহের পর হইতে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া গেল। উষা রোগশয্যা গ্রহণ করিল ও অবস্থা কঠিন হইয়া উঠিল। অত্যাচারের মাত্রা যখন সহ্যশক্তির সীমা ছাড়াইতেছিল, এমন সময় অকস্মাৎ রমেশের মৃত্যু হইল।

(৩)

রমেশের মৃত্যুতে একটা পুলিশের হাঙ্গামা ঘটিল। বহু চেষ্টায় সে হাঙ্গামা মিটাইতে হইল। রমেশের শ্রাদ্ধাদি শেষ হইয়া গেল। ইহার মধ্যে উষার পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। পীযূষ ছুটি লইয়া সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উষার চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় রত হইল।

উষার মামা একবার আসিয়া খোঁজ লইয়া গেলেন। পীযূষকান্তির ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া যাইবার সময়ে তাহার উপরেই ধন্যবাদের সহিত সব ভার দিয়া গেলেন। মাতামহ তখন পরলোকে। মামা জানিলেনও না যে এই পীযূষকান্তিই যৌবনের প্রারম্ভে উষাকে পাইবার জন্য বহু সাধনা করিয়া বিফল হইয়াছিল; এবং তাহারই ফলে সে সংসারে থাকিয়াও অন্তরে সন্ন্যাসী।

উষার শরীরে নানা ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছিল; রমেশই তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে দায়ী। পরিশেষে অযত্ন ও অবহেলায় ও সর্ব্বোপরি তাহার শরীরের দুর্ব্বলতা ঐ সমস্ত রোগকে দেহের মধ্যে স্থায়ী আসন দিয়াছিল। রমেশের মৃত্যুর পর তাহার জীবনের আশা অল্পই অবশিষ্ট ছিল।

বিরাট ধৈর্য্য, বিপুল উৎসাহ ও তাহার হৃদয়ের অনির্ব্বাণ প্রেম লইয়া পীযূষকান্তি উষার প্রাণের জন্য মরণের সঙ্গে এক মাস কাল যুঝিয়া মরণকে ফিরাইয়া দিল। উষা বাঁচিল। কিন্তু তাহার অত্যধিক ম্লান মুখ দেখিলে মনে হইত সে যেন না বাঁচিলেই ভাল হইত।

উষার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া পীযূষের আবাল্যের সমস্ত কথা একে একে মনে পড়িত। পিতার সেই আদরিণী উষার এই অবস্থা দেখিয়া সে অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিত। উষার পিতা বাঁচিয়া থাকিলে সে আজ উষাকে লাভ করিয়া কত সুখী হইত, উষাকেও কত সুখে রাখিতে পারিত—ইহা মনে করিতে দুঃখে আনন্দে তাহার হৃদয় দুরু দুরু করিত। মনের আবেগ অসহ্য হইয়া উঠিত। মনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত দুর্ব্বলতা দমন করিয়া সে শুধু চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, আত্মীয়ের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে উষা সুস্থ হইল। ক্রমে চিকিৎসকের কার্য্য শেষ হইল। আত্মীয়েরও বিদায়ের সময় আসিল।

আজ পীযূষ বাসায় ফিরিবে। এতদিন উষাকে কাছে একা পাইয়াও পীযূষ পুরানো দিনের একটা কথাও তুলে নাই। সেদিনের কথা উষার মনে আছে কি না, এ কথাটাও জিজ্ঞাসা করে নাই। আজ বাসায় ফিরিবার দিন পীযূষের কেবলি মনে হইতে লাগিল, এত সুযোগ পাইয়াও মনের

একটা কথাও সে উষাকে বলিতে পারে নাই—মূঢ় সে। যৌবনের প্রারম্ভেও মূঢ়তার জন্য সে উষাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিতে পারে নাই; আজিও সে সেই পুরাতন নির্বুদ্ধিতারই জন্য উষাকে সেদিনের একটা কথাও বলিতে পারে নাই। রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না—রত্নকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়—এই অতি সরল সত্যকেও সে এতদিনে আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

আজ সে স্থির করিল, একটা কথা সে জিজ্ঞাসা করিবে।

উষা তখনও দুর্ব্বল। শয্যায় বিশ্রাম করিতেছিল। বাহিরে দিনের আলোক ম্লান হইয়া আসিয়াছে; ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকার উঁকি মারিতেছে। এমন সময় পীযূষ অতি সন্তর্পণে ডাকিল—'উষা!'

সে স্বরের গাঢ়তায় উষা চমকিয়া বলিল—'কি? ডাকছ আমায়?'

পীযূষ বলিল, 'হাঁ। একটা কথা তোমাকে বল্‌ব?'

উষা। বল।

পীযূষ। তুমি কি সুখী হয়েছিলে?

উষা। সে কথা আর কেন?

পীযূষ। তবু তুমি একটিবার বল সে কথা।

উষা। মানুষ কি সুখী হয় পীযূষ-দা? আমি তো তা বিশ্বাস করিনে।

পীযূষ। কেন হবেনা? সকলের ভাগ্য কি সমান?

উষা। তোমার বিদ্যা, তোমার বিত্ত, তোমার খ্যাতি—এ তো কারুর চেয়ে কম নয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও কি তুমি সুখী হতে পেরেছ?

পীযূষ। আমি পারিনি তার কারণ অন্য।

উষা। যাকে জিজ্ঞাসা করবে সেই বল্‌বে আমি সুখী নই; কিন্তু তার কারণ অন্য। কিন্তু আশ্চর্য্য এই—একে ভাবে অপরে কত সুখী।

পীযূষ। আমি আজ একটু পরেই বাসায় ফিরে যাব। আমার একটা কথা রাখ্‌বে?

উষা। কি কথা বল।

পীযূষ। শরীরকে এত অবহেলা কোরোনা। এবার করলে তোমার ভাঙা শরীর আর বইবে না। বল যত্ন করবে?

উষা। যেটুকু সম্ভব তাই করব।

পীযূষ। অর্থাৎ করবেনা। আচ্ছা আর একটা কথা রাখ। শরীর খারাপ হলেই—আমি যেন একটা খবর পাই।

উষা। আচ্ছা।

পীযূষ। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌ব। যেন দেখা পাই।

উষা। আমার ভাই নেই; তুমি সেই ভাইয়ের মত। তোমার আস্‌তে কোন বাধা নেই।

পীযূষ স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। উষার নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। পীযূষ কক্ষের আলোক জ্বালিল। উষার চক্ষু নিমীলিত। মুখ ম্লান, কিন্তু নির্বিকার। পীযূষের যে কথা বলিবার ছিল তাহা সে বলিতে পারে নাই। পীযূষ ভাবিল, উষা কি সে কথা বুঝিয়াছে?

পীযূষ স্থির করিল, উষা বুঝে নাই। বুঝিলে সে কি এত সহজে ঘুমাইতে পারিত?

কিন্তু উষা কি সত্যই ঘুমাইতে'ছিল? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পীযূষ কক্ষ ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আর একবার উষার ম্লান মুখ, ক্লান্ত নিমীলিত আঁখি দুটির পানে চাহিল। তার পর ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

উষা চক্ষু মেলিয়া চাহিল। কাণ পাতিয়া পীযূষের পদধ্বনি শুনিতে লাগিল। পদধ্বনি ক্ষীণ হইতে লাগিল। সিঁড়ির উপর আসিতে পদধ্বনি দ্রুততর ও স্পষ্টতর হইল। তার পর তাহা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

উষা উঠিয়া কক্ষের আলোক নিভাইয়া দিল। তার পর পথের দিকের মুক্ত বাতায়নের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পীযূষ তখন নীচে নামিয়া গেটের পথ ধরিয়াছে। অতি মন্দগতিতে সে চলিতেছিল। তাহার চরণ যেন চলিতে চাহিতেছিলনা। গেটের কাছে পৌঁছিয়া সে একবার উষার কক্ষের পানে চাহিল। কক্ষের আলোক নির্ব্বাপিত দেখিয়া তাহার দুঃখ গভীরতর হইল। শেষবার কক্ষের অন্তর্ভাগ দেখিবার সৌভাগ্যও তাহার হইল না। সে জানিতেও পারিল না যে উষা বাষ্পাকুল আঁখি মেলিয়া বাতায়ন-পথ হইতে তখন তাহারই পানে চাহিয়া আছে। পীযূষ যখন গেট পার হইয়া রাজপথের অগণিত লোকের

সহিত মিশিয়া গেল, তখন উষা দুর্বল খিন্ন দেহ ও শোকাকুল মন লইয়া শয্যায় ফিরিয়া আসিল।

গমনশীল পীযূষের মন তখন চীনাংশুকের মত সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছে সেইদিক নির্দ্দেশ করিয়া উড়িতেছিল। পীযূষ যদি এই সময়ে একবার সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিত তাহা হইলে সে বিদীর্ণ কিন্তু পরিতৃপ্ত হৃদয়ে দেখিত যে, যে উষা দারুণ ঔদাসীন্য দেখাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছিল সেই উষা তখন শয্যার উপর লুটাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

(৪)

রমেশের মাসীমা হঠাৎ দেশে গিয়াছেন। তিনি পীযূষের কাছে সংবাদ দিয়া গিয়াছেন যে উষা এখনও দুর্ব্বল, মাঝে মাঝে যেন সে উষার সংবাদ লয়। বাড়ীতে ঝি চাকর ব্যতীত আর কেহই রহিলনা।

উষাকে দেখিতে আসার জন্য পীযূষের মন ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কল্পনায় সে উষাদের বাড়ীতে আসিল, কম্পিত হৃদয়ে উষার কক্ষে প্রবেশ করিল। উষার সঙ্গে কথা কহিল। কিন্তু সত্যকার আসিতে তাহার সাহস হইলনা।

পীযূষ কর্ম্মে একাগ্রতা হারাইল, তাহার শক্তির হ্রাস হইল, উষাকে দেখিবার অত্যুগ্র ইচ্ছাকে দমন করিতে তাহার মনের শান্তি দূরে গেল ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইল। উষার কাছে যাইবার জন্য, তাহাকে আর একটিবার দেখিবার জন্য তাহার সমস্ত অন্তর আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। তথাপি সে সেই অত্যুগ্র ইচ্ছাকে প্রাণপণে দমন করিয়া রহিল। দিবারাত্রির প্রতি মুহূর্ত্ত উষার সঙ্গলাভ, উষার সঙ্গে কথা কহিবার মধুর প্রলোভন তাহাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দুই দিন সে জোর করিয়া রহিয়া গেল। তৃতীয় দিনে সে আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিলনা। মনের গতি রোধ করা যখন আর তাহার দ্বারা সম্ভব হইলনা, তখন এক অপরাহ্নে সে উষার কাছে আসিল।

উষা শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিল। পীযূষকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'এস; আমি আজ ভাব্‌ছিলাম তোমার কাছে একবার খবর পাঠাব।'

উষার শীর্ণ ও বিবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া পীযূষ বলিল, 'তোমার আবার অসুখ করেছিল?'

উষা লজ্জিত হইয়া বলিল, 'তেমন বিশেষ কিছু নয়; শরীরটা সামান্য একটু বেভাব মত হয়েছিল।'

তুমি বস, দেখি তোমার হাত দেখি, বলিয়া পীযূষ উষাকে বসাইয়া তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিল। তার পর করতল দ্বারা তাহার ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া বলিল, এই বুঝি তোমার শরীরের বেভাব। এখনও যে জ্বর রয়েছে। উষা ইহার কোন উত্তর দিল না।

পীযূষ বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, তুমি যখন আমার একটা কথাও শোননা, তখন আর কি বলব। এত করে বলে গেলাম শরীরের উপর একটু যত্ন কোরো, অসুখ হলে একটা খবর দিও। কিন্তু তুমি তা করবেনা।

উষা এবার বলিল, একটু অসুখ হলেই যদি তোমায় খবর দিতে হয় তাহলে রোজই তোমায় ডাকতে হয়।

পীযূষ বলিল, তাই যদি হয় সেটুকুও কি তোমার সহ্য হয় না, উষা?

উষাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া পীযূষ পুনরায় বলিল, তুমি হয় ত বল্‌তে চাও সেটা খারাপ দেখাবে। কেন দেখাবে?

উষা নিরুপায় হইয়া বলিল, এর উত্তর কি তোমায় বলে দিতে হবে?

পীযূষ হঠাৎ যেন মরিয়া হইয়া উঠিল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, কেন হবে না? আমায় বুঝিয়ে দাও কেন খারাপ দেখাবে। তুমি একদিন আমার বাক্‌দত্তা ছিলে এ কথা তোমার মনে আছে?

উষা আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, সে কথা আর কেন তুলছ?

পীযূষ তেমনি ক্ষোভ ও উত্তেজনার সহিত বলিল, কেন তুলব না? আমার বাবা যখন তোমার মাতামহের কাছে বারবার ভিক্ষুকের মত গিয়ে বৃথা আবেদন জানিয়ে ফিরে এসেছিলেন, তখন খারাপ দেখায়নি? তোমার মাতামহের মুখের সামান্য একটা কথা অবলম্বন করে আমি তোমায় পাব এই ভরসায় বিলেতে ডাক্তারি পড়্‌তে গেলাম। ফিরে আস্‌তে তর সইল না, তারি মধ্যে যখন তোমার সঙ্গে রমেশের বিবাহ হয়ে গেছে, তখনও সেটা একটুও খারাপ দেখালনা? আর যত

খারাপ দেখাবে আমি যদি দিনান্তে তোমার চিকিৎসার জন্য একটিবার আসি ? না জেনে, না শুনে, না অনুসন্ধান করে, আমাকে বঞ্চিত করে, একটা মাতাল, একটা বেশ্যা-সক্ত ধনীর হাতে যখন তোমাকে ধরে দেওয়া হল, তখন সেটা খারাপ দেখায়নি ? তখন কারও ধর্ম্মজ্ঞানে বাধেনি—তোমারও নয়। আর যত বাধা, যত সংকোচ এল যখন আমি ভিখিরীর মত মুষ্টি ভিক্ষার জন্য তোমার দুয়ারে দাঁড়ালাম। যে অগাধ ঐশ্বর্য্যে আমার ন্যায্য অধিকার ছিল সেই ঐশ্বর্য্যের এককণা যখন আমি ভিক্ষাস্বরূপ চাইলাম তখনি তোমাদের যত ধর্ম্মজ্ঞান এল ! আমাকে বঞ্চিত করবার সময় যদি এর এককণা সংকোচ কারু মনে জাগৃত, তাহলে তো আমার আজ এমন অবস্থা হ'ত না ? তখন কেন তাঁরা এমন ব্যবস্থা করলেন ? তখন তুমি কেন একটা সামান্য কথা বল্লেনা ?

ভয়ে লজ্জায় উষা হাত যোড় করিয়া কহিল—তোমার পায়ে পড়ি আমায় ক্ষমা কর। নীচে চাকর-বাকর রয়েছে—তারা যদি দৈবাৎ উঠে এসে এসব শোনে তাহলে আমার যে মুখ দেখাবার যো থাকবে না !

উষার বিবর্ণ মুখ একেবারে রক্তশূন্য দেখাইতেছিল। সে মুখের পানে চাহিয়া, সেই ভয়-ব্যাকুল কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া পীযূষ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। উষাকে যে সে কতখানি আঘাত করিয়াছে তাহা ভাবিতে তাহার সারা চিত্ত অনুশোচনায় ভরিয়া গেল। সে ব্যাকুল হইয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, আমায় ক্ষমা কর উষা, আমার অন্যায় হয়েছে। তোমায় যে আমি এসব কথা বলব এ আমি কখন ভাবিনি। স্বার্থপরের মত আমি আমার দুঃখের কথাই ভেবেছি, তোমার দুঃখের কথা মনেও করিনি। অতীতের কথা তুলে আমি তোমাকে আর কখন দুঃখ দেবনা। কিন্তু আজ একটি কথা তোমাকে বলব, তার জন্য তোমার অনুমতি চাইছি।

উষা কাতর হইয়া বলিল, কি কথা বলবে বল। তার জন্য অনুমতি চাওয়া কেন ?

পীযূষ বলিল, দেরী করলে আমি কথা তুলতেই পারব না ; তাই শীগ্‌গির আমি কথাটা বলে ফেলি। যদি এতে দোষ হয় ক্ষমা কোরো।

উষা ভীত চকিত দৃষ্টিতে পীযূষের পানে চাহিয়া, সে কি সাংঘাতিক কথা বলিবে তাহার প্রতীক্ষায় রহিল।

পীযূষ তাড়াতাড়ি কথাটা সমাপ্ত করিবার জন্য বলিল, আমার মনোভাবের সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়নি। কিন্তু যতদিন তোমার স্বামী বেঁচেছিলেন আমি একটি ক্ষণের জন্যও সে কথা তুলিনি ; কোন অভিযোগ জানাইনি। কিন্তু আজ আর তোমাকে এভাবে ছেড়ে যেতে পারিনে।

উষা নিরাশার স্বরে বলিল, এ যে নিতান্তই আমার বিধিলিপি ; এর আর তুমি কি করবে !

পীযূষ বলিল, অক্ষর বিধির ; কিন্তু লিপি সাজাই আমরা। একবার লেখা লিপি কেটে আবার অন্যভাবে লেখা যায়। আমি তোমার কাছে তোমাকে সুখী করবার, তোমার সঙ্গে থাকার অধিকার চাইছি ! আমায় তুমি সেই অধিকারটুকু আজ ভিক্ষা দাও।

উষা ভয়ে ভয়ে বলিল, কি করে তা হবে ?

পীযূষ বলিল, আমি তোমাকে বিবাহ করবার অনুমতি চাইছি।

উষা বিপুল বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত পীযূষের পানে চাহিতে পীযূষ আবার বলিল, তুমি অত আশ্চর্য্য হোয়ো না। আমায় কথাটা শেষ করতে দাও। বিধবা-বিবাহ হিন্দুসমাজেও একেবারে অচল নয়। তোমার কোন সন্তানও হয়নি যে তাই বলে তুমি আমায় নিরস্ত করবে। ভালবাসা বা বিশ্বাস নষ্ট হবে এ কথা বললে আমি মানব না। কি ভাবে তোমার বিবাহিত জীবন কেটেছে তা আমার অবিদিত নেই। একটা কথা তুমি বলতে পার যে—একজনের সম্পত্তির অন্ততঃ সামান্য অংশও গ্রহণ করে কি করে তুমি অন্যকে বিবাহ করবে। তার উত্তরে আমি তোমায় বলব তুমি এই মুহূর্ত্তে এ সমস্ত ছেড়ে চলে এস। আমার যা কিছু আছে, সে সমস্ত তোমার সেবা করতে পেয়ে ধন্য হবে।

উষা কি একটা বলিতে যাইতেছিল। পীযূষ বাধা দিয়া বলিল, তুমি আর একটু চুপ কর দয়া করে। আমি আর কখন হয়ত এসব কথা বলার সুযোগ ও শক্তি পাবনা। আজ যখন এ-কথা আরম্ভ করতে দিয়েছ, এ কথাটা আজ শেষও করতে দাও। তুমি হয়ত বলবে—মাত্র কয়মাস

তুমি বিধবা হয়েছে, এখন বিবাহের কথা বড় অশোভন হবে। আমি তাড়াতাড়ি করে তোমাকে কোন প্রকারে হীন করতে চাইনে। আমি প্রতীক্ষা করতে জানি। তুমি যতদিন বল্‌বে—যে ভাবে বল্‌বে তোমার জন্য ততদিন সেইভাবে প্রতীক্ষা কর্‌ব। তুমি সুধু বল যে তুমি আমাকে গ্রহণ কর্‌বে। কালই তুমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে এস। আমার বাসায় এখন যেতে যদি আপত্তি থাকে আমি অন্য বাসা করে তাতে লোকজন রেখে দিচ্ছি; তুমি সেখানে থাক। ইচ্ছা কর তুমি বাপের বাড়ীতে গিয়েও থাকতে পার। সেখানে তো তোমাকে কেউ কিছু বল্‌তে পার্‌বেনা। সে তোমার নিজের সম্পত্তি। এখন বল—তুমি আমাকে গ্রহণ কর্‌বে?

উষা এতক্ষণ পরে কথা কহিল। ম্লানমুখে কাতরস্বরে বলিল, তোমার দুঃখের কথা আমি সব জানি; সে কথা ভাব্‌লে আমি নিজের দুঃখও ভুলে যাই। কিন্তু ভগবান্ যখন সুখী করেন নি তখন জোর করে আর সুখের আশা কোরোনা। তুমি যা বল্‌ছ তা আর সম্ভব হয় না।

পীযূষ কাতর হইয়া বলিল, অত সহজে—একটুও না ভেবে এ উত্তর দিওনা। যে কথা জীবন মরণের চেয়েও বড় তার জন্য একটুখানি সময় ব্যয় কর। একটুখানি ভাব।

উষা তথাপি বলিল, সে আর হয়না। সে সম্ভব নয় পীযূষ দা।

পীযূষ শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, আচ্ছা কেন সম্ভব নয় সে কথাটা একবার বল। দেখি যদি আমি তোমার যুক্তি খণ্ডন করতে পারি।

উষা বলিল, এ যুক্তির কথা নয়। এ সংস্কারের কথা। সংস্কারের বিরুদ্ধে যাবার শক্তি আমার নেই। আমায় ক্ষমা কর।

এবার পীযূষ নিরাশ হইয়া বলিল, তাহলে এই তোমার শেষ উত্তর?

উষা নির্ব্বাক্ রহিল। ইহার উত্তর দিল তাহার জলভরা চক্ষু!

পীযূষ এতক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইল। উষার তখনকার করুণ মুখের পানে চাহিতে, তাহার দুটি সজল চাহনির উপর দৃষ্টি রাখিতে পীযূষের মুখে যে কঠিন কথা আসিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল। পূর্ব্ব সংকল্পিত কঠিন কথার পরিবর্ত্তে সে শুধু বলিল—উষা,—বহুকাল নিরাশার পর আমি বড় আশা করে আজ এসেছিলাম। আজ তাই শতগুণ নিরাশা নিয়ে যাচ্ছি। আর আমি তোমাকে বিরক্ত কর্‌তে আস্‌বনা।

পীযূষ এবার নতদৃষ্টিতে কক্ষত্যাগ করিতে উদ্যত হইল।

উষা এবার ছুটিয়া গিয়া পীযূষের হাত ধরিল। কাতরকণ্ঠে বলিল, তোমাকে দুঃখ দিতেই আমার জন্ম। পার তো আমায় ক্ষমা করে যাও। আমার উপর রাগ রেখে যেওনা। আর তুমি যাবার আগে আমাকে একটা ভিক্ষা দাও।

উষার করস্পর্শে পীযূষের সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল।

পীযূষ অশ্রুবাষ্পভরা কণ্ঠে কহিল, ভিক্ষা বোলোনা—তোমার কি ইচ্ছা, কি আদেশ বল।

উষা চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল, মরবার আগে একটিবার তোমার দেখা যেন পাই। একটি কথা আমার বল্‌বার বাকি রইল। যদি খবর দিতে পারি দয়া করে এস। সেদিন বল্‌ব।

প্রাণপণ শক্তিতে অশ্রু রোধ করিয়া পীযূষ বলিল—তুমি খবর দিলেই আমি যেখানে থাকি আস্‌ব। আমি কোথায় থাক্‌ব এখন ঠিক নেই। বাড়ীর ঠিকানায় খবর দিলেই আমি পাব।

পরমুহূর্ত্তে পীযূষ কক্ষের বাহিরে আসিল ও সিঁড়ি বাহিয়া—দেহভার বহিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল। যখন গেট পার হইয়া পীযূষ রাজপথে নামিল—তখন তাহার মনে হইল জীবনে তাহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই—সুখহীন আশাহীন দেহভার বহিয়া আর কণামাত্র লাভ নাই!

(৫)

এক বৎসর পরে এক প্রভাতে কাশীর একটা স্বল্পপরিসর গলির মধ্যে বাড়ীর নম্বর দেখিতে দেখিতে পীযূষ এক দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া তাহার ভিতরকার ঠিকানাটা দেখিয়া লইল। তার পর বন্ধ দুয়ারের কড়া নাড়িয়া অনুচ্চ স্বরে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে একবার ডাকিল—উষা!



একলব্যের গুরুদক্ষিণা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পরমেশ রায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

দুয়ারের পাশেই যেন কে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। একটিবার ডাকিবামাত্র ভিতর হইতে দুয়ার খুলিয়া এক বিধবা যুবতী বলিল, আসুন, আপনি তো পীযূষবাবু—গরিফা থেকে আসছেন?

পীযূষ ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিতেছিলনা। কষ্টে বলিল, হাঁ। উষা কোথায়?

যুবতী বলিল, আসুন, এই উপরের ঘরে।

যুবতী পথ দেখাইয়া চলিল। পীযূষ তাহার অনুসরণ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল ও যুবতীর নির্দ্দেশমত একটি কক্ষে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে পীযূষ শুনিল, এতদিনে এসেছ?

পীযূষ চমকিয়া উঠিল। স্বর শুনিবামাত্র সে চিনিল ইহা উষার কণ্ঠস্বর; কিন্তু যেন বহু দূর হইতে আসিতেছে। প্রথমটা সে উষাকে দেখিতে পায় নাই। কক্ষের এক প্রান্তে শয্যা রচিত ছিল। উষার শীর্ণ দেহ সেই শয্যার সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছিল। কি শীর্ণ সে মুখমণ্ডল, কি বিশীর্ণ দেহ। সুধু সেই চক্ষু দুটি তেমনি আয়ত, তেমনি উজ্জ্বল—বুঝি পূর্ব্বের অপেক্ষাও উজ্জ্বল হইয়া দীপ্ত মণির মত জ্বলিতেছে!

যুবতী উষাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি তাহলে কাজকর্ম্ম সেরে আসি দিদি। তুমি ততক্ষণ এঁর সঙ্গে কথা কও।

উষা বলিল—তাই এস ভাই।

যুবতী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বাহির হইতে দুয়ারটি ভেজাইয়া দিল।

কক্ষমধ্যে আর দ্বিতীয় কোন আসন ছিল না। পীযূষ শয্যা হইতে একটু দূরে ঘরের মেঝের উপর বসিতেছিল। উষা শয্যার উপর আপনার শিয়রের কাছটা দেখাইয়া দিয়া বলিল—মাটিতে ব'স না। এইখানটিতে উঠে এস আজ।

পীযূষ বাহিরেই জুতা খুলিয়া আসিয়াছিল। শয্যার উপরে উঠিয়া সে উষার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিল। একবার উষার আপাদমস্তক চিকিৎসকের দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল। একবার নাড়ী টিপিল। তার পর অত্যন্ত ক্ষোভ ও হতাশার স্বরে বলিল, এ কি করেছ উষা! আমায় আগে একটিবার কেন ডাকনি?

উষা অতি ধীরে বলিল, আগে খবর দেবার যে মুখ রাখিনি পীযূষদা। কি করে খবর দেব? আর আমি যে এই দিনটির জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। নইলে তোমায় কিসের জোরে ডাকতাম।

পীযূষ অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, এক বৎসর আগে অভিমান-ভরে কি বলেছিলাম, তাই কি আজ তুমি আমায় এই শাস্তি দিলে?

উষা অতি শান্তকণ্ঠে বলিল, তুমি মনেও কোরো না যে তোমার উপর আমার এতটুকু রাগ বা অভিমান আছে। তোমার উপর এতটুকু অভিমান করবার যে তুমি উপায় রাখনি। আমার জন্য কি কষ্ট, কি দুঃখ তুমি সয়েছ, সে কি আমি জানিনে পীযূষ!

তাহারা দুইজনে বাল্য হইতে সাথীর মত ছিল, দুইজনেই পরস্পরকে নাম ধরিয়া ডাকিত। তাহাদের পিতা-মাতাও জানিতেন যে চির-জীবনই দুইজনে যখন জীবন-মরণের সাথী থাকিবে তখন তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকায় কোন ক্ষতি নাই। তাঁহারাও এই ডাক শুনিয়া তৃপ্তির হাসি হাসিতেন। রমেশের সহিত বিবাহের পর যেদিন প্রথম উষার সহিত আবার পীযূষের দেখা হয়—সেদিন উষার মুখে সে 'পীযূষদা' শুনিয়াছিল। তাহার কারণও সে কতকটা অনুমান করিয়াছিল। আজ এত কাল পরে উষার কণ্ঠে সেই পুরাতন মধুর আহ্বান শুনিয়া পীযূষের অন্তর এই দুঃখের মধ্যেও পুলকিত হইল।

পীযূষ বলিল, যদি জান উষা, যদি সেই পুরানো দিনের কথা এখনো মনের কোণে রেখেছ, তবে কেন নিজে এত দুঃখ সয়ে আমার কষ্ট দশগুণ বেশী করে দিলে?

উষা ধীরে ধীরে পীযূষের দক্ষিণ হাতখানি তুলিয়া আপনার হাতের মধ্যে লইয়া ক্ষণকালের জন্য চক্ষু মুদিয়া রহিল। তাহার মুদিত চক্ষুর প্রান্ত দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তার পর চক্ষু মেলিয়া বলিল, আমায় তার জন্য সমস্ত মন থেকে ক্ষমা কর পীযূষ। পার তো সে দুঃখ ভুলে যেও।

তার পর একটু স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, ছ'সাত বৎসরের সমস্ত কথা আজ বুকের মধ্যে তোলপাড় করে আসছে, আজ কোন্ কথা রেখে কোন্ কথা বলি, তা স্থির করতে পারছিনে। তবু যে জন্য তোমায় ডেকেছি তা না বলে গেলে মরণে আমি শান্তি পাবনা।

পীযূষের চক্ষে এবার জলের ধারা ছুটিল। সে আপনার হাতে বদ্ধ উষার হাত দুখানি কোলের উপর রাখিয়া সজল চক্ষে বলিল, তোমার আর কিছু বল্‌তে হবেনা, উষা। তোমার এই শীর্ণ কম্পিত হাত, তোমার ওই সজল চোখ আমার এতদিনকার ব্যথা হরণ করে সব কথা বলে দিয়েছে। এ কথার চেয়ে আর কোন কথা বড় নয়। তুমি বড় শ্রান্ত হয়েছ, বড় দুর্ব্বল দেখাচ্চে তোমায়। তুমি স্থির হ'য়ে থাক। আমি সব বুঝেছি।

উষা একটু স্তব্ধ থাকিয়া যেন কিঞ্চিৎ শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিল, সব কথা হয় ত বোঝনি, পীযূষ, হয় ত বা বুঝেছ। তবু আমায় বল্‌তে দাও। আজকের দিনে আমি তোমায় সব বলে যাব এই ভরসায়, যেদিন তোমায় চোখের জলে বিদায় করেছিলাম, সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত দিন গুণ্‌ছি। আজ ঠিক ৩৬৬ দিন হয়েছে। এই দেখ কেমন করে আমি দিনের হিসাব রাখ্‌ছি। তোমার হাত থেকে আজ আর আমার হাত উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা কর্‌ছেনা। বালিশের তলায় একখানি কাগজ আছে। একটিবার সেখানি বার কর তো পীযূষ।

পীযূষ তাহার মুক্ত বাম হাতখানি দিয়া উষার মাথার বালিশের নীচে হইতে একখানি সুদৃশ্য ছোট খাতা ও একটি কলম বাহির করিল। অতি সুন্দর, অতি শুভ্র 'ফুলস্‌কেপ' মাপের দুই তা কাগজ তিনবার ভাঁজ করিয়া ১৬ পৃষ্ঠা করা। সুতার পরিবর্ত্তে মাথার একটি কেশ দিয়া বাঁধা। উপরের পৃষ্ঠাখানিতে লাল অক্ষরে লেখা আছে পীযূষের স্মৃতি।

পীযূষ খাতাখানি খুলিয়া দেখিতে লাগিল—বড় যত্নে, প্রাণভরা মমতার সহিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হইতে একটির পর একটি পীযূষের নাম লেখা। সব অক্ষরগুলি লাল।

উষা বলিল, ওরি পৃষ্ঠায় আমার জীবনের সব ইতিহাস লেখা আছে পীযূষ। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তোমার নাম ২৫ বার করে লেখা আছে। এক একটি পৃষ্ঠায় ২৫টি দিনের ইতিহাস। সুধু শেষ পৃষ্ঠায় ১৬টি নাম লেখা। আজ ঠিক ৩৬৬ দিন পূর্ণ হয়েছে। আজ তুমি আস্‌বেই এ আমার মন বলে দিচ্ছিল। তাই প্রতিদিনকার মত আজও প্রত্যূষে তোমার নাম লিখে পূর্ণাহুতির মত নীচে নিজের নাম লিখে রেখেছি। আজকের তারিখও লিখে রেখেছি—জানি আজকে তোমায় দেখ্‌তে পাব।

পীযূষের সারা চিত্ত আনন্দে দুঃখে অভিভূত হইয়া গেল। যে তাহাকে একদিন শত অনুরোধেও ফিরাইয়া দিয়াছিল—কি আশায়, কি প্রতীক্ষায় সে দিনের পর দিন সুধু তাহারি নাম লিখিয়া নাম গণিয়া কাটাইয়াছে!

পীযূষ অশ্রুবিগলিতকণ্ঠে বলিল, সেদিন এর একটা কথাও কেন বলনি, উষা? আমি যে তাহলে জোর করে তোমার কাছে রইতাম। তোমার শত অনুরোধ বা তিরস্কারেও তোমাকে ছেড়ে যেতামনা।

উষা বলিল, আমি যে সে কথা জানতাম, পীযূষ। তাই আমি বড়ই কঠিন হয়ে তোমাকে যেতে বলেছিলাম। তুমি আমাকে আগের মত ভালবেসে গ্রহণ করতে চেয়েছিলে, কিন্তু তাতে যে তোমার গৌরব খর্ব্ব হ'ত। লোকে হয় ত বল্‌ত—তুমি এতদিন এরি প্রতীক্ষায় বসে ছিলে। তোমাকে চিরজীবন ভালবাসব, চিরদিন তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে সেবা কর্‌ব - আবাল্যের এ বাসনা যখন সফল হ'ল না, তখন আশাহীন, অবলম্বনবিহীন অনুতাপদগ্ধ প্রাণ কি করে তোমায় সমর্পণ কর্‌তাম! সর্ব্বস্ব দিয়েও যাকে তৃপ্তি হতনা, শুষ্ক শীর্ণ ফুলের মত সত্যকার প্রাণহীন দেহ তাকে কি করে দিতাম? তুমি সেদিন বড় দুঃখে চলে গেলে। তোমাকে তবু বল্‌তে পারলাম না, আমি তোমাকে তখনও কত ভালবাসি। সংস্কারের দৃঢ় বাঁধন, মন্ত্র দিয়ে বাঁধা কঠিন সম্বন্ধের শক্তি, তোমার নিন্দার চিন্তা, কিছুতে মন থেকে দূর করতে পারলামনা। হৃদয় চুরমার হয়ে গেল, তবু তোমাকে মনের কথা এতটুকুও বল্‌তে পারলামনা।

কিন্তু যখনি তুমি চলে গেলে, সেই সময় থেকে আমার জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠ্‌ল। কেন তোমায় সব কথা বলিনি এই ভেবে দুঃখের সীমা-পরিসীমা রইলনা। ক্রমশঃ মৃত্যুর পথে এগিয়ে এলাম। মনে মনে ভগবান্‌কে বলিলাম, জীবনে যাকে পেলামনা, যে হতে বঞ্চিত হয়ে অসহ্য দুঃখ সইলাম, মরণের পর যেন তাকে পাই। সুধু এই উদ্দেশ্য নিয়ে বেঁচে রইলাম—জীবনে যে কথা তোমাকে বল্‌তে পারিনি, মরণের সময়টীতে সে কথা যেন বলে যেতে পারি। আজ এই মরণের তীর হতে আমি তোমার। আমায় তুমি গ্রহণ কর, পীযূষ!

বলিয়া উষা পীযূষের দিকে তাহার মুক্ত হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

পীযূষ দেখিল উষার প্রসারিত হস্ত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। সে উষার কম্পিত হস্ত আপনার হাতের মধ্যে লইল। উষা কিছুক্ষণের জন্য প্রায় অপলক দৃষ্টিতে পীযূষের হাতের মধ্যে হাত রাখিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে নিদ্রাভারে তাহার চক্ষু দুটি মুদিয়া আসিল। মুখে শান্তির প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিল।

ঘণ্টা দুই পরে সেই যুবতী ফিরিয়া আসিল। উষাকে নিদ্রিত দেখিয়া সে আবার ফিরিয়া গেল। চুপি চুপি বলিয়া গেল—বহুদিন সে উষাকে এমন শান্তভাবে ঘুমাইতে দেখে নাই। ঘুম আর একটু গাঢ় হইলে তিনি যেন উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া স্নান সারিয়া লন; ততক্ষণে তাহার রান্না শেষ হইয়া যাইবে।

পীযূষ বলিল, আপনি রান্না শেষ করে কাছে এসে বসুন, তার পর আমি উঠ্‌ব।

যুবতী চলিয়া গেল। কাজ শেষ করিয়া কাছে আসিয়া বসিতে পীযূষ উঠিল এবং অল্প সময়ের মধ্যে স্নানাদি শেষ করিয়া লইল। তার পর একবার বাহিরে গেল। বলিয়া গেল যে ফিরিয়া আসিয়া খাইবে, এবং ইহার মধ্যে যদি উষা উঠে তো যুবতী যেন বলে সে শীঘ্রই ফিরিবে।

পীযূষ যখন ফিরিল তখন তাহার সঙ্গে একজন ডাক্তার। উষা তখন জাগিয়া ছিল। ডাক্তার আসিয়া পীযূষের কথামত নাড়ী, মুখ, চক্ষু ও বক্ষঃ পরীক্ষা করিলেন। হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করিবার সময় বক্ষের উপর দুইটি ক্ষত দেখিয়া ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কিসের ক্ষত। উষা জানাইল উহা বিশেষ কিছু নহে, এমনি কাটার দাগ।

ডাক্তার বাহিরে আসিয়া বলিলেন, বড় দুঃখের বিষয়—এঁকে বাঁচানো আর মানুষের হাতে নয়। ইনি যে এখনো বেঁচে আছেন সেই আশ্চর্য্যের বিষয়। হঠাৎ এই মুহূর্ত্তে যদি মারা যান্ তাহলেও আমি বিস্মিত হবনা। আমার বিশ্বাস আজই এঁর মৃত্যু হবে। আপনি সাবধান থাক্‌বেন। আধ ঘণ্টা অন্তর নাড়ী দেখ্‌বেন, আর হার্টের উপর লক্ষ্য রাখ্‌বেন। কোন উপকারে তো আপনার আস্‌তে পারলামনা। কিন্তু যদি দরকার মনে হয় আমার খবর দিলেই আমি আস্‌ব।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। পীযূষ আসিয়া উষার কাছে বসিল। উষা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নিজে বড় ডাক্তার, আবার অন্য ডাক্তার কেন নিয়ে এলে?

পীযূষ বলিল, আপনার লোককে দেখা ডাক্তারের বিদ্যায় কুলায় না।

উষা বলিল, আমায় তুমিই দেখ। যতক্ষণ আমি বাঁচি, তুমিই আমার কাছে থেক। আমায় এই সবশেষ ও সবশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত কোরোনা।

ইহা বলিতে উষার চোখে জল আসিল। পীযূষ চক্ষু মুছাইয়া বলিল, আচ্ছা। উষার হাত সে আপনার হাতের মধ্যে লইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল।

দুপুর কাটিয়া গেল। অপরাহ্ণ আসিল। দিনের আলোক ক্রমে ম্লান হইতে লাগিল।

বক্ষঃ পরীক্ষা করিতে করিতে পীযূষ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বুকে এতগুলি দাগ কিসের?

উষা মৃদু হাসিল।

পীযূষ বলিল, হাসি উত্তর নয়। বল কিসের দাগ?

উষা বলিল, বলেছি তো ঘায়ের দাগ?

পীযূষ বলিল, কিসের ঘা?

উষা বালিশের তলা হইতে সেই নামাবলির খাতাখানি বাহির করিয়া আপনার চোখের সামনে ধরিতে বলিল।

পীযূষ তাহাই করিল।

উষা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার এই নাম কি দিয়ে লেখা জান?

পীযূষ সভয়ে সসন্দেহে জিজ্ঞাসা করিল—কি দিয়ে?

উষা বলিল, আমার বুকের রক্ত দিয়ে। কাঁটা দিয়ে একটি জায়গা ক্ষত করে সেখান থেকে রক্ত নিয়ে তোমার নাম লিখতাম। একটা ক্ষত বড় হয়ে গেলে সেটা ছেড়ে আর একটা জায়গায় ক্ষত করতাম—

পীযূষ আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—উষা! তার পর জিজ্ঞাসা করিল, কেন এ রকম করতে?

উষা ধীরে ধীরে বলিল—তাতে সামান্য যে একটু লাগ্‌ত সে জন্য আনন্দ হ'ত। তোমায় কত দুঃখ দিইছি—তাই এ কষ্টর জন্য একটু তৃপ্তি পেতাম। কাঁটা ফুটিয়ে রক্ত তুলে নিতাম আর ভাবতাম, তুমি কি একদিন আমার এ ব্যথা অনুভব করবেনা—এ কথা জান্‌বেনা—আমার ক্ষমা করবেনা?

কি দুঃখে উষার দিন কাটিয়াছে, কি কষ্টে সে দিন গণিয়া গণিয়া মর্ম্মন্তুদ যাতনা সহিয়াছে, তাহার করুণ চিত্র পীযুষের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। উষার হাতখানি আপনার কোলের উপর রাখিয়া সে তাহার বক্ষের ক্ষত কয়েকটির উপর পরম যত্নে পরিপূর্ণ প্রেমের সহিত আপনার দক্ষিণ করতল রাখিল। তাহার কম্পিত অঙ্গুলি ধীরে ধীরে সেই ক্ষতগুলির উপর চালনা করিতে করিতে তাহার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল।

সেই স্নিগ্ধ—বুঝি বা বহু-প্রত্যাশিত পরশে, সেই সজল চক্ষুর দর্শনে উষার সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিয়া কদম্বের মত শিহরিয়া উঠিল। চক্ষুর জ্যোতি সহসা তীব্র ও অপার্থিব হইল। পরক্ষণে হস্তদ্বয় বারেকের জন্য দৃঢ় হইয়া আবার শিথিল হইয়া পীযুষের কোলের উপর পড়িয়া গেল। সেই জ্যোতিষ্মান্ চক্ষুর্দ্বয় পীযুষের মুখপানে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। উষার একসময়কার অনিন্দিত কুসুম-পেলব—এখনকার শীর্ণ—তবু সুন্দর মুখখানি স্থির হইয়া আসিল। সর্ব্ব দেহ নিশ্চল হইয়া গেল।

উষা মৃত্যুর শীতল কোলে আশ্রয় পাইল।

পীযূষ একবার উষার নাড়ী দেখিল, একবার বক্ষঃ পরীক্ষা করিল। দেখিল সব স্থির—সব স্তব্ধ!

তার পর মরণের পূর্ব্বক্ষণে উষা তাহাকে যে অধিকার দিয়া গিয়াছে—তাহার বলে সে উষার শির আপনার অঙ্কোপরি তুলিয়া লইয়া তাহার ললাটের উপরকার চূর্ণ কুন্তলগুলি সরাইয়া দিয়া সেই মরণাহত পরম সুন্দর পরম প্রিয় মুখের পানে স্নিগ্ধ সজল নয়নে চাহিয়া রহিল।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

জয়দেব ও গীতগোবিন্দ *

সমালোচনা

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে এম-এ, ডি-লিট্

বাঙ্গালা দেশের কবি জয়দেবের অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ গীতগোবিন্দ, কেবলমাত্র বৈষ্ণবদিগের নহে, সমস্ত বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহার একটি বিশুদ্ধ ও সুসম্পাদিত সংস্করণ বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও রসজ্ঞ ব্যক্তি। সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিবার সংকল্প হইয়াছে, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সহযোগিতায় তিনি তাহার সম্পাদনের ভার লইয়াছেন। সুতরাং গীতগোবিন্দের এই অভিনব সংস্করণ তাঁহার ন্যায় সুরসিক ও ভক্তের উপযুক্তই হইয়াছে। বাঙ্গালা ও দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত গীতগোবিন্দের অনেকগুলি সংস্করণ প্রচলিত আছে; কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে মূলের সহিত চৈতন্য-সম্প্রদায়-সম্মত পূজারী গোস্বামীর টীকা ও সম্পাদকের স্বকৃত সরল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, ১৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ মুখবন্ধে সম্পাদক মহাশয় জয়দেব ও গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে নানা তথ্য ও প্রবাদের সমাবেশ ও সমালোচনা করিয়াছেন। কবির জীবনী ও সাময়িক প্রসঙ্গ, কাব্য-কথা, বাঙ্গালা বৈষ্ণব ধর্ম্মের পূর্ব্ব ইতিহাস, জয়দেবের বৈষ্ণব ভাবের বৈশিষ্ট্য, রাধাতত্ত্ব, রসোপাসনা প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত, পরিশিষ্টে অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত কতিপয় শ্লোকের পাঠাদির তারতম্য, গীতগোবিন্দের প্রায় ৪০ খানি টীকাগ্রন্থের পরিচয়, ও গীত-গোবিন্দের অনুকরণে ১৩ খানি কাব্যগ্রন্থের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। বোধ হয়, সাধারণ পাঠকের জন্য সম্পাদিত বলিয়া সম্পাদক মহাশয় পাঠভেদের নির্দেশ করেন নাই, কিন্তু গ্রন্থের মূল ও টীকা কোনও নির্দ্দিষ্ট পুঁথি অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হইয়াছে কি না তাহারও কোন বিবরণ নাই।

দীর্ঘ ভূমিকাটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত, এবং জয়দেব সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিতে সম্পাদক মহাশয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে সকল বিবিধ বিষয়ের অবতারণা করা

* কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ। পূজারী গোস্বামীর টীকা ও ভূমিকাদি সহ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা. ১৩৩৬।

হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে ; কিন্তু এই সকল প্রশ্ন যখন উত্থাপিত হইয়াছে, তখন এ সম্বন্ধে দুএকটি সাধারণ কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ভূমিকায় 'জীবন-কথা' শীর্ষক নিবন্ধে জয়দেব সম্বন্ধে যে বিবরণ সম্পাদক মহাশয় বিবৃত করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই কিংবদন্তী-মূলক। যখন গ্রন্থখানি কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হয় নাই, তখন প্রবাদ বা ঐতিহ্যকে ঐতিহাসিক তথ্য হইতেই পৃথক করিলেই ভাল হইত ; এবং যে সকল তথ্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে, সেগুলিরও স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন ছিল। সংগৃহীত সমস্ত কিংবদন্তীর যে ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তাহা মনে হয় না ; কিন্তু এই গল্পগুলির একটি উপকারিতা আছে। ইহাদের মধ্যে জয়দেবের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা তথ্যমাত্রদর্শী ঐতিহাসিকের গ্রহণযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে পরবর্ত্তী সময়ে বৈষ্ণব ভক্তেরা তাঁহাকে ও তাঁহার কাব্যকে কিরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এ সকল কাহিনী ছাড়িয়া দিলে, কবির কাব্যই তাঁহাকে বুঝিবার আমাদের একমাত্র অবলম্বন ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার কাব্য হইতে তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের কথা বেশী কিছু জানা যায় না। যে শেষ শ্লোকে কবি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা আবার সকল পুঁথিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সংস্করণে এই শ্লোকটি ধরা হইয়াছে ; ইহা হইতে জানা যায় যে কবির পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী, এবং পরাশর প্রভৃতি প্রিয়বন্ধুর প্রীত্যর্থে গীতগোবিন্দ রচিত হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় কুত্রাপি পাঠ-ভেদ নির্দ্দেশ করেন নাই, কিন্তু কোন কোন পুঁথিতে তাঁহার মাতার নাম রামাদেবী বা রাধাদেবী এইরূপও পাওয়া যায়। প্রথম সর্গের 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী' এবং দশম সর্গের 'জয়তি পদ্মাবতীরমণ-জয়দেব-কবি-ভারতী-ভণিতমতিশাতম্'—এই দুই পদ হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, জয়দেবের পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী। শঙ্কর তাঁহার রসমঞ্জরী টীকায় উভয়ত্র এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। যদিও পূজারী গোস্বামীর টীকায় প্রথম উদ্ধৃত পদটির এরূপ ব্যাখ্যা করা হয় নাই, তথাপি দশম সর্গ হইতে যে দ্বিতীয় পদটি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যায় পূজারী গোস্বামী 'তথানাম্নী জয়দেবপত্নী' এইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু মুম্বই নির্ণয়সাগর যন্ত্রের সংস্করণে এই দ্বিতীয় পদটির ভিন্ন পাঠ ধরা হইয়াছে, তাহাতে পদ্মাবতীর নামোল্লেখ মাত্রও নাই ; যথা—'জয়তি জয়দেব-কবি-ভারতী-ভূষিতম্' ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য, রাণা কুম্ভের রসিকপ্রিয়া টীকায় 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী' পদটির উল্লিখিত ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করা হইয়াছে, এবং পদ্মাবতী অর্থে এই টীকাকার কেবলমাত্র পদ্মহস্তা দেবী লক্ষ্মী এইরূপ বুঝিয়াছেন। যাহা হউক, প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে এইরূপ মতভেদ থাকিলেও, যে-প্রবাদ লইয়া এই ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এত সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত যে ইহা নিতান্ত অমূলক নহে বলিয়াই মনে হয়। কেন্দুবিল্ব যে কবির জন্মস্থান তাহা তৃতীয় সর্গের একটি পদ হইতে অনুমিত হয়। এই কেন্দুবিল্ব বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়নদীর তীরবর্ত্তী কেঁদুলি গ্রাম, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ; এবং এখনও এই গ্রামে জয়দেবের উদ্দেশে প্রতি বৎসর মেলার উৎসব হইয়া থাকে। গীতগোবিন্দে রাজা লক্ষ্মণ সেনের নামোল্লেখ না থাকিলেও, গোবর্দ্ধন, ধোয়ী প্রভৃতি কবিগণের উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে জয়দেব তাঁহার সমসাময়িক এবং খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের উত্তরার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। এই কয়েকটি তথ্য ভিন্ন জয়দেবের আর কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের পূর্ব্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও, তাহাতে অনুসন্ধানের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত সর্ব্বতোভাবে একমত হইতে পারিলাম না। গুপ্ত সম্রাটদিগের আমল হইতে বিষ্ণু উপাসনার প্রমাণ আছে সত্য, কিন্তু কৃষ্ণলীলা বা কৃষ্ণ উপাসনার উল্লেখ নাই। সম্প্রতি পাহাড়পুর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা হইতেও রাধাকৃষ্ণ উপাসনা কতদিন হইতে বা কত বিস্তৃতভাবে এ দেশে প্রচলিত ছিল তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ভোজদেবের বেলাবলিপিতে 'মহাভারত-সূত্রধার' ও 'গোপীশতকেলিকার' কৃষ্ণের কথা আছে ; কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে বেলাব লিপি খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ 'অংশকৃতাবতার'—ভাগবতোক্ত বা চৈতন্যসম্প্রদায়-নির্দ্দিষ্ট স্বয়ংভগবান্ নহেন। প্রায় এই সময়েই জয়দেবের গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণলীলা স্পষ্টরূপে কাব্যের বিষয়ীভূত হইয়াছে, এবং কবি এখানে দশাবতারী শ্রীকৃষ্ণের ('দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায়') নমস্কার করিয়াছেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ও স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত রাধা-প্রসঙ্গ-বর্জ্জিত কৃষ্ণ-গোপী-লীলা জয়দেবের উপজীব্য নহে ; বরং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শৃঙ্গার-রস-বহুল রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসই তাঁহার কবি-কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে বর্ণিত বিষয়টির নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, কিন্তু ইহার উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রাচীনতর বৈষ্ণব পুরাণে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; বরং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। জয়দেবের কাব্যে বসন্তকালীন রাসের উল্লেখ রহিয়াছে ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের রাস শরৎকালীন। গোপীলীলার কথা থাকিলেও শ্রীরাধার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায় না ; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মত, জয়দেবের কাব্যে শ্রীরাধাকে রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সকল বিলাস-লীলার মূলাধাররূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহা আরও উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার কৃষ্ণ-রাধার নিয়মিত বিবাহের অনুষ্ঠান করিয়া পরকীয়াবাদ সমর্থন করেন নাই ; আমাদের সম্পাদক মহাশয়ও বলিয়াছেন (পৃঃ ৩৫)—"শ্রীগীতগোবিন্দ আলোচনা করিয়া পরকীয়াভাবের পরিস্ফুট-স্বরূপ উপলব্ধি হয় না।" ভগবদুপাসনার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই দুইটি দিকই গীতগোবিন্দে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সমানভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন হইতে মনে হয় যে, জয়দেবের

সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতানুমোদিত বৈষ্ণব ভক্তির ধারা বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না তাহাতে সন্দেহ আছে; খুব সম্ভব, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকারের মত জয়দেব অন্য একটি বিভিন্ন ধারার অনুগামী। ইহা যদি সত্য হয়, তবে "কর্ণদেবের সংস্রবে কর্ণাটগণের সঙ্গে রামানুজ প্রবর্ত্তিত ভক্তিবাদ পরবর্ত্তী কালে রাঢ়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জয়দেবের পুর্ব্বেই এই দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল" (পৃঃ ১৮)—এই কাল্পনিক উক্তির সম্পূর্ণ সমর্থন করা যায় না। রামানুজী বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মতবাদের কোন পরিচয়ই জয়দেবের কাব্যে পাওয়া যায় না; বরং জয়দেবের রচনায় যে বৈষ্ণব ভাবের উপলব্ধি হয় তাহা কোনও সম্প্রদায়-সংশ্লিষ্ট নহে বলিয়াই মনে হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়-চতুষ্টয় শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, জয়দেব তাহা স্পষ্টতঃ করেন নাই। এমন কি, ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে, তিনি মধুর-রস-সমুজ্জ্বল কৃষ্ণলীলা বর্ণনায় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দে শ্রীরাধাকে উজ্জ্বল রসের নায়িকারূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থের সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। কবি শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিয়াছেন, এবং গ্রন্থের ও প্রতি সর্গের নামকরণে গোবিন্দের নামই কীর্ত্তিত হইয়াছে, রাধার নহে; প্রথম দুইটি বন্দনা-স্তোত্রে রাধার নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েরই সমান প্রাধান্য দেখা যায়। সুতরাং এই পুরাণে ও গীতগোবিন্দে বর্ণিত বৃন্দাবন-বিলাসের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও, এমন কোনও প্রমাণ নাই যে জয়দেব ইহা হইতে সাক্ষাৎভাবে বিষয়-বস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ পার্থক্যও যথেষ্ট রহিয়াছে। এমন হইতে পারে যে উভয় গ্রন্থই এক অধুনা-লুপ্ত মূল অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া কোন কোন বিষয়ে আপাত-সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অন্যান্য প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বার্কসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণও রাগমূলক উপাসনার পদ্ধতি স্বীকার করেন; এবং ইঁহাদের উপাসনা-তত্ত্বে রাধারও স্থান রহিয়াছে। নিম্বার্কের সময় ঠিক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু তিনি জয়দেবের প্রায় সমসাময়িক এই অনুমান যদি সত্য হয় (পৃঃ ৪২) তবে জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালাদেশে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রভাবও স্বীকার করা যায় না। বাস্তবিক, বাঙ্গালা দেশে রাধাকৃষ্ণের রসোপাসনা কখন কাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা দুরূহ, কারণ তদানীন্তন বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাসের সুস্পষ্ট পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। যতটুকু জানা যায়, তাহারও বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়; তথাপি, বোধ হয় এরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে, জয়দেব, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার ও নিম্বার্ক—এই তিন জনই কোন অধুনালুপ্ত পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবভাবের ধারার অনুসরণ করিয়াছেন। এই পূর্ব্ববর্ত্তী ধারা বোধ হয় শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবর্ত্তিত ভক্তির ধারা হইতে স্বতন্ত্র, এবং ইঁহাদিগকে পরস্পরের নিকট ঋণী বলিয়া গ্রহণ করিবার কোনও প্রমাণ নাই। ইহা আরও সম্ভব যে, জয়দেবের কবি-কল্পনার উপর সহজিয়া মতবাদেরও প্রভাব ছিল (পৃঃ ১১), কারণ বৈষ্ণব সহজিয়াগণ জয়দেবকে আপনাদের আদি-গুরু এবং নব রসিকের একজন রসিক বলিয়া গণনা করেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনার মধ্যেও এইরূপ সহজ ভাব লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্য-পূর্ব্ব সহজিয়া মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এত অল্প যে এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

বাঙ্গালা দেশে চৈতন্য-সম্প্রদায়ই শ্রীমদ্ভাগবতানুমোদিত ভক্তিবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ইহাদের প্রামাণিক গ্রন্থ নহে, এবং নিম্বার্ক বা সহজিয়া মতবাদের প্রভাবও ইহাদের দ্বারা স্বীকৃত হয় নাই। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, জয়দেবের কাব্যগ্রন্থ কিরূপে এই সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তাহাদের অন্যতম ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে, জয়দেব মুখ্যতঃ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন নাই। তিনি কবি ছিলেন এবং কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; সেই কাব্য নির্ব্বিশেষ রস-পদবীতে আরোহণ করিয়া সকল সাম্প্রদায়িক বিশিষ্ট মতবাদের ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে; এবং এই অসাম্প্রদায়িক নির্ব্বিশেষ ভাব ছিল বলিয়াই, ইহাকে অঙ্গীকার করিতে কোনও বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের অসুবিধা হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে, বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃকও গীতগোবিন্দ স্বীকৃত হইয়াছে, এবং তৎসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র বিঠ্‌ঠলেশ্বর গীতগোবিন্দের সাক্ষাৎ অনুকরণে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক 'শৃঙ্গাররসমণ্ডন' (মুম্বই, সংবৎ ১৯৭৫) নামক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং, চৈতন্য-সম্প্রদায় যে গীতগোবিন্দকে "শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য" (পৃঃ ৪৫, ৮৭) বলিয়া গ্রহণ করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। গীতগোবিন্দের এরূপ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ইতিহাস-সম্মত না হইলেও সহজসাধ্য। জয়দেবের ভাবমূলক পদাবলীগুলিকে, ভক্তিশাস্ত্র-বর্ণিত উজ্জ্বল রসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে ভক্তিরসশাস্ত্রের কবি করিয়া তোলা কিছুই কঠিন নহে। কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, জয়দেবের অন্ততঃ তিন শত বৎসর পরে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তৎসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত রসশাস্ত্র বৃন্দাবনগোস্বামীগণ কর্ত্তৃক আরও পরে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং গোস্বামী মতের প্রচার জয়দেবের এত পরবর্ত্তী সময়ে হইয়াছিল যে তাঁহাকে গোস্বামী মতের বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কবি হিসাবে বৃন্দাবন-লীলার মাধুর্য্য রস তাঁহাকে মুগ্ধ ও বিভোর করিয়াছিল; কিন্তু রূপগোস্বামীর মত, রসশাস্ত্রের উদাহরণ স্বরূপ অথবা সেই শাস্ত্রের আদর্শে তিনি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে শুধু ইতিহাসের অপলাপ নহে, তাঁহার কবি-প্রতিভারও অসম্মান করা হয়। জয়দেব হরিগুণ গানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু বিলাস-কলা-কুতূহলের কথাও বলিয়াছেন। জয়দেব যে রসিক ভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট; কিন্তু তিনি তত্ত্বান্বেষী নহেন, তাঁহার কল্পনা ও প্রকৃতির স্বরূপ ছিল মুখ্যতঃ কবিধর্ম্মী।

গীতগোবিন্দের কবি মধুর রস বা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছিলেন বলিয়াই যে সাম্প্রদায়িক রস-শাস্ত্রের নিয়মে তাঁহার

কাব্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে তাহা ঠিক নহে। সম্পাদক মহাশয় জয়দেবের বহু পরবর্ত্তী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিবৃত রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ববাদ অবলম্বন করিয়া জয়দেবের বৈষ্ণব ভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু গীতগোবিন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্যতম সূত্রগ্রন্থরূপে পূজিত হইলেও এরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা সাধারণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের ঐতিহাসিক ধারা বা পারম্পর্য্য উপেক্ষিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এরূপ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার দ্বারা জয়দেবের রচনার প্রকৃত তাৎপর্য্যও যথাযথরূপে গৃহীত হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, জয়দেব ছিলেন কাব্যামোদী রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ও গীতিবিশারদ কবি; সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সৃষ্টির দ্বারা মনোরঞ্জন করাই তাঁহার কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। আদি-রস চিরদিনই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের আধার, এবং আমাদের দেশে আদিরসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। সুতরাং, বৃন্দাবন-লীলার চিরন্তন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য অবলম্বন করিয়া, জয়দেবের মত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কবি কাব্য সৃষ্টি করিবেন ইহা স্বাভাবিক। চৈতন্যানুযায়ী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তিশাস্ত্রে রাধাকৃষ্ণের প্রেম মধুর রসের আকররূপে বিবৃত হইয়াছে, এবং তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত গীতগোবিন্দেও রাধাকৃষ্ণের প্রেম সেই মধুর রসের নিদর্শন স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব পরবর্ত্তী ভক্তিশাস্ত্র অনুসরণ করেন নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী ভক্তিশাস্ত্র তাঁহার কাব্যগ্রন্থকে শাস্ত্রগ্রন্থরূপে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। চৈতন্য সম্প্রদায়ী ভগবদ্ভক্তিকে রসরূপে আস্বাদন করিয়া থাকেন, এবং এই শৃঙ্গার-রাগ-মূলক উপাসনাই তাঁহাদের উপাসনা-তত্ত্বে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে; জয়দেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যগ্রন্থেও এই ভক্তিমূলক শৃঙ্গার রসই অঙ্গী। এই জন্যই বোধ হয় জয়দেবের উজ্জ্বলরসাভিষিক্ত পদাবলী চৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রীতিকর ছিল বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং, পরবর্ত্তী সময়ে গীতগোবিন্দকে ধর্ম্মগ্রন্থ ও জয়দেবকে সম্প্রদায়ানুযায়ী ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ পরম বৈষ্ণব করিয়া তোলা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইরূপ চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক বিদ্যাপতিকে এবং বাশুলী দেবীর উপাসক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচয়িতা চণ্ডীদাসকে শাস্ত্রসম্মত বৈষ্ণব কবি সাজাইয়া, ইদানীন্তন বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহাদের গানগুলিকে যে-রসে যেটি উপযোগী সেইরূপ বসাইয়া স্বকীয় রসশাস্ত্রের আদর্শে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বোধ হয়, এই কারণেই সম্পাদক মহাশয় গীতগোবিন্দকে যতটা ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে দেখিয়াছেন ততটা কাব্যগ্রন্থ হিসাবে দেখেন নাই। তিনি ইহার ভক্তিবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কাব্য-রসের বিচার করেন নাই। কবিসুলভ গর্ব্বে জয়দেব আপনাকে 'কবিরাজরাজ' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার এই কবি-অভিমান একেবারেই নিরর্থক নহে; সুতরাং তাঁহার রচনার এই দিক্‌টি কোন মতেই উপেক্ষা করা যায় না।

শুধু ভাব বা কথাবস্তুর দিক্ হইতে দেখিলে জয়দেবের গীতগোবিন্দে বিশেষ নূতনত্ব আছে বলিয়া মনে হইবে না। পূর্ব্বরাগ হইতে মিলন পর্য্যন্ত প্রেমের যাহা কিছু ভাব ও লীলা, তাহার সরস চিত্র পূর্ব্ব-গামী সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। জয়দেব তাঁহার কাব্যে এমন কোন বিচিত্র ভাব বা অবস্থার বর্ণনা করেন নাই, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের কাব্যে বর্ণিত হয় নাই। রাধাকৃষ্ণের বিলাসলীলাও সংস্কৃত কাব্যে নূতন নহে। কিন্তু মূল বিষয়টি অথবা ইহার আনুষঙ্গিক ভাবরাজি পুরাণকার বা প্রাচীন কবিগণের নিকট হইতে নিপুণভাবে আহৃত হইলেও, জয়দেবের কাব্যের রসরূপটি তাঁহার নিজস্ব। কেবলমাত্র ভাব বা প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাঁহার রচনার উৎকর্ষ নহে, এ সকল চিরাগত ভাব বা সর্ব্বসাধারণ বিষয়টিকে তিনি যে স্বতন্ত্র আকার ও ভঙ্গিমা দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ইহা সত্য যে, জয়দেবের কাব্যের বহিরঙ্গ রূপটিই সর্ব্বাগ্রে চক্ষে প্রতিভাত হয়। ইহার শব্দ, অর্থ, ভাবা, ছন্দ—এক কথায় ইহার গঠন-শিল্পের চমৎকারিতা, পাঠকের মনকে সহসা চকিত ও আনন্দিত করিয়া তোলে, ভাবগ্রহণের অপেক্ষাও রাখে না। কিন্তু ইহার অন্তর্গত ভাব ও বহিরঙ্গ রূপ, এই উভয়েরই সমষ্টি বা সমগ্রতা লইয়াই কবির কাব্য-প্রতিভার বিকাশ। ইহাকেই আমরা তাঁহার কাব্যের ভঙ্গিমা বা রসরূপ বলিতেছি।

শুধু শিল্পী হিসাবে জয়দেবের কৃতিত্ব এত অসাধারণ যে অনেক সময় তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্যকে তাঁহার কবি-প্রতিভার সর্ব্বস্ব বলিয়া ধরা কিছু অস্বাভাবিক নহে। কবি-কল্পনার প্রাচুর্য্যের সহিত প্রকৃত শিল্পীর সংযম, বাগর্থের পরস্পর-সাপেক্ষ সার্থকতা, শব্দময় আলেখ্য-লিখনে দক্ষতা, ধ্বনি-বৈচিত্র্য, ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য, পদ-লালিত্য ও গীতি-মাধুর্য্য তাহার কাব্যকে একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। জয়দেবের কাব্য-কলায় বৈচিত্র্য-লীলার স্ফূর্ত্তি ও চমৎকারিত্ব থাকিলেও, সামর্থ্যের স্বেচ্ছাচার বা প্রাগল্ভ্য নাই; শিল্প-নৈপুণ্যের সূক্ষ্মতা থাকিলেও, অনর্থক আড়ম্বর বা কৃত্রিমতা নাই; ইহার কান্ত কোমলতা ও স্বচ্ছন্দ গতি পাঠকের মনকে তন্ময় করিয়া দেয়। শব্দ-সম্পদে সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী; প্রাচীন কবিগণ যে অদ্ভুত শব্দ-বিন্যাস-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাহা কেবল সংস্কৃতের মত ভাষায় সম্ভবপর হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দমাত্র-পরম্পরায় যে অন্তর্লীন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, তাহার সহজ ও সুনিপুণ প্রয়োগে এতাদৃশ সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যেও জয়দেবের মত শিল্পী কবি দুর্লভ। গীতগোবিন্দের অর্থ-গৌরব পৃথক বস্তু নহে, ইহা ইহার শব্দ-সৌন্দর্য্য ও ছন্দ-লালিত্য হইতে আপনি আসিয়াছে। কিন্তু নিখুঁত বহিরঙ্গ কারিগরীই জয়দেবের কাব্য-সৃষ্টির সর্ব্বস্ব নহে; শুধু নিপুণ শিল্পী বলিয়া অভিহিত করিলেই তাঁহার কবি-প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। কারণ, জয়দেবের এই স্বভাবসিদ্ধ শিল্প-নৈপুণ্য তাঁহার ভাব ও কল্পনার অঙ্গ মাত্র। তাঁহার ছন্দ ও শব্দ বিষয়বস্তুর অনুগামী; বাহির হইতে আরোপিত নহে, কেন্দ্রগত ভাব হইতে আপনি বিকশিত। জয়দেব সৌন্দর্য্য-বিলাসী কবি; যে ধ্যান ও গীতি তাঁহার আত্মগত অনুভব ও প্রীতির রঙ্গে সুন্দর ও মধুর হইয়া তাঁহার কবি-হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাকে তিনি সম্পৃক্ত বাগর্থ-পরম্পরায় তাহার অনুরূপ সুন্দর ও মধুর রূপ দিয়াছেন।

কারণ, জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দে কেবল তাঁহার ইষ্টদেবতার

অপ্রাকৃত লীলা-বর্ণন অথবা প্রাচীন কবিগণের মত প্রাকৃত প্রেমগাথা রচনা করেন নাই ; এই প্রেম ও লীলা যে-রূপে তাঁহার কল্পনা-দর্পণে ও অনুভূতির আলোকে প্রতিফলিত হইয়াছিল সেই অপরূপ রূপটি তাঁহার চিত্রে ও গানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহার রচনায় অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃত, ভক্তির সহিত প্রীতি, কল্পনার সহিত অনুভূতি একাকারে মিশিয়া গিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের যে চিরন্তন প্রেমলীলা তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা শুধু কাহিনী মাত্র নহে, তাঁহার ও তাঁহার শ্রোতৃবর্গের নিকট তাহা বাস্তব-জগতের বিচিত্র রূপে ও রসে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সেইজন্য, কবি শুধু ধ্যান-ধারণার নিত্য-বৃন্দাবন সৃষ্টি করেন নাই, তাহাকে কবি-মানসের সুখ, দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির রসে অভিষিক্ত করিয়া অপূর্ব্ব বাস্তব-সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছেন। প্রাকৃত প্রেমলীলার প্রতিচ্ছবি-রূপে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলা, মানবোচিত ভাব ও ভাষায়, উজ্জ্বল ও গীতিময় শব্দচিত্র-পরম্পরায় সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য হইয়াছে। এই বাস্তব ও কল্পনার সংযোগ, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গত ভাবের মিশ্রণই গীতগোবিন্দের অন্তর্গত কাব্যবস্তু। আদিরসের মত মানব-হৃদয়ের একটি নিগূঢ়, মধুর ও শক্তিশালী বৃত্তিকে ধর্ম্মসাধনার অঙ্গীভূত করিয়া, অপরূপ দেবলীলাকে সুপরিচিত মানব-লীলার যে নির্দ্দিষ্ট রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য-পিপাসু ভক্তের আদরের সামগ্রী নহে, কাব্য-রস-পিপাসু রসিক মাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী। এখানে মর্ত্ত্য প্রেমের মধ্য দিয়াই অমর্ত্ত্য প্রেমের সাক্ষাৎকার হইয়াছে ; কবি মানব-প্রেমের শ্রেষ্ঠ, সার্থক ও সুন্দরতম পরিণতিরূপে পরমরসময় ভগবৎ-প্রেমের আস্বাদন লাভ করিয়াছেন। আপনার কামনার মধ্যেই আপনার সাধনাকে কবি পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। সেইজন্য শুধু ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে নহে, কাব্যগ্রন্থ হিসাবেও গীতগোবিন্দের উৎকর্ষ। কবি-হৃদয়ের একান্ত ও বাস্তব অনুভূতি, কবির অবাস্তব প্রেম ও সৌন্দর্য্য-কল্পনাকে বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে ; সুতরাং পরোক্ষভাবে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বিলাস-লীলা বর্ণিত হইলেও, প্রত্যক্ষভাবে ইহা কবির জীবনের নিগূঢ়তম সুখদুঃখের বর্ণবিন্যাসে ও সত্য সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল। সম্পাদক মহাশয়ও দেখাইয়াছেন যে, কবির রাধা শুধু তাঁহার কল্পলোকের কল্পনারূপিণী নহেন, তাঁহার জীবনের সমস্ত অনুভূতি ও প্রীতির বাস্তব-লক্ষ্মী। এখানে মানবী হইতে দেবীকে পৃথক্ করা যায় না। পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আদর্শকে কবি জীবনের কোন বিশিষ্ট বিগ্রহের মধ্যে অনুভব করিয়া, কল্পনা-লোকের অপরিমেয়তাকে জীবনের পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে, অপার্থিবকে পার্থিব রূপ ও রসের সীমানায় লাভ করিতে চাহিয়াছেন ; কারণ, সকল প্রকৃত কবির মত তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্র অনুভূতির উপরই অতীন্দ্রিয় জগতের বৃহত্তর শাশ্বত সত্য প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য তাঁহার কাব্যের রসরূপটি সম্পূর্ণ কল্পনা-মূলক নহে ; যিনি বাহির-ভুবনে ও কায়া-সৌন্দর্য্যে তাঁহার বাহুপাশে ধরা দিয়াছেন, তিনিই তাঁহার গানের আড়ালে ও ছায়া-সৌন্দর্য্যে কল্পনারূপিণী হইয়া সাড়া দিয়াছেন। ভাব ও বস্তুর, স্বপ্ন ও সত্যের, অন্তর ও বাহিরের, বাস্তব ও অবাস্তবের এই স্পষ্ট ও অপূর্ব্ব সংমিশ্রণই গীতগোবিন্দ কাব্যের অন্তর্গত প্রেরণার মূলে রহিয়াছে। যদি গীতি-প্রাণতা ও আত্মগত ভাবনার দ্বারা বহির্গত জগৎকে আত্মসাৎ করা গীতি-কবিতার মূল-লক্ষণ হয়, তবে জয়দেবের পদাবলীগুলি প্রকৃত গীতি-কবিতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, জয়দেবের কাব্যে সংস্কৃত গীতি-কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তথাপি, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জয়দেবের রচনাকে প্রাচীন সংস্কৃত গীতি-কবিতার কোনও বিশিষ্ট পর্য্যায়ে নিশ্চিতরূপে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। পূর্ব্বতন সংস্কৃত কাব্যের ভাষা, ভাব ও ছন্দ গ্রহণ করিলেও, প্রকৃত পক্ষে জয়দেব তাহাদিগকে নূতন প্রকারে ও ভঙ্গীতে প্রয়োগ করিয়াছেন ; এবং তাঁহার সমস্ত কাব্যটিকে, বাহির ও ভিতর হইতে, যে নূতন ও বিচিত্র রূপ দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত কাব্যের সম্পূর্ণ অনুযায়ী নহে,—বরং সমসাময়িক নবোদিত দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধিকতর অনুরূপ। বাহ্যতঃ নাটকের কিঞ্চিৎ আবরণ থাকিলেও, জয়দেবের রচনা গীতিপ্রাণ ও গীতিসর্ব্বস্ব ; ইহার গীতগোবিন্দ এই নামটিই তাহার নিদর্শক। কিন্তু মেঘদূত প্রভৃতি প্রাচীনতর গীতি-কবিতার সহিত ইহার সাদৃশ্য অতি অল্প। সর্গ-বিভাগ হইতে ইহাকে ঠিক কাব্য বলিয়াও ধরা যায় না, কারণ সর্গ-বন্ধ কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি ইহাতে নাই বলিলেও চলে। অন্য দিকে আবার গীতগোবিন্দকে ঠিক দেশীয় গীতিনাট্য-শ্রেণীর রচনাও বলা যায় না। ভাব-প্রবণতায় ও গীতি-বাহুল্যে দেশীয় গীতাভিনয়ের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও, প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রাদির সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্যও রহিয়াছে। ইহার নাট্যবস্তু যৎসামান্য, এবং যাত্রাদির মত ইহা সাময়িক প্রেরণায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। উৎসবাদিতে জন-সাধারণের চিত্ত-বিনোদনের জন্য লিখিত ও ব্যবহৃত হইলেও, ইহা নিপুণ শিল্পীর স্বেচ্ছাকৃত লিপিকুশলতায় সমৃদ্ধিশালী ; রাগ-বহুল, প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ হইলেও, ইহার রচনা নিখুঁত ও নিপুণ শিল্পের পরিচায়ক। ইহার দ্বাদশ সর্গে কৃষ্ণ, রাধা ও সখীর উক্তিগুলি গীতের আকারে সজ্জিত হইয়াছে, এবং প্রাকৃতানুযায়ী মাত্রাচ্ছন্দে রচিত এই গেয় পদগুলিই ইহার সর্ব্বস্ব ; কিন্তু এই গানগুলি শুধু গীতিমাধুর্য্যে নহে শিল্প-চাতুর্য্যেও মনোগ্রাহী। আবার এই গান বা গীতি-কবিতার সঙ্গে আখ্যান-বস্তু, বর্ণনা, কথোপকথন, এবং পদাবলীগুলির যোগসূত্র হিসাবে সংস্কৃত ছন্দে রচিত শ্লোকাবলীও পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহার উপর,—কাব্য-স্মৃতি-বিজড়িত যমুনার তটপ্রান্তে, কখনো মেঘ-মেদুর বরষার নব সমারোহে, কখনো বা নব-বসন্তের সুরভি সৌন্দর্য্যে, বৃন্দাবনের না হউক বাঙ্গালা দেশের তমাল-শ্যামল বনভূমি যে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ছায়াও জয়দেবের কান্তকোমল পদাবলীর মাধুর্য্যরসসিক্ত ভাবরাজির সহিত বিচিত্রভাবে মিশিয়া গিয়াছে। ভাব ও কল্পনার সহিত প্রকৃতির এই উৎসব-সমারোহের মধ্যে, মধুর রসের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব বিরহ-মিলনের কাহিনী, শব্দ-ঝঙ্কারে, ছন্দ-হিল্লোলে, অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় ও কবি-মানসের পার্থিব অনুভূতির বিচিত্র ধারায় অভিষিক্ত হইয়া সমস্ত কাব্যটিকে একটি নূতন রূপ দান করিয়াছে। তৎকালীন সংস্কৃত ও দেশীয় সাহিত্যের যাহা কিছু মধুর ও সুন্দর উপাদান,

তাহা গীতগোবিন্দে স্থান লাভ করিয়াছে ; কিন্তু এই রচনার মধ্যে জয়দেবের কবি-প্রতিভার যে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ও শক্তিময় স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, তাহা ইহাকে সংস্কৃত বা দেশীয় কাব্য-সাহিত্যের গতানুগতিক ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

বাস্তবিক, এই সকল কথা আলোচনা করিলে মনে হয়, ভাব ও রূপ এই দুই দিক্ হইতেই তৎকালীন কাব্য-সাহিত্যে গীতগোবিন্দ একটি নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ দেশীয় বলা যায় না, কিন্তু সম্পূর্ণ সংস্কৃতও নহে। তথাপি গীতগোবিন্দের কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে, সংস্কৃতের ছাপ থাকিলেও, এই কাব্য প্রথমতঃ দেশীয় ভাষায় ও দেশীয় প্রথায় রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ছন্দে রচিত বর্ণনামূলক শ্লোকগুলি ছাড়িয়া দিলে, যে রাগমূলক পদাবলী গীতগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেগুলি নামমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে রচিত হইলেও, এই ভাষা ও ছন্দের ভঙ্গী যতটা প্রাকৃত বা দেশী ভাষা ও ছন্দের অনুযায়ী ততটা সংস্কৃতের নহে। 'পদাবলী' শব্দটিও যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও সংস্কৃত নহে। গীতগোবিন্দে সংস্কৃত অলঙ্কার ও শব্দার্থগৌরব সর্ব্বত্র রক্ষিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পদাবলীতে প্রযুক্ত ভাষার রচনাপদ্ধতি সংস্কৃত কাব্যের অনুরূপ নহে ; বরং এই স্বচ্ছ ও সহজ গেয় পদগুলি দেশীয় গানের পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছে। এমন কি, অতি অল্প চেষ্টায় অনেক পদ যে সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা দেখান কঠিন নহে। প্রাকৃত-পিঙ্গলে উদাহৃত পাদাকুলক প্রভৃতি যে সকল মাত্রাচ্ছন্দ ইহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও প্রাকৃত বা অপভ্রংশ কবিতার আত্মীয়, সংস্কৃতের নহে। সংস্কৃত ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস আছে কিন্তু পদান্ত মিল বা rhyme নাই ; গীতগোবিন্দের সমস্ত পদাবলী, অপভ্রংশ কবিতার মত, মিলযুক্ত। পদাবলীর রচনার ধরণও ভিন্ন। সংস্কৃত কবিতা সাধারণতঃ পাদচতুষ্টয়-সমন্বিত এক একটি stanza-য় পর্য্যবসিত ; এবং এইরূপ শ্লোকের সমষ্টি লইয়াই কাব্য। এই শ্লোকগুলি কখনও পরস্পর-সম্বদ্ধ, কখনও অসম্বদ্ধ ; কিন্তু এক একটি শ্লোক প্রায়ই এক একটি সম্পূর্ণ ভাবের জ্ঞাপক। পদাবলীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এগুলিকে ব্যষ্টিভাবে লইলে সম্পূর্ণ অর্থগ্রহণ করা যায় না ; গানের মত, পৃথকরূপে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক হইলেও এগুলিকে সমষ্টিভাবেই ধরিতে হইবে, এবং অন্তে নিবিষ্ট refrain বা ধ্রুবপদই ইহার ভাবপরম্পরার যোগসূত্র। পদাবলীর এই ধরণটি দেশীয় গানের প্রথাই অবলম্বন করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, পদাবলীর ছন্দগুলি পরবর্তী বাঙ্গালা ছন্দের মূলস্বরূপ বলিয়া, মাত্রাচ্ছন্দ হইলেও এগুলির ধ্বনি-বৈচিত্র্য যে অতি সহজেই আধুনিক অক্ষর-বৃত্ত বাঙ্গালা ছন্দে রক্ষা করা যায়, তাহা সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় তাঁহার গীতগোবিন্দের অনুবাদের অনেক স্থলেই দেখাইয়াছেন। এইরূপ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জয়দেবব্যবহৃত ষোড়শমাত্রা-যুক্ত পাদাকুল-ছন্দকে বিশ্লেষণ করিয়া দেশীয় চতুর্দ্দশ-অক্ষরযুক্ত পয়ারের উদ্ভব দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও

বদসি যদি কিঞ্চিদপি-দন্তরুচি কৌমুদী

এই ছন্দ-ধ্বনির অনুকরণে

একথা কবে আর ধরি ফিরিবে মন ভুবনে

এইরূপ অপূর্ব্ব বাঙ্গালা ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন। গীতগোবিন্দে এই পদাবলী ভিন্ন যে সকল সংস্কৃত ছন্দের শ্লোক দেখা যায়, সে-গুলির সন্নিবেশও দেশীয় গীতি-সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করিতেছে ; কারণ এই ধরণের সংস্কৃত শ্লোকে বক্তব্য বিষয়ের বিবৃতি ও পারম্পর্য্য রক্ষা শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনাদিতেও দেখা যায়, এবং দেশীয় গানের ইহা একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি।

এই সকল কারণে Pischel-প্রমুখ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, গীতগোবিন্দ প্রথমে জনসাধারণের জন্য কোন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় জয়দেব কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, পরে সংস্কৃতাভিমানী পাঠকদিগের জন্য কোন পণ্ডিত বা পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক সংস্কৃতে অনূদিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। আধুনিক সময়ে ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় এই অনুমানের সমর্থন করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় এই মতবাদ স্বীকার করেন নাই (পৃঃ ৪৬), কিন্তু তিনি ইহাকে "অতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের নেতিবাদের ঔদ্ধত্য" বলিয়া কেবল দুএকটি কথায় এই প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন।

এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে এই মতবাদের কোন সন্তোষজনক ভিত্তি নাই। জয়দেবের কাব্য যে প্রথমে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় রচিত ও পরে সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রবাদ বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা সত্য যে গীতগোবিন্দের বর্ণনামূলক সংস্কৃত শ্লোকগুলি, সমসাময়িক শ্রীধরদাস সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃতে ও কাশ্মীরক বল্লভদেবে সংগৃহীত সুভাষিতাবলিতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহার গেয় পদাবলী হইতে একটিও উদাহরণ উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু ইহা হইতে এ সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণিত হয় না। এমন হইতে পারে যে, পদাবলী উদ্ধৃত হয় নাই তাহার কারণ, এগুলিতে সংস্কৃত শ্লোকাপেক্ষা পদাধিক্য রহিয়াছে, এবং এগুলি দেশীয় ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীর অনুকরণে রচিত ধ্রুবপদ-সমন্বিত গান বলিয়া সংস্কৃত শ্লোকের সুভাষিত-সংগ্রহে স্থান পায় নাই।

জয়দেবের কাব্যের আদিম রূপ নির্ণয় করিতে হইলে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, গীতগোবিন্দ যে-সময় রচিত হইয়াছিল সে-সময় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রায় শেষ অবস্থা বা অবনতির যুগ, এবং অপভ্রংশ বা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যুদয়ের কাল। সেইজন্য এই পরিবর্ত্তন যুগে এক শ্রেণীর রচনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যের নিয়ম-নিগড়ের দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত নহে, অথচ নূতন দেশীয় সাহিত্যের পূর্ণ স্বাধীনতাও লাভ করে নাই। ইহা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উপর সংস্কৃতের প্রভাবের ফল নহে ; বরং সংস্কৃতের উপর দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবের নিদর্শন। কারণ, এই সময় হইতেই, গীতগোবিন্দ ভিন্ন অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ও তাহারই অনিবার্য্য প্রভাবে, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইতেছিল। নবোদিত ও জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তৃত দেশীয়

ভাষা ও সাহিত্যের আদর্শকে আত্মসাৎ করিয়া, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত ও নূতন রূপে গঠিত করিবার একটি প্রচেষ্টা সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছিল। আমাদের মনে হয়, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এই নূতন প্রচেষ্টার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দেশীয় গানের আদর্শে রচিত হইলেও, গীতগোবিন্দকে ঠিক দেশীয় গান বলা যায় না। দেশীয় ভাষার পদ্ধতি ও ভঙ্গী, দেশীয় সাহিত্যের গীত-বাহুল্য ও ভাব-প্রবণতা ক্রমশঃ সংস্কৃতে রচিত কাব্যে ও নাটকে আসিয়া পড়িতেছিল; গীতগোবিন্দেও তাহাই দেখা যায়। কিন্তু ইহার অলঙ্কার-বহুল ও পরিণত রচনা-কৌশল সংস্কৃতের অনুযায়ী, প্রাকৃতের নহে। যে যমক ও অনুপ্রাসাদির নিপুণ প্রয়োগ ইহার সংস্কৃত শব্দ ও বর্ণ-বিন্যাসে পাওয়া যায়, তাহা ব্যঞ্জনবর্ণবিরল প্রাকৃত বা অপভ্রংশ রচনায় এই পরিমাণে সম্ভবপর নহে। সুতরাং যদি ইহা প্রথমে প্রাকৃত বা অপভ্রংশে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধরিতে হইবে এই শব্দালঙ্কারগুলির প্রাচুর্য্য প্রথম রচনায় ছিল না; পরে সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হইবার সময় ইহাদের সন্নিবেশ হইয়াছে। কিন্তু গীতগোবিন্দ যে এরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত রচনা তাহা কোনও সাহিত্যজ্ঞ পাঠক বিশ্বাস করিবেন না, কারণ ইহার শব্দ-বর্ণের বিন্যাস-কৌশল ও অলঙ্কার-সন্নিবেশ বাহির হইতে আরোপিত ব্যাপার নহে, ইহার রচনা-পদ্ধতির স্বাভাবিক অঙ্গ। কাব্য হিসাবে ইহার ভাব ও রচনার যে অচ্ছেদ্য ঐক্য ও সমগ্রতা রহিয়াছে, তাহা ভাষান্তরিত-মাত্র রচনায় সম্ভব বলিয়া কোনও কাব্য-রসিক স্বীকার করিবেন না। এখানে সংস্কৃত রচনা-নৈপুণ্য শুধু দেশীয় গানের প্রভাব স্বীকার করিয়া, দেশীয় ধরণের গান বা পদাবলী রচনা করিয়াছে; দেশীয় গানকে কেবল সংস্কৃতে অক্ষরানুযায়ী অনুবাদ করে নাই। যেরূপ পরিবর্ত্তন যুগের কথা আমরা উপরে বলিতেছিলাম, সেইরূপ যুগেই এই শ্রেণীর অভিনব রচনার সম্ভব হইয়াছিল—যে সকল রচনা পূর্ণমাত্রায় সংস্কৃত নহে, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় দেশীও নহে; ভাষান্তরের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয় না। তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে গীতগোবিন্দ এই শ্রেণীর একমাত্র রচনা নহে। গুজরাতের কবি রামকৃষ্ণ রচিত গোপাল-কেলি-চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থেও গীতগোবিন্দের অনুরূপ পদাবলী দৃষ্ট হয়; এই রচনাটি নামে নাটক হইলেও, সংস্কৃত নাটকের লক্ষণাক্রান্ত নহে, বরং পুরাতন দেশীয় যাত্রার প্রভাবে ইহাতে নাট্যকলা ও প্রকৃত নাট্যবস্তুর অভাব, গানের আধিক্য ও ভাবপ্রবণতার প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত দেখা যায়। আমি অন্যত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সংস্কৃত মহানাটকও এইরূপ সহজ ভাষায় ও প্রাকৃত যাত্রার অনুকরণে রচিত; কিন্তু ইহা বোধ হয় কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা এবং ইহাতে পদাবলী নাই। পরবর্ত্তী সময়ের আনন্দলতিকা, নন্দিঘোষবিজয়, চিত্রযজ্ঞ প্রভৃতি নাটক-নামধেয় রচনাগুলিও বোধ হয় এই ধারারই অনুসরণ করিয়াছে। বিদ্যাপতির পূর্ব্ববর্ত্তী মৈথিল কবি উমাপতি শর্ম্মার সংস্কৃত পারিজাতহরণ নাটকে মৈথিল ভাষায় রচিত পদাবলীর সমাবেশ রহিয়াছে, এবং ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই মৈথিল গানগুলি সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হয় নাই। নেপালে আবিষ্কৃত হরিশ্চন্দ্র-নৃত্যও এই ধরণের মিশ্র রচনা। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, পদাবলী এই শব্দটি দেশীয় ভাষা হইতে গৃহীত, এবং ইহা দেশীয় সাহিত্যের প্রভাবের সুস্পষ্ট পরিচায়ক; কিন্তু গীতগোবিন্দের পদাবলী যদি প্রথমে দেশীয় ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে, তবে পারিজাতহরণের পদাবলীর মত সেগুলির সেই আদিম আকারে থাকিয়া যাওয়াই সম্ভব ছিল; সংস্কৃতে ভাষান্তরিত হইবার কোনও যুক্তিসিদ্ধ কারণ পাওয়া যায় না। পদাবলীর দেশীয়-ছন্দ-অনুযায়ী ছন্দ-বৈচিত্র্য ও পাদান্ত মিলও উল্লিখিত সাময়িক পরিবেষ্টনের প্রভাবে দেশীয় গান হইতে সংস্কৃত গানে অবলম্বিত হইয়াছিল; ইহা দেশীয় গানের সংস্কৃত-অনুবাদের চিহ্ন নহে। এমন কি, পদাবলী ভিন্ন সংস্কৃত শ্লোকগুলির সন্নিবেশের প্রথাও এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাদির মত দেশীয় গান হইতে গৃহীত।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত সংস্করণের খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে; কিন্তু তাঁহার অন্যথা-সুরচিত ভূমিকায় কয়েকটি অসাবধান উক্তি রহিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রয়োজন। আশা করি, সম্পাদক মহাশয় ইহাকে সমালোচকের স্বভাবসিদ্ধ দোষদর্শিতার নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিবেন না; কারণ, যাহাতে তাঁহার সুসম্পাদিত সংস্করণ ভবিষ্যতে আরও সুসম্পাদিত হয়, তাহাই আমাদের আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। যে সমস্ত সামান্য ত্রুটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহার কয়েকটির উল্লেখ এখানে করিতেছি—

(১) পৃঃ ৭। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—'সর্ব্বানন্দ সরস্বতীর 'টীকা সর্ব্বস্বে' গোবর্দ্ধনের নাম পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণের মতে বল্লালসেনের সময় ১০৮১ শকাব্দায় (১১৫৯ খৃঃ) এই গ্রন্থ রচিত হয়।" এই কথাগুলি মোটামুটি ঠিক হইলেও, একটু সাবধানে লেখা উচিত ছিল। সর্ব্বানন্দের 'সরস্বতী' উপাধি সম্পাদক মহাশয় কোথায় পাইয়াছেন জানি না; তাঁহার গ্রন্থে 'দশটীকাবিদ্ আর্ত্তিহরপুত্র বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দ' কেবলমাত্র এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। কালবর্গের একবিংশ শ্লোকের ব্যাখ্যার মধ্যেই উল্লিখিত তারিখ রহিয়াছে; সুতরাং 'পণ্ডিতগণের মতে' এই কথাগুলি অনাবশ্যক। টীকাসর্ব্বস্বে গোবর্দ্ধন ও গোবর্দ্ধনের উণাদিবৃত্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু এই গোবর্দ্ধন লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক কবি গোবর্দ্ধন কি না, তাহা কে বলিবে? সম্পাদকের উদ্ধৃত বাক্যটি পাঠ করিলে এরূপ ভ্রম হওয়া সম্ভব যে, সর্ব্বানন্দ বল্লালসেনের রাজ্যে বা রাজসভায় বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সর্ব্বানন্দ বন্দ্যঘটীয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হইলেও, তাঁহার টীকাসর্ব্বস্বের কোন পুঁথি এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে পাওয়া যায় নাই; যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা সুদূর দাক্ষিণাত্যে। এমন কি, কুলপঞ্জিকাকারগণও সর্ব্বানন্দের নামোল্লেখ করেন নাই। সুতরাং তিনি যে উক্ত সময়ে বাঙ্গালা দেশে উপস্থিত ছিলেন তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই।

(২) পৃঃ ৬৮—"মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মহাশয় রামায়ণকে বৈদিক যুগের সমসাময়িক বলিয়া মনে করেন।" পুজ্যস্মৃতি শাস্ত্রী মহাশয় এ কথা কোথায় বলিয়াছেন জানি না ; কিন্তু এরূপ উক্তি কোন ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবেন না।

(৩) পৃঃ ৬৯—"মহাভারতের নারায়ণীয় উপাখ্যানে বিষ্ণু-সহস্র-নামের বর্ণনা আছে।" নারায়ণীয় উপাখ্যানের ৩৪২ অধ্যায়ে বিষ্ণুর কতকগুলি নামের নিরুক্ত বিবেচিত হইয়াছে মাত্র ; বিষ্ণু-সহস্রনামের উল্লেখ মহাভারতের অন্যত্র (অনুশাসনপর্ব্ব, ১৪৯ অধ্যায়ে) রহিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে এমন কোন নাম বা বিশেষণ নাই যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক কাহিনীর কোন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৪) পৃঃ ৬৯—"শাণ্ডিল্যসূত্রে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।" সূত্রের মধ্যে যে গীতার সম্পূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত হওয়া সম্ভব নহে তাহা বলা বাহুল্য। শাণ্ডিল্যসূত্র ২।২।৮৩-৮৪ এই দুইটি সূত্রে গীতার ও গীতার কেবল শ্লোকাংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুনশ্চ—"নারদসূত্রে গীতা মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ ভাগবত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের উল্লেখ পাওয়া যায়" (পৃঃ ৬৯)" এ উক্তিরও কোন ভিত্তি নাই, কারণ এই সকল গ্রন্থের একটিও নারদসূত্রে উল্লিখিত হয় নাই।

(৫) পৃঃ ৮০ "উত্তরভারতে (কাশ্মীরে) আনন্দবর্দ্ধন যখন রাধাকৃষ্ণের প্রেমগাথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধন ঠিক রাধাকৃষ্ণের প্রেমগাথা সংগ্রহ করেন নাই ; তিনি শুধু তাঁহার ধ্বন্যালোকের বৃত্তিতে রাধানামাঙ্কিত কৃষ্ণলীলাসূচক দুইটি শ্লোক উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৬) পৃঃ ৮৬৭—"রামানন্দ রায়ের মতে জয়দেব এখানে শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা শ্রীগীতগোবিন্দে রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন।" রামানন্দের এই সম্বন্ধে ঠিক যে কি মত ছিল তাহা জানা যায় না ; এখানে সম্পাদক মহাশয় যাহা রামানন্দের মত বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্ত্তৃক বিবৃত বা আরোপিত রামানন্দের মত। রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটকে জয়দেবের অনুকরণে গীত রহিয়াছে, কিন্তু গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে এরূপ কোন বিশিষ্ট মতবাদ পাওয়া যায় না।

(৭) অনেক স্থলে ছাপার ভুল বা অনবধানতা বশতঃ অর্থগ্রহণ দুরূহ হইয়াছে। যথা, পৃঃ ৭৬—'যাবন্নৈত্রং' স্থলে 'যাবচ্চৈত্রং' হইবে, এবং 'ধনুঃকৌতুকং' সমস্ত পদ হইবে। পৃঃ ৮৯—'ব্রজসুন্দরীঃ' এই পদের বিসর্গ পড়িয়া যাওয়ায় বাক্যের অন্বয় হয় না। পৃঃ ৯৮—গীতা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকে 'কন্দর্প' শব্দের এইরূপ বিসর্গ পড়িয়া গিয়াছে। পৃঃ ১৬—'গোপীশতকেলীকারঃ" এস্থলে 'কেলি' শব্দ দীর্ঘ ইকারান্ত ছাপা হওয়ায় ছন্দ পতন হইয়াছে। ইত্যাদি।

(৮) ৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 'যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকটি কোন কোন প্রাচীন সুভাষিতসংগ্রহে শীলাভট্টারিকার নামাঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ ত্রুটিগুলি খুব মারাত্মক নহে ; সুতরাং ইহার বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। ইহার দ্বারা বর্ত্তমান সুসম্পাদিত সংস্করণের গুণসমূহের অপকর্ষণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সম্পাদক মহাশয়ের স্বভাবসিদ্ধ লিপিকুশলতায় তাঁহার বক্তব্যগুলি সুস্পষ্ট ও সুখপাঠ্য হইয়াছে, এবং প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও বিচারশক্তির ধীরতা তাঁহার সংস্করণের মূল্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত করিয়াছে। উপরে আমরা যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে মতভেদ থাকা অসম্ভব নহে। এই যুগের ধর্ম্ম, ইতিহাস, ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান এত অল্প ও অস্পষ্ট যে ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক, এবং সকল বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু কোন বিশেষ মতবাদ স্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আলোচনার দ্বারা সত্যনির্ণয় করাই আমাদের অভিপ্রায়। সুতরাং যাহা বলা হইল তাহা সুধীগণের বিচার্য্য মন্তব্যমাত্র।

বঙ্গদেশের জনসংখ্যা

শ্রীরামানুজ কর

গত ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বৃটিশ শাসিত বাংলাদেশের পরিমাণ ৭৬৮৫৪ বর্গমাইল ছিল। গত ১৯৩১ সালের সেন্সাসের কতক বিবরণ গত ৭ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বাংলাদেশের পরিমাণ ৭৭৫২১ বর্গমাইল অর্থাৎ আয়তনে ৬৭৮ বর্গমাইল বেশী হইয়াছে। পূর্ব্বে কলিকাতা সহরের পরিমাণ ২১ বর্গমাইল ছিল ; কিন্তু মাণিকতলা, কাশীপুর, চিৎপুর ও গার্ডেনরীচ কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সামিল হওয়ায় উহার আয়তন ৩৩ বর্গমাইল হইয়াছে। চট্টগ্রাম ব্যতীত সকল বিভাগের আয়তন বেশী দেখান হইয়াছে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের আয়তন হ্রাস হইয়াছে। দেশীয় রাজ্য ২টীর আয়তন ঠিকই আছে। বর্ত্তমানে দেশীয় রাজ্যসহ বাংলার আয়তন ৮২৯৫৫ বর্গমাইল। ইহা ব্যতীত সিকিম রাজ্যের আয়তন ২৮১৮ বর্গমাইল। সিকিমরাজ্যের লোক সংখ্যা পৃথক ধরা হইয়াছে।

বৃটিশ বাংলা ও দেশীয়রাজ্যে কোন আদম সুমারীতে লোকসংখ্যা কত ছিল তাহা নিম্নে আহৃত হইল—

	বৃটীশবাংলা	দেশীয়রাজ্য
১৮৭২সালে	৩৪১১৯১৭৬	৫৬৭৮২৭
১৮৮১	৩৬৩১৬৩৬০	৬৯৮২৬১
১৮৯১	৩৯০৮৯২১৭	৭১৬৩১০
১৯০১	৪২১৪১০৬০	৭৪০২৯৯
১৯১১	৪৫৪৮২৬০৫	৮২২৫৬৫
১৯২১	৪৬৭০২৩০৭	৮৯৬৯২৬
১৯৩১	৫০১১৪০০২	৯৭৩৩৩৬

১৮৯১ সালে সিকিমরাজ্যে লোকসংখ্যা ৩০৪৪৮ জন ছিল। ১৯৩১ সালে ১০৯৮০৮ হইয়াছে। বৃটিশবাংলায় যশোহর ও রাজসাহী ব্যতীত সকল জেলাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যশোহর জেলার হাজারকরা ৩০ জন এবং রাজসাহী জেলায় হাজারকরা ৪৬ জন হ্রাস পাইয়াছে। কুচবিহার রাজ্যে হাজারকরা ৩ জন হ্রাস পাইয়াছে।

১৮৭২ সালে কুচবিহার রাজ্যে লোকসংখ্যা ৫৩২৫৬৫ এবং ত্রিপুরা রাজ্যে ৩৫২৬২ ছিল। ১৯২১ সালে ৯টী জেলায় এবং কুচবিহার ও সিকিম রাজ্যে লোকসংখ্যা হ্রাস হইয়াছিল। এবারে সিকিম রাজ্যে শতকরা ৩৪ ৪ জন হারে বৃদ্ধি হইয়াছে। বৃটিশবাংলায় বৃদ্ধির হার হাজারকরা ৭২ জন এবং দেশীয় রাজ্য ২টাতে হাজারকরা ৮৫ জন, ত্রিপুরারাজ্যে শতকরা ২৫·৬ হারে বৃদ্ধি হইয়াছে। হাজারকরা বৃদ্ধি বর্দ্ধমান বিভাগে ৭৪, প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৭০, রাজসাহী বিভাগে ২৭, ঢাকা বিভাগে ৮২, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩৭ জন। বৃটিশবাংলায় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ও হ্রাসবৃদ্ধি নীচের তালিকায় দেওয়া হইল—

	১৯২১ সালে	১৯৩১ সালে	হ্রাসবৃদ্ধি
হিন্দু	২০২০৬৭৬২	২১৫৭০৪০৭	+১৩৬৩৬৪৫
মুসলমান	২৫২১০৮০২	২৭৪৯৭৬২৪	+২২৮৬৮২২
বৌদ্ধ	২৬৫৬০৪	৩১৬০৩১	+৫০৪২৭
ভূতোপাসক	৮৪৫৭৮০	৫২৮০৩৭	−৩১৭৭৪৩
খৃষ্টান	১৪৭০৮১	১৮০২৯৯	+৩৩২১৮
বিবিধ	১৯৫০৭	২১৬০৪	+২০৯৭
	৪৬৬৯৫৫৩৬	৫০১১৪০০২	+৩৪১৮৪৬৬
জৈন	১৩৩৬৯	৮৪৩২	−৪৯৩৭
শিখ	২৩৮০	৭২৬৪	+৪৮৮৪
ইহুদি	১৮৫১	১৮৬৭	+১৬
পার্শী	৭৭০	১৫২০	+৭৫০
ভারতীয় খৃষ্টান	১০৪১৭৬	১০০৭৭৭	−৩৩৯৯
এংলোইণ্ডিয়ান	২২২৪১	২৭৫৭৩	+৫৩৩২
ইউরোপীয়ান	২২৬৫২	২৩০৩০	+৩৭৮

১৯২১ সালে ব্রাহ্মদের সংখ্যা পৃথক ছিল ; এবারে উহা হিন্দুর সহিত মিলিত হইয়াছে। উপরে ১৯২১ সালে হিন্দুর যে সংখ্যা দেওয়া হইল তাহা ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের হিন্দু ও ব্রাহ্মর সংখ্যা যোগ করিয়া দেওয়া হইল। ১৯২১ সালে ব্রাহ্মদের সংখ্যা ৩২৩৫ ছিল ; ১৯৩১ সালে ১৬৭০ হইয়াছে। বিবিধর মধ্যে শিখ জৈন ইহুদি, পার্শী, কনফিউসিয়ান, নাস্তিক প্রভৃতি আছে। বাংলার সহরগুলিতে এই সকল জাতির বাস। ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বাংলার লোক সংখ্যা যাহা আছে, তাহার সহিত ৭ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রদত্ত ১৯২১ সালের সহিত মিল নাই। কলিকাতা গেজেটে ৬৭৭১ বেশী ধরা হইয়াছে। ১৯৩১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বরের ইণ্ডিয়া গেজেটে বাংলার যে জনসংখ্যা দেওয়া আছে, ৭ই জুলাইএর কলিকাতা গেজেটে প্রদত্ত সংখ্যা তাহা অপেক্ষা কম। হিন্দু মুসলমানের সংখ্যাও কম।

প্রত্যেক জেলায় হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা ও হ্রাস বৃদ্ধি নীচে দেওয়া হইল—

	হিন্দু		
	১৯২১	১৯৩১	হ্রাস বৃদ্ধি
বাংলা	২০২০৬৭৬২	২১৫৭০৪০৭	+১৩৬৩৬৪৫
বর্দ্ধমান বিভাগ	৬৬০৭২১৭	৭১৬৪৪৪১	+৫৫৭২২৪
বর্দ্ধমান	১১২২২৬৩	১২৩৮৮৭২	+১১৬৬০৯
বীরভূম	৫৭৬৬৮৮	৬৩৬৪২৫	+৫৯৬৩৭
বাঁকুড়া	৮৮০৪৪২	১০১১৬৫৪	+১৩১২১২
মেদিনীপুর	২৩৫২০২৩	২৪৯২৯৮৯	+১৪০৯৬৬
হুগলী	৮৮৪৮০৯	৯২৪০৬১	+৩৯২৫২
হাওড়া	৭৯০৮৯২	৮৬০৪৪০	+৬৯৫৪৮
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৪৮৬৬৩৫৪	৫১৭৯১২৭	+৩১২৭৭৩
২৪ পরগণা	১৬৮৭৭১৭	১৭৪২৩৮৭	+৫৪৬৭০
কলিকাতা	৬৪৪৭৭২	৮২২২৯৩	+১৭৭৫২১
নদীয়া	৫৮১৮২৪	৫৭৪০৪৬	−৭৭৭৮
মুর্শিদাবাদ	৫৬৮৮২২	৫৮৯৫৫১	+২০৭২৯
যশোহর	৬৫৬৩৫৮	৬৩৪২৩০	−২২১২৮
খুলনা	৭২৬৮৬১	৮১৬৬২০	+৮৯৭৫৯
রাজসাহী বিভাগ	৩৪৮৭২৫৫	৩৭২১৭২৬	+২৩৪৪৭১
রাজসাহী	৩১৮৩৯৬	৩২৬০১৮	+৭৬২২
দিনাজপুর	৭৫১৮৩৫	৭৯৩৮৩২	+৪১৯৯৭
জলপাইগুড়ি	৫১৫১১০	৬৬৪০১৫	+১৪৮৯০৫
দার্জ্জিলিং	২০১৩৫৬	২৩৬৯১৩	+৩৫৫৫৭
রংপুর	৭৯১১৬৪	৭৪৬৫৪৬	−৪৪৬১৮
বগুড়া	১৭৪৪৯৩	১৭৭৬২৯	+৩১৩৬
পাবনা	৩৩৪৩৪৮	৩৩২৪৬৭	−১৯৮১
মালদহ	৪০০৫২৩	৪৪৪৪০৬	+৪৩৮৮৩
ঢাকা বিভাগ	৩৮১৩৫৭৯	৩৯৫৮৮৭০	+১৪৫২৯১
ঢাকা	১০৬৯১৭৬	১১২৪৮৯৩	+৫৫৭১৭
মৈমনসিংহ	১১৭৪১২৫	১১৭৪৩২৮	+২০৩
ফরিদপুর	৮১৫৭০২	৮৪৭০৬৪	+৩১৩৬২
বাকরগঞ্জ	৭৫৪৫৭৬	৮১২৫৮৫	+৫৮০০৯
চট্টগ্রাম বিভাগ	১৪৩২৩৫৭	১৫৪৬২৪৩	+১১৩৮৮৬
ত্রিপুরা	৭০৭৬৬০	৭৫০৭২৪	+৪৩০৬৪
নোয়াখালী	৩২৯১৩৭	৩৬৬৩৯১	+৩৭২৫৪
চট্টগ্রাম	৩৬৪০২১	৩৯২৩৫২	+২৮৩৩১
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৩১৫৩৯	৩৬৭৭৬	+৫২৩৭

দেশীয় রাজ্য	৬০৫৬৭০	৬৪১৬৬২	+৩৫৯৯২
কুচবিহার	৩৯৭৯৫৭	৩৮০০৭৩	−১৭৮৮৪
ত্রিপুরা	২০৭৭১৩	২৬১৫৮৯	+৫৩৮৭৬
সিকিম	৫৪৫৩৫	৪৬৬৭৩	−৭৮৬২

সিকিম রাজ্যে ১৯২১ সালে বৌদ্ধের সংখ্যা ২৬৭৮৮ ছিল। ১৯৩১ সালে ৩৫৪১২ অর্থাৎ ৮৬২৪ বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯২১ সালে ভূতোপাসক একজনও ছিল না, ১৯৩১ সালে Tribal Religionএর সংখ্যা ২৬৯৪০ হইয়াছে।

মুসলমান

	১৯২১	১৯৩১	
বাংলা	২৫২১০৮০২	২৭৪৯৭৬২৪	+২২৮৬৮২২
বর্দ্ধমান বিভাগ	১০৮২১২২	১২২২৭৭৯	+১৪০৬৫৭
বর্দ্ধমান	২৬৬২৮১	২৯২৪৭১	+২৬১৯০
বীরভূম	২১২৪৬০	২৫২৯০৮	+৪০৪৪৮
বাঁকুড়া	৪৬৬০১	৫১০১২	+৪৪১১
মেদিনীপুর	১৮০৬৭২	২১২৪৭৩	+৩১৮০১
হুগলী	১৭৩৬৩৩	১৮০২১৭	+৬৫৮৪
হাবড়া	২০২৪৭৫	২৩৩৬৯৮	+৩১২২৩
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৪৪৭৬৭৪১,	৪৭৭১১৬৫	+২৯৪৪২৪
২৪ পরগনা	৯০৯৭৮৬	৯১৩২৩৩	+৩৪৪৭
কলিকাতা	২০৯০৬৬	৩১১১৫৫	+[illegible]২০৮৯
নদীয়া	৮৯৫১৯০	৯৪৪৯১৫	+৫৯৭২৫
মুর্শিদাবাদ	৬৭৬২৫৭	৭৬১৫৮২	+৮৫৩২৫
যশোহর	১০৬৩৫৫৫	১০৩৫৩৭১	−২৮১৮৪
খুলনা	৭২২৮৮৭	৮০৪৯০৯	+৮২০২২
রাজসাহী বিভাগ	৬৩৪৯৬৮৯	৬৬৪০৩০৩	+২৯০৬১৪
রাজসাহী	১১৪০২৫৬	১০৮৩১০৫	−৫৭১৫১
দিনাজপুর	৮৩৬৮০৩	৮৮৬৭২৩	+৪৯৯২০
জলপাইগুড়ি	২৩১৬৮৩	২৩৫৯৫১	+৪২৬৮
দার্জ্জিলিং	৮৫১৬	৮৩৯১	−১২৫
রংপুর	১৭০৬১৭৭	১৮৩৬৮৪০	+১৩০৬৬৩
বগুড়া	৮৬৪৯৯৮	৯০৫৬৩৮	+৪০৬৪০
পাবনা	১০৫৩৫৭১	১১১১৭১২	+৫৮১৫১
মালদহ	৫০৭৬৮৫	৫৭১৯৪৩	+৬৪২৫৮
ঢাকা বিভাগ	৮৯৪৬০৪৩	৯৮৩৩২৮৯	+৮৮৭২৪৬
ঢাকা	২০৪৩২৪৬	২২৯৩৩৯৬	+২৫০১৫০
মৈমনসিংহ	৩৬২৩৭১৯	৩৯২৭৫৫২	+৩০৩৮৩৩
ফরিদপুর	১৪২৭৮৩৯	১৫০৭১৫৭	+৭৯৩১৮
বাকর গঞ্জ	১৮৫১২৩৯	২১০৫১৮৪	+২৫৩৯৪৫
চট্টগ্রাম বিভাগ	৪৩৫৬২০৭	৫০৩ ০৮৮	+৬৭৩৮৮১
ত্রিপুরা	২০৩৩২৪২	২'৫৬৬০৯	+৩২৩৩৬৭
নোয়াখালী	১১৪২৪৬৮	১৩৩৯০৫৫	+১৯৬৫৮৭
চট্টগ্রাম	১১৭৩২০৫	১৩২৬২০৮	+১৫৩০০৩
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৭২৯২	৮২১৬	+৯২৪
দেশীয় রাজ্য	২৭৫৩২২	৩১২৪৭৬	+৩৭১৫৪
কুচবিহার	১৯৩০৩৪	২০৮৭৫৬	+৫৭২২
ত্রিপুরা	৮২২৮৮	১০৩৭২০	+২১৪৩২
সিকিম	২০	১০৪	+৮৪

ভূতোপাসক

	১৯২১	১৯৩১	হ্রাসবৃদ্ধি
বর্দ্ধমান	৪৫৮০৯	৩৮২৬৪	−৭৫৪৫
বীরভূম	৫৭৬১০	৫৭০৬০	−৫৫০
বাঁকুড়া	৯১৪৭৭	৪৭৩৮৩	−৪৫০৯৪
মেদিনীপুর	১২৭৮২২	৮৬২৪৫	−৪১৫৭৭
হুগলী	২০৭৪৫	৮৮৫৭	−১১৮৮৮
২৪ পরগনা	১১১৭৬	৩৬৯৫১	+২৫৭৭৫
মুর্শিদাবাদ	১৫৬৫১	১৮১০৭	+২৪৫৬
রাজসাহী	২৯৭৭৪	১৮১০৬	−১১৬৬৮
দিনাজপুর	১১১২১৪	৬৭৪০৪	−৪৩৮১০
জলপাইগুড়ি	১৭৪১৭৫	৬০৬৭৫	−১১৩৫০০
দার্জ্জিলিং	১২৬৮১	৬৯৬৩	−৫৭১৮
বগুড়া	৮২০৩	২২৯৪	−৫৯০৯
মালদহ	৭৬৭৩৮	৩৬১৫৮	−৪০৫৮০
মৈমনসিংহ	৩৫১৯১	১৭৩৯৪	−১৭৭৯৭
রংপুর	৭২৮৭	৮২৩৫	+৯৬৬
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১৪৯৮৯	১১৭৫৯	−৩২৩০
কুচবিহার	৮৬১	১৩৮২	+৫২১

গত ১৯২১ সালে মাণিকতলা, কাশীপুর-চিৎপুর ও গার্ডেনরীচ এই তিনটী মিউনিসিপালিটীতে হিন্দু ১০৬৮৪১ এবং মুসলমান ৬০৭৮৩ ছিল এই দুই সংখ্যা ২৪পরগণার সংখ্যা হইতে বিয়োগ করিয়া কলিকাতার সহিত যোগ করিলে গত ১০শ বৎসরে হিন্দুর বৃদ্ধি ২৪পরগণার ১৬১৫১: এবং কলিকাতায় ৭০৬৮০ মোট ২৩২১৯১ এবং মুসলমানের বৃদ্ধি ২৪পরগণায় ৬৪২৩০ এবং কলিকাতায় ৪১৩০৬ মোট ১০৫৫৩৬ হয়। নদীয়া, যশোহর, রংপুর ও পাবনা এই চারিটী জেলার হিন্দুর সংখ্যা ৭৫৫০৫ কম হইয়াছে এবং যশোহর, রাজসাহী ও দার্জ্জিলিং এই তিনটি জেলায় মুসলমানের সংখ্যা ৮৫৪৬০ হ্রাস হইয়াছে।

ঘাটাল মহকুমায় ১৯৩১ সালে হিন্দু ২৫৬৫৪৯ এবং মুসলমান ১৫০৯৭ ; গত দশ বৎসরে এই মহকুমায় ২৯১৬ হিন্দু এবং ১৩১২ মুসলমান বৃদ্ধি হইয়াছে। আরামবাগ মহকুমায় হিন্দু পুরুষ ৪৮৭৩ বৃদ্ধি হইয়াছে ; কিন্তু স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৬১৬ হ্রাস হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমায় মুসলমানের সংখ্যা ১৮৩৩৩ এবং বিষ্ণুপুর মহকুমায় ৩২৬৭৯। সদর মহকুমায় ৩৫১২ এবং বিষ্ণুপুর মহকুমায় ৮৯৯ জন মুসলমান বৃদ্ধি হইয়াছে। বিষ্ণুপুর মহকুমায় হিন্দুর সংখ্যা ২৮৪৩৪৬ জন। গত দশ বৎসরে ৪৮৫১ জন কম হইয়াছে। কিন্তু ভূতোপাসকের সংখ্যা ১৫১৪ বৃদ্ধি হইয়াছে। গত ১৯২১ সালে এই মহকুমায় ভূতোপাসক ৪৪৮৯ ছিল। বারাসত মহকুমায় মুসলমান ১৬০ হাজার এবং হিন্দু ১১০ হাজার। গত দশ বৎসরে মুসলমান ৪০৪৯ এবং হিন্দু ৫২৬২ হ্রাস হইয়াছে। বসিরহাট মহকুমায় হিন্দুর সংখ্যা ২৯৪৭৩৬। গত দশ বৎসরে বৃদ্ধি হইয়াছে পুরুষ ৫৮২ এবং স্ত্রীলোক ২৪৮০। মুসলমানের সংখ্যা ২০৭৫১৪। বৃদ্ধি হইয়াছে ৯৭৫৬। নদীয়া জেলার সদর মহকুমায় হিন্দুর সংখ্যা ৯৭৭৫ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং রাণাঘাট মহকুমায় ৭২৮৫, চুয়াডাঙ্গা মহকুমায় ৪০৭৩, কুষ্টিয়া মহকুমায় ৩২০৯ এবং মেহেরপুর মহকুমায় ২৯২৫ হ্রাস হইয়াছে।

২৮টী জেলার মধ্যে ১৬ জেলায় হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেশী এবং ১১টী জেলায় মুসলমানের চেয়ে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় হিন্দু ও মুসলমানের চেয়ে বৌদ্ধের সংখ্যা বেশী। ১৯৩১ সালে এ জেলায় বৌদ্ধের সংখ্যা ১৫৫৪০৩ জন। মুসলমান-ভূয়িষ্ঠ ১৬টী জেলায় মুসলমানের সংখ্যা ২৩২৯২৯৯০ এবং হিন্দুর সংখ্যা ১০০৮৬৯৬২। হিন্দুভূয়িষ্ঠ ১১টী জেলায় হিন্দুর সংখ্যা ১১৪৪৬৬৬৯ এবং মুসলমানের সংখ্যা ৩৪৯৬৪১৮। মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি মহকুমায় মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা বেশী। যশোহর জেলায় নড়াইল, নয়গাঁতী, লালিখা, খুলনা জেলায় সদর মহকুমায় ফলতলা থানা ব্যতীত সকল থানায়, সাতক্ষীরা মহকুমায় শ্যামনগর দেবহাট্টা আশাশুনি থানায় হিন্দুর সংখ্যা বেশী। বাগেরহাট মহকুমায় বাগেরহাট, মরেলগঞ্জ, শরণখোলা থানা মুসলমানভূয়িষ্ঠ, অবশিষ্ট ৪টী থানা হিন্দুভূয়িষ্ঠ। সাতক্ষীরা থানায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক। দিনাজপুর জেলায় বালুরঘাট মহকুমায় বালুরঘাট, ধামোইরহাট, কুমারগঞ্জ গঙ্গারামপুর ও তপন, ঠাকুর গাঁ মহকুমায় পীরগঞ্জ, বোচাগঞ্জ, কাহারুল এবং সদর মহকুমায় বিরল, রাইগঞ্জ হেতমাবাদ, ইটাহার কালীয়াগঞ্জ, বংশীহরি ও কুসমুণ্ডী থানায় এবং রাজসাহী জেলায় গোদাগাড়ী ও বোয়ালিয়া থানায় হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী। রংপুর জেলায় কালীগঞ্জ ও ডোমর থানা, মালদহ জেলায় মাণিকচক, গাজোল, বামনগোলা, মালদহ, হবিবপুর, ইংলিশবাজার ও নাচোল থানা, ঢাকা জেলায় চাঙ্গীবাড়ী ও ময়মনসিংহ জেলায় খালিয়াজুড়ী থানা, বাকর জেলায় গৌরনাদী, স্বরূপকাটী, নাজিরপুর, ও ঝালোকাটী থানা হিন্দুভূয়িষ্ঠ। ফরিদপুর জেলায় গোপালগঞ্জ মহকুমায় হিন্দুর সংখ্যা বেশী। এই মহকুমায় কেবলমাত্র মুকসুদপুর থানায় হিন্দুর সংখ্যা কম। জলপাইগুড়ি জেলায় কোদা ও পচাগড় থানায় মুসলমানের সংখ্যা বেশী। ২৪ পরগণা জেলায় বারাসত মহকুমায় হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। সদর মহকুমায় ভাঙ্গার থানায়, বসিরহাট মহকুমায় বসিরহাট, স্বরূপ নগর, বাদুড়িয়া থানা মুসলমানপ্রধান। নদীয়া জেলায় রাণাঘাট মহকুমায় হরিণঘাটা থানা ব্যতীত সকল থানায় হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী। কুচবিহার রাজ্যে হলদিবাড়ী থানা এবং ত্রিপুরারাজ্যে সোণামুড়া ও উদয়পুর বিভাগে মুসলমানের সংখ্যা বেশী।

গত দশ বৎসরে শিক্ষায় কোন্ জাতির কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল—

লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা

	১৯২১	১৯৩১	হ্রাসবৃদ্ধি
হিন্দু পুরুষ	২৬০১০৭৭	২৫৮৯৩১৭	—১১৭৬০
স্ত্রী	৩১৮৩৩০	৪৪৩৫৯২	+১২৫২৬২
মুসলমান পুরুষ	১২৪০১৬৯	১৩৯২৮৫৯	+১৫২৬৯০
স্ত্রী	৫৯৩৭৯	১৯৩৪১১	+১৩৪০৩২
বৌদ্ধ পুরুষ	২০৬৩৯	২১৮৪৩	+১২০৪
স্ত্রী	২১৭৯	৩৪৫৯	+১২৮০
ভূতোপাসক পুরুষ	৫১৫৯	৩১০১	—২০৫৮
স্ত্রী	২৫১	৮১২	—৩৬১
খৃষ্টান পুরুষ	৩৭৯১৬	৪০৯১৪	+২৯৯৮
স্ত্রী	২৬০৮৪	২৮২৬৫	+২১৮১
মোট পুরুষ	৩৮৫০৬৫১	৪০৫৬৩৫৪	+২০৫৭০৩
স্ত্রী	৪০৩৯৫০	৬৭১৩৯৬	+২৬৭৪৪৬

১৯৩০—৩১ সালের শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৩১ সালের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে বাংলা বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রসংখ্যা ২৭৭৮৯৯২ এবং ছাত্রীসংখ্যা ৫৩৩৫৬১ ছিল।

তাহা হইলে বাংলার বিদ্যালয়সমূহের বাহিরে লিখনপঠনক্ষম পুরুষ ১২৭৭৩৬২ এবং স্ত্রীলোক ১৩৭৮৩৫ হইতেছে। ঐ তারিখে হিন্দু ছাত্র ১০৪৬৮৬১, ছাত্রী ২৬১১৬৯ এবং মুসলমান ছাত্র ১১০৩৭৪৬, ছাত্রী ২৮৭৭১৬ ছিল। বিদ্যালয়ের বাহিরে হিন্দুদের পুরুষ ১৫৪২৪৫৬ স্ত্রীলোক ২১২৪২৩ এবং মুসলমানদের পুরুষ ১৮৯১১৩ জন লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তি। ১৯৩১ সালের সেন্সাসের বিবরণে প্রদত্ত লিখনপঠনক্ষম মুসলমান স্ত্রীলোকের সংখ্যার চেয়ে ৯৪৩০৫ জন অধিক স্ত্রীলোক ১৯৩১ সালের ৩১এ মার্চ্চ তারিখে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। চারি বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক বালিকাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ পাঠান হয় না। সেন্সাস রিপোর্টে চারি বৎসর ও তত্তোহধিক বয়সের পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

কোন বিভাগে কিরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল—

		১৯২১	১৯৩১	হ্রাসবৃদ্ধি
বর্দ্ধমান পুরুষ		৮৪৯৬৮৩	৯৮৩২১১	+১৩৩৫২৮
বিভাগ	স্ত্রী	৬৬৩০১	১৩১০৩৮	+৬৪৭৩৭
প্রেসিডেন্সী	পু	১০৫৭১৫৩	৯৮৪৫৩৭	+৭২৬১৬
বিভাগ	স্ত্রী	১৪৪৪১৫	২০৩৪৮৮	+৫৯০৭৩
রাজসাহী	পু	৬২৪৪১১	৫৮৭৬৫৭	—৩৬৭৫৪
বিভাগ	স্ত্রী	৪৪৩৩০	৬৮৬৭৯	+২৪৩৪৬
ঢাকা	পু	৮৭৮৭৩৭	৯৭৮৬৬৪	+৯৯৯২৭
বিভাগ	স্ত্রী	১১১৭৩৪	২০২০৮৮	+৯০৩৫৪
চট্টগ্রাম	পু	৪৪০৬৬৭	৫২২২৮৫	+৮১৬১৮
বিভাগ	স্ত্রী	৩৭১৭০	৬৬১০৬	+২৮৯৩৬
কুচবিহার	পু	৪৩৯৬৪	৩৫৪৭৯	—৮৪৮৫
	স্ত্রী	২৫১৬	৩৩১৪	+৭৯৮
ত্রিপুরা	পু	২০১৯৯	১০১৩০	—১০০৬৯
	স্ত্রী	১৩৬৫	৭৭৪	—৫৯১

ইংরাজি ভাষায় লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা ও হ্রাসবৃদ্ধি

	১৯২১	১৯৩১	
পুরুষ	৭২৮৪৪১	৯৬২২২৭	+২৩৩৭৮৬
স্ত্রী	৪৪৭২০	৯৯৩৭৪	+৫৪৬৫৪

কোন বিভাগে কত বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

	পুরুষ	স্ত্রী
বর্দ্ধমান	৫১১৯৯	৭২৯৭
প্রেসিডেন্সী	৫৩১৮৯	২১১৬৫
রাজসাহী	২৫০৮৭	৪১৯৮
ঢাকা	৭১৭০৮	১৭৪২৭
চট্টগ্রাম	৩২৬৩৩	৪৫৬৭
	২৩৩৭৮৬	৫৪৬৫৪

কলিকাতা সহরে ইংরাজি ভাষায় লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা

	১৯২১	১৯৩১	
পুরুষ	১৫৩১০৮	১৯১১১৯	+৩৮০১১
স্ত্রী	২০৭৪৪	৩৭৫৬৭	—১৬৮২৩

বাংলা দেশে কেবলমাত্র রাজসাহী, দিনাজপুর, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায় লিখনপঠনক্ষম হিন্দুর চেয়ে লিখনপঠনক্ষম মুসলমানের সংখ্যা বেশী। মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায় শিক্ষিত হিন্দুর সংখ্যা এবং বাকরগঞ্জ জেলার পটুয়াখালী ও ভোলা মহকুমায় শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা বেশী। মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায় এবং ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় শিক্ষিতা মুসলমানীর সংখ্যা বেশী। মৈমনসিংহ জেলায় জামালপুর মহকুমায় এবং নোয়াখালী জেলার ফেণী মহকুমায় শিক্ষিতা হিন্দুর সংখ্যা বেশী।

১৪৩টী সহরের লোক সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৃটিশ শাসিত বাংলায় ১৩৮টী এবং দেশীয় রাজ্যে ৫টী অবস্থিত। ১১৮টী সহরে মিউনিসিপালিটী আছে। ১৭টীতে মিউনিসিপালিটী নাই এবং ৩টী ক্যাণ্টনমেণ্ট। দেশীয় রাজ্যের ৫টী সহরেই মিউনিসিপালিটী আছে। ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বৃটিশ বাংলায় ১৩০টী সহরে লোক সংখ্যা ৩১৮৬৩০০ এবং দেশীয় রাজ্যের ৫টী সহরে লোক সংখ্যা ২৫০০৪ ছিল। ১৯৩১ সালে বৃটিশ বাংলার সহরে লোক সংখ্যা ৩৬৮৪৩৩০ এবং দেশীয় রাজ্যের সহরে ২৭৬১০ হইয়াছে। বৃটিশ শাসিত সহরে ৪৯৮০৩০ এবং দেশীয় রাজ্যের সহরে ২৬০৬ বৃদ্ধি হইয়াছে। বৃটিশ শাসিত সহরগুলিতে কোন ধর্ম্মের কত লোক বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল—

	১৯২১	১৯৩১	বৃদ্ধি
হিন্দু	২২১২৬১৩	২৫৪১০৬২	+৩২৮৪৪৯
মুসলমান	৮৭৫২৬৪	১০২৯৩৭৪	+১৫৪১১০
খৃষ্টান	৬৪১১৬	৭৬৪৪০	+১২৩২৪
বৌদ্ধ	১৪০৩৩	১৫৬০৯	+১৫৬৫
জৈন	৮৩৫৮	৫৬৪৩	—২৭১৫
শিখ	২০১৯	৬৬২৭	+৪৬০৮
ইহুদি	১৮৩৭	১৮৫১	+১৪
পার্শি	৭১৬	১৩৫০	+৬৩৪
ভূতোপাসক	৫৬৭০	৪৮৪৭	—৮২৩
বিবিধ	১৬১৩	১৫২৭	—১৩৬
	৩১৮৬৩০০	৩৬৮৪৩৩০	+৪৯৮০৩০

এবারের তালিকায় বীরভূম জেলার বোলপুর, জলপাইগুড়ি জেলার বক্সা, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ সহরের বিবরণ নাই। বক্সায় ক্যাণ্টনমেণ্ট ছিল তাহা উঠিয়া গিয়াছে। মাণিকতলা, কাশীপুর, চিৎপুর ও গার্ডেনরীচ মিউনিসিপালিটী কলিকাতার সহিত যুক্ত হইয়াছে। তালিকা হইতে এই ৬টী বাদ হইয়াছে। ১১টী অন্য সহরের জনসংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। এমন কতকগুলি সহরের জনসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে যাহাদের লোকসংখ্যা ৩/৪ হাজারের কম। ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে উল্লেখ আছে—বাংলাদেশে ২ হাজার হইতে ৫ হাজার লোক বাস করে এরূপ গ্রামের সংখ্যা ২৮৮৫ এবং লোকসংখ্যা ৮৩০১৫৩৭। পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার লোক বাস করে এরূপ গ্রামের সংখ্যা ৩৬৪ লোকসংখ্যা ২৩৬৮৬৭২ এবং দশ হাজার হইতে বিশ হাজার লোক বাস করে এরূপ গ্রামের সংখ্যা ৭৬ লোকসংখ্যা ৯৩৬৯০৮। ক্যাণ্টনমেণ্ট ৩টীতে লোকসংখ্যা ১২২৬৪। ইহার মধ্যে ব্যারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের লোকসংখ্যা ১০৯৮২ জন। ব্যারাকপুর ও উত্তর ব্যারাকপুর এই দুইটী সহরের লোকসংখ্যা ৩০৬৭১। দমদমে ৩টী পৃথক মিউনিসিপালিটী আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দমদম এবং দমদম এই তিনটী মিউনিসিপ্যালিটীতে লোকসংখ্যা ২৮৩৫৬ জন। এক লাখের বেশী লোক বাস করে এরূপ সহরের সংখ্যা কলিকাতা বাদে ২টী মাত্র—হাওড়া ও ঢাকা; এবং খড়্গপুর ভাটপাড়া ও চট্টগ্রামের লোকসংখ্যা ৫০ হাজারের বেশী। ৩০ হাজারের বেশী লোক বাস করে এরূপ সহরের সংখ্যা ১৬টী। ৫ হাজারের কম লোক বাস করে এরূপ সহরের সংখ্যা ১৯টী এবং দেশীয় রাজ্যে ৩টী। প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৫০, বর্দ্ধমান বিভাগে ৩৬, রাজসাহী বিভাগে ২৫, ঢাকা বিভাগে ২০ এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ৭টী মাত্র সহর আছে। ২৪ পরগণায় ২৬ এবং হুগলী জেলায় ১০টী সহর আছে। বর্দ্ধমান নদীয়া মেদিনীপুর ও মৈমনসিংহ প্রত্যেক জেলায় ৯টী সহর আছে। প্রেসিডেন্সী বিভাগে সহরগুলিতে লোকসংখ্যা ১৯৮৮০৮৯ অর্থাৎ অর্দ্ধেকের বেশী। ২৪ পরগণা জেলায় সহরবাসীর সংখ্যা ৫৩৮৬০৯।

কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলায় [illegible] শহরগুলির মোট জনসংখ্যা ২১৮৬৬৯৫। গত দশ বৎসরে ২৮টী সহরে লোকসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যে কুচবিহারের হলদিবাড়ী সহরের লোকসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। বৃটিশ বাংলায় ১২৫টা সহরে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা বেশী এবং ১২টা সহরে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। কক্স বাজার সহরে বৌদ্ধের সংখ্যা বেশী। নীচে ১২টি সহরের হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা দেওয়া হইল।

	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান
জলীপুর	১২৭৯৬	৫৬৩৬	৭১২৩
ধুলিয়ান	৯৭৬৭	৩৭৫৫	৫৯৪৮
কোটচান্দপুর	৬১১৫	২৮৯৭	৩২১৬
কুড়িগ্রাম	৮৪৫২	৩২৯৬	৫১১৪
সিরাজগঞ্জ	৩২৪৬৭	১৩০০৯	১৯২৮৪
নবাবগঞ্জ	১৫৮২৬	৫৪৩৫	১০৩৮৪
শেরপুর	১৯৫৪৭	৮৩৮৪	১১০৩৩
কিশোরগঞ্জ	১৫৪৩৭	৭৪৬৭	৭৯৫৪
নোয়াখালী	১৩০৬৩	৪৬৯১	৮১৬৮
ফেণী	১০৮৭৫	৩১৩২	৭৭২১
চট্টগ্রাম	৫৩১৫৬	২৩৯৭৭	২৭১৯৮
কুমিল্লা	৩১৩৬৫	১৪৬২৫	১৬৫৯৫

কক্স বাজারের লোকসংখ্যা ৫০১৮, তন্মধ্যে বৌদ্ধ ২২৫৮, হিন্দু ৮৫৭, মুসলমান ১৮৯৯ জন।

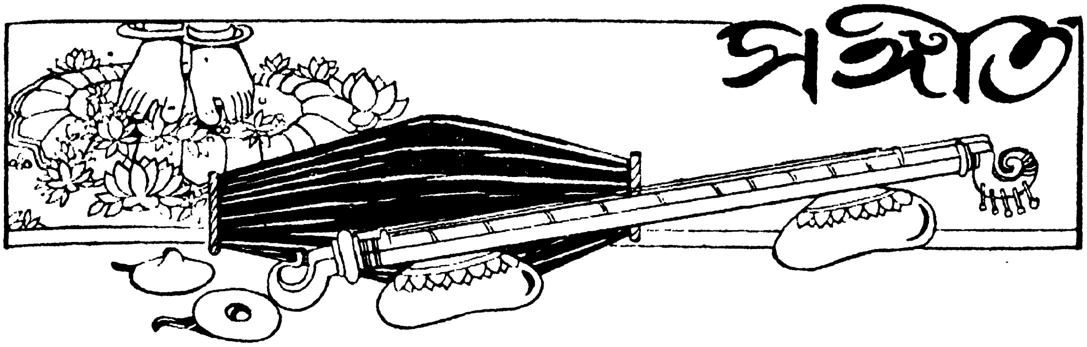
কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, মুক্তাগাছা ও পিরোজপুর সহরে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। ১৯২১ সালে যশোহর জেলার কোটচান্দপুর সহরে মুসলমানের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা বেশী ছিল। গত ১০ বৎসরে হিন্দু ৯৩২ এবং মুসলমান ৪৫৫ হ্রাস হইয়াছে।

গত ১৪ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটে এবারের সেন্সাসে হিন্দুদের ১৩৯টী জাতির জনসংখ্যা বাহির হইয়াছে। গতবারে ৫৬টী জাতির জনসংখ্যা এবং যে সকল জাতির কেবলমাত্র একাধিক জেলায় বাস সেইরূপ ৪৬টী মোট ১০২টী জাতির পৃথক জনসংখ্যা ছিল। এবারে প্রথম তালিকা হইতে ১০টী এবং দ্বিতীয় তালিকা হইতে ১৪টী জাতি বাদ পড়িয়াছে। অর্থাৎ গতবারে প্রদত্ত ২৪টী জাতির পৃথক জনসংখ্যা এবারে নাই। এই ২৪টী জাতির মধ্যে গন্ধবণিক, তাম্বুলী, সুবর্ণ বণিক, ময়রা, চাষাধোবা প্রভৃতি জাতির জনসংখ্যা নাই।

কতকগুলি আদিম জাতির হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ভূতোপাসকের সংখ্যা পৃথক পৃথক দেওয়া হইয়াছে। গত বারে মুসলমানদের ৭টী পৃথক শ্রেণীর জনসংখ্যা ছিল। এবারে কেবল সৈয়দ ও জোলা মুসলমানের পৃথক সংখ্যা আছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৫৬টী পৃথক পৃথক শ্রেণীর পৃথক জনসংখ্যা আছে। কতকগুলি জাতির অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে। হয় ত ইহা গণনার ভুল হইবে। সেন্সাস বিভাগের ইহা আর একবার সংশোধন করিয়া দেখা উচিত। যে ২৪টী জাতির জনসংখ্যা এবারে দেওয়া হয় নাই, তাহাদের এবারে বৃদ্ধি হইল কি হ্রাস হইল তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহাদের চেয়ে কম সংখ্যক অনেক জাতির জনসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুদের প্রধান জাতিগুলির জনসংখ্যা ও হ্রাস-বৃদ্ধি নীচে দেওয়া হইল।

	১৯২১	১৯৩১	হ্রাস-বৃদ্ধি
ব্রাহ্মণ	১৩০৯৫৩৯	১৪৪৭৬৯১	+১৩৮১৫২
মাহিষ্য	২২১০৬৮৪	২৩৮১২৬৬	+১৭০৩৮২
নমঃশূদ্র	২০০৬২৫৯	২০৯৪৯৫৭	+৯২৬৯৮
রাজবংশী	১৭২৭১১১	১৮০৬৩৯০	+৭৯২৭৯
কায়স্থ	১২৯৭৭৩৬	১৫৫৮৪৭৫	+২৬০৭৩৯
বাগ্দী	৮৯৫১৭৩	৯৮৭৫৭০	+৯২১৭৩
সাঁওতাল হিন্দু	১৫৮৩৮৩	৪৩৩৫০২	+১৭৫১১৯
„	৫৫৩৬৫৭	৩৫২৩৮৩	—২০১২৭১
পোদ	৫৮৮৩৯৪	৬৬৭৭৩১	+৭৯৩৩৭
গোয়ালা	৫৮৩৯৭০	৫৯৯২৮৩	+১৫৩১৩
সদ্গোপ	৫৩৩২৩৬	৫৭১৭১২	+৩৮৪৭৬
নাপিত	৪৪৪১৮৮	৪৫১০৬৪	+৬৮৭৬
সাহা	৩৫৯৭৩১	৪২০১৯৯	+৬০৪৬৮
মুচি	৪১৭৫৯৪	৪১৪২২১	—৩৩৭৩
যোগী	৩৬৫৯১০	৩৮৪৬৩৪	+১৮৭২৪
জালী কৈবর্ত্ত	৩৮৪০৪৯	৩৫২০৭২	—৩১৯৭৭
বৈষ্ণব	৩৭৮১০৭	৩৩৭৭৭১	—৪০৩৩৬
বাউরী	৩০৩০৫৪	৩৩১২৬৮	+২৮২১৪
তাঁতি	৩১৯৬১৩	৩৩০৫১৮	+১০৯০৫
কলু	৯৫৯০৬	২৯৫৩০৬	+১৯৯৪০০
কুমার	২৮৪২৫৩	২৮৯৮১০	+৫৫৫৭
কামার	২৫৬৮৮৭	২৬৫৫৩১	+৮৬৪৪
ধোবা	২২৭৪৬৮	২২৯৬৭২	+২২০৪
তিলি	৩৯৫৯২৬	২০৭৮৮৩	—১৮৮০৪৩
ওরাঁ হিন্দু	৬৪৬৭৭	১৩৬৪২৭	+৭১১৫০
„	১৩৭৭৬৫	৮৩৭৯২	—৫৩৯৭৩
মালো	২২১১৯৮	১৯৮০৯৯	—২৩০৯৯
বারুই	১৮৫৮৭০	১৯৫১৩৯	—১৯২৬৯
কুরমী	১৮১৪৪৭	১৯৪৬২৫	+১৩২০৫
কাপালী	১৫৮৮৬৪	১৬৫৫৮৯	+৬৭২৫
রাজপুত	১২৫৫১৩	১৫৬৯৭৮	+৩১৪৬৫
চামার	১৫২৩৭২	১৫০৪৫৮	—১৯১৪
ডোম	১৫০২৬৩	১৪০০৬৭	—১০১৯৬
হাড়ি	১৪৮৮৪৭	১৩২৪০১	—১৬৪৪৬
মাল	১১৭৫৩৭	১১১৪২২	—৬১১৫
বৈদ্য	১০২৯৩১	১১০৭৩৯	+৭৮০৮
কেওড়া	১১০৬৫২	১০৭৯০৮	—২৭১৪
তিয়র	১৭৫৭২১	৯৬৪১৩	—৭৯৩০৮
ভূমিজ	৭৯১৯৬	৮৫১৮১	+৫৯৮৫
কোচ	১৩০২৭৩	৮১২৯৯	—৪৮৯৭৪
মালাকার	৫৬৭০৪	৭৯০৮৪	+২২৩৮০
শুঁড়ি	৯২৪৯২	৭৬৯২০	—১৫৫৭২
ভূঁইমালি	৮১৯৫২	৭২৮০৪	—৯১৪৮
মুণ্ডা হিন্দু	৪০৫৭৪	৬৩১০৭	+২২৫৩৩
„	৫৮৭৬৯	৪২৩২১	—১৬৪৪৮
লোহার	৬৫১০৩	৫০১৮২	—১৪৯২১
পাটনী	৪৩৯৬৫	৪০৭৬৬	—৩১৯৯
ভূঁঞা	৫৯৪৪৮	৫০৪০৫	—৯০৪৩
দোশদ	৪০১২১	৩৬৪২০	—৫৭০১

বাঁকুড়া জেলায় ১৯০১ সালে ৩১৩৪০ এবং ১৯১১ সালে ৩০৪৬৭ জন খয়রা ছিল। ১৯২১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বাঁকুড়া জেলায় এই জাতির সংখ্যা ছিল না। এবারের তালিকায় দেখিতেছি বাঁকুড়া জেলায় এই জাতির জনসংখ্যা ২৬৯৫৮।



কে তুমি ওগো !

কথা—স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন বসু

মিশ্র আসোয়ারী—একতালা।

কে তুমি ওগো ! কে তুমি ! মম বিষণ্ণ শূন্য জীবনে।
উদিলে আসিয়া বিকাশিয়া হিয়া
আলোকে পুলকে যৌবনে।

সুখ-কম্পিত স্রোত-হিল্লোলে
বহে কল্লোলে মন্দাকিনী,
মরম বীণায় উঠিল বাজিয়া,
বিস্মৃত যত রাগরাগিণী।

মধুর সুরে ললিত ছন্দে,
প্রেম পূরিত পূর্ণানন্দে,
উঠিল গীতি উদারা কণ্ঠে
সপ্তম তান কম্পনে ॥

\+ -
II { ণ্‌া সা জ্ঞা | মপা পর্সা র্সা | ণধা র্সণা দা | পা মপা জ্ঞা
কে • তু মি ও গো কে • তু মি ম ম

\+ ৩ • ১
মা পণা দা | পমা পা মা | জ্ঞা মজ্ঞা ঋা | সা । । } | { পা জ্র্ঁা জ্র্ঁা | র্ঋা র্সা র্সা
বি ষ ণ্ণ শূ • ন্য জী • ব নে • • উ দি লে আ সি য়া

\+ ৩ • ১ + ৩
I ণা ণর্ঋা র্সা | ণা দা পা | মা পা জ্ঞা | মা পণা দপমা | জ্ঞা মজ্ঞা ঋা | সা । । } II
বি কা শি য়া হি য়া আ লো কে পু ল কে যৌ • ব নে • •

৭৫

০ ১ + ৩

II { মা পা ণদা | ণদা দা ণা | র্সা র্সা র্জ্জা | র্ঋা র্সা র্সা

সু খ ক ০ ম্পি ত স্রো ত হি ০ ল্লো লে

০ ১ + ৩

| র্জ্জা র্জ্জা র্ঋা | ৷ র্সা র্সা | ণা র্ঋা র্সণা | দা পা ৷ } |

ব হে ক ০ ল্লো লে ম ন্‌ দা কি নী ০

০ ১ + ৩

| {পা র্সা র্সা | র্ঋা ণসা র্জ্জর্ঋর্সণা | ণা র্সা ণা | দা পা ৷

ম র ম বী ণা য় উ ঠি ল বা জি য়া

০ ১ + ৩

| মা পা জ্ঞা | মা ণা দপমা | জ্ঞা মা জ্ঞা | ঋা সা ৷ } II

বি ০ স্ম ত য ত রা গ রা গি নী ০

০ ১ + ৩

II {মা পা পা | ণদা ৷ দণা | ণা র্সা র্সা | র্জ্জর্ঋা ৷ র্সা

ম ধু র সু ০ রে ল লি ত ছ ০ ন্দে

০ ১ + ৩

| র্জ্জা ৷ র্জ্জা | ঋা র্সা র্সা | ণা ণর্ঋা র্সণা | দা দা পা } |

প্রে ০ ম পূ রি ত পু ০ র্ণা ন ০ ন্দে

০ ১ + ৩

| পা র্সা র্সা | ণর্সা র্জ্জাঋা র্সা | ণা র্সা ণা | দা ৷ পা

উ ঠি ল গী ০ তি উ দা রা ক ০ ণ্ঠে

০ ১ + ৩

| মা পা জ্ঞা | মা ণা দপমা | জ্ঞমা জ্ঞা ঋা | সা ৷ ৷ } II II

স ০ প্ত ম তা ন ক ম্‌ প নে ০ ০



টাণ্ডা জলপ্রপাত - বিন্ধ্যাচল

অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

তেইশ বৎসর পরে আবার এলাহাবাদ গিয়াছিলাম। সেদিন আর এদিনে কত প্রভেদ। তখন ষ্টেসনের বাহিরে এক্কা ও টাঙ্গার ভিড়ই দেখিয়াছি বেশী, আর এবার দেখিলাম, টেক্সি, লরি, সঙ্গে সঙ্গে আছে এক্কা ও টাঙ্গা; তবে মনে হইল অনেকটা যেন কম। সেবার আসিয়াছিলাম তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে; তাই ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইয়াছিলাম; আর মন্দিরে-মন্দিরে ঘুরিয়াছি এবং গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়াছি। এবার স্বর্গীয় প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের রাজপ্রাসাদের মত জর্জ্জ টাউনের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। তাঁহার পুত্রদের সৌজন্যে মুগ্ধ হইলাম।

সময়ে সব জিনিষ বদ্‌লাইয়া যায়। আকবরের নির্ম্মিত এলাহাবাদের দুর্গ তেমনি আছে; কিন্তু গঙ্গা সেখান হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। অনেকটা স্থান যুড়িয়া বিশাল বালুর চর। তার পর পথ-ঘাটেরই বা কত পরিবর্ত্তন। সারা পথে পিচ্ ঢালা; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—একেবারে ঝরঝরে। দুই দিকে তরুবীথি ছায়া-শীতল করিয়া দূরদিগন্তে যাইয়া মিশিয়াছে। সেবার শীতে কাঁপিয়াছি; এবার গ্রীষ্মের 'লু' জিনিষটা যে কি রকম, তাহা অনুভব করিয়াছি। তবে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলিয়া মাঝে দিন কয়েক বৃষ্টি হওয়ায় গরমটা তত পীড়া দেয় নাই।

মানুষ কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? এলাহাবাদে যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহা হাওয়া-গাড়ীর কৃপায় অতি অল্প সময়েই দেখা হইয়া গেল। তখন কথা হইল—কি দেখি, কোথা যাই? সঙ্গীই বা কে হয়! কেহ বলিলেন, প্রাচীনের শত-স্মৃতি-সঞ্চিত কৌশাম্বী,—সেখানে অশোকের একটি লাট আছে, অনেক ঢিবি আছে, অনেক মূর্ত্তি আছে, এমন কি যদি ভাগ্য ভাল থাকে তাহা হইলে প্রাচীন তাম্রমুদ্রা কিনিতে যাইয়া স্বর্ণমুদ্রাও লাভ হইতে পারে! দু' একজনের অদৃষ্টে না কি অমন জুটিয়াছে। ভাবিলাম—যদি আমাদের হয়, মন্দ কি! কিন্তু তাহা কি হয়? অভিজ্ঞ যাঁহারা তাঁহারা বলিলেন—এলাহাবাদ হইতে কৌশাম্বি অনেকটা দূর—প্রায় ৪০।৪৫ মাইল। অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয়। তাও পথ তত ভাল নয়। আর এমন দিনে যাওয়াটা কোন রকমেই ভাল নয়। কাজেই সাধ না মিটিল! সেদিনকার সেই বিতর্ক-সভায় শ্রীমান্ হরিনাথবাবু বলিলেন—"অত শত ভেবে কাজ কি? চলুন টাণ্ডায় যাওয়া যাক্। বৃষ্টি হয়ে গেছে—এখন প্রপাতে



বিন্ধ্যাচলের পথে

বেশ জল দেখা যাবে। এ কথায় অনেকেই সায় দিলেন—দিলেন না পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পণ্ডিত মহাশয় প্রবীণ লোক—সাহিত্যিক মানুষ। মাথার মাঝখানটায় টাকটিও অশোভন নয়, তার আশে পাশে পাকা চুল। বয়সও পঞ্চাশের অনেকটা উপরে। এ দেশেও আছেন সাতাইশ বছরের বেশী। এ হেন অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"মশাই, ওখানে শ্রাবণ মাসের

আগে কিছুই দেখ্‌তে পাবেন না—মিছামিছি কষ্ট পাবেন। পণ্ডিতজীর কথায় একটু দমিয়া গেলাম,—কিন্তু নিরাশ হইলাম না। নিরাশ না হইবার কারণ পণ্ডিতজী নিজেই কথা-প্রসঙ্গে অনেকবার বলিয়াছেন যে, তিনি সুযোগ সত্বেও এলাহাবাদ আর কাশী ছাড়া এক পাও অগ্রসর হন নাই—নিজে টাণ্ডায় কোন দিন যান নাই, কাজেই hearing is no evidence! শোনা কথার আবার মূল্য কি? এ কথা মনে করিয়া তাঁহার কথাটা আমরা গ্রাহ্য করিলাম না। বরং তাঁকেও দলে আনিবার চেষ্টা করিলাম—তাহলে হয় ত বা ভ্রমণটায় কোন বাধা নাও ঘটিতে পারে। পণ্ডিতজী কিন্তু সোজা লোক নন্—'বাঙ্গাল বাঁকুড়াবাসী!' তিনি



টাণ্ডা-প্রপাতের জলধারা

বলিলেন—আমার কি যাবার জো আছে? তাহলে যে ব্যাকরণের ফর্মাটা আট্‌কা পড়্‌বে মশাই!" একে পণ্ডিত; তাতে ব্যাকরণ, এ হেন কাজের লোককে সঙ্গী হ'তে বলা যে বিড়ম্বনা মাত্র, তা না বলিলেও চলে। পণ্ডিতজী না গেলেও আমাদের সঙ্গী জুটিয়া গেল। শ্রীমান্ হরিনাথ ঘোষ, হরিভূষণ ঘোষ ও তুলসীচরণ, ইণ্ডিয়ান প্রেসের এ তিন অর্দ্ধরথী মহা উৎসাহের সহিত সঙ্গী হইলেন। ইঁহাদের কাহারো বয়স কুড়ি, একুশ, বড় জোর বাইশের উপর যায় নাই! কাজেই অর্দ্ধরথী কথাটা বোধ হয় মানায়। হরিনাথবাবু আলোকচিত্র গ্রহণে বিশেষ দক্ষ। তুলসীবাবু তাঁহার সহকারী।

টাণ্ডা জলপ্রপাত মির্জাপুর হইতে নয় মাইল দূরে বিন্ধ্যাচলের উপর। মির্জাপুর এলাহাবাদ হইতে ৫৮ মাইল দূর। 'ষ্টেসনে এক্ক', টাঙ্গা এ-সব মিলে, টেক্সিও সময় সময় পাওয়া যায়। কাজেই যাওয়ার কোন ক্লেশ নাই। এলাহাবাদ হইতে টাণ্ডা জলপ্রপাত দেখিতে যাইবার পক্ষে 'তুফান' মেইলেই সুবিধা। সে গাড়ী এলাহাবাদে আসে রাত্রি ৩-৩৫ মিনিটে। অসময়ে কে কাকে জাগাইবে? হরিনাথ ভায়া সে ভার দিলেন আমার উপর। আমি বয়সে প্রবীণ হইলেও ভ্রমণের ব্যাপারে তরুণদের চেয়ে উৎসাহী এতটুকু কম নই। রাত্রি আড়াইটার সময় জাগিয়া সকলকে জাগাইলাম। তখন হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বাড়ীর লোকদের ঘুমের যে ব্যাঘাত হইয়াছিল, সে কথা পাঠক-সাধারণ বুঝিয়া লইবেন। আমাদের গোলযোগের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর 'গ্রে' কুকুরটাও ভীষণ চীৎকার সুরু করিয়া দিয়াছিল। মোটর-চালক লছমন্ বেচারার সে নিশীথে আর নিদ্রার সুযোগ ঘটে নাই। মিনিট দশেকের মধ্যে নিস্তব্ধ রাজপথের ভিতর দিয়া ষ্টেসনে আসিলাম। সেদিন গাড়ী প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্বে আসিয়াছিল। রাত্রির অন্ধকারে দুই দিকের বিশাল মাঠ, আমবাগান, গাছপালা সব পিছনে পড়িতে লাগিল। খুব ভোরে আসিয়া পৌঁছিলাম বিন্ধ্যাচলে। বিন্ধ্যাচলের পরেই মির্জাপুর আসা গেল।

তখন সবে ছ'টা। মির্জাপুরে যে রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুম' আছে সেটা হইতেছে শুধু Tea Refreshment room,—খাওয়ার কোন ব্যবস্থা চলে না। ষ্টেসনে মির্জাপুর E. I. Ry-এর ডাক্তারবাবুর সহিত আলাপ হইল। তিনি আমাদের খাবার ব্যবস্থা করিতে রাজি হইলেও, আমরা অস্বীকার করিয়া—Refreshment room-এ চায়ের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে রুটি, মাখন, ফল খাইয়া অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইলাম। ষ্টেসনের বাহিরে কয়েকটা এক্কা ও টাঙ্গা দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের মধ্য হইতে দুইখানি এক্কা আসা-যাওয়ার জন্য তিন টাকায় ভাড়া করিয়া বিন্ধ্যাচলের দিকে টাণ্ডার পথে রওয়ানা হইলাম।

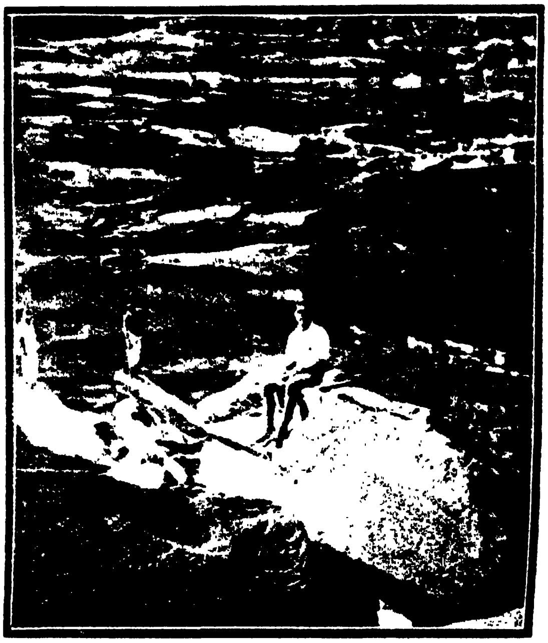
পথটি বেশ ভাল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্। পথের দুই দিকে নিম, জাম, মহুয়া গাছের সারি। কালো-জাম গাছগুলি বেশী উঁচু নয়, কিন্তু গাছের পাতা পর্য্যন্ত দেখা যায় না এমনি থলো থলো কালোজাম ফলিয়াছে।

গাছের নীচে গ্রামের পুরুষ ও মেয়েরা ফল কুড়াইয়া ঝুড়ি ভরিতেছে; কেহ বা ঝুড়ি বোঝাই করিয়া সহরে বিক্রী করিবার জন্য যাইতেছে। এক দিকে একটা ইন্দারার ধারে, ছোট একটা খোলার ঘরের ভিতর, কয়েকজন পালোয়ান লাল মাটি মাখিয়া ডন-কুস্তী খেলিতেছে। দুই দিকে পাথরের কারখানার মজুরদের হাতুড়ি বাটালির খুট্ খুট্ শব্দ চলিতেছে। দূরে বিন্ধ্য-পাহাড়ের ধূসর অঙ্গ কোথায় যাইয়া মিশিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে তেমন গাছপালা নাই। বিন্ধ্য-পাহাড় তেমন উঁচুও নয়। সমুদ্রের বুকে যেমন একটির পর একটি ঢেউ আসে, এ তেমনি ঢেউয়ের মত একটির পর একটি এমনি ভাবে দূরদিগন্তে যাইয়া মিশিয়াছে। বেলা প্রায় সাড়ে সাতটায় রওয়ানা হইয়া বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম নয়টার কাছাকাছি। পাহাড়ের গা কাটিয়া-ভাঙ্গিয়া-খুদিয়া পাথর বাহির করিয়া ফেলায় বিন্ধ্যাচলের গা দেখাইতেছিল ঠিক্ যেন মৌচাক।

পাহাড়ের একটা বাঁকের নীচে খানিকটা পথ ঢালু। এখানে একা হইতে নামিলাম। নামিয়া আমরা হাঁটিয়া পাহাড়ে উঠিলাম। আকাশ ঘন নীল। মেঘের কোন চিহ্ন নাই। সূর্য্যের তেজ অতি প্রখর। বিন্ধ্যাচলের উপরটা বহুদূর-বিস্তৃত সমতল ভূমিখণ্ড। পাহাড়ের উপর এমন বিস্তৃত সমতলভূমি বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। লালমাটির পথ। বড় বড় কালো পাথর। কুল-গাছ আর কাঁটা-গুল্ম। কিন্তু পাহাড়ের উপর হইতে চারি দিকের দৃশ্য অতুলনীয়। পাহাড়ের পর পাহাড়। মাঝে মাঝে আমবাগানে ঘেরা মাটির দেয়ালের তৈয়ারী খোলার ছাউনি ঘরবাড়ী। বাহিরে আমগাছের নীচে একটা কূয়া। স্ত্রীলোকেরা কলসী সাজাইয়া বসিয়া আছে, একজনের পর একজন জল ভরিয়া ধীর-গতিতে বাড়ীর পথে চলিয়াছে। আকাশে পাখীও বড় একটা উড়িতে দেখিলাম না। তবে আমগাছের ঘন পাতার মধ্যে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছিল। সে কুহুরব শুনিতেছিলাম অবিশ্রান্ত। মহুয়া গাছের নীচে আকুশি হাতে মেয়েরা বীজ সংগ্রহ করিতেছিল।

পাহাড়ের উপর আবার একায় চড়িলাম। একেবারে সমতল। লাল মাটির বিস্তৃত পথ। গাড়ীর চাকার দাগ। এ পথে অনেক হরিণ ছুটিয়া বেড়াইতে দেখিলাম। কোথাও ময়ূর ময়ূরী নিঃশঙ্ক চিত্তে বেড়াইতেছে। আকাশে এই একটু মেঘ দেখিতেছি, অমনি আবার তাহা মিলাইয়া যাইতেছে।

পাহাড়ের সামান্য একটু ঢালু জায়গায় ডাকবাংলো। ডাকবাংলোর বাড়ীটির বয়স বড় কম নয়—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এই বাড়ীটি তৈয়ারী হইয়াছিল। প্রপাতের ঠিক্ উপরে ঢালু পাহাড়ের গায়ে ইহার অবস্থান। খানিকক্ষণ ডাকবাংলোয় বিশ্রাম করিলাম। বারান্দার উপর আরাম-কেদারায় বসিয়া চাহিয়া দেখিলাম—প্রকৃতির অপূর্ব্ব



প্রপাত-সম্মুখে

সৌন্দর্য্য। অতি দূরে গঙ্গার সলিলধারা শুভ্র রজতরেখার মত দেখা যাইতেছে। তিন দিকে বিন্ধ্যাচল। মির্জাপুরের দুই একটি বাড়ীর সাদা সাদা চিহ্ন দেখা যাইতেছে মাঠ কোথাও সমতল-শ্যামল—কোথাও অসমতল বন্ধুর ও অনুর্ব্বর। বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির, দু'চারিটি বাড়ী বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। হঠাৎ একটু কালো মেঘ আসিয়া আকাশের অনেকটা ছাইয়া ফেলিল। সূর্য্য ঢাকা পড়িল। সে ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। সামনের পত্রবহুল নিমগাছের পাতাগুলি ঝিরিঝিরি রবে কাঁপিতেছিল। শরীর স্নিগ্ধ হইল—

এ শুধু নিমেষের খেলা। আবার রৌদ্র দেখা দিল। সেই রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে চক্ষে পড়িল—টাণ্ডা জলপ্রপাতের জলধারা দুইটি উপত্যকার মধ্য দিয়া ক্ষীণ গতিতে সমতল-ভূমির দিকে নামিয়া চলিয়াছে। দুই দিকে উঁচু পাহাড়। মাঝে শিলাকীর্ণ বন্ধুর নদীর বুক। পাহাড়ে পাহাড়ে—কালো পাথর—জঙ্গল, ঝোপঝাড়। শাখাবহুল বড় গাছ বড় বেশী নাই। নদী যেখানে সমতল-ভূমির দিকে নামিয়া চলিয়াছে, সেখানে দেখা যাইতেছে—শ্যামল বনানী, আর দু'চারিটি পল্লীর সাদা পাথরে গড়া দেবমন্দিরের চূড়া। বিশ্রাম-শেষে প্রপাতের দিকে চলিলাম।

ডাকবাংলোর বাহিরে গুটিকয়েক নিমগাছ। তার সাম্‌নে একটা টাঙ্গা। টাঙ্গার ঘোড়াটি চরিয়া



প্রপাত-নিম্নস্থ জলাশয়

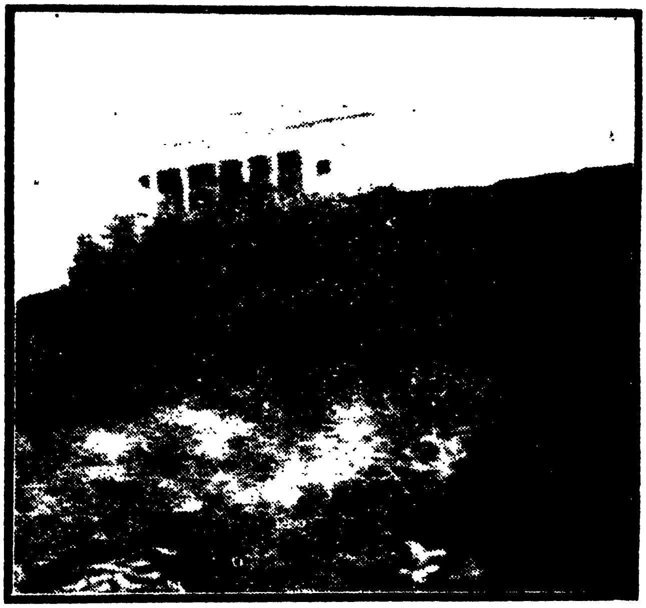
বেড়াইতেছে। আমাদের একাওয়ালারা ঘোড়া দু'টি ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহারা মনের আনন্দে রৌদ্রদগ্ধ বিবর্ণ ঘাসের উপর ইচ্ছামত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাস খাইতেছে। দাড়িওয়ালা একাওয়ালা নিমের ছায়ায় গায়ের কাপড় বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে, আর গাহিতেছে, 'মুরলি ধুন কাঁহা বাজিরে।' দীপ্ত দ্বিপ্রহরে রাধার বিরহ-বেদনা কাহারও চিত্তে বেদনা জাগাইয়া দিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। একটি নিমগাছের নীচে বসিয়া একজন ভুঁড়িওয়ালা মির্জাপুরে ঠিকাদার বন্দুক সাফ করিতেছিল। তাহার পাশে তার পাঁচ ছয় বছরের ছোট মেয়েটি বয়স্কা গৃহিণীর মত গম্ভীরভাবে বসিয়া ছিল। এই ঠিকাদার আমাদের গাইড্ হইলেন। তিনি ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু বনভোজন ও শিকার খেলিতে এখানে আসিয়াছেন। আমরা তাঁহার সহিত নীচে নামিয়া চলিলাম। কয়েক পা নীচে নামিয়াই দেখিলাম একটি ছোট বটগাছের নীচে গুহার মত একটা জায়গার পাশে কতকগুলি সমতল পাথরের উপর চুল্লি তৈরী হইয়াছে। ওখানে একটু নীচে অনেকটা সবুজ জল জমিয়া আছে। সে জল দিয়া তাহারা ঐ জায়গাটিকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। প্রপাতের জলধারা যেখানে পড়ে সেদিকে নামিতে লাগিলাম। বন্ধুর শিলাকীর্ণ পথ। পথ বলা চলে না। কাঁটা-গুল্ম ও লতা। জলের ধারা নামিবার পথটি শৈবালাচ্ছন্ন, পিচ্ছিল। পা পিছলাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তরুণের দল পরম উৎসাহে নামিতে লাগিলেন। হরিনাথ ভায়া তাহার ক্যামেরা লইয়া ব্যস্ত। হরিভূষণ বাবু ওরফে ভূষি' বাবু একটা adventureএর জন্য ব্যাকুল। অতি কষ্টে প্রায় এক শত ফিট নীচে প্রপাতের কাছাকাছি আসিলাম। এখানকার দৃশ্য অতি সুন্দর। তিন দিকে পাষাণ-প্রাচীর। জল-স্রোতের আঘাতে নানা আকার ধারণ করিয়াছে। প্রায় ১৫০—২০০ ফিট উঁচু হইতে জলধারা নামিয়া আসে। কিছু দিন পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়াছিল; তাই অল্প অল্প ধারা পড়িতেছিল। সেই নিস্তব্ধ বনভূমে যে জল পতনের শব্দ ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্ করিয়া শুনিতেছিলাম না বটে, তবে ঝির্‌ঝির্ ঝিম্‌ঝিম্ শুনিতেছিলাম। জলপ্রপাতের নীচে একটি গভীর জলাশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সে জল স্বচ্ছ, শীতল ও গভীর। মির্জাপুরি বন্ধু বলিলেন—থৈ মিল্‌তা নেই। মাছ আছে অনেক। মহাশোল, রুই, কাতল—ছোট মাছ ত অফুরন্ত। আমরা দেখিলাম প্রখর সূর্য্যকিরণে জলের বুকে মাছেরা পরমানন্দে খেলিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের বন্ধুবর পরমোৎসাহে বন্দুক চালাইলেন; কিন্তু মৎস্যেরা তাহাদের নিরাপদ দুর্গ শিলার আড়ালে লুকাইয়া যাইতেছিল। আবার পর মুহূর্ত্তেই পাখ্‌না মেলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। বাজ পক্ষী যেমন

শিকারের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, হরিনাথবাবুও তেমনি মাছের দিকে চাহিয়া ছিলেন; এবং দুই একবার বলিতেছিলেন—'কাপড় দিয়া ধরিলে হয় না!' কিন্তু আমরা সায় না দেওয়ায় বাধ্য হইয়াই নিরস্ত হইলেন।—আমরা এখানে কয়েকখানি ছবি তুলিলাম। ডাকবাংলো, নদীর স্রোতধারা এই সব। ভূষিবাবু একটা নূতন পথে adventure করিতে যাইয়া শিলাকীর্ণ অগভীর জলমধ্যে পড়িয়া গেলেন। অমনি ঠিকাদার ভায়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"জলদি উঠিয়ে, উসমে বহুৎ মুগ্‌গর হ্যায়।" মুগ্‌গর মানে কুমীর।

আপনারা ফোটোগ্রাফের চিহ্নিত স্থানে ঐ যে একটি নারীমূর্ত্তি দেখিতেছেন—উদাস বিভল মূর্ত্তি, অবগুণ্ঠিতা—তিনি যে নারী নহেন, সে কথা হলপ করিয়া বলিতে পারি। শ্রীমান্ তুলসীবাবু রৌদ্রের তেজ সহিতে না পারিয়া মাথায় রুমাল বাঁধিয়াছিলেন, তাই ক্যামেরা তাঁহাকে নারী সাজাইয়াছে। এলাহাবাদে যিনি এই ছবি দেখিয়াছেন, তিনিই আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে বলিয়াছেন—'ঐ মহিলাটি কে?' আমরা যত বলি—আমরা 'পথে নারী বিবর্জ্জিতা'র পক্ষপাতী, ততই তাঁরা অনুমান করেন—কথাটা মিথ্যা। অগত্যা মির্জ্জাপুরী ঠিকাদার বন্ধুটির স্ত্রী বলিয়া ইজ্জত বজায় রাখিয়াছি। তুলসীবাবু তাঁহার এই অপমানে আমাদের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়াছিলেন; আর আমাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য একদিন তাঁহার রন্ধন নৈপুণ্যেরও পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু ফল যে ভাল হয় নাই, তাহা আপনারা বেশ বুঝিতেছেন।

এক ঘণ্টা কাল ঘুরিলাম। এদিক্ ওদিক্—যেদিকে চক্ষু চলে। আমি ক্লান্ত হইয়াছিলাম; তাই পূর্ব্বে আসিয়া ডাকবাংলোর বারান্দায় আরাম-কেদারায় পা ছড়াইয়া বসিয়াছিলাম। হঠাৎ নীচে শুনা গেল হরিনাথবাবু, ভূষিবাবু ও তুলসীবাবুর উগ্রস্বর! ক্যামেরা আসিয়াছে, কিন্তু ক্যামেরার বাক্স নাই! এ যেন নস্য আছে, নস্যাধার নাই! আবার ভূষিবাবু ও তুলসীবাবু নীচে নামিয়া বাক্স উদ্ধার করিলেন। ভাগ্য ভাল খানিকটা নীচেই মিলিয়াছিল। মূল প্রপাতের কাছে ফেলিয়া আসিলে কি বিপদই না ঘটিত।

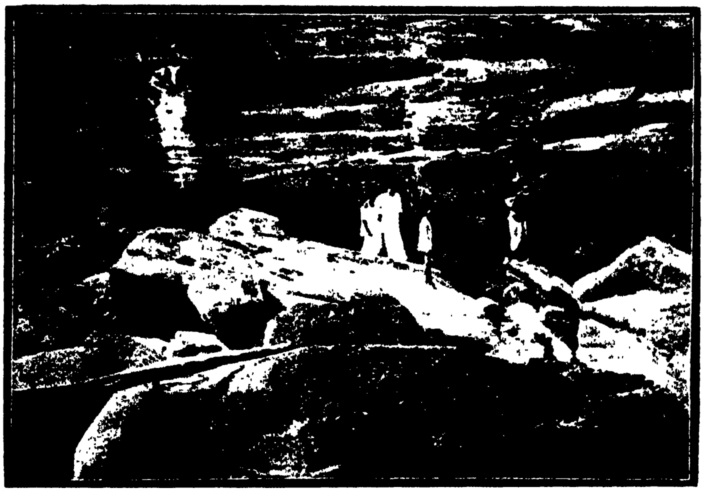
এইবার সকলে বিশ্রাম করিলাম। ডাক-বাংলোর চৌকিদারের সংগৃহীত ঝর্ণার জল আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিলাম। শরীর স্নিগ্ধ হইল। এইবার ফিরিবার আয়োজন চলিল। একায় চড়িবার সময় দেখি—নিম গাছের ছায়ায় একটি বিশাল মাতঙ্গ তাহার শুঁড় দোলাইতেছে। শুনিলাম পাটনার একজন ব্যারিষ্টার (!) সাহেব ও মির্জ্জাপুরের জজ সাহেব শিকারে আসিতেছেন। রান্নার ধূম আয়োজন চলিয়াছে। পথে ইঁহাদিগকে মোটরে যাইতে দেখিলাম।



পাহাড়ের উপর ডাকবাংলো

মির্জ্জাপুরে যখন ফিরিলাম তখন বেলা বারোটা। ক্ষুধায় সকলেরই পেট জ্বলিতেছে। একাওয়ালা বলিল—ডাকবাংলোয় গেলে সব ব্যবস্থা হইবে। ষ্টেসন হইতে ডাকবাংলোর দূরত্ব চারি মাইলের কম নয়। কি করা—সেই দিকেই চলিলাম। মির্জ্জাপুর পুরানো সহর। এক সময়ে ইহার খুবই প্রসিদ্ধি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য। এখানকার কার্পেটের কারখানা দেখিবার মত। ল্যাক্ বা গালার কারবারের জন্যও ইহার প্রসিদ্ধি আছে। পাথরের কারখানাও আছে—Bengal Stone Companyর আফিস রহিয়াছে। পূর্ব্বে মির্জ্জাপুরে বাঙ্গালা দেশ হইতে

অনেক নৌকা মাল লইয়া আসিত এবং মাল লইয়া যাইত। এই পথে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ষ্টীমার চলিত। বাসনের কারবারও ছিল প্রধান। এখন মির্জ্জাপুরের সে গৌরব নাই। দুপুর রোদে আমাদের একা মির্জ্জাপুরের রাজপথ দিয়া চলিল। আমাদের মুরুব্বি এক্কাওয়ালা একে একে ঘণ্টাঘর, মিউনিসিপাল আফিস, চক্‌, বাজার, ডাকঘর, আফিস আদালত সব দেখাইতে দেখাইতে চলিল। গঙ্গার তীরবর্ত্তী পথটি বেশ সুন্দর। দুই দিকে বড় বড় গাছ। পথটিও পরিষ্কার। গঙ্গার পাড় খুবই উঁচু। গঙ্গার প্রসারও এখানে বেশ। মির্জ্জাপুরের কাছ দিয়া গঙ্গা বাঁকিয়া চলিয়াছে। নদীর পরপারে গ্রামের পর গ্রাম।



শিকার সন্ধানে

আমগাছের সারি দেখা যায়। মির্জ্জাপুরের পথে দেখিলাম স্বাস্থ্যবতী মহিলারা সব বড় বড় বেসাতীর বোঝা মাথায় লইয়া পথ চলিয়াছে। তাহাদের গায়ে অলঙ্কারের বহর। এখানকার রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে কয়েকজন বাঙ্গালীও আছেন।

ডাকবাংলোটি নদীর পারে মাঠের উপর। চারি দিক বেড়িয়া গাছপালা। বেচারা খানসামা আসিয়া আমাদিগকে নিরাশ করিয়া বলিল, চার পাঁচ মাসের মধ্যে একটি প্রাণীও এখানে আসে নাই, কাজেই খাবার কোন ব্যবস্থা সে করিতে পারিবে না। আমাদের মধ্যে তখন বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই ক্ষুধায় কাতর, অথচ খাবার কিছুই মিলিতেছে না। এক্কাওয়ালার উপর ভয়ানক রাগ হইল। সে বেচারা আমাদের ভাল করিবার বাহনায় তাহার ভাল করিয়া বসিল—অর্থাৎ তাহার ভাড়ার অঙ্কটা বাড়িয়া গেল।

আবার ষ্টেসনে আসিলাম। Refreshment Room হইতে প্রচুর পরিমাণে রুটি, মাখন, চা, ডিম, মাংস সংগ্রহ করিয়া উদর পূর্ত্তি করা গেল। আমাদের গাড়ী পাঁচটার পরে, কাজেই বিশ্রাম কক্ষে বসিয়া, শুইয়া, কাৎ হইয়া যে যেমন পারিলাম ঘুমাইয়া লইলাম। বাহিরে তেমনি রৌদ্র। দূরে বিন্ধ্য-পাহাড়ের গা যেন আগুনের মত জ্বলিতেছে!

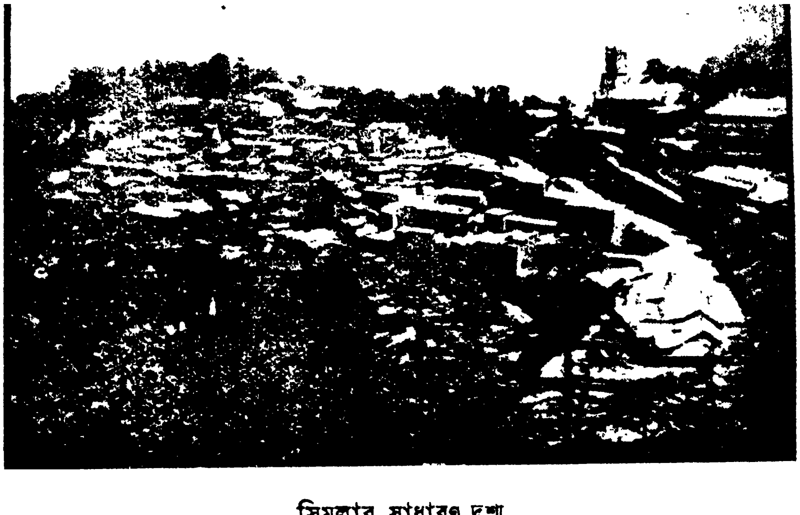
আমরা রাত্রি সাড়ে আটটায় এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলাম। যদি কেহ টাণ্ডা জলপ্রপাত দেখিতে যান, তাহা হইলে তাঁহাদের শ্রাবণের শেষাশেষি যাওয়া উচিত। তখন প্রপাতের বিচিত্র শোভা হয়। বহু দূর হইতে জল পতনের শব্দ শোনা যায়। ডাকবাংলোর নীচে পর্য্যন্ত জলে ভরিয়া যায়। তখন ফেনিলোজ্জ্বল প্রপাতের জল-ধারায় রামধনুর সপ্তবর্ণ বিভাসিত হয়। সে সৌন্দর্য্য দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। আমরা লজ্জাবতী বধূর শঙ্কিত গমনের ন্যায় স্রোতধারার ক্ষীণ গতিই দেখিয়া আসিয়াছি। শিকারের ও বনভোজনের পক্ষে টাণ্ডা অতি সুন্দর স্থান। বিন্ধ্যাচলের উপরে অনেক পল্লী আছে। দু'একটী পল্লী টাণ্ডা হইতেই দেখা যায়। পাহাড়ের উপর একটি বিস্তৃত জলাশয় আছে। উহাতে বর্ষার জল সঞ্চিত থাকে। সেই জলই মির্জ্জাপুরবাসীদের জল যোগায়। মির্জ্জাপুরের বাড়ীঘর ইত্যাদি আশাতিরিক্ত সুলভ। স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। শীতের সময় ত কথাই নাই। এখানে মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ অত্যন্ত সুলভ। বিন্ধ্যাচল মির্জ্জাপুরের অতি কাছে—মাত্র চার পাঁচ মাইল দূর। আমাদের কাছে ছোটখাট মির্জ্জাপুর সহরটি বেশ লাগিয়াছিল।

অতীত ও বর্ত্তমান সিমলা

শ্রীশক্তিচরণ নিয়োগী

(১)

ছন্নছাড়া জীবনটাকে বয়ে নিয়ে বেড়ানো যখন ক্রমশঃই দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠ্‌ছিল, নিজের মনের দীনতায় ও দেহের অপটুতায় জীবনটা একটা মস্ত অভিশাপ-রূপে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছিলুম। দুঃখে ক্লিষ্ট ও আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হ'য়ে দিকে দিকে দেশ দেশান্তরে ফিরে শেষে অন্ন সংস্থানের আশায় ভারতের রাজধানী দিল্লী সহরে 'দিল্লীকা লাড্ডু' নামক অপূর্ব্ব চিজটী ভক্ষণের আশায় উপনীত হলেম। আর শেষে সে আশায়ও যখন 'ছাই' পড়'ল, তখন একেবারে মরিয়া হয়েই চেষ্টা দেখছিলুম যে সাগর-পারে পাড়ি দিয়ে জীবনের গতিটা ফেরানো যায় কি না। ঠিক এমনি সময়ে সাদর নিমন্ত্রণ পেলুম আমার সোদরোপম বন্ধু শ্রীমান হাবুল ভায়ার কাছ থেকে—সিমলা শৈলে যাবার জন্য। আমার বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে জীবন মনে-প্রাণে বোধ হয় এই রকম একটা কিছু পরিবর্ত্তন চাইছিল, তাই বিনা দ্বিধায় ও কতকটা আগ্রহের সঙ্গেই এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম। জীবনে যার কোনও আকর্ষণ নেই, সে একটু খাম-খেয়ালী ও বেপরোয়া না হয়েই পারে না। আর এই বেপরোয়া-ভাবই আমায় যখন তখন নানা ভাবে ও নানা দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। তাই দিল্লী থেকে সিমলায় আসব, এর আর বিচিত্রতা কি? যাক্, যথাসময়ে ত সিমলায় আসা গে'ল। পাহাড়ের অভিজ্ঞতা আমার বাল্যকাল থেকেই; তবুও সিমলায় আসবার পথে একটু চাঞ্চল্য অনুভব না করেই পারি নি। আমার মতন অ-কবির প্রাণেও প্রকৃতি তার শান্ত সৌন্দর্য্য-শ্রীর মধুর পরশ বুলিয়ে গেল। জীবনের এই ক্ষণিক বৈচিত্র্য যাঁর দান, তাঁর উদ্দেশে মাথা আপনিই নত হ'ল; বার বার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শুধু এই মিনতি তাঁর চরণে জানালুম যে, হে অন্তর্যামী, আমার জীবনের সত্যকার বিকাশ যদি এই পথেই হয় ত তার আসল রূপটী এই শত নিত্য ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে যেন ঠিক ফুটে ওঠবার অবকাশ পায়। সকলের জীবনের সার্থকতা একটীমাত্র বাঁধা-ধরা পথেই পর্য্যবসিত না হ'তেও পারে। সংগ্রামের পথেই যদি আমার জীবনের পূর্ণ বিকাশ হওয়াই তোমার বাঞ্ছিত হয় ত, হে দেব, তাই হোক—আমার সেই ভালো।



সিমলার সাধারণ দৃশ্য

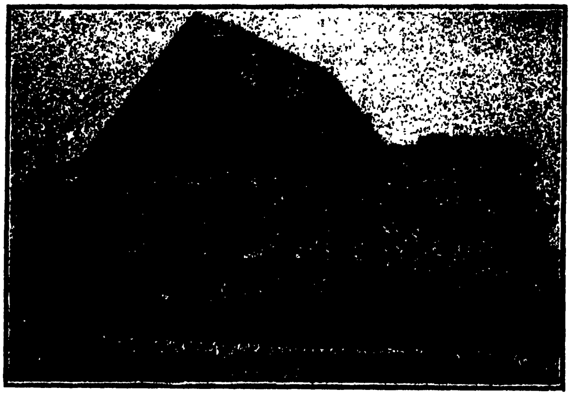
"এই করেছ ভালো নিঠুর,
এই করেছ ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়া'লে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।

নূতনত্বের আদর সর্ব্বত্র ; কারণ, নূতনত্বের মোহ মানুষকে অভিভূত না ক'রেই পারে না। নূতন জায়গা, নূতন আব-হাওয়ায় একটা চঞ্চলতা, একটা সজীবতা দেখা যায়, যা অসাড় মনকেও সাড়া দেয়, নীরস প্রাণকেও সরস করে তোলে। সিমলায় এসে প্রথম দিন-কয়েক ত খুব একচোট ঘুরে নিলুম। কাছা-কাছি বা আশেপাশে যেখানে যা



কায়থু পাহাড়—সিমলা

দেখবার তা যখন শেষ হ'ল, সঙ্গীহীন ও লক্ষ্যহীন হ'য়ে এ লামেলো ভাবে বেড়ানো যখন নিজেরই নিকট অপ্রীতিকর হ'য়ে উঠল,—(আমার মত নিষ্কর্মা ও বেকার লোকের সাহচর্য্য বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই, কারো কাম্য নয়), তখন দিনের দারুণ দীর্ঘতায় মন আবার ক্লিষ্ট হয়ে উঠল।



টাউনহল—সিমলা

সময় বড়ই ভারী হয়ে বুকে বাজে, কাটতে যেন চায় না আর কিছুতে। সকাল-সন্ধ্যায় বেড়িয়ে, লাইব্রেরীতে প্রত্যহ রীতিমত দু তিন ঘণ্টা ক'রে কাটিয়ে, ক্লাবে ক্যারম ও তাস পিটেও যখন সময়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না, তখন কতকটা বাধ্য হ'য়েই চিত্ত-বিনোদন ও কাল-ক্ষেপণের সহায়ক ব'লেই এই ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার বাসনা মনে জা'গল। আমি সাহিত্যিক নই ; কবিও নই, তবুও, বাসনা হৃদয়ে জেগেছে বলে শুধু এই অজুহাতেই তাকে রূপ দিতে হবে এমন দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করি না—যদিও তা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ; কারণ, মানুষ সৃষ্টি করতে ভালবাসে, তার স্বভাবই যে সৃষ্টি করা। কিন্তু সৃষ্টি করবারও ত ক্ষমতা থাকা চাই ? যা হবে সুন্দর, যা হবে স্থায়ী, যা হবে কল্যাণকর, সেই ত হ'ল আসল সৃষ্টি। তাতেও যখন আমি অক্ষম, তখন কেন এ দুরাকাঙ্ক্ষা ? তারই উত্তর দেবো।

সিমলায় প্রবাসী-বাঙ্গালীর মধ্যে আমি একটা বিশিষ্টতা লক্ষ্য করেছি যা বাংলার বাইরে অন্ত কোথাও এত নিবিড়ভাবে অনুভব করি নি। সিমলার বঙ্গীয় সম্মিলনী, কালীবাড়ী বা হরিসভা দেখবার ও জানবার জিনিষ। বাংলার বাইরে যেখানেই বাঙ্গালী গেছে, সেখানেই সে তার নিজস্ব একটা বিশিষ্ট ছাপ রেখে এসেছে। কিন্তু সিমলায় এই ছাপ গভীরতর। তার কারণ বোধ হয় বাঙ্গালীর প্রতিভা, মনীষা ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ সব চেয়ে বেশী হয়েছে সিমলায়। চাকুরী-জীবী বাঙ্গালীর সংখ্যা এখানে এখনও খুব বেশী, যদিও তা ক্রমঃশই হ্রাস হয়ে আসছে। লর্ড সিংহের অনন্যসাধারণ প্রতিভা, স্যার ভূপেন মিত্রের অপূর্ব্ব কর্ম্ম-শক্তি ও মেধা, দাস মহাশয় ও স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের স্যায় আইনজ্ঞদের অতুলনায় ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে এখানে প্রবাসী-বাঙ্গালী তার সামাজিকতায় এখনও মনে-প্রাণে খাঁটী বাঙ্গালীই আছে। তা ছাড়া সিমলায় বাঙ্গালীর দান নগণ্য নয়। তার কৃতিত্ব ও দানের কথা বলাই এ ভ্রমণ-কাহিনীর অন্যতম উদ্দেশ্য।

আরও একটা গৌণ কারণ আছে। সিমলায় সচরাচর বহু বাঙ্গালীর যাতায়াত আছে বলেই হো'ক, অথবা এটা এতই সুপরিচিত যে সিমলা সম্পর্কে নূতন কিছু বলা বা লেখা বাহুল্য বোধেই হো'ক, সিমলা সম্বন্ধে কোনও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বেরিয়েছে বলে আমার জানা নেই। মাসিকপত্রের ক্রোড়ে দার্জ্জিলিং, চেরাপুঞ্জী, শিলং, মুসৌরী, ডেরাডুন এমন কি আলমোড়া ও মুক্তেশ্বরের সম্বন্ধে অনেক ভ্রমণ-

কাহিনী পড়েছি; কিন্তু সিমলা শৈলের বিষয়ে বাঙ্গলায় কোনও প্রবন্ধ, রচনা, ভ্রমণ-কাহিনী বা ইতিহাস চোখে পড়ে নি।

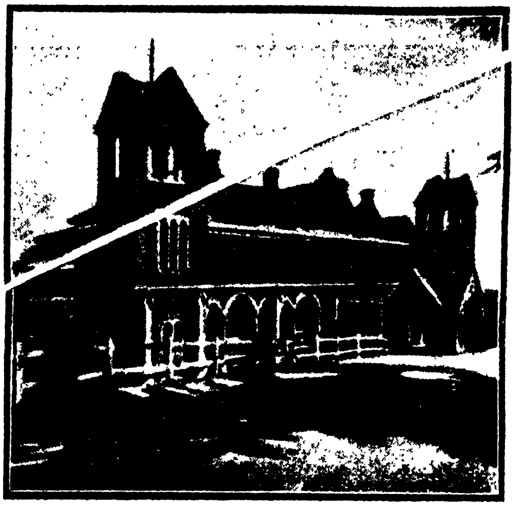
(২)

সিমলার খ্যাতি প্রধানতঃ ভারত-সরকারের তথা পাঞ্জাব প্রদেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ব'লে। সিমলা শৈল একাধারে বড়লাট বাহাদুর, পাঞ্জাবের শাসন-কর্ত্তা এবং জঙ্গীলাট সাহেবের গ্রীষ্মাবাস। এটী গুটী-কতক ছোট-বড় পাহাড়ের সমষ্টি—হিমালয়ের পাদদেশের গুটী কয়েক উপত্যকা বল'লেই বোধ হয় আরো ভালো হয়। সেগুলির নাম—বড় সিমলা, ছোট সিমলা, প্রস্পেক্ট হিল, ইলিসিয়ম, বয়লুগঞ্জ, সমর হিল, কায়থু এবং জ্যাকো। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে সিমলার উচ্চতা প্রায় ৭,১০০ ফিট। আর এর ল্যাটিচিউড্ ৩১"৬' (N) ও লঙগিচিউড্ ৭৭'১৩' (E)। এন্, ডবলিউ রেলওয়ের কালকা ষ্টেশন থেকে যে 'কারট্ রোড্'টী একেবারে সিমলার বুকে এসে মিশেছে, তা ধরে সিমলায় আসতে গেলে প্রায় ৫৮ মাইল পাহাড়ে রাস্তার ওপর দিয়ে পাড়ি দিতে হয়। সিমলার আব-হাওয়া ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের খ্যাতিও নেহাৎ নগণ্য নয়। পাহাড়ের পর পাহাড়, শৃঙ্গের ওপর শৃঙ্গগুলি যেন অনন্তের কোলে গিয়ে মিশেছে; দূরে—অনতিদূরে যতদূর দৃষ্টি যায় সিমলার উত্তরাভিমুখে কুলু ও সিপ্‌টী পর্ব্বতের শুভ্র উচ্চ শৃঙ্গশ্রেণী তুষার-কিরীট পরে' দাঁড়িয়ে আছে; হঠাৎ দে'খলে মনে হয় যেন পাহাড়ের মাথায় কে অজস্র নুন ছড়িয়ে রেখেছে। এই সব শৃঙ্গশ্রেণীর মধ্যে সিমলা থেকে সবচেয়ে নিকটতম শৃঙ্গটীর নাম 'চেরু'। সিমলা থেকে এর দূরত্ব ২৭ মাইল এবং উচ্চতা ১৬,০০০ ফিটেরও ওপর। অনেক দিন আগে কুমার-সম্ভবের

আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং
ছায়ামধঃ সানুগতাং নিষেব্যঃ।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে
শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ॥"

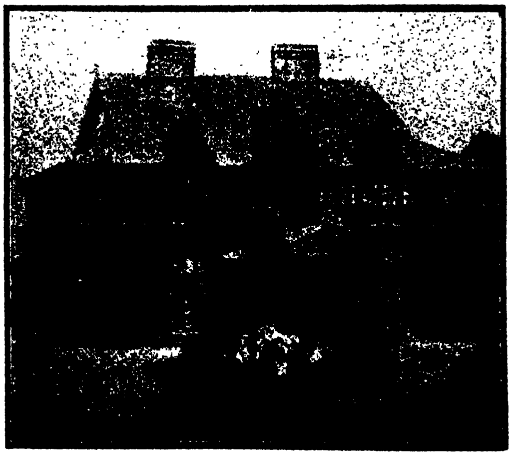
এই শ্লোকটার মানে না বুঝেই পড়েছিলুম; কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ প্রাণের সহিত প্রথম উপলব্ধি ক'রলুম এই জায়গায় এসে।

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নাকি বলেন যে অ-নে-ক অ-নে-ক দিন আগে—কত হাজার বছর তা অন্তর্যামীই জানেন,—যেখানে বর্ত্তমান সিমলার উৎপত্তি, সেখান দিয়ে এক সুদূর অতীতে খরস্রোতা নদী প্রবাহিতা হ'য়ে যেতো; আর তার



পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট আপিস—সিমলা

বক্ষের ওপর দিয়ে বৃহদাকার বরফের পাহাড় ভেসে যেতো। এই বরফের পাহাড়ে যে সব বড় বড় পাথর এসে পড়ত বা থেকে যেতো, সে-গুলো, যখন সূর্য্যোদয়ে বরফের পাহাড়



জঙ্গীলাটের বাসভবন—সিমলা

গলতে সুরু হ'ত, তখন নদীর গর্ভেই আশ্রয় পেতো। আর এইরূপে ক্রমে ক্রমে নদীর তলায় পাথর জমা হয়ে হয়ে বর্ত্তমান সিমলা শৈলের উৎপত্তি হয়। কতদিনে, কি বিচিত্র

উপায়ে, এই রকম তিল তিল করে সিমলা ও তার চারি দিকের শৈলরাজি গড়ে উঠেছে তা ভাব'লে বিস্মিত না হ'য়ে থাকা যায় না। সৃষ্টির মূলে কি গভীর রহস্য নিহিত আছে, কে তার নির্ণয় করবে?

সিমলার বিজ্ঞান-সম্মত, ধারাবাহিক খাঁটী ইতিহাস



কালকা-সিমলা রেলপথ

বলতে কিছু পাওয়া যায় না; কারণ, এর পূর্ব্ব ইতিহাস বিলুপ্ত। যাও বা পাওয়া যায় তার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। সিমলা এবং তার পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য দেশগুলির কোনও সত্যকার খাঁটী ইতিহাস না



জাক্কো মন্দির-সান্নিধ্যে বানরের মেলা

পাবার কারণ আরও এই ব'লে মনে হয় যে, এই সব দেশ কি মুসলমানী বাদশাহী যুগে বা বৃটীশ কর্ত্তৃক ভারতাধিকারের পূর্ব্বভাগে, সুদূর, নির্জ্জন ও অগম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত থাকায়, নীচের সমতল-ভূমির বহু বাদ-বিসম্বাদ, মারামারি-কাটাকাটী ও যুদ্ধ-বিগ্রহের হাত থেকে স্বভাবতঃই নিজেকে এড়িয়ে চলে আসতে পেরেছিল। কাজেই বাইরের জগৎ থেকে সম্পর্ক-শূন্য হয়ে পড়ায় এই সব পার্ব্বত্যদেশের উত্থান-পতন, সভ্যতা ও ইতিহাস এদেরি মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; এবং সে সবের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে সারা হিন্দুস্থানের বিশেষ কিছু এসে-যেতো না। তা ছাড়া, বর্ত্তমান সিমলাকে প্রকৃত পক্ষে ইংরেজরাই গড়ে তুলেছেন; এবং এঁরাই সিমলার রূপটী গত এক শত বৎসর ধরে রূপ-দক্ষ শিল্পীর ন্যায় পাহাড়ের বুকে কুঁদে কুঁদে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই হিসাবে সিমলাকে অতি আধুনিক সহর বলা যেতে পারে।

ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে সিমলার সম্বন্ধে যা বিবরণী পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তা এইরূপ—

১৮০৪ খৃষ্টাব্দের পর গুর্খারা সিমলা ও তার পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্যদেশগুলির বিরুদ্ধে রীতিমত অভিযান সুরু করে; এবং প্রায় চার বৎসরের মধ্যেই যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশসমূহে স্বীয় অধিকার বিস্তার করে। পরাজিত দেশ ও অধিবাসীর উপর তাদের অত্যাচার না কি অমানুষিক ছিল; এবং তা ক্রমশঃ এতই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, তাদের বিজিত দেশ-বাসীর মধ্যে অনেকেই বৃটিশ শক্তির শরণাপন্ন হ'তে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানান কারণে বৃটিশেরাও এইরূপ অবসর ও সুযোগেরই প্রতীক্ষা ক'রছিলেন; এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁরা নেপাল-রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে বিপুল অভি-যানের বন্দোবস্ত করেন। পার্ব্বত্য প্রদেশের ছোট-বড় অধিকাংশ রাজাই এই যুদ্ধে ইংরাজের পক্ষে সহায়তা করে। চারি-দিক হ'তে একযোগে গুর্খাদের আক্রমণ করা হয়; এবং এই জন্য দানাপুর, বেনারস, মীরাট ও লুধিয়ানা এই চার জায়গা থেকে সৈন্যাদি সংগ্রহ ও সমাবেশ করা হয়। গুর্খারা

যুদ্ধে অমিত পরাক্রম, তেজ ও নির্ভীকতা দেখালেও, শেষে পরাজয় স্বীকার করে; এবং ইংরাজ ও গুর্খাদের শেষ যুদ্ধের ফলাফল নির্ণীত হয় ১৫ই মে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সিমলারই নিকটে। এই যুদ্ধের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে একজন বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক এইরূপভাবে লিখে গিয়েছেন—

"After desperate fighting in which the Gurkhas charged to the muzzles of the British guns, Bucktu Thappa, a famous Gurkha leader, was killed, many of his followers refused to continue the contest; finally Ummar Singh was on the 15th May induced to surrender, and Gurkha's opposition in the vicinity of Simla ended. Many hundreds of the rank and file of the Gurkhas forthwith came over and joined our forces where they did loyal service."

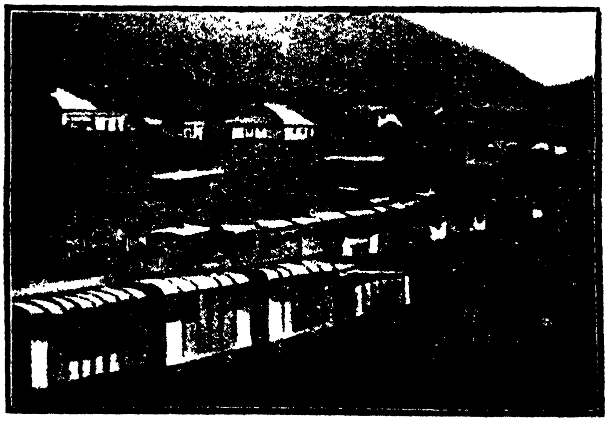
এই ভাবে সিমলায় ও তার পার্শ্বস্থ পার্ব্বত্যদেশ সমূহে ইংরাজ কর্ত্তৃত্ব বিস্তৃত হয়। যুদ্ধের পর সন্ধি-সর্ত্তানুযায়ী যে সমস্ত রাজগণ বৃটিশের পক্ষে যোগদান করেছিলেন, প্রত্যুপকার স্বরূপ গুর্খা কর্ত্তৃক তাঁদের পূর্ব্বহৃত রাজ্য তাঁদের প্রত্যর্পণ করা হয়। পার্ব্বত্য ভাকত ও কিয়নথল রাজদ্বয় বৃটিশকে লোকবল বা অর্থবলে সাহায্য না করায় তাদের রাজ্যাধিকার সঙ্কুচিত ও খর্ব্ব করা হয় এবং তাদের প্রত্যেকের রাজ্যের কিয়দংশ যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ পাতিয়ালা-মহারাজকে বিক্রী করা হয়।

"সিমলা" এই কথাটীর উৎপত্তির সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, জ্যাকো পাহাড়ের উপর কোনও এক সাধু "শ্যামলা" দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই "শ্যামলা" কথাটী পাহাড়ীদের মুখে মুখে রূপান্তর হয়ে পরে "সিমলা"য় পরিণত হয়।



পর্ব্বতশৃঙ্গে তুষার-মণ্ডল—সিমলা

১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিমলা সম্বন্ধে সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে, সিমলা এবং তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ পরগণাসমূহ পাতিয়ালা-মহারাজ ও কিয়নথল রাণাসাহেবের অধিকারভুক্ত ছিল। গুর্খা যুদ্ধ অবসানের পর সিমলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে



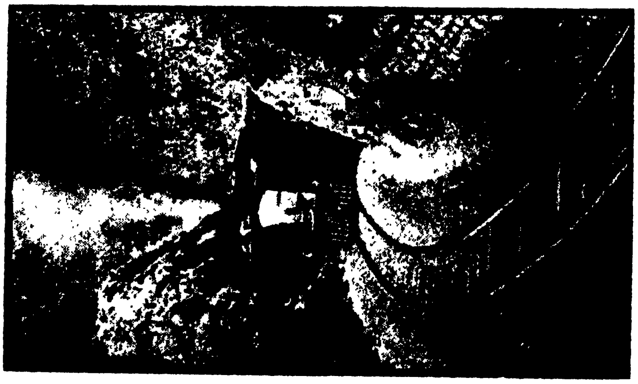
সিমলা রেলষ্টেশন—কালকার নিকটবর্ত্তী দৃশ্য

মুগ্ধ হ'য়ে এবং নীচেকার প্রচণ্ড গ্রীষ্মের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে, দুই একটী করে ইয়োরোপীয়ান অস্থায়ীভাবে সিমলায় যাতায়াত করতে থাকেন। ক্রমশঃ এঁদের মারফত সিমলার স্বাস্থ্যকর আব-হাওয়া ও রমণীয় প্রাকৃতিক শোভার কথা একটু অতিরঞ্জিত হয়েই অন্যান্য ইয়োরোপীয়ানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এইরূপে বহু ইয়োরোপীয়ান



বড়লাটের প্রাসাদ—সিমলা

সিমলায় এসে উপরিউক্ত দুই রাজার অনুমতি নিয়ে সিমলায় প্রথম স্থায়ীরূপে বসবাস আরম্ভ করেন। ইয়োরোপীয়ান-দিগের ভিতর সিমলা প্রীতি যখন ক্রমশঃই বাড়তে থাকে,



কালকা-সিমলা রেলপথ। ট্রেণ সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিতেছে

তখন বৃটিশ-রাজ তদানীন্তন পলিটিক্যাল এজেণ্ট মেজর কেনেডির মারফত সিমলাকে নিজেদের খাসদখলে আনবার বন্দোবস্ত করেন এবং সেই অবধি সিমলা ইংরাজাধীন।

বড়লাট বাহাদুরগণের মধ্যে লর্ড আমহার্ষ্ট ই ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম সিমলায় আসেন এবং মেজর কেনেডির আতিথ্য গ্রহণ করেন। মেজর কেনেডি যে বাসায় থাকতেন তার নাম "কেনেডি হাউস্" (Kennedy House) এবং তদবধি বাড়ীটা এই নামেই পরিচিত। এইখানেই বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্ট খেতে বসে বলেছিলেন যে "The Emperor of China and I govern half the human race and yet we find time to breakfast." পরবর্ত্তী বড়লাট আসেন লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক এবং তাঁর সময় থেকেই সিমলাকে ভারত-সরকারের গ্রীষ্মাবাসের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে রীতিমত চেষ্টা চলে এবং সে চেষ্টা আজও সমভাবে চলেছে। উপযুক্ত যান-বাহনাদি ও যাতায়াতের রাস্তা না থাকায় বর্ত্তমান কার্ট রোডের (Cart Road) সূচনা এবং শেষে এ রাস্তাটীও পর্য্যাপ্ত বিবেচিত না হওয়ায় বর্ত্তমান কাল্কা-সিমলা রেলওয়ের কল্পনা ও সৃষ্টি। সিমলা সহরের অসুবিধা নিরাকরণের জন্য দিকে দিকে কত ভাবে কত উপায়ে এবং কি পরিমাণে খরচ হয়েছে তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ কাল্কা সিমলা রেলওয়ে। ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিল হিসাবে কাল্কা-সিমলা রেলওয়ে নির্ম্মাণের একটা বিরাট কীর্ত্তি। পরিকল্পনা করেন মিষ্টার এইচ, এস, হ্যারিংটন,—প্রথম চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার ও এজেণ্ট ; এবং এঁরই তত্ত্বাবধানে কাল্কা-সিমলা রেলওয়ে লাইন নির্ম্মাণ করা ও খোলা হয়। এই রেলওয়ে লাইনের দৈর্ঘ্য ৬০ মাইল এবং এই ৬০ মাইল লাইন পাততে ও নিয়ে আসতে ১০৭টী টনেল বা সুড়ঙ্গ পাহাড়ের ভেতর খুঁড়তে হয়েছে। সবগুলি টনেলের মিলিত দৈর্ঘ্য ৫ মাইল। পাহাড়ের গায়ে কত যে পাথরের দেওয়াল ও বড় বড় খিলান গাঁথতে হয়েছে, তা অসংখ্য বললেই হয়। ১৯০৩ সালের ৯ই নভেম্বর এই লাইনে প্রথম প্যাসেঞ্জার ট্রেণ চলে। সর্ব্বসমেত কাল্কা-সিমলা রেলওয়ে নির্ম্মাণে খরচ হয় ১,৭১,০৭,৭৪৮ টাকা।

সিমলার জল-বায়ু ও আব-হাওয়া মোটের ওপর

নিন্দনীয় নয়। সিমলার প্রথম ও প্রধান গুণ এই যে এখানে এলে নীচেকার প্রচণ্ড গ্রীষ্মের কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু যাকে স্বাস্থ্যকর স্থান বা স্বাস্থ্যাবাস (Ideal Sanitarium) বলা যেতে পারে, তা এ মোটেই নয়। Sanitarium হিসেবে এর খ্যাতি তৃতীয় শ্রেণীর। এই সম্পর্কে এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের অভিমত এই যে—"Man was not created to live at an elevation of 7,000 to 8,000 feet, where he only inhales half the amount of oxygen that is required for working his machinery and digesting his food." পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সিমলার temperature কোন্ মাসে কত হয় তা হাওয়া-তত্ত্ববিদ-আফিসে প্রকাশিত তালিকা থেকে নীচে উদ্ধৃত করে দিলাম—

সিমলায় প্রবেশের পথে বড়লাট বাহাদুরের প্রাসাদ প্রথমেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—দূর থেকে মধ্যযুগের



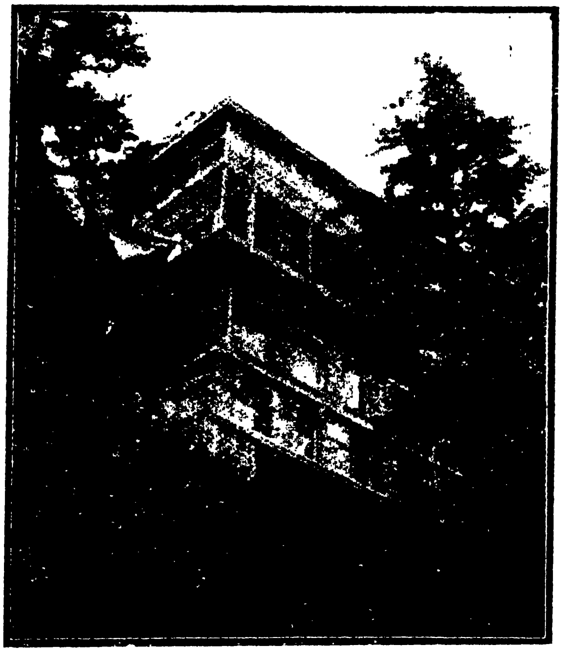
কালীবাড়ী ও মন্দির—সিমলা

কেল্লা বলে ভ্রম হয়। 'ভাইসরিগাল লজ' নির্ম্মাণের জন্য যে সব পাথর ব্যবহৃত হয়েছে, তখনকার সময়ে শুধু তাতেই খরচ হয়েছিল প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা। বর্ত্তমান 'ভাইস্-

(SIMLA NORMALS.)

Month	Mean maximum temperature	Mean minimum temperature	Mean temperature	Average number of rainy days	Mean rainfall
January	46.4	35.9	41.1	4 7	2.71
February	46.8	35.9	41 3	5 8	3.13
March	55.2	43 4	49 3	5.0	2.67
April	61 6	51.0	57.8	3 9	1.94
May	72.1	58 1	65.1	5.3	2.87
June	73 1	60 7	66.9	9.9	7.13
July	68.9	60.2	64.5	19.5	16.88
August	66 7	59.2	63 0	19.5	17.33
September	65.8	56 6	61.2	8.9	6.20
October	62 7	51.3	57.0	1.6	1.08
November	56.0	44.7	50.3	1.1	0 52
December	49 8	39 3	44.5	2.0	1,11
Mean for year	60.7	49.7	55 2	87.2	63.57

রিগাল লজ্' লর্ড ডফারিণের আমলে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। 'ভাইস্‌রিগাল এষ্টেট' প্রায় ৩৩১ একর জায়গার ওপর বিস্তৃত এবং এর ভিতর সর্ব্বসমেত ২৬টী বাড়ী আছে। 'ভাইস্‌রিগাল লজ' ও তৎসংলগ্ন বাটীসমুদয় নির্ম্মাণে খরচা হয়েছিল প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা এবং সমুদয় এষ্টেটের দেখা শোনা ও তদারক করতে বার্ষিক খরচ হয় প্রায় দশ হাজার পাউণ্ড। অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও এখানে বলা বোধ হয় অশোভন হবে না যে, বড়লাট বাহাদুরের বার্ষিক মাহিনা ২,৪০,০০০ টাকা এবং তা ছাড়া official allowanc· হিসাবে বার্ষিক ৩,০০০ পাউণ্ডের বন্দোবস্ত আছে।



সিমলা কালীবাড়ীর নবনির্ম্মিত গৃহ (মল হইতে দৃশ্য)

তার পরেই জঙ্গীলাট বাহাদুরের (Commander-in-chief) বাড়ীর কথা স্বভাবতঃই মনে জাগে। জঙ্গীলাট বাহাদুরগণের মধ্যে সিমলায় প্রথম আসেন লর্ড কম্বারমিয়ার (Lord Combermere)। জঙ্গীলাট বাহাদুরদের সিমলায় থাকবার জন্য যে বাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে তার নাম 'স্নোডন্' (Snowdon)। 'স্নোডন্' প্রথমে জেনারেল পিটার ইনস্ (General Peter Innes) সাহেবের সম্পত্তি ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তদানীন্তন জঙ্গীলাট লর্ড রবার্টস্ (Lord Roberts) এই সম্পত্তি ক্রয় করেন এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁর ভারতবর্ষ ত্যাগের পর, ভারত-সরকার এটী ৭৯,১৮৭ টাকায় ক্রয় করেন এবং সেই অবধি 'স্নোডন্' জঙ্গীলাটবাহাদুরগণের বাস-স্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট। 'স্নোডন'টাকে সর্ব্বপ্রকারে শ্রীসম্পদে ভূষিত করতে ভারত সরকারকে এর পেছনে আজ পর্য্যন্ত সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে।

সিমলা পাঞ্জাব প্রদেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসাবে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রথম নির্দ্দিষ্ট হয় এবং তদবধি পাঞ্জাব লাটবাহাদুরগণ প্রত্যেক বৎসরের প্রায় ছয় মাস এখানে এসে কাটিয়ে যান। সিমলায় প্রথম পাঞ্জাব-লাট যিনি আসেন তাঁর নাম স্যার রবার্ট ডেভিস্ (Sir Robert



লেখক—শ্রীযুক্ত শক্তিচরণ নিয়োগী

Davies)। ইনি মহারাজা পাতিয়ালার বাড়ী 'ওকওভার' (Oakover) এ থাকতেন। তাঁর পরবর্ত্তী স্যার রবার্ট ইগারটন্ (Sir Robert Egerton) সাহেবের আমল থেকে 'বারণস্ কোর্ট' (Barnes Court) পাঞ্জাব প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণের বাস-স্থান রূপে পরিগণিত হয়। 'বারণস্ কোর্টের' উপযুক্ত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করতে পাঞ্জাব সরকারের মোট খরচা হয়েছে ছয় লক্ষ টাকা এবং পাঞ্জাব সেক্রেটেরিয়েট ও তৎসংক্রান্ত ঘরদুয়ার নির্ম্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে বাইশ লাখ টাকা। পাঞ্জাব প্রদেশ সংক্রান্ত যা কিছু আফিস বা বাড়ীঘর সবই ছোট সিমলায় অবস্থিত।

ভারত-সরকার ও মিলিটারী সংক্রান্ত অধিকাংশ আফিস বড় সিমলায় মল্ রোডের (Mall Road) ওপর নির্ম্মিত। এ সকলের নির্ম্মাণ-খরচা বড় কম নয়, একমাত্র 'ইম্পিরিয়াল সেক্রেটেরিয়াট (Imperial Secretariat) নির্ম্মাণে ৫৬ লাখ ও তৎসংক্রান্ত 'Residences for officials and departmental establishments' এর জন্য ৯৭ লাখ টাকা খরচা হয়েছে। তা ছাড়া মিলিটারী আফিসের জন্য ২২ লাখ, 'লেজেসলেটিভ চেম্বারস্' ও পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ আফিসের জন্য ২৬ লাখ (প্রত্যেকের জন্য ১৩ লাখ করে) খরচ হয়েছে। তা ছাড়া, প্রত্যেক বৎসরে দিল্লী-সিমলা যাতায়াতের জন্য ভারত-সরকারের খরচা প্রায় ৩॥০ লাখ টাকা।

গভর্ণমেন্ট-সংক্রান্ত আফিস ও অন্যান্য বাড়ীঘর ছাড়া নিয়ে কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান ও বাড়ীর নাম উল্লেখ করা গেল—

বাড়ী—মিউনিসিপাল আফিস, টাউন হল, ইউনাইটেড্ সার্ভিস ক্লাব ও ইনষ্টিটিউট, ম্যাসোনিক লজ্, রিপণ, ওয়াকার ও লেডি রিডিং হাসপাতাল, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, ওক্ ওভার, বাণটনি, রথনি কাসল, ইলিসিয়ম হোটেল, গ্র্যাণ্ড হোটেল, সিসিল হোটেল, ওয়াই-এম-সি-এ এবং ওয়াই-ডবলু-সি-এ, বিশপ কটন স্কুল, বটলার হাই স্কুল, হনুমানজীর মন্দির, কালী-বাড়ী, সওদাগরণকী মসজিদ, ঈগলমাউণ্ট, পিটার্সফিল্ড, ক্রোগস্, ষ্টারলিং কাসল্ ইত্যাদি।

স্থান—দি রিজ্, মাহাসু রিজ্, মাসোবরা, সঞ্জৌলি টনেল, বলদেরা, আনানডেল, তারাদেবী ইত্যাদি।

এইগুলির মধ্যে সিমলা মিউনিসিপ্যালিটী, রথ্নি কাসল (Rothney Castle) ও আনানডেল (Annandale) সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলে আমি কালী-বাড়ী ও বটলার হাই স্কুল (Sir Butler High School) নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রবাসী বাঙ্গালীর কৃতিত্বের পরিচয় দে'ব।

(৪)

সিমলা-মিউনিসিপ্যালিটী গঠিত হয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে; এবং সমুদয় পাঞ্জাব প্রদেশের ভিতর এই প্রথম মিউনিসিপ্যালিটীর সূত্রপাত। ১৮৪৪ সালে সিমলার বসত-বাড়ীর সংখ্যা মোট একশত ছিল। ১৯০৪ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ১৪০০তে গিয়ে ঠেকে এবং ১৯২৫ সালে সর্ব্বসমেত ১৮০০য় দাঁড়ায়। খুব সম্ভব ১৯৩২ সালে সিমলায় বাড়ীর সংখ্যা দুই হাজার। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সিমলার জন-সংখ্যা ছিল ১৭,৪৪০, ১৮৯০তে ৩০,০০০ এবং ১৯২০তে ৫০,০০০। ১৯৩২ সালে জন-সংখ্যা যে যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে সে কথা সহজেই অনুমেয়। মিউনিসিপ্যালিটীর বার্ষিক আয় ১২ লাখ টাকা এবং মাথা পেছু ১৭৲ টাকা প্রত্যেক বৎসরে খাজনা দিতে হয়। সারা সিমলা সহরটীকে উপযুক্ত পরিমাণে জল সরবরাহ করতে ও যোগান দিতে, মিউনিসিপ্যালিটীকে Water Works, Reservoir ও Tanks নির্ম্মাণ করতে হয়েছে এবং সেজন্য খরচ হয়েছে প্রায় ৫৪ লাখ টাকা। মাসোবরার নীচে 'Settling Tanks at the Guma Water Works' একটা দেখবার মতন জিনিষ।

সিমলার 'Hydro-Electric Power Station' আর একটী উল্লেখযোগ্য দেখবার জিনিষ। Main Power Station সিমলা থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরবর্ত্তী ছাবা (Chabba) নামক স্থানে অবস্থিত। সিমলা সহরকে বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় সজ্জিত ও ভূষিত করবার জন্য Hydro Electric Schemeএর সূচনা হয় এবং এই Schemeটীকে কার্য্যে পরিণত করতে প্রায় ১৩ লাখ টাকা খরচা হয়েছে।

রথনি কাসেলের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সকল ভারতবাসীর জানা প্রয়োজন, এই বিবেচনায় এটী বিশেষ করে উল্লেখ করেছি। ইহা মহাত্মা হিউমের পুণ্য-স্মৃতি-বিজড়িত বাস-ভবন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অতীত ইতিহাসের সহিত যাঁরা পরিচিত, তাঁরা মিষ্টার এ, ও, হিউমের (Mr. A. O. Hume) নামে এখনও সাদর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

এই 'রথনি হাউসটি' জ্যাকো পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। কর্ণেল রথনি (Colonel Rothney) ১৮৩৮ সালে ইহা নির্ম্মাণ করেন। অনেকবার হস্তান্তরিত হবার পর, মিষ্টার পি, মিচেল (Mr. P. Mitchell) এই বাড়ীটী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ক্রয় করেন ও পরে মিষ্টার

হিউমকে বিক্রয় করেন। মিষ্টার হিউম সেই সময় গভর্ণমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার সেক্রেটারী রূপে সিমলায় অবস্থান করতেন। ইনি বাড়ীটার আমূল সংস্কার করেন এবং এইজন্ত প্রায় দুইলাখ টাকার ওপর তাঁকে ব্যয় করতে হয়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক-নেতা জোসেফ্ হিউম (Joseph Hume)এর ইনি পৌত্র। মিষ্টার হিউম অনন্ত-সাধারণ গুণ ও উচ্চ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন; এবং কর্ম্মশক্তি ও নেতৃত্ব করবার যোগ্যতা ছিল এঁর অসাধারণ। থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাত্রী প্রসিদ্ধা ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি তাঁর গুণ-মুগ্ধ আমেরিকান শিষ্য কর্ণেল অলকট্ (Golonel Olcott) সহ ভারতবর্ষের থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা-কল্পে এই রথিন কাসেলেই এসে হিউম মহোদয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং এইখান থেকেই তত্ত্ব-বিদ্যার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য সার্ব্বজনীন কর্তৃত্ব-স্থাপনের মূল মন্ত্র প্রচার করেন।

মল রোডস্থিত ইম্পিরিয়েল সেক্রেটেরিয়াট ও লেজিস্লেটিভ চেম্বারস্ বিল্ডিংস্এর প্রায় এক হাজার ফিট নীচে আনানডেল উপত্যকা অবস্থিত। প্রায় সিকি মাইল পরিমিত সমতলভূমি ইহার প্রথম বিস্তৃতি ছিল। পরে আশে-পাশের পাহাড় কেটে মোট প্রায় শওয়া লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহার পরিধি ও আয়তন যথেষ্ট বাড়ানো হয়। সারা সিমলা সহরের মধ্যে এতবড় সমতলভূমি আর নেই এবং আনানডেলই সব রকম খেলা-ধূলার একমাত্র জায়গা। পোলো, রেস, ক্রীকেট, হর্স সো, ডগ্ সো, ফ্যান্সি ফেয়ার ও বিখ্যাত ডুরাণ্ড ফুটবল টুর্ণামেন্ট এইখানেই হয়।

(৫)

গুর্খা-যুদ্ধ অবসানের পর, ভারত-সরকার ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সিমলা ও তার পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য দেশসমূহ মাপ-জরীপ করবার বন্দোবস্ত করেন এবং তদুপলক্ষে কলিকাতা থেকে গুটী কয়েক বাঙ্গালী প্রথম সিমলায় আসেন। কথিত আছে যে, বর্ত্তমান কালীবাড়ীর আশে-পাশেই কোনও জায়গাকে কেন্দ্র করে উক্ত জরিপ সুরু করা হয়। জরিপ-কার্য্য অগ্রসর হবার পথে নিকটস্থ কোনও এক সঙ্কীর্ণ গুহায় চণ্ডীদেবীর প্রতিমার পুরোভাগে অবস্থিত এক ধ্যান-মগ্ন তান্ত্রিক সাধুর দেখা তাঁরা পান। চণ্ডীদেবীর উপাসক এই সাধু একজন উঁচু দরের জ্ঞানী ও গুণী সাধক ব'লে সম্মানিত ও পূজিত হ'তেন। ইঁহার দেহাবসানের পর তদানীন্তন বাঙ্গালীরা সাগ্রহে ও সাদরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীদেবীর যাবতীয় ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। তাঁদের মিলিত চেষ্টায় ও আগ্রহে, সেই জায়গায় অনতিবিলম্বে একটী ছোটখাট আড়ম্বর-হীন কাঠের মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং এই মন্দিরে চণ্ডীদেবীকে যথোপযুক্ত ভাবে স্থাপিত করা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে কালীমাতার প্রতিমাও প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাঁদেরই ভিতর একজন দৈনিক পূজা ও আনুষঙ্গিক তাবৎ ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করেন। ভবিষ্যৎ সিমলা কালীবাড়ীর সূচনা এইভাবেই হয়। তাঁদের সাধনা ও চেষ্টায় বীজ যে অনুর্ব্বর জমিতে উপ্ত হয় নি, তা যে পরে ফল-ফুলে সুশোভিত মহা মহীরুহ-রূপে নব কলেবর লাভ করেছে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান সিমলার কালীবাড়ী। এই কালীবাড়ী তাঁদের পূত-স্মৃতি বুকে ধারণ করে আজ ধন্য।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে "সিমলা" শব্দটীর উৎপত্তি "শ্যামলা" কথাটীর সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রবাদ এই যে, বহু পূর্ব্বে জ্যাকো পাহাড়ের ওপর রথনি ক্যাসেলের সন্নিহিত কোনও স্থানে "শ্যামলা" দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে এই মন্দিরটী যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে ভগ্ন-দশা প্রাপ্ত হয়। পরে কোনও ইয়োরোপীয়ান নিজ গৃহ নির্ম্মাণার্থ মন্দির-সন্নিহিত সমস্ত জায়গা খরিদ করেন এবং মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাটীকে "খড়্"এ (Khud) ফেলে দেন। দৈবক্রমে রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী নামে এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ প্রতিমাটীকে ঐরূপ অবস্থায় পতিত দেখে ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সাহায্যে রীতিমত শাস্ত্র-সম্মত অভিষেক করবার পর "শ্যামলা" দেবীকে কালীমাতার পাশেই প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেই অবধি (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে) শ্যামলা দেবী কালীবাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই সম্পর্কে উপরিউক্ত ভদ্র-মহোদয়গণের বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। বাংলার বাইরে রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ন্যায় ত্যাগী ও কর্ম্মবীর খুব কম বাঙ্গালী কর্ম্মীরই প্রাদুর্ভাব হয়েছে। কথিত আছে, উত্তর ভারতে যে সব জায়গায় প্রবাসী-বাঙ্গালী কর্ত্তৃক কালীবাড়ী স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে সবেরই মূলে তাঁর প্রেরণা, ঐকান্তিক

যত্ন ও অধ্যবসায় বিদ্যমান। এ হেন কর্ম্মী বাঙ্গালীর মুকুটমণি—সারা বাংলার গৌরব; এবং এরূপ মহাত্মা ব্যক্তির জীবনাখ্যায়িকা সম্বন্ধে যত বেশী আলোচনা হয় ততই বাঙ্গালীর পক্ষে মঙ্গলজনক। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে এ হেন কর্ম্মবীরের জীবন-কাহিনী নেই। আর বাবু ভুবন-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,—যে সব বাঙ্গালী সরকারী জরিপ-কার্য্য উপলক্ষে প্রথম সিমলায় আসেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম এবং সেই প্রথম যুগে সিমলা কালীবাড়ী স্থাপন বিষয়ে একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁদের উভয়ের পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে আজ সাদর ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

ক্রমে সরকারী চাকুরী উপলক্ষে সিমলায় বাঙ্গালীর সংখ্যা যতই বেড়েছে, ততই কালীবাড়ীর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি পরিস্ফুট হয়েছে। ১৯১৩ সালে বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় মন্দিরটীকে উদ্ভাসিত করা হয়। তার পরেই ভক্ত-বৃন্দের চেষ্টায় ও অর্থানুকুল্যে মোট প্রায় এগার হাজার টাকা ব্যয়ে ৺মায়ের নাটমন্দির সুদৃশ্য মার্ব্বেল পাথরে ভূষিত হয়, মার্ব্বেলের মনোরম পদ্মাসন ক্ষোদিত হয়, প্রীতি-প্রদ ও সুচারু কারুকার্য্য-সম্বলিত মার্ব্বেল-স্তম্ভ নির্ম্মিত হয় এবং জয়পুরের মহারাণী সাহেবার আনুকুল্যে মন্দিরদ্বার রৌপ্য-নির্ম্মিত হয়। মন্দির-সংলগ্ন চারিতলা বাড়ীটীর নির্ম্মাণ খরচা পড়েছে প্রায় ৪০,০০০ টাকা। সমস্ত টাকাটাই সিমলার প্রবাসী-বাঙ্গালী সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে চাঁদা করে তুলে দিয়েছেন। গত বৎসর ১৩ই সেপ্টেম্বর এই সুবৃহৎ বাটীর উদ্বোধন খুব জাঁক-জমকের সহিত সম্পন্ন হয়ে গেছে। নব-গৃহের এই শুভ উদ্বোধন-ক্রিয়া উপলক্ষে কালীবাড়ীর বর্ত্তমান সুযোগ্য অনারারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সেন মহাশয় কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটী সুচিন্তিত ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন ও পাঠ করেন এবং সেইটাই 'The Simla Kali Bari'—A Historical Retrospect (1822-1931) এই নামে পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটী বহু মূল্যবান তথ্যে পরিপূর্ণ এবং এর প্রকাশ খুবই সময়োচিত হয়েছে। প্রবাসী-বাঙ্গালীর কর্ম্ম-কুশলতা ও কৃতিত্বের পরিচায়ক এরূপ পুস্তিকা সঙ্কলন করে তিনি সিমলার প্রবাসী বাঙ্গালীর তথা সমগ্র বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

সিমলা কালীবাড়ীর সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, আয় ও আমদানী যথারীতি ট্রাষ্ট ডিড্ (Trust Deed) দ্বারা ৺কালীমাতার নামে উৎসর্গীকৃত; এবং ভবিষ্যতে যাতে কাহারও সাহায্য না নিয়ে, মন্দিরের আয়ে ৺মায়ের পূজা ও সেবাইতের ভরণ-পোষণ চলে যায় তার পাকাপাকি বন্দোবস্ত আছে। তা ছাড়া যে কোনও বাঙ্গালী সিমলায় কালীবাড়ীতে যাতে অন্ততঃ তিন দিন নিখরচায় থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা আছে। প্রবাসী-বাঙ্গালীর মিলন ও আদান-প্রদান, সামাজিকতা ও বৈশিষ্ট্য, তার ধর্ম্ম, তার সভ্যতা ও তার culture এই কালীবাড়ীকে কেন্দ্র করেই ফুটে আছে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার সুখ-দুঃখ এইখানেই মূর্ত্ত্য হয়ে ওঠে; বাঙ্গালীর সঙ্গে, বাংলার সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ এইখানেই।

সিমলা কালীবাড়ীর আর একটী প্রধান অঙ্গ তার "ধর্ম্ম-জ্ঞান বিধায়িনী হরি-সভা।" প্রতি রবিবারের সন্ধ্যায় এই হরি-সভার অধিবেশন হয় এবং তদুপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন এবং সময়োপযোগী মধুর "পাঠ" ও ধর্ম্ম-তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা করা হয়। বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ বলতে যদি কিছু থাকে ত তা এই মধুর কীর্ত্তন। এর জন্ম, প্রসার ও পরিপুষ্টি বাংলার মাটীতেই। তাই বাংলার বাইরে কীর্ত্তনের প্রচলন দেখলে মনে আনন্দ না হয়েই পারে না। সিমলা কালীবাড়ী বড় সিমলায় মল রোডের ওপর অবস্থিত। ছোট সিমলায় যে সব প্রবাসী বাঙ্গালী থাকেন তাঁরা নিজেদের মধ্যে অনুরূপ হরি-সভার প্রচলন করেছেন। শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় এই হরি-সভার অধিবেশন হয়। শুনতে পাই ছোট সিমলার হরিসভা নাকি আদি ও প্রাচীন হরি-সভা এবং নকুড়বাবুর পিতার আমল হ'তে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ থেকে এঁদের বাড়ীতে এই হরি-সভার নিয়মিতরূপে অধিবেশন হয়ে আসছে। এঁরা তিন ভাই এবং এঁর পিতার নাম ৺রজনাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। সিমলায় প্রবাসী বাঙ্গালীর ভিতর রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন। স্বজাতি-বাৎসল্য ও বাঙ্গালী-প্রীতির জন্য এই পরিবার প্রসিদ্ধ। এঁদের অমায়িকতা, নিরহঙ্কারতা, ও ভদ্রতা আদর্শ-স্থল।

সিমলায় বাঙ্গালীর অন্যতম কীর্ত্তি—স্যার বট্‌লায়

হাইস্কুল (Sir Butler High School)। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বাঙ্গালী, পরিপোষক বাঙ্গালী ও নিয়ন্ত্রক বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর ছেলে তার মাতৃভাষা পড়তে পায় না, তার উচ্চ-শিক্ষা লাভের সুযোগ নেই, এই সব নানা অসুবিধা লক্ষ্য করে, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে যে সব বাঙ্গালী ভারত-সরকারের সঙ্গে সঙ্গে সিমলায় আসেন, তাঁরা সকলে উদ্যোগী হয়ে "Bengali Boys High School" এই নামে এক স্কুল স্থাপন করেন। পরে স্কুলটার 'affil ation' নিয়ে গোল বাধে ; কারণ, তখনকার যুগে কাছাকাছি যে দুটী— কলিকাতা ও পাঞ্জাব ইউনিভারসিটী ছিল, তাদের কেহই নানান কারণে এতদূরে স্থাপিত স্কুলটাকে 'affiliation' দেবার কষ্টটুকু গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। বাঙ্গালীরা তখন তদানীন্তন এডুকেশন মেম্বর স্যার বট্‌লারের সহায়তায় স্কুলটাকে খাস ভারত-সরকারের অন্তর্ভূক্ত করে নে'ন। স্থির হ'ল যে, এখান থেকে যে সব ছাত্র পাশ করে বেরুবে, তাদের School Leaving Certificate দেওয়া হবে এবং এই সার্টিফিকেটের জোরে তারা যে কোনও কলেজে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারবে। সেই অবধি S. L. C. র চলন। স্যার বট্‌লার সাহেবের বাঙ্গালীর এই স্কুল স্থাপনে আনুকুল্য ও সহায়তার স্মৃতি-নিদর্শন রূপে পরে এই স্কুলটীর তাঁরই নামানুসারে পুনঃনামকরণ করা হয়। বর্ত্তমানে এই স্কুলটী অতি সুযোগ্যতার সহিত পরিচালিত হচ্ছে।

(৩)

প্রথমেই বলা হয়েছে যে, সিমলার আশে-পাশে, সামনে ও পেছনে, চারিদিকে পাহাড়ের অনন্ত বিস্তৃতি। এই জন্যই বোধ হয় সিমলাকে বলা হয় যে "Simla is practically on oasis surrounded by hill states." সিমলার চারিপাশে মোট ২৭টী ক্ষুদ্র-বৃহৎ পার্ব্বত্য রাজ্য আছে এবং এই পার্ব্বত্য রাজ্য সমূহের পরিদর্শন ও তদারক করবার জন্য 'Superintendent of Hill States' এর পদ প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। সিমলার ডেপুটী কমিশনার একাধারে এই দুই পদে সমাসীন। এই সম্পর্কে সাতটী প্রধান পার্ব্বত্য রাজ্যের নাম দেওয়া গেল ; তা যথাক্রমে বাসার (Bashahr), নলাগড় (Nalagarh), কিয়নথল (Kconthal), জুব্বল (Jubbal), বঘল (Baghal), বঘত (Baghat), ভজ্জি (Bhajji), এবং কোটী (Koti), ষ্টেটস্। রাজ্যের বিস্তৃতি ও জন-সংখ্যায় বাসার ষ্টেট সবার চেয়ে প্রধান। এর পরিধি ৩,৮২০, স্কোয়ার মাইল এবং লোক-বল প্রায় ৮৮,০০০। বাসাররাজ্যের রাজধানীর নাম রাজপুর এবং এর বর্ত্তমান রাজার নাম রাজা পদম্ সিং। সিমলা থেকে রাজপুরের দূরত্ব প্রায় কুড়ি মাইল।

নলগড় রাজ্যের সীমানা ও পরিধি প্রায় ২৫০ স্কোয়ার মাইল এবং জন-সংখ্যা প্রায় ৭০,০০০। এ রাজ্যটী প্রস্তর-খনির জন্য বিখ্যাত এবং এর বর্ত্তমান রাজার নাম রাজা যোগেন্দ্র সিং।

কিয়নথলের রাজধানীর নাম জুর্গা (Jur ga)। রাজ্যের বিস্তৃতি ১১৬ স্কোয়ার মাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় ২৫,০০০। বর্ত্তমান রাজার নাম রাজা হেমেন্দ্রচন্দ্র।

জুব্বল রাজ্যে পরিধি প্রায় ২৮৮ স্কোয়ার মাইল এবং এর লোক-সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০। বর্ত্তমান রাজার নাম রাজা ভকতচাঁদ। এই রাজ্যে বহু ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃহদাকার পার্ব্বত্য গাছের নিবিড় বনানী থাকায়, রাজ্যটী ক্ষুদ্র হ'লেও এর আয় অন্যান্য পার্ব্বত্য ষ্টেটস্ অপেক্ষা বেশী।

বঘল রাজ্যের আয়তন ১২৪ স্কোয়ার মাইল ও লোক-সংখ্যা ২৫,০০০। এর রাজধানীর নাম 'আরকী (Arki).

বঘত রাজ্যের বিস্তৃতির পরিমাণ মোট ৩৬ স্কোয়ার মাইল এবং ইহার বার্ষিক আয় এক লক্ষ দশ হাজার টাকা। এর বর্ত্তমান রাজার রাণা দুর্গা সিং।

ভজ্জি ষ্টেটের রাজধানী সুনি (Suni)। এটা শতদ্রু নদীর প্রান্তে অবস্থিত। এর রাজ-প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানটার সৌন্দর্য্য না কি অতুলনীয়। গন্ধকের ফোয়ারা (Hot Sulphur Springs) এর অপর এক খ্যাতি। সুনি থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে এই সব গন্ধকের ফোয়ারা অবস্থিত এবং বহুদূর থেকে এই সব ফোয়ারা হ'তে উদ্গত বাষ্প দৃষ্টিগোচর হয় ও গন্ধকের তীব্র গন্ধ অনুভব করা যায়। যাঁদের রক্ত-দুষ্টতা ও বাত-রোগ আছে, এই সব ফোয়ারার উত্তপ্ত জলে স্নান করা তাঁদের পক্ষে খুবই ফলপ্রদ ও উপকারী। এই রাজ্যের লোক-সংখ্যা ১৪,০০০।

কোটী ষ্টেটের বিস্তৃতি একেবারে সিমলার গা ঘেঁসে। মাসোবরা, মাহাশু ও নলদেরা কোটী রাজ্যের অন্তর্গত।

রাজ্যের আয়তন মাত্র ৫০ স্কোয়ার মাইল হ'লেও সিমলার খুবই নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এ রাজ্যের আয় সম্প্রতি বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই কারণে কোটি রাজা পার্ব্বত্য রাজগণের মধ্যে সমধিক সম্পদশালী।

সিমলার সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে দু'চারটি কথা না ব'ললে সিমলার চিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সিমলা সহর অভিজাতবর্গের; এবং এই আভিজাত্যবর্গের জন্যই সিমলা সহর—এ কথা বল্‌লে বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। আবার এই আভিজাত্যের ধারণা ও শ্রেণী-বিভাগেও বেশ একটু বৈচিত্র্য আছে। যেমন ইয়োরোপীয়ানদের মধ্যে, সেইরূপ ভারতবাসীদিগের ভিতরও এই গর্ব্বিত আভিজাত্য নির্ণীত হয় প্রত্যেকের সরকারী চাপরাসের উপর—যে যেরূপ রাজকার্য্যে নিযুক্ত তদনুযায়ী। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী লক্ষপতি, শিক্ষিত ও ভদ্র হ'লেও, তাঁর এই গোলামীর চাপরাশ না থাকায় তিনি উক্ত অভিজাতবর্গের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হ'তে পারেন না। আর গরীব সাহিত্যিক, কবি বা আর্টিষ্টের কথা না বলাই ভাল—তাঁদের "ছাড়পত্র" ত একদমই নেই।

লালমোহন ঘোষ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বৈদেশিক ভাষায় অসামান্য বাগ্মিতা-শক্তি প্রদর্শন করিয়া যাঁহারা কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, লালমোহন ঘোষ মহাশয়কে তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিতেই হয়। তাঁহার বন্ধুরা বলিয়া থাকেন, লালমোহনের ন্যায় বক্তৃতাশক্তি নব্য ভারতের অপর কাহারও ছিল না। বক্তৃতাশক্তির বিচার যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহারা একবাক্যে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, লালমোহন নব্য ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা। ইংরেজরাও তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া শত মুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

লালমোহনের বক্তৃতাশক্তি সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন তাঁহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনোমোহন ঘোষ মহাশয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতার এই অসামান্য গুণের পরিচয় পাইয়া মনোমোহন তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন। সেইজন্য, যখন ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিস সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে ডেপুটেশন প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হয়, তখন লালমোহনের উপর সেই ভার অর্পিত হয়, এবং ইংল্যাণ্ডে পৌঁছিয়া দুই একটি বক্তৃতা করিবামাত্র লালমোহন অদ্বিতীয় বক্তা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

লালমোহনের পিতার নাম ৺রামলোচন ঘোষ। তিনি কৃষ্ণনগরে সেরেস্তাদার ছিলেন, পরে সদরআলা হন। কর্ম্ম-সূত্রে কৃষ্ণনগরে বাস উপলক্ষে রামলোচন সেইখানেই প্রকাণ্ড একটি বাটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্থায়ীভাবে বাস স্থাপন করেন।

তাঁহাদের আদিনিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর। বিক্রমপুরের এই ঘোষ বংশ প্রাচীন প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত বংশ। রামলোচনের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ মনোমোহন, মধ্যম লালমোহন, কনিষ্ঠ মুরলীমোহন।

রামলোচন রাজা রামমোহন রায়ের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, এবং রাজার সকল কার্য্যে উৎসাহ দিতেন।

অনুমান ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লালমোহনের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিয়া লালমোহনও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ মুরলীমোহনেরও বিলাত যাইবার কথা হইয়াছিল; কিন্তু পুত্র-পিণ্ডের জন্য তাঁহাদের জননীর অনিচ্ছায় মুরলীমোহনের বিলাত যাওয়া হয় নাই। বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলেও কন্যার বিবাহকালে লালমোহন হিন্দুমতে হিন্দু আচার অনুষ্ঠান পালন করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার জামাতা সুবিখ্যাত স্বর্গীয় শরৎকুমার মল্লিক মহাশয়।

ভারতের অভাব অভিযোগ বিলাতবাসীকে জানাইবার জন্য লালমোহন বিলাতে গিয়া বহু স্থানে অনেক বক্তৃতা

করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া বিলাতবাসীরা মুগ্ধ হইয়াছিল। বিলাতে Willis Roomএ তিনি ওজস্বিনী ভাষায় এমন বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ অবাক্, স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া Sir Roper Lethbridge লিখিয়াছিলেন—Mr. Lal Mohon Ghose was a platform orator of a very high order; his command of the English language was remarkable, his delivery more fluent than that of nine out of ten English M. P's, his idiom correct and graceful, and even his accent was almost identical with that of a highly educated English gentleman."

অর্থাৎ "মিঃ লালমোহন ঘোষ অতি উচ্চ শ্রেণীর বক্তা। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার। পার্লামেন্টের সদস্যগণের প্রতি দশজনের মধ্যে নয়জনের অপেক্ষা তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন। তাঁহার 'ইডিয়ম' নির্ভুল ও মনোহর। তাঁহার উচ্চারণ উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ ভদ্রলোকদিগের প্রায় সমান।"

পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার অভিপ্রায়ে লালমোহন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আর একবার ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। তিনি লিবারেল দলের পক্ষ লইয়া ডেপ্টফোর্ড হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হন। পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার তাঁহার খুবই আশা ছিল। কিন্তু আইরিশ ভোট-দাতারা বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই।

ব্যাপারটা হইয়াছিল এই—তখন পার্নেল ছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের নেতা। আইরিশ আন্দোলনকারীরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত—তিনি ছিলেন আইরিশদিগের "অনভিষিক্ত রাজা!" লিবারেল নেতাদের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ হওয়ায় নির্ব্বাচনের চারি দিন পূর্ব্বে তিনি আইরিশ ভোটারদের আদেশ করেন যে, লিবারেল নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের পক্ষে কেহ যেন ভোট না দেয়। এই কারণেই নির্ব্বাচনে লালমোহন পরাজিত হন। তবে তাঁহার পক্ষ যাহারা সমর্থন করিয়াছিল, তাহাদের উৎসাহ-উদ্যমের সীমা ছিল না। তাহারা মিছিল করিয়া পতাকা উড়াইয়া রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়াছিল, পথে ভারতবাসী দেখিলেই তাহারা তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া ভারতের পক্ষে জয়ধ্বনি করিয়াছিল, আরও নানান কাণ্ড করিয়াছিল। লালমোহন নির্ব্বাচিত হইতে না পারিলেও তাঁহার নির্ব্বাচন-প্রচেষ্টায় একটা কাজের মত কাজ হইয়াছিল—উত্তরকালে দাদাভাই নৌরজীর পার্লামেন্টের সদস্য পদে নির্ব্বাচনে সফলতা লাভ করিবার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলনের সময় ইয়োরোপীয়ান প্রতিবাদকারিগণের পক্ষ হইতে টাউনহলের সভায় ব্যারিষ্টার ব্র্যান্সন ভারতবাসীদের অত্যন্ত গালাগালি করেন, এমন কি, ভারত-মহিলাগণের প্রতিও অশিষ্ট উক্তি করেন। লালমোহন তখন ঢাকায়। সেখানে এক জনসভায় লালমোহন ব্র্যান্সনের বক্তৃতার জবাবে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তেমন বক্তৃতা ভারতবর্ষে কেহ কখনও শুনে নাই—এত ভাল হইয়াছিল সে বক্তৃতা। ঐ বৎসরের ২৯এ মার্চ্চ তারিখে এই বক্তৃতা হয়। তাহাতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যেমন ছিল, যুক্তি-তর্কও তদ্রূপ অখণ্ডনীয় ছিল। এই বক্তৃতার ফলে এটর্ণীরা ব্র্যান্সনের প্রতি এমন বিরূপ হন যে, তাঁহারা তাঁহাকে মোকদ্দমা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। কাজেই, অবশেষে ব্র্যান্সন সাহেবকে পাততাড়ি গুটাইয়া জাহাজে উঠিতে হয়। যাইবার পূর্ব্বে তিনি শোকার্ত্ত চিত্তে প্রকাশ্য সভায় তাঁহার অশিষ্ট উক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যান।

অনেক সভায় সুবিখ্যাত বক্তা জন ব্রাইট ও লালমোহন বক্তৃতা করিতেন। তুলনায় কেহ লালমোহনের বক্তৃতাকে জন ব্রাইটের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিতে পারে নাই।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে লালমোহন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে লালমোহন এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মান্দ্রাজ নগরে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন।

লালমোহন ঘোষ মহাশয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের অমিত্র-ছন্দে ইংরেজী অনুবাদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

বঙ্গীয় ১৩১৬ সালের ২রা আশ্বিন (১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর) লালমোহন লোকান্তরে প্রস্থান করেন।

অপমৃত্যু

শ্রীফণীন্দ্র পাল

আলাপ হ'ল প্রথম দিনই। রমেনের ত্রিসংসারে নেই কেউ; সুতরাং পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরাণী হলেও বিলাসিতা বজায় রেখেছে। বিলাসিতা আর কিছুই নয়, মেসের এক ঘরে চারজনে মিলে সঙ্কুচিত ভাবে থাকতে তার ভাল লাগেনা। নিজের জন্তে স্বতন্ত্র একখানি ঘর, একটু বেশী আলো, বেশী বাতাস, আর মাঝে মাঝে অকারণ একটু নির্জ্জনতা পাওয়ার তৃষ্ণা যদি তার থাকে, তা'তে ক্ষতি কী! রমেনের আচার-ব্যবহারে মনে হয়, তার কবিতা লেখা উচিত; কিন্তু কবিতা সে লেখেনা, লেখার স্বপ্ন দেখে। আসল কথা, সে একটুখানি দুর্বোধ্য।

লোকে তার সম্বন্ধে বলে অনেক কিছু—কেউ বলে, ও বড় দুঃখী, কেউ বলে স্তাকা। তার সম্বন্ধে লাজুক অপবাদও শোনা যায়, কিন্তু কথাবার্তায় সে বেশ সপ্রতিভ। যাই হোক্, তার স্বভাব সম্বন্ধে এত খুঁটিয়ে দেখবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা, এইটুকুই যথেষ্ট যে সে দুর্ব্বল-চরিত্রের লোক নয়।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে একটা ছোট তেতালা বাড়ী রমেনের চোখ পড়ল। সামনে একটু ফুলের বাগান আছে, পূবদিকে মাঠ—ঘরে রোদ আসবার পথ কিছুতে আটকায়না। বাড়ীর বাইরে একটি টুকরো পিজবোর্ডে লেখা ছিল, 'ঘর ভাড়া—ভিতরে অনুসন্ধান করুন।' রমেন ঢুকে পড়ল।

সেইখানে সাবিত্রীর সঙ্গে তার আলাপ, প্রথম দিনেই। আলাপ না হবেই বা উপায় কি। দরজার কড়া নাড়তেই একটি মেয়ের দেখা পাওয়া গেল, বললে—ঘর ভাড়া নিতে চান তো? চলুন ঘরটা দেখিয়ে আনি।—বলেই সে নির্লিপ্ত ভাবে চলতে আরম্ভ করল।

রমেন পিছু পিছু গিয়ে তেতালায় পৌছল। পাশাপাশি দুখানি ঘর, তার একটি ভাড়া দেওয়া হবে। ঘরখানি বেশ বড়, সামনে আবার একটুখানি রেলিং দেওয়া বারান্দা আছে। মেয়েটি বললে, বাড়ীর নীচের তলায় পিছন দিকে আরও কয়েকটি ভাড়াটে আছে, তাদের সঙ্গে এখানকার কোন সংস্রব নেই। এ ঘরটা নেহাৎ দায়ে পড়ে ভাড়া দিতে হচ্ছে, দেখছেনই তো এটা একেবারে অন্তঃপুর।

রমেন বললে, দেখছি। এ দিকে আপনারা থাকেন বোধ হয়। বেশ ঘর, এমনি নিরিবিলিই আমি পছন্দ করি।

বুঝেছি, এখানে আপনার কোন অসুবিধা হবেনা।—বলে মেয়েটি উদাসভাবে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটির সীঁথিতে সিঁদুর, চোখদুটি উদাস—স্বপ্নময়, কোথাও তার এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, বৈচিত্র্যের সমারোহ তাকে উতলা করে তোলেনা, জীবনের চারি পাশে আনন্দ-বেদনার স্রোত তার সামনে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে—যে সব প্রয়োজন অপ্রয়োজনের ঘটনা হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কাছে, তারা অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত ঘরোয়া—তাদের অনিশ্চিত দিনে আসার আশঙ্কা আর আগত দিনের সংস্রবের সঙ্গে যেন এই মেয়েটির বহুদিনকার আত্মীয়তা।

যাই হোক্, রমেন বলল, আপনার স্বামী বোধ হয় বেরিয়ে গেছেন,—আচ্ছা তা'হলে কাল সকালে আসব, ভাড়ার কথাবার্তা হবে।

মেয়েটি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। মুখ না ফিরিয়েই বললে, না তিনি অসুস্থ, ওঠবার বা কথা কইবার শক্তি পর্য্যন্ত নেই। যা' বলবার আমাকেই বলতে পারেন। এ ঘরটার ভাড়া পনেরো টাকা।

আচ্ছা তাই দেবো। বলে' রমেন সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করল। সদর দরজা পার হবার আগে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, তা'হলে কবে থেকে এখানে আসছেন?

পরশু দিন। আচ্ছা, নমস্কার।—বলে' রমেন পথে নেমে পড়ে। আশ্চর্য্য, মেয়েটি তার নাম কি, একবার জিজ্ঞাসা করলেনা!

সময় তখন গোধূলি। রমেন একটা রিক্স করে তার

সামান্য জিনিষপত্র নিয়ে হাজির হ'ল। বাড়ীতে কোথাও আলো জ্বালা হয়নি। প্রথম কিছুক্ষণ ডাকের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেলনা। একটু পরে সদর দরজা যে খুলে দিল সে আর কেউ নয়, সেই মেয়েটি, একেবারে পরিপাটি সাজ-সজ্জায়। কিন্তু সেই অস্পষ্ট আলোয় রমেনের মনে হল, মেয়েটির সঙ্গে যেন অনেকখানি নির্লিপ্ততা আছে যা' মানুষকে দূরে রাখবার জন্তে অত্যন্ত সহজভাবে কাজ করে চলে ;—কারো আত্মাভিমানে আঘাত না দিয়ে।

রমেনই প্রথমে মৃদু হেসে বললে, এসে পড়লাম আর কি। কেমন আছেন ?

ভালই। আপনার ঘর ঠিক করে রেখেছি,—বলে' মেয়েটি চলে যাবার জন্ত পা বাড়াল। রমেনের বিস্ময় জাগা এখানে অত্যন্ত স্বাভাবিক,—অভ্যর্থনার খাতিরে তাকে একটু মৃদু হাসির প্রত্যুত্তর দেওয়া তো উচিত! কিন্তু—! হঠাৎ রমেনের মনে হ'ল, হয় তো স্বামীর অসুখ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় এসে পৌঁছেচে, সেইজন্তে ওর মন ভাল নেই।

উদ্বিগ্নতা দেখিয়ে রমেন বললে, আপনার স্বামী কেমন আছেন ? আচ্ছা দাঁড়ান, জিনিষপত্রগুলো ওপরে রেখে আসি। উনি থাকেন কোন্ ঘরে ?

দোতলার একটি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মেয়েটি বললে, এইখানে।

ওপরে জিনিষপত্র গোছগাছ করে রমেন যখন দোতালায় নেমে এল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হয়ে এসেছে। সেই ঘরটিতে বিছানার দিকে এগিয়ে রমেন দেখল একটি মানুষ শুয়ে রয়েছে, আর মেয়েটি জানলার কাছে ক্লান্তভাবে দাঁড়িয়ে ; আকাশের অসীম শূন্যতা ওর চোখে, জীবনে যেন ওর কোন গতিও নেই, আবেগও নেই।

বিছানায় শুয়ে লোকটি রমেনকে একটি হাত নেড়ে কি ইসারা করল।

এ কি! এক রূঢ় বিস্ময়ের বেদনা হঠাৎ রমেনকে আক্রমণ করল। এই কি মেয়েটির স্বামী—অতি শীর্ণ পা দুটি মুড়ে বুকের কাছে এসেছে, বুকে হাঁটুতে জোড় লেগে গেছে বলে মনে হয়, ডান হাতটা বাঁকা—দেখলেই বোঝা যায়, হাতটাও অক্ষম। সবচেয়ে বীভৎস ওর মুখ—একপাশের চোয়াল ঝুলে পড়েছে।—ও পঙ্গু, ও বোবা। ওর জীবনের চিহ্ন শুধু দুটি বড় বড় চোখে, ক্লান্ত, কাতর চোখ।

বাঁ হাতটির সামান্য একটু নড়বার শক্তি আছে ; সেটি নেড়ে সে রমেনকে বিছানার পাশে চেয়ারে বসবার জন্তে অনুরোধ জানাল। রমেন চেয়ারে বসে মুখ ফিরিয়ে দেখলে মেয়েটি তখনো তেমনি নীরবে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

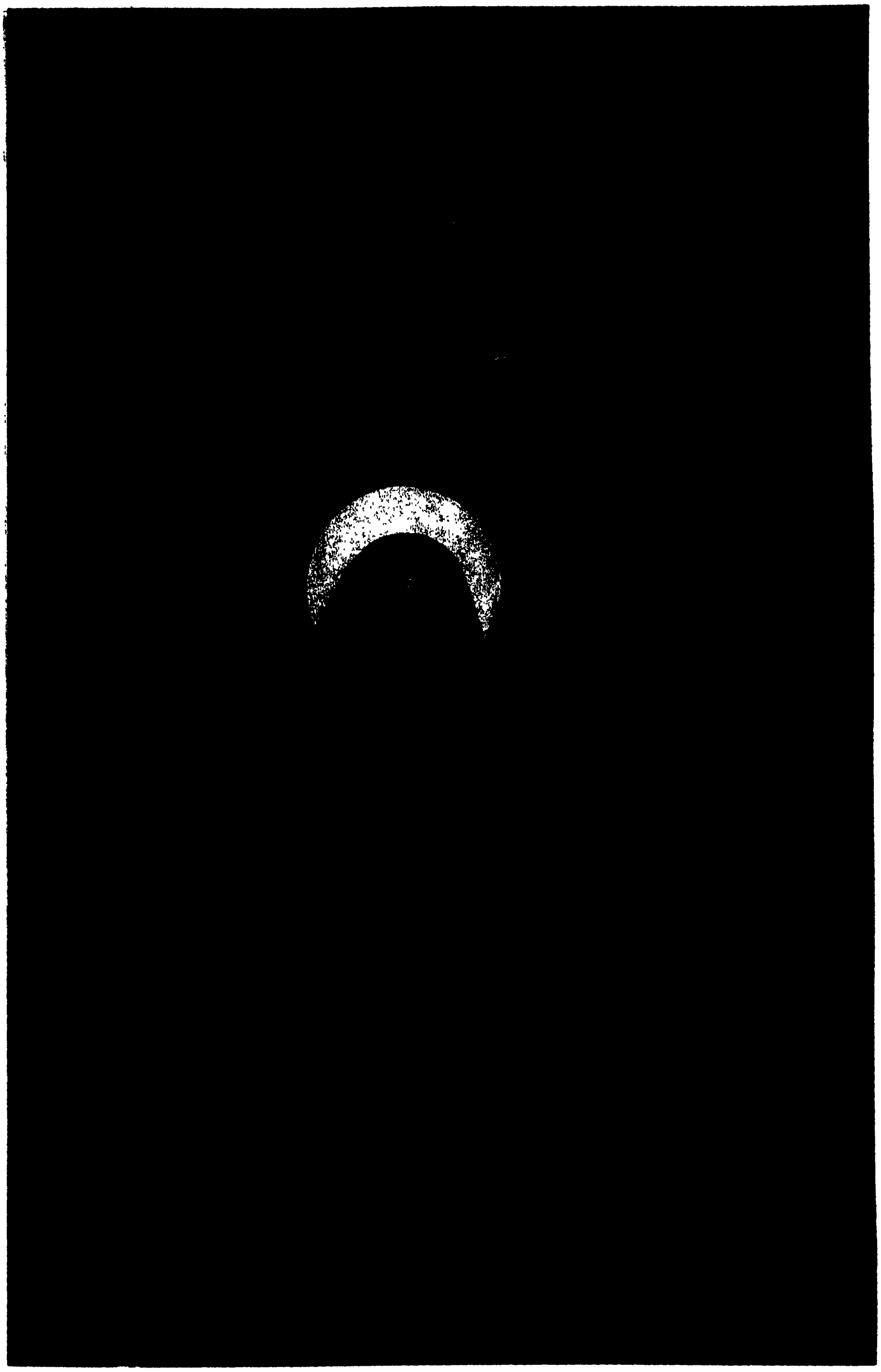
রমেন হঠাৎ অত্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিই বা সে তখন বলতে পারে! কিন্তু এ-রকম অবস্থায় বেশীক্ষণ নীরব থাকাও বিরক্তিকর। রমেন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বোধ হয় মেয়েটিকেই—এমন সময়ে বাইরের বারান্দা থেকে কাকাতুয়াটা ডেকে উঠল, সাবিত্রী।

মেয়েটির নাম সাবিত্রী। সাবিত্রী কারো দিকে না চেয়ে নীরবে ঘর হতে চলে গেল। রমেনও উঠে পড়বে কি না ভাবলে, কিন্তু মুখ ফিরাতেই দেখলে বিছানা থেকে সাবিত্রীর স্বামী তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এই পঙ্গু, চির-অভিশপ্ত জীবন নিয়ে পৃথিবীতে ওর বেঁচে না থাকলেও যে কারো কোন ক্ষতি নেই, তা' যেন ও বুঝেচে। সত্যিই, ওর অসহায়, অবসন্ন চোখের দিকে চাইলে মায়া হয়, মরণাপন্ন রোগীর প্রতি মমতা জাগার মত।

রমেন তার দিকে চেয়ে বললে, আজ এইমাত্র এলাম, ঘরখানা আমার ভারি পছন্দ হয়েছে। আমার নাম রমেন, আপনাদের যখন যা' দরকার হবে জানাবেন।

ওদিক হতে উত্তর এল আশ্বাস পাওয়ার কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে ; মৃদু হাসবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় আর বাঁ হাতখানা শুধু একটু নড়ে উঠল। তার পর সব স্তব্ধ।

কিন্তু কতক্ষণই বা এ-রকম করে বসে থাকা চলে! রমেন উঠে বলল, এখন আসি, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।—ওকে নমস্কার জানালে বিদ্রূপ করাই হয়, কারণ যে ভগবানের কাছে হাতজোড় করে কোনদিন তার গভীর অসম্পূর্ণতার জন্ত অভিযোগ জানাতে পারলনা সে কি করেই বা রমেনকে প্রতি-নমস্কার করবে! রমেন ঘর হতে বেরিয়ে ভাবলে সাবিত্রীর সঙ্গে এখন দেখা না হওয়াই ভাল,—কারো মৃত্যুর পর তার আত্মীয়দের সামনাসামনি পড়ে গেলে যেমন সহানুভূতি জানানো একান্ত উচিত অথচ সহানুভূতির যথার্থ ভাষা তখন মুখে জোগায় না, তেমনি রমেনও সাবিত্রীর মুখের দিকে চেয়ে কি সান্ত্বনা দেবে! তার চেয়ে রমেনের আজকের আবিষ্কারের দুঃখ



সন্ধ্যা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত কিরণময় ধর

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

রাত্রির ব্যবধানে লঘু হ'য়ে যাক্, সাবিত্রীর এত বড় দুর্ভাগ্য জানার বেদনা অভ্যস্ত হয়ে আসুক, তার পর যেন তার সঙ্গে রমেনের দেখা হয়।

বাইরে এসে রমেন কোথাও সাবিত্রীর দেখা পায়নি। ওপরে গিয়ে বিছানায় ক্লান্তভাবে শুয়ে সে ভাবতে লাগল, সাবিত্রীর কথা। এই মেয়েটির জীবনে অতীত যেটুকু তা' হয় তো অত্যন্ত সাধারণ, যাকে ঘিরে কোন স্বপ্ন রচনা করা চলেনা, যার চিন্তার আতিথ্যে আজিকার বিপুল ব্যর্থতার ভীত আয়ুর দৈর্ঘ্য বিস্মৃত হওয়া চলতে পারে। সাবিত্রীর জীবনে না আছে অতীত, না আছে ভবিষ্যৎ; আর বর্ত্তমান যদি কিছু থাকে, সে শুধু অনন্ত মানসিক লাঞ্ছনার নির্ম্মম অভিশাপ।

রমেনের মনে হতে লাগল এখন বুঝি অনেক রাত্রি। কিন্তু রিষ্টওয়াচে তখন সবেমাত্র সাতটা বেজে পঁচিশ। সমস্ত বাড়ী থেকে একটিও সাড়াশব্দ উঠছেনা, স্তব্ধতা যেন মৃত্যুর মত নীরব মমতায় এই বাড়ীটিকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। রমেন আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগল, এতদিন ধরে এখানে সাবিত্রীর সময় কাটল কি ক'রে? ওর পাগল হয়ে যাওয়া তো কিছুই বিচিত্র ছিলনা, ওর সঙ্গে সমস্ত দিনে রাত্রে কেউ একটা কথা বলবার নেই, কেউ ওকে আদর করেনা—প্রীতি, স্নেহ ভালবাসা যদি কিছু সে পেয়ে থাকে তা' তার স্বামীর মতই পঙ্গু, নিঃশব্দ। সাবিত্রীর জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তটি এমনি করে এই প্রখর সুপ্তি-স্তব্ধতার ভেতর ডুবে গেছে।

সাবিত্রীর স্বামীর কণ্ঠ নেই বলে কোন দিন সে তার অপরিমেয় অভাবের জন্যে অসহিষ্ণু আর্ত্তনাদ করতে পারবেনা; কিন্তু তার চেয়ে মর্ম্মান্তিক এই যে, সাবিত্রী কণ্ঠ থেকেও মূক—ও যদি আজ কাঁদে, কে ওকে সান্ত্বনা দেবে! কাকাতুয়াটা মাঝে মাঝে ওকে ওর নাম ধরে ডাকে; কিন্তু সে তো ওরই শেখানো—সে যেন তার পরিপূর্ণ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে বিদ্রূপের মত। সাবিত্রীর স্বামীর যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তা'হলে সাবিত্রীর হয়েছে অপমৃত্যু।

শৈশবের কথা সাবিত্রীর এখন কিছুই মনে পড়েনা। তার পর তার কৈশোর দিনের দৈনন্দিন অভাব অনটনের স্মৃতি মনে করে রাখায় সুখের চেয়ে অস্বস্তিই বেশী। তার পিতার জীবিকা ছিল নানারকম অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত অর্থ; আর তার দুটি ভাই পৈতৃক বিদ্যাকে যথাসাধ্য আয়ত্ত করবার চেষ্টায় জেলখানার আতিথ্য কয়েকবার স্বীকার করেছিল। কলঙ্কিত জীবন যাপনের আশঙ্কা অনেকবারই সাবিত্রীর নিকট এসে ফিরে গেছে।

যেদিন এই পঙ্গু বোবা লোকটি তার স্বামীর স্থান গ্রহণ করেছিল সেদিনও দাম্পত্য-জীবনের পরিণতির দিক ছিল সাবিত্রীর নিকট একেবারেই অজানা। কিন্তু তার পর অনেকগুলি দিন কেটে গেছে এবং সেই সময়ের স্রোতের সঙ্গে তার কাছে ভেসে এসেছে, জীবনে পরিপূর্ণতা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, আশা। তার পর এল নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান—প্রান্তরের স্বপ্ন গেল ভেঙে, সাবিত্রী দেখল যে সে প্রাচীরঘেরা প্রাঙ্গণে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে,—সেখানে আশ্বাস, আনন্দ, তৃপ্তির বাতাস গেছে থেমে,—তার মাথার উপর ব্যর্থতার সঙ্কীর্ণ অপরিচ্ছন্ন আকাশ।

সাবিত্রী তার পঙ্গু স্বামীকে ভালবাসতে পারেনি, এমন কি স্বামীর প্রাপ্য শ্রদ্ধাটুকুও দেয়নি, এ কথা জানালে ধর্ম্মের দিক হ'তে নানা আপত্তি উঠতে পারে, তবু এ কথা স্বীকার না করে উপায় কি। এই অকর্ম্মণ্য অসম্পূর্ণ মানুষটির জন্যে সাবিত্রীর দুঃখের সীমা নেই। প্রতি দিনের তুচ্ছতম প্রয়োজনে সাবিত্রীই তার একমাত্র অবলম্বন; সাবিত্রী তাকে নিজে হাতে খাইয়ে দেয়—তার পরিচর্য্যার ভেতর নিষ্ঠার কার্পণ্য নেই—সে-নিষ্ঠা একটি মমতাময়ী মাতার মত যেন তাঁর শিশু পুত্রকে প্রতিনিয়ত সস্নেহে ঘিরে রেখেছে, চিররুগ্ন ভাইয়ের সেবায় যে বোন নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করে, সাবিত্রীরও মনোভাব সেই রকম।

যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ভবিষ্যৎ নেই, যে আশা শেষ নিশ্বাসে পর্য্যন্ত তীব্র প্রতীক্ষা নিয়ে জেগে থাকে, তাকে নিয়ে মানুষের স্বপ্ন রচনা ভুল হতে পারে, কিন্তু তা অত্যন্ত স্বাভাবিক, একান্ত প্রয়োজন। বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দুঃখ বেদনা, অভাব অভিযোগ অসংখ্য, অনন্ত আশাই সেখানে একমাত্র আশ্রয়। চিরকাল গভীর অন্ধকারের ভেতর যাকে কাটাতে হবে, আলোর স্বপ্ন না দেখলে সে বাঁচে কি করে! জীবনে সুখ না থাক কিন্তু সুখের মরীচিকার পিছনে ছুটে যদি সার্থকতা আসে তা'হলে কি

ক্ষতি! বেঁচে-থাকার যথার্থ বিলাসিতা শুধু এইটুকু। সাবিত্রীও বুঝি সেই স্বপ্ন দেখে!

তেতালার রমেনের ঘরের পাশের ঘরখানি বিশেষ বড় নয়। রমেন যখন সাবিত্রীর বর্ত্তমান জীবনের নিগূঢ় অভিব্যক্তি নিয়ে তন্ময় হয়ে ছিল, তখন সাবিত্রী ছিল ঠিক তার পাশের ঘরে।

ছোট একটি টেবিল, তার সামনে একটি চেয়ার, জানালার পাশে খাটের ওপর একটি ধবধবে সাদা বিছানা পাতা আছে, ওদিক্‌কার জানলাটা খুলে দিলে শুক্লপক্ষের রাত্রে বিছানার ওপর এক ঝলক্ জ্যোৎস্না এসে পড়ে বৈ কি। দেয়ালে টাঙানো আল্‌নাটায় জরিপাড় কোঁচানো ধুতি আর গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী ঝুলচে। আর এক পাশের দেয়ালে একটি বড় আয়না। দেখলেই মনে হয় যেন একটি মহা সৌখীন লোক এখানে থাকে।

বড় আয়নাটাতে যার ছায়া পড়েছিল, সে সাবিত্রী। হাল্‌কা হলদে রঙের সাড়ী আর বেগুণে রংয়ের ব্লাউজে ওকে বেশ মানিয়েছে। কপালে আবার ছোট একটি সিঁদূরের টিপ্। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার খোঁপায় সুচারুভাবে কয়েকটি ফুল আট্‌কাচ্ছিল, সূর্য্যমুখীই হবে।

কিন্তু এ কি, এ বুঝি সেই উদাসিনী বিষণ্ণ-প্রশান্তি-মাখা সাবিত্রী নয়, এর টানা দুটি চোখে যে বিদ্যুতের স্ফুরণ এসেছে, ঠোঁট দুটিতে আনন্দ-জোয়ারের কাঁপন—এ সাবিত্রী বুঝি চিরন্তন অভিসারিকা, শ্যামল, তন্বী, সলজ্জ; ওর প্রত্যেক মূক ভঙ্গীর ভেতর কত যেন মুখরতার ইঙ্গিত আছে।

ঘরে অন্য কেউ ছিলনা। সাবিত্রী আপনমনে মৃদুস্বরে কথা বলতে লাগল, এমনভাবে যেন কোন অশরীরি আত্মা শুধু তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে; তার সঙ্গেই যেন সাবিত্রীর আলাপ চলছে। সাবিত্রী শূন্য চেয়ারটার দিকে একটি বিলোল কটাক্ষ হেনে বললে, দেখদিকিনি, আমাকে কি ঠিক সাঁওয়াতালী মেয়ের মত দেখাচ্ছেনা?

সাবিত্রীর ফুলসাজ ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে, চেয়ারের পাশটিতে সপ্রেম ভঙ্গীতে সে তখন দাঁড়িয়ে, যেন প্রণয়ী স্বামীর পাশে অনুরাগবিহ্বলা স্ত্রীর মত। সাবিত্রীর প্রশ্নের অত্যন্ত সুমধুর উত্তর দেওয়া চলে। যেন সেই উত্তর ও পেয়েছে, এমনি ভাব দেখিয়ে সে সলজ্জ সঙ্কোচের সঙ্গে বললে, যাওঃ, তুমি ভারী দুষ্টু—

নববিবাহিত স্বামীরা না কি সাধারণতঃ দুষ্টুই হয়ে থাকে। সাবিত্রী উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে হাসতে বললে, তুমি একটি বাচস্পতি, তোমার সঙ্গে কথায় কে পেরে উঠবে বল!

এর পরেই অভিমানের সুরে সাবিত্রী বলে, তোমার জন্যে সমস্ত দুপুর ধরে কাপড় কুঁচিয়ে রাখলাম, আদ্দির পাঞ্জাবীও বের করে রেখেছি, আর তুমি যত সব ছেঁড়া জামা কাপড়গুলো পরে থাকবে। তা' আমার আবদার রাখবেই বা কেন! রাতদিন তো তোমার কবিতা নিয়েই আত্মহারা হয়ে আছ; আমি তোমার কে!—অভিমানে সাবিত্রীর চোখে বুঝি জল এসে পড়ল!

সাবিত্রী তার কবিতা, তার মানসী। কিন্তু এ উত্তরে কোন মেয়েই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেনা, সাবিত্রী সজল আবেগের সুরে বললে, মানসী না ছাই। ওই কবিতাই তো আমার সতীন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিছুক্ষণের জন্যে সব নীরব। হয় তো সাবিত্রী চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদছিল, আর তারই স্বপ্নে-গড়া অশরীরি স্বামী আদর সোহাগে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। একটু পরেই প্রসন্ন মৃদু হাসির সঙ্গে চেয়ারের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে বলল, হ্যাঁ গা, তুমি আমার ওপর ভয়ঙ্কর রাগ করেছ, না?

সাবিত্রীর ওপর রাগ!—অসম্ভব। ও তো মানুষ নয়, ও না কি একটি ফুল—একটি শ্যামল বনফুল; ছোট্ট, সুন্দর, স্নিগ্ধ, সুরভিত।

সাবিত্রীর হাসি আবার উথ্‌লে উঠল, তারই ফাঁকে বললে, যাঃ কী যে বল! পুরুষমানুষরা শুধু মুখেই মিষ্টি।

এবার সাবিত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, অনেক রাত হল, বেশী রাত-জাগা তোমার সহ্য হয়না; এবার শুয়ে পড়।

সাবিত্রীর কি এর মধ্যেই ঘুম এল না কি? সে অনুযোগ করে বলে, না গো না আমার ঘুম পায়নি। কিন্তু তোমার যে বেশী রাত অবধি জেগে থাকলে অসুখ হবে। লক্ষ্মীটি আর বসে থেকোনা, শুতে চল।

কিন্তু তার এই কল্পিত স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে সে কি করবে! কি আর করবে, সাবিত্রী আপনার মনে ভাবলে সে না কি তাঁর ঘুমন্ত সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকবে।

পাশের জানালাটি থাকবে খোলা, তারই ফাঁকে দিগন্তনীল আকাশের সংখ্যাহীন নক্ষত্র তার দিকে চেয়ে থাকবে, কৃষ্ণপক্ষের পাণ্ডুর চাঁদ জাগবে তার সঙ্গে, আর নিবিড় অন্ধকারের আড়াল থেকে হাওয়া এসে তাদের ঘিরে ছুটোছুটি করবে। তন্দ্রালস গাছের পাতায় পাতায় মৃদু মর্ম্মরধ্বনি শোনা যাবে।

সাবিত্রী এইবার বিছানার ওপর গিয়ে বসল। তার স্বামীর আঙুলগুলি যেন হাত দিয়ে ছুঁয়ে রয়েছে এমনি ভঙ্গীতে বসে সে মৃদু কণ্ঠে বলতে লাগল, রূপ গুণ কিছুই তো আমার নেই তবু তুমি আমায় এত ভালবাস কেন?

তার নিত্যকালের মানসকল্পিত স্বামী পঙ্গুও নয়, মূকও নয়—সে সবল সুস্থ মুখর যাকে ঘিরে সাবিত্রীর অকুণ্ঠ প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। সেই কায়াহীন স্বামীর নিকটই যত তার আবদার, অভিমান, উদ্বিগ্নতা। সাবিত্রী নিজের প্রেমেই নিজে আচ্ছন্ন। এই অকলুষ স্বপ্নই তার বেঁচে থাকার সহায়।

সকালবেলা নীচে নামবার সময় সিঁড়িতে রমেনের সঙ্গে সাবিত্রীর দেখা হয়ে গেল। রমেন যেন হঠাৎ বিপদের মুখোমুখী এসে পড়েছে। কারণ সময়ে সময়ে পরস্পর অপরিচিত দুজনও এমন অবস্থায় এসে পড়ে যেখানে নীরবতা নিতান্ত অশোভন বলে মনে হয়। ঠিক এমনি অবস্থার মাঝখানে সাবিত্রী আর রমেন এসে পড়েছিল। দুজনেই দুজনকে কি যেন বলতে গিয়ে থমকে থেমে রইল—রমেন একটু অপ্রতিভ হয়ে, সাবিত্রী প্রশান্ত উদাসীনতায়।

অবশেষে কথা বলল প্রথমে সাবিত্রী, বলল, বেরিয়ে যাচ্ছেন না কি? যাবার সময় বলবেন দরজাটা বন্ধ করে দেব।

মৃদু হেসে রমেন জবাব দিল, না, বাইরে যাবার প্রয়োজন আমার নিজের জন্যে বিশেষ কিছু নেই। তবে আপনাদের যদি কিছু দরকার থাকে ত বলুন এই বেলা সেরে আসি, সাড়ে ন'টার সময় আবার অফিস।

সাবিত্রী কোন কথা বললনা, শুধু একবার মাথা নেড়ে জানাল যে তাদের এমন কোন প্রয়োজন নেই যাতে রমেনের বাইরে যাওয়া চলতে পারে।

রমেন পরিহাস করে বললে, বাজার করে আনবারও দরকার নেই! আশ্চর্য্য, গৃহস্থ-বাড়ীতে কিছু কিনতে হয় না এমন ত কখনও শুনিনি!

সাবিত্রী কিন্তু একটুও হাসল না, বলল, পাড়ার একজন মুদী প্রতি সপ্তাহে জিনিষ-পত্র যা দরকার হয় দিয়ে যায়, সুতরাং অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয়না।

একটু চুপ করে থাকবার পর রমেন মৃদু হাসির সঙ্গে বলে, বেশ। কিন্তু আমাকে মাঝে মাঝে আপনাদের একটু-আধটু সাহায্য করতে না দিলে আমি বিশেষ দুঃখিত হব। আচ্ছা, এখন একবার পাড়াটা ঘুরে-ফিরে দেখে আসি, দরজাটা বন্ধ করে দিন।

রমেন যখন ফিরে এল তখন সাড়ে আটটা বেজেছে। রমেন চেয়েছিল সাবিত্রীর সঙ্গে যেন তার দেখা হয়। কিন্তু দরজা ছিল খোলা; সুতরাং তার আসবার কোন প্রয়োজন হয়নি। রমেন ক্ষুব্ধ হ'ল, বিস্মিতও হয়েছিল।

সাবিত্রী তার জীবনের প্রথম মধ্যাহ্নে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সে মধ্যাহ্নে রৌদ্রের প্রাচুর্য্য নেই, প্রখরতা নেই, নেই আশা-আকাঙ্ক্ষার মাদকতা। সাবিত্রীর মনের আকাশের শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও অনাগত দিন-রাত্রির আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে। সেখানে ঝড়ের আশকাও সে করে না। সে-আকাশের চোখ অন্ধ হয়ে আছে বিবর্ণ মেঘের তলায়। তবু হয় ত একদিন এই মেঘ কেটে যাবে। তার এই চিরসন্ধ্যার তন্দ্রালস প্রাণে চৈত্রের প্রখর রৌদ্র, ফাল্গুনের প্রফুল্ল জ্যোৎস্নার সাড়া যদি কেউ আনতে পারে,—এই কথাই রমেন ভাবতে ভাবতে বাড়ী এসে পৌঁছেছিল।

আগেকার মতই সাবিত্রীর জীবনে সকাল আসে—নিরালা প্রভাত, স্তব্ধ দুপুর, স্বপ্নময় নিবিড় রাত্রি—পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত অলস অবসর—আকাশের মতই বিস্তীর্ণ বিশুষ্ক শূন্যতা। রমেনের সঙ্গে কচিৎ কখনো দেখা হ'লেও নিতান্ত সাধারণ দু'একটি উত্তর দিয়ে সে সরে আসে।

সন্ধ্যাবেলা সাবিত্রীর পঙ্গু স্বামীর ঘরে যাওয়া রমেনের কাছে যেন একরকম নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে বসে বহুক্ষণ আলাপ করবার প্রবৃত্তি তার হওয়ার কোন কারণ নেই; একতরফা কথা বলে যাওয়ার মোহ রমেনের নেই। শুধু কুশল প্রশ্ন ও বাইরের জগতের তুচ্ছ ঘটনার

দু' একটি অপ্রাসঙ্গিক কথার ভেতর রমেনের আলাপ শেষ হয়ে যায়।

বেশীক্ষণ সেখানে বসে থাকবার ধৈর্য্য রমেন খুঁজে পায়না। সেই ঘরে বসলেই রমেনের হঠাৎ লজ্জা হয়, ঘৃণা হয়, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। মনে হয় বাইরের জগৎ আলোহীন, বাতাস থেমে গেছে, সচল সবকিছুর হৃদয়স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে এল বুঝি—বিশাল মুমূর্ষু বিকলাঙ্গ—জগৎকে যেন সঙ্কীর্ণ ঘরের ভেতর অনাদরে অবরোধ করা হয়েছে।

তবু রমেন প্রতি দিন সেখানে যায়—হয় তো তার এখানকার বাসের প্রতিটি দিন সে যাবেও। কারণ রমেনের সেই পঙ্গু লোকটিকে দেখে করুণা হয়, লজ্জা আসে। বিধাতার বিদ্রূপ রমেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অকারণ বলে মনে করে।

স্বামীর ঘরে সন্ধ্যাবেলা সাবিত্রীর দেখা প্রায়ই পাওয়া যায়না। যদিও বা কখনো কখনো আসে তা' অপ্রয়োজনে নয়। যেটুকু সময় তাকে সেখানে কাজের জন্যে থাকতে হয়, সে'কয়েকটি মুহূর্ত্ত সে তেমনি নীরব হয়েই থাকে। শুধু একবার মাথা নাড়া অথবা দু'একটি মৃদুস্বরে জবাব দেওয়া ছাড়া সেখানে সাবিত্রীর সঙ্গে রমেনের আর কোন ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠবার অবকাশ হয় না। পঙ্গু স্বামীর সাম্‌নে যে-সাবিত্রী দাঁড়িয়ে থাকে তার সঙ্গে কথা বল্‌বার ভাষা, সপ্রতিভ ভাব রমেনের ছিলনা।

এমনি করে কেটে গেল একটি সপ্তাহ, রমেনের ও সাবিত্রীর পরিচয়ের নিবিড়তার অন্তরালও রইল তেমনি অটুট। কিন্তু বিপর্য্যয় যখন আসে তখন তার পূর্ব্বাভাস থাকেনা,—আসে অকস্মাৎই।

সেদিন সমস্ত দিন আকাশ ছিল মেঘলা, বাতাস ছিল অত্যন্ত মৃদু, মাটি আর আকাশের মাঝখানে ছিল কি যেন প্রতপ্ত ক্লান্তি। সন্ধ্যার অন্ধকারের আড়ালে ঝিম্‌-ঝিম্‌ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। অফিস থেকে এসে পরিশ্রান্ত রমেনের সেদিন আর বেড়াতে বেরোবার আগ্রহ রইলনা। সাবিত্রীর স্বামীর ঘর হতে বেরিয়ে বারান্দায় পৌঁছতেই রমেন দেখল সাবিত্রী রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সম্মুখে সুদূরবিসর্পিত অমা-রজনী, মৃদু বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ছোট ছোট অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে, যেন কোন অদৃশ্য ক্ষীণ একটি নদীর তীরে তীক্ষ্ণ কয়েকটি ঢেউয়ের অস্ফুট গুঞ্জন-রোল। সাবিত্রীর চেতনা হঠাৎ যেন সেখানে স্তব্ধ-তপস্যায় দাঁড়িয়ে আছে; আজ যেন তার স্বপ্নের মাঝখানে কোন দুর্ব্বল সত্যের সন্দেহ-বিহ্বলতা দেখা দিতে চায়।

রমেন তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু সাবিত্রী রইল তেমনি নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে। কি জানি কেন অকস্মাৎ রমেনের মনে হ'ল সাবিত্রী যেন তার কতদিনকার পরিচিত, তাদের দুই আত্মার অবিচ্ছিন্ন বন্ধুত্বে সন্ধি হয়েছিল বহু দিন পূর্ব্বে। তার পর কবে সাবিত্রীর আত্মা পথ ভুলে বৈরাগীর বেশে চলে গিয়েছিল; আজ আবার তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে।

রমেন নম্রকণ্ঠে বলল, এখানে একা চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন যে?

সাবিত্রী মুখ তুলে চাইল। একটু পরে বলল, কোন কাজ নেই, কি আর করি! তার পর একটি ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস।

রমেন তখন অত্যন্ত সহজ সুরে বলল, সত্যিই তো—আপনার আর কি-ই বা কাজ। কিন্তু আপনি একটা বিস্ময়—এত মুখ বুজে থাকতে পারেন, আশ্চর্য্য। আমার ত হাঁপ ধরে যায় বোধ হয়; সেইজন্যে আমি দিনে দু'বার অন্ততঃ কারো না কারো সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক করি। আচ্ছা, আমার নাম কি, আপনি জানেন?

উত্তর এল, জানি।

রমেন একটু হেসে বলল, ও-হো একদিন বলে ফেলেছিলুম বটে। মানুষকে ভাল করে জানবার লোভ হয় এবং তা' প্রয়োজনও। বিশেষতঃ মেয়েদের না কি এ বিষয়ে কৌতূহলের সীমা থাকেনা শুনেছি, কিন্তু আপনি তো দেখছি একেবারে উল্টো। এই যে এত দিন ধরে আপনাদের এখানে রয়েছি, একই সিঁড়ি দিয়ে উঠি, পাশাপাশি ঘরে থাকি, তবু আপনি জানেন না আমি কি ধরণের লোক,—চোর না ডাকাত, না একেবারে নিরেট সন্ন্যাসী—কাঁচকলা সেদ্ধ খেয়ে থাকি আর রাত্রিবেলা উঠে বিছানায় বসে গীতা পাঠ করি।

একজনের কাছ হতে এতগুলো কথা একসঙ্গে সাবিত্রী বোধ হয় জীবনে শুনল এই প্রথম। রমেনের মুখরতায় তার মনে কৌতূহলের আভাস দেখা দিল—সলজ্জ

তীব্র অস্ফুট কৌতূহল, প্রথম বিস্ময় যার মুখে ভাষা থাকেনা।

সাবিত্রী বাইরের দিকে চেয়েই বলল, সকলের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার দরকার হয়না।

রমেন হেসে বলল, তা হয় ত সত্যি। আপনি একটু-আধটু মানুষ চেনেন দেখচি। মানুষের মুখের চেহারা দেখে মনের চেহারা অনুমান কিছু-কিছু করা যায় বটে। তবু আমি যে আপনাদের বাড়ীতে আছি, বাড়ীর গিন্নী হয়ে আপনার তো এক-আধবার খোঁজ নেওয়া উচিত যে এই নিরাত্মীয় লোকটার দুবেলা ভাল আহার জুটচে কি না!

সাবিত্রী চুপ করে রইল। রমেন এবার বলল, আপত্তি না থাকলে আমার একটা আবেদন ছিল।

উত্তর এল, বলুন।

রমেন বলতে লাগল, খাওয়াটা নয় হোটেলেই সারব—হতভাগাদের গতিই বা আর কোথায় হবে। কিন্তু দিনের মধ্যে দুটো মিষ্টি কথা, প্রীতির একটু আলাপ আমায় না করতে দিলে আমার সাদর-স্নেহের অভাব আর কোন দিন মিটবেনা। তা ছাড়া কথা বলি বলেই তো বেঁচে থাকি, মনের সমস্ত কোমল অনুভূতিও সজাগ থাকে। নাহ'লে তো এতদিনে পাগল হয়ে যেতাম, পাষাণ হয়ে যেতাম।

তার পর কিছুক্ষণ চুপ করে দুজনে দাঁড়িয়ে থাকবার পর সাবিত্রী চলে যাবার জন্য এগিয়ে বলল, যাই, কাজ আছে।

রমেনও বলল, যাই বন্ধু নেমন্তন্ন করেছে, না গেলে চটবে।

বৃষ্টি তখনো থামেনি, একটু পরেই ছাতা নিয়ে রমেন বেরিয়ে পড়ল।

রমেন চলে যেতেই সাবিত্রী চলল তার কায়াহীন কল্পিত স্বামীর ঘরে। দরজাটি আস্তে বন্ধ করে দিয়ে সে চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তখন তার অঙ্গে অঙ্গে আনন্দের ব্যাকুল হিল্লোল, ঠোঁটে উজ্জ্বল মধুর হাসি, চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ। চেয়ারের একটি হাতলের ওপর বসে সে বললে, কবিতা নিয়ে তো মত্ত আছ, আমি যে এখনি একজন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করে এলুম।

সাবিত্রীর কায়াহীন স্বামী বোধ হয় তার রচনা থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই প্রশ্ন করল, কে গো?

সাবিত্রী উত্তর দিল, রমেনবাবু, আমাদের নতুন ভাড়াটে। কি ভয়ঙ্কর বেশী কথা বলে—বাবাঃ; ঠিক তোমারই মত বাচাল।

অশরীরি স্বামী বোধ হয় একটু হাসল। অমনি সাবিত্রী অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, ওই জন্যেই তো রাগ ধরে, কিছু বললেই খালি ফিক্ ফিক্ করে হাসা হয়, শুধু শুধু হাসলে কেন বল ত?

অশ্রুত উত্তর এল, কে জানে হয় ত রমেনবাবুর কথার মোহে পড়ে তুমি কোন দিন আমার বিরহদশা উপস্থিত করে বৃন্দাবনে কণ্ঠিবদল করতে না চলে যাও।

রেগে গিয়ে সাবিত্রী বলল, মা গো কি ঠাট্টার ছিরি! লজ্জা হয় না তোমার এরকম করে বলতে।

একটু থেমে আবার সে বললে, হ্যাঁ গো, যখন-তখন আমায় সঙ্গে শুধু শুধু এমনি করে লাগ কেন বল দিকিনি?

বোধ হয় উত্তর এল, তোমায় খুব ভালবাসি বলে।—সাবিত্রীর মুখে তখন পরিতৃপ্তির আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

পরের দিন রমেন যখন স্নান সেরে বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ সাবিত্রীর দেখা পাওয়া গেল, বলল, খেয়ে যাবেন—একটু অপেক্ষা করুন।

রমেন এতখানি আশা করেনি, বিস্ময়-ব্যস্ত হয়ে সে বলল, কি আশ্চর্য্য, কালকে আমার একটা কথাতেই আপনি সব আয়োজন করে ফেললেন। কিন্তু এত ব্যস্ত হবার দরকার কি ছিল; প্রতি দিন সাড়ে ন'টার ভেতর আমার আহার যোগাড় করে তোলা তো খুব সোজা নয়। আপনার যে ভারী কষ্ট হবে, তাছাড়া আমিও পড়ব বিপদে। সময়মত ভাত না হ'লে আপনাকে তো আর ধমক দিয়ে তাগাদা করতে পারবনা! নিজে রেঁধে খাওয়াবেন সেই কত বড় অনুগ্রহ—তার অপমান করবই বা কোন লজ্জায়! না—না, সকাল বেলাটা না হয় হোটেলেই খাব।

হঠাৎ সাবিত্রী কঠোরভাবে বলে ফেলল, তা হ'লে কালকে অত ভণিতা করে খাওয়ার কথা তোলবার দরকারই বা কি ছিল!

রমেনকে তখন হেসে বলতে হ'ল, রাগ করছেন আপনি। তবে থাক, হোটেলে না হয় নাই খেলাম, যত্ন করে যারা খাওয়াতে চায় তাদের চটালে ভয়ঙ্কর ক্ষতিই হয়,

কিন্তু শেষে একদিন যেন বেঁকে না বসেন যে এ রাক্ষসটার আহারপর্ব্ব নিয়ে আর বেশী পরিশ্রম ভাল লাগেনা।

সেদিন থেকে রমেনের হোটেলে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সকালে স্নান সেরে এসে আর রাত্রে বেড়িয়ে ফিরে এসে সে প্রতি দিনই দেখতে পায়—তার আহার ঘরের একটি পাশে ঢাকা দেওয়া আছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে সাবিত্রীর দেখা পাওয়া যায় ক্বচিৎ। অকারণে রমেনের সঙ্গে আলাপ করবার আগ্রহ সাবিত্রীর মনে তখনো প্রবল হয়ে ওঠেনি।

একদিন একটু বেশী রাত্রে রমেনের কি জানি কি খেয়াল হ'ল ছাদে গিয়ে বেড়াবার। ওপরে গিয়ে দেখে সাবিত্রী বিবর্ণ জ্যোৎস্নার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। রমেন গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে বলল, কি ভাবছেন?

সাবিত্রী তখন বোধ হয় ছিল স্বপ্নরাজ্যে—জ্যোৎস্নার নীচে তার অশরীরি স্বামীর সঙ্গ-তন্ময়তায়।

রমেনের প্রশ্নে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল, ধরা পড়বার ভয়ে, লজ্জায় ব্যস্তভাবে বললে, কই না কিছু ত ভাবিনি।

রমেন বলল, আপনাকে কত কথা জিজ্ঞেস করব ভাবি, কিন্তু আপনার দেখা পাওয়াই তো দায়। কোন দেব-দেবীর জন্তে যদি এতদিন ধরে তপস্যা করতাম তাহলে তিনি বোধ হয় আমার ঘরে এসে বসে থাকতেন। যাক্ এ সব কথা, আপনাদের বাড়ী কোথায়? কে কে আছেন বাড়ীতে?

সাবিত্রী নীরব। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়া তার কাছ হতে প্রথমে আর কোন উত্তর এলনা। রমেন কি ভেবে বলল, সে-সব পুরানো দুঃখের কথা, বলতেও কষ্ট হয়, ভাবতেও ভাল লাগেনা, না? কিন্তু বুঝলেন, দুঃখ বেদনাকে নিজের মধ্যে গোপন রেখে বিশেষ শান্তি নেই; বরং পরের কাছে ব্যক্ত করতে পারলেই নিজেকে হাল্‌কা বলে মনে হয়—মনে হয় যেন কি এক গভীর সান্ত্বনা পেলাম।

সাবিত্রী এইবার কথা বলল—বলল, বাবা বেঁচে নেই। মার মুখ ভাল করে মনে পড়েনা, তিনি বেঁচে আছেন কি না আমার পক্ষে বলা শক্ত। দু'টি ভায়ের একটি মারা গেছে, আর একটি নিরুদ্দেশ।

রমেন জিজ্ঞাসা করল, মা বেঁচে আছেন কি না সে কথা আপনার পক্ষে বলা শক্ত কেন?

রমেনের কণ্ঠস্বরে সহানুভূতির এমন একটি আকর্ষণী সুর ছিল, যার প্রভাব সাবিত্রীকে আচ্ছন্ন করে দেয়। তবু কিছু-ক্ষণের জন্তে সাবিত্রী কোন উত্তর দিলনা। পরে নিজে থেকেই বলল, বাবার জন্তে সংসারে সুখ-সোয়াস্তি আমাদের কারোরই ছিল না। তাছাড়া মার ছিল রূপ; কিন্তু এসব কথা এখন থাক্—প্রবল সঙ্কোচে সাবিত্রী চুপ করে গেল।

রমেন বলল, বুঝেচি—আর বলতে হবেনা। মামুলি ভাষায় আপনাকে সান্ত্বনা বা সহানুভূতি জানালে ত মনোকষ্ট দূর হবেনা। শুধু এইটুকু জানাতে পারি, সংসারে আপনার মত লাঞ্ছনা কলঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়াতে হয়নি বটে, কারণ, আমি পুরুষ—কিন্তু দুঃখ আমি পেয়েছি বিস্তর। আর সংসারে এমন একজন নিকট আত্মীয় নেই, যার সঙ্গে দেখা হলে দুটো মনের কথা বলি। জীবনের যাত্রাপথ আমাদের দুজনের প্রায় একই।

কিছুক্ষণের গভীর নিস্তব্ধতা, ঘনায়মান রাত্রি। আকাশের অল্প একটু মেঘ সরে গিয়ে বহু দূর অবধি বাড়ীর মাথার ওপর নিস্তরঙ্গ প্রগাঢ় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে গেছে দেখা যায়। আর দেখা যায় সুদূর একটি নারিকেল গাছ মাঝে মাঝে হাওয়ায় কেঁপে উঠছে।

সে-নীরবতা ভাঙল প্রথমে রমেন; মৃদুকণ্ঠে বলল, আপনি বলে সম্বোধন করবার গুরু-সম্মানের ব্যবধান তোমার সঙ্গে আর রাখতে ইচ্ছা যায় না সাবিত্রী। বয়সে তুমি ত আমার চেয়ে অনেক ছোট। তাছাড়া ও-কথাটা যেন পরিচয়ের নিবিড়তার মাঝখানে আড়াল হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে।

তার পর কয়েক দিনের মধ্যে যে কি রকম নিবিড় আত্মীয়তা হয়েছে, তা' রমেনও ওজন করবার চেষ্টা করেনি, সাবিত্রীও চায়নি জানতে। সহজ সরল হাসি-পরিহাস অনাড়ম্বর আলাপে দুজনেই অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সাবিত্রীর কল্পনা আজকাল প্রতিমুহূর্ত্তে বিচূর্ণ হয়ে যায়—তার স্বপ্নের ছায়ারা কায়া-রূপকে অবলম্বন করবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

সাবিত্রীর কত পরিবর্ত্তনই না এসেছে। দুটি বেলা রমেনের খাওয়ার সামনে বসে অনুযোগ না করলে তার

নিজের যেন খেয়ে সুখ হয়না। অফিস হ'তে রমেনের আসতে দেরী হলে সে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে—জানালার কাছে বারবার এসে দেখে মোড়ের বাঁক ঘুরে রমেন এই পথে আসছে কি না।

একদিন বুঝি রমেনের আসতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। রমেন বাড়ী ফিরতেই সাবিত্রী বলল, রোজ রোজ অফিস থেকে অন্ত কোথায় যান বলুন দিকি? ছুটি হলে বাড়ী ফিরবেন, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করবেন, তা না বাবুর আরো ঘণ্টা তিনেক হৈ রৈ করলে তবে বাড়ীর কথা মনে পড়ে।

রমেন আপত্তি জানিয়ে বলেছিল, কই না—আমি ত ছুটি হলেই সোজা চলে আসি।

সাবিত্রী ঠোঁট উল্টে বলল, হ্যাঁ গো মশায়, সোজা এসে আবার বেঁকে যান। তিন দিন দেখেছি আপনি বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে গেছেন কিন্তু বাড়ী ঢোকেন নি। আমি বুঝি কিছু জানতে পারিনা ভাবেন।

এমনি রমেনের সম্বন্ধে সাবিত্রীর ব্যগ্র উৎকণ্ঠা, সযত্ন সেবার সীমা নেই। রমেন দুপুরে অফিস চলে গেলে সে তার ঘরটি পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখে।

সত্যিই সাবিত্রীর মনে পরিবর্ত্তন এসেছে—নব বসন্তের উন্মাদনা। নিস্তব্ধ দুপুরে উন্মুক্ত বাতায়নের পাশে সে বসে থাকে। সম্মুখের আকাশে কি যেন একটি প্রগাঢ় সুনীল মায়া, অদূরে শিমুল গাছের চূড়াটি ফুলে ফুলে লাল হয়ে গেছে, বন্ধ্যা মাঠটি ভরে গেছে নবশ্যাম তৃণে, নগরীর কোলাহলের অস্পষ্ট সুরটি বিহ্বল বাতাসে মধুর হয়ে ভেসে আসে। সন্ধ্যায় কোথা হতে হাস্নুহানার সকরুণ সুমিষ্ট গন্ধটা এসে হাওয়ার সঙ্গে ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

সাবিত্রীর কাছে পৃথিবীর সব কিছু ভাল লাগে। তবু তার পরিতৃপ্তির মাঝখানে কোথায় যেন একটি অজানা অতৃপ্তির কাঁটা বিঁধে আছে; সে ক্ষত স্থানের নির্দ্দেশ সাবিত্রী জানেনা। শুধু মাঝে মাঝে কি এক অকারণ অশান্তির আশঙ্কা তাকে বিব্রত করে তোলে। মনে হয়, সে যেন নিজের কাছে প্রতিমুহূর্ত্তে কি একটি দুর্ব্বার অনুভূতিকে অস্বীকার করতে চায়।

ছুটির দিন। খাওয়া-দাওয়ার পর রমেন একটি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে ছিল; আর সাবিত্রী ছিল বসে রমেনের বিছানার ওপর। রমেনের শরীর বিশেষ ভাল ছিলনা।

সাবিত্রী বলছিল, অসুখের আর অপরাধ কি! সময়ে নাওয়া খাওয়া নেই, রোদে রোদে ঘোরায় আর রাত্রে সব ক'টা জানালা খুলে ঠাণ্ডা লাগালে কি শরীর ভাল থাকবার কথা। আপনি যেন এখনও কচি ছেলেটি আছেন।

তুমিই বা এমন কি বুড়ী হয়ে গেছ, শুনি,—রমেন হেসে বলল।

সাবিত্রী অনুযোগ করে বলল, সত্যি ঠাট্টা নয়, নিজের শরীরের ওপর অত্যাচার করলে কি পুরুষত্বের গৌরব কিছু বাড়ে! এবার থেকে কিন্তু আপনাকে আমার কড়া শাসনে থাকতে হবে।

রমেন বলল, কোন বা না আছি, তোমার অনুমতি ছাড়া কিছু করবার পথ তো আর রাখনি। সত্যি সাবিত্রী, স্নেহ মমতা মানুষকে কী রকম বন্দী করে রাখে তা' বলা চলেনা। অথচ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে একটু স্নেহ, একটু মমতা, অকপট প্রীতির যত্ন না পেলে চলেনা। কিন্তু মানুষের অসন্তোষের আর সীমা নেই। এই দেখ তোমাদের এখানে আমার কিছুরই অভাব নেই; তবু মাঝে মাঝে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় দরিদ্র বলে মনে হয়, তৃপ্তির শেষ খুঁজে পাইনা। মনে হয় দিনের প্রখর আলো আমাদের কাছে ম্লান, বিরক্তিকর, আকাশ সঙ্কীর্ণ বোবা, জ্যোৎস্না বিফল হয়ে গেছে; ধরিত্রীর অন্ধকার ঘরে স্বল্প বাতাসে আমরা বীভৎস ভাবে পড়ে আছি। এইজন্যেই বুঝি লোকে বিয়ে করে সুখী হবার চেষ্টা করে।

সাবিত্রী বলে বসল, আপনিও বিয়ে করুননা কেন।

রমেন ম্লান হাসির সঙ্গে বলল, সুখী হবার চেষ্টা করে বটে কিন্তু সুখী কেউই হয়না; সে সব দুদিনের স্বপ্ন। তা ছাড়া মেয়েই বা মনের মতন পাওয়া যায় কোথায়? সেবায়, শুশ্রূষায়, যত্নে, মমতায় যদি তোমার মত একটি মেয়ে পেতাম সাবিত্রী, তাহ'লে না হয় চেষ্টা করে দেখা যেত সুখী হতে পারি কি না।

লজ্জারক্ত মুখে সাবিত্রী বলল, কি যে বলেন আপনি

তার ঠিক নেই। মেয়েদের নিন্দে করতে পারলে আপনাদের বোধ হয় আর কিছু ভাল লাগেনা।

রোদ ফিকে হয়ে এসেছে, পড়ন্ত বেলা। রমেন অন্যমনস্ক ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে বললে, তা নয় সাবিত্রী। এই ত তুমি এত ভাল; কিন্তু তুমি কি সুখে আছ বলতে পার? আত্মীয়-স্বজন নেই, বিকলাঙ্গ স্বামী, তোমার সংসার কোনকালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কলরবে সজীব হয়ে উঠবেনা—এমনি ব্যর্থ শূন্য জীবন নিয়ে তোমায় বেঁচে থাকতে হবে; কে বা শুনবে তোমার বিলাপ, কে বা দেবে তোমায় সান্ত্বনা।

সাবিত্রী চমকে উঠল। রমেনের কথা যেন হঠাৎ তার চেতনার রুদ্ধ দুয়ারে করল প্রবল আঘাত। কি যেন সঙ্কোচ বোধ হতে লাগল, যার ফলে রমেনের সামনে বসে থাকা তার আর চললনা।

সন্ধ্যার সময় রমেন বেরিয়ে গেল; আর সাবিত্রী চলল তার অশরীরি স্বামীর ঘরে, যেখানে রমেনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হওয়ার পর হতে তার যাওয়া হয়নি। সাবিত্রী ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে গেল ভুলে, এতদিন না আসার অপরাধে যেন কুণ্ঠা-বিব্রত হয়ে সে চেয়ারের পাশে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

কিন্তু সাবিত্রীর আজ এ কি অধঃপতন হল! তার কল্পনায় তার পরিচিত ছায়ামূর্ত্তিটি এলনা যাকে নিয়ে এতদিন তার সময় কেটেছে, যে তার মনের স্বপ্ন-রচা স্বামী—সে ছায়া আড়াল করে দাঁড়াল রমেনের কায়ার ছায়া। বিস্ময়ে সাবিত্রী চারি পাশে তার অশরীরি স্বামীর অনুসন্ধান করতে লাগল কিন্তু সবখানেই রমেনের ছায়া—সাবিত্রীর চোখের সামনে কেবলি ভেসে উঠছে রমেনের শরীরের গঠন, তার চলার ভঙ্গী, হাসবার বিশিষ্ট ধরণ, কথা বলবার সময়ের অদ্ভুত মুখভাব।

নিজেকে এত ভাল করে জানার লজ্জায়, ঘৃণায় অনুশোচনায় সাবিত্রী বিছানায় মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল, কিন্তু ইতিমধ্যে কখন রমেন যে ফিরে এসে ঘরের ভেতর দাঁড়িয়েছে তার একান্ত নিকটে—তা' সে বুঝতে পারেনি। বুঝলে হয় তো সে নিজের দুর্ব্বলতা, ব্যাকুলতা সম্বরণ করবার চেষ্টা করত।

রমেন বিমূঢ়ভাবে বলল, এ কি সাবিত্রী, তুমি কাঁদছ!

সাবিত্রী চমকে উঠে মুখ তুলে চাইল; সে সজল-দৃষ্টিতে কিছুই অপ্রকাশ ছিলনা—তার অন্তরের নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব, ভাব ও ভাবনা সেখানে যেন আয়নার ছায়ার মত স্বচ্ছ—যা' বোঝাবার জন্যে ভাবার কোন প্রয়োজন ছিলনা, হয় তো তা' কথায় পরিস্ফুট করে বলাও যেতনা।

অনেক বেলা অবধি সাবিত্রীর কোন সাড়া পাওয়া গেলনা। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, বৃষ্টি আসার হয় তো আর বেশী দেরী নেই। রবিবার সুতরাং রমেনের আজ অফিস যেতে হবেনা। সমস্ত বাড়ীটির অখণ্ড স্তব্ধতায় রমেনের মনে হ'তে লাগল, কে বুঝি এখানে আত্মহত্যা করেছে—সাবিত্রীর মৃত্যু হয়েছে কি না কে জানে!

কিন্তু একটু পরেই সাবিত্রী এসে রমেনের ঘরে ঢুকল,—রাত্রি জাগরণে অশ্রান্ত কান্নায় বিবর্ণ কৃশ শরীর,—তার চোখের দিকে চাইলে মায়া হয়। ঘরে ঢুকে রমেনের দিকে না চেয়ে সে বললে, আপনাকে আজই এখান থেকে চলে যেতে হবে।

রমেনের নিকট হতে উত্তর এল, তা জানি, তুমি না বললেও আমাকে নিজে হতে যেতেই হ'ত।

একটুখানি নীরব থাকবার পর সাবিত্রী তেমনি মাটির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, কখন যাবেন?

—এক ঘণ্টার মধ্যেই—জিনিষপত্র গোছ-গাছ করে নিয়েই।

বেশ। বলে সাবিত্রী ঘর হ'তে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রমেন তার জিনিষ-পত্র গুছিয়ে একটি রিক্স ডেকে নিয়ে এল। বাইরে তখন ঝড়-বৃষ্টির ঝগড়া লেগে গেছে। ঘরে ঢুকেই রমেন দেখে সাবিত্রী দাঁড়িয়ে আছে। তার ঘর আর সাবিত্রীর অশরীরি স্বামীর ঘরের মাঝখানের বন্ধ দরজাটি খোলা। সাবিত্রী রমেনের কাছে এসে মিনতি-কাতর কণ্ঠে বলল, আপনি যাবেন-না, থাকুন।

রমেন বলল, আবার কি ছেলেমানুষী করছ। নিজের ওপর তোমার বিশ্বাস নেই, আর আমার পক্ষেও প্রলোভনে দুর্ব্বলচিত্ত হয়ে পড়াও কিছু বিচিত্র নয়! তার চেয়ে আমার চলে যাওয়াই ভাল। ছায়ার প্রেম হতে তোমার মুক্তিতে আমি সুখীই হয়েছি। যেখানেই থাকি, যতদিন বাঁচব, তোমায় ভুলব না, প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার মঙ্গল কামনা করব।

রমেন তার জিনিষপত্র নিয়ে নীচে নেমে গেল, আর সাবিত্রী গিয়ে দাঁড়াল জানালার কাছে। অশ্রান্ত বৃষ্টি-ধারায় পথের বেশী দূর দেখা যায় না। যতক্ষণ রিক্সটি দেখা যায়, সাবিত্রী এক দৃষ্টিতে রইল চেয়ে। ক্রমশঃ রিক্সওলার ঘণ্টার ক্ষীণ শব্দটিও উন্মত্ত বৃষ্টি-বর্ষার শব্দের ক্রুদ্ধ হাওয়ার, চকিত বিদ্যুতের গর্জ্জনের মাঝখানে মিলিয়ে গেল।

সাবিত্রী রমেনের শূন্য ঘরে জানালার পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে স্পন্দহীন হয়ে বসে রইল। মাঝখানের খোলা দরজা দিয়ে পাশের সাজানো ঘরটি চোখে পড়ে। হাওয়ার দৌরাত্ম্যে ঘরের সাজ-সজ্জা সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। সাবিত্রীর চোখে না ছিল অশ্রু, না ছিল ব্যর্থ-কাতরতা—সে দৃষ্টি যেন পাষাণমূর্ত্তির উদ্দেশ্যহীন অপলক শূন্য দৃষ্টি।

"পাগলামী—তুই আয় রে দুয়ার ভেদি"

শ্রীপ্রণবচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম্‌-এ, বি-এল্, বি এণ্ড ও সি-এস্

(১)

অপরাধ-নিদানের সঙ্গে পাগলামীর এত নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে যে, এ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে পরে মনে হয় যে, আমাদের কারাগৃহগুলি মনুষ্যত্বকে আরো ঘৃণ্য ও অসামাজিক করিয়া তুলিতেছে। খাঁটি পাগল যারা, তারা যখন অপরাধ করে, তাহাদের মনোজগৎকে বিশ্লেষণ করিলে মনে হইবে যে, তাহাদের অপরাধের জন্য দায়ী বেশী আমরা, তাহারা নহে। অপরাধীর অপরাধকে কার্য্য-পরম্পরা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে চলিবে না। প্রত্যেক অপরাধের পশ্চাতে সহস্র চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত, সহস্র প্রেরণার সংঘর্ষণ রহিয়াছে। অপরাধ করাটাই অস্বাভাবিক—সামাজিক মানুষ যখন অপরাধ করে,—অপরের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া লয়, বা কাহাকেও হত্যা করে তখন তাহার কার্য্যসূত্র বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, পাগলামী ছাড়া আর কোন প্রবৃত্তি মানবকে সমাজের চক্ষে, রাজদ্বারে অপরাধী করিতে পারে না। কাহারও কাহারও মতে, অন্ততঃ চিত্তভ্রান্তি না ঘটিলে, মানুষ হত্যা বা তদনুরূপ কোন গুরু অপরাধ করিতে পারে না। আবার অন্য দিকে ভাবিতে গেলে, অনাহারে ক্লিষ্টা রমণী যখন দেহ বিক্রয় করে, দারুণ মনঃকষ্টে পিতা যখন পুত্রের মরণ ঘটায়, মানুষ যখন আত্মহত্যা করে—তখন কি বলিব তাহার পাগলামী ঘটিয়াছিল?

অপরাধ-নিদানের মূল কথাগুলি কি? জন্ম-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই বাঁচিবার, নিজেকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা সকলেই করিতেছে। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতা সকলেই পৃথিবীর বক্ষে নিজের স্থান সংরক্ষণ করিতে ব্যস্ত,—মানব-সমাজেও অহরহ সেই অনন্ত সংগ্রাম চলিতেছে। পুষ্প যখন মধুমক্ষিকাকে আকর্ষণ করে, শীর্ণা লতাটি যখন কোন বৃক্ষকে অবলম্বন করে, প্রাণভয়ে সর্প যখন মানুষকে দংশন করে, তখন তাহাদের মধ্যে সেই সংগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। বাঁচিবার নানা উপায়ের মধ্যে সমাজবদ্ধভাবে জীবন-যাপন অতি সুন্দর পন্থা। নিজের রক্ষা, গোষ্ঠির রক্ষাতেই সামাজিকতার উদ্ভব। জীবজগতে মানবের স্থান সর্ব্বোচ্চ; কারণ, মানুষ সম্পূর্ণভাবে সমাজবদ্ধ। সামাজিকতার সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যতার প্রারম্ভ। সমাজবদ্ধ মানবকে নিজের, পরিবারের প্রয়োজনের অল্প কার্য্যই স্বহস্তে করিতে হয়। একই লোককে যদি খাদ্য সংগ্রহ ও যুদ্ধ করিতে হইত, তবে সমাজের উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।

সমাজেই অপরাধ জন্মিতে পারে। গহন বনে একাকী যে তপস্বী বাস করে, বনের স্বচ্ছন্দজাত শাকমূল যাহার আহার, ঝরণার জলে যাহার স্নান, বৃক্ষচ্ছায়ায় যাহার কুটীর—সে কখনো, আমরা যাহাকে অপরাধ বলি, করিতে পারে না। অপরাধ-চিন্তার প্রারম্ভে দেখিতে হইবে—অপরাধের উৎপত্তি যেখানে সম্ভব, সেই সমাজের প্রকৃতি কি। সমাজ-প্রকৃতিতে তিনটি বিশিষ্টতা দেখিতে পাওয়া যায়—প্রজনন, আত্মরক্ষা এবং সামাজিকতার জন্য আত্মদমন। যদিও আত্মরক্ষার উৎপত্তি প্রজননে, তথাপি প্রজনন এবং আত্ম-রক্ষার মধ্যে বিরোধ হইতে পারে। বিপদে পড়িলে সন্তানের যাহাতে অনিষ্ট না হয় সে জন্য মাতা নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিবেন। যদিও মানব-সমাজে কোন-কোন জাতীয় উর্ণনাভের মত যৌন ক্রিয়া সম্পন্নের সঙ্গে সঙ্গে নারী নরকে হত্যা করে না, তথাপি সন্তান পালনে পিতামাতার ক্ষতি ও কষ্ট আছে সন্দেহ নাই। যদিও তৃতীয় মূল সূত্রটি প্রথম দুইটির বিরুদ্ধবাদী, তথাপি ইহাদের প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য একই। সমাজবদ্ধ মানব নিজের চিত্ত-ক্ষুধা কখনই সম্পূর্ণ ভাবে মিটাইতে পারিবে না। আমার অধিকার অপরের অধিকার দ্বারাই নির্ণীত হয়। আমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিব না, যাহা ইচ্ছা লইতে পারিব না, যাহা ইচ্ছা করিতে পারিব না—এই বিচিত্র নেতিবাদ আমাদের জীবনের অতি বড় সত্য এবং সমাজ-প্রাণকে সতেজ রাখিয়াছে। ইহা ব্যতীত সমাজ সুসংবদ্ধ কখনই থাকিতে পারিত না।

আমি যে শুধু নিজের চিত্ত-ক্ষুধা মিটাইতে পারিব না—তাহা নহে, অপরের প্রয়োজন হইলে আমার নিজস্ব যাহা তাহা হইতেও কিছু ত্যাগ করিতে হইবে। এই চিন্তা আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা রহিয়াছে—তাই জলমগ্ন মানুষকে বাঁচাইতে নদীতে লাফ দিয়া পড়ি—যুদ্ধ বাধিলে সমর-প্রাঙ্গণে যাইতে কুণ্ঠিত হই না। গোষ্ঠির কাছে সমাজের জন্ত আমার নিজস্ব কিছু বিসর্জ্জন দিতে পারি,—এই প্রবৃত্তি প্রজনন ও আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির অপেক্ষা উচ্চতর। ব্যক্তিগত জীবনের চেয়েও বড় জীবন সমাজ-প্রাণ, ব্যক্তিগত মনের চেয়েও উচ্চতর সঙ্ঘ-মন।

সমাজের ভিত্তি পরিবার। সামাজিক জীবন এই পারিবারিক জীবনের পরিণতি মাত্র। যে সকল প্রেরণায় পারিবারিক জীবন অনুপ্রাণিত—সামাজিক জীবনেও সেই সকল প্রেরণা রহিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরানুরাগ অপরে সহ্য করিতে পারে না—সে ভাব অহেতুকী নহে। স্বামী-স্ত্রীর অনুরাগ পরিবারের ভিত্তি; তাহা শিথিল হইলে পরিবারের স্বরূপ নষ্ট হয়। আবার সেই মন্দাকিনী-ধারা কলুষিত হইলে সমস্ত সমাজ অপবিত্র হইবে এবং সমাজের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইবে। পিতামাতার ভালবাসার আর এক বিকাশ পুত্র স্নেহে। অথচ এই স্নেহ কলুষিতও হইতে পারে। দেশে যদি যুদ্ধ হইল ও আমি সন্তানকে সমর-ক্ষেত্রে না পাঠাইবার জন্ত তাহার বয়স কমাইয়া দিলাম, তাহা হইলে আমার কার্য্যকে প্রশংসা করা চলে না।—আমার আজ যে সন্তান শিশু রহিয়াছে, কাল সে বড় হইয়া সমাজে অপর দশজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবে। আমি যদি তাহাকে আজ অতিরিক্ত আদর দিয়া আর পাঁচজনের সঙ্গে মিশিতে একেবারে মানা করি—তবে তাহার পরিণাম কতদূর ভাল হইবে তাহা চিন্তনীয়। মানব-প্রকৃতির ক্রমবিকাশে সমাজের জন্ত স্বার্থ-বিসর্জ্জন সব চেয়ে বড় ব্যাপার—শিশু-জীবন হইতেই পিতামাতাকে সেই সঙ্ঘমনের দাবী মনে রাখিতে হইবে।

আমরা সংক্ষেপে সামাজিকতার মূল সূত্রগুলি দেখিলাম—কিন্তু মানুষ সর্ব্বদা সামাজিকতায় অনুপ্রাণিত থাকে না। মানব-চিত্তের এই দুর্ব্বলতার জন্তই রাজদ্বারে বিচারের প্রয়োজন ও দণ্ডবিধির সৃষ্টি। সমাজের বাঁধন যাহাতে শিথিল না হয় সেই জন্তই আইনকানুনের সৃষ্টি। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, গোষ্ঠির বিকাশ, যতই উন্নত হইতে থাকিবে, দণ্ডবিধির প্রয়োজন ততই কমিতে থাকিবে—এইরূপ আশা করা যায়। সভ্যতার স্তরে স্তরে এক এক প্রকার দণ্ডবিধির প্রয়োজন। আজ আমরা মাতৃহত্যা পাপ মনে করি, দণ্ডনীয় মনে করি—কিন্তু আদিম মানবসমাজে বৃদ্ধা ও অকর্ম্মণ্যা মাতাকে হত্যা করা পাপ বা অন্যায় কেহ মনে করিত না। এখনো ছোটনাগপুরে উরাঁও মুণ্ডাগণ মড়ক উপস্থিত হইলে নির্ব্বিকারচিত্তে কোন বৃদ্ধা রমণীকে "ডাইন বিশাইন" স্থির করিয়া হত্যা করে।

আমাদের মনের রাজ্যে সামাজিকতা ও অসামাজিকতার দ্বন্দ্ব সর্ব্বদাই চলিতেছে। আমরা সকলেই চুরী-ডাকাতী করি না, তাহার কারণ, আমরা সমাজ-বাঁধন শিথিল করিতে বা শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত নহি। কিন্তু শুধু শাস্তির ভয়ে যদি আমি অপরাধ না করি, তবে আমি কখন অপরাধ করিব না, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। শুধু শাস্তির ভয় সম্ভবতঃ সামাজিক প্রেরণার অভাবকে মিটাইতে পারিবে না। আমাকে মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, প্রত্যেক নর-নারীর সুখ-দুঃখের সহিত আমার সুখ-দুঃখ বিজড়িত রহিয়াছে। যদি আমি কোন অপরাধ করিলাম তবে সম্ভবতঃ (১) আমার সামাজিক প্রেরণা যথেষ্টভাবে বর্দ্ধিত হয় নাই বা (২) আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে আমার কৃত কর্ম্ম অন্যায়। যদি সামাজিক-বোধের অভাবের জন্ত আমি পরের অর্থ লুণ্ঠন করি বা অপরের গৃহে অগ্নি প্রদান করি, তবে আমি রাজদ্বারে দোষী হইব। কিন্তু আমি যদি আমার কৃত কর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে না পারি—এবং না পারিয়া অন্যায় করি, তবে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক হইবে কি? আমার মধ্যে হয় ত সামাজিক প্রেরণা যথেষ্ট নাই, আত্মগত প্রবৃত্তি যথেষ্ট আছে ও শাস্তির ভয় একেবারে নাই। সত্য বলিতে গেলে, এই তিনের যোগাযোগে সমাজ চলিতেছে। একের অভাব বা অপরের প্রাদুর্ভাব ঘটিলেই মানুষ দোষ করে বা অপরাধ বলিতে যাহা বুঝি তাহা করে। অপরাধ করিয়া যখন কেহ রাজদ্বারে বিচারের জন্ত আসে, তখন তাহার কৃত কর্ম্মের পশ্চাতে কত সহস্র ভাবনা ও কার্য্য-পরম্পরা রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। মানব-চিত্তে কর্ত্তব্যবোধ স্বতঃই রহিয়াছে—কিন্তু

তাহার বিকাশ বহু ঘটনাসাপেক্ষ। প্রত্যেক মানুষের জীবন-বৈচিত্র্য আছে। আমার পিতার জীবন-বৈচিত্র্য আমার মধ্যে থাকিবেই, এমন কথা বলা যায় না। আমার বন্ধুর জীবন-বৈচিত্র্য ও আমার জীবন-বিশিষ্টতা এক কখন হইবে না। প্রত্যেকের জীবন যেন আলাদা-আলাদা ছাঁচে ঢালা। এই যে ছাঁচ, এই যে জীবন-দেবতার বিকাশ ইহা কোন্ সময় গড়িয়া ওঠে? শৈশবেই কি ইহার চরম বিকাশ ঘটে? পারিপার্শ্বিকের প্রভাব কি মৃত্যু পর্য্যন্ত মানবের উপর থাকে? করিবার শক্তি ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব এই উভয়ের যোগাযোগে বোধ হয় কোন কর্ম্ম ঘটিতে পারে। ইহার একের ব্যতীত শুধু অন্য দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া মনে হয় না। সম্পূর্ণ হঠাৎ কোন কার্য্য হয় কি না সন্দেহ। মৃত্যুর পরপারের বার্ত্তা আমরা পাই না—পাইলে বোধ হয় ইহার ধ্রুব সমাধান পাইতাম। মানুষ যখন আত্মহত্যা করে—আমরা বলিয়া থাকি হঠাৎ এমন করিল;—রাজার বিচারে সাব্যস্ত হয় যে সেই সময় মাথার ঠিক না থাকায় আত্মহত্যা করিয়াছে। যিনি আত্মহত্যা করিয়া পরলোকে গিয়াছেন শুধু তিনিই বলিতে পারেন যে তাঁহার এই কৃত কর্ম্মের পশ্চাতেও বহুদিনব্যাপী চিন্তার সংঘাত ছিল কি না।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পরেই মানব-শিশু অঙ্গ-সঞ্চালনের চেষ্টা করে। তাহা কি হঠাৎ সম্ভব হইতে পারে? মাতৃগর্ভে তাহার এই সঞ্চালনের উৎপত্তি—পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তাহার বিকাশ। আমি লিখিতেছি—ইহা শুধু হস্তের ব্যাপার নহে। পত্নীহত্যা করিয়া যে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইল, তাহার সেই ভয়াবহ কার্য্যকে বিশ্লেষণ করিলে জানা যাইবে, তাহা হঠাৎ সম্ভব হয় নাই। সাময়িক উত্তেজনা নাই এ কথা বলি না—কিন্তু প্রায়ই এই স্থূলত কারণটি বিশ্লেষণ করিলে দুর্লভ হইয়া উঠিবে। আমার পিতার শিক্ষার দোষে আমার কর্ত্তব্যবোধ বিকসিত হয় নাই, সমাজ-দেবতা আমাকে শুধুই নিপীড়ন করিয়াছে—সেই আমি যদি কোন অপরাধ করি তাহার জন্য কি শুধু আমিই দায়ী? আত্মগত বিরোধের জন্য আমি আমার শত্রুকে বিনাশ করিলে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইব, কিন্তু দেশগত বিরোধে বহু শত্রুর বিনাশ করিলে রাজদ্বারে বিশেষ সম্মান লাভ করিব। আমার চক্ষে যে মাননীয় গাজী, অপরের চক্ষে সে হত্যাকারী মাত্র। নারীকে পীড়ন করিয়াছিল বলিয়া যে যুবক অত্যাচারীর প্রাণবধ করেন তিনি রাজদ্বারে দণ্ডিত হইলেন বটে, কিন্তু সমাজ-দেবতা তাঁহাকে বরমাল্যে অলঙ্ক্যে বিভূষিত করিয়া দিল।

আবার মানুষ যেমন নিজের চিন্তায় মগ্ন হইয়া অপরাধ করে, সেইরূপ খাঁটি কর্ত্তব্যবোধেও অপরাধ করিতে পারে। সে কর্ত্তব্যবোধে হয়ত ভ্রান্তি থাকিতে পারে—কিন্তু সে লোক জানে সে তাহার কর্ত্তব্য করিতেছে। সম্প্রতি লাহোরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় পড়িলাম। গত ১৩ই এপ্রিলের কাগজে পড়িলাম যে লাহোরের এক লোক তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে, কারণ, তাহার স্ত্রী বারংবার পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হইত; এবং সে স্ত্রীই তাহার স্বামীকে বলে যে তাহার পক্ষে সৎপথে থাকা অসম্ভব এবং নিজেকে বিনাশ করিতে অনুরোধ করিতে পারে। ঘটনাটি সত্য না হইবার কোন কারণ নাই। এ ক্ষেত্রে ঐ স্বামীটিই তাহার স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ ও অনুকম্পাবশতঃই এই কার্য্য করিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কখন কখন আত্মর পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টাতেও কেহ কেহ অপরাধ করেন, সমাজ-চক্ষে দোষী হন। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের সময় উদ্‌যোক্তাগণ সমাজ-চক্ষে অপরাধী বিবেচিত হইয়াছিলেন। সেইরূপ, অনেক সময় সাময়িক প্রভাবের গণ্ডী ছাড়াইতে গিয়া অনেকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবেন।

কখন কখন দেখা যায়—কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য না থাকিলেও মানুষ অপরাধ করে। শুধু অপরাধ সংঘটনেই যেখানে পরিণতি, প্রায়ই চিত্ত-বৈকল্য বা পাগলামী তাহার কারণ। কিন্তু চিত্ত-বিকার মাত্রই পাগলামী নহে। কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু চিত্ত-বিকারকেই পাগলামী বলা মহা ভুল। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে আমার প্রত্যেক কার্য্যের একটি স্বতন্ত্র ক্রম বা ধারা স্থির করিয়া লই এবং সেই ক্রমের গতানুগতিক ধারায় না চলিলেই আমরা কার্য্য-প্রেরণায় সন্দিহান হইয়া পড়ি। অথচ এই কার্য্যের ক্রম কখনই এক থাকিতে পারে না। আমার পিতামহের সময় বহুবিবাহই কুলীন ব্রাহ্মণকুলে প্রথা ছিল, এখন সে প্রথা নাই।

কেহ কেহ ভাবেন, পাগলামীর প্রধান বিশিষ্টতা মস্তিষ্কের গোলমালেই দেখা যায়—এ মতও ভ্রান্ত মনে হয়। "পাগল কি করে হবে—ওর মাথা ঠিক আছে ত" এ কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা সকল কার্য্যেই সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করেন—কিন্তু কোন ক্রমেই একাকী কোন স্থানে থাকিতে পারেন না। না থাকিতে পারা যে হাস্যকর বা শিশুসুলভ, এ কথা তাঁহারাও জানেন; অথচ কোন ক্রমেই মনকে দূর করিতে পারেন না। যেখানে আমি নিজেই বুঝিতেছি যে আমার এ মত ভ্রান্ত, সেখানে আমাকে পাগল স্থির করা কি ঠিক হইবে? মনের মধ্যে ও কার্য্যের মধ্যে দুইটির মধ্যেই যখন গোলমাল পাওয়া যায়, তখন হয় ত উদ্‌ভ্রান্ত স্থির করা যাইতে পারে। মনের প্রধান কার্য্য ধারণা করা ও নির্ব্বাচন-ক্ষমতা। নির্ব্বাচনের ক্ষমতা যেখানে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সে ক্ষেত্রে পাগলামী বলা চলে না। আমি কলিকাতা হইতে কটক পদব্রজে যাইব। কটক কলিকাতার দক্ষিণে, অথচ আমি কটক পৌঁছিবার ইচ্ছায় যদি পূর্ব্বে হাঁটিতে থাকি, তবে আমার উদ্দেশ্য কখন সফল হইবে না। এ ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য স্থির আছে—অথচ সে উদ্দেশ্য সাধনে এমন একটি উপায় অবলম্বন করিলাম, যাহাতে সে উদ্দেশ্য সাধনে শুধু বাধা পড়িতে পারে তাহা নয়, বরং সে উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হইবে না। এখানে আমার নির্ব্বাচন-ক্ষমতা একেবারেই নাই—এখানে পাগলামী বলা চলিতে পারে। কিন্তু বলা সম্পূর্ণতঃ ঠিক হইবে যদি আমাকে কেহ বুঝাইয়া দিলেও আমি আমার ভুল না বুঝি। যে কার্য্য করিতেছি তাহার স্বরূপ না বুঝিতে পারাই পাগলামীর পরিচয়। রাঁচীর মানসিক চিকিৎসালয়ে আমার সহস্র সহস্র উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত মানবের সহিত পরিচয় করার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার বিশেষ প্রীতি পর্য্যন্ত জন্মিয়াছিল। কিন্তু "আমি পাগল" এ চিন্তা আমি কাহারও মধ্যে পরিষ্কাররূপে পাই নাই। সেই সহস্র সহস্র নরনারীর ঐক্য বোধ হয় এইখানে। আমার মনের কাঠি বিগড়াইয়াছে এ চিন্তা একেবারে বিলুপ্ত না হইলে কেহ প্রকৃত পাগল হইয়া যায় বলিয়া আমার মনে হয় না। রাঁচীতে আমি বিশেষ করিয়া হত্যাপরাধে দণ্ডিত পাগলদের সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু আমার সে চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই। তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেককে যেন বিষাদমণ্ডিত মনে হইত—যেন তাঁহারা কি-যেন চিন্তাভাবে ক্লিষ্ট। তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে পাগল হইয়াছেন কি না বলা আমার ধৃষ্টতা হইবে—তবে তাঁহাদের দেখিলেই মনে হইত যেন তাঁহারা সেখানকার অন্য সকলের মধ্যে স্বতন্ত্র।

আকাঙ্ক্ষা যদি উচিত গণ্ডীর মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে অনেক সময় চিত্ত-বিকৃতি হইয়াছে ভাবিয়া লইতে হইবে। আগুন দেখিতে ভাল লাগে—বাজী পুড়িলে আনন্দ লাভ করি; কিন্তু সেই আগুনকে খুব মজা করিয়া দেখিবার জন্য যদি কাহারও গৃহে অগ্নি প্রদান করি, তবে সে আকাঙ্ক্ষার পরিণতি বিকৃতভাবে হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। কাঁচ ভাঙ্গিলে যে ঠুং করিয়া আওয়াজ হয় তাহা বড় মিষ্ট লাগিতে পারে—তবে সেই মিষ্ট আওয়াজ গভীরভাবে পাইবার জন্য যদি বাড়ীর সমস্ত কাঁচের বাসন ভাঙ্গিয়া ফেলি, তবে আমার চিত্ত স্থির আছে কি না সন্দেহ করা যাইতে পারে। কাহারও কাহারও চৌর্য্য-বৃত্তি বড় অদ্ভুত-প্রকৃতির হয় দেখা যায়। আমার এক বন্ধু আছেন তিনি কাহারও বহি পড়িতে লইলে কখন নিজের ইচ্ছায় ফেরত দেন ত নাই—উপরন্তু লুকাইয়া রাখিয়া বলিয়া দেন যে চুরি গিয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে। কটকে এক বৃদ্ধ আছে—সে বাগানের ফুল চুরি করিয়া বেড়ায়। সে কখন বলিয়া বাগানের ফুল লইবে না—সর্ব্বদা গোপনে ফুল চুরি করিবে এবং সেই ফুল পরদিন সকালে লোকের বাড়ীতে বিতরণ করিবে। কেবল জুতা চুরি করিয়া বেড়ায় এমন এক চোরের সঙ্গে আমার একবার কার্য্যসূত্রে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রাঁচীতে মানসিক চিকিৎসালয়ে একজন আছেন, তিনি কাগজ পাইলেই তাহা তুলিয়া রাখেন এবং টুকরা টুকরা করিয়া বাঁধিয়া রাখেন। তাঁহার বিশ্বাস প্রত্যেকটি কাগজের টুকরা এক একটি নোট। তিনি অতি সংগোপনে আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার সঙ্গের অন্যান্য সকলে তাঁহার নোট চুরি করিতে উৎসুক—সেই জন্য তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টাই জাগিয়া থাকিতে হয়। অথচ তাঁহার নিদ্রা সাধারণ লোকের ন্যায় হয় সংবাদ লইয়াছিলাম। কবিতা লিখিবার আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত এক মুসলমানের

সহিত আমার বিশেষ প্রীতি হইয়াছিল। তিনি কবিতা লিখিতেন ও কবিতা বুঝাইবার জন্ত ছবি আঁকিতেন। কবিতা ও ছবির আরম্ভ সাধারণ ভাবেই হইয়াছে দেখিতাম—কিন্তু শেষ অতি অদ্ভুত। কবিতার শেষের দিকে কতকগুলি অর্থহীন বাক্য থাকিত এবং শেষ কয়েকটি চিত্র শুধুই রেখাসমষ্টি মাত্র। অথচ তাঁহার কবিতা বুঝিতে পারিতেছি না, এ কথা বলিলেই তিনি অতি ক্রুদ্ধ হইতেন। এই মুসলমান কবির সহিত প্রথম আলাপ হইবার পর আমার সত্যসত্যই মনে হইত, ইঁহাকে পাগলা-গারদে কেন রাখা হইয়াছে! পরে বুঝিলাম এই কবিতা রচনাই তাঁহার পাগলামীর কারণ। যে লোক নিজের জন্ত টাকা চুরি করে সে সাধারণ চোর—কিন্তু যে লোক টাকা চুরি করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দেয় বা অন্তকে দিয়া দেয় তাহাকে কি সাধারণ চোর বলা যাইবে?

কর্ত্তব্য-বোধের বিকৃতি ঘটিলেই কাহাকেও পাগল বলা উচিত নহে। মানসিক বিকারেই কি কর্ত্তব্য-বোধের বিকৃতি? মানসিক বিকার মাত্রই ত পাগলামী নহে। মানসিক সুস্থতা ও বিকারের সীমা আবিষ্কার করা অত্যন্ত দুরূহ। জন্মাবধি যদি কোন শিশুর হাতে সাতটি আঙ্গুল থাকে বা একটি পা বাঁকা থাকে তবে কি তাহাকে কেহ দোষ দিবে? যে কারণেই হোক জন্মাবধি যদি কোন লোকের কর্ত্তব্য-বোধ বিকৃত থাকে তবে কাহার দোষ? শিশুর জন্মের পূর্ব্বেই তাহার জন্ম-পত্রিকার আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর প্রথম জীবনে সে যে শিক্ষা লাভ করে—যে শিক্ষা তাহাকে দেওয়া হয়, তাহার উপর তাহার উত্তর-জীবনের ফলাফল নির্ভর করে। কর্ত্তব্য-বোধ শিক্ষা-সাপেক্ষ নহে, এ কথা কখনই বলিতে পারা যায় না। বুদ্ধির বিকার-জনিত আমার যদি কর্ত্তব্য-বোধ না থাকে এবং সেই জন্ত যদি আমি কোন অপরাধ করি, তবে আমাকে সাধারণ অপরাধীর শ্রেণীতে বিচার করিলে ন্তায় হইবে মনে হয় না। ছোটনাগপুর অঞ্চলে গ্রামে অসুখ-বিসুখ হইলে কোন বৃদ্ধাকে "ডাইন-বিশাইন" স্থির করিয়া হত্যা করা এখনো খুবই সাধারণ কার্য্য। আবার কেহ কেহ কার্য্যের প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেও পরিণাম বুঝিতে পারে না। এক পাগলের কথা শোনা গিয়াছিল—সে সব নিদ্রিত ব্যক্তির মাথাটা কাটিয়া ফেলিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছিল। নিদ্রা-ভঙ্গের পর নিদ্রিত ব্যক্তি নিজের মাথা খুঁজিয়া পাইবে না সহজে এই কথা ভাবিয়া তাহার বড় আনন্দ। এক ডাক্তারের ঔষধালয় হইতে যে কেহ ঔষধ লইত তাহার দাস্ত হইত। পরে জানা গেল ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার প্রত্যেক ঔষধের সহিত জোলাপ মিশাইয়া দিত। ইহাও পাগলামী, ইহাও অন্তায়। কিন্তু সাধারণ অপরাধীর শ্রেণীতে এই কম্পাউণ্ডারকে বিচার করা ন্তায়সঙ্গত হইবে কি না বিচার্য্য।*

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় এই বহিগুলি হইতে সাহায্য পাইয়াছি—

Genius and Criminal H. T. F. Rhodes (John Murray).

Crime and Insanity C. A. Mercier (W. F. Norgate).

The Diagnosis of Mental Deficiency—H. Herd (Hodder and Stonghton).

Emotion and Insanity—S. Thalbitzer (Kegan Paul).



শেষের পরিচয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৪)

নতুন-মা ডাকেন নাই, রাখাল নিজে যাচিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে চলিয়াছে।

তখনকার দিনে রমণীবাবু রাখালরাজকে ভালো করিয়াই চিনিতেন। তাহার পরে দীর্ঘ তেরো বৎসর গত হইয়াছে, এবং উভয় পক্ষেই পরিবর্তন ঘটিয়াছে বিস্তর কিন্তু তাহাকে না-চিনিবারও হেতু নাই; অন্ততঃ, সেই সম্ভাবনাই সমধিক।

গাড়ীর মধ্যে বসিয়া রাখাল ভাবিতে লাগিল হয়ত তিনি দোকানে যান নাই, হয়ত, ফিরিয়া আসিয়াছেন, হয়ত বাড়ীতে না-থাকার অপরাধে তাহারি সম্মুখে নতুন-মাকে অপমানের একশেষ করিয়া বসিবেন;—তখন, লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাঁই থাকিবেনা,—এইরূপ নানা চিন্তায় সে নতুন-মার পাশে বসিয়াও অস্থির হইয়া উঠিল। স্পষ্ট দেখিতে লাগিল তাহার এই অভাবিত আবির্ভাবে রমণীবাবুর ঘোরতর সন্দেহ জাগিবে এবং রেণুর বিবাহ ব্যাপারটা যদি নতুন-মা গোপনে রাখিবার সঙ্কল্পই করিয়া থাকেন ত তাহা নিঃসন্দেহ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, সত্য ও মিথ্যা অভিযোগের নিরসনে আসল কথাটা তাঁহাকে অবশেষে প্রকাশ করিতেই হইবে।

সেই অভদ্র চাকরটা ড্রাইভারের পাশে বসিয়াছিল; মনিবের ভয়ে তাহার ভাগিদের উদ্‌ভ্রান্ত রুক্ষতা ও প্রত্যুত্তরে নতুন-মার বেদনা-ক্ষুব্ধ লজ্জিত কথাগুলি রাখালের মনে পড়িল, এবং সেই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি স্বয়ং মনিবের মুখ হইতে এখন কি আকার ধারণ করিবে ভাবিয়া অতিষ্ঠ হইয়া কহিল, নতুন-মা, গাড়ীটা থামাতে বলুন আমি নেবে যাই।

নতুন-মা বিস্ময়াপন্ন হইলেন,—কেন বাবা, কোথাও কি খুব জরুরি কাজ আছে?

রাখাল বলিল, না, কাজ তেমন নেই,—কিন্তু আমি বলি আজ থাক্।

কিন্তু মেয়েটাকে যদি বাঁচানো যায় সে তো আজই দরকার রাজু। অন্যদিনে তো হবেনা।

বলা কঠিন। রাখাল সঙ্কোচ ও কুণ্ঠায় বিপন্ন হইয়া উঠিল, শেষে মৃদু-কণ্ঠে বলিল, মা, আমি ভাবচি পাছে রমণীবাবু কিছু মনে করেন।

শুনিয়া নতুন-মা হাসিলেন, ওঃ—তাই বটে। কিন্তু, কে-একটা-লোক কি-একটা মনে করবে বলে মেয়েটা মারা যাবে বাবা? বড় হয়ে তোমার বুঝি এই বুদ্ধি হয়েছে! তাছাড়া শুন্‌লে তো তিনি বাড়ী নেই, পুলিশ-হাঙ্গামার ভয়ে পালিয়েছেন। হয়ত, দু-তিন দিন আর এ-মুখো হবেননা।

রাখাল আশ্বস্ত হইলনা। ঠিক বিশ্বাস করিতেও পারিলনা, প্রতিবাদও করিলনা। ইতিমধ্যে গাড়ী আসিয়া দ্বারে পৌঁছিল। দেখিল তাহার অনুমানই সত্য। এক-জন প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক উপরের বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দ্রুতপদে নামিয়া আসিলেন। রাখাল মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তাঁহার চোখে-মুখে-কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ পরিপূর্ণ, কহিলেন, এলে? শুনেচো তো জীবনের স্ত্রী কি সর্ব্বনাশ—

কথাটা সম্পূর্ণ হইলনা, সহসা রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই থামিয়া গেলেন। নতুন-মা বলিলেন, রাজুকে চিন্‌তে পারলেনা?

তিনি একমুহূর্ত ঠাহর করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওঃ—রাজু। আমাদের রাখাল। বেশ,—চিন্‌তে পারবোনা? নিশ্চয়।

রাখাল পূর্ব্বেকার প্রথা মতো হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। রমণীবাবু তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এতকাল একবার দেখা দিতে নেই হে! বেশ যা হোক সব। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ করলে মেয়েটা। পুলিশে এবার বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে হয়রান করে মারবে। দুশ্চিন্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বার বার তোমাকে বলি নতুন-বৌ, যাকে-তাকে ভাড়াটে রেখোনা। লোকে বলে শূন্য গোয়াল ভালো। নাও, এবার সামলাও। একটা কথা যদি কখনো আমার শুন্‌লে!

রাখাল কহিল, এঁকে হাঁসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেননি কেন?

হাঁসপাতালে? বেশ! তখন কি আর ছাড়ানো যাবে ভাবো? আত্মহত্যা যে!

রাখাল কহিল, কিন্তু তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করা চাই তো। নইলে, আত্ম-হত্যা যে তাঁকে বধ করায় গিয়ে দাঁড়াবে।

রমণীবাবু ভয় পাইয়া বলিলেন, সে তো জানি হে, কিন্তু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে কিছু-একটা করে ফেল্‌লেই তো হবেনা। একটা পরামর্শ করা তো দরকার? পুলিশের ব্যাপার কি না।

নতুন-মা বলিলেন, তা'হলে চলো; কোন ভালো এটর্ণির আফিসে গিয়ে আগে পরামর্শ করে আসা যাক্।

রমণীবাবু জ্বলিয়া গেলেন,—তামাসা করলেই তো হয়না, নতুন-বৌ, আমার কথা শুনলে আজ এ বিপদ ঘট্‌তোনা।

এ সকল অনুযোগ অর্থহীন উচ্ছ্বাস ব্যতীত কিছুই নয় তাহা নূতন লোক রাখালও বুঝিল। নতুন-মা জবাব দিলেননা, হাসিয়া শুধু রাখালকে কহিলেন, চলো ত বাবা দেখিগে কি করা যায়। রমণীবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তুমি ওপরে গিয়ে বসোগে সেজবাবু, ছেলেটাকে নিয়ে আমি যা' পারি করিগে। কেবল এইটি কোরো, ব্যস্ত হয়ে লোকজনকে যেন বিব্রত করে তুলোনা।

নিচের তলায় তিন-চারটি পরিবার ভাড়া দিয়া বাস করে। প্রত্যেকের দু'খানি করিয়া ঘর, বারান্দার একটা অংশ তক্তার বেড়া দিয়া এক সার রান্নাঘরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইঁহাদের রন্ধন ও খাবার কাজ চলে। জলের কল, পায়খানা প্রভৃতি সাধারণের অধিকারে। ভাড়াটেরা সকলেই দরিদ্র, ভদ্র কেরাণী, ভাড়ার হার যথেষ্ট কম বলিয়া মাসের শেষে বাসা বদল করার রীতি এ বাটীতে নাই,—সকলেই প্রায় স্থায়ীভাবেই বাস করিয়া আছেন। শুধু জীবন চক্রবর্ত্তী ছিল নূতন, এ বাড়ীতে বোধকরি বছর দুইয়ের বেশি নয়। তাহারই স্ত্রী আফিং খাইয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছে। বউটির নিজের ছেলে-পুলে ছিলনা বলিয়া সমস্ত ভাড়াটেদের ছেলে-মেয়ের ভার ছিল তাহার পরে। স্নান করানো, ঘুম পাড়ানো, ছেঁড়া জামা-কাপড় সেলাই করা,—এ সব সেই করিত। গৃহিণীদের 'হাত-জোড়া' থাকিলেই ডাক পড়িত জীবনদের বউকে,—কারণ, সে ছিল ঝাড়া-হাত-পা'র মানুষ, অতএব, তাহার আবার কাজ কিসের? এত অল্প বয়সে তুরেনি ভালো নয় বউটির সম্বন্ধে এই ছিল সকল ভাড়াটের সর্ব্ববাদি-সম্মত অভিমত। সে যাই হোক্, শান্ত ও নিঃশব্দ প্রকৃতির বলিয়া সবাই তাহাকে ভালোবাসিত, সবাই স্নেহ করিত। কিন্তু স্বামীর যে তাহার পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া কাজ নাই, এবং সেও যে আজ সাত-আট দিন নিরুদ্দেশ এ খবর ইহাদের কানে পৌঁছিল শুধু আজ,—সে যখন মরিতে বসিয়াছে। কিন্তু তবুও কাহারও বিশ্বাস হইতে চাহেনা,—জীবনদের বউ যে আফিং খাইতে পারে এ যেন সকলের স্বপ্নের অগোচর।

রাখালকে লইয়া নতুন-মা যখন তাহার ঘরে ঢুকিলেন তখন সেখানে কেহ ছিলনা। বোধকরি পুলিশ হাঙ্গামার ভয়ে সবাই একটুখানি আড়ালে গা-ঢাকা দিয়াছিল। ঘরখানি যেন দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি। দেয়ালের কাছে দুখানি ছোট জল-চৌকি, একটির উপরে দুই একখানি পিতল-কাঁসার বাসন ও অন্যটির উপরে একটি টিনের তোরঙ্গ। অল্পমূল্যের একখানি তক্ত-পোষের উপরে জীর্ণ শয্যায় পড়িয়া বউটি। তখনও জ্ঞান ছিল, পুরুষ দেখিয়া শিথিল হাতখানি মাথায় তুলিয়া আঁচলটুকু টানিয়া দিবার চেষ্টা করিল। নতুন-মা বিছানার একধারে বসিয়া আর্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, কেন এ কাজ করতে গেলে মা, আমাকে সব কথা জানাওনি কেন? হাত দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বলিলেন, সত্যি কোরে বলো ত মা, কতটুকু আফিং খেয়েচো? কখন্ খেয়েচো?

এখন সাহস পাইয়া অনেকেই ভিতরে আসিতেছিল, পাশের ঘরের প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি বলিল, পয়সা তো বেশি ছিলনা মা, বোধহয় সামান্য একটুখানিই খেয়েচে,—আর, খেয়েচে বোধহয় বিকেল বেলায়। আমি যখন জানতে পারলুম তখনও কথা কইছিল।

রাখাল নাড়ি দেখিল, হাত দিয়া চোখের পাতা তুলিয়া পরীক্ষা করিল, বলিল, বোধহয় ভয় নেই নতুন-মা, আমি একখানা গাড়ী ডেকে আনি, হাঁসপাতালে নিয়ে যাই।

বউটি মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল।

রাখাল বলিল, এ ভাবে মরে লাভ কি বলুন ত? আর, আত্ম-হত্যার মত পাপ নেই তা কি কখনো শোনেননি? যে-স্ত্রীলোকটি বলিতেছিল বাড়ীতে ডাক্তার

আনিয়া চিকিৎসার চেষ্টা করা উচিত, রাখাল তাহার জবাবে নতুন-মাকে দেখাইয়া কহিল, ইনি যখন এসেছেন তখন টাকার জন্তে ভাব্‌না নেই,—একজনের বায়গায় দশজন ডাক্তার এনে হাজির করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে সুবিধে হবেনা নতুন-মা। আর, হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাণটা যদি ওঁর বাঁচানো যায়, পুলিশের হাত থেকে দেহটাকেও বাঁচানো যাবে এ ভরসা আপনাদের আমি দিতে পারি।

নতুন-মা সম্মত হইয়া বলিলেন, তাই করো বাবা, গাড়ী আমার দাঁড়িয়েই আছে তুমি নিয়ে যাও।

তাঁহার আদেশে একজন দাসী সঙ্গে গিয়া পৌঁছাইয়া দিতে রাজি হইল, এবং নতুন-মা রাখালের হাতে কতকগুলা টাকা গুঁজিয়া দিলেন।

সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে, আসন্ন রাত্রির প্রথম অন্ধকারে রাখাল অর্দ্ধ-সচেতন এই অপরিচিত বধূটিকে জোর করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া হাঁসপাতালের উদ্দেশে যাত্রা করিল। পথের মধ্যে উজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে এই মরণ-পথ-যাত্রী নারীর মুখের চেহারা তাহার মাঝে মাঝে চোখে পড়িয়া মনে হইতে লাগিল যেন ঠিক এমনটি সে আর কখনো দেখে নাই। তাহার জীবনে মেয়েদের সে অনেক দেখিয়াছে। নানা বয়সের, নানা অবস্থার, নানা চেহারার। একহারা, দোহারা, তেহারা, চারহারা—খ্যাংরা-কাঠির ন্যায়,—ঢ্যাঙা, বেঁটে,—কালো, শাদা, হলদে পাঁশুটে,—চুল-বাঁধা, চুল-ওঠা,—পাশ-করা, ফেল-করা,—গোল ও লম্বা মুখের,—এমন কত। আত্মীয়তার ও পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় অভিজ্ঞতা তাহার পর্য্যাপ্তেরও অধিক। এঁদের সম্বন্ধে এই বয়সেই তাহার আদেখ্‌লে-পণা ঘুচিয়াছে। ঠিক বিতৃষ্ণা নয়, একটা চাপা অবহেলা কোথায় তাহার মনের এক কোণে অত্যন্ত সংগোপনে পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, কাল তাহাতে প্রথম ধাক্কা লাগিয়াছিল নতুন-মাকে দেখিয়া। তেরো বৎসর পূর্ব্বেকার কথা সে প্রায় ভুলিয়াই ছিল, কিন্তু সেই নতুন-মা যৌবনের আর এক প্রান্তে পা দিয়া কাল যখন তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া দেখা দিলেন, তখন সকৃতজ্ঞ-চিত্তে আপনাকে সংশোধন করিয়া এই কথাটাই মনে মনে বলিয়াছিল যে নারীর সত্যকার রূপ যে কতবড় দুর্লভ-দর্শন তাহা জগতের অধিকাংশ লোকে জানেইনা। আজ গাড়ীর মধ্যে আলো ও আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে মরণাপন্ন এই মেয়েটিকে দেখিয়া ঠিক সেই কথাটাই সে আর একবার মনে মনে আবৃত্তি করিল। বয়স উনিশ-কুড়ি, সাজ-সজ্জা-আভরণহীন দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে, অনশন ও অর্দ্ধাশনে পাণ্ডুর মুখের পরে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে,—কিন্তু রাখালের মুগ্ধ চক্ষে মনে হইল মরণ যেন এই মেয়েটিকে একেবারে রূপের পারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহা দেহের অক্ষুণ্ণ সুষমায় না অন্তরের নীরব মহিমায় রাখাল নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলনা। হাঁসপাতালে সে তার যথাসাধ্য,—সাধ্যেরও অধিক করিবে সংকল্প করিল, কিন্তু এই দুঃখ-সাধ্য প্রচেষ্টার বিফলতার চিন্তায় করুণায় তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। হঠাৎ, সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটির কাঁধের উপর হইতে মাথাটা টলিয়া পড়িতেছিল, রাখাল শশব্যস্তে হাত বাড়াইয়াই তৎক্ষণাৎ নিজেকে সাম্‌লাইয়া ফেলিল।

এই অপরিচিতার তুলনায় তাহার কত বড়-ঘরের মেয়েদেরই না এখন মনে পড়িতে লাগিল। সেখানে রূপের লোলুপতায় কি উগ্র অনাবৃত ক্ষুধা। দীনতার আচ্ছাদনে কত বিচিত্র আয়োজন, কত মহার্ঘ প্রসাধন,—কি তার অপব্যয়! পরস্পরের ঈর্ষা-কাতর নেপথ্য-আলোচনায় কি জ্বালাই না সে বারবার চোখে দেখিয়াছে।

আর, সমাজের আর-এক-প্রান্তে এই নিরাভরণ বধূটি? এই কুণ্ঠিত-শ্রী, এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব মাধুর্য্য ইহাও কি অহঙ্কৃত আত্মম্ভরিতায় তাহারা উপহাসে কলুষিত করিবে?

সে ভাবিতে লাগিল কি-জানি দায়গ্রস্ত কোন্ ভিখারী মাতা-পিতার কন্যা এ, কোন্ দুর্ভাগা কাপুরুষের হাতে ইহাকে তাহারা বিসর্জ্জন দিয়াছিল। কি-জানি, কতদিনের অনাহারে এই নির্ব্বাক মেয়েটি আজ ধৈর্য্য হারাইয়াছে, তথাপি, যে সংসার তাহাকে কিছুই দেয়নাই ভিক্ষা-পাত্র হাতে তাহাকে দুঃখ জানাইতে চাহে নাই। যতদিন পারিয়াছে মুখ বুজিয়া তাহারি কাজ, তাহারি সেবা করিয়াছে। হয়ত, সে-শক্তি আর নাই,—সে-শক্তি নিঃশেষিত,—তাই কি আজ এ ধিক্কারে, বেদনায়, অভিমানে তাঁহারি কাছে নালিশ জানাইতে চলিয়াছে যে-বিধাতা তাঁর রূপের পাত্র উজাড় করিয়া দিয়া একদিন ইহাকে এ-সংসারে পাঠাইয়াছিলেন?

কল্পনার জাল ছিঁড়িয়া গেল। রাখাল চকিত হইয়া দেখিল হাঁসপাতালের আঙ্গিনায় গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে। ষ্ট্রেচারের জন্য ছুটিতেছিল, কিন্তু মেয়েটি নিষেধ করিল। অবশিষ্ট সমগ্র-শক্তি প্রাণপণে সজাগ করিয়া তুলিয়া সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, আমাকে তুলে নিয়ে যেতে হবেনা আমি আপনিই যেতে পারবো, এই বলিয়া সে সঙ্গিনীর দেহের পরে ভর দিয়া কোনমতে টলিতে টলিতে অগ্রসর হইল।

* * * *

এখানে বউটি কি করিয়া বাঁচিল, কি করিয়া আইনের উপদ্রব কাটিল, রাখাল কি করিল, কি দিল, কাহাকে কি বলিল, এ সকল বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক। দিন চার-পাঁচ পরে রাখাল কহিল, কপালে দুঃখ যা লেখা ছিল তা ভোগ হলো, এখন বাড়ী চলুন?

মেয়েটি শান্ত কালো-চোখ দুটি মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিলনা।

রাখাল কহিল, এখানকার শিক্ষিত, সুসভ্য সাম্প্রদায়িক বিধি-নিয়মে আপনার নাম হলো মিসেস চকারবুটি, কিন্তু এ অপমান আপনাকে করতে পারবোনা। অথচ, মুস্কিল এই যে কিছু-একটা বলে ডাকাও তো চাই।

শুনিয়া মেয়েটি একেবারে সোজা সহজ গলায় বলিল, কেন, আমার নাম যে সারদা। কিন্তু আমি কত ছোট, আমাকে আপনি বল্‌লে আমার বড় লজ্জা করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, করার কথাই তো। আমি বয়সে কত বড়। তাহলে, যাবার প্রস্তাবটা আমাকে এই ভাবে করতে হয়,—সারদা, এবার তুমি বাড়ী চলো?

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, আমি আপনাকে কি বলে ডাক্‌বো? নাম তো করা চলেনা।

রাখাল বলিল, না চল্‌লেও উপায় আছে। আমার পৈতৃক নাম রাখাল,—রাখাল-রাজ। তাই, ছেলেবেলায় নতুন-মা ডাক্‌তেন রাজু বলে। এর সঙ্গে একটা 'বাবু' জুড়ে দিয়ে তো অনায়াসে ডাকা চলে সারদা।

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, ও এক-ই কথা। আর, গুরুজনেরা যা' বলে ডাকেন তাই হয় নাম। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণকে বলে দেব্‌তা। আমিও আপনাকে দেব্‌তা বলে ডাক্‌বো।

—ইঃ! বলো কি? কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব আমার যে কাণা-কড়ির নেই সারদা।

—নেই থাক্। কিন্তু দেবতাত্ব ষোল-আনার আছে। আর, ব্রাহ্মণের ভাল-মন্দর আমরা বিচার করিনে। করতেও নেই।

জবাব শুনিয়া, বিশেষ করিয়া বলার ধরণটায় রাখাল মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। সারদা পল্লীগ্রামের কোন-এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে, সুতরাং যতটা অশিক্ষিতা ও অমার্জ্জিতা বলিয়া সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল ঠিক ততটা এখন মনে করিতে পারিলনা। আর একটা বিষয় তাহার কানে বাজিল। পল্লীগ্রামে শূদ্ররাই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহার নিজের গ্রামেও ইহার প্রচলন আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কন্যার মুখে এ যেন তাহার কেমন-কেমন ঠেকিল। তবে, এ ক্ষেত্রে বিশেষ-কোন অর্থ যদি মেয়েটির মনে থাকে ত সে স্বতন্ত্র কথা। কহিল, বেশ, তাই বলেই ডেকো, কিন্তু এখন বাড়ী চলো? এরা আর তো তোমাকে এখানে রাখবেনা।

মেয়েটি অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

রাখাল ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কহিল, কি বলো সারদা, বাড়ী চলো?

এবার সে মুখ তুলিয়া চাহিল। আস্তে আস্তে বলিল, আমি বাড়ী-ভাড়া দেবো কি ক'রে? তিন-চার মাসের বাকি পড়ে আছে আমরা তাও তো দিতে পারিনি।

রাখাল হাসিয়া কহিল, সেজন্যে ভাব্‌না নেই।

সারদা সবিস্ময়ে কহিল, নেই কেন?

—না থাকার কারণ, বাড়ী-ভাড়া তোমার স্বামী দেবেন। লজ্জায়, অভাবের জ্বালায় বোধহয় কোথাও লুকিয়ে আছেন, শীঘ্রই ফিরে আসবেন। কিম্বা, হয়ত এসেছেন আমরা গিয়েই দেখ্‌তে পাবো।

—না, তিনি আসেননি।

—না এসে থাক্‌লেও আসবেন নিশ্চয়ই।

সারদা বলিল, না, তিনি আসবেননা।

—আস্‌বেননা? তোমাকে একলা ফেলে রেখে চিরকালের মতো পালিয়ে যাবেন,—এ কি কখনো হতে পারে? নিশ্চয় আসবেন।

—না।

—না? তুমি জান্‌লে কি করে?

—আমি জানি।

তাহার কণ্ঠস্বরের প্রগাঢ়তায় তর্ক করিবার কিছু রহিলনা। রাখাল স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, তা'হলে হয় তোমার শ্বশুরবাড়ী, নয় তোমার বাপের বাড়ীতে চলো। আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবো।

মেয়েটি নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া রহিল, উত্তর দিলনা।

রাখাল একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, কোথায় যাবে, শ্বশুরবাড়ী?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

—তবে কি বাপের বাড়ী যেতে চাও?

সে তেম্‌নি মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

রাখাল অধীর হইয়া উঠিল,—এতো বড় মুস্কিল। এখানকার বাসাতেও যাবেনা, শ্বশুর-বাড়ীতেও যাবেনা, বাপের ঘরেও যেতে চাওনা,—কিন্তু চিরকাল হাঁসপাতালে থাক্‌বার তো ব্যবস্থা নেই সারদা। কোথাও যেতে হবে তো?

প্রশ্নটা শেষ করিয়াই সে দেখিতে পাইল মেয়েটির হাঁটুর কাছে অনেকখানি কাপড় চোখের জলে ভিজিয়া গেছে, এবং এইজন্যই সে কথা না কহিয়া শুধু মাথা নাড়িয়াই এতক্ষণ প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল।

—ও কি সারদা কাঁদচো কেন, আমি অন্যায় তো কিছু বলিনি।

শুনিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু তখনি কথা কহিতে পারিলনা। রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিতে সময় লাগিল, কহিল, আমি ভাবতে আর পারিনে,—আমাকে মরতেও কেউ দিলেনা।

রাখাল মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু, শেষ কথাটায় বিরক্ত হইল,—এ অভিযোগটা যেন তাহাকেই। তথাপি, কণ্ঠস্বর পূর্ব্বের মতই সংযত রাখিয়া বলিল, মানুষে একবারই বাধা দিতে পারে সারদা, বার বার পারেনা। যে মরতেই চায় তাকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যায়না। আর, ভাব্‌তেই যদি চাও, তারও অনেক সময় পাবে। এখন বরঞ্চ বাসায় চলো, আমি গাড়ী ডেকে এনে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার আরো ত অনেক কাজ আছে।

খোঁচাগুলি মেয়েটি অনুভব করিল কি না বুঝা গেলনা, রাখালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমি যে ভাড়া দিতে পারবোনা দেব্‌তা।

—না পারো দিওনা।

—আপনি কি মাকে বলে দেবেন?

রাখাল কহিল, না। ছেলেবেলায় বাবা মারা গেলে তোমার মতো নিঃসহায় হয়ে আমিও একদিন তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইতে যাই। ভিক্ষে কি দিলেন জানো? যা' প্রয়োজন, যা চাইলাম,—সমস্ত। তারপরে হাত ধরে শ্বশুরবাড়ীতে নিয়ে এলেন, অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে, বিদ্যে দান করে আমাকে এতবড় করলেন। আজ তাঁরই কাছে যাবো পরের হয়ে দয়ার আর্জ্জি পেশ করতে? না, তা কোরবনা। যা' করা উচিত তিনি আপনি করবেন, কাউকে তোমার সুপারিশ ধরতে হবেনা।

মেয়েটি অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, আপনাকে কথনো ত এ বাড়ীতে দেখিনি?

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কতদিন এ বাড়ীতে এসেছো?

—প্রায় দু' বছর।

রাখাল কহিল, এর মধ্যে আমার আসার সুযোগ হয়নি।

মেয়েটি আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল, কলকাতায় কত লোকে চাকরি করে, আমার কি কোথাও একটা দাসীর কাজ জোগাড় হতে পারেনা?

রাখাল বলিল, পারে। কিন্তু তোমার বয়স কম, তোমার ওপর উপদ্রব ঘটতে পারে। তোমাদের ঘরের ভাড়া কতো?

সারদা কহিল, আগে ছিল ছ'টাকা,—কিন্তু এখন দিতে হয় শুধু তিন টাকা।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ কমে গেল কেন? বাড়ী-আলাদের তো এ স্বভাব নয়?

সারদা বলিল, জানিনে। বোধহয় ইনি কখনো তাঁর দুঃখ জানিয়ে থাক্‌বেন।

রাখাল লাফাইয়া উঠিল, বলিল, তবেই দেখো। আমি বল্‌চি তোমার ভাব্‌না নেই, তুমি চলো। আচ্ছা, তোমার খেতে-পরতে মাসে কতো লাগে?

সারদা চিন্তা না করিয়াই কহিল, বোধহয় আরও তিন চার টাকা লাগ্‌বে।

রাখাল হাসিল, কহিল, তুমি বোধহয় একবেলা খাবার কথাই ভেবে রেখেচো সারদা, কিন্তু তা-ও কুলোবেনা। আচ্ছা, তুমি কি বাংলা লেখা-পড়া জানোনা?

সারদা কহিল, জানি। আমার হাতের লেখাও বেশ স্পষ্ট।

রাখাল খুশি হইয়া উঠিল, কহিল, তা'হলে তো কোন চিন্তাই নেই। তোমাকে আমি লেখা এনে দেবো, যদি নকল করে দাও, তোমাকে দশ-পনেরো কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত আমি স্বচ্ছন্দে পাইয়ে দিতে পারবো। কিন্তু যত্ন ক'রে লিখ্‌তে হবে,—বেশ স্পষ্ট আর নির্ভুল হওয়া চাই। কেমন, পারবে তো?

সারদা প্রত্যুত্তরে শুধু মাথা নাড়িল, কিন্তু আনন্দে তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া রাখালের আর একবার চমক্ লাগিল। অন্ধকার গৃহের মধ্যে আকস্মিক বিদ্যুদ্দীপালোকে এই মেয়েটির আশ্চর্য্য রূপের যেন সে একটা অত্যাশ্চর্য্য মূর্ত্তির সাক্ষাৎ লাভ করিল।

রাখাল কহিল, যাই এবার গাড়ী ডেকে আনিগে?

মেয়েটি বলিল, হাঁ, আসুন। আর আমার ভাবনা নেই। বোধহয়, এই জন্যেই আমি যেতে পেলামনা, ভগবান আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

রাখাল গাড়ী আনিতে গেল, ভাবিতে ভাবিতে গেল সারদা আমাকে বিশ্বাস করিয়াছে। একদিকে এই ক'টি টাকা, আর একদিকে—? তুলনা করিতে পারে এমন কিছুই তাহার মনে পড়িলনা।

বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল নূতন-মার সন্ধানে উপরে গিয়া শুনিল তিনি বাড়ী নাই। কখন এবং কোথায় গিয়াছেন দাসী খবর দিতে পারিলনা। কেবল এইটুকু বলিতে পারিল যে বাড়ীর মোটরখানা আস্তাবলেই পড়িয়া আছে, সুতরাং হয় তিনি আর কোন গাড়ী পথের মধ্যে ভাড়া করিয়া লইয়াছেন, না হয় পায়ে হাঁটিয়াই গেছেন।

রাখাল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে কে গেছে?

দাসী কহিল, কেউনা। দরওয়ানজিকেও দেখলুম বাইরে বসে আছে।

—আর নবীনবাবু?

দাসী কহিল, আমাদের বাবু? তিনি তো রোজ আসেননা। এলেও রাত্রি ন'টা দশটা হয়।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রোজ আসেননা তার মানে? না এলে থাকেন কোথায়?

দাসী একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, কেন, তাঁর কি বাড়ী-ঘরদোর নেই নাকি?

রাখাল আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলনা, মনে মনে বুঝিল আসল ব্যাপারটা ইহাদের অজানা নয়। নীচে আসিয়া দেখিল সারদাকে ঘিরিয়া সেখানে মেয়েদের প্রকাণ্ড ভিড়। আর শিশুর দল, যাহারা তখন পর্য্যন্ত ঘুমায় নাই তাহাদের আনন্দ-কলরোলে হাট বসিয়া গেছে। তাহাকে দেখিয়া সকলেই সরিয়া গেল,—যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির জিম্মায় সারদার ঘরের চাবি ছিল সে আসিয়া তালা খুলিয়া দিয়া গেল। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমার স্বামীর কোন খবর পাওয়া যায়নি?

সারদা কহিল, না।

—আশ্চর্য্য।

—না, আশ্চর্য্য এমন আর কি।

—বলো কি সারদা, এর চেয়ে বড় আশ্চর্য্য আর কিছু আছে নাকি?

সারদা ইহার জবাব দিলনা। কহিল, আমি আলোটা জ্বালি, আপনি আমার ঘরে এসে একটু বসুন। ততক্ষণ মাকে একবার প্রণাম করে আসিগে।

রাখাল কহিল, মা বাড়ী নেই।

সারদা কহিল, নেই? কোথাও গেছেন বোধকরি। হয় কালীঘাটে, নয় দক্ষিণেশ্বরে—এমন প্রায়ই যান—কিন্তু এখুনি ফিরবেন। আমি আলোটা জ্বালি, হাত-মুখ ধোবার জল এনে দিই,—একটু বসুন, আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ুক।

রাখাল সহাস্যে কহিল, পায়ের ধুলো পড়তে বাকি নেই সারদা, সে আগেই পড়ে গেছে।

সারদা বলিল, সে জানি। কিন্তু সে আমার অজ্ঞানে,—আজ সজ্ঞানে পড়ুক আমি চোখে দেখি।

রাখাল কি বলিবে ভাবিয়া পাইলনা। কথাটা অভাবনীয়ও নয়, অবাক্ হইবার মতোও নয়,—সে তাহাকে

মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছে, এবং বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছে,—এই মেয়েটি পল্লীগ্রামের যত অল্প শিক্ষিতই হোক তাহার সকৃতজ্ঞ চিত্ত-তলে এমন একটি সকরুণ প্রার্থনা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু কথাটির জন্ত তো নয়, বলিবার অপরূপ বিশিষ্টতায় রাখাল অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিল। এবং বহু পরিচিত রমণীর মুখ ও বহু পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার চক্ষের পলকে মনে পড়িয়া গেল। একটু পরে বলিল, আচ্ছা, আলো জ্বালো। কিন্তু আজ আমার কাজ আছে,—কাল পরশু আবার আমি আস্‌বো।

আলো জ্বালা হইলে সে ক্ষণকালের জন্য ভিতরে আসিয়া তক্ত-পোষে বসিল, পকেট হইতে কয়েকটা টাকা বাহির করিয়া পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, এটা তোমার পারিশ্রমিকের সামান্ত কিছু আগাম সারদা।

—কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনার কাজ চলে তবেই তো। প্রথমে হয়ত খারাপ হবে, কিন্তু আমি নিশ্চয় শিখে নেবো। দেখ্‌বেন আমার হাতের-লেখা? আনবো কালি কলম? বলিয়া সে তখনি উঠিতেছিল, কিন্তু রাখাল ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল,—না না, এখন থাক্। আমি জানি তোমার হাতের-লেখা ভালো, আমার বেশ কাজ চলে যাবে।

সারদা একটুখানি শুধু হাসিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাড়ীতে কে-কে আছে দেব্‌তা?

রাখাল জবাব দিল, এখানে আমার তো বাড়ী নয়, আমার বাসা। আমি একলা থাকি।

—তাঁদের আনেননা কেন?

রাখাল বিপদে পড়িল। এ প্রশ্ন তাহাকে অনেকেই করিয়াছে, জবাব দিতে সে চিরদিনই কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে, ইহারও উত্তরে বলিল, সহরে আনা কি সহজ?

সহজ যে নয় এ কথা মেয়েটি নিজেই জানে। হয়ত তাহারও কোন্ পল্লীঅঞ্চলের কথা মনে পড়িল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কে তবে আপনার কাজ করে দেয়?

রাখাল বলিল, ঝি আছে।

—রাঁধে কে? বামুন-ঠাকুর?

রাখাল সহাস্তে কহিল, তবেই হয়েছে। সামান্ত একটি প্রাণীর রান্নার জন্তে একটা গোটা বামুন-ঠাকুর? আমি নিজেই করে নিই। কুকার বলে একটা জিনিসের নাম শুনেচো? তাতে আপনি রান্না হয়। শুধু খাবার সামগ্রীগুলো সাজিয়ে রেখে দিলেই হলো।

সারদা বলিল, আমি জানি। তারপরে খাওয়া হয়ে গেলে ঝি মেজে-ধুয়ে রেখে দিয়ে যায়?

—হাঁ, ঠিক তাই।

—সে আর কি-কি কাজ করে?

রাখাল কহিল, যা দরকার সমস্ত করে দেয়। আমি তাকে বলি নানী—আমাকে কোন-কিছু ভাব্‌তে হয়না। আচ্ছা, তোমার আজ কি খাওয়া হবে বলো ত? ঘরে জিনিস-পত্র তো কিছু নেই, দোকান থেকে আনিয়ে দিয়ে যাবো?

সারদা বলিল, না। আজ আমার সকলের ঘরে নেমন্তন্ন। কিন্তু আপনাকে গিয়ে তো রান্নার চেষ্টা করতে হবে?

রাখাল কহিল, না, হবেনা। যে করবার সে করে রেখেচে।

—আচ্ছা, ধরুন যদি তার অসুখ হয়ে থাকে?

—না হয়নি। তার বুড়ো হাড় খুব মজবুত। তোমাদের মতো অল্পে ভেঙে পড়েনা।

—কিন্তু দৈবাতের কথা তো বলা যায়না, হতেও তো পারে,—তা'হলে?

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা'হলেও ভাবনা নেই। আমার বাসার কাছেই ময়রার দোকান, সে আমাকে ভালোবাসে, কষ্ট পেতে দেয়না।

সারদা কহিল, আপনাকে সবাই ভালোবাসে। তখনি বলিল, আপনি চা খেতে খুব ভালোবাসেন—

—কে তোমাকে বল্‌লে?

—আপনি নিজেই সেদিন হাঁসপাতালে বল্‌ছিলেন। আপনার মনে নেই। অনেকক্ষণ তো কিছু খান্‌নি, তৈরি করে আন্‌বো? একটুখানি বস্‌বেন?

—কিন্তু চায়ের ব্যবস্থা তো তোমার ঘরে নেই, কোথায় পাবে?

—সে আমি খুব পাবো, বলিয়া সারদা দ্রুতপদে উঠিয়া যাইতেছিল রাখাল তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, এমন সময়ে চা আমি খাইনে সারদা, আমার সহ্য হয়না।

—তবে, কিছু খাবার আনিয়ে দিই,—দেবো? অনেকক্ষণ কিছু খান্‌নি, নিশ্চয় আপনার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

—কিন্তু কে এনে দেবে? তোমার ত লোক নেই।

—আছে। ·হারু আমার খুব কথা শোনে, তাকে

বল্‌লেই ছুটে যাবে। বলিয়াই সে আবার তেম্‌নি ব্যস্ত হইয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু এবারেও রাখাল বারণ করিল। সারদা জিদ করিলনা বটে, কিন্তু তাহার বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া রাখালের আবার সেই সকল বহু পরিচিত মেয়েদের মুখ মনে পড়িল। ইহাদের মধ্যে তাহার অনেক আনাগোনা, অনেক জানাশুনা, অনেক সভ্যতা ভদ্রতার দেনা-পাওনা, কিন্তু ঠিক এই জিনিসটি সে যেন অনেক দিন হইল ভুলিয়া আছে। তাহার নিজের জননীর স্মৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ, অতি শৈশবেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন,—একখানি খোড়ো-ঘরের দাওয়ায় বেড়া দিয়া ঘেরা একটু ছোট্ট রান্নাঘর, সেখানে রাঙা-পাড়ের কাপড় পরা কে যেন রন্ধন করিতেন,—হয়ত ইহার সবটুকুই তাহার কল্পনা—কিন্তু সে তাহার মা,—সেই মায়ের একান্ত অস্ফুট মুখের ছবিখানি আজ হঠাৎ যেন তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। মনের ভিতরটা কেমন ধারা করিয়া উঠিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কিছু মনে কোরোনা সারদা আজ আমি যাই। আবার যেদিন সময় পাবো আমি নিজে চেয়ে তোমার চা তোমার জল-খাবার খেয়ে যাবো।

সারদা গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বলিল, আমার লেখার কাজটা কবে এনে দেবেন?

—এর মধ্যেই একদিন দিয়ে যাবো।

—আচ্ছা।

তথাপি কিসের জন্য সে যেন ইতস্তত: করিতেছে অনুমান করিয়া রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আর কিছু বল্‌বে?

সারদা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, প্রথমে হয়ত আমার ঢের ভুল হবে, আপনি কিন্তু রাগ করবেননা। রাগ করে আমাকে ফেলে দিলে আর আমার দাঁড়াবার যায়গা নেই।

তাহার সভয় কণ্ঠের সকাতর প্রার্থনায় করুণায় বিগলিত হইয়া রাখাল বলিল, না, সারদা আমি রাগ করবোনা। তুমি কিন্তু শিখে নেবার চেষ্টা কোরো।

প্রত্যুত্তরে এবার সে শুধু মাথা নাড়িয়া সায় দিল। তারপরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফিরিবার পথটা রাখাল হাঁটিয়াই চলিল। ট্রামের গাড়ীতে অনেকের মধ্যে গিয়া বসিতে আজ তাহার কিছুতেই ইচ্ছা হইলনা।

সে গরিব লোক, উল্লেখ করিবার মতো বিদ্যার পুঁজিও নাই, নাম করিবার মতো আত্মীয়-স্বজনও নাই, তবুও সে যে এই সহরে বহু গৃহে, বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে আপন-জন হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল সে কেবল তাহার নিজের গুণে। তাঁহাদের স্নেহ, সহৃদয়তার অভাব ছিলনা, অনুকম্পাও প্রচুর ছিল, কিন্তু অন্তর্নিহিত একটা অনির্দ্দিষ্ট উপেক্ষার ব্যবধানে কেহ তাহাকে এর চেয়ে কাছে টানিয়া কোনদিন লয় নাই। কারণ, সে ছিল শুধু রাখাল,—তার বেশি নয়। ছেলে-টেলে পড়ায় মেসে-টেসে থাকে। সেটা কোন্‌খানে না জানিলেও তাহার বাসার ঠিকানায় বরানুগমনের আমন্ত্রণ-লিপি ডাক যোগে অনেক আসে। প্রীতি-ভোজের নিমন্ত্রণে নাম তাহার বাদ যায়না। এবং না গেলে সেদিনে না হোক, দুদিন পরেও একথা তাঁহাদের মনে পড়ে। কাজের বাড়ীতে তাহার অনুপস্থিতি বস্তুতঃই বড় বিসদৃশ। জীবনে অনেক বিবাহের ঘটকালি সে করিয়াছে, অনেক পাত্র-পাত্রী খুঁজিয়া বাছিয়া দিয়াছে,—সে পরিশ্রমের সীমা নাই। হর্ষাপ্লুত পিতা-মাতা সাধুবাদে দুই কান পূর্ণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছে, রাখাল বড় ভালো লোক, রাখাল বড় পরোপকারী। কৃতজ্ঞতার পারিতোষিক এম্‌নি করিয়া চিরদিন এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে। এজন্য বিশেষ কোন অভিযোগ যে তাহার ছিল তাও নয়। শুধু, কখনো হয়ত চাকুরীর নিষ্ফল উমেদারীর দিনগুলা মাঝে মাঝে মনে পড়িত। কিন্তু সে এম্‌নিই বা কি!

ভিড়ের মধ্যে চলিতে চলিতে আজ আবার বার বার সেই সকল বহু-পরিচিত মেয়েদের কথা মনে পড়িতে লাগিল। তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব, আলাপ-আলোচনা, পড়া-শুনা, হাসি-কান্না—এমন কত কি। ব্যক্ত-অব্যক্ত কত না চঞ্চল প্রণয়-কাহিনী, মিলন-বিচ্ছেদের কত না অশ্রুসিক্ত বিবরণ।

কিন্তু রাখাল? বেচারা বড় ভালো লোক, বড় পরোপকারী। ছেলে টেলে পড়ায়,—মেসে-টেসে থাকে।

আর আজ? কি বলিল সারদা? বলিল, দেব্‌তা, আমার অনেক ভুল হবে, কিন্তু তুমি ফেলে দিলে আমার আর দাঁড়াবার স্থান নেই।

হয়ত, সত্যই নাই। কিম্বা—? হঠাৎ তাহার ভারি হাসি পাইল। নিজের মনেই খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, রাখাল বড় ভালো লোক,—রাখাল বড় পরোপকারী।

পাশের অপরিচিত পথিক অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সেও হাসিয়া ফেলিল। লজ্জিত রাখাল আর একটা গলি দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। (ক্রমশঃ)

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(উপসংহার)

চলচ্চিত্রে শিশু অভিনেতৃগণ—এদের সম্বন্ধে দু' এক কথা না ব'ললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ব'লে মনে করি। যতদূর মনে পড়ে শিশুদের মধ্যে চলচ্চিত্রে প্রথম দর্শকদের চিত্তাকর্ষণ করেছিল শিশু অভিনেতা Bob (Robert); আদর ক'রে একে সবাই ব'লতো 'ববি'। তারপর এসেছিল ওস্তাদ্ ছেলে 'জ্যাকী কুগান' পর্দ্দার উপর অভিনয় ক'রতে। এই শিশুর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দীর্ঘকাল সকলকে প্রীত ও চমৎকৃত করেছে। আজকাল জ্যাকী কুগানকেও অভিনয়-নৈপুণ্যে অতিক্রম ক'রে গেছে—প্রতিভাশালী শিশু-নট 'জ্যাকী কুপার'। শিশু অভিনেত্রীদের মধ্যে বোধহয় 'বেবি পেগীর' কৃতিত্বকে আজও কেউ ম্লান ক'রতে পারেনি। পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চ বা চলচ্চিত্রের জন্য একটি শিশু অভিনেতা বা অভিনেত্রী সংগ্রহ করা একরকম প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। আজকাল কিন্তু তা সহজ ও সুলভ হ'য়ে পড়েছে। শিশুদের নিয়ে হাস্য-রস-প্রধান চিত্র ও করুণ-রসাত্মক



"আমাদের দল" (Our Gang)

চিত্র যে অতি অপূর্ব্ব ও উপভোগ্য ক'রে তোলা যায় মেট্রো গোল্ড্‌ইন্ মেয়ার কোম্পানী সে সন্ধান জানতে পেরে একেবারে 'আমাদের দল' (Our Gang) নাম দিয়ে একটি শিশু-অভিনেতৃ-বাহিনী গঠন ক'রে রেখেছিলেন। এদের নিয়ে তাঁরা একাধিক উপভোগ্য চিত্র তুলে দর্শকদের আনন্দ দিতে পেরেছিলেন। এই শিশু-চমূ চিত্রপ্রিয়দের সকলেরই কাছে বিশেষ সুপরিচিত। চার্লি চ্যাপলীনের "বাচ্ছা" (The Kid) ছবিতে জ্যাকী কুগানের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সহজে তাকে ভুলতে পারবেন না। 'হেলেনের ছেলেরা' (Helen's



জ্যাকী কুগান (Jackie Coogan)

Babies) চিত্রে 'বেবি পেগীর' অভিনয়-নৈপুণ্য তাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। শিশু 'স্কিপী'র (Skippy) ভূমিকায় সম্প্রতি 'জ্যাকী কুপার' যে অদ্ভুত অভিনয়-চাতুর্য্য প্রকাশ করেছে তা' বহু পরিণত বয়স্ক অভিনেতার মধ্যেও দেখা যায়না। জনী, লুসী, রবি, মেরী, জেন, ফ্র্যাঙ্ক্ প্রভৃতি আরও অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'রে বেশ সুনাম অর্জ্জন ক'রতে পেরেছিল। ছবির মধ্যে উপযুক্ত স্থানে ও আবশ্যকীয় অবস্থায় একটু বুদ্ধি-বিবেচনার সঙ্গে ও সুকৌশলে যে পরিচালক ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ব্যবহার ক'রতে পারেন তাঁর ছবি লোকপ্রিয় না হ'য়েই পারেনা। দেশী ছবিতে এখানকার পরিচালকেরা বড় বড় অভিনেতাদেরই ভালো করে চালাতে পারেন না। শিশুদের চালানা তার চেয়েও ঢের বেশী কঠিন। তাই, মাত্র দু' একখানি দেশী ফিল্মে ছোট ছেলে-মেয়েদের নামাতে দেখা গেছে। তার মধ্যে সুপরিচালক শ্রীযুক্ত চারু রায় তাঁর 'বিগ্রহ' ছবিতে একটি শিশুকে অতি চমৎকা সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন।



জ্যাকী কুগান ("Kid" ছবিতে)

এইখানে শিল্পীর কলা ও কল্পনা দর্শকদের হৃদয় সহজেই জয় করতে পেরেছে।

চলচ্চিত্র সম্বন্ধে প্রায় সকল কথারই আলোচনা বিশদভাবে করা হ'ল। এ বিষয়ে যা কিছু জানবার ও বুঝবার আছে সমস্তই একে একে বলা হয়েছে। এর প্রথম উদ্ভাবন থেকে ক্রমোন্নতি, প্রসার, পরিণতি ও প্রভাব সম্বন্ধে আমরা সবিস্তারে আলোচনা করেছি। চলচ্চিত্রের

ব্যবসায়ের দিক, তার বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক দিক এবং সৌন্দর্য্যের দিকেরও সম্পূর্ণ আলোচনা হ'য়েছে। চলচ্চিত্রের দৃশ্যরচন-রীতি, আলোক-রহস্য, রূপসজ্জা, বাক্-সন্নিবেশ, চিত্র-নাট্য, চিত্রাভিনয়, ও চিত্র-গ্রহণ প্রভৃতি এ বিষয়ের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় ও অতি আবশ্যকীয় বিভাগগুলির সকল জ্ঞাতব্য তথ্যই এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উপসংহারে কেবল সামান্য কয়েকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের উল্লেখ করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করবো।

চলচ্চিত্র (Cinematograph)—পূর্ব্বেই বলেছি যে চলচ্চিত্র আর কিছুই নয়, স্থির আলোক-চিত্রেরই



বেবী পেগী (Baby Peggy)

একটা বিশেষ রূপ। আলোক-চিত্রের ভিত্তির উপরই এর অবস্থান। 'আলোক-চিত্র' এই নাম থেকেই বোঝা যায় যে এ ছবি আলোর তুলিতে আঁকা হয়। অর্থাৎ, আলোক প্রতিহত কোনো বস্তু বা ব্যক্তির আকৃতি অনুযায়ী প্রতিবিম্বিত আলোকরশ্মিগুলি সংহত ক'রে এমন কোনো একটি জিনিসের উপর ধরা—যার বুকে সেই বস্তু বা ব্যক্তির আকৃতি হ'তে প্রতিফলিত আলোক-প্রকৃতিটি স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ হ'য়ে যায়! সেই হ'য়ে ওঠে—আলোক-চিত্র! যেমন জলের উপর আমাদের যে আলোক-প্রতিবিম্ব পড়ে বা মুকুরে আমাদের যে ছায়া প্রতিফলিত হয়, আলোক প্রতিহত সেই প্রতিকৃতি যদি স্থায়ীভাবে ধ'রে রাখতে পারা যায় তাহ'লেই আমাদের ছবি পাওয়া যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে চলচ্চিত্রের ভিত্তি যে আলোক-চিত্র, তার গোড়ার কথা হ'চ্ছে—আলোক-বিজ্ঞান, যা' সম্যকরূপে অনুশীলন ক'রলে ইচ্ছামত ছবি সৃষ্টি করা ও তা' প্রকৃষ্টরূপে লিপিবদ্ধ করার কৌশল সহজেই আয়ত্ত হ'তে পারে।



বেবী পেগী ("Helen's Babies" ছবিতে)

রঙীণ ছবি (Coloured Film)—আলোক-চিত্র এতদিন শুধু আলো ছায়ার প্রতীক্ স্বরূপ সাদা ও কালোয় দেখা যেতো। কিন্তু, আজকাল বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে রঙীণ ছবি তোলাও সম্ভব হ'য়েছে। এটা কি ক'রে সম্ভব হ'ল জানতে হ'লে প্রথমে জানা দরকার 'রং' ব্যাপারটা কি? আলোক-বিজ্ঞান থেকে জানা যায়

যে আলোক হচ্ছে ঈথারের উপর একটা তাড়িত-চৌম্বুক (Electro-magnetic) তরঙ্গ-প্রবাহ। আলোকের এই তরঙ্গ-বাহু (Wave-Length) অগণিত ও অনন্ত-প্রসারিত। এবং এর স্পন্দন-হিল্লোলের গতিও অগণিত এবং অন্তহীন। ঠিক্ যেমন বেতার-স্বর-তরঙ্গ-প্রবাহ—অনেকটা সেই রকমই, কেবল আলোকের তরঙ্গ-বাহু স্বর-বাহুর চেয়ে অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব এবং এর স্পন্দন-হিল্লোল বেতার স্বর-স্পন্দন অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। এই আলোক-



মাষ্টার রবি ("Bubbles" ছবিতে Master Roby)

তরঙ্গের স্পন্দন হিল্লোলের বিভিন্ন গতি ও তরঙ্গ-বাহুর প্রসার ভেদে আমাদের দৃষ্টিপথে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উদয় হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, রংয়ের এই প্রকার ভেদ বা পার্থক্য অসংখ্য রকম হ'তে পারে। আমরা যখন সাদা আলো দেখি—যেমন সূর্য্য কিরণ, তখন বুঝতে হবে যে সেটা হচ্ছে তাড়িত-চৌম্বুক-প্রবাহের সবরকম তরঙ্গ-ভেদ ও স্পন্দন-বেগের সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ। কিন্তু সেই আলো যখন অন্য কোনো বস্তুর ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয় তখন তার স্পন্দন-বেগ ও তরঙ্গ-ভেদের একাধিক অভাব ঘটে। যেমন একটি লাল গোলাপ ফুল আলোকের কেবলমাত্র সেই তরঙ্গটুকুই প্রতিফলিত করে যা আমাদের দৃষ্টিতে রক্তাভ দেখায়। আলোকের অন্যান্য তরঙ্গ-স্পন্দন তার মধ্যে নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। তেমনি গাছের সবুজ পাতা কেবলমাত্র সেই তরঙ্গ-স্পন্দনটুকুই প্রতিফলিত করে যা আমাদের দৃষ্টিতে 'সবুজ' রং বলে প্রতিভাত হয়। অন্যান্য তরঙ্গ-স্পন্দন তার মধ্যে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সমস্ত



জেন লী (Jane Lee)

বিভিন্ন রংই এইভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কেবল, যখন আমরা কোনো কিছু 'কালো' দেখি তখন বুঝতে হবে যে আলোকের সর্ব্ববিধ তরঙ্গ-স্পন্দন তার মধ্যে নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। কোনো কিছুই আর প্রতিফলিত হ'চ্ছে না।—সবরকম আলোর অভাবে যেমন জগতে অন্ধকার নেমে আসে! অন্ধকারের রংও সেইজন্যই 'কালো।'

বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের দীর্ঘকাল গবেষণার ফলে আবিষ্কার করেছেন যে 'সাদা' রংকে এমন তিনটি প্রধান রংয়ে বিভক্ত

ক'রে ফেলা যায়, যে তিনটি রংয়ের পরস্পর সংমিশ্রণ-ভেদে সবরকম ভিন্ন ভিন্ন রংই উৎপন্ন ক'রতে পারা যায়। এই প্রধান তিনটি রং হ'চ্ছে লাল, নীল ও হ'লদে। (পক্ষান্তরে সবুজ) এই তিনটি রং যদি ঠিক সমানভাবে সংমিশ্রিত হয় তাহলে আমাদের দৃষ্টিপথে তা 'সাদা' হ'য়ে দেখা দেবে। আর যদি এ তিনটি রং একটু কম-বেশী করে পরস্পরের সঙ্গে সংমিশ্রিত করা হয় তাহলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রং দেখ্‌তে পাবো। কারণ, আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়বিক-শৃঙ্খলার সূত্রও (Optic Nervous system) এই তিনটি প্রধান রংয়ের সঙ্গেই সমতালে বাঁধা। যখন যে রংটার সং-



জ্যাক ও ভার্জ্জিনীয়া ("Jack & the beanstalk" ছবিতে)

মিশ্রণ আমাদের চ'খে প্রতিফলিত হ'য়ে দর্শনেন্দ্রিয়ের তদনুকূল স্নায়বিক শৃঙ্খলাকে উত্তেজিত করে, আমরা তখন সেই সেই রংই দেখতে পাই। সুতরাং, কোনো কিছুর আমরা যদি তিনখানি পৃথক্ পৃথক্ আলোক-চিত্র গ্রহণ করি, এবং প্রত্যেকখানি ছবি নেবার সময় যদি তার মধ্যে প্রতিফলিত মোট আলোক-তরঙ্গকে এমনভাবে ছেঁকে নিই যাতে আলোক-তরঙ্গের বিভিন্ন স্পন্দনের অনুপাত অনুসারে ওই তিনটি প্রধান রংয়ের পৃথক্ পৃথক্ ছাপ ওঠে, এবং তারপরে যদি সেই তিনখানি পৃথক ছবিকে কোনোরকমে একত্র মিলিয়ে একখানি ছবিতে পরিণত করতে পারি তাহ'লে হুবহু সেই বস্তুর স্বাভাবিক রংটি ছবিতে ধরা পড়ে। মাসিকপত্রে যে সব তিন রংয়ের 'হাফটোন' ছবি ছাপা হয় সে সব ঠিক এই নিয়মেই মুদ্রিত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

রঙীন ছবি তোলার দু-রকম পদ্ধতি আছে। একটাকে বলে 'যৌগিক' (Additive) অন্যটা হচ্ছে 'ব্যবচ্ছেদিক' (subtractive)। যৌগিক পদ্ধতিতে যে রঙীন ছবি তোলা হয় চিত্রবাহনে তার কোনো রং দেখতে পাওয়া যায় না বটে,



মেরী (Mary Mc Alister)

কিন্তু বিশেষভাবে আলোক-তরঙ্গের বিভিন্ন স্পন্দনের অনুপাতে বর্ণশোধকের (Filters) সংযোগে তোলা বলে বর্ণচ্ছটা তার মধ্যে অদৃশ্যভাবে নিহিত থাকে। সেই চিত্রবাহন যখন আবার বিশেষভাবে 'বর্ণশোধক' (Filters) সংযুক্ত প্রক্ষেপক-যন্ত্রের ভিতর দিয়ে পর্দার উপর গিয়ে পড়ে তখন তার বিভিন্ন বর্ণ আমাদের দৃষ্টিপথে পরিদৃশ্যমান হ'য়ে ওঠে। 'ব্যবচ্ছেদক' পদ্ধতিতে যে ছবি তোলা হয় বর্ণ সে চিত্রবাহনেই সুস্পষ্ট মুদ্রিত হ'য়ে যায়, কাজেই সে ছবি পর্দার উপর দেখাবার সময় প্রক্ষেপক-যন্ত্রের সঙ্গে কোন

বর্ণশোধক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু, ছবি নেবার সময় বিশেষভাবে নির্ম্মিত বর্ণগ্রাহী ছায়াধর যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় এবং বর্ণচ্ছটাযুক্ত ছায়াবাহন মুদ্রণেরও বিশেষ একটি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী 'অনু-সরণ করতে হয়। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে 'ব্যবচ্ছেদক' প্রণালীতে তোলা রঙীন ছবির একটা মস্ত সুবিধা এই যে সে ছবি যে কোনো ছবি-ঘরের সাধারণ প্রক্ষেপক-যন্ত্রে দেখানো চলে।

১৮৯৫ সালে মিঃ জেঙ্কিন্স্ (Mr. Jen-kins) যে রঙীন ছবি দেখিয়েছিলেন ছবির ইতিহাসে সেই হ'চ্ছে প্রথম রঙীন ছবি। মিঃ বয়ইস্ (Mr. Boyce) নামে একজন শিল্পী এ ছবিখানি আগাগোড়া তুলি দিয়ে হাতে রং ক'রেছিলেন। তার পরবৎসর মিঃ রবার্ট পল "The miracle" নামে যে রঙীন ছবি দেখিয়েছিলেন—সেখানিরও আদ্যোপান্ত অর্থাৎ সাত রীলের প্রায় ১,১২০০০ খানি ছবি সমস্তই হাতে রং করিয়েছিলেন। কিন্তু, এতে যে অমানুষিক পরিশ্রম ও দীর্ঘ সময় লাগ্‌লো তাতে ব্যবসা চলে না। তখন



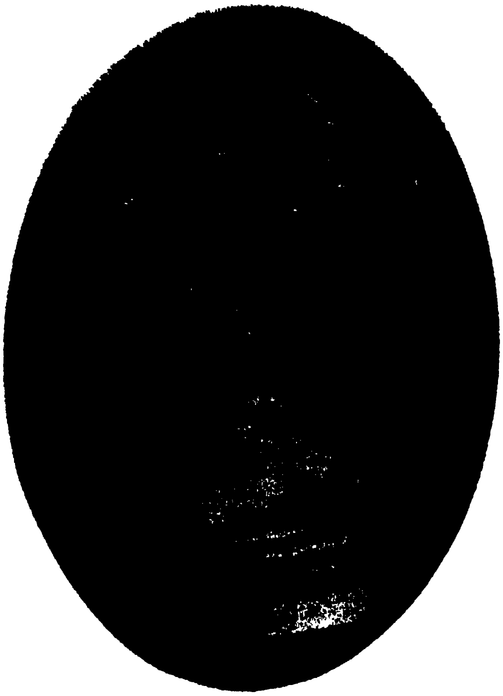
জ্যাকী কূপার (Jackie Cooper)



১০ জ্যাকী স্তেয়ার্ল ও মিজি গ্রীন্ ('Skippy' ছবিতে এরা দু'জনেই সুঅভিনয় করেছে)

যান্ত্রিক উপায়ে অর্থাৎ কলে রং করা যেতে পারে কিনা তারি চেষ্টা চ'লতে লাগলো। ফলে 'Pathe-color' ছবি সৃষ্টি হ'ল। এ ছবি চিত্রানুযায়ী একটা কোনো কঠিন পাতের উপর খাদ্‌রি কেটে (Stencil process) সেই পাতটি ছবির উপর ফেলে রং করা হ'তো। আরও দুবছর পরে 'যৌগিক' পদ্ধতিতে স্বাভাবিক রংয়েই ছবি তোলা সম্ভব হ'ল। মিঃ ফ্রাইজ্ গ্রীন্ (Mr. Friese Greene) এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। কিন্তু এ ছবি প্রক্ষেপক-যন্ত্রে দেখাবার অসুবিধা একটু বেশীরকম থাকায় ব্যবসায়ের দিক দিয়ে সাফল্য লাভ ক'রতে পারলে না। তারপর এলো 'Kinema color'—রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের 'করোণেশন' এবং 'দিল্লী দরবার' প্রভৃতি ছবি এই পদ্ধতিতেই তোলা ও দেখানো হয়েছিল। কিন্তু এরও দেখাবার একাধিক অসুবিধা থাকায় বেশীদিন চললো না। প্রসিদ্ধ ফরাসী চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞ M. Leon Gaumont এই সময় রঙীন ছবি তোলার আর এক উপায় আবিষ্কার করেন। কিন্তু, সেও দেখাবার জন্ত বিশেষ যন্ত্রপাতির দরকার ব'লে সার্ব্বজনীন হ'য়ে উঠতে পারলো না। তারপর, বিখ্যাত

ফিল্ম-ব্যবসায়ী 'ইষ্টম্যান্' কোম্পানীরা 'Kodachrome' প্রণালীতে রঙীন ছবি সৃষ্টি করলে। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে এ পদ্ধতি অনেকটা সাফল্য লাভ ক'রতে পেরেছে, কারণ এ ছবি তোলবার ও ছাপবার জন্ম বিশেষ যন্ত্রপাতি দরকার হ'লেও—দেখাবার জন্ম সাধারণ প্রক্ষেপক-যন্ত্রেই কাজ চলে। বর্ণগ্রাহী চিত্রবাহনও (Panchromatic Film) এঁরাই প্রথম সৃষ্টি করেছেন। তারপর দেখা দিলে 'প্রীজ্মা' (Prizma) রঙীন ছবি। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত 'প্রীজ্মা' খুব চলেছিল। গ্রিফীথ্, হিউগো বলীন্, কমোডোর ব্ল্যাক্টন, ফেমাস্ প্লেয়ার্স কোম্পানী প্রভৃতিরা



সামনে দিকে আলো (Flat lighting)

'প্রীজ্মা' পদ্ধতির ভয়ানক ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু 'প্রীজ্মা'কে বিবর্ণ করে দিয়ে ফুটে উঠ্লো—বর্ণকলা (Technicolor) পদ্ধতি। এ ঠিক্ তিন রঙা ছবি ছাপার মতই তিন রংয়ের তিনখানি পৃথক্ ফিল্ম তুলে তারপর একখানিতে সেই তিনখানি পরের পর ছেপে নিয়ে তিনরঙা একখানি চিত্রবাহন তৈরী করা হয়।

আজকাল সর্ব্বত্র এই 'বর্ণকলা' পদ্ধতিরই (Technicolor) জয় জয়কার চ'লছে বটে, কিন্তু এর এক অপরাজেয় প্রতিদ্বন্দ্বী ইতিমধ্যে চিত্রজগতে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত চিত্র-প্রতিষ্ঠান উৎসুক আগ্রহে তার অভিযান লক্ষ্য ক'রছে। সেটি হ'চ্ছে 'বহুবর্ণ' (Multi-color) চিত্র-পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে রঙীন ছবি তোলবার জন্ম বিশেষ ভাবে প্রস্তুত ছায়াধর-যন্ত্র, বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত প্রক্ষেপক-যন্ত্র, অধিক আলোকে সঞ্চারণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না। Multi-color কোম্পানী এক রকম সপ্তবর্ণের মুখ্য ও গৌণ চিত্রবাহন (Rainbow Positive & Negative Film) উদ্ভাবন করেছেন। 'ব্যবচ্ছেদক' প্রণালী অনুসারে এই সপ্তবর্ণ চিত্রবাহনের সঙ্গে একখানি সবর্ণ (Panchromatic) চিত্রবাহন ব্যবহার দ্বারা অতি সহজেই নানা বর্ণের সঠিক



সামনে ও পাশের দিকে আলো (একসঙ্গে দু রকম)

আলোক-চিত্র তোলা সম্ভব হয়েছে। এই অভিনব পদ্ধতি অনুসারে তোলা যুগল চিত্রবাহনের জন্ম কেবল একটি নূতন ধরণের যমজ-চিত্রাধার, (Double Magazine) ছায়াধরযন্ত্রে সংযোগ ক'রে নিয়ে এবং দু'খানি ছায়াবাহন যাতে একসঙ্গে যাতায়াত ক'রতে পারে [কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি এই বহুবর্ণ চিত্র-পদ্ধতি অনুসারে একসঙ্গে একই ছায়াধর-যন্ত্রে দু'খানি গৌণছবি (Negative) নিতে হয় ; পরে তার রাসায়নিক পরিস্ফুটনের সময় একই (Positive) মুখ্যছবির দু'পিঠে দু'খানি ছাপা হয়। এই মুখ্য ছবি

বহুবর্ণ-চিত্র ছাপবার জন্ত বিশেষ ভাবে তৈরি। এর দু'পিঠেই ছবি ছাপা চলে।] এমনভাবে ছায়াধর যন্ত্রের প্রবেশ-পথ (Camera Gate) একটু বাড়িয়ে নিতে পারলেই এই নবাগত 'বহুবর্ণ' চিত্রপদ্ধতি বিশ্বের চিত্র-জগতে যে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার ক'রতে পারবে সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ছায়াধর-যন্ত্র (Camera)—চলচ্চিত্রের জন্ত যে ছায়াধর-যন্ত্র ব্যবহার হয় সাধারণ ছায়াধর-যন্ত্র অপেক্ষা তার কলকজা মাত্র দু'চারটে বেশী। সাধারণ ছায়াধর-যন্ত্রের প্রধান কলকজা হ'চ্ছে তিনটি; ১। আলোক-বারণ ছায়াধর (light-proof box or magazine) যার মধ্যে ছায়াবাহনের গতির সঙ্গে সমতালে মণিমুকুরের আলোর ঢাক্‌নাটিও খোলা ও বন্ধ হওয়ার কৌশল। ছায়াচিত্রের চিত্রবাহন অপেক্ষা চলচ্চিত্রের চিত্রবাহন দৈর্ঘ্যে শত শতগুণ বেশী বলে তার ছায়াধরও তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। এ ছাড়া প্রধান পার্থক্য আর বেশী কিছু নেই। তবে, ছোটখাটো খুচরো কলকজা চলচ্চিত্রের' ছায়াধর-যন্ত্রে আরও অনেক রকম আছে, যার আলোচনা এ প্রবন্ধে অনাবশ্যক।

ছবি তোলা (Shooting)—অভিজ্ঞ আলোক-চিত্র-শিল্পী মাত্রেই একটু যত্ন ও চেষ্টা করলেই সহজে চলচ্চিত্রে ছবি তুলতে সক্ষম হবেন। চলচ্চিত্রে ছবি



পিছন থেকে ও পাশ থেকে আলো (দুরকম একসঙ্গে)



উপর থেকে ও পাশ থেকে আলো (দুরকম একসঙ্গে)

অক্ষত গৌণ চিত্রবাহন (Negative film) থাকে। ২। মণিমুকুর (Lens) যার সাহায্যে কোনোও বস্তু বা ব্যক্তির আলোক-প্রতিহত-প্রকৃতি-সংহত হ'য়ে উক্ত চিত্রবাহনের উপর প্রতিফলিত ও লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ৩। ঢাকনা (shutter) যা' মণিমুকুরে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মিকে চিত্রবাহনের সম্মুখ থেকে ইচ্ছামত আড়াল করে রাখতে পারে। চলচ্চিত্রের ছায়াধর যন্ত্রেও এ তিনটি ব্যবস্থা ত' আছেই, তা' ছাড়া আরও আছে ছায়াবাহনকে গতিশীল করবার জন্ত একটা অতিরিক্ত ব্যবস্থা এবং সেই তোলবার সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার তা পূর্ব্বেই বর্ণিত হ'য়েছে। তার মধ্যে প্রধান বিষয় হ'চ্ছে আলোক (light) এবং লক্ষ্য-নির্ণয় বা আলোক-সন্ধান। (focussing) আলো মোটামুটি দুরকম। চড়া আলো (Hard light) আর নরম আলো (soft light)। সূর্য্যকরোজ্জল দিনের আলো হ'চ্ছে চড়া, আর মেঘলা দিনের মৃদু আলো হচ্ছে নরম। এই দুরকম আলোর ছবি তুললে ছবিও হয় দুরকম। চড়া আলোর ছবি হয় একটু কড়া গোছের। কারণ তা'তে ছায়া (shade) পড়ে

বেশ ঘন কালো হ'য়ে এবং আকৃতির কোনাচে বাঁক (angular curves) গুলোর রেখা বড্ড বেশী স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। নরম আলোয় ছবি হ'য়ে যায় পানসে! (flat) কারণ ছায়া পড়ে না বলে আলো-ছায়ার বৈষম্য থাকে না, এবং আকৃতির কোনাচে বাঁকগুলোর রেখা হয়ে যায় একেবারে কোমল! এ ছাড়া কোনো বস্তু বা ব্যক্তির উপর বিভিন্ন দিক থেকে আলো প'ড়লে তার ছবিও ওঠে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। সাধারণতঃ চিত্রের বস্তু বা ব্যক্তির উপর আলো এসে প'ড়তে পারে পাঁচটি বিভিন্ন দিক থেকে। পিছন থেকে, সামনে থেকে, দক্ষিণ-পার্শ্ব থেকে, বাম-পার্শ্ব থেকে, এবং মাথার উপর থেকে। স্থিরচিত্রে আলো যাতে ক্যামেরার পিছন থেকে এসে পড়ে সেই সময় ছবি বেশ নির্দোষ হ'য়ে উঠবে; সেটা হ'চ্ছে এই যে—চিত্রের বস্তু বা ব্যক্তির যে দিকটায় অন্ধকার বা ছায়া দেখানো হবে সেদিকে যে পরিমাণ আলো ফেলা হবে—ঠিক তার দ্বিগুণ আলো ফেলতে হবে ছবির যেদিকটা আলোকিত বা উজ্জ্বল রাখা হবে—সেদিকে। লক্ষ্য নির্ণয় বা আলোক-সন্ধান (focussing) আজকাল খুব সহজ হ'য়ে গেছে, কারণ ছায়াধর-যন্ত্রের সঙ্গেই লক্ষ্যভেদে সাহায্যকারী কলকব্জা সংযুক্ত থাকে। ছবি তোলবার সময় দু'রকম অবস্থানে ক্যামেরা রেখে ব্যবহার করা চলে। এক রকম হ'চ্ছে আলোক-চিত্র-শিল্পীর চোখের সমান উঁচু ক'রে রেখে, আর একরকম হ'চ্ছে তাঁর কটিদেশের সমান নীচু ক'রে রেখে। এ দু'য়ের মধ্যে ক্যামেরা চোখের সমান



আলো-ছায়া (কেবল একদিক থেকে আলো)



চিত্র বহ চক্র (Spirograph Film Record)

দিকেই লক্ষ্য রাখতে হয়, কিন্তু চলচ্চিত্রে সব সময় তা করলে হবে না; চলচ্চিত্রে আলো প্রথমটা যাতে কোনো একটা পাশ থেকে এসে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, তাতে আলো-ছায়ার বৈষম্য খোলে এবং আকৃতি বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। তার উপর যদি আবার পিছনে এমন ভাবে আলোর ব্যবস্থা করা যায় যা সামনে থেকে ক্যামেরার চোখে এসে লাগবে না অথচ পাশ থেকে ফুটে বেরুবে, তাহ'লে সে ছবি হ'য়ে উঠবে ঠিক চিত্রকরের তুলিতে আঁকা অপরূপ প্রতিকৃতি! আলো-ছায়ার তারতম্য ক'রতে জানার উপরই আলোক-চিত্রকরের কলা-নৈপুণ্য নির্ভর করে। একটা হিসাব জেনে রাখলেই সকল উঁচু ক'রে রেখে ছবি তোলাটাই সব দিক দিয়ে সুবিধাজনক। আর একটা কথা—ক্যামেরার আসন (base) সকল সময় অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা চাই, তবে, প্রয়োজনমত 'পর্য্যবেক্ষণ পট' 'দোলন-পট' প্রভৃতি তোলবার সময় কেবলমাত্র ছায়াধর-যন্ত্রটিকে ঘোরানো-ফেরানো (Tilting) চলতে পারে।

পারম্পর্য্য (Continuity)—ছবি তোলবার সময় আলোক-চিত্রকরের লক্ষ্য রাখা উচিত যে গল্পানুযায়ী অভিনয়ের পারম্পর্য্য ঠিক রক্ষিত হ'চ্ছে কিনা। ধরুন যদি কোনো গল্পে থাকে গৃহকর্ত্তা মাতাল। মদ আর জীবনে কখন ছোঁবেন না বলে প্রতিজ্ঞা ক'রছেন, কিন্তু না খেয়েও

থাকতে পারছেন না। অস্থির হ'য়ে কর্ত্তা ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়লেন গলির মোড়ের শুঁড়ির দোকান থেকে মদ আনতে। তিনি যদি ঘরের বামদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ক্যামেরার সামনে দিয়ে হেঁটে ডানদিকে চলতে সুরু করেন তাহ'লে বরাবর তাঁকে সেই দক্ষিণমুখেই চ'লতে হবে যতক্ষণ না শুঁড়ির দোকানে গিয়ে পৌঁছবেন। তাঁর ভাই যদি তাঁকে নিষেধ করবার জন্য পেছু নেন তাহ'লে তাঁকেও আসতে হবে সেই বামদিক থেকে দক্ষিণ দিকে। কিন্তু যদি তাঁর কোনো বন্ধু তাঁকে দেখতে



মুখের একদিক মাত্র ফিরিয়ে অভিনয়

পেয়ে পথের মাঝখানে নিবারণ ক'রতে আসেন, তাঁকে আসতে হবে দক্ষিণ দিক থেকে বামদিকে বরাবর। তাঁর কথা শুনে কর্ত্তা যদি ফেরেন তাহলে তাঁকে আসতে হবে তখন দক্ষিণ দিক থেকে বামদিকে ফিরে। এ ত গেলো গতির পারম্পর্য্য ; তারপর আছে ঘটনার পারম্পর্য্য। যে দৃশ্যে যে ব্যাপার ঘ'টছে ঠিক তার আগের দৃশ্যে যাতে সেই ঘটনার পূর্ব্ব-সূচনার ছবি থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা চাই, নইলে পারম্পর্য্য রক্ষিত হবে না। দর্শকদের কাছেও ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকবে।

সঙ্গতি (Tempo)—ছবিতে পারম্পর্য্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গতি ও ঘটনার সঙ্গতি যাতে ঠিক বজায় থাকে সেদিকেও সবিশেষ লক্ষ্যরাখা দরকার। ধরুন, যদি পূর্ব্বোক্ত মাতাল কর্ত্তাটি ছবিতে যে দৃশ্যে বাড়ী থেকে বেরুলেন ধীর মন্থরপদে, পরের দৃশ্যে তাঁকে যদি হঠাৎ দেখি ছুটতে এবং তার পরের দৃশ্যে দেখি হন্ হন করে চলতে তা'হলে সে গতির মাত্রা-বিপর্য্যয় ঘটবে। কিন্তু, তিন দৃশ্যে তাঁর এই তিন রকম গতিরই মাত্রা বজায় থাকতে

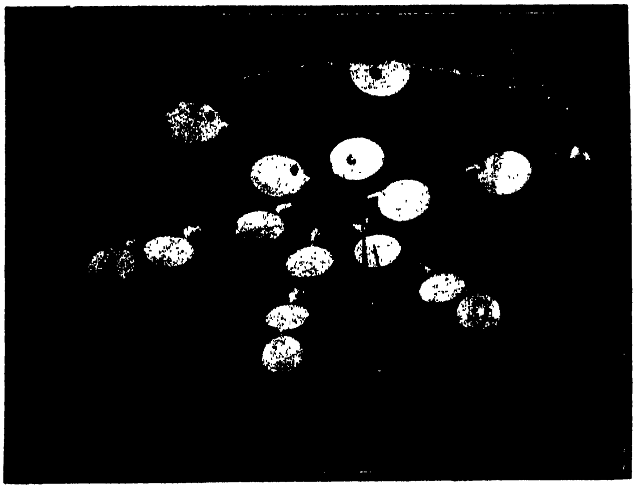


মাথার উপরের আলোক ব্যবস্থা

পারে যদি আমার এই পার্থক্যের যুক্তিযুক্ত কারণও সঙ্গে সঙ্গে দেখাতে পারি। যেমন ধরুন, কর্ত্তা শুঁড়ির দোকানে যাচ্ছেন দেখে ভাই যদি তাঁকে তেড়ে ধরতে যায় তিনি টের পেয়ে ছুটতে পারেন, কিম্বা কেউ তাঁর পেছু নিয়েছে বুঝতে পেয়ে তিনি হন্ হন্ ক'রে জোরে হাঁটতে পারেন, তা'হলে আর ছবির মাত্রা-বিপর্য্যয় ঘটবেনা। দু'টি পর পর দৃশ্যে বিপরীত ঘটনা ঘটলে মাত্রা-বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু, এ রকম

ঘটনার ব্যাপারেও এই সঙ্গতি বজায় রাখা সম্ভব হয় যদি ওই দুটি ঘটনার মাঝখানে দেশ-কালের পরিবর্ত্তনেরও ইঙ্গিত করা থাকে। সকল দিক দিয়ে ছবির এই মাত্রা বা সঙ্গতি (Tempo) যাতে পরের পর আগাগোড়া বজায় থাকে সেদিকে পরিচালক এবং আলোক-চিত্র-শিল্পী উভয়েরই অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

চিত্রগুপ্ত (Script-Clerk)—প্রত্যেক চিত্র-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের মধ্যে এমন একজন থাকেন যাঁর কাজ হ'চ্ছে শুধু ছবির প্রত্যেক দৃশ্যের প্রত্যেক খুঁটিনাটির একটি নির্ভুল হিসাব রাখা। এই লোকটির নাম দেওয়া যায়, চিত্রগুপ্ত। এ কাজটি যেমনি কঠিন তেমনি অত্যাবশ্যকীয়। কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি, ছবি যখন তোলা হয় তখন চিত্রনাট্য অনুযায়ী ঠিক পরের পর দৃশ্যগুলি তোলা হয়না। অন্দরের



ঘরের ভিতরে আলো (Chamber lighting)

দৃশ্য—(Interior scenes) এবং বহির্দৃশ্য (Exterior-scenes) গুলি পৃথক ক'রে বেছে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময় তোলা হয়। ধরুন, আজ হয়ত' তোলা হ'লো নায়ক বিদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে সেজে-গুজে ঘর থেকে বেরুলেন। তারপর হয়ত পনেরো দিন পরে তোলা হবে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সীতে উঠ্‌ছেন ট্রেন ধরতে ষ্টেশনে যাবার জন্য। এখানে 'চিত্রগুপ্ত' যদি তাঁর 'নোট-বই' হাতে শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে প্রত্যেক খুঁটি-নাটির হিসাবটি না টুকে রাখেন তাহ'লে এমনও ভুল হ'তে পারে যে নায়ক ঘর থেকে বেরুচ্ছিলেন 'স্যুট' পরে; কিন্তু ট্যাক্সীতে ওঠবার সময় নৈপুণ্যগুণে তাঁকে ধুতি চাদর পরা! চিত্রগুপ্তের কাজ হ'চ্ছে তাঁর নোট বই দেখে সেই নায়ককে বলে দেওয়া যে সেদিন সে দৃশ্যে তার পরিধানে কী পোষাক ছিল। কোন্ রংয়ের কি ফ্যাশানের জামা। পায়ে মোজা ছিল কিনা; কি রকম জুতো ছিল তার পায়ে। হাতে 'রিষ্ট্‌ওয়াচ্' বাঁধা ছিল কিনা। মাথার চুল কি ভাবে আঁচড়ানো ছিল। হাতে ছড়ি ছিল না ছাতা ছিল ইত্যাদি। কারণ, সেদিনের ঠিক সেই বেশেই তাঁকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সীতে উঠতে হবে যে! চিত্রগুপ্তের এই হিসাব ছবির প্রত্যেক দৃশ্যের 'আগম' 'নির্গমের' (Exit & Entrance) ধারা বজায় রাখারও সাহায্য করে এবং চিত্র-সম্পাদন (Editing) ও পরিচয়-লিপি (Titles) সংযোগ করবার সময়ও বিশেষ কাজে লাগে। ছবির নক্সায় (shooting Script) প্রত্যেক দৃশ্যের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা থাকে। ছবি তোলবার সময় সেই সংখ্যাটিও প্রত্যেক দৃশ্যের আলোক-চিত্রের উপর তুলে নেওয়া হয়। সংখ্যার ছবি নেওয়া হয় একখানি শ্লেটের বা বোর্ডের সাহায্যে। শ্লেটের উপর বা বোর্ডের উপর সংখ্যাটি লিখে শ্লেটখানি বা বোর্ডখানি ক্যামেরার সামনে ধরা হয়। এই উপায়েই ছবির নাম, পরিচালকের নাম, চিত্র-শিল্পীর নাম, অভিনেতৃবর্গের নাম, এমন কি চিত্র-পরিচয়ও ক্যামেরার ভিতর দিয়ে চিত্রবাহনের উপর তুলে নেওয়া চলে। আমরা যে অনেক সময় দেখতে পাই, এক একটি হরফ লাফাতে লাফাতে পর পর এসে পর্দ্দার উপর প'ড়ছে এবং একটি 'নাম' বা 'কথা' লেখা হ'য়ে যাচ্ছে—সেও এই শ্লেটের সাহায্যে সম্ভব হয়। অনেক সময় ঘটনার পূর্ব্বাভাষের একটু ছায়া ছবি ও ঐসব লেখার পট-ভূমিকা রূপে ব্যবহার করা হয়। সে ছবিও সেই বোর্ড অথবা শ্লেটেরই উল্টো পিঠে এঁকে নিয়ে তোলা হয়।

সম্পাদন (Editing)—চিত্র-সম্পাদনের উপর যে ছবির সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। তার কারণ, চিত্র-সম্পাদনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ছবিতে গল্পটিকে গুছিয়ে বলা এবং চিত্তাকর্ষক ক'রে চোখের সামনে তুলে ধরা। সুতরাং সম্পাদকের কাজ হ'চ্ছে ছবির অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয়

অংশ কেটে বাদ দেওয়া। ছবি যাতে কোথাও এক-ঘেয়ে না লাগে, এবং বিরক্তিকর বলে মনে না হয় তেমনি করে দৃশ্যগুলি সাজানো এবং জোড়া দেওয়া। চিত্রের সৌন্দর্যের দিক বা কলা-নৈপুণ্যের বৈশিষ্ট্য যাতে বেশ ফুটে ওঠে সেদিকে যত্নবান হওয়া। ভাবপ্রকাশের সৌকুমার্য্য অক্ষুন্ন রাখা, ছবির পারম্পর্য্য, ঘটনার সঙ্গতি, অভিনয়ের উৎকর্ষ, ও সমস্ত ছবিখানির মাত্রা বা সঙ্গতি ঠিক রাখাও অনেকখানি নির্ভর করে ছবির সুসম্পাদনার উপর।

চিত্র-নাট্য, ছবির নক্সা ও চিত্রগুপ্তের নোট-বই নিয়ে সম্পাদক প্রত্যেক দৃশ্যের সংখ্যা মিলিয়ে চিত্রধারা (Sequence) অনুযায়ী বিভিন্ন দৃশ্যের আনুসঙ্গিক ছবিগুলি পরের পর কেটে কেটে পৃথক করে নেন। প্রত্যেক দৃশ্যের ছবিগুলি এক একটি পৃথক লাটাইয়ে (spool) গুটিয়ে রেখে এক-টুক্‌রো কাগজে তার হদিশ লিখে এঁটে রাখেন। এক রকমের বা একই দৃশ্যের যত ছবি সব একত্র জড়ো করা হয়। তারপর ছবিখানিকে মোটামুটি সাজিয়ে ফেলে জোড়া হয় এবং লাটাইয়ে গোটানো হয়। তার আগে অবশ্য ছবির যত কিছু আলোক-চিত্র সংক্রান্ত দোষ ত্রুটী সব ছেঁটে বাদ দিয়ে ফেলা হয়। আসল সম্পাদনার কাজ তারপরই সুরু হয়, অর্থাৎ প্রক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে ছবিখানি পর্দায় ফেলে কলা-সৌন্দর্য্যের দিক থেকে তার কোথায় কি অদল-বদল করতে হবে, বাদসাদ দিতে হবে, কোন্ দৃশ্যের পর কোন্ দৃশ্য দিলে গল্প জমে উঠ্‌বে ও ছবি চিত্তাকর্ষক হবে, নিকট পট (close ups) গুলি ঠিক কোন্ জায়গায় দিতে পারলে বেশ লাগসই হবে, পরিচয়-লিপি কোথায় কোথায় দেওয়া দরকার, এই সমস্ত স্থির ক'রে ফেলেন এবং তদনুসারে ছবিখানিকে সাজিয়ে সুসম্পূর্ণ ক'রে ফেলেন। অনেক সময় ছবির সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব বাড়াবার জন্য তাঁরা ভাঁড়ার (stock) থেকে কোনো পুরাতন ভালো ছবির কেটে-রাখা অতিরিক্ত অংশ নূতন ছবির সঙ্গে জুড়ে দেন। এটা প্রায়ই প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্পর্কে করা হয়, যেমন সূর্য্যাস্ত বা পর্ব্বতচূড়ায় সাগর-কূলে চন্দ্রোদয় কিম্বা মেঘাচ্ছন্ন ও বিদ্যুৎ-বিকীর্ণ আকাশ ইত্যাদি। এ-ছাড়া ছবির সৌন্দর্য্য বাড়াবার জন্য সম্পাদকেরা অনেক সময় রংয়ের সাহায্যও নেন (Tinting & Toning) যেমন জঙ্গলের দৃশ্যগুলি সেপীয়ায় (sepia) ছাপলে ভালো হয়; তুষার, মেঘ, বা সমুদ্রের দৃশ্য নীলে ছাপলে ভাল হয়; আলোকোজ্জ্বল গৃহের অভ্যন্তর-দৃশ্য এ্যাম্বারে (amber) রং করলে খোলে; শস্য-ক্ষেত্র বা উদ্যানের দৃশ্য সবুজ রং করলে মানায়; আগুনের রং লাল ক'রলে ভাল হয়। ইত্যাদি।

(সমাপ্ত)

শোক-সংবাদ

৺দুর্গাদাস লাহিড়ী

আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত চিত্তে বাঙ্গলার আর একজন সাহিত্যেকের পরলোকগমন সংবাদ পাঠকপাঠিকাগণকে জ্ঞাপন করিতেছি। ইনি সুবিখ্যাত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়। ইনি বিগত ২১এ শ্রাবণ (১৩৩৯) ৬ই আগষ্ট, ১৯৩২ ৭৪ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন।

লাহিড়ী মহাশয় ছিলেন আজীবন সাহিত্যিক। তিনি কত দিক হইতে কত প্রকারে যে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না।

বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানার এলাকায় চকবামন-গড়িয়া গ্রামে বাংলা ১২৬৫ সালে দুর্গাদাস জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি নীরবে সাহিত্য-সাধনা করিতেন। ১২৯৪ সালের ১৩ই শ্রাবণ "অনুসন্ধান" পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অনুসন্ধান পত্রের প্রধান কাজ ছিল মুখ্যতঃ সাহিত্যিক এবং গৌণতঃ সাধারণ ডিটেকটিভগিরি; সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সেবাও চলিত। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে "বঙ্গবাসী"র সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বঙ্গবাসীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে তিনি হাবড়া হইতে "পৃথিবীর ইতিহাস" নামক সুবিখ্যাত প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে টীকাটিপ্পনী ও বিশদ ব্যাখ্যা সহ চারিবেদ প্রকাশ করেন।

তাঁহার 'দ্বাদশ নারী', 'নির্ব্বাণ জীবন', 'ভারতে দুর্গোৎসব', 'চুরি-জুয়াচুরি', 'জাল ও খুন', 'স্বাধীনতার ইতিহাস', 'রাণী ভবানী', 'বাঙ্গালীর গান', 'সাধনা ও সৎপ্রসঙ্গ', 'রাজা রামকৃষ্ণ', 'লক্ষ্মণ সেন', 'সুবর্ণ বলয়', 'সুখ শান্তি', 'মর্ত্তে ভগবান', টেনিসনের 'এনক আর্ডেনে'র অনুবাদ বাঙ্গলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

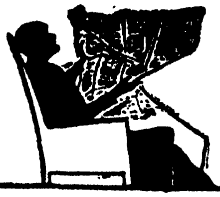
এ মাসে বাঙ্গলার এক মহাপণ্ডিতের তিরোধান ঘটিল—গত ১৩ই আগষ্ট (১৯৩২) আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। আচার্য্য মহাশয় আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় মালদহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামজয় ভট্টাচার্য্য এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামকমল ভট্টাচার্য্য। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যু হইলে উভয় ভ্রাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ১৭ বৎসর সংস্কৃত কলেজে থাকিয়া কৃষ্ণকমল প্রভূত পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকমল ও স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একই বৎসর একসঙ্গে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯ বৎসর বয়সে গ্র্যাজুয়েট হইবার পর বঙ্কিমচন্দ্র ও কৃষ্ণকমল একসঙ্গে বি-এল পড়িতেন। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কৃষ্ণকমলের সহপাঠী ছিলেন। ২২ বৎসর বয়সে কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজে সহকারী সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু শীঘ্রই অধ্যাপকতা পরিত্যাগ করিয়া হাবড়ায় ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি ঠাকুর আইন অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন; এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ দশ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হন। পরে তিনি হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। কিছুদিন তিনি হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও সামাজিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহার মত উদার ছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি ফ্রেঞ্চও জানিতেন।

ওকালতী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে তিনি রিপন ল কলেজের অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত, দর্শন ও আইন অধ্যাপনা করিতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী ফেলো পদে মনোনীত হন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল এণ্ট্রান্স হইতে এম-এ পর্য্যন্ত সংস্কৃতের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিধবাবিবাহের সমর্থন করিতেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময়ে তাঁহার ছাত্র ছিলেন। সমাজপ্রসঙ্গে উদার মত পোষণ করিলেও তিনি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের স্বগ্রামে শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন এবং ছাত্র স্যার গুরুদাসের শ্রাদ্ধবাসরে মহাভারতের বিরাট-পর্ব্ব পাঠ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবকালে তিনি রোগশয্যাগত থাকায় উৎসবে যোগ দিতে না পারিয়া পত্র লিখিয়া শুভকামনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ৮২ বৎসর বয়স্কা পত্নী, কন্যা দৌহিত্র, দৌহিত্রী বর্ত্তমান। আমরা তাঁহাদের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিগত ৯ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার আমাদের পরম সুহৃদ, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার দেওঘর কুণ্ডার বাসভবনে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া অকস্মাৎ বন্ধ হওয়ায় পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি অধুনালুপ্ত 'মানসী' পত্রের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম ও সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'পুষ্পপাত্রে'রও সম্পাদক ছিলেন। অনেক মাসিক ও দৈনিক পত্রে তাঁহার প্রবন্ধাবলী ছাপা হইয়াছে। 'ভারতবর্ষের' তিনি লেখক ছিলেন। তিনি তিনটী পুত্র, পাঁচটী কন্যা ও পত্নী রাখিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়-পরিজনের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।



সাময়িকী

সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা—

বর্ত্তমানে ভারতের উল্লেখযোগ্য সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড মহাশয়ের 'মীমাংসা" (award)! গোলটেবিল বৈঠকে যখন সাম্প্রদায়িক সমস্তার কোন সমাধানই সম্ভবপর হইল না, তখন অগত্যা প্রধান মন্ত্রী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, তবে আমরাই যা-হোক একটা মীমাংসা করিয়া দিব। সেই যা-হোক মীমাংসার কথা গত ১৭ই আগষ্ট (১৯৩২) বিলাতে ও ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে; এবং তাহার ফলে, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যেই বোধ করি, হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় স্বয়ং বলিয়াছেন যে, কেবল প্রধান মন্ত্রী বলিয়া নহে, ভারতের বিশেষ বন্ধু বলিয়াই গত দুই বৎসর ধরিয়া ভারতের সংখ্যাল্প সম্প্রদায়গুলির স্বার্থরক্ষার চিন্তায় তিনি অতিমাত্র উদ্বিগ্ন ছিলেন। সেই গভীর চিন্তাপ্রসূত ফল—এই মীমাংসা।

প্রধান মন্ত্রীর বাণী—

ভারতের সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না; এবং গোলটেবিলের দুইবারের বৈঠকে তিনি সে কথা স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিয়াছিলেন। তথাপি তিনি যে কেন মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইলেন তাহার কারণ—আমরা মীমাংসা করিতে পারিলাম না বলিয়া; এবং মীমাংসা না হইলে নূতন শাসন-তন্ত্রও দেওয়া যায় না বলিয়া। অবশ্য তাঁহার মীমাংসা যে ভারতবাসী কোনও সম্প্রদায়েরই মনঃপূত হইবে না, এ কথা তিনি ভালরূপই জানেন। তবে তাঁহার ভরসা এই যে, পরিণামে তাঁহার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া ভারতবাসীরা সাম্প্রদায়িক সমস্তা সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের মীমাংসা মানিয়া লইতে ইতস্ততঃ করিবে না। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের এই আশা যদি পূর্ণ হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।

ভাগ-বাঁটোয়ারার হিসাব—

এখন, ম্যাকডোনাল্ড সাহেব কি মীমাংসা করিলেন তাহা পাঠকরা শুনিয়া রাখুন। তিনি পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন—যাহা লইয়াই যত গণ্ডগোল, এবং গোলটেবিলের বৈঠকেও যে গণ্ডগোলের মীমাংসা করা সম্ভবপর হয় নাই। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় এই ব্যবস্থা কেন যে করিলেন তাহারও তিনি গুরু কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সে কারণ—সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্ত তাঁহার বিষম উদ্বেগ। তবে এই সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নূতন ভারত-শাসন-বিধি বিরচিত হইয়া পার্লামেন্টে আইনে পরিণত হইবার পূর্ব্বে ভারতবাসীরা যদি আপনাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্তার একটা সুমীমাংসা করিয়া লইতে পারে, এবং এমন একটা খসড়া শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া দিতে পারে যাহা কার্য্যকর হইবে, তাহা হইলে তিনি আনন্দের সহিত তদনুযায়ী আইন রচনা করিবার চেষ্টা করিবেন। তবে সে দিকে ভরসা খুবই কম। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের অভিপ্রায় অতি উত্তম। আমরা ভারতবাসীরা যদি আপনা-আপনির মধ্যে একটা মিটমাট করিয়া লইতে পারিতাম, তাহা হইলে সকল দল মিলিয়া সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে সকলের মনের মতন একটা খসড়া শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া পার্লামেন্টের দ্বারা আইনে পরিণত করাইয়া লইতে পারিতাম। তাহা যখন পারিলাম না, তখন বৃটিশ মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের ঘোষণা মানিয়া লওয়া ছাড়া আর উপায়ান্তরই বা কি? এবং সেই ঘোষণার মর্ম্ম এইরূপ—

পৃথক নির্ব্বাচন—

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খৃষ্টীয়ান, এ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান, এবং ইয়োরোপীয়ান নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় নির্দ্ধারিত সংখ্যক সদস্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। অনুন্নত শ্রেণীর লোকরা সাধারণ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর সহিত ভোট দিবেন; তবে তাঁহাদের জন্য কয়েকটি বিশেষ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীও গঠন করা হইবে। এইগুলির স্থায়িত্বকাল ২০ বৎসর। তবে অনুন্নত শ্রেণীর লোকরা ইচ্ছা করিলে ২০ বৎসরের পূর্ব্বেই তাঁহাদের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচক-মণ্ডলীগুলি রহিত হইতে পারিবে। সাম্প্রদায়িক পদ্ধতিক্রমে মেয়েরাও বিশেষ বিশেষ নির্ব্বাচক-মণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা অসাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

সংখ্যা-নির্দ্দেশ—

ইহা ত গেল মোটামুটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুযায়ী কোন্ সম্প্রদায় হইতে কতগুলি করিয়া সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন, প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের ঘোষণায় তাহারও আভাষ পাওয়া গিয়াছে। মুসলমানরা যেখানে সংখ্যায় কম, সে সকল স্থলে তাঁহারা যাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা হইবে। পঞ্জাবে ও বাঙ্গলায় মুসলমানদের সংখ্যা বেশী। এই দুই প্রদেশে লোক-সংখ্যার অনুপাতে মুসলমান সদস্য সংখ্যা অধিক হইবে। তন্মধ্যে পঞ্জাবে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা হইবে—মোট সদস্য-সংখ্যার শতকরা ২৪৷৷ পাইবেন হিন্দুরা, শিখরা পাইবেন শতকরা ১৮৮। আর মুসলমান মোট সদস্য সংখ্যা হইবে ৮৬; এবং জমিদারদের প্রতিনিধি থাকিবেন তিনজন—তাঁহারাও মুসলমান; কাজেই মুসলমান সদস্যের শতকরা হার হইবে ৫১। বাঙ্গলায় মুসলমান সদস্যসংখ্যা হইবে শতকরা ৪৮৪; হিন্দু ৩৯.২, ইয়োরোপীয়ান ১০।

ব্যবস্থা চূড়ান্ত নহে—

গবর্ণমেণ্ট এই যে ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাই চূড়ান্ত ব্যবস্থা নহে—ইহার পরিবর্ত্তন করা চলিতে পারে; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তিত প্রস্তাবে সকল দলের সম্মতি থাকা চাই। নচেৎ কোন পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে না—সরকারী প্রস্তাবই বহাল থাকিবে এবং তদনুসারেই আইন রচিত হইবে। সম্প্রদায় সকল মিটমাটের জন্য যে পরামর্শ করিবেন, সরকার সে বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিবেন, কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তবে মিটমাটের পক্ষে গবর্ণমেণ্ট কোনরূপে বাধাও দিবেন না। সকল দল মিলিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন, তাহা সন্তোষজনক হইলে গবর্ণমেণ্ট সেই ব্যবস্থা আইনে পরিণত করিবার জন্য পার্লামেণ্টে উপস্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব কাহারও মনের মতন হয় নাই—এমন কি মুসলমানগণেরও নয়। কাজেই দেশব্যাপী প্রতিবাদের কলরোল উত্থিত হইয়াছে; এবং কোন দিনই যে একটা সুমীমাংসা হইবে তাহাও বোধ হইতেছে না।

বাঙ্গলার ব্যবস্থা—

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার মোট সদস্য সংখ্যা হইবে ২৫০। তন্মধ্যে মুসলমান ১১৯, ভারতীয় খৃষ্টান ২, ব্যবসা-বাণিজ্য ১৯, জমিদার শ্রেণী ৫, এ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান ৪, ইয়োরোপীয় ১১, বিশ্ববিদ্যালয় ২, শ্রমিক ৮ এবং সাধারণ কেন্দ্র ৮০ জনকে নির্ব্বাচিত করিবেন। সাধারণ কেন্দ্রের মধ্যে অনুন্নত শ্রেণী এবং নারী সদস্যরা থাকিবেন। সাধারণ কেন্দ্র বলিতে সম্ভবতঃ হিন্দু বা 'অমুসলমান' বুঝিতে হইবে। এই সংখ্যায় অনুপাত ঠিকভাবে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে না। মুসলমানেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সদস্য প্রেরণের অধিকার পাইতেছেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু হিন্দুরা সংখ্যানুপাতে এত কম পাইবেন কেন? মুসলমানরা সংখ্যায় অধিক বলিয়া যেমন বেশী সদস্য পাঠাইবার অধিকার পাইতেছেন, হিন্দুদেরও তদ্রূপ, সংখ্যানুপাতে যতগুলি সদস্য প্রেরণের অধিকার পাওয়া উচিত তাহা তাঁহারা পাইবেন না কেন? না

পাইলে এই ব্যবস্থা অসঙ্গত বলিয়া সকলের মনে ধারণা জন্মিতে পারে এবং জন্মিয়াছেও।

সামঞ্জস্যের অভাব—

আবার, বাঙ্গলায় ও পঞ্জাবে মুসলমানরা সংখ্যায় অধিক বলিয়া বেশী সংখ্যক সদস্য পাঠাইবার অধিকার পাইতেছেন, কিন্তু যে সকল প্রদেশে তাঁহাদের সংখ্যা কম, সেখানে তাঁহারা minority শ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়াছেন। তাঁহাদের interest বজায় রাখিবার জন্য সে সকল স্থলে তাঁহাকে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। সংখ্যাধিক্যের বেলা হইয়াছে অনুপাত এবং সংখ্যাল্পের বেলা হইয়াছে minority interest; অর্থাৎ লোকসংখ্যার অনুপাত সর্ব্বত্র সমানভাবে রক্ষিত হইতেছে না। লোকসংখ্যার অনুপাত যে রক্ষিত হয় নাই তাহার আরও নিদর্শন রহিয়াছে। ইয়োরোপীয়ান ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা লোক সংখ্যার অনুপাতে শতকরা ১ জন, কিন্তু সদস্যপদ পাইল পনের জন! দেশীয় খৃষ্টানরা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন মণ্ডলী চায় নাই, তাহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে তাহা দেওয়া হইল কেন, ইহার কারণ কিছুই উপলব্ধি করা যায় না। আর জমিদার শ্রেণীর প্রতিও যে সুবিচার করা হইয়াছে তাহাও বলা যায় না। পুরাতন ব্যবস্থায় মোট সদস্য সংখ্যা যাহা ছিল, এখন নব প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সদস্য সংখ্যা প্রায় তাহার দ্বিগুণ হইতে চলিল; অথচ, জমিদারদিগের প্রতিনিধির সংখ্যা পূর্ব্বেও ছিল পাঁচ, এখনও সেই পাঁচই রহিল। ইহা কি সঙ্গত হইয়াছে? তাঁহাদের প্রতিনিধি সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া কি উচিত ছিল না?

মীমাংসার আলোচনা—

মীমাংসা সম্বন্ধে আমরা আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না,—কেবল একটিমাত্র কথা। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, মহামান্য সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট এ কথা অতি স্পষ্টভাবে জানাইতে চাহেন যে, মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন ঘটাইবার জন্য ভারতবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে আলোচনা করিতে চাহিলে স্বচ্ছন্দে তাহা করিতে পারেন; কিন্তু সরকার পক্ষ সে আলোচনায় যোগ দিবেন না। আর ভারতবাসীরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে কোন সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তনসূচক কোন অনুরোধ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত নহেন। এখন প্রশ্ন এই—মন্ত্রীসভা স্বয়ং যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তটিও যদি এ দেশের সর্ব্ববাদিসম্মত না হয়, যদি কোন সম্প্রদায় দৃঢ়তা সহকারে উহার প্রতিবাদ করে এবং উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হয় তাহা হইলেও কি উহা আইনে পরিণত করিয়া ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা হইবে? প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের নিজের উক্তি ও যুক্তি অনুসারেই তাহা হইতে পারে না।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অভিমত—

প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের ঘোষণা উপলক্ষে "ফ্রী প্রেসের" প্রতিনিধির অনুরোধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে দেশবাসীর নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বাণী প্রদান করিয়াছেন:—

"আর একবার আমি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঘোষিত সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের কিরূপ মনোভাব হওয়া উচিত, তাহা বিবৃত করিতে চাই। ধীরভাবে বিবেচনা করিলে আমাদের বুঝা উচিত, প্রকৃত সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিবার আর একটি উপলক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এই নির্দ্ধারণ আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষভাব জাগ্রত করিয়া আসন্ন শাসন সংস্কার হইতে আমাদের মনোযোগ অন্য দিকে সরাইয়া লইবে।

"এই অবস্থায় দেশবাসীর প্রতি আমার উপদেশ এই যে, প্রধান মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া সম্মিলিতভাবে নূতন ব্যবস্থাগুলি বিবেচনা করিবার নিমিত্ত তাহাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করা উচিত। সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা করার ভার আমাদের হাতেই রহিয়াছে। অযৌক্তিক সাম্প্রদায়িক ভেদবাদ ও শ্রেণী-বৈষম্যের বিরুদ্ধে অধুনা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে নূতন বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের মধ্যে একটা নিষ্পত্তি করিয়া লওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য; এতদ্দ্বারা আমাদের জাতীয় আত্ম-বিকাশের পথের অন্যতম প্রধান বিঘ্ন দূর হইবে। ভাববিলাসে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া আমাদের

উচিত নহে। নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ এবং ভাবী পরিস্থিতির জন্ত প্রস্তুত হইয়া অদূর ভবিষ্যতে যে সকল বিষয় আমাদের নিকট উপস্থিত করা হইবে, তাহার সম্মুখীন হওয়া আবশ্যক।" বিশ্বকবির সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও বহুদর্শিতা-সঞ্জাত এই বহুমূল্য উপদেশ ভারতবাসীরা যে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়া কার্য্যতঃ পালন করিবেন এরূপ আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

—

রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক—

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর পাঁচ বৎসরের জন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা সাহিত্যে "রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকে"র পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। খগেন্দ্রবাবু আপাততঃ প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টরের পদে কার্য্য করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি বিশেষ নির্ব্বাচন কমিটি রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদের জন্ত খগেন্দ্রবাবুকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথের বাঙ্গলা সাহিত্য-সাধনার কথা কে না জানেন? বাঙ্গলার প্রায় সকল প্রতিষ্ঠাপন্ন সাময়িকপত্র তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধরাজিতে সমলঙ্কৃত। এক সময়ে তিনি একাদিক্রমে কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা-গ্রন্থগুলি সাধারণ্যে সমাদৃত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রায় বাহাদুরের যে বৈষ্ণব-সাহিত্য-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে পাঠকরা বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁহার অধিকারের পরিচয় পাইয়াছেন। সম্ভবতঃ বৈষ্ণব-সাহিত্যে গবেষণার জন্তই তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে; এবং এই নির্ব্বাচন যে সর্ব্বাংশেই উপযুক্ত হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। স্বর্গীয় দেশবন্ধুর আন্দোলনের ফলে ছাত্রসমাজ যখন বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল কলেজের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় ছাত্র-সমাজকে স্কুল কলেজ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাশন্যাল ইউনিভার্সিটি (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়); ইহা তোমরা ছাড়িয়ো না, ইহার সংস্রবে থাকিলে তোমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। স্যার আশুতোষের সেই উক্তি আজ কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন; আজ তাহা সার্থক হইতে চলিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হইতেছে; আর বাঙ্গলা সাহিত্যের পক্ষ হইতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা সাহিত্যের লেকচারারের পদে এবং রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন—এতদিনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইতে চলিল।

—

কুমারী জাহান্ আরা চৌধুরী—

আমরা এবার আরও একটি প্রীতিকর সংবাদ পাঠক পাঠিকাগণকে জানাইতেছি। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান



কুমারী জাহান্ আরা চৌধুরী

বর্ষেও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে কলাশিল্প প্রদর্শনীর বিপুল আয়োজন হইয়াছিল এবং প্রদর্শকদিগের

মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতাও চলিয়াছিল। এই প্রতিযোগিতায় শিল্পকলায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পদক পুরস্কার পাইয়াছেন কুমারী জাহান্ আরা চৌধুরী। কুমারী জাহান্ আরার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। এই অল্প বয়সেই তিনি ছোটদের পাঠোপযোগী একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ অল্পবয়স্কা মুসলিম ছাত্রীর রচিত কোন গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। কুমারী জাহান্ আরার সূচিশিল্প-দক্ষতাও প্রশংসনীয়; এবং এইজন্য তিনি পূর্ব্বে বহু প্রদর্শনী হইতে কয়েকখানি সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা এই বালিকা শিল্পী ও গ্রন্থকর্ত্রীকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালাদেশের মুসলমান সমাজে আরও বিদুষী লেখিকার আবির্ভাব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। মুসলমান যুবকগণের ন্যায় তাহারা মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি কল্পে আত্মনিয়োগ করিলে দেশের শ্রী ফিরিয়া যাইবে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইবে।

দানশীলা মহিলার পরলোক গমন

বিগত ১৪ই ভাদ্র মঙ্গলবার কলিকাতায় সুবিখ্যাত ও দানশীল জৈন ব্যবসায়ী বাবু বাহাদুর সিং মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী তাঁহাদের কলিকাতাস্থ ভবনে পরলোকগতা হইয়াছেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স ৪৭ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই এই মহিলা অবশাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল জৈন সমাজের দীন দুঃখীদিগের মাতা-স্বরূপিনী ছিলেন; তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব দূর করিতেন তাহা নহে, তাঁহার গৃহদ্বার সকল শ্রেণীর অভাবগ্রস্ত নরনারীর জন্যই উন্মুক্ত ছিল। বলিতে গেলে এই মহীয়সী মহিলা, তাঁহার জীবন দরিদ্র নারায়ণগণের সেবার জন্যই উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাঁহার অকাতর দানের হিসাব করা যায় না। মৃত্যুকালে তিনি তিনি দরিদ্রগণের দুঃখ মোচনের জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহার অনেক ক্ষুদ্র দান ছিল। তাঁহার তিন পুত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র সিং, নরেন্দ্র সিং ও বীরেন্দ্র সিং মাতার ন্যায়ই পরদুঃখকাতর। আমরা তাঁহাদের জননীর অকালে পরলোক গমনের জন্য শোকপ্রকাশ করিতেছি, এবং এই মহিলার পরলোকগত আত্মার-মঙ্গলকামনা করিতেছি।

গ্রন্থ-প্রাপ্তি-স্বীকার

"শ্রীরামকৃষ্ণ চন্দ্রিকা" [পূর্ব্বার্দ্ধ] [পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী বিরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রামৃত' অবলম্বনে ও তদীয় ভূমিকা সহ] ব্রহ্মচারী প্রজ্ঞাচৈতন্য প্রণীত। প্রকাশক—ব্রহ্মচারী সুবোধচন্দ্র, ৩১ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹।

"ভক্তির জয়" ধর্ম্মমূলক গল্প; নলতা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পোষ্ট নলতা, জেলা খুলনা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

"কুসুমার্ঘ" খণ্ডকাব্য। শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন সরকার প্রণীত। মূল্য চারি আনা। ২০৩৷১৷১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

"অশ্রুকণা" খণ্ডকাব্য। শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন সরকার প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। ২০৩৷১৷১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

"ফুলকলি" ছোটদের খণ্ডকাব্য। শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক—ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কামাল কাচনা, নবাবগঞ্জ, রংপুর। মূল্য চারি আনা।

"আনন্দ-প্রদীপ" ব্রহ্মতত্ত্বমূলক গানের বই। পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ পুরী বিরচিত। বঙ্গীয় শঙ্কর-মঠ, সাঁতরাগাছি; হাওড়া হইতে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

"স্মৃতি" পদ্য ও গল্পের বই—৺গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী ভাগবত[illegible] প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবরদাপদ চক্রবর্ত্তী, ৪ ই, মোহনলাল ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

"ভারতের ধর্ম্ম-বিবর্ত্তন" (Choudhury's Social Service Series, First Primer.) Or a religio-political lecture on India's spiritual Evolution. প্রণেতা ও প্রকাশক—শ্রীঅভয়াচরণ শর্ম্মা চৌধুরী। মূল্য আট আনা। শ্রীহট্টে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

"বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত-সার" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় বঙ্গভাষা যাঁহারা ২য় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সুবিধার্থ লিখিত। ৫৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত সাবিত্রী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

"[illegible]" পৌরাণিক কাব্য, শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বীণা লাইব্রেরী, ঢাকা।

"Search-light. সন্ধান-দ্যুতি"—ইংরেজী ও বাঙ্গালা কাব্য; শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার রায় প্রণীত। ৬নং হেয়ার ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা—প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

"শ্রীচৈতন্য-জাতক"—নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের গণিত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত-গণিত। নবদ্বীপকান্তি প্রেস—নবদ্বীপ—প্রাপ্তব্য। মূল্য দুই আনা।

"ভক্তিরত্নমালা" বা অপূর্ব্ব সাধন সঙ্গীত। শ্রীগুরুদাস আশুতোষ সরকার বিরচিত। ৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা, প্রকাশক—শ্রীহৃষীকেশ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য। দক্ষিণা—এক টাকা।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "প্রতীক্ষায়"—২।০

শ্রীমতী নীলিমা দেবী প্রণীত উপন্যাস "আগমনী"—॥০

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বাগচী এম-এ অনুবাদিত 'পুস্কিন' প্রণীত বৈদেশিক উপন্যাস "রাশিয়ার দুর্গেশনন্দিনী"—১॥০

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বালক বালিকাদের পাঠ্য "আমরা ও বিশ্বজগৎ"—॥০

পণ্ডিত শ্রীদিগিন্দ্রনাথ কাব্য ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ সম্পাদিতঃ "সানুবাদঃ চমৎকার চিন্তামণিঃ" জ্যোতিষের বই—।/০

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের "বিজ্ঞানের জন্মকথা"—১৲

শ্রীমতী হেমলতা রায় প্রণীত শ্রীশ্রীহংসদেব অবধূত মহারাজের জীবনকথা ও উপদেশ মূলক "কৈলাসপতি"—১৲

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "মুখোমুখি—২৲ ও "দিগন্ত"—১৸০

শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "অসবর্ণা"—১৲ ও "আঁধারে আলো"—১৲

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য লহরী উপন্যাস মালার অন্তর্ভুক্ত "১৪নং কামরা" ও "ভাড়াটে প্রজাবন্ধু" প্রত্যেকখানি—৸০

শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্তজায়া বিরচিত আর্য্যলক্ষ্মী সিরিজের অষ্টম গ্রন্থ "গার্গী"—।০

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ অনূদিত জ্যোতিষের বই "গ্রহযামল"—১।০

শ্রীযুক্ত যতীন সাহা প্রণীত ও শ্রীযুক্ত সমর দে চিত্রিত ছেলেদের ভৌতিক কাহিনী "সোণার ঘড়া"—৸৶০

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRA NATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.



শয়নের পূর্বে

কলাদক্ষ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের শ্রেষ্ঠ অবদান
—ওটীন কোম্পানীর সৌজন্যে

BEFORE RETIRING

This masterpiece by Mr. H. Mazumder
is presented with Oatine Co's compliments



ভারতবর্ষ

কার্ত্তিক—১৩৩৯

প্রথম খণ্ড | বিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গীতি-কবিতা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

সত্যকার যাহা কাব্য তাহার পরমায়ু কালের নিক্তিতে মাপা পড়ে না। তাই যে সব যুগ বিস্মৃতির অন্ধকারে চাপা পড়িয়াছে সে সব যুগেও যে সমস্ত কাব্য রচিত হইয়াছে তাহাও মরে নাই। আজিকার মানব-সমাজেও তাহারা আলো ছড়ায়—আজিকার মানব-মনেও তাহারা দোলা জাগায়। ভারতবর্ষের যিনি কাব্য-লক্ষ্মী তাঁহার ভাণ্ডারও এই কাব্যের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া তামিল, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী—এমন কি যাহাদের কোনো শিক্ষা এবং সভ্যতার দাবী বা গৌরব নাই তাহাদের ভাষাতেও ইহার অদ্ভুত দীপ্তির সন্ধান মেলে।

ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃতের কথাই বলিতে হয়। কারণ বৈদগ্ধ্যের দিক দিয়া এত বড় সমৃদ্ধ ভাষা দুনিয়ায় আর দু'টি নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু ধর্ম্ম-কথা এবং দার্শনিক তথ্য কবিতায় রচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা লইয়া আমরা আলোচনা করিব না—করিবার শক্তিও আমাদের নাই। আমাদের কারবার যাহা জীবন-ব্যাপারে একান্ত অকেজো জিনিষ তাহাই লইয়া, অর্থাৎ রস-সাহিত্য লইয়া। সংস্কৃতে এ সাহিত্যটাও বিরাট।

সংস্কৃতের রস সাহিত্য বিশেষভাবে কাব্য ও নাটকেরই সাহিত্য। স্বতন্ত্র স্বাধীন গীতি-কবিতার সংখ্যা তাহাতে খুব বেশী নাই। মেঘদূত, গীত-গোবিন্দ, ঋতু-সংহার প্রভৃতির মতো দুই চারিখানা গ্রন্থের দ্বারাই তাহার ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তবে যদি ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন কল্পনার টুকরোগুলিকে চার লাইনের কবিতার ছাঁচে ফেলিলেই তাহাকে 'লিরিক' বলা যায় তবে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহু কবি যে সংস্কৃতে 'লিরিক' লিখিয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয়, সত্যকার 'লিরিক' ঢের বড় জিনিষ। এগুলিতে 'লিরিকের' ধাচ্ হয়তো বা আছে কিন্তু তাহার ব্যাপকতা নাই। অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার, বিচিত্র প্রকাশ-ভঙ্গির পরিচয় ইহাদের ভিতর যথেষ্ট; কিন্তু হৃদয়ের যে গভীর আবেগ, রসের যে নিবিড় অনুভূতি কবিতাকে 'লিরিক' করিয়া তোলে ইহাদের অধিকাংশ শ্লোকের ভিতরেই তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই

অন্ত বহু স্থানে কৃত্রিমতাই ইহাদের ভিতর রসের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এই কৃত্রিমতা কোনো সময়ে সংস্কৃত-সাহিত্যকে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছিল যে, সত্যকার রস-সৃষ্টির শক্তি যাঁহাদের ছিল তাঁহারাও তাহারই স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। দুই একটি নমুনা দিতেছি।

শ্রীহর্ষ সংস্কৃত সাহিত্যের বেশ একজন বড় কবি। তিনি তন্বীর রূপের বর্ণনা করিতেছেন—

তনু-তট তব তন্বী, স্তনের ভারেই জেরবার,
কে চাপালে ঐ মাল্য বক্ষের পরে ফের তার ?
গুরু নিতম্ব উচ্ছল, তাহারে টানাই দায় হায়,
মেখলার ভারি পর্ব্বৎ চাপায় কি কেউ তার গায় ?
চারু চরণের ছন্দ উরুর চাপেই হিম্‌সিম্‌,
কে তায় জাগায় ফের্ বল্ নূপুরের ঐ রিম্‌ঝিম্ ?
প্রতি অঙ্গই হায় যার ভূষণ—ধরার গৌরব,
আভরণ দিয়ে তার গায় কেন দাও দুখ এই সব !

ইহার ভিতর প্রকাশ-ভঙ্গির নিপুণতা আছে, বুদ্ধির খেলায় চমক লাগাইবার মতো উপাদান আছে। কিন্তু যে সুর প্রাণের তারে ঘা দিয়া সমস্ত চিত্তকে সচকিত করিয়া তোলে তাহার পরিচয় ইহাতে নাই। ঠিক এই ছাঁচেরই আরও দুই একটি কবিতার অনুবাদ আপনাদিগকে উপহার দিতেছি। প্রিয়তম প্রিয়ার দৃষ্টির প্রশংসা করিতেছেন :—

তরল তব দীর্ঘ চোখের দৃষ্টি হানো ফের প্রিয়ে,
আঁখি যারে বিঁধল বাণে আঁখি তারেই যাক জী'য়ে।
নয় এ অসম্ভবের কিছু, চিরদিনের রীত্ যে এই—
যে গরলে মরণ আনে, বাঁচে মানুষ সেই বিষেই।

অজ্ঞাত

আর একজন কবির প্রিয়ার রূপের বর্ণনাও নীচে দেওয়া গেল। প্রথম কবিতাটির অতিশয়োক্তির অত সহজ পরিচয় ইহাতে নাই। কিন্তু যে পরিচয় আছে তাহার সঙ্গেও যোগ কেবল বুদ্ধির—হৃদয়ের নহে। বর্ণনাটি এইরূপ—

বিম্বফলে গড়্‌তে ভুলে' গড়্‌লে বিধি তার অধর,
নীলোৎপলে গড়্‌তে গিয়ে গড়্‌ল নয়ন ইন্দীবর,
মদন রাজার ভুলের ভূমি তার দেহের যে সকল ঠাঁই—
বিধাতারি ভুল হয় যদি, আমরা তবে কোথায় যাই।

অজ্ঞাত

পড়িতে প্রথমে বেশ চমক লাগে।—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই—হৃদয়ে কোনো রকমের ছাপ রাখিয়া যায় না।

কিন্তু এ কথা একান্ত সাধারণ ভাবেই বলা চলে—সমস্ত শ্লোকের সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বলা চলে না। কারণ কোনো কোনো শ্লোকের চারিটি মাত্র পংক্তিতে আবার এমন প্রগাঢ় রসানুভূতির ছাপ আছে যে, অন্ত খুব কম ভাষার কবিতায় তাহার তুলনা পাওয়া যায়। ইহারও নমুনা দিতেছি—

ছাঁচা হলুদ—তারই মতো রূপসী, তোর অঙ্গ ঐ,
বিরহ তাই পাণ্ডু ক'রে—পাংশু ক'রে তুল্‌ল সই।
সোণার সাথে মিশ্‌ল রূপা—বিরহ তার রং-শালায়
আঁক্‌ল একি রূপের ছবি ? চোখ ফিরানো আজ যে দায় !

রাজশেখর

কথা আর কয়টি ? কিন্তু তাহাতেই বিরহের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অপরূপ। আর একজন কবি তাঁহার প্রিয়ার বর্ণনা করিতেছেন—

সকলের সেরা দেখার জিনিষ কি আছে দুনিয়া মাঝে ?
প্রেয়সীর মুখ যাতে উৎসুক হরিণীর আঁখি রাজে।
কোন্ সেই ঘ্রাণ মাতায় যা প্রাণ ?—ঘন নিঃশ্বাস তার,
শ্রবণের ক্ষুধা মিটায় কি সুধা ?—তার সুর ঝঙ্কার।
মধু হ'তে গাঢ় মধুর কি আছে ?—প্রিয়ার ঠোঁটের ক্ষীর,
জিনে চন্দন কার পরশন ?—পরশ সে প্রেয়সীর।
কাহার ধ্যানের স্বপনের জের সুখে মন করে ভোর ?
সন্ধানী কয়—সে যে নিশ্চয় রূপসী প্রেয়সী মোর।

অজ্ঞাত

এ কবিতাতেও অত্যুক্তির অভাব নাই। কিন্তু

আন্তরিকতার ছোঁয়ায় সমস্ত অত্যুক্তির বাহুল্য একটা অকৃত্রিম আবেগের অপূর্ব্বতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে কবি অমরুর নাম বিশেষ ভাবেই উল্লেখ-যোগ্য। এক একটি stray thought বা আল্‌গা কল্পনা লইয়া শ্লোক-রচনা সংস্কৃতের প্রায় প্রত্যেক কবিই করিয়াছেন—এমন কি কালিদাসও বাদ যান নাই। কিন্তু তাঁহাদের এই সব কবিতায় ছন্দের ধ্বনি-বৈচিত্র্য, বুদ্ধির দীপ্তির প্রখরতা, প্রকাশ-ভঙ্গির অভিনবত্ব থাকিলেও, 'লিরিকে'র যাহা প্রাণ সেই দুর্দ্দম হৃদয়াবেগ, সেই প্রচণ্ড রসানুভূতির অভাবই তাহাদের ভিতর রহিয়া গিয়াছে। এ কথা যে কত বড় সত্য তাহা কালিদাসের পুষ্প-বাণ বিলাস বা শৃঙ্গার-তিলক পড়িলেই ধরা পড়ে। বস্তুতঃ অধিকাংশ স্থলেই এ-সব কবিতা স্থূল-ইন্দ্রিয়ানুভূতির রাজ্য ছাড়াইয়া 'লিরিকে'র বিচিত্র রস-সমুদ্রের ধারে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই—দেহের সীমানাতেই তাহাদের খেই হারাইয়া গিয়াছে। দেহাতীত রসের সন্ধান যাহা সত্যকার 'লিরিক' দেয় তাহার ইঙ্গিত ইহাদের ভিতর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু অমরুর এই চার লাইনের শ্লোকগুলি এই শ্রেণীর কবিতা হইতে একটু ভিন্ন ধরণের বস্তু। স্থূল দৈহিক লালসার উপর লোভ অমরুরও আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে দেহের সীমা ছাড়াইয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যের মাঝখানেও তিনি হৃদয়কে টানিয়া লইয়া যাইতে জানেন। দেহের সঙ্গেই তাঁহার বড় কারবার। তবু তিনি মনকেও ফাঁকি দেন নাই। সেই জন্য মনোবৃত্তির অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় রসানুভূতির পরিচয়ও তাঁহার কবিতার ভিতর দুর্লভ নহে। অমরুর অদ্ভুত কবি-প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার জন্য তাঁহার কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। অমরু বিরহিণীর প্রতীক্ষার ছবি আঁকিতেছেন—

বঁধুর পথে চোখটি রেখে মিলিয়ে গেল দীর্ঘ দিন,
অন্ধকারে পথিক-প্রিয়া ফিরল ঘরে—ব্যথায় লীন।
ঘরে ফিরে'ও একটি পা সে দাওয়ায় রেখে আবার চায়,
হঠাৎ যদি বঁধুর ছায়া পথের বাঁকে দেখাই যায়!

প্রতীক্ষার ছবি ইহার চেয়ে করুণ—ইহার চেয়ে সুন্দর আর কি হইতে পারে! অভিমান এবং তাহার ফলে বুকের ভিতর যে ব্যথার সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠে তাহার পরিচয় দিতে গিয়া অমরু লিখিয়াছেন—

খেলার ছলে কি খেয়ালে হঠাৎ বলেছিলাম—'যাও',
জোর ক'রে তাই শয্যা ছাড়ি' নিঠুর বঁধু আজ উধাও।
হায় যে পাষাণ এম্‌নি ক'রেই ভালোবাসার ভাঙ্‌ল জের,
তবু হিয়া চাইছে তারেই—এমনি আমার গ্রহের ফের!

বস্তুতঃ প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরের ছবি—সে যেন অমরুর কাছে একেবারে খোলা-পুঁথির মতো সহজ ও সরল হইয়া গিয়াছে। প্রেমের খেয়াল চিত্তের তারে যখন যে সুরের ধ্বনি তোলে তাহার প্রত্যেকটি সুরের সঙ্গে যেন তাঁহার পরিচয় আছে। তাই নিশীথ রাত্রিতে নবোঢ়ার যে ইতিহাস তিনি রচনা করিয়াছেন তাহা এইরূপ—

শূন্য ঘরে শয়ান পতি, চোখে তাহার নিদের ভান,
নবোঢ়া সে প্রথম ব'সে রূপ-সুধা তার কর্‌লে পান,
একটি চুমো তার পরেতে—শিউরে ওঠে পতির বুক।
লাজে মাথা নোয়ায় বঁধু—অম্‌নি চুমোয় ভর্‌ল মুখ!

তাই কলহ-ক্লান্ত দম্পতির বিরাগের পরিমাপেও তাঁহার ভুল হয় না। সে বিরাগ অমরুর ভাষায় যে রূপ লাভ করিয়াছে তাহা এই—

এক বিছানায় বাক্যবিহীন—বিমুখ শু'য়ে পরস্পর,
মিলন লাগি' উতল হিয়া, তাও ছাড়ে না কেউ গুমর।
একটু পরেই উচ্চ শির—আড়্‌ চোখেতে চাওয়ার চোট,
চোখে চোখে মিলন হ'তেই ঠোঁটের সাথেও মিল্‌ল ঠোঁট!

ক্রুদ্ধা প্রিয়ার রোষচঞ্চল ভঙ্গির ভিতর হইতে কি ভাবে যে অমৃত চয়ন করিয়া লইতে হয় তাহার ফন্দী বাৎলাইতেও এইজন্য অমরুর জোড়া নাই—

অধরটারে কাম্‌ড়ে দাঁতে, দুলায়ে দু'টি কোমল কর,
'ছুঁয়ো না' কয় যখন প্রিয়া, চোখ্‌ ছুটোতে ঝরায় ঝড়,
জোর ক'রে হায় তখন তারে যে খায় চুমো সেই তো পায়
সুধার সোয়াদ—দেব্‌তারা সব বৃথাই মথে সাগর হায়!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বুদ্ধির কারসাজি, বাক্‌চাতুর্য্যের আড়ম্বর যে সব কবিতার প্রাণ তাহার উপর লোভও অমরুর ছিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয় ছিল সত্যকার কবিহৃদয়। তাই এই ধরণের কবিতাগুলিতেও তিনি একটা বিশিষ্টতার ছাপ আঁকিয়া দিতে পারিয়াছেন—আড়ম্বরের ভিতর দিয়াও ধরা পড়িয়াছে কাব্য-লক্ষ্মীর দৃষ্টির প্রসন্নতা। নমুনা দিতেছি—

'নিশীথ রাতের আঁধার এ যে—তন্বী, ওরে কোথায় যাস্?'
'যাচ্ছি যেথায় রভস-ব্যাকুল বন্ধু আমার করেন বাস।'
'কুটিল ও পথ, একলা তুমি—চিত্তে তোমার ভয় কি নাই?'
'শঙ্কা কিসের? সঙ্গে আছেন বাণ হাতে কাম-
দেব্‌তা ভাই!'

অথবা—

জঘনে তোর কাঞ্চি হাঁকে, গলায় মালা জ্বল্‌ছে ঠিক,
পা'র পরে ঐ নূপুর দু'টি ঝাঁকিয়ে চলে দিগ্বিদিক্।
ঢোল দিয়ে আজ প্রিয়ার পথে যাত্রা যদি সুরুই হয়,
চকিত্‌ চোখে চাইছ কেন?—আবার তোমার
কিসের ভয়?

নূতন রকমের একটা কথা বলার আয়াস—একটা কসরৎ উপরিউক্ত শ্লোক দু'টিতে আছে—সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাই উহাদের সর্ব্বস্ব নহে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া আবার মিশিয়াছে সত্যকার রস-বোধের একটা অনুভূতি।

কিন্তু এই ধরণের স্বতন্ত্র স্বাধীন 'লিরিক' সংস্কৃত-সাহিত্যে খুব বেশী না থাকিলেও তাহার কাব্য ও নাটকগুলির সঙ্গে 'লিরিক' ওতঃপ্রোত ভাবেই জড়িত হইয়া আছে। সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের বহু শ্লোকে প্রকৃত 'লিরিকে'র খোঁজ পাওয়া যায়। বেদের উষা-স্তুতির স্থানে স্থানে 'লিরিকে'র রূপ অপূর্ব্ব ভাবে ধরা দিয়াছে। বেদের ঋষি উষার বর্ণনায় বলিতেছেন—

রূপ তব সেই রমণীর মতো
নিভৃত নদীতে অঙ্গ ধু'য়ে
যৌবন যার ঘন হ'য়ে ওঠে—
ঝ'রে পড়ে দেহ-বৃন্ত চু'য়ে।
রূপ তব সেই নবোঢ়ার মতো
দীপ্ত ভূষণে তনু যে ঢাকে,
দয়িতের স্মিত নয়নে গর্ব্বে
যে তার কুহক ছড়ায়ে রাখে।
রূপ তব সেই কুমারীর মতো
যে নিজ রূপের শক্তি জানে,
নয়নের কোণে মায়ারে ছড়ায়,
জিনে' নেয় হিয়া চোখের বাণে।
নৃত্য-নিপুণা নটিনীর মতো
রূপ ঝরে তব অঙ্গ হ'তে,
বুকের বসন খুলে' ফেলে দাও,
ধরা ভ'রে ওঠে আলোর স্রোতে।

রূপের এ বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, ঋষির অন্তর্দৃষ্টি উষার মর্ম্মলোকের রহস্য-পাথারে অবগাহন করিয়া তাহার রূপের আদি-অন্ত কথা সমস্তই জানিয়া আসিয়াছে।

কালিদাসের কাব্য ও নাটক এ সম্বন্ধে সকলের উপরে টেক্কা দেয়। তাঁহার কাব্য এবং নাটকে নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে 'লিরিকে'র পরিপূর্ণ রূপের পরিচয় অজস্র পাওয়া যায়। শকুন্তলাকে কণ্ব যে স্থানে বিদায় দিতেছেন সে যায়গার কয়েকটি শ্লোক চমৎকার 'লিরিক'। কুমার-সম্ভবের 'রতি-বিলাপ' 'লিরিকে'র আমেজে ভরপুর। রঘু-বংশের 'অজ-বিলাপ' আগাগোড়া 'লিরিকে'র ছাপে মোড়া। কালিদাস ছাড়া অন্যান্য সংস্কৃত কবির ভিতরেও এমনি ভাবে অকস্মাৎ অনেক 'লিরিকে'র সন্ধান মেলে।

কিন্তু সংস্কৃত কাব্যের সম্পর্কে 'লিরিকে'র কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে মেঘদূতের উল্লেখ অপরিহার্য্য। বিশ্বের গীতি-কবিতার রাজ্যে মেঘদূত এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। মেঘ-দূতের ছন্দের ভিতর যেমন সুরের তরঙ্গ সমুদ্রের তরঙ্গের মতো গড়াইয়া চলে, তেমনি ভাবে লীলায়িত হইয়া উঠে তাহাতে রসের অনুভূতি। প্রকৃতির প্রত্যেকটি ইঙ্গিত মেঘদূতে সজীব ও জীবন্ত। জীবন্ত মানুষের মতোই সে যেন কথা বলে, মাথা দোলায়, হাস্য ছড়ায়, কান্না ঝরায়। কিন্তু এই যে সজীব প্রকৃতি—ইহার চেয়েও সজীব হইয়া উঠিয়াছে মেঘদূতে বিরহীর আত্মা। মর্ম্মলোকের অদৃশ্য-পুরীটার সকল দরজা—সবগুলি অর্গল এ গ্রন্থের ছন্দের

ছোঁয়ায় যেন এক মুহূর্ত্তে খুলিয়া আলগা হইয়া গিয়াছে। অমূর্ত্ত যিনি তিনিই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছেন কবির বীণার ঝঙ্কারে। কল্পনাকে প্রাণ দিয়াছেন আরো অনেক কবি। কিন্তু সেই প্রাণ যাঁহারা বিশ্বের প্রাণ করিয়া তুলিয়াছেন তেমন শক্তিশালী কবি খুব কমই আছে। মেঘদূতে বিশ্ব-বিরহীর হৃদয়ের ক্রন্দন নানা ব্যঞ্জনায় গুমরিয়া উঠিয়াছে—তাই বিশ্ব-সাহিত্যের ভিতরেও মেঘদূতের তুলনা মেলে না।

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে কম-বেশী ঘনিষ্ঠতা প্রায় সমস্ত বাঙালী সাহিত্য-রসিকেরই আছে। অন্ততঃ তাহার শ্রেষ্ঠ কয়েকজন কবির রচনার খবর তাঁহারা প্রায় সকলেই রাখেন। সুতরাং সংস্কৃত সম্বন্ধে বেশী কথা এ প্রসঙ্গে হয়তো না বলিলেও চলে। কিন্তু সংস্কৃত ছাড়াও এই ভারতবর্ষেই এমন দুই একটি ভাষা আছে যাহার সমৃদ্ধিও সামান্য নয়—রসের পরিবেশনে যাহা সমস্ত দুনিয়াকেই চমৎকৃত করিয়া দিতে পারে। এই সব সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালীর মন আদৌ সচেতন নহে। আমি প্রাচীন হিন্দী, তামিল প্রভৃতি ভাষার কথা বলিতেছি। ইহাদের এক একটির রাজ্য যেন মায়াপুরীর মতো। এত বিভিন্ন সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ইহাদের ভিতর আছে যে, তাহার রূপ চোখে চমক লাগায়—মন খুশীতে ভরিয়া তোলে। তাহা ছাড়া এগুলির আরো একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের কাব্য-রাজ্য বিশেষ করিয়া গীতি-কবিতার রাজ্য। হৃদয়াবেগের প্রগাঢ়তা, অনুভূতির তীব্র মাধুর্য্য, জীবনকে ঘিরিয়া কল্পনার লীলা এমন একটি ঐশ্বর্য্য ইহাদিগকে দান করিয়াছে যাহা বিশেষ ভাবে 'লিরিকের'ই এলাকার জিনিষ।

দাদুর একটি কবিতা অনুবাদের ভিতর দিয়া যে আকার লাভ করিয়াছে তাহা এইরূপ—

অজ্ঞেয় বঁধু ব'সে আছে ঐ আকাশ পারে,
হরিৎ বসনে ধরণী সেজেছে তাহার লাগি';
পৃথিবী আজিকে বসুধা বিবিধ ফুলের ভারে,
রূপসী ধরার জয় গান গাহে গগন জাগি।'
কালের আননে কালী প'ড়ে গেছে—জলে স্থলে
তারি উৎসব সু-কাল চলেছে নিত্য যার,
প্রেমের মাধুরী ঘন ক'রে তোলে মেঘের দলে,
ঐ ঝর্ ঝর্ ঝরে বারি—ঝরে অমৃত ধার।

* * * *

শ্রাবণের শোভা দাদু তুই ছাখ্ ধ্যানের চোখে,
কত যুগ গেছে—ধরার হরিৎ হয়নি ক্ষয়,
রস ম'রে যায়, মন প'ড়ে থাকে পঙ্গু শোকে,
বুড়া মন—তবু দেহে যৌবন জাগিয়া রয়!

গীতি-কবিতার যাহা রস-মাধুর্য্য তাহা একান্ত সহজ ভাবেই ধরা পড়িয়াছে এই কবিতাটিতে।

ছবি যে কেমন করিয়া কথার কারসাজিতে গীতি-কবিতার ভিতরে জীবন্ত হইয়া উঠে তাহার পরিচয় স্বরূপ হিন্দী কবি পদ্মাকরের একটি কবিতার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

তরুণীর ঘুম কেবলি ভেঙেছে এই,
দেহে মনে তার তখনো আলস ঘোর,
ঘোমটা খসেছে—ভ্রূক্ষেপ তবু নেই,
মদেরও বেশী তার ও রূপের জোর।
কেশ এলায়েছে হীরক হারের পরে,
পায়ে পায়জর ঈষৎ দিতেছে উঁকি,
দাঁড়ায়েছে বালা নিরালা দরজা ধ'রে,
ভঙ্গি তাহার নয়ন নিয়েছে টুকি'।
এক হাত তার রহিয়াছে দরজায়,
আর এক হাতে গোলাপগুচ্ছ ভায়।

বর্ত্তমানের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য হুবহু ছবি আঁকিবার স্পর্দ্ধা করে। সাহিত্যে ইহাই তাহার বিশেষ দান বলিয়া ঘোষণা করিতেও সে দ্বিধা করে না, কিন্তু কবিতার এ রাজ্যটাও যে প্রাচীন কবিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে তাহার এই ধরণের পরিচয়ও দুর্লভ নহে।

'Golden Book of Modern English Poetry'-র সম্পাদক Mr. Thomas Coldwell তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"The most Significant Poetry of our time is either classical or romantic in character and not as some critics would have it of the realistic school." প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এই সব কবিতার আলোচনা করিতে

করিতে এই কথাটি আমার বার বার করিয়া মনে পড়িয়াছে। 'Our age' কথাটা তিনি হয়তো একান্ত বিনয় বশেই ব্যবহার করিয়াছেন—কারণ তাঁহার মন্তব্য সমস্ত যুগের সমস্ত কবিতার পক্ষেই সমান সত্য। মানব মনের যাহা শাশ্বত ধর্ম্ম তাহা সমস্ত যুগেই প্রায় একই রকমের। তাহাই প্রকাশ-ভঙ্গির বিচিত্রতার ভিতর দিয়া যাঁহারা ধরিতে পারেন তাঁহাদের কাব্যই অমর হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তু-তান্ত্রিকতার ভিতর এই শাশ্বত সত্য নাই। সময়ের খেয়ালে, সমাজের ইঙ্গিতে তাহার রূপ বদ্‌লায়—ধাঁজ বদ্‌লায় এবং বদলাইতে বদলাইতে অবশেষে তাহা এমন আকার লাভ করে যে, দুই চারি বৎসরের ব্যবধানেই তাহা যে কখনো ছিল সে কথাও আর লোকের মনে পড়ে না। এইজন্যই যে সাহিত্য অমর হইবে তাহার মূলগত প্রকৃতি Classical বা Romantic হওয়া দরকার। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের ভিতর হইতে একটা উদাহরণ লইলেই এ সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় দূর হইতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যে এমন একটা যুগ এক সময় আসিয়াছিল যখন আদি রসই তাহার কাব্যের একমাত্র উপাদান হইয়া উঠিয়াছিল। সমাজের বস্তু-তান্ত্রিক মনই ছিল সেদিন সে সাহিত্যের কর্ণধার। শ্লোকের পর শ্লোক রচিত হইয়াছে তখন এই আদি রসকেই আশ্রয় করিয়া। তর্জ্জমার ভিতর দিয়া এমনি ধরণের দুই একটি শ্লোকের নমুনা দিতেছি—

কামিনীর দেহ—দেহ সে তো নয় ঘন ঘোর কান্তার,
কুচ-যুগ সম অতি দুর্গম গিরি আছে বুকে তার।
বাঁকে বাঁকে তার আছে তস্কর মন্মথ মনোচোর,
ওরে ও পান্থ, তার মাঝখানে হারাস্ নে পথ তোর।

অথবা—

করীর কুম্ভ—কেহ কহে—ঐ ঘট সম কুচ দু'টি
কেহ কহে—রূপ-সায়রে রয়েছে স্বর্ণ-পদ্ম ফুটি'।
আমি কহি—না—না, মদনের রাজা জয় করি চরাচর
দুন্দুভি দু'টি উপুড় করিয়া রেখে গেছে হিয়া পর।

অজ্ঞাত।

এ কবিতা দু'টি অবশ্য এই শ্রেণীর কবিতার সব চেয়ে কম আপত্তিকর উদাহরণ। সংস্কৃত সাহিত্যে এমন কবিতাও আছে যাহা আধুনিক বাংলার একান্ত বেপরো কবিদের রুচিকেও তুড়ি মারিয়া 'নস্যাৎ' করিয়া দেয় বস্তুতঃ এমনি ধরণের একটা মনোভাবের ফেরে পড়ি শ্লীলতা-অশ্লীলতার ভেদ-রেখাও সেদিন সংস্কৃত সাহিত হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। সেদিন তাহা যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছে। কিন্তু এই সমাদরও তাহাকে সত্যকা সাহিত্যে পরিণত করিতে পারে নাই। ব্যাঙের ছাতা মতোই তাহারা গজাইয়াছিল এবং ব্যাঙের ছাতার মতো তাহারা মিলাইয়া গিয়াছে। সে যুগের সে ধাঁজ বদ্‌লাইয় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-রসিকদের কাছে আজ আ তাহার কোনো দামও নাই। তাহার দাম নাই বটে কিন্তু দাম আছে শকুন্তলার, দাম আছে মেঘদূতের, দাম আছে উত্তরচরিতের—এমন কি অমরু-শতকেরও। এই সব কারণেই মনে হয় সত্যকার রস-সাহিত্যের উপর আধুনিকতার কোনো দাবীই নাই। সত্যকার রসসাহিত্য যাহা তাহা চিরন্তন সত্যের অভিব্যক্তি বলিয়া একদিকে যেমন চির-পুরাতন, আর একদিকে আবার তেমনি চির-নূতন।

তামিল কবি তিরুবল্লুবর প্রায় পৌনে দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন। তাঁহার একটি কবিতার কিয়দংশের অনুবাদ এইরূপ :—

আকাশ নীল—তারো চেয়ে গাঢ় আমার প্রিয়ার চোখ্,
তার পানে চেয়ে মাথা না নোয়ায় কে আছে এমন লোক?

* * * *

গগনের চাঁদ নীচে কি নেমেছে?—ভেবে দিশা নাহি পায়,
পথে যেতে যেতে আকাশের তারা তাই বুঝি ঝ'রে যায়।
দিশাহারা তারা, এ যে তোমাদের মিছে ভুল করা ভাই,
দিনে দিনে বাড়ে তোমাদের চাঁদ—বাড়া-কমা এর নাই।

তায়ুমানবরও আর একজন তামিল কবি। অন্ততঃ দুইশত বৎসর আগে তিনি যে সব কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহার একটির নমুনা দিতেছি—

আকাশ ঘিরে' মেঘের দোলা আজি,
মেঘের পানে চেয়ে ময়ূর নাচে,

নটরাজের নৃত্য দেখার লাগি',
চিত্ত আমার ময়ূর হ'য়ে আছে।

আব্‌ছা হাসি—মায়াপুরীর মায়া—
চকোর কেঁদে যাচে চাঁদের আলো,
আলোর বাণী পৌঁছে যদি দিলে,
প্রভু, তোমার দীপ-শিখাটি জ্বালো।

সাড়ে তিনশত বৎসর আগের কবি দাদু লিখিয়াছিলেন—

গন্ধ কহিছে—পুষ্পেরে আমি চাই,
ফুল ডেকে কহে—গন্ধরে আমি যাচি,
ভাষা কহে—আমি সত্যরে যেন পাই,
সত্য কহিছে—ভাষারে খুঁজিতে আছি।
রূপ কহে—আমি ভাবের কামনা করি,
ভাব কহে—চাহি রূপেরে অনুক্ষণ,
দুয়ের আরতি চলেছে নিখিল ভরি,
অগাধ এ পূজা—অরূপ এ আয়োজন।

এই ধরণের আরো অজস্র কবিতা উদ্ধৃত করা যায়। এগুলি যত পুরাণোই হোক্ না কেন, এ কথা কে বলিতে পারে যে, এগুলি আধুনিক নহে, সুতরাং এগুলির কোনো মূল্যও নাই। কবিতার ভিতর যদি শাশ্বত সত্য থাকে, যদি তাহার দ্বারা প্রকৃত সুন্দর যে তাঁহারই অর্ঘ্য রচনা করা হইয়া থাকে তবে সেই কবিতাই অমর হয়। সমস্ত যুগের মনকেই রস-সৃষ্টির অপূর্ব্বতায় তাহা ধাক্কা দিয়া বলে —আমি আছি—চিরকাল থাকিব, চিরদিন তোমাদিগকে আনন্দ-লোকের—অমৃত-লোকের সন্ধান দান করিব।

কেবল যে সাহিত্যের পংক্তিতে যে সব ভাষা স্থান পাইয়াছে, বা বৈদগ্ধ্যের কষ্টি-পাথরে খাঁটি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহাদের ভিতরেই কাব্য-লক্ষ্মীর রূপ এইভাবে ধরা পড়িয়াছে তাহা নহে, গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকের বহু রচনাতেও ভারতবর্ষের অপরূপ কাব্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়—অসীম সৌন্দর্য্যের সন্ধান মেলে। তবে এ-সব কবিতার সৌন্দর্য্য সংস্কৃতের ঠিক উল্টা—একেবারে সব রকমের বাহুল্য-বর্জ্জিত। ভূষণ-বাহুল্য নাই—কিন্তু সুপুষ্ট অঙ্গের, উপচীয়মান স্বাস্থ্যের যে সৌন্দর্য্য এই সব প্রাদেশিক কবিতায় তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই আছে। কোচ ভাষা হইতে একটি কবিতার তর্জ্জমা করিয়া এই সৌন্দর্য্যের নমুনা দিতেছি—

তোমরা নদীর ধারে দিদি, মনসাই নদীর পারে
সোনার বঁধু গান গেয়ে—যায় সে অভিসারে।
তোর পানে ও চায় কি দিদি, মোর পানে ও চায়?
কান পেতে শোন্, সোনার বঁধু গান গেয়ে ঐ যায়।

বড় বহিন ঢেঁকি পাড়ায়, ছোট বহিন ঝাড়ে,
গাঙ গড়িছে মেজ বহিন দুই নয়নের ধারে—
চোখের জলের ধারা দিয়ে গাঙ্ যে গড়ি হায়,
তোর পানে ও চায় কি দিদি মোর পানে ও চায়!

যায় চলে আর পিছন পানে তাকায় থাকি' থাকি,'
ও দিদি, ও যায় যে চ'লে কেমন ক'রে ডাকি?
যায় ছড়িয়ে তুষের আগুন মনের আঙিনায়।
তোর পানে ও চায় কি দিদি, মোর পানে ও চায়।

প্রকাশ-ভঙ্গি ভারি সহজ ও সরল—আন্তরিকতার ভিতর দিয়া বুকের কান্না একেবারে যেন জমাট বাঁধিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। দুর্লভ কবিত্ব এবং ততোধিক দুর্লভ অনুভূতি ছাড়া এ ধরণের কবিতা লেখা যায় না। কিন্তু এরূপ কবিতার সন্ধান এ-সব সাহিত্যেও খুব বেশী মিলে না। তাহা না মিলিলেও একটি স্বাভাবিক সরলতা ও সৌন্দর্য্যের যে আবহাওয়া এই সব কবিতা সৃষ্টি করে তাহার দামও অল্প নহে। কথাটা পরিষ্কার করিবার জন্য দুই একটি সাঁওতালী কবিতা তর্জ্জমা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

দেশ ভরা মহুয়ার কত আছে গাছ।
মহুয়া সে—দিন ভর্ ঝ'রে ঝ'রে পড়্ছে,
হিংসুটে বাতাসটা—নেই তার লাজ,
অলস ও রোদ্দুরো আঙিনাটা ভরছে।
বঁধুয়ারে, মহুয়ায় না কুড়ালে আজ,
তার চেয়ে মিঠে সুর বাঁশীতেই ঝরছে।

কবিতাটির বিশেষ কোনো অর্থ নাই—কেবল একটা stray thought—একটা আল্‌গা কল্পনা রূপ লাভ করিয়াছে এই কয়েকটি পংক্তির ভিতরে। কিন্তু বিশেষ অর্থ না থাকাটাই ইহার বৈশিষ্ট্য, তাহাই ইহার সৌন্দর্য্যের দীপ্তিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

এই ধরণের আর একটা অলস চিন্তার অভিব্যক্তি এই নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি -

"মোর নেইকো সম-বয়সী মেয়ে—
তাই কুমার হ'য়েই রইনু হায়,
আমি বেরিয়ে যাবো আজই চলে
আর রইব না এ দেশের ছায়।"
"বঁধু তাও কভু হয়—তাও কভু হয়,
আজ বিদেশ যাবার দিনই যে নয়।
দেখো জ্যোৎস্নাতে আজ বান ডেকেছে,
শুধু রূপা ঝরে রাতের গায়।"
"তবে ভার ছেড়ে দেই রাতের হাতেই
যদি সঙ্গিনীটি সেই জোটায়।"

এ কবিতা প্রকৃতির আর একটি সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ ভক্তের একটা চমৎকার আত্ম-নিবেদনের নমুনা। কোনখানে এতটুকু আড়ম্বর নাই, অথচ জ্যোৎস্নার রূপ হৃদয়ের কানায় কানায় যে ঢেউ তুলিয়াছে তাহার পরিচয়ও এমনি সুস্পষ্ট যে, তাহা বলিয়া দিবার—বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিবারও অবকাশ রাখে না।

আরও একটি সাঁওতালী কবিতা উদ্ধৃত করিয়াই আমার এই উদ্ধৃত করার পালা শেষ করিব। কবিতাটি এই—

কথায় কথায় কথা বেড়ে গেল হায়,
লোকের ফোড়ন পড়িল তাহারি গায়,
ভিন হ'য়ে গেনু আচমকা খেয়ালেই।
বন্ধু আমার বছর না হ'তে ওর,
তোমার লিখন কাছে যেন আসে মোর,
বিরহের ব্যথা তোমারো কি বুকে নেই!
* * * *
বন্ধুর মোর ছিল যে সোনার সাজ,
পোষাকে তাহার ছিল যে রূপার কাজ,
তারে ভোলা যায়?—কি করে তাহারে ভুলি?
তেঁতুলের গাছ আকাশ গিয়েছে ছুঁয়ে—
পোষাক গুলোরে তারি পরে এনু থুয়ে,
ঝাট্ দিতে ভুলি—উঠানে জমিছে ধূলি!

কলহান্তরিতার বেদনা বিধুর হৃদয়ের কি সহজ সরল অথচ অপরূপ অভিব্যক্তি! অথচ এ কবিতা যাহার লেখা তাহার পিছনে শিক্ষার ছাপও নাই—সভ্যতার আলোকও নাই। ইহা একান্ত ভাবেই একটি Pastoral Poem মাত্র।

যাহাকে Pastoral Poems বলে ইউরোপের সাহিত্য-গুলিতে তাহার যথেষ্ট সমাদর আছে। তাহার অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য যে উপেক্ষার যোগ্য নহে আইরিশ কবি ইয়েট্‌স্-এর কবিতাই তাহার প্রমাণ। সাহিত্যের ভিতর তিনি এমন একটি নূতন সুরের আমদানী করিয়াছেন যাহা সেখানকার শিক্ষিত সাহিত্যিক সমাজকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু নূতন হইলেও সে সুর বিশেষ করিয়া এই Pastoral কবিতারই সুর। অথচ এ সুর আমাদের দেশের যাঁহারা সাহিত্য-রসিক তাঁহাদের মনে দোলা জাগায় না। না জাগাইবার কারণও আছে। আমাদের শিক্ষার ভিতর দিয়া এমন একটা কৃত্রিমতা আমাদের চারিদিক ঘিরিয়া ব্যূহ রচনা করিয়াছে যে, যাহা সহজ—যাহা স্বাভাবিক তাহা কিছুতেই আমাদের মনে সাড়া জাগাইতে পারে না। সুন্দরকে তাহার স্বাভাবিক মূর্ত্তিতে গ্রহণ করিবার শক্তিই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। এই অতি-কৃত্রিম আবহাওয়া যেমন ভাবে আমাদের মনের উপর চাপিয়া বসিতেছে তাহাতে, এ সম্বন্ধে যদি এখনও আমরা সাবধান না হই, তবে ক্ষতির পরিমাণ যে ঢের বাড়িয়া যাইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের কাব্য-সাহিত্য অত্যন্ত বিপুল—অথচ সমুদ্রের মতো। তাহাতে অবগাহন করিলে মণি-মুক্তা অজস্র কুড়াইয়া আনা যায়। কিন্তু আমাদের পশ্চিমাভিমুখী মন পশ্চিমকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া আছে। এদিকে নজর দিবার অবকাশ তাহার নাই। পশ্চিমের সাহিত্যের ধন-ভাণ্ডারে যাহা আছে তাহার দিকে তাকাইবার প্রয়োজন নাই—এ কথা আমি বলিতেছি না। আমার বক্তব্য—কেবল পশ্চিমের দিকে নজর দিতে গিয়া আমাদের নিজেদের দুর্লভ মণি-মুক্তাগুলি যেন উপেক্ষিত না হয়। যে সমস্ত ভাষার কবিতা এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সব ভাষার কত গ্রন্থের অনুবাদ যে ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। অথচ সমস্ত বাংলা ভাষা হাতড়াইলেও এমন একখানি গ্রন্থ পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ যাহাতে তিরুবল্লুবর, তায়ুমানবর, অপ্পর, পদ্মাকর প্রভৃতির কাব্যের রসের সন্ধান পাওয়া যায়। এ অবস্থা জাতির মনের দীনতারই পরিচয় প্রদান করে। জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে এই দীনতা দূর করার প্রয়োজন আছে। আর সেই প্রয়োজনের অনুরোধেই এ প্রবন্ধে আমি যে স্পর্দ্ধা ও অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি, বাংলার সুধীজন আশা করি তাহা মার্জ্জনা করিবেন। এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িলে আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।



বন্যা

শ্রীসীতা দেবী বি-এ

(১০)

এলাহাবাদে একদিন থাকাটা নাম মাত্র হইল। বাক্স বিছানা খুলিবার অবকাশও হইলনা। কোনোমতে নাহিয়া খাইয়া রাজুর মায়ের আগ্রহের আতিশয্যেই একরকম, তাহারা গাড়ী করিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। সুপর্ণারও ইচ্ছা ছিল একবার ত্রিবেণী-সঙ্গমে ডুব দেয়, কিন্তু চারিদিকে যাত্রীর ভিড়, পাণ্ডার কোলাহল, ইহার ভিতর পিতা তাহাকে নিশ্চয়ই স্নান করিতে দিবেননা, তাহা সে বুঝিতেই পারিল। অগত্যা মাথায় গঙ্গাজল ছিটাইয়া যতদূর পুণ্য-সঞ্চয় করা যায়, তাহা সে করিয়া লইল। রাজুর মার অত ভদ্রতার বালাই ছিলনা, সে জলে নামিয়া দিব্য স্নান করিল, পাণ্ডাদের সঙ্গে সমানে গলা চড়াইয়া দর-কষাকষি করিল, কত সস্তায় কত ওজনের পুণ্য উপার্জ্জন করা যায়, তাহার হিসাব-নিকাশের কোনো ত্রুটিই করিলনা।

এই স্থানটিতে আসিয়া সুপর্ণা একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছিল। দিল্লী, আগ্রা, পাঠান বা মোগলের নামের সঙ্গে তাহার পরিচয় নাই; কিন্তু প্রয়াগের নাম, ত্রিবেণী-সঙ্গমের নামের সঙ্গে তাহার আবাল্য পরিচয়। কল্পনায় কতবার কতরকম করিয়া এই স্থানটিকে সে দেখিয়াছে। শ্বশুরবাড়ীতে তাহার সুখ-শান্তি কিছুই ছিলনা। কতবার মনে মনে ভাবিয়াছে, কোন মতে কোনো তীর্থস্থানে পলাইয়া যাইতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়। সুখ তাহার অদৃষ্টে নাই, তবু শান্তি পায়। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, এ নামগুলি তাহার বড় চেনা।

স্থানটিকে ঠিক ঐ রকম বলিয়া সে ভাবে নাই, কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিল ইহা তাহার চেয়েও সুন্দর। যমুনার উদার সুনীল প্রসার, পরপারে ছায়া-ছবির মত তরুশ্রেণী, পল্লীগ্রাম, ঝুঁসীর দেবালয়। সারে সারে নৌকা চলিয়াছে, কত দেশের কত যাত্রী আসিতেছে, ফিরিয়া যাইতেছে, কত রকম তাহাদের পোষাক, কত রকম তাহাদের ভাষা। রঙ্গীন চুনারী শাড়ী পরা, সিন্দুর এবং টিপে সুশোভিতা হিন্দুস্থানী যুবতীগুলিকে সুপর্ণার বড় ভাল লাগিল। সে হিন্দি ভাল করিয়া জানেনা, না হইলে ইহাদের সঙ্গে ভাব করিতে চেষ্টা করিত। আকবরের দুর্গ তাহার চোখে দেখিতে ভাল লাগিল, কিন্তু ইহার বিরাট সৌন্দর্য্য তাহার মনকে স্পর্শ করিলনা। কে আকবর সে জানেনা; কি তিনি করিয়াছিলেন, তাহাও জানেনা। কিন্তু অক্ষয় বট দেখিবার তাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল, সময়াভাবে দেখা যে গেলনা, তাহাতে সে দুঃখিতও হইল।

নৌকা করিয়া ফিরিয়া যাইবার পথে ছোট একটি ভগ্নপ্রায় মন্দির দেখিল। নদীর উঁচু পাড়ের উপর উহা অবস্থিত; সিঁড়িও নাই, কিছুই নাই, সরু মেটে পথ, নদী পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। দুই চারিখানি যাত্রী-নৌকা এখানেই অপেক্ষা করিতেছে। কয়েকজন বাঙালী যাত্রী মন্দির দর্শন করিয়া অতি সন্তর্পণে নামিয়া আসিতেছে। বিপুল অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত এই নিরালা দেব-মন্দিরটি সুপর্ণার মন যেন টানিয়া লইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই মন্দিরটির নাম কি বাবা?"

প্রতুলচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "মনস্কামনেশ্বরের মন্দির।"

সুপর্ণা হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিল, মনে মনে কি

কামনা সে মনস্কামনেশ্বরকে জানাইল, তাহা তিনিই কেবল শুনিলেন।

এলাহাবাদে দেখিবার স্থান আরো ঢের ছিল, কিন্তু অধিক ঘোরাঘুরি করিয়া সুপর্ণা পাছে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে প্রতুলচন্দ্র আর বাহির হইলেন না। সুপর্ণারও ত্রিবেণী ভিন্ন আর কিছু দেখিবার বড় বেশী উৎসাহ ছিলনা।

পরদিন আবার ট্রেনে চড়িয়া বসিতে হইল। প্রতুলচন্দ্র এই একদিনের জন্য তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতেই উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা যথেষ্টই সমাদর করিলেন। রাজুর মা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল, তাঁহারা টিফিন্ বাস্কেট্ ভরিয়া নানারকম খাবার দেওয়ায়। ট্রেণে ভ্রমণ করা সুপর্ণার কোনো কালে অভ্যাস নাই, সে কিছু খাইতে পারিতনা, তাহার মাথা ঘুরিত। প্রতুলচন্দ্রও মিতাহারী, সুতরাং সুখাদ্যগুলির সদ্ব্যবহার করার ভার প্রধানতঃ রাজুর মায়ের উপরেই পড়িত। ষ্টেশনে যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিয়া সে সুপর্ণাকে বলিল, "চমৎকার লোক এঁরা দিদিমণি, কত আদর যত্ন করল, ভদ্দর লোক না হলে এমন করেনা।"

সুপর্ণা হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, খুব করে খেতে পারবে, কাজেই তোমার ভাল লাগ্ছে।"

রাজুর-মা লজ্জিত হইয়া বলিল, "আর দিদিমণি খাওয়া, —খাওয়ার বয়স কি আর আছে? তবে হাওয়াটা বদল হওয়ায় এখন দুচারখানা একটু খেতে পারছি। কিন্তু তুমি যাহোক নিখাউতি দিদিমণি, একেবারে যেন দাঁতে কুটো দিয়ে আছ। তোমাদের বয়সে আমরা পাথর খেয়ে হজম করেছি।"

এবারকার গাড়ীতে বিশেষ সুবিধা হইবেনা তাহা ষ্টেশনে পৌছিয়াই বুঝা গেল। ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য, তাহার ভিতর মুসলমান অনেকগুলি, বাঙালী প্রায় নাই বলিলেই হয়। প্রতুলচন্দ্র রাজুর মাকে বলিলেন, "এবারে বেশ সাবধানে থাকবে। তবে অনর্থক গোলমাল বাধিও না।"

এত মুসলমান দেখিয়া রাজুর-মা এবং সুপর্ণা দুইজনেরই চক্ষুস্থির হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের সহিত এক গাড়ীতে যাইতে হইবে নাকি? রাজুর-মা বলিল, "হে মা, এই লোকদের সঙ্গে যেতে হবে নাকি? তাহলেই হয়েছে খাওয়া-দাওয়া আমাদের!"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "পথে-ঘাটে অত বিচার করতে গেলে চলেনা। ওরাও মানুষ, তোমরাও মানুষ।"

ট্রেণ আসিয়া পড়িল। মেয়েদের গাড়ীতে লোক ছিল, তবে তখনও ভীড় হয় নাই। রাজুর-মা এবং সুপর্ণা গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল; জিনিষপত্র এবার ভাগাভাগি করিয়া, কিছু প্রতুলচন্দ্রের সঙ্গে, কিছু মেয়েদের গাড়ীতে দেওয়া হইল।

গাড়ীর ভিতর যে সকল যাত্রিনী বসিয়া ছিলেন, তাঁহারা কেহই বাঙালী নন, কাজেই গল্প করিবার কোনো সুযোগ এবারে হইলনা। দুটি বেঞ্চ একেবারে ঠাশা; একটা বেঞ্চে গুটি-দুই তিন মুসলমান-শিশু বসিয়া ছিল, সুপর্ণাকে উঠিতে দেখিয়া তাহারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট পলায়ন করিল। খালি বেঞ্চ পাইয়া সুপর্ণা এবং রাজুর-মা আরাম করিয়া বসিল।

কিন্তু আরাম বেশীক্ষণ করিতে হইলনা। গাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে, এমন সময় গুটি-দুই মুসলমান স্ত্রীলোক, একগাদা জিনিষপত্র লইয়া হুড়মুড় করিয়া গাড়ীর ভিতর আসিয়া পড়িল। সুপর্ণার অনভিজ্ঞ চোখে তাহাদের বিশেষত্ব কিছু ধরা পড়িলনা, কিন্তু রাজুর-মা একেবারে ছিট্‌কাইয়া বেঞ্চের এক কোণে সরিয়া গেল। ফিশ্‌ফিশ্ করিয়া সুপর্ণার কাণের কাছে বলিল, "ওমা, এ যে দেখি বাইজী।"

সুপর্ণা স্ত্রীলোক দুইটির দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল। মেয়েমানুষ, অথচ পুরুষের মত পায়জামা, ওয়েষ্ট কোট পরা দেখিয়া তাহার বড়ই অদ্ভুত লাগিল। ইহাদের সঙ্গে জিনিষ-পত্র অনেক, তাহার ভিতর বাদ্যযন্ত্রও নানা রকম রহিয়াছে। সুপর্ণা বলিল, "মাগো মা, কি করে যে অত পথ যাব জানিনা, আরো যদি লোক ওঠে ত উপায় কি হবে?"

যাহা হউক, লোক আর উঠিল না, এবং গাড়ী এলাহাবাদ ষ্টেশন ছাড়িয়া বাহির হইয়া চলিল। বাইজীদের বিদায় দিতে আরো দুইটি স্ত্রীলোক আসিয়াছিল, তাহারা গাড়ী ছাড়িবামাত্র গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল, প্ল্যাটফর্ম্মের লোকজন বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহাদের দিকে তাকাইতে লাগিল। সুপর্ণাও খানিকটা অবাক্ হইল। এই জাতীয় জীবদের মনেও যে স্নেহ-মমতা আছে, তাহা তাহারা কোনো দিনও মনে করে নাই।

গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাইবামাত্র গাড়ীর ভিতরের বাইজীরা ওড়নায় চোখ-মুখ মুছিয়া গুছাইয়া বসিলেন। একজন আয়না চিরুণী বাহির করিয়া চুল ঠিক

করিতে লাগিলেন, আর একজন সুর্ম্মা লইয়া চোখের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে বসিয়া গেলেন। অন্যান্য যাত্রিনীরা এতক্ষণে বোরকা শোভিত হইয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁহারাও এখন ঘেরাটোপ হইতে বাহির হইয়া সহযাত্রিনীদের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাইজীদ্বয় বেশ সপ্রতিভ দিলদরিয়া মানুষ, সহযাত্রিনীদের সঙ্গে ভাব জমাইবার তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অযাচিতভাবেই সুপর্ণাকে জানাইল যে, তাহারা আগ্রায় যাইবে, অতএব টুণ্ড্‌লা পর্য্যন্ত এই গাড়ীতেই আছে। সুপর্ণা দিল্লী যাইবে শুনিয়া একজন বলিল গানের বায়না লইয়া তাহারাও অনেকবার দিল্লী গিয়াছে।

তাহাদের উর্দ্দু ঘেঁষা হিন্দি সুপর্ণা খুব কমই বুঝিতেছিল, তবু মানুষ দুইটা কথা যখন বলিতেছে, তখন সে আন্দাজে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে একটু একটু উত্তর দিতে লাগিল। বাইজী পদার্থ-টা যে কি তাহা সে খুব ভাল করিয়া বুঝিতনা, সুতরাং রাজুর-মার মত অত নাক সিঁট্‌কাইবার প্রবৃত্তি তাহার হইতেছিলনা। তবে খানিক পরেই একজন বাইজী বিড়ি বাহির করিয়া ধরানোতে সুপর্ণার উৎসাহ অনেকটা কমিয়া গেল, গন্ধে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বাইজীদের সঙ্গে এক ভৃত্য চলিয়াছে, তাহার নাম হায়দার আলি। প্রতি ষ্টেশনে নামিয়া সে মনিব দুইটির সেবা-যত্ন অতিশয় আগ্রহ সহকারে করিতে লাগিল। রাজুর-মা ইহাতে আরো চটিয়া গেল, এবং বিড়বিড় করিয়া নানাবিধ মন্তব্য করিতে লাগিল, সেগুলি অবশ্য সুপর্ণা শুনিতে পাইল না।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইয়া চলিল, কোথাও মানুষ নামে, কোথাও ওঠে, মোটের উপর গাড়ীর ভিতরকার ভীড় সমানই রহিল। খাওয়া-দাওয়া করিবার প্রবৃত্তি সুপর্ণার বিশেষ ছিলনা, নিতান্ত রাজুর-মার জেদাজিদিতে অন্য যাত্রিনীদের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া সে সামান্য কিছু খাইল। রাজুর-মা বক্তৃতা যতই করুক, ক্ষুধার কোনো অভাব তাহার দেখা গেল না। বাহিরের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গাড়ীর ভিতরেও সকলেই খানিকটা মুষ্‌ড়াইয়া পড়িল। গল্প জমাইবার মত উৎসাহ কাহারো দেখা গেল না, অনেকে বসিয়া বসিয়া ইহারই ভিতর ঢুলিতে লাগিল।

বাইজী দুইটিই খালি দমিলনা। তাহারা খুব উঁচু গলায় পরস্পরের সহিত গল্প চালাইয়া চলিল। মাঝে মাঝে গল্পে মন্দা পড়ে, একটু হয়ত ঝিমাইতে ইচ্ছা করে, অমনি তাহাদের ভিতর কমবয়সী যেটি সে তুড়ি দিয়া হাঁক দিয়া ওঠে, "ইয়া খুদা, তেরা শুক্‌র্ হ্যায়!" আবার গল্প পুরাদমে চলিতে থাকে। সুপর্ণা প্রথম এই চীৎকারের অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলনা, মানুষটাকে তাহার পাগল বোধ হইতেছিল। কোনও এক ষ্টেশনে প্রতুলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও মেয়েটা কি বলে চেঁচাচ্ছে বাবা?"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "হরি হে, তুমিই সত্য" গোছের কিছু হবে। যে রকম বাজনা নিয়ে যাবার ঘটা, তোদেরও গান-টান পথে দু-একটা শুনিয়ে দেবে এখন দেখিস্।"

সত্যই তাই হইল। সহযাত্রিনীরা নিতান্তই অকালে ঘুমাইয়া পড়িবার জোগাড় করিতেছে দেখিয়া, ছোট বাইজী তাড়াতাড়ি একটা বক্স হারমোনিয়ম টানিয়া বাহির করিল। তাহার ঢাকনাটা তুলিয়া ফেলিয়া পূর্ণ বিক্রমে বাজাইতে সুরু করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ মোটা গলায় গান ধরিল "নারাজিয়া হরে তুয়া বিনা রহা নাহি যায়।"

সুপর্ণা গাড়ীর গায়ে হেলান দিয়া ঝিমাইতেছিল, গানের তরঙ্গ তাহার কর্ণপটহের উপর ভীমবেগে আছড়াইয়া পড়িতেই সে চট্ করিয়া সোজা হইয়া বসিল। মেয়েমানুষের গলা দিয়া যে এমন স্বর বাহির হইতে পারে, তাহা তাহার ধারণা ছিলনা। কিন্তু গলা যেমনই হউক, মানুষটা যে গান গাহিতে জানে তাহা সুপর্ণা অনভিজ্ঞা হইয়াও বুঝিতে পারিতেছিল। বাইজী শুধু গান গাহিয়াই সন্তুষ্ট নহেন, শ্রোতৃবর্গ তারিফ করিতেছে কি না, তাহাও তিনি বারবার খোঁজ করিতেছিলেন। মোটের উপর আসর জমান অভ্যাস থাকায় এই দুইজন মহিলা সারা পথ নানাভাবে আসর জমাইয়াই চলিলেন।

রাত্রি আসিয়া পড়িল। কে যেন সুপর্ণাকে বলিয়া দিয়াছিল দিল্লীর লাইনে ট্রেণে বড় চুরি হয়, সেই কথা তাহার বারবার মনে হইতে লাগিল। ঘুম পায় অথচ ঘুমাইতে ভরসা হয় না। ঢুলিয়া পড়ে, আবার উঠিয়া বসে। টুণ্ড্‌লা জংশনে বাইজীরা খুব সোরগোল করিয়া নামিয়া গেলেন। গাড়ীর ভিতরটা একেবারে নীরব হইয়া গেল।

রাজুর-মা বলিল "নাও, হাত পা ছড়িয়ে একটু শুয়ে

নাও দিদিমণি, এখন তবু একটু জায়গা আছে। আবার কে কখন হৈ হৈ করে এসে জুটবে।"

সুপর্ণা বলিল "কেমন যেন গা ছম্‌ছম্‌ করে।" রাজুর-মা জাঁক করিয়া বলিল "ভয় কি দিদিমণি, আমি থাকতে? যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ তোমার কাছে কেউ এগোতে পারছে না।" সুপর্ণা বেঞ্চের অপরিসর জায়গার মধ্যে গুটিসুটি মারিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রি গভীরতর হইয়া আসিল, ট্রেণের শব্দ ভিন্ন আর কোনো শব্দ নাই। মাঝে মাঝে ষ্টেশনে গাড়ী থামে, গোলমালে সুপর্ণার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। মানুষ উঠিতেছে, নামিতেছে, গোলমাল, ঝগড়া ঝাঁটি, সব যেন স্বপ্নের ঘোরে শুনিয়া যায়। আবার ঘুমাইয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে চোরের ভয়ে ধড়মড় করিয়া জাগিয়া ওঠে। রাজুর-মা সুপর্ণার রক্ষণাবেক্ষণ করার দায় হইতে অনেকক্ষণ নিজেকে মুক্তি দিয়াছে। বেঞ্চে পা ছড়াইয়া, প্রবল নাসিকাধ্বনি সহকারে সে ঘুমাইতেছে। এই রকম ঘুম আর জাগরণের ভিতর দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল।

ভোরের আলো ধরণীর সুপ্ত বক্ষে প্রথম স্পর্শ বুলাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী আসিয়া দিল্লী ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। প্রতুলচন্দ্র ষ্টেশনের গোলমালে প্রথম জাগিয়া উঠিলেন, এবং তাড়াতাড়ি মেয়েদের গাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিলেন, সুপর্ণা এবং রাজুর-মা দুজনেই ঘুমাইতেছে। জানলা দিয়া হাত গলাইয়া সুপর্ণার কাঁধ ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিলেন "ওরে ওঠ, ওঠ, ষ্টেশন ত এসে পড়েছে।"

রাজুর-মা এবং সুপর্ণা দুইজনেই এক সঙ্গে উঠিয়া বসিল। তার পর জিনিষপত্র নামান, নিজেদের নামার ধূম পড়িয়া গেল।

দিল্লী ষ্টেশনটি বিরাট, ভারতবর্ষের চিরন্তন রাজধানীর উপযুক্ত বটে। সুপর্ণা ফিশ্‌ ফিশ্‌ করিয়া বলিল, "বাবা, এ যে কলকাতার চেয়েও বড়!"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "তুই কি মনে করেছিলি, কলকাতার চেয়ে বড় কোথাও কিছু থাকতে পারেনা?"

দেখা গেল ষ্টেশনটিই শুধু কলিকাতার চেয়ে বড় নয়, প্রায় সকল বিষয়েই দিল্লী কলিকাতা হইতে শ্রেষ্ঠ। মুটে-ভাড়া, গাড়ীভাড়া যেরূপ শোনা যাইতে লাগিল, তাহাতে ত প্রতুলচন্দ্রের চক্ষু কপালে উঠিবার উপক্রম করিল। ইহারা দুনিয়াকে চিনিয়াছে ভাল। হাজার হোক, পুরাতন সহরের বাসিন্দা, ইহাদের তুলনায় কলিকাতার লোক ত অতি অর্ব্বাচীন।

এমন সময় প্রৌঢ় তারণবাবু এক রকম ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতুলচন্দ্রকে দেখিয়া আবেগ-ভরে তাঁহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "এসে পৌছতে একটু দেরি হয়ে গেল, কিছু মনে করবেননা। কলকাতার গাড়ীটা এমনই ভোরে পৌছয় যে উঠে আসা শক্ত।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন "আমি ত আশাই করতে পারিনি যে এত ভোরে কেউ আসতে পারবেন। গাড়ীওয়ালাদের সঙ্গে দর করছিলাম, তা দর যা শুন্‌লাম তাতে আর ভরসা হচ্ছিলনা। সত্যিই এখানে এই রকম দর নাকি?"

তারণবাবু বলিলেন "ওসব জোচ্চোরদের পাল্লায় যাবেন না ত। আমার বাড়ী এমন কিছু দূরে নয়, দশ মিনিট হাঁটলেই পৌছে যাবেন। আমরা ত পারত পক্ষে গাড়ী চড়িই না।" সুপর্ণার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "কি বল মা, পারবে হাঁটতে? আমার গাড়ীটা মিস্ত্রিখানায় গিয়েই ত বিপদ বাধাল।"

সুপর্ণা বলিল "তা খুব পারব।"

কুলির মাথায় জিনিষ চাপাইয়া তাঁহারা তখনই ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। দুই একটি টঙ্গাওয়ালা তাঁহাদের অনুসরণ করিল, এবং অপেক্ষকৃত অল্প ভাড়ায় যাইবার প্রস্তাব কয়েকবার করিল। তারণবাবু দুই ধমক দিয়া তাহাদের বিদায় করিয়া দিলেন, এবং আরো মহোৎসাহে চলিতে লাগিলেন।

দিল্লীর পথে পা দিয়া প্রতুলচন্দ্রের হৃদয় অপূর্ব্ব ভাবা-বেগে দুলিয়া উঠিল বটে, কিন্তু সুপর্ণা বিশেষ কিছু অনুভব করিলনা। দিল্লীর নামে তাহার মনোবীণার কোনো তারে আঘাত পড়িলনা। তবে ইহার বিরাট ভাব, ইহার বহু-জাতীয় অধিবাসীর দল, ইহার পাথরে বাঁধান রাস্তা-ঘাট, সকলি তাহাকে কিছু কিছু বিস্মিত করিল।

কয়েক মিনিট পরে তারণবাবুদের বাড়ী আসিয়া সকলে পৌছিলেন। বাড়ীটি সহরের মধ্যেই তবে খুব বেশী ঘিঞ্জির মধ্যে নয়। দুইতলা বাড়ী, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,

সাজান গোছান। তাঁহাদের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র চাকর বাকর, একটি তেরো চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে এবং তাহার চেয়ে ছোট একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল। চাকররা মুটেদের মাথা হইতে জিনিষপত্র নামাইয়া উপরে লইয়া চলিল। মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া সুপর্ণার হাত ধরিয়া বলিল, "এস ভাই, তোমাদের এত দেরি হচ্ছিল যে আমি ভাবলাম যে, শেষ অবধি আজকের ট্রেণে আর এলেই না।"

সুপর্ণা বলিল, "আমরা হেঁটে এলাম কি না, তাই দেরি হয়ে গেল। তুমি অমিতা ত?"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "তা ছাড়া আর কে হতে যাব? তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে?"

সুপর্ণা বলিল, "হ্যাঁ।"

তারণবাবু বলিলেন "চল সব ওপরে, চায়ের সব জোগাড় আছে ত?"

অমিতা বলিল, "সব ঠিক। আমি ভোরেই উঠেছি না?"

সকলে মিলিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। অমিতা সুপর্ণাকে নিজের ঘরে লইয়া গেল। সেখানে সে কাপড় চোপড় ছাড়িয়া, হাত মুখ ধুইয়া আসিল। একজন বাঙালী চাকর আছে শুনিয়া রাজুর-মা খুসি হইয়া রান্নাঘরে গিয়া অধিষ্ঠান করিল।

অমিতা খুব গিন্নির মত মুখ করিয়া সকলকে চা, জল-খাবার পরিবেশন করিতে লাগিল। তারণবাবু বলিলেন, "আমার ছোট্ট-মা এরই মধ্যে কেমন গিন্নি হয়ে উঠেছে দেখেছেন?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "গিন্নিগিরিটা বাঙালীর মেয়ের মজ্জাগত দেখ্‌ছি।"

বাঙালীর মেয়ে দুইটি পরস্পরের দিকে তাকাইয়া হাসিল।

(১১)

মানুষের জীবন নশ্বর, খেলাঘর পাতিয়া ভাল করিয়া বসিবার আগেই, তাহার ডাক পড়ে। তাহার পর সাধারণ লোকে বাঁচিয়া থাকে সন্তান-সন্ততির জীবনে; অসাধারণ লোক বাঁচে নিজের কীর্ত্তির মধ্যে, অক্ষয় যশের মধ্যে। পুরাতন দিল্লীর স্থানে, এখন নূতন দিল্লী,—মোগল পাঠান বাদশাহের স্থলে ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি। কিন্তু পুরাতন দিল্লী এখনও রোমান্সের রাজ্যের রাজধানী, উপকথার একচ্ছত্র সম্রাট এখনও সেকালের সম্রাটরাই। সেখানে কাল কোনই পরিবর্ত্তন ঘটায় নাই।

পুরাতন দিল্লীর এইরূপ একটি ঐতিহাসিক তীর্থক্ষেত্রের সম্মুখে অনেকগুলি বাঙালী স্ত্রী পুরুষ গাড়ী হইতে নামিতেছিল। বাড়ীর মোটরকার একটি, ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী একটি। স্থানটি বিখ্যাত মুসলমান সাধু নিজামউদ্দীন্ আউলিয়ার সমাধি-ক্ষেত্র।

মোটর হইতে নামিয়া একটি তরুণী বলিল, "নাও এসে ত পড়া গেল, গাড়ীর রকম দেখে আর ভরসা হয়নি।"

আর একটি তরুণী বলিল, "বাস্তবিক, আমি ভাবছিলাম, পাঠান বাদশাহের জ্ঞাতি-গুষ্টির মধ্যে আমরাও সমাধিলাভ করব। কাশীনাথ বড় বড়াই করে ভাল গাইড্ বলে এবার একেবারে পরলোকের গাইড হয়ে উঠ্‌বার জোগাড় করেছিল।"

গাইড্ কাশীনাথ খাঁটি দিল্লীওয়ালা, বহু পুরুষ ধরিয়া তাহারা এই কাজ করিতেছে। এ হেন অপবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া, সে চোস্ত উর্দ্দুতে অনর্গল বক্তৃতা দিয়া চলিল। ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়ার যদি ঠ্যাং খোঁড়া হয়, সেটাও কি তাহার দোষ? গাড়ীর চাকা যদি খুলিয়া যায়, সেও কি তাহার দোষ?

একটি প্রৌঢ়া মহিলা কিঞ্চিৎ ব্যস্তভাবে বলিলেন, "নে বাপু অমিতা, তোদের গাইডের বক্তৃতা থামা, বিকেল গড়িয়ে এল, বাড়ী ফিরবি কখন? তোদের মত ত পিসীমার কচি হাড় নয়?"

অমিতা বলিল, "এইয়ো কাশীনাথ, থাম ত বাপু। বক্তৃতা ভিতরে গিয়ে দিও। বাজে অপব্যয় করছ কেন? কি বল্ ভাই সু, কথা বলাই যার ব্যবসা, সে অকারণে কথা খরচ করলে চলে কখনও?"

সু ওরফে সুপর্ণা বলিল, "সাধে কি আর কথা খরচ করছে? এখানে যে ওদের দাঁত ফোটাবার জো নেই? নিজামউদ্দীনে এঁদের প্রবেশ নিষেধ, এখানে ওদের সব নিজস্ব গাইড্ আছে না?"

সুপর্ণাকে এখন দেখিলে কেহ আর সেই পাড়াগাঁয়ের নির্য্যাতিতা, উৎপীড়িতা বালিকা বলিয়া চিনিতে পারিবেনা। এই তন্বী, সুবেশা, সুরূপা যুবতীর ভিতর অতীত কালের

সেই সুবর্ণের চিহ্নমাত্রও নাই। তাহার সপ্রতিভ ভাবভঙ্গী, তাহার কথাবার্ত্তা, সবই চেহারার সঙ্গে সঙ্গে বদল হইয়া গিয়াছে। এই কয়েকটা বৎসরে তাহার জন্মান্তর ঘটিয়াছে। নিষ্ঠুর অতীতকে সে ভুলিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, অনেক পরিমাণে সক্ষমও হইয়াছে। সেই ভয়াবহ দিনগুলিকে স্মরণ করাইয়া দিবার মত এখানে কিছুই নাই। প্রতুলচন্দ্র বৎসরে এক-আধবার আসিয়া কন্যাকে দেখিয়া যান, ইহাই মাত্র পূর্ব্ব জীবনের সঙ্গে তাহার বাহিরের সম্পর্ক। অন্তরলোকে তাহার কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা সুপর্ণা ভিন্ন অন্য কেহ জানেনা।

অমিতার পিসীমা, ছেলে পিলে, সকলকে লইয়া, ভাইয়ের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছেন, তাই তাঁহাদের সকলকে লইয়া রাজধানীর ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া বেড়ান হইতেছে। দলটি কম নয়, কাজেই বাড়ীর গাড়ীতে কুলায় নাই; একটি ভাড়াটে গাড়ীও সংগ্রহ করা হইয়াছে।

বাহির হইতে নিজামউদ্দীনের সমাধিক্ষেত্রের স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য কিছুই বোঝা যায়না। শ্যাওলা এবং কালের প্রকোপে হতশ্রী কয়েকটি গুম্বজ ভিন্ন কিছুই আর দেখা যায়না। এক হাঁটু ধূলা অতিক্রম করিয়া সুপর্ণাদের দল প্রধান গেটের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলকে জুতা খুলিয়া রাখিতে হইল, কারণ জুতা পরিয়া পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। এখানকার একটি গাইড্ আসিয়া জুটিল। দিব্য রাজপুত্রের মত চেহারা, ফিট্‌ফাট পোষাক, চালচলন এমনই কেতাদুরস্ত যে তাহাকে বাদশাহজাদা বলিয়া ভ্রম হয়।

অমিতা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সুদর্শনবাবু গেলেন কোথায়?"

একটি বলিষ্ঠদেহ, শ্যামবর্ণ যুবক অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "আমি ঠিক আছি, গাড়ী থেকে পড়ে যাইনি। ফিরবার পথে আর একটা গাড়ী সংগ্রহ করা যায় কি না, তাই দেখছিলাম। নইলে এই গাড়ীতে যেতে হলে রাত বারোটার আগে পৌঁছবার কোনো সম্ভাবনা থাকবেনা।"

সুপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল "পেলেন কোন গাড়ী।"

সুদর্শন বলিল, "আমার এক ক্লাশফ্রেণ্ডের সঙ্গে বাইরে দেখা হল, তাকে ভার দিয়ে এলাম। চলুন, এগোন যাক।"

সকলে চলিতে আরম্ভ করিল। একটি সিঁড়িসংযুক্ত কূপের কাছে আসিয়া গাইড্ বলিল, ইহার জল মন্ত্রপূত, নানাপ্রকার রোগ আরোগ্য করার ক্ষমতা ইহার আছে। জলটি একেবারে সবুজবর্ণ। বহু নরনারী, বালকবালিকা এখানে স্নান করিয়া জল ঢালিয়া দিতেছে।

সুপর্ণা বলিল, "বিশেষ একটা জলের এমন সুখ্যাতি কি করে যে দাঁড়িয়ে যায়, আমি ভেবেই পাইনা। আচ্ছা, সুদর্শনবাবু, আপনি ত full-fledged ডাক্তার হলেন বলে, আপনি বলুন ত কি করে এটা হয়?"

সুদর্শন বলিল, "এটা ডাক্তারী সায়েন্সের বাইরের জিনিষ। Faith-healing, চিরকাল, সব দেশেই চলিত আছে। অবশ্য জলের গুণও না থাকতে পারে, তা আমি মনে করি না। ধরুন, যদি জর্ম্মণীর বা ফ্রান্সের গরম জলের ফোয়ারা, বা ধাতুমিশ্রিত জলের ফোয়ারার মত হয়। তাতে ত কত রোগ সারছে।"

সুপর্ণা বলিল, "সেখানে ত একটা কারণ বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু এখানে যে কিছু বুঝবার জো নেই। ছেলেবেলা পাড়াগাঁয়ে জলপড়া দিয়ে রোগ সারাতে দেখতাম। এখন বুঝতে পারিনা, কি করে অসুখ সারত,—সত্যিই সারত কিন্তু।"

সুদর্শন বলিল, "আপনার ছেলেবেলার সব গল্প শুনতে আমার ভারি ভাল লাগে। কিছুই যদিও বিশেষ শুনিনি। বাঙালীর ছেলে হয়েও আমি বাংলাদেশ দেখিনি বললেও চলে।"

সুপর্ণার মুখখানা কেমন যেন গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, "কেন, আপনি কলকাতায় ত কয়েক বৎসরই ছিলেন।"

সুদর্শন বলিল, "কলকাতাকে আর বাংলাদেশ বলবেন না। ওটা জগতের যে কোন জায়গায় পাওয়া যেত। পাড়াগাঁয়েই একটা দেশের আসল পরিচয় পাওয়া যায়।"

সুপর্ণা বলিল, "তা কিন্তু ঠিক বলে আমার মনে হয়না।"

সুদর্শন বলিল, "কেন?"

সুপর্ণা বলিল, "জাতির মধ্যে শিক্ষায়, অর্থে, মানে, সম্ভ্রমে, অনুসন্ধিৎসায় যারা শ্রেষ্ঠ, সবাই প্রায় গ্রাম ছেড়ে এসেছে। পাড়াগাঁয়ে টিঁকে আছে কেবল তারাই যাদের আর গতি নেই,—অন্য কোথাও গেলে, খায়া না খেয়ে মরবে। তাদের পরিচয় পেলেই কি দেশের যথার্থ পরিচয় পাওয়া হল?"

সুদর্শন কি যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় অমিতা চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই সু, কি করছিস্ বল ত? ডাক্তারী আলোচনা না অন্য কোনো তত্ত্বের আলোচনা? দেখিস্ যেন হোঁচোট্ খেয়ে পড়িস্না।"

তাহারা লম্বা একটি সুড়ঙ্গের মত চারিদিক চাপা পথে প্রবেশ করিতেছিল, সুতরাং অমিতা হোঁচোট্ খাওয়ার কথাটা সম্ভবতঃ সোজাসুজিই বলিয়াছিল। সুপর্ণার মুখ কিন্তু একেবারে রক্তাভ হইয়া উঠিল, সে হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া গিয়া বড় দলের মধ্যে মিশিয়া গেল। সুদর্শনের মুখে একটু অপ্রতিভ হাসি দেখা দিল, সেটা কিন্তু সে চট্ করিয়া সামলাইয়া লইল। তাহার পর, সহজ ভাবে হাঁটিয়া সেও সকলের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে চলিল।

সুদর্শন এখানেরই এক প্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোকের ছেলে। Final M. B. পরীক্ষা দিয়া, কলিকাতা হইতে সবে ফিরিয়া আসিয়াছে। পরীক্ষার ফলাফল এখনও বাহির হয় নাই; তবে সুদর্শন যে খুব কৃতিত্বের সহিত পাশ করিবে, সে বিষয়ে তাহার বা অন্য কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কলেজের পরীক্ষায় সে সর্ব্বদাই প্রথম স্থান অধিকার করিত।

সুড়ঙ্গটি শেষ হইতে বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগিল। অমিতা বলিল, "এ আচ্ছা জায়গা বাবা, কোথায় যে যাচ্ছি তার ঠিক ঠিকানা নেই।"

সুপর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "সত্যি, এর ভিতর কেউ যদি মাথায় একটা চাঁটি দেয়, বাইরের আলোয় বেরিয়ে কার accountএ সেটা জমা করব, তা ভেবেও পাবনা।"

অমিতা তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ফিস্ করিয়া বলিল, "চাঁটি না হয়ে যদি অন্য কিছু হয়?"

সুপর্ণা তাহাকে একটা চিম্‌টি কাটিয়া ঠেলিয়া দিল। সুদর্শন সুপর্ণার কথাটা শুধু শুনিয়াছিল, অন্ধকারে দুই সখীতে কিছু একটা রসিকতা হইয়া গেল, এই পর্য্যন্ত সে বুঝিল, কিন্তু কাহাকে লইয়া যে ঠাট্টাটা হইতেছে, তাহা ঠিক বুঝিলনা।

দিনের আলোয় বাহির হইয়া আসিয়া অমিতার পিসীমা বলিলেন "বাঁচলাম বাবা, ঠিক যেন পাতাল প্রবেশ হচ্ছিল। এ জায়গাটা কি?"

গাইড্ ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, ইহা মোগল সম্রাটদের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র। এখানে যাঁহারা সমাধিস্থ, তাঁহারা ইতিহাসে বিশেষ কোনো নাম রাখিয়া যান নাই, এক একজনের নশ্বর দেহকে স্থান দান করিবার জন্য বিরাট সৌধ ইঁহাদের জন্য কেহ নির্ম্মাণ করে নাই। নিতান্তই এক ঘরের মানুষের মত কাছাকাছি জায়গায় সকলে অনন্তশয্যা বিছাইয়াছেন। গাইড্ বলিয়া চলিল "এই শেষ সম্রাট, এই তাঁর ভাই শাহ্‌জাদা জাহাঙ্গীর, এই দ্বিতীয় আকবর, ইত্যাদি। একটি একটি ছোট উঠানের মত, চারিদিকে তাহার বিচিত্র রঙ্গীন কাজ করা শ্বেত পাথরের দেওয়াল, ইহারই ভিতর এক একটি কবর। এক একটি আঙ্গিনার ভিতর মধ্যে মধ্যে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যারও সমাধি রহিয়াছে। মরণের ভিতরেও ইঁহারা যেন মায়ার বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কালের প্রকোপ কোথাও ইহাদের সৌন্দর্য্যের হানি করিতে পারে নাই। মার্ব্বেল পাথরের রং এখনও বিন্দুমাত্রও মলিন হয় নাই।

বিখ্যাত কবি আমীর খশ্রুর সমাধি। রাজসিক আড়ম্বরের ঘটা এখানে মৃত্যুকে যেন উপহাস করিতেছে। ধবধবে বিছানা পাতা, তাহার উপর রাশিকৃত ফুল ঢালা, চারিদিক আতর গোলাবের গন্ধে আমোদিত। ছাদ হইতে সোণার বাতিদান ঝুলিতেছে। স্বয়ং নিজামউদ্দীনের সমাধিও এমনি করিয়াই সাজান। এখানে মুসলমান পাণ্ডার উৎপাত কিছু বেশী।

পীরের নামে পয়সা দিবার জন্য পীড়াপীড়ি চলিতেছে দেখিয়া সুপর্ণা বলিল "পাণ্ডাবৃত্তি নেই, এমন কি কোনো ধর্ম্ম জগতে থাকতে নেই?"

সুদর্শন বলিল, "আছে, তবে তাদের Followers বেশী নেই। সাংসারিক দিক দিয়ে যাকে বেশ কাজে না লাগান যায়, অমন ধর্ম্ম নিয়ে কি হবে?"

অমিতা বলিল, "দু'পয়সা গুছিয়ে নেবার জন্যেই বুঝি ধর্ম্মকর্ম্মের প্রয়োজন?"

সুদর্শন বলিল, "না ত কি? যা মানুষকে বেঁচে থাকার পথে সাহায্য করবে না, এমন ধর্ম্ম নিয়ে কি হবে? ক'জন লোক তা গ্রহণ করবার উৎসাহ সঞ্চয় করতে পারে?"

অমিতার পিসীমা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন "বেঁচে

থাকার পথে টাকাই কি কেবল সাহায্য করে বাবা? এমন দশাও হয়, যখন টাকা-কড়ির মধ্যে কোনো সান্ত্বনাই থাকে না।"

সুদর্শন উত্তর দিবার আগেই সুপর্ণা বলিল, "এই দেখুন একজন, যে টাকার ভিতর কোনো সান্ত্বনা পায়নি।" তাহারা সদলে আসিয়া সাহ্‌জাহান-নন্দিনী জাহান্‌-আরার সমাধির নিকট দাঁড়াইলেন। চারিদিকে পাথরের জালিকাটা পরদা টানা, সমাধিটি শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত, উপরে সবুজ ঘাসের আচ্ছাদন। অবশ্য ঘাস এখন আর সবুজ নাই, শুকাইয়া বিবর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। রাজসিক আড়ম্বর যেখানে, দু'পয়সা পাওয়ার সম্ভাবনা যেখানে, সেখানে সেবকের অভাব নাই, কিন্তু অল্পমাত্র জল সিঞ্চন করিয়া এই তৃণগুলিকে হরিৎ রাখিবার লোক এখানে কেহ নাই।

সুদর্শন বলিল, "টাকাতে যে মানুষের সব অভাব মেটেনা, তা যতখানি টাকা পেলে বোঝা যায়, তা ক'টা মানুষে পায়? বাদশাহের মেয়ে বলে ইনি বুঝেছিলেন, গরীবের মেয়ে হলে ভাবতেন, যথেষ্ট টাকার অভাবেই তাঁর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।"

সুপর্ণা হঠাৎ বলিল, "বাদশাহের মেয়ে না হয়েও দুচারজন সে কথা বুঝতে পারে।"

কথাটা সে এমন নীচু গলায় বলিল, যে সুদর্শন এবং অমিতা ভিন্ন বিশেষ কেহ তাহার কথা শুনিতে পাইলনা। সুদর্শন একবার তীক্ষ্ণভাবে তাহার দিকে তাকাইল, কিন্তু কোনো কথা বলিলনা। নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সমাধি ক্ষেত্র ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতেই সূর্য্য ডুবিয়া গেল। এইবার সকলে বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তারণবাবু বলিলেন "থাক, আজ আর হুমায়ুনের কবর দেখে কাজ নেই, কাল আবার বেরনো যাবে এখন।"

তাঁহার ভগিনী বলিলেন, "একেবারে সেরে গেলে হতনা? যা গাড়ীভাড়া এখানে বাবা, শুনলে একেবারে চোখ কপালে উঠবার জোগাড় হয়। একসঙ্গে যতটা সারা যায়, ততই ভাল।"

অমিতা বলিয়া উঠিল, "আহা, কাল আর ত গাড়ী-ভাড়া করতে হবেনা, বাড়ীর গাড়ীই পাবেন। আজ না হয় দলবল বেঁধে বেরিয়েছি, ছুটি ছিল আমাদের তাই, কাল আর পাঁচ-ঘণ্টা কলেজ করে এসে বেড়াবার সখ থাকবেনা। আমার ত থাকবেইনা, তবে সু'র কথা বলতে পারিনা।"

সুপর্ণা বলিল, "কোন বিষয়ে, কবে আমার সখটা তোমার চেয়ে প্রবল দেখেছ?"

অমিতা বলিল, "আমি না হয় হৈ হৈ করে যা কিছু মনে আছে, সব বলে ফেলি, তুমি সেয়ান মানুষের মত সব তালা-চাবি দিয়ে রাখ। তাই বলে কি আর প্রমাণ হল যে তোমার সখ কম?"

সুপর্ণা বলিল "ও রকম করে প্রমাণ করতে চাইলে সব জিনিষই প্রমাণ করা যায়।"

সুদর্শন বাহিরে আসিয়া বলিল, "যাক, রামরূপ তবু একটা কাজ করেছে। ঐ পুষ্পক রথটিতে আর চড়তে হবেনা।"

পুরাতন গাড়ীওয়ালা খুব একপালা হল্লা করিল, তবে ভাড়া প্রায় পুরাই পাওয়াতে, এবং জনমত তাহার বিপক্ষে দেখিয়া, শেষ অবধি গাড়ী হাঁকাইয়া প্রস্থান করিল। এবার সুদর্শন আর তাহাদের সঙ্গে গেলনা, বলিল, "আমি আর অতটা ঘুরে গিয়ে করব কি? খানিক হেঁটে, খানিক ট্রামে যাব এখন।"

অমিতা বলিল, "কেন চলুন না খানিকদূর? শুধু শুধু এক হাঁটু ধূলোর মধ্যে হেঁটে কি লাভটা হবে?"

সুদর্শন বলিল, "হাঁটা মাঝে মাঝে খুব দরকার। কাল বিকেলে তাহলে শেট্‌গুলো নিয়ে আস্‌ব?"

সুপর্ণাকে লক্ষ্য করিয়াই সে প্রশ্ন করিল, উত্তর দিল কিন্তু অমিতা, বলিল, "বিকেলে না এসে সকালে এলেই ভাল। ওর ত কলেজ থেকে ফিরতেই সন্ধ্যে হয়ে যায়। তবে ওর টেঁচী বন্ধু আছে ঢের, তাদের অনুগ্রহে মাঝে মাঝে আগেও এসে পড়ে। ডাক্তার হওয়ার ঠেলা কম নয় বাবা।"

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করিল, "টেঁচী পদার্থটা কি?"

অমিতা বলিল, "ওমা, তাও জানেননা? ওটা হচ্ছে ট্যাঁশ্‌ ফিরিঙ্গীর সংক্ষিপ্তসার।"

এতক্ষণ পরে সুপর্ণা বলিল, "আপনার যখন সুবিধে হয় আসবেন। বিকেলেও আমি পাঁচটার মধ্যেই আসি, নিতান্ত অঘটন কিছু না ঘটলে।"

অমিতার বাবা বলিলেন, "অমিতাই আছে সুখে। পড়াশুনোটা একটা recreationএর মতই,—ক্লাশ যতটা, leisure periodও প্রায় ততগুলো।"

অমিতা বলিল, "আহা, আমার আর একটুও খাট্‌তে হয়না, না? ডাক্তারী ছাড়া অন্য বিষয় শিখ্‌তেও ত মানুষের পরিশ্রম হয়!"

সুদর্শন বলিল, "তা হয় নিশ্চয়ই। তবে আমাদের একটু ভাল করে break করা হয়, ভবিষ্যৎ জীবনে দিনরাত ভেদ না করে, খেটে খেতে হবে কি না?"

অমিতা বলিল, "ও সব নামেই, কার্য্যতঃ ত দেখি ডাক্তাররাও অন্য সব মানুষেরই মত খায়, ঘুমোয়, আমোদ করে।"

সুদর্শন বলিল, "বাইরের থেকে তা দেখাতে পারে। কিন্তু খুব close quartersএ কোনো ডাক্তারের জীবন দেখেছেন কি? যারা বেশ successful ডাক্তার, সত্যিই অবসর বলে তাদের কিছু থাকেনা। পয়সার মায়াও গজিয়ে ওঠে খুব, তার উপর আত্মীয় বন্ধুর উৎপাতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।"

সুপর্ণা বলিল, "আমার মনে হয় ডাক্তাররা সব চেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ।"

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করিল, "কি senseএ সৌভাগ্যবান?"

সুপর্ণা বলিল, "তাদের দিয়ে মানুষের উপকার হয় সব চেয়ে বেশী। অথচ তাতে পয়সা খরচ নেই। আর যে কোনো professionএর লোকই অন্যের উপকার করতে যাবে, তাতে পয়সা খরচ না করেই পারবেনা।"

অমিতাদের গাড়ীটা এই সময় ছাড়িয়া দেওয়াতে আলোচনাটা মাঝপথে ধামা চাপা পড়িয়া গেল। সুদর্শন পদব্রজে নিজের বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল।

(১২)

তারণবাবুর বাড়ীতে, যে ঘরটিতে সুপর্ণা থাকে, সেটিতে ঢুকিতেই একটা বিশেষত্ব অনেক মানুষের চোখে পড়ে। ঘরটি মাঝারি, কিন্তু আলো বাতাস খুব। বড় বড় দুইটি জান্‌লা, এবং দরজা দুইটি, একটি দরজা দিয়া অমিতার ঘরে যাওয়া যায়, অন্যটি দিয়া বাহিরে যাইবার পথ। ঘরে আসবাবের বাহুল্য নাই, গৃহসজ্জা কিছুমাত্র নাই। একটি স্প্রিং-দেওয়া লোহার খাট, কাপড় রাখিবার ছোট আলমারি একটা, লেখাপড়ার জন্য একটি টেবল ও চেয়ার, কাপড়ের আল্‌না, বইয়ের তাক, এইমাত্র আসবাব। দেওয়ালে একখানা ছবি পর্য্যন্ত নাই, দরজা জান্‌লার পরদা ধবধবে শাদা, রংয়ের চিহ্ন কোথাও নাই। বিছানা-ঢাকাটিও শাদা, আলনায় পাট করা ঝোলান কাপড়-চোপড়গুলিও শাদা ঘেঁসার ভাগ, তবে নিতান্ত শাদাশিদা বা শস্তা নয়। শাদা রংয়ের ভিতরই সৌখীনতা এবং সুরুচির পরিচয় অনেকখানিই আছে। ঘরের মেঝে হইতে দেয়াল, ছাদ, দরজা জানলার শার্শি খড়খড়ি পর্য্যন্ত ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছে, কোথাও একফোঁটা ধুলা বা ঝুলের লেশমাত্র নাই। ঘরে ঢুকিবামাত্র বুঝা যায়, এ ঘরের বাসিন্দাটি নিতান্ত একেবারে সাধারণ ব্যক্তিত্ববিহীন গোছের মানুষ নয়, তাহার একটা সুস্পষ্ট মতামত সকল বিষয়েই আছে। অবশ্য সকল জিনিষ লক্ষ্য করা, বা ঘরের চেহারা দেখিয়া অধিবাসিনীর স্বভাব অনুশীলন করিতে সকলেই পারেনা, কিন্তু সংসারে দুচারজন মানুষ আছে, যাহারা কেবল বাহিরের উপর চোখ বুলাইয়াই তৃপ্ত হয়না, ভিতরের খবর লইতে চেষ্টা করে, সেদিকে অলঙ্ঘনীয় বাধা যদি কিছু না থাকে।

বেড়াইয়া ফিরিয়া, সকলে যে যার ঘরে গিয়া ঢুকিল, কাপড় চোপড় ছাড়িবার জন্য। তারণবাবুর ভগিনী সুপর্ণার ঘরে ঢুকিয়া, তাহার পড়িবার টেবলের সামনের চেয়ারখানাতে বসিয়া বলিলেন "তোমার ঘরখানা যে দেখ্‌বে মা, সেই বুঝবে মেয়েটি ডাক্তারণী হবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে।"

সুপর্ণা হাসিয়া বলিল "তা ত বুঝ্‌বেই পিসীমা, টেবলে, আলমারীতে যা ডাক্তারী বই, ডাক্তারী চার্টের ছড়াছড়ি।"

অমিতার পিসীমা বলিলেন, "শুধু কি আর সেজন্যে? আমি ত ইংরিজী পড়তেই জানিনা, কাজেই তোমার বইগুলি ডাক্তারী বই কি উপন্যাস, তা বুঝবারও আমার ক্ষমতা নেই, আর ডাক্তারী ছবি ত মাত্র একখানা। তবু ঘরটাতে ঢুকলে মনে হয়, যার ঘর, তার হাঁসপাতালের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, এমন তক্‌তকে পরিষ্কার, একটা মাছি শুদ্ধ নেই। কোথাও জিনিষ এদিক ওদিক হয়নি, কোথাও জিনিষের বাহুল্য নেই, আড়ম্বর নেই।"

সুপর্ণা বলিল, "এতটা আপনি একবার তাকিয়ে দেখেই বুঝতে পারলেন, অনেকে ত এ ঘর রোজ দেখছে, অথচ এ সব কথা তাদের মনে আসেনা।"

পিসীমা বলিলেন, "কচি চোখে সব জিনিষ ধরা পড়েনা মা। যারা বহুকাল ধরে সংসারকে দেখছে তারা কোন্‌টার কি মানে তা বুঝতে পারে। এটা যে তপস্বিনীর ঘর তা কি আমি ছাড়া আর কেউ চট্ করে ধরতে পারে?"

সুপর্ণা অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিল, "কি যে বলেন পিসিমা, তার ঠিক নেই। খুব ঘটা করে ঘর সাজিয়ে না রাখলেই কি আর তপস্বিনীর ঘর হয়? আমার মধ্যে তপস্যা আবার কোথায়? আমাতে আর অমিতাতে তফাৎ কি?"

অমিতা কাঁধের ব্রোচটা শুধু খুলিয়া, কাশ্মীরি রেশমের শাড়ীর আঁচলটা লুটাইতে লুটাইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সুপর্ণার শেষ কথাটা কেবল সে শুনিতে পাইয়াছিল, তাহার উপর মন্তব্য করিয়া বলিল "আমাতে তোমাতে তফাৎ আবার নেই? যে কোনো মানুষকে জিগগেস কর, সেই বলে দেবে।"

সুপর্ণা বলিল, "সেই তফাৎটা কি তাই ত জিগ্গেস করছি।"

অমিতা বলিল "আমি জগতে এসেছি জগৎটা শুধু enjoy করবার জন্যে, তুমি এসেছ একটা ব্রত নিয়ে। এটা একটা তফাৎ না? আমার জন্যে জগৎ, আর তুমি জগতের জন্যে।"

সুপর্ণা তাহার পিঠে একটা কাল মারিয়া বলিল "আচ্ছা, পিসীমার কাছে আর বেশী ফড়ফড়ি করতে হবেনা। জগৎটা তোমার চেয়ে আমি কি কম enjoy করছি শুনি? ব্রহ্মচারিণীর ভাবটা তুমি আমার মধ্যে কি দেখলে? দিব্যি খাচ্ছি দাচ্ছি, সাজ-গোজ করছি, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখছি। ত্রুটি ত কিছুই নেই।"

পিসীমা বলিলেন, "তুমি বাছা, কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে, কিন্তু কথাটার মধ্যে সত্যি আছে। আচ্ছা, আর একদিন এ নিয়ে কথা হবে এখন। আজ গায়ে-গতরে ব্যথা ধরে গেছে। চল গো ভাইঝি, একটু পিসীর আদর-যত্ন করবে চল।"

বাড়ীটা বিশেষ বড় নয়, সব ক'টি ঘরই জোড়া; কাজেই অতিথি আসিলে কর্ত্তা এবং মেয়েদের ঘরেই স্থান করিয়া দিতে হয়। পিসীমা অমিতার ঘরেই আছেন, ছেলে রাত্রে ড্রয়িংরুমে শয়ন করে, দিনের বেলা তারণবাবুর ঘরেই কাটায়। তিনি বেশীর ভাগ সময় বাহিরেই থাকেন, কাজেই খুব বেশী অসুবিধা হয়না।

পিসীমা অমিতার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। অমিতা আদর করিয়া তাঁহাকে নিজের খাট-বিছানা ছাড়িয়া দিয়াছে,—নিজে একখানা ছোট ক্যাম্পখাটে সতরঞ্চি এবং চাদর বিছাইয়া শোয়। অমিতা বলিল, "ও কি পিসীমা, কাপড় চোপড় ছাড়লেন না কিছু?"

পিসীমা বলিলেন, "আর পারি না বাছা, একেবারে খেয়েদেয়ে সব ছাড়ব। তোদের এখানে ত সকাল সকাল খাওয়া, আর কতক্ষণই বা দেরি আছে?"

অমিতা বলিল, "দেরি কিছুই নেই। ওরা উল্টে বরং বসে বসে ভাবছে যে কতক্ষণে আমরা খাবার চাইব।"

পিসীমা বলিলেন "তোদের চাকরের ভাগ্যি ভাল বলতে হবে। অনেক বাড়ীতে দেখি পাঁচটা ছ'টা চাকর কাজ করচে, অথচ খেতে এদিকে বেলা তিনটে, ওদিকে রাত এগারোটা। যতই তাড়া দেও, কাজ আর কিছুতেই এগোয়না।"

অমিতা বলিল, "আমাদের চাকরগুলিকেও কিছু ক্ষণজন্মা মনে করবেন না। তবে ভড়্টা বহুকালের; ও সকলকে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তা ছাড়া আমরা কলেজ থেকে এসেই এ-বেলার খাওয়া খেয়ে নিই, বাবাও তাই পছন্দ করেন। রাত্রে যার খুসি দুধ খেল, না হয় ovaltine খেল, দু একটা বিস্কিট্ খেল, এই পর্য্যন্ত। কাজেই রান্নাবান্না বিকেলের মধ্যে সেরে রাখাই এদের অভ্যাস। এখন আপনাদের জন্যে বেড়ে দিতে রাত একটু করে এই যা।"

এমন সময় সুপর্ণা কাপড় চোপড় বদলাইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "চলুন, টেবিলে খাবার দিয়েছে।"

সকলে উঠিয়া খাবার ঘরে চলিল। ইহাদের বাড়ীর চালচলন সবই একটু অতিরিক্ত মাত্রায় পাশ্চাত্য-ঘেঁষা, প্রবাসী বাঙালীর বাড়ীতে সচরাচর যাহা হইয়া থাকে। আধুনিক হইয়াও কি ভাবে বাঙালী থাকা যায়, সেটা কলিকাতার বাহিরে বড় একটা কেহ জানেনা। পিসীমা টেবলে বসিয়াই ছুরি কাঁটাগুলা সরাইতে সরাইতে বলিলেন,

"এ-সব রোজ রোজ আর আমায় কি করতে দাও বাছা, এতে হাত-মুখ কাটা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ হবেনা।"

সুপর্ণা হাসিয়া বলিল, "বাবা, প্রথম প্রথম ছুরি কাঁটা দেখে আমার যা ভয় লাগত। কেবলি মনে হত এই বুঝি খোঁচা লাগল, এই বুঝি জিবটা কেটে গেল!"

অমিতা বলিল, "মেয়ের কিন্তু চট্‌পট্‌ শিখে নেবার ক্ষমতা অসাধারণ। এখন সাহেবীআনাতে আমাকে কোথায় ছাড়িয়ে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। হাতে খেতে আমার ত দিব্যি ফূর্ত্তি লাগে, কিন্তু সু'কে একবার হাতে খেতে বল দেখি, খাবার আগে আর পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ধুয়ে হাতের ছাল চামড়া উঠিয়ে ফেল্‌বে।"

সুপর্ণা বলিল, "তা করি বটে, তবে সেটা সাহেবী-আনার জন্যে মোটেই নয়। মড়া কাটা হাতে খেতে অভিরুচি না হওয়াই বোধ হয় স্বাভাবিক।"

অমিতা বলিল, "মাগো মা, কি করে যে মানুষ এমন নির্ঘিন্নে কাজ করে তাও বুঝিনা। বাবা ত আমাকেও মেডিক্যাল লাইনে দেবার জন্যে জেদ করছিলেন, আমি সোজা বলে দিলাম ও-সব আমার পোষাবে না বাপু। ও-সব সু'র মত কাটখোট্টা মানুষেরই পোষায়।"

পিসীমা হাসিয়া তারণ বাবুকে বলিলেন, "আর যেই ডাক্তার হোক, তোমার মেয়ে পারবেনা দাদা। সেদিন দরজার কপাটে একটা আরশোলা চাপা পড়েছিল, অমির মুখ যদি দেখতে।"

তারণবাবু বলিলেন, "ওর মাও ঠিক ঐ রকম nervous ছিলেন। ওটা সারাবার জন্যেই ওকে সু'র সঙ্গে দিতে চেয়েছিলাম, তা ও কিছুতেই রাজী হলনা।"

পিসীমা সুপর্ণার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার কিছু আপত্তি হয়নি ডাক্তারী পড়তে যেতে?"

সুপর্ণা বলিল, "না, আমি ডাক্তারী পড়ব, এ ত গোড়ার থেকেই ঠিক ছিল। আপনার মনে নেই পিসীমা, আপনাদের বাড়ী বসেই ত প্রথম কথা হল?"

শশধর বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই ত, এখন মনে পড়ছে। প্রতুলবাবু মেডিক্যাল কলেজে পড়াবার কথা তখনই বলেছিলেন বটে। বাবা, তুমি যে সেই সুবর্ণ, তা কে বল্‌বে? নিতান্ত আমরা জানি বলে তাই। চেহারা শুদ্ধ বদলে গেছে একেবারে।"

সুপর্ণার মুখ খানিকটা গম্ভীর হইয়া গেল। অমিতা হাসিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, সু, তোর নাম কেন বদলে দেওয়া হল ভাই?"

সুপর্ণা বলিল, "বাবার সুবর্ণ নামটা একটুও পছন্দ ছিলনা।" অমিতার পিসীমা কি যেন বলিতে যাইতে-ছিলেন, সুপর্ণার উত্তর শুনিয়া, এবং তাহার মুখের গম্ভীর ভাব দেখিয়া তিনি চুপ করিয়া গেলেন। অতীতের কথা আবার বর্ত্তমানে টানিয়া আনিতে সে হয়ত চায়না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতেই যে যাহার ঘরে শুইতে চলিয়া গেল। অমিতার ঘরে খানিকক্ষণ গল্প-গুজবের শব্দ শোনা গেল, কিন্তু সুপর্ণার ঘরের আলো মিনিট কয়েকের মধ্যেই নিভিয়া গেল। তাহার দেহমন দুই-ই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, গল্প করিয়া রাত জাগিবার ইচ্ছা তাহার ছিলনা।

আলো নিভাইয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল। খোলা জান্‌লার পথে, নক্ষত্র খচিত আকাশ যেন সহস্র জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কি সে ভাবিতেছে? তাহার দুই চোখ হঠাৎ জলে ভরিয়া উঠিল কেন? কোন্ গোপন ব্যথা আবার রাত্রির অন্ধকারে তাহার হৃদয়-গুহা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল? দিনের আলোয় ইহাদের মুখ ত সে কখনও দেখেনা? তাহার জীবনে দুঃখ নিরাশার স্থান কোথাও কি আছে? তাহাকে দেখিলে কেহই তাহা মনে করিবেনা। সে ধনী-কন্যার মতই বাস করে, সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদে যোগ দেয়, নিজের পড়াশুনায় তাহার মনোযোগ অখণ্ড; সে যে দায়ে পড়িয়া পড়িতেছে, তাহা মনেও হয়না। কিন্তু নিশীথের আঁধারের বক্ষে তাহার গোপন অশ্রুজল থাকিয়া থাকিয়া ঝরিয়া পড়ে কেন? কোথা হইতে এই তীব্র অজানা ব্যথা তাহার জীবনে আসিয়া প্রবেশ করিল?

অল্পক্ষণ পরেই সে চোখ মুছিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইল। সবলেই যেন মন হইতে অন্য সকল ভাবনা চিন্তা দূর করিয়া দিয়া, ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মনের সহিত সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়াই হয়ত ঘুমাইয়া পড়িল।

ছুটির দিন ছাড়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সুপর্ণা এবং অমিতার বিশ্রাম থাকেনা। বিশেষ করিয়া সুপর্ণার পড়ার চাপ ঢের বেশী, তাহার যেন নিশ্বাস ফেলিবারও

সুপর্ণা বলিল, "এতটা আপনি একবার তাকিয়ে দেখেই বুঝতে পারলেন, অনেকে ত এ ঘর রোজ দেখছে, অথচ এ সব কথা তাদের মনে আসেনা।"

পিসীমা বলিলেন, "কচি চোখে সব জিনিষ ধরা পড়েনা মা। যারা বহুকাল ধরে সংসারকে দেখছে তারা কোন্‌টার কি মানে তা বুঝতে পারে। এটা যে তপস্বিনীর ঘর তা কি আমি ছাড়া আর কেউ চট্ করে ধরতে পারে?"

সুপর্ণা অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিল, "কি যে বলেন পিসিমা, তার ঠিক নেই। খুব ঘটা করে ঘর সাজিয়ে না রাখলেই কি আর তপস্বিনীর ঘর হয়? আমার মধ্যে তপস্যা আবার কোথায়? আমাতে আর অমিতাতে তফাৎ কি?"

অমিতা কাঁধের ব্রোচটা শুধু খুলিয়া, কাশ্মীরি রেশমের শাড়ীর আঁচলটা লুটাইতে লুটাইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সুপর্ণার শেষ কথাটা কেবল সে শুনিতে পাইয়াছিল, তাহার উপর মন্তব্য করিয়া বলিল "আমাতে তোমাতে তফাৎ আবার নেই? যে কোনো মানুষকে জিগগেস কর, সেই বলে দেবে।"

সুপর্ণা বলিল, "সেই তফাৎটা কি তাই ত জিগ্‌গেস করছি।"

অমিতা বলিল "আমি জগতে এসেছি জগৎটা শুধু enjoy করবার জন্যে, তুমি এসেছ একটা ব্রত নিয়ে। এটা একটা তফাৎ না? আমার জন্যে জগৎ, আর তুমি জগতের জন্যে।"

সুপর্ণা তাহার পিঠে একটা কাল মারিয়া বলিল "আঃ, পিসীমার কাছে আর বেশী ফড়ফড়ি করতে হবেনা। জগৎটা তোমার চেয়ে আমি কি কম enjoy করছি শুনি? ব্রহ্মচারিণীর ভাবটা তুমি আমার মধ্যে কি দেখলে? দিব্যি খাচ্ছি দাচ্ছি, সাজ-গোজ করছি, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখছি। ক্রটি ত কিছুই নেই।"

পিসীমা বলিলেন, "তুমি বাছা, কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলে, কিন্তু কথাটার মধ্যে সত্যি আছে। আচ্ছা, আর একদিন এ নিয়ে কথা হবে এখন। আজ গায়ে-গতরে ব্যথা ধরে গেছে। চল গো ভাইঝি, একটু পিসীর আদর-যত্ন করবে চল।"

বাড়ীটা বিশেষ বড় নয়, সব ক'টি ঘরই জোড়া; কাজেই অতিথি আসিলে কর্ত্তা এবং মেয়েদের ঘরেই স্থান করিয়া দিতে হয়। পিসীমা অমিতার ঘরেই আছেন, ছেলেরা রাত্রে ড্রয়িংরুমে শয়ন করে, দিনের বেলা তারণবাবুর ঘরেই কাটায়। তিনি বেশীর ভাগ সময় বাহিরেই থাকেন, কাজেই খুব বেশী অসুবিধা হয়না।

পিসীমা অমিতার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। অমিতা আদর করিয়া তাঁহাকে নিজের খাট-বিছানা ছাড়িয়া দিয়াছে,—নিজে একখানা ছোট ক্যাম্পখাটে সতরঞ্চি এবং চাদর বিছাইয়া শোয়। অমিতা বলিল, "ও কি পিসীমা, কাপড় চোপড় ছাড়লেন না কিছু?"

পিসীমা বলিলেন, "আর পারি না বাছা, একেবারে খেয়েদেয়ে সব ছাড়ব। তোদের এখানে ত সকাল সকাল খাওয়া, আর কতক্ষণই বা দেরি আছে?"

অমিতা বলিল, "দেরি কিছুই নেই। ওরা উল্টে বরং বসে বসে ভাবছে যে কতক্ষণে আমরা খাবার চাইব।"

পিসীমা বলিলেন "তোদের চাকরের ভাগ্যি ভাল বলতে হবে। অনেক বাড়ীতে দেখি পাঁচটা ছ'টা চাকর কাজ করচে, অথচ খেতে এদিকে বেলা তিনটে, ওদিকে রাত এগারোটা। যতই তাড়া দেও, কাজ আর কিছুতেই এগোয়না।"

অমিতা বলিল, "আমাদের চাকরগুলিকেও কিছু ক্ষণজন্মা মনে করবেন না। তবে জগুটা বহুকালের; ও সকলকে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তা ছাড়া আমরা কলেজ থেকে এসেই এ-বেলার খাওয়া খেয়ে নিই, বাবাও তাই পছন্দ করেন। রাত্রে যার খুসি দুধ খেল, না হয় ovaltine খেল, দু একটা বিস্কিট খেল, এই পর্য্যন্ত। কাজেই রান্নাবান্না বিকেলের মধ্যে সেরে রাখাই এদের অভ্যাস। এখন আপনাদের জন্যে বেড়ে দিতে রাত একটু করে এই যা।"

এমন সময় সুপর্ণা কাপড় চোপড় বদলাইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "চলুন, টেবিলে খাবার দিয়েছে।"

সকলে উঠিয়া খাবার ঘরে চলিল। ইহাদের বাড়ীর চালচলন সবই একটু অতিরিক্ত মাত্রায় পাশ্চাত্য-ঘেঁসা, প্রবাসী বাঙালীর বাড়ীতে সচরাচর যাহা হইয়া থাকে। আধুনিক হইয়াও কি ভাবে বাঙালী থাকা যায়, সেটা কলিকাতার বাহিরে বড় একটা কেহ জানেনা। পিসীমা টেবিলে বসিয়াই ছুরি কাঁটা গুলা সরাইতে সরাইতে বলিলেন,

"এ-সব রোজ রোজ আর আমায় কি করতে দাও বাছা, এতে হাত-মুখ কাটা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ হবেনা।"

সুপর্ণা হাসিয়া বলিল, "বাবা, প্রথম প্রথম ছুরি কাঁটা দেখে আমার যা ভয় লাগত। কেবলি মনে হত এই বুঝি খোঁচা লাগল, এই বুঝি জিবটা কেটে গেল!"

অমিতা বলিল, "মেয়ের কিন্তু চটপট্ শিখে নেবার ক্ষমতা অসাধারণ। এখন সাহেবীআনাতে আমাকে কোথায় ছাড়িয়ে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। হাতে খেতে আমার ত দিব্যি ফূর্ত্তি লাগে, কিন্তু সু'কে একবার হাতে খেতে বল দেখি, খাবার আগে আর পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ধুয়ে হাতের ছাল চামড়া উঠিয়ে ফেলবে।"

সুপর্ণা বলিল, "তা করি বটে, তবে সেটা সাহেবী-আনার জন্যে মোটেই নয়। মড়া কাটা হাতে খেতে অভিরুচি না হওয়াই বোধ হয় স্বাভাবিক।"

অমিতা বলিল, "মাগো মা, কি করে যে মানুষ এমন নির্বিঘ্নে কাজ করে তাও বুঝিনা। বাবা ত আমাকেও মেডিক্যাল লাইনে দেবার জন্যে জেদ করছিলেন, আমি সোজা বলে দিলাম ও-সব আমার পোষাবে না বাপু। ও-সব সু'র মত কাটখোট্টা মানুষেরই পোষায়।"

পিসীমা হাসিয়া তারণ বাবুকে বলিলেন, "আর যেই ডাক্তার হোক, তোমার মেয়ে পারবেনা দাদা। সেদিন দরজার কপাটে একটা আরশোলা চাপা পড়েছিল, অমির মুখ যদি দেখতে।"

তারণবাবু বলিলেন, "ওর মাও ঠিক ঐ রকম nervous ছিলেন। ওটা সারাবার জন্যেই ওকে সু'র সঙ্গে দিতে চেয়েছিলাম, তা ও কিছুতেই রাজী হলনা।"

পিসীমা সুপর্ণার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার কিছু আপত্তি হয়নি ডাক্তারী পড়তে যেতে?"

সুপর্ণা বলিল, "না, আমি ডাক্তারী পড়ব, এ ত গোড়ার থেকেই ঠিক ছিল। আপনার মনে নেই পিসীমা, আপনাদের বাড়ী বসেই ত প্রথম কথা হল?"

শশধর বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই ত, এখন মনে পড়ছে। প্রতুলবাবু মেডিক্যাল কলেজে পড়াবার কথা তখনই বলেছিলেন বটে। বাবা, তুমি যে সেই সুবর্ণ, তা কে বলবে? নিতান্ত আমরা জানি বলে তাই। চেহারা শুদ্ধ বদলে গেছে একেবারে।"

সুপর্ণার মুখ খানিকটা গম্ভীর হইয়া গেল। অমিতা হাসিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, সু, তোর নাম কেন বদলে দেওয়া হল ভাই?"

সুপর্ণা বলিল, "বাবার সুবর্ণ নামটা একটুও পছন্দ ছিলনা।" অমিতার পিসীমা কি যেন বলিতে যাইতে-ছিলেন, সুপর্ণার উত্তর শুনিয়া, এবং তাহার মুখের গম্ভীর ভাব দেখিয়া তিনি চুপ করিয়া গেলেন। অতীতের কথা আবার বর্ত্তমানে টানিয়া আনিতে সে হয়ত চায়না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতেই যে যাহার ঘরে শুইতে চলিয়া গেল। অমিতার ঘরে খানিকক্ষণ গল্প-গুজবের শব্দ শোনা গেল, কিন্তু সুপর্ণার ঘরের আলো মিনিট কয়েকের মধ্যেই নিভিয়া গেল। তাহার দেহমন দুই-ই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, গল্প করিয়া রাত জাগিবার ইচ্ছা তাহার ছিলনা।

আলো নিভাইয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল। খোলা জানলার পথে, নক্ষত্র খচিত আকাশ যেন সহস্র জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু মেলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কি সে ভাবিতেছে? তাহার দুই চোখ হঠাৎ জলে ভরিয়া উঠিল কেন? কোন্ গোপন ব্যথা আবার রাত্রির অন্ধকারে তাহার হৃদয় গুহা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল? দিনের আলোয় ইহাদের মুখ ত সে কখনও দেখেনা? তাহার জীবনে দুঃখ নিরাশার স্থান কোথাও কি আছে? তাহাকে দেখিলে কেহই তাহা মনে করিবেনা। সে ধনী-কন্যার মতই বাস করে, সর্ব্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদে যোগ দেয়, নিজের পড়াশুনায় তাহার মনোযোগ অখণ্ড; সে যে দায়ে পড়িয়া পড়িতেছে, তাহা মনেও হয়না। কিন্তু নিশীথের আঁধারের বক্ষে তাহার গোপন অশ্রুজল থাকিয়া থাকিয়া ঝরিয়া পড়ে কেন? কোথা হইতে এই তীব্র অজানা ব্যথা তাহার জীবনে আসিয়া প্রবেশ করিল?

অল্পক্ষণ পরেই সে চোখ মুছিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইল। সবলেই যেন মন হইতে অন্য সকল ভাবনা চিন্তা দূর করিয়া দিয়া, ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মনের সহিত সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়াই হয়ত ঘুমাইয়া পড়িল।

ছুটির দিন ছাড়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সুপর্ণা এবং অমিতার বিশ্রাম থাকেনা। বিশেষ করিয়া সুপর্ণার পড়ার চাপ ঢের বেশী, তাহার যেন নিশ্বাস ফেলিবারও

সময় হয়না। অমিতা উঠিবার ঘণ্টা খানিক আগে সে উঠিয়া পড়ে, হাত-মুখ ধোওয়া, বিছানা ঠিক করা, ঘর গোছানো, তাহার বাড়ীর অন্ত লোকে উঠিবার আগেই চুকিয়া যায়। তাহার পর হয় সে পড়িতে বসে, না হয় ভাঁড়ার দেয়, বাজারের ব্যবস্থা করে, কোন্ বেলা কি রান্না হইবে তাহা পাচককে বুঝাইয়া দেয়। তারণবাবুর গৃহিণী নাই, কাজেই সংসার চালানোর কাজটা এই দুইটি মেয়ে পালা করিয়া করে। এক সপ্তাহে সুপর্ণা, পরের সপ্তাহে অমিতা।

চা খাইবার সময় বাড়ীর সকলে একত্র হয়, তাহার পর দেখা-শোনা সেই রাত্রে খাইবার সময়। সকলেই কাজের মানুষ, বিভিন্ন সময়ে খাইয়া বাহির হয়, বিভিন্ন সময়ে বাড়ী ফেরে। সুপর্ণা ও অমিতা বাহির হয় বটে এক সময়, কিন্তু ফেরে আলাদা।

আজ সুপর্ণার কাজের পালা ছিলনা। সে পড়িতেই বসিল; কিন্তু কেন জানিনা, পড়ায় আজ তাহার মন ছিলনা। পূর্ব্বাকাশ তখন রক্ত-রাগ-রঞ্জিত হইয়া সূর্য্যদেবের আগমন ঘোষণা করিতেছিল, সেই দিকেই সুপর্ণার চোখ অনেকক্ষণ আবদ্ধ হইয়া রহিল। জোর করিয়া পড়ায় মন দিল, আবার তাহার মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কাহার আশায়, কিসের আশায়, নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার চিত্ত বারম্বার উন্মুখ হইয়া উঠিতে লাগিল।

একজন চাকর উপরে উঠিয়া আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, সেই ছোক্‌রা ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

সুদর্শনের নাম এ বাড়ীতে ছোক্‌রা ডাক্তারবাবু, কারণ পারিবারিক চিকিৎসক রামকমলবাবু আছেন, শুধু ডাক্তারবাবু বলিলে তাঁহার নামের সঙ্গে গোলমাল হইবার সম্ভাবনা আছে।

সুপর্ণা মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "নীচের বসবার ঘরে বসতে বল।"

এ বাড়ীর বসিবার ঘর, তারণবাবুর অফিস ঘর, খাইবার ঘর প্রভৃতি সব নীচের তলায়। তবে মেয়েরা খাওয়া-দাওয়ার জন্ত পঞ্চাশবার নীচে নামা পছন্দ করেনা, সিঁড়ির মুখের জায়গাটাকে তাহারা একটা ছোটখাট খাইবার ঘরে পরিণত করিয়াছে, ছোট একটা টেবল এবং গোটা তিন চার চেয়ার দিয়া সাজাইয়া। বাহিরের অতিথি অভ্যাগত না থাকিলে এইখানেই খাওয়া-দাওয়ার কাজ তাহারা সারিয়া লয়।

চাকর নামিয়া যাইতেই সুপর্ণা বই ঠেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িল। একবার নীচে যাইতে অগ্রসর হইয়াও যেন আবার ফিরিয়া গেল। অমিতার শয়নকক্ষের দরজায় গিয়া সজোরে আঘাত করিয়া বলিল, "হ্যাঁরে, আজকে তোর ঘুম ভাঙবে, না আজকের দিনটা বাদই যাবে?"

অমিতা ভিতর হইতে নিদ্রালস কণ্ঠে বলিল, "কেন বাপু, চেঁচিয়ে অকাল নিদ্রাভঙ্গ করছ? ভাঁড়ার ত আমি কাল রাত্রেই দিয়ে রেখেছি।"

সুপর্ণা বলিল "ভাঁড়ার দেওয়া ছাড়া জগতে আর কিছু কাজ নেই বুঝি? একজন caller এসেছে, শীগ্‌গির উঠে আয়।"

ভিতর হইতে একটা চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণে অমিতা দরজাটা একটুখানি ফাঁক করিয়া বলিল, "দেখছিস্ ত আমার অবস্থা, তুই গিয়ে অভ্যর্থনা কর, আমি মিনিট দশ পনেরো বাদে যাচ্ছি।"

সুপর্ণা বলিল, "বেশী দেরি করিস্‌নে যেন।" অমিতা বলিল, "যা, যা, আর ন্যাকামী করতে হবেনা, আমি দেরি করলেই ত তুই বর্ত্তে যাস্।"

সুপর্ণা সিঁড়ির দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। অমিতার কথা শুনিয়া সে একেবারে দাঁড়াইয়া গেল। তাহার মুখ চোখের ভাবে একটা উত্তেজনা দেখা গেল, গালের কাছটা লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তাই বুঝি তোমার ধারণা? আচ্ছা, এইখানে বস্‌ছি। যতক্ষণ না তুমি বেরবে, আমি এক পাও নড়বনা।"

অমিতা আবার মুখ বাড়াইয়া বলিল "কি যে ন্যাকামী করিস্ তার ঠিকানা নেই। ভদ্রলোক ভাববে আমরা সবাই ক্ষেপে গেছি। আসতে বলে সবাই মিলে টেনে ঘুম দিচ্ছি, ঠিক ভাব্‌বে। তুই এগো, আমি যত শীগ্‌গির পারি যাচ্ছি।"

সুপর্ণা নড়িবার কোনোই লক্ষণ দেখাইলনা। অমিতা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "যা লক্ষীটি ভাই। আচ্ছা আর তোকে কখনও ঠাট্টা করবনা। যাই বল এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি।"

সুপর্ণা উঠিয়া বলিল, "তা বই কি, তুই যা মুখে আসে বলে যাবি, সেটা বাড়াবাড়ি নয়, আর আমি একটু রাগ করলেই সেটা বাড়াবাড়ি।" সে নামিয়া গেল।

নীচে বসিবার ঘরে সুদর্শন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সুপর্ণাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমি বেশী *early*

এসে পড়েছি না কি? আমি নিজে এত ভোরে উঠি, যে, অন্য মানুষের দিন যে কত পরে আরম্ভ হয়, তা আমার সব সময় মনেই থাকেনা।"

সুপর্ণা বলিল, "আমিও ভোরেই উঠি, কাজেই যত earlyই আসুন, আমার অসুবিধে নেই। তবে অমিতা এখনও ওঠার ব্যাপারটা শেষ করতে পারেনি। তাকে ডাক দিয়ে এসেছি। আপনি বসুন না।"

সুদর্শন বসিয়া, কয়েকখানা বাঁধান খাতা সুপর্ণার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, "এই সেই নোট্‌গুলো।"

সুপর্ণা খাতাগুলি কাছে টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। খানিক পরে বলিল, "আপনার হাতের লেখা ত বেশ দেখছি। ডাক্তাররা প্রায়ই যা চমৎকার লেখে, compounder ছাড়া আর তা কারো বুঝবার সাধ্যি থাকেনা।"

সুদর্শন হাসিয়া বলিল, "দেখা যাক, full-fledged ডাক্তার হলে আবার লেখা বদলে যেতেও পারে।"

অমিতা এমন সময় ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, "তা হয়না। মানুষের আর সব বদলায়, কেবল হাতের লেখা বদলায়না।"

সুপর্ণা বলিল, "কি যে বলিস্ তার ঠিক-ঠিকানা নেই। গোড়াতে তোর যা হাতের লেখা ছিল, তার ত নমুনা একখানা আমার কাছে আছে। তুই বলতে চাস, তোর লেখা এখনও তেমনিই আছে? নিজের এতবড় libel করিস্‌নে।"

অমিতা বলিল, "আহা, তাই যেন আমি বলছি আর কি? ছোট বাচ্চার আর grown-up মানুষের লেখা কি একই থাকবে নাকি? কিন্তু আমার লেখা এখন যা আছে, পনেরো বছর পরেও তাই থাকবে, তুই দেখিস্।"

সুপর্ণা বলিল, "পনেরো বছর পরে তোমার লেখা দেখবার সৌভাগ্য কি আমার হবে?"

অমিতা বলিল, "থাক থাক, আর বেশী রসিকতায় কাজ নেই। সৌভাগ্যটা কোন্ দিকে তা দেখাই যাবে।"

সুদর্শন বলিল, "আপনারা ত নিজেদের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য নিয়ে তর্ক লাগালেন, আমার সামান্য একটু সৌভাগ্য বর্ত্তমানে যা ঘটেছে, সেটা আর বলাই হলনা।"

অমিতা চীৎকার করিয়া উঠিল "পাশের খবর পেয়েছেন বুঝি?"

সুদর্শন বলিল, "হ্যাঁ, রাত্রে গিয়ে দেখি, wire এসেছে।" (ক্রমশঃ)

অন্নপূর্ণা

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল

উগ্রের ভেরী গর্জিয়া কাঁদে কাটায়ে সন্ধি পাষাণের—
সাজে বুভুক্ষু রুক্ষ পিশাচ শ্মশানের।
ভুঞ্জিবে আর খুঁজিবে আহার
খুঁড়িয়া পৃথ্বী উপাড়ি' পাহাড়,
শুধু খাই-খাই রবেতে সবাই করে চীৎকার।

রুধির তৃষায় অধীর ক্ষিপ্ত বধির বিলাপে আর্ত্তের;
জ্বলে দাউ-দাউ অনল প্রেতের স্বার্থের।

কোথা শতদল, এ যে রে অনল!
সুধার আধার উগরে গরল;
তবু খাই-খাই রবেতে সবাই করে কোলাহল।

কাঁদিয়া গর্জে ভেরী আর তূর্য্য—জঠর জ্বালাকে জুড়াবে!
ক্ষিপ্ত দস্যু শ্মশানে ভস্ম উড়াবে।

উগ্র জীবনে দৈন্য অপার—
ক্ষুধার অন্ন কোথায় আমার!
নাই, কিছু নাই, শুধু খাই-খাই, করে হাহাকার।

উৎসবে অই শুনি রে অদূরে—মঙ্গলপুরে বাজে শাঁখ,—
উগ্র রুদ্রে নন্দিতে ভেসে আসে ডাক।
সেথা কি সাধনা বেদীর তলায়,
ক্ষুধিতেরা খায় গলায় গলায়?
নাই খাই-খাই, পিশাচের হাঁই, বেদনা গলায়?

শমিত উগ্র; হেরে শঙ্কর অন্নপূর্ণা প্রতিমায়,
জীবন ধন্য প্রেমের কণার মহিমায়।
প্রেমের অন্ন কভু না ফুরায়—
সারা বিশ্বের জঠর জুড়ায়।
কোথা খাই-খাই? লক্ষ্মী যে সবার প্রাণে উজল

তরুণ জাপান

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আজ সমস্ত পৃথিবীতে যে আর্থিক অসাচ্ছল্য দেখা দিয়েচে, জাপানও তা থেকে অব্যাহতি পায় নি। অত্যন্ত দ্রুত জাপান এগিয়ে চলেছিল আর্থিক সমৃদ্ধির পথে; কিন্তু



১৮৫ ফীট উঁচু এক চিমনির উপর দাঁড়িয়ে জনৈক ধর্ম্মঘটকারী বক্তৃতা করচে

১৯৩০ সাল থেকে সেই সমৃদ্ধির স্রোতের মুখে যেন প্রকাণ্ড একটা পাথর চেপে বসল। এখন পর্য্যন্ত পূর্ব্বাবস্থা সহজে ফিরে আসবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। নতুন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আর জাপানে খোলা হচ্চে না। যাদের তহবিলে



'বসন্তের ইঙ্গিত'—জাপানী নৃত্য

প্রচুর অর্থ মজুদ আছে, তাঁরা তাই নিয়েই সন্তুষ্ট, নতুন কিছু করবার মত দুঃসাহস কারুরই নেই। ব্যাঙ্কগুলিতে মোটা

টাকা জমা হয়ে আছে ; কিসে সেগুলি নিয়োগ করা হ'বে, পরিচালকরা ঠিক করে উঠতে পারচেন না। ১৯৩১ সালে এক সময় জাপানের বিভিন্ন ব্যাঙ্কে ৩৮০০০০০০০০ ইয়েন অকারণে জমা হয়েছিল। ফলে সুদের হার সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা সেখানে ছিল না। এ ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যেও জাপানের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা

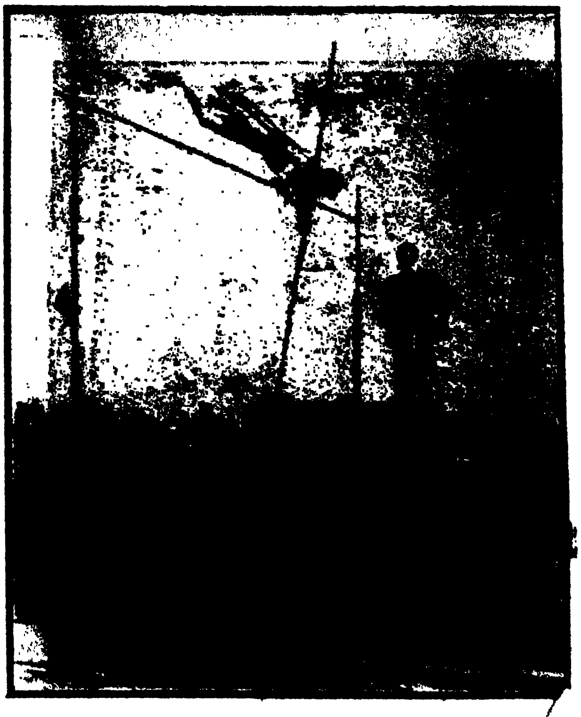


জাপানী বেতের ঝুড়ি—



'বসন্ত'—জাপানী নৃত্য

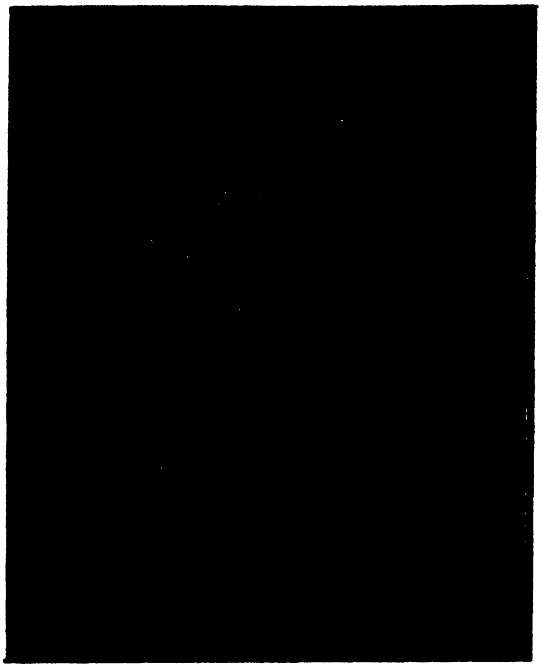
অনেক কমে গেচে ; এবং তার জন্যে জাপান-সরকারকে বাজেট নির্দ্ধারণ করতে রীতিমত বেগ পেতে হচ্চে। মোটের উপর, আমদানী এবং রপ্তানির আয় জাপানের শতকরা কুড়ি ভাগ কমে গেচে।



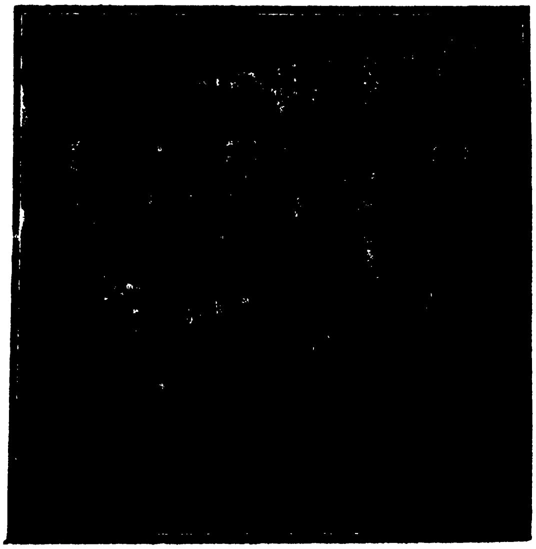
উল্লম্ফন-কৌশল

পৃথিবীর সর্ব্বত্র পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাসই যে এই অবস্থার

কারণ, তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু পূর্ব্বে শ্রমিক ও শ্রমশিল্পীদের যে রকম পারিশ্রমিক দেওয়া হ'ত, এখন দিতে হয় তার চেয়ে অনেক বেশী, এবং ১৯১৪



ইরিয়ে তাকাকো—শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী

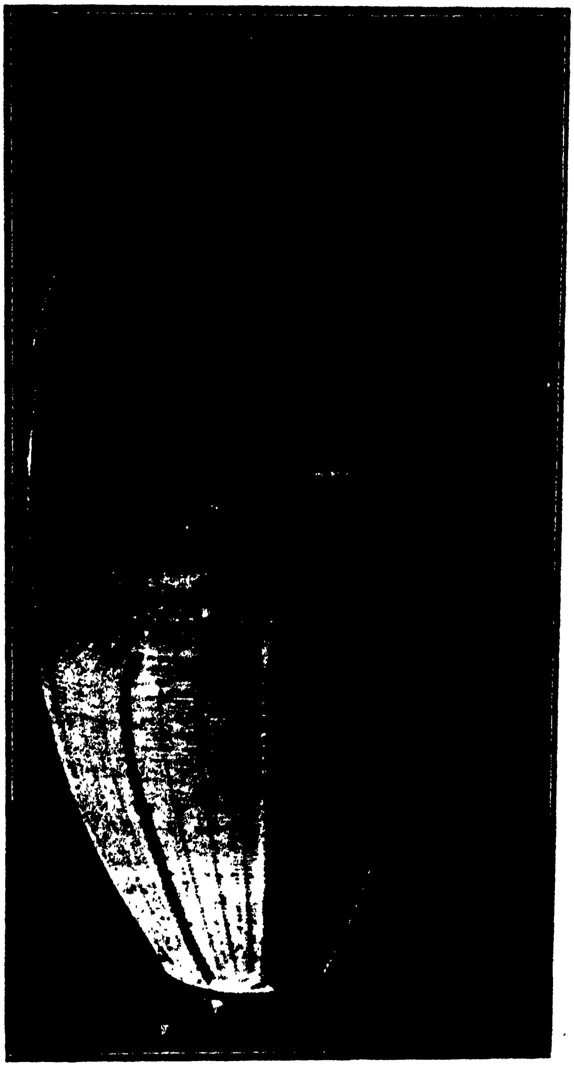


আধুনিক গৃহসজ্জা

সালের পূর্ব্বে যে হারে পারিশ্রমিক দেওয়া হ'ত, পুনরায় সেই ব্যবস্থা করাও একরকম অসম্ভব।

কিন্তু এই গুরু অর্থসঙ্কটে পড়েও জাপান-সরকার বিচলিত হন নি। কি করে আবার জাপানের আর্থিক সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনা যায়, তার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সরকার বিশেষ ভাবে চেষ্টা করছেন। তবে সে চেষ্টা কত দিনে সাফল্যমণ্ডিত হ'বে তা বলবার উপায় নেই।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা বোধ হয় খুব অন্যায় হ'বে

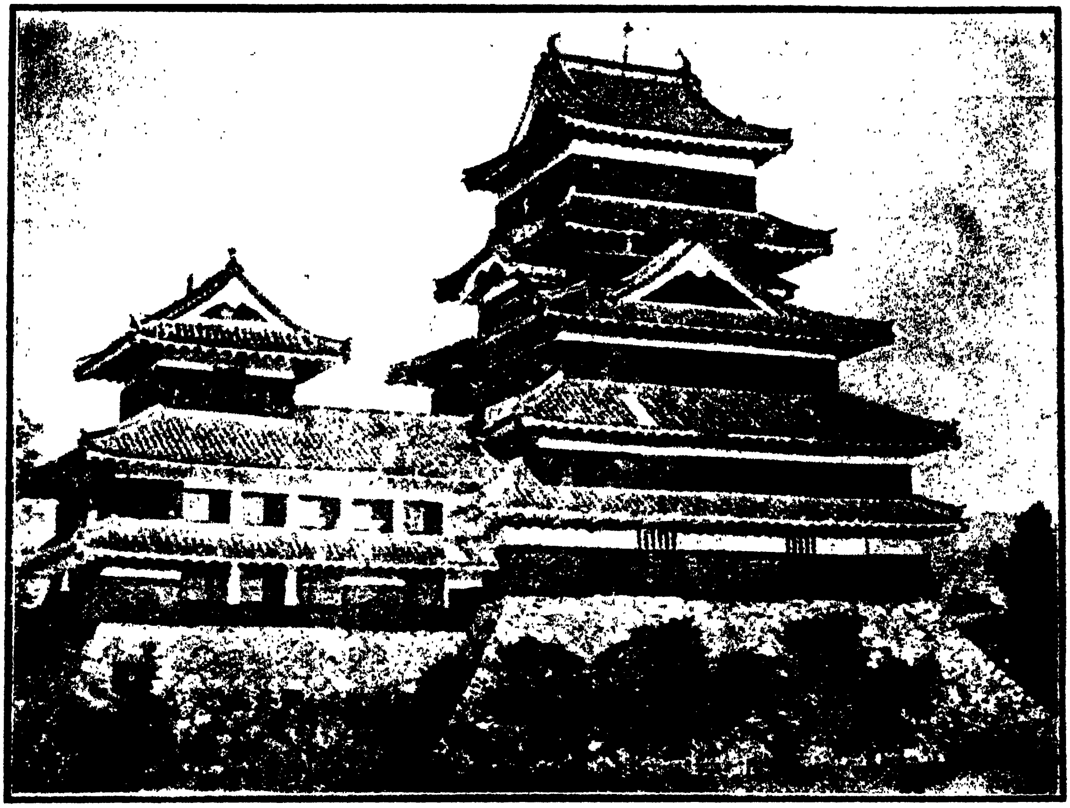


জাপানী বেতের ঝুড়ি

না যে, জাপানের এই আর্থিক সমস্যার মূলে অন্যান্য দেশের একটু হাত আছে। জাপান অল্প মূল্যে পৃথিবীর বাজার-ময় যে ভাবে নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্য চালান দিচ্ছিল, তাতে অন্যান্য দেশ রীতিমত বেগ পেয়েছে। জাপানের এই

আধিপত্য দূর করবার জন্য তারা অনেক দিন থেকেই চেষ্টা করে আস্‌ছিল; এতদিনে সেই চেষ্টা ফল দান করেচে।

এইবার জাপানের গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে দু'চারটী কথা বলব। জাপানে এই গণ-আন্দোলন সুরু হয়েচে খুব অল্প দিন এবং জাপান এই আন্দোলনকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখে বলে মনে হয় না।



মাতসুমোতো প্রাসাদ

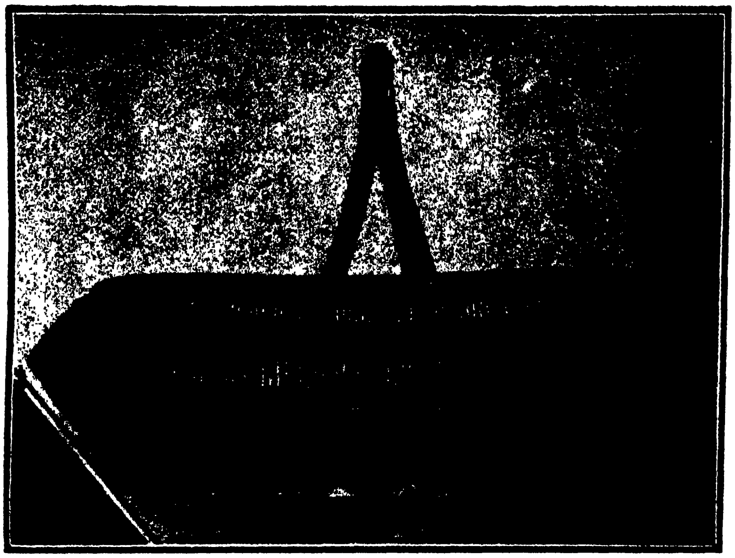
১৯৩০ সালের শেষ থেকে জাপানী শ্রমিকরা আত্ম অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হয়ে উঠেচে। কিন্তু এর সূচনা হয়েচে তার আগে—১৯২৮ সালে সরকার যখন শ্রমিক ও কৃষক-সঙ্ঘ ভেঙে দেন, সেই থেকে। তার পর ১৯৩০ সালে জাপানের কম্যুনিষ্ট দল আত্মপ্রকাশ করল শ্রমকাতর নর-নারীর দাবী নিয়ে। দলটীর অস্তিত্ব আগেও ছিল, কিন্তু কাজ চলছিল ভিতরে ভিতরে। তিরিশ সালে দলটী একেবারে কৃষক ও শ্রমিকদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। এরা যে আন্দোলন সুরু করলে, জাপানের



ফুকুয়োকা সহরের দৃশ্য

ইতিহাসে তা একেবারে নতুন। প্রচার-কার্য্যের জন্ত তারা কেবল সাধারণ লোক সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট হ'ল না ;—চিত্রকর, নাট্যকার, প্রবন্ধকার ও আলোক-চিত্রকররাও তাদের দলে যোগ দিলেন।

জাপানে আর একটী শ্রমিক ও কৃষকসঙ্ঘ আছে, সেটী কিন্তু সরকারের চক্ষে বে-আইনী নয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট দল এই সঙ্ঘের ঘোর বিরোধী। এই সঙ্ঘ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, কম্যুনিষ্ট দল সেটী পণ্ড করবার জন্তে চেষ্টার ক্রটী করে না। অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী দলের সভা পর্য্যন্ত ভেঙ্গে দিয়েচে। এই রকম চেষ্টার ফলে ক্রমেই তাদের শক্তি বৃদ্ধি হচ্চে এবং অন্ত দল ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়চে। এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করায় জাপানের ধনীরা কিন্তু শ্রমিকদের উপর মর্ম্মান্তিক অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েচেন। কারণ, তাঁরা কোন দিন কল্পনাই করেন নি যে, এমন একটা সৃষ্টি-ছাড়া আন্দোলনও আবার তাঁদের দেশে আরম্ভ হ'তে পারে! ফলে শ্রমিক ও মালিকদের বিরোধ অবসানের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্চে না,—ক্রমেই তা



জাপানী বেতের ঝুড়ি—



ওসাকা সহরের হোটেল



উল্লম্ফন-ক্রীড়ায় নারী

তীব্র হয়ে উঠ্‌চে। পূর্ব্বে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হ'লে, উভয় পক্ষকে বুঝিয়ে একটা আপোষের ব্যবস্থা করা সম্ভব হ'ত ; কিন্তু বর্ত্তমান ধর্ম্মঘট আরম্ভ হ'লে কোন পক্ষকেই সহজে সন্তুষ্ট করা যায় না।

প্রচার-কার্য্যের জন্ত শ্রমিকরা অনেক সময় নূতন নূতন উপায়ও অবলম্বন করে থাকে। কিছু দিন আগে

ইয়োকোহামা ফেডারেটেড লেবার য়ুনিয়নের জনৈক শ্রমিক, ফুজি গ্যাস স্পিনিং কোম্পানীতে ধর্ম্মঘট বাধলে কারখানার ১৮৫ ফুট উঁচু এক চিমনীর উপর দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের উত্তেজিত করেছিল। ধর্ম্মঘট শান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত—অর্থাৎ প্রায় ১৩০ ঘণ্টা ২২ মিনিট এই লোকটী চিমনীর উপর থেকে নামে নি। এই ভাবে লোকটী সমগ্র জাপানে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেচে।

ওসাকা সহরে নিপ্পন ব্রাস কোম্পানীতে যখন ধর্ম্মঘট বাধে, সেই সময় প্রায় ৭০জন ধর্ম্মঘটকারী কারখানার একটী ঘর দখল করে কয়েক দিন ধরে তারই মধ্যে বসবাস করতে থাকে। ভিতর থেকে তারা ঘরের দ্বার এমন ভাবে বন্ধ করে রেখেছিল যে, খোলবার আর কোন উপায়ই ছিল না শেষ পর্য্যন্ত আর কোন উপায় না দেখে পঞ্চাশজন উত্তেজিত পুলিস সেই দ্বার ভেঙে ফেলে। কিন্তু



হিকোন প্রাসাদ

তাতেই কি নিষ্কৃতি আছে? শ্রমিকরা ঘর থেকে বেরিয়ে পুলিসগুলির গায়ে এমন এক বিশ্রী গন্ধযুক্ত কারখানার কাল-

হার্য্য তেল ঢেলে দিল যে, তারা পালিয়ে প্রাণরক্ষা করল। কি-হান ইলেকট্রিক কোম্পানীতে ধর্ম্মঘটের সময় তারা একটী যাত্রীবাহী গাড়ীও ভেঙে চুরমার করেছিল।



নাট্যাভিনয়ের একটী দৃশ্য—

এ রকম ছোট-খাট উপদ্রব তারা প্রায়ই করে থাকে। জাপানের কর্ত্তৃপক্ষ মনে করে থাকেন যে সেখানকার এই হাঙ্গামার সঙ্গে একটী বিপ্লব-পন্থী প্রতিষ্ঠানের গোপন [illegible]

১৯৩০ সালের জুন মাসে জাপানের আইন-সম্মত শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির সংখ্যা ছিল—৬৫০; এবং সেইগুলির সদস্য-সংখ্যা ছিল—৩৪২,৩৭৯। এই সদস্যদের মধ্যে নারীর সংখ্যা বার হাজার তিন শত চল্লিশ।

জাপানের নাট্যশালাগুলি তার জাতীয় জীবনের একটা প্রধান দিক। জাপানের শিল্পী-মন বহু কাল থেকে এর পৃষ্ঠপোষকতা করে আসচে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, শিল্প-সাধনার এই ক্ষেত্রটিকেও জাপান দলাদলি থেকে মুক্ত



জাপানের এককালের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী

রাখতে পারে নি। ধনিকের সঙ্গে শিল্প-সাধকদের এবং পুরাতন-পন্থীদের সঙ্গে নূতন-পন্থীদের বিবাদ সেখানে লেগেই আছে। যে কোন শিল্পের পরিপুষ্টির পক্ষেই যে দলাদলি মারাত্মক, এ কথা রসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন। প্রতিযোগিতায় উন্নতি হ'তে পারে এ কথা সত্যি, কিন্তু প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে হীনতা আসতে বাধ্য এবং হীনতা হচ্চে শিল্পের মৃত্যু।

জাপানে অভিনয়ের ধারা দু'রকম এবং সে দু'টার নামও পৃথক। একটা ধারার নাম "কাবুকী"; অপর ধারাটার নাম "রনবাকু"। কাবুকী ধারার ভক্ত হচ্চেন জাপানের ধনী ও বিলাসী ব্যক্তিরা, অর্থাৎ হাতে যাঁদের সময় প্রচুর ও বিলাস-স্পৃহা যাঁদের অফুরন্ত। 'রনবাকু' কিন্তু জন-সাধারণের এবং রসবোধসম্পন্ন দর্শকদের চিত্ত বিনোদনের জন্ত। যে সকল নাট্যশালায় এই ধারার অভিনয় হয় সেগুলির প্রবেশ-পত্রের মূল্য অপেক্ষাকৃত সস্তা এবং অভিনয়-



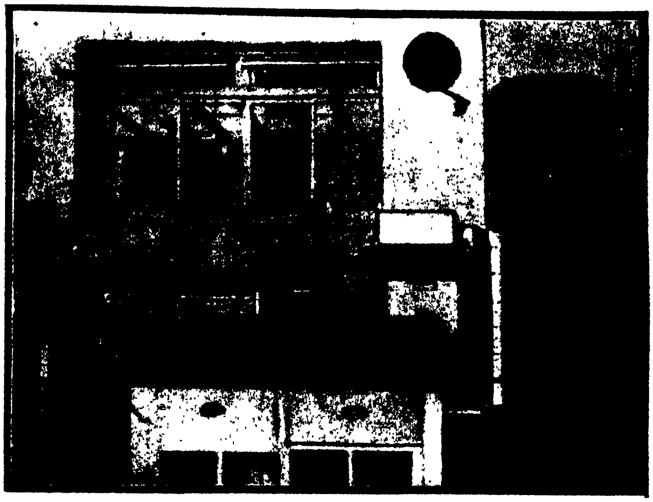
প্রাচীনকালের জাপানী মহিলার সজ্জা

কৌশলও ঢের উঁচু স্তরের। জনসাধারণের জন্ত বলেই বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত নয়।

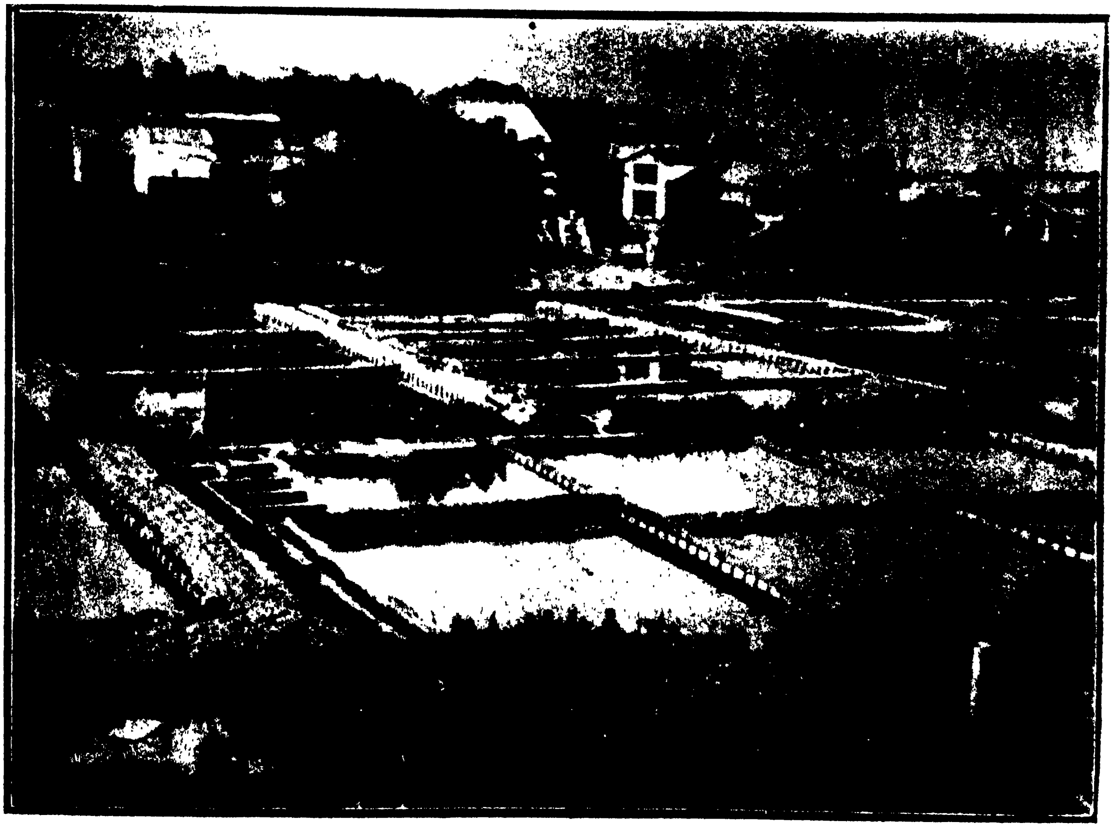
এই থিয়েটরগুলিকে puppet theatre বলা হয়। এই থিয়েটরগুলির নাটক-নির্ব্বাচনের একটা বিশিষ্ট ধারা আছে। জাপানের জাতীয় জীবনে নিত্য-নূতন যে সব সমস্যা আত্মপ্রকাশ করচে, যে সব কাহিনীর সঙ্গে জাপানের সত্যিকারের যোগ, নাটকের মধ্যে দিয়ে সেইগুলিকেই

এই সব থিয়েটারে রূপ দেবার জন্যে চেষ্টা করা হয়ে থাকে। জাপানের সত্যিকার আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা ও বেদনা তাই এই নাটকগুলির অভিনয়ের মধ্যে একটা রূপ পরিগ্রহ করে। জাপানের সর্ব্বত্র যে গণ-আন্দোলনের ঢেউ বইচে, এদের অভিনয়ও তারই একটা অংশ। এই দলের দু'টী প্রধান নাট্যশালার নাম—সায়োকু গেকিজো (চরমপন্থী থিয়েটর) ও শিন্ সুকীজী জেকিদান (নূতন সুকীজী থিয়েটর-দল)।

যে নাট্যশালাগুলিতে প্রাচীন পদ্ধতির নাটক অভিনীত হয় এবং ধনীরা যেগুলির পৃষ্ঠপোষক, সেগুলির অধিকাংশই পরিচালিত হয় 'মোচিকু' নামে পরিচিত একটী দল কর্তৃক। এদের নাট্যাভিনয়ের ধ্যান এবং ধারণা প্রাচীন হলেও অর্থবল এদের বিরোধী দলের চেয়ে অনেক বেশী; কারণ, জাপানের অধিকাংশ ধনীই এদের পৃষ্ঠপোষক; আর প্রবেশ-পত্রের মূল্যও রীতিমত বেশী। ফলে অবস্থা দাঁড়িয়েচে এই যে, যারা অভিনয়-কলার দিক থেকে জাতির সামনে সত্যই একটা নূতন কিছু উপস্থিত করতে



আধুনিক পাকশালা



রঙীন মাছেদের জন্যে তৈরী পুকুর

চায়, আর্থিক কারণে বিপক্ষের কাছে তাদের প্রতি পদে পরাস্ত হ'তে হচ্চে। জাপানের যারা নাম-করা অভিনয়-শিল্পী, তাদের প্রায় সকলকেই 'মোচিকু' সম্প্রদায় মোটা টাকা দিয়ে হস্তগত করে রেখেচে। মাত্র দুই-একজন—যাঁরা শিল্প-সাধনাকেই জীবনের ব্রত বলে মনে করেন, টাকার প্রলোভন ত্যাগ করে puppet theatreএ যোগদান করেচেন।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে তাকাকো বলে যে মেয়েটার ছবি দেওয়া হ'ল, সে জাপানের একজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। বহু জটিল চরিত্রে অভিনয় করে সে প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন



জাপানী তাসের ছবি—

করেচে। তাকাকো সম্বন্ধে আর একটী উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, সে কোন ভাইকাউণ্টের কন্যা। এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে জাপানে অভিনয়কলা এখনও অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে নেই। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা তা'তে যোগদান করচে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাপান চলচ্চিত্রের দিকেও মনোযোগ দিয়েচে। নির্ব্বাক চলচ্চিত্র জাপানে অনেক দিন থেকেই তৈরী হচ্ছিল; এখন মুখর চলচ্চিত্রের আত্মপ্রকাশের ফলে জাপানও মুখর চিত্র তৈরী করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেচে।

কেবল মুখর চলচ্চিত্র তৈরী করে জাপান ক্ষান্ত হয় নি, মুখর চিত্র নির্ম্মাণের যন্ত্রপাতিও তারা তৈরী করচে নিজেদের দেশে। এ দিক দিয়ে জাপানের অধ্যবসায় ও উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয় বলতে হ'বে। অবশ্য, তারা মুখর চলচ্চিত্রের জন্য যে যন্ত্রপাতি তৈরী করেচে, তা যে বিদেশী যন্ত্রপাতির মত নিখুঁত হয়ে ওঠে নি, এ কথা স্বীকার করতে হয়। এই কারণেই মুখর ছায়া-চিত্র অপেক্ষা নীরব ছায়া-চিত্রেই তারা সমধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করে থাকে। তবু এই কারণে তা'দের প্রশংসা না করে পারা যায় না যে, মুখর



জাপানী তাসের ছবি

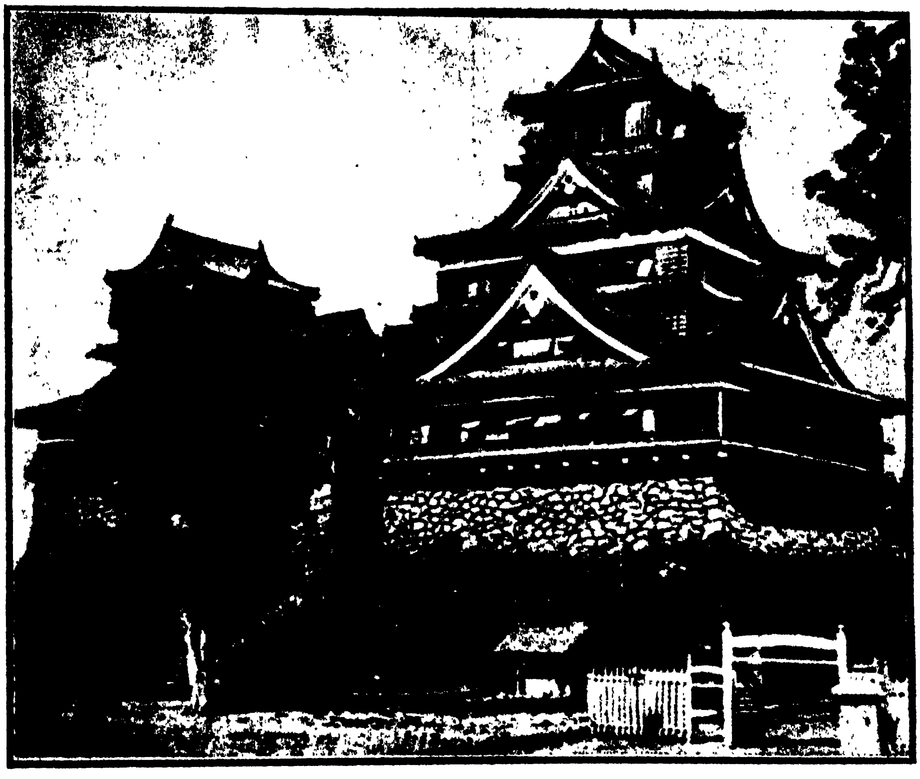
চলচ্চিত্র তৈরীর যন্ত্রপাতি আনাবার জন্যে বিদেশে যে প্রচুর টাকা পাঠাতে হয়, সেটা তাদের দেশেই থেকে যাচ্চে; এবং ক্রমে তা'দের যন্ত্রও যে সুসম্পূর্ণ হ'বে না, এ কথাই বা কে বলবে?

মুখর ছায়া-চিত্র তোলবার যন্ত্রপাতিকে উন্নত করবার জন্য জাপানের চেষ্টারও ত্রুটী আছে বলে মনে হয় না। "ব্লু এঞ্জেল" (ইউফা) 'মরক্কো' (প্যারামাউণ্ট) ও "অল্ কোয়ায়েট" (ইউনিভার্স্যাল) প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত

মুখর চিত্রগুলি যখন একে একে জাপানে গিয়ে পৌঁছল, তখন জাপানীরা দেখলে যে তাদের শব্দ-গ্রহণ-পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। নইলে তাদের ছবি কখনই বিদেশী উৎকৃষ্ট ছবিগুলির মত হ'বে না। এই ধারণা সৃষ্টির ফলে 'সুমীহাসি'-ক্যামেরার সাহায্যে মোচিকু-সম্প্রদায় "ম্যাডাম এণ্ড ওয়াইফ" নাম দিয়ে একখানি ছবি তোলেন। এই ছবিখানি জাপানের পূর্ব্বেকার তোলা ছবি—"Lullaby" "Farewell" "Silent flowers" প্রভৃতি ছবির চেয়ে ঢের বেশী উপভোগ্য হয়েচে। এ ছাড়া "নিক্কাৎসু" নামে আর একটী বৃহৎ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান জানিয়েচেন যে, তাঁরা 'কছুকা' বলে যে ক্যামেরা তৈরী করেচেন, তাতে মুখর ছায়া-ছিত্র আরও সম্পূর্ণতা লাভ করবে। সুতরাং অচির-ভবিষ্যতে জাপানী মুখর-চিত্র যে তার শৈশব অবস্থা পার হ'তে পারবে, এ আশা করা অন্যায় নয়। পূর্ব্বে জাপানে যে নীরব ছায়াচিত্রগুলি তৈরী হ'ত, তাতে ইতিহাসের মাল-মসলা এত বেশী ব্যবহার করা হ'ত যে, দর্শকদল ক্রমে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলল। তার পর থেকে জাপানের চলচ্চিত্রগুলিতে ঐতিহাসিক সমারোহ কমে গেচে; এখন তা'রা যথাসম্ভব আধুনিক ও স্বাভাবিক জীবন-কাহিনীকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করে থাকে। প্রকিনো বলে একটী চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান, চলচ্চিত্রের মধ্যে জনগণের বাণীকে রূপ দেবার জন্যে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে, কিন্তু অর্থবল তাঁদের সামান্য, এই জন্য অনেক সময় তাঁরা ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন না। অন্যান্য চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকরা ধনবান; তাঁরা ছবির মধ্যে জনসাধারণের দাবী প্রচার করবার দুঃসাহস রাখেন না; সুযোগ ও সুবিধামত তাঁরা বিপরীত প্রচার-কার্য্যই করে থাকেন।



পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে তৈরী একটী বাড়ী



কুমামোটো প্রাসাদ

এই কারণে অনেক শক্তিশালী অভিনেতা বহুবার নিজেদের একটী চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান খোলবার জন্তে চেষ্টা করেচেন, কিন্তু প্রতিবারই তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েচে। মালিকদের খেয়াল ও খুশীমত কাজ করতে গেলে অনেক সময় অভিনেতারা যে উপযুক্ত নাটক অভিনয়ের জন্ম পান না, এ' কথাটা কেবল জাপানের পক্ষে সত্য নয়, পৃথিবীর যে-কোন দেশের পক্ষেই সত্য। প্রত্যেক দেশেই



সাহিত্যসেবী ছকু তকুনাগা—

শিল্প-সাধকদের ধনবান ব্যক্তিদের কথামত কাজ করতে গিয়ে নিজেদের প্রতিভার ও শক্তির অবমাননা করতে হয়েচে ; কিন্তু এর জন্তে আক্ষেপ করে লাভ নেই। সরস্বতী এবং কমলার সম্প্রীতি পৃথিবীতে যদি সহজে ঘটত, তা'হ'লে এখানকার অর্দ্ধেক দুর্দ্দশা বুঝি কমে যেত।

কিন্তু সে কথা যাক্।

জাপানের নাটক ও চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায়, তা' থেকে এটা কল্পনা করে নেওয়া কঠিন নয় যে, এই দুটী বস্তুর মধ্যে একটা করে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েচে ; এবং সেই দ্বন্দ্বের কারণ হচ্চে জনসাধারণ। জনসাধারণ আজ সেখানে যেমন প্রবল কণ্ঠে নিজের দাবী ঘোষণা করচে, তাতে নাটক ও চিত্রনাট্যের মধ্যেও সেগুলিকে



জাপানী তরুণী—

স্থান না দিলে চলচে না। জাপান এতকাল ধনিকতন্ত্রের উপাসনা করে আসছিল, আজ সব দিক দিয়েই তাতে ভাঙন ধরে গেচে।

আমাদের দেশের শিল্পকলার মধ্যে মূঢ়, মূক, অগণ্য গণ-নারায়ণের বাণী কবে আত্মপ্রকাশ করবে কে জানে!



দামোদরের বিপত্তি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নিতাই ঘোষের রাগ

নিতাই ঘোষ মেস্‌-বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পানওয়ালাকে চুপি চুপি কি বলিয়া তাহার হাতে ১০৲ টাকার একখানি নোট্‌ দিয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া নিজের হোটেলের দিকে চলিল। হোটেলটি বৈঠকখানা বাজারের উপরেই। অতি "বিশুদ্ধ হিন্দু হোটেল"। তাহার সিঁড়ি কোথায় আবিষ্কার করিতে কলম্বসের মত প্রতিভা কিম্বা নিতাই ঘোষের মত প্রতিভার দরকার। সিঁড়ি দিয়া নিতাই ঘোষ উপরে উঠিয়া একটা গলির মত অপ্রশস্ত ও আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থান অতিক্রম করিয়া একটা বন্ধ দরজায় ঘা' দিল। মিনিট দুই পরে' বিশুদ্ধ হিন্দু হোটেলে'র দরজা খুলিয়া গেল। একটা বেহারী চাকর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, "এত রাত হোল বাবু?" নিতাই ঘোষ তাহার কথা যেন শুনিতেই পাইল না,—সোজা গিয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরের তালা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরটি দৈর্ঘ্যে ৮ হাত; প্রস্থে ৫ হাত; উচ্চতায় ১০½।১১ হাত হইবে। মধ্যে সমস্তটা জুড়িয়াই একখানা সস্তা কাঠের তক্তপোষ। একপাশে দেওয়ালে টাঙানো কাপড় রাখার একটা গা-আল্‌না। আর আসবাবপত্র কিছু নাই। ইহার জন্য নিতাই ঘোষকে প্রত্যহ ১৲ টাকা ভাড়া দিতে হইতেছে। ঘরে জামা ছাড়িয়া, জুতা খুলিয়া, নিতাই ঘোষ গামছা লইয়া বাহিরে আসিয়া হাত-মুখ ধুইল। মাথায় খুব ঘটিকতক জল ঢালিল। তাহার পর মাথা মুখ সমস্ত দেহ ভিজা গামছা দিয়া মুছিয়া, চাকরের নিকট আহার চাহিল। চাকর একদিকে একটা সরু সিঁড়ি পার হইয়া কোথা হইতে একথালা ভাত, কিছু কিছু তরিতরকারি সমেত আনিয়া দিল। নিতাই ঘোষ থালা লইয়া ঘরে আসিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া খাইতে বসিল। দেখিল ভাত যাহা দিয়াছে, তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সময়ে আসিলে চাহিয়া লইতে পারিত; কিন্তু কি করিবে, এখন খাওয়ার পাট শেষ হইয়াছে। নিতাই ঘোষ সমস্ত শেষ করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল, "নীচের দোকান থেকে খাবার আন্‌তে পার?"

ভৃত্য জানাইল, পারে। নিতাই ঘোষ তাহাকে একটি টাকা দিয়া বলিল, "একসের লুচি নেবে, কিছু আলুর দম নেবে, কিছু মিষ্টি নেবে।"

ভৃত্য খাবার আনিলে, নিতাই ঘোষ তাহা শেষ করিয়া তবে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। কলিকাতার দোকানের খাবার নিতাই ঘোষের বড় প্রিয় ছিল। ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে বাতি নিভাইয়া নিতাই ঘোষ শুইয়া পড়িল।

প্রভাতে উঠিয়া ম্যানেজারকে ডাকিয়া বলিল, "আমি আটটার ট্রেনেই বাড়ি যাবো। আমার হিসাব দাও।"

ম্যানেজারের হিসাব চুকাইয়া সে নিজের সামান্য আস্‌বাবপত্র লইয়া বাহির হইল। এদিক-ওদিক ঘুরিয়া সে শিয়ালদহের কাছাকাছি একখানা ছোট বাড়ি ভাড়া করিল। ৪০৲ টাকা বাড়ি-ভাড়া বাড়িওয়ালাকে আগাম দিয়া বলিল, তিন দিনের ভিতরই সে পরিবার লইয়া আসিবে। বাড়িওয়ালা সম্মতি জানাইল। নিতাই ঘোষ সন্তুষ্ট হইয়া ষ্টেশনে গিয়া টিকিট করিয়া সময়মত গাড়ি ধরিল।

পালঘাটিতে বেলা ৩টা নাগাদ পৌঁছিয়া, নিতাই ঘোষ বাগ্গ্রামের বাড়ি গেল। বাগ্গ্রাম তাহাকে দেখিয়াই ভীত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি? আমার সর্ব্বনাশ করেও তোমার তৃপ্তি নেই? আবার কি কর্ত্তে এসেছ? আমার একমাত্র রোজকেরে ছেলেকে পর করেছ; আমার ক্ষেতের ধান কেটে নিয়ে গেছ; আমাকে লাঞ্ছনা অপমান করেছ; আর কি চাই তোমার?"

নিতাই ঘোষ অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, "বেহাই, যা' হবে

গেছে, তা' গেছে। আর তা' নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই। আমাদের দু'জনকেই সে ধাপ্পা দিয়েছে।"

বাঞ্ছারাম বিস্মিত হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কে ধাপ্পা দিয়েছে?"

নিতাই ঘোষ উত্তর দিল, "তোমার লেখাপড়া জানা বেটা, আমার গুণের জামাই। সে 'ত আজ কত দিন পালিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। কল্‌কাতায় আছে।"

বাঞ্ছারাম মনে মনে প্রীত হইয়া কহিল, "বটে? শুনি নি ত?"

নিতাই ঘোষ জানাইল সেও মাত্র হালে জানিয়াছে। তাহার সন্ধান করিয়াছে। তবে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই।

বাঞ্ছারাম হতাশ সুরে বলিল, "তা' আমি আর কি কোর্ব্ব, বেহাই? আমি ওর আশা ছেড়েছি। আমাকে সে ত্যাগ করে গেছে; আমিও তাকে ত্যাগ করেছি। সীতারাম বড় হয়েছে। ও যে করেই হোক্ চালাবে। চলে যাচ্ছেই। শুধু তুমি আমার ধানগুলো নিয়ে আমায় বৃথা কষ্ট দিচ্ছ। ছেলের ভরসা আর রাখি না।"

নিতাই ঘোষ বলিল, "ধান আমি ফিরিয়ে দেব, বেহাই। আর ঝগড়া নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, কি করা যায়? একটা পরামর্শ দাও, তাই তোমার কাছে এলুম।"

বাঞ্ছারাম উত্তর করিল, "পরামর্শ কি যে দিই তা' বুঝতে পারি না, বেহাই। আমার ও ছেলেতে আর দরকার নেই। যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে,—বেশ আছি। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। তখন না হয় নগদ্ ২৫৲।৩০৲ পেতুম। এখন পাই না। কষ্ট হয়েছে একটু; কিন্তু ভাবি—আগে 'ত এই রকমই চলেছে।"

নিতাই ঘোষ বলিল, "তোমার না হয় ছেলে চাই না। আমার ত জামাই চাই। আমার এক মেয়ে। জামাই যদি তাকে না নেয়, তার দিকে ফিরে না চায়, তবে কি হবে তার? তা' ছাড়া, ঐটুকু ছেলে, ২৪।২৫ বছরও বয়স কি না সন্দেহ, ও কি না তোমার আমার মত বুড়োকে খেলিয়ে বেড়ায়? এত বড় ওর স্পর্দ্ধা? এত বড় ওর সাহস? এ যে ভাব্‌লেও সারা শরীর জলে ওঠে। রাগে যেন সর্ব্বাঙ্গ বিষিয়ে উঠে।"

বাঞ্ছারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি কোর্ত্তে বল তুমি? আমিই বা কি কোর্ত্তে পারি?" সে মনে মনে ভাবিল, "বেশ হইয়াছে।"

নিতাই ঘোষ বলিল, "তুমি আর কি কোর্‌বে? তুমি কোন কাজেরই নও। তোমাতে কি আর পদার্থ আছে? শুধু তুমি এইটুকু করো যে সে এলেই আমাকে একটা খবর দেবে। অবশ্য সে আস্‌বে না চট্ করে; তবু যদি তা'র মন হয়, যদি এখানে আসে, আমাকে জানাবে। জানাবে 'ত? দেখ। আমি তা'কে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবো না, তবে দেখ্‌বো।"

বাঞ্ছারাম জবাব দিল, "তা' জানাবো। এ আর এমন বেশী কি, বেহাই? তবে আমার ধানটা ফিরিয়ে দিও। কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে ঘর, অতগুলো ধান গেলে কি চলে আমার, বেহাই? আমি 'ত তোমার মত বড়-লোক নই!"

নিতাই ঘোষ জানাইল, সে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবে; তবে ঐ এক সর্ত্ত যে দামোদর আসিলে যেন খবর পায়। নিতাই ঘোষ বাঞ্ছারামকে দিব্য করাইয়া লইল।

পালঘাটি হইতে নিতাই ঘোষ নিজের বাড়ি গেল। বাড়িতে পৌঁছিতেই গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইল? নিতাই ঘোষ জানাইল, খোঁজ এখনও হয় নাই। আরও সময়ের দরকার। তাই সে বাড়ি ঠিক করিয়া আসিয়াছে, সকলকে লইয়া গিয়া কলিকাতায় কিছুদিন থাকিবে।

গৃহিণী কহিলেন, "সেখানে থেকে আমাদের কি হ'বে?"

নিতাই ঘোষ জবাব দিল, "দরকার হতে পারে। একলা আমি হোটেলে খেয়ে কত দিন কাটাবো? অসুখে পড়্‌বো?"

গৃহিণী বলিলেন, "তা' বটে। এ ভাল বিপদে পড়া গেল!"

নিতাই ঘোষ কহিল, "তা'কে বা'র কোরবই। সে যেখানেই থাক্ তা'কে এনে তবে কাজ! শুধু মেয়ের জন্যে নয়,—তা'র জন্যে আমার যা' অপমান হয়েছে, তা' আমি মরলেও ভুল্‌বো না।" তাহার মুখ-চোখ কঠিন হইয়া উঠিল। গৃহিণী ভয় পাইয়া বলিলেন, "তা' হ'লেও জামাই, এ কথা ভুলো না। অপমান? তা' মেয়ে যখন দিয়েছি, তখন অপমানে ভয় খেলে বা রাগ কর্লে চল্‌বে কেন? মেয়ের মুখ চেয়ে সহ্য কর্ত্তে হবে।"

নিতাই ঘোষ কিছু আর ভাবিল না। গৃহিণীকে

বলিল "সব ঠিক করে প্রস্তুত হ'য়ে নাও। আমিও সব ব্যবস্থা ক'র্ত্তে যাই। কালপরশু আবার ফিরবো।"

সে নিজের লোকজনদের ডাকিয়া ৩।৪ দিন ধরিয়া পরামর্শ মন্ত্রণা করিল। তা'র পর নিজের ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট হইয়া, কেবল রমাইকে জমিজোত সব দেখিবার জন্ত রাখিয়া, সমস্ত পরিবার ও আপনার অনুচরদের ভিতর ৪ জনকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিল। তাহার সমস্ত মতলব একেবারে পাকা হইয়া গেল। এইবার সে অন্ত চিন্তা ছাড়িয়া তাহার হাতের কাজে মন দিতে পারিবে। বাঞ্ছারাম যে তাহাকে দরকার মত সংবাদ দিবে সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত রহিল। শুধু এখন কার্য্যারম্ভ করিলেই হয়। সে তাহার পরিচিত পাণওয়ালার কাছে গিয়া মেসের সংবাদ লইল। শুনিল, মেসের ভিতর পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই। রোজই সেই পারসী লোকটি আসে যায়। সে নজর রাখিয়াছে। দরকার হইলেই নিতাই ঘোষকে সাহায্য করিতে সে লোক দিবে। নিতাই ঘোষ সন্তুষ্ট হইয়া হাসিয়া জানাইল, দরকার হইলেই সে খবর পাইবে। যেন লোক প্রস্তুত থাকে। পাণওয়ালা বলিল, "একদিন আমাদের সর্দ্দারের কাছে যেতে হবে।" নিতাই ঘোষ রাজী হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"ছদ্মবেশের নানা জ্বালা"

নিতাই ঘোষের এত ব্যাপার কিন্তু দামোদর, শচীন, নগেন, এমন কি, রমেশ পর্য্যন্ত কিছুই সন্দেহ করিতে পারে নাই। কি করিয়া করিবে ? তাহারা কেহই নিতাই ঘোষকে চিনিত না। তাই যে দিন নিতাই ঘোষ কলিকাতায় বাসা ঠিক করিয়া দেশে ফিরিল, সেইদিন প্রাতঃকালে ৯টার সময় সকলে সুরেনবাবুর চা এর দোকানে আবার একত্র হইল। গত রাত্রের ব্যাপারটা তখন হাসি ও পরিহাসে তরল হইয়া গিয়াছে। রমেশের মনেও আর বিশেষ কোনও অস্বস্তি ছিল না। দামোদরও অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। বিশেষতঃ সকালে সেদিন মেসের সামনে নিতাই ঘোষকে দেখিতে না পাইয়া তাহারা অনেকটা সুস্থ হইল। শচীন বলিল, "এইবার ভূত ছাড়্‌লো বোধ হয়। এতেও যদি না ছাড়ে, ত' রোজা নাচায়।" রমেশ ও দামোদরও ভাবিল "সম্ভব তাই।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "যাবে না ত কি? কতকাল আর থাকবে? তা' ছাড়া, কাল নিশ্চয়ই ও বুঝ্‌তে পেরেছে যে এ তার জামাই নয়। তা'র জামাই ত আর পার্শী নয়, বাঙালী।"

শচীন কহিল, "পাশায় শ্বশুরের অমন চেহারা হলেই গেছি আর কি?"

নগেন কহিল, "তবে আরও ২।৪ দিন না গেলে বুঝা যাবে না।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "তা' ত বটেই। তবে দামোদর-বাবু এইবার ঐ বেশে একটু সুস্থচিত্তে একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা কর্ত্তে পারেন।"

দামোদর জানাইল, সে তাহাই করিবে।

রমেশ গতরাত্রে যাহা প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহা আবার এখন প্রস্তাব করিল। কিন্তু শচীন আপত্তি করিল যে তাহা হইলে ত দামোদরবাবু একেবারে পাড়া-ছাড়া হয়ে যাবেন,—তা ছাড়া অমন পোষাকটা মাটি হবে।

দামোদরেরও ইচ্ছা হইতেছিল না। পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়িতে সে যে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্যে থাকিবে তাহা সে বুঝিতে পারিল। একে বড়লোকের বাড়ি—তাহার কল্পনাতীত বড়লোক,—তা'র উপর সব অদ্ভুত, খেয়ালী মানুষের বাস; তা'দের কাছে চাকরি করার মত দুর্ভাবনা আর কি হো'তে পারে? তা' ছাড়া দামোদরের প্রধান আপত্তি যে সে তাহা হইলে নারাণবাবুর বাড়ি যাইতে পারিবে না। অবশ্য সে রমেশের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিতে সাহসী হইল না। তবে তাহার অনিচ্ছা তাহার মুখে ও ব্যবহারে ফুটিয়া উঠিল।

রমেশ বলিল, "আপনার ইচ্ছা। আপনি নিরাপদই হোতেন। একটা কাজও লেগে থাক্‌তো।"

দামোদর একেবারে অস্বীকার করিল না। বলিল, "একটু ভেবে দেখি অন্ত দু-এক জায়গায় চেষ্টা করে, তখন দেখা যাবে।"

ক্রমে বেলা হইলে শচীন, রমেশ ও নগেন চলিয়া গেল। দামোদর শচীনের নিকট ১০৲ টাকা ধার লইল। সে সারাদিন বাহিরে থাকিবে, কেবল রাত্রে মেসে ফিরিবে এই ব্যবস্থা করিয়া লইল। যদি প্রয়োজন হয়, তবে সুরেনবাবুর বাড়িতেও দু'এক দিন দিনের বেলায় যাতায়াতি করিবে।

পারে। এখন দিন তাই সে সুরেনবাবুর সহিত তাঁহার বাড়িতে আহার করিতে গেল।

এতক্ষণ বাহিরে বড় বেড়ায় নাই, সেইজন্য দামোদর তাহার নূতন ছদ্মবেশের মহিমা বুঝিতে পারে নাই। এখন পথে চলিতেই সকলেই প্রায় তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দামোদর প্রত্যেকের দৃষ্টির বিষয় হইয়া উঠাতে, ক্রমশ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। তাহার উপর রৌদ্রে তাহার মনে হইল যেন সর্ব্বাঙ্গে কিসের একটা ধারা বহিতেছে। যেন তেল গড়াইতেছে। সে দু-একবার হাত দিয়া মুখ মুছিল; কৈ হাতে ত তেল লাগে না। তবে কি? সে সুরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেনবাবু, আমাকে বড় অদ্ভুত দেখাইতেছে, না? রঙ্ দেখা যাইতেছে কি? বেশ বুঝা যায় কি?"

সুরেনবাবু ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "খুব কাছ থেকে দেখ্লে বুঝা যায়। দূর থেকে কিছু বুঝা যায় না, একদম না।"

দামোদর একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি যন্ত্রণা বলুন ত!"

সুরেনবাবু বলিলেন, "কিছু না, দামোদরবাবু! অভ্যাস হয়ে যাবে।"

শিয়ালদহ পার হইয়া দু'জনে গুঁড়ার ভিতরে প্রবেশ করিল। গুঁড়ার এক অতি জীর্ণ ও দুর্গন্ধপূর্ণ অংশে তাঁহার ভাড়াটে বাড়ি। মাসিক ৪॥০ টাকা ভাড়ায় একতলা বাড়ি। তাহার দুই খানি পাকা ঘর, দুইখানি খোলার ঘর। একটু উঠান ভিতরে আছে। রান্নাঘর প্রভৃতি আলাদা। তবে সুরেনবাবুর বাড়ির মেয়েদের পরিশ্রমে বাড়িটি বেশ ঝর্‌ঝরে। উঠানে কতকগুলি ফুলেরও গাছ আছে; দু'একটি ফুলও ধরিয়াছে। এক ধারে একটা তুলসীমঞ্চও আছে।

সুরেনবাবু দামোদরকে লইয়া একটি ঘরে সতরঞ্চি পাতিয়া বসাইয়া, "আমি স্নান ক'রে নিই; একটু বসুন।" বলিয়া চলিয়া গেলেন, দামোদর বসিয়া রহিল। ঘরের ভিতর এক ধারে একখানি তক্তপোষ, আর এক দিকে একটা কাপড়ের আল্না। বিছানার পায়ের দিকে ২।৩টি ট্রাঙ্ক—রঙিন্ কাপড় দিয়ে মোড়া। তাহার বসিবার স্থানের চারি দিকে কিছু নাই। শুধু মেঝে; বেশ্ পরিষ্কার; যেন ধূলা পড়িলে খুঁটিয়া তুলিয়া লওয়া যায়। ঘরের দরজা দিয়া দামোদর বাহিরের উঠানের দিকে দেখিল। তাহার কেমন লজ্জা হইল। তাই ত' এখনই সকলে জানিবে তাহার কি অবস্থা। কেন সে আসিল? না আসিলেই হইত। তবে সুরেনবাবু বিচক্ষণ লোক—কোনও কথা হয় ত ভাঙিবেন না। অপরিচিত লোকের কাছে তাহার বিশেষ অসুবিধা হয় না; কিন্তু পরিচিতদের কাহারও সম্মুখে সে বিব্রত হইয়া পড়ে। বোধ হয় মনের বিকার মাত্র।

সুরেনবাবু আসিয়া খবর দিলেন, "আহার প্রস্তুত, চলুন।"

দু'জনে খাইতে বসিল। বেশ পরিচ্ছন্ন ভাত, ডাল, আলু ভাতে, শাক ভাজা, বেগুণ ভাজা, চুনোমাছের ঝোল, রাঙা আলুর টক্।

দামোদর তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিল; কেন না, তাহার ক্ষুধা তখনও বেশ সতেজ ছিল। সুরেনবাবু বলিলেন, "গরীবের বাড়ি; বেশী আয়োজন করা যায় কোথা থেকে। এইতেই আপনাকে চালাতে হবে।" দামোদর উত্তর দিল না। সে বুঝিতে পারিল না, সে এখানে কি ভাষায় কথা কহিবে। চারিদিকে যে শুনিবার জন্য অনেকগুলি কাণ উৎসুক হইয়া আছে, তাহা বুঝিল। কিন্তু পাছে কিছু বেফাঁস বলিয়া ফেলে, তাই কিছু বলিতে সাহস করিল না। আহারাদি সারিয়া সে উঠিয়া পড়িল। তাহার পর সেই ঘরে সুরেনবাবুর সহিত ফিরিয়া আসিল।

সুরেনবাবু বলিলেন, "একটু শুয়ে বিশ্রাম করুন না হয়।"

দামোদর উত্তর করিল, "না। আমি যাই, সুরেনবাবু। বিকালে দোকানেই যাবো।"

সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবেন?"

দামোদর বলিল, "যাই, একবার বড়বাজার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট এই সব ঘুরে আসি। বসে আর কি হবে?" তার পর একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "সুরেনবাবু, আপনি মাড়োয়ারি মহলের কাউকে চেনেন?"

সুরেনবাবু জবাব দিলেন "চিন্‌তুম বটে; এখন আর ও-সব মনে নেই। ১৫ বছর প্রায় ও-সংসর্গ ছাড়া। নিজের ভাব্‌নাতেই অস্থির; অপরের খবর নিই কখন্।"

দামোদর একটু চুপ করিয়া রহিল। সুরেনবাবু বলিলেন, "কোন গতিকে দিন গুজ্‌রাণ হয়। তিনটি মেয়ে

এখনও অবিবাহিতা; দু'টি নাবালক ছেলে মানুষ করা; তা'র উপর নিজে, স্ত্রী ও বিধবা ভগ্নী; সোজা ব্যাপার!"

দামোদর কহিল, "কিন্তু আপনার বাড়ি বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে সবেতেই তৃপ্তি, শান্তি আছে।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "তাই টিকে আছি। আমার মেয়েগুলি বড় ভাল। আপনার ত অনেক ছেলেদের সঙ্গে আলাপ আছে; সময়মত দু'একটি পাত্রের জোগাড় করে দেন যদি, আমি উদ্ধার হই। গরীব; কিছু দিতে পার্ব্বো না। মেয়েও আমার খুব রূপসী নয়। তবে চলনসই; আর বড় কাজের। আপনাকে দেখাচ্ছি।"

সুরেনবাবু উঠিয়া ডাকিলেন, "মালতী, এদিকে আয় ত।"

দামোদর বলিয়া উঠিল, "থাক্ না। আগে ছেলের সন্ধান হো'ক্। পরে দেখাশুনা হবে।"

সুরেনবাবু কহিলেন, "দেখুন। না হলে বল্‌বেন কি ক'রে কাউকে। কেমন মেয়ে দেখা দরকার বৈ কি।"

মালতী আসিল। দামোদর দেখিল তাহার বয়স প্রায় পনর ষোল বৎসর হইবে। রঙ্, অনেকখানি রাধা-রাণীর মত। শ্যামল। মুখখানি তবে মন্দ নহে। সুরেন-বাবু বলিলেন, "মেয়ের রূপ নেই; কিন্তু ওর গুণ যথেষ্ট। আমি ত' বাপ্; আমার কথা হয় ত' বাড়ান হবে। তবু আপনি ঘরের লোক, আপনাকে ত' মিথ্যা বল্‌বো না। একটি ছেলে দেখে দিন্। এটি আমার জ্যেষ্ঠা। এরই আগে বিবাহের দরকার।"

দামোদরের মনের ভিতর তখন মানদা'র রূপ জ্বলিতে-ছিল; সে উত্তর দিল, "আচ্ছা; চেষ্টা করে দেখি, সুরেনবাবু।"

সুরেনবাবু মালতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের খাওয়া হয়েছে?" মালতী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে। সুরেনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা যা।"

দামোদর বলিল, "আমি চেষ্টা কোরব। আপনার জন্ত আমি যা যা পারি কোর্ব্ব, সুরেনবাবু। দু'চারজনকে বল্‌বো।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আপনাদের দয়া। আপনারাই আমার বলবুদ্ধি ভরসা। দু'দিন আগে আমার অন্নসংস্থান ছিল না। কাল দোকানে প্রায় ১০৲ টাকা বিক্রী হয়েছে। আজও সকালে প্রায় ২।৩৲ টাকা বিক্রী হয়েছে। আজ সকাল সকাল যাবো। ২টা ২৷৹টার ভিতর।"

দামোদর উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা। আমি এখন চলি, সুরেনবাবু। একটু ঘুরে আসি।" তার পর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বাড়ীর ভিতর আমার কথা কিছু বলেননি ত'?"

সুরেনবাবু উত্তর দিলেন, "পাগল! সে কি বলি?"

দামোদর নিশ্চিন্ত হইল। সে প্রস্থান করিল। বাহিরে আসিয়া কিছু দূর যাইতেই, তিনচারটি কুকুর তাহাকে দেখিয়া ডাকিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিয়া, আবার ডাকিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া দামোদর একটা ঢিল উঠাইয়া মারিতে গেল। কুকুরগুলি আরও চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। আশ-পাশ হইতে দু' চারজন উঁকি মারিয়া তাহাকে দেখিল। দামোদর দ্রুতপদে চলিল। আরও কিছু দূরে একজন লোকের সহিত তাহার ধাক্কা লাগিয়া গেল। সে লোকটি পড়িতে পড়িতে উঠিল; দামোদর পড়িয়া গেল, সাম্‌লাইতে পারিল না। লোকটি বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল; দামোদর উঠিয়া তাহার জামা ঝাড়িল; টুপি ঠিক করিয়া মাথায় বসাইল। তার পর আবার চলিল। শিয়ালদহ্ পার হইয়া সে ট্রামে উঠিল। ট্রামে বসিয়া তবে কতকটা সুস্থির হইল।

লালদীঘির ধারে ট্রাম হইতে নামিয়া, সে ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিল। ইচ্ছা সমস্ত অফিসে একবার সন্ধান করিবে, কর্ম্মখালি আছে কি না। কিন্তু সব আফিসের দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া সে থামিয়া যাইতে লাগিল। ভিতরে যাইবার সাহস হইল না। তবু এখানে সে সুস্থির হইল; বড় আর কেহ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে না। সে ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্ ধরিয়া চলিতে চলিতে, এক স্থানে ফুটপথের উপর দেখিল, বহু মাড়োয়ারি একত্র হইয়াছে ও উত্তেজিতভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। সে সেখানে দাঁড়াইয়া গেল। একজন মাড়োয়ারি তাহাকে আসিয়া একটা ঠেলা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেত্‌না হ্যায়? তেরা? পোনরা? সাতাইশ? ছত্তিশ্!" দামোদর হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। মাড়োয়ারি তাহাকে ছাড়িয়া ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। দামোদর ব্যাপার কি বুঝিতে পারিল না। সেও একটু উৎসুক হইয়া ফুটপথের উপর উঠিল। দু'জন মাড়োয়ারি উত্তেজিতভাবে কথা কহিতে কহিতে তাহার জামার খানিকটা পানের পিক্ ফেলিয়া দিল। দামোদর পকেট্ হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুছিল। মুখটাও

মুছিয়া লইল। সে উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতে লাগিল, এই ভিড়ের মধ্যে ভকতরামকে দেখা যায় কি না। কিছু দেখিতে পাইল না। শুধু দেখিল একটা লম্বা বড় ঘরের ভিতর খুব ভিড়। দরজার কাছে তিন-চারজন দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কথা কহিতেছে। আর একজন মাঝে মাঝে হাঁকিতেছে, ছাব্বিশ, সাতাইশ, আটাইশ্। সে ভাবিল বুঝি নিলাম হইতেছে। কিন্তু কিসের নিলাম হইতেছে জানিতে পারিল না। সে ফুটপথের ধারে দাঁড়াইল। ইহাদের কাহাকেও ভকতরামের কথা জিজ্ঞাসা করিবে কি না ভাবিতে লাগিল। ইহারা সম্ভবতঃ খোঁজ রাখে। হাজার হইলেও জাতভাই। তা'ছাড়া ভকতরাম ধনী। তাহার সন্ধান ইহারা রাখিতে পারে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভকত্‌রাম বাবু হ্যায়? জান্‌তা ভকত্‌রাম বাবুকো?" মাড়োয়ারিটি মুখে একটা পান পুরিয়া উত্তর করিল, "কোন্ ভকত্‌রাম? হিঁয়া ত' কম্‌সে কম বিশো ভকত্‌রাম বাবু হ্যায়।" দামোদর হতবুদ্ধি হইল। বলিল, "ও বহুত্ ধনী হ্যায়। চার পাঁচ সালমে চার পাঁচ লাখ কামায়া।" মাড়োয়ারি হাসিয়া উঠিল। বলিল, "হয়া, সাহব। ঐসে বহুত্ হ্যায়; পর কঁড়ো হ্যায়।" দামোদর কি আর জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিতে লাগিল। শেষে কহিল, "নারাণবাবুকো জান্‌তা?" মাড়োয়ারি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "নেহি; নারাণবাবু কোন্ হ্যায়। ফট্‌কামে উস্‌কো কোই বিজ্‌নেস্ হ্যায়?" দামোদর ফট্‌কা কি তাহাই জানে না। নারাণবাবু কি কারবার করেন, ভকতরাম কি কারবার করে, সে ত' কিছুই জানে না। মাড়োয়ারিটিও ইতিমধ্যে অন্য কাহার ডাকে অন্য দিকে সরিয়া গেল। দামোদর হতাশ হইল। না; এ ভিড়ে কি কেহ কাহারও সন্ধান পায়। সে ভাবিল, ফট্‌কা কি তাহা সুরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। সে ফুটপথ ধরিয়া বড়বাজার অভিমুখে চলিল। কিছু দূর যাইতেই তাহারই মত পোষাক পরা কিন্তু আরও দীর্ঘদেহ, একজন পার্শী তাহাকে দাঁড় করাইয়া কি জিজ্ঞাসা করিল, পার্শীদের ভাষায়। দামোদর বিপন্ন হইল। নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সে পার্শীটি প্রায় চার পাঁচ মিনিট তাহাকে কি অনর্গল বলিয়া গেল, সে একটি বর্ণও বুঝিতে পারিল না; শুধু দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল। শেষে সেই লোকটি কোনও উত্তর না পাইয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল। দামোদর প্রতিজ্ঞা করিল, "এ বেশে সে আর এদিকে আসিবে না। এদিকে থাকা নিরাপদ নহে। সে জাল, এখনই ধরা পড়িয়া যাইবে। তখন হয় ত' তাহাকে পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিবে। না; সে ভাল কাজ করে নাই।" সে দ্রুতপদে চলিল; আরও কিছুদূরে একজন সাহেব তাহাকে ইংরাজিতে কি জিজ্ঞাসা করিল; সে একবর্ণও বুঝিতে পারিল না; হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। সাহেব আবার প্রশ্ন করিল; দামোদর ইংরাজি জানিত; কিন্তু সাহেবের মুখের ইংরাজি শুনে নাই। কাজেই কিছুই তাহার বোধগম্য হইল না। সে দাঁড়াইল না; পিছনে না তাকাইয়াই হন্ হন্ করিয়া চলিল। হ্যারিসন্ রোডের মোড়ে আসিয়া ট্রামের জন্য দাঁড়াইল। সম্মুখে দৃষ্টি পড়িতে দেখিল একখানা বড় সাইনবোর্ডে বড় বড় হরপে লেখা; "ভকতরাম লছমীরাম।" তাহার মনে হইল, সে এইখানে একবার সন্ধান করে। কিন্তু সাহস করিল না। ট্রাম আসিলে উঠিয়া পড়িল। চিৎপুর রোডে বদল্ করিয়া সে নারাণবাবুর বাড়ার দিকে পা চালাইল।

নারাণবাবুর বাড়ীর দরজার শিকল নাড়িতেই আজ মানদা দরজা খুলিয়া দিল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই মানদার মুখেচোখে ভয় ফুটিয়া উঠিল। সে জোর করিয়া বলিল, "তুমি কে?" বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দামোদর বলিল, "মানদা, আমি; আমি দামোদর। দরজা খোল; সব বল্‌ছি।"

মানদা দরজা খুলিল। দামোদর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ভয় নেই। আমি এই পোষাক পরে বেরিয়েছিলুম কাজে।"

মানদা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিল। তাহার ভয় তখনও যায় নাই। দামোদর হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, "আমায় কেমন দেখাচ্ছে, মানদা? খারাপ দেখাচ্ছে? না, আরও ভাল দেখাচ্ছে।"

মানদা কোনও কথা না বলিয়া ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল। দামোদরও তাহার পশ্চাতে চলিল। আজ নীচেকার ঘরের দরজা খোলাই ছিল। মানদা সেইখানেই

শুইয়া ছিল। দামোদর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরটি পরিষ্কার করা হইয়াছে। সতরঞ্চটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া পাতা হইয়াছে; একটা বালিসও রাখা হইয়াছে। দামোদর জুতা ও টুপী খুলিয়া বসিল; মানদা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

দামোদর বলিল, "মানদা, কি দেখ্‌ছো? আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? এটা কাজ কর্ত্তে যাওয়ার বেশ। কেউ সাহেব সাজে, আমি পার্শী সেজেছি।"

মানদা সংক্ষেপে বলিল, "বেশ্।"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "আগেকার চেয়েও ভাল?"

মানদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। দামোদর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমার এই বেশ পছন্দ কর, না আগেকার বেশ্?"

মানদা বলিল, "এই বেশ। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।"

দামোদর হাসিয়া বলিল, "তবে যে দরজা বন্ধ কর্‌ছিলে? চিন্‌তে পারনি, না?"

মানদা উত্তর দিল, "হাঁ। কিন্তু রঙ্ মেখেছ কেন? বেটাছেলে রঙ্ মাখে?"

দামোদর বলিল, "দরকারে পড়ে মেখেছি, মানদা। আমার কি ফর্সা হো'তে সখ্ হয় না। তুমি না হয় এমনিই ফর্সা। তোমার রঙের দরকার হয় না।" দামোদর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

মানদা কোন কথা না বলিয়া চাহিয়া রহিল। দামোদর বলিল, "মানদা, তোমার বাবার খবর পেয়েছ?"

মানদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

দামোদর চিন্তান্বিত হইয়া বলিল, "তাই ত! মানদা, তোমার বাবা না এলে ত কোন কাজই এগুচ্ছে না। কোথা যান্?"

মানদা জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ?"

দামোদর উত্তর দিল, "অনেক কাজ, মানদা। তোমাদের বাড়িতেও ত' কেউ নেই। কি করে চলে তোমাদের? বাজার-হাট্ কর না? কে ক'রে দেয়? ঝি আছে? ঠিকে ঝি বুঝি?"

মানদা কোনও উত্তর দিল না। দামোদরও তাহার দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মানদা, তুমি খুব সুন্দরী!"

মানদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে সুন্দরী। দামোদরের মনে হইল, যেন মানদার ওষ্ঠে একটু ক্ষীণ হাসির আভা দেখা গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমায় ভালবাস্‌তে পার্ব্বে? আমি ত' তোমার উপযুক্ত নই, মানদা।"

মানদা জবাব দিল, "তুমি শোবে? ঘুমোবে? ত' ঘুমোও। আমি এসে উঠিয়ে দেব।"

দামোদর বলিল, "একটু বোস না, তুমিও। তোমার কি কোনও কাজ আছে? বোস; বিয়ের পর কিন্তু তোমার আর এ বাড়ীতে এ রকমে থাকা হবে না। ভাল বাড়ি দেখে চলে যাবো। তোমায় ভাল কাপড় জামা গহনা পরতে হবে। বুঝেছ?"

মানদা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা'র অনেক টাকা জমান আছে, না? কিন্তু বড় কৃপণ, না? তোমাদের এমন ক'রে রেখেছেন; কষ্ট দিচ্ছেন। কিন্তু আমি ত' কষ্ট দিতে পার্ব্বো না।"

মানদা ঘাড় নাড়িয়া "তুমি ঘুমোও।" বলিয়া দ্রুতপদে অন্তর্হিত হইল।

দামোদর তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল, বিবাহের পর সে কেমন করিয়া বাস করিবে। নিশ্চয়ই একখানা বড় ও ভাল দেখিয়া বাড়ি লইবে। ২টা চাকর, না হয় তিনটাই রাখিবে। একটা ঝি ত' থাকিবেই। একজন পাচক ব্রাহ্মণ চাই; মানদা'কে রান্না করিতে দেওয়া হইবে না। উহার রূপ তাহাতে খারাপ হইয়া যাইবে। বাড়িতে ভাল ভাল আস্‌বাব রাখিবে। নারাণবাবু কত টাকা দিবে কে জানে; সম্ভব দশ হাজারই এখন দেবেন। দশ হাজার নারাণবাবুর কাছে কিছুই নয়। কত টাকা এই বাড়িতে কোথাও পোঁতা আছে মাটির ভিতর তা'র কি ঠিকানা আছে। চৌরঙ্গীতে বাড়ি কিনিয়া থাকা ত' বড় কম কথা নয়। দশ হাজারও যদি দামোদর পায়, তবে সে কি করিবে? বাড়ি ভাড়া বড় জোর মাসে ৮০৲ টাকা দিবে; আচ্ছা, ১০০৲ টাকাই ধরা থাক্; চাকর-বাকরের মাহিনা, ধর ৫০৲ টাকা; এই হো'ল ১৫০৲; আচ্ছা, সংসার খরচ ধর আরও ১০০৲; এই হো'ল ২৫০৲; ২৫০৲ টাকা মাসিক খরচ। প্রথম দু'এক মাস ঐ দশহাজার থেকেই খরচ হবে। আট হাজার টাকা সে আলাদা রাখিবে। দু' হাজার হইতে খরচ করিবে।

দু' হাজার টাকা হইতে বাড়ির আসবাবপত্রও কিনিতে হইবে। তার' পর সে নিজেই ত' অর্থ উপার্জ্জন করিবে। তখন আর ঐ টাকা হইতে বিশেষ কিছু খরচ হইবে না। একখানা মোটরগাড়িও তখন কিনিবে। মোটরগাড়ি না হইলে চলিবে না। তাইতে সে মানদাকে লইয়া মাঝে মাঝে গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে যাইবে। কিন্তু এই সমস্ত হইলে, শচীন, রমেশ, নগেন ইঁহাদের খবর দেওয়া উচিত কি না! বিবাহের আগে খবর দেওয়া ঠিক হইবে না; এক ভয় নিতাই ঘোষ। তা' ততদিনে নিতাই ঘোষ আর গ্রাম ছাড়িয়া তাহার সন্ধানে আসিবে না। আসিলেও সে তাড়াইয়া দিবে। তাহারই ত' তিন চারজন চাকর থাকিবে! বেশী উৎপাত করে পুলিসে ধরাইয়া দিবে। যদি রাধারাণী আসে? না, রাধারাণীকেও সে আর চাহে না। তবে যদি থাকিতে চাহে, তাড়াইয়া দিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরে দামোদর ঘুমাইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙিল তখন প্রায় সন্ধ্যা। দেখিল মানদা তাহার অদূরে দাঁড়াইয়া। তাহাকে চোখ খুলিতে দেখিয়া, সে বলিল, "এইবার যাও।" দামোদর উঠিয়া বসিল; জুতা পরিতে পরিতে বলিল, "কেন? তাড়িয়ে দিচ্ছ?"

মানদা উত্তর দিল, "যাও। আবার কাল এসো।"

দামোদর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মানদা, তোমাকে ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছে হয় না। কত দিনে যে বিয়েটা হবে!"

মানদা উত্তর করিল না। দামোদর জুতা পরিয়া, টুপি ঠিক করিয়া, বসাইয়া, বলিল, "চল। তুমি না তাড়িয়ে যখন ছাড়্‌বে না, চল।"

মানদা কহিল, "তুমি আগে চল।"

দামোদর আগে চলিল। দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "কালও এই সময় আসবো।" তা'র পর ক্ষুণ্ণ মনে, মন্থরগতিতে, দুই তিনবার পিছন তাকাইতে তাকাইতে সে প্রস্থান করিল। নারাণবাবুর উপর তাহার মনে মনে রাগ হইল। এ কি রকম ব্যবহার? তাহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া, এখন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই! সে কতকাল অপেক্ষা করিবে?

সে হাঁটিয়াই চলিল। এখন সুরেনবাবুর দোকানে যাইবে; সেখান হইতে মেসে যাইবে। ঘুমাইয়া তাহার শরীরও একটু সুস্থ হইয়াছে, সতেজ হইয়াছে। রাস্তায় দুই চারজন তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিল। সে কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া চলিল। কিন্তু তাহার মনে হইল যে এই পোষাকে এদিকে না বেড়াইয়া সাহেব মহলে, চৌরঙ্গীতে বেড়ানই ভাল। বিবাহের পর সে এ পোষাক যদি পরে, তবে ত মানদাকেও পার্শী-মেয়েদের মত পোষাক কিনিয়া দিতে হইবে। কিন্তু এ পোষাক পরিয়া তাহার দিনের বেলায় বাহির হওয়া চলিবে না। আজ দুপুরে কি বিভ্রাটই বাধিয়াছিল। আবার যদি কোনও পার্শী ধরিয়া বসে! কথা মনে হইতেই তাহার ভয় হইল। না, রাস্তায় চলা নিরাপদ নহে।

সুরেনবাবুর দোকানে আজও খুব ভিড়। তবে আজ রমেশ, নগেন কি শচীন কেহই নাই। সে অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিল, দলে দলে ছেলেরা আসিতেছে ও যাইতেছে। বুঝিল এখন যাওয়া ঠিক নহে। সে আবার হ্যারিসন রোড ধরিয়া ফিরিয়া আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইয়া বহুবাজারে পড়িল। ভাবিল, বায়স্কোপে যাইবে। বহুদিন বায়স্কোপে যায় নাই। সময়ও কাটিবে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সে কি করিবে?

দামোদর বহুবাজার ধরিয়া কলেজ ষ্ট্রীটে পড়িল; সেখানে ট্রামে চাপিয়া চাঁদনীর সম্মুখে নামিয়া পিক্‌চার প্যালেসের দিকে অগ্রসর হইল। বায়স্কোপের কাছে আসিয়া সে কোন্ শ্রেণীর টিকিট কিনিবে ভাবিতে লাগিল। আগে যখন আসিত তখন ত' ।০ আনার টিকিটই কিনিত; বড় জোর ॥০ আনা। কিন্তু এই চেহারা ও সাজে ত' ।০ আনা ॥০ আনার টিকিট চলিবে না। সে ১৲ টাকার একখানি টিকিট কিনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সে যেই একখানি চেয়ার দেখিয়া লইয়া বসিয়াছে, অমনি বায়স্কোপ সুরু হইল। দামোদর অনেকদিন না দেখাতেই হো'ক্, আর ছবিও ভাল বলিয়াই হো'ক্, তাহার সমস্ত বেশ ভাল লাগিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, সে জানিতে পারিল না। 'ইন্‌টারভালে' তাহার সময়ের জ্ঞান হইল। চারিদিকের আলোতে সে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল। হঠাৎ তাহার পিছন হইতে তাহার কাঁধে কে হাত দিতেই সে চমকাইয়া ফিরিয়া দেখিল, সাহেবী-বেশী একজন বৃদ্ধ

তাহাকে কি বলিতেছেন। বৃদ্ধটির সহিত ৪।৫ জন পার্শী রমণী দেখিয়া সে বুঝিল, ইহারা সবাই পার্শী। দামোদর এ বিপদ প্রত্যাশা করে নাই। বায়স্কোপ দেখিবার প্রবল আগ্রহে সে এসব ভাবনা না ভাবিয়াই আসিয়াছিল। বৃদ্ধটি তাহাকে কতকগুলি কথা বলিবার পর, একজন বর্ষিয়সী রমণীও তাহাকে কি বলিল। দামোদর উঠিয়া পলাইবে কি না ভাবিতে লাগিল। তাহার উত্তর না পাইয়া পার্শীদের দল নিজেদের ভিতর কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল; দামোদর বুঝিল, সে'ই তাহাদের আলোচ্য। বায়স্কোপ আবার আরম্ভ হইল; চারি দিক অন্ধকার হইল। দামোদর হাঁফ ছাড়িল; ভাবিল শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে উঠিয়া পলাইবে।

কিন্তু ছবির গল্পে এত শীঘ্রই আকৃষ্ট হইল যে তাহার মন হইতে সমস্ত কথা ও সঙ্কল্প একেবারে তিরোহিত হইল। সে পলায়নের কথা ভুলিয়া গেল। একেবারে শেষ হইয়া সমস্ত বাতি জ্বলিয়া উঠিলে, তবে তাহার হুঁস হইল। কিন্তু সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, বর্ষিয়সী পার্শী মহিলাটি তাহার হাত ধরিয়া কি কতকগুলি বলিল। তাঁহার সঙ্গের সকলেও উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। দামোদরও কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া একটু হাসিল; কিন্তু তাহার বুকের ভিতর ভয় হইল, এইবার বুঝি ধরা পড়িল; এইবার তাহাকে পুলিসের হাতে যাইতে হইল! কেন সে আসিয়াছিল? একবার বর্ষীয়সী মহিলাটি তাহার হাত ছাড়িতেই, সে বাহির হইবার জন্ত দ্রুতপদে চলিল। পার্শীদের দলও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কোনও রূপে বাহিরে আসিয়া ভিড়ের মধ্যে সে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিল। তা'র পর হগ্ সাহেবের বাজারের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া চৌরঙ্গী রোড ধরিয়া সে এস্প্লানেডে আসিয়া ট্রামে উঠিল।

মেসে ফিরিবার পথে সে স্থির করিল যে ছদ্মবেশ সে রাখিবে না। ইহার বড় বিপদ। হো'ক নিতাই ঘোষের ভয়; হো'ক মানদার কাছে ইহা সুন্দর। কিন্তু সে জেলে যাইতে পারে না। মেসে ফিরিয়া সে শচীনকে বলিল, "আমি এ পোষাক আর পরবো না।"

শচীন কহিল, "তাই ত, ওটা তা'হলে নষ্ট হবে, দামোদরবাবু! না পরেন ত কি ক'রে চলবে? ৩৫৲ টাকা! সব জলে যাবে?"

দামোদর বলিল, "যাই কপালে থাকুক্, এ আর নয়। শচীনবাবু, এ যে কি রকম বিপদ, তা' আপনি জানেন না। আমার মনে হয় নিতাই ঘোষ আর এখানে নেই—চলে গেছে। আজ কি তা'কে দেখেছেন?"

শচীন জানাইল, না দেখে নি।

দামোদর বলিল, "তবে? কেন বৃথা নিজেকে বিপন্ন করি?"

নগেন বলিল, "নিতাই ঘোষ যায় নি বোধ হয়। দু' একদিন আসে নি বলে কি হাল ছেড়ে দিয়েছে সে? সে লোকই নিতাই ঘোষ নয়।"

দামোদর মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা' হোক্।"

সকলে তাহার মনের জোর দেখিয়া বিস্মিত হইল। শচীন বলিল, "কিন্তু তা' হলে, চারুবাবু এ মেসে আপনাকে থাক্‌তে দিতে আপত্তি কর্ত্তে পারেন।"

দামোদর রমেশের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল হইয়া বলিল, "রমেশ বাবু, আমি কি কোর্‌বো? আপনি বলুন।" সে সারা দিন তাহার ছদ্মবেশে কি বিপদ্ ঘটিয়াছে বর্ণনা করিল। শচীন শুনিয়া বলিল, "ইস্, একটু পার্শীভাষা যদি শিখে রাখ্‌তেন কি adventureই হো'ত!"

রমেশ তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া বলিল, "আমি ত বলেছি। এখনও চা'ন ত সেই বাড়িতে কাজ কর্ত্তে যেতে পারেন, না পোষায় ছেড়ে দেবেন। কিন্তু আপাততঃ আপনিও নিশ্চিন্ত হোতেন, আমরাও নিশ্চিন্ত হতুম। এ সব দুর্ঘটনাও ঘটতো না।"

দামোদর উত্তর করিল, "তাই যাবো। আপনি কাল চিঠি দেবেন, আমি এ রকম করে বেড়াতে পারবো না।"

শচীন আক্ষেপ করিয়া বলিল, "পোষাকটা মাটি হবে। ৩৫৲ টাকা খরচ হয়েছে।"

নগেন বলিল, "আচ্ছা, আমি পরে বেড়াবো'খন। তো'র দুঃখ কর্ত্তে হবে না। আমি পার্শী হবো। বহুদিন বাঙালী থাকা গেছে, আর নয়।"

শচীন বলিল, "সত্যি? ঠিক পরবি?"

নগেন উত্তর দিল, "হাঁ। কা'ল সকাল থেকেই পরবো। দিনকতক খুব adventure হবে। না, রমেশ? এ আর ভাল লাগে না।"

রমেশ উত্তর দিল, "হবে।"

শচীন শুইয়া পড়িয়া বলিল, "তোর কি হয়েছে, রমেশ?

তো'র অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। মরেছিস্ বুঝি প্রেমট্রেম ক'রে ?"

তা'র পর নিজের মনে সখেদে বলিল, "আমার আর কিছু হো'ল না ও-সব! নগেনটারও কিছু হো'ল না! আমাদের কপালে দেখ্‌ছি একেবারে বিয়েই আছে! সুখ আর নেই।"

নগেন উত্তর দিল, "তুই দেখ্, শচী, আমি একটা মত্‌লব করেছি। দেখ্ কি করি। এতই যখন হোল, তখন একবার পার্শী হোয়েই দেখ্‌বো; অন্ততঃ খানিক অভিজ্ঞতা ত হবে। পার্শীদের সুন্দরী মেয়ে আছে; খুব শিক্ষিতা আর সভ্য। ওদের টাকা আছে, ব্যবস্থা আছে। দেখি যদি কিছু কোর্ত্তে পারি। বুঝেছিস্, শচী ?"

বিংশ পরিচ্ছেদ

"Dictionary'র কতটা মুখস্থ আছে ?"

পরদিন দামোদর রমেশের নিকট চিঠি লইয়া স্বমূর্ত্তিতে ও স্ববেশে ১০৫।৪নং পার্ক ষ্ট্রীটে গেল। সেখানে পৌঁছিয়া বেহারাকে দিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিল। চিঠির উপরে নাম "মিস্ সুনীতি রায়" ছিল। সুনীতি রায় কে ও কেমন, দামোদর জানিত না; রমেশের সহিতও কি সম্পর্ক বুঝিত না। রমেশ কোনও কথা ভাঙিয়া বলে নাই; তবুও এতবড় ধনী লোকের সহিত তাহার আলাপ আছে, হয়'ত আত্মীয়তাও আছে, ভাবিয়া রমেশের প্রতি তাহার একটা সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব হইল। রমেশকে সে গোড়া হইতেই শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে। শচীন ও নগেন দু'জনেই যে তাহাকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করে তাহাও সে বুঝিয়াছিল।

চিঠি পাঠাইয়া দিবার ৮।১০ মিনিট পরে বেহারা আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসিতে বলিল। বেশ বড় ঘর; বহুমূল্য আস্‌বাবে সজ্জিত। মেঝেতে গালিচা পাতা; এত পরিষ্কার ও মূল্যবান যে তাহার জুতা রাখিতেই ভয় হইতেছিল। বড় বড় আয়না; নানাবিধ ছোট খেল্‌না ও মূর্ত্তি! সে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার একবার কাছে গিয়া ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু নড়িতে চড়িতে সাহস হইল না। একখানি চেয়ারে সে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল,—কেহ আসেও না, কাহারও কোনও শব্দও শুনিতে পায় না। প্রায় আধ ঘণ্টা সে বসিয়া রহিল। মনে মনে এই ঘর ও নারাণবাবুর বাহিরের ঘর তুলনা করিয়া হাসিল। নারাণবাবুও মনে করিলে এই রকম সব আসবাবপত্র কিনিয়া বাড়ি সাজাইতে পারেন। কিন্তু কি কৃপণ! আর হয় ত সেই ভাল! এত দামী দামী আস্‌বাব, সাজসজ্জার ভিতর প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া উঠে; হাঁফ ধরে। কেবলই ভয় হয় বুঝি ময়লা হইল, দাগ ধরিল, নষ্ট হইল! তক্তপোষ ও ছেঁড়া সতরঞ্চির সে ভয় নেই। যে রকমে ইচ্ছা ব্যবহার কর। তাহার উপর উঠিয়া নাচ, বাজাও,—কোনও ভয় নাই।

সে অপেক্ষাই করিতে লাগিল। এক ঘণ্টা গেল; প্রায় ১½ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইল; কেহ তাহাকে ডাকেও না, সন্ধানও করে না। সে যে একটা বাহিরের লোক আসিয়াছে, যেন কাহারও খেয়াল নাই। সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ইহারা ভুলিয়া গেল না কি? যাহাকে চিঠি পাঠাইয়াছে, সে নিশ্চয়ই সেই অদ্ভুত মহিলাটি, যে তাহাকে প্রবন্ধ লিখিতে দিয়াছিল। তাহার পক্ষে চিঠির কথা ভুলা কিছু আশ্চর্য্য নহে! কিন্তু রমেশ তাহাকে চিনিল কি করিয়া? কি রকম আত্মীয় কে জানে! চিঠি দিয়াছে যখন তখন নিকট আত্মীয়ই হইবে।

বেহারা আসিয়া খবর দিল, "উপরে আসুন।"

দামোদর বুঝিল, চিঠির কথা ভুলে নি, সে যেই হোক্। সে বেহারার পশ্চাতে গিয়া উপরে উঠিল। সিঁড়ি বেশ প্রশস্ত; ম্যাটিন করা; জুতার আওয়াজ মরিয়া যায়। চারি দিক একেবারে পরিচ্ছন্ন। ধূলাটি পর্য্যন্ত নাই। সে সন্তর্পণে চলিল। উপরে উঠিয়া বড় বারান্দা। তাহাতে একখানি গোল বড় টেব্‌ল; চার দিকে আরাম-চেয়ার। বেহারা তাহাকে বসিতে বলিল। এখানে অপেক্ষা করাই প্রধান নিয়ম বুঝিয়া সে আবার বসিল। তাহার ঐ চেয়ারে বসিতে সঙ্কোচ হইতেছিল; তবু সে, অনুরূপ ব্যবস্থা না থাকায়, বাধ্য হইয়া বসিল। বেহারা চলিয়া গেল। মিনিট ১০।১৫ বাদে একজন মহিলা আসিল। দামোদর অনুমানে বুঝিল এ সেই মেয়েটিই। তাহার হাতে রমেশের লিখিত চিঠি। মেয়েটিকে এবার দামোদর ভাল করিয়া দেখিল। বয়স ২২।২৩ হইবে; রূপ আছে। বেশ ফ্যাসান দুরস্ত

বেশভূষা; পায়ে মখমলের স্লিপার। দামোদর বেথুন কলেজের গাড়িতে যে-সব মেয়েদের দেখিয়াছিল, সেই ধরণের। সে অনুমান করিল, এই মেয়েটি নিশ্চিত শিক্ষিতা। খুব পড়িয়াছে; সম্ভব বি-এ, এম-এ পাশ করিয়াছে। হয় ত বা বিলাতেও গিয়াছে। কে জানে? সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া পড়িল।

মেয়েটি তাহাকে দেখিয়া বলিল, "বসুন আপনি।" সে নিজেও বসিল। দামোদর দাঁড়াইয়াই রহিল। মেয়েটি আবার তাহাকে বসিতে বলিল। দামোদর বসিল।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এ কাজ পার্বেন? আমরা লোক খুঁজ্‌ছি; কিন্তু ঠিক মনের মত পাই নি। আপনি ত বিএ পাশও করেন নি। তবে শুনছি আপনার বাংলা ও ইংরাজিতে দখল আছে! কবিতা লিখ্‌তে পারেন? এখন লিখে দেখাতে পার্বেন? আপনি কি রকম কবিতা লেখেন? ভাব এলে লেখেন? না, ভাবের ওপর আপনার command (প্রভুত্ব) আছে? ইংরাজি কি পড়েছেন? ডিক্সনারির কতটা মুখস্থ আছে?"

দামোদর এত প্রশ্নের একটিরও উত্তর দিতে পারিল না। সে নতমস্তকে বসিয়া রহিল। মেয়েটি আপন মনেই বলিয়া চলিল, "কবিতায় ডিক্‌স্‌নারি দরকার হয়। না হ'লে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আপনি দিন কতক থাকুন। এসেছেন যখন। কাজ কর্ত্তে সুরু করুন, বুঝ্‌তে পার্বেন।"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ আমায় করতে হবে?"

মেয়েটি বলিল, "কাজ? চিঠি-পত্র লেখা; বাবা একখানা বই লিখ্‌ছেন, 'প্রাগৈতিহাসিক বাংলা' তার জন্যে আপনাকে তাঁ'র সাহায্য কর্ত্তে হবে; সাহিত্যিক প্রবন্ধ লিখে দিতে হবে, আমাদের একটা সাহিত্য-সভা আছে, তার জন্যে; আর একটু আধটু দরকার হবে বাহিরের লোকজনের সঙ্গে দেখা ক'রে কথাবার্ত্তা কহা। খুব পরিশ্রম নেই। মাহিনা আপাতত আপনাকে ৭৫৲ টাকা দেওয়া হবে; খাওয়াদাওয়া এখানেই হবে। একটা আলাদা ঘরও দেওয়া হবে, থাক্‌বার জন্যে। তবে দরকার মত আপনাকে পাওয়া চাই। বাকী যা' বল্‌বার বাবা বল্‌বেন। তিনি নীচে আছেন। চলুন তাঁ'র কাছে যেয়ে যাই।"

মেয়েটি উঠিয়া চলিল; দামোদর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নীচে আসিয়া প্রথম দিন যে ঘরে সেই বৃদ্ধের সহিত দেখা করিয়াছিল সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

মেয়েটি সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়া বলিল, "বাবা, এই ভদ্রলোক কাজ কর্বেন।"

বৃদ্ধ কি লিখিতেছিলেন, দামোদরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কাজ? কেন কর্বেন?"

মেয়েটি চুপি চুপি তাঁহার কানে কি বলিল। বৃদ্ধ কহিলেন, "ওঃ! তা' বেশ্। করুন। আজ থেকেই করুন না।"

মেয়েটি বলিল, "তোমার যা' যা' কর্ত্তে হবে, ওঁকে বলে দাও। ওঁর নিজের কাজ সম্বন্ধে একটা আইডিয়া ত দেওয়া চাই। আমি কতক দিয়েছি। তুমি বাকী সব বলে দাও। কেমন? তোমার যা' দরকার।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওঁকে প্রবন্ধটা রচনা কর্ত্তে দেবে না?"

মেয়েটি জবাব দিল, "না। তা'র দরকার নেই।"

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা।" মেয়েটি—দামোদর ধরিয়া লইল উনিই সুনীতি রায় আর ইনি মিঃ রায়—প্রস্থান করিল।

মিঃ রায় তাহাকে ডাকিয়া কাছে বসিতে বলিলেন। তার পর নিজের লেখায় মনঃসংযোগ করিলেন। দামোদর বসিয়া রহিল; এদিক-ওদিক দেখিতে লাগিল। মিঃ রায় একমনে লিখিতে লাগিলেন। আধঘণ্টা, একঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল; দামোদরের বসিয়া বসিয়া দেহ আড়ষ্ট হইল; ক্ষুধায় উদর জ্বলিয়া গেল। অথচ উঠিতেও পারে না। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে, মিঃ রায় মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিয়া চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসামে মানুষ আসিল কি করিয়া?" আসামীরা যদি মোঙ্গলয়েড হয়, তবে মঙ্গোলিয়ার লোক নিশ্চয়ই আসিয়াছিল; কিন্তু কোন্ পথে আসিয়াছিল? উত্তর দিয়া না দক্ষিণ দিয়া? পূর্ব্ব দিয়া না পশ্চিম দিয়া? আসিয়া কি দেখিল? কাহাকে দেখিল? মোঙ্গলয়েড জাতের আগে কাহারা ছিল?"

দামোদর জীবনে এ সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা শুনে নাই। তবু সাহস করিয়া বলিল, "দেখ্‌তে হ'য় খুঁজে। নিশ্চয়ই

কোথাও কোনরকম ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। প্রাত্নতাত্ত্বিক চিহ্ন কিছু থাক্‌তে পারে!"

মিঃ রায় বলিলেন, "ঠিক! দেখুন 'ত খুঁজে।" তা'র পর তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। দামোদর কোথায় খুঁজিবে ভাবিয়া পাইল না। আসামের প্রাত্নতাত্ত্বিক অবশেষ কলিকাতার পার্ক ষ্ট্রীটে কোথায় খুঁজিবে? মিঃ রায় মিনিট ১৫।২০ চিন্তা করিলেন; দামোদর নিতান্ত সহিষ্ণুতার সহিত বসিয়া রহিল। মিনিট ১৫।২০ বাদে মিঃ রায় বলিলেন, "বেদে "বাঙ্‌লা" নাই। না থাক্‌লে কি বাঙ্‌লা থাকিতে পারে না? বেদের সঙ্গে বাঙ্‌লার কি সম্পর্ক? বেদ বই; বাঙ্‌লা দেশ। বেদ যদি ভূগোল হোত, যদি পাহাড়, নদী, জঙ্গল হো'ত, বাঙ্‌লার সঙ্গে সম্বন্ধ থাক্‌তো। নয় কি না?" বেলা ২টা ২॥০টার সময় এরূপ সাংঘাতিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দামোদরের পক্ষে কষ্টদায়ক হইল। এ সব বৃত্তান্ত তাহার চৌদ্দপুরুষ কেহ কখনও জানে নাই, শোনে নাই: সে অসহায় অবস্থায় বসিয়া রহিল।

মেয়েটি এই সময় আবার আসিল; তাহার বাবাকে বলিল, "বাবা, লাঞ্চের সময় হয়েছে; চল।" তার পর দামোদরকে দেখিয়া বলিল, "ওঃ! আপনি বসে এখনো? বাবা! এঁকে তুমি বসিয়ে রেখেছ? কিছু বল নি?"

বৃদ্ধ লজ্জিতভাবে কহিলেন, "তাই 'ত! নীতি, ভুলে গিছলুম, মা। তুমি দাও না ব্যবস্থা ক'রে। ওঁ'র ঘর দেখিয়ে দাও; খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দাও। আগে দাও; তা'র পর আমি খেতে যাবো।"

সুনীতি উত্তর দিল, "তুমি ওঠ, যাও। আমি এঁকে সব দেখিয়ে বলে দিচ্ছি।" তা'র পর সে দামোদরকে বলিল, "আপনি আসুন।"

দামোদরকে নীচের ঘরের ভিতর দিয়া, একটা পার্শ্বের বারান্দা পার হইয়া সুনীতি পিছন দিকের একটি ঘরের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া বলিল, "এই আপনার ঘর। ঘরের ভিতর দিয়াই বাথরুমে যাওয়া যাবে। ঘর দেখে নিন্। যা' দরকার আরও হবে, আমি বেহারা পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাকে বল্‌বেন। আর খানাও পাঠাচ্ছি। আপনার কোনরকম প্রেজুডিস্ নাই ত'? আমাদের খাওয়া-দাওয়া খেতে আপত্তি নেই ত'?"

দামোদর জানাইল, তাহার কোনও আপত্তি নাই।

মেয়েটি বলিল, "আপনি বেশ জিরিয়ে বিশ্রাম করে তার পর আবার ওপরে যাবেন। আমি আপনাকে সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে দেব। বুঝেছেন?"

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সুনীতি চলিয়া গেলে সে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরের এক দিকে খাট-পাতা, তাহার উপর বিছানা; পরিষ্কার বিছানা; বেড-কভার দিয়ে ঢাকা। আর এক পাশে একটা বড় কাপড়ের আলমারি। তাহাতে একখানা প্রকাণ্ড আয়না লাগান। অন্য এক দিকে, একটা টেবিল। টেবিলের উপর কালিকলম, চিঠির কাগজ; দুখানা বসিবার হাতওয়ালা গদি-আঁটা চেয়ার, দুখানা আরাম কুর্সী; একখানা সোফা। ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা দুখানা; চার পাঁচটা আলো; এক ধার দিয়া একটা দরজা; সে দরজা দিয়া দামোদর উঁকি মারিয়া দেখিল, পাথরের মেঝে-ওয়ালা বাথ-রুম। তিন-চারটা জলের কল। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল, একটা প্রকাণ্ড শুইয়া নাহিবার টব—পাথরের; কমোড, ইত্যাদি। দামোদর সমস্ত দেখিয়া অভিভূত হইল। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল! ফিরিয়া ঘরে আসিয়া একখানি চেয়ারে হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। সে এখানে কি করিবে; কি করিতে হইবে, তাহার কোনও জ্ঞান নাই; জীবনে এমন অবস্থায় পড়ে নাই। ইহার চেয়ে নারাণবাবুর বাড়ির তক্তপোস ও সতরঞ্চি ভাল। কথাটা মনে হইতেই তাহার মানদার কথা স্মরণ হইল। তাই ত! মানদা তাহার আশা করিয়া আছে, তাহার ত' যাওয়া হইল না। মানদাকে দেখিতে যাইতে তাহার মন উন্মুখ হইল। কিন্তু কি করিয়া যায় আজ? আজ ত' কিছু বলা হয় নাই; কাল না হয় বলিয়া অনুমতি লইয়া যাইবে। আজ দিনটা বৃথাই গেল। কি বাড়িতে কি লোকের সংসর্গে আসিয়া পড়িয়াছে, সে বুঝিতে না পারিয়া আরও হতবুদ্ধি ও নিরুৎসাহ হইল।

একজন বেহারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার দেব?"

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, দিবে। বেহারা চলিয়া গেল। অবিলম্বে সে ও আর একজন বেহারা আসিল। একজন একটা ছোট টি-পয় কোথা হইতে আনিয়া তাহার সম্মুখে স্থাপন করিল; একটা কাচের

গেলাসে জল দিল। অন্যটি হাত হইতে নামাইয়া দুখানা প্লেট ও দুটা ছোট ছোট প্লেট বাহির করিয়া খাবার দিয়া চলিয়া গেল। দামোদর দেখিল বড় প্লেটের একখানিতে ডবল রুটির টুক্রা খান ৪।৫; একটা কি ভাজা; আর একখানিতে একটা কি জিনিস্ তাহা দামোদর বুঝিতে পারিল না। ছোট প্লেটেও কি আছে সে চোখেও দেখে নাই পূর্ব্বে কখনো। কেবল কতকগুলি পেঁয়াজ কুঁচা ও আলু সিদ্ধ দেখিতে পাইল ও চিনিতে পারিল। যে বেহারাটা দাঁড়াইয়া ছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "ছুরি-কাঁটা চামচ্ চাই?" দামোদর জবাব দিল, "না।" বেহারাটা একটু অপেক্ষা করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "চা 'দেব কটার সময়?" দামোদর ভাবিয়া বলিল, "৫টার সময়।" বেহারা আবার একটু দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু চাই?" দামোদর কি পাইয়াছে জানিত না; কাজেই বলিল, "না।" বেহারা চলিয়া গেল। দামোদর বেশ করিয়া চাহিয়া চাহিয়া তাহার খাদ্যের মূর্ত্তি দেখিল। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া একটুকরা পাঁউরুটি লইয়া মুখে দিল। তাহার পর বড় প্লেটে যে জিনিসটা ছিল শুঁকিয়া দেখিল। অনেকটা যেন হোটেলের মটন চপের মত মনে হইল। সে আঙুল দিয়া টিপিয়া দেখিল। হাতে একটু ঝোল লাগিয়া গেল; সে মুখে দিয়া দেখিল, কি রকম গন্ধ! সে আর এক টুক্রা শুক্না রুটি খাইল। একটু আলুসিদ্ধ খাইল। তার পর এক গেলাস জল খাইয়া উদর পূর্ণ করিল। হাত ধুইয়া আসিয়া সে আরাম-চেয়ারে শুইয়া ভাবিল, এ সুখের শয্যা তাহার কণ্টকপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু উপায়ান্তর নাই। এইখানেই তাহাকে আপাতত থাকিতে হইবে। কিন্তু কাল না হয় আজ সন্ধ্যায় একবার তাহাকে মেসে ফিরিতে হইবে। কিছু কাপড়-জামা অন্তত চাই ত'। আর মানদাকে দেখিতে যাইবার একটা উপায় বাহির করিতে হইবে।

পাঁচটার সময় সে উপরে যাইতে প্রস্তুত হইল। বেহারা আসিয়া তাহাকে একটা ট্রে করিয়া চা-দান, একটা পেয়ালা-পিরিচ, প্রভৃতি দিয়া গেল, আর উচ্ছিষ্ট বাসন লইয়া গেল। সে তিনপেয়ালা চা' খাইল, ক্ষুধার তেজে। তার পর উঠিয়া অনেক কষ্টে পথ চিনিয়া উপরে গেল। সুনীতি তখন বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল; পার্শ্বে মিঃ রায়ও বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। দামোদরকে দেখিয়া সুনীতি বলিল, "আপনি এসেছেন? বসুন।"

দামোদর বসিলে, সে বলিল, "বাবার সঙ্গে কথা কহেছি। আপনি ইচ্ছা করেন সকাল থেকে—এই ৮টা থেকে ১১টা পর্য্যন্ত—লাইব্রেরিতে কাজ কর্ব্বেন; সমস্ত বই-পত্র ঠিক করে রাখ্‌বেন; বাবার যা' নোটের দরকার হবে সব খুঁজে পেতে দেবেন; যদি copy করার (নকল করার) প্রয়োজন হয়, সময় সময় নকলও করে দেবেন। ১১টা থেকে ৩টা পর্য্যন্ত আপনার বিশ্রাম; ৩টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত চিঠিপত্র লেখা। ৪টা থেকে ৬টা পর্য্যন্ত অন্য যে কোনও কাজ হয়। কি কাজ তা'র ঠিক্ নেই কিছু; হয় ত কোনও কাজ কর্ত্তে হবে না। কিন্তু আবার হয় 'ত অনেক কাজ কর্ত্তে হবে। আর আপনার একটা মস্ত কাজ হবে, সব হিসাবপত্র ঠিক রাখা। ক্রমশঃ বাড়ির সমস্ত খরচপত্র হিসাবের ভার আপনার উপর দেওয়া হবে। এ বিষয়ে এখন সনাতন বেহারাই সমস্ত ক'রে। কিন্তু সে হিসাব রাখিতে পারে না। আর যা' বল্লুম, মাঝে মাঝে সাহিত্যিক প্রবন্ধ লিখে দিতে হবে আমার জন্যে।"

দামোদর উত্তর দিল "বেশ। আমি কাল সকাল থেকে কাজে লাগবো! আজ আমার জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড় নিয়ে আসি। তা হ'লে আর থাকার আপত্তি হবে না।"

মিঃ রায় সম্মতি দিলেন। দামোদর নমস্কার করিয়া সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিয়া অনেকটা আরাম অনুভব করিল। সে সুরেনবাবুর চা-এর দোকানে না গিয়া, নারাণবাবুর বাড়িতেই চলিল। মনটা তাহার সে দিকেই ঝুঁকিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

যুযুৎসু কৌশল

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

যুযুৎসু কৌশলগুলির পূর্ব্বাপর ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে আমরা অপরকে আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষার কৌশলই বেশী দেখিতে পাই। সেইজন্য এই কৌশলগুলিকে, সকলেই কেবলমাত্র আত্মরক্ষার কৌশল বলিয়াই অভিহিত করিয়াছে। কিন্তু এই কৌশলগুলি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিলে এই কৌশলের দ্বারা অপরকে আক্রমণ করিতে পারা যাইবে না, তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য নই। তবে যুযুৎসু কৌশল বলিতে আমরা কি বুঝি? যে কৌশলের দ্বারা অপরের আক্রমণ হইতে নিজেকে বিনা অস্ত্রে রক্ষা করিতে ও তাহাকে



১নং চিত্র

আয়ত্তে আনিতে পারা যায় সেই কৌশলগুলিকে যুযুৎসু বলা হয়।

এই কৌশলগুলির উৎপত্তি লইয়া অনেক কিছু মত আছে। সকলের মত এক না হইলেও আমার মনে হয় যুযুৎসু কৌশল অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে; তবে কত প্রাচীন তাহা এখনও ঠিক করিয়া প্রমাণিত হয় নাই। জাপানীদের মতে এই কৌশলটী প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের দেশে প্রচলিত ছিল না; কিন্তু তাহা বহু পূর্ব্ব হইতেই যে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল শ্রীসুবলচাঁদ চন্দ্র মহাশয় তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মানিয়া লইতেই হইবে যে, সেই সময় হইতে উহা জাপানীদের একান্ত চেষ্টায় ও যত্নে বৈজ্ঞানিক আকারে পরিণত হইয়া যুযুৎসু কৌশলগুলির অত্যন্ত উন্নতিসাধন হইয়াছে। পূর্ব্বে জাপানে যুযুৎসু কৌশলগুলির মাত্র জাপানী যোদ্ধারাই চর্চ্চা করিত এবং সেই কৌশলগুলি তাহাদেরই একচেটিয়া ছিল। এই কৌশল সাহায্যে সে সময় তাহারা অনেক যুদ্ধও জয় করিয়াছিল। সাধারণেরও ইহা শিক্ষা



২নং চিত্র

করা প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়া পরে জাপানী যোদ্ধারাই সাধারণকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে। সেই সময় হইতেই তাহাদের একান্ত চেষ্টায় যুযুৎসু কৌশলে বর্ত্তমানে পৃথিবীর মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ। পরে জাপান হইতে ইহাদের দ্বারাই ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতে প্রচলিত হইয়াছে। ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে ইহার প্রচলন ছিল তাহা দেখাইতে গিয়া সুবলবাবু তাঁহার 'প্রাথমিক যুযুৎসু' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন যে, এই আত্মরক্ষার কৌশলটী ভারতে বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল। পরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ধর্ম্ম-চর্চ্চার সঙ্গে

সঙ্গে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতি ইত্যাদির চর্চ্চা করিবার সময় এই সকল কৌশলেরও চর্চ্চা করিতেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৌদ্ধ সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই কৌশলের শিক্ষা দিতেন। এই সকল বৌদ্ধ



৩নং চিত্র

সন্ন্যাসীর দ্বারাই এই যুযুৎসু কৌশল প্রথমে চীন দেশে ও পরে কোরিয়া ও জাপানে প্রচারিত হয়। যুযুৎসু শব্দটী



৪নং চিত্র

সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়াছে। যুযুৎসু অর্থে যুদ্ধাভিলাষী বা সমরেচ্ছু বুঝায়। ব্যাকরণ মতে শীলার্থে যুধ্‌+উক বিশেষণ: ত্রিলিঙ্গ হইতেছে। ইহা হইতে তিনি আরো প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব হইতেই এই শব্দের প্রচলন ছিল।

এই সকল কারণেই আমরা বুঝিতে পারি যে যুযুৎসু



৫নং চিত্র

কৌশল ভারতের নিজস্ব ও ভারতীয়দিগের দ্বারাই পৃথিবীর অন্য সকল দেশে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভারতের নিজস্ব হইলেও একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য সাধারণে যুযুৎসু কৌশলকে জাপানেরই নিজস্ব বলিয়া



৬নং চিত্র

জানে। জাপানেরই অনুকম্পায় আবার ভারতে কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে।

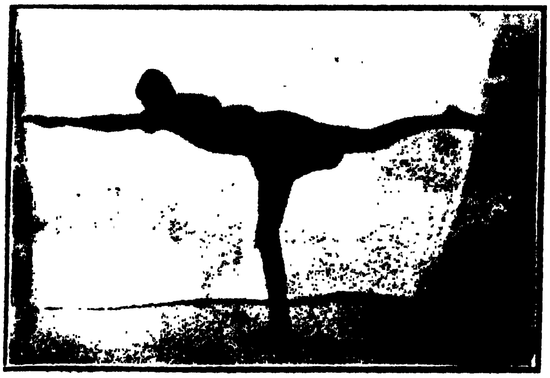
কুস্তি ও যুযুৎসু

যুযুৎসুর Throwing শ্রেণীভুক্ত অনেক কৌশলের আমাদের ভারতীয় কুস্তির কৌশলের সহিত মিল দেখিতে পাই। তবে ভারতীয় কুস্তির কৌশল ও যুযুৎসুর কৌশলগুলির মধ্যে বিচার করিলে দেখিতে পাই যে ভারতীয়



৭নং চিত্র

কুস্তির কৌশলগুলিতে অপরকে কোন আঘাত না করিয়া জোরের ও কৌশলের দ্বারা তাহাকে চিৎ করিলেই হার স্বীকার করান হয়। কিন্তু যুযুৎসু কৌশলগুলিতে অপরকে

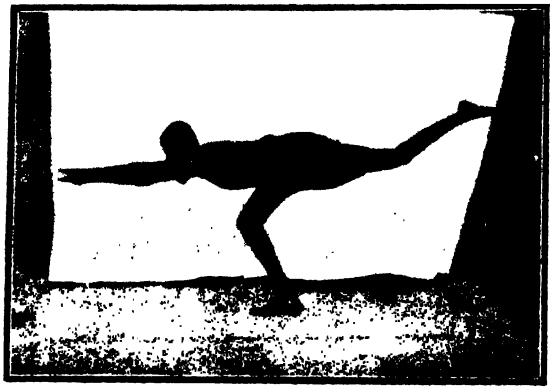


৮নং চিত্র

আঘাত করিয়াই হউক আর যে কোন কৌশল দ্বারাই হউক তাহাকে আয়ত্তে আনিলেই হার স্বীকার করান হয়। তবে উভয়েরই আরো অনেক কিছু বাঁধা ধরা নিয়ম আছে। ইহাতেই অনুমিত ও প্রত্যক্ষ হয় যে কুস্তির কৌশল অপেক্ষা যুযুৎসুর কৌশলে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা



৯নং চিত্র



১০নং চিত্র



লেখক

বেশী। এক কথায়, যুযুৎসুর কতকগুলি কৌশলকে foul tricks of wrestling বলিলেও চলে। বোধ হয় ইহাতে

যুযুৎসুকে ছোট করা হয় না। কিন্তু অধুনা জাপানীরা এই এই কৌশলটাকে এরূপ নিয়ম কানুনের মধ্যে ফেলিয়া অভ্যাস করে যে তাহাতে বিশেষ আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। জাপানীরা যুযুৎসু অভ্যাস করিবার সময় বা দুইজনে প্রতিদ্বন্দী হিসাবে খেলিবার সময় এক-প্রকার জাপানী মাদুরের উপর ও কেম্বিসের জামা পরিয়া খেলা করে।

যুযুৎসু কৌশলগুলি অভ্যাস করিলে যে শুধু আত্মরক্ষা করিবারই কৌশল শিক্ষা করা হয় তাহা নহে, শরীরের পেশীগুলি বলবান ও শরীরের টাল ঠিক হয় এবং তৎপর হওয়া যায়। যুযুৎসু কৌশলগুলি এত সুন্দর যে অভ্যাস করিবার সময় আমার কখনও বিরক্তির ভাব আসে না।

মেয়েদেরও যুযুৎসু শিক্ষা করা বিশেষ দরকার। যুযুৎসু কৌশলে মেয়েরা ভাল করিয়া অভ্যস্ত হইলে দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে তাহারা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে এবং সাহসও বাড়িবে। যুযুৎসু কৌশলগুলি অভ্যাস করিবার সময় একাগ্রমনে ও উপযুক্ত শিক্ষকের সম্মুখে অভ্যাস করিতে হয়; নচেৎ ভুল অভ্যাসের দ্বারা আসল কৌশলগুলির শিক্ষায় ভুল থাকিয়া যায় এবং আঘাত লাগিবারও বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

একটী প্রবাদ আছে "জোর রাজা, কৌশল মন্ত্রী।" জোর না থাকিলে শুধু কৌশলে কোনই কাজ করিতে পারিবে না। সাধারণে মনে করে যে অতি দুর্ব্বল লোকও যুযুৎসু কৌশলের সাহায্যে বলবান লোককে কাবু করিতে পারে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। যে কোন কৌশল দ্বারাই অপরকে আয়ত্তে আনিতে চেষ্টা কর না কেন জোর না থাকিলে তাহা কাজেই আসিবে না। সেইজন্য কৌশলগুলি অভ্যাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জোরের জন্য বিধি পূর্ব্বক নিত্য ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। শরীরকে ও তাহার পেশীগুলিকে সুস্থ, সবল ও দৃঢ় করিতে হইলে নিয়মিত ব্যায়াম ব্যতিরেকে তাহা অসম্ভব।

আমার মনে হয় ডন, বৈঠক, বারবেল, Freehand exercise ও তাহার সহিত Breathing exercise এই কয়টী ব্যায়াম নিয়মিত করিলেই শরীরের সকল দিক দিয়া উন্নতি হইবে। কিন্তু যুযুৎসু কৌশলগুলি অভ্যাস করিবার জন্য আরো গুটিকতক Balance exercise ও Breakfall "পড়ন শিক্ষা" করিতে হয়। ইহাতে যুযুৎসু কৌশলগুলি শিক্ষার অনেক সুবিধা হয়। শরীরের টাল ঠিক না হইলে অপরকে ফেলিতে বা নিজেকে রক্ষা করিতে অনেক অসুবিধা হয়। অপরকে মাটিতে ফেলিতে হইলে Balance-এর বিষয় ভাল করিয়া জ্ঞান না হইলে তাহাকে মোটেই ফেলিতে পারা যাইবে না। এবং কি করিয়া পড়িতে ও উঠিতে হয় তাহাও ভাল করিয়া অভ্যাস না করিলে শরীরে আঘাত লাগিবার বিশেষ সম্ভাবনা। সেইজন্য যুযুৎসু-কৌশল শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে এই দুইটী বিশেষ দরকার এবং ইহা ভাল করিয়া আয়ত্ত না করিলে যুযুৎসু শিক্ষাই হইবে না।

"যুযুৎসুর ক্রম" *

যুযুৎসু কৌশলগুলিকে সাধারণতঃ ৫ ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা :—

১। Extricate—মুক্ত হওয়া।
২। Lock—বন্ধন।
৩। Throwing—নিক্ষেপন।
৪। Ground Lock—জমির প্যাঁচ।
৫। Chocking—টিপন।

"Extricate."

১। যে কৌশলগুলির সাহায্যে অপরের আক্রমণ হইতে বিনা আঘাতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারা যায় সেই কৌশলগুলি Extricate শ্রেণীভুক্ত।

"Lock."

২। যে কৌশলগুলির দ্বারা অপরের হাতে, পায়ে গলায় ইত্যাদিতে প্যাঁচ লাগাইয়া ইচ্ছামত নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যায় সেই কৌশলগুলি Lock শ্রেণীভুক্ত।

"Throwing."

যে কৌশলগুলির দ্বারা অপরকে মাটীতে ফেলিতে পারা যায় সেই কৌশলগুলি Throwing শ্রেণীভুক্ত।

"Ground Lock."

যে কৌশলগুলির দ্বারা অপরকে মাটিতে ফেলিয়া

* সুবলবাবুর প্রাথমিক যুযুৎসুর "যুযুৎসুর ক্রম" অংশটী সমর্থন যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

নিজের ইচ্ছামত আয়ত্তে আনিতে পারা যায় সেই কৌশলগুলি Ground Lock শ্রেণীভুক্ত।

"Chocking."

যে কৌশলগুলির দ্বারা অপরের শিরা, উপশিরাগুলি টিপিয়া তাহার সেই অঙ্গটীকে অবশ করিতে পারা যায় সেই কৌশলগুলি Chocking শ্রেণীভুক্ত।

সাধারণে কেবলমাত্র Chocking শ্রেণীভুক্ত কৌশলগুলিকেই যুযুৎসু বলিয়া জানে; কিন্তু ইহা একেবারে ভুল।

Balance Exercise

এই ব্যায়ামগুলি যুযুৎসু শিক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিলে শরীরের "টাল" ঠিক হইবার বিশেষ সহায়তা করিবে। গুটীকতক ব্যায়াম নিম্নে দেওয়া হইল।

১নং

সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটী দুই পাশে সোজা করিয়া সমান্তরালভাবে রাখিয়া পরে একটী পা সামনে সোজা ভাবে তুলিয়া দিয়া যে পা মাটীতে আছে সোজা ভাবে রাখিয়া সেই পায়ের উপর ভর দিয়া আস্তে আস্তে হাঁটুর কাছ হইতে মুড়িয়া মাটীতে বসিতে হইবে ও উঠিতে হইবে; তবে তোলা পা'টী ঠিক সোজাভাবেই থাকিবে। এইভাবে পা দুইটী অদল-বদল করিয়া দশবার করিয়া করিতে হইবে। বসিবার সময় শ্বাস ছাড়িতে ও উঠিবার সময় শ্বাস লইতে হইবে।

২নং

সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটী দুই পাশে সোজা করিয়া সমান্তরালভাবে রাখিয়া পরে কোমর হইতে শরীরটী সামনে ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে একটী পা পিছনে সোজাভাবে তুলিয়া দিয়া যে পা'টী মাটীতে আছে সোজা করিয়া রাখিয়া সেই পায়ের উপর ভর দিয়া শরীরটাকে একটী উড়া পাখীর ন্যায় আকৃতি করিয়া আস্তে আস্তে হাঁটুর কাছ হইতে মুড়িয়া মাটীতে বসিতে হইবে এবং উঠিতে হইবে। কিন্তু শরীরের আকৃতিটী ঠিক পূর্ব্বমতই থাকিবে। এইভাবে পা দুইটী অদলবদল করিয়া দশবার করিয়া করিতে হইবে। বসিবার সময় শ্বাস ছাড়িতে ও উঠিবার সময় শ্বাস লইতে হইবে।

৩নং

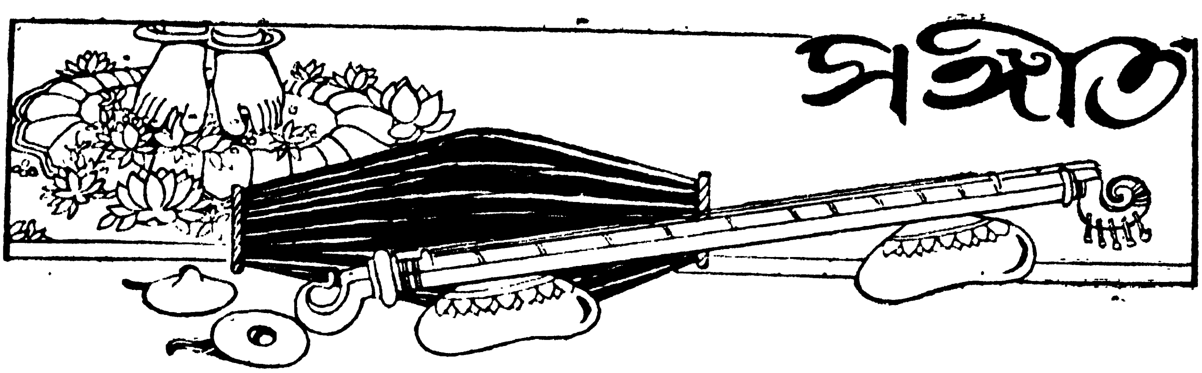
সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটী দুই পাশে সোজা করিয়া সমান্তরাল ভাবে রাখিয়া পরে কোমর হইতে শরীরটী ধারে ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে, যে ধারে ঝুঁকিতে হইবে সেই পা'টী মাটীতে সোজা করিয়া রাখিয়া ও সেই ধারের হাতটী মাটীতে নামাইতে নামাইতে অপর পা'টী ধারে সোজা করিয়া তুলিতে হইবে। আবার পা'টী নামাইবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটীকে প্রথম অবস্থায় আনিতে হইবে। এই ভাবে অদল-বদল করিয়া দশবার করিয়া করিতে হইবে। শরীরটী ধারে ঝুঁকিবার সময় শ্বাস ছাড়িতে ও উঠিবার সময় শ্বাস লইতে হইবে।

৪নং

সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটী মাথার উপর সোজা করিয়া তুলিয়া দিয়া পরে কোমর হইতে শরীরটী সামনে ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে একটী পা মাটীতে সোজা করিয়া রাখিয়া ও অপর পা'টী পিছনে সোজাভাবে তুলিতে তুলিতে হাত দুইটী সামনে মাটীতে নামাইতে হইবে। আবার হাত দুইটী তুলিয়া ও পা'টী নামাইয়া প্রথম অবস্থায় আনিতে হইবে। এইভাবে অদলবদল করিয়া দশবার করিয়া করিতে হইবে। শরীরটী নামাইবার সময় শ্বাস ছাড়িতে ও উঠিবার সময় শ্বাস লইতে হইবে।

সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটী মাথার উপর সোজা করিয়া তুলিয়া দিয়া পরে কোমর হইতে শরীরটী সামনে ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে একটী পা মাটীতে সোজা করিয়া তুলিয়া দিয়া যে পা মাটীতে আছে আস্তে আস্তে হাঁটুর কাছ হইতে মুড়িয়া মাটীতে বসিতে হইবে এবং উঠিতে হইবে; কিন্তু শরীরের আকৃতিটী ঠিক পূর্ব্ব মতই থাকিবে। এইভাবে পা দুইটী অদলবদল করিয়া দশবার করিয়া করিতে হইবে। বসিবার সময় শ্বাস ছাড়িতে ও উঠিবার সময় শ্বাস লইতে হইবে।

এই ব্যায়ামগুলি নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিলে পায়ের জোর ও শরীরের টালের বিশেষ সহায়তা করিবে। শরীরের টাল ঠিক না হইলে যুযুৎসু প্যাঁচ মারিবার ও প্যাঁচ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। এক কথায় শরীরের টাল ঠিক না হইলে যুযুৎসু-কৌশলে শিক্ষার একদিক একেবারে অভাব থাকিয়া যাইবে। (ক্রমশঃ)



গৌরী

(পঞ্চচামর ছন্দ)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সুদূর দীপ্তিবিহ্বলা !
হিরণ্যগর্ভবন্দিতা !
অমা-তটে সমুজ্জ্বলা
অদৃশ্য-রশ্মি-রঞ্জিতা !

বসুন্ধরা সদা স্বপে
স্ফুলিঙ্গ যার গৌরবে ;—
মরীচি যার উৎসবে
যুগান্ধতা পরাভবে ;—

প্রবাহি' যে ধরাঙ্গণে
দ্যুলোক স্বপ্ন মঞ্জরে ;—
ধিয়ান-সিংহ-আসনে
পরাঙ্ক দৈত্য সংহরে ;—

পরার্দ্ধ কণ্টকক্ষতে
ভুলে বিনিদ্র রাধনে ;—
ধনধ্রুবে পদে পদে
ত্যজে অসাধ্য-সাধনে ;—

তপঃ-স্বয়ম্বরা চিত্তে
বিলাস বিশ্বরে ভবে ;—
অসীম স্বপ্ন ঝঙ্কৃতে
অমূর্ত্ত মন্ত্র যে জপে ;—

Priestess of the Unseen Light

(শ্রীক্ষিতীশ সেন, আই সি এস অনূদিত—
শ্রীঅরবিন্দ-সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত)

O thou inspired by a far effulgence,
Adored of some distant Sun gold-bright,
O luminous face on the edge of darkness
Agleam with strange and viewless light !

A spark from thy vision's scintillations
Has kindled the earth to passionate dreams,
And the gloom of ages sinks defeated
By the revel and splendour of thy beams.

In this little courtyard Earth thy rivers
Have made to bloom heaven's many-rayed flowers,
And, throned on thy lion meditation,
Thou slayest with a sign the Titan powers.

Thou art rapt in unsleeping adoration
And a thousand thorn-wounds are forgot ;
Thy hunger is for the unseizable,
And for thee the near and sure are not.

Thy mind is affianced to lonely seeking,
And it puts by the joy these poor worlds hoard,
And to house a cry of infinite dreaming
Thy lips repeat the formless word.

পদে নমামি তার মা,
তব স্তবে হিয়া নতা,

O beautiful, blest, immaculate,
My heart falls down at thy feet of sheen,

দুরাশিনী ! তিলোত্তমা !
শুভা ! অনাগতব্রতা !

O Huntress of the Impossible,
O Priestess of the light unseen.

DILIP,

Khitish Sen's translation is far from bad, but it is not perfect either and uses too many oft-heard locutions without bringing in the touch of magic that would save them. Besides, his metre inspite of his trying to lighten it, is one the common and obvious metres which are almost proof against subtlety of movement. It may be mathematically more equivalent to yours but there is an underrunning lilt of celestial dance in your rhythm which he tries to get but, because of the limitations of the metre, cannot manage. I think my iambic-anapestic choice is better fitted to catch the dance-lilt and keep it.

SRI AUROBINDO.

তাল—একতালা স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী

সা | র্সা -া ধা | না -া ধপা | ধা -া গহ্মা | হ্মধা পপা রা | গা -া ণা
সু দূ - র দী প্ তি বি উ ত লা - হি র ন্ ন

ধা -া পা | হ্মা -া ধা | হ্মধা পপা পা | হ্মধপা হ্মপা হ্মা | গমা গা রা
গ ন্ ত ব ন্ দি তা - অ মা - ত টে - স

গা মা ধা | হ্মধপা হ্মপা রা | গা -া না | ধা -া পা | হ্মধপা হ্মপা সা |
মু চ্ ছ লা - অ দূ - শ্র র শ্ মিঁ রন্ - জি

১ + ৩ ০ ১
সা -া সা | নসা নসা ন্া | ধন্া ধ্া ন্া | পা -া পা | হ্মধা পা হ্মা |
তা - ব সুন্ - দ রা - স দা - স্ব পে - ন্দু

+ ৩ ০ ১ +
পা -া র্সা | ণা -া ণা | ধণা ধণা পধর্সণা | ধপা -া পা | পা র্গা র্রা |
লি ঙ্ গ যা - র গউ - র বে - ম রী - চি

৩ ০ ১ + ৩
-া র্গা র্রর্গর্র | র্সনা র্সা র্রা | র্সণা ধণা ধা | পমা গা মা | পা -া ধা |
• যা র উত্ - স বে - যু গা ন্ ধ তা - প

• ১ + ৩ •
র্রা র্সা ণা | ধা -া পমগা | গমপা ধনর্সা না | না -া র্সা | পা র্সা র্সা |
রা - ত বে - শ্র বা - হি যে - থ রা ঙ্ গ

নর্রা র্সর্সা র্সা | পা না না | না -া র্সা | নর্সা নধা না | ধপা -া সা |
গে - ছ্য লো - ক প দ্ দ্দ মন্ - জ রে - খি

+ ৩ • ১ + ৩
রা -া মা | পা -া র্রা | র্সা -া না | ধণা -া ধা | পমা গা মা | পা র্সণা ধা |
রা - ন সি ঙ্ হ আ - স নে - প রা র ধ দ ই ত্য

পমা মজ্ঞা সরা | সা -া সা | গা -া সা | গা মা পা | মজ্ঞা মজ্ঞা সরা | সা -া সা |
সঙ্ - হ রে - প রা স্ ধ ক ন্ ট ক - ক্ষ তে - তু

+ ৩ • ১ + ৩
গা -া মা | পা -া ধা | নর্সা নধা না | ধপা -া পা | না -া পা | না র্সা র্রা |
লে - বি নি - ত্র রা - ধ নে - ধ ন - ক্ষু বে - প

• ১ + ৩ • ১
র্মজ্ঞা র্মজ্ঞা র্সর্রা | র্স -া ণা | ধা -া মা | রমা পধা মপা | মজ্ঞা মজ্ঞা সরা | সা -া সা |
দে - প দে - ত্য জে - অ সা - ধ্য সা - ধ নে - ত

+ ৩ • ১ + ৩
সা পা পা | পা -া পা | ধপা মগা মা | পা -া পা | না -া না | না -া র্সা |
প স্ ব য় ম ব রা - চি তে - বি লা - স বি - শ্ব

• ১ + ৩
নর্সা নধা না | ধপা -া পা | পা না পা | পা না র্সা |
রে - ত বে - অ সী - ম স্ব প্ ন

• ১ + ৩ •
র্র র্মজ্ঞা র্সর্রা | র্সা -া র্রা | র্সধা সা ণা | ধা পা ধা | ধর্রর্সা নর্সা ণা |
স্ব ঙ্ ক তে - অ মূ ম্ ত ম ন্ ত্র যে - ক্ষ

১ + ৩ ০ ১
ধা -া পা | পমা পা পা | মজ্ঞা মজ্ঞা মা | পা না না | র্সা -া -র্সা |
পে - প দে - ন মা - মি তা - র মা - ত

+ ৩ ০ ১ +
মর্জ্ঞা মর্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্রা র্সা র্সর্রা | র্সনা -া র্রা | র্সা -া পা | না -া না |
ব - স্ত বে - হি ম্না - ন তা - দ্রু ম্না - শি

৩ ০ ১ + ৩
না র্সা র্সা | না ধনা ধনা | ধপা -া না | র্সা র্সর্গা র্রা | র্সা -া র্সা |
নী - তি লো ত্ ত মা - দ্রু ম্না - শি নী - তি

+
না ধনা ধনা | ধপা -া পা | মপা মপা ধা | পমা পমা পা
লো ত্ ত মা - শু ভা - ঋ না - গ

০ ১ +
মজ্ঞা মজ্ঞা সরা | সা -া সা | র্সা -া ধা | না -া ধপা | ইত্যাদি
ত - ত্র তা - সু দূ - র দী প্ তি

এ গানটি স্তব। "অমাতটে" ও "আসনে"-র পর chromatic descent (পর পর তিন চারটি পর্দ্দা কোমলে অবতরণ) আছে। সেখানে খুব মৃদু গেয়। সুরে ঈষৎ পাশ্চাত্য ঢঙের আমেজ লক্ষিত হবে। ইহার ছন্দ (সংস্কৃত) লঘুগুরু অর্থাৎ আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ দুই মাত্রা। যথা (রাবণ কৃত শিবতাণ্ডব স্তোত্র) :—(ইংরাজী iambicএর সঙ্গে তুলনীয়)

। ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥ । ॥
চ কা র চ ণ্ড তা ণ্ড বং ত নো তু নঃ শি বঃ শি বম্
সু দূ র দী প্তি বি হ্ব লা হি র ণ্য গ র্ভ ব ন্দি তা

সত্যেন্দ্রনাথের "মহৎ ভয়ের মূরৎসাগর বরণ তোমার তমঃশ্যামল" এরই বাংলা স্বরমাত্রিক প্রতিরূপ। কিন্তু সে ভাবে যুগ্মধ্বনি দিয়ে যে দীর্ঘস্বরের কল্লোল পাওয়া যায় না তা শিবতাণ্ডব স্তোত্রের ঐ একটি লাইন থেকেই প্রতীয়মান হবে। সংস্কৃত গুরুস্বর বাংলা স্তোত্রের বিশেষ উপযোগী মনে হয়। এ গানটি আবৃত্তি করলে, আশা করি, এটা খানিকটা বোঝা যাবে।



পড়ো'-বাড়ী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

(১)

মস্ত একটা পড়ো'-বাড়ী—তিন প্রকোষ্ঠ, দোতালা ;
দক্ষিণে তা'র ফুলের বাগান, উত্তরে তার গোশালা।
বাগিচা আজ কাঁটায় ভরা, নাইক গরু গোহালে,—
দুমণ দুধের যোগাড় হ'ত যেখানে রাত পোহালে !
পূব্ কোণের ঐ পুকুরধারে কল্মীদামের আড়ালে
পৈঠাগুলোর হাড় ক'খানা দেখ্‌তে পাবে দাঁড়ালে।

পাঁচটা পুরুষ যায়নি আজো, এরি মধ্যে এই ব্যাপার ;—
লক্ষ্মী যখন ছেড়ে চলেন, এম্‌নিতর কাণ্ড তাঁর !
চক্-মিলানো চতুঃশালায় লোক যেখানে ধরে না,
আজ সে বাড়ী শূন্য পড়ে', একটা কোণও ভরে না !
পেটের জ্বালায় ছিট্‌কে পালায় যেথান থেকে মালেকে,
সকালবেলায় ঝাঁট্ কে বা দেয়, সন্ধ্যাদীপ বা জ্বালে কে ?

হানা বাড়ী—ভূতের বাড়ী—এম্‌নিতর রটনা
পাড়াগাঁয়ে এসব ক্ষেত্রে খুবই চলিত ঘটনা ;
চোর ছাড়া তাই মাড়ায়নাক' কেউ বড় আর সেদিকে,
জান্‌লা-দুয়োর খুলে' তারাই নেয় খুসী যার যেদিকে !
রাতভিতে তো সে পথ দিয়ে বিশেষ কেউ আর চলে না,
এম্‌নি হ'ল, গোঁসাই-বাড়ীর নাম বড় কেউ বলে না।

(২)

এই তো গেল বাড়ীর কথা, আসল কথাই বলি নি,—
একটি কেবল মেয়ে থাকে বাড়ীতে—নাম নলিনী ;
বংশে একা সেই শুধু আজ আঁক্‌ড়ে' পড়ে' ভিটাতে,
দেব্‌তা জানেন্ কি জন্যে বা কিসের আশা মিটাতে !
আপন ঝোঁকে আপ্‌নি থাকে, বয়সখানা পুরন্ত,
পায় না খেতে, অটল তবু দুঃসাহসী দুরন্ত !

একটিমাত্র বুড়ো চাকর, রাত্রিদিনের সঙ্গী সে,
কোনোমতে কাটায় তারা গোহাল-বাড়ীর কোণ্ ঘেঁসে' ;
সব্‌জী লাগায়, তাইতে তাদের বেচে'-কিনে' দিন কাটে,
দুজন ছাড়া নেইক প্রাণী পড়ো'-বাড়ীর তল্লাটে।
আশের-পাশের পড়্‌শী যারা, কেউ বড় খোঁজ রাখে না,
এরাও নিজে বেরোয়নাক', তারাও বড় ডাকে না।

বিশেষ করে' ঐ মেয়েটির ভূত-নামানো কথাতে
অনেকেরই আস্থা আছে পল্লীসুলভ প্রথাতে !
—নইলে কেন নিশীথ-রাতে বাড়ীর ছাতে দীপ জ্বলে ?
ছাতিম-ঘাটের চাতাল থেকে নজর সেথায় ঠিক চলে !
চাকরটা তো হদ্দ বোবা—হবে না আর ? হবেই তো ;
সে ছাড়া কি লোক জোটে না ? লোকে বলে—তবেই তো !

(৩)

এমন সময় গ্রামটিতে এক বাবু এলেন ক'ল্‌কাতার,—
কলেজ-পড়া, মোটর-চড়া, মনের মধ্যে ডুব-সাঁতার !
সিংহী-বাড়ীর শ্যালাই বটে, ভাব্‌না-ভীতি নেই প্রাণে ;
প্রথম রাতেই ভূতের বাড়ীর খবর পেলেন সেইখানে।
—'নষ্ট মেয়ের ঐ তো মজা—আমরা বাবা, সব জানি,
রও না দুদিন, দিচ্ছি ভেঙে ধিঙ্গী মাগীর সয়তানি'।

কুকুর এবং শিকার নিয়ে কাট্‌ল ক'দিন জঙ্গলে,
ঘুঘু-মারায় কতই তারিফ কর্‌ল ইয়ারদঙ্গলে !
পুকুরপাড়ে ছিপ দিয়ে হয় মাছ ধরিবার ব্যবস্থা,—
ঘাটের পথে বৌ-ঝি চলা বন্ধ হবার অবস্থা !
গোঁসাই-বাড়ীর আস্-পাশে তো নেক্-নজরের অন্ত নাই,
সকাল এবং সন্ধ্যা কাটে মানুষ ধরার মন্ত্রণায় !

রাত্রি কাটে সিংবাবুদের বাগান-বাড়ী আনন্দে,
সঙ্গে যত সঙ্গী-ইয়ার—বিপিন দত্ত, কানন দে।
চল্‌ছে যত নারীর কথা, চল্‌ছে আরো কত কি,—
সহরে সব রূপের ডালি—পারুল, চাঁপা, কেতকী!
—'যাহোক বাবা, পাড়াগাঁয়ের পক্ষে, এটিও মন্দ না,—
পড়ো'-পাখী নাই বা হ'ল, সত্য বনের চন্দনা'!

(৪)

এম্‌নি করে' দিন কেটে যায়; একদা এক নিশীথে,
শুকতারাটি চাইছে যখন ভোরের আলোয় মিশিতে,
খবর এল—জ্বল্‌ছে আলো গোঁসাই-বাড়ীর ছাত-ঘরে,—
নফর নন্দী নজরবন্দী রাখছে সারারাত ধরে';
একটি পরী বেড়ায় ঘুরি'—সাদায় সাদা অঙ্গটি,
বেরুচ্ছে আর ঢুকছে ঘরে, করছে আরো রঙ্গ কি!

শুনেই বাবু বন্দুক এবং বিজ্‌লী-বাতি ত্বরিতে
চল্‌ল নিয়ে পল্লী-মায়ের কলঙ্ক দূর করিতে!
আগু-পিছু চায় না কিছু, এম্‌নি দারুণ ব্যগ্রতা—
ভোরের রাতে চম্‌কে দিয়ে পড়ো'-বাড়ীর স্তব্ধতা!
সড়্‌কী-হাতে সঙ্গীরা সব চল্‌ল ছাতে তেতালায়,
ভয়ের সাথে তীক্ষ্ণ নজর, কোন্ ধারে বা কে পালায়!

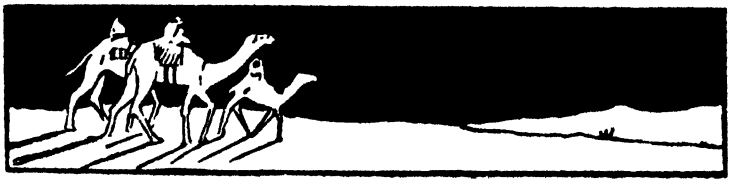
(৫)

চিলের কোঠায় ঘরটি পূজার—নির্জ্জনতার গৌরবে
নিঃশ্বসিছে ঝাপসা আলোয় ধূপের ধোঁয়ার সৌরভে;
চটা-ওঠা দেয়ালটাতে চিত্র একটি টাঙানো,
চারধারে তার শালু-মোড়া, রক্তে যেন রাঙানো!
সাত বছরের শুক্‌নো বকুল—সাক্ষী সে কোন্ ফাগুনের,
মৌনমুখে বিলায় স্মৃতি ভস্ম-শেষী আগুনের!

শুভ্র বাসে অঙ্গ ঢাকা, মূর্ত্তি যেন শুকতারা,
রুদ্ধ আঁখি, যুক্ত-করা, চক্ষে ঝরে অশ্রুধারা;
পাষাণ-সম লগ্ন যেন মেঝের-পাতা কম্বলে,
আগ্‌লে নারীর ইহকালের পরকালের সম্বলে!
মরণ-দিনের স্মরণ-রাতি আজো বুঝি হয়নি ভোর—
চরণ-সাথে জড়িয়ে আছে বরণ-মালার পুষ্পডোর!

রক্ত জবা উঠ্‌ল ফুটে' পূর্ব্বাকাশের কাননে;
দিব্য আভা লাগ্‌ল তারি সংজ্ঞাহারা আননে!
ভোরের হাওয়া দেয় দুলিয়ে মুক্তকেশের অন্ধকার,
সাত বছরের শুক্‌নো বকুল, সেও কি বিলায় গন্ধভার!
চিত্রপটের মূর্ত্তিখানি উঠ্‌ল দুলে' বাতাসে;—
রাতের সাথে দিনের মিলন ফুট্‌ল বুঝি আকাশে!

উদ্ধত সব পদধ্বনি থাম্‌ল কেঁপে দুয়ারে;—
বিস্ফারিত রক্ত আঁখি এ চায় শুধু উহারে!
গোঁসাই-বাড়ার এই সে মেয়ে—এই সে নারী অভাগী?
সারা গ্রামের মুখ-ফেরানো এই সে কলঙ্কভাগী!
স্বামীর ভিটায় বদ্ধ পাখী—এই কি বনের চন্দনা?
নন্দিত এ মূর্ত্তি—এ যে বিশ্বনাথের বন্দনা!



সংসার কঠিন বড়

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্

জীবনটা একেবারে বিরস, তিক্ত! স্নেহ নাই, প্রেম নাই— বিচার-বিবেচনাও বুঝি লোপ পাইয়াছে! কোনোমতে শুধু রুটীনে বাঁধা কাজ সারিয়া চলিয়াছি! কি সুখ, কি আরাম এ জীবন বহিয়া বেড়ানোয়! তার চেয়ে সে যুগের সেই বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্যের মত……

তাই বা কি করিয়া হয়! আজ কোথায় সে তপোবন! কোথায় বা তাপস-তাপসীর দল! বন এখন বন,—সে বনে মশা, মাছি, ম্যালেরিয়া! তাছাড়া লোকের মন পাথরে গড়া! সে-যুগের সে করুণার প্রস্রবণ আজ পাথরের চাপে কোথায় শুকাইয়া মরিয়াছে।

বাহিরের ঘরে তক্তাপোষের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া বিহারী এমনি সব কথা ভাবিতেছিল! সন্ধ্যা হইয়াছে—ঘরে আলো জ্বলে নাই! বন্ধুর দল ভুলিয়া তার গৃহের ত্রিসীমা মাড়ায় না! প্রিয়ার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি—বন্ধু বান্ধব ধারে ঘেঁষিতে পারিত না। তবু হায়, প্রিয়া আজ প্রিয়া নন্— সংসার-যন্ত্র ঘুরাইতে নিপুণা গৃহিণী। কাজেই জীবনও একান্ত নিঃসঙ্গ, দুর্বহ!

চিরকাল এমন ছিল না! একদিন এই বিহারী বড় দর্পে সকলকে বলিয়াছে—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'! এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নাই! স্নিগ্ধ প্রভাত, অলস মধ্যাহ্ন, শ্যাম সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না-মধুর রাত্রি— পাখীর গান, ফুলের গন্ধ, ফাগুন হাওয়া, তরুণী প্রিয়া— এমন সম্পদ পৃথিবীর বাহিরে আর কোথায় মিলিবে!

আর আজ…?

জীবনের পুরানো দিনের স্মৃতি উচ্ছলিত তরঙ্গে বিহারীর বুক ছাপাইয়া বহিয়া চলিয়াছে!

বিহারী তখন ফোর্থ-ইয়ারে বি এ পড়ে। পড়ার কেতাবে ভবিষ্যতের কি বিচিত্র স্বপ্ন জাগিয়া উঠিত! আকাশের পানে চাহিলে দেখিত, আলো-ছায়ার অপরূপ লীলা—বায়ুভরে কম্পিত নব পল্লবদলে আনন্দের কলরব! ভাবের দোলায় মন মাটীর স্পর্শ ছাড়িয়া কোন্ কল্পলোকে উধাও হইত! বিহারী কবিতা লিখিত—রঙীন আকাশ…ও কার রূপের আভা! দখিণ হাওয়া? খোলা বাতায়নে সে কার নিশ্বাস-পরশ! বুকের পথে যেন কার পায়ের সলাজ ধ্বনি!

এমনি আকুলতার মাঝে প্রিয়া মালতীমালা আসিয়া পাশে দাঁড়াইল! দিনের সূর্য্য নিশীথ-শশীর স্নিগ্ধ শীতল রূপে ভরিয়া উঠিল। শুধু গান, আর গন্ধ, বর্ণ আর ছন্দ—সারা নিখিল কল্পলোকে মিশিয়া একাকার হইয়া গেল।

কলেজের কেতাব একপাশে পড়িয়া রহিল—সেদিকে মন দিবার অবসর নাই! সারা মন কেবলি ডাকে—পিয়া, পিয়া…পড়ার ঘর প্রেমের নিকুঞ্জে রূপান্তরিত হইল!

কেতাবের রাশি কিন্তু এ উপেক্ষার শোধ দিল। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে গেজেটে বিহারীর নাম খুঁজিয়া পাওয়া গেল না! রাত্রে প্রিয়া মালতীর চোখে অশ্রুর নির্ঝর— মুখ বেদনায় মলিন!

বিহারী কহিল—কাঁদো কেন মালা?

মালতীকে আদর করিয়া সে ডাকিত, মালা! কবিতার ছন্দ মিলানোও তাহাতে সহজ হইত।

> হৃদয়ের জ্বালা ঘুচালে তুমি মালা!…
> কল্পলোকের বালা, তুমি আমার মালা!…
> সোহাগ-সুধা বালা, আমার বধূ মালা!…

মালা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—কেন তুমি ফেল হলে!

বিহারী কহিল—পাশ হলে কি আর এমন সুমধুর সান্ত্বনায় শরীর-মন স্নিগ্ধ হবার সুযোগ পেতো!

মালতী কহিল—না, আমার ভারী কান্না পাচ্ছে।

মালতীকে বুকে টানিয়া অজস্র চুম্বনে তার অধর দুটীকে নিপীড়িত করিয়া বিহারী কহিল,—জীবনে নিছক সুখ কি ভালো, মালা! এই বেদনায় হয়তো বহু দুর্গ্রহ-অভিশাপ কেটে গেল!

স্বামীর পানে অধীর একাগ্র দৃষ্টিতে মালতী চাহিয়া রহিল—হয়তো তাই! যদি বড় বিপদ ঘটিত···দুষ্ট গ্রহের বক্র দৃষ্টি···!

বিহারী কহিল—ভগবান এ বিপদের বাজ ফেলবেন বলেই তোমায় এনে পাশে বসিয়েচেন, না হলে আজকের এ-বিপদে কে আমায় সান্ত্বনা দিত, মালা!···আজ তোমার চোখে ঐ অশ্রু···আমার বুকের কি দাহ যে শান্ত করেচে! তুমি পাশে না থাকলে ফেল হওয়ার এ বেদনা হয়তো আমি সহ্য করতে পারতুম না! হয়তো বা আর পাঁচ-জনের মত আত্মহত্যা করে বসতুম!

মালতী শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া সে কহিল,—না, ছিঃ, ও কথা মনে করতে নেই!···

তার চোখের পিছনে অশ্রু আবার ঠেলিয়া আসিল।··· জীবনে সেই প্রথম আঘাত—নৈরাশ্যের বেদনা, তার সঙ্গে জড়ানো কি লাঞ্ছনা, কতখানি অপমান! মালতীর অশ্রু সুস্নিগ্ধ ধারায় অপমানের কালি মুছাইয়া বিহারীর প্রাণকে অমলিন শুভ্রতায় রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিল!

তার পর······

বিহারীর মনে পড়িল, মালতীকে লইয়া ট্রেণে চড়িয়া একবার নিমন্ত্রণে গিয়াছিল সুদূর পল্লীগ্রামে! ষ্টেশন ছাড়াইতে আশেপাশে ঘর-দ্বার, পল্লীর পথ, ঘাট, ছায়াস্নিগ্ধ তরুশ্রেণী ··সে সব পার হইয়া শেষে জাগিল শুধু ধূ-ধূ মাঠ, গাছপালার চিহ্ন নাই,—মরুর বুকের মত রৌদ্র-তাপে জ্বলন্ত প্রান্তর! লোকালয়ের আভাসমাত্র জাগে না,—শুষ্ক ডোবা, বিল;—সেদিকে চাহিলে মনে হয়, এ পথে পথিক যদি রৌদ্রতাপে শ্রান্তির ভারে পড়িয়া মরে, তার যাত্রার শেষে আস্তানায় পৌঁছানো অসম্ভব!

ঠিক তেমনি করিয়া ছায়া-স্নিগ্ধ মায়া-মমতার শ্যামল কুঞ্জ, স্নেহ-নীর-ভরা পুষ্করিণী কোথায় সব মিলাইয়া গেল,— দুর্দ্দিনের খর রৌদ্রে দিগন্ত জ্বলিয়া উঠিল,—পাশ হইতে আত্মীয়-স্বজন কে কোন্ অদৃশ্য লোকে সরিয়া পড়িল,— জীবনকে বহিয়া বেড়ানো যখন দুঃসাধ্য ঠেকিল, তখন ঐ মালতী···মালতী শুধু তাকে খাড়া রাখে!

লেখাপড়ার পাট চুকিল। কলিকাতার বাসা—ভাড়া দিয়া থাকা চলে না! কাজেই বিহারীকে পল্লীর গৃহে ফিরিয়া আশ্রয় লইতে হইল। বিদায়-বেলার কথা মনে পড়িল,, রুদ্ধশ্বাসে মালতীর মুখের পানে সে চাহিয়া ছিল!!

মালতী বলিল—কি ভাবচো?

বিহারী কহিল—কি করে চলবে, মালা?

মালতী কহিল—যা করে আর পাঁচজনের চলে!

বিহারী তার পানে কুতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া মালতী কহিল—ঐ চাকরি···

একটা চাকরি মিলিয়াছিল,—কলিকাতার এক ফার্ম্মে; মাহিনা পঞ্চাশ টাকা। বাপের সঙ্গে ফার্ম্মের জানাশুনা ছিল,—তার ফলে।

বিহারী কহিল—মোটে পঞ্চাশটি টাকা সম্বল!

মালতী কহিল,—তাতে রাজার হালে তোমায় রাখবো। পাড়া-গাঁ! বাড়ীর ভাড়া লাগবে না। বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ···ভয় কি? চালে-ডালে কত খরচ হয়? তুমি ডেলি-প্যাশেঞ্জারি করে চাকরি রাখবে···

বিহারী কহিল—রান্নাবান্না?

হাসিয়া মালতী কহিল—আমি রাঁধবো! ভারী তো! দুটী লোকের রান্না! আর বাসন? আমি মাজবো। আমার মা-দিদিমা এই করে সংসার চালিয়েছেন। আমি বাঙালীর মেয়ে, বাঙালীর বৌ ··

বিহারীর বুকে তখনো একরাশ নিশ্বাস শ্রাবণের মেঘের মত শুম্ভিত দাঁড়াইয়া ছিল। মনে মনে সে যে কত কি কল্পনা করিত! মস্ত বাড়ী, দাস-দাসী, মোটর, বিলাস-প্রাচুর্য্য, প্রিয়া মালতীমালা রাজেন্দ্রাণীর আসনে বসিয়া থাকিবে, আর বিহারী তার উচ্ছ্বসিত প্রাণের আবেগ ছন্দে গাঁথিয়া রাজেন্দ্রাণীর হাতে নিত্য তাহাতে অর্ঘ্য রচিয়া দিবে!···

বিহারী কহিল—কিন্তু কি কল্পনাই ছিল, মালা···

তার চোখে জল দেখা দিল।

সস্নেহে সে চোখের জল মুছাইয়া মালতী কহিল—ছি, কেঁদো না। দাস-দাসী নাই বা হলো, মোটরে নাই বা চড়লুম—আমার ভালোবাসায় তোমায় সে অভাব জানতে দেবো না! আমাদের ভালোবাসায় এই দারিদ্র্যেই আমরা সব সুখ আয়ত্ত করতে পারবো, দেখো!

কি সুধা ভরা সে স্বর—কি গভীর প্রীতি আর স্নেহ সে স্বরে!···

বিহারীর কোনো দুঃখ ছিল না।…এবং ঐ চাকরির অন্তরালেই তার কাব্যচর্চ্চা চলিয়াছিল পূর্ণ আবেগে…

মাসিকে-মাসিকে তার কত কবিতা ছাপিয়া বাহির হইয়াছে—কবিতা লিখিয়া মালতীকে শুনাইয়াছে। শুনিবার জন্ম মালতীর আগ্রহের সীমা থাকিত না! কাজের অবসরে ছুটীতে নিভৃতে বসিয়া কি স্বর্গ না রচনা করিত! দুঃখ ছিল না, নৈরাশ্য ছিল না—ম্লান অশ্রুর রাশি হাসির শুভ্র-ধবল সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিল!…

তার পর……

ছেলেমেয়ে আসিয়া জীবন-পথে উদয় হইল! তাদের প্রথম উদয়ে সে কি আনন্দ! তাদের কি নাম হইবে, তা লইয়া দুজনে কত মান, অভিমান, কত কলহ-কলরব!…

সহসা এই প্রীতি-স্নেহের দীপ্ত নির্ম্মল আকাশে এক টুকরা কালো মেঘ দেখা দিল! বিহারীর স্পষ্ট মনে আছে—

ছেলে অমিয়র অসুখ…'বসুন্ধরা' পত্রিকার পূজা-সংখ্যায় জন্ম বিহারী চমৎকার এক কবিতা ফাঁদিয়া বসিয়াছে, মালতী আসিয়া কহিল—ছেলেটার এই অসুখ গো—আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে চুলোর কবিতা লিখচো!

কথাগুলা যেন অগ্নিমাখা তীর! বিহারীর প্রাণে দাহ ছিটাইয়া দিল। এ তীর এমন অতর্কিতে এমন অলক্ষিতে আঘাত করিল,…

কাঠ হইয়া সে মালতীর পানে চাহিল। মালতীর চোখে বহ্নির স্ফুলিঙ্গ!

ও চোখে তেমন দৃষ্টি বিহারী পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই! সে স্তব্ধ বসিয়া রহিল। কল্পনা দেবী সত্রাসে কোথায় সরিয়া পলাইলেন!

মালতী কহিল—ডাক্তারের কাছে যাও, জ্বর ১০৪! ছেলে কথা কয় না, চোখ খোলে না…

বিহারী একটা নিশ্বাস ফেলিল। মালতী কহিল—টাকার জন্ম ভাবতে হবে না। আমার গায়ে এখনো গহনা আছে। আগে ছেলের প্রাণ, তারপর আর সব।

বিহারী কি কোনো দিন সে কথা অস্বীকার করিয়াছে? না। তবে? এ কথার কি প্রয়োজন ছিল? সাদাসিধা ভাবে কথাটা বলা চলিত না?

বিহারী বলিল—যাই।

মালতী কহিল—তাও বলি, সংসার ক্রমে বাড়চে। এখন শুধু ঐ আপিসের মাহিনের উপর নির্ভর করে বসে বসে কবিতা লিখলে চলে না! একটা ছেলে পড়ানো-টড়ানোর চেষ্টা ভাখো—তাতেও কিছু আসবে।

মালতী আরো কি বলিতেছিল,—সে কথাগুলো বিহারীর কাণে গেল না। সে উঠিয়া ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল। চট্‌পট সরিয়া না পড়িলে পাছে আরো তীব্র রূঢ় কিছু শুনিতে হয়, সেই আশঙ্কায়!…

ছেলে সারিয়া উঠিল,—ছেলেকে আরোগ্য করিয়া তুলিতে মালতীর হাতের দুগাছা বালা বিক্রয় হইয়া গেল!

রূঢ়তার সে বেদনা বিহারীর বুকে কাঁটার মত বিঁধিয়া আছে।

তার দু'দিন পরের কথা। ছেলের অসুখ সারিয়া গিয়াছে। ছুটীর দিন,—'বসুন্ধরা' কবিতার প্রুফ তারা পাঠায় নাই, অথচ সামনের মাসের কাগজ বাহির হইবার সময় আসন্ন। যা-তা ভুল-সমেত ছাপাইয়া দিলে সমালোচকের দল লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত করিয়া দিবে। তাড়াতাড়ি সে টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া খুলিল। মালতীর আলমারি। কাপড় চোপড় কাগজপত্র মেঝেয় ফেলিয়া কাণ্ড যা বাধাইল—স্নান করিয়া ভিজা চুলগুলা পিঠে ফেলিয়া মালতী ঠিক সেই ক্ষণে ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে। কাণ্ড দেখিয়া মালতী কহিল,—কি ও? ব্যাপার কি? একেবারে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাধিয়ে তুলেচো দেখচি…

মালতীর পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বিহারী কহিল—একটা পোষ্টকার্ড ·

কঠিন দৃষ্টি স্বামীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া মালতী কহিল—কোথায় রেখেচো?

—রাখিনি!

—তবে?

—খুঁজচি। ঘর সংসারে মানুষ দু'-একখানা খাম-পোষ্টকার্ড রাখে তো! কখন দরকার হয় না হয়…

—বটে! পোষ্টকার্ডে আমার কি দরকার! কাকে চিঠি লিখচি? কত খাম পোষ্টকার্ড কিনে যোগাচ্ছ?… তোমার সংসারে ঢুকে গেরস্থালী কাজ করতেই বেলা পুইয়ে যায়—রাত্রে বিছানায় ঢুকি যার নাম সেই বারোটায়—তারপর ঘুম যেটুকু হয়…

—বাপের বাড়ীতেও চিঠি-পত্র লেখো না?

—লিখি বই কি! শুধু চিঠি লেখা কি! পয়সা-কড়িও পাঠাই!

বিহারী স্তম্ভিত দৃষ্টিতে মালতীর পানে চাহিয়া রহিল। এই তার স্ত্রী মালতী! সামান্ত একখানা পোষ্টকার্ড খুঁজিতে গিয়াছে—তাহাতে একেবারে এমন মর্ম্মান্তিক কথা শুনাইয়া দিল!···

যবনিকার অন্তরালে অতীতের অনেকখানি দৃশ্য নজরে পড়িল। এই সংসার—পরম আগ্রহে সে পাতিয়া বসিয়াছে! গৃহ-কাজ—ইহাতে ছিল তার পরম আনন্দ, গৌরব!

আর আজ?

মালতী কহিল—ভালো বাঁদী এনেচো! নাও, সরো—কাপড়-চোপড় গুছোতে বসি। ওদিকে ছেলেটার জন্ম দুখানা রুটি করে দিতে হবে—সুজি ভিজ্‌নো রয়েচে!···

মালতী আর বাক্য ব্যয় না করিয়া কাপড়-চোপড় গুছাইতে লাগিয়া গেল। বিহারী আল্‌না হইতে কামিজ টানিয়া গায়ে চড়াইল। মালতী কহিল—কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

—নরেনবাবুর ওখানে।

—কলকাতায়?

—তাই। কবিতাটা ভুল-শুদ্ধ ছাপা হয়ে যাবে! আমায় প্রুফ পাঠালে না···

মালতী কহিল—তার সময় পাচ্ছো তো! কাল রাত্রে বললুম, আজ ছুটী আছে, লোক ডাকিয়ে পুকুরের পানা-গুলো তুলিয়ে দিয়ো—তার বেলায় সময় পেলে না! অথচ সময় হয়, কি ছাই লিখেচেন, তার প্রুফের তদ্বির করতে! লিখে একেবারে রাজ্য জয় করবে, ভেবেচো! এ বয়সে ও ছেলেমান্ষী করতে লজ্জা হয় না। যাতে দু'পয়সা রোজগার হয়, সংসারের শ্রী ফেরে—তবে গিয়ে ছেলে-মেয়ে হয়েচে, তাদের ভবিষ্যৎ আছে···ইত্যাদি।

মালতীর মুখে কথার বাণ ডাকিয়া চলিল! আগে এ বাণে বিহারীর রসিকতার হাওয়া আসিয়া মিশিত, এখন আতঙ্ক জাগে! আজও জাগিয়াছিল,—তাই আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে সে সরিয়া পড়িল।

মালতী বাহিরে আসিয়া কহিল—কখন ফিরবেন, দয়া করে বলে যাবেন। বাঁদীকে সেই তো বসে থাকতে হবে ভাত বেড়ে···

বিহারী কহিল—আমার জন্ম কাকেও বসে থাকতে হবে না। তোমরা খেয়ে নিয়ো।

মালতী কহিল,—শুনে কৃতার্থ হলুম!

বিহারী ফিরিল—বৈকালে। তার হাতে খানিকটা রঙীন কাপড়।

মালতী বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল। কাপড়খানা তার সামনে ফেলিয়া বিহারী কহিল—পর্দ্দার কাপড় চেয়েছিলে, কিনে আনলুম।

মালতী গম্ভীর-মুখে কহিল—কোথাকার পর্দ্দা, শুনি!

বিহারী কহিল—বলেছিলে না···দরকার আছে!

মালতী কহিল—ও!—সে তিন মাস আগে বলেছিলুম। তোমার আনার প্রত্যাশায় আজো বসে আছি, বৈ কি! হুঁ:—তা হলে এ সংসারে আজ আর অন্ন মিলতো না! খেয়াল বটে!—ছেলেমেয়েগুলোর গায়ে জামা নেই, যে করে চালাচ্ছি, আমিই জানি! তাদের দুটো করে জামা এনে দিলে তারা পরে বাঁচতো—তা চুলোয় গেল, আনলেন কি না পর্দ্দার কাপড়! এতে পয়সা খরচ হয় না!···

মালতী প্রসন্ন হইবে ভাবিয়া বহু কষ্টে মালতীর কি চাই স্মরণ করিয়া বিহারী পর্দ্দার কাপড় কিনিয়া আনিয়াছে। তা প্রসন্ন হওয়া দূরের কথা! মালতী···

নাঃ, স্ত্রী-জাতটাই এমনি! কিসে তারা প্রসন্ন হইবে, তা তাদের বিধাতাও বোধ হয় বলিতে পারেন না!···

ছেলেমেয়েদের কল্যাণে বাড়ীতে সেবার সত্যনারায়ণ পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সন্ধ্যায় প্রদীপ জালিয়া মালতী পাটের শাড়ী পরিয়া পূজার আয়োজন করিতেছে, ছেলে-মেয়েরা দোতলার ঘরে বসিয়া ক্রীড়ায় মত্ত, অফিসের-ফেরত মুখ-হাত ধুইয়া বিহারী আসিয়া মালতীর কাছে বসিল,—মনটা ভালো ছিল, অফিসের বনমালীকে ছ'মাস পূর্ব্বে সাত টাকা ধার দিয়াছিল, বহু তাগিদে পায় নাই, আজ মাহিনা পাইবামাত্র বনমালী সাধিয়া সে সাত টাকা শোধ করিয়াছে—সেই সাত টাকার মধ্য হইতে নগদ আঠারো আনা মূল্যে নিজের একটা গেঞ্জি কিনিয়া আনিয়াছে—সেই গেঞ্জি গায়ে দিয়া সে বসিয়াছে। মালতী খুশী হইবে, তাই! প্রায় তাকে বলে, ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে দিলে মহত্ত্ব প্রচার করা হয় বুঝি যে,—স্ত্রী-পুত্রকে সর্ব্বস্ব দিয়ে নিজে বৈরাগ্য সার করেচি—ভাখো, তোমরা ভাখো! যা-কিছু

দ্রব্য শুধু স্ত্রীকেই আমি কিনিয়া দিই! লোকে ভাবিবে, কি উদার স্বামী!…

বেচারী বিহারী বহুদিন যুক্তি তুলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছে, মহত্ব-প্রচারের ব্যাপার এ নয়,…খরচে কুলায় না, তাই! তাহাতেও মালতী কত কথা শুনাইয়াছে… তাই আজ গেঞ্জি কিনিয়া মালতীর কাছে আসিয়া বসা!

মালতীর কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই। একান্ত মনে পূজার আয়োজনে ব্যস্ত!…পাটের শাড়ীখানিতে তাকে যা মানাইয়াছে, চমৎকার!…

একটা কৌতুকের বাসনা বিহারীর মনে জাগিল। প্রাচীন কালে এমন কৌতুক বহুবার করিয়াছে; তাহাতে কি উচ্ছ্বাস, কি চাঞ্চল্যই না মালতী প্রকাশ করিয়াছে…

মালতী পাথরে চন্দন ঘষিতেছিল। বিহারী ডাকিল—মালা…

মালতী তার পানে চাহিল।

বিহারী কহিল—একটা কথা ছিল…

—কি কথা?

বিহারী কহিল,—যদি কোনো তরুণী আমায় ভালোবাসে এবং সে ভালোবাসা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে, এবং তা শুনে আমি বিচলিত হই…

মুখখানা বাঁকাইয়া মালতী কহিল, —আর রঙ্গ করে না! যাও—উঠে যাও। করচি পুজোর কাজ—সাহায্য করবার কেউ নেই…উনি এলেন ফষ্টি-নষ্টি করতে!

বিহারী কহিল—শোনোই না

মালতী কহিল—বয়স দিন-দিন বাড়চে বৈ কমচে না। ও-সব পাগলামি করতে হয় যদি, তার স্থান এখানে নয়, বন্ধুদের মজলিসে। সেইখানে যাও।

বিহারী কহিল—কথাটা একটু শোনো…চন্দন-ঘষায় ব্যাঘাত ঘটবে না!

মালতী সঝঙ্কারে কহিল—কি—কি কথা শুনবো?

বিহারী কহিল—যদি আমি সে তরুণীর প্রেমে পড়ি?

মালতী কহিল—যা হতে পারে না, তা নিয়ে মাথা ঘামানো আমার স্বভাব নয়…

বিহারী সচকিত হইল, কহিল—কি? কি হতে পারে না? আমার প্রেমে পড়া…?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ ‥

বিহারী কহিল—একদিন হয়তো এ ব্যাপার সম্ভব ছিল না! কিন্তু আজ হয়েচে…

মালতী কোনো কথা কহিল না; নিজের মনে চন্দন ঘষিতে লাগিল। বিহারী কহিল,—জীবনে একটি কামনা আমার ছিল, নারীর প্রেম! একদিন ভেবেছিলুম তা আয়ত্ত হয়েচে! কিন্তু ভুল…সে মরীচিকা! বিহারী স্বর গাঢ় করিল, কহিল,—আজ আমার প্রেয়সী কঠিন গৃহিণী! আমার মনের উপর দিয়ে সংসারের রথ তিনি চালিয়ে চলেছেন। সে রথের চাকায় আমার মন গুঁড়িয়ে গেল—সেদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই… আমি কিন্তু তা পারবো না। এ-মনের এমন ধ্বংস সইবো না!…কাজেই আমায় যত্ন করে, আমার মনকে মানে, শ্রদ্ধা করে—এমন একজন তরুণী…

বিহারী বকিয়া চলিল—কণ্ঠস্বর আবেগে কোথাও গদ্গদ করিয়া তোলে, কোথাও নিশ্বাসের বাষ্পে স্বরকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়… মালতীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই! চন্দন ঘষিয়া, পুষ্পপাত্রে পুষ্পভার সাজাইয়া সে ডাকিল—ও শিবুর মা…

—যাই বৌদি…

ঠিকা দাসী শিবুর মা আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। মালতী কহিল… বাতাসাগুলো এনে দাও দিকিন্… তোমার কাচা কাপড়…

—নিশ্চয়। নারায়ণের কাজ—বলো কি বৌদি—শুদ্ধাচার চাই…

মালতী কহিল—এনে এখানে রাখো। আমি ধূপ-দীপ আনি—ভট্চায্যি মশায় আটটার সময় আসবেন। ধূপ-দীপ এনে সিণিটা মেখে ফেলি। তা হলেই আমার সব গুছোনো হয়…

মালতী দোতলায় চলিয়া গেল… বিহারীও চুপ করিয়া ক্ষণেক বসিয়া থাকিবার পর উঠিয়া গেল। এমন হৃদয়গ্রাহী কথাগুলাতেও মালতীর হৃদয় টলিল না! হায় রে, ইহা তাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, তার কল্পনার অতীত ছিল!…

তার পর আজ…

খুবই তুচ্ছ ব্যাপার! আপিস হইতে ফিরিতে বড়

ছেলে মনু বলিল,—যাবো বাবা,—গোসাইদের বাড়ী যাত্রা হচ্ছে—শুনতে ?···

বিহারী কহিল—যা···

মহানন্দে ছেলে তখনি পথে ছুটিল ··

বাপের প্রাণ—মমতা জাগিয়াছিল। কখনো তেমন কিছু চাহে না—না চাহিলেও বিহারী কি-বা দিয়াছে! একটু যাত্রা শুনিতে যাইবে···যাক্! আহা!

মুখ-হাত ধুইয়া বিহারী একতাড়া প্রুফ লইয়া বসিল। মালতী আসিয়া কহিল—জলখাবার খেয়েই না হয় বসতে···

বিহারী কহিল—সময় হলেই দেবে, জানি। তাই···

কোথায় নাকি কবে কাদের উঠানের কোণে বারুদ পড়িয়াছিল, কোন্ বাবু সিগারেট টানিয়া পোড়া অংশটুকু সেই কোণে ফেলিয়া দেয়—সেই বারুদের উপর! অমনি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটে! সে আগুনে সিগারেট-খাওয়া বাবুর একটি ছেলে ও মেয়ে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়! খবরের কাগজে এ খবর দু'মাস পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল! বিহারীর কথার কোথাও প্যাঁচ ছিল না, গূঢ় অর্থও কিছু নয়—কিন্তু কি জানি কেন, সেই বারুদের ফল ফলিল!

মালতী ফোঁশ করিয়া উঠিল, কহিল—তোমার বাড়ী সত্যি ঘুমিয়ে আয়েস করে বেড়াচ্ছি না।···আজো ঘুমোইনি —তুমি এত আগে কখনো আসো না—তাই ছেলেমেয়েদের গা-হাত ধুইয়ে দিচ্ছিলুম। ভবানীদের বাড়ী সন্ধ্যার সময় যাবো—নেমন্তন্ন করে গেছে,—যাত্রা হবে,—একটু শুনে আসবো···তোমার বাড়ীতে বাঁদীগিরি নেওয়া ইস্তক সখের পাট উঠেই গেছে। এ'ও সখ নয়—অত করে বলেচে, তাই!

বিহারী জানে, মালতী এখন এমন হইয়াছে, কথা একটু সুরু করিলে সুদীর্ঘ বিস্তারে সে-কথা বাড়াইয়া তোলে! এবং ভারতের ইতিহাস লিখিতে বসিলে যেমন বাঁধা সিলেবাস আছে, হিন্দু বৈদিক আমল হইতে সুরু করিয়া পাঠান আমল, মোগল আমল, ব্রিটিশ আমল প্রভৃতি সব আমলের কথা লেখা চাই—তেমনি বিবাহিত জীবনের পূর্ব্বে সুখ-সৌভাগ্য কতখানি ছিল, তাহারি উজ্জ্বল বিবৃতি হইতে বর্ত্তমান শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কথা—মালতী এতটুকু বাদ দেয় না! কাজেই বাধা দিবার উদ্দেশ্যে সে কহিল —ও, ভবানীদের বাড়ী যাত্রা! মনু তাহলে সেখানেই গেল!

বড় ছেলের নাম মনু।

মালতী দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কহিল-মনু গেছে!

বিহারী কহিল—হাঁ। আমায় বললে, যাবো বাবা যাত্রা শুনতে? আমি বললুম, যা—

স্তব্ধ-গম্ভীর দৃষ্টিতে স্বামীর প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া মালতী একটা নিশ্বাস ফেলিল; নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল— তুমি তাহলে হুকুম দেছ! বাঃ! এই বয়স্ থেকেই ছেলেকে বেশ তৈরী করচো! তোমার আস্কারা না পেলে আমার এতখানি অপমান করবার তার সাহস হয় কখনো!

চায়ের পেয়ালায় তুফান বলিয়া একটা কথা বিহারীর শুনা ছিল। ঘরে তার চেয়েও বড় তুফানের সৃষ্টি হইতে পারে, এটুকু জানা ছিল না।

বিহারী কহিল—এ-সব কথা কেন তুলচো, বুঝি না। ছেলে বললে, যাবো? আমি বল্লুম—যা··এর মধ্যে শিক্ষা, অপমান, এত পলিটিক্স তুমি পাচ্ছো কি করে!

মালতী কহিল—থাক্, ঢের হয়েচে। যাত্রা শুনতে যাবেন —কি নাচন! আমি বললুম, এখন খা-দা, তারপর যাত্রা আরম্ভ হলে শিবুর-মা তোদের নিয়ে যাবে—ছেলে মুখ গোঁজ করে রইলো···খেলেন না, দেলেন না—কি চোপা! তাই আমি বললুম,—তোর যাত্রা শুনতে যাওয়া হবে না!···তাতে চোখ যা কট্‌মটিয়ে গেল! তারপর তুমি হুকুম দেছ—ছেলে বুঝেচে, মা কে? সে তো সংসারে বাঁদী—তার আবার বারণ কি, শাসন কি!

বিহারী কহিল-বেশ, তাকে ডাকাচ্ছি বাবু! ডাকিয়ে না হয় শাসন করচি! আমি তো এ সব খবর জানি না—

মালতী কহিল,—কেন ডাকাবে! না—না—না। কর্ত্তা তুমি, পয়সা তোমার—তুমি যাকে যা হুকুম করবে, তাই হবে। আমি কে—সত্যি এ কথা কে না বোঝে! না হলে

ঐ নতুন চাকরটা এসেছিল—সেও ত ঐ বাবু যতক্ষণ বাড়ীতে আছে—ততক্ষণই যা কাজ-কর্ম্ম করা, বাড়ীতে থাকা—আমায় মোটে গ্রাহ্য করতো না!···ছেলেও তেমনি দেখচে তো দু'বেলা। খোকাটি নয়—চোখ-মুখ ফুটেচে বেশ! ···ঐ ছেলে যদি এর পর আমার বুকে বসে জাঁতা না ঘুরোয়, তো আমি···

মালতী একটা কটু শপথ করিল।

বিহারী প্রমাদ গণিল,—অথচ কি করিয়া বুঝাইবে যে এ ব্যাপারে তাহাকে অপরাধী করিয়া এ সব কথা তোলা—···অবিচার!

সে সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল। মালতী কহিল,—এতই যদি—স্পষ্ট বললে পারো!···তোমার সংসারে কোনো কথায় থাকতে চাই না—চাকর-বাকর, ছেলে-পিলে কারো উপর আমার কোনো অধিকার নেই!

বিহারী নিঃশব্দে নামিয়া আসিল।···কেন যে মালতী এমন চটিয়া ওঠে! কেন তাকে ভুল বোঝে!

সংসার! সংসার কার নাই? অভাব-অভিযোগ সব সংসারে আছে; তার চেয়ে অভাব-অভিযোগ কত সংসারে আরো বেশী!

চুপ করিয়া ঐ সব কথাই সে ভাবিতেছিল,—মালতী আসিয়া দুম্ করিয়া চাবির গোছা ফেলিয়া দিয়া কহিল—চাবি রইলো, তোমার ছেলে-পিলে রইলো, আমি ভবানীদের বাড়ী যাচ্ছি—বোধ হয়, রাত্রে ফিরবো না। খাবার-দাবার রইলো, খেতে হয়, খেয়ো। ছেলে-পিলে দেখতে হয়, দেখো—না দেখতে হয়, যা তাদের খুশী, তাই তারা করবে······

এমনি বহু কথা এক নিশ্বাসে বলিয়া মালতী চলিয়া গেল।···বিহারী নড়িল না।

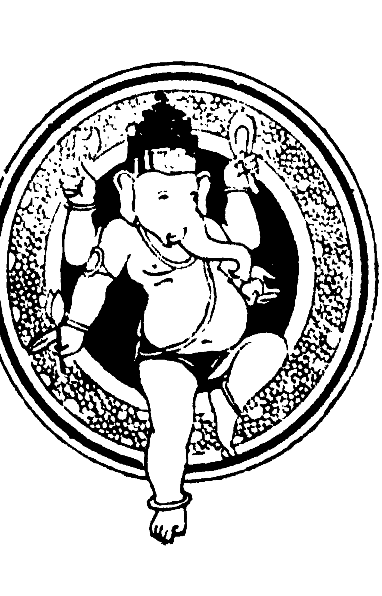
সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে তাকিয়া টানিয়া সে তাহাতে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল,—শুইয়া নিজের জীবনের অতীত দিনের স্মৃতি পাড়িয়া বসিল।

ভাবিতেছিল,—এ-ভাবে জীবন বহিয়া বেড়ানো—সে এক দুর্ঘট ব্যাপার! অথচ উপায় কি?

তার বুকে এখনো তেমনি প্রীতি, তেমনি ভালোবাসা! মালতীর প্রাণে মায়া নেই, তাও নয়···সংসারেও এমন কোনো ঘটনা ঘটে নাই···

কোনো নাদির শা আসিয়া তার গৃহ-দুর্গ আক্রমণ করে নাই! জার্ম্মানির গুলি গোলাও স্বামী-স্ত্রীর হৃদয় দু'টাকে ফাটাইয়া চৌচির করে নাই! তবে—তবে—তবে—

সুগভীর সমস্যা! এ সমস্যার সমাধান কি করিয়া হয়, কে তাকে বলিয়া দিবে!



জীবন-শরৎ

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

কত যে ঝঞ্ঝা এলো এ জীবনে রুধিয়া যাত্রা-গতি,
ধূলায় ধূসর হ'লো কলেবর, দৃষ্টি হারাল জ্যোতি।
মাথার উপর দিয়া
গেল কতবার করকাবর্ষ কেশমূল উপাড়িয়া।
তারপর হ'তে শুধু ধারাপাত সারারাত সারাদিন।
বাদলের বায়ু জীবনের আয়ু-প্রদীপে করিছে ক্ষীণ।
ক্ষণে-ক্ষণে অই অশনি গরজি হৃদয়-শোণিত শোষে,
পিচ্ছিল পথে মুষ্টি হইতে যষ্টি পড়িছে খসে।
ধ্বসে ধ্বসে পড়ে কায়
মত্ত ফেনিল আবিল সলিল উত্তাল বন্যায়।
আঘাতে আঘাতে অঙ্গগ্রন্থি শ্লথ হয় ধীরে ধীরে,
হের হের শ্বেত ফেনরাশি সখি, জমা আমার শিরে।

সেই দিন পড়ে মনে
যেদিন বালিকা গাঁথিতে মালিকা মাধবী কুঞ্জ-বনে।
গাহিত কোকিল মুকুলে আকুল রসালের প্রশাখায়,
কণা-কণা মধু অলি মুখ হ'তে ছিটায়ে পড়িত গায়।
মলয়া তোমার অলকে মাখাত বন-কুসুমের রেণু,
গাহিত মধুপ তব বন্দনা,—আমি বাজাতাম বেণু।
চৈতালি ভরা ক্ষেত,
সে দিনের চোখে এ দুর্দ্দিনের ছিল না ত সঙ্কেত।
বাসন্তী মদিরতা
ক'দিনের সখি? —সে যেন স্বপ্ন, যেন প্রাক্তন কথা।

'হেন দিন নাহি র'বে,
শরৎ আসিবে বাদলের শেষে; এই কথা বলে সবে।
এ হত জীবনে শরৎ হাসিবে? ভুলেও হয় না মনে।
পঙ্কে ভুলিলে কেমনে, লক্ষ্মি! যাব পঙ্কজ-বনে?
শুধু তব ভালবাসা
এতদূর মোরে এনেছে আগায়ে,—আর নেই সখি আশা।

হের মেঘে মেঘে হায় গেছে ঢেকে জীবনের সারা পথ,
ক্লান্ত এ তনু, শ্রান্ত এ আঁখি,—মূর্চ্ছিত মনোরথ।

মাথার উপরে বলাকার সারি উড়ে যায় কোন্ দেশে?
শরৎ বুঝি বা ডেকেছে তাদের ইঙ্গিতে ভালবেসে।
দূর দিগন্তে ও কি? পাথারের বুঝি বা অট্টহাসি!
দৃষ্টি চলে না! কি বলিলে সখি কাশফুল রাশি রাশি?
হায়রে শরৎ-রাণী!
দূর হ'তে কই আমাপানে সই—দেয় না ত হাত-ছানি!
অনেকেই বলে,—এখান হতেই শেফালি-গন্ধ পায়,
কেয়া-বাস ছাড়া আর কোন বাস পাই না এ দুনিয়ায়।

এই দেহটার পানে একবার চেয়ে সখি বল দেখি,
এ জীবনে মোর শরৎ আসিবে? সম্ভব হবে এ কি?
তোমার জীবনে প্রিয়া
যদি আসে তবু ডুবিতে পারিব সেই ভরসাটি নিয়া।
যদি সে একদা আসে
আমার হইয়া তার বরণের গুচ্ছ বাঁধিও কাশে।
আমার হইয়া শুনাইও প্রিয়া তার অভিনন্দন।
ক্ষণেকের তরে নয়নের লোর করিও সম্বরণ।
শুনিয়া বোধন-বাঁশী
ঘেরিবে তোমারে ছেলে-মেয়েগুলি খেলা ফেলে ছুটে আসি'।
নব বেশবাস তাদেরে পরায়ে দিতে যেও নাক ভুলে,
তারাই তোমার পরম তীর্থ অশ্রু-সাগর-কূলে।
কাঁদিতে ব'সো না যেন,
দু'জনার ভার একের মাথায়, ভুলিলে চলিবে কেন?
কোজাগর-বিভাবরী
একাই জাগিও, চাহিয়া গগনে সব ব্যথা সম্বরি'।
জীবনে যে জনা পায়নি জ্যোছনা স্মরিয়া তাহার ব্যথা,
শুভ্র শারদ শুচিতার মাঝে আনিও না মলিনতা।
ঝরা শেফালির ফুলে
অঞ্জলি রচি শারদীয়া মার সঁপিও চরণ-মূলে।
জীবনে যাহার শরৎ এলো না, তাহার প্রাণের বাণী
শুনাইও তাঁরে, সব সন্তাপে পাবে সান্ত্বনাখানি।

অবৈধ

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

মাঠের পর মাঠ পার হইয়া ট্রেণ ছুটিতেছিল। রাত্রি তখনও গভীর হয় নাই। বাহিরে বন-প্রান্তর, তরুশ্রেণী ও খালবিলগুলি কোমল ও করুণ চন্দ্রালোকে প্লাবিত হইয়া যাইতেছে।

তৃতীয় শ্রেণীর একখানি মেয়েদের গাড়ীতে বিকাল হইতে সেই-যে কলরব সুরু হইয়াছিল তাহা এতক্ষণে একটু থামিয়াছে। থামিয়াছে, তাহার কারণ, উৎসাহ আর নাই। উৎসাহ ফুরাইয়া গেলে মেয়েরা সাধারণতঃ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। গাড়ীতে ভিড় বিশেষ ছিল না, শুইয়া বসিয়া পা ছড়াইয়া জায়গা বেশ সঙ্কুলান হইয়া গেছে। কেহ কেহ পূরা বেঞ্চি দখল করিয়া বিছানা ছড়াইয়া রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমাইবার আয়োজন করিতেছিল। 'বসিতে পাইলে শুইতে চায়'—এই প্রবাদ-বাক্যটি যিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, নারী-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল বলিতে হইবে।

গাড়ীর এক কোণে দুইটি মেয়ে কাছাকাছি বসিয়া ছিল। পরস্পরের মধ্যে কোনো পরিচয়ই নাই। বিকাল হইতে এই ঘণ্টা পাঁচেকের ভিতর সামান্য দুই চারিটি কথা হইয়াছে মাত্র। প্রথম মেয়েটি কুমারী, বয়স আন্দাজ সতেরো আঠারো, গায়ের রং কালো, মাথার চুলগুলি বিবর্ণ, কপালে একটি কাঁচপোকার টিপ্, পরণে একখানি আধ-ময়লা রাঙাপেড়ে শাড়ী ও একটি দেশী ছিটের সেমিজ। সেমিজের লেশ খানিকটা ছিঁড়িয়া উড়িয়া গিয়াছে। নিতান্তই সে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। গায়ের রং ময়লা হইলেও মুখখানি তাহার মন্দ নয়, চোখ দুইটির চাহনি ভাল, এবং সকলের চেয়ে স্পষ্ট হইতেছে তাহার বলিষ্ঠ দেহ। দেহে তাহার কোথাও ফাঁকি নাই, লম্বা চওড়া ভরাট এবং কঠিন নিটোল।—অপর মেয়েটি অন্য রকম। সে সুশ্রী এবং সুন্দরী। তাহার রূপ, দেহ এবং পরিচ্ছদ সমস্তই আধুনিক। তাহার বসিবার ভঙ্গী সুন্দর ও বলিবার ভঙ্গী সুমার্জ্জিত। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কোথাও তাহার অশিক্ষার ইঙ্গিত নাই। দেখিলে মনে হয়, সে ধনীর কন্যা ও বধূ। পরণে একখানি পার্শী শাড়ী ও বেগুনী রেশমের ব্লাউস, হাতে দুইগাছি চিক্‌চিকে সোনার চুড়ি, পায়ে একজোড়া ফ্যান্সী চটিজুতা। এ মেয়েটি যে কেন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছে, এতক্ষণেও তাহার কোনো কারণ বুঝা যায় নাই। পাশেই বেঞ্চিতে শোয়ানো তাহার একটি কচি ছেলে, আন্দাজ পাঁচ ছয় মাসের হইবে। বিকাল হইতে এতক্ষণ পর্য্যন্ত কুমারী মেয়েটির উৎসুক দৃষ্টি বার বার তাহার উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। এত সুন্দর, এমন ফুট্‌ফুটে ছেলে জীবনে সে দেখিয়াছে বলিয়া মনে নাই। এমন কোঁকড়ানো চুল, এমন মুখের কাটুনি, এমন টকটকে গৌরবর্ণ···কুমারী মেয়েটির অপলক দৃষ্টি একবার তাহার উপর গিয়া পড়িলে আর ফিরিতে চায় না!

'তোমার নাম কি ভাই?'

মৃদুকণ্ঠে সে কহিল, 'হরিদাসী।'

'ও, আমার নাম অরুণা দেবী। কতদূর যাবে তুমি?'

হরিদাসী কহিল, 'বর্দ্ধমানে নাব্‌বো।'

আলাপ করিতে পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। বলিল, 'ছেলেকে শুইয়ে রেখেচেন, খায়নি যে অনেকক্ষণ?'

অরুণা পাশ ফিরিয়া তাহার ছেলের দিকে তাকাইল। বলিল, 'হ্যাঁ, এবার গাড়ী থামুক, উনি দুধ এনে দেবেন, খাওয়াবো।'

'ততক্ষণ মাই দিন্ না?'

'ন্-নাঃ, দুধ নেই!'

মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া গ্রাম্য হাসি হাসিয়া হরিদাসী বলিয়া ফেলিল, 'ছেলেটাকে একটু দিন্ না আমার কোলে?' বলিয়া আর সে অপেক্ষা করিতে পারিল না, অরুণার সম্মতিসূচক মুখের দিকে মুহূর্ত্তমাত্র তাকাইয়া সে বেঞ্চির উপর হইতে ছেলেটিকে ছোঁ দিয়া

তুলিয়া লইল। দুই হাতে করিয়া বুকের মধ্যে লইয়া বলিল, 'এমন ছেলে মানুষের হয়? যেন রাজপুত্তুর!'

ছেলেটিকে লইয়া সে কী যে করিবে, কোথায় যে রাখিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না, শুধু ক্ষুধাতুর অজস্র চুম্বনে তাহার ঘুমন্ত সুন্দর মুখখানিকে ভরিয়া দিতে লাগিল।

চোখ দুইটি তাহার আনন্দে ও স্নেহের আবেগে চকচক্ করিতেছিল। তাহার এই অকপট আত্মীয়তা দেখিয়া অরুণা নির্ব্বাক দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। গ্রাম্য বলিয়া যাহারা চিরদিন উপেক্ষিত, হৃদয়ের দিক দিয়া তাহারা অবহেলার যোগ্য নয়।

কি একটা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। অরুণা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া এদিক ওদিক তাকাইতেই একটি যুবক আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন আলাপ করিতে লাগিল। ছিপ্‌ছিপে চেহারা, সুশ্রী যুবক,—সময় থাকিলে হরিদাসী আরো ভাল করিয়া দেখিতে পাইত, কিন্তু তাহার সময় ছিল না। ছেলেটিকে লইয়া নানান্ রকম করিয়া সে সোহাগ করিতেছিল।

যুবকটি চলিয়া যাইবার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, 'দুধ আন্‌তে বলে' দিয়েচেন?'

অরুণা কহিল, 'আন্‌তে গেলেন।'

কিন্তু দুধ আসিয়া পৌঁছিবার আগেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। হরিদাসী রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল, 'ওমা, দুধ এল না, ছেলেকে খাওয়াবো কি? যদি ভোঁচ্‌কানি লাগে?'

অরুণা বলিল, 'তাই ত, কি করি বল ত?'

'আবার গাড়ী কোথায় থামবে?'

'তা ত' জানিনে?'

'শিশি করে' দুধ আপনি রাখেননি কেন সঙ্গে?'

'গাড়ীর তাড়াতাড়িতে সময় হয়ে ওঠেনি কি না—'

ক্ষুধা পাইলেও ছেলেটি কাঁদে নাই, জাগিয়া জাগিয়া হরিদাসীর কোলের মধ্যে শুইয়া হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতেছিল। অরুণা এইবার ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার সঙ্গে কে এসেছে ভাই?'

সে কহিল, 'দাদা। দাদা আর কাকা। ও-গাড়ীতে আছে সব।'

'তোমার বিয়ে হয়নি?'

হরিদাসী কহিল, 'হবে এইবার, পাত্তর দেখা হচ্ছে।' একটু থামিয়া সে কহিল, 'আপনার ছেলে আপনার বরের চেয়েও সুন্দোর হয়েছে।' বলিয়া একটু হাসিল। ভিতরে তাহার কথা থাকে না।

অরুণা অন্যমনস্ক হইয়া বলিল, 'তাই না কি? আমারো চেয়ে?'

মাতা ও পুত্রের দিকে হরিদাসী একবারটি মুখ চাওয়াচায়ি করিল, তারপর আবার বলিল, 'হ্যাঁ…এই আপনারই মতন!'

গাড়ী চলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আলাপও চলিতে লাগিল। হরিদাসীর বাড়ী বর্দ্ধমানে, কি এক গ্রামে, গ্রামের কোলে কোন্ এক নদী। তাহার মা নাই। বাপ আর বিধবা পিসি। বাড়ীর সে একটিমাত্রই মেয়ে। কবে কি এক কঠিন রোগে তাহার বাম চক্ষুর তারায় একটা সাদা দাগ পড়িয়াছে বলিয়া অনেকগুলি পাত্র তাহাকে অপছন্দ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এইবার একজনের সহিত প্রায় ঠিক হইয়া আসিয়াছে। বিবাহ হয় নাই বলিয়া সবাই তাহার নিন্দা করে।

অরুণা অতি সংক্ষেপে নিজেই তাহার পরিচয় দিল। সে অত্যন্ত স্বাধীন মেয়ে। একা একা দেশভ্রমণ করা তাহার অভ্যাস। আজ প্রায় সাত আট মাস যাবৎ সে এদেশ ওদেশ করিতেছে। বিবাহ তাহার অল্পদিনই হইয়াছে ইত্যাদি।

রাত দেখিতে দেখিতে গভীর হইয়া উঠিল। কেহ নিদ্রিত, কেহ অর্দ্ধজাগ্রত। ছেলেটিকে কোলের উপর পরম যত্নে শোয়াইয়া হরিদাসী তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। তাহার কোলের কোমল উষ্ণ স্পর্শ পাইয়া ছেলেটি অকাতরে ঘুমাইতেছে। ছোট একটা কাপড়ের পুঁটুলিতে করিয়া সে খাবার আনিয়াছিল, তাহা পড়িয়াই রহিল, কচি ছেলেকে না খাওয়াইয়া নিজে খাইবার কথা তাহার মনেই পড়িল না।

অরুণা বলিল, 'তোমার বুঝি ঘুম পায়নি?'

'পেয়েছিল, এখন আর নেই। একদিন নাই ঘুমোলাম!'

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অরুণা বলিল, 'ধন্য মেয়ে ভাই তুমি। পরের ছেলে নিয়ে এত…'

হরিদাসী তাহার দাঁতের মাড়ি বাহির করিয়া হাসিয়া কহিল, 'আমার বিয়ে হলে' এর চেয়েও বড় ছেলে হতো।'

অরুণাও হাসিল, হাসিয়া বলিল, 'বেশ ত, আমার ছেলেটাকেই নিয়ে যাও না?'

'খুব তামাশা কচ্ছেন যা হোক।' বলিয়া হাসিমুখে হরিদাসী নিদ্রিত শিশুটির সুকোমল ওষ্ঠাধরে আর একটি গভীর চুম্বন বসাইয়া দিল। শিশুটিকে চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতে পারিলে বোধ হয় তাহার আদর করা শেষ হইত!

অরুণা কহিল, 'তুমি লেখাপড়া জানো?'

ঘাড় নাড়িয়া হরিদাসী বলিল, 'একটুও না, আপনার কাছে বসতে আমার লজ্জা করে!'

অরুণা তাহার চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া কহিল, 'এমন কথা কি বলে? তোমার যে-পরিচয় পেলাম তা'তে আমারো ত লজ্জা করতে পারে তোমার পাশে বসতে?'

হরিদাসী আবার বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার দিকে এবং তাহার এই শিশু সন্তানটির দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার দেখিবার ক্ষুধা যেন আর মিটিতে চায় না। তারপর ছোট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে সে কহিল, 'আপনারা কত বড়লোক!'

অরুণা তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল, 'বড়লোক, কিন্তু বড় হয় ত' নয় হরিদাসী।' বলিতে বলিতে, হরিদাসী স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার আয়ত দুইটি চোখের কোলে জলের রেখা জমিয়া উঠিয়াছে। অশ্রু দেখিয়া সে মরমে মরিয়া গেল, অনুতপ্ত হইল, কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া মাথা হেঁট করিল। আহা, মানুষের যে কোথায় ব্যথা জমিয়া থাকে, তাহা বাহির হইতে কেহ জানিতেও পারে না! মনে আছে, অনেকদিন আগে তাহাদের গ্রামে একটা লোক মাঝে মাঝে আসিয়া ভিক্ষা করিয়া যাইত। মুখে মুখে মাথুরের পালা সে সুন্দর গাহিতে পারিত। একদিন ফস্ করিয়া গ্রামের একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, সে কাহাকেও ভালবাসে কি না। বাস্, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া লোকটার সেই-যে মাথা খারাপ হইয়া গেল, তাহা আর ভাল হয় নাই। ভগবান জানেন সত্য কি না, একদিন খবর রটিল সেই পাগলটা না কি রেল-লাইনের উপর কাটা পড়িয়াছে।

পিঠের দিকে ঠেস দিয়া হরিদাসী পা ছড়াইয়া বসিয়াছিল। তাহার বুকের উপর টিক্‌টিকির মত ছেলেটি অতি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছে। অরুণা একবারটি তাহাকে নিজের কোলে লইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু হরিদাসী হাসিয়া অস্বীকার করিয়া দিয়াছে। গাড়ী দুলিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি একটু একটু তাহার বুকের উপরে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। তাহার শিরার তরুণ রক্ত অনির্ব্বচনীয় আনন্দে নৃত্য করিতেছিল, অসহনীয় আরামে তাহার সর্ব্বশরীর অপূর্ব্ব নেশায় রোমাঞ্চ হইতেছে, কথা বলিবার যেন আর তাহার শক্তি নাই; সে বিবশ, বিহ্বল, কাঙাল। ছেলেটি আর একটু বড় হইলে সে হয় ত তাহাকে নিজের বুকের উপর পিষিয়া চট্‌কাইয়া কী যে করিতে থাকিত বলা যায় না। হরিদাসী শুধু নীরবে শিশুটিকে দুই হাতে চাপিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল। মাথার খোঁপা তখন তাহার খুলিয়া পড়িয়াছে, দেহের আর কোথাও তাহার সাড়া নাই, কেবল আপনার একটা পায়ের উপর আর একটা পা ছড়াইয়া দিয়া দুই পা সে ধীরে ধীরে ঘষিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই দুইটা পা তাহার থামিয়া গেল, আর তাহার সাড়াশব্দ নাই, ঘুমাইবে না বলিয়াও সে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার বলিষ্ঠ দেহের বড় বড় নিশ্বাসে ছেলেটা কেবল থাকিয়া থাকিয়া তাহার বুকের উপর উঠানামা করিতে লাগিল।

কতক্ষণ সে ঘুমাইল কে জানে, গা ঠেলিয়া ডাকিতেই সে জাগিয়া উঠিল। আকাশ তখন একটু একটু ফর্সা হইয়া আসিতেছে। দেখিল, বড় একটা ষ্টেশনে তাহাদের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহার দাদা কহিল, 'নাম শিগ্‌গির হরিদাসী, এই বর্দ্ধমান।'

বুকের ভিতরটা তাহার ধড়াস করিয়া উঠিল। ছেলেটিকে ছাড়িয়া এইবার তাহাকে বিদায় লইতে হইবে। তাহার কান্না আসিল। এদিক ওদিক একবার তাকাইয়া দেখিল, তারপর বলিল, 'দাঁড়াও দাদা, এর মা গেছে পায়খানায়। আসুক, ছেলেকে দিয়ে যাবো।'

দাদা তাহার ইতিমধ্যে জিনিসপত্র নামাইয়া লইয়াছে। গাড়ী মাত্র দশ মিনিট দাঁড়াইবে, আর একবার সে হরিদাসীকে তাড়া দিল। হরিদাসী একটু ব্যস্ত হইয়া ছেলেকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মা তাহার আর বাহির

হয় না। এমন মা-ও কোথাও দেখা যায় না বাপু! হরিদাসী আবার বসিল।

মিনিটের পর মিনিট অতিক্রম করিয়া গেল, অরুণা আর বাহির হইতে চায় না। দাদা আসিয়া চোখ পাকাইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, 'কি ন্যাকামি হচ্ছে হরি, শিগ্‌গির নেমে আয়। রেখে দিয়ে আয় না ছেলেটাকে ওখানে?'

হরিদাসী রাখিল না, ছেলেকে কোলে লইয়াই সে পায়খানা খুলিয়া তাহার মাকে ডাকিতে গেল। কিন্তু দরজা খুলিয়া দেখিল, অরুণা সেখানে নাই। চারিদিকে সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া দেখিল, কোথাও অরুণা নাই। দুই তিনজন মাত্র বাঙালী ও পশ্চিমা স্ত্রীলোক পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে, তাহাদের ডাকিয়া খোঁজও পাওয়া গেল না, ভাল করিয়া তাহারা সাড়াও দিল না। তবে কি সে নামিয়া গিয়াছে? বেঞ্চির দিকে তাকাইয়া দেখিল, অরুণার কাছে একটা চামড়ার ব্যাগ্ ছিল তাহাও নাই। তবে?

'অ দাদা, এর মা গেল কোথায় গো?'

দাদা দাঁত খিঁচাইয়া কহিল, 'তা আমি কি জানি? নেকি, রাখ্ ফেলে ওর ছেলেকে, রেখে নেমে আয়।'

'কার কাছে রেখে যাবো?'

'আবার বেশি কথা বল্‌চিস হতভাগি? তুই বাড়ী চল্ আগে, ঝাঁটার বাড়ি আগাপাছতলা···আয় শিগ্‌গির? নাম্ বলচি?'

ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিতেছিল। কিন্তু আর কোনো পথ ছিল না, তাহাকে বেঞ্চিতে শোয়াইয়া দিয়া অগত্যা পুঁটুলিটি হাতে করিয়া হরিদাসীকে নামিয়া যাইতেই হইল। ভোরের আকাশে ধীরে ধীরে আলো ফুটিয়া উঠিতেছে।

বিশ্ব-সংসার তাহার চোখের চারিদিকে ঘূর্ণীর মত ঘুরিতেছিল, আকাশ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, পায়ের নীচে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছে। ষ্টেশনের হাঁক-ডাক, জন-জটলা, ট্রেণের আওয়াজ, কুলীর চীৎকার,—সমস্তটা মিলিয়া মিশিয়া তালগোল পাকাইয়া তাহাকে যেন অকস্মাৎ উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল।

কুলী করিতে পয়সা লাগিবে বলিয়া তাহার দাদা ও কাকা জিনিষপত্রগুলি একে একে নিজেদের ঘাড়ে তুলিয়া লইতেছিল, সেও পুঁটুলিটি লইয়া একবার পিছন ফিরিয়া তাহার পরিত্যক্ত ট্রেণখানার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাইতেছিল। মেয়েদের কামরার ভিতর হইতে কচি ছেলের কান্নার আওয়াজ এখান হইতেও স্পষ্ট শুনা যাইতেছে। সে কান্নার শব্দ হরিদাসীর নাড়িতে নাড়িতে পাক খাইয়া সর্ব্বশরীর মুচ্‌ড়াইয়া উঠিতে লাগিল।

টিকিট-কলেক্টরকে টিকিট দিয়া তাহারা যখন রেলিংয়ের বাহিরে গেল, তখন সবুজ নিশান উড়িয়াছে। বাঁশী বাজিয়া উঠিল, আর দেরী নাই, ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে মুহূর্ত্তেই চির-দিনের জন্ম অদৃশ্য হইয়া যাইবে। হঠাৎ পুঁটুলিটি ফেলিয়া উন্মাদিনীর মত লোকজন ঠেলিয়া হরিদাসী বাহির হইয়া ট্রেণের সেই কামরায় গিয়া উঠিল। ছেলেটা তখন কাঁদিয়া ককাইয়া উঠিয়াছে। কোলের উপর তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিয়া চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্বেগে সে যখন আবার নামিয়া আসিল, গাড়ী ততক্ষণে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার সমস্ত ভঙ্গীটি কথা কহিয়া যেন বলিতে লাগিল, মা-বাপ যাহাকে নিষ্ঠুরের মত ছাড়িয়া চলিয়া গেছে, তাহাকে সে ফেলিবে কেমন করিয়া?

দেখিতে দেখিতে যাহা ঘটিল তাহা দৃশ্য-মধুর নয়। দাদা আসিয়া তাহার হাত মুচ্‌ড়াইয়া অপমান করিতে লাগিল, খুড়ামহাশয় আসিয়া তাহার এই নাটকীয় ন্যাকামির প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ সুরু করিয়া দিল। ক্রমে ক্রমে লোকজন জমিয়া গেল, ভিড় হইল, নানা লোকের নানান্ টিট্‌কারি ও বিদ্রূপ আসিয়া কানে বিঁধিতে লাগিল এবং শেষকালে গোলমাল দেখিয়া রেলওয়ে পুলিশের দল আসিয়া পড়িল। বহু গবেষণা হইতে লাগিল, কিন্তু কোনো সন্ধান পাইবার উপায় ছিল না। কত রাত্রে কোন্ ষ্টেশনে কোথায় তাহার মা-বাপ নামিয়া গিয়াছে তাহা হরিদাসী বলিতে পারিল না, তাহাদের ঠিকানা-নাম কিছুই তাহার জানা নাই। অবশেষে জমাদারের কোলে ছেলেটিকে তুলিয়া দিতে হইল, পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু ডায়েরী টুকিয়া লইতে লাগিলেন।

গোলমালে বেলা বাড়িয়া চলিল। স্থির হইল, ছেলেটি আপাততঃ পুলিশের হেপাজতে থাকিবে। কিন্তু কতদিন থাকিবে, কেই বা তাহাকে লালন করিবে, তাহার কিছুই হদিস মিলিল না। আসামীর যদি দেখা না পাওয়া যায়

তাহা হইলে পুলিশ কি ব্যবস্থা করিবে, তাহাও জানা গেল না।

জমাদার শিশুটিকে লইয়া আপিস-ঘরে চলিয়া গেল। হরিদাসী উদ্বেগ-আকুল চোখে সেইদিকে তাকাইয়া কহিল, 'নিয়ে গেল, খায়নি যে কাল রাত থেকে?'

খুড়া কহিল, 'খায়নি তা তোর বাবার কি? বলি, ঘরে ফিরতে হবে না? এর পর গরুর গাড়ী যদি না পাওয়া যায়? হারামজাদি, তোর মতন আমাদের গায়ের জোর? বুড়ো মানুষ···এতটা পথ···'

'আমি দেবো না ওদের হাতে।' বলিয়া কাহারও বাধা না মানিয়া হরিদাসী আবার লোকজন ঠেলিয়া আপিস-ঘরে গিয়া ঢুকিল। বলিল, 'দাও, ও ছেলে আমার।' বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে জমাদারের কোল হইতে ছেলেটাকে কাড়িয়া লইয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিল। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল; কিন্তু কাহারও কথা না শুনিয়া, কোনও দিকে না তাকাইয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না। অথচ এত বড় শক্তি আর কাহারও ছিল না যে ওই নারীটির নিকট হইতে আবার কেহ ছেলেটিকে ছিঁড়িয়া আনিবে। সকলে হতবুদ্ধি হইয়া মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু আসিয়া বলিলেন, 'ঠিকানাটা তবে দিয়ে যাও, তোমার বোনের কাছেই থাক্, এন্‌কোয়ারি চলুক। কোন্ গাঁয়ে ঘর তোমাদের?'

কাকা ও দাদা নাম-ধাম লিখাইয়া দুধ কিনিয়া বাহির হইয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, একখানা খালি গরুর গাড়ীর কাছে ছেলেটাকে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া হরিদাসী পাগলের মত টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

প্রায় চার মাস চলিয়া গিয়াছে। এতগুলি দিন যে কেমন করিয়া কাটিয়াছে তাহা হরিদাসীর আর মনে পড়ে না। ছেলের সে নাম রাখিয়াছে আদু। আদু এখন একটু একটু হাসিতে শিখিয়াছে। চোখে কাজল পরিয়া শুইয়া শুইয়া সে যখন হরিদাসীর দিকে তাকায়, রোমাঞ্চ আনন্দে হরিদাসীর সর্ব্বাঙ্গ কি যেন একটি মধুর আবেশে সির সির করিতে থাকে। অতি যত্নে সে দুধ খাওয়াইতে বসে।

গ্রামের মেয়ে সে; এবং তাহা নিতান্তই অবজ্ঞাত অখ্যাত গ্রাম। হরিদাসী যেদিন আদুকে লইয়া গ্রামে ঢুকিল, সেদিন হইতে মুখে মুখে যে আলোচনা সুরু হইয়াছিল তাহার অপকলঙ্ক আজিও হরিদাসীকে ত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হয় নাই। সন্দেহ নিন্দা বিদ্রূপ অপমান—ইহাদেরই কণ্টক-বনে হরিদাসীর অবারিত আনা-গোনা। দীর্ঘকাল অজ্ঞাত কোন্ মাতুলালয়ে বাস করিয়া যে যুবতী নারী শিশু-সন্তান লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে, এ পাওনা তাহাকে লইতেই হয়।

গ্রামের লোকের কানাঘুষা শুনিয়া উপ্‌রোউপ্‌রি তিন চারিটি পাত্র হাত-ছাড়া হইয়া গেল। গেল বলিয়া আর যাহারই দুশ্চিন্তা হউক না কেন, হরিদাসীর নাই। নূতন কাপড়, নূতন গহনা পরিয়া সে শ্বশুরঘরে যাইবে এ গ্রাহ্যই তাহার ছিল না। সে যেন এক বিচিত্র রসে, রঙে ও আনন্দে মাতিয়া উঠিয়া বাহিরের পৃথিবীটাকে একরূপ বাতিল করিয়া দিয়াছে।

এই চার মাস কি করিয়া যে কাটিয়াছে তাহা সে জানে। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ সে উৎকর্ণ হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে, পাছে আসামীর সন্ধান পাইয়া পুলিশের দারোগা আসিয়া আদুকে লইয়া যায়! পাড়ায় কাহারো ঘরে চিঠি আসিলে তাহার বুকের ভিতর ধড়ফড় করিয়া উঠে, ভিন্ন গ্রামের নূতন লোক কেহ আসিলে তাহার হাত হইতে দুধের বাটি পড়িয়া যায়, হঠাৎ কোনো সময় চৌকীদারের হাঁক শুনিলে সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া দুই হাতে আদুকে জড়াইয়া ধরে।

আদুকে লইয়া তাহার সংসার, আদু ছাড়া সংসারে তাহার কেহ নাই। আদুকে কেন্দ্র করিয়া তাহার অতি-ব্যস্ততা, অতি-চাঞ্চল্য। কল্পনা এবং ভাবপ্রবণতা বলিয়া হরিদাসীর কোনো বস্তু ছিল না, এখন সে আকাশের দিকে তাকাইয়া সাদা মেঘখণ্ডগুলির শিশুসুলভ লীলা-চপলতা উপভোগ করে। আদু তাহাকে কবি করিয়াছে। আপনার পরণের রাঙা দেশী শাড়ীখানি ছিঁড়িয়া হরিদাসী একটা জামা শেলাই করিয়া ফেলিল। অথচ সে ভাল করিয়া রান্না করিতেই জানিত না, সূচীকার্য্য ত দূরের কথা। জামাটা

নিতান্ত মন্দ হয় নাই দেখিয়া সে আপন মনে হাসিতে লাগিল। আদু করিয়াছে তাহাকে শিল্পী!

সংসারের নানা কাজের ফাঁকে আদুকে লইয়া পায়চারি করিতে করিতে হরিদাসী অনেক কথাই ভাবে। অজ্ঞাত কোন্ পিতামাতার এই দুর্লভ সুন্দর শিশু-দেবতাটিকে কোলে পাইয়া সে চির জীবনের জন্য গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ সে ত কাহারো চেয়ে কম নয়! মাথা তাহার কেনই বা হেঁট হইয়া থাকিবে? বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা, ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা, মার্জ্জিতরুচি, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহীয়সী নারীর সহিত আজ সে একাসনে বসিবার যোগ্য। স্পর্শমণিকে আঁচলে বাঁধিয়া যে ঘুরিয়া বেড়ায়, ভিখারী বলিয়া তাহাকে অসম্মান করিবার অধিকার ত কাহারো নাই? গ্রামের মেয়ে সে, তা হউক,—আদু যাহার আছে, সে নিতান্ত গ্রাম্যবালা নয়! কে বলিয়াছে সে সরল, শান্ত, ভয়কুণ্ঠিতা পল্লী-বালিকা? এখন হইতে সবাইকে সে জানাইবে, সে ভয়হীন, দর্প ও অহংকারের প্রতিমূর্ত্তি, সে অকুণ্ঠ সত্যবাদিনী, তাহার সম্মান আছে, ব্যক্তিত্ব আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। সে ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয়, সে অসামান্য!

তবু একদিন একটি পাত্রের সঙ্গে হরিদাসীর বিবাহের সম্বন্ধ প্রায় ঠিক হইয়া গেল। এই জেলারই কোন্ এক ক্ষুদ্র শহরে এক মহাজনের ধানের গদীতে ছেলেটি হিসাব-নিকাশের কাজ করে। অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়, সামান্য কয়েক বিঘা জমিজমা, কিন্তু পাত্রটি সচ্চরিত্র। নাম সদানন্দ। হরিদাসীর বাবা বহুদিন পূর্ব্বে কন্যাকে সঙ্গে লইয়া গদীতে ধান বিক্রয় করিতে গিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছিল এবং ফিরিবার সময় এমনও জানা গেল, সদানন্দ হরিদাসীকে পছন্দ করিয়াছে। মা বাপ নাই বলিয়া হরিদাসীর বাবা সেদিন কন্যার সহিত সদানন্দর সম্বন্ধ করিতে একটু আপত্তি করিয়াছিল। আজ ভাবগতিক দেখিয়া সে-আপত্তিও আর টিকিল না।

নারীকে একবার পছন্দ হইলে পুরুষ তাহার অনেক ত্রুটি এড়াইয়া চলে। সদানন্দ যখন শুনিল, যাহাকে সে বিবাহ করিবে, সে একটি পরিত্যক্ত শিশুসন্তানকে লালন করে, শিশুটি চিরদিন তাহার কাছে কাছে থাকিবে, তখনও সে আপত্তি করিল না। একদিন উভয়ের পাকা দেখা হইয়া গেল।

গ্রামের লোক অনেক বাধা দিল, অনেক কথা রটাইল, কেহ কেহ সমাজপতি হইয়া আসিয়া চোখ রাঙাইতে লাগিল, কিন্তু বিবাহ থামিল না। ধোপা নাপিত বন্ধ হইল, দুধ-গোয়ালিনী কাজে জবাব দিল, মুদী জিনিসপত্র বিক্রয় করিল না, সবাই করিল একঘরে,—তবু বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। এমন নয় যে হরিদাসীর বাবা সমাজকে গ্রাহ্য করে না, কিম্বা মনের জোর তাহার প্রচুর; কিন্তু সে বৃদ্ধ বেচারা নিরুপায়। তাহাকে ঘরের কোণে বসাইয়া খুড়া ও দাদাকে দিয়া হরিদাসী নিজে সকল কাজ করাইতে লাগিল, আদুকে কোলে লইয়া সে পিঁড়িতে আল্পনা দিতে বসিল। উচ্চ বংশের মেয়ে সে নয়, তাহারা জাতিতে কৈবর্ত্ত, গতর খাটানো তাহাদের অভ্যাস। নিজেদের কাজ নিজের হাতে করিতে তাহার এতটুকু লজ্জা নাই। হরিদাসীকে দেখিয়া মনে হইল, সে আর শান্ত নয়, মৃদু নয়, কেহ তাহাদের পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইবে এ আর সে সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়। যে-কোনো সমাজপতির সহিত সংগ্রাম করিতে সে যথেষ্ট সক্ষম। আপন ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তায় সে আজ সকলকে করতলগত করিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যায় অতি সামান্য আয়োজনের মধ্যে বর আসিয়া পৌঁছিল। শাঁখ বাজিল, পিসিমা দিল উলুধ্বনি, দেখিতে দেখিতে একশত টাকা গণিয়া দিয়া সম্প্রদান হইল, তারপর বর-কনে উঠিল বাসরে। বাসরে গ্রামের কোনো মেয়ে আসিয়া যোগ দিল না। ঘুমন্ত আদুকে লইয়া গিয়া পিসিমা হরিদাসীর কোলে দিয়া আসিল। চোখের জলে ভাসাইয়া হরিদাসী আদুর মুখখানি চুম্বনে চুম্বনে রাঙা করিয়া তুলিল।

এই শিশুসন্তানটির অপরূপ রূপরাশির দিকে নির্ব্বাক দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া সদানন্দ বিমূঢ়ের মত বলিল, 'এমন ছেলে আমি কখনো দেখি নাই।'

বাসর-ঘরে তাহারা দুইজন ছাড়া আর কেহই ছিল না। সাশ্রুনেত্রে আদুর দিকে তাকাইয়া উদ্বেলিত কণ্ঠে ও হাসি-মুখে হরিদাসী জবাব দিল, 'ছেলের মতন ছেলে!'

সদানন্দ ঢোক গিলিয়া বলিল, 'তুমি যাবে, ছেলে থাকবে কা'র কাছে?'

বড় বড় চোখ বাহির করিয়া হরিদাসী স্বামীর মুখের দিকে তাকাইল। বলিল, 'একে ত' আমি রেখে যাবো না?'

'সঙ্গে নিয়ে যাবে ? কিন্তু—'

হরিদাসী ব্যাকুল হইয়া কহিল, 'আদুর যে কেউ নেই আমি ছাড়া।'

স্বামী তবুও চুপ করিয়া আছে দেখিয়া সে পুনরায় ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'আপনার পায়ে পড়ি, আপত্তি করবেন না!'

সদানন্দ কহিল, 'সে কথা নয়। বলছিলাম কি, আমার এক মাসি আছেন, তিনি—'

হরিদাসী এবার হাসিয়া বলিল, 'মাসিমা আছেন? ও, তাঁকে আমি বুঝিয়ে বল্‌ব।'

'তাঁকে বুঝিয়ে বললেই হবে। নৈলে আমার ত লাভই হলো। বউও পেলাম, ছেলেও পেলাম!' বলিয়া সদানন্দ হাসিতে লাগিল। তাহার হাসি মুখখানি দেখিয়া হরিদাসী খুসী হইল। স্বামীকে তাহার বেশ মনে ধরিয়াছে।

পরদিন গ্রামের সকলের মুখের উপর দিয়া পাল্কীতে চড়িয়া বর-কনে বিদায় লইয়া গেল। গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে পড়িয়া হরিদাসী পাল্কীর দরজা খুলিয়া দিল। স্বামীর দিকে তাকাইবার সময় তাহার নাই, সে তখন আদুকে লইয়াই ব্যস্ত। আগের দিন তাহার যে বিবাহ হইয়াছে, একটি স্বামী পাইয়াছে, গহনা ও চেলী পরিয়া সে যে শ্বশুরঘর করিতে চলিল, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপই নাই। আদুকে পাইয়া সে এই বিশাল পৃথিবীকে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ক্রমে দিন ফুরাইল, প্রান্তরের পশ্চিমপ্রান্তে সূর্য্য হেলিয়া পড়িল, মাঠের গরু গ্রামের দিকে ফিরিতেছে,—পাল্কী আসিয়া শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ে ঢুকিল। গাছে-পালায় রৌদ্র তখন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

পাল্কী আসিয়া আঙিনায় নামিতেই সদানন্দর পাশে আদুকে কোলে লইয়া কনে-বৌ বাহির হইয়া আসিল। মাসি বরণ করিতে আসিয়াছিলেন, হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত শিশুসন্তানটিকে দেখিয়া তিনি একটু থতমত খাইয়া গেলেন, তারপরই কনের দিকে একটু বক্র কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 'ওমা, এ গরু-বাছুর একসঙ্গে কোত্থেকে আন্‌লি রে সদানন্দ?'

সদানন্দ লজ্জায় রাঙা হইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া গেল, তারপর কহিল, 'চমৎকার ছেলেটি মাসী, না? ও এক ভারি মজার গল্প আছে!'

মাসি কহিলেন, 'এ বাবা এ গাঁয়ে নতুন, এমন আমি কোথাও দেখিনি। হ্যাঁ বৌমা, এ কা'র বালাই নিয়ে এলে গা?'

নূতন বধূ কাহারো সুমুখে মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে পারিল না, শুধু অলক্ষ্যে সদানন্দ একবার দেখিল, হরিদাসীর বাঁ-হাতের কয়েকটা আঙুল অধিকতর কঠিন হইয়া আদুকে নিঃশব্দে আঁকড়াইয়া ধরিল।

বরণ করিবার পর বৌ ঘরে উঠিল বটে, কিন্তু বুঝা গেল, এ বিবাহে মাসি সুখী হইতে পারে নাই।

দিনের পর দিন গিয়া নূতন বৌ পুরানো হইয়া আসিল। হরিদাসী স্বামীকে চিনিল না, চিনিবার সময় তাহার ছিল না। আদু একটু বড় হইয়াছে, হাসিতে শিখিয়াছে। মুখের কাছে হাত নাড়িতেই সে যখন হাসে, সেই সঙ্গে মনে হয় হরিদাসীর ঘর-দুয়ার ভিতর-বাহির সমস্তই নৃত্য করিয়া হাসিতে থাকে। তাহার আর কামনা নাই, স্বপ্ন নাই, আশা নাই, সংসারে আপন প্রয়োজন তাহার কিছু নাই। বিবাহের যে উদ্দেশ্য তাহা তাহার সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। স্বামীর সম্বন্ধে সে কর্ত্তব্য পালন করে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে আন্তরিকতার উত্তাপ নাই, হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যও নাই। দিক্‌নির্ণয়ের যন্ত্র বহুরকমে ঘুরাইয়া দিলেও তাহার কাঁটা যেমন বিশেষ দিকটিকে নির্দ্দেশ করিয়া দাঁড়ায়, তেমনি হরিদাসীর মূঢ় অন্তর্কামনা আদুর প্রতি উন্মুখ হইয়া থাকে। যে-আকর্ষণে যোগীর তপস্যা সিদ্ধ হয়, ভক্ত দেখা পায় ভগবানের, যে-আকর্ষণে ব্রহ্মাণ্ড হয় করতলগত, গর্ভের সন্তান হয় ভূমিষ্ঠ, যে-আকর্ষণে মহাকাল দিন এবং রাত্রিকে অতিক্রম করিয়া চলে, এও যেন তাই,—অন্ধ, সর্ব্ববাধাহীন, ব্যাকুল, দুরন্ত। ইহার বেগ যেমন সর্ব্বনাশা, ইহার আবেগও তেমনই সর্ব্বকূলপ্লাবী! হরিদাসীর চোখে আদু একটি রহস্যময় নর-দেবতা। ইহাকে সে চিনে না, জানে না, ইহার রক্তের সহিত তাহার কোনো পরিচয়ই নাই, এই সজীব মাংস-পিণ্ড কোথা হইতে আসিয়াছে, কে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহার এই উপেক্ষিত জীবনের শেষ লক্ষ্য কি, কী বা ইহার পরম পরিণাম—প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিয়া হরিদাসীর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়। অন্ধকারে মুখের উপর মুখ দিয়া আদুকে সে যখন সাপের মত জড়াইয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরে, তাহার সমস্ত অবচেতনার মধ্যে

একটি বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। থর থর করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে। নির্বোধ, অশিক্ষিত, আলো-বায়ুহীন তাহার গ্রাম্য মন, তবু কেমন করিয়া জানি না তাহার মনে হয়, সে আপন আলিঙ্গনের মধ্যে বাঁধিয়াছে এই বিপুল বিশ্বসৃষ্টিকে, অনন্ত আকাশকে, সীমাহীন মহাসমুদ্রকে। ইচ্ছা করে আপন দেহের মধ্যে এই অপরিচিত শিশুকে সে চিরদিনের মত আত্মসাৎ করিয়া রাখে। তাহার নাড়িতে নাড়িতে বহিবে এই শিশুর রক্তোচ্ছ্বাস, শিরায় শিরায় বহিবে ইহার উদ্বেলিত প্রাণধারা; তাহাকে উন্মাদ করিবে, বিভ্রান্ত করিবে, অচেতন করিবে।

একদিন মাসি কহিল, 'এ আমি আর দেখতে পারিনে সদানন্দ, হাতী-হট্‌কো বৌ এল, তার এই ব্যাভার?'

'কি গো মাসি?' সদানন্দ বলিল।

মাসি কহিল, 'আমার কথা বল্‌চিনে, কিন্তু তোর? কি হলো সদু? ভাত-জল দেবে, স্যাবা করবে, তা নয়; তোমার আদুরে বৌএর পেয়াজ্জিই নেই বাবা। আমি বুড়োমানুষ ...'

সদানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমার ত কোনো অসুবিধে নেই মাসি?'

অসুবিধা না থাক্, কিন্তু তাহার মুখখানি যে দিন দিন ম্লান হইয়া আসিতেছে, তাহা এই মাতৃস্বরূপা মাসির চোখ এড়ায় না। মাসি ঝঙ্কার দিয়া কহিল, 'এমন আমি কোথাও দেখিনি বাবা। বলে, 'না বিইয়ে কানাইয়ের মা।' এতই যদি পরের পোলার ওপর দরদ, তবে বে-থা না হলেই ত হতো মা? কা'র না কা'র ছেলে, কি জাত তার ঠিক নেই, আমরাই বা কেন পুষতে যাবো, হ্যাঁ বাবা সদানন্দ?'

সদানন্দ ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে কাজে বাহির হইয়া গেল। মাসি তাহার পথের দিকে তাকাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল। তাহার কথার প্রতিবাদ সদানন্দও করিয়া গেল না, ভিতর হইতেও সাড়াশব্দ আসিল না।

রান্নাবান্নার পর মাসি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দেখিল, আদু জাগিয়া জাগিয়া খেলা করিতেছে আর তাহারই গায়ের উপর একটা হাত ছড়াইয়া দিয়া শ্রীমতী বধূমাতা চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাকে ঘুম বলা চলে না, আবেশে অচেতন! মাথার বড় খোঁপাটা ভাঙিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পরণের কাপড়ের ঠিক নাই,—যেমনি লজ্জাকর, তেমনি বিসদৃশ। সমস্ত ঘরে আগাগোড়া বিশৃঙ্খলা, জঞ্জাল জমিয়া জমিয়া চারিদিক নিতান্তই শ্রীহীন হইয়া আছে। দেখিলে কান্না পায়।

'বলি, হ্যা বৌমা?'

ধড়মড় করিয়া হরিদাসী জাগিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় গুছাইয়া বলিল, 'কি মাসি মা?'

'পড়ে' পড়ে' ঘুমোচ্ছ মা, সংসারের সলতেটুকুও ত উসকে দিতে হয়! আট মাসের ছেলেকে নিয়ে তুমি পাগল, এদিকে আমার আটাশ বছরের ছেলে যে সারা হলো! যদি একটা ভারি ব্যামোয় পড়ে? ও ছেলেকে তুমি বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও গে বাছা।'

হরিদাসী ভয়ে ভয়ে আদুকে আড়াল করিয়া বসিল। মৃদু বিনীত কণ্ঠে কহিল, 'কি কাজ আছে বলুন, আমি যাচ্ছি।'

'আমার আর কি কাজ মা, আমি কারু স্যাবা খেতে চাইনে! হাত পুড়িয়ে রেঁধে-বেড়ে রেখেছি, এবার খেয়ে-দেয়ে আমার উগ্‌গার করবে এস। আ আমার পোড়া কপাল!' বলিয়া গর গর করিতে করিতে মাসি বাহির হইয়া গেল।

সত্যি, লজ্জিত হইবারই কথা। এ সময় শুইয়া থাকা সম্ভবতঃ তাহার ভাল হয় নাই। তাহার শ্রদ্ধেয়া গুরুজন সকাল হইতে পরিশ্রম করিতেছিলেন, সে একটু দেখিলে শুনিলেই পারিত। কিন্তু মাসির যে রকম মুখের চেহারা, যে সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ ও বিরক্তি,—আদুর উপর তাঁহার নজর লাগে নাই ত? হরিদাসীর বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল, তাহার রাঙা শাড়ীর দিকে কুৎকুতে দৃষ্টিতে তাকাইয়া আদু তখনও হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতেছে। দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল, এবং আর একবার উদ্বেলিত আবেগে পাশে শুইয়া পড়িয়া কঠিন বাহু দিয়া আদুকে সে জড়াইয়া ধরিল। আদুর গায়ের কচি মাংসের গন্ধ আনন্দে তাহাকে যেন দিশাহারা করিয়া দেয়।



কিন্তু সমস্ত গ্রাম জুড়িয়া এই নূতন বধূটির সম্বন্ধে যে কথাটা রটনা হইতে লাগিল, তাহার মুখে হাত চাপা দিবার শক্তি কাহারও ছিল না। সে আবিষ্কারের কথা শুধু যে বাহিরে বাহিরেই প্রচারিত হইতে লাগিল তাহা নয়, সদানন্দর দুয়ার পর্য্যন্ত আসিয়াও হানা দিল। এই অপ্রত্যাশিত জনরবের ভয়াবহ পরিণাম ভাবিয়া মাসি পর্য্যন্ত দিশাহারা হইয়া মাথা হেঁট করিল। সদানন্দর কানে কানে আসিয়া সে কথাটা কেহ বলিতে সাহস করিল না বটে, কিন্তু আন্দোলনটা তাহার চারিদিকে অত্যন্ত বিসদৃশ হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঘরের ভিতর বসিয়া শুনিল না শুধু হরিদাসী।

শুনিবার সময়ই তাহার ছিল না। আজ দিন দুই হইল আদুর অল্প অল্প জ্বর হইতেছে। বেচারা সেই যে কান্না লইয়াছে, সে কান্না আর থামিতে চায় না। তাহাকে কোলে লইয়া বিহ্বল হইয়া হরিদাসী ঘুরিয়া বেড়ায়। ঔষধ-পত্র এখনও পড়ে নাই, কাহারও হাতে করিয়া আনা ঔষধে সে বিশ্বাসও করিবে না। চারিদিকের এই বিরুদ্ধতার মাঝখানে থাকিয়া সে যে-ভয় করিয়াছিল তাহাই হইল। তাহার আদুর এই পীড়ার জন্ত সে দায়ী, তাহার স্বামী ও মাসি দায়ী; গ্রামের লোক দায়ী, দায়ী এই আকাশ-বাতাস, দায়ী বিশ্ব-বিধাতা। এ রোগ নয়, এ দয়াহীন নিষ্ঠুর নিয়তি; ইহার সহায় আছে বহু মানবের হিংসা, বিদ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা, নীচ স্বার্থপরতা! এ রোগ আসিয়াছে তাহার জীবনের মর্ম্মমূলকে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইতে। চারিদিকের এই জঘন্ত জিঘাংসার ভিতর হইতে আদুকে সে বাঁচাইবে কেমন করিয়া? এখানে থাকিলে ত তাহার চলিবে না!

আরও তিন চারিদিন চলিয়া গেল, আদুর জ্বর কমিল না। উন্মাদিনীর মত তাহাকে কাঁধে ফেলিয়া হরিদাসী ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল এই পঙ্কিল ঘৃণিত পৃথিবী হইতে সে আদুকে লইয়া পলাইয়া যায়! গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে, তারপর নক্ষত্রলোক, মহাব্যোম, সেই মহাশূন্ত পার হইয়া সপ্তম স্বর্গে,—যেখানে রোগ নাই, মাসির কুদৃষ্টি নাই, গ্রামবাসীর দেওয়া অপকলঙ্ক নাই! যেখানে আছে স্বাস্থ্য, মহাজীবন, অপরিমেয় আশা, অনন্ত পরমায়ু।

হরিদাসীর কান্না আসিল না, দুইটা তীব্র ও চঞ্চল চোখের দৃষ্টি দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, বুকের মধ্যে দাহ হইতে লাগিল, রক্তে রক্তে তাহার আগুন ধরিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। কোথায় কবে যেন সে শুনিয়াছিল শিশুসন্তান স্তনের দুধ না পাইলে অতি সহজে পীড়িত হইয়া পড়ে। বিবাহের পরে নারী যে দুগ্ধবতী হয় এটুকু তাহার জানা ছিল, তাই আদুকে লইয়া তাড়াতাড়ি সে ঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিল, এবং এক জায়গায় বসিয়া পড়িয়া অতি দ্রুত আপন বক্ষবাস খুলিয়া ফেলিয়া একটি স্তনের উপর আদুর মুখ চাপিয়া ধরিল। ধরিল বটে কিন্তু শিশুর লুব্ধ ব্যগ্র ওষ্ঠাধরে বিন্দুমাত্র দুধও আসিল না। একটি হইতে ছাড়াইয়া আর একটিতে আদুর মুখ লাগাইল, কিন্তু তাহাও হইল ব্যর্থ। নির্ব্বোধ নারী নিরুপায় হইয়া তখন দুই হাতে ধরিয়া আপন বক্ষকে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত করিয়া দুধ বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সদানন্দর সাড়া পাইয়া সে যখন গায়ের উপর কাপড় তুলিয়া দিল, দুই চক্ষে তখন তাহার জলের ধারা নামিয়া আসিয়াছে।

ভিতর হইতে সে শুনিল, মাসি বলিতেছে, 'এর পরে আর আমার এখানে থাকা চলে না বাবা সদানন্দ।'

'কেন মাসি?'

'শুনতে পাসনে বাবা? ঘরে থেকেও যে কান পাতা চলে না!'

'সে ত আর সত্যি নয়!'

মাসি কহিল, 'সত্যি নয় বললেই ত আর লোককে থামানো যায় না বাবা,—আমাকে তুমি বাড়ী পাঠিয়ে দাও সদু।'

সদানন্দ একজন সামাজিক ভদ্র গ্রামবাসী। কহিল, 'এ অবস্থায় তুমি চলে' যাবে মাসি?'

'কি করব বাবা। প্রাণের মায়া আমার নেই, তা বলে' জাতের মায়া ছাড়তে পারিনে সদানন্দ। কাল মাসের পয়লা, অগস্ত্য যাত্রা, পরশু দিন আমাকে একখানি গরুর গাড়ী ডেকে দিও বাবা।'

'বেশ, তাই হবে মাসি।' বলিয়া সদানন্দ খিড়কির

দিকে চলিয়া গেল। আজ তাহার দিকে তাকাইবার লোক সংসারে কেহ নাই!

সেদিনকার রাত্রি জ্যোৎস্না প্লাবিত। ঘরের দরজা ও জানালাগুলি সব খোলা। টিপ্ টিপ্ করিয়া এক কোণে একটি আলো জ্বলিতেছে। তাহার শিখাটি যেমন কুণ্ঠিত, তেমনই করুণ। বাহিরের চন্দ্রালোক সকল দরজা ও জানালা দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া ঘর ও বাহির আলোয় আলোয় সব একাকার করিয়া দিয়াছে। রাত্রি সুনিবিড় এবং উদাসীন। কেবল গ্রামের কোন্ প্রান্তে কয়েকটা বিনিদ্র পক্ষী ডানা ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি করিয়া তখনও কলরব করিতেছিল। বোধ করি তাহারা ভিন্ন গ্রামের পাখী।

কাহারও চোখে ঘুম নাই। বড় তক্তাটার একধারে শুইয়াছে সদানন্দ, অন্যধারে হরিদাসী, মাঝখানে আদু। আদু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার নিদ্রিত চোখের পরে অপলক দৃষ্টি মেলিয়া হরিদাসী কাৎ হইয়া শুইয়াছিল।

অত্যন্ত ভদ্রকণ্ঠে সদানন্দ বলিল, 'মাসি পরশু দিন চলে' যাবে।'

হরিদাসী কহিল, 'হুঁ, তোমার খুব কষ্ট হবে।'

'কষ্ট আর কি, আমার কোনো কষ্ট নাই বৌ। কেবল'—বলিয়া সদানন্দ থামিয়া গেল। থামিয়া গেলেও হরিদাসী কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। তাহার না আছে সানন্দ কৌতূহল, না আছে অনুরাগরঞ্জিত কোনো প্রশ্ন।

সদানন্দ আর কথা খুঁজিয়া পাইল না। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আদুর গায়ে একবার হাত দিয়ে দেখব?'

মাথা তুলিয়া হরিদাসী কহিল, 'কি দেখ্‌বে?'

'দেখব জ্বর আছে কি না।'

'তুমি দেখতে জানো? দেখো ত একবার,—দেখো, আস্তে গায়ে হাত দিও, লাগে না যেন।'

এই প্রথম সদানন্দ আদুকে স্পর্শ করিল। গায়ে হাত বুলাইয়া কহিল, 'এ ত' বেশ ভালই আছে! জ্বর ত আর নেই?'

হরিদাসী আস্তে আস্তে আদুকে নিজের কাছে আর একটু টানিয়া নিল।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। আজ সদানন্দ আর নির্ব্বিকারে ঘুমাইতে পারিতেছিল না। অতি ধীরে ধীরে হরিদাসীর গায়ের উপর একটি হাত রাখিয়া সে ডাকিল, 'বৌ?'

'উঁ?'

'এখানেও কেউ তোমাকে বুঝতে পারেনি, আমি কিন্তু -'

হরিদাসী তখন চোখ বুজিয়া আদুর নিশ্বাস পতনের শব্দ শুনিতেছিল, কোনো কথা কহিল না।

সদানন্দ পুনরায় কহিল, 'ওদের কারো দয়ামায়া নাই বৌ, নৈলে তোমার নামে এই মিথ্যে বদ্‌নাম রটিয়ে··· মাসি পর্য্যন্ত ওদের সঙ্গে মিশে···'

হরিদাসী এইবার কহিল, 'তুমি বিশ্বাস কর না?'

'আমি?' বলিয়া ঢোক গিলিয়া সদানন্দ পুনরায় কহিল, 'আমি কেন বিশ্বাস করব বৌ?'

হরিদাসী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, 'কেমন দেখলে? আর বোধ হয় বেশি জ্বর আসবে না, কি বল?'

'না।' বলিয়া সদানন্দ একটা নিশ্বাস ফেলিল। হা ভগবান!

অনেকক্ষণ চলিয়া গেল। রাত্রির গভীর মুহূর্ত্তগুলির সঙ্গে সঙ্গে এ-জানালার চাঁদ ও-জানালায় ঘুরিয়া গেল। মনে হইল, দুইজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; এমনই তাহারা নিশ্চল এবং নির্ব্বিকার। কিন্তু সদানন্দ আবার যখন হঠাৎ কথা বলিল, তখন বুঝা গেল, আজ রাতে ইহারা সম্ভবতঃ ঘুমাইবে না। সে কহিল, 'আমার তখনি বড্ড লাগে বৌ, যখন তুমি এই বদ্‌নাম শুনে একটি কথাও বল না!'

আদুর গায়ের উপর একটি হাত রাখিয়া অবলীলাক্রমে হরিদাসী বলিয়া ফেলিল, 'কেন বল্‌ব, যদি সত্যি হয়?'

সদানন্দ এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, 'ছেলেমানুষি, তাই কি হয়? আমি তোমাকে অনেকদিন থেকে জানি।'

'তুমি জানো না।'

সদানন্দ উঠিয়া বসিয়া বড় বড় চোখে চাহিয়া বলিল, 'কি জানি না বৌ?'

হরিদাসী কহিল, 'তুমি আমাদের কোথাও রেখে এসো। এ ছেলে আমারই।'

সদানন্দ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিছানা হইতে নামিয়া ঘরময় ঘুরিয়া হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া গেল। মাসি টের পাইল না, দরজা খুলিয়া সে পথে গিয়া নামিল, এবং নির্জ্জন পথ ধরিয়া সেই রাত্রে সে যে কোন্ দিকে ছুটিয়া চলিল, তাহার হদিস রহিল না।

গ্রাম্য কুকুরের ডাক উপেক্ষা করিয়া গ্রাম ছাড়াইয়া সে মাঠের কাছে আসিয়া পড়িল। এক জায়গায় বসিতে গিয়া শুইয়া পড়িল, শুইয়া শুইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'পাগল, পাগল।' বলিয়া নিজেই সে পাগলের মত হাসিতে লাগিল। সেখান হইতে সে আবার উঠিল, উঠিয়া আর একদিকে ছুটিয়া চলিল।

ফিরিল যখন তখন রাত্রি শেষ হইতে আর বাকি নাই। ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, আদুকে কোলে লইয়া হরিদাসী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মনে হইল, ঘরের ভিতর থাকিলে এখনই তাহার নিশ্বাস রোধ হইয়া যাইবে। পিছনে দাঁড়াইয়া সে একপ্রকার অস্বাভাবিক গভীর কণ্ঠে কহিল, 'আজ আমার সব পরিষ্কার হয়ে গেল বৌ, তুমি চল।'

মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে বিমল ও সুন্দর হাসিতে মুখখানিকে উদ্ভাসিত করিয়া হরিদাসী বলিল, 'বাঁচলাম, চল। নৈলে এখানে থাকলে আদু আমার বাঁচবে না। তুমি যাবে নাকি সঙ্গে?'

'না।'

'আচ্ছা আমি একলাই পারব,—চল।' বলিয়া আদুকে লইয়া সে একেবারে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কোথায় যাইতে হইবে তাহার কৈফিয়ৎ সদানন্দ নিজেই দিয়া বলিল, 'কোনো কষ্ট নাই, ছেলে নিয়ে থাকবে। হিন্দু-মিশন্ না কাদের দল এসেছে রতনজুড়িতে, এই ত কাছেই,—খুব ভাল লোক তারা, খুব যত্ন তোমায় রাখবে।'

হরিদাসী তখন আগেই পা বাড়াইয়াছে। সদানন্দ কহিল, 'কিছু নেবে না সঙ্গে? গয়না গাঁটি, বাক্স, কাপড়-চোপড়…'

'না।' বলিয়া সে আবার পা বাড়াইল।

সদানন্দ তাহার সহিত যখন বাহির হইয়া পথে নামিল, তখন সবেমাত্র ভোর হইতেছে। চন্দ্র হইয়াছে ম্লান, জ্যোতিঃহীন। আনন্দে ও পরম উৎসাহে আদুকে ঢাকা দিয়া কোলে লইয়া হরিদাসী পথ চলিতে লাগিল। গ্রামের প্রান্ত-সীমায় আসিয়া সদানন্দ কহিল, 'কিছু নিলে না সঙ্গে, ওসব ত তোমারই বৌ!' বলিয়া সে গলাটা আর একবার পরিষ্কার করিয়া লইল।

'আমার নয়।' বলিয়া হরিদাসী অতি স্নিগ্ধ হাসিয়া পুনরায় কহিল, 'তুমি যাকে আবার বিয়ে করবে, ও-সব তার।'

সদানন্দ সে কথা কানে লইল না, শুধু অতি কষ্টে চোখের জল চাপিয়া বলিল, 'এতদিন তুমি এই ভয়ানক কথাটা চেপেছিলে বৌ?'

ভয়ানক শুনিয়া হরিদাসী আবার হাসিল। এ যেন তাহার কাছে কিছুই নয়, অতি সহজ, অতি সাধারণ। শুধু বলিল, 'আমাকে জিজ্ঞেস করলেই পারতে, বলতাম? তোমার খুব কষ্ট হবে, না গো?'

'তোমারই বা কি কম! তুমিও ত মাথায় দুঃখের বোঝা নিয়ে গেলে বৌ?'

দূরে রতনজুড়ি দেখা যাইতেছিল। এইখানেই সদানন্দকে বিদায় দিয়া সে হাঁটিয়া চলিল। আঃ, এবার সে বাঁচিয়া গেল! যে-কলঙ্কের দাগ সে সর্ব্বাঙ্গে আজ হাসি-মুখে মাখিয়া লইল, যে-সংসার সে চিরদিনের জন্য অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া গেল, তাহাতে এতটুকু তাহার ক্লেশ নাই। এই বিপুল পৃথিবীর মাঝখানে গিয়া আদুকে সে বড় করিয়া তুলিবে। তাহারই বক্ষরক্তধারা বিন্দু বিন্দু ক্ষয় করিয়া এই শিশু একদিন মানুষ হইয়া উঠিবে! গ্রাম ছাড়াইয়া, শহর ছাড়াইয়া, দেশ মহাদেশ অতিক্রম করিয়া এই শিশু-সন্তানের মাথা একদিন দূর ঊর্দ্ধে আকাশ স্পর্শ করিবে! পৃথিবীর দুঃখ মুছাইবে, জীবনের দৈন্য ঘুচাইবে,—প্রতি মানবের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে ইহার জয়গাথা!

চলিতে চলিতে হরিদাসীর দুই চক্ষে আনন্দাশ্রু জমিয়া উঠিল।

কবিপ্রিয়া

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ

তৃপ্তিকে সাধারণ বাঙালীর মেয়ে হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া বিধাতা গড়িয়াছিলেন। ছোটবেলা হইতে প্রকৃতির নানা রঙের খেলার মাঝখানে, উদার অনন্ত আকাশের নীচে, দূর দিগন্তলীন ধরিত্রীর শ্যামলাঞ্চলে, বাধাবিহীন কল্পনা লইয়া মানুষ হইয়া উঠিবার যে প্রচুর অবসর পাইয়াছে, এক দেশ হইতে আর এক দেশে ট্রেণে ষ্টীমারে টাঙ্গায় একার গোরুর গাড়ীতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া নানা বিচিত্র সমাজ, নানা বিচিত্র মানুষের দেখা পাইয়া, টুক্‌রো টুক্‌রো অসংখ্য



কামাখ্যাদেবীর মন্দির দ্বার

ছবি দেখিয়া অন্তরে অন্তরে কবি ও ভাবুক হইয়া উঠিবার পক্ষে তার কোনো বাধা হয় নাই। তাই কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লইয়া তার পিতা একটু অধিক বয়সের অনূঢ়া মেয়েকে লইয়া যখন কলিকাতায় একান্নবর্ত্তী পরিবারে ফিরিলেন, তখন আর কাহারও অসুবিধা না হোক তৃপ্তির যথেষ্টই অসুবিধা হইতে লাগিল।

মেয়েমহলে পা ছড়াইয়া বসিয়া ও শুইয়া যে সমস্ত আলোচনা চলিত, তা তাহার একেবারেই ভালো লাগিবার কথা নহে। কার কোথায় কেমন বিয়ে হইয়াছে, কার আবার সন্তান-সম্ভাবনা, কার শাশুড়ী বধূকে দুটি চক্ষে দেখিতে পারে না, কার নতুন গয়না কি হইয়াছে, কে বিবিয়ানা লইয়া থাকে, ঘাড় বাঁকাইয়া খোঁপা ঘুরাইয়া নাক সিঁটকাইয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে সেই সব প্রসঙ্গের অবতারণায় বিশ্ব-সংসারের কি উপকার হইতে পারে, তৃপ্তি তাই ভাবিত।

দাদাদের আসরে গিয়া দাঁড়াইলেও গোষ্ঠ পাল কেমন খেলিয়াছে, অমুক থিয়েটারের ভিতরের কথা কি, বোকা না মালিক কে বড়, ক্লাইভষ্ট্রীট মোটর দাঁড়ানো কি রকম কমিয়াছে, কোন্ ব্যাঙ্ক ফেল করিবার উপক্রম, কোন্ ডাক্তার কোন্ মিসেস্‌এর চটিজুতা হাতে লইয়া ঘোরে, সেদিনকার দাঙ্গার আসল ব্যাপারটা কি—ইত্যাদি বড় বড় পরচর্চ্চা বিপুল উৎসাহে চলিতে দেখিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া আসে।

নতুনদার ঘরে গানের আসর বসে; তব্‌লায় চাঁটি, যন্ত্রসঙ্গীতের কাণমলা, বি-শার্প, ডি-শার্প, গ্রামোফোন কোম্পানী, কেরামৎখান্...সে ওসব বোঝে না।

ফুলদা'র বৈঠকখানায় সাহিত্যচর্চ্চা—অনেকেরই আমদানী—পাঞ্জাবীর গলার বোতাম উল্টানো, নানা ঢংএর স্যাণ্ডেল, চাদর, চুল, চশমার বাহার, সিগারেট চুরোটের তীব্র গন্ধ, আনাতোল ফ্রাঁস, ব্যালজাক্, হামসুন, গেয়্টা... নানা রকমের বুকনি—শাস্ত্র ব'লে কিছু নেই—আজ তুমি যা লিখচো, দুহাজার বছর পরে তাই হবে শাস্ত্র...কবিতা যদি শুনতে হয় ত শোন—

আমারে ডোবাতে—
জীবনের বসন্তের প্রথম প্রভাতে
তুমি এলে হে চঞ্চলা প্রেয়সী রূপসী,
আমি যবে ছিলাম উপোসী—

কিছুই তৃপ্তির ভালো লাগে না।

সাবেককালের প্রকাণ্ড বাড়ী—তিন মহল। বা'রবাড়ীর সংস্কার করা হইয়াছে; মার্ব্বেল পাথর, আসবাবপত্র, টেলি-

ফোন, লাইট্—আধুনিক কালেরউপযোগী সুরুচিসঙ্গত ভাবে সাজানো।

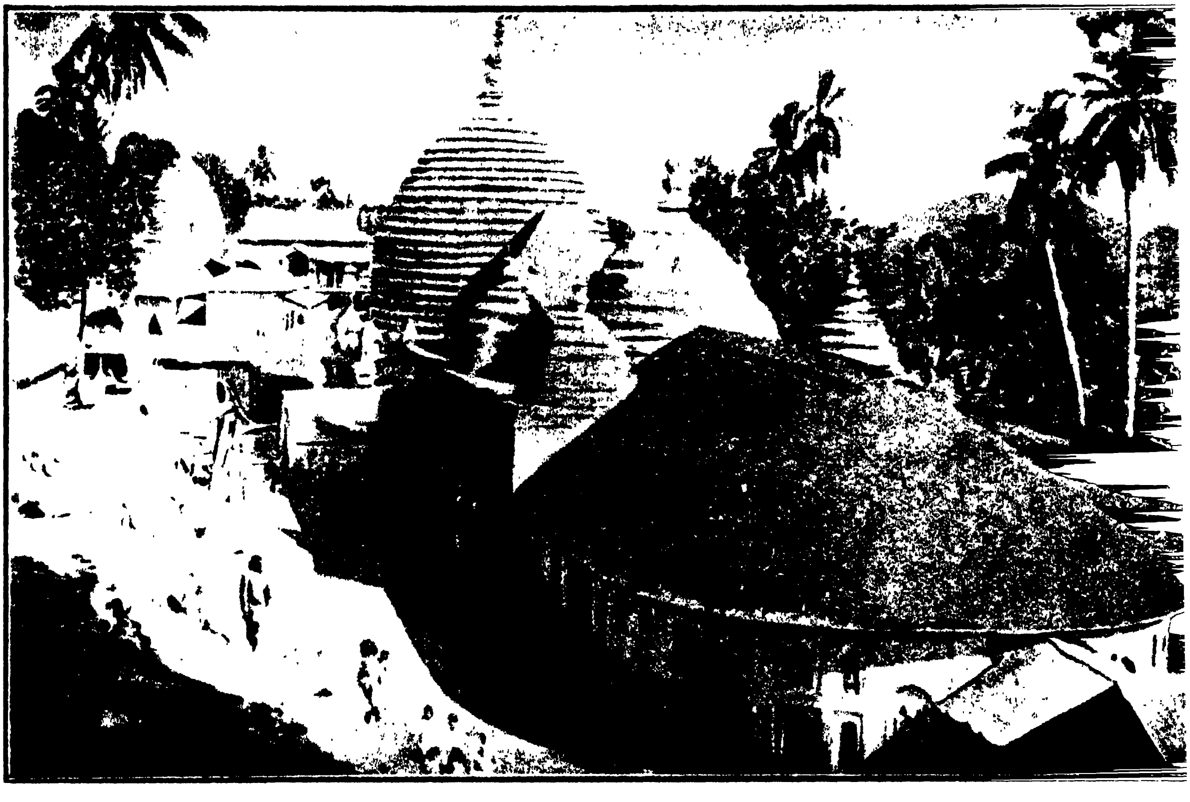
ভিতর-বাড়ীর উপরতলাটা সংস্কৃত হইলেও একতলার অধিকাংশই জীর্ণ—লাইট সব জায়গায়ই আছে, সব সময়ে জ্বলে না।

আরো পরের মহল প্রায় শূন্যই থাকে, সেদিকটা একেবারে জঙ্গল। সন্ধ্যার অন্ধকারে একলাটি সেইদিকে গিয়া তৃপ্তি ভাবে—বিস্তীর্ণ উঠানের চারিপাশে লম্বা লম্বা থামগুলা বারান্দার নীচে শুব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে; জনহীন

বাগানের নারিকেলগাছগুলার পাতা—অনেকখানি উঁ ঝাপ্‌সা চাঁদের আলোয় উচ্ছৃঙ্খলভাবে দুলিতেছে। ফাঁ ফাঁকে ফাঁকে ভীরু জ্যোৎস্না; ট্রামের টিংটিং, বা কালিঘাট ধরমতলার আওয়াজ এ-ধারে আসে না।

দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি ভাবে, এ যেন কলিকাতা ন নয়—যেন দূরের পল্লীগ্রাম!

দাসীরা কয়লার ঘরে যাইবার সময়ে কখনো কখনো



কামাখ্যাদেবীর মন্দির

ঘরগুলা প্রদীপহীন নীরবতায় অতীতের উৎসবদিনগুলির বিপুল কলধ্বনির কথা হয় ত বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্মরণ করে।

একদিন চারি পাশের পরিত্যক্ত ঘরে নববধূদের নূপুর বাজিয়া উঠিয়াছিল, একদিন দীর্ঘ রাত্রে পিতামহদের প্রণয়ালাপ ঐ সব ইঁট-বার-করা ঝুলিয়া-পড়া সেকালের বাতায়নতলে রণিয়া রণিয়া থামিয়া গেছে—আজ দরজাগুলা দমকা হাওয়ায় ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া পড়িতেছে, পিছনে

ছাতের সিঁড়ির কাছটায় ভূত দেখিয়াছে; কে যেন কা একটি সুন্দরী বধূকে ঐ দালানের কোণে মিলাইয়া যাইে দেখিয়াছে। তৃপ্তির এক ঠাকুরমা নাকি আত্মহত করিয়াছিলেন প্রথম যৌবনে।

কথাটা ভাবিতে গায়ে একটু শিহরণ লাগে। তৃ এ-ধারে চলিয়া আসে, যেদিকে লোকের গোলমালে আন কোলাহলে রাত বারোটায়ও সন্ধ্যা!

সমবয়সী মেয়েদের মাঝখানে গিয়া বসে। ফিস্‌ফা

চলিতেছিল—তোর বর কি করলে ভাই বল্, ফুলশয্যের দিন—বল্ তোর পায়ে পড়ি—

কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া তরুণী কি বলে,—তার শ্রোত্রী এবং এ ধারে ও-ধারে যারা কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল, কলহাস্য করিয়া ওঠে।

তৃপ্তির দিকে চাহিয়া বলে, তোকে বল্‌ব না সেজদি!

সকলেই সেখানে বিবাহিতা নয়, এবং তৃপ্তির চেয়ে সে অনেকটাই ছোট। তৃপ্ত মুখ ঘুরাইয়া বলে—শুন্‌তেও চাইনে—যত সব খারাপ কথা! বৌদি কি বলে শুন্? তোমার না মেয়ের বয়সী? আর রাঙাকাকীমা তুমি?—



উমানন্দ ভৈরব

দুজনেই অপ্রস্তুত হইয়া যায়, তবু দোষ ঢাকিবার জন্য বলে—শুন্‌তে হয়! তোর এবার বিয়ের যোগাড় করছি দেখ্ না!

আবার কলগুঞ্জন চলে। কার স্বামী শালীকে স্ত্রী মনে করিয়া—ওগো শুন্‌ছ, এই ওঠোনা—বলিয়া ঠেলা মারিয়াছিল এবং তার পর কি একটা কথা বলিতেই—ওমা ছি ছি, কোথা যাব গো, বলিয়া সকল মেয়ে লুটোপুটি খায়।

কোন্ যায়েরা সোয়ামীদের সঙ্গে হুড্ খোলা মোটরে গড়ের মাঠে বেহায়ার মত হাওয়া খাইতে যায়, তারও আলোচনা চলে, কার দেওরের শাশুড়ীর কেলেঙ্কারী আর জানিতে বাকী নাই, সে সম্বন্ধেও মন্তব্য সুরু হয়।

তৃপ্তির অসহ্য হয়, উঠিয়া পড়ে।

সকালবেলা ছাদে উঠিয়া রাস্তার দিকের পাঁচীলের কোণে দাঁড়াইয়া সে দেখে কি বিচিত্র কলিকাতা—লোকের পর লোক পিঁপড়ার মত সার বাঁধিয়া ছুটিয়াছে;—এত লোক কোথায় যায়? কেহ বাজার করিয়া ফিরিতেছে, কেহ হয় ত দাঁড়াইয়া, হয় ত কেহ ডাক্তার ডাকিতে চলিয়াছে—

বেলা বাড়ে—বাস বোঝাই লোক ছাতে ছাতা খুলিয়া ট্রাম মোটর রিক্স—ওমা একটি রিক্সয় একটি পুরুষের গায়ে ঠেস্ দিয়া একটি মেয়ে বসিয়াছে, হয় ত ভাই-বোন, হয় ত স্বামী-স্ত্রী—তা হোক্ বাপু, তবু এ যেন কেমন চোখে লাগে! কি সুন্দর ছেলেটি বই বগলে করিয়া স্কুলে যায়, মুখখানি ঠিক তার ছোট ভাইয়ের মতন—মেয়ে-ভর্ত্তি কত বাস্, রাস্তায়ও ত মেয়ে—

কিন্তু যাই বলো নদীর মতন সুন্দর জিনিষ আর কিছু নেই। সে কাবেরী, কৃষ্ণা, গোদাবরী, মহানদী, নর্ম্মদা, যমুনা, গঙ্গা, কত নদীই না দেখিয়াছে। এক গঙ্গাই কত রকমের,—হরিদ্বারে মরকত-শ্যাম, বারাণসীতে নীল, পাটনায় কাকচক্ষু, পদ্মায় রূপালি, বজবজে গেরুয়া রংএর। তারপর রূপনারায়ণ, শীতলাক্ষা, সুবর্ণরেখা, উস্রী!—চূর্ণী! চূর্ণীও কি সুন্দর!—

কুষ্টিয়ার নীচে গোরী নদী, ওঃ কতখানি বালির চড়া! শোণ ত সে হাঁটিয়া পার হইয়াছে। কোনো একটি নদীর ধারে বাসা বাঁধিয়া থাকিতে তার সাধ যায়।

যদি তার বিয়ে হয়, ত হয় যেন অমনি সুন্দর নদীর ধারে কোনো গ্রামে, আর তার বর যেন হয় কবি;—শোবার ঘরের সামনের বারান্দা হইতে যেন নদী দেখা যায়। সমস্ত কাজের শেষে একলাটি স্বামীকে পাইয়া সে খুব মিষ্টি করিয়া একটা কবিতা শোনাইবে;—হঠাৎ আপন মনে—ধ্যেৎ, কি যে ভাবি, বলিয়া সে অন্য কথা মনে করিবার চেষ্টা করে,

এবং পিছন ফিরিয়া দেখিয়া লয় কেহ শুনিতে পাইয়াছে কি না—

ফিরিয়া দেখে উড়ে ঠাকুর তার কাপড় শুকাইতে দিতে আসিয়াছে ; সে অনেকটা পিছনে।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে—দিদিমণি, এত রৌদ্রে আপনি কি দেখ্‌ছ।

তৃপ্তি বলে, তোমাকে বেশী কথা বলতে হবে না। ঠাকুর অলক্ষ্যে হাসিয়া নীচে নামিয়া যায়। তাহার দেশে এত বড় মেয়ে সে অবিবাহিত দেখে নাই,—ভাবে, কলিকাতার সকলি অদ্ভুত!

একটি কবিতার খাতা করিয়াছে তৃপ্তি। প্রায় ভরিয়া আসিয়াছে ; যতগুলি কবিতা লিখিয়াছে সবগুলিকেই প্রেমের কবিতাও বলিতে পারো, গীতাঞ্জলিও বলিতে পারো।

যেদিন প্রিয় আস্‌বে তুমি
এই বাতায়নতলে,
ডেকে নিয়ো ডেকে নিয়ো
গভীর কোলাহলে।

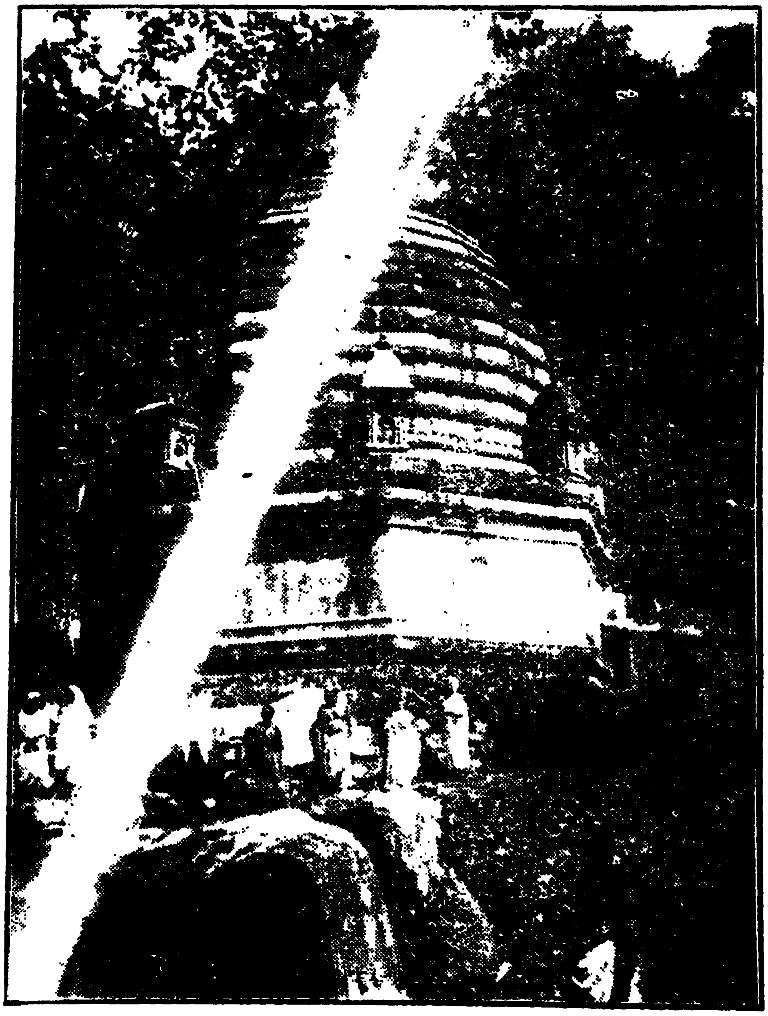
কিম্বা

কত দীর্ঘ রাত্রি প্রিয় নিদ্রাহীন আঁখি
তব পদশব্দ লাগি অপেক্ষায় থাকি।
তুমি কি আসিবে নাকো কোনো
নিশিশেষে
অভাগিনী তরুণীর প্রিয়তম বেশে?

ভগবানকে না ব্যক্তি-বিশেষকে বলা হইয়াছে, নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু মনের কথা জানাইবার উপযুক্ত সঙ্গিনীর অভাবে তৃপ্তির দিন যেন আর কাটিতেছিল না।

অবশেষে একদিন তার জন্য পাত্র খোঁজা সুরু হইল। তার পিতা বিহারীবাবু ডিগ্রীধারী কিম্বা উকিল এটর্ণী ডাক্তার পাত্র চাহিতেছিলেন না, কলিকাতায় বাড়ীরও প্রয়োজন নাই। তিনি চান—খাইবার পরিবার সংস্থান আছে, কলিকাতার বাহিরে কোনো স্বাস্থ্যকর মফঃস্বলে কিছু জমিজমা আছে। বাস্! বিদ্যা যদি থাকে মন্দ নয়, না থাকিলেও তত আপত্তি নাই, যদি স্বভাবটি হয় ভালো এবং ভাতের জন্য কখনো কারও দুয়ারে হাত পাতিতে না হয়।

বিজ্ঞজনেরা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিলেন



বশিষ্ঠাশ্রম

না,—নানা অযাচিত উপদেশে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন চাকরী করিয়া মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন,—ডিগ্রী এবং দাসত্বের পরিণাম কি, সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তাঁহার অভাব নাই,—কাহারও কথায় কান তিনি দিলেন না।

তৃপ্তির এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য ছিল; কিন্তু মেয়েকে বেশী বয়স অবধি অবিবাহিত রাখিয়াও তাহার স্বতন্ত্র মতের কোনো মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না; যেহেতু, তিনি মনে করিতেন, দীর্ঘ দিবসের কর্ম্মজীবনে ঠকিয়া শিখিয়া তিনি নিজে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, সংসারে অনভিজ্ঞা বালিকার পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে তাহার সন্ধান করিতে যাওয়া বাতুলতা।

যে পাত্র স্থির হইল নাম তার শ্যামাপদ। অত্যন্ত সাধারণ নাম, অত্যন্ত সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি;—বিদ্যা—কলেজের মুখদর্শন করিয়াছে মাত্র। কিন্তু খাটিয়া কখনো খাইতে হইবে না এমনি অবস্থা।

একটা কথা আরো আগে বলা উচিত ছিল। বিহারীবাবুর একটা ধনুকভাঙা পণ ছিল—মেয়ের বিবাহে



বশিষ্ঠাশ্রমের পথে শৃঙ্গ বিহীন গাভী

একপয়সা বরপণ দিবেন না; যেহেতু, প্রথাটা সমাজের যারপরনাই ক্ষতি করিতেছে। সহরে পড়া ডিগ্রীধারী ছেলে কিম্বা অর্দ্ধগ্র্যাজুয়েট যে বিনাপণে পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, এমন বিশ্বাসও তাঁহার ছিল। হয় ত সে কারণেও তিনি ঐ জাতীয় পাত্রদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতেন। হইতে পারে; সে সম্বন্ধে আমরা স্থিরনিশ্চয় নই।

শুভদিনে দুই হাত এক হইয়া গেল। বিবাহের পরদিন বরকনে গ্রামে যাত্রা করিল। তৃপ্তি যেমন আশা করিয়াছিল তার কিছুই না। কোন নদীর তীরে নহে,—একটা পানাপড়া পুকুরের ধারে একতলা বাড়ী; পিছনে ঘন গাছপালার কালো অন্ধকারে বাগান কি বন স্থির করা কঠিন। দূর মাঠের শ্যামল শোভা কোনখান হইতে দেখা যায় না। তার শয়নঘরের জানলা হইতে চোখে পড়ে শুধু একটা পায়ে চলার পথ—বেড়া পার হইয়া কোন্ দিকে চলিয়া গেছে—

ফুলশয্যার রাত্রে প্রথম প্রশ্ন সে স্বামীকে করিল—কাছে কোন নদী আছে?

শ্যামাপদ হঠাৎ নদীর খবর জিজ্ঞাসায় অবাক্ হইয়া গেল, বলিল—কেন বল্ ত?

তৃপ্তি বলিল, নদী আমার ভালো লাগে।

—ওঃ! নদী সেই কোলাঘাটে, রূপনারায়ণ।

কতদূর? সে কতদূর?

তা পাঁচকোশটাক্ হবে।

তৃপ্তি নিরাশ হইয়া গেল।

শ্যামাপদ স্ত্রীকে কাছে টানিল; বলিল—তোমার হাতখানা বেশ নরম, তুমি আমাকে ভালোবাসো?

তৃপ্তির শুধু হাসি পাইল, এ অত্যন্ত মামুলী প্রেমালাপ! বর্ত্তমান জগৎ এর চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর হইয়াছে। শ্যামাপদ সে খবর রাখে না বলিয়া তার যেন কৃপা হইল।

সে জবাব না দিয়া বাহিরের কৃষ্ণচূড়া গাছটার কম্পিত পাতাগুলার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বিছানার ফুলের গন্ধ ছাপাইয়া বাহিরের ভিজে মাটি ও বনফুলের অজানা গন্ধ…ঝিঁঝির একটানা সুর…অন্ধকারের থমথমে ভাব…জীবনে প্রথম অজানা পুরুষের সান্নিধ্য তার কবি মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল—প্রেমে নয় বিস্ময়ে।

তার স্বপ্ন যেন ভাঙিয়া গেছে। কবি সে। তবু বিধাতার খেলার পুতুল। সেই অতি পুরাতন কথা—তোমার হাতখানা নরম!—ওদিকে নদীর কোন চিহ্ন নাই। সে কি পাগল হইয়া যাইবে?

দিন যায়। শ্যামাপদ কাব্যের কোন ধার ধারে না। স্ত্রীর কাছে যা প্রাপ্য বলিয়া মনে করে, পৌরুষের সঙ্গে জোর করিয়াই আদায় করে। মুখের কথা, চোখের ভা

মিষ্টতার আশা সে কয়েক দিনের মধ্যেই পরিত্যাগ করিয়াছে,—বুঝিয়াছে, সে পাইবার নয়।

তবু যখন তৃপ্তি বাপের বাড়ী চলিয়া গেল, শ্যামাপদ এক চিঠি লিখিয়া বসিল—হৃদয়েশ্বরি, তোমার বিহনে আমার প্রাণ যে কি করছে সে যদি বুঝাইতে পারিতাম। বেশী দিন থেকো না, আমার ভালো লাগে না।

চিঠিখানার মধ্যে 'আমার ভালো লাগে না' শুধু এই কথাটির মধ্যে যেন খানিকটা কবিত্ব ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, প্রথম দিকটা পড়িয়া ত তৃপ্তি হাসিয়াই আকুল।

বোঝা গেল না। হ্যাঁ কিম্বা না লিখিলেই ত গোল চুকিয়া যাইত, ধোঁকায় পড়িতে হইত না।

সহরের মেয়ে বলিয়া যদি তার অহঙ্কার থাকে, তবে—হুঃ ঐ সহরে গিয়া কত দিন সে রীতিমত কচুরী খাইয়া আসিয়াছে!

কিন্তু তৃপ্তি তার স্বামীকে এতটা গদ্য স্বভাবের বেশী দিন থাকিতে দিল না। আসিয়াই এমন ভাবে তার



অম্বরাপ্তি

জবাব দিল

মিষ্টি

তুমি শুধু মিষ্টি নও, দুষ্টুও। চিঠি যখন লিখবে, যা মনে আসবে লক্ষ্মীটি তাই লিখো, পত্র-লিখন প্রণালী খুলে বসো না। আমি এখানে বেশী দেরী করব না। আমারো কি মন কেমন করে না মনে করো?

এ চিঠি শ্যামাপদ ঠিক বুঝিল না। দুষ্টু কথাটার কোন মধুর অর্থ আছে এ তার জানা ছিল না এবং 'মন কেমন করে না মনে করো' এ একটা মস্ত হেঁয়ালি; কিছুই

মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া অত্যন্ত ছেলেমানুষের মত আদর করিতে লাগিল যে, তাহাতেই সে রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তার পর দু'এক মাসের মধ্যেই বিবাহিত জীবনের ছোটখাটো নানা দুষ্টামির নিত্য-নূতন ফন্দী বাহির করিতে সহজেই ওস্তাদ হইয়া উঠিয়া শ্যামাপদ আগের মত ততটা গদ্দভ আর রহিল না।

শ্যামাপদর মা নিস্তারিণী দেখিলেন ছেলে বেহাত হইয়া যায়—স্ত্রীর কথায় উঠিতে-বসিতে সুরু করিয়াছে।

তিনি চট্ করিয়া তার মনটা সাতপুরুষের বিষয়ের দিকে টানিলেন।

পুকুরের পশ্চিম ধারে যে ভাঙা ঘাটটা কমপক্ষে একশো বছরের স্মৃতি বহিয়া নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া ছিল, সেই ঘাটে অনেক কাল পরে নবৌকে আসিতে দেখিয়া নিস্তারিণী হাঁকিলেন—শ্যামাপদ, পীরেকে খবর দে। পনেরো বচ্ছর বাদে তোর ন'খুড়ি ঘাট দখল করতে এলো বুঝি শ্যাখ্।

পুরুষানুক্রমের ফৌজদারী প্রবৃত্তি সহসা শ্যামাপদর মস্তিষ্কে চাড়া দিয়া উঠিল। ন'খুড়ির মুখের কাছে গিয়া দক্ষিণ হস্তটা বীরবিক্রমে আন্দোলন করিয়া সে কহিল—এক চড়ে ঠাণ্ডা করে দোব। এ ঘাট আর কোনদিন মাড়িয়েছ কি ঠ্যাং খোঁড়া ক'রে···

মামলা উলুবেড়ে হইতে হাওড়া—হাওড়া হইতে হাইকোর্ট; —বিচারে প্রমাণ হইল শ্যামাপদ নাকি নোটোদের সুন্দর বাঁধনো ঘাট ভাঙিয়া তছনচ্ করিয়াছে এবং এক ঘণ্টার মধ্যে কমসে কম ২৫ হাজার ইঁট গাড়ী বোঝাই করিয়া তুলিয়া লইয়া গেছে এবং নোটোর মাকে ভয়প্রদর্শন ও প্রহার করিয়া লোকসমাজে হীন করিয়াছে, তার মনোবেদনার কারণ হইয়াছে—অতএব তার জরিমানা হইয়া গেল। জরিমানার টাকা নিম্ন আদালতে বেশীই ছিল, আপীল করিতে কিছু কমিয়া গেল এবং এস্-ডি ওর বিচার-বুদ্ধি সম্বন্ধে হাইকোর্ট কৃপাপূর্ব্বক মৃদুহাস্য ও কটাক্ষপাত করিলেন। এইমাত্র।

আপীলের শেষ খবর বাড়ীতে পৌঁছিবার আগে নবৌ



অশ্বক্রান্তি হইতে গৌহাটীর দৃশ্য

নবৌ না কি মাতৃস্তন্য দিয়া শ্যামাপদকে মানুষ করিয়াছিলেন; গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—ভাগাড়ে যা ভাগাড়ে যা মুখপোড়া! বলি ও শামের মা, যে ব্যাটাকে দিয়ে মা-খুড়ির অপমান করছিস সে ব্যাটা তোর থাকবে মনে করেছিস্? —মা-খুড়ির নিশ্বেসে জ্বলে যাবে না? ভস্ম হয়ে যাবে না? আসুক নোটো আজ ঘরে, এ অপমানের শোধ যদি আমি না তুলি—

ব্যাপারটার সহজে মীমাংসা হইল না—এ-দলে পীরে গুণ্ডার দল আসিল, ও-দলে ভেমো গয়লারা ক'ভাই—

বাড়ীর পাশে আসিয়া চীৎকার করিয়া শোনাইয়া গেলেন—ওরে অ শামের মা, তোর শামকে জেলে পুরলরে—

কথাটা শুনিয়া তৃপ্তির বুকটা কাঁপিয়া উঠিল,—পাড়াগাঁয়ের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তার এত ভয় করিতে লাগিল যে বলিবার নয়।

কিন্তু তার শাশুড়ীঠাকরুণ হাতের মালাটা মাথায় ঠেকাইয়া সহজ কণ্ঠে বলিলেন—বাপপিতেমোর বিষয় রাখতে যদি ফাটকে যেতে হয়, তাতে ত লজ্জা করবার কিছু নেই—সে ত কারু কিছু চুরী করে দণ্ড পায়নি—বাপের ব্যাটার

মতন নিজের বিষয় রাখতে গিয়ে গেছে, তা যাক্—তা বলে তোকেও ও-ঘাটে আমি কিছুতেই সরতে দেব না—তোর নোটোর যেন তেরাত্তির না পোয়ায়—ভগমান আছেন, ভগমান আছেন—

সে যাহা হউক, বাপের ব্যাটা হইবার এ-রকম সহজ পন্থা তৃপ্তির মোটেই মনঃপূত হইল না, সে আতঙ্কে কাঁটা হইয়া বসিয়া রহিল।

কোর্ট হইতে ফিরিয়া শ্যামাপদ তার খুড়তুতো ভাই নোটোর উদ্দেশে খানিকটা চ্যাচাইল—ঐ শালা নোটো, শালা নোটো, বেটাচ্ছেলেকে খুন যদি না করি—

অপর পক্ষও দূর হইতে, বেরিয়ে আয় না শালা—দাগী আসামী, দাগ রয়ে গেল তো শালার। মজা এই, কেহ কাহারও বাড়ীর সীমানা ছাড়াইতেছিল না—যেন গ্রামের দুই কুকুরে ঝগড়া—ঊর্দ্ধমুখে চীৎকারই চলিয়াছে!

সাত দিন না যাইতে যাইতে আর এক কাণ্ড:—গোপাল নেপাল শ্যামাপদর জাঠতুতো ভাই;—জেঠা কেষ্ট ডাক্তার অতিবৃদ্ধ হইয়াছেন, দাওয়াটিতে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, চিকিৎসা ছাড়িয়া দিয়াছেন। দুই বাড়ী একেবারে সাম্‌না-সামনি।

ভাত খাইয়া নিস্তারিণী পুকুরে হাত ধুইতে গেছেন,—দেখেন, পূবদিকের পাড়ে তাঁহারি একটা নারিকেল গাছে গোপাল উঠিয়া ডাব পাড়িতেছে, নেপাল নীচে দাঁড়াইয়া—

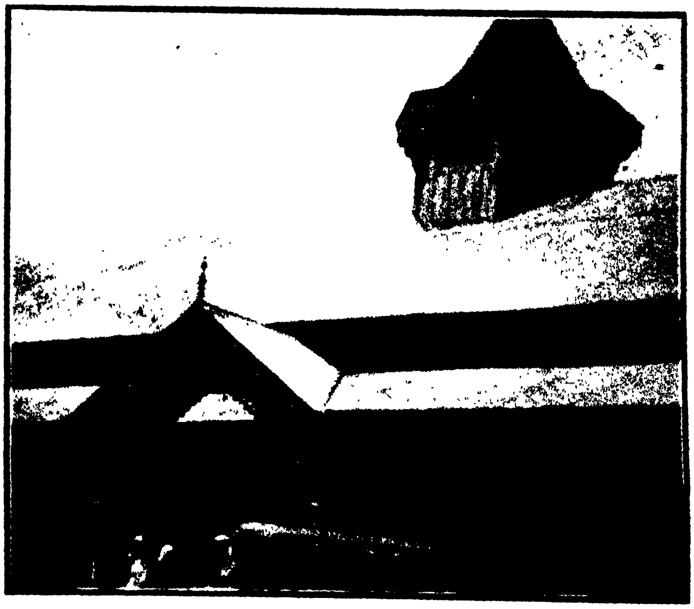
নিস্তারিণী হাঁকিলেন, হ্যাঁ র‍্যা, অ গোপ্‌লা—মাসে দুটো একাদশী, একটা আমাবস্যে, একটা পুন্নিমে; ডাবগুলো সব শেষ করলি ত আমি খাই কি? তোদের ত দুশো ছাব্বিশটে গাছ আছে, যা না যত খুসি ডাব পাড়গে যা—আমার গাছে কেন?

গোপাল ত গ্রাহ্যই করিল না, উপরন্তু বলিল—চশমা পরে বেশ বাজারে মাগীর মতন দেখ্‌তে হয়েছে?—



গৌহাটী ব্রহ্মপুত্রের উপর ষ্টীমারাদি

নিস্তারিণী হাঁক দিয়া উঠিলেন—তবে রে অলপ্পেয়ে, খুড়িকে বেশ্যে বলো—ঐ ত বুড়ো বসে রয়েছে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—ছেলে সাম্‌লাতে পারে না;



গৌহাটীর ধর্ম্মশালা

বলতে পারে না যে খুড়িকে অকথা-কুকথা বললে মুখে কি হয়?—

ভাদ্রবধূর তর্জ্জন-গর্জ্জনে ভাসুর মহাশয় ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। নিস্তারিণীর দুই চাকর ছুটিয়া গিয়া ডাব কাড়িয়া লইয়া দুই ছেলেকে দুই চড় দিয়া তাড়াইল—গোপালের মা শাপমন্তি দিতে সুরু করিলেন—গোলমালে কান পাতে কাহার সাধ্য!

গিয়াছিল; সে ফিরিতে আরো একচোট্ হইল। সেই রাত্রি হইতে একটা টর্চ্চ ও টাঙ্গি লইয়া শ্যামাপদ রাত একটা অবধি চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিতে সুরু করিল—কে কি চুরি করিতে আসিতেছে।

তৃপ্তির খোঁপায় বেলফুলের মালা মরমে মরিয়া থাকে।



শিক্ষিতা খাসিয়া-রমণী

সেদিন অমাবস্যার রাত্রি। শ্যামাপদর বাম বাহুর উপর মাথা রাখিয়া তৃপ্তি অঘোরে ঘুমাইতেছে;—শ্যামাপদর চোখে ঘুম নাই, জানালা দিয়া প্রাঙ্গণের যতটা দেখা যায় দেখিতেছে। এমনি অন্ধকার রাত্রিই প্রতিশোধ লইবার অবসর।

সহসা একটা আগুনের ঝলক যেন রান্নাবাড়ীর খড়ের চালায় আসিয়া লাগিল—তাহার তীরে জলন্ত কয়লা বাঁধিয়া ছোড়া হইয়াছে, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় এ কথা বুঝিতে তার দেরী হইল না।

তৃপ্তির মাথাটা সজোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সে খিল খুলিয়া বাহির হইয়া গেল—আগুন তখন দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

তার পর চেঁচামেচি, লোকজন, জল-ঢালাঢালি, বিষম গোলযোগ—রান্নাবাড়ীর আধখানা মাত্র বাঁচানো গেল।

এখানেই যদি শেষ হইত তবুও নিস্তার। ইহার পর একদিন রাত ১০টার সময় ইস্কুল বাড়ীর সামনে দিয়া আসিতে নোটোকে কে বা কাহারা ধরিয়া এসিড খাওয়াইয়া দিল।

ডায়েরী করা হইল, পুলিশ তদন্ত হইল; কিন্তু অপরাধী ধরা পড়িল না। শ্যামাপদ ঘটনার দিন কলিকাতায় ছিল।

১৫ দিন হাঁসপাতালে থাকিয়া নোটো যখন প্রাণ লইয়া ফিরিল, তখন তাহার কথা বলিবার শক্তি চির-দিনের জন্য লুপ্ত হইয়াছে।

তৃপ্তি আপনার মনে বলে

এ কোথায় এনেছ আমারে

জীবনের দেবতা আমার?

গোলমালের আরো বাকী ছিল। শ্যামাপদ তিনগাঁয়ে

শ্যামাপদ একদিন অতি গোপনে স্ত্রীর কাছে বাহাদুরী লইতে গেল,—দেখ্‌লে কেমন শালাকে জব্দ করলুম?

বিস্ময়ে অধীর হইয়া তৃপ্তি শুধু বলিল—তুমি?

—আমি মানে আমার লোক। আমারি টাকা খেয়ে।

মানুষ এত নৃশংস হইতে পারে তৃপ্তির ধারণা ছিল না। সে বলিল—কিন্তু তার বৌটার কথা ভাবতে হয়, সবে তিন মাস হল বিয়ে হয়েছে।

—তা আমি কি করব? লাগতে আসে কেন! আর তারাই কি তোমার কথা ভেবে আমাকে ছাড়ে?

তবু তৃপ্তি স্বামীকে ক্ষমা করিতে পারিল না। ওঃ—এত নীচ প্রবৃত্তি ইহাদের!

ক্ষমা হয় ত কোনো দিনই করিতে পারিত না; কিন্তু পরদিন রাত্রে তার মনের ধারণা বদলাইয়া গেল। বিছানায়

সাপটাকে মারিয়া ফেলা হইল বটে, কিন্তু সে অতি-বিষাক্ত সাপের স্পর্শ যে বিছানায় পড়িয়াছে, সেখানে সে সে-রাত্রে শুইতে পারিল না। দারুণ গরমেও বাগানের দিকের জানালা বন্ধ করিয়া দখিন্ হাওয়ার পথ রুদ্ধ করিতে হইল, এবং সমস্ত রাত অনিদ্রায় দুশ্চিন্তায় ছটফট্ করিতে করিতে এই সর্ব্বনেশে দেশে আর একদিন থাকিতে তৃপ্তির প্রবৃত্তি হইল না। শ্যামাপদকে পরামর্শ দিল—চল আমরা আর কোথাও যাই।

শ্যামাপদ জবাব দিল—এইতেই ভয় খেলে বিষয় রক্ষা করা চলে?



থাপ্পাসসহ খাসিয়া-রমণী

শুইবার আগে একবার টর্চ্চ দিয়া চারিপাশ দেখিয়া লওয়া শ্যামাপদর স্বভাব। হঠাৎ বালিশটা তুলিয়াই তৃপ্তিকে ডাকিল—দেখো!

কি? বলিয়া আগাইয়া আসিয়া তৃপ্তি দেখে একটি ঘন কৃষ্ণবর্ণের সরু লতার মত সাপ চুপ করিয়া শুইয়া আছে।

এ সাপ কে দিয়াছে এবং কেমন করিয়া দিয়াছে—বাগানের দিকের জানলার বাহির হইতে একটি বাঁশের চোঙ আনিয়া শ্যামাপদ সহজেই বুঝাইয়া দিল।

এইতেই যদি ভয় না খাইবে ত মানুষ আর কিসে ভয় খাইবে, তৃপ্তি কল্পনা করিতে পারিল না।

কিন্তু এর পরে এমন একটা ব্যাপার ঘটিল যাহাকে কোন রকমেই অবহেলা করা গেল না।

শ্যামাপদ ত ইদানীং সন্ধ্যার পর ঘরের বাহির হওয়া ছাড়িয়াই দিয়াছিল। একদিন দুপুরবেলা তিলজলার মাঠের পথে ফিরিতে যেখানটা বনের মত খানিকটা পার হইয়া যাইতে হয়, সেইখানে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র একখানা

দা ছুটিয়া আসিল। একটা সম্‌সর শব্দ শুনিয়া সে খানিকটা পিছাইয়া গিয়াছিল তাই রক্ষা, নহিলে চক্‌চকে ধারালো কাটারিখানা একেবারে তার গলায় গাঁথিয়া যাইত। তবু সেখানাকে সামলাইতে গিয়া তার হাত চিরিয়া গিয়া বেশ খানিকটা রক্ত বাহির হইয়া পড়িল।

দায়ের বাঁটখানাকে রক্তমাখা হাতে তুলিয়া ধরিয়া, তবে রে শালা, বলিয়া সে ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া আততায়ীকে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু সে কি আর ততক্ষণ আছে? কোন্ ধার দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।



খাসিয়া-রমণী কাষ্ঠ বহন করিতেছে

ডাক্তারের বাড়ী হইয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া আসিতে তার অনেকটাই সময় গিয়াছিল। ফিরিবার পথে আগে যেখানে হাট বসিত তাহারই পূবদিকে উমেশ চক্কোত্তির বাড়ীর সামনের ঘরে বুঝিতে পারিল রীতিমত জটলা বসিয়াছে এবং হাসাহাসি চলিতেছে। দু-একটা কথা তার কানে আসিয়াছিল—একেবারে বেটা টেঁসে যায় ত হয়; কিন্তু তার কোন্ জায়গায় লেগেছে দেখেছিস কি? গলাটা তার জ্ঞাতি যজ্ঞেশ্বরের, সম্পর্কে জাঠতুতো ভাই!

সঙ্গে সঙ্গেই একসঙ্গে দু-একজনের কণ্ঠস্বর—আরে আস্তে, চেপে, হাতে দড়ি দিবি দেখছি।

কে আছে পথে এমন সময় বলিয়া জানলার কাছে দাঁড়াইতেই যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে শ্যামাপদর চোখোচোখি। তার পরই মনে হইল যেন ঘরে বাজ পড়িয়াছে। কিন্তু শ্যামাপদ তখন অনেকটা আগাইয়া গেছে।

বিকালের কাজ সারিয়া তৃপ্তি একখানা মাসিক-পত্র লইয়া কবিতাগুলি বাছিয়া বাছিয়া পড়িতেছিল। নিতান্ত পাদপূরণের জন্য যেগুলি কাজে লাগিয়াছে এবং যাহার জন্য কবিদের সম্পাদককে নানা পূজা অর্চনায় তুষ্ট করিতে হইয়াছে এবং যেগুলার উপর অধিকাংশ লোকই শুধু চোখ বুলাইয়া যায়, তাহাই তৃপ্তির লাগিল অনবদ্য।

সে বার বার করিয়া প্রত্যেকটি আবৃত্তি করিয়া পড়িতে লাগিল—বিশেষ করিয়া একটি কবিতার তিনটি Stanza—

১

ও আমার যাত্রা পথের জয়ের মালা,
ও আমার যূঁই চামেলীর বরণ-ডালা,
তোমার ঐ কাজল চোখের মিষ্টি চাওয়া—
সে যেন অনেক দূরে প্রদীপ জ্বালা!

২

আমি যে ভাবটি ফোটাই আমার গানে
সে শুধু চেয়ে তোমার মুখের পানে,
কবিতার প্রিয়ার চোখের ছবি ভেবে
কবিতার কল্পনা সব জুটিয়ে আনে।

৩

এ-কথা রইলনা আর গোপন মোটে,
আমারি সঙ্গীতে তার খবর ছোটে,
দেখে মোর সঙ্গিনীরা খাতার পাতা
কবে কার স্মৃতির রংএ রঙিয়ে ওঠে!

সকল লেখকদের ও কবিদের তার দেখিতে ইচ্ছা করে। নামটি পড়িয়া রূপটি কল্পনা করিবার চেষ্টা করে। যার

লেখা মিষ্ট লাগে, তার চেহারাও যে ভালো না হইয়া যায় না, এই তার ধারণা। যে নির্য্যাতিতা নারীত্বের দুঃখে বিগলিত দেড়গজী উচ্ছ্বাস ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিতে পারে, বাস্তব চরিত্রে সে যে পিশাচের অধম হইতে পারে—না, এ কথা সে মরিয়া গেলেও বিশ্বাস করিবে না। অথচ কুন্দা এই কথাই তাকে বারবার বলিয়াছে। এটুকু বুঝিবার বুদ্ধি তার আছে যে, সে তাকে নিছক রাগাইবার জন্য। লেখা আর লেখককে আলাদা করিয়া ভাবিতেই পারা যায় না। মনে না আসিলে কখনো লেখা যায়? সে নিজে কি



খাসিয়া-কুলী পান প্রস্তুত করিতেছে

ানদিন সে যা ভাবে নাই, যা তার স্বভাবের বিরুদ্ধ, ন কিছু কবিতার মুখে ফুটাইতে পারিয়াছে?

মনে সে একবার ভাবিল, তার স্বামী যদি একজন থক হইত, তাহা হইলে এই অবেলায় তার বিছানায় ং হইয়া পড়িয়া অলস কাব্যচর্চ্চার ভঙ্গীটুকুর মধ্যেও কটা নিজস্ব রূপ দেখিতে পাইত; এবং এই ঘোমটা-খোলা াপা, এই অবনমিত নয়ন-পল্লবের দিকে খানিকটা মুগ্ধ-নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া হয় ত কাছে আসিয়া—কি যে করিত তা কি সে অনুমান করিতে পারে? ভাবুকদের সোহাগ জানাইবার উপায় কি একটা? তাহাদের ভালোবাসা প্রকাশের ধরণটা কি গতানুগতিক? হইলে হইতে পারিত'র কথা যে আরো কতক্ষণ ভাবিত বলা যায় না, সহসা শ্যামাপদর কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবং তার শাশুড়ীর আর্ত্তনাদ—

ইহার পরে আর স্বামীকে সে সেখানে থাকিতে দিতে প্রস্তুত নহে; বলিল, চলো অন্ততঃ দিনকতকের জন্যে বাইরে কোথাও ঘুরে আসা যাক, এ খুনে দেশে থেকে কাজ নেই। না, কোনো কথা শুনব না, শেষে কি একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে?—

শ্যামাপদকে রাজী করানো গেল; কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়?

তৃপ্তি বলিল—কামাখ্যা।

পশ্চিমের এত তীর্থ থাকিতে, কাশী বৃন্দাবন মথুরা

প্রয়াগ ছাড়িয়া হঠাৎ আসামের দুষ্কর তীর্থের প্রতি লোভ দেখিয়া শ্যামাপদ কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

তৃপ্তি বলিল—কারণ কিছু না, ঐটিই অ-দেখা আছে, আর ত সব দেখা।

তা বটে, শ্যামাপদ শুনিয়াছিল, ভুলিয়া গিয়াছিল।

শীতের রাত্রি।

শ্যামাপদ আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিল, পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া সেই বেঞ্চিতেই তৃপ্তি শুইয়াছিল। তাহার চোখে ঘুম নাই। সেই যে বিকালে পদ্মা

জানলা নামাইয়া দিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে শূন্য প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে চাহিয়া তৃপ্তি ভাবিতে লাগিল এই রংপুর।

অত রাত্রে যাত্রী বিশেষ ছিলনা, দু'একটা ফেরিওয়ালা ক্লান্তকণ্ঠে পান বিঁড়ি সিগ্রেট হাঁকিয়া যাইতেছিল। একটা নীল পোষাক-পরা কুলী দরজার সামনে দিয়া চলিয়া গেল—এই রংপুর।

শ্যামাপদ বলিল, ঘুমোবে না?

তৃপ্তি বলিল, না। এই দেখ কতগুলো জেলা আমরা একদিনে পেরিয়ে যাচ্ছি। আমি ম্যাপ দেখে বলে যাচ্ছি, তুমি গোণো। প্রথমে ধরো ২৪-পরগণা—

—২৪-পরগণা আবার কি ধরব?



খাসিয়া পূজা (ডিম্ব ভগ্ন)

পার হইয়াছে—সাড়া সেতুর উত্তরে নদীর রূপালি জলে রূপার মত সাদা পাল তুলিয়া নৌকা চলিতে দেখিয়াছে, তাই তার এখনো মনে পড়িতেছে। ঐখানে গাড়ী থামিয়া গেলে ভালো হইত।

রংপুরে ট্রেণ থামিলে সে শ্যামাপদকে জোরে নাড়া দিয়া জাগাইয়া দিল, ওগো, দেখো দেখো, রংপুর।

শ্যামাপদ বিরক্ত হইয়া বলিল, রংপুর আবার কি দেখ্‌ব?

আশ্চর্য্য হইয়া তৃপ্তি বলিল—দেখ্‌বে না, কত বিখ্যাত জায়গা, তার ষ্টেশনটাও দেখবে না?

—বাঃ, ধরবে না? ওটাও ধরতে হবে। তার পর যশোর, নদীয়া, পাবনা, রাজসাহী, দিনাজপুর, কুচবিহার, ময়মনসিংহ, রংপুর, জলপাইগুড়ি, কামরূপ, গৌহাটি—ও গো না ভুল হয়ে গেল—এখন গুণো না—দাঁড়াও আবার দেখি—এই ত ২৪-পরগণা; তার পর এখানটা যশোর ত? দেখো ত!—

দেখাইবার জন্য উঠিয়া দেখে শ্যামাপদর নাক ডাকিতেছে!

আচ্ছা লোক! বলিয়া তৃপ্তি টাইম-টেবিল বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

লালমণির হাটে একবার উঠিয়া ষ্টেশনটা দেখিয়া আর জাগিয়া থাকিতে পারিল না, সকল উৎসাহ দমন করিয়া ঝুপ্ করিয়া শুইল।

আমিনগাঁওয়ে ভোর হইল। শুনিয়াছিল সাম্‌নেই ব্রহ্মপুত্র। কিন্তু কই দেখিতে পাইল না।

ঘন কুয়াসায় চারিদিক ছাইয়া গেছে; প্ল্যাটফর্ম্মের মাথার টিনগুলা ও ষ্টেশনের পাশে খানিকটা মাঠ ছাড়া কিছুই নজরে পড়িতেছিল না।

রেলোয়ের লোকেরা বলিল, কুয়াসা না কাটিলে পাণ্ডারা আসিতে পারিবে না, ষ্টীমারও ছাড়িবে না।

তৃপ্তির দেরী সহিতেছিল না, শুনিয়াছিল এখানে ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্য অপূর্ব্ব। পরপারে কামাখ্যা পাহাড় ঘনবনরাজিতে ভারী সুন্দর। কিন্তু ঘাটের কাছে সে নামিয়া গিয়াও ৩।৪ হাতের বেশী কিছুই দেখিতে পাইল না,—সবই স্বচ্ছ ধোঁয়ার মত। তার বিশ্রী লাগিতেছিল।

রৌদ্র ফুটিতে প্রায় ১০টা বাজিয়া গেল; কুজ্ঝটিকা মিলাইয়া গিয়া এ-পার ও-পারের ছবি সূর্য্যকিরণে ঝলমল করিয়া উঠিল।

আনন্দে তৃপ্তি চীৎকার করিয়া উঠিল—কি চমৎকার! ওগো কি সুন্দর!

উমানন্দর দিকে ষ্টীমার চলিয়াছিল! দীর্ঘ বিস্তৃত নদী,—নদী নয় নদ—কিন্তু তৃপ্তির নদী বলিতেই ভালো লাগে। ব্রহ্মপুত্রের বুকের দিকে চাহিয়া তৃপ্তি বসিয়া ছিল। বারবার নদী মোড় ফিরিয়াছে। বাঁকে বাঁকে নূতন সৌন্দর্য্য। দুই পাড়ে পাহাড়ের শ্রেণী, ছোট ছোট গ্রাম, মন্দিরচূড়া—আসামের নিজস্ব শোভা।

পাণ্ডা দেখাইয়া দিল ঐ অশ্বক্লান্তি ঘাট, পাণ্ডবদের অশ্বমেধের ঘোড়া যেখানে ক্লান্তি দূর করিতে বিশ্রাম করিয়াছিল।

তৃপ্তি অবাক হইয়া দেখিল বহুশতাব্দীর দেবদেউল।

ভোঁ ভোঁ আওয়াজ চটকলের বাঁশীর মত অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিতে লাগিল, ষ্টীমারের গতি বাড়িতে লাগিল।

ষ্টীমারের যাত্রীদল ডেকের এ-ধারে ও-ধারে পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ তৃপ্তির কানে আসিল—একজন বলিতেছে এবারকার 'বসুধা'র আমার একটা গল্প বেরিয়েছে।

তৃপ্তি ফিরিয়া দেখে একটি যুবক ও শ্যামাপদ সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়াইয়া। তার হাতে ক্যামেরা। সেই বলিতেছিল, এই মাসের বসুধায়। পড়েছেন?

শ্যামাপদ বলিল, পড়েছি। গ্র্যাণ্ড হয়েছে। এই ষ্টীমারের কথাই ত?

হাঁ—বলিয়া যুবকটি এধারে চাহিতেই তার দৃষ্টি তৃপ্তির দিকে পড়িল। সে লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

তৃপ্তি বসুধা নেয়, কিন্তু শ্যামাপদ যে এত মনোযোগ দিয়ে পড়ে তা তার জানা ছিল না।

সে চুড়ীর ও চাবির আওয়াজ করিতেই শ্যামাপদ কাছে আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ করলে? কি ওঁর নাম।

রঞ্জন সেন।

তৃপ্তি একরকম চেঁচাইয়াই তাহাকে শুনাইয়া বলিল, উনিই রঞ্জন সেন? ওঁর ত ঢের গল্প পড়েছি। কবিতাও লেখেন ভারী চমৎকার।

বলিয়া আগাইয়া গিয়া বলিল—আপনি ছবি তুলছেন?

মৃদু হাসিয়া রঞ্জন বলিল, হ্যাঁ—এই একটু-আধটু।

আচ্ছা উমানন্দ কোন্ দিকে? তাহাকেই প্রশ্ন করিল। একজন সাহিত্যিককে দেখিয়া সে যেন আলাপ করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল।

রঞ্জন দেখাইয়া দিল—ঐ যে নদীর মাঝখানে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে! ঐ সামনে, এই আঙুলের দিকে চেয়ে দেখুন।

তৃপ্তি বলিল, অত সুন্দর! আপনি ছবি তুলবেন না?

—তুলব। আর একটু কাছে গিয়ে। আর এদিকে দেখুন—ঐ উর্ব্বশী—ঐ পাহাড়টার সামনে এক প্রোফেসরের দুর্ঘটনা ঘটে—কাগজে পড়েছিলেন ত?

তৃপ্তি জানাইল, পড়িয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বলিল, আহা! আচ্ছা ঐ বাড়ীগুলো দেখা যাচ্ছে ওটা কোন্ জায়গা?

—ঐ ত গৌহাটি।

ও মা ঐ গৌহাটি। ছবির মতন সহরটি ত! লাল-

ছাতওলা সব বাড়ী কি চমৎকার দেখাচ্ছে! আপনি এত সব জানলেন কি করে! আগে এসেছিলেন বুঝি?

রঞ্জন জানাইল, হাঁ।

ওদিকে শ্যামাপদর মুখ দেখিয়া বোঝা যাইতেছিল সে চটিয়াছে, কিছু বলিবার সুবিধা করিতে পারিতেছে না।

তৃপ্তির মনে হইল রঞ্জনের হাসিয়া হাসিয়া কথা বলার ভঙ্গীটুকু বেশ, যদিও মোটা চেহারাটা যেমনি কালো, তেমনি ক্যাড্! তা হোক্, তবু ত সাহিত্যিক!

রঞ্জনের সঙ্গ তৃপ্তি ছাড়িল না। তৃপ্তির সঙ্গও রঞ্জন ছাড়িবার লক্ষণ দেখাইল না। গৌহাটিতে তার মাসীর বাড়ীতে দুইজনের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

কামাখ্যা পাহাড়ের একেবারে মাথায় ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের পাশে দাঁড়াইয়া একটি বৃহৎ বটগাছের ডালপালার ফাঁক দিয়া দূরের বিচিত্রবর্ণের গৌহাটির সোজা লম্বা রাস্তায় শিলংগামী বাস। এ-পাশে উমানন্দ, ও-পাশে পাহাড়ের পর পাহাড়ের মালা দেখিয়া তৃপ্তি যখন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে নিঃশব্দে একটি স্ন্যাপ্ লইয়া রঞ্জন বলিল, ক্ষমা করবেন, আপনাকে শকুন্তলার মতন দেখাচ্ছিল দেখে একখানা ছবি নেবার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি।

তৃপ্তি বলিল, এই ত চেহারা!

রঞ্জন বলিল, আশা করি, আপনার নাম বিনয়কুমারী নয়।

তৃপ্তি বলিল, না, আমার নাম তৃপ্তি।

—তাই ত বলছি, অত বিনয় দেখাচ্ছেন কেন নিজের চেহারা নিয়ে, আপনার নাম বিনয়কুমারী নয়।

তৃপ্তি হাসিল, সাহিত্যিকদের বলিবার ধরণই অন্যরকম।

তৃপ্তির মাথার কাপড় হাওয়ায় খুলিয়া গেল। সে তুলিয়া দিবার আগে রঞ্জন বলিল, আর একখানা ছবি নিই আপনার—মাথার কাপড়টা খোলাই থাকবে যেন বনদেবী—এলো খোঁপাটা ঠিক যেমন আছে—দাঁড়ান, বলিয়া হাতটা একটু সরাইয়া দিল, গাল ধরিয়া মুখটা ফিরাইয়া দিল, আঁচলটা ঠিক করিয়া দিল, চুড়ীগুলা আঁট করিয়া বসাইয়া দিল। তাহাকে ধরিয়া এ-ধারে টানিয়া ও-ধারে সরাইয়া এমন কাণ্ড করিতে সুরু করিল যে, অন্য লোক হইলে বুঝিতে পারিত—ছবি তোলাটাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তৃপ্তি আপনাকে তার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল: কেন না, সে বলিয়াছে—যেন বনদেবী—কথাটার মিষ্টতার অন্ত নাই।

ভাষায় আরো মধু ঢালিয়া রঞ্জন বলিল, আপনার কবিতা অত মিষ্টি হয় কেন বুঝেচি—আপনার চেহারাটাই যেন মূর্ত্তিমতী কবিতা। কিন্তু আপনি কোন কাগজে ছাপান না কেন? দেখি, আরেকটু এ-ধারে ফিরুন ত, আমার দিকে চান—রেডি!—

এমনি সময়ে শ্যামাপদর উদ্গারের শব্দ শোনা গেল। সে টিফিন ক্যারিয়ারটি শেষ করিয়া তাড়া দিতে আসিয়াছে।

ছবি নড়িয়া গেল। তৃপ্তি ফিরিয়া দেখে—একটি খাসিয়া রমণী কাঠের বোঝা মাথায় ব্যাপার দেখিয়া হাসিতেছে! সে কি বুঝিল, সেই জানে।

তৃপ্তির শিলঙ যাইবার তোড়জোড় সব কাঁচিয়া গেল। দেশ হইতে শ্যামাপদর নামে জরুরী চিঠি আসিয়াছে শীঘ্র ফিরিবার জন্য। মাত্‌লার আবাদটা বারো হাজার টাকা জোগাড় করিতে পারিলেই এবার কিনিয়া ফেলা যায়—সেজন্যও বটে, আবার ওদিকে হাঙ্গাম বাধিয়াছে পুরুষানুক্রমে যে শ্যাওড়া গাছের স্বত্ব লইয়া মামলা চলিতেছে, যাহাতে কমসে-কম দশ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, আপোষ মীমাংসার কথা উঠিতেছে,—ওদিকে পুরানো ঘাটে আবার ওরা আসিতেছে এবং কে বা কাহারা তার পুকুরের মাছ, কলার কাঁদি ইত্যাদি লইয়া সরিতেছে।

এমন অবস্থায় আর কি করিয়া থাকা যায়! তবু তাড়াতাড়িতে তৃপ্তি বশিষ্ঠাশ্রমের ঝর্ণা দেখিয়া লইল—নহিলে চিরদিনের আফশোষ থাকিত। শ্যামাপদ মোটঘাট বাঁধিয়া আসামের সীমানা ছাড়িল। গাড়ীতে শ্যামাপদ যখন মকর্দ্দমার ফন্দী আঁটিতে গিয়া ঘুম তাড়াইতেছিল, তৃপ্তি সেই সময় আলোর দিকে চাহিয়া রঞ্জন সেনের তোলা পথের দৃশ্যের অজস্র ফটোগুলি বাহির করিয়া দেখিতে বসিল—এইগুলি তার ভবিষ্যতের কল্পনায় মধুসঞ্চয় হইয়া রহিল।

দেশে আসিয়াই শ্যামাপদ আবার চীৎকার সুরু করিল। আবার মামলা মোকর্দ্দমা হাঙ্গাম হুজ্জৎ।

তৃপ্তির ও-সব ভালো লাগে না। দূর সম্পর্কের দেওর নীরেন আসিয়া বলে—বৌদি, তুমি এসব ঝঞ্ঝাট ভালো-বাসো না? না?

তৃপ্তি বলে, না ভাই। কি দরকার ও-সবে। মিলে-মিশে থাক্‌লে কেমন বলো ত! না—এ-সব কি!

নীরেন বলে, একটু চা করো না।

করি। বসো।

তৃপ্তি জল চড়াইয়া চায়ের বাটি টিপয় নামাইয়া রাখিতে থাকে। নীরেন সেইখানেই একটা আসন টানিয়া লইয়া বসিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া দেখিতে থাকে, এটা ওটা কথা কয়।

তাহার বিবাহ লইয়া দেওর-ভাজে হাসাহাসি চলে। নীরেন বলে, ক্ষেপেছ, নিজে খেতে পাই না, আবার বিয়ে।

আলাপে প্রলাপে হাসি-আমোদে গ্রামের এই একটি লোকের কাছেই তৃপ্তি মন খুলিয়া দেয়। ও না কি তার দাদার সঙ্গে পড়িয়াছে, তাই আরো ভালো লাগে।

সেদিন মামলাসংক্রান্ত একটা কাজে শ্যামাপদ কলিকাতায় চলিল, তার মাও গেল ৺কালীঘাটে পূজা দিতে।

বাহিরের ঘরে চাকরেরা রহিল। ভিতরের দালানে মঞ্জুরী ঝি রহিল। তবু বিপদ আপদের দিনে বাড়ীতে একজন পুরুষমানুষ থাকা দরকার বলিয়া শ্যামাপদ নীরেনকে রাখিয়া গেল।

তৃপ্তির ঘরের পাশের ঘরটায় সে রহিল।

রাত তখন অনেক। চারিধার ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে।

তৃপ্তির ঘরের দরজার কাছে আসিয়া নীরেন ডাকিল, বৌদি! বৌদি!

তৃপ্তি সাড়া দিল, কেন ঠাকুরপো!

—দেশলাইটা একবার দাও ত।

টেবিলের কাছে হাৎড়াইয়া তৃপ্তি পাইল না, বলিল, পাচ্ছি না ত।

খোলো। আমি দেখছি।

দরজা খুলিয়া দিতেই নীরেন তার হাত ধরিয়া খাটের কাছে টানিয়া আনিল।

খাটের গায়ে ঠেস্ দিয়া তৃপ্তি দাঁড়াইয়া ছিল। বাহিরের

তৃপ্তি বলিল—এ কি ঠাকুরপো!

কি, জানো না? চেঁচিও না।

না না ছি। ছাড়ো আমি চেঁচাব।

চেঁচালে তোমারি কেলেঙ্কারি! শোনো না বলি—

বলিতে হইল না, হাতটা জোর করিয়া টানিয়া দু'-একবার ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া আচম্‌কা তৃপ্তি এক লাথি মারিয়া বসিল। নীরেন অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া ছাড়িয়া দিতে আরো একবার আরো জোরে পদাঘাত করিয়া সে দালানে আসিয়া ডাকিল, ঝি অ-ঝি মঞ্জুরী!

মঞ্জুরী একটা স্বপ্ন দেখিয়া তখন কাঁদিবার উপক্রম করিতেছিল, তৃপ্তির ডাকে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল, কি গো বৌমা!—

তৃপ্তির রাগে তখন কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান ছিল না, সে আঙুল দেখাইয়া বলিল, ঐ দেখ্!

তৃপ্তির ঘরে চোর মনে করিয়া মঞ্জুরী তারস্বরে চীৎকার জুড়িয়া দিল, চাকর লোকজন জাগিয়া উঠিয়া হৈ হৈ হল্লা—প্রহার—পাড়াপ্রতিবেশীর ঘুমভাঙা—নানা ভাবে কথাটা নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

সকালবেলা শ্যামাপদ ফিরিতেই নীরেন গিয়ে বলিল—এমন করে ত আর পারা যায় না দাদা, ভালোমানুষের কাল নেই!

শ্যামাপদ উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল—কেন, কেন? কি হল?

নীরেন বলিল—কাল রাত্রে বৌদির কাছ থেকে দেশলাইটা চাইলুম। অমনি আমাকে ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে যা সব কথা বল্লে—কানে আঙুল দিতে হয়! বড় ভাজ সাক্ষাৎ মায়ের মতন। আমি পায়ে ধরে বললুম ছেড়ে দাও! করলে কি জানো? চোর চোর বলে চেঁচিয়ে চাকর দিয়ে আমাকে মার খাওয়ালে।

শ্যামাপদর চোখ জ্বলিয়া উঠিল। তবু বলিল, সত্যি বলছিস্?

যদি সত্যি না বলে থাকি ত আমি—বলিয়া নীরেন এমন এক ভীষণ শপথ করিল যাহার উপর আর কথা কওয়া যায় না।

কথাবার্ত্তা সে শুনিতে পায় নাই, শ্যামাপদ ভিতরে আসিলে সে কেমন করিয়া কুৎসিত কথাটা পাড়িবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। তার মুখ অসম্ভব গম্ভীর, চোখে জলের রেখা। শ্যামাপদকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে যেন পরম ভরসা পাইল।

ওগো বলিয়া কথাটা পাড়িতে যাইতেই মুখের ওগো মুখেই মিলাইয়া গেল—তবে রে শালি দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা?—বলিয়া শ্যামাপদ কীল-চড়-ঘুষিতে তাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল।

চাকর দাসীর সামনে এমনি ভাবে হঠাৎ এতটা মার খাইয়া তৃপ্তি অবাক্ হইয়া গেল। রাগে অপমানে ক্ষোভে লজ্জায় তার চোখের জলও যেন শুকাইয়া গেল।

গলা ধরিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আবার চুলের মুঠি ধরিয়া সোজা টানিয়া তুলিয়া শ্যামাপদ যে কাণ্ড করিতে লাগিল তাহাতে এতটুকু বাধা দিবার প্রবৃত্তিও তার হইল না।

শ্যামাপদর মা চীৎকার করিতে লাগিলেন—বল্‌তে ঘেন্না, কইতে ঘেন্না, বংশের লজ্জা—হারামজাদিকে গুণে সাতটা লাথি মার—

মাতৃভক্ত পুত্র গোদা পায়ের লাথি গণিয়া গণিয়া মারিতে লাগিল এক—দুই—তিন—পঞ্চম লাথির পর আর কোন সাড়া পাওয়া গেলনা, মনে হইল অজ্ঞান হইয়া গেছে।

মঞ্জুরী আপত্তি করিয়াছিল; বলিয়ছিল—নচ্ছার ছোঁড়াটারই যত দোষ, ওকে মারতেছ কেন?

শ্যামাপদ গর্জ্জন করিয়া ওঠে থাম্ মাগী, ঘুষ খেয়ে উল্টো গাইছিস্!

স্নান সারিয়া আহার করিয়া শ্যামাপদর রাগ কতকটা কমিল।

বেলা ১২টা বাজিয়া গেছে,—তৃপ্তি মাথা নীচু করিয়া পুতুলের আলমারীর সামনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একভাবে কাঠ হইয়া বসিয়া আছে। শ্যামাপদ আপন মনে বলিল, আগে লাথ পিছে বাত! তার পর তৃপ্তির দিকে চাহিয়া কণ্ঠস্বর মোলায়েম করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কি হয়েছিল খুলে বল্, দেখি, মাপ করতে পারি কি না।

এক সঙ্গে অনেকগুলা কথা তৃপ্তি বলিয়া ফেলিল—আমি বলব না। তোমার যা খুসি কর। তোমার মাপ আমি চাই না।

ইহার পর শ্যামাপদর ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইল, সে চট্ করিয়া কামিজটা গলায় গলাইয়া দিয়া চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া মনিব্যাগটা পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিল—ওঠ্, তোকে বিদেয় করে এসে তবে কথা—বলিয়া নড়া ধরিয়া হেঁচ্‌কা টান দিয়া তাহাকে তুলিল, তেমনি ভাবেই টানিয়া সদর রাস্তায় বাহির করিয়া আনিল।

অশথতলা হইতে ষ্টেশনের দিকে বাস্ ছাড়িতেছিল—পাঁচখানা গ্রামের লোকজন—তাহাদেরি মাঝখানে স্ত্রীর ঘাড়টি টিপিয়া ধরিয়া ধাক্কা মারিয়া সে বাসের মধ্যে ঠেলিয়া দিল এবং তর্জ্জি বাসটার দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ছেড়ে দাও।

পাথরের থালাটা কোলের কাছে লইয়া নিস্তারিণী তখন ভাবিতেছিলেন—কাজটা ভালো হইল না,—সকল কথার মীমাংসা হয় নাই,—হয় ত ও নিষ্পাপ। যদি দোষীও হয়, তবু একদিন দুধে-আলতায় ঘরের লক্ষ্মী বলিয়া যাহাকে আদর করিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, আজ ঠিক দুপুর বেলায় তাহাকেই দুটি ভাত মুখে না তুলিতে দিয়া নিতান্ত ছোট জাতের বৌএর মত তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া কিছুতেই উচিত হয় নাই। ছেলে তাঁর কাঠ গোঁয়ার, বাধা দিবার অবসর তিনি পাইলেন না। এতক্ষণ বাস হয় ত বাথড়ার পথে চলিয়া গিয়াছে। অবগুণ্ঠিতা বধূর সজল মুখখানির কথা কল্পনা করিয়া হঠাৎ তাঁর বুকটা ক্ষণেকের জন্য কেমন করিয়া উঠিল।

শ্বশুরবাড়ীর দরজায় স্ত্রীকে নামাইয়া দিয়া শ্যামাপদ যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত এগারোটা।

তিন বছর কাটিয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে তৃপ্তিকে লইয়া কত কাণ্ডই না হইয়া গেল। তৃপ্তির বাবা পাঠাইতে চান না, তারা লইয়া যাইতে চায়। অনেক চিঠিপত্র, মামলা-মোকর্দ্দমার ভয় দেখাইয়া শাসানো, কাকুতি-মিনতি—কিছুই বাদ যায় নাই। অবশেষে ভালো ব্যবহার করিবার কড়ারে লইয়া গিয়া কিছুদিন পরে আবার

কলহ করিয়া শ্যামাপদ তার কুঞ্চিত চুলের গোছা কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

ইহার পর তৃপ্তি ঠিক করিয়াছে মরিয়া গেলেও আর সে ঘরে যাইবে না।

এদিকে আত্মীয়-স্বজনের কাছে স্বামী কেন গ্রহণ করে না, তার জবাবদিহি করিতে করিতে তৃপ্তি ক্লান্ত হইয়া পড়িল। শেষকালে তারই অনুরোধে বেহারীবাবু বরাকর নদীর ধারে একটা পরিত্যক্ত কোলিয়ারীর বাড়ী সস্তায় কিনিয়া ফেলিলেন।

বাংলোর বারাণ্ডায় বসিয়া তৃপ্তি সেই নদীর জলের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, যা সে চিরজীবন ধরিয়া ভালো-বাসিয়া আসিয়াছে।

অনেকখানি গৈরিক বালুচর অসংখ্য পদ-চিহ্নময়, তারি কিনারায় বনানীর শ্যামচ্ছায়ায় শ্যামল জলরেখা,—এ-দিকে পাহাড়, ও-দিকে পাহাড়, সে-দিকে সূর্য্য ডুবিতেছে।

সূর্য্য ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, স্নিগ্ধ জলো হাওয়া বহিতে সুরু করিল।

তৃপ্তি বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

কল্যাণেশ্বরীর মন্দিরের ও-পার দিয়া যে সদর রাস্তাটা দৈতুরা কোলিয়ারী হইয়া সীতারামপুরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই পথে দেও-বরিয়াদের পূজারী ব্রাহ্মণ শাবন-পুরের গ্রামে ফিরিতেছিলেন।

রাস্তার কাছাকাছি আসিয়া একটা পলাশগাছের তলায় রাশিকৃত চকচকে পাথর হইতে একটি একটি করিয়া বাছিয়া তুলিয়া সে আঁচলে ভরিতে লাগিল। সহসা একটা বাস থামিতে দেখিয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল। একটি লোক পুঁটুলী হাতে করিয়া নামিয়া তার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, বাস দৈতুরার পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কাছে আসিতে তৃপ্তি চিনিল—শ্যামাপদ। বিনা-ভূমিকায় শ্যামাপদ বলিল—তোমায় নিতে এসেছি। এই নির্লজ্জ লোকটা—যে বারবার তাকে অকথ্য অপমান করিয়াছে—তার এই অবলীলাক্রমে নিতে এসেছি বলায় তৃপ্তির রাগের অবধি রহিল না।

একটুও না ভাবিয়া সে বলিল—যে পথে এসেছ সেই-পথে এক্ষুণি ফিরে যাও; নইলে এই পাথর ছুঁড়ে মারব। সঙ্গে সঙ্গে সে একটা বড় পাথর হাতে করিল।

শ্যামাপদ কি বলিতে যাইতেছিল, তৃপ্তির শুনিবার সহিষ্ণুতা ছিল না। সে জিম্ জিম্ বলিয়া ডাক দিতে, তার ফক্স টেরিয়ার কুকুরটা ছুটিয়া কাছে আসিল—স্ স্ স্—বলিয়া শ্যামাপদকে দেখাইয়া দিতেই তাড়া করিল। শ্যামাপদ তখন পুঁটুলিটা ফেলিয়া তীরবেগে সদর রাস্তায় গিয়া পড়িল। শিক্ষিত কুকুর না কামড়াইয়া শুধু চীৎকার করিয়া ভয় দেখাইয়া তাকে অনেক দূরে দিয়া আসিল।

সে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে তৃপ্তি পুঁটুলিটা তুলিয়া আনিয়া খুলিয়া দেখিল—একখানি ডুরে শাড়ী, একটি নীলাম্বরী, তরল-আলতা, কেশ-তৈল, পাউডার,—স্নো,—অনেক দুঃখে তৃপ্তির হাসি আসিল।

সন্ধ্যার ও মেঘের অন্ধকারে চারিদিক কালো হইয়া আসিয়াছে। পঞ্চকোটের পাহাড় আর দেখা যায় না। দামাগুড়িয়া কোলিয়ারীতে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ঝড় জল সুরু হইল—বনভূমি কাঁপাইয়া শোঁ শোঁ শোঁ আওয়াজ—

জানালাগুলা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া তৃপ্তি বিছানায় গিয়া শুইল। আজকের সন্ধ্যার ঘটনা না বাবাকে না মাকে বলিল।

বৃষ্টিতে ভিজিয়া পার্ব্বতীয়া ঝি ফিরিল। হাতের টাকাটা দরজার পাশে রাখিতে রাখিতে সে বলিল, বিষ্টি আসে দেখে বেরিয়েছিলুম; একেবারে ভিজে গিইছি গো দিদিমণি। আর আজ ভারী ডর লেগে গেইছিল। কুলটি পার হয়ে যে বোড়ো ভারী ময়দানটা আছে, সিঠ্‌নে কে রোচ্ছিল, শুনেছি ত ছুট্ দিয়েছি। বিজ্‌লি চক্‌মকাল ত দেখি একটা বাঙ্গালী বাবু মতন রোতে রোতে যাচ্ছে। রাস্তা হারালো না কি হ'ল বুঝলুমনা।

চেহারায় যতটুকু জানিল তাহাতে তৃপ্তি বুঝিল, এ কে।

অজানা তেপান্তরের মাঠে পড়িয়া দুর্য্যোগে অন্ধকারে দুর্দ্দান্ত লোকটাকে আজ অসহায়ের মত কাঁদিতে হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া নির্য্যাতিতা তৃপ্তির হয় ত খুসি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হইল না। সে উৎকণ্ঠায় সারা হইয়া উঠিল। মনে হইল লোক পাঠাইয়া খোঁজ করা যাক্। তাও সম্ভব নয়—এ ঝড়ে কে বাহির হইবে?

যে স্বামীর কর্ত্তব্য করে নাই, যে তাকে লাঞ্ছনায়, অপমানে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে, আজো যার অত্যাচারের

চিহ্ন তার চূর্ণকুন্তলে বিদ্যমান, সকল দিক দিয়া তার মূল্যবান্ জীবন যে ব্যর্থ করিয়া দিল, সেই লোকটার আসন্ন বিপদে হয় ত তার ব্যাকুল হওয়ার কথা নয়, তবু শত শতাব্দীর রক্তধারার মতো মাতামহী প্রমাতামহীর সংস্কার তার জাগিয়া উঠিল। গগনের বাদল তার নয়নে ঘনাইয়া আসিল।

সকলের দৃষ্টি এড়াইতে সে ঘরের ও-ধারের দালানে চলিয়া গেল। সেখান হইতে অন্ধকার উঠানে নামিয়া সে খিড়কির দরজা খুলিয়া সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিল। হঠাৎ কড়াক্কড় কড়—মানুষের প্রকৃতি দেখিয়া হয় ত প্রকৃতিদেবী বজ্রের মুখে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

(শেষ)

ছিন্নপত্র

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

সহসা তোমার চিঠি পেয়ে হাতে চৈতালী রাতে চমক লাগে!
সত্যি?—রাণুদি! ভোলোনি এখনো? সত্যি কি 'রুণু' স্মরণে জাগে?
চূত-মুকুলের গন্ধে আকুল দখিনা-বাতাস ব্যাকুল আজি!
নবযৌবনা ধরণী পরেছে কবরী বেড়িয়া কুসুমরাজি!
ঋতুরাজ এসে পরিচিতবেশে চিরচেনা হেসে দাঁড়ালো দ্বারে!
তারি সাথে এলো তোমার লিখন বহুদিন পরে শৈল পারে!
সুখের সময়ও সখীর স্মৃতি যে মন থেকে আজো যায়নি সরে,
কোমর বেঁধে কি চিঠির পাতায় দিয়েছো সে-কথা প্রমাণ করে?—
খবর না-রাখা দোষটা তো তুমি সব দেবে জানি আমারি 'পরে!
তোমার লেখার সময় কোথা গো?—গৃহিণী হয়েছো নূতন ঘরে!
বিয়ের বছরে বারোটা মাসের কে বলো জগতে হিসাব রাখে?
প্রথম প্রেমের প্রগাঢ় মিলনে নবপরিণীতা ডুবিয়া থাকে।

বলোনা রাণুদি, ভেঙেছে কি সেই কুমারী-মনের ধারণা তব,—
'সারাটি জীবন সুদূরে থাকিয়া বঁধুর স্বপনে বিলীন র'ব।
আত্মা মিলেছে আত্মার সাথে অন্তর লোকে আপনি যেথা,
নিত্যরসের মানস-লীলায় চিত্তে পরমানন্দ সেথা।
স্থূল-মিলনের নাহি প্রয়োজন—তুচ্ছ এ তনু প্রেমের কাছে!
দুটি হৃদয়ের ভাব-সঙ্গম—তার চেয়ে বড়ো আর কি আছে?—'
এই আদর্শ বুকে নিয়ে দিদি, ছিলে বহুদিন তাপসী হ'য়ে,—
এখন বোধ'য় বুঝেছো, মানুষ বাঁচেনা শুধুই স্বপ্ন ল'য়ে!
মাটির মানুষ আমরা রাণুদি! প্রকৃতি মোদের মিলন মাগে!
শাস্ত্র-পুঁথির পাহাড় ঠেলেও বক্ষে প্রেমের ঝরণা জাগে।

হৃদয় দিয়েছো, দাওনি নিজেকে, যখন তোমার প্রিয়র হাতে,—
বলো দেখি ভাই সেদিন এমন মনের প্রসাদ ছিল কি তা'তে?—
দেহটা বাতিল করি কিসে বলো?—এ' দেহে মোদের দেবতা প্রীত!
জীবনে ইহার অমোঘ প্রভাব স্বীকার করিতে হব কি ভীত?—
অন্তর-বা'র মেলে দু'জনার দেহের দেউলে যখন এসে,
এক হয়ে যায় যুগল জীবন নিবিড় প্রেমের পুলকাবেশে।
সব সঙ্কোচ সরম ভরম লাজুক মনের সকল ভীতি
নিমেষে মিলায়, আপনা বিলায়ে উপলে পরাণে পরমা প্রীতি।
আর তো তখন নহেক' দু'জন, পরস্পরের হৃদয় হতে
নারী ও পুরুষ মিলে মিশে চলে একটি সহজ জীবন-স্রোতে।
তা' বোলে ভেবোনা 'দেহবাদী' আমি তরুণ দলের ক্রয়েডী-মেয়ে,—
প্রেমহীন গেহে দেহের বিলাস ঘৃণা করি আমি তোমারো চেয়ে।
থাকুক ও-কথা। তোমার চিঠির জবাব এখনো লিখিনি মোটে!—
দেহতত্ত্বের দীর্ঘ আলাপে হয় তো বা তুমি উঠ্‌ছো চোটে!

অনেক যোজন দূরের খবর চেয়েছো অনেক দিনের পরে!—
পরম গুরুটি আছেন কেমন?—একাকী কী নিয়ে রয়েছি ঘরে?
বিরহবেদনা অসহ হলে কি নিশুতি নিশীথে কবিতা লিখি?—
অথবা উঠিয়া ছাদের উপরে বিকালে বসিয়া সেতার শিখি!—
প্রবাসী বঁধুর লিখন কখন ডাকের পিয়ন বহিয়া আনে?—
তোমাকে কেন সে লেখেনা কিছুই?—বিবাহ করেছো সে কি তা জানে?
শুনিতে চেয়েছো এমনি কত কি হাল্‌কা-হাওয়ার খবর মেলা!
পড়িয়া বুঝেছি সুখের সাগরে পরাণ তোমার করিছে খেলা!
ধন্য হয়েছে পরাণ তোমার, পরাণপ্রিয়র বক্ষে লুটি'!—
মনের মানুষে বরণ করিয়া প্রেমের গরবে উঠেছো ফুটি!
না মানি নিঠুর কঠিন মিথ্যা, দাঁড়ালে প্রাণের সত্য ল'য়ে,—
বিধাতা করুন সীঁথির সিঁদুর থাকুক্ তোমার উজল হ'য়ে।

'অমুকবাবু'র খবর ভালোই,—চিঠিও লেখেন দু'এক খানা!
কেমন আছেন এইটুকু শুধু বার দুই মাসে হচ্ছে জানা!
ডাকের মাশুল বেড়েছে জানো তো?—কাজেই ওটাও এসেছে কমে!
কাচ্ছা-বাচ্ছা গুটি দুই তিন,—দেনাও ক্রমশঃ উঠ্‌ছে জমে!

'অমুকবাবু' যে তোমাকেও চিঠি লেখেননা আর আগের মত,—
'ইক'নমি' তা'র প্রধান কারণ, পয়সা বাঁচান, পারেন যত!
অথবা জানো তো পুরুষ মানুষ, অমনি ধারাই ওদের রীতি;
আগে যে তোমার ছিলনা মালিক, পেয়েছিলে তাই অতটা প্রীতি।

মনে কি পড়েনা আমার সে কথা,—কলেজে যখন প্রথম ঢুকি,—
যুবতী যদিও হইনি তখনো, তবুও নহিকো নেহাত্‌-খুকী !
কহিতে শিখেছি চোখে চোখে কথা, পড়িতে শিখেছি আঁখির ভাষা !
রূপ-চঞ্চল পুরুষের দল তখনি করেছে অগাধ আশা !
আটাশ পাতার কমে তো কখনো মনেই পড়েনা পেয়েছি চিঠি !
একেলা ওবেলা হরেক রকম নতুন-প্রেমের 'পাব্‌লিসিটি' !—
কেহ বা ভক্ত, কেহ বা পূজারী, প্রণয়ী কেহ বা,—কেহ বা সখা,—
পাতায় পাতায় রঙীণ কালীতে আবোল তাবোল কত কি বকা !
কুমারী-হৃদয়-কমল-মধুর লুব্ধ মধুপ ছিল সে কত ;
আমার গুণের অনুরাগী হওয়া যেন বা তাদের জীবন-ব্রত !
তারপর যেই দিলাম মালাটি তোমার অমুক বাবুর গলে,—
কোথা গেল সেই প্রেমিকপুঞ্জ ?···পালালো সবাই বিয়ের ফলে ।

আমার ইনিও তেমনি তোমার পূজারী ছিলেন মহোৎসাহে,—
পূজার নেশাটা কেটেছে হয়তো, সহসা তোমার এ উদ্বাহে !
পুরাণো দলের না এলেও কেউ, নূতনের দল ফিরিবে পিছু !
দেবী-মন্দিরে ভক্তদলের ভীড়ের অভাব হবেনা কিছু !
এখনো তো দেবী হয়নি জীর্ণা, প্রত্নতত্ত্বে প্রাচীনশিলা,—
দীপ্ত-প্রতিমা জাগ্রতা যেগো, বহে চঞ্চল জীবনলীলা !
যতদিন তব ভ্রমরভ্রান্তি কালো-কেশজাল কাশ না হবে,
পরকীয়া-প্রীতি মহা আদর্শ পুরুষেরো প্রাণে বজায় র'বে !
মাড়ীর আসন ছাড়ি যবে ক্রমে পাড়ি দেবে তব দন্তরুচি,—
তখনি জানিবে ভুলেও ভক্ত ভেটিবেনা পূজা একটি কুচি !
ও'জাতির 'পরে আমি তো রাখিনে মনের কোণেও আস্থাটুকু !
—বড় জ্বালাতন ! রইলো কলম !!—ও-ঘরে বেজায় কাঁদছে খুকু !···

* * * *

দুষ্টু মেয়েটা চায়না ঘুমোতে,—ভুলিয়ে ভালিয়ে অনেক বোকে,—
চিঠিটা সারতে পালিয়ে এলুম খোকনের ঘাড়ে চাপিয়ে ওকে ।
দাদাটিকে তুমি জানিয়ো আমার স্নেহ-অকপট প্রণামখানি !
বছর না যেতে 'কবিতার খাতা' তাঁরি যত্নেতে কেটেছে জানি ।
তোমরা যাহার বন্ধু রাণুদি 'গরীব হোলেও সে নয় দীনা !
—বাধা দেবোনাক' সাধে তোমাদের, হোক্‌ পুনঃ ছাপা "বুকের বীণা" ।
অদল-বদল কোরে কিছু-কিছু, পাঠালুম 'খাতা' তোমারি কাছে ।
দিও দেখে-শুনে তোমরা দু'জনে, আমার ওখানে কে আর আছে ?

অপদেবতা

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নলিনী ত' আত্মহত্যা করিল গলায় দড়ি দিয়া।

এমন ঘটনা গ্রামদেশে সচরাচর ঘটে না, দৈবাৎ যদি-বা এক-আধটা ঘটে ত' তাই লইয়া অনেকদিন ধরিয়া আলোচনা চলিতে থাকে। ওই রকম আর-একটা কিছু আলোচনার খোরাক্ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহা আর সহজে বন্ধ হইতে চায় না।

গ্রামের মাঝখান দিয়া যে রাস্তাটি চলিয়া গেছে, তাহারই একপাশে প্রকাণ্ড একটি বকুলগাছের তলায় অনেক দিন হইতে মস্ত একটা শিমুলগাছের গদি পড়িয়া আছে। প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় দেখা যায়, একে একে লোকজন আসিয়া ওই গদিটির উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। শিমুলের গদি, কতটুকুই-বা লম্বা! শেষে এমন হয় যে, গদিতে যখন আর বসিবার জায়গা কুলায় না, তখন কেহ-বা বসে বকুলের শিকড়ের উপর, কেহ-বা বসে মাটিতে। এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে বেশ একটি মজ্‌লিস জমিয়া ওঠে। হুঁকাও আসে, কলিকাও আসে,—তামাক খায় আর গল্প করে।

আজকাল গল্পের ধারাটা চলিয়া গেছে অন্যদিকে। নলিনীর কথা ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন আর কোনও কথা নাই!

তা, আলোচনা করিবার মত ঘটনাই বটে। গ্রামের মাঝখানে অত বড় ওই জাগ্রত দেবতা বাবা-রুদ্রেশ্বর, মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে গেল কিনা একেবারে তাঁহার মন্দিরের সুমুখে—নাট্‌শালায়! মরিবার আর জায়গা পাইল না!

বাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের ও-পারে যাহাদের বাড়ী, এ-পাড়ার এই বকুল-তলার মজ্‌লিসে আজকাল তাহারা আর আসে না। না আসিবার জন্য দোষ দেওয়া বৃথা। কারণ মজ্‌লিস ভাঙিতে রাত্রি হয়; বাড়ী ফিরিবার রাস্তার উপরেই বাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দির, মাথা নোয়াইয়া সেখানে একটি প্রণাম না করিলেও চলে না, অথচ প্রণাম করিয়া মাথাটি তুলিবামাত্র সুমুখেই সেই নাট-শালাটা নজরে পড়ে।

একে ত' ওই অপমৃত্যুর মড়া, তাহার উপর 'ময়না-ঘরে' চালান্ গিয়াছে। না হইল সৎকার, না হইল শ্রাদ্ধ-শান্তি, না হইল ব্রাহ্মণ-ভোজন! বাড়ীতে তাহার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, সন্ধ্যায় একটা প্রদীপ পর্য্যন্ত জ্বলে না। বাড়ীটা তাহার ত' ভূতের আড্ডা হইলই, তাহা ছাড়া গ্রামের লোকের কখন্ যে কি হয় কে জানে।

ভয় একটু-আধটু সকলেরই হইয়াছে।

অবিনাশ সেদিন লণ্ঠন হাতে লইয়া ও-পাড়ার আরও দু'তিন জন লোকের সঙ্গে একরকম চীৎকার করিয়া গল্প করিতে করিতে এ-পাড়ার এই বকুল-তলার মজলিসে আসিয়া বসিল। তাহার ঘরখানিই নলিনীর ঘরের সবচেয়ে কাছে। লণ্ঠনের পলিতাটি খাটো করিয়া দিয়া মজলিসের মাঝখানে বসিল একেবারে রঞ্জনের গা ঘেঁসিয়া। মজলিসে তখন নলিনীর কথাই চলিতেছিল।

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরে অবিনাশ, কি রকম শুনছি যেন।'

অবিনাশ বলিল, 'ও-কথা আর বলিসনি রঞ্জন, গাঁ ছেড়ে পালাব ভাবছি। আর না হয় ত' তোরা এ-পাড়ায় একটু জায়গা-টায়গা দে।'

সকলেই অবাক! কারণ এই অবিনাশ ছোকরাটিই তাহাদের গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধ সাহসী। অন্ধকারে সে নাকি শ্মশানে গিয়াও একাকী বসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার মুখেই এই কথা!

শুনিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

অবিনাশ বলিল, 'শুনলে অবাক্ হবে, সন্ধ্যে হয়েছে কি বাস্, আমার ঘরে তখন খিল্ পড়লো। মতির মাকে বৌ-এর কাছে শুইয়ে রেখে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তবে এই আজ বেরোলাম বাড়ী থেকে। ছুঁড়ি আমার বৌটার কাছে মাঝে-মাঝে যেতো কিনা!···সেদিন আমার বৌ

তখন হেঁসেলে রান্না করছে। সন্ধ্যে বেলা। হঠাৎ বাবারে মারে বলে' চেঁচিয়ে উঠলো। আমি তখন এ-ঘরে আমার ছেলেটাকে ঘুম পাড়াচ্ছি। 'কি হ'লো ?' বলে' বেরিয়ে গিয়ে দেখি, লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে হোঁস্‌ফোঁস্ করতে করতে বৌ তখন ছুটে পালিয়ে আসছে। এ-ঘরে এসে সে আর বসতে পারলে না, একেবারে শুয়ে পড়লো। হাতের ইসারায় আমাকে কাছে ডেকে হাতখানা আমার চেপে ধরে ক্যাপার মত এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো। মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না! বললাম, 'জল খাবে ?' ঘাড় নেড়ে বললে, 'হাঁ।' জল আনবার জন্যে উঠতে গেলাম, কিছুতেই উঠতে দিলে না, বললে, 'না, যেয়ো না, মরে' যাব।' সব্বনাশ! কি হ'লো রে বাবা! আমি ত' ভয়েই অস্থির! শেষে অনেকক্ষণ পরে কথা কইলে। বললে, 'নলিনীকে দেখলাম। ঠিক সেই সাদা কাপড়টি পরে' আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। রান্না করছি। আমার পেছন দিক থেকে বললে, 'দাঁও।' নলিনীর গলার আওয়াজ পেয়ে চম্ করে' মাথাটা ঘুরে গেল। পিছন ফিরে দেখি—নলিনী আমার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে! চেঁচিয়ে যেম্‌নি সেখান থেকে উঠে আমি পালিয়ে আসতে যাব, দেখলাম, তখন মিলিয়ে গেছে। দেখলাম, কালো একটা বেড়ালের মত কি যেন আমার সুমুখ দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।'

এই বলিয়া অবিনাশ একটুখানি থামিল। সকলেই চুপ। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। হাওয়ায় শুধু বকুলগাছের পাতাগুলি সর্ সর্ করিতেছে।

অবিনাশ বলিল, 'তারপর শোনো। পরশু থেকে আবার আর-এক হাঙ্গামা। মানুষের গলাটা চেপে ধরলে কঁক্ কঁক্ করে' যেমন আওয়াজ হয়, ঠিক তেম্‌নি আওয়াজ! রাত তখন দুপুর। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই শুনি—তেমনি আওয়াজ হচ্ছে আমার উঠোনে। আমার ত' এত সাহস, তবু আমার তখন ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ হিম্ হয়ে গেছে। ভাবলাম, বৌ ঘুমোচ্ছে ঘুমোক্, ও যেন আর না শোনে। কিন্তু ও-ও যে জেগেছে তা বুঝতে পারিনি। খানিক বাদে বৌ বলছে, ওগো শুনছো ? বললাম, শুনছি। সাহস-টাহস কোন্‌দিক দিয়ে গেল উড়ে। ভয়ে-ভয়ে বাবা রুদ্রেশ্বরকে ডাকতে লাগলাম। বাবাই শেষে রক্ষা করলেন। শব্দটা ধীরে-ধীরে যেন ওপরের দিকে উঠতে লাগল, তারপর মনে হ'লো যেন সেটা ওই নলিনীর বাড়ীর দিকেই চলে গেল। কালও সে শব্দ আমি আবার শুনেছি।—ছেলে পুলে নিয়ে ঘর করি··· আমার ত' ভাই ভারি ভাবনা হয়েছে।'

তারিণী বলিল, 'ন্যাখো অবিনাশ, ওই শব্দটা—আমার মনে হয়, ও কিছু না। তোমার বাড়ীর পাশে ওই যে বড় অশ্বত্থগাছটা—ওখানে কতকগুলো বক্ থাকে। ও বোধ হয় ওই বকের গলার আওয়াজ। আমারও ঘরের সামনে ওই তেঁতুলগাছটার মাঝে মাঝে অম্‌নি কঁক্ কঁক্ আওয়াজ শুনতে পাই।'

রঞ্জন চীৎকার করিয়া উঠিল। বলিল, 'তোর গুষ্টির মাথা! দুপুর রাত্রে বক্ গেল ওর ঘরে ঢুকে আওয়াজ করতে! জানিস্‌নে-শুনিস্‌নে, কেন চেঁচাস্ বল্ ত,'—চুপ করে' থাক্!'

তারকব্রহ্ম মুরুব্বি-মানুষ। বয়স অনেক। মাথার চুল সব পাকিয়ে গেছে। এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া তিনি আস্তে আস্তে হুঁকা টানিতেছিলেন, হুঁকাটা আর-একজনের হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'না, বক নয়, বক নয়,। অবিনাশ ঠিকই বলেছে, শোন্ তবে বলি।'

এই বলিয়া তিনি একবার নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া চাপিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'গলায় দড়ি নিয়ে যারা মরে তারা অমনি ভূত হয়। ওদের বলে—গলোসী ভূত। আমাদের এ-ছুঁড়ি ত' ভূত হবেই, তাতে আর আশ্চর্য্য কি!'

অবিনাশ বলিয়া উঠিল, 'তাহ'লে কি করা যায় বলুন ত' দাদা, এ ত' ভারি বিপদ হ'য়ে উঠলো দেখছি।'

তারকব্রহ্ম বলিলেন, 'গয়ায় পিণ্ডদান করতে হবে, তা ছাড়া আর উপায় ত' দেখছিনে।'

এই বলিয়া তিনি হুঁকাটার জন্য আর একবার হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'এই ভূতগুলো ভারি বজ্জাত ভূত, বুঝলি ? ওরা চায়—আরও ওদের সঙ্গী হোক। শোন্ তবে—আমার একটা জানা ঘটনা মনে পড়লো—শোন্! আমার মামার বাড়ীর পাশে কলগাঁ বলে' একটা গাঁ আছে, —বুঝলি ? সেই কলগাঁয়ে আমার মামার বাড়ীর একটি চাষার মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। মেয়েটার স্বামীটা ছিল আস্ত জানোয়ার, ভারি মার্-ধোর্ করতো, কিছুতেই আর বনতো না, শ্বশুরবাড়ী থেকে মেয়েটা খালি পালিয়ে পালিয়ে

আসতো। মেয়েটার তখন একটি ছেলে হয়েছে। একদিন দুপুর বেলা, চাষা মাঠে গেছে, মেয়েটা সেই অবসরে তার ছেলেটাকে কোলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়ে এলো। গ্রীষ্মকাল। রোদ্দুরে চারিদিক তখন পুড়ে যাচ্ছে। বাড়ীর বা'র হয় কার সাধ্যি! গাঁয়ের কাছাকাছি এসে একটা পুকুরে খানিক্ জল খেয়ে মেয়েটা একটা আমগাছের ছায়ায় চুপ করে' বসলো। হঠাৎ শুনলে—গাছের ওপর থেকে কে যেন বলছে, 'গলায় দড়ি নিবি? নে না, গলায় দড়ি নিয়ে মর্ না!' মেয়েটা অবাক্ হ'য়ে গাছের পানে তাকিয়ে দেখল—কেউ কোথাও নেই। ধীরে-ধীরে সেখান থেকে উঠে সে বাড়ী চলে গেল। মেয়েটার মা ছিল বাড়ীতে। শ্বশুরবাড়ী থেকে আবার তাকে পালিয়ে আসতে দেখে মা ত' খুব একচোট গালাগালি করলে। মেয়েটা কাঁদতে লাগল। তারপর হলো কি,—ঠিক সন্ধ্যের মুখে ছেলেটাকে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে রেখে পুকুরে কাপড় কাচতে যাচ্ছি বলে' মেয়েটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যখন গেল তখন সূয্যি ডুবছে। তারপর ধীরে-ধীরে সন্ধ্যে হ'লো, রাত হ'লো, কিন্তু মেয়েটা আর ফেরে না! কোথায় গেল তা'হ'লে? মা বেরোলো খুঁজতে, ভাই বেরোলো, কিন্তু কেউ আর তার কোনও সন্ধান পেলে না। তার পরদিন সকাল বেলা দেখা গেল, মেয়েটা সেই আমগাছের একটা ডালে গলায় দড়ি দিয়ে মরে' ঝুলছে। তাদেরই গোয়ালের বাছুর-বাঁধা দড়িটা বোধ হয় সে হাতে করে' নিয়ে গিয়েছিল।—গলোসী ভূতগুলো এমনি বজ্জাত! বুঝলি? কেউ যদি মরব ভেবেছে, তার আর রক্ষে নেই।'

শুক্লপক্ষ গত হইয়াছে। শুভ্র সুন্দর জ্যোৎস্না আর নাই। তাহার পরিবর্ত্তে গ্রামের চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। শেষ পর্য্যন্ত মীমাংসা কিছুই হইল না, কিন্তু মজলিস তাহাদের সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ভাঙিয়া গেল।

নয়। সকলেই তাবে বুঝি নলিনীর প্রেতাত্মা অন্ধকারে গ্রামের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কত রকমের কত কথা যে গ্রামের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। উপদ্রব যে একা অবিনাশের বাড়ীতেই সুরু হইয়াছে তাহা নয়। ভুবন বলে, সেদিন সে ভিন্নগ্রামে গিয়াছিল চাষাদের বাড়ী শ্রাদ্ধ করাইতে, ফিরিতে তাহার সন্ধ্যা হইয়া গেল। যা থাকে কপালে বলিয়া বাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের পাশ দিয়াই সে বাড়ী ফিরিতেছিল। অন্ধকারে সাদা ধপ্‌ধপে কাপড়-পরা একটি মেয়ে ঠিক মন্দিরের সুমুখে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া ভাবিল হয়ত গ্রামেরই কেহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিতে আসিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

এবং জিজ্ঞাসা করিয়াই তাহার মুখের পানে তাকাইতে গিয়া ভুবনের মাথার ভিতরটা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া গেল, ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। হুবহু নলিনী! সর্ব্বনাশ! চীৎকার করিতে গিয়া মুখ দিয়া তাহার আর কথা বাহির হইল না, ছুটিয়া পলাইতে গিয়া দেখে, পা যেন আর চলে না। মনে মনে রাম নাম উচ্চারণ করিয়া প্রাণপণে দু' পা আগাইয়া গিয়া পিছন ফিরিয়া দেখে, কেহ কোথাও নাই! ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কোনরকমে পা চালাইয়া দৌড়িয়া হাঁপাইয়া জীবন লইয়া যখন সে তাহার বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল তখন ভুবন আর সে-ভুবন নাই। ভয়ে একেবারে আধ-মরা হইয়া গেছে। বৌকে বলিল, 'দাও, জল—' আর কিছু তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

বৌ জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কি! হাঁপাচ্ছ কেন গা?' বলিয়া সে জল আনিয়া দিল।

ঢক্‌ঢক্ করিয়া একগ্লাস জল খাইয়া ধড়ে তাহার প্রাণ আসিল।

পল্লীগ্রামে চিরকাল যাহাদের অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়ানো অভ্যাস, আজকাল তাহারাও আর সন্ধ্যার পর একা বাহির হয় না। একান্ত প্রয়োজনে যদিই-বা কাহাকেও কোথাও যাইতে হয় ত' আর-একজনকে সঙ্গে ডাকিয়া

গোয়াল-ঘরে ঝট্‌পট্ শব্দ শুনিয়া রঞ্জন সেদিন রাত্রে লণ্ঠন লইয়া গোয়ালে গিয়া দেখে, গরুর গলার দড়িগুলা কে যেন খুলিয়া দিয়াছে।

গ্রামের চৌকিদার রাত্রে হাঁক দিতে বাহির হইয়া

রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের ও-পার হইতেই ফিরিয়া যায়। সাহস করিয়া প্রথম কয়দিন সে ওই জায়গাটা চোখ বুজিয়া দৌড়িয়া পার হইয়া যাইত, কিন্তু পিছন দিক হইতে একদিন একটা ঢিল আসিয়া তাহার গায়ে লাগে, আর-একদিন মনে হয় যেন নলিনীর ভিটের মাঝখানে বাতাবী-লেবুর গাছটা কে যেন সজোরে ঝড়্ঝড়্ করিয়া নাড়া দিতেছে—বাস্, সেইদিন হইতে চৌকিদারেরও ভয় হইয়া গেছে।

মেয়েরা ত' প্রায়ই দেখে, কখনও কুকুরের মত, কখনও বিড়ালের মত রূপ ধরিয়া নলিনী তাহাদের চোখের সুমুখ দিয়া পার হইয়া যায়।

এমনি আরও কত-কি !···বিভীষিকার আর অন্ত নাই!

বকুল-তলায় মজলিসে সেদিন কথা উঠিল, নলিনী ভূত হোক্ আর যা-ই হোক্, তাহার বাড়ীতে যে-সব জিনিসপত্র আছে, সেগুলার একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলা উচিত। গ্রামে গরীব-দুঃখীর অভাব নাই, জিনিসগুলি তাহাদের দান করিয়া দেওয়া হইবে এবং টাকাকড়ি যদি কিছু থাকে ত' তাই দিয়া তাহার বাড়ীতে হোক্ কিম্বা যেখানে মরিয়াছে সেইখানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া দেওয়া হইবে। আর ধানের জমিগুলির উৎপন্ন ফসল হইতে প্রতি বৎসর বাবা রুদ্রেশ্বরের গাজনের সময় রামায়ণ গান কিম্বা এমনি যা হোক্ একটা সৎকর্ম্ম করাইয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

ভাল কথা।

সকলেই তাহাতে রাজি হইল। সভায় অবিনাশ উপস্থিত ছিল। সে-ই সর্ব্বপ্রথম বলিয়া উঠিল, 'তা তোমরা জমির ফসল দিয়ে যা খুসী তাই কর বাবা, কিন্তু ওর জিনিসপত্র কে নেবে শুনি? সর্ব্বনাশ! যে নেবে, ছুঁড়ি কি তাকে ছাড়বে ভেবেছ?—আর ওর ঘরেই বা ঢুকতে যাবে কে?'

তারকব্রহ্ম বলিলেন, 'দিনের বেলা আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে ঘরে ঢুকব, তাতে আর কি হয়েছে?'

তাহাই স্থির হইল। আগামী কাল সকালে কিম্বা দুপুরে স্নান করিবার আগে যে যে যাইতে চায় সকলে মিলিয়া এক জোট হইয়া উহার বাড়ীতে গিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। এবং তাহার পর যাহা হয় সেইখানে গিয়া স্থির করিলেই চলিবে।

অবিনাশ বলিল, 'দোহাই বাবা, আমাকে ডেকো না কিন্তু। যেতে হয় তোমরাই যেয়ো।'

সেইদিনই গভীর রাত্রে রামাইএর বন্ধ দরজায় টুক্ টুক্ করিয়া ঘা দিয়া রঞ্জন ডাকিল, 'রামাই!'

ঘরের ভিতর হইতে ভয়ে-ভয়ে রামাই সাড়া দিল—'কে?'

'আমি রে রঞ্জন। বেরিয়ে আয় দেখি একবার!'

'কেন রে? এত রাত্রে?' বলিয়া রামাই বাহির হইয়া আসিল। দেখিল রঞ্জনের হাতে একটা খাটো লাঠি। চুপি চুপি বলিল, 'শোন্!'

বলিয়া রঞ্জন তাহাকে ঘরের বাহিরে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'চল্ আমার সঙ্গে। ছুঁড়ির জিনিসপত্তরগুলো বার করে' নিয়ে আসি। তারপর দু'জনে ঘরে এসে ভাগাভাগি করে নিলেই হবে।'

রামাই একটুখানি অবাক্ হইয়া গিয়া বলিল, 'সে কিরে! এই অন্ধকার রাত্রে···আর যেরকম সব শুনছি···'

রঞ্জন বলিল, 'আরে দূর্! কিছু হবে না—চল্। ওর টাকাকড়ি আছে আমি জানি, আর তাছাড়া গয়না-গাঁটিগুলোও ত' আছে!'

রামাই আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। ভয়ে-ভয়ে বলিল,—'চল্। এমন জানলে একদিন দিনের বেলাতেই চুপি চুপি···'

রঞ্জন বলিল,—'দূর্ পাগল! দিনের বেলা এ সব কাজ কখনও হয়?'

রামাই জিজ্ঞাসা করিল, 'আলো একটা নিলে হ'তো না?'

রঞ্জন বলিল,—'দেশলাই আছে।'

বাবা রুদ্রেশ্বরকে একটি প্রণাম করিয়া দুজনে ধীরে-ধীরে সতর্ক পদবিক্ষেপে নলিনীর বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইল।

অন্ধকার নিঝুঝুম রাত্রি। ঝিঁঝিঁপোকার শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনও শব্দ নাই।

দরজা খোলাই ছিল। কিন্তু যেই তাহারা পা বাড়াইয়া ভিতরে ঢুকিতে যাইবে, দেখিল, সুমুখে কে একটা লোক যেন ঘর হইতে বাহির হইতেছে। রামাই ত' ভয়ে কাঠ! থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া সে রঞ্জনকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিতে যাইতেছিল, রঞ্জন্ বলিল, 'চুপ্!' ভয় যে তাহারও হয় নাই তাহা নয়, তবু সে সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

যে লোকটা আসিতেছিল সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন তখন দিয়াশালাই জ্বালিয়াছে। তাহারই অস্পষ্ট আলোকে দেখিল—লোকটি আর কেহ নয়, অবিনাশ। তাহার কাঁধে একটা টিনের বাক্স, আর হাতে একটা কাপড়ের গাঁঠ্রি!

রামাই অবাক্! যে-অবিনাশ ভূতের ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, সেই অবিনাশকে একাকী এই অন্ধকার রাত্রে এখানে এই অবস্থায় দেখিবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করিল, 'সবই কি শেষ করে' ফেল্লি নাকি অবিনাশ?'

অবিনাশ বলিল, 'কোথা পাবি? কি আছে ছাই যে শেষ করব! দাঁড়া, আসছি।'

বলিয়া সে জিনিসগুলা বোধ করি বাড়ীতে তাহার রাখিয়া আসিতে গেল।

রামাইএর এতক্ষণে ভরসা হইল। বলিল, 'চল রঞ্জন, কি আছে না আছে আমরা দেখি ততক্ষণ।'

দু'জনে এঘর-ওঘর তন্ন তন্ন করিয়া দিয়াশালাই জ্বালিয়া জ্বালিয়া খুঁজিয়া দেখিল, একটা ঘরের মাঝখানে নলিনীর স্বামীর গাঁজার কলিকাটি মাত্র পড়িয়া আছে, আর রান্না-ঘরটা অবিনাশ বোধ হয় খুঁজিয়া দেখে নাই। সেখানে রহিয়াছে মাত্র দুইটি জলের ঘটি।

দুইজনে দুইটি ফাঁকা ঘটি হাতে লইয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে, এমন সময় অবিনাশ ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'পেলি কিছু?'

রঞ্জন বলিল, 'দূর শালা তুই সবই নিয়ে গেছিস ত' আর পাব কি?'

অবিনাশ বলিল, 'মাইরি না। বাবা রুদ্রেশ্বরের দিব্যি করে' বলছি, শুধু ওই ফাঁকা টিনের বাক্সটা এইখানে হাঁ হয়ে পড়েছিল—আর কিচ্ছু পাইনি। এতদিন ধরে এমনি খোলাই পড়ে রয়েছে, শালা চোরে কোন্ সময় সব চুরি করে' মেরে দিয়েছে হয়ত।'

রামাই বলিল, 'বুদ্ধি করে' আমাদের মাইরি আরও আগে আসতে হতো।'

রঞ্জন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'শালা চোরের কি ভূতের ভয়ও নেই রে!'

অবিনাশ বলিল, 'তবে আর চোর বলেছে কাকে!

পরদিন দুপুরে গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী একত্রিত হইয়া ভক্তি-ভরে বাবা রুদ্রেশ্বরকে প্রণাম করিয়া নলিনীর বাড়ী ঢুকিয়া দেখে, কোথাও কিছুই নাই।

অবিনাশ কিন্তু কিছুতেই ঘরে ঢুকিল না। অনেকখানি তফাতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, 'না বাবা, এম্‌নিতেই বলে আমার যা হবার তাই হচ্ছে, তার ওপর আবার ঘরে ঢুকে কেন বাবা—'

বাহিরে যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারাও তাহাকে নিষেধ করিল। বলিল, 'না বাপু, তোমার বাড়ীতে যে রকম উপদ্রব শুনছি তাতে তোমার আর ঢুকে কাজ নেই।'

রামাই ও রঞ্জন দূরে দাঁড়াইয়া পরস্পরের মুখের পানে একবার চাওয়াচাওয়ি করিল মাত্র।



সুইজারল্যাণ্ড

ডাক্তার শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, ডি-এসসি ; এম্-বি ; এম্-আর-সি-পি

(১)

লুসার্ণ, গসেনেন্ ও এন্ডারমট্

রাত প্রায় দশটায় বার্লিন হতে সুইজারল্যাণ্ডের লুসার্ণ অভিমুখে রওয়ানা হলুম। গাড়ীতে উত্তাপের জন্ম চমৎকার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমাদের বেশ শীত লাগছিল। তাই দুই বন্ধুতে কম্বল মুড়ি দিয়ে, নিজকে যতদূর সঙ্কুচিত করা সম্ভব, তাই করে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। গাড়ীতে লোকের ভিড় ছিল না, তাই সারা রাত্রি দিব্যি আরামে, (এবং সম্ভবতঃ নাক ডাকিয়ে!) যা' ভোগ করা গেল, তাকে সুনিদ্রা বলা যেতে পারে! ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর, গাড়ীর জানালা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই, অতি চমৎকার দৃশ্য দেখতে পেলুম! যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যায়, শুধু সাদার পর সাদা,—ঘর বাড়ী, গাছ লতা পাতা, ঘাট, মাঠ, পথ সবই যেন একসঙ্গে শুভ্র অপরূপ বেশে সজ্জিত হয়ে আছে! দেখে মনে হল, সারা রাত্রিই অনবরত বরফ পড়েছে, অথচ গাড়ীর ভিতরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আমরা তা' একটুও বুঝতে পারি নি। এ রকম তুষারপাত, এডিনবরায় পূর্ব্বে দু' একবার আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল ; কিন্তু, বন্ধুবরের কাছে এ দৃশ্য একেবারে নূতন! তাই মুখুয্যে ভায়া, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে, পুলকিত চিত্তে প্রকৃতির এই শুভ্র বেশ দেখছিলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা সম্ভবপর নয়, কারণ, এমন চমৎকার বলেই বোধ হয় অনেকক্ষণ তা' ভোগ করা যায় না ; চোখে ধাঁধাঁ লাগে, এবং স্বভাবতঃ নীলবর্ণের নানা রকমের after-imageসমূহ চোখের সামনে ভাসতে থাকে! কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা আমাদের চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলুম। আবার চেয়ে দেখতে লোভ হচ্ছিল, আবার খানিকক্ষণ শুভ্রাবগুণ্ঠনার মুখের পানে নির্ল্লজ্জের মত তাকিয়ে পুনরায় চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছিলুম!

খবর করে যখন জানা গেল, গাড়ীতে খাবার কোন ব্যবস্থা নাই, তখন মনে মনে বেশ অস্বস্তি ভোগ কচ্ছিলুম। বাইরে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু বরফ আর বরফ! মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগ, তার উপর সময় প্রাতঃকাল! এমন সময় যদি এককাপ্ গরম চায়ের ব্যবস্থা না হয়, তাহলে, মন খারাপ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক! সুতরাং বন্ধু দুজন, একে অন্যের মুখের পানে চেয়ে, কয়েকটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চা-বিরহের ব্যথার ভার লঘু করবার চেষ্টা কচ্ছিলুম,—আর যে সব ষ্টেশনে গাড়ী থামছিল, সেখানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে দেখছিলুম বাঞ্ছিতের দর্শন পাওয়া যায় কি না। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! তখন বলাবলি কচ্ছিলুম, 'না জানি কার মুখ দেখে উঠিয়াছি আজি, প্রভাতে মিলিল না এক কাপ্ চা।' তার পরই খেয়াল হল, গাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তির অভাবে,—বন্ধুবর আমার এবং আমার বন্ধুবরের মুখ দেখে উঠা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না! তখন বেগতিক দেখে, চায়ের সঙ্গে মুখ-দেখাদেখির পরিকল্পনাটা বন্ধ কর্ত্তে হলো ; কারণ বন্ধুবর ও আমি কেউই স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলুম না, কারো মুখ অতটা 'অপয়া' যে ভোর বেলা তা' দেখে উঠ্‌লে চায়ের কাপ্ শুকিয়ে যায়! প্রমাণ ছিল স্থূল ও প্রত্যক্ষ,—একই স্থানে সহকর্ম্মীরূপে, ভারতবর্ষের ও ইয়োরোপের নানা স্থান ভ্রমণের সঙ্গী রূপে সেই মার্চ্চ মাসের ভোরবেলার মত দুর্ভাগ্য আর ত কখনো হয় নি!

দিবালোকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাড়ীতে, কজন সঙ্গিনী, দু একজন সঙ্গী, ও গুটিকয়েক মানব-শাবক, এসে আমাদের দ্বয়িত্ব ভঙ্গ কর্লেন! তাদের প্রায় সবই সুইস, অনেকটা দেখতে আমাদের দেশের পাহাড়ে জাতি—ভুটিয়া, খাসিয়া প্রভৃতির মত! বলিষ্ঠ নাতিদীর্ঘ দেহ, গোলগাল মুখ, একটু চাপা নাক,—সবই আমাদের দেশের পার্ব্বত্য জাতিদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল! সুইস্ জাতীয়দের ভাষা, যদিও হয় ফরাসী, নয় জার্ম্মেণ, নয় ইটালীয়, তবু লক্ষ্য কর্লুম অনেকেই অল্পবিস্তর ইংরেজী জানে! গাড়ীতে

তাই মহিলাদের সঙ্গে আমরা ইংরেজীতে মাঝে মাঝে আলাপ কচ্ছিলুম। ছেলেমেয়েগুলি ইংরেজী জানে না, তাই হাঁ করে আমাদের পানে তাকিয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছিল! বেলা বারোটার কিছু পরে গাড়ী এসে বাল ষ্টেশনে থামলো! পেটে ক্ষিদেও বেশ পেয়েছিল, তাই বন্ধু ছুটলেন খাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে! কিছুক্ষণ পরেই, কতকগুলি বিস্কুট, আপেল, কলা প্রভৃতি নিয়ে ফিরে এলেন। তাই দিয়ে গাড়ীতে বসেই একসঙ্গে প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করা গেল! ছোট ছোট ছেলে মেয়ে কটিকে, খানকয়েক বিস্কুট ও ক'টা ফল দিতে গেলে, তারা কিছুতেই নিতে চায় না! তার পর যখন তাদের মায়েরা বলে দিলে যে নিতে পারে, এতে আপত্তির কিছু নেই, তখন তারা হাসিমুখে ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে সেগুলি নিলে ও মায়েদের নির্দ্দেশমত তাদের নিজের নিজের ভাষায় ধন্যবাদ জানালে।

কাষ্টম অফিসারেরা তাঁদের কর্ত্তব্য যা' করে গেলেন—আমাদের বেলা তাকে "নামকো ওয়াস্তে" ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। সঙ্গে চুরুট আছে কি না, ক্যামেরা প্রভৃতি আছে কি না, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা কর্ত্তে বন্ধুবর, গলায় ঝুলানো সদ্যঃক্রীত নাম-লেখা ক্যামেরা দেখিয়ে বল্লেন যে এটা নিজস্ব, আবশ্যকীয় জিনিষ! দেখা গেল লোকগুলি ভদ্র, আর বিনা বাক্যব্যয়ে, মালপত্রগুলি পাস্ করে দিয়ে চলে গেল! অথচ তখন ওভারকোটের পশ্চাতে সন্তোষের বন্ধু অজিতবাবুর জন্য কেনা নূতন 'ফিল্ড-গ্লাস'টি দিব্যি ট্রেনের গায়ে ঝুলছিল! তাই কথা বলতে গিয়ে বন্ধুবরের বুক দুরুদুরু কচ্ছিল, আর দু' একটা কথা ভীষণভাবে আটকে যাচ্ছিল। এ জন্য আমিই অকুণ্ঠিত চিত্তে, তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, তার পক্ষে কষ্ট করে বলার শ্রমটা সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছিলুম! সুতরাং অফিসারদের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, বন্ধুবরের 'দেহে যেন প্রাণ এল, যাক, বাঁচা গেল' বলে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নিজকে একেবারে হাল্কা করে ফেল্লেন।

বাল্ ছেড়ে যতই আমরা লুসার্ণের পথে এগিয়ে যাচ্ছিলুম, রেলওয়ের দুপাশে বরফের পরিমাণ ততই বেড়ে চলেছিল! কোন কোন স্থানে রেলওয়ে লাইনকে পর্য্যন্ত বরফ সরিয়ে পরিষ্কার করে, গাড়ীর পথ করে দিতে হচ্ছিল! তুষারপাতের তখন পর্য্যন্ত বিরাম নেই! শাদা পেঁজা তুলার মত উড়ে এসে গাড়ীর কাচের জানালার উপর পড়ে, সেগুলিকে ঝাপ্সা করে তুলছিল! তাই মাঝে মাঝে আমাদের রুমাল দিয়ে জানালাগুলি পরিষ্কার করে, তবে জানালার বাইরের দৃশ্য তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছিলুম আমরা! এম্নি করে প্রায় ঘণ্টা দুই এগিয়ে, বেলা তিনটার সময় এসে গাড়ী লুসার্ণে থামল।

লুসার্ণ, 'আলোর আলোকময়' সহর নামে প্রসিদ্ধ! ইয়োরোপের মধ্যে সুইজারল্যাণ্ড্ প্রকৃতির নীলানিকেতন বলে পরিচিত! নদ, নদী, হ্রদ, গিরির এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ সত্যই বিরল! প্রকৃতির রম্য উপবনের মত সহরগুলির মধ্যে লুসার্ণ সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বলে বিখ্যাত! তার উপরে, সুইজারল্যাণ্ডের পৌরাণিক ইতিহাসের সঙ্গেও সহরটির নাম বিজড়িত আছে। লুসার্ণ হতে ফ্লুয়েলেন্ এবং কুশনাক্‌ট হতে আল্‌প্‌নাষ্টাড্ পর্য্যন্ত, সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামের লীলানিকেতন ছিল, এবং বারবার এই ক্ষুদ্র দেশের বীরপুত্রদের হৃদয়শোণিতে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। এখনকার চেয়ে, কয় শতাব্দী আগে, লুসার্ণ নানা কারণে সুইস্ সহরগুলির মধ্যে প্রধানরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল! তা' ছাড়া লুসার্ণ হ্রদটিও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়! এই সব নানা কারণেই আমরা লুসার্ণে নামা ঠিক করেছিলুম। গাড়ী হতে নেমেই, কুক্ কোম্পানীর নির্দ্দেশমত, হোটেলের উদ্দেশে একখানা ট্যাক্সি করে রওয়ানা হলুম। কিন্তু অবিরল তুষারপাত এবং প্রকৃতির বিষণ্ণ বিরস ভাব দেখে মন অত্যন্ত দমে গেছিল। ক'মিনিট পরেই ট্যাক্সি এসে হোটেলের দরজায় থামলো! ভাড়া চুকিয়ে দিতে গিয়ে দেখা গেল, গাড়ীতে মিটার নেই, আর তারই সুযোগে ট্যাক্সি-চালক যা' ভাড়ার দাবী কর্লে, তাও অত্যন্ত বেশী বলে মনে হোলো। হোটেলের পোর্টারকে জিজ্ঞেস কর্লে সেও বল্লে, লুসার্ণে গাড়ীতে মিটার থাকে না, এবং ট্যাক্সি চালক যা' চাইছে, তাই তার ন্যায্য পাওনা। দিতে হলো বটে তাই, কিন্তু বন্ধুবর ও আমি দুজনের কেউই বিশ্বাস কর্ত্তে পারি নি যে লোকটা আমাদের ঠকায় নি। হোটেলের পোর্টারের সমর্থনের ভঙ্গী দেখে মনে হলো হয় ত বা তারা দুজন মাস্‌তুতো ভাই।

লটবহর নিজেদের কামরায় রেখে, হোটেলের রেস্তঁরায়

ঢুকে সারা দিনের পর চা-যোগ পর্ব্ব শেষ করা গেল! আমাদের বিদেশী দেখে, বোধ হয় একটু বেশী রকমের উৎসুক ভাবেই হোটেলের পরিচারিকা আমাদের তৃপ্তি-সাধনের জন্য নিতান্ত উন্মুখ হয়ে আছে, এটা বেশ টের পাওয়া গেল! এ রকমে তখনকার মত পরিতৃপ্তি সহকারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, দুই বন্ধু হোটেলের বাইরে এলুম এবং দিনের বাকী সময়টুকুর সদ্ব্যবহারের জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম, আকাশের গুমোট ভাবের দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করে! কিন্তু তার ফল ভুগতে হলো, ক'মিনিটের মধ্যেই। আকাশ ভেঙে অবিরল ধারে, ধরণীর বুক সিক্ত করে বৃষ্টি নাম্‌লো। আমরা একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার বারান্দায় গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলুম। সেখানে মিনিট পনেরো দাঁড়ানোর পর, বারিধারা একটু সংযত হলে, আবার দুজনে চলতে আরম্ভ কল্লুম! মিনিট পাঁচেক চলার পর, আবার ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো, এবং সর্ব্বাঙ্গে 'বারিধারা বহে দরদর' অবস্থাতেই আমরা দুজন গিয়ে ছুটতে ছুটতে, জেনারেল পোষ্টাফিসের বারান্দায় দাঁড়ালুম। দুজন কালা আদমিকে এ রকম বৃষ্টির মাঝে ছুটতে দেখে অনেকেই আমাদের পানে ব্যগ্রভাবে দৃষ্টিপাত কচ্ছিল। পোষ্টাফিসের বারান্দার কোণে দাঁড়িয়েও দেখতে পেলুম, অভ্যন্তরস্থিত দুচারিটি মহিলা-কর্ম্মচারীর ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টি আমাদের পানে এক রকম অপলক ভাবেই নিবদ্ধ আছে।

পোষ্টাফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তখন দুজনের জল্পনার বিষয় হয়েছিল, এ রকম দুর্য্যোগের মাঝে কি করে সন্ধ্যা কাটানো যায়!—এ দিকে আবার সময় সঙ্কীর্ণ, সুতরাং সহর ঘুরে দেখা স্থগিত রাখারও কোন উপায় ছিল না। তাই দুই বন্ধুতে স্থির করা গেল যে, যেমন করেই হউক অদূর-স্থিত ষ্টীমার-ঘাটে পৌছতে হবে, এবং রাত দশটা পর্য্যন্ত লুসার্ণ লেকে বেড়িয়ে আসা ছাড়া, কর্ত্তব্যর মত আর কিছু হতে পারে না! তাই বৃষ্টির বেগ সামান্য প্রশমিত হওয়া মাত্রই, অল্প বৃষ্টি মাথায় করেই দুজন ছুট্‌লুম অদূরস্থিত ষ্টীমার-ঘাটের উদ্দেশে! ষ্টীমার-ঘাটে তখন অনেক যাত্রীই অপেক্ষা কচ্ছিল; দেখে মনে হল, সারা দিনের কর্ম্ম-ক্লান্ত দেহে তারা দিবাবসানে যার যার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম-সুখ উপভোগের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে! সেই ভিড়ের মধ্যে তাকিয়ে স্পষ্টই মনে হ'ল, যে, এমন দুর্য্যোগময়ী সন্ধ্যায় বেড়াবার সখ বুকে নিয়ে জাহাজের অপেক্ষায়, "সৃষ্টিছাড়া, ছন্নছাড়া, লক্ষীছাড়া…" আর তৃতীয়টি সেখানে ছিল না। প্রায় আধঘণ্টা পরে জাহাজ এল, আর জলের ঝাপ্‌টা সহ্য করে, অপূর্ব্ব সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে, আমরা দুইজন জাহাজে চড়লুম। এম্নি অসময়ে এ ভাবে ভ্রাম্যমান, বিদেশীর দর্শন লাভ যে একান্ত বিরল, তা' জাহাজের উপরিস্থিত প্রত্যেক নরনারী ও ছেলেমেয়ের বিস্মিত ভাব দেখে বেশ বুঝতে পারা গেল।

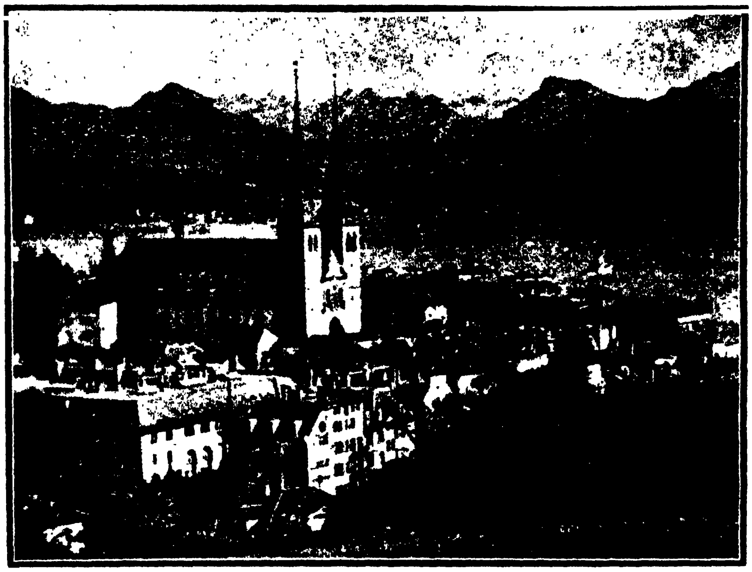
ভেবেছিলুম, যে, জাহাজে চড়ে হয়ত দুপাশের দৃশ্যাবলী দেখতে পাবো, কিন্তু বৃথা আশা! একে ত রাত্রিকাল, তাতে আবার বাইরে অনবরত জল ঝরছে। সুতরাং সেই দুর্য্যোগময়ী রাত্রিতে, লুসার্ণ হ্রদে এ্যাড্‌ভেঞ্চার করা ছাড়া আর মনে কোন সান্ত্বনা ছিল না। লুসার্ণ হতে জাহাজ, হ্রদের সুনীল জল, আর ঝড়ো হাওয়া ভেদ করে—এগিয়ে চল্লো! মাঝে মাঝে দু'একটা ষ্টেশনে থামছিল, আর দু একজন যাত্রী উঠানামা কচ্ছিল, অবশ্য বৃষ্টিতে আপাদ-মস্তক ভিজে! এম্নি করে আমরা এগ্নিলেজ, মেগেনহর্ণ, হার্টেনষ্টিন ও ওয়েগ্‌গিস্ হয়ে ভিজনার্ড্‌তে পৌছলুম। এ স্থান হতেই সুপ্রসিদ্ধ 'রিগি' পর্ব্বতে যেতে হয় এবং সে স্থান পর্য্যন্ত রেলওয়ে আছে। দুরদৃষ্ট বশতঃ আমাদের সেখানে যাওয়ার পক্ষে পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিছুই অনুকূল ছিল না। সেজন্য মনের খেদ মনেই চেপে আমরা ভিজনার্ডতে নামলুম, কারণ লুসার্ণ হতে ওখান পর্য্যন্তই আমাদের রিটার্ণ টিকিট ছিল। ভিজনার্ডতে আমাদের সঙ্গে আরো দু'একজন নামলো', উঠলো বোধ হয় একজন! ছোট্ট ষ্টেশন; দু'একজন জাহাজের কর্ম্মচারী ছাড়া, অন্ধকার রজনীতে জনমানবের সাড়া কোথাও নেই! বাইরে তেম্নি দুর্য্যোগ চলছে, আর ষ্টেশনে যে দু একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে ঝড়ের ঝাপ্‌টা খেয়ে তারাও যেন একেবারে হিম্‌সিম্ খেয়ে গেছে! মনে হচ্ছিল, যে আলোর খেলা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে সুইজারল্যাণ্ডে এলুম, কোথায় সেই আলো, আর কোথায় তার সৌন্দর্য্য! আমরা যেন পথ ভুলে, কোথায় যেতে, কোথায় গিয়ে ঠিক্‌রে পড়েছি। তাই বাইরের বিরস বিমর্ষ ভাবের চেয়ে, আশাভঙ্গজনিত আমাদের মনের নৈরাশ্যও বড় কম ছিল না! তাই দুই বন্ধুকে, এটা নেহাৎ দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিতে হ'ল। একজন কর্ম্মচারীকে

জিজ্ঞেস করে যখন জানতে পারা গেল যে, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই, লুসার্ণে ফিরে যাবার জাহাজ পাওয়া যাবে, তখন খানিকটা আশ্বস্ত হওয়া গেল, কারণ, ষ্টেশনে ততক্ষণ দাঁড়িয়েই কাটাতে হচ্ছিল, বসবার উপযুক্ত আসনের অভাবে। দু' একখানা আসন যে না ছিল তা নয়, তবে ক্রমাগত জলে ভিজে তাদের অবস্থা মোটেই আরামদায়ক ছিল না।

সেই জাহাজখানাই সে রাত্রির মত শেষ জাহাজ; তাতে করেই বেশ গভীর রাত্রিতে হোটেলে ফেরা গেল। পরদিন কতকগুলি চিঠিপত্র লেখার আবশ্যক ছিল, তাই জাহাজেই সুইস্ পোষ্টেজ্ পাওয়া যায় জেনে, তারই কতকগুলি কিনে আনা হয়েছিল। খাবার ঘরে গিয়ে দেখি তখনো সেখানে বেশ ভিড়। তারই এক প্রান্তে আগুনের ধারে বসে খেতে খেতে নিজেদের বেশ তাতিয়ে নেওয়া গেল। আমাদের পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকাটি, পরিবেশন কালে আমরা কতদূর গিয়েছিলুম, ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে কেন গেলুম, বড় বিশ্রী রাত করেছে, আমাদের কেমন লাগছে, ইত্যাদি বলে আমাদের শ্রমোপনোদনের চেষ্টা কচ্ছিল। তার সেই সযত্ন পরিচারণাটুকু বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

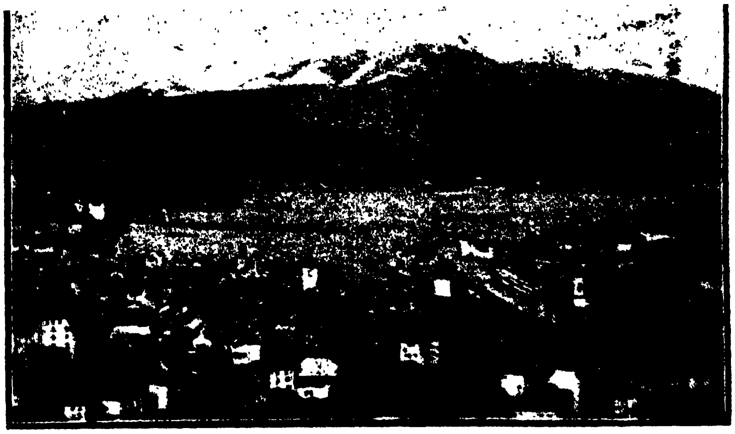
পরদিন প্রাতঃকালে—বেশ দেরীতে ঘুম ভাঙলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সাড়ে আটটা বাজে। ওদিকের জানলা খুলতেই যে দৃশ্য চোখে পড়লো, বাস্তবিকই অভিনব। ঘর বাড়ী, পথ ঘাট, গাছপালা, সবই শাদা; দেখে মনে হ'লো, সারারাত্রিতে নিশ্চয়ই দুই হাত পরিমিত বরফ পড়েছে। এখনও গাছের ডাল পাতার উপর তিন চার ইঞ্চি পর্য্যন্ত বরফ জমে আছে। ইলেক্ট্রিকের, টেলিগ্রাফের তারগুলি পর্য্যন্ত শাদা হয়ে গেছে। রাস্তায় কখানি মোটরকার দাঁড়িয়ে আছে, তাদের চাকাগুলি সবই বরফের নীচে। এম্নি অবস্থায় দ্বিতলের ঘরের জানালায় বসিয়া বন্ধুবর একখানা স্ন্যাপ্ নিলেন।

সকালবেলা; বৃষ্টি আর ছিল না, তবে তুষারপাতের বিরাম নেই। তা' সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ শেষ



লুসার্ণ

করে বন্ধুবর ও আমি হোটেল হতে ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম অন্য কোন যানবাহনে



লুসার্ণ হইতে রিগির দৃশ্য

যাতায়াত অসম্ভব বল্লেও চলে,—শুধু একমাত্র ট্রামই ভরসা; তাও, লোকজনেরা কোদাল দিয়ে লাইন পরিষ্কার করে দিচ্ছে; আর স্তূপীকৃত বরফের রাশি ঠেলে ট্রামগাড়ী কোন

রকমে যাওয়া-আসা কচ্ছে। তাই অগতির গতি ট্রামের শরণাপন্ন হওয়ার মনস্থ করে, বড় পুল-টা পার হয়ে এসে ট্রামে চড়লুম, লুসার্ণের দ্রষ্টব্য দেখবার জন্য! ট্রাম লিউএন ষ্ট্রাসে হয়ে চল্লো! এই রাস্তা দিয়ে গিয়েই, লুসার্ণের সুপ্রসিদ্ধ সিংহ দেখতে পাওয়া যায়। সুবিশাল সিংহটি পাহাড় কেটে পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজপরিবারের রক্ষার্থে, ষোড়শ লুইএর যে সমস্ত সুইস্ গার্ড নিহত হয়, তাহাদের স্মৃতিরক্ষার্থ থরওয়াল্ড্‌সেনের মডেল অনুযায়ী, সুইস্ ভাস্কর আর্হন কর্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। শুনেছি, পরিষ্কার দিনে এ স্থান হতে যে প্রায় সাড়ে ছ' হাজার ফিট্ দৃশ্য নজরে পড়ে, তাহাই ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের সময় জেনারেল বুরবাকীর অধীনে ফরাসী সৈন্যের সুইজারল্যাণ্ডে প্রবেশ-পথ ছিল।

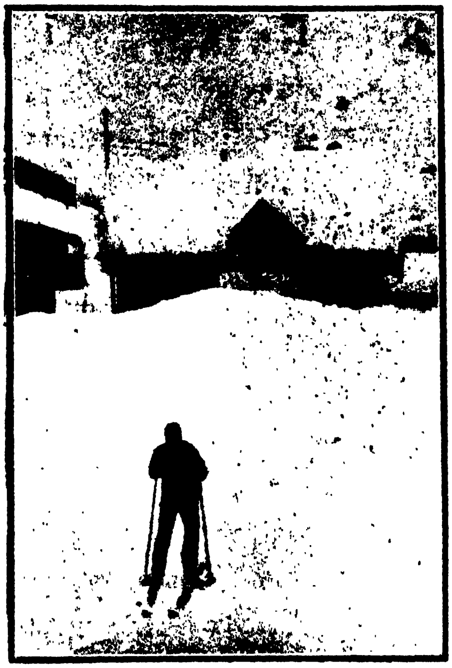
সহরের মধ্যে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান, হফ্ গীর্জ্জা, সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়েছিল, এবং সহরের পেট্রন সেণ্ট লিয়োডেজারের নামে উৎসর্গীকৃত! উইনমার্কেটের ফোয়ারা ও সেণ্ট্ মরিসের প্রস্তরমূর্ত্তি দুটি স্থাপত্য-কলার উৎকর্ষের জন্য প্রসিদ্ধ! লুসার্ণের সবচেয়ে পুরাতন সেতু 'কেপেলব্রুকে' ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়, এবং তার গায়ে লুসার্ণের ইতিহাসের নানা দৃশ্য চিত্রিত আছে। কেপেলব্রুকের মধ্যস্থিত সলিলস্তম্ভ (water tower) এককালে সহরের ধনাগার ছিল এবং এখন পর্য্যন্ত তাহাতে মিউনিসিপালিটির দলিলপত্র রাখা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত সেণ্ট জেভিয়ার গীর্জ্জা ও তৎপার্শ্বস্থ গভর্ণমেণ্ট বিল্ডিংটিও উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত অট্টালিকাটি ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্লোরেণটাইন স্থাপত্যকলানুযায়ী নির্ম্মিত হয়। ক্যান্টোনেল লাইব্রেরী সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার, এবং এতে প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার পুস্তক আছে। তা ছাড়া নবনির্ম্মিত টাউনহল ও পুরাতন ব্যারাকগুলিও দর্শনযোগ্য স্থান! লুসার্ণের গ্লাসিয়ার-উদ্যানটির কথা অনেক দিন শুনে এসেছি, দেখবারও ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শুনলুম বরফে ঢেকে গিয়ে কদিন হলো তার চিহ্নমাত্র নেই,—তাই মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রাখতে হলো। এ-সব ছাড়া, লুসার্ণ নিজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, বিরস, বিমর্ষ নগরীর তুষারধবল শ্বেতাম্বর বিধবার বেশ ছাড়া, অন্য কোন মূর্ত্তি দেখতে পাই নি! শুধু ফিরবার পথে যখন রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে, লুসার্ণ হ্রদের



গসেনেন সাধারণ দৃশ্য

তীরে নামলুম, তখন তুষারপাতের একটু বিরাম হয়েছিল, এবং প্রকৃতির মুখে সবেমাত্র একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল! সেই ক্ষণেকের পাওয়া আলোর সম্পাতে, লুসার্ণ হ্রদ ও তার ওপাশে অমল-ধবল ঝিগি গিরিশ্রেণীর যে ছবি অল্প সময়ের জন্ম আমাদের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব! কিন্তু, চপলা চঞ্চলা মেঘের কোলে বিদ্যুৎরেখার মতই, তা' ক্ষণস্থায়ী হলেও মর্ম্মস্পর্শী!

এ রকম বিরস বিমর্ষ আবহাওয়ায় আমাদের দুজনের কারো আর লুসার্ণে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তাই দুপুর



গসেনেন (স্কী ইং রত লেখক)

বেলাই এন্ড্রারমট্ এ আমাদের ভাগ্য পরীক্ষার জন্ম রওনা হওয়া গেল! খানিকক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ী, আল্প্স-এর বুক ভেদ করে, সুপ্রসিদ্ধ সেণ্ট্ গোথার্ড টানেল দিয়ে চলতে আরম্ভ কর্লে! বাহিরের আলোর সংস্পর্শ হতে ছিন্ন হতে না হতে, গাড়ীর সব-কটি বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠ্‌লো! সুড়ঙ্গের প্রথম হতে আরম্ভ করে শেষ পর্য্যন্ত ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে রইলুম, সবটা পার হয়ে যেতে প্রায় সাড়ে চৌদ্দ মিনিট লাগলো! আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের পার্ব্বত্য বিভাগে, বদরপুর হতে লামডিং জংশন পর্য্যন্ত বত্রিশটি টানেল আছে, তাছাড়া মধ্যভারতে বোম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ও বোম্বাইর কাছাকাছি—জি, আই, পি রেলের কতকগুলি টানেলও দেখেছি! এদের মধ্যে এ, বি, আরএর 'মাহুর'ই সবচেয়ে লম্বা এবং গাড়ী যেতে চার মিনিটেরও কিছু উপর লাগে! সেণ্ট্ গোথার্ডের তুলনায় সেগুলি কিছুই নয়! এম্নি করে কোথাও আল্প্স্-এর ভিতর দিয়ে, কোথাও বা তারই উপর বরফে ঢাকা রেল লাইনের উপর দিয়ে প্রায় ঘণ্টা দুই পরে আমরা এসে গসেনেন্ এ পৌছলুম! গসেনেন্ হতে লাইট ইলেক্‌ট্রিক্



এণ্ডারমটের পথে (উপরে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন)

রেলওয়ে এন্ড্রারমট্ পর্য্যন্ত গ্যাছে! টাইম্-টেবলএ লেখা মতে প্রায় পোনর মিনিটের মধ্যেই এন্ড্রারমটের গাড়ী ছাড়বার কথা! প্রায় আধঘণ্টা হতে চল্লো তবু গাড়ীর দেখা নেই। অগত্যা ষ্টেশনের জনৈক কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, যে, রেললাইন আগাগোড়া দশ বারো ফিট্ বরফের নীচে পড়ে আছে, সুতরাং রেললাইন পরিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত গাড়ী যাবে না এবং খুব সম্ভবতঃ চারি দিনের

আগে এন্ডারমটে যাওয়া সম্ভবপর নয়! অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায় ; এ একটা অতি প্রসিদ্ধ প্রবচন! আমাদের ভাগ্যে কথাটি সেদিন অত্যন্ত সত্যি বলে মনে হয়েছিল। একে ত সময় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, বন্ধুর ভেনিস্ হতে জাহাজ ছাড়বার আর মোটে তিনদিন দেরী, তাই তাড়াতাড়ি করে এন্ডারমট্ যাওয়ার জন্ম লুসার্ণ ছেড়ে



মোটবাহী সুইস্ বালক

এসেছিলুম ; তাতেও বিধি বাম সাধিলেন। রেল-কর্ম্মচারীর কথা শুনে আমাদের চৈতন্ত হলো,— তাই ত, এ রকম একটা কিছু আশঙ্কা করা উচিত ছিল আমাদের, কেন না, লুসার্ণ হতে গসেনেন্ পর্য্যন্ত আগাগোড়াই বরফে ঢাকা দেখে এসেছি। প্রত্যেকটি ঘরের উপরে এত বরফ জমে আছে যে, ঘরের উচ্চতা হতে উপরের বরফের স্তূপের উচ্চতা কোন অংশে কম নয়। সুইজারল্যাণ্ড চিরকালই বরফের রাজ্য, তবু সেখানকার লোকদের মুখে পর্য্যন্ত শুনলুম যে সেবারকার মত বরফ না কি গত কুড়ি বছরের মধ্যে কখনো পড়ে নাই। অথচ আমাদের একটুও খেয়াল হয় নি যে, যখন সব ঢেকে গেছে বরফে,—আমাদের এন্ডারমটের পথটুকুও ত ঢাকা পড়ে যেতে পারে! যাক, তখন উপায়ান্তরবিহীন ভাবে, অগত্যা চব্বিশ ঘণ্টার জন্ম, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত গসেনেনে স্থিতি লাভ করাই স্থিরীকৃত হয়ে গেল!

সেই লুসার্ণে খেয়ে আসা হয়েছিল, সেটা যে পাকস্থলী ছেড়ে অনেকদূর নেমে গেছে, তা' বেশ বুঝতে পাচ্ছিলুম। তখন ভাবনা হলো, সারা দিন রাত্রির মত' আড্ডা নেওয়া যায় কোথায়? হোটেলের সন্ধান নিতে গিয়ে জানলুম, গসেনেনের মত ছোট জায়গায় হোটেল বলে কিছুই নেই। তবে ষ্টেশন পার হয়ে, ছোট একটা পাহাড়ের উপর একটা বাড়ী আছে। সেখানে একটি ছোট পরিবার থাকে। তারা হয় ত দিন-রাত্রির জন্ম একখানা কি দু'খানা ঘর ভাড়া দিতে পারে, এবং থাকবার খাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে! সুতরাং ষ্টেশন হতে দুজন কুলীর ঘাড়ে মোট চাপিয়ে আমরা রওয়ানা হলুম অগতির গতি সেই বাড়ীর উদ্দেশে! ষ্টেশন ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়েই, আমাদের পাহাড়ের উপর উঠতে হলো! একে খাড়া পাহাড়ের ঢালু পথ, তার উপর প্রায় চার পাঁচ ফিট বরফ জমে একেবারে পিচ্ছিল হয়ে আছে। অতি সন্তর্পণে উঠতে গিয়েও বারবার আমাদের পদস্খলন হচ্ছিল, আর পতনের সঙ্গে সঙ্গে হর্ষ ও বিষাদ মিশ্রিত নানা Interjection সময়োপযোগী ভাবে বের হচ্ছিল আমাদের মুখ দিয়ে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে একেবারে বিশেষ ভাবে পশ্চাতে আর্ত্তনাদ শুনে দেখতে পেলুম, আমার মালবাহী মুটেটি একেবারে ধরাশায়ী এবং হাত হতে সুটকেসটি প্রায় পাঁচ হাত দূরে ছিট্‌কে পড়েছে ; তার হাণ্ডলটি পর্য্যন্ত আল্‌গা হয়ে ঝুলছে! তাই না দেখে, আমার পক্ষে হাসি সংবরণ

একান্ত দুরূহ হয়ে উঠেছিল ; অতি কষ্টে কোন রকমে দাঁতে দাঁত চেপে হাসি চেপে রেখেছিলুম। পরমুহূর্ত্তেই যখন বন্ধুবর পা ফস্কে প্রায় তিন হাত নেমে এসে আমার সঙ্গে ধাক্কা খেলেন, তখন আর হাসি না আটকাতে পেরে হাসিমুখে, দিব্যি বঙ্গভাষায় বল্লুম "সাধু সাবধান!" ততক্ষণে বেচারা পোর্টার কোন রকমে উঠে আবার চলতে আরম্ভ করেছে, এবং তাকিয়ে দেখলুম, তার হাতে আমার সুটকেসটি হ্যাণ্ডল্ হতে ঘড়ীর পেণ্ডুলামের মত ঝুলছে!

এম্নি করে বারবার পদস্খলনের হাত হতে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে এসে গন্তব্যস্থলে পৌঁছান গেল। গৃহের কর্ত্তা ও কর্ত্রী অল্প-স্বল্প ইংরেজী জানেন, তাই রক্ষা! বলে কয়ে একখানা ঘর ভাড়া পাওয়া গেল দোতালায়! মটন চপ্, ও খানিকটা আলুভাজার সহযোগে চা-পান করে শরীরকে বেশ একটু তাতিয়ে নেওয়া গেল! বাড়ীর ছেলে-মেয়েগুলি এন্ড্রারমটের পথে অনেক কালা আদমিকে যাওয়া-আসা করতে হয় ত দেখে থাকবে, কিন্তু এম্নিভাবে, একান্ত আপনার ভাবে, নিজের গৃহে, নিজেদের খাবার টেবিলে বোধ হয় আর কখনো পায় নাই। তাই তাদের মুখে বিস্ময় ও কৌতূহলের একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছিল। খাওয়া শেষ করে বন্ধুর একটু বিশ্রামের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার তাড়ায় সেটি হয়ে উঠলো না। অগত্যা বেরিয়ে এসে পাহাড়ের উপর গ্রামের পথ ধর্লুম। গসেনেন ছোট্ট একখানি গ্রাম। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাড়ীগুলি তৈরী। তার মাঝ দিয়ে গেছে এঁকে বেঁকে সরু পথ, কোথাও নেমে কোথাও বা আবার খাড়া পাহাড়ের উপর! বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, বরফের নীচে সমস্ত গ্রামখানি যেন ডুবে গেছে! প্রত্যেক বাড়ীরই দু একখানি দরজা জানালা কোন রকমে বরফের নীচে হতে উদ্ধার করা হয়েছে, কোথাও কোথাও বা তার চেষ্টা চল্‌ছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এমন কি মাঝে মাঝে বুড়োরা পর্য্যন্ত পায়ে কাঠ বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে হৈ হৈ করে বরফের উপর দিয়ে তীর গতিতে ছুটছে! কোথাও ছেলে মেয়ে কিশোর কিশোরীর দল, বরফের বল তৈরী করে একে অন্যের পানে ছুঁড়ছে! আমাদের পথে বেরোতে দেখে, ছেলে মেয়েরা একটু বিস্ময়ের ভাবে আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছিল "টা—টা"; আমরাও তাদের প্রতি-ইচ্ছা জানিয়ে এগিয়ে চলেছিলুম। এম্নি সময় কোথা হতে একটা বরফের বল ছুটে এসে আমার গায়ে পড়লো। সেদিকে দৃষ্টিপাত করে দেখি এক তরুণী নিজের লক্ষ্যের সাফল্যে দিব্যি প্রাণ খুলে হাসছে, আর আবার লক্ষ্য-বেধের জোগাড় দেখছে! মজা ত মন্দ নয়—! আমিও একটা বরফের ঢিল পাঠিয়ে দিলাম প্রত্যুত্তর রূপে! বন্ধুবরও



বরফে প্রস্তুত অভিনব মূর্ত্তি

দেখি খেলার আমোদে মেতে উঠেছেন, তাঁরও লক্ষ্যস্থল অদূরবর্ত্তিনী আর একজন তরুণী! ছেলে-মেয়েদের দলের খুব স্ফূর্ত্তি! তাদের কেউ কেউ আমার কচ্ছিল, তাদের পানে ঢিল ছুঁড়তে! আমরাও যথাশক্তি তাদের সঙ্গে তাদের খেলায় যোগ দেবার চেষ্টা করেছিলুম সেদিন! বলা বাহুল্য মাথা হতে পা পর্য্যন্ত, আমাদের সাদা হয়ে

গেছিল বরফে। কিছুক্ষণ পরে যখন বিরক্তি ধরে গেল, তখন তাঁদের কাছে বিদায় নিলুম। তাঁরাও হাসিমুখে "টা—টা" বলে বিদায় সম্ভাষণ জানালে! পর মুহূর্ত্তে আমরা আবার হোটেলে ফিরে এলুম দুই উদ্দেশ্যে—এক ক্যামেরা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে, আর দুই স্কীইংএর জন্য কাঠ ভাড়া পাওয়া যায় কি না জানতে।

হোটেলওয়ালা, স্কী ভাড়ার জন্য তার একটি ছেলেকে আমাদের সঙ্গে যেখানে তা' পাওয়া যায় পাঠিয়ে দিলে! আমরা ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে ছোট ছেলেটির পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়ে উপস্থিত হলুম এক বুড়ীর বাড়ীতে! বুড়ীর মেটে একজোড়া স্কীই ছিল, তাই অনেকক্ষণ দর-কষাকষি



এঙ্গারমটে বরফের সমুদ্র

করে পাঁচ ফ্রাঙ্কে (প্রায় ২৫ সুইস্ ফ্রাঙ্কে এক পাউণ্ড) বিকেল বেলার জন্য ভাড়া নেওয়া গেল! লম্বা দুখানি কাঠ, তার দুটি লাঠি নিয়ে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে এলুম, মহা খুসী হয়ে যে সুইজারল্যাণ্ডে এসে আর কিছু না হোক, স্কীইং ত করা গেল! তখনো দুই বন্ধুর কেউ বুঝতে পারিনি যে, এটুকু আমোদ উপভোগের জন্য কতটুকু দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে!

যাক্, বন্ধুবর একে বামুন, তাতে আবার বয়সে বড়; সুতরাং যখন তার দাবীতে স্কী ব্যবহারে প্রথম অধিকারের দাবী কর্লেন, তখন বুদ্ধিমানের মত, তাতেই সম্মত হলুম। বন্ধু, পায়ে কাঠ্ দুটো বেঁধে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে, হাতের লাঠি দুটোর সহযোগে যেমন সামনে এগিয়ে যাবার জন্য, বরফের উপর ধাক্কা দিয়েছেন, আর যান্ কোথা,—বাঁ পায়ের কাঠ চার হাত এগিয়ে গেল, ডান পায়ের খানা যথাস্থানে, এবং বন্ধুবর হুমড়ী খেয়ে পড়লেন রাস্তায়। ক্যামেরা কাঁধে আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসছিলুম। ব্যাপার দেখে একেবারে হো হো করে হেসে উঠ্লুম! বন্ধু ততক্ষণ বরফের উপর গড়াগড়ি দিয়ে, গা ঝেড়ে আবার উঠেছেন, এবং দ্বিতীয়বার স্কী চালাবার চেষ্টা কর্ত্তে, এবারও চিৎপটাং। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে উঠ্তে সাহায্য কর্লুম। বন্ধুবরের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে, আর মুখের কথা মুখে বেশ আটকাচ্ছে তখন! বন্ধুর কিন্তু অধ্যবসায়ের প্রশংসা কর্ত্তে হয়। বার-কয় বিফল-মনোরথ হয়ে শেষে, balance রাখাটা খানিকটা আয়ত্ত করে, হৈ হৈ করে খানিকক্ষণ এগিয়ে ঘুরে এলেন। তার পর বীরদর্পে আমার পানে কাঠ দুটি এগিয়ে দিয়ে বল্লেন "নাও এইবার, বুঝ ঠেলা।"

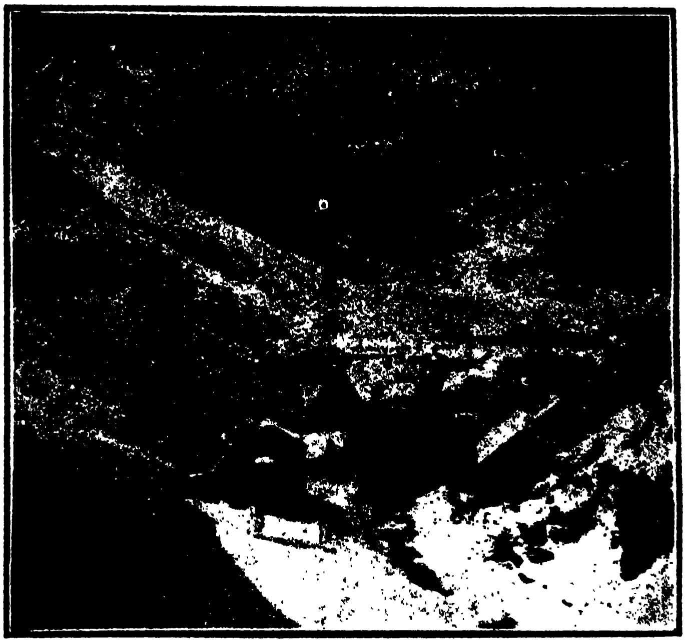
এতক্ষণ ত প্রাণভরে হেসে এসেছি, এবার মনে মনে প্রমাদ গুণ্লুম। কোন রকমে কাঠ দুটি পায়ে লাগিয়ে, মনে মনে বিপাত্ততে মধুসূদনের নাম স্মরণ করে, যেই লাঠি নিয়ে, সম্মুখে ভর করেছি, অম্নি কাঠ দুটি নিমেষে এগিয়ে গেল, আর মাথা এবং শরীরটা তার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে, একেবারে বরফ-শয্যায় শয্যাশায়ী! পশ্চাতে বন্ধুবরের হাততালির সঙ্গে বিদ্রূপাত্মক বাক্যবান্ শুনলুম, "কেমন জব্দ এইবার!" কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতই তা' এসে বাজলো। কোন রকমে চোখ মুখ লাল করে গায়ের বরফ ঝেড়ে, আবার যেম্নি হৈ হৈ করে দিয়েছি ধাক্কা, অম্নি আবার পপাত ধরণীতলে! যাক্, এম্নি বার কয়েক উঠে পড়ে শেষে চলা যখন খানিকটা আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল, তখন অতি সন্তর্পণে, নিজেকে পতনের হাত হতে বাঁচিয়ে প্রায় আধ মাইল ঘুরে আসা গেল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কটি ছেলের দল, হৈ হৈ করে এগিয়ে গেল! ভাগ্যিস্ সেদিন তারা আমাদের পেছনে লাগে নি। সেদিন এম্নি অবস্থায় বন্ধু, আমার স্কীইংরত মূর্ত্তির ছবি তুলে নিলেন।

প্রায় ঘণ্টা দুই এ রকম জবরদস্তি ভাবে স্কীইং করে দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। তাই ভারি ও ক্লান্তিকর

কাঠ দুখানিকে পা হতে খুলে, অনেকটা আরাম বোধ হল। ক্যামেরা দিয়ে খানকয় স্ন্যাপ্ নেওয়া ছাড়া, তখনকার মত উল্লেখযোগ্য আর কিছু নেই। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে, স্কী দুটোকে ঘাড়ে করে সন্ধ্যার সময় শীতে কাঁপতে কাঁপতে হোটেলে ফিরে এলুম! জুতা মোজা হতে আরম্ভ করে ওভারকোট পর্য্যন্ত বরফে ভিজে ভিজে প্রায় দ্বিগুণ ভারি ঠেকছিল! তার পর পিচ্ছিল, অপরিসর পথে চলতে গিয়ে, পা সামলাতে না পেরে, বরাবর হোঁচট্ খেতে খেতে গিয়ে হোটেলে পৌঁছেছিলুম সেদিন, সেটা খুব মনে আছে। সন্ধ্যার পরে আর কাজকর্ম্ম কিছুই ছিল না; ভিজা কাপড় চোপড় ছেড়ে খানিকক্ষণ আরামে আগুনের কাছে বসে, দুজনেই গিয়ে কম্বলের নীচে, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহকে প্রসারিত করে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, জানি না। ঘুম ভাঙলো, দরজায় বাড়ীওয়ালীর বড়মেয়ের টোকার শব্দে! কম্বলের নীচে থেকে, অতি কষ্টে মুখখানা বের করে বন্ধুবর তাকে ভিতরে আসতে অনুমতি দিলেন! মেয়েটি টেবিলের উপর কাপড় বিছিয়ে, যে নয়নতৃপ্তিকর উপাদেয় বস্তুগুলি রেখে গেল, তা দেখে দুজনের কেউই আর নিজেকে কম্বল চাপা দিয়ে রাখতে পারলু্ম না! "হুররে, পিলাফ্ দি পুলে পাওয়া গেছে, মুখুয্যে শীগ্‌গির ওঠো," বলে আমি লাফিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসলুম! বন্ধুবরও ত্বরায় উঠে বল্লেন "তাই ত! আশ্চর্য্য, সমস্ত কন্টিনেণ্টে চেয়ে চেয়েও যা' পাই নি, তাই কি না, ভাগ্যক্রমে মিললো এসে গসেনেনে!"

আর প্লেটের উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, যখন বল্লুম, আবার "ওটা কি দেখ!" তখন এ যে পোলাও, বলে বন্ধু একেবারে ভাবে গদ্‌গদ! যাক্ সে রাত্রে দিব্যি পোলাও (অথবা তার মতই কিছু, নাম জানি নে) ও মুরগীর ঝোলের সঙ্গে যা' আহার করা গেল, তাকে গুরুতর (বন্ধুর কথায় "গুরুচরণ") বলা চলে!

পরদিন ভোরবেলা ঘুম হতে উঠে খবর নিয়ে জান্‌তে পারলু্ম যে, এণ্ডারমটের পথ পরিষ্কার করা হয়েছে ও সেদিন ঘণ্টাখানেক পরেই গাড়ী যাবে। সুতরাং আমরা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য ও ভোজন শেষ করে, দুটি লোক ডেকে জিনিষপত্তর নিয়ে, সামালে সামলে পা' ফেলে, অতি কষ্টে নীচে নেমে এলুম। বিদায়ের সময়, হোটেলওয়ালা স্ত্রীপুত্রকন্যাগণসহ, দরজায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে করমর্দ্দন করে আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানালে! বাস্তবিকই একদিনের পরিচয়েই তারা যেন অনেকটা আপনার হয়ে গেছিল! ষ্টেসনে মালপত্তরগুলি ক্লোক-রুমের হেপাজতে দিয়ে আমরা শুধু ক্যামেরা ও লাঠি সম্বল করে এণ্ডারমটের গাড়ীতে চড়লুম! গসেনেন হতে এণ্ডারমট পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক রেলওয়ে! গাড়ী অনেকটা আমাদের ট্রামের মত চলে! মোটে দুখানি গাড়ী, তার



এণ্ডারমট

মধ্যে একখানি পথ পরিষ্কারের জন্য মজুরে ভর্ত্তি! বাকী একখানায়ই আমরা মোটে সাত আটজন যাত্রী। গাড়ী যখন চলতে আরম্ভ কর্লে তখন দেখতে পেলুম, লাইনের দুপাশে পর্ব্বতপ্রমাণ বরফ জমে আছে। আমাদের মনে হচ্ছিল আমরা যেন বরফ ঠেলে রাস্তা করে চলেছি! রাস্তার দুপাশেই অসংখ্য লোক কোদাল দিয়ে বরফ পরিষ্কার কর্চ্ছিল। তাই দেখে মুখুয্যে বল্লেন "দেখ পাল, এদের মধ্যে একটা জিনিষের অভাব দেখছি!"

আমি একটু ঔৎসুক্যভরে বল্লুম "কি?"

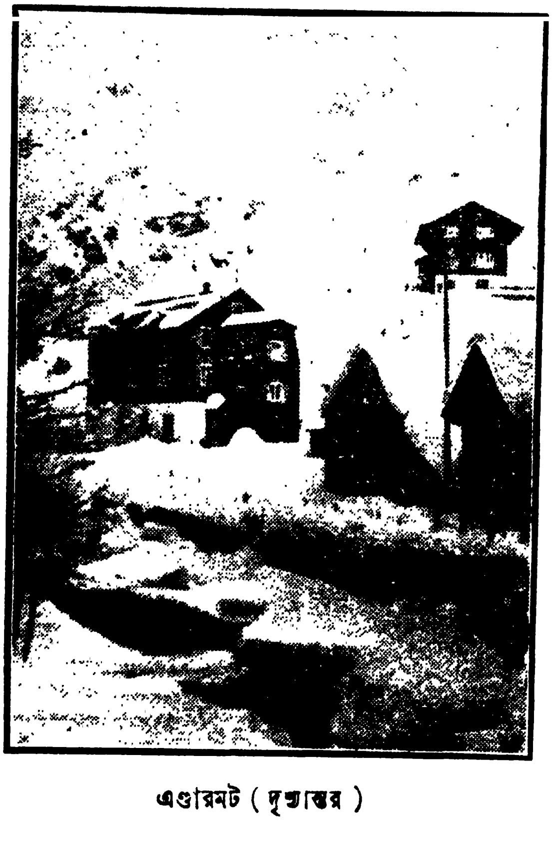
বন্ধু বল্লেন "Unemployment"

কথাটা ঠিক না বুঝতে পেরে বল্লুম "কেন ?"

বন্ধুবর বল্লেন "নয় কেন, যার কোন কাজকর্ম্ম নেই, কোদাল নিয়ে বরফ পরিষ্কার কর্ত্তে লেগে গেলেই হলো !"

কথাটা শুনে আমার পক্ষে সশব্দে হাস্যসংবরণ কঠিন হয়ে উঠেছিল !

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে আমরা এন্ডারমট্ ষ্টেশনে এসে পৌছলুম। এখানে এসেই রেললাইন শেষ হয়ে গেছে। ষ্টেশনের বারান্দায় দেখি বরফ গলে পড়ে



এণ্ডারমট (দৃশ্যান্তর)

চমৎকার তলোয়ারের মত, বর্শার ফলকের মত, ইত্যাদি নানা আকারের, Icicle তৈরী হয়ে আছে। তা দেখতে বাস্তবিকই চমৎকার। তাদের কতকগুলি হাত দিয়ে ভেঙ্গে আমরা তাদের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা কচ্ছিলুম ! আমাদের অদ্ভুত চেহারা (কালো !) ও পোষাক দেখে অনেক লোকই আমাদের পানে তাকিয়ে দেখছিল ! আমাদের পোষাক ছিল দিব্যি বাবু হয়ে খোলা মাঠে বেড়াবার। দেখলাম সুইজারল্যাণ্ডের পোষাক তা থেকে অনেক পৃথক ! এত শীতেও বরফপাতের মধ্যে খুব কমই লোকের গায়ে ওভারকোট দেখতে পেলুম। তাদের পায়ে মস্ত মস্ত ভারী জুতা, অনেকটা আমাদের দেশের মিলিটারী বুটের অনুরূপ। পায়ে গরম কাপড়ের পটি বাঁধা, গায়ে খুব পুরু গরম কাপড়ের কোট ! সুতরাং আমাদের পায়ে সু, লম্বা প্যাণ্ট ও তার উপর ওভারকোট দেখে, তারা নিশ্চয়ই আমাদের 'বাঙাল' বলে মনে কচ্ছিল !

ষ্টেশন ছেড়ে আমরা গ্রাম্য-পথে চলতে আরম্ভ কর্লুম ! ওদিকে তাকিয়ে দেখি, সমস্ত শৈলশৃঙ্গটি আগাগোড়া বরফে ঢাকা,—এমন কি, ইলেকট্রিক ট্রামের তারগুলি পর্য্যন্ত ডুবে গেছে, সুতরাং উপরে চড়া অসম্ভব। সুতরাং আবার বিফল-মনোরথ হয়ে, আশাভঙ্গজনিত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়া ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না। এন্ডারমটেই প্রথম লক্ষ্য করে দেখলুম যে সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ে অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের দেশের পাহাড়ে নেপালী, ভুটিয়া, খাসিয়া প্রভৃতি জাতির অনেকটা দেহগত ও আচারগত সাদৃশ্য আছে। এরা সকলেই অনেকটা খাটো, অথচ বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ! চেহারা পেশীবহুল, মুখ গোলগাল, চোখ অল্প ছোট ! ভুটিয়া খাসিয়াদের মত এরাও অত্যন্ত পরিশ্রমসহিষ্ণু, কর্ম্মঠ ও বিশ্বাসী ! খাসিয়ারা যেমন "থাবা" করে জিনিষপত্র উপরে পাহাড়ের উপর বয়ে নিয়ে যায়, এরাও তেমনি মাথার ফিতে বেঁধে, কাঁধের উপর খুব ভর বোঝা নিয়ে উপরে উঠে ! ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ীরা, সকলেই পরিশ্রম কর্ত্তে ভালবাসে ! আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় যে, পাহাড়ে লোকেরা খুব সরল হয়, এদের দেখে মনে হলো এরাও তেমি ! কারণ পথে চলতে গিয়ে আমাদের বিদেশী বলে' এরা কোন রকমে ঘৃণা না করে, সকলেই চলতে চলতে "টা-টা" জানিয়ে যাচ্ছিল ! তাদের সেই সারল্যপূর্ণ হাসি দেখে ও সাদর সম্ভাষণ শুনে আমাদের মনে হচ্ছিল, তারা যেন কত না পরিচিত !

বরফ যখন পড়ে, তখন বরফ নিয়ে এরা নানা খেলাধূলা করে। দশ পোনর মাইল পর্য্যন্ত, বরফের উপর স্কীইং করে যাওয়া একটা বিশেষ আমোদের বিষয় ! তাছাড়া, একত্র বরফ জড় করে এরা নানারকম মূর্ত্তি তৈরী করে, কখনো বা ভূতের, কখনো বা মানুষের, আবার কখনো নানা জীবজন্তুর ! এ রকমই একটি বিশালকায় মূর্ত্তির কোলে বসে



খেলার সাথী

[illegible] Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works

একটি কিশোরীর ছবি এতৎসঙ্গে সন্নিবেশিত কচ্ছি! বরফে গুলি তৈরী করে, একে অন্যের প্রতি নিক্ষেপ, তাও ছেলেদের মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ ক্রীড়া বলে পরিচিত! এন্ডারমটের গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে, এক স্থানে দেখলুম দু তিনটি মেয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, আর একটি ছোট্ট বছর দু-একএর মেয়ে কোন সুযোগে মায়ের কোল থেকে নেমে গিয়ে, দুহাতে বরফ তুলে বারবার মার গায়ে তাই মাখাচ্ছে, অথচ মা সেদিকে দৃকপাতও কচ্ছে না! দেখে একটু হেসে আমরা আবার এগিয়ে চল্লুম!

এন্ডারমট্, ইণ্টারলেকেন প্রভৃতি তাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ! কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে অসময়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত তুষারপাতের জন্য, এন্ডারমটে এসে, আল্‌প্‌এর উপর চড়তে পারি নি বলে, এখনো মনে দুঃখ জাগে! মনের দুঃখ মনেই রেখে আমরা ছোট্ট গ্রামখানির আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে গিয়ে গিয়ে উন্মুক্ত মাঠে পড়লুম, যেন একেবারে বরফের সমুদ্র! এক দিকে তুষারধবল গিরিশৃঙ্গ, আর তার নীচে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু বরফ আর বরফ—একেবারে দিক-চক্রবালে গিয়ে যেন আকাশের সঙ্গে মিলেছে! খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখলেই চোখে ধাঁধাঁ লাগে। তাই বড় নীল রঙের চশমা পরে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তা না হলে অনেক সময় চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়! পথ-ঘাটের চিহ্নমাত্র নেই। শুধু স্কী করতে করতে একটা পথের দাগের মত তৈরী হয়ে বরফ বসে গিয়ে। আমরা তারই উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলুম। একটু এদিক্ ওদিক্ লাইনের বাইরে পা গেলেই, তা' পাঁচ হাত অতল বরফের স্তূপে ঢুকে যাচ্ছিল! সময় সময় দলে দলে স্কীতে ছেলেমেয়েরা আমাদের পিছনে ফেলে হৈ হৈ করে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমরাও কোন রকমে পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য পথ করে দিচ্ছিলুম। এম্নি করে বরফের সমুদ্রে ছোট্ট একটি রেখা ধরে আমি প্রায় ছয় সাত মাইল এগিয়ে গিয়েছিলুম, বন্ধুবর অনেক পশ্চাতে পড়ে রয়েছিলেন। অবশেষে ঘণ্টা দুই পরে ঘর্ম্মাক্ত দেহে (সেই বরফের মধ্যেই!) ফির্ব্বার সময় দেখি তিনি মাঝামাঝি পথে বিশ্রাম সুখ উপভোগ কর্চ্ছেন; আর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে প্রকৃতির শ্বেতাম্বরের মাঝে সৌন্দর্য্যের সন্ধান কর্চ্ছেন! অবশ্য গুটি কয়েক দৃশ্য ক্যামেরা-গত কর্ত্তে ভুল হয় নি! এন্ডারমটে যে উদ্দেশ্যে যাওয়া, তা' যদিও সফল হয়নি, তবু আমরা যে খুসী হই নি তা' বলতে পারি না। এন্ডারমটের ছোট একটা রেস্তঁরায় ঢুকে আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করে ষ্টেশনের পথ ধর্লুম; কারণ আর এক ঘণ্টার মধ্যেই মিলানের গাড়ী ছাড়বার কথা! গাড়ী ছাড়বার পরও পশ্চাৎ ফিরে যতক্ষণ এন্ড রমট্ দেখা গেল, বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে আমরা তাকিয়েছিলুম তার পানে! আল্‌প্‌স্‌এর উপর চড়তে পার্লে খুবই খুসী হতুম নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার অভাবেও এন্ডারমটের যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করে এসেছি, তা বোধ হয় জীবনে ভুলতে পারবো না।

নাম

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

পুরাণো স্নেহের স্বরে, কে আমারে ডাকিল রে?
খুলে গেল হৃদয় দুয়ার।
জাগিয়া উঠিল স্মৃতি, অতীতের সুধা-গীতি,
ঝঙ্কারিল চিত্তে বারম্বার।
পিতামাতা গুরুজনে, কত মমতার সনে,
ডাকিতেন যে নাম স্মরিয়া,
আজি তাহা লুপ্ত প্রায়, কে আর ডাকিবে হায়,
এবে তাঁরা সুর-পুরে
ধরা হ'তে বহু দূরে,
কে ডাকিবে তেমন করিয়া?
গৃহে বড় সবাকার, জানে সবে সমাচার,
ছোট'রাতো ধরিবে না নাম,
শিশুকাল হ'তে তারা, শিখেছে বংশের ধারা—
করিবে না কভু অসম্মান।
দিনে দিনে নামহীনা, মাত্র শুধু স্নেহ বিনা,
তাই নাম চাহি মুছে দিতে,
সেই আনন্দের স্মৃতি, কত স্নেহ কত প্রীতি,
অমূল্য সম্পদ মম চিতে।
তাহার তুলনা নাই, বিশ্বে না খুঁজিয়া পাই;
পরিচিত তাঁহাদের দানে;
বহু বর্ষ গেছে চলি' তবু সেই নাম বলি',
সংসার এখনো মোরে জানে।

দুর্জ্ঞেয়

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ধনীর ফটকের উপরকার লোহার জাল বেষ্টন করিয়া উঠিয়াছিল মাধবীলতাটি; পার্শ্বের এক দরিদ্রের গৃহের ভগ্ন প্রাচীরলগ্ন অপরাজিতাটি লতাইয়া লতাইয়া মাধবীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। তারপর, একদিন অপরাজিতাটি শুকাইল। হয়ত অযত্নে, হয় ত বা স্বল্পায়ু বলিয়া, শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গেল। দু'-একটি পত্রহীন শুষ্ক-লতা মাধবীর শ্যামল বক্ষে লাগিয়া রহিল। আমাদের গল্প আরম্ভ সেই সময়ে।

(১)

কিন্তু, কিছু আগের কথা বলা দরকার।

বড়লোকের বাড়ীর অনেকগুলি বধূর মধ্যে প্রতিমা একটি বধূ, সেজ কি ন', এই রকম। আর পাশের বাড়ীর গরীবদের ঘরে তরলা একটি মাত্র বধূ। এই দুইটি বধূতে বন্ধুত্ব হইয়াছিল, স্বল্পক্ষণ মধ্যে; বন্ধুত্ব স্থায়ী হইয়াছিল, বহুদিন। প্রতিমার স্বামী উকীল, বাপেরও পয়সা আছে, ওকালতীতেও বেশ দু'পয়সা আসিতেছে। পাড়ার লোকে বলে, জলেই জল বাধে। প্রতিমার স্বামীর নাম নরেশ; নামটা জানাইয়া রাখা ভাল, সেই জন্যই বলিলাম; নহিলে, স্বেচ্ছায় ত ন'য়ই, প্রতিমার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে পা ফেলেন নাই। তরলার স্বামী হৃদয়নাথ কেরাণী, কোন্ অফিসে কর্ম্ম করেন, কত তনখা, তাহা আমরা জানি না, জানিবার চেষ্টাও করি নাই। এইটুকু শুধু জানি, তিনি গরীব। একটি মাত্র ছেলে, বছর পাঁচেক বয়স, নাম তাপস। প্রতিমার ছেলে মেয়ে নাই, হয় নাই, এই ছেলেটিকে সে ভালবাসে। নিজের একটা থাকিলে, ইহার চেয়ে তাহাকে বেশী ভালবাসিতে পারিত কি-না সে বিষয়ে তাহার মনে একটা সন্দেহ আছে, এবং আজিও সে-সন্দেহের নিরসন হয় নাই।

বৈকালে ঘড়িতে ঠিক যখন পাঁচটা বাজিত, প্রতিমা এই গরীবদের বাড়ীতে আসিয়া বসিত। তরলা ময়দা মাখিত, প্রতিমা লুচী পাতাইত, তরলা সেঁকিত, প্রতিমা রুটি বেলিয়া দিত। কোন কোন দিন এক-আধটা তরকারী ও প্রতিমা রাঁধিয়া দিয়া যাইত; তাহাদের গৃহে ভালমন্দটা আসিতই, প্রতিমা কিয়দংশ তরলাদের না দিয়া থাকিতে পারিত না। পাড়ার আর পাঁচবাড়ীর নারী, খুকীরা হইতে কর্ত্রীরা পর্য্যন্ত তরলার হিংসা করিত। হিংসা করিত, তরলার ভাগ্যের নয়, তাহার সখী ভাগ্যের।

তাহাদের হিংসার বিষেই হোক, অথবা তাহার পরমায়ুর অল্পতার জন্যই হোক, তরলা একদিন স্বামী পুত্র ফেলিয়া, চোখের কোণে জল লইয়া এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। হৃদয়নাথ কাঁদিল, তাপস কাঁদিল, প্রতিমাও কাঁদিল, বড় কান্নাই কাঁদিল। পাড়ার আর পাঁচবাড়ীর মেয়েরা শোকে সান্ত্বনা দিতেই আসিয়াছিলেন, কিন্তু পারিলেন না, প্রতিমার বাড়াবাড়ি দেখিয়া, তরলার দেহের পূর্ব্বেই তাঁহাদের দেহগুলায় আগুন ধরিয়া গেল, পলায়ন করিয়া বাঁচিলেন!

তরলার সব-চেয়ে ভাল কাপড়খানি, ভাল জামাটি, ভাল সেমিজটি পরাইয়া দিয়া, সিন্দুর-অলক্তকে চর্চ্চিত করিয়া, প্রতিমা সমারোহ করিয়া সখীকে শেষ সজ্জায় সাজাইল। এক হাতে চক্ষু মুছিল, অন্য হাতে সাজাইল; চোখের জল রোধ করিতে বারবার পাশের ঘরে উঠিয়া গেল। তারপর যখন যাত্রার সময় হইল, তাপসকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজেদের বাড়ী চলিয়া গেল।

বর্ষীয়ানরা বলিয়াছিলেন, ছেলে মুখাগ্নি করিবে, প্রতিমা বলিয়া পাঠাইল, না, হৃদয়বাবুই সে কাজ করিবেন। তাহাই হইল।

(২)

বোধ হয় সার্ভেণ্ট এণ্ড মেড-সার্ভেণ্ট এসোসিয়েটেড প্রেস মারফত সংবাদটা প্রচারিত হইয়াছিল, প্রতিমা একদিন নির্জ্জন মধ্যাহ্নে হৃদয়নাথের শয়নকক্ষে প্রবেশ

করিয়া দেখিল, ঝি অতিরঞ্জিত করে নাই। তরলার ফটোগ্রাফখানির গলায় সদ্যঃফোটা ফুলের মালা, তখনও মলিন হয় নাই; সুবাস ঘুচে নাই; পেলবতা নষ্ট হয় নাই। ঝি বলিয়াছে, প্রত্যহ প্রভাতে বাবু নিজে বাজারে গিয়া একছড়া করিয়া মালা কিনিয়া আনেন; স্নানান্তে কৌশিক বস্ত্র পরিধান করিয়া মালাটি তরলার প্রতিকৃতির কণ্ঠে দুলাইয়া দেন; পূর্ব্বদিনের শুষ্ক মালাগাছি আফিসে যাইবার সময় পকেটে করিয়া লইয়া যান—পথে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান। রবিবার ও ছুটির দিনেও, বাহিরে কোন কাজ না থাকিলেও, শুধু মালাগাছিকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য বাবুকে বাহিরে যাইতে হয়। ঝি কাছেই ছিল, কহিল, বালিশের তলাটা একবার দেখুন না বৌমা!

সেখানে আবার কি, বলিয়া প্রতিমা হৃদয়নাথের মাথার বালিশটা তুলিয়া দেখিল, দুই তিনখানি মলিন, শতছিন্ন পত্র মাত্র। হাতের লেখা তরলার। বিবাহের পর তরলা সম্ভবতঃ কিছুদিন পিত্রালয়ে ছিল, সেই সময়কার লেখা চিঠি, কারণ প্রতিমা খুব ভালই জানে, তাহার পর পত্র লিখিবার কোন কারণ বা সুযোগ এই দম্পতির হয় নাই। তরলা সেই যে দ্বিরাগমনে আসিয়াছিল, আর এই সেদিন মহাপ্রয়াণ করিল, ইহার মধ্যে একটি দিনও এই প্রায়ান্ধকার ধূমমলিন কক্ষখানি সে ত্যাগ করে নাই।

ঝি বলিল, বুঝলেন গা বৌমা, বিছানা আমিই ঝাড়ি-ঝুড়ি বটে, বালিশে হাত দেওয়া বারণ। ওয়াড় ময়লা হ'লে নিজের হাতে খুলে দেন, আমি সাবান দিয়ে দিই, আবার শুকোলে নিজের হাতে পরান। আমায় বলেই দিয়েছেন, সদু, বালিশে তুমি হাত দিও না বাছা, ওতে আমার দরকারী জিনিষ-পত্তর আছে। জিনিষ-পত্তর ত ঐ—ছাই পাঁশ ক'টা লেখন।

প্রতিমা ব্যথিত চক্ষু দু'টি ফিরাইয়া কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। এই ছাই পাঁশ লেখনগুলির মূল্য এই শ্রেণীর নারী কি বুঝিবে? ইহারা জীবন্ত মানুষের মূল্যই বড় বুঝে, তা মৃতের হাতের লেখা!

প্রতিমার বেদনার্ত্ত দৃষ্টির কোন সম্মানই সদু রাখিল না, সোৎসাহে বলিতে লাগিল, ভাবনের কথা কত আর বলবো বৌমা, দেখে শুনে হাসবো কি কাঁদবো তাই শুধু ভাবি। প্রথম প্রথম, বুঝলে গা বৌমা, খেতে ব'সে ভাত ডাল তরকারী মাছ সব সামিগ্রা আদ্ধেক ক'রে তু'লে রাখা হোত; তার পর খাওয়া হোয়ে গেলে ছাদে উঠে সেই ভাত ডাল তরকারী যত সামিগ্রী সব ছাদের ওপর রেখে আসতেন। ওমাস থেকে সেটা বন্ধ হয়েছে। আফিসের মুখপোড়া সায়েব মিন্সেরা বুঝি মাইনে কমিয়ে দিয়েছে, তাই খরচা কমান হ'য়েছে। তবু খেতে বসেই সব জিনিষ একটু একটু আলাদা ক'রে রাখা হয়। মাগ ত কত লোকেরই মরে গা, আমাদের বাবুর মত এমন বাড়াবাড়ি বাপের কালেও কারুকে করতে দেখি নি বাছা! এ-সব আদিখ্যাতা নয় তো কি, বল ত গা বৌমা?

আদিখ্যাতা কি-না বৌমা তাহা বলিতে পারিল না, অথবা বলিল না;—তাহার মন বলিল, এমন আদিখ্যাতা যদি কেহ তাহার জন্য করে, তবে সে সাতজন্ম মরিতেও দুঃখ বোধ করিবে না।

ঝি কহিল, বৌমা ত মঙ্গলবারে মরেছিলেন, সেই থেকে বাবু মঙ্গলবার করেন—মাছ খান না, নুন খান না, তেল মাখেন না। ভোরবেলা উঠেই ধূপ ধুনো জেলে, ঐ ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কি-সব বিড় বিড় ক'রে বলেন—ছাই পাঁশ পদ্যো না কি বলে যে গো, তাই আওড়ান। তপু উঠলেই বলেন, তাপস, পেন্নাম করো। নিজে পেন্নামটা আর করেন না, এই আমার বাবার ভাগ্যি, বৌমা!

তাহার বাবার ভাগ্যের সহিত প্রতিমার কোন সম্পর্ক ছিল না, এই 'রয়টার'-সহোদরা এখানে এই মুহূর্ত্তে উপস্থিত না থাকিলে প্রতিমা গললগ্নীকৃতবাসে ঐ সৌভাগ্যবতীর চরণে প্রণাম করিত!

জীবদ্দশায় স্বামীর সোহাগ, আদর, পূজা অনেক ভাগ্যবতীই পায়, কিন্তু মরণে এত পূজা কয়জন নারীর ভাগ্যে জুটে! জুটিয়াছিল মমতাজ বেগমের; হৃদয়নাথের অর্থ থাকিলে হয় ত আর একটা তাজমহল গঠিত হইতে পারিত। চোখের জল গোপন করিবার জন্যই প্রতিমা তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়, কোনদিকে না চাহিয়া রাস্তাটুকু পার হইয়া, বাড়ী ঢুকিয়া পড়িল।

তাপসের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, প্রতিমার ছোটজা তাহাকে লইয়া ময়ূরের ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া ছিল,

প্রতিমাকে দেখিয়া ছোটজা বলিল, এতক্ষণ একলা ও-বাড়ীতে কি করছিলে দিদি!

প্রতিমার অন্তরখানি তখনও শ্রাবণের ধারাসজল বৃক্ষপত্রের মত কাঁপিতেছিল, বলিল, একটা জিনিষ দেখছিলুম ছোট, তোকেও একদিন দেখিয়ে আনবো ছোট! তাপস, এসো বাবা, খাবে এসো। এই বলিয়া তাপসকে চাপিয়া ধরিয়া চলিয়া গেল; কথা বাড়াইবার মত শক্তি সামর্থ্য তাহার ছিল না।

(৩)

দূরপথে গরুর গাড়ী যেমনভাবে চলে, অলস মধ্যাহ্নে শহরের রাস্তায় বেতো ঘোড়ার ছ্যাকড়া গাড়ী যে-ভাবে চলে, কেরাণী হৃদয়নাথ বাবুও সেই ভাবে চলিতেছেন। আফিসে যান, আসেন; উড়ে বামুন একটি রাখিয়াছেন, যা রাঁধিয়া দিয়া যায়, খান; ঠিকা ঝি, সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘরে যাইবার সময় বিছানা করিয়া, মশারী টাঙাইয়া, হারিকেন সাজাইয়া, শিয়রে জানালার পটীতে জলের গ্লাস রাখিয়া, জলভরা বাটীর উপরে রেকাবে তাপসের জন্য একটি বা দুইটি সন্দেশ রাখিয়া যায়; দিন এবং রাত্রি অবাধে চলিয়া যায়। প্রতিমা আগেও আসিত, এখনও আসে। সকালে আসিয়া উড়ে বামুনকে রন্ধনাদি সম্পর্কে আবশ্যকীয় উপদেশ দান করিয়া, তাপসকে লইয়া চলিয়া যায়, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আর একবার বকাঝকা করিয়া তাপসকে তাহার পিতার জিম্মায় রাখিয়া দিয়া যায়। লজ্জার আতিশয্য এই মেয়েটির কোনদিনই ছিলনা, আজও নাই; আগে দরকার হইত না, হৃদয়নাথের সঙ্গে বিশেষ কথা কহিত না; এখন দরকার হয়, কথা বলে; কথা যদি বেশীক্ষণ বলিতে হয়, তা'ও বলে; হাসির কথা হইলে হাসে; দুঃখের কথা উঠিলে, চক্ষু দু'টি ছলছল করিয়া উঠে, ম্লানমুখে চলিয়া যায়। পাড়ার দূরদৃষ্টি-সম্পন্না নারীরা জনান্তিকে বলাবলি করেন, বড় লোকের বড় কথা! প্রতিমার এক জা' কথাগুলা কোথায় কাহার কাছে শুনিয়াছিলেন; প্রতিমাকে বলিতে গেলে, বাধা দিয়া প্রতিমা বলিয়াছিল, কাজ নেই ভাই শুনে, আমার আবার গায়ের চামড়া বড্ড নরম, শুনলেই ফোস্কা পড়বে। জা' হাসিয়াছিলেন।

প্রতিমার ভিতরে একটু দুষ্টামী যে না ছিল তা নয়। জায়ের সঙ্গে ঐ কথা হওয়ার পর হইতে, যখনই সে এ-বাড়ীতে আসিত বা এ-বাড়ী হইতে যাইত, বেশ খানিক সোরগোল করিত। আশে-পাশের জানালা খড়খড়ী-গুলাকেও সে-যেন জানান্ দিয়া যাইত।

উড়ে ঠাকুর বিনা-নোটীশে একদিন বৈকালে কামাই করিয়া বসিল। বাবুর ফিরিবার সময় হইয়াছে বুঝিয়া, উনান ধরাইয়া ঝি চায়ের জল বসাইয়া দিয়া, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়াবস্থায় বসিয়া ভাবিতেছে, তাপসের হাত ধরিয়া প্রতিমা আসিয়া দাঁড়াইল। ঝি দুঃসম্বাদ জ্ঞাপন করিলে, প্রতিমা বলিল, তার আর কি সহু! আমাদের বাড়ী ত আছে। তুমি এক কাজ কর, আমাদের ঠাকুরকে একবার ডেকে আন,—বুড়ো ঠাকুরকে নয়, তার সঙ্গে বক্‌তে আমি পারবো না। নরসিং ঠাকুরকে আমার নাম ক'রে ডেকে আন।

নরসিংহ ঠাকুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল; এবং কিছুক্ষণ পরে ডিসে ডিস্ চাপা দিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য-দ্রব্য লইয়া ফিরিয়া আসিল।

হৃদয়নাথ আসিলেন, প্রতিমা চা প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে খাবার সাজাইয়া সামনে আসিয়া বলিল, আজ আপনার ঠাকুর 'এ্যাবসেণ্ট'!

হৃদয়নাথের মুখ শুষ্ক হইল, বলিল, তাই ত! ভারি মুস্কিল ত!

প্রতিমা একটু হাসিয়া কহিল, মুস্কিল বৈ কি! তবে কথা এই, উকীল, কেরাণী, মাষ্টার, ব্যারিষ্টার, উড়ে বামুন একদিন-না একদিন সকলেই কামাই করে।

তা করে; কিন্তু খবর দিয়ে—

হঠাৎ অসুখ-বিসুখ হ'লে খবর দেওয়া তাদেরও ঘটে না হয় ত!

হৃদয়নাথ চিন্তিতমুখে বলিলেন—তা বটে!

প্রতিমা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, কহিল, অত ভাববেন না, বরং উইদাউট নোটীশে কামাই করলে মাইনে কাটবার আইন থাকলে কাটতে পারেন। চা খেয়ে নিন, মুস্কিল আসানের ব্যবস্থা আছে।

হৃদয়নাথ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, না, না, সে কিছুতে হবে না, আপনি যে আগুন-তাতে গিয়ে শরীর খারাপ করবেন, সে আমি কিছুতে হতে দোবনা।

না, শরীর খারাপ করব না।

ঝি একটা পেতলের হাঁড়ীতে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিক্ না, আমি নামিয়ে নিতে পারবো'খন।

পারবেন ত? হাত পুড়িয়ে বস্‌বেন না ত?—হাসি-মুখে কথাটা বলিয়াই প্রতিমার মুখ মলিন হইয়া গেল। কয়েক মাস পূর্ব্বের কথা, তরলার তখন খুব অসুখ, প্রায় শয্যাশায়ী; ঠাকুর তখনও পাওয়া যায় নাই—চেষ্টা চলিতেছে, সেই সময়ও তরলা মরি-তে-মরিতে উঠিয়া ভাতের হাঁড়ীটি নামাইয়া দিয়া যাইত; এক-একদিন প্রতিমাও নামাইয়া দিয়া গিয়াছে। অল্প বয়সের, সমবয়স্ক, অধিকবয়স্ক অনেক গৃহিণীকে প্রতিমা দেখিয়াছে, মিশিয়াছে; কিন্তু কর্ত্তব্যে এমন অবিমিশ্র নিষ্ঠা প্রতিমা আর দেখে নাই। তরলা ঘর-খানিকে এমন করিয়া রাখিত, তুচ্ছ গামছাখানিকেও এমন যত্নে পাট্ করিত, বিছানাটিকে এমন সুচারু করিয়া পাতিত যে, মনে হইত যেন ভক্ত-পৌত্তলিকও তাহার দেবতার জন্য তেমনটি করিয়া করিতে পারে না। সেই যে কণ্টকাকীর্ণ পথে বুক পাতিয়া দেওয়া বলে, এই লোকটির জন্য তরলা তাহাও পারিত। হৃদয়নাথ সকালে টিউসানি করিতে চলিয়া যাইতেন, রান্না-বান্না, ঘর-দোরের সব কাজ করিয়া বধূটি কোন্ ফাঁকে যে তাহার জুতাটিও কালী লাগাইয়া বুরুশ করিয়া রাখিয়া দিত, আশ্চর্য্য! এতটা করিতে হইত না বটে, কিন্তু তরলার দৃষ্টান্তে প্রতিমা নরেশচন্দ্রের অনেকগুলি কাজ নিজের হাতেই টানিয়া লইয়াছিল। হৃদয়নাথকে জলখাবার খাইতে দিয়া তরলা জলের গ্লাসটি মাটীতে নামাইত না, ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত; খাওয়া হইলে, হাতে জল ঢালিয়া দিত, হাত ধোওয়া হইলে গ্লাসটি হাতে দিত।

যে পায় নাই, তাহার হয়ত দুঃখ হয় না, সে হয়ত এ-অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে না; যে পাইয়াছে, পাইয়া যে-হারাইয়াছে, তাহার দুঃখ অপরিসীম। জানিনা, বুঝিনা, বুঝিতে পারি না, পুরুষে সে দুঃখের পরিমাপ করিতে পারে কি-না, কিন্তু নারী কাঁদিয়া মরে! প্রতিমা চা'য়ের বাটীটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, হৃদয়নাথের হাতে বাটী তুলিয়া দিয়া তবে যেন সে আরাম অনুভব করিল।

চা-পানান্তে চায়ের বাটীটি নামাইয়াছে মাত্র, প্রতিমা ছোট্ট একটি পিতলের রেকাবীতে চারিটী পাণ আনিয়া ধরিল। একদিন ছিল, যেদিন ঠিক এমনই ভাবে, ঐ রেকাবীতেই পাণ লইয়া আর একটি নারী সামনে আসিয়া দাঁড়াইত। আজ-কাল ঝি সন্ধ্যার ও রাত্রের পাণ সাজিয়া ডিবায় ভরিয়া রাখিয়া দিয়া যায়। চায়ের পরে কয়েকটি খাওয়া হয়, রাত্রের জন্য কয়েকটি রাখিয়া দেওয়া হয়।

প্রতিমা তাপসের হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে বলিল, আপনি ত ন'টার সময় খান, না?

হৃদয়নাথ কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন, হ্যাঁ, ন'টা, সাড়ে ন'টা, এমন বাঁধাবাঁধি কিছু নেই।

আচ্ছা, বলিয়া প্রতিমা চলিয়া গেল। হৃদয়নাথ শূন্য ঘরে প্রদীপের কাছে বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

কিয়ৎপরে বড় বাড়ীর ভৃত্যের কোলে চড়িয়া তাপস ফিরিয়া আসিল। ভৃত্য জানাইয়া গেল, তাপস বাবুর আহারাদি হইয়া গিয়াছে।

পিতা, পুত্রকে কাছে বসাইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কি খাইয়াছে, কতখানি খাইয়াছে, স্বহস্তে খাইয়াছে অথবা কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এমনই সব একান্ত অনাবশ্যক ও নিরর্থক প্রশ্ন করিয়া শেষকালে জিজ্ঞাসিলেন, হ্যাঁরে তাপস, আমাকে খেতে যেতে হ'বে কি-না তোর মাসীমা কিছু বলে দিয়েছে নাকি?

না বাবা। ঘুম পেয়েছে বাবা।

হৃদয়নাথ তাহাকে বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া, আস্তে আস্তে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন; তাপস অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। কয়েকটি সন্তানকে যমের হাতে তুলিয়া দিতে হইয়াছিল, দম্পতীর হৃদয়ভরা স্নেহ উজাড় হইয়া এই শিশুটির উপর বর্ষিত হইয়াছিল; একজন ত মায়াপাশ ছিন্ন করিল, অপরজন যক্ষের ধন আগলাইয়া পড়িয়া আছে!

ন'টা বাজিতে তখনও পাঁচ দশ মিনিট বিলম্ব আছে, দ্বারে কড়া নাড়িয়া উঠিল, হৃদয়নাথ বুঝিলেন, আহারের আহ্বান আসিয়াছে। মশারীটা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন। যে চাকর তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছে, তাহাকে তাপসের কাছে অবস্থান করিবার আদেশ প্রতিমা নিশ্চয়ই দিয়াছেন ভাবিয়া, যদিচ বিশ্বাসী

চাকর, তথাপি সাবধানের বিনাশ নাই চিন্তা করিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া মণি ব্যাগটা বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেন। কড়া তখন খুব জোরে নড়িতেছে।

দ্বার খুলিয়া হৃদয়নাথ যাহা দেখিলেন, তাহা যেমন অভাবনীয় তেমনই আশ্চর্য্যজনক। প্রতিমা দুই হাতে [illegible] আহার্য্য সমেত প্রকাণ্ড থালা লইয়া [illegible] সঙ্গের ভৃত্যের হাতে একটি জলের গ্লাস ও একখানি কার্পেটের আসন। প্রতিমার হাত দু'খানি যে 'ভারিয়া' গিয়াছিল, তাহার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা গেল। ক্লিষ্ট আননে হাসি আনিয়া প্রতিমা জিজ্ঞাসিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বুঝি?

হৃদয়নাথ কুণ্ঠিতস্বরে কহিলেন, না ঘুমুইনি। কিন্তু আপনি এ-সব বয়ে আনতে গেলেন কেন? ঠাকুরকে দিয়ে পাঠালেই ত হোত। আমিও অক্লেশে যেতে পারতুম।

প্রতিমা বলিল, উনিও আস্‌ছিলেন, তারপর মনে হো'ল কাল শনিবার, টালিগঞ্জের রেস, ঘোড়াদের ঠিকুজি-কুষ্ঠি খুলে বসে পড়লেন। আমায় বল্লেন, তুমিই খাইয়ে এসো গে।

হৃদয়নাথের কুণ্ঠার অবসান তখনও হয় নাই; পুনশ্চ বলিলেন, আমায় খবর পাঠালে, আমিই যেতুম। না-হয় ঠাকুরকে দিয়ে খাবার পাঠালেও হোত। নিজে কেন এতো কষ্ট করা?

প্রতিমা সে কথার কোন জবাব না দিয়া, ভৃত্যের দ্বারা আসন পাতাইয়া, জলের ছিটা দেওয়াইয়া, থালা নামাইয়া ঢাকাগুলি খুলিতে খুলিতে বলিল—বসুন। চাকরকে বলিল, তুমি যাও হরি, একটু পরে কদমকে পাঠিয়ে দিয়ো, সকড়ী নিয়ে যাবে।—বলিয়া মশারীর চাল হইতে পাখাখানি পাড়িয়া সামনে আসিয়া বসিল। মশারীর ভিতরে ছোট্ট একটি বালিশে মাথা রাখিয়া তাপস ঘুমাইতেছিল, পার্শ্বের বড় বালিশটার উপর কয়েকটি ফুল্ল মল্লিকা! বালিশের নিম্নে কি আছে, তাহা প্রতিমা জানিত; আপনা হইতেই চক্ষু দু'টি উঠিয়া তরলার ছবিখানিতে পড়িল; তরলা যেন নবোঢ়া বধূর মত কুন্দফুলের মালা পরিয়া সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

হৃদয়নাথ আড়ষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ও কি আপনি বাতাস করতে বসবেন নাকি?

প্রতিমা কেরোসিনের আলোটি উজ্জ্বল করিয়া দিল, আনত মুখে হাসিয়া বলিল, দোষ কি!

না, না, দোষের কথা নয়, কিন্তু দরকার হয় না।

প্রতিমা বলিতে যাইতেছিল, আগে দরকার হোত, কিন্তু থামিয়া গেল। যে অগ্নি ভিতরে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে, তাহাতে বায়ু সঞ্চালিত করিয়া লাভ কি! কহিল, আপনি ত তরকারীতে খুব ঝাল খান্, আমি ঠাকুরকে ঝাল দিয়ে সব তরকারী আলাদা আপনার জন্যে করতে বলে দিয়েছিলুম, দেখুন ত কেমন করেছে?

হৃদয়নাথ মাংসের কালিয়াটা চাকিয়া কহিলেন, চমৎকার রেঁধেছে। ভারি সুন্দর হয়েছে।

ওটা কিন্তু ঠাকুর রাঁধে নি।

তাহার বলার ভঙ্গীতে হৃদয়নাথের মনে হইল, এটা প্রতিমাই রাঁধিয়াছে; বলিলেন, এটা আপনি রেঁধেছেন বুঝি?

প্রতিমা কথা বলিল না, আনত হাসিমুখ আরও নত করিল মাত্র।

আপনি কি মাঝে মাঝে রাঁধেন?

প্রতিমা অপরাধীর মত নিম্নকণ্ঠে কহিল, না।

হৃদয়নাথ ডিমের কচুরী খাইতেছিলেন, বলিলেন, এমন সুন্দর কচুরী আমি কখনও খাই নি কিন্তু।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল, ভাল হয়েছে?

হৃদয়নাথ হাসিয়া বলিলেন, শুধু ভাল হয়েছে বল্লে ঠিক বলা হ'বে না, তার চেয়ে ঢের বেশী ভাল। এটাও ঠাকুরের তৈরী বলে মনে হচ্ছে না।

প্রতিমা কথা কহিল না, কিন্তু নতাননা নারীর মুখখানিতে তৃপ্তির যে লালিমা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতেই হৃদয়নাথ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইলেন। সে ভাষা পাঠ করিতে সেই ভাগ্যবানই পারে, যাহাকে কেহ কোনদিন এমন করিয়া আহার করাইয়াছে; ব্যঞ্জনের সুস্বাদে অথবা শুদ্ধ হৃদয়ে স্নেহসলিলসম্পাতে আহার্য্য বস্তু এমন রুচিকর হইয়া উঠিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। বলিতে পারে একমাত্র সে-ই, এমন করিয়া খাইবার সৌভাগ্য জীবনে যাহার একটি দিনও হইয়াছে!

হৃদয়নাথ কহিলেন, আজ আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।

প্রতিমা নীরবে পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

জলের গ্লাসটি, আসনখানি পর্য্যন্ত এনেছেন।

প্রতিমা নীরব।

নরেশবাবুর খাওয়া হয়ে গেছে?

না, এইবার হবে।

তবে আপনি আর দেরী করবেন না, যান্. ঝি এসে সকড়ী নিয়ে যাবে'খন; আপনি যান্।

প্রতিমা লজ্জারুণ মুখে কহিল, ব্যস্ত হতে হবে না, আপনার খাওয়া হোক্-না, তার পরে যাব।

হৃদয়নাথ বলিতে গেলেন, কিন্তু,

ও-কথার কিন্তু ঐখানেই শেষ, ওর আর কিন্তু নেই।

হৃদয়নাথ হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, আমার খাওয়া হয়ে গেছে! ওঃ, এতক্ষণ ধরে আমি কখনও খাই নি বোধ হয়।

প্রতিমা হাসিয়া কহিল, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে খাওয়া হয়ে গেলো না-কি? কিন্তু আমার দেরী হয় নি।

না, না, কত আর খাব?—হৃদয়নাথ জল খাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। কলতলা হইতে আচমন শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, প্রতিমা স্বয়ং এঁটো বাসন-পত্রগুলি গুছাইয়া তুলিতেছে. সসব্যস্তে কহিলেন, ও আপনি করছেন কি?

এমন আর কি!—বলিয়া প্রতিমা সেগুলিকে বাহিরের বারান্দায় রাখিয়া আসিয়া, স্থানটি পরিষ্কার করিতে করিতে কহিল—কদম ত এখনও এলো না, কখন্ তাঁর ফুর্সৎ হবে তারও ঠিক নেই, ততক্ষণ আপনাকে কেন আট্‌কে রাখি? ঐ যে, পাণের ডিবে ওখানে রেখেছি।

রূপার ডিবা, উপরে নাম লেখা নরেশ-প্রতিমা। হৃদয়নাথ পাণ খাইতে লাগিলেন; প্রতিমা বলিল—এইবার আমি যাই, আপনি দোর বন্ধ করবেন চলুন।

চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, তার দরকার নেই; তিন-চারখানা বাড়ীর মেয়ে ও পুরুষ যাঁরা আমার আসা-পথ চেয়েছিলেন, যাওয়া-পথ থেকেও যে চোখ তুলে নেন্ নি, তা আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি।

কথাগুলা যে শুনিল, তাহার মুখখানা নিমিষে অন্ধকার হইয়া উঠিল কিন্তু যে বলিল, তাহার পাতলা ঠোঁট দু'খানিতে হাসি, শরতের রৌদ্রের মত ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল।

(৪)

ইহারই ঠিক পূর্ব্বের দিন, পুনর্ব্বার বিবাহের কথা পাড়িয়া আফিসের আশুবাবু একপ্রকার ধমকই খাইয়া-ছিলেন। দিন দুই পরে আফিসের টিফিন কামরায় বসিয়া নিভৃতে আশুবাবু যখন তাঁহার ভগ্নীটির রূপ ও গুণগ্রামের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করিলেন, শ্রোতাটির উষ্ণতা ত ছিলই না, অধিকন্তু একটু আগ্রহও যেন প্রকাশ পাইল। আশুবাবুর ভগ্নী সুলতার বয়স ষোল পার হইয়াছে কি-হয়-নাই বটে, কিন্তু কাজেকর্ম্মে, সাংসারিক দক্ষতায় তাহার তুলনা মেলা ভার। আশুবাবু কিছুই খরচ করিতে পারিবেন না তাই, নতুবা সুলতার মত মেয়ে কোন বনেদী রাজা-রাজড়ার ঘরে পড়িলেই যেন ঠিক মানাইত।

হৃদয়নাথবাবু শুনিয়াই গেলেন, প্রতিবাদও করিলেন না, কোন প্রশ্নও করিলেন না। আশুবাবু সেদিনের মত নিরস্ত হইলেন। চারে মাছ আসিয়াছে জানিতে পারিলে 'ছিপাড়ী' চুপ করিয়া যায়।

হৃদয়নাথের বয়স চল্লিশ, একচল্লিশ, অথবা বিয়াল্লিশ; পঁয়তাল্লিশ যে নয়, ইহা ঠিক। একদিন আশুবাবু বলিলেন, হুঁ, চল্লিশ আবার বয়েস! আজকাল লোকে ত বিয়েই ক'রে থাকে, চল্লিশ-বেয়াল্লিশে। আগে চল্লিশ বছরটা দোষের ছিল, কারণ চাল্‌সে ধরতো, চশমা নিতে হোত! আর এখন, হুঁ, চশমার কথা আর বলবেন না মশাই, দশ বছরের ছেলের চোখেও চশমা! এই ত আমাদের আফিসে ক'টি ছোকরা এপ্রেন্টিস্ এসেছিল, বয়স কুড়ি একুশের বেশী হ'বে না, টাট্‌কা গ্রাজুয়েট সব, দেখেছিলেন ত, চোখে সব হরেক রকম চশমা! সোনার, নিকেলের, কচ্ছপের খোলার, আলুর খোসার—কত রকমের! হুঁ!

সেদিনও কাটিল।

তাপসকুমার কি ভাবিবে? নতুন মা'কে কি সে প্রসন্নমনে গ্রহণ করিতে পারিবে? তা যদি না পারে? আশুবাবু এ সমস্যারও সুন্দর সমাধান করিলেন; কহিলেন, হাঘরের ঘরের মেয়ে আনলে ছেলেমেয়ের দুর্দ্দশার সীমা

থাকে না। সুলতা ছেলেমেয়ে-অন্ত প্রাণ; আমার তিন তিনটে ছেলে আর চার চারটে মেয়েকে সেই ত মানুষ করেছে, মশাই, তার বৌদি ত খালাস হয়েই খালাস। তার ওপর, সুলতা আপনার তাপসকুমারকে জানে। যেদিন থেকে তাপস মাতৃহীন হয়েছে, সেইদিন থেকে প্রায়ই সে তাপসের খোঁজ নেয়, আমার মুখে শুনেছে কিনা সব।

আশুবাবুর সহকর্ম্মীরা প্রায়ই জিজ্ঞাসাবাদ করেন, কতদূর এগুলো আশুবাবু?

আশুবাবু বলেন, চার খাচ্ছে, ফুট দিচ্ছে, চানাচ্ছেও বটে, সুতোতে গা'ও লাগছে. এই গপ্ ক'রে টোপ ধরলে বলে।

আশুবাবুর ভবিষ্যবাণী ফলিতে বিলম্ব হইল না। একদিন সকালে তাপস প্রতিমাকে গিয়া বলিল, মাসীমা, বাবা দু'দিন বাড়ী আসবেন না। আমি আপনার কাছে থাক্‌বো।

প্রতিমা তাহাকে জানুতে জড়াইয়া ধরিয়া, নত হইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিল, বেশ ত বাবা—থাক্‌বেই ত! কিন্তু তোমার বাবা কোথায় যাচ্ছেন তপু? তোমার নতুন মা আস্তে নয় ত?

তাপস সাশ্চর্য্যে কহিল—নতুন মা কোথায় মাসীমা?

তা ত জানিনে বাবা! হয় ত আছেন কোথায়। তোমার বাবা ত এখনও আফিস্ যান্ নি, জিজ্ঞেস্ ক'রে এসো ত বাবা, তিনি কোথায় যাচ্ছেন?

তাপস ছুটিয়া গেল, ছুটিয়া ফিরিল, বলিল, বাবা বাগনানে যাচ্ছেন, সেখানে তাঁর আফিসের এক বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন।

প্রতিমা হাসিয়া বলিল—সোণা ফেলে আঁচলে গেরো। তোমাকে বাদ দিয়ে নেমন্তন্ন!

নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা প্রতিমার ভাল লাগিল না; কিন্তু সে-সম্বন্ধে আলোচনাও সে করিল না; আর করিবেই বা কাহার সঙ্গে?—কেনই বা করিবে? মা-হারা এই ছেলেটাকে দু'রাত্রি বুকে চাপিয়া খুব ঘুমাইল।

(৫)

তাপস ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া খবর দিল, মাসীমা, আমার ঠাক্‌মা এসেছে।

প্রতিমা বিস্মিত হইয়া বলিল, তোমার ঠাকমা আছেন তা ত জান্‌তুম না তপু!

তুমি দেখবে এস না, মাসীমা! সাদা ধব ধব করছে চুল, একটিও দাঁত নেই, চোখে চশমা, এই-এ্যাতো মোটা; এস না মাসীমা।

চল যাই, বলিয়া তাপসের হাত ধরিয়া প্রতিমা এ-বাড়ীতে আসিল। নবাগতা রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া ঠাকুরের নিকট রান্নাবাড়ার হিসাব-নিকাশ বুঝিয়া লইতেছিলেন, প্রতিমা আসিয়া রোয়াকের নীচে দাঁড়াইয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল; ইহার বেশী পারিল না। তাপস এইভাবে পরিচয় করাইয়া দিল, ঠাক্‌মা চশমার ভেতর থেকে কুৎ কুৎ ক'রে দেখছে, কিন্তু চিন্তে পারছে না! আমার মাসী গো আমার মাসী।

ঠাক্‌মা বলিলেন, বস বাছা, বস। তোমাদেরই বুঝি এই বড় বাড়ীটা!

প্রতিমা উত্তর দিল না, অনাবশ্যক বলিয়া; তাপসের নিকট এই প্রসঙ্গ খুবই স্বাদু। সে পরমোৎসাহে বলিতে লাগিল, দু'টো মস্ত মস্ত ময়ূর আছে বুঝলে ঠাকমা? প্যাখম ধরলে কি সুন্দর দেখায়, না মাসীমা?

হ্যাঁ বাবা।

এখন আর প্যাখম ধরে না কেন মাসীমা?

ওরা শুধু বর্ষাকালে মেঘ দেখলে পেখম তুলে নাচে।

আর সেই তোমার হীরেমোনটা ময়ূর দেখলেই চেঁচায়, না মাসীমা?

হ্যাঁ।

তোমার কাকাতুয়াটা ভাল নয় মাসীমা, আমায় দেখলেই দূর দূর করে চেঁচায়।

প্রতিমা তাপসকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ছিঃ বাবা, ও কথা কি বল্‌তে আছে? কাকাতুয়াটা সব্বাইকেই দূর দূর বলে। তোমার বড়-মাসীমা ওকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না, দেখলেই দূর দূর করেন, ও তাই শিখে নিয়েছে।

আচ্ছা মাসীমা, মেসোমশাই বিলেত থেকে যে কুকুরটা এনেছেন, সেটার বাচ্ছা হ'লে আমায় একটা দিতে বলো না।

তুমি বলো-না বাবা!

আমি বল্‌তে পারবো না, তুমি বলো।

ঠাকুমা প্রশ্ন করিলেন, ছেলেটা বুঝি তোমার খুব নেওটো ?

প্রতিমা এ কথারও উত্তর দিল না, আর একটু জোরে তাপসকে কোলে চাপিল।

হৃদয়নাথ ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কিন্তু বাহিরে আসিলেন না। এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই ; প্রতিমা আসিলে, শত কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও, বাহিরে আসিতেন ; কোনও কথা না থাকিলেও দু'টা কথা কহিতেন—একদিন দুইদিন, এক-মাস, দুইমাস, এক বছর দুই বছর নয়, যেদিন তরলার সঙ্গে প্রতিমার ভাব হইয়াছিল, সেই দিন হইতে ইহাই ঘটিত ; তরলার মৃত্যুর পরেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই সাধারণ ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের অভাব আজই ঘটিল এবং ইহা স্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক হইতে পারে না, ভাবিতে ভাবিতে প্রতিমা উঠিল, 'আপনি বসুন' বলিয়া আবার দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বিদায় লইল। তাপস সঙ্গে আসিয়াছিল, সঙ্গেই গেল।

তাপসের যাওয়া-আসা কমিয়া আসিল, প্রতিমা ইহাও লক্ষ্য করিতেছিল ; কিন্তু কারণ অনুসন্ধানের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। নরেশ বলিতেন, ডেকে পাঠালেই ত পারো। সে হয়ত নতুন ঠাকুমা পেয়ে সকল সময় আসে না, তুমি ডাকলেই আসবে।

প্রতিমা ডাকিল না। একটা ছেলেকে সর্ব্বদা বুকে পিঠে করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয় সত্য ; কিন্তু ভগবান যাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার কোন্ চেষ্টা কবে সফল হয় ?

কয়েকদিন পরে, মধ্যাহ্নে শাঁখ বাজিয়া উঠিতেই পাড়ার লোকে আসল ব্যাপার চাক্ষুষ করিল। হৃদয়নাথ বিবাহ করিয়া বধূ লইয়া গৃহে আসিলেন। প্রতিমা সেলাই করিতে-ছিল ; তাহার ছোটজা আসিয়া বলিল, ওমা দিদি, তুমি বুঝি কিছুই দেখ নি, তরলার বর যে বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে এল।

কথাটা যে সত্য, মনে মনে তাহা উপলব্ধি করিয়াও যেন সত্য নয়, যেন বিশ্বাস হয় না, এই ভাবে প্রতিমা জিজ্ঞাসুনেত্রে ছোট জা'র মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অশিক্ষিতা, বর্ণ-পরিচয় জ্ঞানহীনা সদুঝি'র কথা মনে পড়িয়া গেল ; সদু বলিয়াছিল, তাবন দেখে আর বাঁচি নে। তবু কি বিশ্বাস হয়—না, বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় ? আহার্য্যের অর্দ্ধাংশ উৎসর্গ করার কথা, শিয়রের বালিশের নীচে সযত্নে রক্ষিত সেই লেখন ক'টার কথা, নিত্য প্রভাতে প্রতিকৃতিকণ্ঠে পুষ্পমাল্যদানের কথা !—মা গোঃ, কেমন করিয়া সে সব মিথ্যা হইয়া গেল ! প্রতিমার চোখের নীচে জল টল টল করিতে লাগিল। পদ্মার পাড়ের হর্ম্ম্য যেন চক্ষুর পলকে নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গেল।

ছোটজা অতশত বুঝিল না, কহিল – চল না ভাই দিদি, বৌ দেখিগে।

প্রতিমা শেলাইটা সরাইয়া রাখিয়া বলিল—দূর্, বুড়ো মিন্সের বৌ দেখতে যেতে লজ্জা করে না ?

দিদির এক কথা। যে বিয়ে ক'রে আনলে, তার লজ্জা করলো না, যে দেখবে তার হ'বে লজ্জা! আমি জানালা দিয়ে দেখেছি দিদি, মন্দ নয়, বেশ বৌটি হয়েছে।

এরই মধ্যে দেখেছিস্ ? তবু আবার যেতে চাচ্ছিস যে !

কাছে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয় না ?

আমার হয় না। হ্যাঁরে ছোট, বৌয়ের বয়স কত ?

কত আবার ! ষোল সতেরো।

বলিস্ কি রে ! মিন্সে পাগল না-কি ? চল্লিশ পঁয়-তাল্লিশ বছরের বুড়ো, একটা ষোল বছরের কচি মেয়ের সর্ব্বনাশ করলে ? এটা আমাদের বাঙলাদেশ কি-না, বাঙলাদেশে সবই সম্ভব, মেয়ের বাপ-মাও দেখেশুনে সর্ব্বনাশ ঘটতে দেয়। আশ্চর্য্য !

সর্ব্বনাশ কেন করবে দিদি ! বিয়ে করেছে। আর বুড়ো ক'নে পাবেই বা কোথায় বলো ?

প্রতিমা বলিল—বিধবা বিয়ে করলেই পারতো। বয়স্কা বিধবার ত অভাব ছিল না দেশে।

ঘন ঘন শাঁখ বাজিতেছিল ; ছোট বলিল, তুমি যাবে না ত ! আমি যাই, ভাই, জানালা দিয়ে দেখিগে।

প্রতিমা কিছুই বলিল না।

একটু পরে তাপস আসিয়া বলিল, মাসীমা, আমার নতুন মা এসেছে। এসেই আমায় কোলে নিয়েছে। নতুন মা খুব কর্সা মাসীমা। বাবা তোমায় ডাকছেন মাসীমা !

পাছে চক্ষু দুটি ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে, প্রতিমা তাপসের পানে চাহিতেও পারিল না, নত চক্ষু মাটীতে নিবদ্ধ রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—আমায়! না বাবা, তুমি ভুল শুনেছো।

বাবা বল্লেন, মাসীমাকে বলে এসো তাপস। আমি যাই মাসীমা।

তরলার কথা মনে পড়িয়া গেল কি না জানি না, প্রতিমার টানা টানা ডাগর চোখ দু'টি জলে ভরিয়া আসিল, দুই হাতে একটিবার মাত্র তাপসকে বুকে চাপিয়া, মুখে চুমা দিয়া ছাড়িয়া দিল; তাপস চলিয়া গেল।

নরেশ বলিলেন, হৃদয়নাথবাবু আবার বিয়ে ক'রে মরতে গেলেন কেন এ বয়সে!

প্রতিমা খড়ের আগুনের মত হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি হ'লেও তাই করতে গো; করবেও হয় তো!

নরেশ হাসিয়া বলিলেন, সে তখন দেখা যাবে!

(৬)

সুলতা বলিল, তপুর যে আজ জন্মদিন তা ত তুমি আমাকে বলনি?

হৃদয়নাথ ম্লানমুখে অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন, আমারও মনে ছিল না সুলতা।

রোয়াকে কাপড়, জামা, জুতা ও নানাবিধ আহার্য্য রক্ষিত, ও-বাড়ীর ঝি কদম রোয়াকের নীচে বসিয়া বলিল, ঐ থালা-টালাগুলো খালি ক'রে দাও বৌমা!

তাপস নূতন কাপড়, জামা, জুতা পরিয়া মাসীমাকে প্রণাম করিয়া আসিল। মস্তক চুম্বন করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া মাসীমা দুইটি টাকা তাহার হাতে দিলেন।

স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া, সুলতা মধ্যাহ্নে বড় বাড়ীতে গিয়া প্রতিমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। ভাল করিয়া কথা হইল না, গল্পও জমিল না, সুলতার মনে হইল, ধনী-গৃহের বধূটির রূপের, ধনের গর্ব্বের সীমা নাই। দু' একটি এ-কথা সে-কথার পর সুলতা আসল কথাটি বলিয়া ফেলিল, উনি বল্‌ছিলেন, তপুর জন্মদিনে আজ যদি আপনি আমাদের বাড়ীতে খান্—

প্রতিমা ধীর, সংযত, সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল—আমি ত কোথাও খাইনে।

সুলতা, ইহার পরে, আর কি বলিয়া অনুরোধ করিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া, বলিল—তবু একবার আসবেন দিদি, আপনারই দেওয়া পাঁচ সামগ্রী দিয়ে তপু খাবে—

প্রতিমা কথাটা সেইখানেই শেষ করিয়া দিতে কহিল—জন্ম জন্ম খাক্।

সুলতা বলিল, আপনি ত আমাদের বাড়ীতে যেতেন দিদি, কতদিন ওঁকে খাইয়েছেনও—

প্রতিমা বলিল, আমার যাওয়ার সুবিধে হবে না। আপনি আমাকে মাপ করবেন।

*

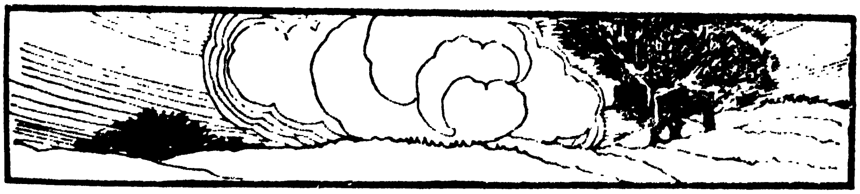
স্বামী-স্ত্রীতে রাত্রে এইরূপ কথা হইল:

মাগীর সঙ্গে তোমার ভালবাসা হয়েছিল না কি গো?

ছিঃ!

ছিঃ নয় গো, ছিঃ নয়, বলই না খুলে, শুনে সার্থক হই। এত আনাগোনা, এত খাওয়ান-দাওয়ান, এত আদর-যত্ন, আর এখন একবার আসবারও সুবিধে হয় না!

হৃদয়নাথ কি ভাবিতেছিলেন, ভাবিতে ভাবিতেই অসংলগ্ন-কণ্ঠে কহিলেন—ছিঃ!



মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

কাশিমবাজারের রাজবংশ দানশীলতার জন্য ভারত-বিখ্যাত। এই বংশের ধন-সম্পদও যেমন প্রচুর, অর্থের সদ্ব্যবহার কিরূপে করিতে হয়, তাহাও পুরুষানুক্রমে এই বংশীয়গণের অধিগত। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র এই বংশের দৌহিত্র সন্তান হইয়াও উত্তরাধিকার সূত্রে বিষয়-সম্পত্তির সহিত বংশগত দানশীলতারও অধিকারী হইয়াছিলেন। সাধারণের হিতকর কার্য্যে তাঁহার ধনাগারের দ্বার সদা উন্মুক্ত থাকিত। মুক্তহস্তে দান করিয়া তিনি বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

সন ১২৬৭ সালের ২৮এ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা, শ্যামবাজারে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নবীনচন্দ্র নন্দী কাশিমবাজার রাজবাড়ীর জামাতা; মহারাজা লোকনাথ রায়ের পৌত্রী, রাজা হরনাথ রায়ের কন্যা গোবিন্দসুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রাজা হরনাথের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণনাথ। কৃষ্ণনাথের পুত্র ছিল না; দুইটি মাত্র কন্যা জন্মিয়াছিল,—তাহারা অকালে মারা যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী মহারাণী স্বর্ণময়ী বিষয়াধিকারিণী হন। দানশীলতার জন্য ইনি সমগ্র ভারতে খ্যাতি লাভ করেন এবং সরকার হইতে সম্মান লাভ করেন। কৃষ্ণনাথ পত্নীকে কিছু লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। সেই শিক্ষাগুণে তিনি স্বয়ং, দেওয়ান রাজীবলোচন রায়ের সহায়তায়, সুবৃহৎ জমিদারীর কার্য্য পরিচালন করিতেন। তিনি ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় থাকিতেন—তাঁহার নিজের জন্য ব্যয় প্রায় কিছুই ছিল না—আর জনহিতকর কার্য্যে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শাশুড়ী রাণী হরসুন্দরী বিষয়াধিকারিণী হন। কিন্তু তিনি দৌহিত্র মণীন্দ্রচন্দ্রকে সম্পত্তির অধিকার অর্পণ করিয়া কাশীবাস করিতে থাকেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে) কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয় মণীন্দ্রচন্দ্র এই বিপুল সম্পত্তি লাভ করেন। তাঁহার পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না। তাঁহার বয়স যখন মাত্র দুই বৎসর তখন তাঁহার জননীর এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়। চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাকে কাশিমবাজার রাজসংসার প্রদত্ত মাসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া বৃহৎ পরিবার পালন করিতে হইয়াছিল। তাহার পর মাতামহের সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে আইসে।

জীবনের প্রধান ভাগ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ভাবে কাটাইয়া তিনি যে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার ফলস্বরূপ তিনি মাতামহের বিপুল সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রও বিলাসবর্জ্জিত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। জমিদারীর সমগ্র আয় প্রায় জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইত। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সদনুষ্ঠানে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় চারি কোটী টাকা। বহরমপুরে মাতুলের স্মৃতিচিহ্ন কৃষ্ণনাথ কলেজে তিনি প্রতি বৎসর ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। কলেজ ও স্কুল সংলগ্ন ছাত্রাবাসের জন্য বৎসরে আরও ১৫ হাজার টাকা দিতেন। কলেজ বাটীর সংস্কার সাধনার্থ তিনি দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বহরমপুরে একটি শিল্প বিদ্যালয় ও একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার ছিল, এবং মেডিক্যাল স্কুলের জন্য ৫০ হাজার টাকা তিনি গবর্ণমেণ্টের কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হয় নাই—স্কুল দুইটি স্থাপিত হয় নাই। তাঁহার প্রদত্ত অর্থে কলিকাতায় একটি শিল্প বিদ্যালয় ও তৎসহ একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, এবং ইথোরায় একটি ধনিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। নানা স্থানে আরও কয়েকটি উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সেইগুলির পরিচালনের জন্য তিনি বৎসরে ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। তিনি কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই লক্ষ, এবং আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান কলেজে দুই লক্ষ টাকা দান করেন। রংপুর কলেজে তিনি ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দৌলতপুর কলেজ, পুরী বেদ বিদ্যালয়, দিল্লীর মহিলা

ডাক্তারী স্কুল প্রভৃতি আরও নানা প্রতিষ্ঠানে তিনি অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন। দুঃস্থ ছাত্রগণের সাহায্যার্থ তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার অর্থ সাহায্যে বহু বঙ্গীয় যুবক বিদেশে গিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের জীবন, বলিতে গেলে, একটি নিরবচ্ছিন্ন দানের ইতিহাস।

দেশে জ্ঞানালোকের বিস্তার, বিশেষ করিয়া শিল্প শিক্ষার বিস্তারের দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ও আগ্রহ ছিল। স্বদেশীর যুগে প্রধানতঃ তাঁহার আগ্রহে ও আংশিক অর্থ সাহায্যে বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রথম চীনামাটীর বাসনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। নূতন কলকারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইলেই তিনি প্রচুর অংশ ক্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠাতৃ-বর্গকে উৎসাহিত করিতেন। তিনি নিজেও কলকারখানা স্থাপন করিয়া শিল্পের প্রসারের জন্য প্রভূত চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিতেন। কলকারখানায় ও ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া অর্থলাভ অপেক্ষা শিল্প বাণিজ্যের বিস্তৃতি সাধনই তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল। এইরূপ নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য করার দরুণ, কোন কলকারখানা উঠিয়া গেলে বা ব্যবসায় ফেল করিলে, অর্থনাশের আশঙ্কা তাঁহাকে একটুও বিচলিত করিতে পারিত না। পক্ষান্তরে, কোন শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সফলতা লাভ করিলে দেশের ও জন-সাধারণের মঙ্গলের কথা ভাবিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না।

একদিনের একটা কথা মনে পড়ে। শিল্প বাণিজ্যে তিনি নিজে কিরূপ উৎসাহী ছিলেন, অপরকেও কিরূপ উৎসাহ দিতেন—এটি তাহারই সম্বন্ধীয় কথা।

কলিকাতা বিডন স্কোয়ারে যে বৎসর কংগ্রেসের অধি-বেশন হয়, সেই সঙ্গে একটি নিখিল ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীরও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই প্রদর্শনীতে আমি আমার (পেষ্টবোর্ডের তৈয়ারী) নকল শ্লেট প্রদর্শন ও বিক্রয় করিয়াছিলাম। ঠিক পাথরের শ্লেটের সকল কাজই ইহাতে চলিত—ইহা সম্পূর্ণ ওয়াটারপ্রুফ হইয়াছিল—জল দিয়া লেখা মুছা যাইত—শ্লেটের কোন ক্ষতি হইত না। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র সেই প্রদর্শনী-কমিটির সভাপতি ছিলেন। প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়া সেই শ্লেট দেখিয়া তিনি এতদূর প্রীতিলাভ করেন যে, বলেন, যদি আমি রীতিমত মাল সরবরাহ করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীর সর্ব্বত্র সমস্ত প্রাইমারী ইস্কুলে আমার শ্লেট ব্যবহার করাইবেন। (ভবানীপুরের কংগ্রেস একজিবিসনে বরোদার মহারাজও ঠিক ঐরূপ কথাই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক—সেখানে বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে; তিনি সমস্ত প্রাথমিক স্কুলে আমার শ্লেট ধরাইয়া দিবেন।) কিন্তু আমার আয়োজন অতি সামান্য ছিল—আমি ঐ লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিতে ভরসা করি নাই।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র একদেশদর্শী ছিলেন না—কেবলমাত্র শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে অর্থ সাহায্য এবং উৎসাহ-সহানুভূতি প্রদানে তাঁহার কল্যাণময় ভাণ্ডার শূন্য হয় নাই—জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রের উপরই তাঁহার সমদৃষ্টি ছিল—হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি তাঁহার আর্থিক সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইত না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁহার রাজোচিত দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কয়েকজন কর্ত্তৃপক্ষ মহারাজের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইবামাত্র পরিষদের গৃহনির্ম্মাণার্থ তিনি আপার সার্কুলার রোডে হালসীবাগানে বহুমূল্য জমি দান করেন। বার্ষিক বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনেরও তিনিই প্রথম ও প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন—তাঁহারই গৃহে কবীন্দ্র রবীন্দ্রের সভাপতিত্বে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল।

রাজনীতি ক্ষেত্রেও মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র বহু স্থলে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি এবং মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সভাপতি রূপে জনসাধারণের মঙ্গল সাধন করিবার তিনি যেমন প্রচুর সুযোগ পাইয়া-ছিলেন—সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতেও তিনি তদ্রূপ কৃপণতা করেন নাই। বাঙ্গলার অন্যতম জমিদারসভা—বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনেরও তিনি কিছুকাল কর্ম্ম-নির্ব্বাহক সভার সদস্য এবং কিছুকাল উহার সভাপতির পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভা, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যরূপে

তিনি জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে অবহিত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তিনি দেশের পক্ষ হইতে সরকারের নিকট ন্যায়সঙ্গত দাবী পেশ করিতে এবং সরকারের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ আন্দোলন এবং রৌলট আইন ঘটিত আন্দোলনের সময় তিনি সরকারের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর বদান্যতাগুণে প্রসন্ন হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে বংশানুক্রমে মহারাজা উপাধি দানে প্রতিশ্রুত ছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩০এ মে তারিখে মণীন্দ্রচন্দ্রের মহারাজা উপাধি ঘোষণা করেন; এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের লোকান্তরের পর তাঁহার পুত্র শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয় মহারাজা হইয়াছেন।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কেবল যে দানশীলতার জন্যই প্রসিদ্ধ তাহা নহে—সামাজিকতায়ও তিনি রাজবংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বিনয়, আড়ম্বরশূন্যতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, মহানুভবতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবোচিত বিনয় তাঁহার সহজাত সংস্কার স্বরূপ ছিল।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র রীতিমত বিষয়ী লোক ছিলেন—পরমুখাপেক্ষী না হইয়া তিনি বিষয়কর্ম্ম স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন—কর্ম্মচারীদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন না। তিনি বিষয়কর্ম্ম ভালরূপ বুঝিতেন বলিয়া বিষয়ের সম্যক উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সময়ে সম্পত্তির আয় ছিল বার্ষিক সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সুদক্ষ পরিচালনে উহার আয়ের উন্নতি হইয়া বার্ষিক কুড়িলক্ষ টাকা আয় দাঁড়ায়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র কে-সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন।

সন ১৩৩৬সালের ২৫এ কার্ত্তিক মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র পরলোকে গমন করিয়াছেন।

কাশিমবাজারের বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী পিতার উপযুক্ত পুত্র। তিনি কৃতবিদ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পিতৃ পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং পিতার সদ্‌গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হইয়া পিতৃকীর্ত্তিসমূহ রক্ষণে সতত যত্নশীল। প্রার্থনা করি, শ্রীভগবান জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ও আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধন করুন।

অলখ্

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

ঘাটের প্রদীপ জ্বল্‌বে নাকো,
উঠ্‌বে শুধু ঢেউ প্রাণে;
অলখ্!—আবির্ভাব যে তোমার
হঠাৎ কখন, কেউ জানে?
কখন চরণ কমল দুটি
বুকের কূলে উঠ্‌বে ফুটি',
কোথায় তখন মঙ্গল-ঘট—
পল্লব পুট,—জল-ভরা?
অতর্কিতের প্রকাশ তুমি—
অম্‌নি তোমার ছল করা!

তবে, জানি—আস্‌বে, জানি—
আস্‌ছ তুমি, ভুল নেই;
বাড়্‌চ তুমি আলোক-লতা—
মাটির 'পরে মূল নেই।
মরুবালির তলে তলে
ফল্গু যেমন লুকিয়ে চলে,
তিমির-গোপন আস্‌ছ তুমি
তেম্‌নি নিচুপ একজনা
সাঁত্‌রে' আমার জীবন-সাগর—
আভাব না পাই এক কণা!

যেনাহং নামৃতা স্যাম্

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ঘটনা-পর্যায় বা চরিত্র-বিবর্দ্ধনের দিক থেকে মানুষের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের একটা আপাতশোভন তুলনা চললেও আসলে জীবনের সঙ্গে নাটকের কোনো বিষয়বিন্যাসগত সাদৃশ্য নেই। জীবনের ঘটনাগুলি নাটকের সুসম্বদ্ধ দৃশ্যাবলীর কঠোর পারম্পর্য্যের মধ্যে শেষ হয় না, এখানে-ওখানে ভেঙে ছিটিয়ে পড়ে, তাদের কোনো সময়ানুগত্য নেই, বিধিবদ্ধতা নেই—এমন জায়গায় এসে শেষ হয়, যেখানে আর একতিল নাটকীয়ত্ব থাকে না। নাটক পরিণতির জন্যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে আস্তে-আস্তে প্রস্তুত হ'তে থাকে, কিন্তু জীবনে কোথাও এতোটুকু এই নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত প্রত্যাশা নেই—তার আগাগোড়া অহৈতুক আকস্মিকতা। যা মাত্র হ'তে পারে, তার চেয়ে যা হয়—তা'র শক্তি অনেক ব্যাপক, অনেক স্বেচ্ছাচারী, অনেক উৎপথগামী—এবং সেই কারণেই জীবন অত্যন্ত সহজ, সমারোহহীন, আকাশময় শূন্যতার মতো সুসমতল। কেবল এক জায়গায় দু'য়ের মিল আছে—বলো তো কোথায়?—দোদুল্যমান ব্যাকুলতায় নয়, রোমাঞ্চকর বিস্ময়োৎপাদনে নয়—একমাত্র অতিক্রুত যবনিকা-পতনে।

শ্রীসরলকুমার রায়চৌধুরী—শুধু এইটুকু বললেই চেনা যাবে না, কেননা বাংলা-দেশে উক্ত নামধেয় ব্যক্তির অভাব নেই, কিন্তু 'সসাগরা' পত্রিকার সম্পাদক বললেই তা'র যথার্থ সংজ্ঞানির্ণয় হ'বে। তখুনিই আমরা তা'র পরিচয়ের খসড়া একটা নক্সা পাবো। অন্তত স্বচক্ষে আমরা তাকে বহুবার দেখেছি এবং তা'র লেখা ও পত্রিকা-পরিচালনার পদ্ধতি থেকেই আমরা তা'র চরিত্রের একটা স্থূল নির্দ্দেশ পাই। বয়েস আটাশ-উনত্রিশের বেশি হ'বে না, ঋজু সরল দীর্ঘচ্ছন্দ চেহারা, প্রোফাইলে বা মুখের পার্শ্বচিত্রে অনেকটা ঠিক ভ্যানডাইকের জেন্টল্‌ম্যান্-এর মতো। তার চালচলনে এমন একটা নির্লিপ্ত উপেক্ষা আছে যে ঠিক তাকে সাধারণের দলে ফেলা যায় না, রুচি বলে' একটা অসুলভ গুণের সে চর্চ্চা করেছে বলে' সে একজন সবিশেষ ব্যক্তি—এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 'লোক মাত্রেই লোকের চোখে অহঙ্কারী। লোকে যেমন তাকে দেখতে পায় না, তেমনি জনপ্রিয়তাকেও সরল সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করে। পরের মতানুকূল্যের চেয়ে নিজের বুদ্ধিশক্তিকে সে বেশি মর্য্যাদা দেয়। আকারে ও কণ্ঠস্বরের মতো তার অস্তিত্বচেতনারো একটা স্বাতন্ত্র্য আছে।

সে যে বেঁচে আছে, সবাইর থেকে আলাদা হ'য়ে একাকী বেঁচে আছে তারই পরিচয় হচ্ছে তার 'সসাগরা'। মানুষের জীবনের সবখানি জুড়ে এক বিরাটকায় দৈত্য থাবা মেলে আছে—তার নাম হচ্ছে গতানুগতিকা, পৌনঃপুন্য, তার নাম হচ্ছে জীবন্মৃতা। একমাত্র লেখনীকে অস্ত্ররূপে সম্বল করে' সরল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে, একমাত্র লেখনীর তীক্ষ্ণতায় তাকে সে জর্জ্জর, খণ্ড-বিখণ্ড করবে। তার মাঝে আদর্শের পৌত্তলিকতা নেই, সচ্চরিত্র হওয়ার চেয়ে চরিত্রবান হ'বার সে পক্ষপাতী। ঘরে মুক্ত হাওয়া আন্‌বার জন্যে দরজা-জান্‌লা সে ভেঙে দিতে চায়, জীর্ণ দেয়ালে চুণকাম করিয়ে তাকে সস্তা জৌলুস দেয়ার চাইতে সমস্ত ভিৎ নতুন করে' পত্তন করতে হ'বে। পৃথিবীর কক্ষাবর্ত্তনের মতো মানুষের জীবনে বৈচিত্র্যহীন দিনানুদৈনিকতা নেই, পৃথিবীর মেরুদণ্ডের মতো, ঈশ্বরের স্থায়িত্বের মতো মানুষের কোনো স্থির, অচঞ্চল, অপরিবর্ত্তনীয় প্রিন্সিপ্‌ল্ নেই—আইনস্টাইন্ সে-মোহ ভেঙে দিয়েছে। "Do what you will."

সরলের মত হচ্ছে এটা সাহিত্যের যুগ নয়, এটা জার্নালিজ্‌মের যুগ। সৌন্দর্য্য নয়, রূপের সাধনা করতে হ'বে। ছবি না এঁকে পোষ্টার। তাই সে বরাবর নবীনতার বদলে আধুনিকতার ভক্ত। রাস্কিন-মরিস্‌এর মতো সেও Art for life's sake-এর পতাকাবাহী, কিন্তু অন্যার্থে। অর্থাৎ জীবনের জন্যেই আর্টকে হ'তে

হ'বে রূঢ়, সর্ব্বসংস্কার-মুক্ত, সত্যবাদী। তাই পরিণত জ্ঞানের উপলব্ধিকে সে ভাবাকুলতার বাষ্পে স্পর্শসহ করবার বিরুদ্ধে। যা সত্য তা সর্ব্বভুকের মতো লেলিহান শিখা বিস্তার করবে, তার চারদিকে সৌন্দর্য্যের ঘেরাটোপ ঘেরার দরকার করে না।

কিন্তু যা অথচ সত্য নয়,—এমনিই ভাগ্যের বিড়ম্বনা—তা'রি সৌন্দর্য্যে সরলকে একদিন বিস্মিত হ'তে হ'লো। ব্যাপারটা তা হ'লে খুলে বলি।

'সসাগরা'তে এমন সব লেখা বেরোয় যা চল্‌তি সমালোচকের ভাষায় মা-মেয়ে একসঙ্গে বসে' পড়তে পারে না। সেই কারণে মা-ও একখানা কাগজ কেনেন, মেয়েও একখানা কাগজ কেনে। কাগজ সেই হিসেবে পুরোদমে চলছে, যদিও ব্যবসার দিক থেকে সরলকুমার অতিমাত্রায় স্বনামধন্য। তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, সরলকুমারের সম্প্রতি কিছু পয়সার ভাবনা নেই। ওটা তা'র সময়াতিবাহনের নিরীহ একটা উপায়, যদিও কথাটা ও-ভাবে বললে ও চটে। সাহিত্যের স্থায়ী উপকার কিছু না হ'লেও এই উগ্র অভিভাষণে নিজের একটা বিজ্ঞাপন হচ্ছে এতেই সে খুসি—যদিও সাহিত্যে স্থায়িত্ব বলে' কোনো জিনিস সে মানে না এবং তার মতে সাহিত্যিকের এই আত্মঘোষণার আড়ম্বরের তারতম্য থেকেই এই স্থায়িত্ব-নির্ণয় ঘটে। সে-কথা নিয়ে আর যে-খুসি মাথা ঘামাক্, সে ইদানি এবং সবসময়েই বর্ত্তমান হ'য়ে বিরাজ করতে চায়, সেই বাঁচাই আসল বাঁচা—সাহিত্যিকের বাঁচার চাইতে জার্নালিষ্টএর বাঁচাকেই সে বেশি পছন্দ করে—কীর্ত্তির অবিনশ্বরতা নয়, কর্ম্মের অবিরতি। বেশির ভাগ লেখা তাকেই স্বহস্তে লিখতে হয়—কেন না আমাদের লেখাকেও সুরে মিল্‌লো না বলে' ফেরৎ দিতে সে পেছপা হয় না। আমরা যখনই ঐ সাহিত্যিক অমরত্বের লোভে পড়ে' অলক্ষ্যে লেখাকে সুন্দর করতে গেছি, তখনই তার ভাগ্যে প্রত্যাখ্যানের লাঞ্ছনা জুটেছে। তাই 'সসাগরা'য় কোনোদিন কবিতা ছাপা হয় নি, পৃষ্ঠার পাদপূরণ করবারো তা'র কোনোকালে সৌভাগ্য হ'লো না। কবিতাকে সরল চিরকাল এনিমিয়ার লক্ষণ বলে' মনে করতো এবং তা'র চিকিৎসার যা ব্যবস্থা করতো তা অতিমাত্রায় স্থূল ও সামাজিক। বল্‌তো: বিষস্য বিষমৌষধম্।

কিন্তু একদিন এই কবিতাই কী কাণ্ড করলে তাই আমাকে লিখতে হচ্ছে।

'সসাগরা'র আপিস্ হচ্ছে সরলেরই বাড়ির নিচের বৈঠকখানায়। দুপুরবেলা আমরা কয়েকজন বেকার সাহিত্যিক বসে'-বসে' খোসগল্প করছি, আর সরল তার টেব্‌লে ঘাড় গুঁজে বসে' কাগজের প্রথম ফর্ম্মার প্রুফ্ দেখছে। প্রুফ-দেখায় ওর অখণ্ড মনোযোগ এবং লেখার চাইতে তা'র প্রুফ দেখায় ওর উৎসাহ বেশি। চিন্তাগুলিকে যখন ও স্পষ্ট সার বেঁধে চোখের সামনে দাঁড়াতে দেখে, তখন তাদের ওপর আবার ও নতুন করে' সমালোচকের অস্ত্রক্ষেপ করে। রচনার চাইতে তা'র প্রসাধনেও তা'র কম আনন্দ নয়।

এমন সময় জান্‌লা দিয়ে পিওন একটা লম্বা মোটা খাম ফেলে দিলো। ওটা কুড়িয়ে নিয়ে সরলের হাতে দিলাম। সাধারণত 'সসাগরা'র সম্পাদকের ওপর এমন দৌরাত্ম্য ঘটে না, কেননা বাংলা দেশের লেখক-সম্প্রদায়ের দ্বার একমাত্র এইখানেই চিরকালের জন্য বন্ধ করে' দেয়া হয়েছে। সরল তা'র পত্রিকার কভারের প্রথম পৃষ্ঠায়ই গ্রেট য়্যান্টিকে ছেপে দিয়েছে যে এ-কাগজে তা'র দলের লোক ছাড়া অন্য কারো প্রবেশাধিকার নেই; 'সসাগরা'র সম্পাদককে অযথা বিরক্ত না করে' তারা যেন নিজের-নিজের কাজ করে। পড়তেও সে কাউকেও বিশেষ আমন্ত্রণ করছে না, কেননা বাঙলা-দেশের নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট সে শ্রদ্ধা রাখে। বাঙালিকে মানুষ করে' দেখবার স্বপ্ন যদি সে দেখে থাকে, তবে অন্যান্য স্বপ্ন-দ্রষ্টার মতো সেও পাত্‌তাড়ি গুটোতে রাজি আছে।

তবু নেপথ্যে বসে' মানুষের কৌতূহলী হওয়াই স্বাভাবিক—তাই সরল চিঠিটা খুলে ফেল্‌লে। একবার চোখ বুলোতেই সে চিনতে পারলে লেখাটা কবিতা, আর লেখকটি নিতান্তই লেখিকা। সামান্যতম দ্বিধাও তাকে তা'র সহজ সিদ্ধান্ত থেকে বিচলিত করতে পারলো না, খামশুদ্ধ্ লেখাটা সে সিগারেটের ছাই ঝাড়বার মতো

অত্যন্ত অবহেলায় ওয়েষ্ট্-পেপার-বাস্কেটে ফেলে দিলো। বল্লো: কী দুঃসাহস! হাতা-খুন্তি, সূচ-কাঁটা ছেড়ে কলম হাতে নিয়েছে।

এই মন্তব্যটা এককথায় ঐ চিঠিটার পৃষ্ঠ-পট আমাদের চোখের সামনে পরিষ্কার করে' ধরলো। অসিত তাড়াতাড়ি খামটা ফের কুড়িয়ে নিলে, ঠোঁট-মুখ চঞ্চল করে' বল্লে—কী লিখেছে শোন্, স-সা। ('সসাগরা'র সম্পাদক হিসেবে সরলের নামটা আমরা ঐ ভাবে অপভ্রষ্ট করে' নিয়েছিলাম।) অসিত পড়তে লাগলো:

"দলের লোক ছাড়া আর কারো লেখা ছাপিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু আমিও যে 'সসাগরা'র দলীয় নই, তাহা কে বলিল? অতএব সেইদিক হইতে এই কবিতাটির অমনোনীত হইবার কারণ দেখি না, তবে রসবিচারের দিক হইতে ইহার ভাগ্যে কি ঘটিবে বলা কঠিন। যদিও রসজ্ঞ বলিয়া আপনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই, তবু অন্য কোনো পত্রিকায় যে ইহার স্থান হইবে না এইটুকু আশা করি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। ভঙ্গির তীক্ষ্ণতা ও প্রকাশের নিরাবরণ ঔজ্জ্বল্যের জন্য এই লেখা অন্যত্র নির্ব্বাচিত হইবে না—আপনার কাছে ইহাই তো ইহার পক্ষে বড় সার্টিফিকেট। ইতি।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী।"

চিঠির প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে সরল চিড়বিড় করে' উঠ্লো। বল্লে: লেখাটা কী নিয়ে?

একটু চোখ বুলিয়ে নিয়েই অসিত বল্লে: As usual প্রেমের কবিতা।

—As usual. সরল ব্যস্ত হ'য়ে বললে: রেখে দাও। আমাদের দলের লোক না হাতি! আমাদের দলের লোকরা মেয়েমানুষ নয়, আর সব কিছু ছেড়ে প্রেম সম্বন্ধে প্রকাশের ঔজ্জ্বল্য দেখাতে তারা মাথা ঘামায় না। বলে' সে ফের প্রুফ্ কাটতে মনোনিবেশ করলে।

আত্তোপান্ত কবিতাটা পড়ে' আনন্দে অসিত একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠ্লো: Marvellous! এ যে সহজে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না হে! বলে কী? বাঙালির মেয়ে এ কী করেছে?

সবাই হকচকিয়ে গেলাম। সমস্বরে বলে' উঠ্লাম: কেন? কী? কে?

অসিত চিঠির কাগজটা শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে বল্লে: আরে, সত্যি-সত্যিই যে এ প্রেমের কবিতা লিখেছে। মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে নয়, দস্তুরমতো কোনো জীবন্ত ব্যক্তিকে নিয়ে।

প্রণব প্রবলকণ্ঠে হেসে উঠ্লো: সেই জীবন্ত ব্যক্তিটির স্বামী হ'তে দোষ কী?

—আরে, না, এতে পাতিব্রত্যের এতোটুকু গন্ধ নেই। ক্ষণসুহৃৎকে সম্বোধন করে' লেখা হচ্ছে প্রেমের অকালমৃত্যুতেই প্রেমের অবিনশ্বরতা, তোমাকে আমি একটি মুহূর্ত্তের কোটিতম ভগ্নাংশের জন্যে পেতে চাই; তারপর আমি তোমাকে সময়সমুদ্রে চিরকালের জন্যে বিসর্জ্জন দেব—শোনোই না কবিতাটা।

প্রণব তা'র হাত থেকে খপ্ করে' কাগজটা কেড়ে নিয়ে বল্লে: তুই পড়বি কী? কোথায় কোন্ accent দিতে হ'বে তুই জানিস্? বলে' সে প্রথম নকল থিয়েটারি ঢঙে আবৃত্তি সুরু করলে, কিন্তু কখন যে তা'র গলার স্বর নিটোল ও ঘরের আবহাওয়া গাঢ় হ'য়ে উঠেছে খেয়াল করবার সময় পেলাম না।

মিহিন্ সুরে এস্রাজের টান নয়, একেবারে সমুচ্ছ্বসিত অর্কেষ্ট্রার কনসার্ট। লেখিকার কাছে প্রেম অর্থ নিরীহ নিরুপদ্রব শোকাকুলতা নয়, দেহ মনের সকাম, প্রবল ও পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা। তার কাছে প্রেম অর্থ তারার জন্যে আলোক পতঙ্গের পিপাসা নয়, আগুনের জন্যে পিপাসা। কী অসীম দুঃসাহস! অবরুদ্ধা, অন্তঃপুরিকা বাঙালিমেয়ের এই সতেজ ও নির্ভীক কামনার দীপ্তিতে চক্ষু ও কান আমাদের ঝল্সে গেলো। ভাষা ও ধ্বনির যে রমণীয় অমিতব্যয় ঘটলে কবিতা কবিতা হ'য়ে ওঠে, তা এর প্রতি ছত্র ভারাক্রান্ত করে' আছে, উত্তীর্ণ হ'য়ে কোথাও এতটুকু উপচে পড়ছে না। ভাব নয়, অনুভব; উদ্বেগ নয়, উত্তেজনা—মধুর দুঃসহ উত্তেজনা—প্রতিটি শব্দ চয়ন করেছে—যেন নিটোল, পরিপূর্ণ চুম্বন; শব্দ হ'তে শব্দান্তরে প্রতিটি অনুচ্চারিত বিরামে উত্তপ্ত গাত্রস্পর্শ। রেখা ও রঙ দিয়ে ছবি আঁকে নি, ভাষা ও ধ্বনি দিয়ে কবিতাকে চিত্রিত করেছে। মিল্টনের সংজ্ঞা মানতে গেলে কবিতাটি নিখুঁত, সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট—স্ফটিকস্বচ্ছ আন্তরিকতায় একান্ত সরল, বর্ণ ও গতি, ধ্বনি ও ছন্দের

ছটায় সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য, আর পরাক্রান্ত সর্ব্বকূলপ্লাবী কামনায় গভীর ও গাঢ়। আর্ট যে লজিক নয়, ম্যাজিক্, তা যেন আমরা সবাই একসঙ্গে এক নিমেষে চোখের সামনে দেখতে পেলাম।

কিন্তু সরল উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লো অন্য কারণে। কোনো মেয়ে বহুভাষণের দীপ্তিতে তা'র প্রেমকে এমন করে', এতোখানি কুরে', উলঙ্গ করে' দিতে পারে এই ভঙ্গিটাই তাকে চঞ্চল করে' তুললো। এতোকাল পুরুষই উদ্যোগী ছিলো, তাও কতো ভদ্র হ'য়ে, পেনাল-কোডের পাঁচশো ধারা বাঁচিয়ে, ধরি মাছ না ছুঁই পানির শরণাপন্ন হ'য়ে। প্রেমিকার নামোচ্চারণে পর্য্যন্ত কবিতার জাত যেতো। সে সব মামুলি প্রথা বাতিল করে' এ কী দৃপ্ত প্রখর আবির্ভাব! এ কী অকুণ্ঠিত অনর্গলতা! ভালো সে বেসেছে, হ্যাঁ, স্মরজিৎ নামে এক শরীরী পুরুষকে ভালোবেসেছে—তাকে সে চায়, একটি মুহূর্ত্তের কোটিতম ভগ্নাংশের জন্যে চায়,—অনেক দিনের জন্যে চেয়ে অনেকক্ষণের ক্লান্তিতে সে পাওয়াকে তার ব্যর্থ করতে ইচ্ছা করে না।

সরল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো: 'সসাগরা' এতোদিনে সাগর আবিষ্কার করলো দেখছি। রইলো এই প্রবন্ধ, এই কবিতাই হ'বে এবারের প্রথম লেখা।

তাকে এই উৎসাহের প্রাবল্য থেকে রক্ষা করলাম; বল্‌লাম: ভয় নেই, এ হচ্ছে কোনো পুরুষের রচনা—মেয়ের ছদ্মবেশে দেখা দিয়েছে। মেয়ে হ'লে কখন হিষ্টিরিয়ায় পড়ে' যেতো, নয়তো বা সেই melancholia. পরের কারণে স্বার্থ বলি দিতে পারলেই মেয়েরা খুসি, তাদের কাছ থেকে বলির এমন সু-অর্থ তুমি আশা করো না।

কথাটা বিশ্বাস করতে না চাইলেও সরল একটু দমে' গেলো দেখলাম। একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বল্‌লে: চিঠিতে ঠিকানা দিয়েছে তো? কল্‌কাতার ঠিকানা? কী বল্‌লি? পোষ্টাপিস হাটখোলা? আমি আজই খোঁজ নিচ্ছি।

অসিত বল্‌লে,—দেখিস, শেষকালে না সেই সম্পাদকের বিড়ম্বনা ঘটে। গল্পে সবাই মোহভঙ্গের কথাটাই লিখেছে, রসাভাসের ভয়ে প্রহারের কথাটা কেউ আর উল্লেখ করে নি। দেখিস তোর কপালে যেন—

প্রণব বাধা দিয়ে বল্‌লে,—এতো যে সাহসী, এতো যে স্বাধীন সে সম্পাদকের সঙ্গে চাক্ষুষ একটা পরিচয় করতে রাজি হ'বে না? তাই যদি হয় তবে ও-কবিতা ছেপে কাজ নেই। অমন বাঙালিত্বকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেয়া চলবে না।

কবিতা-বিচারে এই নির্লজ্জ ও অসামাজিক যুক্তির অবতারণায় সরল বোধ করি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। গলা খাঁখ্‌রে বললে: দেখা যাক্।

পুরো একমাস সরল এ-দিকে আর মন দিলে না। এতোটা ব্যস্ততা তারই মনের দুর্ব্বল একটা অব্যবস্থার পরিচয় মনে করে' সে থেমে গেলো। কবিতা সে ছাপলে, কিন্তু হাটখোলার ঠিকানায় কাগজ পৌঁছুবার আগেই শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর আরেকটি কবিতা বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো আমাদের একেবারে ধাঁধিয়ে দিলো। সেই প্রেমের উৎস-উৎসারিত যৌবনের সমুচ্ছ্বাস।

সরলকে আর আমরা উদাসীন থাকতে দিলাম না। সে হেসে বল্‌লে,—গণ্ডাঘাত বা গদাঘাতের ভয়ে তোমরা আমার সঙ্গে যাচ্ছ না বটে, শেষকালে—

—শেষকালে সেই ভদ্রলোককে না হয় তাঁর ছদ্মবেশ ছাড়িয়ে ভদ্র বানানো যাবে।

পরদিন আপিসে গিয়ে সবাই চড়াও হ'তেই সরল দুই হাতে সবলে ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌লে: হোপলেস্। একেবারে হোপ্‌লেস্।

নিশ্চিন্ত হ'বার ভাণ করে' বল্‌লাম,—লেডি ভলান্টিয়ার নয় তো? বাবাঃ, বাঁচা গেলো। পাঁচজনের সামনে আর মুখ দেখানো যাচ্ছিলো না।

চেয়ারের ওপর বস্‌বার ভঙ্গিটা বিস্তৃত ও শিথিল করে' সরল নৈরাশ্যের সঙ্গে বিস্ময় মিশিয়ে বল্‌লে,—ও আমাদের কুঙ্কুম। ওর পেটে যে এতো বিদ্যে ছিলো কে জান্‌তো? সেই কতো ছেলেবেলায় ওকে দেখেছিলাম।

প্রণব অস্থির হ'য়ে বল্‌লে,—ব্যাপারটা খুলেই বল্ না ছাই। কুঙ্কুমই বা কে, বা সে সাবিত্রীই বা হ'ল কিসে? দেখি ঘটনাটা থেকে একটা গল্প বের করা যায় কিনা।

সরল বলতে লাগলো: ঠিকানা চিনে তো গেলাম বিকেল বেলা। তোদের বলবো কি, পাড়ায় রোয়াকে

রোয়াকে দাবার ছক্ আর পাশার আড্ডা দেখে মনে ভয় ধরে' গেলো—মনে হ'লো সাবিত্রী দেবী আপাততো পুরুষ হ'লেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে দুটো আলাপ সেরে মানে-মানে বাড়ি ফিরতে পাবো। সেই নম্বরের বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি রোয়াকে এক দঙ্গল লোক জাঁকিয়ে বসে' প্রাণপণে মুখে-মুখে মোহনবাগানের হ'য়ে গণ্ডায়-গণ্ডায় গোল দিচ্ছে। তাকিয়া, আলবোলা, ঘুগনি-দানা, সাড়ে বত্রিশভাজা, দসারে করে' কালো বরফ—কোনো কিছুরই অভাব নেই। গলিটা আবার ব্লাইন্‌ড্, অতএব আমার নির্গমনের রাস্তা ঐ বাড়িটার সামনে এসেই সহসা থেমে গেলো বলে' সবাই উৎসুক হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকালো। একজন গলা উঁচিয়ে স্পষ্ট জিগ্‌গেস করে' বসলো: কাকে চান্ মশাই ?

সরলের কথা-বলার ধরন দেখে আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

—কী করে' বলি : এ বাড়িতে সাবিত্রী দেবী থাকেন ? সে একটা নিদারুণ ছন্দপতনের মতো শোনাবে। অথচ নম্বরের নীল প্লেটে সাদা কালিতে স্পষ্ট ৭ লেখা। পুরুষ হ'লেই ব্যাপারটা কতো সভ্য ও শোভন হ'তো, কিন্তু সাবিত্রীকে সত্যবানে রূপান্তরিত করবার তখন সময় নেই।

অসিত বল্‌লে,—তুই কী করলি তাই বল্ না।

সরল হেসে বল্‌লে,—ফিরে যাওয়াই ঠিক করলাম। ভাবলাম লেখার বিচার করবারই আমার অধিকার আছে, লেখকের identity নয়।

উত্তেজিত হ'য়ে উঠলাম: কক্‌খনো না। কোনো পুরুষ নারীর হ'য়ে এমন ভলান্‌টিয়ারি করবে এই নির্লজ্জতার প্রশ্রয় দেয়া চলে না। পরের জবানিতে কথা বলার অধিকার সাহিত্যে কারুর নেই।

সরল বল্‌লে,—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে পৃষ্ঠ প্রদর্শনই একমাত্র প্রশস্ত ছিলো। এ-বাড়িতে সাবিত্রী আছে কিনা খোঁজ করতে গেলে আমাকে ওরা আর পালাবার পথ দিতো না। তাই ভদ্রলোকের প্রশ্নকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে' য়্যাবাউট-টার্ণ করলাম। কিন্তু,—সবাইর মুখের দিকে পর-পর চেয়ে সরল বল্‌লে : কিন্তু ফেরবার মুখেই ও-পাশের ভিড় থেকে কানে একটি বালককণ্ঠের স্বর এলো : কে, সরল-মামা না ?

অসিত মুখবিকৃতি করে' বল্‌লে,—এঃ, একেবারে থার্ড-রেট্। ছ' পেনির গল্প।

—প্রায়। ফিরে চেয়ে দেখি আমার দিদির ভাসুরের ছেলে—নির্ম্মাল্য। জিগ্‌গেস করলাম: তোমরা এই সাত নম্বরেই আছো নাকি ? এখানে কবে এলে ? নির্ম্মাল্য তো আমার হাত ধরেই টানাটানি সুরু করলে: আসুন, ভেতরে আসুন। বাবা এখানে বদলি হ'য়ে এসেছেন যে। মা, ছোটপিসিমা—

প্রণব বল্‌লে,—রাখ্, অতো সব 'মিউনিশিই' আমরা জান্‌তে চাই না। ছোটপিসিমা কী বল্‌লেন তাই বল্ এবার।

সরল গম্ভীর হ'য়ে বলতে লাগলো: কী কথা হ'ল সেটা পরে আসছে। কুঙ্কুম যে দেখতে-দেখতে এতো বড়ো হ'য়ে উঠেছে সেইটের বিস্ময় কাটাতেই কিছু সময় লাগলো। বড়ো অর্থ বয়সে ততো নয়, দৈর্ঘ্যে—সাধারণত এমন দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে চোখে পড়ে না। ঐ শারীরিক দীর্ঘতা থেকেই তা'র ইন্‌টেলেকচুয়েল ভঙ্গিটা আন্দাজ করতে পারা যায়।

প্রশ্ন করলাম : ঐ কুঙ্কুমেরই ভালো নাম সাবিত্রী তো ?

—ব্যাপারটা আগাগোড়া আগে শোন্। সরল এবার চেয়ারে শিরদাঁড়া খাড়া করে' ভঙ্গিটা 'ইন্‌টেলেকচুয়েল্' করলে: হিরণ-দি অর্থাৎ দিদির জায়ের সঙ্গে রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আলাপের অবতরণিকা চলছে, হঠাৎ পাশে এসে সস্মিত কণ্ঠে কে আমাকে লক্ষ্য করে' বল্‌লে : নমস্কার ! প্রথমটা চম্‌কে গেলাম—হিরণ-দি তাঁর ননদকে চিনিয়ে দিলে প্রকৃতিস্থ হ'বার আগেই গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো: কে, কুঙ্কুম না ? উনুনের ধোঁয়ায় ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছিলো বলে' চিনতে পারিনি।

অস্থির হ'য়ে অসিত বল্‌লে,—উনুনের ধোঁয়ায় ঝাপ্‌সা রেখে লাভ নেই, আমাদেরো চিনতে ভয়ানক অসুবিধে হচ্ছে। কুঙ্কুমকে নিয়ে দোতলায় চলে' আয়—হিরণ-দিকে জলখাবারের বন্দোবস্ত করতে নিচে পাঠিয়ে দে। অফিস-ফেরৎ দিদির ভাসুর-ঠাকুরকে আরো কিছুকাল বাগবাজারের ট্রামের জন্যে ড্যালহৌসি স্কোয়ারে দাঁড় করিয়ে রাখ্। এই ফাঁকে কুঙ্কুমের সঙ্গে তোর আলাপের উপসংহারটা শেষ কর্।

অতএব সরলকে অনেকগুলি ধাপ একলাফে ডিঙিয়ে

যেতে হ'লো। বললে,—পোর্টফোলিয়ো থেকে এ-মাসের এক কাপি 'সসাগরা' বের করে' কুস্তুমকে জিগগেস করলাম: এ-বাড়িতে সাবিত্রী দেবী কে? অসঙ্কোচে কুস্তুম উত্তর করলো: আমি। সর্ব্বান্তঃকরণে এই উত্তরটাই আশা করছিলাম বলে' বিশেষ চমকালাম না। বল্লাম: কিন্তু তোমার অমন একটা পোষাকি নাম আছে নাকি? ও হেসে বল্লে: পাছে প্রেমের কবিতা লিখছি বলে' দাদারা তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেন সেই ভয়ে নামে অমন একটা ঘোম্‌টা টানতে হয়েছে। আশা করি কবিকে এইটুকু প্রিভিলেজ্ দিতে আপনি আপত্তি করবেন না।

সবাই উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌লাম: তারপর?

—তারপর যা-যা কথা জিগ্‌গেস করা উচিত ছিলো, বা যা-যা ঠিক তারপরেই নাটকীয় দৃশ্য-পরিবর্ত্তনের মতোই সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে উঠ্‌তে পারতো—তা নিতান্ত নার্ভাস্‌নেস্-এর জন্যেই বলতে পারলাম না। কিন্তু তা'র এখনো সময় যায়নি।

সুতরাং প্রয়োজনীয় কথা পাড়া ছাড়া উপায় রইলো না: বয়েস কতো? কেমন দেখতে? লেখাপড়ায় কদ্দূর?

সরল বল্লে,—কবিতা থেকেই বয়েসের একটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। গদ্গদতার বয়েস সে পেরিয়ে এসেছে —এই কুড়ি-একুশ হ'বে। এতোদিন বিয়ে হয় নি—সেটা যতো বড়োই সামাজিক দুর্ঘটনা হোক্, সাহিত্যের পক্ষে ভয়ানক লাভ। দেখতে ও কালো, কিন্তু মেয়েমানুষের সৌন্দর্য্য তা'র বর্ণে নয়, বর্ণাতীত উজ্জ্বলতায়। সেই উজ্জ্বলতা দেখলাম তা'র দৃষ্টিতে, ব্যবহারে, ভঙ্গিতে, কথায়। সেইটে তার আসল রূপ, তার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি, পূর্ব্বপুরুষ থেকে ভিক্ষা করে' আনে নি। তোরা অত্যন্ত জুড়িয়ে গেলি মনে হচ্ছে, কিন্তু তোদের সঙ্গে ওর একদিন আলাপ করিয়ে দেব, দেখবি, দেখ্‌তে না হ'লেও শুনতে ও কী চমৎকার! এমন কথা বল্‌তে কোনো মেয়েকে কখনো দেখিনি, পুরুষের দলেও তার সচরাচর জুড়ি মেলে না। বেশি কথা বলতে গেলেই মেয়েরা হয় ফাজিল নয় ন্যাকা সাজে—কিন্তু এ হচ্ছে মুখর, যাকে বলে মর্ম্মরিত। কথা বলাটা যে কথা না-বলার মতোই কতো বড়ো আর্ট তা কুস্তুমকে দেখে আমি প্রথম টের পেলাম। আমরা আজকাল নিউ-ইয়র্ক অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কথা বলছি, কিন্তু আমাদের পাশের বন্ধুর সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে জানি না। এই টকি রেডিয়ো অটোমোবাইল্-গ্রামোফোনের যুগে কেউ এমন অনর্গল কথা কয়ে' যেতে পারে—দ্রুত, তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল কথা—তা ওর সঙ্গে এই নতুন আলাপ হ'বার আগে আমি ভাবতে পারতাম না।

ঠোঁটের বাঁ প্রান্তটা কুঁচ্‌কে প্রণব বল্লে,—কী নিয়ে কথা হ'লো?

—ফিল্‌ম্ নিয়ে নয়, বিয়ের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা নিয়ে নয়, ওর কবিতার বিষয়ীভূতকে নিয়ে নয়। কথা হ'লো ঐ art of talking নিয়েই। প্রতিটি কথা নির্ব্বাচিত, প্রতিটি কথা পরিচ্ছন্ন। লেখাপড়া কদ্দূর শিখেছে জিগ্‌গেস করছিলি না? অবস্থা ভালো নয় বলে' স্কুলে-কলেজে পড়তে পায় নি, এবং সেই কারণেই হয় তো মনে রুক্ষতা আসে নি, সস্তা cynicismএর মোহ থেকে সে আত্মরক্ষা করেছে। যাই বল্, শিক্ষার সার্থকতা হচ্ছে আত্মপ্রকাশে। নিজেকে কোনোরকমে যে সৃষ্টি করতে পারলো না, নিজের মাঝে নতুন করে' জন্ম নিতে যে ভুলে গেলো—

ধমক দিয়ে উঠ্‌লাম: তোর বাচালতা শুনতে আমরা আসি নি। কবে দেখা করিয়ে দিবি তাই বল্।

সরল বল্লে,—দেখি। কিন্তু মাত্র চোখে দেখে তা'র মাহাত্ম্য বোঝা যাবে না। তার ঐশ্বর্য্য হচ্ছে এই প্রকাশের অদম্যতায়—এই ভঙ্গির ঔদ্ধত্যে। ওর সঙ্গে কথা বলে' আমি আরো অবাক হ'য়ে গেলাম। ওর কবিতার অসমমাত্রার মধ্যেও সে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত হয় নি।

ওর অন্যায় উৎসাহকে কিঞ্চিৎ প্রশমিত করবার দরকার হ'লো। বল্লাম: যাই হোক্, ওর কবিতা তো নিতান্ত namby-pamby নয়, তার পেছনে একটা বড়ো রকম সত্য আছে। বা, বলা যাক্, সত্যবান আছে। অতএব এ-ক্ষেত্রে তোর এতোটা না ভড়পালেও চলবে।

—সে-কথাটা আমাকে মনে করিয়ে দিতে হ'বে না। সরল দাঁড়িয়ে পড়লো: এবং তা'র প্রকাশের পেছনে যে কঠিন একটা উপলব্ধি আছে সেইটেই বাঙলা-সাহিত্যের গৌরব। আলাদা করে' সে নারী-সাহিত্য তৈরি করতে চায় না, সমস্ত জীবনকে শৈশবে পর্য্যবসিত রাখতে সে ঘৃণা বোধ করে। আগে সে ব্যক্তি, পরে নারী। এই স্থূল কথাটাই যে সে বুঝেছে তার জন্যেই তাকে অভিনন্দিত করছি।

কিন্তু একদিন আমরাও তো তাকে দেখলাম।

বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে-ভিজ্‌তে হুড়মুড় করে' আপিসের ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি ইজিচেয়ারের নিচু কোলের মধ্যে ডুবে গিয়ে একটি মেয়ে কোলের ওপর একটা বিলিতি মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। সরল আলাপ করিয়ে দেবার আগেই চিনতে পেরেছি। কিন্তু দেখতে তো নিতান্ত 'না-ইভ্‌', বঙ্কিমি যুগের 'সরলা বালা' বলে' মনে হ'লো। অনেকটা আমাদের দেশের অপরাজিতা টাইপ্‌, স্নিগ্ধতা ও শ্যামলতার গা ঘেঁসে আছে। মুখে শিশুর কমনীয়তা, শ্রদ্ধা না এসে মায়া করতে ইচ্ছা করে। সরলের রিপোর্টের সঙ্গে কোথাও মিল পাচ্ছি না। এমন নিরীহ গৃহপালিত চেহারা দেখে অজ্ঞ, অপক বলে'ই তো ধারণা হয়, তবে ও নাকি শুনতে চমৎকার—তারই আশায় গায়ের সমস্ত রোমকূপ শ্রুতিমান করে' রইলাম। কিন্তু মুখে তা'র একটিও কথা নেই, কাগজটা না থাকলে শেষকালে ওকে আঁচলের খুঁট বা নখ খুঁটে আত্মরক্ষা করতে হ'তো। সমস্ত ভঙ্গিটাতে কেমন একটা অত্যাচারিত অভিমান আছে। তবে কথা না বলাটাও নাকি একটা আর্ট—আগে থেকে সরল আমাদের এ-আশ্বাসও দিয়ে রেখেছে। নীরবতা নাকি গভীরতার পরিচায়ক, অতলসঞ্চারী জল নাকি নিঃশব্দ, কিন্তু সত্য কথা বলতে কী, এইভাবে চুপ করে' থাকায় ওকে বেশ একটু বোকাটে ও বিশ্রী দেখাচ্ছিলো। কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শনে যে স্বপ্নভঙ্গ ঘটে তা নারীর বেলায় খাটবে এটা মনে করিনি। সরল আমাদের এতোটা প্রস্তুত না করলেও পারতো। সব চেয়ে মুস্কিল হ'লো এই, ওর এই কুণ্ঠিত উপস্থিতিতে আমরাও চুপ করে' যেতে বাধ্য হ'লাম! নইলে, এই জলে-ভেজার পর ঘরময় সে কী হুল্লোড়ই না পড়ে' যেতো! সরল এটা-ওটা কথা পেড়েও মেয়েটির মুখ থেকে দু' একটা হাঁ-হুঁ'র বেশি কোনো শব্দ বা'র করতে পারলো না।

এমন সময় রক্ষা করলো ওকে সরলের ভাইঝি। এসে খবর দিলে: তাকে উপরে মা ডাকছে। আর যায় কোথা! চেয়ার থেকে ওঠা আর মেঝেটুকু পেরিয়ে যাওয়া—দুটোয় মিলে একটা মুহূর্তের কোটিতম ভগ্নাংশও লাগলো না। সরলের ভাষায় বলতে গেলে তখন একটা দীপ্তি দেখলাম—দৈর্ঘ্যের দীপ্তি,—এতো বড়ো ঢ্যাঙা মেয়ে বাঙালির ঘরে সচরাচর দেখা যায় না বটে।

সেই যে কুঙ্কুম উপরে গেলো, আর আমরা তা'র সন্ধান পেলাম না। এখন থেকে আমাদের ছুটি—তার কবিতা পড়ে'ই আমরা অভিভূত। দোতলার অন্তঃপুরে আমাদের গতিবিধি ছিলো না, তাই এখন থেকে বাকি অধ্যায়গুলি সরলকেই একা শেষ করতে হ'বে। আমরা কুঙ্কুমের মুখের কথার চাইতে মনের কথাতেই বেশি তৃপ্ত রইলাম, তা'র দেহভঙ্গির চাইতে কবিতার অসমমাত্রিকতাই আমাদের বেশি মুগ্ধ করলো।

মাসে-মাসে 'সসাগরা' নব-নব কীর্তি অর্জ্জন করতে লাগলো। পাঠকসমাজে প্রকাণ্ড সাড়া পড়ে' গেছে। হস্‌টেলে-মেস্‌এ, আড্ডায়-আখড়ায় সাবিত্রী দেবী ছাড়া কথা নেই। আগে সবাই ও-গুলোকে পুরুষের রচনা বলে'ই মনে করতো, কিন্তু পুরুষ কখনো বেশি দিন নারীত্বের ভাণ করতে পারে না, যদিও মেয়েরা দুয়েকজন ইংলণ্ডে ফ্রান্সে পুরুষের নামে সাহিত্য-রচনায় সফলকাম হয়েছে। কবিতা, বিশেষ করে' প্রেমের কবিতা, বলতে গেলে, ব্যক্তিত্বের আন্তরিকতা না পেলে কখনোই এতোটা তীব্র ও জীবন্ত হ'তে পারে না। কলেজের ছাত্ররা সবাই নিদারুণ উৎসুক হ'য়ে উঠ্‌লো; ফুটবল-খেলার মাঠে, ডবল-ডেকারে, সিনেমায়, গ্রামোফোনের দোকানে তাকে খুঁজে ফিরতে লাগলো; আর সমস্ত ভালো-মন্দ আন্দোলনের পুরোধা হচ্ছে এই 'যুব'-সম্প্রদায়। দৈনিকে-সাপ্তাহিকে তাড়াটে সমালোচকেরা তার আত্মশ্রাদ্ধের সাড়ম্বর ব্যবস্থা করলে—নারী-জাতির এই অধোগতির নিন্দাচ্ছলে নারীরা ওর শূর্পণখার দশা করলে। এতো সেই লেখায় তেজ যে তাকে উপেক্ষা করা যায় না, সেই সত্যভাষণের দীপ্তিতে দগ্ধ হ'তেই হ'বে,—অথচ সেই সত্যভাষণের অহঙ্কার সম্পূর্ণ একটি রসসৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। 'সসাগরা'র ঠিকানায় রাশি-রাশি চিঠি—নিন্দা ও স্তুতি, কটূক্তি ও কোনো কোনোটাতে বিয়ের সম্বন্ধের প্রস্তাব। কাগজ হু-হু করে' কাটতে সুরু করলো, কষ্ট করে' আমাদের

আর নিজের হাতে কর্ম্মা ভাঁজতে ও লেবেল্ আঁটতে হ'লো না।

ব্যস্, এই পর্য্যন্ত। বাকিটুকু সব নেপথ্যে, আমাদের অগোচরে। এর পরে আমরা আর নেই।

*

• * *

একদিন কুন্তুম সরলদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে—প্রায়ই সে আজকাল আসে—বিকেল বেলা, আমরা নিচের ঘরে বসে' সরলের অভাবে এক হাত 'ডামি' রেখে হয়তো ব্রিজ খেলছি, (art of talking আমরা জানি না) সরল সরাসরি কুন্তুমকে জিগগেস করলে : একটা কথা আজ জানতে হচ্ছে কুন্তুম। বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাছে সম্পাদক হিসেবে আমার দায়িত্ব অসীম।

কুন্তুম তরল একটি হাসির টানে দীর্ঘ দেহ ঈষৎ ছন্দিত করে' বল্‌লে,—কী কথা? আপনার নিজের জন্যে যদি জানতে চান তো জিগ্‌গেস করুন। আমি ঐতিহাসিকের জন্যে নই, প্রত্নতাত্ত্বিকের জন্যে।

—মানে?

—মানে, আমি ঐতিহাসিককে কোনো জানা তথ্য দিয়ে যেতে চাই না, আমি যখন একদিন লুপ্ত হ'ব, তখন প্রত্নতাত্ত্বিক আমাকে উদ্ধার করবে। তাইতেই বেশি রহস্য, বেশি গভীরতা। যাক্, কিন্তু প্রশ্নটা আপনার কী?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গলাটা ভেজাতে ভেজাতে প্রশ্নটা সরল সাজিয়ে নিলে। বল্‌লে,—কিন্তু আজ আমাকে তোমার বলতেই হচ্ছে কুন্তুম, কবিতায় যাকে তুমি সম্বোধন করছ তিনি কে?

হাসির একটা কোমল কুন্তুমের মতো ফেটে পড়ে' কুন্তুম বল্‌লে,—এই কথা? তা, এর বহু আগেও আপনি জিগ্‌গেস করতে পারতেন। যাকে আমি সম্বোধন করছি তিনি একটি বৃহদাকার শূন্য।

সারা গায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে সরল উঠে বস্‌লো। জোর-গলায় বল্‌লে,—এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবো না। কোনো ব্যক্তি না থাকলে লেখা এমন পার্সক্যাল ও পরিষ্কার হয় কী করে'?

কুন্তুম বল্‌লে,—কবিতা বলে'ই পারে। প্রথম যখন মন বলি-বলি করে' ওঠে তখন প্রেম ছাড়া কিছুতেই সে প্রকাশের পূর্ণতা পায় না। আর ও এমনি জিনিস যে কবিতার অবাস্তবতার মধ্যেই বেশি সত্য, বেশি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

অস্থির হ'য়ে সরল প্রশ্ন করলে : তবে স্মরজিৎ বলে' কেউ নেই?

কুন্তুম হেসে, সহজ গলায় বল্‌লে,—আছে বৈ কি। সে আমার মনে। আমার মনে এক কঠোর তপস্যাপরায়ণ কামনাবিজয়ী সন্ন্যাসী আছে—বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে repression—আমি তা'র ধ্যান ভাঙবো বলে' প্রতিজ্ঞা করেছি।

—আমি কিছুতেই তা মানবো না? এতো দিনেও তুমি তার দেখা পাও নি? অতীতের পৃষ্ঠাগুলি তোমার এমনি সাদা? প্রকাশের এই অদম্যতার তবে কী কারণ থাকতে পারে?

কুন্তুম তেমনি হেসে বল্‌লে,—বল্‌লাম যে প্রকাশের অতিদম্যতার সেই ফল।

গলা নামিয়ে সরল জিগ্‌গেস করলে : আমাকে লুকিয়ে কী লাভ বলো?

কুন্তুম খিলখিল করে' হেসে প্রায় চুরমার হ'য়ে গেলো। পরে দম নিয়ে বল্‌লে,—সত্য কথা বলে' ফেলতে আমার দেরি হয় না, তার ফলভোগ করতে আমার মনে যথেষ্ট নিষ্ঠুরতা আছে। আচ্ছা, এতোদিন তো আমার সঙ্গে মিশ্‌লেন, ধারে-কাছে কোথাও কোনোদিন সেই স্মরজিতের 'সেণ্ট্' পেলেন? ও আমার একলার মনের মানুষ, বলা যেতে পারে কবিতার কেন্দ্রবিন্দু—"the light that was not on sea or land." তেমন লোক থাকলে সবাইর আগে আপনাকেই তো বল্‌তে আস্‌তাম।

মুখ ভার করে' মাথা নেড়ে সরল বল্‌লে,—কিন্তু এ-কথা আমাকে তুমি বিশ্বাস করাতে পারবে না, মরে' গেলেও না।

চায়ের কাপ্‌টা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে কুন্তুম আর চেয়ারে গিয়ে বসলো না। অলক্ষ্যে সরলের চেয়ারে সামনে দু' পা এগিয়ে এসে বল্‌লে,—প্রবন্ধকার কি না, কেবল স্থূল প্রতিপাদনেই বিশ্বাস করেন। মৌলিক কিছু তো সৃষ্টি করতে শেখেন নি, কেবল পরের সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক করতেই ওস্তাদ। বেশ, আমি প্রমাণই করবো তা হ'লে।

সরল তা'র মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে-ভয়ে বল্লে,—যা নেই, তার অনস্তিত্ব কোনোদিন প্রমাণ করা যায় নাকি ?

কুঙ্কুম বল্লে,—তার contradictoryর অস্তিত্ব প্রমাণ করলেই চলবে। স্মরজিৎ নেই বা না-স্মরজিৎ আছে ছুটোই তো একসঙ্গে সত্য হ'তে পারে না। পরেরটা প্রমাণ করলেই আগেরটা যারপরনাই মিথ্যা হ'য়ে যাবে। ডিডাক্‌টিভ্‌ লজিক্‌। কেমন, ঠিক কি না। নেতি নেতি করে' অস্তিত্ব প্রমাণ করার চাইতে এ অনেক সহজ। বলে' সে হাসতে-হাসতে সরলের বৌদির ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

এলিজাবেথ ব্যারেট তবু নিচের ঘরে রবার্ট ব্রাউনিঙকে দাঁড় করিয়ে রেখে তার কোটের প.কেটে একটা চিঠি ফেলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে পালিয়ে গিয়েছিলো, বিংশ শতাব্দীর কুঙ্কুম ভঙ্গিতে ও স্বরের কুণ্ঠা বা জড়িমায় এতোটুকু বাহুল্য না করে' সোজা স্পষ্ট ভাষায়, সরলের সামনে দৃঢ় দীর্ঘ দেহে অটল থেকে তা'র প্রতি তা'র প্রেম নিবেদন করলে।

বক্তব্যটাকে প্রাঞ্জল করবার জন্যে সে নিজ হাতে চেয়ার টেনে সরলের সামনে বস্‌লো। জান্‌লার একেবারে সামনে পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো তা'র উপস্থিতিটা নিস্তব্ধ প্রগল্‌ভতায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

আজ তার পরনে বৃন্তহীন শেফালিকার মতো গরদের সাড়ি—সরোবরে নরম জ্যোৎস্নার মতো, মুখমণ্ডলে গ্রাম্য আকাশের অপার স্নিগ্ধতা, ডান হাতের অনামিকায় শাঁখার একটি আংটি, ছ'টি ভুরুর মাঝখানে সিন্দুরের একটু প্রসন্নচিহ্ন।

কথাটা শুনে সরল সমস্ত শরীরে তীব্র একটা যন্ত্রণার আনন্দময় কশাঘাত অনুভব করলো। প্রায় চীৎকার করে' উঠ্‌লো: এ তুমি কী বলছ, কুঙ্কুম ? তুমি পাগল হ'লে ?

হাসতে গিয়ে কুঙ্কুমের মুখ ম্লান হ'য়ে উঠ্‌লো। তরল করে' বলতে গিয়েও স্বরের গভীরতা সে চাপতে পারলো না: এই দেখ গদ্যের অসুবিধে। সত্য কথা সুন্দর করে' বলা যায় না, প্রমাণ করবার একটা ঔদ্ধত্য থাকে বলে' তা কেমন নির্লজ্জ, কেমন কৃত্রিম শোনায়। তবু যা সত্য, তোমাকে সেদিন বলে' গেছি, যা সত্য তা বলতে আমার ভয় নেই, তার ফলাফল গ্রহণ করতেও আমি প্রস্তুত।

সরল স্বপ্নগ্রস্তের মতো চারদিকে চাইতে লাগলো। ব্যাপারটার অপ্রত্যাশিততা তাকে অভিভূত, ক্লান্ত, ক্লিষ্ট করে' তুললো। গলায় অনেকক্ষণ সে কথা পেলো না। অনেক পর সে বল্লে,—কিন্তু আমি—আমি কে? শেষকালে তুমি বিয়ে করবে? তা কি না আমাকে? আমার মাঝে তুমি কী পেলে ?

স্থির, পাষাণোৎকীর্ণ মূর্ত্তির মতো কুঙ্কুম নিষ্প্রাণ গলায় বল্লে,—অতো অবান্তর কথার উত্তর আমি দিতে পারবো না। আমার সত্য আমি আজ প্রকাশ করে' দিলাম—তাইতেই আমি মুক্ত হ'য়ে গেছি। গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তোমার আছে। তোমার মুক্তিও তোমার কাছে থাক্‌।

সরল চেয়ারের হাতলটা দৃঢ় করে' চেপে ধরে' কথার সামান্য তোৎলামি সংযত করলে: কিন্তু এতোদিন যাকে নিয়ে এতো কবিতা লিখলে—

—আমি আর কোনো কথা বলতে চাই না। বলে' সে কোলের ওপর ছুই করতল রেখে নুয়ে পড়ে' তাতে মুখ ঢাকলে।

ঘরের আবহাওয়াটা পাথর হ'য়ে রইলো।

সরল হাত বাড়িয়ে কুঙ্কুমের ফাপানো খোঁপার ওপর হাত রাখলো। চকিতস্পর্শে কুঙ্কুম মুখ তুললে, কিন্তু সে মুখে এক কণা শোকচ্ছায়া নেই, সেই প্রসন্ন পূর্ণিমার পরিব্যাপ্ত প্রকাশময়তা। বল্লে,—আমি এবার তবে যাই।

সরল বল্লে,—না, বোস।

আর কারো মুখে কোনো কথা নেই।

সরলের যা যুগধর্ম্ম তাতে প্রেমে বিশ্বাসপরায়ণতা নেই; কিন্তু তার এই অতিললিত সুপ্রচুর প্রকাশের মহিমাকে সে কোথায় স্থান দেবে? প্রেমে সে বিশ্বাস করতো না, তার অর্থ ওটাকে সে পুরুষের দিক থেকে ক্ষণিক একটা হৃদয়-বিলাস বলে' মনে করতো—মেয়ের বেলায় তো তা একেবারেই মরীচিকা, আলোকলতা। কিন্তু কোনো মেয়ে সত্যের এমন প্রবল প্রেরণায় সংযমে ও স্পষ্টতায় এতো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে পারে প্রকৃতিতে বা তার অনুকৃত সাহিত্যে সে তার কোনো পরিচয়ই পায় নি। কিন্তু জীবন সাহিত্য থেকে অনেক বড়ো, প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হ'য়েও তাকে সে অতিক্রম করে' গেছে। প্রকাশের সেই অদম্যতায়

এইখানেও সে বিহ্বল, মুহ্যমান হ'য়ে পড়লো। এতো বড়ো নির্ম্মম, শাণিত সত্য বা সাধারণ সত্যের এই ঐশ্বর্য্যময় অভিব্যক্তিকে সে কী বলে' প্রত্যাখ্যান করে?

সরল বল্লে,—আমার দিকে তাকাও।

নির্ম্মল, পরিপূর্ণ দুইটি চক্ষু কুসুম তার মুখের ওপর প্রসারিত করলো।

সরল সহানুভূতির সঙ্গে বল্লে,—কিন্তু তোমার সাহিত্যিক জীবনের কী ভীষণ ক্ষতি করতে চাচ্ছ তা তুমি জানো?

—সাহিত্যিক জীবন? কুসুমের মুখে সেই মোনা লিসার অবর্ণনীয় হাসি: কিন্তু জীবনের সাহিত্য কি তার চেয়ে বড়ো নয়?

সরল বল্লে, অনেকটা সেই ফরিয়াদি পক্ষের উকিলের examination-in-chiefএর সুরে: কিন্তু তোমার কবিতা? তোমার প্রেমের কবিতা? বাংলা-দেশকে এতোটা ক্ষতিগ্রস্ত করতে তোমার কষ্ট হ'বে না?

কুসুম শুভ্র, সাদা দেয়ালের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো: কবিতা? মাসিক-কাগজের পৃষ্ঠা ছেড়ে আরো বড়ো পটের ওপর আমি এবার আরো সত্য কবিতা লিখতে চাই। সে আমার সংসার। সে আমার নারীত্ব। বাংলা-দেশ প্রেমের কবিতা না পাক্, প্রেম পাবে। কিন্তু তুমি আর আমাকে কিছু দয়া করে' জিগ্‌গেস করো না। বলে' সে এক ঝট্‌কায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো।

—আর একটিমাত্র কথা বলতে চাই। সরল চেয়ারে হেলান দিয়ে বস্‌লো: কিন্তু স্মরজিৎ?

কুসুম ফিরলো। অসহিষ্ণু গলায় বল্লে;—কেন আমাকে বারে-বারে ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করো? কথা বেশি বল্লেই তা বেশি বোঝানো যায় না। বলে' সে দ্রুত পায়ে বারান্দায় চলে' গেলো।

সরল ডাক্‌লে: কুসুম! কুসুম!

কুসুম ফিরে এলো। বল্লে,—কেন?

—আমাকে আরেক পেয়ালা চা করে' দিতে পারো?

—দিচ্ছি। বলে' সে চঞ্চল শিশুর মতো, তার কবিতার ছন্দের মতো ঘর থেকে উড়ে চলে' গেলো।

কান্নার দাম

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

ডেকে ডেকে ক্লান্ত যখন,
চেষ্টা কর কান্দতে—
ডাকের চেয়ে কান্না দামী
মাকে কাছে আন্‌তে।
ডাক শোনে মা আনন্দেতে,
কাজের মাঝে কান্টী পেতে,
কান্নাতে মা ছেলের ব্যথা
ত্বরিৎ পারে জান্‌তে।

২

ব্যাকুল ভাবে কাঁদলে ছেলে
কাঁদার মত কান্না,
কি দিয়ে যে ভুলাইবেন
মা যে খুঁজে পান না।
কোনো জিনিষ অদেয় তাঁর
তখন জেনো থাকে না আর,
দশটী হাতই ব্যস্ত মাতার
তনয় কোলে টান্‌তে।

৩

বিশ্বনাথের আইন কানুন
পলকে হয় ভঙ্গ,
নিয়তি যায় ভয়েই সরে,
যম যে দেখে রঙ্গ।
কান্নাতে হয় এমনি করি,
ভয়ঙ্করী শুভঙ্করী;
কান্না পারে মহামায়ায়
মায়ার ডোরে বাঁধতে।

৪

সে কান্না যে নিত্য করে
সকল বাধা চূর্ণ,
চতুর্ম্মুখের কমণ্ডলু
কাণায় কাণায় পূর্ণ।
সে কান্নারি উষ্ণ জলে
কল্পতরুর ফসল ফলে,
সে কান্না দিক্‌গজের শিরে
কুলিশ পারে হান্‌তে।

তৃতীয় আফ্‌গান যুদ্ধ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ভ্রমণ

শ্রীঅসিতনাথ রায় চৌধুরী

১৯১৯ সালে যুদ্ধ-বিরতির জন্ম সাময়িক চুক্তি দস্তখত হইবার পর এবং বিবদমান শক্তিসমূহের মধ্যে সন্ধি-সর্ত্তাবলী আলোচিত, নির্দ্ধারিত ও স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বে, আফগানিস্থানের তদানীন্তন আমীর, (বর্ত্তমানে "রাজা") বৃটিশ বিদ্বেষ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে, নানা প্রকারের বহু মুদ্রিত ইস্তাহার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মাসুদ, মোমন্দ ও ওয়াজির প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে, বিস্তৃতভাবে বিতরণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ইস্তাহারের কতকগুলি প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সরকারের হস্তগত হওয়ায়, এবং আফগান সরকারের এইরূপ রাজনৈতিক প্রচার-কার্য্য স্থগিত করিবার জন্ম, তৎকালীন আমীর আমানুল্লাহকে (বৃটিশ সরকারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী) ভারত সরকার কর্তৃক একখানি জরুরী পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রে আফগান সরকারকে তাঁহাদের অনুসৃত ঐরূপ অন্যায় প্রচার-কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার কথা ভিন্ন ইহাও জানান হইয়াছিল যে, নির্দ্ধারিত কয়েক দিনের মধ্যে যদি আফগান সরকার তাঁহাদের কৃত কার্য্যের জন্ম সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ বৃটিশ সরকারে দাখিল না করেন, এবং তৎসঙ্গে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন করিয়া বৃটিশ সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইবেন।

পূর্ব্ব-বর্ণিত পত্রের উত্তর ভারত সরকারের নিকট বহু বিলম্বে আসায়, নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় আফগান যুদ্ধ ঘোষিত হইল এবং গত ১৯১৯ সালের ১৬ই মে তারিখে ভারত সরকারের সৈন্ম বিভাগ হইতে আমাদের আপিসে একখানি জরুরী তার আসিল। উক্ত তারে সৈন্ম বিভাগের এ্যাড্‌জুটাণ্ট জেনারেল, তৃতীয় আফগান যুদ্ধে কার্য্য করিবার জন্ম, লাহোর, পেশোয়ার, কোহাট ও কালাবাগ (মিয়ানওয়ালী) এই চারিটী স্থানে চারিটী ষ্টেশনারী আপিস পাঠাইবার জন্ম লিখিয়াছিলেন। এই ষ্টেশনারী আপিসগুলি যুদ্ধের সময় সমস্ত সৈন্ম বিভাগকে কাগজ, কলম প্রভৃতি আপিসের সরঞ্জাম, নানা কার্য্যে ব্যবহারের জন্ম বিভিন্ন প্রকারের ছাপা ফরম ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কীয় নানা প্রকারের আইন পুস্তকাদি সরবরাহ করে। ভারত সরকারের অধীনস্থ কলিকাতাস্থিত ষ্টেশনারী আপিস হইতেই এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আপিসগুলি যুদ্ধে কার্য্য করিবার জন্ম পাঠান হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এই একটীমাত্র আপিসের কর্ত্তা সাধারণতঃ বাঙ্গালী থাকেন। অবশ্য গত মহাযুদ্ধের সময় বসরা ষ্টেশনারী আপিসে একজন ইংরাজকে অফিসার কমাণ্ডিং রাখা হইয়াছিল। তবে প্রথম যখন বসরা আপিস খোলা হয় তখন বাঙ্গালীই উহার কর্ত্তা ছিলেন; কিন্তু আপিস খুব বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং আপিসের কর্ম্মচারী সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় উক্ত বাঙ্গালীর পরিবর্ত্তে একজন ইংরাজকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বসরা আপিসে উর্দ্ধতন পদে ইংরাজ থাকিলেও পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত নিম্নতন পদেই বাঙ্গালী ছিলেন।

আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ তৃতীয় আফগান যুদ্ধ সম্পর্কে এবং সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে। সে কারণ গত মহাযুদ্ধের আংশিক ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ করার কোন সার্থকতা নাই।

লাহোরের আপিসটী হইল আমাদের Base Depot এবং অপর তিনটী আপিস হইল Advanced Depot। এই তিনটী Advanced Depot প্রেরিত হইবার কিছুদিন পরে আরও একটী আপিস কোয়েটায় পাঠান হইয়াছিল। আমাকে পেশোয়ার আপিসে পাঠান হইয়াছিল এবং এখানে যাইবার পূর্ব্বে গত ১৯১৭ সালে জগদ্ব্যাপী মহাযুদ্ধের সময় ভারত সীমান্তে মাসুদদের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল সেই যুদ্ধেও আমি গিয়াছিলাম।

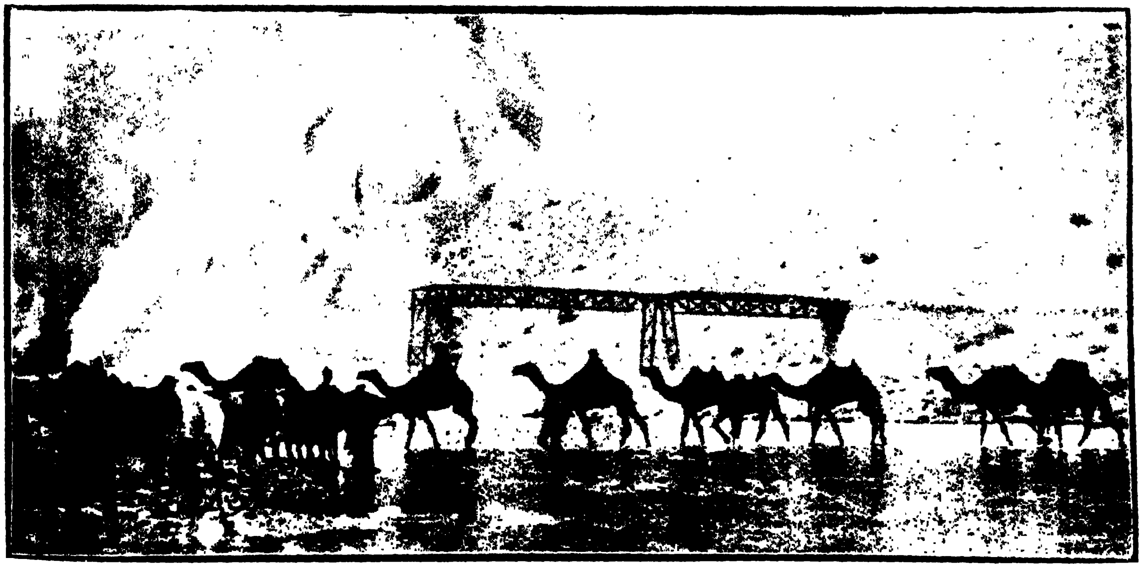
১৬ই মে তারিখে কলিকাতা আপিসে অকস্মাৎ ঐরূপ তার আসায় সমস্ত আপিসে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। কে কে যুদ্ধে যাইতে ইচ্ছুক—কাহাকে কাহাকে লওয়া উচিত—কোথায় কাহাকে পাঠাইলে হেড আপিসের সুনাম

রক্ষা হইবে, এই সমস্ত বিষয়ে বড়বাবুদের মধ্যে জল্পনা চলিতে লাগিল। পরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হইল— শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি-এ মহাশয়কে লাহোরের



টাঙ্ক হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী Decauville Railwayর "ডেরা ইস্মাইল খাঁ ষ্টেশন"। লোকজন ও মালপত্র বহনের সুবিধার জন্য সৈন্য-বিভাগ হইতে খোলা হইয়াছে

Base Depotর অফিসার করিয়া পাঠান হউক এবং অন্যান্য Advanced Depotর লোকজন তিনিই মনোনীত

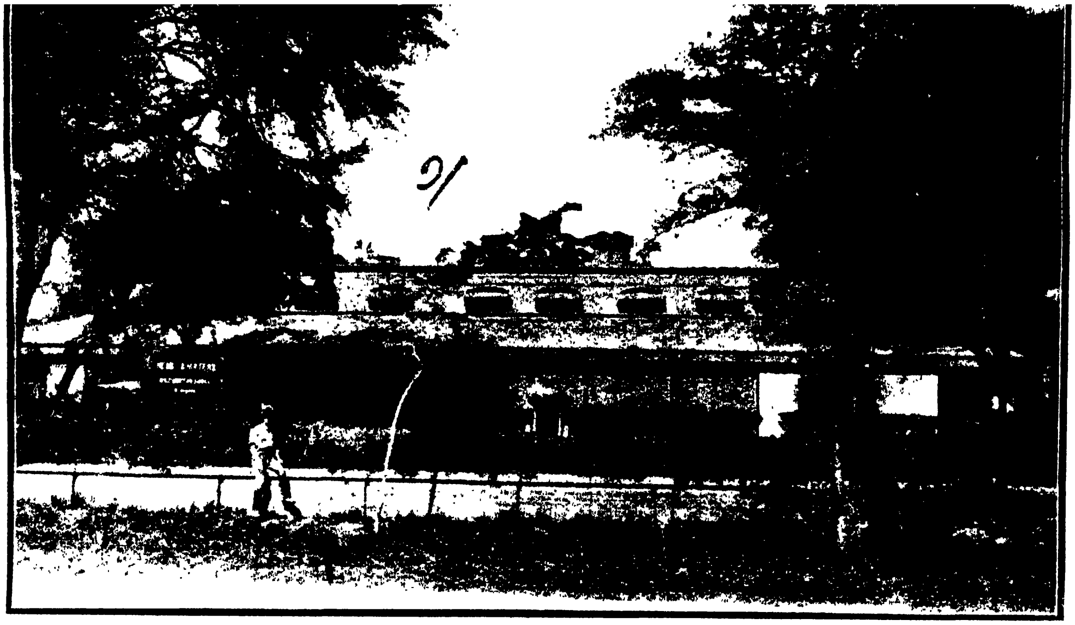


টাঙ্ক হইতে বাইশ মাইল দূরবর্ত্তী "মাঞ্জাইয়ের পুল"। পাহাড়ে অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ায় সেতুর তলদেশস্থ জল-প্রবাহের উপর দিয়া ভারবাহী উষ্ট্র ও অশ্বতরসমূহ পার হইতেছে

করিয়া সাহেবকে দিয়া মঞ্জুর করাইয়া লউন। তদনুসারে আমার পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করিয়া পেশোয়ার আপিসে পাঠান হয়; যেহেতু সেখানে সৈন্য-সমাবেশ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা খুব বেশী হইয়াছিল।

লোকজন রুক্রুট করার পর ১৭ই মে তারিখে আমাদের সকলকে এক মাসের বেতন অগ্রিম দেওয়া হইল এবং যুদ্ধে যাইবার জন্য আমাদের গাড়ীর ব্যবস্থা করা হইল। ১৯শে মে তারিখে আমাদের রওনা হওয়ার দিন স্থির হইয়াছিল।

যথাসময়ে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া দেখিলাম, আমাদের সকলেই আসিয়াছেন এবং অনুসন্ধান-আপিসে সংবাদ লইয়া জানা গেল যে, দিল্লী এক্সপ্রেসের সঙ্গে আমাদের জন্য দুইখানি গাড়ী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি আমার ছাড়িতে বিলম্ব ছিল। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অনেকে আমাদিগকে হাসিমুখে বিদায় দিবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। বিদায়ের পূর্ব্বে তাঁহাদের পানে তাকাইতে চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা কষ্ট



হেড্ কোয়ার্টার—ওয়াজিরিস্তান ফোর্সের সম্মুখভাগ। জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিংএর আপিস

বেতন ও পদমর্য্যাদা অনুসারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করার অধিকারী হইয়াছিলাম। হইতেছিল বঙ্গ-জননীর অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ২০০০ মাইল দূরে বিদেশে যাইতে ;—কিন্তু উপায় নাই।

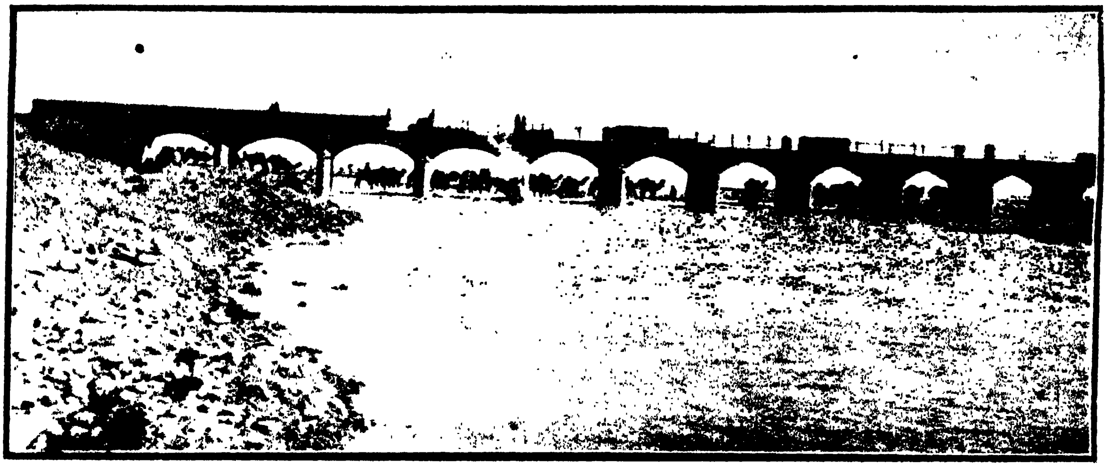


টাঙ্ক হইতে পঞ্চাশোর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী "জান্ডোলার পুল"। সৈন্য বিভাগ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

গাড়ী প্লাটফরমে আসিলে আমাদের স্ব স্ব বাক্স বিছানা প্রভৃতি গুছাইয়া লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী যথানিয়মে ষ্টেশনে ঘণ্টা বাজিল, গার্ড বংশীধ্বনি করি সবুজ নিশান উড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন হইতে গুরু-গম্ভ

স্বরে বাঁশী বাজিবার অব্যবহিত পরেই গাড়ী হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া একটু একটু করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আমরা সামরিক পোষাক পরিহিত থাকায় সাহেবী প্রথায় খাকী রুমাল ও হস্ত সঞ্চালন দ্বারা সকলকে বিদায় দিয়া ক্ষুণ্ণমনে যুদ্ধ-যাত্রা করিলাম।

মধুপুর পৌঁছিল, তখন বন্ধুবর ষষ্ঠীদাস কুণ্ডু তাঁহার টিফিন কেরিয়ার হইতে খাবার বাহির করিলেন। তাঁহার স্ত্রী সেগুলি সযত্নে স্বহস্তে তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন। সে কারণ তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আমরা খুবই আনন্দিত ও আগ্রহান্বিত হইয়াছিলাম।



টাঙ্ক হইতে চৌদ্দ মাইল দূরবর্ত্তী "কাউর ব্রীজ"। সৈন্য-বিভাগ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

দেখিতে দেখিতে একটার পর একটা ছোট ষ্টেশন পশ্চাতে রাখিয়া হু হু শব্দে গাড়ী চলিতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টা যাবৎ বঙ্গভূমি ও প্রিয়জনের বিচ্ছেদজনিত ব্যথায় সকলেই ম্রিয়মাণ অবস্থায় ছিলেন—কাহারও যেন বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। ক্রমে ক্রমে সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দুই একজন একটু-আধটু কথা বলিতে লাগিলেন। এইরূপে বর্দ্ধমান, আসানসোল প্রভৃতি ষ্টেশন ছাড়াইয়া গাড়ী যখন

পরদিন সকাল আন্দাজ নয়টার সময় গাড়ী মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌঁছিল। তথাকার হিন্দু রিফ্রেসমেণ্ট-রুমে পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম করিয়া আমাদিগকে ভাত ও মাছের ঝোল সর-বরাহ করিবার জন্য জানান হইয়াছিল। গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছাই-তেই রিফ্রেসমেণ্ট-রুমের লোকজন আমাদের আহার্য্য দ্রব্যগুলি আনিলে সেগুলি আমরা গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া তাহাদের মূল্য দিয়া বিদায় দিলাম। আধ-ঘণ্টা পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।



নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের "দরিয়া খাঁ ষ্টেশন"

অবিশ্রান্ত গতিতে গাড়ী চলিতে লাগিল। আমরা গাড়ীর মধ্যে শুইয়া, বসিয়া, কখনও বা তাস খেলিয়া কাটাইলাম, কখনও বা দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি পড়িয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

মে মাসের প্রখর রৌদ্রতাপে আমরা গাড়ীতে থাকিয়া মাঝে মাঝে যেন হাঁপাইয়া পড়িতেছিলাম এবং নিদারুণ গিরি দুরন্ত সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাতার ন্যায় ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে লাগিলেন।

গোধূলির পূর্ব্বে গাড়ী যখন যুক্ত-প্রদেশের বক্ষ ভেদ করিয়া চলিতেছিল, তখন মাঝে মাঝে ময়ূর ও হরিণ দেখিয়া আমরা আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিতেছিলাম এবং কখনও কখনও অদূরস্থিত আম্রকাননে ফলভারনত বৃক্ষ-



দরিয়া খাঁ হইতে ডেরা ইস্মাইলখাঁ সহরে ভারবাহী উষ্ট্রশ্রেণী আসার দৃশ্য। বড় বড় নৌকায় কাঠের পাটাতন ফেলিয়া এবং দুইধারে রেলিং দিয়া অস্থায়ীভাবে সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে

গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ পিপাসার্ত্ত হইয়া মুহুর্মুহু জল পান করিতে বাধ্য হইতেছিলাম। পরে যখন সূর্য্যদেব তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ দেখাইয়া দিবসের শেষভাগে পশ্চিম গগনে ঈষৎ হেলিয়া পড়িলেন, তখন আমরা গাড়ীর এক পার্শ্বের সমস্ত গুলিতে সুপক্ক ফলগুলি দেখিয়া জননী বঙ্গভূমির কথা হৃদয়পটে জাগরিত হইতেছিল এবং পরক্ষণেই জননী জন্মভূমির বিচ্ছেদজনিত ব্যথায় বিশেষভাবে কাতর হইয়া পড়িতেছিলাম।

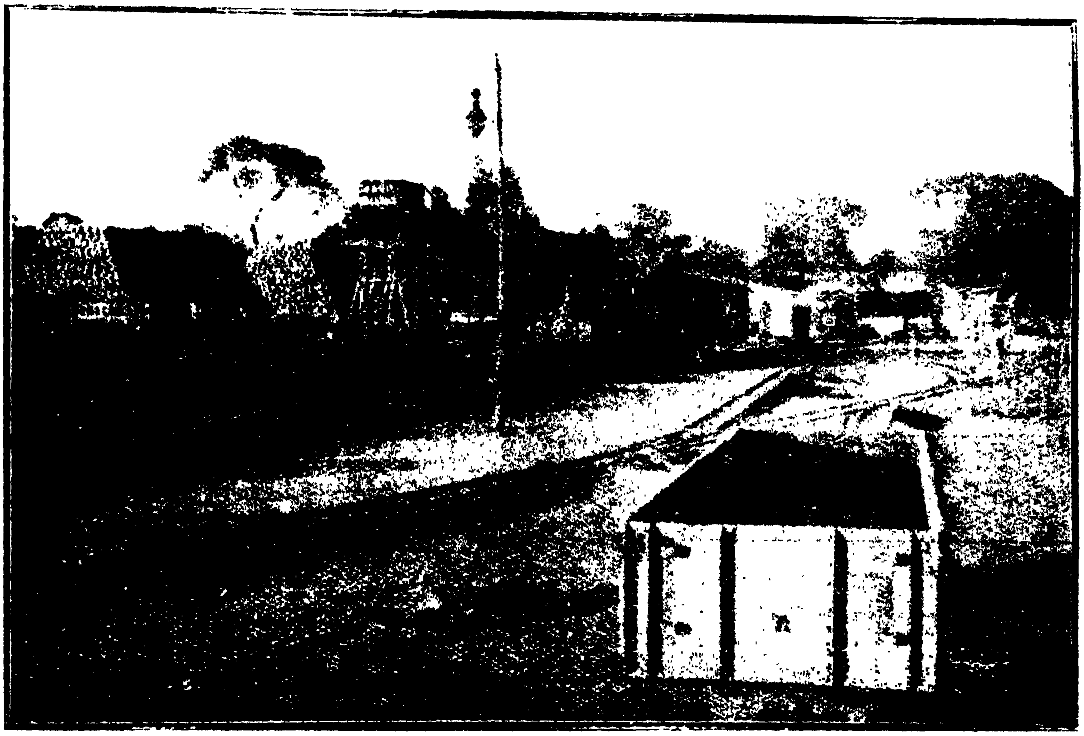


দরিয়া খাঁ হইতে ডেরা-ইস্মাইলখাঁ সহরে ভারবাহী উষ্ট্রসমূহ আসার অপর দৃশ্য

জানালা খুলিয়া দিলাম। এইরূপে আরও দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর বিপরীত পার্শ্বের জানালাগুলিও খুলিয়া দিয়া আমরা জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া কখনও ধূসর প্রান্তর, কখনও শ্যামল শস্যক্ষেত্র সমূহ নির্ব্বাক বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। বিপুলায়তন বিন্ধ্য-

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। ছোট ছোট ষ্টেশনগুলি যেন আলোকমালা পরিধান করিয়া বরণীয় কাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা যেন কুরূপা, শ্রীহীন। তাই যেন তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া, তাচ্ছিল্যভরে একটু অপাঙ্গ

দৃষ্টিতে দেখিয়াই শিক্ষিত, ধনবান ও উদ্ধত যুবকের ন্যায় গর্ব্বিতভাবে আমাদের ট্রেণ তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। এমনই আশ্চর্য্য যে, যাহারা তাহাকে পাইবার আশায় অধীর আগ্রহে সন্ধ্যা হইতে অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহাদিগকে সে ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া, সেবা-যত্ন লইয়া কৃতার্থ করা দূরের কথা, মদমত্তভাবে তাহাদের বক্ষের উপর দিয়া দলিয়া পিষিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। অথচ যাহাদের সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে সে এত দ্রুতবেগে ছুটিতেছিল, তাহারা ঐশ্বর্য্যশালী জমিদার-কন্যার ন্যায় নানা অলঙ্কার-সম্ভারে ও বিচিত্র



কালাবাগ বন্নু রেলওয়ের টাঙ্ক ষ্টেশন

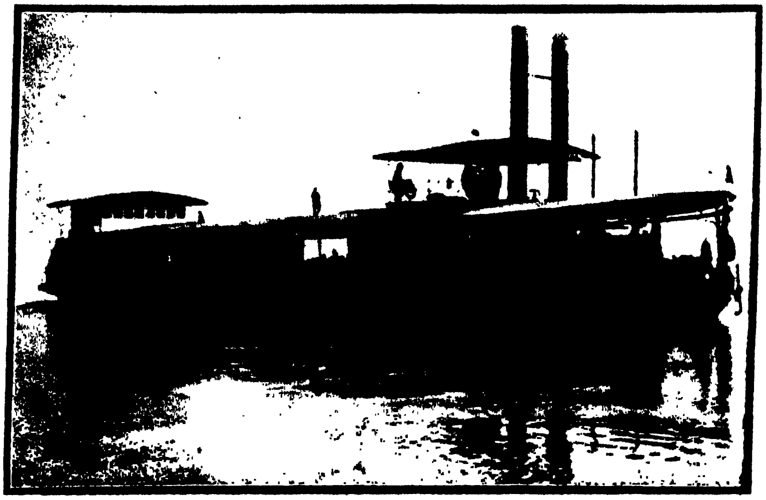
বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া, আপনার গর্ব্বে আপনি মত্ত হইয়া, নিতান্ত হেয়ভাবে একবার ট্রেণখানির প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিল মাত্র।

এটোয়া হইতে আমরা রাত্রের জন্য পুরী মিঠাই ইত্যাদি ক্রয় করিয়া রাখিলাম এবং রাত্রি নয়টার অব্যবহিত পরেই সকলে একত্রে আহার করিয়া যে যাহার শয্যায় আশ্রয় লইলাম। শায়িত অবস্থায় বেশ অনুভব করিতে লাগিলাম, গাড়ী কখনও উপরে উঠিতেছে, কখনও বা দ্রুতবেগে নিম্নে অবতরণ করিতেছে। চুপ করিয়া শুইয়া থাকিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কখন নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলাম জানি না।

তৃতীয় দিবসে ভারতের বর্ত্তমান রাজধানী দিল্লীতে পৌঁছিলাম। প্লাটফরমে অবতরণ করিতেই দেশী ও বিদেশী হোটেলের কর্ম্মচারী এবং কতকগুলি পথি-প্রদর্শক (Guide) আমাদিগকে বিশেষভাবে বিরক্ত করিয়া তুলিল। যাহা হউক, আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া একটী দেশী হোটেলে একখানি ঘর লইয়া কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিবার ব্যবস্থা করিলাম এবং সেই অল্প সময়ের মধ্যেই দিল্লীর কেল্লা, কুতবমিনার, হস্তিনাপুর, হুমায়ুনের কবরস্থান ও মানমন্দির প্রভৃতি তাড়াতাড়ি করিয়া দেখিয়া লইলাম।

রাত্রির গাড়ীতে আমরা লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং পরদিন প্রাতে তথায় পৌঁছিয়া একটী দেশী হোটেলে চব্বিশ ঘণ্টা ছিলাম। লাহোরে আমরা কিছু দেখিবার অবকাশ পাই নাই; কেন না আমাদের প্রধান আপিসটী (Base Stationery Depot) সেখানে

খুলিবার কথা ছিল। সেখানকার সামরিক কর্ত্তাদের উপদেশ অনুসারে সমস্ত দিন নানা স্থানে ছুটাছুটি করিতে হইয়াছিল। তাহা ভিন্ন অতিরিক্ত গরমে শরীর ও মন অত্যন্ত ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত থাকায় কিছু দেখিবার উৎসাহও ছিল না।



মার ঘাট হইতে কালাবাগ ঘাটে সিন্ধুনদীর উপর দিয়া ষ্টিমার আসার দৃশ্য

লাহোরে আটজন সঙ্গীকে পরিত্যাগ করিয়া পরদিন সকালে দশটার সময় আমরা পেশোয়ার মেলে যাত্রা করিলাম এবং পথে ক্যাম্বেলপুর ও রাওয়ালপিণ্ডি ষ্টেশনে কালাবাগ (মিয়ানওয়ালী) ও কোহাট Advanced



ডেরা-ইস্মাইল খাঁ হইতে দারয়া-খাঁতে বর্ষাকালে ষ্টিমার যাওয়ার দৃশ্য

Stationery Depotর কর্ম্মচারীদের নামাইয়া দিয়া আমরা অবশিষ্ট তিনটী মাত্র বাঙ্গালী পেশোয়ার যাত্রা করিলাম। একে একে সমস্ত সঙ্গীগুলি পরিত্যাগ করিয়া সুদূর বিদেশে, অজানিত স্থানে, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া যাওয়া যে কত কষ্টকর তাহা অনুভব করিবার বিষয়। তবে আমাদের সুবিধার মধ্যে এই ছিল যে, বাক্স বিছানা প্রভৃতি লইয়া আমাদিগকে কখনও কোন ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হয় নাই। আমাদের নির্দ্দিষ্ট গাড়ীগুলি নির্দ্ধারিত সময়ে সর্ব্বদা অন্য গাড়ীর সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

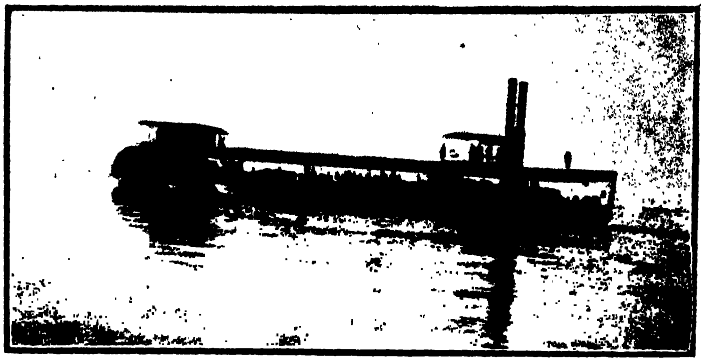
পঞ্চম দিবসে রাত্রি প্রায় দশটার সময় আমরা পেশোয়ার ছাউনী ষ্টেশনে পৌছিলাম। প্লাটফরমে অবতরণ করিয়া আমরা তথাকার রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আমরা কোথায় অবস্থান করিব জিজ্ঞাসা করায়, জবাব পাইলাম—আমাদের আসার সম্বন্ধে কোন সংবাদ ইতিপূর্ব্বে না পাওয়ায় তিনি আমাদের সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ কোন ব্যবস্থা করিতে অক্ষম। সেই শত্রুবেষ্টিত স্থানে আমরা রাত্রিটুকু কোথায় কাটাইব জিজ্ঞাসা করায়, তিনি পরুষকণ্ঠে জবাব দিলেন "ষ্টেশন প্লাটফরমে বেঞ্চের উপর শুইয়া রাত্রিটুকু কাটাইয়া দাও।" প্রথম অবস্থাতেই সহযোগিতার এবম্প্রকার ধারা দেখিয়া অঙ্গ জল হইয়া গেল। যাহা হউক ষ্টেশনের নিকটেই পাঞ্জাবীদের ছোট একটী হোটেল (Canteen) দেখিতে পাইয়া সেখানে গেলাম। তাহারা তখন হোটেল বন্ধ করিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছিল। তথাপি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম চা ও কিছু খাবার পাওয়া যাইবে কিনা। উত্তরে জানাইল "যাইবে"। তখন আমাদের জিনিষপত্রগুলি একজনের হেপাজতে রাখিয়া আমি ও শ্রীযুক্ত কালিপদ ঘোষ চা পান করিতে বসিলাম। খাবারের

মধ্যে একমাত্র কেক্ ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। যাহা হউক কোনপ্রকারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া অন্য সঙ্গীটীর জন্য কিছু চা ও কেক আনিয়া খাওয়াইলাম এবং সমস্ত রাত্রিটুকু প্রায় জাগিয়াই কাটাইয়া দিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় চা পান করিয়া আমরা একখানি টঙ্গায় জিনিষপত্র উঠাইয়া পেশোয়ার হেড কোয়ার্টার্স আপিসে গেলাম। সেখানকার Base Commandant আমাদের আগমনবার্ত্তা পাইয়া বিশেষ সুখী হইলেন এবং মিষ্ট ভাষায় নানা কথাবার্ত্তার পর আমাদের বাসস্থান ও আপিসের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পেশোয়ার ছাউনীর সাউথ সারকুলার রোডে একটী বড় পাকা বাড়ীতে আমাদের বাসা ও আপিস স্থাপিত হইল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পেশোয়ার ছাউনীর কতকগুলি বাড়ীর মালিককে তাহাদের ঘরবাড়ী নির্দ্দিষ্ট মাসিক ভাড়ায় সরকার বাহাদুরকে ছাড়িয়া দিয়া সহরে বা অন্যত্র যাইতে হইয়াছিল।

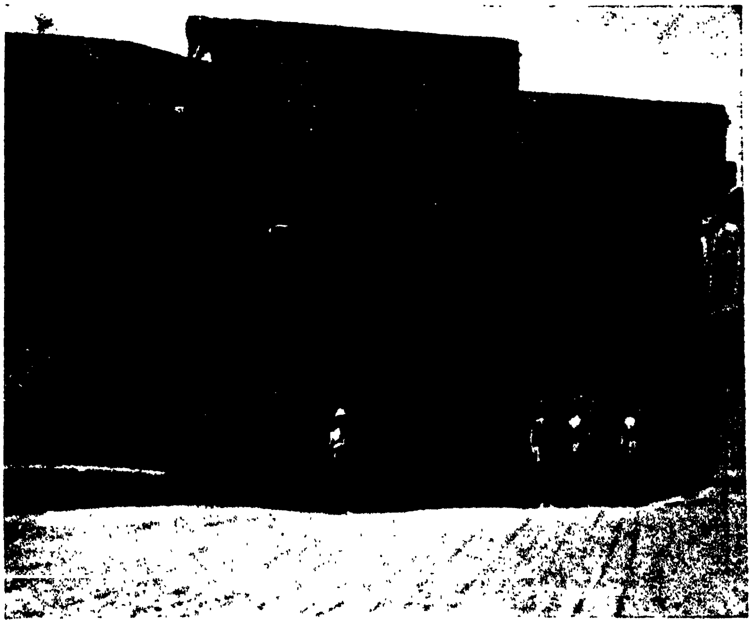
যুদ্ধের সময় পেশোয়ারে থাকাকালীন ভোর ছয়টার পূর্ব্বে এবং রাত্রি নয়টার পরে কাহারও রাস্তায় চলাফিরা করিবার হুকুম ছিল না। সরকারী কার্য্যের জন্য ডাক ও সেন্সর বিভাগে যাহাদিগকে থাকিতে বা যাইতে হইত, তাহাদিগের জন্য পাশের ব্যবস্থা ছিল। সমস্ত ছাউনীটী রাত্রিকালে মিলিটারী পুলিসের পাহারায় থাকিত এবং আলোকবর্ত্তির সাহায্য ব্যতিরেকে কাহারও রাত্রিতে রাস্তায় চলা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

যে জুন মাসে অসহ্য গরমের জন্য আমরা পেশোয়ারে প্রত্যহ তিনবার স্নান করিতাম; এবং আপিসের কাজকর্ম্মের এত বেশী চাপ ছিল যে, অনেক সময় সারা দিন চা ও বিস্কুট খাইয়া থাকার পর রাত্রিতে একবার মাত্র পুরা আহার করিবার অবসর পাইতাম। পেশোয়ারে যেরূপ সৈন্যসমাবেশ হইবার কথা আমরা কলিকাতা হইতে জানিয়া গিয়াছিলাম, তাহাতে অত কষ্ট হইবার কথা ছিল না; কিন্তু পরবর্ত্তী হুকুম অনুসারে সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক হওয়ায়, আমরা প্রথম দুই সপ্তাহ যাবৎ আপিসের



সিন্ধু-বক্ষে ষ্টিমার যাওয়ার অপর দৃশ্য

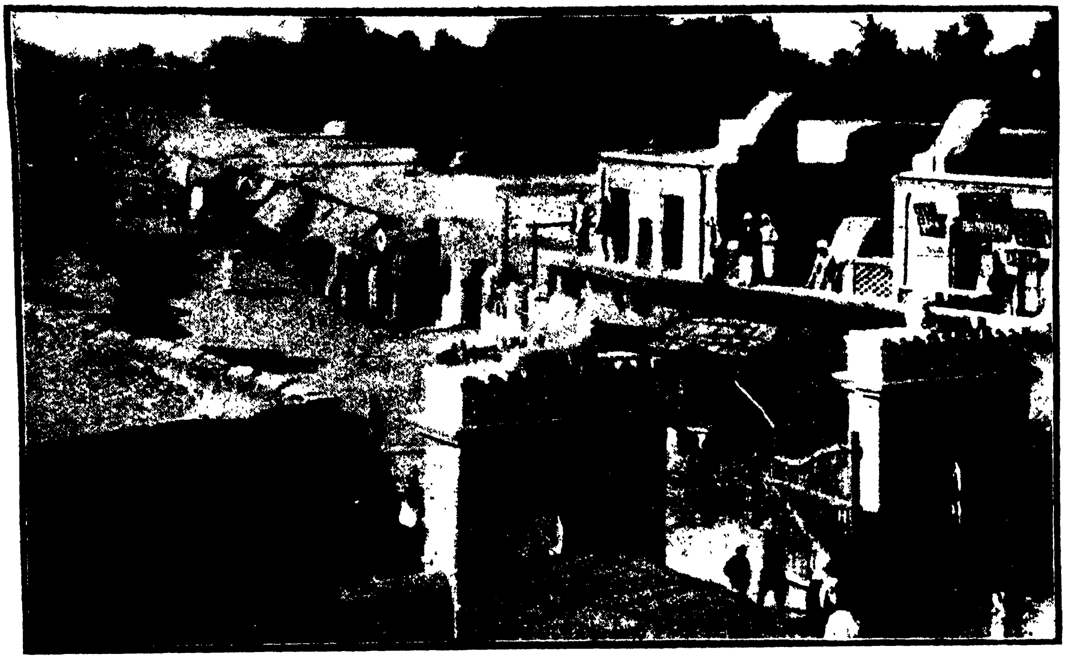
কাজ আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হই নাই। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে কার্য্যের তারতম্য অনুসারে আপিসের কর্ম্মচারী সংখ্যা যথাসম্ভব বাড়াইয়া লওয়া হইয়াছিল এবং মালপত্রও যথেষ্ট



ডেরা-ইস্মাইল খাঁর আকালগড় দুর্গের সম্মুখভাগ

পরিমাণে সঞ্চিত রাখা হইয়াছিল, যাহাতে সকল আপিসে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করিতে পারা যায় এবং যাহাতে আমাদের কলিকাতাস্থিত হেড আপিসের সুনাম রক্ষা হয়!

এমনও বহুদিন হইয়াছে যে, দিবসে অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া রাত্রে যখন অঘোরে নিদ্রা যাইতেছি, তখন প্রকৃত



ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে ডেরা ইস্মাইল খাঁ সহরে যাইবার প্রবেশ দ্বার। তোপানওয়ালা গেটের সম্মুখভাগ

যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী জালালাবাদ ও আলি মসজিদ প্রভৃতি স্থান হইতে মোটর সাইকেলে আরোহণ করিয়া বৃটিশ সেনানীরা আসিয়া মাল চাহিয়াছে এবং অনতিবিলম্বে তাহা আমাদিগকে সরবরাহ করিতেও হইয়াছে। হয় ত মাল তাহাদের ছিল; কিন্তু শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় তাহারা সমস্ত মালপত্র পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে—অথবা যুদ্ধকালে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার পথে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিবার সময় নিম্নস্থ গভীর খাদে হয় ত মালপত্র পড়িয়া গিয়াছে।



জনৈক আহত মাসুদ সেনানায়ক। গণ্ডে গুলীর আঘাত লাগায় চারপায়ে শোয়াইয়া চিকিৎসার্থে ভারতীয় সামরিক হাঁসপাতালে আনা হইয়াছে

চারি মাস কাল মাত্র আমাদিগকে পেশোয়ারে থাকিতে হইয়াছিল, কেন না তৃতীয় আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু দিন পরেই সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে আফগানরাজের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া সন্ধিসর্ত্তসমূহ উত্থাপন করা হইয়াছিল। প্রথম দিনের অধিবেশনে ভারতসরকারের প্রতিনিধি আফগানরাজের হঠকারিতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া বেশ চড়া চড়া দুকথা বলেন এবং তিনি তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলে আফগান-রাজের প্রতিনিধি আরোপিত অভিযোগ-সমূহের প্রত্যুত্তর

দিয়া তাঁহাদের দোষ স্খালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এই দিনের অধিবেশনে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা যোগদান করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন; কিন্তু পর দিনের অধিবেশনে তাঁহাদিগের অধিকার প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। অধিবেশন তিন চারি দিন গোপন কক্ষে চলিয়াছিল; এবং উহা সমাপ্ত হইবার পর নিমন্ত্রিত প্রতিনিধিদিগকে সসম্মানে বিদায় দেওয়ার কিছু দিন পরেই সন্ধির সর্ত্তসমূহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং সীমান্ত প্রদেশের সীমা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য জরীপ বিভাগীয় আপিসগুলি রাখিয়া বাকী সমস্ত সৈন্য ও আপিস demobilize করাইবার অনুমতি আসিল।

তখনও ওয়াজির ও মাসুদদের সহিত প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সরকারের বিবাদ প্রশমিত না হওয়ায় ওয়াজিরিস্থানের যুদ্ধ থামে নাই। সে কারণ, লাহোর, পেশোয়ার, কোহাট ও কোয়েটার আপিসগুলির কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি আসিলেও, কালবাগের ষ্টেশনারী আপিসটী রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

পেশোয়ার হইতে যেদিন আমাদের কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা ছিল, তাহার পূর্ব্ব দিনে একখানি তারের সংবাদে আমাদিগের মধ্যে প্রথম তিনজনকে কালাবাগ আপিসে যোগদান করিবার জন্য হুকুম আসিল। অনন্যোপায় হইয়া রওনা হইতে হইল।

কালাবাগ যাইতে হইলে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের মারি-ইণ্ডাস নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। ষ্টেশনটী সিন্ধুনদীর তীরে অবস্থিত এবং অপর পারেই কালাবাগ। গাড়ী হইতে নামিবার পর আমাদিগকে শ্রেণীবদ্ধভাবে প্লাটফরমে দাঁড়াইতে বলা হইল এবং তথা হইতে কিছু দূরে সামরিক প্রথায় হাঁটাইয়া বিশ্রাম-শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় প্রত্যেককে ডাক্তারী পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল বিসূচিকা ও জ্বরের জন্য প্রত্যেককে টীকা দেওয়া হইয়াছিল কি না। আমাদের টীকা লওয়া ছিল না, সে কারণ আমাদিগকে টীকা লইয়া তথায় একদিন থাকিতে হইয়াছিল।

পরদিন কালাবাগে পৌছিয়া যথারীতি কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম।

কালাবাগ সহরটী খুব ছোট। সামরিক আপিসগুলি অদূরস্থিত সুলেমান পর্ব্বতমালার পাদদেশে একটু উচ্চ মালভূমিতে এবং সিন্ধুনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। তথাকার অধিবাসীরা বেশ শান্ত এবং আইন-ভীরু। সৈন্যদিগকে তাহারা বেশ ভয় করিত এবং বিনা প্রয়োজনে তাহাদের সেনাশিবিরের সীমার মধ্যে আসিবার হুকুম ছিল না। প্রথম অবস্থায় আমাদের কালাবাগ সহরে প্রবেশ করিবার হুকুম ছিল না। সহরের মধ্যস্থলে একটী অপরিসর রাস্তা আছে। ভারবাহী উষ্ট্র ও গর্দ্দভ ভিন্ন অন্য কোন যান-বাহন সেখানে নাই। সেখানকার বাড়ীগুলি সমস্তই মাটীর ও উপর্য্যুপরি স্তরে স্তরে পর্ব্বত-গাত্রের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত সাজান। সিন্ধুনদীর অপর তীর মারি-ইণ্ডাস হইতে কালাবাগ সহরটী দেখিলে যেন মনে হয় কতকগুলি পারাবতকক্ষ স্তরে স্তরে সজ্জিত করা হইয়াছে। ইষ্টক-প্রাচীর-বেষ্টিত দুই চারিখানি বাড়ী সহরের বহির্ভাগে আছে বটে, তবে সেগুলির ছাদ মাটীর, কেন না গ্রীষ্মকালে সে দেশের গরম অসহ্য এবং অত্যধিক সূর্য্যতাপে ছাদ ফাটিয়া যাওয়ারও বিশেষ সম্ভাবনা।

কালাবাগ হইতে বান্নু ও ট্যাঙ্ক পর্য্যন্ত নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের একটী ছোট লাইন আছে। উহা যুদ্ধের সময় সম্পূর্ণভাবে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকে।

কালাবাগ সহরে প্রায়ই সন্ধ্যার পর আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে ডাকাতি হইত। পার্ব্বত্য জাতিরা দলবদ্ধ হইয়া গোপন পথে আসিয়া সহরের সমীপস্থ পর্ব্বতের অপর পার্শ্বস্থ সানুদেশে অপেক্ষা করিত; এবং রাত্রিকালে অকস্মাৎ বন্দুকের আওয়াজ করিয়া সহরবাসীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া, স্ব স্ব বহন-ক্ষমতা অনুযায়ী রসদ ও টাকাকড়ি লইয়া পলায়ন করিত। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সেনাশিবিরের চতুঃসীমায় নির্দ্দিষ্ট সামরিক ঘাঁটীতে যথাসম্ভব সৈন্য স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং রাত্রিকালে উক্ত সৈন্য-সংখ্যা প্রয়োজন অনুসারে দেড়গুণ হইতে দ্বিগুণ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইত। আমরা সর্ব্বদাই বেশ সুরক্ষিত স্থানে থাকিতাম।

উপরিউক্ত দস্যুদের চলাফিরা সম্পর্কে ভারত সরকার সর্ব্বদা যথাসম্ভব সংবাদ রাখেন ও সাবধানতা অবলম্বন করেন। পাহাড়ের উপর সে দেশের যে সমস্ত লোক গরু, ছাগল, উট ও দুম্বা চরাইতে যায়, তাহারাই প্রথমে

দস্যুদলের আগমন সম্পর্কে এবং তাহাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্বন্ধে যথাসম্ভব সংবাদ সংগ্রহ করে এবং গৃহপালিত পশুগুলিকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনার পর তাহারা স্থানীয় কোতোয়ালীতে সবিশেষ সংবাদ প্রদান করে। এইরূপ গোপন সংবাদ সংগ্রহ করার জন্ম ঐ সমস্ত লোকেরা সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়। পরে ঐ দস্যুদল সংখ্যায় কত, কোথা হইতে কোন্ রাস্তা দিয়া আসিতেছে ও তাহাদের কোন্ স্থানে যাইবার উদ্দেশ্য, তাহা গোপন ভাবে অন্যান্য কোতোয়ালী ও সৈন্য-বিভাগের হেড্ কোয়ার্টারে জরুরী তারযোগে জানান হয়। সর্ব্বপ্রকারে আশু সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বৃটিশ প্রজাদিগকে নিরাপদ করিবার চেষ্টা করিতে সরকার বাহাদুর কখনও পরাঙ্মুখ হন না। তথাপি এইরূপ অতর্কিত লুণ্ঠন যেন সে দেশে একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

কালাবাগের নিম্নস্থ সিন্ধুনদীর প্রশস্ততা খুব কম হইলেও স্রোত খুব প্রবল। মারী-ইণ্ডাস হইতে এখানে আসিতে হইলে ষ্টীমারে পার হইতে হয়। মারী ষ্টেশনের বড় লাইনের পার্শ্বেই ছোট লাইনও পাতা আছে। বড় লাইন হইতে মালপত্র নামাইয়া উহা ছোট লাইনের মালগাড়ীতে বোঝাই করার পর সেই গাড়ীগুলি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে ফ্ল্যাটে উঠাইয়া ষ্টীমারের পার্শ্বে বাঁধিয়া অন্য পারের লাইনে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। পরে তাহা টাঙ্ক, বান্নু প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

এই স্থানে সিন্ধুনদীর স্রোত বিশেষ প্রবল থাকায় Hydraulic Pressএর সাহায্যে কতকগুলি আটার কল চালান হয় দেখিয়াছি।

এ দেশে চাষ-আবাদের কার্য্য খুব ছোট ছোট লাঙলের সাহায্যে করা হয়। লাঙলের ফলা পাঁচ ছয় ইঞ্চির বেশী নয়। জমী খুব গভীর করিয়া না চষা হইলেও ফসল বেশ আশাতীত ভাবে জন্মায়। সেদেশের জমীর উর্ব্বরতা-শক্তি খুব বেশী এবং সেখানে বৃষ্টি খুব কম হয় বলিয়া কূপ হইতে জল উঠাইয়া জমীতে দিবার ব্যবস্থা আছে। কূপ হইতে জল উঠাইবার ব্যবস্থা বেশ দেখিবার জিনিষ। সে দেশের লোক অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া যাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা তাহাদের এবম্প্রকার বুদ্ধির পরিচয় পাইলে বিস্মিত হইবেন। একটী খুব বড় কাঠের চাকায় ছোট ছোট কলসীর একটী বড় মালা চাকার উপর হইতে কূপের জল পর্য্যন্ত ঝুলান থাকে; এবং ঐ চাকার সহিত একটী বড় লম্বা কাঠ এরূপ ভাবে বাঁধা থাকে, যাহাতে গরু জুড়িয়া দিলে, সে কূপের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া অল্প পরিশ্রমে যথেষ্ট জল উঠাইয়া দেয়।

সাধারণতঃ এ অঞ্চলে বৃষ্টি হয় না। বর্ষাকালে মাঝে মাঝে আকাশ খুব ঘনঘটা করিয়া আসিত বটে; কিন্তু বর্ষণের পরিবর্ত্তে বজ্র তুফান ও আঁধি—(ধূলার ঝড়) হইত। আঁধির সময় তাম্বুর বাহিরে আসা যাইত না এবং সেই সময়কার ধূলা আকাশে উত্থিত হইয়া কখনও কখনও চার পাঁচ দিন অন্ধকার হইয়া থাকিত—সূর্য্যের মুখ পর্য্যন্ত দেখা যাইত না। আঁধির এইরূপ অবস্থায় কখনও বৃষ্টি হইলে তাম্বুর উপরে দেখা যাইত যেন কর্দ্দম বর্ষণ হইয়াছে। শীতকালে এদিকে বৃষ্টি হইত। সেই সময় শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইত বলিয়া আমরা লেপের উপরে ও নীচে দুইখানি হিসাবে চারিখানি কম্বল মুড়িয়া শুইতাম এবং তাম্বুর মধ্যে আগুন জ্বালা নিষিদ্ধ থাকায় Heating Stove জ্বালিয়া রাখিতাম।

বর্ষার সময় মেঘগুলি যখন অদূরস্থিত সুলেমান পর্ব্বত-গাত্রে শয়ন করিয়া থাকিত এবং মাঝে মাঝে একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইত, তখন তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া তাহা অন্য প্রিয়জনকে দেখাইবার আগ্রহ স্বতঃই মনে উদয় হইত; কেন না মানুষের মনোবৃত্তিই এইরূপ যে "সুন্দর কিছু দেখিলেই একটা উল্লাস আসে" এবং তাহা অন্য প্রিয়জনদের না দেখাইতে পারিলে যেন সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া পরিপূর্ণ আনন্দ পাওয়া যায় না।

বর্ষা-সমাগমে পর্ব্বতে যখন প্রচুর পরিমাণে বারিপাত হয় এবং সেই বারিরাশি যখন পর্ব্বত-গাত্র ধৌত করিতে করিতে সিন্ধুতে আসিয়া পতিত হয়, তখন সিন্ধুর জল গৈরিক বর্ণ ধারণ করে। সে সময় সিন্ধুর সেই ভৈরব গর্জ্জন ও উদ্দাম নর্ত্তন নিরীক্ষণ করিলে যুগপৎ হর্ষ ও ভীতির সঞ্চার হয়। তখন তাহার গতিবেগ এত প্রখর হয় যে, কোন কোন দিন ষ্টীমার পারাপার করিতে পারে না।

কালাবাগ সহরটী তিন দিকে পর্ব্বত-মালায় বেষ্টিত এবং এক দিকে সিন্ধুনদী। এই সমস্ত পর্ব্বতে সৈন্ধব লবণ, ফটকিরি, লোহা ও চূণ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া

যায়। লবণের পাহাড় রীতিমত পাহারা দিয়া রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে এবং উহা ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন সুপারিন্টেণ্ডেন্টের তত্ত্বাবধানে সুপারিচালিত হইতেছে। ফটকিরি প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যগুলি সম্ভবতঃ সর্ব্বোচ্চ মূল্যে স্থানীয় ঠিকাদারদিগকে বিশেষ চুক্তিতে ইজারা দেওয়া হয়।

আমরা সৈন্য-বিভাগ হইতে দশ দিন অন্তর রসদ পাইতাম। যে পরিমাণ রসদ আমাদিগকে জোগান হইত তাহা পর্য্যাপ্ত ছিল এবং দুই একটী দ্রব্য কচিৎ কখনও অনটন পড়িলে, তাহার পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য সরবরাহ করা হইত। রসদ আদৌ নিকৃষ্ট ছিল না এবং সংসারের আবশ্যকীয় হিসাবে প্রায় সমস্ত দ্রব্যই তথায় আমরা পাইতাম। তবে পরিধেয় পোষাকগুলি আমাদের পছন্দ মত হয় নাই। সেগুলি সাধারণ ভারতীয় সৈন্যদের অনুরূপ আমাদিগকে দেওয়া হইত এবং তাহা পরিধান করিতে আমরা লজ্জা অনুভব করিতাম। সে কারণ বাধ্য হইয়া আমরা আমাদের পোষাক তৈয়ারী করাইয়া লইতাম, যাহাতে দেখিতে একটু সভ্য-ভব্য হয়।

সৈন্য-বিভাগের শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও বিচার প্রভৃতি বিশেষ প্রশংসনীয়। প্রত্যেক বিভাগেই এত সুবন্দোবস্ত যে, তাহার প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই। এই একটীমাত্র বিভাগে দেখিতে পাওয়া যায় সৎকার্য্য, বিশ্বস্ততা, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের যেরূপ পুরস্কার আছে, কুকার্য্য ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির সেইরূপ শাস্তিও আছে।

দেড় বৎসর যাবৎ কালাবাগে থাকার পর আমাদের আপিস হেড্ কোয়ার্টার্সের হুকুম অনুসারে ডেরাইস্মাইল-খাঁতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ওয়াজিরিস্থানের যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য জেনারেল আফিসার কমাণ্ডিংএর আপিস ডেরাইস্মাইলখাঁতে স্থাপিত হইয়াছিল।

ডেরাইস্মাইলখাঁ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটী জিলা। ইহার উত্তরে বান্নু, দক্ষিণে ডেরাগাজীখাঁ, পূর্ব্বে ভক্তি ও সাহাপুর এবং পশ্চিমে সুলেমান পর্ব্বতমালা। এই জিলার আয়তন ২২৯৬ বর্গ মাইল। এখানকার অধিবাসীরা পুস্তু ও উর্দ্দু ভাষায় কথা বলে।

ডেরাইস্মাইলখাঁ সহরটী বেশ বড়; তবে সহরের মধ্যস্থিত পল্লীগুলি অত্যন্ত নোংরা। সহরে আবশ্যকীয় প্রায় সমস্ত দ্রব্যই কিনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সৈন্য-বিভাগের বহু লোক ছাউনীতে থাকায়, যুদ্ধের সময় সেখানে জিনিষপত্রের মূল্য কিছু বেশী ছিল। এই অভিযোগ স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতেই পাইয়াছিলাম।

ডেরাইস্মাইলখাঁ হইতে দিল্লী বা লাহোর যাইতে হইলে সিন্ধুনদী পার হইয়া নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের দরিয়াখাঁ ষ্টেশনে গাড়ী ধরিতে হয়। ডেরাইস্মাইল খাঁ ও দরিয়া-খাঁর মধ্যবর্ত্তী স্থলে সিন্ধুনদী বহু স্থানে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে এবং মাঝে মাঝে চড়া ও নল-খাগড়ার বড় বড় ঝোপ আছে। যে যে স্থলে নদীর প্রশস্ততা কিছু কম, সেই সেই স্থলে কতকগুলি বড় বড় নৌকা পাশাপাশি স্থাপন করিয়া নৌকার পুল (Boat Bridge) তৈয়ারী করা হয়। এই নৌকা-গুলি খুব বড় লৌহ শৃঙ্খল ও কাছির সাহায্যে বাঁধা থাকে, যাহাতে স্রোতের সময় অথবা প্রবল বাতাসে নৌকাগুলি স্থানচ্যুত না হইতে পারে। বর্ষার সময় যখন সিন্ধুর স্রোতোবেগ বর্দ্ধিত হয়, তখন নৌকাগুলি খুলিয়া কূলে নিরাপদ স্থানে রাখা হয়; এবং শীতের প্রারম্ভে যখন নদীর স্রোত মন্দীভূত হয়, তখন পুল তৈয়ারী করিয়া লোকজন ও উষ্ট্র প্রভৃতি ভারবাহীদের চলাচলের বন্দোবস্ত করা হয়।

ডেরাইস্মাইলখাঁ হইতে টাঙ্ক পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ মাইলব্যাপী খুব ছোট একটী রেলওয়ে লাইন পাতা আছে। উহা মিটার গজ লাইন অপেক্ষাও ছোট। উহাকে Decauville Railway বলে এবং উহার ইঞ্জিন তৈলের সাহায্যে চলে। গতিবেগ মন্দ নয়—ঘণ্টায় তিরিশ মাইল হইবে। ঐ লাইনের গাড়ীগুলি খুব ছোট এবং উহা সৈন্যবিভাগের লোক-লস্কর ও মালপত্র বহনের জন্যই ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে সাধারণ যাত্রীরাও উহাতে নির্দ্ধারিত ভাড়া দিয়া গমনাগমন করিতে পারে। পথে খুব দূরে দূরে কুলুচী, হাথালা প্রভৃতি নামীয় তিন-চারিটী মাত্র ষ্টেশন আছে। লাইনের উভয় পার্শ্বেই ধূসর প্রান্তর এবং বহু দূরে পাদপশূন্য পর্ব্বতরাজি দৃষ্ট হয়—লোকালয় একরূপ নাই বলিলেই হয়।

এইবার ওয়াজির ও মাসুদদের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিব। ওয়াজির বা মাসুদদের কোন রাজা বা গভর্ণমেণ্ট নাই। উহারা প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ অথবা আফগানরাজের অধীন নহে। কতিপয়

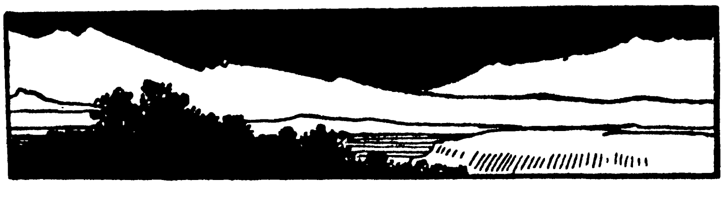
লোক একত্র মিলিত হইয়া এক একটী দল গঠন করে এবং এক একজন দলকর্ত্তার অধীনে ইহারা থাকে। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। সে কারণ দলস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি পুত্র পরিবার ও গৃহপালিত পশু প্রভৃতি লইয়া চলাফিরা করে; এবং বাসস্থানের অভাবহেতু পর্ব্বতগাত্রস্থ গর্ত্তে বা গহ্বরে ইহারা সপরিবারে বসবাস করে। এক এক স্থলে চল্লিশ-পঞ্চাশটী গর্ত্তে পঁচিশ তিরিশটী ওয়াজির বা মাসুদ পরিবার বাস করে; এবং উহাই তাহাদের একটী গ্রামরূপে পরিগণিত হয়। গৃহপালিত পশুগুলি বর্ষা ও শীতের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে গর্ত্তের বহির্ভাগে অর্থাৎ পর্ব্বতের উপরেই বাঁধা থাকে। এই সমস্ত পর্ব্বতগুলি বন্ধ্যা—ইহার উপরিভাগে কয়েকপ্রকারের কাঁটা গাছ ও উপত্যকা-ভূমিতে উইলো ঝোপ ভিন্ন অন্য কোন গাছ জন্মে না। বৎসরের মধ্যে ছয় মাসের মত আহার্য্য ইহারা চাষ-আবাদ করিয়া সংগ্রহ করে; এবং অবশিষ্ট ছয় মাসের আহার ইহারা দস্যুবৃত্তির সাহায্যে সংগ্রহ করে। এ দেশের জমীর উর্ব্বরতাশক্তি যথেষ্ট; কিন্তু জলের অভাবে চাষের কার্য্য উহারা ভালভাবে করিবার সুবিধা পায় না।

উপরিউক্ত দলগুলি, বৃটিশ সরকারের কমিশন, কমিটির মত, দলকর্ত্তার নাম অনুসারে অভিহিত হয়। যথা—ইসাখেলের দল, মুসাখেলের দল, আব্দুর রহমানখেলের দল ইত্যাদি। দলস্থ প্রত্যেকে, এমন কি, বারো বৎসরের বালক পর্য্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিতে পারদর্শী। আট নয় বৎসরের ছোট ছোট বালককে পর্য্যন্ত ছোট ছোট বন্দুক দিয়া তাহাদিগের পিতামাতা পক্ষী প্রভৃতি শীকার করিতে পাঠাইয়া দেয় এবং তাহারা শীকার করিয়া পক্ষী প্রভৃতি না আনিতে পারিলে, অর্থাৎ রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাহাদের অকৃতকার্য্যতার শাস্তিস্বরূপ, সেদিন আহার পায় না, কখনও বা তিরস্কার ও অর্দ্ধাহার পাইয়া থাকে। এই কারণে তাহাদের লক্ষ্যশক্তি বাল্যকাল হইতেই খুব তীক্ষ্ণ হয়।

যুদ্ধের সময় যখন তাহারা তাহাদের গ্রামের উপর বিমানপোত উড়িতে দেখে, তখন তাহারা আত্মরক্ষার্থে গর্ত্তে লুকাইয়া থাকে; এবং যখন তাহাদের গ্রামের উপর অতিরিক্ত রূপে বোমা বর্ষণ হয়—তখন তাহারা পুত্র পরিবার ও গৃহপালিত পশু ও গৃহস্থালীর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সমেত রাত্রির অন্ধকারে দূরস্থ অন্য পাহাড়ে চলিয়া যায়। তাহাদের পারিবারিক জীবন যেন কতকটা যাযাবরদের মতন।

উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের কতকাংশ যুদ্ধের পর ইংরাজ সরকারের অধীনে আসিয়াছে এবং সদাশয় সরকার বাহাদুর এই দেশের লোকদিগকে ক্রমে ক্রমে শিক্ষিত ও সুসভ্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অল্প কয়েক বৎসরের চেষ্টায় ঐ সমস্ত দেশের রাস্তা ও গ্রামসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তত্রত্য অধিবাসীদের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া "ফ্রন্টিয়ার কনষ্টিবিউলারী" ও খাসাদার প্রভৃতি গঠন ও নিয়োগ করা হইয়াছে। অদূর-ভবিষ্যতে এই সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ, যুদ্ধপ্রিয় পার্ব্বত্য জাতি ইংরাজ সরকারের অসীম অনুগ্রহে বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানগরিমায় জগৎসমক্ষে পরিচিত হইবে সন্দেহ নাই।

১৯১৯ সাল হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত সীমান্তে রীতিমত সৈন্যবাহিনী রাখিবার আবশ্যক হইয়াছিল; এবং তৎপরে ভারত সরকার যখন সীমান্তের অবস্থা কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তখন তথাকার সৈন্যসংখ্যা ক্রমে-ক্রমে হ্রাস করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। পরে ওয়াজিরিস্তান ফোর্স উঠাইয়া দিয়া—উহাকে একটী সামরিক জেলায় (Military District) পরিণত করা হইয়াছিল এবং ভারতসরকারের অনুমতি অনুযায়ী আমরা আমাদের আপিস বন্ধ করিয়া দিয়া ১৯২৩ সালের ১৪ই আগষ্ট কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম।



শরৎ-বন্দনা

অপরাজেয় কথা-শিল্পী ও সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিগত ৩১শে ভাদ্র ছাপ্পান্ন বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া সাতান্ন বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। এই শুভ উপলক্ষে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কলিকাতার নাগরিক, বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য-সেবী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, ৩১শে ভাদ্র শুক্রবার টাউন-হলে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করা হইবে; নাগরিকগণের পক্ষ হইতে একখানি অভিনন্দন-পত্র ও মহিলাগণের পক্ষ হইতে আর একখানি অভিনন্দন-পত্র শরৎচন্দ্রকে প্রদত্ত হইবে। শরৎচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে অন্য কোন উপহার দেওয়া হইবে না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই দিনে সভাপতিত্ব করিবেন। দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ১লা আশ্বিন শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় শরৎচন্দ্র ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অন্যান্য বন্ধুগণকে তাঁহার গৃহে অভ্যর্থনা করিবেন এবং তদুপলক্ষে একটা মজ্‌লিস হইবে। তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ২রা আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ণে টাউন-হলে একটী সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন। এই সম্মেলনের পক্ষ হইতে শরৎচন্দ্রকে 'শরৎ-বন্দনা' নামক একখানি পুস্তক উপহার দেওয়া হইবে। চতুর্থ দিনে অর্থাৎ ৩রাআশ্বিন কলিকাতার রঙ্গালয় সমূহের অভিনেতৃগণ সম্মিলিত ভাবে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিবেন; এবং শরৎচন্দ্রের নাটকগুলি হইতে নির্ব্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় করিবেন।



শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৪৫ বৎসর বয়সে)

কিন্তু, এই কার্য্য-প্রণালী রক্ষিত হইতে পারে নাই। ৩১শে ভাদ্রের তিন চারিদিন পূর্ব্ব হইতেই প্রথম দিনের অনুষ্ঠান বন্ধ রাখিবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত হয়। আন্দোলনকারীরা বলেন যে, ৩১শে ভাদ্র হিজলীর শোচনীয় ব্যাপারের দিন; সেদিন কোন প্রকার আনন্দ-অনুষ্ঠান

হইতে পারে না। অভ্যর্থনা-সমিতির আয়োজন তখন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; নিমন্ত্রণ-পত্র ও বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। এ অবস্থায় ৩১শে ভাদ্রের অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা অসম্ভব বলিয়া অভ্যর্থনা-সমিতি মত প্রকাশ করেন।

৩১শে ভাদ্র অপরাহ্ণ তিনটা হইতে টাউন-হলে জন-সমাগম হইতে লাগিল। অভ্যর্থনা-সমিতির চেষ্টায় সেদিন টাউন-হলের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল; পত্রপুষ্প পতাকা-অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে টাউন-হল উদ্ভাসিত হইয়াছিল। অসংখ্য নরনারীর সমাগম হইয়াছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু পূর্ব্বেই শরৎচন্দ্রের মোটর যখন টাউন-হলের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন স্বদেশী স্বেচ্ছা-সেবকগণ তাঁহার মোটরের গতিরোধ করিলেন; তাঁহাকে কিছুতেই সভায় যোগদান করিতে দিবেন না। প্রায় আধ-ঘণ্টা পর্য্যন্ত উভয় দলে বাদবিতণ্ডা চলিল। তখন শরৎচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া সেখান হইতেই চলিয়া গেলেন, সভা-গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় তখন সেদিনের মত সভার কার্য্য বন্ধ রহিল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকগণ বিষণ্ণ মনে টাউন-হল ত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় দিনে যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। সেইদিনই অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক মহাশয় সংবাদপত্রে ঘোষণা করিলেন যে, ২রা আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ণ চারিটার সময় প্রথমে পূর্ব্বদিনের ব্যবস্থিত অভিনন্দন-পত্রাদি প্রদত্ত হইবে এবং তাহার পর সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আগমন হয় নাই; তাঁহার বাড়ীতে অসুখ হওয়ায় তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি শরৎচন্দ্রকে একটী আশীর্ব্বচন পাঠাইয়াছিলেন।

২রা আশ্বিন অপরাহ্ণ চারিটার সময় সভার অধিবেশন হয়। এদিনেও বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার বসু একটী গান করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। তাহার পর মহিলাবৃন্দের পক্ষ হইতে সুকবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন; অভিনন্দন-পত্রখানি সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত হইয়াছিল। তাহার পর নাগরিক ও সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় রবীন্দ্রনাথ, সার প্রফুল্লচন্দ্র ও অন্যান্য অনুপস্থিত মহোদয়গণের পত্র পাঠ করেন। তাহার পর শরৎচন্দ্র এই সকল অভিনন্দনের উত্তর দান করেন। ৩১শে ভাদ্রের ব্যবস্থিত কার্য্যের এখানেই শেষ হয়। অবশ্য ৩১শে ভাদ্র যেভাবে এ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার অনেক অঙ্গহানি হইয়াছিল, অনেক অনুষ্ঠান বাদ দিতে হইয়াছিল। তবুও অনুষ্ঠানটী যে সুসম্পন্ন হইয়াছিল, সে কথা বলিতেই হইবে। আমরা নিম্নে দুইখানি অভিনন্দন-পত্র, রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বচন ও শরৎচন্দ্রের প্রত্যুত্তর উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

স্বদেশবাসিনীবৃন্দের অভিনন্দন

বাংলার বরেণ্য

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের

করকমলে—

বাংলার সাহিত্যাকাশ যেদিন ধরণীর সর্ব্বোজ্জ্বল রবিকরে সুপ্রদীপ্ত, সেই অদ্বিতীয় আদিত্যের অপূর্ব্ব কিরণচ্ছটায় সকল গ্রহনক্ষত্রের আলোকরেখা যেদিন পরিম্লান,—সেদিনের সেই রবিকরোদ্ভাসিত জ্যোতির্ম্ময় যুগে বঙ্গবাণীর দিক্‌চক্রবালে যাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার অপরাজেয় দীপ্তি আপনার দিব্য মহিমায় সকল জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, হে শুভ্রসুন্দর শরৎচন্দ্র! তুমিই সেই সেই জ্যোতিষ্মান্,—আমরা তোমার বন্দনা করি।

শরতের পূর্ণচন্দ্রের অফুরন্ত জ্যোৎস্না প্লাবনেরই মত তোমার কথা-সাহিত্যের কনক-কৌমুদী এদেশের নরনারীর মর্ম্মে সুগভীর আনন্দ-বেদনার বিচিত্র তরঙ্গ তুলিয়াছে। তোমার প্রাণবন্ত সৃষ্টি তাহাদের দীর্ঘ তন্দ্রাহত অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, স্পন্দিত করিয়াছে, সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে বাংলার কথা-সাহিত্যের অসামান্য শিল্পি! আমরা তোমার বন্দনা করি।

পরাধীন বাংলার অধঃপতিত সমাজের অসহায়া

অন্তঃপুরচারিণীদের অন্তরের মূক আনন্দ-বেদনাকে তুমি ভাষায় মূর্ত্ত করিয়া ধরিয়াছ। তাহাদের দুর্গত জীবনের সকল দুঃখ সুখের অনুভূতিগুলিকে নিবিড় সহানুভূতির পরম রসরাগে সাহিত্যে বাস্তবরূপে সত্য করিয়া তুলিয়াছ। তোমার অনাবিষ্ট দৃষ্টি, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, সুগভীর উপলব্ধি-শক্তি, বিচিত্র মানব-চরিত্রের অতল অভিজ্ঞতা,—নিখিল নারী-চিত্তের নিগূঢ় প্রকৃতির গোপনতম সন্ধান লাভ করিয়াছে। হে নারী-চরিত্রের নিবিড় রহস্য জ্ঞাতা! আমরা তোমার বন্দনা করি।

সর্ব্ববিধ আত্মবমাননা, সর্ব্ববিধ হীনতর অবস্থার মধ্যেও নারীর সহজ-প্রকৃতিজাত যে বৈশিষ্ট্যগুলি সকল দেশের, সকল কালের সকল সমাজে বর্ত্তমান, তুমি তাহার অকৃত্রিম রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাহার সত্য প্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার মৌন ভাষা বুঝিতে পারিয়াছ। হে সকল নারীর অন্তর্যামি! আমরা তোমার বন্দনা করি।

আজ তোমার এই সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মোৎসবের অভিনন্দনবাসরে আমরা আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে আসিয়াছি। আমরা আমাদের মনের ভাব সুস্পষ্ট ও সুন্দর-রূপে প্রকাশ করিয়া বলিতে শিখি নাই; তবুও, আজিকার এই বিশেষ দিনে তোমাকে আমরা কেবল এই কথাই জানাইতে আসিয়াছি, তোমার প্রতিভাকে আমরা বরণ করি। তোমাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তোমাকে আমরা ভালবাসি। তোমাকে আমরা আমাদের একান্ত আপনজন বলিয়াই জানি। হে নারীর পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু! আমরা তোমার বন্দনা করি।

তুমি আমাদের সকৃতজ্ঞ প্রণিপাত গ্রহণ কর! তুমি আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর! আমাদের পরম প্রিয় তুমি, পরম আত্মীয় তুমি। তোমার এই শুভ জন্মোৎসব-অনুষ্ঠান বাংলার গৃহে গৃহে বর্ষে বর্ষে যোগ্য সমারোহে প্রতিপালিত হউক। তোমার যশঃ ও আয়ু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক। তোমার সুখ ও স্বাস্থ্য চির অব্যাহত থাকুক। তোমার জীবন আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যে হেমবিমণ্ডিত হউক—অন্তরের এই ঐকান্তিক কামনা লইয়া হে নারী-হৃদয়ের মরমী ঋষি! আমরা তোমার বন্দনা করি।



শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(৫৭ বৎসর বয়সে)

তোমার—স্বদেশ-বাসিনীগণ।

স্বদেশ-বাসিগণের অভিনন্দন

শরৎ-বন্দনা

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

করকমলে

হে বঙ্গবাণীর বরপুত্র !

তোমার সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মদিবসে সমবেত স্বদেশবাসীর বন্দনা গ্রহণ কর। আমরা আজ আমাদের হৃদয়ের পাত্রে যে প্রগাঢ় প্রীতির অর্ঘ্য বহন করিয়া আনিয়াছি, তোমার নিরভিমান স্নেহ-সিঞ্চিত প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে তাহা সার্থক কর।

বঙ্গসাহিত্যে তোমার আবির্ভাব শরতের পূর্ণচন্দ্রের মতই পরিপূর্ণ ও প্রভা-সুদীপ্ত। তোমার প্রথম উদয়-ক্ষণে বাঙ্গালী-হৃদয় চন্দ্রাকর্ষিত সমুদ্রের মতই উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে আমরা সেদিন দেখিয়াছিলাম, তুমি তোমার জ্যোতির্ময় প্রতিভার দ্যুতিতে অন্তরের সুনিবিড় অনুভূতিকে জাগ্রত করিয়া দুঃখের মলিন মূর্ত্তিকে ভাস্বর করিয়া তুলিলে। ইহা তোমারই পক্ষে সম্ভব, যেহেতু তুমি সত্যের সাধনায় বহু অন্ধকার রাত্রি অতন্দ্র থাকিয়া দুঃখের সমগ্র রূপকে ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছ।

হে দুঃখ বেদনার রহস্যবিৎ! বঞ্চিত-স্নেহ এবং উপেক্ষিত-প্রেমের নির্দ্দয় আঘাতে বিপর্য্যস্তা বঙ্গনারীর সংযত ধৈর্য্যের মহিমাকে তুমি বিনম্র শ্রদ্ধার অজিনাসনে বসাইয়া মহীয়সী করিয়াছ। পৌরুষহীন সমাজের অচেতন মনকে তুমি তার বিগত গৌরবের মূঢ় মোহ হইতে জাগ্রত করিয়াছ। আমাদের জীবনের যত কিছু সঞ্চিত লজ্জা, অপমান ও উৎপীড়নের ব্যথাকে তুমি কেবল ভাষা দাও নাই, আশা দিয়াছ; তোমার প্রতিভার আলোকে বাঙ্গালী নিজের পরিচয় পাইয়াছে।

হে ঐন্দ্রজালিক শিল্পি! অতি সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের বিক্ষিপ্ত ও অকিঞ্চিৎকর উপকরণ লইয়াই তুমি স্বকীয় মৌলিকতায় স্বতন্ত্র, অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব, ভাবরস-সমৃদ্ধ যে কথা-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছ,—কেবলমাত্র বাঙ্গালীরই নহে, তাহা সর্ব্ব দেশের, সর্ব্ব কালের অক্ষয় সম্পদরূপে অভিনন্দিত হইবে। মানব-মহত্ত্বের তুমি মহিয়ান উদ্গাতা; তোমার দুর্লভ দান কেবল প্রসাদ-লব্ধ লঘু চিত্তের শূন্য অহঙ্কারের জন্য উৎসর্গিত নয়; ইহাকে শুধু অবসরের বিলাস-বস্তু রূপে ব্যবহার করিলে আত্মবঞ্চনাই হইবে। অতএব তোমার সৃষ্টির যথার্থ মাহাত্ম্য উপলব্ধির দ্বারা আমরা যেন বল লাভ করি, ফল লাভ করি—এই আশীর্ব্বাদ করিয়া হে শক্তিমান স্রষ্টা! তুমি তোমার স্বদেশবাসীর প্রীতি-উৎসারিত বন্দনা গ্রহণ কর!

শরৎ-বন্দনা-সমিতি তোমার গুণমুগ্ধ
৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৯ স্বদেশবাসিগণ

শরৎচন্দ্রের প্রতিভাষণ

৩১শে ভাদ্র আমার জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণের আহ্বান আমার স্বদেশের আপন-জনের কাছ থেকে প্রতি বৎসরেই আসে; আমি শ্রদ্ধানত শিরে এসে দাঁড়াই; অঞ্জলি ভরে আশীর্ব্বাদ নিয়ে বাড়ী যাই,—সে আমার সারা বছরের পাথেয়। আবার আসে ৩১শে ভাদ্র ফিরে, আবার আসে আমার ডাক, আবার এসে আমি আপনাদের কাছে দাঁড়াই। এমনি ক'রে এ-জীবনের অপরাহ্ণ সায়াহ্নে এগিয়ে এলো।

এই ৩১শে ভাদ্র বছরে বছরে ফিরে আসবে, কিন্তু, একদিন আমি আর আসবো না। সে দিনে এ-কথা কারো বা ব্যথার সঙ্গে মনে পড়বে, কারো বা নানা কাজের ভিড়ে স্মরণ হবে না। এ-ই হয়, এমনি করেই জগৎ চলে।

কেবল প্রার্থনা করি, সেদিনও যেন এমনি-ধারা স্নেহের আয়োজন থেকে যায়, আজকের দিনে যাঁরা তরুণ, বাণীর মন্দিরে যাঁরা নবীন সেবক, তাঁরা যেন এম্‌নি সভাতলে দাঁড়িয়ে আপনাদের দক্ষিণ হস্তের এম্‌নি অকুণ্ঠিত দানে হৃদয় পূর্ণ করে নিয়ে গৃহে যেতে পারেন।

আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার পুরস্কার দেশের কাছে আমি অনেক দিক দিয়ে অনেক পেলাম,—আমার প্রাপ্যেরও অনেক বেশি।

আজকের দিনে আমার সবচেয়ে মনে পড়ে এর কতটুকুতে আমার আপন দাবী, আর কত বড় এর ঋণ। ঋণ কি শুধু আমার পূর্ব্ববর্ত্তী পূজনীয় সাহিত্যাচার্য্যগণের কাছেই? সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—

এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালীশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেচি অবিচার, কত দেখেচি কুবিচার, কত দেখেচি নির্ব্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্য্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি; আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী-জাতি যূথি, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন; কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘট্‌লো না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু, অন্তরে যাকে পাইনি, শ্রুতি-মধুর শব্দ-রাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি বলে প্রকাশ করবার ধৃষ্টতাও আমি করিনি। এম্‌নি আরও অনেক কিছুই—এ জীবনে যাঁদের তত্ত্ব খুঁজে মেলেনি স্পর্দ্ধিত অবিনয়ে মর্য্যাদা তাঁদের ক্ষুণ্ণ করার অপরাধও আমার নেই। তাই সাহিত্য-সাধনার বিষয়-বস্তু ও বক্তব্য আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়, তারা সঙ্কীর্ণ, স্বল্প-পরিসরবদ্ধ। তবুও এটুকু দাবী করি, অসত্যে অনুরঞ্জিত করে তাদের আজও আমি সত্যভ্রষ্ট করিনি।

আমার বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। প্রতি সাহিত্য-সাধকের অন্তরেই পাশাপাশি বাস করে দুজনে; তার একজন হলো লেখক, সে করে সৃষ্টি, আর অন্য জন হলো তার সমালোচক, সে করে বিচার। অল্প বয়সে লেখকই থাকে প্রবলপক্ষ,—অপরকে সে মানতে চায় না। একজন পদে পদে যতই হাত চেপে ধরতে চায়, কানে কানে বলতে থাকে,—পাগলের মতো লিখে যাচ্ছো কি, থামো একটুখানি,—প্রবল পক্ষ ততই সবলে হাত দুটো তার ছুড়ে ফেলে দিয়ে চালিয়ে যায় তার নিরঙ্কুশ রচনা। বলে, আজ তো আমার থামাবার দিন নয়,—আজ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের গতি-বেগে ছুটে চলার দিন! সেদিন খাতার পাতায় পুঁজি হয় বেশি, স্পর্দ্ধা হয়ে ওঠে অভ্রভেদী। সেদিন ভিৎ থাকে কাঁচা, কল্পনা হয় অসংযত উদ্দাম;—মোটা গলায় চেঁচিয়ে বলাটাকেই সেদিন যুক্তি বলে ভ্রম হয়। সেদিন বইয়ে-পড়া ভালো-লাগা-চরিত্রের পরিস্ফীত বিকৃতিকেই সদম্ভে প্রকাশ করাকে মনে হয় যেন নিজেরই অনবদ্য মৌলিক সৃষ্টি।

হয় ত, সাহিত্য-সাধনায় এইটিই হচ্চে স্বাভাবিক বিধি; কিন্তু উত্তরকালে এর জন্যই যে লজ্জা রাখার ঠাঁই মেলে না এ-ও বোধ করি এর এমনিই অপরিহার্য্য অঙ্গ। আমার প্রথম যৌবনের কত রচনাকেই না এই পর্য্যায়ে ফেলা যায়।

কিন্তু ভাগ্য ভালো, ভুল আমার আপনার কাছেই ধরা পড়ে। আমি সভয়ে নীরব হয়ে যাই। তারপরে দীর্ঘ দিন নিঃশব্দে কাটে। কেমন কোরে কাটে, সে বিবরণ অবান্তর। কিন্তু বাণীর মন্দিরদ্বারে আবার যখন ফিরিয়ে এনে আত্মীয় বন্ধুরা দাঁড় করিয়ে দিলেন, তখন যৌবন গেছে শেষ হয়ে, ঝড় এসেছে থেমে; তখন জানতে বাকী নেই সংসারে সংঘটিত ঘটনাই কেবল সাহিত্যে সত্য নয়, এবং সত্য বলেই তা সাহিত্যের উপাদানও নয়। ওরা শুধু ভিত্তি এবং ভিত্তি বলেই থাকে মাটীর নীচে সংগোপনে,—থাকে অন্তরালে।

তখন আমার আপন বিচারক বসেছে তার সুনির্দ্দিষ্ট আসনে; আমার যে-আমি লেখক, সে নিয়েছে তার শাসন মেনে। এদের বিবাদের হয়েছে অবসান।

এমনি দিনে একজন মনীষীকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি; তিনি স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন আমাদের ছেলেবেলায় ইস্কুলের শিক্ষক। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এই নগরেরই এক পথের ধারে। ডেকে বল্‌লেন, শরৎ, তোমার লেখা আমি পড়িনি, কিন্তু লোকে বলে সেগুলো ভালোই হচ্চে। একদিন তোমাদের আমি পড়িয়েছি। আমার আদেশ রইলো যা' সত্যিই জানো না তা' কখনো লিখোনা। যাকে যথার্থ উপলব্ধি করোনি, সত্যানুভূতিতে যাকে আপন ক'রে পাওনি, তাকে ঘটা করে ভাষার আড়ম্বরে ঢেকে পাঠক ঠকিয়ে বড় হতে চেয়ো না। কেন না এ ফাঁকি কেউ-না-কেউ একদিন ধরবেই, তখন লজ্জার অবধি থাক্‌বে না। আপন সীমানা লঙ্ঘন করাই আপন মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা। এ ভুল যে করে না তার আর যে দুর্গতিই হোক্ তাকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় না। অর্থাৎ বোধ হয় তিনি এ-কথাই বল্‌তে চেয়েছিলেন যে, পেটের দায়ে যদি বা কখনও ধার করো, ধার করে কখনো বাবুয়ানি করো না।

সেদিন তাঁকে জানিয়েছিলাম, তাই হবে।

আমার সাহিত্য-সাধনা তাই চিরদিন স্বল্প পরিধি-

বিশিষ্ট। হয় ত, এ আমার ত্রুটি, হয়ত এই আমার সম্পদ, আপনাদের স্নেহ ও প্রীতি পাবার সত্য অধিকার। হয়ত আপনাদের মনের কোণে এই কথাটা আছে,—এর শক্তি কম, তা হোক, কিন্তু এ কখনো অনেক জানার ভান কোরে আমাদের অকারণ প্রতারণা করেনি।

এমনি একটা জন্ম-দিন উপলক্ষে বলেছিলাম চিরজীবী হবার আশা আমি করিনে। কারণ, সংসারে অনেক-কিছুর মতো মানব-মনেরও পরিবর্ত্তন আছে; সুতরাং আজ যা বড়ো আর একদিন তাই যদি তুচ্ছ হয়ে যায় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সে-দিন আমার সাহিত্য-সাধনার বৃহত্তর অংশও যদি অনাগতর অবহেলায় ডুবে যায়, আমি ক্ষোভ করবো না। শুধু, মনে এই আশা রেখে যাবো অনেক কিছু বাদ দিয়েও যদি সত্য কোথাও থাকে সেটুকু আমার থাকবে। সে আমার ক্ষয় পাবে না। ধনীর অজস্র ঐশ্বর্য্য নাই বা হলো, বাক্‌দেবীর অর্ঘ-সম্ভারে ঐ স্বল্প সঞ্চয়টুকু রেখে যাবার জন্তই আমার আজীবন সাধনা। দিনের শেষে এই আনন্দ মনে নিয়ে খুসি হয়ে বিদায় নেবো,—ভেবে যাবো আমি ধন্ত, জীবন আমার বৃথায় যায়নি।

উপসংহারে একটা প্রচলিত রীতি হচ্চে শুভানুধ্যায়ী প্রীতিভাজন বন্ধুজনের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো। কিন্তু এ প্রকাশ করার আমি ভাষা খুঁজে পেলাম না। তাই শুধু জানাই আপনাদের কাছে আজ আমি সত্যই বড় কৃতজ্ঞ।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

ওঁ

'UTTARAYAN'

Santiniketan. Beng il

কল্যাণীয়েষু

শরৎচন্দ্র, বিশেষ উদ্বেগজনক সাংসারিক ঘটনায় তোমার জন্মদিনের উৎসবে সম্মাননা সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হোলো। অগত্যা আমার আন্তরিক শুভ কামনা এই উপলক্ষ্যে পত্রযোগে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিই।

তোমার বয়স অধিক নয়, তোমার সৃষ্টির ক্ষেত্র এখনো সম্মুখে দীর্ঘ প্রসারিত, তোমার জয়যাত্রার বিরাম হয়নি। সেই অসমাপ্ত যাত্রাপথের মাঝখানে অকস্মাৎ তোমাকে দাঁড় করিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া আমার কাছে মনে হয় অসাময়িক। এখনো স্তব্ধ হবার অবকাশ নেই তোমার, ফলশস্যবহুল দূর ভবিষ্যৎ এখনো তোমাকে সম্মুখে আহ্বান করচে।

সত্তর বছর উত্তীর্ণ করে কর্ম্মসাধনার অন্তিমপর্ব্বে আমি পৌঁচেছি। কর্ত্তব্যের চক্রপথ প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ করার পরেও এখানে যদি আমাকে চলতে হয় সেটা পুনরাবর্ত্তনমাত্র। এই কারণেই অল্প দিন হোলো আমার দেশ আমার জীবনের শেষ প্রাপ্য সমারোহ করে চুকিয়ে দিয়েছে। সাধারণের কাছে আমার পরিচয় সমাপ্ত হয়ে গেছে বলেই এই শেষকৃত্য সম্ভবপর হয়েছে। আকাশ থেকে শ্রাবণের মেঘ তার দান যখন নিঃশেষ করে দেয় তখনি ধরাতলে প্রস্তুত হয় শরতের পুষ্পাঞ্জলি। তার পরেও মেঘ যদি সম্পূর্ণ বিশ্রাম না করে সেটা হয় বর্ষার পুনরুক্তিমাত্র, সেটা বাহুল্য।

সেই দাঁড়ি-টানা সময় তোমার নয়। এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠ্‌বে তারা তোমার; অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্ব্বজনহস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্ত শেষ বরমাল্য। সে দিন বহুদূরে থাক্। আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে; তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো, পথের চরমপ্রান্তবর্ত্তী আমি সেই কামনা করি। জনসাধারণ সম্মানের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তি-বাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয় একথা নিশ্চিত মনে রেখো।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে "কালের যাত্রা" নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই—রথযাত্রার উৎসবে নর নারী সবাই হঠাৎ দেখ্‌তে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের

চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চল্‌ছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চল্‌বে।

কালের রথযাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক, এই আশীর্ব্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিনন্দন-প্রদান শেষ হইলে সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হইলেন। প্রথমেই সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ হইতে সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব 'শরৎ-বন্দনা' উপহার দিলেন। তাহার পর প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ আরম্ভ হইল। সর্ব্বশুদ্ধ ১৯টী কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিবার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই। সাতটার সময় অনুন্নত সম্প্রদায়ের একটা সভা টাউন-হলে হইবার কথা; সুতরাং অনেকগুলি কবিতা ও প্রবন্ধ অপঠিতই রহিয়া গেল।

এইদিনে কলিকাতার রঙ্গালয় সমূহের প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় বলিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে দেশের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে রঙ্গালয় সমূহের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন দিবার কথা ছিল, নিতান্ত দুঃখের সহিত তাহা বন্ধ রাখিতে হইল; তবে তিনি রঙ্গালয় সমূহের পক্ষ হইতে এই সভাতেই শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতেছেন।

ছাত্র-ছাত্রী সমাজের অভিনন্দন

১লা আশ্বিন শনিবার সেনেট হলে ছাত্র-ছাত্রী উৎসব-পরিষদ শরৎ-বন্দনার যে আয়োজন করিয়াছিলেন তাহার কোন দিক দিয়াই কোন ত্রুটি ছিল না। সেনেট হলটি চমৎকারভাবে সাজান হইয়াছিল। ছাত্র-ছাত্রী ও নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে সভাস্থল পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সুকণ্ঠ শ্রীহরিপদ রায়ের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের সঙ্গে সভার উদ্বোধন হয়। তাহার পর ছাত্রছাত্রীগণের পক্ষ হইতে শরৎচন্দ্রকে নিম্নলিখিত অভিনন্দন দান করা হয়।

পরম শ্রদ্ধাভাজন

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

হে বন্ধু,

তোমার সপ্ত-পঞ্চাশৎ জন্মদিনে, বাঙলার ছাত্র ছাত্রীর প্রণাম গ্রহণ কর।

যখন বয়স অল্প ছিল, তখনই বীণাপাণি তোমাকে আপনার একান্তে গ্রহণ করিয়াছেন। যে মহাকাল, বর্ত্তমানকে গোপনে ভাবীকালের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেছেন, তাঁহার বিচারে তোমার কিরণ-লেখা ভবিষ্যতের প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। পঞ্চাশৎ বৎসরেরও পূর্ব্বে তোমার জন্ম, তোমার আয়ুষ্কাল সমগ্র কালকে বেষ্টন করিয়া আছে। হে শরৎচন্দ্র, আমরা তোমাকে প্রণাম করি।

তুমি কীর্ত্তিমান হইয়াও খ্যাতিতে আসক্ত নও, তেজস্বী হইয়াও নিরভিমানী, শ্রদ্ধার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও নিরহঙ্কারী! সত্যভাষণে তোমার কুণ্ঠা নাই, দৃষ্টিতে আবিলতা নাই, দেশবাসীর প্রিয় হইবার গ্লানিকর চেষ্টা হইতে তুমি আপনাকে মুক্ত করিয়াছ। হে দেশবাসীর বরপুত্র আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

যে বিচিত্র জীবনের সন্ধান তোমার লেখনীতে বাঙ্গলার তরুণ পাইয়াছে, তাহারই আহ্বানে সে আজ দুঃখের অভিসার-যাত্রায় জগৎ সমাজে তাহার পথের দাবী লইয়া দাঁড়াইবে। বাঙ্গালীর জাতীয় প্রগতির সঙ্গে তোমার এই নাড়ীর যোগ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাই প্রার্থনা করি।

হে নবজীবনের হোতা! তোমার আশীর্ব্বাদ আমাদের নবদীক্ষায় দীক্ষিত করুক। তোমার সত্য দৃষ্টি, সত্যভাষণ ও সত্য চিন্তা, আমাদের দৃষ্টি, কথা ও চিন্তাকে সমস্ত রকম অসত্যের মায়া থেকে মুক্ত করুক।

হে ঋষি! আজ বাঙ্গালীর সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, সমাজে, কৃষ্টিতে নূতনের ভাববিপ্লব উপস্থিত। তোমার লেখনী এই জাতার ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে আবার কোন নূতন পথের সন্ধান দিবে তাহার আশায় সমগ্র ছাত্রসমাজ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

অভিনন্দন দানের পর শ্রীহরিপদ রায় ও শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ আর একটি গান করেন। তাহার পর শরৎচন্দ্রকে ছাত্রসমাজের পক্ষ হইতে উপহার দেওয়া হয়।

শরৎচন্দ্রের প্রতিভাষণ

আমার তরুণ বন্ধুগণ,

আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রসাদ আমি আজ লাভ ক'রলাম—আমি তোমাদের চিত্তলোকে স্থান পেয়েছি, তোমরা আমাকে ভালবেসেচ। আমার সাহিত্য-সেবার এর চেয়ে বড় পুরস্কারের কথা কল্পনা ক'রতে পারিনে। যে তরুণশক্তি যুগে যুগে, কালে কালে পৃথিবীকে নূতন ক'রে গঠন করে, দৃষ্টি যাদের প্রসারিত, অন্যায় বন্ধন যারা মানে না, বড় মন নিয়ে সর্ব্বত্যাগের বাণীকে অবলম্বন করে' যারা যে কোনও মুহূর্ত্তে হাসিমুখে পৃথিবীর বন্ধুরতম পথে যাত্রা করতে পারে, তারা আজ আমাকে তাদের আপনার জন বলে' স্বীকার করেচে, এ আনন্দের স্মৃতি আমার চির-জীবনের সঞ্চয় হ'য়ে রইল। আমার সাহিত্য-সাধনার মূল্য নির্দ্ধারণ করবার ভার আমি তোমাদের উপর দিয়েচি; ভরসা আছে, আর যে যাই বলুক, তোমরা কোনদিন আমাকে ভুল বুঝ্‌বে না। দেশের জন্যে, অবহেলিত মানব-সমাজের জন্যে আমি কতটুকু করেছি, তা স্থির করবার ভার রইল ভাবীকালের সমাজের উপর। বহুবার বহুস্থানে যে কথাটি আমি বলেচি, তোমাদের কাছে আজ সেই কথারই পুনরুল্লেখ করতে চাই। মিথ্যাকে তোমরা কোনদিন কোন ছলেই স্বীকার কো'রো না;—সত্যের পথ, অপ্রিয় সত্যের পথ—যদি পরম দুঃখের পথও হয়, তা'হলেও সে দুঃখ-বরণের শক্তি নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ কোরো। দেশের এবং দশের যে ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে নির্ভর করচে, সে ভবিষ্যৎ যে কখনও দুর্ব্বলতার দ্বারা, ভীরুতার দ্বারা এবং অসত্যের দ্বারা গঠিত হয় না, তোমাদের পানে তাকিয়ে দেশের লোকে যেন এই কথাটা নিরন্তর মনে রাখতে পারে। তোমাদের আমি আশীর্ব্বাদ করি, জীবন তোমাদের সার্থক হ'ক, সাধনা তোমাদের সফল হ'ক এবং আরও যে কটাদিন বাঁচি তোমাদের দিকে চেয়ে আমিও যেন বল লাভ ক'রতে পারি।

অমৃতের স্বপ্ন

শ্রীঅনিলবরণ রায়

মর্ত্ত্যের মানব! চাহ অমরত্ব বর?
কিছুতেই তৃপ্তি নাহি লভে তব মন,
মৃৎপাত্রে অমৃতের লবে আস্বাদন,
বিষবৃক্ষে পারিজাত ফুটাতে তৎপর!

কে জাগালো এ দুরাশা হৃদয়ে তোমার?
ভাঙিয়া সুখের নীড় এলে অভিসারে
দুর্গম অরণ্যপথে গাঢ় অন্ধকারে
সর্ব্বনাশা বংশীধ্বনি শুনিয়া কাহার?

বৃথা আর ফিরে চাওয়া সতৃষ্ণ নয়নে,
হারাইবে দুইকূল; নিম্নে রসাতল—
দেখ শুধু ঊর্দ্ধে চাহি কোন্ দীপ্তানল
দিশারী হইয়া জ্বলে আঁধার গগনে।

মৃত্যুরে যে তিলে তিলে করিবে বরণ,
তারই সাজে অমৃতের স্বপ্ন-দরশন।



সাময়িকী

৪ঠা আশ্বিন—

সূর্য্যের পূর্ণগ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করচে। এমন সর্ব্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটেনি, পরমশোকে এই আমাদের মহৎ সান্ত্বনা। দেশের আপামর সাধারণকে আজকের দিনের বেদনা স্পর্শ করেচে। যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থভাবে গভীরভাবে আপন করে নিয়েচেন সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন।

দেশকে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে যারা বাহুবলে অধিকার করে, যত বড়ো হোক্ না তাদের প্রতাপ, যেখানে দেশের প্রাণবান সত্তা সেখানে তাদের প্রবেশ অবরুদ্ধ। দেশের অন্তরে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি জয় করবে এমন শক্তি নেই তাদের। অস্ত্রের জোরে ভারতবর্ষকে অধিকার করেচে কত বিদেশী কত বার। মাটিতে রোপন করেচে তাদের পতাকা, আবার সে পতাকা মাটিতে পড়ে ধুলো হয়ে গেছে।

অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটা-বেড়া দিয়ে যারা বিদেশে আপন স্বত্বকে স্থায়ী করবার দুরাশা মনে লালন করে একদিন কালের আহ্বানে যে মুহূর্ত্তে তারা নেপথ্যে সরে দাঁড়ায় তখনই ইঁট কাঠের ভগ্নস্তূপে পুঞ্জীভূত হয় তাদের কীর্ত্তির আবর্জ্জনা। আর যাঁরা সত্যের বলে বিজয়ী তাঁদের আধিপত্য তাঁদের আয়ুকে অতিক্রম করে' দেশের মর্ম্মস্থানে বিরাজ করে।

দেশের সমগ্র 'চিত্তে যাঁর এই অধিকার তিনি সমস্ত দেশের হয়ে আজ আরো একটি জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েচেন চরম আত্মোৎসর্গের পথে। কোন্ দুরূহ বাধা তিনি দূর করতে চান, যার জন্যে তিনি এত বড়ো মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হলেন না সেই কথাটি আজ আমাদের স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করবার দিন।

আমাদের দেশে একটি ভয়ের কারণ আছে। যে পদার্থ মানসিক তাকে আমরা বাহ্যিক দক্ষিণা দিয়ে স্থূলত সম্মানে বিদায় করি। চিহ্নকে বড়ো করে তুলে সত্যকে খর্ব্ব করে থাকি। আজ দেশনেতারা স্থির করেচেন যে, দেশের লোকেরা উপবাস করবে। আমি বলি এতে দোষ নেই, কিন্তু ভয় হয় মহাত্মাজী যে প্রাণপণ মূল্যের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করবার চেষ্টা করচেন তার তুলনায় আমাদের কৃত্য নিতান্ত লঘু এবং বাহ্যিক হয়ে পাছে লজ্জা বাড়িয়ে তোলে। হৃদয়ের আবেগকে কোনো একটা অস্থায়ী দিনের সামান্য দুঃখের লক্ষণে ক্ষীণ রেখায় চিহ্নিত করে কর্ত্তব্য মিটিয়ে দেবার মতো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে।

আমরা উপবাসের অনুষ্ঠান করব কেননা মহাত্মাজি উপবাস করতে বসেচেন, এই দুটোকে কোনো অংশেই যেন একত্রে তুলনা করবার মূঢ়তা কারো মনে না আসে। এ দুটো একেবারেই এক জিনিষ নয়। তাঁর উপবাস, সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে একটি বাণী, চরম ভাষার বাণী। মৃত্যু তাঁর সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্বের কাছে ঘোষণা করবে, চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই যদি গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয় তবে তা যথোচিতভাবে করতে হবে। তপস্যার সত্যকে তপস্যার দ্বারাই অন্তরে গ্রহণ করা চাই।

আজ তিনি কী বলচেন সেটা চিন্তা করে দেখো। পৃথিবীময় মানব ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি একদল মানুষ আরেক দলকে নীচে ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতি প্রচার করে। আপন দলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্য দলের দাসত্বের উপরে। মানুষ দীর্ঘকাল ধরে এই কাজ করে এসেচে কিন্তু তবু বলব এটা অমানুষিক। তাই দাসনির্ভরতার ভিত্তির উপরে মানুষের ঐশ্বর্য্য স্থায়ী হতে পারে না। এতে কেবল যে দাসেদের দুর্গতি হয় তা নয় প্রভুদেরও এতে বিনাশ ঘনায়। যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি তারাই আমাদের সম্মুখ পথে পদক্ষেপের বাধা। তারা গুরুভারে আমাদের নীচের দিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীন করি তারা ক্রমশই আমাদের হেয় করে। মানুষখেগো

সভ্যতা রোগে জীর্ণ হবে, মরবে। মানুষের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ষে মানুষোচিত সম্মান থেকে যাদের আমরা বঞ্চিত করেচি তাদের অগৌরবে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েচি।

আজ ভারতে কত সহস্র লোক কারাগারে রুদ্ধ বন্দী। মানুষ হয়ে পশুর মতো তারা পীড়িত অবমানিত। মানুষের এই পুঞ্জীভূত অবমাননা সমস্ত রাজ্যশাসনতন্ত্রকে অপমানিত করচে, তাকে গুরুভারে দুরূহ করচে। তেমনি আমরাও অসম্মানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেচি সমাজের বৃহৎ একদলকে। তাদের হীনতার ভার বহন করে আমরা এগোতে পারচিনে। বন্দীদশা শুধু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মানুষের অধিকার সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন। [সম্মানের খর্ব্বতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষে সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেচি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি পাব কী করে? যারা মুক্তি দেয় তারাই তো মুক্ত হয়।

এতদিন এইভাবে চলছিল—ভালো করে বুঝিনি আমরা কোথায় তলিয়ে ছিলাম। সহসা ভারতবর্ষ আজ মুক্তির সাধনায় জেগে উঠল। পণ করলাম চিরদিন বিদেশী শাসনে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময়ে দেখিয়ে দিলেন কোথায় আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহ্বরগুলো। আজ ভারতে যাঁরা মুক্তি-সাধনার তাপস তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেচি। যারা ছোট হয়ে ছিল তারাই আজ বড়োকে করেচে অকৃতার্থ। তুচ্ছ বলে যাদের আমরা মেরেচি তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারচে।

এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির শক্তির স্বাভাবিক উচ্চনীচতা আছে। জাতিবিশেষের মধ্যেও তেমন দেখা যায়। উন্নতির পথে সকলে সমান দূর এগোতে পারেনি। সেইটেকে উপলক্ষ্য করে সেই পশ্চাদ্বর্ত্তীদেরকে অপমানের দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া তুলে দিয়ে স্থায়ীভাবে যখনি পিছিয়ে রাখা যায় তখনি পাপ জমা হয়ে ওঠে। তখনি অপমান বিষ দেশের এক অঙ্গ থেকে সর্ব্ব অঙ্গে সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনি করে মানুষের সম্মান থেকে যাদের নির্ব্বাসিত করে দিলুম তাদের আমরা হারালুম। আমাদের দুর্ব্বলতা ঘটল সেইখানেই, সেইখানেই শনির রন্ধ্র। এই রন্ধ্র দিয়েই ভারতবর্ষের পরাভব তাকে বারে বারে নত করে দিয়েচে। তার ভিতের গাঁথুনি আল্‌গা, আঘাত পাবামাত্র ভেঙে ভেঙে পড়েচে। কালক্রমে যে ভেদ দূর হতে পারত তাকে আমরা চেষ্টা করে সমাজরীতির দোহাই দিয়ে স্থায়ী করে তুলেচি। আমাদের রাষ্ট্রিক মুক্তি সাধনা কেবলি ব্যর্থ হচ্চে এই ভেদবুদ্ধির অভিশাপে।

যেখানেই একদলের অসম্মানের উপর আর-এক দলের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই ভারসামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে বিপদ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যায় সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম্ম। য়ুরোপে এক রাষ্ট্রজাতির মধ্যে অন্য ভেদ যদি বা না থাকে শ্রেণীভেদ আছে। শ্রেণীভেদে সম্মান ও সম্পদের পরিবেষণ সমান হয় না। সেখানে তাই ধনিকের সঙ্গে কর্ম্মিকের অবস্থা যতই অসমান হয়ে উঠ্‌চে ততই সমাজ টলমল করচে। এই অসাম্যের ভারে সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যহই পীড়িত হচ্চে। যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই। মানুষ যেখানেই মানুষকে পীড়িত করবে সেখানেই তার সমগ্র মনুষ্যত্ব আহত হবেই, সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়।

সমাজের মধ্যেকার এই অসাম্য এই অসম্মানের দিকে মহাত্মাজি অনেক দিন থেকে আমাদের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করেচেন। তবুও তেমন একান্ত চেষ্টায় এই দিকে আমাদের সংস্কার কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয়নি। চরখা ও খদ্দরের দিকে আমরা মন দিয়েচি, আর্থিক দুর্গতির দিকে দৃষ্টি পড়েচে কিন্তু সামাজিক পাপের দিকে নয়। সেই জন্যেই আজ এই দুঃখের দিন এল। আর্থিক দুঃখ অনেকটা এসেচে বাইরে থেকে, তাকে ঠেকানো একান্ত কঠিন না হতে পারে। কিন্তু যে সামাজিক পাপের উপর আমাদের সকল শত্রুর আশ্রয়, তাকে উৎপাটন করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপরে আমাদের মমত্ব। সেই প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণক্ষেত্রে তাঁর দেহের অবসান ঘটতেও পারে কিন্তু সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে যাবেন। যদি তাঁর হাত থেকে আজ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে]

সেই দান গ্রহণ করতে পারি তবেই আজকের দিন সার্থক হবে। এত বড়ো আহ্বানের পরেও যারা একদিন উপবাস ক'রে তার পরদিন হতে উদাসীন থাকবে, তারা দুঃখ থেকে যাবে দুঃখে, দুর্ভিক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষে। সামান্য কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সত্য সাধনার অবমানা যেন না করি।

মহাত্মাজির এই ব্রত আমাদের শাসনকর্তাদের সংকল্পকে কী পরিমাণে ও কী ভাবে আঘাত করবে জানিনে, আজ সেই পোলিটিকাল তর্ক অবতারণার দিন নয়। কেবল একটা কথা বলা উচিত বলে বল্‌ব। দেখতে পাচ্ছি মহাত্মাজির এই চরম উপায় অবলম্বনের অর্থ অধিকাংশ ইংরাজ বুঝতে পারচেন না। না পারবার একটা কারণ এই যে মহাত্মাজির ভাষা তাঁদের ভাষা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ ঘটাবার বিরুদ্ধে মহাত্মাজির এই প্রাণপণ প্রয়াস তাঁদের প্রয়াসের প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না বলেই এটাকে এত অদ্ভুত বলে মনে হচ্চে। একটা কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি—আয়র্লাণ্ড যখন ব্রিটিশ ঐক্যবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করেছিল তখন কী বীভৎস ব্যাপার ঘটেছিল। কত রক্তপাত, কত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। পলিটিক্‌সে এই হিংস্র পদ্ধতিই পশ্চিম মহাদেশে অভ্যস্ত। সেই কারণে আয়র্লাণ্ডে রাষ্ট্রিক প্রয়াসের এই রক্তাক্ত মূর্ত্তি তো কারো কাছে, অন্তত অধিকাংশ লোকের কাছে, আর যাই হোক্‌, অদ্ভুত বলে মনে হয় নি। কিন্তু অদ্ভুত মনে হচ্চে মহাত্মাজির অহিংস্র আত্মত্যাগী প্রয়াসের শান্তমূর্ত্তি। ভারতবর্ষের অবমানিত জাতির প্রতি মহাত্মাজির মমতা নেই এত বড়ো অমূলক কথা মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েচে তার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের রাজসিংহাসনের উপর সঙ্কটের ঝড় বইয়ে দিয়েচেন। রাজপুরুষদের মন বিকল হয়েচে বলেই এমন কথা তাঁরা কল্পনা করতে পেরেচেন। এ-কথা বুঝতে পারেন নি রাষ্ট্রিক অস্ত্রাঘাতে হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম বিপদের নয়। একদা বাহির থেকে কোনো তৃতীয়পক্ষ এসে যদি ইংলণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান্‌ক্যাথলিকদের এইভাবে সম্পূর্ণ বিভক্ত করে দিত তা হলে সেখানে একটা নরহত্যার ব্যাপার ঘটা অসম্ভব ছিল না। এখানে হিন্দু-সমাজের পরম সঙ্কটের সময় সেই বহুপ্রাণঘাতক যুদ্ধের ভাষান্তর ঘটেচে মাত্র। প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান্‌ক্যাথলিকদের মধ্যে বহুদীর্ঘকাল যে অধিকারভেদ চলে এসেছিল সমাজই আজ স্বয়ং তার সমাধান করেচে, সে জন্যে তুর্কির বাদশাকে ডাকে নি। আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের ভার আমাদের পরেই থাকার প্রয়োজন ছিল।

রাষ্ট্রব্যাপারে মহাত্মাজি যে অহিংস্রনীতি এতকাল প্রচার করেচেন, আজ তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত এ কথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করিনে।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩৯।

স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ হেগের বিবৃতি—

২০শে সেপ্টেম্বর ব্যবস্থাপরিষদে স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ হেগ নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন :—

মিঃ গান্ধীকে স্থানান্তর করা বিষয়ে গবর্ম্মেণ্টের অভিপ্রায় সম্পর্কে কতকগুলি ঘটনার উদ্ভব হইয়াছে। আমি পরিষদকে তাহা জানাইতে চাহি। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর পরিষদে আমি যে বিবৃতি দিয়াছিলাম, তাহাতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, মিঃ গান্ধী যেই অনশন আরম্ভ করিবেন অমনি তাঁহাকে কোন ব্যক্তি বিশেষের গৃহে স্থানান্তর করা হইবে এবং তাঁহার উপর একমাত্র বাধা-নিষেধ এই থাকিবে যে, তাঁহাকে সেখানেই থাকিতে হইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত করার মধ্যে অভিপ্রায় ছিল এই যে, তিনি এই ভাবে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা পরামর্শের পূর্ণ সুবিধা পাইবেন এবং তাহাদের সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসা করিবার প্রচেষ্টা করিতে পারিবেন।

মিঃ গান্ধী বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছেন :—

মহাত্মা গান্ধীর তার—"আমাকে বিরক্ত করিবেন না"—

"আমার সঙ্কল্পিত অনশন আরম্ভ হইলে গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি বাধা-নিষেধ সহ আমাকে কোন অজ্ঞাত

প্রাইভেট গৃহে স্থানান্তর করিবেন—গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্ত এই মাত্র পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। এই অনাবশ্যক হাঙ্গামা, অনাবশ্যক সরকারী অর্থব্যয় এবং আমার অনাবশ্যক কষ্টভোগ হইতে অব্যাহতির জন্য আমি গবর্ণমেণ্টকে বলিতেছি—আমাকে বিরক্ত করিবেন না। কেননা আমাকে মুক্তি দিয়া যদি আমার স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন সম্পর্কে কিম্বা অন্য প্রকারে কোন প্রকার সর্ত্ত জুড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহা আমি পালন করিতে সক্ষম হইব না।"

স্বরাষ্ট্র-সচিবের উক্তি—

গবর্ণমেণ্ট মিঃ গান্ধীর এই সিদ্ধান্তে দুঃখিত। যে বন্দোবস্ত তাঁহার পক্ষে প্রীতিকর নহে, তাহা তাঁহার উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার কোন ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের নাই। অতএব তাঁহার অনুরোধ অনুসারে তাঁহাকে যারবেদা জেলেই শান্তিতে থাকিতে দেওয়া হইবে। তবে পূর্ব্ব প্রস্তাবের এই পরিবর্ত্তনে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমস্যার আলোচনার সুযোগ সুবিধা যাহাতে ব্যাহত না হয়—তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত ব্যস্ত। এই সব সুযোগ সুবিধা তিনি তথায় পাইবেন—গবর্ণমেণ্টের ইহাই কল্পনা। অতএব গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর দরুণ আর কোন পরিবর্ত্তন আবশ্যক না হইলে তিনি যে সব ব্যক্তি বা প্রতিনিধিমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সহিত জেলে ঘরোয়াভাবে সাক্ষাৎকারের সকল প্রকার যুক্তিসম্মত সুযোগ সুবিধাই তিনি পাইবেন। তাঁহার আলাপ-আলোচনার উপর কোন প্রকার বাধা-নিষেধ থাকিবে না।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস 'প্রাচীর ও প্রান্তর"—মূল্য ২৲

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "জীবন সঙ্গিনী"—মূল্য ১॥০
ও "অপরাধের জের"—মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ প্রণীত ইতিহাস "কামাল পাশা"—মূল্য ৸০

শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ শর্ম্মা চৌধুরী প্রণীত "ভারতের ধর্ম্ম-বিবর্ত্তন"—মূল্য ।০

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রণীত "জ্ঞানাঙ্কুর"—মূল্য ।৵০

শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী প্রণীত জাতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের অন্বেষণ গ্রন্থ "আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি"—মূল্য ২॥০

শ্রীযুক্ত মৃণাল সর্ব্বাধিকারী প্রণীত উপন্যাস "মনের খেলা"—মূল্য ১॥০

শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর বসু সর্ব্বাধিকারী প্রণীত ছাত্র ও ছাত্রীদের নাটক "মহামিলন"—মূল্য ৸০

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গানের বই "গীতি-কদম্ব"—মূল্য ১।০

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মণ্ডল প্রণীত উপন্যাস "ঋণী"—মূল্য ২৲

জনৈক অভিজ্ঞ কম্পোজিটর প্রণীত "মাষ্টার অফ্ প্রিণ্টিং বা কম্পোজিটারি শিক্ষা"—মূল্য ।৵০

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত উপন্যাস "মাটির মেয়ে"—মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত জগৎ মিত্র প্রণীত গল্পের বই "আঠারো বছর"—মূল্য ১।০

শ্রীযুক্ত প্রভাংশু গুপ্ত বি-এ প্রণীত ভূতের গল্প "ভুতুড়ে বন"—মূল্য ।০

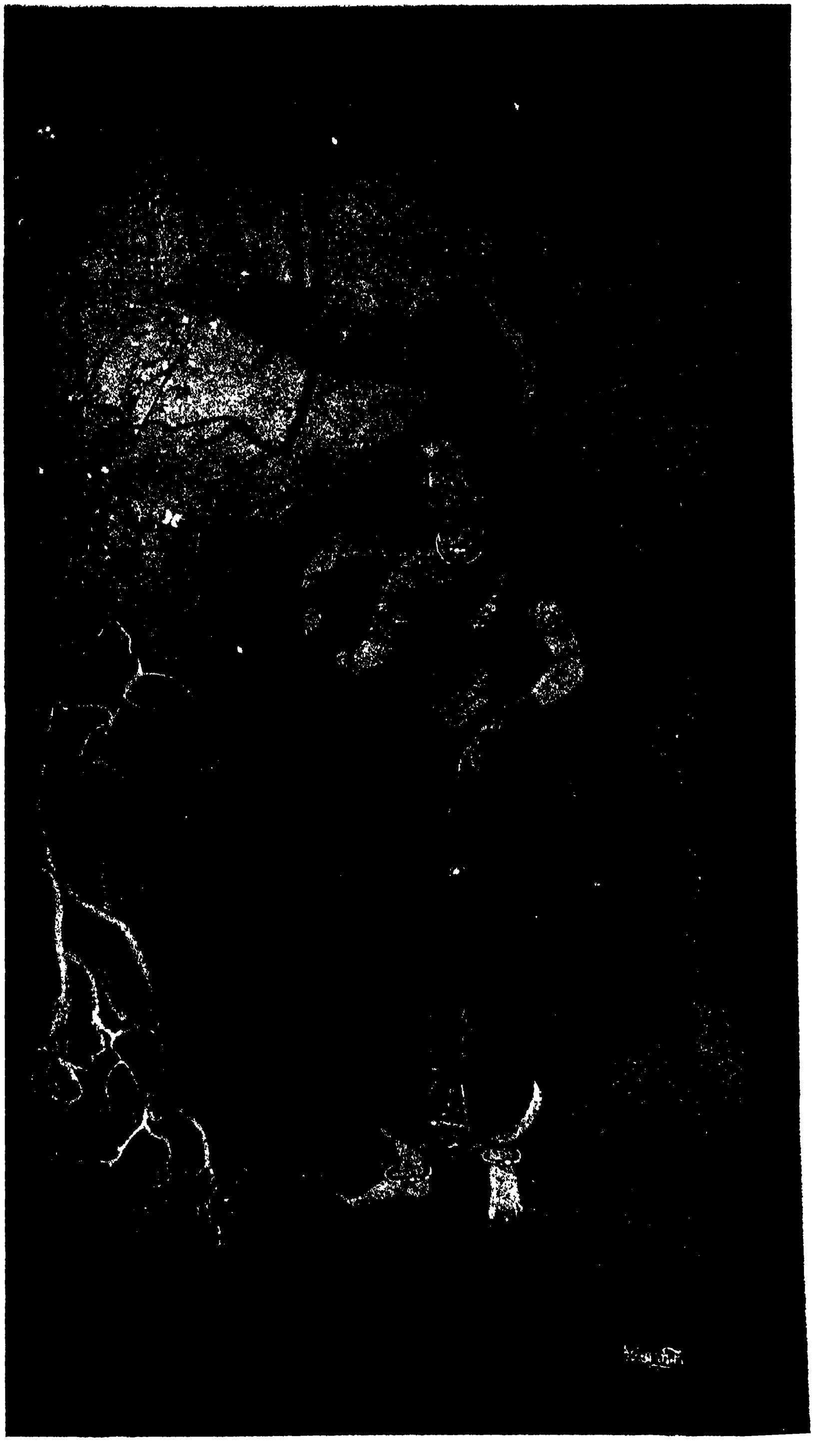
সঙ্গীত নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত স্বরলিপি পুস্তক "গীত-দর্পণ"—মূল্য ২॥০

শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই 'চীনের পাখী"—মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত কমলকুমার বসু বি-এ সঙ্কলিত "গল্প-দাদার কথা"—মূল্য ১৷০

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRA NATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA



ভারতবর্ষ

অগ্রহায়ণ—১৩৩৯

প্রথম খণ্ড	বিংশ বর্ষ	ষষ্ঠ সংখ্যা

গোড়ার ছবি—নূতন ও পুরাতন

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

তলাইয়া দেখিতে গেলে, গোড়ার কথা বা স্বষ্টিতত্ত্বের ভিতরেই ইতিহাসের বীজ রহিয়াছে। কেমন করিয়া, কি লইয়া, গোড়া-পত্তন হইয়াছে, তাহা না জানিলে ও বুঝিলে ইতিহাসের আসল প্রকৃতি ও আকৃতি, গতি ও ভঙ্গী—এ দুয়ের কোনটাই, ভালমতে জানিতে ও তলাইয়া বুঝিতে পারা যাইবে না। ভারতবর্ষের পুরাণকার এই জন্ম স্বষ্টিতত্ত্ব হইতেই পুরাণ-কথা স্বরু করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬ অধ্যায়ে পরাশর-মুখে পুরাণ-লক্ষণ এবং পুরাণগুলির নাম কথিত হইয়াছে। "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ। সর্ব্বেষ্বেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ ॥ ২৫ ॥" ইত্যাদি। এইটাই হইল স্বাভাবিক ব্যবস্থা—বীজ হইতে গাছের আরম্ভ ও বিকাশ যেরূপ। বীজ এক রকমের না হইয়া যদি অন্য রকমের হয়, তাহা হইলে গাছেরও সে রকমের না হইয়া অন্য রকমের হওয়াই স্বাভাবিক। নিছক জড়বাদীদের মতো যদি আমরা ভাবি যে কতকগুলি জড় অণুপরমাণুর সংঘাতে এই জগতের গড়ন ও ভাঙ্গন চলিতেছে, এ ব্যাপারের মূলে চিৎ-শক্তির কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব বা প্রভাব নাই, তাহা হইলে জগতের ইতিহাসের বীজ-তত্ত্বটি এক রকমের হইল; এবং সে বীজ হইতে ইতিহাসরূপ পাদপটির বিকাশও এক রকমের হইবে। বহু দিন পূর্ব্বে W. K. Clifford যেমন-ধারা বলিয়াছিলেন—"On the whole, therefore, we seem entitled to conclude that during such time as we have evidence of, no intelligence or volition has been concerned in the events happening within the range of the Solar system, except that of animals living on the planets." কথা কটা সতর্কভাবে বলা হইলেও, স্পষ্ট। সবই অণুপরমাণুর নিজেদেরই খেলা হইলে, গোড়াতে ভগবান্, দেবযোনি, সপ্তর্ষি, মন্বাদি—এই সকল উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক-বিভূতি-সম্পন্ন সত্তার কল্পনা করা চলে না। এ কথা বলা চলে না যে, প্রজাপতি ও মনু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অলৌকিক পুরুষেরা এই জগতের ধারাটিকে চালাইয়া দিয়াছেন, এবং এই ধারা কোন্ কোন্ প্রণালীতে কোন্ কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হইবে, তাহা ধার্য্য করিয়া দিতেছেন। সর্গ, প্রতিসর্গ, মন্বন্তর ও যুগান্তর—এ সকল

পুরাণকার যে ভাবে আমাদের শুনাইয়াছেন, সে ভাবে আদৌ ঘটিতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল—ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শন স্বতন্ত্র পদার্থ ও সমবায়ি কারণ রূপে পরমাণু প্রভৃতি মানিয়াছেন বটে, কিন্তু আত্মা, পরমেশ্বর, দিক্, কাল, আকাশ—এ সকল তত্ত্বের স্বীকারের ফলে সিদ্ধান্ত মোটেই জড়বাদ হয় নাই। দেহাতিরিক্ত আত্মা ও জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত করিতে আচার্য্যেরা প্রচুর যত্ন করিয়াছেন। ম্যাক্‌ডোনেল প্রমুখ পণ্ডিতেরা (History of Sanskrit Literature, pp. 385 ff) ষড়্দর্শনের মধ্যে অন্ততঃ চারিটিকে গোড়ায় নিরীশ্বর ছিল বলিয়া অনুমান করেন। যথা—P. 405—"Neither the *Vaisheshika* nor the Nyaya-Sutras originally accepted the existence of God ; and though both school later became theistic, they never went so far as to assume a creator of matter. Their theology is first found developed in Udayanacharyya's *Kasmanjali* which was written about 1200 A. D etc." ষড়্দর্শনগুলির কোন কোনটির মূল খৃঃ পূঃ অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইঁহারা বলেন। এ ক্ষেত্রে এ কথার আলোচনা অনাবশ্যক।

যাহা হউক, পাশ্চাত্য জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের সুরে সুর দিয়া আমরা বলিতেছিলাম যে, অণুপরমাণুগুলি নৈসর্গিক নিয়মে নানা রকম জোট্ বাঁধিয়া প্রথমতঃ জড় জগতেরই একটা কাঠামো তৈয়ারি করে; সে কাঠামো প্রাণহীন, সংজ্ঞাহীন, বুদ্ধিবিবেকহীন। সেই কাণ্ট, লাপ্লাস্ প্রভৃতি যে আকারে নেবুলা হইতে সৌরজগতাদির নক্সা ছকিয়াছিলেন; অথবা পরবর্ত্তী কালে অপরে যে আকারে ছকিয়াছেন বা ছকিতেছেন। অবশ্য, যে কেহ এ কাজে হাত দিয়াছেন, তিনিই যে নাস্তিক, এমন কোন নিয়ম হইয়া নাই। তার পরে, সেই বিশ্বকারখানায় অণুপরমাণুদের নানারূপ গড়ন-পেটন ও জোড়াতালির ফলে ক্রমশঃ প্রাণ ও সংজ্ঞা অভিব্যক্ত হয়। সেই চার্ব্বাকগণ যেরূপ বলিতেন —চূর্ণ ও হরিদ্রা এ দুয়ের কোনটাতেই লৌহিত্য নাই; দুয়ের সংমিশ্রণে লৌহিত্য আগন্তুকরূপে আসিয়া হাজির হয়। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকও সেইরূপ বলিবেন—কার্ব্বণ পরমাণু ও হাইড্রোজেন্ পরমাণু, এ দুয়ের কোনটাতেই প্রাণ নাই; প্রধান ভাবে এ দুই পদার্থের একটা বিশিষ্ট রাসায়নিক সংযোগ হইলে প্রাণ আসিয়া দেখা দেয়, তখন সেই যৌগিক পদার্থে আমরা প্রাণের লক্ষণগুলি পরিচয় পাই; যতক্ষণ সেই সংযোগবিশেষটি বাহাল থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্তই সে পদার্থটি প্রাণী; কোন রকমে সে সংযোগটি ভাঙ্গিয়া গেলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেরও শেষ হইয়া যায়। এ প্রসঙ্গে "Colloidal Theory" ইত্যাদি চিন্তনীয়। এই ভাবে দেখিতে গেলে জগতের গোড়ায় প্রাণ বলিয়া কিছু ছিল না, প্রাণের প্রাণহীন মসলাগুলিই বিদ্যমান ছিল; ভাবী কালে, কোন রূপ নৈসর্গিক ও আকস্মিক কারণে, সেই মসলাগুলি মিলিয়া মিশিয়া প্রাণ নামক বস্তুটি পায়দা করিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অনেকে (সকলে নহেন) প্রাণের নৈসর্গিক উৎপত্তিবাদ (Spontaneous Generation) অথবা প্রাণহীন হইতে প্রাণের উৎপত্তি (Abisgensis) মানিয়াছেন। অবশ্য বিশ্বব্যাপী প্রাণসত্তা (Cosmozoic Theory) ইত্যাদিও ও-দেশে বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা কখন কখন স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে প্রাণ সম্বন্ধে ধারণার কতকগুলি স্তর আমরা দেখিতে পাই। (১) প্রাণ = ব্রহ্ম; (২) প্রাণ = হংস = বৈশ্বানর = আদিত্য = হিরণ্যগর্ভ; (৩) প্রাণ = অণু (৪) প্রাণ = প্রাণাপানাদি কতিপয় "বায়ু"। মোটামুটি এই কয়েকটা স্তর। এ সকলের সম্যক্ বিচার এ দেশের দার্শনিকেরা করিয়াছেন। তবে কোন আস্তিক সম্প্রদায়েই প্রাণকে একেবারে জড় পরমাণুর সমষ্টির বৃত্তি বা বিকার মনে করা হয় নাই। "জড়" কথাটা আমাদের সাবধানে ব্যবহার করিতে হইবে। এটি পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের জড় বা "ম্যাটার" নয়। সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি = জড়, কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃতি = "ম্যাটার" নয়। সাংখ্য-কারিকায় দেখিতে পাই—"স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্যসৈষা ভবত্যসামান্যা। সামান্য-করণ-বৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥" (২৯) অন্তঃকরণ ত্রয়ের আপন আপন লক্ষণ, অর্থাৎ বুদ্ধির অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান ও মনের সঙ্কল্প অসাধারণ বৃত্তি; উঁহাদের সাধারণ বৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু॥"

জড়বাদীর মতে, ভবিষ্যতে যদি জড়জগতের প্রকৃতি ও অবস্থা বদলাইয়া যায়, তবে হয় ত আবার সেই মিশ্রিত মসলাগুলি (কার্ব্বণ্, হাইড্রোজেন্ ইত্যাদি) আলাদা আলাদা হইয়া যাইবে, সুতরাং তাদের সৃষ্টি, প্রাণও

অন্তর্হিত হইয়া যাইবে; তখন আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রাণ ও প্রাণী বলিয়া কিছু থাকিবে না। প্রাণের "বস্তু" প্রোটো-প্ল্যাজমের দানা বা মলিকিউল ত' জটিল যৌগিক বস্তু; সে ত' হামেশা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, যাইতেছেও; কেমিকাল্ এটম্‌গুলোই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, এবং সম্ভবতঃ নূতন করিয়া পায়দাও হইতেছে। প্রাণিজগতে ইভোলিউ-শনের মতন, জড়জগতেও ইন্‌অরগ্যানিক্ ইভোলিউশন হইতেছে। এখনও পণ্ডিতদের অনুমানে এই বিপুল বিশ্বের মাঝে বোধ হয় মাত্র গোটা দুই রেণুর উপরে প্রাণ ও প্রাণী বাস করিতেছে; তা ছাড়া আর সকল জায়গাতেই প্রাণের কোন সাড়া আমরা পাইব না। সেই রেণু দুইটি হইতেছে আমাদের এই ধরিত্রী, আর হয় ত' ধরণীগর্ভ-সম্ভূত, লোহিতাঙ্গ, "কুমার" মঙ্গলগ্রহ। ওই যে সাক্ষাৎ জ্যোতি-পিণ্ড ভাস্করদেব, উনি হালের পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে, খানিকটা বেজায় গরম ভূতের গোলা; উঁহার উত্তাপ কয়েক হাজার ডিগ্রির কম নয়; উঁহার বিশাল কুক্ষিদেশে আমাদের এই পৃথিবীর মত তের লক্ষটা গ্রহ স্বচ্ছন্দে বেমালুম ভাবে বাস করিতে পারে; কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে—ওই বিরাট্ বিপুল তৈজস বপু একেবারে প্রাণহীন, মৃত। পুরাণে আছে, দেবমাতা অদিতির গর্ভে মৃত অণ্ড হইতে জন্মিয়া-ছিলেন বলিয়া সূর্য্যদেব "মার্ত্তণ্ড" আখ্যা পাইয়াছিলেন। যথা—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১০৫ অধ্যায় ১৯ শ্লোক—"মারিতং তে যতঃ প্রোক্তমেতদণ্ডং ত্বয়া মুনে। তস্মান্মুনে সুতস্তেঽয়ং মার্ত্তণ্ডাখ্যো ভবিষ্যতি॥" হালের বৈজ্ঞানিক বলিবেন—মার্ত্তণ্ড কেবল যে মৃত অণ্ড হইতে জন্মিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি মৃত হইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন; অদিতি দেবী এ ক্ষেত্রে জীবিত "বৎস" প্রসব করেন নাই। সূর্য্যে যখন প্রাণের অভাব সাব্যস্ত হইতেছে, তখন সংজ্ঞা চৈতন্য প্রভৃতির কথা আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। সূর্য্যের ভাগ্যে যাই ঘটুক, এ বিশ্বের একজন "কবি", কল্পয়িতা ও নির্ম্মাতা অবশ্য এ-দেশে ও-দেশে অনেকে মানিয়াছেন। এ বিশ্বের রচনা-কৌশলের উপপত্তি করার জন্য অনেকে জগৎকর্ত্তা মানিয়াছেন। অবশ্য, জড়বাদীদের তাতে সম্মতি নাই। আমাদের শরীরে চোখের মতন কারিগুরি আর বোধ হয় কিছুতে নেই; কিন্তু হেল্‌ম্ হোল্‌জ বলিয়াছিলেন—কোন অপ্‌টিসিয়ান্ যদি মানুষের চোখের মতন একটা যন্ত্র বানাইয়া আমাকে পাঠাইয়া দেয়, তবে, আমি তাহাকে আনাড়ী সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইব—এত সব মারাত্মক খুঁৎ ও যন্ত্রটায়!

আমাদের ভারতবর্ষের ঋষিদের দৃষ্টিতে সূর্য্য বেজায় গরম গ্যাসের বা আর কিছুর গোলা মাত্র নহেন। যাহা হইতে এই সৌর জগতের নিখিল প্রাণ ও চৈতন্য নিঃসৃত হইতেছে, সেই মূল উৎস কখনই স্বয়ং প্রাণহীন ও চৈতন্য-হীন হইতে পারেন না। এ সম্বন্ধে প্রাচীন তত্ত্বদর্শীদের মত আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১০১ অধ্যায়ে এবং অন্যত্র শুনিতে পাই। উক্ত অধ্যায়টি পড়িয়া দেখা উচিত। আমরা আর উদ্ধৃত করিলাম না।

সেখানে আমরা সংক্ষেপে পাইতেছি যে, সূর্য্যের স্থূল সূক্ষ্মভেদে সপ্তরূপ হইয়াছে—ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি। অতএব সূর্য্যকে কোন ক্রমেই মাত্র 'Sun' করিয়া দেখিতে পারা যায় না। তার পরের অধ্যায়ে এই কথাগুলি রহিয়াছে (বঙ্গানুবাদ দিতেছি)—"হে ব্রহ্মণ! তৎপরে সেই ছান্দস (বৈদিক) উত্তম তেজোমণ্ডলীভূত হইয়া পরে শ্রেষ্ঠ তেজ ওঙ্কারের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে ঐ তেজ আদিতে (প্রথমে) উদ্ভূত হইয়াছেন বলিয়া আদিত্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। হে মহাভাগ! ইনিই এই বিশ্বের অধ্যয়াত্মক কারণ। ঋক্, যজুঃ ও সাম নাম্নী সেই ত্রয়ীই প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, ও অপরাহ্নকালে তাপ দান করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তন্মধ্যে প্রাতে ঋক্ সকল, মধ্যাহ্নে যজুঃ ও অপরাহ্নে সাম সকল তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব উল্লিখিত প্রকারে বেদাত্মা, বেদসংস্থিত ও বেদবিদ্যাময় ভগবান্ ভাস্বান্ পরম পুরুষ বলিয়া কথিত হন। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী এই শাশ্বত আদিত্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব নাম প্রাপ্ত হন। সর্ব্বদা দেবগণ কর্ত্তৃক পূজ্য সেই দেবমূর্ত্তি নিরাকার অথচ অখিল প্রাণিগণের মূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তিমান্, জ্যোতিঃস্বরূপ আদিপুরুষ সেই ভগবান্ আদিত্য বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ, অবেদ্যধর্ম্মা, বেদান্তগম্য এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর।"

যে প্রাণ বিচিত্র বিবিধরূপে পৃথিবীতে আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই প্রাণরূপী জাহ্নবীধারার গোমুখী হইতেছেন ওই জ্যোতির্ম্ময়ী বেদময়ী, ভগবতী আদিত্যতনু।

কেবল প্রাণ বলিয়া কেন, চৈতন্য সম্বন্ধেও ওই কথা। "কতম একোদেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্মত্যদিত্যা চক্ষতে" বৃ: উ:, ৩.৯।৯—শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন কে সেই একদেবতা? গুরু উত্তর করিলেন—সেই একদেবতা হইতেছেন প্রাণ, তিনিই ব্রহ্ম, তাহাকে "ত্যৎ" বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশ:—ছা, উ:, ৩।১৯।১—বিদ্বানেরা আদিত্যকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিতে আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই দুইটি মন্ত্রে আমরা পাইতেছি যে, যিনি প্রাণ, তিনি ব্রহ্ম, এবং যিনি ব্রহ্ম, তিনি আদিত্য। সুতরাং, আদিত্য ও প্রাণ—এ দুই অভিন্ন। অন্যত্র শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে "আদিত্যো বৈ প্রাণ:"—(মৈত্র্যুপনিষৎ ষষ্ঠখণ্ডে আদিত্য এবং প্রাণের সম্বন্ধ, এবং গায়ত্রী মন্ত্রের সবিতার বরণীয় ভর্গের ভাবনা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে হইবে) ইত্যাদি বলিয়া প্রাণ ও আদিত্যের তাদাত্ম্য কার্ত্তন করিয়াছেন। তার পর প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রে সূর্য্যের বরণীয় জ্যোতি:কে আমাদের ধীবৃত্তি সমূহের প্রেরক বলা হইয়াছে। ইহার শুধু এই মাত্র তাৎপর্য্য নহে যে, প্রভাতে সূর্য্যদেব উঠিলে আমাদের সুপ্ত চৈতন্য জাগিয়া উঠে, এবং নানা দিকে নানা ভাবে প্রবৃত্ত হয়, আর সূর্য্যদেব অস্তাচলের পরপারে ডুবিলে আমাদের চৈতন্যও গুড়িগুড়ি স্বপ্নপুরীর দিকে চলিতে আরম্ভ করে। ইহার তাৎপর্য্য আরও গভীর, আরও ব্যাপক। একটা মহাজ্যোতি: হইতে যেমন চারি ধারে বিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে, তেমনি প্রত্যক্ষ জ্যোতি:-স্বরূপ সূর্য্যদেব হইতে নানা বিস্ফুলিঙ্গ বিশ্বময় বিচ্ছুরিত হইয়া ঘটে ঘটে, জীবে জীবে, ব্যষ্টি প্রাণ ও ব্যষ্টি চৈতন্য রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আমার মধ্যে যে বস্তুটি প্রাণরূপে স্পন্দিত হইতেছে এবং চেতনা-রূপে সুখ দু:খাদির আস্বাদ করিতেছে, সে বস্তুটি ঐ বিরাট আদিত্যরূপী হিরণ্যগর্ভ হইতে বিক্ষিপ্ত একটা স্ফুলিঙ্গ বই আর কিছুই নহে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একটা প্রসিদ্ধ সূক্তে বিষ্ণুরূপী আদিত্যের সেই পরম পদের কথা আছে, যে পরম পদ সূরিগণ অবলোকন করিয়া থাকেন। "তদ্বিষ্ণো: পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়:" ইত্যাদি।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ যে বলিয়াছেন—অক্ষির অভ্যন্তর ভাগে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হিরণ্যবর্ণ হিরণ্যকেশ পুরুষ হইতে অভিন্ন—এ কথা আমাদের উপর উপর বুঝিলে চলিবে না—ইহার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে হইবে। অক্ষির মধ্যে যে পুরুষটি বাস করেন, তিনি অধ্যাত্ম, আর আদিত্যমণ্ডলে যে পুরুষটি রহিয়াছেন, তিনি অধিদৈবত—কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই রহস্য বুঝা গেল না। অধিদৈবত ও অধ্যাত্মের সম্পর্কটাই রহস্য। সে সম্পর্কটা সাদা কথায় এই—কোন একটা প্রাণময় চৈতন্যময় সত্তা এই বিশ্বভুবনে ওতপ্রোত রহিয়াছে; সে সত্তার কোন বিচ্ছেদ নাই, অবচ্ছেদ নাই। সে সত্তা অসীম, ভূমা। জগতে যেখানে যত গণ্ডী, যত অবচ্ছেদ রহিয়াছে, সে সকলের মধ্যে সে সত্তা বর্ত্তমান, অথচ সে সকল গণ্ডী ও অবচ্ছেদ তাহা অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে। এক একটা গণ্ডী এক একটা গুহা; এক একটা পুর। গুহাতে সেই সত্তা শয়ান রহিয়াছে বলিয়া শ্রুতি তাহাকে গুহাশয়, গুহাহিত বলিয়াছেন; প্রত্যেক পুর বা পুরীতে তিনি শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া শ্রুতি আবার তাঁহাকে পুরুষ বলিয়াছেন। কিন্তু গুহাশয় পুরুষ হইলেও, তাঁহার বিরাট্, সীমাহীন সত্তার অন্যথা হয় না; যেমন ঘটের মধ্যে আকাশ থাকুক আর মঠের মধ্যেই থাকুক, আকাশ আকাশই; জল গোষ্পদেই থাকুক আর সমুদ্রেই থাকুক, জল জলই। সেই বিরাট্ সত্তা হইতেছে প্রাণ বা চৈতন্য। সূর্য্যরূপী আদিত্যদেব সেই বিরাট্ সত্তার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ও প্রতীক। আমরা সাধারণ জ্ঞানে যেটিকে সূর্য্য বা Sun বলিয়া জানি, সে বস্তুটি আদিত্যদেবের পূর্ণ, সমগ্র অভিব্যক্তি নহে; স্থূল সসীম অভিব্যক্তি মাত্র। আদিত্য এমন একটা সত্তা যাহার কোন ছেদ নাই, খণ্ড নাই। এক কথায়, আদিত্য ব্রহ্মই। একটা Cosmic Reservoir of Energy—যা হইতে জড়ে, প্রাণে, মনে নিখিল শক্তির সরবরাহ হইয়াছে ও হইতেছে,—বৈজ্ঞানিকদেরও অনেকে মানিয়াছেন। অবশ্য, ঠিক বৈজ্ঞানিক "যুক্তি"র উপর ষোল আনা নির্ভর করিয়া হয় ত' নহে। যাই হোক্—সেই বিশ্বাত্মা, বিশ্বাত্মরা ও বিশ্বাত্মিকা শক্তিই আদিত্যসত্তা। প্রত্যক্ষগোচর সূর্য্য তার প্রতীকমাত্র।

শ্রুতি আদিত্যদেবের যে কোষ্ঠী তৈয়ারী করিয়া

রাখিয়াছেন, তাহাতেই তাঁর স্বরূপ প্রকটিত। অদিতির অপত্য বলিয়া তিনি আদিত্য। অদিতি কে? যে সত্তায় ছেদ নাই, খণ্ড নাই সেই সত্তাই অদিতি। সায়ণাচার্য্যাদি অনেকে ঐ ভাবেই নিরুক্তি করিয়াছেন দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিকও দেখিতেছি গুড়িগুড়ি সেই অদিতির (Fundamental Continuum) পানেই হাতড়াইয়া চলিয়াছেন। ঈথার, দেশ-কাল বা দিক্‌কাল —এ সকল তাঁর নতুন নতুন অদিতি-পরিচয়। সে পরিচয়টি সবে সুরু হইয়াছে মাত্র। অদিতির আত্মজ আদিত্য অদিতি হইতে অভিন্ন; যিনি অদিতি তিনিই আদিত্য; যিনি মাতা তিনিই পুত্র। ঋগ্বেদ-সংহিতা ১।৮৯।১০—"অদিতির্দ্যৌর-দিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্॥" বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে "আদিত্যগণে"র কথা শুনিতে পাই বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সে "গণ" ব্যবহারিক মাত্র; পারমার্থিক নহে; যেমন ব্যবহার চালাইবার জন্য, লোককে বুঝাইবার ও বলিবার জন্য "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি", সেইরূপ এক অদিতি ও আদিত্য আমাদের লৌকিক কারবারের খাতিরে "যজ্ঞ প্রয়োজনে," বহু হইয়া "গণ" হইয়া সাজিয়া বসিয়া আছেন।

এখন এই যে ব্যাপক প্রাণ-সত্তা ও চৈতন্য-সত্তা, যাহাকে আমরা আদিত্য বলিয়া অভিবাদন করিতেছি, তাহা হইতে বিস্ফুলিঙ্গের মত নানা ছোট ছোট প্রাণী ও জীব এই বিশ্বের বিপুল আসরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আদিত্যরূপী প্রজাপতি নিখিল প্রজার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন, এবং তাহাদের ভিতরে থাকিয়া নিজের মহত্ত্ব ও ভূমত্বকে তিনি গোপন করিয়াছেন। ইহাই তাহার গুহায় বা পুরীতে শয়ন করা। এইরূপ শয়ন করিবার ফলে এমন একটা ভেদ, এমন একটা গণ্ডী ব্যবহারে আসিয়া দেখা দেয়, যে ভেদ বা গণ্ডী সত্যসত্যই, তত্ত্বতঃ নাই। সে ভেদ হইতেছে—ভিতর ও বাহিরের ভেদ, এবং সঙ্গে সঙ্গেই, যিনি ভিতরে থাকেন ও যিনি বাহিরে থাকেন, তাঁহাদের ভেদ। এই কারণে মনে হয়, যেটা ভিতর সেটা বাহির নয়, এবং যিনি ভিতরে রহিয়াছেন, তিনি আর বাহিরে নাই। যিনি ভিতরে রহিয়াছেন তাঁহার নাম দিই অধ্যাত্ম, যিনি বাহিরে রহিয়াছেন তাঁহার নাম দিই অধিদৈবত ও অধিভূত। এই কথাটা মনে রাখিলে আমরা বুঝিতে পারিব, কি উদ্দেশ্যে শ্রুতি অক্ষিমধ্যবর্ত্তী পুরুষটিকে অধ্যাত্ম এবং আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষটিকে অধিদৈবত বলিলেন। সত্যসত্যই কোনরূপ ভেদ করা অভিপ্রেত নয়; বরং সমীকরণ করা, মিলাইয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ, আমাদের ভিতর যে সত্তা ক্ষুদ্র হইয়া, অল্প হইয়া রহিয়াছেন, সেই সত্তা আবার আদিত্যে বিরাট্ হইয়া, ভূমা হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং খাঁটি ভারতবর্ষীয় দৃষ্টিতে আদিত্যে কেবলমাত্র প্রাণ ও চৈতন্য যে আছে এমন নহে; আদিত্যই নিখিল প্রাণ ও চৈতন্যের অধিষ্ঠান ও উৎস। অবশ্য, অদিতি ও আদিত্যের, মায়ের ও পোএর, স্বরূপ পরিচয়টি আগে করিয়া লওয়া আবশ্যক।

আমরা দেখিয়াছি, জড়বাদী বৈজ্ঞানিক এ সকল কথায় সায় দিতে পারেন না। তবে, বৈজ্ঞানিকমাত্রেই জড়বাদী ছিলেন না, এখনও নেই। নিছক জড়বাদ (Materialism), এমন কি, নিছক নিয়তিবাদ (Cosmic Determinism) এখন বে-ফ্যাসান্ হইয়া পড়িতেছে বৈজ্ঞানিক মহলে। যাই হোক্, তাঁহার দৃষ্টিতে আদিত্য হইতেছেন Sun, এবং সে পদার্থে প্রাণ ও চৈতন্য থাকারই যে কোন প্রমাণ নাই এমন নয়, তাহাতে প্রাণ ও চৈতন্য আদৌ থাকিতে পারে না। সূর্য্য যে অবস্থায় রহিয়াছে, সে অবস্থায় কোন জ্যোতিষ্ক রহিলে, তাহাতে প্রাণের অঙ্কুর দেখা দিতে পারে না; কার্ব্বন হাইড্রোজেন প্রভৃতি মসলার সংযোগে প্রোটোপ্লাজম নামক বস্তুটি পয়দা হওয়া চাই; আর, সেই বস্তুটিকে আশ্রয় করিয়া প্রাণের বিকাশ হইতে পারে; প্রোটোপ্লাজম তাই "the physical basis of life" পৃথিবীতে যে অবস্থা বর্ত্তমান, মোটামুটি সেই অবস্থার ভিতরেই প্রোটোপ্লাজম ভূমিষ্ঠ হইতে পারে; সূর্য্যের মত অবস্থাতে, এমন কি চন্দ্রের মত অবস্থাতেও, তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এমন কি, আমাদের পৃথিবীরও বাল্যে ও কৌমারে সে অবস্থাপুঞ্জ বর্ত্তমান ছিল না। সুতরাং জগতে যতদিন না পৃথিবী ভূমিষ্ঠ হইয়া বর্ত্তমান অবস্থার কাছাকাছি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ততদিন জগতের ইতিহাসে কোন মৌজাতেই প্রাণ বা চৈতন্যের

দখলি স্বত্ব দেওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীতে প্রথম জীবাবির্ভাবের যুগ অবশ্য কোটি কোটি বৎসর পিছাইয়া লইয়া যাইতে পারিয়াছেন। ভূতত্ত্ববিদেরা নানাপ্রকারের জীব আবির্ভাবের পরিচয় বা অভিজ্ঞান পাইয়া পৃথিবীর স্তরগুলিকে ও যুগগুলিকে নানান্ স্তরে সাজাইয়াছেন, এবং তাদের এক-একটা আনুমানিক বয়স নির্দ্ধারণও করিয়াছেন। প্রত্নকঙ্কালের সাহায্যে মানুষের আবির্ভাবের যুগও এখন বহু লক্ষ বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে। সার আর্থার কিথের মতন কোন কোন হালের পণ্ডিত বেশ লম্বা "পাঁতি"ই দিয়াছেন। তা হইলেও সমগ্র ইতিহাসের তুলনায় প্রাণের এই কয়টা যুগ একটা পলক বলিলেও চলে।

জড়বাদী বৈজ্ঞানিক জগতের ইতিহাস লিখিতে বসিয়া জড় অণু পরমাণুগুলিকে আদিম ও প্রাচীন বানাইয়াছেন; প্রাণ ও চৈতন্য তাহার দৃষ্টিতে নিতান্তই আগন্তুক ও অর্ব্বাচীন বনিয়া যাইবে। শুধু ইহাই নহে। জগতের পর পর অবস্থাগুলি তাঁহার দৃষ্টিতে, সাধারণতঃ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থাগুলি হইতে বেশী উন্নত বিবেচিত হইবে; অর্থাৎ, জগতের আদিম বা প্রাচীন কোন অবস্থার তুলনায় নবীন বা আধুনিক কোন অবস্থা, সাধারণতঃ সমধিক উন্নত ও বিকশিত। অবশ্য, এ নিয়মের কচিৎ ব্যভিচারও আছে। ইহাই হইল বৈজ্ঞানিকদের মামুলি ইভোলিউশন্ থিওরি। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি একে সার্ব্বভৌম অধিকার দেন। প্রাণি-জগতে এমিবা প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবেরাই আগে দেখা দিয়াছে; তাহাদের মধ্যে প্রাণের পরিচয়টি নিতান্ত সরল ও সংক্ষিপ্ত; চৈতন্য একরকম নাই বলিলেই হয়। তার পর, উত্তরোত্তর যেমন এক দিকে প্রকৃতির কারখানা হইতে ভাল ভাল প্রাণীর কাঠামো সব বাহির হইয়াছে, তেমনি আবার অন্য দিকে সেই সব কাঠামোর ভিতরে প্রাণের ও চৈতন্যের বিকাশ ও পরিচয় তত বেশী স্পষ্ট, বিশদ ও বিচিত্র হইয়াছে। চৈতন্য বা Consciousness "বস্তুটিকে অনেক সময় মস্তিষ্কের অবস্থাবিশেষের সঙ্গে নিয়ত সম্পর্কে, এমন কি অবিনাভাব সম্বন্ধে, সংযুক্ত করিয়াই রাখা হইয়াছে। মস্তিষ্কের ব্যাপারে একটা "লুপ্ লাইন", একটা "কর্ড লাইন", এমন কি "গ্রাণ্ড কর্ড লাইন"ও আছে দেখান' হয়। কর্ড লাইনে ব্যাপার হইলে চৈতন্য সম্ভবতঃ প্রায়ই থাকেন না; প্রায় "অজ্ঞাতসারেই" ব্যাপার নির্ব্বাহ হইয়া যায়। লুপ লাইনে ব্যাপার হইলেই "জ্ঞাতসারে" "সচেতন ভাবে" হয়। মস্তিষ্ক আর তার "লাইন" ও "ষ্টেশন"গুলি যত বিচিত্র হইয়াছে, চৈতন্যও নাকি ততই বিকশিত ও বিচিত্র হইয়াছে। এই গেল এক দিকের কথা। যাই হোক্, সেই সকলের নীচের ধাপে এমিবা, আর এই সকলের উপরের ধাপে উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তি-ওয়ালা মানুষ। মানুষও গোড়াতে মনুরূপে, সপ্তর্ষিরূপে আবির্ভূত হয় নাই। আদিম অবস্থার মানুষ বনমানুষ, বানরের জ্ঞাতিভাই; অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে সেই আদিম মানবতা এখনও ওয়ারামুঙ্গার সাজ পরিয়া কোন মতে "কোণ ঠেসা" হইয়া আত্মরক্ষা করিয়া রহিয়াছেন; (তাস্‌মেনিয়া দ্বীপের বুনোবেচারীরা ত' লোপাট্ই হইয়া গিয়াছে) সুসভ্য মানুষের আগ্নেয়-অস্ত্রে তিনি নির্ব্বংশ হইলে, আমরা আর আমাদের আদি পুরুষের সজীব কাঠামো কোথায় খুঁজিয়া পাইব না, মাটি খুঁড়িয়া কবর হইতে শুধু তাঁর পাইথেক্যান্‌থ্রোপাস্ প্রভৃতির প্রত্ন-কঙ্কাল বাহির করিয়া দেখিয়া আমাদের কৃতার্থম্মন্য হইতে হইবে। অবশ্য, এই "বনমানুষ" সম্বন্ধে ধারণা পশ্চিম দেশেও কিছু কিছু বদলাইয়া না গিয়াছে এমন নয়। Edward Carpenter Civilisation: its Cause and Cure" নামক গ্রন্থে বলিতেছেন—

"Without committing omrselves to the unlikely theory that the "noble savage" was an ideal hmman being physically or in any other respect, and while certain that in many points he was decidedly inferior to the civilised man, I think we must allow him superiority in some directions; and one of these was his comparative freedom from disease: Lewis Morgan, who grew up among the Iroquois Indians, and who probably knew the North American natives as well as any white man has evor done, says (in his Ancient Society P. 45) "Barbarism ends with the production of grand Barbarians". And though there are no native races on the Earth to-day who are actually in the latest and most advanced stage of Barbarism; yet if we take the most advanced

tribes that we know of such as the said Iroquois Indians of twenty or thirty years ago, some of the kaffir tribes round Lake Nyassa in Africa, now (and possibly for a few years more) comparatively untouched by civilisation, or the tribes along the river Uampes, 30 or 40 years back, of Wallace's Travels on the Amazon —all tribes in what Morgon would call the middle stage of Barbarism—we undoubtedly in each case discover a fine and (which is our point here) healthy people" রুশোর সেই "noble savage" এখনও নানা দিক দিয়া অনেকের শ্রদ্ধা ও প্রশস্তি পাইতেছেন দেখিতেছি। যাই হোক্, সৃষ্টি সম্বন্ধে গোঁড়া জড়বাদীর ও অভ্যুদয়বাদীর মত মানিতে গেলে ইতিহাসের আলেখ্যখানা মোটামুটি এক ভাবে আঁকা হইবে আমরা দেখিলাম। এ দেশের ও অপর কোন কোন দেশের নৈমিষারণ্যে সে আলেখ্য অন্ত ভাবে আঁকা হইত, তাও আমরা কটাক্ষে মোটামুটি দেখিলাম। কোন্ আলেখ্যখানা যাথার্থ্যের বেশী অনুরূপ—এ প্রশ্নের জবাব জরুরি সন্দেহ নেই; কিন্তু জবাব এখনও পাওয়া যায় নাই। বিজ্ঞানের দস্ত এত দিন সেই সব নৈমিষারণ্যের পুরানো আলেখ্য তুচ্ছ করিয়া ছিঁড়িয়াই ফেলিতে চাহিত। আজও বিজ্ঞান যে সে আলেখ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথায় তুলিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছে, এমন নয়। তবে, এটা ঠিক যে—এই বিংশ শতাব্দীতে সে আলেখ্য হাতে তুলিয়া ধরিয়া বিজ্ঞান ইতস্ততঃ করিতেছে; তার হাতও কাঁপিতে সুরু হইয়াছে, মস্তকও কিছু আনত্ও হইতেছে। দেখা যাক কতদূর কি গড়ায়!

অরক্ষণীয়া

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর, বি-এ

এস এস, কোথা প্রিয়তম?
যূথিকার অন্বেষণে বৃথাই মালতী বনে
ফিরিতেছ মধুকর সম।
তব ইষ্ট ধন হেথা, ভুল পথে খুঁজিবে তা?
কে তোমারে করেছে বঞ্চনা?
জানিলে কি স'বে বঁধু? জাননা তোমার বধূ
প্রতিদিন কি সহে গঞ্জনা।
এ কপালে টিপ এঁকে হাতে ঠোঁটে রঙ মেখে
গায়ে মুখে লেপে পাউডার,
নানা ছাঁদে বেঁধে কেশ পরিতে হয় যে বেশ
রাশি রাশি, ঢিলা অলঙ্কার।
তোমার বধূর হায় এ অঙ্গ যে লাজ পায়
সাজ নিতে পরখের তরে।
কারা সব বসে থাকে তোমার বধূরে ডাকে
কতদিন বাহিরের ঘরে।
দৃষ্টিশর বুকে বাজে ব্যাধের সভার মাঝে
ভয়ে কাঁপে এ মৃগী-হৃদয়,
পা'র তলে কাঁপে মাটি জল আসে চোখ ফাটি
কিশোরী-জীবন কত সয়?
বসে বসে নখ খুঁটি হাসি পায়, কত ত্রুটী
ধরে এরা, দেখে কর-রেখা;
কেহ বলে—হাঁট দেখি, কেহ বলে—জানে একি
নাচ গান? কেহ দেখে লেখা।
শুনে তব হাসি পাবে, যারে এরা খুঁত ভাবে,
কোথা তাহা যাবে ডুবে ভেসে
এ দেহ মৃণালে তা যে ফুটিবে গুণেরি সাজে
তুমি যবে চাবে মৃদু হেসে।
আসে যায় দালালেরা, পণ্য নারীসম এরা
আমারে যে সাজায় যাচায়,
অপমান দয়িতার কতদিন স'বে আর?
এস বঁধু, বাঁচাও আমায়।

এরা ত চিনেনা মোরে চলে যায় হেলা ক'রে।
পর তারা, চিনিবে কেমন?
না আসিতে তব রথ পাছে তারা দেয় মত,
সেই ভয়ই জাগে যে এ মনে।
কতদিন বাপমার নেহারিব মুখ ভার?
কতদিন র'ব গলগ্রহ?
এস এস প্রিয়তম, কুমারী জীবন মম
লাঞ্ছনায় হয়েছে দুঃসহ।
তুমি এলে, তব মর্ম্ম দেখিবে না শুধু চর্ম্ম,
মুহূর্ত্তে ফেলিবে মোরে চিনি।
অন্তরে প্রতিমা যার বহিতেছ অনিবার,
আমি তব সেই আদরিণী।
সব বেশভূষা ছেদি' কৃত্রিম এ কান্তি ভেদি'
অন্তরের অন্তঃপুর মাঝে
তব দৃষ্টি প্রবেশিবে, নিমেষে চিনিয়া নিবে
সেথা তব পদ্মাসন রাজে।



বন্যা

শ্রীসীতা দেবী বি-এ

(১৩)

সুদর্শনের কথা শেষ হইতে না হইতে অমিতা আবার মহোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "কবে খাওয়াচ্ছেন এখন, তাই বলুন ত, অন্য কথা থাক।"

সুদর্শন নিতান্ত অবজ্ঞার ভান করিয়া বলিল, "কি আর এমন ব্যাপার যে খাওয়াতে হবে? পাশ ত প্রতি বছরেই হাজার হাজার ছেলে হচ্ছে।"

অমিতা বলিল, "হাজার হাজার ছেলে ত first হয়না প্রতি বছর?"

সুদর্শন বলিল, "আমি first হয়েছি, কে বল্লে আপনাকে?"

সুপর্ণা এতক্ষণ পরে কথা বলিল। মুখে একটু ক্ষীণ হাসি টানিয়া আনিয়া সে বলিল, "আপনি last হলে নিশ্চয়ই আর আমাদের খবর দিতে আসতেন না?"

সুদর্শন বলিল, "First এবং last ছাড়াও কতগুলো মাঝামাঝি অবস্থা আছে ত?"

সুপর্ণা বলিল "তা আছে বটে, কিন্তু সেগুলো আপনার জন্যে নয়। ফাষ্ট হয়েছেন সেটা স্বীকারই করে ফেলুননা?"

সুদর্শন বলিল, "আচ্ছা, ভদ্রমহিলাদের কথার প্রতিবাদ করতে নেই, সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছি যে আমি ফার্ষ্ট হয়েছি।"

অমিতা বলিল "তা হলেই হল। আপনার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ওটা ধরে নেবে এখন। কিন্তু খাওয়ানোর কথাটা ধামা-চাপা দিচ্ছেন কেন? এর পর ত কেবল মানুষের অনিষ্ট চিন্তা করবেন, গোড়ায় একটু খাইয়ে পুণ্য অর্জ্জন করুন।"

সুদর্শন বলিল, "নিজেরা রেঁধে বেড়ে যদি খেতে পারেন, তাহলে আমি রাজী আছি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। কিন্তু নিমন্ত্রণ করে আমাদের 'মহারাজের' রান্না আপনাদের খাওয়াতে পারবনা। লোকে তাহলে ভাববে আমি career এর গোড়াতেই বিষ খাইয়ে patient জোটাবার চেষ্টায় আছি।"

অমিতা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "না, না, ও-রকম খাওয়া আমি অন্ততঃ খেতে চাইনা। বাড়ী বসে চাকরের রান্না ত রোজই খাচ্ছি। একটা picnicএর মত organise করতে হবে। পিসীমা আছেন পাকা রাঁধুনী, তাঁকে রান্নার ভার দিয়ে দিলেই হবে। আমরা খুব হৈ হৈ করে বেড়াব। আমাদের দলের ইন্দু আর সু'র বন্ধু গার্গীকে জোটান যাবে। তাদের ত আপনিও চেনেন, গার্গী থাকলে গানের অভাব হবেনা। আপনার বন্ধু-বান্ধব কেউ থাকলে নিয়ে আসবেন।"

সুপর্ণা বলিল, "যাক, পাশ করলেন যিনি, এবং খরচটা যাঁর ট্যাঁক থেকে হবে, তাঁর মতামতটা নিতে কেবল বাকি রইল। ব্যবস্থা ত সব তুই করে দিলি। আমার কিন্তু এই নিয়মটা ভাল লাগেনা?"

অমিতা জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ নিয়মটা? ফুর্ত্তি করাটা? তাহলে কি তোমার পছন্দ? সবাই মিলে একটা condolence meeting করব?"

সুদর্শন হাসিয়া বলিল, "আমার ভবিষ্যৎ patientদের পক্ষ থেকে সেটা করা চলে অবশ্য, তবে একটু premature হবে। কিন্তু নিয়মটা আপনার ভাল লাগেনা কেন?

আমোদ-প্রমোদটা যে মানুষের পক্ষে প্রায় খাওয়া এবং ঘুমনোর মতই দরকার ?"

সুপর্ণা বলিল, "অমিতার জ্বালায় কোনো কথা মানুষ বলতে পায়না। আমি আমোদের মোটেই বিরোধী নই। আমি বলতে যাচ্ছিলাম এই যে, আমাদেরই সকলের আপনাকে একটা party দেওয়া উচিত। তা না করে উল্টে আপনাকেই host হতে বাধ্য করাটা মোটেই শোভন হয়না।"

সুদর্শন বলিল "আমি ত host হব নামে মাত্র, hostess হতে হবে আসলে আপনাদের।"

অমিতা বলিয়া উঠিল, "ওমা, সে কি কথা! ও ভাই সু, আমি এ-সবের মধ্যে নেই।" বলিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সুদর্শন বলিল, "বেশ যা হোক।"

সুপর্ণা মুখ লাল করিয়া বলিল, "অমির মত ফাজিল মেয়ে সত্যি আমি খুব কম দেখেছি। কোথায় যে কি বলতে হয় বা না হয়, তা যেন ওর একেবারে মাথায় আসেনা। সে যাক গে, আপনি তাহলে আবার কলকাতায় ফিরবেন নাকি ?"

সুদর্শন বলিল, "না, সেখানে গিয়ে হবে কি ? ডাক্তার ত সেখানে প্রতি গলিতে চারটে করে। এমন কোনো জায়গা বেছে বের করতে হবে, যেখানে এখনও field খালি পড়ে আছে।"

সুপর্ণা বলিল, "বাংলা দেশে সে-রকম জায়গার অভাব নেই। তবে পয়সা পাবেননা। আমার দুচারটি গ্রাম জানা আছে, যেখানে জলপড়া, চালপড়া, এবং ভুতঝাড়া ভিন্ন আর কোনো রকম চিকিৎসার চলন নেই।"

সুদর্শন বলিল "সেই গ্রামগুলির ঠিকানা দিয়ে দিননা। ভূতের ওঝাদের সঙ্গে compete করে কি জিততে পারবনা ?"

সুপর্ণা একটু হাসিয়া বলিল, "তা নাও পারতে পারেন। ভূতের ওঝাই তাদের আসল দরকার। তবে ভূতগুলি বেশীর ভাগই সশরীরে ঘোরেন, এই যা।"

এমন সময় অমিতা আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সামনের শুক্রবারে আমার ছুটি আছে, আর সকলের আছে কিনা, তা অবশ্য জানিনা। যদি সুবিধা হয়, সেই দিন পিক্‌নিক্‌টা করলে হয়না ?"

সুপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল, "পিক্‌নিক হওয়াটা কি স্থির হয়ে গেছে ? তা হলে পরে তবে ত স্থান কাল ঠিক হবে।"

অমিতা বলিল, "এর আবার স্থির অস্থির কি ? পাশ করলে খাওয়াতে হয় এ ত জানা কথা। Admission feeর মত, ওটাও একটা ন্যায্য খরচ। আমি যদি পাশ করিত খাওয়াব, সকলকে এখন থেকেই কথা দিয়ে রাখছি।"

সুপর্ণা বলিল, "তা ভাল, এখন থেকে নেমন্তন্ন হয়ে রইল। সুদর্শনবাবু যেখানেই থাকুন, খবরের কাগজে তোর পাশের খবর দেখলেই এসে জুটবেন। কিন্তু picnicটা হচ্ছে কোথায় ?"

সুদর্শন একটু ভাবিয়া বলিল, "লালা বিশ্বম্ভর দাসের বাগানবাড়ীটাতে হতে পারে। তাঁর সঙ্গে বাবার আলাপ আছে, চাইলেই লালাজী আনন্দের সঙ্গে রাজী হবেন। বাগানটা মন্দ না, গিয়েছেন কখনও ?"

অমিতা বলিল, "না, যাইনি। বেশ ত, সেই জায়গাটাই ঠিক করুন। শুক্রবারে হতে পারবে কি ?"

সুপর্ণা বলিল, "আমার ত তিনটের আগে ছুটি নেই। তা আর সকলের যদি সুবিধে হয়, তাহলে আমার জন্যে আটকাবেনা। আমি চারটের সময় গিয়ে পৌঁছব।"

অমিতা কিছু বলিবার আগেই সুদর্শন বলিয়া উঠিল, "না, না, সে কিছুতেই হবেনা। রবিবারেই করা ভাল, সেদিন কারো অসুবিধা হবেনা।"

অমিতা আড়চোখে সুদর্শনের দিকে একবার তাকাইয়া বলিল, "সেই ভাল। তাহলে এর পর list করা যাক্।"

সুপর্ণা উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "নে বাপু, থাম। তোর মত তড়বড়ে মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি।"

অমিতা চটিয়া বলিল, "না, কেবল নিজের নাকের ডগায় মনোনিবেশ করে বসে থাকতে হবে, তোমার মত। সুদর্শন বাবু ওর কথা শুনবেন না ত। মাঝে ত চারটে দিন মোটে, চটপট্ ব্যবস্থা করতে হবে ত ? ঐ নাও, পিসীমা আবার ডাকাডাকি লাগালেন কেন ?"

অমিতা আবার বাহির হইয়া যাইতেই সুদর্শন বলিল, "পিক্‌নিকের ideaটা আপনার কি ভাল লাগছেনা ?"

সুপর্ণা বলিল, "আমার আপত্তির কারণ গোড়াতেই ত বললাম।"

সুদর্শন বলিল, "আমাকে পার্টি দেওয়ার চেয়ে, আমার

দেওয়া পার্টিতে যদি আপনারা দয়া করে যান, তাহলে আমি ঢের বেশী খুসি হব, এবং কৃতজ্ঞও হব অনেকখানি।"

সুপর্ণা বলিল, "পরের উপকার করেই শুধু আপনি সন্তুষ্ট নন, আবার কৃতজ্ঞও হবেন নিজে? আমাদের জন্তে বাকি থাকবে তাহলে কি?"

সুদর্শন বলিল, "পার্টিটা enjoy করে, আমাকে কৃতজ্ঞ হবার সুযোগ করে দেওয়াটা। সেটা নিতান্ত সহজ কাজ নয়।"

অমিতা ফিরিয়া আসিয়া বলিল "পিসীমা আপনাকে চা খেতে ডাকছেন।"

সুদর্শন বলিল, "আমি ত চা খেয়েই বেরিয়েছি, আবার কেন?"

অমিতা বলিল, "চাটা আলো বাতাসের মত। ওটা বেশী বা কম খেলে কিছু এসে যায়না, মোট কথা সামনে এলেই খেতে হয়।"

সুদর্শন বলিল, "আপনার কথাটা ঠিক বিজ্ঞানের অনুমোদিত নয়। তবে তার চেয়ে ঢের বেশী সুবিধাজনক। অতএব চলুন, চা খেয়েই আসা যাক।"

নীচের খাবার ঘরেই অমিতা চায়ের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিয়াছিল। তিনজনে ঘরে ঢুকিতেই তারণবাবুর ভগিনী বলিলেন, "কি বাবা, খুব ত কৃতিত্ব দেখিয়েছ, ফার্ষ্ট হয়েছ নাকি?"

সুদর্শন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "হ্যাঁ পিসীমা, আপনার ভাইঝি বুঝি এরই মধ্যে খবরটা সবাইকে শুনিয়ে দিয়েছেন?"

অমিতা বলিল, "সুখবর ত সবাইকে শোনাতেই হয়।" এমন সময় তারণবাবু এবং পিসীমার দুই ছেলে আসিয়া জোটাতে কথাটা তাঁহাদের মধ্যেও প্রচার করিয়া দেওয়া হইল। সকলে মিলিয়া মহোৎসাহে গল্প চলিল। সুপর্ণা ইহার ভিতর একটুখানি চুপ করিয়া গেল। একেই তাহার স্বভাব নয় অমিতার মত অত কথা বলা, তাহার উপর এ ক্ষেত্রে বেশী উচ্ছ্বসিত ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে তাহার কোথায় যেন বাধিতেছিল। আগামী রবিবারে পিক্‌নিক্ করা হইবে, ইহা একপ্রকার স্থিরই হইয়া গেল। কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, অমিতা তাহারই তালিকা প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেল। সুদর্শন তাহার প্রস্তাবিত সকল নামেই সম্মতি প্রকাশ করিয়া, আধঘণ্টা খানেক পরে চলিয়া গেল। বাগানবাড়ী পাওয়া যাইবে কি না, তাহা সে বিকালে আসিয়া জানাইবে, বলিয়া গেল।

সাড়ে ন'টায় সুপর্ণা অমিতাকে কলেজে বাহির হইতে হয়, সুতরাং সকালবেলা বেশী অবকাশ তাহাদের থাকেনা। চায়ের টেবিলের সভা তাহাদের শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল। সুপর্ণা নিজের ঘরে উঠিয়া গেল। পড়ার বইগুলো একটু দেখিলে চলিত, কিন্তু কিছুতেই আর সেদিকে মন দিতে পারিলনা। দেরাজ টানিয়া খুলিয়া, অকারণেই গোছান জিনিষ দশ বার করিয়া গুছাইতে লাগিল। আল্‌নার কাপড়-জামাগুলির দিকে চাহিয়া দেখিল। অন্যের চক্ষে সেগুলির কোনো মলিনতা ধরা পড়িতনা, কিন্তু সুপর্ণার চক্ষে সেগুলি বাহিরে পরিয়া যাইবার উপযুক্ত বোধ হইলনা। কাপড়ের আলমারী খুলিয়া একপ্রস্থ ধোপদস্ত কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া রাখিল। তাহার পর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া খাটের উপর বসিয়া রহিল। অকারণে সময় নষ্ট করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কিন্তু আজ কোনো কাজেই সে মন দিতে পারিতেছিলনা। কিসের একটা উত্তেজনা থাকিয়া থাকিয়া তাহার স্বভাবতঃ ধীর স্থির চিত্তকে দোলা দিয়া যাইতেছিল। সুপর্ণা প্রাণপণে ইহাকে না চিনিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু নিষ্কৃতি পাইতেছিলনা।

অমিতা ভাঁড়ার এবং রান্নার সব ব্যবস্থা সারিয়া, গান করিতে করিতে উপরে উঠিতেছিল, চুল খোলার কাজটাও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। সিঁড়ির মুখেই সুপর্ণার ঘর। বাতাসে দরজার পরদাটা উড়িয়া উড়িয়া, নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া তুলিতেছিল; কাজেই অমিতার চোখ সহজেই ঘরের ভিতর গিয়া পৌঁছিল। গান থামাইয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো ঠাকরুণ, পাথরের মত জমে বসে আছ কেন? আজ কলেজ নেই?"

সুপর্ণা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "এই ত যাচ্ছি স্নান করতে।"

অমিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আচ্ছা গার্গী আর ইন্দু ছাড়া আর কারো নাম তোর মনে হচ্ছে না?"

সুপর্ণা বলিল, "আমাদের অত নাম মনে করে কাজ

কি বাপু? যাঁর Party তিনিই guest নির্ব্বাচন করবেন, সেটাই ভাল।"

অমিতা বলিল, "তুই যে hostess হবি, তোর কি একটা কর্ত্তব্য নেই?"

সুপর্ণা তাহার পিঠে একটা কীল মারিয়া বলিল, "থাক থাক, আমি কোন্ দুঃখে হতে যাব? নিজে গায়ে পড়ে সব ব্যবস্থা যে করতে গিয়েছে, সেই hostess হোক। কথাটা তোকেই লক্ষ্য করে যে বলা, তা যেন আর বুঝতে পারিস্নি।"

অমিতা বলিল "বাবা, এরই ভিতর অভিমান? তাহলে ব্যাপার অনেকদূর এগিয়েছে বল?"

সুপর্ণা নিজের তোয়ালে সাবান প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া বলিল "তোমার যত খুসি ব্যাজর্ ব্যাজর্ কর, আমি চল্লাম।" বলিয়া সে স্নানের ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

অমিতা হাসিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। সুদর্শনকে লইয়া সুপর্ণাকে জ্বালাতন করিতে তাহার বড় ভাল লাগিত। সুদর্শন যে সুপর্ণাকে একটু বেশীরকম পছন্দ করে, তাহা অমিতার তীক্ষ্ণ চক্ষুতে ধরাই পড়িয়া গিয়াছে। সুদর্শন বহু কাল পড়াশুনার খাতিরে কলিকাতায় বাস করিয়াছে, মধ্যে মধ্যে ছুটি প্রভৃতিতে দুই তিন সপ্তাহের জন্য দিল্লী আসিয়াছে। সুতরাং এতকাল তাহার সহিত সুপর্ণার পরিচয় বেশী ঘনিষ্ঠ হইবার কোনো সুযোগ ঘটে নাই। পরীক্ষা দিয়া এবার আসার পর, সুদর্শনের অবকাশ যথেষ্ট জুটিয়াছে, এবং অবসর সময়ের অধিকাংশই সে এই বাড়ীতে কাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘরে অমিতাই যে খালি ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছে, তাহা নয়, বাহিরেও ইহা লোকের চোখে পড়িতেছে। সুদর্শন সকল দিক দিয়াই যোগ্য পাত্র, সুতরাং তাহার গতিবিধির উপর অনেকগুলি বাঙালী পরিবারই সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছিল।

সুদর্শনের পক্ষপাত অমিতা সহজেই বুঝিয়াছিল, কিন্তু সুপর্ণার মনের কথা সে কিছুতেই বাহির করিতে পারিতনা। এমন চাপা মেয়ে, তাহার মুখ হইতে বেফাঁস একটা কথা কোন মতেও বাহির করিবার উপায় নাই। অমিতার মনের কোনো কথা সুপর্ণার জানিতে বাকি ছিলনা, কিন্তু সুপর্ণার হৃদয়ের গোপন কক্ষের অর্গল একেবারে বন্ধ। অমিতা জানিতনা যে তাহাতে এবং সুপর্ণাতে ভগবান কি দারুণ ভেদ ঘটাইয়া রাখিয়াছেন। সুপর্ণা যখন এ বাড়ীতে আসে তখন অমিতা বালিকা মাত্র। সুপর্ণার বাল্য-জীবনের বেদনাময় ইতিহাস দিল্লীতে ঘুণাক্ষরেও প্রচারিত হয় নাই। এক জানিতেন শুধু অমিতার পিতা, তাঁহার দ্বারা কথা প্রচার হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা ছিলনা। বন্ধু প্রতুলচন্দ্রের নিষেধকে তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিতেছিলেন। অমিতা এবং তাহার সমবয়সী তরুণী বন্ধুদের জীবনে প্রেম এবং বিবাহ এই দুটি জিনিষই জগৎ জুড়িয়া ছিল। কিন্তু এই দুইটি ব্যাপার সম্বন্ধেই সুপর্ণা এমন অনাসক্তি প্রকাশ করিত, যে, বন্ধুবান্ধবের দল বিস্মিতও হইত, চটিয়াও যাইত। মেয়ে যেন সং। এত ঘটা করিয়া সাধু সাজিবার দরকার কি? বিবাহ যখন সব মেয়েই একদিন না একদিন করিবেই, তখন গোড়ায় অত বকধার্ম্মিকের মত ভাব দেখাইয়া কি লাভ আছে? কিন্তু হাজার ঠাট্টা বিদ্রূপেও অমিতারা সুপর্ণাকে ঠিক দলে টানিতে পারে নাই।

নিজেকে সুপর্ণাও ঠিক বুঝিত কি না সন্দেহ। বাল্য-জীবনের উপর তাহার যে অভিশাপ দৈববিড়ম্বনায় আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার চিহ্ন সুপর্ণার মন হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। সে জানিত কোনো দিনই সাংসারিকভাবে সুখের জীবন তাহার হইবেনা। নিজেকে ভালভাবে গড়িয়া তুলিবার দিকে, সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন আত্মনির্ভরক্ষম হওয়ার দিকেই সে সমস্ত মন ঢালিয়া দিয়াছিল। নারীজীবনের মধুরতর দিকগুলি হইতে সে যথাসাধ্য মুখ ফিরাইয়া থাকিতেই চাহিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অসুবিধা ছিল ঢের। বৃদ্ধ তারণবাবু ভিন্ন আর সকলেই তাহাকে কুমারী মনে করে, এবং সেই ভাবে তাহার সঙ্গে ব্যবহার করে। সুপর্ণার এক এক দিকে অতিরিক্ত নির্লিপ্ত ভাবটা অনেকের চোখে বিসদৃশ লাগে, তাহা লইয়া ক্রমাগত তাহাকে ঠাট্টা তামাসা সহ্য করিতে হয়। সে সুন্দরী, ধনীর একমাত্র কন্যা, বিদুষী এবং নানা গুণে অলঙ্কৃতা। সুতরাং তরুণ সম্প্রদায়ের দৃষ্টিকে এড়াইয়া চলিতে পারেনা। অমিতার চেয়ে সুপর্ণাই যেন তাহাদের

আকৃষ্ট করে বেশী। ইহা লইয়া অমিতা ত সারাক্ষণই সুপর্ণাকে নানা কথা শোনায়, অবশ্য ঠাট্টাচ্ছলে।

সুপর্ণা এতদিন মনের স্থৈর্য্য হারায় নাই, অমিতার রসিকতা সে গায়ে মাখিতনা। পড়াশুনায় অত্যন্ত বেশী ব্যস্ত থাকিত বলিয়া, আমোদপ্রমোদে বেশী যোগ দেওয়া তাহার ঘটিতনা। বাড়ীতে গৃহিণী নাই বলিয়া এবং তারণবাবুর কোনো বয়স্ক পুত্র নাই বলিয়াও খানিকটা, এ বাড়ীতে কোনো যুবকের খুব বেশী গতিবিধি ছিলনা। বাহিরে যাহাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইত, তাহারা কোনো দিনই সুপর্ণার মনোজগতে স্থান লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এইবার যেন কি একটা ভাঙন ধরিতে সুরু হইয়াছিল।

সুদর্শন তারণবাবুর বন্ধুপুত্র, সেই হিসাবে যাওয়া আসা করিত। এবারে তাহার যাওয়া-আসা একটু অতিরিক্ত রকম বাড়িয়া গিয়াছিল। দুইটি মানুষ মনে মনে ইহাতে বিচলিত হইয়া উঠিতেছিল। একটি বৃদ্ধ তারণবাবু, তিনি বুঝিতেছিলেন সুদর্শন অত্যন্ত প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু এই আকর্ষণের পরিণাম কি দাঁড়াইবে? সে যাহাকে কুমারী কন্যা ভাবিয়া জীবনসঙ্গিনী, প্রণয়িনীরূপে পাইতে আকুল হইয়া উঠিয়াছে, নিষ্ঠুর দৈবের চক্রান্তে সে তাহার আয়ত্তের বাহিরে, চিরদিনই তাহাই থাকিবে। সুদর্শনকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, সুপর্ণা ত তাঁহার কন্যা হইতে ভিন্ন ছিলনা। এই দুইটি তরুণ প্রাণের জন্য ভাগ্য যে কি নিদারুণ বজ্র উদ্যত করিতেছে, ভাবিতে তাঁহার প্রাণ কাঁপিত, অথচ তিনি একেবারে নিরুপায়।

সুপর্ণাও বিচলিত হইতেছিল, কিন্তু সুদর্শনের কথা ভাবিয়া ততটা নয়, যতটা নিজের কথা ভাবিয়া। তাহার মনোজগতেও বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় ছিলনা।

(১৪)

রবিবার দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। পিক্‌নিকের ব্যবস্থা সারা সপ্তাহ ধরিয়াই চলিতেছিল, শনিবার হইতে অমিতার ত আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই সব ব্যাপারে তাহার মত উৎসাহী মানুষ আর দুইটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতনা। সুদর্শনের হইয়া নিমন্ত্রণ করা, জিনিষপত্রের তালিকা করা, কে কি রাঁধিবে, কে গান গাহিবে, কে বাজনা বাজাইবে, সবের সে ব্যবস্থা করিতেছিল। যাহার নিমন্ত্রণ, সে একেবারেই পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটাতে অবশ্য অমিতার পিসীমা উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিতেছিলেন। সুপর্ণাই কোনো কিছুতে হাত দিতে দ্বিধা করিতেছিল। বলা বাহুল্য, তাহার জন্য অমিতার কাছে বকুনি খাইতে খাইতে তাহার প্রাণ বাহির হইতেছিল। সুপর্ণা নিজের কাছে এবং পরের কাছে নিজের ব্যবহার কিছুতেই সহজ করিয়া তুলিতে পারিতেছিলনা। কোথায় কিসে যে তাহার বাধিতেছে, তাহা নিজে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেছিলনা, কিন্তু তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার সাহসও তাহার হইতেছিলনা।

শনিবারে সকালবেলা হঠাৎ অমিতার পিসীমা এবং অমিতা দুইজনেরই কিঞ্চিৎ মত পরিবর্ত্তন ঘটিল। পিসীমা বলিলেন, "এক কাজ করা যাক, রান্নার ব্যাপারটা রাতারাতি এইখানেই চুকিয়ে ফেলি। ওখানে নানা অসুবিধায় পড়তে হবে হয় ত,—এটা পাবনা, সেটা পাবনা। তা ছাড়া বাইরে বেরিয়ে, একটু আধটু ঘুরতে ফিরতে আমারও ত ইচ্ছে করবে, যতই বুড়ো হইনা কেন? পঁচিশ ত্রিশজন লোকের ব্যাপার, এ চট করে হয়ে যাবে,—জোর চারটের যে ক'টা উনুন আছে ধরিয়ে নিলেই হবে।"

অমিতা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তা হয়ে যাবে বই কি? ভারি ত ব্যাপার, খিচুড়ী, ভাজা, মাংস আর চাট্‌নী,—দই সন্দেশ ত আর রান্না করতে হবেনা? সে বেশ মজা হবে। ইন্দুকেও ডাকব নাকি, তরকারি কুটতে?"

সুপর্ণা বলিল, "আহা, তরকারি ত কত, তার আবার বাইরে থেকে লোক ডাকতে হবে, কুটবার জন্যে। আমরাই করে নেব, তবে বাজারটা এখুনি করতে হবে, আর রাত্রে গিয়ে স্লটার হাউস্ থেকে মাংসটা নিয়ে আসতে হবে। সাড়ে তিনটায় গেলে ঠিক টাট্‌কা জিনিষটা পাবে।"

সুপর্ণা, অমিতা দুজনেরই শনিবারে একটু সকাল সকাল ছুটি হয়, তাহারা ট্যাক্সি করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। রান্নার জোগাড় চা খাওয়ার পর হইতেই চলিতে লাগিল। খাইবার ঘরের মেঝেতে আসন পাতিয়া বসিয়া, সুপর্ণা আর অমিতা মহোৎসাহে আলু

ছাড়াইতেছে, এমন সময় সুদর্শন আসিয়া হাজির হইল। অমিতা তাহাকে দেখিয়াই বলিল, "এই যে, কর্মকর্ত্তা হাজির, দেখুন কেমন কোমর বেঁধে কাজে লেগে গিয়েছি, সব কাজ আজ রাত্রেই সারা হয়ে থাকবে, বাগানে গিয়ে বাকি থাকবে খালি খাওয়া।"

সুদর্শন বলিল, "অন্য রকম ব্যবস্থা ছিলনা আগে ?"

অমিতা বলিল, "সে সুবিধা হবেনা। পিসীমা বল্‌ছেন তিনিও ত একটু বেড়াবেন, না কেবল হাঁড়ি আগ্‌লে বসে থাকবেন। তার চেয়ে রান্না করে নিয়ে গেলেই হবে। দুখানা 'কার' হাতে পাওয়া যাচ্ছে, নিয়ে যাবার ভাবনা কি ?

সুদর্শন বলিল, "সে আপনারা যা ভাল মনে করেন। আমার খেতে পেলেই হল। আমি বলতে এসেছিলাম, লোক আরো তিনজন বেশী হবে।"

সুপর্ণা বলিল, "তা হোক। অমি যে রকম মহোৎসাহে মণ খানিক আলু নিয়ে বসে গিয়েছে, তাতে অকুলান হবে বলে ত মনে হয়না।"

অমিতা বলিল, "মরে যাই, যত দোষ নন্দ ঘোষ। আলুর estimate কি আমি করেছি মশাই ? আমার expenseএ clever হবার চেষ্টা কোরোনা, আমি একেবারে তোমায় পথে বসিয়ে দেব।"

সুদর্শন বলিল, "তা যাক, না হয় আলু কিছু বেশীই হবে, কম হওয়ার চেয়ে ত ভাল ? আমার উপর কি কি ভার আছে বলুন ত ? একবার memoryটাকে refresh করে নিই, নইলে কোথায় কি ভুল ঘটে যাবে।"

অমিতা বলিল, "আপনার উপর ভার আছে প্রথমে ভোরবেলা গিয়ে বাগানবাড়ীটা পরিষ্কার করান। স্নানের এবং খাবার জলের ব্যবস্থা করা এবং আপনার স্বজাতীয় বন্ধুগুলিকে ঠিকমত জুটিয়ে আনা। তা ছাড়া আর কি কাজের ভার আপনি চান, তা ভেবেই দেখুন।"

সুদর্শন বলিল, "আর কোনো ভার চাইনা। তবে সেখানে গিয়ে যে রকম inspiration পাই, তা করা যাবে।"

অমিতা বলিল "Inspirationএর অভাব কি ? Electric Shock শুদ্ধ পেয়ে যেতে পারেন।"

এমন সময় পিসীমা আসিয়া পড়াতে কথাটা অন্য দিকে চলিয়া গেল। সুদর্শন খানিক পরে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি আসি এখন, কয়েকজন বন্ধুকে পথের সন্ধান দিয়ে যেতে হবে, নইলে তারা কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে যে উঠ্‌বে তার ঠিকানা নেই।"

সুপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল "আপনার বাবা আসতে পারবেননা ?"

সুদর্শন বলিল, "কি জানি, সব দিন তাঁর সমান যায়-না ত ? যদি বাতের ব্যথাটা না বাড়ে, তাহলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব। সকাল সকাল ফিরিয়ে নিয়ে এলেই হবে।"

অমিতার পিসীমা বলিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, নিয়ে যেও। তুমি তাঁর মুখ উজ্জ্বল করেছ, তোমাকে নিয়ে আনন্দ করা হবে, তিনি না থাকলে কি চলে ? নিয়ে যেও যেমন করে হয়।"

সুদর্শন বলিল, "নিয়ে যেতেই ত চাই, তবে তাঁর যা শরীর, বেশী নাড়ানাড়ি করতে ভরসা হয়না।"

সুদর্শন আর না বসিয়া চলিয়া গেল। এ বাড়ীতে হৈ হৈ চলিতেই লাগিল, উৎসাহের চোটে কেহ আর বিশ্রাম করিতেই গেলনা, যদিও খানিকটা করিয়া লওয়া কঠিন হইতনা।

রাত একটার সময় সুপর্ণা বলিল "এই অমি, ঘণ্টা দুই চলনা গড়িয়ে নিই, নইলে কাল পিক্‌নিক্ আর করতে হবেনা, বসে বসে খালি ঢুল্‌বি।"

অমিতা বলিল, "চল্। পিসীমা, মাংস এসে পৌঁছলেই আমাদের ডাক দিও কিন্তু।" দুইজনে গিয়া শুইয়া পড়িল।

যখন জাগিয়া উঠিল, তখন ভোরের আলো সবে সুপ্ত জগতের উপর প্রথম রঙের তুলি বুলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। অমিতা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ওমা, কি সর্ব্বনাশ! একেবারে ভোর হয়ে গেছে যে ? পিসীমা যে কি কাণ্ড করলেন। এই সু, শীগ্‌গির ওঠ বল্‌ছি, শীগ্‌গির ওঠ।"

অমিতার ঠেলায় সুপর্ণাও এক মুহূর্ত্তে উঠিয়া বসিল। রাত-কামিজের উপর শাড়ী জড়াইয়া দুইজনে ক্ষিপ্রগতিতে নীচে নামিয়া আসিল। রান্নাঘরের দরজার ভিতর দিয়া তাকাইয়া অমিতা বলিয়া উঠিল, "পিসীমা, বেশ যা হোক, কেন আমাদের ডাকলেনা ?"

রান্নাবান্না সবই শেষ হইয়া গিয়াছে, উনুনের আঁচ নামাইয়া ফেলিয়া, খিচুড়ী, মাংস প্রভৃতি দমে বসাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা দিতে দিতে পিসীমা বলিলেন, "কেন রে,

অন্যায়টা কি হয়েছে? বেশ ত ঘুমিয়ে নিলি, নইলে সারাদিন খালি ঢুলতিস্, আমোদ প্রমোদ কোথায় ভেসে যেত তার ঠিকানা নেই।"

অমিতা বলিল, "না পিসীমা, এ তোমার ভারি অন্যায়। রাত জেগে একলা একলা খাট্‌লে, আমাদের ডাকা তোমার উচিত ছিল।"

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, "নে, নে, গিন্নিপনা করতে হবেনা। সারা বছর ত গিন্নিপনা করিসই, এখন বুড়ী পিসী এসেছে, দিনকয়েক ছুটি নে।"

সুপর্ণা এতক্ষণে কথা বলিল, "আচ্ছা, এইবার গিয়ে আপনি খানিক শুয়ে নিন্। আর যেটুকু করবার আছে, তা আমরা করছি। আটটা ন'টার আগে ত আর যাওয়া হবেনা, ঘণ্টা দুই তিন ঘুমিয়ে নিতে পারবেন।"

পিসীমা চলিয়া যাইতেই অমিতা ধপ্ করিয়া একটা টুলের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল "বকছিলাম বটে, কিন্তু এইটুকু ঘুমিয়ে নিতে না পারলে, আমাকে সারা দিন বড়ই কাবু হয়ে থাকতে হত।"

সুপর্ণা দই সন্দেশের হাঁড়িগুলি জাল-আল্‌মারাতে তুলিতে তুলিতে বলিল, "সে আর বল্‌তে, যা পার্টি হত তা আর কহতব্য নয়। নাও, সব ত হল, এখন ইন্দুদের মোটরটা যথাসময়ে এলে আর কিছু দুঃখ থাকেনা।"

অমিতা বলিল,"এখন সুদর্শনবাবু গিয়ে ঘর পরিষ্কার করা, জল তোলান প্রভৃতি করতে ভুলে না যান, তাহলেই হয়।"

সুপর্ণা বলিল, "তিনি ত আর ক্ষ্যাপেন নি।"

অমিতা শ্লেষের সুরে বলিল, "ক্ষেপতে বড় কিছু বাকিও নেই।"

সুপর্ণা বলিল, "আচ্ছা, ক্রমাগত একটা বাজে কথা repeat করে তুই কি সুখ পাস্ বল্ ত?"

অমিতা বলিল, "বাজে হলে বল্‌তে যাব কেন? তুমি ছাড়া সবাই স্বীকার করবে যে our young doctor is madly in love."

সুপর্ণার মুখ অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হইয়া গেল, সে বলিল, "বল, তোমাদের বলে কোন সুখ হয় ত বল।" সে চাবি বন্ধ করিয়া হন্‌হন্ করিয়া উপরে চলিয়া গেল। "এই সু, রাগ করলি, শোন্ শোন্," বলিতে বলিতে অমিতা তাহার পিছনে ছুটিল।

দরজার কাছে তাহাকে ধরিয়া বলিল, "অত ক্ষেপে যাবার কি হয়েছে শুনি?"

সুপর্ণা বলিল, "তোমাদের love ছাড়া আর কিছু শুনতে ভাল লাগেনা, আমার ওটাই শুনতে সব চেয়ে আপত্তি।"

অমিতা বলিল, "কেন তুই কি nun হবি যে loveএর নামে তোর এত রাগ?"

সুপর্ণা বলিল, "nun না হলেই যে সারাক্ষণ moon-struck হয়ে থাকতে হবে, তার কোনো কথা আছে?"

অমিতা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "ইস্, দেখব গো দেখব, এই বছরের December মাসের মধ্যে তুমি যদি আমাদের চেয়েও বেশী moon-struck না হও, ত আমার নামে কুকুর পুষো। ৫০৲ টাকা বাজি রইল আমার।"

সুপর্ণা বলিল, "আচ্ছা, ৫০৲ টাকা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা করে রাখিস্, নইলে তোর যে খরচে হাত, দরকার মত পাওয়া যাবেনা।"

সুপর্ণা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, অমিতাও পিছন পিছন ঢুকিল। বলিল, "ঝগড়া এখন রাখ্ দেখি, তার চেয়ে কি পরে যাবি, কাপড়-চোপড় সব বার করে রাখ্। তার পর স্নানটা সেরে নে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ত আটটা বেজে যাবে। ইন্দুরা এসে পড়লে আর দেরি করা উচিত হবেনা।"

সুপর্ণা কাপড়ের আলমারীর চাবি খুলিতে খুলিতে বলিল, "আমার আর কতক্ষণই বা লাগবে? তোমাদের মত রং বাছতে পাঁচ ঘণ্টা কেটে যাবেনা ত?"

অমিতা বলিল, "আজ তোকে রঙীন কাপড় পরতেই হবে। কি সব জায়গায় বিধবার মত শাদা কাপড় পরে বেড়াস, দেখলে হাড় জ্বালা করে।"

সুপর্ণা বলিল, "তা করুক হাড় জ্বালা। কোথাও যখন পরিনা, তখন আজই বা পরতে যাব কেন?"

অমিতা দেখিল জেদ করিতে আরম্ভ করিলে, সুপর্ণারও জেদ চড়িয়া যাইবে। সে অন্য পথ ধরিল, বলিল, "সেবার জন্মদিনে বাবা আমাদের দুজনকে একরকম শাড়ী দিলেন, তুই একবারও পরলিনা, বাবা সেদিন দুঃখ করছিলেন। চল্‌না ভাই আজ সেইটা পরে। বাগানবাড়ীতে শাদা কাপড় পরে সারাদিন ঘুরলে সে কাপড়ের যা শ্রী হবে তা বলে কাজ নেই।"

কাপড়-চোপড় মলিন বিশ্রী হইয়া যাওয়াটা সুপর্ণার কাছে একটা অত্যন্ত ঘৃণার জিনিষ ছিল। অমিতার এই যুক্তিটা কাজে কাজেই তাহার মনে লাগিল, বলিল, "আচ্ছা চল্, যদিও জগীপেড়ে নীলাম্বরী শাড়ীপরা আমাকে কেউ চিনতেও বোধ হয় পারবেনা।"

অমিতা বলিল, "তা নাই বা পারল? বেশ একটা sensation হবে এখন। কে একজন সুন্দরী তরুণী এসেছেন, কেউ তাঁকে চিন্‌তে পারছেনা।"

সুপর্ণা হাসিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। আটটা দেখিতে দেখিতে বাজিয়া গেল। স্নান করা, চা খাওয়া এবং সাজ-সজ্জা করা, তিনটিই সময়সাধ্য ব্যাপার—বিশেষ করিয়া তরুণী নারীর পক্ষে। কাজেই নিমন্ত্রিতা ইন্দু যখন আসিয়া হাজির হইল, তখনও অমিতার ঘরের দরজা বন্ধ।

ইন্দু অমিতার সহপাঠিনী, সুদর্শনের সঙ্গেও তাহার কিছু কিছু আলাপ আছে। সে এক ছুটে উপরে উঠিয়া আসিয়া অমিতার দরজায় এক ধাক্কা দিয়া বলিল, "এই মেয়ে, কি এত কনে সাজছিস্ যে এখন অবধি শেষ হলনা? আমি দেখ্‌ছি গার্গীকে নিয়ে এলেই পারতাম।"

অমিতা ভিতর হইতে বলিল, "কনে আমি কেন সাজতে যাব, সে যার সাজবার সেই সাজবে, পাশের ঘরে দেখ্‌না গিয়ে। তা তুই গার্গীকে নিয়েই আয় না, সে বেচারী হয় ত হতাশ হয়ে বসে আছে।"

ইন্দু বলিল, "আচ্ছা, আমি তাহলে চল্লাম তাকে আনতে, তুই যেন আরো দু ঘণ্টা দেরি করিস্‌না।"

সুপর্ণার ঘরের দরজা ভেজান, ভিতর হইতে বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হইলনা। ইন্দু সিঁড়ির দিকে যাইতে যাইতে দরজায় একটা টোকা মারিয়া বলিল, "এ মহলের খবর কি? এখনও উদ্যোগ-পর্ব্বই চল্‌ছে?"

সুপর্ণা আসিয়া দরজাটা খুলিয়া দিয়া বলিল, "অত সময় আমাদের থাকেনা ভাই, হব ত কাঠখোট্টা ডাক্তারণী, তাদের কি আর তিন ঘণ্টা ধরে toilette করা পোষায়?"

ইন্দু তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তা এমনিতেই যা হয়েছে, আরো বেশী সময় খরচ করে করলে, homicidal কাণ্ড হত। সত্যি তোকে এত সুন্দর কোনো দিন দেখিনি। পার্টির সকলের মুণ্ডু না ঘুরে যায়।"

সুপর্ণা নীলাম্বরী শাড়ীর চওড়া জরীর পাড়টা হাত দিয়া সোজা করিতে করিতে একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, "কি করব ভাই, অমিতা কিছুতেই ছাড়লনা। তা ছাড়া সারা দিন শাদা কাপড় পরে মাঠে ঘাটে ঘুরলে কাপড় বড় বেশী নোংরা হয়ে যেত, সে ভয়ও আছে।"

ইন্দু বলিল, "তা পরেছিস্ বেশ করেছিস্, তার জন্যে আবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি? আচ্ছা, আমি গিয়ে গার্গীকে নিয়ে আসি, তুই অমিতাকে তাড়া দিয়ে ঘর থেকে বার কর।"

ইন্দু চলিয়া গেল। সুপর্ণা ঘরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষগুলি কুড়াইয়া গুছাইয়া রাখিল। ঘর এলোমেলো করিয়া ফেলিয়া যাওয়ার জন্য অমিতাতে এবং তাহাতে দিনে দশবার করিয়া ঝগড়া হইত। অমিতা বলিত, "আমার ঘরটা ত সাহেবদের দোকানের show window নয় যে একটা জিনিষ এদিক-ওদিক হলে চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে? মানুষের ঘরে একটু human touch থাকবেনা?"

সুপর্ণা বলিত, "Human আর বোলোনা, animal touch বলতে পার। ঘর ত নয় যেন খোঁয়াড়।"

অমিতা সাজ-সজ্জা শেষ করিয়া সুপর্ণার ঘরে আসিয়া বলিল, "নে হয়েছে? পিসীমা ত হাল ছেড়ে দিয়ে নীচে চলে গেছেন। কিন্তু দুটো গাড়ীতে ত কুলোবেনা ভাই?"

সুপর্ণা বলিল, "তা ত কুলোবেই না। আমরা মেয়েরাই ত চারজন। গার্গী যদি মাধবকে নিয়ে আসে, তাহলে পাঁচজন। তার উপর পিসীমা আছেন, শিবু নিবু আছে, জ্যাঠামশায় আছেন। চাকরও একজনকে নিতে হবে, ফরমাশ খাটবার জন্যে। একটি গাড়ী ত ভরে যাবে হাঁড়ি, ডেক্‌চিতে, চাকরটা বড় জোর তাতে যেতে পারবে। আমাদের একটা ট্যাক্সি করতে হবে।"

এমন সময় নীচে একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেল। অমিতা জানলার দিকে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "ইন্দুরা ফিরে এল এর মধ্যেই? ওমা, না ত, এ কার গাড়ী?"

সুপর্ণা তাহার পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া বলিল, "বাবা, এ যে বিরাট ব্যাপার। Dodge Sedan আবার কোথা থেকে এল?"

বাহির হইতে চাকর ডাকিয়া বলিল, "দিদিমণি, চিঠি নিয়ে এসেছে।"

অমিতা চিঠিখানা হাতে করিয়া পড়িল, "Miss

Suparna Mitra". ওরে বাবা, গাড়ীটা তোরই জন্তে এসেছে। কোন Prince Charming পাঠিয়েছে জানিনা। খুলে দেখব?"

সুপর্ণা বলিল, "নে, নে, ন্যাকামী করতে হবেনা, দেখনা খুলে।"

অমিতা চিঠি খুলিয়া পড়িল। সুদর্শনই গাড়ীটা পাঠাইয়াছে। যে ভদ্রলোকের বাগানবাড়ীতে তাহারা পিক্‌নিক্ করিতে যাইতেছে, গাড়ীখানা তাঁহারই। কার্য্যোপলক্ষে তিনি গয়া চলিয়া গিয়াছেন, গাড়ীখানাও সুদর্শনকে ব্যবহার করিতে অনেক করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। সুদর্শন তাহাদের জন্ত তাই গাড়ীটা পাঠাইয়া দিয়াছে।

ইন্দুও এই সময় গাড়ীতে করিয়া গার্গী এবং তাহার বালক ভ্রাতা মাধবরাওকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ট্যাক্সি ডাকিবার আর দরকার হইলনা। সুদর্শনের পাঠান গাড়ীতে মেয়েরা সকলে চড়িয়া বসিল। বাড়ীর গাড়ীতে তারণবাবু, তাঁহার ভগিনী ও তাঁহার দুই পুত্র চলিলেন। আর একখানি গাড়ীতে সমস্ত খাবার চলিল, একজন চাকরের জিম্মায়।

বাগানবাড়ীটা বেশ খানিক দূরে। মোটরে যাইতেই এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। দূর হইতে গেটের কাছে দুই তিনটি যুবক মূর্ত্তি দেখিয়া অমিতা বলিল, "বাঁচা গেল, সুদর্শনবাবু এসে পৌছতে ভুলে যাননি।"

(১৫)

সুপর্ণারা গাড়ী হইতে নামিবামাত্র সুদর্শন হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। অমিতা বলিল, "দেখুন, শুধু আমাদের দেখে ভয় পেয়ে যাবেননা, খাবার জিনিষগুলো ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই পৌছবে। এ গাড়ীটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠ্‌লনা, তাই, নইলে একসঙ্গেই তিনটে গাড়ী ছেড়েছিল।"

সুদর্শন বলিল, "খাবারের গাড়ীটা ভাগ্যে আগে এসে পৌছয়নি, তা হলে আমি ত একেবারে পিক্‌নিকের সব আশা ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলে যেতাম।"

অমিতা বলিল, "ইস্, ডাক্তার হলে কি হয়? Pretty speeches আপনার জিবের ডগায় লেগেই আছে।"

সুপর্ণা এ-সব রসিকতায় যোগ না দিয়া, গার্গীকে লই অগ্রসর হইয়া চলিল। তাহার অভিনব সুসজ্জিত মূর্ত্তি দিকে সুদর্শন কেমন একটা গভীর দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছি তাহাতেই তাহার মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল যে চিন্তাগুলিকে সে প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলিয়া রাখিতে চায়, তাহারা যেন ভেদ করিয়া দুর্গ আক্রমণ করে, ভিতরে তাহারা আসিবেই, জায়গা জুড়িয়া থাকিবেই। পৃথিবী লোকে না জানিয়া তাহাকে এক নিষিদ্ধ পথে ঠেলি দিতেছে, তাহার নিজের মনও কি বিশ্বাসঘাতকতা আরম্ভ করিল? এইভাবে যদি হাল ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহা হইলে সুপর্ণার গতি কি হইবে?

সুপর্ণাকে হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া অমিতা তাহার পিছন পিছন ছুটিতে ছুটিতে বলিতে লাগিল, "এই পালাচ্ছিস্ কোথায়? তোকে কি বাঘে তাড়া করেছে?"

সুদর্শন তাহাদের সঙ্গেই আসিতেছিল, সুপর্ণার দূরে সরিয়া যাইবার চেষ্টাটা সে বুঝিয়াছিল। এই চেষ্টার মূলে কি আছে, তাহাও যেন খানিকটা বুঝিতে পারিয়াছিল। প্রেমের দেবতার এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, যাহাদের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়, তাহারা কথার সাহায্য না লইয়াই কেমন করিয়া পরস্পরের মনকে চিনিতে পারে। সহস্র আড়াল রচনা করিয়া যে কথাটিকে গোপন রাখিবার প্রয়াস হয়, সেই কথাটিই দর্পণের প্রতিবিম্বের মত উজ্জলভাবে প্রকাশ পায়।

সুদর্শন বলিল, "চলুন, বাগানবাড়ীটা দেখে আসবেন। আমি আনাড়ী হাতে যতটা পারি ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু নিশ্চয়ই তাতে অসংখ্য খুঁৎ থেকে গিয়েছে।"

সকলে মিলিয়া বাগানবাড়ীটার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। বাগানটা বেশ বড় এবং বেশ সুরক্ষিত, বাগানবাড়ীটা তত বড় নয়। বাগানের মালিক এখন বৃদ্ধ এবং রোগে শোকে অভিভূত, তবু অর্থের জোর আছে বলিয়া এ স্থানটি একেবারে অযত্নে নষ্ট হয় নাই। বাড়ীটি দোতলা, নীচে একটি হল, উপরে একটি হল, মস্ত বড় একটি গাড়ী-বারান্দার ছাদ। ইহা ছাড়া স্নানের ঘর প্রভৃতি কয়েকটি আছে। হলগুলি খুব বহুমূল্য আসবাবপত্রে সজ্জিত। দেয়ালের গায়ে বড় বড় আয়না হইতে প্রভাতের সূর্য্যালোক

ছিটাইয়া পড়িতেছে। দেশী ও বিলাতী অনেকগুলি তৈল-চিত্রও রহিয়াছে। অধিকাংশই নারীমূর্ত্তি, কয়েকখানির উপর আবরণ টানা রহিয়াছে। অমিতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া ইন্দুকে একটা চিমটি কাটিল, সুদর্শন সঙ্গে ছিল বলিয়া মুখে কিছু বলিলনা।

উপরে নীচে, দুইটি ঘরেই বহুমূল্য কার্পেট পাতা ছিল, সুদর্শন দরোয়ানদের বলিয়া নীচের ঘরের কার্পেটটা তুলাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার বদলে সেখানে শুধু শতরঞ্চি পাতা। অমিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "এই ঘরে খাওয়া দাওয়া হবে, আর আমরা দুপুরে নরক গুলজার করব, তাই কার্পেট আর রাখলামনা, কেন মিথ্যে পরের জিনিষ নষ্ট করব। উপরের ঘরটা যেমনকে তেমন সাজান রইল, আপনারা দুপুরে use করতে পারবেন।"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার দলবল কই সব? কাউকে ত দেখছি না?"

সুদর্শন বলিল, "সবাই এখনও এসে পৌঁছয়নি, ছ' সাতজন এসেছে, তারা বাগানে ঘোরাঘুরি করছে। চলুন না আপনারাও এখনি ঘরের কোণে ঢুকে বসে কি হবে?"

এমন সময় বাগানের একজন মালী ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে আরো দুখানি গাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং একজন বাবু সুদর্শনের খোঁজ করিতেছেন। অমিতা বলিয়া উঠিল, "যাক, পিসীমার দল এসে পড়েছে, চল দেখা যাক, খিচুড়ী মাংসের হাঁড়িগুলো সংখ্যায় ঠিক আছে কি না।"

সুপর্ণা বলিল, "সেগুলো ত আর গাড়ীতে বসে বসে কেউ খেয়ে ফেলতে পারেনা?"

ইন্দু বলিল, "গাড়ী থেকে পড়ে ত যেতে পারে?"

গেটের কাছে সবাই গিয়া আবার উপস্থিত হইল। তারণবাবু দলবল লইয়া নামিয়া পড়িলেন। খাবার বোঝাই গাড়ীখানা একেবারে বাড়ীর সামনে চালাইয়া আনা হইল, তাহার পর চাকরবাকররা হাঁড়ি ডেক্‌চী সব বহন করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। হলের পাশে ছোট একটি কামরা, তাহাতেই এখন সব ঠাসিয়া রাখিয়া, তালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অমিতা বলিল, "নাও, এখনকার মত কাজ হয়ে গেল, এখন নিশ্চিন্ত মনে বেড়ান যেতে পারে।"

সকলে মিলিয়া বাগানে বাহির হইয়া পড়িল। তারণবাবু সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবা এলেন না?"

সুদর্শন বলিল, "তিনি আসবেন কিছুক্ষণ পরে। এত সকাল সকাল তাঁকে বার করা যায়না।"

বেড়াইতে বেড়াইতে সুদর্শনের বন্ধুদেরও সন্ধান মিলিল। মেয়েদের সহিত পরিচয় তাহাদের করিয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু আলাপ বিশেষ জমিলনা। সাধারণ বাঙালী যুবক, নিঃসম্পর্কীয়া মেয়ের সঙ্গে সহজভাবে ব্যবহার বা আলাপ করিতে একেবারেই অনভ্যস্ত। সুতরাং কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আবার সবাই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তারণবাবু বেশী ঘোরাঘুরি করিতে পারেননা, তিনি একটু পরেই বাগানবাড়ীতে ফিরিয়া চলিলেন। সুদর্শনকে বলিলেন, "আমি ঘরেই বসি গিয়ে, তোমার বাবা এলে আলাপ করা যাবে।"

পিসিমা অত শীঘ্র ঘরে ঢুকিবার পক্ষে ছিলেননা, তবে তিনি সারাক্ষণ মেয়েদের পিছনে ঘুরিলে তাহারা মন খুলিয়া স্ফূর্ত্তি করিতে পারিবেনা, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতে-ছিলেন। অমিতাদের সঙ্গে খানিকটা হাঁটিয়াই তিনি বলিলেন, "আমি এই বেঞ্চিটাতে একটু বসি বাপু, যা তোরা ঘোড়ার মত ছুটিস্, আমি পেরে উঠি না তোদের সঙ্গে, আমি আস্তে আস্তে নিজের মত বেড়াব এখন।"

ভাইঝির তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিলনা, তাহারা পিসীমাকে ফেলিয়া রাখিয়া কোলাহল করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুদর্শন মেয়েদের সঙ্গেই ছিল, খানিকটা কর্ত্তব্যের খাতিরে, কারণ সেই নিমন্ত্রণকর্ত্তা, এবং অনেকটাই প্রাণের টানে, কারণ সুপর্ণাকে চোখের আড়াল করিতে তাহার কিছুতেই ইচ্ছা করিতেছিলনা। কিন্তু নিজের যুবক বন্ধু-গুলিকে একেবারে চরিয়া খাইতে ছাড়িয়া দিলে, কিঞ্চিৎ দুর্নাম রটিবার সম্ভাবনা ছিল, তাই কি উপায়ে সবাইকে আবার একত্র করা যায়, সে ক্রমাগত সেই ভাবনা ভাবিতে-ছিল। বাগানের মাঝখানে একটি সুন্দর পাথরে বাঁধান বসিবার জায়গা দেখিয়া সে বলিল, "এইখানটাতে বসে বেশ গানবাজনা হতে পারে, এখনও ত রোদ বেশী হয়নি।"

অমিতা বলিল, "সত্যি, এই গার্গী, তোর বীণা কোথায় রেখে এলি?"

ইন্দু বলিল, "সেটা ত আর কাঁধে করে বেড়ান যায়না? সুদর্শনবাবুকে তাহলে কষ্ট করে সেটা নিয়ে আসতে হবে।"

সুদর্শন বলিল, "স্বচ্ছন্দে। সেই সঙ্গে শ্রোতার দলকেও জোগাড় করে নিয়ে আসব।"

সুদর্শন দ্রুতপদে চলিয়া গেল। খানিক পরে অমিতা হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল, "হ্যাঁ রে সু, আমার চাবিটা তোর কাছে নাকি?"

সুপর্ণা বিস্মিত হইয়া বলিল, "তোর চাবি আমার কাছে কেন থাকবে রে? হারিয়েছিস্ নাকি?"

অমিতা ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, "ওমা, কি কাণ্ড হল! ঐ চাবীর তাড়াতে ত সব। কোথায় ফেল্লাম? বাগানে যদি ফেলে থাকি তাহলেই হয়েছে।"

সুপর্ণা বলিল, "দোতলার হলঘরে ত ব্যাগ, স্কার্ফ, পাখা, কত কি রেখে এলি. সেই সঙ্গে রাখিস্নি ত?"

অমিতা ব্যগ্রভাবে বলিল, "একটু দেখে আয় না ভাই, আমি ততক্ষণে বাগানটাতে একটু খুঁজে দেখি—না পেলে একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।"

সুপর্ণা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া পড়িল। চাবী হারাইলে বাস্তবিকই অসুবিধার সীমা থাকিবেনা, এমন কি আজ খাওয়াও বন্ধ, কারণ যে ঘরে খাবার তালা দিয়া রাখা হইয়াছে, সেই ঘরের চাবীও অমিতার চাবীর তাড়াতেই ছিল। সুপর্ণা চোখের আড়াল হইতেই অমিতা হি হি করিয়া হাসিয়া, গড়াইয়া পড়িল।

গার্গী মারাঠী মেয়ে হইলেও ইহাদের কল্যাণে বেশ বাংলা শিখিয়া গিয়াছিল। সে অমিতার পিঠে একটা কিল মারিয়া বলিল "দুর বাঁদরী, শুধু শুধু হেসে মরছিস্ কেন?"

অমিতা ব্লাউসের ভিতর হইতে হারান চাবীর তাড়া বাহির করিয়া দেখাইল। ইন্দু বলিল "তবে সু বেচারীকে wild goose chaseএ পাঠালি কেন?" অমিতা বলিল "Wild goose না গো, একেবারে নন্দনের পারিজাত।"

ইন্দু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সুদর্শনবাবুর সঙ্গে বখ্শিশের ব্যবস্থা আগে করে নিয়েছিস্ ত?" তিনজনে মিলিয়া মহা হাসাহাসি লাগাইয়া দিল।

সুপর্ণা যথাসম্ভব দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিয়া, বাগানবাড়ীতে গিয়া উঠিল। নীচের তলায় পৌঁছিয়া দেখিল, সুদর্শনের বাবা আসিয়া পড়িয়াছেন, তারণবাবুর সঙ্গে বেশ জমাইয়া গল্প সুরু করিয়াছেন। ভদ্রলোক বয়সে না হইলেও রোগে অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছেন, লোকে সাহায্য ভিন্ন চলাফেরা করিতে পারেননা। একটা ব আরাম-চেয়ারে শাল মুড়ি দিয়া বসিয়া আছেন।

সুপর্ণা ঘরে ঢুকিবামাত্র তিনি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাস করিলেন, "এইটি কি আপনার মেয়ে, না সুপর্ণা?"

তারণবাবু হাসিয়া বলিলেন "এইটি সুপর্ণা। আমার মেয়েও আছে কাছাকাছি কোথাও।"

সুপর্ণা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "চিরসুখী হও মা, আত্মীয়স্বজন সবাইকে সুখী কর।"

সুপর্ণা সেখানে আর না দাঁড়াইয়া সরিয়া পড়িল। বৃদ্ধ তাহার কথা শুনিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। সুদর্শন ভিন্ন আর কেই বা তাঁহাকে তাহার খবর দিতে যাইবে? সুপর্ণার মুখ উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিল।

দোতলার হলে ঢুকিয়াই সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সুদর্শন একলা সেখানে দাঁড়াইয়া কি যেন গভীর আগ্রহ সহকারে দেখিতেছে। সুপর্ণার পায়ের শব্দ সে শুনিতে পায় নাই। সুপর্ণা আর একটু অগ্রসর হইতেই দেখিল সুদর্শনের হাতে তাহারই জরপুণী ছাপা রেশমের স্কার্ফটা, মোটরে চড়িবার সময় সর্ব্বদা সে এটা ব্যবহার করে।

নিজের উপস্থিতি কি ভাবে জানাইবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতেছে, এমন সময় সুদর্শন এক কাণ্ড করিয়া বসিল। স্কার্ফটা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া, সেটাকে চুম্বন করিল। তাহার পর হয় ত সুপর্ণার গভীর নিঃশ্বাসের শব্দেই চকিত হইয়া ফিরিয়া তাকাইল।

মিনিট খানিক কাহারো মুখে কথা নাই। সুপর্ণাই যেন অপরাধী, তাহার মুখ শ্বেতপদ্মের মত শুভ্র. ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে. চোখ তুলিয়া সুদর্শনের দিকে চাহিবারও তাহার ভরসা হইতেছেনা। সুদর্শনের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা, বিশেষ অপ্রতিভ বা লজ্জিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়না,—কেবল কি ভাবে ইহার পর কথা আরম্ভ করিবে তাহাই যেন ভাবিতেছে।

তবু সুপর্ণাই আগে কথা বলিল। অনেক কষ্টে গলাটা পরিষ্কার করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "অমির চাবীর তাড়াটা কি এখানে আছে? সে সেটা খুঁজে পাচ্ছেনা।"

সুদর্শন বলিল, "দেখিনি ত। আমি বীণা নিয়ে যেতে এসে আটকে পড়েছিলাম।"

সুপর্ণা আর কথা বলিতেছেনা দেখিয়া সুদর্শন বলিল, "দেখুন, ভালই হল না কি এক দিক দিয়ে? যা বল্‌তে প্রাণপণে চাইছিলাম, অথচ যা বলবার উপায় আর ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলামনা, তা নিজে থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ল। আমি কাটখোট্টা ডাক্তার মানুষ, সুন্দর করে কিছুই বলতে পারবনা, কিন্তু feel যা করছি, তার চেয়ে বেশী করে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিও feel করতনা। সেইটাই কি আসল জিনিষ নয়?"

সুপর্ণা যেন নিজের অজ্ঞাতেই শিহরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার সম্মুখে নন্দনের ঐশ্বর্য্য রূপ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, কিন্তু হায়, কোথায় তাহার অধিকার, ইহা উপভোগ করিবার? ভগবান তাহাকে ত সুখের রাজ্য হইতে চিরনির্ব্বাসন দিয়া রাখিয়াছেন। সংসার ও সমাজের নিয়মে, এ সকল কথা শুনিবারও তাহার অধিকার নাই, কি উত্তর দিবে সে?

সুদর্শন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কিছুই বলবার নেই? আমার কথার একটা উত্তরও কি পেতে পারি না?"

সুপর্ণার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। অস্ফুট আর্ত্তনাদের সুরে বলিল, "আমি কিছু বল্‌তে পারবনা, দয়া করে আমায় কিছু জিগগেষ করবেননা।"

কিন্তু তাহার মনের কথা এবং মুখের কথার দ্বন্দ্ব ধরা পড়িয়া গেল, তাহার ভাবভঙ্গীতে, তাহার গলার স্বরে। সুদর্শন আসিয়া তাহার পাশে বসিল। মুখ হইতে জোর করিয়া হাতের আবরণ সরাইয়া দিল। একখানি হাত নিজের দুই হাতের ভিতর লইয়া, গভীর আবেগের স্বরে বলিল, "কেন সুপর্ণা? আমার কি কোনো আশা নেই? তবে তাই আমায় বলে দাও।"

সুপর্ণার দুই চোখ ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তাহার অশ্রু-আকুল দৃষ্টি সুদর্শনের প্রাণে নব আশা জাগাইয়া তুলিল। সে সুপর্ণার হাত ছাড়িয়া দিয়া, সবলে তাহাকে নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল, বলিল, "আমি জানি, তুমি আমায় ভালবাস, কেন সে কথা আমায় জানতে দিতে চাওনা? আমি তোমার যোগ্য নই, তা আমি জানি। কিন্তু যোগ্য করে নাও আমাকে। তোমাকে ছাড়া আমার কিছুতেই চল্‌বেনা।"

সুপর্ণা প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল। তাহার যেন মূর্চ্ছা আসিতেছিল। উঠিয়া পড়িয়া, দরজার কাছে সরিয়া দাঁড়াইল, কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি কাউকে ভালবাসতে পারিনা।"

সুদর্শন বিস্মিত হইল, আবার তাহার কাছে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন এ কথা বল্‌ছ? তোমাকে দেখে এ কথা কেউ বিশ্বাস করবেনা। হতে পারে, আমায় তুমি ভালবাসনা; আমি নিজের মনের আগ্রহে যা নয়, তাই ভেবে রেখেছি। সেই কথাই বল।"

সুপর্ণা নীরবে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। সুদর্শন চাহিয়া দেখিল তাহার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সে স্কার্ফটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, বলিল "এইখানে বসে একটু বিশ্রাম কর, আমি চলে যাচ্ছি। কেউ তোমায় disturb করবেনা, আমি ওদের আটকে রাখব, কিছু একটা বলে। তোমাকে অকারণে কষ্ট দিলাম, ক্ষমা কোরো। কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা হেঁয়ালীই থেকে গেল,—আমি পরিষ্কার করে কিছু বুঝলামনা।"

সে বীণাটা তুলিয়া লইয়া নীচে নামিয়া গেল। সুপর্ণা সেই কার্পেটমণ্ডিত মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের নিভৃত কোণে যে কথা অতি যত্নে সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, নিজের কাছেও যাহা সে স্বীকার করিতে চাহিতনা, আজ ধ্বংসের আগুনে তাহা বড় উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিল। হারাইবার ক্ষণেই সে জানিল, কি সে হারাইতেছে, জীবন তাহার কতখানি শূন্য হইতে বসিয়াছে। সুদর্শনকে এত গভীর ভাবে যে সে ভালবাসিয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া আজ সে প্রথম অনুভব করিল। প্রেমহীন জীবন নারীর কাছে শ্মশানেরও চেয়ে ভয়াবহ, তাহার ভীষণ রূপ মানসদৃষ্টিতে দেখিয়া ভয়ে, দুঃখে, নিরাশায় তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল।

পিক্‌নিক সেদিন মোটেই জমিলনা। কোনোমতে খাওয়া দাওয়া সারিয়া, সুপর্ণার অসুখের অজুহাতে সকলে রোদ পড়িবার আগেই বাড়ী ফিরিয়া চলিল। আসল ব্যাপার

আনিল খালি দুইটি মানুষ। অমিতা খানিকটা আন্দাজ করিল, তবে চাপিয়া গেল, মুখে বলিল, "দুটা এমন delicate, একটু রোদে হেঁটেছে কি অমনি sunstroke হয়ে মরতে বস্‌ল। এই শরীর নিয়ে মেয়ে ডাক্তার হবেন।"

গার্গী ও ইন্দু কিছু হয় ত বুঝিল, কিন্তু তাহারাও চুপ করিয়া গেল।

মেয়েদের মোটরে উঠাইয়া দিতে দিতে, সুদর্শন বলিল, "কেবল কষ্ট দেওয়াই সার হল, মাফ করবেন।"

যাহাকে বিশেষ করিয়া শুনাইয়া এ কথা সে বলিল, সে নির্জীবের মত গাড়ীর কোণে পড়িয়া ছিল, একবার মাথা তুলিয়া তাকাইল মাত্র। কিন্তু তাহার দৃষ্টির কোনো অর্থ বোঝা গেলনা। (ক্রমশঃ)

বর্ত্তমান যুগ ও ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা

শ্রীমহেশচন্দ্র রায়

দুর্ব্বল-সবলের সমস্যাটা আজকের সমস্যা নয়, সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই ও সমস্যার উদ্ভব; আর ওর মীমাংসাও এ পর্য্যন্ত এক ভাবেই হয়ে এসেচে—অর্থাৎ, দুর্ব্বলকে সবল পদানত করেচে, নিজের স্বার্থ-সাধনের উপায় এবং উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেচে, এবং ধ্বংসও করেচে। জীবাণু-জগৎ থেকে সুরু ক'রে সভ্য-মানুষের জগৎ পর্য্যন্ত বলীয়ানের এই নীতিই নির্ব্বিচারে অনুসৃত হয়ে চলেচে। মোট কথা, বলবান্ চিরকাল ধ'রেই আছে; আর দুর্ব্বল চিরকালই তার হাতে মার খেয়ে এসেচে,—তার পায়ের কাছে অসহায়ের মত আশ্রয় ভিক্ষা করেচে।

এই বিশ্ব-প্রকৃতির কাছেও আবার একদিন সব মানুষই ছিল অসহায়। প্রাকৃতিক শক্তির নানা রুদ্র প্রকাশে মানুষ বারে বারে হতবুদ্ধি হয়েচে; কখনো তার রাক্ষসী মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে কোথায় পালাবে ভেবে পায়নি, আবার কখনো তার দুর্জ্জের লীলার পানে তাকিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েচে। প্রবলের কাছে মার খেয়েও যেমন তাকেই স্তব-স্তুতি করা ছাড়া দুর্ব্বলের গতি নেই, প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষেরও তেমনি উপাসক না হয়ে পথ ছিল না। ভীষণকে সে ভীত হয়ে আর্ত্তস্বরে ত্রাণের প্রার্থনা জানিয়েচে, আবার বিপুল বিশালের সুমুখে সম্ভ্রমে নত হয়েচে।

মানুষের মনে প্রথম ধর্ম্মবোধ জাগরণের ইতিহাস হয় ত ওই।

হয় ত সবটাই ভয় নয়, বিস্ময়ও হয় ত মানুষকে অজ্ঞেয়ের দিকে আকর্ষণ করেচে। হয় ত শুধু বিস্ময়ও নয়,—প্রাকৃতিক জগতের আনন্দময় রূপও হয় ত তাকে পুলকিত করেচে। শুধু ভাম ভয়ানককে সে দেখেনি, শুধু অপরূপ রহস্যময় বিস্ময়কেই প্রত্যক্ষ করেনি, সেই সঙ্গে কখনো কখনো পুলক-মগ্ন হয়ে জ্যোতির্ম্ময় আনন্দরূপকেও দেখেচে। আজ আমরা তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলচি মানুষের শক্তি-হীনতা, অজ্ঞান এবং অন্ধ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভগবানের, দেবতার জন্ম হয়েছিল।

প্রশ্ন হয় ত জাগে, মানুষ আজ শক্তিহীনতা, অজ্ঞান আর অন্ধ বিশ্বাসের হাত থেকে কতটুকু মুক্তি পেয়েচে?

যাই হোক, মানুষ সংসারে বাঁচতেই এসেচে। ভয়ালুতা জীবনের পরিপন্থী, সুতরাং জীবন-ধর্ম্মের মধ্যেই ভয়ের প্রতি বিরুদ্ধতা আছে। মানুষ ভয় পেয়েচে সত্য, কিন্তু ভয়কে সে জয় করবার দুর্নিবার পণ করেচে, এটা আরো সত্য।

মানুষ বুদ্ধিমান্। বুদ্ধির দ্বারাই কিন্তু সে ভয়কে জয় করেচে। আর আজ বুদ্ধির জোরেই সে বলচে যে ভয়ানককে একদিন আমরা অন্ধকারে দেখে কাঁপছিলাম, বুদ্ধির আলোকে দেখচি সেটা আমাদের চোখের ধাঁধা মাত্র। বুদ্ধির জগতে আজ আছে সত্য, সেখানে ভয়ও নেই, রহস্যও নেই। সত্যকে আর ভয় কিসের?

ইন্দ্র বরুণ Zeus Neptune সবই ছিল অন্ধকারের ইন্দ্রজাল, সে সব লুপ্ত হয়েচে। দেবপূজক মানুষ আজ কোথায় পাওয়া যাবে। যে মানুষ বিজ্ঞানাগারের মাঝে প্রকৃতিকে শৃঙ্খলিত করবার বিদ্যা আয়ত্ত করেচে, সে মানুষের আবার ভগবান্ কি, তার কাছে 'দেবতা'র অর্থ নেই।

পূর্ব্বকালে অর্থাৎ অজ্ঞানের যুগে—(সে যুগের অন্ধকার কি আজ ছিন্ন মেঘের মত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে নেই ?) —মানুষ ত্রিবিধ দুঃখের তাড়নায় দেবতার কাছে কত কান্নাই কেঁদেচে। আজ সেই কান্নার কথায় মানুষের হাসি পায়। দুঃখ কি তবে আজ নিঃশেষিত হয়েচে! দিকে দিকে কোটি কোটি মানবের বুকফাটা কান্নায় আকাশ যে বধির হয়ে গেছে।—তবে ?

তবে ?—মানুষ কি আজও অবুঝ শিশু রয়েচে যে আছাড় খেয়ে মাটিকে লাথি মারবে ? বৃষ্টির জল পায়নি' বলে সে যাবে ওই মেঘের কাছে—যা হচ্চে H_2O, যা গণিতক নিয়মে চলাফেরা করতে এবং বর্ষণ করতে বাধ্য—প্রার্থনা জানাতে জল দাও ব'লে ? ম্যালেরিয়ার মশায় কামড়ে জ্বর করেচে বলে সে যাবে মন্দিরে ধরণা দিতে ? বসন্ত হয়েচে ব'লে যাবে শীতলার মন্দিরে জল ঢালতে ? লজ্জার কথা নয় ? মানুষের এর বাড়া অপমান আর কি-ই বা আছে !

মানুষ নিজের অন্ধতা আর অজ্ঞানকেই এতকাল পূজো দিয়ে এসেচে, তারই পায়ে এতকাল বুকের কত রক্ত ঢেলেচে সে-কথা বিংশ শতাব্দীর মানুষই কি অকস্মাৎ বুঝতে পারল ?

না, তার আগেও বুঝেচে বই কি !

আর যারা বুঝেচে, তারাই মানুষের দুর্গতিকে আরো বাড়িয়েচে, কমাবার চেষ্টা করেনি'।

সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে প্রাণ চায় না। মানুষ মানুষের ওপর এতখানি নিষ্ঠুর হ'ল কি ক'রে ? তবু এই সত্য ! হায় রে মানুষ !

বিংশ শতাব্দীর অনেক আগে থেকে মানুষ—অর্থাৎ কোনো কোনো মানুষ সত্যকে জেনেছিল। সবখানি না হ'লেও কিছু কিছু সত্যকে জেনেছিল ; আর সেই পরিমাণেই ভয়মুক্ত হয়েছিল ; অর্থাৎ অদৃশ্য দেবতার ভীতি থেকে ত্রাণ পেয়েছিল। কিন্তু অন্ধ মানুষগুলোকে সেই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রাখলে।

(অশ্রু ব্যাকুল হৃদয় আজও বার বার জিজ্ঞাসা করেচে, হায় হায়, কেন, কেন তারা এমন ক'রে মানুষের মুক্তির পথকে রোধ করল !)

বঞ্চিত রাখলে সুখের আশায়, প্রভুত্বের যে মদমত্ত সুখ, প্রবলের দুর্ব্বলকে দলিত ক'রে যে-সুখ সেই সুখের লালসায়। তারা যে-দেবতাকে মিথ্যা ব'লে জানল, সেই দেবতারই হ'ল তারা পুরোহিত। তারা অজ্ঞান মানুষকে আশ্বাস দিলে যে তারা নাকি দেবতাকে তৃপ্ত করবার উপায় জানতে পেরেচে, তাদের নিকট নাকি দেবতা তাঁর বিশেষ আদেশ জ্ঞাপন করেচেন। ত্রাণ-লোলুপ অন্ধ জনতা বুদ্ধিমান্ মিথ্যাচারীর পায়ে প্রণত হ'ল।

(মিথ্যার জয় হয় না, কে বলে ?)

কয়েকটি মানুষের সুখের লালসা সকল মানুষের পরিত্রাণকে কত যুগ রুদ্ধ ক'রে রাখল ! সেই মহাপাপের স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে দিকে দিকে জাগল কত মন্দির, কত পীঠস্থান, কত oracle, কত কি ! আর রচিত হ'ল কত পুরাণকাহিনী, কত দেবতার পাঁচালী। একটা সামান্য চন্দ্রগ্রহণকে বুদ্ধিমান কত স্বার্থ-সেবায় লাগালে : আজও হাজারো হাজারো লোক সেই মিথ্যার মোহে ঘরছাড়া হয়ে দেশান্তরে গিয়ে পথে-ঘাটে কলেরা হয়ে মরে, জলে ডুবে ম'রে, সর্দ্দি-কাসি হয়ে মরে, ভিড়ে চাপা পড়ে মরে ; কত নারী সর্ব্বস্বান্ত হয়।

অন্ধ জনতাকে মোহগ্রস্ত রেখে স্বল্পসংখ্যক গুরু পুরোহিত, সাধু-সন্ন্যাসী, দৈবজ্ঞ-জ্যোতিষী কত না সহজে উদরান্নের ব্যবস্থা করচে। প্রবলের কাছে দুর্ব্বলের নিস্তার কোথায় ? বুদ্ধিও একটা প্রচণ্ড শক্তি। সেই শক্তিকে এরা কাজে লাগিয়ে তার ফল ভোগ করবে না ?

আগে অজ্ঞ মানুষ যে-দেবতার কল্পনায় ভয়ার্ত্ত হয়েচে, প্রার্থনা জানিয়েচে, সেই দেবতা তার কোনো ক্ষতি করেনি' যা-কিছু ক্ষতি করেচে তার অজ্ঞতাই। কিন্তু যে-দিন থেকে দেবতার প্রতিনিধি, দেবতার নায়েব-গোমস্তার আবির্ভাব হ'ল, সেদিন থেকে আরম্ভ হ'ল মানুষের ওপর দেবতার শোষণ। সেই শোষণে মানুষ যতই ক্ষীণ হ'তে লাগল ততই তার ধারণা হ'তে লাগল যে তার দেবতার খাসমহলে যাবার দিন আসন্ন হচ্চে ; সুতরাং আনন্দ।

সংসার কারাগার হ'ল, ইন্দ্রিয়গুলো শত্রু হ'ল, দেহ শৃঙ্খল হ'ল, পরলোক স্বদেশ হ'ল। ইত্যবসরে গুরু পুরুত পোপপাদ্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল, তাদের পরলোকের জন্য কোনো তাড়াহুড়োই দেখা গেল না। গরাব কাঙাল না খেয়ে ধর্ম্মসেবা করতে লাগল, আর সাধুদের বড় বড় মঠ হতে লাগল, পোপের প্রাসাদ হ'ল, গুরুজীদের এক একজনের অনেকগুলো আশ্রম হ'তে লাগল ! মানুষের দুঃখকে স্থায়ী করে তুলল বুদ্ধিমানদের ধর্ম্মপ্রপাগ্যাণ্ডা।

তাই বলছিলাম, বহু কাল থেকেই মানুষ ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝে এসেছে, কিন্তু তাকে প্রচার করেনি ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে আর মুখোসটিকে সত্য ব'লে চালানো চললো না। মিথ্যার দুর্গতোরণ ভেঙে পড়েছে বিজ্ঞানের 'গদা'ঘাতে।

জীবনের অনিবার্য্য গতিকে রুদ্ধ করবে কে! তাই জীবনের অগ্রগতির স্রোতেরই ফলে জ্ঞানকে আর মঠের মাঝে, ব্রাহ্মণের সতর্ক-রক্ষিত গণ্ডীতে বদ্ধ ক'রে রাখা চললো না।

('চললো না তো', হৃদয় বলে, 'তবু এত বিলম্ব হ'ল কেন? কত লক্ষ মানুষের প্রাণ যে বৃথাই বিনষ্ট হয়ে গেল!')

যে জ্ঞান সকলের, তাকে নিয়ে ভণ্ডামীর জালপাতা যে অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই জ্ঞানকে অন্ধ ঘরে বন্ধ করে রাখবার কম প্রয়াস হয়েচে না কি! শূদ্রের কানে সীসা গালিয়ে ঢালা হয়েচে, ব্রুনোকে আগুনে পুড়ে মরতে হয়েচে! তবু জ্ঞানের শিখা জ্বললো জনগণের মনে—তাই ধর্ম্ম আজ লজ্জিত, লুক্কায়িত, পলায়িত, মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে ভীত।

(ওই যে জাগ্রত জনগণের চোকে জ্বলে উঠেচে একটি অত্যুগ্র প্রতিহিংসা, প্রতিশোধের কামনা। হাজারো হাজারো বছর ধ'রে যাদের রক্তশোষণ করেচে তারা যে আজ ধর্ম্মের কাছে তার প্রতিশোধ চায়। ধর্ম্মকে যে তা কড়ায় গণ্ডায় আজ চুকিয়ে দিতে হবে! কাদের বুক আজ কাঁপচে ত্রাসে!)

এ তো তার সাময়িক উন্মাদনা; যাদের কাঁপবার তারা কাঁপুক আজ।

গণচিত্ত কিন্তু জেগেচে আত্মশক্তিতে। আজ তার কাছে আত্মশক্তির চাইতে বড় কথা নেই। এতকাল সে পূজা করেচে অন্ধকারের, আজ সে আবাহন গাইচে আলোকের, আত্মজ্ঞানের। বাইরের অন্ধকার ছেড়ে কি দেবতা আজ মানুষের অন্তরে আসন পাতলেন!

ছিঃ—দেবতার নাম! ও নাম করলেই আজ তার ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। ও নাম মানুষের অজ্ঞতার, দৈন্যের, শক্তিহীনতার। আজ তাই ভগবান্ নেই, দেবতা নেই।

—সবার ওপর আজ মানুষই সত্য—

সব মানুষই সত্য, সব মানুষের জীবনই সত্য, সব মানুষের বেঁচে থাকবার অধিকার একটি সংশয়হীন সত্য।

কিন্তু বেঁচে থাকাটাই তো আদর্শ নয়: বেঁচে থাকার সামনে একটা আদর্শ চাই, কি জন্যে মানুষ বাঁচবে, কি নিয়ে মানুষ বাঁচবে।

হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুকানিটাই বেঁচে থাকা নয়, পেট পুরে খেতে পাওয়াটাই বেঁচে থাকার চরম প্রমাণ এবং সার্থকতা নয়। এ সবের অতিরিক্ত একটি বস্তুকে নিয়েই বেঁচে থাকা সত্য এবং সার্থক হয়ে থাকে।

সেই অতিরিক্ত বস্তুটিকে অতীত কালের মানুষ কি নাম দিয়েছিল? মৈত্রেয়ীর প্রশ্নে সেই অতিরিক্ত বস্তুটির কামনা ধ্বনিত হয়েছিল, যার উপলব্ধির দ্বারা মৈত্রেয়ী অমৃতত্বের অধিকার পাবার আশা করেছিলেন। সেই বস্তুটির কত জন কত নামই দিলে! মোক্ষ, নির্ব্বাণ, আত্মবোধ, বিশ্ববোধ, ভাগবত-উপলব্ধি—আরো যে কত কি!

সে যে কি বস্তু যাতে মানুষের অন্তরাত্মার সকল জিজ্ঞাসা আনন্দে পরিসমাপ্তি পেয়েছিল, তার হদিস আমরা পাই নে।

মানুষ ধ্যানলোকে কি যে দেখে অমন বিমুগ্ধ হয়েছিল, যে-দেখাকে ঘিরে এক একটা জাতির আজও অন্ধ আকুতির বিরাম নেই, তা আমরা আধুনিক বিজ্ঞানবুদ্ধি মানুষ কিছুই বুঝতে পারি নে।

ইতিহাসের মিথ্যা মসীলিপ্ত পাতার কৃষ্ণপ্রলেপের মাঝেও কোথাও কোথাও দুটি একটি সোনার রেখা ঝিকমিক করচে—তাদের মিটিয়ে ফেলা গেল না। দুটি একটি বিরাট মানুষের চিত্তোপলব্ধি আজও মানুষকে ব্যাকুল করচে।

কিন্তু সেদিকে তাকাবার অবসর কোথায়? সেই দুটি একটি মানুষের সত্যকে ঘিরে সুবিশাল মিথ্যার প্রপঞ্চ সৃষ্টি হয়েচে! বুদ্ধিমান্ লোভী মানুষের দল সেই সত্যের নামে শুধু করেচে অত্যাচার, শুধু করেচে নিরীহ অসহায় অন্ধ মানুষের বুকের রক্তশোষণ—

ভাগবত-সাধনার নামে আজ রক্তে আগুন জ্বলে! ভগবানের মৃত্যু হোক্—মানুষ একটু স্থান চায় আজ।

সুতরাং আজ মানবজাতির আদর্শ ধার্ম্মিকতা নয়, ভগবান্ সাক্ষাৎকার নয়, সংসার থেকে ছুটি নয়।

তার সামনে আজ একটি কথা সবার সেরা—সেটি হচ্চে Culture: মানবমনের প্রকৃষ্টতম বিকাশ হলেই মানুষ ধন্য।

স্বর্গে না কি দেবদূতেরা সর্ব্বক্ষণ পবিত্র পরম পিতার জয়গান নিয়ে আনন্দ-মগ্ন। ধর্ম্মজগতে একদিন মানুষ ওই

ভগবৎ মহিমায় তন্ময় হয়ে যাওয়াটাকেই মনের প্রকৃষ্টতম বিকাশ মনে করেছিল।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নৈব কেবলম্"

"ওই হরিনামের মত কি ধন আছে সংসারে—

বল্ মাধাই মধুর স্বরে'—জগতের সকল মানুষের জীবনের চরম সার্থকতার সন্ধান ওইখানে।

কিন্তু আজ মানুষ কি করবে? কার জয় গাইবে?

যে জয়ী হ'ল তারই জয় গাইবে মানুষ, যে-ভগবান মরেচে তার নয়, যে-ভগবানের নাম ক'রে যুগের পর যুগ লোভী মানুষ নিঃসহায় মানুষের বুকের রক্তপান করেচে, তা সত্ত্বেও যে-ভগবান্ একবার প্রতিবাদ করবার শক্তি পেলে না, সেই মিথ্যা ভগবানের জয় গাইবে মানুষ আবার? ছিঃ, ও লজ্জা থেকে ত্রাণ হোক্। না, জয় গাইবে মানুষ বিশাল বিশ্বব্যাপ্ত জীবনের—দার্শনিকের কাল্পনিক জীবনের নয়, যে-জীবন আমাদের প্রতি মানবের শিরায় শিরায় উচ্ছ্বসিত, আমাদের দেহমনপ্রাণের বাস্তব কামনায় যার গতিচ্ছন্দ স্পন্দিত। মানুষ জয়গান করুক যৌবনের—যে-যৌবনের প্রাচুর্য্যে জীবনের পরিপূর্ণতা প্রকাশিত।

পূর্ব্বযুগের প্রকৃষ্টতম বিকাশকে আজ তাই মানুষ স্বীকার করবে না কিছুতেই! ওই ধর্ম্ম কথাটিকে ঘিরে কত রস-বিহ্বলতা, কত পূজারতি, কত অপরূপ রূপসৃষ্টি চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, কত গীত-গাথা-কাহিনী, কত শিল্প, কত পুরাণ কাব্য, কত মন্দির গির্জ্জা মসজিদ্, মানুষের আশা আনন্দের কত উপকরণ—সব ভাসিয়ে দিতে হবে জীবনের খরস্রোতে, কালের প্রবল প্রবাহে, জঞ্জালের মত; মিথ্যা মোহকে কিছুতেই মনের পাকে পাকে জড়িয়ে থাকতে দেবে না।

(হায়রে, কেঁদে ওঠে মন! কত যুগযুগান্ত-সঞ্চিত, কত মমতা-পরিপুষ্ট সম্পদ্‌রাশি, কত আনন্দ আশা বিশ্বাস ভরসার সভ্যতা-সম্পদ্ তাকে একেবারে ধূলায় মিশিয়ে দিতে হবে! এতই কি মিথ্যা হয়ে গেল অরূপের ওই সব রূপরাশি!)

যায় যদি যাক্—তাতে মানুষের এমন কিই বা ক্ষতি হবে। আধুনিক মানুষ তার চিত্তপ্রকর্ষের ফলে জন্ম দেবে নতুন সভ্যতার, তার সম্পদ্ কোনো যুগের সম্পদের কাছেই লজ্জিত হবে না। ভগবান্ যদি নাই থাকে, তাতে জীবনের গৌরব হ্রাস পাবে কেন!

(আর সত্যি ভেবে দেখ, এতকাল যে মানুষ জীবনের দিন কাটিয়ে এল সে কি নিয়ে! কিসের পশ্চাতে সে জীবনের সব শক্তি নিয়োজিত করেচে! ভগবানের উদ্দেশে? নিশ্চয়ই না। মানুষ চেয়েচে ভালো খেতে পরতে, চেয়েচে ভালো স্বাস্থ্য, চেয়েচে স্ত্রীপুত্র, চেয়েচে ভালোবাসা মান যশ, চেয়েচে বিশ্বের সৌন্দর্য্য-সুধা, চেয়েচে জানার তৃপ্তি আর আনন্দ—আর কিই বা মানুষ চায়!)

আজকের মানুষ পারলৌকিক জীবনের আশায় আর ইহলৌকিক জীবনকে বঞ্চিত বিড়ম্বিত করবে না। নব সভ্যতা হবে এই জীবনেরই শোভা-সম্পদে পরিপূর্ণ। এই জীবনকে মানুষ সুন্দর করবে, ভালো ক'রে এই জীবনকে উপভোগ করবে। উপবাসে ক্লিষ্ট করবার জন্য জীবন পায়নি মানুষ, তাকে সব দিক দিয়ে উপভোগ করবার জন্যই তো জীবন। নব সভ্যতার সাধনাই হবে জীবনকে পরিপূর্ণ ক'রে আস্বাদন।

মৃত্যুর সাধনা মানুষ অনেক করেচে; শেষের দিকে চেয়ে চেয়ে সমগ্র জীবনকে অস্বীকার করবার মূর্খতা মানুষের অবসান হোক। শেষ কিসের নেই? বসন্তের অবসান আছে, ফুল ঝ'রে যায়, যৌবন ম্লান হয়ে পড়ে, মানুষ অমর নয়। নাই বা হ'লো! ক্ষণিকের দিনের আলোয় যে ফুল বর্ণসুষমায় বিকশিত হ'ল তার মাঝে কি প্রচুর আনন্দ নেই?

মৃত্যুকে সহজভাবে স্বীকার ক'রেই মানুষ জীবনকে উপভোগ করতে পারবে না কেন? করবেই তো প্রতিনিয়ত, "মৃত্যুরে কে মনে রাখে?" মৃত্যুর দুয়ারে ব'সে প্রশ্নই বা কেন? যা ফুরায় তাকে আবার ফুরালো ব'লে প্রশ্ন অনাবশ্যক।

শেষ-প্রশ্ন শেষের জন্যই স্থগিত থাক।

শেষের পূর্ব্বে আছে জীবন, অপূর্ব্ব জীবন, সুন্দর জীবন, নানা রসে উচ্ছল জীবন। এই জীবনের পাত্রখানি অধরে স্থাপন ক'রে তার রসধারা পান করবে মানুষ।—বহু কালের বঞ্চিত বুভুক্ষু পিয়াসী মানুষ!

অবহেলায় তাচ্ছিল্যে মানুষ জীবনকে পঙ্গু করেচে, পঙ্কিল করেচে, আনন্দহীন করেচে। সেই জীবনকে আজ আবার সুস্থ সবল সুন্দর করতে হবে।

মানুষের কি রুগ্ন হবার, স্বাস্থ্যহীন হবার কোনো নিয়তি আছে বা ছিল? একটুও না। মানুষ ছিল অজ্ঞান—আজ মানুষ জানতে পেরেছে তার সুস্থ সবল হবার কোনোই বাধা নেই; একমাত্র প্রবল স্বার্থপরের অত্যনিষ্ঠ সুখলিপ্সা আর তার আনুষঙ্গিক নির্ম্মমতা এবং নৃশংসতা।

জীবনে মানুষের আনন্দসম্পদ্ কি অপরিসীম! মনের কথা না হয় থাক, মানুষকে শুধু সবল সুস্থ দেহ দাও; দেহের শিরায় শিরায় জীবনপ্রবাহকে প্রবলভাবে অনুভব করবার সামর্থ্য দাও। ভেবে দেখেচ মানুষের কতখানি আনন্দ মুক্ত ধারার মত পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে যাবে যদি পৃথিবীর মানুষ সুস্থ হয়, যদি তারা যৌবনস্ফূর্ত্ত দেহ পায়, যদি তারা অন্নাভাবের দৈন্য থেকে মুক্তি পায়?

মানুষকে প্রকৃতির আলো বাতাসকে চোক ভ'রে বুকে পুরে গ্রহণ করবার যোগ্য ক'রে তোলো—তার পর তাকে জিজ্ঞাসা কর, ওরে ভাই, আর কি চাই তোমার?

বেশি কি চাইবে? বলবে না কি বেশ আছি ভাই! আকাশ বাতাস জল স্থল আমাকে আত্মীয়ের মত গ্রহণ করেচে, আমার দেহের সঙ্গে বিশ্বের পরম আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েচে, কোথাও আমার সঙ্গে এর বিরোধ নেই। আমার দেহ আজ হয়েচে স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল বিশ্ব প্রকৃতির সুরে তালে আমার দেহবীণা স্পন্দিত ছন্দিত হয়েচে—

দেহের সেই সহজ সুন্দর যৌবনোল্লাস সব মানুষের প্রাণকে যেদিন পূর্ণ করবে সেদিন মানুষ ধরণীকে স্বর্গ ব'লে মানবে না?

বলচ হয় ত, শুধু এই? মনের ক্ষুধা জাগবে না? হৃদয়ের আরো কোনো তৃষ্ণা, আরো কোনো আকুতি?

ভগবানের ক্ষুধা? পরপারের ব্যাকুলতা, বিশ্বাতীতের অন্বেষণ?—সেই অন্ধকারের মায়াবী আহ্বান?—নাঃ, সে সব আর নয়।

তবুও মনকে অস্বীকার করি নে, হৃদয়কেও অবহেলা করি নে।

সতেজ দেহ বলেই তো মন হবে সতেজ, হৃদয় হবে আবেগময়।

কিন্তু সে তো অন্ধকারে আত্মহারা হবার জন্য নয়, পরলোককে ভালোবাসার জন্য নয়!

আধুনিক মানুষ প্রচার করচে আত্মশক্তির অধিকার আর মানবপ্রীতির বাণী, বিশ্বজগৎকে সুন্দর ব'লে কাম্য ব'লে দেখার বিধান।

মন জেগেচে, তাই সে বলেচে আমি জানতে চাই। 'জানতে চাই'—এই হচ্চে তার বীরদর্পে যুদ্ধঘোষণা। কোনো কিছুতেই মন আজ ভয়বিমুখ নয়, সবকে জেনেই যে তার বিজয়প্রতিষ্ঠা। সেই জানার সঙ্গে সঙ্গেই তার বিশ্ব-সাম্রাজ্যের ওপর অধিকার বিস্তৃত হবে,—সংসার দিন দিন কারাগার হয়ে উঠবে না।

হৃদয় জেগেচে, সুন্দরের তৃষ্ণায়, ভালোবাসার ব্যাকুলতায়, প্রীতির মধুর কামনায়। অরূপের পায়ে নিজকে নিঃশেষিত, অপব্যয়িত করবার মোহ নেই তার। হৃদয় জেগেচে, যে-হৃদয়ে শোণিতপ্রবাহ আনন্দ বেদনায় চঞ্চল সেই হৃদয় জেগে উঠেচে, আরেকটি হৃদয়কে স্পর্শ করবে ব'লে।

এই বিশ্বসংসারের রূপে রসে গন্ধে যে অপরিসীম মাধুরী রয়েচে তাতেই মানুষের জীবন ধন্য হবে না? এক দিকে বিশ্ব-প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার, আরেক দিকে মানুষের হৃদয়ের বিচিত্র ভালোবাসার অনন্ত উৎস—এদের নিঃশেষে শোষণ ক'রে কবে মানুষ ক্লান্ত রিক্ত হবে!

নরনারীর ভালোবাসা কি আজও এতটুকু পুরানো হয়েচে; তার বৈচিত্র্য, তার নবীনতা, তার মাধুর্য্যে কি কোথাও হ্রাস পেয়েচে? কবিকণ্ঠে সেই আদিম ভালোবাসার স্তবগান কি আজ পুনরাবৃত্তির দ্বারা ক্লান্ত হয়ে এসেচে? প্রকৃতির শ্যামলে হরিতে, আকাশের শরৎনীলিমায়, শ্রাবণ বাদলের ঘনঘটায়, সাগরের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে, পক্ষীর কাকলিতে আজও কি চিরনবীনের আবির্ভাব চিরন্তন হয়ে নেই? কবি, গায়ক, ভাস্কর, কথাশিল্পী, নর্ত্তকী, চিত্রকর—এরা কি আজ সৃষ্টির আনন্দবাণী প্রচারে বিমুখ হয়েচে?

তা তো হয় নি। আধুনিক মানুষ আজ সহজ চোকে জগৎকে দেখবার অবসর পেয়ে তাই তো বলে উঠেচে

ফুরায়নি' ভাই কাছের সুধা
পাই যে রে তাই দূরের ক্ষুধা
এই যে এসব ছোটখাটো পাইনি' এদের কুল কিনারা
তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজো আমার হয় নি সারা।

আজকের মানুষ তাই পরলোকের বাণী শোনার আশায় সাধু মহাত্মার পথ চেয়ে নেই; আজ ওই কাছের সুধার পিপাসায় ব্যাকুল নবযুগমানব ডাকচে শিল্পীকে কবিকে সুন্দরের পূজারীকে, যারা আমাদের কাছে এই ধরণীর জীবনকেই মধুর করে তুলবে, এই ধরণীকে স্বর্গসুষমায় ভূষিত করবে, মানুষকেই মানুষের প্রিয় ব'লে প্রচার করবে।

দামোদরের বিপত্তি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নগেনের রুচি-বিকার

নগেন দামোদরের পরিত্যক্ত পোষাক পরদিন পরিয়া বসিল ও শচীনকে বলিল, "শচী, আমার রঙটা পার্শীর মত ?"

শচীন উত্তরে কহিল, "না ; একটু পালিস্ কর্ত্তে হবে।"

নগেন 'পালিস' করাইতে প্রস্তুত হইল না। বলিল, "না। বল্বো রোদে পুড়ে কাল্চে মেরেচে। একটু কাল্চে হলে ক্ষতি নেই।"

শচীন বলিল, "কিন্তু এটা পোষাকি না আটপৌরে ?"

নগেন উত্তর দিল, "দেখি একবার প'রে কি রকম দেখায়।" সে আয়না লইয়া বেশ করিয়া দেখিয়া বলিল, "চলনসই। তবে আজ গুড্ নাইট্, শচী। আমি ম্যাডান-ম্যান্সনে চল্লুম।"

শচীন্ বলিল, "যা মরগে যা।"

নগেন আয়না লইয়া আবার একবার ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "আমার পিতৃধন প্রায় শেষ করে এনেছি, শচী। আর বোধ হয় বাকী বেশী নেই। বিধবার ধন, পাঁচজনকে বিতরণ করেছি ; অনেকটা প্রায়শ্চিত্ত হো'ল। বার ক'রে দেখ্ ত ব্যাঙ্কের খাতাটা, কত আর আছে।"

শচীন নগেনের ট্রাঙ্ক হইতে একখানা কাল রঙের কেতাব বাহির করিয়া দেখিয়া বলিল, "৭৩৩৲ টাকা আর আছে।"

নগেন খাতাটা তাহার হাত হইতে লইয়া মনোযোগ-পূর্ব্বক দেখিয়া ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "তবে প্রায় শেষ হয়েছে। ৭ বছরে ১০ হাজার টাকা শেষ করা গেছে, শচী। এর চেয়ে আর আমি বেশী কি কর্ত্তে পারি ? এতেও যদি বিধবার আত্মা তৃপ্ত না হয়, তবে আমি নাচার। তার আত্মার গতি হবে না কিছুতেই তা' হলে।"

শচীন ট্রাঙ্কে বইখানা আবার রাখিতে যাইতেছিল। নগেন নিষেধ করিল, "উঁহুঁ। ও পাপ আর ঢোকাস্ নি। আমায় দে।" সে লইয়া তাহা পকেটের ভিতর পুরিল।

শচীন্ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কোর্বি ?"

নগেন বলিল, "ওটুকুও নিঃশেষ করি। রোগের শেষ আর ঋণের শেষ রাখ্তে নেই। এখন আমি ম্যাডান-ম্যানসনে ঘর ভাড়া কোর্ত্তে চল্লুম। মাসখানেক ঐ দিকে থাক্বো। এ মেসে আমার আর রুচি নেই।"

শচীন উত্তরে বলিল, "দাঁড়া, রমেশ আসুক। তার 'পর যা' হয় করিস্।"

নগেন কহিল, "উঁহুঁ। রমেশ এলে হবে না। সে এমন গম্ভীর হবে যে আর কিছু কোরতে সাহস হবে না। ওর বুদ্ধি বেশী ; তাই ওকে ভয় করে। শচী, বুদ্ধি বেশীর চেয়ে কম থাকা ভাল।"

শচীন বলিল, "বাঁদরামি করিস্ নি।"

নগেন কহিল, "না। কিন্তু এত টাকা খরচ ক'রে যেটুকু adventure এত বৎসরে কোর্ত্তে পার্লুম না, দামোদর তিন দিনে তিন সিকে খরচা করে করে ফেল্লে। আমি এইবার ক্ষতিপূরণ কোর্বো। শেষ এই কটা টাকা দিয়ে একবার দেখ্বো। এ রকম ক'রেই বা কি কোর্ছি ; কলেজে মাহিনা আর আমি এক পয়সাও দেব না। রোজ percentage কাট্বার ভয় দেখাচ্ছে, অনুকূল। আমি বলেছি, আমার percentage যেন না কাটে, অনেক দুঃস্থ ছেলে আছে, বছরের শেষে তা'দের বিতরণ কর্ত্তে হবে। বুঝেছিস্। এ মেসে মাস গেলে ৩০৲ টাকা দিই। আর এদিক ওদিক ৪০.৫০৲ টাকা যায়। এই খরচে কেন আমি ম্যাডান-ম্যান্সনে থাক্বো না ?"

শচীন বলিল, "তো'র সেখানে থেকে হাত পা'র উপর আর কিছু গজাবে ?"

নগেন জবাব দিল, "জানি না। গজাতে পারে। আমার ইচ্ছা তো'রাও চল্। বুঝেছিস্? খরচা বেশী পড়্বে না; অথচ একটু নূতনত্ব হবে। এ ছাই চারুবাবুর হোটেল আর ভাল লাগে না। আর কি, অনেক দিন কেটে গেল। ঠাঁই নাড়া হওয়া ভাল।"

শচীন্ বলিল, "তবে রমেশ আসুক্। কিন্তু তো'র আসল মতলবটা কি বল্ ত। তুই রোমান্স খুঁজ্‌তে যাচ্ছিস্? Don Quixote?"

নগেন উত্তর দিল, "মতলব কিছু বিশেষ নেই। তবু বিরক্ত হয়ে গেছি; ভয়ানক বিরক্ত হয়ে গেছি। একঘেয়ে থেকে থেকে মন চটে গেছে। হাঁফিয়ে উঠেছি। এইবার মেস্ ভাঙ্। তুই বাড়ি যা; বাবাকে বলে বিয়ে কর্ গে; আমিও যাই—কোথাও; রমেশ কি কর্বে জানি না। ওর কথা টের পাওয়া পিরের বাবার অসাধ্য। তবে ওর ভিতরে কিছু রহস্য আছে। ও যে কেন এমন ক'রে পড়ে আছে তা' জানি না।"

শচীন বলিল, "তা'তে ভুল নেই। ও'র ব্যাপার কি জান্‌তে ইচ্ছে করে; কিন্তু ওকে ভয় করে বড়।"

নগেন শচীনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কোর্‌বি? মেস্ ভাঙ্‌বি? বাড়ি গিযে বিয়ে কোর্‌বি? না, এইখানে এই রকম পড়ে থাক্‌বি? আমি কিন্তু আর থাকবো না।"

নগেন বাহির হইবার উপক্রম করিল। শচীন বলিল, "দাঁড়া, আমিও যাবো। তো'কে একলা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়।"

শচীন ও নগেন বাহির হইল। নগেনকে মন্দ দেখাইতেছিল না, পার্শীর পোষাকে। সে সত্যই সাজা বহুবাজারে গেল; সেখানে একটা বড় বাড়িতে নানা রকম পার্শী পরিবারের বসতির মধ্যে থাকিবার জন্য দুইটি সুসজ্জিত ঘর ও একটি বাথ-রুম ও রান্নাঘর লইল, মাসিক ৬০৲ টাকাতে। তাহার পর সেইখানেই একজন ভৃত্য ঠিক করিয়া ১৮৲ টাকায় নিযুক্ত করিয়া তাহাকে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে আদেশ দিল। আগামী মাসের প্রথম দিনেই সে যাইবে স্থির করিল। আর ৮।৯ দিন মাত্র দেরী। শচীন বিস্মিত কৌতুকপূর্ণ মনে তাহার সমস্ত কার্য্য দেখিতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে রহিল। নগেন সেখান হইতে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে গেল। সেখানে একজন পার্শীকে ধরিয়া বলিল, "আমি পার্শী ভাষা শিখ্‌তে চাই, একজন লোক দিতে পার?"

লোকটি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কেন?"

নগেন কহিল, "দরকার আছে। দিতে পার লোক? যদি পার ত' দাও।"

লোকটি তাহাকে পাগল ভাবিয়া চলিয়া গেল। শচীন বলিল, "তুই গাধা। পার্শী শিখ্‌তে চাস্, ইউনিভার্সিটিতে যা'। সেখানে লোক পাবি।"

নগেন আনন্দিত হইয়া জানাইল যে শচীন ঠিকই বলিয়াছে। সে সোজা ইউনিভার্সিটিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া একজন প্রফেসর ঠিক করিল; সেইদিন হইতে রোজ সন্ধ্যার পর দু' ঘণ্টা পড়িবে। সমস্ত ঠিক করিয়া সে মেসে ফিরিল। মেসের সকলকে বলিল, তাহার পার্শী বন্ধু তাহাকে পার্শী করিয়াছে। সে আর হিন্দু নয়। সকলে হাসিল। কিন্তু সে জানাইল, ইহা পরিহাস নহে।

শচীন রমেশকে সব কথা শুনাইতেই রমেশ বলিল, "বেশ্। আমিও ভাব্‌ছি; মেসে থেকে আর লাভ নেই। নগেন কি কোর্‌বে ও কোরচে জানি না। তুই বাড়ি যা'। আমিও পথ দেখি।"

শচীন উত্তর দিল, "তা না হয় যাবো। কিন্তু এমন ছত্রভঙ্গ হয়ে কি থাক্‌তে পার্ব্বে?"

রমেশ বলিল, "আজ না হয় দুদিন বাদে ত ছত্রভঙ্গ হতেই হবে। এ-রকম বেকার বসে অর্থের অপব্যয় আর কত দিন করা যাবে? এই মাসের শেষেই সব যে যা'র পথ দেখা যাক্, শচীন্।"

শচীন্ বলিল, "আমার কিন্তু মন বড় খারাপ হ'চ্ছে, রমেশ। এত দিন একত্র থেকে, এখন আলাদা থাকা বড় কষ্ট হবে।"

রমেশ কহিল, "শচী, আমাদের বন্ধুত্ব ত যাচ্ছে না। যা'র যখন দরকার পড়্বে লিখে জানালেই হবে। যে উপায়ে হোক্, তখনি হাজির হবো। সুতরাং কর্ম্মবিপাকে যদি এখন ছত্রভঙ্গ হয়েও পড়ি, আমাদের বন্ধুত্ব ত অটুট থাক্‌বে।"

নগেন বলিল, "শচী, তুই ছেলেমানুষি করিস্ নি। তোর বিয়ের সময় আমাদের নিমন্ত্রণ করিস্। আমরা যাবো। আর তুই জমীদার হলে আমাকে একটা চাকরি

দিস্। আমি ৩।৪ মাস বাদে তোর কাছে দরখাস্ত নিয়ে হাজির হবো। যাতে চুরি করা যায় এমন একটা চাক্‌রি দিস্, বুঝেছিস্?"

শচীন কহিল, "তো'র জন্তই ত ভাবনা হয়! তুই যে শনি আমার! তো'কে ছেড়ে যাই কি ক'রে! যে কাণ্ডের সূত্রপাত করেছিস্। কোথায় থাকি কে জানে? কি কুক্ষণেই ঐ পোষাকটা কিনেছিলুম! আর কি কুক্ষণেই দামোদর এসেছিল!"

রমেশ বলিল, "ভালই হয়েছে, শচী। ও না এলে আমাদের এই গড্ডালিকা-স্রোত রুদ্ধ হোত না। ও এসে যা' হোক্ সব একরকম ভেস্তে দিয়ে গেল।"

শচীন রমেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "নগেন কিন্তু কি ভান কোরছে?"

রমেশ বলিল, "ওর রুচি হয়েছে যা'তে, ও তাই কোর্‌ছে। আর নিক্ দিনকতক বকামো ক'রে; ভবিষ্যতে ত কর্ত্তে পাবে না। ওর যে ত্রিসংসারে কেউ নেই, এই হয়েছে ওর বিপদ ও সুবিধা।"

নগেন উত্তর দিল, "সে আর কত দিন। পণ্ডিতজি বলেছে ছেলে স্ত্রী সংসার সব হবে! দুঃখ, দুর্দ্দিন, দারিদ্র্য সমস্ত। তাই নির্ভাবনায় এখন দিনকতক ম্যাডান ম্যান্‌সনে থাকা যাক্। মাস ৩,৪ বৈ ত নয়। তা'র পর পিতৃ-ঋণ শোধ! আমিও নিশ্চিন্ত। শচীর জমিদারিতে গিয়ে হাজির হবো। কিন্তু রমেশের প্রোগ্রামটা কি শুনি।"

রমেশ কহিল, "আমার কোনও programme নাই। মেস ভেঙে আমি কোথায় যাবো ঠিক নেই। তবে যেখানেই যাই, তো'র খবর রাখ্‌বো। তুই ভাবিস্ নি যে তুই নিরাপদ।"

সকলেরই মন একটু চঞ্চল ও বিষণ্ণ হইল! শেষে রমেশ হাসিয়া বলিল, "এখনও ত দেরী আছে; আজ থেকে সব মাথায় হাত দিয়ে কি হবে? এখন নগেনের রুচি-বিকার কোথায় গিয়ে পৌঁছায় দেখা যাক্। ওর মনের যে দিকে গতি, ও একটা হাঙ্গাম অচিরেই বাধাবে।"

দিনের পর দিন সকলের এই রকম আসন্ন বিচ্ছেদের ভয়ে কাটিতে লাগিল। দামোদর আর মেসের দিকে আসিত না; শচীন মাঝে মাঝে দুঃখ করিত। রমেশ বলিত, "কাজ কোর্‌ছে, কোরবে না? তা' ছাড়া আর তা'র এসে দরকার নেই. এ কদিন সুস্থির হয়ে নিশ্চিন্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়।" মাস প্রায় কাটিয়া আসিল। নগেন তাহার নূতন রুচির পোষাকে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল। সে খুব উৎসাহে পার্শীভাষা শিখিতে সুরু করিল। প্রায়ই শচীনের উপর তাহার নূতন শিক্ষার নমুনা চালাইতে লাগিল।

মাসের শেষাশেষি—আর একদিন মাত্র আছে মাস শেষ হইতে—রাত্রে—শচীন একলা ঘরে সারা রাত কাটাইল। নগেন ও রমেশ দু'জনেরই কেহই ফিরিল না। শচীন ৯টা, ১০টা হইতে সুরু করিয়া রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত ঘড়ির আওয়াজ শুনিল; তা'র পর ঘুমাইয়া পড়িল। প্রত্যূষে ঘুম ভাঙিয়াও দেখিল সে ঘরে একাকী। তাহার ভয় হইল। রমেশ মাঝে মাঝে রাত্রে অনুপস্থিত থাকে; কিন্তু নগেন অদ্যাবধি কখনও এ-রকম করে নাই। কিছু বিপদ হয় নাই ত? সে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া নিধিকে ডাকিয়া তুলিয়া চা পান করিল। তা'র পর অস্থির মনে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে বেলা হইল। ৮টা, ৯টা বাজিল; ৯টার সময় রমেশ ফিরিল। শচীন রমেশকে নগেনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল রমেশ নগেনের সন্ধান রাখে না। রমেশ বলিল, "কোথাও যায় নাই 'ত? কিছু বলে গেছে?"

শচীন জানাইল, "না। সে এমন ভাবে কোথাও যায় না।"

রমেশ বলিল, "আরও কিছুক্ষণ দেখা যাক্; তা'র পর যা' হয় করা যাবে।"

শচীন কহিল, "নিশ্চয়ই তাহার কিছু হইয়াছে।"

রমেশ জবাব দিল, "যাহাই হো'ক্, কিনারা এখনি ত হবে না। ব্যস্ত হয়ে লাভ কি। ভেবে দেখি কি হো'তে পারে।" শচীন আর দ্বিরুক্তি করিল না।

ক্রমে বেলা হইল,—১১টা বাজিল। রমেশ বলিল, "শচী, তবে চল্, একবার হাস্‌পাতালে খোঁজ করে আসি। মোড় থেকে ফোন্ করে খবর নিই।"

দু'জনে বাহির হইয়া মোড়ের ডিস্‌পেনসারিতে গিয়া প্রবেশ করিল। রমেশ ফোন্ করিয়া জানিল যে নগেনের মত কেহই হাসপাতালে নাই। সে শচীনকে লইয়া ডাক্তারখানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুরেনবাবুর দোকানের দিকে চলিল।

হঠাৎ শচী বলিয়া উঠিল, "রমেশদা, দেখ সাম্‌নে।"

রমেশ দেখিল ঠিক তাহার সম্মুখে পথ রোধ করিয়া নিতাই ঘোষ দাঁড়াইয়া তাহাদের দু'জনকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতেছে। তাহার চক্ষুতে একটা ক্রুর ভাব পরিস্ফুট। রমেশ তাহাকে গ্রাহ্য না করিয়া, নিতাই ঘোষকে হাত দিয়া সরাইয়া অগ্রসর হইল; শচীনও তাহার পিছনে পিছনে চলিল। কিছু পথ অগ্রসর হইয়াই আবার শচীন পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, আর নিতাই ঘোষকে দেখিতে পাইল না। সে রমেশকে সে খবর দিল। রমেশ কোন উত্তর দিল না। দু'জনে সুরেনবাবুর চা-এর দোকানে আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া বসিল। শচীন বলিল, "রমেশ, ঐ লোকটা নিশ্চয়ই এর ভিতর আছে। ও এখনও ঘুরছে যখন, তখন ওর মতলব আছে। আমার মন বল্‌ছে।"

রমেশ তাহাকে ধমক দিল, "তুই আমায় ভাব্‌তে দিবি না বক্‌বক্ কোর্‌বি? ও যদি করেই থাকে এই কাজ, নগেনকে আটক্ করেই থাকে, একটা উপায় ত খুঁজে বার ক'র্ত্তে হবে তা'কে উদ্ধার করবার!"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নারাণবাবুর উৎকণ্ঠা

দামোদর পার্ক ষ্ট্রীট হইতে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মেসে না গিয়া নারাণবাবুর বাড়িতে চলিল, এ কথা পাঠকবর্গকে জানান হইয়াছে।

নারাণবাবুর বাড়িতে আসিয়া শিকল নাড়িয়া দামোদর ৫।৭ মিনিট অপেক্ষা করিয়াও কোনও সাড়া পাইল না। সে দ্বিতীয়বার জোরে শিকল নাড়িতেই, মানদা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আস্তে বলিল, "বাবা আছে; নীচে।" তা'র পর কি বলিল দামোদর শুনিতে পাইল না। মানদা অদৃশ্য হইল। দামোদর অগ্রসর হইয়া উঠানের সম্মুখের ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "নারাণ-বাবু!" প্রথমে উত্তর পাইল না। দ্বিতীয়বার ডাকিতে নারাণবাবু ঘরের ভিতর হইতে সাড়া দিল, "কে? বাড়ির ভিতর কে?" দামোদর আত্ম-পরিচয় দিল। কিন্তু সে একটু বিস্মিত হইল। ঘরের ভিতর হইতে বিভিন্ন কণ্ঠে আর একজন কে বলিল, "নারাণবাবু'র অসুখ—বেমার হয়েছে। কে তুমি আছেন?"

দামোদর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। আন্দাজে প্রশ্ন করিল, "কে—ভকতরামবাবু?"

ভকতরামবাবু ভীত স্বরে উত্তর করিল, "কোন্ আছ তুমি? তোমাকে দরওয়াজা কোন্ খুলে দিলে?"

দামোদর ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নারাণবাবুর কি হয়েছে? আমি দামোদর।"

নারাণবাবু এতক্ষণে যেন আশ্বস্ত হইল। তক্তপোষ হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল. "ও! দামোদর! তুমি? কি আশ্চর্য্য, চিন্তে পারি নি। এসেই বড় জ্বর হয়েছে কি না? তাই। এসো, এসো। ভকতরামবাবু! এ দামোদর! সেই যে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল।"

দামোদরকে বসিতে বলিয়া নারাণবাবু উপরে আলো আনিতে গেল। দামোদর বসিল।

ভকতরামবাবু এইবার একটু সুস্থ স্বরে বলিল, "আরে, এইবার পছান্তে পেরেছি। তা'র পর; বাবুজি, কি খবর আছে? চাকৃরি হোয়েছে? কোথা আছ এতো দিন?"

দামোদর উত্তর দিল, এক জায়গায় চাকৃরির কথা-বার্ত্তা হোয়েছে। কিন্তু চাকৃরি কর্ত্তে তা'র ইচ্ছা নাই। সে নারাণবাবু'র সঙ্গে বাজারে বেরুবে। ব্যবসা কর্ত্তে তা'র ইচ্ছা। তাই আসিয়াছে।

ভকতরামবাবু সোৎসাহে বলিল, "খুব ভাল কথা আছে। তা' এখানে না এসে তুমি আমার আফিসে যেও, বাবুজি। সেখানে নারাণবাবুকে পাবে। আমার আফিসের ঠিকানা, ১১নং বাঁশতলা গলি। গেলেই চিন্‌তে পার্ব্বে। বড় গদি।"

দামোদর জানাইল, সে যাইবে।

নারাণবাবু লণ্ঠন লইয়া আসিয়া ভকতরামকে কি ইসারা করিল। ভকতরামবাবু উঠিয়া বলিল, "আমি চল্‌ছে, বাবুজি। তুমি যাবেন আমার আফিসে। সব বন্দোবস্ত হোবে।"

দামোদর সম্মতি জানাইতেই, ভকতরামবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নারাণবাবু দামোদরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া লণ্ঠনটার পলিতা নামাইতে নামাইতে বলিল, "দামোদর! ক'দিন ছিলুম না। ব্যবসার জ্বালায় কি দুদিনও স্থির হো'য়ে বোস্‌তে পারি? তুমি এসে এসে ফিরে গেছ? না?"

দামোদর বলিল, "হাঁ। দু'তিন দিন এসেছিলুম। কোথায় গিছ্লেন? আমি শেষে এক জায়গাতে কাজের ঠিকই প্রায় করেছি।"

নারাণবাবু বলিল, "সে আর বোল না। কানপুরের আমাদের গদিতে প্রায় দেড় লাখ টাকার তছরূপ হয়েছে; তাই তা'র কিনারা কর্ত্তে আমি ও ভকতরাম দু'জনে গিছ্লুম। আজই একটু আগে ফিরেছি ডাউন এক্সপ্রেসে। তার' পর তোমার খবর কি?"

দামোদর কহিল, "খবর ভালই। আপনার অপেক্ষাতেই ছিলুম। আপনি যা' পরামর্শ দিয়েছেন, তাই কোর্ত্তে এখনও রাজী আছি।"

নারাণবাবু অনুমোদন করিল, "বেশ। আমি খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু মনটা আমার আপাতত ভাল নেই। এই দেড় লাখ টাকার কোনও কিনারা হোল না; তা' ছাড়াও অন্য ব্যাপারেও প্রায় দু' লাখ আড়াই লাখ লোকসান হয়েছে। অবশ্য টাকা ভকতরামবাবুর; তবুও আমি কোন্ না পঞ্চাশ-ষাট হাজার পেতুম। বড় বড় কিস্তি, দামোদর। তাই আর এখন দিনকতক আর বাজারে বেরুবো না। মন ভাল না থাক্‌লে কি কাজ করা যায়?"

দামোদর নীরবে শুনিয়া যাইতে লাগিল।

নারাণবাবু বলিয়া চলিল, "আমার নিজের আর কাজ কারবার কিছুরই দরকার নেই। একলা মানুষ; আর খরচও নাই; যা' কুড়ি-পঁচিশ লাখ করেছি, যথেষ্ট। শুধু ঐ মেয়েটার জন্তেই না? ওর নামেই হয়েছে; তাই তা' থেকে একটি আধ্‌লাও আমি খরচ করি না। ওকেই সব দেব। ও'র পয়েতেই হয়েছে, কি না। ঐ আমার সব উন্নতির মূল।"

দামোদর সায় দিল, "তা' বটে। তবে আর কাজ করেন কেন?"

নারাণবাবু সোৎসাহে বলিতে লাগিল, "তা' বটে নয়, দামোদর, আমি যা' সত্যি কথা তাই বল্‌ছি। আমার যতই এলেম থাক্, যতই বুদ্ধি থাক্, ও না হলে কিছুই হোত না। এখন ওকে পাত্রস্থ ক'রে নিশ্চিন্ত হো'তে পারি যদি, তবেই আমার এত দিনের মেহনত্ সার্থক হয়। তুমি কথাটা কি ভেবে দেখেছ? আমার এখন আর পয়সার জন্ত উৎকণ্ঠা নেই; যত উৎকণ্ঠা এখন ওর জন্ত।"

দামোদর জানাইল, সে প্রস্তুত আছে। বিবাহ করিতে ইচ্ছুক।

নারাণবাবু যেন অনেক স্বস্তি অনুভব করিল। বলিল, "ভাল বিবেচনা করেছ। এতে তোমার লাভ ছাড়া লোকসান নেই। নিতান্ত তোমায় উপর আমার কেমন মায়া প'ড়ে গেছে, কেমন স্নেহ পড়েছে, তাই। না হলে, কত লোক সাধাসাধি করেছে, বিয়ে দিই নি। তোমাকে আমার বড় পছন্দ হয়েছে।"

এমন সময় বাহিরের কড়া নড়িল। নারাণবাবু চমকিত হইয়া ঘরের ভিতরে কোণের দিকে গিয়া বসিয়া চুপি চুপি দামোদরকে বলিল, "বাতিটা নিভিয়ে দিয়ো; বাহিরে গিয়ে দেখ গে, কে? প্রথমে দরজা খুলো না। যদি বেশী ডাকাডাকি ক'রে, বলে দিয়ো আমি কানপুর গেছি। পাঁচ-সাত দিন পরে ফিরতে পারি।" বাহিরে আবার সজোরে কড়া নাড়িল। দামোদর বাতিটা নিভাইয়া, ঘরের দরজায় বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া, সদর দরজায় গিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পুনরায় বাহিরের শিকল নড়িয়া উঠিল।

দামোদর দরজা না খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

বাহির হইতে কে জোর মোটা গলায় ডাকিল, "একবার বাইরে বেরিয়ে আসুন না!"

দামোদর বাহিরে আসিলে, একটি লোক টেপা বাতির আলো জ্বালিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নারাণ কোথায়? তুমি কে?"

দামোদর উত্তর দিল, "আমি কেউ নয় এদের। এমনি এসেছি। নারাণবাবু নেই এখানে। ক'দিন হো'ল কানপুরে গেছে।"

লোকটা তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "তুমিও কি ওদের দলের না কি? তোমাকে ত' কখনো দেখেছি মনে হয় না। সত্যি কথা বল্‌ছো?"

দামোদর জানাইল, সে পল্লীগ্রামে থাকে, মাত্র দু'চার দিন আসিয়াছে। অন্যত্র থাকে; এখানে দেখা করিতে আসিয়াছে। আর একটি লোক বলিল, "বাবা! এ গলিতে কি ভদ্রলোক আসে, না, থাকে! এখানে নিশ্চয়ই কোকেন আর জুয়ার আড্ডা আছে। চল পুলিশে খবর দেওয়া যাক্।"

লোক দু'টি আপনাদের ভিতর কথা কহিতে কহিতে প্রস্থান করিল। দামোদর ঘনায়মান অন্ধকারে চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের কথা ভাবিতে লাগিল। নারাণবাবুর কুড়ি-পঁচিশ লাখ সম্বন্ধে তাহার মনে খুব গুরুতর সন্দেহ হইতে লাগিল।

পিছনে পদশব্দে সে ফিরিয়া দেখিল, মানদা। মানদা তাহার কাণে কাণে বলিল, "ভিতরে এসো। ওরা চলে গেছে। আর দাঁড়িয়ে কেন? বাবার সঙ্গে কথা শীঘ্র ঠিক ক'রে নাও।"

দামোদরের অনেক কিছু প্রশ্ন করিবার ছিল। পুলিসের নাম শুনিয়া তাহার বিলক্ষণ ভয়ও হইয়াছিল। কিন্তু প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই মানদা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। সে দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিয়া নারাণবাবুর ঘরের শিকল খুলিয়া বলিল, "তারা চলে গেছে। পুলিশে খবর দেবে বলে গেছে।"

নারাণবাবু কোণ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "পুলিসে খবর দেবে? পুলিস ওদের বাপ মা কি না? আমি কি কোর্ট? ভকতরামের কাছে যা না বাবু। তা'র সঙ্গে টাকার কারবার, আমার কাছে কেন? সে এগুবার ক্ষমতা নেই, দামোদর। সে বড় শক্ত জায়গা; দু'দশ লাখ সে থোড়াই কেয়ার করে। এসেছে মর্ত্তে আমার কাছে। টাকার ব্যাপারে বাপের কথা ছেলে শোনে না, ভকতরাম শুনবে আমার কথা! আজ তিন-চার মাস ধরে এই চলেছে। এখন ওদের দেখ্‌লে আমার ভয় করে। ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে আমার আতঙ্ক জমিয়ে দিয়েছে, দামোদর! ওরা কি চায় আমার লক্ষ্মীর পুঁজি ভেঙে আমি ওদের টাকা দেব?"

দামোদর কহিল, "ওরা পুলিসে খবর দেবে।"

নারাণ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "দিক্। অমন ঢের পুলিস দেখেছি। মাসে আমরা ৩০টা পুলিস কেস্ করি, ৩০০টা দেওয়ানী করি। টাকার কারবারে অমন কত হয়।"

তার পর একটু কোমল সুরে বলিল, "দামোদর! তুমি না হয় আজ রাতে থাক না এইখানে। তোমার মেসে যাওয়া কি এমন দরকার? এইখানে বিছানা করে দেবে, মানদা; শোবে। কি বল?" তাহার স্বরে তাহার উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইল।

দামোদর উত্তর করিল, "আমার অবশ্য ফিরে যাব তেমন প্রয়োজন নেই। তবে আপনাদের অসুবিধা হবে।"

নারাণবাবু বলিল, "কিছু না। তুমি ত ঘরের ছে প্রায়। বল্‌তে গেলে তুমিই সব হয়ে দাঁড়াবে। তু থাক্‌লে আর অসুবিধা কি? বরং আমার আনন্দই হবে কেমন, রাজী ত? তা' হলে আমি মানদাকে খাব আয়োজন কোরতে ও বিছানার বন্দোবস্ত কোরতে ব দি। কেমন?"

দামোদর ভাবিল, মেসে ফিরাও তাহার পক্ষে কষ্টকর তাহার কিছু দরকার ছিল টাকার; শচীনের কাছে কি নগেনের কাছে ধার করিতে হইত। রমেশকেও এক সংবাদ দেওয়াও চলিত। তা' কাল সকালে সুরেনবাবু চা-এর দোকানে গেলেই হইবে। আজ রাত্রে এখানে থাক আপত্তি নাই। নারাণবাবু যখন এত করিয়া বলিতেছে তখন শোনাই ভাল। বিশেষ মানদা রহিয়াছে যখন, তখ এখানে তাহার থাকায় যত সুবিধা ও সুখ, অন্যত্র তাহা হইবে পারে না। সে রাজী হইল। নারাণবাবু নামিয়া উপ গেল মানদা'র সন্ধানে। দামোদর অন্ধকারে একাকী চু করিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। বিবাহ এখন সারিয়া ফেলিতে পারিলে হয়।

আধ ঘণ্টা সে অন্ধকারে বসিয়া থাকিবার পর নারাণবা আবার ফিরিয়া আসিল। হাতের দেশ্‌লাই দিয়া লণ্ঠন জ্বালিল। দামোদর দেখিল, নারাণবাবু জামা কাপ জুতা পরিয়া, চাদর লইয়া, সুসজ্জিত; হাতের কাছে একটি ক্যাম্বিসের বড় ব্যাগ্। আলো জ্বালিয়া নারাণবা বলিল, "দামোদর! দেখদেখি হাঙ্গাম। এই রাতে আবার আমাকে যেতে হবে মাদ্রাজ। একখানা প্যাসেঞ্জা আছে, তাইতেই।"

দামোদর বিস্মিত হইল, বলিল, "এর মধ্যে কি হোল?"

নারাণচন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিল, "এর মধ্যে নয়। কথাটা বল্‌তে তোমায় ভুলে গিছলুম। এখন মানদা মনে করিয়ে দিলে। ঐ আমার সব কি না। মায় momory (স্মৃতি শক্তি) পর্য্যন্ত। বিকালে এসেই ওকে বলেছিলুম। তা'র পর তোমার সঙ্গে কথায় কথায় সব ভুলেছিলুম। বড় জরুরী কাজ; এও প্রায় তিন-সাড়ে-তিন লাখের কথা; কাজেই গাফিলি করা চলে না। আর আমারও এক বদ্

অভ্যাস যে কাজ হাতে থাক্‌লে, মন কিছুতেই সুস্থির হয় না। তুমি রইলে, বুঝ্‌লে ? আর এই নাও—কিছু টাকাও রাখো। খরচপত্র করো।” নারাণবাবু ব্যাগ খুলিয়া তাহা হইতে ২০।২৫ খানি নোট্‌ দামোদরের হাতে দিল।

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, “বেশী দেরী হবে কি আপনার ফিরতে ? আমি কত দিন থাক্‌বো ?”

নারাণবাবু উত্তর দিল, “ব্যবসার কথা, টাকার ব্যাপার, কি ক’রে বলি ? দশ পোনেরো বিশ দিন লাগ্‌তে পারে।”

দামোদর বলিল, “টাকা মানদার হাতে দিয়ে যান্‌।”

নারাণবাবু হাসিয়া জবাব দিল, “তুমিও যা, মানদাও তাই। তোমাকে কি আর পর ভাবি ? আমি এসেই তোমাদের চার হাত এক করে দেব। বুঝেছ, দামোদর ? আমি আর বোস্‌বো না ; গাড়ির সময় হোল। যাই।”

নারাণবাবু ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান করিল। দামোদর সদর দরজা পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল। সে তাহার ভাগ্যের দ্রুত বিপর্য্যয় দেখিয়া আপনিই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িল। সেই ঘরে পুনঃ প্রবেশ করিয়া সে অন্যমনস্ক হইয়া নোটের তাড়া লইয়া খেলা করিতে লাগিল। কেমন করিয়া ভাগ্য তাহাকে লইয়া খেলা করিতেছে ? কোথায় পালঘাটি আর কোথায় নারাণবাবুর বাড়ি ? হঠাৎ সে চাহিয়া দেখিল পাশের বাড়িতে আলোক। তবে ত লোক আছে ? কিন্তু দিবসে ত ও বাড়ির সমস্ত বন্ধ থাকে ; জনমানবের শব্দ পাওয়া যায় না ; কোনও দিনই ত কাহাকেও দেখে নাই। হঠাৎ অত আলো কোথা হইতে আসিল। সে মানুষের গলারও আওয়াজ পাইল। কত লোক কথা কহিতেছে, কত লোক—অথচ সে একদিনও পথে কাহাকেও দেখে নাই। তাহার সেই লোক দু’টির কথা মনে হইল, এখানে কোকেনের বা জুয়ার আড্ডা আছে। তাই না কি ? কিছু আশ্চর্য্য নহে। মানদা একখানা পরিষ্কার বিছানার চাদর ও একটা বালিশ লইয়া আসিয়া তাহাকে বলিল, “বিছানাটা করে দিই।” সে লণ্ঠনটি দেওয়ালের আড়ালে সরাইয়া দিয়া, দরজা ভেজাইয়া দিল।

দামোদর উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাশের বাড়ির আলো দেখাইয়া বলিল, “ওখানে আলো কিসের ?”

মানদা সতরঞ্চি ঝাড়িয়া বিছানার চাদরটি পাতিতে পাতিতে জবাব দিল, “জানি না। ওখানে ও-রকম প্রায় হয়।”

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, “রোজ জ্বলে ? কিন্তু লোক ত দেখ্‌তে পাই নি কোনও দিন। জুয়ার আড্ডা নয় ত ?”

মানদা উত্তর না দিয়া চাদর বিছান শেষ করিয়া, বালিস রাখিয়া বলিল, “খাবার ত কিছু নেই। কি দেব ?”

দামোদর কহিল, “দরকার নেই, মানদা। একটু জল দাও, তাই খাই।”

“ক্ষিধে পাবে না ?” মানদার প্রশ্নে দামোদর ক্ষুধা অনুভব করিল। তবু সে বলিল, “না। শুধু জলই দাও, আর শোন ; তোমার বাবা এই টাকা দিয়ে গেছেন খরচের জন্যে, নাও।” সে নোটগুলি মানদার হাতে দিতে গেল।

মানদা ভীত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল ; নোট লইবার কোন আগ্রহ দেখাইল না। দামোদর বলিল, “নাও। রেখে দাও। খরচ কর্ত্তে দরকার হবে ’ত ?”

মানদা জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা দিয়ে গেছে ?”

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, “হাঁ।” মানদা হাত পাতিয়া লইয়া লণ্ঠনের আলোতে একবার খুলিয়া খুলিয়া সমস্ত দেখিল। তা’র পর সমস্ত উঠানের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, “ওতে দরকার নেই !”

দামোদরের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, “সে কি মানদা ? কি ব্যাপার আমায় বল ত।”

মানদা উঠিয়া প্রস্থানোদ্যম করিয়া কহিল, “জল নিয়ে আসি।”

দামোদর বলিল, “আগে বল, তুমি ফেলে দিলে কেন ?”

মানদা জল আনিতে চলিয়া গেল। দামোদর বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া রহিল। জীবনে এত রকম রহস্য থাকিতে পারে তাহা স্বপ্নেও সে জানে নাই। মিনিট-কতক পরে মানদা একটা এলুমিনিয়মের গেলাসে এক গ্লাস জল আনিয়া দামোদরকে দিল। দামোদর জল পান করিয়া মানদাকে বলিল, “মানদা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না তোমাদের ; আমার ভয় কোরছে। তোমার জন্যই আসি ; তুমি আমায় সব বল, কি আসল ব্যাপার ভিতরের। সব ভেঙে বল, তা’ না’ হলে আমার মনঃকষ্টের সীমা থাক্‌বে না।”

মানদা তাহার ব্যাকুল স্বরে যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া জবাব

দিল, "আমি পারি ত একটু পরে এসে বল্‌বো। এখন অনেক কাজ আছে, যাই। তুমি কেন র'লে? ঘুমিয়ো না। ও বাড়িতে এখন খুব হট্টগোল হচ্ছে, একটু জেগে থেকো। মা ও আমি একলা আছি; আর যে কেউ নেই। তুমি আলো নিভিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে নাও ভিতর থেকে; আমি এসে তিনটা টোকা দেবো, তবে খুল্‌ব। শিকল নাড়লে, কি ধাক্কা দিলে খুলো না।" কথাগুলি বলিয়া মানদা চলিয়া গেল। দামোদর কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তা'র পর মানদার কথামত সমস্ত কাজ করিয়া শুইয়া পড়িল। ভয়েই তাহার ঘুম হইল না; সে কি এক মহা বিপদের প্রত্যাশায় শুইয়া রহিল।

পাশের বাড়িতে গোলমাল ক্রমশই যেন বাড়িতে লাগিল। তাহার একবার ইচ্ছা হইল উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখে কি হইতেছে। কিন্তু সাহস হইল না। তার উপর মানদার নিষেধ বাক্য মনে হইল। গোলমাল আবার যেন কমিয়া গেল; ক্রমে সব চুপ চাপ হইয়া গেল। চারি দিক নিস্তব্ধ হইল। তন্দ্রা আসিয়াছে এমন সময় ঘরের উপরের ঘরে সে পদশব্দ শুনিল; কি একটা ভারী জিনিস দুম্ করিয়া পড়িল। তাহার পর সেই গোঁয়ানি, কাতরানি শব্দ উঠিল; থামিয়া থামিয়া, ছিন্ন ধারায়, সরু গলির ভিতর দমকা বাতাসের মত। ক্রমে সেই শব্দ যেন তাহার ঘরের ছাদ ভেদ করিয়া তাহার কাণে পৌঁছিল; যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিল। দামোদরের হাত পা অবশ হইল; সে নাড়িতে চেষ্টা করিয়া হাত পা কিছুই নাড়াইতে পারিল না। কিছুক্ষণ পরেই তাহার ঘরের সম্মুখে উঠানে যেন লোকের—অনেক লোকের চাপা গলার আওয়াজ পাইল। কাহারা এখানে এ বাড়িতে আসিয়াছে। তা'র পর কাহারা তাহার দরজায় সজোরে ধাক্কা মারিল; দুই চারিবার ধাক্কা মারিল। কে যেন বলিল, "দরজায় তালা দেওয়া।" দরজার শিকল ধরিয়া কে নাড়িল। তালায় ঘা দিল। শেষে ছাড়িয়া দিল বলিয়া অনুমান হইল। দামোদর নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিল। ক্রমে আবার যেন লোকজন চলিয়া গেল; কাহারও আর কোনও শব্দ পাওয়া গেল না। কোথায় গেল, কোথা হইতে আসিয়াছিল, দামোদর কিছুই ধারণা করিতে পারিল না। সে চোখে হাত দিয়া দেখিল, ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে কি না। চোখ চাহিয়া সে ত জাগিয়া রহিয়াছে—একটুও ঘুমায় নাই। তবে কি তন্দ্রা গিয়াছিল, কে জা[নে]? হইলেও হইতে পারে। স্বপ্ন না হইলে এ সমস্ত সম্ভব হই[তে] পারে কি করিয়া? পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল মান[দার] কথা। হয়ত তবে এ সমস্তই ঘটিতেছে। তাহার ভয় হইল, মানদার কিছু ঘটে নাই ত? সে ত উপরে অসহায় অবস্থা[য়] আছে! কিন্তু যদিও তাহার একবার উঠিয়া উপরে যা[ইয়া] সব দেখিবার শুনিবার ইচ্ছা হইল, সে অবশ হাত পা ল[ইয়া] উঠিতে পারিল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপে কাটিতে লাগিল; কৈ মা[নদা] ত আসিল না! সে যে একটু পরে আসিবে ব[লিয়া] গিয়াছিল! এতটা সময় গেল, আসিল না। নিশ্চ[য়] তাহার কিছু হইয়াছে! কি হইয়াছে? যদি কিছু ঘটিয়[া] থাকে দুর্ঘটনা, সে কি করিবে? নাঃ! তাহার ভাগ[্য] খারাপ! সেখানে যায়, সেইখানেই একটা না এক[টা] বিপদ! সেখানেই একটা না একটা বিভীষিকা। ভাগ্যকে সে কি করিয়া অতিক্রম করিবে? তবে জ্যোতি[ষী] কি মিথ্যা বলিয়াছে? তাহার ভবিষ্যৎ কি দেখিতে পায় না[?] শুধু তাহাকে প্রতারণাই করিয়াছে? তাহাই বা [কি] করিয়া হইবে? সে ত সবই ঠিক বলিয়াছিল—বাড়ি হই[তে] পলায়ন, নিতাই ঘোষের ভয়, সমস্তই ঠিক বলিয়াছি[ল]; তবে তাহার ভবিষ্যদ্-দর্শন কেন ভ্রান্ত হইবে!

দামোদর চিন্তা-পীড়িত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতে [চেষ্টা] করিয়াও পারিল না। কেবলই তাহার কাণে সে গোঁয়া[নি] শব্দ যেন বাজিয়া উঠিতে লাগিল। মানুষের ঐরূপ [শব্দ] হইতে পারে কি? মানদার মা'রই শব্দ? তা' যদি হ[য়], তবে সে অমন করিয়া কেন অস্বাভাবিক রকম হই[বে]? নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটিয়াছে! মানদা একলা নিশ্চ[য়] বিপদে পড়িয়াছে—আর সে নিশ্চেষ্ট থাকিবে? সে উঠি[ল]। নিঃশব্দে দরজার অর্গল খুলিয়া টানিল। বাহির হইতে ব[হু] লোকগুলি তালা দেওয়া দেখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। [কে] তালাবদ্ধ করিল? মানদা? কেন? সে বিপ[দের] আশঙ্কাতে এইরূপ করিয়াছে, কিন্তু কি বিপদ?

দামোদর নিরুপায় হইয়া তক্তপোষে শুইল। ন[া,] তাহার কিছু করিবার উপায় নাই। সে বদ্ধ। যাহা হইব[ে]

হইবে। কিন্তু যদি কেহ তালা না খুলে? তাহাকে যদি এইরূপে রুদ্ধ করিয়া রাখে? কে কি মত্‌লবে তাহাকে বন্দী করিবে? তাহার ত কিছু নাই। সে কাহারও সহিত শত্রুতা করে নাই। পৃথিবীতে এক নিতাই ঘোষই তাহাকে এইরূপে হাত করিবার চেষ্টা করিতে পারে। অন্যের কি স্বার্থ?

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মানদা কোথায় গেল?

প্রভাতে দামোদর উঠিয়া তক্তপোষ হইতে নামিয়া দরজা খুলিতে চেষ্টা করিয়া দেখিল দরজা খোলা। চারি দিকে সব স্থির, শান্ত; যেন কখনও কোনও প্রকার গোলমাল কি উপদ্রব হয় নাই। সে পার্শ্বের বাড়ির ছাতের ওপরের বারান্দার যেটুকু দেখা যায়, দেখিল। সেখানে যে কোনও কালে লোকের আগমন হইয়াছিল, বুঝা যায় না। বেশ নির্ম্মল প্রভাত। দামোদর দরজা খুলিয়া রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়া তক্তপোষে বসিল। আবার উঠিয়া দেখিতে গেল, গত রাত্রে মানদা যে নোট্‌গুলি বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল, আছে কি না। দেখিল তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। সে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া চিন্তাকুল চিত্তে বসিল। এখন সে কি করিবে? মানদা কাল রাত্রে আসিবে বলিয়া আসিল না। সে কোথায়? তাহার সহিত দেখা না হইলে, কোন কর্ত্তব্যের স্থির হইবে না।

বসিয়া বসিয়াই তাহার বেলা হইল; বাড়িতে সূর্য্যালোক একটু মুস্কিলে আসিলেও, আসিল। দামোদর অনুমান করিল, বেলা ৭॥০টা হইবে। এইবার ত এখান হইতে যাওয়া প্রয়োজনীয়! এখানে থাকিতে তাহার আপত্তি ছিল না; কিন্তু থাকার ত' কোনও উপায় নাই। আরও কিছুকাল সে অপেক্ষা করিল, যদি মানদা নামে; যদি সে ঘুমাইয়া পড়িয়াই থাকে;—আর সেটা ত বিচিত্র নহে, গত রাত্রের উৎপাতে ঘুমাইতে পারে নাই হয় ত—এখন মাত্র ঘুমাইয়াছে;—দামোদর আবার বসিল। তা'র পর তাহার মনে হইল, একবার উপরে যাইয়া সন্ধান করিলে হয় না? সে উঠিল; অতি সন্তর্পণে, ধীরে ধীরে সিঁড়ি খুঁজিয়া বাহির করিয়া উপরে চলিল।

ছোট ছাদে দাঁড়াইয়া দেখিল দু'টি গুদাম ঘরেরই দরজা খোলা। সে দাঁড়াইয়া একটু ইতস্ততঃ করিল; কোনরূপ সাড়া-শব্দের প্রতীক্ষা করিল; কিন্তু কোন কিছুই শুনিতে পাইল না। তার পর সে বড় ঘরে ঢুকিল। প্রভাতের এত আলোও সেখানে ব্যাহত হইয়া ফিরিয়াছে। ক্ষীণ আলোকে দামোদর দেখিল সে ঘরে কোনও প্রকার জিনিসপত্র নাই। একেবারে অনধ্যুষিত স্থান! যেন কোন কালেও লোকের বাস এখানে ছিল না। সে ধীরে ধীরে বড় ঘরটি অতিক্রম করিয়া ছোট ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিল। সেখানেও কিছু বা কোন প্রাণী আছে বলিয়া তাহার অনুমান হইল না। সে ভিতরে প্রবেশ করিল। না, কেহই ত কোথাও নাই! সমস্ত বাড়িতে জন-প্রাণীও নাই। তাহার দেহ ভয়ে শীতল হইতে সুরু করিল! মানদা ও মানদার মা কোথায় গেল? কি হইল তাহাদের? মানদার মার ত পক্ষাঘাত, সে কি করিয়া উঠিল? কেমন করিয়া কোথায় গেল? মানদারই বা কি হইল? দামোদর ভাল করিয়া সমস্ত ঘর পা দিয়া হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পায়ে এক-খানা কাপড়ের মত কি ঠেকিল। সে তাহা উঠাইয়া লইল। কাপড়ই ত বটে! আবার একখানা ছেঁড়া সতরঞ্চির মত কি ঠেকিল; সেখানা সে পায়ে করিয়াই সরাইয়া দিল! দেয়ালে কি যেন একটা ঝুলান রহিয়াছে বলিয়া অনুমান হইল; সেটা সে স্পর্শ করিতে সাহস করিল না। কাপড়খানি হাতে করিয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্পর্শ করিয়া দেখিল দেওয়ালে আরও কোন নির্গমনের পথ আছে কি না! কোথায়ও কিছু নাই। কেবল দুইটা গা-আলমারি দেখিল মাত্র। তাহাও হাট করিয়া খুলা। সে কাপড়খানি হাতে করিয়া বড় ঘরটি আবার পার হইয়া ছাতে আসিয়া দাঁড়াইল। কাপড়খানি ধুতি, কিন্তু কাহার কাপড় বুঝিতে পারিল না। সে সেখানি ফেলিয়া দিয়া ছাত হইতে দেখিতে লাগিল, বাড়ির আর কোনও নিক্রমণের পথ আছে কি না। কিছুই লক্ষ্যগোচর হইল না। সে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া, জুতা ও জামা পরিয়া লইয়া সদরদরজায় উপস্থিত হইল। অর্গল খুলিয়া টান্ দিল। দরজা বাহির হইতে বন্ধ! দামোদর তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া টানিল; দরজা খুলিল না। দামোদরের শরীর কাঁপিতে লাগিল; তাহার হাত

পা' অবশ হইল ; বুকের ভিতরটা যেন খালি হইয়া গেল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল !

কতক্ষণ এইভাবে তাহার কাটিল, তাহার হুঁস্ রহিল না। যখন তাহার চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসিল, সে উঠিয়া আর একবার দরজা খুলিবার বৃথা প্রয়াস করিয়', বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এখন কি করিতে পারে সে। চীৎকার করিবে ? চীৎকার করিতে সে পারিতেছে না। লোকে শুনিতে পাইবে, কি না পাইবে ঠিক কি ? তা ছাড়া কি চীৎকার করিবে ? এরূপ বিপৎ-পাত তাহার কল্পনাতীত ছিল ! কিন্তু এইরূপ বন্দী অবস্থায় সে কত কাল কাটাইবে ? তাহার মনে পড়িল, গত কল্য হইতে প্রায় তাহার কিছু আহারই হয় নাই ! উদরের ভিতর কেমন জ্বালা ধরিয়াছে ! শেষে কি এই স্থানে না খাইয়া সে মরিবে ? দামোদরের কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। সে কি ইহার জন্যই কলিকাতায় আসিয়াছিল ? উঠানে জলের কল ছিল ; সে উঠিয়া গিয়া আকণ্ঠ জল পান করিয়া লইল। মাথায় মুখে জল দিল। তার পর আবার সেই ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিল ! এ বাড়ি হইতে বাহির হইতে হইবে। বেলা বাড়িল—দামোদরের জন্য বসিয়া থাকিতে পারে না। সময় কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। তাহার নূতন কাজে যাইবার সময় বহুক্ষণ হইয়া গিয়াছে ; সে কি করিয়া যাইবে ? কাজ ত দূরের কথা—তাহার এইবার প্রাণ লইয়াই টানাটানি। দামোদর চিন্তায় আর কূল-কিনারা পাইল না। সে উঠিয়া উঠানে পদধারণা করিয়া বেড়াইল ; কল হইতে আবার জল পান করিয়া লইল। শেষে ভাগ্য ভরসা করিয়া সে ঘরে আসিয়া শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, গত রাত্রে লোকগুলি ত সদর দরজা দিয়া আসে নাই। সদর দরজা দিয়া আসিলে ত সে পদশব্দ পাইত। কেন না সদর দরজার পথ তাহার সেই ঘরের গা দিয়াই ; কেহ বাইলে আসিলে পদশব্দ পাওয়া যায়। অবশ্য খুব আস্তে সন্তর্পণে গেলে পাওয়া যায় না। কিন্তু অত লোক সন্তর্পণে কি করিয়া চলাফেরা করিবে ? উঠানেই ত শব্দ পাইয়াছে,—সদর দরজার রাস্তায় পায় নাই। তবে নিশ্চয়ই বাড়ির ভিতর কোথায়ও নিষ্ক্রমণের রাস্তা অন্য একটা আছে। দামোদর উঠিল। আবা[র] চারি দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। নর্দ্দমার না[লি] ধরিয়া অজ্ঞাত অন্ধকারে কিছু দূরে গেল ; দেখিল না[লি] গিয়া দেওয়ালেই বদ্ধ হইয়াছে। নির্গমনের পথের কোন[ও] চিহ্ন নাই। আবার উপরে গেল ; তন্ন তন্ন করিয়া খোঁ[জ] করিল। কিন্তু কোনও রাস্তা নাই। ছাদের উপ[র] পাশের বাড়ির উচ্চ দেওয়ালের দিকে সে তাকাই[য়া] দেখিল, দেওয়াল বাহিয়া ও-বাড়িতে যাওয়া যায় কি না হয় ত চেষ্টা করিলে যাওয়া যায়। কিন্তু ও-পথে কি আ[র] অত লোক আসিতে পারে, না যাইতে পারে ? মানদা কি মানদার মা ? তাহারা সদর দিয়াই গিয়াছে ! সে কি একবার দেওয়াল বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিবে না কি ? দামোদর সেই দেওয়ালের দিকে চাহিয়া মনে মনে তাহ[া] অবলম্বন করিয়া পাশের বাড়িতে উঠার সম্ভাবনা বিচা[র] করিতে লাগিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

দামোদরের অসম সাহস

শেষে দামোদর দেওয়াল ধরিয়া পাশের সংলগ্ন বাড়িতে[ই] যাইতে মনস্থ করিল। নিশ্চেষ্ট হইয়া আর সে থাকিতে না। অনাহারে মৃত্যুর চেয়ে আর বিপদ কি হইতে পারে ? যদি দেওয়াল বাহিয়া উঠিতে গিয়া সে মরে ক্ষতি নাই। মৃত্যু ত তাহার এখানেও হইবে,—সে আরও যন্ত্রণা-দায়ক মৃত্যু।

ইট-বাহির-করা দেওয়াল ; জুতা খুলিয়া পা' রাখিয়[া] উঠা কষ্টসাধ্য হইলেও, অসাধ্য নহে। দামোদ[র] দেওয়ালের গর্ত্তে পা রাখিয়া, হাতের ভরে একটু একটু করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল। প্রথমবার তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল ; হাত পা' অত্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়া সে পড়িয়া গেল। একটু জিরাইয়া নূতন সাহস ও উৎসাহ লইয়া সে পুনরায় চেষ্টা করিল। এইবার সে ধীরে ধীরে উঠিল ; অতি কষ্টে হাত ও পা স্থির করিয়া সে উঠিল। পিছনে কি নীচে তাকাইতে তাহার সাহস হইল না। প্রাণপণ করিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া সে উঠিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরিশ্রমের বাহুল্যে ঘামিয়া উঠিল ; হাঁটু ছিঁড়িয়া গিয়া জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু সে এবার আর কোন কিছুই

গ্রাহ্য করিল না। দেওয়াল বাহিয়া উঠিয়া পাশের বাড়ির ছাদে পড়িল। ছাদের এক কোণে নীচে নামিবার সিঁড়ি; কিন্তু সিঁড়ির দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। দামোদর চাহিয়া দেখিল, কোথাও কোন বাড়ি সেখান হইতে দেখা যায় না। সে দরজায় তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া ধাক্কা দিল; ভিতরের অর্গল ভাঙিয়া দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল। দামোদর দাঁড়াইয়া হাঁফ ছাড়িয়া লইয়া, সিঁড়ি দিয়া নীচে দ্বিতলে নামিল।

কেহ কোথাও নাই। জনপ্রাণীর বসতির চিহ্ন নাই। তিনটি ঘর ও ঘরের কোলে অপ্রশস্ত বারান্দা। নীচেকার তলার উঠান বারান্দা দিয়' দেখা যায়। ঘরের দুটি বাহির হইতে তালা ও শিকল দিয়া বন্ধ; একটি দরজা যেন ভিতর হইতে বন্ধ। দামোদর কি করিবে ভাবিল! এই দরজাতে ধাক্কা দিয়া দেখিবে কি ও কে আছে? তাহার পূর্ব্বে একবার সব ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া উচিত। সে একতলায় নামিল। নারাণবাবুর বাড়ির মত ইহারও একতলা অন্ধকার। দামোদর বাড়ির ধরণ দেখিয়া বুঝিল, দুই বাড়ি আগে একই ছিল; শেষে কি করিয়া আলাদা হইয়াছে। সে একটি সরু পথ দিয়া অনুমানে সদর দরজার দিকে গেল। গিয়া দেখিল, ভিতর হইতে তাহার তালা বন্ধ। তালা ধরিয়া দু'চারবার সে সজোরে নাড়িল; কিন্তু কিছুই হইল না; তালা মজবুত। তালা নাড়ার শব্দেও কেহ আসিল না। দামোদর মরিয়া হইয়া উঠিল। যে করিয়াই হোক্ সে বাহির হইবেই।

সে পুনরায় দ্বিতলে উঠিয়া আসিল ও যে ঘর ভিতর হইতে বন্ধ ছিল ভাবিয়াছিল, তাহার দরজায় প্রথম ঘা' দিল। ভিতরে কোনও শব্দ শুনিতে পাইল না। সে আরো জোরে ঘা' দিল। এইবার যেন কে ভিতরে চলিয়া বেড়াইতেছে মনে হইল। সে আরও জোরে ঘা দিল। ভিতর হইতে কে দরজা খুলিয়া দিল।

দামোদর ঘরে প্রবেশ করিল না, বাহির হইতে প্রশ্ন করিল, "কে? কে তুমি? বাইরে এসো ত একবার!"

তাহার আহ্বানে যে বাহিরে আসিল, তাহাকে দেখিয়া দামোদরের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে ভকতরাম।

ভকতরাম তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইল। কিন্তু সে ভাব লুকাইয়া সহাস্যে বলিল, "ইয়া! বাবুজী, তুমি আছে! এসো, এসো, অন্দর এসো।"

দামোদর তাহার সঙ্গে ভিতরে গেল। দেখিল ঘরের ভিতর একখানি দড়ির খাটিয়া মাত্র; দেওয়ালে একটা পেরেক হইতে ভকতরামের পাগড়ী ঝুলিতেছে। আর কোথাও কিছু নাই। ভকতরাম খাটিয়াতে উপবেশন করিল। দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "ভকতরাম বাবু! আপনি? এখানে কি করছেন? কি ক'রে এলেন? বাড়ির চাবি কোথায়?"

ভকতরাম তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "বাবুজি, বোস। তুমি কি ক'রে আস্‌লে? কোথা থেকে আস্‌লে?"

দামোদর উত্তর করিল, "সব বলছি। কিন্তু আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।"

ভকতরাম শুষ্কমুখে বলিল, "বাবুজি, হামি বদ্‌মাসের হাতে পড়েছি। কাল সন্ধ্যেবেলাতে তোমার সঙ্গে বাত্ বলে যেই বেরিয়েছি গলিতে, আর ১০।১২ জনে হামাকে ধরে বেঁধে লিয়ে এসেছে। হামার টাকাকড়ি সব ছিনিয়ে লিয়েছে। আমাকে এইখানে কয়েদ ক'রে রেখে গেছে।" তার পর একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নারাণববাবু কোথা আছে?"

দামোদর নারাণবাবুর বাড়ির সমস্ত হাল ভকতরামকে শুনাইল।

ভকতরাম শুনিয়া বলিয়া উঠিল, "বোলেন কি? নারাণবাবুর আওরত্ আর বেটিকে ভি নিয়ে গেছে? এ ত তাজ্জব-বাত্ হোল? হামি ত কিছু সমঝ্‌তে পারছি না। হামার দুষ্‌মন আছে; কিন্তু নারাণবাবুর এমন দুষ্‌মন কে আছে?" ভকতরাম গভীর উদ্বেগে কথা কয়টি বলিল।

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "তা বাড়ির ভিতর হইতে তালা বন্ধ; চাবী কোথায়? এখন ত বেরুতে হবে। এখানে কয়েদ হ'য়ে ত শুকিয়ে না খেয়ে মরতে পারি না।"

ভকতরাম কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিল, "চাবি কোথা জানি না, বাবুজি! কি ক'রে তারা পালিয়েছে জানি না। হামাকে এই কামরাতে বন্ধ ক'রে রেখেছিল; আমি ভয়ে ভিতর থেকে খিল লাগিয়ে দিয়েছিলুম।

কখন তা'রা বাহির থেকে খুলে দিয়েছে জানি না। আমি কিছু জানি না।"

দামোদর বলিল, "তাই ত! এখন কি করা যাবে? ছাতে উঠে চীৎকার কোর্‌বো, যদি কেউ শুন্‌তে পায়?"

ভকতরাম জবাব দিল, "সে হোবে না, বাবুজি। এখন কতো বেলা হো'য়েছে? কতো বেজেছে?"

দামোদর জানাইল, বেলা প্রায় একটা দেড়টা হইবে।

ভকতরাম কহিল, "তবে? এখন কেউ কি বাড়িতে আছে? সবাই কাম কর্ত্তে গেছে। এখন হল্লা করায় কোনও ফয়দা নেই। তা' ছাড়া এ হাল্ দেখে শেষে বাহিরের লোক কোনও ফ্যাসাদ বাধিয়ে দেবে পুলিস ডেকে? সেটা ভালো হোবে না। এর ওপর পুলিস সহ্য হোবে না।"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি কোর্‌বেন?"

ভকতরাম খাটিয়ার তলা হইতে একটা বাটি বাহির করিয়া দামোদরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "এইতে ভুজা চানা আছে, হামাকে খেতে দিয়েছিল, তুমি খাইয়ে লও, বাবুজি। তোমার ভূখ্ লেগেছে। তা'র পর ভেবে সোচে দেখি কি করা যায়। নিক্‌লাবার রাস্তা কোথায়ও আছে কি না তল্লাস কোর্ত্তে হোবে।"

দামোদরের ক্ষুধা পাইয়াছিলই। সে ছোলাভাজা দু' চার গ্রাস খাইয়া লইল। খাইতে খাইতে বলিল, "পাশের ঘরে কি আছে?"

ভকত্‌রাম ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে কিছুই জানে না। রাতে বহুত্ আদ্‌মি হল্লা করেছে, এইমাত্র জানে। শেষে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একটু আগে উঠিয়াছে।

দামোদর বলিল, "তালা ভাঙিয়া দেখি।"

ভকত্‌রাম কহিল, "না, বাবুজি। আগে বেরুবার উপায় করা চাই। ও তালা ভেঙে লাভ কি? তা'র পর একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "বাবুজি, আমার মনে হয় নারাণবাবুও এই দলের ভিতর আছে। তা না হ'লে তা'র আওরত্ ‘ওর বেটিয়া কোথায় গেল?"

দামোদর শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। তাই যদি হয়? হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। কলিকাতা সহরে সবই সম্ভব। কিন্তু মানদা? না, মানদা কখনই ইহার ভিতর থাকিতে পারে না। সে কখনই বদ্‌মাসের দলে মিলিতে পারে না। অসম্ভব কথা। সে ভকতরামকে বলিল, "সে পরে বুঝা যাবে, ভকতরামবাবু। এখন উদ্ধারের উপায় করা চাই। চানা ভাজা খেয়ে আর কতক্ষণ বাঁচবো!"

ভকত্‌রাম উঠিল; দামোদরও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভকতরাম দ্বিতলের সমস্ত ভাল করিয়া দেখিয়া একতলায় গেল। সদর দরজা হইতে নর্দ্দমার রাস্তা পর্য্যন্ত সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল। কোথাও নির্গমনের কোনও চিহ্ন খুঁজিয়া পাইল না। সিঁড়ি ধরিয়া উপরে ছাদে গেল। উঁকি মারিয়া নারাণবাবুর বাড়ি দেখিল। তা'র পর ঘাড় নাড়িয়া হতাশ হইয়া বলিল, "না, বাবুজি! উপায় নাই!"

দামোদর মত দিল, "সদর-দরজার তালা ভাঙ্গি!"

ভকতরাম উত্তর দিল, "ভাঙ্‌তে পার্‌বে? না তেজে যখন চল্‌বে না, উপায় নেই, তখন তাই করো।"

দামোদর নীচে একতলায় গিয়া একটা মজ্‌বুত কিছুর সন্ধান করিল কিছুই খুঁজিয়া পাইলনা। একখানা ইট ছিল; তাই দিয়া চেষ্টা করিল; ইট্ ভাঙিয়া গেল। তালা খুলিল না। দামোদর আবার আর একখানি ইট্ আনিয়া তালাতে সজোরে ঘা' দিল। তালা ঘুরিয়া গেল, ভাঙিল না। ইট ভাঙিয়া গেল। ভকত্‌রামও এতক্ষণে নীচে পৌঁছিয়া বলিল, "ও ইট দিয়ে হবে না, বাবুজি। আরও মজ্‌বুত কিছু দেখ পাও কি না।" দামোদর খুঁজিয়া আসিয়া বলিল, "না। আর কিছুই নেই।"

ভকতরাম জিজ্ঞাসা করিল, "তবে? কি কোর্ব্বে ওর, বাবুজি?"

দামোদরের রক্ত তখন গরম হইয়াছে। সে বলিল, "তালা যে উপায়ে হোক্, ভাঙিবই।"

ভকত্‌রাম হতাশভাবে বলিল, "তালা ভাঙ্‌লেই বা কি হোবে? বাহির থেকেও তালা দেওয়া থাকতে পারে! এত অস্থির হইও না। দেখ না আজ দিনভোর সবুর কোরো কি হোয়।"

দামোদর জানাইল, সে আর অপেক্ষা করিতে পারে না। তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ নাই। সে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কি আজ দিনভোর অপেক্ষা করিতে পারিবে না।

ভকতরাম বলিল, "বাপুজি, তুমি মিথ্যা পরিশ্রম কোর্‌বে। ও তালা বিলাতী ও খুব মজ্‌বুত আছে। তুমি

ইট দিয়ে তোড়্‌তে পারবে না। চল উপরে যাই, সবুর করে দেখি। আমি বড় লোক আছি উমরমে ভি, আমার পরামর্শ শোন্‌। মাথা গরম করিয়ো না। কোন ফয়দা নেই।”

দামোদর এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিল, ইট ছাড়া আর কিছুই নাই। তাও সেকালের ইট্, ভাঙা, একটুও আঘাত সহ্য করিতে পারে না। তাহার মন উদাস হইল। সে বলিল, “তবে তাই চলুন, ভকতরামবাবু! কল্‌কাতা সহরের মধ্যে এ যে সম্ভব হয়, আমার ধারণার অতীত।”

ভকতরামবাবু হাসিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে বলিল, “বাবুজি, কলকত্তা আজব সহর। এখানে সব হয়। আমি তোমাকে অনেক এ-রকম কেস্‌সা বল্‌তে পারি। তুমি অল্প উমর, তাই জান না।”

উপরের ঘরে বসিয়া ভকতরাম দামোদরকে বলিল, “বাবুজি, এ দল আমি ঠিক চিনি না। কাল রাতের আঁধারে ঠিক ঠাহর কর্ত্তে পার্‌লুম না। কিন্তু এ-রকম আমি দেখেছি। বড়বাজার ও বাঁশতলাতে এমন প্রায়ই হয়। এত বড় সহরে কে খবর রাখে? কত লোক কত মত্‌লবে ফিরছে এখানে কে বল্‌তে পারে? আমার দেখা ঘটনা তোমাকে শোনাই। তা'তে সময়ও কাট্‌বে, তোমার সাহসও হোবে।”

দামোদর নিরুপায় হইয়া রাজি হইল। চানার বাটি হইতে একমুঠা করিয়া চানা লইয়া চিবাইতে লাগিল ও ভকত্‌রামের কথা শুনিতে লাগিল।

ভকতরাম বলিল:—

বাঁশতলা গলিতে আমার গদী থেকে পাঁচ-সাত মিনিটের রাস্তা দূরে তিন-চারখানা বড় বড় বাড়ি আছে। পাশাপাশি লাগা-হুয়া বাড়ি—স্বচ্ছন্দে একটা থেকে আর একটাতে যাওয়া আসা যায়। বাড়ির সম্মুখে একটা গলি, মন্দ নহে; এ-রকম এ-বাড়ির গলির চেয়েও ঢের বেড়। আলো বাতাস আসে। সেই বাড়ি তিনটির একটাতে এক জুয়ার আড্ডা ছিল। কতো আদ্‌মি আস্‌তো যেতো তা'র ঠিকানা ছিল না, বাবুজি। আমিও মাঝে মাঝে যেতুম। জুয়াখেলা বেশ্; তা'তে মন খুব খুশী হয়, বাবুজি। হামার জুয়াখেলা খুব ভালো লাগে। আরও সব বড় বড় রূপেয়া-ওয়ালা আমীর আদ্‌মি,—মাড়োয়ারি, বাঙ্গালী, মুসলমান সব আস্‌তো। রাত ১১টা থেকে ভোর ৩।৪টা পর্য্যন্ত জুয়া খেলা হো'ত। লাখ লাখ রূপেয়া রোজ হাতবদল কোরতো। পুলিসের লোকেও জান্‌তো; মাঝে মাঝে তা'রা কিছু বখ্‌শীষ কিছু জলপানি নিতো।

আমরা যে বাড়িতে জুয়া খেল্‌তুম, তা'র পাশের বাড়িতে কিন্তু কি হোতো, কে থাক্‌তো, কিছু জান্‌তুম না। তা'র পাশের বাড়িতে একজন আগ্রা জিলার আদ্‌মী থাক্‌তো। স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে। অত বড় বাড়ির তেতলাতে একলা থাক্‌তো; চামড়ার ব্যবসা কোর্‌ত। মুসলমান কি চামার তা' জানি না। জুয়ার আড্ডার বাড়িতে তিতলে আড্ডাধারী থাক্‌তো, ছোট্টুলাল। ছোট্টুলাল সহরের নামজাদা গুণ্ডা। তা'র তাঁবে খুব কম হোলেও প্রায় তিন-শ লোক ছিল। তা'রা সহরে পকেট কাটে, চুরী করে, মাটিকে সোনা করে, নোট ডবল করে, আবার সন্ধান রাখ্‌বার জন্য লোকের বাড়ি নোক্‌রি করে, দোকানে কুলীগিরি করে, রাস্তার মোড়ে পাণ বিড়িও বেচে দোকান বানিয়ে। ছোট্টুলালের খুব পসার; খুব প্রতিপত্তি। মস্তুর আদ্‌মি। কিন্তু আড্ডা বাড়িতে তা'র স্ত্রী ও এক কন্যা নিয়েই থাক্‌তো। সেখানে কোনও লোকের উৎপাত হোত না। ছোট্টুলালের কারবারও ছিল এক—কাগজের বাক্স বানানো। সকলে জানতো ছোট্টুলালের কারবারই লছমী। আমরা অবশ্য ভিতরের খবর কুছ কুছ জানতুম। তবে আমাদের কাছ থেকে কথা বেরুতো না।

একরাত্রে ছোট্টুলালের বাড়ি গিয়ে দেখি আড্ডা জমে নি। দু'চার আদ্‌মি যা' এসেছে তা'রাও দিল লাগিয়ে খেল্‌ছে না। ব্যাপার কি? পাতা পেলুম যে ছোট্টুলালের স্ত্রী ও বেটিকে কে লোপাট্ করেছে। ছোট্টুলালের ইহা স্বপ্নের অগোচর। তা'র স্ত্রী ও বেটিকে লওয়া বা গুম করা বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু তাই হ'য়েছে। ছোট্টুলাল ভেবে রেগে অস্থির। তা'কে ডেকে জিজ্ঞাসা কোর্‌তে সে বল্‌লে, দুপুরে একবার সে কারখানায় গিছ্‌লো; তা'র পর দরকারে বাজারে গিছ্‌লো; সাড়ে চারটা পাঁচটা নাগাদ ফিরেছে। এসে দেখে তার জরু কি বেটী কেউ নেই। সে অপেক্ষা করেছে। রাত ১১টা পর্য্যন্ত তাদের কেউ ফেরে নি। নিশ্চয়ই তা'দের কেউ লুঠে নিয়ে সরেছে। ছোট্টুলালের তিনশ আদ্‌মির অন্তত দু'শো ছুটলো চারি

দিকে পাত্তা লাগাতে। সারারাত সহর তোলপাড় করে ফেল্‌লে; পাত্তা মিললো না। সকালে ছোট্টুলাল পুলিসে থানায় খবর দিলে। কি কোর্‌বে?

পুলিসের লোক এসে সমস্ত বাড়ি তল্লাস কোর্‌লে; পাশের দুটা বাড়ি তল্লাস কোর্‌লে। কোন নিশানাও পেলে না। ছোট্টুলাল বল্‌লে, "এ জীনের কাণ্ড। হাওয়া হোয়ে কি উড়ে গেল?"

জুয়ার আড্ডা আর ভাল করে জোম্‌তো না। ছোট্টুলাল কেমন মনমরা হয়ে গেল! এ-রকম অসম্ভব কাণ্ডও কলকাতায় হোয়, জানো, বাবুজি! ক্রমে ছোট্টুলালের বাড়ির আড্ডা ভেঙ্গে গেল। পাশের বাড়িতে কিন্তু একটা আড্ডা ক্রমশ পয়দা হো'ল। আগ্রাওয়ালা লোকটি—তা'র নাম—রামবকস্—সে আড্ডা খুল্‌লে। খুব জোর আড্ডা। যা'রা ছোট্টুলালের বাড়ি যেতো, তা'রা গেল না। কিন্তু নতুন আড্ডার জমাটি ক্রমশ বেড়ে গেল। ছোট্টুলাল দেখ্‌তো, শুন্‌তো, কিন্তু কিছু বলতো না। তবে তা'র মনটা দেখেশুনে জ্বলে যেত নিশ্চয়ই। একদিন কি কথা নিয়ে ছোট্টুলালের সঙ্গে রামবক্‌সের আড্ডায় লোকের বচসা হয়। সে যে কি কাণ্ড, বাবুজি তা কি বল্‌বো। যেই রাত হওয়া,—আমি সেদিন ছোট্টুলালের আড্ডায় গিছ্‌লুম—অমনি সব ছোরাছুরি বেরুলো; ছোট্টুলালের তরফে প্রায় ১৫।২০ জন ছাদ দিয়ে রামবক্‌সের সেই আড্ডাবাড়িতে লাফিয়ে পড়্‌লো। সিঁড়ির দরজা ভেঙ্গে তা'রা নীচে নেমে গেল। তা'র পর কি ঘটলো দেখি নি; তবে শুনেছি—ছোট্টুলালের দলের একটা লোকও ফেরে নি; তা'দের লাসও যে কোথায় গেল, তা ভগবানই জানেন। রামবক্‌সের দলের কি হোল—কত ঘাল হোল তা'ও শুনি নি। তবে কোন না ১০।১৫ জন ঘাল হোয়েছিল।

ব্যাপার দেখে ছোট্টুলালেরও ভয় হোয়ে গেল। সে ভাবে নি, রামবক্‌স্ এত শক্তিমান্। কিন্তু ছোট্টুলালও তখন মরিয়া হোয়েছে। সে আবার মতলব ঠিক কোরতে লাগল। কিন্তু সে মতলব ঠিক করার আগেই একরাত্রে রামবক্‌স্ ও তার দল এসে ছোট্টুলালের আড্ডা সমস্ত ভেঙ্গে চুরে, ছোট্টুলালকে জখম করে, তা'র ৫।৭ জন লোককে ঘাল করে গেল। যাবার সময় রামবক্‌স্ জানিয়ে গেল যে ছোট্টুলালের জরু ও বেটি তাহার কাছে আছে। জরুর সঙ্গে তা'র নিকা হয়েছে; বেটির সঙ্গে তা'র বেটার নিকা দিয়েছে। তা'রা মুসলমান হয়েছে। কাল সকালে পাঠিয়ে দেবে তা'দের। সত্যই তা'র পর দিন সকালে ছোট্টুলালের আওরত্ ও বেটি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এসে হাজির হোল। তা'রাও বল্‌লে যে রামবক্‌সের লোক দুপুরবেলায় এসে তা'দের লুঠে নিয়ে গিছ্‌লো; তা'দের উপর বহুত্ অত্যাচার করেছে; ইত্যাদি। ছোট্টুলাল রেগে তাদের তাড়িয়ে দিলে। তা'র পর সে নিজের দলের লোক ডেকে মন্ত্রণা সলা করে, একদিন—দুপুরবেলায়—রামবক্‌সের বাড়ি চড়াও হোল। দু পক্ষে ৫০।৬০ জন এবারও ঘাল হোল। কিন্তু ছোট্টুলাল রামবক্স, তা'র জরু ও বেটিকে লুঠে নিয়ে যে কোন দেশে কোথায় গেল, আজ অবধি তা'র আর পাত্তা নেই। তা'র দলের লোকও সবাই জানে না।

ছোট্টুলালের কারবার এখনও চল্‌ছে। রামবক্‌সের চামড়ার কারবার কিন্তু আর নেই। তা'র জুয়ার আড্ডাও গেছে। তা'র এক ছেলে ছিল; সে কোথায় কোকেনের আড্ডা করেছে। আবার দল করেছে। সে সম্ভব ছোট্টু-লালের প্রত্যাশাতে আছে। এবার আবার ছোট্টুলালের পালা। সে এইখানেই আছে, তা' ঠিক্।

ভকত্‌রাম বর্ণনা শেষ করিয়া বলিল, "বাবুজি, এ ত এই কলকত্তাতে হয়েছে। আমরা সবাই চোখে দেখেছি। এ রকম কত হোয়। এতে আশ্চর্য্য হবার কি ভয় খাবার কিছু নেই!"

দামোদর ক্রমশ নিস্পন্দ হইয়া শুনিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সত্যই কি এই সব ঘটে? এই কলিকাতায়? ইহাদের এই ছোট্টুলাল ও রামবক্‌সের তুলনায় নিতাই ঘোষ কি?

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসে দেখিয়া, রামভকত বলিল, "বাবুজি, দুজনে একত্র থাকা আর ঠিক নয়। তুমি আছ, তা' সম্ভব এরা জানে না। তুমি আবার পালাও। যেমন ছিলে, যাও। যদি আজও রাতে কোনও উপায় না হয় কাল তখন ভেবে দেখা যাবে। আজ লুকিয়ে থাকগে।"

দামোদর বলিল, "আমি ফিরবো কি করে? যে করে এসেছি, সে উপায়ে ত ফিরা যাবে না।"

ভকতরাম বলিল, "এক কাজ কর। তোমার কাপড় খুলে ফেল। ছাতে কিছুতে বেঁধে তাই ধরে ও দিক দিয়ে উত্‌রে পড়। তা'র পর আমি কাপড় খুলে দেব।"

দামোদর সেই উপায়ে পুনরায় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিল। ভকতরামের কথা তাহার যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছিল। তা' ছাড়া তাহারও মনে ভয় হইয়াছিল। লোকগুলি তাহাকে যদি খুন করিয়াই যায়, তবে সে কি করিতে পারে? কিছুই না। ইহাদের মধ্যে যে ছোট্টুলালের মত কেহ নাই, তাহা কে জানে?

(ক্রমশঃ)

পাগল

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ বি-এ

রে পাগল, ছন্ন-ছাড়া—
ওরে দিশে-হারা!
কার মূর্ত্তি গড়ি' তুমি দিতে আল্‌পনা,
আপনারে ক'রেছ উজার? নিত্য আন্‌মনা,
জগতের দ্বারে দ্বারে আজি—
হাতে ল'য়ে শূন্য তব সাজি,
তুলিতে পূজার ফুল—ব্রতী আত্মহারা!
বিদ্রূপ কুড়াও শুধু, নিত্য ছন্ন ছাড়া।
ওরে দিশে-হারা।

তোমার অন্তর-দীপ অনন্ত ঝঞ্ঝায়—
কাঁপিয়া নিবিয়া গেছে কোন্-সে সন্ধ্যায়।

প্রভাতের গাঁথা মালাখানি—
তপ্ত-বেলা ভোর, নাহি জানি,

শুকায়েছে কোন্ মরু নিঃশ্বাস আগুনে—
সীমাহীন বেদনায় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

ভেঙেছে প্রতিমাখানি, টুটেছে আগল।
ওরে ও পাগল!

সে তোর পূজার দেবী আজো তোর বুকে
ঘুমায়ে র'য়েছে বুঝি অফুরন্ত সুখে।
জীবন-দুয়ারে আজি তাই—
পূজারী প্রহরী জেগে নাই।
জরা-জীর্ণ জীবনের ছিন্ন-বাস খুলে'—
উল্লাস-উলঙ্গ হ'য়ে সর্ব্ব ব্যথা ভুলে'—
আছো তুমি নিশিদিন প্রেয়সীরে ঘিরে,
মনের অজানা কোন্ সাধনার তীরে।
দিশেহারা—উন্মনা উদাসী!
তুমি যে সন্ন্যাসী!

দাহ

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

আফিসে বসে পরিচিত হস্তাক্ষরে একটী চিঠি পেয়ে সুবিমল বিস্মিত হ'ল যতখানি, রাগও তার চেয়ে ওর বিশেষ কম হ'ল না। চিঠিখানি কে লিখেচে তা কল্পনা করে নিতে সুবিমলের এতটুকু দেরী হয় না এবং হয় না বলেই খামখানি না খুলেই ও পকেটের মধ্যে রেখে দিল। চিঠি ইরার; কিন্তু এত দিন পরে, এত জায়গা থাকতে আফিসের ঠিকানায় ইরা তাকে চিঠি লিখতে গেল কেন?

আফিসের কাজ যখন কমে এল, সুবিমল খামখানা ছিঁড়ে ফেলে চিঠিখানি পড়তে আরম্ভ করলে। ছোট দ্বাদশটী পাতা ভর্ত্তি করে ইরা তাকে এই চিটিখানি লিখেচে:

সুবিমল,

আমার চিঠি পেয়ে তুমি যে অনেকখানি বিস্ময় বোধ করবে, তা আমি প্রথমেই কল্পনা করে রাখচি; কারণ, আজ তুমি যাদের চিঠি প্রত্যাশা কর আমার নাম তাদের সকলের শেষে। তবু একদিন তুমি প্রতিনিয়ত আমার চিঠি প্রত্যাশা করতে, এবং কোন দিন সময়ের অল্পতার জন্তে আমার চিঠি যদি চার পাতার জায়গায় সাড়ে তিন পাতায় এসে শেষ হ'ত, তা'তে তোমার অনুযোগের আর অন্ত থাকত না: সুতরাং, তোমাকে আজ আবার অনধিকার-স্মরণ করলাম বলে রাগ তুমি অবশ্যই করতে পার, কিন্তু তোমায় ক'টা কথা বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত বেশী রকম প্রয়োজন হয়ে পড়েচে। নইলে এই চিঠি হয়ত লেখাই হ'ত না।

ভূমিকা এই পর্য্যন্ত।

চিঠি লেখবার সাধারণ প্রথা অনুসারে এবার তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করাই স্বাভাবিক হ'ত; কিন্তু মানুষের জীবনে যা সহজ, যা স্বাভাবিক, তোমার সঙ্গে তা'র সম্বন্ধ অত্যন্ত অল্প এবং আমিও সেগুলি প্রায় ভুলে যেতে বসেচি। সুতরাং সহজ ভদ্রতার কথা এখানে নাই বা তুললাম।

তিন-চার দিন আগের কথা,—প্রতিমাকে নিয়ে মার্কেটে গিয়েছিলে, নয়? সেদিন কি বার তা' আর মনে নেই, তবে ইভনিং-স্যুটে তোমাকে এত চমৎকার মানিয়েছিল যে, যে কোন অবিবাহিতা মেয়ে তোমাকে কামনা করতে দুঃখ বোধ করত না; প্রতিমার পরণে ছিল পাইন্যাপ্‌ল র:এর শাড়ী,—কেমন? আমিও সেদিন মার্কেটে গিয়েছিলাম। তুমি তা বোধ হয় লক্ষ্য করেচ; বোধ হয়ই বা কেন, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেচ। কিন্তু আমাকে দেখেই হঠাৎ কিউরিয়োর দোকানে ঢুকে পড়ে একটা পিতলের বুদ্ধ মুর্ত্তি নিয়ে দর আরম্ভ করে দিলে কেন? প্রতিমা ছিল বলে? কিন্তু প্রতিমা তোমার ভাবান্তর বুঝতে পারে নি, এ কথা শুনে তুমি নিশ্চয়ই আশ্বস্ত বোধ করবে।

প্রতিমাকে কি করে চিনলাম তা জানবার আগ্রহ হওয়া তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। প্রতিমার সঙ্গে এককালে পড়তাম এবং সে কথা দু'জনের কেউই ভুলে যাই নি।

প্রতিমা আমাকে দেখে দাঁড়াল।

ইরা-দি! তুমি?

আমার সঙ্গের ছোট ছেলেটীর দিকে চেয়ে প্রতিমা আবার বললে, এ কে? তোমার ছেলে বুঝি ইরা-দি? বাঃ—ফাইন্! কি নাম দিয়েচ এর? শঙ্কর বা ভ্যালেন্টিনো?

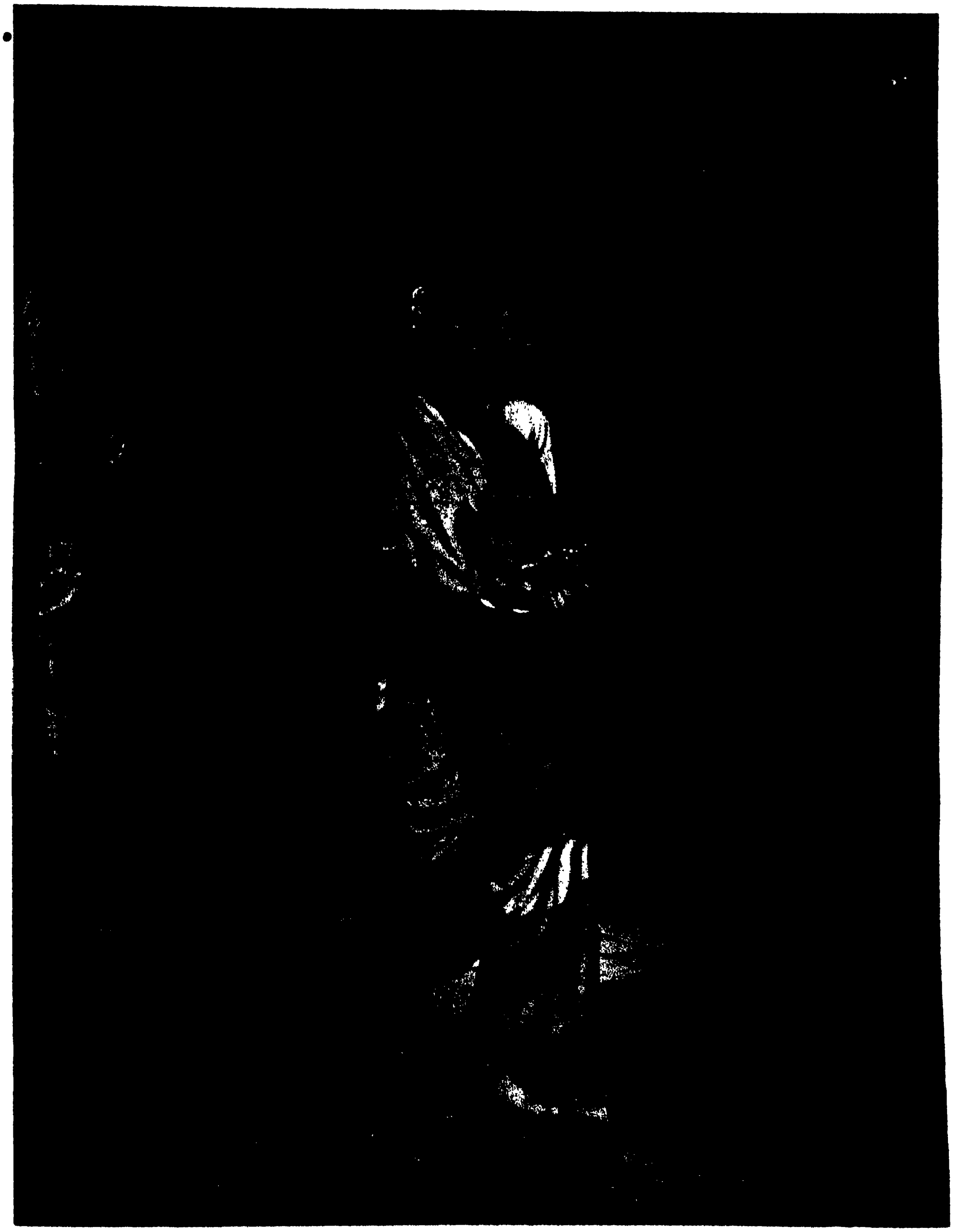
ইরার অতগুলি প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম, ভ্যালেন্টিনো রাখলে খুব খারাপ হ'ত না, কিন্তু ওর নাম দিয়েছি বিমল। নামটা কি খুব খারাপ?

মোটেই না, ওর সঙ্গে একটা 'সু' যোগ করে দিলেই আমার স্বামীর নাম হয়ে যায় তা জানো?

তার স্বামীর নাম কি না জানতাম না, কিন্তু নামটা আমার অচেনা নয়, তা তুমি জানো। ভয় নেই তোমার, প্রতিমাকে কিছু সন্দেহ করবার সুযোগ দিইনি।

প্রতিমা বললে, ওঁর সঙ্গে আলাপ করবে ইরা-দি? এসো না, উনি ওই দোকানটায় ঢুকেচেন।

প্রতিমার ব্যস্ততায় বাধা দিয়ে বললাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি যার-তার সঙ্গে আলাপ করি নে; যদি পরিচয় করাবার বাসনাই তোমার থাকে তা হ'লে you can invite me one day. কিন্তু তারও দরকার নেই প্রতিমা, দিনগুলো আমার অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কাটচে। তুমিই একদিন এসো না আমার



ভেলোরের মন্দির

শিল্পী— শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ সান্যাল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

এখানে—তের এক, মনোহরপুকুর রোড, মনে থাকবে ?

প্রতিমা বললে, তা থাকবে। কিন্তু তুমি যে চুপি চুপি বিয়ে করে ফেলেচ, এ খবর ত পাই নি !

বললাম, এ কথা তোর সম্বন্ধেও খাটে।

প্রতিমা হেসে উঠে বললে, ছ্যাট্'স রাইট। অথচ, হস্‌টেলে থাকবার সময় আমরা বলেছিলাম, কেউ কাউকে খবর না দিয়ে বিয়ে করব না। কি মজা !—' একটু থেমে প্রতিমা বললে, কিন্তু তোমার চেহারা অনেকখানি বদলে গিয়েচে ইরা-দি ; আগে তোমার দিকে চেয়ে আমাদের সকলের হিংসে হ'ত ! আজ ত' প্রথমে তোমাকে চিনতেই পারিনি। এ' রকম কি করে হ'ল ?

প্রতিমার প্রশ্নের উত্তরে বললাম, খুব সহজে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে সে কথা বলা চলে না। আমার ওখানে একদিন যাস, তার পর অনেক কথাই হয়ত বলতে পারব ; ···এই রবিবারেই, কেমন ত ?

—প্রতিমা আসবে বলে কথা দিল।

আমি বেশ কল্পনা করতে পারচি যে চিঠির এই পর্য্যন্ত পড়ে তোমার মুখ বর্ব্বর আহ্লাদ এবং মস্ত অহঙ্কারে রাঙা হয়ে উঠেচে। তুমি নিশ্চয়ই ধরে নিয়েচ যে আমি বিবাহ করেচি এবং তোমাকে না পাওয়ার বিপুল বেদনাকে সামান্য সান্ত্বনা দেবার জন্ম আমার বিবাহজ পুত্রের নাম রেখেচি তোমারই নামের প্রথম অক্ষর বাদ দিয়ে। তোমার ধারণা সত্য হলে পৃথিবীতে প্ল্যাটনিক প্রেমের আর একটা উদাহরণ তৈরী হ'ত ; তবে, সত্যি কথাটা এই যে—কিন্তু তার আগে প্রতিমার সঙ্গে বাড়ীতে আমার সাক্ষাৎ পর্ব্বটা তোমায় একটু শুনিয়ে রাখি।

মনোহরপুকুর রোডের যে ছোট্ট একতলা বাড়ীটি ভাড়া নিয়ে আছি, রবিবার দু'পুরে সত্যিই প্রতিমা সেখানে এসে পৌঁছল।

বিমলকে তখন পড়া দেখিয়ে দিচ্ছিলাম।

প্রতিমা ভিতরে পা দিয়েই কলরব করে উঠ্‌ল ! বললে, ওর বাবা কোথায় ? এখুনি তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও ? কোথায় তিনি ?

প্রতিমাকে বসতে বললাম। কিন্তু আমার কাছে বসবার চেয়ে বিমলের বাবার সঙ্গে পরিচিত হ'বার আগ্রহটাই তখন তাকে অস্থির করে তুলেচে। প্রতিমা বললে, তোমার কাছে বসে বসে গল্প করবার সময় পরে অনেক পাব। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ করাটা আমার এখুনি দরকার।

প্রতিমাকে বলতে পারতাম, তিনি বেরিয়েচেন কিম্বা বিদেশে গেছেন, ফিরতে দু'চার মাস দেরী হবে ;—এমন অনেককে বলেচি। কিন্তু প্রতিমার সামনে একটা তৈরী করা গল্প বলে যেতে কেমন লজ্জা হতে লাগল। হস্‌টেলে প্রতিমা আর আমি থাকতাম এক ঘরে। সেই ঘরটীতে আমাদের কৈশোর-কল্পনার সঙ্গতি-হীন কত কাহিনী, আমাদের অপরিস্ফুট মনের গোপন বাসনার কত অনুচ্চারিত বিলাপ অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেছে—সে সব প্রতিমাকে দেখে, মনের দুয়ারে এসে কলরব করতে লাগল। আমাদের পাড়াটা দুপুরের রোদে একেবারে নির্জীব ; শুকনো হাওয়া ঘরের সামনে দিয়ে ছুটোছুটি করচে। হস্‌টেলের ঘরে এমনি বহু মধ্যাহ্ন প্রতিমার চীৎকার, ইলা-দির-গান, বেলা-ডলি-টুনু-কেতকীর তাস খেলার শব্দে মুখরিত হয়ে থাকত !··· প্রতিমার কাছে আত্ম প্রবঞ্চনা করলাম না। বললাম, বিয়ে আমার হয় নি প্রতিমা, কেন মিছি-মিছি পীড়াপীড়ি করচিস !···

প্রতিমা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেল ; প্রথমে মনে করলে ঠাট্টা, কিন্তু অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকেও যখন কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, তখন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রতিমা কেবল এইটুকু জিজ্ঞাসা করতে পারল : কিন্তু বিমল···?

বললাম, ওর কথা বলব বলেই তোকে আসতে বলেছিলাম। কাব্য করে বলতে হ'লে বলা যায়, ও আমার বন্দিনী নারীত্বের ফল নয়, আমার দেহ-তীর্থের মুক্তির ফুল। সাদা বাংলায়, বিয়ে না করেই ওকে পেলাম।

প্রতিমা আবার কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না ; আমার প্রতি সমবেদনায় ওর ঠোঁট দু'খানি কাঁপচে। মনে হল, সেই মুহূর্ত্তটী.ত অতীতটা আমাদের দু'জনের মাঝখানে মরে গিয়েচে, তার মৃতদেহ সামনে রেখে আমরা বিলাপ করচি। কতকগুলো মিনিট নিঃশব্দে পার হয়ে এলে প্রতিমা বললে, তুমি কি ইচ্ছে করেই এই কলঙ্ক কুড়িয়েচ ইরা-দি ?

প্রতিমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, ঠিক বলতে পারি না, কিম্বা ঠিক কি বললে সত্যি বলা হবে তা বুঝতে পারি না।···

হাঁ, একদিন তাকে চেয়েছিলাম বৈ কি,—আমার প্রথম জাগরণের সমস্ত আবেগ আর উত্তেজনা দিয়ে তাকে চেয়েছিলাম; কবির ভাষায় বলতে গেলে আমার সে দিনের স্বপ্নে শুধু তারি পদধ্বনি শুনতাম। একদিন সে কাছে এলো। অ্যাপোলোর মত মূর্ত্তি, সূর্য্যোদয়ের মত জ্যোতির্ম্ময়। তার পর···চরম আত্ম-নিবেদনের পালা। কিন্তু তখন কে জানত যে জোর করে কারও মনের পায়ে বেড়ী দিয়ে রাখা যায় না; যার সবটুকু জানি বলে অহঙ্কার করি, তার কিছুই হয়ত জানি না।

আহত কণ্ঠে প্রতিমা বললে, চলে গেল লোকটা?

চলে যাওয়াই তার রীতি। এমনি বহু মনের উপর পদচিহ্ন রেখে দিয়ে সে নিজের পথে চলে গেছে—পরে জানলাম; কিন্তু তখন অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে। আমার মাঝখানে তখন নতুন সৃষ্টির বীজ···

তার পর—?

তার পর, এই বিমলকে পেলাম। এক মেয়ে-ইস্কুলে পড়াতাম, হাতে কিছু টাকা ছিল—বিবাহিত বলে পরিচয় দিয়ে এক প্রসূতি-আগারে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

প্রতিমা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, লোকটার নাম জানতে আমার বড্ড কৌতূহল হচ্চে ইরা-দি! · বলবে না?

প্রতিমাকে আমি সেই লোকটার নাম বলি নি এবং কোন দিন বলব না। বলব না, তার কারণ, প্রতিমা তোমাকে নিয়ে মনে মনে যে আকাশ-কুসুম রচনা করেছে, আমি তা ভেঙে দিয়ে অপরাধের বোঝা বাড়াতে চাই না।

প্রতিমার কাছ থেকে তোমার জীবনের latest মূর্ত্তি—অর্থাৎ বিবাহিত জীবনের খানিকটা পরিচয় পেলাম; ঠিক পরিচয় নয়, একটু আভাষ বলতে পারি। শিলংএ ছোট একটা বাংলো ভাড়া নিয়ে তোমাদের দু'জনের বিবাহিত জীবনের প্রথম পরিচ্ছদটা কেটেচে শুনলাম। শুনলাম তুমি ওকে সমস্ত দেহ মন দিয়ে সারাক্ষণ ঘিরে রাখ, এক মুহূর্ত্ত তাকে ছেড়ে কোথাও যাও না—এক আফিস যাওয়া ছাড়া। জীবনে আফিস-আদালতগুলো না থাকলে প্রেমের পথ যে আরও সুগম হ'ত, এ কথা আমি নিজের মনে স্বীকার করি এবং তুমিও বোধ হয় এই একটা মাত্র বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত। দেখছিলাম—তোমার কথা বলতে গিয়ে তার শ্যামল মুখখানিতে গৌরবে এবং গর্ব্বে মাঝে মাঝে অরুণোদয়ের আভা! কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো? আমার মনে হয়, প্রতিমা তোমার যে জিনিষটাকে প্রেম মনে করে পরম পরিতৃপ্তি বোধ করচে, সেটা তোমার সমস্ত জীবনের অপ্রিয় অভিজ্ঞতার অভিশাপ! তুমি প্রতিমাকে বিশ্বাস কর না, বিশ্বাস করবার ক্ষমতা তোমার নেই, তাই ছায়ার মত দিন-রাত তাকে বেষ্টন করে থাকতে চাও। ওকে এক মুহূর্ত্ত একলা রেখে তোমার স্বস্তি নেই—এ কথা প্রতিমা না বুঝুক আমি বুঝি। তুমি আজীবন সুন্দরী মেয়েদের জন্তে উন্মাদ হয়ে, শেষকালটায় প্রতিমার মত একটা সাধারণ শান্ত এবং শ্যামলা মেয়েকে বিয়ে করলে কেন, এর কারণ আর যার কাছেই অজানা থাক না কেন, আমার কল্পনা করে নিতে দেরী হয় না। অনেক মণি-মাণিক কুড়িয়ে আজ আভরণহীনতার প্রতি তোমার এই আসক্তি, কারণ, মণি-মাণিক চুরী যাবার ভয় থাকে, এ ক্ষেত্রে তা নেই; কেমন? আমার কথা অনায়াসে বাদ দিতে পারো, কিন্তু আরও অনেক মেয়ে তোমার রুচির এই অধঃপতন দেখে কি মনে করবে বল ত?

আমার ছেলের নামের সঙ্গে কেন তোমার নামের সাদৃশ্য রাখলাম, সেই কথা বলেই চিঠি শেষ করব। আমার সামাজিক জীবনকে কুৎসিত করে', আমার শিশুর যে পরিচয় গোপন করবার জন্ত তুমি পালিয়েছিলে, তার নামের মধ্যে দিয়ে সেই পরিচয়ই আমি তোমাকে দিয়ে গেলাম। দশ পনের বছর পরে, তোমার প্রথম যৌবনের শরীরী মূর্ত্তির মত একটা কিশোরের সঙ্গে কোনদিন যদি তোমার পথে দেখা হয় এবং কৌতূহলী হয়ে তুমি যদি তার নাম জানতে চাও, তা' হলেই তার পরিচয় তুমি পাবে। মায়ের জীবনে সব চেয়ে বড় পাপ—সন্তানের মৃত্যুকামনা। যতদিন বেঁচে থাকব, আমি সেই কামনাই করব; কারণ পৃথিবীতে সে তোমার চেয়ে এবং আমারও চেয়ে অভাগা; কিন্তু আমার সে কামনা তাকে যদি মৃত্যুই দেয়, তা' হ'লে সেই মৃত্যুর অভিশাপ যেন শুধু আমার গায়েই না লাগে। তোমার ওপর আমার সব চেয়ে বড় অভিশাপ এইখানেই।

তোমাকে এর চেয়ে কোন শক্ত কথা বলবার আ[illegible] কি না মনে করতে পারচি না। কিন্তু এই চিঠিটাকে তু[illegible] আমার maintenance suit file করবার ভূমিকা মনে ক[illegible]

ভয় পেও না ; আমি বালিগঞ্জের একটী মেয়ে স্কুলে পড়িয়ে যা পাই তা'তে বিমলকে তোমার কাছে কোন দিন হাত পাততে হ'বে না বলে আশা রাখি। —ইরা।

চিঠি যখন শেষ হ'ল, আফিসে তখন লোকজন বড় একটা কেউ নেই। বেয়ারাগুলো দরজা-জানালা বন্ধ করবার উদ্যোগ করচে।

সুবিমল বেয়ারাকে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল দিতে বলে, পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখখানা মুছে ফেলল। তার চওড়া কপালে আঁকা-বাঁকা হাজারটা রেখা ; মুখখানি এমনি নিস্তেজ যে তার সঙ্গে নিশীথ রাত্রির জনহীন পল্লী-শ্মশানের তুলনা করলে নিতান্ত অতিশয়োক্তি হয় না।

পনের-বিশ মিনিট পরে চিঠিখানা সে কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে জোর করে উঠে পড়ল। কিন্তু প্রতিমার সামনে যেতে তার ভয় হচ্চে। প্রতিমাকে ইরা যদি না জানত। প্রতিমা হয়ত সব বুঝতে পেরেচে ; তবে অনাবশ্যক মনে করে ইরাকে বা তাকে কোন কথা বলা প্রয়োজন মনে করে নি। ভীরু, মৃদুস্বভাব প্রতিমা! এই মুহূর্ত্তে প্রতিমাকে সামনে পেলে সুবিমল হয়ত গলা টিপে তার কণ্ঠ চিরকালের মত থামিয়ে দিত ; কিন্তু প্রতিমা এখন অনেক দূরে এবং প্রতিমা যখন রূপোর রেকাবীতে জল-খাবার সাজিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াবে তখন সুবিমল হয়ত বলবার কোন কথা খুঁজে পাবে না।

আফিস থেকে বার হ'বার সমস্ত সিঁড়িগুলি স্বপ্ন-চালিতের মত পার হয়ে সুবিমল পথে এসে পড়ল। ট্রামেই তার বাড়ী ফেরবার কথা ; কিন্তু এক সময় সুবিমল দেখল সে একখানা ট্যাক্সিতে উঠে বসেচে। অনেক দিন পরে সুবিমলের ট্যাক্সি চৌরঙ্গীর একটা নামজাদা 'বারে' এসে থামল। খানিকটা র' হুইস্কী গলায় ঢেলে সুবিমল আবার ট্যাক্সিতে উঠে বসল···

রেড রোড, পার্ক ষ্ট্রীট···আলো···ট্রাম···বাস···ইরা··· যূথিকা···রসা রোড—ইরা, প্রতিমা···বিমল···

সুবিমল ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিতে বললে।

কলকাতা তখন রাত্রির রূপসী নটীর মত মনোহারিকা। শীতের রাতের কুয়াসায় বড় বড় গাছগুলি এবং মাঠের পরপারে, খিদিরপুরের দিকের সারি সারি আলোগুলি ভারি অদ্ভুত মনে হয়!—যেন অর্দ্ধবিস্মৃত কতকগুলি পরিচিত মুখ, অস্পষ্ট কয়েক টুকরো হাসি। সেই আলো, ট্রাম-মোটর, বাস-সাইক্লের বেতালা চীৎকার, হোটেল ও রাস্তা ও রেস্তরাঁর তীব্র আলো, হাসি আর কলরবের মাঝখানে নাগরিক সভ্যতার প্রেতের মত সুবিমল সে রাত্রে এগারটা পর্য্যন্ত ট্যাক্সিতে ঘুরে বেড়াল···

তার পর বাড়ীতে।

কিন্তু প্রতিমার আচরণে এতটুকু বৈষম্য দেখা গেল না।

প্রতিদিনের মত মধুর হাসিটুকু মুখে টেনে প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, এত রাত্রি হ'ল আজ ?

সুবিমল দ্রুত পায়ে উপরে উঠে যেতে যেতে বললে, এমনি। কিন্তু আজ রাত্রে আমার খাবার করো না, আমি খেয়েই এসেছি।

রাত্রি—যে রাত্রি মানুষকে সমস্ত দৈন্য থেকে আড়াল করে, যে রাত্রি মানুষের সমস্ত দৈন্য উদ্‌ঘাটিত করে দেয়।

সাদা ফুলের মত একরাশ জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল বিছানাটার ওপর। সুবিমল শার্সীটা বন্ধ করে দিল। তবু নির্ব্বাক জ্যোৎস্না নিদ্রা-নিশ্চেতন প্রতিমার শিথিল সর্ব্বাঙ্গে লুটিয়ে পড়ল।

প্রতিমার যত্ন-রচিত কবরী ভেঙ্গে গেচে, ঘোমটা গেছে খসে। তার পরিপূর্ণ যৌবন জ্যোৎস্নালোকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেচে। ঠোঁটের চারি পাশে মুক্তার মত ক'টী স্বেদ-বিন্দু···

সুবিমল উঠে পড়ল।

অনেকের প্রথম প্রেম নিয়ে এতদিন ও যে ছেলেখেলা করেচে, প্রতিমাও যে তাকে তেমনি করেই প্রতারিত করল না এ কথা কে বলবে ? নইলে ইরা আর সুবিমলের সম্বন্ধে ওর মনে এতটুকু সন্দেহ জাগল না কেন ? কেন ও মুখ ফুটে একটী কথা বলল না ; বলল না যে তুমি প্রতারক, তুমি কপট···

সুবিমল খাট থেকে নেমে পাথরের মেঝের উপর একটা বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ল। এখানে জ্যোৎস্নার নিরাবরণতা নেই। না থাক্, নিভরতাও নেই। ঘুম যখন চোখ একটু নিমীলিত হয়ে আসে, তখুনি ও মুখের ওপর অনুভব করে বহুমুখের চুম্বনের উষ্ণতা ; বহু বিস্মৃত দেহস্পর্শে তার তন্দ্রা আসে তরল হয়ে··· ··

এমনি করে রাত্রি ভোর হয়।

এমনি কত রাত্রি তার জীবনের মুহূর্ত্তগুলিকে বিষাক্ত করে তুলবে ভেবে সুবিমল ভয় পেয়ে চম্‌কে ওঠে। সান্ত্বনা পাবার লোভে একটু চোখের জল ফেলবার দুর্ব্বলতাও তার এসেছিল ; কিন্তু তার জন্যে যারা চিরজীবন চোখের জল ফেলেচে এবং ফেলবে, তাদের অনেকের নির্ব্বুদ্ধিতা স্মরণ করে সেই অন্ধকারের মধ্যেই সুবিমল হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল।···

তরুণ জাপান

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিশ্বের সাহিত্য-সৃষ্টিতে আজ একটা নূতন সুর শোনা যাচ্ছে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এক কথায় সে সুর মানবতার। কেউ কেউ তর্ক তুলে বলবেন, পূর্ব্বকালের সাহিত্যে কি মানুষ ছিল না? উত্তরে বলতে হ'বে, ছিল



জাপানী কবরী



জাপানী পাদুকা

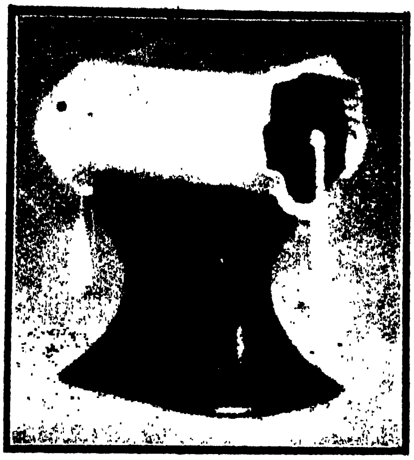
বই কি; কিন্তু সেই মানুষগুলির আগে একটা 'অতি' যোগ করে দেওয়া দরকার। অর্থাৎ পূর্ব্বকালের সাহিত্যে মানুষের উদারতা, মানুষের মহত্ব ও ত্যাগের বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহের ছবিই বিশেষ সমারোহ করে ফুটিয়ে তোলা হ'ত। প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ দুঃখ সুখ, অগণ্য গণ-জীবনের ক্ষুধা, লোভ, আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার ছবি তার মধ্যে চোখে পড়ত কদাচিৎ। আজকের সাহিত্য সেই



বাসের মহিলা কণ্ডাক্টার

গুলির সঙ্গে এবং মানুষের সেই পাপ-কলুষ-কদর্য্যতার সঙ্গে পরিচিত করেছে। শুধু রাশিয়ায় নয়, প্রত্যেক দেশে

সাহিত্যেই আজ এই মানব-জীবনের বহু-বিচিত্র বাণী কম বা বেশী ভাবে আত্মপ্রকাশ করচে। আভিজাত্য-প্রিয় জাপানও এই প্রবল জনগণ-বন্যাকে আটকে রাখতে পারে নি। নানা ভাবে তা সেই দেশের সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে।



জাপানী বালিশ

সেইগুলি এক কালে জাপানের গন্ত ও কবিতার উপর যথেষ্ট ছায়াপাত করেচে। তা ছাড়া মানব-জীবনের পক্ষে প্রায়-অসম্ভব মহত্ত্ব ও ত্যাগের এবং বিচিত্র প্রেমের কাহিনী ত ছিলই। কিন্তু একদিন জাপান হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, সেগুলির মধ্যে রস হয় ত কিছু আছে, কিন্তু সত্য-বস্তু বুঝি কিছুই নেই। এই চেতনা তাদের অত্যন্ত প্রবল



জাপানী পাদুকা



লণ্ঠন উৎসব

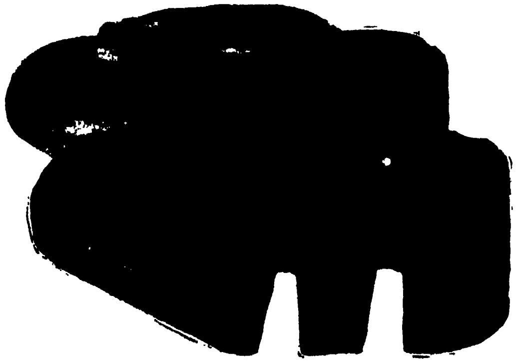
জাপানে আগের দিনে যে-শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টি হত, তার প্রকৃতি অবসর-বিনোদনের। জাপানের দেব-দেবীদের সম্বন্ধে যে অসংখ্য, এবং সম্ভবতঃ অমূলক, কাহিনী প্রচলিত আছে, হয়ে উঠল ১৯২৩ সালের সেই সর্ব্বনাশা ভূমিকম্পের পর; এবং জাপানের সাহিত্য-ক্ষেত্রেও সে এক ভূমিকম্পই বলতে হ'বে। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে দেশকে অসম্ভব ও অবাস্তব

স্বপ্ন দেখিয়ে যাঁরা এত কাল খ্যাতি ও অর্থ দুই সমান ভাবে উপার্জ্জন করে আসছিলেন, তাঁরা বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে



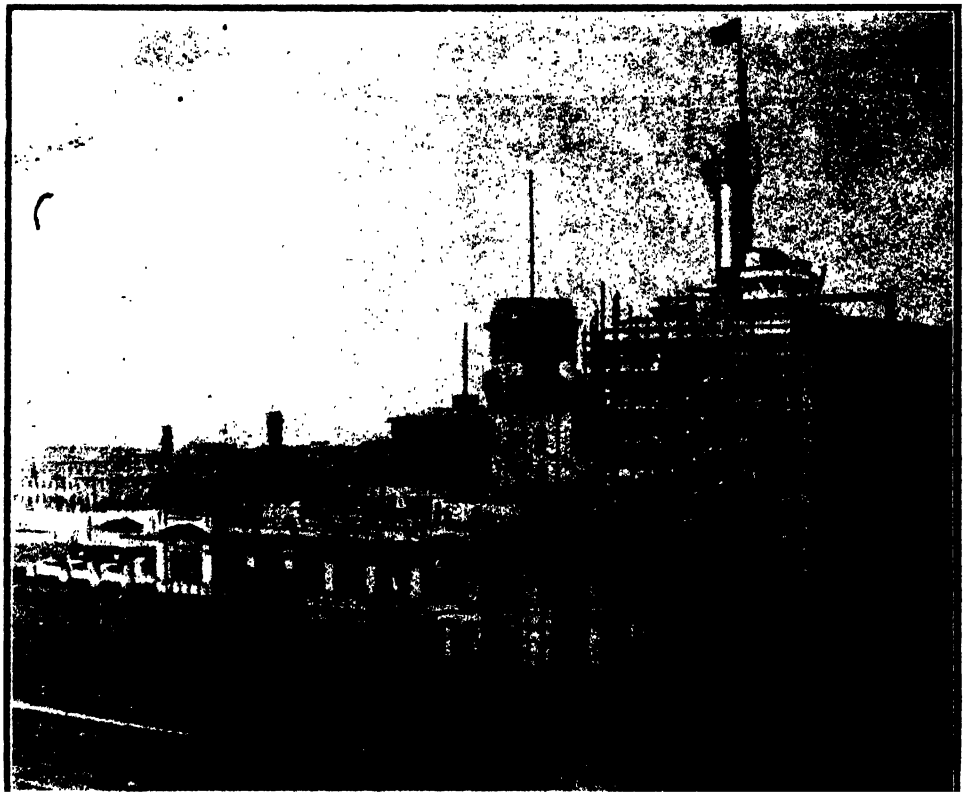
জাহাজ থেকে অতিকায় মৎস্য শীকার

সেই দিন থেকে দুটী দল হয়ে গেল; সুরু হয়ে গেল দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ।



আর একপ্রকার পাদুকা

কিন্তু জনসাধারণ যে বস্তুটাকে সত্য বলে বোঝে, তাকে নীতি বা আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে চেপে রাখা এক রকম অসম্ভব,—কারণ মানুষের চিত্তকে অধিকার করাই প্রত্যেক

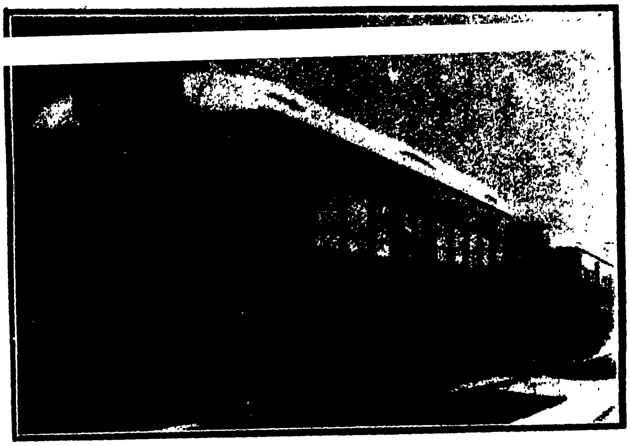


ওসাকা অসাহী সংবাদ পত্রের কার্য্যালয়

দেখলেন তাঁদের আরামের ক্ষেত্রে ধুলো মাখা, কয়লা-মলিন এক বিরাট জনতার আবির্ভাব! জাপানী সাহিত্যে সাহিত্যের প্রাথমিক প্রয়োজন। জাপানও তা পারল না এবং ক্রমে তা এমনি বিস্তার লাভ করল যে জার্ম্মাণী এবং

রাশিয়া ছাড়া গণ-সাহিত্যের এমন আদর বোধ করি আর কোথাও হয় নি। সাহিত্যের মধ্যে নিজেদের অনুচ্চারিত বেদনার প্রতিধ্বনি শুনে দলে দলে চাষী ও মজুররা তার ভাগ নিতে লাগল। বৃটেনের কথা ছেড়েই দিলাম; কিন্তু আমেরিকা বা ফ্রান্সেও বোধ হয় গণ-সাহিত্যের এমন প্রচার ও প্রভাব নেই। জাপানী সাহিত্য-ক্ষেত্রে আজ মার্কস্‌পন্থী লেখক সংখ্যায় বহু।

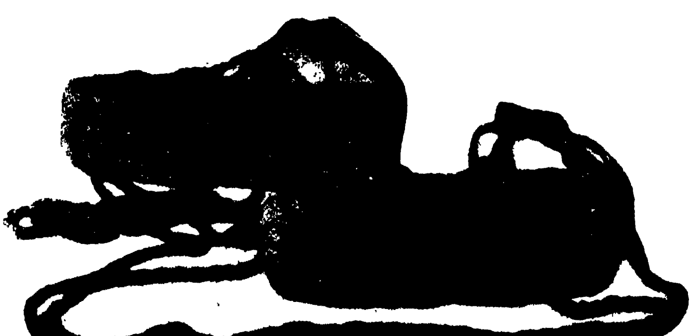
জাপানের সাহিত্যের গণ-আন্দোলন সুরু হয় প্রকৃত পক্ষে ১৯২১ সালে। তখন কিন্তু এর প্রভাব বেশী ছিল না—নূতনকে বরণ করতে প্রত্যেক দেশই প্রথমে সঙ্কোচ প্রকাশ করে থাকে। ক্রমে এই আন্দোলনটী বিস্তৃত ও পল্লবিত হ'তে লাগল এবং তার ফলে এই শ্রেণীর কয়েকজন লেখক মিলে একটা নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। সেই প্রতিষ্ঠানটীর নাম হ'ল "নিপ্পন গণতান্ত্রিক সাহিত্যিক সঙ্ঘ।"



গ্যাসোলিন চালিত গাড়ী



দাই—শানসুয়ে,—একপ্রকার জলচর জন্তু



জাপানী পাদুকা



কবরী রচনার আর এক পদ্ধতি

এরপর; ১৯২৮ সালে আর একটা দল গড়ে উঠল; এই দলটার নাম—"গণতান্ত্রিক শিল্পীসঙ্ঘ।" এই দুটী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ফলে যাঁরা বিক্ষিপ্ত ভাবে জনসাধারণের বাণী প্রচার করছিলেন, তাঁরা একত্র হয়ে কাজ করবার সুযোগ পেলেন, তাঁদের শক্তি বহু গুণ বেড়ে গেল। এ ছাড়া সেখানে আরও কতকগুলি সাহিত্যিক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু সবগুলির নাম উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয়। আমাদের দেশেও সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রতিনিয়ত নানা রকম কলরব শুনি। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জন-

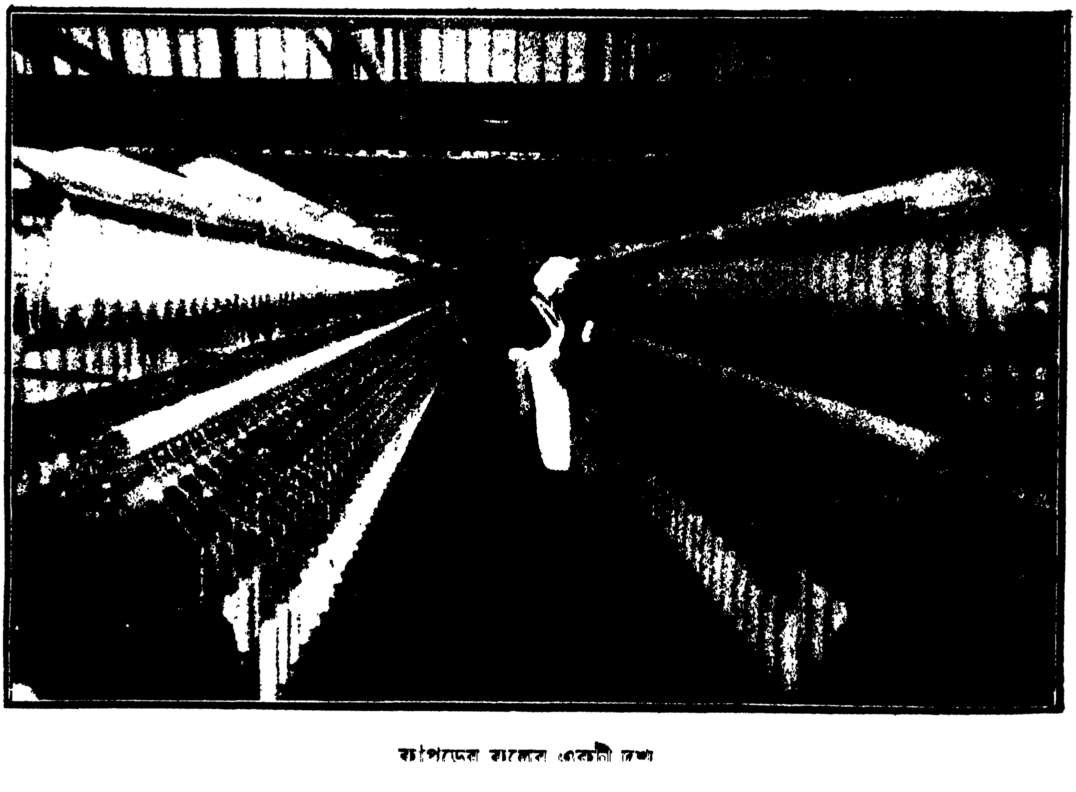
গণের বাণী প্রচার করবার চেষ্টাও যে একেবারে হয় নি তাও নয়। সাহিত্য-সেবীদের সংখ্যাও যে খুব অল্প, তাও মনে হয়



কেয়দে গাছের পাতা—এই গাছ শুধু জাপানেই দেখতে পাওয়া যায়

না; কারণ, এ দেশে বেকারের সংখ্যা কম নয় এবং যেখানে বেকার সংখ্যা বেশী সেখানে সাহিত্যের উপর উপদ্রবও বেশী। কিন্তু তবু আজ পর্য্যন্ত এই দেশে সাহিত্যিকদের এমন একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'ল না যেখানে সম্মিলিত হয়ে তারা নিজেদের দুঃখ-দুর্দ্দশা, অভাব অভিযোগের আলোচনা, তার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করতে পারে। দেশে ফুটবল খেলোয়াড়দের সমিতি আছে, তাস খেলোয়াড়দের এসোসিয়েশন আছে; কিন্তু সাহিত্যিকদের মিলবার একটী জায়গা নেই। সাহিত্যিকদের সম্বর্দ্ধনার চেয়ে এই ধরণের একটী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ঢের বেশী প্রয়োজন। কিন্তু থাক এ অবাস্তব কথা।

পূর্ব্বে নিপ্পণ গণতান্ত্রিক শিল্পী-সঙ্ঘ নামে যে প্রতিষ্ঠানটীর উল্লেখ করেছি, সেই সঙ্ঘের নামকরা লেখকদের মধ্যে চোকু টোকুনাগা, তাকিজি কোবিয়াশি, শিগেহারু নাকানো, তিপ্পেই কাতায়োকা এবং ইনেকো কুয়েকাওয়ার খ্যাতি আর সকলকে ছাড়িয়ে গেচে। এই দলের মধ্যে থেকে মিস্ য়ুরিকো চুজো বলে একটা মেয়েও সবিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেচে। মেয়েটী কয়েক বৎসর সোভিয়েট রাশিয়ায় কাটিয়ে এসে সম্প্রতি সাহিত্য-ক্ষেত্রে আত্ম-



কাপড়ের কলের একটী দৃশ্য

নিয়োগ করেছে এবং অত্যন্ত অল্প কালের মধ্যে যে খ্যাতি সে অর্জ্জন করেছে, তা অনেকের পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। জাপানে জনগণের বাণী নিয়ে যে সব বই লেখা দিয়েছে, সেইগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই "সূর্য্যালোকহীন পথ"। বইটীর রচয়িতার নাম চোকু টোকুনাগা। বইখানি জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হয়ে বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। "সত্যের উৎস" নামে তামিকি হোসোদার লেখা একখানি বইতে বণিক সমাজের কীর্ত্তি-কাহিনী যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে চিত্রিত হয়েছে, তা এ দেশের কোন পুস্তকে চিত্রিত হলে নিশ্চয়ই রাজরোষে নিপতিত হ'ত। সম্প্রতি জাপানের সাহিত্যিকেরা কৃষক সমস্যার প্রতি বিশেষ উৎসাহের সহিত মনোনিবেশ করেছেন।

এই শ্রেণীর বইগুলির সঙ্গে রাজনীতির একটা পরোক্ষ সম্বন্ধ আছে, কারণ এগুলি রাজনৈতিক প্রচারকার্য্যে সাহায্য করে। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে কোনরকম সম্বন্ধ নেই, অথচ বাস্তব জীবনের চিত্র চমৎকার নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছে, এমন বইয়ের সংখ্যাও জাপানে নিতান্ত অল্প নয়। এদেরও নিজস্ব একটী দল আছে। এই সব বস্তুতান্ত্রিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তোমন সিমাজাকি, জুনিচিরো তানিজাকী, টন সাতোমি, কোজিয়ো হিরোৎসু, সাইনি সুয়ো যুজো ইয়ানা মোটো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বস্তুতন্ত্রবাদীদের মধ্যেও আবার দুটী দল আছে,—নূতন ও পুরাতন। কেবল শিল্পের খাতিরে শিল্প সৃষ্টি করবার ঝোঁকও একদল সাহিত্যিকের সেখানে দেখা যায়। কিন্তু, কি কারণে জানি না, তাঁরা সেখানে বিশেষ জনপ্রিয় হ'তে পারেন নি।

প্রত্যেক দেশের মত জাপানেও 'সস্তা' সাহিত্যের অভাব নেই। তবে ১৯২৩ সালের পূর্ব্বে এ ধরণের বই জাপানে না কি খুব অল্পই বা'র হ'ত। এই বইগুলি সাধারণতঃ কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ভগ্নাংশ নিয়ে রচিত হয়; কিন্তু ইতিহাসকে যথার্থভাবে অনুসরণ না করলেও চলে, কেবল কল্পনার বল্গা খুসী মত ধরে থাকলেই হ'ল। এই দলের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় দুইজন লেখকের নাম হচ্ছে নায়োকী এবং হামেচাওয়া।

জাপানের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে একজনের নাম বাদ দিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই লোকটির নাম ইয়ন্ নোগুচি। জাপানের কাব্য-সাহিত্যে এর বড় কবি আর কোন দিন আত্মপ্রকাশ করেনি। নোগুচির কবিতায় খ্যাতি তাঁর মাতৃভূমির চতুঃসীমা অতিক্রম করে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর কবিতায় বর্ত্তমান জীবনের সমস্যা হয় ত নেই, কিন্তু তাঁর কবিতাকে যদি কর্ম্মশ্রান্ত জাপান-জীবনের একটী বিশ্রাম-নীড় বলে অভিহিত করি, তা'তে আর যাই হ'ক, অতিশয়োক্তির অপরাধ হয় না। জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মত তাঁর কবিতার ভাষা ও ভাব এক অপূর্ব্ব রহস্য ও স্নিগ্ধতায় বিজড়িত। সূর্য্যাস্তের পর এবং রাত্রির আগমনের মাঝখানে, নিস্তরঙ্গ নদীর জলের উপর যে স্নিগ্ধ, রহস্যময় সৌন্দর্য্যের আভাষ পাই, নোগুচির কবিতাও সেই স্বপ্নজগতের আভাষ দেয়। নোগুচির কাব্য আজ বিশ্বের সাহিত্যসভায় সমাদৃত হয়েছে, সুতরাং তার সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বলবার নেই। কেবল তাঁর কাব্য-জীবন আরম্ভের কথা এখানে উল্লেখ করব। তাঁর প্রথম যুগের অধিকাংশ কবিতাই আত্মপ্রকাশ করেছিল ইংরাজী ভাষায়। কারণ, যখন সেগুলি তিনি রচনা করেন, সে সময় তিনি ছিলেন বিদেশে। ছেলে বয়স থেকে তাঁর বিদেশেই কেটেছিল এবং বিদেশেই তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। অত্যন্ত কঠোর জীবন-সংগ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সেই বিদেশেই তিনি তাঁর জীবনের স্বপ্নগুলিকে সর্ব্বপ্রথম রূপ দিয়েছিলেন।

জাপানের সাহিত্যের কথা এই পর্য্যন্ত।

এবার জাপানের সুর-শিল্পের কথা।

জাপানের ভৌগোলিক অবস্থিতির জন্যে ইউরেশিয়া এবং আমেরিকার সভ্যতার ধারা বহু কাল ধরে জাপানের উপর প্রভাব বিস্তার করে আসচে। বিশেষ করে জাপানের সুর-শিল্পের মধ্যে এই জিনিষটী এমনভাবে নিজের ছাপ রেখে গেছে যে, অত্যন্ত সহজে তা লোকের চোখে পড়তে বাধ্য। দশম শতাব্দী থেকে প্রাচীন জার্ম্মাণ সঙ্গীত এবং আধুনিক রাশিয়ান এবং ফরাসী সঙ্গীত, তা' ছাড়া ইতালীর অপেরার সঙ্গীত-পদ্ধতি ত' জাপানের সুর-শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছেই, তা ছাড়া আমেরিকার মুখর ছায়াচিত্র 'জ্যাজ্'-ও

তার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেচে। ফলে জাপানী সুর বা সঙ্গীত-শিল্পের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। এ দিক দিয়ে জাপান অত্যন্ত পর-নির্ভরশীল, তা স্বীকার করতেই হ'বে।

জার্ম্মাণ-সঙ্গীতের প্রভাবই সকলের বেশী। সঙ্গীতে জার্ম্মাণ প্রথা প্রচলনের জন্ত এক কালে না কি সরকার থেকে সাহায্য করবার ব্যবস্থাও ছিল। 'টোকিয়ো স্কুল অফ্ মিউজিক' নামে জাপানে যে সঙ্গীত-শিক্ষার সরকারী প্রতিষ্ঠানটী আছে, তার অধিকাংশ শিক্ষকই শিক্ষালাভ করে আসেন হয় জার্ম্মানী, নয় অষ্ট্রিয়া থেকে। ফলে জাপানের সঙ্গীত-শিল্পের উপর যদি জার্ম্মানীর ছাপ অত্যন্ত বেশী করে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তা'তে বিস্মিত হ'বার কিছুই নেই। কারণ, উপরিউক্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানটী ছাড়া জাপানে সঙ্গীত-শিক্ষার উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠান নেই বললেই হয়। শিক্ষকদের সাহায্যে বাচ্, হ্যাণ্ডেল্ ও মোজার্টের মত বিখ্যাত 'কম্পোজার' এবং বীঠোভেন, মেন্ডেলসন্, স্কুশন্ প্রমুখ রোমাণ্টিক স্কুলের বিখ্যাত সুর-শিল্পীদের বিশিষ্ট পদ্ধতিগুলি অনায়াসেই ছাত্রদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হ'তে পেরেচে। তবে এই অনুকরণের ফলে, বৈশিষ্ট্য হারালেও জাপানের সঙ্গীত-শিল্পের এই একটা সুবিধা হয়েচে যে, তার আদর্শ কখনও ছোট হয়ে পড়ে নি। তারা নকল করতে চেয়েচে বটে, কিন্তু সুর-শিল্পের যা' কিছু শ্রেষ্ঠ তারি উপর তা'দের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

পূর্ব্বেই বলেচি যে, আধুনিক রাশিয়ান এবং ফরাসী সুর-শিল্পের ছাপও জাপানের সঙ্গীত-কলায় দেখা যায়। কিন্তু এই দুটী দেশের প্রভাব জার্ম্মানীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প। এর একটা কারণ এই যে, রাশিয়ান এবং ফরাসী সুর জাপানে যথাযথ ভাবে আমদানী করা হয় নি। পথেই তার বিকৃতি ঘটেচে। মিঃ ইজো তেরুই এবং মিস্ ওয়াকো ওগিনো ফরাসী সঙ্গীত জাপানে চালাবার জন্তে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। জাপানে যাঁরা রাশিয়ান সঙ্গীত প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেচেন, তাঁদের মধ্যে জোসেফ সিকেরক্লাট, সোণ্ডইয়েফস্কি এবং বোরিস স্যাফের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁরা নিজেরাই জার্ম্মান সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

ফরাসী ও ইতালী-সুলভ অপেরা কিন্তু জাপানে সাফল্যের সঙ্গে প্রবর্ত্তিত হয়েচে। সম্প্রতি "ক্যামিলি" 'ম্যাডাম্ বাটারফ্লাই' বলে দু'খানি গীতিনাট্যের অভিনয় সেখানে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েচে।

জাপানের নিজস্ব যে সুর-শিল্প তার সাধনাও একেবারে কেউ করেন না, এমন নয়। তবে তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এঁদের মধ্যে মিসেস্ ইকুকো নাগাই এবং মিস্ চিয়াকো সাটোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এঁরা খাঁটী জাপানী ভাষায়, জাপানী ঢঙে সঙ্গীতচর্চ্চা করে থাকেন। এঁদের চেষ্টায় জাপানের নিজস্ব সঙ্গীত-শিল্পের লুপ্ত-প্রায় ধারাটী এখনও একেবারে বিশুষ্ক হয়ে যায় নি।

আগামী সংখ্যায় জাপানের নৃত্যকলা এবং খেলা-ধূলার কথার আলোচনা করব।



পুরাতন বাংলা সংবাদপত্র

অধ্যাপক শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত এম-এ

পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রে ১৯ শতাব্দীর বাংলার পরিচয়

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে যে সকল প্রাচীন বাংলা সংবাদপত্র সংগৃহীত আছে তাহার মধ্যে কোন কোনটী বাংলা দেশে দুষ্প্রাপ্য। ডক্টর সুশীলকুমার দে ইহার কয়েকটীর পরিচয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে—"কলিকাতা রিভিউ" প্রভৃতি পত্রিকায় দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্যক্ নহে। এই সকল সংবাদপত্রে বিগত শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও নানা বিষয়ক অনেক প্রকার জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্যে আমার উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও বাঙ্গালার ইতিহাস

(সোমপ্রকাশ, ১১ই জুলাই, ১৮৫৯)

"শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন আমাদিগের নিকটে উক্ত উভয় গ্রন্থ প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। উক্ত উভয় গ্রন্থই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ভূদেববাবুর প্রণীত। ইহাতে যন্ত্রবিজ্ঞান ও বাষ্পীয় যন্ত্রের বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বিজ্ঞান শাস্ত্র অতিশয় কঠিন। কঠিন শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ সরল ভাষায় ব্যক্ত করা সহজ কর্ম্ম নহে। ভূদেববাবু তাহা করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে অধিকতর প্রশংসা করিতে হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে যে প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাতে আমরা অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারি, এতৎ পাঠে পাঠকগণের সবিশেষ উপকার দর্শিবে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলার ইতিহাস রামগতি ন্যায়রত্ন সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে হিন্দু রাজাদিগের চরমাবস্থা অবধি নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর অধিকার কাল পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহার রচনা ললিত ও প্রসাদ গুণ দ্বারা অলঙ্কৃত।"

সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স

(সোমপ্রকাশ, ১লা আগষ্ট, ১৮৫৯)

"গত ১২ই জুলাই সুপ্রিম কোর্টে ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সুপ্রিম কোর্টের এই নিয়ম আছে সেসন খুলিবার সময়ে প্রধান বিচারকর্ত্তাদিগকে এক একটি বক্তৃতা করিতে হয়। তিনি সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ঐ দিবস একটী বক্তৃতা করেন। তদ্দ্বারা তাঁহার উদার স্বভাব ও মহানুভাবতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি তাঁহার যে আত্যন্তিক বিদ্বেষ বুদ্ধি ও স্বদেশীয়দিগের প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ আছে, তিনি এককালে উভয়েরই পরিচয় দিয়াছেন। স্বদেশীয়ের প্রতি অনুরাগ থাকা কোন ক্রমেই নিন্দনীয় নহে, কিন্তু সেই অনুরাগ অসঙ্গত ও ন্যায়বিরুদ্ধ হইলেই দূষনীয় হয়। ইউরোপীয়দিগের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ জন্মিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ানুগত না হইলেও আমরা তন্নিমিত্ত তাঁহার প্রতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট নহি। কিন্তু তিনি মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলিয়া অকারণ যে এতদ্দেশীয়দিগের কুৎসা করিয়াছেন তন্নিমিত্ত আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। তিনি অল্প দিন হইল এদেশে আসিয়াছেন, অদ্যাপি তিনি এদেশের কিছু জানিতে পারেন নাই। সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া এককালে একদেশের যাবতীয় লোককে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলা সামান্য ধৃষ্টতার কর্ম্ম নয়। তিনি যেরূপ পদের লোক এ কর্ম্ম তদুপযুক্ত হয় নাই।"

নূতন গ্রন্থ

(সোমপ্রকাশ, ৫ই নবেম্বর, ১৮৬০)

[এই তারিখের 'সোমপ্রকাশ' সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীহরিনাথ ন্যায়রত্ন কৃত মুদ্রারাক্ষসের বাঙ্গলা

অনুবাদ ও নীলদর্পণ গ্রন্থের সমালোচনা করেন। শেষোক্ত সমালোচনাটী উদ্ধৃত হইল।]

"নীলদর্পণ মূল গ্রন্থ। গ্রন্থকার স্বনাম প্রকাশ করেন নাই। ইহা ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে নীলকরদিগের যাবতীয় অত্যাচার সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে এই সংস্কার জন্মে, নীলকরদিগের কোন অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তাঁহারা স্ত্রীহত্যা ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ নহেন। গ্রন্থকার নীলদর্পণকে করুণরসপ্রধান করিয়া রচনা করিয়াছেন। পাঠকালে অনেক স্থলে আমাদিগকে অশ্রুমোচন করিতে হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা বিলক্ষণ রচনা চাতুর্য্য ও সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে এই বোধ হয়, জগদীশ্বর এদেশের লোকের অনৈক্য ও আলস্য দোষের দণ্ডবিধানার্থ-ই নীলকরদিগকে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন।"

বাঙ্গলা ভাষার অনাদর

(সোমপ্রকাশ, ১২ই নবেম্বর, ১৮৬০)

"বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গালিদিগের জননী স্বরূপ। বাঙ্গলা এক্ষণে অতিশয় দীন ভাবাপন্ন আছেন। ইহার বেশভূষা উজ্জ্বল নয়, শ্রীও সেবকগণের প্রীতিবিধায়িনী নহে। ইহাকে এই নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা বাঙ্গালিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহার প্রতি অণুমাত্র অবজ্ঞা প্রদর্শন বিধেয় হয়না।

... ...

বাঙ্গলা ভাষা আজিও ইংরাজীর তুল্যাবস্থ হয় নাই বলিয়া কি ইহার প্রতি উপেক্ষা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য? উপেক্ষা করিলে কি কখন ইহার অবস্থা সংশোধিত হইবে? সে উপেক্ষায় কেবল আমাদিগের অসারতা প্রকাশ হইবে, অন্যদেশীয়দিগের নিকটে আমরা উপহসনীয় হইব সন্দেহ নাই.........ইংরাজীর কি এদেশের চলিত ভাষা হইবার সম্ভাবনা আছে? স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ব্যতিরেকে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। কি প্রাচীন কালে, কি ইদানীন্তন কালে, যখন যে জাতি সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া প্রধানতম জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহাদিগের নিজের একএকটা ভাষা বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। অন্যদেশীয় ভাষা ঋণ করিয়া কেহ কখন শ্রেষ্ঠ পদবীতে অধিরূঢ় হয় নাই। গ্রীকদিগের যদি একটী সজাতীয় ভাষা না থাকিত, তাহারা কি তাদৃশ উন্নত পদ লাভে সমর্থ হইত? রোমকদিগের কি স্বতন্ত্র ভাষা ছিল না? ইউরোপ খণ্ডের ইদানীন্তন প্রধানতম জাতিদিগের কি স্বতন্ত্র নিজ নিজ ভাষা নাই? এক এক দেশে এক এক প্রকার বৃক্ষ আছে। তাহারা দেশান্তরে নীত হইলে বদ্ধমূল ও বর্দ্ধমান হয় না। ইংরাজী ভাষাও আমাদিগের দেশে সেইরূপ হইবে। ইহা শীতপ্রধান দেশের ভাষা, ইহা কখনই এই উষ্ণ দেশে বদ্ধমূল ও বর্দ্ধমান হইবে না।"

[উক্ত সংখ্যা সোমপ্রকাশে প্রকাশ যে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের "সুশীলার উপাখ্যান" গ্রন্থ পাঠে প্রীত হইয়া রঙ্গপুরের অন্যতর জমীদার শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁহাকে ২৫ টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।]

নূতন গ্রন্থ

(সোমপ্রকাশ, ১৯শে নবেম্বর, ১৮৬০)

"সম্প্রতি বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ হইতে শিল্পিক দর্শন নামে একখানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত। ইহাতে শিল্প শাস্ত্র ঘটিত কয়েকটি বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই বিষয়গুলি পূর্ব্বে বিবিধার্থসংগ্রহে প্রকটিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ যদি বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয়, সবিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা আছে। বালকগণ ঢাকাই বস্ত্র প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু সচরাচর দেখিতে পায়, তাহার কোন্ বস্তু কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, কোন্ বস্তু কিরূপে প্রস্তুত হয়, কোন্ বস্তু কোথা হইতে আইসে, এসকল অবগত হইতে পারিবে। এই সকল জানিবার সময়ে তাহাদিগের চিত্ত একান্ত কৌতুকাবিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অতএব আমাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, এতৎ পাঠে বালকগণের সাভিনিবেশ প্রবৃত্তি জন্মিবার সমধিক সম্ভাবনা আছে।"

ইয়ং বেঙ্গাল ও হিন্দু পেট্রিয়ট

(সোমপ্রকাশ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৬০)

[১৮৬০ খৃঃ এর ২৮শে নবেম্বর সংখ্যা 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ইয়ং বেঙ্গলের মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির তীব্র সমালোচনা

বাহির হয়। তৎপ্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন।]

"নব্যতন্ত্রের লোকেরা ইয়ং বেঙ্গাল এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ের কতগুলি লোকের দোষে এই শব্দদ্বয় সর্ব্বসাধারণের এমনি বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহার অর্থ এক্ষণে কাহার অবিদিত নাই। অর্থ করিয়া দেওয়া বাহুল্য।.........আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লাবকদিগের মধ্যে কতগুলি লোক এরূপ আছেন, তাঁহারা কেবল কপট ভাবাবলম্বী নহেন. তাঁহাদিগের চরিত্র ও ব্যবহার বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে অন্তঃকরণে বিজাতীয় ঘৃণাসহকৃত রোষ ও ক্ষোভের উদয় হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের চরিত্র বর্ণন বিষয়ে অধিকতর বক্তব্য নাই, এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে, তাঁহাদিগের ব্যবহারের সহিত পশুগণের ব্যবহারগত অধিকতর বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়না। না, হিন্দু-ধর্ম্ম, না, খৃষ্ট ধর্ম্ম, না ব্রাহ্ম্য ধর্ম্ম, কোন ধর্ম্মেই তাঁহাদিগের আস্থা নাই, তাঁহারা নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। কিন্তু নাস্তিকেরা লোক সমাজের কল্যাণ কামনায় যেমন সামাজিক নিয়ম পদ্ধতির রেখা মাত্র অতিক্রম করেনা, তাঁহারা সেরূপ নহেন। তাঁহাদিগের যাদৃচ্ছিক ব্যবহার দর্শন ও শ্রবণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, পশুগণেরও তাদৃশ বিরুদ্ধ ব্যবহার নাই। আজি যিনি উদ্যান বিহারী ও সুরাপানে মত্ত হইয়া বারাঙ্গনা সঙ্গে রসরঙ্গে রজনী যাপন করিয়া আইলেন, তাঁহাকেই আবার দেখিতে পাইবে প্রাতঃকালে দিব্য গরদের জোড় পরিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকেই আবার কতিপয় দণ্ড পরে দেখিতে পাইবে, সুশোভিত আসনে আসীন, পুষ্পোপহার বেষ্টিত, মুদ্রিত নয়ন ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। এই ব্যক্তিকেই আবার সায়ংকালে দেখিতে পাইবে, এক সভাগৃহে অধিষ্ঠিত ও কতিপয় সুশিক্ষিত যুবক বেষ্টিত হইয়া তারস্বরে এই বক্তৃতা করিতেছেন হিন্দু ধর্ম্ম উৎসন্ন না হইলে এদেশের উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই। ঈদৃশ ব্যবহার কোন্ ধর্ম্মের ও কোন্ সভ্য ও পণ্ডিতগণের অনুমোদিত?......

আমরা উপরে নব্যতন্ত্রের যে সমস্ত ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা করিলাম, ইংরাজী অধ্যয়নই ইহাঁদিগের কাল স্বরূপ হইয়াছে। ইংরাজী ইহাদিগের শুভ ফলদায়ী না হইয়া বিপরীত ফলোপধায়ী হইয়াছে। ইংরাজী ইহাদিগের হিন্দুধর্ম্মরূপ দুর্ভেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের প্রধান গুণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ইংরাজী প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম উৎসন্ন হওয়াতে সে গুণও সেই সঙ্গে সঙ্গে উৎসন্ন গিয়াছে। উল্লিখিত মহাপুরুষেরা পরস্ত্রীস্পর্শে ভীরু নহেন, সুরাপানেও পরাঙ্মুখ নন। এবং অসৎ বিষয় সেবাদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের চরিতার্থতা সম্পাদন পুরুষার্থ জ্ঞান করেন। ক্ষোভের বিষয় এই, ইংরাজী অধ্যয়ন ইহাদিগের এই সকল দোষের নিবারণে সমর্থ না হইয়া প্রত্যুত এই সমস্ত দোষের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজীর এ সমস্ত দোষ নিবারণ ক্ষমতা নাই, পাঠকগণ এ বিবেচনা করিবেন না, অন্যদেশের কথা থাকুক, এদেশের এই নব্য সম্প্রদায়েরই অনেকের ইংরাজী প্রভাবে চরিত্র এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, অন্যকে তদনুকরণে একান্ত স্পৃহাবান্ ও যত্নশীল দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে উপরি বর্ণিত গুণধরেরা হিন্দুধর্ম্ম বিনিময় করিয়া সভ্যতাসহচর দোষগুলি ক্রয় করিয়াছেন।"

[২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ তারিখের সোমপ্রকাশের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রকাশ যে মেজর রিচার্ডসনকে পাথেয় ও অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য টাউনহলে ৫ই ফেব্রুয়ারী এক সভা হয়। চারিহাজার টাকা পাথেয় ও অভিনন্দন প্রদানের পরে রিচার্ডসন কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে যাহারা বলিয়া থাকেন যে এদেশীয়দিগের কৃতজ্ঞতা নাই তাহারা অতিশয় ভ্রান্ত।]

নূতন পত্রিকা

১৮৬১ খৃঃ ৪ঠা মার্চ্চ 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশ:

"ইণ্ডিয়ান রিফরমার নামে একখানি পাক্ষিক সমাচার পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা উহা পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। এতদ্দেশীয় কোন খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী উহার সম্পাদক। ধর্ম্মসংক্রান্ত উপদেশ দান, দেশের আচার ব্যবহার সংশোধন ও এতদ্দেশীয়দিগের উৎকর্ষ সম্পাদন চেষ্টা করা সম্পাদকের প্রধান উদ্দেশ্য।"

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ

(সোমপ্রকাশ, ৮ই এপ্রিল, ১৮৬১)

[১২৬৭ সনের ১৭ই চৈত্র পাইকপাড়ায় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ দেহত্যাগ করেন। তিনি বঙ্গীয় নাট্যশালার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে সোমপ্রকাশে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিত হয়।]

"উক্ত রাজা ১২৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কালেজে ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিদ্যাশিক্ষায় বাল্যাবধিই তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ও যত্ন ছিল। তিনি ইংরাজীতে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কাব্য ও নাটক বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি এই শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া আপনিই কেবল অনির্ব্বচনীয় আনন্দসুখ অনুভব করিতেন না, তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল না, উহার অভিনয়াদি দর্শন করিয়া স্বদেশের লোকে আনন্দিত হন এবং তাঁহাদিগের সহৃদয়তা বৃদ্ধি হয়, এই তাঁহার মনোগত ইচ্ছা ছিল। এই উদ্দেশে তিনি আপনার উদ্যান মধ্যে ঐ নাটকের অভিনয়োপযোগী সমুদায় অনুষ্ঠান করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিমিয়া ও ফটোগ্রাফিতে তাঁহার সবিশেষ নৈপুণ্য ছিল। তিনি বহু মুদ্রা ব্যয় করিয়া কিমিয়া ও ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত যন্ত্র সকল পাইকপাড়ার বাটীতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ফটোগ্রাফি দ্বারা তিনি ইংরাজ প্রভৃতি অনেকের প্রতিমূর্ত্তি তুলিয়া লন। অশ্ববিদ্যায় তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। এতৎ সংক্রান্ত প্রায় শতাবধি ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করেন। ঘোটক দেখিবামাত্র তিনি তাহার গুণদোষ বুঝিতে পারিতেন। সুলক্ষণাক্রান্ত ঘোটক তাঁহার নয়নগোচর হইলে তিনি আনন্দে এককালে উন্মত্ত প্রায় হইতেন। তাঁহার নিজ উদ্যানে ঘোটক শিক্ষার একটি কারখানা ছিল। অনেক অশ্ববিদ্যাবিৎ পণ্ডিত তাঁহার অশ্ববিদ্যায় যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।"

নূতন সংবাদপত্র

(সোমপ্রকাশ, ২২শে জুলাই, ১৮৬১)

"পরিদর্শক নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী এতৎ সম্পাদন ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। নূতন বলিয়া একণে আমরা এতদ্বিষয়ে আপনাদিগের বক্তব্য ব্যক্ত করিতে অভিলাষী নহি। এখন ইহার প্রশংসা স্থলে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষার রীতিক্রমে ইহার রচনা হইতেছে। এখন এ গুণও পরম দুর্লভ জ্ঞান হয়।"

নূতন গ্রন্থ

(সোমপ্রকাশ, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬১)

আমরা এবারেও ক্রমশঃ কয়েকখানি নূতন গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। আর, এম, বসু কোম্পানি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত ব্রজাঙ্গনা কাব্য মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। এবং আমাদিগকে উহার একখণ্ড উপহার দিয়াছেন। ইহার রচনা প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে।"

বীরাঙ্গনা কাব্য

(সোমপ্রকাশ, ১০ই মার্চ্চ, ১৮৬২)

বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ প্রবর্ত্তয়িতা প্রসিদ্ধ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত বীরাঙ্গনা নামে একখানি নূতন কাব্য সম্প্রতি প্রচার হইয়াছে। আমরা তিলোত্তমা ও মেঘনাদ অপেক্ষা এতৎ পাঠে সমধিক প্রীতিলাভ করিলাম। ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত মধুর হইয়াছে। ইহাতে একাদশ সর্গ আছে। এক এক সর্গে শকুন্তলা প্রভৃতি একাদশ নায়িকার এক একখানির পত্র লিখিত দৃষ্ট হইল। পত্রিকাগুলি, গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য, বহুজ্ঞতা ও ভাবুকতার বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। অনেক স্থলেই আমাদিগের মন তাঁহার প্রশংসা গানে ধাবমান হইল। তিনি অনেক স্থলেই উল্লিখিত নায়িকাগণের বিরহ ও মনের ভাব সুন্দর রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। নীলধ্বজের পত্নী জনা পার্থহত আত্মপুত্রের শোকে কাতর হইয়া যে পত্রখানি লিখেন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হৃদয়পরিতোষকর হইল। কাব্যের বীরাঙ্গনা এই যে নাম দেওয়া হইয়াছে, ঐ পত্রখানি দ্বারাই তাহা অন্বর্থ হইয়াছে।

বিধিসৃষ্টির ন্যায় কবিসৃষ্টিতেও একাধারে সমুদয় গুণ দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থকার কি যুক্তিতে তারা ও সুর্পণখার পত্রদ্বয় বীরাঙ্গনার অন্তর্নিবেশিত করিলেন? এতৎ পত্রদ্বয়

সন্নিবেশ দ্বারা গ্রন্থের "বীরাঙ্গনা" এই নামটীর অন্বর্থতা কি অব্যাহত রহিতেছে? তারা দেবগুরু বৃহস্পতির ধর্ম্ম-পত্নী। চন্দ্র যখন দেবগুরু বৃহস্পতির নিকটে অধ্যয়ন করেন, তারা তাঁহার অসামান্য রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। তারা কি বীরাঙ্গনা? চন্দ্র ধর্ম্মভয়, গুরুভয়, ও লোকভয় গণনা না করিয়াও অসতী তারার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন, বলিয়া তাঁহাকে বীরোচিত পূজা করা কি কবির অভিপ্রেত? সেই বীর চন্দ্রের সংসর্গ করাতে তারাও কি বীরাঙ্গনা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন? শূর্পণখা ও লক্ষ্মণের বিষয়ে এরূপ ঘটনাও দৃষ্ট হইতেছে না। লক্ষ্মণ ঐ অসতীর প্রশ্রয় বর্দ্ধন করেন নাই। এবম্বিধ অনুচিত প্রণয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃগণের ধর্ম্মনীতি বিষয়ে শৈথিল্য জন্মিবার সমধিক সম্ভাবনা আছে। বোধ হয়, গ্রন্থকার পোপের ইলোয়িসা ও আবেলার্ড স্মরণ করিয়া তারা ও চন্দ্রের প্রণয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু ইলোয়িসা ও আবেলার্ড এবং তারা ও চন্দ্র বৃত্তান্তে বহু বৈলক্ষণ্য আছে। অবিবাহিত আবেলার্ড অন্যের অপরিগৃহীত ইলোয়িসার প্রতি প্রণয় প্রদর্শন করিয়া লোকস্থিতি ভ্রংশকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া যান নাই, কিন্তু চন্দ্র গুরু-পত্নী গমন করিয়া তাহা করিয়াছেন। ইলোয়িসা আবেলার্ডের নিকটে অধ্যয়ন করিতেন। শিষ্যার পাণিগ্রহণ চেষ্টা আবেলার্ডের এই যে কিছু অপরাধ। কিন্তু এ অপরাধ চন্দ্রের গুরুপত্নী গমনাপরাধের নিকটেও যাইতে পারে না।

অপর, শকুন্তলা দুষ্মন্তকে লিখিতেছেন,

"দয়া করি, কভু যদি বিরামদায়িনী
নিদ্রা, সুকোমল কোলে, দেন স্থান মোরে,
কত যে স্বপনে দেখি, কব তা কেমনে?
স্বর্ণরত্ন সংঘটিত দেখি অট্টালিকা;
দ্বিরদরদ নির্ম্মিত দুয়ারে দুয়ারী
দ্বিরদ; সুবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে;
ফুলশয্যা; বিদ্যাধরী গঞ্জিনী কিঙ্করী;
কেহ গায়, কেহ নাচে; যোগায় আনিয়া
বিবিধ ভূষণ কেহ; কেহ উপাদেয়
রাজভোগ! দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি,
অলকা সদনে যেন! শুনি বীণাধ্বনি;
গন্ধামোদে মাতে মন, নন্দন কাননে—
(শুনেছি এ কথা, নাথ, তাত কণ্বমুখে)
নন্দন কাননান্তরে বসন্তে যেমনি!
তোমায়, নৃমণি, দেখি স্বর্ণ-সিংহাসনে!
শিরোপরি রাজছত্র! রাজদণ্ড হাতে,
মণ্ডিত অমূল্য রত্নে; সসাগরা ধরা,
রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে!
কত যে জাগিয়া কাঁদি কব তা কাহারে।"

এই বর্ণনাটী অতিশয় অনৈসর্গিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। শকুন্তলা বনেই জন্মিয়াছেন; বনেই বর্দ্ধিত হইয়াছেন; তিনি কখন নগর দর্শন করেন নাই; নগরের কিছুই জানেন না। তাঁহার রত্ন সিংহাসনাদির স্বপ্নদর্শন নৈসর্গিক নহে। শকুন্তলা যদি কখন রত্ন সিংহাসনাদির সদৃশ কোন পদার্থ দর্শন করিতেন, তাহা হইলেও একদিন তাদৃশ স্বপ্নদর্শন বর্ণন করা কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইত। যে পদার্থ কখন চক্ষে দেখা না যায় অথবা যাহার সদৃশ অপর পদার্থ কখন নয়ন গোচর না হয়, তাহার স্বপ্ন দর্শন সম্ভাবিত নহে। আমরা অনেকবার লণ্ডনের বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু কখন ত লণ্ডন স্বপ্নে দেখি নাই। এতদ্ভিন্ন, গ্রন্থকারের হায়রে প্রভৃতি কয়েকটী প্রেমাস্পদ শব্দ আছে, তাহা অযথা স্থানেও বিন্যস্ত হইয়াছে।"

উৎসব ও উৎসবপ্রিয় ব্যক্তিগণ

(সোমপ্রকাশ, ১২ই মে, ১৮৭২)

"এক্ষণে আর আমোদ নাই, সে কাল গিয়াছে" বৃদ্ধদলের অনেকে এই আক্ষেপ করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমাদিগের সমাজের একটি বিশেষ অবস্থা ঘটিয়াছে, ইহা অন্য দেশে দৃষ্ট হয় না। অন্য অন্য দেশে নব্যতন্ত্র নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি ভালবাসেন, বৃদ্ধেরা এসকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বঙ্গদেশে বৃদ্ধেরাই যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতিতে আসক্ত এবং কৃতবিদ্য যুবকেরা তাহাতে বিমুখ হইয়া পুস্তক পাঠ, সভায় তর্কবিতর্ক ও সংবাদ পত্রাদি পাঠে সমধিক অনুরক্ত দৃষ্ট হন। যুবকেরা উল্লিখিত যাত্রাদির আমোদে রত হওয়া লঘুচেতার কর্ম্ম বিবেচনা করেন।

যাঁহারা উল্লিখিত আমোদের বিদ্বেষ্টা, বোধ হয়, তাঁহারা

এই কথা কহিবেন, আজি কালি চাঁদা, সভা, রাজনীতি সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্ক ও দর্শন বিজ্ঞানাদি শিক্ষার কাল উপস্থিত, এ সময়ে কি কোন প্রকার আমোদ করা উচিত? আমাদিগের মাতৃভূমির কি এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে আমরা স্বদেশের হিতসাধন পরিত্যাগ করিয়া উল্লিখিত জঘন্য আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইব? পক্ষান্তরে উৎসবপ্রিয় ব্যক্তিরা বলিতে পারেন "আমরা যদি বারইয়ারি পূজা করি, বাইনাচ দেখি, অথবা যাত্রা শুনি তাহা হইলে নব্য সম্প্রদায়ের সম্পাদকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন; স্নান যাত্রায় গেলে নিন্দা হয়, গ্রাণ্ট সাহেবের স্মরণীয় চিহ্নে না দিয়া যাত্রায় প্যালা দিলে অপব্যয় হয়। তবে কি আমরা কেবল পেচকের ন্যায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিব?" পাঠকগণ! আমরা ইহার অন্যতর কোন বাক্যেই অনুমোদন করিতেছি না। আমোদ নিতান্ত আবশ্যক, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। আমাদিগের শরীর যেরূপ নিদ্রার পর নূতন বল প্রাপ্ত হয়, আমোদের পরও তেমনি আমাদিগের মন সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হয়। কোন্ ব্যক্তি সমস্ত দিন কেরাণীগিরি, শিক্ষকতা, কিম্বা ওকালতী করিতে সমর্থ হন? কিন্তু সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদ সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় প্রীতিকর হয়না। বৃদ্ধেরা যে যাত্রা পাঁচালী প্রভৃতিতে আনন্দসুখ অনুভব করেন, নব্য সম্প্রদায়ের তাহা ভাল লাগেনা কেন, এক্ষণে তদ্বিষয় বিবেচিত হইতেছে।

পূর্ব্বকালে যে যে বিষয়ে হিন্দুজাতির শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইয়াছিল, এই জাতির রাজত্ব ও স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদায় বিষয়েরই প্রায় শ্রীভ্রংশ হইয়া যায়। অভিনয়াদি বিষয়ে হিন্দুজাতি যে উৎকর্ষ লাভ করেন, ক্রমে তাহার বহু বিপর্য্যাস হয়, তদ্বিষয়িনী রুচিও ক্রমশঃ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে। আমরা এক্ষণে যে যাত্রাদি দর্শন করি, তাহা সেই রুচি বিপর্য্যাস দোষের ফল। এখন সে রঙ্গভূমি নাই, এখন সে অনুরূপ ভূমিকা, বিশুদ্ধ নাট্যোক্তি ও বিশুদ্ধ সংগীতাদির রীতিও নাই। এখন সমুদায়ই বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আলঙ্কারিকেরা অশ্লীলতা দোষকে নাটকের একটী প্রধান দোষ বলিয়া গণনা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ দোষটী এক্ষণকার যাত্রাদির একটী প্রধান গুণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। মধ্যে যে কতগুলি লোক হইয়া গিয়াছে এবং এখনও আমরা যাহাদিগকে বৃদ্ধ এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তাহাদিগের অধিকাংশ লোক ঐ সকল অশ্লীল যাত্রাদির একান্ত ভক্ত। ঐ মহাপুরুষেরা কেবল যে আমাদিগের দেশের নাটক নাটিকা প্রভৃতির অভিনয়াদিকে হীন দশা পাওয়াইয়াছেন এরূপ নহে। তাঁহারদিগের হইতে আমাদিগের দেশ নানাপ্রকারে দুর্দ্দশা ও দুর্নামগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের যেরূপ গুণ, তাহাতে এরূপ ঘটনা হওয়া অসম্ভাবিত নহে। তাঁহারা না জানেন সংস্কৃত, না জানেন বাঙ্গালা, না জানেন ইংরাজী। যাঁহাদিগের এমন গুণ, তাঁহাদিগের অসাধ্য কি আছে? লার্ড মেকলি এ দেশের যাবতীয় লোককে যে প্রবঞ্চক বলিয়া গালি দিয়াছেন এবং সর মর্ডণ্ট ওয়েলস যে আজিও গালি দিতেছেন, সে কেবল ঐ মহাপ্রভুদিগের গুণে। চুলকাটা গোঁফছাটা আমলাদলই উহাদিগের প্রধান। পক্ষান্তরে, নব্য সম্প্রদায়ের নানাবিধ ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া রুচি পরিবর্ত্ত হইয়াছে, সুতরাং চলিত সদোষ যাত্রাদিতে তাঁহাদিগের প্রীতি জন্মেনা। এক একটী করিয়া ধরিয়া দেখ, উহাতে প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই।

প্রথম, ওস্তাদি কবিতা। সখী সম্বাদ, বিরহ প্রভৃতি কতকগুলি গান অপ্রশংসনীয় নয়, কিন্তু বাদ্যের ও স্বরের যেরূপ মিষ্টতা, তাহাতে ঐ কবিতা যত শীঘ্র বিলুপ্ত হয় ততই আহ্লাদের বিষয়। ঢুলে ও কাওরা বাদ্যকর, গায়কেরাও প্রায় জাতিতে ঐরূপ। দোহার দিগের দুঃশ্রব চীৎকার ধ্বনিও খেউড়েতে ঐ কবিতার উৎকর্ষের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছে। দ্বিতীয় যাত্রা। ইহা বরং কতক ভাল। কিন্তু ইহা প্রাচীন কালের অভিনয়ের বিকৃত আদর্শ। অভিনেয় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রূপ, বেশ, বাক্য ও ব্যবহারের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করা হয়না। শ্মশ্রুল ব্যক্তিও কখন যশোদা সাজে, গৌরবর্ণ বালকও কখন কৃষ্ণ হয়, এবং কাফ্রি সদৃশ শ্যামবর্ণ বালকও রাধার রূপ ধারণ করে। পরিচ্ছদের বিষয়েও এইরূপ। যাত্রায় ঢাকাই সাড়ি পরা যশোদাও কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। শোক, রোষ, সন্তোষ প্রকাশ করিবার সময়ে কখন্ কি প্রকার অঙ্গভঙ্গী করিতে হয়, তাহা যাত্রার নটনটী প্রভৃতি কেহই জানেনা। ব্যবহারের বিষয়েও নিতান্ত অনভিজ্ঞ। হয়ত প্রহ্লাদ চরিত হইতেছে এমত সময়ে কয়েক জন ইংরাজের বেশ ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত

হইল। পাঁচালী হাপ আকড়াই প্রভৃতির ত কথাই নাই। ইহার নিকটে ওস্তাদি কবিতা ও যাত্রা সহস্রগুণে প্রশংসনীয়। অধিক কথা কি, মদ, গুলি ও গাঁজায় পরিপক না হইলে পাঁচালী ও হাপ আকড়াই দলে প্রবেশাধিকার হয়না। যতদিন আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা সংগীত বিদ্যা না শিখিবেন, ততদিন বাই ও খেমটার প্রাদুর্ভাব দূর হইবেনা। সামান্য বারাঙ্গনা লইয়া আমোদ করা কি সভ্যতার বিপরীত কার্য্য নহে ?

যাত্রা, পাঁচালী, বাই ও খেমটা প্রভৃতি একে একে সকলই খণ্ডিত হইল, তবে কি আমাদিগের দেশের লোকেরা এক কালে আমোদে প্রমোদে বঞ্চিত থাকিবেন ? ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, আমাদিগের পূর্ব্বতন অভিনয়াদি পুনরুজ্জীবিত হউক। রত্নাবলী, শকুন্তলা প্রভৃতির অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম এই সভ্য আমোদ ক্রমশঃ পুনরুজ্জীবিত হইবে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, আর উহার প্রসঙ্গ নাই। শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব হালদার প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি সাধারণ রঙ্গভূমি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু উৎসাহ বিরহে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পুনরায় তাঁহাদিগের এ বিষয়ে চেষ্টাবান্ হওয়া উচিত। স্বভাবের অনুকরণ দর্শন ব্যতিরেকে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের নয়ন ও মনের প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।

শুভকরী পত্রিকা

(সোমপ্রকাশ, ২৬ মে ১৮৬২)

এই নূতন পত্রিকার একখণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমরা পাঠ করিয়া অতিশয় পরিতৃপ্ত হইলাম। বালিগ্রামের কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ইহার প্রণয়ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা মাসে মাসে একবার করিয়া বাহির হইবে। ইহাতে যে কয়েকটি বিষয় যে রীতিতে লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কয়েক-জন ভাল লোক এতৎসম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা যদি শ্রথাদর না হন, এই পত্রিকার নাম অন্বর্থ হইবে সন্দেহ নাই। ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে আমাদিগের অল্পমাত্রও সংশয় জন্মিতেছে না। মাসিক চারি আনা মাত্র মূল্য নিরূপিত হইয়াছে। স্বল্পকাল মধ্যে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। স্বল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাইলে কোন্ ব্যক্তি গ্রহণ করিতে অভিলাষী না হইবেন? আমরা এই পত্রিকা হইতে একটি বিষয় উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ ইহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বুঝিতে পারিবেন।

[উদ্ধৃত প্রবন্ধের নাম "বানরের অনুচিকীর্ষা।"]

প্যারিসে প্রথম কয়েক দিন

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী

৫ই মে (১৯৩১) ভোরবেলা থেকে তিন প্রহর কাল ট্রেনে সুইজারলণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাশির মধ্য দিয়ে এসেছি। বিকালে ফ্রান্সের সীমানায় এসে পড়লাম। কখনো পাহাড়, কখনো প্রান্তর, কখনো বন, কখনো নগর-পল্লীর মধ্য দিয়ে রাত্রি দশটায় প্যারিস নগরে পৌঁছলাম। বিরাট এই ষ্টেশনটির নাম 'গার-দে-লিয়' Gare-de-Lion অর্থাৎ Station of Lion.

সঙ্গে দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা অপরাজিতা। কোথায় গিয়ে বাসা নেব ঠিক নেই। দু-একজন লোকের সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে দেখলাম, ইংরেজী বোঝে না ; আমরাও ফরাসী ভাষা জানি না। ষ্টেশনের গায়ে একখানা প্যারিসের বড় আকারের মানচিত্র দেখতে পেয়ে, সহরের কোন্ জায়গায় আমরা নেমেছি তা ঠিক করে নিলাম। ঐখানেই একটি আধ-ইংরেজী-জানা লোক জুটে গেল ; তাকে দিয়ে উপস্থিত আবশ্যক বিষয় কিছু কিছু জেনে নিলাম। আমরা যে উপলক্ষে প্যারিসে এসেছি সেই 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কলোনিয়াল একজিবিশন' সহরের কোন্ অংশে আরম্ভ হয়েছে তাও মানচিত্রের সাহায্যে বুঝে নিলাম।

ষ্টেশন-সংলগ্ন প্রধান রাস্তাটির খানিকটা এগিয়ে সারি-সারি হোটেল। একটিতে প্রবেশ করে দেখলাম, মেয়ে পুরুষে মশগুল হয়ে বসে উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে হাসি-তামাসা ক'রছে। সামনে পানীয় দ্রব্যপূর্ণ এক-একটি পাত্র। আমরা নতুন রকমের দুটি প্রাণী অকস্মাৎ উপস্থিত হয়ে বোধ হয় এদের একটু রসভঙ্গ করেছিলাম। তাদের কাছে



লেখক

রাত্রিবাসের স্থান প্রার্থনা করে' কোন ফল হ'ল না। তাদের মুখনাড়া হাতনাড়া অর্থে যেন 'হবেনা' ভাবটি প্রকাশ পেল। বোঝা গেল আহারাদির সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। হোটেলের ঝি-চাকরেরা স্ফূর্ত্তি করছে। পর পর তিনটি হোটেলের লোকজনের অবস্থা একটু ভিন্ন ভিন্ন রকমের হলেও প্রায় একই রকমের ব্যবহার পেয়ে একটু ভাবনায় পড়লাম। অপরাজিতা আমাকে বলল, বাবা, কি বিশ্রী দেশ!

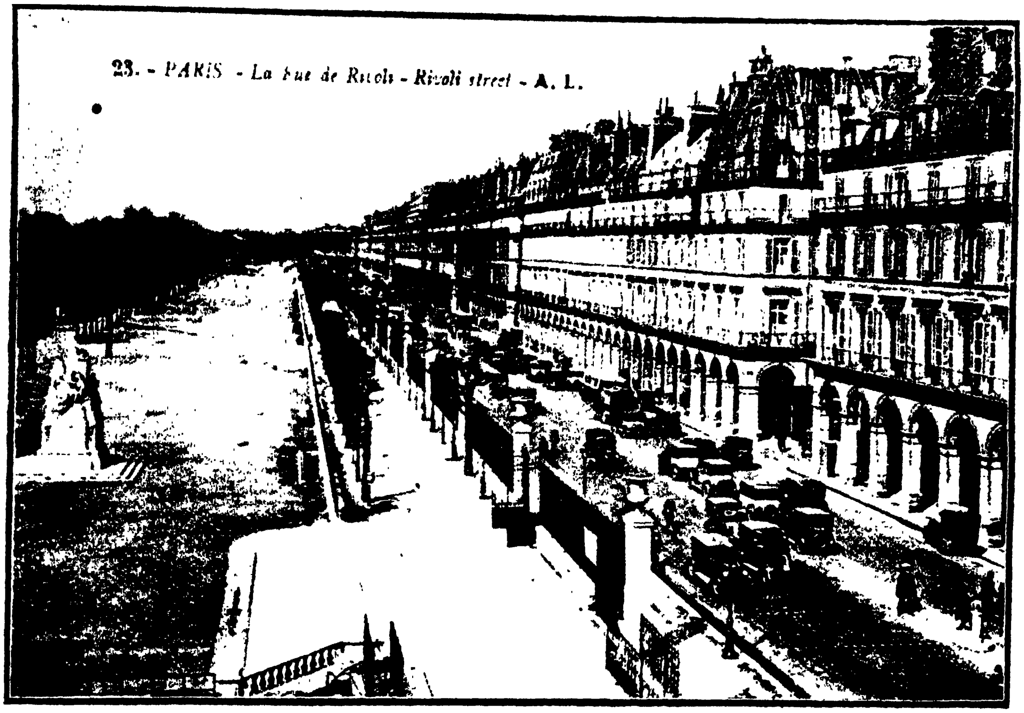
রাত্রি প্রায় এগারটা। হঠাৎ রাস্তায় দুটি মেয়েকে পেলাম। খুব ভদ্র চেহারা। দেখলাম তারা ইংরেজী জানে। আমাদের অবস্থা জানাতেই তারা একটি ভাল হোটেলে আমাদের নিয়ে গেল। আমাদের পরিচয়াদি জেনে হোটেলের কর্ত্রীকে সব বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিল।



কুমারী অপরাজিতা ও তাহার ফরাসী শিক্ষয়িত্রী (তুর্কীবেশে)

হোটেলটির নাম Concordia. দ্বিতলে একখানা পরিষ্কার ছোট রকমের ঘর। মেয়ে দুটি যখন শুনল, আমাদের খাওয়া হয়নি, তখন তারা আমাদের নিকটবর্ত্তী একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আনল। গরম খাবার কিছু ছিলনা, ঠাণ্ডা খেতে হল। মেয়ে দুটি আবার আমাদের ঘরে এসে, আমাদের আরাম বিরামের সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে বিদায় নিল। আমরা তাদের

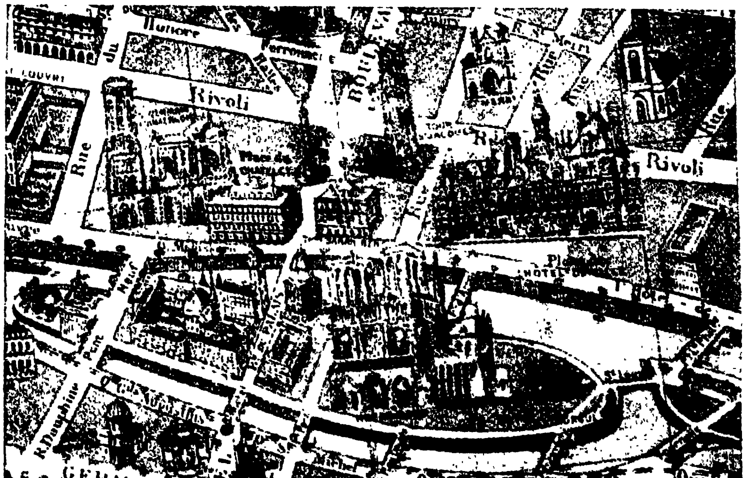
একজিবিশনে হিন্দুস্থান বিভাগে সময়মত আমাদের সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করে আমাদের ঠিকানার কার্ড দিলাম। রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা গেলাম।



প্যারিসের রাস্তার একাংশ

আট বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড যাবার পথে প্যারিস নগরীতে একটি দিন অবস্থান করে গিয়েছিলাম। তখন সঙ্গী ছিল দশ বারজন ইংরেজ। তাদের সঙ্গে তাদের ভাবেই কলের পুতুল হয়ে ঘুরেছিলাম। স্বাধীন মন নিয়ে স্বাধীন চিন্তায় দেখাশুনার সুযোগ সেবার হয়নি।

৬ই মে সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমরা একজিবিশনের স্থান দেখতে গেলাম। দমনীল য়্যা ভি নি উ ধরে দু-মাইল পথ গিয়ে সহরের প্রান্তে Bois-de-Vincennes বোয়া-দে ভি ন সে ন অর্থাৎ 'ভিনসেনের বন' মধ্যে চার মাইল বেষ্টনী নিয়ে একজিবিশন—আমরা তার সদর দ্বারে উপস্থিত হলাম। বাইরে অস্থায়ী ভাবে নানা রকম ভোজনাগার বসেছে; আমরা কিছু জলযোগ করে প্রদর্শনীর ভিতরে প্রবেশ করলাম। একটি ইংরেজী-জানা জাকোস্লোভাকিয়া য়িহুদি কুমারী সঙ্গী জুটে গেল। সে তার দেশ থেকে এই প্রদর্শনী দেখতেই এসেছে। হাতে একটি বড় ব্যাগ। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমরা নতুন নতুন কথাবার্ত্তায়



দ্বিখণ্ডিত সীনের মধ্যে 'নতরদেম' গির্জ্জা, উত্তরপারে [illegible]

দেখতে দেখতে চললাম। ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্যাভিলিয়নগুলি সবে গড়া শেষ হয়েছে। সাদা সাদা কুলি মজুর নানা

ভালই জানে। আধ ঘণ্টা ঘুরে আমরা হিন্দুস্থান বিভাগ পেলাম। দেখলাম তখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত শেষ হয় নি।



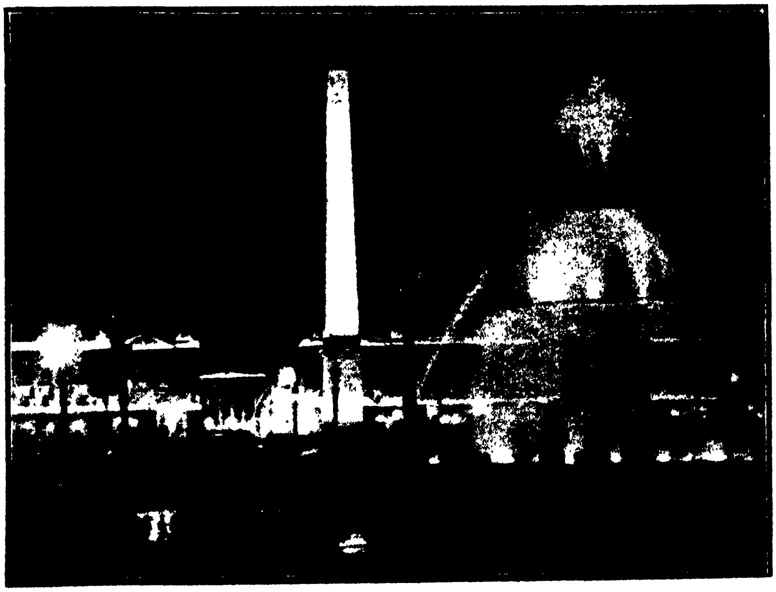
Place-do-l1—Concord

কাজ নিয়ে ছুটাছুটি করছে, কারো পিঠে বোঝা, কারো গায় কাদা মাখা। অনেককেই জিজ্ঞাসা করলাম, হিন্দুস্থান প্যাভিলিয়নটি কোথায়? কেউই সঠিক বলতে পারল না।

কাঠামো উঠেছে মাত্র। মনে একটু দুঃখ হল, এখানেও ভারত সবার পিছনে!

এ দিন মধ্যাহ্নে বহু জাঁকজমকের সঙ্গে প্রদর্শনী খোলা হল। দ্বারোদ্‌ঘাটন করলেন ফরাসী প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং বহু সৈন্যসামন্ত, ব[...] বাজনা বাদ্যের সঙ্গে নাগরিক প্রতিনিধিগণকে নিয়ে। উদ্বোধন-উৎসব দেখা শেষ করেই আমরা আমাদের হোটেলে ফিরলাম। বিকালে আর কোথাও যাইনি—অপরাজিতা ব[...] ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

৭ই মে সকালে আমরা 1[...] Rue-de-Sommerrard ঠিকানা[য়] Indian Students' Association এ গিয়ে তাদের তত্ত্বে আমাদের জন্য একটি হোটেলের স্থায়ী বন্দো[বস্ত] করে নিলাম। দোতলায় পরি[ষ্কা]র পরিচ্ছন্ন আসবাবপত্রে সাজানো ঘরখানি; দুটি বিছানা, [...]



রাত্রির আলোকে Concordএর ফোয়ারা

যে যার কাজ নিয়েই ব্যস্ত। আমরা যে কথাটা বোঝাতে

রান্নাঘর। ভাড়া মাসিক পাঁচ শ' ফ্রাঙ্ক; অর্থাৎ কমিবেশী ষাট টাকা। এক ফ্রাঙ্ক আমাদের দেশের প্রায়

মধ্যাহ্নে অপরাজিতাকে নিয়ে বেড়াতে বের হ'লাম। আমাদের হোটেলের একটু দূরেই 'সীন' (Seine) নদী।



প্যারিসের একটি রাস্তার একাংশ

দুই আনা। এই অঞ্চলটি প্যারিসের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলির কেন্দ্রস্থল। ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন

সীনের দু'ধারে অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান। বড় বড় প্রাসাদে সজ্জিত; কিন্তু কোঠা বাড়ী দিয়ে ভারাক্রান্ত করে তোলা



প্যারিসের সর্ব্বপ্রধান রাস্তা সাঁজ এলিজে (Avenuedes Champs Elysees.)

বাঙালী পাওয়া গেল, তাঁরা আমাদের নানা ভাবে সহায়তা করলেন।

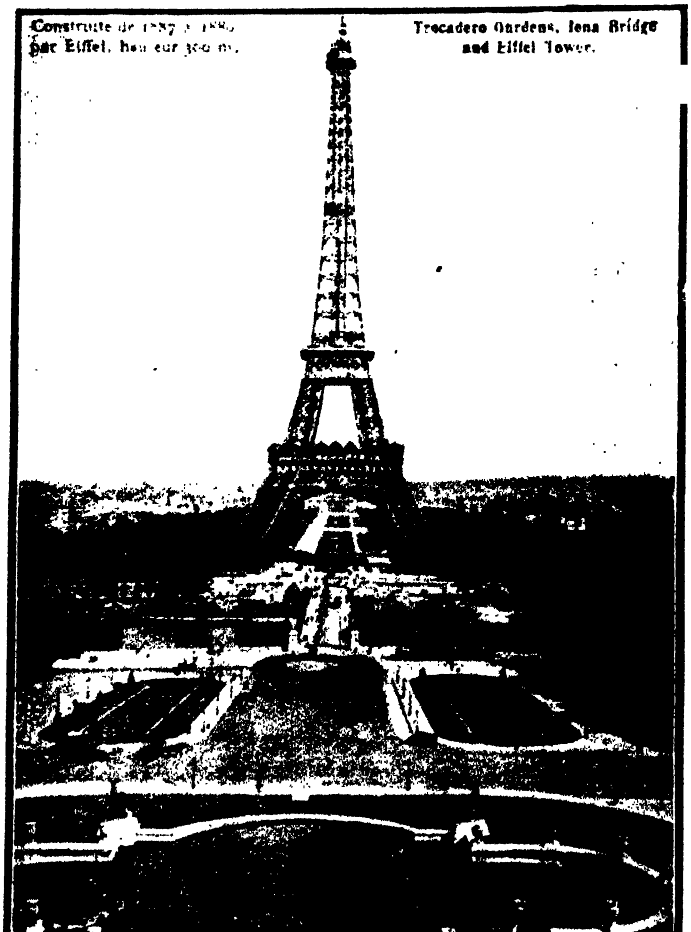
হয়নি। প্রচুর গাছপালা, রাস্তাঘাট, বেড়াবার জন্য প্রচুর খোলা জায়গা। আমরা প্রথমেই সীনের তীরে গিয়ে

উপস্থিত হ'লাম। এখানে নদীটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে মাঝে দ্বীপ উৎপন্ন করেছে। দ্বীপের উপর সুবিখ্যাত Notredame গির্জ্জা এবং Palais-de Justice. আজ আমরা কেবল বাইরে বাইরে দেখ্‌তেই বেরিয়েছি; কাজেই গির্জ্জার ভিতর দেখাটার প্রচুর ঔৎসুক্য আজকার মত ক্ষান্ত দিয়ে কালকের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে রাখলাম। এই 'নতর-দেম' গির্জ্জাকেই কেন্দ্র করে প্যারিস নগর গড়া হয়েছে। পরক্ষণেই সীনের তীরে আমরা পৃথিবীর অদ্বিতীয় মিউজিয়ম লুভ্ (Louvre) দেখতে পেলাম। এইটাই এককালে প্যারিসের রাজপ্রাসাদ ছিল। সাত দিনের কমে না কি এ মিউজিয়মটা দেখা শেষ করা যায় না। লুভ্-মিউজিয়মের সঙ্গেই



Alexandre III Bridge

মনোহর Tuileries উদ্যান। তার পরই Palace-de-la Concordএর স্তম্ভ। এখানকার সৌন্দর্য্য দেখে আমরা যে শুধু মুগ্ধ হ'লাম তা নয়, একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। প্যারিস নগরী যে সৌন্দর্য্যে সমস্ত জগৎকে পরাজিত করেছে, সে বোধ হয় এই স্থানটির মহিমায়। Concordএর স্তম্ভটি চতুষ্কোণ, প্রচুর খোলা জায়গার উপর অবস্থিত। দুই ধারে দুটি সৌন্দর্য্যের আধার বড় বড় ফোয়ারা; মাঝে-মাঝে নানাভঙ্গিমাময় মূর্ত্তি। তার এক একটি মূর্ত্তি অনেকক্ষণ ধরে দেখতে ইচ্ছে করে। পূর্ব্ব দিকে উদ্যান-সমন্বিত লুভ মিউজিয়ম, দক্ষিণে প্যারিসের গৌরব "সাঁজ-এলিজে"র (Avenue-des-Champs Elysees) প্রশস্ত রাস্তা—প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ। রাস্তার দুধারের বৃক্ষশ্রেণীর শোভা, তার বিশাল ফুটপাথের শোভা, তার পরবর্ত্তী রাস্তার দুধারের প্রাসাদাবলীর শোভা আমাদের সৌন্দর্য্য-বোধের তৃপ্তি ছাড়িয়েও অনেক উপরে। রাস্তার মধ্যপথে অজ্ঞাত মৃত সৈনিকদের স্মৃতি তোরণ অস্পষ্ট দেখা-ছিল। নিকটেই গ্রাঁ প্যালে (Grand Palace), পিতি প্যালে (Fitit Palace)



প্যারিসের গৌরব Fiffel Tower.

নামে ছুটি প্রাসাদ, নানা রমণীয় মূর্ত্তি দিয়ে সজ্জিত। আমরা প্রায় আধঘণ্টা পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে এই ছুটি প্রাসাদের সৌন্দর্য্যই দেখলাম।

এখান থেকে 'মেদেলীন' (Madeline) বা মাতৃমন্দির গির্জ্জা দেখা যাচ্ছিল। মন্দিরের গুরুত্ব হিসাবে নতরদেমের পরেই এই 'মেদেলীন'। আমরা খানিকটা পথ হেঁটে সেই গির্জ্জাটিকেও প্রদক্ষিণ করে দেখলাম। এটিরও ভিতর দেখা আজকের প্রোগ্রাম নয়। বেলা তিনটা। এখানকার দোকানপাট প্রভৃতি সব ব্যাপারগুলিই বড় বড়। আমরা একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বিশ্রাম করলাম। এখানে আমাদের কাফির সঙ্গে কিছু জলযোগ হল। নিকটেই টমাস কুক্ এণ্ড সন্‌এর আফিস। এখানকার ব্যাঙ্ক থেকে আমরা আমাদের হিসাব থেকে কিছু ফরাসী মুদ্রা খরচের জন্য তুলে নিলাম। অনেক বিদেশী লোকের গতিবিধি এই মেদেলীন অঞ্চলটিতে দেখা গেল।

ভাষা সম্বন্ধে আমরা বড়ই অসুবিধা ভোগ করছিলাম। টমাস কুকের আফিসে দেখলাম, সকলেই ইংরেজী জানে। এদের সঙ্গে একটু কথা কয়ে অনেক জেনে নিলাম। তার পর একটিবই এর দোকানে গিয়েএকখানি English French এবং French English একত্রে বাঁধা পকেট ডিক্সনারী কিনলাম।

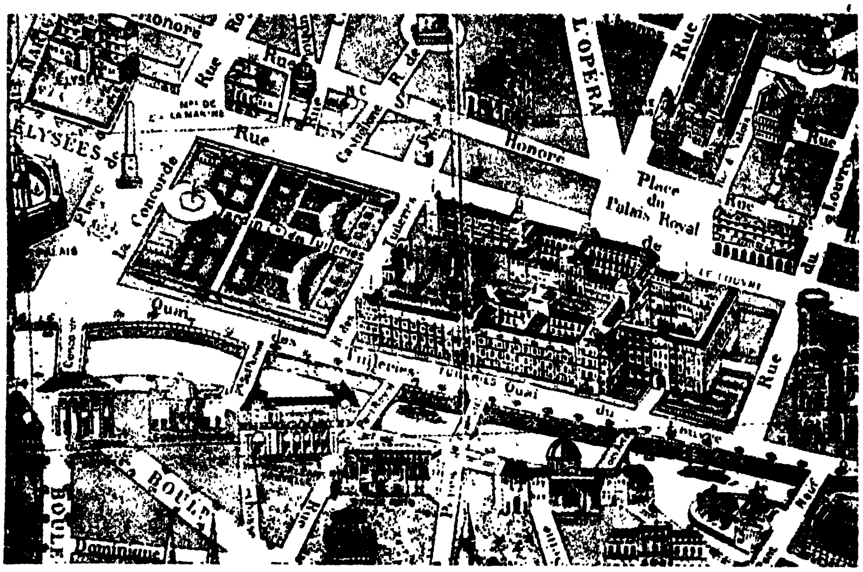


অমরত্ব (মর্ম্মর মূর্ত্তি)



Tuileries উদ্যান

নিরবচ্ছিন্ন পাশ্চাত্য ধারার মধ্যে এইখানে একটি মুদী-দোকান দেখতে পেলাম কিছু প্রাচ্য ধরণের। এখানে চাল, দাল, দ'লের বড়ি, আমসত্ব, লঙ্কা পিঁয়াজের আচার, খেজুর, কিস্‌মিস্‌, বেদানা, আক, ডাব, বাতাবী, খরমুজা, গোল আলু, শাঁক আলু, মূলা, বেগুন, কুমড়া, শশা, পিঁয়াজ, রশুন, আদা, শুক্‌নো ও কাঁচা লঙ্কা, লঙ্কা গুঁড়া, গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি—কোন কিছুরই অভাব দেখলাম না। ফল আরশাকসব্জিগুলি একটু শুকনো রকমের। দাম আমাদের দেশের দ্বিগুণ থেকে দশগুণ পর্য্যন্ত।

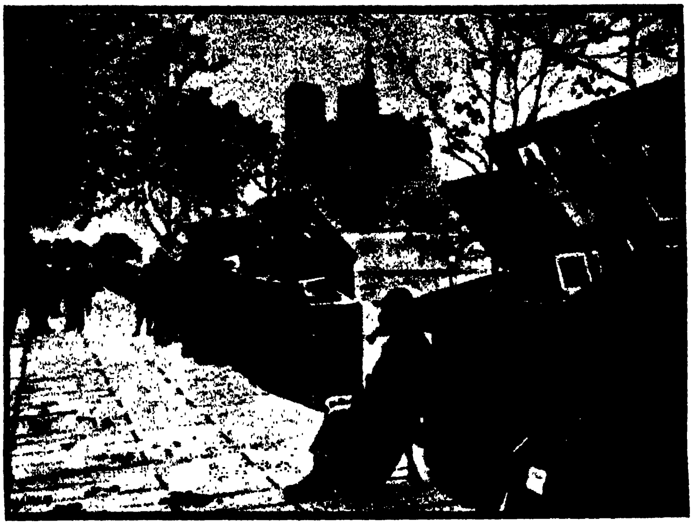


সীনের তীরে লুভ্‌ মিউজিয়ম ও Tuileries

অপরাহ্নে আমরা পুনরায় সীনের তীরে মুক্ত ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হ'য়ে Alexandre III Bridge-এর নিকট Grand Palace-এর উদ্যানে একটি বেঞ্চের উপর গিয়ে বসলাম। সীনের তীরে বহু নরনারী রমণীয় পরিচ্ছদে সান্ধ্য-ভ্রমণে বের হয়েছে। কত রকম তাদের বেশ-বিন্যাস, গতিবিধির মধ্যেই বা কত হাবভাব। সকলেই প্রফুল্ল, সকলের মুখেই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হাসির রেখা। অপরাজিতার মুখে মেয়েদের বর্ণনা কিছু কিছু ফুটছিল ভাল। সে চুলের ফ্যাসন, চোখের কাজল, ঠোঁটের আলতা, নখের ছাঁটকাট, বর্ণনা করবার পক্ষে আমার মত নীরস মানুষ একান্তই অযোগ্য। নানা রকমের লোক, সবার সঙ্গেই আমাদের কিছু কিছু কথা কইতে ইচ্ছা হচ্ছিল, সম্মুখে দেখা বিষয়গুলির কোন্‌টা কি তার অনেক জেনেশুনে নিতে ইচ্ছা হচ্ছিল; কিন্তু কি করি, ফরাসী ভাষা ত জানি নে। এইখানে অপরাজিতার একটু তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিই। সে বলল, "বাবা, আমি ইংরেজী-জানা মানুষ দেখলেই চিন্‌তে পারি।" তার কথামত যে কজন লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে চেষ্টা করেছিলাম, দেখলাম তারা সকলেই কিছু কিছু ইংরেজী জানে। বুঝলাম, অপরাজিতার ইংরেজী-জানা লোক ধরবার কৌশলটি হচ্ছে এই যে, উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের লোকগুলোর গঠনে একটু ইংরেজের ধারা আছে। তাদের অনেকেই ইংরেজী জানে। দেখলাম ইংরেজের গঠন একটু শুকনো আর ফরাসীর একটু মোলায়েম। ফরাসীর চোখের তারাও অপেক্ষাকৃত কালো। এর পর থেকে আমরা সহজেই ইংরেজী-জানা লোক বেছে নিয়ে আমাদের আবশ্যক বিষয় জানবার অনেক সুযোগ পেয়েছি।


'মেদেলীন'—রাত্রির আলোলোকে

Alexandre III Bridgeএর উপরে এসে আমরা পার হয়ে সীনের দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলাম দীর্ঘ এক মাইল ব্যেপে সারি সারি পুরাতন পুস্তকের ষ্টল। এর মধ্যে কোনখানিতে শুধু পুরাতন ছবি আর এলবাম, কোনখানিতে পুরাতন মানচিত্র—নানা দেশ বিদেশের। আমরা মানচিত্রগুলি বেছে বেছে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একখানি মধ্যএশিয়ার ও আর একখানি ভারতবর্ষের মানচিত্র পেয়ে মোট ষাট ফ্রাঙ্ক দাম দিয়ে কিনলাম। উহা আমরা কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পাঠিয়ে দেওয়ায় তাঁরা আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।



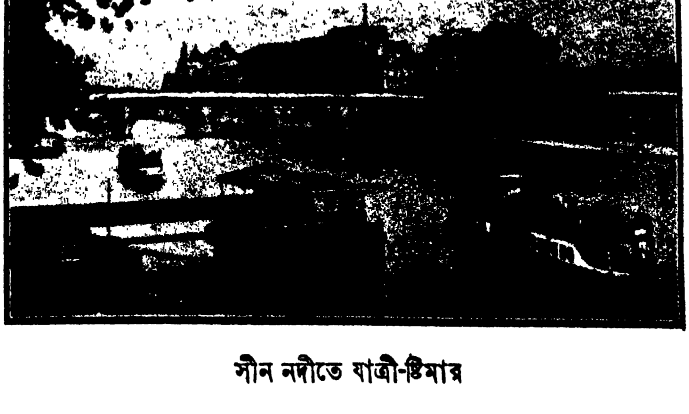
সীনের তীরে ছবি ও বইএর দোকানের শ্রেণী

সীনের তীরেই অনতিদূরে ইফেল টাওয়ার (Eiffel Tower) আপাদমস্তক পরিষ্কার দেখা গেল। চূড়াটি প্যারিসের অনেক স্থান থেকেই দৃষ্ট হয়। ইফেল টাওয়ারের কাছে গেলাম; নয়শো পঁচিশ ফিট উঁচু, অর্থাৎ কলকাতার মনুমেণ্টের পাঁচ গুণ উঁচু, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দুই লক্ষ পাউণ্ড খরচে আগাগোড়া লোহা জুড়ে জুড়ে তৈরী। দেখলাম liftএ করে বহু লোক উপরে ওঠানামা ক'রছে। পরে একদিন এর উপরে উঠেছিলাম, সে বর্ণনাটা অন্যত্র করব।



Tuileries উদ্যানে প্লাষ্টারের

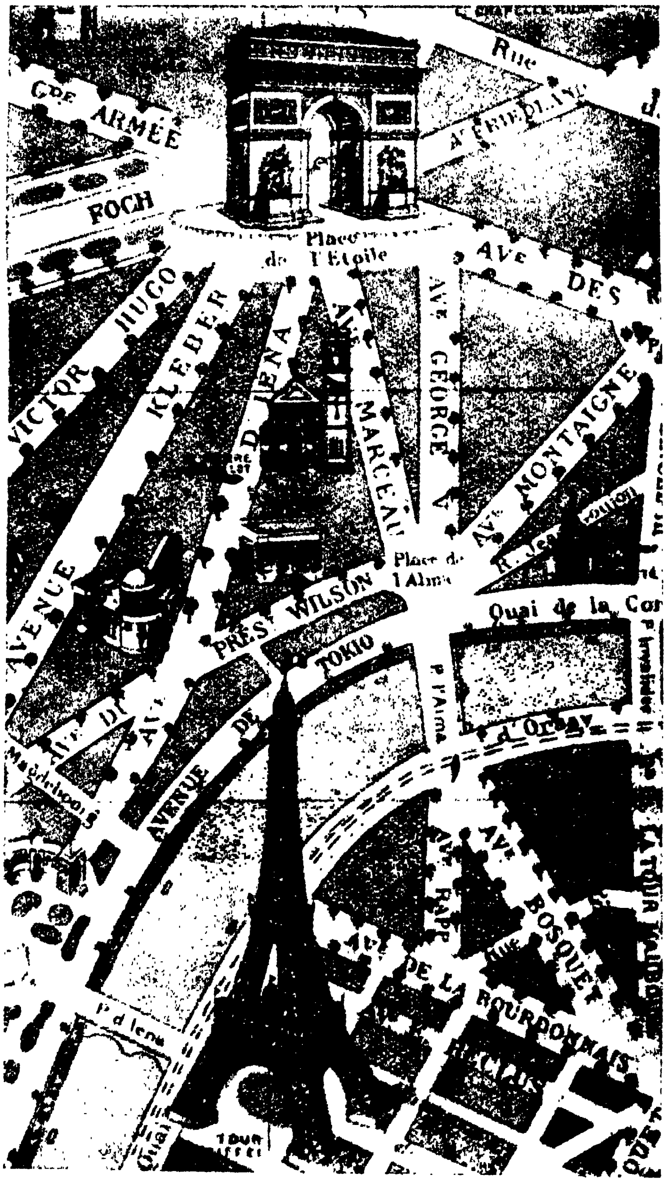
রাত্রি ন'টায় আমরা ক্লান্তদেহে ট্রামে করে বাসায় ফিরলাম। দুটো ভাতের জন্য প্রাণ অস্থির হচ্ছিল—অথচ রান্না করতেও আর শরীরে কুলায় না। নিকটেই চীনা-হোটেলে গিয়ে ভাত পেলাম। ভাতের সঙ্গে উপকরণ নেওয়া গেল মটরকলাইএর বড় বড় অঙ্কুর দিয়ে শাকের ঘণ্ট, ভেড়ার মাংস আর বরবটি সীম মিশিয়ে তরকারী; সঙ্গে এক পেয়ালা করে কাফি। দু'জনের চার্জ্জ হল মাত্র পনের ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায়



সীন নদীতে যাত্রী-ষ্টিমার

দু'টাকা। এশিয়াবাসীর হোটেল বলেই এত সস্তা, ইয়োরোপীয় হোটেল হলে তিন টাকায় কমে একজনের পেট ভরে না।

৮ই মে সকাল সকাল আহার শেষ করে আবার আমরা ভ্রমণে বের হ'লাম—সেই সীন নদীর তীরে।



ইফেল-টাওয়ার। বারটি রাস্তার মুখে অজ্ঞাত মৃত সৈনিকদের স্মৃতি-তোরণ

নিকটেই 'নতর-দেম্' গির্জ্জা। কাল বাইরে বাইরে দেখেছি, আজ ভিতরে প্রবেশ করব। এই 'নতর-দেম্' ফরাসী জাতিরা যে অর্থে ব্যবহার করে, আমি বাংলায় তার নাম দিলাম—'আমাদের রাণীমা'। সম্মুখে বড় বড় তিনটি দ্বার—তাজমহলের দ্বারের গঠনের মত। দরজার উপর দিয়ে খৃষ্টভক্তগণের মূর্ত্তি খোদাই করে তোলা—ভাস্কর্য্য-শিল্পের চরম উৎকর্ষ। ভিতরে প্রবেশ করলাম। চারিদিকে নানা ভাবে নানা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কোথাও খৃষ্টমূর্ত্তি, কোথাও খৃষ্টভক্তগণের মূর্ত্তি। মধ্যস্থলে মাতা মেরীর মূর্ত্তি—বিশেষ ভাবে সুসজ্জিত। প্রত্যেক মূর্ত্তির নিকটেই বহুসংখ্যক মোমের বাতি জ্বলছে। মাতৃমূর্ত্তির সুমুখের বাতিগুলি খুবই বড় বড়। দর্শকগণ নীরবে ধীর পদক্ষেপে চারিদিকে দেখে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকের মুখই গম্ভীর—ভক্তিমাখা। মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে বহু ভক্ত নরনারী নতজানু হয়ে নীরবে ধ্যান করছেন। শেষের প্রণামটি ঠিক আমাদের হিন্দু দেবদেবীকে প্রণামের মত।

'নতর দেম' থেকে বার হয়ে নদী পার হয়ে আমরা 'হোটেল দে-ভিলা' (Hotle-de-villa) নামক বিরাট একটি বাড়ী দেখতে পেলাম। বাড়ীটির গুরুত্বে বোঝা গেল বিশেষ একটা কিছু হবে। জানলাম, টাউন হল। এর গায়েও স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ বহু বহু মূর্ত্তি খোদিত। এই বাড়ীটির অনতিদূরেই 'বাজার-হোটেল দে-ভিলা' (Bazzar-Hotle-de Villa) নামক প্যারিসের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ একটি দোকান। মানুষের ব্যবহার্য্য এমন জিনিস নাই, যা এই দোকানটিতে নাই—তা সিকি পয়সা থেকে লাখ টাকা পর্য্যন্ত। আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। কলকাতার Whiteaway Laidlawএর দোকান দেখেছি, এর তুলনায় চাঁদে আর জোনাকিতে। লণ্ডনের বড় বড় দোকানগুলোর ভিতর দেখেছি, তারাও এর কাছে লজ্জা পায়। বিভিন্ন রকম দ্রব্যের পৃথক পৃথক বিভাগ, এক একটি বিভাগ কতকগুলি করে হল। প্রত্যেক হল দু'তিনটি ক'রে নারীর

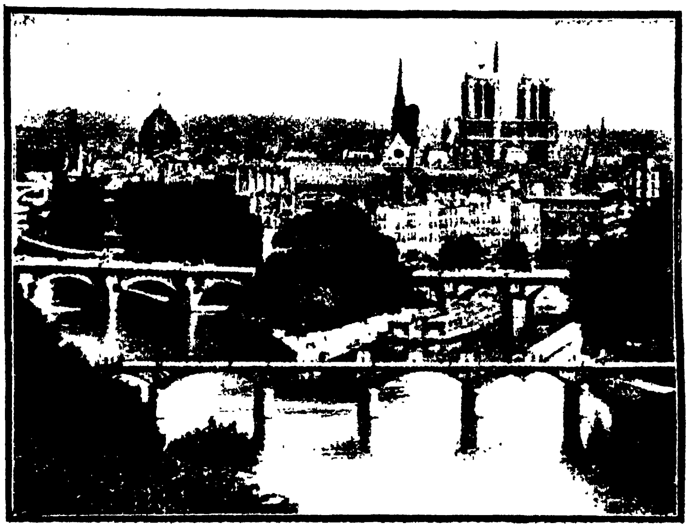
তবে। গ্রাহক ও দর্শকে ভরপুর, স্থানে স্থানে liftএ ক'রে তেতলা চৌতলা ওঠানামা করছে।

আমরা এখান থেকে কিছু বাসন কোসন, ষ্টোভ, কাগজ, খাতাপত্র, সূচ-সূতা প্রভৃতি অনেক জিনিস কিনে সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরলাম। ফিরবার পথে চাল, ডাল, মসলা পেয়েছিলাম। রাত্রিতে ডাল ভাত রান্না হল।

৯ই মে সকালে আমরা নিকটবর্ত্তী হাট দেখতে গেলাম। সহরের স্থানে স্থানে সপ্তাহে দুদিন সকালবেলা হাট হয়। কাল যেখানে দেখেছি বৃক্ষশ্রেণী যুক্ত প্রশস্ত ফুটপাথ, আজ সেখানে শত শত দোকানপাট বসেছে। অধিকাংশ দোকানই আচ্ছাদনের নীচেয়, আসবাবপত্রে সাজানো। এই দোকানের উপযোগী আসবাবযুক্ত আচ্ছাদনগুলি কর্পোরেশন থেকে করে দেয়। যেদিন যেখানে হাট, তার আগের দিন বিকালে সেখানে তৈরী করে দিয়ে যায়। ক্রেতা বিক্রেতা চারি ভাগের একভাগ পুরুষ, তিন ভাগ স্ত্রীলোক। হাটে খাদ্যদ্রব্য সব ত পাওয়া যায়ই, এ ছাড়া আবশ্যক জিনিসপত্রও প্রচুর। এক স্থানে দেখলাম মেয়েদের চুল কোঁকড়ানোর একটি দোকান বসেছে। সেখানে মেয়েদের খুবই ভীড় হয়েছে। হাটে মাছ, মাংস, তাজা শাকসব্জি প্রচুর দেখলাম।

হাট থেকে আমরা আবশ্যক আহার্য্য দ্রব্যাদি কিনে এনে রন্ধন ও আহারাদি সম্পন্ন করলাম। অপরাজিতা আজ দেশীয় ধরণে টাটকা মাছের ঝোল ভাত করে পরম তৃপ্তি লাভ করল। সে একটি কাঁচা লঙ্কা কিনে এনেছিল এক ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ দু' আনা দিয়ে।

মধ্যাহ্নে আমরা আণ্ডারগ্রাউণ্ড ট্রেণে করে আমাদের প্রধান বিষয় ইণ্টারন্যাশন্যাল কলোনিয়াল একজিবিশন ক্ষেত্রে গিয়ে আমাদের ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কসের ষ্টল করবার জন্য আফিস-সংক্রান্ত প্রাথমিক কার্য্য সম্পন্ন করলাম। এবং একজিবিশনের 'সিটি-দে-ইনফরমেশিয়' (City-de-Information) ডাকঘরটিতে গিয়ে দেশের



সীনের দৃশ্য—দূরে নতরদেম' সব চেয়ে উঁচু

চিঠিপত্র পেলাম। কলকাতা থেকে আমরা কিছু ময়লা মাটি মিশ্রিত সোনা লণ্ডনে স্বর্ণকারদের নিকট পাঠিয়েছিলাম—পরিষ্কার করে দেবার জন্য। সেটি বিক্রি হলে



Nation square with Triumph Monument

তার দাম পাঠাবার কথা ছিল প্যারিসে আমাদের কাছে। তারা জিনিসগুলি বিক্রি করে বাহাত্তর পাউণ্ডের একখানি

চেক আমাদের নামে এখানে পাঠিয়েছিল, এই ডাকঘরে এসে পেলাম। দেখলাম খুব ঠিকঠাক দামই আমরা পেয়েছি। তার পর আমরা আমাদের ভারতীয় বিভাগ দেখতে গেলাম। পূর্ব্বেই বলেছি, ভারতীয় বিভাগ এখন অসম্পন্ন; দেখলাম অতি ধীর ভাবে প্রস্তুতের কাজ চলছে। এই বাড়ীটির নাম হচ্ছে—Hindustan Palace. Architecturer হয়েছেন একজন বেলজিয়ান। তিনি আমার সঙ্গে খুবই সদ্ব্যবহার করলেন এবং ভারতীয় বিভাগ প্রস্তুত হবার বিলম্বের কারণ স্বরূপ লণ্ডনস্থ কতকগুলি বোম্বে-ওয়ালা য়ীহুদির ক্রটির উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ ক'রলেন।

সন্ধ্যায় আমরা Indian Students' Associationএ গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে দেখাশুনা করলাম। এটি আমাদের হোটেলের অতি নিকটেই। প্যারিসে ভারতীয় ছাত্রগণ নানা স্থানে বাস করে, সন্ধ্যার পর এখানে এসে সংবাদপত্র পাঠ ও গল্পাদি করে। ছাত্রদের মধ্যে একটি ছাত্রীও উপস্থিত হয়েছেন দেখলাম। ইনি মহারাষ্ট্রীয় কন্যা—পুনা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মনস্তত্ত্ব' অধ্যয়ন করতে এসেছেন। নাম—মিস্ কেতকার। বাঙ্গালী ছেলেদের অনুরোধে অপরাজিতা একটি গান শোনাল। বাঙ্গালীর ছেলে অনেক দিন পরে বাঙ্গালী মেয়ের বাঙ্গলা গান শুনল; গাওয়াটা কাণে তাদের যেমনই লাগুক প্রাণে তাদের লেগেছিল—তা বোঝা গেল।

আমাদের একজিবিশনের শেষ পর্য্যন্ত ছয় মাস কাল প্যারিসে কাটাতে হবে—ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে হবে, অথচ ফরাসীভাষা জানি না—এটা যেমন লজ্জার কথা ততোধিক অসুবিধার কথা। এই সব আলোচনা করে সকলেই আমাদিগকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করবার পরামর্শ দিলেন। বিশেষতঃ অপরাজিতাকে এই দীর্ঘ সময়টির মধ্যে একজন ফরাসী শিক্ষয়িত্রী রেখে রীতিমত ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। শিক্ষয়িত্রী দেবার ভার নিলেন—মিস্ কেত্কার। সকলেই ভরসা দিলেন, দুএক মাসের মধ্যে আমরা যা শিখতে পারব তা খুবই কাজে লাগবে।

একজিবিশনে আমাদের Hindustan Palace প্রস্তুত হ'তে থাকুক, এদিকে আমরাও ফরাসী ভাষা ও ফরাসী জাতটাকে অধ্যয়ন করতে থাকি; আমাদের-পাঠকপাঠিকা অপেক্ষায় থাকুন—এর পর আরও নতুন কথা কিছু শোনাব।

কনকাঞ্জলি

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি,

[বিবাহ-বাটী। কদলী বৃক্ষ, পুষ্পমাল্য, পূর্ণ কলসী ও আম্র-পল্লবে প্রবেশ-দ্বার সজ্জিত। মঞ্চের উপর নহবৎ বসিয়াছে। গোধূলির ধূসর রং ডুবাইয়া দিয়া বিবাহ-বাটির আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। নিকটাগত মধুর বাদ্যধ্বনি বরাগমন সূচিত করিল। অভ্যর্থনার জন্য কন্যাপক্ষীয় লোকজন প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। বরযাত্রি-গণ দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র বৈদ্যুতিক উপায়ে সজ্জিত মর্ম্মর-নির্ম্মিত নারী-মূর্ত্তির হস্তধৃত পিচকারি নিঃসৃত গোলাপ জলে বরযাত্রীদের শুভ্র বস্ত্রাদি ও বরের কৌষেয় বাস সুরভিত হইল। কন্যার পিতা প্রিয়ব্রতের সন্ধানে দুই একজন অন্তঃপুরের দিকে গেল।

ত্রিতলের একটি নাতিক্ষুদ্র কক্ষে এক নারীমূর্ত্তির তৈল-চিত্রের সম্মুখে নির্নিমেষ নয়নে প্রিয়ব্রত দাঁড়াইয়া। চিত্রখানি পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত। কক্ষটি সুগন্ধি দীপের আলোকে আলোকিত ও সুরভিত।

প্রিয়ব্রত। (চিত্রের দিকে চাহিয়া) কথা ছিল নিজে দেখে শুনে জামাই পসন্দ করবে; নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করবে। তবে কেন আগে চলে গেলে? এখন এস, একটিবার এই চিত্রাধার থেকে নেমে এসে সামনে দাঁড়াও। দেখে একবার বল তোমার মনোমত জামাই এনেছি। কত ভয়ে, কত সাবধানে স্থির করেছি তা কি তুমি দেখ্তে পেয়েছ। কোন রকমে একবার আমাকে জানিয়ে যাও যে তোমার তৃপ্তি হয়েছে।

[প্রদীপ-শিখা ক্ষণেকের জন্য স্থির অবিচল হইয়া জ্বলি

লাগিল। এক অপূর্ব্ব সুগন্ধে কক্ষ ভরিয়া গেল। চিত্র যেন একটিবার দুলিয়া উঠিল। অকস্মাৎ মনে হইল কে যেন কক্ষে শব্দহীন চক্ষে প্রবেশ করিল।]

প্রিয়ব্রত। (একটু স্তব্ধ থাকিবার পর) বল, নেমে এসে বল! না হয় যেখানে আছ সেখান থেকেই বল, তুমি সব শুনছ, তুমি সব দেখছ। বল, তুমি তৃপ্ত হয়েছ, তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ, জামাই তোমার মনোমত হয়েছে। তোমার সাধ, তোমার ইচ্ছা সর্ব্বক্ষণ মনে রেখে আমি সর্ব্ব বিষয়ে তোমার মনোমত পথে চলেছি। কেবল মনে ভেবেছি, তুমি তো দুঃখ পাবে না, তুমি তো সুখী হয়েছ।

ধীর পদসঞ্চারে সেই কক্ষে এক কিশোরী আসিল।

প্রিয়ব্রত। (চমকিয়া) এ কি, শ্যামা! কি হয়েছে মা? আজকের দিনে মুখ অমন ম্লান কেন মা?

শ্যামা। (মুহূর্ত্তে মুখে প্রফুল্লতা আনিয়া) কই বাবা, মুখ তো ম্লান নয়। সবাই আমাকে নানা কাজে আট্‌কে রেখেছিল, তাই এতক্ষণ আস্‌তে পারি নি। মাকে এতক্ষণে একবার প্রণাম করতে এসেছি। তুমি এখানে আছ তা তো জানতাম না, বাবা।

প্রিয়ব্রত। নাই বা জান্‌লে, মা! তোমার মাকে প্রণাম করে নেও। তাঁর আশীর্ব্বাদে তোমার বধূজীবন যেন শান্তিময়—গৌরবময় হয়।

শ্যামা গলবস্ত্রা হইয়া সাশ্রুনেত্রে চিত্রতলে প্রণাম করিল। পরে পিতার চরণে প্রণতা হইল।

প্রিয়ব্রত। (কন্যার অশ্রু মুছাইয়া) মা আমার! সাবিত্রী সমান হও!

শ্যামা চেষ্টা করিয়া পিতার পানে প্রফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রিয়ব্রত। (যতক্ষণ দেখা যায় শ্যামার গতিশীল দেহের পানে চাহিয়া থাকিয়া)—কই, তোমার শ্যামাকে আশীর্ব্বাদ করতেও এলে না! তবে আর কবে আস্‌বে? কতদিন যে বলেছিলে, 'তোমাকে না দেখে আমি কোথাও থাক্‌তে পারব না; যদি মরি, তবু আমি এসে এসে তোমাকে দেখে যাব।'—সে সব কি ভুলে গেলে?

ও কি! কে বল্‌লে—'আমি ভুলি নি, আমি তো আসি!"

(ছবির দিকে চাহিয়া) তুমি কি? না, তুমি তো তেমনি নিষ্ঠুর, মৌন, মধুর! এ আমার উত্তেজিত কল্পনার প্রলাপ!

বাহির হইতে কে ডাকিল—বাবু সম্প্রদানের সময় হয়েছে। সবাই আপনাকে খুঁজ্‌ছে; আসুন।

প্রিয়ব্রত। (ছবির দিকে আর একবার চাহিয়া) তাই ত! চল, যাই। (উদ্‌ভ্রান্তের মত ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

(২)

রাত্রিকার উৎসব-সজ্জা প্রভাতের আলোকে ম্লান দেখাইতেছে। 'যাবি যদি ব'লে যাস্, আবার আসিবি কবে' সুরে বাজিয়া বাজিয়া শানাই পুরবাসীর অন্তরে আসন্ন বিরহের ব্যথা জাগাইতেছে। মুক্ত আকাশের স্নিগ্ধ আলোকেও যেন সেই সুরের ঢেউ প্রবেশ করিতেছে।

শ্যামা। বাবা!

প্রিয়ব্রত। (চমকিয়া চক্ষু মুছিয়া) কি মা?

শ্যামা। তোমায় এমন কেন দেখাচ্ছে, বাবা? রাত্রে বুঝি একটুও ঘুমাও নি?

প্রিয়ব্রত। এ কথা কেন বল্‌ছ মা?

শ্যামা। রাত্রে দুবার আমি উঠে তোমার ঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসেছি। বিছানায় একটি বারও পিঠ পাত নি। এতে যে অসুখ করবে বাবা!

(হাত দিয়া কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া)—তোমার গা যে গরম হয়েছে, বাবা! চোখও একটু লাল হয়েছে। তোমার অসুখ করেছে। তুমি শোবে চল।

প্রিয়ব্রত। মিছামিছি ব্যস্ত হোয়ো না মা। কিছু হয় নি। আজ তুমি শ্বশুরবাড়ী যাবে এ কথাটি কাল রাত্রে সর্ব্বক্ষণ অনুভব করেছি মা। তাতে কি ঘুম আসে?

শ্যামা। রাত্রে তাহলে কোথায় ছিলে বাবা?

প্রিয়ব্রত। এইখানে, এই ছাদের উপর।

শ্যামা। সারারাত এইখানে একা ছিলে বাবা?

প্রিয়ব্রত। একা নয়। এই পাশেই তোমার মায়ের ঘর। দোতলা থেকে আনন্দের কলধ্বনি একটু একটু ভেসে আস্‌ছিল। জ্যোৎস্নায় চারি দিক ভরে গেছে। এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল ভেবেছি এতদিন এত ডেকেও এক মুহূর্ত্তের জন্যও যার আবির্ভাব বুঝ্‌তে পারি নি, তোর

বিবাহের রাতে হয় ত তার একটু আভাস পাব। হয় ত তোকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে একটিবার তিনি আস্‌বেন। তাই কাল জেগেছিলাম। কিন্তু বৃথা মা। যে যায় সে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও ফিরে আসে না। বলে গেলেও নয়।

শ্যামা। না বাবা, ফিরে আসেন। ফিরে এসেছেন।

প্রিয়ব্রত। আসেন! এসেছেন! তুই দেখেছিস্? কি করে দেখলি মা? আমায় একটিবার ডেকে কেন দেখালি নে মা?

শ্যামা। রাত্রে যখন তোমার কাছ থেকে নেমে আসি ঠিক সেই সময়ে মনে হ'ল আমার মাথার কে যেন অতি সন্তর্পণে অতি ভালবেসে একখানি হাত রাখলেন। সে এক মুহূর্ত্তমাত্র। কিন্তু তাতেই আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌ল, চোখে জল এল। পাছে তুমি চোখের জল দেখে ফেল তাই আর পিছনের দিকে ফিরে চাই নি।

প্রিয়ব্রত। তুই তাঁর আশীর্ব্বাদ পেয়েছিস্। বাঁচলাম। তুই ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছিলি। সেই তাঁর আশীর্ব্বাদের পরশ। এটুকু দেখ্‌বার জন্য সারারাত্রি এইখানে জেগে কাটিয়েছি।

পুরবাসিনী। (দূর হইতে) কনে বিদায়ের সময় হ'ল যে—কোথায় গেল শ্যামা? ওমা! তুই এখানে? শীগ্‌গির নেমে আয়। (প্রিয়ব্রতকে লক্ষ্য করিয়া) আপনিও আসুন। আশীর্ব্বাদ করবেন। বরকর্ত্তা ব্যস্ত হয়েছেন।

প্রিয়ব্রত। তুমি যাও মা, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

পিতার নিদ্রাহীন মুখের পানে আর একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে শ্যামা নামিয়া গেল।

প্রিয়ব্রত। সুধু আজ নয়, এখনি শ্যাম চলে যাবে। এতদিনকার খেলাঘর ফেলে রেখে আবার নূতন করে খেলাঘর পাত্‌তে যাবে। এই সংসারের নিয়ম। যেদিন সে এ সংসারে এসেছিল সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত ও এখানে যে স্নেহের ঢেউ তুলেছিল সুধু তার স্মৃতিটুকু রেখে যাবে। দুদিন ওর মনও হয় ত এম্‌নি কাঁদবে। তার পর ধীরে ধীরে দুঃখ ভুলে যাবে। আপনার নূতন সংসারের চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাক্‌বে।

সত্যই কি এই শ্যামা আমাদের ভুলে যাবে? যাবে; কিন্তু হয় ত আমাদের পেয়েই ভুলে যাবে। আমি আবার পুত্র হয়ে ওর কোলে জন্মাব, ওর মা মেয়ে হয়ে ওর কোলে আস্‌বেন। ও তাই পেয়ে ভুলে থাক্‌বে। নিশ্চয়ই এই ঠিক। এই সত্য কথা! আঃ বাঁচলাম! তবে আর কি ভাবনা! এতদিনকার সব সমস্যার আজ সমাধান হয়ে গেল। আমি শিশু হয়ে—শ্যামার পেটে জন্মাব। শ্যামাকে মা বলে ডাকব। শ্যামা আমাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খাবে। আমার পানে চেয়ে চেয়ে তার আঁখির পলক পড়্‌বে না। কেমন হবে! ঠিক হবে! অতি সুন্দর হবে।

(নীচে নামিয়া গেলেন।)

(৩)

এক পুরনারী। কাকা এসেছেন? বাসি বিয়ে শেষ হয়ে গেছে। এবার মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ করুন।

(দুই জনে প্রণাম করিল।)

প্রিয়ব্রত। (আশীর্ব্বাদ করিয়া চোখের জলে ভাসিয়া হাসিতে হাসিতে) ভাব্‌ছ মা, আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছ? তা আর হয় না মা। এতকালকার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। আমিই আবার তোমাদের কাছে পুত্র হয়ে যাব। তোমাদের সব স্নেহ কেড়ে নেব।

অপরা পুরনারী। এইবার কনকাঞ্জলিটা শেষ করে দাও।

প্রথমা। এই যে দিই। এই থালাখানা হাতে নে তো শ্যামা!

(প্রিয়ব্রতের প্রতি) আপনি গায়ের চাদরখানা একবার এমনি করে পাতুন তো!—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। (শ্যামার প্রতি) এইবার এই টাকা ও চাল সুদ্ধ থাল বাপের চাদরে ফেলে দেও। দিয়ে বল—বাবা, এতদিন তোমার যা খেয়েছিলাম যা পরেছিলাম আজ সব শোধ দিয়ে চল্লাম।

শ্যামা শিহরিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অপরা। ও কি, চুপ করে রইলি যে! বল্‌, বলতে হয়।

শ্যামা ভাবিয়া ধীরে ধীরে হাত হইতে কনকাঞ্জলি নামাইয়া রাখিল।

প্রথমা। ও কি! নামিয়ে রাখ্‌লি যে! ওতে অকল্যাণ হয়! বল্‌তে হয় যে, বল্‌। কাকা, আপনি বলুন; নইলে ও শুনবে না।

শ্যামা। বাবার বুকে মানুষ হয়ে—আজ তাঁকে কাঁদিয়ে

যাবার সময় একখানা থালে এক মুঠো চাল আর একটা টাকা দিয়ে বলে যাব তোমার যা কিছু খেয়েছি, পরেছি—যা কিছু পেয়েছি সব ফিরিয়ে দিলাম! আমি পারব না।

প্রিয়ব্রত। বল্ মা, তবু বল্‌তে হয়।

শ্যামা। (জানু পাতিয়া বসিয়া পিতার মুখের পানে চাহিয়া)—বাবা, আমায় ও কথা বল্‌তে বোলো না। তার বদলে আমি বলে যাচ্ছি,—যখন যেখানে যাই, যেখানে থাকি, অগাধ ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সুখশান্তির মধ্যে ডুবে থাক্‌লেও সর্ব্বক্ষণ মনে রাখ্‌ব, যে, এখানে তোমার কাছে, মায়ের কাছে যে স্নেহ পেয়েছি—যে স্নেহ নিয়ে যাচ্ছি, তার এক কণাও কোন দিন শোধ দিতে পার্‌ব না। জন্মজন্মান্তর শ্যামা সেই ঋণে বাঁধা থাক্‌বে।

প্রিয়ব্রত। (শ্যামার মাথায় হাত রাখিয়া) অন্তরের আশীর্ব্বাদ নে মা। বড় সুন্দর কথা বলেছিস্। ওই দেখ্ জামাইয়ের চোখে প্রশংসার দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। আর এই—ও কি! (উদ্‌ভ্রান্তের মত) এবার দেখেছি, এই যে চোখে জলের ধারা—মুখে তৃপ্তির হাসি! তোর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তোকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে নেমে এসেছেন।

শ্যামা। (উঠিয়া পিতার কম্পমান দেহ লইয়া জড়াইয়া ধরিয়া)—বাবা! ও কি, ও-দিকে কি দেখ্‌ছ? এই যে আমি! বাবা!

প্রিয়ব্রত। (অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া) মা! তাকে আর একটু ধরে রাখ্‌তে পারলি নে!

দর ও দস্তুর

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

'পর, পর মা, গয়না পর'—

সেই গল্পটা মনে পড়ে, ছোটবেলায় শুনেছিল—সবটা ভাল মনে নেই। মনে হয় সেই মেয়েটা কাঁদতে লাগল। প্রকাণ্ড অজগর সাপটা তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে সমস্ত শরীর সমস্ত হাড় অস্থি চূর্ণ করে দিতে লাগল। দরজা বন্ধ—ঘরের ভেতর সে আর সেই সাপ।

ব্যাকুল হয়ে কেঁদে মেয়ে বলে, 'মা আর গয়না পরব না'—বন্ধ দরজার বাইরে ঠাকুমা দিদিমা মা সবাই বলেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে,—'পর, পর মা গয়না পর';—

ওরা কনে দেখে ফিরে গেল—গহনা কাপড় সব ছেড়ে ছাতের কোণে এসে বসে নিভার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল।

সূর্য্যাস্তের সময়। রাঙা হয়ে উঠেছে পশ্চিম দিগন্ত। কালো কালো মেঘ—এক দিকে গোটাকতক সোণালী পাড় কাপড়ের মতন পড়ে আছে। তা থাক্। অন্য সময় ঐ কাপড়ের পাড়ের শোভা দেখাতে সে ছোট বোনকে মেজ বোনকে ডাকে—আজকে তার চোখে ও-সব শোভা হিসেবে পড়ছিল না আর। এমনিই চেয়ে ছিল। তার মনে হচ্ছিল, ঐ গল্পটা 'পর, পর মা, গয়না পর'। আর সেই মেয়েটা তার পর মরে গেল। গেল তো! বেশ হ'ল, বেশ হয় সেও যদি মরে যায়।—রোজ রোজ আর কেউ দেখাতে পারে না।

আজকে ওরা আবার বড়রা কেউ ছিল না—সব না কি ছেলেটার বন্ধুরা!—ওকে ইংরিজী বাংলা লেখালে।

ওরা কি জানে না, ও লিখতে জানে? কেন ছোটকা' তো বল্লেন ওর সামনেই যে, ওকে সেকেন ক্লাস অবধি পড়িয়ে আমরা স্কুল ছাড়িয়ে নিয়েছি—বড় বড় মেয়ের স্কুলে যাওয়ার প্রথা আমাদের বাড়ীতে নেই কি না—' তার পর বল্লে,—'গান জানে?'

কাকা বল্লেন, 'জানে; কিন্তু ওর লজ্জা করবে মশাই, ছেলেমানুষ কি না—' একটা ছেলে একটু মুখটিপে হেসে বল্লে,—'ছেলেমানুষই মেয়ে হয় মশাই—'

গান গাইতে গলা কেঁপে গেল,—ছাই হ'ল গান।—অত ছাই ও কোনোদিন গায় না, এমন কি মিমি হরী কাল

চেষ্টা করলেও ওরকম হয় না। কাকা কেন বল্লেন না—গান ও জানে না।

ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। ওরা না কি সভ্য,—ওরা না কি সব বিদ্বান!—ওদের বোনকে এদের কেউ অমনি করে দেখে!—

সেজদি এলো কাপড় কেচে,—ছাতে কাপড় শুকুতে দিতে।

'ওমা, তুই বুঝি এখানে বসে!—আর মা সারা পৃথিবী খুঁজছেন। খাবার খাস্‌নি যে! কাঁদছিস কেন?'

ও রাগ করে বল্লে, 'কই কেঁদেছি?' চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জলে ভরে এলো।

'ওরে, এ দুঃখ সবারি করতে হয় রে! তোর একার নয়। আমাকে আবার আমার মামাশ্বশুর সমস্ত দালানটা হাঁটিয়ে নিয়েছিলেন। আর একটা কে ছিল, সে বল্লে,—'চুলটা খুলে দেখান নি কেন মশাই। বড় খোঁপা—দেখে ভাবলে বোধ হয় গুছি দিয়ে চুল বাঁধা—

ওতো ভাল—সেই প্রতিমার—আমার ননদের মেয়ে রে, খুব সুন্দর দেখতে, মনে আছে তো?—তার আবার দেখতে এসে সব বলে, 'মশাই হাতে মনে হচ্ছে 'কড়া' পড়েছে! নন্দাইর রাগে মুখ লাল হয়ে গেল, তবু বল্লেন, 'টিপে দেখুন হাত'। ছেলেটী এম-এ পাশ করেছেন, বাড়ী আছে নিজের, বাপ মা আছে, কি করা যায়, সবই সহ্য করলেন। কিন্তু এখন যদি হাত দুটো দেখিস্ তার! শাশুড়ী ঝি-চাকরের জল-বাটনা নেয় না। রোজ ভাল ভাল বাটনা বাটে,জল তোলে। মুখখানি কচি টুলটুল করছে, হাত দুখানা যেন কার!—তা হলে কড়া পড়া তখন কেন যে বলেছিল—কে জানে!

কথাগুলো খুব আশাপ্রদ নয়। নিভা অবাক হয়ে শুনছিল। সে বল্লে, 'দিদি, তোমাকে তারাই পছন্দ করলে যাঁরা হাঁটালে?'

মেজদিদি বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই হাসলে, 'হাঁটালেন তো বাড়ীর কেউ নয়—মামা শ্বশুর—'

নিভা আরও অবাক হয়ে বল্লে, 'জামাই বাবুর মামা তো! তা' তুমি সেখানে গিয়ে রাগ কর নি, কিচ্ছু বল নি কারুকে? জামাই বাবুকেও না?'

'ওঁর দোষ কি? আর এ যে রেওয়াজ, সবাই এই করে—'

নিভার রাগে গা জলে যায়। কিন্তু মেজদির যেন সবই খুব সহজ মনে হচ্ছে।

পাশের বাড়ীর ছাতে কে উঠলেন, বল্লেন, 'তোমাদের নিভাকে আজ দেখে গেল? কি বল্লে?'

মেজদির উপদেশ-স্রোত থামল। কথার গন্ধ পেয়ে—পুলকিত হয়ে আলসের ধারে গিয়ে, দাঁড়ালেন। —'হ্যাঁ, দেখে তো গেল, এখনি কি বলবে. কিছুই বলে নি। (ঈষৎ মৃদু কণ্ঠে) আর শ্যামবর্ণ কি না তাই, সহজে কি পছন্দ করে?—বাবা এই দুটী ছোট বোনের বিয়ে দিতে জেরবার হয়ে যাবেন ভাই।—যে দেখ্‌ছে সেই বলে, সব ভাল মশাই, কিন্তু রংটী যদি একটু ফরসা হ'ত। গান গাওয়ালে, লেখা দেখ্‌লে, কত কি—'

প্রতিবেশিনী একটু মুখভঙ্গী করে বল্লেন, 'লেখা নিয়েই বা কি করবেন—গানেই বা কি করবেন? সেই সুনীরার কথা মনে আছে তোর? সেই যে আমার ছোট পিসিমার মেয়ে? কি চমৎকার গলা, পাড়ার লোক দাঁড়িয়ে যেত গানের সুরে তার। রং তেমন ছিল না—ঐ গানের আর বাপের টাকার জোরে—বিয়ে তো হ'ল,—এখন শুনি না কি বর কারুর কাছে কোনো জায়গায় গান গাওয়া পছন্দ করেনা। বড্ড 'খপিশ! ক্যাঁক করে বলে, মেয়েদের আবার বিয়ের পরে গান কি!—কোনোখানে পাঠায় না—মেয়ে-যজ্ঞিতেও গাইতে বারণ—কাজের বাড়ীতে পাঁচটা পুরুষ আসে তাই।'

মেজদি বল্লেন, 'অথচ বরবে সব বিয়ের সময় সব জিগ্‌গেস করে।—যার হাতে পড়বে সেই যদি ও-সব না চায়—ছাই দরকারেও লাগে না!'—

'তা' দরকারে লাগে না বটে, কিন্তু সুনীরার মেয়েটী যে কি চমৎকার গায়—'

মা এলেন, কথায় বাধা পড়ল।

'হ্যাঁরে নিভা কই?—কি সব ঢং বল তো।—খাবার খেলে না অবধি;—চিরকালকার জিনিষ, তারা নিয়ে যাবে—দেখবে না? দেখেছে তো মেয়ে অমনি গলে গেলেন!'

মার পিছন দিয়ে নিভা নেবে গেল।

'ভাল লাগে না মানি, তা কি করব ছাই?'—এক সঙ্গে

এত কথা এবং এত রাগ গলার কাছে জড় হ'ল যে মার আর কথা বেরুলো না মুখে—

অনেক রাত্রি।

•

ছোট ছেলেরা সকলে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েছে। পুরুষদেরও খাওয়া চুকেছে, মার কাজ সারা হ'ল।—

—পাশের ঘরে মেয়েছেলেরা ঘুমুচ্ছে—নিভাদের বাবা এ-ঘরে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে চুরুট খাচ্ছেন।—বেশী চিন্তিত হলেই তাঁর সিগারেট খাওয়া অভ্যেস,—অন্যমনে প্রতি দিনের দ্বিগুণ খান সেদিন।

নিভার জননী জলের ঘটী, দুধের বাটী, পানের ডিবে, মিছরী বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।—একে একে সবগুলি যথাস্থানে নাবিয়ে স্বামীর বিছানার পাশে এসে বসলেন।

'তার পর?'—

চুরুটটা হাতে নিয়ে স্বামী বল্লেন 'কিসের?—'

'এই যে গো,—নিভাকে দেখে কি বল্লে?—পছন্দ করেছে ছেলে?'

স্বামী অন্যমনে দুটান সেটাকে টেনে আধখানাই ছুঁড়ে বাইরে ফেলে বল্লেন, 'কাল ওর বোনেরা, মা আর ঠাকুমা আসবে দেখতে,—ছেলের ছোট ভাই ছিল, বলে গেল'—

মাতাপিতা দুজনেই—জানলার পথে রাস্তায় গ্যাসের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

অবশেষে মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে মাতা বল্লেন, 'মেয়েটার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল,—কতবার যে সব দেখলে'—

বাপ চুপ করেই রইলেন।

মা বল্লেন, 'দেখ না, সেবার নরেশবাবুরা হাঁটালে, বিষ্টুবাবুরা কি সব বলে গেল। তার পর জগন্নাথ বাবুরা মুখের ওপর কালো বল্লে!'

বাপ চুপ করেই রইলেন।

মা আবার বল্লেন, 'ওরা না কি বলে—আমাদের চেয়ে বাজারে মাছের দর আছে!'

নিভার পিতা অন্যমনে শুনছিলেন, শেষ কথাটায় একটু হাসলেন; বল্লেন, 'মিছে বলে না।'

খানিক চুপ করে বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা ঘুমুচ্ছে?'

মা বল্লেন, 'হাঁ।'

রাত্রি গভীর হয়ে এলো। ক্লান্ত স্বামী ঘুমুলেন। •

নিভার মার চোখে আর ঘুম এলো না। মনে হয়, বারে বারেই নব নব অভিজ্ঞতায় এই একই অভিনয় দেখেছেন। অসম্মান, সম্মান, অবমাননা, অত বোঝে না মন—শুধু একে একে মনে পড়ে কত বিয়ের কথা, জানাশোনা, স্বজন আত্মীয়—কত কথা।

কারো বা গহনা, কারো বা গহনার ওজন, কারো বা গহনার রং, কারো বা নিজেরি রং;—কারও বা তুচ্ছ কথা, কারও দরিদ্র পিতামাতা; যা হোক, তাহোক অমনিই তো হয়ে থাকে!—বলে, লক্ষ কথা না হলে বিয়ে হয় না!

—ছোট বোন সুধারি তো বিয়ের পরদিন কুশণ্ডিকার আগেই গহনা ওজন করে দেখেছিল তারা। ৬০ ভরিতে দেড় ভরি কম ছিল। কাঁটা হয়ে ওঠেনি!—তাঁদের বাপ গিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁটার ত্রুটী সেরে নিলেন কাঁটা দিয়ে।

হয় ত তখন সুধার মনে একটু কাঁটা ফুটেছিল।

তা' হোক। আজ সুধার ঐশ্বর্য্য দেখে কে? ছেলে-মেয়ে সুখ ঐশ্বর্য্য ঘর বাড়ী হীরে মুক্তা!—

আহা, তা বেঁচে থাক্। আহা! বাবা দেখে যান নি!

কিন্তু;—

তা কি হবে—এই রকমই তো সব ঘরে;—

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। ছেলেমেয়েরা সব ঘুমুচ্ছে। মা তাঁর কালো মেয়েটার মুখের দিকে একবার চা'ন। গ্যাসের আলো ঘরে পড়েছে—তারি সামান্য আলোয় দেখা যায়, খোকার গায়ে চাদর নেই, নিভার মাথার বালিসটা কোথায় সরে গেছে। ঠিক করে দিয়ে মা শুয়ে পড়েন।

আকাশে নিঃস্তব্ধ শান্তি। এক আকাশ তারা ঝিকমিক করে ঘুমের রাজত্বে চেয়ে আছে।

পরদিন বৈকালে ছেলের মা আর অন্য পরিজনরা দেখতে এলেন ভিতরে, আর বাইরে এলেন বাপ, মাতুল, কাকা।

পূর্ব্বদিনের চেয়ে বেশী করে সব ময়দা, সাবান, স্নো ঘষে রংটা অনেকটা খসখসে করে, মাথা ঘষে চুল খুলে মাথাটা মাথার তেলের বিজ্ঞাপনের মতন করে, শাড়ীর সঙ্গে জামার রংয়ে মিল করিয়ে ভেবে চিন্তে অনেক পরিশ্রমে শ্যামা মেয়েটীকে সবাই সাজাল।

অবাধ্য অপমানবোধ কেবলি নিভার চোখের কোলে উপছে জল পাঠায়। আর দিদিরা ধমক দেয়।

'কাকে আবার না দেখেছে,'—'কে আবার না দেখে'—'তোর রকম দেখে বাঁচিনে'—'চোখ মুখের কি ছিরি হবে।'

মেজদি বল্লে,—'বেশ দেখাচ্ছে এবার।—নিভার মুখখানি যে বেশ!'—

যথারীতি প্রণামাদি ও শিষ্টাচারের কথা সমাপ্ত করে—মেয়ে দেখা। মেয়ে অন্দরে প্রেরণ করাও হ'ল।

খোস গল্পে আসর জমকে ওঠে। যথারীতি দেশের কি অবস্থা, বেকার সমস্যা, ঘি দুধের দুর্ম্মূল্যতা, পাশ করার নিষ্ফলতা, এবং মূর্খ কেঁইয়াদের উপার্জ্জনে কৃতিত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসে ছেলের মাতুল পৌছলেন।

'বলবেন না মশাই, রাম, রাম, কি যে সব হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপার, আমরা তবু রোজগার করিছি—ছেলে ব্যাটারা আর খেতে পাবে না—!'

পাত্রীর পিতা 'আজ্ঞে হাঁ'—বলে সমর্থন করলেন। তার পর কন্যাদায় ও তার পর পাত্র পক্ষের নানারকম অভদ্রতার কথাও ওঠে।

এবার পাত্রীর পিতা কিছু বলতে পারেন না। কে জানে যদি কারো গায়ে বাজে।

'কিন্তু মশাই, আসল ব্যাপার হচ্ছে, এই কালোকে ফরসা করতে জানা!'—মাতুল ডাক্তার—বেশ নাম-করাও,—উৎসুক হয়ে শ্রোতারা মুখের দিকে চেয়ে রইল,—ভদ্রলোক কিছু ঔষধ বলবেন না কি?

অট্টহাস্যে মাতুল বল্লেন, 'তা হচ্ছে মশাই এই—রং অনুপাতে রৌপ্য মুদ্রা। ওষুধ বিষুধ নয়! এই আমাদের পাড়ায় সম্প্রতি একটী যক্ষা কালো মেয়ের বিবাহ হ'ল। বাপ বেশ বড় কাজ করে। মেয়ের মুখ তাকিয়ে দিলে মশাই।—বলব কি—আট হাজার নগদ দিলে। ছেলেটী সোনার চাঁদ—যেমন রূপ, তেমনি গুণ। খরচ করলে যেমন, পেলেও তেমনি। বুঝলেন কি না?'—মাতুল আবার উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়ে দিলেন।— অবশ্য আমরা অর্থাৎ আমার ভগ্নিপতিদের টাকা নগদ নেওয়ার প্রথা নেই; তবে—'

বিমূঢ় অপমানিত বেদনায় অনুজ্জ্বলবর্ণা মেয়ের পরিজনরা হাসবার চেষ্টা করলে তাঁর সঙ্গে পাছে ভদ্রতার লাঘব হয়। আর তাতে মেয়ে পছন্দতে ত্রুটী ঘটে।

নিভা ওপরে উঠে এলো। এবার মা জলটল খাওয়াবেন ওদের। আর চোখে জল এলো না। যা হোক একটা নিষ্পত্তি—এস্পার কি ওস্পার হয়ে চুকে গেলে ও বাঁচে।

এ বাড়ীর ও বাড়ীর চিহ্ন বিহ্ন রুদ্ধ রেবা আশা সব বারাণ্ডার ছাতে দাঁড়িয়েছে।

নিভা উদাসীন ভাবে ছাতের অন্য এক কোণে দাঁড়ায়। গল্পের কথা কানে টুকরো টুকরো ভেসে আসে।

'জানো ভাই, আমার বে'তে পাঁচবার দশবার দেখাদেখি কিছু হয় নি। যেমন শাশুড়ী দেখলেন অমনি সব কথা ঠিক হওয়া'—

'তা ভাই তোমার বাবা যে তেমনি ৬ হাজার করে খরচ করেছিলেন। তোমাদের ঐ সুধার কেন অত নাকাল'—

'দেখতে তো সুধা ভাল নয়। আর কাকা তেমন খরচ করলেন কই?'

এইবার একটী মুখরা মেয়ের গলা শোনা গেল বেশ জোরে, 'তাবলে তোরা যারা রূপসী তাদেরি সব ভাল হবে? তা হলে তোদের লীলার কেন ভাল ঘর বর হ'ল?—'

'সে যে তার বাপের একটীমাত্র মেয়ে—অত বিষয় সেই পাবে—আর কালো, তা' কি—মুখখানি সুন্দর। স্বামী খুব আদর যত্ন করে'—

মুখরা মেয়েটী শ্যামা,—বিদ্রূপ-হাস্যে সে বল্লে, 'তাই বল্—আসল কথা টাকা—তাই মুখখানি ভাল, তাই তার শ্বশুরবাড়ীর যত্ন।'—

যে তর্ক করছিল সে বল্লে রাগ করে,—'তা' টাকা তো কি? যার বাবার আছে তিনি দেবেন না?'—

কেউ হারে না—নানামুখী তর্ক চলে।

রাত্রি হল। অন্ধকারে নিভা একলা ছাতে শুয়ে ভাবে। মনের একপাশে দাঁড়ায় আকাশ-ভরা তারা—অন্যধারে পৃথিবী জোড়া অন্ধকার।—

সেদিন মেজদি' এসেছিল। ওপরে এলো তারা।

'হ্যাঁরে, ন' ওপরে একলা?'

নিভা উঠে বসে।

সেই একই কথা। মেজদি বেশ করে বসে, সান্ত্বনা দেবে তাবে, বলে, 'এমনি হয়েছে ভাই।'—সে তাদে

পাড়ায় কার কন্যাদায়ের নিদারুণ মর্ম্মস্পর্শী ব্যাখ্যা দেয়। আর উপসংহারে বলে. 'কি করবি—এমনি ঘরে ঘরে—'

তার পর মেজদি তার মামাশ্বশুরের শ্বশুরবাড়ীর কার এক কৃষ্ণা কন্যাদায়ের ভয়াবহ—অথচ উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেয়; অর্থাৎ মেয়েটী বিয়ের পরে না কি আত্মহত্যা করে। তার উপসংহারে সে বলে,—'তার চেয়ে আমাদের নিভা দিব্য ঢের ফরসা'—

রাত্রিও বাড়ে,—গল্পও বাড়ে। আসর জমে ভূতের গল্পের মত। নিজ নিজ নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ হৃদয়বান অথচ পিতৃ-মাতৃভক্ত স্বামীদের বাদ দিয়ে—অন্য সকলের ভদ্রতাহীন বিয়ের কথা বলে। শ্বশুরালয়ের গোঁচার কথা বলে।

নিভা আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকে। বর এবং বর-পক্ষীয়দের সম্বন্ধে তার ধারণা তো খুব ভাল হয়ই না, বরং বেশ ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে।—

অনেক রাত্রে মেজদি গেল ছেলে শোওয়াতে—

চুপ করে থেকে থেকে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বস্‌ল, 'আচ্ছা ভাই মেজদি, মেজজামাই বাবুরাও অমনি করেছিলেন?'

মেজদি সোজাসুজিই বল্লে,—'দেনা-পাওনার কথা আবার কোন্ বিয়েতে না হয়? হয়েছিল বৈকি। তা' সে তো কি না আমার দিদি-শাশুড়ী আর শ্বশুর করেছিলেন। উনি তার কি জানেন?'

মেজদির স্বামীকে ভাল বলবার সরল প্রচেষ্টায় নিভার হাসি পেল। সে একটু চুপ করে থেকে বল্লে, 'তাহলেও ভাই উনি তো মা বাপের ছেলে, বলতে পারতেন না কি?'

মেজদি—'তা কি করে বলবেন? মাথার ওপর গুরুজন বাপ মা, তাঁরা যা' করবেন ভালর জন্যেই তো?—আর এ তো সবাই করে।'

নিভা অপ্রস্তুত ভাবে বল্লে, 'তাহলেও অত বিদ্বান জামাইবাবু'—

মেজ দিদি বল্ল, 'তাতে কি'—?

নিভার অন্তরে বিদ্বান পুরুষসমাজের ওপর ঈষৎ শ্রদ্ধা ছিল তখনো;—সে ভাবত বোধ হয়, তারা পৌরুষে দীপ্ত, আকাশের মত উদার, অচলের মত দৃঢ়, সমুদ্রের মত গভীর। নিত্যকার ছোট ছোট দৈন্য, ক্ষুদ্রতা, লোভ তাদের স্পর্শ করে না।

আবার সে বলে, 'আচ্ছা ভাই, তোমার শাশুড়ী না কি বড় খোঁটা দিয়েছিলেন বাবাকে, তাতেও জামাইবাবু চুপ করে রইলেন?'

'তা কি করে বল্‌বেন?—তুই এক পাগ্‌লী। মা বাপকে বলা যায়? হ'লই বা শোনালেন আমার শাশুড়ী—তাঁদের হ'ল গিয়ে ছেলে, আমার বাবার মেয়ে! লোকে কত কথা বলে, তাঁরা আর এমন কি বলেছেন? —বিয়েতে লক্ষ কথা হবে,—আর ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষকে বলবে, এই হল ধারা।'

যুক্তিসঙ্গত জবাব পেয়ে নিভা চুপ করে গেল।

আকাশের এক প্রান্ত থেকে কৃষ্ণ তৃতীয়ার বাঁকা সোণার থালার মত চাঁদ উঠ্‌ল। মা ডাকলেন, 'ওরে ও মেয়েরা, কত রাত্তির হ'ল, ছেলেমেয়েকে খাইয়ে নে না? নিভাকেও খেতে ডাক্।'

নিভা উঠ্‌ল।

এবারে সে কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা দিদি ভাই, তোমাদের জামাইবাবুদের ভাল লেগেছিল?'

তার ষোলো বছর পার হয়ে গেছে, গল্পের বই পড়ারও প্রচুর সময় ছিল, কাব্য জাগতিক আদর্শ স্বামী সম্বন্ধে কল্পনার যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

মেজ দিদি উঠ্‌ছিল, হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'স্বামীকে ভাল লাগবে না? কেন? শোনো একবার মেয়ের কথা!—হাসিয়ে পাগল করতে পারে ও!'—মাগো,—ওদেরও তো বিয়ে হয়েছিল সব,—কই এসব কথা তো ভাবেও নি'—মেজ দিদি সেজদি এবং মার কাছে এত হাসির কথা বলতে নেমে গেল।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে নিভা দিদিদের ছোট ছেলেদের ঘুম পাড়াতে মার কাছ থেকে নিয়ে এলো।

আদর কাড়াতে নিভা পায় না, আদরই পায়নি। দর থাকলে আদর থাকে। পাঁচ বোনের প্রথম নয় শেষ নয় সে; আদর কাড়াতে অপ্রস্তুত মনে হয়।

তবু অনেক রাত্রে যখন সেজদি মেজদি ঘুমুলো, ছেলেরা, ভাইয়েরা ঘুমুলো;—মার ঘটি বাটী ডিবে রাখার শব্দে নিভা উঠে বস্‌ল। সবাই ঘুমুচ্ছে।

জননীর চোখ পড়ল তাই,—'কিরে?'

'একটু জল খাব।'—উঠে এসে কুঁজো থেকে জল খায়।—

কলকাতার আকাশ ঝাপসা জ্যোৎস্নায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে মহানগরীর দিকে চেয়ে আছে। পাড়ার প্রায় সব বাড়ীই অন্ধকার।—

মা তখন ভাবছিলেন, স্বামীর কাছে গিয়ে কিছু পরামর্শ করবেন, জিজ্ঞাসা করবেন।—

নিভা এসে দাঁড়াল কাছে।—

'কিরে?'

'আমায় ও-রকম করে বিয়ে দিয়ো না মা!'—

'কি রকম করে'—মা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

'ঐ কেবলি টাকা আর গয়না দেবে।—আমি ওদের ভালবাসতে পারবো না'—তার চোখ ছল ছল করে এলো।

'শোনো কথা! ওরা টাকা নিয়ে বিয়ে করবে—তার সঙ্গে তোর ভালবাসার কি?—পাগল আর কি।—এরাও তো টাকা নিয়েছিলেন'—তাঁর নিজের ভালবাসার কথা মা আর বল্লেন না —

'রাত হয়েছে, যা শুগে'—

বাপ জেগেই প্রায় ছিলেন; জিজ্ঞাসা করলেন,—'নিভা কি বলছিল?'

মা বল্লেন। নিভার বাপ একটু চুপ করে থেকে একটু হেসে বল্লেন 'তা ভালবাসার ব্যাঘাত হয় না—দৃষ্টান্ত যা দিয়েছ তার জবাব দেবার উপায় ওর আর নেই—আমারো নেই!'

স্ত্রী একটু অপ্রতিভ হয়ে গেলেন!

কথা উল্টে বল্লেন,—'ওরা কি বল্ল? জবাব কবে দেবে? পছন্দ হয়েছে? কিন্তু কেমন ধরণ যেন!'

শেষ কথার জবাব না দিয়ে স্বামী বল্লেন, 'ওরা বলে গেল, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ওদের—রং ফরসা করার উপায়ও একটা বাংলে দিয়েছে,—সেটা হলেই ওরা বিয়ে সামনে বৈশাখে দেবে।'—

উৎসুক নিভার মা জিজ্ঞাসা করলেন 'সে কি উপায়?'

'কিছু বেশী টাকা। নগদ ওরা নেয় না, কিন্তু 'রকম' নেয়'—

খানিক চুপ করে থেকে পত্নী বল্লেন, 'তা কি করবে?'

'তাই দোব আর কি। ছেলেটী ভাল, স্বাস্থ্য ভালো, বাপের অবস্থা ভালো।—বাজারে দর আছে।—তাছাড়া মেয়েকে গয়নাগাটী দেবে—আদরও করবে'—তার পর একটু থেমে ঈষৎ হেসে বল্লেন—'আর তুমি তো বলেইছো ঠিকই—ভালবাসতে কোনোই বাধা হয় না'।—

যুযুৎসু-কৌশল

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পড়ন শিক্ষা—(Break fall)

নিম্নলিখিত পড়নগুলি ভাল ভাবে অভ্যাস করিলে কেহ ফেলিয়া দিলে বা নিজে পড়িয়া গেলে কোন আঘাত না লাগিয়াই নিজেকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে এবং অপরকে ফেলিবার সময়ও সাহায্য হইবে। সেইজন্য যুযুৎসু শিক্ষা করিতে হইলে এইগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং অভ্যাস করিতেই হইবে। অল্প ছবির দ্বারা এই সকল বোঝান কত শক্ত তাহা ভুক্তভোগীরাই অনুভব করিতে পারেন। সেই জন্য ছবি তুলাইবার কিছু ত্রুটি রহিয়া গেল। লেখা পড়িলে বুঝিতে অসুবিধা হইবে না।



১নং চিত্র

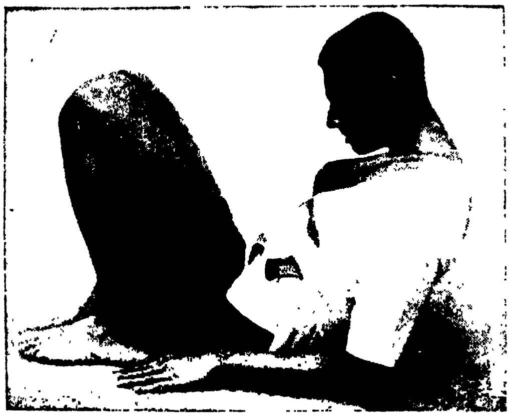
১নং

প্রথমে বসিয়া আরম্ভ করিতে হইবে, নচেৎ অভ্যাস না থাকার দরুণ আঘাত লাগিতে পারে। পায়ের আঙুলের

উপর উপু হইয়া মাথাটী একটু সাম্‌নে ঝুঁকিয়া বসিয়া হাত দুইটী সামনে সোজা ভাবে রাখিয়া পিছনে গড়াইয়া যাইবে। (১নং চিত্র)। পিছনে গড়াইয়া যাইয়া কাঁধটী মাটীতে



২নং চিত্র



৩নং চিত্র

ঠেকিবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে হাত দুইটী ধারে সোজা ভাবে লইয়া আসিয়া হাতের আঙ্গুল হইতে কাঁধের কাছ অবধি মাটীতে মারিলে, শরীরে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা কম। মাথাটী মাটী হইতে তুলিয়া রাখিতে হইবে (২নং চিত্র)। আবার এই অবস্থা হইতে উঠিয়া বসিতে হইলে পা দুইটী ঝোঁক দিয়া সোজা করিয়া তুলাইয়া মাটীতে রাখিয়া ও হাতের জোরে উঠিয়া (৩নং চিত্র) আবার পূর্ব্বের মত বসিতে পারা যাইবে। এইভাবে বসা ও উঠা ভাল ভাবে অভ্যাস হইলে দাঁড়াইয়া পড়িতেও অসুবিধা হইবে না। তবে দাঁড়াইয়া এইভাবে পড়িবার সময় হাঁটুর কাছ হইতে ভাঁজ করিয়া (৪নং চিত্র) পিঠের উপর শুইয়া পড়িতে হইবে তাহা হইলে আর কোন আঘাতের সম্ভাবনা থাকিবে না।

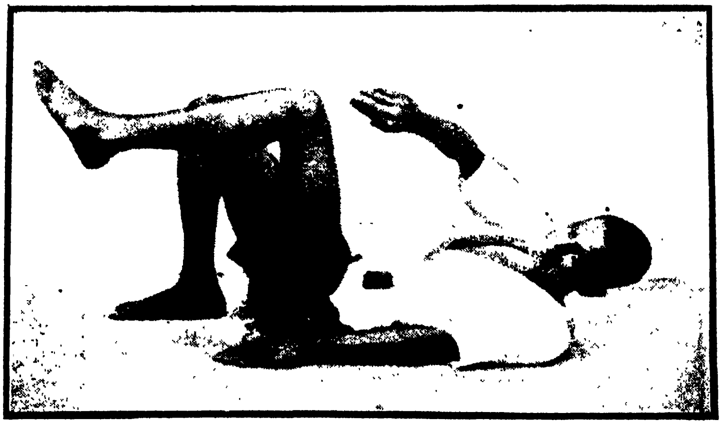
২নং

যদি কেহ ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয় এবং চিৎ হইয়া



৪নং চিত্র

মাটীতে পড়িতে হয় তবে ঠিক পড়িবার সময় হাঁটুর কাছ হইতে ভাঁজ করিয়া (৪নং চিত্র) পিছনে শুইয়া পড়িতে হইবে



৫নং চিত্র

এবং শুইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতটী পূর্ব্বের মত মাটীতে মারিয়া ও ডান হাতটী উপরে শরীরের একটু বাঁ দিকে রাখিয়া শরীরটাকে একটু বাঁ দিকে কাৎ করিয়া শুইতে হইবে



৬নং চিত্র

এবং এইরূপে হাতের কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা-টী যেমন মাটীতে আছে না তুলিয়া ও বাঁ পা-টী হাঁটুর কাছ হইতে



৭নং চিত্র

মুড়িয়া উপরে তুলিয়া রাখিতে হইবে (নং চিত্র)। অপরদিকে পড়িতে হইলে হাতের ও পায়ের কাজ বদলাইয়া করিতে



৮নং চিত্র

হইবে। শিক্ষার্থীদিগকে দুইধার দিয়াই অভ্যাস করিতে হইবে। এইরূপে পড়িবারও একটু কারণ আছে। একটী হাত



৯নং চিত্র

ও একটী পা তোলা থাকার দরুণ পরমুহূর্ত্তের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে এবং উঠিবারও অনেক সুবিধা হইবে।

৩নং

সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, সাম্‌নে ঝুকিয়া বাঁ হাতটী মাটীতে ও ডান হাতের পুরবাহুটী মাটীতে রাখিয়া (ডান পুরবাহুটী এইরূপভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে হাতের আঙ্গুলের দিকটী বাঁ হাতের কাছে থাকে) এবং মাথাটী একটু বাঁ দিকে কাৎ করিয়া (৬নং চিত্র) কোমর হইতে ঝোঁক দিয়া উল্টাইয়া যাইতে হইবে। ঘুরিয়া যাইবার সময় ডান মোড়া হইতে পিঠের কোণাকুনি ভাবে ঘুরিয়া যাইবে (৭নং চিত্র)। ঘুরিয়া যাইয়া ডান পা-টী সোজা এবং বাঁ পা-টী হাঁটু হইতে মুড়িয়া পায়ের জোরে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে (৮নং চিত্র)। এইরূপে হাতের ও পায়ের কাজ বদলাইয়া



১১নং চিত্র

করিয়া দুইধার দিয়াই অভ্যাস করিতে হইবে। এইটী ভাল ভাবে অভ্যস্ত হইলে পরে মাটীতে হাত না রাখিয়াই অভ্যাস করিতে হইবে। এই পড়নটী ভালভাবে আয়ত্তে আসিলে অনেক "Throwing"-শ্রেণীভুক্ত প্যাঁচ মারিতে সুবিধা হইবে।



১০নং চিত্র

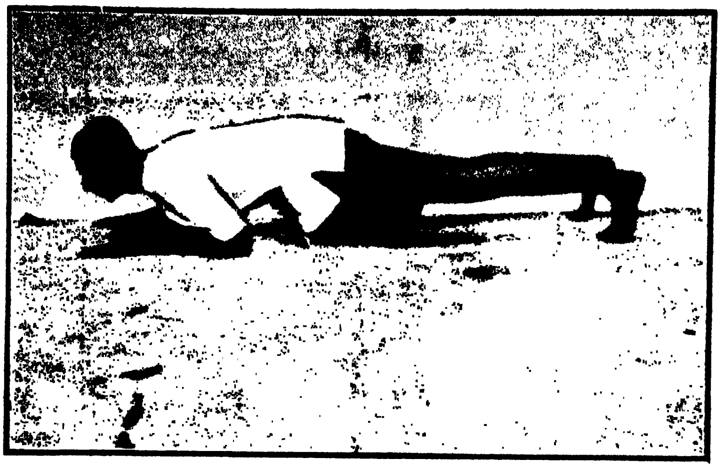
৪নং

যদি কেহ কোন প্যাঁচ মারিয়া কিম্বা ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয় এবং চিৎ হইয়া মাটীতে পড়িতে হয় তবে নিম্নলিখিত



১২নং চিত্র

উপায়টী অভ্যাস করিয়া রাখিলে নিজেকে আঘাত হইতে বাঁচাইতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পিছনে পড়িয়া যাইবার সময় পা দুইটী হাঁটুর নিকট



১৩নং চিত্র



১৪নং চিত্র

হইতে ভাঁজ করিয়া (৪নং চিত্র) পিঠের উপর শুইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই পা দুইটী ছুড়িয়া উপরে সোজা ভাবে তুলিতে এবং হাত দুইটী সোজা করিয়া পূর্ব্বের মত চেটো দিয়া মাটীতে মারিতে হইবে (২নং চিত্র)। এই ভাবে অভ্যাস করিলে পড়ার আঘাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে। পরে হাত দুইটী তুলিয়া কাঁধের দুই পাশে রাখিয়া পা দুইটি সোজাভাবে দুলাইয়া ঝোক দিয়া (৯নং চিত্র) ও হাতের জোরে শরীরটী উল্টাইলে শরীরটী উপুড় অবস্থায় হইবে (১০নং চিত্র)। সেইখান হইতে দাঁড়াইতে বিশেষ কষ্ট-সাধ্য হইবে না (১১নং চিত্র)। এই পড়নটীতে ভাল করিয়া অভ্যস্ত থাকিলে অনেক প্যাঁচ মারিবার ও সুবিধা হইবে।



১৫নং চিত্র

৫নং

এই পড়নটী অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমতঃ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পরে পা দুইটী হাঁটুর নিকট হইতে ভাঁজ করিয়া (১২নং চিত্র) সামনে মাটীতে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িতে হইবে। শুইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই হাত দুইটী কনুই হইতে চেটো অবধি মাটীতে মারিয়া পড়িতে হইবে। শুইয়া পড়িয়া মাটীতে শুধু কনুই হইতে চেটো ও পায়ের অঙ্গুলগুলি লাগিয়া থাকিবে। শরীরের অন্ত কোনস্থান মাটীতে

ঠেকিবে না (১৩নং চিত্র)। এইটী ভাল ভাবে অভ্যস্ত হইলে পর নিম্নলিখিত পড়নটী অভ্যাস করিতে হইবে। উপরিউক্ত ভাবে হাঁটুর নিকট হইতে ভাঁজ করিয়া শরীরটীকে লাফাইয়া উপরে তুলিয়া পা দুইটী সোজাভাবে পিছনদিকে উর্দ্ধে তুলিয়া মাটীতে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িতে হইবে। মাটীতে পড়িবার পূর্ব্বেই হাত দুইটী কনুই হইতে চেটো অবধি মাটীতে মারিয়া পড়িতে হইবে। ঠিক তাহার পরেই পা দুইটী মাটীতে আসিয়া পড়িবে। শরীরের কনুই হইতে চেটো ও পায়ের অঙ্গুলিগুলি ভিন্ন অন্য কোনস্থান মাটীতে ঠেকিয়া থাকিবে না (১৩ নং চিত্র) এই অবস্থা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইলে ডান পা-টী হাঁটুর নিকট হইতে মুড়িয়া শরীরটীকে ডানদিকে ঘুরাইয়া ডান পা-টী বাঁ পায়ের ডানদিকে রাখিয়া (১৪ নং চিত্র) বসিয়া ডান পায়ের জোরে উঠিয়া দাঁড়াইতে অভ্যাস করিতে হইবে (১৫ নং চিত্র)। বাঁ পা দিয়াও হইবে তবে কাজগুলি বদলাইয়া করিতে হইবে। এইরূপে পড়িতে ও উঠিয়া দাঁড়াইতে অভ্যাস করিলে অনেক অবস্থা হইতে বাঁচিতে সহজ সাধ্য হইয়া যাইবে।

অপূর্ণ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বাবা-মায়ের বড় আদরের ছেলে ছিল রতন। ছেলেবেলায় কি করিয়া কাপড়ে আগুন লাগিয়া তাহার সারা দেহের সঙ্গে মুখখানি পুড়িয়া যায়। ডাক্তারী চিকিৎসার গুণে, কালে সর্ব্বাঙ্গের দুরারোগ্য ক্ষত মিলাইয়া গেল,—শুধু চক্ষু দুটিতে দুর্ঘটনা তাহার স্মৃতি চিহ্ন রাখিয়া দিল। দৃষ্টি একেবারে নিবিয়া যায় নাই। স্বল্প আলোকে আকাশের নীলিমা, বনের শ্যামলতা ও লোকের মুখগুলি দেখিয়া চিনিবার ক্ষমতা তাহার ছিল।

বাবা-মায়ের আরও দুটি সন্তান ছিল। তারা কর্ম্মক্ষম, সবল, সুস্থ। কাজেই, এই অঙ্গহীন রুগ্নটির উপর তাঁহাদের মমতা কিছু অত্যধিক পরিমাণেই ছিল।

অর্থও তাঁহাদের কিছু ছিল। ভাবিয়াছিলেন, মরণ-কালে অক্ষম সন্তানের যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়া দিয়া যাইবেন। কিন্তু নিষ্ঠুর কাল ধীরে সুস্থে তাঁহাদের সে ব্যবস্থা করিতে দিল না। রতনের তিন বৎসর বয়সের সময় বার ঘণ্টার কাল ব্যাধিতে মা চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় স্বামীর হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া মিনতি-ভরা কণ্ঠে কহিলেন,—ওকে দেখো।

তার পর, বার বৎসর ধরিয়া মৃতা পত্নীর শেষ অনুরোধ পালন করিয়া পিতাও একদিন সেই অজানা লোকে প্রয়াণ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল: সুতরাং কিছুই বলিতে পারিলেন না। একবার রোদন-ক্ষুব্ধ রতনের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মেজ ছেলে ভূষণের পানে চাহিয়া কি যেন ইঙ্গিত করিতে গিয়াছিলেন, স্বর বাহির হয় নাই—কণ্ঠটা ঘড় ঘড় করিয়া চক্ষু দুটি বুজিয়া আসিয়াছিল। কিছুই বলা হয় নাই।

ভূষণ সে ইঙ্গিত বুঝিয়াছিল কি না বলা যায় না; তবে সস্নেহে অবোধ পিতৃহারা ভাইটীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনা দিয়াছিল,—তোর ভাবনা কি রতন, যখন আমরা রয়েচি!

রতন শুধু কাঁদিয়াছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে দুই দাদার পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ছিল না বলিয়াই হয় ত তাঁহাদের আকুল ভাবে কাঁদাইতে পারে নাই। তা না পারুক, সকলের হৃদয় ত সমান নহে। কেহ স্নেহমায়ামমতাশীল, কেহ বা সংসারের উপযোগী কিছু কঠিন।

রতনের বয়স তখন পনেরো—কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থল। আপনার সৌন্দর্য্যহীন ইন্দ্রিয়ের জন্য তখনই তার আক্ষেপ বেশী হইয়া উঠিয়াছিল। ধরণী রূপ-রস-গন্ধময়ী, প্রকৃতি নব নব ঋতুর বিকাশে নৃত্য-চঞ্চলা। আকাশ, নদী, প্রান্তর, পথ জীবনের নবীন আকাঙ্ক্ষার সবেমাত্র হিরণ-বরণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে। সূর্য্য

দিতেছেন প্রচুর উজ্জ্বল কিরণ, রাত্রিতে চন্দ্র জ্যোৎস্নার বানে আকাশ ভাসাইতেছেন। কুসুম-গন্ধ বহিয়া বায়ু-অঙ্গ ছুঁইয়া বিহ্বল সন্ধ্যার রাগিণী ঝঙ্কার তুলিতেছে। এমন দিনে কোথায় খোলা মাঠে মুক্ত আকাশতলে নদীর তট পথে চিন্তালেশশূন্য হইয়া নব আনন্দের অমৃতধারা বিলাইয়া ছুটাছুটি করিবে, না ম্রিয়মাণ রতন ধীরে ধীরে বক্র পথটিতে আসিয়া ম্লান দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধ পানে চায়। আকাশের ভাষা সে পড়িতে পারে না,—বায়ুর ব্যাকুলতা বোঝে না, ঋতু উৎসবে সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পায় না—শুধু অর্দ্ধ-বিকশিত নেত্রে ঊর্দ্ধ পানে করুণভাবে চাহিয়া কাহাকে নালিশ জানায়। হয় ত ভাবে, কেন তাহার দৃষ্টির প্রসার আরও বাড়ে নাই? কেন চাহনির তীব্রতা নাই? ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা ছায়ায় অঙ্গ ঢাকিয়া কেন তাহার সম্মুখ দিয়া অর্দ্ধ-অচেতনে চলিয়া যায়?

বড় ভাই বলেন, হাঁরে, বই খাতা নিয়ে কি ক'রতে রোজ রোজ স্কুলে যাস? তার চেয়ে কিছু কাজ শেখ—ক'রে খেতে পারবি।

রতন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে তাকায়। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা থাকিলে তিনি দ্বিতীয়বার ও-কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেন না।

সহপাঠীরা বলে,—কানার আবার বিদ্যে! ফুটো কলসীতে জল!

রতন মনে মনে রাগে, উত্তর দেয় না। চোখের পরদায় যাহা পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয় না—মনের আয়নায় যে তাহা নির্ম্মলভাবে ফুটিয়া উঠে। একটি অঙ্গ তাহার নাই,—সেজন্য অপরাধ কি তাহার?

কিন্তু নিষ্ঠুর সহপাঠীরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বুঝাইয়া দেয়—অঙ্গহীনের অপরাধ কত গুরুতর। উহাদের চঞ্চল উল্লাসও তাই তাহার সারা অঙ্গে আগুন ধরাইয়া দেয়।

জগতে সবাই ইহাকে কৃপার চক্ষে দেখে—সমবেদনা জানায়। রতন ঘৃণা সহিতে পারে, কিন্তু করুণার অজস্র ধারায় মন তাহার হাঁফাইয়া উঠে। বিধাতা যাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার নালিশ পৃথিবীর আদালতে নাই। কেন এই অবুঝ লোকগুলা বুঝে না? অথবা বুঝিয়াও মর্ম্মব্যথায় প্রলেপ মাখাইতে গিয়া খানিকটা খোঁচা লাগাইয়া দেয়।

মলিনা কোন কথা বলে না। চুপ করিয়া তাহার কাছটিতে বসিয়া এ-বাড়ির ও-বাড়ির খবর দেয়। রতনকে কত আশ্চর্য্য কথা বলিয়া হাসায়।

রতনের চেয়ে বয়সে সে অনেক ছোট। মনটি তার ভারী সাদা। তাদের ক্ষুদ্র গ্রামের অনেক খবরই প্রত্যহ সে রতনকে দিত। রতন নীরবে শুনিয়া কখনও বা অতি সংক্ষিপ্ত দু-একটি মন্তব্য প্রকাশ করিত।

সেদিন মলিনা রতনকে বলিল, ছোড়দা, আজ একটা খবর শুনে এলাম।

রতন জিজ্ঞাসা করিল, কি খবর রে?

এদিক ওদিক চাহিয়া মলিনা বলিল,—বড় বৌদি শুনতে পাবে। এদিকে এস, তোমায় বলচি।

বাড়ির পিছনে খানিকটা পতিত জমি ছিল। গোটা-কয়েক আম, বেল ও নিম গাছ সেখানে ছিল। ফল হয় না, তবু তারা বাগানের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

রতনের পিতার আমলে গাছগুলি কয়েকবার ফলিয়াছিল। দু'তিন বৎসর হইতে আর মুকুল ধরে না।

গাছ কয়টি রতনের বড় প্রিয়। কত দিন সকালে ও দুপুরে সে একা এই গাছগুলির তলায় ঘুরিয়া বেড়াইত। কোনটির গায়ে মাথা রাখিয়া—কোনটিতে বা পিঠ চাপিয়া আপন মনে খেলা করিত। কোনটির তলায় নোনা আতার পাতার ছাউনী দিয়া ছোট কুটীর বাঁধিয়া একা একা গৃহ সুখের কল্পনায় বিভোর হইত।

ফজলী, কাঁচা-মিঠে, জোয়ানে, ক্ষীরপুলি, পাটালি, দুধে এমনি কত কি নামকরণ করিয়াছিল—গাছগুলির। আম একটারও ভাল ছিল না। লোকে নাম শুনিয়া চক্ষু-নাসা কুঞ্চিত করিয়া কহিত,—কানা পুতের নাম পদ্মলোচন। সে কথা রতনকে আঘাত করিত। তাই সে নীরবে ইহাদের সাহচর্য্যে আপনার মনের ব্যথা দূর করিতে প্রয়াস করিত। গাছেরা কথা কহে না, কিন্তু পাতা নাড়িয়া কত কি বলে। মধ্যাহ্ন-বায়ু-তাড়িত মৃদু পত্র-মর্ম্মর-ধ্বনিটুকু রতনের কাণে সঙ্গীতের সুরে বাজিতে

থাকে। প্রভাতের মিষ্ট হাওয়া তাকে সখার মত স্নেহস্পর্শ জানায়। অপরাহ্নে—রক্তরবির শেষ কিরণরেখা গাছের মাথা লাল করিয়া ঘরে ফিরিবার ইঙ্গিত জানায়। সুখে দুঃখে ইহারাই তাহার একমাত্র নর্ম্মসখা।

মলিনা আসিয়া হেলান ক্ষীরপুলি গাছটার গুঁড়ি ঠেস দিয়া দাঁড়াইল, রতন আর একটু উপরের ডালে পা দুখানি ঝুলাইয়া বসিল।

কহিল,—কি কথা রে?

—ভুবনদা যে বৌদিকে নিয়ে ক'লকাতায় চ'ললো!—

ভুবন রতনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সংসারে তাহার উপার্জ্জনই বেশী। সম্প্রতি একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং বধূ ও পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যয়সঙ্কোচে মন দিয়াছেন। এখানে থাকিলে অনাবশ্যক খরচের ভার বৃদ্ধি হয়, চাকুরীর স্থলে স্বামীও খাওয়া-পরার যথেষ্ট কষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন; সুতরাং সব দিক ভাবিয়া কলিকাতায় যাওয়াই শ্রেয়। স্বামীর কষ্ট দূরীকরণার্থে সে এই সৎপরামর্শ দিয়াছিল।

ভুবন অবুঝ হইয়া প্রথমটা আপত্তি করিয়াছিল,—কানা ভাইটার কি হবে?

স্ত্রী বলিয়াছিল, তোমায় যে একাই সব ক'রতে হবে তার মানে কি? মেজ ঠাকুর-পো র'য়েচে—কিছু দিক,—তুমিও কিছু কিছু পাঠিয়ো।

যুক্তি মন্দ নহে ভাবিয়া ভুবন সম্মতি দিয়াছিল।

কথাটা অনেকেই শুনিয়াছিল, মলিনাও জানিত। রতনকে বলা হয় নাই, কারণ, সে হয় ত কাঁদাকাটা করিতে পারে।

শুনিয়া রতন বিশ্বাস করিল না।

কহিল,—দূর, ক'লকাতায় কোথায় গিয়ে থাকবে?

মলিনা মাথা নাড়িয়া বলিল,—দূর বই কি! যখন যাবে—দেখতেই পাবে। ব'লছিল,—একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সেইখানে থাকবে।

রতনের মুখখানি শুকাইয়া গেল।

সে বড় হইয়াছে। নিজের সমস্যা যে না বুঝিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু একটি পয়সা সে উপার্জ্জন করিতে পারে না। রুগ্ন-দুর্ব্বল দেহে শ্রম তাহার সয় না, তাই, সে চেষ্টাও এতদিন করে নাই। আজ বড় ভাই চলিয়া যাইতেছেন, কাল যে মেজদাও না যাইবে তাহার ঠিক কি? তার পর, তাহার উপায়?

মলিনা বলিল,—তোমায় না কি মাসে মাসে টাকা পাঠাবে।

শুনিয়া রতনের মুখখানি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কহিল,—কে ব'ললে—টাকা দেবে?

—কেন বড়-বৌদি কিছু দেবে ব'ললে—মেজদাও হয় ত দিতে পারে। তাহ'লে মজা ক'রে বেশ খরচ করবে, নয়? রোজ রোজ ফুলুরি কিনে পান্তাভাত দিয়ে খাবে। ফুলুরীর উপর মলিনার যত লোভ ছিল—রতনের তত ছিল না। আপাততঃ পান্তাভাত ও ফুলুরী চলিতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাও মিলিবে কি না—কে বলিতে পারে!

রতন চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বলিল,—আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা ক'রবো—বড়-বৌদি্কে।

বালিকা হইলেও মলিনার একটু বুদ্ধি ছিল। সে ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল,—আমার কথা বিশ্বেস হ'লো না বুঝি? যাও না, ব'লে মজাটা দেখগে না।—বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল। রতন অনুনয় করিয়া তাহাকে ফিরাইল,—শোন, শোন, মলিনা—তোর কথা আমি বিশ্বাস ক'রচি।

মলিনা ফিরিল।

রতন বলিতে লাগিল,—আচ্ছা মলিনা, মেজদাও যদি ক'লকাতায় চ'লে যায়? তখন আমার দশা কি হবে?

মলিনা টপ্ করিয়া জবাব দিল,—কেন, তুমিও চ'লে যাবে।

রতন ম্লান হাসিয়া বলিল,—কানা লোক, অত দূরে কি যেতে পারবো? কে নিয়ে যাবে?

মলিনা বলিল,—দূর—কানা বই কি! এই ত গাছে উঠে ব'সেচ,—এই ত দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা, কটা আঙুল ন'ড়চে বল দেখি?—বলিয়া পাঁচটি আঙুলই তাহার সম্মুখে নাড়িতে লাগিল।

রতন রাগ করিল না। হাসিয়া বলিল,—এটুকু দেখতে পাই, কিন্তু কাজ ক'রবার শক্তি কৈ? দেখচিস ত আমার চেহারা।

মলিনা তাহার গায়ে হাত রাখিয়া বলিল,—তা হোক, বড়দার কাছে থেকো—তোমায় কাজ ক'রতে হবে না।

রতন কিছুতেই ইহাকে বুঝাইতে পারিল না—বড়-দা তাহাকে এড়াইবার জন্ত কলিকাতায় যাইতেছেন। সে দশ বৎসরের বালিকা,—বলিলেও বোঝে কই?

অবশেষে রতন বলিল,—টাকা না হয় পেলাম, হাত পুড়িয়ে রাঁধবো কি ক'রে?

মলিনা বলিল,—ও মা, তুমি রাঁধবে কেন? তোমার বৌ এসে রেঁধে দেবে।—

রতন ব্যথার হাসি হাসিয়া বলিল,—নিজে পাই না খেতে—আবার বৌ!

মলিনা বলিল,—আহা! কথার ছিরি দেখ না,—বৌ যেন আসবে না? বেশ গো বেশ, দেখে নিয়ো—আমার কথা সত্যি হয় কি না!

তাহার কথা ও হাত-নাড়ার ভঙ্গীতে রতনের মুখে হাসি ফুটিল। কহিল,—পাগল কোথাকার!—

মলিনা ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, যতদিন বৌ না আসে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার ডাল তরকারী রেঁধে দিয়ে যাব। ভাতটা তুমি নামিয়ো।

রতন বলিল,—তুই আর কত দিনই বা আমায় রেঁধে খাওয়াবি। বিয়ে হ'লে যখন শ্বশুরবাড়ী চলে যাবি আমার কথা মনেও থাকবে না।

মলিনা রাগিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল,—হাঁ,—যাবে বই কি? যাও, তুমি ভারী দুষ্টু,—বলিয়া ছুটিয়া পলাইল। রতন তাহার গমন-পথের পানে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

তাহার বয়স হইয়াছে,—সে অনেক কথাই বুঝিতে পারে।

যথাসময়ে বড় দা কলিকাতায় চলিয়া গেল। রতন কাঁদিয়া হাট বসাইল না।

বৌ দি দাদাকে অলক্ষ্যে বলিল,—দেখলে কাঠ প্রাণ! একরত্তি মায়া নেই গা? সাধে কি আর বলে—কানা খোঁড়ার এক গুণ বেশী!

ভুবন কোন উত্তর দিল না।

বৈকালে ভূষণ বলিল,—দেখলি ত র'তে, বড়-দার আক্কেলখানা! বউ নিয়ে ক'লকাতায় পালালো!

রতন চুপ করিয়া রহিল।

ভূষণ বলিতে লাগিল, অথচ বড় ভাই ব'লে আমি একটি কথাও কইনি। বাবা ম'রতে না মরতে টাকাগুলো নিলে ভাগ করে। নিলে—নিলে। আমি যেন রোজগার করি, কারো তোয়াক্কা রাখিনে। কিন্তু, তোর কথা একবার ভাবলে না? ভাবলে না, অক্ষম ভাইটা কি ক'রে খাবে? তথাপি রতন চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া সে ঈষৎ উচ্চস্বরে বলিল,—কথা কচ্ছিস না যে?

রতন বলিল,—আমি কি ব'লবো মেজ-দা?

ভূষণ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল,—আমি কি ব'লবো? কেন, ব'লতে পারলি না,—তুমি চলে গেলে আমার চলবে কি ক'রে?—

রতন ভাবিল,—সে কথা বড় দাই কি জানিত না! মুখে বলিল,—ব'লে গেছে পাঁচ টাকা ক'রে পাঠিয়ে দেবে।

তাচ্ছিল্য ভরে ভূষণ বলিল,—পাঁচ টাকা! তাতে কি হবে? আজকালকার বাজারে চলে একটা লোকের? ধর গিয়ে এক মোণ চালের দামই তিন চার টাকা। তার পর, জামা, কাপড়, জুতো, ছাতা, হাট বাজার—

মৃদুস্বরে রতন বলিল,—বৌদি ব'লেচে আর আদ্দেক খরচ তুমি দেবে।

এবার ভূষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—আমি দেব! বড় পয়সা আমার, নয়? চাকরী ক'রে পাই ত তিরিশটি টাকা মাইনে, হাতে মাথতে কুলোয় না। উঃ—আক্কেলখানা দেখ একবার। কি ব'লে বল্লে এ কথা? চামার—চামার।

রতন কুণ্ঠিত মুখে বসিয়া আপনার মৃত্যু প্রার্থনা করিতে লাগিল। কেন ভগবান আমায় সৃষ্টি করিয়াছিলে? যদি জগতের আলো দেখাইয়াছিলে, আবার কেন তা হরণ করিয়া লইলে? পরের গলগ্রহ করিয়া এ জীবনকে লাঞ্ছিত করায় তোমার সৃষ্টির কি সার্থকতা হইল প্রভু! এখনও সময় আছে, মরণ দাও, মরণ দাও। মাঠের মাঝে বজ্রদগ্ধ তাল নারিকেল তরুর মত প্রয়োজনহীন দেহটা জীয়াইয়া রাখিয়া বৃথা লোকের অবজ্ঞাভাজন করিও না। মরণ দাও।

ক্রোধের উচ্ছ্বাস থামিলে ভূষণ বলিল,—তুই একখানা চিঠি লেখ। লেখ,—পাঁচ টাকায় আমার চলবে না। মেজ-দা অক্ষম। তোমায় দিতেই হবে, না দিলে শুকিয়ে ম'রবো। পরে আত্মগত ভাবে বলিল,—দেবে না? ইঃ—! মার পেটের ভাই—না দিলেই হ'লো আর কি।

রতন বলিল,—আমি ত লিখতে পারি না মেজদা, তুমি যদি লিখে দাও।

ভূষণ বলিল, না, না, আমি লিখলে হবে না। মনে ক'রবে—টিপ্‌নি। তুই আর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নে। দেবে না, মাগ্‌না আর কি!

বলিয়া উঠিয়া গেল।

পিতার মৃত্যুর পর বৎসরও ঘুরে নাই। মেজদার কথা এখনও মনে পড়ে,—তোর ভাবনা কি রতন, আমরা যখন রয়েচি।

পিতা নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদিয়াছিলেন। রতনও যদি অমন নিশ্চিন্ত হইতে পারিত।

সে স্থির করিল বড়দাকে পত্র দিবে না। তাহারা যদি অনাথ ভাইটির মুখপানে না চাহিয়া পিতার নিকট মৃত্যু কালের শপথকে এমনই লঘুভাবে উড়াইয়া দিতে পারেন, ত জগতে বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? না খাইয়া সে যদি শুকাইয়া মরে তথাপি সে কোন কথা বলিবে না।

সন্ধ্যাবেলায় ভূষণ বলিল,—চিঠিখানা আমায় দে। আমি পাঠিয়ে দেব।

রতন বলিল, আমি ত চিঠি লিখিনি, মেজদা।

—কেন?

কি হবে লিখে। বড়-দা কি নিজেই বুঝতে পারচেন না সব?

ভূষণ ব্যঙ্গস্বরে কহিল,—ওঃ, ভারী ত দরদ! তাই ফেলে চ'লে গেলেন। তার কি কিছু পদাথ আছে যে বুঝবে? বৌদি যে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

অপদার্থ ভাইয়ের আচরণের ত্রুটি পদার্থবান ভাইয়ের চোখে এমনই বৃহৎ হইয়া দেখা দেয়।

রতন কিন্তু বলিল,—মাসখানেক যাক—মেজদা—

ভূষণ রাগিয়া বলিল,—বেশ তাই থাক। তখন যদি পেট না ভরে ত আমার কাছে কুকুর-কান্না কেঁদ না—যেন। আমি আগে থেকেই ব'লে রাখচি—কিছু দিতে পারবো না।

পরদিন প্রাতঃকালে মলিনা আসিতেই রতন তাহার সম্মুখে কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল,—কি ক'রলে মানুষ শীগ্‌গির মরে—জ্বালা যন্ত্রণা হয় না—ব'লতে পারিস, মলিনা?

মলিনা বলিল,—ও কি কথা ছোড়দা?

রতন বুঝিল ইহার কাছে কাঁদা ভাল হয় নাই। সে হয় ত কিছুই বুঝিবে না, লাভে হইতে পাড়াময় এ-কথা বলিয়া বেড়াইবে। কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য সে বলিল,—আজ কি রাঁধবো বল দিকি? ঝোল ভাত, কি বলিস?

মলিনা উৎসাহ-ভরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—বেশ ত, বড় বড় ট্যাংরা মাছ এনো—খাসা ঝোল হবে।

রতন বলিল,—ঝোলে কি কি মশলা দিতে হয় জানিস?

মলিনা মুখ ঘুরাইয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল,—হুঁ। মা আঁতুড়ে গেলে আমি কত দিন বাবাকে ঝোল ভাত রেঁধে খাইয়েচি। প্রথমে তরকারীগুলো ভেজে নেবে, তার পর মাছ ভাজবে। তার পর হলুদগোলা জল দেবে ঢেলে। লঙ্কা দুটো কুচিয়ে দিতে পার। একটু জিরে বাটা, ধ'নে বাটা, লঙ্কা বাটা—ব্যস্‌। ঝোল ত ফুটতে থাকবে। তার পর—একটু ঘন হ'লেই নামাবে। তেজপাত জিরে লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে সাঁতলে নেবে। ছ্যাক করে শব্দ হবে। তারপর পিটুলি গুলে নামিয়ে নেবে।

রতন জিজ্ঞাসা করিল,—পিটুলি কি?—

মলিনা হাসিয়া বলিল,—ওমা! পিটুলি কি জান না? ময়দা-গোলা। না, না, আমিই ভুল বলচি, মাছের ঝোলে পিটুলিগোলা দেয় না। ডালনায় দেয়। পার ত একটু ঘি দিও।

রতন হাসিয়া বলিল,—দেখা যাক। তুই বরং দেখিয়ে দিস।

মলিনা বলিল,—আচ্ছা, বাজার ক'রে আন।

রতন বলিল,—বাজার আর ক'রবো না। ঘরে আলু আছে, বেগুণ আছে। আজ ভোর বেলায় মেজদা কাঁচড়াপাড়ায় গেছে কি না!

মলিনা বলিল,—মাছ আনবে না?

—না। পয়সা কোথায় পাব?—

—বা—রে! যাবার সময় তোমার দাদা পাঁচটা টাকা দিয়ে গেল,—আমি দেখিনি বুঝি?—

রতন বলিল,—সে টাকায় ট্যাংরা মাছ কিনলে ত হবে না—চাল কিনতে হবে।

মলিনা মুখ ঘুরাইয়া বলিল,—আচ্ছা মশায়—সে হবে এখন ত মাছ আন।

যাই—বলিয়া রতন বঁটি পাতিয়া আলু কুটিতে বসিল। বহু কষ্টে একটির খোসা ছাড়াইয়া কুচি কুচি করিয়া কুটিতেই মলিনা হাসিয়া উঠিল।

রতন বলিল,—হাসলি যে?

মলিনা ভ্রূ নাচাইয়া কহিল,—আহা! বাবুর আলু কোটার বা ছিরি! ওই বুঝি ঝোলের আলু কোটা হ'লো? এমনি লম্বা লম্বা চারফালা ক'রে কুটতে হবে না? সর—সর—আমি কুটচি—বলিয়া রতনকে ঠেলিয়া দিয়া বঁটির উপর গিয়া বসিল।

রতন হাসিতে হাসিতে বলিল, তবে তুই কুটে রাখ—আমি বাজার ঘুরে আসি।

এমনি করিয়া সেদিন দুজনে রান্না করিল।

খাইতে খাইতে রতন বলিল,—সুন্দর ঝোল হ'য়েচে, মলিনা।

—নুন ঝাল সমান হ'য়েচে ত? বলিয়াই মলিনা চীৎকার করিয়া উঠিল, ওই যাঃ,—নুন দিতে একদম ভুল হ'য়ে গেচে।—বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল ও এক খাম্‌চা নুন হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, এই দেখ, উনুন পাড়ে যেমনটি রেখেছিলাম,—তেমনি আছে। একবারও মনে হ'লো না—না? পোড়া কপাল আমার। নাও, ঝোলের সঙ্গে একটু মেখে নাও।

আহার শেষ হইলে মলিনা চলিয়া গেল।

রতন ভাবিতে লাগিল,—এই ত সবে আরম্ভ! এখনও কত দিন এমন করিয়া কাটাইতে হইবে, কে জানে? মলিনা ছেলেমানুষ, মনটি উহার সাদা। জানেও কিছু কিছু। কিন্তু কত কাল আর সে এই ভাবে যাওয়া আসা করিবে? একটু বড় হইলেই বুঝিবে—কানার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই উচিত। জগতে বিধাতা যার কোন মূল্যই নির্দ্ধারণ করিয়া দেন নাই, তাহার সঙ্গে সুখ দুঃখের সম্পর্ক পাতাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। দান করিয়া পাইবার প্রত্যাশা না থাকিলে—দানের সুখ কোথায়? আপনার সুখ যেখানে—স্বার্থ সেইখানে। মানুষ জানে অজানে এই সুখকেই কামনা করিয়া থাকে। রতন নিজেই কি নিজের স্বাচ্ছন্দ্য চাহে না?

শনিবারে ভূষণ বাড়ি আসিয়া বলিল, বাবার পুরোনো আলমারীটা মাঝের ঘরে আছে বুঝি?

রতন বলিল—হাঁ।

ভূষণ ঘর খুলিয়া দেখিল—ধূলি আবর্জ্জনায় ঘর ভর্ত্তি। আলমারীর পালিশ্ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া রতনের পৃষ্ঠে একটা চাপড় মারিয়া কহিল,—ভূত কোথাকার! যেমন নিজে বাঁদর, তেমনি ঘরদোরগুলো নোংরা ক'রে রেখেচ! পয়সার জিনিষটা একেবারে মাটী করেচ।

রতনের শীর্ণ দেহ সে আঘাতে কাঁপিয়া উঠিল। অতি কষ্টে দুয়ার চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—উঃ।—

ভূষণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া আলমারীর ধূলা ঝাড়িতে লাগিল।

রবিবারে খরিদ্দার আসিল—আলমারীটা বিক্রয় হইয়া গেল। রতনকে একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া ভূষণ বলিল,—এই নে এক টাকা। বড়দা এসে জিজ্ঞেস ক'রলে বলবি,—জানি না।

রতন সবিস্ময়ে মেজদার পানে চাহিয়া বলিল, বড়দার টাকা পাঠিয়ে দেবে না?—

ভূষণ হাসিয়া উঠিল।

কহিল,—আমি ভাবতাম হাবা-বোকা! ও হরি! কানার পেটে পেটে এত! ভাগের বেলায় ত জ্ঞান টন্‌টনে। না দেব না। সে যখন চলে গেল—আমাদের কথা ভেবেছিল কি? নিজে ত বিয়ে ক'রে দিন কিনেচে। ভেবেছিল কি,—আর দুটো ভাই আছে—তাদের মানুষ ক'রতে হবে—সংসারী ক'রতে হবে? আমার বাবার জিনিষ;—বেচব—ভাঙ্গব—যা ইচ্ছে ক'রবো। কে কি ক'রতে পারে—করুক।

রতন ভয়ে আর কোন কথা কহিল না। তার যত পরামর্শ মলিনার সঙ্গে। পরদিন সে আসিলে কহিল,—মলিনা, মেজদা ত আলমারী বেচে টাকা নিয়ে গেল। কি করি বল দেখি?—দাদাকে জানাবো?

মলিনা জিজ্ঞাসা করিল, তোমায় ক'টাকা দিলে?

—এক টাকা।

ঠোঁট উল্টাইয়া মলিনা বলিল,—মোটিস্ এক টাকা! না বাপু, তুমি বড় বোকা—আর চাইতে পারলে না?

—চাইব কি! বড়দার কথা ব'লতেই মেজদা আমায় মারতে এল।

মলিনা মুখখানি গম্ভীর করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কি

ভাবিল। পরে অকস্মাৎ করতালি দিয়া কহিল,—বেশ হ'য়েচে। চার পয়সার পাঁপড় ভাজা কিনে আন, আজ রথের দিন মজাসে খাওয়া যাবে।

এত বড় সমস্তার সমাধান এমন সহজে যে মলিনা করিয়া দিবে তাহা রতন ভাবে নাই।

সে হাসিয়া বলিল,—এই জন্তেই ত তোর সঙ্গে পরামর্শ করি। আমার ভাবনা চিন্তাগুলো তোর পরামর্শ পেলে একদম কোথায় মিলিয়ে যায়!

—এমনি করিয়া ছুটি বৎসর চলিয়া গেল।

—বড়দা আর বাড়ি আসে নাই। মেজদা মাঝে মাঝে কাঁচড়াপাড়া হইতে আসে, আলমারী, খাট, সিন্দুক প্রভৃতি এক একটি জিনিষ বেচিয়া কিছুদিনের মত গা ঢাকা দেয়। রতন কখনও বা টাকাটা সিকেটা পায়, কখনও বা কিছুই পায় না। ভূষণ প্রতি বারেই বড় ভায়ের নিন্দা করে, ছোট ভায়ের উপর করুণা দেখায়। কিন্তু সে ওই পর্য্যন্তই। তাহার নিন্দা সুখ্যাতিতে কাহারও কিছু যায় আসে না।

মলিনা আর তত ঘন ঘন আসে না। রান্না সে নিজেই এক রকমে চালাইয়া লয়। পরামর্শ লওয়ার ব্যাঘাত আজকাল কিছু কিছু হয়। মলিনার কেমন যেন একটা লজ্জা সঙ্কোচ আসিয়াছে। আগের মত হি হি করিয়া অকারণে হাসে না, নাচিয়া ছুটিয়া বেড়ায় না বা রতনের পিঠে হাত রাখিয়া এ-বাড়ি ও-বাড়ির গল্পও করে না। মনটি তার আগের মতই সাদা আর দরদে ভরা,—তবু রতনের মনে হয়,—সে যেন অনেক বদলাইয়া গিয়াছে।

রতন কি নিজেই বদলায় নাই? খাওয়া পরার কষ্ট তার কষ্ট বলিয়াই মনে হয় না। আপন নষ্ট অঙ্গটি ফিরিয়া পাইতে সে সারা জীবন উপবাসে কাটাইয়া দিতে পারে, মনে হয়। লোকের বিদ্রূপ বড় তীব্র হইয়া বুকে বাজে।

—অভাব বাহিরের না হইয়া অন্তরের হইলে,—ইচ্ছা হয়,—দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া কোথাও ছুটিয়া পালাই—নির্জ্জনে বসিয়া খানিক কাঁদি।

অঙ্গহীন অক্ষম সে, তবু যৌবন আসিয়াছে। অর্দ্ধস্ফুট কামনা-কুবলয় ধরণীর শোভা হাসি-সলিলে প্রস্ফুটিত হইতে চাহিতেছে। কিন্তু সে প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভ বহিয়া ফিরিবে যে মত্ত আনন্দ-বায়ু, সে ত চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করে না! চঞ্চল পদ তাহার বিষাদ বালুকার মগ্ন হইয়া যায়, দুরন্ত জীবন-স্রোত ব্যর্থ হাহাকারে হৃদয়ের রুদ্ধ তটে আছাড় খাইয়া পড়ে। সে অক্ষম—সে দুর্ব্বল—সে ঘৃণিত!

মলিনাকে ঘিরিয়াই সে কত স্বপ্ন না রচনা করে!

জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন সে মানে।

শুভক্ষণে মলিনা তাহাকে দেখা দিয়াছিল। ব্যথার ব্যথী—দরদী—সুকোমলা এই বালিকার মন বলিয়া একটা জিনিষ আছে। এবং সেই মন বিশ্বের অসহায় ঘৃণিত দুর্ব্বলের ব্যথায় সমব্যথাতুর হইয়া উঠে। অল্প বয়স হইলে কি হয়, ছুটি নিপুণ করের স্পর্শে পরিপাটী কর্ম্মগুলি শৃঙ্খলিত হইয়া বাহিরে আসে। সে কর্ম্ম দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। সংসারকে সুচারুরূপে চালাইবার ক্ষমতা তাহার আছে। যে সংসারে এ লক্ষ্মীর পদার্পণ হইবে, নিরন্ন দরিদ্রের কুটীর হইলেও, তাহা লক্ষ্মীশ্রীতে ভরিয়া উঠিবে। রতনের বুক ঠেলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হয়।

সে যদি কর্ম্মক্ষম হইত ত এখনই এক গৃহলক্ষ্মী তাহার ঘরখানিকে পরিপাটীরূপে সাজাইয়া রাখিত। পরিষ্কার তুলসীমঞ্চ;—সন্ধ্যাবেলায় তাতে স্নিগ্ধ প্রদীপটি জ্বালিয়া একটি ভক্তি নির্ব্বাক প্রণাম-নিবেদন, প্রত্যূষে উঠিয়া পাট-ঝাঁট সারিয়া রান্নার উদ্যোগ আয়োজনে মাতিয়া থাকা, দ্বিপ্রহরে গরমের দিনে ঠাণ্ডা মেঝেয় চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আরাম উপভোগ করা—শীতে তপ্ত রৌদ্রে পিঠ পাতিয়া বসা,—অপরাহ্ণে পুষ্করিণীতে জল আনিতে যাইবার কালে সহচরীর কাণে কাণে গৃহস্থালীর তুচ্ছ সুখ দুঃখের গল্প এবং সময় অসময়ে সে সব কথা লইয়া হাসি তামাসা—যেন জীবনের পরিপূর্ণতার একটা দিক।

রতনের চেয়ে কত দরিদ্র আছে—যাদের পেট দুবেলা ভাল করিয়া ভরে না। পরনে শতছিন্ন গ্রন্থি দেওয়া কাপড়, ভগ্ন চালার ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র বৃষ্টির উৎপাত লাগিয়াই আছে, তবু তাহাদের মুখের হাসিটুকু একেবারে লুপ্ত হয় নাই। হউক ভগ্ন গৃহ—শ্রীভ্রষ্ট সংসার, সেখানকার সুর বাঁধিয়া যিনি এমন অহরহ হৃদয় তারে ঝঙ্কার দিতেছেন,—তাঁহার হৃদয়ের সুকোমল স্পর্শে বাহিরের দুঃখ অসঙ্গতি বাহিরেই পড়িয়া থাকে। সেই দরদীকে জানিবার জন্য একটা প্রবল বাসনা আজকাল তার চিত্তকে প্রতিনিয়ত আকুল হইয়া দোলা দিতে থাকে।

—ওমা গো!—ডাল যে ধ'রে পুড়ে দুর্গন্ধ বেরিয়েচে।

ব'সে ব'সে কি ভাবচ, ছোড়দা?—বলিয়া মলিনা আসিয়া রান্নাঘরে উঁকি মারিল।

সচকিতে মলিনার পানে চাহিয়া রতন ডালের কড়াইখানা নামাইয়া লইল ও তাহাতে এক ঘটি জল ঢালিয়া দিয়া কহিল,—আর এ বিড়ম্বনা সহ্য হয় না।

মলিনা বলিল,—আজ হঠাৎ এ বৈরাগ্য কেন?

রতন হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—সংসার আমার কোথায় যে—বৈরাগ্য আমার! তা নয়, রোজ রোজ একঘেয়ে রান্না খাওয়া,—অভাব দুঃখ,—জীবনে ঘেন্না ধ'রে গেছে।

মলিনা বলিল,—তা কি ক'রবে বল,—ভায়েরা যে যার বউ নিয়ে চলে গেল। তোমার এ ছাড়া উপায় কি?—

রতন ঈষৎ বেগের সহিত বলিল,—আমিও ত বিয়ে ক'রতে পারি।

বছর দুই পূর্ব্বে হইলে মলিনা হাততালি দিয়া হাসিয়া বলিত,—তাহ'লে বেশ মজা হবে, ছোড়দা,—তুমি বিয়ে কর। কিন্তু এখন বয়সের সঙ্গে বিজ্ঞতাও বাড়িয়াছে। সে কথা কি বলা যায়?

ঈষৎ হাসিয়া সে মুখখানা নীচু করিল।

—তাহার হাসি দেখিয়া রতন মনে করিল, মলিনা কথাটা উপহাসের ভাবিল।—মনে মনে তার রাগ হইল।

ঈষৎ ঝাঁঝালো সুরে বলিল,—হাসচিস যে বড়? দেখিস, ছ মাসের মধ্যে বিয়ে করি কি না?

এ কথায় মলিনা একটু বেশী করিয়াই হাসিল।

মৃদুস্বরে কহিল,—কে তোমার বিয়ে দেবে, ছোড়দা?

রতন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিল, যেই দিক না, বিয়ে হ'লেই ত হ'ল!

মলিনা বলিল,—তা হ'লে ত আমি বাঁচি।

রতনের ক্রোধ চলিয়া গেল। ব্যগ্রভাবে কহিল,—কেন, কেন?

মলিনা বলিল,—কেন আবার! যে আনাড়ী তুমি, দু বছরের মধ্যে হাত শাট হ'লো না। বউটি এলে পোড়া ভাত ডাল আর খেতে হবে না। আমিও এটা ক'রো না—ওটা কর—এই সব ব'লে দেবার দায় থেকে বাঁচবো।

অকস্মাৎ রতনের মাথায় কি দুর্ব্বুদ্ধি চাপিল। ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল,—তুই কেন আয় না মলিনা, দুজনে বেশ মনের সুখে ঘরকন্না করি।

মলিনা রাঙা হইয়া কহিল,—ধোৎ! কি যে বল? তোমার একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।—বলিয়া আর সেখানে ক্ষণমাত্র দাঁড়াইল না।

রতন সবিস্ময়ে ভাবিল, মলিনা এই কথায় চলিয়া গেল কেন? কথাটা কি এমনই অসম্ভব?—সে কি মানুষ নহে,—না তাহার দেহে রক্তমাংসভরা জীবন নাই?

ভাবিল,—লজ্জায় রক্তরাগে মলিনা অমন রাঙা হইয়া উঠিল, না ঘৃণায় অমন দেখাইল?···ঘৃণাই হয় ত। কানাকে লইয়া সারা জীবন ঘর করিবার কল্পনা কোন্ সুস্থ নারীই বা করিতে পারে? মলিনার মনে দয়া আছে। তাই সে অক্ষমকে সাহায্য করিতে যখন-তখন ছুটিয়া আসে, দুঃখে সমবেদনা জানায়। সে দয়াকে ভালবাসা মনে করিয়া আকাশ-কুসুম রচনা—বাতুলতা ছাড়া আর কি!—তাহার অন্ধ জীবনের আলো চিরদিনই অনুজ্জ্বল থাকিবে। বাসনা-প্রদীপে আশার তৈল ঢালিয়া কেন তাহাকে উজ্জ্বল করিবার ব্যর্থ প্রয়াস?

পরদিন মলিনা আসিল না।

রতনের কেমন যেন সব ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিল। নিজের উপর রাগ হইল,—কেন সে অমন কথা বলিতে গেল? এবার দেখা হইলে, মলিনাকে সে দুঃখ করিতে বারণ করিবে। বলিবে, ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলাম ও-কথা। আমার কি ও-সব সাধ সাজে?

এই জগৎ চক্ষুষ্মানের—কর্ম্মক্ষমের—সুস্থ, সবলের। দুর্ব্বলের চিন্তা, দুর্ব্বলের সাধ—কল্পনা—এখানকার তীব্র স্রোতে বুদ্‌বুদের মত মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া মিলাইয়া যায়।

পরদিন, আমবাগানের ধার দিয়া মলিনা কোথায় যাইতেছিল, ক্ষীরপুলি গাছের তলায় দাঁড়াইয়া রতন তাহাকে ডাকিল। মলিনা আসিতেই অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল,—আমার ওপর রাগ করেছিস, মলিনা? পরশু সত্যিই ভারী অন্যায় কথা ব'লেছিলাম।

বলিতে পারিল না—তাহা নিছক পরিহাস মাত্র।

মলিনা মুখ তুলিয়া দেখিল, রতনের চোখে জল। মনটি তাহার দ্রব হইয়া গেল। নিজের আঁচল দিয়া রতনের চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিল,—ছি! কাঁদতে আছে?

রতন বলিল, বল,—আমার ওপর তোর রাগ নেই?

মলিনা বলিল, না—নই। কিন্তু, যখন-তখন ও-সব কথা ব'ললে আমার লজ্জা করে না বুঝি?

রতন বলিল, আমার কিন্তু লজ্জা নেই।. তোর রাগ সত্যিই নেই, মলিনা?

মলিনার হাসি পাইল। ওষ্ঠপ্রান্তে সে হাসি চাপিয়া বলিল, না গো, রাগ নেই—নেই—নেই। কথা শেষে সে হাসিয়া ফেলিল। মনের মেঘ কাটিয়া গেল।

রতন বলিল,—যাঃ, কি কি রাঁধতে হবে তার কুটনো কুটে দিবি।—

নূতন মাস পড়িয়াছে,—বড়দাদা খরচ পাঠায় নাই। ঘরে চাল নাই—মসলাপাতিও নাই। হাতের পয়সা ফুরাইয়া গিয়াছে। বড়দা ত কখনও এমন করে না। কে জানে তার অসুখ বিসুখ হইয়াছে কি না? দুটি বৎসরের মধ্যে কখনও ত এমন হয় নাই!

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া রতন একখানি পত্র লিখিল। দিন দশেক পরে পত্রের উত্তর আসিল,—এ মাসে খোকার অসুখের দরুণ বেশী খরচ হওয়ায় টাকা পাঠাইতে পারিলাম না। খুব সম্ভব আগামী মাসেও কিছু দিতে পারিব না। ভূষণকে লিখিও সে যেন দু-এক টাকা বেশী পাঠায়।…

পত্র পাইয়া রতন চোখে অন্ধকার দেখিল। হা ভগবান! মেজদা যে তাহাকে এ যাবৎ এক পয়সা দেয় নাই—উপরন্তু ঘরের আসবাবপত্র বেচিয়া যাহা কিছু পাইয়াছে আত্মসাৎ করিয়াছে—সে খবর ত বড়দাকে দেওয়া হয় নাই! ভাবিয়াছিল, বড়দাকে জানাইবে, কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করিয়াছিল। মেজদার মাহিনা কম—অভাব বেশী। কাজেই দেনা শোধের জন্য সখের আসবাবপত্রগুলি বেচিয়াছে। মেজদার কষ্টের কথা ভাবিয়া রতন জানাইতে পারে নাই।

কিন্তু, এখন উপায়? মেজদা যে এক পয়সা দিবে না—তাহা সুনিশ্চিত। ছয় মাস সে বাড়িমুখো হয় নাই। রতন লোকের মুখে শুনিয়াছে,—কাঁচড়াপাড়ার লোকো আপিসের কোন্ এঞ্জিন মিস্ত্রির কন্যাকে বিবাহ করিয়া সে শ্বশুরবাড়ীতেই সংসার পাতিয়াছে। বিবাহের সময় এ-বাড়ী আসে নাই,—বড়দাকেও একটা সংবাদ দেয় নাই।

এখন তাহার উপায়? ভিটা আগলাইয়া অনশনে প্রাণত্যাগ ভিন্ন ত অন্য পথ নাই।…আসবাবপত্রও এমন কিছু নাই—যাহা বেচিয়া মাস দুই চলিতে পারে। আর পরের কাছে শুধু-হাতে ধার চাহিতে গেলে লাঞ্ছনা ছাড়া অন্য কিছু মিলিবে কি না সন্দেহ! এমনই ত খুচরা দু এক আনা পয়সার জন্য ক্ষান্ত-পিসি, বামুন-দিদি, হরি ছুতোর, দীন ময়রা কত না শুনাইয়া দেয়।

অঙ্গহীনতার জন্য অনেক দিন সে মৃত্যু-কামনা করিয়াছে, কিন্তু এমন চোখের সামনে অনাহারে শুকাইয়া মরার কল্পনা সে করে নাই। যার দুঃখ যত মর্ম্মভেদীই হউক, কে নবীন যৌবনে অফুরন্ত কামনা বুকে লইয়া রূপে-রসে পরিপূর্ণা শ্যামা বসুন্ধরার নিকট ক্ষোভ-গ্লানি-শূন্য হইয়া অকস্মাৎ বিদায় লইতে পারে!

রতন দারুণ হতাশ-ভরে ঘরের চারি ধার অনুসন্ধান করিল।…নাই, নাই, কিছু নাই। নিষ্ঠুর মেজদা সমস্তই শোষণ করিয়া লইয়াছে।

সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল,—কখন এক সময়ে মেঝের উপর তন্দ্রাতুর হইয়া পড়িয়াছিল। তন্দ্রা ভাঙ্গিলে দেখিল, মলিনা মাথায় হাত দিয়া ঠেলিতেছে। সে চোখ চাহিতেই মলিনা বলিল,—বাবা, বাবা, এমনও কুম্ভকর্ণের ঘুম তোমার। কখন থেকে ডাকাডাকি করচি—

রতন উঠিয়া বসিয়া মলিনার পানে চাহিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, একটু জল দিতে পারিস?

মলিনা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল ও অনতিবিলম্বে একগ্লাস জল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

রতন একনিশ্বাসে সমস্ত জলটুকু পান করিয়া ফেলিল।

মলিনা তাহার শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া বলিল, মুখ শুক্নো কেন, ছোড়দা? অসুখ ক'রেচে বুঝি!

রতন ঘাড় নাড়িয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মলিনা জিজ্ঞাসা করিল, আজ কি রাঁধলে?

রতন তাড়াতাড়ি কি একটা উত্তর দিতে গিয়া থামিয়া গেল। মিথ্যা কথাটা বলিতে তার প্রবৃত্তি হইল না। মলিনা তাহার পানে চাহিয়া বলিল, কৈ, বললে না ত?

রতন বলিল, আজ রাঁধি নি।

—কেন?—

—আজ—আজ,—বলিতে গিয়া অবাধ্য অশ্রু উপচাইয়া পড়িল। হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিতে মুছিতে রতন রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, মলিনা, হাতে পয়সা নেই। দাদা খরচ পাঠায় নি।

মলিনার ক্ষুদ্র প্রাণটিও এই অন্ধ যুবকের অনশন-দুঃখে গলিয়া গেল। বিধাতা যাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন—কেন তাহার প্রতি মানুষের এই নির্ম্মম অবহেলা!

বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না।

মলিনা ধীরে ধীরে বাড়ী চলিয়া গেল এবং পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—এই নাও ছোড়দা, একটা সিকি। কাকেও ব'লো না যেন। যাও, উঠে খাবার নিয়ে এস।

রতন অবাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া কহিল,—তুই কোথায় পেলি সিকি?

—যেথানেই পাই না কেন! যাও, ওঠ আগে।

রতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না মলিনা, তোর ঠেঁয়ে নিলে লোকে ব'লবে—ছেলেমানুষ পেয়ে ভুলিয়ে নিয়েচে। তা আমি পারবো না।

মলিনা ঘাড় বাঁকাইয়া দৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—ইঃ—ব'ললেই হ'লো আর কি! তারা কি আমায় এক পয়সা দিয়েচে? আমি যার জলখাবারের পয়সা থেকে না খেয়ে জমিয়েছি। নাও, নাও, ওঠ—আর দেরী ক'রো না।

তথাপি রতন উঠিল না। কহিল,—শেষে তোর পয়সা—

এবার মলিনা সত্য সত্যই রাগিয়া উঠিল। মুখ ঘুরাইয়া কহিল,—কেন, আমার পয়সা নিলে তোমার মান খোওয়া যাবে বুঝি?···আপনার লোক? ভারী আমার আপনার লোক গো! ভাইটা রইলো কি ম'লো একবার উঁকি দিয়ে চেয়ে দেখে না!

রতন কোন কথা কহিল না।

মলিনার মুখখানি ভারী হইয়া আসিল, চোখ দুইটা ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

অশ্রুরুদ্ধ স্বরে সে কহিল,—তবে আমি পর, আমার পয়সা নিলে তোমায় খাটো হ'তে হয়। তা নিয়ো না। আমার যেমন মরণের জায়গা নেই—তাই ছুটে ছুটে আসি তোমার কাছে। বলিয়া সে পিছন ফিরিল।

রতন উঠিয়া তাহার আঁচলটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতি-ভরা কণ্ঠে কহিল,—দে তোর সিকি। পৃথিবীতে কেউ কারো আপন নয়, পরও কেউ নয়। মলিনা, তোর দেনা আমি হয় ত জীবনে শুধতে পারবো না।

মলিনা ওষ্ঠে তর্জ্জনী রাখিয়া কহিল,—চুপ্—আবার। যাও—জলখাবার কিনে নিয়ে এস। তার পর ঘটি-বাটি থালা বাসন যা আছে বেচে মাস দুই চালাও। আপনি বাঁচলে বাবার নাম।

মলিনার কথায় রতন অকূলে কূল পাইল। তখনও খানকয়েক থালা-বাটি অবশিষ্ট ছিল—বেচিলে কিছু দিন চলিতে পারে। পরের ভাবনা পরে। বড়-দার তৈজস-পত্র বৌদি কলিকাতা যাইবার সময় চুল চিরিয়া ভাগ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। মেজ-দাও ভাগের অতিরিক্ত লইয়াছে। সে-ই বা কেন প্রাণ ধারণের জন্য এগুলি বিক্রয় করিবে না? বাপ-মায়ের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ সে এগুলি আগলাইয়া আছে। যখন এই ভুবনেশ্বরী থালাখানিতে ভাত খায়, তখনই মনে পড়ে, মায়ের অর্দ্ধ-বিস্মৃত বলিরেখাঙ্কিত সৌম্য স্নেহময় মুখখানি। তিনি ভাতের সঙ্গে দুধ মাখিয়া শিশু রতনের মুখে অমৃতের গ্রাস তুলিয়া দিতেন। গ্লাসটি বাবা রথের মেলায় কিনিয়া দিয়াছিলেন। ছোট্ট পিতলের ঘটিটিতে বাবার প্রাত্যহিক মিছরি ভিজান থাকিত। আর এই যে পাথরের খোরা—ইহাতে করিয়া তিনি কত দিন আমের অম্বল রাঁধিয়া ঢালিয়া রাখিয়াছেন। অম্বলটা তিনি বেশী খাইতেন এবং একদিন রাঁধিয়া দুই দিন তাহাতে চালাইতেন। ক্ষিত্তুরে কাঁসিখানি না কি বড়-পিসিমা শ্রীক্ষেত্রে রথ দেখিতে গিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন। ছোট পদ্মকাটা বাটিটি দুধ খাইবার জন্য তাহার মাসীমা দিয়াছিলেন। মাসী বা পিসিমাকে রতন দেখে নাই। বাবার মুখে তাঁহাদের কথা ও এই বাটি কাঁসির ইতিহাস শুনিয়াছে।

আজ এগুলি পেটের দায়ে বেচিতে হইবে। আজন্ম স্নেহ-বঞ্চিতের জন্য এই যে অবশিষ্ট স্নেহের সঞ্চয়, এগুলি অন্নের মূল্যে বিকাইয়া দিতে হইবে! তাহার আর কিছু নাই, তবু এগুলির পানে চাহিলে সময়ে সময়ে মনে হয়,—যত বড় দুর্ভাগ্যই সে জন্মের সঙ্গে বহন করিয়া আসুক না কেন, তাহার তাপদগ্ধ জীবনের উপর একদা বর্ষাবারি স্নেহ-প্রাচুর্য্যে ঝরিয়া পড়িয়াছিল। আজ সে বিশ্বের অবহেলিত

হইলেও—সেদিন কয়টি প্রাণীর অন্তরে সে আরাধনার ধন হইয়াই ছিল। এই থালার সঙ্গে, বাটির সঙ্গে, খোরার সঙ্গে যে তাহার স্বপ্নময় সফল মুহূর্ত্তগুলি বিজড়িত রহিয়াছে! এগুলি গেলে জীবনে আর অবশিষ্ট রহিল কি?

রতন জানিত না—চলমান জগতে জড়স্মৃতির অস্তিত্ব চিরদিন থাকে না। দিন-রাত্রির সঙ্গে অণুপরমাণু—প্রাণী-জগতে প্রতিনিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে। স্থিতিশীলের জীবন এই বিশ্বের পৃষ্ঠ হইতে কালের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রতি মুহূর্ত্তে মুছিয়া যাইতেছে।

সব কয়টি জিনিষ বাঁধা দিয়া আটটি টাকা সে পাইল। প্রাণ ধরিয়া বিক্রয় করিতে পারিল না, যদি কখনও হাতে টাকা আসে সর্ব্বাগ্রে সে এগুলি উদ্ধার করিয়া আনিবে।

মলিনার চার আনা আর দেওয়া হইল না। সে চার আনা যেন এক মহামূল্য স্মৃতি—পরিশোধ করিলে তাহার সুকুমার আয়ু নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

কিন্তু সেইদিন হইতে মলিনা আর আসে নাই। রতন মনে মনে হাঁফাইয়া উঠিল। মলিনার সঙ্গে অনেক পরামর্শ আছে যে। ঘটি বাটি ত বাঁধা পড়িয়াছে, ভবিষ্যতে একটা কোন রকমের পেট-চালানো গোছের কাজ যদি জোটাইয়া লইতে পারে ত পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। মলিনার বাপ কোন্ মিলে কাজ করেন। তাঁহাকে বলিলে কিছু সুবিধা হইবে না কি?

কিন্তু সে লেখাপড়া তেমন জানে না—কোন্ মুখে কাজের কথা উত্থাপন করিবে? তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, কতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়াছ? কি উত্তর সে দিবে? গায়ে ক্ষমতাও সেরূপ নাই যে, পরিশ্রমের কাজ লইবে। মলিনাকে দিয়া যদি বলানো যায়, লেখা-পড়ার কাজ নয় অথচ খাটুনি কম এমন কিছু যদি একটা মিলিয়া যায়। না, মলিনা বড় দুষ্ট হইতেছে। জানে—সে নহিলে রতনের এক-দণ্ড চলে না—কোন পরামর্শ সে করিতে পারে না; তবু, জানিয়া শুনিয়াও সে ইচ্ছা করিয়া দেখা দিতেছে না। সাতটি দিন নহে—সাতটি মাস।

রতন মলিনার খোঁজে তাহাদের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দুয়ারে গাড়ি দাঁড়াইয়া—ভিতরে লোকজনের সমারোহ। বুঝি কোন সম্ভ্রান্ত অতিথিরা আসিয়াছেন। মলিনার ছোট ভাই একবার ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ছোট বোনটা একখানা রঙীন কাপড় পরিয়া চকিতে দুয়ারে উঁকি মারিয়া আবার নাচিতে নাচিতে ভিতরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ভাইটি খাবারের ঠোঙা হাতে বাড়ি ঢুকিল, রতন সাহস করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

ধীরে ধীরে বিষণ্ন মনে বাগানের সেই হেলান ক্ষীরপুলি গাছটার গায়ে ঠেস দিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

মলিনা কি রাগ করিয়াছে? কিন্তু সেদিন ত এমন কিছু কথা হয় নাই যাহাতে সে রাগ করিতে পারে। সে, তাহাকে জল খাওয়াইয়া হাসিতে হাসিতে বিদায় লইয়াছিল। তবে?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেও অন্ধকার হয় নাই। তিথিটা চতুর্দ্দশী কি পূর্ণিমা হইবে। আমগাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার কিরণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সামনের পথটায় লোকচলাচল বড়-একটা নাই। রতনের এ সকল খেয়াল ছিল না; সে আপন মনে ভাবিতে লাগিল,—মলিনা আর আসে না কেন?

একটি সুমিষ্ট হাস্যধ্বনিতে তাহার চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল। সম্মুখে মলিনা।

মলিনা যেখানে দাঁড়াইয়াছে, সেখানে পাতার ফাঁকটা কিছু বেশী। সুতরাং জ্যোৎস্নায় সবখানি আলোময় হইয়া উঠিয়াছে। রতন দেখিল,—এ যেন আগেকার মলিনা নহে। কেশ বেণীবদ্ধ, কপালে কিসের টিপ্ জল্ জল্ করিতেছে, সুন্দর একখানি পেঁয়াজী রঙের সাড়ী তার পরণে। কাপড় পরিবার ধরণটিও ভারী চমৎকার। গলায় এক গাছি সরু হার জ্যোৎস্নায় চিক্ চিক্ করিতেছে; কাণে দুল ও হাতে চুড়ি কয়গাছি মানাইয়াছে বেশ। মুখখানি সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত সুষমাময়। সমস্ত স্থানটি পুষ্পসার সৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষীণ দৃষ্টি ভরিয়া রতন মলিনার এই অপরূপ রূপ দেখিতে লাগিল।

মলিনা হাসিতেছিল। হাসিয়া বলিল,—অবাক্ হ'য়ে দেখছ কি, ছোড়দা? তোমায় প্রণাম ক'রতে এলাম। বলিয়া হেঁট হইয়া রতনের পায়ের ধূলা তুলিয়া মাথায় দিল।

রতনের মনে হইল, কি যেন ঘটিয়াছে—যাহা আগেকার জীবনের সহজ সুন্দর গতির পরিপন্থী। মলিনা সাজিয়াছে বটে, কিন্তু উহার পানে চাহিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে কেন?

শুষ্কমুখে সে কহিল, তোর ব্যাপার কি মলিনা? আর আসিস না কেন?

মলিনা মুখখানি নীচু করিয়া এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, পরে পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল, আর ত আসবো না, ছোড়দা। সে কণ্ঠস্বর রতনের বুকে তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মত গিয়া বিঁধিল। তেমনই শুষ্কস্বরে কহিল,—কেন মলিনা?

মলিনা পুনরায় ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—আমি যে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। স্বর অশ্রু-কম্পিত।

রতন এবার যেন কিছু কিছু বুঝিতে পারিল। তথাপি সে মূঢ়ের মত প্রশ্ন করিল,—কেন মলিনা?

মলিনা ম্লান হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া কহিল,—কেন? মেয়েছেলে কি চিরকাল বাপমার কাছে থাকে! আমায় তারা আজ আশীর্ব্বাদ ক'রে গেল।

স্তম্ভিত রতনের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। এতদিনে মলিনাও তবে চলিল!

কেন চলিবে না? চলাই যে জগতের নিয়ম। সে পড়িয়া আছে বলিয়া জগৎ ত অচল, অনড় হইতে পারে না। একদৃষ্টে সে মলিনার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মলিনা কি বলিতে গিয়া মুখ নামাইল। আঁচলটা একবার যেন চোখে তুলিয়া দিল—পরে নম্রকণ্ঠে কহিল, খুব সাবধানে থেকো, ছোড়দা।

রতনের দুচোখ বাহিয়া তখন ধারা নামিয়াছে। কোন উত্তরই সে দিতে পারিল না।

মলিনা পশ্চাৎ ফিরিয়া অগ্রসর হইল।

রতনের মনে হইল,—সমস্ত জগৎ—হাসি—আনন্দ আলো লইয়া মলিনার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। অজস্র অন্ধকারের চাপে সে বুঝি হাঁফাইয়া মরিবে। আর্ত্তকণ্ঠে সে ডাকিল,—মলিনা।

মলিনা ফিরিয়া কহিল,—কি?

রতন কথা কহিতে পারে না। অনেক কথাই যে বলিবার আছে। কোন্‌টা আগে বলিবে সে। বুকের প্রচণ্ড আলোড়নে মুখের ভাষা ভাঙ্গিয়া মিলাইয়া গেল।

মলিনা সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—ছি, কাঁদচো! কেঁদ না। কি ব'লবে বল।

রতন সহসা যেন কথা খুঁজিয়া পাইল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল,—আমি—আমি যদি তোকে কোন উপহার দিই—নিবি মলিনা?

মলিনা আনন্দিত হইয়া কহিল, নেব।

রতন আগ্রহভরা স্বরে কহিল,—তবে বল,—কি তুই ভালবাসিস?

মলিনা খানিক ভাবিল।

ভাবিয়া বলিল,—আরসী একখানা।

রতন আনন্দিত হইয়া বলিল,—আরসী, আর কিছু না?

—না, আর কিছু নয়।

রতনের মনে পড়িল কতদিন পান চিবাইতে চিবাইতে মলিনা আসিয়া তাহার ছোট কাচভাঙ্গা আরসীখানায় জিব বাহির করিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া মুখ দেখিয়া আপন মনেই হাসিয়াছে। আরসী সে ভালবাসে বটে।

মুখে বলিল,—বেশ তাই দেব। কিন্তু তোর বাড়ি গিয়ে তা দিতে আমার লজ্জা ক'রবে।

মলিনা বলিল,—যেদিন আমার গায়ে-হলুদ হবে,—সেই দিন সন্ধ্যেবেলায় এই গাছতলায় এসে আমি নিজে নিয়ে যাব।

—আসবি ত?

—নিশ্চয় আসবো।

তার পর পাঁচ ছয় দিন গিয়াছে। রতন গাঁয়ের হাটে গিয়া একখানি ভাল লতাপাতা কাটা আরসী কিনিয়া আনিয়াছে। লোককে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—কেমন জিনিষ?

কেহ বলিয়াছে,—ভাল। কেহ বলিয়াছে,—দামটা বড় চড়া,—তোমায় ঠকিয়ে নিয়েচে।

রতন মনে মনে হাসিয়া ভাবিয়াছে,—লোকসান ত জগতে আসিয়া অবধি আমি ভোগ করিতেছি। আজ যদি আনন্দের মধ্যে সে লোকসানকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি, ত, তাহার চেয়ে পরম লাভ আর কি আছে?

এই আরসীর মধ্যে আছে তাহার জগতের যত কিছু সফল স্বপ্ন;—মায়ের স্নেহ, বাপের ভালবাসা, আত্মীয়-স্বজনের মমতা-মাখা আশীর্ব্বাদ এবং যৌবনের কামনা-কুসুম। বাটি, থালা, গেলাস বাঁধা দিয়া যে কটি টাকা হাতে পাইয়াছে, তাহা হইতেই ত আজ এতবড় সম্পদ্ লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

হে শৈশবের অদৃশ্য দেবদেবী! তোমাদের অক্ষয় স্নেহ-আশীর্ব্বাদ কে জানিত এত দীর্ঘ দিন পরে ব্যর্থ জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণটিকে এমন প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে?

উদ্দেশে রতন তাঁহাদের পায়ে বারংবার নতি জানাইল।

শনিবার অপরাহ্ণে মেজদা বাড়ি আসিল।

রতন তখন ঘরে বসিয়া ফুলের মালা ঘিরিয়া সযতনে আরসীখানাকে সাজাইতেছিল।

মেজদা ডাকিল,—ওরে রতনা?

যাই দাদা—বলিয়া আরসীখানা সন্তর্পণে বাক্সের উপর রাখিয়া সে বাহিরে আসিল।

মেজদার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াই ছিল। আরও রক্তবর্ণ করিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল,—ফেলার মুখে শুনলাম, তুই না কি ঘরের ঘটি বাটিগুলো পর্য্যন্ত বেচে কিনে খাচ্ছিস?

রতনের ইচ্ছা হইল বলে, তুমিও ত যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া লইয়াছ। সে শিক্ষা যদি পাইয়াই থাক ত তোমারই কাছে পাইয়াছি। কিন্তু সে কোন কথা বলিল না।

মেজদা স্বর আর এক পরদা তুলিয়া কহিল,—কিরে শূয়ার,—উত্তর দিচ্ছিস না যে?

রতন কুণ্ঠিতস্বরে কহিল,—কি ক'রবো মেজদা,—বড়দা এ মাসে এক পয়সা পাঠাতে পারে নি।

—তাই ব'লে জিনিষ পত্তরগুলো বেচে তছ নছ্ ক'রতে হবে? বাবু নবাব! একটা মাস আর কষ্ট ক'রে চালাতে পার না?

তিরস্কার রতনের অঙ্গে বিঁধিল না। সে হেঁটমুখে চুপ করিয়া রহিল।

মেজদা বলিল,—ম'রগে যা, নিজেই কষ্ট পাবি—আমার কি! তা ওই থেকে দে দিকি আমায় গোটা পাঁচেক টাকা? বড্ড দরকার।

রতন অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে কহিল,—টাকা ত নেই, মেজদা।

—নেই? বলিস কি? এরই মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিস! খুব দুধ ঘি ওড়াচ্ছিস বুঝি?

রতন অন্তরে অন্তরে কাঁপিতে লাগিল।

মেজদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,—হুঁ বাবা, আমার কাছে মিথ্যে কথা! খোল তোর বাক্সো আমি দেখব। বলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রতন ছুটিয়া আসিয়া বাক্সের উপর বুক দিয়া পড়িয়া কাতরস্বরে কহিল,—সত্যি বলচি, মেজদা—কিছু নেই।

মেজদা দাঁত খিঁচাইয়া কহিল, কিছু নেই ত অমন বুক দিয়ে পড়েছিস কেন? আমি হ্যাকা,—কিছু বুঝি না, নয়? সর—সর দেখি। বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া একটা হেঁচ্‌কা টান দিল।

ফুলের মালা ছিঁড়িয়া গেল। রতন প্রাণপণ শক্তিতে আরসীখানা বুকে চাপিয়া ধরিল।

নিষ্ঠুর মেজদা আবার প্রাণভেদী কর্কশ হাসি হাসিল। হুঁ—বাবুর আবার সখটুকু মন্দ নয়। থালা ঘটি বেচে ফুলের মালা! কথায় বলে, 'বাইরে কোঁচার পত্তন—ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন', এ হ'য়েচে তাই। হুঁ—হুঁ—তোমার পেটে এত! দেখি, দেখি, চক্ চক্ ক'রচে ওটা কি?—বলিয়া আবার একটা হেঁচ্‌কা টান দিল।

ক্ষীণ দুর্ব্বলদেহ রতন সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না, মুখ গুঁজিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। আরসীখানা সশব্দে ভাঙিয়া গেল।

রতন মর্ম্মভেদীস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—মেজদা গো—আমার এমন সর্ব্বনাশও ক'রলে তুমি?

কাচের টুকরা ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, রতনের বুকেও আসিয়া কতকগুলি বিঁধিয়াছে। লাল রক্তে তাহার বুকের খানিকটা ভিজিয়া উঠিল।

কিন্তু দেহের যন্ত্রণা ভুলিয়া রতন অবোধ বালকের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেই সন্ধ্যাকালে মলিনা ক্ষীরপুলি গাছতলায় দাঁড়াইয়া রতনের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

নারীর কর্ত্তব্য

(প্রতিবাদ)

রাধারাণী দেবী

১৩৩৯ সালের শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে' নারীর কর্ত্তব্য শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়লাম। প্রবন্ধ-লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী এদেশের পাঠক পাঠিকাদের কাছে সুপরিচিতা। নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তা' যদি বেশ সুনির্দ্দিষ্ট ও সুসম্বদ্ধ হ'ত তা'হ'লে বলবার কিছু থাক্‌তনা। কারণ, ভিন্নপন্থী বা ভিন্ন মতবাদীদের আপন আপন আদর্শে অবহিত হ'য়ে থাকা দোষের নয়, বরং তাঁদের সেই স্বমত-নিষ্ঠা শ্রদ্ধারই যোগ্য। কিন্তু মুসলমান-শাসনের মধ্যযুগে তদানীন্তন দেশ-কালের প্রয়োজনবোধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের নবপ্রবর্ত্তিত সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে যদি কেউ প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের সনাতন শাস্ত্রীয় বিধান ব'লে প্রচার করতে সুরু করেন, তা'হলে শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেরই অতি অবশ্য তার প্রতিবাদ করা উচিত। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সেই চেষ্টাই করা হ'য়েছে দেখে এ সম্বন্ধে কিছু ব'লতে বাধ্য হলেম।

প্রথমেই প্রবন্ধের ভাষা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয়া লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অবশ্য তাঁর ভাষার ভুল ধরবার ধৃষ্টতা আমি রাখি না, তবে প্রবন্ধটি পড়তে গিয়ে পার্ব্বত্য প্রদেশের অসমতল জমিতে হাঁটার মত ক্রমাগত ঠোকর খেতে হয়েছে ব'লেই ভাষা সম্বন্ধে তাঁর অসতর্কতার বিষয় অল্প একটু উল্লেখ না ক'রে পারলেম না।

প্রবন্ধারম্ভে তিনি লিখেছেন :—"মনে হলো মনের মধ্যে যেন এই কর্ম্মবীরের কর্ম্মের সঙ্গে আমার অন্তরের একটি গোপন-সংযোগ ইতিমধ্যেই ঘটে গ্যাছে; আমার কাছে ঐ নিমন্ত্রণ কিছুই নূতন ঠেকলো না। এসে পৌঁছে গেলেম। কিন্তু আসাটা যত সহজ, তার পরের কর্ত্তব্যটা ঠিক তেমন সোজা নয়। আপনারা নারীর শিক্ষা বা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার জন্য আমায় এখানে আমন্ত্রণ করেছেন; সে সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার অনুযায়ী কিছু বলবারও ইচ্ছা আছে, কিন্তু বলতে গিয়ে আমি যে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হইনি, তা' বলতে পারিনে। বলা কওয়া আমার দিনের চাইতে তার আগের দিনে অনেকখানিই যেন সহজ ছিল, আজকের দিনে আর তা' নেই। আজকের দিনে আমাদের বলবার কথা যত বেশি হয়ে উঠেছে, বলবার পথ হয়ে যাচ্ছে ততই সঙ্কীর্ণ। এ কথা শুধু আমিই নয়, অনেকেই হয় ত স্বীকার করবেন। কারুকে কিছু বলতে গেলে, লিখতে গেলেই মনে পড়ে যায়—

—"ভয়ে ভয়ে বলি কি বলিব আর?"

প্রবন্ধ শেষে তিনি লিখেছেন :—"ভারতীয়া নারী স্বতন্ত্রা, বিলাসিনী, স্বেচ্ছাচারের স্রোতে আত্মনিমজ্জিতা, "নহ মাতা নহ কন্যা নহ ভগ্নি, শুধুই প্রেয়সী" এই আদর্শে গঠিতা হইবেন না। তিনি কন্যা, ভগ্নি, গৃহিণী এবং জননী; তিনি প্রথমে আদর্শ সতী, তারপর সুপুত্রের মাতা। তিনি স্বামীর সহধর্ম্মিণীরূপে গৃহে এবং বাহিরে, সংসারে সমাজে এবং রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই তাঁহার অনুবর্ত্তণশীলা হউন, কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দুসমাজ পত্নীকে পতির অনুসারিণী করিয়া, তাঁর জন্য সতীধর্ম্ম সহধর্ম্মিণীর পদ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাঁকে তো যথেষ্ট এবং যথার্থ উচ্চাধিকারই প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যদি ভারতীয় পুরুষ তাঁর নিজের আদর্শে সুস্থির থাকিতেন তবে আজ ভারতীয় নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতেই পারিত না। ভারতসতীর একমাত্র কর্ত্তব্য তার স্বামীর ধর্ম্মের সহায়তা করা। কিন্তু তাঁর অধর্ম্মেরও অনুবর্ত্তন করা ইহা সতীধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী।"

সমস্ত প্রবন্ধটির ভাষা এই রকম পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন ভঙ্গীতে কণ্টকিত। স্থানে স্থানে তাঁর রচনায় একটি সুদীর্ঘ বাক্য-বিন্যাসের মধ্যেই ভাষার একাধিক বৈষম্য যথার্থই পীড়াদায়ক। যেমন :—"তারপর দেখুন আমাদের এই চিরবৈচিত্র্যময়ী নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই বহু মত ও বহু পথাবলম্বী নানাধর্ম্মী এবং নানা কর্ম্মীর সমবায়ে বিচিত্রতর যাদের জন্য আবহমান কাল হইতেই ঋজুকুটীল নানা পথ সুবিস্তৃত রহিয়াছে, সেই ভারতবর্ষীয়দের মধ্যেও আজকালকার মত দিনে কোনও উপদেশের মত কথা বলতে যাওয়া আর তেমন সহজ নেই।" ইত্যাদি।

এ প্রবন্ধটি তিনি পয়লা মে চন্দননগরের পুস্তকাগারের উদ্যোগে নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ সভায় পাঠ করেছিলেন। অতএব এটিকে যদি বক্তৃতা ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়, তাহ'লে অবশ্য ভাষার গোলমালের জন্য বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার সময় অনেক বড় বড় বক্তারও ভাবের আবেগে, উচ্ছ্বাসের মুখে ও ঘনঘন সপ্রশংস করতালির শব্দে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠার ফলে ভাষার প্রতি মনোযোগ অব্যাহত থাকে না। কিন্তু লেখিকা সম্ভবতঃ এ প্রবন্ধটি লিখে নিয়ে গিয়েই উক্ত সভায় পয়লা মে পাঠ করেছিলেন এবং তার আড়াই মাস পরে একখানি প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রের শ্রাবণ সংখ্যায় সেটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং, প্রবন্ধটির ভাষা সংশোধন করে নেবার যথেষ্ট সুযোগ ও সময় থাকা সত্ত্বেও তাঁর মত একজন বিশিষ্টা

লেখিকার এই অসাবধানতা জনিত ভাষার ত্রুটী অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলে মনে করি।

'নারীর কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী তাঁর প্রবন্ধে যা বলতে চেয়েছেন সেটা প্রধানতঃ নারীর সামাজিক বা পারিবারিক জীবন সম্বন্ধেই। পরিণত বয়স্কালে বিবাহ, স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত বিবাহ, অসবর্ণ বা অহিন্দু বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, এবং যৌথপরিবার প্রথা লঙ্ঘন করা—এই কয়টি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর তীব্র অভিমত প্রচার করেছেন। অথচ, যুক্তি-স্বরূপ তিনি কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্ম জীবনাদর্শের মাপকাঠি অবলম্বন ক'রেই অগ্রসর হ'তে চেয়েছেন। তাঁর আলোচ্য উপরোক্ত নিছক সামাজিক প্রথাগুলি কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বের আদর্শকে ভিত্তি করেও কিছুতেই অবিচলিত থাকতে পারে না। কারণ, সামাজিক প্রথা ও পারিবারিক বিধি ব্যবস্থা কালের পরিবর্ত্তন ও প্রয়োজনের সঙ্গেসঙ্গে যুগে যুগেই পরিবর্ত্তনশীল, কাজেই সেগুলিকে শাশ্বত বিধান বলে মেনে' নেওয়া চলে না। কিন্তু, ভারতের তপোবনবাসী ঋষিগণের দীর্ঘসাধনলব্ধ যে অধ্যাত্মতত্ত্ব, তা' শাশ্বত সত্য। এ দু'য়ের মধ্যে হয়ত' সময়োচিত সন্ধি হ'তে পারে, কিন্তু চির-অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ হ'তে পারে না। কারণ এ দু'য়ের মধ্যে একের বিকার অনিবার্য্য এবং অন্যটি চিরনির্ব্বিকার।

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম পথস্তৎ—" ইত্যাদি উপনিষদোক্ত সতর্কবাণী ব্রহ্মজ্ঞান পিপাসুর তত্ত্ব সন্ধানের পথে যাত্রা সম্পর্কেই উচ্চারিত হ'য়েছিল ; তর্ক বা প্রতিবাদ-আশঙ্কিত মতামত প্রচারের পথে যাত্রা সম্পর্কে নয়। সুতরাং বেদান্তের এই উদ্বোধন মন্ত্রটির খণ্ডাংশ লেখিকা যেস্থলে ও যে প্রয়োজনে প্রয়োগ করেছেন তা' কতটা সুষ্ঠু ও সঙ্গত হ'য়েছে সেটা বুধগণের বিচার্য্য।

শাস্ত্রবাক্যের সুসঙ্গত প্রয়োগ যে স্বমতকে প্রতিষ্ঠিত করার সবিশেষ অনুকূল একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু, সকল সময়ে সে প্রচেষ্টা বোধ হয় নিরাপদ নয়, কারণ, শাস্ত্রবাক্যের অপপ্রয়োগ ঘটলে ফল বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। যাই হোক্, উপনিষদোক্ত তত্ত্বজ্ঞানমার্গে যাত্রার এই প্রথম সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রে লেখিকা প্রবন্ধারম্ভে আক্ষেপ করেছেন যে —তাঁর এখনকার দিনের চাইতেও আগেকার দিনে মনের কথা বা মতামত খুলে বলার সুবিধা নাকি সহজ ছিল। কিন্তু আজকের দিনে তাঁর বলার কথা যত বেশী হ'য়ে উঠেছে বলার পথ হ'য়ে যাচ্ছে ততই সংকীর্ণ।

লেখিকার এ উক্তি যে যুক্তিসহ নয়, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর এই চন্দননগরে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে আসতে পারাটাই নয় কি ?

আজ এক লাইব্রেরী গৃহে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সভায় বহুলোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি যে প্রবন্ধটি স্বয়ং পড়ে আসতে পেরেছেন, আগের দিন হ'লে সভা ত' দূরের কথা, অন্তঃপুরের প্রাচীর সীমার মধ্যেও এসকল বিষয় এমনভাবে আলোচনা করবার সুযোগ সুবিধা ও অধিকার তিনি পেতেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আজকের দিনে তিনি যে সকল বিষয় ভাবতে ব'লতে বা লিখতে পারছেন সে যে তাঁর এই অতিনিন্দিত এ যুগের কল্যাণেই, একথাটা ভুলে যাওয়া বোধ হয় তাঁর মত একজন অন্তঃপুরচারিণীর পক্ষে আদৌ সমীচীন হয়নি।

লেখিকা আরও বলেছেন যে—"আমাদের মত সেকেলের মতামত এই নব্যতান্ত্রিকতার যথেচ্ছাচারের যুগে একান্তই অসহনীয় হয়ে ওঠা কিছুই বিচিত্র নয়।" কথাটা একটু ভেবে দেখবার মত। মতামত দাতা 'সেকেলে' হ'লেই নব্যতান্ত্রিকদের কাছে সেটা যদি স্বতঃই অসহনীয় হ'য়ে উঠতো তাহ'লে লেখিকার চেয়ে অধিকতর সেকেলে অনেকের মতামত তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিতে পারতো কি ? শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ দেব, স্বামী বিবেকানন্দ, কবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী এঁদের মত সেকেলেদের মতামত বা বাণী এই নব্যতান্ত্রিকতার যথেচ্ছাচারের যুগেও জনে জনের জপমন্ত্র হ'য়ে উঠেছে কেমন করে ?—সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 'সেকেলে' মাত্রেরই মতামত একেলেদের পক্ষে অসহনীয় হ'য়ে ওঠেনা। অসহনীয় তখনই হ'য়ে ওঠে, যখন সে মতামত শুধু অযৌক্তিক অর্থহীন বা বিচার বিবেচনা শূন্য অন্ধ গোঁড়ামীর আতিশয্য মাত্র হ'য়ে দাঁড়ায়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা ভাববার আছে। আজকের দিনে যাঁরা নিজেদের 'সেকেলে' বলে উল্লেখ ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে চান, তাঁরা ভুলে যান যে একদিন তাঁরাও সকলেই তাঁদের অতীতের তদানীন্তন নবীন যুগেই জন্মেছিলেন এবং সেকালের নব্যতান্ত্রিকতার আবহাওয়ার মধ্যেই বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠেছিলেন। সেদিন 'সেকেলে' ছিলেন তাঁদের পিতৃ-পিতামহীরা। তাঁদের সেই পিতৃ-পিতামহীদের কাছে আজকের 'সেকেলে'রাই ছিলেন সেদিনের 'নব্যতান্ত্রিক'দেরই অন্তর্ভুক্ত। সকল মানুষের জীবনেই একদিন যৌবনের নবীন তারুণ্য নবযুগের নূতন আবহাওয়া নিয়ে আসে। সম্মুখের দিকে অগ্রসর হবার গতিবেগ এনে দেয়। কারণ, পশ্চাদ্গমন বা অচলত্ব যৌবনের ধর্ম্ম নয়। সেদিনের সে তারুণ্যের সেই সর্ব্ববাধা বিধ্বংসী জোয়ার এদিনে যাদের কাছে শুধু অতীতের নিষ্ফল স্মৃতিতে মাত্র পর্য্যবসিত, তাদেরই কাছে সে হ'য়ে ওঠে নব্যতান্ত্রিকতার যথেচ্ছচার দোষে অপরাধী !

যুগে যুগে কালে কালেই এই অভিযোগ হ'য়ে আসছে যৌবনের বিরুদ্ধে বার্দ্ধক্যের। নবীন ও প্রবীণের এ সংঘর্ষ মানব ইতিহাসের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। কাল দুর্নিবার বেগে গতিশীল। সে চিরদিন এগিয়েই চলেছে। একদা যে ছিল যৌবন-দৃপ্ত নবীন, আজকের তরুণদের মাঝে সে নিস্তেজ বৃদ্ধ। কালের গতি রোধ ক'রে যৌবনের পথ আগলে দাঁড়িয়ে অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকবার পরামর্শ একশ্রেণীর সেকেলেরা বরাবরই দিয়ে থাকেন, কারণ তাঁদের সেই বিগত অতীতকালেই একদিন তাঁদের প্রত্যেকের জীবন, নবীন যৌবনের ঐশ্বর্য্যে ও প্রাচুর্য্যে সার্থক হ'য়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছিল, তাই তার মায়া তাঁরা ভুলতে পারেন না। কাজেই তাঁদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব জীবনের বিগত বাল্য ও কৈশোর এবং অতীত-যৌবনকালের আদর্শকেই সকলকালের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে না ভেবে পারেন না। এ দুর্ব্বলতা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু নিত্য নূতন তরুণ-জীবন-যাত্রীদের পথ যে তারা দেখে সম্মুখের দিকে প্রসারিত— তাদের পিছু হেঁটে ফিরে যেতে বললে শুনবে কেন তারা ? কাজেই,

গোল বেধে যায় এইখানে। প্রবীণের সঙ্গে ঘটে নবীনের নিত্যকালের সংঘর্ষ! প্রাচীনদের কাছে যথেচ্ছাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হ'য়েও নবীনের দল নব্যতান্ত্রিকতার বিজয় পতাকাই কাঁধে তুলে নেয়। অনাগত যুগের আগমনী পেয়ে তারা সম্মুখের পথেই অগ্রসর হ'য়ে চলে—জীবনের পরম সার্থকতার সন্ধানে। ভয়কুণ্ঠাহীন দুর্নিবার সে গতি। সে নবীন প্রাতের প্রাণবন্ত তরুণ যাত্রীদলকে যাঁরা সেদিন সভয়ে পিছু ডাকেন, সেই পশ্চাদ্বর্তীদের অতীতের প্রতি মোহ বা প্রীতিকে তারা কোনো দিনই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারেনা। কারণ বিগতকালের প্রাচীন যুগে ফিরে যাওয়া, বা বর্ত্তমানের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে স্থাণুত্ব লাভ করা কোনোটাই নবীনের জীবন-ধর্ম্মের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সমস্ত সেকেলে আর একেলেদের জীবনে এই 'ট্র্যাজেডি' চিরকালই ঘটে আসছে এবং আসবেও। আজকের নব্যতান্ত্রিকরাও আবার ভবিষ্যতে একদিন 'সেকেলে' হ'য়ে নিশ্চয়ই—পিতৃপিতামহদের মতই নিজ নিজ পৌত্র প্রপৌত্রদেরও এই 'নব্যতান্ত্রিকতার যথেচ্ছাচার' অভিযোগেই তীব্র তিরস্কার করবেন। এমনিই হ'য়ে থাকে।

লেখিকা তাঁর এই প্রবন্ধে বারম্বার সবিনয়ে অনুরোধ করেছেন বটে, যে, কেউ যেন তাঁর এ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে তাঁকে না অশান্তিতে ফেলেন। এমন কি তিনি ধর্ম্মের দোহাই দিয়েও বলেছেন যে—"পরমত সহিষ্ণুতা এ দেশের ধর্ম্ম—পরম ধর্ম্ম।" একটু পরেই কিন্তু আবার এ কথাও স্বীকার করেছেন যে:—"পরমত খণ্ডন চেষ্টা এদেশে চিরদিনই হ'য়ে এসেছে, তা' না হ'লে ষড়্দর্শনের সৃষ্টি হ'তনা। এবং এই অসংখ্য মতবাদের স্থান ধর্ম্মে সমাজে সাহিত্যে থাকতোনা। কিন্তু পরমত খণ্ডন করা এক আর বিরুদ্ধ মতবাদীদের মধ্যে দল বন্ধন করে বিরোধকে পাকিয়ে তোলা সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ।" তিনি এত কথা বলা সত্ত্বেও তাঁর সেই বহু-আশঙ্কিত প্রতিবাদ লিখতে কেন যে আমি বাধ্য হ'য়েছি তার কারণ প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি। তবে দলবন্ধন ক'রে বিরোধকে পাকিয়ে তোলার দুরভিসন্ধি যে আমার কিছুমাত্র নেই এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

লেখিকা বলেছেন:—"আর কোনো দেশ এমন ক'রে মত-বিরোধের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে নিতে পারেনি। অসংখ্য নদী তড়াগকে বহিয়ে এনে এক মহার্ণবে ডুবিয়ে দিতে পারেনি। বহুকে একের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। সে এ দেশই পেরেছিল, চিরদিনই পারছে, ইচ্ছা করলে আজও পারে এবং চির-ভবিষ্যকাল ধরে পারবেও তা'।"

লেখিকার এই স্বাজাত্যাভিমানের গর্ব্বিত উক্তি আমাদের কাণে বেশ শ্রুতিমধুর লাগে বটে, এর মূলে সত্য কতটুকু আছে সন্ধান ক'রতে গেলেই মুস্কিল বাধে এবং সব উৎসাহ কর্পূরের মত উবে যায়!

এ দেশের ইতিহাস এবং জাতির বর্ত্তমান অবস্থা আমাদের বলে, সকল মতবিরোধকে এক পথে এনে এক মহার্ণবে ডুবিয়ে দিতে এদেশই কোনদিন পারেনি এবং আজও পারছেনা! তবে ভবিষ্যৎকালে পারবে কিনা সে কথা জ্যোতির্ব্বিদেরা বলতে পারেন। দেশের দিকে চেয়ে আমরা দেখতে পাই বৈদান্তিকের দল থেকে আরম্ভ করে শৈব শাক্ত গাণপত্য বৈষ্ণবাদি বহুবিধ ধর্ম্মমত এ দেশেই সম্ভব হয়েছে। এমন কি হালের 'আদি' 'সাধারণ' ও 'নববিধান' এবং রামকৃষ্ণ' 'বিজয়কৃষ্ণ' 'দয়ানন্দ' 'পাগল হরনাথ' সৎসঙ্গ' ইত্যাদি নিয়ে অসংখ্য দল ও অসংখ্য ধর্ম্মমত বর্ষার ভেকছত্রের মত ভারতবর্ষের বুকে নিয়ত গজিয়ে উঠেছে এবং উঠছে। এক বৈষ্ণবধর্ম্মেরই অসংখ্য শ্রেণী। দক্ষিণভারতে আবার তাদের তিলক-কাটার ভঙ্গী নিয়েও দলাদলি। 'Y' আর 'U' তিলকধারী বৈষ্ণবদের পরস্পারের মধ্যে দাঙ্গা হ'তেও দেখেছি। শুধু ধর্ম্মমতেই যে এই বৈষম্য তা নয়, জাতিভেদও এ দেশে অসংখ্য। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র পুরাণের এ চতুর্বর্ণ ক্রমশ ভাগ হ'য়ে হ'য়ে যে কত চুরাশী লক্ষ হ'য়ে উঠেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। এ ছাড়া আছে আবার কায়স্থ নবশাখ, জলাচরণীয়, অস্পৃশ্য অন্ত্যজ পঞ্চম আরও কত কি! এক হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিতরই কতনা বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন বিভেদ। একই প্রদেশের অধিবাসী একই হিন্দু জাতির মধ্যেই নানা সম্প্রদায় শ্রেণী ও জাতিভেদ দেখা যায়। এমন কি সাধারণ নিয়ম নিষেধ সমাজবিধি রীতি নীতি, আচার ব্যবহার সকল বিষয়েও এ দেশের সর্ব্বত্র বিষম অনৈক্য!

এই সব শত শত ধর্ম্মমত, শত শত জাতি সম্প্রদায় শ্রেণী বিশেষের আবার ভিন্ন ভিন্ন সমাজবিধি তাদের প্রত্যেকের আবার কত সহস্র বিভাগ, লক্ষ মত ও লক্ষ পথের কোলাহল মারামারি দাঙ্গার মধ্যে এদেশ এবং এ জাত আজ বহুধা বিভক্ত হ'য়ে পড়েছে। যে দেশে বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র ও ষড়্দর্শনের মত উচ্চ অধ্যাত্ম বিদ্যা ব্যাখ্যাত হয়েছিল সে দেশে অস্পৃশ্যতাবাদের মত হীন সংকীর্ণতার অস্তিত্ব কি বিস্ময় ও বেদনাকর নয়?

ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে একথা আজ লজ্জাবনমিত শিরে এদেশবাসীদের স্বীকার করতেই হবে যে কাস্মিনকালেও কোনো বিষয়েই ভারতে আসমুদ্র হিমাচল একমত বা একপথ গড়ে ওঠেনি। এমন কি বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্বর্ণ যুগেও নয়। চিরটা কালই বিচ্ছিন্নতর খণ্ড রাষ্ট্র, পরস্পর বিরোধী বিভিন্নতর ধর্ম্মমত, বিভিন্নতর বিপরীত সমাজবিধি ও রীতি নীতির অনুসরণ করে ভারতবাসীরা নিজেদের মধ্যে ক্রমাগত নানা অনৈক্য ও বিরুদ্ধ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট শত্রুতার সৃষ্টি করে নিজেদের শতধা বিভক্ত দুঃস্থ ও দুর্ব্বল করে ফেলেছে, এবং তারই অনিবার্য্য পরিণাম-পরম্পরায় সে আজ এমন শোচনীয় অধঃপতনের মধ্যে নেমে আসতে বাধ্য হ'য়েছে।

'নারীর-কর্ত্তব্য' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখিকার প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম যথার্থই প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁর লেখনী ভারতের গৌরব বর্ণনা ক'রতে যতখানি রঙীন কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে, ততখানি ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান রাখতে পারেনি। তা' যদি পারতো তাহ'লে এরূপ প্রবন্ধ লেখার জন্য তিনি লজ্জিত হ'য়ে পড়তেন। 'ভারতনারী' তথা ভারতসতী'কে তিনি 'জগৎ পূজ্যা' আখ্যায় অভিহিত ক'রে আমাদের প্রাণে যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি ও আত্মগৌরবের আনন্দ দান করেছেন বটে,—কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা রাখতে হ'লে এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে কোনো কোনো—ভারত নারী'—'ভারত পূজ্যা' হ'য়েছিলেন বটে, কিন্তু জগৎপূজ্যা তাঁরা

কোনোদিনই হ'য়ে উঠতে পারেন নি। যত বড় লজ্জা ও বেদনার কথাই হোক্ না কেন এটা—তবু এ রূঢ় বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করি কেমন করে? 'ভারতনারী' আজও পর্য্যন্ত এমন কোনো কাজই ক'রতে পারেন নি—যার জন্ম সমস্ত জগৎ তাকে পূজা দিতে পারে। স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে সতীর প্রাণত্যাগ আমাদের কাছে 'হয়ত' খুব বড় আদর্শ; কিন্তু জগৎ আজও এটাকে মনে ক'রে অমানুষিক বর্ব্বরতা!

'বুদ্ধ' বা 'খৃষ্টের' ন্যায় মহাপুরুষদের যেমন 'জগৎপূজ্য' বলা যেতে পারে তেমনি তাঁদের সাথে সমানে নাম উচ্চারণ ক'রতে—পারা যায় এমন নারী ভারতে কেন পৃথিবীতেই একাধিক জন্মেছেন কি না আমার জানা নেই। প্রবন্ধ লেখিকাও কারুর নাম ক'রতে পারেন নি এবং পারবেন কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তিনি সম্ভবতঃ দেশপূজ্যা' ও 'জগৎপূজ্যায়' গোলমাল ক'রে ফেলেছেন।—জগৎটা অত্যন্ত বিশাল ও উদার। কাজেই 'জগৎপূজ্যা' হ'তে হ'লে প্রাণটা বিশাল হওয়া চাই; এবং অনেকখানি ঔদার্য্য থাকাও প্রয়োজন। ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে থেকে তা হওয়া যায় না। জগতের সঙ্গে তাঁর মনের আদান প্রদান হওয়া দরকার। বিশ্বের সঙ্গে তাঁর চিন্তা ধারায় নিবিড় যোগ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাও অত্যাবশ্যক।

সে যাই হোক্; লেখিকা এইবার প্রশ্ন ক'রেছেন:—

"নারীর কর্ত্তব্য কি? হয়ত' আমাদের এই-ই প্রশ্ন? কিন্তু এ প্রশ্ন কেন ওঠে? নারী কি এদেশে ছিলেন না? আজই কি তাঁদের এদেশে এই প্রথম অভ্যুদয় ঘটলো?"

তারপর আবার অন্যত্র বলেছেন:—"নারীর কর্ত্তব্য ব'লে নতুন কোনো প্রশ্ন যে আজকাল কেন জেগে উঠছে এ কথা আমি ভেবেই পাইনে। যখনই এতদ্বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে তখন নর এবং নারী দু'জনকার সম্পর্কেই ওঠা সঙ্গত আমার এই মনে হয়।"—

এ কথার উত্তরে বলা যেতে পারে—এ প্রশ্ন নূতন নয়! নারী সকল দেশে ও সকল কালেই আছেন এবং থাকবেনও। তাঁদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং তার নির্দ্দেশ চিরকালই আছে এবং থাকবেও। 'নারীর কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমাদের দেশের অনেক পুঁথি ও সংহিতার আয়তন আরও ক্ষীণ হ'তে পারতো! সকল দেশেই প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক কালে নর ও নারীর কর্ত্তব্যের প্রশ্ন উঠে আসছে এবং যুগোপযোগী ও দেশকালোপযোগী তার এক একটা মীমাংসা ও নির্দ্দেশও হয়ে আসছে। যতদিন মানব সভ্যতার অভ্যুদয় হ'য়েছে মানুষ যতদিন পরিবার ও গোষ্ঠীবদ্ধ হ'য়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রাধীন জীবনযাপন ক'রতে শিখেছে, ততকালই এ প্রশ্ন চলে আসছে। এ নূতন কিছু নয়।

তারপর, নারীর কর্ত্তব্যের প্রশ্ন উঠলেই যে সঙ্গে সঙ্গে নরেরও কর্ত্তব্যের প্রশ্ন ওঠা সঙ্গত এরূপ মনে করারও কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। নারীর কর্ত্তব্য ও নরের কর্ত্তব্য এ দু'য়ের সকল দিক দিয়েই বহু পার্থক্য। জগতের কোনো দেশেই নারী—আজও পর্য্যন্ত নরের অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে কোনোদিনই চলতে পারেন নি। দুর্গম পথের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্—ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, দর্শনে, বিজ্ঞানে সাহিত্যে, শিল্পে ইতিহাসে, পুরাতত্ত্বে, কোথাও কোনো সহজ পথেও নরের পদচিহ্নের পাশাপাশি নারীর পদপল্লবাঙ্ক দেখতে পাওয়া যায় না। নরের কর্ত্তব্যেরই উপর ভিত্তি করে জগতে এই বিরাট মানব সমাজ ও মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে। নারী কেবলমাত্র নরের জননী, এ ছাড়া আর তার নিজস্ব কোনো গৌরবময় পরিচয় কোনোখানেই খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রবন্ধ লেখিকাও শেষ পর্য্যন্ত নারীর এই বিশেষত্ব-টুকুকেই তাঁর একমাত্র অবলম্বন ক'রে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রেছেন দেখা গেল। কিন্তু সেখানে এ কথাটা বোধ হয় তিনি ভেবে দেখেন নি যে—নারী যে নরের জননী হয়—সে তো প্রকৃতিরই অমোঘ বিধানে! এর মধ্যে তাঁর নিজের কৃতীত্ব কোথায়? এদেশে নারী তার নিজের কর্ম্মজাত, মস্তিষ্কজাত, কল্পনাজাত, শক্তিজাত বা গবেষণা ও অনুসন্ধানজাত কোনো সৃষ্টি, আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের কোনো পরিচয়ই জগতে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারে নি। নারীর প্রগতি যেখানে নরের তুলনায় এত বেশী পশ্চাৎপদ হ'য়ে রয়েছে, সেখানে নারীর কর্ত্তব্যের প্রশ্ন উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে নরের কর্ত্তব্যের প্রশ্ন ওঠারও বিশেষ কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। নরের যা কর্ত্তব্য তা মানবজাতির প্রাথমিক উন্নতি উৎকর্ষ ও সভ্যতায় সুরু হ'তে চিরদিন আপনা আপনিই উঠে চলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। এবং তারই ফলে গড়ে উঠেছে বিধাতার সৃষ্ট এই জগতের বুকে মানবের সৃষ্ট এক নূতন জগৎ! সে জগতে নারী নরেরই শক্তির ছায়ায় নিরাপদে গৃহনীড়ে থেকে পুরুষের পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম বিধান এবং তার সন্তান পালন নিয়েই দীর্ঘ যুগ কাটিয়ে এসেছে। কাজেই, নারীর কর্ত্তব্যের প্রশ্ন ও উত্তর হয়ত এতকাল সামান্যই ছিল; কারণ সর্ব্ববিষয়ে পতির অনুসারিণী হওয়া, সন্তান পালন করা ও গৃহের সৌষ্ঠব সাধন করা এই তিনটি কাজই ছিল তার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু আজ যুগদেবতার দুর্ণিবার গতিবেগে দেশ কালের প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটেছে। পুরুষের জীবন-যাত্রার প্রণালীও আজ একেবারে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কাজেই, সেদিন নারীর কর্ত্তব্য যা ছিল আজও যে ঠিক তাই আছে এমন কথা বলা চলে না। সুতরাং, নারীর কর্ত্তব্যের প্রশ্ন ওঠা কিছুমাত্র অবান্তর বা অনাবশ্যক নয়। বরং এটা খুবই সময়োচিত এবং স্বাভাবিক।

তারপর লেখিকা আমাদের নরনারীর জন্মেতিহাস বা মানবজাতির মূল সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝাবার জন্য লিখেছেন—"শাস্ত্র বাক্য আমাদের শুনিয়ে দিচ্চেন,—পরমাত্মা নিজ শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে একভাগে পুরুষ এবং তার আর এক ভাগে নারীর সৃষ্টি করেছিলেন।"

পরমাত্মা নিজ দেহকে দুভাগে বিভক্ত ক'রে নর ও নারী সৃষ্টি—করেছিলেন কিনা, অথবা তিনি নিজেকে অবিভক্ত রেখেই "একোহং বহুস্যাম্" এই সিসৃক্ষা হ'তে নিজের একাংশে বিশ্বসৃষ্টি করেছিলেন—সে সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ নর ও নারী না হয়ে প্রথমে ধ্বনি (ওঙ্কার) এবং তারপর ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম্ এই পঞ্চভূতের একটি হতে অপরটির উদ্ভব হয়েছিল কিনা, প্রাণীসৃষ্টি কালে যথাক্রমে উদ্ভিজ্জ প্রাণী, স্বেদজ প্রাণী, অণ্ডজ প্রাণী ও জরায়ুজ বিবিধ প্রাণী সৃষ্ট হবার পর সর্ব্বশেষ মানুষ-

জাতির সৃষ্টি হ'য়েছিল কি না—শাস্ত্রীয় সৃষ্টি তত্ত্বের এ সব জটিল-তর্ক তাঁর সঙ্গে না করেও যদি তাঁর এই অনির্দ্দিষ্ট 'শাস্ত্র বাক্যটিকে' নির্ভুল বলে মেনেও নিই, তবুও কিন্তু অল্প কথায় এ আলোচনা সমাপ্ত ক'রতে পারবো বলে আশা দেখছি না। কারণ, লেখিকা তারপরেই এমন একটি অদ্ভুত ও কাল্পনিক মতবাদ প্রচার করেছেন যা প্রাচ্য কিম্বা পাশ্চাত্য কোনো দেশের নরনারীর সমাজতত্ত্বে বা মানবজাতির জন্মেতিহাসের কোনো পৃষ্ঠাতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি লিখেছেন :—

"বিশ্বপ্রভাতেই তাঁরা তাঁদের পরস্পরের স্নেহ প্রেম আশা ও বাসনা পরস্পরকে বিনিময় করিয়া দিয়া রিক্ততার গৌরবে গৌরবান্বিত রূপেই দেখা দিয়েছিলেন। জগতের সেই প্রথম প্রভাতেই সুপ্তিমগ্ন জগদ্বাসী জেগে উঠেছিল তাদের জননীর স্নেহে, ভগ্নীর ভালবাসায়, পত্নীর অনুরাগে এবং দুহিতার অপরিসীম শ্রদ্ধায় পরিপুরিত হইয়া।"

কিন্তু আদিম মানবের ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ে আমরা নর ও নারীর যে রূপ দেখতে পাই তাতে পরস্পরের স্নেহ প্রেম আশা ও বাসনা বিনিময় ক'রে দেওয়া দূরে থাক, বরং তার বিপরীত ব্যবহারই চখে পড়ে। আদিম নর ও নারীর মধ্যে স্নেহ প্রেম প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলি মোটেই তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল ছিল না। সেদিন তাদের হৃদয়বৃত্তি ছিল অনেকটা বন্য পশুরই মত, অথবা তাদের চেয়েও হিংস্র ও স্থূল ছিল। কারণ, সেদিন স্বজাতীয়ের মাংস ভক্ষণেও তাদের কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ হ'ত না। নারী তখন পুরুষের সম্পত্তিমাত্র রূপে গণ্য হ'ত এবং একাধিকবার বলিষ্ঠতর পুরুষের হস্তান্তর হওয়ায় তাদের বিন্দুমাত্র বাধা ছিল না। দৈহিক শক্তিই ছিল তখন মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং পশুর সঙ্গে তার খুব বেশী পার্থক্য ছিল না। সুতরাং জগতের সেই আদিম প্রভাতেই জগদ্বাসীর পক্ষে তাদের জননীর স্নেহে, ভগ্নীর ভালবাসায়, পত্নীর অনুরাগে এবং দুহিতার অপরিসীম শ্রদ্ধায় পরিপুরিত হ'য়ে জেগে ওঠা—একেবারেই ঔপন্যাসিকের স্বপ্ন! ঐতিহাসিকের সত্য তা নয়। ইতিহাস বলে—সেদিন তারা তাদের জননী ভগ্নী দুহিতা বা পত্নীকে সব সময় ঠিক চিনতেই পারত কিনা সন্দেহ! পত্নীর ত কোনো অস্তিত্বই ছিল না তখন। মানবজাতির ইতিহাসে বিবাহ-বিধির প্রচলন বা পতি-পত্নীর সম্বন্ধ প্রবর্ত্তন তাদের সেই 'প্রথম প্রভাতে জেগে ওঠার' অনেক পরের ঘটনা। মানবসভ্যতা ও সমাজতত্ত্বের ক্রমানুসন্ধান করলে দেখা যায় রক্তসম্পর্কীয়া নারীকেও পত্নীর সম্বন্ধে টেনে নেওয়ায় সেই অসামাজিক মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বাধাই ছিল না। এবং কে কার দুহিতা ও কে কার জননী তা নির্ণয় করাও তাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল।

এই প্রসঙ্গে লেখিকা একটি 'ছড়া' উদ্ধৃত করে শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের আরও একটু আগের কথা শুনিয়ে দিতে চেয়েছেন ; কিন্তু, আমরা শ্রুতির চেয়েও আগেকার কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থের সন্ধান এখনও পাইনি। সেই শ্রুতি বলেন সৃষ্টির পূর্ব্বে নাকি ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয় রূপে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর সেই 'একোহং বহুস্যাম্' এই ইচ্ছাশক্তি থেকেই জগৎসংসারের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয়েছে। শ্রুতির মতে ব্রহ্ম থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা' কিছু সমস্তরই উৎপত্তি এবং ব্রহ্মেই তাদের স্থিতি ও লয়। সুতরাং—

"প্রলয়কালে যখন কারণ জলে ডুব্‌লো ধরা।
তখন, পুরুষ হলেন পরুষ হারা
বিশ্ব হ'ল জ্যান্তেমরা।
আবার, এ জগৎ উঠলো জেগে
আত্মানারীর বীণার তানে।
তাই, নারী যেথায় সম্পূজিতা
নারায়ণের বাস সেখানে।"

লেখিকার উদ্ধৃত এই শ্লোকটি নির্ব্বিচারে মেনে নেওয়া চলে না। অথচ এই নিয়ে তর্ক করতে বসলে এখনি দ্বৈত-অদ্বৈতবাদের চিরন্তন প্রশ্ন এসে পড়বে, এবং পারমার্থিক সত্য ও ব্যবহারিক সত্য নিয়ে এ বিষয়ে একটা বোঝাপড়া করতে গিয়ে 'উত্তর মীমাংসা' থেকে 'পূর্ব্ব মীমাংসা' পর্য্যন্ত টান পড়বে। তাই আমি এ প্রতিবাদের প্রথমেই বলেছি যে 'নারীর কর্ত্তব্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ড হ'তে যুক্তি প্রয়োগ কোনোদিক দিয়েই সঙ্গত হ'তে পারে না। বরং কর্ম্মকাণ্ড হ'তে এর কিছু কিছু যুক্তি গ্রহণ সুষ্ঠু হ'লেও হ'তে পারত। এ প্রবন্ধে ঐ সকল জটিল দার্শনিকতত্ত্বের অপ্রামাণিক ও ভ্রান্ত মতামত অবতারণা করা শুধু অবান্তরই নয়, 'ধান ভানতে শিবের গীত' গাওয়ার মতই একান্ত নিরর্থক।

অতএব, ওসব অবান্তর ও অনাবশ্যক প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে লেখিকা তাঁর আসল বক্তব্য সম্বন্ধে যা বলেছেন—তাই নিয়েই একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। তিনি 'সত্যংবদ' 'ধর্ম্মংচর' 'নাস্তি জামাৎ পরং তপঃ' 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' ইত্যাদি কয়েকটি বহুবিশ্রুত সংস্কৃত নীতিবাক্যের ব্যবহার করে বলেছেন—

"নর নারীর কর্ত্তব্যে মূলতঃ কোনোই প্রভেদ নাই, মূলতঃ দু'জনকার কর্ত্তব্যই মোটামুটি এক।"

"নর এবং নারীর শিক্ষার মূল বিষয়ে কোনোই প্রভেদ নাই, প্রভেদ থাকা উচিত নয়, থাকা অসম্ভব ও অসঙ্গত।"

এই কথাগুলি পড়ে অনেকেই হয়ত মনে করবেন যে লেখিকার মতে নরের যা কর্ত্তব্য তাই নারীরও কর্ত্তব্য। কিন্তু, তা নয়। লেখিকা তারপরই আবার বলছেন :—

—"কিন্তু যেমন মূল লক্ষ্যে উভয়ের ধর্ম্ম একই তেমনই আবার এর আর একটা দিক আছে সেটা—এর স্থূল দিক নয় সূক্ষ্মদিক। যেহেতু ব্রহ্ম তাঁর শরীরকে একলা রেখে দ্বিধা বিভক্তিত করেছিলেন সেই দ্বিধা বিভাজিত দুইয়ের মধ্যের একজে নর ও অপরকে নারীরূপে পরস্পরে বিভিন্ন ধর্ম্মীরূপে তৈরী করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই হেতু মূল বিষয়ে মুখ্য বিষয়ে যতই একত্ব থাকুক, সূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁদের মধ্যে একটুখানি প্রভেদ আছে এ'কথা মানতেই হবে। যতই আমরা মানতে না চাই তবু সেই শেষকালে তর্কের শেষে মেনে নিতে বাধ্য হবোই যে,

হ্যাঁ তা' আছে ; নারীর কর্ত্তব্যে এবং নরের কর্ত্তব্যে একটুখানি প্রভেদ আছে ; এবং নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই সেটুকু যেন থেকেই যাবে, যতই আমরা মেয়েরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মরি না কেন, সৃষ্টির শেষ দিনে পর্য্যন্ত সেটুকু হয়ত নিঃশেষ হয়ে কোন দিনেই মুছে যাবে না।"

লেখিকার এই পরস্পর বিরোধী মতের অবিরত সংঘাতে আলোচ্য প্রবন্ধটি আগাগোড়াই দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর বক্তব্য কোথাও সহজ ও সুস্পষ্ট করে তুলতে পারেননি এবং সুনির্দ্দিষ্টও করতে পারেননি।

তিনি একবার বলেছেন নর ও নারীর কর্ত্তব্য একই যেহেতু তাদের সৃষ্টি এক সূত্রেই হয়েছে। অবশ্য এক হ'তে সৃষ্টি হলেই যে তাদের কর্ত্তব্যও এক হবে এর মধ্যে কোনও যুক্তি নেই বরং প্রকৃতি ভেদে তাদের মধ্যে কর্ত্তব্যেরও ভেদ থাকাটাই সঙ্গত। সে যাই হোক, একটু পরেই কিন্তু লেখিকা স্বীকার করেছেন যে তাদের মধ্যে প্রভেদ আছে। কিন্তু সেটা মূলতঃ ও স্থূলতঃ কিছু নয়। কেবলমাত্র সূক্ষ্ম বিষয়ে তাদের মধ্যে একটুখানি প্রভেদ মাত্র। অথচ এই "সূক্ষ্মতঃ" প্রভেদটি যে কী এবং কোথায় তা' তিনি ইঙ্গিতেও কোথাও কিছু প্রকাশ করেননি। তা'ছাড়া তিনি যে 'প্রতিজ্ঞা' অবলম্বনে এখানে তাঁর এই সূক্ষ্ম প্রভেদের অবতারণা করেছেন, সে সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার আছে। তিনি বলেছেন—"যেহেতু ব্রহ্ম তাঁর শরীরকে একলা রেখে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলেন, সেই দ্বিধাবিভাজিত দু'য়ের মধ্যের একজনকে নর এবং অপরকে নারীরূপে পরস্পরের বিভিন্ন ধর্ম্মীরূপে তৈরী করতে বাধ্য হয়েছিলেন—" ইত্যাদি।

সৃষ্টিতত্বের এ'হেন অদ্ভুত বিবৃতি এই শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্না লেখিকা যে কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন সেইটাই সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্য ঠেকেছে।

ব্রহ্ম বিশ্বসৃষ্টি ফেলে রেখে আকাশ তেজঃ বায়ু জল মাটী সমস্ত বাদ দিয়ে নিজেকে একলা রেখে দু'ভাগ করে ফেলে একভাগে নর ও অন্যভাগে নারী সৃষ্টি করতে বাধ্য হ'লেন—এ শাস্ত্রবাক্য মৌলিক বটে, কিন্তু, দুঃখের বিষয় প্রামাণ্য নয়।

বেদকে হিন্দুজাতি অপৌরুষেয় বলে থাকে। বেদের চেয়েও প্রাচীনতম শাস্ত্র ভারতে আজও আবিষ্কৃত হয়নি শুনি। সেই বেদের উপনিষদ্ বহুল জ্ঞানকাণ্ডের সমস্ত উপদেশগুলির সামঞ্জস্য বিধান করে আচার্য্য বাদরায়ণ ব্যাস বেদান্ত মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন। এবং আচার্য্য জৈমিনি সেই বেদের কর্ম্মকাণ্ডের একটি সুনির্দ্দিষ্ট মীমাংসা প্রণয়ন করেন যা কর্ম্ম মীমাংসা বা পূর্ব্ব মীমাংসা নামে পরিচিত। লেখিকার উদ্ধৃত সৃষ্টিতত্বের সঙ্গে শ্রুতি শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্বের কোনোই সাদৃশ্য নেই। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসূত্রের বহুবিধ ব্যাখ্যা আমাদের দেশের আচার্য্যেরা করে গিয়েছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, ভাস্করাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি বহু পণ্ডিত ও মনীষীগণ সৃষ্টিতত্বের বহু বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু লেখিকার উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যের সমর্থন—অর্থাৎ কিনা ব্রহ্মের "নিজের শরীরকে একলা রেখে দু'ভাগ করে নর ও নারী তৈরী করতে বাধ্য হওয়া—" তাঁদের কারুর ব্যাখ্যার মধ্যে কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

নর নারীর সহজ সাধারণ সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ ক'রতে বসে যদি কেউ স্মৃতি ও সংহিতা ছেড়ে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ব ধ'রে এ কাজ করতে চেষ্টা করে দেখি, তাহলেই এই প্রবচনটি মনে পড়ে—"কলৌ বেদান্তিনঃ সর্ব্বে ফাল্গুনে বালকাইব—" ইত্যাদি। অর্থাৎ—ফাল্গুন মাসে হোলির সময় বালকেরা যেমন অর্থ না বুঝেই যত্রতত্র অশ্লীল হোলির গান গেয়ে বেড়ায় কলিকালেও তেমনি সাধারণে বেদান্তের সম্যক্ অর্থ না বুঝেই যত্রতত্র তার অযথা প্রয়োগ করে থাকে।' অবশ্য, লেখিকাও যে এইরূপই করেছেন এমন স্পর্দ্ধার কথা আমি ব'লতে চাইনে।

তিনি বলেছেন—"এ দেশে এই নারীধর্ম্মের যেমন চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল অন্য কোনও দেশে তেমন ঘটিতে পারে নাই।" নারীধর্ম্মের চরম বিকাশ কেন যে অন্য কোনো দেশে ঘটেনি তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি অন্য সকল দেশ ও জাতির স্বল্প জীবন এবং হিন্দুজাতির সুদীর্ঘ জীবনকে নির্দ্দেশ করেছেন। তাঁর এ যুক্তি যে কতখানি বিচারসহ তা' নিয়ে এখানে বৃথা আলোচনা না ক'রে কেবল এ দেশের কথাটাই একটু তলিয়ে দেখা যাক।

প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য 'নারীধর্ম্ম' বলে' লেখিকা কী বোঝাতে চেয়েছেন? তিনি ত' তাঁর মৌলিক শাস্ত্রবাক্যের দোহাই দিয়ে প্রথমে বলেছেন নর-নারীর কর্ত্তব্য অভেদ, কেবল সূক্ষ্ম দিক ছাড়া। সুতরাং, তৎকথিত সেই 'সত্যংবদ' 'ধর্ম্মংচর' ইত্যাদিই কি সেই 'নারীধর্ম্ম' না প্রবন্ধ শেষে উল্লিখিত সুপুত্রের জননী হওয়াই তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ 'নারীধর্ম্ম'?

দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই 'নারীধর্ম্মের' 'চরম বিকাশটা' কি? কোন্ অবস্থাকে তিনি 'নারীধর্ম্মের চরম বিকাশ' বলে মনে করেন? তাঁর প্রবন্ধে এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তরই খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে যদি ধরে নেওয়া যায় যে মাতৃত্বকেই তিনি 'নারীধর্ম্মের চরম বিকাশ' ব'লতে চেয়েছেন, তাহ'লে কিন্তু আবার ওই 'নারীধর্ম্ম' বস্তুটা কি সেই প্রশ্ন এসে পড়ে!

লেখিকা বলেছেন :—"ভারতবর্ষীয় হিন্দু তার জাতীয় জীবন গঠনের প্রথম প্রভাত থেকে আরম্ভ করে তার অভ্যুন্নতির দীপ্ত মধ্যাহ্নে আবার তার অবনতির জীবন-সন্ধ্যায় সর্ব্বত্রই তার বিরাট সমাজভুক্ত নরনারীর কল্যাণ কামনাকে একাগ্রচিত্তে পর্য্যালোচনা করেছিল। "নেতি নেতি" করে সে তার সমাজগত নারী পুরুষের কর্ত্তব্যকে একটার পর আর একটা ধাপে তুলে সম্যকরূপেই পরীক্ষা করে গেছে ; তার প্রত্যেকটি পরীক্ষার ফল আমরা প্রাচীনকালের পুঁথিপত্র হ'তে জানতে পারি। তারপর তার সেই 'এক্স্পেরিমেণ্ট্যাল ষ্টেজ,' পার হয়ে এসে সে যখন তার সমাজকে তার সেই সকল পরীক্ষার ফল দিয়ে লব্ধ পূর্ণ অভিজ্ঞতার বলে এক আদর্শ সমাজে গঠিত করে তুলতে পারলে, তখনই তার মাথার উপর গৌরব ভাস্কর প্রদীপ্ত হ-য়ে উঠলো।"

ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজের ও হিন্দুজাতির জীবন গঠনের প্রথম প্রভাত দীপ্ত মধ্যাহ্ন ও অবনতির সন্ধ্যা—কোনোটার সঙ্গেই লেখিকার যদি সম্যক পরিচয় থাকতো তাহ'লে নিশ্চয় তিনি এরূপ ভাবপ্রবণ হয়ে

উঠে তার পুঁথি পত্রে কি আছে সে সম্বন্ধে এরূপ ভ্রান্ত কল্পনা করে নিতে পারতেন না, এবং 'নেতিনেতি' শব্দে একেবারে চার হাজার বছরের 'এক্স্পেরিমেণ্ট্যাল' ষ্টেজ্ পার হ'য়ে এসে অবনতির জীবন সন্ধ্যার প্রবর্ত্তিত স্মার্ত্তযুগের সমাজবিধিকে—'গৌরব ভাস্কর প্রদীপ্ত' ব'লে ভুল ক'রতেন না।

জিজ্ঞাস্য এই,—ভারতের কোন্ যুগকে তিনি 'এক্স্পেরিমেণ্ট্যাল্ ষ্টেজ' এবং কোন্ যুগকে 'সকল পরীক্ষার ফল দিয়ে লব্ধ পূর্ণ অভিজ্ঞতার বলে গঠিত এক আদর্শ সমাজ গঠনের যুগ' বলে মনে করেন? ভারতের সেই 'অভ্যুন্নতির দীপ্ত মধ্যাহ্ন'—অর্থাৎ যখন তার 'মাথার উপর গৌরব ভাস্কর প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো'—তখনকার সেই কালটি যে কোন্‌কাল—ভারতের কোন্‌যুগ সেটি,—তাঁর প্রবন্ধে কোথাও সুস্পষ্ট লেখা নেই। তিনি বলেছেন:—"ভারতবর্ষীয় হিন্দুর যা' কিছু নিয়ে আজও এই পরাধীন দৈন্যগ্রস্ত জীবনে গর্ব্ব কর্ব্বার আছে, সে তার সেই একান্ত শুভদিনেরই দান। আজও যদি সেদিনের সেই মহিমময় গরিমা দীপ্ত যুগের অত্যুচ্চ আদর্শবাদকে আমরা অনুসরণ না করিতাম, তবে ভারতবর্ষীয় হিন্দুর এই সাতশত বর্ষকাল ব্যাপী পরাধীন জীবনে এমন কি আছে যার বলে সে জগৎ-সমাজের মধ্যে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে ভরসা করে? কি আছে তার, যার জোরে সে তার বহুদিনের হৃতরাষ্ট্র ফিরিয়া পাওয়ার অধিকার চায়? যার বলে সব হারাইয়াও সে নিঃস্ব নয়, ভিখারী হইয়াও রাজা। সে কি? সেই ভারতীয় সভ্যতা—যে সভ্যতার অংশভাগী হইয়াও গ্রীস রোম মিশর কোথায় কবে ধ্বংস হইয়া গেলেও, যে সভ্যতার পূর্ণরূপকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকার জন্য ভারতের নারীপুরুষ এই বহুতর শতাব্দীর ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও উৎপীড়ন অত্যাচার অধঃপাতের তলায় পড়িয়াও পূর্ণরূপে তলাইয়া যায় নাই, আজো মাথা তুলিয়া অচল অটল দাঁড়াইয়া আছে—এ' সেই সর্ব্বশক্তিমৎ ভারতীয় সভ্যতা।"

প্রবন্ধ লেখিকার এই উক্তি থেকে তাঁর বক্ষ্যমান কালের কতকটা আন্দাজ করে নেওয়া যেতে পারে। কারণ তিনি এখানে বলেছেন—"ভারতবর্ষীয় হিন্দুর সাতশতবর্ষ কালব্যাপী পরাধীন জীবনে এমন কি আছে যার বলে সে জগৎ সমাজের মধ্যে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে ভরসা করে?" বেশ কথা। এখন অনুমান করে নিতে পারা যাচ্ছে তিনি যে যুগের কথা ব'লছেন তা' এই সাতশত বৎসর পূর্ব্বের স্বাধীন ভারতের কথা। যে সময় ভারতে প্রাচীন সমাজবিধি ও ধর্ম্মনীতিবাদ প্রভৃতি কিছু কিছু বিদ্যমান ছিল—তাকেই হয়ত' তিনি "মহিমময় গরিমাদীপ্ত যুগের অত্যুচ্চ আদর্শবাদ" বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে তিনি এই সাতশত বছরের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বের ভারতের কথা বলছেন না তারও বহু আগের প্রাচীন ভারতের সুদিনের উল্লেখ করছেন?...

তিনি লিখেছেন—"যে সভ্যতার অংশভাগী হইয়াও গ্রীস রোম মিশর কোথায় কবে ধ্বংস হইয়া গেল"—ইত্যাদি। অতএব দেখা যাচ্ছে তিনি ভারতের যে গৌরবময় দীপ্ত যুগের কথা ব'লছেন সেটা ঠিক সাতশত বছর আগেকারও নয়, সে তার আরও বহু আগের প্রাচীন ভারতের কথা—যে ভারতের তদানীন্তন সভ্যতার গ্রীস্ রোম মিশর প্রভৃতি অংশভাগী ছিল। লেখিকার মতে—সেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পূর্ণরূপকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকার জন্য ভারতের নরনারী এই বহুতর শতাব্দীর ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও উৎপীড়ন অত্যাচার অধঃপাতের তলায় পড়েও সম্পূর্ণ তলিয়ে না গিয়ে অচল অটল ভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যার জোরে তারা নাকি পরাধীনতার মধ্যেও স্বাধীন—বিজিত হ'য়েও আজও অপরাজেয়।

হিন্দু আজ মাথা তুলে অচল অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে—কিম্বা অবনত শিরে ভূলুণ্ঠিত ভারত আজ পরাধীন হ'য়েও স্বাধীন কিনা এবং বিজিত হ'য়েও অপরাজেয় কিনা এ নিয়ে আর অসার তর্ক করবার প্রবৃত্তি নেই। ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় এ দেশ কোনোদিনই কোনো সভ্যতার পূর্ণরূপকে অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে বসে ছিলনা। সে যুগে যুগেই নব নবপরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে তাকে স্বীকার ও গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে এসেছে। আর্য্য অনার্য্যকে নিজের মধ্যে গ্রহণ না করলে এখানে সে টিকতেই পারতনা। হিন্দু বৌদ্ধকে স্বীকার ক'রে নেওয়াতেই তারপক্ষে বেঁচে থাকা আজও সম্ভব হ'য়েছে। চৈতন্যদেব যদি যবন হরিদাসকে না কোল দিতেন—অস্পৃশ্যদের না বুকে টেনে নিতেন তাহ'লে সমস্ত বাংলা দেশ আজ মুসলমান হ'য়ে যেতো! রাজা রামমোহন রায় বিকৃত হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার সাধনে ব্রতী হ'য়ে উপনিষদোক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার না করলে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে আকৃষ্ট ইংরাজী শিক্ষিত নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের খৃষ্টান হওয়া ছাড়া অন্য পথ থাকতোনা। পীড়িত দুর্গত জাতিচ্যুত হিন্দুদের মধ্যে সেদিন খৃষ্টান মিশানারীদের প্রভাব মুসলমান মোল্লাদের চাইতে কোনো অংশেই কম ছিলনা। কারণ হিন্দুসমাজ তখনও এই প্রবন্ধ লেখিকারই অনুমোদিত—অষ্টমে গৌরীদান, নির্জ্জলা একাদশী, স্ত্রী স্বাধীনতা-বিরোধ, সমুদ্রযাত্রা নিষেধ প্রভৃতি আরও বহুবিধ বিধি-নিষেধের মিথ্যা গৌরব-বোধ নিয়ে সর্ব্বপ্রকার সংস্কার ও উন্নতির বিরুদ্ধে লৌহদ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে নিজের শুচিতা রক্ষা করতে ব্যস্ত ছিল। সে দ্বার ভেঙে যদি না তাদের যুগ-সংস্কারক ঋষিরা মুক্তির পথে নিয়ে আসতেন তাহ'লে আজ নিজেদের রুদ্ধ বিবরে মৃতমূষিকের মত হিন্দু জাতির অস্তিত্বও লোপ পেয়ে যেত—এ ধরা পৃষ্ঠ হ'তে। যুগে যুগে কালে কালে পরিবর্ত্তনকে সহজভাবে স্বীকার ক'রে নিতে পেরেছিল যতদিন, ততদিনই হিন্দুজাতি যথার্থ মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পেরেছিল। কিন্তু এ অতি বেদনা ও লজ্জাকর কথা হ'লেও একথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই—যে, ভারতবর্ষ আজ চরম অবনতির পঙ্কে নেমে এসেছে এবং হিন্দুজাতি বেঁচে থাকলেও তার মাথা আজ আর উঁচু নেই। সাতশ' বছরের উপর তার উষ্ণীষহীন মস্তক বিদেশীদের পদানত হ'য়ে লুটুচ্ছে। শৌর্য্যে বীর্য্যে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, সামাজিক ব্যবহারে, নৈতিক চরিত্রে, ধর্ম্মজীবনে সকলদিক দিয়ে এ জাতির যে অধঃপতন ঘটেছে তাকে অস্বীকার করা যেমন অজ্ঞানতা, ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতাকে এর জন্য দায়ী করাও তেমনিই মূঢ়তায় পরিচায়ক। কারণ এ দেশের জাতীয় অবনতি যা ঘটবার তা' ইংরেজ এদেশে আসবার

অনেক আগেই ঘটেছিল, নইলে মুষ্টিমেয় ইংরাজ বণিকের পক্ষে বিশাল ভারতবর্ষকে হেলায় পদানত করা বোধহয় কোনোদিনই সম্ভবপর হ'তনা।

হিন্দুর প্রকৃত অধঃপতন সুরু হ'য়েছে——যেদিন থেকে সে তার প্রাচীন সভ্যতার বিস্তীর্ণ উদার রাজপথ ছেড়ে দিয়ে,—নীচ সাম্প্রদায়িকতার স্বার্থ-সংকীর্ণ অন্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে কাপুরুষের ন্যায় আত্মরক্ষার চেষ্টা ক'রেছে।—ভারতীয় সমাজ—ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য—ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দুধর্ম্মের সকল দিক দিয়ে অধঃপতন সুরু হ'য়েছে তার রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই। ইংরেজ আমলে সে শস্ত্রহীন হয়েছে বটে; কিন্তু শাস্ত্রহীন হ'য়েছে সে মুসলিম যুগেই। এই সময়েই, অর্থাৎ ষোড়শশতাব্দী থেকে হিন্দুসমাজে—বিশেষ করে বাংলাদেশে—বয়স্থা শিক্ষিতা কন্যার স্বেচ্ছানির্ব্বাচন প্রথা, উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা অসবর্ণবিবাহ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় বিধি-ব্যবস্থা বন্ধ হ'য়ে—বাল্যবিবাহ, অবরোধ প্রথা, স্ত্রীশিক্ষা রোধ প্রভৃতি অনেক কিছু দুর্বিধির সৃষ্টি হয়। তার আগে সেই বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে পৌরাণিক যুগ বৌদ্ধ যুগ ও এমন কি নব-ব্রহ্মণ্য যুগ পর্য্যন্তও বয়স্থা নর নারীর স্বেচ্ছনির্ব্বাচন প্রথা, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি লেখিকা উল্লিখিত ইংরাজী শিক্ষার সমস্ত কুপ্রথাগুলি ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। তবে সে সকল যুগকে লেখিকা যদি ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও শিক্ষার 'এক্স্‌পেরিমেণ্ট্যাল যুগ' বা 'বর্ব্বর সমাজের অসভ্য যুগ' বলেন—তাহ'লে প্রশ্ন উঠবে—তবে কি লেখিকার মতে 'সেকাল' বা 'প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগ' ব'লতে বল্লালী আমলের কৌলীন্যপ্রথার যুগ বা মুসল্মান শাসনাধীন ভ্রষ্ট হিন্দুত্বের যুগ, অথবা রঘুনন্দন প্রবর্ত্তিত স্মার্ত্ত-শাসনের যুগ বুঝতে হবে? ষোড়শ-শতাব্দীই কি লেখিকার মতে ভারতের চরম উন্নতির যুগ? কিন্তু, তাতে মুস্কিল বাধে এই নিয়ে—যে, এ যুগের ভারতীয় সভ্যতাকে কোনো প্রবল কল্পনাশক্তি দিয়েও 'গ্রীস রোম বা মিশর বিজয়ী প্রাচীন আর্য্যসভ্যতা' বলে প্রমাণ করা চলে না!

সে যাই হোক, 'নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লেখিকা এইবার ব'লছেন—"আমার মতে 'নারীর কর্ত্তব্য' যা ভারতবর্ষীয় সমাজ তার গৌরবোজ্জ্বল, উন্নতি সমুচ্চ যুগে স্থির ক'রে দিয়েছিল, সেই আদর্শই তার পক্ষে শ্রেয়স্কর ও যশস্কর উচ্চাংশ; তার থেকে বার হ'য়ে তার চেয়ে যথেষ্ট হীনতর আদর্শে নেমে যাওয়া তার পক্ষে একটুও সম্মানের নয়। সুবিধারও নয়।" —তা' তো' নয়ই! শ্রদ্ধেয়া লেখিকার সঙ্গে এ বিষয়ে আমার এতটুকুও মতদ্বৈধ নেই। "কিন্তু, গোল বাধছে তাঁর সঙ্গে ওই 'ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল উন্নতি সমুচ্চ যুগ" নিয়ে! তিনি যে সব সংকীর্ণ সামাজিক বিধি-বিধানের পক্ষপাতিনী, দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের উন্নতি সমুচ্চ যুগে সে সকলের কোনো অস্তিত্বই ছিল না!

তাঁর প্রবন্ধ পড়লে মনে হয় যে লেখিকার ধারণা এই বিংশশতাব্দীতেই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসেই 'ভারত নারী' তথা 'ভারত সতী' তাদের গৌরবোজ্জ্বল উন্নতি সমুচ্চ যুগের শ্রেয়স্কর ও যশস্কর উচ্চাদর্শ থেকে যথেষ্ট হীনতর আদর্শে নেমে এসেছেন এবং আসছেন।

লেখিকার এই ধারণা যে হিমালয়ের চেয়েও বড় ভুল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর যে কোনো হিন্দু-অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেই। নারী যে সেদিন সেখানে মাত্র গৃহশোভা অথবা আসবাবপত্রের সামিল হ'য়ে পড়েছে, তার যে আর কিছুমাত্র শিক্ষা, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব নেই সেটা অষ্টাদশ—এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর যে কোনো হিন্দু-ঘরেই দেখতে পাওয়া যাবে। বরং এই বিংশ শতাব্দীতেই আজ দেখা যাচ্ছে মেয়েরা আবার নূতন ক'রে ভারতের সেই গৌরবোজ্জ্বল উন্নতিসমুচ্চ যুগের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শগুলি অন্তরে বাহিরে অনুসরণ ক'রতে চেষ্টা ক'রছে। তাদের শিক্ষা স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট, বিস্তৃত ও পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে! কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের, এবং সে যুগের নারীর আদর্শ—কোনোটার সম্বন্ধেই লেখিকার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা না থাকাতে তিনি এই শোচনীয় ভুল করে ফেলেছেন ব'লে মনে হয়। তারপর লেখিকা ব'লছেন:—

"ত্যাগের পথ কঠোর ও বন্ধুর হলেও সেই পথই শ্রেয়ের পথ, 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' হলেও সেই পথই তাঁদের অনুসরণীয়। যে পথে গার্গী মৈত্রেয়ী, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী মদালসা এবং এই সেদিনেও বিদ্যাসাগর মাতা, ভূদেব জননী, স্যার রাজেন্দ্রের স্যার আশুতোষের স্যার গুরুদাসের হরিহর শেঠের গর্ভধারিণীগণ অনুবর্ত্তন করে ঐ সকল পুত্ররত্ন লাভ করেছিলেন, এর চেয়ে সমাজ-হিতৈষণা আমাদের মেয়েরা যে আর কি দিয়ে করবেন আমার মত সামান্যার বোধগম্য হয় না।"

লেখিকা বৈদিক যুগ থেকে একেবারে এই অতি নিন্দিত ইংরাজ যুগ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ভারত ইতিহাসের অনেকগুলি আদর্শ নারীর নাম একত্রে একই পর্য্যায়ে উল্লেখ ক'রে তাদের সকলকে একই পথে ঠেলে নিয়ে গেছেন। ভারতের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন অবস্থার এই সব খ্যাতনামা মহিলার চরিত্র ও জীবনী অনুশীলন ক'রে দেখলে যে কোনো লোকের চোখেই এটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে যে এঁরা পরস্পরে কেউ কারুর পথেরই অনুবর্ত্তিনী নন। গার্গী বা মৈত্রেয়ীর আদর্শের পথে সীতা সাবিত্রী বা দময়ন্তী এঁরা কেউই অনুবর্ত্তিনী হননি, এবং বিদ্যাসাগর মাতা বা স্যার রাজেন্দ্র জননী এঁরাও কেউ গার্গী মৈত্রেয়ীর ন্যায় ব্রহ্মবাদিনী ঋষি-রমণী ছিলেন না। তাঁদের পথ ও এঁদের পথও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর মতো এঁরা স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত পতিকে বিবাহ করেননি। কাজেই তাঁদের পথেরও অনুবর্ত্তিনী হওয়া এঁদের পক্ষে সম্ভব বা সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এঁরা কেউ স্বাধীন চিন্তাশীলা উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বাভিজ্ঞা বা ব্রহ্মবিদ্যার পারদর্শিনী ছিলেন কিনা তাও জানি না।

হাজার-হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতার সাগর ছেঁচে যে ক'টি উল্লেখযোগ্য মেয়ের নাম আমরা পাই তাদের আঙুলে গোণা যায়। যখন তখন আমরা তাদের নিয়েই নাড়াচাড়া করি, কারণ ওই কজনই আমাদের যুগ যুগান্তের আদর্শ নারীর পুঁজি। লেখিকাও এখানে তাই

করতে বাধ্য হ'য়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি যাদের নাম ক'রেছেন তাঁরা কেউই তাঁর আদর্শ নারীর ছাঁচে ঢালা ছিলেন না।

কুমারী গার্গী ছিলেন ঋষি বাচক্নুর বিদুষী কন্যা। তিনি তাঁর সুগভীর জ্ঞান নির্ভীক তেজস্বী প্রকৃতি ও অপরাজেয় তর্কশক্তির জন্য নারী সমাজে বরণীয়া ও চিরস্মরণীয়া হয়ে আছেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী দেবী সংসারের অসার বিষয়বস্তুর চেয়ে অমৃতত্বকেই জীবনের সমধিক কাম্য বলে গ্রহণ করতে পারায় আজও ভারত নারীর অগ্রগণ্যা ও নমস্যা হ'য়ে আছেন; কিন্তু সীতা সাবিত্রীর আদর্শ ছিল ভিন্ন। অটুট পতিভক্তি ও অসীম দুঃখসহিষ্ণুতাই সীতা চরিত্রের বিশেষত্ব। বয়স্থা কুমারী শ্রীমতী দময়ন্তী দেবী নলরাজকে হংসদূত সাহায্যে প্রণয়লিপি পাঠিয়েই যাকিছু বিদ্যার পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্য কোনো সূত্রে তাঁর অগাধ পতিপ্রেম ছাড়া আর কোনো উচ্চ বিদ্যাবত্তা বা জ্ঞান-অনুশীলনের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিদুষী সাবিত্রী প্রাপ্তযৌবনা হ'য়ে স্বয়ং মনোমত পতি নির্ব্বাচনে দেশান্তরে যাত্রা করেছিলেন এবং যমরাজকে প্রীত করে মৃত পতির পুনর্জ্জীবন আদায় করেছিলেন। যমরাজের কাছে তিনি মোক্ষ প্রার্থনা করেননি, অমৃতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেননি, ব্রহ্মজ্ঞানেরও বর চেয়ে নেননি। তিনি চেয়েছিলেন পুত্রহীন পিতার পুত্র, রাজ্যভ্রষ্ট অন্ধ শ্বশুরের দৃষ্টিশক্তি ও সিংহাসন এবং নিজের শতপুত্র বর। তাঁরও আদর্শ গার্হস্থ্য ও পাতিব্রত্য। তত্ত্বদর্শন নয়। পুরাণে গন্ধর্ব্বরাজ তনয়া পতি সোহাগিনী মদালসার সুখময় দাম্পত্যজীবনের উল্লেখ ছাড়া আর কোনো বিশেষত্ব দেখা যায় না। তবে নাগরাজ তনয়া মদালসাকে স্বীয় পুত্রদের দুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যা ও দুরূহ রাজনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে দেখি। তারপর এদেশে বৌদ্ধযুগ ছিল, নব ব্রহ্মণ্য যুগ ছিল, ঐতিহাসিক ক্ষাত্র যুগ ছিল, মোসলেম যুগ ছিল, কিন্তু লেখিকা সে সমস্তই বাদ দিয়ে একেবারে পৌরাণিক সীতা সাবিত্রীর পাশেই হাল ইংরাজী আমলের 'ভূদেব জননী' প্রভৃতিকে এনে ফেলেছেন। এঁদের সম্বন্ধে প্রথম কথা বলা চলে এই যে—লেখিকা পূর্ব্বে যাঁদের নাম করেছেন তাঁরা সকলেই স্বনামখ্যাতা মহিয়সী মহিলা। "অমুকের জননী" ব'লে তাঁদের কারুর পরিচয় দিতে হয় না। কিন্তু এঁদের সেরূপ নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই। আমাদের বাংলা দেশে একটা গ্রাম্য প্রবচন আছে—"পো'র নামে পোয়াতি বর্ত্তায়!" এ যেন অনেকটা সেই শ্রেণীর। দ্বিতীয় কথা—পূর্ব্বোক্ত মহিলারা সকলেই বিদুষী' চিন্তাশীলা ও স্বাধীনা নারী ছিলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই লেখিকার নিন্দিত 'বয়স্থা নরনারীর স্বেচ্ছানির্ব্বাচন' প্রথায় বিবাহিতা, তবে সে স্বেচ্ছা নির্ব্বাচন 'লালসা প্রণোদিত' কিম্বা 'বৈরাগ্য প্রণোদিত' তা লালসা-বিজ্ঞান বিশারদেরা বলতে পারেন।

গার্গী মৈত্রেয়ী ছিলেন বেদের উত্তরমীমাংসা-সংশ্লিষ্ট উপনিষদোক্ত আদর্শের অনুসারিণী, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী ছিলেন পূর্ব্ব মীমাংসাজাত সংহিতার পথাবলম্বিনী, আর ইংরাজী আমলের অখ্যাত নারীরা ছিলেন স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অনুশাসনে বন্দিনী। সুতরাং এঁরা সকলেই যে একই পথ অনুবর্ত্তন করেছিলেন এমন কথা বলা চলে না। তা ছাড়া, কৃতী সন্তানের গর্ভধারিণী বলে তিনি "ভূদেব জননী" প্রমুখ যে কজন ইংরাজী আমলের বঙ্গনারীর পক্ষ হ'তে 'সমাজ হিতৈষণার' গৌরব দাবী করেছেন, এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কৃতী-সন্তানের জননী হওয়ার সৌভাগ্য সেকালের মায়েদের কারুরই স্বোপার্জ্জিত গৌরব নয়। ওটা তাঁদের পক্ষে ছিল তখন একেবারেই ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত ঘটনা। কারণ, ভারত তখন তার সেই প্রাচীন সভ্যতার উদার আদর্শ ও বৃহত্তর সমাজবিধি বর্জ্জন ক'রে অধঃপতিত পরাধীন জীবনের হীন দুর্ব্বল ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তি-প্রসূত যে অনুদার ও অহিন্দু বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিল তার মধ্যে নারীর স্থান নির্দ্দিষ্ট ক'রেছিল সর্ব্ব নিম্নে। এদেশের নারী ছিল তখন সর্ব্বপ্রকার বন্ধনে আড়ষ্ট পরাধীন, সকলপ্রকার উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হ'তে বঞ্চিতা, কৈশোর উত্তীর্ণ হবার আগেই অবগুণ্ঠিতা হ'য়ে গৃহ প্রাচীরের চতুঃসীমার মধ্যে চির-বন্দিনী। সে দিনের মায়েরা শুধু সন্তানপ্রসবকারিণী মাত্র ছিলেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন ও চরিত্র গঠন ক'রে তোলবার অধিকার ও যোগ্যতা কোনটাই ছিল না তাঁদের। আজও খাঁটি বাংলার অদূর পল্লী সমাজের যে কোনো অশিক্ষিতা জননীর দিকে চাইলে এ কথার জীবন্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আর একটা কথাও বলবার আছে এখানে। লেখিকা যেসব সামাজিক প্রথাকে নিন্দনীয় ও জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী ব'লে মনে করেন এরূপ একাধিক অন্যায় কার্য্যই উক্ত জননীদের কৃতী সন্তানেরা তাঁদের মাতাঠাকুরাণীদের জীবিতকালেই ক'রে গেছেন। বিদ্যাসাগর ও স্যার আশুতোষ বিধবা-বিবাহ শুধু সমর্থন ও প্রচার নয় কার্য্যতঃ নিজ পরিবারের মধ্যে দিতেও সাহস করেছিলেন। সার্ রাজেন্দ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার শুধু পক্ষপাতিই নন; নিজ জীবনে তার সম্পূর্ণ অনুসরণ ক'রে আজ একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ও ব্যবসায়ী হ'য়ে উঠতে পেরেছেন। এই সকল কারণে যৌথপরিবার প্রথা মেনে চলাও এঁদের পক্ষে সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনি। সুতরাং লেখিকার আদর্শ মানতে হ'লে এঁদের জননীদের তো কুপুত্রের গর্ভধারিণী ব'লেই অভিহিত করতে হয়! তা ছাড়া, কেবলমাত্র সুপুত্রের জননী হ'তে পারলেই যদি নারীর পক্ষে 'সমাজ হিতৈষণার চরম কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হ'য়ে যায়, তা হ'লে 'নারীর কর্ত্তব্য' যে কেবলমাত্র গর্ভধারণেই পর্য্যবসিত হ'য়ে পড়ে! এবং তাই যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহ'লে তাঁর উক্ত গর্ভধারিণীদের সঙ্গে সার হরিশঙ্কর পালের জননী, সার্ হরেরাম গোয়েঙ্কার জননী, সার্ ওঙ্কারমল জেটিয়ার জননী, সার স্বরূপচাঁদ হুকুম চাঁদের জননী—এঁদেরও আদর্শ সমাজহিতৈষিণী নারীর তালিকায় নামোল্লেখ ক'রলে কী দোষ হ'ত?

রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ, সার প্রফুল্লচন্দ্র, সার জগদীশচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এঁদের জননীদের নাম বাদ পড়ার না হয় একটা শুচিগ্রস্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় যে, তাঁদের পুত্রেরা কেউ, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ বা গোঁড়া হিন্দু নন, কিন্তু, কৃতী ও ধনকুবের মাড়ওয়ারী জননীরাও, সকলেই খাঁটি নিষ্ঠাবান পরম হিন্দুর মাতা!

তারপর লেখিকা ব'লেছেন—

"জগৎপূজ্যা ভারতীয় নারীসমাজে বৈদেশিক অপুষ্ট সমাজের অনুকরণ, যৌথ পরিবার প্রথা নষ্ট করা, বয়স্ক নরনারীর লালসা প্রণোদিত স্বেচ্ছা

নির্ব্বাচন, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অহিন্দু বিবাহ, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদির দ্বারা ভারতসতীর বৈশিষ্ট্য নাশ করায় সমাজ যে কতখানি মঙ্গল লাভ করিবে বুঝিতে পারি না। যাদের মধ্যে এই সব ব্যাপার আছে, তারা কি এ দেশের মেয়েদের চেয়ে খুব বেশী সুখী? এ সব কি সমাজের অপরিণততা প্রমাণ করে না?"—ইত্যাদি।

ভারতনারী 'জগৎপূজ্যা' কি না—এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি। লেখিকা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের যে সকল সংস্কার প্রচেষ্টাকে বৈদেশিক অপুষ্ট সমাজের অনুকরণ ব'লে ভুল ক'রেছেন, সেগুলি পুষ্ট বা অপুষ্ট কোনো বৈদেশিক সমাজেরই অনুকরণ নয়। তা' এই ভারতবর্ষেরই নিজস্ব বস্তু। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যুগে এদেশে মেয়েদের আত্মোন্নতির যে সব সুযোগ ও সুবিধা ছিল, বর্ত্তমান সভ্যসমাজের একাধিক বিধি-নিয়মের সঙ্গে তার হুবহু সৌসাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ, বয়স্থা কন্যার স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত বিবাহ, চিরকুমারী থাকা, নৃত্য গীত বাদ্য ক্রীড়া কৌতুক আমোদ প্রমোদ ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, রথচালনা, শস্ত্র বিদ্যা, শাস্ত্র বিদ্যা, শিল্প কার্য্য ও চিত্রকলা, ইত্যাদি—সকল বিষয়েই প্রাচীন ভারতে—মেয়েদের জ্ঞানলাভের অধিকার ও সুযোগ দেওয়া হ'ত। অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা-বিবাহও বৈদেশিক আমদানি নয়, প্রাচীন ভারতেরই উদারবিধি মাত্র! আজ পতিত ভারতের সংকীর্ণ সমাজ সংরক্ষকদের কাছে এ সব পাশ্চাত্যের অনুকৃতি বলে ভ্রম হ'চ্ছে এমনিই আত্মবিস্মৃত হতভাগ্য আমরা! পরাশর সংহিতায় আছে—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎস্থ নারীনাং পতিরন্যোবিধিয়তে।"

বিবাহ বিচ্ছেদের এই বিধানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের 'ডাইভোর্স' আইনের ধারা গুলির একাধিক সৌসাদৃশ্য পাওয়া যায় না কি?

ভারতের অধঃপতিত যুগেই নারীকে জীবনের সকল উৎকর্ষ লাভ থেকে বঞ্চিত করে কেবলমাত্র নির্ব্বিচারে মূক বধির ও অন্ধ পাতিব্রত্য বিধান দেওয়া হয়েছে। পতির সঙ্গে পরিচয়ের কোনো সুযোগ না ঘটলেও বালবিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা নাবালিকা বধূকে কাল্পনিক পতির ধ্যানে পাতিব্রত্য পালন করে চির জীবন কাটাতে হবে। তাদের সেই না জানা অচেনা স্বামীর উদ্দেশে তাদের পতিভক্তি যদি উদ্বেলিত হ'য়ে না উঠে তাহ'লেই তারা অসতী বলে গণ্যা হবে। যে কোনো রকমের অবস্থাই উপস্থিত হোক্‌না কেন—স্ত্রীলোককে সকল অবস্থাতেই অচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধনে শৃঙ্খলিত ক'রে রেখে তথা-কথিত সতী' তৈরী করবার যে কৃত্রিম বিধি নির্দ্দিষ্ট করা হ'য়েছে তা' সকল সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। যে 'সতীধর্ম্ম' সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত, কোনো বিধি নিষেধের চাপে বা বাধ্যকরী নয়, বা নারীর স্বভাবজাত অন্তরের বস্তু—ভারতের প্রাচীন যুগের সেই সতীত্বই প্রকৃত সতীধর্ম্মের গৌরব ও আদর্শ স্বরূপ।

'অহিন্দু-বিবাহ' যে লেখিকা কোন্ বিবাহবিধিকে লক্ষ্য করে বলেছেন তা অনুমান করা কঠিন। কারণ, প্রাচীন ভারতের হিন্দু বিবাহ শাস্ত্রমতে অষ্টবিধ। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, অসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। যে হিন্দু সমাজে রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহকেও 'বিবাহ' বলে স্বীকার ক'রে নিয়ে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, সেখানে 'অহিন্দু বিবাহ' বলে লেখিকা আমাদের কী বোঝাতে চান জানি না। তবে, তাঁর মতামত পড়ে কতকটা অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে হয়ত, তিনি অন্যান্য অনেক কিছু ভুল ধারণার মত 'আন্তর্জাতিক বিবাহ' এবং 'অসবর্ণ' বিবাহকে'ই অহিন্দু-বিবাহ বলে মনে করেন। কিন্তু, এই ভারতেরই অত্যুন্নত দীপ্ত মধ্যাহ্নে যে অবাধে অসবর্ণ বিবাহ এবং আন্তর্জাতিক বিবাহ চলত এটা তিনি আর কিছু নয় শুধু মহাভারতের পাতাগুলো আর একবার ওলটালেই একাধিক প্রমাণ পাবেন। সুতরাং একেও তিনি 'বৈদেশিক অনুকরণ' না বলে বরং প্রাচীন ভারতের উদার বিধির অনুসরণ বলতে পারেন।

তারপর 'বিধবা বিবাহ'। এ নিয়ে বাংলা দেশে এ পর্য্যন্ত বহু তর্ক আলোচনা হ'য়ে গেছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে বিধবা-বিবাহ সম্পূর্ণ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত। সে সকলের পুনরুল্লেখ ও পুনরুক্তি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে আজ আর একথা কাউকে দু'বার বলবার আবশ্যকও করে না যে 'বিধবা-বিবাহ' বৈদেশিক অনুকরণ নয়, এটা হিন্দু শাস্ত্রান্তর্গত ভারতীয় বিধিই।

'যৌথপরিবার প্রথা ভঙ্গ' সম্বন্ধে লেখিকা যদি ভেবে দেখতেন তাহ'লে বুঝতে পারতেন—এর মূলকারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ নয়, এর মূল কারণ সমস্ত জগৎব্যাপী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত কঠিন অর্থ-নৈতিক সমস্যা। এখানে জীবিকার্জ্জনের পথ দিনের দিন যতই সংকীর্ণ ও দুরতিক্রমণীয় হ'য়ে উঠছে, যৌথ পরিবার ততই আপনা আপনি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আসছে। এর জন্য কোনো বিদেশী শিক্ষা ও সমাজকে দায়ী করা ভুল। বর্ত্তমান জগতের আর্থিক অবস্থায় কোনো দেশের কোনো সমাজের গৃহস্থ পরিবারের মধ্যেই প্রাচীন যৌথ সংসারের আদর্শ চির-অব্যাহত থাকতে পারে না। আগের দিনে এদেশের সাধারণ গৃহস্থেরা কেউ চাকুরিজীবী ছিলেন না। কৃষিজীবী ও বাণিজ্যজীবী ছিলেন। সেদিন দূর দূরান্তরের পথ আজকের মত বিজ্ঞানের কল্যাণে এমন সহজগম্য হয়নি। হিন্দুরা তখন এক একটি স্থানে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে গ্রাম সীমানার মধ্যেই প্রায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। জমি জমা চাষবাসের কাজ যৌথ-পরিবারভুক্ত সকল ভাই, ভাইপো ও ছেলেরা একত্রে মিলে মিশে সম্পন্ন ক'রত, কারণ তাদের প্রত্যেকের স্বার্থ তাতে সমান ছিল। পরিবারের জ্যেষ্ঠের হাতে সমস্ত আয় ব্যয় ও বিধিব্যবস্থার ভার থাকা তাই সহজ ও সুবিধার ছিল।

আজকার দিনে কোন পরিবারে একটী ভাই হয়ত ব্যারিষ্টার, একটি ভাই ডাক্তার, একটি ভাই স্কুল মাষ্টার, একটি ভাই কেরাণী। প্রত্যেকের উপার্জ্জন বিভিন্ন এবং পদমর্য্যাদা অনুযায়ী ব্যয়ও বিভিন্নতর। একান্নবর্ত্তী পরিবারের সমান ভাগ বাঁটোয়ারা এদের মধ্যে সম্ভবপরও নয় সমীচীনও নয়। ধরুণ ব্যারিষ্টারের বসবার ঘর অথবা ডাক্তারের চেম্বারের জন্য যেসব আসবাব পত্র ও আড়ম্বরের প্রয়োজন আছে, ইস্কুলমাষ্টার বা কেরাণীর তা

নেই। এদের মোটরগাড়ী না হলেও চলবে কিন্তু ওদের একদিনও চলবে না। এদের ধুতি পিরানই যথেষ্ট, কিন্তু ওদের ভাল ভাল "হ্যাট" পরা চাই। কোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠান ক্লাব্, লজ্, প্রভৃতির সভ্য হ'তেই হয় ওদের, এদের দরকার নেই। পাড়ার বারোয়ারী, লাইব্রেরী বা কোনো চ্যারিটি ফণ্ডে ওদের মোটা চাঁদা না দিলে মান থাকে না। এদের না দিলেও চলে। তেমনি অন্তঃপুরেও মেয়েদের মধ্যে স্বামীর অবস্থা ও পদমর্য্যাদা অনুযায়ী উৎসব, ক্রিয়া কর্ম্ম, নিমন্ত্রণে মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার ব্যবহার করা প্রয়োজন। অন্যান্য দৈনন্দিন ছোটখাটো ব্যাপারেও পরিবারের মধ্যে তাঁরাই সংসারে কতকগুলো বিশেষ সুখসুবিধা ভোগ করতে পান যা অন্ন-উপার্জ্জনক্ষম তা'য়েদের পত্নীরা পান না। এর ফলে সংসারে নিয়ত একটা বিরোধ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। কাজেই, যৌথ পরিবারের আটচালা ভেঙে পড়তে বেশিদিন সময় লাগে না।

একালে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে স্বার্থপরতা নাকি একান্তভাবে বেড়ে উঠেছে এমনি একটা অভিযোগও প্রায়ই শোনা যায়। আজকালকার দিনে লোকে না কি নিজের নিজের স্ত্রীপুত্র নিয়ে আলাদা সংসার করে থাকাটাই পছন্দ করে বেশী। কিন্তু সেকালে এমন ছিল না। তখন সকলে এক-জায়গায় মিলে মিশে থাকতেই ভালবাসতো! কথাটা ঠিক্। কিন্তু, কেন ভালবাসতো সে কথাটা যদি ভেবে দেখা যায় তাহলে আর এটা বুঝতে কারো দেরী হবে না যে,—সেও সম্পূর্ণ স্বার্থের খাতিরেই। কারণ, সেকালে একজন লোকের পক্ষে কেবলমাত্র নিজের স্ত্রী পুত্র নিয়ে একা একটি ক্ষুদ্র সংসার রচনা করে' থাকা মোটেই সহজ ও সুবিধাজনক ছিল না। জমীজমা ও চাষবাসই ছিল যে সময়ে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র ভরসা, সেদিন বৃহৎ পরিবারের সকলে একত্রে মিলে মিশে থাকার মধ্যেই ছিল সবচেয়ে বেশী সুবিধা ও সেইটেই ছিল সকলের স্বার্থের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল। কাজেই যৌথপরিবার প্রথাটাই ছিল সেদিন সচল ও বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ সামাজিক আদর্শ হিসাবে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়। কারণ দশগাছা কঞ্চির একটা আঁটির জোরই ছিল সেদিন তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা অর্জ্জনের উপায়ান্তর ঘটায় বহু আত্মীয় কুটুম্ব নিয়ে একত্র এক বৃহৎ সংসার পেতে থাকা কোনো দিক দিয়েই সুখ শান্তি ও সুবিধার হ'চ্ছে না। অর্থসমস্যার চাপে (economic pressure) যৌথপরিবার প্রথা ভেঙ্গে যাওয়া ও ভিন্ন-পরিবার প্রথা গড়ে ওঠা ক্রমশই সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে উঠ্ছে। আজকের দিনে যেখানে চারভাইই চাকুরিজীবী, কিন্তু, কেউ হয়ত কাজ করেন এখানে, কেউ কাজ করেন ঢাকায়, কারুর কর্ম্মস্থল কানপুর, কারুর বা মীরাট কি বর্ম্মা—সেখানে 'যৌথ পরিবার' টিকে থাকা সম্ভব নয়, এবং সেজন্য দুঃখ করবারও কিছু নেই। সেদিন যৌথ পরিবার মানুষের নিজের স্বার্থের জন্যই প্রয়োজন ছিল, কাজেই সে টি'কেছে। কিন্তু আজ যৌথপরিবার তার স্বার্থের বিরোধী, সুতরাং তার অস্তিত্ব লোপ পাওয়া ত অবশ্যম্ভাবী!

তারপর লেখিকা বলেছেন:—"ভারতবর্ষীয়া নারীর কর্ত্তব্য নয় যে তারা সমাজ সংস্কার জন্য নব্যতান্ত্রিক ইউরোপীয়ের দ্বারস্থ হওয়া। তার সমাজ সংস্কার জন্য তার নিজের ঘরের মধ্যে চাহিলেই সে তার বিধি বিধান খুঁজিয়া পাইবে।"

এ বিষয়ে লেখিকার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র মতদ্বৈধ নেই। ভারতবর্ষ তার সমাজ সংস্কারের জন্য নিজের ঘরের দিকে চেয়ে দেখলেই যে উপযুক্ত বিধিবিধান খুঁজে পাবে এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। তবে কিনা সে অনুসন্ধানীর দৃষ্টি একটু দুর-প্রসারী হওয়া চাই। পরাধীন শক্তিহীন পতিত ভারতের গত কয়েক শতাব্দীর সঙ্কীর্ণ সামাজিক বিধি ব্যবস্থার অনুদার প্রাচীর পর্য্যন্ত পৌঁছে থেমে গেলেই চলবে না। সে লজ্জাকর কারাপ্রাচীর পার হ'য়ে, স্বাধীন শক্তিশালী উন্নত ভারতের উদার অঙ্গনে গিয়ে পৌঁছতে হবে। সেইখানে সে তার মুক্তির পথ খুঁজে পাবে নিশ্চয়।

আজকের দিনে জগতে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে হ'লে হয়ত' অনেক কিছুর জন্যই এই সর্ব্বহারা জাতিকে বাধ্য হ'য়ে ওই বিজ্ঞানোন্নত বৈদেশিক জাতিরই দ্বারস্থ হ'তে হবে। যেমন চীন জাপান তুরস্ককে হ'তে হ'য়েছে এবং ইরাক্ পারস্য ও আফ্‌গানিস্থানকে হ'তে হ'চ্ছে, কিন্তু, সমাজ সংস্কারের জন্য সে যদি তার স্মার্ত্ত গোঁড়ামীর ধোঁয়াটে চশ্‌মা খুলে ফেলে গৃহদ্বার হ'তে ছুঁৎমার্গের পর্দা-তুলে তার গৌরবময় অতীতের দিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ফিরে চায় তাহ'লে এই শোচনীয় সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ধারের সহজ উপায় সে দেখতে পাবেই।

লেখিকা তাঁর বক্তব্য সমর্থনের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুত্ব' প্রবন্ধের যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন, বিশ্ব কবির সে বাণী কিন্তু লেখিকার মতের মোটেই অনুকূল নয়। কবি অধঃপতিত ভারতের সংকীর্ণ অনুদার হীন সমাজ বিধি ব্যবস্থাকে মূঢ়ের মত আঁকড়ে থাকতে উপদেশ দেন নি। সে বাণী জাতকে গতিহীন ও পঙ্গু হ'য়ে পড়ে থেকে তিলে তিলে মৃত্যুর অন্ধকারে তলিয়ে যেতে বলে নি। সে বাণী এই আত্মবিস্মৃত অবনত জাতকে ডেকে বলেছে তার দেশের প্রাচীন মহৎ স্মৃতি ও বৃহৎ ভাবের দ্বারা অণুপ্রাণিত হ'য়ে গোঁড়ামীর জড়তা পরিহার করে আদ্যোপান্ত সজীব ও সচেষ্ট হ'য়ে উঠতে। সে বাণী আমাদের অচলায়তনের মাটি আঁকড়ে স্থাণুর মত পড়ে থাকতে উপদেশ দেয় নি। আমাদের 'সচেষ্ট স্বাধীন হ'তে ও জীবন প্রবাহ পূর্ণ হ'তে ব'লেছে!

তারপর লেখিকা বলেছেন:—"এখন এই যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে, এই সেই সামাজিক স্বাধীনতার রূপ? পর সমাজের অনু-কৃতিকে কোনোমতেই কেহ সামাজিক স্বাধীনতার নাম দিতে পারেন না। স্বাধীন—এই কথার মধ্যেই এই স্বা-ধী-ন-তা শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া প্রকট হইতেছে। তাহা স্ব-অধীনতা, স্বেচ্ছাচার নয়।'

স্বাধীনতার অর্থ যে স্ব-অধীনতা এটা যদি এদেশের মেয়েরা বুঝতো তা'হলে এমন নির্বিবাদে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মনুষ্যত্ব সঙ্কোচক বিধিবিধান মেনে চলতে পারতোনা। বিশ্ব সভায় নিজেদের স্থান ক'রে নেবার জন্য অগ্রসর হ'য়ে যেত। স্থাবর সম্পত্তির মত এমন জড় ও অচল হ'য়ে পড়ে থাকত না। সর্ব্ব বিষয়ে এমন পরমুখাপেক্ষিণী অসহায়া হ'য়ে ধিকৃত অপমানিত জীবন যাপন ক'রতে পারত না। যারা সংস্কারকে ভয়

করে তাদের সে গোঁড়ামী দাসমনোভাবেরই পরিচায়ক। এবং এই মনোভাব থেকেই তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীনা মেয়েদের স্বেচ্ছাচারিণী অথবা স্বৈরিণী ব'লতেও লজ্জাবোধ করে না। লেখিকা উপদেশ দিয়েছেন—

"ভারতীয়া নারী স্বতন্ত্রা, বিলাসিনী, স্বেচ্ছাচারের স্রোতে আত্ম-নিমজ্জিতা, "নহ মাতা নহ কন্যা নহ ভগ্নী শুধুই প্রেয়সী" এই আদর্শে গঠিতা হইবেন না। তিনি কন্যা ভগ্নী গৃহিণী এবং জননী। তিনি প্রথমে আদর্শ সতী তারপর সুপুত্রের মাতা। তিনি স্বামীর সহধর্ম্মিণী-রূপে গৃহে এবং বাহিরে, সংসারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই তাঁহার অনুবর্ত্তনশীলা হউন, কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।"

দুঃখের বিষয় যে একজন প্রবীণা নারীকে একথা আজ স্মরণ করিয়ে দিতে হ'চ্ছে যে একমাত্র রূপোপজীবিনী ভিন্ন কোনো দেশের কোনো সমাজের নারীই "নহ মাতা নহ কন্যা নহ ভগ্নী শুধুই প্রেয়সী" এই আদর্শে গঠিতা নন এবং হ'তেও পারেন না। সকল দেশের সকল সমাজের সকল ভদ্র পরিবারের দুহিতারাই যথাক্রমে কন্যা ভগিনী গৃহিণী ও জননীই হ'য়ে থাকেন। আর, 'আদর্শ সতী' শাস্ত্রের কারখানায় তৈরী হয়না বা 'অর্ডার' দিয়েও গহনার মত বা গৃহের আসবাবের মত গড়িয়ে নেওয়া চলেনা। 'আদর্শ সতী' তাঁরাই হ'তে পারেন যাঁরা আদর্শ পতির পুণ্য প্রেমলাভে ধন্যা ও সৌভাগ্যবতী। সতীত্ব সেখানে নারীর মুক্ত মনের স্বভাবসুলভ ও প্রকৃতিজাত গুণ হ'য়ে ওঠে। নইলে, বাধ্যতামূলক যে সতীত্ব বৃত্তি তা যেমনি কৃত্রিম তেমনি অশ্রদ্ধেয়। সে মিথ্যা সতীত্বের কোনো মর্য্যাদাই থাকতে পারে না। থাকা উচিতও নয়।

সুপুত্রের জননীও কেবলমাত্র সেই সকল নারীর পক্ষেই হওয়া সম্ভব যাঁরা নিজেরা সকল রকম শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান ও বিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করে, সন্তানের জীবন ও চরিত্র গঠনের গুরুভার ও দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ সমর্থ। নচেৎ, অশিক্ষিতা যাঁরা—বা অসম্পূর্ণ জ্ঞান যাঁদের—সে সকল নারী শুধু পুত্রের গর্ভধারিণী মাত্র হ'তে পারেন। সে পুত্র 'সু' বা 'কু' হওয়া সম্পূর্ণ তাঁদের ভাগ্যের উপরই নির্ভর করে। তাঁদের কৃতীত্ব তাতে বিন্দুমাত্র নেই।

'ঘরে বাইরে সংসারে সমাজে রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই সহধর্ম্মিণীরূপে স্বামীর অনুবর্ত্তনশীলা' হতে হ'লেও সে স্ত্রীকে আগে সকলদিক দিয়ে যোগ্যতা অর্জ্জন করে যোগ্য স্বামীর উপযুক্তা স্ত্রী হবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। কিন্তু লেখিকা যখন অপ্রাপ্ত বয়স্কা ও অপরিণত বুদ্ধি বালিকা বিবাহেরই পক্ষপাতিনী তখন এ উপদেশ তাঁর মুখে নিতান্তই নিরর্থক ও হাস্যকর শোনায় না কি? তার উপর,—"কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়" এই ব'লে তিনি যে রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা দিয়েছেন তা' পড়ে কেবলই মনে হ'চ্ছে আমাদের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদের সেই Safe-guard রেখে ভারতকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়ার কথা! তাঁর এই নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে সর্ব্বপ্রকারে বিলোপ করে দিয়ে তার মাথায় বাধ্যতামূলক সতীত্বের গৌরবহীন মুকুট পরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব আমরা কোনমতেই সুযুক্তি বলে অনুমোদন ক'রতে পারলেম না। তিনি হয়ত জানেন না যে আইন-কানুন বা বাঁধা-ধরা একটা কিছু জবরদস্ত বিধান ক'রে কোনো মানুষের অন্তরাত্মাকে আয়ত্ত করা যায় না। কেবলমাত্র ভারতীয় নারী কেন, যে কোনো দেশের যে কোনো সমাজের নারীই তার নিজের অক্ষুণ্ণ স্বাতন্ত্র্য নিয়েও স্বামীর গভীর প্রেম ও অনুরাগের প্রভাবে আপন অন্তরের বিবেক বুদ্ধি প্রণোদিত হ'য়ে এবং সুশিক্ষার গুণে ও কর্ত্তব্য বোধে স্বেচ্ছায় স্বামীকে নিঃশেষে আত্মোৎসর্গ ক'রে দিয়ে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করে!

সে যাই হোক, 'নারীর স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়' এই মূল্যবান উপদেশ দেবার পরক্ষণেই লেখিকা কিন্তু আবার নারীদের জন্য বিপরীত ব্যবস্থাও নির্দ্দেশ করেছেন:—

"ভারত-সতীর একমাত্র কর্ত্তব্য তার স্বামীর ধর্ম্মের সহায়তা করা, কিন্তু তাঁর অধর্ম্মেরও অনুবর্ত্তন করা ইহা সতীধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। এইখানে অনেকেই ভ্রম করিয়া থাকেন, স্বামীর অধর্ম্মকে তিনি অনুসরণ করিতে বাধ্য নহেন; যেহেতু স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী! তাঁর সংশ্রব তাঁর ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে; অধর্ম্ম জীবনে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

ভারত নারীকে যদি 'সর্ব্বথাই স্বাতন্ত্র্য পরিবর্জ্জনের' উপদেশ দেওয়া হ'ল, এবং প্রথমেই তাকে 'আদর্শ সতী' হ'তে হবে বলা হ'ল, আর, সর্ব্ব বিষয়ে সকল অবস্থায় স্বামীর ধর্ম্মের সহায়তা করাই যদি তার 'একমাত্র কর্ত্তব্য' বলে নির্দ্দেশ করা হ'ল, তাহ'লে 'পতি পরম গুরুর' অন্যায় বা অধর্ম্মের বিচার ক'রতে ব'সবে সে কোন্ অধিকারে? এবং, অধার্ম্মিক স্বামীর সংশ্রব ত্যাগ ক'রে তার সম্পূর্ণ অপরিচিতা হ'য়ে সে দাঁড়াবেই বা কার আশ্রয়ে? আর যদিই বা দাঁড়াতে পারে, তাহ'লে তার 'আদর্শ সতী ধর্ম্ম' অক্ষুণ্ণ থাকে কেমন করে? এখানে যে নারীর সর্ব্বথা নিষিদ্ধ সেই 'স্বাতন্ত্র্য' দোষ এসে পড়বে! এবং 'বৈদেশিকদের অনুকরণে' 'সেপারেশন্' দোষও ঘটে যাবে! ভারতীয়া নারী এবং আদর্শ সতী হ'য়ে কি এ স্পর্দ্ধা তার কখনো হ'তে পারে? 'লক্ষ্যহীরা' প্রভৃতি 'আদর্শ সতীর' উপাখ্যান তাহ'লে রচিত হ'তনা। ঘোর অধার্ম্মিক পাষণ্ড ব্যাভিচারী লম্পট ও কুৎসিত রোগগ্রস্ত স্বামীর প্রতিই বিশেষভাবে প্রেম ও ভক্তি সম্পন্না হ'তে পারাই যে লেখিকা-উল্লিখিত ভারতীয়া নারীর আদর্শ সতীত্বের চরম নিদর্শন! সর্ব্বথা স্বাতন্ত্র্য পরিবর্জ্জন মানেইত 'নির্ব্বিচার পাতিব্রত্য!' ভারত নারী যদি পতির কার্য্যের সমালোচনা ক'রে তার মধ্যে অধর্ম্ম নিরূপণ ক'রতে বসে, এবং স্বামীর যা কিছু আদেশ বা ইচ্ছা তা পালন না ক'রে, অর্থাৎ, তাঁর কোনো অধর্ম্মের সহায়তা না ক'রে নিজের বিবেক ও বিচার বুদ্ধিতে পতির অবাধ্য হ'য়ে অপরিচিতের ন্যায় দূরে সরে দাঁড়ায় তাহ'লে লেখিকার বিবৃত 'ভারত সতীর বৈশিষ্ট্য' বজায় থাকে কেমন ক'রে?

অতএব, 'নারীর কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে কেন যে প্রশ্ন ওঠে আশা করি প্রবন্ধ লেখিকা এইবার তা বুঝতে পারবেন। এবং ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে উপদেশ দেবার সময় এমন করে আর প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগ নিয়ে প্রমাদের সৃষ্টি, বর্ত্তমান সমস্যাকে অবজ্ঞা ও দেশকালের প্রভাবকে নিশ্চয়ই তিনি অবহেলা করবেন না বলে মনে হয়।

জন্মান্তরবাদ

ডাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র এল্-এম্-এস্

দেহ ও দেহী সম্পূর্ণ পৃথক। যাহাকে আমরা 'আমি' বলি তিনিই দেহী বা আত্মা। আর্য্য ঋষিগণ বলেন এই আত্মার ধ্বংস নাই; ইনি অবিনশ্বর। অনন্ত কাল হইতে ইনি বিদ্যমান থাকিয়া সংসার মধ্যে অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং যত দিন ইঁহার মুক্তি না হইবে, তত দিন আরো বহু শত জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথাদেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥"

জীব এই দেহে যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা এই তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, দেহান্তর প্রাপ্তিও তাহার সেইরূপ একটি অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র। এই অবস্থান্তর প্রাপ্তিতে ধীর ব্যক্তি কখন মুহ্যমান্ হ'ন না।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া আবার একখানি নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া আর একটি নূতন দেহ গ্রহণ করেন।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি
নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো।
ন শোষয়তি মারুতঃ ॥"

এই আত্মাকে অস্ত্র ছেদন করিতে পারে না; অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে সিক্ত করিতে পারে না; বায়ুও ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।

একটি কাচকূপীর মধ্যে যেমন কতকগুলি মধুকরকে প্রবিষ্ট করাইয়া উহার মুখ আবদ্ধ করিয়া দিলে, ঐ মক্ষিকাগুলি কেহ উহার ঊর্দ্ধে কেহ মধ্যে এবং কেহ বা অধোদেশে গমন করে, কিন্তু উহা হইতে কেহ বহির্গত হইতে পারে না, সেইরূপ জীব শুভাশুভ কর্ম্মদ্বারা কেহ নরলোক, কেহ দেবলোক এবং কেহ বা তির্য্যাগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু কেহই পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

আর্য্য ঋষিগণ বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে—

"স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাং চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ ॥"

বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ।

জীব ২০ লক্ষ বার স্থাবর জন্ম, ৯ লক্ষ জলজ, ৯ লক্ষ কূর্ম্ম, ১০ লক্ষ পক্ষী, ৩০ লক্ষ পশু এবং ৪ লক্ষ বার বানর জন্ম গ্রহণ করিয়া অবশেষে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয় এবং কার্য্য করিতে থাকে। ইহার পরে সে দ্বিজত্ব লাভ করে এবং সর্ব্বশেষে ব্রহ্মযোনি প্রাপ্ত হয়।

আত্মা দেহ হইতে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া যতই উন্নত দেহ অধিকার করে ততই তাহার আত্মিক শক্তির বিকাশ অধিক পরিমাণে হইতে থাকে।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ জন্মান্তর স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যখন আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের সহিত চৈতন্য বা আত্মার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন সমগ্র দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলে বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট হইলে, চৈতন্য আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে? চৈতন্য না থাকিলে আত্মার অস্তিত্ব কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

আবার কোন একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন মানুষের সকল ভয়ের মধ্যে মরণ ভয়ই প্রধান। এই মরণ ভয় হইতে কোন প্রকারে নিষ্কৃতি নাই বুঝিয়া শাস্ত্রকর্ত্তারা কল্পনা করিয়া লইয়াছেন মানুষ মরিয়াও মরে না; তাহার দেহ নষ্ট হয় বটে কিন্তু আত্মা জন্মান্তর পরিগ্রহ করে।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের এই সকল যুক্তি নিতান্ত ভিত্তিহীন। একটু স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের সহিত আত্মা বা চৈতন্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই।

এমিবা নামক সর্ব্ব নিম্নস্তরের এককোষ জীবের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল আছে বলিয়া মনে হয় না; অথচ উহাদের আমিত্ববোধ রহিয়াছে। উহারা নিজের ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে।

এরূপ শুনা গিয়াছে—মানুষের মৃত্যু হইয়াছে। চিকিৎসক উহাকে মৃত বলিয়া মত দিয়াছেন। প্রতিবেশীরা শ্মশানে শব লইয়া যাইবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। এমন সময় শব একটু নড়িয়া উঠিল। তখন সকলে তাহার মুখে অল্প অল্প জল দিন; সেও জলটুকু গলাধঃকরণ করিল। ক্রমে তাহার নাড়ী পাওয়া গেল; অল্পক্ষণ পরে সে ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিল। পরে ঐ ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া তাহার মৃত অবস্থায় যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সমস্তই বলিতে লাগিল।

ঐ ব্যক্তির হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছিল; মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল অসাড় হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে অবস্থাতেও তাহার ভিতরের চৈতন্য বিলুপ্ত হয় নাই। চৈতন্য বিলুপ্ত হইলে সে কখনই পরে সকল কথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারিত না।

পঞ্জাবের সাধু হরিদাস নামক যোগীর কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। ইঁহার অলৌকিক শক্তি তৎকালীন পলিটিক্যাল এজেন্ট কাপ্তেন ওয়েড,

ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর, ডাক্তার মারে প্রভৃতি অনেক পদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইঁহাকে সুদীর্ঘ কাল মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। যে সময়ে ইঁহাকে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আনা হইল তখন দেখা গেল যোগী-দেহে চৈতন্য বা জীবনীশক্তির কোন লক্ষণ নাই; তিনি যে জীবিত আছেন তাহা কোন ক্রমে বুঝা যায় না; অথচ দেহটি পচিয়া যায় নাই। বাহিরে আসিয়া তিনি ক্রমশঃ আবার পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের সহিত যে চৈতন্যশক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে এ ধারণা ভ্রমাত্মক। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ আত্মার কার্য্য করিবার এক একটি যন্ত্র মাত্র। চক্ষু কর্ণ ইহারা কেহই কিছু করে না; আত্মাই দেখেন ও শুনেন। উহারা আত্মার দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়। এইরূপ স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্ক আত্মার দেহ চালাইবার ও চৈতন্য প্রকাশ করিবার এক একটি যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মৃত্যু শব্দের অর্থ আত্মার বিনাশ নহে; দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ মাত্র। তৃণ জলৌকা যেমন একটি তৃণের অন্তে গিয়া অন্য তৃণ আশ্রয় করে, আত্মাও সেইরূপ এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপেই জীবের গতাগতি।

"জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"। গীতা ২।২৭

প্রারব্ধ কর্ম্ম-ভোগের জন্যই আমাদের দেহ ধারণ ও সংসারে যাতায়াত। এই কর্ম্মফল ভোগের নাম অদৃষ্ট। পাপী পুণ্যবান্ সকলকেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে।

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।"

মহাভারতে উক্ত আছে—

"যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি-মাতরং।
তথা পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি।"

অর্থাৎ সহস্র গাভীর মধ্যে বৎস যেমন আপন মাতাকে বাছিয়া লয়, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মও সেইরূপ কর্ত্তাকে অনুসরণ করে।

কর্ম্ম ত্রিবিধ; প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ। যে সকল কর্ম্ম ফলোন্মুখ হইয়াছে, যাহাদের ভোগের জন্য এই দেহ ধারণ, সেইগুলি প্রারব্ধ কর্ম্ম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত যে সকল কর্ম্ম সঞ্চিত আছে, তাহাই সঞ্চিত কর্ম্ম এবং যে কর্ম্ম এই জন্মে আমরা করিতেছি, তাহা ক্রিয়মাণ। প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মে আমাদের আর হাত নাই; উহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। ক্রিয়মাণ কর্ম্মে আমাদের স্বাধীনতা আছে। উহা ভাল কি মন্দ তাহা আমরা বিচার করিয়া করিতে পারি। যদি এ স্বাধীনতা মানুষের না থাকিত, তাহা হইলে মানুষের দায়িত্ব থাকিত না;—মানুষ জড় পদার্থ হইত। "সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ"—ইত্যাদি শাস্ত্রকর্ত্তাদের উপদেশ যদি আমাদের পালন করিবার শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই ঐরূপ উপদেশ দিতেন না।

জন্মান্তর প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও অনুমানসিদ্ধ। এই সংসারে কেহ জন্মাবধি সুখী, কেহ জন্মকাল হইতে দুঃখী। আবার এমনও দেখা যায়—দক্ষিণহস্ত-বামহস্ত-জ্ঞানহীন মূর্খ বিনা ক্লেশে প্রভূত ধনের অধিকারী; অপর পক্ষে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম করিয়াও জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হইতেছে না। কেহ বিনা চেষ্টায় রাজ্যলাভ করে; আবার কাহার সর্ব্বস্ব অগ্নি বা তস্করে লয়। কেহ জন্মাবধি দেবভক্ত; কেহ নাস্তিকশিরোমণি। কেহ শান্ত, শিষ্ট, সাধু; কেহ বা দুষ্ট, শঠ, তস্কর। কেহ আবাল্য রোগী, কেহ সারা জীবন স্বাস্থ্যসুখে সুখী। কোন বালক হয় ত এরূপ বুদ্ধিমান যে একবার পাঠ বলিয়া দিলেই বুঝিতে পারে। আবার কোন বালক এরূপ জড়বুদ্ধি যে শিক্ষকের বেত্রাঘাতেও তাহার মস্তিষ্কে ক অক্ষর প্রবেশ করে না। এই বৈষম্যের কারণ কি? ঈশ্বর ত সর্ব্বশক্তিমান্; তিনি ত করুণাময়। তিনি ত বলিয়াছেন—সকল জীবই আমার কাছে সমান; কেহ প্রিয়, কেহ অপ্রিয় নাই।

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

গীতা ৯।২৯

তবে জগতে এই বৈষম্যের অবতারণা করিলেন কেন? হিন্দুরা ইহার উত্তরে বলেন পূর্ব্বজন্মে যে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তদনুরূপ ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। নতুবা ইহা কখন ভগবানের স্বেচ্ছাচারিতার ফল হইতে পারে না। ঈশ্বর কর্ম্মানুসারে প্রত্যেক লোকের পুরস্কার ও দণ্ডবিধান করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই।

আপত্তি হইতে পারে যে, কর্ম্মফলই যদি আমাদের সুখ দুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মের কথা আমাদের স্মরণ থাকে না কেন? ইহার উত্তর এই, স্মৃতি মস্তিষ্কের সহিত জড়িত। পূর্ব্বজন্মে আমরা যে মস্তিষ্ক লইয়া জন্মিয়াছিলাম, মৃত্যুর সঙ্গে সে মস্তিষ্ক ধ্বংস হইয়াছে। এখন যে মস্তিষ্ক পাইয়াছি তাহা এ জন্মে প্রাপ্ত। এ জন্মের মস্তিষ্কের দ্বারা পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ হইবে কি প্রকারে? তবে পূর্ব্বজন্মের ঘটনা সচরাচর আমাদের স্মরণ-পথে না আসিলেও উহার একটা সংস্কার আমাদের মনে রহিয়া যায়। সকলেই দেখিয়াছেন—সদ্যোজাত হংস-শাবক জলে সন্তরণ করিতে পারে; গোবৎস দৌড়াইতে পারে, বানর-শিশু বৃক্ষশাখা ধরিয়া আত্মরক্ষা করে। এ বিদ্যা উহারা কোথা হইতে শিখিল? ইহা জন্মান্তরের অভ্যাসজনিত সংস্কার।

সময়ে সময়ে সংবাদপত্রে এক একটি অদ্ভুত শিশুর কথা পাঠ করা যায়। ঐ সকল শিশু অপরিণত বয়সে, বিনা শিক্ষায় এমন এক একটি আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় দেয়, যাহা শুনিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। পৃথিবীর অন্য দেশের কথা বলিব না। যাহা আমাদের দেশের ঘটনা, যাহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ নাই, সেইরূপ দুই একটি উদাহরণ দিব। মাষ্টার মদনের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। এই অদ্ভুত বালক ৫ বৎসর বয়সে যে সঙ্গীত-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্যগণ আশ্চর্য্যান্বিত হন।

আর একটি বাঙ্গালী বালক; ইঁহার নাম সোমেশচন্দ্র বসু। ইনি ৮ বৎসর বয়সে বড় বড় গুণন মুখে মুখে কসিয়া দিতেন।

এই সকল শক্তি নিশ্চয়ই জন্মান্তরীণ সংস্কারের ফল। নতুবা এই সমস্যার অন্য কি সমাধান হইতে পারে?

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিশুর স্তন্য পানে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ব্যতীত শিশুর এ প্রবৃত্তি কেমন করিয়া আসিতে পারে? ক্ষুধার্ত্ত হইলে স্তন্যপানেই ক্ষুধার শান্তি হইবে—এ কথা তাহাকে কে শিখাইল? এবং স্তন্যপানের প্রক্রিয়াই বা সে কেমন করিয়া জানিল? পূর্ব্ব অভ্যাসের স্মৃতিই তাহাকে এই প্রবৃত্তি আনিয়া দেয়।

বিপক্ষবাদীরা বলেন—লৌহ যেমন অভ্যাস ব্যতীত চুম্বকের দিকে গমন করে, শিশুও সেইরূপ অভ্যাস ব্যতীত স্তন্য পান করিতে অভিলাষ করে। কিন্তু তাঁহাদের এ কথা একেবারেই যুক্তিহীন; কারণ লৌহ যেমন চুম্বকের নিকটস্থ হইলেই সর্ব্ব সময়ে তাহার দিকে ধাবিত হয়, ইহাতে তাহার কোন প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি নাই; শিশুর পক্ষে সেরূপ নহে। সে সর্ব্ব সময়ে স্তন্য পানে অভিলাষ করে না। ক্ষুধার্ত্ত হইলেই তাহার এই প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন এই সংসার দেখিল, তখনই সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে কত জ্ঞান জন্মিল; কত হর্ষ শোক ভয় মনে উৎপন্ন হইল। এই বিশ্ব যদি তাহার পূর্ব্বে দেখা না থাকিত, তাহা হইলে জগৎ দেখিয়া তাহার কোন জ্ঞানই হইত না; হর্ষ ভয় প্রভৃতিও মনে আসিত না।

গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ"।

হে অর্জ্জুন, তোমার ও আমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে। সে কথা আমার মনে আছে কিন্তু তোমার তাহা মনে নাই।

দেখা যায় জীবমাত্রেই মরিতে ভয় করে। এমন কি সদ্যোজাত শিশুরও মরণত্রাস আছে। মরণ যে অতি ভয়ঙ্কর, মরণে যে ভীষণ যন্ত্রণা আছে, ইহা জানা না থাকিলে, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে ভোগ করা না থাকিলে, মরণের নামে জীবের এত ভয় আসে কেন? দুঃখ অজ্ঞাত থাকিলে, দুঃখজ পদার্থে ভয় আসিতে পারে না। সুতরাং জীবের এই মরণত্রাসও পূর্ব্ব জন্মের কথা সপ্রমাণ করিয়া দেয়।

এইবার আমরা দুই একখানি বিলাতী পুস্তক হইতে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের কিছু কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

বিলাতের সুবিখ্যাত ডাক্তার Tanner তাঁহার "Practice of Medicine" নামক পুস্তকে এক ধর্ম্মযাজকের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই ইংরাজ পুরোহিত ইচ্ছা করিলে নিজ দেহে মৃত্যু-লক্ষণ আনিতে পারিতেন।

"Thus Celsus speaks of a priest who could seperate himself from his senses when he chose and lie like a man void of life and sense."—Tanner's Practice of Medicine", Vol. 1, Page 256.

ঐ পুস্তকের ঐ স্থানে Colonel Townshend নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ইচ্ছা-মৃত্যু সম্বন্ধে Dr. George Cheyne যে অদ্ভুত বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা আরো বিস্ময়কর। তিনি লিখিয়াছেন—

"We all three felt his pulse first; it was distinct though small and thready; and his heart had its usual beating. He composed himself on his back and lay in a still posture for some time; while I held his right-hand Dr. Baynard laid his hand on his heart and Mr. Skrine held a clean Looking-glass to his mouth. I found his pulse sink gradually, till at last I could not feel any by the most exact and nice touch. Dr. Baynard could not feel the least motion in his heart, nor Mr. Skrine the least soil of breath on the bright Mirror he held to his mouth. Then each of us by turn examinid his arm heart and breath, but could not by the nicest scrutiny discover the least symptom of life in him. We reasoned a long time about this odd appearance as well as we could, and all of us judging it inexplicable and unaccountable and finding he still continued in that condition we began to conclude that he had indeed carried the experiment too far and at last were satisfied he was actually dead and were just ready to leave him. This continued about half an hour. By 9 o' clock in the morning in antumn as we were going away, we observed some motion about the body and upon examination found his pulse and the motion of his heart gradually returning; he began to breathe gently and speak softly; we were all astonished to the last degree at this unexpected change and after some further conversation with him and among ourselves went away fully satisfied as to all the particulars of this fact but confounded and puzzled, and not able to form any rational scheme that might account for it."

ফরাসী দেশের সুবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ্ Charles Lancelin একটি শিশুর পুনর্জ্জন্মের কথা তাঁহার একখানি পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। এই শিশু পঞ্চম বৎসর বয়সে পঞ্চত্ব পায়। শিশুর মাতা সন্তানের শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। একদিন মাতা স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার সেই মৃত শিশু আসিয়া বলিতেছে যে, সে ও তাহার এক অল্পদিন-পূর্ব্বে-পরলোকগতা মাসী, শীঘ্রই যমজরূপে তাঁহার গর্ভে আসিবে। এই স্বপ্ন মাতা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই; কিন্তু কালে যখন তিনি যমজ সন্তান প্রসব করিলেন, তখন তাঁহার আর অবিশ্বাস রহিল না।

এরূপ স্বপ্নের কথা আমাদের দেশেও শুনিয়াছি। স্বপ্ন দর্শনের অল্প কাল পরে সেই নারী অন্তর্ব্বত্নীও হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়। সে স্বপ্ন 'অমূলক চিন্তামাত্র' বলিয়া এ দেশের লোক হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। কোনও কোনও ব্যক্তি জাতিস্মর—তাহারা পূর্ব্বজন্মের অনেক কথা স্মরণ করিতে পারে এবং অনেক ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিয়া থাকে। সংবাদ-পত্রে এরূপ ব্যক্তির কথাও পাঠ করা গিয়াছে—ইহা কাহারও কপোল-কল্পিত নহে।

গয়ায় হনুমানজীর মন্দির দেখিয়া মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পূর্ব্ব-জন্মের কথা স্মরণ হইয়াছিল। মন্দিরের নিকটস্থ একটি বৃক্ষে ছাল কাটিয়া তিনি পূর্ব্বজন্মে "ওঁ রামঃ" এই কথাটি লিখিয়াছিলেন। এ স্মৃতিও তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি অনুসন্ধান করিয়া ঐ বৃক্ষটি দেখিতে পান। তখনও বৃক্ষগাত্রে অক্ষর কয়টি একটু অস্পষ্টভাবে লিখিত ছিল। যোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামী তাঁহার শিষ্য উমাচরণবাবুকে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের সকল কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের দেশের কয়জন লোক এই সকল মহাপুরুষের কথায় আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করেন?

তীর্থ-যাত্রী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন, ১৪ই অক্টোবর

গভীর উদ্বেগের মধ্যে মনে আশা নিয়ে পুণা অভিমুখে যাত্রা করলেম। দীর্ঘপথ, যেতে যেতে আশঙ্কা বেড়ে ওঠে, পৌঁছে কী দেখা যাবে। বড়ো ষ্টেশনে একেই আমার সঙ্গী দুজনে খবরের কাগজ কিনে দেন—উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে দেখি। সুখবর নয়। ডাক্তারেরা বলচে মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা danger zoneএ পৌঁছেচে। দেহেতে মেদ বা মাংসের উদ্বৃত্ত এমন নেই যে দীর্ঘকালের ক্ষয় সহ্য হয়, অবশেষে মাংসপেশী ক্ষয় হতে আরম্ভ করেচে। Apoplexy হয়ে অকস্মাৎ প্রাণহানি ঘটতে পারে। সেই সঙ্গে কাগজে দেখচি দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে জটিল সমস্যা নিয়ে তাঁকে স্বপক্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে গুরুতর আলোচনা চালাতে হচ্চে। শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের অন্তর্গত রূপেই অনুন্নত সমাজকে রাষ্ট্রনৈতিক বিশেষ অধিকার দেওয়া বিষয়ে দুই পক্ষকে তিনি রাজি করেচেন। দেহের সমস্ত যন্ত্রণা দুর্ব্বলতাকে জয় করে তিনি অসাধ্য সাধন করেচেন, এখন বিলেত হতে এই ব্যবস্থা মঞ্জুর হওয়ার উপর সব নির্ভর করচে। মঞ্জুর না হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না, কেননা প্রধান মন্ত্রীর কথাই ছিল অনুন্নত সমাজের সঙ্গে একযোগে হিন্দুরা যে ব্যবস্থা মেনে নেবে তাকে তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য।

আশানৈরাশ্যে আন্দোলিত হয়ে ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতে আমরা কল্যাণে পৌঁছলেম। সেখানে শ্রীমতী বাসন্তী ও শ্রীমতী উর্ম্মিলার সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা অন্য গাড়ীতে কলিকাতা থেকে কিছু পূর্ব্বে এসে পৌঁচেচেন। কালবিলম্ব না করে আমাদের ভাবী গৃহস্বামিনীর প্রেরিত মোটর গাড়ীতে চড়ে পুণার পথে চল্লেম।

পুণার পার্ব্বত্য পথ রমণীয়। পুরদ্বারে যখন পৌঁছলেম, তখন সামরিক অভ্যাসের পালা চলেচে—অনেকগুলি armoured car, machine gun এবং পথে পথে সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ চোখে পড়ল। অবশেষে শ্রীযুক্ত বিঠলভাই থ্যাকার্সে মহাশয়ের প্রাসাদে গাড়ী থামল। তাঁর বিধবা পত্নী সৌম্যসহাস্য মুখে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে চললেন। সিঁড়ির দুপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গান করে অভিনন্দন জানালেন।

গৃহে প্রবেশ করেই বুঝেছিলাম গভীর একটি আশঙ্কায় হাওয়া ভারাক্রান্ত। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার ছায়া। প্রশ্ন করে জানলেম মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। বিলাত হতে তখনও খবর আসেনি। প্রধান মন্ত্রীর নামে আমি একটি জরুরী তার পাঠিয়ে দিলেম।

দরকার ছিলনা পাঠাবার। শীঘ্রই জনরব কানে এল, বিলাত থেকে সম্মতি এসেচে। কিন্তু জনরব সত্য কি না তার প্রমাণ পাওয়া গেল বহু ঘণ্টা পরে।

মহাত্মাজির মৌনাবলম্বনের দিন আজ। একটার পরে কথা বলবেন। তাঁর ইচ্ছা সেই সময়ে আমি কাছে থাকি। পথে যেতে যারবেদা জেলের খানিক দূরে আমাদের মোটর গাড়ী আটকা পড়ল—ইংরেজ সৈনিক বললে কোন গাড়ী এগোতে দেবার হুকুম নেই। আজকের দিনে জেলখানায় প্রবেশের পথ ভারতবর্ষে প্রশস্ত বলেই তো জানি। গাড়ীর চতুর্দ্দিকে নানালোকের ভিড় জমে উঠল।

আমাদের পক্ষ হতে লোক জেলের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিতে খানিক এগিয়ে যেতেই শ্রীমান দেবদাস এসে উপস্থিত—জেল প্রবেশের ছাড়পত্র তাঁর হাতে। পরে শুনলেম মহাত্মাজি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কেননা তাঁর হঠাৎ মনে হয় পুলিশ কোথাও আমাদের গাড়ী আটকেচে, যদিও তার কোনো সংবাদ তাঁর জানা ছিলনা।

লোহার দরজা একটার পর একটা খুলল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। সামনে দেখা যায় উঁচু দেয়ালের ঔদ্ধত্য, বন্দী আকাশ, সোজা লাইন করা বাঁধা রাস্তা, দুটো চারটে গাছ।

দুটো জিনিষের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে বিলম্বে

ঘটেচে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পেরিয়ে ঢুকেছি সম্প্রতি। জেলখানায় প্রবেশে আজ বাধা ঘটলেও অবশেষে এসে পৌঁছন গেল।

বাঁ দিকে সিঁড়ি উঠে দরজা পেরিয়ে দেয়ালে-ঘেরা একটী অঙ্গনে প্রবেশ করলেম। দূরে দূরে দু-সারি ঘর। অঙ্গনে একটি ছোট আমগাছের ঘনছায়ায় মহাত্মাজি শয্যাশায়ী।

মহাত্মাজি আমাকে দুই হাতে বুকের কাছে টেনে নিলেন—অনেকক্ষণ রাখলেন। বললেন, কত আনন্দ হল।

শুভ সংবাদের জোয়ার বেয়ে এসেচি এজন্য আমার ভাগ্যের প্রশংসা করলেম তাঁর কাছে। তখন বেলা দেড়টা। বিলাতের খবর ভারতময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে—রাজনৈতিকের দল তখন সিমলায় দলিল নিয়ে প্রকাশ্য সভায় আলোচনা করছিলেন পরে শুনলেম। খবরের কাগজওয়ালারাও জেনেচে। কেবল যাঁর প্রাণের ধারা প্রতি মুহূর্তে শীর্ণ হয়ে মৃত্যুসীমায় সংলগ্নপ্রায় তাঁর প্রাণসঙ্কট-মোচনের যথেষ্ট সত্বরতা নাই। অতি দীর্ঘ লাল ফিতের জটিল নির্ম্মমতায় বিস্ময় অনুভব করলেম। সওয়া চারটে পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রতিক্ষণ বেড়ে চলতে লাগল। শুনতে পাই দশটার সময় খবর পুণায় এসেছিল।

চতুর্দ্দিকে বন্ধুরা রয়েচেন। মহাদেব, বল্লভভাই, রাজগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এঁদের লক্ষ্য করলেম। শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ এবং সরোজিনীকে দেখলেম। জওহরলালের পত্নী কমলাও ছিলেন।

মহাত্মাজির স্বভাবতঃই শীর্ণ শরীর শীর্ণতম, কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যায় না। জঠরে অম্ল জমে উঠেচে তাই মধ্যে মধ্যে সোডা মিশিয়ে জল খাওয়ানো হচ্চে। ডাক্তারদের দায়িত্ব অতিমাত্রায় পৌঁছেচে।

অথচ চিত্তশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি, চিন্তার ধারা প্রবহমান, চৈতন্য অপরিশ্রান্ত, প্রায়োপবেশনের পূর্ব্ব হতেই কত দুরূহ ভাবনা, কত জটিল আলোচনায় তাঁকে নিয়ত ব্যাপৃত হতে হয়েচে। সমুদ্রপারের রাজনৈতিকদের সঙ্গে পত্র ব্যবহারে মনের উপর কঠোর ঘাত-প্রতিঘাত চলেচে। উপবাসকালে নানান দলের প্রবল দাবী তাঁর অবস্থার প্রতি মমতা করেনি, তা সকলেই জানেন। কিন্তু মানসিক জীর্ণতার কোন চিহ্নই তো নেই। তাঁর চিন্তার স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রকাশধারায় আবিলতা ঘটেনি। শরীরের কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েও আত্মার অপরাজিত উদ্যমের এই মূর্ত্তি দেখে আশ্চর্য্য হতে হল। কাছে না এলে এমন করে উপলব্ধি করতেম না কত প্রচণ্ড শক্তি এই ক্ষীণদেহ পুরুষের।

আজ ভারতবর্ষের কোটি প্রাণের মধ্যে পৌঁছল মৃত্যুর বেদীতলশায়ী এই মহৎ প্রাণের বাণী। কোনো বাধা তাকে ঠেকাতে পারলনা; দূরত্বের বাধা, ইঁটকাঠপাথরের বাধা, প্রতিকূল পলিটিক্সের বাধা, বহু শতাব্দীর জড়ত্বের বাধা আজ তার সামনে ধূলিসাৎ হোলো।

মহাদেব বললেন, আমার জন্যে মহাত্মাজি একান্তমনে অপেক্ষা করছিলেন। আমার উপস্থিতি দ্বারা রাষ্ট্রিক সমস্যার মীমাংসা সাধনে সাহায্য করতে পারি এমন অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাঁকে যে তৃপ্তি দিতে পেরেচি, এই আমার আনন্দ।

সকলে ভিড় করে দাঁড়ালে তাঁর পক্ষে কষ্টকর হবে মনে ক'রে আমরা সরে গিয়ে বসলেম। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করচি কখন খবর এসে পৌঁছবে। অপরাহ্নের রৌদ্র আড় হয়ে পড়েচে ইঁটের প্রাচীরের উপর। এখানে ওখানে দুচারজন শুভ্র খদ্দর-পরিহিত পুরুষ নারী শান্তভাবে আলোচনা করচেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় কারাগারের মধ্যে সংযত এই জনতা। কারো ব্যবহারে প্রশ্রয়জনিত শৈথিল্য নেই। চরিত্রশক্তি বিশ্বাস আনে—জেলের কর্ত্তৃপক্ষ তাই শ্রদ্ধা করেই এঁদের সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মেলামেশা করতে দিতে পেরেচেন। এঁরা মহাত্মাজির প্রতিশ্রুতির প্রতিকূলে কোনো সুযোগ গ্রহণ করেননি। আত্মমর্য্যাদার দৃঢ়তা এবং অচাঞ্চল্য এঁদের মধ্যে পরিস্ফুট। দেখলেই বোঝা যায় ভারতের স্বরাজ্য সাধনার যোগ্য সাধক এঁরা।

অবশেষে জেলের কর্ত্তৃপক্ষ গবর্ণমেণ্টের ছাপ-মারা মোড়ক হাতে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখেও আনন্দের আভাষ পেলুম। মহাত্মাজি গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন। সরোজিনীকে বললেম, এখন ওঁর চার পাশ থেকে সকলের সরে যাওয়া উচিত। মহাত্মাজি পড়া শেষ করে বন্ধুদের ডাকলেন। শুনলেম তিনি তাঁদের আলোচনা করে দেখতে বললেন এবং নিজের তরফ থেকে জানালেন কাগজটা ডাক্তার আম্বেদকরকে দেখানো দরকার, তাঁর সমর্থন পেলে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হবেন।

বন্ধুরা একপাশে দাঁড়িয়ে চিঠিখানি পড়লেন। আমাকেও দেখালেন। রাষ্ট্রবুদ্ধির রচনা, সাবধানে লিখিত, সাবধানেই পড়তে হয়। বুঝলেম মহাত্মাজির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ নয়। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর পরে ভার দেওয়া হল চিঠিখানির বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মহাত্মাজিকে শোনাবেন। তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় মহাত্মাজির মনে আর কোনো সংশয় রইল না। প্রায়োপবেশনের ব্রত উদ্‌যাপন হল।

প্রাচীরের কাছে ছায়ায় মহাত্মাজির শয্যা সরিয়ে আনা হল। চতুর্দ্দিকে জেলের কম্বল বিছিয়ে সকলে বসলেন। লেবুর রস প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী কমলা নেহেরু। Inspector General of Prisons—যিনি গবর্ণমেণ্টের পত্র নিয়ে এসেছেন—অনুরোধ করলেন রস যেন মহাত্মাজিকে দেন শ্রীমতী কস্তুরীবাই নিজের হাতে। মহাদেব বললেন—"জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো"—এই গীতাঞ্জলীর গানটি মহাত্মাজির প্রিয়। সুর ভুলে গিয়েছিলেম। তখনকার মতো সুর দিয়ে গাইতে হলো। পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী বেদ পাঠ করলেন। তারপর মহাত্মাজি শ্রীমতী কস্তুরীবাইয়ের হাত হতে ধীরে ধীরে লেবুর রস পান করলেন। পরিশেষে সবরমতী আশ্রমবাসিগণ এবং সমবেত সকলে "বৈষ্ণব জন কো" গানটী গাইলেন। ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ হল—সকলে গ্রহণ করলেম।

জেলের অবরোধের ভিতর মহোৎসব। এমন ব্যাপার আর কখনো ঘটেনি। প্রাণোৎসর্গের যজ্ঞ হল জেলখানায়, তার সফলতা এইখানেই রূপ ধারণ করলে। মিলনের এই অকস্মাৎ আবির্ভূত অপরূপ মূর্ত্তি একে বলতে পারি যজ্ঞসম্ভবা।

রাত্রে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রমুখ পুণায় সমবেত বিশিষ্ট নেতারা এসে আমাকে ধরলেন, পরদিন মহাত্মাজির বার্ষিকী উৎসবসভায় আমাকে সভাপতি হতে হবে, মালব্যজীও বোম্বাই হতে আসবেন। মালব্যজীকেই সভাপতি করে, আমি সামান্য দুচার কথা লিখে পড়ব এই প্রস্তাব করলেম। শরীরের দুর্ব্বলতাকেও অস্বীকার করে শুভদিনের এই বিরাট জনসভায় যোগ দিতে রাজি না হয়ে পারলেম না।

বিকালে শিবাজি মন্দির নামক বৃহৎ মুক্ত অঙ্গনে বিরাট জনসভা। অতি কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করলেম। ভাবলেম অভিমন্যুর মতো প্রবেশ তো হোলো, বেরোবার কী উপায়। মালব্যজী উপক্রমণিকায় সুন্দর করে বোঝালেন তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায়, যে অস্পৃশ্যবিচার হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নয়। বহু সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁর যুক্তি প্রমাণ করলেন। আমার কণ্ঠ ক্ষীণ, সাধ্য নেই এত বড়ো সভায় আমার বক্তব্য শ্রুতিগোচর করতে পারি। মুখে মুখে দুচারটি কথা বললেম, পরে রচনা পাঠ করবার ভার নিলেন পণ্ডিতজীর পুত্র গোবিন্দমালব্য। ক্ষীণ অপরাহ্ণের আলোকে



শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অদৃষ্টপূর্ব্ব রচনা অনর্গল অমন সুস্পষ্টকণ্ঠে পড়ে গেলেন এতে বিস্মিত হলেম।

আমার সমগ্র রচনা কাগজে আপনারা দেখে থাকবেন। সভায় প্রবেশ করবার অনতিপূর্ব্বে তার পাণ্ডুলিপি জেলে গিয়ে মহাত্মাজির হাতে দিয়ে এসেছিলেম।

মতিলাল নেহেরুর পত্নী কিছু বললেন তাঁর ভ্রাতা-ভগিনীদের উদ্দেশ করে, সামাজিক সাম্যবিধানের ব্রত-রক্ষায় তাঁদের যেন একটুও ত্রুটি না ঘটে। শ্রীযুক্ত

রাজগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ অন্যান্য নেতারাও অন্তরের ব্যথা দিয়ে দেশবাসীকে সামাজিক অশুচি দূর করতে আবাহন করলেন। সভায় সংবেত বিরাট জনসংঘ হাত তুলে অস্পৃশ্যতা নিবারণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। বোঝা গেল সকলের মনে আজকের বাণী পৌঁছেচে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এমন দুরূহ সঙ্কল্পে এত সহস্র লোকের অনুমোদন সম্ভব ছিলনা।

আমার পালা শেষ হল। পরদিন প্রাতে মহাত্মাজির কাছে অনেকক্ষণ ছিলাম। তাঁর সঙ্গে এবং মালব্যজীর সঙ্গে দীর্ঘকাল নানা বিষয়ে আলোচনা হল। একদিনেই মহাত্মাজি অপ্রত্যাশিত বল লাভ করেচেন, কণ্ঠস্বর তাঁর দৃঢ়তর, blood pressure প্রায় স্বাভাবিক। অতিথি অভ্যাগত অনেকেই আসচেন প্রণাম করে আনন্দ জানিয়ে যেতে। সকলের সঙ্গেই হেসে কথা কইচেন। শিশুর দল ফুল নিয়ে আসচে, তাদের নিয়ে তাঁর কী আনন্দ। বন্ধুদের সঙ্গে সামাজিক সাম্যবিধান প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা চলচে। এখন তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ভঞ্জন।

আজ যে মহাত্মার জীবন আমাদের কাছে বিরাট ভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল, তাতে সর্ব্বমানুষের মধ্যে মহামানুষকে প্রত্যক্ষ করবার প্রেরণা আছে।' সেই প্রেরণা সার্থক হোক্ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র।

মুক্তি-সাধনার সত্য পথ মানুষের ঐক্যসাধনায়। রাষ্ট্রিক পরাধীনতা আমাদের সামাজিক সহস্র ভেদবিচ্ছেদকে অবলম্বন করেই পুষ্ট।

জড়প্রথার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে উদার ঐক্যের পথে মানবসভ্যতা অগ্রসর হবে সেই দিন আজ সমাগত। *

—ফ্রী প্রেস।

* পুণা ভ্রমণ সম্পর্কে শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা।

শেষ স্মৃতি

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

"দেখ, ধর্ম্মে সইবে না, তা বলে দিচ্ছি !"

হাস্যরোলে কক্ষটি ভরিয়া গেল। অঙ্গ-প্রসাধন হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া পতি অধরচন্দ্র পত্নীর অনুযোগের উত্তরে বলিলেন, "কেন, অধর্ম্মটা কি করছি? দুটি প্রাণ—যেন দুটি কপোত-কপোতী—দুটি যাতে এক হয়ে যায়, তারই ত চেষ্টা করছি। এতে আমার কতটা ক্ষতি করছি, তা যদি বুঝতে, তা হলে দেবতারা দধীচিকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছিলো, তার চাইতেও বড় সার্টিফিকেট তোমরাই দিতে আমাকে।"

কাত্যায়নীর অধর-কোণে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি ঈষৎ শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "তা আর জানি না? সেই জন্যেই ত ওদের বাপ-বেটীকে কোথাও স্বস্তির নিশ্বেস ফেলতে দাও নি একদিনও। বাবা, বাঙ্গালা ছেড়ে পালালো, তাও রক্ষে আছে কি? দিল্লী দিল্লী—"

অধরচন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন, "আহা-হা, কত ধানে কত চাল তা তো বোঝ না। মেয়েমানুষ, মোট বয়ে এনে দিলে তবে ত সংসার চালাবে। তা সেটা আসে কোথেকে তার খোঁজ ত রাখতে হয় না।"

কাত্যায়নী বলিলেন, "উঃ, ভারী আমার পুরুষ মানুষ! দেখ, সোজা কথা বলি, রাজা উইলখানা করবার পর থেকেই না তোমার ধর্ম্মজ্ঞান জেগে উঠেছে, নইলে—যাক্, ওদের যা শাস্তি দিতে চাও দিও, কথা কইবো না। কিন্তু ছেলেটাকে পথে বসাবার চেষ্টা কোরো না, ধর্ম্মে সইবে না। আহা, মা-হারা ছেলে, এই কোলে-পিঠেই ত মানুষ হয়েছে। রাজার ছেলে—বাপের অমতে যদি গোঁ ধরে কাযটা করেই বসে—তা হলে বাপ-বেটায় মুখ দেখা-দেখি থাকবে ভেবেছ? মেজাজ ত দেখেছ, কেউ খাটো না কারু কাছে। আহা, ছেলেটার আর যাই দোষ থাকুক, আমায় কিন্তু মার মত—"

অধরচন্দ্র পুনরায় বাধা দিয়া ঈষৎ ক্রোধে বলিলেন,

"ভক্তি শ্রদ্ধা করে এই ত। আরে রাখ বাপু তোমার ঐ ধর্ম্মের কান্না! ও ভেন-ভেনানি ঢের শুনে আসছি। ওতে যদি কাণ দিতুম, তা হলে চন্দনপুরের বেণী রায়ের বেটা অধরচন্দ্র এসে আজ বিলাসপুর রাজবাড়ীতে বাসা বাঁধতে পারতো না, আর তোমাকেও গোয়াল নিকোনো ছেড়ে এসে আজ রাজার বেটার মায়ের জায়গা দখল করে বসতে হোতো না! বলে, কোলে-পিঠে মানুষ করেছে! আরে কোলে-পিঠে কাকেও কোকিলকে মানুষ করে থাকে, কিন্তু ডানা দেখা দিলেই কোকিল নিজের ঘরে উড়ে যায়। ওরে বাপু, বোঝাবো কত! যতদিন রয় সয়, ঘর ছেয়ে নাও নিজেদের—"

"ম্যানিজার বাবু! হুজুরালি তলব দিয়া আপনেকো," —বাহির হইতে রাজভৃত্যের আহ্বান আসিল। প্রসাধন-পর্ব্ব অসমাপ্ত থাকিতেই তলব—অধরচন্দ্রের মুখ চক্ষু অপ্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিলেও তিনি বলিলেন, "আচ্ছা যাও।"

ভৃত্য চলিয়া গেলে অসমাপ্ত প্রসাধন-কার্য্য ত্বরিত গতিতে সমাপ্ত করিতে করিতে অধরচন্দ্র বলিলেন, "তলব দিয়া! মাথা কিয়া! কি হ'ল আবার? ওয়ালটেয়ার থেকে ছোট রাণীর চিঠি এলো না কি? ছেলের রক্ত ওঠা বাড়লো না কি?"

কাত্যায়নী বলিলেন, "সেই ভাবনায় ত তোমার ঘুম হচ্ছে না দেখছি। হয়েছে ভাল! বাপ বাতে পঙ্গু, এক বেটা মহাল দেখবার নাম করে তোমার বুদ্ধি নিয়ে গেল সেই হাঘরে মেয়েটার সন্ধান করতে, আর একটা মরে সঙ্গে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে রাজ্যিময় বেয়রামের জন্যে, রাজবংশটায় যেন শাপমুক্তি আছে বাবু!"

অধরচন্দ্র তখন বিরলকেশ শীর্ষদেশে গোলাপ জলের শিশি খালি করিতেছিলেন। শ্বেতাভ গুম্ফরাজিতে শেষ একবার কসমেটিক মাখাইয়া তিনি প্রাচীর-বিলম্বিত বহুমূল্য দীর্ঘ দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সাজ-সজ্জার পারিপাট্য বিধান করিয়া তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। যাত্রাকালে বলিয়া গেলেন, "দেখ, ফিরতে হয় ত রাত হবে। ছুঁড়িটা কলকাতায় ফিরে এসেছে বলেছি ত। একবার তার খোঁজটা নিতে হবে।"

কাত্যায়নী আপন মনে বলিলেন, "কোন্ চুলোয় আর যাবে? ইস্কুলের মাষ্টারণীগিরি করা ছাড়া ওদের বরাতে আর কি জুটবে কলকাতায়? যাই, ওঁর সুটকেসটা খুলে জিনিষগুলো তুলে রাখিগে, ঘোরাঘুরির ত আর অন্ত নেই।"

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ মহামূল্য পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত। তাঁহার ব্যথাক্লিষ্ট নয়নযুগল কাতরতা জ্ঞাপন করিতেছিল। দুই বৎসর যাবৎ তিনি পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রভূত ধনবল তাঁহাকে উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।

রাজার ইঙ্গিতে রাজভৃত্যরা কক্ষত্যাগ করিয়া গেলে, রাজা অধরচন্দ্রকে বলিলেন, "বোসো। ফিকির করে মহলে ত পাঠালে তারে, কিন্তু সে যে উধাও!"

অধরচন্দ্র বিস্মিত হইবার ভান করিয়া বলিলেন, "উধাও? তার মানে?"

রাজা বলিলেন, "মানে-টানে অত বুঝি না বাপু—চিঠি এসেছে, পড়ে দেখ।"

অধরচন্দ্র পত্র পাঠ করিতে করিতে বলিলেন, "দীপু কি কলকাতায় ফিরে আসছে?"

রাজা বিরক্তিভরে বলিলেন, "ফিরে আসছেন কি চুলোয় যাচ্ছেন, তা তোমাদের কুমার বাহাদুরই জানেন! ভণিতা বাদ দিয়ে কাযের কথাগুলো পড়ে যাও। কীর্ত্তিমান আবার যে কি কীর্ত্তিধ্বজা উড়াবেন তা ত বুঝতেই পারছি না, গুণের ত ঘাট নেই!"

অদ্ভুত কৌশলে ভীর শিকার হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রির ঘোর দুর্য্যোগে ভেড়ীর উপর ব্যাঘ্রের কবল হইতে শিশু ছানাকে উদ্ধার করা পর্য্যন্ত কুমারের অনেক কীর্ত্তি-কথাই পত্রে ঘোষিত হইয়াছিল। অধরচন্দ্র যখন উচ্চ স্বরে সে সকল কথা পাঠ করিতেছিলেন, তখন রাজা বাহাদুরের মুখমণ্ডল একবারও প্রসন্নভাব ধারণ করিল না। কিন্তু কুমারের সর্পভয়ে আলোক সম্মুখে রাখিয়া মশারির মধ্যে বিনিদ্র রজনী যাপনের কথা যখন পঠিত হইল, তখন রাজা বাহাদুর বিরক্তিভরে বলিলেন, "বীরপুরুষ!"

অধরচন্দ্র পত্রের অন্য স্থান পাঠ করিলেন, "বাউরী আর তিওর নিয়েই আবাদ। কুমার বাহাদুর সেই আবাদের জল কাদা ভেঙ্গে বনবাদাড়ের মধ্য দিয়ে বুনোপাড়ায়

গিয়ে থাকেন, তাদের কাচ্ছাবাচ্ছাকে কোলে-পিঠে করেন, কত কি খেতে দেন—"

ক্রোধকম্পিত স্বরে রাজা বলিলেন, "মাথা দেন! চিরকালটাই ছোটলোক-ঘেঁষা! তার পর?

অধরচন্দ্র পাঠ শেষ করিলেন, "ললতেকাঠির বড়তরফরা—আমাদের চন্দনকাঠির আমলাদের সঙ্গে একজোট হয়ে প্রজাদের তরফ থেকে কুমার বাহাদুরকে এক অভিনন্দন দেবে বলে ঠিক করেছিল। উদ্যোগ আয়োজন সমস্তই ঠিক, সড়কী খেলা আতসবাজী ঢোলবাদ্যি সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, হঠাৎ তার আগেই কুমার বাহাদুর অন্তর্দ্ধান! সবাই ভারী মনকষ্ট পেলে।"

রাজা বলিলেন, "শুনলে ত? এ সব অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারী নিয়ে কি করে কায চালাই বলতে পার? বলে দিলুম বিশেষ করে, ওকে ওদিকে মাসখানেক আটকে রাখ্‌তে, তার মধ্যে তোমাদের ঐ জমাদারণী না মাষ্টারণীর সম্বন্ধে যা হয় একটা বিলিবন্দেজ করে ফেলতুম—তা না। তারানাথটা একটা নিরেট গাধা, এবার দোবো দূর করে—"

অধরচন্দ্র বলিলেন, "তা এলেই বা দীপু চলে, ভয়টা কি তাতে?"

রাজা বাহাদুর উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "ভয় কি তাতে? কি বলছ অধর? যার ভয়ে কলকাতা থেকে জঙ্গলে পাঠালুম—সেই আসছে কলকাতায়—হয় ত এতদিন এসেছে—কোথাকার একটা জমাদারনি"—

অধরচন্দ্র বলিল, "মাষ্টারণী।"

রাজা বলিলেন, "ঐ হ'ল ও একই কথা। বরদা লিখেছে, লক্ষ্ণৌ ছেড়েছে, কলকাতায় রওনা হয়েছে। তা কলকাতার কোথায় এসে উঠেছে, সে খবরটুকু দিলে না কেন? আহাম্মুখ!"

অধরচন্দ্র বলিলেন, "না, বরদার দোষ নেই, সে অমনই মাস মাস মাইনে পাচ্ছে না! ওরা দেশত্যাগী হবার পর থেকে এ পর্য্যন্ত যখন যেখানে ওরা বাসা বেঁধেছে, তখনই সেখানকার খবর দিয়েছে, ওকে দুষতে পারেন না। রাখাল মাষ্টার বরাবরই ওকে বিশ্বেস করতো। দেশত্যাগী হবার সময় কেবল ওকেই পশ্চিম থেকে ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দিতো। গাঁয়ের মধ্যে বরদাই ওর সমস্ত সন্ধান জানত, বরাবর ওদের পৈতৃক জমিজমার খাজনার টাকা বরদাই আদায় করে পশ্চিমে পাঠিয়ে দিত।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কলকাতার ঠিকানাটা জানতে পারলো না কেন?"

অধরচন্দ্র বলিলেন, "তা জানবে কেমন করে? লক্ষ্ণৌ সহরে মাষ্টারীতে স্থিতভিত হলে রাখাল হঠাৎ একদিন কলেরায় মারা যায়। মেয়েটার বোধ হয় মাথা খারাপ হয়েছিল, কাউকে কিছু না বলে বাসা ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায়। বরদা তার পর আর কোন খোঁজখবর পায় নি। তাকে সে জন্যে লক্ষ্ণৌ পাঠিয়েছিলুম। সেখান থেকে কেবল এইটুকু জেনে এসেছে যে, সে কলকাতার কোন একটা খৃষ্টান গার্ল স্কুলে চাকুরী নিয়ে চলে এসেছে।"

রাজা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যাক্, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হবে। দেখ অধর, আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমার এটা পৈতৃক জমিদারী নয়, সমস্তই নিজের রোজগার—এ খেতাবও স্বোপার্জ্জিত। ইচ্ছে করলে বিষয় যাকে ইচ্ছে বিলিয়ে দিয়ে যেতে পারি। যদি তোমাদের ঐ আদুরে গোপাল ঐ জমাদারণীটাকে ঘরে এনে তোলে, তা হলে জেনে রেখো, বিষয়-সম্পত্তির কাণা কড়িটাও ও পাবে না। সে বন্দোবস্তও হয়েছে, তুমিও সেই উইলের কথা জান। বিষয় আমি নেপুকেই দিয়ে যাব—নেপু, নেপু, শুনতে পাচ্ছো না, তোমাদের ছোট রাজকুমার নৃপেন্দ্রপ্রসাদ, তাকেই যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে যাব। এই যে বৌমাও এসে পড়েছেন, ভালই হয়েছে। গলার চড়া আওয়াজ পেয়েই ছুটে এসেছেন বুঝি? যাক্, ভালই হল, তুমিও আবার শুনে রাখ, বিষয় আমি নেপুকেই দিয়ে যাব। উইল করেছি, মাষ্টারের মেয়েকে ঘরের বউ করে তুলে আনলে তোমাদের কুমার বাহাদুর পথের ভিখিরী হবেন। তুমি মানুষ করেছ ওটাকে বৌমা, তাই বলে রাখলুম যদি ওর মতিগতি ফেরাতে পার। উঃ বড় কষ্ট হচ্ছে,—কোথায় রে বেটারা—"

রাজা বাহাদুর শয্যার উপর এলাইয়া পড়িলেন, ভৃত্য পরিজন চারি দিক হইতে ছুটিয়া আসিল; কাত্যায়নী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অধরচন্দ্রের অন্তরের ভাব কেহ বুঝিতে পারিবে এরূপ

সম্ভাবনা ছিল না কিন্তু তাঁহার চোখে মুখে দুরন্ত হাসির রেখা স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

যখন স্ত্রী-পুরুষ আপনাদের শয়ন-কক্ষে উপনীত হইলেন, তখন কাত্যায়নী বলিলেন, "তোমরা কি ছেলেটাকে গলা টিপে মারতে চাও?"

অধরচন্দ্র দন্তাগ্রে রসনা কর্ত্তন করিয়া দুই কর্ণ অঙ্গুলীর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বলিলেন, "রাম! রাম! মহাভারত! আমি মারতে চাই? আহা, কপোত-কপোতী যথা,—আমি তাদের ছাড়াছাড়ি করে দোবো? এত নিষ্ঠুর আমায় ঠাওরালে?"

কাত্যায়নী হাসিয়া বলিলেন, "থাক্‌, আর রঙ্গ করতে হবে না, মিনষের ঢঙ দেখে আর বাঁচি নি! ভাবছি ছোঁড়াটা কি বোকা, পায়ে করে লক্ষ্মী ঠেলে ফেলছে এমনি করে!"

অধরচন্দ্র বলিলেন, "ঠেলে ফেলছে কই? লক্ষ্মী ত ঘরেই আনছে গো!"

কাত্যায়নী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ছোট রাণীর কি বরাত! ওর ছেলেই সর্ব্বস্ব পাবে।"

অধরচন্দ্রের চোখে মুখে কুটিল হাসির রেখা খেলিয়া গেল, তিনি শ্লেষের সুরে বলিলে, "তা আর বল্‌তে! রক্ত ওঠা ব্যারাম—ও আর রাজত্ব করবে না?"

(২)

"তুমি কে?"

রোগীর ক্ষীণ কণ্ঠোত্থিত প্রশ্নে প্রবীণ চিকিৎসক ডাক্তার চৌধুরী চমকিত হইলেন, ফিরিয়া বলিলেন, "চুপ, বেশী কথা কোয়ো না। আমি ডাক্তার।"

ব্যথাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখমণ্ডল উত্তোলিত করিয়া অত্যুজ্জল দৃষ্টিতে রোগী তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিল। সে বলিল, "ডাক্তার? ডাক্তার কেন?"

ডাক্তার চৌধুরী বলিলেন, "বাস্ একসিডেণ্টে তুমি যে চোট খেয়েছ হে। মনে পড়ছে কিছু? তোমার বাড়ী কোথা হে?"

রোগী চেষ্টার পর বলিল, "বাড়ী? কার বাড়ী? উঃ, বড় যন্ত্রণা।" মাথার উপর হাত রাখিয়া রোগী নয়ন নিমীলিত করিল। ডাক্তার চৌধুরী তাপমান যন্ত্রটি আধার মধ্যে রক্ষা করিলেন। চিন্তা রেখায় তাঁহার মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হইল। তিনি বলিলেন "না, এখনও সামান্য ডিলিরিয়াম রয়েছে—মাথায় আঘাত! আজ ক'দিন?"

তাঁহার পশ্চাতে অদৃশ্যপ্রায় অবস্থায় একটি তরুণী অবস্থান করিতেছিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "ছ দিন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "একসিডেণ্টের কথা আমি বাজারেই শুনেছি। বাসখানা শিবানীপুর থেকে বেহালায় আসছিল না?"

তরুণী বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "যাক, ভয়ের কারণ আর নেই, তবে কিছু সময় নেবে। তোমাদের কে হয়?"

"কেউ না। আমাদের বাড়ীর সামনে বাসখানা উল্টে পড়লো, কাকাবাবু তাই ওঁকে এইখেনেই নিয়ে এলেন। সেই অবধি ত আর জ্ঞান হয় নি, নাড়াচাড়া করতেও আপনি বারণ করেছিলেন।"

"হুঁ। ঐ ওষুধটাই খাইয়ে যেও, আর মাথায় যেমন তেল মালিস করছিলে করে যেও, তবে আর আইস ব্যাগ দিও না। না, ভিজিট আর দিতে হবে না। তোমাদের যখন কেউ নয়, টাকা কেন নেব? তোমার কাকাবাবু এখনও অফিষ থেকে ফেরেন নি বুঝি?"

ডাক্তার চৌধুরী গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেলেন।

কেরোসিন ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি রোগীর বিবর্ণ মুখের উপর নৃত্য করিতেছিল। তরুণী ডাক্তার চৌধুরীকে দ্বার-প্রান্তে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া আলোকের জ্যোতিঃ কমাইয়া দিল। তাহার পর রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে রোগীর শিরোদেশে ও ললাটদেশে মালিস মাখাইয়া দিতে লাগিল। তখন তাহার আয়ত নয়ন-যুগল হইতে যেন স্নেহের নির্ঝর-ধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল। অচেতন রোগীর পরিচর্য্যা-নিরত তরুণী অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন চিন্তা করিতেছিল।

অতীতের স্মৃতিই কি বর্ত্তমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার অন্তরকে ভরিয়া তুলিয়াছিল? কুহেলি-আবৃত শৈশব, তথায় দুরান্তরে অন্ধকারময় রাজ্যে উজ্জ্বল স্নিগ্ধ শীতল মাতৃ-ক্রোড়—তাহার পর সংসারে পিতাই একমাত্র অবলম্বন, একাধারে জনক ও জননী। আজ তিনি কোথায়? যাঁহাদের উপর তাহার কোনও দাবীই নাই—

মাত্র পিতৃবন্ধু, আজ তিনিই তাহার একমাত্র ভরসা, একমাত্র আশ্রয়স্থল! অদৃষ্টের এ খেলা কেন, কে বুঝিবে?

তাহার নয়নপল্লব স্বতঃই অশ্রুসিক্ত হইল।

"তুমিই কি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছ?"

তরুণী অত্যধিক বিস্ময়ে চমকিত হইয়া দেখিল, রোগী অপলক নেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে,—তাহার ক্ষীণ মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তিই যেন দৃষ্টি মধ্যে সন্নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

রোগী পুনরপি বলিল, "কাছে কাছে থাক, চলছ ফিরছ, দেখছি তোমায় বটে, কিন্তু এই আছ এই নেই—"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোগী নীরব হইল।

তরুণী বলিল, "চুপ করুন, কথা কইতে মানা।"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রোগী বলিল, "তুমি—তুমি—তুমি কে? মনে পড়ছে যেন—"

তরুণী বাধা দিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু বারণ করেছেন"—

রোগীও কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু? কেন, ডাক্তার বাবু কেন? ও হো হো ঠিক বটে, এই মাথাটা—উঃ!" রোগীর নয়নযুগল আবার নিমীলিত হইয়া আসিল।

তরুণী কক্ষত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত অতর্কিত প্রশ্নে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল,—"তুমি কি ইন্দু—ইন্দিরা?"

স্তম্ভিত তরুণী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার জানুদ্বয় কম্পিত হইল।

রোগী আবার বলিল, "সে কত দিনের কথা—তোমায় আমায় সেই শেষ দেখা!" দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিল, "কোথায় ছিলে তোমরা ইন্দু! তোমার বাবা—মাষ্টার কাকা—স্যার? তুমি এ কোথায় রয়েছ?" রোগী শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া তরুণীর করপল্লব ধারণ করিল।

ধরা গলায় তরুণী বলিল, "কাকে কি বলছেন আপনি? আপনার মাথার ঠিক নেই।"

তরুণী গৃহত্যাগের জন্য পা বাড়াইল।

রোগী দৃঢ়মুষ্টিতে ইন্দিরার করপল্লব ধারণ করিয়া বলিল, "না, না, যেও না, এবার ত আর যেতে দোবো না—আমাদের যে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ"—

কৌশলে মুক্ত হইয়া তরুণী কম্পিত বক্ষে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কাকিমাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি এখানে, কাকাবাবুও এলেন ব'লে। আপনি শুয়ে থাকুন দয়া করে।"

তাড়াতাড়ি তরুণী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ঘরের বাহিরে ভগ্ন, জীর্ণ রোয়াকের উপর দাঁড়াইতেই সে শুনিতে পাইল, বাহিরের দ্বার হইতে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাড়ীতে আছেন কি, মশাই?"

স্বর ত অপরিচিত নহে!—তাহার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যেই আগন্তুক স্বয়ং বাহির হইতে দ্বার মুক্ত করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। কক্ষের আলোক-রশ্মির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেই তরুণী ভয়বিস্ময়বিমূঢ় বিহ্বল দৃষ্টিতে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল। ব্যাধভয়ভীতা হরিণীর অবস্থাও কি তাহা হইতে আরও শোচনীয়?

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি দুই পদ অগ্রসর হইয়া সুগন্ধী রেশমী রুমালে মুখমণ্ডল মুছিয়া লইয়া ভ্রূকুটী কুটিল হাস্য করিয়া বলিলেন, "তার পর ইন্দিরা, এখানে কত দিন? ভাল, ভাল, বসতেই না হয় দাও খানিক।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়াই ভদ্রলোকটি আলোকিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সহসা তাঁহার গতি-বেগ রুদ্ধ হইল। তিনি স্তম্ভিতভাবে দ্বার সান্নিধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাঁহার ব্যাকুল বিস্মিত দৃষ্টি শয্যায় নিদ্রিত রোগীর পাণ্ডুর বদনমণ্ডলে নিবদ্ধ হইয়া রহিল!

(৩)

"আবার কেন এসেছেন? এখানেও কি বাস করতে দেবেন না?"

ইন্দিরার নয়নে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

নাসাগ্রে সুগন্ধি রেশমী রুমাল চাপিয়া ধরিয়া অধরচন্দ্র বলিলেন, "উঃ, কি দুর্গন্ধ। মাছি ভ্যান ভ্যান করছে। তোমার কি এই বদ জায়গায় থাকা পোষায়? না, একদিনও না, আর একদিনও তোমার এখানে থাকা চলবে না, ইন্দিরা।"

"আমাদের মত গরীবদুঃখীদের এর চেয়ে ভাল জায়গা কোথায়?"

অতি দুঃখেও ইন্দিরার মুখে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পরেই গম্ভীর পরুষকণ্ঠে বলিল, "যেথানেই থাকি আমরা, আপনাদের তাতে কি? অনাথ গরীব দুঃখী আপনাদের রাজারাজড়াদের কাছে কি অপরাধ করেছে বলুন ত?"

প্রচণ্ড চেষ্টা সত্ত্বেও তরুণী অশ্রুধারা রোধ করিতে পারিল না। •

অধরচন্দ্র একথানা ভাঙ্গা তক্তপোষের উপর কায়েম মোকাম হইয়া বসিয়া বলিলেন, "এ হে হে, একবারে ছেলে-মানুষ! কেঁদেই ফেললে যে গো! যাতে পরের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে রাজরাণীর মত বাস করতে পার, তারই ত উপায় করছি আমি। ভাল করতে গেলেও মন্দ?"

ইন্দিরা ধরা গলায় বলিল, "আর ভালয় কায নেই আপনার। একবার ভাল করতে গিয়ে দেশত্যাগী করেছিলেন"—

অধরচন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন, "আরে ছ্যাঃ! উল্টোই বুঝছ কেন বল দেখি? দেখ, ছেলেমানুষি কোরো না। তোমার কি এই চাকুরী করা সাজে, না, এই নরকে বাস করা পোষায়—তুমি রাজার পুত্রবধূ? না, কোন কথা শুনতে চাই নি। যাতে তোমরা দুজনে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো, তারই ত বন্দোবস্ত করছি গো।"

ইন্দিরা বলিল, "থাক, আর বন্দোবস্ত করতে হবে না। বলেইছি ত, আর দয়া দেখিয়ে কায নেই। যাবেন না চলে এখান থেকে? কেন, আমরা দুটি স্ত্রীলোক রয়েছি বলে? কাকাবাবু থাকতেন যদি এখন"—

অধরচন্দ্র হো হো হাসিয়া বলিলেন, "কেন, তাহলে কি করতে? পুলিস ডাকিয়ে ধরিয়ে দিতে, না, গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে?. তোমার কাকাবাবুও ত রাজী গো। কে তোমার ভাল চায় না বল ত?"

ইন্দিরা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তাহলে যাবেন না চলে? তা আমিই যাচ্ছি। এ কি অত্যাচার বলুন ত? বার বার বলছি, আমার ভাল আপনাদের দেখতে হবে না! আজই কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি যে দিকে দু চক্ষু যায়! এ কি অন্যায়? আপনাদের কি একটু লজ্জাও নেই? এই গরীব-গেরস্থরা দয়া করে আশ্রয় দিয়েছে—এঁদের ঘরে এমন করে অত্যাচার করলে এঁরাই বা পাড়ায় বাস করবেন কি করে? এঁদেরও ত একটা সমাজ আছে, সুনাম দুর্নাম আছে"—

অধরচন্দ্র হাস্যরোলে কক্ষ প্রকম্পিত করিয়া বলিলেন, "বাঃ বাঃ একবারে সুরেন বাঁড়ুয্যে যে! এ হোলো কি? এ্যাঁ—সাত চড়ে একটা কথা ফুটতো না যে গো!"

ইন্দিরা রুষ্ট স্বরে বলিল, "আপনারাই ফুটিয়েছেন কথা। যে অত্যাচার করেছেন বাবার উপর, তাতে মরা মানুষেরও কথা ফোটে, জানেন?"

অধরচন্দ্র হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তামাসা নয় ইন্দিরা! সত্যিই তোমাদের বিবাহ দেবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। দেখ, আগেকার কথা ভুলে যাও। দেখলুম, তোমায় না পেলে ছোঁড়াটা কিছুতেই শান্তি পাবে না, তথন হাতে পায়ে ধরে রাজা বাহাদুরকে রাজী করেছি। দীপু দার্জ্জিলিং থেকে ফিরে এলেই তোমায় রাজবাড়ীতে নিয়ে যাবে। সে ত দার্জ্জিলিং থেকে চিঠি লিখেছে, এথনই তোমাদের কলকাতায় একথানা ভাল বাড়ী দেখে তুলে নিয়ে যেতে। কিছু খরচপত্তোর তোমার কাকীমার হাতে—ওরে বাপরে! একবারে ফোঁস করে উঠলে যে! তা যাক, সে তথন দীপু এলে যা হয় হবে। দীপুর চিঠিথানা রইল, অবসর মত পোড়ো। উঃ কি পরিশ্রমটাই করছি—কি মাথাটা ঘামাচ্ছি তোমাদের জন্যে বাপু! তবুও অবিশ্বাস! কলি, ঘোর কলি!"

সুবর্ণশীর্ষ যষ্টিটি তুলিয়া লইয়া অধরচন্দ্র আর একবার ইন্দিরার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে মৃদু হাসিয়া বলিয়া গেলেন, "দেখো পড়ে চিঠিথানা, সব বুঝতে পারবে।"

ইন্দিরার উদাস দৃষ্টি গবাক্ষের বাহিরে খরোজ্জ্বল সূর্য্যা-লোকের উপর সন্নিবদ্ধ। কর্ম্ম-কোলাহলময় বহিঃ-প্রকৃতির সহিত তথন তাহার অন্তরের যোগাযোগ ছিল কি?

অনেকক্ষণ পরে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

স্বপ্নের মায়া টুটিয়া গেলে বাস্তব জগতের কঠোররূপ মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

অঙ্কস্থিত পত্রখানির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। ঠিকানা—কা কা সা হে ব, চন্দনবিলাস রা জ প্রা সা দ, কলিকাতা।

এ হস্তলিপি তাহার অপরিচিত নহে।

ইন্দিরা মুগ্ধদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত পত্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

স্মৃতি—অতীতের স্মৃতি—সুখময় কি জ্বালাময়, সে যে নিজেই বুঝিতে পারে না! নিশীথে রোগশয্যায় শায়িত রোগীর সমুজ্জ্বল নয়ন-তারকার কি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! রোগশীর্ণ পাণ্ডুর বদনে—অপূর্ব্ব তেজোদীপ্ত নয়নে—কি আকুল আকুতি-কাকুতি! কেন সে চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারে না? কি ভীষণ ঘাতপ্রতিঘাত!—দুর্জ্জয় দুর্নিবার আত্মিক শক্তি প্রয়োগ না করিলে সে আজ কোথায় থাকিত? অভিমানাহত ব্যথাক্লিষ্ট নয়নের আকুল আত্মনিবেদন কিরূপে সে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইত?

এ কি মোহ? হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত, সংগ্রামের শক্তি ত অনন্ত, অপরিমেয় নহে! তবে নূতন তীব্রতর আঘাত পাইবার জন্ম চিত্ত আবার বিমূঢ় হইয়া পড়িবে? ধনী, বিলাসী, আত্মসুখ-সর্ব্বস্ব লক্ষ্মীর দুলাল—দরিদ্রের মর্ম্ম-ব্যথার সহিত তাহার হৃদয়ের সম্পর্ক কি? কৈশোরের পবিত্র বাক্‌দানের মর্য্যাদাকে যে পদতলে দলিত পিষ্ট করিয়া হত্যা করিয়াছে, তাহাদের অজ্ঞাতবাসকালে যে তাহাদের কোন তত্ত্বগ্রহণ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করে নাই,—তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের সুখদুঃখে তাহার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক কি?

তবে এই পত্রের সহিত তাহারই বা সম্পর্ক কি? ধনীর পুত্র বায়ুপরিবর্ত্তনে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছে, সেই স্থান হইতে তাহার সুখদুঃখের কথা তাহার আত্মীয়-স্বজনকে জানাইয়াছে,—এ পত্রে তাহার কি স্বার্থ থাকিতে পারে?

কি আছে ইহাতে? হস্ত কম্পিত হইতেছে কেন? কেন বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে? এ কি আকর্ষণ? এ কি কুহক প্রলোভন! কি আছে, কি আছে পত্রের মধ্যে? একি উৎকট আগ্রহ!

কম্পিত হৃদয়কে ঈষৎ সংযত করিয়া ইন্দিরা পত্রপাঠ করিতে লাগিল:—

হিলভিউ, দার্জ্জিলিং!

১২-৪-৩১।

কাকাসাহেব,

তোমার চিঠি পেয়ে ধড়ে প্রাণ পেলুম। তোমরাই যে আমার আপনার জন, তা এবার ভালই জানলুম। মা-হারা হবার পর থেকে কাকীমাকেই জানি। শৈশব থেকেই রাজা বাহাদুরের মুখ ভারী দেখে আসছি। তার পর ছোট মা—তাঁর কথা না-ই তুললুম।

"থাক সে কথা। আমার ইন্দুর কাষ ছাড়িয়ে দিয়েছ ত? তার আশ্রয়দাতার ওপর কোনও চাপ না পড়ে, তার ব্যবস্থা করেছ ত? ভবানীপুরের দিকে তাদের জন্তে একখানা ভাল বাড়ী ঠিক করে দিয়েছ ত? আহা ওরা বড় গরীব, কিন্তু বড় অভিমানী! যাতে মনে ব্যথা না পায়, তেমনই ভাবে লুকিয়ে সাহায্য কোরো। কাকীমাকে একদিন ইন্দুকে দেখে আসতে বোলো। সেও আমার মত মায়ের আদর পায়নি।

"আঃ, মাথাটা কেমন মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়! চমৎকার জায়গাটা—পরিষ্কার আকাশ, রোদ ফুট ফুট করছে। ইন্দু যদি কাছে থাকতো! ওঃ সে কদ্দিনের কথা! কত চিঠি দিয়েছি ইন্দুকে, কত খোঁজ করেছি মাষ্টার সাহেবের—দেশে গিয়ে দেখেছি, বাড়ী ঘর ছেড়ে ওরা কোথায় চলে গিয়েছে। চিঠির উত্তর পাই নি, কোন খোঁজ পাই নি—কিন্তু ভুলতে ত পারি নি একদিনও! কত খুঁজেছি, কত কেঁদেছি, উঃ, বড় নিষ্ঠুর ইন্দিরা, বড় পাষাণ!"

এ কি? সে যাহা মনে করিয়াছিল, পত্রে ত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত মনোবৃত্তিরই পরিচয়! ইহা কি সত্য? আন্তরিক?

দ্রুততর বেগে হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে কেন?—ইন্দিরা প্রবল চেষ্টায় আপনাকে সংবরণ করিয়া পুনরায় পড়িতে লাগিল—

"আরে, কোত্থেকে মেঘ জুড়ে বোসলো আকাশে দেখ! আ গেল, জানলা দিয়ে মেঘ ঢুকে বিছানাটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল! দুত্তোর দার্জ্জিলিং! না, ভাল লাগছে না এখানে, বিশ্রী জায়গা। দেখ কাকাসাহেব, ইন্দুকে আর কোথাও পালাতে দিও না, তা হলে এবার আমিও এমন পালাবো যে আর আমায় খুঁজে পাবে না! সত্যি বলছি, কাকাসাহেব, আমার জীবনটাকে যদি ব্যর্থ হতে দেবার ইচ্ছে তোমাদের না থাকে তবে ইন্দুর মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখো। আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে ইন্দুকেই আমার গৃহলক্ষ্মীরূপে চাই। জেনো—এই আমার কামনা—প্রতিজ্ঞা—ব্রত!

ইন্দিরা অভিভূত, বিমূঢ়ার ন্যায় কয়েক মুহূর্ত বসিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি যেন ক্ষীণ হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পত্রের অক্ষরসমূহ যেন অস্পষ্ট, চীনা হরপের ন্যায় দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। অঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিয়া সে আবার পড়িতে লাগিল—

"না, কলকাতাই ভাল—আমার বেহালার সেই ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরই ভাল। সেখানে রোজ ইন্দুকে দেখতে পাবো। ভাগ্যে খেয়াল মত চন্দনকাঠি থেকে ডায়মণ্ড হারবারে নেমে ট্রেণ ফেল হয়েছিলুম, না হলে শিবানীপুরও আসতে পারতুম না, সেখান থেকে বেহালার বাস্‌ও ধরতে পারতুম না, আর বেহালায় এক্‌সিডেণ্টটাও হেতো না। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্য।

"আচ্ছা কাকাসাহেব, এদ্দিন ইন্দুর খবর জানতে দাও নি কেন বল ত? কিন্তু তোমরা যতই লুকিয়ে রাখ তাকে, আর আমার কাছছাড়া করতে পারবে না। অবিশ্যি এখন তুমি যা করছো, তার ঋণ শুধতে পারবো না। বুঝছি, রাজা বাহাদুর আর তোমায় টলাতে পারবেন না।

"কি কষ্টেই কাটিয়েছে ইন্দু এই বয়েসটা! এবার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বাধা দিলেও তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না, তা তোমায় বলে রাখছি জেনো। উঃ, মাথাটা ঘুরছে দেখ। একটু শুই।"

নাম স্বাক্ষর পর্য্যন্ত নাই, কিন্তু হস্তলিপি পরিচিত। মাত্র দুই বৎসরের ব্যবধানে পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। ইন্দিরা পত্রের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু চক্ষুর জলে কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না, তাহার প্রাণের মধ্যে তখন সপ্ত সমুদ্রের তুফান বহিতেছিল। কি ভ্রান্ত ধারণায় এত দিন সে মর্ম্মান্তিক বেদনা হৃদয়ে বহিয়া বেড়াইয়াছে! একটি—একটি মাত্র আঘাতে হৃদয়-বীণার তারে মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। অতীত কি ভীষণ—অথচ কি মধুর!

পিতা ব্রহ্মমোহন ঘোষ মানুষের মত মানুষ—শান্ত ঋষিপ্রতিম মনীষী পণ্ডিত। জননীর স্নেহস্পর্শ সে মনেই আনিতে পারে না, পিতাই তাহার সর্ব্বস্ব। চন্দনপুর স্কুলের হেডমাষ্টার, রাজপুত্রের গৃহশিক্ষক—তাঁহারই গৃহে অনেক সময়ে বাল্যে ও প্রথম কৈশোরে সে প্রবলপ্রতাপ জমীদার-পুত্রের সহিত পিতার নিকটে লালিত ও শিক্ষিত হইয়াছে—একত্র কত খেলা খেলিয়াছে। রাজপুত্র তাহাকে গাছের ফল পাড়িয়া দিয়াছেন, বকুলের মালা গাঁথিয়া দিয়াছেন। সে স্মৃতি কি ভুলিবার!

স্কুলের কর্ত্তব্য সম্পাদনের পর পিতা গৃহে ফিরিয়া আপনার ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের গবেষণার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন,—বাহিরে পৃথিবী হাজিয়া মজিয়া গেলেও তাঁহার দৃষ্টি ও চিন্তার ধারা ক্ষুণ্ণ হইত না। দুইটি নবীন মুকুলিত জীবন পরস্পরের সান্নিধ্যে ক্রমেই যে মধুর প্রীতির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতেছিল, তাহা জানিবার তাঁহার কোনও অবসরই ছিল না।

কিন্তু বাহিরের জগৎ তাঁহার মত ধ্যান-নিরত যোগীর ন্যায় অনন্যমনা হইয়া ছিল না। স্কুলমাষ্টারের কন্যার সহিত রাজপুত্রের ঘনিষ্ঠতার কথা রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। উচ্চশিক্ষা লাভার্থ রাজপুত্র কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তথাপি উভয়ের মধ্যে পত্রের আদানপ্রদানে বা শারদীয় ও গ্রীষ্মের অবকাশকালে সাক্ষাৎ ও আলাপে কোনও ব্যাঘাত ঘটিল না। রাজা বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। প্রথমে অনুনয়-বিনয়, তাহার পর প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন, শেষে রাজার আদেশ। কিন্তু পিতা স্কুলমাষ্টার হইলেও নিতান্ত নিরীহ প্রকৃতির ছিলেন না। কিছুতেই তিনি রাজার ভয়ে গ্রাম বা চাকুরী ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না।

কিন্তু জলে বাস করিতে হইলে কুম্ভীরের সহিত বিরোধ অধিক কাল সুবিধাজনক হয় না। স্কুলমাষ্টারের পরলোক-গতা পত্নীর নামে মিথ্যা কুৎসা প্রচারিত হইল। সমাজের রক্তচক্ষু তাঁহার প্রতি নির্ম্মমভাবে অগ্নিজ্বালা বর্ষণ করিতে লাগিল। ধনীর প্রতাপ ও অর্থ দরিদ্র শিক্ষকের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। পথে ঘাটে দুই একদিন তাঁহার প্রাণসংশয়ও হইল। রাজা বাহাদুরের অতি নিকট জ্ঞাতি-ভ্রাতা অধরচন্দ্র মাষ্টার মহাশয়ের অনূঢ়া কন্যাকে বলপূর্ব্বক অন্যত্র পাত্রস্থ করিবার আয়োজন করিলেন। প্রবল প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব দেখিয়া ব্রহ্মমোহন কন্যাকে লইয়া একদিন গোপনে গ্রাম ত্যাগ করিয়া সুদূর প্রবাসে চাকুরীর সন্ধানে প্রস্থান করিলেন।

মীরাটে তাঁহার এক বাল্যবন্ধু ও আত্মীয় চাকুরী করিতেন। তাঁহারই আশ্রয়ে উঠিয়া দুই চারি দিন পরে

স্থানীয় অ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুলে তাঁহার অস্থায়ী চাকুরী জুটিল। কিন্তু আশ্চর্য্য! সেখানেও নিস্তার নাই। পরম শত্রু অধরচন্দ্র সেখানেও তাঁহার কন্যাকে বিবাহিতা করিবার জন্য উত্ত্যক্ত করিতে লাগিল। এজন্য সে রাজার তরফ হইতে তাঁহাকে কল্পনাতীত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিতেও ক্ষান্ত হইল না। ব্রহ্মমোহন মীরাটও গোপনে ত্যাগ করিলেন। মার্জ্জারী যেমন শাবককে মুখে লইয়া এক স্থান হইতে অন্যত্র যাত্রা করে, ভাগ্যহত ব্রহ্মমোহন তেমনই অনূঢ়া কন্যাকে লইয়া এলাহাবাদ, কানপুর, দিল্লী ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন; কিন্তু কোন স্থানেই শান্তি পাইলেন না। দুষ্ট শনিগ্রহের ন্যায় অধরচন্দ্র সর্ব্বত্র তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহার এক কথা,—রাজা বাহাদুরের তরফ হইতে সে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবে, কন্যাকে তিনি সুপাত্রে অর্পণ করুন; পরন্তু জীবনে আর যাহাতে তাঁহাকে পরের চাকুরী করিতে না হয়, রাজা বাহাদুর এমন ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। ব্রহ্মমোহন কাহারও ভয়ে বা হুকুমে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না।

শেষ লক্ষ্ণৌ। সেখানে অতি সঙ্গোপনে বাস করার ফলে অধরচন্দ্র প্রথমে তাঁহাদের কোন সন্ধান করিতে পারিল না। পিতা কিন্তু এত দুঃখ বিপদের মধ্যেও একদিনও কন্যাকে শিক্ষাদানে বিরত হন নাই। সে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানীয় খৃষ্টান গার্ল স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করিল। নানাস্থানী হইয়া পিতা তাহার বিবাহের চেষ্টা করেন নাই, সেও বিবাহের পক্ষপাতিনী ছিল না। আপাততঃ অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং সঙ্গিহীন পরিণত বয়স্ক পিতার সেবায় সে আত্মনিয়োগ করিবে, ইহাই বুঝাইয়া সে সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞ পিতাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল। পিতার ন্যায় তাহারও প্রগাঢ় কর্ম্মশক্তি ও পরিশ্রমানুরাগ ছিল। সে কর্ম্মেই ডুবিয়া থাকিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিত।

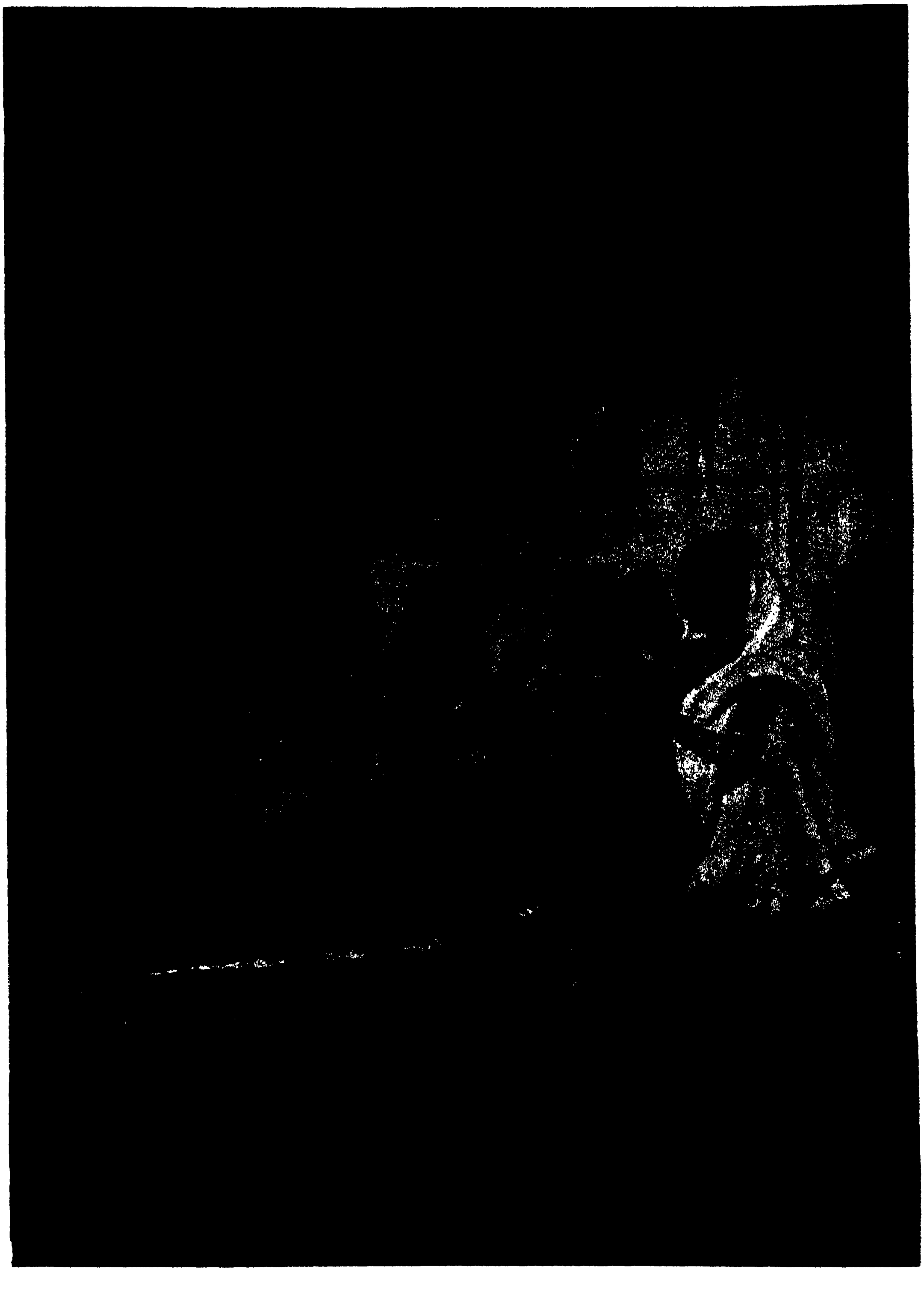
অপেক্ষাকৃত শান্তিতে দিন চলিতেছিল। এমনই সময়ে হঠাৎ একদিন অতর্কিতভাবে অধরচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। এই ঘটনার কয়েক দিন পূর্ব্বে সে তাহার পিতার আদেশমত নিয়মিত প্রাপ্য খাজনা পাঠাইবার জন্য দেশে তাগিদ দিয়াছিল। তবে কি দেশের জ্ঞাতি খুল্লতাতের নিকট পত্র প্রেরণের সহিত এই আবির্ভাবের কোনও সম্পর্ক আছে? তাহার মন দারুণ সংশয়াচ্ছন্ন হইল। কিন্তু বিধাতা তাহাকে চিন্তা করিয়া সঙ্কল্প স্থির করিবার অবসর প্রদান করিলেন না। একদিন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। স্নেহময় পিতা বিসূচিকা রোগে ইহলোক ত্যাগ করিলেন! ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সে একবারে আশ্রয়হীন হইয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়িল!

কিন্তু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় একজন আছেন। সে যখন শোকে দুঃখে সহায় সঙ্গিহীন অকূল পাথারে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময়ে একদিন সে কলিকাতা হইতে তাহার মীরাটের পিতৃবন্ধুর পত্র পাইল। তাঁহার সহিত তাহাদের সর্ব্বত্রই পত্রবিনিময় হইত। তিনি কলিকাতায় বদলী হইয়াছেন, বেহালায় একখানি ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতেছেন। বেহালার গার্ল স্কুলে সম্প্রতি একটি শিক্ষয়িত্রীর পদ খালি হইয়াছে। তিনি যে ধনী আত্মীয়ের কৃপায় বেহালার বাগানবাড়ীতে বিনা ভাড়ায় বাস করিতে পাইয়াছেন, তিনিই স্কুলের সেক্রেটারী। তাঁহারই কৃপায়, তাহার পিতৃবন্ধু তাহার জন্য স্কুলের চাকুরীটি যোগাড় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা দরিদ্র, কিন্তু সে আসিলে তাহাকে কন্যার মত যথাসাধ্য পালন করিবেন।

তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে গভীর কৃতজ্ঞতার দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল। দয়াময়ের অনন্ত দয়ার অন্ত কোথায়!

মহানগরী কলিকাতা—তাহার বিরাট বক্ষে লক্ষ লক্ষ নরসমুদ্রের মধ্যে সে একটি বিন্দুমাত্র। দরিদ্র পিতৃবন্ধুর ক্ষুদ্র আবাসগৃহ—তাহারই ক্ষুদ্র একখানি কামরার একাংশে সে তাহার স্থান করিয়া লইয়াছে, অপরাংশে দরিদ্রের সামান্য ভাণ্ডার। তাঁহারা পতিপত্নী,—সন্তানসন্ততি নাই, শৈশবেই তাহারা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তাই সে তাঁহাদের বুভুক্ষু স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে সযত্নে গৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু হিংস্র কুচক্রীর নির্য্যাতন হইতে এখানেও নিস্তার নাই; স্কুলে অনুসন্ধান করিয়া সে তাহার সন্ধান পাইয়াছে। কি কর্ত্তব্য এখন তাহার? এই শেষ আশ্রয়ও কি সে ত্যাগ করিবে?



আশীর্ব্বাদ

শিল্পী— [illegible]

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

? কিন্তু—কিন্তু এই পত্র? সরল উদার অকপট মনের চিত্র ইহার ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত। যে শত্রুরূপে এতদিন অনুসরণ করিয়াছে, আজ সেও ত হিতৈষী বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেছে। কেন এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন? কি গূঢ় অজ্ঞেয় রহস্য ইহার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে? কে সেই রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিবে? কে তাহার এই বিষম সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে?

(৪)

বড় আনন্দে, বড় সুখস্বপ্নাবেশে একটা সপ্তাহ অতীত হইল। কুমার দীপেন্দ্রপ্রসাদ যখন ইন্দিরার কুঞ্চিত কেশদামের একটা চূর্ণকুন্তল মৃদু অঙ্গুলীস্পর্শে কম্পিত আন্দোলিত করিয়া মাত্র এক সপ্তাহের মত দার্জ্জিলিংএর জরুরী কার্য্য সারিয়া লইবার অবসর প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন দুঃখের মধ্যেও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখাবেশে তাহার অশ্রুসিক্ত নয়ন দুইটি নিমীলিত হইয়া আসিল, সে তন্ময়চিত্তে তাঁহার বিদায়-বাণীটি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিল, "মনে পড়ে ইন্দু, তোমায় আমায় সেই মালা-বদল? সেই পুকুরঘাটে বাঁধা বকুলতলায়?" সে তাহার উত্তরে হাসিয়া বলিয়াছিল, "সে ত পুতুলখেলা।" কুমার গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিলেন, "না, ইন্দিরা, আমি তা মোটেই খেলা বলে মনে করি নি, তাঁরাও করেন নি। জান ইন্দু, পরে সে কথা তাঁর কাছে তুল্লে তিনি কি বলেছিলেন? আজও আমার মনে তাঁর কথাগুলি জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে,—'দেখ দীপু, তুমি রাজপুত্র হতে পারো, কিন্তু ভেবো না, আমার মেয়েকে তোমার হাতে দিয়ে আমি আমাকে কৃতার্থ মনে কোরবো। ও আমার কে তা কি বোঝাবো? ওকে আমি আমার মনের মত করে গড়ে তুলেছি। দেখো, ওর মত স্ত্রীলাভ যার তার ভাগ্যে ঘটবে না'।

সুখের মধ্যেও ইন্দিরা আপনার মনে লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কি উচ্চ মহান উদার হৃদয় তাঁহার। সে কে, যে তাহার জন্য—না, এ ভগবানের অযাচিত দান। কি পুণ্য করিয়াছে সে? দরিদ্র অভিশপ্ত জীবনে বিধাতার এ কি অজস্র আশীর্ব্বাদ? তাহার ভয় হইল, বুঝি-বা ইহা দিবাস্বপ্ন! যদি সে এই সুখস্বপ্নাবেশে চিরনিদ্রিত হইত! না, না, মুকুলিত জীবন-নাট্যের প্রবেশ-দ্বারে কত অনন্ত অতৃপ্ত কামনা তাহাকে ইঙ্গিতে আমন্ত্রণ করিতেছে। দুঃখের অপার বারিধি পার হইয়া যদি সে ভগবানের অনন্ত দয়ার কূলে উপনীত হইয়া থাকে, তবে কি হেলায় দেবতার দানকে সর্পভ্রমে দূরে ফেলিয়া দিবে?

আশায়, আনন্দে, গর্ব্বে তাহার আয়ত নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জ্ঞানে সে কখনও কাহারও অনিষ্ট করে নাই, তবে কেন সে অনর্থক অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছে? ভগবানের দান সে নিশ্চিতই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে। দার্জ্জিলিঙের পত্র একখানি নহে, পত্রের পর পত্র আসিয়াছে। মাত্র এই কয় দিনে—কি গভীর, কি মহান হৃদয়ের নিবেদন ইহার ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত! অন্ধ সে—রজ্জুতে কি সে এতদিন সত্যই সর্পভ্রম করিয়া আসিয়াছে?

রুদ্ধ জলস্রোত একবার বাধা অতিক্রম করিলে কূল প্লাবিত করিয়া মত্ত মাতঙ্গকেও ভাসাইয়া লইয়া যায়। ইন্দিরার অভিশপ্ত জীবনের ব্যর্থতার বাধা অতিক্রম হইবামাত্র দুর্জ্জয় আনন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। এ জীবন-স্পন্দন এতদিন নিরাশার কোন্ অন্ধ কারায় রুদ্ধ হইয়া ছিল? এই ধনৈশ্বর্য্যময়ী শোভাশালিনী পৃথিবী কি সুন্দর! সূর্য্যালোক কি উজ্জ্বল! বাতাস কি মধুর! পাখীর গানে, ফুলের হাসিতে এত মাদকতা ছিল, কে জানিত?

যখন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়, তখন সবই সুন্দর হয়। না হইলে পরম শত্রু অধরচন্দ্র আজ পিতার ন্যায় স্নেহকরুণা বর্ষণ করিতেছেন কেন? কুমার বাহাদুরের অসমাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিবার উদ্দেশ্যে তিনি কয় দিনের জন্য চন্দনকাঠি যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কি সুন্দর ব্যবস্থাই না তিনি করিয়া গিয়াছেন!

আর দুই চারি দিনের মধ্যে কুমার বাহাদুরের প্রত্যাবর্ত্তনের কথা। আশায় আনন্দে ইন্দিরা অধীর হইয়া উঠিল—বুঝি তাহার এ দুরু দুরু বক্ষস্পন্দনের আর নিবৃত্তি হইবে না। সে এক স্থানে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। স্কুলের কার্য্যে তাহাকে ইস্তফা দিতে

হইয়াছে। তাহার দরিদ্র অভাবগ্রস্ত আশ্রয়দাতাকে যাহাতে কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়, সে বন্দোবস্তেরও কোনও ত্রুটি হয় নাই। তাহার মনে হইতেছিল, যেন সে ভূতাবিষ্টা হইয়াছে। যে গৃহে এতদিন দাসদাসীর সম্পর্ক ছিল না, আজ তথায় তাহার সুখের জন্য কোন আয়োজনেরই ত্রুটি নাই। এই ক্ষুদ্র কুটীর পরিবর্তন করিবার কথাও স্থির হইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। ইন্দিরা সেই আলো-আঁধারে বাতায়ন-পার্শ্বে কুমার দীপেন্দ্রপ্রসাদের শেষ পত্রখানি আর একবার পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময়ে গৃহস্বামিনী কক্ষদ্বার হইতে বলিলেন, "ওমা, এখনও বসে আছিস, ইন্দু? যা, যা, গা ধুয়ে এসে চুলটা বেঁধে নে মা—সন্ধ্যে হ'ল যে!"

ইন্দিরা চমকিত হইয়া ত্রস্তে দাঁড়াইয়া বলিল, "এই যাই মা।"

সে যখন কলতলায় গাত্র মার্জ্জনা করিতেছে, তখন গৃহস্বামিনী কক্ষ হইতে বলিলেন, "খাটের উপর একখানা চিঠি রইলো। একজন দিয়ে গেল, এসে পড়িস।"

ইন্দিরা বিস্মিত হইল। পত্র? কে তাহাকে পত্র দিবে? কোথা হইতে আসিতেছে? বাহকই বা কে? লোক মারফতে পত্র দিবার এখানে তাহার ত কেহ নাই।

কক্ষ-মধ্যে ফিরিয়া যাইবার সময় একটা কাষ্ঠাসনে বাধা পাইয়া সে বসিয়া পড়িল। তাহার বক্ষ দুলিয়া উঠিল—অমঙ্গলের পূর্ব্বাভাস?

কাহার এ পত্র? দীপালোকে ইন্দিরা পত্র পাঠে মনোনিবেশ করিল। ক্ষণপরেই তাহার মুখমণ্ডল গম্ভীর আকার ধারণ করিল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, নয়নে বিস্ময়, ক্রোধ, ভয় অভিব্যক্ত হইল।

পাঠান্তে দৃঢ় মুষ্টিতে পত্র আবদ্ধ করিয়া ইন্দিরা বিগত-চেতনার মত নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। তখন তাহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে! জগৎ সংসারে তখন কোথায় কি হইতেছে, সে দিকে তাহার অনুভূতির চিহ্নমাত্র রহিল না!

(৫)

দার্জ্জিলিং হইতে কত আশা আনন্দ লইয়াই কুমার দীপেন্দ্রপ্রসাদ রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন! মেল যখন ঝড়ের বেগে ছুটিতেছিল, তখন তাঁহার মনের মধ্যেও প্রলয়ের ঝড় বহিতেছিল। দুঃখের পর সুখ বড় মিষ্ট, নিরবচ্ছিন্ন সুখ কি তাহার সহিত তুলিত হইতে পারে? ইন্দিরা—বিষাদপ্রতিমা ইন্দিরা—কে তাহার মত ধৈর্য্যময়ী! জীবনের এই প্রথম প্রভাতে তাহার উপর দিয়া সংসারের কত ঝড়ই না বহিয়া গিয়াছে! এমনই করিয়া ব্যর্থ জীবনভার বহন করিবার জন্যই কি তাহার জন্ম? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। এবার কলিকাতায় গিয়া রাজা বাহাদুরের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া লইতেই হইবে। যে কাকা সাহেব এত দিন তাহার সুখের পথে প্রবল অন্তরায় ছিলেন, এখন তিনিও পরম অনুকূল, তাহার দুর্ভাবনার কারণ নাই। কিন্তু—কিন্তু পাষাণের মত শুষ্ক নীরস কঠিন রাজা বাহাদুরের প্রাণ! তাহার উপর গত সপ্তাহে ছোট রাণী রুগ্ন পুত্রকে লইয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, বায়ু পরিবর্তনে ফল হয় নাই। তিনি আরও কঠিন, আরও কঠোর হইয়াছেন নিশ্চিতই। তিনি বাধা দিলে ইন্দিরার কৃষ্ণতার নয়নের চকিত হরিণীর মত সশঙ্ক দৃষ্টি ঘুচাইতে পারা সম্ভব হইবে কি?

কত অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত মনে দীপেন্দ্রপ্রসাদ প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু সেখানে যে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে ক্ষিপ্ত গ্রহের ন্যায় তিনি জন্মের মত প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গেলেন। সে দৃশ্য কি তিনি জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিবেন?

রাজপুত্রের সানুনয় নিবেদনে ব্যাধিক্লিষ্ট পিতা অপ্রসন্ন মুখে পরিষ্কার জবাব দিলেন যে, এ বিবাহে তাঁহার সম্মতি নাই, কখনও থাকিবে না। যে স্বয়ং স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, যাহার জননী কলঙ্কের পশরা বহন করিয়া কুলত্যাগিনী হইয়াছে, সে কখনও তাঁহার পুত্রবধূ হইতে পারে না। ক্রোধে প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় দীপেন্দ্রপ্রসাদ দীপ্ত দৃষ্টিতে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রোগ শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু রাজরাণীর শ্লেষব্যঙ্গ-মিশ্রিত উচ্চ হাস্যরোলে চমকিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

"কি গো, মারবে না কি?" রাজরাণীর ওষ্ঠাধর ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইল, তিনি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রোগা শরীরে বুড়ো বয়সে মার খেতে ইচ্ছে হয়ে থাকে,

খাও। তোমরা বাপ-বেটায় বোঝাপড়া কর—আমি না হয় চলে যাচ্ছি।"

রাজা বাধা দিয়া বলিলেন, "যেও না, বোসো। দেরাজের টানার মধ্যে থেকে উইলের নকলখানা বার করে এনে পড়ে শোনাও।"

দীপেন্দ্র অধৈর্য্য হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পড়বার দরকার নেই, শোনবারও দরকার নেই। আমি আপনার বিষয় চাই না। কেবল আপনাকে জানিয়ে যেতে চাই যে, রাজপুরীতে জন্মেছি বলে মানুষের জন্মগত অধিকার কারুর হুকুমে বিসর্জ্জন দেবো না।"

রাজা ঘূর্ণিত আরক্ত লোচনে বলিলেন, "বেশ, আমারও কথা শোন। আমার শেষ উইলে আছে যে, আমার অমতে যদি তুমি বিবাহ কর, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না, এ রাজবাড়ীর কোন সম্পত্তির সঙ্গেও তোমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। খেতাব যেমন আমার স্বোপার্জ্জিত, এ বিষয়ও তেমনই আমার নিজের গড়া। আমি যাকে ইচ্ছা বিলিয়ে দেবো, এই আমার শেষ কথা।"

দীপেন্দ্র রোষ ও অভিমানাহত কণ্ঠে বলিলেন, "আমারও শেষ কথা শুনুন, আমি আমাকে বেচে পৃথিবীর রাজ্যও ভোগ করতে চাই নে।"

ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ব্যথাহত হৃদয়ে উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই দীপেন্দ্র কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

"এ কি বাবা, দীপু ?—এমনি করে রাগ করে যেতে আছে কি ? ছি বাবা, এস এ ঘরে,—"

"বাধা দেবেন না আমায় কাকিমা—আমি—"

"ছি বাবা ! আমার মাথা খাও, ঘরে এস"—দীপেন্দ্রকে একরূপ টানিয়া লইয়া কাত্যায়নী আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সযত্নে বসাইয়া তাঁহার মস্তকের উপর সস্নেহে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন। দীপেন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কাত্যায়নী তাঁহার নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "ছি বাবা! কার জন্যে অভিমান করে চলে যাচ্ছ ? সে কি তোমার যুগ্যি ছিল ? একবার খোঁজ করে দেখেছ কি ?"

দীপেন্দ্র চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

কাত্যায়নী বলিলেন, "সমস্ত প্রাণটা ঢেলে দিয়ে যার জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছ, সে কি তোমার জন্যে দুদিন অপেক্ষাও করতে পারলে না ? যারা পেটে না খেয়ে আশ্রয় দিয়েছিল, তাদেরও কিছু না জানিয়ে একেবারে উধাও ! আমি ইন্দিরার কথাই বলছি। সে কি সামান্যি মেয়ে ? তোমায় নিয়ে কি খেলাটাই না খেল্‌লে বল দিকি !"

দীপেন্দ্র বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তাঁহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, নয়ন রক্তাভ। কাত্যায়নী তখনও বলিয়া যাইতেছিলেন,—"মীরাটে থাকতে ওর বিয়ের সবই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, হয় না হয় ওর বেহালার খুড়ো খুড়ীকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।"

দীপেন্দ্র দৃপ্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মিথ্যে কথা !"

ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া তিনি কাত্যায়নীর কোন বাধা না মানিয়া দীর্ঘ চরণ-বিন্যাস দ্বারা কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

কাত্যায়নী দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর মৃদু হাসিয়া আপন মনে বলিলেন, "তোরই ভালোর জন্যে ত করছি, বাপু ! আমার কি ?"

কক্ষ-মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ক্যাত্যায়নী আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "মেয়েটা কিন্তু বড় লক্ষ্মী, সরল মনে সব বিশ্বেস করেছে। কি সুন্দর চিঠিখানাই লিখেছে !" গুপ্ত স্থান হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া কাত্যায়নী পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"আর জন্মে আপনি আমার মা ছিলেন, না হলে এই বিপদ থেকে এমন করে বাঁচাবেন কেন ? কাশীর হিন্দী গার্ল স্কুলে দরখাস্ত বোধ হয় মঞ্জুর হবে। ঐখানেই চল্‌লুম। কেবল আপনি গোড়া থেকে জানেন বলে জানালুম, নইলে আমার কাকিমা কাকাবাবুকেও জানাই নি। কি জানি, যদি অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাঁদের মুখ থেকে কথা বের হয়ে পড়ে ! যা হো'ক, আর আপনাদের জ্বালাতন করতে আসবো না। ইতি—

ইন্দিরা"

অকস্মাৎ রাজা বাহাদুরের মহল হইতে গগনভেদী আর্ত্তরোল উত্থিত হইল। কাত্যায়নী স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার বক্ষপঞ্জরে যেন কে তীব্র কশাঘাত করিল। হস্ত-

স্খলিত পত্রখানি ভূমিতলে পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই তিনি উর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটিয়া গেলেন।

ইহার কিছু পরেই অধরচন্দ্র জমীদারী মহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনার শয়নকক্ষাভিমুখে গমন করিলেন। তখন রাজবাটীর মধ্যে তুমুল কাণ্ড চলিতেছে, রাজা বাহাদুর পক্ষাঘাত রোগে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হইয়াছেন। ডাক্তার ডাকাডাকি, ভৃত্য পরিজনের হুড়াহুড়ি, ছুটাছুটি,—অধরচন্দ্রকে কেহ লক্ষ্যই করিল না। অধরচন্দ্রও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পৃথিবী ওলোট পালোট হইয়া গেলেও তাঁহার অঙ্গ-প্রসাধন বন্ধ হইবার নহে!

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভূমিলগ্ন খোলা চিঠির উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। কৌতূহলী হইয়া পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল বর্ষার গুরুগম্ভীর মেঘের মত কালো—আঁধার হইয়া আসিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি আপন মনে বলিলেন, "হুঁ, এত দূর? খোদার উপর কারসাজি? আচ্ছা!"

(৬)

শ্রান্ত, অবসন্ন, অবসাদগ্রস্ত দেহে দীপেন্দ্র কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

দুই চারিটি করিয়া ঘাটের ও নৌকার সাঁঝের আলো জ্বলিয়া উঠিতেছে, দেবালয়ে নিত্য পূজার কাঁসর-ঘণ্টা বাজিতেছে, সমস্ত ঘাটটাই প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই লোকারণ্যের মধ্যেও দীপেন্দ্রপ্রসাদ সম্পূর্ণ একা!

লক্ষ্ণৌ, মীরাট, দিল্লী, এলাহাবাদ,—একে একে তিনি পশ্চিমের কত সহরের বালিকা বিদ্যালয়ে ইন্দিরার সন্ধানে ফিরিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছেন। শেষে অবসাদ—মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিবে না ত?

যদি ইন্দিরা ছলনা করিয়া কলিকাতাতেই লুকাইয়া থাকে? দীপেন্দ্র মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই ইন্দিরার খুল্লতাতের বেহালার বাসায় উপস্থিত হইলেন। ইন্দিরার কোন সংবাদ তাঁহারা পাইয়াছেন কি? সে কি কোথাও এই সহরে লুকাইয়া রহিয়াছে? জানিলে যদি তাঁহারা এখনও সংবাদ গোপন করিয়া রাখেন, তাহা হইলে সত্যই তিনি আত্মঘাতী হইবেন।

ইন্দিরার পিতৃবন্ধু তাঁহার দেহের পরিবর্ত্তন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, ব্যথায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। তিনি সযত্নে তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন, একরূপ বলপ্রকাশ করিয়া স্নানাহার করাইয়া দিলেন। স্বল্পকাল মধ্যেই দীপেন্দ্রপ্রসাদ ঘুমাইয়া পড়িলেন। ইন্দিরার আত্মীয় বুঝিলেন, কয় দিন বোধ হয় তাঁহার আহার ও বিশ্রামেরই অবসর ছিল না। সেদিন আর তাঁহার কর্ম্মস্থলে যাওয়া হইল না।

বিশ্রামের পর ইন্দিরার পিতৃবন্ধু যখন বলিলেন, সত্যই তিনি ইন্দিরার কোন সন্ধানই পান নাই, তখন দীপেন্দ্রপ্রসাদ আবার অবসাদগ্রস্ত হইলেন। ইন্দিরার পিতৃবন্ধু কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তিনি কেবল বলিলেন, স্থানত্যাগের পূর্ব্বে ইন্দিরা একখানি খাতা ফেলিয়া গিয়াছিল। তাহা তাঁহারা জানিতেন না। এত দিন পরে হঠাৎ তাঁহার পত্নী তাহার পরিত্যক্ত একটি ভাঙ্গা হাতবাক্সের মধ্যে সেইখানে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দীপেন্দ্রের পাণ্ডুর বদনে সহসা এক ঝলক রক্তের সঞ্চার হইল। নয়ন যুগল অপরূপ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সাগ্রহে খাতাখানি লইয়া তাহার মধ্যে আপনার হৃদয়ের ও চক্ষুর সমস্ত আগ্রহ ডুবাইয়া দিলেন। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত বিপন্ন বুভুক্ষু ভিখারী যেমন সম্মুখে আহার্য্য পাইলে অনন্যমনা হইয়া তাহাতেই আত্মনিয়োগ করে, দীপেন্দ্রকে তদবস্থ দেখিয়া ইন্দিরার পিতৃবন্ধু তাঁহাকে নির্জ্জনে অবস্থান করিতে দিয়া অন্যত্র সরিয়া গেলেন।

সে কি রচনা! রচনার ছত্রে ছত্রে ব্যথিতা নির্য্যাতিতার মর্ম্মবেদনা কি করুণ আর্ত্তরবেই না ফুটিয়া উঠিয়াছে! দুঃখ সহিতেই তাহার জন্ম—অনুযোগের অধিকার তাহার কি আছে? দারিদ্র্যের সহিত তাহার নিঃসঙ্গ নিরবলম্ব জীবনের সংগ্রাম—সে ত তাহা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে। তাহার দুঃখ কি? সে ত স্বস্তিতেই বাস করিতেছিল, কোথা হইতে তাহার জীবনাকাশে আবার রাজপুত্রের উদয় হইল? আবার রাজপ্রাসাদের আকর্ষণ, আবার প্রলোভন! মুক্তি কি তাহার নাই? কোথা হইতেই বা আবার অকস্মাৎ উল্কাপাতের ন্যায় এই অধরচন্দ্রের উদয়? সে কি তাহার জীবনের শনিগ্রহ? এই লোকটা কি এক মুহূর্ত্তও তাহাকে স্বস্তিতে বাস করিতে দিবে না? ইহার ক্রূর

কুটিল হাসি শত্রুর শাণিত অসি হইতেও ভীষণ নহে কি? রাজপুত্রের সহিত তাহার মিলন সংঘটনে তাহার এত আগ্রহ কেন? পূর্ব্বে ত সে এ মিলনের ঘোর বিরোধী ছিল। তবে কি উদ্দেশ্য আছে তাহার?

পাষাণও টলে, কিন্তু এ লোকটা ত টলে না! এত কাকুতি মিনতি—কিছুই শুনিবে না?

কিন্তু সে ত জানে না, কেন জমীদার-পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে না। তাহার পত্নী কাত্যায়নীই ত তাহাকে তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। তিনিই তাহার যথার্থ বন্ধু। সত্যই ত, কাঙ্গালের আবার রাজতক্তের স্বপ্ন কেন? রাজপুত্রের ক্ষণিকের মোহ—কত দিন তাহার অস্তিত্ব? ছিঃ ছিঃ, কি ভুলই সে করিতে বসিয়াছিল! অতি তুচ্ছ, অতি হীন সে। সে কে যে, ধনীর দুলালের সুখের জীবনাকাশ ছায়া করিয়া রাখিবে? যাঁহার পায়ে একটী কণ্টক বিদ্ধ হইলে সে প্রাণ দিয়া তুলিয়া দিতে পারে, তাঁহার ভবিষ্যৎ সুখের পথে সে কণ্টক হইবে? তাহার পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হউক না! ঋষিতুল্য পিতার নিকট তবে সে কি শিক্ষা লাভ করিয়াছে?

দীপেন্দ্র আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, পাগলের ন্যায় ক্ষণেক ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন। ইন্দিরা! এত অবিশ্বাস? একবার দেখাও দিলে না, জিজ্ঞাসাও করিলে না? তুমি ত সরলা,—কিন্তু কে এই সর্ব্বনাশের বীজ তোমার মনে উপ্ত করিল?

দীপেন্দ্র আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া রচনা পাঠ সাঙ্গ করিলেন—

এ নরক-যন্ত্রণা হইতে কিসে মুক্তি হইবে? না, প্রলোভনের পথ নিজেই ত্যাগ করা ভাল। কাহাকেও কিছু জানাইব না, কি জানি যদি অসতর্ক মুহূর্ত্তে কথা জানাজানি হইয়া পড়ে। না, চিরজন্মের মত এই স্থান ত্যাগ করিব। তাহার পর এমন স্থানে লুকাইব যে, পৃথিবীর এই অংশের সহিত আমার আর কোন সম্পর্ক থাকিবে না। এই পত্রখানিও এই সঙ্গে রাখিয়া গেলাম। কেন গোপনে গৃহত্যাগ করিলাম, এই পত্র পাঠ করিলেই আমার কাকাবাবু কাকিমা বুঝিতে পারিবেন। তাঁহাদের দয়া মায়ার কথা ইহজীবনে ভুলিতে পারিব না। ঘোর অপরাধ করিয়া না জানাইয়া চলিয়া যাইতেছি, তাঁহারা আমার এ পাপের ক্ষমা করিবেন। ইতি

সঙ্গে আর একখানি পত্র। হস্তলিপি দেখিয়াই দীপেন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন।—কি আশ্চর্য্য, এ যে তাঁহার খুল্লতাত-পত্নীর হস্তাক্ষর! তিনি কিরূপে ইন্দিরার সহিত পরিচিত হইলেন? পত্রখানি এই:—

"ইন্দিরা, তোমায় বেশী জানি না, তবে তোমার সব কথা জানি। তোমার সঙ্গে রাজকুমারের বিবাহ হতে পারে না। কেন না তাহলে রাজা দীপুকে ত্যাজ্যপুত্তুর করবেন নিশ্চয়। সেই ভাবের উইলও গড়া হয়েছে। আমার স্বামী তোমাদের আগে খুব শত্রু ছিলেন। কিন্তু কিছু দিন হতে উইলের কথা জানতে পেরে অবধি তোমাদের খুব বন্ধু হয়েছেন। এতে তাঁর এক ফোঁটাও দয়ার কারণ নেই, সবটাই স্বার্থ। রাজপুত্র ত্যাজ্যপুত্র হ'লে, আর রাজার যক্ষারুগী ছেলেটা ম'লে আমার স্বামী রাজার ওয়ারিশেন বলে বিষয় পাবেন, এই লোভে তোমাদের বিয়ের চেষ্টায় প্রাণপণ করছেন। কিন্তু এখনও রাজার রাণী রয়েছেন, তাঁর ছেলে এখনও মরে নি, রাজা বিষয় দেবতার নামেও করে দিয়ে যেতে পারেন, তবুও স্বামী লোভে অন্ধ হয়ে তা বুঝছে না। তুমি মা লক্ষ্মী, তুমি ত সব বুঝতে পারছ। আমি দীপুকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি, তাকে আমি পথের ভিখিরী হতে দিতে পারি না। তুমিও মা পারো না। যে ভালবাসে সে আর ভালবাসার সামগ্রীকে নর্দ্দমার পাঁকে টেনে নিয়ে যেতে পারে না। তা ছাড়া দীপু কি দার্জ্জিলিং হতে নেমে তোমায় একদিনও দেখতে গেছে? দেশের দিকে কাঁটাশেওলার জমিদারদের ঘরে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে, তাই নিজে সব দেখতে শুনতে গেছে। তুমিও যেমন, ওরা রাজারাজড়ার ছেলে, ওরা কি একটা জিনিষে মন দিয়ে চুপ করে থাকে? ইতি"

দীপেন্দ্রপ্রসাদের সম্মুখ হইতে যেন এক অন্ধ যবনিকা সরিয়া গেল, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "শয়তান!"

তাহার পর অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন।

ইহার পর যখন ইন্দিরার আত্মীয়রা তাঁহাকে বহু চেষ্টার পর প্রকৃতিস্থ করিয়া বলিলেন,—"এই পত্রখানা অধরবাবু রেখে গেছেন। বলে গেছেন, তুমি কোথায় ঘুরছো জানেন না, এখানে এলেই দিতে। পড়ে দেখ, আমরা তোমার খাবার জোগাড় করি গিয়ে।" তাঁহারা প্রস্থান করিলেন।

দীপেন্দ্র প্রথমে ঘৃণাভরে পত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিলেন, কিন্তু কি ভাবিয়া পত্র পাঠ করিলেন। মাত্র এই কয়টি কথা:—"যেখানেই থাক, এই পত্র পেলেই কাশী চলে এস। সন্ধ্যার পর, দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ থেকো, দেখা হবে। যার সন্ধানে ঘুরছো, এখানে এলেই তার সন্ধান পাবে।"

সেই দিনই দীপেন্দ্র কাশী রওনা হইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই দীপেন্দ্র অধরচন্দ্রের কণ্ঠরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আতঙ্কে অধরচন্দ্র দুই চারি দিন তাঁহার ত্রিসীমায় পদার্পণ করেন নাই। কিন্তু যে জন্য কাশী আগমন, তাহার ত কিছুই হইল না। অধরচন্দ্র প্রায় সপ্তাহাধিক কাল কাশীতে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া কোন গার্ল স্কুলে ইন্দিরার সন্ধান পান নাই। তার পর যখন তিনি দেখিলেন, দীপেন্দ্র সত্যসত্যই আর ঘরে ফিরিবেন না, হয়ত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যোগদান করিয়া সেবাধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিবেন, তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে একদিন হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন।

যেখানেই থাকুন, দীপেন্দ্রপ্রসাদ সন্ধ্যার পর নিত্য দশাশ্বমেধ ঘাটে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। কোন কোন দিন সঙ্গী জুটিতেন,—তাঁহারা মঠের সাধু। তাঁহারা তাঁহাকে সেবাধর্ম্মের মহত্ত্বের কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। একটি সাধু প্রায় তাঁহার সমবয়স্ক, নাম পরমানন্দ স্বামী, তাঁহার সহিত দীপেন্দ্রপ্রসাদের ঘনিষ্ঠতা অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়াছিল।

ঘাটের কোথাও কীর্ত্তন হইতেছে, কোথাও কথকতা, কোথাও ধর্ম্মব্যাখ্যা, কোথাও বা কেহ ঘাসিরামের চানাচুর গরমাগরম হাঁকিতেছে, কেহ বা সপরিবারে নৌবিহার করিতেছে। দীপেন্দ্র ভাগীরথী-বক্ষে আলোক-রশ্মির ঝিকিমিকি খেলার দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়াছিলেন।

"কতক্ষণ?" স্কন্ধের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া পরমানন্দ আসিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। দীপেন্দ্র চমকিত হইয়া ফিরিয়া বলিলেন, "কোথায় ছিলেন,—ক'দিন দেখিনি যে?"

"ডিউটি ছিল ক'দিন। যাক্, কি ঠিক করলেন? আমি ভাই এক ঝঞ্ঝাটে পড়েছি কাল থেকে।"

"কি রকম?"

"বলছি। কাল ডিউটি শেষ হ'ল। ফিরে আসছি মঠে, পথে এক বুড়ীর সঙ্গে দেখা। সে বল্লে, 'সাধু বাবা, একটা মেয়ে জ্বরে মরছে, কেউ দেখবার নেই। এত করে বলছি, মঠে খবর দিই গিয়ে, তা শুনবে না। চিকিৎসে করাবার ক্ষমতা নেই। যদি তুমি দয়া করে একটা ডাক্তার এনে দেখাও তা হলে মেয়েটা বাঁচতে পারে। আহা, বেচারা বড় ভালমানুষ'—আমি বললাম, 'তোমার কে হয়?' সে বল্লে, 'কেউ না বাছা। ঘাটে শুয়ে পড়ে ছিল, বল্লে বুকে ব্যথা। ধরে ঘরে তুলে নিয়ে এলাম। সে কি আবার ঘর? একখানা নিচের তালার অন্ধকূপ।' যেতে যেতে বল্লাম, 'ঘাটে পড়ে ছিল কেন, কেউ নেই তার?' সে বল্লে, 'কি জানি বাছা, কেউ থাকলে কি অমন করে ঘাটে পড়ে থাকে। বল্লে, সাত আট দিন কিছু খায় নি, বোধ হয় ভিক্ষী গিয়েছিল।' বুড়ীর অন্ধকার ঘরে প্রথমে কিচ্ছু দেখতে পাই নি। তার পর দেখলাম, ছেঁড়া মাদুরে একটি মেয়ে পড়ে আছে, ছেলেমানুষ, কঙ্কালসার দেহ। যা শুনলাম, প্রাণ ফেটে গেল! আহা, বড় যন্ত্রণা পেয়েছে। গার্ল স্কুলে মাষ্টারীর চেষ্টায় এসেছিল। ঘুরে ঘুরে কোথাও চাকুরী পায়নি, চাকুরী খালি ছিল না কি ঐ রকম কি একটা হবে। বহুকষ্টে শেষকালে একটা সামান্য মাইনের জুটলো বটে, কিন্তু একদিন সে স্কুলের কাছে দূর থেকে তার শত্রুকে দেখতে পেয়ে চাকুরীর মায়া কাটিয়ে লুকিয়ে রইলো। সঙ্গের পুঁজিপাটা সব ফুরিয়ে গিয়েছিল। শেষে ঘরভাড়াও দিতে পারে নি, দুবেলা আহারও জুটতো না, বুকে ব্যথা ধরতে লাগলো। এ রোগ না কি আগে ছিল, আগে ডাক্তার বলেছিল, ভয়ে ভয়ে রোগ ধরেছে। নাড়ী দেখবার সময় তার আঙ্গুলে একটা দামী হীরের আঙটি দেখে চমকে উঠলাম। বল্লাম, 'তোমার আঙটির অনেক দাম হবে যে, ঐটে বেচে চিকিৎসা করাও নি কেন?' তাড়াতাড়ি হাতখানা বুকের মধ্যে চেপে রেখে ভাঙ্গা গলায় বল্লে, 'মরলে পরে ঐটে বেচে আমার দাহ করবেন।' আমি স্পষ্ট দেখেছি, জল জল করছিল হীরের অক্ষরগুলো আঙটির গায়—নামটাও বেশ ফুটে উঠেছিল"—

দীপেন্দ্র বিমূঢ়ের মত শুনিয়া যাইতেছিলেন! সহসা ধৈর্য্যহারা হইয়া তাঁহার হস্ত সজোরে চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি, কি, কি নাম দেখেছিলেন?"

"দীপেন!"

দীপেন্দ্র উন্মত্তের মত দণ্ডায়মান হইয়া পরমানন্দকে সবলে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "কোথায়, কোথায়, এখনই নিয়ে চলুন।"

পরমানন্দ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কে? আপনার কে হয়? কাল তার সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু এতক্ষণ কি—"

দীপেন্দ্র তাঁহার কথা সাঙ্গ হইতে দিলেন না, দ্রুতপদে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া বাঙ্গালীটোলার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

* * * *

"ইন্দিরা—ইন্দু—এই জন্যই কি আমাকে রোগশয্যা থেকে বাঁচিয়েছিলে? কি অপরাধ করেছিলুম আমি তোমার?" দীপেন্দ্রপ্রসাদের অশ্রুধারায় ইন্দিরার শীর্ণ, রোগজীর্ণ দেহ অভিষিক্ত হইল।

ভয়ভীতা কুরঙ্গীর মত ইন্দিরার ব্যথাক্লিষ্ট পাণ্ডুর নয়নে আতঙ্করেখা ফুটিয়া উঠিল। ক্ষীণকণ্ঠে সে কোনও মতে বলিল, "এখানেও এসেছেন কেন? আমি ত"—

ইন্দিরা অতি কষ্টে শ্বাসগ্রহণ করিতে লাগিল।

"ইন্দিরা—এখনও অবিশ্বাস? যে শয়তান"—

বাধা দিয়া ইন্দিরা বলিল, "আমি ত আপনার সুখের পথে কণ্টক হইনি—আমি ত পালিয়েই এসেছিলুম"—

দুই তিন বার ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ইন্দিরার দেহলতা এলাইয়া পড়িল।

দীপেন্দ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—জড়িত অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "ইন্দিরা, বিশ্বাস করলে না, জন্মের মত অপরাধী করে রেখে গেলে?"

দীপেন্দ্র সংজ্ঞারহিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন—নিস্পন্দ ইন্দিরার একখানি হস্ত তাঁহার মুষ্টির মধ্যে দৃঢ় সংবদ্ধ হইয়া রহিল। সন্ন্যাসী পরমানন্দের নয়নেও তপ্ত অশ্রুধারা নামিয়া আসিল!

দূন বন-বিজ্ঞান মন্দির

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-আই-ই-ই, এ-এম-আই, মেকানিকাল, ই, এম-আই-ই (ইণ্ডিয়া)

যুক্তপ্রদেশের মধ্যে দেরাদুনের মত সদা-স্নিগ্ধ শ্যামল-সৌন্দর্য্যে-ভরা কোন নগর আছে কি না সন্দেহ। বাঙ্গলার মত সবুজবর্ণের সমাবেশ ও স্নিগ্ধ-মধুর বাতাস, যুক্তপ্রদেশে—এক দেরাদুনেই পাওয়া যায়। দেরাদুনে ও বাঙ্গালায় পার্থক্যের মধ্যে, দেরাদুন পাহাড়ী জায়গা এবং বাঙ্গলার মত নদ-নদীর বাহুল্য সেখানে নাই; যাও-বা দু-একটী নদী আছে, তাও পাহাড়ী নদীর মত জলবিহীন; নচেৎ,—দেরাদুন বাঙ্গলার মতই শ্যামল ঐশ্বর্য্যে ভরা।

দেরাদুনের প্রাকৃতিক দৃশ্যও উত্তম। স্বাস্থ্যকর জল-বায়ু ছাড়া,—ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক কিছুই দেখিবার নাই। কেবল হিমালয় পর্ব্বতের এত নিকটে থাকায়, এখানে গ্রীষ্মের আতিশয্য একেবারেই জানা যায় না; যদিও—অন্য পাহাড়ী জায়গা যেমন,—নৈনীতাল, দার্জ্জিলিং ও শিলঙএর মত অত ঠাণ্ডাও নয়। তবে শীত কালে যথেষ্ট ঠাণ্ডা পড়ে; এবং বরফমণ্ডিত হিমালয়ের দৃশ্যও বেশ উপভোগ করা যায়। এখানকার নাতি-শীতোষ্ণ জলবায়ুর জন্য অনেকেই অন্যান্য পাহাড়ী জায়গার পরিবর্ত্তে এখানে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ আসিয়া থাকেন, এবং দুএকটী ঝরণা ও পাহাড়ের দৃশ্য উপভোগ করিয়া থাকেন।

কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান যে এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে বিষয় কেহ ভাল করিয়া অনুসন্ধান করেন কি না জানিনা। দেরাদুনের এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মাত্র Forest Research Institute সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই; এবং আমার ধারণা যে, এই প্রতিষ্ঠান হইতে সাধারণের কিছু সাহায্য হইতে পারে। নচেৎ দেরাদুন সম্বন্ধে কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। কারণ যাঁহারাই দেরাদুনে বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থ আসেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর দেরাদুনের পরিচয় ও বর্ণনা মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তখন এ বিষয়ে আমার কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

ফরেষ্ট কলেজে ফরেষ্টের বা বন-বিভাগের কার্য্য

করিবার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব ও বাঙ্গলার সমস্ত ফরেষ্ট অফিসার এই ফরেষ্ট কলেজ হইতে শিক্ষা পান।

আজকাল বাঙ্গলার ছাত্রগণ নাম-মাত্রই এখানে শিক্ষা লইতে আসিয়া থাকেন; কিন্তু পূর্ব্বে এখানে বাঙ্গালী ছাত্র-সংখ্যার আধিক্য ছিল। এখন যেমন ছাত্রসংখ্যাও কমিতেছে, তেমনি বাঙ্গালী অধ্যাপকও নাই বলিলেই চলে।

পূর্ব্বে এই ফরেষ্ট কলেজেই যাবতীয় বনজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে রিসার্চ্চ বা গবেষণা কার্য্য হইত; এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান ছাত্রদেরই জঙ্গলের গাছগাছড়া সংরক্ষণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে কাজে লাগাইবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ যাহাতে এই রিসার্চ্চের ফল ভোগ করিতে পারেন অর্থাৎ জঙ্গলের কাঠ ও গাছগাছড়া—দরজা, জানালা ছাড়া আরও নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুতে পরিণত করিয়া কাজে লাগাইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালে চাঁদবাগ নামক দেরা-দূনের এক পল্লীতে পৃথকভাবে রিসার্চ্চ আরম্ভ করা হয়। তাহার ফলে গাছগাছড়া ও কাঠ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়া ১৯১৮ সালে Industrial Commission আসিয়া এই research বিভাগ আরো প্রসারিত করিবার জন্য দেরাদুন সহর হইতে ৩ মাইল দূরে কলাগড় নামক জায়গায় ৩০টী গ্রামের ৩০০ শত বিঘা জমি গভর্ণমেণ্ট হইতে সংগ্রহ করিয়া Indian Forest Research Institute ১৯২৪ সালে স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে এই কলাগড়েই দেরাদুনের প্রসিদ্ধ বাসমতি চাউলের চাষ হইত। এই Research Instituteএর বাড়ী ও সমস্ত অফিসার, কর্ম্মচারী ও কেরাণীদের বাস করিবার কোয়ার্টার, রাস্তা-ঘাট ও ক্লাব ইত্যাদির জন্য ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই Institute আবার চারি ভাগে বিভক্ত, যথা:—

(১) Silviculture,

(২) Forest Economy or Utilization.

(৩) Forest Entomology.

(৪) Forest Botany and Chemistry.

Silviculture বিভাগ হইতে, গাছ কোন্ সময় কাটিলে কোন্ কার্য্যের উপযোগী হইতে পারিবে, অর্থাৎ কোন্ কোন্ গাছ কত বৎসর বাড়িতে দেওয়া উচিত এবং কোন্ কোন্ গাছের কত বয়স, এবং কত বৎসরের হইলে বিভিন্ন গাছের কাঠ নষ্ট হইবার ভয় থাকিবে না, এই বিষয়ে সকলকে সাহায্য করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট ও জমিদারগণের জঙ্গলের গাছের কাঠ হইতে কি ভাবে আয় বাড়াইতে পারা যায় ও তার জন্য কি কি গাছ কি ভাবে ও কোন্ সময়ে লাগাইতে হইবে, সে সব বিষয়ে নানারকমে সাহায্য করিয়া থাকে।

Forest Economy ও Utilization আবার ছয় ভাগে বিভক্ত, যথা:—

(১) Wood Technology.

(২) Timber Testing.

(৩) Wood Preservation.

(৪) Timber Seasoning.

(৫) Paper Pulp.

(৬) Minor Forest Product.

(১) Woofl Technology বিভাগে কাঠের শারীর বা আভ্যন্তরিক আকৃতির গঠনপ্রণালী (Anatomical structure), মাইক্রো ফোটোগ্রাফ (Micro photogroph) দেখিয়া বিভিন্ন কাঠ কি কি কার্য্যোপযোগী হইতে পারে, এবং আবহমান কাল হইতে যে নির্দ্দিষ্ট কাঠ, যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যোপযোগী হইয়া আসিয়াছে, সেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য অন্য প্রকার কাঠ ব্যবহৃত হইতে পারে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিয়া থাকে।

অনেকেই হয় ত বলিতে পারেন যে, কাঠের আবার শারীর আভ্যন্তরিক গঠনপ্রণালী দেখিয়া কাঠ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কি? অনেক সময় ঐ গঠনপ্রণালী পরীক্ষা না করার জন্য, প্রকৃত সেই নির্দ্দিষ্ট জাতীয় কাঠ সেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যবহার করিবার যোগ্য কি না, কোন মতেই জানা যায় না। যথা;—একবার এক মিউনিসিপ্যালিটি হইতে কোন কার্য্যের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট জাতীয় কাঠ এক ঠিকাদারকে সরবরাহ করিবার জন্য অর্ডার দেওয়া হয় এবং ঠিকাদারও সেই কাঠ বলিয়া, এক প্রকার কাঠ সরবরাহ করে। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ কাঠ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সেই কাঠ হইতে এক টুকরা কাটিয়া Research Instituteএ পাঠাইয়া দিয়া তার শারীর আভ্যন্তরিক গঠন পরীক্ষা করিয়া সেই জাতীয় কাঠ কি না জানিতে চান এবং Research Institute পরীক্ষা দ্বারা

উহা সে জাতীয় কাঠ নয় জানানোতে, সেই ঠিকাদারের কাঠ সরবরাহ নাকচ্ হয়।

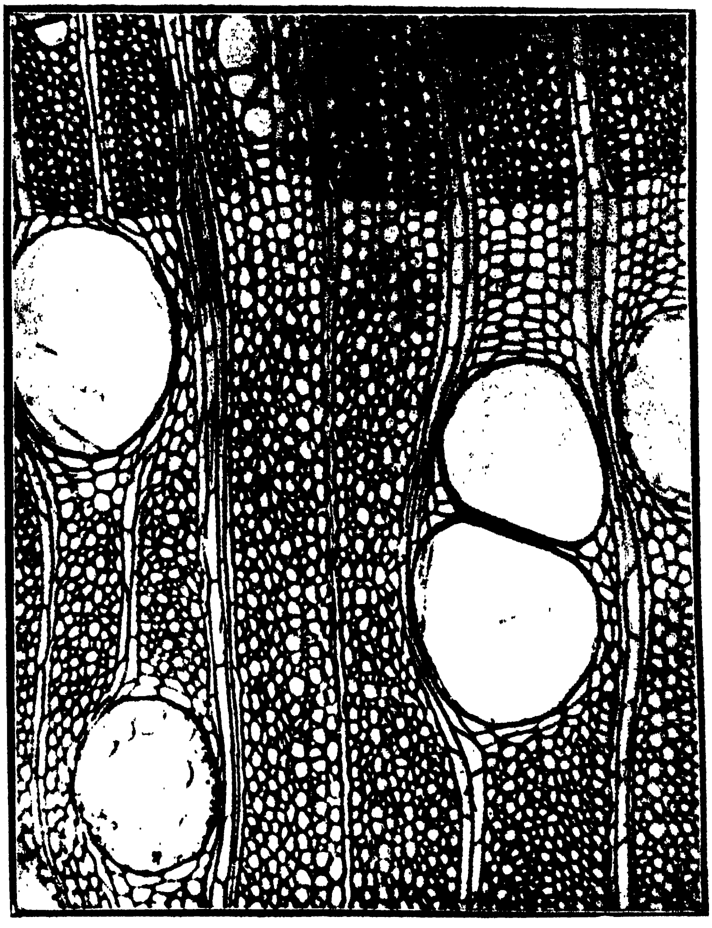
পূর্ব্বে হাতুড়া, কোদাল, সাফট্ ও বন্দুকের বাঁট্এর বন্দুকের জন্য কাঠ ভারতের বাহির হইতে আমদানী হইত, এখন এই পরীক্ষা দ্বারা ভারতের কাঠ ঐ কার্য্যের উপযোগী সাব্যস্ত হওয়ায় দেশের কাঠই ব্যবহৃত হইতেছে।



ইনষ্টিটিউট ভবন

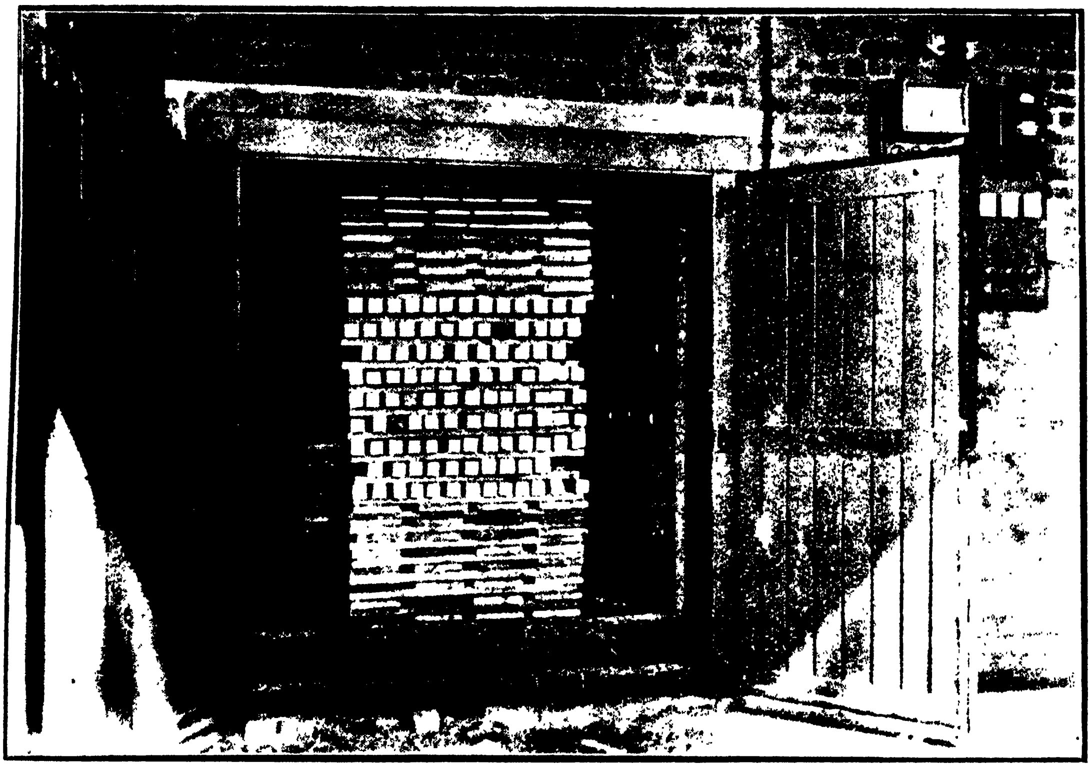
জন্য বিলাতী Ash ও Hickory ছাড়া অন্য কাঠ ব্যবহৃত হইত না; কিন্তু উপরি-উক্ত কাঠের শারীর আভ্যন্তরিক গঠন দেখিয়া উহার সমতুল্য শারীর আভ্যন্তরিক গঠনের ভারতবর্ষীয় কাঠ, আজকাল হাতুড়ি, কোদাল সাফ্‌টের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। কাজেই কাঠ সম্বন্ধে এই বিভাগের গবেষণা নানা রকমে প্রয়োজনীয়। এই বিভাগে একজন বাঙ্গালী অফিসার আছেন।

Timber testing বিভাগে, কোন্ কোন্ কাঠ কোন্ কোন্ কার্য্যের উপযোগী শক্তি ধারণ করে, এবং আবহমান কালের জানা কাঠের স্থলে কোন নতুন অজানা কাঠ সেই শক্তি ধারণ করিয়া, সেই কার্য্যের উপযোগী কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। তাহার ফলে, বরগা ও পুলের নানা অংশ এবং রেলের স্লিপারের জন্য যে সব কাঠ ভারতবর্ষের বাহির হইতে পূর্ব্বে আমদানী করা হইত, সে আমদানী বন্ধ হইয়াছে। ইহাতে দেশের কাঠের কাট্‌তি হইয়া দেশেরই লাভ হইয়াছে। যেমন পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের তোপ- খানার গাড়ীর ও



কাঠের মাইক্রো ফোটোগ্রাফ

অনেকেরই বিশ্বাস যে, যে-কোন কাঠেই প্যাকিং বাক্স হইতে পারে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্যাকিং বাক্সর কাঠেরও বিশেষ পরীক্ষা আবশ্যক। কেন না, রেলে ষ্টীমারে কুলীদের আছাড়ের ফলে যাহাতে বাক্সগুলি এতটুকুও নষ্ট না হইয়া বাহির হইয়া আসতে পারে, অথচ ওজনে হাল্কা হয় এরূপ কাঠে বাক্সগুলি তৈরী হওয়া দরকার; কাজেই বাক্সের কাঠের শক্তি পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন, এবং Timber testing বিভাগই সেই পরীক্ষা করিতে পারেন। এই কারণে এই Timber testing বিভাগে জানালা তৈরী করবার সময় সকলেই কাঁচা ও পাকা কাঠ যাচাই করিয়া থাকেন। কাঁচা কাঠ এই সব কাজের জন্য ব্যবহার করিলে কি রকম ক্ষতি হয়,—অর্থাৎ কাঁচা কাঠের দরজা, জানালা ও আসবাব বর্ষার সময় ও গ্রীষ্মকালে কি রকম বাঁকা চোরা হইয়া যায়, তা সকলেই জানেন বলিয়া, এই সব কাজের জন্য পাকা কাঠ অর্থাৎ রৌদ্র পক্ব ও বৃষ্টি সহ দেখিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ ভারতবর্ষে কাঠ পরিপক্ক করা হইত না। কেবল গভর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে নিজের ব্যবহারের জন্য কাঠ বাহিরে রৌদ্রে ও



শুকাইবার যন্ত্র

একটী Drum Testing Machine আছে যাহাতে নানা রকমের কাঠের বাক্স তৈরী করিয়া পরীক্ষা করা হয় যে, কোন্ কাঠ প্যাকিং বাক্সর জন্য নিরাপদ ও উপযোগী।

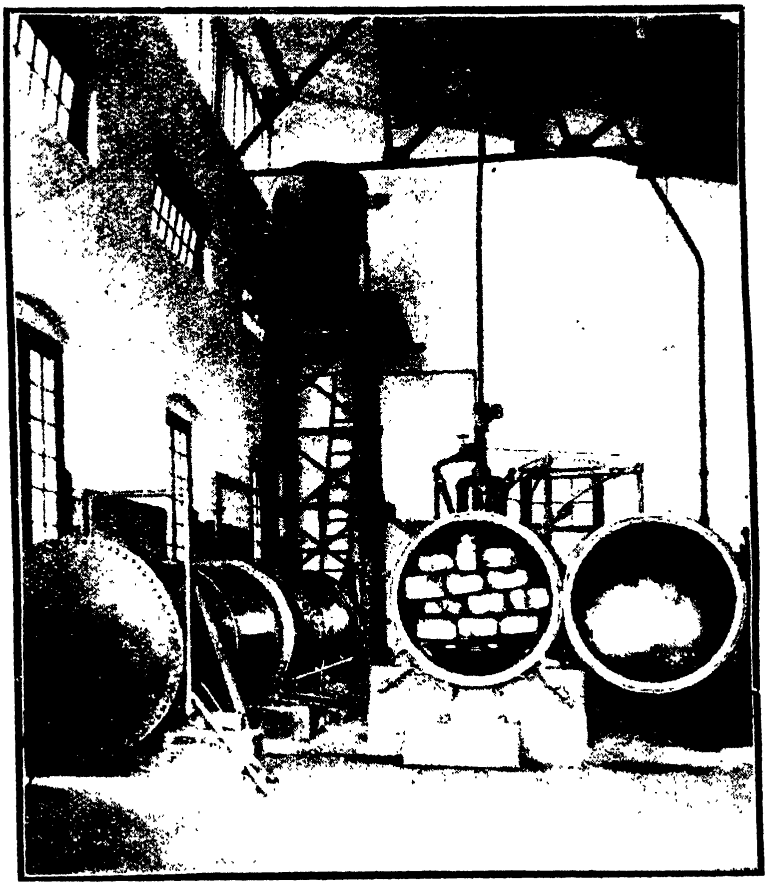
পূর্ব্বে এই কাঠ ভারতের বাহির হইতে আমদানী হইতে; কিন্তু আজকাল drum Testing করার জন্য দেশের বাহির হইতে প্যাকিং বাক্সের কাঠের আমদানী বন্ধ হইয়াছে।

Timber seasoning section :—কাঠের দরজা, বৃষ্টিতে ফেলিয়া রাখিয়া পরিপক্ক করিতেন। ইহার নাম open air seasoning ছিল। তজ্জন্য অনেক টাকার কাঠ কিনিয়া চার-পাঁচ বৎসর ফেলিয়া রাখিতে হইত এবং অনেক টাকা আটক হইয়া থাকিত; কিন্তু, এখন এখানে কৃত্রিম উপায়ে গরম ষ্টীম ও ঠাণ্ডা জলের দ্বারা দিয়া (artificial way) কাঠ পরিপক্ক করা হয়। তাহাতে চার-পাঁচ বৎসরের স্থলে পাঁচ-ছয় সপ্তাহেই কাঠ পরিপক্ক (seasoned) হইয়া যায়।

Wood Preservation Section :—সাধারণতঃ সকলেই কাঠকে উই ও ঘুণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আলকাতরা, টারপিন তেল ও নানা রকম রং দিয়া ব্যবহার করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। আর কোন রকম antiseptic oil দিয়া Preserve করিতে জানেন না বা করেন না।

পূর্ব্বে Rly Company নানা রকম উপায়ে কাঠ Preserve করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। Forest Research Instituteই প্রথম open tank preservation system আরম্ভ করেন; অর্থাৎ একটা open tank এ তেল রাখিয়া তাহার মধ্যে কাঠের slipper রাখিয়া গরম করা হইত ও পরে জ্বাল সরাইয়া দিত এবং জ্বাল সরাইবার পরে কাঠ ঠাণ্ডা হইবার সময় কাঠের উপরের পর্দ্দাগুলা অল্প সল্প তেল শুষিয়া লইয়া কিছু কিছু preserved হইত। কিন্তু পুরাপুরি ভিতর পর্য্যন্ত তেল না যাওয়াতে পুরা preserved হইত না। তজ্জন্য কেবল শাল ও দেওদার কাঠই slipper এর জন্য ব্যবহার করা হইত এবং অন্য জাতীয় কাঠ 2nd class বলিয়া slipperএর অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইত।

১৯১২ সালে এই Instituteএ Pressure Plant systemএ wood preservation আরম্ভ করে। এই plantটীতে একটী Vacuum Cylinder এর মধ্যে কাঠের log রাখা হয় এবং cylinder-টাকে steam coil দিয়া গরম করিবার পর তেল ঢালা হয় এবং কাঠগুলা গরম ও Vacuumed হইয়া থাকায়, কাঠের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তেল ঢুকিয়া গিয়া, কাঠটাকে উই ও ঘুণের হাত হইতে রক্ষা করে এবং তাহাতে কাঠের আয়ু হাজার হাজার বৎসর বৃদ্ধি করে।



বন রক্ষণ

পূর্ব্বে open tank প্রথায় যে spruce ও fir কাঠকে slipperএর অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইত, এখন এই pressure plant system এর দ্বারায়, সেই spruce ও fir আজকাল slipperএর জন্য ব্যবহৃত হইতেছে এবং তাহাতে জঙ্গলের হাজার হাজার টন কাঠ, যাহা 2nd class বলিয়া কেবল জ্বালানী কাঠের জন্য ব্যবহৃত হইত, সে সবও কাজে লাগিতেছে।

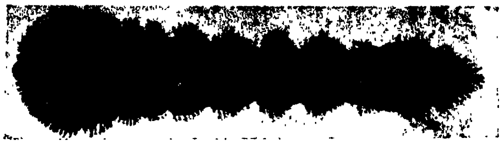
Paper Pulp বিভাগ :—সকলেরই জানা আছে বোধ হয় যে জঙ্গলের ঘাস ও বাঁশ হইতে কাগজ তৈরী হইয়া থাকে; কিন্তু ভারতীয় paper mill এর জন্য বরাবর ভারতের বাহির হইতেই wood pulp আনান হইত; কারণ, জঙ্গলের বাঁশ ও ঘাস হইতে pulp তৈরী করিতে অনেক খরচ পড়িয়া যাইত।

১৯০৯ সালে এই Forest Research Instituteই

প্রথমে একটী Experimental Paper Pulp Plant বসান। এটি এত বড় যাহাতে সব রকম Experiment ব্যবসাদারী মতে হইতে পারে এবং এই plant হইতে যে experiment হয়, তাহা হইতে Factoryওয়ালারা বেশ ভাল করিয়া জানিতে পারেন যে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের paper pulp এর বাজার-দর কি রকম দাঁড়ায় এবং বাহিরের আমদানী pulp হইতে সস্তা হয় কি না।

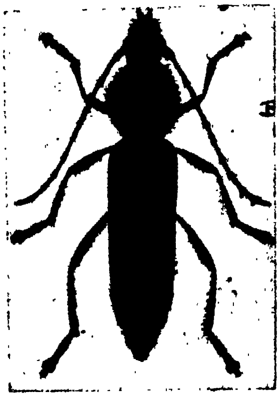


বাঁশের পোত









গত ১৪ বৎসর ধরিয়া এখানে Experiment করিয়া দেখা গিয়াছে যে সাহারাণপুরের জঙ্গলের "ভাব্বর" ঘাস ও ভারতীয় বাঁশের তৈয়ারী Paper pulp দামে সস্তা হয় এজন্য Titagarh paper mills বৎসরে লাখ টাকার "ভাব্বর" ঘাস সাহারাণপুরের জঙ্গল হইতে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের Paper millএ কাগজ তৈরী করিবার জন্য ও তারতেই যাতে সস্তায় ভারতীয় বাঁশের Pulp তৈরী হইতে পারে তার জন্য বাঁশের pulp এর কারখানা কোন কোন জায়গায় তৈরী হইবার কথা হইতেছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, এই Research Institute জঙ্গলের বনজ সম্পদের উপর গবেষণা করিয়া কত হাজার হাজার টাকা বন বিভাগ হইতে আয় হইতে পারে তাহার চেষ্টা ও সাহায্য করিতেছেন। ঘাস ও বাঁশের Pulp এইখানেই তৈরী হওয়াতে ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে Wood pulpএর আমদানী বন্ধ হইয়া যাইতেছে। কেহ যদি এই রকম বাঁশের pulpএর ছোট Factory খুলিয়া ছোট ছোট কাগজের Mill খোলেন, তাহা হলে এই অন্ন-সমস্যার দিনে অনেকেরই অন্নকষ্ট ঘুচে ও দেশের সম্পদ দেশেতেই কাজে লাগে।

Minor Forest Product Department :—এই বিভাগে জঙ্গলের নানা রকম উদ্ভিদ, লতা, গুল্ম, ঘাস, বনফল ও বড় গাছের ছাল ইত্যাদি হইতে ব্যবহার্য্য কোন বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে কি না, পরীক্ষা করিয়া Instituteএর নানা বিভাগে পুরাপুরি research করিতে দিয়া থাকেন। যেমন, কোন কোন ঘাস ও গাছ হইতে তৈল বা টারপিণ তৈল পাওয়া যায়, ও কোন কোন গাছের ছাল ও চামড়া ট্যান করবার উপযোগী এবং কি কি গাছ হইতে গঁদ ও ধুনা বাহির হয় ও কি কি গুল্ম হইতে কি কি ঔষধ বাহির হয়, তারই বিষয় পরীক্ষা করিয়া বাজারে সেই সব জিনিসের চলন করবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

এমন কি ইঁহারা প্রচলিত কাঠের কয়লার নানা রকম পরীক্ষা করিতেছেন। অর্থাৎ পাহাড়ের উপর হইতে পোড়াইবার জন্য কাঠ বহিয়া আনা বড় কষ্টকর ও

ব্যয়সাধ্য। এমন অনেক গাছ আছে যা পোড়ান ছাড়া আর কোন কাজে আসে না। সেই সব গাছ, শুদ্ধ সেই কারণে কোন ব্যবহারে আসে না। তাই ইঁহারা সেই সব পাথুরে কয়লার দিনে কাঠের কয়লা করিয়া কি লাভ হইবে? কিন্তু অনেকেরই হয় ত অজানা নয় যে এখনও পাথুরে কয়লা সস্তা দামে পাওয়া ত দূরের কথা, অনেক স্থানে পাওয়াই যায় না

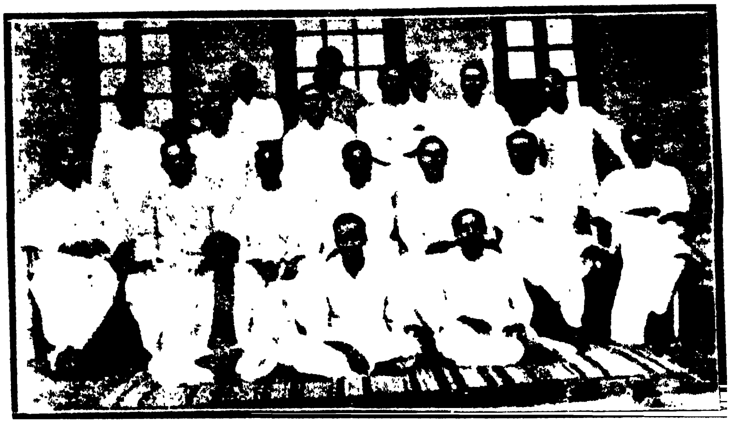


দিওদার বৃক্ষ

গাছের কাঠের কয়লা পাহাড়ের উপরেই তৈরী করিয়া অল্প আয়াসেই আনাইবার চেষ্টা করিতেছেন; কারণ কাঠ কয়লা সহজে নীচে আনা যায়। আমাদের চলিত আদিম প্রথায় কাঠের কয়লা তৈরী করিলে অনেক কাঠ, কয়লা হইবার সময়ই ছাই হইয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং কয়লার কোন by-product পাওয়া যায় না। ইঁহারা নূতন রকম Kiln প্রথায় কাঠ পোড়াইয়া কয়লা তৈরী করিবার চেষ্টা করিতেছেন, যাতে কয়লার By-product ও পাওয়া যাইবে এবং কাঠ পুড়িয়া ছাই হইয়া না গিয়া সবই কয়লা হইতে পারিবে।

অনেকে হয় তো মনে করিতে পারেন যে

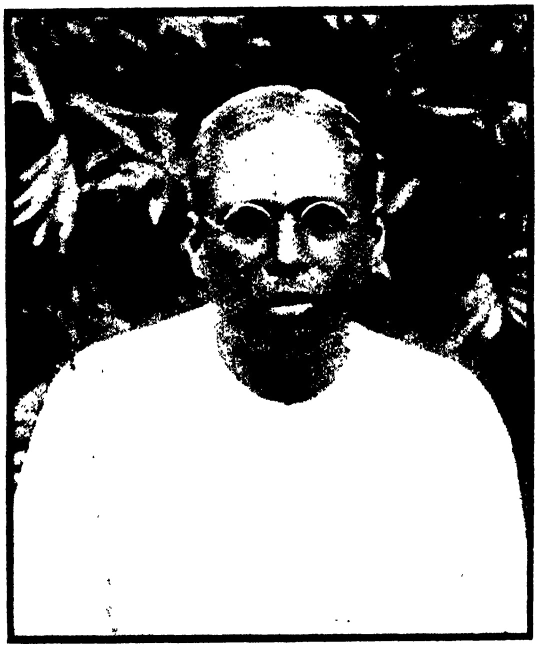
এবং সে সকল জায়গায় কামার ও ঢালাইয়ের কাজ (Foundry work) সবই কাঠে ও কাঠের কয়লায় হয় এবং অনেক



ইনষ্টিটিউটের বাঙ্গালীগণ

জায়গায় কাঠের কয়লার দাম বেশী পড়ে বলিয়া কাঠে কাজ করিতে নানা রকম অসুবিধাও ভোগ করিতে হয় এবং বর্ষাকালে যাহাতে ভিজা বা কাঁচা কাঠ না ব্যবহার করিতে হয় তাহার জন্ত পূর্ব্ব হইতে কাঠ কিনিয়া রাখিবার জন্ত অনেক টাকা আটক হইয়া যায়। যদি এই Institute নূতন প্রথায় কাঠের কয়লা প্রস্তুত-প্রণালী,—প্রচলিত প্রণালী হইতে সহজে ও সস্তায় করিতে পারেন, তাহা হইলে কাঁচা কাঠ পোড়াইয়া কাজ করার কষ্ট হইতে অনেকেই অব্যাহতি পাইবেন।

Forest Entomology Section :—এই বিভাগকে



লেখক

সাধারণতঃ গাছের চিকিৎসা-বিভাগ বলা চলে। অনেক সময় বড় বড় গাছ, ছোট একটু পোকার বাসস্থান হোয়ে, একেবারে মৃত্যুমুখে পড়ে। এই বিভাগে কোন্ কোন্ পোকা কোন্ কোন্ গাছের কি রকম অনিষ্ট করে এবং কোন্ কোন্ পোকা সেই অনিষ্টকারক পোকাদের বিনাশ করিতে সমর্থ হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া থাকেন। শোনা যায় যে এক জঙ্গলে প্রায় ৫০ লাখ গাছ এই পোকার হাতে নষ্ট হয়, এবং তাহাতে গভর্ণমেণ্টের প্রায় দুই লক্ষ টাকা নষ্ট হইয়া যায়। ভবিষ্যতে আর এরূপ ক্ষতি হইবার ভয় নাই; কারণ, এই Entomology section এই পোকা-চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। এই বিভাগে একজন বাঙ্গালী অফিসার আছেন।

Botany ও By-Chemist Department :—এই বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই; কারণ, সকলেই জানেন যে Botanyই Forestry। Botany ছাড়া Forestry হইতেই পারে না এবং researchই Chemistry,—Chemistry ছাড়া research হইতে পারে না।

প্রকৃত পক্ষে এই দুই বিভাগই Research Institute-এর মেরুদণ্ড।

এই Research Instituteএ বনজ গাছ-গাছড়া, লতাগুল্ম, কাঠ-কাঠরা ও কি কি বস্তু এই গাছ-গাছড়া হইতে হইতে পারে এবং তৈরী হইতেছে, তাহার একটী সুন্দর Museum করিয়াছেন। দেরদূনের এই Museum একবার সকলেরই দেখা উচিত। তাহা হইলে অনেকেই বনজ উদ্ভিদ হইতেও কত রকম বস্তু হইতে পারে তা ভালরূপে জানিতে পারবেন।

তার পর আমার বক্তব্য এই যে বাঙ্গলার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান-মন্দির এবং তাঁহাদের শিষ্য থাকা সত্বেও এই Forest Research Instituteএ বাঙ্গালী কেউ নাই বলিলেই হয়। ১০,১২ জন Lower grade assistant ও দুইজন মাত্র বাঙ্গালী অফিসার আছেন। এখানে অবাঙ্গালীর প্রাধান্তই বেশী।

৩০০ বিঘা জমি জুড়িয়া যে একটী প্রায় সহরের মত প্রতিষ্ঠান হইয়াছে, তাহাতে যদি ১০০ জনও বাঙ্গালী থাকিত, তাহা হইলে আচার্য্য বসু মহাশয়ের বিজ্ঞান মন্দিরের সাফল্য হইতেছে বুঝিতাম। ঘরের কোণে বসিয়া বাঙ্গালী কি ডেলী প্যাসেঞ্জারি কোরেই ভগ্নপ্রাণে জীবন কাটাইবে?

দেরাদূনে বাঙ্গালী যে নাই তাহা নয়; কিন্তু এই নূতন প্রতিষ্ঠানে নাই। কলিকাতায় যে Survey of India অফিস আছে, তাহারই একটী branch এখানে আছে এবং এই survey অফিসের জন্তই দেরাদূনে বাঙ্গালীর বসবাস ও করণপুর নামে একটী জায়গা বাঙ্গালা পল্লী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রদ্ধেয় জলধরদাদা বহুদিন পূর্ব্বে এই করণপুরেই কয়েক বৎসর কাটিয়েছিলেন। যদিও এখন আর এ আফিসেও বাঙ্গালী প্রাধান্ত আর নাই কেবল কেরাণী ও দু-চারজন Surveyer আছে মাত্র। কিন্তু পূর্ব্বে কেরাণী বাঙ্গালী ত ছিলই, অফিসারও ছিল; এবং তাঁরা অনেকেই দেরাদূনেই বাড়ী-বাড়ী ঘর করিয়া বসবাস করিয়াছেন। তাঁদেরই যত্নে একটী বাঙ্গালী ক্লাবও স্থাপিত হোয়েছে ও একটী লাইব্রেরিও আছে।

হাজি মহম্মদ মহসীন

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রচুর ধনের অধীশ্বর হইয়াও যিনি আজীবন সন্ন্যাসী ছিলেন, ধর্ম্মই যাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য ছিল, যাঁহার দানশীলতা এদেশে প্রবাদ বাক্যে পরিণত, পরোপকারে কেহ যাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না, মনুষ্যত্বের সাধনায় যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মার্থে এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কল্পে যিনি যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন, জাতিবর্ণধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যিনি পরোপকার করিয়া বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষকে ধন্য করিয়াছেন, সেই দানবীর হাজি মহম্মদ মহসীনের পবিত্র জীবনীর আলোচনায় সুযোগ পাইয়া "ভারতবর্ষ"ও আজ নিজেকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছে।

বর্ত্তমান যুগে যেমন, মোগল বাদশাহগণের আমলেও তদ্রূপ, ভারতের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানের লোকেরা এদেশে আগমন করিতেন—কেহ-বা রাজকার্য্যে অর্থ ও যশোলাভের আশায়, কেহ-বা ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া ধনার্জ্জনের আশায়। যাঁহারা রাজসেবার্থ আসিতেন—রাজধানী দিল্লী তাঁহাদের গন্তব্য স্থল ছিল। আর যাঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে আসিতেন, তাঁহারা বাণিজ্য-প্রধান মুর্শিদাবাদ ও হুগলীতে আগমন করিতেন। প্রায় দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাদশাহ আওরঙ্গজীবের আমলে এইভাবে ইরাণ দেশ হইতে দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজনের নাম আগা মোতাহার, অপরের নাম আগা ফয়জুল্লা।

আগা মোতাহার আসিয়াছিলেন মোগল বাদশাহের দরবারে রাজকার্য্যের সন্ধানে। তাঁহার গুণগ্রাম দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বাদশাহ আওরঙ্গজীব তাঁহাকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। শেষ পর্য্যন্ত ইস্পাহাননিবাসী এই পারসী নাগরিক সম্রাট আওরঙ্গজীবের কোষাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন, এবং ইনাম স্বরূপ যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি স্থানে বহু জাগীর লাভ করেন। শেষ বয়সে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বীয় জাগীরের নিকটবর্ত্তী স্থানে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দিবার অভিপ্রায় করেন, এবং সম্রাটের অনুমতি লইয়া হুগলীতে আসিয়া বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার তৃতীয় পক্ষের পত্নী জয়নাব খানুম এবং প্রিয়তমা দুহিতা মন্নুজান খানুমের সহিত তথায় বাস করিতে থাকেন।

হুগলীর ন্যায় বাণিজ্য-প্রধান স্থানে বাস স্থাপন করিয়া আগা মোতাহারের ন্যায় উদ্যোগী পুরুষ নিশ্চেষ্ট ভাবে কালযাপন করিতে পারেন নাই—ইহা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যাপার। সেইজন্য তিনি হুগলীতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিবার পর এখানে ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হন, এবং প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতে থাকেন। সেই অর্থে তিনি যশোহর, নদীয়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তাঁহার জমিদারীর আয়তন ও আয় বর্দ্ধিত করেন; এবং সেই সঙ্গে হুগলীর সম্ভ্রান্ত নাগরিক বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতে থাকেন।

আগা ফয়জুল্লাও পারস্য দেশ হইতে বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতে আগমন করেন, এবং মুর্শিদাবাদ ও হুগলীতে কুঠী স্থাপন করিয়া ব্যবসায়ে প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতে থাকেন। ক্রমে তাঁহার পুত্র হাজি ফয়জুল্লাও পারস্য হইতে ভারতে আগমন করিয়া পিতার সহিত বাণিজ্যে যোগদান করেন। অল্পকাল মধ্যে মুর্শিদাবাদ ও হুগলী উভয় স্থানের কুঠীই বিলক্ষণ জাঁকিয়া উঠে এবং প্রচুর ধনাগম হইতে থাকে। ক্রমে আগা ফয়জুল্লার শেষের দিন উপস্থিত হইল, যথাসময়ে তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তখন হাজি ফয়জুল্লা একাই কারবার চালাইতে লাগিলেন।

কিন্তু বণিকদিগের পক্ষে লক্ষ্মী দেবী অতিমাত্র চঞ্চলা। যখন তিনি প্রসন্না থাকেন, তখন ধূলা মুঠা ধরিলে মা-লক্ষ্মীর কৃপায় সোনা মুঠা হয়। আবার তিনি বিরূপ হইলে অগাধ ঐশ্বর্য্য দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া যায়। ভাগ্য-

লক্ষ্মী যতদিন হাজি ফয়জুল্লার প্রতি প্রসন্না ছিলেন, ততদিন তাঁহার ঐশ্বর্য্যেরও সীমা ছিল না। কিন্তু শেষকালে ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিল—কারবারে অত্যন্ত ক্ষতি হইতে লাগিল। অগত্যা হাজি ফয়জুল্লা মুর্শিদাবাদের কুঠী তুলিয়া দিয়া হুগলীতে সামান্য একখানি দোকান রাখিয়া কোনক্রমে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

হুগলী নগরে হাজি ফয়জুল্লা ও আগা মোতাহার ছিলেন পরস্পরের প্রতিবাসী; উভয় পরিবারের মধ্যে সম্ভবতঃ কিছু আত্মীয়তাও ছিল; এবং উভয়েই ইস্পাহানের অধিবাসী বলিয়া উভয় পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল।

আগা মোতাহার যখন দেখিলেন যে তাঁহার জীবনের মেয়াদ ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতেছে—শীঘ্রই তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হইবে, তখন তিনি তাঁহার বিষয়-সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বয়স তখন তাঁহার প্রায় ৭৮ বৎসর। তিনি একটি স্বর্ণের পদক প্রস্তুত করাইলেন এবং সেইটি তাঁহার কন্যাকে উপহার দিয়া বলিলেন, পদকটি মহা মূল্যবান। তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, মন্নুজান ততদিনের মধ্যে উহা খুলিতে বা ভাঙ্গিতে পারিবেন না। পিতার মৃত্যুর পর কন্যা উহা ভাঙ্গিয়া দেখিলেই উহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিবেন। কন্যাও পিতার কাছে সেইরূপই প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ইহার পর আগা মোতাহার আর বেশী দিন জীবিত থাকেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর সর্ব্বসমক্ষে পদক ভঙ্গ করা হইলে উহার মধ্য হইতে একখানি দানপত্র বাহির হইয়া পড়িল। দানপত্র পঠিত হইলে সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, আগা মোতাহার তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি তাঁহার একমাত্র সন্তান মন্নুজানকে দান করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যবস্থার কথা অবগত হইয়া, বলা বাহুল্য, আগা মোতাহারের পত্নী মন্নুজানের জননী প্রসন্না হন নাই।

আগা মোতাহার তাঁহার প্রতিবাসী ও বন্ধু হাজি ফয়জুল্লাকে তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি ও পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধানের ভারার্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। হাজি ফয়জুল্লাও সানন্দে এই ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া দেখিলেন তাঁহার ন্যায় নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির পক্ষে নাবালকের বিষয় রক্ষা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তিনি পদে পদে বাধা পাইতে লাগিলেন। বিপুল সম্পত্তির লোভে অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অসন্তুষ্টা মোতাহার পত্নী জয়নাব খানুমকে হস্তগত করিয়া বিষয়-কার্য্য পরিচালনে বিশৃঙ্খলা ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায় মোতাহারের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করা। তাহা হইলে মোতাহার পরিবারের সহিত তাঁহার একটা সম্পর্ক ঘটিবে এবং বিষয়ের তত্ত্বাবধানেরও একটা অধিকার জন্মিবে।

জয়নাব খানুমের ইহাতে কোন আপত্তি ছিল না। তাঁহার বয়স অধিক নহে—সমাজ ও ধর্ম্মের দিক হইতেও এই বিবাহের বিপক্ষে কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। সুতরাং হাজি ফয়জুল্লা বিবাহের প্রস্তাব করিবামাত্র তিনি সহজেই সম্মত হইলেন—বিবাহও অচিরে সম্পন্ন হইল—বৈষয়িক গোলযোগ ঘটিবার আশু আশঙ্কাও তিরোহিত হইল। এই দম্পতি হইতে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলী নগরে প্রাতঃস্মরণীয় হাজি মহম্মদ মহসীনের জন্ম হয়। মন্নুজান খানুমের বয়স তখন মাত্র আট বৎসর।

মন্নুজান খানুম ও হাজি মহম্মদ মহসীনের জনক বিভিন্ন হইলেও তাঁহারা উভয়েই একই জননীর সন্তান। শৈশব কাল হইতে ভ্রাতা-ভগিনী একত্র লালিত-পালিত হন এবং সিরাজী নামক একজন মহাপণ্ডিত, চরিত্রবান, উন্নতচেতা মৌলবীর নিকট একত্র শিক্ষালাভ করেন। উভয়ের প্রকৃতিও একই রূপ ছিল। উভয়েরই সেই শৈশবকাল হইতেই ধর্ম্মের দিকে একটা আন্তরিক টান ছিল। দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তি, বিষয়-সম্পত্তি এবং সংসারের প্রতি বৈরাগ্যও দুই ভ্রাতা-ভগিনীর প্রায় সমান ভাবেই ছিল। একই রূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসাও জন্মিয়াছিল।

এই দুইটি শিশুর শিক্ষার ভার যোগ্য ব্যক্তির হস্তেই অর্পিত হইয়াছিল। বিপুল ধন সম্পত্তি, প্রচুর বিলাস-বিভবের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াও উপযুক্ত গুরুর শিক্ষাধীনে ভাই-ভগিনী শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। সেই অল্প বয়স হইতেই বিষয়-বৈভবের প্রতি হাজি মহম্মদ মহসীনের বিতৃষ্ণা দেখা যাইতে লাগিল। পিতামাতার সহস্র চেষ্টা

সত্ত্বেও মহসীনের চিত্ত তৎকাল-প্রচলিত নৃত্য-গীত, আমোদ-উৎসবের প্রতি আকৃষ্ট হইল না। কোরাণ পাঠ, ভগবানের নাম গান প্রভৃতি শুনিতে তাঁহার সেই বয়সেই বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত। তাহার উপর সিরাজীর শিক্ষা-দান-কৌশলে মহসীনের মহৎ চরিত্র গঠিত হইতে লাগিল।

কেবল লেখাপড়া শিক্ষা নহে—মহসীন শরীর-চর্চ্চায়ও উদাসীন ছিলেন না। তিনি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিতেন। কুস্তী, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, তরবারি-ক্রীড়া, পদব্রজে ভ্রমণ প্রভৃতি তিনি শিক্ষা করিয়া অসাধারণ শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষাতেও তাঁহার আগ্রহ ছিল। তৎকালে যশোহর নিবাসী ভোলানাথ সিংহ নামক একজন সঙ্গীতজ্ঞ গীতবাদ্য-নিপুণ ব্যক্তি হুগলী নগরে বাস করিতেন। মহসীন তাঁহার নিকট গীতবাদ্য শিক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করেন। এইরূপে, সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তানের পক্ষে যাহা কিছু শিক্ষণীয়, মহসীন সেই সমুদয়ই শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সিরাজী সাহেবের নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হইলে মহসীন উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন এবং যথাকালে তত্রত্য শিক্ষাও শেষ করিলেন। মহসীনের বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁহাকে একটি উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন। কয়েক বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার পর মহসীনের বিষয়-বিরাগী মন রাজধানীর আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসিতায় বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়া হুগলীতে ফিরিয়া আসিলেন। ভ্রাতা-ভগিনীর আবার মিলন হইল—উভয়েই উভয়কে পুনরায় দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন।

কিন্তু হুগলীতে বাস করাও মহসীনের অভিপ্রায় ছিল না। তাঁহার শৈশবগুরু সিরাজী বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীর নিকট তিনি তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর মনোহর বর্ণনা করিতেন। সেই বর্ণনা শুনিয়া মহসীনের মনে তখন হইতেই দেশ-ভ্রমণের প্রবল ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। তিনি হুগলীতে ফিরিয়া আসিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইবার অভিপ্রায় করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে সেই অভিপ্রায় দূরীভূত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইল।

নাবালিকার বিপুল সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য কুচক্রী লোকেরা আগা মোতাহারের বিধবা পত্নীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তাই বলিয়া তাহারা নিরস্ত হইবার পাত্র নহে। বিশেষতঃ বিষয়ের লোভ অতি প্রবল। তাহারা এক্ষণে উপায়ান্তর অবলম্বন করিল।

মন্নুজান এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্কা, বিদুষী, সুন্দরী, সুশীলা তরুণী; তাহার উপর তিনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারিণী। পূর্ব্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় কুচক্রীদের মধ্যে অনেকে মন্নুজানকে বিবাহ করিয়া তাঁহার ধনসম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু মন্নুজান তাহাদের কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিলেন না। তাঁহার পিতা আগা মোতাহার মৃত্যুকালে কন্যাকে তাঁহার এক আত্মীয় (nephew—ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা ভাগিনেয়) ইস্পাহান-নিবাসী মীর্জ্জা সালাউদ্দীন মহম্মদ খাঁকে বিবাহ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং বিবাহার্থী যুবকগণের প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করিতে পারিলেন না। প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাহারা তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে মন্নুজানের জননী এবং হাজি ফয়জুল্লা উভয়েই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। মন্নুজান এখন সম্পূর্ণ একাকিনী। কাজেই তাঁহার বিপদ অনুমেয়। এমন সময়ে মহসীন মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাগমন করায় মন্নুজান আশ্বস্ত হইলেন। মহসীন তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, প্রত্যাখ্যাত যুবকরা বিষ-প্রয়োগে মন্নুজানের প্রাণ-সংহারের ষড়যন্ত্র করিতেছে। মহসীন ভগিনীকে সাবধান করিয়া দিলেন এবং কৌশলে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এইরূপে প্রিয় ভগিনীর প্রাণ রক্ষা হইল।

ইহার পর মহসীন (১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে) দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। কয়েক বৎসর তিনি ভারতের নানা স্থান, আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশভ্রমণ করেন এবং ঐ সকল দেশের ভাষা, সাহিত্য, স্থানীয় অবস্থা, অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়া প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জ্জন করেন। তাহার পর তিনি মক্কা ও মদিনা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া হাজি উপাধি লাভ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই কয় বৎসরের মধ্যে মন্নুজানের জীবনে প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল। পিতৃ-নির্ব্বাচিত পতি মীর্জা সালাউদ্দীন পারস্য দেশ হইতে হুগলীতে আগমন করায় মন্নুজান তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। কয়েক বৎসর পতি-সহবাসে সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবার পর তাঁহার পতি-বিয়োগ ঘটিল। মহসীনের ন্যায় মন্নুজানও কোন দিনই বিষয়ে আসক্তা হন নাই। বিধবা হইবার পর বিষয়ে তাঁহার একটুও আসক্তি রহিল না। তাঁহার সন্তানাদিও হয় নাই। তিনি বিষয় সম্পত্তির ভার অর্পণ করিবার জন্য প্রিয় ভ্রাতার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মহসীন ভারতবর্ষে ফিরিয়াছেন শুনিয়া বহু অনুসন্ধানে তাঁহার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পত্রের উপর পত্র লিখিয়া তাঁহাকে হুগলীতে আনাইয়া তাঁহার হস্তে বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মন্নুজানের মৃত্যু হইল। তখন তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর, আর মহসীনের ৭৮ বৎসর।

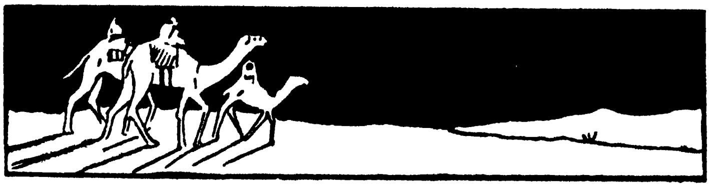
একে ত মহসীন চিরদিনই বিষয়-বিরাগী, তাহার উপর এ বয়সে নূতন করিয়া বিষয় ভোগের প্রবৃত্তি তাঁহার ন্যায় লোকের হইতে পারে না। তিনি সমুদয় সম্পত্তি লোক-হিতকল্পে নিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড ঘটিল। মন্নুজানের মৃত্যুর কিছুদিন পরে বান্দা আলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি আসিয়া প্রকাশ করিল যে, মন্নুজান তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বলিয়া সে বিষয়ের দাবী করিল। বিষয়-বিরাগী মহসীন স্বচ্ছন্দে তাহাকে বিষয় ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইলে অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়া তিনি তাহার দাবী নামঞ্জুর করিলেন। তখন সে বিষয় পাইবার জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ করিল, কিন্তু মোকদ্দমায় পরাজিত হইল। বিচারে সাব্যস্ত হইল যে মহসীনই মন্নুজানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির যথার্থ অধিকারী।

মহসীন চিরকুমার ছিলেন। তিনি বিপুল সম্পত্তির মধ্যে বাস করিয়াও নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি গোপনে অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত দুঃখীর দুঃখের কথা অবগত হইয়া গোপন দানের দ্বারা তাহাদের দুঃখ দূর করিতে লাগিলেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। আরও নানা প্রকারে লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তাঁহারও দিন ক্রমে ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তিনি একখানি দানপত্র রচনা করিয়া তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি লোকহিতের জন্য অর্পণ করিলেন। তাঁহার সম্পত্তির বার্ষিক আয় অনুমান দেড় লক্ষ হইতে দুই লক্ষ টাকার মধ্যে ছিল। রাজব আলি খাঁ ও সাকের আলি খাঁ নামক তাঁহার দুই বন্ধুকে তিনি ত্যক্ত সম্পত্তির মাতোয়াল্লী নিযুক্ত করেন। কি ভাবে তাঁহার অর্থ ব্যয় করিতে হইবে দানপত্রে তিনি তাহারও নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২৯এ নবেম্বর ৮০ বৎসর বয়সে মহসীন লোকান্তরে প্রস্থান করেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন এবং এই অর্থে হুগলী কলেজ, হুগলীর প্রসিদ্ধ ইমামবাড়ী, নির্ম্মিত হয়। আর মুসলমান ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ অনেকগুলি বৃত্তি স্থাপিত হয়। তদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক মাদ্রাসা ও মক্তব স্থাপিত হয়; ধর্ম্মার্থে বহু অর্থ ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়। হাজি মহম্মদ মহসীন মহোদয়ের জীবনীর অনুশীলন করিলে কি হিন্দু কি মুসলমান বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা না করিয়া পারেন না। আমরা এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের জীবন-কথার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার সুযোগ লাভ করিয়া গৌরব বোধ করিতেছি।



বৌদ্ধযুগের ভূগোল

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি,

এই প্রবন্ধে মধ্যদেশের নগর, জনপদ, গ্রাম প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ পালি সাহিত্য হইতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের ছবিগুলির জন্য আমরা Director Generai of Archæology নিকট ঋণী এবং তাঁহার আদেশ লইয়া এখানে প্রকাশিত হইল।

অপর গয়া—বুদ্ধদেব বারাণসীবাসী পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে তাঁহার ধর্ম্মশিক্ষা দিবার মানসে উরুবিল্ব হইতে গয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন এবং গয়া হইতে সর্পরাজ সুদর্শন কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া অপরগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি বৈশালী দিয়া চুন্দবিল্ব নামে এক নগরে গমন করিয়াছিলেন; সেখানে তিনি উপক নামক একজন আজিবিককে বলিয়াছিলেন যে তিনি অপরের সাহায্য ব্যতীত বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন। ১।

অম্বসণ্ডা—রাজগৃহের পূর্ব্বদিকে অম্বসণ্ডা নামে এক ব্রাহ্মণগ্রাম ছিল। ২।

অন্ধক-বিন্দ—এক সময়ে ভগবান বুদ্ধদেব মগধরাজ্যে অবস্থিত অন্ধক-বিন্দে গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে ব্রহ্মা সহম্পতি স্বয়ং সেখানে বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে কতকগুলি গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ৩।

অযোধ্যা—পালি সাহিত্যে অযোধ্যার কথা প্রায়ই পাওয়া যায়। এক সময়ে ভগবান বুদ্ধদেব গঙ্গার তীরে অবস্থিত অযোধ্যা নগরীতে বাস করিয়াছিলেন। ৪। বৌদ্ধযুগে দক্ষিণ কোশলের রাজধানী সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ইউয়ান্ চুয়াং-এর মতে এই নগরকে A-ye-te বলা হয়। এই চৈনিক পরিব্রাজক আরও বলেন যে নবদেবকুল নামে একটি নগরের সন্নিকটে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ৬০০ লি দূরে অযোধ্যাপুরী অবস্থিত। এই নবদেবকুল নগর যুক্তপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত নেওয়াল নগর বলিয়া পরিচিত। অযোধ্যা ফাইজাবাদ হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। ইহাই বর্ত্তমান আউধ্।



মগধরাজ বিম্বিসার

অন্ধপুর—সেরিরাজ্যবাসী দুইজন মৃত্তিকাপাত্র-ব্যবসায়ী তেড়বাহ-নদী পার হইয়া অন্ধপুর নগরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেখানে পথে পথে জিনিষ বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছিল। ৫।

আড়বী—আড়বী নগরের সন্নিকটে অগ্‌গাড়ব নামে

১। A Study of the Mahavastu, p. 156-57.
২। Digha Nikaya, II, 263.
৩। Samyutta Nikaya, I 154.
৪। Ibid., III, 140.
৫। Jataka, I, 111.

এক চৈত্য ছিল। ৬। বুদ্ধদেব যখন এই চৈত্যে বাস করিতেছিলেন তখন তিনি কুটীর নির্ম্মাণের নিয়ম পালন সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কানিংহাম্ সাহেব এবং ডাক্তার হর্ণ্‌লি বলেন যে আঢ়বী বুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত উনাও জেলায় নেওয়াল বা নওয়াল নামে পরিচিত। শ্রদ্ধেয় নন্দলাল দের মতে ইহা এট্‌ওয়ার উত্তর-পূর্ব্ব ২৭ মাইল দূরে অবিওয়া (Aviwa) নগর।

অনুপিয়—অনুপিয় নামে আম্রবন অনুপিয় নগরের নিকটে অবস্থিত ছিল। একদা যখন বুদ্ধদেব এই আম্রবনে বাস করিতেছিলেন তখন তিনি ভিক্ষু ভদ্দিয়ের কথা বলিয়াছিলেন। ভদ্দিয় ছয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। ৭।

অসসপুর—চেতি দেশের রাজার চার পুত্র পাঁচটী নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, হত্থিপুর, অসসপুর, সীহপুর, উত্তরপঞ্চাল এবং দদ্দরপুর। যেখানে রাজপুত্র একটি শ্বেতহস্তী দেখিয়াছিলেন সেইখানে হস্তীপুর নির্ম্মিত হইয়াছিল; যেখানে তিনি শ্বেত অশ্ব দেখিয়াছিলেন সেখানে অস্‌সপুর নামে একটি নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল; একটি কেশরযুক্ত সিংহ হইতে সীহপুর নামের উৎপত্তি; দুইটী পর্ব্বতের সংঘর্ষণজাত দদ্দর শব্দের উৎপত্তি হইতে নগরের নাম দদ্দরপুর হইয়াছে। ৮। এই সকল নগরগুলির বর্ত্তমান স্থান নির্ণয় করা কঠিন। তক্ষশীলার পূর্ব্বদিকে ৭০০ লি অর্থাৎ ১১৭ মাইল দূরে সিংহপুর কিংবা ইউয়ান্ চুয়াং এর Seng-ho-pu-lo নগরটী সীহপুর বলিয়া আমরা সঠিক নির্দ্দেশ করিতে পারি না। আমাদের মনে হয় হত্থিপুর এবং হস্তীনাপুর একই নগর। এই হস্তীনাপুরটী বর্ত্তমানে মিরাটে অবস্থিত মওয়ানা (Mawana) তহশীলের অন্তর্গত একটি পুরাতন নগর। ৯।

অল্লকপ্প—অল্লকপ্প দেশের বুলিজাতি বুদ্ধের দেহাবশেষের একটি অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহার উপরে তাহারা একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই বুলি জাতির প্রজাতন্ত্র-শাসন ছিল। পালি সাহিত্যে ইহাদের বিষয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। ধম্মপদ ভাষ্যে অল্লকপ্প রাজধানীর নাম পাওয়া যায় মাত্র। ১০। অল্লকপ্প রাজধানী ১০ যোজন বিস্তৃত ছিল এবং ইহার রাজার সহিত বেঠদীপের রাজার বড়ই বন্ধুত্ব ছিল। দ্রোণ ব্রাহ্মণের জন্মস্থান বেঠদীপ সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত মসার হইতে বৈশালীর পথে অবস্থিত। ইহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে অল্লকপ্প বেঠদীপের নিকটবর্ত্তী স্থান।

ভদ্দীয়—অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত ভদ্দীয় নগর বিশাখার জন্মস্থান। ১১।

বেলুবগাম—ইহা বৈশালী নগরে অবস্থিত। ১২।

ভণ্ডগাম—ইহা বৃজিদেশের অন্তর্গত। ১৩।

ভরু—ভরু নামে এক রাজা ভরুরাজ্য শাসন করিতেন। ১৪। এই ভরুরাজ্যের বর্ত্তমান স্থান নির্ণয় করা কঠিন।

বহুহৃগোজতীর—বাবুহুৎ শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার বর্ত্তমান স্থান নির্ণয় করা কঠিন। এইমাত্র অনুমান করা যায় যে এই স্থানটী কোন একটি নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ১৫।

বিবিকানদীকট—বাবুহুৎ শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। এই দেশটী বিবিকা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু ইহার সঠিক স্থান নির্ণয় করা কঠিন। ১৬।

বোধিচক (সং—বোধিচক্র)—পুরাণে বোধিচক্রের নাম পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার বর্ত্তমান স্থান নির্দ্ধারণ করা কঠিন। ১৭।

ব্রহ্মপালগাম—কাশীরাজ্যে ইহা অবস্থিত ছিল। ১৮।

দভ (সং—দর্ভ)—ইহার উল্লেখ ব্রহ্মাণ্ড এবং অন্য পুরাণে পাওয়া যায়। বাবুহুৎ শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে।

৬। Jataka, I, 160

৭। Jataka I 140.

৮। Jataka III 460.

৯। Cunningham's Ancient Geography of India (Ed. by S. N. Mazumdar). p. 702

১০। Harvard Oriental Series, Vol. 28, p. 247.

১১। Dh mmapade Commentany, T. 384.

১২। Samgntta Nikaya, v 152.

১৩। Arignttara Nikaya II, p, 1.

১৪। Jataka II 171.

১৫। Barhut Inscriptions by Barna & Sinha p. 7.

১৬। Ibid. p, 8.

১৭। Barhut Inscriptions by Barna & Sinha p. 28.

১৮। Mohadhammapale Jataka Jataka, IV p. 50.

দসার্ণ—যোলটী মহাজনপদের মধ্যে শিবি এবং দশার্ণের নাম পাওয়া যায়। ১৯। দশার্ণের উল্লেখ মহাভারতে (২, ৫-১০) এবং কালিদাসের মেঘদূতে (২৪-২৫) পাওয়া যায় এবং এই দেশটী মধ্যপ্রদেশের (Central Provinces) অন্তর্গত বিদিশা কিংবা ভিল্‌সা নামে পরিচিত।

একসালা—একসালা নামে একটি ব্রাহ্মণগ্রামে ভগবান বুদ্ধদেব কোশলদিগের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন।২০।

একনালা—একনালা একটি ব্রাহ্মণগ্রাম।২১। ইহা মগধে অবস্থিত ছিল। এক সময়ে ভগবান বুদ্ধদেব একনালার অন্তর্গত দক্ষিণগিরিতে বাস করিয়াছিলেন।

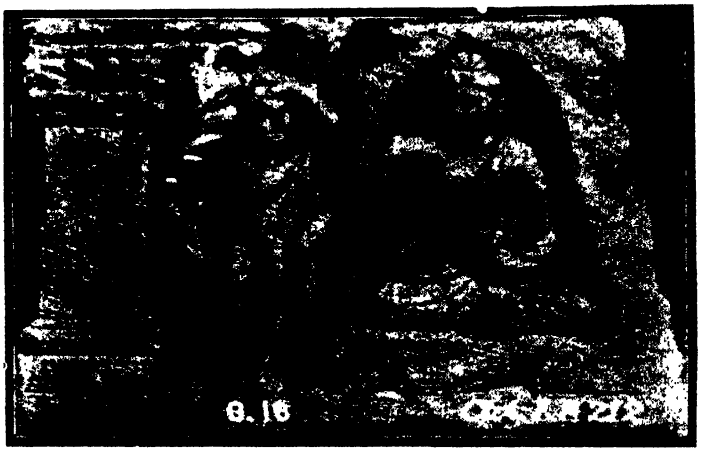
এরকচ্ছ—এরকচ্ছ দশার্ণদিগের একটি নগর। ইহার বর্ত্তমান স্থান নির্ণয় করা কঠিন। ২২।

ইসিপতন—বারাণসীর অন্তর্গত ইসিপতন মিগদাবে বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। ২৩। বারাণসী হইতে ছয় মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম সারনাথ।

গয়া—এক সময়ে ভগবান বুদ্ধদেব গয়ায় বাস করিয়াছিলেন। ২৪। যক্ষ সুচিলোম ভগবান বুদ্ধদেবের অনিষ্ট করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন যদি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধদেবের নিকট হইতে না পান। বুদ্ধদেব প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন যে শরীরই সমস্ত কামের উৎপত্তি স্থান। উত্তর দিকে সাহেবগঞ্জের নূতন নগর এবং দক্ষিণ দিকে পুরাতন গয়া বর্ত্তমানে গয়া নামে পরিচিত। বুদ্ধগয়া গয়ার দক্ষিণ দিকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

হত্থিগাম—ইহা বৃজিদেশে অবস্থিত ছিল। রাজগৃহ হইতে কুশীনারা যাইবার পথে বুদ্ধদেব এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন। ২৫।

হলিদ্দবসন—ইহা কোলিয়দেশের একটি গ্রাম। এখানে বুদ্ধদেব বাস করিয়াছিলেন।২৬। কোলিয় দেশ শাক্যদেশের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত ছিল এবং তাহার রাজধানী ছিল রামগাম। রোহিণী নদী শাক্য এবং কোলিয়দেশের সীমানায় ছিল এবং রামগামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। কোলিয়া এবং শাক্যেরা এই নদী বাঁধের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহারা কৃষিকার্য্যে ইহার জল ব্যবহার করিত। ২৭।



বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য আনন্দ

হিমবন্তপদেশ—এই প্রদেশে মজ্ঝিম থের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ২৮। কেহ কেহ ইহাকে তিব্বত বলে কিন্তু ফার্গুসন সাহেবের মতে ইহা নেপাল। মহাবংসে যাহাকে হিমবন্তপদেশ বলে সাসনবংসে তাঁহাই চীনরাষ্ট্র নামে পরিচিত। রিস্ ডেভিড্‌স্ সাহেব হিমবন্তপদেশ এবং হিমালয়া অভিন্ন বলিয়াছেন। ইহা ৩,০০০ যোজন বিস্তৃত। ২৯।

ইচ্ছানঙ্গল—ইহা কোশলের একটি ব্রাহ্মণগ্রাম এক সময়ে ভগবান বুদ্ধদেব ইচ্ছানঙ্গলের অন্তর্গত বনসণ্ডে

১৯। A Study of the Rahavastu p. 9.
২০। Saringutta Nikaya. I, p. 111.
২১। Ibid. p. 172.
২২। Petavatthn, p. 20.
২৩। Majjhima Nikaya T Ip. 170 A. C/o. Saingntta Nikaya V, Ip. 420 ff.
২৪। Sutta Nipata p. 47.
২৫। Digha Nikaya II. p. 123.
২৬। Sainyutta Nikaya V. p. 115.
২৭। Jataka (Cowell's Ed.) V. pp. 219 fon.
২৮। Mahavamsa Ch. XII.
২৯। Papaucasudani, II, 6.

বাস করিয়াছিলেন। ৩০। সুত্তনিপাত। ৩১। গ্রন্থে এই গ্রামের অপর একটি নাম ইচ্ছানঙ্গল।

জন্তুগাম—এক সময়ে বুদ্ধদেব চালিকার অন্তর্গত চালিকা পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন। ভিক্ষু মেঘিয় বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া জন্তুগামে ভিক্ষান্বেষণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বুদ্ধদেবের সম্মতি পাইয়া তিনি ভিক্ষা করিতে যান এবং পরে কিমিকালা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। ৩২।

কাকন্দি—বারহুৎ শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান যুগে ইহার নির্দ্দিষ্ট স্থান নির্ণয় করা কঠিন।

খুজতিংদুক—বারহুৎ শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার বর্ত্তমান স্থান নির্দ্দেশ হয় নাই। ভারতের পবিত্র স্থানগুলির মধ্যে কুব্জক এবং কুব্জাম্র এই দুইটী দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুইটী দেশের সহিত খুজতিংদুকের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

কল্লবাড় গামক—ইহা মগধরাষ্ট্রে অবস্থিত।৩৩। মোগ্‌গল্লান যখন এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছিলেন তখন তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সপ্তম দিবসে আলস্যে জড়িত হইয়া পড়েন; কিন্তু তিনি বুদ্ধদেবের সাহায্যে আলস্যকে দূর করেন এবং সমাধিশেষে প্রধান শিষ্যদিগের মত সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

কজঙ্গল—ইহা মধ্যদেশের পূর্ব্ব সীমায়।৩৪। ইহাই ইউয়ান্ চুয়াংএর Ka-chu-wen-ki-lo বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার মতে ইহা পরিধিতে ২,০০০ লি। ৩৫। রামপাল চরিতের ভাষ্যে ইহা কয়ঙ্গল নামে পরিচিত। ৩৬। কজঙ্গল একটি পুরাতন স্থান এবং এখানে প্রচুর খাদ্য পাওয়া যাইত। ৩৭। ইহা একটি ব্রাহ্মণগ্রাম এবং রাজা নাগসেনের জন্মভূমি। ৩৮। বুদ্ধদেব কিছুদিন কজঙ্গলের বেণুবনে। ৩৯। এবং মুখেলুবনে। ৪০। বাস করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত স্থানে তিনি ইন্দ্রিয়ভাবনা সূত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

কোটিগাম—ইহা বৃজিদিগের একটি গ্রাম। ৪১। বুদ্ধদেব রাজগৃহ হইতে কুশীনারা যাইবার পথে এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন। ৪২।

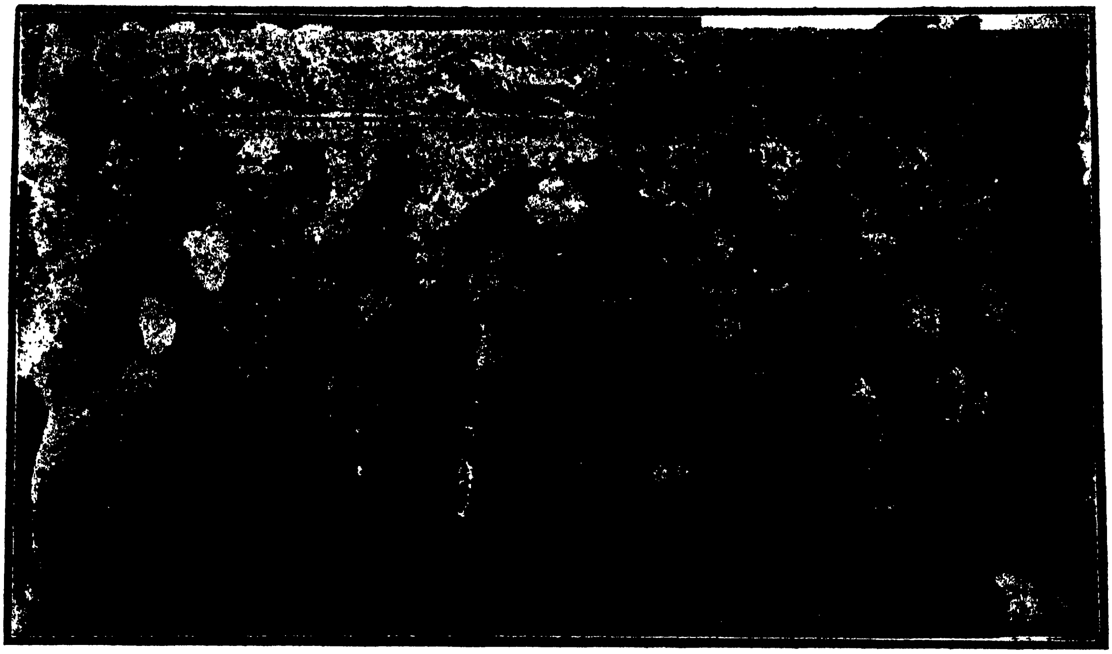
কুণ্ডিয়—কুণ্ডিয় নগরের নিকটে কুণ্ডধানবন অবস্থিত ছিল। সেখানে বুদ্ধদেব কোলিয় রাজকন্যা সুপ্পবাসা সম্বন্ধে একটি বিবরণ দিয়াছিলেন। ৪৩।

কপিলবস্তু—ইহা শাক্যদেশের রাজধানী এবং ঋষি কপিল হইতেই ইহার নামকরণ। ললিতবিস্তর গ্রন্থে আমরা তিন প্রকার নাম পাই—কপিলবস্তু, কপিলপুর (পৃঃ ২৪৩) এবং কপিলাহ্বয়পুর (পৃঃ ২৮)। মহাবস্তু ৪৪ গ্রন্থেও এই সকল নামের উল্লেখ আছে। দিব্যাবদানে (পৃঃ ৫৪৮) ঋষি কপিলের নামের সহিত কপিলবস্তু জড়িত আছে। বুদ্ধচরিত কাব্যে ৪৫ কপিলস্তবস্তুর উল্লেখ আছে। কপিলবস্তু সাতটী প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল ৪৬। ভারত ইতিহাসে শাক্যদিগের প্রাধান্যের কারণ এই যে বুদ্ধদেব তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাবস্তু গ্রন্থে কপিলবস্তু নির্ম্মাণের এবং সেখানে শাক্যদিগের উপনিবেশের একটি বর্ণনা আছে ৪৭। ইউয়ান্ চুয়াংএর মতে শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রায় ৫০০০ লি দূরে ইহা অবস্থিত ছিল। কপিলবস্তু ছাড়া আরও অনেক শাক্যনগরের কথা পাওয়া যায়, যথা, চাতুমা, সামগাম, উলুম্পা, দেবদহ, শক্কর, শীলবতী এবং খোমদুস্‌স। কোশলরাজ প্রসেনজিতের বাসবক্ষত্রিয়ার সহিত বিবাহ বর্ণনা পাঠে দেখিতে পাওয়া যায় যে শাক্যগণ কিরূপ দাম্ভিক ছিলেন। থেরীগাথায় কতকগুলি শাক্যরমণীর

৩০। Angnttara Nikaya, III pp. 30 341; Ibid., IV, p. 340.
৩১। Page 115.
৩২। Angdttara Nikaya, IV, 354.
৩৩। Dhammapada Commentary, I, 96.
৩৪। Vinaya Texts, II, 38; Sumangalavilasini II, 429.
৩৫। Watters on Ynan Chwang, II, 182
৩৬। Cunningham's Ancient Geography of India p. 723.
৩৭। Jataka, IV, 310.
৩৮। Milinda-panho, p. 10
৩৯। Anguttara Nikaya, V, 54;
৪০। Majjhima Nikaya, III 298.
৪১। Samyutta Nikaya, v, 431
৪২। Digha Nikaya, II, 90-91
৪৩। Jataka, I. 407.
৪৪। Vol. p. II.
৪৫। Book I v 2.
৪৬। Mahavastu II 75.
৪৭। Mahavastu (Senart's Bd.) vol. I. pp. 348 foll.

গাথা লিপিবদ্ধ আছে, যথা :—তিস্‌সা,৪৮ অভিরূপনন্দা,৪৯ মিত্তা ৫০ এবং সুন্দরীনন্দা ৫১। শাক্যদিগের রাজকার্য্য কপিলবস্তু নগরের সন্থাগারে সম্পন্ন হইত ৫২। তাঁহাদের ব্যবস্থাপক-সভায় ৫০০ সভ্য ছিলেন ৫৩। এক সময়ে শাক্য এবং কোলিয়দের মধ্যে রোহিণী নদীর দখল লইয়া কলহ উপস্থিত হয়। বুদ্ধদেব দেখিলেন যে এই কলহের জন্য তাহাদের ধ্বংসের সম্ভাবনা আছে ; তিনি ঐ স্থানে আসিয়া তাহাদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন ৫৪। বিড়ুডভ শাক্যদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে রাজা হইয়াছিলেন। ধ্বংস করিবার কারণ এই যে শাক্যগণ তাঁহার পিতাকে এক নীচসম্ভূতা দাসী কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বিড়ুডভ অনেক সৈন্য লইয়া শাক্যদের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন ৫৫। শাক্যগণ তাঁহার দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া হিমালয়ায় পলায়ন করেন এবং সেখানে মোরীয় নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ৫৬। অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মোরীয় বংশসম্ভূত। এই মোরীয়গণের রাজ্য ছিল পিপ্‌ফলিবন। মোরিয় এবং মৌর্য্য অভিন্ন।

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান্‌ চুয়াং কপিলবস্তু, ক্রকুচন্দ্র, কোনাগমন এবং বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনীবাগানে গমন করিয়াছিলেন। সম্রাট অশোকের লুম্বিনীস্তম্ভ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে বর্ত্তমান যুগে লুম্বিনীবাগানের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নিগ্‌লিবস্তম্ভ শিলালিপি হইতে লুম্বিনীবাগান কোনাগমন স্তূপের নিকটে অবস্থিত বলিয়া জানা যায়। ফ্লিট্‌ সাহেব বলেন যে পিপ্রাওয়া গ্রাম (যেখানে বিখ্যাত মৃত্তিকাপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে) কপিলবস্তু নামে পরিচিত ৫৭। রিস্‌ ডেভিড্‌স্‌ সাহেবের মতে তিলৌরাকটই পুরাতন কপিলবস্তু এবং পিপ্রাওয়া একটি নূতন নগর যাহা বিড়ুডভ কর্ত্তৃক পুরাতন নগর ধ্বংস



সারনাথে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু

৪৮। Psalms of the Sisters, pp 12-13.
৪৯। Ibid., pp. 22-23.
৫০। Ibid., p. 29.
৫১ Ibid. pp 56 57.
৫২ Buddhist India p. 19.
৫৩ Lalitavistara, pp 136-137.
৫৪ Dhammapada commentary, III, 254,
৫৫। Jataka, IV, pp 144 ff.
৫৬। Mahavamsa Tika pp. 99.121,
৫৭। J. R. A. S. 1906, p. 180 ; Cunningham Ancient Geography of India. 711-712.

হইবার পর নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিঃ পি, সি, মুখার্জি এই মত সমর্থন করেন এবং বলেন যে তিলৌরা এবং কপিলবস্তু অভিন্ন। তরাই রাজ্যের কেন্দ্রস্থল তৌলিব নগরের উত্তর দিকে দুই মাইল দূরে এবং নেপালী তরাইএর অন্তর্গত গোরখপুরের উত্তরে নিগ্‌লিব নামক নেপালী গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সাড়ে তিন মাইল দূরে তিলৌরা অবস্থিত। কপিলবস্তুর পূর্ব্ব দিকে ১০ মাইলের মধ্যে এবং ভগবানপুরের উত্তরদিকে ২ মাইলের মধ্যে রুম্মিন-দেঈ অবস্থিত।

কেশপুত্ত—সম্রাট বিম্বিসারের রাজত্বকালে কেশ-পুত্তের কালামেরা গণতান্ত্রিক জাতি ছিল। তাহারা শাক্য, কোলিয়, ভগ্‌গ, বুলি এবং মোরিয়গণের সমসাময়িক। এই জাতির মধ্যে দার্শনিক আরাঢ়কালাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ৫৮। কেশপুত্ত কোশলে অবস্থিত ৫৯।

ক্ষেমবতী—ইহা রাজা ক্ষেমের রাজধানী ৬০। বর্ত্তমানে ইহার স্থান নির্ণয় করা কঠিন।

মিথিলা—ইহা বিদেহদিগের রাজধানী এবং রামায়ণ-মহাভারতে রাজা জনকের স্থান বলিয়া বিখ্যাত। বুদ্ধের সময়ে বিদেহদেশ বৃজি সঙ্ঘের আটটির মধ্যে একটি রাজ্য ছিল, এই আটটি রাজ্যে মধ্যে বৈশালীর লিচ্ছবিরা এবং মিথিলার বিদেহেরা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিদেহের রাজধানী মিথিলা নগর সাত যোজন বিস্তৃত এবং বিদেহ রাজ্য ৩০০ যোজন বিস্তৃত ৬১। মিথিলা হইতে চম্পা যোজন দূরে অবস্থিত ৬২। বিদেহ রাজ্যে ১৫,০০০ গ্রাম, ১৬,০০০ ভাণ্ডাগার এবং ১৬,০০০ নর্ত্তকী ছিল ৬৩। ধর্ম্মপালের থেরগাথা ভাষ্যে ৬৪ লিখিত আছে যে বুদ্ধদেবের সময় বিদেহ নগর একটি বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। শ্রাবস্তী হইতে বিদেহ নগরে বণিকেরা দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্ম আসিত এবং এই পথটি মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। বিদেহ নগর বর্ত্তমান তিরহুট্ (পুরাতন তীরভুক্তি)। শতপথ ব্রাহ্মণের ৬৫ মতে বিদেঘ মাথব নাম হইতে বিদেহ নগরের নামকরণ হইয়াছে এবং এই বিদেঘ মাথব এই স্থানে (বিদেহে) উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। বিদেহের পূর্ব্ব দিকে কৌশিকী (কোশি), দক্ষিণ দিকে গঙ্গা, পশ্চিমে সদানীরা (গণ্ডক বা রাপ্তি) এবং উত্তরদিকে হিমালয়। রামায়ণ ৬৬ এবং মহাভারত হইতে আমরা জানিতে পারি যে দেশ এবং রাজধানী উভয়েরই নাম মিথিলা। 'কানিংহাম সাহেব বলেন যে মিথিলা এবং জনকপুর অভিন্ন। জনকপুর নেপাল সীমানার অন্তর্গত একটি ছোট নগর, যাহার উত্তরে মুজাফরপুর এবং দারভাঙ্গা জেলা একত্রে মিলিত হইয়াছে ৬৭।

মচলগামক—ইহা মগধরাজ্যে অবস্থিত ৬৮।

নন্দিনগর—বাবৃহৎ শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার বর্ত্তমান স্থান নির্ণয় করা কঠিন। যদি এই নগর এবং রামায়ণের নন্দিগ্রাম অভিন্ন হয় তাহা হইলে আউধের অন্তর্গত নন্দ্‌গাঁও এবং নন্দিনগর একই বলা যায়।

নগর বা নগরি—বাবৃহৎ শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার বর্ত্তমান স্থান নির্ণয় কঠিন। নগর এবং পরাশর তন্ত্রে উল্লিখিত নগরহার যদি একই স্থান বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারা যায় তাহা হইলে নগর উত্তরাপথে অবস্থিত বলিতে হইবে। কিন্তু এই নগর এবং রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুরের চিতোরগড় রাজ্যের ৮ মাইল দূরে অবস্থিত নগর বা নগরী অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

নালন্দা—পালি সাহিত্যে ইহার উল্লেখ আছে। বুদ্ধদেব রাজগৃহ হইতে নালন্দায় গিয়াছিলেন ৬৯। এক সময় তিনি কোশল হইতে নালন্দায় গিয়াছিলেন ৭০। পাবারিকম্ব-বনে বাস করিবার সময় তিনি নিগণ্ঠ দীঘতপসীর সহিত জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং উপালি সুত্র আবৃত্তি করিয়াছিলেন ৭১। নালন্দা রাজগৃহ হইতে এক

৫৮। Buddha carita, XII, 2.

৫৯। Anguttara Nikaya, I, 188.

৬০। Digha Nikaya, II., 7.

৬১। Jataka (Cowell), III, p. 222

৬২। Ibid., IV, p. 204.

৬৩। Ibid., III, p, 222.

৬৪। Pages 277-278.

৬৫। I, IV, 1,

৬৬। Adikanda, XLIX, 9-16 ; cf. Santi Parva of the Mahabharata F. G. C. C. XXVII, 12233-8.

৬৭। Cunningham's Ancient Geography of India, p. 718.

৬৮। Jataka. I 199.

৬৯। Digha Nikaya I, pp 1 foll.

৭০। Sanyutta Nikaya IV, 323.

৭১। Majjhima Nikaya, I, 371.

যোজন দূরে অবস্থিত ৭২। নালন্দা এবং পাটনা জেলার অন্তর্গত রাজগিরের সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বর্ত্তমান বার্গাঁও অভিন্ন। গুপ্তরাজাদের সময় নালন্দা বৌদ্ধশিক্ষার একটি কেন্দ্র ছিল। ইন্দ্রশীলাগুহা বার্গাঁও গ্রামের ঠিক পশ্চিমে একটি অমসৃণ পর্ব্বতের উপর অবস্থিত।

নালক—ইহা মগধের একটি গ্রাম। এখানে সারিপুত্র আসিয়াছিলেন ৭৩। রাজগৃহের অবিদূরে নলগামকে সারিপুত্র মধ্যদেশবাসীর সহিত বাস করিয়াছিলেন ৭৪। নলগামক এবং নলিক অভিন্ন। ভিক্ষু সারিপুত্র নাল নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ৭৫।

ঞাতিক—বুদ্ধদেব এক সময়ে এখানে বাস করিয়াছিলেন ৭৬। ইহার অন্য একটি নাম নাদিক। বর্ত্তমানে ইহার স্থান নির্ণয় কঠিন।

পুপ্ফবতী—এই নগরের রাজা একরাজের পুত্র চন্দ্রকুমার দাতা ছিলেন এবং ভিক্ষুককে কিছু দান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না ৭৭। কাশীরাজ্যের রাজধানী বারাণসীর অপর একটি নাম পুপ্ফবতী ৭৮। বারাণসীর আরও অনেক নাম পাওয়া যায়, যথা—সুরুন্ধন, সুদর্শন, ব্রহ্মবর্দ্ধন, রম্যনগর এবং মোলিনি।

পিপ্ফলিবন—বুদ্ধদেবের সময়ে পিপ্ফলিবনের মোরিয়দের গণতন্ত্র শাসন ছিল ৭৯। বৌদ্ধসাহিত্যে মোরিয়দের কথা বিরল। ইহারা বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের এক অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

রামগাম—বুদ্ধদেবের সময়ে কোলিয়দিগের গণতন্ত্র শাসন ছিল এবং রামগাম ও দেবদহ তাহাদের বাসস্থান ছিল। দীঘ নিকায়ের ভাষ্য সুমঙ্গল বিলাসিনীতে ৮০ কোলিয়দিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। রাম নামে একজন ঋষি (বারাণসীর ভূতপূর্ব্ব রাজা) স্ত্রী ও জ্ঞাতিদ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই বনে ওক্কাক রাজার পাঁচ কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা জ্ঞাতিদের দ্বারা পরিত্যক্তা হইয়া বাস করেন। এখানে ঋষির সহিত রাজকন্যার মিলন হয়। ঋষি একটি বড় কোল বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া একটি নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এই নগরের নাম হইয়াছিল কোল নগর এবং ঐ রাজার বংশধরেরা কোলিয় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহাবস্তুর ৮১ মতে কোলিয়গণ ঋষি কোলের বংশধর। কোলিয়গণ ঐ কোলবৃক্ষের মধ্যে বাস করিত বলিয়া কোলিয় নামে পরিচিত ৮২। শাক্য এবং কোলিয়দিগের মধ্যে একটি বিবাদ উপস্থিত হয় এবং এই বিবাদ বুদ্ধদেব মিটাইয়া দেন ৮৩ কোলিয়দিগের রামগাম বর্ত্তমানে আউধের অন্তর্গত বস্তি জেলার রামপুর দেওয়ারিয়া।

সামগাম—এক সময়ে বুদ্ধদেব সামগামের শাক্যদেশে বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি সামগামসুত্ত আবৃত্তি করিয়াছিলেন ৮৪।

সাপুগা—এক সময়ে আনন্দ সাপুগণ নামে কোলিয়দিগের নগরে বাস করিয়াছিলেন ৮৫।

শোভবতী—ইহা রাজা শোভের রাজধানী ৮৬।

সেতব্য—ইহা কোশলদেশের একটি নগর। ইহা উকট্টের নিকট অবস্থিত। উকট্ট হইতে সেতব্যে যাইবার একটি পথের উল্লেখ পাওয়া যায় ৮৭।

সংকস্স—ইক্ষুমতি নদীর উত্তর তীরে সংকিস্স গ্রা সংকিস-বসন্তপুর অবস্থিত। সংকস্স এবং সংকিস্স অভিন্ন। ইক্ষুনদীর বর্ত্তমান নাম কালীনদী। ইহা অত্রঞ্জি এবং কনোজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং সংকস্স এটা জেলার অন্তর্গত ফতেগড়ের পশ্চিমে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত। বুদ্ধদেব স্বর্গে বাস করিবার সময় তাঁহার "ধুরু

৭২। Sumangalavilasini vol 1, 35
৭৩। Samyutta Nikaya, IV. 251.
৭৪। Ibid, v. 161,
৭৫। Jataka, I, 391
৭৬। Samyutta Nikaya, II, 74.
৭৭। Cariyapitaka (Law's Ed.) p. 7,
৭৮। Carmichael Lectures, 50-51.
৭৯। Digha Nikaya, II, 167.
৮০। Pages 260 262.
৮১। Vol. 1, 352-55.
৮২। Jataka v, 413
৮৩। Theragatha, v 529, p. 56 & Cowell's Jataka, v., 219.
৮৪। Majjhima Nikaya II, 243.
৮৫। Anguttara Nikaya, II, 194.
৮৬। Digha Nikaya, II, p. 7.
৮৭। Anguttar Nikaya, II, 37.

আতঙ্কপুর্ শেষ করিবার পর তিনি পবারণা উৎসবে সংকস্স নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এখান হইতে তিনি বহু শিষ্যের সহিত জেত বনে গিয়াছিলেন ৮৮।

সালিন্দিয়—ইহা রাজগৃহের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত একটি ব্রাহ্মণগ্রাম ৮৯।

সুংসুমার গিরি নগর—পালি সাহিত্যে সুংসুমার পর্ব্বতবাসী ভগ্গদের বিবরণ পাওয়া যায়। সুংসুমার পর্ব্বত ভগ্গদিগের রাজধানী ছিল এবং দুর্গস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের পুত্র যুবরাজ বোধি পিতার প্রতিনিধিরূপে ভগ্গগদিগকে শাসন করিয়াছিলেন। পরে যুবরাজ বোধি বুদ্ধদেবের একটি শিষ্য হইয়াছিলেন ৯০। ভগ্গদের দেশে প্রজাতন্ত্রশাসন ছিল। কিছুদিনের জন্য ভগ্গরা কৌশাম্বীর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল ৯১।

সেনাপতিগাম—বুদ্ধদেব যখন উরুবিল্বের সেনাপতি গ্রামে ছয় বৎসর কাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন তখন গবা নাম্নী একটি বারবিলাসিনী ধ্যানের পর ব্যবহারের জন্য একটি শাখার উপর একখানি কাপড় রাখিয়া দিয়াছিল। এই সৎকার্য্যের জন্য সে স্বর্গে অপ্সরা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ৯২।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন—মহাভারতে পৌণ্ড্রগণের উল্লেখ আছে। কোন কোন সময়ে তাহাদিগের কথা বঙ্গ এবং কিরাতের ৯৩ সঙ্গে পাওয়া যায় এবং কখন কখন উদ্র, উৎকল, মেখল, কলিঙ্গ এবং অন্ধ্র ৯৪ সম্পর্কে পাওয়া যায়। প্যার্জিটার সাহেবের মতে পৌণ্ড্রগণ বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণায় অবস্থিত বীরভূম এবং হাজারিবাগের উত্তর অংশে বাস করিত। পুণ্ড্রবর্দ্ধন মধ্যদেশের পূর্ব্ব সীমানায় অবস্থিত ৯৫।

তনসুলিয় বা তনসুলি—হাতি গুম্ফা শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজা খারবেলের রাজধানী কলিঙ্গ নগর। তনসুলিয় কিংবা তনসুলিয় পথের অবিদূরে অবস্থিত।

থূন—সম্ভবতঃ থূন এবং দিব্যাবদানের স্থূন একই। ইহা মধ্যদেশের পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত একটি ব্রাহ্মণগ্রাম ৯৬। বর্ত্তমানে থূনের স্থান নির্ণয় কঠিন। হুয়ান্ চুয়াং এর মতে বৌদ্ধ মধ্যদেশের পশ্চিম সীমানা স্থানেশ্বর। সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার মহাশয় বলেন যে থূন এবং স্থানেশ্বর কিংবা স্থানিশ্বর অভিন্ন ৯৭।

উক্কাচেলা—বুদ্ধদেব বৃজিদেশে গঙ্গাতীরে অবস্থিত উক্কাচেলা নগরে বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি চূড়গোপালক সূত্র আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

উপতিস্সগাম—ইহা রাজগৃহের নিকটে অবস্থিত ৯৮।

উগ্গ নগর—ধম্মপদভাষ্যে উগ্গ ৯৯ নগরের উল্লেখ আছে। উগ্গ নামে একজন শ্রেষ্ঠি, উগ্গ নগর হইতে বাণিজ্য করিবার মানসে শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন।

উসীনারা—পালি সাহিত্যে উসীনারার কথা পাওয়া যায়। দিব্যাবদানে ১০০ উসীরগিরির উল্লেখ আছে। ডাঃ রায় চৌধুরীর মতে কথাসরিৎ সাগরে লিখিত উশীনরগিরি দিব্যাবদানের উসীরগিরি এবং বিনয় পিটকের ১০১ উসীরধ্বজ অভিন্ন। উসীরধ্বজ বৌদ্ধ মধ্যদেশের উত্তর সীমানায় অবস্থিত। Hultzsch ১০২ সাহেবের মতে ইহা কঙ্খলের উত্তরে অবস্থিত একটি পর্ব্বত।

বেরঞ্জ নগর—এক সময়ে বুদ্ধদেব বেরঞ্জ নগরে বর্ষাবাস শেষ করিয়া শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন ১০৩।

বেত্তবতী—ইহা বেত্তবতী নদীর তীরে অবস্থিত একটি নগর ১০৪। বেত্তবতী এবং কালিদাসের মেঘদূতে

৮৮। Jataka, I 193.
৮৯। Jataka, III, 293.
৯০। Majjhima Nikaya, II, 91 ; Gataka, III 157.
৯১। Digha Nikaya, II, 167.
৯২। A Study of the ranavastu p. 154.
৯৩। Rahabharata Sabha, XIII 594.
৯৪। Ibid, vana parva. LI 1988 ; Bhioma p. IX, 365 ; Drona p, IV 122'
৯৫। CRAS, 1904, p 86'
৯৬। Jataka, VI 62.
৯৭। Cunnighais Anciat Ceogrophy of tndia, Inpo, P, XI iii
৯৮। Dhamuapada Commentary, T, P 88.
৯৯। Ibid. III, 463.
১০০। Phge 22.
১০১। S. B E pt, II 39
১০২। Indian Antiquary, 179,
১০৩। Jataka III 494,
১০৪। Gataka, IV p 388

লিখিত বেত্রবতী অভিন্ন। বেত্রবতী নদী বর্ত্তমানে বেৎ (Betva) নামে গঙ্গার একটি ক্ষুদ্র শাখা।

বেন্নুবগ্রাম—ইহা কৌশাম্বীর একটি গ্রাম। কানিংহাম সাহেবের মতে কোশলের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বেন্—পুরওয়া (Ben Purwa) এবং বেন্নুবগ্রাম অভিন্ন।

বেদিস—বারহুৎ শিলালিপিতে লিখিত বেদিস, পালি বিদিসা এবং সংস্কৃত বৈদিশা অভিন্ন। কানিংহাম সাহেবের মতে ইহা বেস্ নগরের পুরাতন নাম। ভিলসের দুই মাইলের মধ্যে বেৎওয়া (Betwa) এবং বেস্ বা বেদিস নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর। পুরাণের মতে বিদিসা নদীর তীরে বৈদিশ অবস্থিত। উপরাজা অশোকের সময়ে বিদিসা বৌদ্ধধর্ম্মইতিহাসের খুব উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিল। অশোক যখন উজ্জয়িনীর উপরাজা ছিলেন তখন তিনি বেস্‌স নগর বা বৈশ্যনগরের একটি বৈশ্য বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বেস্‌সনগর বা বৈশ্যনগর বেসনগরের পুরাতন নাম। অশোকের সময় হইতে বিদিসা বৌদ্ধধর্ম্মের এবং পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিখ্যাত কেন্দ্র হইয়াছিল।

যবমজ্‌ঝক—যবমজ্‌ঝক চারিটী বাজারযুক্ত নগরের সাধারণ নাম। এই চারিটী নগর বিদেহের রাজধানী মিথিলা নগরের চারিটী তোরণদ্বারের সন্নিকটে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর ভাগে অবস্থিত ১০৫।

১০৫। Ibid VI, 330-331

জন্মান্তর

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

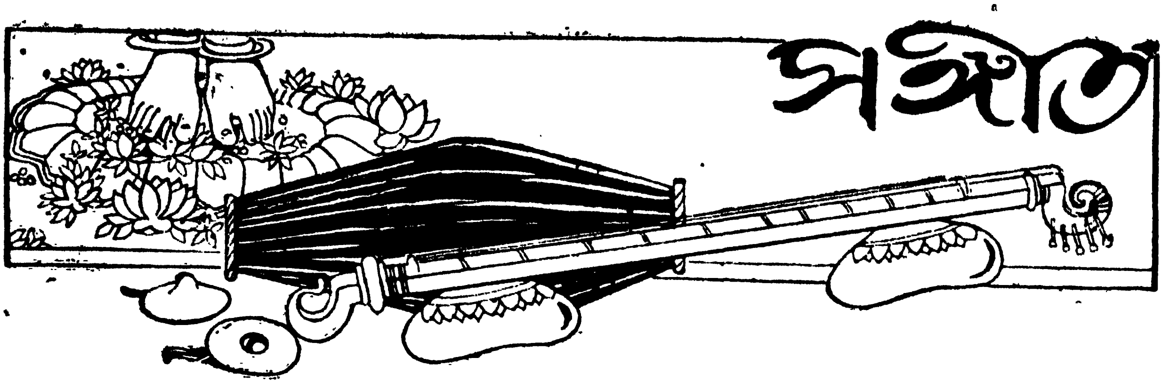
জাতক কাহিনীগুলি পড়িতে পড়িতে অকস্মাৎ
অজ্ঞাতে মুদিয়া এলো স্বপ্নভরে নয়নের পাত,
জাতিস্মর দৃষ্টি মোর চলে গেল যুগ যুগান্তরে
এ কি দেখি? পুড়িতেছি শত শত চিতার উপরে
আমারি সহস্র শব নানা বয়সের সারি সারি
চলিয়াছে পথ দিয়া হরিবোল সঘনে উচ্চারি,
বহিয়া চলেছে মোরে শ্মশানের ঘাটে বন্ধুগণ
ঘরে ঘরে মোর শোকে উচ্চরোলে উঠিছে রোদন।

কতজনে কাঁদায়েছি যুগে যুগে জন্মজন্মান্তরে
কত সুখ সংসারের রচিয়া তুলেছি নিজকরে
চূর্ণ করি চলে গেছি, সুখস্বপ্ন করি দিয়া দূর
কত কচি বুকে হায় হানিয়াছি অশনি নিষ্ঠুর।

তাদের বেদনা আজ আকুলিয়া তুলিতেছে বুক
চারি পাশে হেরি আমি লক্ষ লক্ষ শোকম্লান মুখ,
মোহমুগ্ধ মায়ামূঢ় গণ্ড বেয়ে ঝরে অশ্রুধারা
চিনেছি তাদেরে আমি, আমারে কি চিনেছে তাহারা?
কত মাতা কত ভগ্নী কত প্রিয়া, মিত্র সহোদর
সন্তান সন্ততি কত—হেরি মোর উদ্বেল অন্তর।

জাতিধর্ম্ম গোত্র বর্ণ বেশভূষা ভাষা আচরণ
কতই বিচিত্র তবু চিনে মোর জাতিস্মর মন;
পিতা হয়ে পুত্র হয়ে কত ঘরে লভেছিনু ঠাঁই
অবাক হইয়া ভাবি। চারিদিকে যত আমি চাই
তাহাদেরই বংশধরে দেখি আজ ভরেছে ভুবন,
মহামানবের মাঝে কেবা নয় আমার আপন?

আজি আমি হেরি তাই ঘেরি মোর এ জীবন্ত শব
একান্ত আত্মীয় হয়ে ঘিরে আছে নিখিল মানব।



কথা ঃ—শ্রীঅনিলবরণ রায় — স্বরলিপি ঃ—শ্রীমতী সাহানা দেবী

তুই মা আমার হিয়ার হিয়া, তুই মা আমার আঁখির আলো।
ওই চরণে শরণ নিয়ে মাগো আমার প্রাণ জুড়ালো॥
ঝঞ্ঝারবে ভয় যবে পাই, তোমি কোলে মুখটি লুকাই ;
মধু হাসির ঝরণা ধারায় দাও ধুয়ে সব মনের কালো॥

চলেছি যে গহন পথে, বড়ই কঠিন বড়ই পিছল।
পায়ে পায়ে বাজে আমার আপন হাতের গড়া শিকল॥
'মা' ব'লে মা ডাকলে তোরে, বুকের মাঝে পাই কত বল,
দূর করিয়ে সকল বাধা আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো॥

যোগী ঋষি না পায় ধ্যানে তোমার তত্ত্ব, তোমার সীমা।
কত কবি ধন্য হ'ল ছন্দে গাহি' তোর মহিমা॥
নাই মা আমার সাধন ভজন, নাই মা আমার জ্ঞান গরিমা
সারা হৃদয় দিয়ে শুধু তোমারে মা বাস্‌ব ভালো॥

II { সা সসরা গমপা | পা পা -া | ধপধা পগা পা | মা
তুই মা - আ মা র্ হি য়া র্, হি

মা -া | গা -া মগরগা | রা সা -া | সরা সরা গমপনা |
য়া - তু ই মা - আ মা র্ আঁ খি -

রগা রা গরগা | } সা সরা রা | রা রা -া | রগা রগপা মা |
আ লো - ও ই চ র ণে - শ র ণ্

মা　মা　-া　|　গা　গমগা　রগা　|　রা　সা　-া　|　সরা　সরগমা　গমা　|
নি　য়ে　-　　মা　গো　-　　আ　মা　র্　　প্রা　-　ণ্　জু　-

রগা　রা　গরগা　|　II II
ড়া　লো　-

[র্সনা　ধপা　|　পধা　পধনর্সা]
I { মা　পা　না　|　না　না　র্সা　|　নর্সা　-া　র্সা　|　র্সনা　ঋর্সনর্সা　-া
ঝ　ন্　ঝা　　র　বে　-　　ভ　য়্　য　　বে　পা　ই
মা　ব'　　লে　মা　-　　ডা　-ক্　লে　　তো　রে　-
না　ই　মা　　আ　মা　র্　　সা　ধন্　-　　ভ　জ　ন্

[র্সর্ঋা　র্সা　ণা　|　ধা　পা　-া　|　সরমা　পধর্সা　পণা　|　ণা　ণা　ণা　|]
র্সর্রা　র্সরা　ণা　|　ধা　পা　-া　|　পা　ধা　পধর্সা　|　ণা　ধর্সণা　ধপধা　| }
তো　রি　-　　কো　লে　-　　মু　খ্　টি　-　　লু　কা　ই
বু　কে　র্　　মা　ঝে　-　　পা　ই　ক　　ত　ব　ল্
না　ই　মা　　আ　মা　র্　　জ্ঞা　ন্　গ　-　　রি　মা　-

পধা　মপধা　র্সণা　|
{ ণা　ণা　-া　|　ধা　পা　-া　|　মধা　পধা　পমপা　|　মা　গা　-া　|
ম　ধু　-　　হা　সি　র্　　ঝ　র্　ণা　　ধা　রা　য়্
দূ　র্　ক　　রি　য়ে　-　　স　ক　ল্　　বা　ধা　-
সা　রা　-　　হৃ　দ　য়্　　ঢে　-　লে　　শু　ধু　-

[না　র্সনা　সা　|　ধা]
গা　-া　মা　|　পা　না　-া　|　র্সা　র্সনা　ঋর্সনর্সা　|　ণধা　ণধণা　পা　| }
দা　ও　ধু　　য়ে　মো　র্　　ম　নে　র্　　কা　লো　-
আঁ　ধা　-　　রে　দী　প্　　তু　মি　-　　জ্বা　লো　-
তো　মা　-　　রে　মা　-　　বা　স্　ব　-　　জা　লো　-

ধা　-া　ণা　|　ধা　ধা　-া　|　মা　মমপধণর্সা　ণসণা　|　ধা　পধা　পধা　|
তু　ই　মা　　আ　মা　র্　　হি　য়া　-　-　র্　　হি　য়া　-
তু　ই　মা　　আ　মা　র্　　হি　য়া　-　-　র্　　হি　য়া　-
তু　ই　মা　　আ　মা　র্　　হি　য়া　-　-　র্　　হি　য়া　-

গমা -া মগরগা | রা সা -া | সরা সরগমা গমা | গা
তু ই মা - আ মা র্ আঁ খি - র্ আ
তু ই মা - আ মা র্ আঁ খি - র্ আ
তু ই মা - আ মা র্ আঁ খি - র্ আ

রা গরসা | II II
লো -
লো -
লো -

[গা গমগা রগা | রসা সরা -া | গা রা -া |]
{ সা সা সরা | রা রা -া | রা রা রা | রা রা -া | গরা গা
চ লে - ছি যে - গ হ ন্ প থে - ব ড়
যো গী - ঋ ষি - না পা য় ধ্যা নে - তো মা

[রা রগমপা মপা | মা মা -া]
মপা | পা পন্ধধপন্ধপা রা | রগা রগপা মা | মা মা -া }
-ই ক ঠি - ন্ ব - ড় ই পি ছ ল্
র্ ত ত্ব - - তো মা র্ সী মা -

[পধণা র্রসর্নর্সা | ণা]
{ মা মমপা -া | পা পা -া | পধা পধর্সা ণা | ণা ণা ণা |
পা য়ে - - পা য়ে - বা জে - - আ মা র
ক ত - ক বি - ধ ন্ত - হো ল -

[ন্সরগমপা রমা | মা মা মা]
ধা ধা ণধপধা | পা মগা রসা | সা সসরগমপা রমা | মগা পমা গমা | }
আ প ন্ হা তে - র্ গ ড়া - - শি - ক ল্
ছ ন্ দে - গা হি' - তো - র্ ম - হি মা

———

রেওয়া-ভ্রমণ

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

একটা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বল্‌তে চাই। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে জরাজীর্ণ শরীরে ভ্রমণ করবার শক্তি-সামর্থ্য একেবারেই নেই। তবুও যে কোথাও যাই, সে আমার মধ্যে যে ভবঘুরে আছেন, তাঁরই প্রবল তাড়নায়,—তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও আমাকে ছাড়েন নাই।

সেই তাড়নায় এই পূজার পূর্ব্ব-পূজার সময় একটু দূরবর্ত্তী এক স্থানে গিয়েছিলাম। ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসের ৯ই তারিখে বেড়াতে গিয়েছিলাম, আর এই ১৩৩৯ সালের ঠিক ৯ই আশ্বিনে একটু অবকাশ পেয়ে, ঠিক এক বৎসর পরে এই ভ্রমণ-কাহিনী লিখ্‌তে বসেছি।

সে সময় আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাই ভগ্ন-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের বৃথা আশায় ঘরের বে'র হয়ে পড়েছিলাম—ভবঘুরে মানুষটা এই ভ্রমণে যে উৎসাহ দিয়েছিলেন, তা না বল্‌লেও চলে।

আমার গন্তব্য স্থান কোন্নগরও নয়, ডায়মণ্ড হারবারও নয় যে, গাড়ীতে উঠ্‌লাম, আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। তারপর, ফিরে এসে একটা খুব লম্বা বিবরণ লিখে বুভুক্ষু সম্পাদকের কাগজের কয়েক পৃষ্ঠা মসী-কলঙ্কিত করলাম। আমি গিয়েছিলাম মধ্য-ভারতের এক স্বাধীন রাজ্যে। নেটিভ ষ্টেটকে যদি স্বাধীন রাজ্য ব'লে অভিহিত করা অসঙ্গত না হয়, তা হ'লে আমি যে রাজ্যে গিয়েছিলাম, তাকে একটা বড় রকমের স্বাধীন রাজ্য বল্‌তে দ্বিধা বা সঙ্কোচের কারণ নেই;—অর্থাৎ আমি গিয়েছিলাম স্বনামখ্যাত রেওয়া রাজ্যে।

ভারতবর্ষে এত স্থান থাক্‌তে—দারজিলিং, মসুরী, সিমলা, নাইনিতাল, উতকামণ্ড প্রভৃতি মনোহর শৈল-নিবাস, মধুপুর, বৈদ্যনাথ, পুরী, ওয়াল্‌টেয়ার, রাঁচি প্রভৃতি অগণ্য স্বাস্থ্য-নিবাস থাক্‌তে আমি বেছে বেছে সুদূর রেওয়া রাজ্যে স্বাস্থ্যলাভের জন্য যাওয়া স্থির করেছিলাম কেন? তার প্রধান কারণ এই যে, আমার বৈবাহিক শ্রীযুক্ত শ্রীপতি ঘোষ বি-ই মহাশয় রেওয়া রাজ্যের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। তাঁরই সাগ্রহ নিমন্ত্রণে আমি রেওয়ায় গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন এবং আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যে দুই-একজন রেওয়ায় গিয়েছিলেন, তাঁরাও বলেছিলেন যে, স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যকর এবং মনোহরও বটে। দূর দেশ বেড়ানোও হবে, আর মহা সমাদরে থাকা যাবে, কোন প্রকার অসুবিধা হবার মোটেই সম্ভাবনা নেই, এমন সুযোগ কি এই বৃদ্ধ বয়সে ত্যাগ করা যায়! স্বাস্থ্যলাভ যে স্বর্গে গেলেও এ বয়সে হবে না, তা আমি বেশ জানি; তবুও স্বাস্থ্যলাভের ওজুহাত দিয়ে, যাঁরা অতদূরে যাওয়ার বিরোধী, তাঁদের নিরস্ত করা যায়।

এইবার পথের কথা বলি। দূর দেশ হ'লে কি হবে, রেলের কল্যাণে 'ছয় দণ্ডে চ'লে যায় ছ-মাসের পথ'—তার মধ্যে বল্‌বার কথা মোটেই নেই; তবে যাঁরা কবি মানুষ, তাঁরা রেল-গাড়ীর জানালা দিয়ে প্রকৃতির অতুল সৌন্দর্য্য দেখে বিস্তৃত বিবরণ লিখ্‌তে পারেন। আমি কবিও নই, সৌন্দর্য্য দেখবার ও উপভোগ করবার শক্তিও আমার নেই। কাজেই, প্রায় ছয়-শ মাইল পথ ভ্রমণ করেও আমি পথের কথা বল্‌বার মত কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনে।

আশ্বিন মাসের ৯ই তারিখের বোম্বাই মেলে সন্ধ্যার পর হাবড়া ষ্টেসন ত্যাগ করি। আমার ছেলে আগেই ষ্টেসনে গিয়ে গাড়ীর নির্দ্দিষ্ট আসনে বিছানা পেতে রেখেছিলেন। গাড়ী ছাড়তেই শয়ন ও নিদ্রা; কোন্ ষ্টেসন যে কোন্ দিয়ে গেল, তা জান্‌তেও পারলাম না। পর দিন প্রাতঃকালে ঢেঁকি ষ্টেসনে ঘুম ভাঙলো; উঠে হাতমুখ ধুয়ে এক পেয়ালা চা পান করা গেল। বেলা বারোটার সময় সাট্‌না ষ্টেসনে অবতরণ। ষ্টেসনেই আমার বৈবাহিক শ্রীযুক্ত শ্রীপতিবাবু স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেসনের বাইরেই তাঁর নিজের মোটর ছিল; সারথি তিনি নিজেই। বেলা তখন বারোটা; সুতরাং ষ্টেসনে একটুও অপেক্ষা না করে মোটরে আরোহণ করা গেল। সঙ্গে জিনিসপত্র তেমন ছিল না,

তার দরকারও ছিল না। সাট্‌না থেকে রেওয়া রাজধানী এ-পাড়া ও-পাড়া নয়—পাকা ছত্রিশ মাইল পথ। সুদক্ষ সারথি শ্রীপতিবাবু এই ছত্রিশ মাইল পথ দেড় ঘণ্টায় পাড়ি দিলেন। আরও কম সময়ে তিনি আমাকে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু, বড় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে পথের মধ্যে নানা স্থানে মোটর থামিয়ে লোকজনের কাছ থেকে সেলাম কুড়াতে হয়েছিল, তাই খানিকটা দেরী হয়ে গেল। দেড়টার সময় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের প্রকাণ্ড বাংলোতে গিয়ে গাড়ী দাঁড়ালো। ছেলেমেয়েরা এসে প্রণাম করল। আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে তখনই আনন্দের হাট বসিয়ে ফেললাম; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুদীর্ঘ পথ-ভ্রমণের ক্লান্তি যাদুমন্ত্র বলে কোথায় চলে গেল; আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলের একজন হয়ে পড়লাম। তার পর, প্রায় তিনটের সময় স্নান আহার করে বিশ্রাম। পথের কথা এইখানেই শেষ।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখ্‌বার প্রচলিত আইন অনুসারে এইবার রেওয়া রাজ্যের ইতিহাস বলা দরকার। কিন্তু, সে ইতিহাস ত ছুই-এক শত বছরের নয়। একেবারে গোড়া থেকে বল্‌তে গেলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে যেতে হয়। তবে, অত আগে থেকে আরম্ভ করতে গেলে অনেক গোঁজা-মিল দিতে হয়, ঐতিহাসিক প্রমাণও খুব পাকা পাওয়া যায় না। সে সব সত্য মিথ্যা কথা বল্‌তে গেলে প্রকাণ্ড এক মহাভারত হয়, আর তা হ'লে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলা হয় না। কাজেই সে চেষ্টা না ক'রে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দ থেকে যে প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায়, তারই একটু অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই।

কিন্তু, তারও আগে রেওয়া-রাজের বংশ-পরিচয় দিতে চাই। আর এ পরিচয়টা একটু সেকেলে রকমে দেব। আমাদের ছেলেবেলায় বৃদ্ধ অভিভাবকেরা আমাদিগকে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সাতপুরুষের নাম শিখিয়ে দিতেন। সুধু কি তাই, সেই সঙ্গে সঙ্গে গোত্র, প্রবর, সূত্র, শাখা প্রভৃতিও মুখস্থ করে রাখতে হোতো। এখন ছেলেরা বড় বেশী হয় ত পিতামহ ও মাতামহের নাম পর্য্যন্ত বল্‌তে পারে, গোত্রের নামও দুইচারজন বল্‌তে পারে, আর সব 'যথানাম' দিয়ে পুরুতঠাকুর সেরে নেন। আমি কিন্তু, রেওয়া রাজবংশের পরিচয় দিতে সেকেলে প্রথাই অবলম্বন করছি।

রেওয়ার বর্ত্তমান রাজ-বংশ সোলাঙ্কি বা চালুক্য ক্ষত্রিয় জাতীয়। তাঁদের গোত্র ভরদ্বাজ, তাঁদের বেদ যজু, তাঁরা মধ্যন্দিনী-শাখাভুক্ত, তাঁদের প্রবর ভারদ্বাজ অনাঋষি, বার্হস্পত্য, তাঁদের সূত্র কাত্যায়ন, আর তাঁরা বৈষ্ণব শ্রেণীভুক্ত। তাঁদের রাজ্যের আদি নাম বাঘেলখণ্ড। এখনও এ প্রদেশকে লোক বাঘেলখণ্ডই ব'লে থাকে। এই রাজ্যের motto বা শিরোভূষণ হচ্চে—

"মৃগেন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বতমা প্রয়াৎ"

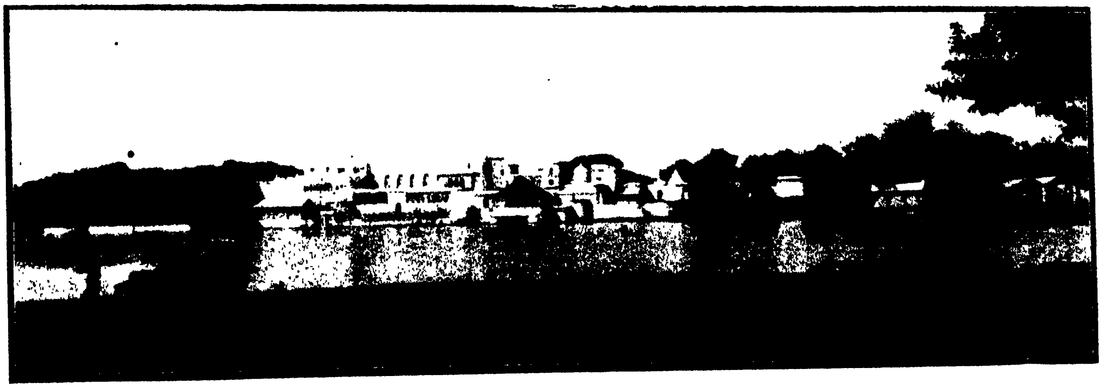
অর্থাৎ বাঘের সঙ্গে লড়াই কোরো না। তার কারণ হচ্চে এই যে, রেওয়া রাজ্যটা একেবারে বাঘের কেল্লা। আগে এ অঞ্চলে এত বাঘের বসতি ছিল যে, তাদের ভয়ে শত্রুরা এ দেশে আস্‌তে পারত না, দেশরক্ষার ভার বাঘেরাই নিয়েছিল। আর এই রাজ্যের যিনি আদি সংস্থাপক, তাঁর নাম ছিল ব্যাঘ্র দেব; বোধহয় বাঘের রাজ্যের অধিপতি ব'লেই তাঁর এই নামকরণ হয়েছিল। সত্য-সত্যই রেওয়া রাজ্য বাঘের দ্বারাই পূর্ব্বে রক্ষিত হয়েছিল। এখন কিন্তু তা আর নেই। মটো ত আছে—বাঘের সঙ্গে লড়াই কোরো না; কিন্তু কিছুদিন থেকে এ রাজ্যের নরপতিরা সে আদেশ অমান্য করতে আরম্ভ করেছেন; প্রতি বৎসর যে কত বাঘ এ রাজ্যে মারা যায়, তার সংখ্যা শুন্‌লে অবাক হতে হয়। প্রতি বৎসর শীতকালে লাট বেলাট থেকে ক্ষুদিরাম সাহেবেরা পর্য্যন্ত রেওয়া রাজ্যে বাঘ শিকার করতে আসেন। এ ছাড়া মধ্য ও পশ্চিম ভারতের নৃপতিগণের ত আগমনের কামাই নেই; সবাই শিকার করতে আসেন। বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুরের কুটুম্বোত্তম, যোধপুরের মহারাজা ও তাঁহার ভ্রাতা সর্ব্বদাই এখানে বাঘ মারতে আসেন। আগে ঘোড়া হাতীতে চ'ড়েই শিকার করা হোতো, তারই জন্য 'রেওয়ার' অশ্বশালা ও হাতীশালা হাতী ঘোড়ায় পরিপূর্ণ রাখতে হোতো, এখনও তা রাখতে হয়। এখন আবার মোটর চলেছে; রেওয়ার গ্যারেজে বহু সংখ্যক মোটর এই শিকারের জন্যই রাখতে হয়েছে। হাতী ঘোড়ার আমলে যেমন-তেমন পথ হ'লেই চল্‌ত; এখন মোটর-যাতায়াতের সুবিধা করবার জন্য পাহাড় পর্ব্বতের উপর দিয়ে ভাল ভাল রাজপথ তৈরী করতে হয়েছে; আর বাঘেলখণ্ডের সম্মানিত অধিবাসী ও রক্ষী ব্যাঘ্র মহাশয়েরা শিকারীদের ভয়ে দূর

অরণ্যের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেও আত্মরক্ষা করতে পারছেন না। কত বাঘ যে প্রতি বৎসর মারা যায়, তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুরের বয়স এই সবে ঊনত্রিংশ বৎসর। এই অল্প বয়সের মধ্যেই তিনি প্রায়



ভেঙ্কট-ভবন, রেওয়া

চারিশত ব্যাঘ্রের জীবন-লীলা শেষ করে দিয়েছেন। মহারাজ ব্যাঘ্রদেবের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য, ব্যাঘ্রের দ্বারা সুরক্ষিত জনপদে



গোবিন্দগড় রাজপ্রাসাদ ও সরোবর

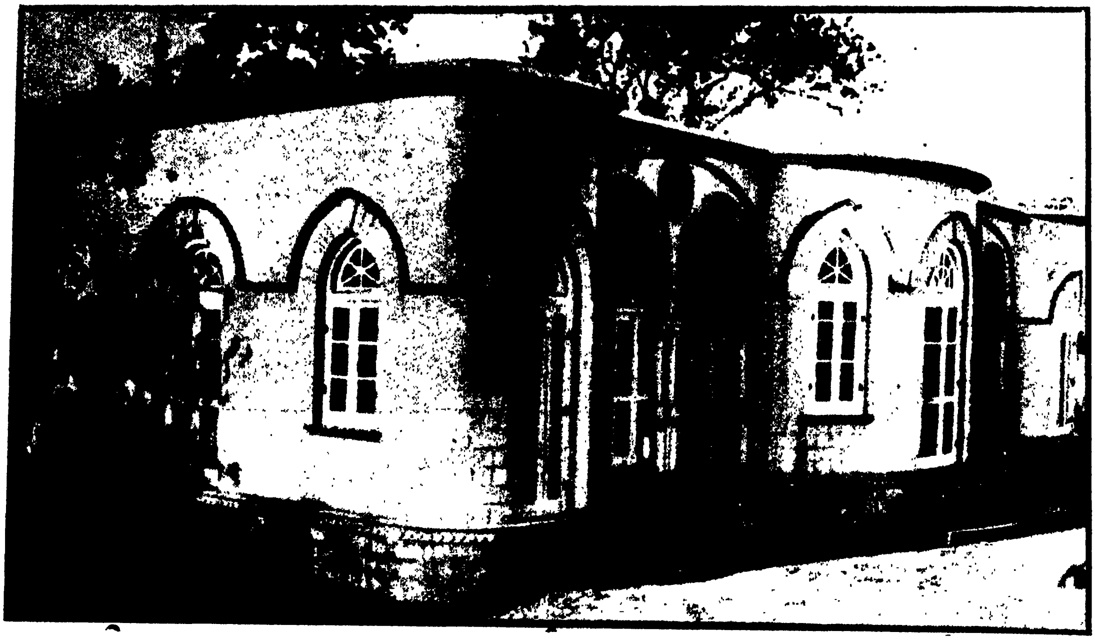
এসে পনর কুড়ি দিন বাস করে, বন-জঙ্গল ঘুরেও কিন্তু আমার অদৃষ্টে বনের মধ্যে একটীও বাঘের দর্শন মেলে নাই, মহারাজের চিড়িয়াখানায় অনেক বাঘ দেখেই কৃতার্থ হ'তে হয়েছে।

এইবার আরও একটু ইতিহাস বলি। চতুর্দ্দশ শতাব্দ থেকে রেওয়া রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়; শ্রীযুক্ত শ্রীপতিবাবুর অনুগ্রহে সে ইতিহাস আমি আদ্যন্ত পড়েছি। সেই সময় থেকে পর-পর যাঁরা এ রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন, তাঁদের নাম ও কীর্ত্তি-কাহিনী বলা এ ভ্রমণ বৃত্তান্তে সম্ভবপর নয়। আমি বর্ত্তমান মহারাজের

পিতৃদেব পরলোকগত কর্ণেল মহারাজা সার ভেঙ্কট রমন সিং বাহাদুর জি-সি-এস্‌-আই মহোদয় থেকেই বিবরণ আরম্ভ করি।

মহারাজ ভেঙ্কট রমন সিং বাহাদুরের বয়স যখন চার বৎসর, তখন তিনি সিংহাসন লাভ করেন; পলিটিক্যাল এজেন্ট নাবালকের পক্ষ থেকে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। ১৮৯৫ অব্দে মহারাজ সাবালক হয়ে রাজ্যভার পান। ১৮৯৭ অব্দে মধ্য-ভারতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়; রেওয়া রাজ্যেও ঘোর হাহাকার উপস্থিত হয়। মহারাজ ভেঙ্কট রমন তখন প্রজাদের কষ্ট দূর করবার

মহারাজ ভেঙ্কট রমন বাহাদুর পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার সভায় বহু পণ্ডিতের সমাগম হোতো। তিনি নিজে একজন সুকবি ছিলেন; তাই সে সময়ের অনেক কবি ও সাধু মহাত্মা রেওয়া রাজ্যে সমাগত হতেন; মহারাজা বাহাদুর সকলকেই যথাযোগ্য সমাদর করতেন এবং যথেষ্ট সাহায্য করতেন। তিনি রাজ্যের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। রেওয়ার দরবার-বিদ্যালয়, হাসপাতাল, অতিথিশালা এখনও তাঁহার বদান্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তিনি এক কথায় প্রজার মা-বাপ ছিলেন, আদর্শ নরপতি ছিলেন।



ছুইয়া কুঠী

জন্য এক প্রকাণ্ড জলাশয় খনন আরম্ভ করেন। এত বড় সরোবর আমি আর কোথাও দেখি নাই। প্রত্যহ চারি হাজার লোক এই খনন কার্য্যে নিযুক্ত হয়। আড়াই বছরে বারো লক্ষ টাকা খরচ করে মহারাজা বাহাদুর এই সরোবর খনন শেষ করেন। এই সরোবরের তীরেই সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দগড় রাজপ্রাসাদ। এখানে গোবিন্দজির মন্দির আছে; তাঁহারই নামানুসারে এই মন্দির-সংলগ্ন বিশাল প্রাসাদের নাম গোবিন্দগড় প্রাসাদ হয়েছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য এই সাধু প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট হয়ে গবর্ণমেণ্ট মহারাজকে জি-সি-এস-আই উপাধি দান করেন।

১৯১৮ অব্দের ৩০শে অক্টোবর মহারাজ ভেঙ্কট রমন সিং বাহাদুর পরলোকগত হন। তাঁহার পুত্র মহারাজা সার গুলাব সিং বাহাদুর কে-সি-এস-আই এখন রেওয়ার অধিপতি। সার গুলাব সিংজি বাহাদুর ১৯০৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর দিন (১৯১৮, ৩১শে অক্টোবর) তিনি নাবালক অবস্থায় রাজ্যলাভ করেন; রতলামের মহারাজা সার সজ্জন সিং বাহাদুর একটী প্রতিনিধি-সভার সাহায্যে নাবালকের রাজ্য পরিচালন করতে থাকেন। ১৯২২ অব্দে মহারাজ গুলাব সিং স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুর স্বয়ং মহারাজকে সিংহাসনে

অভিষিক্ত করেন। মহারাজ গুলাব সিং ১৯১৯ অব্দে যোধপুরের বর্ত্তমান মহারাজের ভগিনীকে বিবাহ করেন। কিষেণগড়ের মহারাজ-দুহিতা মহারাজ গুলাব সিংয়ের দ্বিতীয়া মহিষী; এ বিবাহ ১৯২৫ অব্দে হয়। মহারাজের প্রথমা রাণীর গর্ভে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেছেন; ইহার নাম মহারাজকুমার মার্ত্তণ্ড সিংজি। ইনি ১৯২৩ অব্দের ১৫ই মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজের আর কোন সন্তান হয় নাই। আমি যখন রেওয়ায় গিয়েছিলাম, তখন মহারাজ দ্বিতীয় গোলটেবিলে যোগদানের জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। এবার একাকাই গিয়াছিলেন; প্রথম বারের গোলটেবিলে যাওয়ার সময় তাঁহার প্রথমা মহিষী ও পুত্র তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

রেওয়ার রাজ-পরিবারের কথা অতি সংক্ষেপে বলা হোলো। এইবার রাজ্যের কথা একটু বলি। রেওয়া রাজ্যের লোক-সংখ্যা ১৯০১ অব্দের গণনায় তের লক্ষের কিছু বেশী হয়েছিল; এখন বোধ হয় লোকসংখ্যা প্রায় আঠারো লক্ষ হবে। এর তিন ভাগই হিন্দু; মুসলমানের সংখ্যা শতকরা তিনজনেরও কম। রেওয়া রাজ্যের আয় কত, তা ঠিক বল্‌তে পারি না; তবে পঞ্চাশ ষাট লক্ষ টাকা হবে বলেই আমার মনে হয়। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা অতি সুন্দর; শাসন-বিভাগে সাহেব কর্ম্মচারী একজনও নেই। সেনা-বিভাগে সাহেব আছেন; মহারাজ-কুমারের প্রধান শিক্ষক একজন সাহেব। আরও দুই চারিজন সাহেব আছেন। সুদক্ষ ও শিক্ষিত দেশীয় কর্ম্মচারীদের দ্বারাই রাজকার্য্য সম্পন্ন হয়। বাঙ্গালী অতি কম, সর্ব্বশুদ্ধ আট দশ জন মাত্র; আমার বৈবাহিক শ্রীযুক্ত শ্রীপতিবাবুই বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত। মহারাজা বাহাদুর সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃতই আদর্শ নরপতি; তাঁহার কোন প্রকার বিলাস-ব্যসন নাই; একেবারে সাদাসিধে ভদ্রলোকের ন্যায় তিনি থাকেন। দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহার অত্যধিক আগ্রহ। এই সেদিন সংবাদপত্রে পড়ছিলাম যে, রেওয়ার ভদ্র-বংশীয় লোকেরা যাতে কৃষি কার্য্যকে নীচ কার্য্য মনে না করেন, তার জন্য তিনি স্বহস্তে হল চালনা করেছিলেন। আমাদের দেশে এমন দৃষ্টান্ত কৈ? রেওয়ার অধিবাসীরা সকলেই সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে, কারণ সেখানকার ভূমি খুব উর্ব্বর। কৃষকেরা জমি চাষ করে যে ধান গম পায়, তাতে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট হয় না। জিনিস-পত্রও খুব সস্তা। আমাদের দেশের মত দরিদ্রের হাহাকার সেখানে নাই বল্‌লেই হয়।



মধ্যে রেওয়ার মহারাজ, দক্ষিণদিকে যোধপুরের মহারাজ, বামদিকে যোধপুরের মহারাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা

রেওয়া রাজ্যের কথা এইখানেই শেষ করি। তারপর এখন বলি আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। আমি রেওয়ায় কুড়ি দিন ছিলাম। এই কুড়ি দিনই আমি বেড়িয়েছি, এবং প্রতিদিন দশ পনর মাইল মোটরে চ'ড়ে ঘুরেছি; মধ্যে মধ্যে পঞ্চাশ ষাট, এমন কি এক-শত দেড়-শত মাইল পর্য্যন্ত

একদিনে বেড়িয়েছি। সেই সুদীর্ঘ ভ্রমণের দুই চারিটা বিবরণ লিপিবদ্ধ করছি।

এক রবিবার প্রাতঃকালে বৈবাহিক মহাশয় বল্লেন "আজ আপনাকে শতাবধি মাইল ঘুরিয়ে আন্‌ব; অতএব ব্রেক-ফাষ্টটা একটু গুরুতর রকম করে নিন। ফিরতে সেই একটা-দুইটা।" আমি বল্লাম "প্রতিদিনের ব্রেকফাষ্ট যে রকম গুরু হয়, তার উপর 'তর' করতে গেলে আমাকে আর বস্‌তে হবে না।" বিশেষ আপত্তি করেও 'গুরুতরের' হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল না।



নিহত ব্যাঘ্র ও মহারাজা বাহাদুর

ালে সাতটার একটু পূর্ব্বেই বের হওয়া গেল। সারথি বৈবাহিক নিজে; তবে তাঁর মাইনে-করা সারথি সাক্ষী-গোপাল রূপে সঙ্গে রইল।

প্রথমেই আমরা সেনানিবাসের দিকে গেলাম। লম্বা লম্বা ঘরে সৈন্যরা বাস করে; স্থানটী চারিদিকে খোলা। অনেক সৈন্য আছে। তারা পুরাতন কেল্লার মধ্যে না থেকে এই খোলা মাঠে থাকে কেন জিজ্ঞাসা করায় শ্রীপতিবাবু বল্লেন, সেকেলে ধরণের পুরাতন আমলের তৈরী কেল্লায় বাস করতে সাহেবেরা চান না, তাই এই বন্দোবস্ত। আমি তখনও পুরাতন কেল্লা দেখি নাই; তাই মনে করলাম সে কেল্লা হয় ত বাসের অযোগ্য হয়েছে। কিন্তু, কয়েক দিন পরে যখন পুরাতন কেল্লা দেখ্‌লাম, তখন আমার ভ্রম দূর হলো। অতি সুন্দর কেল্লা। সে কথা যথাস্থানে বল্‌ব।

সেনা-নিবাস থেকে বেরিয়ে আমরা একটা প্রশস্ত পথে পড়লাম। সুমুখের দিকে চেয়ে দেখি, সে পথের আর অন্ত নেই—এইটেই গ্রাণ্ড বম্বে রোড। ইনি অনেক রাজার রাজ্য, অনেক নদনদী, অনেক পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করে বোম্বাই সহরে পৌঁছেছেন। একটা পর্ব্বত দেখিয়ে শ্রীপতি বাবু বল্লেন "ঐ যে পাহাড় দেখ্‌ছেন, আমরা ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠব; তারপর ও-পাশের উৎরাই নেমে শিকার-গঞ্জে যাব।" পাহাড়-পর্ব্বতের দূরত্ব সম্বন্ধে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। একটা পাহাড় দেখে মনে হয়, এ আর কতদূর—বড় জোর তিন মাইল পথ; কিন্তু, যত চল্‌তে থাকা যায়, ততই পাহাড় যেন দূরে স'রে যায়। তিন মাইলের স্থানে পনর মাইল চ'লেও পাহাড়ের পদতলে উপস্থিত হওয়া যায় না। সুতরাং, শ্রীপতি বাবুর 'ঐ যে দেখ্‌ছেন' তিনি যে কত দূরে রয়েছেন, তা আমি বেশ বুঝতে পারলাম;—পাকা আটত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করে আমরা পাহাড়ের পদতলে উপস্থিত হলাম। সেইখান থেকেই বোম্বাই রোড আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে পাহাড়ের পাশ দিয়ে চ'লে গেলেন। আমরা অপর রাস্তা ধ'রে পাহাড়ের চড়াই ভাঙ্গতে গেলাম। এ পথ শ্রীপতি বাবুই তৈরী করেছেন। সেই চড়াইয়ে মোটর নিয়ে সহজে

উঠ্‌বার জন্য যত অন্ধিসন্ধি হ'তে পারে, শ্রীপতিবাবু তার নিদর্শন দেখিয়েছেন। রাস্তায় এত বাঁক যে মোটর-চালক সামান্য একটু অসতর্ক হ'লে আর রক্ষা নেই। দেখ্‌লাম, শ্রীপতিবাবু শুধু ইঞ্জিনিয়ার নহেন, মোটর-চালনায়ও তাঁহার অসামান্য দক্ষতা! এই একটা বাঁক ফিরতে না ফিরতেই আর একটা। শিলিগুড়ি থেকে দারজিলিংয়ের চলা-পথে মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের অবকাশ আছে —কিন্তু এই পথে তা মোটেই নেই। অন্য মোটরচালক হ'লে আমি ভয়েই আড়ষ্ট হ'তাম—ঐ বুঝি গেলাম! কিন্তু, এই শ্বেত-কেশ, নিরামিষভোজী প্রৌঢ় ব্যক্তির অদ্ভুত শক্তি দেখে আমি অবাক্‌ হয়ে গেলাম—নিশ্চিন্ত মনে মোটরে ব'সে রইলাম।

আগাগোড়া চড়াই অতিক্রম ক'রে সেই পর্ব্বতের একেবারে শীর্ষস্থানে মোটর পৌঁছিল; আমি হাঁফ ছেড়ে নেমে পড়লাম। পরলোকগত মহারাজ এই পর্ব্ব-তের চূড়ায় তাঁর গ্রীষ্মাবাস নির্ম্মাণ করবার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। তাঁরই আদেশে শ্রীপতি-বাবু এই পর্ব্বতের শীর্ষস্থান সমভূম করে একটা নাতিবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেছিলেন; আরও বড় বড় বাড়ী নির্ম্মাণ করবার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু মহারাজের মৃত্যু হওয়ায় এবং বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুরের এ সব সৌখান ব্যাপারের দিকে আগ্রহ না থাকায় যেটুকু হয়েছিল, তাই পড়ে আছে। পরলোকগত মহারাজা ভেঙ্কট রমন বাহাদুর যে সুকবি, শোভা-সৌন্দর্য্য-জ্ঞান যে তাঁহার বিশেষ ভাবে ছিল, তা এই পাহাড়ের চূড়ায় গ্রীষ্মাবাস নির্ম্মাণের পরিকল্পনাতেই বেশ উপলব্ধ হয়। স্থানটী সত্যসত্যই কবি-কুঞ্জেরই উপযুক্ত! এই অট্টালিকার নাম যে কেন "ছুইয়া কুঠী" রাখা হয়েছিল, তা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই; 'ছুইয়া' শব্দের কোন কবিত্বপূর্ণ অর্থ আছে কি না, তাও আমি জানিনে। তবে এমন মনোরম স্থানের অমন নাম আমার বাঙ্গালী কানে মোটেই ভাল লাগ্‌ল না। স্থানটী অনাদরে পড়ে থাক্‌লেও ইহা স্বর্গীয় মহারাজের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের নিদর্শন বলে সকলেই স্বীকার করবেন।



মাননীয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড আরউইন ও রেওয়ার মহারাজ শিকার-ক্ষেত্রে

এইবার ছুইয়া কুঠী থেকে উৎরাই করতে হবে। যেতে হবে পাহাড়ের অপর দিক দিয়ে নেমে প্রায় কুড়ি মাইল সমতল স্থান অতিক্রম করে শিকারগঞ্জ নামক স্থানে। যাঁরা

যান-বাহনে পাহাড়-পর্ব্বতে ওঠা-নামা করেছেন, তাঁরা জানেন যে, চড়াই উঠ্‌তে তত ভয়ের কারণ নেই, যত ভয় উৎরাইয়ের সময়; কোন রকমে চালক যদি একটু অন্যমনস্ক হন, তা হ'লে আর রক্ষা নেই, একেবারে নীচের খদে পতন এবং নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু, এই ছুইরা কুঠী থেকে নামবার সময় শ্রীপতিবাবুর মোটর-চালনার কৌশল দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। কোন রকম বিপদ না হওয়ায় আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নীচে নেমে এলাম। তারপর কুড়ি মাইল গিয়ে যে স্থানে উপস্থিত হোলাম, তার বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যে কুলাবে না। রেওয়ার রাজ-বংশ বাধ্য হয়েই শিকার-প্রিয় হয়েছেন; কাজেই এই স্থানের হয়। নদী-তীরে নৌ-সেতু দেখ্‌লাম। সেতুটাকে এখন তীরে তুলে রাখা হয়েছে। যখন মহারাজ ও তাঁহার শিকারী অতিথিবর্গের সমাগম হয়, তখন এই সেতু ভাসিয়ে দেওয়া হয় এবং তার উপর দিয়ে শিকারীদের মোটর নদী-পারে চ'লে যায়; বাঘ মহাশয়েরা নাকি নদীর ওপারেই বেশী আছেন; তাই এই আয়োজন। শিকারীরা এই গঞ্জে এসে রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম করে থাকেন। আমরা শিকারী না হ'লেও এই প্রাসাদে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে, তারপর চারিদিক ঘুরে দেখে ফিরবার আয়োজন করলাম।

যে পথে গিয়েছিলাম, সেই পথেই ফিরতে হবে; সেই কুড়ি মাইল দূরের পর্ব্বত অতিক্রম করতে হবে, অন্য পথ



চাচাই জলপ্রপাত

নাম তাঁরা শিকারগঞ্জ রেখেছেন; কিন্তু নাম রাখবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করবার সুবিধা যদি তাঁদের হোতো, তা-হ'লে আমি এই স্থানের নাম রাখতাম 'অমরাবতী'। শোন ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বনাশ নদীর সঙ্গমস্থলে এই শিকারগঞ্জ প্রতিষ্ঠিত। একেবারে নদীর মধ্য থেকেই প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়েছে। তারই পার্শ্বেই কয়েকটী দেবালয়। সঙ্গমস্থলের অপূর্ব্ব শোভা। চারিদিকে গভীর অরণ্য; তারই মধ্য দিয়ে শোণ নদ ভীষণ গর্জ্জন করে চ'লে যাচ্ছেন; বনাশ এসে এইস্থানের শোনের কাছে আত্ম সমর্পণ করেছেন। এ যেন প্রকৃতির লীলা-নিকেতন; এখানে শিকারের সন্ধানে আস্‌তে নেই, তপস্যা করতে আস্‌তে নেই। আমরা যখন পর্ব্বত অতিক্রম করে রেওয়ার দিকের সমভূমিতে উপস্থিত হলাম, তখন শ্রীপতিবাবু প্রস্তাব করলেন যে, মাইল দশেক ঘুরে গেলে একেবারে গোবিন্দগড় রাজপ্রাসাদ ও ভেঙ্কট জলাশয় দেখে যাওয়া যায়। আমার আর আপত্তি কি? যদিও তখন বেলা প্রায় বারোটা; তা হ'লেও এই পথেই গোবিন্দগড় দেখে যাওয়াই স্থির হোলো।

এই গোবিন্দগড় প্রাসাদ ও গোবিন্দজির মন্দির মহারাজ ভেঙ্কট রমন বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত। প্রাসাদের চারিদিকে প্রশস্ত পরিখা। সেই পরিখার সঙ্গেই জলাশয় সংযুক্ত। জলাশয়ের তীরেই প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ। রেওয়া

রাজ্যে এমন সুন্দর প্রাসাদ আর নেই। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও গোবিন্দজীর সেবাপূজা যথারীতি সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর এখানেই বেশী সময় বাস করতেন; বর্ত্তমান মহারাজা মধ্যে মধ্যে এখানে এসে থাকেন। রেওয়া রাজধানী থেকে গোবিন্দগড় এগার মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা রাজপ্রাসাদের প্রত্যেক অংশ দেখে, সেই প্রকাণ্ড জলাশয়ের তীর দিয়ে অগ্রসর হলাম। এ জলাশয়ের ইতিহাস পূর্ব্বেই বলেছি। বাড়ী ফিরতে আমাদের প্রায় তিনটে বেজে গিয়েছিল; ভ্রমণও প্রায় দেড়শ মাইল হয়েছিল।

আর একদিন চাচাই জলপ্রপাত দেখ্‌বার জন্য যাত্রা করেছিলাম। চাচাই জলপ্রপাত দুইটীই দেখ্‌বার মত; কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে একটীরও দর্শন লাভ হোলো না। প্রায় কুড়ি মাইল গিয়ে দেখা গেল, রাস্তা জলে ডুবে গিয়েছে; আর কোন দিক দিয়েই প্রপাতের কাছে যাওয়ার সুবিধা নেই। কাজেই দূর থেকেই প্রপাতদ্বয়কে সেলাম জানিয়ে ফিরে এলাম। প্রপাতের যে আলোকচিত্র কিনেছিলাম, তাই দেখেই প্রপাত দেখার আকাঙ্ক্ষা মিটাতে হোলো।

আর একদিন ভেঙ্কট রাজপ্রাসাদ ও পুরাতন কেল্লা দেখতে গিয়েছিলাম। রাজপ্রাসাদ সহরের মধ্যেই অবস্থিত। একটী পুরাতন প্রাসাদ—সেই সেকেলে ধরণে তৈরী প্রকাণ্ড রাজপুরী; ভিতর অংশ একেবারে অসূর্য্যম্পশ্য নয়, আলো বাতাসের প্রবেশাধিকার আছে। এই প্রাসাদে এখন বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুরের কনিষ্ঠা মহিষী বাস করেন। আমি যখন গিয়েছিলাম, তখন মহারাণী সেই প্রাসাদে অবস্থিতি করছিলেন; সেই জন্য সিংহদ্বারের বাহির হইতেই এই প্রাসাদ দর্শন করতে হয়েছিল। নব-নির্ম্মিত ভেঙ্কট প্রাসাদ ইংরাজী ধরণে প্রস্তুত, ইংরাজী কায়দায়ই সজ্জিত। বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে এই প্রাসাদ অবস্থিত। মহারাজা বাহাদুর রাজধানীতে ছিলেন না, দ্বিতীয় গোল টেবিলে হাজিরা দিবার জন্য বিলাতে গিয়েছিলেন; জ্যেষ্ঠা মহারাণীও পুত্রসহ মসুরীতে গিয়াছিলেন; সুতরাং এ রাজপ্রাসাদের সমস্ত অংশ দর্শনের কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই; বিশেষতঃ রেওয়া রাজ্যের একজন সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত শ্রীপতি বাবু যখন সঙ্গে ছিলেন, তখন দু চারটে সেলামও আমাদের মোটরের উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছিল। ভেঙ্কট রাজপ্রাসাদের কথা বেশী বল্‌বার কিছুই নেই—সেই আগাগোড়া বিলাতীর সমাবেশ,—সেই টেবিল চেয়ার সোফা; সেই বৈদ্যুতিক আলো, সেই বিলাতী বিলাস-সম্ভার। বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুর এ সকলের একেবারেই পক্ষপাতী নন; তা ব'লে ত এত বহুমূল্য আস্‌বাবপত্র অদূরবর্ত্তী পুণ্যতোয়া তমসা নদীর গর্ভে ফেলে দিতে পারেন না।



মহারাজকুমার মার্ত্তণ্ড সিং

এই প্রাসাদের এক প্রান্তে যে চিড়িয়াখানা আছে, তা দেখবার মত। চিড়িয়া কিন্তু নেই বল্‌লেই হয়—আছেন বহু মহামান্য অতিথি ব্যাঘ্রাচার্য্যগণ। একটী বৃহদাকার বাঘিনী দেখলাম; তিনি তিন পুরুষ এই স্থানেই বাস

করছেন ; তাঁর সন্তানদের সন্তান হয়েছে। এটা বাঘেরই আড্ডা। যে সব বাঘ ধরা পড়েন, তাঁদের এখানে এনে রাখা হয় ; বন্ধুবান্ধব ও বড় সাহেবদের এই সব বাঘ উপহার দেওয়া হয় ; আর যাঁরা মারা পড়েন, তাঁদের চামড়া দিয়ে গৃহের শোভা বর্দ্ধন করা হয়।

রাজপ্রাসাদ দেখা শেষ করে আমরা বাজারের মধ্য দিয়ে পুরাতন কেল্লা দেখতে গেলাম। বাজারের গায়েই পুরাতন কেল্লা—একেবারে সেই সাবেকী আমলের দুর্গ। চারিদিকে প্রকাণ্ড গড়খাই। তাতে এখনও প্রচুর জল আছে। একটী সেতু পার হয়ে আমরা দুর্গের সিংহদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হলাম। এইখানেই আমাদের মোটর মধ্যে প্রবেশ করবার সিঁড়ির নীচেই জুতা ছাড়তে হোলো। আমার এতে মোটেই আপত্তি হোলো না, বরঞ্চ সম্ভ্রমের ভাব মনে উদিত হোলো। এই তো চাই! এই যে সুদৃঢ় দেওয়াল-শ্রেণী ঊর্দ্ধ দিকে মাথা তুলে কত শত্রু সৈন্য-বাহিনীকে উপেক্ষা করেছে, এই যে পরিখা-বেষ্টিত বিশাল দুর্গ কত শত বৎসর সগৌরবে দণ্ডায়মান থেকে সোলাঙ্কি বংশের বিগত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করছে, সেই দুর্গের প্রতি, সেই দুর্গের স্মরণীয় অধিনায়কগণের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা সকলেরই উচিত।

এই দুর্গে বিলাতী বিলাসিতা, বিলাতী আস্‌বাব কিছুই প্রবেশাধিকার পায়নি। প্রকাণ্ড দরবার-হলে



শিকারগঞ্জে শোন ও বনাস্ নদীর সঙ্গমস্থল

ত্যাগ করতে হোলো ; রাজপরিবারের মহামান্য ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কাহারও যানারোহণে এই দুর্গের সিংহদ্বার অতিক্রম করবার হুকুম নেই।

সিংহদ্বারের কাছে গিয়েই শ্রীপতি বাবু বল্লেন "বেয়াই, এ দুর্গের মধ্যে 'নাঙ্গা শিরে' অর্থাৎ খোলা মাথায় প্রবেশের আদেশ নেই। শুধু তাই নয়, ধুতির কোঁচা ঢুলিয়েও যাওয়ার হুকুম নেই।" হুকুম যখন নেই, তখন আর কি করা যায়—গায়ের চাদরখানি মাথায় জড়ালাম, আর কোঁচাটা দুমড়ে কাছার সঙ্গী করা গেল। তখন মনে করলাম, জুতার উপর বোধ হয় এ আদেশ প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু ভিতরের চত্বরে গিয়েই সে ভ্রম দূর হোলো—দুর্গের সেই সেকেলে ধরণে ফরাস পাতা রয়েছে, তাকিয়া রয়েছে ; দরবার-হলের মধ্যে মহারাজের উপবেশনের জন্য সেই সেকেলে কারুকার্য্যময়, স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত সিংহাসন ; সিংহাসন পার্শ্বে সেই আশা সোটা, পাখা চামর, রাজছত্র প্রভৃতি এখনও সাজানো রয়েছে। শুনলাম, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে দরবার এখানেই হয়—ভেঙ্কট প্রাসাদেও নয়, গোবিন্দগড়েও নয়। আমি ভেবেছিলাম, দুর্গটী বুঝি জঙ্গলাকীর্ণ হয়েছে, নানা স্থান ভেঙ্গে পড়েছে ; পরিখা হয় ত শুকিয়ে গিয়েছে, আর না হয় শৈবালাচ্ছন্ন হয়েছে। দেখে আনন্দবোধ হোলো, এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরাতন দুর্গ সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। এখানে

সেনা-নিবাস স্থাপন না করে. তিন মাইল দূরে মাঠের মধ্যে সামান্য কতকগুলি লম্বা বাংলো তৈরী করে সৈন্য স্থাপনের কি দরকার হয়েছিল। দুর্গ পরিভ্রমণ করে দেখ্‌লাম, অন্ততঃ দশ হাজার সৈন্য এই দুর্গের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে; তাদের স্বাস্থ্যহানির কোন সম্ভাবনাই নাই।

এই কয়টী স্থান ছাড়া দূরে দূরে আরও অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে; আমি আর সেগুলি দেখ্‌তে পারি নি। তবুও প্রতিদিন দশ পনর মাইল মোটর ভ্রমণ হয়েছে। এরই মধ্যে একদিন রেওয়ার সেই অল্প কয়েকজন বাঙ্গালী একটা সভা করে, সেখানকার বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারের পক্ষ থেকে আমাকে সংবর্দ্ধনা করেছিলেন। যথারীতি বক্তৃতা, মাল্যদান ও অসামান্য জলযোগও হয়েছিল।

এবার ফিরবার পালা। রেওয়ায় যে কয়দিন ছিলাম, বাতের যন্ত্রণা ছাড়া আর কোন অসুখ বোধ করিনি। স্থির করলাম, মহাষ্টমীর দিন রেওয়া ত্যাগ করব; অভিপ্রায় এই ছিল যে, মহাষ্টমীর দিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় সাটনাতে বোম্বাই মেল ধ'রে রাত একটার সময় মোগলসরাই পৌঁছিব। সেখানে তখনই গাড়ী বদল করে মেনলাইনের একখানি গাড়ীতে পরদিন বেলা এগারটার সময় বৈদ্যনাথে নামব—বোম্বাই মেল যে গ্রাণ্ড-কর্ড দিয়ে আসে। এই ব্যবস্থা অনুসারে মহাষ্টমীর দিন তিনটার সময় রেওয়া থেকে শ্রীপতি বাবুকে সারথি করে সাটনা গেলাম।

যথাসময়ে বোম্বাই মেলে উঠ্‌লাম। আমি সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ীতে উঠলাম, তাতে জব্বলপুরের একটী মুসলমান যুবক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী, খুলনা জেলায় তাঁর বাড়ী। জব্বলপুরে তাঁদের কারবার আছে। সঙ্গীটি ভালই মিলেছিল। সাটনা ছেড়ে যে ষ্টেসনে মেল প্রথম দাঁড়ায়, তার নাম মাণিকপুর। মাণিকপুরে এসেই আমার জ্বর এলো। সে যে কি জ্বর, তা আর বল্‌তে পারিনে। আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। কোথায় বা মোগলসরাই আর কোথায় বা বৈদ্যনাথ! গাড়ী যখন গয়ায় পৌঁছিল, তখন আমার জ্ঞানসঞ্চার হোলো। চেয়ে দেখি সেই মুসলমান যুবকের কোলে মাথা রেখে আমি শুয়ে আছি। আমাকে চোখ মেলতে দেখে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন "আপনাকে নিয়ে কি যে করব, ভেবে পাইনি। আপনার যদি জ্ঞান-সঞ্চার না হোতো, তা হ'লে আপনাকে নিয়ে আমি এই অপরিচিত গয়াতে নেমে হাসপাতালে আশ্রয় নিতাম।" অপরিচিত মুসলমান যুবকের দিকে আমি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করলাম; তখনও কথা বল্‌বার শক্তি হয় নাই। তিনি তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা এনে আমাকে খাওয়ালেন; আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করলাম। বেলা এগারটার সময় একশ তিন ডিগ্রী জ্বর নিয়ে স্বাস্থ্যলাভ করে আমি বাসায় এসে উঠ্‌লাম। মুসলমান যুবকটী ইটালাতে তাঁদের বাসায় চলে গেলেন। আমি তাঁর এই সেবার জন্য ঋণ কখনও শোধ দিতে পারব না।



শেষের পরিচয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৫)

বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল দু'খানা পত্র পাইল,—দুই-ই বিবাহের ব্যাপার। একখানায় ব্রজবিহারী জানাইয়াছেন যে রেণুর বিবাহ এখন স্থগিত রহিল, এবং সংবাদটা নতুন বউকে যেন জানানো হয়। অন্যান্য কয়েকটা মামুলি কথার পরে তিনি চিঠির শেষের দিকে লিখিয়াছেন, নানা হাঙ্গামায় সম্প্রতি অতিশয় ব্যস্ত, আগামী শনিবারে বিকালের দিকে নিজে তোমার বাসায় গিয়া সমুদয় বিষয় বিস্তারিত মুখে বলিব। দ্বিতীয় পত্র আসিয়াছে কর্ত্তার নিকট হইতে। অর্থাৎ, যাঁহার ছেলে-মেয়েকে সে পড়ায়। ভাই-পোর বিবাহ হঠাৎ স্থির হইয়াছে দিল্লীতে, কিন্তু অতদূরে যাওয়া তাঁহার নিজের পক্ষে সম্ভবপর নয়, এবং তেমন বিশ্বাসী লোকও কেহ নাই, সুতরাং বরকর্ত্তা সাজিয়া রাখালকেই রওনা হইতে হইবে। সামনের রবিবারে যাত্রা না করিলেই নয়, অতএব, শীঘ্র আসিয়া দেখা করিবে। এই কয়দিনের কামাইয়ের জন্য যে তিনি ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতির উল্লেখ করেন নাই, ইহাই রাখাল যথেষ্ট মনে করিল। সে যাই হোক, মোটের উপর দুইটি খবরই ভালো। রেণুর বিবাহ ব্যাপারে তাহার মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। 'এখন স্থগিত' থাকার অর্থ বেশ স্পষ্ট না হইলেও, পাগল বরের সহিত বিবাহ হইয়া যে চুকিয়া যায় নাই, ইহাতেই সে পুলকিত হইল। দ্বিতীয়, দিল্লী যাওয়া। ইহাও নিরানন্দের নহে। সেখানে প্রাচীন দিনের বহু স্মৃতি-চিহ্ন বিদ্যমান, এতদিন সে সকল কথা কেবল পুস্তকে পড়িয়াছে ও লোকের মুখে শুনিয়াছে, এবার এই উপলক্ষে সমস্ত চোখে দেখা ঘটিবে।

পরদিন সকালেই সে চিঠি লইয়া নতুন-মার সঙ্গে দেখা করিল, তিনি হাসিমুখে জানাইলেন শুভ-সংবাদ পূর্ব্বাহ্ণেই অবগত হইয়াছেন, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণের অপেক্ষায় অনুক্ষণ অধীর হইয়া আছেন। একটা প্রবল অন্তরায় যে ছিলই তাহা নিঃসন্দেহ, তথাপি কি করিয়া যে ঐ শান্ত, দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষটি একাকী এতবড় বাধা কাটাইয়া উঠিল তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

রাখাল কহিল, রেণু নিশ্চয়ই তার বাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল নতুন-মা, নইলে কিছুতে এ বিয়ে বন্ধ করা যেতোনা।

নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, জানিনে তো তাকে, হতেও পারে বাবা।

রাখাল জোর দিয়া বলিল, কিন্তু আমি তো জানি। তুমি দেখে নিয়ো মা, আমার অনুমানই সত্যি। সে নিজে ছাড়া হেমন্তবাবুকে কেউ থামাতে পারতোনা।

নতুন-মা আর তর্ক করিলেননা, বলিলেন, যাই হোক্, শনিবার বিকালে আমিও তোমার ওখানে গিয়ে হাজির থাক্‌বো রাজু, সব ঘটনা নিজের কানেই শুন্‌বো। আরও একটা কাজ হবে বাবা,—আর একবার তোমার কাকাবাবুর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে আসতে পারবো।

তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সে নীচে একবার সারদার ঘরটা ঘুরিয়া গেল, দেখিল ইতিমধ্যেই সে ছেলেদের কাছে কাগজ কলম চাহিয়া লইয়া নিবিষ্ট মনে হাতের লেখা পাকাইতে বসিয়াছে। রাখালকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া এ সকল সে লুকাইবার চেষ্টা করিলনা, বরঞ্চ, যথোচিত মর্য্যাদার সহিত তাহাকে তক্তপোষে বসাইয়া কহিল, দেখুন তো দেব্‌তা, এতে কি আপনার কাজ চল্‌বে?

সারদার হস্তাক্ষর যে এতখানি সুস্পষ্ট হইতে পারে রাখাল ভাবে নাই, খুশী হইয়া বারবার প্রশংসা করিয়া কহিল, এ আমার নিজের লেখার চেয়েও ভালো সারদা, আমাদের খুব কাজ চলে যাবে। তুমি যত্ন করে লেখা-পড়া শেখো, তোমার খাওয়া-পরার ভাবনা থাক্‌বেনা। হয়ত, তুমিই কতলোকের খাওয়া-পরার ভার নেবে।

শুনিয়া অকৃত্রিম আনন্দে মেয়েটির মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাখাল মিনিট দুই নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া

বলিল, টাকাটা তুমি কাছে রাখো সারদা, এ তোমারই। আমি এক বন্ধুর বিয়ে দিতে দিল্লী যাচ্ছি, ফিরতে বোধহয় দশবারো দিন দেরি হবে,—এসে তোমার লেখা এনে দেবো —কি বলো? কিছু ভেবোনা,—কেমন?

সারদা কহিল, আমার টাকার এখন দরকার ছিলনা দেবতা,—সে-ই এখনো খরচ হয়নি।

—তা হোক্, তা হোক্,—এ টাকাও আপনিই শোধ হয়ে যাবে। যদি হঠাৎ আবশ্যক হয় কার কাছে চাইবে বলো? কিন্তু আমার জন্যে চিন্তা কোরোনা যেন, আমি যত শীঘ্র পারি চলে আস্‌বো। এসেই তোমাকে লেখা দিয়ে যাবো।

সারদার নিকট বিদায় লইয়া রাখাল তাহার মনিব বাটীতে উপস্থিত হইল, সেখানে কর্ত্তা গৃহিণী ও তাহাতে বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল সমস্ত দলবল লইয়া তাহাকে রবিবার রাত্রির গাড়ীতেই যাত্রা করিতে হইবে। গৃহিণী বলিয়া দিলেন, রাখাল, তোমার নিজের বন্ধু-বান্ধব কেউ যেতে চায় তো স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেয়ো,—সব খরচ তাদের। মনে রেখো, এ-পক্ষের তুমিই কর্ত্তা,—টাকা-কড়ি, গয়না-গাঁটি, জিনিস-পত্র সমস্ত দায়িত্ব তোমার।

রাখালের সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িল তারককে। সে হুঁসিয়ার লোক, তাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে, বিনা খরচায় এ সুযোগ নষ্ট করা হইবেনা। কেবল একটা আশঙ্কা ছিল লোকটার এক-ঝোঁকা নৈতিক বুদ্ধিকে। সেখানে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন উঠিয়া পড়িলে তাহাকে রাজি করানো কঠিন হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সে যে মাষ্টারি লইয়া বর্দ্ধমানে চলিয়া যাইতে পারে এ কথা তাহার মনেও হইলনা। কারণ, তাহার ফিরিয়া আসার অপেক্ষা করিতে না পারুক, একখানা চিঠি লিখিয়াও রাখিয়া যাইবেনা এমন হইতেই পারেনা। রবিবারের এখনো তিনদিন বাকি, ইহার মধ্যে সে আসিয়া দেখা করিবেই, নাহয় কাল একবার সময় করিয়া তাহাকে নিজেই তারকের মেসে গিয়া খবরটা দিয়া আসিতে হইবে। বাসায় ফিরিয়া রাখাল নানা কাজে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। সে সৌখিন মানুষ, এ কয়দিনের অবহেলায় ঘরের বহু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে—যাবার পূর্ব্বে সে সকল ঠিক করিয়া ফেলা চাই। সাহেব-বাড়ী হইতে একটা ভালো তোরঙ্গ কেনা প্রয়োজন, বিদেশে চাবি খুলিয়া কেহ কিছু চুরি করিতে না পারে। বর-কর্ত্তার উপযুক্ত মর্য্যাদায় জামা-কাপড় আলমারিতে কি-কি আছে দেখা দরকার,—না থাকিলে তাড়াতাড়ি তৈরি করাইয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। আর শুধু তারক তো নয়, যোগেশবাবুকেও একবার বলিতে হইবে। তাঁহার পশ্চিমে যাইবার অনেক দিনের সখ কেবল অর্থাভাবেই মিটাইতে পারেননাই। আফিসের বড়বাবুকে ধরিয়া যদি দিন দশেকের ছুটি মঞ্জুর করানো যায় তো যোগেশ আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। মনিব গৃহেও অন্ততঃ একবারও যাওয়া চাই, না হইলে ছোট-খাটো ভুল চুক ধরা পড়িবে কেন? আলোচনা দরকার, কারণ বিদেশে সমস্ত দায়িত্বই যে একা তাহার। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে এত কাজ কি করিয়া যে সে সম্পন্ন করিবে ভাবিয়া পাইলনা। শনিবারের বিকালটা তো কেবল নতুন-মা ও ব্রজবাবুর জন্যই রাখিতে হইবে, সেদিন হয়ত কিছুই করা যাইবেনা। ইতিমধ্যে মনে করিয়া পোষ্ট-আফিস হইতে কিছু টাকা তুলিতে হইবে, কারণ নিজের সম্বল না লইয়া পথ চলা বিপজ্জনক। কাজের ভিড়ে ও তাগাদায় রাখাল চোখে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কিন্তু একটা কান তাহার অনুক্ষণ দরজায় পড়িয়াই থাকে তারকের কড়া-নাড়া ও কণ্ঠস্বরের প্রতীক্ষায়, কিন্তু তাহার দেখা নাই। এদিকে বৃহস্পতিবার পার হইয়া শুক্রবার আসিয়া পড়িল। দুপুর বেলা পোষ্টাফিসে গেল সে টাকা তুলিতে। কিছু বেশি তুলিতে হইবে। মনে ছিল, যদি তারক বলিয়া বসে তাহার বাহিরে যাইবার মতো জামা কাপড় নাই তা' হইলে কোনমতে এই বাড়তি টাকাটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে হইবে। এতে মুস্কিল আছে। সে না করে ধার, না চায় দান, না লয় উপহার। একটা আশা, রাখালের পীড়াপীড়িতে সে অবশেষে হার মানে। সময় নষ্ট করা চলিবেনা। পোষ্ট-আফিস হইতেই একটা ট্যাক্সি লইতে হইবে। তারক একটু রাগ করিবে বটে,—তা করুক।

কিন্তু টাকা তুলিতে অযথা বিলম্ব ঘটিল। বিরক্ত-মুখে বাহিরে আসিয়া গাড়ী ভাড়া করিতেছে, পাড়ার পিয়ন হাতে একখানা চিঠি দিল,—লেখা তারকের। খুলিয়া দেখিল সে বর্দ্ধমানের কোন্ এক পল্লীগ্রাম হইতে সেই হেড-মাষ্টারির খবর দিয়াছে এবং আসিবার পূর্ব্বে দেখা করিয়া আসিতে পারে নাই বলিয়া দুঃখ জানাইয়াছে

নতুন-মা ও ব্রজবাবুকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে, এবং পত্রের উপসংহারে আশা করিয়াছে অনতিকাল মধ্যেই দিন কয়েকের ছুটি লইয়া না বলিয়া চলিয়া আসার অপরাধের স্বয়ং গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। ইহাও লিখিয়াছে যে রেণুর বিবাহ বন্ধ হওয়ার সংবাদ সে জানিয়াই আসিয়াছে। রাখাল চিঠিটা পকেটে রাখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক্, ট্যাক্সি ভাড়াটা বাঁচ্লো।

পরদিন বিকালে রাখাল নূতন তোরঙ্গে কাপড়-চোপড় গুছাইয়া তুলিতেছিল, ফিরিতে দিন দশেক দেরি হইবে, নতুন-মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাখাল প্রণাম করিয়া চৌকি অগ্রসর করিয়া দিল, তিনি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল রাত্রেই তোমাদের যেতে হবে বুঝি বাবা?

—হাঁ মা, কালই সবাইকে নিয়ে রওনা হতে হবে।

—ফিরতে দিন আষ্টেক দেরি হবে বোধ হয়?

—হাঁ মা, আট-দশদিন লাগবে।

নতুন-মা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'টা বাজ্লো রাজু?

রাখাল দেয়ালের ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল, পাঁচটা বেজে গেছে। আমার ভয় ছিল আপনার আসতেই হয়ত বিলম্ব হবে, কিন্তু আজ কাকাবাবুই দেরি করলেন।

দেরি হোক্ বাবা, তিনি এলে বাঁচি।

রাখাল হাসিয়া বলিল, পাগলের সঙ্গে বিয়েটা যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন ভাবনার তো আর কিছু নেই মা। তিনি না আসতে পারলেও ক্ষতি নেই।

নতুন-মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, কেবল রেণুই তো নয়, তোমার কাকাবাবুও রয়েছেন যে। আমি কেবলই ভাবি ঐ নিরীহ শান্ত মানুষটি না জানি একলা কত লাঞ্ছনা, কত উৎপীড়নই সহ্য করেছেন। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল মনে মনে মামাবাবু হেমন্তকুমারের চাকার মতো মস্ত মুখখানা স্মরণ করিয়া নীরব হইয়া রহিল। এ কাজ যে সহজে হয় নাই তাহা নিশ্চয়।

নতুন-মা বলিতে লাগিলেন, এ বিয়ে স্থগিত রইলো তিনি এইমাত্র লিখেছেন। কিন্তু কিছুদিনের জন্যে না চিরদিনের জন্যে সে তো এখনো জানতে পারা যায়নি রাজু।

রাখাল বলিয়া উঠিল, চিরদিনের জন্যে মা, চিরদিনের জন্যে। ঐ পাগলদের ঘরে আপনার রেণু কখনো পড়বেনা আপনি নিশ্চিন্ত হোন্।

নতুন-মা বলিলেন, ভগবান তাই করুন। কিন্তু ঐ দুর্ব্বল মানুষটির কথা ভেবে মনের মধ্যে কিছুতে স্বস্তি পাচ্চিনে রাজু। দিনরাত কত চিন্তা, কত রকমের ভয়ই যে হয় সে আর আমি বল্বো কাকে?

রাখাল বলিল, কিন্তু ওঁকে কি আপনার খুব দুর্ব্বল লোক বলে মনে হয় মা?

নতুন-মা একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, দুর্ব্বল প্রকৃতির উনি তো চিরদিনই রাজু। তাতে আর সন্দেহ কি!

রাখাল বলিল, দুর্ব্বল লোকে কি এত আঘাত নিঃশব্দে সইতে পারে মা? জীবনে কত ব্যথাই যে কাকাবাবু সহ্য করেছেন সে আপনি জানেননা, কিন্তু আমি জানি। ঐ যে উনি আসচেন।

খোলা জানালার ভিতর দিয়া ব্রজবাবুকে সে দেখিতে পাইয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল, এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলে সে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। নতুন-মা কাছে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রজবাবু চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন, বলিলেন, রেণুর বিয়ে ওখানে দিতে দিইনি শুনেছো নতুন-বৌ?

—হাঁ, শুনেচি। বোধহয় খুব গোলমাল হলো?

—সে তো হবেই নতুন-বৌ।

—তুমি নির্ব্বিরোধী শান্ত মানুষ, আমার বড় ভাবনা ছিল কি কোরে তুমি এ বিয়ে বন্ধ করবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, শান্তিই আমি ভালোবাসি, বিরোধ করতে কিছুতে মন চায়না এ কথা সত্যি। কিন্তু তোমার মেয়ে অথচ, তোমারই বাধা দেবার হাত নেই। কাজেই সব ভার এসে পড়লো আমার ওপর, একাকা আমাকেই তা বইতে হলো। সেদিন আমার বারবার কি কথা মনে হচ্ছিল জানো নতুন-বৌ, মনে হচ্ছিল আজ তুমি যদি বাড়ী থাকতে সমস্ত বোঝা তোমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে আমি গড়ের মাঠের একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিতাম। তাদের উদ্দেশে মনে মনে বল্লাম, আজ সে থাক্লে তোমরা বুঝ্তে জুলুম করার সীমা আছে,—সকলের ওপরেই সব কিছু চালানো যায়না।

সবিতা অধোমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। সেদিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার সাহস তাঁহার হইলনা। রাখালও তেমনি নির্ব্বাক স্তব্ধ হইয়া রহিল। ব্রজবাবু নিজে হইতেই ইহার অধিক ভাঙিয়া বলিলেননা।

মিনিট দুই তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পরে রাখাল বলিল, কাকাবাবু, আজ বড় আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্চে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তার হেতুও যথেষ্ট আছে রাজু। এই ছ'-সাত দিন কারবারের কাগজ-পত্র নিয়ে ভারি খাট্‌তে হয়েছে।

রাখাল সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল সব ভালো ত কাকাবাবু?

ব্রজবাবু বলিলেন, ভালো একেবারেই নয়। সবিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার সেই টাকাটা আমি বছর খানেক আগে তুলে নিয়ে ব্যাঙ্ক রেখেছিলাম, ভেবে-ছিলাম আমার নিজের কারবারের চেয়ে বরঞ্চ এদের হাতেই ভয়ের সম্ভাবনা কম। এখন দেখ্‌চি ঠিকই ভেবেছিলাম। এখন এর ওপরেই ভরসা নতুন-বৌ, এটা না নিলেই এখন নয়।

সবিতা এবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, নিলে কি নষ্ট হবার ভয় আছে?

—আছে বই কি নতুন-বৌ,—বলা তো যায়না।

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু কহিলেন, কি বলো নতুন-বৌ, চুপ করে রইলে যে?

সবিতা মিনিট দুই নিরুত্তরে থাকিয়া বলিলেন, আমি আর কি বলবো মেজকর্ত্তা। টাকা তুমিই দিয়েছিলে, তোমার কাজেই যদি যায় তো যাবে। কিন্তু আমারো ত আর কিছু নেই।

শুনিয়া ব্রজবাবু যেন চমকাইয়া গেলেন। খানিক পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, ঠিক কথা নতুন-বউ, এ দুঃসাহস করা আমার চলেনা। তোমার টাকা আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দেবো। কাল একবার আসবে?

—যদি আসতে বলো আস্‌বো।

—আর তোমার গয়নাগুলো?

—তুমি কি রাগ করে বলচো মেজকর্ত্তা?

ব্রজবাবু সহসা উত্তর দিতে পারিলেননা। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বেদনায় মলিন হইয়া উঠিল, তারপরে বলিলেন, নতুন-বউ, যার জিনিষ তাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্চি আমি রাগ করে,—এমন কথা আজ তুমিও ভাব্‌তে পারলে?

সবিতা নতমুখে নীরব হইয়া রহিলেন। ব্রজবাবু বলিলেন, আমি একটুও রাগ করিনি নতুন-বউ, সরল মনেই ফিরিয়ে দিতে চাইচি। তোমার জিনিষ তোমার কাছেই থাক্, ও ভার বয়ে বেড়াবার আর আমার সামর্থ্য নেই।

সবিতা এখনও তেমনি নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন,—কোন জবাবই দিতে পারিলেননা।

সন্ধ্যা হয়, ব্রজবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আজ তা'হলে যাই। কাল এমনি সময়ে একবার এসো—আমার অনুরোধ উপেক্ষা কোরোনা নতুন-বউ।

রাখাল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, একটি বন্ধুর বিয়ে দিতে কাল রাতের গাড়ীতে আমি দিল্লী যাচ্চি কাকাবাবু, ফিরতে বোধ করি আট দশ দিন দেরি হবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তা হোক্, কিন্তু বিয়ে কি কেবল দিয়েই বেড়াবে রাজু, নিজে করবেনা?

রাখাল সহাস্যে কহিল, আমাকে মেয়ে দেবে এমন দুর্ভাগা সংসারে কে আছে কাকাবাবু?

শুনিয়া ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, আছে রাজু। যারা আমাকে মেয়ে দিয়েছিল সংসারে তারা আজও লোপ পায়নি। তোমাকে মেয়ে দেবার দুর্ভাগ্য তাদের চেয়ে বেশি নয়। বিশ্বাস না হয় তোমার নতুন-মাকে বরঞ্চ আড়ালে জিজ্ঞেসা কোরো, তিনি সায় দেবেন। চল্‌লাম নতুন-বৌ, কাল আবার দেখা হবে।

সবিতা কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলেন, তিনি অস্ফুটে বোধ হয় আশীর্ব্বাদ করিতে করিতেই বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন ঠিক এম্‌নি সময়ে ব্রজবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে তাঁহার শিল-মোহর করা একটা টিনের বাক্স। সবিতা পূর্ব্বাহ্নেই আসিয়াছিলেন, বাক্সটা তাঁহার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, এটা এতদিন ব্যাঙ্কেই জমা ছিল, এর ভেতর তোমার সমস্ত গহনাই মজুত আছে দেখ্‌তে পাবে। আর এই নাও তোমার বায়ান্ন হাজার টাকার চেক্। আজ আমি খালাস পেলাম নতুন-বৌ, আমার বোঝা বয়ে বেড়াবার পালা সাঙ্গ হলো।

কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এ সব গয়না তোমার রেণু পরবে ?

ব্রজবাবু কহিলেন, গয়না তো আমার নয় নতুন-বৌ, তোমার। যদি সেদিন কখনো আসে তাকে তুমিই দিও।

রাখাল বারে বারে ঘড়ির প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিল, ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার বোধ করি সময় হয়ে এলো রাজু ?

রাখাল সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, ও-বাড়ী হয়ে সকলকে নিয়ে ষ্টেসানে যেতে হবে কিনা—

—তবে আমি উঠি। কিন্তু ফিরে এসে একবার দেখা কোরো রাজু। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় কহিলেন, কিন্তু আজ তো তোমার নতুন-মার একলা যাওয়া উচিত নয়। কেউ পৌঁছে না দিলে—

রাখাল বলিল, একলা নয় কাকাবাবু। নতুন-মার দরওয়ান, নিজের মোটর সমস্ত মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে।

—ওঃ—আছে ? বেশ, বেশ। নতুন-বৌ, যাই তা' হলে ?

সবিতা কাছে আসিয়া কালকের মতো প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইলেন, আস্তে আস্তে বলিলেন, আবার কবে দেখা পাবো মেজকর্ত্তা ?

—যেদিন বলে পাঠাবে আসবো। কোন কাজ আছে কি নতুন-বৌ ?

—না, কাজ কিছু নেই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, শুধু এম্‌নিই দেখ্‌তে চাও ?

এ প্রশ্নের জবাব কি! সবিতা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি বলি এ সবের প্রয়োজন নেই নতুন বৌ। আমার জন্যে মনের মধ্যে আর তুমি অনুশোচনা রেখোনা, যা' কপালে লেখা ছিল ঘটেছে,—গোবিন্দ মীমাংসাও তার এক রকম করে দিয়েছেন,—আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখী হও, আমাকে অবিশ্বাস কোরোনা নতুন-বৌ. আমি সত্যি কথাই বল্‌চি।

সবিতা তেমনিই অধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাখালের মনে পড়িল আর বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। অবিলম্বে গাড়ী ডাকিয়া তোরঙ্গটা বোঝাই দিতে হইবে। এবং এই কথাটাই বলিতে বলিতে সে ব্যস্ত-সমস্তে বাহির হইয়া গেল।

সবিতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তাঁহার দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল। ব্রজবাবু একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তোমার রেণুকে একবার দেখ্‌তে চাও কি নতুন-বৌ ?

—না মেজকর্ত্তা, সে প্রার্থনা আমি করিনে।

—তবে কাঁদচো কেন ? কি আমার কাছে তুমি চাও ?

—যা চাইবো দেবে বলো ?

ব্রজবাবু উত্তর দিতে পারিলেননা, শুধু তাহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সবিতা কহিলেন, কতকাল বাঁচবো মেজকর্ত্তা, আমি কি নিয়ে থাক্‌বো ?

ব্রজবাবু এ জিজ্ঞাসারও উত্তর দিতে পারিলেননা, ভাবিতে লাগিলেন। এমনি সময়ে বাহিরে রাখালের শব্দ সাড়া পাওয়া গেল। সবিতা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল। কহিল, নতুন-মা, আপনার ড্রাইভার জিজ্ঞেসা করছিল আর দেরি কতো ? চলুননা ভারি বাক্সটা আপনার গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি ?

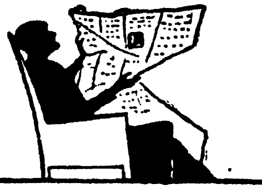
নতুন-মা বলিলেন, রাজু আমাকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে, আমি ওর আপদ-বালাই।

রাখাল হাত জোড় করিয়া জবাব দিল,—মায়ের মুখে ও-নালিশ অচল নতুন-মা। এই রইলো আপনার রাজুর দিল্লী যাওয়া,—ছেলেবেলার মতো আর একবার আজ মার কোলেই আশ্রয় নিলাম। এখান থেকে, আর যেতে দিচ্চেন না,—যত কষ্টই ছেলের ঘরে হোক্‌।

সবিতা লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন। রাখাল বলিয়া ফেলিয়াই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ভাল-মানুষ ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্যও করিলেননা। বরঞ্চ বলিলেন, বেলা গেছে নতুন-বউ, বাক্সটা তোমার গাড়ীতে রাজু তুলে দিয়ে আসুক, আমি ততক্ষণ ওর ঘর আগলাই। এই বলিয়া নিজেই বাক্সটা তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন।

প্রশ্নের উত্তর চাপা পড়িয়া রহিল, রাখালের পিছনে পিছনে নতুন-মা নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)



সাময়িকী

অস্পৃশ্যতা-প্রসঙ্গ—

আগামী ভারত-শাসন-ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ হইবে—নির্ব্বাচনাধিকার। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান, ভারতবাসী-ইয়োরোপীয়, উন্নত-অনুন্নত সম্প্রদায়—কোন্ দল, কোন্ পক্ষ, কোন্ সম্প্রদায় কতখানি নির্ব্বাচনাধিকার পাইবেন, ইহা লইয়া ভারতে ও বিলাতে যে মহা সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, গোলটেবিল বৈঠকে তাহার সমাধান সম্ভবপর না হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী মহাশয় স্বয়ং এই সমস্যার সমাধানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা অধিকাংশ ভারতবাসীর মনোনীত না হওয়ায় আর একটা নূতন সমস্যার—অর্থাৎ একটা পুরাতন সমস্যার নূতন সংস্করণের আবির্ভাব হইয়াছে। সেটি সেই সনাতন অস্পৃশ্যতা-সমস্যা। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় অনুন্নত সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী ইহাতে আপত্তি করিয়া এই প্রস্তাব রহিত করাইবার জন্য প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে সমগ্র বিশ্ব-জগতে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়াছেন। ইহাতে আপাততঃ নির্ব্বাচনাধিকার সমস্যার একটা চলনসই গোছের সমাধানের সম্ভাবনা হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল সমস্যা এখনও অমীমাংসিতই রহিয়াছে। মহাত্মাজী বলিয়াছেন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার দিবার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিলে চলিবে না—অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে হইবে। আগামী ছয় মাসের মধ্যে কার্য্যতঃ কতকটা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সাধিত না হইলে তিনি পুনরায় প্রায়োপবেশন করিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজনীতিক্ষেত্রে একটা সাময়িক চুক্তি হইয়া থাকিলেও হিন্দুর ধর্ম্মগত ও সামাজিক একটা বড় সমস্যার সমাধান হিন্দু সমাজকে অচিরেই করিয়া ফেলিতে হইবে। নচেৎ দেশের স্থায়ী মঙ্গল ও শান্তির আশা সুদূর-পরাহত।

জনসাধারণের সাড়া—

সুখের বিষয় ভারতের সমগ্র জনসমাজ মহাত্মা গান্ধীজীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী কি চাহেন? অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন বলিতে কি বুঝেন? এ সম্বন্ধে অনেকের মনে নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল অংশ বিবেচনা করেন যে মহাত্মাজী সব একাকার করিয়া ফেলিতে চাহেন—হিন্দুসমাজের বনীয়াদ ভাঙ্গিয়া দিয়া হিন্দুসমাজকে ধ্বংস করিতে চাহেন। মহাত্মাজীর প্রতি অনুরাগবশতঃ যাঁহারা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া সনাতন হিন্দুদিগের মনে ঐরূপ ধারণা জন্মানো অসঙ্গত নহে। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন বলিতে অনেকে সকল জাতীয় হিন্দুর একত্র আহার বিহার বুঝিয়া থাকেন। অনেকে আবার অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন বলিতে আন্তর্গণিক বিবাহ বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ মহাত্মা গান্ধীজী সে রকম কিছুই বলেন না। তিনি বলেন, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা যে সকল অধিকার ভোগ করেন, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে তাঁহারা যে সকল অধিকারে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, সেই সকল অধিকার নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুদিগকে দিতে হইবে। এক কথায়, নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে মানুষের অধিকার দিতে হইবে। এই অধিকার কে দিবে? বাহ্যতঃ অবশ্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের হাতে এই অধিকার আছে, তাঁহারাই কেবল এই অধিকার দিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষই কেবল মানুষকে এই অধিকার দিতে পারে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যখন এই অধিকার নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগকে দিতেছেন না, অথবা দিতে পারিতেছেন না, তখন বুঝিতে হইবে তাঁহাদের মনুষ্যত্ব কতকটা খর্ব্ব হইয়াছে। অতএব স্বয়ং তাঁহাদিগকে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে হইবে। এই মানবতা অর্জ্জন সাধনাসাপেক্ষ। মানবতার এই সাধনা অতিবড় কঠোর সাধনা। সাধনার দ্বারা মনকে উদার উন্নত করিতে হইবে, সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী ভারতবাসী উচ্চবর্ণের হিন্দুগণকে এই কঠিন সাধনা করিবার

জন্য আহ্বান করিতেছেন। এই সাধনার পথে অগ্রসর হইবার জন্য মহাত্মাজী কতকগুলি কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের কর্ম্মপন্থা—

কতকগুলি নিম্ন জাতির স্পৃষ্ট জল উচ্চবর্ণের লোকেরা ব্যবহার করেন না। ইহাদিগকে জল আচরণীয় করিয়া লইতে হইবে—অর্থাৎ ইহাদের দেওয়া জল রন্ধন ও পানার্থ ব্যবহার করিতে হইবে। ধোবা ও নাপিত অনেক জাতির কাজ করে না। এই সকল জাতিকে ধোবা ও নাপিতের সুযোগ দিতে হইবে। ব্রাহ্মণের আহারের স্থলে উচ্চ বর্ণের হিন্দুর যতটুকু যাইবার ও কাজ করিবার অধিকার আছে, নিম্নবর্ণকেও সেই অধিকার দেওয়া চাই। জল-আচরণীয় জাতিরা দেবমন্দিরে যতটা দূর যাইতে পায়, অস্পৃশ্যরাও ততটা দূর যাইতে পারিবে। এই সকল অধিকার এবং ইহাদের অনুরূপ আর যে সকল অধিকারে অস্পৃশ্যরা বঞ্চিত আছেন, সেই সকল অধিকার তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া একটা সামাজিক সমন্বয় করিয়া লইতে হইবে। অস্পৃশ্যদিগকে কোন অধিকারে বঞ্চিত রাখিবার বিধিব্যবস্থা কোন শাস্ত্রে নাই। ইহা লোকাচার মাত্র। লোকাচারের এই প্রভাব খর্ব্ব করিতে হইবে, এবং লোকশিক্ষার দ্বারা এই কার্য্য সাধন করিতে হইবে। যাঁহারা অস্পৃশ্য বলিয়া পরিচিত মহাত্মাজী তাঁহাদিগের জন্য এইরূপ কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, তাঁহারা উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগকে তাঁহাদিগের ন্যায়সঙ্গত দাবী জানাইবেন। উচ্চবর্ণীয়েরা তাঁহাদের দাবী পূরণ করেন, ভালই। যদি না করেন তবে নিম্নবর্ণীয়েরা অহিংসভাবে সত্যাগ্রহ করিবেন।

মহাত্মাজীর মতামত—

অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন বলিতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে মহাত্মাজী তাঁহার নিজের মত বেশ সুস্পষ্ট ভাষায় পরিষ্কার ভাবে তাঁহার Young India (তরুণ ভারত) পত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। "ইয়ং ইণ্ডিয়া" হইতে মহাত্মাজীর উক্তি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"This question of inter-dining is a vexed one and in my opinion no hard and fast rules can be laid down. Personally, I am not sure that inter-dining is a nec-ssary reform. At the same time I recognise the tendency towards breaking down the restriction altogether. I can find reason for and against the restriction. I would not force the pace. I do not regard it as a sin for a person not to dine with another nor do I regard it as sinful if one advocates and practises inter-dining. I should, however, resist the attempt to break down the restrictoin in disregard of the feelings of others. On the contrary I would respect their scruples in the matter."—(Young India (1924-26) Page 1317).

ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—"আন্তর্জাতিক ভোজ সংক্রান্ত প্রশ্নটা অত্যন্ত জটিল। আমার মতে এ বিষয়ে কোন কড়া নিয়ম করা যাইতে পারে না। ব্যক্তিগত ভাবে আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না সমাজ সংস্কারের পক্ষে আন্তর্জাতিক ভোজ অপরিহার্য্য কি না। এই সঙ্গে আমি ইহাও বুঝিতেছি যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে যে বিধি নিষেধ আছে অনেকেই তাহা সম্পূর্ণরূপে উন্মুলিত করিতে ইচ্ছুক। আমি দেখিতেছি এই বাধা নিষেধের সপক্ষে ও বিপক্ষে তুল্য যুক্তি আছে। এরূপ ভাবে খাওয়া-দাওয়া করিতে বাধ্য করিতে আমি চাহি না। কেহ যদি অপর কোন একজনের সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিতে না চায়, তাহা আমি পাপ বিবেচনা করি না; আবার, কেহ যদি এরূপ ভাবে খাওয়া-দাওয়া পছন্দ করে এবং খাওয়া-দাওয়া করে, তাহাও আমি পাপকার্য্য বলি না। তবে অপরের মনে আঘাত দিয়া বিধি নিষেধ ভাঙ্গিবার চেষ্টারও আমি অনুমোদন করি না। আমার মত বরং তাহার বিপরীত—যাহারা এরূপ খাওয়া পছন্দ করে না, আমি তাহাদের আপত্তির সমর্থন করি।"

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, দেশের কাজ করিবার অতি আগ্রহের ফলে অনেকেই ন্যায্য গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অসঙ্গত ভাবে অগ্রসর হইয়া যান। সেটা অনুচিত। চিরাচরিত প্রথা ও রীতিনীতির সংশোধন করিতে হইলে বিশেষ বিচার বিবেচনা করিয়া ধীরভাবে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সঙ্কোচ—

ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট যে ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই কমিটি তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল ও সিদ্ধান্ত সরকারকে জানাইয়াছেন। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইলে বিচার ও শাসন ব্যবস্থার প্রভূত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে বলিয়া প্রকাশ। নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে সরকারের বার্ষিক কিঞ্চিদধিক পৌনে দুই কোটী টাকা খরচ বাঁচিবে। ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি মন্ত্রী ও শাসন-পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ৭ হইতে কমাইয়া ৫ করিতে বলিয়াছেন। আর শাসন বিভাগের ১৩২টি ও বিচার বিভাগের ৭৫টি চাকুরী বাতিল করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। পুলিশ বিভাগের দুইটি রেঞ্জের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের পদ রহিত হইবে। রেলওয়ে ও জলপুলিশ তুলিয়া দিয়া তাহাদের কার্য্যভার সাধারণ পুলিশের উপর অর্পণ করা হইবে। শিক্ষা বিভাগের কতকগুলি প্রোফেসরের সংখ্যা হ্রাস করা হইবে; এবং যাঁহারা থাকিবেন তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া কার্য্য পরিচালন করিতে হইবে। স্কুল ইনস্পেক্টরদিগের সমস্ত পদ তুলিয়া দেওয়া হইবে; সাবইনস্পেক্টরদের মধ্যে মাত্র ৯২টি পদ রাখা হইবে। কতকগুলি সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিবেন, এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ে কেবল কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন। মফস্বলের সরকারী হাসপাতাল সমূহের কার্য্য সাব-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনদের দ্বারা চালানো হইবে। পূর্ত্ত বিভাগে সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারদের পদ আর থাকিবে না। আরও কোন কোন বিভাগের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

সরকারের এই ব্যয়-সঙ্কোচ প্রচেষ্টার সমর্থনই করিতে হয়; কারণ, সরকারের দৃষ্টান্ত জনসাধারণের পক্ষে পরম উপাদেয় হইতে পারে—তাহারাও আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে। ব্যয় সঙ্কোচ প্রচেষ্টার ফলে যে সকল সরকারী চাকুরী উঠিয়া যাইবে, তাহাতে efficient serviceএর যদি বিশেষ কোন ক্ষতি না হয় তাহা হইলে দেশবাসী ব্যয় সঙ্কোচ প্রচেষ্টার সমর্থন করিবেই। কিন্তু যাহাদের চাকুরী যাইবে তাহাদের উপায় কি হইবে? তাহারা কি বেকারদিগের দল বৃদ্ধি করিয়া দেশব্যাপী অসন্তোষের মাত্রা বাড়াইবে? অথবা যাহাতে তাহাদিগকে অনাহারে না মরিতে হয় এমন ভাবে যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইবে?

তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক—

তৃতীয় গোল টেবিলের উদ্যোগ আয়োজন প্রায় শেষ হইয়া আসিল। নিমন্ত্রিত সদস্যগণের ভারতীয় তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে—অনেকে যাত্রাও করিয়াছেন—তাঁহারা সম্ভবতঃ এখন জাহাজে। গোল টেবিলের তৃতীয় বৈঠকে আড়ম্বর বা সমারোহ কিছুই হইবে না। ইহা নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার হইবে। এই বৈঠকের আলোচনা প্রকাশ্য ভাবে হইবেনা—হইবে যবনিকার অন্তরালে। বৈঠকে যাহা সিদ্ধান্ত হইবে—ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের যে পাকা রকম ব্যবস্থা হইবে, সেইটুকু কেবল জনসাধারণ জানিতে পারিবেন। তৃতীয় বৈঠকের আয়তন খুবই সঙ্কুচিত হইয়াছে। এবারকার বৈঠকের সদস্য সংখ্যা হইবে মোট চল্লিশ। তন্মধ্যে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি থাকিবেন এগারজন, বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধি-সংখ্যা হইবে আঠারো। আর বিলাতের পার্লামেণ্টের এগারজন প্রতিনিধি বৈঠকে যোগ দিবেন। ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করিবেন হিজ হাইনেস আগা খান, মিঃ এ, এইচ, গজনবি, স্যার মহম্মদ ইকবাল, ডাক্তার সাফাৎ আমেদ খান ও চৌধুরী জাফর উল্লা খাঁ। জাতীয় মসলেম দলের একজনও প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত হন নাই। মিঃ জিন্না বিলাতে আছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি বৈঠকেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এবার তিনি নিমন্ত্রণ না পাওয়ায় অনেকে বিস্মিত হইয়াছেন। মৌলানা সৌকত আলি দ্বিতীয় বৈঠকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন—এবার তাঁহার নিমন্ত্রণ না পাওয়া অনেকের বিস্ময়োদ্রেক করিয়াছে।

মডারেট বা লিবারেল দলের প্রতিনিধি মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বাদ পড়িয়াছেন। রুটার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে মিঃ শাস্ত্রীর শরীর অসুস্থ বলিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। এ দিকে শুনা যাইতেছে যে, মিঃ শাস্ত্রী নিমন্ত্রিত হইবেন আশা করিয়া, পাছে যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে এই আশঙ্কায় অন্য সকল নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া গোলটেবিলের নিমন্ত্রণ পাইবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকের অতিথি মিঃ চিন্তামণিও বাদ পড়িয়া গেলেন।

এবার বাঙ্গালা দেশ হইতে মাত্র একজন প্রতিনিধি

নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি মিঃ এ, এইচ, গজনবি, এবং মসলেম স্বার্থের প্রতিনিধি। বাঙ্গলায় হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে একজনও প্রতিনিধিকে নির্ব্বাচিত হইতে না দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। এমন কি বাঙ্গলার লাট সাহেব পর্য্যন্ত বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই। কারণ পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল যে, লেপ্টেন্যাণ্ট বিজয়প্রসাদ সিংহ বাঙ্গলার হিন্দুদের পক্ষ হইতে তৃতীয় গোল টেবিলে যাইবেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে কে অস্থায়ীভাবে মন্ত্রীত্ব করিবেন তাহাও স্থির হইয়াছিল। কিন্তু গোল বাধাইলেন বিজয়প্রসাদের মাতামহী। তিনি জাতিনাশের ভয়ে দৌহিত্রকে কিছুতেই কালাপানির পারে যাইবার অনুমতি দিলেন না। সেইজন্ত বিজয়প্রসাদ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার মাতামহীও গত ২৩এ অক্টোবর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; কিন্তু দৌহিত্রকে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিজয়প্রসাদের স্থলে তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে বাঙ্গলার হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করিবেন বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়। অতএব উদ্বেগ, আশঙ্কা, বিস্ময়ের কারণ নাই।

প্রফুল্ল-জয়ন্তী—

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের জয়ন্তী উৎসবের দিন প্রায় ঘনাইয়া আসিল। আগামী বড়দিনের অবকাশে হয় টাউন হলে, নচেৎ অন্ত কোন উপযুক্ত স্থলে —সম্ভবতঃ সায়েন্স কলেজে—উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। রায় মহাশয় সাত্ত্বিক প্রকৃতির সন্ন্যাসী—তাঁহার জয়ন্তী উৎসবও তদ্রূপ অনাড়ম্বর ভাবেই সম্পন্ন হইবে—প্রাকৃতজনোচিত নাচ-তামাসা-গীত-বাদ্যের স্থান এই উৎসবে থাকিবে না। আচার্য্যদেবের জয়ন্তী-উৎসব-অনুষ্ঠানের একটা প্রধান অঙ্গ—দুঃস্থ ছাত্রগণের জন্ত একটা স্থায়ী সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপন। আচার্য্যদেব স্বয়ং চিরদিন দরিদ্র ছাত্র-সমাজকে অর্থে সামর্থ্যে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। এ দেশের ছাত্র-সমাজের দারিদ্র্য প্রবাদ-বাক্যে পরিণত—সেই অনাদি-অনন্ত কাল হইতে দারিদ্র্যের জন্ত এ দেশের ছাত্র-সমাজ প্রসিদ্ধ। অথচ, দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিয়াই পর জীবনে অসংখ্য ছাত্র বিশ্বজয়ী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন—বাঙ্গলার অধিকাংশ প্রতিভাবান মনস্বী ব্যক্তি ছাত্রজীবনে অতি দরিদ্র ছিলেন। বাঙ্গলার দরিদ্র ছাত্র-সমাজ যে আচার্য্যদেবের অতি প্রিয়পাত্র—তাঁহারই জয়ন্তী-উৎসবে ছাত্রভাণ্ডার স্থাপন অতীব সমীচীন কার্য্য হইবে, সন্দেহ নাই। শুনা যাইতেছে, সদস্যগণ প্রদত্ত সমস্ত টাকা এই ভাণ্ডারে যাইবে; এবং মূল উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন আচার্য্যদেবের কয়েকজন বন্ধু। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এই উৎসব অনুষ্ঠানের যাঁহারা সদস্য হইয়াছেন, হইতেছেন এবং হইবেন, তাঁহারা পরোক্ষভাবে দেশের একটি মহৎ অনুষ্ঠানকে সফল করিয়া তুলিতেছেন। এবং ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, প্রফুল্ল-জয়ন্তী উৎসবের সদস্য-সংখ্যা যতই অধিক হইবে, ছাত্র-সাহায্য-ভাণ্ডারটিও ততই পুষ্টিলাভ করিবে, এবং ততই অধিক সংখ্যক ছাত্র এই ভাণ্ডারের সাহায্য লাভ করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারিবে।

ভারতীয় বাণিজ্যক্ষেত্রে জাপান—

জাপানী সুদৃশ্য, সুচিক্কণ, সূক্ষ্ম অথচ সস্তাদরের বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া বোম্বাই অঞ্চলের ভারতীয় বস্ত্রের কলওয়ালারা তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করায় জাপানী বস্ত্রের উপর মোটা হারে আমদানী শুল্ক স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জাপান কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে—কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে তাহা লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিয়াছিল। তখন কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, আমদানী শুল্কের প্রতিশোধ স্বরূপ জাপান ভারতীয় তূলা ক্রয় করা বন্ধ করিবে, এবং আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, মিশর, রাশিয়া অথবা অন্ত যে-কোন দেশ হইতে তাহার প্রয়োজনীয় তূলা ক্রয় করিবে। ইহা ব্যতীত, আরও অনেকে অনেক রকম অনুমান করিয়াছিলেন। এক্ষণে জাপানের অভিপ্রায় সম্বন্ধে আর এক প্রকার কথা শুনা যাইতেছে। একখানি এ্যাঙ্গলোইণ্ডিয়ান সহযোগীর সিমলাস্থিত সংবাদদাতার নিকট কয়েক দিন পূর্ব্বে জাপানের বাণিজ্যদূত না কি প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত অনুমানগুলির কোনটিই জাপানের অভিপ্রেত নহে। জাপান যাহা করিবে তাহা এই—চীন, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি দেশে জাপান যেরূপ কাপড়ের কল স্থাপন

করিয়াছে, বঙ্গদেশে সেইরূপ কাপড়ের কল বসাইয়া সস্তায় কাপড় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া আমদানী শুল্ক ফাঁকি দিবে এবং বোম্বায়ের কাপড়ের কলওয়ালাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। বাঙ্গালায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত জাপান স্বদেশ হইতে মূলধন আমদানী করিবে না,—ভারতীয় ধনীর সহিত বখরায় তাহারা কাপড়ের কল চালাইবে। জাপান হইতে কেবল তাঁত ও কাপড়ের কলের সরঞ্জাম এবং কল চালাইবার লোকজন আসিবে। জাপানী বাণিজ্য দূত মহাশয় বঙ্গবাসীকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, জাপানী কলওয়ালারা বাঙ্গলার কলগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিবে না—তাহাদের বোঝাপড়া বোম্বায়ের কাপড়ের কলওয়ালাদের সঙ্গে। এই আশ্বাসের কোন মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, বাঙ্গলায় যে কয়েকটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহারা বোম্বায়ের কলওয়ালাদের সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। কারণ, বাঙ্গলার কাপড়ের অপেক্ষা বোম্বায়ের কাপড় সরেস অথচ মূল্য কম। সেই বোম্বাইকে যে জাপানীরা হারাইয়া দিবে, সেই জাপানীদের সঙ্গে বাঙ্গলার কল পারিয়া উঠিবে কেমন করিয়া? তাহার পর, জাপানীরা যদি এ দেশে আসিয়া কাপড়ের কল বসায় তাহাতে বাধা দিবার কোন উপায় নাই। যে কোন দেশের লোক এ দেশে আসিয়া কল বসাইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারে—তাহার প্রতিষেধক কোন ব্যবস্থাই এ দেশের আইন-কানুনে নাই। তাহার সাক্ষী—এ দেশের অধিকাংশ কল-কারখানাই বিদেশীদের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত। পাটের কলগুলির প্রায় সবই বিদেশী! কাগজের কলও প্রায় সবই বিদেশীর বলিলেই হয়। আমদানী দেশালাইয়ের উপর শুল্ক বসিল, অমনি সুইডিস কোম্পানীরা এ দেশে কল বসাইয়া দেশালাই তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল। বিদেশী বণিকরা এ দেশে কাপড়ের কলও অনেক বসাইয়াছে। সুতরাং জাপানীদেরই বা ঠেকাইবে কে? কাজেই অসহায় আমরা নিতান্তই নিরুপায়। তবে একটা কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। চীন-মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীরা যে কাপড়ের কল বসাইয়াছে তাহা লইয়া চীনাদের সঙ্গে জাপানীদের প্রায়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, এমন কি যুদ্ধবিগ্রহ হয় বলিয়া সংবাদপত্রে পাঠ করা যায়। এ দেশে জাপানীদের কাপড়ের কল কিম্বা অন্ত কোনরূপ কলকারখানা স্থাপিত হইলে জাপানীদের সঙ্গে এ দেশবাসীর দাঙ্গাহাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা আছে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক; অর্থাৎ চীন-মাঞ্চুরিয়ায় চীনাদের সঙ্গে জাপানীদের হাঙ্গামার প্রকৃত কারণ জানা দরকার। এ দেশেও যদি সেইরূপ হাঙ্গামার আশঙ্কা থাকে তবে এ দেশে জাপানীদের দ্বারা কলকারখানা প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ করিতে দেশের প্রত্যেক লোকই বাধ্য।

মহাত্মাজীর মুক্তি-প্রার্থনা—

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক অশান্তি চলিতেছে এবং তাহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা বিবেচনা করিয়া, এই অশান্তির যাহাতে অবসান হয় এবং বাণিজ্যের ক্ষতি নিবারিত হয় ইহা সকলেরই ইচ্ছা। কিন্তু কি করিলে এই অশান্তির অবসান ঘটে, সে সম্বন্ধে কেহ কোন নিশ্চিত উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না, ইহাই যা দুঃখের কথা। রাজনৈতিক অশান্তি দূর করিবার জন্ত, শিল্প-বাণিজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্ত অনেকেই অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিতেছেন। চিন্তাশীল, দূরদর্শী, বিচক্ষণ রাজনৈতিক ও বাণিজ্য-নীতিবিদ্ ব্যক্তিরা (বিলাতে ও ভারতে উভয়ত্রই) বিবেচনা করিতেছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় শান্তি-প্রিয় ব্যক্তিকে যতদিন কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে, এবং অর্ডিন্যান্সগুলি বলবৎ রাখিয়া অথবা আইনে রূপান্তরিত করিয়া যতদিন লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিয়া রাখা হইবে, ততদিন শান্তির আশা নাই। বিলাতের বহু রাজনৈতিক এই কারণে মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি প্রদান এবং অর্ডিন্যান্সগুলির প্রত্যাহার করিবার জন্ত ভারত-সচিব তথা বিলাতী গবর্ণমেণ্ট এবং ভারত-গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিতেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় এসোসিয়েসনের বোম্বাই শাখা তাঁহাদের একটি অধিবেশনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অশান্তি দমনের জন্ত আইন ও অর্ডিন্যান্স বজায় রাখিয়া কঠোরতর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হউক। ইয়োরোপীয় এসোসিয়েসনের এইরূপ সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ইয়োরোপীয় মাত্রেরই মত এইরূপ নহে। অনেক ইয়োরোপীয়ই কঠোর শাসন ব্যবস্থাকে অশান্তি দমনের

একমাত্র পন্থা বিবেচনা করেন না। সম্প্রতি বোম্বায়ের তূলার বাজারে বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল—বাজার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পরে বোম্বায়ের ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় তূলা ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়। এই সম্পর্কে কতিপয় প্রধান ইয়োরোপীয় তূলা-ব্যবসায়ী কোম্পানী একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাহাতে তাঁহারা ভারতবাসীদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন, এবং এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, রাজনৈতিক শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং বর্ত্তমান আন্দোলনের দ্রুত মীমাংসার জন্য তাঁহারা বিশেষ আগ্রহান্বিত রহিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, অর্ডিন্যান্স এবং আইন লঙ্ঘন আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি প্রদান করিলে দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সরল হইবে। এই বিবৃতি-পত্রে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বড় বড় ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী কোম্পানী আছেন, যথা,—মেসার্স পি, ক্রিষ্টাল এণ্ড কোং, সিল এণ্ড কোং, ল্যাজলী এণ্ড কোং, রেলী ব্রাদার্স, রোডোকোনাচি এণ্ড কোং, ই, স্পিলার এণ্ড কোং, দি বোম্বে কোং লিঃ, ভোলকার্ট ব্রাদার্স।

এই বিবৃতি প্রদান ও মীমাংসার পর বাজারের অবস্থার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, অবাধ বাণিজ্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। কেবল তূলা ও বস্ত্রের বাজার নহে—বোম্বায়ের শস্যের বাজারেও অত্যন্ত গোলযোগ ঘটিয়াছিল, বাজার বন্ধ হইয়াছিল। তূলা-ব্যবসায়ীদিগের প্রদর্শিত পন্থায় বোম্বায়ের ইয়োরোপীয় শস্য ব্যবসায়ীরাও কংগ্রেসের কর্ম্মীদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মে চুক্তি করিয়া শস্যের বাজারে অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারাও মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি কামনা করিয়া বিবৃতি দিয়াছেন। বর্ত্তমান অশান্তি যখন তাঁহাদের স্বার্থের প্রতিকূল এবং আর্থিক ক্ষতির কারণ, তখন এই সকল ইয়োরোপীয় বণিক কোম্পানীর বিবৃতির আন্তরিকতায় সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না।

এলাহাবাদের মিলন-বৈঠক—

মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশনের আর একটা পরোক্ষ ফল—এলাহাবাদের মিলন-বৈঠক। অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন বিষয়ে যারবেদার কারাগারে মহাত্মাজীর সহিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের যখন পরামর্শের সুযোগ দেওয়া হয়, তখনই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কল্পে সেইখানেই মিলন-বৈঠকের সূচনা হয়। অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর প্রধান মন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সংবাদ সরকারী ভাবে মহাত্মাজীর নিকট প্রেরিত হইলে মহাত্মাজী উপবাস ভঙ্গ করিয়া পারণ করেন। তৎপরেই গবর্ণমেণ্ট মহাত্মাজীর সহিত নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার বন্ধ করিয়া দেন। তাহার পরিণামে এলাহাবাদে মিলন-বৈঠকের অধিবেশন হইবে স্থির হয়। এই মিলন-বৈঠকের আবশ্যকতা সকলেই তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা না হওয়ায় দুই দুইটা গোলটেবিলের বৈঠক ব্যর্থ হইয়া গেল। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের বন্দোবস্ত হইয়াছে বটে, নিমন্ত্রিত সদস্যগণ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন বটে, আগামী শাসন-সংস্কারও আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু, ঘরোয়া ভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা না হইয়া গেলে, বিলাতী পার্লামেণ্ট আমাদিগকে যেমন ধরণের শাসন পদ্ধতিই প্রদান করুন না কেন, উহা যে কার্য্যকরী হইবে না তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন।

মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশন সমগ্র বিশ্বে একটা অসাধারণ ঘটনা। এই ঘটনায় সমগ্র জগতের উপর দিয়া একটা ভাবের বন্যা বহিয়া যায়। এই ভাব-তরঙ্গ বৃথা হয় নাই—ভারতের আপামর সাধারণ সকলেরই মনে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসার প্রয়োজনীয়তার কথা জাগিয়াছিল। তাহার অভিব্যক্তি স্বরূপ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী, মৌলানা সৌকত আলি, প্রমুখ সমগ্র ভারতের বিভিন্ন মতবাদের পরিপোষক নেতৃগণ মিলিত হইয়া প্রয়াগধামে এই মিলন-বৈঠকের বন্দোবস্ত করেন। তৎপূর্ব্বেই মুসলমান সমাজের সকল দলের সকল মতের নেতারা লক্ষ্ণৌ নগরে সমবেত হইয়া আপনাদিগের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা করিয়া লইয়াছিলেন। কারণ, পূর্ব্বেই মহাত্মাজী বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন দলের ও মতের মুসলমানরা আপনাদের মতভেদের নিরাকরণ করিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত একটা প্রস্তাব খাড়া করিতে পারিলে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তিনি উহা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবেন। এক্ষণে লক্ষ্ণৌ

মিলন-বৈঠকে বিভিন্ন দলের মুসলমানগণের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা হইয়া যাওয়ায়, এলাহাবাদের মিলন-বৈঠকের কার্য্য অনেকটা সরল হইয়া আসে।

গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণীক্ষেত্রে মহা পুণ্যতীর্থ প্রয়াগ-ধামে মেয়ো হলে হিন্দু-মুসলমান-শিখ এই তিন সম্প্রদায়ের শতাধিক প্রতিনিধি গত ১লা নবেম্বর হইতে মিলিত হইয়া যে বৈঠকের অধিবেশন করিতেছেন, অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, সফলতার পথে তাহা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই মিলন বৈঠকে প্রধান আলোচ্য ছিল তিনটি বিষয়—বাঙ্গলা, পঞ্জাব ও সিন্ধুর সমস্যা। শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘব আচারিয়ার সভাপতিত্বে কয়েক দিবসব্যাপী আলোচনার ফলে বাঙ্গলা ও পঞ্জাবের সমস্যার একরূপ মীমাংসা হইয়াছে। বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমানগণ গত ৭ই নবেম্বর সোমবার সম্মিলিত ভাবে চুক্তি করিয়া একটি প্রস্তাব মিলন-বৈঠকের সভাপতির নিকট পেশ করেন। এই প্রস্তাবে শতকরা ৫১টি অর্থাৎ মোট ১২৭টি পদ মুসলমানগণকে, এবং শতকরা ৪৯·৭টি অর্থাৎ মোট ১১২টি পদ হিন্দুগণকে দেওয়া হইয়াছে। বাকী ১১টি পদের মধ্যে ৭টি দেওয়া হইয়াছে ইয়োরোপীয়ানদিগকে, ২টি ভারতীয় খৃষ্টীয়ান-দিগকে এবং ২টি এ্যাংলোইণ্ডিয়ানদিগকে। বাঙ্গলার প্রবাসী শিখগণ ১টি পদের দাবী করেন। ইহার এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, সিন্ধু সম্বন্ধে তাঁহাদের সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া গেলে শিখরা বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিত্বের দাবী প্রত্যাহার করিবেন। সুতরাং বাঙ্গলার সমস্যার মীমাংসা একরূপ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। বৈঠকের কার্য্য শেষ না হইতেই সম্মিলনীর অন্যতম উদ্যোক্তা ও নেতা মৌলানা সৌকত আলি ইংল্যাণ্ড হইয়া আমেরিকায় প্রচার কার্য্যে গমন করিবার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। যাত্রাকালে তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, বৈঠকের কয়েক দিনের আলোচনায় যোগদান করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, এই মিলন-বৈঠক সুযুক্ত হইবেই। এইরূপ আশান্বিত হইয়াই তিনি বৈঠকের মাঝখানেই, আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া, অনিবার্য্য কারণে আমেরিকায় যাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

সিন্ধু-প্রদেশের প্রধান সমস্যা সিন্ধু-বিচ্ছেদ লইয়া। মুসলমানগণ সিন্ধু দেশকে বিচ্ছিন্ন করিবার পক্ষপাতী। হিন্দুরা প্রথমে তাহাতে আপত্তি করেন এই বলিয়া যে, সিন্ধুর নিজের আয়ে উহার শাসনব্যয় কুলাইবে না। এই অতিরিক্ত ব্যয় কে দিবে? তাঁহারা বলেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে সিন্ধু বিচ্ছেদে তাঁহাদের আপত্তি নাই। মুসলমানরা বলেন, সিন্ধু বিচ্ছেদের সম্পর্কে এরূপ সর্ত্তের কোন প্রয়োজন নাই। বিনা সর্ত্তেই সিন্ধু বিচ্ছেদে সম্মতি দিতে হইবে। সর্ব্বশেষে এইরূপ একটা মীমাংসা হয় যে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সমভাবে সিন্ধুর শাসন-ব্যয় বহন করিবেন। এই মীমাংসা অবশ্য চূড়ান্ত মীমাংসা নহে—আপাততঃ ইহা পরীক্ষাধীন রাখিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু তাহাতেও গোলযোগ মিটে নাই। পরে আবার প্রস্তাব হয় যে, শাসনব্যয় নির্ব্বাহ সম্বন্ধে সিন্ধুদেশ স্বাবলম্বী হইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিবার ভার একটি কমিটির উপর অর্পণ করা হইবে। সিন্ধুর অধিবাসীরা কমিটির রিপোর্ট মঞ্জুর করিলে ১৫ দিনের মধ্যে উহা লণ্ডনে তৃতীয় গোলটেবিলের বৈঠকে উপস্থিত করা হইবে। এই প্রস্তাবটা না কি সিন্ধুর হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-দিগের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। তবে ইহা প্রস্তাব মাত্র—কোনরূপ চূড়ান্ত মীমাংসা নহে।

বিগত ৯ই নবেম্বর বুধবারের বৈঠকে একটি কাজের মত কাজ হয়। ঐক্য সম্মেলন কমিটি দশ ঘণ্টা ধরিয়া পঞ্জাব সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হন, এবং সরকারীভাবে সে কথা এইভাবে প্রকাশ করেন যে, অদ্য সমস্ত দিন পঞ্জাব সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি। ইহার দ্বারা সম্মেলনের এক অংশের সমস্যার সমাধান হইয়াছে। কিরূপ ভাবে সমাধান হইয়াছে, কমিটি তাহা এখনও প্রকাশ করেন নাই। ইহার পর বাকী আছে অন্যান্য প্রদেশে সংখ্যা লঘিষ্ঠদের সম্বন্ধে এবং সিন্ধু বিচ্ছেদ সম্বন্ধে আলোচনা। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, কমিটির অধিবেশন আরও কয়েক দিন ধরিয়া চলিবে। তাহার পর মিলন-বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে কমিটির সিদ্ধান্তগুলির আলোচনা হইয়া চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে।

মৈত্রী সম্মেলনের পূর্ণ বৈঠক বোধ হয় এলাহাবাদে হইবে না—খুব সম্ভবতঃ দিল্লীতে হইবে; কারণ, সদস্যগণের অধিকাংশই দিল্লীতে গমন করিয়াছেন।

মিলন-বৈঠকে আর কিছু না হউক, একটা শুভ লক্ষণ দেখা গিয়াছে। অধিকার-অনধিকার, সাম্প্রদায়িক সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি বিষয়ে মতভেদ যতই থাকুক —এবং সে মতভেদ দূরীকরণের সম্ভাবনা যতই কম হউক—একটা বিষয় বেশ সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে—যত বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম্ম ও দলভুক্ত ব্যক্তি এই সম্মেলনে যোগ দান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একই ভাব-প্রণোদিত হইয়া সম্মেলনে গিয়াছেন—মীমাংসা ও মিলন সকলেরই আন্তরিক অভিপ্রায়। এবং এই মিলন সাধনে বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অন্তরের সহিত মিলনকামী হইয়াই তিনি এলাহাবাদে সকলকে সমবেত করিয়াছেন। এই মিলন-প্রচেষ্টা যদি সফল হয়—এবং তাহার সম্ভাবনাই পনেরো আনা—তাহা হইলে তাহার গৌরব সর্ব্বাগ্রে মালব্যজীরই প্রাপ্য। যদিই নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে মিলন-বৈঠক ব্যর্থই হয়—যদিও সে আশঙ্কা খুবই কম—তাহা হইলে ব্যর্থতার ব্যথাটা বাজিবে তাঁহারই বুকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে।

কিন্তু—এত সুলক্ষণের পরেও আবার একটা কিন্তু আছে। বাঙ্গলার সম্বন্ধে যে মীমাংসা হইয়াছে—বাঙ্গলার মিঃ গজনবী ও তাঁহার দল ইহাতে সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবার জন্য লণ্ডন যাত্রার প্রাক্কালে মিঃ এ, এইচ, গজনবী কোন সাংবাদিকের নিকট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হউক, সকলে মিলিয়া একতাসূত্রে আবদ্ধ হউন, এ বিষয়ে আমার আগ্রহ অপর কাহারও অপেক্ষা অল্প নহে। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে এলাহাবাদ বৈঠকে যে ভাবে কাজ চলিতেছে, তাহাতে একতার পথ প্রশস্ত হইবে না। কারণ, এলাহাবাদে যাঁহারা মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কথা দিবার অধিকারী নহেন।

বাঙ্গলার সমস্যার যে ভাবে সমাধান করা হইয়াছে তাহাতে আর এক দিক হইতেও গোল বাধিবার একটু আশঙ্কা আছে। প্রধান মন্ত্রীমহাশয় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে ইয়োরোপীয়ানদিগকে ১১টি পদ দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। মিলন বৈঠকে ইয়োরোপীয়ানদিগকে ৪টি পদ কম দিয়া সেই চারিটি পদ ভারতীয় খৃষ্টান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগকে দিবার কথা হইয়াছে। ইয়োরোপীয়ানরা এই চারিটি পদ ছাড়িয়া দিবেন কি না, এবং কেনই বা দিবেন—ইহাও এক সমস্যা।

ইয়োরোপীয়ানদিগকে চারিটি পদ ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিবে কে? কোন্ সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে এই চারিটি পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে? মিলন-বৈঠকের কমিটি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই। কাজেই মনে হয়, বাঙ্গলার সমস্যার সমাধান হইলেও একটু খুঁত থাকিয়া গেল। সে যাহাই হউক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে মিলন-বৈঠকের সাফল্য কামনা করি।

পরলোকে গোলাপলাল ঘোষ—

সুপ্রসিদ্ধ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র অন্যতম কর্ণধার, আমাদের পরম বন্ধু, অক্লান্তকর্ম্মী, একনিষ্ঠ সাধক গোলাপলাল ঘোষ মহাশয়ের পরলোক-গমনে আমরা নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। যাঁহারা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা, সেই চিরস্মরণীয় ধর্ম্মপ্রাণ শিশিরকুমার ও মতিলালের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন গোলাপলাল। একে একে বিধির বিধানে আর সকলেই পরলোকগত হইলে একমাত্র গোলাপলালই জীবিত থাকিয়া পত্রিকা সম্পাদন ও অন্যান্য সমস্ত কার্য্য করিতেন। বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর ৭২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগত হইলেন। গোলাপলালের মনে কোন দিন আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব উদিত হয় নাই, তিনি অন্তরালে থাকিয়া কর্ত্তব্যসম্পাদন করিতে ভালবাসিতেন; কিন্তু, যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই এই জ্ঞানগরিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ম্মশ্রেষ্ঠ, মহানুভব ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। গোলাপলালের পরলোকগমনে এ দেশের সংবাদপত্র-সেবকগণের মধ্যে যে স্থান শূন্য হইল, তাহা আর পূর্ণ হইবে না। শ্রীভগবান গোলাপলালের আত্মীয়-স্বজনগণের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

যদুনাথ মজুমদারের পরলোকগমন—

যশোহরের প্রবীণ জননায়ক, দেশমাতার অকৃত্রিম সেবক, প্রগাঢ় পণ্ডিত যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচস্পতি সি-আই-ই মহোদয়ের পরলোকগমন সংবাদে আমরা বিশেষ শোকার্ত্ত হইয়াছি। যদুবাবু পূজার ছুটীতে তাঁহার জমিদারী-কাছারী রাজপাট পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সেখানেই ২৪শে অক্টোবর তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা স্বদেশ-সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, যদুনাথ তাঁহাদের অন্যতম। যশোহর জেলার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, যশোহরের জেলা বোর্ড, মিউনিসিপালিটী, এক কথায় বলিতে গেলে দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল; হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার অভাব আর এ দেশে পূর্ণ হইবে না। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্র কন্যা ও অসংখ্য আত্মীয়বন্ধুগণের এই গভীর শোকে আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

নিখিলনাথের সস্ত্রীক দেহাবসান—

'ভারতবর্ষে'র সুপ্রতিষ্ঠ লেখক, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, আমাদের সোদরোপম স্নেহভাজন নিখিলনাথ রায় বি-এল আর ইহজগতে নাই; বিগত ১৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার প্রাতঃকালে আটটা পাঁচ মিনিটে তাঁহার ও তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর আটটা কুড়ি মিনিটে—কয়েক মিনিট অগ্রপশ্চাৎ দেহাবসান হইয়াছে। নিখিল এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী একই সঙ্গে কয়েক দিন পূর্ব্বে জ্বরে আক্রান্ত হন। সেই জ্বরেই শুক্রবার প্রাতঃকালে নিখিল দেহত্যাগ করেন; তাহার কয়েক মিনিট পরেই তাঁহার সহধর্ম্মিণী পতির অনুগমন করেন,—সাধ্বী মহিলার বৈধব্যভোগ পনর মিনিট মাত্র হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণের নিকট নিখিলনাথের পরিচয় দিতে হইবে না; স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত একই সময়ে নিখিলনাথ মুরশিদাবাদের ইতিহাস লেখেন। তাহার পর এই সুদীর্ঘ কাল তিনি ঐতিহাসিক গবেষণা ও সাহিত্যালোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান ত্রিদিবনাথকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব; একই সঙ্গে পিতা ও মাতার বিয়োগে তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। ভগবান তাঁহার হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।



পরলোকে—নিখিলনাথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত উপন্যাস "তরুণী ভার্য্যা"—২৲

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অস্তাচল"—১৷৽

শ্রীরামেন্দু দত্ত প্রণীত গান ও স্বরলিপি "মঞ্জরী"—১৷৽

শ্রীরামেন্দু দত্ত প্রণীত গল্পের বই "রসায়ন"—১৲

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ছেলেদের গল্পের বই "ছোটদের গল্প গুচ্ছ"—১৷৽

শ্রীগিরিজাকুমার বসু ও শ্রীসুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত ছেলেদের গল্পের বই "ছোটদের গল্প সঙ্কলন"—১৷৽

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর প্রণীত পৌরাণিক উপাখ্যান "লক্ষেশ্বর"—৷৶৽

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মুক্তি"—১৷৷৽

শ্রীভোলানাথ রায় কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত নাটক "অজাতশত্রু"—১৷৽

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য-লহরী উপন্যাস মালার অন্তর্ভুক্ত "বন্দী সম্রাট" ও "বুড়ো আঙুলের ছাপ" প্রত্যেকখানি—৷৷৽

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত নাটক "মেঘনাদ-বধ বা লক্ষ্মণের শক্তি-শেল"—১৷৽

শ্রীবিমলা দেবী প্রণীত উপন্যাস "মীমাংসা"—১৲

শ্রীমণিভূষণ বাগচি প্রণীত জীবনী "ভারতের সাধনা—বিজয়কৃষ্ণ"—১৲

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা বি-এ প্রণীত উপন্যাস "মিলন-প্রতীক্ষা"—১৲

শ্রীপরাগরঞ্জন দে প্রণীত ভ্রমণ কাহিনী "পদব্রজে পেশোয়ার যাত্রী"—১৷৽

শ্রীযতীন সাহা প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই "চিচিং ফাঁক" ও "যাদুকর"; প্রত্যেকখানি—৷৽

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই "ধাঁধার উত্তর"—১৷৽

শ্রীসতীন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত গল্পের বই "হেঁয়ালী"—১৲

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত কৃষ্ণযাত্রা "নিমাই-কীর্ত্তন পদাবলী"—১৲

কাজি নজরুল ইসলাম প্রণীত গানের বই "সুর-সাকী"—১৷৽

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত "যোগবিজ্ঞান সহ উপাসনা তত্ত্ব দ্বিতীয় ভাগ বা পুরশ্চরণ প্রদীপ"—১৷৽

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "দিবাস্বপ্ন"—২৲

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত খণ্ডকাব্য "নৈশ জ্যোৎস্না"—৷৽

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "অকাল বসন্ত"—২৲

শ্রীআশুতোষ সান্যাল প্রণীত হাস্য রসাত্মক ভ্রমণ বৃত্তান্ত "জগাখিচুড়ী"—১৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে ষাণ্মাষিক গ্রাহকদিগের মধ্যে যাঁহার টাকা না পাইব, তাঁহাকে পৌষ সংখ্যা আমরা পরবর্ত্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃ করিয়া পাঠাইব। গ্রাহক নম্বরসহ টাকা মণিঅর্ডার করিলে, ৩৶৽ আনা ভিঃ পিঃতে ৩৷৽ পাঠাইবেন।

যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান অনুগ্রহ করিয়া ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিলে বাধিত হইব।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRA NATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

বিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়,—অগ্রহায়ণ,—১৩৩৯

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রামক—লেখসূচি

চিত্রসূচি

আষাঢ়—১৩৩৯

বহুবর্ণ-চিত্র

শ্রাবণ—১৩৩৯

বহুবর্ণ চিত্র

ভাদ্র—১৩৩৯

বহুবর্ণ চিত্র

আশ্বিন—১৩৩৯

বহুবর্ণ চিত্র

কার্ত্তিক—১৩৩৯

বহুবর্ণ চিত্র

অগ্রহায়ণ—১৩৩৯

বহুবর্ণ চিত্র



নারায়ণ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত [illegible] চক্রবর্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works